সাপ্তাহিক
# সুমতী

হারা, স্বজনহারা এরা
সীমান্ত পেরিয়ে চলেছে
দণ্ডকারণ্যের পথে।

শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৪ ফাল্গুন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • February 20, 1964 • Vol. 68, No.

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

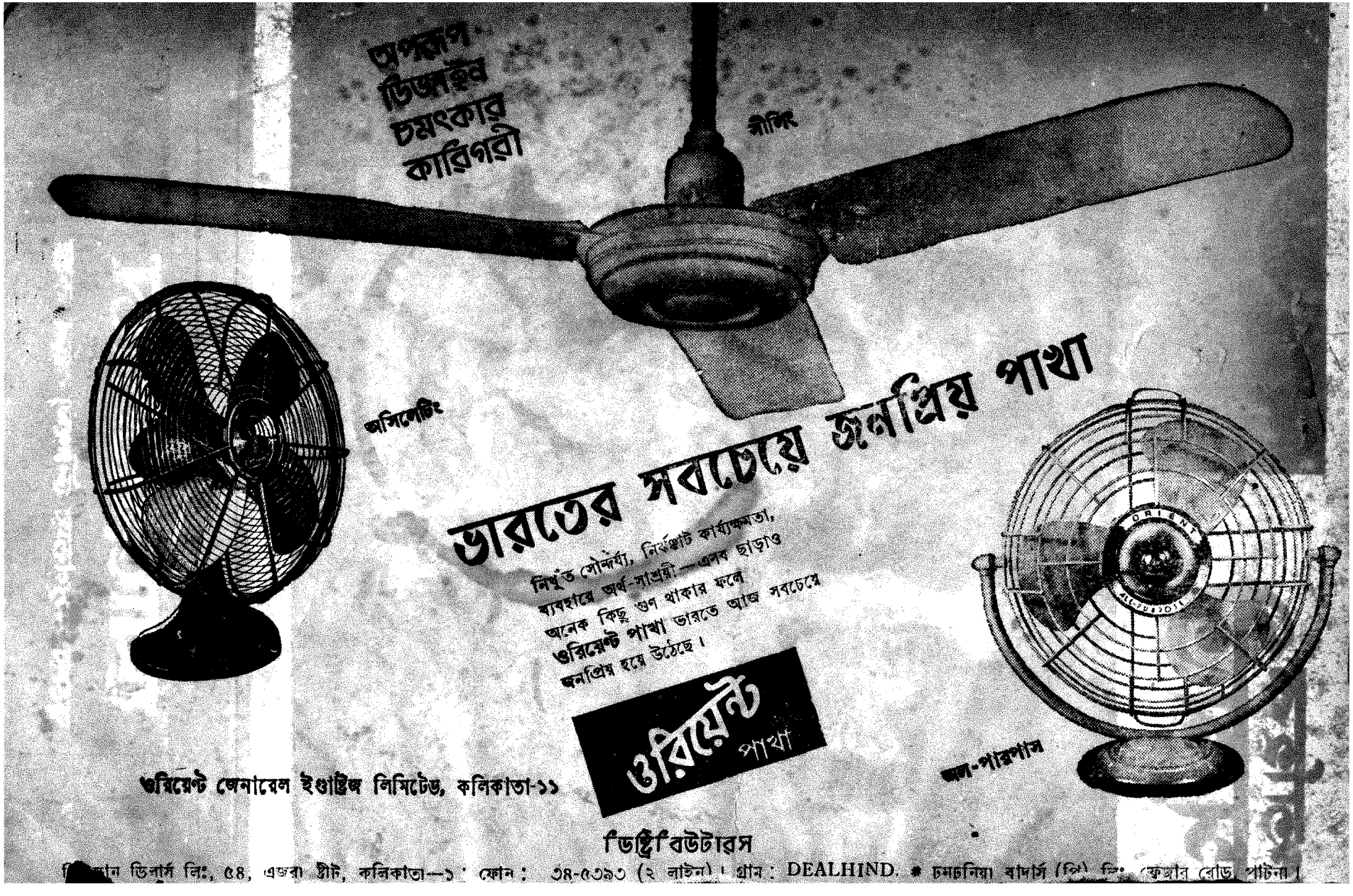
অপরূপ
ডিজাইন
চমৎকার
কারিগরী
সীলিং
অসিলেটিং
ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা
নিখুঁত সৌন্দর্য্য, নির্ভুল কার্য্যক্ষমতা,
ব্যবহারে অর্থ-সাশ্রয়ী—এসব ছাড়াও
অনেক কিছু গুণ থাকার ফলে
ওরিয়েন্ট পাখা ভারতে আজ সবচেয়ে
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
ওরিয়েন্ট
পাখা
জল-পারপাস
ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, কলিকাতা-১১
ডিষ্ট্রিবিউটারস
ডিলার্স লিঃ, ৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ ফোন : ৩৪-৫৩৯৩ (২ লাইন) । গ্রাম : DEALHIND. * চমনলিয়া বাদার্স (প্রা) লিঃ, ফেজার রোড, পাটনা।

# সূচীপত্র

756.3
.003/3
Y8.68
no.39


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২১২৩ |
| আজকের মানুষ | ... | ২১২৪ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২১২৫ |
| লণ্ডনের চিঠি | অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২১২৯ |
| কল্পিত প্রত্যয় ( কবিতা ) | সন্তোষ মুখোপাধ্যায় | ২১৩১ |
| নির্জন অন্ধকারের কবিতা ( কবিতা ) | বঙ্কিম মাহাত | ২১৩১ |
| অনন্ত আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২১৩২ |
| জ্যোতির্ময় ( গল্প ) | প্রভাত দেব সরকার | ২১৩৭ |
| পৃথুমালিনী কথা ( রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২১৪২ |
| শহর কলকাতা ... | শ্রীপদাতিক | ২১৪৬ |



প্রকাশিত হইতেছে !! প্রকাশিত হইতেছে !!

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রাজভাষা

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০
( প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে )

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]
( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

অনামধন্য কথাশিল্পী
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাবলী
স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),
দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০
শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
ধনুর্ব্বেদ
( কোদণ্ড-মণ্ডনম্ )
মূল্য আট আনা
অহল্যা উপাখ্যান ১৲
( হিন্দুজাতির পতনের কারণ ও তাহার
পুনরুদ্ধারের উপায় )
বৈরাগ্যশতকম্ ৵০
নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা
( নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরমায়ু নিরূপণ )
মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২২৫০ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২১৫৩ |
| দুরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২১৫৪ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালিপি | ২১৫৭ |
| নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী | দেবনারায়ণ গুপ্ত | ২১৫৮ |
| নিঃশব্দ তুষারে ঢেউ ( প্রবন্ধ ) | আর্যদেব | ২১৫৯ |
| ভারত দর্শন | .. | ২১৬২ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২১৬৬ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২১৭১ |
| খেয়াধূলা | ... | ২১৭৫ |



রঙ্গসুগের বিপ্লবী গুরু

**উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

নির্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

**বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী**

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহাভিসার, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসসম্রাট

**অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

**বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী**

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

**বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী**

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

**যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী**

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

**শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬৮ বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৭ই ফাল্গুন ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 20th February 1964

# বৃটিশ সরকারের কারসাজি

স্বস্তি পরিষদে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভু। নির্লজ্জভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। কিন্তু সেই বিষোদ্গারে যে কেউ কেউ খুশি হবেন, এমন আশা আমরা আগে থেকেই করেছিলাম। কেন না, সত্যের খাতিরে কথা বলার মতো সৎসাহস খুব কম লোকেরই থাকে। স্বার্থ যেখানে বৃহৎ আকারে দেখা দেয়, সেখানে দালালী করাই হয়তো কারো কারো পক্ষে শোভন বলে মনে হয়। একথা ঠিক, স্বাধীন এই উপমহাদেশের মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদ নিপাত গেলেও, সাম্রাজ্যবাদের দালালগুলি এখনো শকুনির মতো অপেক্ষা করছে। তাই দেখা গেল, স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কে বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন যে বক্তৃতা দিলেন তা শুধুমাত্র পাকিস্তান ঘেঁষাই নয়, এই উপমহাদেশের দিকে কোনো একটা অছিলায় পক্ষবিস্তারের জঘন্য প্রচেষ্টাও বটে।

পাকিস্তানের সঙ্গে বৃটিশ সরকার অবশ্য সামরিক জোটে বাঁধা। সুতরাং পাকিস্তানের প্রতি দরদটা সহজবোধ্য। স্বার্থও সেখানে রয়েছে প্রচুর। কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বৃটিশ সরকার কমনওয়েলথের বন্ধনে বাঁধা থাকলেও স্বার্থ সেখানে কখনোই নিরাপদ নয়। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রকে যেন তেন প্রকারেণ জব্দ করে একটা মানসিক আধিপত্য বজায় রাখাই বৃটিশ সরকারের কাম্য। তা নইলে ডীন সাহেবের মুখ দিয়ে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের কথা বলা ও পূর্ব পাকিস্তানে সুপরিকল্পিত হিন্দুহত্যার কাহিনী (যার একটা মামুলি হিসেব দিয়েছেন একজন বিদেশী নার্স) বেমালুম চেপে যাওয়া সম্ভব হোত না। যাই হোক বৃটিশ সরকারের এই ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের একটা শিক্ষা হোল। বৃটিশ সরকারের প্রতি আমাদের দরদ না থাকলেও এতোদিন একটা আস্থা বা বিশ্বাস আমরা স্থাপন করে এসেছিলাম, যদিও সেই বিশ্বাস স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েকটি ঘটনায় 'নড়েচড়ে' উঠলেও আমরা আস্থা বজায় রেখেছিলাম। কিন্তু বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উচিত, বৃটিশ সরকারের যাবতীয় কারসাজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুনভাবে চিন্তা করা।

রাষ্ট্রসংঘে অবশ্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী এম সি চাগলা কূটনৈতিক আচরণে বৃটিশ সরকারকে একটা রীতিমত শিক্ষা দিয়েছেন। বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন পাকিস্তানের পক্ষে খবর্দারী করার পর শ্রীচাগলাকে একটি সান্ধ্য-ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। শ্রীচাগলা ঘৃণার সঙ্গে সেই ভোজ প্রত্যাখ্যান করে ভারতের সম্মান ও সততাকে যে ভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন তা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তুলনা-বিহীন। শ্রীচাগলার মধ্য দিয়ে ভারতের যে আদর্শ প্রতিফলিত হোল, তা থেকে আমরা ভবিষ্যতে যেন বিচ্যুত না হই। পরাধীন ভারতে বৃটিশ সরকার নির্মম অত্যাচার চালিয়েও শেষ পর্যন্ত সত্যের কাছে হার স্বীকার করেছিল, স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরের গায়ে আমুবের বিষোদ্গারে সহায়তা করতে গিয়ে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এবার পরাজয় বরণ করলো। আমাদের প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কি বিপথে পা দেবেন?

সম্পাদকীয়

# আমাদের মানুষ

প্রতিষ্ঠার অনড় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েও যে মানুষ আত্ম-মর্যাদার স্বার্থে পদমর্যাদার প্রলোভনকে অস্বীকার করে সে বড় সহজ মানুষ নয়। আত্মসম্মান ও মনোবলের আশ্চর্য সাযুজ্যে সে মানুষ শ্রদ্ধার্হ। তার চরিত্র অনিন্দ্য। নিজের ব্যক্তিত্বের কাছে সেই অঙ্গীকার পালন করেই অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি আজকের বহু আলোচিত মানুষ। সিগ্ধদর্শন শান্ত নয়ন সঞ্জীব রেড্ডি। কিন্তু ন্যায়ের সম্মান রক্ষায় তাই তীক্ষ্ণ, দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে। এই বিরল বৈপরীত্য নিয়েই শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি এতদিন আমাদের শ্রদ্ধা আহরণ ক'রে আছেন। সম্প্রতি অন্ধ্রে পরিবহণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন। যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ তাঁকে রাষ্ট্র-জগতে বহুবিধ দুর্লভ সম্মান এনে দিয়েছে সেই ব্যক্তিত্বেরই স্ফূরণ আত্মঅবমাননার ক্ষেত্রে সে সম্মানকে অগ্রাহ্য করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি। সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত তাঁর সাথে সমস্ত মন্ত্রী-পরিষদকেই দায়ী করেছিল। তথাচ রাজ্যের প্রধান কর্ণধার হিসেবে নিজে পদত্যাগের ইচ্ছা জানিয়ে তাঁর নির্লোভ মহত্বের প্রমাণ করেছেন নিঃসংশয়ে। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীনও তাঁর এই দৃঢ় ভূমিকা আমাদের শ্লথগতির রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছে। জনসাধারণের মনে সঞ্চার করেছে আশার। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন কোনও কংগ্রেসের কর্মকর্তাই একাদিক্রমে দশ বছরের বেশি একই পদদায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। বলাবাহুল্য সাংগঠনিক সততা আর প্রশাসনিক তৎপরতার জন্য তাঁর এই প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য। পূর্বতন কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডির কল্যাণমূলক ইচ্ছার অঙ্কুরই ফলশ্রুতিতে বুঝি কামরাজ পরিকল্পনার মত বৃহৎ মহীরুহে পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

১৯১৩ সালের যে দিন এই পৃথিবীর আলো তিনি প্রথম দেখেছেন সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান। অনন্তপুরে আর্ট কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। সেই পদে সুনামের সাথে দীর্ঘ দশ বছর ছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে কারাজীবন যাপন করেছেন বহুবার, অনন্তপুর কেন্দ্র থেকে ১৯৪৬ সালে এম-এল-এ নির্বাচিত হন। তারপর মাদ্রাজ কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক, ভারতীয় কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য, মাদ্রাজের গৃহ ও বন বিভাগের সচিব ইত্যাদি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিলে তিলে তাঁর সম্ভাবনার সৌধ গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবেই একদিন জনতার সমর্থনে নির্বাচিত হন অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্যসভা, অন্ধ্র কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টির সদস্য হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৫৫ সাল থেকে বৎসরাধিককাল তিনি অন্ধ্রের উপপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তারপরে ১৯৫৬ সাল থেকে এ-পর্যন্ত তিনি অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব বহন করে এসেছেন। আজ তাঁর আত্মসম্মানকে আহত করেছে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত। সঞ্জীব রেড্ডির মত আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানুষ ঠুনকো পদমর্যাদার জন্য আত্মমর্যাদাকে বিক্রয় করতে পারেন না।

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি

সংবাদপত্রের বিবিধ আলোচনা পড়েই তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর আত্মঅবমাননার জ্বালাই তাঁকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে আলিঙ্গন করবার সাহস দিয়েছে। অনেকে একে 'আবেগের তাড়না' বলে কটাক্ষ করলেও সঞ্জীব রেড্ডির আত্মপ্রত্যয়ের সত্য প্রতিষ্ঠার মূল্য কিছু কমে না। বরং এই দুর্দম তীব্র মর্যাদাবোধের জন্যই সাধারণ মানুষ এই বিরাট ব্যক্তিত্বকে অনাগত ভবিষ্যতের দিনে সংযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। এই তেজস্বী মানুষের কণ্ঠে পরাজয় শুভেচ্ছার বৈজয়ন্তী।

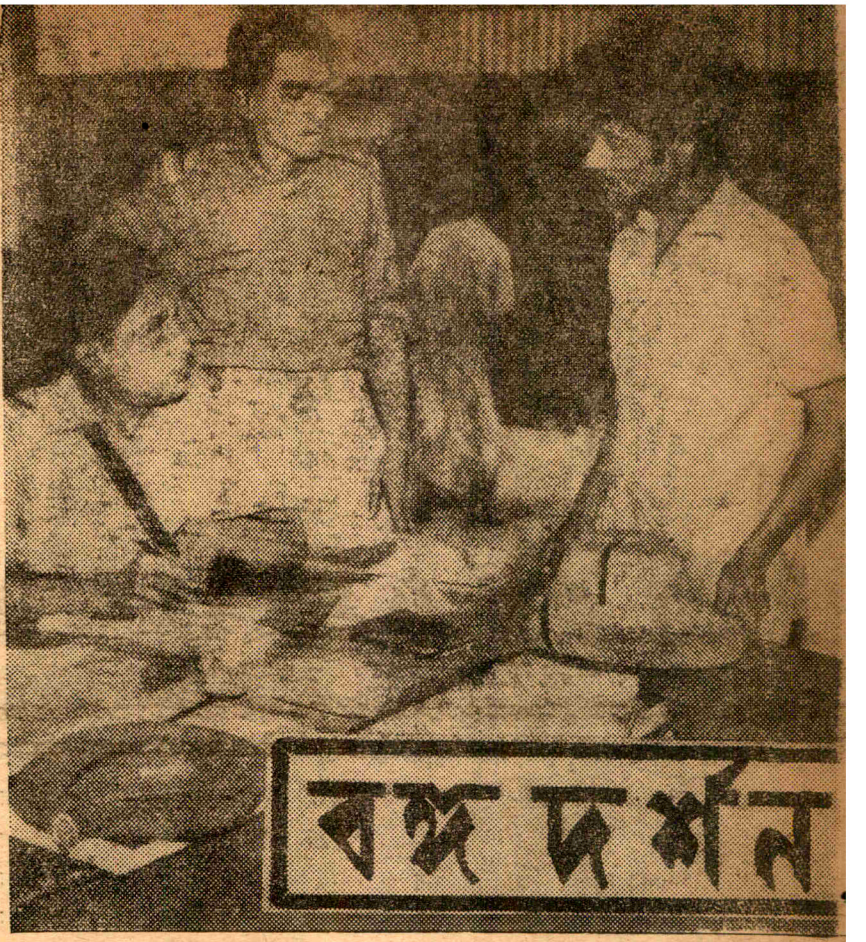


ঢাকার শ্রীবিমল ভট্টাচার্য। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় ইনি বৃদ্ধ পিতা, শিশু-পুত্র, স্ত্রী ও ভগ্নীকে হারিয়েছেন।

**রাজধানী ঃ**

পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মেধকে কেন্দ্র করে সারা পশ্চিমবঙ্গের জনমানস যখন স্তম্ভিত, তপ্ত, আন্দোলিত ঠিক সে সময় রাজধানী কলকাতায় বিধান সভা ও বিধান পরিষদের অধিবেশন সুরু হয়েছে। শীতকালীন এই বাজেট অধিবেশনে তাই এবার বিক্ষুব্ধ জনচেতনার আন্দোলিত কণ্ঠকেই বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যপালের ভাষণে এবার জাগ্রত জনমতের গভীর স্পর্শই আশা করেছিলেন বিধান সভার বিরোধী সদস্যবৃন্দ। কিন্তু রাজ্যপালের নিরুত্তাপ ভাষণ শুধু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্বন্ধে সীমায়িত হয়ে একচক্ষু হরিণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সীমান্ত অতিক্রমকারী মানবতার উচ্চাদর্শে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মতো রাজ্যপালের ভাষণ হৃদয়াবেগ তথা তথ্যসমৃদ্ধ আবেদনে আপ্লুত হয় নি। তাই বিধান সভাকক্ষে যেমন বিরোধী ও কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য হতাশ হয়েছেন, তেমনি দেশের সাধারণ মানুষ রাজ্যপালের ভাষণে নিরাশ হয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের কয়েক হাজার বাঙালী হিন্দু যখন পাকিস্তানী জল্লাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালী যখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হারিয়ে নূতন ইহুদীতে পরিণত হয়েছেন, পূর্ববঙ্গে বাঙালী নরনারীর মান-ইজ্জত যখন বিপন্ন, লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের ভারতে চলে আসার পথও যখন রুদ্ধপ্রায়, তখন রাজ্যপালের ভাষণে বাঙালীর জাতীয় জীবনের এই গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে কেবলমাত্র দায়সারা গোছের উল্লেখ থাকবে, একথা কে আশা করেছিল? অন্যান্য বছরের মত এ-বছরও শিক্ষা-সমস্যা, বেকার-সমস্যা ইত্যাদির গতানুগতিক উল্লেখ করেই রাজ্যপালের ভাষণ শেষ হবে এ-আশা কেউই করে নি। আজকের দিনে বাঙালীর মন যে সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধানের কথা কি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিন্তা করছেন, তার আভাস রাজ্যপালের বক্তৃতায় থাকবে, এটাই ছিল সকলের আশা। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আইন সভার যুক্ত-অধিবেশনে যে বক্তৃতা রাজ্যপাল দিয়েছেন, তাতে কেবল পূর্ববঙ্গের যশোহর এবং খুলনার হিন্দু-নিধনের উল্লেখ আছে। কিন্তু যশোহর ও খুলনার হত্যাকাণ্ডের চেয়ে ব্যাপকতা এবং বীভৎসতায় বহুগুণ ছাপিয়ে গিয়েছে যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গা তার উল্লেখমাত্রও নেই। এমন অবিশ্বাস্য ঔদাসীন্য সম্ভব হল কি করে? রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে কলকাতা এবং ২৪ পরগণায় দাঙ্গা নিবারণে সরকারী কঠোরতার প্রশংসা করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর মত গভীর মর্মবেদনা যে আর কেউ অনুভব করেন নাই, একথাও সোচ্চার ঘোষণা করেছেন। একথা বলাই বাহুল্য যে, এ দেশে সংখ্যা-লঘুদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি বিপন্ন হোক, কোন দায়িত্বশীল পশ্চিমবঙ্গবাসীই তা চান না। কিন্তু রাজ্যপালের মর্মবেদনা কি কেবল পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকবে? পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা কি পশ্চিমবঙ্গের বহু নাগরিকের অতি নিকট আত্মীয় নয়? সাধারণ মানবিকতার খাতিরেও কি এঁরা রাজ্যপালের মর্মবেদনার একটা ক্ষীণ ভগ্নাংশও পেতে পারেন না?

ভারতের সেকুলারত্ব বিপন্ন না করেও যে কথা ভারতীয় সংসদের অধিবেশনে ডাঃ জাকির হোসেন উল্লেখ করতে পারলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের ভাষণে সেকথা উল্লেখ করা গেল না কেন? কেবল 'সেকুলারত্ব' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মোহ, না, এর পেছনে আরো কোন রহস্য আছে? এই প্রশ্ন লোকের মনেও উঠেছে এবং ওঠবার কারণ রাজ্যপালের ভাষণ কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, শেষ

পর্যন্ত এই ভাষণের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার এবং রাজ্যপালের ভাষণের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। শোনা যাচ্ছে যে বৈঠকে রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে আলোচনা হয় তাতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্যও বেদনা প্রকাশ করে কিছু বক্তব্য বক্তৃতার মধ্যে স্থান দেবার কথা উঠেছিল। কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রীর আপত্তিতে নাকি শেষ অবধি ঐ বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়। এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে তার চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু কল্পনা করা যায় কি? এখানকার সংখ্যালঘুদের ভোট কুড়াবার অতিরিক্ত আগ্রহে যাঁরা পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত মানবতার সমর্থনে কথা বলতেও ভয় পান তাঁদের বাঙালী জনসমাজ কোন্ চোখে দেখবে? কোন্ চোখে তাঁদের দেখা উচিত?

* * *

রাজ্যপালের ভাষণ বিতর্কের পর এবার বিধান সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেদিন বিধান সভায় ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল। এই ঝড়ের আসল কেন্দ্রীভূত বিষয় ছিল গড়িয়ার দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের ছাত্র ভূদেব সেনের পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত অবস্থা। প্রকাশ্য দিবালোকে যে ভাবে ভূদেব সেনকে হত্যা করা হয়েছে, তা বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সম্ভব হতো। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, জননেতা, শিক্ষক এবং অধ্যাপক পুলিশকে দায়ী করেছেন এবং সমস্ত মহল থেকে এই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী হয়েছে। এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমালিকও ভূদেব সেনের মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী তুলেছেন। আমরা আশা করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা হয়তো এই দাবী স্বীকার করে নেবে, কিন্তু আমাদের সে আশা ফলবতী হয় নি। এবারের বিধান সভা অধিবেশনে এই ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে বিরোধী পক্ষ দাবী করলে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে এই প্রস্তাবকে সরাসরি

● রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু

অগ্রাহ্য করে শুধু বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাস দেন, তাতে আমরা বিস্ময়বোধ করছি। স্বাধীন ভারতের একজন ছাত্র তথা নাগরিকের জীবনের মূল্য সম্পর্কে পুলিশ সীমাহীন তাচ্ছিল্যের পরিচয় দিয়েছে। সরকার যেভাবে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, বিভাগীয় তদন্তের অছিলায়, তাতে শুধু বিধান সভার বিরোধী পক্ষরাই সভাকক্ষ ত্যাগ করছেন না---বাংলা দেশের অন্তর থেকে তাঁদের স্মৃতিও ক্রমশ মুছে যাচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে জনমতের আক্রোশও ক্রমশ গভীর হচ্ছে, আশা করি মুখ্যমন্ত্রী তা অনুধাবন করবেন।

গণতন্ত্রী দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ যদি হাতে বন্দুক পেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তবে এই বুলেটে শুধু ভূদেব সেনরাই আত্মবলি দেবে না---দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতও নষ্ট হবে। দেশের গণতান্ত্রিক দাবী পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের কাছে লাঞ্ছিত হলে দেশের সরকার যে ঘড়ির কাঁটা পেছনে ঘুরিয়ে শুধু নিজেদের কবর খুঁড়বেন এক। বোঝবার শক্তিও যদি ক্ষমতাগর্বী নেতৃবৃন্দ হারিয়ে থাকেন তা হলে কে আর তাঁদের বোঝাবে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষের ছুটি নেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়ে গেছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে। শ্রী ঘোষ এক মাসের ছুটি নিয়েছিলেন, তাঁর ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়াতেও তিনি কাজে যোগদান না করায় সেই জল্পনা, সেই সন্দেহ যেন বাংলা দেশের মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। অনেকেই সন্দেহ করছেন যে, শ্রী ঘোষকে উক্ত পদ থেকে কৌশলে অপসারিত করা হয়েছে। শ্রী ঘোষের এই আকস্মিক ছুটির বিষয় নিয়ে সেদিন পুলিশদের বার্ষিক সভায় যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।

আমরা শ্রী ঘোষের পক্ষে ওকালতি করছি না। যদি শ্রী ঘোষের দোষ থাকে, তবে তা তদন্ত সাপেক্ষে বিচার করা হোক। যদি দোষ না থাকে, তবে অযথা খেয়াল-খুশিতে পুলিশের দায়িত্বশীল পদে বহাল কর্মচারীকে কার্য থেকে অপসারিত করলে পুলিশ বিভাগের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে আমরা আত্মকলহ ও দ্বন্দ্বের সংঘাতে দুর্বল করেই তুলবো। আশা করি, সরকার এ বিষয়ে অবহিত হবেন। পুলিশ কমিশনারের মত একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কারও খেয়ালের বশে যেন অপসারিত না করা হয়।

* * *

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নার্সেস হোষ্টেলের একটি মর্মান্তিক চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। যে নার্সদের ওপর অসংখ্য রোগীর জীবন নির্ভর করে সেই নার্সরা আজ তাদের দপ্তরের কাছে কি ভাবে অবহেলিত হচ্ছে তার বিবরণ আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি।

নার্সদের সেবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার, আজকাল নার্সেস হোষ্টেলে তা নেই। খাবার দাবারের ওপর যত্ন নেওয়া আজকাল আর হয় না---তাই পচা মাছ, ঠাণ্ডা ভাতেই নার্সদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এমন কি বার ঘণ্টা সমানে ডিউটি দিয়েও অনেক

সময় নার্সরা বিশ্রাম নেওয়ার সুবিধা পায় না। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাদের পাওনা ছুটি দিতে গাফিলতি করেন,—বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম করলেও তাদের জানানো প্রয়োজনবোধ করেন না। এমন কি পুরো ট্রেনিং না দিয়েই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের পুরো কাজের দায়িত্বে নিযোগ করা হয়—এই অভিযোগও পাওয়া গেছে। এটা শুধু মেডিক্যাল কলেজ নার্সেস হোষ্টেলের কথা নয়—নীলরতন সরকার হাসপাতাল নার্সেস হোষ্টেলে ঠিক এমনি অবস্থাই ঘটে চলেছে দিনের পর দিন। আমরা আশা করবো, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী এ বিষয়ে সজাগ হবেন—নার্স ও শিক্ষার্থীদের মানবতার দৃষ্টিতে দেখে ওদের মনকে সেবার উপযুক্ত করে তুলবেন। শাসন ও স্নেহে, নিয়ম ও প্রযত্নের সাহায্যেই নার্সদের তৈরি করতে হবে। আশা করি এ কথাটা স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির জাতীয়করণের দাবী উঠেছে। এই দাবী যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়-সঙ্গত তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এখন ঘাটতির ভিত্তিতে সাহায্য পেয়ে থাকে। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের যে-হার প্রবর্তিত হয়েছে তাও অনেকাংশে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের প্রায় সমান। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা এক কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রায়ত্ত করবার ক্ষেত্রে যেরূপ বিপুল আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন সরকারকে হতে হয় এক্ষেত্রে সেরূপ অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্বের বোঝাও সরকারকে বহন করতে হবে না। অথচ বিদ্যালয়গুলি সরাসরি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এলে শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক দুরূহ সমস্যারই সমাধান সহজ হয়ে আসবে।

বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার যে ব্যবস্থা চলে আসছে, তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই গলদের প্রধান কারণই হল রাজ্য-সরকারের শিক্ষা বিষয়ে দূরদর্শিতা ও বাস্তব বুদ্ধির অভাব। সরকারের শিক্ষা দপ্তরটি একটি আজব জায়গা। বিভাগীয় সেক্রেটারী হতে সুরু করে সবাই নিজের নিজের পরিকল্পনা রচনা ও বিদ্যা জাহির করতে ব্যস্ত। শিক্ষার কি হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার এঁদের অবকাশ নেই। শিক্ষার ব্যাপারে এই ঔদাসীন্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গ হতে মা সরস্বতী বিদায় নেবার উপক্রম করছেন—বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষকদের করুণায় যারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করে বেরুচ্ছে, জীবনের ক্ষেত্রে তারা বিবেচিত হচ্ছে একেবারে অযোগ্য—


দু' সপ্তাহে নিঃশেষিত

শংকর-এর নতুন ধরণের রচনা **পাত্র-পাত্রী**

২২শে জানুয়ারী প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম-২ ৫০

**চৌরঙ্গী** ১০ম সংস্করণ ১০·০০ • **যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ** ৭ম সংস্করণ ৪·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের — **নিশিপদ্ম** (৪র্থ সং) ৪·০০ • **পাড়ি** (৭ম সং) ৩·৫০ • জরাসন্ধ-র **মসিরেখা** (৩য় সং) ৩·৫০

বনফুলের — **দূরবীন** (২য় সং) ৪·০০ • অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **পরিয়সী গৌরী** (২য় সং) ৪·৫০ • সুবোধ ঘোষের **চিত্তচকোর** (২য় সং) ৩·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের — **অগ্নিমিতা** (২য় সং) ৫·০০ • **রোশনাই** ৪·০০ • বিকর্ণ-র (নারায়ণ সান্যাল) **নৈমিষারণ্য** ৯·৫০

নীলকণ্ঠের — **ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে** (২য় সং) ৩·০০ • স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আজ রাজা কাল ফকির** (২য় সং) ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর — **চন্দন কুঙ্কুম** (২য় সং) ৩·৫০ • মন্মথনাথ রায়ের **সমাজ শিক্ষা প্রসঙ্গ** ৩·৫০

গোরাঙ্গপ্রসাদ বসুর রহস্য উপন্যাস — **গীতা কাপুরের আত্মহত্যা** ৫·০০ • ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের **পকেটমার** (২য় সং) ৫·০০

দিলীপকুমার রায়ের শিষ্যা — **ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী** ৫·০০ • সমরেশ বসুর **জোয়ার ভাটা** (২য় সং) ৩·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের — **অযাত্রায় জয়যাত্রা** ৪·০০ • **দৈনন্দিন** ৩·০০ • দিলীপকুমার রায়ের **দ্বিচারিণী** ২·৭৫

হিমানীশ গোস্বামীর — **বিলিতি বিচিত্রা** ৪·০০ • দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বনহরিণীর সংসার** ৩·৫০

বাক্-সাহিত্য ঃ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের বেকার সমস্যা। জ্ঞানসাধনার পবিত্র অঙ্গন বিদ্যালয়গুলি এখন পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং স্থানীয় রাজনীতির লীলা-নিকেতনে। পরিচালকমণ্ডলীর দলাদলির চাপে শিক্ষক ও ছাত্রগণ জড়িয়ে পড়ছেন। তোয়াজ, তোষামোদ এবং দলাদলির কৌশলে যাঁরা পাকাপোক্ত নন তাঁদের পক্ষে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদে শিক্ষকতা করা যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

নিশুতি রাতে নিদ্রালু চোখে দরজা খোলবার পর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতির নির্দেশে টাইপ করা পদ-ত্যাগপত্রে সই করতে এবং সই না করলে উত্তম-মধ্যম সহ্য করতে পূর্বেও বহু শিক্ষক বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগপত্র সম্ভবত বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে আছে শিক্ষা দপ্তরে এবং পশ্চিম-বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের দপ্তরে। প্রতিকার সত্যিকারের কেও পেয়েছেন বলে জানা নেই।

শিক্ষকদের এই অনিশ্চিত জীবনের কোন সুরাহা করতে হলে বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া শিক্ষা পর্ষতের হাতে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের হতাকর্তার। সময়মত টাকা তুলে না দেওয়ায় বিদ্যালয়-গুলিকে পর্ষৎ সময় মত টাকা দিতেও পারবেন না। ফলে, বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দীর্ঘদিন বাকী পড়ে থাকে। এই দুর্দিনের বাজারে বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের সকাল-সন্ধ্যা গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে শিক্ষকের জীবনযাত্রাও একটু সহজ সরল হবে। শিক্ষার প্রসারে ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি আরও অধিক যত্ন নেবার সুযোগ পাবেন। অবসর গ্রহণের পরও তাঁকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করতে হবে না। শিক্ষার পরিবেশটাই হয়ে উঠবে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে মধুরতর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রকে প্রমোশন না দিলে শিক্ষকদের অভিভাবক, ছাত্র এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের হাতে নির্যাতনের সম্ভাবনাও থাকবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি জাতীয়করণের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের অভিমত কি বলা শক্ত; কারণ এবিষয়ে কোন কথাই তাঁরা

বীভৎস বিভীষিকা পার হয়ে অবশেষে নিরাপদ আশ্রয়ে...

আজ পর্যন্ত উত্থাপন করেন নি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতেই হবে। তা না করতে পারলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গালভরা প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়ণ করবেন। সম্ভব হবে না।

* * *

এবার শীতের মেলা, কলকাতা শিল্পমেলা টালা পার্কে সুরু হয়েছে। এই শিল্পমেলায় সরকারী ও বে-সরকারী পরিকল্পনা কালে দেশের শিল্পোন্নয়নের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মণ্ডপটি শিল্প-চেতনায় ভাস্বর। বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তরুণ ছাত্রদের দ্বারা তৈরি কয়লা-সম্পর্কিত মডেলটি আকর্ষণীয়।

**হাওড়া :**

হাওড়া শহরে বিষাক্ত চোলাই মদ পান ক'রে ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে বাইশজন ব্যক্তি এবং এই সূত্রে একজন রমণীও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সংবাদটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। যে দেশে মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা মদ্যপান আজও বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হয় নি, সে দেশে চোলাই মদের কারবার এত ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করেছে কি ক'রে! অনুমান করা শক্ত নয় যে, এই কারবারে একদল সমাজবিরোধী লোক দিনের পর দিন পয়সা লুটছে অকাতরে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে হাজার হাজার লোক। এমন কি, বিশেষ বিশেষ মহলের স্ত্রীলোকেরাও এই মহামারীরূপ মদ-অভ্যাসের শিকারে পরিণত। সরকার এবং আবগারী পুলিশ চোলাই মদের এই বিপজ্জনক ব্যবসার বিরুদ্ধে সর্বদাই সচেতন—এমন সংবাদ পাওয়া যায়। অথচ তা সত্ত্বেও সমাজদেহের এই দুষ্টক্ষত এমন প্রবল আকার ধারণ করছে—তাতে মনে হয় ব্যাধি বুঝি দুরারোগ্য।

কোনো অভ্যাসই রাতারাতি গ'ড়ে ওঠে না। অতএব এই চোলাই মদের নেশার অভ্যাসও যে দীর্ঘদিনের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই মনে হয় পুলিশ সচেতন হলেও, সম্ভবত খুব সক্রিয় নয়। নচেৎ এ-অভ্যাস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারতো।

আজ সৎ নাগরিকদের প্রতি আমাদের আবেদন, তাঁরা স্বয়ং এবার সচেতন হয়ে এগিয়ে আসুন। পুলিশ যেখানে ব্যর্থ, সেখানে জনসাধারণকেই এর মূলোৎপাটনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে চোলাই মদের প্রতি আসক্ত কিছু লোক দেশের সমগ্র সমাজেই এই কটুগন্ধী ক্ষয়িষ্ণু রোগের প্রসার ঘটিয়ে দেশকে ঠেলে দেবে চিরন্তন অধোযাত্রার পথে। সুতরাং সাবধান!

# লণ্ডনে টি

● বি বি সি টেলিভিশন সেন্টারের বাড়ি

## বি বি সি টেলিভিশন

**অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়**

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন নামটি যেমন গালভরা, তেমনি ওজনে ভারি। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বেতার প্রতিষ্ঠান এই বি বি সি। পৃথিবীর প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় বি বি সি থেকে, আর বি বি সি'র হ'ল রাউণ্ড দি ক্লক সার্ভিস—সমস্ত দিন-রাত্রির পুরো ২৪ ঘণ্টা ধরে বি বি সি'র নানান ভাষার নানা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। বি বি সি থেকে একবার যে নাটক সম্প্রচারিত হয়, তা ইউরোপের কোন দেশে হোক, আমেরিকায় হোক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবেই হবে। বার্নার্ড শ' সম্পর্কে শোনা যায়, শ'কে যখন বি বি সি থেকে প্রথম অনুরোধ জানানো হ'ল যে শ'র নাটক বি বি সি কর্তৃপক্ষ বেতারস্থ করতে চান। শ' ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন, What a fun! It seems to me nonsense, পরে বার্নার্ড শ' দেখতে পেলেন যে, তাঁর নাটকের পাঠকের চাইতে শ্রোতা অনেক, অনেক গুণে বেশি। বি বি সি থেকে শ'র নাটক সম্প্রচারিত হওয়ার ফলে শ্রোতার সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে নাটকের সংখ্যা : মানুষের অনন্তত্ত্বের রীতিই হ'ল লোকে যা কানে শোনে, তা চোখ দিয়ে পড়তে চায়—বার্নার্ড শ'কে পর্যন্ত পরে বেতার প্রচারের অসাধারণ উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর মত পাল্টাতে হয়েছিল।

ইংরেজি সাহিত্যের সাম্প্রতিক কালের আর একজন বিখ্যাত কথাশিল্পী এলগারনন ব্ল্যাকউড-এর কথা ঐ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এলগারনন ব্ল্যাকউড-এর গল্প-উপন্যাসের বই প্রথম ছাপা হয়ে বেরোয় ১৯০৮ সালে, সেই সময়ে ব্ল্যাকউড-এর বই এ দেশের বাজারে তেমন বিক্রি হত না। ব্ল্যাকউডকে বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে লণ্ডনের প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হত। এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে থাকে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে প্রথম ব্ল্যাকউডের গল্প বি বি সি থেকে নাটক আকারে প্রচারিত হওয়া সুরু হয়। বি বি সি থেকে প্রচারিত হওয়ার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্ল্যাকউডের গল্প বিলেতের জনসাধারণের কাছে খুবই আদরণীয় হয়ে উঠলো। হু হু করে কাটতে লাগলো এলগারনন ব্ল্যাকউডের বই। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত এলগারনন ব্ল্যাকউডের একটি অসাধারণ রোমাঞ্চকর বই John Silence পুনঃ প্রকাশিত হ'ল। John Silence-এর একটির পর আর একটি সংস্করণ ছাপা হয়ে হয়ে ক্রমে নিঃশেষিত হতে লাগলো। বহুকাল ধরে অত্যন্ত অজ্ঞাত অপরিচিত লেখক এলগারনন ব্ল্যাকউড রাতারাতি প্রখ্যাতনামা হয়ে উঠলেন। তারপর এল বি বি সি'র টেলিভিশনের যুগ। টেলিভিশনের সুরু হতেই দেখা গেল যে গল্প, যে কাহিনী শুধুমাত্র সাউণ্ড ব্রডকাস্টিংয়ে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে, টেলিভিশনে তা হয় আরও বেশি চমকপ্রদ, আরও বেশি আকর্ষণীয়। টেলিভিশনের আমদানী এদেশের শিল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি সাধন করেছে।

লণ্ডন বি বি সি'তে টেলিভিশন প্রথম সুরু হয় ১৯৩৬ সালের ২রা নভেম্বর। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের বেতারে টেলিভিশন আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে লণ্ডনের বি বি সি'তে প্রথম টেলিভিশন সুরু হয়। লণ্ডন বি বি সি'র টেলিভিশন-ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিপুল এবং এর কার্যক্রমও খুবই বিচিত্র। নানান ধরণের অত্যন্ত বেশি আকর্ষণীয় ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহ প্রতিদিনই পরিবেশন করা হয়ে থাকে বি বি সি টেলিভিশন থেকে। এ-যুগের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিফলন রয়েছে বি বি সি টেলিভিশনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ও প্রয়োগে।

১৯৩৬ সালের ২রা নভেম্বর

বি বি সি টেলিভিশনের কাজ আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই এদেশে টেলিভিশন খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গত মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বি বি সি টেলিভিশনের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে, অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনেক রকম বৈচিত্র্যও এসেছে। কয়েক বছর আগে তাই বি বি সি টেলিভিশন সেণ্টারের জন্য লণ্ডনের লাইম গ্রোভে বিরাট এক বাড়ি তৈরি হয়েছে, টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য অনেকগুলো ষ্টুডিয়োও সেই বাড়িতে রয়েছে। লাইম গ্রোভের এই নতুন বাড়িতে বি বি সি টেলিভিশন সেণ্টারের উদ্বোধন হয় ১৯৬০ সালের জুন মাসে। টেলিভিশনের আধুনিকতম সব যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ এত বড় বড় ষ্টুডিয়ো এবং সকল দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন বিরাট টেলিভিশন কেন্দ্র ইউরোপের আর কোথাও নেই। এই টেলিভিশন সেণ্টারের ষ্টুডিয়োগুলোতে শুধু যে বৃটেনের সর্বত্র সম্প্রচারের জন্য নানান বিচিত্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয় ও তা প্রণয়ন করা হয়, তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেতার টেলিভিশনের ফরমায়েস এবং চাহিদা মেটাবার জন্যও লণ্ডন বি বি সি'র টেলিভিশন সেণ্টারে নানা জাতের টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়ে থাকে।

বি বি সি টেলিভিশন ষ্টুডিয়োর একটি অনুষ্ঠান

পৃথিবীর সত্তরটি বিভিন্ন দেশে এই টেলিভিশন সেণ্টার থেকে অনুষ্ঠান তৈরি করে পাঠানো হয়।

লণ্ডনের টেলিভিশন সেণ্টারের উদ্দেশ্যই হ'ল এমন ধরণের সব টেলিভিশন উপাদান তৈরি করা, যা শুধু আজকের দিনে বা বর্তমান সময়েই প্রদর্শিত হবে না, ভবিষ্যতেও ঐ সব উপাদান যেন সময় বিশেষে প্রদর্শিত হতে পারে। শুধুমাত্র সাদা-কালো ছবির মাধ্যমে প্রদর্শনের জন্যই এই ষ্টুডিয়োগুলোতে উপাদান তৈরি করা হয় না, রঙীন ছবির টেলিভিশনও এখানে তৈরি হয়। ইউরোপের সমস্ত দেশে এবং আমেরিকার সর্বত্র প্রদর্শনের জন্য বিস্তর টেলিভিশন উপাদান প্রতিদিন এই ষ্টুডিয়োগুলোতে তৈরি হচ্ছে।

বি বি সি টেলিভিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল ইলেকট্রনিক পদ্ধতি অনুযায়ী টেলিভিশন উপাদান এই ষ্টুডিয়োগুলোতে তৈরি করা হয়। ষ্টুডিয়োগুলোর ভেতর টেলিভিশনে প্রদর্শনের উপযোগী ফিল্ম তৈরি করা ছাড়াও এইসব ফিল্ম যাতে বাইরে দেখানো সম্ভব হয়, দূর দূর দেশে নিয়ে গিয়ে দেখানো সম্ভব হয়, তার জন্য দীর্ঘ আকারের সব ফিল্ম ষ্ট্রীপ এখানে তৈরি করা হয়। ফিল্মে ব্যবহৃত বক্তৃতা, গান, নাটক, হাসির নক্সা, কৌতুকালেখ্য প্রভৃতি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করে, পরে সেই সব রেকর্ডের হাজার হাজার কপি সাধারণ বাজারে বিক্রয় করার জন্যও রেকর্ডগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

বি বি সি টেলিভিশন সেণ্টার সাড়ে তিন একর জমি জুড়ে অবস্থিত। ওয়েষ্ট মিনষ্টার থেকে লণ্ডন এয়ার পোর্টের মাঝামাঝি জায়গায়। বাড়িটি বৃত্তাকার, বৃত্তের মাঝখানে বিভিন্ন ষ্টুডিয়ো আর অনেকগুলো অফিস ঘর। বৃত্তের ধারটিতে টেলিভিশনে ব্যবহারের জন্য সাজানো সব দৃশ্য—এক নার সিনারি কুক। আর একদিকে

কর্মীদের আহারাদির ব্যবস্থার জন্য রয়েছে রেষ্টুরেণ্ট বুক। টেলিভিশনের বক্তৃতাদি প্রযোজনার জন্য, সাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে ফিল্ম তৈরি করার জন্য, ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতির কল-কারখানা নিয়ে বৈজ্ঞানিক কাজ ও অনুশীলনের জন্য আর একটি স্বতন্ত্র বুক তৈরি হচ্ছে, তার নাম হবে ষ্টাফ বুক। বাড়িটির ঠিক প্রবেশ পথে একটি গোল চত্বর, চত্বরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ৪০ ফুট উঁচু একটি কৃত্রিম ফোয়ারা, ফোয়ারাটির ঠিক ওপরে গ্রীক দেবতা হেলিয়সের ব্রোঞ্জমূর্তি, গ্রীক পুরাণের সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ সূর্য দেবতার নাম হেলিয়স। ফোয়ারার নীচে যে জলাশয়টি রয়েছে, সেই জলাশয়ের দুই ধারে দুইটি অর্ধশয়ান ব্রোঞ্জমূর্তি—একটি মূর্তি শব্দের, আর একটি মূর্তি দৃশ্যের প্রতীক। টেলিভিশন সেণ্টার বাড়ির প্রধান বুকটি সাততলা, ১১০ ফুট উঁচু, পরিধিতে ৫০০ ফুট, লণ্ডনের সুবৃহৎ সেণ্ট পলস্ ক্যাথেড্রেলের যা আয়তন, তার প্রায় দ্বিগুণ আয়তন হ'ল এই বুকটির। এই বুকটিতে অফিসকক্ষ প্রায় চার শত। ঐ চার শত কক্ষে প্রায় তিন হাজার কর্মী কাজ করছে. শিল্পীদের সংখ্যা পাঁচশ' থেকে ছ'শ', শিল্পীদের জন্য প্রসাধন ও সাজগোজ করার ড্রেসিং-রুমও অনেকগুলো। টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রযোজনা করার জন্য চারটি বড় বড় ষ্টুডিয়ো এবং বিচিত্র অনুষ্ঠান-সমূহ রূপায়িত করার জন্য বিরাট এক এলাকাও রয়েছে এই বুকটিতে। সাততলার ওপরে দাঁড়ালে লণ্ডন শহরের বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে। ছ'তলায় রয়েছে শিল্পীদের নির্দেশ দেওয়ার ও শিল্পীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য বড় বড় হলঘর, পাঁচতলায় স্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী : টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি করার জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজন ও ব্যবস্থা প্রত্যেক তলাতেই রয়েছে আলাদা আলাদা ঘরে।

বৃটেনের শতকরা ৯৯ জন লোক প্রতিদিন টেলিভিশন শোনে ও দেখে আর এই বাড়ি থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত অঞ্চলের জন্য টেলিভিশন সম্প্রচারিত হয়। বৃটেনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে এবং ইউরোপের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে বি বি সি টেলিভিশন সেণ্টারের আউটসাইড বুডকাষ্ট পয়েণ্ট আছে, কোথায় কোন্ অঞ্চলে কি ভাবে কি ঘটছে, না ঘটছে তা সঙ্গে সঙ্গে টেলিভাইজ করার জন্য। যেমন ওয়েষ্ট মিনষ্টারে এমনি একটি আউটসাইড বুডকাষ্ট পয়েণ্ট আছে, বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের যাবতীয় ঘটনা, বক্তৃতা, সদস্যদের বাদানুবাদ, তর্ক সঙ্গে সঙ্গে টেলিভাইজ করা হয় ঐ পয়েণ্টটি থেকে। বি বি সি টেলিভিশন সেণ্টারে আছে একটি ইণ্টার ন্যাশনাল কণ্ট্রোল রুম, তার সঙ্গে বিশেষভাবে তৈরি করা একটি ধারাবিবরণী ঘর—ঐ ঘরটি থেকে শত শত মাইল দূরে, হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর কোথায় কখন কি ঘটছে, কি ভাবে ঘটছে সব জানা সম্ভব আধুনিকতম নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার দ্বারা। টেলিভিশনে যে সকল ঘোষক ও ধারাবিবরণী প্রচারকারী ব্যক্তিরা নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে ঐ ঘরটিতে বসে লণ্ডন শহর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর কোন্ দেশে কখন কি ঘটছে, কি ভাবে ঘটছে, তা নিজেরা জেনে নিয়ে নিজ নিজ ভাষায় প্রচার করতে পারেন এবং তাঁরা তা করেও থাকেন।

# কল্পিত-প্রত্যয়

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

বিক্ষত স্মৃতির নৌকা এই মনে—দ্বিতীয় সৈকতে
স্রোতের ভাসান, বিলম্বিত শুদ্ধতায় কান্নার প্রার্থিত-শোকে
সানাইয়ের সুর- - -আমি এক সৌজন্যের বিলম্ব আলোকে
—বিষণ্ণ সুরের মন্ত্রে জেগে আছি যন্ত্রণার ব্রতে।

অথচ তোমরা সব আলোর কিনারে শুয়ে পর্যাপ্ত নিদ্রায়
আমার স্রোতের নৌকা ঠেলে দিয়ে অন্ধকার নীলে—
আশ্চর্য, বিশ্বাসটাকে শেষ-শূন্যে গলা টিপে দিলে
এবং এখন আমি এই দ্বীপে উজ্জ্বল, ব্যথায়।

সব শেষ শূন্যতায় অন্ধকার উদ্যানের নদী
বিশ্বাসে কল্পিত হয়ে বাঁচবো কি শুধু নিরবধি।

# নির্জন অন্ধকারের কবিতা

বাঙ্কম মাহাত

সমগ্র মহুয়া গাছে কী-নির্জন অন্ধকার দ্যাখো
কেমন জড়িয়ে আছে, একটি পাতাও বাকি নেই
সব কোন্ সমুদ্রের তলায় নিঃশেষে নিমজ্জিত;
কোন্ ডালে পাখি আছে, কোন্ ডালে কাঠবেড়ালীরা,
কিছুই সুগম্য নয়, সারা চরাচর চিরায়ত।

আকাশে নক্ষত্র কিছু ব্রীড়া-বিলসিত হাস্যে শুধু
কয়েকটি প্রাণস্পন্দ উজ্জ্বল আবেগে গড়ে তোলে;
খোলা দরোজার পথে ভীরুপদে হাওয়া আসে যায়,
বৈশাখের রাত কাটে, ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই
কখন কোকিল ডাকবে কান পেতে জাগি উৎকণ্ঠিত॥

# অনলা আয়ী

সুশীল রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

শুধু এই একটি বাড়ির কথা না। অনেক বাড়ির হাঁড়ি-হেঁসেলের গল্প ফেঁদে বসলেন কানাগিন্নি ; কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ লাহার ও লালমোহন পালের বাড়ির কথা আজ আর কিছু বললেন না। হয়তো সম্প্রতি সে-বাড়ির নিমক খেয়ে এসেছেন বলেই। দু'দিন বাদে মুখ পানসে হয়ে উঠলেই হয়তো তাদের কথাও উঠবে।

—কি জান কনে-বৌ ? কানাগিন্নি বললেন, মরদের মত মরদ দরকার এক-জন। যে এসে এইসব বুজরুকি ঘুইয়ে দেবে। পরশুও ফরেশডাঙার ঘাটে এক বুড়োর চিতেয় সাতজন বৌকে পুড়ে মরতে হয়েছে। সে মিনসের মেগদাব কি, না, যে কোন কুটির নাকি মুৎসুদ্দি।

চোখ দু'টি বড় বড় করে কানা-গিন্নির চোখের দিকে তাকাল রাধা, তার ওই একটি চোখেই জ্বলছে বুঝি একটি উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ।

নিজের জীবনটা কেমন বিপর্যস্ত আর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে কানাগিন্নির। হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই জীবনের নীচে, আগ্নেয়গিরি বুঝি জ্বলছেই অহর্নিশি ; মাঝে মাঝে তার থেকে তাই এই উদ্‌গার।

এমন ভিখিরির জীবন নিয়ে জন্মান নি তিনি, কিন্তু যে বান্দার একটা উচ্ছৃংখল খামখেয়ালির জন্যে তাঁর জীবন এমন শৃংখল ও শৃংখলা-বিহীন হয়ে গেল, তার কথা মনে পড়ে তাঁর। বেঁচে থেকেও একদিন একটা খবর সে দেয় নি, মরে গিয়েও একটা খবর দিতে পারে নি ; এতখানি যার দারিদ্রের জ্ঞান তাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ। জীয়ন্ত তাদের পেলে বুঝি তাদের তিনি জীয়ন্ত গোর দেন। কিন্তু—

তাঁর কানা চোখটা দিয়েও জল গড়াতে লাগল ; এত হাসিখুশি মানুষ তিনি, তাঁর সমস্ত হাসি গেছে উহ্য হয়ে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কানাগিন্নি বললেন, আমি এখন একটা আপদ। সকলে ঘেন্না করে আমাকে। ভাবে বুঝি, বুড়ি এত ঠাটও জানে। কিন্তু কি করি, শুধু নিশ্বাস নিয়ে আর এঁটো কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচলেই তো মানুষের মত বাঁচা হয় না, বিড়াল-কুকুরেও তো অমনিভাবে বাঁচে।

চাঁপা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কানাগিন্নির কান্না কখনো সে দেখে নি, এ-মানুষটা কাঁদতে জানে বলে জানতও না সে ; কতদিন ধরে তো দেখছে একে।

রাধাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। পাক খেয়ে খেয়ে সেই নাচ ও সেই গান মনে পড়ছে তার। ওই মানুষের মনের মধ্যেও এত দুঃখ আছে, এত কান্না আছে, কে জানত আগে, কে তা ধারণা করেছে ?

—আমি নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু কেন নষ্ট হলাম, কারা নষ্ট করল আমাকে ? যারা আমাকে বেন্না করে তাদের শুধাতে ইচ্ছে করে এই কথা। আরও জানতে ইচ্ছে করে, তারা কোন্ সৎ, তারা কোন্ সতী।

আবার চোখের কোণ পরিষ্কার করলেন কানাগিন্নি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, আমা-দের রক্ষা করে এমন কেউ নেই রে ক'নে-বৌ। পুরুষদের বিশ্বাস করিনে, কোন্ শাস্ত্রে আছে এ সব বিধান জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় ওই হরি বিদ্যালঙ্কারের কাছে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি নাম বললে ?

—হরি বিদ্যেলঙ্কা।

মনে মনে নামটা আওড়াল রাধা। না, আর ভুল হবে না।

—কিন্তু তাকে পাচ্ছি কোথায়। সে যে এখন কাশীতে। হতাশার সুরে বললেন কানাগিন্নি।

না, তাকে চায় না রাধা। শুধু একটা নাম জেনে রাখা মাত্র। অসহায় জীবনে তবু যে ভরসা একজন আছে, এই চিন্তাতেই বুঝি অনেক সান্ত্বনা।

কিন্তু অযথা সন্তুষ্ট না পেয়ে লাভ কি। এই বাংলা দেশের বর্ধমান জেলার একটি বিধবা মেয়ে নিজের চেষ্টায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এমন পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল যে, শাস্ত্র আলোচনায় বড় বড় পুরুষ-পণ্ডিতদেরও হটিয়ে দিয়েছে; কাশীতে গিয়ে চতুষ্পাঠী খুলেছে। এই খবরটুকুই জানেন কানা-গিন্নি। নীলমণি হালদারের বাড়িতে যাতায়াত আছে তাঁর, তাঁর ছেলে নীলরত্ন লেখাপড়া নিয়ে থাকে, সেখানেই বুঝি কানাগিন্নি শুনেছেন হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা। কিন্তু শেষ খবরটি এখনো বুঝি শোনেন নি কানাগিন্নি, মাস কয়েক হল হটী মারা গিয়েছেন কাশীতে।

রাধারও তাই জানা হল না খবরটা, এইজন্যে কেবল ঐ নামটা নিয়ে সে একটা অলীক ভরসায় ভর করে রইল।

কানাগিন্নি আর একটা কামনা জানিয়েছেন, সে কথাটা হয়তো খেয়াল করে নি রাধা। মরদের মত একটা মরদের কথা বলছিলেন কানাগিন্নি। একথা ভালো করে তার কানে গেলে নিশ্চয় সে প্রার্থনা করত তেমনি একটা মরদের জন্যে। শুধু তার নিজের জন্যে না, তার মত আরো কত অসহায় রাধা কত অন্তঃপুরে বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, কত পাষাণপুরীর মধ্যে কতজন বন্দী হয়ে আছে তার কি ঠিক আছে কোনো?

চাঁপা এতক্ষণ বলে নি কথাটা, এবার বলল, লক্ষ্মী বৌ তুমি। লাখ টাকা লটারি পেয়ে গেল বাবু তোমারি দুয়াতের জোরে।

চাঁপা শুনেছে এই শুভসংবাদ। এর জন্যে বহির্বাটীতে উৎসবের ধুম যে পড়ে গেছে একথাও কানে এসেছে তার। লক্ষ্মী আর সরস্বতী ফল বলেছে তাকে খবরটা।

কানাগিন্নির মুখের দিকে চেয়ে চাঁপা বলল, খুশিতে ডগমগ হয়েছেন দাদাবাবু। মদের বন্যে বওয়াচ্ছেন। কিন্তু এ-টাকা কার জান?

কানাগিন্নি জানেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কার?

—গিন্নিমার। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর ভবসুন্দরীকে।

—আমার জিজ্ঞাসা করার দরকার কি বাপু। কত লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা চালাচালি হচ্ছে সংসারে, তাতে আমাদের মত ভিখিরি-দের কি লাভ। হীরে-চুণী-পান্নার জোয়ার বয়ে চলেছে কলকাতায়, কিন্তু গঙ্গায় যে জল সেই জল; তার জোয়ার-ভাঁটায় ঝিলিক বাড়ে নি।

কিন্তু চাঁপার বুঝি গায়ে লেগেছে, সব টাকা গিন্নিমা একা নেবেন কেন? অর্ধেকটা কি পাবে না তার বৌদি?

রাধা বলল, চুপ। টাকা আমি চাইনে বে।

টাকা চায় না রাধারাণী। তার কামনা অন্য। নারীর জীবনের চরম কামনা যা হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। সেই কামনা বুকে লালন করে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে চলেছে সে। এ পাষাণপুরী—ঐশ্বর্যের এ-এক খাজাঞ্চি-খানা হয়ে আছে। এখানে লাখ টাকাই বা কি, কোটি টাকাই বা কি। ঘরে ঘরে সিক্কা টাকার রূপালি আওয়াজ আর মোহরের সোনালি শব্দ বেজে চলেছে রাত্রিদিন। এক লাখ টাকায় কি যায় আসে তার শ্বশুরের? তার বিবাহের উৎসবে কত লাখ টাকা গড়িয়ে গে চুঁচুড়ার পথে, কত লাখ ভেসে গেছে হুগলী নদীর ঐ জলে—তার কি হিসাব আছে কোনো?

কে কত টাকা করতে পেরেছে, নদীর দুই পারে চলেছে বুঝি তারই পাল্লা। হায়, সে-রেষারেষিতে কে জিতল কে হারল সে-খোঁজ নেওয়ার আগে সেইসব মানুষদের অন্দরে অন্দরে উঁকি দিয়ে একবার বুঝি কারো দেখার ইচ্ছে হয় না—কাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।

দিনের পর দিন কাটে চুঁচুড়ার আকাশে। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি নিয়মিত বেজে চলেছে নিয়ত। ধনীদের ধন স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে ক্রমশ।

প্রাণকৃষ্ণ লাহা, লালমোহন পাল, নীলমণি হালদার, মনমোহন কাঞ্জিলাল, ভবতোষ মিত্র—কত নাম আর মুখস্ত করবে রাধা—এই চুঁচুড়ার নামকরা ধনী এঁরা। এঁদের সকলের বাড়িতেই কি অবিকল এই রকম হাহাকার বাজছে? অত বড় নামজাদা বাবু ঐ নীলমণি হাল-দার, শুধু এই চুঁচুড়াতেই না, কল-কাতার ধনী-মহলেও তাঁর খুব কদর—সেখানকার নামজাদা বাবুদের নামের সঙ্গে তাঁর নামও বুঝি যুক্ত, কেবল বুঝি তাঁর বাড়িতে এ হাহা-কার বাজছে না। তাঁর ছেলে নাকি আলাদা জাতের মানুষ—বাবুয়ানির দিকে না ঝুঁকে সে নাকি ঝুঁকেছে লেখাপড়ার দিকে। বিয়েও হয়েছে তার, রাধার বিয়ের কয়েক মাস আগে। কানাগিন্নি বলেন, সে নাকি বই নিয়ে যেমন মত্ত বৌ নিয়েও অনেকটা তেমনি, বই-এর বাই নাকি নেই তার।

রূপনারায়ণ—মনে মনে স্বামীর নাম করলে হয়তো দোষ হয় না, মুখে তো উচ্চারণ করছে না রাধা

—রূপনারায়ণ আর ওই নীলরতন নাকি একবয়সী এবং দু'জন নাকি খুব বন্ধু। এমন বন্ধুত্বের দাম কি, রূপনারায়ণকে যদি ভালো পথে টেনে নিতে নাই পারল, তবে বন্ধু হওয়া কেন?

নীলরতনের বৌ-এর কথা ভেবে হিংসে হয় রাধার। হিংসে হয়, তবু আলাপ করার আগ্রহও হয় খুব। জানতে ইচ্ছে করে, তার স্বামী তাকে কি বলে, কেমন করে বলে। উত্তরে ঐ বৌটিই বা কেমন করে হাসে, কেমন করে মুখ ঢাকে সে লজ্জায়।

কিন্তু কি হবে ছাই পরের সুখের চিন্তা ক'রে নিজের দুঃখ চতুর্গুণ করায়। পাঁচটা বছর অতীত হয়ে গিয়েছে তার বিয়ের পর, পাঁচটা বসন্তের কোকিল পঞ্চমস্বরে কুহুতান তুলেছে বনে-বনান্তরে। চুঁচুড়ার গাছে-গাছে তাদের কুহুরব ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে হয়তো মোট পাঁচবারই চোখের দেখা দিয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ। অন্দরমহলে তার আসক্তি নেই। এ-মহল নিতান্তই মেয়েমহল, এখানে পুরুষের পদার্পণ ঘটবে কেন। পুরুষের আস্তানা বাহির মহলে, সুতরাং সে ইখানেই নিরিবিলি কেটে চলেছে তার জীবন।

ফরাসগঞ্জের কথা মনে হয় তার। আবার কি ফিরে পাওয়া যায় না সেই জীবন? বিয়ের পর একবারও সে যেতে পারে নি। এ-বাড়ির নাকি নিয়ম নেই, বৌকে বাপের বাড়িতে যেতে দেওয়ার রীতি নেই এঁদের। রাধা বোঝে, সমানে সমানে যদি হত এই বাড়ির ছেলের বিয়ে তাহলে নিয়মটা তৈরিই হত না, পালন করা তো দূরের কথা। নেহাৎ নগণ্য এক দীন-দরিদ্রের ঘর থেকে কৃপা করে তাকে তুলে আনা হয়েছে বলেই এই নিয়ম পালনের জন্যে এঁদের এত কড়াকড়ি।

বাবা এসে দেখা করে গিয়েছেন বার-কয়েক। অল্পদিনের মধ্যেই কেমন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন বাবা, দাড়ি-গোঁফে কেমন পাক ধরে গিয়েছে। বাবা এলে ভালো লাগে রাধার, কিন্তু সেই সঙ্গে বড় বিশ্রীও লাগে। বাবাকে আদর-যত্ন করতে এঁদের হেলাফেলা লক্ষ্য করে সে। অমন দীন-হীন মানুষকে প্রাণ ঢেলে খাতির করতে এঁদের যেন বাধে কোথায়।

মার সঙ্গে আর বুঝি দেখা হবে না এ-জীবনে। মুরলী আর নবীন এখন দেখতে কত বড় হয়েছে? গাঙ্গুলিবাড়ির পিসিমা বেঁচে আছেন? পদ্মু-গয়লানিরা আসে তাদের বাড়িতে? আর, আর তাদের সেই কদমমাসি—তার কথা নিশ্চয় এর মধ্যে ভুলে গেছে তাদের ফরাসগঞ্জ।

দু'চোখ ছল-ছল করে ওঠে রাধার। মা না, বাবা না, ভাই না, বন্ধু না—কাউকে চায় না সে। সে চায় এই পাষাণপুরী থেকে মুক্তি। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে রাধার—এমন কোনো জায়গা কি নেই, যেখানে গেলে কেউ খোঁজ পাবে না, কেউ খবর পাবে না, নিজেকে সম্পূর্ণ গোপনে রেখে সে নিজের জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে।

মাথার ওপরে দুলছে টানা-পাখা। অদৃশ্য নেপথ্যে বসে দড়ি ধরে টানছে অমনি কোন এক অজানা পুরুষ। তাদের সকলের মাথার ওপর বসে হয়তো টেনে চলেছেন তাদের জীবনের দড়ি, পুতুলনাচের মত নেচে নেচে মরছে তারা। কে জানে, এই নৃত্যের শেষ কোথায়।

লক্ষ্মী পাখা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে রাধার মুখের দিকে অনেকক্ষণ হল। রাধার মুখের ভাব লক্ষ্য করছে সে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কেন ঐ মুখে এই রকম ছায়া নেমে আসছে। ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, শরীর ভালো আছে তো বৌদি?

মুখ তুলল না রাধা, মাথা নীচু করে বসে থেকেই বলল, শরীর ভালই আছে রে।

আর কোনো প্রশ্ন না করে জোরে-জোরে হাওয়া করতে লাগল লক্ষ্মী। ননীর মত নরম এই শরীরে গরম কি সয় কখনো? দাসী-বাঁদীর শরীর তাদের, তাদেরই কেমন আনচান করে ওঠে গা।

কান সজাগ করে ঘাড় একটু হেলিয়ে রাধা জিজ্ঞেস করল, কে আসছে রে? কার যেন পায়ের শব্দ।

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে ফিরে এসে বলল, ভব, ভবসুন্দরী ওপরে গিন্নিমার কাছে গেল।

—ও অত গিন্নিমার কাছে কেন যায় রে?

ফিক করে হেসে লক্ষ্মী বলল, কে জানে বৌদি।

লক্ষ্মীর হাসির ধরণ দেখে রাধার মনে হল, কানাগিন্নীর সেদিনের কথা বুঝি ভুল না।

কিন্তু ভুল হলেই বুঝি ভালো হত। নিজের শাশুড়ি না হোক, শ্বশুরের স্ত্রী তো, তাঁর সম্বন্ধে এইসব কদর্য ও কদাকার কথা শুনে রাধার শরীর শিউরে ওঠে। সেই শিহরণের সঙ্গে অন্য ধরণের আর একটি শিহরণও খেলে যায় তার অঙ্গের ওপর দিয়ে। কেঁপে ওঠে রাধা, ঘাম দেখা দেয় গায়ে।

এ-বাড়ির এই যদি রীতি, তাহলে সে-ই বা সে-রীতি পালন না করে কেন। ভবসুন্দরীকে সে না পাক, তার ভরসা তবু আছে, তার আছে চম্পা-নাপিতানি।

অনেক আশ্বাস সেদিন তাকে দিয়েছে চাঁপা। কান পেতেই শুনেছে রাধা, কিন্তু যেন কান করে নি, এই রকম ভঙ্গিতে সে বসেছিল। প্রতিহিংসা নিতে ইচ্ছে করে ঐ মানুষটার ওপর, ঐ রূপনারায়ণের ওপর: আর, প্রতিহিংসা নিতে ইচ্ছে করে এই বাড়ির এই ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের ওপর। নিজের মুখে চুনকালি মেখে সবার মুখে কলঙ্ক লেপে দিতে ইচ্ছে জাগে রাধারাণীর।

নীচে থেকে দাসীদের কলকাকলি

শোনা যাচ্ছে, সেই শব্দে হঠাৎ বুঝি উৎফুল্ল হয়ে উঠল একটু।

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে বলল, চাঁপা এসেছে।

চমকে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাল রাধা। তার মনের ভাবনা-গুলো তার অজ্ঞাতেই শব্দ করে উঠে-ছিল নাকি? লক্ষ্মীর কানেও পৌঁছে গেছে নাকি সেই ভাবনাগুলো? সংকোচে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। ছি ছি, মানুষের ওপর রাগ করে মানুষ হঠাৎ কত জঘন্য ভাবনাই ভেবে বসতে পারে, তার ঠিক নেই।

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রাধা দেখল, পায়ের আলতার রঙ বুঝি সিঁথির সিঁদুরের মতই টকটকে রাঙা আছে, তবু আসুক নাপিতানি, সেজে দিক তার পা, আর, যদি পারে ঘষে দিয়ে, মুছে দিয়ে যাক তার মনের ময়লাও।

ঝুমঝুম শব্দে পায়ের মল বাজিয়ে কোমর দোলাতে দোলাতে ঘরে এসে ঢুকল চাঁপা, পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বলল, ওগো বৌদি, ওগো বৌদি, ওগো বৌদি। বড় সুখের সংবাদ গো, বড় সুখের সংবাদ।

কি এমন সুখ, কিসের এত আহ্লাদ, এত পুলকই বা কিসের—জানার কৌতূহল নিয়ে রাধা ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তাকাল চাঁপার মুখের দিকে।

চাঁপা বসল। বৌদির পায়ের কাছে চেপে বসল। চন্দ্রহারটার ওপরেই বুঝি চেপে বসে পড়েছিল, একটু উঁচু হয়ে পিছন থেকে সেটা কোমরের দিকে একটু তুলে দিয়ে বলল, জ্বালা। এও আবার কামড় দিচ্ছে গো।

রাধা জিজ্ঞেস করল, আহ্লাদে আজ বড়ই যে আটখানা দেখছি? ব্যাপারটা কি চাঁপা?

ভিবে খুলে একটা পান মুখে ফেলল চাঁপা, একটু চিবিয়ে রস গিলে বলল, ভামিনীর ছেলে হবে।

—ভামিনী কে?

—ভামিনীকে চেন না? তোমাদেরই পড়শী গো। ওই যে তোমাদের বাড়ির পশ্চিমে প্রাচীরের ওপারে ছোট কোঠাবাড়িটা? উঠোনে নিমগাছ?

রাধা চুপ করে বসে আছে দেখে চাঁপা গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, নিমগাছটাও চোখে পড়ে নি। কি চোখ গো? চুঁচড়োর এই বাড়ির দেয়াল-গুলো দেখেছ তো?

রাধা বলল, কি হবে ওসব দেখে? তা, ছেলে হল ভামিনীর, কিন্তু তোমার এত আহ্লাদ কেন?

চাঁপা তার সরস্ত খোঁপা-সমেত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আহ্লাদ হবে না? ওর কখনো ছেলে হবে, এ কি কেউ ভেবেছিল, না, ও নিজেই ভেবেছিল!

—কেন, না হবার কি আছে চাঁপা?

চাঁপা বলে উঠল, ন্যাকা সেজো না বৌদি। কিছুই বোঝো না? তোমার তবে ছেলে হচ্ছে না কেন শুনি?

চাঁপার কথা শুনে শিউরে উঠল রাধার সারা গা। পুত্রকামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল না সে, কিন্তু স্বামীকামনায় কাতর হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ। জিজ্ঞেস করল, ভামিনীরও বুঝি ঐ দশা?

—দশা সবারই সমান, বৌদি।


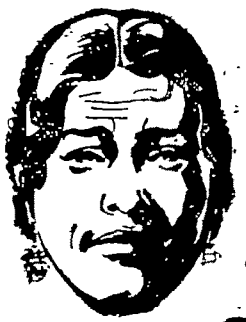

অম্লাধিক্য
বুকজ্বালা
ও
কোষ্ঠকাঠিন্যে

বি.আই.
মিল্ক অব
ম্যাগনেশিয়া

অম্লনাশক ও বিরেচক

বিশুদ্ধ কার্বনেরী

বয়স্ক ও শিশুদের
উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোম্পানি লিমিটেড

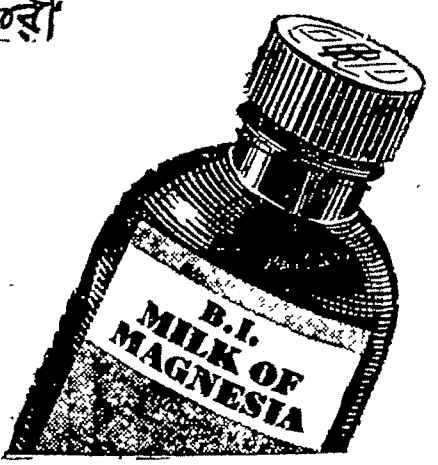

তোমরা আছ বাণীর হালে, পড়শীর খবরও তাই রাখ না। কিন্তু ভামিনী তোমার কথা বলে, কত চোখের জল ফেলে।

—কি বলে রে ?

অন্তত একজন প্রাণীও যে তার কথা বলে, তার কথা ভাবে এখবরটা সান্ত্বনার মত মনে হয় তার। তাই সে আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কি বলে ও ?

অনেক কথা বলে যায় চাঁপা। তার বৌদি তবু বড় মানুষের বৌ, স্বামীর অভাব তবু সে ভুলে থাকতে পারে টাকার মোহরের দাসীর বাঁদীর আর এই নাপিতানির সঙ্গে এক হয়ে থেকে থেকে। কিন্তু ভামিনীর মত মানুষের দশা একবার ভাব। একটা ছোট কোঠাবাড়ি তার সম্পত্তি আর সম্পদ হচ্ছে তার স্বামী। ছগলীর চিনি কলে কেরাণীগিরি করে তার স্বামী, কত আর মাইনে তার। কিন্তু হলে হবে কি, মোসাহেবি করে বেড়ায় ধনীবাবুদের নন্দনদের সঙ্গে। ঘরের দাওয়ায় পা-ই পড়ে না। কত পুজো দিয়েছে ভামিনী, কত সুবচনীর ব্রত করেছে, কিন্তু স্বামীকে তবু পায় নি। কত কেঁদেছে, কত চোখের জল ফেলেছে, সব অযথা। কিন্তু আজ সে সুখী, আজ সে খুশি। তার সঙ্গে এই মাত্র কথা বলে এল চাঁপা। সেখানে একটু বসতে হল বলেই তো আজ এখানে আসতে একটু বেলা হয়ে গেল।

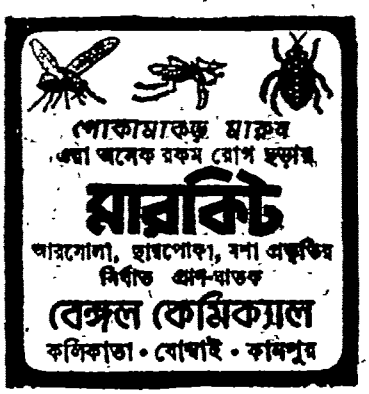


—দাও, না দাও।

রাধা স্তব্ধ হয়ে বসে ঐ কথাগুলি যেন শুনছিল না, গিলছিল। ধীরে ধীরে সে দু'টি পা এগিয়ে দিল।

চরণপদ্ম দু'টো নরম পা দু'টি জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে। হাঁটুর কাছের কাপড় টেনে রাধা পা দু'টো নগ্ন করে দিল, চরণপদ্ম দু'টো সন্তর্পণে ওপরের দিকে তুলে পায়ের গোছার সঙ্গে এঁটে নিয়ে পদচর্চা আরম্ভ করল চাঁপা।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি বলছে এখন ভামিনী ?

—কি আর বলবে। বলছে, এক দিন খরা দিয়েছিল তার স্বামীটি, সেদিন সে তার জন্মের পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছে। তা যে মিটিয়েছে, ভামিনীর মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। তার ঠোঁটের কিনারে জেগেছে হাসি, আর সে প্রাণের আনন্দে বলছে, জানিস চাঁপা, ছেলে হবে আমার। যতক্ষণ ছিলাম, শুধু ঐ গল্প, ঐ আলাপ। প্রথমে ভেবেছিলাম, এ বুঝি মজার ঘটনা, কিন্তু ওকে জেরা ক'রে বুঝে নিলাম, মজার না, সুখের ঘটনা এটা।

—কিসের মজা ?

—ন্যাকা সেজো না, বৌদি। দাও, ঐ পা দাও।

মজা যে না বোঝে, সে ন্যাকা ছাড়া কি। ঘরে-ঘরে আকছার এমার মজা লোটালুটি চলেছে, একটুও জানে না বুঝি বৌদি ? সেদিন কানাগিন্নি কি বলে গেল, মনে নেই বৌদির ? ভবসুন্দরীর সঙ্গে গিন্নিমার ভাব কেন এত ? এই বাড়িতেই চলছে না মজা ? এসব সত্ত্বেও বৌদির ওই জিজ্ঞাসা শুনে গা জ্বলে।

চাঁপার ঝংকার শুনেই রাধা বুঝে নিল, মজা বলতে কি বোঝায়। তাই আর সে ও-কথা জিজ্ঞাসা না করে বলল, ভামিনী মেয়েটা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, বুঝি বড়—

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বড় পতিব্রতা। ওইখানেই তো ওর মরণ। পতি ছাড়া আর পুরুষ নেই ওর কাছে।

কথাটা বলেই চাঁপা মাথা তুলে রাধার মুখের দিকে চাইল, বলল, তোমারই মত ঠাণ্ডা মেয়ে। মেয়ে-মানুষ যত ঠাণ্ডা হবে পুরুষরা ততই গরম হয়ে ওঠে, ততই মেজাজ বাড়ে তাদের। কেন, অত কিসের গা ? অমুক মেয়ে পতিব্রতা, শুনে কত খুশি হই আমরা, কিন্তু অমুক পুরুষ পত্নীব্রত শুনলে গাল পেড়ে বলি, মানুষটা বড় স্ত্রৈণ। কি নিয়ম দেখ !

পায়ের আঙুলের ডগায় ডগায় সূক্ষ্ম আলপনা আঁকার মত করে আলতা-ছোপা তুলি টানতে টানতে মাথা নীচু করে চাঁপা বলতে লাগল, স্ত্রীর ওপর টান দেখালেই মানুষ স্ত্রৈণ হয়, কিন্তু দাসী-বাঁদীর ওপর টানের তো কামাই নেই, ঝিয়েদের নিয়ে চলাচলি যে কত করছেন বাবুরা, তখন নিশ্চয় তাঁদের আমরা গাল পাড়ব, বলব, বৈণ।

রাধা বুঝতে পারল না যেন, বলল, কি হল কথাটা ?

হেসে ফেলল চম্পা-নাপিতানি, বলল, এসব আমার কথা না বৌদি, কানাগিন্নির বানানো।

—কিন্তু কথাটা কি ?

—স্ত্রীর ওপর টান হলে মানুষ যদি স্ত্রৈণ হয়, ঝির উপর টান হলে তবে—

পা চট করে টেনে নিয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি বললি চাঁপা ? এই বাড়িতে বুঝি ঘটছে এমনি ঘটনা ? অ্যাঁ, বলছিস কি চাঁপা !

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে রাধার সর্বশরীর জর্জরিত হয়ে উঠল নিমেষে। তার স্বামী না-আসছে তো না-আসছে, বাইরে-বাইরে তার যা-ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে সে, বেড়াক। কিন্তু এ কি অপমানের লজ্জার ঘৃণার কথা আজ শোনাল তাকে চাঁপা। ( ক্রমশ।

'But trailing clouds of glory do we come...'

সেদিন ট্রেনেও যেমন বাসেও তেমনি ভিড় ছিল। তা ছাড়া ন'টা দশের গাড়িটাও কিছু লেট ছিল। ঠিক সময় অফিস পৌঁছতে গেলে ছোটাছুটি করে বাস বা ট্রাম যা হোক একটা ধরতে হয় শিয়ালদা' থেকে।

ছুটে গেটের বাইরে এসে একটা না-থামা, না-চলা বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে সমীর ঝুলে পড়ল। একটুর জন্যে পিছনে ট্রামের গুঁতো খেকে বেঁচে গেল। বাসের যাত্রীরা হা-হা করে উঠল। থিতিয়ে চাপে চাপে বাসের মধ্যে এসে সমীর অপ্রতিভের মত হাসতে লাগল। চোখ-কান বুজিয়ে পথ চলার জন্যে মৃদু ভর্ৎসনা শুনলে। এখুনি এক চুল ব্যবধানে যে মর্মান্তিক ঘটনাটা তাকে নিয়ে ঘটতে যাচ্ছিল তার আর জবাবদিহি করতে হতো না, আর মা-ও বলতে হতো না। সকলেই প্রায় সেই কথাই বললে।

'দেখে-শুনে চলতে হয়। কি কাণ্ডটা করছিলেন বলুন দিকি? বাসটা নড়লো তাই, না হ'লে?'

'কোন বিশ্বাস আছে মশাই, আজকালকার গাড়িকে। ওদের কি, চালিয়ে দিলেই হ'লো।'

'ডেঞ্জারাস মশাই এই ঝুলে যাওয়াটা। না হয় একখানা কি দু'খানা বাস ছেড়েই দিলেন। প্রাণটা আগে, না, বাসে ওঠাটা আগে?'

'একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে ছাড়তেন মশাই, খুব বেঁচে গেছেন।'

সমীর আর হাসছে না, এতগুলো উৎকণ্ঠিত সহযাত্রীর মন্তব্য তার বেপরোয়া বাস-ধরা সম্পর্কে তাকে সত্যিই লজ্জিত করেছে। নিজের দোষটা সে বুঝতে পারছে।

কিন্তু আজই দেশের ষ্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে প্রাত্যহিক কর্মসূচীর কেমন যেন রদ-বদল করে ফেলেছে। মনে মনে মিলিয়ে দেখলে, শিয়ালদা'র গাড়ি ন'টা দশে পৌঁছলে শুয়ে বসে অফিসে হাজির হ'বে।

রোজ সকাল আটটায় খেয়ে আটটা পনেরর মধ্যে ষ্টেশনে এসে লোক্যাল ট্রেনটা ধরে নির্দিষ্ট কামরায় উঠে গন্তব্যে এসে পৌঁছয়। ঘড়ির কাঁটা, ট্রেনের গতি আর তার দৈনন্দিন রুটিন মিলে যায়। এক চুল এদিক-ওদিক হয় না। আজই কেবল—

অবধারিত দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেও ঠিক সময়ে কিন্তু অফিস পৌঁছন গেল না। পথে বাসটা অবশ্য কোন গোলমাল করে নি, তবু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। সমীর মাঝপথে লোকটির পিছন পিছন বাস থেকে নেমে পড়ল। বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এই লোকটিকে দেখে সমীর যুগপৎ কেমন অবাক বিস্ময় আর আনন্দ বোধ করেছিল—যেন এই মুখ, এই হাসি, এই দেহ, এই সব মিলিয়ে একটা রূপ তার চেতনার কোথাও লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ তা

প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অনেক চেষ্টা করে সমীর সামনে এগোতে পারল না, কিন্তু ডুবন্ত প্রাণীর আকুলতায় বার বার ঐ মুখটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে। 'চিনি চিনি, চিনি না' এমনি একটা মুখ, 'দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না' এমনি একটা দর্শনীয় বস্তু যেন। নারী নয় পুরুষ, তবু তার আকর্ষণ কত যেন গাঢ়কতা-পূর্ণ, দৃষ্টি ফেরান অসম্ভব হয়েছিল। ভিড়ের চাপ, সহযাত্রীদের গায়ের ঘাম, চালানী পশুর অবস্থান, কোন কিছুই সমীর খেয়াল করে নি—শুধু লক্ষ্য ঐ মুখটি, ঐ লোকটি; বাসের প্রথম সিটের জানালার ধারে বসে যে লোকটি স্মিতমুখে সামনে চেয়ে আছে।

সমীর ভিন্ন দিকে অনেকবার চোখ ফিরিয়ে মনের এই অহেতুক কৌতূহলকে দমন করবার চেষ্টা করেছে। তার কেউ না, চেনা-জানাও না, কোনদিন দেখেছে এমনও নয়—তা হ'লে? আবার চোখ ফিরিয়েছে, আবার দেখেছে ভিড়ের সুড়ঙ্গ পথে চোখ বাড়িয়ে মানুষের বেড়া টপকে। মনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে যেন আর পারা যায় নি, অবুঝ আগ্রহ ফিরে-ফিরে প্রবল-আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দেখে দেখে আশ মেটে নি।

বোধহয় সে-ই কেবল দেখেছে, আর কেউ দেখে নি বাসভর্তি এত লোকের মধ্যে। সমীর লক্ষ্য করেছে, দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখেছে, তারই দৃষ্টি কেবল অনুসৃত হ'য়েছে ঐ মুখটির দিকে—আলোমুখী পতঙ্গের মতন। যেন কাছাকাছি পৌঁছন গেলে, সামনা-সামনি দেখতে পেলে, দৃষ্টির লেহনে মনেপ্রাণে শেষ করতে পারলে শান্তি। মনের বিমুগ্ধ ভাবটা ব্যক্ত করার একটা উপায় খুঁজে খুঁজে আকুলতায়, ব্যগ্রতায় সমীর ব্যস্ত, চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হঠাৎ লোকটি সিট থেকে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসে। সমস্যাটা প্রত্যক্ষ হ'য়ে সমীরের মনে কেমন যেন আলোর একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়; সমীর এক পাশ হ'য়ে পথ করে দেয়। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে, তারপর নিজেই দরজার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে কাটা-ছাগলের মত ছট্‌ফট করে ওঠে। সহযাত্রীরা বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'কি মশাই, এখানে নামবেন নাকি? অমন করছেন কেন?'

দু'জনেই নেমে পড়ে। বাসটাকে দু'বার ক'রে থামাতে হয়।

সমীর লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি আগ্রহে লক্ষ্য করে। এখানে রাস্তায় ভিড় কম নয়, প্রবহমান জনস্রোত স্তিমিত নয়, যানবাহনের অসতর্ক আক্রমণে দুর্ঘটনা ঘটা কিন্তু বিচিত্র নয়। ভিড় ভিড়, কেবল ভিড়। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যে নিশ্চিন্তে মানুষ নিঃশ্বাস ফেলে। উঃ, ক্রমেই অসহ্য হয়ে আসছে অবস্থাটা।

চোখে চোখে থেকে চোখের পলকে লোকটি যেন কোথায় সরে গেল, ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল। আবার সমীরের সেই বাসের মতন অবস্থা, চোখ দু'টো সামনে বাড়িয়ে আঁক-পাঁক করতে লাগল—এই তো ছিল চোখের ওপর, গেল কোথায়?

না, নিঃশ্বাস ফেলে যেন নিশ্চিন্ত হয় সমীর—এই তো লোকটি, পিছন ফিরে সামনের একটা সর্বাহারী দোকানে কি যেন কিনছে। দোকানীর চোখ দু'টো বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—কে জানে লোকটির প্রতি ও-ও বোধহয় আকৃষ্ট হয়েছে। কেমন একটা তদ্গত ভাব যেন।

সমীর এগিয়ে এল। এসে লোকটির পিছনে দাঁড়াল। যেন চুম্বকের টানে চলে এসেছে। হঠাৎ লোকটি পিছন ফিরতে চোখাচোখি হয়ে গেল। সমীরের সারা দেহে কেমন একটা আনন্দ-শিহরণ বয়ে গেল, আপ্লুত মনটা কেমন ধড়ফড় করে উঠলো। ইচ্ছে করল, হাতটা বাড়িয়ে স্পর্শ করে লোকটিকে—এত নিকট, এত দূর। এত উল্লাস, এত বিষাদ। এত আনন্দ, এত বেদনা। আশ্চর্য, লোকটিকে সামনাসামনি দেখে উদ্বেলিত হৃদয় আরো আকুল হ'য়ে উঠলো—কি যেন করবে সমীর ভেবে পেল না। পূর্বাপরের সমস্ত স্মৃতি-শ্রুতির বিভ্রম হল। সমীর ভুলে গেল তার অফিস-যাওয়া, ভুলে গেল শান্তিপুর লোক্যালের ন'টা দশের ট্রেনটা।

আরো আশ্চর্য, লোকটি যেন সমীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। সমীর হাসতে গিয়ে কেমন যেন ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেল—মুখটা তার কেমন করুণ হ'য়ে উঠলো। লোকটি পিছন ফিরে এগিয়ে গেল। সমীরও এগোতে চেষ্টা করলে।

পিছন থেকে দোকানী ডাকলে, 'এই যে দাদা, কি নেবেন?'

লোকটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জোরে জোরে পা ফেলছে—কেমন যেন একটা ক্ষিপ্রতা গতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে। সামনের ভিড়টা আকাশে বাউণ্ডুলে মেঘের মতন লোকটিকে আড়াল করছে—ঐ, ঐ, ঐ—

লোকটিকে সমীর চোখে চোখে রাখলে। আবার দোকানী ডাকলে, 'কি নেবেন এই যে। আসুন, আসুন না।'

সমীর বিরক্ত হয়। আচ্ছা মুশকিল, সবাইকে খরিদ্দার ভাবে। ওৎ পেতে সব বসে আছে। হেঁটে যাবার উপায় নেই।

ভিড়ের মধ্যে একরকম ধাক্কা দিয়ে দিশাহারা হয়ে সমীর এগোতে লাগল—ঐ, ঐ, ঐ যাচ্ছে লোকটি। আশ্চর্য, যেন ওরই আকর্ষণে সামনের লোকগুলি এগিয়ে চলেছে। অদ্ভুত একটা প্রবহমানতা যেন বোধ করা যায়। অনেকটা কাছাকাছি সমীর এসেছে লোকটির। এখানে মানুষ-জনও অপেক্ষাকৃত কম। বৌবাজারের মোড় অনেক দূরে, জঞ্জালের মতন মানুষের, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়, শীতের আকাশের দিগন্তের মতন বিষণ্ণ-বিষণ্ণ।

লোকটি থামল। পকেট থেকে কি যেন হাতড়ে বার করল। মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ল। সমীর পিছন থেকে দেখলে, একটা পুরণো গির্জার সামনে লোকটি দাঁড়িয়ে—গির্জাটা আশপাশের বাড়ি-ঘরের সঙ্গে মিশে বৈরাগীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। থালির পলেস্তারায় ক্রশ-চিহ্নটা শেওলায় সবুজ হয়ে আছে—এক ধারে দেওয়ালে খৃষ্টধর্মের মর্মবাণী উৎকীর্ণ করা আছে: তিনি এমন প্রেম করিলেন—আপন পুত্রকে উৎসর্গ করিলেন।

লোকটি বোধহয় ঐ লেখাগুলো পড়ছে। খৃষ্টান-টৃষ্টান নাকি? নাকি এমনি কৌতূহল? সমীরের কেমন মনে হল, লোকটি যদি যীশু হয়? সঙ্গে সঙ্গে শরীরে রোমাঞ্চ বোধ করলে; দিনদুপুরে একটা অখ্যাত গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে অপরিচিত লোককে নিয়ে অদ্ভুত কথা ভাবছে সে। কিন্তু খুব সুন্দর লোকটি, কেমন একটা মণ্ডিত মহিমা যেন আছে লোকটিকে ঘিরে। ক্রুশে-বেঁধা যীশুর ছবির সঙ্গে যেন মেলে।

লোকটি ফিরলে, চোখে চোখ পড়তে সমীর বিমুগ্ধ হয়ে গেল। আবার রোমাঞ্চ বোধ করলে—পা দু'টো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল। ঠিক সেই ভাব হুবহু, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই কোথাও, অদ্ভুত সমাহিত, স্থির আত্মস্থ লোকটি! এবার লোকটি হাসলে না, তাই মনে হল, চোখ দু'টো যেন কেমন শান্ত। চোখ দু'টো গির্জার দেওয়ালের লেখাগুলোর দিকে প্রদীপের আলোর মত বাড়িয়ে ধরা। ভাষান্তরিত বাইবেলের বাণী অদ্ভুত: ঈশ্বর আমাদিগকে এমন প্রেম করিলেন---তাঁহার আপন পুত্র যীশু---

কি বাংলা! ওর চেয়ে বাইবেল ক্লাসে পড়া ইংরাজীটা অনেক মিষ্টি, সুললিত গানের মতন:

'Our father which in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy Kingdom come! Thy will be done.
In earth, as it is in heaven.'

সে অনেকদিন আগের কথা, প্রেয়ার কালে তালগাছের মতন চ্যাঙা চার্লস দিগমার বিশ্বাস হাত দু'টোকে উর্ধ্বে তুলে চোখ বুজিয়ে ভাবগাম্ভীর্যে গদ্ গদ্ হ'য়ে বলতেন।

'For Thine is the Kingdom, and the power.
And the glory, for ever. Amen.'

কপালে আর বুকে হাত ছুঁইয়ে ক্রশ-চিহ্ন করাটা ভারি সুন্দর। চার্লস দিগমার বিশ্বাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভগবানের রাজত্ব পৃথিবীতে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই চার্লস বিশ্বাস মহাশয়কে সমীর কদিন আগে যেন শিয়ালদা'র মোড়ে দেখেছিল—বুড়ো হয়ে গেছেন, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, পাদ্রীর আলখাল্লা ময়লা আর ছেঁড়া, খালি পা। বড় দীন-দরিদ্র যেন। কে জানে উনি এখনো ভগবানের রাজত্বে বিশ্বাস করেন কি না।

এ লোকটিও পাদ্রী হতে পারতেন—অদ্ভুত নমনীয়, কমনীয় আর আকর্ষণীয় চেহারাটি। সমীর কিছুতে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। লোকটি চোখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে তাকালে, মনে হল যেন হাসলে সমীরকে অনুসরণরত দেখে—গির্জার চূড়াটা যেন নুয়ে পড়ল। সমীর লজ্জা পেল, তার এ ঔৎসুক্য বা মোহ অনুচিত যেন। লোকটি বুঝতে পেরেছে, পিছন পিছন এভাবে যে আসে তার উদ্দেশ্য ভাল নয়। সমীর সরে দাঁড়াল, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলে, একটা ছুটন্ত মোটরের দিকে চেয়ে দেখলে—একটা ঘূর্ণাবর্তন অনুভব করলে, তারও দেহটা যেন ঐ যান্ত্রিক বেগের সঙ্গে মিশে কোথাও ছুটে যেতে চায়।

এখানেও ভিড়। হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মতন রাস্তার মোড়টা ভরে

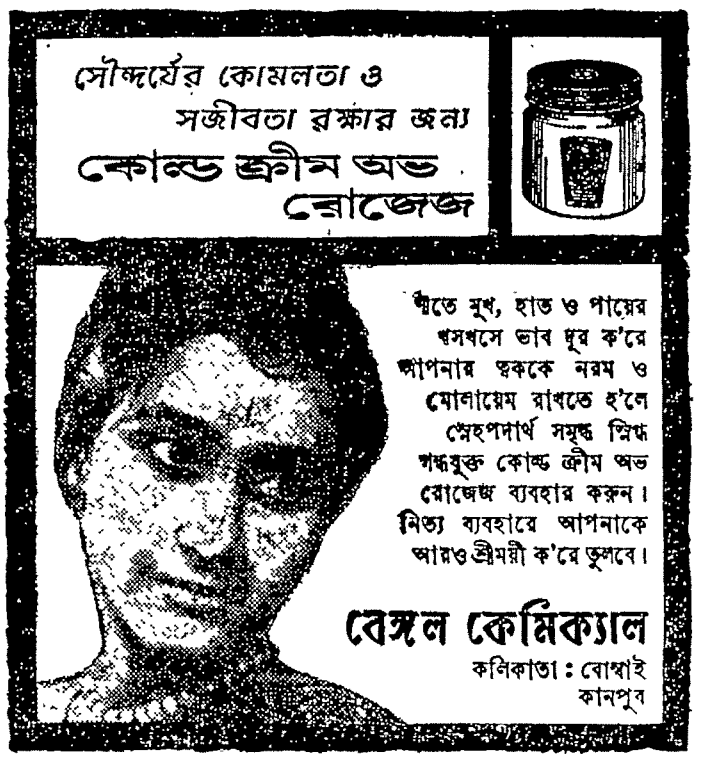

গেল। একটা শব্দ উঠলো, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ! চোখ তুলে ওদিকে দেখেই সমীরের মনে পড়ে গেল—তাই তো, তার লক্ষ্য বস্তুটা গেল কোথায়? কোথায় সেই মনোহরণ, জ্যোতির্ময়, আনন্দ---?

এদিক-ওদিক দিশাহারা হ'য়ে সমীর খুঁজলে। কোথাও দেখতে পেলে না লোকটিকে। মোড়ের গোল-মাল থেমে গেছে, গাড়ি-ঘোড়া খুলে গেছে, ট্রাম-বাস স্বাভাবিক চলছে, মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে পুব-পশ্চিমে, গির্জার ঘড়িতে পুরণো সুরে ঘণ্টা বাজল—ঢং, ঢং, ঢং। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ---এগার।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে। ন'টা দশের গাড়ি অনেকক্ষণ কেরাণীদের পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরে, সরকারী নিয়মে আফটারনুন পড়ে যাবে। একদিন নাগা হ'য়ে যাবে। সমীর ছুটে একটা বাস ধরলে। মনকে বোঝালে এ মনো-ভাব, কৌতূহল অনুচিত—প্রাত্যহিক কর্মসূচীর পরিপন্থী। শুধু শুধু—

কিন্তু আশ্চর্য সেই লোকটি! কখন আগে-ভাগে এই বাসে উঠে বসেছে, একটি কোণে সেই আগের বাসের মতন। মুখটা তেমনি ফেরান সামনে, হাসি-মাখান, উৎকীর্ণ অলক-গুচ্ছ স্পর্শে আমোদিত যেন। সমীর চোখ চাইলে, চোখ নামালে, আবার চোখ তুললে, চোখ ফেরালে—আবার দেখলে---

উঃ কি ভিড় এখনো, অফিসের সময় হ'য়ে গেছে তবু। কে জানে সমীরের মতন বাসের যাত্রীরা দেরীতে অফিস যাচ্ছে কি না! চোখের ওপর কত যে আড়াল, বুক, মাথা, পিঠ, হাত, পা! ভাল করে চোখ চেয়ে কিছু দেখা যায় না, চোখ বুজিয়ে দুর্গা-নাম জপা কেবল।

'বাসটা কোথায় এল?' এক সময় সমীর ভিড়ের মধ্যে ছটফট করে বললে।

'কোথায় দরকার?' পার্শ্ববর্তী সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলে। 'দেখার উপায় আছে কি!'

'এই, এই ধরমতলা বাঁধকে—ধরমতলা।' কচ্ছপের মতন ভিড়ে মাথা ঠেলতে ঠেলতে সমীর বললে।

'এই তো ধরমতলা পেরিয়ে এল। নামুন নামুন।' দরজার কাছ থেকে একজন বললে।

'সে কি।' জবাই-করা মুর্গীর মতন ফড় ফড় করে সমীর দরজার কাছে এগিয়ে এল।

অনেক প্রতিবাদকে পিছনে ঠেলে, চোখে-কানে অন্ধকার দেখে সমীর বাস থেকে লাফিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে বুঝি তার সমস্ত চেতনা লোপ পেল।

আবার সেই লোকটি এগিয়ে এসে হাত ধরে তুলে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'লাগে নি তো?'

হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমীর চেয়ে দেখলে সেই লোকটি, কখন তার আগে বাস থেকে নেমে পড়েছে। নিজেকে একটা 'আর্তত্রাণ' ছবির সঙ্গে তুলনা মনে পড়ে। পঙ্গুকে হাত ধরে তুলতে, কুষ্ঠের পদসেবা করতে, তৃষ্ণার্তের মুখে জল ঢেলে দিতে এক মহান সাধু ব্যক্তিকে ইষৎ নুয়ে পড়তে দেখা যায় অনেক ছবিতে, কখনো প্রস্তর খোদাই-এর মূর্তিতে। যীশু! চার্লস দিগমার বিশ্বাস বলেছিলেন, 'In all our afflictions He comes and stoops low....'

'না!' লজ্জা পেয়ে সমীর বললে।

তারপর লোকটি পিছন ফিরে সামনে এগিয়ে গেল। খোঁড়া পায়ে কাতর চোখে সমীর চেয়ে দেখলে। অনেক উঁচু বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে যেন লোকটি চলে যাচ্ছে, অনেক দূরে, আর তার দৃষ্টি পৌঁছচ্ছে না।

সমীর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চেষ্টা করলে। হাঁটুটায় চোট লেগেছে বেশ। খচ্ খচ্ করছে। কিন্তু অফিস তো আরো খানিকটা দূর।

হঠাৎ কি মনের জোর হল, সমীর ছুটতে লাগল। খোঁড়া পা যেন জোড়া লাগল। মনে পড়ে, ছেলে বেলায় এমনি কত পড়ে-ঝড়ে হাতে পায়ে আঘাত বা চোট লেগে গা-ঝাড়া দিয়ে ছুটে-হেঁটে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কতবার—কোথায় গেছে জ্বালা-যন্ত্রণা! এও কি তাই? খুব পারবে, এত কাছে এসে লোকটিকে ছেড়ে দেবে! এই আনন্দ, এই বেদনার মধ্যে নিহিত! না না, কোন কষ্ট তার নেই।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে সমীর বসে পড়ল। আর পা উঠছে না। বোধহয় সত্যি সত্যি পঙ্গুই হয়ে গেল সে। কেমন মাটির সঙ্গে পা'টা আটকে গেছে। উঃ, নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

বড় বাড়িটার দ্বারী লক্ষ্য করলে—মানুষটা যেন ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পাচ্ছে, শারীরিক কোন বৈকল্য বোধহয়। এগিয়ে এসে বললে, 'বাবুজী কই গড়বড় হুয়া?'

নিজেকে সংহত ক'রে নেয় সমীর, মনোবল উদ্দীপ্ত করে খাড়া হয়ে বললে, 'কুছ নেহি। ইধার কই আদমী আয়া? এই আচ্ছা খাপসুরৎ—লম্বা লম্বা চুল, ফর্সা সিধা-সাধা, কাঁধে এক ঝোলা, নওজোয়ান?'

দ্বারী মাথা নাড়লে, তেমন কোন ব্যক্তিকে সে ধারে-কাছে দেখে নি। এ অফিস-বাড়িতে তা ছাড়া কত লোক আসছে যাচ্ছে—ঠিক ঐ রকম চোখে পড়বার মতন বিশেষ ক'রে কাউকে সে দেখে নি। কত লোক দেখছে তার হিসেব নেই।

তা হলে? নিঃশ্বাসটা যেন দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে, আবার পা ভেঙে রাস্তায় বুঝি বসে পড়ে সমীর।

অফিসের দারোয়ান হাত ধরে এনে 'ইনকয়েরির' সামনে বেঞ্চিটার ওপর বসিয়ে দেয়। অফিসের বাবু

একজন ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসেন খোঁজ-খবর নিতে, কি ব্যাপার, কে ইনি, কোথা থেকে এলেন, ইত্যাদি।

সমীরের বাহ্যজ্ঞান-বোধ লোপ পেয়েছে যেন, ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে সবার মুখের দিকে—যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—অদ্ভুত মুগ্ধ, আবিষ্ট ভাব যেন। মনে মনে শব্দহীন উচ্চকণ্ঠে জিহ্বার জড়তায় যেন সে শূন্য দৃষ্টির শূন্যতাকে গভীর করে বলে ওঠে—'সে কোথায়? সে কোথায়? দেবতার মুখ, সে পথিক? যাকে দেখেছি—'

প্রশ্ন করে যখন কিছু পাওয়া গেল না, পরিচয় কিছু জানা গেল না তখন নতুন অফিসের নতুন লোক-গুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, দারোয়ানটা আচ্ছা ঝামেলা পাকিয়ে তুলেছে। বার বার সেই এক কথা বলছে, এক বাবুর খোঁজে বাবু এখানে আস-ছিলেন, হঠাৎ দোরগোড়ায় বসে পড়েন, অসুখ-বিসুখ কিছু ভেবে সে তুলে এনেছে, বসিয়েছে। অন্যায় কি করেছে?

'আর কিছু না, ষ্ট্রোক। ব্রেনের মার্ভে কিছু গোলমাল হয়েছে। ব্রেন থ্রম্বসিস্। কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাস-পাতালে পাঠিয়ে দাও।' অফিস-কর্তা বললেন।

দেখে নেহাৎ ইতি-উতি মনে হয় না, তাই এত সোনামোনা সকলের। জামা-কাপড়, চেহারা সব মিলিয়ে দু'বেলা খেয়ে-পরে মানুষ-হওয়ার মতন চেহারা সমীরের। সে আপন পরিচয় ভুলে গেছে, এরা তার পরিচয় একটা ঠিক করে নিয়েছে—শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, হয়তো চাকুরী-জীবীও।

কিন্তু মুশকিল, এঁদের নিয়ে ব্যবহার করায়! হয়তো কোন—

ভালমন্দ কিছু হ'লে তখন সবাইকে নিয়ে টানাটানি করবে। কিন্তু এখানেও এইভাবে রাখা যায় না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বুজে নিয়ে সমীর বেঞ্চির ওপর ঢলে পড়েছে।---

তিনদিন পরে একটি বিশিষ্ট হাসপাতাল থেকে পুলিশের সাহায্যে সমীরের নিজের অফিসে খবর এল—'গত বুধবার বেলা আন্দাজ বারটার সময় সমীরকে একটি অফিস-বাড়ির সামনে থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক, অবিলম্বে তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট খবর পাঠান উচিত।'

অফিস থেকে সমীরের বাড়িতে খবর পাঠান হল। অফিসের বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা দেখতে এল। রোগের কোন সাঠক কারণ বা নাম জানা গেল না। এখনো পর্যন্ত রোগ-নির্ণয় করা যায় নি।

সমীরের সহকর্মী প্রশান্তর আগ্রহে সমীরের জন্যে নির্দিষ্ট ডাক্তারটি কেবল বললেন, 'কোমা'র অবস্থা। চেষ্টা হচ্ছে কারণটা জানবার।'

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'কোন দুর্ঘটনায় পড়ে নি তো?'

'না, তেমন কিছু শোনা যায় নি।'

'হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে?'

'অজ্ঞান অবস্থায়, এখানে আনা হয়েছে।'

'কে এনেছে?' প্রশান্ত কিন্তু কিন্তু হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'যদি কিছু মনে না করেন—'

'পুলিশকে সব বলা হয়েছে, তাঁরা জানেন।'

'আপনারা কিছু জানেন না?'

'না।' নির্লিপ্ত কণ্ঠে ডাক্তারটি জবাব দিলেন।

সাত দিনের দিন অজ্ঞান অবস্থায় সমীর মারা গেল।---

চিকিৎসার জন্যে সমীরকে একটি 'কেবিনে' রাখা হয়েছিল। দেখবার জন্যে একটি নার্সও নিযুক্ত ছিল। সেই নার্সটি গল্পটা বললে। 'কেবিনে' ঢুকতে গিয়ে দু'দিন নাকি সে দোরগোড়া থেকে রোগীকে কার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কাউকে দেখে নি। কেবল শেষের দিন, অর্থাৎ যেদিন সমীর মারা যায়, সে একজন অচেনা লোককে সমীরের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। লোকটির চেহারা নাকি অপূর্ব জ্যোতিঃমণ্ডিত অনেকটা বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশুর মতন।

নার্সটি আরও বললে, ডিজি-টারদের মধ্যে কোনদিন সে ঐ লোক-টিকে দেখে নি। এমন সুন্দর চেহারার মানুষ সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। সামনাসামনি দেখা হতে লোকটি নাকি মৃদু হেসে মাথা নেড়ে-ছিল। কত যেন পরিচিত।

ভয় পাবার কথা নয়, তবু যেন কেমন ভয় পেয়ে নার্সটি চোখ তুলে দেখতে গিয়ে দেখলে, লোকটি অদৃশ্য হয়েছেন। আরো ভা পেয়ে তাড়াতাড়ি রোগীর কেবিনে ঢুকে নার্স দেখলে, সব শেষ হ'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে লোকটিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলে—রাস্তায় কম্পাউণ্ডে ছোটাছুটি করলে, কোথাও নেই লোকটি। দ্বিপ্রহরে হাসপাতালের নির্জনতা সেদিন ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। আশ্চর্য একটা থমথমে ভাব।---

প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অলৌকিক বা চোখের ভুল বা উদ্বেগজনিত কল্পনা হ'তে পারে। অনেক সাধারণ মৃত্যুর মধ্যে হয়তো এও একটি।

কিন্তু প্রকৃত সত্য যে কি, সেটা বোধহয় কেউ বলতে পারে না।

**ধবল, একজিমা, রাতরক্ত, ছুলি** মেচেতা, ব্রণাদির দাগ ও বিবিধ চর্মরোগ মুক্তির বিশ্বস্ত চিকিৎসা-কেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। (সময় ৪—৮), ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক এস, শর্মা, ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯।

—কি ভাবছো রাধা ?

কোন উত্তর দিল না সে।

—তোমার কি মনে হয়। কেন চারুর কপালে এমন হল ? পালা-লেখক, জীতেনদা'র গলাটিও ভার ভার মনে হ'ল ; বললেন, কোথায় ফুলের মালা, ফুল আর অজস্র লোকের সম্মান পেয়ে শেষ যাত্রা করবে, তা না—

মাথা নীচু করেই বলল রাধা, —এই প্রশ্ন আপনি আরও অনেকবার করেছেন বড়দাদাবাবু। অনেকে করে এই একই প্রশ্ন। কি বলবো—ভাগ্য—ভাগ্য—সব আমার এই ভাগ্য। কপালে দু'টো চাপড় দিল রাধা। আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে ধীরে ধীরে বলল, পালা—নিজের লেখা পালা ছিল বুকের পাঁজরের মতো। একটা বই আমাদের গাঁয়ের অধিকারী রাইচরণ সরকার কিনতে চেয়েছিল—সেই বইটাই আবার সেই খয়রপাড়া যাত্রাপার্টির মাতব্বর হারু ঘোষাল দশ টাকা বেশি দিয়ে চেয়েছিল। সে রাজী হয় নি। শুনেছিলাম ঘোষাল খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। আর—

—আর—আর কি ?

আমাদের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। মুনি বিষণ্ণ হাসি। বলল, আর বোষ্টমের ঘরের ছেলে। তেমন লেখাপড়া জানে না। অথচ পালা লেখে। তাই সবাই হিংসে করতো—কেউ তাকে দেখতে পারতো না। কার যে অত আক্রোশ হল।

—কাকে, কাকে পুলিশ ধরেছিল ?

—কাকে নয় ? গাঁ শুদ্ধ লোককেই তো ধরেছিল, আপনিও তখন বড়। সবই তো জানেন—একটু যেন বিরক্ত হল রাধা।

পাড়ার বিত্তির বাড়ির ভেতর থেকে শংখের আওয়াজ শোনা গেল। অস্ফুটস্বরে রাধা বলল, রাধামাধব—রাধামাধব আমাকে এখুনি ঠাকুর ঘরে যেতে হবে গো দাদাবাবুরা—

জীতেনদা' অদ্ভুতভাবে একটু হাসলেন।

—আচ্ছা আমরা তাহলে চলি—

আমার মনে খটকা লাগল। জীতেনদা' হাসলেন কেন। জানেন কিছু।

অন্ধকার রাস্তা।

—আপনি হাসলেন কেন জীতেনদা' ?

—এমনি—

## ॥ চার ॥

বাড়িতে ফিরতে বেশ রাত হলো।

জ্যাঠামশায়ের ঘরে আলো জ্বলছে। এখনো ঘুমোন নি। আশ্চর্য হলাম। তিনি তো এত রাত অবধি জেগে থাকেন না।

—খোকা—

বাইরের উঠোনে থমকে দাঁড়ালাম।

—এই রে গুণ্ডমন্যানের ডাক পড়েছে—চলো এখন ভাগবতধর্ম চণ্ডীর ব্যাখ্যা শোন—

টেবিলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন জ্যাঠামশায়। আর একটা ছোকরা চাকর তাঁর পিঠ ঠেসে দিচ্ছে। বালিশের পাশে একটা দোনলা বন্দুক পড়ে

রোমাঞ্চকর
মামলার কাহিনী
( পূর্ব-প্রকাশিতের প )

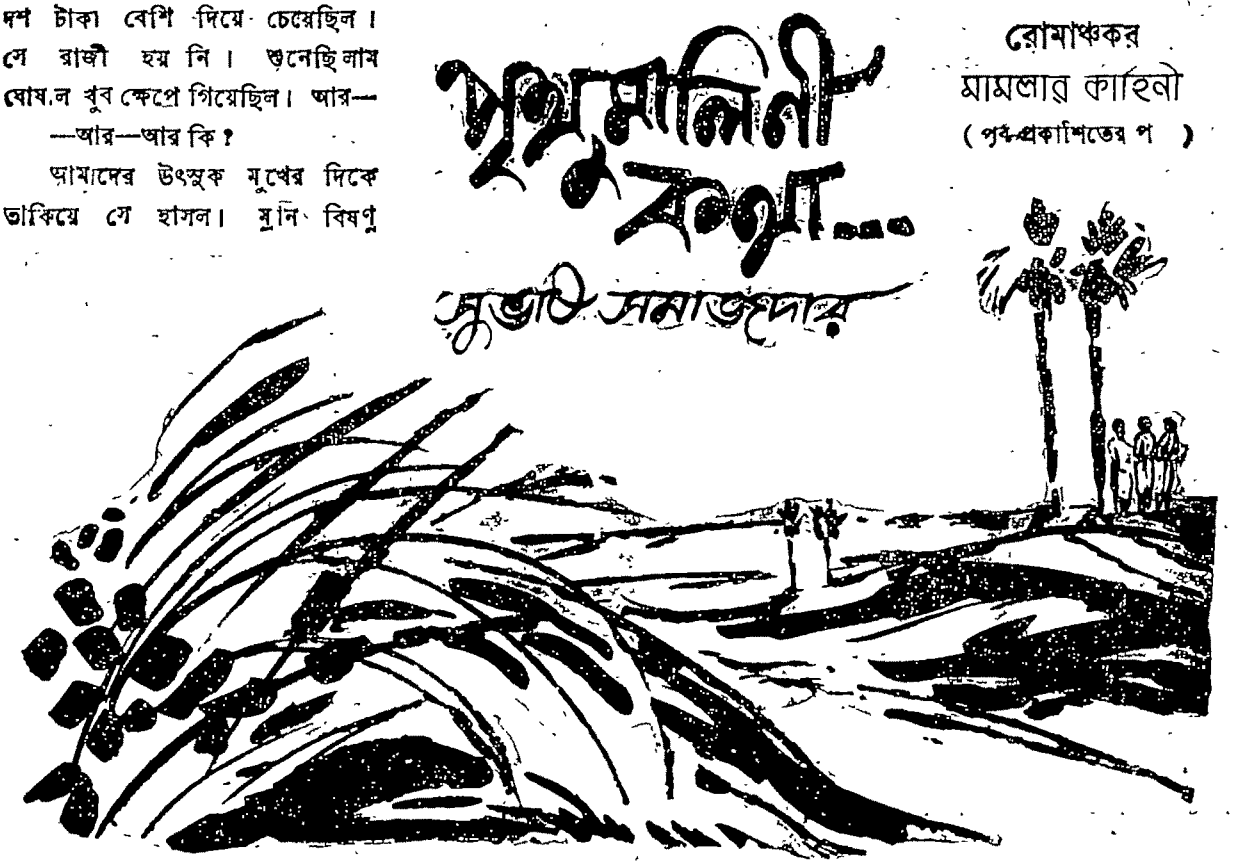

রয়েছে কাত হয়ে। টোটার বেল্টটা তক্তাপোষের ওপর থেকে ঝুলছে। এই ডবল ব্যারেল বন্দুকটির একটা ইতিহাস আছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিরঞ্জন সরকার মশাইয়ের দেখাদেখি খুব সখ করে কিনেছিলেন সেটা। প্রথম দিন গুলি করতে গিয়ে বুকে একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন, আরেকদিন ভূতকুঁড়ির পুকুরের পাড়ে সাইবেরিয়ান পাখির ঝাঁকে গুলি মেরেছিলেন। বেশির ভাগই উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মরল একটা। মরার আগে সে কি চীৎকার আর ছটফটানি। সেই থেকে বন্দুক ছাড়লেন। কিন্তু ছেলেমানুষের খেলনার মত বিছানার ওপরে রেখে দেন। আর মাঝে মাঝে তার গায়ে হাত বুলান। অদ্ভুত মানুষ—

—খোকা, শঙ্কর কোথায় রে? কি যে করতে কলকাতা থেকে এসে?

—জ্যাঠামশায় আপনি কি পছন্দ করছেন না এই ব্যাপারটার খোঁজ-খবর—

—না ঠিক তা নয়; বালিশে মুখ গুঁজেই জ্যাঠামশায় বললেন, এতদিন পরে গ্রামে এলে। একটু ঘুরবে ফিরবে বেড়াবে, তা না কি একটা—

বালিশে মুখ চেপে রাখার জন্য কথাগুলো অস্পষ্ট শোনালো। চাকরকে হুকুম দিলেন, এই জোরে জোরে ঠাসতে পারছিস না? জোরে—আরও জোরে—

আমি আর জীতেনদা' বেরিয়ে এলাম। বাইরে কাছারীবাড়ির উঠোনে দু'জনে দু'টো চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম।

আকাশে তারার দীপালি জ্বলছে। ফাঁকা ধূ ধূ মাঠে অন্ধকারের সমুদ্র থৈ থৈ করছে। সেই ঘন থকথকে অন্ধকারে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আলো। প্রেতলোকের সন্ধান দিচ্ছে এলোমেলো আলেয়া।

—দেখ শঙ্কর, রাধাকে আমার কি মনে হয় জানো? মাঠের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন জীতেনদা' ও একটা আলোর মত। ওকে দেখে কীট-পতঙ্গরা ছুটে ছুটে আসতো। দোষ আলোর নয়,—দোষ পতঙ্গের।

—আমার মনে হয় রাধার চরিত্রটা ছিল ফ্লেলিক। মানে হাসিখুশিতে ভরা লাস্যময়ী। চারুর সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব তার মোটেই ভাল লাগতো না—

জীতেনদা'র মনের ভেতরে নাড়া-চড়া চলছে। কথা বলছেন না। কিছুক্ষণ পর নিজের ভেতরে যেন ডুব দিয়ে বললেন, চারুর পাণ্ডুলিপি, বই এত যত্ন করে বেঁধে রেখেছে কেন?

—লোকের চোখে ভাল হতে চায়,—

মাথাটা ঝাঁকালেন জীতেনদা'। একটু হেসে বললেন, তোমার কি বি-এ তে ফিলজফি ছিল?—ও দর্শন পড়ো নি? পড়েছো ইকনমিক্স। তার মানে পড়েছো মানি ভ্যালু ইণ্ডেক্স আর ইনফ্লেশানের নীরস বিবরণ। তুমি কি কবে বুঝবে মনুষ্য চরিত্রের অপার রহস্য।

—আপনি কি বলেছিলেন যেন?

—শোপেনহাউয়ের পড়েছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

—তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলেছেন জানো? ওরা নিখুঁত অভিনয় করতে পারে। কিন্তু পারে না বহু-দিনের পুরণো অতীতকে স্মরণ রাখতে। ওরা শুধু বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। যাকে সে ভাল-বাসতো না দেখতে পারতো না, সেই ত্রিশ বছর আগে মরে যাওয়া স্বামীর কোন স্মৃতিচিহ্ন কিছুতেই রাখতো না—রাখতে পারতো না —

—আহা ভালবাসুক কি না বাসুক —এটা তো বড় প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে খুনের সঙ্গে রাধার যোগ কত-টুকু?

—সেটাই তো রহস্যময়।

—ওর গুণমুগ্ধ ভক্তদের ভেতরে শিবে—

—দূর—কিছুতেই বাঁড়িশিটার ভেতরে সুতো পরাতে পারছি না। হা-হা-হা—আচ্ছা আর একবার দেখা যাক সুতো পরানো যায় কি না—

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ক্ষ্যাপা বিলপাড়ার পুলের দিকে চলে গেল। পাতলা অন্ধকারের ভেতরে


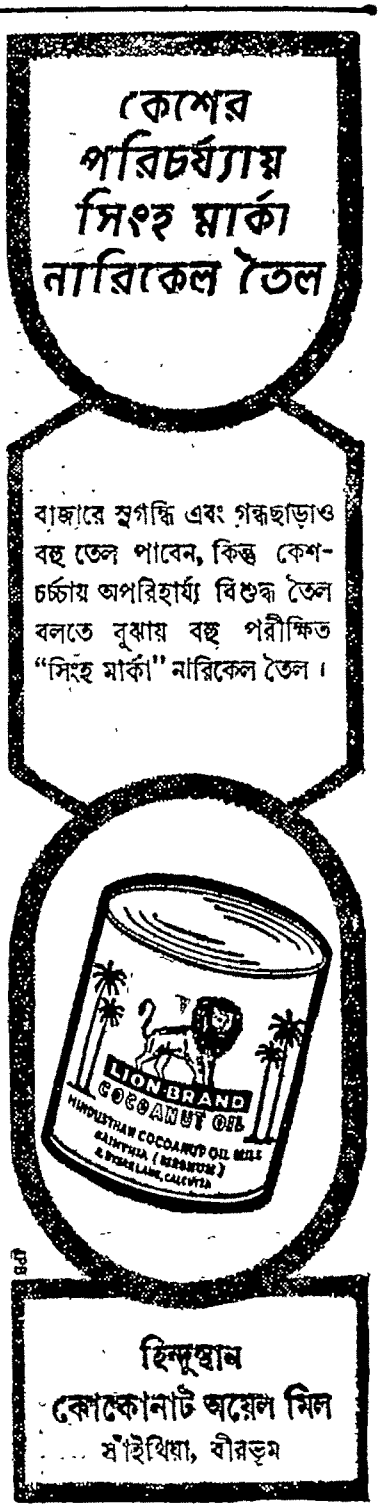

ওর নিকষ কালো মূর্তিটাকে কেমন অশরীরী একটা ছায়ার মত মনে হল।

—লোকটা সারারাত ঘুমোয় না?

—ন। নিশাচর।

জীতেনদা' কি আরও যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ধীর পায়ে সামনে এলেন জেঠিমা।

—তোরা খেতে আসবি নে?

—চল—চল মা। তুমি কষ্ট করে এলে কেন। আমরা তো এখুনি উঠতাম।

জেঠিমা আমাদের নিয়ে যেতে যেতে বললেন আমাকে—তোর কি গোয়েন্দা হওয়ার সখ হয়েছে না কি রে শঙ্কর?

—আমি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা-লেখি করি একটু-আধটু জানো তো?

—হ্যাঁ বাবা। আমি কত গর্ব করি—

খেতে বসে বললাম—জানো জেঠিমা, আমাদের এই উত্তর বাংলার গ্রামের লোক না কি খুব নিরীহ। সাত চড়ে কথা বলে না। একটু থেমে আবার বললাম, এই হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্যটা জানতে পারলে আমি দৈনিক কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখবো—আসলে উত্তর বাংলার লোক নিরীহ নয়। প্রয়োজন হলে ভয়ঙ্কর হিংস্র হতে পারে। তার প্রমাণ আছে বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে—এই দেশেরই ছেলে দিব্যোক—প্রথম গণ-বিদ্রোহের নায়ক; এই দেশেরই ছেলে বারো ভুঁইয়ার মল্লরা—

জীতেনদা'কে একেবারে চুপচাপ থাকতে দেখে আমি থেমে গেলাম। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল সেখানে চিন্তার ছায়া নামছে। কেমন কুয়াশা-ময় আর অবছায়া মনে হচ্ছে চোখ দু'টো।

—তোমার ছুটি কতদিনের?

—পনের দিনের নিয়ে এসেছি। তার দু'দিন তো গেল। আরও তের দিন থাকবো—

—ও! আস্তে আস্তে একটা ঘড় নিশ্বাস ছাড়লেন জীতেনদা'। তাঁকে বড় ক্লান্ত মনে হল।

রাত্রি গভীর হয়েছে। আমার ঘুম আসছে না। জীতেনদা'র মনটাও খুব পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আশ্চর্য! যে খুন হয়েছে তার স্ত্রী রাধা—অনেকে জানে যৌবনে তার ওপরে অনেকের খুব টান ছিল। লোভ ছিল। ফুলের মধু খাওয়ার জন্য যৌমাছিরা যেমন গুন গুন করে। তবুও সেই স্ত্রীলোককেই বিগ্রহের সেবাইত করল কে। জীতেনদা' জানেন সেকথা। বললেন না। জ্যাঠামশাইও কিন্তু খুশি হচ্ছেন না। কেন?

পূর্ণ মণ্ডল বলেছিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নিরঞ্জন সরকারের কথা। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কি ছেলেমেয়ে কেউ নেই? তাদের কাছে গেলে কেমন হয়? তাহলে তো রাইচরণ সরকার, হারু ঘোষাল, যারা যারা বেঁচে নেই তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কি কোন সূত্র পাওয়া যাবে? কিন্তু আমার মনে হয়, এই জীতেনদা' রাধা, পূর্ণ মণ্ডল, জ্যাঠা-মশায় কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে। ওরা জানে প্রকৃত ঘটনা। নিশ্চয়ই জানে।

মাথার ওপরে তারায় ভরা সর্ব-সাক্ষী আকাশের দিকে তাকালাম। কত গভীর রহস্যে ভরা ওই অনন্ত আকাশ। শুধু আকাশ নয়, বাতাস নয়, মাটি নয়—মানুষের মনও জটিল অরণ্যের মত দুর্ভেদ্য আর রহস্যময়। হয়তো ওদেরই ভেতরে কেউ ত্রিশ বছর আগের এই হত্যাকাণ্ডের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। হাসছে, খেলছে, ঘুরছে-ফিরছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা ধিকি ধিকি আগুনের মত জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে উঠে একাই রওনা হলাম পূর্ণ মণ্ডলের বাড়ির দিকে। যদি দেখা হয়, তাহলে আরও কিছু কথা শোনা যাবে। আরও কোন গোপন রহস্য জানাও যেতে পারে।

—পূর্ণ—ও পূর্ণ, বাড়ি আছো না কি হে?

—না। বালুরঘাট গেছে। ভেতর থেকে কে একজন বলল।

নিরাশ হলাম। মাঠের বুক চিরে চলে গেছে বড় বড় আলপথ। একটা আলপথ ধরে রাধার বাড়ির দিকে চলেছি।

—ও—ও মশাই—শুনছেন। আসুন—আসুন—

থামলাম। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে দুইদিকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

—আপনি তো হরিশবাবুর ভাইপো—না?

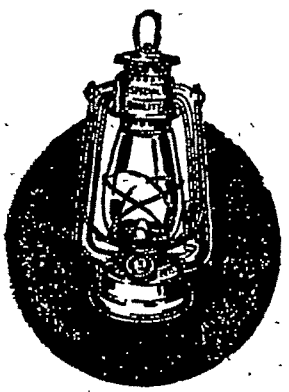
কিয়ান
নতুন সংযোজন
গৌরমোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩ও চিনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬০৮০

—হ্যাঁ।

—কলকাতায় থাকেন?

—হ্যাঁ।

সিগারেট খান? দেখুন দেখি,আপনারা হলেন কলকাতা মহানগরীর লোক। আমার দোকানটা কেমন বলুন তো?

ঘরের ভেতরেবাঁশের মাচা একটা। তার ওপরে গোটা-ছয়েক খোলা খোলা বস্তা। কারো ভেতরে চাল, কারো ভেতরে ডাল—কারো ভেতরে চিনি। বস্তাগুলোর পিছনে কটা উঁচু সেলফ। সেলফের ওপরে সারি সারি অনেক টিনের কৌটা। তার গায়ে কাগজের ছোট লেবেলে লেখা,—লবঙ্গ, জিরা, ধনে---

—বেশ ভালই তো—খারাপ কি।

—অনেক কষ্টে দোকানখানা করেছি মশাই। বড় পরিশ্রম এই ব্যবসার লাইনে। মহাজনের কাছ থেকে মাল কেনো—দোকানে নিয়ে এস। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো---

—কিন্তু আপনার পরিচয়?

—আজ্ঞে আমার নাম যতীন—

—যতীন! চমকে উঠলাম। সেই যাত্রাদলের বংশীবাদক। খাড়া নাক। কোঁকড়ানো চুল। যার বাঁশি রাধা শুনতো মুগ্ধ হয়ে। আজ তার মুখখানা কাঁচা মাটির রাস্তার মত এবড়ো-খেবড়ো, ছানি-পড়া দুটো চোখ। চুল, দাড়ি আর তোবড়ানো মুখের মানুষটাকে মনে হল প্রাচীন আর সুদৃশ্য কোন সৌধের ধ্বংসাবশেষ!

—আপনি এখন আর বাঁশি বাজান না?

হাসল। বড় ক্ষীণ আর দুর্বল হাসি। মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, সেই ঘটনার পর থেকেই বুঝলেন, বাঁশি একেবারে জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আর কখনো ছুই নি ওই পাপ—তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল পুরনো দিনের স্মৃতি। একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, যেতে দিন ওসব কথা। আপনি কতদিন থাকবেন গাঁয়ে?

—দিন বারো তের—

—তাহলে মাঝে মাঝে আসবেন এই গরীবের দোকানে, পায়ের ধুলো দেবেন। আচ্ছা নমস্কার—

বেরিয়ে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, বংশীবাদক যতীন সেই ধাক্কা খেয়েই হয়তো ঘোরতর সংসারী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিবুর কি হলো? শুনেছি বেঁচে আছে। সে কি খাসপুর থেকে একদিনও এখানে আসে না?

ভাবতে ভাবতে কখন দেখি রাধার বাড়ির রাস্তায় এসে পড়েছি। আম-জামগাছের আড়ালে রাধামাধব বিগ্রহের ঘর, রাধার ঘর উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, বীরেনের বাড়ি তো কাছেই।

ধীরে ধীরে বীরেনের বাড়ির সামনে এলাম। বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে একটা পুকুর। পুকুরের চারদিকে চারটে ঘাট। তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। ঘাটে ঘাটে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কেউ কাপড় কাচছে,—কেউ এঁটো বাসন মাজছে—আর কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাসি, গল্প-গুজবও চলছে।

—ওই — ও দাদাবাবু—কাকে খুঁজছেন?

একটা ঘাট থেকে চীৎকার ভেসে এল। কাঁধে দু'তিনটে সদ্যকাচা শাড়ি। টপ টপ করে জল ঝরছে। বীরেনের চোখে হাসি ঝিকমিক করছে।

—জানেন দাদাবাবু, আমি বোধ হয় আর্ম পুলিশে চান্স পেয়ে যাবো। এবার বুড়ো জব্দ হয়ে যাবে। খুব সহজে টেশান (স্টেশন) লিভ করতে দেবে না। বাসা করতে হবে বাধ্য হয়ে।

—তোমার বুড়ো বাবার সে কষ্ট হবে বীরেন—

—কিছুতেই বুড়োর মন ভরে না দাদাবাবু। রাত্রে শোয়ার আগে বুড়োর পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। পান ছেঁচে দেয়---আরও কত লক্ষ কাজ করে—কিন্তু তবুও ক্যাটি করেই যাবে—

—তুমি আজ ডিউটিতে যাবে না?

—যাবো বিকেলে। সদর থেকে এস-পি আসবেন। আমাদের সব সেপাইদের নিয়ে কনফারেন্স করবেন---হোই দেখুন, দাদাবাবু সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। থামুন, ওই বেড়ার ওপরে কাপড়গুলো মেলে দিয়ে আসি—

যেতে যেতে বলল, একলা মানুষ, ও পারে না দাদাবাবু। তাই শাড়ি-গুলো—

—তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন। কাজ শেষ করে এস। হাসি চেপে বললাম।

বীরেনদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসলাম।

—তারপরে গরীবের বাড়ি কি মনে করে দাদাবাবু। আপনার জন্য চা-মুড়ি আনবো?

—না—না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। শোন বীরেন, তোমার কাছে আমি চারু দাসের খুনের ব্যাপারটা জানতে এসেছি—

—ও, তখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ হবে গো দাদাবাবু। সবে চাকরিতে ঢুকেছি। মাসখানেকও হয় নি। সে কি কাণ্ড— (ক্রমশ।

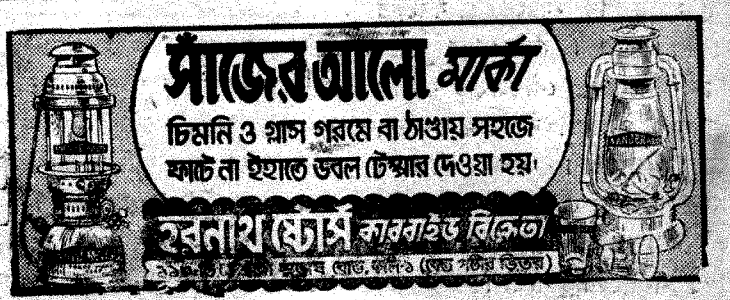

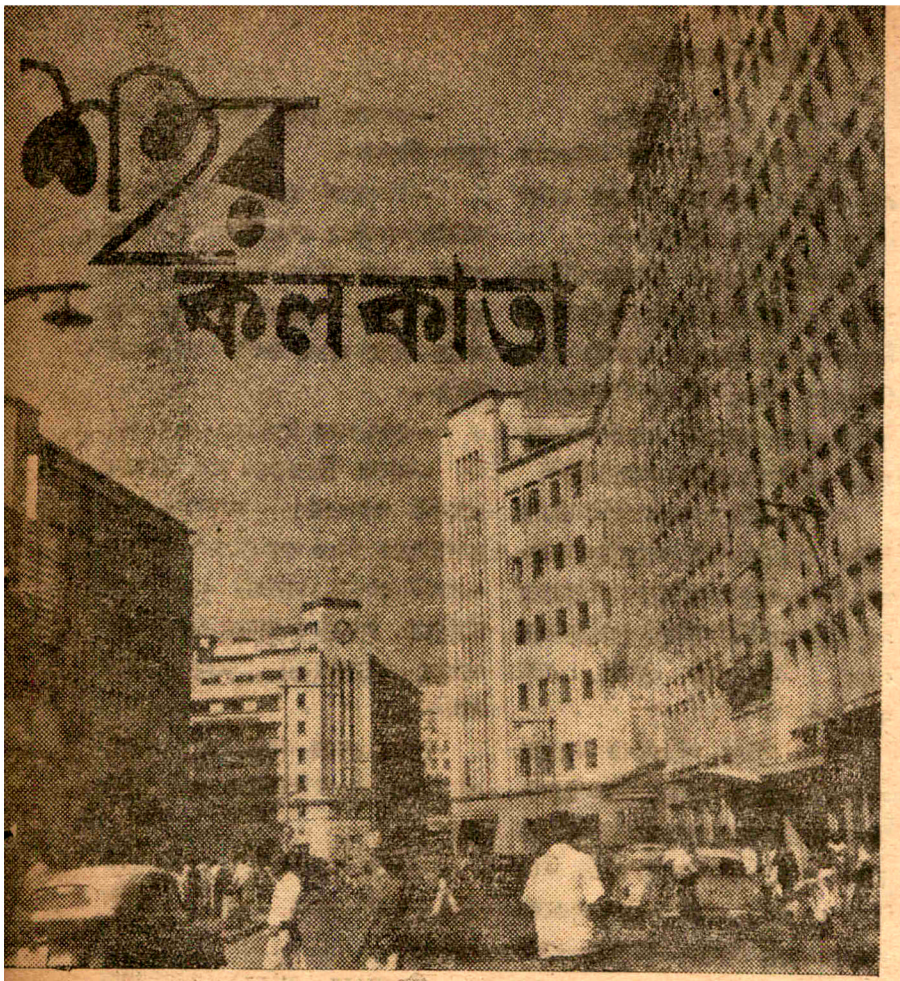


মিশন রো-এর অট্টালিকা-সমন্বিত রাস্তার দৃশ্য

## মিশন রো অঞ্চলের আদি থেকে নবীন অধ্যায়

এখানে মাঠ নেই, মাটি নেই, শুধু পাথর। স্নেহ নেই, সোহাগ নেই, শুধু শাসন। সুর নেই, ছন্দ নেই, কেবল নিয়ম। নিয়মে বাঁধা দিন, পাথরে বাঁধা সময়, হুকুমে বাঁধা জীবন। নিয়তি এখানে চাতুর্যের বাগ্‌দত্তা, লক্ষ্মী তারই দাসীবৃত্তিতে বহাল। লক্ষ্মীর তাই কুল নেই, মান নেই। সে ভুলে গেছে মাটির ঘ্রাণ, স্মরণে নেই সবুজের রূপকলি। এখানে সে পাথর চ'ষে ফসল ফলিয়েছে, সৌধমালার ফসল; যা বিশাল, বিচিত্র, নীরস এবং অটল, উদ্ধত, চিরস্থায়ী। এই সৌধরূপ শস্যরাজির স্বত্বাধিকার তাঁদেরই, যাঁরা বৈশ্যরূপ বিষ্ণু এ-দেশের। লক্ষ্মী তাঁদের অনুগ্রহের পাত্রী। বিধান তাঁদের খেয়ালের যন্ত্র। জীবন তাঁদের যান্ত্রিক দেহরক্ষী। তাঁদের জন্যেই পাথরে এত কারুকার্য, এত রঙ। তাঁদের জন্যেই এখানে যতো আয়োজন, যতো অনুষ্ঠান। আজ তাঁদেরই বৈজয়ন্তী ওড়ে দিকে দিকে।

এখানে দিনের আলো নামে হিসেবী পা ফেলে। তার প্রথম পদক্ষেপে প্রস্তুতি; দ্বিতীয় পদক্ষেপে নিয়মের প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠা; তৃতীয় পদক্ষেপ ক্লান্তির; চতুর্থ শান্তির অথবা সমাপ্তির।

শ্রীপদাতিক

তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে, হাজারে-হাজারে যেন পিঞ্জরমুক্ত কপোত নামে রাস্তায়। ক্লান্ত ডানায় মুক্তির ঢেউ তুলে মুহূর্তেই তারা স'রে যায়, হারিয়ে যায়। কেবল নীরব নদীর নির্বহতায় একাকী দেহ ভাসায় মিশন রো অঞ্চল। তারপর সন্ধ্যা নামে নিঃশব্দে; রাত্রি আসে আরামের কাঁধে হাত রেখে। কিন্তু অন্ধকার থাকে দূরে। কারণ তখন আমিষী-বৈষ্ণব মার্টিন বার্ণ, কারণাসক্ত ট্রাম কোম্পানী, দালাল-শ্রেষ্ঠ জে টমাস এবং অন্যান্য সৌধমালার দাম্ভিক শিখরে জ্বলে আলোর সঙীন। রাস্তাও নিজ বিনিদ্র চোখের বিচ্ছুরণে হুঁশিয়ার। তাই অন্ধকার এগিয়ে এসেও, পিছিয়ে যায় খোঁড়া পায়ে। উজ্জ্বল রাত্রির চিবুকে কেবল মাঝে মাঝে চুম্বন এঁকে যায় হাওয়া।

এমন অবস্থা অবশ্য চিরকাল ছিল না এ-অঞ্চলের। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ-অঞ্চল ছিল এক খালের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অংশ বিশেষ। তাই স্বাভাবিক কারণেই তখন দূরবর্তী আহিরীটোলার গরু চরতো এখানে। অলস মধ্যাহ্নে বাঁশিও বাজতো রাখালের। হয়তো এই বাঁশির সুরেই চমকে উঠতো কোনা কুলবধূ—যে সেদিন স্নানে আসতো গঙ্গার ঘাটে। তার ঝিরঝিরে নদীর মতো হৃদয়ে হয়তো শ্রাবণের বাদল-রাত্রির বান ডেকে উঠতো হঠাৎ। তা লক্ষ্য করেই খলখলিয়ে হেসে উঠতো বয়সিনী গঙ্গা, হাততালি দিয়ে নেচে উঠতো দূরের অশ্বত্থ, আকাশপথে ভাসতে ভাসতে সূর্য হতো লাল, লাজুক এবং রসিক।

তারপর উক্ত শতাব্দীরই মধ্যভাগ থেকে তৃণভূমির একদিকে, অর্থাৎ আজকের এই মিশন রো-তেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক বিস্তৃত বস্তি। তখন যে-সমস্ত পর্তুগীজ এ-দেশীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতো, তাদেরই ঔরসজাত সন্তানাদির মধ্যে যারা ছিল পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং মাতা কর্তৃক অনাদৃত—দিনে দিনে বিপুল আকারে বংশবৃদ্ধি ঘটে তাদের। তারা বিচ্ছিন্নভাবে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কালীঘাটের বিভিন্ন অংশে যেমন বাসা বাঁধে, তেমনই তাদের একটা বিরাট অংশ সেদিন আজকের এই মিশন রো-তেও গ'ড়ে তোলে সেই বস্তি। তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল জীবিকাহীন

এবং শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গেও বিশেষ কোন যোগসূত্র ছিল না তাদের। তাই অশেষ দারিদ্র্যই ছিল তাদের নিত্য-কালের সঙ্গী। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক-জনেরই ছিল কিছু কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সংসার নির্বাহের চেষ্টা। বাকি অধিকাংশই তাদের জীবনধারণের উপায় খুঁজতো চুরিবিদ্যায়, গুণ্ডা-বাজিতে, লুটের কারবারে এবং সুচতুর জুয়া খেলায়। তাছাড়া জলদস্যু-দের দলেও ছিল অনেকের নাম। জীবন তাদের এভাবেই কাটতো এবং তৃণভূমির পাশে তাদের সেই বস্তির অস্তিত্ব ছিল প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই বস্তি-সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তীর প্রকাশ ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী 'এম্পায়ার' পত্রিকার কোনো এক সাহিত্য সংখ্যায়। কিংবদন্তী হলেও, তা নাকি সর্বাংশে কিংবদন্তী নয়। কিছু অংশে তা সত্যাশ্রিত বলেই উল্লেখ ছিল লেখার প্রথম স্তবকে। কিংবদন্তীটি আমার ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে এই :

পর্তুগাল থেকে আগত এক জলদস্যু কিছুকাল দস্যুবৃত্তি বর্জন ক'রে বসবাস করতে থাকে বাংলা দেশে। এখানে সে জীবিকারূপে গ্রহণ করে ছোটো-খাটো ব্যবসা এবং সেও বাসা বাঁধে বর্তমান মিশন রো-এর তৎকালীন বস্তিতে। তারপর সে বিয়ে করে একজন এ-দেশীয় নারীকে—যার বাপের বাড়ি আহিরী-টোলায়। বিয়ের বছর-খানেক পরেই তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মে—যার মুখশ্রীর তুলনা চলে কেবল ফুলের সঙ্গেই। তারা তার নাম রাখে রোজারিও। মা-বাপের ছায়াতলে হাসতে-হাসতেই সে বড়ো হয়, অর্থাৎ শৈশব ছাড়িয়ে পদার্পণ করে কৈশোরে। তখন সে দ্বিভাষী। বাপের দৌলতে সে যেমন আয়ত্ত করেছে পর্তুগালের ভাষা, তেমনই মায়ের কৃপায় ঠোঁটস্থ করেছে বাংলায় কথা বলা। রোজারিওর রূপ দেখে এবং সেই সঙ্গে মেধার পরিচয় পেয়ে পল্লীবাসীরা প্রত্যেকেই মুগ্ধ। সবাই তাকে ভালোবাসে, আদর করে এবং প্রবীণরা প্রাণভরে আশীর্বাদ জানায় তার উদ্দেশে।

ঠিক এমনই দিনে কী-এক অজ্ঞাত কারণে, রোজারিওর পিতা, অর্থাৎ সেই জলদস্যু হঠাৎ স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে ফিরে যায় পর্তুগালে। হয়তো কোনো নতুন জলদস্যুর জাহাজ

ভিড়েছিল গঙ্গার ঘাটে, সে-জাহাজই তাকে নিয়ে যায়।

সুতরাং পিতার অভাবে মাতাই হলো রোজারিওর একমাত্র নির্ভর। দুঃখিনী মায়ের স্নেহ-যত্নেই সে কৈশোরের পথ ধ'রে এগিয়ে আসে যৌবনের সীমায়। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তেমন যোগসূত্র না থাকলেও, গুণ্ডাবাজি বা দস্যুবৃত্তিকে সে ঘৃণা করতে শিখেছে মায়ের কাছেই। অতএব সঙ্গীদের সঙ্গদোষ থেকে মুক্ত হয়ে সে দূরবর্তী আহিরীটোলারই এক গৃহস্থের গরু চরাবার কাজে নিযুক্ত হয়। তাদের বস্তি থেকে আহিরীটোলা দূর হলেও, প্রত্যহ পায়ে-হেঁটেই সে যাতায়াত করে অক্লেশে। এভাবে যাতায়াত করতে করতেই একদিন আহিরীটোলার একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় তার। রোজারিও যেমন সুপুরুষ, তেমনই মেয়েটিরও রূপ-লাবণ্য উপেক্ষার নয়। সুতরাং প্রথম আলাপেই তারা আকৃষ্ট হলো পরস্পরের প্রতি। তারপর আকর্ষণ আরও গভীর হতেই একদিন মায়েরই ব্যবস্থাপনায় মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হলো রোজারিওর। নবদম্পতির মিলিত সন্তার সেতুতে দাঁড়িয়েই বুক ভরে উঠলো দুঃখিনী মায়ের।

তারপর একদিন যখন পুত্র ও পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়েই হাসতে হাসতে চোখ বুজলো রোজারিওর মা, ঠিক তার কিছুকাল পরেই গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়লো এক জলদস্যুর জাহাজ। জাহাজ থেকে নেমেই জন-কয়েক দস্যু এসে দাঁড়ালো রোজারিওর বাড়ির সামনে। রোজারিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চিনতে পারে : দলের প্রধান তার পিতা। পিতা আনন্দে আলিঙ্গন করে পুত্রকে। তারপর বলে : সে তাকে নিয়ে যাবে পর্তুগালে। কিন্তু রোজারিও রাজি হয় না। সে রাজি না হওয়ায় তার পিতা এবার অবলম্বন করে চরম ব্যবস্থা। অর্থাৎ সে অন্য দস্যুদের সাহায্যে রোজারিওকে জোর করেই টেনে এনে জাহাজে তোলে। তারপর নোঙর খুলে দেয় জাহাজের।

রোজারিওর বউটি ছিল তখন আহিরীটোলায় তার বাপের বাড়িতে। একজন প্রতিবেশীর মারফত খবর পেয়েই সে ছুটে আসে। কিন্তু জাহাজ তখন গঙ্গার বুক ছেড়ে স'রে গেছে দূরে, অনেক দূরে।

বউটি আহার ছেড়ে স্বামীর ঘরেই মাথা খোঁড়ে বার বার। দিনে দিনে এগিয়ে চলে সময়, তবু ফিরে আসে না রোজারিও। বউটি কেবল কাঁদে। কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দেয় আরও কিছুদিন। তারপর একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে-ও। সবার অলক্ষ্যেই সে চ'লে যায় ক্লান্ত পায়ে। কোথায় যায়---কেউ তার খবর পায় না।

ব্যস্ত হয়ে উঠলো বউটির মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন। তারা অনুসন্ধান করলো বিস্তর। কিন্তু হদিস পেলো না কোথাও। কেবল গঙ্গার ঘাটের এক বৃদ্ধা ভিখারিণী বললো : সেদিন সন্ধ্যাকালে একটি সুন্দর বউকে সে ডিঙি ভাসাতে দেখেছে গঙ্গায়। ডিঙিতে ভেসেই দক্ষিণের দিকে গিয়েছে বউটি। যাবার সময় ভিখারিণীকেই নাকি ব'লে গেছে : সে যাচ্ছে তার স্বামীর দেশে।

কিংবদন্তীর সমাপ্তি এখানেই। উনবিংশ শতাব্দীতে তার প্রকাশ ঘটলেও, তার উৎপত্তিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম ভাগ। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন রেভারেণ্ড জন জ্যাকারী কায়েরন্যানডর তিনি সুইডেনের অধিবাসী। তিনি ধর্মপ্রচারক রূপেই ভারতের কুড্ডালোরে আসেন প্রথম। সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি গীর্জা এবং সেই সঙ্গে সেখানে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও প্রসার ঘটে। কিন্তু ফরাসী সেনানায়ক ফাউণ্ট ল্যালী হঠাৎ কুড্ডালোর অধিকার করায় তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি ক'রে কলকাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। কলকাতায় তখন নগর-পত্তন সুরু হয়েছে। বিক্ষিপ্ত সৌধ উঠেছে বর্তমান ডালহৌসী

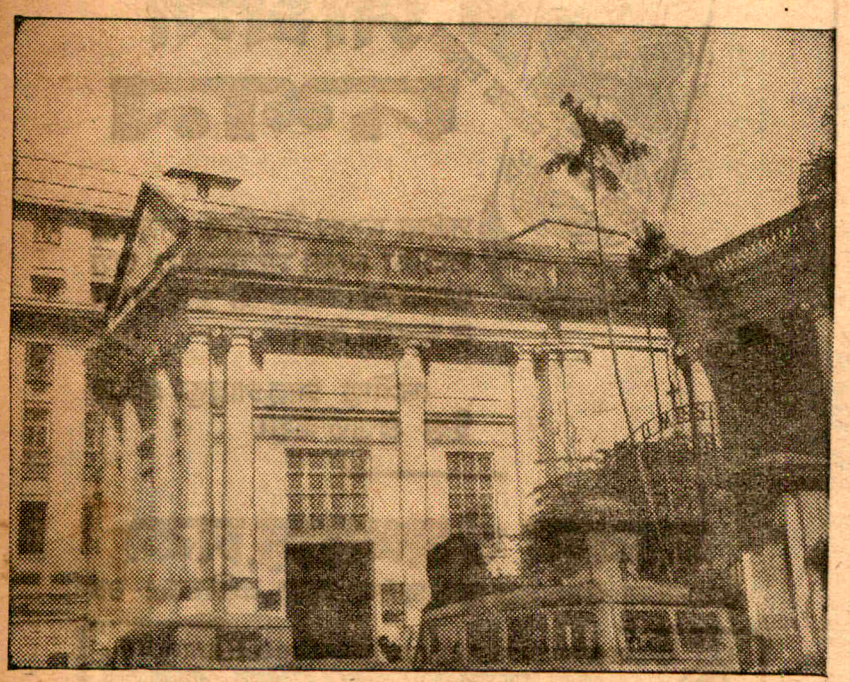

● মিশন রো অঞ্চলের প্রোটেস্ট্যাণ্ট লাল গীর্জার দৃশ্য

অঞ্চলের তৎকালীন ভূমিখণ্ডে। মিশন রো অঞ্চলের তৃণভূমিরও বিলোপ ঘটেছে বহুলাংশে। তবে পর্তুগীজ-বস্তি তখনও ছিল, খানিকটা সঙ্কুচিত হলেও। ঠিক এমন দিনেই কলকাতায় এসে ধর্মপ্রচার সুরু করেন রেভারেণ্ড কায়েরনান্যানডর। তাঁর প্রচারের ফলস্বরূপ হিন্দু এবং পর্তুগীজ মিলে প্রায় কয়েক শ' ব্যক্তি খৃষ্টধর্মের প্রটেস্ট্যাণ্ট মতে দীক্ষিত হয় বছর-কয়েকের মধ্যেই। তারপর একটি মিশন চ্যাপেল এবং একটি প্রটেস্ট্যাণ্ট গীর্জা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তিনি রেভারেণ্ড হেনরী বাটলারের সহ-যোগিতায় চাঁদা তুলতে সুরু করেন। সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি-রূপে কর্নেল ক্লাইভই কলকাতার অধিপতি। তিনি কায়েরনান্যানডরের শুভ প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে নিজেও এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। ফলে উভয়ের যুগ্ম উদ্যোগে মিশন চ্যাপেল এবং গীর্জার নির্মাণকার্য সুরু হলো ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। তারপর বছর-দুয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ হলো তার নির্মাণকার্য। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সর্বসাধারণের জন্য উক্ত মিশন চ্যাপেল এবং গীর্জার দ্বারোদ্ঘাটন করলেন স্বয়ং কায়েরনান্যানডর। গীর্জার তখন নামকরণ হলো 'বেথ-লেফিলিয়া' বা 'দি হাউস অব প্রেয়ার'। অবশ্য অনে-কের মতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি গীর্জা এখানে অনেক আগে থেকেই ছিল। সিরাজের কলকাতা অবরোধকালে গীর্জাটির ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। ১৭৬৭-৭০ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কায়েরনান্যানডর সে-গীর্জাকেই গ'ড়ে তোলেন নতুন কলেবরে। মিশন চ্যাপেল এবং এই গীর্জা প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ্ শ্রীরায়ের একটি বর্ণনার উল্লেখ করা যায়:

'From Barretto's Lane and along a bit of Mango Lane, the passage opens into Misson Row, where the memory of old rope-walk has been supplanted by that of Kieranander's chapel and school. Here the Parish Church lay open at many points in full view across the 'Park' and sweetwater tank and Fort William, also with its handsome factory buildings, gleaming white above its crimson walls.'

গীর্জার যে সত্যই পুনর্গঠন হয়েছিল, এমন কিছু উল্লেখ করেন নি শ্রীরায়। তাঁর বর্ণনা থেকে কেবল জানা যায়: বর্তমান মিশন রো অঞ্চলের তৎকালীন পরিবেশের গীর্জাতোরণ থেকেই দৃষ্টিগোচর হতো পার্ক-সংলগ্ন বা উদ্যান-শোভিত লালদীঘি, ফোর্ট উইলিয়াম, কোম্পানীর কাছারীবাড়ি—ইত্যাদি।

সে যাই হোক, উক্ত গীর্জাই ইংরেজদের প্রথম প্রটেস্ট্যাণ্ট গীর্জা কলকাতার। গীর্জা এবং মিশন চ্যাপেলের অধিষ্ঠান হেতুই সংলগ্ন রাস্তার নামকরণ হয় মিশন রো। রেভারেণ্ড জন জ্যাকারী কায়েরনান্যানডরের পরে আরও অনেক বিদ্যোৎসাহী এবং উদার-হৃদয় রেভা-রেণ্ডের সমাগম ঘটেছে এখানে। অনেকে আবার সমাধিলাভ করেছেন গীর্জা-সংলগ্ন ভূমিখণ্ডেই। আজও গীর্জার অভ্যন্তরে যাঁদের স্মৃতি-ফলক বর্তমান, তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড হেনরী পি পার্কার, রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন, বিশপ ড্যানিয়েল করি, চার্লস গ্র্যাণ্ট, রেভারেণ্ড হেনরী মার্টিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এই লাল গীর্জার নিষ্কলুষ অভ্যন্তরেই একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি চমকপ্রদ এবং কারো পক্ষে বেদনার, কারো পক্ষে আনন্দের—ইতিহাস যার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে আজও।

সেদিন ছিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী। ওদিকে লালদীঘি নির্জন, কোম্পানীর কাছারীবাড়ি শব্দহীন এবং নীরব-নির্বিকার সৌধমালা। কেবল প্রভাতের রক্তরশ্মি ডানায় তুলে লালদীঘির আকাশে ভাসছে একঝাঁক শুভ্র পারাবত। ----এদিকে গীর্জার চূড়ায় তখন উজ্জ্বল আলোর পতাকা। মিশন চ্যাপেলের সামনে-পেছনে পুলিশ-বেষ্টনী। বেষ্টনীর ওপারে কৌতূহলী জনতা কলকাতার। আর গীর্জার অভ্যন্তরে সাগরদাঁড়ির তেজস্বী হিন্দুসন্তান এবং হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ছাত্র মধুসূদন দত্ত। তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। —সেদিন দীক্ষার সেই মুহূর্তে, মধুসূদনের কোনো আত্মীয় অথবা অন্য কোনো গোঁড়া হিন্দু হঠাৎ বাধার সৃষ্টি করতে পারে ভেবেই প্রয়োজন হয়েছিল পুলিশ পাহারার। তবে বাধার সৃষ্টি কেউ করেন নি। সেদিনের সব আয়োজন নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয় শান্ত পরিবেশে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পরি-বর্তনের পথ-পরিক্রমায় মিশন রো অঞ্চলের দ্রুত পদক্ষেপ সুরু হয়। আজ বিংশ শতাব্দীর উর্ধ্ব সোপানে পা রেখেই তার পরিবর্তন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা চলে। আজ আর মাটি নেই, বস্তি নেই, চারণভূমি তৃণাঞ্চলও নেই। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আজ কেবল কঠিন সৌধমালা—যাদের শিখরে শিখরে অবক্ষয়ের উদ্ধত স্বাক্ষর এবং পাদদেশে নিয়মের দুর্জয় বন্ধনে উদ্যমতার অব্যাহত পদ-সঞ্চার।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী
**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**
৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা
**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

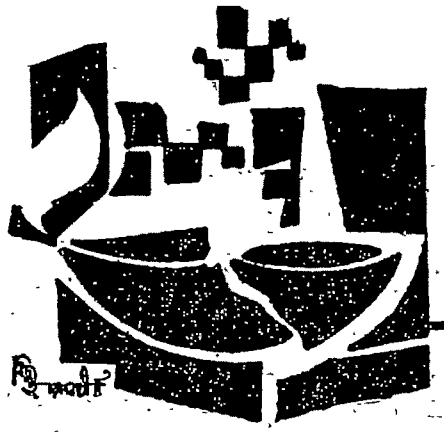

ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'তপ্তুর মাটির পাত্রে'

## মনঞ্জয় বৈরাগী

### পঁয়ত্রিশ

শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পর থেকে সাত বছরের মধ্যে রেণুকা নিজেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রতিষ্ঠা অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করা সম্ভব ছিল না, দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে সে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে। পিতা বিজনবাবু অবশ্য সব সময়ই কন্যাকে সাহায্য করেছেন, যাতে তাঁর এই অভাগা মেয়েটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। প্রথম প্রথম তিনি দুঃখ করে প্রায়ই বলতেন, দোষ আমার, কেন আমি ছেলে না দেখে বংশমর্যাদা দেখতে গিয়েছিলাম। তাই তো এ শাস্তি, কিন্তু এ শাস্তি ভগবান আমাকে দিলেন না কেন, কেন আমার মেয়ের জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিলেন?

রেণুকা বলত, এসব তুমি কি বলছ বাবা। যা ঘটেছে তা নিশ্চয় আমার অদৃষ্টে ছিল। কিন্তু তাই বলে ভেঙে পড়ব কেন? তুমিই তো বল জীবনের ধারা একটাই নয়, অনায়াসে সে পথ পরিবর্তন করতে পারি।

বিজনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বলি তো মা, উপদেশ সকলকেই দিই, কিন্তু নিজের জীবনে এটা সহ্য করা যে কি শক্ত, বিশেষ করে যখনই মনে হয় আমার জন্যেই তোর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

—কিছুই নষ্ট হয় নি, দেখ তুমি, আমি ঠিক দাঁড়াতে পারব।

অসাধারণ দৃঢ়তা রেণুকার। সে পড়াশুনো সুরু করল পরীক্ষা দেবার জন্যে, সেই সঙ্গে বাড়ির কাজকর্মও দেখতে থাকে। সন্ধ্যেবেলা ভাই, বোন, বাবার সঙ্গে বসে প্রার্থনা-সঙ্গীত গায়। বিজনবাবুর সামনে অন্তত কোন সময়েই সে মুখ গম্ভীর করে ঘুরে বেড়াত না, বুঝতেই দিত না তার বেদনা ভরা মনের কথা। শুধু রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবত তার জীবনের কথা। ক'দিনের জন্যে শ্বশুরবাড়িতে যাবার কি প্রয়োজন ছিল, এ প্রহসনটুকু না ঘটলে জীবন-সোত আগের ছন্দেই বইত। সারা জীবনই তাকে এমনি করে লড়াই করতে হবে ভাগ্যের সঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হত সে অন্তঃসত্ত্বা, নতুনের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে কিছুদিনের মধ্যে, কি বার্তা সে নিয়ে আসছে কে বলতে পারে। মনে মনে সে একটি দেবশিশুর ছবি আঁকত, আর ভাবত এমনি একটি শিশুর সে যদি জননী হতে পারে, তাহলে সে মেনে নেবে, স্বামীকে না পেলেও বিবাহ তার ব্যর্থ হয় নি।

কয়েকমাস পরে রতনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রেণুকার মনের পুঞ্জীভূত অভিমান কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সন্তানের মুখের দিকে সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, মনে হত ঠাকুর তার প্রার্থনা শুনেছেন, সেই দেবশিশুই যেন পুত্ররূপে তার কাছে এসেছেন।

রতনের ভাগ্য ভাল, মামার বাড়িতে সকলের কাছে সে পেল অকুণ্ঠ ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা রেণুকার এ ট্র্যাজেডির কথা জানত তারাও সস্নেহে রতনকে কাছে টেনে নিল।

কেউ বলে রতন বড় সুন্দর হয়েছে, ওর মায়ের চেয়ে সুন্দর।

কেউ বলে, এমন শান্ত স্বভাব ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না।

কেউ বলে, বাচ্চার মনটা বড় নরম। হাসিমুখে সবাই-এর সঙ্গে মিশতে পারে।

এসব কথা শুনে পুত্রগর্বে রেণুকার বুক ফুলে ওঠে। ছোট বেলা থেকে সে নিজের হাতে রতনকে চান করিয়েছে, খাইয়েছে, সব সময় কাছে কাছে রেখেছে, অল্পক্ষণের জন্যেও রতনকে দেখতে না পেলে মায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠত।

ক্রমে রতন বড় হতে লাগল, রেণুকাও পরীক্ষা ত পাশ করে ঢুকল স্কুলে মাষ্টারী করতে। ছাত্রীরা তার পড়ান'র ধরা ভালবাসত, রেণুকার মধ্যে তারা পেয়েছিল একজন সহৃদয়া শিক্ষয়িত্রীকে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ কর্তব্যপরায়ণা রেণুকাকে একটার পর একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। তাই দু'তিন বছরের মধ্যেই রেণুকাকে সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে উন্নীত করলেন।

বিজনবাবু বলতেন, বড় বেশি পরিশ্রম করছ রেণু-মা।

রেণুকা উত্তর দিত, না বাবা, শরীর আমার ভালই আছে।

—দিন দিন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছ। চোখের তলায় কালি পড়ছে যে।

—আজকাল ঘুম বোধহয় একটু কম হচ্ছে। ক'দিন থেকেই ভাবছি, রাত্রে একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়ব।

বিজনবাবু মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলে, আবার কি করছ?

রেণুকা মৃদু স্বরে বলে, ভাবছি এম-এ-টা দিয়ে দেব। আজকাল তো আর শুধু বি-এ, বি, টি-তেই চলে না। এম-এ-টাও পাশ করা দরকার।

—যাই কর, শরীরটা বুঝে।

রতন স্কুলে ঢুকেছিল তিন বছর বয়েস থেকে, পাড়াতেই একটি নার্সারি স্কুলে সে পড়ে। এ সব স্কুল এ অঞ্চলে আগে ছিল না। সম্প্রতি এক ভদ্রমহিলা নিজের বাড়িতেই একতলায় বাচ্চাদের পড়ান'র ব্যবস্থা করেছেন। রতন মহা উৎসাহে টিফিনের বাক্স হাতে করে পড়তে যায়, রেণুকাই তাকে পৌঁছে দিয়ে নিজের স্কুলে চলে যায়। দুপুরবেলা ছুটি হলে বিজনবাবু তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, আজ কি পড়লে দাদু।

রতন গম্ভীর হয়ে বলে, অনেক পড়েছি।

—কি বলত।

—এ, বি, সি।

—আর কি করেছ?

—বল খেলেছি।

—টিফিন খেয়েছ?

—খেয়েছি।

রতন কিন্তু বাড়িতে রেণুকার কাছে পড়াশুনা করে না। শ্লেট পেন্সিল নিয়ে দাদুর কাছে গিয়ে বসে। বিজনবাবু যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, তারই মধ্যে সময় বার করে নিয়ে নাতিকে পড়ান, যত না পড়া হয়, গল্প হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

রতনের বয়েস যত বাড়ে, গল্প শোনার চাহিদাও বাড়ে তত বেশি। রামায়ণের গল্প, মহাভারতের কাহিনী, ভূত, প্রেত, ডাকাত, মহাপুরুষের জীবনী, একের পর এক বিজনবাবু বলে যান, যেখানে থামেন, রতন কৌতূহলী চোখে প্রশ্ন করে, তারপরে দাদু, তারপরে?

এ তারপরের শেষ নেই। রেণুকা কাছে থাকলে হেসে ধমকে বলে, আঃ, দাদুকে অমন করে বিরক্ত করো না, একটু জিরুতে দাও।

বিজনবাবু উত্তর দেন, না, না, দাদু আমায় মোটেই বিরক্ত করছে না। ভুলে যাই তো, কতদিন আগে এ সব গল্প পড়েছি। তোরাও গল্প শুনতিস বটে, কিন্তু আমার দাদুর মত নয়। এ বড় হয়ে লেখক হবে। বই লিখবে, কি বল দাদু?

রতন কিন্তু আত্মপ্রশংসায় ভোলে না, আবদারের সুরে বলে, তার পর কি হ'ল বল না দাদু। রাক্ষসটা আর আসবে না।

অগত্যা বিজনবাবু বলতে সুরু করেন, সেই রাক্ষসটা তখন ঘুমচ্ছে, এমন সময় রাজপুত্র একটা তলোয়ার নিয়ে—

স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত রতন কখনও রেণুকার কাছে জানতে চায় নি, তার বাবা কোথায়, কেন তার কাছে আসে না? কিন্তু এ প্রশ্ন শিশুর মনে উঁকি মারতে সুরু করল স্কুলে যাবার পর থেকে। বন্ধুরা বাড়ির কথা বলে, সেই সঙ্গে মা-বাবার কথা ওঠে, বিশেষ করে ওর বন্ধু নন্দন সারাক্ষণই প্রায় ওর বাবার কথা শোনায়। নন্দনের বাবাকে রতনও দেখেছে, ছেলেকে তিনি স্কুলে ছেড়ে দিয়ে যান, আবার নিতে আসেন ছুটির সময়। তিনি একদিন রতনের গাল টিপে আদর করে বলেছিলেন, তোমার নাম রতন? নন্দনের কাছে তোমার গল্প কত শুনি। একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াতে এস।

রতন প্রথমটা কোন জবাব দেয় নি, পরে বলেছিল, মাকে জিজ্ঞেস করব।

নন্দনের বাবা বলেছিলেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করে রেখ, স্কুল থেকেই আমি তোমায় নিয়ে যাব, আবার বিকেলবেলা আমি আর নন্দন গিয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

সেই দিনই রতন রেণুকাকে নন্দনের বাবার কথা বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করেছিল, আমার বাবা কোথায় মা?

রেণুকা প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারে নি, নীরবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ প্রশ্ন যে একদিন উঠবে তা সে জানত। কিন্তু কি উত্তর দেবে তা আজও ভেবে পায় নি।

রেণুকা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, বলে, এলেই দেখতে পাবে।

—বাবা কবে আসবে?

—তা তো জানি না।

—কেন আসে না, বাবা?

রেণুকা বলে ফেলল, অনেক কাজ কি না। শেষ হলেই আসবে।

শিশুর মনে এ কথাগুলো বোঝার মতই রয়ে গেল। মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নন্দনের বাড়ি খেলতে সে প্রায়ই যেত। ওদের বাড়ি কাছেই, অনেকখানি জমি আছে, বাচ্চাদের খেলার খুব সুবিধে হয়। নন্দনের বাবা বাচ্চাদের নিয়ে খেলতে ভালবাসেন, তাদের যত্ন করে খাওয়ান। নন্দন রতনকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল, তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। নন্দনের মা খাটের ওপরই শুয়েছিলেন, রতনকে দেখে হাসলেন, বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন, পরে বললেন, যাও তোমরা বাইরে খেল গে।

রতন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি খেলবে না?

নন্দনের মা হাসলেন, না বাবা। তোমার মা খেলা করেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—মাকে একদিন আসতে বলো, আমি শুয়ে শুয়ে গল্প করব।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দন বলেছিল, আমার মায়ের অসুখ কি না, উনি বিছানায় শুয়ে থাকেন।

—কি হয়েছে?

—জানি না।

ঐ বাড়িতেই একদিন রতনের বাবার প্রসঙ্গ উঠেছিল।

নন্দনের বাবা তাড়াতাড়ি অ

থামিয়ে দিয়ে বলেন, ওসব নিয়ে তোমাদের আলোচনা করতে হবে না, যাও খেলা কর।

তাঁর মুখ থেকে আদেশের সুর শুনে নন্দনও চমকে উঠেছিল, পরে সবাই চলে গেলে সে জিজ্ঞাসাও করে।

উনি বলেন, হয়ত রতন বেচারীর বাবা নেই, দাদুর কাছে মানুষ হচ্ছে, ওকথা বলে ওর মনে কষ্ট দিতে নেই।

নন্দন রতনকে সত্যিই ভালবাসত। স্কুলে পাশাপাশি বসে পড়া বলত, টিফিনের সময় একসঙ্গে বসে খেত, খেলতে নেমে একই দলে নাম দিত দু'জনে। বাবার কথা শুনে নন্দনের মন রতনের প্রতি সমবেদনায় আরো ভরে ওঠে। প্রতি পদক্ষেপেই তা প্রকাশ পেতে লাগল। হয়ত ফুটবল টিমে রতনকে নেওয়া হয় নি, নন্দন গিয়ে জোর হয়ে সুপারিশ করে বলত, রতনকে নিন না, ও বেশ ভাল খেলে।

উত্তর আসত, অত ছেলে দিয়ে তো আর টিম হয় না, কয়েকজনকে তো বসতেই হবে।

—বেশ। তাহলে আমার জায়গায় ওকে নিন।

—তুমি যে ওর চেয়ে ভাল খেল।

—না, তাহলে আমি খেলব না।

নন্দন চলে এসে বন্ধুর পাশে বসে পড়ত। রতন এত কথা জানত না, প্রশ্ন করত, কি রে, তুই খেলবি না?

নন্দন বলত, না, পায়ে ব্যথা, খেলতে ভাল লাগছে না।

এ একদিনের কথা নয়, প্রায়ই এ রকম ঘটতে লাগল। রতন জানতে পেরে একদিন সরাসরি জিজ্ঞেস করে, কেন তুই আমার জন্যে খেলিস না? কেন তুই আমার হয়ে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিস?

খেলা তখন ভেঙে গেছে, প্রায় অন্ধকার মাঠে দুই বন্ধুতে পাশাপাশি বসেছিল। নন্দন উত্তর দিল, তোকে যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

—তাই বলে অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া করবি।

—কি করব, ওরা তো জানে না, বোঝেও না—

—কি?

—যে তোর বাবা নেই।

—আমার বাবা, বলতে গিয়ে রতন থেমে গেল। কিছুতেই মুখ থেকে বেরল না, আছে।

গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, কে তোকে বলেছে আমার বাবা নেই?

নন্দন উত্তর দিল, বাবা।

বাবা নেই এ চিন্তা রতনের মনে আজ প্রথম জাগল। বোধ হয় এই-জন্যেই মা সব সময় এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান, বাড়িতে কখনও তার বাবার বিষয়ে আলোচনা হয় না, তবে এতদিন ধরে সে যে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করছিল তার সবটাই মিথ্যে। কেউ আসবে না। মিথ্যা আশায় বুক বেঁধে যতদিনই সে অপেক্ষা করে থাকুক না কেন, পিতৃশোক সে আজ অনুভব করল। দর দর করে জলের ধারা নেমে এল তার চোখে। নন্দন তাকে তখুনি জড়িয়ে ধরে, কাঁদ কাঁদ গলায় বলে, আমার ভুল হয়েছে, বাবা বারণ করেছিলেন এ নিয়ে কথা বলতে।

দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে ভাবা কাঁদল।

সেই রাত্রে রতন খায় নি, মাথা ধরেছে বলে সন্ধ্যে থেকেই আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসেছিল, তারপর এক সময় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। বাবার ছবি সে বাড়িতে দেখে নি, কিন্তু কল্পনায় একটা মূর্তি তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। আজ বিছানায় শুয়ে সেই মূর্তির কথা চিন্তা করল, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেল না। পিতৃহীন ছেলেদের দুঃখের কথা, সে গল্পের বই-এ পড়েছে, পড়েছে কত কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয়, বিধবা মাকে সুখী করার জন্যে। সে শুয়ে শুয়েই প্রতিজ্ঞা করল, মায়ের মনে সে কখনও কষ্ট দেবে না, সে নিজে বড় হবে, মায়ের যত করবে, অবিরাম চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজতে লাগল।

এমন সময় মায়ের কোমল স্পর্শ রতন অনুভব করল। রেণুকা জিজ্ঞেস করে, এখনও ঘুমাও নি খোকন?

রতন নিরুত্তর।

—বড্ড কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ দেব?

—না।

ছেলের বিকৃত স্বর শুনে রেণুকার সন্দেহ হল, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে চমকে উঠল, একি, কাঁদছিস, কি হয়েছে রে?

রতন পাশ ফিরে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

রেণুকা বিচলিত হয়ে পড়ে, কি হয়েছে, আমাকে বলবি না? কেউ কিছু বলেছে? কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

রতন সজোরে মাথা নেড়ে যায়।

—তবে?

রতন কান্না-ভাঙা গলায় বলল, তুমি কেন বল নি আমার বাবা নেই?

রেণুকার বুক থর থর করে কেঁপে উঠল, এ কথা কে বলেছে?

রতন আবার নিরুত্তর।

রেণুকা নিজেকে সংযত করে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, যেই একথা বলে থাকুক, তা সত্যি নয়। তোমার বাবা আছেন, কেন এখানে আসতে পারেন না, বড় হলে জানতে পারবে।

রতন আস্তে আস্তে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকায়, দেখে সে চোখে জল নেই।

রেণুকা শুকনো গলায় বলে, এইটুকু জেনো তোমার মা কখনও মিথ্যে কথা বলে না। আগে তুমি বড় হও, মানুষ হও, একে একে সব কথা তোমায় বলব, অন্যের কথা শুনে মন খারাপ কোর না। তুমি কষ্ট পেলে আমি কষ্ট পাব। তোমার জন্যেই আমার বেঁচে থাকা।

রতন উঠে বসে, মাকে জড়িয়ে ধরল, সজলকণ্ঠে বলল, তোমাকে আমি কষ্ট দেব না, দেখ আমি ঠিক মানুষ হব।

রেণুকা ছেলের কপালে চুমু খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তা আমি জানি বাবা। ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমি আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

(ক্রমশ।

# গ্রন্থমেলা

জয়ন্তী সেন

**মহাত্মা গান্ধী ঃ** ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু, সম্পাদক, গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা। ১৪, রিভার সাইড রোড, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। দাম :, ৬·৫০ নঃ পঃ।

গান্ধী স্মারকনিধির পক্ষ থেকে সম্প্রতি যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'মহাত্মা গান্ধী' সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বাংলা দেশে যে অল্প ক'জন লোক সত্যিকার কিছু বলবার অধিকারী, ডঃ ঘোষ নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। তিনি গান্ধীজীকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন, তাঁর সংগ্রামের সহযাত্রী ছিলেন এবং কখনও কখনও তাঁর কোন কোন নীতির সমালোচকও ছিলেন। গান্ধীজীর কোন সংস্করণ না হওয়ার মত, তাঁর এই ব্যক্তিত্বও তাঁকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড বলে আমরা মনে করি। অতএব একজন মহাপুরুষকে জানবার এবং চেনবার সবগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান, আমরা এই গ্রন্থকারের মধ্যে পেয়েছি, যিনি গান্ধীবাদকে পোষাকরূপে গ্রহণ না করে জীবনের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এই সব কারণে তাঁর রচিত 'মহাত্মা গান্ধী' অপরিসীম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বইটি পড়ার আগে আশঙ্কা ছিল—আমাদের এত বেশি প্রত্যাশা তিনি পূরণ করবেন কি না। পড়ার শেষে মনে হয়েছে,—আমাদের আরও কিছু প্রত্যাশা ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থটি যদিও জীবনী, তবুও তাঁর জীবনদর্শন এখানে অনুপস্থিত নয়। জীবনীর দিক থেকে, কেবল শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদ ছাড়া, অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি গান্ধী-সাহিত্য পাঠকের কাছে খুব বেশি অপরিচিত নয়। কিন্তু এই শেষের পরিচ্ছেদগুলি, ভারতের রাজনীতি, তার স্বাধীনতা অর্জন এবং তার স্বাধীনোত্তর অধ্যায়গুলির সমীক্ষার জন্য, একান্ত অপরিহার্য। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বই আর দ্বিতীয় নেই। ইংরেজীতেও সম্ভবত 'মহাত্মা গান্ধী—দি লাষ্ট ফেজ'—প্যারেলালের এই দু'খণ্ড বই একমাত্র নির্ভরযোগ্য।

অথচ, এই শেষের অধ্যায়ে এসেই আমরা গান্ধীজীর পরিপূর্ণ মূল্যায়ন পেতে পারি। দেশ বিভাগ, স্বাধীনতা অর্জন, হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য, গদি-লোভী নেতৃবৃন্দের পরিণতি—ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়গুলিকে এই মহান নেতা কি চোখে দেখেছিলেন তার কোন নির্ভরযোগ্য রেকর্ড বাংলা-সাহিত্যে ছিল না। এই বইটি তার অভাব পূরণ করবে। অথচ আমাদের মতে—এই সময়ের পরিধির মধ্যেই গান্ধীজীর মহত্তম বিকাশ ঘটেছিল—তাঁর নিষ্ঠুর মানসিক যন্ত্রণা, বেদনা, ব্যর্থতা ও কান্নার মধ্যেই আমরা গান্ধীজীকে আমাদের দুঃখ-দিনের নিঃসঙ্গ সঙ্গীরূপেই পেয়েছি। এইখানেই অমরত্বের তীর্থে পৌঁছেছেন। গান্ধীজীর এই আলেখ্য, 'মহাত্মা গান্ধী' শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা পাব।

এই জীবনী গ্রন্থের মধ্যে লেখকের জীবনেরও কিছু কিছু সুন্দর ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। একথা আমরা কখনও শুনি নি, গান্ধীজী একজন বিখ্যাত সেতারীর সেতার শুনতে শুনতে কয়েক ঘণ্টা মগ্ন হয়ে কাটিয়েছেন বা পদ্মার বিশাল বুকে জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি দেখবার জন্য তিনি নৌকার ছাদে উঠে এসেছেন। এই সব টুকরো টুকরো কাহিনী—এই বইটিকে রমণীয় করে তুলেছে।

বইটির আরও একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য এই যে, গান্ধীবাদের ও গান্ধী-চরিত্রের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এখানে স্থান পেয়েছে। ভূমিকাটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং চিন্তার উপাদানে পরিপূর্ণ।

গান্ধী-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এই বই পাঠ করে উপকৃত হবেন—একথা আমরা আন্তরিক সততার সঙ্গে বলতে পারি। বইটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর। দাম কিছু বেশি বলে মনে হয়েছে। এর একটি সুলভ সংস্করণ হওয়া উচিত বলে মনে করি।

**দুপুর পর্যন্ত ঃ** রামগোপাল নাথ। প্রকাশক : গোপালচন্দ্র নাথ, মিতা প্রকাশন, ১নং হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, কলকাতা-৩। দাম: দেড় টাকা।

ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় আঠাশটি কবিতায় কবিমনের তীক্ষ্ণ অনুভূতি ধরা পড়েছে ধ্বনি প্রধান, তান-প্রধান এবং গদ্য ছন্দে। বলা বাহুল্য, কাব্যগ্রন্থটির নামেই কবিজীবনের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে এবং তাঁর কাব্যশৈলীর সেই পর্যন্ত আপাতত বিস্তারিত। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম দিকের দু'একটি কবিতায় রবীন্দ্রসুর প্রতিধ্বনিত হলেও কবি ধীরে ধীরে স্বকীয়তার পথ-পরিক্রমা করেছেন। কাব্যের বিষয় সম্পর্কেও কবি সচেতন। প্রেম—যা তথাকথিত বাস্তবতায় মলিন নয়, দার্শনিকতা, ভৌগোলিক চিন্তা, বিজ্ঞান-রহস্য, পুরাণ, দেশ ও দশ, প্রকৃতি ও দুর্ভেদ্য মানব-মন কবিমনকে বার বার বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছে। 'দুর্জ্ঞেয়' কবিতায় যেমন রয়েছে মনস্তাত্ত্বিকতা, তেমনি 'আস্তিক্যে' পাই নিঃসংশয় ব্যঙ্গ। 'জুয়াড়ী', 'সম্রাট', 'তোমার দূত', 'বোধ' প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যঞ্জনাময়। হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদটিতে দৃঢ়তার অনুভূতি মনে একটা অব্যক্ত অনুরণনের সৃষ্টি করে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

দুরন্ত দেহলী

॥ দুই ॥

কানাই, বলাই, সমর ও নৃপেন ট্যাক্সি থেকে নামলো। চারজনের পোষাকই বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের মতন। না বলে দিলে কেউ ভাবতেও পারবেন না যে, ট্যাক্সিটা ধরা হয়েছে ঐ রাস্তারই মোড় থেকে। পদব্রজে চার মাইল এসে চার বন্ধু যখন ট্যাক্সিতে উঠলো পায়ের ব্যথায় সমর তখন কাতর। জুতোটাও নিজের না হওয়ায় হাঁটতে তার কষ্টটাই হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

কাশ্মীরী গেটের কাছে বিরাট প্রাসাদের সামনে ট্যাক্সিটা থামার সাথে সাথে ফুটফুটে চেহারার কজন ভদ্রলোক আদর-আপ্যায়ন করে তাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সুসজ্জিত ড্রইংরুমে তারা গিয়ে বসল। ঘরখানা ইঙ্গরঙ্গীর কায়দায় সাজানো। সোফা, কোচ-এর পাশেই রয়েছে গালিচা, তাকিয়া, গড়গড়া। দেয়ালে মোনালিসার ছবি। সামনের ফুলদানিতে কতগুলো ইষ্টার লিলি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের একখানা ছবি। তার সামনে কয়েকটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

বাঁদিকে ছোট টিপয়ের ওপর একটা এ্যালসেশিয়ান কুকুরের রঙীন ফটোগ্রাফ। অন্য ছোট আর একটি টিপয়ের ওপর একটা ধূপদানির ষ্ট্যাণ্ড।

সোনার সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করে সকলকে যিনি আপ্যায়ন করলেন, তাঁর নাম নিশীথ সেন। তিনি একটি করলার খনির মালিক। তারই কন্যাকে দেখতে এরা আজ সমবেত হয়েছে।

নৃপেনকে উদ্দেশ্য করে নিশীথবাবু বললেন, 'আপনিই হলেন ছেলের গার্জেন, আই মিন্ অভিভাবক?'

এদিক ওদিক না তাকিয়ে অকম্পিত কণ্ঠে নৃপেন বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ওর গার্জেন। ছোটবেলায় মা, বাবা, কাকা সবাই যখন ওকে ছেড়ে চলে যান তখন থেকে আমার কোলেই ও মানুষ। ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা ছিল। তাই দিয়েই ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ালুম। তবে সত্যি বলবো খরচ আমার বেশি হয় নি। সত্যজিৎ বরাবরই স্কলারশিপ পেয়ে এসেছে।'

ওদিকে সমর সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত করে অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আজকের এ প্রহসনে সেই সত্যজিৎ, মানে, ভাবী বর।

পরিপার্শ্বের দিকে তাকিয়ে নৃপেন সমস্ত অবস্থাখানা একবার বিবেচনা করে নিল। বাকী তিনজনই জড়সড় হয়ে বসেছে। সত্যজিতের দিকে তাকালে যে কোন লোকেরই করুণা হয়। ভয়টা সেই যেন পেয়েছে একটু বেশি।

চোখে চোখে দু একবার ইসারা করে নৃপেন তাকে আশ্বস্ত করেছে। তাতেও কোনো ফল হয় নি দেখে এবার বলল, 'আমাদের সত্যজিৎ ভয়ানক লাজুক ছেলে, বুঝলেন মিঃ সেন। ভারত সরকার ওকে বিলেত পাঠিয়েছিল। একটা ডিনার পার্টিতে একটি মেয়ে ওকে বল্ নাচে ডাকায় তারপর দিনই বিলেত ছেড়ে চলে আসে। মেয়েদের সামনে ওর জড়তাটা আরও বেড়ে যায়।

মিঃ সেন একটু আশ্বাসিত হলেন বলেই মনে হ'ল। নৃপেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখুন না রায়বাহাদুর দাশগুপ্ত, এই রকম ছেলেই তো আমি চাই। লেখাপড়া জানলেই চলবে না। টাকাকড়ি থাকলেই চলবে না। যেটি আসল সেটি হ'ল চরিত্র।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলেই, স্বগতোক্তিতে নৃপেন বলে ফেলল, ওটা ধুয়ে জল খাবে।

নিশীথ সেন অন্দরমহলে কন্যাকে আনতে গেলেন।

এই ফাঁকে কানাই ও বলাই সামনে রাখা সোনার সিগারেট কেস থেকে চার-পাঁচটা করে সিগারেট নিজেদের পকেটে পুরে ফেলল।

সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করে একদল অপরূপ রূপসী ঘরে প্রবেশ করলে। তাদের পুরোভাগে নিশীথ সেন ও তাঁর কন্যা।

করজোড় করে নিশীথবাবু বললেন, 'এই আমার একমাত্র কন্যা বনানী।'

চারজনেরই বুকের ভেতর ছ্যাঁক্ করে উঠলো। যেন একটা রূপের ঝর্ণা। এত রূপও মানুষের থাকে? নৃপেন কখন কল্পনাও করতে পারে নি। বনানীকে প্রায় বধূবেশেই সাজানো হয়েছে। লাল বেনারসী শাড়ির সাথে টিস্তর ব্লাউজটা ম্যাচ্ করেছে বেশ। কপালে কুনকুম, গলায় মুক্তোর হার,

কানে কুণ্ডল, হাতে মুক্তোর রিষ্টলেট। এই সব ছাপিয়ে যেটি দেখা যাচ্ছে, সেটি বনানীর প্রতিমার মতন রূপ। স্বর্ণালঙ্কারের সাথে তার অঙ্গের রঙ নিখুঁতভাবে মিলে গেছে।

নৃপেন বনানীর—দিকে তাকিয়ে হতবাক্ হয়ে গেলো। তার মুখ থেকে কোনো প্রশ্নই বেরুলো না। বলাই সাহসে ভর করে বলল, 'গান গাইতে ভাল বাসেন?'

মিষ্টি গলায় বনানী বলল, 'ক্ল্যাসিক্যাল গানই ভালবাসি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও গেয়ে থাকি।'

সাহসে ভর করে নৃপেন বলল, 'তাহলে আমাদের একটা গানই শুনিয়ে দিন। ক্ল্যাসিকাল বুঝি না, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতই হোক।'

অর্গানের সাথে চাঁপা ফুলের মতন আঙুলগুলো চালিয়ে বনানী গান ধরে—

'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও
সে ঘুম আমার রমণীয়—'

গানটা থামার পরেও তার আমেজটা যেন সমস্ত ঘরখানায় ছড়িয়ে ছিল। ভারী মিষ্টি গলা। নৃপেনের বুকের ভেতর যেন কেমন কেমন করে উঠলো।

কানাই ও বলাই-এর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওরা সমর?

নিশীথবাবু নিজেই বললেন, 'কেমন শুনলেন গান রায়বাহাদুর?'

নৃপেন আমতা আমতা করে বলল, 'তা বেশ মিষ্টি গলা। তা লেখাপড়া সম্বন্ধে দু'টো-একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

নিশীথবাবু ঘাড়, হাত নেড়ে উৎসাহের সাথে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনারা পরীক্ষক। আপনারা যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন।'

নৃপেন বলল, 'বুঝতেই তো পারছেন আমাদের সত্যজিৎ লেখাপড়া নিয়েই থাকে। লেখাপড়া সম্বন্ধে তাই আমাদেরও ঔ সুক্যটা একটু বেশি।'

নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কতখানি লেখা-পড়া করেছেন?'

বনানী মাথা নীচু করে জানালো, সে বি-এ অনার্স পড়ে। তার বিষয় হ'ল পলিটিক্যাল সাইন্স্।

কানাই, বলাই, সমর, নৃপেন কেউই পলিটিক্যাল্ সাইন্স সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

তাড়াতাড়ি ধামাচাপা দিয়ে নৃপেন বলল, 'আজ্ঞে আমাদের মেয়ে দেখা হয়ে গেছে। আপনি মিস্ সেনকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারেন।

পরীর দল বনানীকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল। নিশীথবাবু ভেতরে যাবার প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। নৃপেনই একটু জোর করে বলল, 'আজ্ঞে আপনিও একবার যান ওঁর সাথে। ছেলেমানুষ কি না বোধ হয় ঘাবড়ে গেছেন।'

বনানী কিন্তু ভয় পায় নি। সে ঘাবড়ে যাবার মেয়ে নয়। তবুও নিশীথ সেন ভেতরে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

নৃপেন কানাই-বলাইকে ধমক দিয়ে বললে, 'হতভাগার দল। বললুম দাড়িটা ভালো করে আটকে দিতে। ওটা বার বার খুলে যাচ্ছে। নে কানাই, তাড়াতাড়ি দাড়িটা একটু টাইট করে দে। বলাই, দাঁড়িয়ে দেখ কেউ ঢুকে না পড়ে। তোর কি হল সমর? তুই দেখছি সত্যিকারের বরের চেয়েও ভেড়া হয়ে গেলি।

কানাই বলল, 'তা যাই বলো, নৃপেনদা, ও রকম রূপসীকে স্ত্রী কল্পনা করেও সুখ। এ যেন স্বর্গ থেকে অপ্সরার দল নিচে নেমে এসেছে। আমার ত' এখনও মনে হচ্ছে যে আমি স্বপ্ন দেখছি।'

বলাই বুকে একখানা হাত রেখে বলে উঠলো, 'গেলো, গেলো। বুক জ্বলে গেলো। ওগো ও নৃপেনদা,' এ কি করলে গো? কনে দেখতে এসে হৃদয়খানা হারিয়ে গেলুম?'

সমর উদাসভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ধাক্কাটা যেন তারই লেগেছে বেশি। কি চাপা ছেলে। কিছু প্রকাশ করবে না সে।

কানাই ও বলাই নৃপেনের দাড়ি টাইট করে বেঁধে দিল। সমরের পায়ের ফোস্কায় হাত বুলিয়ে দিল। সোনার সিগারেট কেস থেকে তিনজনে তিনটে সিগারেট ধরালো। বলাই সমরকেও দিতে গেল, 'ধর ধর, দামী মাল।

সমর সিগারেট খায় না।

নৃপেন বলল, 'হাঁদারাম, নিশীথ ওর হবু শ্বশুর না? ওর সামনে সমর ধরায় কি করে? কবে কোথায় তোদের হাতে হাতকড়ি পড়বে আমার শুধু সেই ভয়।'

সিগারেটগুলো অর্ধেকও শেষ হয় নি। হন্তদন্ত হয়ে অন্দরমহল থেকে নিশীথবাবু এসে হাজির। পিছনে বেয়ারার দল সারিবদ্ধভাবে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নিয়ে প্রবেশ করল।

কানাই বলাই-এর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির ইসারা করল।

নৃপেন সেটা লক্ষ্য করে রোষ-কশায়িত লোচনে তার দিকে তাকালো। সমর মাথা হেঁট করেই বসে রইলো। সে যেন সত্যিই বিয়ে করতে বসেছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন তারা বেরুবো বেরুবো করছে, নিশীথবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে অত্যন্ত নার্ভাস-ভাবে নৃপেনকে কি যেন বলতে এলেন। কিন্তু পারলেন না। অনেক কষ্টে আবার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'আজ্ঞে দেখবেন একটু। আমি শুধু ছেলের চরিত্র চাই। আর কিছু না হলে হবে। খবরটা একটু তাড়াতাড়ি দিলে ভাল হয়। আর যদি কিছু মনে না করেন, এই ট্যাক্সি ফেয়ারটা'—বলে, একখানা দশ টাকার নোট নৃপেনের পকেটে গুঁজে দিলেন।

'আহা করেন কি? করেন কি?' বলে নৃপেন সমস্তে টাকা দশটা পকেটস্থ করল। লোভাতুর দৃষ্টিতে কানাই, বলাই সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

সমর মাথাটা তুলে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিল। গেটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিতে খানিকটা চেপে নৃপেন কি যেন হারিয়ে যাবার ভাণ করে ট্যাক্সিকে থামিয়ে তাকে বিদায় করে দিল।

কানাই, বলাইকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা নিজের পকেটে রেখে তারা পরম উল্লাসে পদব্রজেই সমস্ত পথটুকু অতিক্রম করল।

বলাই শুধু মাঝে মাঝে বুকে একখানা হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'গেলো, গেলো। বুক জ্বলে গেলো। ওগো ও নৃপেনদা', একি করলে গো। কনে দেখতে এসে শেষ মেশ হৃদয়-খানা খোয়ালাম না তো?'

নৃপেন, কানাই, বলাই-এর পক্ষে এ অভিনয় নতুন কিছুই নয়। আজ প্রায় বছর-ছয়েক ধরে পত্রিকার পাত্র-পাত্রী কলমের বিজ্ঞাপন পড়েই সে সুখে-দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। বাংলা দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অভাব নেই। ট্যাক্সির খরচ বলে, রেলের ভাড়া বলে যে টাকাকড়ি সে তাদের কাছ থেকে আদায় করে, তার একার মেস ভাড়ার পক্ষে সেটা নেহা; কম নয়। শহরের পথঘাট তার নখদর্পণে। কানাই, বলাই তার সাকরেদ। সমর এ সবের সাতে-পাঁচে নেই। চাকরীর সন্ধানে বহুদিন ধরে বহু ঘাটের জল খেয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আজকাল সে নৃপেনের শরণাপন্ন হয়েছে, যেমনিভাবে একদিন হয়েছিল কানাই, বলাই। সমর সুপুরুষ। তার মার্কেট ভ্যালুটা তাই চড়া। ছোটো-খাটো বাড়ি ছেড়ে নৃপেন তাই আজকাল প্রাসাদ বা ম্যানসানে নোঙর দিয়েছে। এতে একটু মুস্কিলও আছে। এদের প্রায় লোকেরই গাড়ি আছে, গাড়ি ভাড়ার বদলে তারা নিজেদের গাড়িতে লিফট্ দিতে চায়। নৃপেন সে সব সামলে নিতে জানে।

আজ্ঞে আপনি কষ্ট করবেন কেন? হেঁ হেঁ। তাছাড়া ট্যাক্সিতেই ওর মতামতটা জেনে নেব। আপনারা থাকলে তো আর ও কিছু বলবে না। বুঝলেন না। তা ভাড়াটা হেঁ হেঁ, আপনারা কেন দেবেন? বলেই সন্তর্পণে টাকাগুলো যে পকেটস্থ করে থাকে।

কানাই, বলাই গাঁয়ের ছেলে। গ্রামে যাত্রার দলে পাওাগিরি করে দিনযাপন করতে না পেরে, চাকরীর সন্ধানে তারা একদিন রাজধানী দিল্লীতে এসে হাজির। বহু ঘাটের জল খেয়ে কানাই, বলাই যখন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল, নৃপেনের জীবন অবলম্বনের সহজ উপায়টুকু যেন সোনার তরীর মতন তাদের তুলে বাঁচালো।

সমর তার ভাড়া করা জামা-কাপড়-গুলো আস্তে আস্তে খুলে রাখলো। এক-মাত্র ছেঁড়া গেঞ্জিটা ছাড়া বাকি সব কটা জিনিসই অপরের। ধীরে ধীরে তার ভাঙা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল। এই ভাঙা খাটিয়া তার জীবনের বহু বিনিদ্র রাত্রির অশ্রুবর্ষণের সাক্ষী। ধীরে ধীরে সে শুয়ে পড়ল। কোণের দিকটা কেটে গেছে। তা যাক। এখন যে চিন্তা তার মনে আসছে না। শুয়ে শুয়ে এ কথাই সে ভাবছিল—এ অভিনয় আর কতদিন? সত্যি কি রূপসীই না বনানী! কি সুন্দর তার আঙুলগুলো। কি সুন্দর পলাশ ফুলের মতন তার চোখ দুটি অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে সরমরক্ত-রাগে অনুরক্ত জানিয়ে তার দিকে মুহূর্ত-মাত্র তাকিয়েছিল। কিন্তু সে কি করবে? সত্যিই যদি সে ইঞ্জিনীয়ার হত।

(ক্রমশঃ)

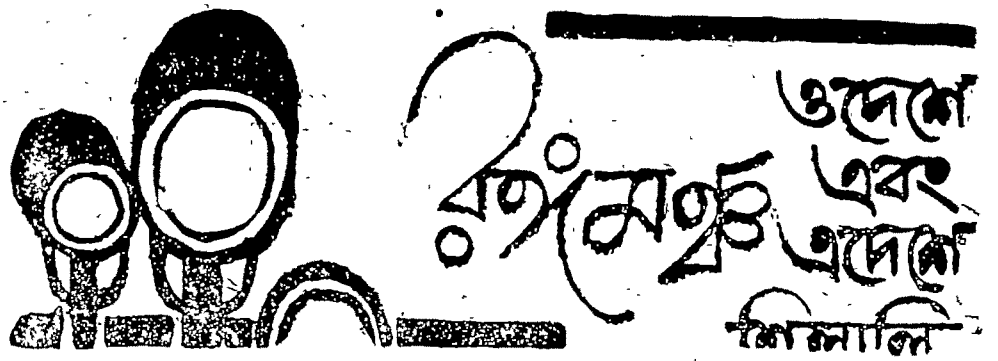


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

তা ছাড়া পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদেরও উপর, যথা—মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ,—যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

এই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখতে হয়েছিল আমাকে। সেটি পড়ে মিষ্টার থর্ণ পত্রে জানান—

'Yes, this is intensely interesting and important. It is well worth fuller treatment. Could you extend this fragment into about 800—1000 words. I should like to see it again. I am quite sure that you can fill this out. Some details of production, about which you know so much, would be extremely effective. You really must get on with this.

আগেই বলেছি, মিঃ থর্ণ যৌবনে অভিনয় করতেন। তাঁর আমলের অনেক বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক interesting কাহিনী তাঁর কাছে শুনেছি। তাঁর অটোগ্রাফের খাতায় দেখেছি—হেনরী আরভিং, বিরবোম ট্রি, গর্ডন ক্রেগ, এলেন টেরী, ফর্বস রবার্টসন প্রভৃতি সবারই হাতের লেখা আছে। অনেক সময়েই পূর্ব-ব্যবস্থামত আমরা meet করতাম বিশেষ বিশেষ কাফেতে বা ককি হাউসে। বিশেষ বলছি এই জন্য যে, পুরণো দিনের স্মৃতি-জড়িত বা ইতিহাস-চিহ্নিত জায়গা-গুলিই তিনি বেশীর ভাগ সময় পছন্দ করতেন।

একবার তাঁকে বলেছিলাম, London Pubs গুলো সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই একটা জায়গা—যেখানে ইংরাজ তার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে সহজ-ভাবে মেশে। তা ছাড়া কত রকমের এবং কত জাতের লোককে কত অদ্ভুত ভাবে দেখতে পাওয়া যায় এখানে। মিষ্টার থর্ণ চিঠিতে আমাকে লিখে-ছিলেন—

'Yes, an interesting and unusual idea, it has novelty, the main-spring of journalism. Much has been written about the Old-Worlde Inns, but very little about London's 'Pubs'. There is, by the way, a very old 'Inn' or 'Pub' in Holborn Circus, the 'Mitre' that goes back to 1530. In it you will find the trunk of the cherry-tree that supplied cherries to Queen Elizabeth I. ! You will find it at the end of a tiny alley in Hatton Garden, not a minute from Gamages.'

হে মার্কেট থিয়েটারে জন ব্যারিমোরের 'হ্যামলেট' তিনি দেখে-ছিলেন—কিন্তু তাঁর ভাল লাগে নি। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতাম যে, আমেরিকান অভিনেতাদের অভিনয় তাঁর ভাল লাগতো না। এ বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোষ ছিল বলেই আমার মনে হয়। শুধু তিনি কেন বেশিরভাগ ইংরেজই আমেরিকান অভিনেতাদের পছন্দ করেন না। আমি লণ্ডনে বার্নার্ড শ'য়ের The Devil's Disciple-এ Tyrone Power-এর মঞ্চাভিনয় দেখি। তাঁর অভিনয় বড় ইংরাজ অভিনেতাদের অভিনয়ের তুলনায় কোনো অংশেই নিকৃষ্ট বলে আমার কিন্তু মনে হয় নি।

বৃটিশ ড্রামা লিগের প্রিন্সিপ্যাল মিস্ ম্যাকেঞ্জি কিন্তু আমাকে বলে-ছিলেন, জন ব্যারিমোরের Hamlet হয়েছিল অত্যন্ত Philosophical এবং Intellectual type-এর হ্যামলেট। সাধারণ আর পাঁচটা হ্যামলেটের সঙ্গে ব্যারিমোরের হ্যাম-লেটের তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল। এর পরের যুগের শ্রেষ্ঠ হ্যামলেট হচ্ছে —বলতেন মিস ম্যাকেঞ্জি, জন গিলগুড।

মিষ্টার থর্ণ আর একটা চিঠিতে দেখি লিখছেন—

'I was in the original production of strike at the Duke of York's. I remember Galsworthy very well indeed, he attended all the rehearsals—over a period of six weeks. Granville Barker produced this fine drama. I had some lines in the big strike scene in Act 2. It was a fine cast, Lilah McCarthy, Norman Mckinnel, Edmund Gween, Fisher White, etc. Lilah McCarthy was Granville Barker's first wife; I shall never forget some rather painful moments during the production of Barker's Winter's Tale at the Savoy Theatre. Poor Lilah McCarthy was a poor actress and Barker went for her tooth and nail! I will say more about this when we meet! Barker was merciless!

Galsworthy always looked extremely ill, and even on fine, worm days, wore a heavy overcoat and muffler.

ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে আগে যাঁর নাম মনে আসে, তিনি হচ্ছেন স্যার হেনরী আরভিং (১৮৩৮-১৯০৫)। তাঁর আসল নাম হচ্ছে জন হেনরী ব্রডরিব। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের শেষ তিরিশ বছর আরভিং লণ্ডন ষ্টেটে একরকম একাধিপত্য করেন। আরভিং টেরী টিমের কথা আজও ইংলণ্ডের থিয়েটার অনুরাগীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

সেক্সপীয়ারিয়েন এ্যাক্টর হিসাবে তাঁর নাম চিরকাল থিয়েটারের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর আগে ওদেশেও নট-নটীদের একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখা হোত। তিনি নাইটহুড পাবার পর থেকেই এ অবস্থার অবসান ঘটে।

(ক্রমশ।

# নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

## ❋ ব্রজমারায়ণ গুপ্ত ❋

### ষত্রিংশ

### একটি প্রতিভার অপমৃত্যু

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আট দিন পূর্বে, তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী ঠিক হয়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে একবার দুর্গাবাবুকে পরীক্ষা করানোর।

নাট্যভারতীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয় মুখোপাধ্যায় সে সময় প্রায় প্রতিদিনই দুর্গাবাবুকে দেখতে যেতেন। বিজয়বাবু ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডাঃ রায় যে সময়ে দুর্গাবাবুকে দেখতে যাবেন বলে কথা দেন, বিজয়বাবু তার আগেই দুর্গাবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং দুর্গাবাবুর গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে ডাঃ রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ডাঃ রায় যথাসময়ে উপস্থিত হন। দুর্গাবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাঃ রায় বলেন :

—মদ আপনার দেহে বিষের কাজ করেছে।

—তা হবে। কিন্তু মদ তো আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি।

—কিন্তু সে আর ক'দিন? আরো আগে ছাড়তে পারলে ভাল হোত।

—আপনি বিশ্বাস করুন। প্রায় বছরখানেকের মধ্যে আর আমি মদ খাই নি।

—বিয়ার?

—হ্যাঁ। বিয়ারই ত' ইদানীং। খেতাম।

—কতটা? এক বোতল?

—না। তারও বেশি।

—ক' বোতল?

—তা বলতে পারবো না। তবে গাড়িতে সব সময়ের জন্যেই বেশ কয়েকটা বোতল রেখে দিতাম।

দুর্গাবাবুর কথা শুনে ডাঃ রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটা প্রতিভার এইভাবে অপমৃত্যু বোধহয় তাঁকে কাতর করে তুলেছিল। তাই বললেন,

—বিয়ারটাও সোডা-লেমনেড্ নয়। ওটাও মদেরই অঙ্গ। যাই হোক, মদ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হবে।

ডাঃ রায়ের উপরোক্ত কথায় দুর্গাবাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন,

—উপদেশ চাই না। চাই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্। আপনি ডাক্তার আর আমি রোগী। পারেন তো কাগজ-কলম নিয়ে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করুন। জীবনে বহু উপদেশ শুনেছি। বাবা, কাকার উপদেশও কোনদিন কানে তুলি নি। আজও তুলবো না—

দুর্গাবাবুর কথা শুনে ম্লান হাসেন ডাঃ রায়। তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পাশের ঘরে এসে দুর্গাবাবুর গৃহচিকিৎসককে বললেন,

—প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করা নিরর্থক। কোন ঔষধেই আর কিছু হবে না। তবে দুঃখ এই, একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে যখন দেখতে এলাম তখন আর আমার কিছু করবার নেই। তিলে তিলে নিজেকেই নিজে শেষ করেছেন।

বিজয়বাবুর কাছে দুর্গাবাবু ডাঃ রায়ের ফিয়ের দরুণ ৬৪৲ টাকা দিয়ে রেখেছিলেন। বিজয়বাবু টাকা ক'টা এগিয়ে দিলেন ডাঃ রায়ের দিকে। ডাঃ রায় ফিয়ের টাকা ফিরিয়ে দিলেন বিজয়বাবুকে। আর সেই সঙ্গে গভীর বেদনায় ভেঙে পড়ে বললেন—একটা প্রতিভার অপমৃত্যু দেখে গেলাম। এর জন্যে ফি দিতে হবে না। যদি কিছু করতে পারতাম বা তার উপায় থাকতো তাহলেও না হয়—

এরপর আর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ডাঃ রায়। সঙ্গে বিজয়বাবু ও দুর্গাবাবুর গৃহ-চিকিৎসক তাঁকে অনুসরণ করলেন। ডাঃ রায়ের গাড়ি স্টার্ট নিল।

আর এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দুর্গাবাবু।

# নিঃশব্দ তুষারে ঢেউ

আর্যদেব

সাহিত্য যুগাক্রান্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধূসর কুয়াশায় আচ্ছন্ন প্রভাতের ওপারে সবুজ কিংবা নীলিম আকাশের যে আয়না তা যে অনেক সময় সময়ের ছবিতে মুখর, সাম্প্রতিক সাহিত্যের শরীরে তার লক্ষণ বিশেষ প্রকটমান, সাহিত্যের আঙিনায় বিচরমান মানুষের কাছে--- একথাটা নতুন নয়। সাম্প্রতিক ক্রুদ্ধ দর্শকের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব কিংবা পশ্চিম জগতের সাহিত্য সাধনাকে বিশ্লেষণ করলে এংগ্রি হাংগ্রি কিংবা বীটদের সমস্ত পদচারণা আমাদের বিস্মিত করবে বৈকি। এবং এই তথাকথিত সদম্ভ পদচারণার ঢেউ যে আমাদের সাহিত্য সৈকতকে আলোড়িত করে নি তা নয়। কিন্তু এই এংগ্রি হাংগ্রি বা বীটদের পাশাপাশি নিঃশব্দ তুষারের ওপারে যে আরেক দল সাহিত্য-সেবী সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে মানুষের নতুন কণ্ঠকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যবনিকার অন্তরাল থেকে তাঁদের সম্বন্ধে আমরা হয়তো ততটা ওয়াকিবহাল নই। কেন না স্তালিনের শাসনকালে সেই সব তরুণ কণ্ঠের আওয়াজ যবনিকার প্রাচীর ভেদ করে আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে নি। কিংবা পার্টি অধ্যুষিত সাহিত্যসংস্থার প্রভাবে সেই আপন রুচির চিত্র রাশিয়ার জমাট তুষার গলিয়ে কলস্রোতে আমাদের মনের তটকে প্লাবিত করতে পারে নি। কিন্তু স্তালিনোত্তর যুগে সেই জমাট তুষার অনেকটা গলতে আরম্ভ করেছে আর সেই অন্তঃসলিলা প্রাণ-চঞ্চলা হৃদয়াবেগ আমাদের মনের তন্ত্রীতে নতুন সুর বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

সেই নতুন সুর সেই নতুন কথা একদিন শুনেছিলাম বরিস পাস্তারনাকের 'ডাঃ জিভাগোর' মধ্যে। রাশিয়ার পরিচিত নয়, এমনি এক ভিন্ন সুরের কথা বলে সেদিন 'ডাঃ জিভাগো' পৃথিবীর সাহিত্য মঞ্চে যে আলোড়ন এনেছিল তেমনি আলোড়ন হয়ত খুব কম পুস্তকের জীবনেই ঘটেছে। শুধু বরিস পাস্তারনাকের ডাঃ জিভাগো নয়, ১৯৫৭ সালে ভ্লাদিমির দুদিনৎসেভ-এর 'নট বাই ব্রেড এলোন' কিংবা ১৯৬৩ সালে ফিদর আব্রামভ-এর 'ওয়ান ডে ইন দি নিউ লাইফ' শুধু রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের প্রাচীরকেই ভেঙে দেয় নি---সাহিত্য জীবনেও এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। সেই সময় এই সমস্ত উপন্যাস শুধু রাশিয়ার কমিউনিষ্ট উত্তরাধিকারের গোপন চিত্রকেই নগ্ন করে নি বরং সাহিত্যের আসরে আমেরিকার প্রেমোপন্যাস 'রোজার-লাভস্ লিণ্ডা'র সাহিত্যকর্মের চিন্তাকে নিজেদের চিন্তার বৈচিত্র্যে ও নাটকীয় শাণিত ঔজ্জ্বল্যের বিকাশে ম্লান করে তুলেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি প্রকাশিত আলেকজাণ্ডার সোলজেনিৎসিন-এর 'ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অফ ইভান ডেনিসোভিচ'-এ শুধু স্তালিন আমলের বন্দী-নিবাসের সেই দৈনন্দিন জীবন চিত্রই অঙ্কিত হয় নি বরং একটি সাহিত্য-ধর্মী জীবনভাষ্যও প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যের সুরে। রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত এই জীবনভাষ্যে হয়ত বা রাজনৈতিক সুরের অনেক তপ্ত কথার ঢেউ উঠেছে কিন্তু সোলজেনিৎসিনের 'টিই নেভার মেক মিষ্টেক্স্' মূলতই সাহিত্য-রসে সিক্ত। এই 'উই নেভার মেক মিষ্টেক্স্'-এ সোলজেনিৎসিন তাঁর দুটি গল্পের 'রিভার্স হিরো' কিংবা 'দি রাইচুয়াজ ওয়ান'-এ যুদ্ধ দুটি সৈনিকের মনঃশ্লেষণে কিংবা একটি বৃদ্ধা কৃষক রমণীর জীবন-মৃত্যুর গাঁথাকে আমাদের কাছে তুলে ধরে রাশিয়ার বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক চেতনার তথাকথিত ব্যর্থতাই তুলে ধরেছেন। রাশিয়ার সমস্ত প্রগতিতেও যে ব্যর্থতা মানুষের স্বাধীন বিকাশকে শুধু প্রাচীন-পন্থী বলে উপহাস করতে পারে সোলজেনিৎসিন-এর মতে সেই প্রাচীন-পন্থী কৃষকমহিলা ম্যাট্রিয়োনা সত্যি সমাজের পক্ষে দি রাইচুয়াজ ওয়ান' 'We all lived beside her and never understood that she was that righteous one without whom according to the proverb, no village can stand. Nor any city. Nor our whole land.

● সোলজেনিৎসিন

এই জীবন-সত্যে সোলজেনিৎসিন পৌঁছেছেন নিজের জীবন-পরিক্রমার গভীর অভিজ্ঞতায়। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষক যিনি তাঁর স্বাধীনসত্তার জন্য স্তালিন আমলে আট বৎসরেরও ওপর বন্দিনিবাসে ছিলেন, যিনি এই বন্দিশিবিরে থাকাকালীন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন, সেই সোলজেনিৎসিন নিয়মতান্ত্রিক সাহিত্য চক্রের বাইরে রাশিয়ার শাশ্বত আত্মার

সন্ধানে নিমগ্ন। তাঁর মতে তিনি—'Wanted to cut myself loose and get lost in the innermost heart of Russia—if there were anything.'

এই নতুন সুরের বিচিত্র ঐকতানে আজ শুধু পাস্তারনাক, আন্দ্রামভ কিংবা দুদিনেৎসেভ নয় কিংবা বহু

● ইভতুশেঙ্কো

আলোচিত চারণ কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ-এর সম পর্যায়ে রাশিয়ার জনপ্রিয় কবি ইভতুশেঙ্কো কিংবা পরবর্তী সময়ের স্থাপত্য বিষয়ের ছাত্র কবি ভূজনেসশিস্কিই নয়—আজ

● কাজাকভ

এই নতুন সাহিত্য-আন্দোলনে বয়সে তরুণতর উরি কাজাকভ, ভ্যাসিলি আকসেনভ কিংবা ভ্লাদিমির ম্যাক্সিমভ-এর নাম বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। এক সময়ে রাশিয়ার সাহিত্যচিত্রে অলঙ্করণের যে প্রাধান্য ছিল কিংবা পরবর্তী সময়ে প্রচারধর্মী সাহিত্য-চেতনার রসে সিক্ত সাহিত্যকে এই তরুণতর সমাজ প্রাণধর্মে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করেছেন যা শাসনতান্ত্রিক নিয়মের কাঁচিতে সীমিত নয়। রাশিয়াতে বোধহয় তাঁরাই প্রথম বলতে পেরেছেন, 'A writer need have no social purpose other than writing as well as he can about a world he knows.'

কাজাকভ-এর 'গোয়িং টু টাউন এণ্ড আদার ষ্টোরিজ'-এ একটি রাজনৈতিক রূপকই আমাদের কাছে ধরা পড়েছে; এই রূপকে পোষা স্বাধীনতাহীন ভালুকের পালিয়ে স্বাধীন জীবনক্ষেত্রে পদচারণার পদক্ষেপের বিচিত্রতাকে অত্যন্ত গভীর জীবন বোধের উত্তাপে চিত্রিত করেছেন কাজাকভ। কাজাকভের লেখনীতে হেমিংওয়ে ও চেখভের লিখনশৈলীর প্রভাব বিশেষভাবে মূর্তিত। এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে কৈশোর পেরিয়ে যৌবন-মুখোমুখি নায়ক-নায়িকার চিত্র আমরা বিশেষ পাই নি। কিন্তু পশ্চিমে আজ এই 'টিন এজের্স' উপন্যাসের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ আলোড়ন উঠেছে। বিশেষত ফরাসী লেখকরা এই বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়ার তরুণতর লেখক আকসেনভ-এর। 'এ টিকিট টু দি ষ্টার্স' ও ম্যাক্সিমভ-এর 'এ ম্যান সারভাইভস' এই উপন্যাস দু'টি পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন স্পন্দন এনেছে। আকসেনভ তাঁর গল্পে বড়ভাই-এর মুখে বর্তমান রাশিয়ার তরুণদের নতুন জীবনের কথা বলেছেন। এক সময় যা রাশিয়ার তরুণদের কাছে স্বপ্ন ছিল আজ তা বাস্তব। গোঁড়ামির বরফ গলে গিয়ে আজ রাশিয়ায় বোধহয় এক নতুন সূর্যোদয়। তাই 'এ টিকিট টু দি ষ্টার্স-এ নৃত্যরত ভাই ও তার বন্ধুদের দেখে বড় ভাই বলছেন, 'তোমরা নাচ। এই তো তোমাদের জগৎ। তোমাদের বিরুদ্ধে এখন আর বৃদ্ধরা খড়্গ তুলে দাঁড়াবে না। আমরা আজ তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

● আকসেনভ

আজ সোভিয়েত দেশের মুক্ত তরুণদের সাহিত্য বোধহয় এই প্রতিশ্রুতিরই সাহিত্য। 'ইজমের' বাইরে নতুন সাহিত্যের কথা।

ম্যাক্সিমভ তাঁর রচিত 'এ ম্যান সারভাইভস্'-এ তাঁর তরুণ নায়ক সেরিয়োজা-এর তথাকথিত জগতের শাসনতান্ত্রিক সমাজ যে তার কণ্ঠকে রোধ করে রাখতে চায় তার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণাকে প্রতিফলিত করেছেন। তাই তাঁর নায়ক বিপদ জেনেও বলতে কুণ্ঠিত হয় নি। 'I hate everybody who has the right to bang his fist on the table, to give marks.' এই উপন্যাসে ম্যাক্সিমভই প্রথম উপন্যাসের নায়ককে দিয়ে রাশিয়ার চিরাচরিত নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়েছিলেন। স্তালিন-যুগের তথাকথিত প্রশস্তিবাদের বিরুদ্ধে সরব ঘোষণা করেছিলেন, ভালো-মন্দ মেশানো

একটি রক্তমাংসের মানুষকে উপন্যাসের জগতে প্রবেশ-অধিকার দিয়েছিলেন। শুধু শাসনতান্ত্রিক আদর্শবাদের বেড়া-জালে রক্ষিত এতদিনকার রাশিয়ান নাগরিক যেন বিপ্লবোত্তর লেখক-দের সৃজনশীল প্রতিভায় আবার মূর্ত হল মাক্সিমভের 'এ ম্যান আরভাইভ্'এ।

সাম্যবাদের দেশে লেখকদের স্বাধীনতা যে সীমিত, তা পাস্তারনাকের ডাঃ জিভাগোর পর বোধ হয় আর সরব ঘোষণা প্রয়োজন নেই। পশ্চিমী দেশ তথা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সাহিত্যিকরা যে মনন স্বাধীনতা পান, তা সাম্যবাদী দেশের লেখকদের কাছে হয়ত বা স্বপ্ন। তাই স্বপ্ন বলেই এই মনন স্বাধীনতার লেখা ওদেশে বিরল। কিন্তু এই যবনিকা-ঘেরা দেশে যাঁরা সাহস-দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারেন, 'I am sorrow, I am the voice of war, the embers of cities or the snows of the year '41; I am hunger I am the throat of a woman whose body like a bell hangs over the naked square'— তাঁদের এই সাহসকে অভিনন্দন জানাতে হবে বৈকি, বরফ রাশিয়ায় গলেছে একথা সত্য। কিন্তু তবুও আজ যাঁরা রাশিয়ার সাহিত্যের মাধ্যমে জীবন-সত্যকে প্রকাশ করতে চান, তাঁদের জীবন, তাদের কর্ম-সাধনা রাশিয়ার শাসন শক্তির কাছে দুর্বিসহ। তাই কাজাকভ, আকসেনভ, মাক্সিমভ, ইভতুশেঙ্কো বা ভজনেসেনস্কি জন-সংবর্ধনায় অভিনন্দিত হলেও শাসকবর্গের কাছে তাঁদের উপস্থিতি সুখদায়ক নয়।

ইভতুশেঙ্কো বা ভজনেসেনস্কি তাঁদের কবিতা হাজার হাজার রাশিয়ানের কাছে পাঠ করেছেন কবি সম্মেলনের মাধ্যমে। তাঁদের কাব্যগ্রন্থ আজ রাশিয়ায় সর্বাধিক জনপ্রিয় পুস্তক বলে বিবেচিত। কিংবা কাজাকভ আজ রাশিয়ার একটি শক্তিশালী তরুণ লেখক বলে জনপ্রিয়। এর মূলে রয়েছে— এঁদের মানব-চেতনা। এঁরা মানুষের চাপা বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। এই ভাষাকেই 'পশ্চিমী জগৎ' 'After silence, Human voice' বলে অভিনন্দিত করেছেন। বর্তমানে রাশিয়ার পাঠকরা যেন এঁদের লেখায় তাদের তৃষিত মনের বেদনাকাতর চিত্রকেই দেখতে পাচ্ছেন, এঁদের কণ্ঠে যেন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত নিজেদের জীবনের বেদনাবিধৃত আশা অনুভূতির কণ্ঠকেই আবার শুনতে পাচ্ছেন। মহান বিপ্লবের স্বপ্নকে আবার সার্থক করতেই সেই সব লেখক যাঁরা অনেক বিদ্রূপ, অনেক যাতনা সহ্য করেও নিজেদেরকে কয়েকটি বুলির কাঠামোয় বন্দী করে রাখেন নি তাঁরা আমলাতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বর্ধিত তথাকথিত চিন্তাশীলদের কাছে অপ্রিয় ভাজন হলেও তাঁরাই অন্যান্য দেশের মতো আজকের দর্শকের লেখক, সৃজনশীল শিল্পী। তাঁরাই যথার্থ বলতে পারেন—

'I live in Russia, among snows and saints !'

প্রাক-বিপ্লব যুগের তলস্তয়, চেখভ ডষ্টভয়স্কির মতো জীবনধর্মী সাহিত্য এই নিঃশব্দ তুষারে কবে ঢেউ তুলবে কে জানে। এই জীবনের ঢেউ আমরা আবার কবে দেখবো ভাগীর জলে।


# রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ

বর্তমান সংখ্যার লেখক সূচী :

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা চার টাকা

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :

পত্রিকা-সম্পাদক :

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরবর্তী সংখ্যা প্রখ্যাত লেখকবৃন্দের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে শেক্সপীয়র স্মরণ-সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সংসদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেবার জন্য শোভাযাত্রা সহকারে সংসদ ভবনে উপনীত হচ্ছেন।

**রাজধানী ঃ**

উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন বাজেট অধিবেশন উদ্বোধন করে সংসদের যুক্ত সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তা সর্বজনের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করেছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অসুস্থ থাকায় ডঃ জাকির হাসেন বর্তমানে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছেন। পাকিস্তান যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সমূলে উৎখাত করার কাজে কোমর বেঁধেছে এবং পাইকারী হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করছে তার উল্লেখ করে উপরাষ্ট্রপতি আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশায় হাজারে হাজারে সংখ্যালঘু নরনারী কেন ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন এবং ভারতের অর্থনীতিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে তা কি দারুণ বিপর্যয়ের সূচনা করছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। পাকিস্তানের এই সংখ্যালঘু নির্যাতন যে একটি সুপরিকল্পিত অভিসন্ধির ফল তা উদ্ঘাটিত করে রাষ্ট্রপতি ডঃ হোসেন বলেন যে, ইহাতে শুধু পাক-ভারত সম্পর্কেরই অধিকতর অবনতি হচ্ছে না, ভারতের শান্তি ও সংগঠনের কাজও ভীষণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ভারত-চীন সম্পর্কের পর্যালোচনা করে ডঃ হোসেন বলেন, ভারতকে সদা সতর্ক থেকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন শক্তিশালী রাখতে হবে; কারণ চীন এখনো চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কিত কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ব্যাপারে অনমনীয় আপোষ-বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করে সমগ্র সীমান্তে পুরাদমে সামরিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সংসদের যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন সমাপ্ত হলে শ্রীনেহরু সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলেন।

* * *

১২ই ফেব্রুয়ারী লোকসভায় পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দুঃসহ জীবনকাহিনী শ্রবণ করে সদস্যগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পক্ষ থেকে প্রায় সবসম্মত দাবীও উত্থাপিত হয় যে, ভারতে আগমনেচ্ছু প্রতিটি মানুষের জন্য ভারতের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হব। শুধু মাইগ্রেশনের নিয়ম-কানুন শিথিল করলেই চলবে না, বিপন্ন মানুষদের সীমান্ত অতিক্রম প্রয়াসে বিন্দুমাত্রও বাধা থাকবে না। এ দাবী কংগ্রেসসহ প্রায় সকল দলের সদস্যের। তাঁরা বলেন, পূর্ববঙ্গে যা ঘটেছে ঘটছে, তা নিছক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার এক সামগ্রিক পরিকল্পনা; আয়ুব-শাহীর জঙ্গীচক্রের সক্রিয় সাহায্যে অনুষ্ঠিত এক নরমেধ যজ্ঞ।

কংগ্রেস সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বলেন যে, তিনি প্রামাণ্যসূত্রে খবর পেয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বিশ হাজার, তন্মধ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে প্রায় দশ হাজার। নির্দলীয় সদস্য শ্রী এন সি চ্যাটার্জী বলেন, পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকেরা প্রকৃত সংবাদ প্রকাশের গলা টিপে রেখেছেন, তা সত্ত্বেও লৌহ যবনিকা ভেদ করে যে সংবাদ আসছে তা থেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়াবহতা ও নৃশংসতা উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচ্যাটার্জী ভাবাবেগে এত আপ্লুত হয়ে ওঠেন যে, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে দেখা যায়।

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, সর্বশ্রী ত্রিদিব চৌধুরী, এস এন দ্বিবেদী, প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী, রেনুকা রায়, শ্রীহীরেন মুখার্জী প্রমুখ আলোচনা কালে সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তান যে চেষ্টা করে আসছে কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত

শ্রী এন সি চ্যাটার্জী

শরণার্থীদের সমস্যাকে সারা দেশের সমস্যা বলে গণ্য করা ও অণুমাত্র বৈষম্য না করে জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের স্থান দেবার জন্য দাবী জানান।

রাজ্য সভায়ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু আগমনের সকল বাধা অপসারণের দাবী প্রাধান্য লাভ করে। কংগ্রেস দলের উপনেতা শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেন যে, এই সকল শরণার্থীর পুনর্বাসনের সকল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

* * *

কংগ্রেস সংসদ দলের কার্য নির্বাহক সমিতির এক সভায় কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটেনের মনোভাব উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে দলের ৫১ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের মনোভাবকে পাকিস্তান সমর্থকরূপে বর্ণনা করে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বৃটিশ সরকারের এই ধরণের পাক-প্রীতির পরিচয় পেয়ে ভারতের জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। লোকসভায় শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেনের কার্যকলাপকে খিড়কি দরজা দিয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, কাশ্মীরের ভারত ভুক্তি চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ। বৃটেন আজ এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেশ বিভাগকালে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তা লংঘন করছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদও লংঘন করছে।

* * *

রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শ্রীঅশোক মেটাকে নিয়ে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির উভয় সংকট সকলে কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। এ যেন শ্যাম রাখি না কুল রাখি গোছের ব্যাপার। আচার্য

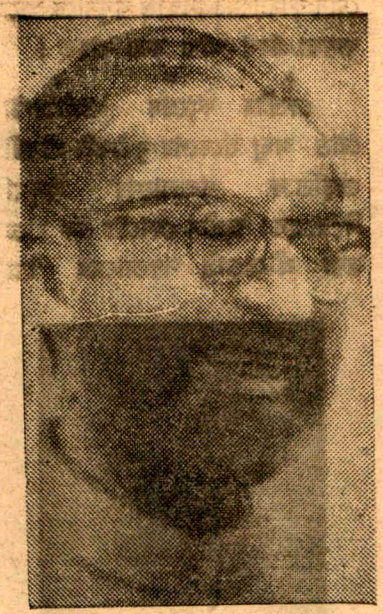

● শ্রীঅশোক মেটা

বিনোবা ভাবে বিপত্তারণের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তিনি প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির জাতীয় কার্যকরী পরিষদের প্রস্তাবকে নেতিবাচক বলে পরিকল্পনা কমিশনে অশোক মেটার যোগদান করা সমর্থন করেছেন।

এদিকে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সোস্যালিষ্ট পার্টির একত্রীকরণের কথা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। সোস্যালিষ্ট পার্টির একদল বলছেন এই একত্রীকরণের পথে শ্রীঅশোক মেটাই বাধা। সুতরাং অশোক মেটাকে পি এস পি থেকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গেই দুই দলের একত্রীকরণের পথ উন্মুক্ত হবে। পি এস পির অনেক সদস্যও অশোক

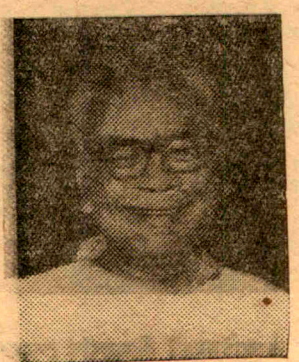

● ডঃ রামমনোহর লোহিয়া

মেটাকে দুই দলের মিলনের অন্তরায় মনে করে। পি এস পির নেতৃবৃন্দ কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অশোক মেটার বিষয় এবং পি এস পি ও এস পির একত্রীকরণের বিষয়কে আলাদা করে রাখতে চান। পি এস পির নেতারা বলছেন---শুধু মাত্র কংগ্রেস বিরোধিতাই দুই দলের মিলনের ভিত্তি হবে না; রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতেই মিলন হবে। জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে সোস্যালিষ্ট পার্টির ঐক্য সম্পর্কিত বক্তব্যের তাঁরা পরিষ্কার ব্যাখ্যা চান। এ কারণে জনসংঘের সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে ডঃ লোহিয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে শ্রীমধু লিমায়া ও শ্রীফার্নাণ্ডেজ-এর বক্তব্যকে পি এস পি নেতারা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এত সত্ত্বেও মনে হচ্ছে সোস্যালিষ্ট পার্টি বিনাসর্তে একত্রীকরণের প্রস্তাব পি এস পির নিকট উপস্থিত করবে এবং লক্ষ্ণৌতে কার্যকরী কমিটীর সভায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পি এস পি নেতারা কিন্তু মিলনের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে চান না। জানা গেল, পি এস পি একটি সাব-কমিটী গঠন করে সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা চালাতে থাকবে এবং ডঃ লোহিয়ার দলের সাথে এক বিশেষ সম্মেলনের প্রস্তাব করবে। পি এস পির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের এখন কোন সম্ভাবনা নাই; এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে এই সম্মেলন হবে। ইত্যবসরে সাব-কমিটী আলোচনা চালিয়ে যাবে এবং জাতীয় সম্মেলনের কাছে চরম নির্দেশ ( mandate ) দাবি করবে সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে একত্রীকরণের জন্য।

* * *

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে দুর্নীতি নিরোধ সম্পর্কিত শান্তনম কমিটীর চূড়ান্ত রিপোর্ট এপ্রিলের মাঝামাঝি পেশ করা হবে ইতোমধ্যে কমিটী

পাঁচটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেছে এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন গঠন করেছেন। আরো জানা গেছে, কমিটী রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিকে একই সঙ্গে বিচার করার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক দুর্নীতি বলতে কমিটীর মতে বোঝায় কেন্দ্রীয় থেকে রাজ্যের মন্ত্রীদের এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়। রাজনৈতিক নেতাদের বিষয়ে বোঝাতে কংগ্রেস দল বা বিরোধী দল বলে কোন তারতম্য থাকবে না। কমিটী এমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছে---যাতে ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ দেওয়াকে দুর্নীতি মনে করা হবে।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী দপ্তর কাউন্সিল অব ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউণ্টসকে যৌথ কোম্পানীগুলিতে জনসাধারণ ও সাধারণ অংশীদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে হিসাব পরীক্ষার জন্য 'কোড' গঠনের আবেদন জানিয়েছে। 'ডালমিয়া জৈন'-এর কারবার সম্পর্কে দপ্তরি-শাস্ত্রী রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ভিভিয়ান বোস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ আশা করা যাচ্ছে।

* * *

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে পদত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ের জন্য শ্রীরেড্ডি পদত্যাগের ইচ্ছা

● পরলোকগত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ৮৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে ডাক ও তার বিভাগ ১৩ই ফেব্রুয়ারী পনের নয়া পয়সা মূল্যের যে বিশেষ ডাকটিকিট বের করেছেন, তারই প্রতিলিপি

প্রকাশ করেন। বোর্ড কেরালার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি টি চাকো যে মামলায় জড়িত সে মামলা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্করকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমি রাজস্ব, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আইন দপ্তরের ভার অবশ্য শ্রীচাকোর ওপরই থাকবে।

* * *

১৩ই ফেব্রুয়ারী এখানে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সরোজিনী নাইডু স্মারক ডাকটিকিট বিক্রির উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় ডাক, তার ও আইন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সরোজিনী নাইডুর ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই বিশেষ ডাক টিকিট জনগণকে একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও একজন মহীয়সী নারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

## বিহার ঃ

সমগ্র বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। পাটনার আবহাওয়া গরম। একদিকে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধর্মঘটকে নিয়ে তীব্র আলোচনা এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, আর একদিকে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলির বহিঃপ্রকাশ। ছাত্রদের ব্যাপার এত গুরুতর হয়ে ওঠে যে, শান্তি, শৃংখলা রক্ষার কথা আলোচনার জন্য রাজ্যের [illegible] জরুরী সভা ডাকতে হয়।

ছাত্রদের সাম্প্রতিক গোলযোগে বিহার রাজ্যের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় জড়িত হয়ে পড়েছিল। প্রথম ঘটনা ঘটে হাজারীবাগে, যেখানে ছাত্ররা দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা হয় ছাপরা রাজেন্দ্র কলেজে। এখানে দুই দল ছাত্রের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয়। তৃতীয় ঘটনাস্থল ভাগলপুরে ছাত্ররা একটি মহল্লা আক্রমণ করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে দাঙ্গা করে। শেষ

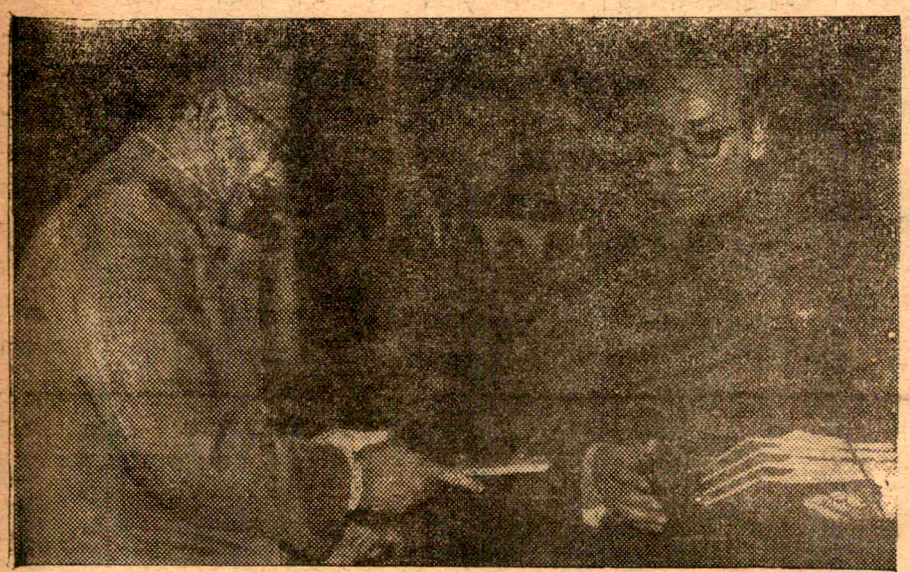

● কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ডাক-তার ও আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের কাছ থেকে সরোজিনী নাইডু ডাকটিকিটের একখানি বিশেষ এ্যালবাম গ্রহণ করছেন।

পাটনা—পাটনা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সাথে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষ। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে এই চারটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে।

ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলাবোধের অভাব এই সব ঘটনার প্রধান কারণ হলেও পুলিশ ও রাজ্য সরকারের নির্বুদ্ধিতার দরুণ ঘটনা বিস্তার লাভ করেছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল সরকারের সমালোচনা করছেন। অত্যন্ত বিশ্রীভাবে মধ্যরাত্রিতে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলে এবং হাসপাতালে হানা দিয়ে দু'জন গুরুতর আহত সহ বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এতে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তারা ধর্মঘট ঘোষণা করে। পাটনার মেডিক্যাল ছাত্রদের সমর্থনে রাঁচী, জামসেদপুর, দ্বারভাঙ্গার মেডিক্যাল ছাত্ররাও ধর্মঘট করে। মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের পাল্টা ধর্মঘটে এবং ব্যাপক গ্রেপ্তারে অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটে।

এই অবস্থায় সকলকে বিস্মিত করে দেয় সেচ ও বিদ্যুৎ-মন্ত্রী শ্রী এম পি সিংহের বিবৃতি। তিনি ছাত্রদের এই বিশৃংখলার জন্য দলত্যাগী কংগ্রেসীদের দায়ী করে বলেন যে, তারা সরকারকে বিপদে ফেলবার জন্য এই কাণ্ড বাধিয়েছে। এতে কংগ্রেসের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ রয়েছে তা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের ভেতরের পুরাতন বিবাদ আবার দেখা দেয় এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বেশ বিপদে পড়েন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসকর্মীরা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রীকে শক্তি পরীক্ষার জন্য জরুরী সভা ডাকতে চ্যালেঞ্জ করে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হবার কারণ এই চার-মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভা কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি। দুর্নীতি বেড়ে চলেছে। জিনিষপত্রের দাম ক্রমবৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অসন্তুষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা শ্রীসহায়ের বিরুদ্ধে গণ-স্বাক্ষর অভিযান সুরু করেছেন। এমন কি, বিধান সভার বহু সংখ্যক সদস্য নাকি শ্রীসহায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করছেন। তাঁরা আশা করেন ১৫০ জন সদস্য এতে স্বাক্ষর দেবেন। শ্রীসহায়ের দল অসন্তুষ্ট কংগ্রেসকর্মীদের নিরস্ত করার জন্য কংগ্রেস সভাপতির হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন। সভাপতি ইতোমধ্যে শ্রী বি এন ঝা সহ কয়েকজন অসন্তুষ্ট কর্মীকে দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়েছেন।

● শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিহারের সর্বশ্রেণীর মেহনতি মানুষ আন্দোলনের প্রস্তুতি করছে। নন-গেজেটেড কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন চালাচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁদের দাবিপত্র নিয়ে পার্লামেণ্ট অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। জানা গেল ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ তারিখে পার্লামেণ্টের সম্মুখে এই বিক্ষোভে ১৫ হাজার শিক্ষক যোগদান করবেন।

## মহারাষ্ট্র ঃ

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়েক সম্পর্কে এযাবৎ কাল ধারণা ছিল তিনি রাজ্য কংগ্রেসের কোন চক্রের মধ্যে নাই। কিন্তু সম্প্রতি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন শ্রীনায়েকের ওপর শ্রী এস কে পাতিল কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রমাণ—শ্রীনায়েক সরকারী নিয়ন্ত্রণে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি মত পালটিয়েছেন। নাগপুরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসা বাস্তব প্রস্তাব নয়। অথচ মাত্র দুই মাস পূর্বে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীতালিয়ার খানকে বিধান সভায় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্যশস্যের ব্যবসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার জন্য শাসিয়েছিলেন। এ হেন শ্রীনায়েকের মত পরিবর্তন কি তবে শ্রীপাতিলের ম্যাজিকে হয়েছে? হাওয়া কোন দিকে যায় এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

অনুমান করা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রের মাদকদ্রব্য নিরোধ নীতির বিরুদ্ধে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধ প্রচারে শ্রীনায়েক কিছু বিচলিত। শ্রীদেশাই ও শ্রীপাতিল এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী, শ্রীপাতিল মাদকদ্রব্য নিরোধ নীতি কিছুটা সংশোধনের পক্ষপাতী। শ্রীপাতিলের এই আংশিক সমর্থন শ্রীনায়েককে যে প্রভাবিত করেছে তাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবত শ্রীপাতিল এই ভাবে এক চালে বাজী মাৎ করার মতলবে আছেন।

* * *

তিনটি সমস্যা এখন মহারাষ্ট্রের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে; কৃষ্ণা-গোদাবরী জল নিয়ে বিবাদ, মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমানা নির্ধারণ, এবং মাদকদ্রব্য নিরোধ নীতি পরিবর্তন প্রস্তাব।

কৃষ্ণার জলকে পশ্চিমে প্রবাহিত হতে দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে দুই মতের কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে শ্রীনায়েকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিরোধনীতির ব্যাপারে তিনি কিঞ্চিৎ সংশোধনের পক্ষপাতী।

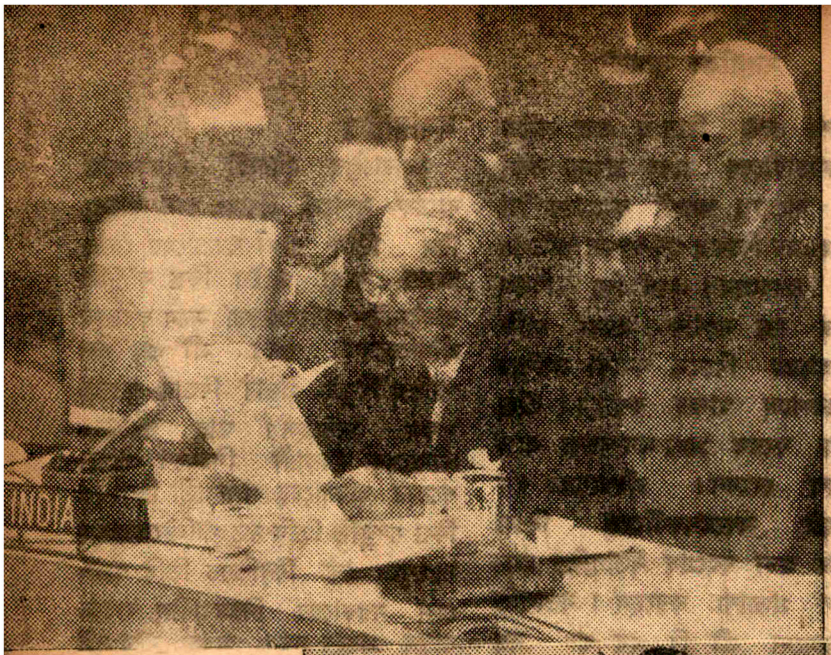


নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর তর্ক : ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীচাগলা বক্তৃতা করছেন।

# আন্তর্জাতিক

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর প্রশ্নে পশ্চিমী মনোভাব এতদিন পরে দর্পণে পরিকার ধরা পড়লো। গত ১১ই তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নে বক্তৃতা করতে গিয়ে বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন গোটা পশ্চিমী জগতের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। নির্বিকার চিত্তে স্যার ডীন বললেন যে, ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের মহারাজা যে ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের যোগদান চুক্তি করেছিলেন তা নাকি ঠিক আইনানুগ হয় নি। বৃটিশ প্রতিনিধি আরো বলেছেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তান একই স্তরে অবস্থান করছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য স্যার প্যাট্রিক যে দাওয়াই বাতলেছেন তা হলো, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আবার বৈঠকের ব্যবস্থা করা (পাঁচ পাঁচটি নিষ্ফলা বৈঠকের পরেও!), কাশ্মীরের জনগণের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা অর্থাৎ পাকিস্তানী দাবী মাফিক গণভোট। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবার রাষ্ট্রসংঘের দুয়ারে ধর্ণা দেবার প্রস্তাবও বৃটিশ প্রতিনিধির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এবং মধ্যস্থতা করার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তৃতীয় পক্ষের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত বক্তৃতাটি রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ অবাক-বিস্ময়ে শুনেছেন। তাঁদের মনে কেবলই প্রশ্ন জেগেছে এ কণ্ঠ কার---বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীন না পাক প্রতিনিধি মিঃ জেড এ ভুট্টো? কারণ, এগুলি তো সবই পাকিস্তানের পক্ষ থেকেই দাবী করা হয়েছে, বৃটেনের নিরপেক্ষতা তবে কোথায় রইলো?

বৃটেনের এ হেন কার্যে (মনে রাখতে হবে স্যার প্যাট্রিক তাঁর সরকারেরই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তার নিজস্ব নয়) স্বভাবতই ভারত সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন। স্যার প্যাট্রিকের বক্তৃতার দিনেই মিঃ বাটলারের সম্মানে প্রদত্ত স্যার ও লেডি ডীনের এক ভোজসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরা যোগদান করেন নি। ক্ষুব্ধ হবার কারণ হলো বৃটেন এতদিন কাশ্মীর প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতার কথা বলে এসেছে। এমনকি, লণ্ডনে মিঃ চাগলার সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তাতেও বৃটেনের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছিল।

পশ্চিমী দেশগুলি যে এই নীতি গ্রহণ করবে তার কিছু কিছু আভাস অবশ্য আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের চাপে আইভরি কোস্ট ও মরক্কোর প্রতিনিধি যখন প্রকৃত প্রস্তাবে পাক পক্ষ সমর্থন করে স্বস্তি পরিষদে বক্তৃতা করলেন তখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দিত করা হয়। এখন স্বস্তি পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। সেই জন্যে স্বস্তি পরিষদের বৈঠক বার বার স্থগিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তি পরিষদে তথাকথিত ঐক্য যে কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না---কাশ্মীর প্রসঙ্গে অন্তত---সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ইতিমধ্যেই (এবং আগেও) সোভিয়েট রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে সে ভেটো প্রয়োগ করবে তবুও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের কুক্ষিগত হতে দেবে না। কারণ সে জানে যে, কাশ্মীর পাকিস্তানে যাবার অর্থ হলো সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হওয়া। চেকোশ্লোভাকিয়া ও সংযুক্ত

• স্যার প্যাট্রিক ডীন

আরব সাধারণতন্ত্রও ভারতের পক্ষ সমর্থন করেছে।

নতুন দিল্লীতে স্যার প্যাট্রিকের ভাষণের একটি প্রতিক্রিয়া হলো সংসদ সদস্যরা ভাবছেন কমনওয়েলথের সঙ্গে ভারতের বন্ধন ছিন্ন করা হোক। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেনন স্যার প্যাট্রিকের বক্তৃতাকে খিড়কি দরজা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ভারতে পুনঃপ্রবেশ বলে কঠোর মন্তব্য করেছেন।

**ওয়াশিংটন :** গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার হিউম ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ জনসন একটি যুক্ত ইস্তাহার দিয়েছেন। বিবৃতিটিতে দঃ পূঃ এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন ও বৃটিশ নীতি এক ও অভিন্ন বলে বলা হয়েছে। কিছুদিন আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গল দঃ পূঃ এশিয়াকে নিরপেক্ষ করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন তারই জবাব হিসেবে এ যুক্ত বিবৃতিটিকে নেওয়া যেতে পারে। স্যার হিউম বলেছেন যে দঃ পূঃ এশিয়ার সব দেশগুলিকে নিরপেক্ষ করা

* প্রেসডেণ্ট জনসন

বাস্তবসম্মত নয়। কতকগুলি দেশে হয়তো নিরপেক্ষ নীতি সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু আর সব দেশে এ নীতি ব্যর্থ হতে পারে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর মনে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মালয়েশিয়া ইত্যাদি ছিল। মালয়েশিয়া নিয়ে বৃটেনের সমস্যার অন্ত নেই। ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপাইন্স এখনো মালয়েশিয়াকে স্বীকৃতি দেয় নি। অথচ মালয়েশিয়া যদি স্থায়িত্ব লাভ না করে তবে গোটা দঃ পূঃ এশিয়াই কমিউনিষ্ট বনে যাবে বলে বৃটেন আশংকা করে। প্রধানত কমিউনিজমের প্রসার রোধ করাই মালয়েশিয়া সৃষ্টির কারণ। এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্য মালয়েশিয়া গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল বলে বৃটেন এবং তার সমর্থক দেশগুলি মনে করে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করেছে, স্যার হিউম তার সমর্থক। তিনি মনে করেন যে, যদি এখানে মার্কিন সামরিক সাহায্য না দেওয়া হতো, তবে বহু আগেই দেশটি উত্তর ভিয়েৎনামের কুক্ষিগত হয়ে পড়তো।

দঃ পূঃ এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের এ-ঐক্যের প্রয়োজন ছিল নিজ নিজ স্বার্থে। কারণ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুবই বেগ পেতে হচ্ছে। তার ওপর দ্য গলের নিরপেক্ষীকরণের প্রস্তাব শেলের মতো উপস্থিত হয়েছিল। কাজেই বৃটেনের সমর্থন পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত খানিকটা নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে

ওদিকে মালয়েশিয়ার প্রশ্নে বৃটেন ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে যে বাধা পাচ্ছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন বৃটেনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ইন্দোনেশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে এসেছে। সেই

* স্যার হিউম

জন্যে বৃটেন মনে মনে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন চেয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে। এখনো সে রকম কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত অবশ্যি পাওয়া যায় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইন্দোনেশিয়ায় তার সাহায্য বন্ধ করে তাকে পুরোপুরি কমিউনিষ্ট চীনের খপ্পরে পড়তে দেবে না সে কথা বলা বাহুল্য। তবুও একথা মনে করা যায় যে দঃ পূঃ এশিয়ায় তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কিছুটা পুনর্বিন্যাস ঘটাবেন।

**হল্যাণ্ড :**

রাজকুমারী আইরিনের বিয়ে উপলক্ষে এখানে এক শাসনতান্ত্রিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। আইরিন হলেন হল্যাণ্ডের রাজা প্রিন্স বার্নহার্ডের দ্বিতীয়া কন্যা। ২৪ বৎসর বয়স্কা রাজকুমারী স্পেনের রাজবংশজাত প্রিন্স হুগো দ্য বুঁর্বোকে বিয়ে করায় সারা হল্যাণ্ডে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। হল্যাণ্ড হলো প্রোটেষ্ট্যাণ্ট দেশ, কিন্তু স্পেন রোমান ক্যাথলিক। কাজেই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পরিবারের কোনো মেয়ে ক্যাথলিক পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করা অচিন্তনীয়। তাও আবার রাজপরিবারে। কিন্তু রাজকুমারী যাঁকে

মনপ্রাণ আগে থেকে সঁপে দিয়ে ব'সে আছেন তাঁর গলায় মালা দিতে না পারলে শান্তি পাবেন না। প্রেমের অমর্যাদা তো তিনি করতে পারেন না! তাই তার জন্যে যে কোনো ঝুঁকি নিতে, যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তিনি কৃত-সঙ্কল্প। মায় সিংহাসনও। উত্তরাধিকারী হিসেবে হল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনের দাবীদারের তালিকায় আইরিনের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু হল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টেও সরকার যখন আপত্তি জানালো এবং এ-সাবধানবাণীও উচ্চারণ করলো যে ক্যাথলিককে বিয়ে করার দরুণ রাজকুমারী আইরিন সিংহাসনের দখলদারী থেকে বিচ্যুত হবেন। তখনও রাজকন্যা পিছু হটলেন না, সিংহাসনের দাবী, ঐশ্বর্যের দাবী ত্যাগ করলেন অবলীলাক্রমে।

এ বিয়ে নিয়ে হল্যাণ্ডে একটা রীতিমত হৈ চৈ হয়ে গেছে। রাণী জুলিয়ানা মনে মনে কন্যাপক্ষ সমর্থন করেন। তিনি যখন স্পেনে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে নিরস্ত করা হলে তিনি স্বভাবতই অপমানিত বোধ করেন। কন্যার জন্যে এখন রাণী জুলিয়ানাও যদি সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। কারণ তিনি মনে করেন যে বিয়ে, প্রেম ইত্যাদি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর মধ্যে সরকারের নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু যে দেশের সঙ্গে হল্যাণ্ডের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়েছে সেই শত্রুদেশ স্পেনের যুবকের সাথে রাজকন্যার বিয়েকে সরকার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন নি। সেইজন্যই বাধা-নিষেধের প্রাচীর তুলেছিলেন সরকার।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি প্রিন্স বার্নহার্ড তাঁর ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিতা কন্যা আইরিনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে স্পেন গিয়েছেন। পিতা-পুত্রীর মিলনে খানিকটা শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল—ডাচ-স্প্যানিশ অশান্ত সম্পর্কের মধ্যে।

## সোভিয়েট রাশিয়া :

**মস্কো :** জেনেভার বৈঠকে একজন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ নিখোঁজ হবার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনবার কথা বিবেচনা করছেন। প্রাপ্ত এক খবরে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ মিঃ য়ুরি নোসেন পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সোভিয়েট সরকার মার্কিন সরকারের নিকট মিঃ নোসেনকে অপহরণের জন্য তীব্র এক প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। সোভিয়েট সরকার

* আঁদ্রে গ্রোমিকো

মার্কিন সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হতে পারে। এই ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আঁদ্রে গ্রোমিকো ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ফর কোজলারের মধ্যে এক আলাপ আলোচনা হয়েছে।

## লণ্ডন :

বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা মার্লো ব্র্যাণ্ডোর বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরোধিতা আজ আর কারুর অজানা নেই। আমেরিকার দক্ষিণী রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে বর্ণবৈষম্য নীতি প্রচলিত তার বিরুদ্ধে মিঃ ব্র্যাণ্ডোর জেহাদ বহু পুরণো। এই নীতির বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয়েছে তার অনেকগুলিতেই তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল। সম্প্রতি লণ্ডনে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, এখন থেকে কোনো ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবার আগে একটি সর্ত রাখবেন। সর্তটি হলো তাঁর অভিনীত ছবিটি কোনো পৃথকীকৃত ছবিঘরে দেখানো হবে না। মিঃ ব্র্যাণ্ডো বলেন যে, তাঁর মতের সমর্থকদের মধ্যে স্যার লরেন্স অলিভার এবং স্যার সি পি স্নো, ক্রিশ্চান মার্কোয়াল্ড প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রযোজক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছেন। ডোরিস ডে, এলিজাবেথ টেলর প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁর বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন।

## ফ্রান্স :

**প্যারিস :** সম্প্রতি ফরাসী-চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর প্রেসিডেণ্ট দ্য গল বলেন যে, তিনি দঃ পূঃ এশিয়াকে নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করতে ইচ্ছুক এবং এই ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য ফ্রান্সের সাথে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ কমিউনিষ্ট চীনের সমর্থন ছাড়া এই অঞ্চলে নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

ইন্দোচীনে সামরিক বিপর্যয়ের পর দঃ পূঃ এশিয়ায় ফ্রান্সের প্রভাব একদম কমে যায়। ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ফরাসী সমস্যাগুলি মেটানোর পর প্রেসিডেণ্ট দ্য গল এই অঞ্চলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এই সব অঞ্চলে আমেরিকা ফ্রান্সের স্থান গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কার্যত আমেরিকা তাতে ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎ কং বিরোধী যুদ্ধ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, লাওসের অশান্তির তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কম্বোডিয়া আমেরিকার বিরোধিতাই করে চলেছে। সুতরাং অবস্থা বুঝে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ইন্দোচীনের সমস্যার

* প্রেসিডেন্ট দ্য গল

আমূল সমাধানের প্রস্তাব করেছেন। যার ফলে ইন্দোচীনের একটি বিরাট অংশ এ প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ**

গত ৩০শে জানুয়ারী দ্বিতীয়বার অভ্যুত্থান ঘটানোর পর দঃ ভিয়েৎনামের সামরিক বিপ্লবী পরিষদের নতুন প্রেসিডেণ্ট জেনারেল নুয়েন খান শত্রু নিধনের নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কমিউনিষ্ট ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এঁটে উঠতে পারছিল না বলেই নভেম্বরের অভ্যুত্থান-কারীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছিলো। দেশকে তারা দ্য গল প্রস্তাবিত নিরপেক্ষতাবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। এখন এই দু'টি উপসর্গই যাতে অঙ্কুরে বিনাশ করা যায় সেইজন্য জেনারেল খান ঘোষণা করেছেন যে, দঃ ভিয়েৎনামে কমিউনিজম ও নিরপেক্ষতাবাদ বেআইনী। এই দুটি মতবাদের প্রচারকারী বা বিশ্বাসী বলে প্রমাণিত এমন অপরাধীকে সামরিক বিচারালয়ে বিচার করা হবে---যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ খুবই সীমিত। বেআইনী মতবাদ দু'টির সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সেই সব সংস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, গোষ্ঠী ইত্যাদির ওপরই এ নির্দেশনামা প্রযোজ্য হবে। নির্দেশনামায় বলা হয়েছে মতবাদ দু'টি জননিরাপত্তার বিরোধী।

কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্য দঃ ভিয়েৎনামে বহু পূর্বেই বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। নিরপেক্ষতাবাদ কথাটা যদিও হালে বহুল প্রচলিত, তবুও একথা সত্য যে কমিউনিষ্টরা দঃ ভিয়েৎনামকে নিরপেক্ষ দেশে পরিণত করতে পারলে লাভবান হতে পারবে মনে করে। দঃ ভিয়েৎনাম সরকার মনে করে যে এখানকার কমিউনিজম বা নিরপেক্ষতা-বাদী সংস্থাগুলি কমিউনিষ্ট উঃ ভিয়েৎনামের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেইজন্যে এই আদর্শ দু'টিকে যদি বে-আইনী ঘোষণা করা যায় তবে তাতে উঃ ভিয়েৎনামকেই শিক্ষা দেওয়া হবে। অপর পক্ষে, সম্প্রতি ভিয়েৎ কং গেরিলাদের হাতে সরকারী বাহিনীর পরাজয়ের একটি কারণ ঐ আদর্শ দু টির সমর্থকদের নাশকতামূলক

* জেনারেল নুয়েন খান

কার্যকলাপ---এ রকম ধারণার দ্বারাই দঃ ভিয়েৎনাম সরকার পরিচালিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

**ইথিওপিয়া ঃ**

**আদিস আবাবা ঃ** সোমালিয়া সীমান্তে প্রচণ্ড সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। এর ফলে পুনরায় যুদ্ধ বাধবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ উভয়পক্ষ সৈন্য বৃদ্ধি করছে। সম্রাট হাইলে সেলাসী প্রায় ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে ইথিওপিয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই রাষ্ট্রগুলি হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী, লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া, আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া ও ইস্রায়েল।

সোমালিয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, সোমালিয়া সরকার তুন ওয়াজালেজ নামে একটি সীমান্ত-বর্তী গ্রামে অস্ত্রসংবরণের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমালিয়া সরকার এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, ইথিওপিয়াই অস্ত্রসংবরণ চুক্তি লংঘন করেছে।

জাতিগত, ভাষাগত বা সংস্কৃতি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলির সীমান্ত নির্ধারিত করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সাথে সাথে বিভিন্ন সীমান্তের সমস্যাবহুল প্রশ্নগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যার পরিণামে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে এক বিবাদ সমুপস্থিত হয়েছে। ইথিওপিয়া আফ্রিকার অন্যতম প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য; সোমালিয়া মাত্র কিছুদিন আগে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশ লক্ষ লোক অধ্যুষিত সোমালিয়ার মোট আয়তন প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গমাইল। সোমালিয়ার সেনাবাহিনী অতি ক্ষুদ্র, তাই সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্য তাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হচ্ছে।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইথিওপিয়া-সোমালিয়া সীমান্ত সংঘর্ষের বিশেষ কোন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নেই, তবু আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে কৃত্রিমতা বিবাদ বাড়িয়ে তুলছে।

## সাইপ্রাস :

সাইপ্রাস সমস্যার কোনো সমাধান আজো হলো না। অথচ গ্রীক ও তুর্ক সাইপ্রীয়টদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আবার নতুন করে সুরু হয়েছে। সমস্যার সমাধান কল্পে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে যে-নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষ এখনো তা গ্রহণ-বর্জন করেন নি। ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব হলো ১০ হাজার সৈন্যের বহুজাতিক শান্তি-রক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীর কাজ হবে সাইপ্রাসে শান্তি রক্ষা এবং বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ অবসানে সহায়তা করা। এই প্রস্তাব নিয়ে বৃটিশ কমনওয়েলথ সেক্রেটারী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডস যেমন মাথা ঘামাচ্ছেন তেমনি মার্কিন আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ জর্জ বলও প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন। মিঃ বল এখন নিকোশিয়া, আঙ্কারা ও এথেন্স---তিনটি সংশ্লিষ্ট পক্ষের রাজধানীতে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু তুরস্ক যেমন নতুন ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবে খুশি হতে পারে নি তেমনি সাইপ্রাসের প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়সও তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়স গোড়া থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিলেন যে, সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকেই করা হোক। ন্যাটো সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সাইপ্রাসে শান্তি স্থাপনের যে চেষ্টা হয়েছিল প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়স তাতে সম্মত হতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে শান্তি সেনাবাহিনীকে আনা হোক। কিন্তু বৃটেন তাতে রাজী হয় নি। কারণ সে জানে যে সে ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। ফলে এশিয়া মাইনরে বৃটেনের অন্যতম শেষ ঘাঁটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

* মিঃ ডানকান স্যাণ্ডস

নতুন ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের বিকল্প হিসেবে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়স কমনওয়েলথ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু বৃটেন তাতেও রাজী হবে বলে মনে হয় না। কারণ এর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুক্তি হলো, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান চীনা আক্রমণ ও কাশ্মীর নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাদের পক্ষে সৈন্য সাহায্য করা সম্ভব হবে না। ওদিকে অষ্ট্রেলিয়াও মালয়েশিয়ার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন। কাজেই কমনওয়েলথ বাহিনী গঠন অসম্ভব বলে বৃটেন সাফাই দিয়েছে। আসলে বৃটেনের মনে এ আশঙ্কার উদয় হয়েছে যে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত আফ্রো-এশীয় দেশগুলি সাইপ্রাসে বৃটিশ ঘাঁটি রাখার বিরোধিতা করার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ বাহিনী গঠন করাটা শেষ পর্যন্ত বৃটেনের পক্ষে ব্যুমেরাং হিসেবে দেখা দেবে। সেই জন্যে বৃটেন কিছুতেই ম্যাকারিয়সের প্রস্তাবে রাজী হতে পারছে না।

এমতাবস্থায় প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়সের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন যে, সাইপ্রাসকে দ্বিখণ্ডিত করে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে শুধু জিইয়ে রাখাই হবে। তাই রাষ্ট্রসংঘের কার্যকরী তদারকীতে সাইপ্রাসে স্থায়ী শান্তির সন্ধানে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়স নিযুক্ত রয়েছেন।

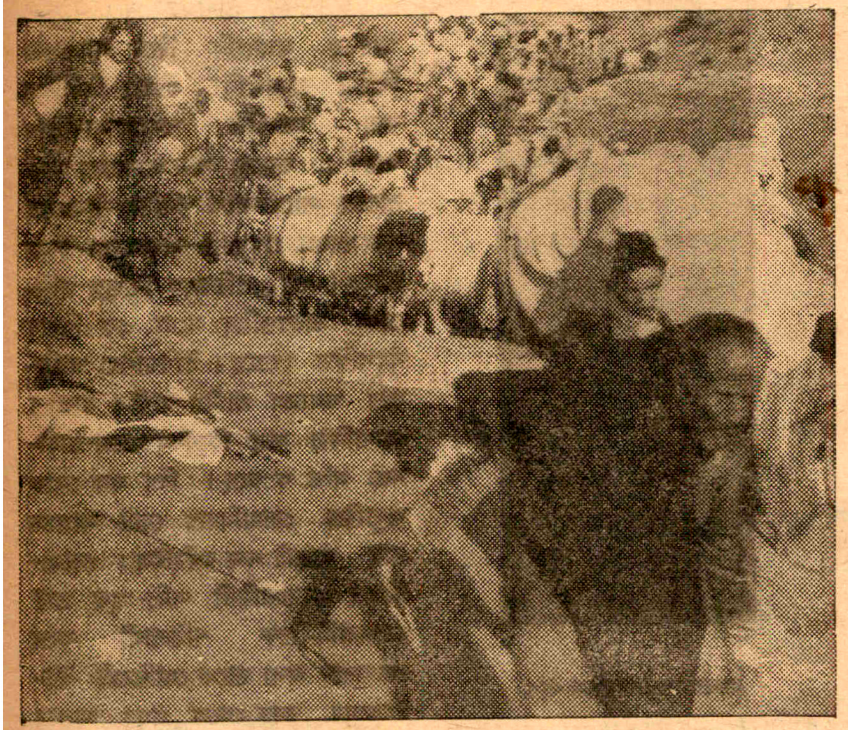

* সাইপ্রাসের নিকোশিয়ার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র তুর্ক গ্রাম আইওস সোজোমেনোস থেকে সব লোক গ্রাম খালি করে চলে যাচ্ছে। জনৈক বৃদ্ধ তুর্ক-সাইপ্রিয়টকে মেষের পাল নিয়ে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামে কয়েকদিন আগে গ্রীকদের সঙ্গে তুর্ক-সাইপ্রিয়টদের সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়

# রঙ্গমঞ্চ

## কেন্দ্রীয় সেন্সার বোর্ডের অবিমৃষ্যকারিতা

কানস্ চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মাদার জোয়ান অব দি এঞ্জেলস' কেন্দ্রীয় সেন্সার বোর্ডের মতে প্রদর্শনের অযোগ্য। এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছবিটি প্রদর্শিত হতে পারলো না।

'মাদার জোয়ান অব দি এঞ্জেলস'-এর বিরুদ্ধে ভ্যাটিক্যান থেকে কোন আপত্তি হয় নি; পোল্যাণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যাধিক্য; সেখানেও কোন প্রতিবাদ ওঠে নি; খৃষ্টান জগতের কোন অঞ্চলে এই ছবির বিরূপ সমালোচনা হয় নি। একমাত্র ভারতের কেন্দ্রীয় সেন্সার বোর্ডের সদস্যগণ সমগ্র খৃষ্টান জগতের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে ভ্যাটিক্যানের পোপকে পর্যন্ত লজ্জা দিয়েছেন। 'মাদার জোয়ান'-এর কাহিনী গত সংখ্যা 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটির বক্তব্য কামনা-বাসনাকে আত্মনিপীড়নে অবদমিত করা যায় না। এই বক্তব্যকে রূপ দেবার জন্য অবলম্বন করা হয়েছে পোল্যাণ্ডেরই এক প্রাচীন উপকথা। সুতরাং ছবিটির ব্যাপারে পোল্যাণ্ডের যত দায়িত্ব তার চেয়ে বেশি আমাদের সেন্সার বোর্ডের থাকার কথা নয়। ইতোপূর্বে 'এশেস এণ্ড দি ডায়মণ্ড' নামক আর একটি পোলিশ ছবি কেন্দ্রীয় সেন্সার বোর্ড নিষিদ্ধ করেছিল, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ছবিটির রাহুমুক্তি ঘটে। হলিউডের উগ্র যৌন আবেদন-সর্বস্ব, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষপূর্ণ ছবিও যে সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র লাভ করে আসছে, হঠাৎ সেই সেন্সার বোর্ড জনসাধারণের নৈতিক অভিভাবক হবার স্পর্ধা প্রকাশ করেন কেন?

—সুজন।

## চিত্র-আলোচনা

### 'সপ্তর্ষি'-'এরা কারা'-'তাহলে?'

এই ফেব্রুয়ারী তিনটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। দু'টি অপরাধ-মূলক কাহিনী চিত্র; সুন্দরম্ নিবেদিত 'সপ্তর্ষি' ও দেবী চিত্রণের 'এরা কারা?'—তৃতীয়টি হাসির ছবি পি, এ, ফিল্মসের 'তাহলে'।

#### বিভ্রান্ত যুবক

'সপ্তর্ষি'—উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত প্রথম কাহিনী চিত্র। শ্রীমৈত্রের শিল্পবোধ ও দক্ষতার পরিচয় ইতোপূর্বে আমরা একটি দলিল চিত্রে পেয়েছিলাম। সুতরাং 'সপ্তর্ষি' সম্পর্কে আমরা আশাবাদী ছিলাম। ছবিটিতে এমন কয়েকটি চমকপ্রদ দৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যার জন্য পরিচালককে দর্শকরা মনে রাখবেন। যেমন—ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটাবার মুহূর্ত, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং ডাকাত দলের আড্ডায় আলো-ছায়াময় কয়েকটি দৃশ্যে নায়িকার মনের দ্বন্দ্ব এবং নায়িকাকে নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য গঠন। এই দৃশ্যগুলিতে চিত্রধারকের কাজ ও পরিচালকের কল্পনার যে সমন্বয় ঘটেছে, তা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে অপরাধমূলক কাহিনী চিত্রের চমক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের ভারসাম্য বিশ্বাস্যতা রক্ষা করে ছবিটি অগ্রসর হতে পারে নি।

সমাজ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত কয়েক জন যুবক—এক ডাকাত দলে পরিণত হয়। অথচ এরা সবাই স্নেহ-মমতা, কর্তব্য-বোধে ও শিক্ষায় সমাজের কারো চেয়ে কম নয়। এই বিভ্রান্ত যুবকদল ডাকাতির পর ডাকাতি করে চলেছে। পুলিশ হতবুদ্ধি। শেষ পর্যন্ত একটি শিশু এবং সেই শিশুকে রক্ষার জন্য অপহৃত নার্সকে কেন্দ্র করে মানবিকতা বনাম দস্যুতার যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাতে কাহিনী চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে। বিভ্রান্ত যুবকদল সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে অগ্রসর হয়।

ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ে কালী ব্যানার্জী ও দিলীপ মুখার্জী, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ এবং কাজল গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেশ মুখার্জীকে দারোগার ভূমিকায় বড় দুর্বল মনে হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন নিরঞ্জন রায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, শ্যাম লাহা প্রমুখ। মাদ্রাজের পদ্মিনী ও সুকুমারীকে দিয়ে একটি নাচের দৃশ্য গঠিত হয়েছে। শ্যামল মিত্র পরিচালিত সঙ্গীতাংশ অপরাধমূলক কাহিনী-চিত্র হিসাবে ছবিটিকে সাহায্য করে নি।

#### ছদ্মবেশী

সমাজে এমন একদল লোক আছেন যাঁরা বাইরে সজ্জন, কিন্তু ভিতরে দুর্জন। এমন ব্যক্তি শশধর

'বিভাস'এর নায়িকা ললিতা চট্টোপাধ্যায়

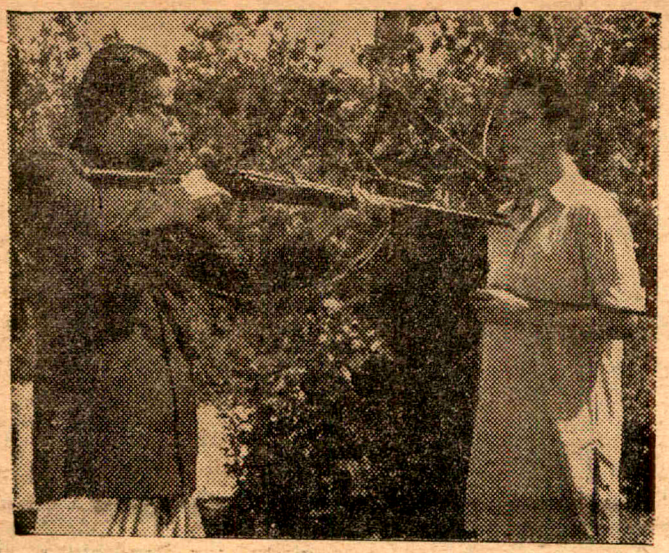

'বিভাস' চিত্রে উত্তমকুমার ও কমল মিত্র

অর্থ ও অট্টালিকার মালিক, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখী সংসার। কিন্তু এই বিত্তের পেছনে আছে বহু অসহায় মানুষের করুণ আর্তনাদ। শশধরের লোভের পৃথিবী যেন প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার পরিচয়। কিন্তু একদিন তারই পুত্রের সততা ও মানবিকতায় শশধরের মুখোস খুলে পড়েছিল, আর অসহায় পঙ্গু মানুষগুলি মুক্তি পেয়েছিল। সমাজে ছেলেমেয়েদের অপহরণ করে ভিখারী সাজিয়ে তাদের নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরই এক মর্মছেদ চিত্র 'এরা কারা'।

ভাবধারার দিক থেকে উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিচালন-রীতি কালোপযোগী হতে পারে নি। এ কারণে দৃশ্যের বীভৎসতা যত বেশি, আবেদন তত বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। বিশেষত এরূপ কাহিনী নিয়ে ইতোপূর্বে কয়েকটি ছবি হয়েছে, সুতরাং এখানে আরো নূতনত্ব কিছু আশা করা স্বাভাবিক ছিল। মনে রাখা দরকার যে, শশধররা স্বতন্ত্র অপরাধীগোষ্ঠি নয়, তাদের সঙ্গে সমাজের আরো গণ্যমান্যরা নানাভাবে জড়িত থাকে বলেই ওরা আজো ছদ্মবেশে বেঁচে আছে। এই সামাজিক রাজনৈতিক চেতনাবোধ নিয়ে পরিচালনা অগ্রসর হলে ছবিটি সার্থক হতো। তার অভাবে ছবিটি হয়ে পড়েছে নৈরাশ্যময় এবং বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে দুর্বল।

অভিনয়ে অসীমকুমার, বীরেন চ্যাটার্জী, শিপ্রা মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, দীপক মুখার্জী, প্রমুখ আরো অনেকে রয়েছেন। পুলিশ কমিশনার রূপে অজিত ব্যানার্জী ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগতা নন্দিতা দে। সঙ্গীত ও কলাকৌশলের কাজ খুব সন্তোষজনক নয়।

### দুয়ের মধ্যে এক—

পিকলুকে না রাহুলকে, কাকে চায়? হঠাৎ-বড়লোক গজু মাষ্টারের মেয়ে ঝিলমিল মনস্থির করতে পারে না। পয়সার সুখে হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী কেতকী সামন্তেরও মেয়ের জামাই করতে সাধ দুজনকেই। কিন্তু তা তো হয় না, চাই একজনকে। তা নিয়ে যত ভাবনা, পরামর্শ সুরু হয়েছে সামন্ত বাড়িতে। অবশেষে কি করে বাড়ির পোষা কুকুর এই সমস্যার সমাধান করে দিল এবং লটারীতে জিতে পিকলু-ঝিলমিলের মিলন ঘটলো, তারই কাহিনী—'তাহলে'। চিত্রনাট্যের অবলম্বন আশাপূর্ণা দেবী রচিত একটি গল্প।

পরিচালক গুরু বাগচীর নিজস্ব সৃষ্টি রূপে ইতিপূর্বে আমরা একটি ছবি দেখেছি, এবারের প্রচেষ্টা একটি হাসির ছবি। এই হাসির ছবিটি প্রথমেই টাইটেল উপস্থাপনা এবং টাইটেল সঙ্গীতে দর্শকদের মনে ছবিটির কৌতুক রস উপভোগ্যতা সম্পর্কে আশ্বাস সৃষ্টি করে। তারপরে ছবি মজার মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ছবিতে অফুরন্ত হাসির উপাদান থাকলেও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর কাহিনী যেন এক জায়গায় ঘুরপাক খেয়েছে; এমন কোন কৌতুককর ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে নি, যাতে ছবি নিজস্ব গতিতে দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দিতে পারে, এই ত্রুটি কিছুটা মেটাবার চেষ্টা করেছেন—কেতকীরূপিণী মলিনা দেবী, পিকলুরূপে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তার বন্ধুর ভূমিকায় অনুপকুমার, শশীমুখী—রেণুকা রায় এবং গজু মাষ্টার—পাহাড়ী সান্যাল, তাঁদের অভিনয়ে। ঝিলমিল ও তার বান্ধবী পল্লবিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে যথাক্রমে সন্ধ্যা রায় ও চিত্রা মণ্ডল। বিকাশ রায়, গীতা, অসিত দে ও আরো অনেকে।

হাল্কারসের এই কৌতুক চিত্রের সঙ্গীতাংশের পরিচালনায় সুধীন দাশগুপ্ত প্রশংসনীয়।

### পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে সমৃদ্ধ

গত ছয় বছরের মধ্যে পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্বের চলচ্চিত্র সভায় বিশেষ স্থান লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক উৎসবসমূহে সমালোচকদের প্রশংসা, পুরস্কার এবং নূতন রীতির ছবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের কাছে পোলিশ ছবি এক নূতন সংস্কৃতি ও শিল্প মাধ্যমরূপে স্বীকৃত।

১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এবং পোল্যাণ্ডের দূতাবাসের উদ্যোগে নিউ এম্পায়ার

সিনেমায় এক পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী পি বি চক্রবর্তী। উৎসবে পোল্যাণ্ডের ছয়টি বিখ্যাত ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছয়টি ছবিই বিশ্বের বিভিন্ন উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

উৎসব উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের দূতস্থানে কনসাল মিঃ রোমান কাউনিস্কি বলেন, ১৯৬১ সালে কলকাতায় পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল তাতে দর্শক ও চলচ্চিত্র সমালোচকরা পোলিশ ছবিকে অসামান্য বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র 'কানাল' ছাড়া আর কোন পোলিশ ছবি এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। ব্যবসায়ের দিক থকে 'কানাল' ভালই করেছে।

পোলিশ ছবি পোল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিবিম্ব। পোল্যাণ্ডের সমাজ ও রাজনীতি চিন্তার যথার্থ প্রতিনিধিরূপে সারা জগতের সাথে পোলিশ ছবি পরিচিত হয়েছে। এমন কি আমাদের অনুভূতি পর্যন্ত এই ছবিতে প্রতিফলিত। এ-কারণে

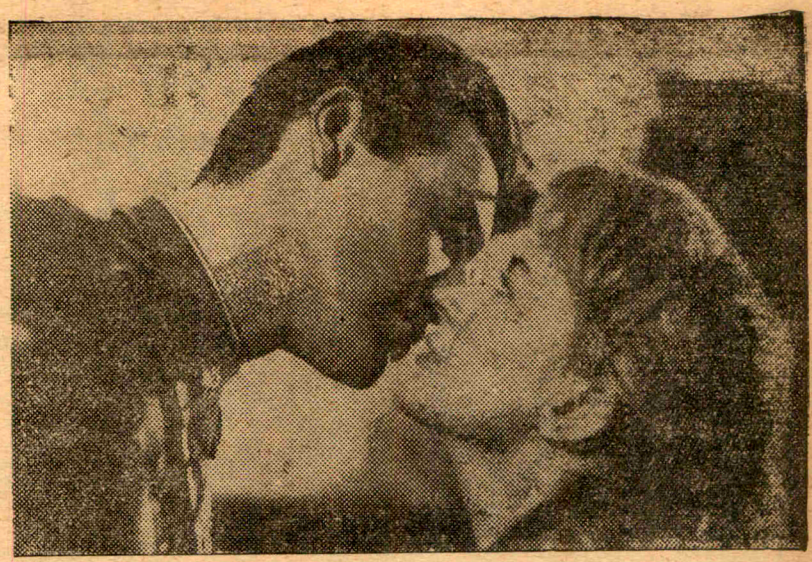

● পোলিশ ছবি 'লোটনা'র একটি দৃশ্য

পোলিশ ছবি সর্বত্র জনপ্রিয়। পোল্যাণ্ডের চিত্র পরিচালকরা জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় এবং মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

জানা দরকার যে, পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্প জাতীয় সম্পত্তি এবং সরকারী পরিচালনাধীন। 'সেণ্ট্রাল অফিস অব সিনেমাটোগ্রাফি' প্রযোজনা, পরিবেশনা, আর্থিক লেনদেন এবং উন্নয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সাংস্কৃতিক মন্ত্রী দপ্তর এই বিভাগটি পরিচালনা করেন। প্রযোজনার ক্ষেত্র কয়েকটি দলে বিভক্ত। এই দলগুলিতে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক এবং অন্যান্য টেকনিশিয়ান ও সহকারীরা রয়েছেন। এইরূপ প্রযোজনা দলগুলিই গল্প বাছাই থেকে সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, রাষ্ট্র আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ছবির আর্থিক লোকসানের ক্ষেত্রে প্রযোজক, পরিচালকরা বোনাস বা পুরস্কার গ্রহণ না করে লোকসান পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ছবি তৈরির ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য সরকারের একটি আলাদা ফিল্মফাণ্ড রয়েছে, এই ফাণ্ড ক্রমেই টিকিট ঘর ও ছবি বিক্রয়ের অর্থে স্ফীত হচ্ছে। বর্তমানে পোল্যাণ্ডে আটটি প্রযোজনা গ্রুপ রয়েছে; এগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন ড্রোগা, কামেরা, সাইরেনা, রিদম্, ষ্টার্ট ইত্যাদি। এসব দলে ৩০ জনের অধিক পরিচালক সংযুক্ত আছেন। ১৯৬১ সালে পোল্যাণ্ডে ২৫টি পূর্ণাঙ্গ চিত্র, ৩৭০টি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি নির্মিত হয়েছে এবং ৫১টি বিদেশী ছবির ডাবিং হয়েছে।

তিন কোটি মানুষের দেশ পোল্যাণ্ডে ৩৭৫০টি সিনেমা আছে, এছাড়া ১৫ হাজার ১৬' মিলিমিটর প্রোজেক্টর রয়েছে স্কুল, ক্লাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে।

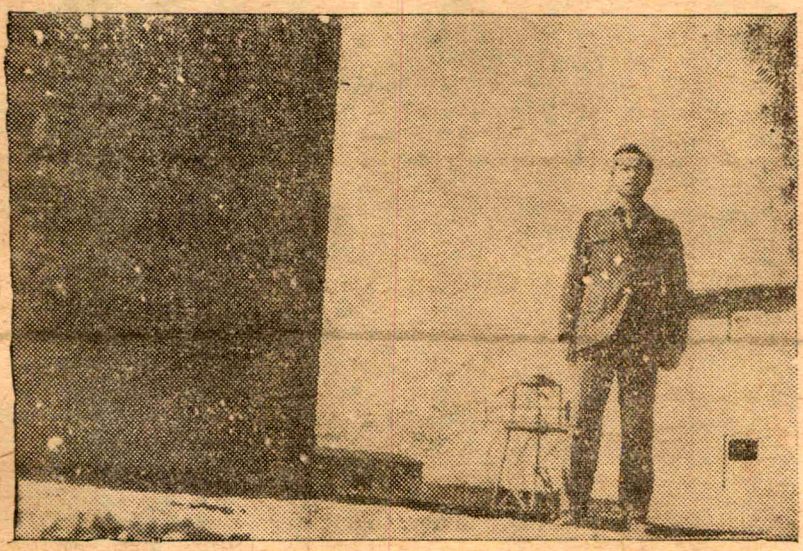

● পোলিশ ছবি 'ইরোইকা'র একটি দৃশ্য

পোলিশ ছবি 'প্যানিক অন এ ট্রেন'-এর দৃশ্য

পোল্যাণ্ডে বার্ষিক ছবির চাহিদা ১৮০—১৯০। টেলিভিশনের প্রসার সত্ত্বেও সিনেমার চাহিদা আছে, এবং এ কারণে বিদেশ থেকে যথেষ্ট ছবি আমদানী করতে হয়। ১৯৬১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, আমেরিকা, ইতালী, গ্রেট বৃটেন, জাপান, সুইডেন, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া এবং ভারত থেকে বহু ছবি ক্রয় করা হয়েছে।

পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রের প্রাচীর-চিত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। প্রাচীর-চিত্র অঙ্কনের জন্য আলাদা শিক্ষালয় রয়েছে। প্রাচীর-চিত্রের শিল্পগত উৎকর্ষ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। উৎসব উপলক্ষে পোলিশ ছবির একটি প্রাচীর-চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে ৬১টি প্রাচীর-চিত্র রয়েছে।

পোল্যাণ্ডে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বহু পত্রিকা রয়েছে। সাপ্তাহিক ফিল্ম পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা এক লক্ষ আশি হাজার। সাপ্তাহিক 'একরান'-এর প্রচার সংখ্যা দেড় লক্ষ। এছাড়া ফিল্ম টেকনিক্যাল পত্রিকা, সমালোচকদের পত্রিকা, ফিল্ম-ক্লাবের পত্রিকা ইত্যাদি রয়েছে।

পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আঁদ্রে ওয়াজদা, আঁদ্রে মুনক, রোমান পোলানস্কি, জানলেনিকা, কাজিমিয়েরঝ কাটজ্ প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত। ধনতান্ত্রিক দেশের মত পোল্যাণ্ড, 'তারকা' প্রথায় বিশ্বাসী না হলেও সেখানে এমন শিল্পী আছেন যাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয়। দর্শকরা তাঁদের বারবার দেখতে চায়।

পোল্যাণ্ডের এই চলচ্চিত্র উৎসব ভারত-পোলিশ সম্পর্ককে আরো উন্নত ও প্রসারিত করুক।


শুভারম্ভ ঃ শুক্রবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী !

● পল্লীবাংলার পটভূমিকায় অপরূপ সমাজচিত্র ●

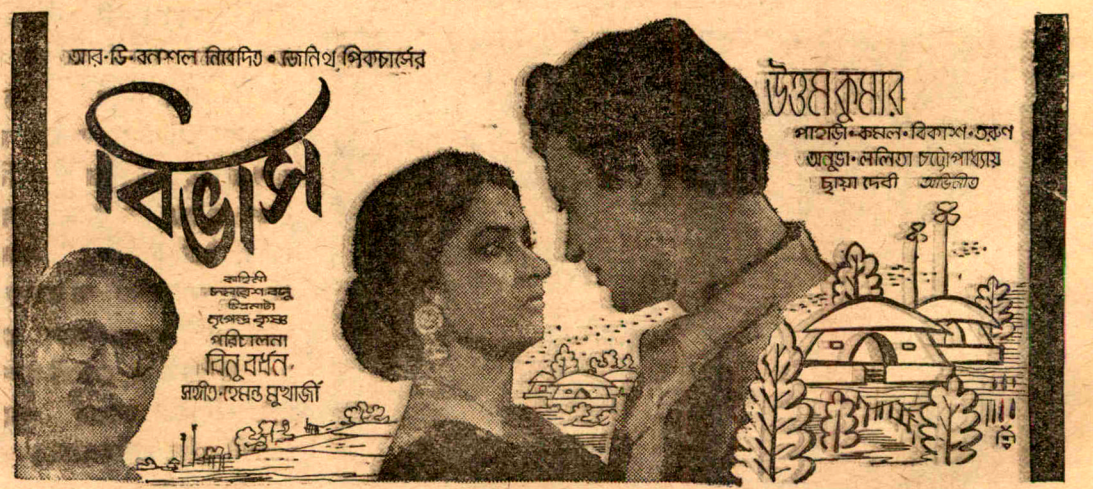


শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা ঃ অশোকা ঃ পদ্মশ্রী

এবং অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

পরিবেশনা ঃ আর, ডি, বি, এণ্ড কোং

# খেলাধুলা

## দুই প্রবীণ এবং নবীনের লড়াই

পূর্ব গোলার্ধের দুই পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে দুই প্রবীণ এবং দুই নবীনের ক্রিকেট যুদ্ধ। একদিকে বুড়ো ক্যাঙ্গারু নবীন স্পিংবকের কাছে কোন রকমে মুখরক্ষা করল; অন্যদিকে নবীন ভাগ্যের কাছে প্রবীণ সিংগিমামা খাবি খাচ্ছে, এখন ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পারবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অষ্ট্রেলিয়া এবং সাউথ আফ্রিকার রাবার যুদ্ধের কোন মীমাংসাই হোল না : পাঁচটি টেষ্টের মধ্যে তিনটি হল ড্র, একটিতে জিতল অষ্ট্রেলিয়া অন্যটিতে সাউথ আফ্রিকা। এই ফলাফল দেখে বোঝা যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট শক্তির ভিৎ নড়ে উঠেছে। অন্যদিকে ভারত সফরে ইংলণ্ডের প্রাণহীন খেলা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মুখে যতই বড়াই করুক না কেন ইংলণ্ড, তার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতের বালিষ্ঠ ক্রীড়াধারা ইংলণ্ডের অহমিকার মুখে চাবুক মেরেছে ; চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নবীনের নবোদ্যম।

দিল্লী টেষ্টও অমীমাংসিতভাবে শেষ হল, ইংলণ্ডের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি তারা নেবে না। প্রথম আবির্ভাবেই হনুমন্ত সিং টেষ্টে শতরান করার গৌরব অর্জন করলেন। ইংলণ্ডের কাউড্রে আবার করলেন সেঞ্চুরী এবং ভারতের উইকেট রক্ষক বুধি কুন্দেরণও আবার শতরান করে ভারতীয় টেষ্টে তাঁর আসন পাকা করে নিলেন। ভারতের তরুণ অধিনায়ক টাইগার পাতৌদি ব্যাট বিক্রমে ভীষণ মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর দীপ্ত ব্যাটিং তছনছ করে দিল ইংলণ্ডের বোলিং শক্তিকে। ব্যক্তিগত ২০৩ রান সংগ্রহ করে তিনি এক নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত অবস্থায় প্যাভেলিয়নে ফিরলেন। পাতৌদির এই অনবদ্য খেলা তাঁর বিরূপ সমালোচকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে। পাতৌদির বিরুদ্ধে যাঁরা অন্যায় মন্তব্য করেছিলেন, এই দ্বিশতাধিক রান তাঁদের মুখে চুনকালি লেপে দিল। নবাবের নবাবী মেজাজের খেলা আবার তাঁর হৃতসম্মান ফিরিয়ে আনল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর এই সুন্দর খেলা অক্ষয় থাকে।

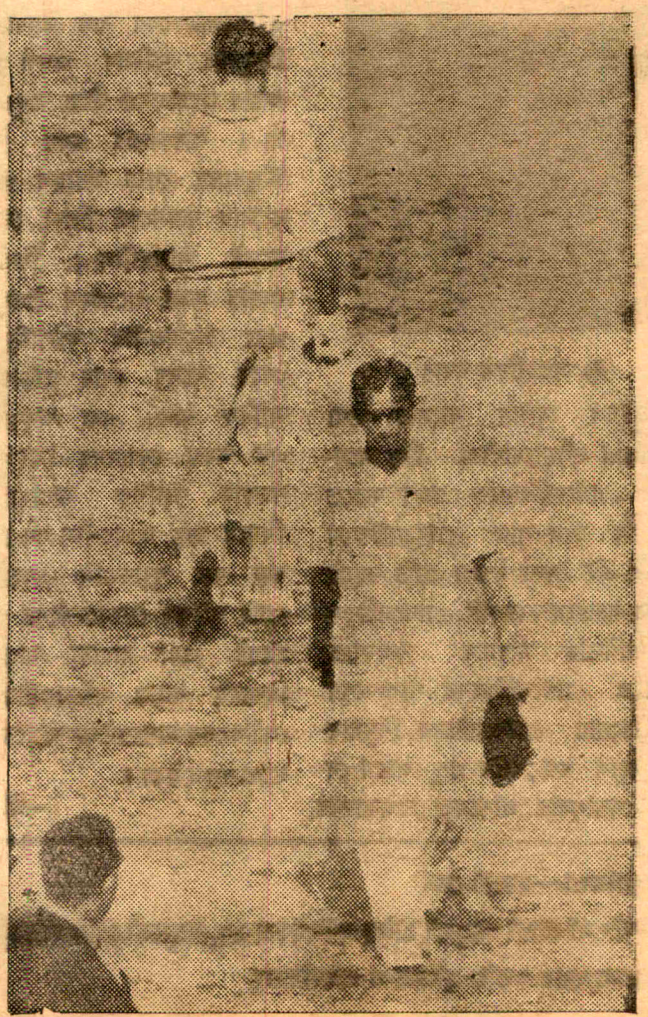

হনুমন্ত সিং আউট হবার পর প্যাভেলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন।

## ভারতীয় টেনিস প্রসঙ্গে

কলকাতায় যখন ক্রিকেটের উত্তেজনা ক্রীড়ামোদীদের শঙ্কিত করে রেখেছে সে সময় নিঃশব্দে সুরু হল এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা। এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার সে জৌলুষ আর নেই। বিদেশী নাম করা খেলোয়াড়দের আগমনে সাউথ ক্লাব আর মুখরিত হয় না। যা দু'-একজন বিদেশী খেলোয়াড় যোগ দেন তাঁরা শীর্ষে উঠবার আগেই কূপোকাৎ হন। এবারেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

শেষ পর্যায়ে ভারতের খেলোয়াড়রাই আসর জুড়ে বসে রইলেন। সেই পুরাণো কাসুন্দি—কৃষ্ণান, জয়দীপ, প্রেমজিৎ, অখতার আলি। ফাইনালে জয়দীপ ও কৃষ্ণান মোকাবিলা করেন। তবে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কৃষ্ণান তরুণ জয়দীপকে সহজেই পরাজিত করেন। কৃষ্ণানের বেলা অবসান হয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে কৃষ্ণান এবার উইম্বলডেনের জন্য শেষ লড়াই করবেন। তাঁর হাতে আছে টেনিস শিল্পীর শ্রেষ্ঠসম্পদ—প্রয়োজন শুধু অনুশীলন ও বিদেশী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগিয়ে চলা। কৃষ্ণানের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

## এ্যাথলেটিকসে বাংলার এত নিম্নমান কেন

ভারতের খেলাধূলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ময়দানের প্রাণ হল ফুটবল। সর্বভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের তথা সারা বাংলার ক্রীড়ামোদীদের যত উৎসাহ, উন্মাদনা উত্তেজনা, একমাত্র ফুটবলকে বেষ্টন করেই। অবশ্য কারণও আছে; ফুটবলে বাংলার একচেটিয়া প্রাধান্য বাংলাকে সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে। দুর্বল পূর্বাঞ্চলের দলগুলির মধ্যে ক্রিকেটে বাংলা হীরো বনে আছে। কিন্তু দিল্লী বা বোম্বাইয়ের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেই বাংলার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। হকিতেও বাংলার অবস্থা তথৈবচ। বাংলার বাইরের ভাড়াটে খেলোয়াড় ছাড়া বাংলার হকিতে দল গঠন করাই শক্ত হয়ে পড়ে। এ্যাথলেটিকসে বাংলার মান এবং স্থান অনেক নিম্নে।

এবার জাতীয় এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার রবীন্দ্রসরোবর ষ্টেডিয়ামে। ষ্টেডিয়ামের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই রবীন্দ্রসরোবর ষ্টেডিয়াম দক্ষিণ কলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকের মনোরম পরিবেশে সি আই টির উদ্যোগে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় নির্মিত। বহু বছর পর এই মরশুমে কলকাতার এই জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসবে। আগামী টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতার গুরুত্বও তাই অসীম। কলকাতার অগণিত ক্রীড়ামোদীর এবার তাই ভারতের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হবে।

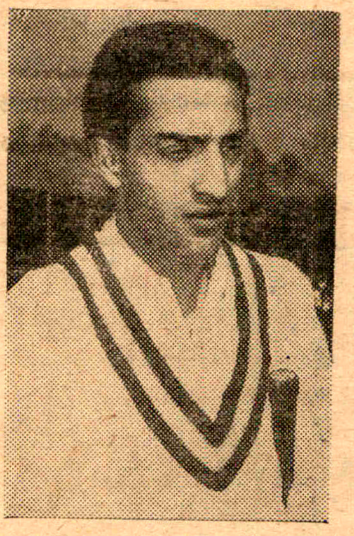

● পতৌদির নবাব

ফুটবল পাগল বাংলার তথা কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা ঠিক মনেপ্রাণে এ্যাথলেটিকসকে গ্রহণ করতে পারে নি বলে আজ এ্যাথলেটিকসে বাংলার এই দৈন্য দশা। প্রতি বছরই শীতের মরশুমে কয়েকটি এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কলকাতা ময়দানের এ্যাথলেটিকসের পালা শেষ হয়। বাংলার এ্যাথলেটদের নিম্নমান দেখে দুঃখ হয়; মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন খেলাধূলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতার ক্রীড়াঙ্গনে এ্যাথলেটিকসে নব নব প্রতিভার উন্মেষ হয় না? সমস্ত বিষয়টি ঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়, কিন্তু আমি আর সেই সমস্ত নোংরা আলোচনার মধ্যে যেতে চাই না।

বাংলার এ্যাথলেটিকসে নিম্নমানের কারণ অজস্র এবং অসংখ্য। কলকাতার জনপ্রিয় এবং খ্যাতনামা দলগুলি, ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেটের পেছনে অজস্র অর্থব্যয় করে এবং যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়। এ্যাথলেটিক্স যেন দুয়োরাণীর ছেলে, তাই বড় বড় ক্লাবগুলি কয়েকটি মাত্র এ্যাথলেট জড় করে আর একটা দায়সারা গোছের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেই নিজেদের কর্তব্য সমাপন হয়েছে বলে মনে করে। এ্যাথলেটিকসের মান উন্নয়নের জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম অথবা অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন না। কলকাতায় বেশ কয়েকজন উঁচুদরের কোচ আছেন এবং তাঁরা বাংলার তরুণদের শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহশীল। কিন্তু শিক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্থান এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মত আর্থিক সামর্থ্য এবং অফুরন্ত সময় এই সমস্ত কোচদের নেই। রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য দেবার বিষয়ে তত আগ্রহশীল নন। সরকার, বড় বড় ক্লাবগুলি এবং বাংলার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সাহায্য লাভ করলে নিশ্চয়ই বাংলা সর্বভারতীয় এ্যাথলেটিকসের আসরে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

## প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

### মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ
শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ
কবিচন্দ্রের

## শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং
ভাগবতাচার্য্যের বিরচিত

## শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।
এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

# হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

### দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ক্রমে ক্ষয়িয়াছে বুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু লেখক বাংলার বালগোপালদের কচি কমকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...একখানা বই। অধিকের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই ধরনের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তানসন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

---

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

# জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিদীপ্ত নাট্যরাজি, কালিদাস, কাঞ্চনাচার্য শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, শূদ্রক, রাজশেখর প্রভৃতির সাহিত্য-মন্থিত অমৃতধারা—বালজাকের বিজ্ঞীবিকা, মোপাসাঁর গল্পসুধা, জোলার রসরঙ্গ, পিয়ের লোতীর সম্মোহন, মোলিয়েরের কৌতুক-কৌতুক, স্বাধীন ভারতের গৌরবদীপ্তি, রাজপুত শৌর্যের অলৌকিক প্রভা তরবারি আস্ফালনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

২য় খণ্ড—মিলিতোনা, শোণিত-সোপান, হত্যাকাণ্ডের পর, সবুজ শয়তান, অলীক বাবু, বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পাঠ, বালনের অবরোধ, দর্পণ, ইংরেজ রঞ্জিত ভারতবর্ষ, মুখোসপরা নাচের মজলিস, মা, জল্লাদ, জ্যোৎস্না রাতে, ঘুকুমা-, শেষ পরী, ঘণ্টা, অভিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব-জনপ্রমোদন—অমরকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—মরলী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কল্পনা, সুপর্ণা, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গবেষণা, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, নেপথ্যে, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের ডাক, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নরনারীর নাট্য ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বারবালা, মমতা, নির্ব্বাসিত, অন্তঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের সৌলতে, মোট ৭ কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

---


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Price : 25 nP. Regd. No. C 71
Gram : "BARRMATE" Phone : { 34-1771, 34-1772, 34-1773.

27 FEB 1964

স্বচ্ছ **কাঁচের** আবরণ

সেরা কাঁচের
দরকারে সর্বদা
এইচ, পি, জি,
কাঁচই নেবেন

বর্ষায়, ঝড়ে অথবা দারুণ শীতেও—যে কোন অবস্থায়ই আপনি আরামে ঘরে বসে আপনার বাগানের শোভা উপভোগ করতে পারেন। ঘরে স্বচ্ছ কাঁচ লাগিয়ে নিলেই হলো। কাঁচে ঝামেলা কম, খরচা অল্প আর তা দেখতেও চমৎকার। কাঁচ লাগালে আপনার ঘর প্রশস্ত মনে হবে, বাইরের আলো ঘরে আসবে কিন্তু আওয়াজ ও ধুলোময়লা ঢুকবার পথ পাবে না। আর কাঁচ পরিষ্কার করতেও কোন ঝামেলা নেই। কাঁচ অজস্র কাজে লাগে—অফিসে, স্কুলকলেজে, হাসপাতালে, দোকানে, হাজারো জায়গায়। নানা মাপের নানা রকম পুরু কাঁচ পাওয়া যায়। আপনার যে কোন প্রয়োজনে এইচ, পি, জি, কাঁচের স্লিট ব্যবহার করতে পারেন।

**হিন্দুস্থান-পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড**

মার্কেটিং এজেন্টস : তালুকদার দ' অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

IWTHP 5464

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ভাইস এ্যাডমিরাল বি এস সোমান আন্দামানে নূতন ভারতীয় নৌ-ঘাঁটি আই, এন, এস জারওয়ার উদ্বোধন করেন।

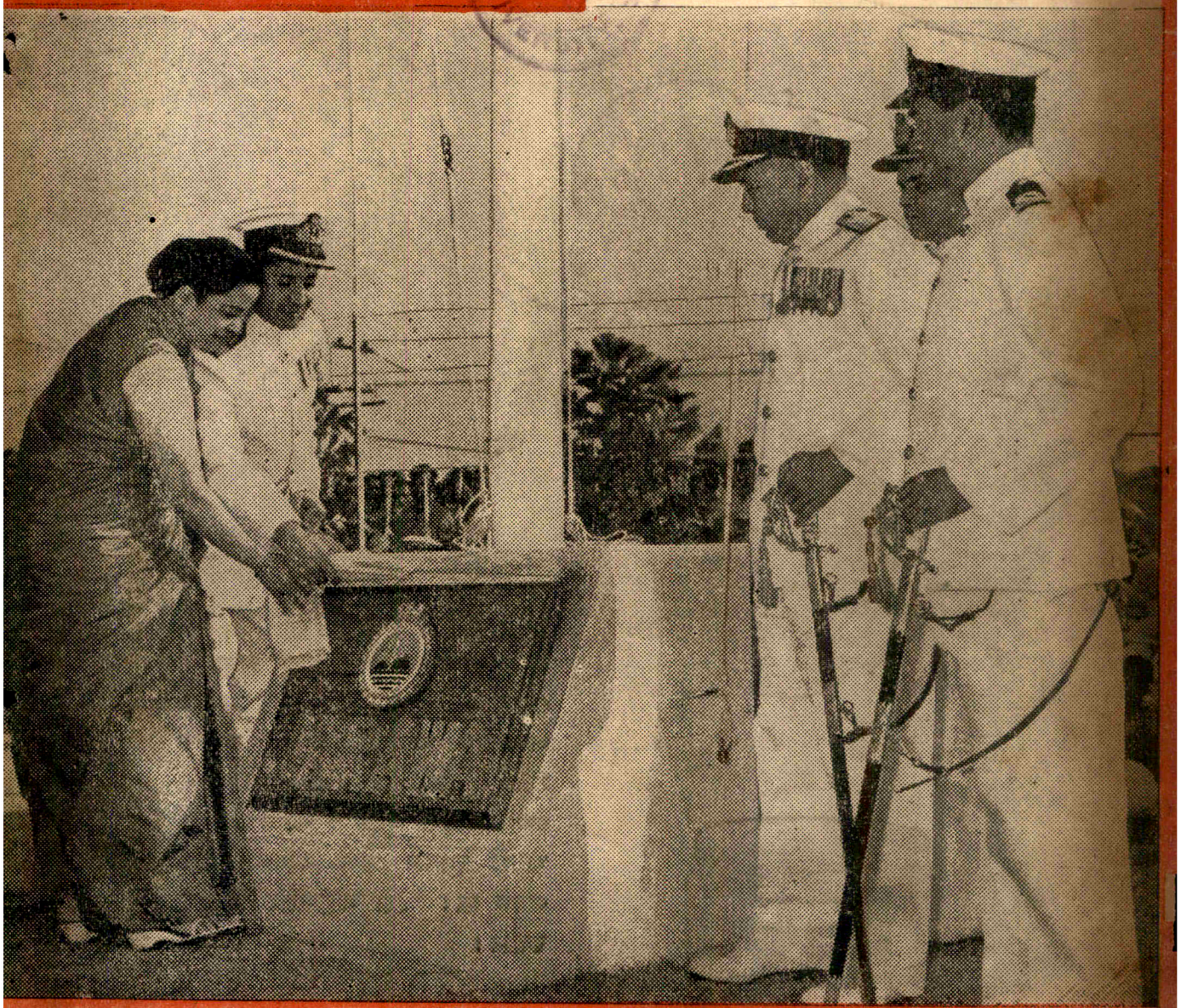

৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১৪ই ফাল্গুন ১৩৭০ • বঙ্গাব্দ • February 27, 1964 • Vol. 68, No. 40

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

# চ্যবনপ্রাশ

চ্যবনপ্রাশের মূল উপাদান আমলকী দেহের পুষ্টিসাধনে ও হৃতস্বাস্থ্যোদ্ধারে আমলকীর অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী সর্ব্বজন বিদিত। এতদ্ব্যতীত, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত—কৃষ্ণতিল তৈল, মিছরী ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্যবান ভেষজ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্দ্দি, কাশি ও স্বরভঙ্গের মহৌষধ

## সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,
এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম্. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম্. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

# সূচীপত্র

756.3
.003/3
Y8.68 no. 40


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২১৭৯ |
| আজকের মানুষ | ... | ২১৮০ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২১৮১ |
| আজকের যুগোশ্লাভিয়া | মৈত্রেয় | ২১৮৫ |
| অস্থির প্রতীক ( কবিতা ) | কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত | ২১৮৭ |
| জাস্তব ( কবিতা ) | সন্তোষকুমার অধিকারী | ২১৮৭ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২১৮৮ |
| দূরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২১৯২ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২১৯৫ |
| পৃথুমালিনী কথা ( রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২১৯৯ |



প্রকাশিত হইতেছে !! প্রকাশিত হইতেছে !!

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

( প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে )

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]

( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )

( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড),
দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

প্রস্থভেদ

( কোদণ্ড-মণ্ডনম্ )

মূল্য আট আনা

অহল্যা উপাখ্যান ১৲

( হিন্দুজাতির পতনের কারণ ও তাহার
পুনরুদ্ধারের উপায় )

বৈরাগ্যশতকম্ ৵০

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

( নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও
পরমায়ু নিরূপণ )

মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাউল কবি কুমুদরঞ্জন (প্রবন্ধ) | বরুণকুমার চক্রবর্তী | ২২০৩ |
| দ্বিতীয়া (কবিতা) | বাসুদেব মুখোপাধ্যায় | ২২০৫ |
| তরঙ্গিছে অন্তঃশীলা | চিত্রা সেনগুপ্ত | ২২০৬ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালিপি | ২২১১ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২২১৩ |
| ভারত দর্শন | ... | ২২১৭ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২২২৩ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২২২৭ |
| খেলাধূলা | ... | ২২৩১ |



রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

**উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

**বলিষ্ঠ কথাশিল্পী**

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

**মূল্য তিন টাকা**

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

**বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী**

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

**অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

**বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী**

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

**বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী**

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

**যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী**

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

**মূল্য দুই টাকা**

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

**শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

তৃতীয় ভাগ—বেলমাতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬৮ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 27th February 1964

# পাকিস্তানের মতিগতি

পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভুট্টো খালি হাতে দেশে ফিরেছেন। শ্রীভুট্টোর এই অভিযোগ ছিল যে, কাশ্মীরে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। পাকিস্তানের গুরু বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীনের প্রকাশ্য সায় এবং মার্কিন প্রতিনিধির 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা সত্ত্বেও সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পাকিস্তানের অভিযোগ সম্পর্কে কাউন্সিলের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখেছেন। এই অবস্থায়, প্রকৃতপক্ষে, শ্রীচাগলা বিজয়ীর বরমাল্য নিয়ে দেশে ফিরেছেন এবং তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কাশ্মীর সমস্যায় এমন নতুন কিছু ঘটে নি, যার ফলে কোনো নতুন আন্তর্জাতিক আলোচনার দরকার হতে পারে। ভারতীয় প্রতিনিধির এই সিদ্ধান্তেই শুধু নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের নতুন কোনো প্রস্তাবের প্রয়োজন নেই। সোভিয়েট প্রতিনিধি তাঁর স্পষ্ট ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন, 'কাশ্মীরের প্রশ্ন কাশ্মীরী জনগণ ইতিমধ্যেই মীমাংসা করে ফেলেছে।'

এই সব আলাপ-আলোচনা ও সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভাপতির সিদ্ধান্তের দ্বারা এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হল যে, পাকিস্তান মিথ্যা অজুহাতে রাষ্ট্রসংঘে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যদি জরুরী অবস্থার কারণ থাকতো তাহলে কখনোই অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্ভব হত না। এই কারণে মনে হয়, মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের দরবারে পাকিস্তানের সমুচিত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এখন সোজাসুজি বোঝা যায়, কাশ্মীর প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘে তোলার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের মধ্যে অবাধ নরহত্যা চালিয়েছে এবং ভারত রাষ্ট্রে যা কিছু ঘটেছে তার জন্যে পাক-গুপ্তচরেরাই দায়ী। অবশ্য, কাশ্মীর আক্রমণকারী হিসেবে অভিহিত পাকিস্তান সরকার কেবলমাত্র নিজের সাহসেই রাষ্ট্রসংঘে যায় নি। পেছন থেকে যে সব রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানকে পরিচালিত করেছে, তাদের কথা ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে মারাত্মক অন্যায়।

পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোটের কথা বলেছে এবং গণতান্ত্রিক দুনিয়ার কেউ কেউ তাদের সহায়তা দিয়েছেন। কিন্তু যে পাকিস্তান সরকার নিজেদের মৃত্তিকা থেকে গণতন্ত্রকে বিদায় দিয়েছে, সেই রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রগুলি যখন সায় দেয়, তখন বোঝা উচিত, ভেতরের উদ্দেশ্য গভীরতর। তাই এখন কাশ্মীরের ব্যাপারে আমাদের অধিকতর বাস্তববাদী হওয়া প্রয়োজন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে শ্রীভুট্টো জানিয়েছেন, 'কাশ্মীরের অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে।' একথা ঠিক যে, নিরাপত্তা পরিষদে পরাজয়ের পর পাকিস্তান মরীয়া হয়ে উঠবে এবং ভারত রাষ্ট্রে আরো অন্তর্ঘাতী কাজ সুরু করবে। জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী আয়ুবের সাত ডিভিশন সৈন্য এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আক্রমণকারী হিসেবে অভিহিত পাকিস্তানের যে কোনো নির্লজ্জ আচরণের জন্য আমাদের তৈরি থাকা দরকার।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

'আমার পদত্যাগের পর অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।'—এই পূর্বাভাষ আত্মবিশ্বাস না আত্মম্ভরিতার তা বলা কঠিন। তবে অনেকাংশেই যে সত্য সে কথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। আজ দিনকয়েক যাবত যে মানুষটির প্রতিটি উক্তি, আচরণ নিরন্তর সমস্যার সূচনা করেছে তাঁর নাম পি টি চাকো। কেরলের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র, ভূমিরাজস্ব ও আইনমন্ত্রী। রাজনীতির নানা আবর্তে বিখ্যাত চরিত্র। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চরিত্রস্খলনের অভিযোগে তাঁকে ধিক্কার জানিয়েছেন অনেকে। কেরল বিধানসভার সমস্ত বিরোধী সদস্য তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছেন। কংগ্রেসের কিছু সদস্যও তাঁর বিরোধী। এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী শংকরও তাঁর ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন। সর্বোপরি তাঁর আত্মরক্ষার অমোঘমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন কংগ্রেসপতি, শ্রীকামরাজ: 'পদত্যাগ কর।' অগত্যা তাতে চাকো রাজী হয়েছেন। বলা বাহুল্য রাহুমুক্ত হয়েছে কেরল। তবু সমস্যার নিরসন হয় নি। কেরলের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে চাকোর অপসারণ মুখ্যমন্ত্রী শংকরকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এরপর চাকোর মত আবার অত্যুৎসাহী (?) শক্তিমান লোক কি ভূমিকা নেবে সেটাই সবচেয়ে আতংকের। আর সেরকম হুমকি তো পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ই তিনি দিয়েছেন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। উচ্চাভিলাষ তাঁকে দুঃসাহস দিয়েছে। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্য কংগ্রেসে তিনি প্রথম আলোচ্য হ'য়ে ওঠেন সি পি রামস্বামী আয়ারের শিক্ষা সংক্রান্ত অনুসিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। শ্রীচাকো তখন ক্যাথলিক আন্দোলনের তরুণ নেতাদের অন্যতম। প্রথম নির্বাচনেই তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন। কিন্তু কার্যকাল শেষ হ'বার আগেই পদত্যাগ করেন। পরিশেষে ক্যাথলিক চার্চের অন্যতম প্রধানের মৃত্যুতে কংগ্রেসের পক্ষে একজন দায়িত্বশীল বিশ্বাসভাজন এবং কর্মক্ষম লোকের প্রয়োজন ছিল। শ্রীচাকো এই অভাব মোচন করে রাজনীতিতে আবার ফিরে এসেছিলেন। কেরলে কমিউনিষ্ট শাসনকালেও বিরোধী কংগ্রেস নেতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন শ্রীচাকো। সেখানে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করার ব্যাপারেও তিনি শ্রীশংকরের সহযোগিতায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেরল কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রয়োগেও সেদিনের হরিহর-আত্মা চাকো-শংকরের অনবদ্য যুগ্ম প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসার্হ।

সাম্প্রতিককালে ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে শ্রীচাকোর ভূমি সংস্কার আইন ভূম্যধিকারীদের আশীর্বাদ লাভ করেছিলো। কিন্তু এই আশীর্বাদই হয়ে দাঁড়ালো অভিশাপ। কেন না এই কর্মোদ্যমের অপরিণামদর্শী উন্মাদনাই পরিণামে ডেকে এনেছে তাঁর পতন। মন্ত্রিপরিষদ তাঁকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ

শ্রী পি টি চাকো

থেকে সরিয়ে এনে আইন ও রাজস্বমন্ত্রীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করার বদখেয়ালের সংশোধন হয় নি। তাঁর চিত্তভ্রষ্টতা তাঁর কর্মক্ষমতার সমাধি রচনা করেছে। 'Like a ghost from the tomb.'—শ্রীচাকো আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেন বলে সবাই আশংকা করেন। কেন না জনরব শোনা গেছে চাকোর লক্ষ্য নাকি মুখ্যমন্ত্রীর দুর্লভ ক্ষমতার আসন। কেরলের রাজনীতির আকাশে আবার চাকোর মতো মূর্তিমান শনির অশুভ উদয়ের সম্ভাবনা কেরলকে নতুন সংকটের সম্মুখীন করেছে।

## রাজধানীঃ

রাজধানী কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মর্মবাণী এবার বিধানসভার উভয় কক্ষকেই সামগ্রিক জীবনবোধের এক মর্মস্পর্শী আবেদনে মুখর করে রেখেছে। শুধু বিরোধী দলের সদস্যই নয়, কংগ্রেস দলের সদস্যরাও সীমান্তের ওপারের মর্মগাঁথাকে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন, এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সীমান্ত, সীমান্তের সমস্যা, ওপারের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে আনার দায়িত্ব ও সরকারী কর্তব্য, মাইগ্রেশন ফর্ম বিলিতে ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশান অফিসের গাফিলতি সব কিছুই এবারকার আলোচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে—আর এই আলোচনার সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অক্ষমতার নগ্নচিত্রই প্রতি-ফলিত হয়েছে বিধানসভার পাদপ্রদীপের মঞ্চভূমিতে। এ চিত্র নিঃসন্দেহে দুঃখের, বেদনার। তবু এ সত্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একচক্ষু হরিণ নীতি এখানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে রক্ষার নামে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তার বিষাক্ত পরিণাম এর মধ্যেই সুরু হয়েছে কলকাতা শহরে।

এই প্রশ্রয়ের বিষাক্ত পরিণামেই রাজ-ধানী কলকাতায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে সাহস পাচ্ছে মুসলমান অধ্যুষিত বস্তী অঞ্চলে এক শ্রেণীর পাক-দরদী। সরস্বতী প্রতিমার ওপর বোমা ফেলে প্রতিমা বিধ্বস্ত করতে উৎসাহী হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গুণ্ডারা কিংবা দেশদ্রোহী কার্যে লিপ্ত মুসলমানকে গ্রেপ্তার করতে গেলে মুসলমান জনতার হাতে নিগৃহীত হতে হচ্ছে পুলিশবাহিনীকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সব জেনে শুনেও আমাদের সরকার যেভাবে ভোলানাথ হয়ে বসে আছেন, তাতে মনে হয় রাজ্য অথবা দেশ সম্বন্ধে এঁদের বোধ হয় ভাবনার কিছুই নেই। কিন্তু আমরা রাজ্য-সরকারকে বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাজ্য এবং এই সীমান্ত-রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা নগণ্য নয়—কোনরূপ সন্দেহ না করেও বলা যায় সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তান সমর্থক। শুধু পাকিস্তান সমর্থক নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে এদে। অনেকের যোগসাজসের কথা পুলিশের ভালভাবেই জানা আছে, আজ

হাবড়ায় পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কৃষক মায়েরাও রেহাই পান নি।

এই পটভূমিকায় বিধানসভার অধিবেশনটি উল্লেখযোগ্য আলোচনায় মুখর হয়েছে। কারণ এই বিধানসভায়ই আমরা শুনতে পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গে সালা-উদ্দিন শুধু একটি নয়, তদন্ত ও অনুসন্ধান করলে আরও শত শত সালাউদ্দিনকে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গেই খুঁজে বের করতে পারবো। সত্যি আজকে পশ্চিমবঙ্গের এই হাঙ্গামার যদি সূত্র অনুসন্ধান করা যায়, তবে আমরা জানি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে পাক-চক্রের ক্রিয়াকলাপ যা অন্ধকারে সাপের মতো বিবরে লুকিয়ে আছে তা অনুসন্ধানের ঝাড় ফুঁকে অবশ্যই আলোতে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই সৎসাহস সংখ্যালঘু নামক কুয়াশায় যে আচ্ছন্ন তা এদের স্বরূপেই বোঝা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কমপ্লেক্স কবে যাবে?

* * *

এবারকার বিধানসভার অধিবেশনে কমিউনিষ্ট সদস্যদের আশ্চর্য নীরবতা আমাদের বিস্মিত করেছে। একদিন সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুমুখার জন্য এই পার্টি সমগ্র দেশকে মাথায় করেছিল আমরা তা ভুলি নি, কিন্তু আজ যখন সীমান্তের ওপারে হাজার হাজার হিন্দু বলি হয়েছে তখন লোকসভা থেকে আরম্ভ করে বিধানসভা পর্যন্ত এই পার্টির সদস্যরা আশ্চর্য কৌশলে সমস্ত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার চিত্রকে অতিরঞ্জিত করে পাকিস্তানের হাতকেই সবল করেছে। তাই লোকসভায় যেমন সৈয়দ বদরুদ্দোজার বক্তৃতায় বাংলা দেশ থেকে নির্বাচিত কমিউনিষ্ট সদস্যদের বাহবা জানাতে দেখতে পাই, তেমনি আলিপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্যকেও তীব্র ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে একতরফা নিন্দা করতে শোনা গিয়েছিল এই বিধান-সভায়। কিন্তু আজ কলকাতার হাঙ্গামার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে। কলকাতায় কারা দাঙ্গা বাধিয়েছিল তা আজ আলোর মতই স্পষ্ট।

বিধানসভায় প্রবীণ কংগ্রেসী সদস্য

শ্রীনরেন সেনের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় কলকাতার দাঙ্গার একটি সম্প্রদায়গত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া গেছে ; যাতে দেখা গেছে কলকাতার হাঙ্গামায় সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি সংখ্যালঘুর তুলনায় মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। মসজিদ থেকে নানা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বস্তী থেকে মৃতদেহ প্রাপ্তি কিংবা কামারহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে হানা দিয়ে পুলিশ সংখ্যালঘুর বাড়ি থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে—পাকিস্তানী চক্রান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে একশ্রেণীর মুসলমান পশ্চিম-বঙ্গকে বিপদগ্রস্ত করতে চায়। কমিউনিষ্ট সদস্যদের এই সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শোনা যায় নি। যখন হিন্দু-দের আকুল আর্তনাদ পূর্ববঙ্গের বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে, অসহায় বাঙালী নর-নারী আয়ুবশাহীর নরককুণ্ডে মৃত্যুর দিন গুণছে তখন আদর্শের বুলি কপচিয়ে কমিউনিষ্টরা যে আসল ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা বোধ করি বাংলা দেশের জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে পারে—এই শ্লোগান মৃত্যুপথযাত্রী পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে সেই ভেক ও বালকদলের গল্পের মতোই একটি উপদেশ। আর সেই উপদেশ আজ গল্পেই মানায়—আশা করি পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট সদস্যরা এটা জানেন। বাংলা দেশের জনতা বেশিদিন কোন কিছু মনে রাখতে পারে না—এই ধারণা পোষণ করেই কিংবা আগামী নির্বাচনের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে কমিউনিষ্ট সদস্যরা মুখ খোলেন নি, না পাক-চীন মিতালী তাদের সত্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করেছে তা কে বলবে! ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টিকে তবু চেনা যায়—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাঙা কমিউনিষ্ট পার্টির স্বরূপ বোঝা দায়! কথায় বলে দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

* * *

'বাঙালী হিন্দু হয়ে জন্ম নেওয়া কি বাংলা দেশে পাপ'—এই আশ্চর্য কণ্ঠ এবার বাংলা দেশের বিধানসভাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্তম্ভিত করেছে। একটি বলিষ্ঠ সত্যকেই এই কণ্ঠে আমরা ধ্বনিত হতে শুনেছি। সত্যি আমরা এতদিন ভেবেছিলাম পূর্ববঙ্গেই বাঙালী হিন্দুরা অনভিপ্রেত আর এই অনভিপ্রায় নানাবিধ খাতে প্রবাহিত হয়ে সেখানের বাঙালী হিন্দুর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে, পাকিস্তান সৃষ্টির এই ষোল বছর ধরে। তাই রাজনৈতিক জুয়া খেলায় এই ষোল বছরে হাজার হাজার বাঙালী হিন্দুকে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষার তীরে। খুলনা, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় জেলায়। বাঙালী হিন্দুরা ভেবেছিল এই দুঃস্বপ্নের রাজ্য পাকিস্তান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ, এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এসে হয়তো স্বস্তি পাবে, শান্তি পাবে, জীবন পাবে। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর সেই স্বপ্ন বোধ হয় স্বপ্নই থেকে গেল। তাই এ দেশের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চশমায় হয়তো সেই

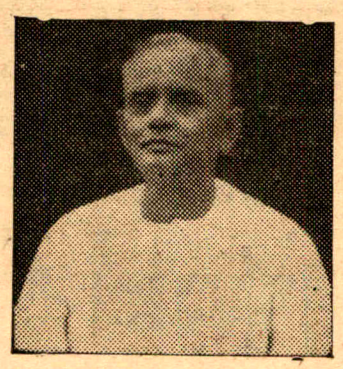

শ্রীনরেন সেন

বাঙালী হিন্দু রেহাই পেল না। আজ হাবড়া, গাইঘাটা, বনগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রক্ষার নামে পশ্চিম-বঙ্গের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পুলিশ যে ভাবে সেখানের বাঙালী হিন্দুকে ব্যাটনের গুঁতোয় ক্ষতবিক্ষত করেছে, তা এণ্ডারসন আমলীয় আমলাতান্ত্রিক নির্যাতনের ইতি-হাসকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে।

তাই এ প্রসঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের দুরদৃষ্ট দেখে আমাদের সেই বহু প্রচলিত প্রবাদটিই মনে পড়ে, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!' পূর্ববঙ্গে আয়ুবশাহের চরেরা ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে বাঙালী হিন্দুকে নিধন করবে, আর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু রক্ষার নামে বাঙালী হিন্দু অত্যাচারিত হবে—এই উভয় সঙ্কটে বাঙালী হিন্দু যে শাঁখের করাতের মধ্যে অবস্থান করছে, তা আজ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তাই আজ কেউ যদি বলে বাংলা দেশে বাঙালী হিন্দু হয়ে জন্ম নেওয়া পাপ, তবে তাতে অতিশয়োক্তি নেই বরং তা সত্যের ব্যঞ্জনায় গভীর।

* * *

কিছুদিন পূর্বে কলকাতা তথা পশ্চিম-বঙ্গের এক শ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী মুসলমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এক যুক্ত আবেদনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিভিন্ন বায়নাক্কা পেশ করেছিলেন, সে সংবাদ হয়তো অনেকের জানা আছে। অধুনা আমরা আর এক ধরণের বিপদের আশঙ্কা বোধ করছি, এই শ্রেণীর মুসলমানদের কাছ থেকে। সংবাদে প্রকাশ, কামারহাটিতে পুলিশ একদল মুসলমান গুণ্ডাকে নিরাপত্তার জন্য গ্রেপ্তার করলে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী মুসলমানরা এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদে তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই রকম গ্রেপ্তারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুর স্বার্থকে বিঘ্নিত করা হচ্ছে এবং এই গ্রেপ্তারে পশ্চিম-বঙ্গের সংখ্যালঘুর অধিকারকে অযথা পুলিশ ক্ষুণ্ণ করছে। আমরা আশঙ্কা করছি এই শ্রেণীর মুসলমানরা নিজেদের জ্ঞাতসারেই অন্যায়কে সমর্থন করে দেশের মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জীইয়ে রাখবার অপচেষ্টা করছেন। এই অপচেষ্টা শুধু কলকাতা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গেই আত্ম-প্রকাশ করেছে। আমরা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এ বিষয়ে অবহিত হতে নিশ্চয়ই বলবো। একদিকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ ও অপরদিকে দেশের ভেতরে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টিকারী গুপ্ত চক্রীর দল যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছে তার অঙ্কুর উদ্গত হওয়ার আগেই তার বিনাশ করতে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। আশা করি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

* * *

অবশেষে রাধার নাচ হ'ল। কেউ কেউ অবশ্য বলেছিলেন, ষাট মণ তেলও

পুড়বে না রাধার নাচও হবে না। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা সম্বন্ধেই রাধার নাচের কথা আমরা উল্লেখ করলাম। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার' মতোই এই মহার্ঘ ভাতা সরকারী কর্মচারীদের ভাগ্যেও বর্ষিত হয়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন, সরকার হয়তো মহার্ঘ ভাতার ব্যাপারে নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের ভেতরে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। কিন্তু কর্মচারীদের সেই আশায় ছাই পড়েছে। যাঁদের কম বেতন তাঁরা কম হারের মহার্ঘ ভাতা ও যাঁদের বেশি বেতন তাঁরা বেশি হারের মহার্ঘ ভাতার অধিকারী হয়েছেন। এটা সরকারের কোন ধরণের যুক্তি তা আমাদের বোধগম্য হল না। সরকারের এই ধরণের মহার্ঘ ভাতা প্রবর্তনের জন্য সরকারী কর্মচারীরা যে সন্তুষ্ট হন নি, তা তাঁদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ওপর বৈঠকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের ৩০৲ টাকা সমান হারে মহার্ঘ ভাতার দাবী ৫৲ ও ১০৲ টাকার বৈষম্যমূলক আচরণে নস্যাৎ হয়ে গেলেও, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষোভ কিন্তু এতে যাবে না, আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তা উপলব্ধি করবেন। কারণ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য যে হারে বেড়ে চলেছে, তার দ্রুতগতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, শুধু ৫৲ বা ১০৲ টাকার দাক্ষিণ্যে তা প্রশমিত হবে না। আশা করি সরকার তা হৃদয়ঙ্গম করবেন।

* * *

কলকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বিভিন্ন মহল্লায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্গতদের মধ্যে সেবাকার্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতির ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের এই মহিলা-মন্ত্রীর মাতৃহৃদয় নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের সর্বহারা, রিক্ত, ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের জন্যেও সমভাবে ব্যথিত হবে।

পূর্ববঙ্গের আয়ুবশাহীর কসাইখানার অন্ধকারে যারা আলোর পিপাসায় অস্থির, যারা হাজার হাজার মানুষের খুনে রঞ্জিত পিছল ভূমিতে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত, তাঁদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের এই মহিলা-মন্ত্রীর প্রাণ কাঁদবে—এটাই হয়তো জেনেছিল সেখানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু এটা কি তারা জানতো যে রাজনীতির খেলায় তারা সর্বস্ব হারিয়ে ভারত সীমান্তে পৌঁছলে শুধু মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নেই বলেই, সেই ত্রাণমন্ত্রীর হৃদয়হীন ব্যবহারে তারা জঞ্জালের মতোই পরিত্যক্ত হবে! আমরা ত্রাণমন্ত্রীকে বলতে চাই—তিনি কি জানেন না সেখানে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশান অফিসে হাজার হাজার দরখাস্ত ডেস্কের তলায় পচছে? তিনি কি জানেন না যে, সেখানে মাইগ্রেশনের

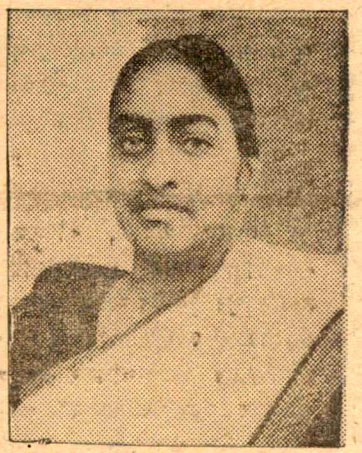

শ্রীমতী আভা মাইতি

জন্য অপেক্ষমান ভীত জনতার সম্বন্ধে তড়িদ্গতিতে কার্য করা এখনো সম্ভব হচ্ছে না সেখানের ভারতীয় ভিসা অফিসের কর্মীদের? দিল্লী পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুর জন্য ভারতের দ্বার খুলেছেন, এ সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন তবু আমাদের ত্রাণমন্ত্রীর এ ধরণের হৃদয়হীন ব্যবহারে শুধু নতুন উদ্বাস্তুরাই নয়—সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ক্ষুব্ধ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সমস্ত মানুষ বিভীষিকার রাজ্য থেকে তাঁদের স্বজন হারিয়ে, জলন্ত আগুনে ঝলসানো চোখে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলকে সম্বল করে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন, যে সমস্ত মেয়েরা সর্বস্ব খুইয়ে শুধু সায়া পরে কিংবা যে সমস্ত যুবক ও বৃদ্ধ শুধু মাত্র কৌপীন ব্যবহার করে ভারতে প্রবেশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী তাঁদের কাছে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দাবী করে তাঁদের পরিহাস করছেন না তো—এটাই ত্রাণমন্ত্রীর কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য? ক্ষমতার সৌধে বসে আজ হয়তো আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করবেন না।

তবু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যখন সাহায্য দেবার ক্ষমতা সীমিত, যখন তাঁরা আগত সমস্ত উদ্বাস্তুদের সাময়িক যথোপযুক্ত সাহায্য দিতে পারছেন না—তখন তাঁদের বাইরের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য নিতে বাধা কোথায়? বিধানসভার আলোচনা থেকে জানা গেল যে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ একটি সরকারী শূন্য গৃহে থেকে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করছিল—ত্রাণমন্ত্রী নাকি নিজে গিয়ে তাদের অবাঞ্ছিত লোক মনে করে সেই গৃহ থেকে বের করে দেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্বাস্তুদের জন্য রান্না করা ভাত তাঁর আদেশেই নাকি ফেলে দেওয়া হয়। ইতিহাসে পড়েছি—একদিন সম্রাট ঔরঙ্গজীব হিন্দুদের মন্দির নিজে দাঁড়িয়ে ধ্বংস করেছিলেন, তৈমুরলঙ্গ মানুষের শবে পাহাড় রচনা করেছিলেন, কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে মানুষকে অভুক্ত রেখে মানুষের খাবার নষ্ট করেছেন ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত থাকলেও তা সুলভ নয়। আমাদের ত্রাণমন্ত্রী ইতিহাসের সেই বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে আজ যে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন, নিঃসন্দেহে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু লোমহর্ষক ঘটনাকেও হার মানায়। বিধানসভায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণে হয়তো সেই নির্মম সত্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত ঘটেছে এবং বিধানসভার এই আলোচনার ফলেই হয় তো তিনি সীমান্তে গিয়ে নবাগত উদ্বাস্তুদের সেবাব্রতী হিসেবে খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উদ্বাস্তুদের সম্মুখে দাঁড়াতে গেলে যে হৃদয়বত্তা, সেবাব্রত কিংবা দরদের প্রয়োজন—ত্রাণমন্ত্রীর কি তা আছে?

* * *

যদিও রাজধানী কলকাতার বইবাজার জমে উঠেছে অনেক আগেই, তবু বইবাজার ঘুরে লম্বা লম্বা কিউ দেখলে কলকাতার বইবাজারকে গড়ের মাঠ বলেই মনে হবে। অথচ ভুক্তভোগী

মাত্রেই জানেন, এ লাইন ইষ্ট বেঙ্গল মোহনবাগান-এর খেলার টিকিট কিংবা ক্রিকেট টেষ্টের টিকিটের জন্য নয় আর এ লাইন আজকের নতুন নয়। ঠিক এমনি সময় প্রতি বছর কলেজ ষ্ট্রীটের বইবাজার লাইনের মেলায় সাজে। আর এই মেলার একমাত্র পণ্য পশ্চিম-বঙ্গ শিক্ষা অধিকারের প্রাথমিক পুঁথি 'কিশলয়', 'প্রকৃতি পরিচয়'। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এই দু'টি পুঁথি শুধু অপরিহার্য নয় বরং একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার জানেন যে, প্রতি বছর এই বইটি নিয়ে কলকাতার বইবাজারে ফাটকা চলে তথাপি সরকার এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন করেন না কেন, তা আমরা বুঝতে পারি না? আমরা জানি কলকাতার এক শ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী এই বই দু'টিকে বাজারের লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে অনেকটা অলীক চাহিদার সৃষ্টি করেন নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাই গাহনে দাঁড়িয়ে বই না পেলেও অনেক সময় নোট বই-এর চাহিদা জানালে যত খুশি এই বইগুলো পাওয়া যায় পিছন দরজার মাধ্যমে। সরকার যে এসব বিষয় জানেন না তা নয়; তা ছাড়া যে সব জায়গায় লাইন দিয়ে কিশলয় নেই এমন বক্তব্য শোনা গেছে, বেশি পয়সা দিলে তাঁরাই আবার বই সংগ্রহ করে দেন—এমন ঘটনাও কলকাতার বহবাজারে বিরল নয়। আর ভুক্ত-ভোগীমাত্রেই এ সব ঘটনার সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন।

আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। চাল-ডাল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিষের ব্যাপারে আমাদের সরকার তাঁর ক্ষমতার দেখিয়েছেন, আমরা সে প্রসঙ্গ তুলছি না—আমরা বলতে চাই শিক্ষা ব্যাপারে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুদ্রিত পুস্তক নিয়ে এ ধরণের ফাটকা আর কতদিন চলবে। বছরের বার মাসের মধ্যে চার মাস যদি শুধু বই সংগ্রহ করতেই অভিভাবকদের লেগে যায়, তবে বাংলার শিশুরা কিশলয় পাঠের উপযুক্ত সময় পাবে কখন?

শিশুদের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এ ধরণের ফাটকা কোন স্বাধীন দেশে সম্ভব কি না, আশা করি সরকার তা ভাববেন। সরকারী হিসেবে আঠার মাসে বছর, জনসাধারণের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা যেন শিক্ষা দপ্তরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আদর্শকে ম্লান না করে। আমরা আশা করি শিক্ষা দপ্তর অবিলম্বে বাজারে কিশলয় দুষ্প্রাপ্যতার কারণসমূহ সরেজমিনে তদন্ত করে অবিলম্বে সতর্ক হবেন। কিশলয় দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা আজকের নতুন নয়, এ বিষয়ে বহু বাগ্-বিতণ্ডা, বহু বিতর্ক হয়ে গেছে, কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয় নি। আমরা এ বিষয়ে তর্কের ঝড় চাই না, আমরা চাই সহজে অবিলম্বে কিশলয় প্রাপ্তির পথ খোলা হোক। বিভাগীয় মন্ত্রী আশা করি লেবু কচলিয়ে আর তেতো না করে এ বিষয়ে আশু দৃষ্টি দেবেন।

## বীরভূম ঃ

সংবাদে প্রকাশ, বীরভূম জেলার নলহাটী থানার বনবিভাগের লক্ষ্মী-নারায়ণপুর সিটের অন্তর্ভুক্ত সুলতানপুর মৌজার ১নং সিটের অন্তর্গত জমিসমূহের উত্তর-পশ্চিমে বন সংরক্ষণ ও সৃষ্টির জন্য পশুনিরোধী খাল কাটা হচ্ছে। এই বনসৃষ্টি ও সংরক্ষণের ফলে সেচহীন কঙ্করময় সুলতানপুর মৌজার কৃষি চরম সংকটের সম্মুখে পড়েছে। এবং সুলতানপুর সহ ৩।৪টি সাঁওতাল গ্রামের যোগাযোগের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বনসৃষ্টি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ভূমিক্ষয় নিবারণ ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ব্যবস্থা। কিন্তু এখানে 'উল্টো বুঝলি রাম' অবস্থা। এখানে বন-বিভাগের হৃদয়হীন এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে, প্রায় দুই হাজার বিঘা কৃষিজমি উষর কঙ্করময় মরুতে পরিণত ও সুলতান পুর সহ কয়েকটি সাঁওতাল গ্রাম উৎখাত হতে চলেছে। সুলতানপুর মৌজার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বন ও উচ্চ ভূমির গড়ানো জলই এখানে কৃষিকার্যের একমাত্র ভরসা। এ বছর বর্ষার পর থেকেই বন বিভাগ সারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বনরক্ষী পশুনিরোধ খাল কেটে ও উচ্চ ভূমি থেকে গড়ানো জল আসার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে সারা মৌজার বিপুল পরিমাণ জমি কৃষির অযোগ্য পতিত ভূমিতে পরিণত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

দেশের খাদ্য ঘাটতির পরি-প্রেক্ষিতে যখন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সর্ববিধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সরকারী নেতৃবৃন্দ বারবার আকুল আবেদন জানাচ্ছেন, ঠিক তখনই এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ কৃষি এলাকাকে সরকারের অন্য আর এক দপ্তর পতিত ভূমিতে পরিণত করতে চলেছেন—তখন আমাদের আশ্চর্য হতে হয় বৈ কি। বন বিভাগের এই ব্যবস্থার ফলে শুধু কৃষি-জমিই পতিত হবে না বরং কয়েক শত কৃষিজীবী পরিবারকে বাস্তু, জমি ও জীবিকা থেকে উৎখাত করে নতুন উদ্বাস্তুতে পরিণত করবে। তা ছাড়া বন বিভাগ সংকল্পিত এই খাল কাটা হলে, বীরভূম জেলার অন্যতম হাট—চাতরা হাটের বিশেষ ক্ষতি হবে। নলহাটী থানার বিরাট এলাকা ও পার্শ্ববর্তী বিহারের সাঁওতাল পরগণার কৃষিপণ্যের এইটিই একমাত্র বাজার।

চাতরা ষ্টেশনের পশ্চিম থেকে সুলতানপুর অবধি জেলা বোর্ড সড়ক ও তার প্রান্ত থেকে বিহারের অভ্যন্তরে প্রসারিত গ্রাম্য সড়ক। চাতরা হাটে আসার জন্য রেল লাইনের পশ্চিমের সমগ্র এলাকার এটাই একমাত্র যোগাযোগের যোগসূত্র। এই খাল কাটা হলে বঙ্গ-বিহারের এই একমাত্র যোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন হবে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটি প্রকটমান যে, এই পরিকল্পিত খাল সমগ্র অঞ্চলের সামাজিক জীবন, কৃষি ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর চরম আঘাত হানবে। এই অবস্থায় আমরা বিভাগীয় বন দপ্তর ও কৃষি দপ্তরকে যুগ্মভাবে সমগ্র অঞ্চলটিকে সরেজমিনে তদন্ত করে, যাতে বনবিভাগের পরিকল্পিত উদ্যোগকে আরো বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্তমান সম্পদকে অব্যাহত রেখে প্রয়োগ করতে পারেন—তার উপায় নির্ধারণ করতে আমরা আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহোদয় দ্বয়কে অনুরোধ করবো।

অধুনা প্রতিষ্ঠিত ছোট্ট ভেলেনজি শহরের নবনির্মিত শ্রমিক ক্লাব ও শ্রমিক শিক্ষাকেন্দ্র।

## গৃহ-সমস্যা আজ সমাধানের পথে

আধুনিক যন্ত্রযুগে সর্বত্র শিল্পসম্ভার বাড়ছে। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক দেশ হয়ে পড়ছে নগরভিত্তিক। বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রগঠনের নতুন সঙ্কল্প নিয়ে যে সব দেশে চলেছে নতুন প্রকল্প, সে সব দেশে আজকের যন্ত্রযুগের কালে গড়ে উঠছে নতুন নতুন কলকারখানা। পত্তন হচ্ছে নতুন শহরের। দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে লোক জমা হচ্ছে শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে শহরের বুকে। ফলে গৃহ-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধির পথে। এমন অবস্থা আজকে আমাদের নবগঠিত ভারতের সর্বত্র। শুধু ভারতে কেন, গৃহ-সমস্যার কথা বোধ করি বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে একই ধরণের। কোন কোন রাষ্ট্রে এই সমস্যা অন্যান্য সমস্যার চাইতে আরও বেশি করে চোখে পড়ে। অধুনা যে সব রাষ্ট্র দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন-চিন্তায় দেশগঠনের পরিকল্পিত পথে চলেছে, সে সব রাষ্ট্রে যেমন এ সমস্যা প্রকট, তেমনি যে সব দেশ গত মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় ক্ষতিগ্রস্ত সে সব রাষ্ট্রেও গৃহ সমস্যা অন্য সমস্যার চাইতে কম নয়। যুগোশ্লোভিয়াতেও দেখা যায় গৃহ-সমস্যা একটি বিশেষ সমস্যা। ওদেশে যুদ্ধের পর নাৎসী আক্রমণের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠছে নতুন সমাজ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে শিল্প-বাণিজ্য। নতুন কল-কারখানার সঙ্গে সঙ্গে পত্তন হচ্ছে নতুন শহর। যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতন্ত্রী সরকার নতুন সুষ্ঠু সমাজ গঠনের যে প্রকল্প

মৈত্রেয়

গ্রহণ করেছে তাতে শহরকেন্দ্রিক শিল্প-কারখানার বৃদ্ধিতে গৃহ-সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।

কিন্তু 'মেঘ ক্ষণিকের, চির দিবসের সূর্য।' সমাজচিন্তার বলিষ্ঠ রূপদানের ওপর নির্ভর করে সমস্যার স্থায়িত্ব। সমস্যাকে জীইয়ে রাখা কোন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের চিন্তা হতে পারে না। যে দেশে একটি একটি ক'রে খেটে-খাওয়া শ্রমিক-মজুর সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে জড়ো হয়ে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত অস্ত্রসজ্জিত মুক্তি-সৈনিকের গুরুদায়িত্ব নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে একদিকে নাৎসীর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে দেশের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্তপাত করে নতুন যুগোশ্লাভিয়ার সৃষ্টি করেছে, সে দেশের গৃহ-সমস্যা সমাধানে বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া স্বাভাবিক। অধুনা যুগোশ্লাভিয়ায় নতুন শিল্প-বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে, নতুন নতুন শহরের পত্তনে গৃহ-সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর ওপর গত মহাযুদ্ধে সারা দেশের মোট যুদ্ধবিধ্বস্ত গৃহের কুড়ি-শতাংশই একমাত্র শহর অঞ্চলে সংগঠিত হয়। সমস্ত অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মুখে তাই যুদ্ধোত্তরকালের প্রথম আট বছরে যুগোশ্লাভিয়ায় দু'শ' শহর অঞ্চলে মাত্র ৭২০০০ নতুন 'ফ্ল্যাট' নির্মিত হয়। এ সংখ্যা মোট সমস্যা সমাধানের পক্ষে নামমাত্র বলা চলে।

যুদ্ধোত্তরকালের দ্বিতীয় দশকে গৃহনির্মাণের কাজে বেলগ্রেড সরকারের পক্ষে একটা 'মাথাধরা' সমস্যায় পড়তে হয়। একদিকে নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় নতুন শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, নতুন শহর গড়ে উঠছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে শহর অঞ্চলে। অন্যদিকে গৃহ-নির্মাণের উপাদানের অপ্রাচুর্যতায়

পিরামিড' সমান বাধা। তবুও বাধা-বিপত্তি ঠেলে ১৯৫৩ সালের গোড়া থেকে বিশেষ প্রকল্প মাধ্যমে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ৬৪০,০০০ নতুন 'ফ্ল্যাট' নির্মিত হয়। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যদিও এ সংখ্যা সামান্য, তবুও যুদ্ধোত্তরকালে ধ্বংসস্তূপের ওপর বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে যুগোশ্লাভিয়া যখন নতুন রাষ্ট্রগঠনের গুরুদায়িত্ব নিয়ে চলছে, তখন এ নতুন গৃহসংখ্যা অগ্রগতির পরিচয় দিচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, এই অগ্রগতির মধ্যেও গৃহ-সমস্যা সমাধান সম্পূর্ণ হয় নি, একথা অস্বীকার করা যায় না। যদিও যে ৬৪০,০০০ ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে সাধারণের জন্যে, যে নতুন নতুন সরকারী দপ্তরগৃহ নির্মিত হয়েছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে পত্তন হয়েছে নতুন শহর আর নতুন ধরণের ঘরবাড়ির, তা একদিকে গৃহ-সমস্যা জর্জরিত যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে যেমন কৃতিত্বের পরিচয়, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে নতুন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন।

কিন্তু পরিকল্পনা-কর্তাদের এখন বড় প্রশ্ন—কেমন করে আগামী বছরের মধ্যেই এই গৃহ-সমস্যার সমাধান করা যায়? সামগ্রিক সমস্যা হিসাবে এ প্রশ্নটি পেশ করা হয়েছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাগরেব সম্মেলনে। এ সম্মেলনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ২২৩টি শহর ও নগরের মোট ৬৭৮ জন প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীতে অনেক রাজনৈতিক ও উচ্চপদস্থ সরকারী নেতৃমণ্ডলীও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত হ'ল, আগামী বছর থেকে যদি গৃহনির্মাণের হার আরও বাড়িয়ে অন্ততপক্ষে প্রতি বছর ২০০,০০০ করা চলে, তবে গৃহ-সমস্যার বিভীষিকা কমে আসবে এবং সমাধান সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ততায় আসা চলবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সম্মেলনে আলোচিত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার গৃহনির্মাণের অগ্রগতি এমনি হারে প্রায় এসে পৌঁচেছে। ১৯৬৩ সালের সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যাচ্ছে, ১২০,০০০ নতুন 'ডুয়েলিং ইউনিট' নির্মিত হয়েছে। রাষ্ট্রের দু'টি বৃহৎ নগর বেলগ্রেড ও জাগরেব-এ গৃহের স্বল্পতার দরুণ সমস্যা খুব প্রকটভাবে চোখে পড়ে। এ দু'টি নগরের গৃহ-সমস্যা আমাদের দেশের কলকাতা আর দিল্লীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। যুগোশ্লাভিয়ার সরকার বিশেষ পরিকল্পনা মাধ্যমে এ দু'টি শহরের গৃহ-সমস্যা সমাধানের কাজে হাত লাগিয়েছে। জাগরেব নগরের চেহারা দেখলেই এই অগ্রগতির ছবি পরিষ্কার ভাবে ভেসে ওঠে। যেখানে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সে নগরে মাত্র ১৪০০০ 'ডুয়েলিং ইউনিট' নির্মিত হয়, সেখানে তার পরবর্তী তিন বছরেই ১৬০০০ নতুন গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯৬৩ সালে আরও ৩০০০ 'ফ্ল্যাট' শেষ হয়েছে বলে পরিসংখ্যান বিভাগ অনুমান করছে। অর্থাৎ গত চার বছরেই পূর্ববর্তী ১৫ বছরের অপেক্ষা ১৬০ ভাগ বেশি গৃহ নির্মিত হয়। বেলগ্রেডেও এমনি অগ্রগতির দৃশ্য লক্ষণীয়। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত হিসাবে বেলগ্রেড নগরে ৪৮০০০ নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়। এ নগরে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও কম নয়। তবুও দেখা যায় ১৯৬২ সালের শেষে প্রাক্ যুদ্ধকালের চাইতে মাত্র ২০০০ 'ফ্ল্যাট' বেশি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র এই বেলগ্রেডেই নাৎসী আক্রমণের ফলে বারবার যে বোমা বর্ষণ হয়, তাতে ৪৬০০০ গৃহ ধ্বংস হয়। তদুপরি অধুনা স্থাপত্য প্রকল্পে অনেক ছোট ছোট 'ডুয়েলিং ইউনিট'কে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে। জাগরেব নগর পরিকল্পনা সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তে সকলে একমত হয় যে, প্রতি বছর ২০০,০০০ গৃহ-নির্মাণের সঙ্কল্প কার্যকরী হওয়া তখনই সম্ভব হবে, যদি অর্থসংগ্রহের পদ্ধতির পরিবর্তন করা চলে। বর্তমানে নতুন গৃহনির্মাণের জন্য তহবিল সংগৃহীত হয় উপার্জনের শতকরা ৪ ভাগ করধার্যের ওপর। পৌরসভা ও 'লোকাল গভর্ণমেণ্টের' ওপর এ অর্থ বণ্টনের দায়িত্ব রয়েছে। শিল্প সংস্থা, সমবায় সমিতি বা ব্যক্তিবিশেষকে সরকার নির্মিত গৃহের মোট ব্যয়ের অর্ধেক দিয়ে থাকে। ১৯৫৯ সালের এই পদ্ধতিতে অনেক অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। এতে সরকার বা ব্যক্তিবিশেষের কোন তরফেরই নতুন গৃহনির্মাণের প্রবল প্রবণতা থাকে না। ফলে সমস্যা দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। আবার উপযুক্ত লোক নির্বাচনেরও সমস্যা রয়েছে।

এ সমস্ত অসুবিধা বিচার ক'রে সম্মেলন স্থির করেছে, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে গৃহনির্মাণের ঋণ দেওয়ার জন্য বর্তমান অর্থসংগ্রহের পদ্ধতির যেমন সংস্কার করা হবে। তেমনি বণ্টনের ব্যবস্থারও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। ব্যাঙ্কগুলি প্রতিটি আবেদন-পত্র পরীক্ষা করে সাধারণ কর্মচারীদের আবেদন প্রথমে বিবেচনা করবে। তারপর বিবেচিত হবে শিল্প-কারখানার

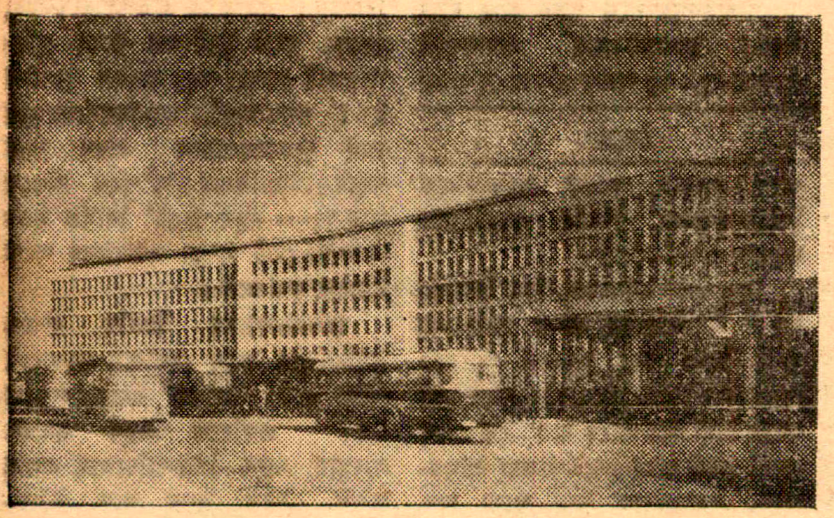

● সোভানদীতীরে নিউ বেলগ্রেডে নবনির্মিত ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিল্ডিং।

# অস্থির প্রতীক

**কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত**

এখনও অনেক বাকী প্রার্থিত সুখের।
ফুটছে গোলাপগুলো টবে কিংবা
আরো নীচে তৃষ্ণার্ত মাটিতে ;
ঘ্রাণে তার মন আর তেমন মাতে না,
যেমন শহরে মাতে পাউডার শুঁকে শুঁকে
ট্রামে বাসে অথবা আরামকেদারায়
ঈষৎ হাওয়ায় কাঁপা মন্থর নিমেষে
মুখোমুখি বসে'।

গোলাপ এখন আর ঘ্রাণ নয় অস্থির প্রতীক।
কাঁটায় বিক্ষত তার রক্তনাভি, কিংবা সানুদেশে
তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত অন্ধকার গোপন বিবর
ক্ষুধিত স্পর্শের তাপে পরিপূর্ণ হতে সমুদগ্রীব।

এখনও অনেক বাকী প্রার্থিত সুখের।
যেহেতু যা-কিছু আজ সুখ বলে বহু-বিজ্ঞাপিত,
ঘ্রাণে নয় যন্ত্রণায় অদৃশ্য কাঁটায়
ক্রুশবিদ্ধ সব ম্রিয়মাণ॥

# জান্তব

**সন্তোষকুমার অধিকারী**

সেই এক আরণ্য উৎসব।
মুখোমুখি যুধ্যমান মন—
শাণিত বর্শায় রক্ত—ছিঁড়ে আনা হৃৎপিণ্ড থেকে;
কাতর আর্তিতে তৃপ্ত বিদ্বিষ্ট জীবন।

সেই এক ক্ষুধিত জান্তব
আদিম হিংসার স্ফূর্তি,
খুঁড়ে খুঁড়ে অন্ত্র রক্ত মেদ
দু'হাতে বিষাক্ত পুঁজ কেদাক্ত শবের।
চারদিকে উত্তাপ, বন জ্বলে যায় হঠাৎ অনলে
দুরন্ত অগ্নিতে পুড়ে যায়
নিশ্চিন্ত জীবন,
পলক আশ্রয় খোঁজে প্রাণ,
কোথায় আশ্রয় ?

শিশুর সরল চোখে অসহায় কাতর জিজ্ঞাসা,
মায়ের দু'চোখে রক্ত
রক্তে লেখা জীবনের নির্মম উত্তর॥

---

কর্তৃপক্ষের আবেদন। গোটা পরিকল্পনাকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এর ফলে সরকারের পক্ষে স্বল্পকালীন পরিকল্পনায় গৃহ-সমস্যার মতো এত বড় সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। উপরন্তু নব-পদ্ধতির ফলে প্রত্যেক নাগরিকের সামনেও অনেক সুবিধা দেখা দিয়েছে। যারা আজ কোন ফ্ল্যাটের মালিক নয়, প্রকৃতই গৃহহীন ভাড়াটে, আজ তাদের পক্ষে একটি নিজস্ব বাড়ির মালিক হওয়া কষ্টকর নয়। যে কোন নাগরিকের পক্ষে একখানি নিজস্ব রুচি-অনুযায়ী বাড়ির মালিক হওয়া সম্ভব। এই বাড়ির মালিক হবার সব চাইতে বড় 'কোয়ালি-ফিকেশান' হ'ল তাকে কোন কাজের অংশীদার হতে হবে। একটি 'ভাল বাসার' এই নতুন পরিকল্পনায় যদিও বর্তমান পরিকল্পনার চাইতে অর্থসংগ্রহ করবার দায়িত্ব সরকারের আরও বেশি নিতে হবে।

গোটা দেশের সামগ্রিক সমস্যা হিসাবে যুগোশ্লাভিয়ার নেতৃমণ্ডলী গৃহ-সমস্যাকে গ্রহণ করায় আজ অতি দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের পথে। ভেলেনজি যুগোশ্লাভিয়ার অধুনা গঠিত ছোট্ট শহর। এই শহরটি সমাজতন্ত্রী সরকারের গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

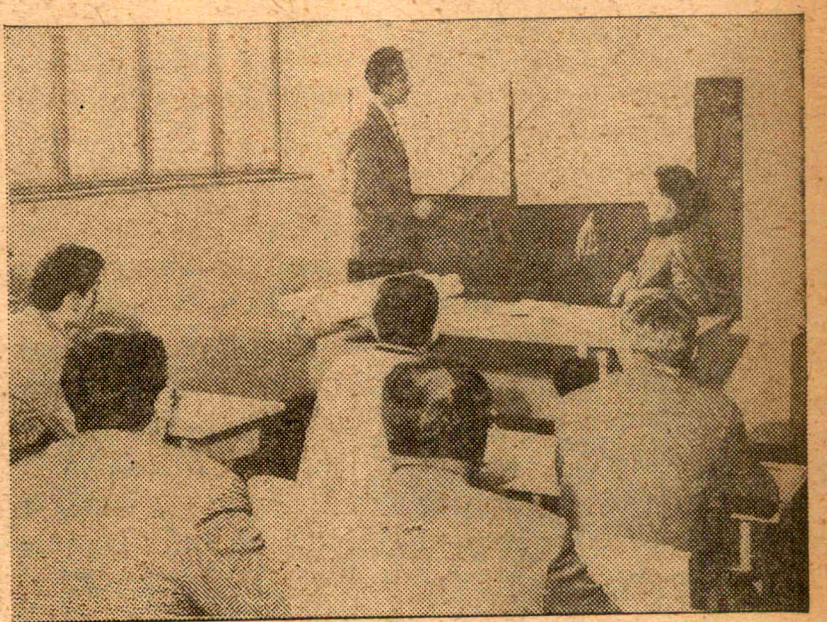

● নতুন পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণের প্রকল্প সেমিনারে তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের দল।

ইউরোপের অন্যতম আধুনিক খনি শহর হিসাবে ভেলেনজির স্থাপত্য-শিল্প নিদর্শন লক্ষণীয়। সোভানদীর বাঁ তীর ঘেঁষে যে নতুন বেলগ্রেড নগর ক্রমোন্নতির পথে, তার অধুনা গঠিত গৃহ যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি অধুনা যুগোশ্লাভিয়ার গৃহ-সমস্যা সমাধানের পরিচয় বহন করছে। ছোট-বড় শহর, নগর, শিল্পাঞ্চলে আজ নতুন ঘর উঠছে। নতুন ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জালিয়ে কল্যাণ কামনা করছে কল্যাণী ঘরণী। গৃহকর্তা দিনান্তে ফিরে আসছে নবনির্মিত গৃহে। বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে। এ সুখের দৃশ্য আজ যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিটি প্রান্তে।

শ্রী সুশীল রায়

# অনলআয়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চাঁপা বুঝতে পারল রাধা তার কথার কি অর্থ করে নিয়েছে, কিন্তু এ অর্থ যে ভুল তা বোঝাবার জন্যে চাঁপা বৌদির পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কি কথার কি মানে করলে গো? এ কি এ-বাড়ির কথা?

—তবে কোথাকার কথা এসব?

—যার মুখের কথা তাকেই জিজ্ঞেস করো। এসব কথা হচ্ছে গো কাঞ্জিলালবাবুর বাড়ি নিয়ে। তাঁর গুণধর পুত্র ভবতোষের কাণ্ড। জিজ্ঞেস করে দেখো কানাগিন্নিকে।

আর শুধাবার ইচ্ছে নেই রাধার কাউকে। সে যেন সব বুঝতে পেরে গিয়েছে পরিষ্কার। স্ত্রী হওয়া ছাড়া আর যাই হোক মেয়েরা, রূপটি কদর তাদের বেড়ে যায় অনেক। এ হওয়াই বুঝি মস্ত বড় ভুল তাহলে? তাহলে, পৃথিবীময় মানুষের এত বিবাহের উৎসব কেন, কেন এত সমারোহ, এত আড়ম্বর, এত অনুষ্ঠান? পৃথিবী ঠিক কত বড় রাধা জানে না, এর যতটুকু অংশের খবর সে পেয়েছে ও পাচ্ছে তার সর্বাংশেই যে এই রকমের রীতিই দেখছে বেশি। কদমমাসির কথা আর একবার মনে হল তার, বড় বোকা মেয়ে কদমমাসি, যা ঘটেছিল তা ঘটেছিলই, নিজেকে শেষ করে না ফেলে, বেঁচে থেকে সকলের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলে তবেই প্রতিহিংসা নেওয়া হত।

কিন্তু সকলের স্ত্রীরই তো এই দশা না। তার মার কথা মনে হল তার, তিনিও তো তার বাবার স্ত্রী, নিরুপমাদি'ও তো আনটুনি সাহেবের স্ত্রী, আর ইরে—তার ঠাকুরমা? বলাগড়ে নাকি আছেন তিনি এবং স্ত্রী হয়েই নাকি আছেন, সুখেই নাকি আছেন?

ঠাকুরমার কথা মনে হওয়ায় বাবার কথা মনে হল তার। বড় দুঃখ হল বাবার জন্যে। অনেক বছর আগের কথা, রাধা তখন এতটুকু একটা মেয়ে, ভীষণ বান এসেছিল সেদিন গঙ্গায়, চানকে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্যে গরিটির ঘাটে গিয়েছিল সে বাবার সঙ্গে। একটা চিতা নিতে গিয়েছিল ঐ বানে, ঐ দৃশ্য দেখে বাবা সেদিন কেমন যেন করছিলেন। অমন কেন করছিলেন, সেদিন বুঝতে পারে নি রাধা। কিন্তু এখন বোঝে।

একটা চালতে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল রাধারা। সেই গাছটা এখনো আছে?

কিন্তু কি আশ্চর্য। কলকাতার শোভাবর্ধন হবে, তার লটারির টাকা পাচ্ছে কে—এই কথা বলতে বলতে কখন গঙ্গা পার হয়ে আমরা ওপারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, বুঝি খেয়ালই হয় নি। যে টাকা পেল তার পিছু ধাওয়া করে আমাদের লাভটা কি। লাভ বিশেষ কিছু হল না বটে, কিন্তু এই সুযোগে তার ঘরসংসারটা একটু দেখে আসা গেল, এতে লোকসানও হয়তো বিশেষ কিছু হল না।

সে চালতে-গাছটা এখনো আছে কি না সে হিসাব করুক চুঁচুড়ায় রায়-পরিবারের গৃহবধূ, আমরা এবার দেখে নিই কলকাতায় এখন কি কি আছে।

আছে অনেক কিছুই। অনেক ইমারত, অনেক পল্লী, অনেক বাবু, অনেক বিবি। অনেক কেচ্ছা, অনেক কেলেঙ্কারি।

কিন্তু এর মধ্যে নতুনত্ব আর আছে কি? কবে কোন্ দেশে এসব ব্যাপার অল্পবিস্তর না-ছিল বা না-থাকবে? শুধু ঐসব জিনিষকে মূলধন করে বাণিজ্য করতে গেলে চাঁদ বেনের মত বণিককেও নিশ্চয় দেউলে হতে হত। তাই সে নিয়েছিল অন্যবিধ পণ্য। চাঁদ বেনের কথা থাক, সে অনেক কাল আগের ঘটনা, ঐ হুগলী জেলার বালি গ্রামের সদাগর গৌরী সেন, সেও কি শুধু পণ্য করেছিল কতকগুলি কেচ্ছা আর ততোধিক কেলেঙ্কারি, তাহলে কি তার নৌকো-বোঝাই রাং একসঙ্গে রূপো

হয়ে যেত? সে তো আর বহুকাল আগের ঘটনা নয়, বড় জোর শ' দুই বছর, বালিতে তার ভিটে এখনো আছে।

থাক। কলকাতার কেচ্ছা-কাহিনীও থাক।

কুমারটুলির বটতলায় ঘন ছায়া পড়েছে, সেই ছায়ার সঙ্গে এসে মিশেছে গোবিন্দ মিস্তিরের নবরত্ন মন্দির-চূড়ার ছায়া। এখানে নিয়মিত জড়ো হয় কবিয়ালেরা। আজো এসেছে তারা। বুড়ো হরু ঠাকুর, তার শিষ্য ভোলানাথ, এবং, নীলু পাটনি, রাম বসু, আন্টুনি ফিরিঙ্গি নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী, সতু রায়, বলা বোষ্টম। তারা কবিয়ালিও করছে, কেচ্ছাও করছে।

তাদের এই হাসিঠাট্টা, মস্করা উপভোগ করার জন্যে কুমারটুলির রসিকেরা এসে থানা দিয়ে বসেছে। কারো হাতে থেলো হুঁকো, কারো সঙ্গে গড়গড়া। হাটখোলার নন্দরাম সেন অনেক কাল আগে একটা ইমারত গেঁথেছিলেন এই বটগাছের লাগোয়া। এখন সেখানে বসবাস কেউ করে না, কিন্তু কবিয়ালের আখড়া যখন বসে ঐ বটতলায় তখন তার উঁচু দাওয়ায় ফরাস বিছিয়ে তৈরি হয় সৌখিন আসর।

সে-আসরও তৈরি হয়েছে আজ।

ছায়ায় বসে কবির দল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে। আজকের এই শখের আসরে কে কে লড়বে, এই বিষয়ে নানা আলোচনা চলছে। যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে আন্টুনির, না রাম বসুর সঙ্গে ভোলা ময়রার, না, নিতাই বৈরাগীর সঙ্গে নীলু পাটনির। কথাই চলেছে, কিন্তু লাব্যস্ত হচ্ছে না কিছু।

বুড়ো হরু ঠাকুর এখন আর লড়াইয়ে নামেন না। এখন তিনি বিচার করেন; লড়াইয়ে কে জিতল কে হারল। ভোলা ময়রার তিনি সাক্ষাৎ গুরু, কিন্তু অন্যান্য কবিয়ালরাও তাঁকে গুরুর সম্মানই দেয়, গুরু বলে মানে।

এইজন্যে সতু রায় বলল, ঠাকুর-মশায়, ওদের ঝগড়া মিটবে না, আপনি বলুন কে কে লড়বে আজ।

সকলে প্রায় সমস্বরেই সায় দিল সতু রায়ের প্রস্তাবে। হরু ঠাকুরও বুঝি সকলের মুখের দিকে চেয়ে ঠিক করতে লাগলেন কাকে কাকে নামাবেন আজ।

একটু তফাতে বসেছিল ঢোল নিয়ে ঢুলির দল। কার ডাক পড়বে কেউ জানে না। ঢুলিরাও তাই সোজা হয়ে বসল।

নন্দরাম সেনের বারান্দার গায়ে এসে নামল ঝালরদার পাল্কী।—কে এল, কে এল?

হাটখোলার তনুবাবু এসে নামলেন। মসৃণ মসলিনের কালো কস্তা-পেড়ে ধুতি পরণে, গায়ে মসলিনের নিমাস্তিন জামা। ধুতির কোঁচার পত্তন চেয়ে দেখার মত। তনুবাবু ফরাসে গিয়ে বসলেন।

কবি-মহলে উৎসাহের ঢেউ দেখা দিল।

এর পর এলেন দুই তরুণ বাবু—সিমুলিয়ার ছাতুবাবু ও লাটুবাবু। তারপর এলেন শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ, হরু ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন।

এঁদের গৃহেই হরু ঠাকুর এখন সভাকবি। কিছুক্ষণ পরেই চেয়ার-পাল্কীতে করে এলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্র।

আসরে বসে সকলে হিসাবপত্র মেলাতে লাগলেন যেন। সবাই এল তো? কই, নীলমণি কই—নীলমণি হালদার? দর্পনারায়ণও নেই যে।

আসর যেন ঠিক জমল না। তবুও এরই মধ্যে যতটা জমে তার জন্যে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে জমাট হয়ে বসতে লাগলেন সকলে।

এসে গেছেন দু'জন—দর্পনারায়ণ ও নীলমণি। রংদার দু'টো পাল্কী প্রায় একই সঙ্গে এসে নামল।

ভিড় জমে গেছে চারধারে। পেয়াদা-বরকন্দাজ চোবদার পাখা-বরদার আর পাল্কী বেহারার ভিড় তো আছেই, তার ওপর হাটখোলা, গরাণ-হাটা, জোড়াসাঁকো থেকেও অনেক লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গায় নেয়ে ফিরছিল যারা, ভিজে কাপড়ে কলসী কাঁখে, তারাও একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ঢুলিরা ঢোলকের গায়ে কাঠি ঠুকছে। হরু ঠাকুর কি বলেন, তার জন্যে কবিরা চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

—ও কে এল? বটতলা থেকে ওরা গলা একটু উঁচু করে তাকাল। আসর থেকেও বাবুরা তাকিয়া থেকে পিঠ আলগা করে নিয়ে তাকালেন।

তনুবাবু বলে উঠলেন, আসুন, নিধুবাবু আসুন।

বৃদ্ধ নিধুবাবু বলিষ্ঠ পদভরে দু'টো সিঁড়ি ভেঙে আসরে এসে দাঁড়ালেন। বটবৃক্ষতল ভালো করে

চেয়ে দেখলেন, মনে মনে বুঝি গণনা করলেন, তার পর আসরের দিকে চেয়ে সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসলেন, বললেন, বেশ। নবজন কবিয়াল এসেছেন, এ যে দেখছি নবরত্ন সভা। কিন্তু আসরের এ দশা কেন? অষ্টবসুর সমাবেশ নেই কেন আজ? রাজা সুখময়কে দেখছি নে কেন?

নীলমণি হালদার বললেন, তিনি অসুস্থ। আমরা পোস্তা হয়ে এলাম, তাঁকে দেখে এলাম। বিশেষ অসুস্থ।

কিন্তু আটবাবু ছাড়া কোনো আসর সচরাচর বসে না এ তল্লাটে, এই জন্যেই নিধুবাবুর চোখে এটা অভাব বলে ঠেকেছে। কিন্তু এই অসুস্থতার সংবাদে সে অভাব বোধটা উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়ে গেল। আসরে গুঞ্জন আরম্ভ হল।

ওদিকে হরু ঠাকুর ঠিক করে ফেলেছেন, কে গাইবে আজ। কার গান দিয়ে আজ এই সমাগত জনতাকে পরিতৃপ্ত করা হবে।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সভার কবি হচ্ছেন হরু ঠাকুর। মহারাজার পুত্র এই আসরে সমাসীন। হরু ঠাকুরের কথার ওজন তাই আজ দ্বিগুণ বেশি।

আসরের সকলেও বটতলার দিকে তাকাল, হরু ঠাকুর কি স্থির করেছেন জানার জন্যেই হয়তো।

উঠে দাঁড়ালেন হরু ঠাকুর, বললেন, আজ আমাদের কবির দলের বাসনা—নিধুবাবু আজ গাইবেন।

প্রস্তাবটি শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বরী খুশি হয়ে উঠল, দু হাতে নিঃশব্দে তালি বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে লাগল—

'অনেক দিনের পরে, সখা,
তোমাকে দেখতে পেলাম চোখেতে।
তাই, বল দেখি তোমার সখার সংবাদ—
ভাল তো আছেন প্রাণেতে?'

প্রস্তুত হয়ে আসেন নি নিধুবাবু, সচকিতে এই প্রস্তাব শুনে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আসরের বাবুরাও সায় দিয়ে উঠলেন হরু ঠাকুরের প্রস্তাবে। নিধুবাবু এখানে বসেই যজ্ঞেশ্বরীর ঠোঁট নাড়া দেখতে পাচ্ছেন, বললেন, ঐ তো গাইছে যজ্ঞেশ্বরী। গলাটা একটু তুলে গাইলেই তো শুনতে পারি আমরা।

গলা তুলে যজ্ঞেশ্বরী বলল, এটা কি গান, বাবু গো? খ্যামটাও যেমন নাচ, আমাদের গানও তেমনি গান। কথা-কাটাকাটি থাকে, মুখে মুখে সাফ সাফ জবাব থাকে, তাই যা কদর দেন-দয়া করে।

যজ্ঞেশ্বরীর কথা শুনে চুপ করে গেল সকলে। নিধুবাবু আর কোনো কথা বললেন না, তাকিয়াটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে তিনি গলা ছাড়লেন—

কে বলে অবলা তোমায়,
মহাবল ধর প্রিয়ে।
ধরাধর ধর হৃদে—
ঢেকেছ বসন দিয়ে।

যজ্ঞেশ্বরী বুঝি একটু লজ্জা পেল, একটু কাত হয়ে বসে রাম বসুর দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হাসল।

নিধুবাবু গাইতে লাগলেন—

স্মরহর শর সম কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নির্গুণ নর বধ নারী হয়ে—

অনেকক্ষণ ধরে চলল গান। সমাগত নরনারী সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছে ঐ গলা। এ-গানের পর আরো গান শোনার কৌতূহলও তাদের আছে। এবং, বলা যায় না, হয়তো তারপর কবির লড়াইও সুরু হবে।

যারা ভিজে কাপড়ে কলসী কাঁখে দাঁড়িয়েছিল, দ্রুতপায়ে বাড়ি গিয়ে তারা কাপড় বদলে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিধুবাবুর গলা বাজছে—

কে বলে অবলা তোমায়,
মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে—
ঢেকেছ বসন দিয়ে।

এমন সময় ঘোড়া দাবড়ে পেয়াদা এসে পৌঁছল পোস্তা থেকে। স্তব্ধ হয়ে গেল নিধুবাবুর গলা।

—কি সংবাদ?

রাজা সুখময় গত হয়েছেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮১১ সাল।

ডাক-চৌকিতে চেপে দ্রুতগতিতে রামমোহন আসছেন তাঁর দেশের বাড়িতে—রাধানগরে।

পা কী বদল করে নিতে হচ্ছে দশ-পনের মাইল অন্তর অন্তর। পা কী বদলের সময় কোনো ঘাঁটিতে তিনি এতটুকু বিশ্রাম বা বিলম্ব করতে রাজি নন। একটা ডাক-চৌকির নির্ধারিত পাল্লা শেষ হওয়া মাত্র তিনি সে-পা কী থেকে নেমে অন্য-টায় উঠেই বেহারাদের বললেন, জোর কদমে নিয়ে চল। সন্ধ্যার আগে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে আত্রাই নদীর ধারে। বকশিস পাবে।

কে এই বিরাট মানুষটি, কিসের জন্যে এঁর এই ব্যস্ততা, তা বেহারারা জানে না, জানতেও চায় না; কেবল এইটুকু জানে যে, তাদের এই সওয়ার সাধারণ মানুষ না—কোম্পানীর একজন বড়দরের চাকর।

তাঁর মনে খুব দুশ্চিন্তা এবং সেইসঙ্গে খুব তাগাদা। যত সত্বর সম্ভব তাঁকে পৌঁছতে হবেই।

আত্রাইয়ে পৌঁছতে দেরি হল না, সন্ধ্যার অনেক আগেই তাঁকে নদীর ধারে নামিয়ে দিল বেহারারা। নৌকো চেপে নদী পার হয়ে তিনি এপারে চলে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে, এখন আর এ-পার থেকে পা কী ছাড়বে না। রাস্তায় ডাকাতের বড় ডর।

সঙ্গের পেয়াদা-বরকন্দাজদেরও ঐ কথা। সংখ্যায় তারা অনেক বটে, কিন্তু ডাকাতদের দল যে এর চেয়েও বড়। চলন বিলের অঞ্চল এটাকে বলা যায়, চলনের ডাকাতদের

চালচলনই আলাদা। তারা বড় কড়া ধাতের মানুষ।

রামমোহনের ইচ্ছে ছিল, আজকের মধ্যে কোনো রকমে নাটোর পৌঁছে যাওয়া; পরদিন ভোরে রওনা হলে হয়তো সন্ধ্যার আগেই পদ্মা অতিক্রম করা যাবে।

কিন্তু বেহারারাও রাজি না, বরকন্দাজদেরও বিশেষ গরজ দেখা গেল না। অতএব ডাক-চৌকির গুমটি-ঘরে তিনি রাত্রিটা অতিবাহিত করার জন্যে মনস্থির করলেন।

কিন্তু মন যেন স্থির হতে চায় না। জরুরি বার্তা পেয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। সংবাদটা শুভ না। বেশি উত্তাপে লোহাও গলে, এই কঠিন মানুষটির মন যখন দ্রব হয়েছে, সংবাদটি তখন অবশ্যই সাধারণ নয়।

পোস্তার রাজা সুখময়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এ-ব্যস্ততা নয়, এ-প্রত্যাবর্তন নয়। রাজা সুখময় গত হয়েছেন, সম্ভবত এ-সংবাদ এখনো তিনি শোনেন নি, শুনলেও উদ্বিগ্ন হতেন কি না বলা যায় না।

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন বাড়াবাড়ি রকমের কাতর—এই জরুরি বার্তা পাওয়া মাত্র তিনি যাত্রা করেছেন। রংপুর থেকে আত্রাই—এই পথটুকু অতিক্রম করতেই চারদিন কেটে গেল। এখনো পথ অনেক বাকি। তাঁর উদ্বেগ এইজন্যে।

অনেক বছর তিনি দেশছাড়া। কাশী থেকে ফিরে এসে পিতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে ছিলেন কিছুদিন। তারপর ডিগবি সাহেবের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে ঢুকে রামগড়, ভাগলপুর ঘুরে রংপুরে এসে স্থায়ী হয়ে বসেছেন। রংপুরেই এর মধ্যে দু'বছর কেটে গেল। এই চাকুরি বুঝি আর ভালো লাগছে না রামমোহনের, মাঝে-মাঝেই মনে হয়—জীবনটা এইভাবে কাটিয়ে দিলে চলবে কিনা। বয়স তো চল্লিশ হতে চলল। এইবার এ-সব কাজ ত্যাগ করে নিজের মনের মত কাজ করার জন্যে তাঁর মন বুঝি ব্যাকুলই হয়েছে একটু।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। তাঁর মনের অশান্তি আর উদ্বেগও গভীর হয়ে উঠছে সেইসঙ্গে। আত্রাই নদীর তীরে খড়ে-ছাওয়া ছাউনির ভিতরে বসে তিনি ভাবছেন নানা কথা। তাঁর ভ্রাতাকে গিয়ে তিনি যেন দেখতে পান—এইটেই এখন তাঁর কাছে প্রধান ভাবনা হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তাও এসে যাচ্ছে তাঁর মনে।

বাইরে বসে পেয়াদা-বরকন্দাজেরা আলাপ করছে বেহারাদের সঙ্গে। তাদের গলার স্বরের সঙ্গে নদীর অস্ফুট কুলুকুলু ধ্বনিও ভেসে আসছে কানে। এই লম্বা রাতটা এখানে তাঁকে কাটাতে হবে।

মাথার পাগড়ি খুলে পাশে রেখে তিনি একটু আরাম করে বসলেন। বাড়িতে চলেছেন বটে তিনি, কিন্তু বাড়ি তাঁকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, এ-শঙ্কা আছে তাঁর মনে। নিজের অভিমত প্রকাশ করে তিনি দেশের অনেক মানুষের সঙ্গে বাড়ির মানুষদেরও ক্ষিপ্ত করে রেখেছেন। পিতার সঙ্গে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, পিতার সঙ্গে মনকষাকষি করে তিনি চলে যান কাশী। পিতার জীবিতাবস্থায় আর নিজের মনের ও মতের কথা প্রচার করে বৃদ্ধ মানুষটির মনে আর ঘা দেন নি তিনি; ঘা দেন নি বটে, কিন্তু কেন যে তাঁর পিতা সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত শুনে অতটা বিচলিত হয়ে উঠতেন কে বলবে। পিতাই হোন, বা যে-ই হোন, কারো ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করার অভিপ্রায় তো তাঁর নয়।

যাই হোক, যতদিন রামকান্ত জীবিত ছিলেন, রামমোহন তাঁর সংস্পর্শে আর আসেন নি। এসে লাভ কি, সংস্পর্শে এলেই যদি সংঘর্ষ বাধে, তা'লে তফাতে থাকাই ভালো। তফাতেই ছিলেন রামমোহন। তফাতে ছিলেন বটে, কিন্তু মনের কথাগুলো মন থেকে তফাত করে দিতে পারেন নি। এইজন্যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর অভিমত ভালো করে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন রামমোহন। পুতুল-পূজা সম্বন্ধে তিনি পার্সী ভাষায় লিখলেন এক কেতাব, তার নাম দিলেন তহ্‌ফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জানালেন তাঁর কঠোর অভিমত। লিখলেন—ব্রাহ্মণেরা এই রকম একটি চলতি রীতি প্রস্তুত করে ফেলেছেন যে, ঈশ্বরের যাবতীয় উপাসনা-উৎসব পরিচালনা করার কড়া আদেশ স্বয়ং ঈশ্বরই তাদের দিয়েছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা-অর্চনার যাবতীয় ভার তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় এ-নির্দেশ লিখিত আছে। অন্যদিকে কোরাণে উল্লিখিত আছে যে, যারা পুতুল-পূজা করে তাদের হত্যা কর। একই ঈশ্বর দুই কেতাবে দু'টি বিভিন্ন মত কি ভাবে প্রকাশ করতে পারেন, এ কথা বুদ্ধিমান লোকেরই বিবেচ্য। এ কি ঈশ্বরের নির্দেশ, না, বিভিন্ন ধর্মের যারা যারক তাদেরই নিজেদের অভিমত। একদিকে ঈশ্বর নিজের পূজার নির্দেশ দিচ্ছেন, অন্যদিকে তিনিই পূজারীকে হত্যা করতে বলছেন? এ কর্ম ঈশ্বরের দ্বারা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে যারা বাণিজ্য করে এ কাজ তাদেরই।

(ক্রমশ।

ধবল, একজিমা, বাতরক্ত, ছুলি মেচেতা, ব্রণাদির দাগ ও বিবিধ চর্মরোগ মুক্তির বিশ্বস্ত চিকিৎসা-কেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। (সময় ৪—৮), ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক এস, শর্মা, ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

॥ তিন ॥

কোম্পানী অফিসে চাকরী।

নৃপেন বলল, 'দেখ্ সমর, এ সব ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীতে কোনো কাজ হয় না। বরং সেটা বহুবার বাগড়া দেয়। অফিসের বড় সাহেব ম্যাট্রিক পাশ। সে চট করে একটা এম-এ পাশকে তার নীচে চাকরি দিতে ইতস্তত করবে। তাহলে যে তার বুদ্ধির জাহাজ ফাঁক হয়ে যাবে। তুই এক কাজ কর, আমাদের বটকেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা কর।'

সমর জিজ্ঞাসা করল, 'বটকেষ্ট কে?'

—'বটকেষ্টকে চিনিস না? চোখে পুরু লেন্সের চশমা, পায়ে মোজা, বুট, ধুতির নীচে শার্ট পরা বুড়ো ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এই মেসে আড্ডা মারতে আসেন। দেখিস নি তাকে? নিজেই রোজ গর্ব করে বলেন, তিরিশ তিরিশটি বছর কোম্পানীর দপ্তরে চাকরি করেছি বাবা, কলমটি কোনদিন টাচ্ করি নি।'

সমর বলল, 'তার চাকরিটা রইল এ্যাদ্দিন?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটাই তো ওর রেকর্ড। কোয়ালিফিকেশন ধুয়ে সবাই জল খাবে? তিরিশটি বছর চাকরি করেছি বাবা। কলমটি কোনদিন টাচ করি নি। চাকরি করার ফন্দি-ফিকির জানা চাই তো?'

নৃপেন বলল, 'শুনবে বটকেষ্টর কাহিনী? কোম্পানীর বড় সাহেব একবার খুব অসুস্থ হন। ওষুধ-পত্তর তখন লড়াই-এর জন্য ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছিল না। বটকেষ্ট তখন তিন-তিনটি বছর ধরে ছাটাই ক করে ক্লাস নাইনের ছাত্র। খবরটা তার কানে গেল। এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে তো ওষুধ জোগাড় করে আনল।

সাহেব বেঁচে উঠল।

একই ক্লাসে এতদিন থেকে বটকেষ্টরও আর স্কুল ভাল লাগছিল না। দুর্গাগার নাম নিয়ে সে সাহেবের কাঁধে ঝুলে পড়ল। কোম্পানীর দপ্তরে তার চাকরি জুটে গেল।

কোম্পানীর দপ্তর। গৌরী সেনের টাকা। কার কি যায় আসে? সাহেব বটকেষ্টকে ঢুকিয়ে দিলেন। বটকেষ্ট অফিসে ঢুকেই একটি সঙ্ঘ খুলল। বাবার সাহেব তাঁর 'দৃষ্টিপাতে' তার খানিকটা রিপোর্ট দিয়েছেন। বটকেষ্ট হ'ল সেই 'হেঁ হেঁ' সঙ্ঘের ফাউণ্ডার। আজও সে সেই সমিতির পার্মানেন্ট সভাপতি।

জিজ্ঞেস করছো কি করে বটকেষ্ট কোম্পানীর দপ্তরে সময় কাটায়? জবাব অতি সহজ। সকাল বেলা গোটা এগারোটা নাগাদ ব্যস্তবাগিশের মতন অফিসের গেট দিয়ে ঢুকেই বটকেষ্ট ছুটে যায় ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে।

—আজ্ঞে হেঁ হেঁ নমস্কার। হুজুরের শরীরটা কাল সন্ধ্যায় একটু ম্যাজ-ম্যাজ্ করছিল। এখন কেমন লাগছে? টুকটুক স্কুলে পৌঁছে টেলিফোন করেছে? মেম-সাহেব বলছিলেন তিন টিন জেলি পাঠাতে। অর্ডারটা দিয়ে এসেছি। আজই বিকেলের ভিতর পৌঁছে দেবে বলেছে। ভিকির জন্য একটা নতুন 'চেন' কেনবার কথা বলছিল খোকন। একটা সুন্দর 'চেন' দেখে এসেছি সদরে। সন্ধ্যার পর সব নিয়ে আসব'খন। আচ্ছা স্যার, নমস্কার। হেঁ হেঁ হেঁ।

ডিরেক্টর হাঁক দিলেন, বটকেষ্ট।

—ইয়েস্ স্যার।

—সন্ধ্যের সময়ে আজকে এসো না। বাইরে যাচ্ছি সকলে।

—আচ্ছা স্যার। আচ্ছা স্যার। কাল সকালে আসব স্যার। একেবারে সকালেই হাজির হব। হেঁ হেঁ হেঁ

—না না সকালে এসো না। বড় শীত। তা ছাড়া কোনো দরকার নেই। কেন মিছি মিছি কষ্ট করবে?

—হেঁ হেঁ হেঁ কষ্ট আর কি স্যার, এ তো পরম সৌভাগ্য।

ডিরেক্টর প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, না কাল সকালে তুমি আসবে না।

—হেঁ হেঁ হেঁ স্যার। সকালে তাহলে আসব না স্যার। হেঁ হেঁ হেঁ বিকেলেই আসব। নমস্কার স্যার। হেঁ হেঁ হেঁ।

ডিরেক্টর সাহেবের ঘর থেকে বটকেষ্ট যখন নিষ্ক্রান্ত হ'ল তখন ঠিক বারোটা। তারপর তার টার্গেট হল ডেপুটি ডিরেক্টর।

—হেঁ হেঁ হেঁ। নমস্কার স্যার। কাল যে পটল এনে দিয়েছিলাম, সেটা কেমন খেলেন স্যার? এতবড় পটল গত দশ বছরে বাজারে ওঠে নি পাহাড়গঞ্জের বাজারে এই পটল দেখেই আপনার কথা মনে পড়ল।

ডেপুটি ডিরেক্টর বললেন, সত্যিই বটকেষ্ট, এত বড় পটল দিল্লীতে এসে কখনও খাই নি। তা দামটা নিয়ে এসেছো তো তোমার বৌদির কাছ থেকে?

—আজ্ঞে কি যে বলেন? ওর দাম না দিয়ে কি কখনও বৌদি ছাড়েন। তার ওপর কাউ—কেক, স্যান্ডউইচ্ চা। আজ বিকেলে ক্রী আছি। দেখি কিছু সংগ্রহ করা যায় কি না।

—বল কি হে? আজ ক্রী কি করে? কাল বললে আজ বড় সাহেবের বাড়ি তোমার নেমন্তন্ন।

—হেঁ হেঁ হেঁ। সেটা তো ঘাঁতরে।

তা যাই বলুন স্যার। বড় সাহেব কিন্তু আপনার কথায় পঞ্চমুখ। বলেন, এমন ডেপুটি পাওয়া ভাগ্যের কথা হে বটকেষ্ট। সিদ্ধেশ্বর ডেপুটি বলেই তো নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে কাজ চালাতে পারি। আমি তখন বললাম, আজ্ঞে যা বলেছেন স্যার। গত পঁচিশ বছরে অমন ডেপুটির আণ্ডারে কাজ করি নি।

—তাই নাকি বটকেষ্ট। বড় সাহেব আর কি বলেন? এই সদানন্দ, এক ট্রে চা নিয়ে আয়।

—আবার চা কেন?

—হোক না। হ্যাঁ যা বলছিলে, আমার সম্বন্ধে বড় সাহেব কি বলছিলেন তোমাকে?

—আজ্ঞে কি আর বলি? সামনে বললে খোসামুদি শোনাবে। এ শর্মা খোসামোদ কি জিনিষ তা জানে না। হেঁ হেঁ হেঁ। আজ সারাটা সকাল আমার সাথে উনি শুধু আপনার কথাই বলছিলেন। বলছিলেন—এত এফিশিয়েন্ট ডেপুটি এ অফিসে কখনও আসে নি। আমি বললাম, আপনি তো স্যার এর চেয়েও বেশি এফিশিয়েন্ট ডেপুটি ছিলেন, হেঁ হেঁ হেঁ তাই তো, আজ এই গদিতে বসেছেন। হেঁ হেঁ হেঁ। কি বলব স্যার তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। আমায় বললেন, কি বলছো বটকেষ্ট। কার সাথে কার তুলনা করছো? ওর বয়সটা একবার দেখেছো? কত কাঁচা।

সদানন্দ চা দিয়ে গেল। বটকেষ্টই সেটা তৈরি করল। চা বটকেষ্টর হাতেই নাকি ভালো হয়। একথা ডেপুটি বহুবার বলেছেন।

—তা বটকেষ্ট, আজ সন্ধ্যায় তোমার নেমন্তন্নটা কি উপলক্ষে—

—আজ্ঞে আজ খোকনের এ্যালসেশিয়ন কুকুর ভিকির জন্মদিন পালন করবে কিনা। তাই শুধু আমারই নেমন্তন্ন। কিছু বলতে হবে বড় সাহেবকে? বলুন তো আজই সব বলে দি। আর কেউ থাকবে না সেখানে। বলব কিছু? একেবারে নিরিবিলি। হেঁ হেঁ হেঁ।

অফিসে ডেপুটি ডিরেক্টর দু'জন। সিদ্ধেশ্বর আর নকুলেশ্বর। দু'জনে ভারী প্রেম? যেন সাপ আর নেউল। সিদ্ধেশ্বর ও নকুলেশ্বর দু'জনেই জানে, তাদের দু'জনের এক অফিসে বেশীদিন চলবে না। সিদ্ধেশ্বর জানে এ ব্যাপারে বটকেষ্ট তার সবচেয়ে বড় সহায়। নকুলেশ্বর জানে এ ব্যাপারে বটকেষ্ট তার সব চেয়ে বড় অস্ত্র।

সিদ্ধেশ্বর কিছুক্ষণ মাথা চুলকে কি ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, থাক গিয়ে।

বটকেষ্ট বলল, আজ্ঞে বলুন না। একা একা থাকবেন বড় সাহেব। আমি অবশ্য জানি সব। অফিসটাকে এই নকুলবাবু একেবারে ডকে তুলতে বসেছে। যা কিছু সামান্য ডিসিপ্লিন আছে সে তো আপনারই জন্য রয়েছে।

—ভাটস্ ইট। পারবে বলতে বটকেষ্ট? আজ সন্ধ্যায়? ঠিক আছে, কাল সকালেই আমাকে জানিও কি হ'ল এ ব্যাপারে। নাও নাও, আরে লজ্জার কি আছে? একটা সিগারেটই তো। তবে জানাতে ভুলো না।

নমস্কার জানিয়ে বটকেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এবার তাকে যেতে হয় নকুলেশ্বরের কামরায়।

নকুলেশ্বর রাশভারি গম্ভীর লোক। কিন্তু কোথায় গাম্ভীর্য, কোথায় রাশভারি ভাব। চাটুবাক্যের চাতুরীতে সব ভেসে যায়।

—এই যে এসো এসো বটকেষ্ট। তোমাকে ডেকে পাঠাবো ভাবছিলুম। তা

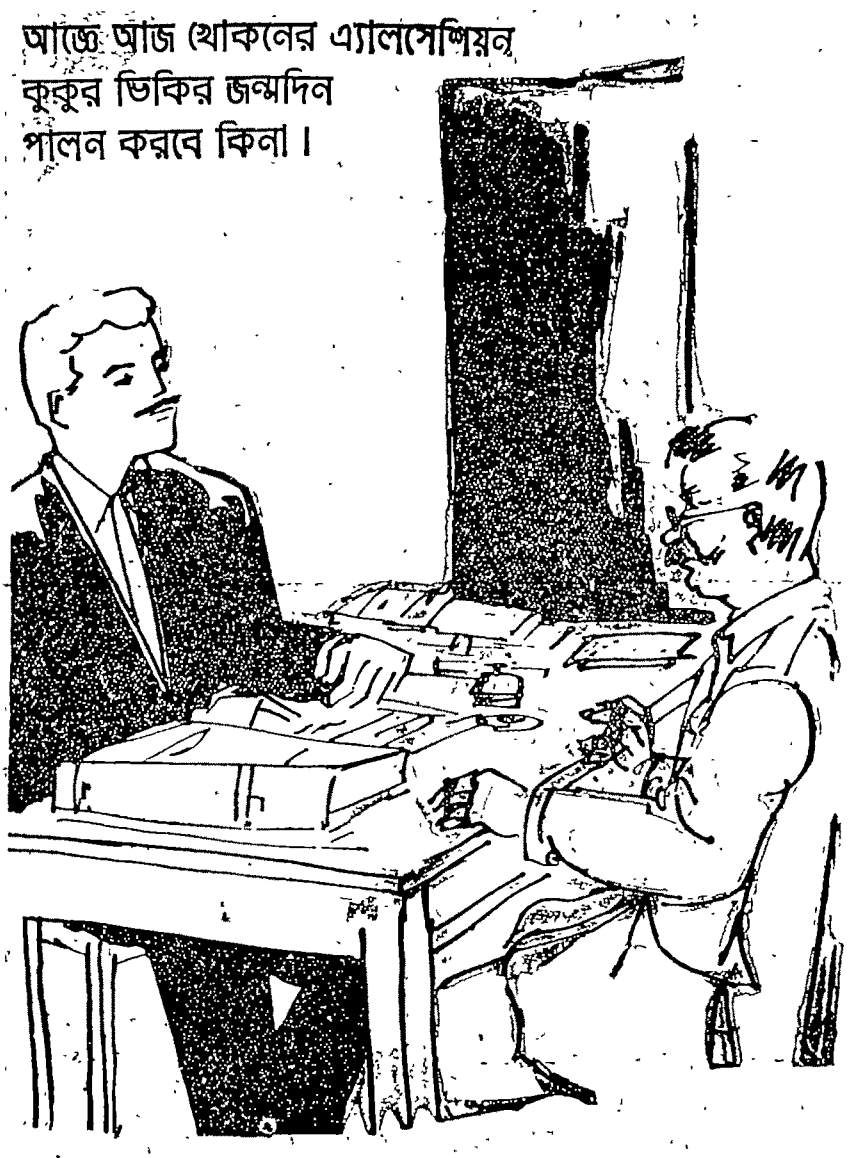

এতক্ষণ বড় সাহেবের কাছেই ছিলে বুঝি! কি রকম মেজাজ বুঝলে?

—কি আর বলব স্যার! বড় সাহেব বলছিলেন ওহে বট, নকুলেশ্বর যে ট্রান্সফার চাইছে। ও গেলে এই এত বড় অফিসটা কি করে চলবে বলতো। আমি বললাম, আজ্ঞে কিছুতেই সেটা হতে দেবেন না। নকুলবাবু গেলে অফিসের রইলোটা কি? কোম্পানীর এ দপ্তরের ডিসিপ্লিন মানেই নকুলবাবু।

—কি খাবে বটকেষ্ট? এখন তো লাঞ্চ টাইম্। খাও না একটু—

হেঁ হেঁ হেঁ করতে করতে বটকেষ্ট ডিমের মামলেট আর টোষ্টের প্লেট টেনে নেয়।

—আমার মাথার তেলটা আবার ফুরিয়ে গেছে। ওটা কোন্ দোকানে পাওয়া যায়, তুমি বললে—কোয়ারায়। তা এই রাখো টাকা কটা। অবসর মতন তিন বোতল তেল পাঠিয়ে দিও। সময় হবে তো?

—হেঁ হেঁ হেঁ, কি যে বলেন স্যার। আপনার জন্য মাথার কেন, পায়ের তেলও জোগাড় করতে পারি।

—হ্যাঁ ঠিক কথা, তুমি সাহেবের বাড়ি যাচ্ছ কখন বললে? আমায় সেই কথাটা তুলে দেখো তো—কি রকম মেজাজটা হয়। তারপর আমি নিজেই যাব। মনে থাকবে?

নকুলেশ্বরের কামরা থেকে যখন বটকেষ্ট নিষ্ক্রান্ত হ'ল তখন লাঞ্চ টাইম্ শেষ হয়ে গেছে। নিজের কামরার দিকেই যাচ্ছিল। এ্যাসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর তাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন, কি হে বটকেষ্টবাবু! চুনো-পুঁটিদের দিকে নজর পড়ে না। বলি, হন্তদন্ত হয়ে কোথায় ছুটছো? বড় সাহেবের বাড়ির সব ভালো তো? আরে বসো না পাঁচ মিনিট। ডেপুটিদের জ্বালায় তো আর পারছি না। একটা কিছু হদিস করাও। ভাবছিলাম অফিসের পর তোমার বাড়িতেই যাব। এসে পড়েছো, বেশ হয়েছে। এই দু'জনের অত্যাচার যে দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু হিল্লে কর। না হলে যে আর বাঁচি না।

—হেঁ হেঁ হেঁ। চট্টরাজ সাহেব কি যে বলেন? আমি কি কিছু করতে পারি? তবে হ্যাঁ বলেন তো বড় সাহেবের কানে তুলে দিতে পারি। একজন চলে গেলেই তো আপনার চান্স! দেখা যাক কি হয়। আজ রাত্তিরেই কথাটা পাড়বো। আচ্ছা উঠি। ভয়ানক কাজ। আবার দেরী করার উপায় নেই। বুঝলেন না সব দরকারী কাজ। বড় সাহেবের কড়া হুকুম। ও কাজগুলো আমাকেই করতে হবে। খেটে খেটে প্রাণটা যে গেলো, সেটা কেউ দেখলো না স্যার, এইটুকুই দুঃখ।

চট্টরাজ বলেন, যা বলেছো বট। তবে তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে?

বটকেষ্ট নিজের কামরার দিকে যাত্রা করে। করিডরে শরৎ সাণ্ডিল্যের সঙ্গে দেখা। শরৎ দীর্ঘ তিরিশ বছর কোম্পানীর চাকরি করেছে। কাজ করতে করতে কুঁজো হয়ে গেছে। তাকে ছাড়া ঐ বাজেট ডিপার্টমেণ্টের কাজই চলে না। কিন্তু বেচারার রিপোর্ট খারাপ। এক্সটেনশনের আশা নেই। রিটায়ার করবে আগামী মাসে। বটকেষ্টর হাত-দু'খানা ধরে মিনতির সুরে বলে—না ভাই, তা হবে না। এতদিনের বন্ধুত্ব। এই অনুরোধটুকু তোমাকে রাখতেই হবে। একটা বছর এক্সটেনশন পেলেই আমি খুশি। যেন নিশ্চয়ই হয়ে যায়। মেয়েগুলোর বিয়ে দিতে হবে। কেষ্টটারও একটা চাকরি জুটলো না। দেখো ভাই, একটু বলে দেখো। তোমার কথাটা বড় সাহেব কখনও ফেলতে পারবে না। তুমি হলে গিয়ে কোম্পানীর বরপুত্র।

কামরার কাছে পৌঁছবার সাথে সাথে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডেপুটি ডিরেক্টর বটব্যাল এসে করমর্দন করেন। গত সন্ধ্যায় তাঁর একটি পুত্র হয়েছে। ঠিক ৭টা ৫৮ মিনিটে। সকাল থেকে তিনি বটকেষ্টর অপেক্ষা করছেন।

হিসাব-নিকাশ করে বটকেষ্ট বললেন, 'মীনরাশি, বিপ্রবর্ণ, দেবগণ। ব্যস্ কোনো চিন্তা নেই। এই সপ্তাহেই একটা ঠিকুজী বানিয়ে দেব। আজ রাতে মাদুলিটা তৈরি করে রাখব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। চলি, বড় কাজের চাপ। জীবনটা গেল স্যার। খেটে খেটে শরীরের আর কিছুই রইলো না।

বটকেষ্ট যখন তার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঘড়িতে তখন পৌনে পাঁচটা। পিওনটা টুলের ওপর ঢুলছিল। তাকে বললেন, বন্ধ করে দে দোকান-পাট। পাঁচটা বাজতে চলল।

দিনের ভেতর মুহূর্তটুকুও তিনি বসতে পারেন না। তিনি সত্যিই বড় ব্যস্ত।

একদিন দু'দিন নয়। তিরিশটি বছর কর্মবীর বটকেষ্ট কোম্পানীর চাকরি করেছে। জীবনে সে কলম স্পর্শ করে নি। বিশ্বাস না করিস সময়, তো আজ বিকেলে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করিস। গর্বের সঙ্গে তোকে সে চাকরি করার ফন্দি-ফিকিরের ওপর লেকচার দিয়ে দেবে। কোম্পানীর চাকরিতে ডিগ্রীর দরকার নেই। ছাড়পত্রের দরকার নেই। দরকার যেটা সেটা সম্বন্ধে বটকেষ্টর থেকে উপদেশ নিয়ে নে। দেখ্ তোর একটা হিল্লে হয়ে যায় কিনা। এ মক্কেল এ বিষয়ে ললিতের ওপর টেক্কা দেয়।

সময় অধীর আগ্রহে বটকেষ্টর জন্য বসে থাকে। লোকটা যে এত বড় ওস্তাদ সে কখনও কল্পনাও করতে পারে নি।

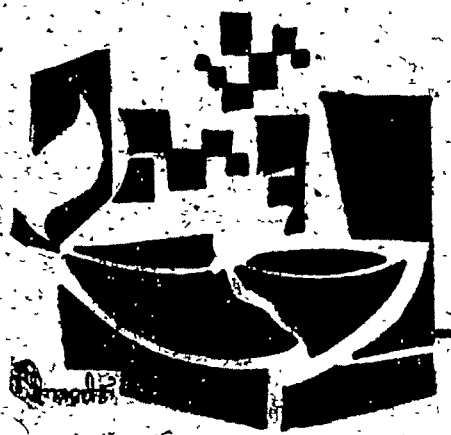

ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'ভঙ্গুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

### ছত্রিশ

—সমাজের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের জীবনে একঘেয়েমি সুরু হয় জীবনের স্রোত থিতিয়ে যাবার পর থেকে। সেই জন্যেই বোধ হয় পুরাকালে বানপ্রস্থে যাবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চল্লিশ বছর বয়স হবার পর নতুন কিছু বড় একটা আশা করতে পারে না সমাজের মানুষ। শৈশব আর কৈশোরে জানবার আগ্রহ থাকে প্রচুর। যৌবনে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ আসে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে সবই স্তিমিত হয়ে যায়। আর নতুনের আগ্রহ থাকে না। যারা বিশ্বাস করে এ সংসার মায়া, তারা চেষ্টা করে মায়া কাটাবার, তার জন্যে আজকের মানুষ বানপ্রস্থে যেতে না পারলেও মনে মনে সংসার থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে। যারা পারে না, যারা মায়াবদ্ধ জীব, তারা ঘোরে রাজনীতির চক্করে, দেশ সেবার অছিলায়, মনের মধ্যে অহমকে পোষণ করে।

রাঙাদা'র মত লোক জীবনকে যথেষ্ট দেখেছে। কর্তাদের নীচে থেকে সংসারের সব দায়িত্বই পালন করেছে। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। ইনাকে সে প্রায়ই বলে, ছেলেমেয়েরা তো বড়ই হয়ে গেছে, চল, আমরা কলকাতার পাট তুলে দিয়ে কোথাও নির্জন বাস করি।

ইনা হেসে প্রশ্ন করে, মুখে তো বলছ, সত্যি গেলে থাকতে পারবে। ছোট খোকার জন্যে মন কেমন করবে না? খুকু শ্বশুরবাড়িতে কেমন আছে তা জানবার জন্যে ছট ফট করবে না?

—না।

—আমি তোমায় বেশ জানি, দশ দিনও স্থির হয়ে তুমি থাকতে পারবে না কোথাও। তোমার মন যে সংসারের মধ্যে বাঁধা। রাঙাদা' উদাস গলায় বলে, বেঁধে রেখেছিলাম সত্যিই, কিন্তু এবার মুক্ত হতে চাই। যখন যুবক ছিলাম, রক্তের জোর ছিল, কর্তাদের সঙ্গে কত সময় তর্ক করেছি, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছি। এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয়। তখন নিজে বোঝবার চেষ্টাও করতাম না, কেন কর্তারা অন্য কথা বলছেন। আজ বয়স হবার পর এটুকু তো বুঝতে পেরেছি ইনা, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। কিছুই আমরা বলতে পারি না। সেই জন্যেই অভিজ্ঞ লোকেরা তর্ক করেন না, চুপ করে থাকেন আর অন্যদের বোকামি দেখে হাসেন।

—আজকাল তোমার কি হয়েছে বলতো। ছোট খোকা বলছিল ও সায়েন্স নেবে না আর্টস নেবে, তাও তুমি বলে দাও নি।

রাঙাদা' হাসল, তাই তো বলছি ইনা। কোনটা ওর পক্ষে ভাল হবে ইনা, আমি কি করে বলব। দু'বিষয়েরই ভাল-মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছি, এখন ওর যা মন চায়।

ইনা বিরক্ত হয়ে বলে, ওইটুকু ছেলে, সে ভাল-মন্দ কি বুঝবে শুনি?

—ও তবু একটা যুক্তি দেবে, আমার যে এখন যুক্তি খুঁজতেও ইচ্ছে করে না। সংসার বড় বিচিত্র জায়গা, কোন হিসেবটাই এখানে মেলে না ইনা। যাদের মনে করতাম আদর্শ পুরুষ, এখন বুঝতে পারছি তাদের বেশির ভাগেরই মুখে ছিল মুখোস। যে সব ছেলেমেয়েকে দেখে আশা করতাম জীবনে বড় হবে, হাউই-এর মত জ্বলে কোথায় তারা ভস্ করে মিলিয়ে গেল। যাদের নাম খরচার খাতায় লিখে রেখেছিলাম, তাদের মধ্যে দেখছি জনকয়েক তবু জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। তুমিই বল, কি হিসেবে এখন কাজ করব, উপদেশ দেব।

ইনার কাজ ছিল, তাই কথা থামিয়ে দেবার জন্যে বলল, আমি জানি, হঠাৎ তুমি এসব বলছ কেন।

রাঙাদা' চোখ তুলে তাকায়, কেন বলতো?

—ছোট খোকার পৈতেটা আর তুমি বড় করে করবে না, এই তো?

রাঙাদা' হেসে ফেলে, তা তো বলি নি, তোমার যখন সাধ, যা করবার করবে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।

ইনা খুশি হল, বলল, বাবা বাবা, এখন আবার গীতা আওড়াতে সুরু করলে। যাই অনেক কাজ আছে। আমি কিন্তু বড় খোকাকে চিঠি ছাপতে বলছি, বাইরের লোক না বল, অন্তত আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ডাকব, অনেকদিন বাড়িতে কোন কাজ-কর্ম হয় নি। তোমাকে ভাবতে হবে না, ছেলেরাই কাজ তুলে দেবে।

রাঙাদা' হেসে বলল, তথাস্তু।

সমাজের বাইরে যারা, তাদের জীবনেও একটা বয়সের পর ঐ একই ধরণের একঘেয়েমি দেখা দেয়। এ একঘেয়েমি আরও ক্লান্তিকর, কারণ নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা, আরও বেশি করে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিজয়ের জীবনেও তাই ঘটেছে। প্রথম সমাদ্দারের আড্ডাও আর তার ভাল লাগে না। পয়সা যোগাড় করে

যেনো মদের বোতল সে বাড়িতেই নিয়ে আসে। এখন তার বয়স হয়েছে। লজ্জা করার কোন কারণ নেই, সকলেই জানে বিজয় মদো-মাতাল, অতএব তাদের সামনে দিয়ে হাতে বোতল নিয়ে সে বাড়িতে ঢোকে। কেউ কেউ হাসে, কেউ বা জোরে টিট্‌কিরি দেয়, বিজয় তা গ্রাহ্য করে না।

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ সে বসে থাকে, কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বোতল শেষ হয়ে গেলে, ইচ্ছে করলে টিফিনক্যারী খুলে বৌদির পাঠান খাবার খায়, আর নয়ত কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। দাড়ি কামাবার পাট বিজয় বাড়িতে আর রাখে নি, মাস খানেক অন্তর হাতে পয়সা পেলে একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সেলুনে ঢোকে, তারাই পরিষ্কার করে দেয়। কাপড়-জামা ময়লা, ছেঁড়া।

বিশ্বনাথ কতদিন বকে, সেদিন যে তোকে জামা কিনে দিলাম, কি করলি?

বিজয় সত্যি কথা বলে, বিক্রি করে দিয়েছি।

—এরকম ছেঁড়া-ময়লা জামা পরে বেড়াতে তোর লজ্জা করে না।

বিজয় উত্তর দেয়, কে আর দেখছে।

বিশ্বনাথ রেগে বলে, সবাই তো আমায় দোষ দেবে, বলবে দাদা ভাইকে দেখে না, এই তো।

বিজয় ফিক ফিক করে হাসে, ভাইটিতো আর কচি খোকা নয়। তুমি আর কত দেখবে। আমার জন্যে ভেবো না, আমি দিব্যি আছি।

—দিব্যি থাকলে তো আর বলতাম না। শরীরটা কি হয়েছে, আয়নায় দেখেছিস?

বিজয় ভেবে জিজ্ঞেস করল, খুব খারাপ হয়ে গেছে, না?

—একেবারে আধখানা হয়ে গেছিস। মা বলছিলেন ডাক্তার দেখাতে।

বিজয় বাধা দিয়ে বলে, না, না, ডাক্তার নয়।

—কেন?

—ওরা এলে বড্ড কড়াকড়ি করবে, কষ্ট দেবে, আমি পারব না। দোহাই তোমার, ডাক্তার ফাক্তার ডেকো না।

—তারপর শরীর আরও খারাপ হলে?

বিজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভালই হবে। আর বেঁচে থেকে কি লাভ।

বিজয়ের মুখে এ সম্পূর্ণ নতুন কথা। বিশ্বনাথ প্রথমটা আশ্চর্য হল, পরে বলল, তুই বরং কিছুদিন আমার বাড়িতে চল, মায়ের কাছে থাকলে মনটা ভাল হবে।

—না থাক।

—কেন?

—বুড়ো বয়সে মাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। অনেক জ্বালিয়েছি, আর নয়।

বিজয়ের এই ধরণের কথা শুনে, বিশ্বনাথের মন আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিই বা তার করার আছে? সত্যিই তো, বিজয় তার বাড়িতে গেলেও নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারবে না, পালিয়ে আসার জন্য ছট্‌ফট্ করবে।

তবু বাড়িতে কাজকর্ম হলে বিজয়ের কিছুটা ভাল লাগে, আপনমনে ঘুরে বেড়ায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। কেউ তাকে কাজ করবার জন্যে ডাকে না, কথাও বলে না অন্যদের সঙ্গে। কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে ফিক্ করে হাসে। এ বাড়ির নতুন ছেলেমেয়েরা বিজয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিজয় তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের খেলা দেখে, কিছুক্ষণ বকে বসে। আবার বাড়ির মধ্যে চক্কর লাগায়।

পুরোণ লোকেরা দেখতে পেলে ডেকে কথা বলে, কি রে বিজয়, তোকে আজকাল দেখি না কেন?

বিজয় উত্তর দেয়, বাড়িতেই তো থাকি।

—কিছু করছিস?

—নাঃ।

—এত রোগা দেখাচ্ছে কেন?

—শরীর ভাল নেই।

এর পর আর কথা চলে না, বিজয়কে এড়িয়ে প্রশ্নকর্তা অন্যদিকে চলে যায়।

বিজয় সেলুন থেকে দাড়ি কামিয়ে ফিরছিল, মনে হল বাড়িতে বেশ ব্যস্ততা, নিশ্চয় কোন কাজকর্ম আছে, কেউ না বললেও কানে শুনেছিল, রাঙাদা'র ছেলের পৈতে হবার কথা। হয়ত তাই হবে, বিজয় সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা রাঙাদা'র ঘরে গিয়ে উঠল।

ঘর ফাঁকা, কেউ ছিল না। একটা বাচ্চা মাটিতে বসে খেলা করছে। বিজয়কে ঢুকতে দেখে, বার দুই মুখ তুলে তাকাল। বিজয় কি করবে ভাবছে।

বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

—রাঙাদা' আছে?

ছেলেটি কি ভেবে উত্তর দিল, নেই।

—ইনা বৌদি।

বাচ্চা ভেতরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও ঘরে। মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে একটা মোটর গাড়ি নিয়ে সে খেলা করছিল, হামাগুড়ি দিয়ে বিজয়ের কাছে এগিয়ে এসে বলল, সরে যাও, তুমি চাপা পড়ে যাবে।

বিজয় সরে দাঁড়াল।

বাচ্চা এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, এটা কি গাড়ি বলতো?

বিজয় গাড়িটার দিকে তাকিয়েও কিছু বুঝতে পারল না।

—বল না কি গাড়ি?

বিজয় স্বীকার করল, জানি না।

বাচ্চা বিজ্ঞের মত হাসে, এটা হিলম্যান্। দেখ না।

গাড়িটা নিয়ে এসে সে বিজয়ের হাতে দেয়। বিজয় উল্টে-পাল্টে দেখে।

ছেলেটা বলে যায়, আমার বাড়িতে আরও দু'টো গাড়ি আছে, একটা ল্যাণ্ডমাষ্টার, একটা স্টুডিবেকার। স্টুডিবেকার খুব জোরে চলে। স্টার্ট দিলেই একেবারে জি টি রোড ধরে নেবে। তুমি গাড়ি চেপে জি টি রোডে গেছ?

বিজয় অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিল, বলল, না।

—ওমা, জি টি রোডে যাও নি? কি বিরাট রাস্তা। একেবারে দিল্লী পর্যন্ত চলে গেছে।

একটু থেমে প্রশ্ন করে, জি টি রোড কে তৈরি করেছিল জানো?

—কে?

—শের শা। যে হুমায়ুনকে হারিয়ে দিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিল, সে। জি টি রোডে গেলে দেখতে পাবে, রাস্তার দু'ধারে শের শা গাছ লাগিয়েছিল। এখন সেগুলো কত বড় হয়েছে যেন এক একটা দৈত্য।

বিজয় না জিজ্ঞেস করে পারল না, তুমি বুঝি জি টি রোডে খুব গেছ?

ছেলেটা বলল, রোজ যাই, আমাদের স্কুল তো জি টি রোডের ওপর। বাবা, রাস্তা পার হতে কি ভয় করে।

সারাক্ষণ লরী চলে, দাদু বলেছে, খুবদার একলা পার হবে না।

বিজয় বুঝতে পারে না এটি কোন্ বাড়ির ছেলে। জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে কবে এসেছ?

—আজকে।

—বেড়াতে?

ছেলেটা হাসে, বাঃ, আজ আমার এখানে নেমন্তন্ন যে।

—কিসের নেমন্তন্ন?

—দাদার পৈতে হবে।

বিজয় যা আন্দাজ করেছিল, ঠিকই, আজই রাঙাদা'র ছেলের পৈতে, কিন্তু ঘরে যখন কেউ নেই কতক্ষণ আর বাচ্চার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা যায়? পরে এসে বরং আরেক বার খবর নেবে।

বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, শুনতে পায় বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করছে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বিজয় মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল, ঘরে।

ইনা একদফা কাজ সেরে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল, চারিদিক খুঁজেও রতনকে দেখতে না পেয়ে ডাকল, রতন, রতন!

কোন সাড়া নেই।

কোথায় চলে গেল ছেলেটা, যে মেয়েটার সঙ্গে খেলা করার জন্যে রতনকে ইনা এ ঘরে রেখে গিয়েছিল, সে তখন উঠোনে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছে।

ইনা বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে বিল্লী, রতন কোথায় গেল?

মেয়েটা বলল, কেন, ঘরে নেই? ও তো গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল।

ইনা ধমকে উঠল, তোর কি আক্কেল বলতো? ছেলেটাকে একলা রেখে চলে গেলি।

—কি করব, ও তো আমার সঙ্গে খেলতেই চাইল না।

ইনা বলল, দেখ তো কোথায় গেল, এবাড়িতে নতুন এসেছে।

শুধু বিল্লীকে নয়, ইনা সবাইকেই বলল রতনকে খুঁজে বার করার জন্যে। রাঙাদা'কেও ডেকে পাঠাল বাইরের বৈঠকখানা থেকে। ইনার এ ব্যস্ততা অকারণ নয়, ছোট খোকার পৈতের নিমন্ত্রণ করতে সে নিজেই গিয়েছিল বালিতে রেণুকার কাছে, অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। তাছাড়া চিঠিপত্রও আজকাল আর আগের মত লেখা হয় না, তবু এই উপলক্ষে অন্তত দেখাটাও হয়ে যাবে। ইনা স্বভাবে গৃহিণী, রতনের জন্যে দু'খানা সার্ট, প্যান্ট আর একখানা মোটর গাড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিল। রেণুকা ইনাকে দেখে খুব খুশি হল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, শুধু তাই নয়, রতনকে বলল, প্রণাম কর, ইনি তোমার জ্যেঠিমা।

জ্যেঠিমা কথাটা ইনার কানেও নতুন শোনাল, কারণ এ পর্যন্ত রেণুকা শ্বশুর-কুলের কারুরই পরিচয় রতনের কাছে দিত না।

ঘণ্টা দুই সেখানে কাটাবার পর ইনা যখন চলে আসছে, এমনি কথার খাতিরেই রতনকে জিজ্ঞেস করেছিল, জ্যেঠিমার সঙ্গে যাবে না কি, দাদার পৈতে দেখতে?

রতন সহজ গলায় উত্তর দিল, হ্যাঁ যাব।

রেণুকা বাধা দিয়ে বলল, আমি কিন্তু যাচ্ছি না খোকন।

রতন বলল, কেন?

রেণুকা বলল, আমার এখানে কাজ আছে।

—আমি তাহলে জ্যেঠিমার কাছে থাকব।

—তুমি একলা থাকতে পারবে?

—হ্যাঁ, পারব।

ইনা বলল, বেশ তো রেণুকা, ও চলুক আমার সঙ্গে।

রেণুকা বলল, না, দিদি, ও থাকতে পারবে না; মিছিমিছি তোমায় জ্বালাতন করবে।

—যদি থাকতে না পারে, আমি ওকে লোক দিয়ে গাড়ি করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

রতন বায়না ধরল, হ্যাঁ আমি যাবো, আমি জ্যেঠিমার সঙ্গে যাবো।

রেণুকা আর বাধা দিতে পারল না, বলল, যাও মাসীর কাছ থেকে দু'টো প্যান্ট আর সার্ট তোমার স্কুলের ব্যাগে ভরে নিয়ে এস?

রতন চলে যেতে রেণুকা গম্ভীর গলায় বলল, তোমার কাছে পাঠাতে কি আমার ইচ্ছে করে না দিদি? কিন্তু ভয় হয়, বাচ্চা ছেলে, কে কি বলবে, মনে হয়ত কষ্ট পাবে।

ইনা উত্তর দিল, সে দায়িত্ব আমার। আমি কারুর কাছেই ওর পরিচয় এখন দেব না। তবে, ছেলে বড় হচ্ছে তো, মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করা ভাল,

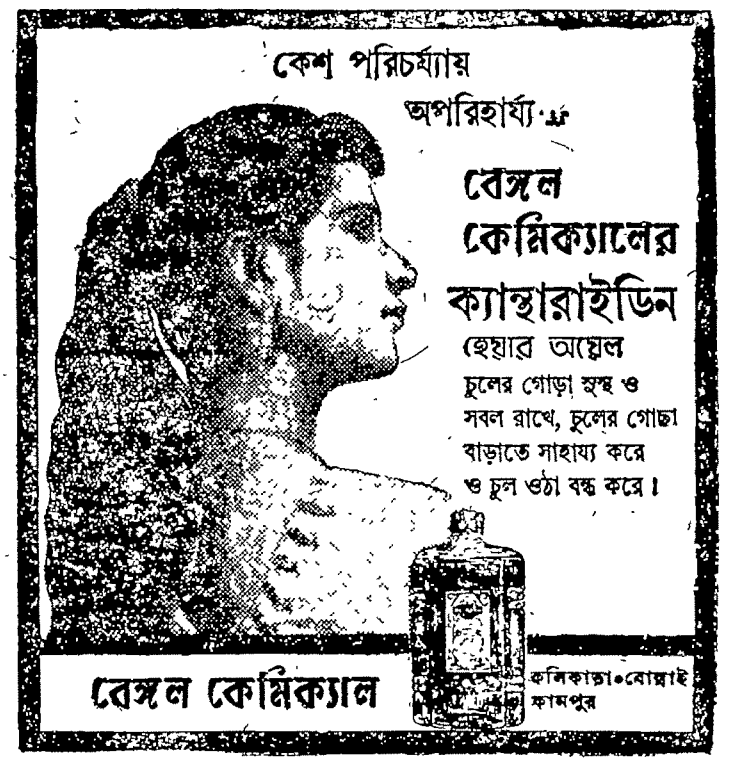

একদিন না একদিন সবই তো জানতে পারবে।

—তা পারবে। সেই দিনের কথা ভেবেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। কি ভাবে এ কথাটা সে নেবে, কে বলতে পারে।

রতন বাক্সে জামা ভরে ইনার কাছে এসে দাঁড়াল, চল জ্যেঠিমা, আমরা বেরিয়ে পড়ি। জি টি রোড দিয়ে গাড়ি করে যেতে কি মজা হবে। চল, চল।

ইনাকে ঘরে টানতে টানতে সে দরজা পর্যন্ত নিয়ে যায়, মুখ ফিরিয়ে রেণুকাকে বলে, তোমাকেও একদিন নিয়ে যাব, যেদিন তোমার কাজ থাকবে না।

রতনের কথা শুনে রেণুকা আর ইনা দু'জনেই হেসে ওঠে।

রতনকে দেখে রাঙাদা'ও খুব খুশি হয়েছিল। ইনাকে বলেছিল, খুব ভাল করেছ ওকে নিয়ে এসে। আমি তো ওকে অনেক দিন দেখি নি। কি চমৎকার ছেলে হয়েছে।

ইনা হাসতে হাসতে বলে, মুখে যেন সারাক্ষণ খৈ ফুটছে।

—একলা থাকতে পারবে তো, না রাত্রে কান্নাকাটি করবে।

—দেখি, নইলে পাঠিয়ে দেব।

রাঙাদা' জিজ্ঞেস করেছিল, বিজয়ের সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবো নাকি?

ইনা বাধা দিয়ে বলে, না, সে ঠিক হবে না। রেণুকা জানতে পারলে চটে যাবে।

ছেলেরা কিন্তু কেউই রতনকে খুঁজে বার করতে পারল না। রাঙাদা'ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে, কোথায় গেল ছেলেটা, রাস্তায় বেরিয়ে গেল না তো!

ইনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, একি কাণ্ড হল বলতো, পরের ছেলে এভাবে নিয়ে আসাই আমার উচিত হয় নি।

—আর একবার ভাল করে খোঁজা দরকার। ছেলেগুলোকে রাস্তা দু'চো দেখতে বলি, আমি নিজে দেখছি কোন ঘরের মধ্যে ঢুকে যদি বসে থাকে।

রাঙাদা' কোন জায়গা বাদ রাখে না, ছাদ থেকে সুরু করে বারান্দা, উঠোন, চণ্ডীমণ্ডপ, প্রতিটি ঘরে সে একবার করে উঁকি মারে।

অন্যরা জিজ্ঞেস করে, কি খুঁজছ রাঙাদা'?

অন্যমনস্ক রাঙাদা' উত্তর দেয়, একটা বাচ্চা ছেলে, কোথায় যে গেল! উত্তরের অপেক্ষা না করেই রাঙাদা' আবার অন্যঘরে গিয়ে ঢোকে, বিফল মনোরথে রাঙাদা' যখন নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসছে, মনে পড়ল, সেজখুড়িমার ঘরের দিকটা দেখা হয় নি, আজকাল অবশ্য ও অংশটায় বড় একটা কেউ যায়ই না, ধুলো-ময়লায় ভরা। তবু আর বাকী থাকে কেন, সেই জন্যেই রাঙাদা' বারান্দা থেকেই মুখ বাড়ালো, আর দেখে আশ্চর্য হল রতন মহা আনন্দে খাটের ওপর বসে বিজয়ের সঙ্গে গল্প করছে। রাঙাদা'র মাথা থেকে দুর্ভাবনার বোঝা নেমে গেল। সহাস্যে বলল, দুষ্টু ছেলে, তুমি এখানে, আর সারা বাড়ি তোমাকে খোঁজা হচ্ছে যে।

রতন বলল, কেন? আমি তো ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

—চল চল, জ্যেঠিমারা তোমার জন্যে বসে আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রতন বলল, বেশ চল। বিজয়ের দিকে ফিরে বলে, পরে এসে তোমার গল্পটা শুনব। এখন চলি।

বিজয় সম্মতি জানাল, বেশ।

রাঙাদা'র হাত ধরে রতন বারান্দায় বেরিয়ে আসে। বিজয় এ ছেলেটির পরিচয় পেয়েছে কি না তা জানে না বলেই রাঙাদা' ঐঘরে দাঁড়িয়ে কোন প্রশ্ন করে নি। বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে রতনকে জিজ্ঞেস করল, যার সঙ্গে গল্প করছিলে, ও কে জান?

রতন বলল, আমার বন্ধু।

রাঙাদা'র কৌতূহল জাগে, কে বলল তোমার?

—কেন, ঐ বন্ধুই তো আমাকে ওর বন্ধু করে নিয়েছে।

রাঙাদা' আর কোন কথা বলল না, শুধু ঐ কথাটাই মনে হল, এ সংসার বড় বিচিত্র। যদি রতনের পরিচয় পেয়েও বিজয় বন্ধু হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করে থাকে, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হয় একক, নিঃসঙ্গ, স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপন করলেও বিজয়ের মধ্যে যে বিবেক-বুদ্ধি বেঁচে রয়েছে তা অনেক তথাকথিত বুদ্ধিমান বিচক্ষণের মধ্যে নেই।

(ক্রমশঃ)

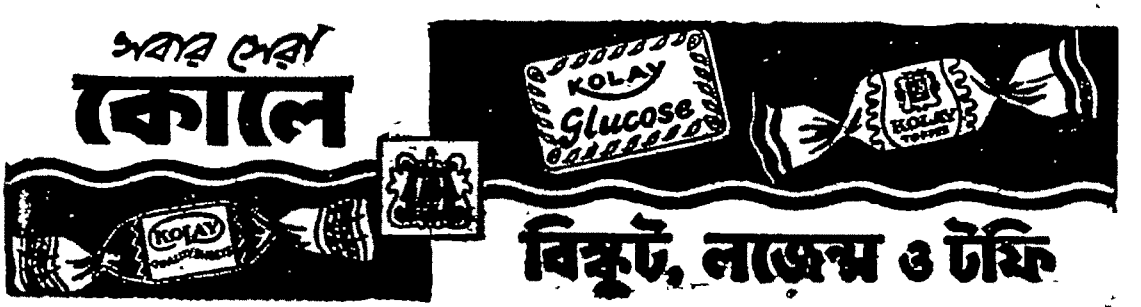

চুপ করল বীরেন। চোখের দৃষ্টিটা কেমন উদাস হয়ে গেল। পুরনো দিনের সেই রোমাঞ্চকর স্মৃতি ওর মনে ভিড় করে আসছে।

মাথা নীচু করে সেদিন বলতে সুরু করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত হয়েছিল। সে তদন্তকারী দারোগা, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আর গোয়েন্দাদের সঙ্গে এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিল। সেই সময় তার দিন-রাত কেমন করে যে কেটে গিয়েছিল, তা সে বুঝতে পারতো না।

যতটুকু সে জানে ততটুকু সে বলেছিল। বলেছিল ছাড়া ছাড়া অসংলগ্ন ভাবে। যার পরে যা বলা দরকার ছিল তা সে বলতে পারে নি। এমন কি চারু দাসের খুনের তদন্তের সঙ্গে যার যোগ নেই তাও সে বলেছিল। সেই দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক, অসংলগ্ন কাহিনী পাঠক-দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে, সেই আশঙ্কায়, আমি তার বক্তব্যের অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিয়ে সংক্ষেপে গুছিয়ে এখানে বলছি—সেই ত্রিশবছর আগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ইতিবৃত্ত।

ভোরবেলা খুনের খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছিল পুলের নীচে নালার কাছে। থানায় এজাহার দেওয়া যে প্রয়োজন, সে খেয়াল কারো নেই।

গ্রামের মুরুব্বী যাঁরা, যেমন হরিশবাবু (আমার জ্যাঠামশায়) বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জন সরকার, আরও অনেকে ঘটনাস্থলে এলেন।

—থানায় খবর দিতে হয়, কি বলো হরিশ?

—হ্যাঁ। এত বড় একটা খুন।

—কিন্তু এজাহার দিতে হলে তো রাধাকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কোথায় রাধা? ভিড়ের ভেতরে রাধা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁর হৃৎস্পন্দন যেন থমকে গিয়েছিল।

চারু দাসের বাড়ির সামনে এলেন নিরঞ্জনবাবু আর হরিশবাবু।

—রাধা—

কোন সাড়া নেই। শুধু হু হু করে বাতাস বয়ে চলেছে উঠোনের চারিদিকে।

—রা—ধা—

কি আশ্চর্য! সমস্ত গ্রামের লোকের মুখে মুখে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে; তার স্বামী খুন হয়েছে। লাশ পড়ে রয়েছে পুলের নীচে, এই অবস্থায় সে গেল কোথায়। কোথায় যেতে পারে!

তাঁরা দু'জন বাড়ির ভেতরে এলেন। চারুর শোয়ার ঘরটা হাট করে খোলা।

ঘরের ভেতরে এলো তাঁরা। দিনের বেলাতেই অন্ধকার। তক্তাপোষের ওপর যদি বসে থাকে, কি শুয়ে থাকে তাও কিছু বোঝবার উপায় নেই। ঘরের বাতাসে সুগন্ধি তেলের উগ্র গন্ধ। কোন বিলাসিনী এ ঘরে থাকে, বেশ বুঝতে পারা যায়।

রাধা নেই ঘরে। নেই বাইরে। তাহলে—

বিজ্ঞজনরা চিন্তিত হন। না থাকা মানে পুলিশের সন্দেহ বাড়িয়ে দেওয়া। বড় মুস্কিলে পড়বে তো? ব্যস্ত হয়ে তার বাপের বাড়ির গ্রাম খাসপুরে রওনা হওয়ার জন্য বাইরে আসতেই তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

খিড়কির পুকুরের ঘোলা জলের নীচে ভলভলে কাদা। পা দিতে না দিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সেই কাদার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে রাধা। তার মুখ থেকে যেন সব রক্ত সরে গেছে। বলির পশুর মত তার চোখ দু'টোর দৃষ্টি কেমন চমার্ত আর বিপন্ন।

রোমাঞ্চকর

# মায়লার কাহিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

# পদ্মমালিনী কথা...

সুভাষ সমাজদার

—কি করছো ওখানে? উঠে এস। তোমাকে থানায় যেতে হবে।

ভয়, দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, আতঙ্ক সব মিলিয়ে তার স্নায়ু যেন অসাড় হয়ে গেছে। কোন কথা বলল না। বলতে পারল না। শুধু শুকনো বেগুনী ঠোঁট দু'টো একটু কেঁপে কেঁপে উঠল।

—চারু কখন বাইরে গিয়েছিল?

—তুমি যখন দেখলে সারা রাতেও এল না, তখন একটা খবর দিলে না কেন?

—তোমার সঙ্গে শেষ কথা কি হয়েছিল?

—কাকে সন্দেহ হয় তোমার?

অনেক প্রশ্ন। অনেক কৌতূহল আর সন্দেহের ধোঁয়া তাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল।

রাধা—রাধা—রাধা। এ অঞ্চলের মানুষের মুখে শুধু ওই এক নাম। তাকে কেন্দ্র করে কত জায়গায়—কত লোকের ভেতরে তর্কের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। কত বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য সন্দেহ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। যাক—পরে বলবো সে সব কথা।

সেদিন হরিশবাবুকে যেতে হয় নি। নিরঞ্জনবাবুকেও যেতে হয় নি পুলিশের কাছে। এত বড় খুন। আর বিলপাড়া-খাসপুরের থেকে হিলি দূরে নয়। আর এ সব খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে যায়।

হিলি থানার ইনচার্জ, আরও দু'জন জুনিয়র সাব ইন্সপেক্টার আর দুই ট্রাক বোঝাই পুলিশ (তার ভেতরে বীরেনও ছিল) বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিলপাড়ার ওপরে। ভারী বুটপরা পায়ের শব্দে আর হত্যাকাণ্ডের টুকরো টুকরো কথায় গ্রাম মুখর হয়ে উঠেছিল।

চারুর লাশ নিয়ে আসা হয়েছিল তার বাড়ির উঠোনে। বারান্দার ওপরে বসল পুলিশ অফিসাররা। সামনে বসে আছে রাধা। নিষ্প্রাণ একটা পুতুল। এক রাতে তার যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

—শুনুন, আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে কিন্তু বুঝলে?

রাধার স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন হরিশবাবু—পুলিশের কাছে খোলখুলি বলো, বুঝলে তাহলে তোমার কোন বিপদ হবে না—

—চারু কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?

—বিকেলে।

—যাওয়ার সময় তোমাকে কি বলেছিল?

—ফিরতে রাত হবে। তার নতুন বইয়ের মহড়া হবে। দেরী হতে পারে—

—ফিরে এসে ভাত খাবে বলেছিল?

—হ্যাঁ।

—তুমি তার জন্য ভাত রেখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—চলো তো দেখি।

অফিসার ইনচার্জ অর্থাৎ বড়বাবু রান্নাঘরের দিকে গেলেন। জুনিয়রদের ইসারা করে ডাকলেন। বড়বাবুর পাকা ভ্রু দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

—ভাত দেখে কি হবে বড়বাবু?

—কি হবে পরে বুঝবে—

রান্নাঘরের মেঝেতে ডালা দিয়ে ঢাকা আছে ভাত। ডালাটা তুললেন বড়বাবু। ভক করে ডাল-ভাতের গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা দিল। থালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন বড়বাবু। তীক্ষ্ণ চোখে পরিপাটি করে সাজানো ভাত-তরকারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিপুণ হাতের ছোঁয়া আছে। আর আছে সেই হাতের মালিকের মনে আন্তরিকতা।

—দেখেছ হে, স্বামীর জন্য কি সুন্দর করে থালা সাজিয়ে বসেছিল—গম্ভীর হয়ে গেলেন বড়বাবু।

—আচ্ছা স্যার দেখুন তো, ও নিজে খেয়েছিল?

হাঁড়িতে ভাত আছে। ডাল তরকারি সবই আছে। স্বামীকে ফেলে রেখে খায় নি। পুলিশের কর্তারা চিন্তায় পড়ে গেল।

মনে হচ্ছে বেশ সাধ্বী স্ত্রী। খুব টান ছিল স্বামীর ওপরে। কিন্তু লোকে তো কত কথা বলে। আরও ভেবে বললেন বড়বাবু, তোমার কাছে ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা কেউ এসেছিল?

রাধা ঘাড় নেড়ে জানালো, এসেছিলো।

—কে? তার নাম ঠিকানা বলো—

একজন দারোগাবাবু নোটবুকে তার উত্তরগুলো টুকতে লাগল।

—খাসপুরের শিবু এসেছিল। সবাই তাকে 'শিবে' বলে ডাকে—

—কতক্ষণ ছিল?

রাধা কি বলল শোনা গেল না। লরীর ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

—পোষ্টমর্টেমের জন্য বালুরঘাটে লাশ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন সেকেণ্ড অফিসার। একজন জমাদার এসে খবর দিল।

—আচ্ছা। লাশটা সঙ্গে সঙ্গে পাঠানোই উচিত ছিল।

আবার জেরা করতে সুরু করলেন বড়বাবু।

—হ্যাঁ, শিবে তোমার কাছে কতক্ষণ ছিল?

—ওর জ্বর এসেছিল। বেশিক্ষণ ছিল না—

—তোমার এখানে প্রত্যেকদিন আসতো?

—হ্যাঁ—না প্রত্যেকদিন নয়, প্রায়ই আসতো। তার কাছেই আসতো। যাত্রার পালা লেখার কথাবার্তা হতো—

—বন্ধুর তোমার সঙ্গে না চারুর সঙ্গে ছিল।

—তার সঙ্গেই ছিল।

প্রত্যেকটির উত্তর মাপা। দারোগাবাবু খুব বিস্মিত হলেন। পাড়াগাঁর মেয়ে। কিন্তু কথাবার্তায় এত সংযত।

—তোমার কাছে আর কে কে আসতো?

—বাঁশি-বাজিয়ে যতীন

—ঘটনার দিন রাত্রে এসেছিল?

—না।

খুব শক্ত জায়গা। গম্ভীর হয়ে বড় দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, সেপাই উসকো হ্যাণ্ডকাপ লাগাও—তোমাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে বাপু—

—কিন্তু আমি তো দারোগাবাবু, কিছু জানি না—কিছু করি নি, বলতে বলতে কান্নার ভেতরে তার কথাগুলো তলিয়ে গেল।

বড় দারোগাবাবুর লাল চোখ দু'টোর দৃষ্টিও কেমন নরম হয়ে গেল। পিঠ পর্যন্ত এলিয়ে পড়েছে রুক্ষ চুলের বোঝা। চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে চোখ দু'টো চেপে ধরে অঝোরে কাঁদছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তা বিন্দুর মত জল টলমল করছে। আর থর থর করে কাঁপছে তার সারা শরীর। হাওয়া দমকে যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে একটি দীর্ঘ পুষ্ট সজীব স্বর্ণলতা।

জেরা আর গ্রেপ্তার।

হিলি থানা আর সদর থানা বালুরঘাটে শুধু ওই দু'টো ছাড়া কথা নেই।

পরদিন পুলিশের অফিসারদের সঙ্গে সদর থেকে ডি-এস-পি সাহেব মিঃ চ্যাটার্জী এলেন। তরুণ অফিসার।

তিনি স্পটটার (ঠিক যেখানে লাশটা পড়েছিল) একটা ফটো তুললেন। আর অদ্ভুত একটা হুকুম দিয়ে বসলেন।

পুলের নীচে এই নালার আশ-পাশে ঝোপঝাড় ভাল করে দেখতে বললেন। সেপাইরা পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। লাটা ঝোপ আর অপোশ্যরীর জঙ্গল রেশ করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে দেখতে লাগল।

না। কোন জঙ্গলে কিছু নেই। কোন ভারী অস্ত্র কি অন্য কিছু নেই, যা দিয়ে একটা পরিণত বয়সের লোকের মাথার খুলি কাটিয়ে দেওয়া যায়, থেঁতলে দেওয়া যায়—

—আচ্ছা পুকুরে জাল ফেলা তো—বলেই মিঃ চ্যাটার্জী নালার ওপরে দাঁড়ালেন।

—কিন্তু স্যার, বুঝতে পারা যাচ্ছে কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে। জাল ফেলে তো তার সেই জিনিষটা পাওয়া যাবে না। বড়বাবু বললেন।

আম-জাম গাছের মিষ্টি ছায়া পড়েছে হাটখোলায়। সেই ছায়ার নীচে বসলেন ডি-এস-পি মিঃ চ্যাটার্জী। গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ।—দেখি বড়বাবু, রাধার ষ্টেটমেণ্টটা।

খুব মন দিয়ে পড়লেন রাধার বক্তব্য। নেতৃস্থানীয় লোক হরিশবাবু, নিরঞ্জনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা থাকতে গ্রামে এই রকম হয়ে গেল। এর কোন কিনারা হবে না?

—কিনারা তো হয়েই আছে স্যার, হাসলেন হরিশ চৌধুরী। শিবেটাকে তো গরাদে পুরেছেন, ওকে আর যতীনকে ধরে ঘা-কতক দিয়ে দিন সব বেরিয়ে পড়বে, দেখবেন—

—ওরা তো অন্য তালে ছিল আর রাইচরণ, হারুর সঙ্গেও চারুর বনিবনাও মোটেই ছিল না—সন্দেহ ওদের ওপরও হয়। নিরঞ্জন সরকার ছাড়া ছাড়া গলায় বললো।

তার কথা যেন শুনতে পেলেন না মিঃ চ্যাটার্জী। বললেন, বড়বাবু আমার এলাকায় এত বড় খুন—তার গিল্টি কে বের করতে পারবো না। তা আমি হতে দেব না। দেখি, কলকাতা থেকে বড় ডিটেকটিভ আনাবো—একটা ব্যবস্থা করবোই—

পুলিশ পার্টি চলে গেল। কিন্তু গ্রামের চারদিকে সেপাই ছড়িয়ে রাখা হলো। প্রত্যেকটি সন্দেহজনক বাড়ির সামনে পেছনে দু'জন দু'জন করে সেপাই মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের ওপরে হুকুম ছিল, দিনে রাত্রে কে-কে বাড়িতে আসে, যায় গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে।

যাক। ওয়াচ করার কথা ছেড়ে এবার পুলিশ আরও কি করেছিল তাই বলছি।

পরের দিনই মিঃ চ্যাটার্জী একটি-মাত্র সেপাই নিয়ে স্পটে এলেন।

পুলের নীচে রোদ যায় না। সেখানে রহস্যময় নীলাভ ছায়া থমথম করছে। মিঃ চ্যাটার্জীর মনে হল, এই জলের নালা, আর বড় বড় দাম ঘাস সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মূক সাক্ষী। চোখ দু'টো ছোট করে দেখলেন সেই জায়গাটা যেখানে চারু উপুড় হয়ে পড়েছিল।

না কিছু না। আশে-পাশের মাটিতে তেমন কোন চিহ্ন নেই—একটু খোঁড়া-খোঁড়া, মনে হয় ধস্তাধস্তি করেছিল এখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি। পকেট থেকে ছবিটা বের করে মিলিয়ে দেখলেন ঘটনাস্থলের সঙ্গে। ছবিতে পুল আছে, নালা আছে, তার দু'পাশে নিবিড় জঙ্গলের শোভাও চমৎকার উঠেছে। কিন্তু মাটি-ওঠা খোঁড়া খোঁড়া জা গাটা খুব পরিকার হয় নি। এই ফটোগ্রাফ কি পাঠানো ঠিক হবে কলকাতা পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের এ্যাড-ভাইসার বিখ্যাত ডিটেকটিভ অরবিন্দ বোসকে? আর একবার স্পটে ভিজিট নিতে হবে।

সদর থানা বালুরঘাটে ফিরে এলেন মিঃ চ্যাটার্জী। টেবিলের ওপরে পড়ে আছে এস-পি সাহেবের নোট। দিনাজপুর জেলার গ্রামে এত বড় খুন কখনো হয় নি। খুনীকে গ্রেপ্তার

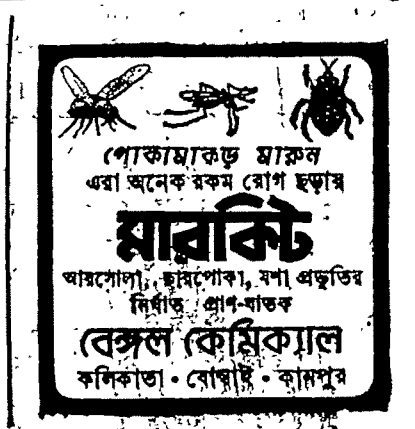

করতে না পারলে আমাদের ডিস-মিস হতে হবে—অতএব—বি. আর. ই।

তথ্যপ্রমাণের অভাব নেই। এতটুকু শিথিলতা নেই। তবুও বড়সাহেব নোটের পর নোট দিচ্ছেন। বিরক্ত হলেন মিঃ চ্যাটার্জী। হুকুম দিলেন বেয়ারাকে, ছিলি থানার ও-সি এসেছেন কি না দেখ তো হে?

ও-সি এলেন। মিঃ চ্যাটার্জী বললেন, রাধা ছাড়া চারু দাসের খুনের ব্যাপারে আর কাকে কাকে এ্যারেষ্ট করেছেন?

পকেট থেকে একটা লিষ্ট বের করলেন। মুখে বলতে পারবো না স্যার। মনে থাকে না। প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন লোক। গোপার ক্যুবের রিহার্সেলে যারা যারা ছিল তারা সব ক'জনই আছে। দুই নম্বর হচ্ছে যতীন। তিন নম্বর স্যার বিলপাড়ার যাত্রাদলের অধিকারী রাইচরণ সরকার, খরলপাড়ার হরু ঘোষাল। এদের প্রত্যেকের বাড়ির সব কখানা ঘরই সার্চ করা হয়েছে। সার্চ-লিষ্ট দেখবেন স্যার?

বিরস মুখে মিঃ চ্যাটার্জী মাথা ঝাঁকালেন। অস্তে অস্তে বললেন, দেখি ষ্টেটমেণ্টগুলো—

### শিবুর বক্তব্য

ঘটনার দিন রাত্রেও অন্যান্য দিনের মত আমি চারু দাসের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঠিক রাত্রি বলা যায় না। তখনো ভাল করে সন্ধ্যার অন্ধকার হয় নি। সবে সূর্য ডুবেছে।

আমি বাড়ির উঠোনে পা দিতেই দেখলাম চারুদা বেরোবার তোড়জোড় করছে।

—কি রে শিবে, খবর কি? বোম্বায়ের আমার নতুন লেখা বই হচ্ছে—

—ওরা আমাকে নেবে কেন? আমি তো ওদের দলের লোক নই। আর তুমি আমার মত পার্ট তো লেখ নি।

চারু দাস আর কোন কথা বলল না। খাতাটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

আমাকে রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়েছিল রাধা। একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। নুন তেল দিয়ে মেখে মুড়ি খেতে দিয়েছিল রাধা।

আমার খেতে ভাল লাগল না। কেমন তেঁতো মনে হল। একটু পরেই বুঝতে পারলাম জ্বর আসছে। চোখ দু'টো জ্বালা করছে।

জ্বর আসছে রাধা। আমি বাড়ি যাই।

জ্বর! দেখি দেখি বলেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল, রাধা। খপ করে হাতটা ধরে নাড়ী পরীক্ষা করতে সুরু করল।

—হুঁ বায়ু চড়া হয়েছে। পিত্তির দোষও হতে পারে—

—তুমি আবার কবরেজী শিখলে কবে?

—বলছো কি ঠাকুরপো, আমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদার বাবা যে কবরেজ ছিলেন।

সেই মুহূর্তে তাকে খুব সুন্দর লাগছিলো। কপালে কাজলের টিপ। চোখে কাজল। কালো দু'টো বড় বড় চোখ। মুখে চাপা হাসি। কেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল।

তাকে আমার ভাল লাগতো। সে-ও আমাকে নিজের দেবরের মত ভালবাসতো। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতো বটে। কিন্তু আমরা জানতাম, আমাদের সম্বন্ধ ছিল খুব নির্মল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করি। রাধা আমাকে পছন্দ করতো বলেই মাঝে মাঝে দু'একটা মনের কথা বলতো।

চারু দাস আর রাধা দু'জনে ছিল দূর দু'টো গ্রহের লোক। দু'জনের জগৎ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো আর জেগে থাকতো ততক্ষণ শুধু লেখাপড়া নিয়ে মেতে থাকতো সে। আর একটা মানুষ যে বাড়িতে আছে, আর তার মনে যে সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, অ যেন জানতোই না চারু দাস, তাই—

তাই রাধা ছিল অসুখী। সেই জন্যেই আমি বা যতীন গেলে খুব আনন্দ হতো তার।

রাধাকে আমার ভাল লাগতো। কিন্তু বেশি করে তাকে পাওয়ার জন্য, চারু দাস —পথের কাঁটাকে সরিয়ে দেওয়া আমি কল্পনাই করতে পারি না—

উপরোক্ত বিবরণ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে, সুস্থ মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ করছি। আমার জ্ঞানমতে এই মন্তব্য সত্য।

স্বাঃ—শিবনাথ মণ্ডল।

শিবনাথেরটা শেষ করে মিঃ চ্যাটার্জী যতীনের ষ্টেটমেণ্ট পড়তে সুরু করলেন। আর ছিলি থানার ও-সি ধূমপান করার জন্যই বাইরে গেলেন।

### যতীনের বক্তব্য

আমি যাত্রাদলের কনসার্ট পার্টির সঙ্গে বাঁশী বাজাই। আমার বাঁশী শুনতে ভালবাসে যারা, যারা তারিফ করে, তাদেরকে আমারও ভাল লাগে।

রাধা। চারু দাস যাত্রাগানের পালা-লেখকের স্ত্রী। আমার বাঁশী শুনলে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। তার ভেতরে প্রাণসম্পদ আছে। তাই সে অত বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে।

তার সনির্বন্ধ অনুরোধে দু'একবার চারু দাসের বাড়িতে গেছি। কিন্তু রাধার ওপর আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না।

আমি বত্রিশ বছরের যুবক। একটি তরুণীর প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করি না কেন? অনেকেই মিথ্যাভাষণ মনে করবেন। কিম্বা ভাববেন, আমি হয়তো অসুস্থ। কোনটাই সত্য নয়।

( ক্রমশ।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

# বাউলকবি কুমুদরঞ্জন

ইদানীং রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কাব্যের প্রতি আধুনিক পাঠকদের একটা নিষ্ক্রিয়ভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, এইসব কবির কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন না হলেও এঁদের অনেকেই যে সুকবি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। এই রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-বৃন্দের কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যের যোগসূত্র রক্ষা করে আসছে। সুতরাং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এঁদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে এঁরা লালিত এবং রবীন্দ্র প্রভাবের দ্বারা যদিও এঁরা প্রভাবিত, তবু এঁদের কেউই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেন নি। এই বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ হয়ত খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়, তবু স্বকীয়তা বলতে যা বোঝায়, তা এঁদের কাব্যে আছে। মূলধন বলতে এঁদের প্রত্যেকেরই প্রায় এক, কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, যৎসামান্য মূলধনের অধিকারী হয়েও এঁরা এঁদের কাব্যাঞ্জলি কাব্যলক্ষ্মীর শ্রীচরণে অর্পণ করে তৃপ্ত হয়েছেন, অন্তরে অনুভব করেছেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি।

কবি হিসেবে কুমুদরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুমুদরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনে একজনের সমিত ভাষায় পাই—কবির গলায় 'বনমল্লিকা', বুকে 'বনতুলসী', কানে 'শতদল', পায়ে 'নূপুর', হাতে 'একতারা',—'অজয়ে'র তীরে 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য় আপনার গানে আপন হারা,' মাতোয়ারা।' এইভাবে কুমুদ-রঞ্জনেরই রচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়ে কবিকে চিত্রিত করা হয়েছে। মানুষ কুমুদরঞ্জন এবং কবি কুমুদরঞ্জন সম্বন্ধে এর অধিক সম্ভবত আর কিছুই বলার নেই। কবির রচিত পুস্তকাবলীর নামকরণের মাধ্যমে কবিরই দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিক গঠনের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর ঐ বর্ণনায় কবিকে বাউলরূপে চিত্রিত করা হয়েছে—তাঁর হাতে একতারা, তিনি বসে আছেন অজয়ের তীরে, তাঁর বুকে বনতুলসী, কানে শতদল, গলায় বনমল্লিকা, পায়ে নূপুর।—একতারা বাউলের একটা বাদ্যযন্ত্র, যাতে একটা মাত্র সুরই ঝঙ্কৃত হয়ে থাকে এবং সে সুর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং বোধগম্য। কুমুদরঞ্জনের কাব্যেও বাউলের এই সরলতা এবং আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে। বলা হয়েছে, কবি বসে আছেন অজয়ের তীরে। বাস্তবিকই, এই অজয়ের তীরে কবির যে কেবল বাসস্থানই অবস্থিত তা নয়, কবির কাব্যজীবনেও এর এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বর্তমান। কবির বুকে বনতুলসী, কানে শতদল ও পায়ে নূপুর দিয়ে সজ্জিত করে তাঁকে এক ভক্ত পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কবির কাব্যেও তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিচয়, আমরা তাঁর কাব্য আলোচনা কালে যথাসময়ে লাভ করব। কুমুদরঞ্জনের কাব্যের যে সব বৈশিষ্ট্য সাধারণত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, তা হল তাঁর কাব্যের সরলতা; ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের প্রতি তাঁর কবিমনের স্বাভাবিক এক আকর্ষণ; পল্লীপ্রীতি এবং পরিশেষে তাঁর ঈশ্বরপ্রীতি।

বর্তমান যুগ। আধুনিক যুগ। আধুনিক জীবনের জটিলতা, আধুনিক কাব্যে ও সাহিত্যেও প্রতিফলিত। বিশেষ করে, এই জটিলতা লক্ষণীয় আধুনিক যুগের কাব্যে, কেন না কাব্যেই জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জন আধুনিক কালের মানুষ হয়েও অতি আধুনিক মনের যে নন, তার প্রমাণ তাঁর কাব্য। কারণ তাঁর কাব্যে আধুনিক মনের কোন পরিচয়ই মেলে না। আধুনিক যুগের প্রভাব কবিমনকে প্রভাবিত করতে পারে নি। সেইজন্যে অতি আধুনিক কবিতায় যে সব লক্ষণ প্রকটরূপে দেখা যায়, সে সব লক্ষণ তাঁর কাব্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু একে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের—প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে এদের কোনটিই প্রযোজ্য নয়। অবশ্য শুনতে পাই—'জটিল অসুস্থ মনো-বিকারের যুগে, যখন বস্তুর অভিঘাতে, কামনার অতৃপ্তিতে, বিরুদ্ধ প্রভাবের

আকর্ষণে কবির চিত্ত ভারসাম্যচ্যুত ও ছন্দোভ্রষ্ট. তখন একটি সহজ মন ও দ্বন্দ্বলেশহীন জীবনদর্শনের অধিকারী হওয়াই অভাবনীয় সৌভাগ্য।... আধুনিক যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিরল মনোভঙ্গীর সৌভাগ্যবান অধিকারী।'—আধুনিক যুগের কাব্যে যখন গদ্যছন্দের একাধিপত্য, ভাষার দুর্বোধ্যতা, অভিনব উপমা প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে কুমুদরঞ্জনের কাব্যে এই সকলের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের বিস্মিত করে। ভাষা, কল্পনা কিংবা ষ্টাইলের জটিলতাপূর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কুমুদরঞ্জনের কাব্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'এই কাব্যগুলির রসে কোন রং নাই, মশলা নাই—ইহা শরবতও নয়, একেবারে ডাবের জল।' এমন কি, আশ্চর্য হতে হয় যে ভাষা সম্বন্ধেও কবি যত্নবান নন। 'তিনি যুগ থেকে একেবারে পিছিয়ে আছেন। আত্মরত জনতার মধ্যে একা, যুগের কলকোলাহলের নিত্য আন্দোলনের মধ্যেও আত্মসুখের একতারাটি নিয়েই তিনি আনন্দিত।' কিন্তু 'এ সুপ্তি পলায়নজাত নয়।' এই ধ্যানরাজ্য কবিরই সৃষ্টি। ওদেশের 'দেবশিশু' নামে পরিচিত 'শেলী'ও ঠিক এইরকমই এক পৃথক জগতের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর জগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অধিবাসী। কিন্তু এই কারণে যদি শেলীকে 'Escapist' বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। কুমুদরঞ্জনের জগতও শেলীর ন্যায় সৃষ্ট তাঁর একার জগৎ, সে জগতের অধিবাসী তিনি একা। সেইজন্যে সমসাময়িক কবিগণ থেকে তিনি পৃথক, তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি একা। কিন্তু এইজন্যে তাঁকে যদি 'Escapist' বলা হয়, তাহলে কুমুদরঞ্জনের প্রতি কেবলমাত্র অবিচার করা হবে না, তাঁকে ভুল বোঝা হবে। কুমুদরঞ্জনের সৃষ্ট স্বপ্নময় জগৎটির স্বরূপ সম্যগ্‌ভাবে না আলোচনা করলে তাঁর কাব্যকে যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। সেইজন্যে আমরা তাঁর কাব্যজগৎটি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন:

'সহজ কথা লিখতে মোরে কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে এই সহজ, সরল, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছেরই আধিপত্য। বাস্তবিক, সাধারণত কবিগণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়-বস্তুকে নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা একঘেয়েমি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ক্ষুদ্রের মধ্যেই চিরন্তন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। পৃথিবীতে বহু ক্ষুদ্র জিনিষ আছে, অজ্ঞানতাবশত আমরা তাদের তুচ্ছ বলে অবহেলা করে থাকি, কিন্তু আমাদের কবি বলেন:

'ছোট যে হায় অনেক সময়
বড়র দাবী দাবিয়ে চলে
রেখা টেনে ছোটর গতি
বড় যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি বড় তুচ্ছ যা তাই
ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি
ছোটর কণা নয়নজলে।'

সেইজন্যেই দেখি যে, কবির বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের প্রতিই একান্ত অনুরাগ। শুধু অনুরাগ নয়, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের বর্ণনায় তিনি উত্তীর্ণ। অসংখ্য কবিতায় কবির তুচ্ছের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেন:

'মহামায়ায় যতই মানাক
সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে
দেখেই যে হয় হিংসা মনে।'

যত অবজ্ঞাত মানুষ, নগণ্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সবই তাঁর রচনায় গৌরবের আসন লাভ করেছে। ক্ষুদ্রের মধ্যেও—তিনি সর্বশক্তিমানের অমর স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাই ক্ষুদ্র তাঁর কাছে অবহেলার উপযোগী তুচ্ছ বস্তুমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্যেও তুচ্ছের বন্দনা দেখা গেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য হল যে, বিশ্বকবির কাব্যে ক্ষুদ্রের মাধ্যমে বৃহৎ এসে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন অসীমের। কিন্তু কুমুদরঞ্জন ক্ষুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্রকেই উপলব্ধি করেছেন। সীমাকে কেন্দ্র করে অসীমের অভিমুখে যাত্রা করতে কবি সমর্থ হন নি, চেষ্টাও করেন নি। কিন্তু তাই বলে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে তিনি কেবলমাত্র তুচ্ছ করেই রাখেন নি, তার মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে—তা তিনি দেখিয়েছেন। 'মজুরের মমতা' এমনই একটি কবিতা যেখানে সামান্য মজুরের অসামান্য অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

'পাষাণের মুখে আছে এত যে রাগী
আমি তো পাথর ভাঙি—তাহা কি জানি!
ভাঙিতে ভাঙিতে আজ মিলিল খুঁজি
মা ছেলে পাষাণে ক্ষোদা সজীব মুরতি।
দুখিনী জননী তার হস্তে ছড়ি
বালক চলেছে তার হাতটি ধরি।
ভাঙিতে গিয়াই আহা জননী পানে—
পড়িল আমার আঁখি বাজিল প্রাণে।'

আবার 'ভক্তির মুক্তি' শীর্ষক কবিতায় সামান্য একজন কৃষক, দুনিয়ার মালিককে—তার সহজ সমাধান করে দিয়েছে তার সহজ সরল বুদ্ধি দিয়ে এবং তাতেই সে অসামান্য হয়ে উঠেছে। কৃষক বলেছে:

'জগৎ জননী মা না হতো যদি
দোপাটী পেত কি কোটা?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী
তার কদলী গরব গোটা?
ময়ূর পেত কি ময়ূরকণ্ঠী
রেশমী পোশাক টিয়া?
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি
বাঁধা লাল ফিতা দিয়া?
ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে,
পারে যে সোহাগ দিতে—
কাজলে সাজাতে পারে টিপ দিয়ে,
দেখিনি তো হেন পিতে।'

সুতরাং ধরার কর্তা জগদীশ্বর না হয়ে শ্যামা-মা তথা জগন্মাতা হয়েছেন। আবার 'নিষ্কর্মা' কবিতায় কবি পাড়ার অবহেলিত যুবকদের প্রতি তাঁর অন্তরের অনুরাগ ও স্নেহ প্রকাশ করে বলেছেন:

'কেবল পরের কাজ করে যায়
একেজো তাই সবাই বলে,
স্মরি তাদের গুণের কথা,
ভাসি আমি নয়নজলে।'

কুমুদরঞ্জনের এই তুচ্ছের প্রতি, নগণ্যের প্রতি অনুরাগের মধ্যে সমালোচক মোহিতলাল বাংলার কালচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন।

বাংলার Wordsworth কবি কুমুদরঞ্জনকে বলা চলে,—'he is a lover of nature'—প্রকৃতি-প্রেমিক কুমুদরঞ্জন। কবির এই প্রকৃতি-প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত,

নেহাৎ কবিকল্পনা বা fancy নয়। কবি Wordsworth-এর মতই পল্লীর মধ্যে তিনি এক জীবন্ত সত্তাকে অনুভব করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুমুদরঞ্জনের shelley'র ন্যায় এক স্বপ্নময় জগৎ আছে। শেলীর জগৎ রচিত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব কল্পনায়—যে জগতে দুঃখ বলে কিছু ছিল না, চিরন্তন যৌবনের অধিকারী সকলে, সেখানে একটা রোমান্টিক পরিবেশ সদা-সর্বদাই বিরাজমান। তেমনই কুমুদরঞ্জনের জগৎ পল্লীকে কেন্দ্র করে। যে জগতে দোয়েল-শ্যামা মিষ্টতানে প্রাণ করে মাতোয়ারা, পল্লীর অতি সাধারণ মানুষের সেখানে বাস, শহরের চীৎকার বা জনকোলাহলের লেশমাত্র সেখানে নেই।

কবির প্রকৃতি-প্রেম সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবির ভাষায়:

'তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি
কাব্য পড়িয়া নহে;
নহেক' শ্যামল স্নেহের লাগিয়া
অন্যে যে কথা কহে।'

কিংবা কবি যখন পল্লীর উদ্দেশ্যে বলেন:

'তুমি মোর গয়া, তুমি মোর কাশী,
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি,—
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার
আর দিকে কালিদহ।'

তখন কবি কেবলমাত্র কাব্য করেই বলেন না, তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেন:

'পাকা পথে চলা মোর কভু কি মানায়
চোখে জল ভরে ওঠে কাণায় কাণায়।'

প্রকৃতই, শহরে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করে থাকেন। পল্লীতে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন। মাতৃক্রোড় সন্তানের নিকট যেমন সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং আরামপ্রদ স্থান, আমাদের কবির নিকট পল্লীজননীর ক্রোড়ও সেইরূপ। মোহিতলালকে অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি: 'জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ, পল্লীর সহিত কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধ সেইরূপ।'

ইতিপূর্বে কুমুদকাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ঈশ্বরপ্রীতি। কবি কুমুদরঞ্জন তাই ভক্তকবি। তাঁর ভক্তি কেবলমাত্র উপাস্য দেবতার প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়,—তাঁর ভক্তি সৎ, মহৎ, বৃহৎ, পবিত্র ও সর্বপ্রকার সৌন্দর্যের প্রতি। এককথায় তিনি যেমন বিশ্বস্রষ্টার ভক্ত তেমনি ভক্ত তাঁর সৃষ্টির। সৃষ্টির প্রতিটি জীব, প্রতিটি ধূলিকণার মধ্যেই কবি অনন্ত সৌন্দর্যের অধীশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। সামান্য শুঁয়োপোকার প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেও কবি সেই অনন্ত করুণাময় ভগবানকে উপলব্ধি করে থাকেন:

'ক্ষুদ্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি যাঁহার
করুণা হেন,
একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ
পাবে না কেন?'

'চকোর' কবিতার ন্যায় বহু কবিতায় কবির প্রেমাতুর সাধকচিত্তটি অতি সহজে ধরা পড়ে গেছে। চকোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন:

'বুঝি তাঁরি কাছে যাবার লাগি এ-পাখা,
কণ্ঠের কাজ কেবল তাঁহাকে ডাকা।'

এমন কি কবি স্বীয় কাব্যসাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর 'কবির সুখ' শীর্ষক কবিতায় বললেন:

'কোন ধন মান পাইবার লাগি' ঝঙ্কারে
পিক পাপিয়া?
কি পায় সাধুরা গিরি-গহ্বরে কঠোর
জীবন যাপিয়া।
চিন্তামণির ধনে ধনী যারা তারা কি
মুক্তামণি চায়
বিস্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি
অণু কণিকায়।
আমি সে সুখের সেই তৃপ্তির আর সে
প্রেমের ভিখারী।
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই
হোমানল শিখারই।'

কবি কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণবের গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর কাব্যে লেশমাত্র স্থান পায় নি। 'শাক্ত' শীর্ষক কবিতায় কবি বললেন:

'চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা
হর্ষে ভাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের
সর্বনাশী।'

আবার 'অঘোরপন্থী' কবিতায় কবি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্তদের উদ্দেশ্য করে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, কবি 'বৈষ্ণব' কবিতায় যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনটি অন্য ধর্মের বিষয়ে লেখা কবিতায় নন। 'বৈষ্ণব' শীর্ষক কবিতায় কবি তাঁর ইষ্টদেবতা প্রসঙ্গে বলেছেন:

'মোদের হরি বংশীধারী,
মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে,
পিপাসী যে রসের মোরা।'

# দ্বিতীয়া

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

দুঃখ ওগো দুঃখ আমার নিরবয়ব নদী
স্তরে স্তরে জমছে যতো সমকালীন ধূলো
হৃদয় কন্দরে, কেন পারো না আগের মতো
নিকিয়ে নিতে? কোন কারণে হয়েছো বিবত—
দর্পী রাজার দেহে যেমন তীক্ষ্ণ তীরগুলো—
হ'তে তেমন সুখব্যাধির পরম ওষধি?

দুঃখ ওগো সন্ধ্যাকাশের ছোট্ট লাজুক তারা
আত্মহারা, ব্রাতকারী কত না সুখের ক্ষণে
রেখেছো মনে, নিয়েছো দূর কাম্পাভেজা দেশে
বিষণ্ণতা। অপচয়ী সুখগুলিও শেষে
সহনীয়। ইদানীং আর নেই কেন নির্জনে
হারিয়ে---খুঁজে---হারিয়ে---ফের খুঁজে পেতে পারা?

দুঃখ আমার নদী আমার নির্নিমেষ তারা
তুমি বিনে আরেক দুঃখ একি ভীষণ ধারা?

কেয়া ঝোপের মাঝে মাঝে হঠাৎ আসা মাতাল হাওয়ার এলোমেলো শনশনানি শব্দটা ক্ষীণতর হয়ে তখনো লবটা মিলিয়ে যায় নি। বৃন্তচ্যুত ফুলরেণু মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়ে সাদা করে ফুটিয়ে তোলে নি কবোষ্ণ অন্ধকারের গভীরতা। কিন্তু আমি চিনতে ভুল করি নি। নক্ষত্রগতি, চকিতা মরালীর মত মাধুরীর চোখের আগুন মিলিয়ে যায় নি, নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। কিম্বা মাটির হিম শীতলতার বুকে ওর অনন্ত জিজ্ঞাসার হয়তো

উত্তরও পেয়েছিল কানে কানে। তাই নিশ্চল নিস্পন্দ নিথর হয়ে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। আমি অন্ধকারে ঠাওর করেও প্রথমটা খুঁজে পাই নি মাধুরীকে। কেন এমন হল, তখন বুঝে উঠতে পারি নি। শুধু বুঝেছিলাম গভীর প্রশান্তিতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল সর্বগ্রাসী অজগরের জঠরে। কি তীব্র তার দংশন। কি ভয়াবহ সংকেত সেই সম্ভাবনায়। তবু গরলে অমৃত মনে হয়েছিল মাধুরীর। একটু একটু করে সবটাই গ্রাস করে ফেলেছিল ওকে। আমি বিহ্বলের মত তাকিয়েছিলাম সেদিকে তাকিয়েছিলাম শেষটা দেখব বলে। অবশ্য প্রথমটাও দেখেছিলাম, তবে অন্যখানে। এটা শেষ। সুরুটা আরো আগে। ভাবছিলাম---

হঠাৎ আমার সম্বিৎ ফিরে এল অনিমেষের ডাকে, কি রে এবার বিশ্বাস হল? চ' এবার ফেরা যাক।

আমি কোন জবাব দিতে পারি নি ওর কথার। ওর পাশাপাশি চুপচাপ হেঁটে ফিরে এসেছি। আর ভেবেছি কেন মাধুরীদি হারিয়ে গেল অন্ধকারে। যার এত রূপ, এত গুণ, সর্ব অংগে চোখ ঝলসানো দীপ্তির প্রখরতা—সে কেন ঐ কেয়াফুলের মত অন্ধকারের বুকে সাদা হয়ে জেগে রইল না।

মনে পড়ে মাধুরীদির সংগে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা। মফস্বলের একটা আধা শহরের স্কুলে মাষ্টারী করতেন মাধুরীদি। আমরা এসে উঠলাম ঠিক পাশের বাড়িতে। মাধুরীদি একটা গেরুয়া শাড়ি পরে জানলায় বসেছিলেন। দোতলার জানলা খুলতেই আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে সপ্রতিভ প্রশ্ন করলেন —তোমরাই এসেছ বুঝি, এ বাড়িতে?

সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

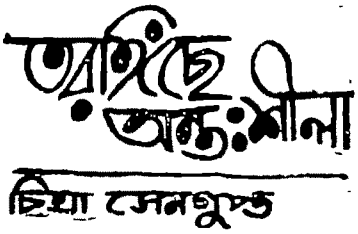

কিন্তু বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। মনে সেই এক প্রশ্ন—আশ্চর্য, এত কম বয়সের সন্ন্যাসিনী তো আগে দেখি নি। দেহের কোন অংগে নেই কোন অলংকার, নেই কোন সমারোহ। তবু নিরাভরণ সন্ন্যাসিনীর দেহে ফাগুনের বনে বনে হঠাৎ-ডাকা কোকিলের কণ্ঠ রোমাঞ্চের মত পুলকিত ধরিত্রীর বুকে হিল্লোলিত হচ্ছিল মুকুলিত প্রাচুর্য। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম সসংকোচে। তবে সে মুহূর্ত মাত্র। তারপর চোখ বুজে ডুব দিলাম মাধুরীদির গহন কালো আঁখির অতল অন্তে। সেদিনও হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

কিন্তু মাধুরীদির চোখ এড়ায় নি। দু'একদিন পরেই হঠাৎ রাস্তায় দেখা মাধুরীদির সংগে। কেমন ভয় জন্মে গিয়েছিল এর মধ্যেই। বিশেষ করে অমন ফরসা ধবধবে রূপের সংগে বড় কালো চোখ দু'টোই যথেষ্ট ছিল। এছাড়াও ছিল কপালে মস্ত একটা সিঁদুর-টিপ। মাধুরীদির ব্যক্তিত্বটাকে যেন পিলসুজের উস্কে দেওয়া আগুনের মত আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

ভেবেছিলাম পাশ কাটিয়ে পালাব। কিন্তু সুযোগ হল না। একেবারে সামনে পড়ে গেছি। এগিয়ে এসে মাধুরীদি আমার হাত চেপে ধরলেন—এই দুষ্টু ছেলে, সেদিন অমন করে কি দেখছিলে—এঁ্যা?

এ কথার কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। তবু রক্ষে, মাধুরীদির ঠোঁটে কৌতুকের হাসি তখনো মিলিয়ে যায় নি। তাই কেবল একটু মুচকি হেসে গা বাঁচানোর চেষ্টা করলাম।

মাধুরীদি স্কুল থেকে ফিরছিলেন। বল্লেন—একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ, এখনো নতুন বন্ধু জোটে নি বুঝি? চল, আমার সংগে বাড়ি চল। সন্ধ্যেও তো হয়ে এল। নতুন জায়গা। হয়তো রাস্তা হারিয়ে ফেলবে।

অগত্যা ফিরে চল্লাম। সেইদিনই প্রথম আলাপ হ'ল মাধুরীদির সংগে। যেতে যেতে কত কথাই বলে চল্লেন মাধুরীদি। কত সহজ সুন্দর করে কথা বলতে পারেন মাধুরীদি। বল্লেন, বল তো—তোমার নামের অর্থ কি?

আমি জবাব দিতে দেরি করছি দেখে বল্লেন—ইস্, নীলেশ মানে কি তাই জান না। এদিকে আবার সেকেণ্ড ক্লাশে পড়া হচ্ছে।

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে পথ চলতে লাগলাম। মাধুরীদি হয়তো আমার অবস্থাটা অনুমান করেই অন্য প্রসংগ ধরলেন। আমার ছোট ভাই সনুর সংগে আলাপ হয়েছে? ও-ওতো তোমার সংগে পড়ে, একদিন এসো আমাদের বাড়ি, কেমন? ভাব করিয়ে দেব।

আমি একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠেছিলাম। প্রথম সংকোচের ভাব কেটে গিয়ে ভাব জমিয়ে ফেলেছিলাম মাধুরীদির সংগেও। তারপর থেকে প্রায় রোজই যেতাম মাধুরীদির বাড়ি। সমীরের সংগেও আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বাবাও বলতেন—অংকে তো তুই চিরদিনই মাথা মোটা—মাধুরীর কাছে একটু আধটু দেখিয়ে নিতে পারিস তো—

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম—বাবা হয় তো ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন আমার মনের কথা। বল্লেন—ও বুঝেছি, তোর লজ্জা হচ্ছে, এই তা! কিন্তু জানিস না তুই, অংকের ওর কত মাথা। তোর মত কত গবেট ছেলেকে পড়িয়ে ও মানুষ করেছে তার ঠিক নেই। আমি শচীনবাবুর মুখ থেকে সব খবর পেয়েছি।

তারপর মাঝে মাঝে সভয়ে অংকের খাতা খুলে ধরেছি মাধুরীদির সামনে। কিন্তু আমার মস্তিষ্কের উর্বরতা নিয়ে আগের শিক্ষকদের মত বিদ্রূপের টিকা-টিপ্পনীতে আচ্ছন্ন করে তোলেন নি আমার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে। বরং সহানুভূতি দিয়ে বিচার করতেন আমার বুদ্ধির স্বল্পতাকে। আমি মুগ্ধ হতাম তাঁর ব্যবহারে। তাঁর আচরণের সহজতায়। ভালবেসে ফেলেছিলাম মাধুরীদিকে। নিজের একান্ত আপনজন ব'লেই মনে মনে বরণ করে নিয়েছিলাম তাঁকে।

একদিন সমীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হ্যাঁ রে তোর অন্যান্য সব দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে—কিন্তু মাধুরীদিই তো সবচেয়ে বড়, তবে বিয়ে করেন নি কেন?

সমীর গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, দিদি যে সন্ন্যাসিনী, দিদি তো বিয়ে করবে না।

আমার সেই বয়সেও কম খটকা লাগে নি সমীরের কথায়। বল্লাম—সন্ন্যাসিনীরা বুঝি বিয়ে করে না।

সমীর তেমনি সহজভাবেই জবাব দিল—দিদি তো তাই বলে। বলে সন্ন্যাসিনীরা বিয়ে করে না। সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে।

আমি ওর জ্ঞান-বৃদ্ধের মত কথা বলার ভংগি দেখে না হেসে পারি নি। বল্লাম—তা তোর দিদি কি এমন সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করছে। বেশ দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে, আমরা অংক না পারলে বিক্রম ফলাচ্ছে, সেবাধর্মের কোন চিহ্ন দেখছি না। শুধু গেরুয়া পরলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

আমার কথার কোন জবাব দেয় নি সমীর। বুঝলাম কথাটা ওকে বিব্রত করেছে যথেষ্ট। অবশ্য এটাও জানি, শুধু সমীর কেন, ওর সব ভাইবোনেরা তো বটেই, এমন কি ওর বাবা পর্যন্ত এমন আদর্শ চরিত্রের মেয়ে পেয়ে গর্বিত। স্বতন্ত্র কেবল ওর মায়ের মত। তিনি চিরদিনই বিষয়ী। এ সব তাঁর ভাল লাগে না। তাঁর আর আর মেয়েদের মত মাধুরীরও বিয়ে দিয়ে দায় উদ্ধার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাদ সাধেন মাধুরীর বাবা শচীনবাবু। বলেন—থাক না। অন্তত একটা মেয়েও আমার মানুষের মত বাঁচুক। কি হবে বিয়ে দিয়ে! সেই তো খাঁড়া

ঘড়ি থোড় আর থোড় বাড়ি খাড়া। তার চেয়ে বেশ আছে, ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাক—তাতে সকলেরই ভাল হবে।

স্বামীর সংগে আর তর্ক করেন নি লাবণ্যপ্রভা। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর একার পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। মেয়ের সংগে মেয়ের বাবাও যদি নাচেন তো তিনি একা কি করে উঠতে পারেন। আগে তো চেষ্টার কোন ত্রুটিও রাখেন নি। এক একবার একটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আর ভেবেছেন বড় মেয়ে মাধুরীর কথা। মাধুরীকে বলে বুঝিয়ে, সাধ্য সাধনা করেও কোন কিনারা করে উঠতে পারেন নি। তবু লোকচক্ষে এটাও খারাপ দেখায় বইকি। অন্য মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ এলেই সেই এক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—বড় মেয়ের বিয়ে দেন না কেন?

তখন অগত্যা ঐ শচীনবাবুর মতটাকেই সত্যি বলে জোর দিয়ে জাহির করতে হয়। জাহির করতে করতে এখন যেন সেটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে লাবণ্যপ্রভার কাছে। হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

ভেবেছিলাম সমীর হয়তো ভুলে যাবে আমার কথাটা। কিংবা আমার কথার কোন গুরুত্ব দেবে না। কিন্তু একদিন ঠিক ধরে বসলেন মাধুরীদি।

মাঝে মাঝে শহরটার একপ্রান্তে একটা আশ্রমে বেড়াতে যেতেন মাধুরীদি। কতদিন বিকেলে খেলার মাঠে দাঁড়িয়েই আমি দেখেছি মাধুরীদি চলেছেন আশ্রমে। আমি কিছুক্ষণ উন্মনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি সেদিকে। আমাদের স্কুল ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে আরো অনেক দূরে গোধূলির হঠাৎ-রাঙা আবছা আলোয় ছোট বিন্দুর মত আশ্রমের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতেন মাধুরীদি। আবার কতদিন খেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে মাধুরীদির সংগে। এক সংগে গল্প করতে করতে ফিরে এসেছি বাড়ির দিকে।

সেদিনও ফিরছিলেন মাধুরীদি। আমার সংগে দেখা হতেই অভিযোগের সুরে একে একে হুবহু সমীরের কাছে বলা আমার কথাগুলো মুখস্থর মত আউড়ে গেলেন তিনি। আমি সভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। এমন বিনা মেঘে বজ্রাপাত হবে একটু আগেও ভাবতে পারি নি। এমন অবস্থায় কি বলা উচিত কিছুতেই ঠিক করতে পারি নি। তাই চুপচাপ হেঁটেই চলাম মাধুরীদির সংগে। কেবল অজানিত আশংকায় বুক দুরু দুরু করতে লাগল।

একবার ভাবলাম ক্ষমা চেয়ে নি। কিন্তু কি জানি কেন তাও বলতে পারলাম না। কিন্তু মাধুরীদি সেদিনও আমায় বাঁচিয়ে দিলেন। হয়তো আমার মনের অবস্থা সেদিনও সহৃদয়তা দিয়ে বিচার করেছিলেন তিনি। সামনেই নদীর উঁচু পাড়। দুজনেই চলেছি তার পাশ দিয়ে। হঠাৎ থেমে পড়লেন মাধুরীদি। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন নদীর অপর প্রান্তের প্রায় অন্ধকারে বিলীন গাছগুলোর দিকে। তারপর তেমনি ভাবগম্ভীর ভাবে বল্লেন—আমি জানি, তুমি ছেলেমানুষ; তাই না বুঝেই অমন সহজে তাচ্ছিল্যের মত কথা বলতে পেরেছ। কিন্তু, কিন্তু---একটু থেমে আবার বল্লেন মাধুরীদি—যখন বড় হবে, যখন পৃথিবীর নানান দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে তখন দেখবে—এর থেকে মুক্তির ঐ একমাত্র পথই খোলা আছে। সে সংসারের বন্ধন মুক্তি। আবার একটু থেমে নিলেন মাধুরীদি। যেন নিজের নিঃশেষিত দমটাকে একটু আয়ত্তে এনেই সুরু করলেন—সে মুক্তির দেবতারও একটা রূপ আছে নীলু। তিনি সম্পূর্ণ নিরাকার, কোন রূপ নেই তাঁর। যিনি যেভাবে তাঁকে ডাকবেন, তিনি সেইভাবেই দেখতে পাবেন তাঁকে। ঐ যে দূরের অন্ধকার গাছগুলো, এখন স্পষ্ট করে দেখা যায় না ভাল। গাছ বলেও বোঝা যায় না। তাকিয়ে দেখ, কেমন একটা অদ্ভুত ধ্যানস্থ মূর্তি যেন দিগ্বিদিক শূন্য করে অসীমের সংগে নিজেকে মিলিয়ে দিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, ঐ যে অস্পষ্ট রূপ, আমার কি মনে হয় জান নীলু, আমি হয়তো ঐ রূপকেই ভালবেসেছি। যতবার যাই এখান দিয়ে তখনই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ঐ দিকে। দিনের প্রচণ্ড আলোয় যখন দেখা যায় না সে মূর্তি, তখন মনের মধ্যে সেই অস্পষ্ট মূর্তিটাকেই কল্পনা করি। আর তখনি আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি এক তীব্র আকর্ষণ, অন্তরের তীব্র দহন—এক অসম্ভব জিজ্ঞাসা— কেন এমন হয় আমার। কি এর অর্থ। প্রথমটা তোমারই মত যখন অবুঝ ছিলাম, তখন দিশাহারার মত চিন্তা করেছি। কিন্তু বড় হয়ে এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি—সে মুক্তির মন্ত্র। মুক্তির জন্যে প্রাণের আকুলতা---

আরো কত কি যেন বলে গেলেন মাধুরীদি। তার সবটা আর কানে যায় নি আমার। আমি কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মত ঐ দূর বনানীর মাথায় বিশাল মূর্তিটার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থেকেছি আর ভেবেছি—ঐ যে আদিত্যমূর্তি ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী—উনিই মাধুরীদির মানসচক্ষে সন্ন্যাসের প্রতিমূর্তি। মাধুরীদির দেহমনের অধীশ্বর। মাধুরীদির ধ্যান-ধারণা, জীবন-যৌবন।

আমি মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছি সেদিন।

আরো একটা অদ্ভুত দিনের ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের স্কুলের ড্রইং-এর টিচার পবিত্র মাষ্টার মশাই আমায় একান্তে ডেকে বলেছিলেন—তুমি বুঝি মাধুরীদের বাড়ির পাশেই থাক?

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম পবিত্র মাষ্টার মশাই-এর দিকে। ওর গলার স্বরে মাধুরীদির

সংগে অন্তরংগ প্রীতির সুস্পষ্ট ছন্দ জড়িয়ে রয়েছে তাঁর উচ্চারণের প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে। বল্লেন—আমার এই চিঠিটা দিয়ে বোল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটা যেন পাই।

নীল খামখানা সযত্নে হাফ-প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফিরে এসেছিলাম বাড়িতে। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সেদিন শেষ ছিল না। ভাবছিলাম, এ কি রকম সন্ন্যাস। সেবাধর্মের জন্যে মাধুরীদি সংসার গ্রহণ করলেন না, সাকার ছেড়ে যিনি নিরাকার ব্রতই সম্বল করেছেন জীবনে—তাঁর জীবনে প্রেমের এ লুকোচুরির কি অর্থ। কিন্তু সেদিন কোন উত্তর খুঁজে পাই নি নিজের মনে। আর সন্তর্পণে মাধুরীদির হাতে পবিত্র মাষ্টার মশাই-এর চিঠি তুলে দিয়েও উত্তর নিয়ে যেতে পারি নি তাঁর কাছে।

একদিন আবার জিজ্ঞাসা করলেন মাষ্টার মশাই, নীলেশ, বলেছ তোমার মাধুরীদিকে আমার চিঠির কথা?

কিন্তু একথার জবাব না দিলেও তো কিছু বলার বাকী থাকে না। তাই নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ মাষ্টার মশাই-এর দিকে তাকিয়ে নাবিয়ে নিয়েছিলাম চোখটা।

দেখতাম ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পবিত্র মাষ্টার মশাই-এর মুখটা। ধীর শান্ত পরিচিত সেই মুখটা যেন অধীর চঞ্চলতায় কুঁচকে উঠত একটু। হয়তো বা পাথরের মত নিস্পন্দ চোখ দুটো স্কুলের জানলা পেরিয়ে, দূরের মাঠ পেরিয়ে, আঁকা বাঁকা রেল লাইন বরাবর এগিয়ে গিয়ে দৃষ্টির শেষ বিন্দুতে মিলিয়ে যেত কিছুক্ষণের মত। বুঝতাম পবিত্র মাষ্টার মশাই ভালবেসেছিলেন মাধুরীদিকে।

তারপর আমরা ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়। যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। দলে দলে লোক কলকাতায় ফিরছে। বাড়তি লোকেরা রাতারাতি শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কয়েক বছরের মত গড়ে ওঠা মুখরিত জনপদ আবার স্বাভাবিক প্রশান্তির মধ্যে ফিরে পেয়েছিল নিজেকে। কিংবা হারিয়ে ফেলেছিল চিরদিনের মত। দীর্ঘ দশ বছর পর আবার ফিরে এসেছিলাম এখানে। এখন আমি সরকারী বড় চাকুরে। সেই আমি, যার অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যেও আলোর দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন আমার মাধুরীদি—আমার জীবনের অপরিসীম কৃতজ্ঞতার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছিলাম তাঁকে। জেলার কাজ সেরে ফিরে যাবার পথে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে সোজা হাঁটা দিলাম শহরের দিকে। সংগে অনিমেষ, আমার বাল্যবন্ধু। ওদের বাড়ি এই শহরে। ঠিকানা জানা ছিল। আসার আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। ঠিক সময়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল অনিমেষ। আমায় দেখে জড়িয়ে ধরল সানন্দে—বড্ড মোটা হ'য়ে গেছিস কিন্তু, তারপর কি খবর বল।

বল্লাম, ভাল—তোর খবর কি, বিয়ে থা করেছিস শুনেছি—এখন করছিস কি?

সারা রাস্তাটা দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছি, কত খোঁজ-খবর নিয়েছি। তাকিয়ে দেখেছি কত অল্প সময়ের মধ্যেই না বদলে গেছে সেই পরিচিত জায়গাটা। কোথাও নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠেছে, আবার যেখানে সেই পুরোণ লোকালয়ে জনবসতি ছিল সব চেয়ে বেশি—সেটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। ভেঙে গেছে পুরোণ বাড়ি-গুলো, এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। তবুও প্রথমটা কেন কে জানে সংকোচে মাধুরীদির খোঁজটাই নিজের থেকে নিতে পারি নি। ভেবে-ছিলাম অনিমেষ নিজের থেকেই কথাটা তুলবে। শেষ পর্যন্ত অগত্যা আমাকেই তুলতে হ'ল। বল্লাম—মাধুরীদির খবর বল—এখন কেমন আছেন? আছেন তো এখনো, না সন্ন্যাসিনী হয়ে গৃহ-ত্যাগ করেছেন ইতিমধ্যেই।

অনিমেষ বলল—আছেন এখানেই। গৃহকে ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। গৃহের যা অবস্থা, তাতে তো মনে হয় গৃহই মাধুরীকে ত্যাগ করবে।

অবাক হয়ে চোখ তুলে অনিমেষকে প্রশ্ন করলাম—কেন, বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নাকি? শচীনবাবু, সমীর এরা সব?

অনিমেষ বলল—শচীনবাবু মারা গেছেন অনেকদিন। আর ভাই বলতে তো ছিল সমীর—সেটা মাধুরীর আগেই গৃহত্যাগ করেছে।

বল্লাম, তার মানে? সেও কি দিদির ধারা পেল শেষ পর্যন্ত।

অনিমেষ জবাব দিল, সেটা অল্প বয়সেই বড্ড বখে গিয়েছিল। ওর বাবা মারা যেতেই আরো সুবিধে হ'ল। মা মারা যেতেই আর ওকে পায় কে! সম্পত্তি ভাগাভাগি করে কাপ্তেনী করল দু'চার দিন। তারপর সেই যে কোথায় উধাও হ'ল কে জানে। মাধুরী এখন একা। সে চাকরীটাও মাধুরী খুইয়েছে কিছুদিন আগে। এখন অভাবেই তার সন্ন্যাস ধর্মটা বেঁচে আছে।

বুঝলাম না অনিমেষের কথা। অবশ্য আমার বিস্ময়েরও শেষ ছিল না। তাই প্রশ্ন করলাম—সে কি, তাহলে চলছে কি করে মাধুরীদির—আর তো কেউ নেই দেখবার।

অনিমেষ এবার বিব্রত হল বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ তো, যখন এসেছ এখানে, না হয় একবার গিয়েই দেখা করে সব জেনে নিও। সবই তো শোনা কথা। ওর মুখ থেকে সব খবরই পাবে।

আমি আর এ প্রসংগে কথা বাড়ালাম না। কিন্তু মাধুরীদির জন্যে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করলাম। সেই আগের মত, যখন একবেলা মাধুরীদির সঙ্গে দেখা না হলে বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। রোজ সকালে পড়তে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম কখন মাধুরীদি তার নদীতে নিত্যকার স্নান সেরে ফিরে আসবেন।

অনিমেষের সঙ্গে গল্প করতে করতে এসে পৌঁচেছি ওর বাড়িতে। তবু মুহূর্তের জন্য ছেদ পড়ে নি মাধুরীদির আলোচনা। নতুন নতুন সে সব কাহিনী। কত নতুনত্বের ছোঁয়ায় অভাবনীয় সে পরিবর্তন। কোনটা অবিশ্বাস্য, কোনটা অস্বাভাবিক, কোনটা আবার অচিন্ত-নীয়। আমি বিহ্বলের মত শুনে যাচ্ছিলাম সে সব কথা আর জন্ম অজানার দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছিল আমার হৃদয়ের বিলম্বিত ছন্দ।

সেই দিনই সন্ধ্যের পর মাধুরীদির সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ছিল অনিমেষ। তবে ওর কথা আমায় রাখতে হয়েছিল, ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেই আমি গিয়েছিলাম মাধুরীদির বাড়ি। কতদিন আসি নি এখানে। তাই সবটাই সন্ধ্যের অন্ধকারে কেমন অচেনা লাগছিল আমার কাছে। কতদিনের পরিচিত পথঘাট, কত বদলে গেছে এর মধ্যে। বরং মনে হ'ল আগে যেখানে জনবসতি কম ছিল, এখন সে দিকটাতেই নতুন মানুষের বসবাস বেশি হয়েছে। আর এ কিটা অনুপাতে ফাঁকা হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। মাধুরীদিদের বাড়িটা সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এক লহমায় অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না যে, কোন রকমে নিজের অস্তিত্বটা বক্ষা করে টিকে রয়েছে বাড়িটা। আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে ফেলেছে বাড়ির নীচের তলাটা। দোতলার অন্ধকার ঘরের একটামাত্র খোলা জানলা দিয়ে অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা ভেসে এসে বাড়ির শেষ বাসিন্দার অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিচ্ছে কোনক্রমে। আমি সেদিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর দ্রুতপায়ে অনেক দিনের পরিচিত খিড়কির দরজার সামনে এসে পৌঁছেই সভয়ে দু'হাতে ঠেলতে সুরু করলাম দরজাটা। ভেবেছিলাম এখুনি হয়তো ওপর থেকে ভেসে আসবে সন্ন্যাসিনী মাধুরীদির পরিপুষ্ট কণ্ঠস্বর। তারপর নিচের সিঁড়ি বেয়ে আগের মত তরতর করে নেমে এসেই আমায় দেখে প্রচণ্ড বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠবে মাধুরীদি। কিন্তু তখনও জানতাম না সে বিস্ময় শুধু আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ভেজান দরজাটা ঠেলাঠেলিতে আচমকা খুলে গেল। আমি যেন আরো বিহ্বল হয়ে পড়লাম। তাই প্রথমটা খেয়াল করি নি ঘন অন্ধকার সিঁড়ির সংকীর্ণ গলিটার মুখেই ব্যাকুল প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে এতক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করছিলেন মাধুরীদি। এবার হয়তো নিশ্চিন্ত হলেন মাধুরীদি। তাই বিনা দ্বিধায় ভেতর থেকে নির্দেশ দিলেন আমায়, চলে এসো আমার সঙ্গে।

একটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে উঠলাম। একি, ভুল করছি না তো। কিন্তু তাই বা কেন? অনেকদিন হলেও মাধুরীদির কণ্ঠস্বর যে আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না, তাও তো জানি। তবে আর দ্বিধা কেন? আবার এগিয়ে চললাম। ঘন অন্ধকারের মধ্যেই আমি মাধুরীদিকে অনুসরণ করে উঠে এলাম ওপরে।

ওপরে উঠে এসে আলোটা উস্কে দিতেই এতক্ষণে অনেকদিন পর দুজনে দুজনকে দেখে সভয়ে আঁতকে উঠলাম —একি?

মাধুরীদির চোখেও অপরিসীম বিস্ময় এ কি তুমি? আর আমি ভাবছি এ কি, মাধুরীদি তুমি? এ কি সাজে সেজেছ তুমি? আশৈশব পরিচিতি সেই সর্বত্যাগী বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি মাধুরীদির দেহের সেই নিরাভরণ সৌন্দর্য আজ কোন যাদুমন্ত্র বলে উড়ে গেল দমকা হাওয়ায়। আর তার জায়গায় জেগে উঠেছে মোহিনী মাধুরীর এ এক অন্য রূপ।

আমি তখনো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছি মাধুরীদির চোখের দিকে। মনের স্তিমিত স্মৃতির অতল অন্তে ডুব দিয়েও খুঁজে পাচ্ছি না আমার সামনে দাঁড়ান আজ রাত্রের মোহিনী মাধুরীদির মধ্যে—কোন এক অতীতের কোথাও এতটুকু লুকিয়ে থাকা সেই সন্ন্যাসিনীর বৈরাগ্যে ভরা সৌম্য মূর্তি। জানি না কোন একলব্যের অব্যর্থ শরসন্ধানে এতটা বদলে গেছেন মাধুরীদি। সঙ্গে নেই সেই পরিচিত বৈরাগ্যের প্রতীক গেরুয়া। হয়তো বা কোন স্তব্ধ অলস বেলার অলক্ষ্য অবসরে মাধুরীর মনের সংগে সংগতি রেখে বিবর্ণ হয়ে সে রং মিলিয়ে গেছে সেই ক্লান্ত নিষ্ফল অতীতের মাঝে। তার জায়গায় ঝলমলে দামী শাড়ি যেন নিশানা উড়িয়ে প্রচার করছে মাধুরীর অনন্ত প্রাচুর্যের গোপন মর্মকথা।

কখন নিজের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম খেয়াল করি নি। তাই আর একবার তাকালাম মাধুরীদির দিকে। তখনো যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি মাধুরীদির। হয়তো নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন বলেই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন আরো বেশি। তাই তাঁর দৃষ্টিতে জড়িয়ে রয়েছে অব্যক্ত বেদনার তির্যক অভিব্যক্তি। আমি নির্বাক, মাধুরীদি বিহ্বল।

কতক্ষণ কেটে গেছে এভাবে খেয়াল ছিল না আমার। তবুও ভেবে চলেছি কিসের জন্যে মাধুরীদির এই প্রতীক্ষা।

খেয়াল হ'ল মাধুরীদির চোখে হঠাৎ জাগা চাঞ্চল্য অনুসরণ করে। বুঝলাম একটু আগেও যে চোখ শূন্যতার অস্ফুট বেদনায় ভরে উঠেছিল ছলে, সে শূন্যতা পূর্ণ হতে চলেছে। মাধুরীদির দীর্ঘায়ত কালো চোখে নিবিড় করে নেমে এসেছে পরিপূর্ণতার ছায়া। প্রথমটা বুঝতে পারি নি কখন অলক্ষ্যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পবিত্র মাষ্টার মশাই।

আমি অভিভূতের মত আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। তবে ওদের মিলিত দৃষ্টির এক চকিত অলক্ষ্য মুহূর্তে ছিটকে বার করে নিয়ে এসেছিলাম নিজেকে। তারপর মিশে গিয়েছিলাম বাইরের ঘন অন্ধকারে ঢাকা পরিত্যক্ত প্রান্তরে। ফিরে আসতে আসতে ভেবেছি, একি হ'ল মাধুরীদির। যে পথ অনেক সহজভাবে পাড়ি দিতে পারতেন তিনি—সে পথ এমন দুস্তর হয়ে রইল কেন তাঁর জীবনে। যে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন নিজের জীবনের মধ্যে—তার প্রত্যুত্তর এমন নির্মম হয়ে উঠবে মাধুরীদির জীবনে—কে ভাবতে পেরেছিল সে কথা।

আজও মনে পড়ে মাধুরীদির সেই ছবি, যে ছবি আমি হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভালবাসতে পারি নি। জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাই নি। সেই সুন্দরী মাধুরীদি, সর্ব ইন্দ্রিয়মুক্ত সন্ন্যাসিনীর জীবনদর্শনের পরিণতিতেও কি তার সে দিনের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন মাধুরীদি। কি জানি কোনটা সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন মাধুরীদি।

তবু আজ ভাবি—যা দেখি নি সেদিন, সেটুকুও মাধুরীদির চোখে দেখে এসেছি। তাই বলছিলাম শেষটা সবটা দেখি নি; কিন্তু না দেখেও ফিরে আসি নি। যক্ষ কৃপণের মত সঞ্চিত জীবন-যৌবন একদিন অকৃপণ হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন মাধুরীদি।

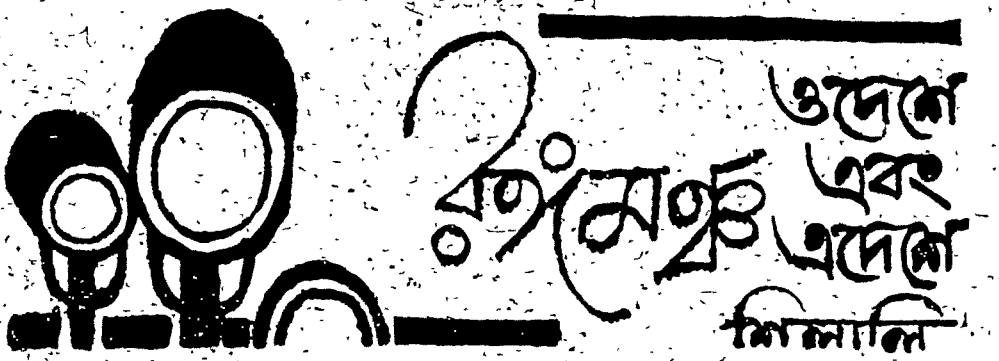


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

খ্যাতির চরমে উঠেও, কিন্তু আরভিং বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি। কিন্তু, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল এমনই যে, এই সব সমালোচকেরাও প্রতি পদে পদে আরভিং-এর বিরুদ্ধতা করেও তাঁর অভিনয় দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। বার্নার্ড শ' Saturday Review-তে নিত্য নিয়মিত আরভিং-এর প্রতি যে কশাঘাত করতেন, তা সময়ে-সময়ে ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। অথচ শ'ই আবার মনেপ্রাণে আশা করেছিলেন যে, আরভিং এবং এলেন টেরী তাঁর The Man of Destiny নাটকটি লাইসিয়ামে অভিনয় করবেন।

অবশ্য শ'য়ের এ সব আক্রমণের অন্তরালে বোধহয় এই উদ্দেশ্য ছিল যে, এর দ্বারাই তিনি থিয়েটার অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন—অনেকটা সফলও হয়েছিলেন এ-বিষয়ে। গর্ডন ক্রেগের মতে হেনরী আরভিং ছিলেন সর্বগুণসমন্বিত আদর্শ অভিনেতা। আরভিংকে ক্রেগ গুরুর মত শ্রদ্ধা করে এসেছেন আজীবন। থিয়েটার ওয়ার্লডে আজ দেখতে পাই শ'-এর নাম অনেকটাই নেমে আসছে। তেমনি আবার ক্রেগের যশ এবং খ্যাতি ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠছে। এ ধরণের পুনর্বিচার এবং পুনর্বিমূল্যায়ণ সাহিত্য, কলা, অভিনয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুগে যুগেই হয়ে থাকে। অস্কার ওয়াইল্ডের কেসটাই ভেবে দেখুন না। এক সময় West End-কে যে নাট্যকার মাতিয়ে রেখেছিলেন, তাঁকে পরে কোথায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ছাত্র-জীবনে অধ্যাপকেরা তো ওয়াইল্ডকে আর্টিফিসিয়াল, কথার ফুলঝুরি এই সব বলেই উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু যে নাট্যকার Lady Windermare's Fan, A Woman of no improtance or Importance of being Ernest নাটক লিখেছেন তাঁকে কি অত সহজে নামিয়ে দেওয়া চলে? আজকের যুগে আবার ওয়াইল্ডের ভাগ্যসূর্য ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে।

তেমনি আবার বার্নার্ড শ'কেও অযথা নামিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও সমর্থন করা যায় না। সমস্যামূলক নাটক লিখতে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। বোধহয় রুশী নাট্যকার বিয়া খানিকটা শ'য়ের পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

যাই হোক, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে, লণ্ডনে একটি থিয়েটারও আরভিং-এর নামানুসারে নামকরণ হয় নি দেখে। লেষ্টার স্কোয়ারের কাছে একটি অতি ছোট (আমাদের কলকাতায় থিয়েটার সেণ্টার হলের মত) থিয়েটারের নাম অবশ্য দেওয়া হয়েছে Irving Theatre. এর মালিক আবার এক বাঙালী ভদ্রলোক—শ্রী ডি কে চৌধুরী। এ হলে কিন্তু থিয়েটার হতো না। মাঝে মাঝে নাচ-টাচের আয়োজন করতেন মিষ্টার চৌধুরী। আর দু'একজন ভারতীয় ছেলে দু'বছরে, পাঁচবছরে কোন ভারতীয় নাটক এখানে ১৫০।২০০ ভারতীয় এবং অভারতীয় দর্শকদের সামনে অভিনয় করে দেখাতেন। দর্শকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হতেন নিমন্ত্রিত অতিথি। তবে প্রডিউসাররা দেশে ফিরে গল্প করতে পারতেন যে, লণ্ডনে নাটক প্রডিউস করেছি।

আরভিং-এর নামানুসারে থিয়েটারের নামকরণ ব্যাপারটা নিয়ে আমার একবার মিষ্টার থর্নের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিলো। মিষ্টার থর্ন লেখেন—

I quite agree. Sir Henry Irving was a giant and his reign at the Lyceum was charged with dignity and genius. One of the most nauseating in recent years, for me, at any rate, was the transformation of the Lyceum into a vulgar Palais De Danse. The sacred walls are now reverberating to the rancous strains of Bebop and the 'Crawl' or is it the 'Creep'? Awful. I saw Irving at the Theatre Royal Drury Lane in, I think, 1904. I was about eighteen. The play was Dante.

There is, by the way, a very small theatre near the Irving Statue, the Irving Theatre, a sort of 'Shop Window' theatre I believe. Seats about 250. The old Green Street has been renamed

Irving Street, I see that you mention this.

You might write an article for the stage upon this subject of the renaming of the Lyceum. I have a horrible feeling that it is only a matter of time before the old theatre is demolished. The Gaiety Theatre opposite is shortly to be demolished to make room for an enormous traffic Circus !

I wish that you could have visited the recent exhibition of Irving relics in Albermarle Street. They had his spectacles, his gold watch and many bits and pieces —manuscripts, programmes etc. I went there twice and met Ellen Terry's niece, a daughter of Gordon Craig.

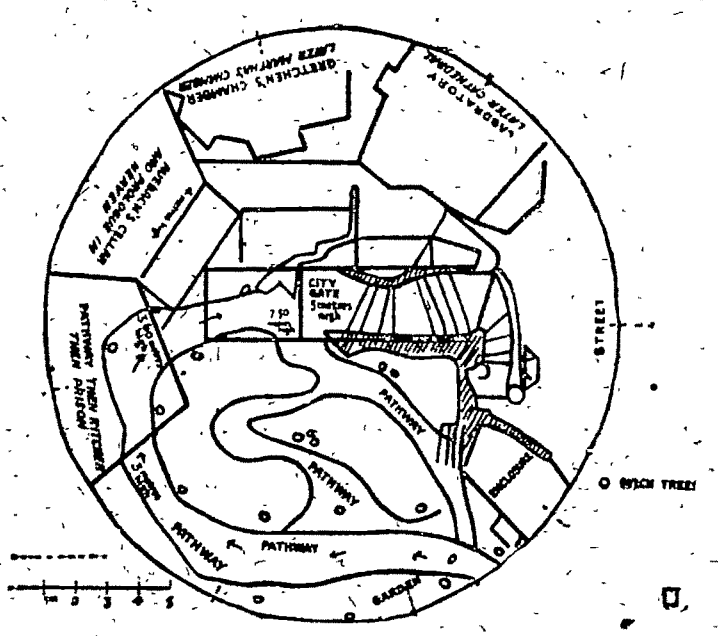


● রাইনহার্ট প্রযোজিত 'Faust'-এর Setting.

I knew Laurence Irving and was in his company at the Duke of Yorks Theatre in 1910—the play was 'Margaret Catchpole'. The Ipswich Drama. Sir Godfrey Tearle was in the cast, then a young man of about twenty five. Laurence Irving was the first to use the cinema screen in a play. Margaret's famous ride on horseback was filmed. She arrived at the door of a cottage, then up went the Silver Screen and Mabel Hackney ( Mrs. Laurence Irving ) was seen upon the stage at the door of the cottage ! The horse being liberally lathered with soap !

As you may know, Laurence Irving and his wife were drowned on the 'Empress of Ireland' on the voyage back to England from New York. This was in the year 1912. They had made their first great hit with the play TYPHOON, A Japanese drama. They found the body of Laurence clutching a piece of his wife's nightdress. A horrible business.

But excuse this gush of memory ! You certainly are busy and I am sure that you will greatly enjoy, your visit to France. Which reminds me that I did actually meet the great Cognelin. He gave me several auto-raphed photos. He came to London with French Company and played about four different parts at, then, His Majesty's theatre. About 1910.'

লরেন্স আরভিং-এর দ্বারা compiled স্যার হেনরীর লেকচারসের একটি বই পরে আমি Foyles-এর rare books' dept. থেকে কিনি। এতে লরেন্স ও তাঁর স্ত্রীর হাতে আঁকা একটি gift-card লাগানো থাকাতেই বইটির কদর বিশেষভাবে বেড়ে গেছে।

( ক্রমশ )

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান
শ্রীঅরবিন্দের
ANANDAMATH
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ
● আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাষ
● আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
● আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।
আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে
ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত
তাই প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।
মূল্য—তিন টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বাপন বহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# শহর কলকাতা

● রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের 'মার্বেল প্যালেস'।

## সেকালের চোরবাগান, একালের মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

সেই এক কাহিনী, যার অস্থিসার দেহ গড়াগড়ি যাচ্ছে স্মৃতির তেপান্তরে—যা প্রবীণের এবং প্রায়ান্ধকার সায়াহ্নের কুহেলিজালে। তবু যুগের পর যুগ পেছনে ফেলে, আজ যদি তাকে আলোয় এনে তুলে ধরা যায়—ক্ষতি কী? মুখে তার অপ্রত্যয়ের জরা, ভঙ্গীতে অসামঞ্জস্যের বিকৃতি, তবু প্রসাধনের মহিমা যদি লাবণ্য কিছু ফেরায়—হয়তো কৌতূহল তাহলে অনীহাশ্রয়ী থাকবে না। তাতে অন্বিষ্টের স্থিতি অনিশ্চিত হলেও, সে হয়তো ধেয়ে আসবে। কারণ সুযোগ পেলে ধাবিত হওয়াই তার ধর্ম। তাছাড়া মিটলেও মিটতে পারে তার দুরন্ত তৃষ্ণা—যদি ইতিহাস কিছু ভুলে সেখানে উঁকি মারে।

অতএব সেই এক-যে ছিলেন রাজা—যাঁর হাজার গোলায় ধান ছিল, এক শ' গোয়ালে গরু ছিল, হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল—লোকে বলতো রামানুজ তাঁর নাম। তাঁর পাইক ছিল, পেয়াদা ছিল, হাজার-কয়েক সেপাই ছিল, মন্ত্রী ছিল ত্রিকালজয়ী, অভাব ছিল না কিছুই। গঙ্গা থেকে দূরে, পশ্চিমে তাঁর মহল। তার শিখরদেশে দুলতো নিশান, তোরণদ্বারে তাল-তমালের ছায়া। হাওয়ায় ভাসতো ফুলের গন্ধ, সকাল-বিকেল গান গাইতো পাখি। সন্ধ্যা এলেই আলো জ্বলতো, ঘণ্টা বাজতো রাজ-দেউলে। আর উঠোনধারে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালতেন রাণী।

রাজার রাণী গুণবতী, এবং রূপবতী। রূপে-গুণে তুলনা তাঁর নেই। তাই রাজার মন রাণীর কাছে বাঁধা। তিনি কেবল রাণীর পাশেই ছায়ার মতো ঘোরেন। মহল ছেড়ে বাইরে আসেন না। রাজধর্মে খেয়াল নেই। তাই রাজকার্যেও অবহেলা তাঁর অশেষ। প্রজার ঘরে আগুন জ্বলে, ফসল জ্বলে মাঠে মাঠে। সেপাইরা সব শৃঙ্খলাহীন, বিরক্ত তাই মন্ত্রীমশাই। রাজা তবু মহল ছেড়ে, রাণীর ছায়া পাশ কাটিয়ে, ক'বার ডাকেই বাইরে আসেন না।

শেষে একদিন ঢেউ জাগলো, ঢেউ জাগল বিদ্রোহের, ক্ষেপে উঠলো সারা-দেশের প্রজা। সেপাইদের সব সঙ্গে নিয়ে রাজদ্বারে মন্ত্রী এলেন, সঙ্গে এলো পাইক-পেয়াদা যতো। এবার তাদের বজ্র-কঠিন ডাকেই, বাধ্য হয়ে বাইরে এলেন রাজা। সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রী বলেন রোষে: 'রাজা তুমি রাজ্য ছাড়ো, এ-দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও তুমি। অথবা যদি রাজ্য চাও, সান্ত্রী সেপাই-মন্ত্রী চাও, এবং চাও হাজার হাজার প্রজা, তাহলে আজ ত্যাগ করো সেই কুহকিনী রাণী—রাণীকে দাও নির্বাসন। নচেৎ তোমার

### শ্রীপদাতিক

মুক্তি নেই, রেহাই আজ পাবে না কিছুতেই।

রাজা ভাবলেন আকাশ-পাতাল। সময় নিলেন আরও দুদিন। তারপর শেষে ভেবে-চিন্তে স্থির হলো এই: রাজ্য নিয়ে রাজা থাকবেন। সঙ্গে থাকবে সান্ত্রী-সেপাই, পাইক পেয়াদা এবং মন্ত্রী। রাণীই কেবল রাজ্য ছেড়ে নির্বাসিতা হবেন।

তাই গঙ্গা পেরিয়ে পূর্বদিকে, কিছু-দূরেই একটি ছোটো মহল—গড়ে উঠলো রাজারই নির্দেশে। চারদিকে তার তরুলতার ছায়া, সামনে একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর। এখানেই রাণী নির্বাসনে এলেন। সঙ্গে এলো দাস-দাসী, এবং কিছু তীরন্দাজ সেপাই। রাণীর তারা সেবা করবে, রাণীকে তারা পাহারা দেবে, মেনে চলবে রাজ-নির্দেশ রাণীর প্রয়োজনে।

দিন কেটে যায় দীর্ঘশ্বাসে, রাত ভেসে যায় চোখের জলে, রাজার শোকে রাণী কেবল কাঁদেন। রাজধানীতে এমনই ধারায় রাজারও দিন কাটে। রাত কাটে তাঁর সর্বনাশের মতো।

এভাবেই দিন কাটতে কাটতে, শেষে একদিন গভীর রাতে, রাণী যখন ক্লান্ত চোখে ঘুমায়, এবং ঘুমায় তরুলতা, ঘুমায় দাস-দাসী ঠিক তখন এক তীরন্দাজ সেপাই—নিশাচর এক পাখির ডাকে চমকে উঠেই ভাখে: অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে ওই রাণীর দুয়ার ঘেঁষে! সেপাই ভাবে হয়তো ডাকাত অথবা দুর্জন। তাই সে হাতে ধনুক তুলে ছুঁড়ে দেয় এক তীর। দুয়ার ঘেঁষে যে জন ছিল, সে-তীর এসে বিঁধলো তাকে, আর্তনাদে ঢ'লে পড়লো সেখানেই সে তখন।

রাতের শেষে নির্বাসিতা রাণী দুয়ার খুলেই চমকে ওঠেন হঠাৎ! হায় রে তিনি দেখেন দ্বারের কাছেই: বিষের তীর বুকে নিয়ে, প্রাণহীন দেহে প'ড়ে আছেন তাঁরই প্রাণের রাজা!

আছড়ে প'ড়ে রাজার বুকেই, রাণী কেবল কাঁদেন অকাতরে! কান্না তাঁর কে শুনবে, শোনার কেউ নেই। কেবল, নিজের কান্না নিজে শুনেই ধারণ করেন

রাজরক্তের তিলক। তারপর তিনি ক্লান্ত পায়ে, পুকুরধারে এগিয়ে আসেন একা। এবং তিনি রাজার কাছে ফিরে যাবেন বলেই, পুকুরজলে দিলেন মরণঝাঁপ।.....

রূপকথার মতো কাহিনী। অতএব রূপকথার সুরেই তার সমাপ্তি ঘটালাম এখানে। রাজা-রাণী অথবা রাজপুত্র-রাজকন্যাকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনীর অভাব নেই এ-দেশে। সুতরাং উল্লেখিত কাহিনীরও মূল্যায়ন হয়তো ধার্য হবে কেবল রূপকথার মূল্যেই। কারণ তা সত্যাশ্রয়ী ব'লে গ্রহণ করা অসম্ভব কিন্তু কাহিনীর সেই রাণী যেখানে নির্বাসিতা হয়েছিলেন, সে-অঞ্চলই যখন পরবর্তীকালের চোরবাগান ব'লে উল্লেখ করেন প্রবীণের দল, তখন অবিশ্বাস্য হলেও, খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েই ধারণা করা যায়ঃ হয়তো অনেককাল আগে, কোনো এক সামন্ত রাজা বা অনুরূপ কোনো ভূ-স্বামীর অধিষ্ঠান ছিল গঙ্গার ওপারে। হয়তো পারিবারিক কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তাঁর মহিষী। তিনি তাই নির্বাসিতার মতই জীবন যাপন করেছিলেন গঙ্গার এপারে মহল তুলে—যা পরবর্তীকালের চোর-বাগান তারপর ঘটনাচক্রে হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছিল ওভাবেই। অবশ্য এ-কথার কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। তবে খানিকটা তার শিথিল প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, চোরবাগানে যখন গৃহ-নির্মাণের জন্য খননকার্য চলে, তখন ভূ-গর্ভ থেকেই আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন ইটের ঘাট বাঁধানো একটি পুকুর, আদি-পদ্ধতির একটি কোঠাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং কিছু ভগ্ন-বিগ্রহ।

সে যাই হোক, নির্বাসিতা রাণীর নিবাসস্থান অথবা অন্য যে-কোন সূত্রেই স্থাপিত সেই বাগানবাড়ি, তারপর থেকে পতিতই ছিল অনেককাল। যুগের পর যুগ পতিত থাকার ফলে, প্রকৃতির অমোঘ বিধানেই তার রূপান্তর ঘটে অরণ্যে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা কিছু পরে, উক্ত অরণ্যেই এসে আস্তানা গড়ে একদল ডাকাত এবং তারাই সেখানে প্রতিষ্ঠা করে এক ডাকাতে কালী। এই ডাকাতদলের উপদ্রব চলেছিল অনেককাল। ডাকাতি বা দস্যুবৃত্তি তাদের সহজাত হলেও, চৌর্যবৃত্তিই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাই তখন চোর বলেই তারা গণ্য হতো অনেকক্ষেত্রে এবং তাদের অধিকৃত বনাঞ্চলও শেষে 'চোরবাগান' নামেই খ্যাত হয় জনসমাজে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়, এই চোর বা ডাকাতদলের উপদ্রব যখন চরমে পৌঁছয়—তখন পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসী-দের আবেদনেই একদিন চোরবাগানে আসে নবাবের ফৌজ। তারা এসেই ডাকাতদলের উচ্ছেদ ঘটায়। ডাকাতরা কেউ নিহত হয়, কেউ বন্দী হয়। গভীর বনে লুকিয়ে থেকে কেবল রেহাই পায় একজন। যে রেহাই পায়, নবাবের ফৌজ স'রে যেতেই সে ধারণ করে সন্ন্যাসীর বেশ। তারপর ডাকাতে কালীর সেবায়েতরূপেই সে নতুন বাসা বাঁধে অরণ্যে।

তারপর দেখতে দেখতে আসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাল। তখন একদিকে সুতানুটী, অন্যদিকে গোবিন্দপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্গী দস্যুদের দলবদ্ধ আক্রমণ এড়াবার জন্যে গোবিন্দপুরেই বসতি স্থাপন করেন নবাবী আমলের অধিকাংশ বিত্তশালী। কিন্তু কোম্পানীর আমলে, ইংরেজ সরকার যখন দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গোবিন্দপুর গ্রামের দখল নিলেন, তখন বাধ্য হয়েই গোবিন্দপুর থেকে খিদিরপুরে সরে গেলেন ভূ-কৈলাসের রাজা, সুতানুটীতে এলেন ঠাকুর, মল্লিক, বসাক প্রভৃতি পরিবার এবং ঘোষ, বোস, দত্ত, মিত্র ও দে পরিবার এলেন চোরবাগানে। এখানে সর্বপ্রথম দে-পরিবারই আসেন। তাঁরাই এসে ক্রয় করেন চোরবাগানের অধিকাংশ জমি। এই বংশের প্রধান পুরুষ মুক্তারামবাবু বা মুক্তারাম দে। তৎকালে তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের দেওয়ান। তাঁর অর্থেই সংস্কার সাধিত হয় চোরবাগানের বনাঞ্চল, ভরাট হয়ে ওঠে

● মার্বেল প্যালেসের ভেতরে হলঘরের অজস্র মর্মর মূর্তি-সমন্বিত দৃশ্য।

পাকিল পরিখা এবং পত্তন ঘটে নতুন নতুন রাস্তাঘাটের। তাই পরবর্তীকালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এক প্রধান রাস্তার নামকরণ হয় 'মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট'।

চোরবাগানে প্রায় দে-বংশেরই সমসাময়িক দত্তবংশ এবং ঘোষবংশ। ঘোষবংশ অবশ্য বসতি স্থাপন করেন চোরবাগান এলাকার খানিকটা বাইরে। কিন্তু চোরবাগানের ডাকাতে কালী—যাঁর সেবায়েতরূপে তখনো ছিল সন্ন্যাসীর বেশধারী সেই ডাকাত, ঘোষবংশই তাঁর উদ্ধার করেন নতুন এক মন্দির গ'ড়ে ডাকাতে কালীকে নবরূপে প্রতিষ্ঠা করেন ঘোষবংশেরই শঙ্কর ঘোষ। বলা বাহুল্য, সেকালের সেই ডাকাতে কালীই বর্তমানে ঠনঠনের বিখ্যাত কালীমাতা।

দে, দত্ত, মিত্র, সরকার প্রভৃতি পরিবারের বসতি স্থাপন হেতু এবং বিশেষ ক'রে মুক্তারামবাবু কর্তৃক চোর-বাগানের অধিকাংশ অঞ্চল সংস্কার সাধিত হওয়ায়, তার পরিবেশগত দৃশ্য বেশ মনোহর হয়ে ওঠে। তাই পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আবার চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পরিবারের সঙ্গে আরও অনেক শিক্ষিত এবং বিত্তশালী পরিবারের বসতি গ'ড়ে ওঠে চোরবাগানে। তা'ছাড়া মুক্তারাম বাবু প্রদত্ত জমিতেই বসতবাটী প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন বিখ্যাত মৈত্রবংশ।

মানুষের পাশাপাশি অনেক দেব-দেবীরও শুভ পদার্পণ ঘটে এখানে। তন্মধ্যে অষ্টাদশভুজা গুহেশ্বরীদেবী অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন সাধারণের মানসলোকে। এ অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় আজ থেকে সত্তর বছর আগে। তাঁর প্রতিষ্ঠাত্রী কালীমতী দেবী। মুখোপাধ্যায়-বংশের বর্তমান উত্তরপুরুষেরা ব'লে থাকেন: সত্তর বছর আগে পশুপতিনাথের দর্শন-উদ্দেশে পুত্র আশুতোষের সঙ্গে নেপাল যাত্রা করেছিলেন কালীমতী দেবী। সেখানেই তিনি পশুপতিনাথের পাশে অষ্টাদশভুজা গুহেশ্বরীর দর্শন পান। গুহেশ্বরীর দর্শনলাভের পর নেপালের গিরিশিখরেই তিনি নাকি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। তারপর যখন কলকাতায় বা চোরবাগানে তিনি ফিরে আসেন, তখন উক্ত দেবীই আবার দর্শন দান করেন স্বপ্নে এবং আদেশ করেন কালীমতীর গৃহ প্রাঙ্গণেই

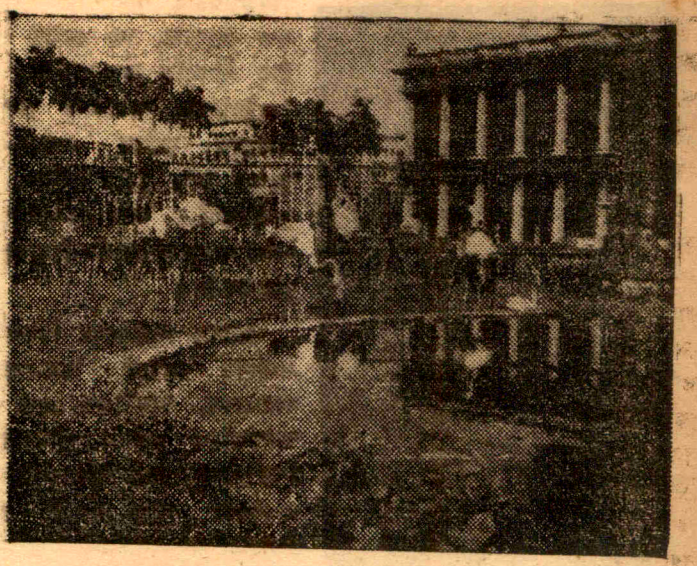

● মার্বেল প্যালেসের উদ্যানের একটি দৃশ্য।

তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সুতরাং স্বপ্নাদেশ পেয়েই একদিন গঙ্গাস্নানের পর অষ্টাদশভুজার প্রতিষ্ঠা করেন কালীমতী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গুহেশ্বরী-দেবীই সম্ভবত একমাত্র অষ্টাদশভুজা কালীপ্রতিমা কলকাতার।

চোরবাগান বা মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটের আরেক প্রান্তে তৎকালেই প্রতিষ্ঠা পান জগন্নাথ দেব। তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন নীলমণি মল্লিক এবং নীলমণির বর্তমান উত্তরপুরুষরাই আজ জগন্নাথ দেবের সেবায়েত।

অতি বাল্যকালে, পূর্বপুরুষদের সঙ্গে গোবিন্দপুরেই বসবাস করতেন নীলমণি মল্লিক। শোনা যায়: এই মল্লিকরাই নাকি আদিকালের চাঁদ সওদাগরের বংশধর। তাঁদের কৌলিক উপাধি শীল। পরে মুসলিম শাসকদের কাছ থেকেই তাঁরা মল্লিক উপাধিতে ভূষিত হন। অনেকে মনে করেন: যেহেতু কৌলিক উপাধি তাঁদের শীল, ঠিক সেইহেতু প্রথমদিকে তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ। কারণ 'শীল' শব্দটি তথাগত বুদ্ধের পঞ্চশীল থেকেই এসেছে। পরে যুগবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাঁদের ধর্মান্তর ঘটে। তাই আজ তাঁরা জগন্নাথ দেবের সেবায়েত।

কোম্পানীর দুর্গ প্রতিষ্ঠার কালে, গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটির পাথুরিয়া-ঘাটায় আসেন মল্লিকবংশ এবং স্থায়ী-ভাবে বসবাস করতে থাকেন সেইখানেই। পরে সেখান থেকেই চোরবাগানের এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের প্রান্তিক রেখায় জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নীলমণি মল্লিক। তিনি পাথুরিয়া-ঘাটাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রলালের জন্মের পর। তাঁর মৃত্যু ঘটতেই বিশাল সম্পত্তির অধিকার নিয়ে প্রচণ্ড কলহ বাঁধে শরিকদের মধ্যে। তাই নীলমণির বিধবা পত্নী নাবালক পুত্র রাজেন্দ্রলাল মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বসতবাটী ত্যাগ করেন, এবং এসে বসবাস করতে থাকেন চোরবাগানে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে।

● মার্বেল প্যালেসের উদ্যানের আর এক দৃশ্য

তখন নাবালক রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের তত্ত্বাবধায়ক বা Legal Guardian নিযুক্ত হন সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার স্যার জেম্‌স্ ওয়্যার হগ্। এই ইংরেজ ব্যারিষ্টারের অবদান রাজেন্দ্রলালের জীবনে অপরিমেয়। তাঁরই ঐকান্তিক স্নেহে এবং তত্ত্বাবধানে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সেই যথারীতি শিক্ষিত হয়ে ওঠেন রাজেন্দ্রলাল এবং ফিরে পান তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির সুবিশাল অংশ।

স্যার জেম্‌স্ ওয়্যার হগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চোরবাগানের মান্দর-পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডেই 'মার্বেল প্যালেস' বা মর্মর-খচিত রাজপ্রাসাদের নির্মাণকার্য সুরু হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। পাঁচ বৎসর পর যখন তার নির্মাণ কার্যের সমাপ্তি ঘটে, তখন রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বয়স মাত্র একুশ। শিল্প বা আর্টের প্রতি অনুরাগ তাঁর তখন থেকেই। তাই এই বিস্ময়কর মার্বেল প্যালেসের অভ্যন্তর ভাগ একদিকে যেমন পূর্ণ হয়ে উঠলো মূল্যবান আসবাবে, তেমনই অন্যদিকে সজ্জিত হয়ে উঠলো সারা পৃথিবীর অমূল্য শিল্প সম্ভারের রুচিসম্মত বিন্যাসে। আজও এখানে চির-নবীন ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করছে অজস্র মূর্তি-সম্ভার—যা সারা পৃথিবীরই পক্ষে ভাস্কর্যের এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। এই মূর্তি-সম্ভারের মধ্যে এ্যাপোলো, ডায়না, মারাকউরী, ভেনাস এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধারাবাহিক মূর্তিপুঞ্জ যে কত প্রাণবন্ত, তা চোখে না দেখলে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আরেকটি বিশাল মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে এখানে—যা ওক বৃক্ষের কাণ্ড দিয়ে নির্মিত। এ-মূর্তির তুলনা নেই। আজ এতকাল পরেও তার সমগ্র অবয়বের জ্যোতি-বিচ্ছুরণ এতটুকুও ম্লান হয় নি।

মার্বেল প্যালেসের দ্বিতল হলঘরে সমাহার ঘটেছে চিত্র-সম্ভারের—যা অনুপমেয়, অতীন্দ্রিয় এবং অন্তহীন আশ্চর্যের। এখানে পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর সমাবেশ এ-দেশের পক্ষে সত্যই গৌরবের। 'ম্যারেজ অব এ ভার্জিন,' 'শাওয়ার অব গোল্ড' প্রভৃতি ওরিজিন্যাল চিত্রশ্রেণীর যথাযথ মূল্য দিতে পারেন—এমন কোনো বিত্তশালীর অস্তিত্ব বিশ্বের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মার্বেল প্যালেসের এই আর্ট গ্যালারীর সঙ্গে বিলেতের বিশ্ববিখ্যাত আর্ট-মিউজিয়াম বার্লিন্টন্ হাউসের তুলনা ক'রে এম্পায়ার পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন :

'Hidden away in an agglomeration of bustees, remote yet penetrable within a stones throw of grimy bustling Chitpore Road there is situate in Chore Bagan what way very aptly be described as the Burlinton House of calcutta.'

অযোধ্যার শেষ নবাব প্রিন্স ওয়াজির আলীর পরিকল্পনা অনুসারে সেকালে এখানেই একটি চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মল্লিক। সেই চিড়িয়াখানারই উদাহরণস্বরূপ আজও মার্বেল প্যালেসে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অজস্র পাখি—যাদের বিচিত্র কলালাপে প্রতিদিন মুখর হয়ে থাকে সমগ্র মার্বেল প্যালেস।

প্যালেস-সংলগ্ন পার্ক বা উদ্যানের পরিবেশও চমৎকার। এদিকে-ওদিকে একাধিক প্রস্রবণ, মৃণালখচিত সরোবর, কৃত্রিম পাহাড় এবং তরুলতার রমণীয় সাযুজ্যে যে-ছন্দসী দৃশ্যের উন্মেষ ঘটেছে, তা সত্যই প্রাণভরে উপভোগ করার মতো। উদ্যানের প্রতিপ্রান্তেই পায়চারী করে ময়ূর-ময়ূরী এবং দীর্ঘ-চঞ্চু সারস। বর্ষা নামলেই ময়ূরী নাচে এবং অপরূপ পেখম মেলে তা উপভোগ করে ময়ূর তারপর তাদের কেকাধ্বনিত কণ্ঠ মেলায় মেঘ, হেসে ওঠে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

একমাত্র মার্বেল প্যালেস এবং সংলগ্ন পার্ক বা উদ্যান ছাড়া, চোরবাগান বা মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটের অন্যান্য অংশে আজ আর কোনো বাহার নেই, সঙ্গতিও নেই। অনিয়ন্ত্রিত বসতি, অপরিচ্ছন্ন বিপণি এবং বে-আইনী বাজার-হাট আজ প্রায় সর্বাংশেই গ্রাস করেছে তার পরিবেশগত কান্তি। দিনে দিনে রাজস্থানী মহাজনরা এসেই এ-অঞ্চলের বুক চেপে ধরেছে। আজ তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি তার মন্থর। আর কিছুদিন পরে তার এই মন্থর গতিও যদি অগতির মুখ চেয়েই স্তব্ধ হয়, তাহ'লে খুব একটা আশ্চর্য হবো না।

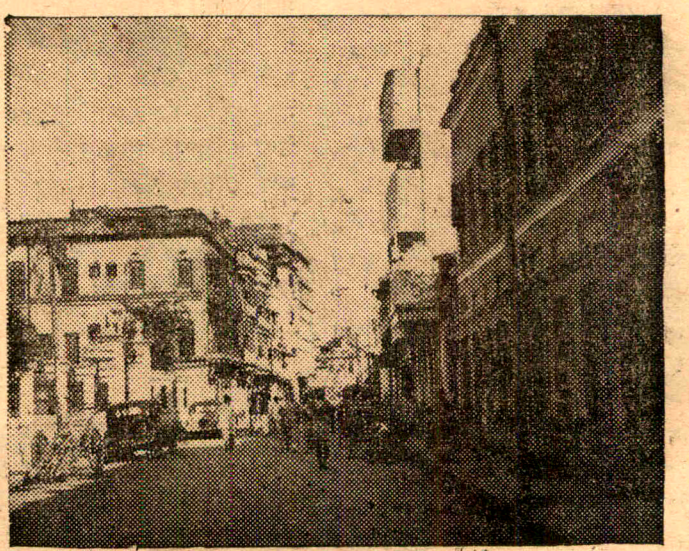

● মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য।

## রাজধানী ঃ

কয়েকদিন ধরে পার্লামেণ্টে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে যে সব আলোচনা হয়ে গেল, তাতে একটা জিনিষ অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে। কি সরকার পক্ষের, কি বিরোধী পক্ষের বক্তারা পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে পৌছলে পর তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কয়েদখানায় যে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু এখনও আটক রয়েছেন তাঁদের রক্ষা করবার, পাকিস্তানী গুণ্ডাশাহীর হাত থেকে সংখ্যালঘুদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করার, নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা করার কোন সুনির্দিষ্ট পথ দেখাতে পারেন নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেছেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি করা হয়েছিল ভারত তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও পাকিস্তান তা লংঘন করেছে

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এমন কি, পাকিস্তানের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে সব ভীত, সন্ত্রস্ত, অত্যাচারিত নরনারী ও শিশু ভারতে চলে আসতে চান, পাকিস্তান তাঁদের আসার পথেও প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টি করছে। পাকিস্তান সরকার যদি দেশ বিভাগের সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ধারাগুলি দু' পায়ে দলে পিষে ফেলতে থাকে, তবে সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য ভারতের মৌখিক সমবেদনা জানান ছাড়া আর কিছু কি করণীয় আছে ? নন্দজী বলেছেন, মাইগ্রেশনের ব্যাপারে প্রয়োজনমত উদারনীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা চলে আসতে চান তাঁদের নিরাপত্তার জন্য

পূর্ব জার্মানীর সহকারী প্রধানমন্ত্রী ( ডান দিক থেকে তৃতীয় ) মিঃ লুশনার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

চেষ্টা করা হবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে যে এখনও চূড়ান্ত গাফিলতি চলছে—এ সংবাদ কারও আজানা নেই। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের দরজা খোলা থাকবে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রয়োজনমত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটী হাই-কমিশনারের অফিসে এই জরুরী অবস্থার সময়ও সপ্তাহে মাত্র দু' দিন করে মাইগ্রেশনের জন্য দরখাস্তের ফর্ম বিলি করা হচ্ছে কেন এবং কেনই বা প্রতিদিন ফর্ম বিলি করা হচ্ছে না তার কৈফিয়ৎ কে দেবে ?

যে সমস্যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-মরণ ও ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত সেই সমস্যাতেও যদি সরকরের গা না ঘামে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তাড়াতাড়ি দেবার মত সামান্য কাজটাও করতে যদি না পারেন, তবে তাঁদের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি ?

কিন্তু ভারতের দিক থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট 'ইস্যু' করার 'গয়াং গচ্ছ' নীতি দর হলেই সমস্যা মিটবে না। সংখ্যালঘুদের চলে আসার ব্যাপারে পাকিস্তান যে বাধা সৃষ্টি করছে তা কেমন করে বন্ধ করা যাবে ? পথে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কিভাবে হবে ? পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু নিধনের প্রকৃত তথ্য এখনও পর্যন্ত ভারত সরকার সংগ্রহ করতে পারেন নি। কত হিন্দু পাকিস্তানে নিহত হয়েছেন, এক হাজার, না বিশ হাজার, না ত্রিশ হাজার তা ভারত সরকার জানেন না। কত ঘরবাড়ি ও গ্রাম শমশানে পরিণত হয়েছে, কত টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে তাও সঠিকভাবে জানা যায় নি। শ্রীনন্দ স্বীকার করেছেন যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাহায্য তাঁরা এ ব্যাপারে চেয়েছিলেন, কিন্তু সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। গভর্ণমণ্ট নিজেদের সূত্র থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন নি। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যে পাকিস্তান সরকার সহযোগিতা করতে রাজী হয় নি, সংখ্যালঘুদের নির্বিঘ্নে ভারতে চলে আসার ব্যাপারে সে সরকার সহযোগিতা করবে, এমন আশার ভিত্তি কোথায় ? নন্দজী

বলেছেন, 'নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পাকিস্তান কার্যকরী না করলেও বাতিল হয়ে যায় নি। ভবিষ্যতে এই চুক্তিতেই আবার প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।'

যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি গত ১৪ বছর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষা করতে পারে নি, ভবিষ্যতে তা রক্ষা করতে পারবে—এ বিশ্বাস আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি? একথা সত্য যে, মাইগ্রেশানের কড়াকড়ি শিথিল করার পরও পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দুর পক্ষে ভারতে চলে আসা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। একথাও হয়ত ঠিক যে, আবার কয়েক বছর পূর্ববঙ্গে

শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

সাময়িক তথাকথিত শান্তির লোক-দেখানো আবহাওয়া বিরাজ করবে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, পাকিস্তান যতদিন থাকবে, যতদিন পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের কব্জা আঁট থাকবে, যতদিন ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত বাঙালী জাতি দ্বিখণ্ডিত থাকবে—ততদিন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জীবনে কোন স্থায়ী শান্তি, কোন স্থায়ী নিরাপত্তা থাকতে পারে না। ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালের রক্তপ্লাবনের এতদিন পরে ১৯৬৪ সালে যদি পূর্ববঙ্গে ভারত-ইতিহাসের বৃহত্তম নরমেধ ঘটতে পারে, তবে ভবিষ্যতে আবার ঘটবে না, এমন ভরসা কোথায়? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চোরাবালির উপর কোন্ ভরসায় হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তানে সুখের প্রাসাদ গড়তে সাহস করবেন? কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন, 'লোকের মনে এ-ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব।' আক্ষরিক অর্থে পূর্ব-বঙ্গের সমস্ত সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে না, একথা হয়ত সত্য। কিন্তু এক হাজার, দু' হাজার বা পাঁচ হাজার নরনারীকেও যদি নিশ্চিহ্ন করা হয়, তবে তার প্রতিকারের কি প্রয়োজন নেই? যে পরিবারে স্ত্রী বা কন্যা ধর্ষিতা হয়েছে, যে পরিবারে পিতার চোখের সামনে পুত্র বা কন্যা গুণ্ডার ছুরিতে নিহত হয়েছে, যে পরিবারে অবিবাহিতা কন্যাকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, সেই পরিবারের মানুষ কি এ ভরসাতে বুক বাঁধবে যে, যতই হোক, শতকরা একশ'জন হিন্দুকে তো আর গুণ্ডারা সাবাড় করতে পারবে না?

এতদিন পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্র-নেতারা জোড়াতালি এবং গোঁজামিল দিয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গোঁজা-মিলের রাজনীতির বীভৎস ব্যর্থতা পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় আর্তনাদের ভেতর দিয়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে। একথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির গলিত শবকে কবর থেকে টেনে তুলে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের বাঁচানো যাবে না। আজ নূতনভাবে চিন্তা করতে হবে, রোগের গোড়া ধরে চিকিৎসা করতে হবে।

* * *

দ্বিতীয় বেলগ্রেড সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে কথাবার্তা এখন দিল্লীতে শোনা যাচ্ছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শ্রীসিং সম্প্রতি কায়রো এবং বেলগ্রেড সফর করে এই সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ করে এসেছেন। ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা গেল, এই সম্মেলন সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা দূর করার ব্যাপারে শ্রীসিংয়ের কূটনৈতিক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারত কেন আর একটি বেলগ্রেড ধরণের সম্মেলন সম্পর্কে এত উৎসাহ প্রকাশ করছে তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছিল। শ্রীসিং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, নিরপেক্ষ শক্তিসমূহের এই সম্মেলন

শ্রীদীনেশ সিং

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক আহূত দ্বিতীয় বান্দুং সম্মেলনের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মেলন নয়।

সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ আরো প্রসারিত করার বিষয়েও প্রস্তাব আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনের স্থানের ব্যাপারে কলম্বো এবং ভারতের মধ্যে টানাটানি চলেছে। কলম্বো বলছে, সেপ্টেম্বরে এই সম্মেলন কলম্বোয় হোক, ভারতে অনুষ্ঠানের জন্য আমাদেরও আগ্রহ কম নয়। মার্শাল টিটো আবার কায়রোয় অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। যুগোস্লাভিয়া এবং সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রীদের

সভা এপ্রিলের শেষে দিল্লীতে করার পক্ষে এই সভায় সম্মেলনের প্রস্তুতির চূড়ান্ত ব্যবস্থাদি করা হবে। এদিকে বড় রকমের সম্মেলন করার উপযোগী বিবিধ ব্যবস্থা নয়াদিল্লীতে হচ্ছে, বড় বড় হোটেলগুলিতে কামরা ভাড়া নেওয়া ইত্যাদির কাজও অগ্রসর হচ্ছে বলে জানা গেল।

* *

পূর্ব জার্মানীর সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীব্রুনো লুশনার দিল্লীতে এসেছেন; সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী উলফগ্যাং কিয়েসেওয়েটার বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীক্রিজকচ এবং আর কয়েকজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে এসেছেন।

শ্রীলুশনার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত এবং পূর্ব জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর করাই তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অনেক বিষয়ে ভারত ও পূর্ব জার্মানীর মতের মিল আছে এবং ঐ মতের ঐক্যই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ভিত্তি হবে। তিনি আরো বলেন, পূর্ব জার্মানী ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। সে সঙ্গে তিনি মনে করেন, তাঁর শিল্পোন্নত দেশ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপারে ভারতকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাহায্য দিতে পারে। শ্রীলুশনার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে দেখা করে উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কাশ্মীর সম্পর্কে স্বস্তি পরিষদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে ইঙ্গ-মার্কিন মনোভাব ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ মীমাংসাকে আরো সুদূর এবং অসম্ভব করে তুলেছে। তিনি বলেন, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব স্পষ্ট কারণেই ভারত অপেক্ষা পাকিস্তানের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। আমরা নিরপেক্ষ, পাকিস্তান দোসর। কাজেই পাকিস্তানের প্রতি তারা বেশি সহানুভূতিশীল।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনোভাবের নিন্দা করলে ভারতের অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হবে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচাগলা বলেন যে, দাতার মন জুগিয়ে চলতে না পারলে, ভারত বিশেষ কোন দেশের অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে---এরূপ

● শ্রীচাগলা

আশংকার ওপর ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে জোরালো সমর্থন করে নি বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, শ্রীচাগলা তা অস্বীকার করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি পরিষ্কারভাবে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ ইতিপূর্বেই ভারতের পক্ষে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

## আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ঃ

দ্বীপান্তরের কঠোর শাস্তির সঙ্গেই আন্দামানের নাম জড়িত বটিশ আমলে দেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের যে সব বীর সন্তান সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই জীবন-দীপ সেলুলার জেলের সুউচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে নিভে গিয়েছে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে তাঁরা যে মুক্তির দীপশিখা জালিয়ে গিয়েছেন, তা আজও উজ্জ্বল।

তাঁদের মহান পন্থা অনুসরণ করেই দেশ স্বাধীনতালাভ করেছে, কিন্তু সেই অমূল্য স্বাধীনতা রক্ষার নূতন দায়িত্ব এসে পড়েছে জাতীয় সরকারের ওপর, দেশবাসীর ওপর। বঙ্গোপসাগরে সদা-সতর্ক প্রহরী মত জেগে আছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। দেশের স্বাধীনতাকে নির্বিঘ্ন করবার উদ্দেশ্যে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নূতন ঘাঁটি। ১৫ই ফেব্রুয়ারী নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ ভাইস এ্যাডমিরাল বি এস সোমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘাঁটির উদ্বোধন করলেন।

আন্দামানের একটি সুপ্রাচীন আদিবাসী 'জারাওয়ার' নামানুসারে ঘাঁটিটির নামকরণ হয়েছে এই দিনই প্রথম ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এই দ্বীপে পদার্পণ করলেন। তবে, অন্যান্য পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবার সময়ে এ্যাডমিরাল সোমান এই দ্বীপে অনেকবার এসেছেন, কাজেই সেদিক থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে তিনি নবাগত নন।

ঘাঁটিটি বন্দরের মাটিতে অবস্থিত হলেও, নৌ-বাহিনীর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে এর নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় নৌ-জাহাজ 'জারাওয়ার'। পূর্ব উপকলের কামেডোরের পর এর পরিচালনা ভার ন্যস্ত থাকবে। তার সদর কার্যালয় বিশাখাপত্তনমে। ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে প্রায়ই নৌ-বাহিনীর শিক্ষা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে

থাকে। কাজেই ভারতীয় জাহাজগুলি যোগাযোগ এবং অন্যান্য সব রকম সুবিধা পাবে এই ঘাঁটির কাছ থেকে তাছাড়াও এই রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নে-ঘাঁটি থাকায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দ্রুত চলাচলের খুব সুবিধা হবে। আর এই দ্বীপপুঞ্জের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার কাজে জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলিও সাহায্য পাবে। এর ফলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও আসবে নতন প্রেরণা।

**মাদ্রাজ ঃ**

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ নানা দিক থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। সম্প্রতি তিনি মাদ্রাজের পৌরসভার নির্বাচনকে উপলক্ষ করে একটি দৃষ্টান্ত এবং আর একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। রেকর্ডটি হচ্ছে বক্তৃতাদানের বিষয়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারী পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি ১০৪টি সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রত্যেকটি বক্তৃতার সময়---মিনিট দশেক। কেবলমাত্র দু'টি সভায় এক ঘণ্টাকালেরও বেশি সময় বক্তৃতা দিয়েছেন।

এই সভাপতি কেবলমাত্র তাঁর নিজের দলের প্রার্থীদের সমর্থনে নয়---কমিউনিষ্ট ও তামিল ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থীদেরও সমর্থনে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আদর্শগত ভিত্তিতে। একদিকে সমাজতন্ত্রের শক্তি আর একদিকে সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তি। এরূপ ভাবে আদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচন দীর্ঘকাল ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা যায় নি। সমাজতান্ত্রিক শক্তির এই ঐক্যের প্রমাণ স্বরূপ দেখা গেছে কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলম, টি-এন-পি নেতা শ্রীবালাথনদামুথম্, শ্রী ই ভি কে সম্পত এবং শ্রীকন্নাদাসন কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। অপরদিকে কংগ্রেস নেতারা কমিউনিষ্ট পার্টি ও টি-এন-পি'র সভায়

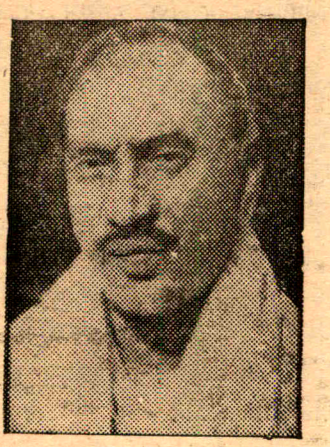

● শ্রীকামরাজ নাদার

প্রার্থীদের সমর্থনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভারতের রাজনীতিতে এই দৃশ্য বাস্তবিকই অকল্পনীয় হয়ে উঠেছিল। শ্রীনাদার দীর্ঘ দিনের জমাট বাঁধা বরফ ভেঙে নূতন জলের ধারা প্রবাহিত করে আদর্শগত ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শ্রীনাদারের প্রত্যেক বক্তৃতার মূল বক্তব্য---'প্রতিক্রিয়ার যোগ্যস্থান ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে।' তিনি স্বতন্ত্র পার্টিকে শোষক শ্রেণীর সংস্থারূপে আক্রমণ করে ডি-এম-কে দলকে ধনিক শ্রেণীর শোষণের বাহনরূপে অভিহিত করেন। সভায় বক্তৃতাদান ছাড়াও শ্রীকামরাজ নাদার নির্বাচনের

● শ্রীরাজাগোপালাচারী

জন্য পদযাত্রা করে ভোটদাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রত্যহ তিনি ১০।১২ জনকে নিয়ে পদযাত্রা সুরু করতেন, শেষ পর্যন্ত তা কয়েক শত জনের মিছিলে পরিণত হতো।

এই নির্বাচন উপলক্ষে শ্রী সি রাজাগোপালাচারীও বসেছিলেন না। তিনি ডি-এম-কের পক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। তিনি বলেছেন, সরকার ডি-এম-কে নেতাকে জেলে দেবার জন্য তিনি এই অভিযানে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তবে বয়সের ভারে তিনি শ্রীকামরাজের সঙ্গে বক্তৃতায় পেরে না উঠলেও, দৈনিক একটি সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রচার-সৌভাগ্য শ্রীকামরাজের অপেক্ষা বেশি। সংবাদপত্রসমূহে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

**কেরালা ঃ**

অবশেষে কেরালার রাজনীতিতে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণী সৃষ্টির নায়ক শ্রীচাকো মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোণঠাসা হয়ে মন্ত্রীবর শেষ পর্যন্ত ছুটে-ছিলেন শ্রীকামরাজের কাছে। কিন্তু শ্রীকামরাজ তাঁকে আশ্রয় দেন নি। অবশেষে মন্ত্রিত্ব ত্যাগের ঘোষণা ছাড়া তাঁর আর উপায়ান্তর থাকলো না। তবে যাবার আগে তিনি শাসিয়ে গেছেন এই বলে যে---তাঁর মন্ত্রিত্ব ত্যাগের জন্য জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এরকম অনেক চাকোই মনে করেছেন তাঁকে বাদ দিয়ে জগৎ চলবে না ; তারপরে ইতিহাস বলেছে অন্যকথা ; কারো অনুপস্থিতিতে জগতের গতি থামে না। চাকো নিজে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। বিধানসভার কংগ্রেসী দলের সাধারণ সভায় শ্রীশঙ্কর তাঁর সাথে শ্রীচাকোর যে পত্রালাপ হয়েছিল, তা প্রকাশ করে দেন এবং শ্রীচাকোর প্রত্যেকটি অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাও প্রমাণ করেন। ফলে বাধ্য হয়ে শ্রীচাকো

প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেও আপোস করার মত করুণা লাভ করতে পারেন নি।

তবে শ্রীচাকোকে নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে কিছুটা পরিবর্তন সূচনা হয়েছে। কংগ্রেসের ওপর বিরোধী দলের প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর এখন সংগঠনের সমর্থন লাভের জন্য ঝুঁকেছেন। রাজ্যসভার জন্য দু'জনকে মনোনয়ন দান এবং মুখপাত্র শ্রীষ্টিফেন কর্তৃক শ্রীচাকোর অপসারণ দাবীতে একথা প্রমাণিত হয়েছে। বাজেট অধিবেশনে প্রচণ্ড ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে; শ্রীচাকো বিদায় নিলেও তাঁর দলের লোকেরা রয়েছে এবং তাদের শ্লোগান—'নূতন নেতা চাই।'

শ্রীচাকোর স্থলে কোট্টায়ম জেলার পুনজার গ্রামের শ্রী টি এ খোমানোকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ করার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অবস্থায় মনে করা চলে না যে, শ্রীচাকোর পদত্যাগে মন্ত্রিত্ব সংকট সমাধান হয়েছে। একথা শ্রীশঙ্করের দলও মনে করেন। তাই দলের মুখপাত্র শ্রীষ্টিফেন বলেছেন যে, কংগ্রেসের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবার জন্য কেবলমাত্র শ্রীচাকোর পদত্যাগই যথেষ্ট নয় এবং 'পিচি'র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তেও সন্তুষ্ট হলে চলবে না। 'পিচি'র ঘটনার মধ্য দিয়ে একজন মন্ত্রীর চরিত্রের নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতার বিরুদ্ধে যেরূপ আক্রমণ করেছেন, সে সম্পর্কেও বিচার করতে হবে।

এদিকে ত্রিচুরে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সমস্ত বিরোধী দল এবং কংগ্রেসের মধ্যকার গণতান্ত্রিক অংশের প্রতি কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং শ্রীচাকোর অপসারণের দাবী জানাতে আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কেরালার প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ রাজনৈতিক ও সাধারণ জীবনে নৈতিকতার স্বাভাবিক মান রক্ষা করার কামনা করেন। কংগ্রেস সভাপতির কেরালা পরিদর্শনের সময় শ্রীচাকোর দল যে উচ্ছৃংখল আচরণ করেছিল এবং যেভাবে হুমকি দিয়েছিল, তা আজ রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় প্রত্যেক মানুষের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন আকারে দেখা দিয়েছে। পি-এস-পি চেয়ারম্যান শ্রীচন্দ্রশেখরণ বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও শ্রীচাকোর অপসারণ দাবী করে তাঁর দলের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। অবাক করে দিয়েছেন বিধানসভায় মুসলিম লীগ দলের ডেপুটি লীডার শ্রীহাসান গণি। তিনি বলেছেন, বিধা সভার বাজেট অধিবেশনে যদি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসে, তবে তাঁর দল কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবে।

* * *

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনার কেরালা পরিদর্শন করায় এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সাধারণ নির্বাচন নিকটবর্তী। কেরালায় মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬০ সালে; নিয়মমাফিক সাধারণ নির্বাচনের কাল ১৯৬৫ সালে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচকমণ্ডলী পুনর্গঠন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার কেরালা পরিদর্শন করেছেন। লোকগণনার ভিত্তিতে কেরালায় এখন ১২৬টির স্থলে বিধানসভার আসন হবে ১৩৩টি, লোকসভায় ১৮টি আসনের স্থলে হবে ১৯টি।

## মধ্যপ্রদেশ ঃ

মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মঞ্চ এখন দু'টি প্রশ্নে সরগরম হয়ে উঠেছে। এই দু'টি প্রশ্নে মিশ্র-মন্ত্রিসভা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন এই দু'টি প্রশ্নের একটি ভাড়াবৃদ্ধি, অপরটি বাস সার্ভিস জাতীয়করণ। এই দু'টি প্রশ্নের দরুণ যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করবে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি কোনদিকে গড়াবে। বাস সার্ভিস জাতীয়করণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে জনসংঘ; আর ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে জনসাধারণ। যে বিক্ষোভের তাপমাত্রা গত কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র অবশ্য তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় বাস সার্ভিস জাতীয়করণের কথা বলেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা একে নির্বাচনী ভাঁওতা মনে করেছিল, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন দক্ষিণপন্থী কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যপালের ভাষণে মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হওয়ায় দক্ষিণপন্থী ও জনসংঘের মত দলগুলি যেন

● শ্রী শঙ্কর

● শ্রী ডি পি মিশ্র

আঘাত পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠেছে। শ্রীমিশ্র অবশ্য হুঁসিয়ার মানুষ, তিনি বলেছেন, এই কার্যসূচীকে রূপ দিতে তিনবছর সময় লাগবে, একসঙ্গে জাতীয়করণ করা হবে না। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের মালিকানাধীন রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ২৮টি রুটের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তার কারণ হিসাবে তিনি প্রয়োজনীয় ১৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা নিয়োগের অসুবিধার কথা বলেছেন।

বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল জনসংঘ এবং আরো কিছুসংখ্যক সদস্য জাতীয়করণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং মুলতুবী প্রস্তাব ও বেসরকারী প্রস্তাব আনয়ন করার কথা চিন্তা করছেন।

কিন্তু বাসের ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবটাই সাধারণের বিক্ষোভের কারণ হয়েছে। প্রায় ৬৬ ভাগ ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পশ্চাৎপদ আদিবাসী সম্প্রদায় পর্যন্ত বিক্ষোভ জানিয়েছে। বিধানসভার সম্মুখে কমিউনিষ্ট পার্টি বিক্ষোভ জানিয়ে ঘোষণা করেছে—অযৌক্তিক বাস ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা হবে। জনসংঘ ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে। অন্যান্য দলগুলিও বসে নেই। এমন কি, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যরাও বিরুদ্ধতা করছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমান্দলইর মত ব্যক্তিও ভাড় বৃদ্ধিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেছেন। কয়েকটি জেলা ও মণ্ডল কংগ্রেস ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমিশ্র এসব প্রস্তাব উপেক্ষা করে সকল রুটে নূতন হারে ভাড়াধার্য করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের 'শক্তমানুষ' শ্রীমিশ্রকে থামতে হয়েছে, বিধানসভার কংগ্রেস দলের বিরোধিতার জন্য। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর শ্রীমিশ্র আর কখনো এভাবে নিজের দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হন নি।

বিধানসভার কংগ্রেস দল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমান্দলইর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা সাবকমিটীর সহযোগিতায় ভাড়াবৃদ্ধির সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য সাতজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটী গঠন করেছে।

## বিহার ঃ

বিহার সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী—জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দুই দলের কোন্দল সৃষ্টি করেছে

● শ্রী কে বি সহায়

এই দুইদল মন্ত্রীদের সমর্থক ও মন্ত্রীদের বিরোধী দল ট্রেড ইউনিয়ন আইনের প্রস্তাবিত সমর্থনের বিরুদ্ধে বিহারের প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা প্রতিবাদ জানিয়েছে। অবশ্য সংস্থাগুলির পরস্পরের ভাষ্য স্বতন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় সম্প্রতি এ-আই-টি-ইউ-সি; আই-এন-টি-ইউ-সি; এইচ-এম-এস; ইউ-টি-ইউ-সি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দলাদলি দূর করাই এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছাড়া অন্য সংস্থাগুলি এই সংশোধনী প্রস্তাবকে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেছে। এই সব সংস্থার মতে এরূপ আভ্যন্তরীণ দলাদলি একমাত্র জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেই রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী সদস্যতালিকা এবং বার্ষিক নির্বাচন পরিদর্শন করবেন।

* * *

শ্রী এল এন মিশ্র সম্প্রতি বিহার থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রীমিশ্র ১৯৬২ সালের পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তরের উপমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হতে পারেন নি। শ্রীমিশ্র কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ফোরামের নেতা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের ভাবধারা প্রচারের জন্য এই ফোরাম গঠিত হয়েছিল।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
---ইহাতে আছে---
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

* সাইপ্রাসের জটিল রাজনৈতিক অবস্থায় স্থানীয় গ্রীক অধিবাসিগণ কর্তৃক তুর্কীরা পরিবেষ্টিত হলে রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় পর্যবেক্ষক জেনারেল জ্ঞানী (দক্ষিণে) এতদুপলক্ষে সাইপ্রাসের পোলিসে এসেছেন।

**সাইপ্রাস ঃ**

শেষ পর্যন্ত সাইপ্রাস প্রসঙ্গ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উঠেছে। সাইপ্রাসের ধর্মযাজক-রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়সের দৃঢ়তায় এবং আমেরিকার পরামর্শে শেষ পর্যন্ত বৃটেন তার অনমনীয়তা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

দীর্ঘদিন আন্দোলন করার পর সাইপ্রাসবাসী যখন স্বাধীনতা অর্জন করল, তখন অনেকে সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সম্পর্কে আশান্বিত হলেও, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের গ্রীক-তুর্কী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আশংকাকেও অনেকেই উড়িয়ে দিতে পারেন নি। বলতে গেলে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই চলেছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ। গত বড়দিনের সময় এই বিবাদ চরম আকার ধারণ করেছে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চলেছে গুলীবর্ষণ—হতাহতের সংখ্যা অনেক। সাইপ্রাসের সমস্যা সাইপ্রাসের অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি—একে কেন্দ্র করে একদিকে তুরস্ক ও অপরদিকে গ্রীস এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। সাইপ্রাস সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে একে কেন্দ্র করে বড় রকমের কোন লড়াই বেধে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

সাইপ্রাসের বর্তমান অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বৃটেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাঁচিয়ে রেখে, পেছন থেকে খবরদারি করা বৃটেনের অতি পুরোণো সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। এই বিভেদের খেলা আমরা দেখেছি আয়ার্ল্যাণ্ডে, প্যালেষ্টাইনে ও ভারতে। একই খেলা চলেছে সাইপ্রাসে। সাইপ্রাসের অধিবাসীদের মধ্যে ৪,৫০,০০০ জন হল গ্রীক, আর মাত্র ১,০০,০০০ হল তুর্কী। অথচ পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও কম তুর্কীদের স্বার্থরক্ষার নাম করে বৃটেন এমন একটি সংবিধান সাইপ্রাসের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব।

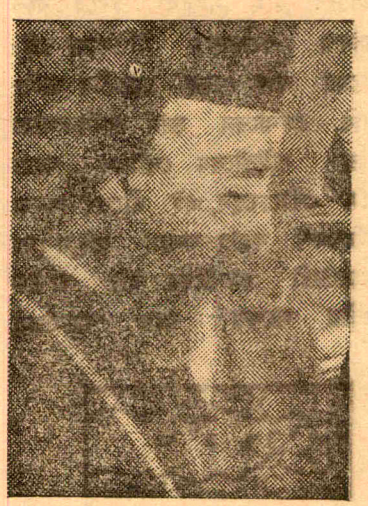

* প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিয়স

সংখ্যালঘুদের সম্মতি ছাড়া কোন কিছুই করা যাবে না, সংবিধানের এরূপ ব্যবস্থা। আইন সভায় অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন আইন পাশ হবে না, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত যে কোন আইন গ্রীক রাষ্ট্রপতি বা তুর্কী উপরাষ্ট্রপতি, যে কেউ একক ভাবে বাতিল করে দিতে পারেন। পাঁচটি প্রধান শহরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দু'টি করে পৌরসভা এবং এরূপ আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থা রয়েছে—এতে অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স দাবী করেছেন, সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সংবিধান সংশোধনের দাবী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কীরা ক্ষেপে উঠেছে সুরু হয়েছে দাঙ্গা। এই সঙ্গে এগিয়ে এসেছে বৃটেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার নাম করে। তুরস্কও নৌ-বহর প্রস্তুত করেছে সাইপ্রাস অভিযানের জন্য।

সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য

অনেক আলোচনা হয়েছে। বৃটেনের মাথাব্যথা তো আছেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ বল পর্যন্ত সাইপ্রাস ঘুরে গেছেন। কিন্তু কারও কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না।

বর্তমানে প্রথম প্রয়োজন হল দাঙ্গা বন্ধ করে শান্তিস্থাপন করা এবং উভয় সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বৃটেন প্রস্তাব করেছে, 'ন্যাটো' রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী সাইপ্রাসে মোতায়েন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু ম্যাকারিয়স এতে রাজি নন। 'ন্যাটোর' সৈন্য ঢুকতে দিলে 'ন্যাটোর' অন্তর্ভুক্ত তুরস্কের সৈন্যদল আসবে, যা সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীদের কাছে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। মিঃ বল প্রস্তাব করলেন—ন্যাটোর কর্তৃত্বাধীনে কমনওয়েলথের সৈন্য আসুক সাইপ্রাসে। ম্যাকারিয়সও অনমনীয়। তিনি কমনওয়েলথী সৈন্যকে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার দাবী জানান। তখন আমেরিকার পরামর্শে বৃটেন সাইপ্রাস প্রসঙ্গ রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপন করে। সাইপ্রাসের পক্ষ থেকে ও রাষ্ট্রসংঘে আবেদন জানান হয়। ম্যাকারিয়স দাবী করেছেন—সমগ্র বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা করা হোক এবং এই প্রসঙ্গে তুরস্কের আক্রমণাত্মক ভূমিকাও বিবেচনা করা হোক। যদি দরকার হয়তো সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসংঘের তদারকী সৈন্যদল আসুক।

সাইপ্রাসে বৃটেনের স্বার্থ অনেকখানি। পশ্চিম ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ ঘাঁটি হল সাইপ্রাস। সাইপ্রাসের এই ঘাঁটি বৃটিশ সামরিক কর্তৃত্বের হাতছাড়া হলে মুশকিল। সাইপ্রাসকে 'ন্যাটোর' প্রভাবের মধ্যে রাখা এবং তুরস্ককে কোনভাবে বিব্রত না করার জন্য বৃটেনের যে আগ্রহ, তাতে সমর্থন থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন। অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘের তদারকী ফৌজের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সৈন্যও যদি থাকে, তবে ভূমধ্যসাগরের এই অঞ্চলে সোভিয়েট অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং এতে করে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রস্তুতি যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই মিঃ বল ম্যাকারিয়সকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘে যাবার দরকার নেই। কিন্তু লাল পোষাক পরা এই পাদরী ভদ্রলোক মিঃ বলের প্রতি কথায় মাথা নাড়লেও শেষ পর্যন্ত নিজের জিদই বজায় রেখেছেন, রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাই।

সাইপ্রাস এখন নিরাপত্তা পরিষদের বিবেচনাধীন। সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রীকদের দাবী বেশ জোরের সঙ্গে সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ভারতীয় প্রতিনিধি জেনারেল জ্ঞানী হেলিকপটার করে সাইপ্রাসের পোলিস শহরে এসে পৌঁচেছেন, এই দ্বীপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টও বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন, আপোসের সূত্র খুঁজে বের করার জন্য।

কেবল সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠাই নয়, সাইপ্রাসের ভবিষ্যতের কথাও রাষ্ট্রসংঘকে ভাবতে হবে। সাইপ্রাস কি দ্বিখণ্ডিত হবে, না সমগ্র দ্বীপে সংখ্যাগুরু গ্রীকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, না বর্তমানের মত অচল অবস্থাই চলতে থাকবে? ভবিষ্যতই এর উত্তর দেবে।

## ইরাক ঃ

মোল্লা মুস্তাফা বার্জানির নেতৃত্বে ইরাকের উত্তরাঞ্চলের কুর্দ উপজাতি

* রাষ্ট্রপতি আরিফ

দীর্ঘদিন ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। গত সপ্তাহে এদের সঙ্গে ইরাকী সরকারের একটা অপোস হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আরিফের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে কুর্দরা অস্ত্রত্যাগ করেছে এবং ইরাকের শাসন মেনে নিতে সম্মত হয়েছে।

কুর্দদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কের কুর্দ অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে কুর্দস্থান গঠন করা। কুর্দদের প্রাধান্য ইরাকের উত্তরাঞ্চলেই প্রবল। যুদ্ধপ্রবণ এই উপজাতি কঠোর পরিশ্রমী এবং বহুদিন ধরে এরা ইরাক

সরকারের সংগে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইরাকের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাশেমের পতন ও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ কুর্দদের সংগে তাঁর দীর্ঘকালের বিবাদ। কাশেমের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাথ পার্টির নেতাদের মধ্যে কুর্দ সমস্যা সম্পর্কে দু'রকম মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ এদের সঙ্গে আপোস চাইলেও অনেকে আবার কঠোরভাবে এদের বিদ্রোহকে দমন করতে চেয়েছেন। জীবিত বা মৃত অবস্থায় বার্জানিকে ধরে দিতে পারলে ২,৮০,০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সোভিয়েট 'মিগ' বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছিল কুর্দ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তবু কুর্দদের শায়েস্তা করা যায় নি। তাই শেষ পর্যন্ত আরিফ এদের সঙ্গে মীমাংসা করতে চেয়েছেন। দীর্ঘদিনের সংগ্রামে ক্লান্ত বার্জানিও শান্তি চান। তাই তিনিও তাঁর দলবল নিয়ে আপোস করতে এগিয়ে এসেছেন। ইরাকী সরকার ঘোষণা করেছে, ইরাকী রাষ্ট্রজীবনে কুর্দদের যোগ্য স্থান দেয়া হবে এবং তাদের পৃথক সংস্কৃতি রক্ষার সকল আয়োজন করা হবে। কুর্দদের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, ইরাকী সরকারের সামগ্রিক শাসন তারা মেনে নেবে।

কুর্দরা আশা করছে, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তন করা হবে এবং উত্তরাঞ্চলে কুর্দপ্রধান আঞ্চলিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সম্ভব হলে, কুর্দস্থানের স্বপ্ন কিছুটা অন্তত সফল হবে। যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কুর্দ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর ইরাকের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।

**ফ্রান্স :**

দ্য গলের ফ্রান্সের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছেদ পূর্ণ হবার আর কিছু বাকি নেই। কাশ্মীরের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য রেখে ফ্রান্স দেখাতে চেয়েছে, সে এখন স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে।

কমিউনিষ্ট চীনকে মেনে নিয়ে ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুবই আঘাত দিয়েছে। তবু শোনা গিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ফ্রান্স স্বীকার করেছিল, কমিউনিষ্ট চীনকে মেনে নিলেও চিয়াং-চীন বা তাইওয়ানকেও (ফরমোজা) সে মানবে, তার সঙ্গে যে

* দ্য গল

কটনৈতিক সম্পর্ক আছে তা অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ 'দু-চীনকে' ফ্রান্স স্বীকার করবে ফ্রান্স কিভাবে এ অবস্থা মানিয়ে নেবে তা বলা শক্ত, তবে কমিউনিষ্ট চীন বা চিয়াং-চীন, কারও পক্ষেই এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা মেনে চলা সম্ভব নয়। চিয়াং কাইশেক যদি বা একে মেনে নেন, মাও-সে-তুং কিভাবে একে মানবেন ? তাই ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলের হয়ে দাঁড়িয়েছে

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ফ্রান্সের সঙ্গে 'জাতীয়তাবাদী' চীনের (তাইওয়ান) সম্পর্ক ছিন্ন হল এবং ফ্রান্স একটি চীনকেই (পিকিং) স্বীকার করছে। কিভাবে এ ঘটনা ঘটল, এ সম্পর্কে নানারকম কাহিনী শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ : পিকিং-এর পক্ষ থেকে দ্য গলের ওপর চাপ দেয়া হয় তাইওয়ানকে মানা চলবে না---চীন বলতে কেবল কমিউনিষ্ট চীনকেই স্বীকার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত দ্য গল রাজি হলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ? উপায় ? উপায় একটা অবশ্যই বের হল তাইওয়ানের ফরাসী দূত পিয়েঁর সলাঁদ তাইওয়ান সরকারের সঙ্গে দেখা করে গত সপ্তাহে বললেন, কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধি প্যারিসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাইওয়ানের সঙ্গে ফ্রান্সের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ কথা শুনে মুখরক্ষার জন্য তাইওয়ান সরকার নিজেরাই ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের কথা ঘোষণা করলেন। ফ্রান্সকেও আর কথার খেলাপ করতে হল না।

ফ্রান্সের এই কূটনৈতিক 'চালের' গল্পই সত্যি, না চিয়াং কাইশেক ফ্রান্সের 'বিশ্বাসঘাতকতায়' ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তা জোর করে বলা শক্ত।

**কিউবা :**

সম্প্রতি কিউবার কয়েকজন জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা সমগ্র লাতিন আমেরিকাতে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। গভীর সমুদ্রে মাছধরা-কালীন চারটে নৌকোতে অবস্থিত ২৬ জন জেলেকে জোর করে মার্কিন নৌবাহিনীর সৈন্যরা তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের ফ্লোরিডা জেলে আটক রাখে। ওয়াশিংটনের কেউই এটা কল্পনা করতে পারে নি যে, মার্কিন কার্যের পরিণতি এত সুদূরপ্রসারী হবে। সমর দপ্তর ভেবেছিল কিউবার মূল ভূখণ্ডে বিমান পাঠিয়ে গোয়েন্দাগিরি করার চাইতে জেলেদের ডিঙি-নৌকোগুলি অপহরণ করা কম বিপজ্জনক হবে। মার্কিন স্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট ভেবেছিল ফাইডেল ক্যাস্ট্রো গতান-

* সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সঙ্গে মিঃ ফাইডেল ক্যাস্ট্রো

গতিকভাবে মার্কিন কার্যের একটা মামুলী প্রতিবাদ করবে মাত্র এবং সেই প্রতিবাদপত্র তাঁরা যত্ন করে ফাইল-বন্দী করে রাখবেন। স্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট একথাও ভেবেছিল পৃথিবীতে প্রচার করা হবে যে, জেলেডিঙির লোকগুলি সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং এরা গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরূপ আচরণে কিউবাতে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিউবা যেভাবে প্রতিশোধ-মূলক মনোভাব গ্রহণ করে, তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তীব্র আলোড়ন দেখা দেয়। কিউবা থেকে সরকারীভাবে জানান হয় যে, কিউবার অন্তর্গত মার্কিন ঘাঁটি গুয়ানটানামোতে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিগত পাঁচ বছর ধরে মার্কিন অঞ্চলে জল সরবরাহের পাইপ লাইনগুলো, যেগুলো দু দেশের বিবাদের একটি বিশেষ যন্ত্র হিসাবে কাজ করছে, পাহারা দিয়ে আসছে। এমন কি, বিগত ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক কিউবাকে অবরোধ-কালে যখন গুয়ানটানামোর মার্কিন সামরিক বিভাগকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছিল, সেই সময়ও ক্রুদ্ধ কিউবার অধিবাসীদের হাত থেকে জল সরবরাহের পাইপ লাইনকে রক্ষা করবার জন্য ক্যাস্ট্রো সরকার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

কিউবার বৈদেশিক দপ্তর মার্কিন নৌ-বাহিনীর বিমান কর্তৃক জেলে-ডিঙিগুলো অপহরণকে জঘন্য দস্যু-বৃত্তিরূপে অভিহিত করেছেন। প্রধান-মন্ত্রী ফাইডেল ক্যাস্ট্রো রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

## পাকিস্তান ঃ

**ভুট্টোর প্রত্যাবর্তন ঃ** অনেক আশা নিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হয়ে মুখে চুনকালি মেখে ঘরে ফিরতে হয়েছে। এবারের কাশ্মীর বিতর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী এম সি চাগলার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ ও ভারত সরকারের দৃঢ় মনোভাব গ্রহণের ফলে ভুট্টোর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তানের আবদার মতো কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি—ভারতের পক্ষে সোভিয়েট সমর্থন তো ছিলই, তাছাড়া শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব গ্রহণের পরিবর্তে ভারত-পাকিস্তান সরাসরি আলোচনার স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। হতাশ ভুট্টো বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক আপাতত বন্ধ রাখার প্রস্তাব করেছেন। আবার মার্চের শেষদিকে বিষয়টি তোলা হবে বলে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। বিতর্ক মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করে ভুট্টো নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন, এবার নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কাশ্মীরে যদি জরুরী পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিলম্ব করার জন্য এত চেষ্টা কেন?

ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে চটাতে চায় না ঠিকই, তবে এবার তারা একথাও বুঝেছে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে একতরফা সমর্থন করলে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া কত তীব্র হতে পারে। এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর ফলে কি পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এখন পাকিস্তান কি করে তাই লক্ষ্য করার বিষয়। আজাদ কাশ্মীরের কর্তারা ইতিমধ্যেই হুঙ্কার দেয়া সুরু করেছে। চৌ-এন-লাই-এর পাকিস্তান সফরকালে নিশ্চয়ই আয়ুব-ভুট্টো কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। নতুন কৌশল একটা না বের করতে পারলে আয়ুবী শাসনের চলবে কি করে?

**পূর্ব পাকিস্তানে নতুন আন্দোলন ঃ** মৌলানা ভাসানী ঢাকায় এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন সুরু করা হবে। গণ-তান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকেও ১৫ই মার্চ 'ভোটাধিকার দিবস' রূপে পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে যদি এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তবে তাতে কেবল পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই জোরদার হবে না, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু-দের স্বার্থও অনেকটা নিরাপদ হবে।

# রঙ্গগৎ

## সমবায় ব্যবস্থায় চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা

সমবায় ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র-শিল্প কত দ্রুত বিকাশ লাভ করতে পারে, সম্প্রতি প্রদর্শিত পোলিশ চলচ্চিত্রে তার নিদর্শন আমরা দেখেছি। পোল্যাণ্ডে প্রযোজনা ক্ষেত্রে প্রযোজক থেকে ছোট টেকনিশিয়ান পর্যন্ত সকলের গঠিত এক একটি সমবায় চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর্থিক দায়িত্ব সরকারের। ছবিতে লোকসান হলে সমবায় সদস্যরা বোনাস গ্রহণ করেন না, এই মাত্র।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয় সম্পত্তি না হলেও, সমবায় প্রথায় প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং চিত্রগৃহ পরিচালনায় সরকারী উৎসাহ ও সহযোগিতা থাকা দরকার। ষ্টুডিও-কর্মীরা নিজেরা সমবায় ব্যবস্থায় ছবি নির্মাণ করতে পারেন। সমস্যা হচ্ছে আর্থিক। সরকার যদি প্রযোজনা ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থাগুলিকে ঋণদানে অগ্রাধিকার দেন তবে কর্মীরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন এবং এভাবে অনেক প্রতিভার বিকাশ সাধন হতে পারে। চিত্রগৃহের মালিকরা যেরূপ ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে তারও একমাত্র জবাব—সমবায় ব্যবস্থায় চিত্রগৃহ পরিচালনা। চিত্রগৃহের মঞ্জুরীদানের ব্যাপারেও সরকার সমবায়কে অগ্রাধিকার দিলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সিনেমাগুলির একচেটিয়া মালিকানা থাকে না।

সরকার যখন চলচ্চিত্র-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তি করতে চান না—বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সমবায় প্রথাকে উৎসাহ দিলে এই শিল্পের সংকট কিছুটা সমাধান হবে।

—সুজন।

## চিত্র-আলোচনা

### বিভাস

গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের অত্যাচার— প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। অচিনপুরের এল-এম-এফ ডাক্তার তারকেশ্বর রায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে চারিপাশের গ্রামের মানুষদের শুধু সর্বনাশই করে না, মহাজনী কারবারে ও নানারকম জঘন্য অছিলায় তাদের ভিটেমাটি-ছাড়া করে। বাড়ি থেকে বিতাড়িত, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত বিভাসকে একদা নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল তারকেশ্বর রায়। বিভাস একদিকে তার কম্পাউণ্ডার, অন্যদিকে আপন বিবেকের বিরুদ্ধেও অসৎ-কারবারের সহায়ক। এই বিভাস-ই হচ্ছে সমরেশ বসুর 'অচিনপুরের কথকতা' অবলম্বনে 'বিভাস' কাহিনী চিত্রের তথাকথিত নায়ক। কাহিনীর নায়কই শিকারী প্রেসিডেণ্টের ছল-বল সব কিছু আয়ত্ত ক'রে একদিন ইলেকশনে জিতে হারিয়ে দেয় তারকেশ্বর রায়কে। কাহিনীর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য জীবন ছায়াছবিতে ধরা পড়লেও তা পরিপূর্ণ নয় এই কারণে যে, নায়ককে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে হাজির করা হয়েছে। নায়কের ছায়ায় গ্রামীণ জনকের মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত নিরাশ্রয় বোধ করেছে এবং এই নায়ক এমন একজন নায়ক যিনি গ্রাম্য মানুষের রাজনীতিতে বিরক্ত হয়ে, প্রেসিডেণ্টের পদ তুচ্ছ করে তারকেশ্বরের কন্যা পদ্মর কাছে 'আত্মত্যাগ' করেছে। অর্থাৎ রূপালি পর্দার ঝোঁক যেদিকে যায় 'বিভাস' চলচ্চিত্রও সেই দিকে এগিয়েছে। স্বভাবতই গ্রাম্য জীবনের যে বলিষ্ঠতা আমরা আশা করেছিলাম, তার খণ্ডাংশ 'বিভাস' চলচ্চিত্রে পেয়েছি। কাহিনীর শেষে আমাদের এই কথাই মনে হয়, গ্রামের লোকগুলি নিন্দুক। তারকেশ্বরের কর্মচারী রামু বিভাস-এর নামে নিন্দা রটনায় সাহায্য করেছিল। কিন্তু নায়কের মন এমন বলিষ্ঠ নয়, যে ভাবতে পারে ভাল কাজ করতে গেলে মন্দ কথাও শুনতে হয়। বিভাস তা পারে নি এবং সঙ্গীতশিল্পী বা রাজনীতির কর্মী হিসেবেও তাঁর পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে নি। অবশ্য কাহিনীকে সিনেমার উপযুক্ত করে তুলতে হলে যা করা দরকার, তা করা হয়েছে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের বিচারে 'বিভাস' সার্থক।

'বিভাস' কাহিনী চিত্রের অভিনয়-নৈপুণ্য মনে রাখার মতো। প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত কমল মিত্র, নায়করূপী উত্তমকুমার, পদ্মর চরিত্রে ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও বৌদির ভূমিকায় অনুভা গুপ্ত সুন্দর অভিনয় করেছেন। রামুর চরিত্র রূপায়ণে ( যদিও এই চরিত্র রচনায় সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি ) বিকাশ রায় অসাধারণ ও আশ্চর্য অভিনয় করেছেন। রায় মশায়ের বলপূর্বক বিবাহিত স্ত্রীর চরিত্রে ছায়া-দেবী যে রহস্যঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন, তা চমৎকার। অন্যান্য চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ কুমার, জ্ঞানেশ মুখার্জী প্রমুখ যথাযথ। 'বিভাস' কাহিনী চিত্রের অনবদ্য সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ছবিটি উৎসর্গীকৃত। ছবির গানগুলি সুগীত। আবহসংগীত পরিবেশানুগ। ছবিটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে, বিজয় ঘোষের আলোকচিত্র গ্রহণ। গ্রাম্য মানুষের সচল সম্পূর্ণ বলিষ্ঠতা প্রদর্শনে না হলেও, সাধারণভাবে প্রদর্শনীয় ছবির পরিচালক হিসেবে শ্রীবিনু বর্ধন অবশ্যই প্রশংসনীয়।

### চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতা

১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ১২৮টি চিত্র ও ৪টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি যোগ দিয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পুরস্কারের জন্য যোগ দিয়েছে উড়িষ্যার ১টি ছবি। কাহিনী-চিত্রের মধ্যে ১৭টি হিন্দী, ১১টি বাংলা, ৮টি মারাঠী, ৭টি তেলেগু, ৭টি কানাড়ী, ৬টি তামিল, ৪টি মালয়ালম, ২টি অসমিয়া, ২টি গুজরাটী, ২টি ওড়িয়া, ১টি পাঞ্জাবী। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ১টি কোঙ্কানী

ফ্লিসাক অঙ্কিত "টু বি অর নট টু বি"র পোষ্টার চিত্র

চিত্র এবারকার নূতন সংযোজন। কাহিনী চিত্র ছাড়া ৪০টি তথ্যচিত্র, ১৫টি শিক্ষামূলক চিত্র, ৩টি শিশু চিত্র।

বিভাগীয় কমিটী ও আঞ্চলিক কমিটীর নির্বাচনের পর ডাঃ গোপাল রেড্ডির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটী চিত্রগুলি বিচার করবেন। আগামী ১৮ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি দিল্লীতে চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ করবেন।

## কয়েকটি অবিস্মরণীয় পোলিশ ছবি

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে নিউ এম্পায়ারে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গজগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেবল সিনেমাজগতে নয়, সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেও এরূপ উৎসবের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া আছে। ছয়টি ছবির মারফত আমরা দেখতে পেলাম—আজকের পোল্যাণ্ডের মানসিকতার ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কটকে। দেখতে পেলাম—কি অমানুষিক নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে পোলিশ জনসাধারণকে ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত অবস্থায়। দেখতে পেলাম, কি অসাধারণ ত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে আজকের সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড জন্মগ্রহণ করেছে এবং সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাদের কি নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে। তার সাথে আরো দেখতে পেলাম হিটলারের জাতিবিদ্বেষের মর্মান্তিক চিত্র। বীরত্বে, ত্যাগে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিযানে পোলিশ জনসাধারণ আমাদের অন্তরে স্থান পেয়েছে। এই ছয়টি ছবি ইউরোপ-এশিয়ার দু'টি ভূখণ্ডের মানুষকে মৈত্রীর সম্পর্কে নিকটতর করেছে।

প্রথম দিন প্রদর্শিত রোমান পোলানস্কি পরিচালিত 'লাইফ ইন দি ওয়াটার' বা ইয়ং লাভার্স ছবিটি পোল্যাণ্ডের চিত্রজগতের নূতন চিন্তাধারার প্রতীক। পোল্যাণ্ডে এরূপ নবতরঙ্গের ছবির স্রষ্টারা সমাজতান্ত্রিক জগতে এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। এই ছবি হ্রদের ওপর একটি সৌখীন নৌকায় তিনটি মাত্র চরিত্র নিয়ে গঠিত। ছুটি উপভোগের আনন্দময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে এখানে চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পোল্যাণ্ডের বর্তমান সমাজের একটি দিক প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষের উন্নাসিকতা ও প্রভু-মনোভাব যা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পর্যন্ত গোপন ফাটল সৃষ্টি করে; অথচ বাইরের জীবনে সবই পরিপাটি। পরিচালক এখানে কোন নীতিকথা প্রচার করেন নি, কেবল বর্তমান সভ্যতার সংকট মুহূর্তের একটা দিকের চিত্র উপস্থিত করেছেন। অভিনয়ে নিও নিমজিক, জোলাণ্টা উমেকা এবং জিমান মানানোউইচ অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

দ্বিতীয় ছবি 'লোটনা' আন্দ্রে ওয়াজদার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণের সময় ছোট্ট একদল অশ্বারোহীর বীরত্ব ও অনুভূতিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যুদ্ধের পরিণতির বক্তব্যে। কিন্তু সে বক্তব্য এত হৃদয়স্পর্শী, এত গভীর যে, দর্শকরা সেই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে পড়েন। একটি সাদা ঘোড়া যার নাম লোটনা, ছবিটির নাটকীয়তার অবলম্বন হয়েছে। এখানেও বহু সৈনিক ও গ্রামবাসীর মধ্যে তিনটি চরিত্রই প্রধান। এই তিনটি চরিত্রে বোজেনা কুরোস্কা, জেরী পিচেলোস্কি, আদম পলিকোস্কির অভিনয় অসাধারণ।

তৃতীয় ছবি 'বার্ণিং মাউন্টেন' যুদ্ধাবসান পরবর্তী কালের ঘটনা। হিটলারী দস্যুতার কবল থেকে মুক্তি লাভের পরেও পোল্যাণ্ডের পাহাড় অঞ্চলে ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা দীর্ঘদিন যাবৎ যে দস্যুতা চালিয়েছিল তাকে পরাভূত করার জন্য পোল্যাণ্ডের সংগ্রামের এক বীরত্বপূর্ণ ও মানবিকতাপূর্ণ চিত্র। এখানে এক সাধারণ সৈনিক বীরত্ব, বুদ্ধি ও মানবিকতায় সকলের অন্তর স্পর্শ করে।

চতুর্থ দিনের ছবি 'বার্থ সার্টিফিকেট' তিনটি ছোট ছোট চিত্রের সমষ্টি। এই তিনটি চিত্রের মধ্যে রয়েছে: 'অন

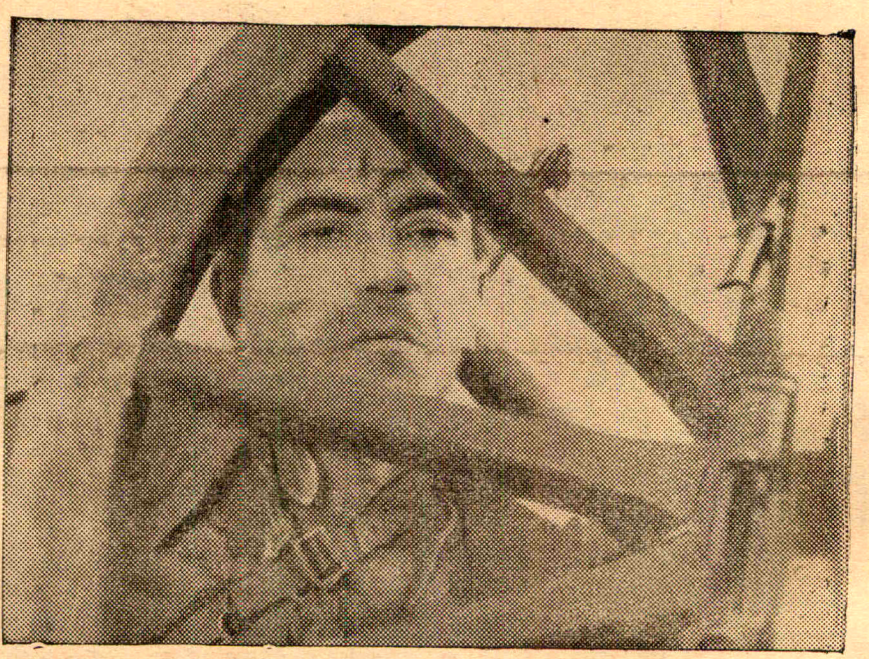

● লোটনা

দি রোড', 'এ লেটার ফ্রম দি পি-ও-ডবলিউ ক্যাম্প' এবং 'এ ড্রপ অব ব্লাড'। ছোটগল্পের মেজাজে এই তিনটি ছবি চিত্রিত। তিনটি ছবির পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। গল্পের নায়করা সবাই শিশু। প্রথমটিতে মাতৃপিতৃহীন এক শিশু—চারিদিকে ফ্যাসিষ্ট নারকীয়তার মধ্যে একাকী। দ্বিতীয়টিতে ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলে একটি গৃহে তিনটি শিশু। তাদের বয়োজ্যেষ্ঠজনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। শেষোক্তটি এক ইহুদী বালিকার মর্মান্তিক বক্তব্য ও আবেদন। যাতে কোন দর্শকের পক্ষে অশ্রুসম্বরণ করা সম্ভব নয়। ইহুদী নিধন অভিযানের মধ্যে এই বালিকা বাঁচতে চেয়েছিল, তাকে বাঁচাবার জন্য অনেকে এগিয়েও এসেছিল। কিন্তু তবু কি সে হিটলারী গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিতে পেরেছিল? তার চোখের অশ্রুবিন্দু যেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের অশ্রুবিন্দু। ইহুদী বালিকার ভূমিকায় বাটা বার্জেওয়াস্কার অভিনয় সহজে ভোলবার নয়। এই তিনটি খণ্ডচিত্রের পরিচালক—স্টানি স্লাব রোজে উইক।'

পরের দু'টি ছবি 'প্যানিক ইন দি ট্রেন' এবং আন্দ্রে মুনক্-এর 'হরোইকা'। এই দু'টি ছবি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্ব

কাহিনী চিত্রগুলির সঙ্গে ছয়টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছবিগুলিকে ছবির কবিতা বলেই উল্লেখ করা উচিত। সমাজতান্ত্রিক জগতে ছবির ক্ষেত্রে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং মানুষের চিন্তা-রাজ্যের অতল সমুদ্র থেকে পরিচালকরা কত মণিমুক্তা আহরণ করে উপস্থিত করতে পারেন—এই ছবিগুলি তারই নিদর্শন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পোলিশ চলচ্চিত্রে প্রাচীর-চিত্রের যে প্রদর্শনী দেখলাম তা অত্যন্ত সুরুচি ও শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ আমাদের দেশের কয়েকটি ছবির প্রাচীর-চিত্র এঁরা যেভাবে এঁকেছেন তা আমাদের দেশের চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকদের শিক্ষণীয়। স্থূল ও যেন আবেদনে দর্শক আকর্ষণের কথা তাঁরা ভাবেন না, ছবির মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তোলা পোল্যাণ্ডের প্রাচীর-চিত্রের উদ্দেশ্য।

এই উৎসব সংগঠনের জন্য আমরা পোলিশ দূতাবাস এবং সিনেক্লাব অব ক্যালকাটাকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, পোল্যাণ্ডের ছবিগুলি যাতে সাধারণ দর্শকরা দেখতে পান তার জন্য সরকার সহায়ক হবেন।

## নাটকের কথা

### স্বীকৃতি

রঙমহলের চলতি নাটক 'স্বীকৃতি'। বর্তমানে রঙমহল পরিচালিত হচ্ছে শিল্পীগোষ্ঠী দ্বারা। তাঁরা পর পর কয়েকটি নাটক উপস্থিত করে শহরের নাট্যরসিক মহলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। নূতন নাটক 'স্বীকৃতি'র নাট্যকার সলিল সেন। দেশ-বিভাগোত্তর বাংলায় সলিল সেন নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে 'স্বীকৃতি' নাটক তাঁর অন্যান্য নাটক অপেক্ষা স্বতন্ত্র। এখানে বক্তব্য বিষয়কে চটুলরসে পরিবেশন করা হয়েছে এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের দিকটাতে প্রধানত লক্ষ্য রেখে দীপিকা দাসকে শ্ল্যাক পরিয়ে কুৎসিত 'টুইস্ট' নাচের ভঙ্গী দেখানো ইত্যাদি চটুল ঘটনা রয়েছে। বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মুখোস খোলার নামে এরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়ে থাকে। এযাবৎকাল সিনেমায় এরূপ মানসিকতা একদল পরিচালকের মধ্যে দেখা গেছে, এখন তা মঞ্চেও উপস্থিত হলো। নাট্যমঞ্চের পক্ষে এই মানসিকতা প্রগতি না প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের নিদর্শন সে বিচার দর্শকরাই করবেন।

'স্বীকৃতি' নাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পপতি সমরেন্দ্রনাথের কুটিল ভাগ্যে, মিলের তত্ত্বাবধায়ক অজিতের জন্য।


শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে

আরতী ফিল্মসের

জীবন কাহিনী

প্রধানাংশে
বিকাশ
সন্ধ্যা·অনুপ
তরুণ·জহর
ভানু
রেণুকা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা· রাজেন তরফদার
সুর· প্রবীর মজুমদার

মিনার • বিজলী • ছবিঘর
পদ্মশ্রী • সুচিত্রা • যোগমায়া • মায়াপুরী
নিউ তরুণ • মীনা • গৌরী ও অন্যত্র
জি আর পিকচার্স রিলিজ

সরযূ দেবী

সমরেন্দ্রনাথ স্বদেশানুরাগসম্পন্ন শিল্পপতি, বিদেশে থাকতেন। তাঁর স্নেহভাজন, তাঁরই বন্ধুর তিন পুত্রের সাথে অজিত ক্রমশ এমন কলহ সৃষ্টি করে যে তাঁদের এতদিনকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই তিন ভাইয়ের হাসি-খুশি পরিবারেও বিপদের ছায়া নেমে আসে। ভুল বোঝাবুঝি হয়। শেষ পর্যন্ত অজিতের মুখোস খুলে পড়ে। সমরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুপুত্রদের সঙ্গে পুনর্বার সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যদ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে তোলার জন্য রয়েছে এমন একটি ঘটনা যা ধনীদের লালসা ও বিবেকহীনতাকে প্রকাশ করেছে। সত্যেন কর্তৃক আবিষ্কৃত আসনের কৃতিত্ব বিক্রয় করে দিয়ে অজিতের অর্থ আত্মসাৎ এবং অভাবের তাড়নায় এরকম বহু প্রতিভাবানের জীবন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিভাবে বিনষ্ট হয়, তা একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের দ্বন্দ্ব পরিণতির দিকে পৌঁচেছে। এবং অজিত ও মলির চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি ধনিকশ্রেণীর একাংশের অন্তসারহীন চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। এখানে নাট্যকারের প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিনয়ে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (সমরেন্দ্র), শেখর চট্টোপাধ্যায় (অজিত), এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে ঠাকুরদাস মিত্র ও সবিতাব্রত দত্ত দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে থাকেন। দুই জা-এর ভূমিকায় সরযূ দেবী ও শিপ্রা মিত্রের অভিনয় উপভোগ্য। মলির চরিত্রে দীপিকা দাস উগ্র আধুনিকার অন্তসারশূন্য চরিত্রকে প্রকাশ করেছেন। মলয় ও মীরা ভাইবোনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতিকা দাশগুপ্তা। আরো কয়েকটি ভূমিকায় রয়েছেন—নির্মল চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল, কাতিক সরকার, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল প্রমুখ। মিঃ চুণ্ডার ভূমিকায় জহর রায় দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন।

নাটকটিতে সবিতাব্রত ও লতিকার কয়েকটি গান রয়েছে। গানগুলি সুগীত। চড়া সুরে বাঁধা নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সাফল্যলাভ করবে।

## তাপসী নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারকোৎসব

২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় ষ্টার থিয়েটারের 'তাপসী' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারকোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

## সৌখীন অভিনয়

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে সন্ধ্যা ৬ টায় জেনারেল ম্যানেজার, পি অ্যাণ্ড টি ওয়ার্কশপস, কলকাতা অফিস কর্মচারীদের প্রমোদ সংস্থা 'দি রিক্রিয়েশনের' সপ্তম বার্ষিক মিলনী উৎসব পি অ্যাণ্ড টি ওয়ার্কশপ্‌সের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীশান্তিস্বরূপের সভাপতিত্বে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সংস্থার অষ্টম নাট্যার্ঘ শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির পরিচালনায় শ্রীরঞ্জন চ্যাটার্জী এবং সংগীত পরিচালনায় শ্রীসুধীর বসু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির দৃশ্যসজ্জা এবং আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন, সর্বশ্রী বাসুদেব দাস, ধৃতি সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ঘোষ, প্রেমাংশু দাশ শর্মা, তারাদাস মৈত্র, রবীন বিশ্বাস, আনন্দ চক্রবর্তী, সুধাংশু দে, গোপীনন্দন মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ দে, শ্রীমতী শাশ্বতী রায় ও শ্রীমতী তৃপ্তি দাস।

আরতি ফিল্মসের 'জীবন কাহিনী' চিত্রে অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়

# খেলাধূলা

## ইঙ্গ-ভারত রাবার যুদ্ধ সাঙ্গ হল

কানপুরে ভারতের প্রায় কান কাটা যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে মানরক্ষা এবং কানরক্ষা করল ভারত। কলকাতার মাঠে যখন নাদকার্ণীকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার দেওয়া হল, অনেকেই তখন বিস্মিত হয়েছিলেন। কানপুরের খেলা নাদকার্ণীর শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহের বাষ্পকে দূরীভূত করল। কানপুরের গ্রীনপার্কের বুকেই নাদকার্ণীর সবুজ স্বপ্নও সফল হল; নাদকার্ণী করলেন জীবনের প্রথম শতরান তাও আবার অপরাজিতের মহিমায় মণ্ডিত। পর পর চারটি টেষ্টে টসে জিতেছেন পতৌদি। পঞ্চম টেষ্টেও আবার টসে জিতলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ দিলেন। ইচ্ছে ছিল ইংলণ্ডকে বেকায়দায় ফেলবেন, কিন্তু নিজেই পড়ে গেলেন বেকায়দায়। তবে পতৌদির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছেন, আমি বলব যে তাঁরা খুবই বোকামি করেছেন।

এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়। ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যম্ ...ভেসে আসছে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র পূজামণ্ডপ থেকে, আর চারদিকে তারস্বরে মাইকে বেজে চলেছে বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী মিশ্রিত ফিল্মী গান। ক্ষীণসুরে মাঝে মাঝে কানে এসে পৌঁচাচ্ছে তরঙ্গায়িত ইংরাজী স্বীলে। ক্রীড়ামোদীরা শাঙ্কতচিত্তে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের কাহিনী শ্রবণ করছে।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের বিরাট ৫৫৯ রানের সম্মুখে ভারতের ব্যাটস্-ম্যানেরা কি রকম যেন ঘাবড়ে গেলেন। রানের গতি কমতে থাকল, কিন্তু উইকেট পড়তে লাগল দ্রুতগতিতে। মাত্র ২৬৬ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস খতম। দলের পতন রোধের জন্য বুক পেতে দিলেন দিলীপ সরদেশাই এবং বাপু নাদকার্ণী। সরদেশাই করলেন ৭৯ রান এবং ৫২ রান করে নাদকার্ণী রইলেন অপরাজিত। ফলো অনের গ্লানি মাথায় নিয়ে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করল। সুরুতেই জয়সীমা নিলেন বিদায়, এর পর ভারত খুব সতর্কভাবে খেলতে লাগল। আবার ত্রাণকর্তার ভূমিকায় দাঁড়ালেন সরদেশাই এবং নাদকার্ণী। কুন্দেরাম ৫৫ রান করে আউট হবার পর, ৮৭ রানে বিদায় নিলেন সরদেশাই। নাদকার্ণী শতরান করলেন এবং অপরাজিত আখ্যা নিয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন, ব্যক্তিগত রান-সংখ্যা তাঁর তখন ১২২। এরই মধ্যে পিটিয়ে খেলে দুরানী করলেন ৬১ রান। শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেটে ভারত করল ৩৪৭ রাণ। শেষ হল কানপুরের পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট এবং রাবার থাকল


আজই গ্রাহক হয়ে পড়া শুরু করুন

সোভিয়েত দেশ

একখানি রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রতীক সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

ইংরাজী, নেপালী এবং ১২টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত।

একটি বহুবর্ণের দেয়াল পঞ্জী এবং আকর্ষণীয় উপহার পাবার সুযোগ গ্রহণ করুন।

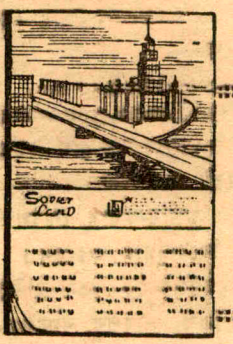


বিশেষ সুবিধাজনক হ্রাস মূল্য ঃ—

| ভারতীয় ও নেপালী ভাষায় প্রকাশিত ঃ— | | ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ঃ— | |
|---|---|---|---|
| এক বছর ... | ৪·০০ | এক বছর ... | ৫·০০ |
| দুই বছর ... | ৬·০০ | দুই বছর ... | ৭·৫০ |
| তিন বছর ... | ৮·০০ | তিন বছর ... | ১০·০০ |
| প্রতিখানি ... | ২৫ নঃ পঃ | প্রতিখানি ... | ৪০ নঃ পঃ |

সরাসরি অথবা এজেন্টের মাধ্যমে গ্রাহক হউন

দি ইনফরমেশান ব্রাঞ্চ অব ইউ, এস, এস, আর কনসুলেটেড জেনারেল,

১।১, উড ষ্ট্রীট কলকাতা—১৬

INTERADS-SL/2

● নাদকার্ণী

অমীমাংসিত। আগামী অক্টোবরে আসছে অষ্ট্রেলিয়া—ভারত এখন সময় থাকতেই তাই প্রস্তুত হোক।

## লড়িয়ে কবি ক্যাসিয়াস ক্লে

কানসাস সিটির নিগ্রো পাড়ায় এক হোকরার দৌরাত্ম্যে পাড়ার ছেলেরা অস্থির। সামান্য তুচ্ছ কারণে সে হাত গুটিয়ে ঘুসি পাকিয়ে তার চেয়ে অনেক বয়সে বড় ছেলেদের সহজেই ঘায়েল করে দেয়। নিগ্রোদের ছেলেরা গায়ের জোরে কেউ কম যায় না, কিন্তু এই গুণ্ডা ছেলেটিকে সকলে যমের মত ভয় করে। ছেলেটিকে যেমন সকলে ভয় করে, তার প্রতি টানও পাড়ার ছেলেদের কম নয়। যে হাতে তার ঘুসি চলে সেই হাতে রচিত হয় সুন্দর সুন্দর কবিতা। রসিয়ে রসিয়ে কবিতা লিখে সে ছেলেদের তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কবিত্বের নেশার চেয়ে ছেলেটির ভাল লাগে বক্সিং-এর পেশা।

সতের বছর বয়স, সুঠাম সুন্দর দেহ। রেসের ঘোড়ার মতন টগবগ করছে। লেখাপড়ায় মন নেই, তাই সে কলম ছেড়ে বেছে নিল বক্সিং গ্লোবস। রণং দেহি ভাব। শুভার্থীরা উপদেশ দিলেন—পেশাদার হবার আগে এ্যামেচারীতে হাত পাকাও। ছোকরার শুভবুদ্ধির উদয় হল—যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক বক্সিং সংস্থায় ঢুকে পড়ল। রোম অলিম্পিকে ঘুসির জোরে একটি স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরল ক্লে। সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল জীবনে। সবাই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল—সাবাস ক্যাসিয়াস ক্লে—সাবাস!

ক্যাসিয়াস ক্লের হামবড়াই ভাবটা বড়ই দৃষ্টিকটু। অনেক সময় সেটা বেশ বাড়াবাড়ি মনে হয়। এর অবশ্য একটা উদ্দেশ্য আছে—প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে নস্যাৎ করে দিলে, তার মনোবল খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে প্রতিপক্ষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং ভালভাবে লড়াই করতে পারে না। ক্লের লড়াইয়ের আগে হলের বাইরের পোষ্টারে লেখা থাকে—

'If you want to see clay,
You all must pay.'

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে, ক্লে প্রতি লড়াইয়ের আগে প্রতিপক্ষকে কত রাউণ্ডে পরাভূত করবেন তা বলে দেন এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করছি। জোন্সের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবেন ক্যাসিয়াস। ক্লে অভ্যাস এবং স্বভাব অনুযায়ী ছড়া বানিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

'Tonight when the great
crowds roar.
There at my feet he will by
destroyed in four.'

আর মুখে বললেন যে, যদি জোন্সের কাছে পরাজিত হই তবে নতজানু হয়ে জোন্সের পদচুম্বন করব এবং প্রথম প্লেনে চড়ে দেশত্যাগী হব এই লড়াইয়ে কিন্তু ক্লের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হল এবং কোন রকমে ক্লে সেদিন তাঁর মান রক্ষা করলেন। লড়াইয়ের শেষে ক্লে আবার মুখ খুললেন—

'He is second best to me,
Better the Liston, you wait and see.'

ক্যাসিয়াসের যত রাগ বর্তমান বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান সোনি লিষ্টনের ওপর। ছড়ায়-কথায় কেবল লিষ্টনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। প্রথমে বললেন যে লিষ্টনকে তিন রাউণ্ডে কাৎ করবেন, কিন্তু তারপর বললেন যে, না আট রাউণ্ডেই ওকে কুপোকাৎ করে আমার প্রাপ্য বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপের মুকুট কেড়ে নেব। লিষ্টনের এক সম্বর্ধনা সভায় হঠাৎ ক্যাসিয়াস ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে বক বক করতে সুরু করে দিলেন এবং লিষ্টনকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। লিষ্টন রেগে বন্ধুবান্ধবদের বললেন যে, ওই (ক্লে) ব্যাটার একটা ডিম ভাঙার মত ঘুসির জোর আছে। তারপর ক্লে-কে সম্বোধন করে বললেন—এস খোকা, আমার কোলে বসে কমলা-লেবুর রস খাও। একবার ক্লের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের কথা শুনে, লিষ্টন ঠাট্টা করে বললেন যে, অবলা ক্লে-কে রক্ষা করবার পর তাঁরও যোগদান প্রয়োজন। জোন্সের সঙ্গে ক্লের লড়াই দেখবার জন্য লিষ্টন গম্ভীরভাবে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন—'যদি আমি ক্যাসিয়াসের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে মিলিত হই, তবে হয়ত আমাকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হবে।'

সোনি লিষ্টন গম্ভীর চালে চলেন, তাঁর হাত চলে মুখ চলে না। একবার ক্লের বকবকানি এবং ফাজলামির উত্তরে লিষ্টন লাগালেন তাঁর গালে প্রচণ্ড এক থাপ্পড়। ক্লে এই ধরণের বেয়াড়া উত্তরের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। মাথায় খুন চড়ে গেল তাঁর। সেদিন পুলিশ এসে না থামালে একটা খুনোখুনি হয়ে যেত।

ক্লের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তাঁর এখনও পর্যন্ত বজায় রাখা অপরাজিত আখ্যা। পরাজয়ের কালোছায়া আজ অবধি স্পর্শ করে নি ক্যাসিয়াস ক্লে-কে। সারা জীবনে লড়েছেন মোট কুড়িটি লড়াই, আর তার মধ্যে ষোলবার প্রতিপক্ষকে নক-আউট করেছেন। চলতি সপ্তাহে তাঁর শক্ত পরীক্ষা হবে লিষ্টনের সঙ্গে। এখন দেখা যাক কতদূর পারেন নিজের কথার মর্যাদা রক্ষা করতে, কারণ মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর বলা ছড়াটি—

'Who is the best in this game.
No prizes for guessin' clay's
the name.'

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২৩২

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ !

# হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

## হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার, চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ডুবুরীদলের কীর্তি, ৫। যেমা দেওগে তেমা পাওগে, ৬। ঘুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঞ্চয়ন—চাবি ও খিল, একখণ্ড মাটি, চোরাই বাড়ী, ছেলেখেলায় একাদশ ও বন-বাদাড়। ৮। ভৌতিক কাহিনীর সঞ্চয়ন—এক রাত্তের ইতিহাস, কঙ্কাল সাধনা, বিজয়ার প্রণাম, কাণকাটা হাঁচি, শয়তান, ভেলকির হুমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জামা। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথের গুপ্তকথা, ১১। হাসিউতের টাকার পাহাড়।

**মূল্য তিন টাকা**

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

—যৌনশাস্ত্র ও যৌনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবিবৃত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা—

।। জটিল প্রশ্নগুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ ।।

* * পাঁচটি খণ্ডে গভীর তত্ত্ব ও প্রচুর তথ্যের অভাবনীয় সমাবেশ * *

অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

# যৌন মনোদর্শন

( নরনারীর দেহমিলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ )

দ্বিতীয় খণ্ডে : বয়ঃসন্ধি—মূল্য ৪·০০ ॥ তৃতীয় খণ্ডে : কামাবেগের বিশ্লেষণ—মূল্য ৩·০০ ॥ চতুর্থ খণ্ডে : প্রেম ও পীড়া—মূল্য ৪·০০ ॥ পঞ্চম খণ্ডে : কামাবেগের নিয়ত কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ—মূল্য ৪·৫০ ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম, সর্বাঙ্গীণ, নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা

# র বী ন্দ্র না থ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

১৩ খানি দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত

মূল্য ১ টাকা ৫০ নঃ পঃ মাত্র

সাহিত্য-আনন্দলোকের মূর্তিমান বিকাশ

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-শিশু সর্বজনের সাগ্রহ-

একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্তি নাট্যকার,

সর্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

## রাজকৃষ্ণ রায়ের

## গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলশালীর, খড়গশূল, চতুরালী, চক্রাবলী, প্রজার চরিত্র, খোকাবাবু, হাসে মালিনী, বনজীর বদলে বুনিয়া, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

২য় ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিষের লীলা, লোভেজ-পবেজ, টাটকা-টোটকা, বনভূষণ, যেদুমে বাঙালী বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহাস্য। মাত্র ১৲ টাকা।

বিখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দের

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-রত্নাকর ৷৷০

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-পূজাপদ্ধতি সম্বলিত )

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মদিরা

( ১ম ভাগ )—১৲ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## নির্ব্বাণ ১৲

## ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ১৲

বিপিনবিহারী মিত্রের

## সোরাব ও রস্তম্ ১৲

( অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদিত )

লোকনাথ ভট্টাচার্য্যের

## আয়তি ১৲

সংসারত্যাগী রাজর্ষি কবি ভর্তৃহরির

## শান্তিশতকম্

( তীব্র বৈরাগ্যের শান্তিস্তব )

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পথ চলার নির্দেশ—১

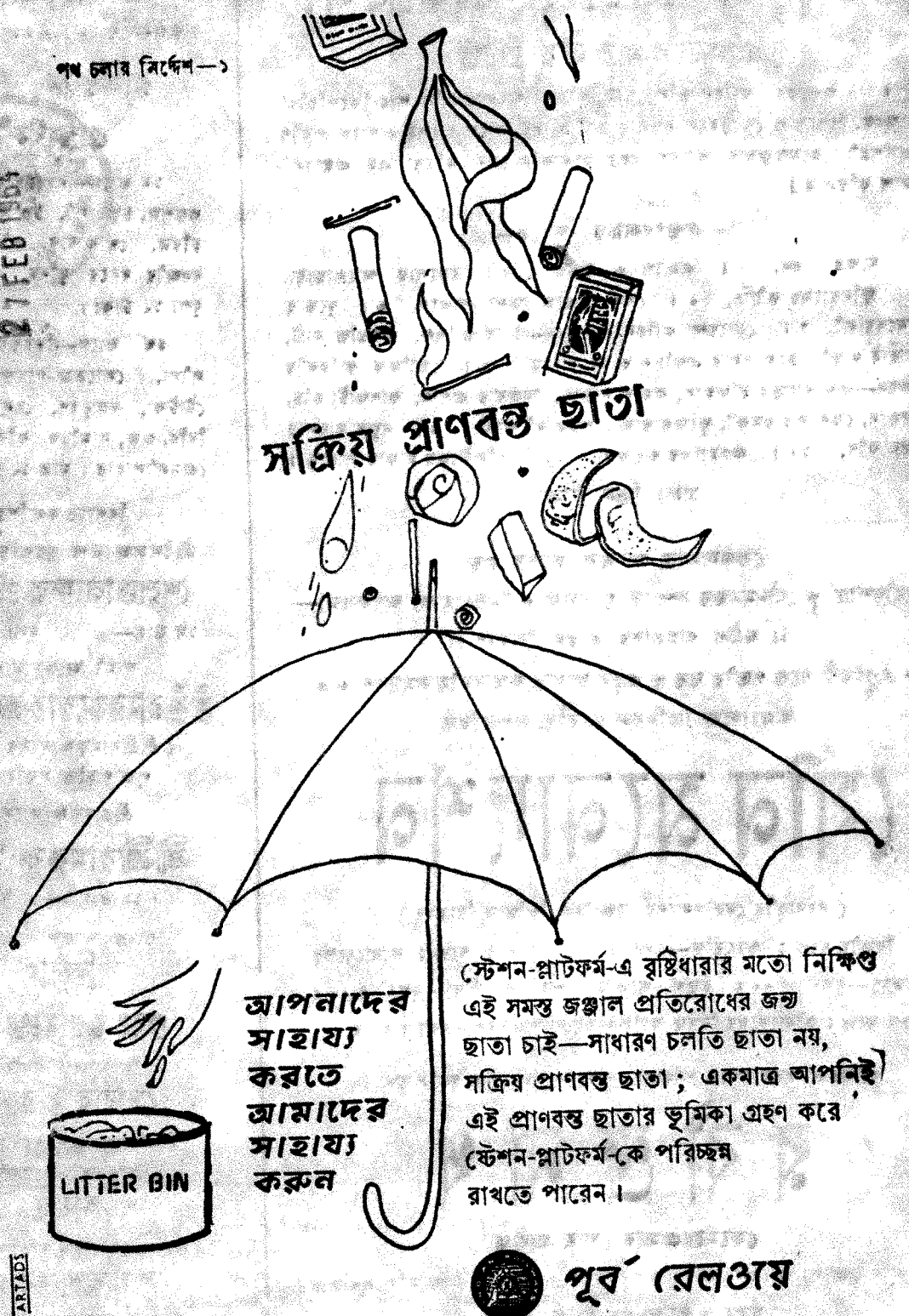


পূর্ব রেলওয়ে

# সাপ্তাহিক বসুমতী

## সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স

UNIVERSITY • CALCUTTA • LIBRARY

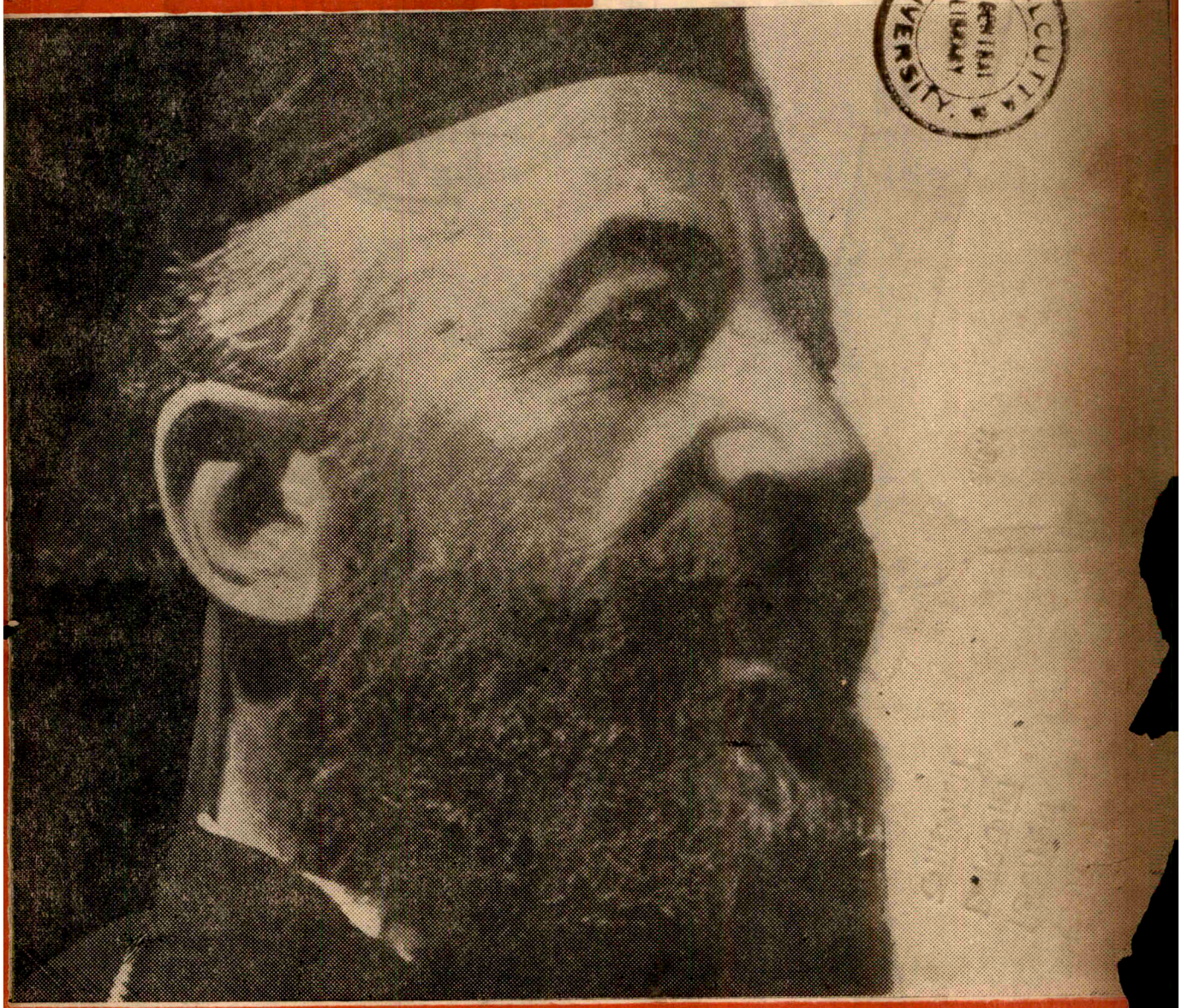

৬৮ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২১শে ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • March 5, 1964 • Vol. 68, No

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন কলিকাতা

অপরূপ
ডিজাইন
চমৎকার
কারিগরী

সীলিং

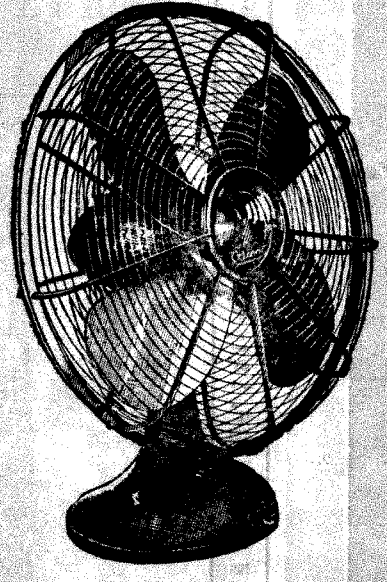

অসিলেটিং

# ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা

নিখুঁত সৌন্দর্য্য, নির্ঝঞ্ঝাট কার্য্যক্ষমতা,
ব্যবহারে অর্থ-সাশ্রয়ী—এসব ছাড়াও
অনেক কিছু গুণ থাকার ফলে
ওরিয়েন্ট পাখা ভারতে আজ সবচেয়ে
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ওরিয়েন্ট পাখা

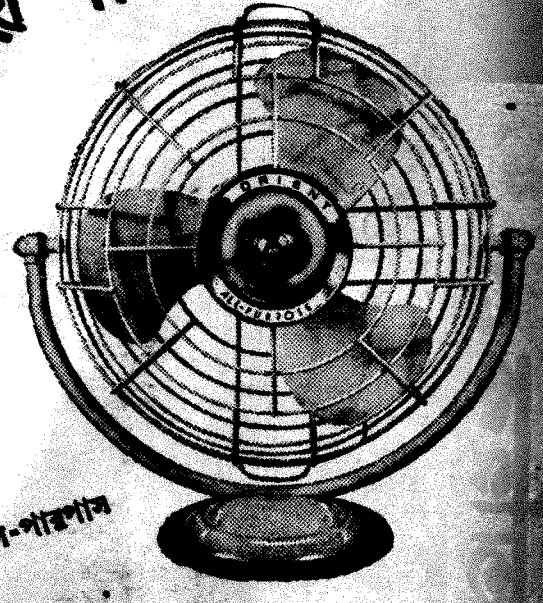

অল-পারপাস

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, কলিকাতা-১১

ডিষ্ট্রিবিউটারস

হিন্দস্থান ডিলার্স লিঃ, ৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১; ফোন: ৩৪-৫৩৯৩ (২ লাইন)। গ্রাম: DEALHIND * চমাচনিয়া বাদার্স (পি) লিঃ, ফেজার রোড, পাটনা। ফোন: ২১৬৯, গ্রাম: ORIENTFANS * হিন্দস্থান ডিলার্স লিঃ ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটি, ফোন: ৬৭৪, গ্রাম: DEALHIND,

# সূচীপত্র

756.3
·603/3
Y8.68 m.o.M.1


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২২৩৫ |
| আজকের মানুষ | ... | ২২৩৬ |
| রঙ্গদর্শন | ... | ২২৩৭ |
| আজকের আমেরিকা | মিনু খালাকার | ২২৪১ |
| ক্রমাগত বাড়ছে বয়স ( কবিতা ) | বরুণ মজুমদার | ২২৪৪ |
| জন্মান্তর ( কবিতা ) | দেবব্রত দত্ত | ২২৪৪ |
| অনল আহুতী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২২৪৫ |
| দূরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২২৫০ |
| পৃথুমালিনী কথা ( রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২২৫২ |


ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·· ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·৫০
( প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে )

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]
( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
বাবনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পূণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম খণ্ড | ১·৫০ | ২য় খণ্ড | ২·৫০ |
| ৩য় খণ্ড | ১··· | ৪র্থ খণ্ড | ২·৫০ |

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২২৫৬ |
| সূর্য স্বপ্ন ( গল্প ) | খগেন্দ্র দত্ত | ২২৫৭ |
| গোয়ালিয়র ( ভ্রমণ-কাহিনী ) | বিজনবিহারী নাগ | ২২৬২ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২২৬৬ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২২৬৯ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিল্পালি | ২২৭২ |
| ভারত দর্শন | ... | ২২৭৩ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২২৭৮ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২২৮৩ |
| খেলাধুলা | ... | ২২৮৭ |



# কবিকঙ্কণ চণ্ডী

**মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী**

**( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক )**

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

**—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—**

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ( ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

**মূল্য সাড়ে চার টাকা**

## নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

**মূল্য সাড়ে তিন টাকা**

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

**ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব**

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

**শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

## মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক
# বসুমতী
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৬৮ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২১শে ফাল্গুন ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 5th March 1964

## অশুভ সঙ্কেত

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের চক্রান্তমূলক যোগসাজস দেখে আর একবার বোঝা গেল যে, ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা করাই পাকিস্তানের হীন উদ্দেশ্য। নিরাপত্তা পরিষদে কূটনৈতিক পরাজয়ের ঘা মিলাতে না মিলাতেই পাকিস্তান চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই'কে এনে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং লাহোর থেকে আয়ুব-চৌ যৌথ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। আগেই পাকিস্তান ভারতেরই একাংশ চৌ-এর হাতে তুলে দিয়ে হাত মিলিয়েছে। এখন পাকিস্তানে চৌ-এর সফর এবং বিজ্ঞপ্তি প্রচারের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে একটি রণক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে পাকিস্তান বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ সে যদি ঐ সম্পর্ক বজায় রেখে চীনের সঙ্গে হাত মেলায় তখন ষড়যন্ত্র যে গভীরতর, তা বুঝে নিতে দেরী হয় না। পাকিস্তান জানে যে, ভারতের সীমান্ত আক্রমণকারী চীনের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে হয়তো ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরকে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব হবে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ ভারতের কাছে নৈতিকভাবে পরাজয় বরণ করে এবং আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির কাছে প্রায় ধাড়ধাক্কা খেয়ে এখন কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে: 'কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ রয়েছে এবং বৃহৎ শক্তির জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মনোভাবের দ্বারা একমাত্র নিজের ইচ্ছা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।' অর্থাৎ কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা হোক, একথাই ঐ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এবং জানিয়েছে কোন্ চীন?—যে চীন কমিউনিজমের নামে গণভোটের বদলে অস্ত্রশক্তিতে গ্রাস করেছে তিব্বত—যেখানে অসহায় নরনারীর ক্রন্দনরোল এখনো আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে তুলছে। যার বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে আসা কামান গর্জন করেছে অহিংস ভারতের বুকের ওপর। আবার যে পাকিস্তানের মুখে গণভোটের কথা উচ্চারিত হয়েছে, সেই পাকিস্তান পাখতুনিস্থানের জনগণের দাবী দাবিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, কাশ্মীরে কেশ চুরির জন্য পনের শত মাইল দূরবর্তী খুলনায় যদি ভীষণ দাঙ্গা বাধানো হয়, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের পরিণাম যে কি হবে সেকথা কল্পনা করাও কঠিন।

আয়ুব-চৌ যুগ্ম বিবৃতিতে যাই বলা হোক না কেন, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি একথা নিরাপত্তা পরিষদে সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে পিকিংস্থ ভারতীয় দূতের নিকট চীনও একথা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র শত্রুতা আচরণের জন্য চীন ও পাকিস্তান আজ ভারতের বিরুদ্ধে মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাই তাদের জঘন্য নীতি সম্পর্কে সর্বদাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে। চীনের নতুন কোনো ছলনায় আমরা যেন আর নতুনভাবে প্রতারিত না হই।

সম্পাদকীয়

# আমেরিকার মানুষ

শিল্পের সাথে রাজনীতির ঘনিষ্ঠতা কতটুকু ?—এক নজরে তা নির্ণয় করা হয়ত কঠিন। তবে যেখানে মানবতার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে সেখানে আর সব নীতির প্রশ্নই অবান্তর। সেখানেই মার্লন ব্র্যাণ্ডোর মত বিশ্রুতকীর্তি চিত্রাভিনেতাও রাজনীতির জটিল আবর্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। এখানেই বিত্তের চেয়ে চিত্ত বড়। বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়। তাই আজ সমস্ত পরিচয়ের চেয়েও যিনি মহান তিনি মানবদরদী মরমী মার্লন ব্র্যাণ্ডো। আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে। তাঁর নিজের দেশ বা বিশ্বের যেখানেই এ অমানুষিক অন্যায়নীতি মানুষের স্বাধিকারকে খর্ব করেছে, আত্মাকে অপমান করেছে সেখানেই তিনি আপোষহীন তিরস্কার জানিয়েছেন।

সম্প্রতি London Press Conference-এ তিনি ঘোষণা করেছেন—এবার থেকে যে সব প্রযোজক বর্ণবিদ্বেষী সিনেমায় তাঁদের চিত্র প্রদর্শনে বিরত থাকবেন শুধু তাঁদের সাথেই তিনি চুক্তিবদ্ধ হবেন। হলিউডের কাছে তাঁর এই সিদ্ধান্ত চরম আঘাতের মত সন্দেহ নেই। আমেরিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ এর আগেও (গতবছর) নিয়েছেন তিনি। সেদিন হলিউডের চলচ্চিত্র কর্ণধারেরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন। তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। মান জনে কটাক্ষ করে বলেছেন —এটা ব্র্যাণ্ডোর অভিনব আত্মপ্রচারের চমক। তিনি অবিচল থেকেছেন। প্রযোজকরা তাঁর জনপ্রিয়তা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। তিনি ব্রতচ্যুত হন নি। এই একই নিষ্ঠা তাঁকে প্রতিভাবান অনন্য অভিনেতার সম্মান এনে দিয়েছে।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ওমাহার, নেব্রাস্কায় তাঁর জন্ম। Libertyvill High School, Shalluck Military Academy-তে বিদ্যালাভ করে পরিশেষে ১৯৪৩ সালে New School for Social Research Dramatic Workshop থেকে মঞ্চশিল্পে স্নাতক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 'I remember mama' নাটকে প্রথম আবির্ভাবেই চিহ্নিত হয়েছেন। 'A flag is Bora', 'The Eagle has two heads' ইত্যাদি নাটকে তাঁর অভিনয়-কৃতিত্বের স্বাক্ষর আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে দর্শকদের মনে। হলিউডে এসে 'Viva Zapata,' 'The wild one', 'Sayonara' এবং 'The Tea house of the August moon' চিত্রে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ হয়েছিল। বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী, আকর্ষণীয় আদব-কায়দায় সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলেন মার্লন ব্র্যাণ্ডো। ১৯৫৪ সালে U. S. motion Picture Academy তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করেছে। তাঁর প্রযোজিত, পরিচালিত, অভিনীত 'One eyed Jacks' সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকীর্তি হ'য়ে থাকবে। সমালোচক, দর্শক সমসাময়িক শিল্পী সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন নিয়ে অম্লান হ'য়ে থাকবে তাঁর 'Mutiny on the Boanty.' এই একটানা সাফল্যের ইতিহাস, তবুও তাঁর অন্তরের মানুষটিকে মোহান্ধ করে নি। মানবতার উদ্বোধন মানুষের মনেই ত' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ক'জনের মধ্যে তা' হয়! যাঁর মধ্যে সেই দুর্লভ উজ্জীবন ঘটে তিনি ধন্য। তাঁর সাধনা সার্থক। শিল্পীর স্বচ্ছন্দ জীবনকেও তিনি তার জন্য ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন না। মার্লন ব্র্যাণ্ডোর এই মহৎ প্রয়াসে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন Elizabeth Taylor, Doris Day, Shirley Madaim, Vanessa Redgrave, Sir Lawrence Oliver, Sir C.P. Snow, Francoise Sagon প্রমুখবিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী, অপমানিত স্বাধীনতাকামী, নিপীড়িত মানুষ।

মার্লন ব্র্যাণ্ডো

শ্রীমতী জ্যাকলিন কেনেডিও তাঁর বিশ্ববরেণ্য শহীদ স্বামী প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যুর পর প্রথম সাধারণ সাক্ষাৎকারে এক ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন ব্র্যাণ্ডোকে। লিঙ্কন-কেনেডির দেশে তাঁদের উত্তরসূরী চিত্রজগতের কমনীয় নায়ক মার্লন ব্র্যাণ্ডো মনুষ্যত্বের জগতেও আজ বলিষ্ঠ নায়ক। বিশ্বের মানবতার ইতিহাসের সাথে তাঁর জীবনের ইতিহাসও আজ লেখা হ'বে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে—শুভবুদ্ধির সম্ভাবনার ইঙ্গিতে।

আলোকগৃহতরী সাগরদ্বীপ

## রাজধানী ঃ

বিগত সপ্তাহে বিধানসভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে বাক্-বিতণ্ডার ঝড় বয়ে যায়। ফ্রক-পরা, মাথায় লাল-ফিতা বাঁধা চোদ্দ বছরের মেয়ে কুমারী মমতা পালের বিধানসভার লবীতে উপস্থিতি ও পুলিশী নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণনা, সরকারী ও বিরোধী সদস্যদের চীৎকার পাল্টা চীৎকার, টেবিল চাপড়ানি, ডিম ছোড়াছুড়ি,, হৈ-হল্লা এবার সভার অধ্যক্ষকে প্রায়ই বেসামাল করে তোলে। কুমারী মমতা পালের চিঠি যা সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় পাঠ করেছিলেন তা যে কুমারী পালের স্বতঃপ্রণোদিত চিঠি নয় এবং সেটি যে পুলিশের ভীতি প্রদর্শনের আর একটি কীর্তি সেকথা ফাঁস হয়ে গেলে বিধানসভা আবার নতুন রূপ ধরে। যদিও সে-রূপ ছোবল ফাটে নি, তবু ফোঁস-ফোঁসানির অন্তহীন গর্জন-তর্জন বিধানসভা ও পরিষদ উভয় কক্ষকেই কয়েকদিন গরম করে রাখে।

* * *

এবার বিধানসভায় ত্রাণমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন নবাগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় এবং পশ্চিমবঙ্গে থাকলে তাঁরা কোনরূপ সরকারী সাহায্য পাবেন না। এদিকে দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের অন্তরায়গুলি নিয়ে চলছে আলোচনা সুরু হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেতে নিশ্চয়ই আমরা উৎসাহী করবো। কিন্তু আমরা এ কথাও জিজ্ঞেস করতে চাই যে, প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত সুন্দরবন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে দিয়েছিলেন সেটি কার্যকরী করতে সরকারের দ্বিধা কেন? মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে সুন্দরবনের কথাকে উড়িয়ে দিয়েছেন, তা খুব যুক্তিগ্রাহ্য বলে আমাদের মনে হয় না। হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকদের কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গটি গুলিয়ে ফেলে আরেক চাল চেলেছেন, তা বোধহয় খালি চোখেই ধরা যায়, তার জন্য অণুবীক্ষণের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর উদ্বাস্তুদের সমস্ত ভার চাপিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে হাত ধুতে চাইছেন এবং সেই হাত ধোওয়ার ব্যাপারটি আমাদের ত্রাণমন্ত্রী যেভাবে

কুমারী মমতা পাল

গ্রহণ করেছেন তাকে হৃদয়হীন এবং উদ্দেশ্যমূলক না বলে উপায় নেই।

* * *

## ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্বার্থবুদ্ধির পঙ্কিলতা ও দলীয় কোন্দলের এক অস্বাভাবিক চেহারার বিকৃত মূর্তি সমাজের পক্ষে কতদূর ভীষণ হতে পারে, তা কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীসুনীল-বরণ রায়ের সেখানে কর্মে বিতৃষ্ণা ও কর্মত্যাগে আবার প্রতিপন্ন হ'ল। বহু বিতর্কিত কমিশনার শ্রীরায় চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার তিলক পরে শেষ পর্যন্ত যে কর্পোরেশনের লাল-কুঠি ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত-পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজে কমিশনারের পদত্যাগের ইচ্ছা জানিয়ে শ্রীরায় আবার একবার প্রমাণ করলেন যে, সৎবুদ্ধিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ লোকের স্থান আর যেখানেই হোক— এই কুটিল আবর্তে ক্ষতবিক্ষত কর্পোরেশনে নয়। কলকাতা কর্পোরেশনের এক শ্রেণীর কাউন্সিলাররা শ্রীরায়ের মতো একজন কর্মনিষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তির নিয়োগে আঁৎকে উঠেছিলেন এবং শ্রীরায় যখন কোন উন্নয়নমূলক সৎকর্ম করতে উদ্যোগী হয়েছেন তখনই পৌরপিতারা তাঁদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি-গুলির দুর্গ থেকে তাতে বাধার সৃষ্টি করেছেন। এবং এইরূপ ক্রিয়া-কর্মের দ্বারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই সব কাউন্সিলাররা নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ রক্ষা করতে

গিয়ে করদাতাদের ও শহরবাসীদের স্বার্থকেই বলি দিয়েছেন। শ্রীরায় চলে যাবেন সত্যি, কিন্তু তাঁর স্থলে আমরা আবার নতুন কোন কর্মীকে পাবো কিনা তা জানি না। কেন না কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অফিসার নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় এই পঙ্কিল আবর্তে হাবুডুবু খেতে রাজী হবেন না। সেদিন শ্রীরায়কে নিয়ে কর্পোরেশনে পরিস্থিতি জটিল হলে তদানীন্তন স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী শ্রীরায়কে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন বলেই শ্রীরায়ের পক্ষে এতদিন কার্য করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্যরূপ। হাওয়া ইতোমধ্যেই বদল হয়েছে। এবং তার অনিবার্য পরিণতিতেই যে কমিশনারকে অপসারিত করা হচ্ছে---আগাগোড়া ব্যাপার দেখে তা যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের বুঝতে কষ্ট হবে না। অতঃপর পৌরপিতাগণ তাঁদের পোষমানা লোককে মনোনয়ন করবেন কমিশনাররূপে, একথা বলা বাহুল্য। তবু বলছি, এ ঘটনা ঘটলে সরকার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে চরম উদাসীনতার নজীর স্থাপন করবেন। আমরা সরকারকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে বলবো যে, দলীয় স্বার্থবুদ্ধি পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তে ডুবন্ত কর্পোরেশন কাউন্সিলারদের হাতে এই রাজধানী কলকাতার ভাগ্যকে ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিজেই এর কার্যভার গ্রহণ করলে, তবু 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' তো হতে পারে। তা না হলে কলকাতার সাধারণ মানুষ, কলকাতার নাগরিকজীবন এই সংকীর্ণ দলীয় নীতির কোন্দলে পড়ে আবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাতে সরকারের প্রশংসা বাড়বে না, বরং নাগরিকজীবন অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ ক্রমশ সরকার-বিরোধী হয়ে উঠবে। আশা করি, কয়েকজন সংকীর্ণচেতা কাউন্সিলারের কথায় ভুলে সরকার এই ভরাডুবির সমুদ্রে আবার পাড়ি জমাবেন না।

সম্প্রতি বিধানসভায় ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে পাকিস্তানীদের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রসঙ্গ উঠলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় ছিটমহলের নাগরিকদের রক্ষার্থে যে অসহায় উক্তি করেছেন তাতে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। বঙ্গদর্শনের পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য আমরা পুরো ঘটনাটি আবার বিবৃত করছি। কোচবিহার জেলার শালবাড়ি, কাজলদীঘি, নাটোকটকা, দহলা, খাগড়াবাড়ি প্রভৃতি ভারতীয় ছিটমহলগুলি পাকিস্তান পরি-

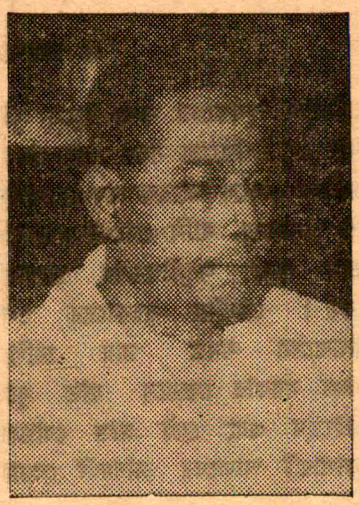

শ্রীসুনীলবরণ রায়

বেষ্টিত থাকায় ঐ এলাকার অধিবাসীদের বহুদিন থেকে লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। অধুনাতন পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই অত্যাচার আরো বেড়েছে। এইসব ভারতীয় ছিটমহলগুলির সঙ্গে ভারতের সরাসরি কোন যোগাযোগ না থাকাতে তারা ভারতীয় নাগরিক হয়েও, কার্যত ভারতীয় নাগরিকত্বের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। পাকিস্তানের ভেতর দিয়েই তাদের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ভারতে এসে তাদের আবার ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণপত্র দাখিলের প্রয়োজন পড়ে। চারদিক পাকিস্তান পরিবেষ্টিত থাকার ফলে এখানে ঐ সব এলাকায় হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চেয়ে অত্যাচারিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। পাকিস্তানীদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইতিমধ্যেই দলে দলে সেখানকার অধিবাসীরা ছিটমহলগুলো ত্যাগ করে ভারতীয় এলাকায় আসতে সুরু করেছে। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, পাকিস্তান এই সব ভারতীয় নাগরিকদের অত্যাচার করে কোন্ সাহসে?

১৯৫৮ সনে নেহরু-নুন চুক্তিতেই কোচবিহার জেলার এই ছিটতালুকগুলো আইনসিদ্ধভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়---এখন সেখানে যখন পাকিস্তানীদের অত্যাচারে ভারতীয় নাগরিকজীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে, তখন সরকার এভাবে চোখ বুজে রয়েছেন কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিশ্চুপ অবস্থা শেষ পর্যন্ত যে কাকের চোখ বোজার গল্পে পরিণত হতে পারে, তা কি তাঁরা বোঝেন না? আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে কঠোর হতে বলি। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে চোখ বুজে থাকলেও, রাজ্য সরকারের যে এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে, তা নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

* * *

আমরা এবার রাজধানী কলকাতায় বেশ কিছুদিন থেকেই কিছু কিছু সঙ্গীত-জলসার আয়োজন দেখতে পাচ্ছি, যার প্রচারের প্রাচুর্য, যার আলোকসম্ভার আমাদের চোখকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গীতচর্চা ভালো জিনিস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া জলসার প্রতিও আমাদের বীতরাগ নেই। শুধু সীমান্তের ওপারে যখন অত্যাচারের ঘন অন্ধকারে লাঞ্ছিত সংখ্যালঘু মানুষের ক্রন্দন আকাশ-বাতাসকে মথিত করছে, যখন সীমান্তে ঘরহারা মানুষদের ব্যথা-বেদনা আমাদের দেশে বেদনার ঢেউ তুলছে, তখন কলকাতার মানুষ এ ধরণের উল্লাস ও হুল্লোড়ে রাজধানী

মাতিয়ে তুলবে, তা বোধহয় সভ্যতার আর এক সঙ্কটেরই ইঙ্গিত বহন করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরণের সঙ্গীত-জলসার উদ্যোগ না করলে সঙ্গীতচর্চা রসাতলে যাবে বলে আমরা মনে করি না। আমরা নানা ব্যাপারে সরকারের সমালোচনা করি, কিন্তু এই সব জলসার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদেরই আত্ম-সমালোচনার দিন এসে গেছে। পূর্ব-বঙ্গ থেকে আগত সর্বহারা মানুষদের সাহায্যার্থে আমরা যখন কিছু করতে পারি নি; তখন যদি শুধু খুশি, তামাসা ও হুল্লোড়ের জন্য এভাবে হাজার হাজার টাকা উধাও হয়ে যায় এবং তাও আবার এই বাংলা দেশে—তখন জাতির কাছে আমাদের বলবার কি থাকে বলুন। আশা করি, কলকাতার সুধীসমাজ তথা আপামর জনসাধারণ বিষয়টিকে নতুনভাবে চিন্তা করে আমাদের মনের এই শোচনীয় আত্ম-বিকৃতির ছায়াটি সুস্থতার দর্পণে যাচাই করে দেখবেন।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রীরাজ-বাহাদুর ১লা মার্চ ভারতের সর্বশেষ আলোক-গৃহ তরী 'সাগরদ্বীপে'র উদ্বোধন করেন।

ভারতের উপকূলে বহু বিচ্ছিন্ন আলোক-গৃহ (লাইট হাউস) আছে। যুগোশ্লাভিয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত এই আলোক-গৃহ তরীটি তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগবে। ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের এই তরীটি যুগোশ্লাভিয়ার টিটস জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় নির্মিত।

**বর্ধমান :**

ক্যানেল জলসেচ পরিকল্পনার ওপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু ঢক্কা-নিনাদ করেছেন, বিভাগীয় দপ্তর তো এর প্রচারকার্যে রং-তুলির ব্যবহার কিছু কম করেন নি, তবু এই বাংলা দেশের অনেক জায়গায় জলসেচের প্রবর্তন যে সরকারী দপ্তরের বাস্তব অভিজ্ঞতা-হীনতায় কি-রকম বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলতে পারে, তার এক জলন্ত নিদর্শন বর্ধমানের গলসী থানার করকুবা ইউনিয়নের শ্রীরামপুর মৌজা। এই মৌজায় ক্যানেল জল স্বাভাবিকভাবে যায় না। ক্যানেল থেকে এই মৌজায় চাষের জমিগুলির দূরত্ব দু' মাইলেরও অধিক। ক্যানেল থেকে করকুবা ও বৃন্দাবনপুর মৌজার মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এই মৌজায় জল আসতে দীর্ঘ সময় লাগে। এই দু' মৌজার চাষ শেষ হবার পর শ্রীরামপুর মৌজায় পৌঁছনোর ফলে শস্যের ফলন কমে যায়। তা ছাড়া এই দু' মৌজার ওপর দিয়ে শ্রীরামপুর মৌজায় জল আনতে গিয়ে প্রতি বছরই কিছু না কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে থাকে। এই অব্যবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য স্থানীয় অধি-বাসীরা ও চাষীরা ক্যানেল কর্তৃপক্ষের নিকট বৃন্দাবনপুর মৌজার ৮৮০ দাগে, যেখানে ক্যানেল এসে শেষ


শংকর-এর

**পাত্র-পাত্রী** ২·৫০ **চৌরঙ্গী** ১০·০০

দু' সপ্তাহে ২য় সংস্করণ বেরুল। দশম সংস্করণ

**যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ** (৭ম সং) ৪·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পাড়ি** (৭ম সং) ৩·৫০ **মাসিরেখা** (৩য় সং) ৯·০০ **নিশিপদ্ম** (৪র্থ সং) ৪·০০

বনফুলের

**দূরবীন** (২য় সং) ৪·০০ **অযাত্রায় জয়যাত্রা** ৪·০০ **দৈনন্দিন** ৩·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

**শরৎ নাট্যসংগ্রহ** (১ম খণ্ড)

প্রবোধকুমার সান্যালের

**দুই পাখা** • **পৌষ ফাগুনের পালা**

সতীনাথ ভাদুড়ীর

**অলোক দৃষ্টি** • **কালো হরিণ চোখ**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

**পরায়ণা গৌরী** (২য় সং) ৪·৫০ **ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী** ৫·০০

নীলকণ্ঠের

**ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে** (২য় সং) ৩·০০ **পকেটমার** (২য় সং) ৫·০০

দিলীপকুমার রায়ের শিষ্যা

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**অগ্নিমিতা** (২য় সং) ৫·০০ **রোশনাই** ৪·০০

সমরেশ বসুর

**জোয়ার ভাটা** (২য় সং) ৩·৫০ • **চিত্তচকোর** (২য় সং) ৩·০০

প্রবোধ ঘোষের

রমাপদ চৌধুরীর

**চন্দন কুঙ্কুম** (২য় সং) ৩·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

**গীতা কাপুরের আত্মহত্যা** ৫·০০

**বাক্-সাহিত্য** : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

হয়েছে, সেখান থেকে ঐ মৌজার ২১ দাগের ওপর একটি দাঁড়া কেটে অসুবিধার অবসান ঘটাতে বার বার অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়েছেন। বৃন্দাবনপুর মৌজার ঐ ৮৮০ দাগে যেখানে ক্যানেল শেষ হয়েছে, সেই জমিটির পশ্চিম অংশ ঢালু ও পূর্ব অংশ উঁচু, সেজন্য ক্যানেলের জল পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে খড়ি নদীতে অপচয় হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত দাঁড়া কেটে দিলে একদিকে যেমন ক্যানেলের জলের অপচয় বন্ধ হবে অপরদিকে শ্রীরামপুর মৌজা সহজে প্রচুর পরিমাণে ক্যানেলের জলে সমৃদ্ধ হবে। অথচ সরকারী বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতার ফলে শ্রীরামপুর মৌজার চাষীদের দুর্ভোগই সহ্য করতে হচ্ছে। প্যাকেজ পরিকল্পনায় চাষীদের অসুবিধা দূর করে কৃষির সুবিধা হচ্ছে বলে সরকারী প্রচার কৌশল যতই আস্ফালন করুক না কেন, শ্রীরামপুর মৌজার চাষীদের ভাগ্য কিন্তু এই 'প্যাকেজের' যুগেও প্রসন্ন হল না।

**বীরভূম :**

আহমদপুরের চারদিকে প্রায় চারশত, পঁচাত্তরখানি গ্রামের ওপর নোটিশ জারী হয়েছে যে, গ্রামবাসিগণ যে ইক্ষু উৎপাদন করেছেন, তার দু'-এর তিন অংশ সুগার মিলে বিক্রয় করবেন এবং বাকি একের তিন অংশ দ্বারা নিজেদের জন্য গুড় প্রস্তুত করতে পারবেন। বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল সুগার মিল কোন ইক্ষু খরিদ করছেন না। চাষীরা কাটা ইক্ষু ফেরত নিতে বাধ্য হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় কর্তৃপক্ষ আবি বলছেন ইক্ষু কেনবার টাকা নাকি নেই। যেহেতু সরকার প্রচার করেছিলেন, উৎপাদিত ইক্ষুর দু'এর তিন অংশ মিলে দিতে হবে, তাতে উৎসাহিত হয়েই চাষীরা বেশি ইক্ষুর চাষ করেছিলেন। এখন অকস্মাৎ মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইক্ষু খরিদ না করবার সিদ্ধান্তে চাষীদের ভাগ্য নিয়েই ছিনিমিনি খেলছে। সরকার চাষীদের ওপর যেমন হুকুম জারী করেছিলেন, তেমনি হুকুমনামায় সরকার মিল কর্তৃপক্ষকে কেন আজ ইক্ষু খরিদ করতে বাধ্য করছেন না, এটা অনেকের কাছেই রহস্যের মত ঠেকছে। এক্ষণে চাষীরা এই কাটা ইক্ষু নিয়ে কি করবে সরকার এ বিষয়ে ভেবে দেখেছেন কি? তার জন্য এই চাষীরা কি মিল কর্তৃপক্ষকে তথা সরকারকে তাদের এই ক্ষতির জন্য দায়ী করতে পারে? এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আমরা না তুলে পারছি না। সরকারী ইস্তাহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তার গুড় প্রস্তুত করবার জন্য যে ইক্ষু মাড়ান কল আসবে, তার প্রত্যেকটির উপর ১৫০'০০ টাকা হিসাবে লাইসেন্স ফি দিতে হবে। কোন চাষীর পক্ষে এখন এটা কি সম্ভব যে, সে ১৫০'০০ টাকা লাইসেন্স ফি দিয়ে ইক্ষুর কল আনবে ও গুড় প্রস্তুত করবে। ফলে এই হবে যে, চাষীর বহু কষ্টের অর্জিত ইক্ষু শুকিয়ে জ্বালানিতে পরিণত হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গুড়ের বাজার খুব মান্দা। দেশী গুড়ের অভাবে পশ্চিমবঙ্গকে গুড়ের জন্য বাইরের মোকামের ওপর নির্ভর করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতিতে এই প্রহসন কেন চলছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা সরকারকে সত্বর এই প্রহসনের একটা মীমাংসা করতে অনুরোধ করি। সেই সঙ্গে সময় থাকতে চাষীদির সর্বনাশের পথ হতে রক্ষা করতে সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহমদপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অর্থনৈতিক বনিয়াদ নির্ভর করছে—এই উৎপাদিত ইক্ষুর ওপর। অতএব, মিল মালিকের খামখেয়ালীর কাছে হাজার হাজার চাষীর স্বার্থ বলি দিলে সরকার নিশ্চয়ই তার ভুলের মাশুলকে ভারী করবেন—এই সহজ হিসাবটা আশা করি, সরকারকে দ্বিতীয়বার বুঝিয়ে না দিলেও চলবে।

**জলপাইগুড়ি :**

জলপাইগুড়ি জেলার দৈখাতা অঞ্চলে ভারতীয় ছিটতালুক থেকে কয়েকশ' সাঁওতাল পরিবার পাকিস্তানীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাক-সীমা অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে ভারতীয় সীমায় এসে পৌঁচেছে, এ সংবাদ আমরা পেয়েছি। চারদিকে পাকিস্তান-সীমার মধ্যে থেকে ছিটতালুকের অধিবাসীদের জীবনে কোন শান্তি, স্বস্তি বা নিশ্চিন্ততা নেই। পাকিস্তানীরা সুযোগ পেলেই এই ছিটতালুকবাসীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে নানা অছিলায়। ভারতীয় অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রহিত বলেই পাকিস্তানীরা এইসব ভারতীয় ছিটমহলের নাগরিকদের ওপর অন্যায় জুলুম করছে। এতে পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই সব ছিটমহল থেকে আগত ভারতীয় নাগরিকদের সরকার নাকি উদ্বাস্তুরূপে গ্রহণ করতে রাজি নন। আশ্চর্য হচ্ছি---এই ভেবে যে, ভারতীয় নাগরিকদের, যাঁদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সরকারের, তাদের রক্ষা তাঁরা করতে পারছেন না উল্টো এইসব অসহায় মানুষদের ভাগ্য নিয়ে তাঁরা দায়সারা জবাব দিতেও পেছপা হন না। ভারতীয় নাগরিকদের মেরে পিটে উৎখাত করে দিলেও সরকার অথর্ব হয়ে বসে থাকবেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। এটা কোন ধরণের রাজনীতি তা আমাদের মগজে ঢুকছে না। এ-ধরণের আত্মনাশা 'ছিট' সরকারের মাথা থেকে না-গেলে ছিট তালুক সরকার রক্ষা করতে পারবেন না—কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে চোখ বুজে থাকলেও রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব আছে, সে কথা তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

# আজকের আমেরিকা

● নিউইয়র্ক বিশ্বমেলার 'ইষ্টম্যান কোডাক' প্যাভেলিয়নের ৮০ ফিট উঁচু ঢেউতোলা ছাদের একাংশ।

**মিনু মালাকার**

আমেরিকার ইতিহাসে আগাগোড়া রয়েছে বৈচিত্র্য। এই মাটিতেই প্রথম বিপ্লবের রক্তপতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। এক সময় অত্যাচারিত, নিপীড়িত ধর্মযাজক, দার্শনিক, রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলী 'মুক্ত দুনিয়া'র সন্ধানে এই আমেরিকায় আসতো ছুটে। দুনিয়ার কত সমাজতন্ত্রী দার্শনিক আমেরিকায় ছুটেছে ওঁদের মতবাদ নিয়ে নতুন সমাজ গড়তে। নিউইয়র্ক নগরীর দ্বারদেশে 'লিবার্টি'র বিরাট মূর্তি সেদিন তাঁদের টেনে নিয়ে আসতো ; তাঁরা তাঁদের চিন্তার প্রতীক হিসাবে 'লিবার্টি'কে গ্রহণ করেছিল। এই বিপ্লবী ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। এলো আমেরিকার স্বরকুণো নীতি। বহুদিন পর্যন্ত, যতদিন নিজের দেশ প্রয়োজনপূর্ণ না হচ্ছে, ইউরোপের কোন ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ার বৈদেশিকনীতি ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করে। লীগ অফ নেশন গড়তেও এগিয়ে এসেছিলেন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন। কিন্তু গোটা পৃথিবীর ব্যাপারে আমেরিকা এগিয়ে এসেও আবার আপন বিবরে নিজেকে গুটিয়ে নেবার নীতি গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও বৃটিশ অনেক পরে আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাতে পেরেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা হঠাৎ যেন নিলিপ্ততার অবস্থা থেকে গোটা বিশ্বের সর্বত্র তার হাত বাড়িয়ে দিল। ফলে, পৃথিবীর প্রতিটি ব্যাপারে আমেরিকা, যেন আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীর বড় সাহেব। কিন্তু গত ১৫ বছরে আরও বড় শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রগতি, চীন নেতৃত্বের গলাবাজী, সদ্য স্বাধীন এশিয়া-আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতি—প্রত্যেকটি ঘটনা একচেটিয়া মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে। আজ গোটা পৃথিবী যেন দু'টি বড় শক্তি শিবিরের আওতায় চলে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বশান্তির প্রশ্নে আজ বড়-ছোট প্রতিটি রাষ্ট্রই সাড়া তুলেছে। সামগ্রিক চিন্তায় আমেরিকাকেও শান্তির পথ নিতে হবে। বিশ্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একথা মার্কিন দুনিয়ার জনগণও উপলব্ধি করছে। আগামী 'নিউইয়র্ক ১৯৬৪-৬৫ বিশ্বমেলা' তারই ফলপ্রসূ ঘটনা। শান্তিতে বিশ্ব প্রগতির পথে এগিয়ে যাক সহাবস্থানের মাধ্যমে —একথাই ঘোষণা করবে 'নিউইয়র্ক বিশ্বমেলা'।

আর একবার বিশ্বমেলা হয়েছিল এই নিউইয়র্ক শহরে ১৯৩৯-৪০ সালে। সেবার যে স্থানে মহতী বিশ্বমেলার আলো জ্বলে উঠেছিল, সেই ফ্ল্যাশিং মিডো পার্কে এবারও ৬৪৬ একর জমির ওপর 'নিউইয়র্ক ১৯৬৪-৬৫ বিশ্বমেলা'র আয়োজন হচ্ছে। জনবহুল নিউইয়র্ক শহরের জনবসতি ও ভৌগোলিক দিক বিচারে এই মিডো পার্ক যে এমন বিরাট মেলার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, সন্দেহ নেই। যানবাহনের সুব্যবস্থার দিক থেকেও এই নির্দিষ্ট স্থানটি উপযুক্ত। কারণ, বাস বলো, যে কোন মোটরযান, সাবওয়ে, রেল, বোট, প্লেন এবং হেলিকপ্টার সব কিছুরই যোগ রয়েছে নিউইয়র্ক শহরের এই কেন্দ্রস্থল পার্কটির সঙ্গে। যদিও প্রথম বিশ্বমেলা এবং আজকের বিশ্বমেলার ব্যবস্থা একই স্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবুও ১৯৩৯ সাল আর '৬৪ সালের এই কালের ব্যবধানে স্থানটির পরিবর্তনও ঘটেছে প্রচুর। ১৯৩৯ সালে এই ফ্ল্যাশিং মিডো শহর জনসংখ্যার দিক থেকে কেন্দ্রমণি ছিল না। যুদ্ধের আমলে বহু কিছু ভেঙেছে, আবার বহু কিছুর সৃষ্টি হয়েছে এই নিউইয়র্কে। শিল্প-সৃষ্টিতে, সাংস্কৃতিক গুরুত্বে, জনবসতির বৃদ্ধিতে নিউইয়র্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের কেন্দ্রস্থল মিডো পার্ক অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়েছে অনেক।

এই বিশ্বমেলার কর্মকর্তারা বিশেষ করে বিরাটভাবে আয়োজিত এই মেলার জন্যে এ স্থানটি বিবেচনার পেছনে আরও একটি কারণ আছে। গত বারের মেলার সঙ্গে জড়িত থাকার

এ অঞ্চলের প্রতিটি কোণের সঙ্গে পরিচয় আছে। ফলে আগামী বিশ্ব-মেলা সাজাবার পক্ষে এটা একটা বিরাট লাভজনক ব্যাপার বইকি।

এই অদ্বিতীয় অতুলনীয় বিশ্ব-মেলায়, ১৯৬৪-৬৫ সালের বিরাট বিশ্ব সার্কাসে আমরা কি কি দেখতে পাবো? এক কথায় বলা যেতে পারে, সর্বদিক দিয়ে মানবতার বিচারে, এই বিশ্বমেলা হয়ে উঠবে এক নয়নাভিরাম দর্শনীয় বস্তু, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের সার্থক কেন্দ্রভূমি। অলিম্পিকের প্রগতি আদর্শে প্রতিযোগিতা-মূলক মনোভাবাপন্ন সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এখানে আসবে তাদের সেরা মানুষ আর জিনিষ নিয়ে। উদ্দেশ্য, পরস্পর পরস্পরের সম্পদকে জানবে, জানবার মন নিয়ে। এই বিশ্ব-মেলার উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করেন, এই মহৎ আদর্শে কূটনৈতিক বা রাষ্ট্রগত কলাকুশল ছাড়াই বিশ্ববাসী নতুন মৈত্রী-ডোরে আবদ্ধ হবে এবং বিশ্ব-শান্তির শুভপথ আবিষ্কার করতে পারবে।

এই নিউইয়র্ক ১৯৬৪-৬৫ বিশ্ব-মেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নিউইয়র্ক শহর সরকার ছাড়াও, ওদেশের ১৪টি অঙ্গরাজ্য সরকার, ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ৫০টির ওপর বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যোগদান করছে তাদের সম্পদ সম্ভার নিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিশ্বমেলার দ্বারোদ্ঘাটন হবে আগামী ২২শে এপ্রিল এবং বন্ধ হবে ১৮ই অক্টোবর। তারপর ১৯৬৫ সালের ২২ই এপ্রিলে আবার এই বিশ্বমেলার আলো জ্বলবে বিশ্ববাসীর জন্যে, পরিসমাপ্তি ঘটবে ১৭ই অক্টোবর

এই প্রদর্শনীতে যোগদানেচ্ছু প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসমূহের ওপর বিশ্ব-মেলা উদ্যোক্তাদের কোনরূপ বিশেষ প্রকল্প চাপিয়ে দেবার মতো প্রবণতা নেই—তাদের প্যাভলিয়ান তৈরি করা সম্পর্কে। মেলার একজন মুখপাত্র কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, প্রতিটি দেশ বা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী তাদের শিল্পসম্ভার নিয়ে প্রদর্শনী মণ্ডপ সাজাবে। এই মেলার প্রতিটি কোণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্ববৈশিষ্ট্য রূপায়ণের স্বাক্ষর হয়ে উঠবে। দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নতুন পদ্ধতিতে, নতুন পসার নিয়ে বৈচিত্র্যের হাট হবে এই বিশ্ব-মেলা। এই মেলা বহুকে টেনে আনবে একের মধ্যে, যার ফল একটি অতুল-নীয় শক্তির সৃষ্টি। উদ্যোক্তারা মনে করেন, কম হ'লেও ৭ কোটি দর্শকের পদার্পণ ঘটবে এই নিউইয়র্ক বিশ্বমেলায়। প্রথম বছরে ৪ কোটি আর পরের বছরে আরও বেশী দর্শকের সমাবেশ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৯৩ সালে চিকাগো মেলায় প্রায় ২ কোটি দর্শকের সমাবেশ হয়েছিল। এক গ্রীষ্মেই ব্রাসেলের প্রদর্শনীতে লোক এসেছিল প্রায় ২৪ মিলিয়ন। এবার নিউ-ইয়র্কের জনবহুল শহরের মিডো পার্কের বিশ্বমেলায় সম্ভবত পুরোণ সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করবেন উদ্যোক্তারা।

সত্যিই বিরাট এই বিশ্বমেলার প্রস্তুতিতে সাংঘাতিক খাটুনিতে পড়তে হচ্ছে কর্মকর্তাদের। কোন জিনিষই কোন পুরোণ খড়কুটোকে আশ্রয় ক'রে তৈরি হচ্ছে না। প্রতিটি জিনিষ নতুন, প্রতিটি চিন্তাও। যাতা-য়াতের পথ তৈরির নতুন প্রকল্প-

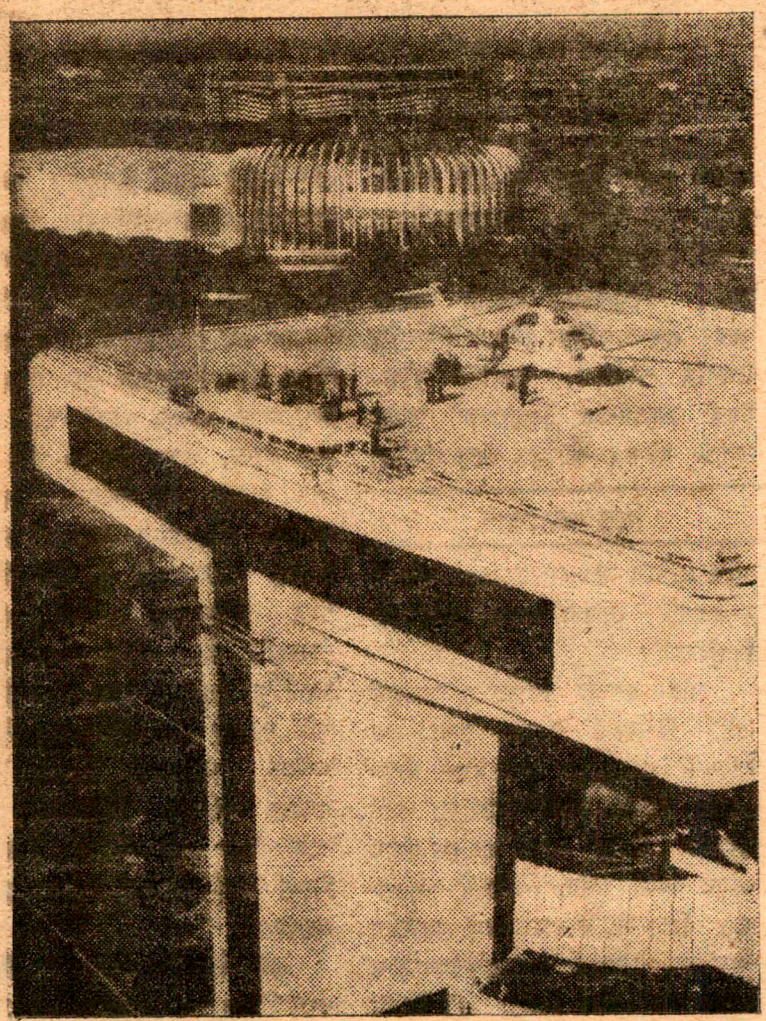

● নিউইয়র্ক বিশ্বমেলার অফিস বিল্ডিং-এর ওপর সামরিক হেলিকপ্টারের দৃশ্য।

সম্পন্ন ছোট-বড় পথ যে কোন শহরের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। এ পথঘাট মেলা শেষ হয়ে গেলেও নিউইয়র্ক শহরের মতো যানবাহনবহুল ঘিঞ্জি মহানগরীর বহু কাজে আসবে। গাড়ি পার্কিং-এর জন্যেও কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর দিয়ে সুব্যবস্থা করেছেন। এ ঠিক, গাড়ির মেলা বসে যাবে বিশ্বমেলায়, যা কিছুতেই ঠেকাবার উপায় নেই। এরকম খুঁটিনাটি ব্যাপারে লক্ষ্য রেখে সর্বদিক দিয়ে মেলার যে প্রস্তুতির কাজ হচ্ছে তাতে অনুমান করা যায়, কম হলেও এক হাজার মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। তাই ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে এই বিশ্বমেলার নামকরণ হয়ে গেছে 'হাজার মিলিয়ন মেলা'। নিউইয়র্ক সিটি কণ্ট্রোলার বলেছেন, এই মেলাতে যেমন খরচ হবে প্রচুর তেমনি সেলট্যাক্সের মাধ্যমে এত আয়ের আশা আছে যে, অতিরিক্ত 'মেলাকর' বসাবার প্রয়োজন হবে না। ইতিমধ্যে মেলার কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতিপর্বের অর্থসংগ্রহের জন্যে ব্যাঙ্কঋণ ও শতকরা ছয় শতাংশ সুদে ঋণপত্র ছেড়েছেন অর্থলগ্নীকারকদের কাছে। যদিও ১৯৩৯-৪০ সালের মেলার সার্থকতা কম নয়, তবুও আর্থিক ক্ষতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এবারের বিশ্বমেলায় যেমন বিশ্বশান্তির দিক দিয়ে রয়েছে সার্থকতার আশা, তেমনি রয়েছে আর্থিক লাভের আশা।

নিউইয়র্ক ১৯৬৪-৬৫ সালের মেলা নিঃসন্দেহে বিরাট উত্তেজক, রোমহর্ষক ঘটনা হতে চলেছে। এ তো মেলা নয় যেন বিশ্বরূপ। কি দেখতে চান? শিল্প-সৌন্দর্যের সূর্যপ্রতীক? চিন্তা করবার, আকাশে ওড়বার, পথে চলবার, রুচি অনুযায়ী পোষাক পরিবর্তন কিম্বা যে কোন কাজ উদ্ধারের যান্ত্রিক সাহায্য? প্রসাধনী বস্তু, আইভরি, কিম্বা অন্য বিলাসবস্তু কিছু? দর্শনের কোন নিদর্শন, যা জীবনের পথপ্রদর্শক হবে? অথবা এমন কোন জ্ঞান, যা মানুষের কাছে শক্তিতে

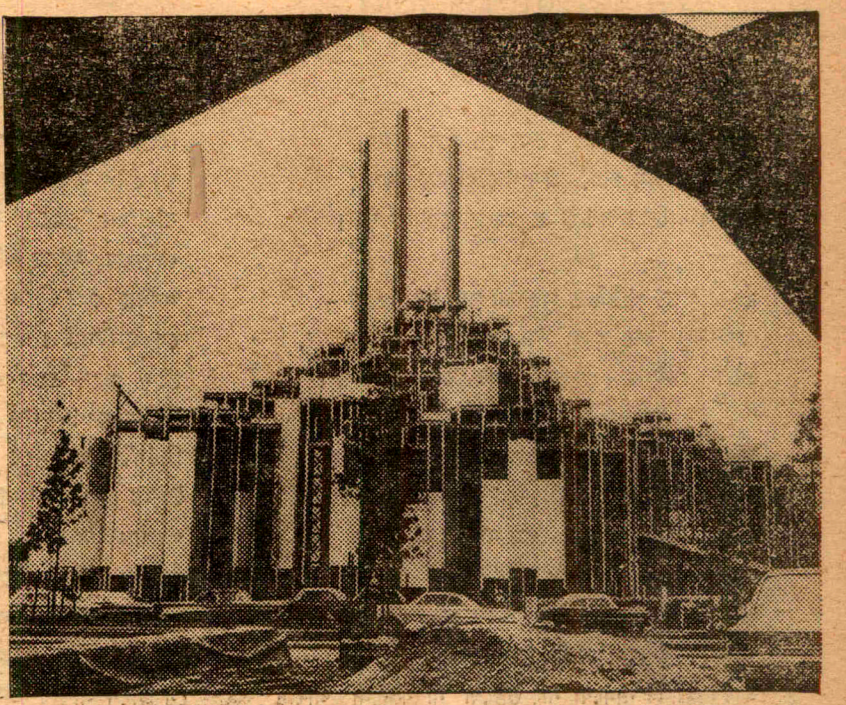

নিউইয়র্ক বিশ্বমেলার ১২০ ফিট উচ্চ 'টাওয়ার লাইট' পিরামিডের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রস্থলে।

পরিণত হবে? সবই পাবেন এই বিশ্বমেলায়। ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, সামাজিকব্যবস্থা, চিন্তার পার্থক্য স্বাভাবিক। যত মত তত পথ। এই বিভিন্ন চিন্তা আর আদর্শপ্রসূত স্ব স্ব সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র সুযোগ পাবে পরস্পরকে জানবার —একথাই বিশ্বাস করে নিউইয়র্ক বিশ্বমেলা। বিশ্বাস করে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আগামী ২২শে এপ্রিল সেই বিশ্বমেলার দ্বারোদঘাটন হচ্ছে সহস্র সহস্র দর্শকদের জন্যে। বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র মেলায় ওরা পরস্পর পরস্পরকে দেখবে আর জানবে, ওরা কারা—কেমন করে জীবনযাপন করে—ওরা কি করে, কি চিন্তা করে। মানুষের মঙ্গলচিন্তায় তারা কোন্ পথে চলেছে। কোন্ পথ বিশ্বাস করে। কম হলেও ৫০টি বিদেশী যোগদানকারী রাষ্ট্রের সমাবেশ হবে এই মেলায়। ইতিহাসে এটিই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক মেলা। শুধু প্যাভেলিয়ানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যই এদের যোগদানের মূল্যায়ন করা হবে তা নয়। বিশ্বমেলার ব্যাপক চিন্তাকে সার্থক করবার জন্যে এরা প্রত্যেকে সমান অংশীদার—এদিক দিয়েই প্রত্যেক যোগদানকারী রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করতে হবে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্যাভেলিয়ানগুলি তৈরি করতে আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে এই মেলার মাধ্যমে, তেমনি রয়েছে শিক্ষাগত গুরুত্ব। এই বিশ্বমেলাতে দর্শকরা গোটা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন কোন জাতি কোন সম্পদের জন্য গর্ব করে, তা খুঁটিয়ে দেখার রয়েছে দর্শকদের এই মেলার মাধ্যমে। বিদেশী যোগদানকারীদের উপস্থিতি এই বিশ্বমেলাকে বিশ্বপার্লামেণ্টে রূপান্তরিত করবে।

সেই দিনটির অপেক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-জনগণ অপেক্ষা করছে যেদিন সরকারীভাবে বিশ্বসরকারের দোর দুনিয়ার সামনে খুলে

## ক্রমাগত বাড়ছে বয়স

বরুণ মজুমদার

এঘর ওঘর করে কতঘর পেরিয়ে এলাম,
এক দুই তিন চার, ক্রমাগত বাড়ছে বয়স ;
সামনে দাঁড়িয়ে আছে দণ্ডহাতে ভয়ানক যম।

মনে পড়ে পরিচিত পুরাতন ঘর ঘর খেলা—
ছোট বড় কত গঙ্গা অতিকষ্টে পার হয়ে শেষে,
এলো সেই গুটি ফেলে একঘর কেনবার পালা।

আর আমি পারবো না কোনঘর পার হয়ে যেতে,
শেষ ঘরে এসে গেছি, আর কোন ঘর নেই বাকী।
এবার খেলার শেষে চলে যাবো, বহুদূর বাড়ি।

আমাকে এখন কেউ পিছু থেকে ডেকো নাকো আর,
নীচু থেকে চলে গেছি ওপরের প্রিয় যাদুঘরে।
আর আমি নামবো না, উঠবো না কখনো আবার ;
থাকবো দাঁড়িয়ে শুধু স্থাণুবৎ অচল অনড়।

## জন্মান্তর

দেবব্রত দত্ত

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে
কী পেল মানুষ তার জীবনের অবশিষ্ট পুঁজি ?
সারাদিন রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে
চেতনার সমুদ্রে অস্থির
অবসন্ন দেহ নিয়ে ফিরে আসি ব্যর্থতার রাত্রির গভীরে
সেখানে আহত স্বপ্ন, অবিশ্বাস, জীবন-জিজ্ঞাসা
ভানা মেলে একে একে ভিড় করে আসে।
বিবিক্ত-যন্ত্রণা-ক্লান্ত বৃদ্ধা পৃথিবীর
নির্ধারিত কক্ষপথে রাত্রিদিন শান্ত পরিক্রমা।
উপরে আকাশ আজো নীল ;
পরমাণু আলোর শরীরে
অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে। মায়াবী হরিণ
বৃথাই অরণ্যে খুঁজে মানুষেরা ফিরে এল ঘরে।
অজীর্ণতে যে লোকটা মারা গেল কাল
সে জানে আত্মার কোন তৃপ্তি নেই। ফসলের গান
ধ্বনিত করার জন্য বারংবার জন্মান্তর এনেছে পৃথিবী॥

---

যাবে। সামগ্রিক প্যাভেলিয়ান তৈরির খরচ পড়বে ২০০ মিলিয়ন ডলার। এই বিশ্ব-পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণ করবে সেদিন আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ। এমন সমাবেশ এর আগে কোনদিন হয় নি। সংস্কৃতি ও শিল্পসম্পদের দিক দিয়ে এই বিরাট সমাবেশের নান্দীমুখ রচনায় বলতে হলে বলতে হয়, পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময়ের সমাবেশ ঘটবে এখানে। ভাটিক্যান প্যাভেলিয়ান দেখাবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ। মাইকেল এঞ্জেলোর 'পিয়েটা'র সঙ্গে পরিবেশন করবে প্রাক ক্রীশ্চান শিল্প-সম্ভার। জর্ডান থেকে আসবে 'ডেড সি স্ক্রোলস' আর প্রাচীন রোম নগরী জেরিস থেকে আসবে সুন্দর 'লুইসপারিং' ; প্রদর্শনীতে যুক্ত আরব দেখাবে প্রাচীন পারস্যের পিরামিড নিদর্শন। ফাইন আর্টের অধিকারী স্পেন পুরস্কার দেবে বিশ্বমেলার দর্শকদের সামনে ফ্রান্সিস্কো ডি জারবারন অঙ্কিত আলেখ্য, ইলগ্রেকোর 'লাইট উইথ হ্যাণ্ড অন চেষ্ট' ও স্পেনের বিশেষ আকর্ষণীয় প্রদর্শনী আলেখ্য।

ইন্দোনেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে ইন্দোনেশীয় প্যাভেলিয়ানে। ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত প্রামাণ্য 'টেম্পল টাওয়ার' দেখানো হবে সে প্রদর্শনীতে। চীন দেশের কিছু কিছু প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন পাঠিয়েছে তাওয়ান থেকে। ভারতও উপস্থিত হয়েছে তার প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে। জাপানও পড়ে নেই।

গোটা মেলায় উপস্থিত শিল্প, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় সামান্য লেখনীতে এখানে কতটুকু বা দেওয়া সম্ভব। একটি কথা বলা হয়তো বাহুল্য হবে না—এখানে উপস্থিত শিল্প-সংস্কৃতিসম্ভার প্রতিটি দেশের পরিচয় বহন করে এনেছে। একটার সঙ্গে আর একটার সাদৃশ্য নেই। তবু এই বৈচিত্র্যে গোটা বিশ্বমেলা যেন একটি 'ইউনিটে' পরিণত হয়েছে।

নিউইয়র্ক মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে এই বিশ্বমেলার স্থান নির্বাচন সবদিক দিয়েই সার্থক। নিউইয়র্ক শুধু আমেরিকার নয়—পৃথিবীর একটি নগর। পৃথিবীর সবরকম ভাষাভাষীকে দেখা যায় এই মহানগরীতে। যাঁরা ইংরেজী বলেন না, তাঁদেরও কদর এখানে কম নয়। সর্বোপরি নিউইয়র্কে জাতিপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার্সের স্থায়ী গৃহ রয়েছে। জাতিপুঞ্জের এই স্থায়ী গৃহের সীট থেকে প্রতিটি জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ টান টান চোখ মেলে দেখতে পাবেন এই বিশ্ব-মেলার বিশ্বরূপ। মহাত্মা পোপের ভাষায়, 'এই বিশ্বমেলা, যা মানুষের অগ্রগতির পরিচয় বহন করে জন-সম্মুখে উপস্থিত হতে চলেছে তা শুধু বিশ্বমানবের মিলিত প্রচেষ্টাই নয়, মিলিত মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মানবতার ফল বিশেষ।'

এই বিশ্বমেলায় পৃথিবীর সবদিক থেকে দর্শকরা ভীড় জমাতে আসছে। আর কটাদিন পর সুরু হবে মেলার নাগরদোলার দোল। সে দোলায় বিশ্বমন্থন হবে। উঠবেন লক্ষ্মী অমৃত হাতে আর জ্ঞানের আলো হাতে সরস্বতী।

সুশীল রায়

# অনলা য়তী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

কত গর্হিত অন্যায় এবং কত লজ্জা যে জমে আছে সমাজের সংস্কারের মধ্যে, তার অন্ত খুঁজে পাওয়া দায়। রংপুরে এসব কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে হরিহরানন্দের সঙ্গে; এই তীর্থস্বামী মহাশয়ের মত ও পথ রামমোহন থেকে ভিন্ন হলে কি হবে, উভয়ে উভয়ের সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় কালযাপন করতে পেরে হরিহরানন্দ হয়ে উঠেছেন।

রংপুরে চাকরির জীবন। কিন্তু রামমোহনের জীবনটা যেহেতু কেবল চাকরির জন্যে নয়, এইজন্যে তিনি তাঁর অভিমত নিয়ে আলোচনার এবং সে-অভিমত প্রকাশের উপযুক্ত অবসর যেমন চেয়েছেন, তেমনি চেয়েছেন একটি আসরও। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর এই উভয় আকাঙ্ক্ষা অনেক পূরণ করেছেন। তিনি বামাচারী তান্ত্রিক আর রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মবাদী—তবু উভয়ের আলোচনায় সংঘর্ষ কখনো বাধে নি, সংঘাতও না—কেউ কারো মতে আত্মসমর্পণ করেন নি বটে; কারো মতে একমত হন নি বটে; কিন্তু উভয়ে উভয়ের হয়েছিলেন অন্তরাত্মা।

রংপুরে এখন তিনি কোম্পানীর দেওয়ান। পদটা যেমন বড়, দায়িত্বও সেই অনুপাতেই। কাজে অনেক বিঘ্ন ও বিপদও অনেক। ডিগবি সাহেব হচ্ছেন কালেক্টর, তাঁর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব আছে ব'লেই তবু একটু নিশ্চিন্তমনে কাজ করা যাচ্ছে। ডিগবির অধীনে কাজ করেন বটে, কিন্তু কাজ নেবার আগে চুক্তি করে নিয়েছেন রামমোহন, মৌখিক নয়—লিখিত চুক্তি। এদেশী লোকদের—তা সে তার পদ যত বড়ই হোক—চেয়ারে বসতে দেয় না সাহেবরা; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে, এই নিয়ম চালু। কিন্তু অধীনে চাকরি বলেই অতটা অধীনতা ও অসম্মান মেনে নিতে রাজি নন রামমোহন। এইজন্যেই ওই চুক্তি। লিখিত ভাবে ডিগবি জানিয়ে দিয়েছেন যে, রামমোহনকে সর্বদা বসবার অধিকার দেবেন, কেদারা দেবেন। এই অধিকার ও সম্মান পাবেন ভরসা পেয়েই চাকরি নিয়েছেন তিনি এবং ডিগবির সঙ্গেই রামগড়, ভাগলপুর ঘুরে এসে পৌঁচেছেন রংপুরে।

উত্তর বাংলার জমিদারির অবস্থা বড় জটিল। বড় বড় জমিদারের সংখ্যা অনেক। তাদের যেমন শক্তি তেমনি সংগতি এবং পরস্পরের মধ্যে কলহও তেমনি অগণ্য।—মীমাংসা হয় নি এবং হয় না, এ-ধরণের মামলাও অনেক। যে-কোনো একটা বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ ঘাঁটতে গেলেই দেখা যায় সেসব কাগজ-পত্রের শেষ নেই। তাছাড়া, দু-পক্ষ থেকে দাবি ও পাটা দাবি আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, জমির প্রকৃত মালিক যে কে তা কাগজপত্রে খুঁজে পাওয়াই যায় না। সেরেস্তাদারদের সাহায্য নিয়েও অনেক সময় বিরোধের মীমাংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

জমিদারির হিসাবপত্রের এবং জমি জরিপ করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে নিতে হয়েছে রামমোহনকে; আমিন আর আমলারা কি ভাবে মিথ্যা হিসাব দাখিল করে, সে-সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা এখন খুব পরিষ্কার। এইসব কারণে দেওয়ানগিরি তিনি করে যেতে পারছেন।

কাজ করে যেতে পারছেন ব'লেই যে সে-কাজ তাঁর মনের মত কাজ, এমন কথা বলা যায় না। সারাদিন দলিল-দস্তাবেজ আমিন-আমলা-সেরেস্তাদার নিয়ে কাটাতেন বটে, কিন্তু সে-সময়টা তাঁর কাছে সময় বলে মনে হয় না।

এই নির্বান্ধব দেশে তিনি তাঁর মনের খোরাক ও প্রাণের আরামের সন্ধানে ছিলেন। ক্রমশ তিনি এখানে গড়ে তুলেছেন বন্ধুগোষ্ঠী। ধর্ম বিষয়ে আলোচনার জন্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে মিলিত হতে লাগলেন সকলে। নিয়মিত আলোচনা হয়, আলোচনায়

প্রধান বিষয় হচ্ছে - পৌরলিকতার অসারতা।

বেশ কেটে চলেছে রংপুরের জীবন। কর্মক্ষেত্রই ছিল এ এতদিন, এবার ক্রমশ এ হয়ে উঠছে যেন একটি ধর্মক্ষেত্রও। এতে মনে শান্তি পাচ্ছেন, সান্ত্বনাও পাচ্ছেন।

কিন্তু বাধা আছে সর্বত্র। বাধা আছে বলেই বেগও আছে। পাহাড়ের গুহা থেকে যখন নদী যাত্রা সুরু করে, তখন মসৃণ পথ তার সম্মুখে প্রসারিত থাকে না। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে হয় তাকে, যতই চলে ততই তার পথ হয়ে উঠে প্রশস্ত, গতি হয়ে ওঠে প্রবল। কে বলতে পারে, রামমোহনও একদিন বাধায়-বাধায় গতি সঞ্চয় করে বিশাল আর বিপুল হয়ে উঠতে পারবেন কি না।

রংপুর জজ আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের কথা ভাবছেন রামমোহন। মানুষটা পণ্ডিত অবশ্যই, পারস্য ভাষায় যেমন দখল, সংস্কৃতেও তেমনি ব্যুৎপত্তি। রামমোহনের যুক্তির প্রতিবাদে একটা বই লিখছেন নাকি তিনি। রামমোহন তাঁর মতে জ্ঞানহীন, সেইজন্যে রামমোহনকে জ্ঞানদান করার অভিপ্রায়ে তিনি সেই বইয়ের নামকরণ করেছেন জ্ঞানচন্দ্রিকা। তা করুন, সে-ভাবে জ্ঞান দেওয়ার অধিকার সকলের আছে, যে-মতে যে বিশ্বাসী সে-মত প্রকাশের ও প্রচারের অধিকারও তার আছে। কিন্তু, রামমোহন ভাবছেন অন্য কথা। ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতাপ আর প্রতিপত্তি রংপুর-অঞ্চলে অসাধারণ, তিনি তার অপব্যবহার করার জন্যে উদ্যত হয়েছেন বলে খবর পেয়েছেন রামমোহন। অনেক লোক একত্র করেছেন নাকি গৌরীকান্ত, বই লিখে কেবল জ্ঞানই দিতে চান না, ঐ সব লোককে দিয়ে হামলা করিয়ে রামমোহনকে শিক্ষাও দিতে চান নাকি তিনি!

গভীর রাত্রে আত্রাই-নদীর তীরের পর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে বসে গায়ে ঝাঁকি দিয়ে একা একাই হেসে উঠলেন রামমোহন।—শিক্ষা। এইভাবে নিজের মত প্রতিষ্ঠা যারা করতে চায়, তাদের মতের উপরে তাদের নিজেদেরই যে আস্থা নেই, এ-ই তো তার প্রমাণ। মত যদি দৃঢ় হয়, বিশ্বাস যদি গভীর হয়, তাহলে তা প্রকাশ কর, প্রচার কর—একদিন তোমার একার মত বহুর মত হয়ে উঠবেই। কিন্তু অন্যকে শিক্ষা-দানের পদ্ধতির যদি ওই রূপ হয়, তা'লে তাঁদের নিজেদের শিক্ষা সম্বন্ধে সহজেই যে সকলের সন্দেহের উদ্রেক হয়।

ঝম্‌ঝম্ শব্দে যেন বেজে চলেছে রাত্রি। কোনো অদৃশ্য ললনা বুঝি ওই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নীলাম্বরীতে আবৃত ক'রে, পায়ে ঝিঁ ঝিঁর নূপুর বেঁধে, মাথায় এলো খোঁপায় জোনাকির ফুল গুঁজে নিয়ে, এই রাত্রির নেপথ্য দিয়ে নৃত্য করতে করতে চলেছে। সেই মঞ্জীর ধ্বনির সঙ্গে নদীর জলগুঞ্জন মিশে যে ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে, কোনো সুবকার থাকলে হয়তো সে তার বীণের তারে তুলে নিতে পারত এই সুর। কোনো কবি থাকলে ঐ অদৃশ্য সুন্দরীর পায়ের নূপুর-ধ্বনির তরঙ্গ থেকে সৃষ্টি করে নিতে পারত হয়তো কোনো অভিনব ছন্দ।

কিন্তু রামমোহন কবি নন, সুবকার নন। তবু তাঁর মন সুরে আর ছন্দে পুলকিত বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই নিবেট অন্ধকারও বুঝি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওই নিশীথিনীর কবরীতে রোপিত আলোক-ফুলের দীপ্তিতে।

আত্রাইতে আটক করেছে তাঁকে এই রাত্রি। কোথায় সেই চলনবিল, আর কোথায় সেই ডাকাতের দল। ইচ্ছে করলে তারা কি হানা দিতে পারে না এখানে এসে? সহজেই পারে। তাহলে তাদের ভয়ে পথ-চলাটা বন্ধ রেখে কি লাভ হল, একথা নিয়ে পাইক-বরকন্দাজ আর বেহারাদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। ওরা তো সকলে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নয় যে, যুক্তি দিয়ে কথা বলবে বা অন্যের যুক্তি বোঝবার চেষ্টা করবে। ওরা ওরাই। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের কথাও মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে।

কিন্তু তাঁদের কথা এখন আর অত মনে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন মনে পড়ছে সেই মহিলার কথা—রাণী ভবানী। এখানে থেমে থাকার ইচ্ছে ছিল না রামমোহনের, ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার মধ্যে নাটোর পৌঁছতে। রাণী ভবানীর ভূমিতে। খুব জবরদস্ত মহিলা ছিলেন। শ্রদ্ধায় এই সুদীর্ঘ শরীরটাও নত হয়ে আসে। প্রায় অর্ধেক বাংলা শাসন করেছেন ঐ মহিলা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে শাঁখা আর শাড়ি ভেট পাঠিয়েছিলেন। নারী-জাতি বলে একটা পৃথক জাতির কথা বলে থাকেন অনেকে, নর থেকে তাঁরা যেন স্বতন্ত্র। তাদের কোনো অধিকার নেই, স্বাধীনতা নেই, কেন না তারা নাকি নরের সমতুল্য নয়। বিদ্যার বুদ্ধিতে জ্ঞানে গুণে তারা অনেক হীন, এবং এইজন্যেই নাকি নরের কৃপার পাত্র। সত্যিই, কেবল করুণার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের; কিন্তু আশ্চর্য, তাদের ওপর করুণার কণামাত্র কারো নেই। কিন্তু সত্যিই এই নারী-জাতি অতটা খর্ব আর বুদ্ধি-বিবেচনায় দীনহীন কি না হিসাব করে দেখে না নিশ্চয় কেউ। সুযোগ আর সুবিধা পেলে তারাও যে তাদের সর্ব-প্রকার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। আপাতত অনেক দূরে গিয়ে সে মাথা কুড়িবে না হয় আনা না হল, হাতের কাছ থেকেই এখন তুলে দেখা যেতে পারে। হটী দ্যালংকার নারী-জাতিরই একজন; কিন্তু কাশীতে চতুষ্পাঠী খুলে শাস্ত্র-বিচারে নিজের জ্ঞানের পরিচয় কি দিতে পারেন নি তিনি? পুরুষদের থেকে তিনি যে কোনো দিক থেকেই হেয় নন, তার বিস্তর প্রমাণ দাখিল

করে তিনি লোকান্তরিত হলেন। কাশীতে থাকা-কালে এই হটীর চতুষ্পাঠীতে কয়েকবার গিয়েছিলেন রামমোহন, এই বাংলা দেশেরই সামান্য একজন মেয়ে তিনি; নিজের চেষ্টায় তিনি নিজেকে নির্মাণ করে তুলতে পেরেছেন, নিজেকে গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই এ-কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তারা কিছু নয়, কেউ নয় বলে তাদের অপাংক্তেয় করে রেখে, সামাজিক নানাবিধ শৃংখলে তাদের বেঁধে রেখে, গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রেখে, তাদের কাছ থেকে কোনো কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। পুরুষের গার্হস্থ্য সুখ ও সাংসারিক সুবিধা পরিবেশনের একটি সজীব যন্ত্ররূপেই তো তাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সুখ এবং সুবিধা থেকে পুরুষে যাতে বঞ্চিত না হয়, সেইজন্যেই এটা পুরুষদের চক্রান্ত ছাড়া কিছু না। আশ্চর্যই লাগে রামমোহনের, সেই পুরুষরাই আবার প্রচার করে—নারী-জাতি দুর্বল, নারী-জাতি হীন, নারী-জাতি ক্ষীণ। পুরুষদের চরিত্রের হীনতা ছাড়া এ বুঝি আর কিছু না। নারী-জাতি সম্বন্ধে পুরুষরা যে আরো কত কি কথা বলে থাকে সে সবের কথা এখন আর ভাবা যায় না। সংসারের তুষানলে তাদের তো দগ্ধ করা হয়ই, শেষে আবার শ্মশানের চিতানলে তুলে তাদের স্বর্গের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। সে-স্বর্গ যদি এতই সুখের জায়গা, পুরুষরা তবে নিজেরাই কেন দল বেঁধে যায় না সে-স্বর্গে। পুরুষদের বুঝি এটা একটা ভীষণ উদারতা! কিন্তু সে উদারতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন হটী, এইজন্যে তিনি প্রমাণ রেখে যেতে পেরেছেন যে, সুযোগ পেলে নারী-জাতি পুরুষদের সমকক্ষই শুধু নয়, পুরুষদের থেকেও নিজেদের উন্নততর করতে পারে। কাশীর টোলে হটী বিদ্যালংকারকে দেখে রামমোহন তাঁর মনে যেন নূতন শক্তি লাভ করেছেন। বৃদ্ধা মহিলাটি আসনে জোড়াসন হয়ে বসে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের বিদ্যা বিতরণ করে চলেছেন; চোখে-মুখে বুদ্ধির আর জ্ঞানের চিহ্ন পরিস্ফুট।

নাটোরের রাণী ভবানী আর-একজন। জমিদারি পরিচালনা করা না,- প্রজা পালন করা—তিনি এ-কাজে অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁকে তাই সকলে স্মরণ

করছে। রাণী ভবানীর প্রজাপালন-পদ্ধতি সকল পুরুষের অনুকরণ করা আবশ্যক। রংপুরে ছোট-বড়-মাঝারি জমিদারদের তিনি দেখছেন, তাদের প্রজা-পীড়ন-পদ্ধতিই তিনি দেখেছেন, প্রজাদের পালনের ভার যেন তাদের নয়। কিন্তু রাণী ভবানী সেই নারী-জাতির একজন, পুরুষরা যাদের বলে ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র। বারাণসীতেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রাণী ভবানী, আর মুর্শিদাবাদের বড়নগরেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবমন্দির, যার ফলে বড়-নগরকে এখন সকলে বলে বাংলার বারাণসী। কিন্তু এইসব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, এইসব দেবার্চনার জন্যে নয়, রামমোহনের কাছে রাণী ভবানী স্মরণীয় অন্য কারণে। অসীম সাহস, অসীম নিষ্ঠা, অসীম আত্মবল—অনেক পুরুষের কাছে যা দুর্লভ, রাণী ভবানীর ছিল—সেই ঐশ্বর্য। আজ ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা ঘোষণা। মানুষকে কৃপ তিরস্কারের পদ্ধতিটাও অভিনব। তিরস্কার মৃদু বটে, কিন্তু মর্মঘাতী। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি শাঁখা আর শাড়ি।

কে না জানে একথা—পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ইংরেজরা এই দেশ অধিকারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন রাণী ভবানী চিঠি লিখে কৃষ্ণচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তিনি যেন কোনোক্রমেই ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করেন। চিঠি পেয়ে মহারাজাও রাণী ভবানীর অনুরোধ রক্ষার সংকল্প মনে-মনে করেছিলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তাঁর মানসিক বলের পরিচয় দিতে পারলেন না। মিরজাফর যখন ইংরেজদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হল, কৃষ্ণচন্দ্রও তখন গত্যন্তর না দেখে মির-জাফরের দলেই ভিড়ে গেলেন। সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন রাণী ভবানী। কিছু বললেন না, আর কোনো চিঠি তখন লিখলেনও না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্র নিষ্ক্রিয়, তিনি পাঠালেন এক পত্র, লিখলেন, অর্ধেক বঙ্গের ভার আমার উপরি ন্যস্ত। আমি কারও বশ্যতা স্বীকারে সম্মত নহি। আশা করিয়াছিলাম, আমার ন্যায় নারীর দ্বারা যাহা সম্ভব, আপনি পুরুষ—আপনার দ্বারা তাহার অধিক সম্ভব হইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, আপনি পুরুষ হইবার যোগ্য নহেন। আপনার আচরণে প্রীত হইয়া এই সঙ্গে যে উপঢৌকন পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন। মহারাজার আসন ত্যাগ-পূর্বক এই শাড়ি ও শাঁখা পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে সুখী হইব।'

ভোর হয়ে আসছে। রামমোহন কুটির থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এখনো পাখি ডাকে নি; পুব-আকাশে চমকে ওঠে নি আলো। কিন্তু আলো হতে আর দেরি বিশেষ নেই। সকাল হলেই রওনা হতে হবে। আজই নাটোর অতিক্রম করে মালকী, ইশ্বরদি পার হয়ে পদ্মার কিনারে যদি বিকেলের আগে পৌঁছতে পারেন, তার বিশেষ চেষ্টা করা দরকার।

অনেকদিন বাদে ফিরছেন দেশে। মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে অনেকদিন পরে। কিন্তু খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রায়বাড়ির ঐ ফুলঠাকুরাণীর কথা ভাবলে একটু ভয়ও হয়। উনিও নারী-জাতির একজন, কিন্তু মনের জোরে পুরুষদেরও বুঝি পরাস্ত করতে পারেন। পুত্রের সঙ্গে মতের মিল নেই, সেইজন্যে পুত্রস্নেহের সঙ্গে আপোষ করে নিজেকে পুত্রের কাছে ত করেন নি, পুত্রের মতে মত দেন নি। তাঁর নিজের মতে তিনি দৃঢ়, নিজের পথে অটল। এমন কি, তাঁর পুত্র রামমোহন সৎ ব্রাহ্মণ কুলে জ নিয়ে এমন ঘোর অনাচারী ও নাস্তিক হয়ে উঠল কি করে, এই তাঁর আক্ষেপ। ব্রাহ্মণের ছেলে, তার উন্নতির জন্যে তাকে পড়ানো হল আরবি, ফার্সি, কিন্তু পরিণাম দাঁড়াল অন্যরকম: ছেলেটা হয়ে উঠল মুসলমানের অনুরক্ত, সাজ-পোষাকে পর্যন্ত তার ঐ রুচি। তাছে আবার হিন্দুধর্মের ওপর এই আক্রোশ!

অনেকবার রামমোহন বুঝিয়েছেন তাঁর মাকে, বলেছেন, আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নি, উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত, তাই আমার আক্রমণের বিষয়।

বার বার ঐ কথা তিনি বুঝিয়েছেন তাঁর মাকে; কিন্তু তিনি কিছুতেই ওকথা বুঝতে চান নি। পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ অবশ্যই আছে, এ-কথা অস্বীকার করেন না রামমোহন; কিন্তু সে-স্নেহের কোনোরূপ প্রকাশ আর তিনি দেখতে পান না।

আজ এতদিন পরে সেই মাতার নিকট গমন করছেন রামমোহন। রাধানগরে চলেছেন তিনি। এবারের সাক্ষাৎ যেন সুখের হয়, এই মাত্র তাঁর কামনা। পৌঁছে যেন দেখেন যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এই মাত্র তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু, মানুষে প্রস্তাব করে, ভগবান তা নস্যাৎ করে দেন—এই রকম একটি ইংরেজি প্রবাদ আছে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন রামমোহন, আত্রাই-ঘাট থেকে রওনা হবার পর পথে তাঁর কেটে গেছে আরো সাতদিন। পথের ক্লান্তি আছেই, কিন্তু গৃহে ফিরে দেখেন, প্রবল অশান্তিতে ভরা রাধানগর পরিপূর্ণ। জগন্মোহন গত হয়েছেন; গৃহসংলগ্ন শ্মশানে প্রকাণ্ড জনতা—সকলেই যেন উত্তপ্ত, সকলেই যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা লোকান্তরিত। কিন্তু তাঁর এই পরলোকগমনের জন্যে কারো চোখে-মুখে কোনো শোকের চিহ্ন যেন নেই, তাদের সকলের মধ্যেই বিষম ব্যস্ততার লক্ষণ।

—কি ব্যাপার? এত লোক কেন? এত কোলাহল কেন? এত কলরব কিসের? এত বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন কি কারণে?

অকারণেই বুঝি প্রশ্ন করতে

লাগলেন রামমোহন। এতদিন পরে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, সে জন্যেও কারো কোনো ঔৎসুক্য নেই, আগ্রহ নেই। চাপকানে, পায়-জামায়, শালের পাগড়ি-টুপীতে সজ্জিত এই বিরাট পুরুষটির আবির্ভাব যেন চোখেই পড়ছে না কারো। রামমোহনের সঙ্গে আগত পাইক-বরন্দাজেরা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে থমকে।

কৌতূহল থামে না, রামমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের এ শব্দ, কেন ও হট্টগোল? কি, হয়েছে কি?

—জগমোহন গত হয়েছেন।

—তা তো জানি, তা তো শুনলাম। কিন্তু এত কলরব কেন?

—বউঠাকুরাণী সতী হয়েছেন?

সতী হয়েছেন? সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে সর্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হয়ে উঠল রামমোহনের। সতী হয়েছেন অলকমণি? অর্থাৎ এতদিন তিনি বুঝি তাহলে সতী ছিলেন না? স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বুঝি সতী হতে হয়?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রামমোহন। অদূরে জ্বলছে ঐ চিতা। এই কলরব কোলাহল ঠেলে আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে, প্রবল উদ্যমে বেজে উঠছে বাদ্য, চিতা থেকে গাত্রোত্থান করার চেষ্টা করছে বৌদি অলকমণি।—এখনো তবে প্রাণ আছে। ঐ, চেপে ধরছে ওরা ঐ বাঁশ দিয়ে। দ্বিগুণ উৎসাহে বেজে উঠছে বাদ্য, শব্দ করে উঠছে কাঁসার ঝাঁঝর। থেমে গেছে আর্তনাদ।

অনড় ও অটল ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন রামমোহন। এই বিপুল জনসমারোহের মাঝে তিনি সামান্য একটি তৃণখণ্ড মাত্র। কিন্তু স্রোতের আলোড়নে তৃণখণ্ডটি যেমন ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে বেড়ায়, তাঁর মনও অবিকল তেমনি আন্দোলিত হয়ে উঠেছে।

মনে-মনে কেবল বললেন, আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নি. ঐ নামে যে অনাচার প্রচলিত তাই আমার আক্রমণের বিষয়।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু স্থির হওয়া বড় কঠিন মনে হল। মনে হল, ঐ চিতানলের আগুনে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে; জ্বালা করে উঠেছে সর্বশরীর।

চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকালেন তিনি। এখনো অন্দরে যান নি, এখনো দেখা হয় নি মায়ের সঙ্গে।

চিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে তিনি যাত্রা করলেন অন্দরের উদ্দেশে। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু পদক্ষেপ এখনো দৃঢ়। বহির্দ্বার পার হয়ে অন্দরে প্রবেশের দরজা অতিক্রম করে রাধা-গোবিন্দের মন্দিরের উঠোন ডিঙিয়ে প্রশস্ত বারান্দায় পদধ্বনি তুলে তিনি হাঁটতে লাগলেন, একে একে প্রতিটি ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে হেঁটে চলেছেন, আর মাঝে মাঝেই দৃপ্তকণ্ঠে ডাকছেন—মা মা।

কিন্তু উত্তর নেই কারো। দাসীরা শুধু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে।

দাসীরা সব নূতন। এই মানুষ-টিকে চেনে না কেউ। তারা অন্দরে এই অচেনা আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। হিন্দুগৃহের অন্তঃপুরে কে এল এই মুসলমান?

—মা কোথায়?

একটা বুড়ি দাসী সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, মা কে?

—কুলঠাকুরাণী।

দক্ষিণ দুয়ারি ঘরে তখন তারিণী দেবী একা বসে চোখের জল ফেলছেন। সম্মুখে হঠাৎ পুত্রের আবির্ভাব দেখে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, খবর পেয়েছিস, রামমোহন, খবর পেয়েছিস?

অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন রামমোহন, বললেন, একি সর্বনাশ করতে দিলে মা? এ কি হয়ে গেল?

—কি হয়েছে?

—কি না হয়েছে বল। দাদার মৃত্যুতে শোক নেই কারো? শ্মশানে ঐ উল্লাস? সতী হল বধূঠাকুরাণী? কেন, কেন, কেন। কেন তুমি বাধা দিলে না? কেন দিলে না বল?

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন তারিণী দেবী। ঐ দু'চোখে যেন জ্বলে উঠেছে দু'টি চিতা—দু' চোখে আগুন জ্বলছে। বললেন, আমি মুহ্যমান হয়ে বসে আছি শোকে, কি হচ্ছে, কি ঘটছে, কেমন করে জানব বলো।

—তোমার বিনা অনুমতিতে কোন কাজ কবে হয়েছে, বলো। তোমার অনুমতি ওরা নেয় নি, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর্। আঁচকানে ঢাকা রামমোহনের দুই হাত ধরে তারিণী দেবী বললেন, বিশ্বাস কর, পুত্রশোকে আমি পাগল হয়ে আছি। আমার রাধাগোবিন্দ জানেন আমার কি দশা।

এ-কথা অবিশ্বাস করছেন না রামমোহন; কিন্তু তাঁর আদেশ ছাড়া ঐ অঘটন যে ঘটতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাই তিনি সে-কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তারিণী দেবী কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বসো। বসো।

রামমোহন শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, না। বসব না। যে গৃহে এ-ধরণের অনাচার চলে, সে-গৃহ আমার নয়।

রওনা হলেন রামমোহন, চলে এলেন বারান্দায়। তারিণী দেবীও এলেন বেরিয়ে, পিছন থেকে ডাকলেন, রামমোহন!

—বাধা দিয়ো না মা। আমি চললাম। প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি—এই প্রথা রদ করতে আমি আমার জীবন সমর্পণ করলাম। যতদিন রদ করতে না পারি ততদিন আমার বিশ্রাম নেই।

(ক্রমশ)

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

॥ চার ॥

নৃপেনদেব মেস ঃ

সমর কটকেষ্টর অপেক্ষায় বসে রয়েছে। নৃপেন বসে খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ছে—ছাবানোপ্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ, পাত্র-পাত্রী। ধাড়ি ভাড়া ও বিক্রয়।— মেসের অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। পটলার পটল-চেরা চোখ। সেই চোখের জন্যই ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে। শীঘ্রই সে চিত্রতারকা হবে, মানে সিনেমার স্টার। ঘরময় বিভিন্ন চিত্রতারকার ছবি বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। তারদিকে একখানা বিরাট আয়না ঝুলছে। পটলা একবার আয়নার দিকে তাকায়। একবার বাঁধানো একখানা ছবির দিকে তাকায়। আর আয়নায় চিত্রতারকার মতন মুখভঙ্গী করে। তার তাকের ওপর সাজ-সরঞ্জামের নানা প্রসাধন সামগ্রী। মেসের ভৃত্য উপেনের সে হিরো।

ভবানী ব্রতী সংঘের চ্যাম্পিয়ান। সকাল বিকেল মুগুর ভাঁজে। সকালে দেড়শো, বিকেলে একশো ডন-বৈঠক না দিলে তার খাবার হজম হয় না। সে বসে বসে স্বাস্থ্যচর্চা করে।

নাথাই কলাকেন্দ্রের ছাত্র। দিবারাত্রিনী ক্ল্যাসিক্যাল গান প্র্যাকটিস করে। মেসের ম্যানেজার তাকে নোটিশ দিয়েছে বলে আজকাল সে জানলা বন্ধ করে সঙ্গীতচর্চা করে।

জগা, গদাধর, বিশু এই হট্টগোলের ভেতর দাবা নিয়ে বসে।

মেসের সকলের খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়িই হয়ে গেছে।

সমর নৃপেনকে বলল, 'নাঃ নৃপেনদা, তোমার সেই বটকেষ্টর আসার তো কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। কাল সন্ধ্যায় এলো না। এখনও আসছে না। লোকটা ভুলে যায় নি তো?'

নৃপেন বলল, 'ওর জন্য চিন্তা করো না। ও নিশ্চয়ই একটা কিছু কলকাঠি নাড়ছে। ও বটকেষ্ট। ঐ রাস্তার মোড়ের বটগাছটার চেয়েও ঝানু। চাকরী তোমার ঠিক করিয়ে দেবে। আমার শুধু ভয়, ও তোমাকে ওর দু'রত্তি মেয়েটা না গছাতে আসে।'

—'ও নৃপেনদা, নৃপেনদা গো—' কুরতে করতে কানাই, বলাই ঘরে ঢুকে পড়লো।

বলাই ঘরে ঢুকে বুকে একখানা হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গেল গেল বুক জ্বলে গেল। ওগো, ও নৃপেনদা, এ কি করলে গো? কনে দেখে এসে হৃদয়খানা হারিয়ে এলাম গো? ওগো ও নৃপেনদা!'

কানাই তাতে সায় দেয়।

নৃপেন বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া। চেঁচামেচি করিস নি। সব হবে, সব হবে। সমরটার বোধহয় আজকালের ভিতরই সত্যি সত্যি একটা চাকরী জুটে যাবে। তারপর একটার পর একটা কনে দেখার প্রোগ্রাম।'

কানাই চেঁচিয়ে উঠলো, 'গেল্লো নৃপেনদা, সব হৃদয়খানা চুরমার হয়ে গেল। আবার কনে?'

—'এই উপেন, উপেন, ক' কাপ চা দিয়ে যা তো। গেল কোথায় লোকটা দেখতো?' বলে নৃপেন হাঁক দিতে থাকে।

বলাই মেসের সমস্ত ক্যামরাগুলো খুঁজেও উপেনের টিকিটি খুঁজে পেলো না। চায়ের তৃষ্ণাটা তারই একটু বেশী।

এদিকে উপেন তখন স্নানঘরে মহা সমস্যায় পড়েছে। বহুদিন থেকেই পটলার শ্যাম্পুর শিশিটার প্রতি তার প্রবল লোভ ছিল। সে জানে পটলার মতন সুন্দর চোখ আর অত সুন্দর চুল ভুভারতে কারুর নেই। পটলা চিত্রতারকা হলে তাকেও দলে নেবে, এ আশ্বাস সে বহুবার তার কাছ থেকে পেয়েছে। সৌন্দর্যচর্চায় সেও তাই আজকাল মনোযোগ দিয়েছে। উপেনের দৃঢ় বিশ্বাস ঐ শিশিটুকুতেই পটলার সৌন্দর্যের রহস্য লুকোনো আছে।

বহুদিন সে ঐ শিশিটা সরাতে চেষ্টা করেছে। আজ মহা কষ্টে সেটা তার করতলগত হয়েছে। পটলা যখন চা খাচ্ছিল তখন সুড়ুৎ করে উপেন তাকের ওপরের শিশিটা সরিয়ে নিজের গামছার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। পটলা গোঁফ নাচিয়ে তখন চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গিমার তালিম নিচ্ছিল।

সমরের সাবান দিয়ে খুব করে স্নান সেরে, উপেন নৃপেনের গামছায় পরম তৃপ্তির সাথে মাথা মুছে ধীরে ধীরে পটলার শ্যাম্পুর শিশি খুলে খানিকটা তেল মাথায় ঢাললো। ঢালার পরই মাথা ভর্তি সাবানের ফেনা দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবার মাথায় জল ঢাললো। গামছা দিয়ে মাথা মুছে সে আবার শ্যাম্পুর শিশি থেকে খানিকটা শ্যাম্পু ঢাললো। তার ধারণা, সে আবার তেল মেখেছে। কিন্তু আবার ফেনা দেখে চক্ষু ছানাবড়া করে স্নানঘরের আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের স্বরূপটা দেখে নিজেই অবাক বিস্ময়ে বলে, 'এইডা কি হইল? পটলাবাবু কি যাদু লাগাইছো? আমার করলা কি? ত্যাল সাপান হইয়া যায়? ছাড়ান দাও, ছাড়ান দাও। যাদু ছাড়ান দাও, আর এ্যাদ্দার হইবে না।'

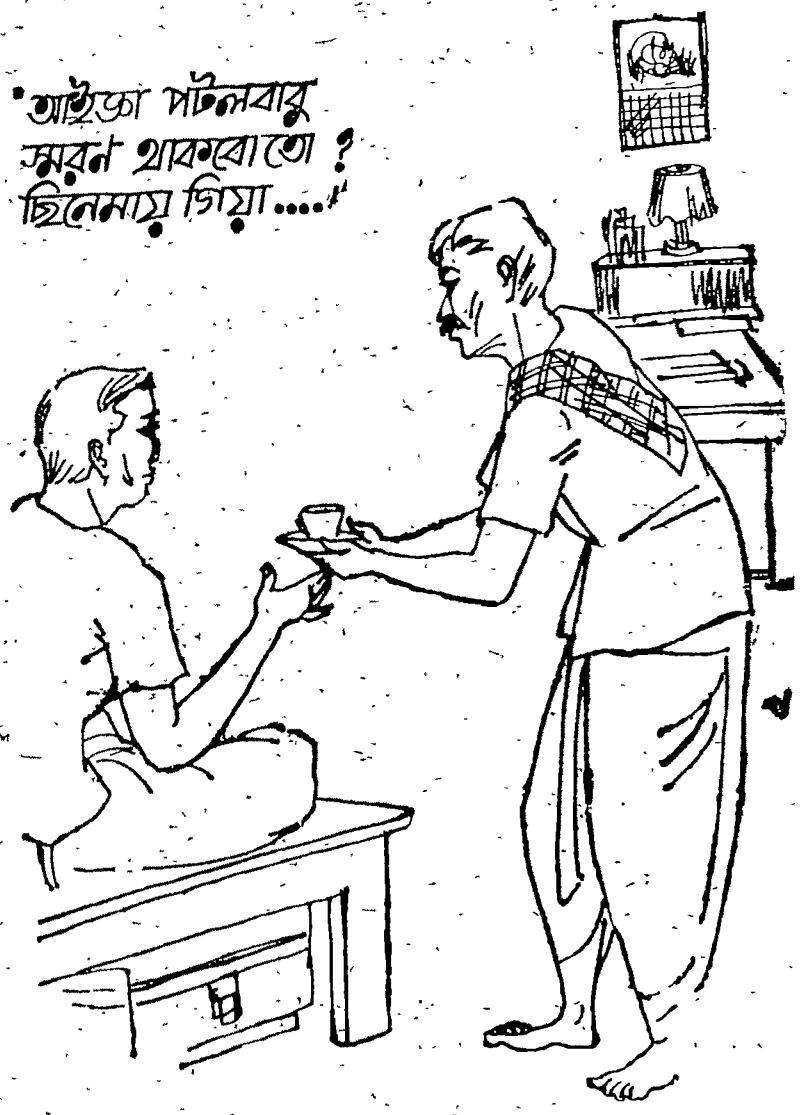


এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে উপেনকে না দেখে বলাই নিরাশ হয়ে নৃপেনের ঘরের দিকে ছুটছিল। স্নানঘর বহুক্ষণ থেকে বন্ধ দেখে, সে একটা চান্স নিল—'ওরে ও উপেন, বলি তোর চান শেষ হবে আজ ? ক'-কাপ চা বানিয়ে দিবি ?'

হন্তদন্ত হয়ে ফেনিল মস্তকে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে, উপেন পটলার পায়ে গিয়ে পড়ল—'পটলবাবু তুমি দ্যাবতা মানুষ। মানুষ নও। এই লও তোমার ত্যাল। আমারে ক্ষ্যামা দাও। এই তোমার সামনে নাকে কানে খত দিলাম। না কইয়া কোনো দিন তোমার ত্যাল নিমু না। সাপান নিমু না। দাঁতের মাজন নিমু না। গায়ে মাখানের গন্ধ নিমু না। তুমি কও আমারে ক্ষ্যামা দিছো ?'

একে একে সে সব জিনিষগুলো টেবিলের ওপর গচ্ছিত রাখল।

পটলা তখন 'নয়ন না মানে' ছবির বন-জোছনার প্রেমাসক্ত দেব-যানের পোজ নিয়ে আয়নায় তালিম নিচ্ছিল। তাকের দিকে তাকিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা তার দয়ঙ্গম হ'ল। আজ ক'দিন থেকেই তার কোনো না কোন জিনি রোজই উধাও হচ্ছিল। সেদিন সকালেও উপেনকে সে সিনেমা নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সকালে চা দিয়ে উপেন বলেছিল, 'আইজ্ঞা পটলবাবু, স্মরণ থাকবো তো ? ছিনেমায় গিয়া আমারে ভুলিয়া যাবা না তো ? কি কইলা কিসের পার্ট দিবা ? হাচাইও কই পটলবাব, যাত্রার দলে বহুবার সখীর পার্ট করছি।'

মিঝুমা।ম্ করে নূতে োজ নিয়ে ে দা।।

পটলার মহামূল্যবান সময়ের অপ-ব্যবহার হচ্ছে দেখে কৃত্রিম রোষ-কশায়িত লোচনে সে উপেনকে বলে, 'যা যা নিজের কাজ কর। বলেছি তো নেব, নেব, নেব। সিনেমায় চুকে তো 'ন একবার।'

আজই সকালের ব্যাপাব। তার কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই এই কাণ্ড ?

চরি ধরা পড়ায় উপেন বিশেষ চিন্তিত নয়। বহুবার বহু জায়গায় মেসের মেম্বাররা তাকে সে জন্য লাঞ্ছিত করেছে। তার জন্য উপেনের আপশোস নেই। আজ তার সত্যিই ভয় হয়েছে তাহলে তার সিনেমায় ঢোকার সব পথ বন্ধ হল কি ?

পটলার গায়ে পড়ে উপেন বলে, 'পটলবাবু, কও কও ক্ষ্যামা দিছো, কিছু ভাবো নাই।'

'দেবযানের' ছোঁয়া তখনও পটলার গায়ে লেগে। সে নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলল, 'শোনো বৎস। কর পণ, এই ক্ষণে কর পণ, পরদ্রব্য পর তেল, পর গন্ধ, পর পেষ্ট, দুগ্ধ ঘি ক্ষীর মাখন—

আর কভু না করো হরণ।
যদি করি, রহিব না রহিব না
ব্যাহ্মণ নন্দন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উপেন ছুটে যায় সকলের জন্য চা তৈরি করতে।

কানাই, বলাই, সমর, নৃপেন চা খেতে খেতেই দেখতে পেল চোখে পুরু লেন্সের চশমা, পায়ে মোজা, বুট, ধুতির তলায় শার্ট বেঁধে বুড়ো বটকেষ্ট হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। সাথে তার দশ-বারো বছরের একটি ছোট মেয়ে।

ওপরের দিকে তাকিয়ে হাই তুলে বটকেষ্ট নৃপেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভায়া নৃপেন, মনে আছে তো ? এই দেখো, চণ্ডীকে একেবারে নিয়েই এসেছি। বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছে। বাড়ির সব কাজ করতে পারে। সেলাই গান নাচ কিছু বাদ নেই।'

বুকটার আঁচল টানতে টানতে চণ্ডী ফোঁস ফোঁস করে গর্জাতে লাগলো। যতই ছোট হোক সে মেয়ে তো। তার লজ্জা বলে একটা জিনিষ আছে।

# পদ্মমালিনী কথা...

রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুভাষ সমাজদার

মাসখানেক আগে আমার পত্নী-বিয়োগ হয়েছে। আমার স্ত্রী সৌদামিনী এই বিলপাড়ারই মেয়ে। সে আমাকে ভাল বেসে বিয়ে করেছিল। ভালবেসেছিল আমি বাঁশী বাজিয়ে বলেই—আমি বাঁশী বাজাতে পারি বলে তার মনে বড় গর্ব ছিল।

হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে সৌদামিনী মারা গেল। আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল। আমি যদি বাঁশী-বাজিয়ে না হতাম, তাহলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। বাঁশীর সুর আমার শোক ভুলিয়ে দিল। দিনরাত আমি সুরের ভেতরে ডুবে থাকতাম, আমার মনে হতো—মনে হতো চাঁদের আলোয় ভরা রাত্রে, ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে সদু যেন আগের মত এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। মৃদুস্মিত হাসছে।

আমার সামনে ধ্যানস্থ মূর্তির মত বসে ব্যাজনা শুনতো। বাজনা শেষ হলে ও খুব গম্ভীর হয়ে যেত। যেন অতলে ডুবে যেত। গভীরে ডুবে গেয়ে বলতো, দেখ—দেখ তোমার একদিন খুব নাম হবে—বলতে বলতে থর থর করে কেঁদে ফেলতো।

সদুর মৃত্যুর পর ওর বয়সী অন্য কোন বিবাহিতা কি অবিবাহিতা মেয়ে দেখলে আমার মনে হতো সদুর কথা আর বুকের ভেতরটা টন টন করে উঠতো। গলার কাছে পাক দিয়ে দিয়ে উঠতো একটা ব্যথা। আর—

থাক। সদুর পরে আমি অন্য কোন তরুণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি নি। কাউকে ভালবাসি নি। বিলপাড়া, খাসপুর, খরলপাড়া, বোয়ালদাড়ে আমার অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের ভেতরে রাধাও একজন। আর কিছু নয়—

তবুও রাধা আমার বাঁশী শুনতে আসতো বলেই অনেকে অনেক কথা বলতো। কিন্তু আমি জানি, কত সামান্য যোগসূত্র তার সঙ্গে আমার। কিন্তু—

রাধাকে দেখে আমার মনে হতো, ওর ভেতরে জ্বালা আছে কিছু। সেই জ্বালার জন্যই ও অমন অস্থির আর চঞ্চল। যে সাপের বিষ থাকে, সেই যেমন বেঁকে বেঁকে চলে।

আমার মনে হয়, রাধা চারু দাসের মনের নাগাল পেত না। সে লেখাপড়া নিয়ে থাকে। সে একটা উত্তাল সমুদ্র। আর রাধা অনেক দূরের একটা ভীরু দুর্বল মিটি মিটি আলো। তবুও আমার মনে হয়—

রাধা ভালবাসতো চারু দাসকে। উপরোক্ত বিবরণ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে ও সুস্থ মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ করেছি। ইহা আমার জ্ঞানমতে সত্য।

স্বাঃ—

—রীতিমত সাহিত্য। বললেন মিঃ চ্যাটার্জী, দু'জনেই কিন্তু একটা বিষয় সত্যি বলেছে, রাধা বড় অসুখী—

—কোন জোর জুলুম করেনি স্যার শিবুকে? যদি কিছু বের করা যায়?—বললেন ও-সি।

—না। আপনি এবার বোয়ার ক্লাবের ছেলেদের ডাকুন, যাদের সঙ্গে চারু দাস সন্ধ্যাবেলা কথাবার্তা বলেছিল—

—আচ্ছা স্যার।

থানার হাজত থেকে বের করে নিয়ে এল একজনকে। চুলগুলো উসকো খুসকো। চোখ দু'টো বসা।

—কি নাম তোমার?

—বগা।

—তোমার সঙ্গে চারুর কোন কথা হয়েছিল?

বগার চোখ দু'টোর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। বলল—হুজুর, ধর্মাবতার, আমি রিহার্সেলে গিয়েছিলাম হঠাৎ। একটা সেপাইয়ের পার্ট ছিল। ওরা লোক পাচ্ছিল না। তাই—

—তোমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিল?

—না হুজুর। —পুকুরে চার ফেলছিলাম (মাছের চৌপ জলে ফেলে গুলে দেওয়া) সেই সময় ওরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে—

—আচ্ছা যাও—নেক্সট ম্যান ডাকুন—

এল আর একজন।

—তোমার নাম

—মংলা।

—চারু তোমাকে কি বলেছিল?

কোন কথা বলল না মংলা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল বাঁ হাতে একবার পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কঠিন চোখে তাকালো ডি-এস-পি মিঃ চ্যাটার্জীর দিকে।

—অমন করে তাকাচ্ছো কেন?

—কেন—কেন আপনাকে দৃষ্টিবাণ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করবো না বলতে পারেন? থিয়েটারী কায়দায় টেনে টেনে বলল মংলা।

—আপনারা এতগুলো নিরপরাধ লোককে একেবারে বিনা কারণে হাজতে পুরেছেন কেন? আমরা চারু দাসের লেখা বই করবো বলে ঠিক করেছিলাম, এই কি আমাদের অপরাধ? সে লেখক মানুষ। আমরা এ্যাক্টর। সে নাটকের চরিত্র আঁকে, আমরা তার রূপ দেই। তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মধুর সম্বন্ধ—

—থামো—

—কে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?

—কেন স্যার। হঠাৎ গলাটা নামিয়ে চোখ দু'টোকে ছোট করে বলল, চারু দাসের স্ত্রী প্রাণচঞ্চলা। লীলাময়ী। খাসপুরের দলে যে কৃষ্ণ সাজে, সেই পিকু আর বংশীবাদক যতীন, তারপর বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জন আর কার নাম বলবো, অনেকের সঙ্গেই তো রাধার ভাবসাব ছিল। আমরা বোম্বার ছেলেরা তো তাকে কোনদিন দেখিই নি।

—আমরা গরীব। আমাদের মুরুব্বী নেই। তাই আমাদের ধরে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিরঞ্জনবাবুকে হাজতে এনেছেন—এনেছেন হরিশবাবুকে? সে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করতে লাগল।

—বসো—বসো—অত চটে যাচ্ছো কেন?

শান্ত হও মংলা।

—তোমার মনে হয় নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে রাধার কোন সম্বন্ধ ছিল? মিঃ চ্যাটার্জীর গলায় অন্তরঙ্গ সুর। তুমি একটু বলে করে দাও না ভাই। তাহলে পুলিশ তোমাকে বেশি নাস্তানাবুদ করবে না—

—আচ্ছা তাহলে শুনুন, আমি বলি—চারু দাসের বাড়ির সামনে একটা বকুলগাছ আছে। সেই গাছের নীচে আমি সেদিন দাঁড়িয়ে যা দেখেছিলাম—

থামল মংলা। হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাতজাগা আর মশার কামড়ে ফোলা মুখখানা। বলল চাপাগলায়, আমি বলতে পারি—ছেড়ে দেবেন?

—দেব।

—সরকার মশাই আর হরিশ চৌধুরীর বাড়ি সার্চ করুন। আমি দেখেছি তারা দু'জন চারুর বারান্দায় একটা শতরঞ্চির ওপর বসে আছে। আর রাধা গান গেয়ে শোনাচ্ছে। সরকার আর চৌধুরীমশাই খুব তারিফ করছে। খুশিতে এওর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে।

—তুমি কি করতে গিয়েছিলে?

—চারুকে ডাকতে গিয়েছিলাম। তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ভাল করে নামে নি। টুপ টুপ করে বকুল ঝরছে। আকাশেও চাঁদ ছিল। আমে এ্যাটমসফীয়ার —পরিবেশটা—

—চারু কোথায় ছিল?

—সে গিয়েছিল মফস্বলে। বাড়িতে ছিল না—

—আচ্ছা, তুমি যাও—

—আমাকে ছেড়ে দেবেন—আমাকে ছেড়ে দেবেন তো? আমি—আমি—

—কি বলবে বলো—খোলাখুলি বলো—

—আমি নববিবাহিত। ঘরে স্যার আমার জন্য প্রতীক্ষাকাতর হয়ে আছে এক পঞ্চদশী —

আচ্ছা—আচ্ছা—হাসি চেপে বললেন মিঃ চ্যাটার্জী। বোম্বার অভিনেত্রী স্ত্রীকে চলে গেল।

হতাশার ছায়া নেমে এল মিঃ চ্যাটার্জীর মুখে। ও সিকে আস্তে আস্তে বললেন, মংলার কথাবার্তা কি রকম মনে হল?

—ড্যাম লায়ার স্যার। ওর প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা। শুধু বাঁচবার জন্য ও যা তা বলল। নিরঞ্জনবাবু বিলপাড়া আর্য খাসপুর স্কুলের সেক্রেটারী। লোকহিতকর অনেক কাজে বিস্তর দানধ্যান আছে স্যার।

—দেখুন, কেস খাড়া করতে পারেন কি না? চলে গেলেন ডি-এস-পি মিঃ চ্যাটার্জী।

নিস্তব্ধ ঘরের ভেতরে বিশাল দেহটা এলিয়ে দিয়ে বোকার মত বসে রইলেন বড়বাবু। দূর থেকে ডি এস পি সাহেবের জুতোর মস মস শব্দটা যেন তার বুকের ভেতরে বাজতে লাগল। তার মনে হল, তীক্ষ্ণ তীব্র একটা অস্বস্তি তার মনটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে।

দীর্ঘ ত্রিশবছরের চাকরি জীবনে এই রকম কো আর কখনো পা-নি তিনি। একেবারে কোন প্রমাণ না রেখে খুন।

বোল্লার ক্লাবের রিহার্সেলে শুধু, উপস্থিত ছিল চারু দাস। কারো সঙ্গে চটাচটি রাগারাগি করার লোক নয় সে। ক্লাবের কোন সভ্যকে খুনী বলে সাজিয়ে দিলেও—সেই অসত্যকে প্রমাণিত করার জন্য প্রচুর মিথ্যা সাক্ষীর প্রয়োজন। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

মানবতার দিক থেকেও উচিত নয়।

জুনিয়রদের সঙ্গে ও-সি ঘন ঘন আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু—

অন্ধকার—

শুধু অন্ধকার।

এই পর্যন্ত বলে থামল বীরেন। দুপুরের রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারদিক। আকাশের মাঝখানে সাবালক সূর্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূরে খাসপুর-বোল্লার মেটে রাস্তাটা একটা বিশাল জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত এঁকে বেঁকে দূরে—বহুদূরে নিঃসীম নীলিমার ভেতরে উধাও হয়ে গেছে।

—তারপরে পুলিশ আরও চেষ্টা করেছিল দাদাবাবু। সেই সব কায়দা আমিও তখন ভাল বুঝতে পারি নি। তাই গুছিয়ে বলতে পারবো না। মুখ্যু মানুষ গো আমরা দাদাবাবু—

বীরেনের মুখে কেমন ভয়ের ছায়া ছমছম করছে। শুধু ভয় নয়। সঙ্গে চাও আছে। সাধারণ একটি কনেষ্টবল। আমার মত বাইরের লোককে এত কথা বলা উচিত নয়। হয়তো তাই ভেবেছিল।

মাথা নীচু করে বলল, দাদাবাবু আপনি যদি আরও বেশি কিছু জানতে চান, তাহলে এক কাজ করুন।

—কি?

—সেই সময় হিলির থানার ও সি যিনি ছিলেন তিনি পেনসন নিয়ে বালুরঘাটে বাড়ি করেছেন। নাম, মণিবাবু। মণীন্দ্রনাথ রায়। নদীর ধারে হরি ঘোষের ঘাটের কাছে বাড়ি—

## ॥ পাঁচ ॥

—কি হে ডিটেকটিভ? কিছু সমাধান করতে পারলে? দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন জীতেনদা', জানো শঙ্কর, পৃথিবীর ভেতরে এত রহস্য রয়েছে যে তার সমাধান খুঁজতে গেলে তুমি একেবারে পাগল হয়ে যাবে—

বাইরের উঠোনের অন্ধকারে বসে আছি দু'জনে। জীতেনদা'র মুখ দেখা যাচ্ছে না। কালো রেখায় আঁকা মূর্তির মত মনে হচ্ছে তাঁকে।

—রাধা কি করে সেবাইত হলো—সে কথা বলবেন আপনি বলেছিলেন, জীতেনদা'।

—হুঁ।

—আপনি অনেক কিছু জানেন। চেপে যাচ্ছেন—

—হুঁ।

গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলেন দার্শনিক। ধীরে ধীরে বললেন, জানো শঙ্কর, পৃথিবীর বুকে যেমন অবিরাম দিনরাত্রির চাকা ঘুরছে তেমনি মানুষের মনেও পাপ-পুণ্যের চক্র ঘুরছে। যে খুনী—যে পাপী সে যে মুহূর্তে ভাবছে, খুব অন্যায় করেছে, পাপ করেছে তখুনি সেই মুহূর্তে সে শুদ্ধ আত্মা—তখুনি সে পবিত্র, তার মনে তখন উষা—তখন দিন। শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ ডিভাইন' পড়েছো?

—কিছুতেই পারছি না—কিছুতেই পারছি না—বঁড়শির ভেতরে সুতো পরাতে পারছি না—রাস্তার অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি চীৎকার ভেসে এল।

—এই যে লোকটা। অন্ধকার পথে পথে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর কোন জ্ঞান নেই। বুদ্ধি নেই। অনুভূতি নেই। ও জানে না কি বলছে—কেন বলছে। জেনে রাখবে ও ঈশ্বরের মত পবিত্র—

—ক্ষ্যাপার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই কোন কৃত-কর্মের অনুশোচনা ওর চেতনাকে বিশৃংখল করে দিয়েছিল। সেই পাপ-বোধ—সেই বিভীষিকা ওকে—

—হা-হা-হা-হা—ওরা মারবে মাছ! বঁড়শিতে সুতো পরাতে জানে না—বহুদূর থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল ক্ষ্যাপার ক্ষীণ গলার অতি ক্ষীণ স্বর। ওর সেই অট্টহাসি আর কথাগুলো তালপুকুরের উঁচু পাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে গেল দূর দূরান্তরে। আর সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন তার সেই হায়েনার মত শুকনো খটখট হাসিটা নিঃশব্দে বাজতে লাগল।

—ও কে? হারু ঘোষাল?

—অনেকদিন আগে মারা গেছে।

—তাহলে নিরঞ্জন সরকার?

—তিনিও গত হয়েছেন।

—তাহলে—

—খোকা, এদিকে আয় তো বাবা শীগগির—জেঠিমা ডাকলেন।

দু'জনেই ছুটে গেলাম।

—দেখ্ তো তোর বাবা কেমন করছে যেন—

—সে কী!

টেবিলের ওপরে যথারীতি হ্যারিকেন জ্বলছে। জ্যাঠামশাই সেই লণ্ঠনের শিখার দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে আছেন। গা ঠাসার জন্য চাকরটা এক কোণে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে।

—কি হয়েছে বাবা?

—ওটাকে—ওই উল্লুক টাকে বিদেয় করে দে এখুনি। ও এখুনি আমাকে মেরে ফেলতো। আমি বলছি পেটে লাগছে। ও সমানে কিল দিয়েই যাচ্ছে—

—কিন্তু বড়দাদাবাবু, নিত্যি দিন তো বুড়োবাবুর পেটে ঘুসি মারতে হয়। কিল-চড় দিলে হয় না। রীতিমত ঘুসি—আজ—

—ঘরে ফেরার তাড়া নেই তো দিদি, জীতেনদা' ডাকে ধমকে উঠলেন। অল্পবয়সীটি ভৃত্যটির মুখখানা করুণ হয়ে গেল।

—যাহা—আহা ভোলা ধমকিস কেন—

—ধমকিস কেন? ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারিস না—জ্যাঠামশাই বিরক্ত হয়ে বললেন। আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, শঙ্কর। তোমার মাথায় যে কি ভূত চেপেছে! কেন বহুদিনের একটা ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?

—আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমি আর কোন খোঁজ খবর করবো না—

—না—না অসন্তুষ্ট হবো কেন—সংসারে কত কিছুই তো ঘটে, যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরো বাবামাধবের যে আখড়া আছে, তার বাঁ-দিকের পুকুরটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। কলো ব্যাখ্যা কি? একটু ভেবে বললেন, আমার মনে হয় ডাকাতরা পয়সাকড়ির লোভেই চারুকে খুন করেছিল। তাদেরই হাতে খুন হয়েছিল শেষ পর্যন্ত—মুখখানা বিকৃত করলেন জ্যাঠামশাই, দেখো তো পেটটা অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছে কেন গো? উপুড় হয়ে শুলেন আর ছোকরা ছেলেটিকে ইঙ্গিত করলেন, পা টিপতে।

দোনলা বন্দুকটা তেমনি কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রেটারার রেলটা আলিশের আরও কাছে মনে হল।

জীতেনদা'র সঙ্গেই বেরিয়ে এলাম। মনে হল, জীতেনদা' গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবছেন। আস্তে বললেন, যাবার পেটে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে রে—

হঠাৎ আমার মনে হল, কলকাতায় চলে যাওয়াই উচিত। পরিবেশটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। জ্যাঠামশাই জীতেনদা', নিরঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই সব কিছু জানেন। ওঁরা একজনও খুশি হচ্ছেন না—

থাক কি দরকার? শুধু শুধু বহুদিন আগে কবরোচাপা পড়া একটি পুরোণো ঘটনাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে কি হবে। মনের কুয়াশার ভেতরে অনেক অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা আর বহু মানুষের মুখ এক একটা ছায়ার মত নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগল। রাধার সেই কান্না-ভরা করুণ মুখখানি আর সেই উক্তি, সব—সব আমার কপাল গো দাদাবাবু—সব আমার কপাল—

যন্ত্রণা। বংশীবাদক, স্ত্রীর বিরহে কাতর বিষণ্ণ যন্ত্রণা। সে বলেছিল—সেই ঘটনার পর বাঁশী জলে ফেলে দিয়েছিলাম।

বীরেন, পূর্ণ মণ্ডল, জ্যাঠামশাই, জীতেনদা', বুড়ো বৃন্দাবন, বিলপাড়ার পুল, নীচে ঘন নিবিড় জঙ্গল সব—সব কেমন ঘসা ঘসা ছবির মত মনে হতে লাগল।

কেমন অস্পষ্ট আর সুদূর।

পরদিন। আকাশটা বেশ মেঘলা মেঘলা ছিল। মনে মনে ঠিক করলাম বালুরঘাটে সেই রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টার নগেন্দ্র রায়ের বাড়িতে আর যাবো না—

বাবার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আমার বেশ লেগেছে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে বকুলগাছের নীচে দাঁড়াতেই সেই পরিচিত চীৎকার কানে এল, তুমি পারবে—তুমি পারবে রাধা—তুমি বঁড়শির ভেতরে সুতো পরাতে পারবে?

ক্ষ্যাপা এখানে কি করছে? ভেতরে গেলাম।

—সে কি দাদাবাবু যে, ও মা! কি ভাগ্যি আমার। আসুন—আসুন—

রাধামাধবের ঘরের বারান্দায় অন্তরঙ্গভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন।

রাধা আর ক্ষ্যাপা।

ক্ষ্যাপার চশমার আড়ালে চোখ দু'টো জ্বল জ্বল করছে। তার দৃষ্টি আমাকে ছুঁচের মত বিঁধছে। মনে হল, আমি এসে পড়ায় সে বিরক্ত হয়েছে। অনেক—অনেক দিন আগে শিবুও হয়তো অস্বস্তি বোধ করতো। কেউ এসে পড়লে মনে মনে খুশি হতো না।

(ক্রমশঃ)

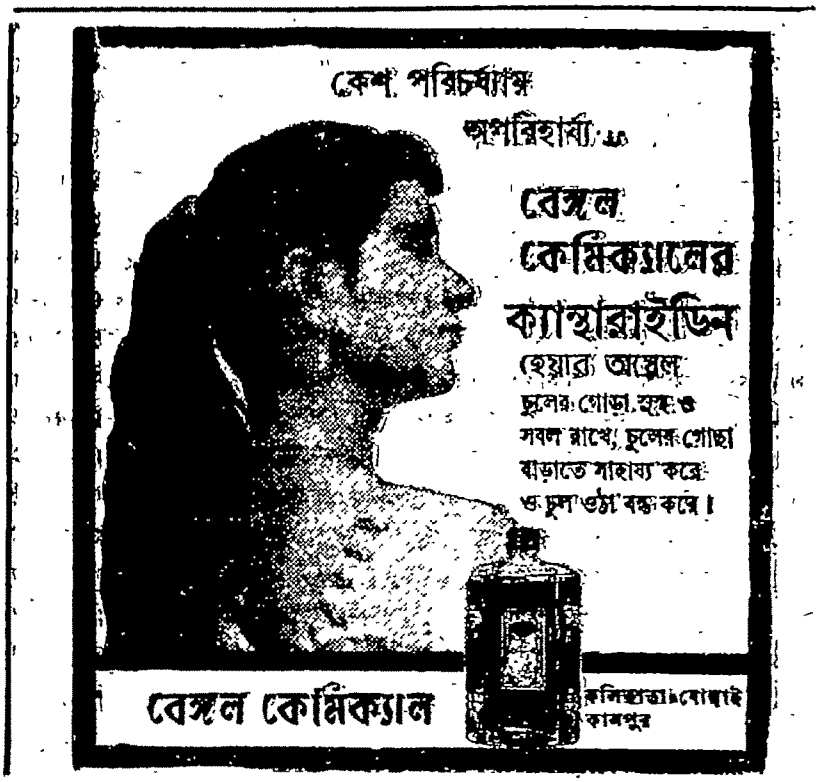

# গ্রন্থমেলা

জয়ন্তী সেন

**কথা সাহিত্য :** শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশক : কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পরিবেশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬। দাম : পাঁচ টাকা।

স্পষ্টবাদী সমালোচক হিসেবে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর খ্যাতি সুবিদিত। এবং একথাও বলা উচিত যে, শ্রীচৌধুরী লেখকদের প্রতি দৃকপাত করে নয়, সাহিত্যের সত্য-শিব-সুন্দর রূপের প্রতি সচেতন থেকেই সমালোচনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাই তাঁর সমালোচনা মনরাখাধর্মী নয়, যথার্থই মননধর্মী। বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের 'কথা-সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের উৎকর্ষের যে মানদণ্ড ও ঐতিহ্য আমাদের সামনে ধরে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে আজও পর্যন্ত আমরা অতিক্রম করতে পারি নি।' (পৃঃ ৪—৫)। একথা বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার বিভিন্ন প্রবন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে 'গোরা' সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা অনস্বীকার্য। ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্মিকল্পে শ্রীচৌধুরী চমৎকার কথা বলেছেন—'বরং গল্পের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই ছোট গল্পের সত্যিকার জগতের আরম্ভ।' অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধকার যথোচিত মন্তব্য করতে পারেন নি। আমাদের মতে—এমন সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, শ্রীচৌধুরীর সমালোচনা-পদ্ধতি প্রায় প্রাচীন রসশাস্ত্রসম্মত এবং এ-যুগের বাস্তববাদী জীবন-দর্শন সম্পর্কে তিনি অনেকখানি সঙ্কুচিত। ঐ কারণে 'সাহিত্যে পরিবেশ-বৈচিত্র্য' প্রবন্ধটি সর্বচারী হয় নি। 'কল্লোল' সাহিত্য প্রবন্ধটিতে যুক্তি থাকলেও শ্রীচৌধুরীর অনুরাগ দৃষ্টি আকস্মিকভাবে 'শনিবারের চিঠির' প্রতি পড়ায়—প্রবন্ধটিতে পক্ষপাতিত্বের ছায়া পড়ে গেছে—যা শ্রীচৌধুরীর কলমে কাম্য বলে মনে হয় নি। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'কথা-সাহিত্য ও দেহবাদ' প্রবন্ধটি একদা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তার বাদ-প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে সংযুক্ত হওয়ায় পাঠকের কাছে—তা শ্রীচৌধুরীর নির্ভীক মনের পরিচয় দান করবে।

**যতীন্দ্রপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা :** ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ-১২। দাম : ছয় টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর যুগেও কবিদলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদল রবীন্দ্রানুসারী, দ্বিতীয় দল স্বকীয় পন্থায় বিশ্বাসী। প্রবীণ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। তাঁর কাব্যের বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি, পল্লী, মানুষ, সমাজ, দেশ, প্রেম ও হাস্যরস প্রভৃতি। তথ্যপূর্ণ ভূমিকার মাধ্যমে কবির কাব্যস্বরূপ যথামথরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সুদীর্ঘ কবিতাগুলিতে কখনো কখনো ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও, কোনো কোনো কবিতায় যে ব্লাঙ্ক (বিক্রেইন) ব্যবহার করা হয়েছে, তা যেমন আবেগসমৃদ্ধ, তেমনি ব্যঞ্জনাময়। আবার ছোট ছোট কবিতায় যে তির্যক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, তা পাঠকচিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিতে সহায়তা করে। 'পঙ্ক প্রকৃতি,' 'রূপের হাট' শীর্ষক কবিতাগুলিতে ঐ ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

কোষ্ঠাকুণ্ডলি; দৃষ্টি ঘোর্-ঘোর্।
চামড়া চিল্-চিল্, দন্ত নড়বোড়।
চিন্তা হৃদয়ম্ মৃত্যু-শঙ্কার।
শক্তি খুব কম, শুষ্ক সংসার।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ছন্দ-দক্ষতায় সত্যেন্দ্রধর্মী। কতকগুলি কবিতার শীর্ষদেশে কাব্য-রচনার উৎস সম্পর্কে কবির ভূমিকা রচনা—আমাদের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। সব শেষে বলা উচিত, এই কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নিকট আমরা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ।

**রামায়ণ-সার :** সঙ্কলক : আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস। প্রকাশক : শ্রীহয়গ্রীব রামানুজ দাস, শ্রীবলরাম বর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। মূল্য ৬-৫০ নঃপঃ

রামায়ণের প্রচার সম্পর্কে কোনো কথা বলাই বাহুল্য এবং যে গ্রন্থের প্রচার যতো বেশি তার বিভিন্ন ধরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় ততো বেশি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে বাল্মীকি রামায়ণ প্রচলিত, তার ব্যাখ্যা কি ভাবে পাঠকদের নবীন জীবনালোকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করতে পারে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রামায়ণের আলোচনায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়ে গেছে। উপযুক্ত গ্রন্থটিতে শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান সুগ্রীব, বিভীষণ, কৌশল্যা, সুমিত্রা, তারা মন্দোদরী, গুহক, শবরী, জটায়ু, প্রমুখের দিব্য চরিত্রসমূহের স্থূলভাবে একটি দিব্য পরিচয় দিয়ে তার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীরামায়ণগত কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত করে তার মর্মার্থ বিশ্লেষণের একটি সফল প্রয়াস করা হয়েছে। অবশ্য এই প্রয়াসের মর্ম সাধারণ পাঠক অপেক্ষা জিজ্ঞাসু পণ্ডিত পাঠকদের কাছেই বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য বলে মনে হবে।

কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল। খবর পেয়েই বাড়িতে চাঞ্চল্য জাগল। বিমলবাবু ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকলেন। অনীতা দেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে যেন কি বললেন চুপি চুপি। সব শুনে পাশের ঘরে গেলেন তিনি। পুত্রবধূর কানে খবরটা তিনিই তুললেন।

কাকলিও শুনল সে খবর। শুনে ওর বুক কাঁপল। কেমন যেন ভয় ভয় করল। সে সময় কাছে এলেন রাণু বৌদি। মুচকি হেসে বললেন: মুখ ভার করে বসে কেন ঠাকরুণ? নাও, এসে গেছে

মুখ মুচকে হাসল কাকলি। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। রাণু বৌদি কাঁধের উপর থেকে আঁচল নামালেন। চাবির তোড়া থেকে সুটকেসের চাবি খুঁজতে খুঁজতে সামনের দিকে এগুলেন। টিনের সুটকেস সরিয়ে লেদার সুটকেস খুলে বের করলেন বাঙ্গালোর শাড়ি। আকাশী রং, সঙ্গে মানানসই ব্লাউজও নিলেন। সেই শাড়ি-ব্লাউজ বগলের নীচে চেপে ধরে মাদুর পাতলেন। তার উপর শাড়ি-ব্লাউজ রেখে নিয়ে এলেন পাউডারের টিন, কুমকুমের শিশি, আলতার পাত্র। তারপর কাকলির হাত ধরে টান দিলেন রাণু বৌদি। পরিহাস-তরল গলায় বললেন: কি গো!

... এসে বসে আছে। এটি ... বাধিকার সাজই হল না।

কাকলি হাত ছাড়িয়ে নিল রাণু বৌদির হাতের মুঠো থেকে। বলল: তোমাদের রাধিকা আজ সাজবে না বৌদি। তুমি মিথ্যাই পরিশ্রম করেছ, অত সব বের করে অনর্থক।

রাণু বৌদির চোখের ভুরু কুঞ্চিত হল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল একরাশ বিস্ময়। হাঁ করে কয়েকটি মুহূর্ত

# সূর্যস্নান

খগেন্দ্র দত্ত

তাকিয়ে থাকলেন কাকলির মুখের দিকে। তারপর একসময় বললেন : কি বলছ ঠাকুরঝি ? ছেলে নিজে এসেছে, সঙ্গে বন্ধুকেও নিয়ে এসেছে। একটু সেজে-গুজে না গেলে ওরা কি বলবে ? জানো তো, খাস কলকাতার ছেলে---

নিজের কথাতেই স্থির থাকল কাকলি, নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকল। গম্ভীর মুখে বলল : কলকাতার ছেলে ঢের তো দেখিয়েছ বৌদি, নতুন করে আবার কি দেখাবে ?

আবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রাণু বৌদি। স্থাণুর মত নির্বাক, অচল। মুখে কোন কথাই জোগাল না বেশ কিছুক্ষণ। ঐ বোবা মুখের নীচে কি বিস্ফোরণ ঘটে গেল হঠাৎ। পাশের ঘরে ততক্ষণে আলোচনা জমে উঠেছে। বিলাসবাবু অমায়িক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে চলেছেন : আসতে কষ্ট হয় নি তো বাবা ? বাড়ি চিনে নিতে কোন অসুবিধা ?

উত্তরও আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

বিলাসবাবুরই মত শান্ত অমায়িক গলার উত্তর।

রাণু বৌদি খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন। শুনলেন পাশের ঘরের কথোপকথন। তারপর এক সময় মৃদুকণ্ঠে বললেন : যা হয় কর বাপু। আমি যা যা এনেছি সব না হয় তুলেই রাখলাম, শাড়িখানা পরবে তো ?

কাকলি উঠে দাঁড়াল। দাদুরের উপর থেকে শাড়িখানা তুলে তার পাট ভাঙতে ভাঙতে বলল : তুমি অযথা রাগ করছ বৌদি। মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

কাকলির গলার স্বরে বিরক্তির ঝাঁঝ, সে ঝাঁঝ নিঃশব্দে হজম করলেন রাণু বৌদি। হজম করলেন কাকলির সঙ্গে তিনিও একমত বলেই। কাকলির কাছে এ ঘটনা প্রথম নয়। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে দু'বছর আগে। এই দু' বছরের মধ্যে বার দশ সাজ-পোষাক নিতে হয়েছে ওকে। কারণ ঐ এক ই। যদি হয়ে যায় বিয়েটা। বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, মা পুজো দিয়ে আসেন কালীঘাটে গিয়ে। বড়দা-বৌদির রাতগুলো হয় রসঘন। কোথা থেকে খোঁজখবর করে সম্বন্ধগুলো নিয়ে আসেন বিলাসবাবু। দিনক্ষণও ঠিক করে আসেন। আর সেই নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট ক্ষণটিতে এসে হাজির হয় ছেলে কিংবা ছেলের বাবা। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলের ছোটভাই অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আর ওদেরই সামনে গিয়ে সেজেগুজে বসতে হয় ওকে। লজ্জা-সঙ্কোচে জড়োসড়ো হয়ে, মাথা নীচু করে থাকতে হয় প্রায় সর্বক্ষণ। বুকের ভেতরে সুরু হয় দুরু দুরু।

তারপর প্রশ্নের ঝড়। এটা সেটা নানা প্রশ্ন। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত নানা ধরণের। প্রথম প্রথম উৎসাহ থাকলেও ইদানীং উৎসাহে ভাটা পড়েছে। উৎসাহের বদলে বিরক্তিরই উদ্রেক করে।

তবু বাবার মুখ চেয়ে, মার আকুলতার কথা স্মরণ করে, সর্বোপরি দাদা-বৌদির উৎকণ্ঠার ওকে সাজতেও হয়, ভীরু পায়ে ওদের সামনে গিয়ে বসতেও হয়। কিন্তু ও কি একটা কলের পুতুল ? নিত্য নতুন লোকের সামনে গিয়ে বসবে আর প্রত্যেকটি কথার উত্তর দেবে ?

এ প্রশ্ন মনে জাগলেও মুখ ফুটে প্রকাশ পায় নি কোনদিন। বরাবরই আগন্তুকদের সামনে গিয়ে বসেছে। মনের বিরক্তি আর রাগকে চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে। একে একে সব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে কাকলি। বিলাসবাবুর মুখে সূর্যোদয়ের রং লেগেছে, মায়ের মুখে চাঁদনী রাতের আলোছায়া খেলা করেছে। খুশিতে আর আশায় জ্বলে উঠেছে বৌদির চোখ।

আগন্তুকরা এক সময় চলে গেছে, বিলাসবাবুর কিছু টাকা অপচয় করিয়ে। অপচয়ই তো। মিষ্টি এসেছে, চা এসেছে, ডিস-ভর্তি পানও। ভালো সিগারেটের প্যাকেটও বাদ যায় নি। ঐ খরচার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়, যখন এ পক্ষ অপেক্ষার প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটায় সুখঘরের প্রত্যাশায় আর অন্য পক্ষ থাকে নীরব। কোন খোঁজ নেয় না, দেয় না কোন খবর। ব্যতিক্রমও দেখা যায় মাঝে মাঝে। কেউ চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় মেয়ে পছন্দ হয়েছে। কিন্তু দাবীর তোড়ে বেসামাল হয়ে যান বিলাসবাবু। আর এগুতে পারেন না।

আজও এরকম একটা কিছুই তো হবে। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেও দ্বিতীয় ধাক্কা আসবে বিলাস-বাবুর উপর। পরোক্ষে দাদার ঘাড়েও। সে ধাক্কার টাল সামলাতে পারলে তবে তো বিয়ে।

অথচ এদিকে মার চোখে ঘুম নেই, বাবার মনে স্বস্তি নেই। দিনরাত এক কথা, এক আলোচনা—কখনও দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সে আলো-চনা আবার কখনও দাদা-বৌদি পর্যন্ত ছড়ায়। মা-বাবার জন্য দুঃখ বোধ করে কাকলি। সেজন্যেই প্রত্যেকবার সেজে-গুজে পরীক্ষার হলঘরে গিয়ে বসে। আজও বসবে। আজও যাবে তাদের সামনে, যারা ওকে দেখতে এসেছে।

শাড়ি-ব্লাউজ পরলো কাকলি। রাণু বৌদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ততক্ষণে ও ঘরে খাওয়া দাওয়ার পালা চুকে গেছে। কাপ-ডিস সরিয়ে আনছে। তার শব্দ আসছে। এর পর আর দেরী করা চলে না।

ঐ ঘরের প্রতিটি অণুপরমাণু প্রতীক্ষা-ব্যাকুল। কাকলির উপস্থিতির জন্যে, ওর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে।

সেজেগুজে সেদিকে পা বাড়ালো কাকলি। মন্থর পায়ে চৌকাঠ পার হলো। সঙ্গে ওর মামা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সারলো। বসলো পাটির এক-ধারে। মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। দু'টো কান সজাগ রাখল আগন্তুকদের প্রশ্নের জন্য। কয়েকটি পলক নিথর নিষ্পন্দ। ঘরঘরে

নীরবতা। সে নীরবতা ভা লেন বিলাসবাবু: এ হচ্ছে আমার মেয়ে কাকলি।

সুবিনয় আর ওর বন্ধুর দৃষ্টি সামনের দেয়াল থেকে সরে এল কাকলির মুখে। সামনেব ডিস থেকে একটা লবঙ্গ তুলে নিযে মুখে পুবে আস্তে প্রশ্ন করলো সুবিনয়ের বন্ধু: কোন• ডিভিশনে পাশ করেছিলেন আপনি?

পানের ডিসে দৃষ্টি স্থির রেখে একটা ঢোক গিলে নিল কাকলি। শাড়ির প্রান্ত দিযে মুছলো কপাল। মুছল চোখ-মখ। বড় বেশি ঘামছে আজ। তারপব অনুচ্চকণ্ঠে বলল: সেকেণ্ড ডিভিশনে।

সুবিনয মুখ তললো। ওব দৃষ্টির ঝলক পড়লো কাকলিব চোখে-মখে। সে দৃষ্টির উত্তাপ অনভব করলো কাকলি। আরও একজনের দৃষ্টি স্থিব ওর মখে, সে দৃষ্টি সুবিনয়ের বন্ধুর।

লজ্জায় আরক্ত হল কাকলির মুখ। সঙ্কোচের বিদ্যুৎ-স্পর্শ লাগলো ওব চেতনায়, কপালে গণ্ডে আবার দেখা দিল ঘামের বিন্দু।

বিয়ের পরে যদি পড়াতে চায় আপনি পড়াশুনা করবেন?

আবার সেই কণ্ঠ। সুবিনযের বন্ধুর গলা।

কথাটি কিন্তু কাকলির কাছে একটা বিশেষ অর্থ বহন করে আনলো। বিশেষ একটা প্রতিশ্রুতি। চোখের সামনে একটা ফুলঝুরির শান্ত আলোকচ্ছটা। তার ছায়া প্রতিফলিত হল ওর চোখে-মুখে। পানের ডিস থেকে চোখ তুলল ও। দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল সুবিনয়ের মাথার উপর দিয়ে পেছনের দেয়ালে। স্পষ্ট উচ্চারণে বললো: আমারও তো তাই ইচ্ছে। যদি সুযোগ পাই নিশ্চয পড়াশুনা করব।

বেশ---একটু নড়ে চড়ে বসলো সুবিনয়। পকেট থেকে রুমাল বের করলে। মুখ চোখ কপাল মুছে নিয়ে প্রথম কথা বললো: সুখী হলাম আপনার লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে।

আবার নীরবতা নামলো ঘরের ভেতর। কয়েকটি পলকের মত। এক সময আবার বললে: আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই—কথাটা শেষ করতে গিয়ে রঞ্জনের দিকে মুখ করল। ঠোঁটের উপর ধরে রাখল হাসির টুকরো: এবার তোমার পালা রঞ্জন---

রঞ্জন একবার কাকলির মুখে আর একবার বিলাসবাবুর মুখে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল বন্ধুর মুখে। তারপর বলল: আমারও আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই সুবিনয়। ওঁকে এবার যেতে দে।

তবু কয়েক সেকেণ্ড বসে থাকল কাকলি। কথা বললেন কাকলির মামা বিমলবাবু: এবার তাহলে যেতে পারে মেয়েটি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিয়ে যান—এক সঙ্গে দু'বন্ধু কথা বলে ওঠে।

কাকলি উঠে দাঁড়ালো। দু'টো হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকাল। তারপর দরজার দিকে মুখ করতেই মামা হাত ধরলেন। দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন।

চৌকাঠ পার হতেই কাকলির সব সঙ্কোচ সব জড়তা উধাও। এক ছুটে পাশের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ঘিরে ধরলো ওকে। এতক্ষণ যারা আড়ালে ছিল, জানালাব পাশে ছিল এবার তারা সবাই ওর কাছে এলো। কেউ হাত ধরলো, কেউ পিঠে হাত রাখলো। এ প্রশ্ন সে প্রশ্ন করতে লাগলো। সকলের শেষে এলেন রাণু বৌদি: কিগো ঠাকুরঝি, পছন্দ হল?

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেললো কাকলি।


# রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা

সম্পাদক: ধীরেন দেবনাথ

বর্তমান সংখ্যার লেখক সূচী:

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

বার্ষিক সডাক গ্রাহক চাঁদা চার টাকা

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা:

পত্রিকা-সম্পাদক:

## রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

পরবর্তী সংখ্যার (শেক্সপীয়র স্মরণ-সংখ্যা) লেখক সূচী:

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার গুহ, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অশীন্দ্র চৌধুরী, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ শীতাংশু মৈত্র প্রভৃতি।

সে হাসি সে দিকে শুধু খুশি করবার জন্যেই। ও আগে এই বৌদিকেই দু'একটা কক্ষ কথা শুনিয়ে গেছে। পাশের ঘরে যাবার প্রস্তুতি পর্বে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আর এখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই একমুখ হাসি দিয়ে বৌদির মনটাকে হালকা করে দিতে চাইলো। একরাশ খুশির উদ্দাম হাওয়া ছড়িয়ে দিল ঘরের ভেতর।

পাশের ঘরে আবার চাঞ্চল্য। সে চাঞ্চল্যের সাড়া পেয়েই এ ঘর স্তব্ধ হলো। উৎকর্ণ হল সবাই। সুবিনয় এবং ওর বন্ধু চলে যাচ্ছে।

কৈ কিছুই তো বলে গেলেন না আপনারা? বিলাসবাবুর কুণ্ঠিত প্রশ্ন।

আমাদের কথাই তো শেষ নয়। আসছে রোববারে বাবা আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেনা-পাওনার ব্যাপারে বোঝাপড়া হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

আপনার বাবা তাহলে আগামী রোববারই আসছেন? তাই বলেছেন বুঝি? বিলাসবাবুকে হাসিখুশি দেখাল।

তাই বলেছেন আমাকে—গলাটা নীচুতে নামালো সুবিনয়: আমাদের পছন্দ হয়েছে শুনলে তিনি আসবেন অন্যান্য ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে।

বিমলবাবুও সায় দিলেন; বললেন: আমার সঙ্গেও সেরকম কথা হয়েছে।

তাহলে আমরা চলি?

এস বাবা—

এক সময় জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেল। পাশের ঘরটা নীরব হয়ে গেছে। বিলাসবাবু এবং বিমলবাবু ওদের এগিয়ে দিয়ে আসতে গেছেন।

এ ঘরের ভিড়ও কমলো। আশপাশ থেকে যে সব মেয়ে-বৌ-ঝিরা এসেছিল তারা বেরিয়ে গেল। ফিরে গেল যে যার ঘরে। আশান্বিত হয়েই গেল সবাই। এবার হয়তো বিলাসবাবুর মাথার বোঝা নামবে। যারা দেখতে এসেছিল তারা তো সে রকম ইঙ্গিতই দিয়ে গেল।

পরের রোববার সত্যি সত্যি এলেন সুবিনয়ের বাবা। এসেই বললেন: মেয়ে দেখব।

এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না এ বাড়ির কেউ। তবু না করতে পারলো না। বিলাসবাবু বললেন: দেখতে চান, দেখবেন—বসুন।

বসছি আমি। কিন্তু মেয়েকে সাজগোজ করিয়ে দেখালে চলবে না। এখুনি নিয়ে আসুন, যে বেশে আছে সে বেশেই দেখতে চাই আমি।

বিলাসবাবু বুঝলেন পাকা লোক। সোনা বলে উজ্জ্বল তাম্রখণ্ড দিয়ে ঠকাতে দেবেন না তিনি। তাই আসল রং, আসল মুখই দেখতে চান তিনি। রং-এর প্রলেপ, কোন প্রসাধনের ছোপ নয় এমন কি পোষাকের জৌলুসও নয়। একেবারে স্বাভাবিক কাকলিকেই দেখবেন তিনি।

পাশের ঘরে খবর পৌঁছাতেই কাকলি চলে এল। পরণে ডুরে শাড়ি। হালকা নীল রং। প্রসাধনহীন চেহারা। খালি পা, গায়ে একটি সাধারণ ব্লাউজ।

কাছে এসে পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করল কাকলি। ভদ্রলোক হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন: বোস মা।

কাকলি বসলো সামনেই। ভদ্রলোক একটুখানি এগিয়ে এসে ওর বাঁ হাতখানা টেনে নিলেন। একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন। রেখা দেখলেন ঝুঁকে পড়ে। চুলের খোঁপা খুলতে বললেন। তাই খুললো কাকলি। পিঠের উপর ছড়িয়ে দিতে বললেন। তাই দিল কাকলি। ভদ্রলোক চুলের ঘনত্ব আর দৈর্ঘ্য দেখলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করতে বললেন। দেখলেন দাঁত। দাঁড় করিয়ে দেখলেন দেহের গড়ন, পায়ের গোড়ালী, পায়ের পাতা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারকয়েক চোখ বুলোলেন।

পাশে বসে সব লক্ষ্য করলেন বিলাসবাবু। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো মেয়েরা। দাঁতে দাঁত ঘষলো কাকলি। এ পরীক্ষা কিছু কিছু আগেও ভোগ করেছে কাকলি। সহ্যও করেছে। আজ কিন্তু অসহ্য ঠেকলো ওর কাছে। রাগে রোষে জ্বলে যেতে লাগলো ওর সর্বশরীর।

ভদ্রলোকের অনুমতি পেয়ে এক সময় সে ঘর থেকে বেরিয়েও এল। মুখখানা আষাঢ়ের আকাশের মতো থমথম করছে। কারও সঙ্গে কথা বললো না। কোন প্রশ্নের উত্তরও না।

পাশের ঘরে ততক্ষণে নতুন পর্ব সুরু হয়েছে। আলোচনা চলছে বিয়ের নানা সমস্যা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপারটা প্রথম স্থান করে নিয়েছে আলোচনায়। মাস তারিখ ঠিক করার কথাটাও বাদ গেল না।

এক সময়ে আলোচনা থামলো। গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু'জনই। ভদ্রলোক সামনে, পেছনে বিলাসবাবু। বিলাসবাবু আজও এগিয়ে দিতে গেলেন ভদ্রলোককে। কেউ ওকে দেখতে এলে অনেক কাজ করতে হয় বাবাকে। সেসব কাজের সঙ্গে অভ্যাগতদের এগিয়ে দিয়ে আসাটাও যুক্ত হয়।

ফিরে আসতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন অনীতা দেবী। চোখে মুখে ঔৎসুক্য, ফলাফল জানার আগ্রহে দু'টো চোখের তারা ঈষৎ বড়। বললেন: কি বলে গেলেন ভদ্রলোক, কোন মাসে রাজি ওরা?

কোন মাসে—বিলাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে হতাশার আমেজ জড়ানো গলায় বললেন: মাস ঠিক করার আগে দাবী মেটাবে কি করে তাই ঠিক কর। জান, ওদের দাবী—হাজার টাকা নগদ তিরিশ ভরি সোনার গয়না—

হাজার টাকা নগদ আর তিরিশ ভরি সোনা?? অনীতা দেবী চোখ কপালে তুললেন মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না অনেকক্ষণ।

বিলাসবাবু বাকী জুড়ে দিলেন : এ ছাড়াও আছে, ছেলের ঘড়ি, পেন, সাইকেল, রেডিও—

অনীতা দেবী ঢোক গিলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না, জিভ শুকিয়ে গেছে।

দরজার আড়াল থেকে একখানা শাড়ির আঁচল সরে গেল। সে আঁচল রাণু বৌদির। একটু পরে ফিরে এসে শাশুড়ির হাত ধরে অন্য ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

কাকলিও শুনলো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে। শুনে সেও সরে গেল।

সরে গেল শুধু জানালার ধার থেকেই নয়—মা বাবার আরোপিত পথ থেকেও। সেই গতানুগতিক পথে আর নয়। অনেক হয়েছে শান্তি, অনেক দুর্ভোগ ভুগেছে।

পরদিন থেকে বাইরে বেরুতে লাগলো কাকলি। সকাল দুপুর বিকেল সব সময়ে। বাড়িতে ঐ নিয়ে কথা উঠলো। প্রথম মা বাবা দাদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো তারপর রাণু বৌদি হয়ে ওর কানে এসে পৌঁছল।

পরদিন বেরুবে মুখে মা এলেন সামনে : কোথায় যাচ্ছিস কাকলি?

কাজ আছে মা—শক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তর।

কাজ? বিস্ময়াভিভূতের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন অনীতা দেবী, তারপর আস্তে আস্তে বললেন : এই দুপুর রোদে বাইরে গিয়ে কি কাজ?

পরে জানতে পারবে মা—জটিল প্রশ্নের সরল উত্তর দিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল কাকলি

নিতান্ত নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকলেন অনীতা দেবী। বিলাসবাবু শুনে গম্ভীর হলেন। মুখে চিন্তার ছায়া ঘনাল। জল্পনা-কল্পনা চললো সারাক্ষণ। রাণু বৌদিও সে জল্পনা-কল্পনায় অংশ নিলেন।

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরতেই রাণু বৌদি কাছে এলেন : একি সুরু করেছ ঠাকুরঝি? সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে কি বলছে বলতো??

বলবে আবার কি? ভুরু কুঁচকালো কাকলি। আড়চোখে তাকালো বৌদির মুখের দিকে। বলল : লোকে বলবে আমার মেয়েটাকে একটু ভালো করে দেখবেন, কেউ বলবে আমার বোনটার দিকে একটু নজর রাখবেন। আর যাদের দু'টোর কোনটাই নেই তারা লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, আর মাঝে ঢোকা গিলবে।

তার মানে? রাণু বৌদিও চোখের ভুরু ধনুকের মত বাঁকা করে তাকালেন কাকলির মুখের দিকে। অবাক হয়ে বললেন : এসব কি বলছ তুমি?

বলছি সত্যি কথাই—বলতে বলতে ব্লাউজের ভেতরে হাত দিয়ে বের করলো একটি খাম। সে খামের ভেতর থেকে নিল এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। বাড়িয়ে ধরলো রাণু বৌদির দিকে।

হাত বাড়িয়ে কাগজ নিলেন রাণু বৌদি। পড়লেন সবটা। চিঠিখানার ভাষা ইংরেজী, তাহলেও সে ইংরেজী বুঝবার মতো বিদ্যে ওঁর আছে। সে বিদ্যে দিয়ে বুঝলেন কাকলি চাকুরী নিয়েছে। স্কুলের চাকুরী। সভয়ে বললেন : একি করেছ ঠাকুরঝি? মা বাবা দাদা এঁদের মতামতটাও নিলে না একবার?

কাকলি তেমনি শান্ত তেমনি নিরুদ্বিগ্ন গলায় জবাব দিল : মতামতটা আজকেই চাইবো বৌদি।

কিন্তু—জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে নিলেন রাণু বৌদি : ওঁরা রাজি হলে তো?

কেন হবেন না রাজি—কাকলির স্বরে দৃঢ়তার আভাস : বাবার কথা ছেড়ে দাও, তিনি সেকেলে মন নিয়েই চলেন। কিন্তু দাদা? তাঁর আপত্তি থাকবে কেন? তিনি নিশ্চয় মেনে নেবেন এবং আশা করি তুমিও।

রাণু বৌদি স্থির নিশ্চল। মুখে কোন কথা নেই।

তাঁর নীরবতা লক্ষ্য করে কাকলি আবার কথা বলল : তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে বৌদি। জান তো অনেক দুঃখে আমি এ পথ বেছে নিয়েছি। লেখাপড়া শিখে একেবারে কলের পুতুল হয়ে থাকতে মন আমার বারে বারে বিদ্রোহ করছিল। তাই আমার নিকট বান্ধবী সুলেখাকে বলে ওর বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কাজ নিয়েছি। অনেক আশা করে অনেক ভেবেচিন্তে তবে আমি গিয়েছি বৌদি। আমি নিজের ধারায় পড়াশুনা করব, এ উদ্দেশ্যের বাস্তব রূপায়ণে তুমি আমার পাশে দাঁড়াও বৌদি।

কথা শেষ করে রাণু বৌদির বুকের মধ্যে মাথা রাখলো কাকলি। রাণু বৌদিও দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন ওকে।

সে মুহূর্তে তাঁর অতীত জীবনটা ভেসে উঠলো মানসচক্ষের সামনে। বিয়ের আগের না-ভরা দিনগুলো দুলতে লাগলো মনের সামনে। দুলতে লাগলো সে সব দিনের তিক্ত স্মৃতি, মন জ্বালা করা অভিজ্ঞতা।

মনদের প্রতি সমবেদনায়, সহানুভূতিতে ওর মনটা নরম হয়ে গেল। কাকলির মাথার চুলের অরণ্যে আঙুলগুলো সচল হয়ে উঠলো।

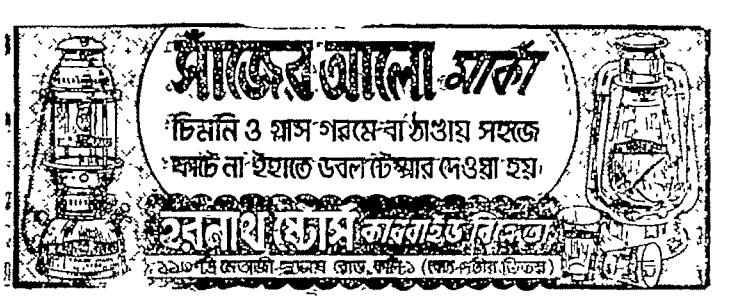

# গোয়ালিয়র

বিজনবিহারী নাগ

ভোরবেলা : মেঘলা আবহাওয়া। টাঙ্গায় উঠে চলেছি শহরের পানে। মাইল তিনেক পথ। খুঁজে তো একটা আস্তানা পাওয়া গেল কিন্তু নামবার জো নেই। বসে আছি—জলের ঝাপটা গায়ে এসে লাগছে। মুষল-ধারে বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মুখে জলের ধারা ঢালু পথে ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে। বর্ষণমুখরিত গোয়ালিয়রের রাজপথে টাঙ্গার ভেতরে বসে চারটি প্রাণী দুর্যোগের রুদ্রলীলা প্রত্যক্ষ করছিলাম। বৃষ্টি কমে গেলে একজন নেমে ম্যানেজারের সাথে কথাবার্তা বলে একটা ঘর ঠিক করলো। দো তলায় সদর রাস্তার ধারে।

স্নান ও খাওয়া দাওয়া মোটামুটি ভালই হলো। বিগত রাত্রির ভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি দূর হয়ে সবাইকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। বেলা তিনটে বাজলেই বেরিয়ে পড়ব স্থির হলো, কিন্তু অলক্ষ্যে নিদ্রাদেবী তন্দ্রার মধুময় আবেশ সৃষ্টি করে যেন মৃদু হাসলেন। সেই স্পর্শাতুর প্রলেপে চলে না পড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লুম সবাই।

প্রায় মেঘমুক্ত আকাশ। শরতের এককালি মেঘ চলে-পড়া সূর্যকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছিল। পথ চলতে দেখছি নিকটেই পাহাড়। সেখানে আছে এক মন্দির। এই মন্দির দেখবার আগে, পথে দেখলুম জিওয়াইজি মহারাজের চট্টি মানে স্মৃতিসৌধ। পুরাতন টাকশাল বর্তমানে পুলিশ ব্যারাক। শহরের প্রায় প্রান্তভাগে এগিয়ে চলেছি। দূরে যে রাস্তা লক্ষ্য গেছে সেই রাস্তা ধরে বরাবর চলেছি পাহাড়ের ধার ঘেঁষে পশ্চিমাভিমুখে। ছোট পাহাড়। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি মন্দির চূড়া। পাথরের ওপর কাটা সিঁড়িপথে বরাবর উঠে দেখলুম পুলিশ ব্যারাক। এর পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখলুম মামুলি ধরণের হনুমানজীর মন্দির। ছায়াঘন জংলা পথে পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে পেলাম বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উঁচু ও নীচু কাঁকর মিশ্রিত রাঙ্গামাটির পথ। জায়গাটা নির্জন। সুমুখে মন্দিরকে লক্ষ্য করে চলছি পথ। খুব সাধারণ মন্দির। মন্দির থেকে বেরিয়েই নীচে নেমে যাবার পথ। সমতলভূমি থেকে মাত্র আড়াইশ' ফুট উঁচু স্থান এটি। সম্মুখের দৃষ্টিপথে গোটা গোয়ালিয়র শহরটা যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

ঐ তো এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই সুন্দর সৌধমালা। ষ্টেশন বলে ভ্রম হবার নয়। দূরে পাহাড়ের ওপর সুউচ্চ প্রাচীন দুর্গ, যার কোল ঘেঁষে রয়েছে সুন্দর গোয়ালিয়র শহরটি। ঐ দেখা যাচ্ছে জয়-বিলাস প্যালেস। মহারাজার রাজবাটি। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে লাইট রেলওয়ে লাইন এঁকেবেঁকে বহুদূর দৃষ্টিপথ মিলিয়ে গেছে। দূরে বিটপিশ্রেণী শোভিত উদ্যানের পাশ দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ। আধুনিক ও পুরাতন বাড়িগুলি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু মিলিয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গোটা গোয়ালিয়র শহরটি সত্যই দেখতে লাগে অপূর্ব।

অতি প্রাচীন শহর এই গোয়ালিয়র। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরটি পাহাড়ের ওপর অতি প্রাচীন এক দুর্গকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের কাছে আজও হয়ে আছে বিস্ময়ের বস্তু। বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢলে-পড়া এই দুর্গের ওপর যে উত্থান-পতনের ইতিহাস তা মানুষের মন থেকে মুছে যাবার নয়। যে সব কিংবদন্তী বহু যুগ যুগান্ত থেকে মানুষের মনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে তা হয়ত বিস্মৃত হবার নয়, তবে সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ হয়ত আছে।

পাহাড়ের নাম গোপাগিরি। এই পাহাড়ের ওপর পাথরের ফাটলে এক জায়গায় ছিল স্বচ্ছ প্রস্রবণ। কশ্‌পবংশীয় সর্দার সুরাজ সেন অশ্বারোহণে ক্লান্ত হয়ে অবতরণ করলেন ঐ স্বচ্ছ জলধারা দেখতে পেয়ে। আকণ্ঠ জল পান করে তাঁর তৃষ্ণা হলো দূর, কিন্তু তিনি বিস্ময়ে হতবাক হলেন এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তাঁর হাতে ও পায়ে ছিল কঠিন দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি। ঐ জলের সংস্পর্শে তা হলো অন্তর্হিত। অনতি-দূরে গোপিল নামে জনৈক জটাধারী ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর পেলেন দেখা। শ্রদ্ধাবনতহৃদয়ে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে সেই সর্দারের জাগলো অপূর্ব অনুভূতি। সন্ন্যাসীকে জানালেন

তাঁর ব্যাধিমুক্তির কথা। আশীর্বাদ পেলেন সেই সন্ন্যাসীর। গর্দার খনন করলেন সেখানে এক গভীর সরোবর। সেই সন্ন্যাসীর আদেশেই সেই সরোবরের নামকরণ হলো সুরাজকুণ্ড। হঠাৎ একদিন সেই সন্ন্যাসী সেখান থেকে হয়ে গেলেন উধাও।

এই সুরাজ সেন ২৭৫ খৃষ্টাব্দে পাহাড়ের ওপর এই সুরক্ষিত দুর্গটি নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন সূর্যের উপাসক। তিনি যে সূর্যমন্দিরটি তৈরি করেন তার অপূর্ব কারুশিল্পের নিদর্শন দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। সুখে সমৃদ্ধিতে বিত্তশালী হয়ে এই সর্দার কয়েক পুরুষ এখানে বসবাস করেন।

অতীতের কত স্মৃতি ও শৌর্য-বীর্যের কীর্তিগাঁথা যে কালস্রোতে বিলুপ্তির পথে মিশে আছে তা কে জানে। মহম্মদ ঘোরী যখন এই দুর্গ দখল করেন তখন সেটা ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ। জানা যায় মহম্মদ ঘোরীর আগে সুলতান মামুদ বারকয়েক চেষ্টা করেও এই দুর্গ অধিকার করতে পারেন নি। বহু বাধা-বিঘ্নের ভেতর রাজত্ব করে মহম্মদ ঘোরী কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত না হতেই সুলতান আলতামাস তাঁকে পরাস্ত করে এই দুর্গের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

দেশে তখন চলছিল অরাজকতার রাজত্ব। আইন-শৃঙ্খলা বলতে সবকিছু পেয়েছিল লোপ। চলছিল তখন শক্তির লড়াই। কতিপয় মুসলমান নৃপতির উত্থান-পতনের রক্তাক্ত ইতিহাস।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ রায় যখন এই দুর্গ অধিকার করেন তখন তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে ধন্য হলো দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা। এই নরসিংহের বংশধর মানসিংহের রাজত্বকালে এই গোয়ালিয়র নগরীর এবং দুর্গের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতিসাধন ঘটলো। দুর্গের অভ্যন্তরভাগে যে

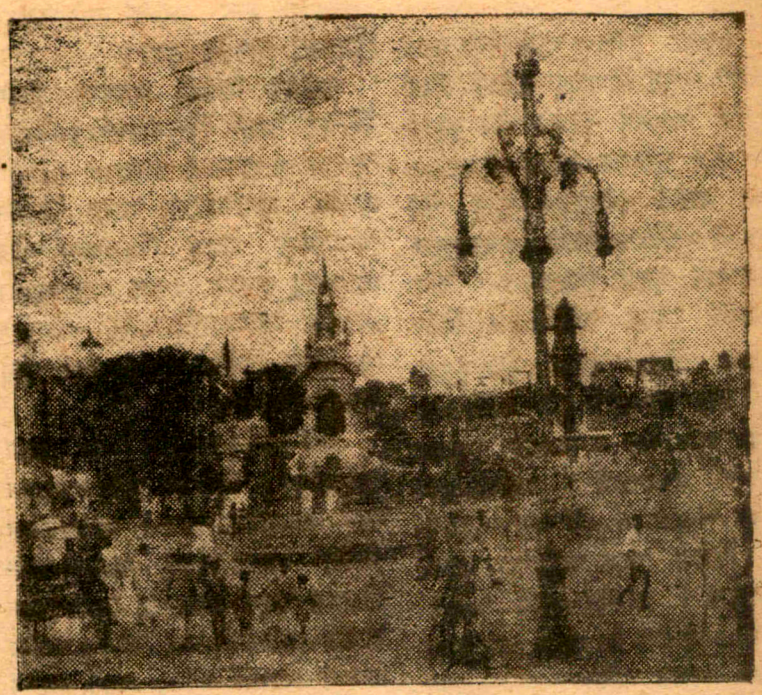

● জিওয়াইজি চক্, গোয়ালিয়র

নামে তাঁর অক্ষর কীর্তিগাঁথা যুগ-যুগান্ত ধরে বহন করে আজও রয়েছে দাঁড়িয়ে।

দুর্গের সর্বপ্রধান দ্বার ২৭৪ ফুট উঁচু। উত্তরাংশে গোয়ালিয়র নগর আর দক্ষিণাংশে দেড় মাইল দূরে লস্কর নগর। ঐ দু'অংশের মাঝখানে মর্মর প্রাচীর বেষ্টিত সোয়া মাইল লম্বা নয়শত গজ প্রস্থ বিশিষ্ট গোটা একটা পাহাড় জুড়ে সুরক্ষিত দুর্গ—কতকাল ধরে সশস্ত্র প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বীরদর্পে যেন আজও ঘোষণা করছে প্রাচীন উত্থান-পতনের কত কাহিনী।

ইতিহাসের পাতায় যে সন পাওয়া যায় সেটা ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ। এই দুর্গ তখন পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদির করতলগত। বৎসর কয়েক পর দখল করেন মোগল সম্রাট বাবর। তারপর আসেন হুমায়ুন, শেরশা, আকবর। এইভাবে একদিন হলো মোগল রাজত্বের পতন। এই পতনের মুখে গোহাদের আটসর্দার বড়ই পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। সুযোগ বুঝে

কিছুকাল পর যখন সর্দার বংশের ক্ষমতা লোপ পেল, মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারে চলে গেল এই দুর্গ।

এরপর এলো ইংরেজ, কিন্তু তারা এই দুর্গ অধিকার করতে যতটা বাধা পেয়েছিল মহারাষ্ট্রের কাছে, সেই রক্তাক্ত বীরত্বের গরিমা আজও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায় নি।

তারপর আসেন রাজপুত। এভাবে যে কতবার হস্তান্তর হয়েছে এই দুর্গ তা সঠিক জানা যায় না।

বর্তমান সময়ে যে রাজবংশ প্রসিদ্ধিলাভ করে আছেন তার আদি-পুরুষ মহারাষ্ট্রবীর রণজী সিন্ধিয়া। আজ যে পথের ভিখারি কাল হয় সে রাজা, যদি তার বিবিলিপির থাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ভাগ্যলক্ষ্মীর স্নেহ-দৃষ্টিতে পড়লেন এই রণজী সিন্ধিয়া। ইনি সুবিখ্যাত বালাজী পেশবারের ছিলেন পাদুকাবাহক মাত্র। পেশবারের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের হন অধিকারী। তিনি মারা গেলে দ্বিতীয় পুত্র মাধাজী

ভাবে পরিচালনা করলেন সমুদয় রাজকার্য।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মাধাজী অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুকে করলেন বরণ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই-এর পৌত্র দৌলতরাও রাজা হন। দৌলতের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মুগতরাও নামে এক বালককে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করলেন। ইনি জনকজী নামে অভিহিত। তিনি অপুত্রক থাকার দরুণ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী বাজিংরাও নামে অষ্টমবর্ষীয় শিশুকে গ্রহণ করলেন দত্তকরূপে। বৃটিশ সরকারের অনুমোদনে এই বালক বাজিংরাও সিন্ধিয়া নামে অভিষিক্ত হলেন সিংহাসনে। তারপর এলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। সিপাহী বিদ্রোহ। এই সময় তান্তিয়া তোপে অধিকার করে বসলেন এই গোয়ালিয়র দুর্গ। বাজিংরাও সিন্ধিয়া তাঁর মন্ত্রী দিনকর রাওয়ের সঙ্গে পলায়ন করলেন আগ্রা নগরে। পরে স্যার হিউরোড্ গোয়ালিয়র অধিকার করে আবার বাজিংরাওকে বসালেন রাজসিংহাসনে।

বর্তমান সিন্ধিয়া একজন নব্য-শিক্ষিত আদর্শ হিন্দু নরপতি। ঐশ্বর্য-সম্পদে ও পরাক্রমে ভারতের শ্রেষ্ঠতম দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। প্রজার হিতসাধনে তাঁর চেষ্টা-যত্ন বলতে গেলে অসাধারণ। একশত মাইলব্যাপী লাইট রেলওয়ে ও প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

এই দুর্গের সর্বপ্রথম দ্বার ২৭৪ ফুট উঁচু। প্রবেশের প্রথম তোরণের নাম আলমগিরি ফটক। আওরঙ্গজেব নির্মাণ করেন ১৬৬৪ সনে। মান-সিংহের মাতুল বাদল সিং তৈরি করেন দ্বিতীয় তোরণ হিন্দোল ফটক। তৃতীয় তোরণ বানস্থর ফটক, চতুর্থ গণেশ পুর ফটক। নিকটে গলিপের মন্দির। একজন সন্ন্যাসীর নির্মিত এই মন্দির। পঞ্চম লক্ষণপুর ফটক, ষষ্ঠ হাতিয়ার পুর ফটক। এই দুই ফটকের মধ্যবর্তী স্থানে আছে চতুর্ভুজ মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমূর্তি। দর্গের পশ্চিম-পার্শ্বে চুণ্চুপুর ফটকের ওপর কারাকক্ষ। নয় চৌকি নামে পরিচিত। ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি আজ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু এগুলির নির্মাণ বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। আলো ও বাতাস প্রবেশের অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখে দর্শককে কিছুক্ষণ এর নির্মাণ-কৌশলের কথা ভাবতে হয়। সত্তর ফুট মাটির নীচে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে

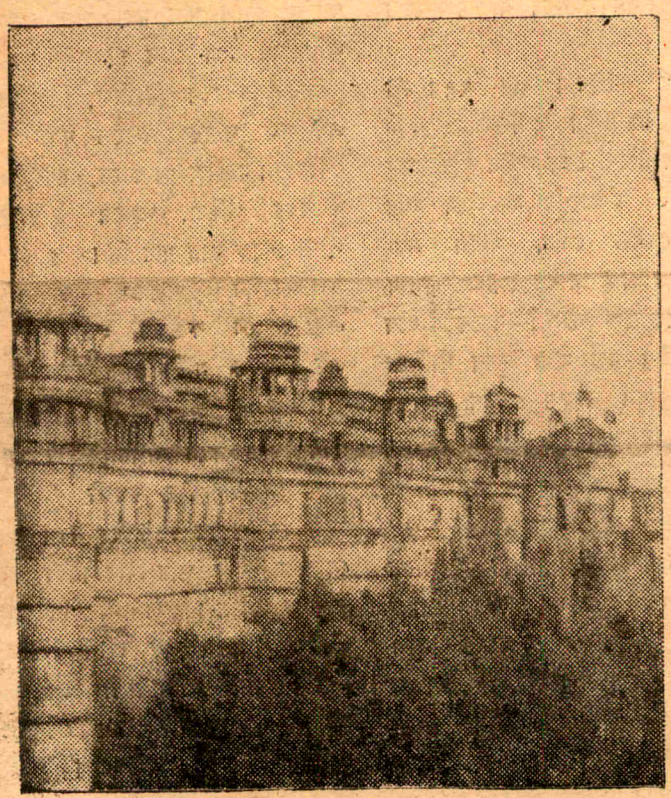

● গোয়ালিয়র ফোর্ট


সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ
কালিদাসে রনাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে
মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

# সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

—এই ভাগে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—
অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—
অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—
অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

( দ্বিতীয় ভাগ )
—এই ভাগে আছে—
১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
(নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন—অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—
অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৬। টুয়েলফথ নাইট—
অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য
একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

নেমে গিয়ে প্রকোষ্ঠগুলিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে অবস্থান করছি। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে স্থানটিকে করে তুলেছে আরামদায়ক। সে যুগে গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। আশ্চর্য হতে হয় দরজাগুলির দিকে নজর দিলে। কোন দরজাই উচ্চতায় চার ফুটের বেশী হবে না। প্রস্থেও দু'জন লোক ঢুকতে পারে না পাশাপাশি। তবে কি বুঝতে হবে যে সে যুগের মানুষ আকৃতিতে বেঁটে ছিলেন? তা কিন্তু ঠিক নয়। সে যুগে প্রায়ই শত্রুপক্ষের আক্রমণে সবাইকে থাকতে হতো সন্ত্রস্ত। ঐ প্রকোষ্ঠগুলিতে ঢুকতে গেলে মাথা অবনত না করে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। অভ্যন্তরে শাণিত তরবারির আঘাতে মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া শত্রুপক্ষের কোন লোকই রেহাই পেতো না।

অভ্যন্তর ভাগে বহু ফোয়ারা-শোভিত স্নানের জায়গা। মাঝখানে রয়েছে গভীর গোলাকার চৌবাচ্চা। বহির্ভাগ হতে জলধারা আসতো এই ফোয়ারাগুলিতে। আবার জল নিষ্কাষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করা রয়েছে এই জলাধারটির। এগুলির অবস্থা আজকাল হয়েছে সম্পূর্ণ অচল। ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় এসে আমরা দাঁড়ালুম। সেখানে ছিল তিনটি গুপ্ত পথ। একটি সুড়ঙ্গপথ আগ্রা, দ্বিতীয়টি দিল্লী আর তৃতীয়টি হলো লস্কর। শত্রুর হাতে পরাজয় বরণ করে অশ্বারোহে। পলায়ন করে সুড়ঙ্গ-পথ লি ছিল প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র অবলম্বন। বহুকাল গত হয়েছে। সংস্কারের অভাবে সেগুলি অপ্রয়োজন-বোধে ইটের গাঁথুনি তুলে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বৃটিশ রাজত্বে। শত্রুপক্ষের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়নের দিন হয়েছে গত। ঐশ্বর্যের গরিমায় লোভাতুর মানুষ আজ আর এখানে আসে না, আসে না কোন মানুষ ভোগের লালসা নিয়ে এখানে।

মহারাষ্ট্রীয় বীর তেলেঙ্গানা এই দুর্গ অধিকার করে তৈরি করেন ১০০ ফুট উঁচু কারুকার্যখচিত অপূর্ব মন্দির। নামকরণ হলো তেলিকা মন্দির। সিংহদ্বারের উপরিভাগে আছে গরুড়ের মূর্তি। দুর্গের অপর প্রান্তে আছে শ্যামবাহুর মন্দির।

দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে আছে একটি ফটক যা তৈরি হয়েছিল বৃটিশ আমলে তাদের প্রয়োজনবোধে। গত মহাযুদ্ধে ছিল এই দুর্গে এক বৃহৎ সেনা-নিবাস ও হাসপাতাল।

দুর্গের এক স্থানে আছে সোজা খাড়াই পাহাড়। তার গায়ে জলের উৎস কত যুগযুগান্ত ধরে সিক্ত হয়ে আছে কে জানে। সেই নিঃসৃত বারি-ধারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর রূপ নিয়ে গড়িয়ে ঢালুপথে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে প্রকৃতির খেয়ালে। এই সিক্ত পাহাড়ের গায়ে আছে সত্তর ফুট উঁচু ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি।

দুর্গ দেখে বেরিয়ে এসে দেখলুম অনতিদূরে প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের সমাধি। দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে তাঁর গুরু ঘাউসউদ্দিনের কবর ও তৎ-সংলগ্ন জুম্মা মসজিদ। তানসেনের সমাধিক্ষেত্র যেন অতি মামুলি ধরণের। দেখে মনে হয়, যেন দিন দিন অবহেলিত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। চতুর্দিকে ঘাস-লতা-পাতার কুঞ্জে অযত্নে রক্ষিত স্থানটির পরিবেশ দেখে বেদনায় মনপ্রাণ ভরে ওঠে যেন। আজও এখানে তৈরি হয় নি বিশেষ করে কোন সমাধিমন্দির যা মানুষের মনে গভীরভাবে হয়ে থাকে স্মরণীয়। ভাবতে গেলে মনে হয় এই অনাদর কেন?

পথের পার্শ্বে মহারাজা সিন্ধিয়ার অতিথিশালা। সুরভি কুসুমোদ্যানে নূতন রাজপ্রাসাদ মতিমহল। বর্তমানে একাউন্ট জেনারেলের অফিস। জয়বিলাস রাজপ্রাসাদ মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত কার্পেট গায়ে অভ্যন্তরভাগ শোভিত; এর ভেতর আছে একশত ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট প্রস্থ এবং উচ্চতায় চল্লিশ ফুট হলঘর। অপূর্ব রঙ্গিন কাচের আয়নায় সুশোভিত।

আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগে শিক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এখানে। সকালবেলা পথ চলতে দেখা যায় দ্বিচক্রযানে বই-এর ঝাঁপি নিয়ে চলেছে সারি সারি যুবক-যুবতী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর দল। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এ-দেশ আজ আর পেছিয়ে নেই, কারণ তাদের চলাফেরায় রয়েছে শুচি-সম্ভ্রম শুভ্রতা যা সবাইকে আকৃষ্ট না করে পারে না।

গোয়ালিয়র মধ্যপ্রদেশের একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে—'রেয়ন' শিল্প আর 'পটারিজ'। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করে নানা রং-এ রঞ্জিত খেলনা-শিল্প সত্যি চমৎকার।


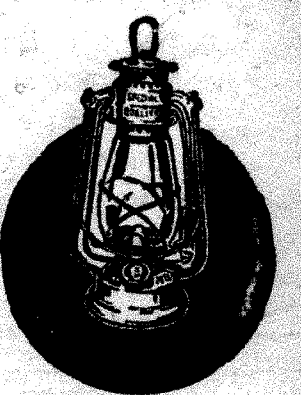

কিমান

নবতম সংযোজন

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

২৩৬,৪ নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৩৫৮০

ধারাবাহিক উপন্যাস

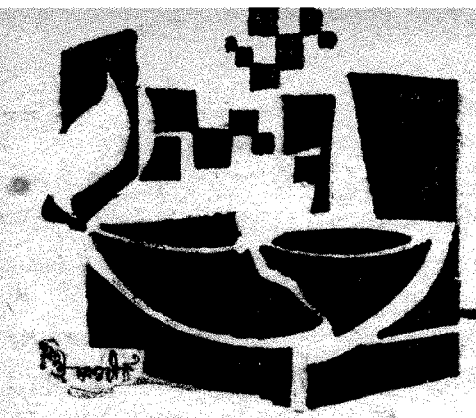

# 'তন্দুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

সাইত্রিশ

সেদিন বিজয় দাঙাদা'র ঘর থেকে বেরিয়ে যখন চলে আসে, সে লক্ষ্য করে নি রতনও তার পিছু পিছু আসছে। নিজের ঘরে ঢুকে খাটের ওপর বসতে যাবে এমন সময় শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে রতন মিটি মিটি হাসছে।

বিজয় জিজ্ঞেস করল, তুমি চলে এলে যে ?

রতন উত্তর দিল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

—ওরা তোমায় খুঁজবে না ?

—ঘরে তো কেউ নেই, ডাকলেই আমি চলে যাব।

বিজয়ের আশ্চর্য লাগছিল এই জন্যে, আজকাল তার ঘরে বড় একটা কেউ আসে না বল্লেই হয়। এ ছেলেটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। বলল, তুমি যে ঘরে ছিলে সে ঘর এখান থেকে বেশ দূরে, তোমার নাম ধরে ডাকলেও শুনতে পাবে না।

রতন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তা দেখছিল, বলল, খুব পারব। আমাদের স্কুলের ছাদে একটা ঘর আছে, কত সময় সেইখানে গিয়ে আমরা খেলা করি। কিন্তু নীচে থেকে দাদু এসে যেই ডাকে, রতন, আমি তখনই সাড়া দিই, যাই।

—বেশ, তাহলে তুমি এখানে খেলা কর, আমি এই খাটে শুয়ে আছি। বিজয় কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাববার চেষ্টা করছিল—কোথায় যেন তার বেরবার আছে। মা'র কাছে কি ? আজ তো নয়, বোধহয় গতকাল যাবে বলে এসেছিল, যাওয়া হয় নি। গেলে মা খুশি হতেন। না চাইলেও গোটা পাঁচেক টাকা ছেলের পকেটে উনি দিয়ে দিতেন। তবু, ওখানে যেতে ভাল লাগে না। দাদার ছেলেমেয়েগুলো কেমন যেন হয়েছে। একেবারে সৃষ্টিছাড়া। মার্কামারা বড়লোকের ছেলেমেয়ে গরীব আত্মীয়-স্বজন দেখলেই নাক সিটকোয় আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। দাদাকে আজকাল তবু ভাল লাগে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আগের মত আর ব্যবহার করে না। তবু ও আর কতজনকে সামলাবে, বৌদির যত বয়স হচ্ছে ততই যেন পাখা গজাচ্ছে। আজকাল কি সাজের ঘটা। বাইরে কোথাও দেখা হলে বিজয়কে তো চিনতেই চায় না। অবশ্য ওকে দোষ দিলেই বা চলবে কেন ? বড়-লোকের বৌ, সাধ-আহ্লাদ নিয়ে নেতে আছে।

বিজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মরুক গে সব, কি হবে চিন্তা করে। চিন্তা করে লাভই বা কি। ওর সাধ্যও নেই, সামর্থ্যও নেই। নীরব উপেক্ষা, কি সরব ভর্ৎসনা সবই তো আজকাল বিজয়ের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রতনের কথায় ওর চমক ভাঙল, তুমি ঘুমোচ্ছ ?

বিজয় বলল, না।

—তাহলে শুয়ে আছ কেন ?

—এমনি।

—তাহলে তোমার অসুখ করেছে।

—না।

—দাদু বলে, অসুখ না করলে দিনের বেলা কেউ খাটে শোয় না।

বিজয় হেসে ফেলল, তোমার দাদুকে বোল, আমি শুই।

—নিশ্চয় বলব, বলেই রতন ভুরু কোঁচকায়, কিন্তু তুমি কে ? দাদুকে কি বলব ?

—আমি এই বাড়ির ছেলে।

রতন হাসল, ছেলেরা তো ছোট হয়, তুমি কত বড়। তোমাকে ছেলে বললে দাদু হাসবে।

বিজয়ের কথা বলতে বেশ মজা লাগছিল, বলল, আমাকে ছেলে বলতে না চাও, দাদু বোল।

রতন আরো হাসে, দাদুরা তো বুড়ো হয়, তুমি কি করে দাদু হবে।

বিজয়ও যেন ভাবনায় পড়ে, তাই তো, কি বলে আমার পরিচয় দেবে ? বরং আমাকে বন্ধু বোল।

—কার বন্ধু ? আমার ? সবাই তাহলে হাসবে। এতবড় বন্ধু।

বিজয় বোঝাবার চেষ্টা করে, বন্ধুর আবার বয়স কি ? একটা বাচ্চা ছেলে ছিল, ঠিক তোমার মত, তার একজন বন্ধু ছিল, এক বিরাট দৈত্য।

রতন উড়িয়ে দেয়, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

—সত্যিই ছিল। দৈত্যটা গ্রামের সব লোকের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার

করত, কিন্তু সে ভালবাসত ঐ বাচ্চা বন্ধুটিকে। বন্ধু যা বলত তাই শুনত। তার কথামত কাজ করত, গ্রামের সবাই গিয়ে সেই বাচ্চাটাকে ধরল, সে যেন তার বন্ধু দৈত্যকে বলে এ-গ্রামের ওপর অত্যাচার আর না করতে। তুমি তো শুনলে বিশ্বাস করবে না, বন্ধুর অনুরোধে সে দৈত্য ঐ গ্রাম থেকে চলে গেল। আর কোনরকম হামলা করতো না।

রতন মন দিয়ে গল্প শুনছিল, জিজ্ঞেস করল, তারপর কি হলো সেই বাচ্চাটার? বন্ধুর সঙ্গে আর তার দেখা হতো না।

—তা হবে না কেন? সারাদিনের কাজকর্ম সেরে রাত্তির বেলা সেই দৈত্য বাচ্চাটার কাছে আসত গল্প করতে। গ্রামের লোকেরাও আর তাকে ভয় করত না, সবাই তাকে ভালবাসত।

রতন বলল, বাঃ, তুমি তো বেশ চমৎকার গল্প বল!

বিজয় লোভ দেখায়, আমি অনেক গল্প জানি।

—আমি তোমার কাছে গল্প শুনতে আসব?

—এস।

—তুমি আমার বন্ধু তো?

—হ্যাঁ। বন্ধু। ঐ দৈত্য বন্ধু।

রতন খিল খিল করে হাসে। দৈত্যরা কত বড় হয়, এক একটা গাছের মত হাতীর মত দাঁত, সূর্যের মত চোখ, তোমার তো এসব কিছুই নেই। তুমি কি করে দৈত্য হবে?

বিজয় বলল, সেসব আমি এখন খুলে রেখেছি।

—কোথায়?

—একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে, সে বাক্সটা কত বড় জানো!

রতন জিজ্ঞেস করল, এই ঘরের মত?

বিজয় মাথা নাড়ে। উঁহুঁ তার চেয়েও বড়। এই পুরো বাড়িটা বাক্সর মধ্যে ঢুকে যাবে।

—যাঃ, তাই কখনও হয়। সে বাক্স তুমি কোথায় রাখবে?

বিজয় গম্ভীর গলায় বলল, আমি সমুদ্রের নীচে রেখে দিয়েছি।

—সমুদ্রে তো কুমীর আছে। তিমি মাছ, হাঙ্গর—

—থাকলেই বা। তারা আমাকে ভয় করে যে।

—কেন?

—আমি যে দৈত্য। দৈত্যরা ইচ্ছে করলে এক চুমুকে গোটা সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলতে পারে।


## সাপ্তাহিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

**ফর্ম—৪ ( বিধি—৮ )**

১। **প্রকাশের স্থান**—কলিকাতা।

২। **প্রকাশের কাল**—সাপ্তাহিক।

৩। **মুদ্রকের নাম**—সুকুমার গুহমজুমদার, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

৪। **প্রকাশকের নাম**—সুকুমার গুহমজুমদার, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

৫। **সম্পাদিকার নাম**—জয়ন্তী সেন, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

৬। **শতকরা ১ ভাগের অধিক মূলধনের মালিক**:—

দিলীপ সেনগুপ্ত—৮৯, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা।

ডি পি চক্রবর্তী—২০এ, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীরেন দে—৮৯, মনোহরপুকুর রোড।

কৃষ্ণকিশোর কর—১৯এ, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫।

মুরারিমোহন দত্ত—১১এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩।

পঙ্কজ চোংদার—গুস্করা, বর্ধমান।

নলিনীমোহন ব্যানার্জী, ধীমানকুমার বসু—২০এ, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্যামল মিত্র, শম্ভু চক্রবর্তী, সুনীলকুমার কুণ্ডু—২, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

শ্যামা চক্রবর্তী—৮৯, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা।

সুজিতমোহন ব্যানার্জী, এসপি চক্রবর্তী, রমা ভট্টাচার্য—২।১, রায়বাগান লেন, কলিকাতা।

অজিতকুমার দত্ত, অজয়কুমার সিংহ, অরুণকুমার বসু—১৪, শিব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা।

অজিতকুমার দাস, তুষার বাগচী, শৈলেশচন্দ্র বর্মণ—৮৫।১, হিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরোজকুমার সোম, কানাই ভট্টাচার্য, ডি এন শ্রীমানী—২১৩, কিশোর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হৃষিকেশ ঘোষ—৬১।৬এ, মুর এভিনিউ, কলিকাতা।

লতিকা সান্যাল—৯৬।১এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

অরবনাথ মৈত্র, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য—৪২, ঠাকুরদাসবাবু লেন, শ্রীরামপুর।

শম্ভুনাথ মুখার্জী, শশাঙ্কশেখর মুখার্জী, করুণেন্দু ভট্টাচার্য—৫০এ, সুরি লেন, কলিকাতা।

এস জি মজুমদার, সুধাংশু রায়—৪৫এ, কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

মাধুরী সেন,—১৬২।২১।১, লেক গার্ডেনস, কলিকাতা।

বিভূতিভূষণ সরকার, জয়শ্রী রায়চৌধুরী—১৫৪ সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

আমি, শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতসত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর:

১লা মার্চ, ১৯৬৪ — **সুকুমার গুহমজুমদার**

রতন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তুমিও পারো ?

—কতবার খেয়েছি। চল আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে। চুমুক দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।

রতন ভয়ে ভয়ে বলে, না, আজ থাক। মাকে বলে আসি নি তো।

—তাতে কি হয়েছে, যাবার পথে মা হয় তোমার মাকে বলে যাব।

রতন বলল, মা তো এখানে থাকে না, থাকে বালিতে, তাছাড়া এখন হয়ত মা'র সঙ্গে দেখাই হবে না।

—কেন ?

—মা যে স্কুলে পড়াতে যায়।

এইবার বিজয়ের মনে কেমন যেন খটকা লাগে, জিজ্ঞেস করে,তোমার মায়ের নাম কি ?

—রেণুকা দেবী।

বিজয় আর কোন কথা বলতে পারল না, একদৃষ্টে সে রতনের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যিই তো রেণুকার সঙ্গে রতনের অনেক মিল। মায়ের মতই তার টানা টানা চোখ, খাড়া নাক, হাসলে তারই মত দু'গালে টোল পড়ে।

রতন জিজ্ঞেস করল, কি দেখছ ?

বিজয় নিরুত্তর।

—বন্ধু, তুমি রাগ করেছ বুঝি, সমুদ্রের ধারে যাব না বলেছি বলে ? আচ্ছা চল ঘুরে আসি।

বিজয় গম্ভীর স্বরে বলল, না থাক, আর একদিন যাব।

হঠাৎ বিজয়ের মুখ কেন এত গম্ভীর হয়ে গেল রতন তা বুঝতে পারল না, মৃদুস্বরে আবদার করল, আর একটা গল্প বল না ?

অন্যমনস্ক বিজয় উত্তর দেয়, গল্প, আমি তো জানি না।

—সেকি ? তুমি যে বললে অনেক গল্প জান।

বিজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, জানতাম, কিন্তু ভুলে গেছি।

—তুমি মনে করে রেখ, এর পরে যেদিন তো বো সেদিন কিন্তু বলতেই হবে।

বিজয় উত্তর দেয়, সেই ভালো, তোমে মনে রাখব।

—ভাবা হয়ে গেলে আমাকে একটা চিঠি লিখে দিও, আমি এখানে এসে শুনে যাব।

বিজয় বিপদে পড়ে, তোমার চিঠি কোথায় লিখব, ঠিকানা তো জানি না।

—তাহলে আমিই চিঠি দেবো।

বিজয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, হ্যাঁ সেই ভাল।

আর কথা হতে পারল না। এই সময়ই রাঙাদা' রতনকে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছিল, তাকে নিয়ে সে চলে গেল।

বিজয় কিন্তু সেদিন বাড়ির বার হয় নি। খালি ঘুর ঘুর করেছে রাঙাদা'র ঘরের কাছটিতে। দূর থেকে সে শুধু রতনকে দেখতে চেয়েছে। কাছে আসার সাহস তার হয় নি। আর বেশি কথা বললে নিজের পরিচয় গোপন রাখা বোধহয় সম্ভবপর হবে না। রাঙাদা' কিন্তু তাকে ঠিকই ধরেছিল, জিজ্ঞেস করল, ও ছেলেটি কে, চিনতে পেরেছিস ?

বিজয় ভ্যাবলা চোখে বলে, হ্যাঁ।

—কে বল তো ?

—রেণুকার ছেলে।

রাঙাদা' চোখ তুলে বিজয়ের মুখটা দেখল, ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ। বলল, ছেলেটা কিন্তু বড় চমৎকার হয়েছে, খুব কথা বলে, বলছিল ও তোর বন্ধু।

বিজয় কোন উত্তর দিল না, মৃদু হাসল।

রাঙাদা'ই বলে যায়, এবার থেকে ভাবছি ছেলেটাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে মাঝে মাঝে রাখব, কি বলিস ?

বিজয় উত্তর দিল, যার ছেলে তাকে জিজ্ঞেস কর। আমি আর কি বলব ?

—রেণুকাকেও আসবার জন্য বলেছিলাম। ও এল না।

বিজয় কথাটা যেন শুনতেই পায় নি এইরকম ভাব করে আস্তে আস্তে সেই জায়গা থেকে সরে গেল।

রাঙাদা' নিজের মনেই মাথা নাড়ে, ছোটবেলা থেকে সে বিজয়কে দেখেছে. কিরকম যেন হয়ে গেল ওর জীবনটা। অকালে যৌবন শুকিয়ে গেছে, এখন দেখলে প্রৌঢ় মনে হয়। নিজের মনেই বিড় বিড় করে কথা বলে, অত্যধিক মদ্যপানের ফলে নার্ভ্‌ বোধহয় নষ্টই হয়ে গেছে। রতনের মতন অমন সুন্দর ছেলেকে দেখেও তার কিছু ভাল লেগেছে বলে মনে হল না। অনুভূতি যার নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষের সমাজে সে আর বাস করবে কি বলে।

কাজের বাড়ি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে অন্যের কথা চিন্তা করার অবকাশ কোথায় ? ছেলের দল রাঙাদা'কে ডেকে নিয়ে গেল। কিভাবে আজ পরিবেশন হবে তারই পরামর্শ করার জন্যে।

দিন কয়েক পরের কথা। রাঙাদা' এল বিজয়ের ঘরে দেখা করতে। আজকাল সে আসে না বলেই বিজয় অবাক হল, মুখের জলন্ত সিগারেটটা লুকোবার চেষ্টা করল হাতের আড়ালে।

রাঙাদা' বলল, সিগারেট খাওয়া লুকোবার দরকার নেই। তুই তো আর আগের কচি খোকাটি নোস।

বিজয় সেকথা শুনল না, সিগারেটটা চেকেই রাখল।

রাঙাদা' বলল, তোকে একটা চিঠি দিতে এলাম।

বিজয় মুখ তুলে তাকায়, কিসের ?

—তোকে একজন লিখেছে।

—কে ?

রাঙাদা' হাসল, তোর বন্ধু।

চিঠিটা বিজয়ের হাতে দিয়ে রাঙাদা' ইচ্ছে করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিজয় চিঠিটা নিয়ে পড়ে, পরিষ্কার গোটা গোটা হরফে রতন চিঠি লিখেছে।

বন্ধু,

তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি। মা ভাল আছে, দাদুও ভাল আছে।

তোমার কথা শুনে দাদু খুব হেসেছে। কবে সমুদ্রে যাবে ? চল দেখব এক চুমুকে তুমি সব জল খেতে পার কি না। পাঠের বাক্সটা দেখাতে হবে যাতে তোমার চোখ দাঁত কান সব আছে। চিঠি দিও। ইতি বন্ধু

(ক্রমশ)

# কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের সমীক্ষা

কীড ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

একদিকে বর্ণভিক্ষু ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীট ; সেখানে জীবনের স্রোতস্বিনী ঘূর্ণিমালার উৎপীড়নে আর্তনাদ করে অবিরাম। আরেকদিকে বর্ণ-বৈভবের পাটে চৌরঙ্গী রোড ; তার প্রাণের সাগর-মেলায় হাজার দৃশ্যের ঐক্য : সেখানে উর্মিল-মুখরতায় বজরা ভাসে বাণিজ্যের। কারণ কূলে কূলে তার রূপের হাট প্রতিষ্ঠিত।

এই চৌরঙ্গী থেকেই যাত্রা ক'রে ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীটে যতিলাভ করেছে কীড ষ্ট্রীট—আজও যা প্রণিহিত অভিজ্ঞান সেই ফিরিঙ্গী পরিবারের। বসতি-বিন্যাস তার ডাইনে-বাঁয়ে সীমিত। পরিবেশ তার পায়চারী করে দীঘির ঘাটে, লতাবিতানের ছায়ায়। কখনো আলোর আয়নায় মুখ দেখে নিঃশব্দে হাসে, পাখির গলায় গান হয়ে হাওয়ার কোলে দোল খায়। কখনো সে দীঘির উন্মুখ পদ্মে নিশান্তের অঞ্জলি ; আবার কখনো সে বুকের আঁচল খুলে পাড়ের তৃণাঞ্চলে পাতে রমণীয় শরীর। তার কোনো তাড়া নেই, তাগিদ নেই। দায়িত্বও নেই, সে গায়ে মাখে না ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীটের ক্ষুরধার আর্তি, কান পাতে না চৌরঙ্গীর প্রচণ্ড উল্লাসে। নিজের মধ্যে সে নিজেই মগ্ন ; আপনার মধ্যে আপনিই অফুরন্ত। আদিকাল থেকে সে এগিয়ে এসেছে পায়ে-পায়ে, ধাপে ধাপে নির্মাণ করেছে আপন স্বরূপ। তারপর তা প্রকাশ করেছে বর্তমানে। আজ পরিধি তার সংকীর্ণ হলেও, বিকাশ তার অসম্পূর্ণ নয়।

অনেক, অনেক দূরে সরে গেছে তার আদিকাল, হারিয়ে গেছে অজস্র যুগ-প্রস্থানের অন্ধকার পথে। অতএব আদিকালের সেই সমগ্র মানচিত্র আজ বর্তমানের আলোক-সরণিতে স্থাপন করার কোনো উপায় নেই। তবে খানিকটা শ্রুতি এবং খানিকটা ইতিহাসের সূত্র ধরে কৌতূহলের সূক্ষ্ম তুলি যা রচনা করতে পারে—তাতে দেখা যায় : ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অরণ্যের পার্শ্ববর্তী এক পতিত জমিরূপেই গণ্য ছিল বর্তমান কীড ষ্ট্রীট অঞ্চল। কিছুকাল পর এই পতিত জমিতেই এসে বসতি স্থাপন করে কয়েকঘর আদিবাসী। প্রধান জীবিকা তাদের পশুপালন। তারা সম্প্রদায়গত দিক থেকে ছিল শ্রমশীল এবং দেহ-গঠনে বলিষ্ঠ ও বিপদে নির্ভীক। কালে কালে তাদের বংশবৃদ্ধির ফলেই বসতিরও

## শ্রীপদাতিক

বিস্তার ঘটে। একদিকে নিবিড় বাঁশবন, আরেকদিকে গভীর অরণ্য। মধ্যে তাদের ঘন-বসতির অবস্থান ছিল অনেকটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নির্বিরোধ। তখন মুসলিম সুবাদার কর্তৃক তাদের কাছ থেকে কোনো রাজস্ব আদায় হতো কি না—বলা দুষ্কর। তবে শক্তি এবং তীক্ষ্ণ বিবেকবুদ্ধির বিনিময়ে আদিবাসীদের মধ্য থেকেই যে-ব্যক্তি সর্দার বা 'তালেবর'-রূপে গণ্য হত বৎসরান্তে তাকেই কিছু খাজনা অথবা প্রণামী দান করার নিয়ম ছিল উক্ত বসতির ; এই নিয়ম বা নীতির অনুবর্তী হয়েই বসতির অস্তিত্ব ছিল অনেককাল। তারপর শোনা যায় ° এই বসতির অধিবাসীদের সঙ্গেই হঠাৎ একবার প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে পর্তুগীজ দস্যুদের। পর্তুগীজ দস্যুরা জাহাজ থেকে নেমেই সদলবলে হানা দিয়েছিল আদিবাসীদের পল্লীতে। আহার্যের প্রয়োজনেই তারা লুঠ করতে এসেছিল পল্লীবাসীদের গৃহপালিত পশু। তাই পল্লীবাসীদের পক্ষ থেকেও বাধাদানের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দস্যুরা যুদ্ধবিদ্যায় অনেক চতুর এবং দলগত দিক থেকেও তারা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দস্যুদলের সামনে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি পল্লীবাসীরা। দস্যুরা ভস্মীভূত করে সমগ্র পল্লী, অকাতরে হত্যা করে অসংখ্য অধিবাসী এবং পাশবিকতার পাপচক্রে টেনে আনে পল্লী-যুবতীদের। তারপর সমুদয় গৃহপালিত পশু, সঞ্চিত শস্য এবং কিছু

অলঙ্কারাদি নিয়ে তারা ফিরে যায় তাদের জাহাজে।

উক্ত ঘটনার পর আদিবাসীদের সেই পল্লী-অঞ্চল শ্মশানের রূপ নিয়েই প'ড়ে ছিল দীর্ঘকাল। তারপর দিনে দিনে প্রাণের স্পর্শেই শ্মশান হয় সজীব। ধীরে ধীরে বসতির উন্মেষ ঘটে আবার। এবার আদিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে কৃষক, কুম্ভকার, জেলে এবং তন্তুবায় শ্রেণীর। তারপর দেখতে দেখতে কেটে যায় যুগের পর যুগ। ধাপে ধাপে মহাপ্রয়াণ ঘটে ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই বর্তমান কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের তৎকালীন পল্লীতে এসে বসতবাটী নির্মাণ করেন জেনারেল আলেকজাণ্ডার কীড। তিনি বিখ্যাত 'ফরফারসায়ার' বংশের সুযোগ্য সন্তান এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রবার্ট কীড ও জেমস্ কীডের পূর্বপুরুষ। তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলের একদিকে ছিল অজস্র বৃক্ষের অকৃত্রিম সমারোহে বিস্তৃত ময়দান এবং আরেক দিকে গভীর অরণ্য। আর বর্তমান কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের পূর্বদিকে অর্থাৎ ফ্রী-স্কুল ষ্ট্রীটের সমগ্র এলাকায় ছিল দুর্ভেদ্য বাঁশবন। সেদিন এমন এক পরিবেশেই বসতবাটী নির্মাণ করেন আলেকজাণ্ডার কীড। বসতবাটী নির্মাণের পর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিশাল পুকুর---যার নিরুদ্বিগ্ন অবস্থান দৃষ্টির আসনে আজও ছন্দসী বর্তমান আর্ট কলেজের পাশেই। পুকুর প্রতিষ্ঠার অনেককাল পর আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ স্পিক তা সংস্কার ক'রে সংরক্ষণ করেন চারদিকে ঝাঁঝরির বেড়া তুলে। তাই সে-যুগে পুকুর পার্শ্ববর্তী রাস্তা, অর্থাৎ বর্তমান কীড ষ্ট্রীটের নামকরণ হয়েছিল ঝাঁঝরিতলা-কি-রাস্তা। তারও আগে অর্থাৎ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাস্তার নাম ছিল চৌরঙ্গী ট্যাঙ্ক ষ্ট্রীট।

জেনারেল আলেকজাণ্ডার কীড ফিরিঙ্গী পরিবারভুক্ত হলেও, তিনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই একজন বিশিষ্ট সদস্য। এ-অঞ্চলের তৎকালীন বসতবাটীতে তিনি এবং এবং তাঁর পরিবার অতিবাহিত করেন অনেককাল। সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর পরেই কীড-পরিবার এ-অঞ্চলের বসতবাটী ত্যাগ ক'রে হাওড়ার শালিমার অঞ্চলে নতুন বসতবাটী নির্মাণ করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন স্থায়িভাবে। এদিকে কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের পরিত্যক্ত বসতবাটীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালনাধীনেই প্রতিষ্ঠা পায় 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব।'

জেনারেল আলেকজাণ্ডার কীডের উত্তরপুরুষদের মধ্যে কর্নেল রবার্ট কীড এবং তদীয় পুত্র জেমস কীড সত্যই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। রবার্ট কীড লেফটনাণ্ট কর্নেল উপাধি লাভ করেন ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। তিনি তখন শালিমারে বসবাস করলেও, কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের তৎকালীন 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ক্লাবেই অতিবাহিত করতেন। তাঁর সময়েই, অর্থাৎ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম Curfew বা সান্ধ্য আইনের জন্মলাভ ঘটে কলকাতায়। সেদিন এই সান্ধ্য আইন জারী হওয়ার ব্যাপারে কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলও জড়িত ছিল---যদিও এককভাবে দায়ী ছিলেন এক পর্তুগীজ কাপ্তেন। তাঁরই দলবলের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে সেদিন ইংরেজ সরকার দিনের গোধূলি লগ্ন থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত প্রায় মাসাধিককাল ধরে সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখতে বাধ্য হন।

উক্ত পর্তুগীজ কাপ্তেন সেদিন গঙ্গার ঘাটে জাহাজের নোঙর তুলে সেখানেই অবস্থান করছিলেন বেশ কিছুকাল। প্রত্যহ সন্ধ্যা ঘনালেই তিনি তাঁর দলবল নিয়ে নেমে আসতেন জাহাজ থেকে। তারপর অন্ধকারে গা ঢেকে হানা দিতেন বিভিন্ন পল্লীতে। উদ্দেশ্য: রমণী শিকার। তখন বর্তমান কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের তৎকালীন পল্লীতে কিছু ফিরিঙ্গী রমণীর বসবাস ছিল। শোনা যায়: তারা তখন অর্থের বিনিময়ে রূপের পসারিণী। তাই সেই পর্তুগীজ কাপ্তেন তাঁর দলবল নিয়ে এখানেই আসতেন বেশির ভাগ। কাপ্তেন সুপুরুষ। সুতরাং উক্ত রমণীদেরও আকর্ষণ ছিল তাঁর প্রতি। তবে যে-কোন কারণেই হোক, কাপ্তেনের সাঙ্গপাঙ্গদের তারা বরদাস্ত করতো না। কিন্তু বরদাস্ত না করলেও, সাঙ্গপাঙ্গরা ছাড়বার পাত্র নয়। কাপ্তেন কোনো

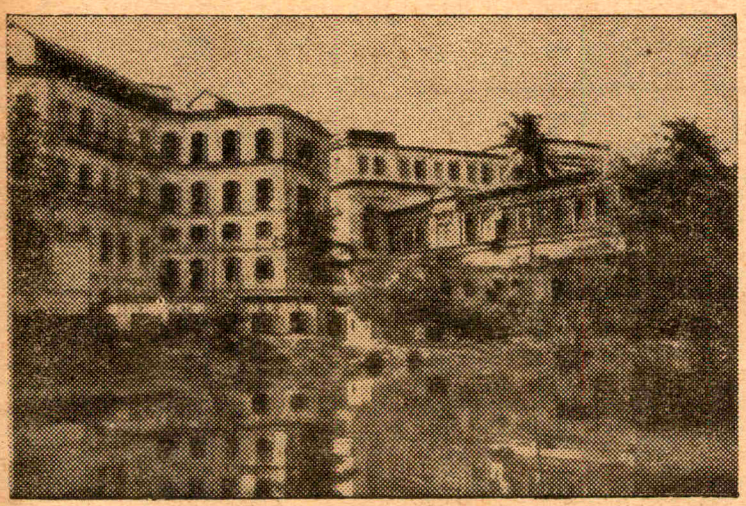

কীড ষ্ট্রীটের পুকুরের ছবি

একজনের ঘরে প্রবেশ ক'রে যারে খিল দিলেই সাঙ্গপাঙ্গরা অন্যান্যদের ঘরে বলপূর্বক প্রবেশ করতো এবং অত্যাচার চালাতো নির্মমভাবে। তাদের এই অত্যাচার বা বলাৎকারের ফলে প্রতিরাত্রে নিয়মিতই হাহাকার জাগতো পল্লীতে। তাই পল্লীবাসীরা বাধ্য হয়েই একদিন প্রতিরাত্রের এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান কামনা ক'রে কর্নেল রবার্ট কীডের মারফৎ এক আবেদনপত্র পেশ করেন ইংরেজ সরকারের কাছে। সরকার অনায়াসেই উক্ত কাপ্তেন এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বন্দী ক'রে শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু সরকার তা করেন নি। হয়তো পর্তুগীজদের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিত্রতার বন্ধন শিথিল বা ছিন্ন হতে পারে ভেবেই কোম্পানী উক্ত কাপ্তেনের বিরুদ্ধে সেদিন কোনো চরম বিধান প্রয়োগ করা থেকে বিরত ছিলেন। তবে উক্ত অবাঞ্ছিত ঘটনার ধারাবাহিক উদ্ভব প্রতিরোধ করার জন্যে কর্নেল রবার্ট কীডের পরামর্শ অনুসারে কোম্পানী বা সরকার সেদিন সান্ধ্য আইন জারী করেন কলকাতার সর্বত্র। কারণ কাপ্তেন তাঁর দলবল সহ মাঝে মাঝে কলকাতার অন্যান্য পল্লীতেও হানা দিতেন।

এই সান্ধ্য আইন জারী হওয়ার ফলেই উক্ত কাপ্তেনের পক্ষে সন্ধ্যার পর জাহাজ থেকে নেমে আসা আর সম্ভব হতো না। তাই নারীমাংসের কদর্য ক্ষুধা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে উঠলেও, তা সে দমন করতে বাধ্য হয়েছিল উপায় ছিল না ব'লে। কিন্তু কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের সেই ফিরিঙ্গী রমণীদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন মেলা-মেশার ফলেই গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিল কাপ্তেনকে, এই সান্ধ্য আইন মৃত্যুতুল্যই প্রতীয়মান হয় তাদের কাছে। মাত্র সপ্তাহখানেক কাপ্তেনের অদর্শনেই প্রায় উন্মাদিনীর পর্যায়ে নেমে আসে যে দু'জন নারী, তারা একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মুসলিম রমণীদের কালো বোরখায় আপাদ-মস্তক ঢেকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। তারপর বৃক্ষ-সমাকীর্ণ ময়দানের পথ ধরে নিঃশব্দে রওয়ানা হয় জাহাজের উদ্দেশে। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ময়দান অতিক্রম করার আগেই—তারা উভয়ে একসঙ্গেই চ'লে পড়ে টহলদারী সান্ত্রীর গুলীর আঘাতে।

সেদিন এই কামাতুরা নারী-যুগলের রক্তেই অবগাহন ক'রে কলকাতার প্রথম সান্ধ্য আইন বা Curfew তার নির্মম পরিচিতি পেশ করে জনসমাজে।

কর্নেল রবার্ট কীড কলকাতার সেই প্রথম সান্ধ্য আইনের প্রয়োগ-কর্তাদের অন্যতম ছিলেন বলেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নন। তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়েছেন অন্য অনেক কারণে। তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ শিবপুরের 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' প্রতিষ্ঠা। তিনি বাংলা সরকারের মিলিটারী-সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং তখনই তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যার জন ম্যাকফার্সনের অনুমতি নিয়ে এই রমণীয় উদ্ভিদ-উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করেন শিবপুরে। অবশ্য এই উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ নির্মাণের উপযোগী কাঠ বা Teak-wood উৎপাদন। কিন্তু পরে উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা কার্যের তীর্থ বা তপোবনরূপেই তার সার্থক রূপায়ণ ঘটে এ-দেশে।

কর্নেল রবার্ট কীডের পুত্র জেমস কীডও একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। এ-দেশের জাহাজ নির্মাণের কারখানায় তিনিই ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ। খিদিরপুরের জাহাজ মেরামতের কারখানাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাই তাঁর নামেই পরে খিদিরপুর বা খিজরপুরের নামকরণ হয় 'কীডারপুর'। সর্বসমেত পঁচিশখানি জাহাজ নির্মাণ করেন জেমস কীড। তন্মধ্যে হেষ্টিংস নামাঙ্কিত ম্যান অব ওয়ার বা যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করে তিনি বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দেন। এই জাহাজ ওজনে ছিল ১৭৩২ টন এবং তার চারদিকে সংযুক্ত ছিল চুয়াত্তরটি কামান।

কেউ কেউ মনে করেন : জেমস কীডের পিতা কর্নেল রবার্ট কীডেরই নামাঙ্কিত রাস্তা কীড ষ্ট্রীট। কিন্তু নির্ভরযোগ্য একাধিক প্রাচীন গ্রন্থে প্রমাণ রয়েছে : বর্তমান কীড ষ্ট্রীট রবার্ট কীড এবং জেমস কীডের পূর্ব-পুরুষ জেনারেল আলেকজাণ্ডার কীডেরই অভিজ্ঞানস্বরূপ। এই সূত্রে ইতিহাস লেখিকা শ্রীমতী ব্রিচেনডেন-এর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

—the then new road, Kyd Street named after general Alexander Kyd, who built and lived in the house which been for so many yeats the United Service Club.

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কাউন্সিল সদস্য মিঃ শ্লিক কর্তৃক গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের পরিবর্তন সুরু হয়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বেই পশ্চিমদিকে যেমন অরণ্যের অপসারণ ঘটে, তেমনই পূর্বদিকেও উচ্ছেদ ঘটে বাঁশবনের। সঙ্গে সঙ্গে কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলের তৎকালীন বস্তিও স'রে যায় দূর থেকে আরও দূরে। ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায় নবীন বসতি। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে সমগ্র কীড ষ্ট্রীট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে-পরিবেশগত কান্তি, তা বিশেষভাবেই নিলিপ্ত, বিনম্র এবং নিরুপম তরুলতার সমাহারে বিলম্বিত ছন্দের মতোই গভীর। পুকুরের পাশ ঘেঁষেই বিন্যাস ঘটেছে রাস্তার, সুদৃশ্য বসতির। পুকুরের অপর পারেই আর্ট কলেজ, যাদুঘর এবং জিওলজিক্যাল গার্ডেন অব ইণ্ডিয়ার অবিচল দৃশ্য। সব মিলিয়ে কীড ষ্ট্রীট অঞ্চল আজ সত্যই সম্পূর্ণ। সীমিত বলেই যে আপন সত্তায় আপনিই অক্ষরস্ত।

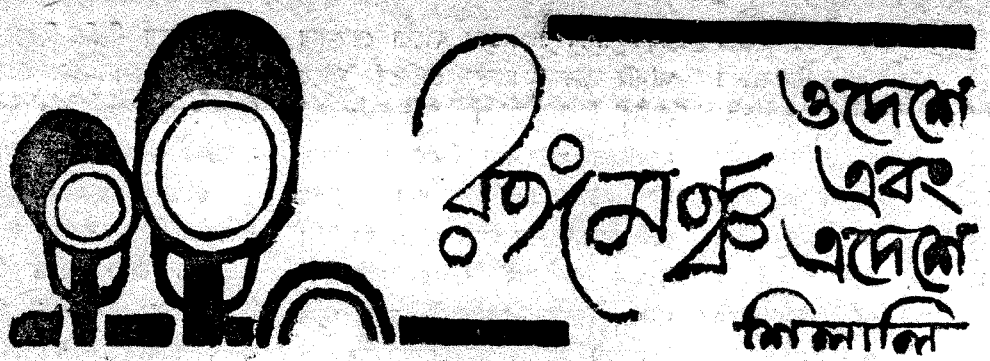


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

## সঙ্গীত সাম্মলনা

অভিনয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নৃত্য এবং সঙ্গীত। অনেক সময়ে নাটকে কণ্ঠসঙ্গীত না থাকলেও পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য সহায়ক হিসাবে আবশ্যক হয় যন্ত্রসঙ্গীতের। দৃশ্যবন 'মুড' সৃষ্টি করতে হলে সঙ্গীত একেবারে অপরিহার্য। আর থিয়েটারের হাঁটাচলা যে ছন্দবিহীন হতে পারে না, একথা তো সবাই জানে। অভিনয়-কালীন মুভমেণ্ট যদি rhythmic না হয়, তবে সে অভিনয় সত্যিকার শিল্পের স্তরে উঠতে পারে না কখনোই। পাশ্চাত্যে একদিকে যেমন থিয়েটারের কদর, তেমনি আবার ব্যালে বা অপেরার পপুলারিটিও কম নয়।

পাশ্চাত্যের ধারায় কিন্তু নিজস্ব স্বকীয়ত বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথও কিছু নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য রচনা করেছেন। এগুলি নানা সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং মঞ্চরূপ দেখে দর্শকরা সত্যিকার আনন্দ পেয়েছেন। তবে গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যে অংশ নিতে গেলে, তার পেছনে বহুদিনের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয়। অভিনয়-শিক্ষার ব্যাপারে—কি পেশাদারী, কি অপেশাদারী সংস্থায় সাধারণত পরিচালকই শিক্ষা-দানের দায়িত্বটা নিজের ওপরই রাখেন। অবশ্য ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের দেশেও আজ অভিনয় শিক্ষা দেবার দু'একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—যেমন দিল্লীর সঙ্গীতকলা আকাডেমীর স্কলাটি, কলকাতার সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য আকাডেমী বা দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার নাট্যবিদ্যালয়। তবে এখনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিনয় শিক্ষার্থীরা মনে করেন, থিয়েটার করা শিখতে হয় না—কয়েকবার ষ্টেজে নামতে পারলেই অভিনয় করবার কৌশলটা আয়ত্তে এসে পড়ে।

সঙ্গীত বা নৃত্যের বেলায় অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীরা এ ধরণের দুঃসাহস দেখাতে যান না কখনও। রীতিমত বহুদিন যাবৎ ওসব বিষয়ে বিদ্যালয়ে বা সদ্‌গুরুর নির্দেশে চর্চা করে তবেই আসরে নামেন।

'বাংলায় সঙ্গীত-শিক্ষা প্রচার' বিষয়ক একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য আকাডেমীর সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগের সর্বাধিনায়ক সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

'জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত প্রচার এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত প্রবর্তন কার্যে ভারতের মধ্যে বাঙ্গলা দেশই অগ্রণী। ললিতকলার অনুশীলন ও উন্নতি বিধানে বাঙ্গলার নাম চিরস্মরণীয়।

একথা অনেকেরই বিদিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায় সঙ্গীতকে ভগবৎ উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ না করলে এবং তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত প্রবর্তন না করলে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠধারা ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি হয়ত বিলুপ্ত হত। সঙ্গীতের উদ্ধার ও প্রচাররূপে, বাঙ্গলা ও বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজের দান চিরস্মরণীয়। কিছুদিন পূর্বেও বাঙ্গলার বাহিরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের কোন কোন সভাপতি তাঁদের ভাষণে একথা স্বীকার করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যমেই যে কোন শিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণ হওয়া সম্ভব। মুষ্টিমেয় ওস্তাদ সম্প্রদায় বা সঙ্গীত অনুরাগীদের দ্বারা একাজ সম্ভব নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেতভাবে শিক্ষালাভ করার একটা মূল্য আছে, সংঘবদ্ধভাবে আলোচনা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাব জাগে, গঠনমূলক কাজের স্পৃহা জন্মে এবং সমাজ ও দেশের কাজে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার শক্তি জন্মে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের রাজা মান কর্তৃক। তানসেনও সে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন।

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সঙ্গীত ও অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন বহু গুণী-জ্ঞানী সঙ্গীত সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

( ক্রমশ: )

সেদিনের ইতিহাস আজও মুছে যায় নি, যেদিন বাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জন্যই ইতিহাসের আদিম অন্ধকার ঘেঁটে ভারতবর্ষের সেই কিংবদন্তীর দণ্ডক অরণ্যে আবার বাস্তব জীবনের পরিপূর্ণ আলোকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। সে ইতিহাস আজো ভোলবার নয়।

কিন্তু সেই দণ্ডক পরিকল্পনা, সেই দণ্ডকারণ্যের জন্মের সুরু থেকেই বার বার কুচক্রীদের অঙ্গুলি হেলনে—পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল জনজীবনের ছায়া-উপচ্ছায়া অবহেলিত হয়েছে। আজ দণ্ডকারণ্যের প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশী সেই মুহূর্তে আবার সেই কুচক্রীদের স্বরূপ প্রকাশ্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তাতে শঙ্কার বিশেষ কারণ দেখা দিয়েছে। একদিন দণ্ডকারণ্যের ডাক—পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের স্বতঃ উৎসাহিত করতে পারে নি—কিন্তু সেদিন যখন লোকপ্রিয়, জনসেবী ও প্রভাবশালী অফিসার শ্রীসুকুমার সেন দণ্ডক পরিকল্পনার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন, তখন এই দক্ষ বাঙালী পুরুষের অসাধারণ প্রযত্নে সেই দণ্ডকারণ্যে বাঙালী ছিন্নমূল মানুষদের নব-বসতি গড়ে ওঠে। আজ যখন দণ্ডকারণ্য বাঙালীর কাছে নতুন উৎসাহ, নতুন জীবন পথের ইঙ্গিত—ঠিক সেই সময় দণ্ডকারণ্যকে বাঙালী ছিন্নমূল মানুষদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার এক অশুভ চক্রান্ত সুরু হয়েছে—যে চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে শ্রীফ্রেচার দণ্ডকারণ্য ছাড়তে বাধ্য হয়ে ছিলেন, যে পাপচক্রে পড়ে সুকুমার সেনের মতো দক্ষ প্রশাসক পর্যন্ত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, আজ সেই চক্র সেই খান্না-ডেমকিনেণ-জনসন চক্র আবার দণ্ডকের আদিম অন্ধকারে হিংস্র থাবা মেলে ধরছেন, তা যে দণ্ডকারণ্যের প্রশাসন ক্ষেত্রে এক অনিবার্য সংঘাত বাধিয়ে তুলবে বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ আবার

# ভারত দর্শন

শ্রীনেহরুর সাথে আলোচনারত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লী কুয়ান ইউ।

সেই চক্র দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্তের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রশাসককে যে কোণঠাসা করতে চাইছে, তা ইদানীংকালের কয়েকটি ঘটনায় বিশেষভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বর্তমান এই সংঘাত-এর আসল কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য রায়পুরের মানা ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা নিয়ে। সম্প্রতি বাংলার সীমান্ত থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের সরাসরি পুনর্বাসন

মেহেরচাঁদ খান্না

কেন্দ্রে না পাঠিয়ে এই ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে দণ্ডক পরিকল্পনার চীফ এডমিনিস্ট্রেটর শ্রীজনসনের আদেশে। শ্রীগুপ্ত এই ব্যবস্থার সঙ্গে এক মত নন। কেন না তিনি জানেন, মানায় গ্রীষ্মকালে যে তাপমাত্রা উঠবে তাতে বঙ্গালী জীবন সেখানে নিশ্চিত অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তা ছাড়া যেভাবে ট্রানজিট ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে তা যে বস্তীর নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীগুপ্ত ও খান্না-জনসনের মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না দণ্ডকারণ্যে কোন স্বাধীনতা উদ্বাস্তুদরদী অফিসারকে কাজ করতে দিতে চান না—ফ্রেচারকে দেন নি, সুকুমার সেনকে দেন নি এবং বর্তমানে শৈবাল গুপ্তকেও দিচ্ছেন না।

কিন্তু খান্না-কিং ণ-জনসন চক্রের অভিশাপ থেকে দণ্ডকারণ্যকে মুক্ত করতেই হবে। কেন না দণ্ডকারণ্যের মৃত্তিকায়ই পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের নতুন জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের বহুতর সম্ভাবনাটি লুকিয়ে আছে। দণ্ডকারণ্য বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যই রচিত হয়েছে, একথা বহুবার ঘোষণা করা হয়েছে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে। এবং সেই

উদ্যোগ নিয়েই ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের প্রস্তাব নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। আজ সেখানে ছয় হাজারের কম পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। বাঙালী উদ্বাস্তুদের নাম করে যে মাটিতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে সেখানের এই অবাঞ্ছিত প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে অবিলম্বে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেও শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এই প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেভাবে ব্যর্থতার নজীর উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর হাতে এই উন্নয়ন সংস্থার যে কোন ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে না, তা তাঁর কার্যকলাপে প্রমাণিত হয়েছে। অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের জন্য ছোট বড় মাঝারি ধরণের উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। আজ যা কিছু শিল্পোদ্যোগ দেখা যাচ্ছে সেখানে তা সেদিনের চেয়ারম্যান সুকুমার সেনের কর্মপ্রেরণায়ই সম্ভব হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীখান্নার বিরুদ্ধে বাঙালী উদ্বাস্তুদের ক্ষোভ বহুদিনের। তাই দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থাকে আজ শ্রীখান্নার হাত থেকে সরিয়ে এনে পৃথক একজন পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে দণ্ডকারণ্যকে নতুনভাবে রচনার ভার দিলে আশা করা যায়, বর্তমান প্রশাসনিক ঝড়ের কালো মেঘ অপসারিত হবে।

* * *

কাশ্মীরে যেভাবে ঘন ঘন বিমান দুর্ঘটনা ঘটছে এবং যেভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় অফিসারগণ প্রাণ হারাচ্ছেন, তাতে অনেকেই সন্দেহ করেন যে, এগুলি একেবারে সাধারণ বা দৈব দুর্ঘটনা নয়। এগুলির পেছনে কোনপ্রকার অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র আছে। এ সন্দেহ যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের লোকসভার বিবৃতি। তিনি বলেছেন যে, কয়েকটি ভারতীয় বিমান নিকটস্থ কোন 'ভূতুড়ে' বেতার কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত ভুল পথে যাওয়ার নির্দেশ পাচ্ছে। ঐ সব বিমান ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিখোঁজ ইলুসিন-১৪ বিমানের জন্য কাশ্মীরে ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্য চালাচ্ছে। ঐ ভূতুড়ে কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তা প্রকাশ না করলেও এ কথা জানা গেছে যে, এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ পাঠান হয়েছে। সুতরাং ঐ বেতার কেন্দ্র যে পাকিস্তানে কিংবা পাক-অধিকৃত 'আজাদ কাশ্মীর' এলাকায় অবস্থিত, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। এর ফলে অনেকেই অনুমান করছেন যে, নিখোঁজ বিমানটি পাকিস্তানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

লোকসভায় প্রকাশিত সংবাদের পর এমন সন্দেহ গভীর হওয়া স্বাভাবিক যে, পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে পর পর যে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, তার মূলে পাকিস্তানের কোন গুপ্তচরচক্রের সুপরিকল্পিত কার্যকলাপ রয়েছে। ভূতুড়ে বেতার কেন্দ্র তারই অন্যতম বাহন মাত্র।

* * *

গত সপ্তাহে রাজধানীতে বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লী কুয়ান ইউ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি নতুন দিল্লীতে এসে পৌঁছেন এবং সেইদিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সাথে সাক্ষাৎ করে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

## গুজরাট :

**আমেদাবাদ :** আমরেলি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়কে উপলক্ষ করে এখানে জোর আলোচনা সুরু হয়েছে। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস যদিও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু পর্যবেক্ষক মহল একে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহতার জয় বলে মনে করছে। রাজকোটের লোকসভা আসনের জন্য নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর মুহূর্তে পুনর্বার এই পরাজয় কংগ্রেসের পক্ষে নিদারুণ আঘাত। অথচ কৌতুকের বিষয় এই যে, কংগ্রেসের একাংশ এই পরাজয়ে বেশ খুশি হয়েছে। ডাঃ জীবরাজ মেহতাকে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হয়েছে তাতে কংগ্রেসের অনেকে মনে করছেন—এই পরাজয় তারই এক উপযুক্ত জবাব।

● ডাঃ জীবরাজ মেহতা

সুতরাং বলা চলে, কংগ্রেসকর্মীদের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই পরাজয়ের কারণ।

আমরেলি নির্বাচনের ফলাফল স্বতন্ত্র দলের জন্যও এক চরম আঘাত। রাজকোটে স্বতন্ত্র পার্টির নেতা মিনু মাসানী জয়লাভ করায় স্বতন্ত্র দল মনে করেছিল, এবার তাদের জয়লাভের পালা। আমরেলিতে তারা এক ঢিলে কংগ্রেস ও পি-এস পি দুই পাখিকে বধ করবে। কিন্তু ভোটাররা এই দিবাস্বপ্নের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। তারা স্বতন্ত্র দলকে যে চায় না, একথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ১৮১৬ ভোট, ফলে তাঁর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অথচ

স্বতন্ত্র দল এই নির্বাচনে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। নির্বাচনে তাদের প্রধান অভিযান ছিল গঠনতন্ত্রের সপ্তদশ সংশোধনীর বিরুদ্ধে। যারা ভারতের স্বতন্ত্র চাঁই। সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন, নির্বাচনী প্রচারের জন্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক এন জি রঙ্গ, মাসানী, বরোদার মহারাজার পিতৃব্য প্রিন্স খাদারো, যশদান-এর রাজকুমার, শিবরাম কুমার, গুজরাটের স্বতন্ত্র দলের চেয়ারম্যান লালভাই প্যাটেল। কংগ্রেসের মত স্বতন্ত্র দলও মনে করেছিল, স্বতন্ত্র দলের ভোটেই তারা জিতবে। বাস্তবিকপক্ষে গ্রামাঞ্চলের কিছু পরিমাণ ভোট তারা টেনেছিল এবং এটাও কংগ্রেসের পরাজয়ের একটা কারণ।

বিজয়ী পি-এস-পি দল এই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ডাঃ জীবরাজ মেহতার ব্যাপারটি ব্যবহার করেছে এবং কংগ্রেসের নেতাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়েছে। লক্ষণীয় যে, পি-এস-পি প্রার্থী শ্রীনর্বেশঙ্কর পানেরি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীগোন্দিয়া অপেক্ষা মাত্র ৮২৮ ভোট বেশী পেয়ে জয়লাভ করেছেন।

কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীগোন্দিয়া একজন সর্বোদয় কর্মী এবং সমাজসেবক-রূপে পরিচিত। তাঁর জনপরিচিতিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি নির্বাচনের সময় জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছিলেন। কারণ শ্রীমোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে ডাঃ জীবরাজ মেহতার বিরোধী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি ডাঃ মেহতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাবার জন্য আবেদন করেছিলেন। এসবের জন্য ভোটাররা বিরক্ত হয়েছিল। ডাঃ জীবরাজ মেহতাকে যেভাবে মন্ত্রিত্ব থেকে সরানো হয়েছে, ভোটাররা এবার তারই প্রতিবাদ জানিয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ জীবরাজকে পদত্যাগে বাধ্য করার বিরুদ্ধে জনসাধারণ হরতাল ও জনসভা করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রতিবাদ করেছিল। এই নির্বাচনে সেই জনসাধারণ দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করে কংগ্রেস নেতাদের দলাদলির জবাব দিল।

শ্রীমিনু মাসানী

* * *

এবার গুজরাটের বাজেট অধিবেশনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবলবন্ত রাও মেহতা বিধানসভার নেতৃত্বের দায়িত্ব সমর্পণ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীহীতেন্দ্র দেশাই-এর ওপর। যদিও এই নেতৃত্ব পরিবর্তন পার্টিগতভাবেই হয়েছে, কিন্তু বিধানসভায় তার কিছুটা প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

শ্রীবলবন্ত রাও মেহতা

পি-এস-পি সদস্য প্রতাপ সিং প্রশ্ন তুলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী এভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে পারেন কি না। স্পীকার শ্রী ফতে আলি পালেওয়ালা মাদ্রাজ বিধানসভায় অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করে প্রশ্ন বাতিল করে দেন। কিন্তু শহরের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা—'এ বোধ হয় বিদায়ের পূর্ব সংকেত।' এবং তাঁরা মনে করেন শ্রীমোরারজী দেশাই চান যে, তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতেই পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে। কিছুকাল পূর্বে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শ্রীহীতেন্দ্র দেশাই-এর নাম শোনা গিয়েছিল। ধীরে হলেও, শ্রীহীতেন্দ্র দেশাই গুজরাটের 'শক্ত মানুষ' হিসাবে প্রকাশ হচ্ছেন।

* * *

সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে ধূমায়িত হয়ে উঠছে। প্রদেশ কংগ্রেসও এই অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, জুনাগড়, সুরেন্দ্রনগর, আমরেলি প্রদেশ কংগ্রেসের বিরোধী জেলা। এই জেলাগুলির আনুগত্য শ্রীরতুভাই আদানী, শ্রীরসিকলাল পারিখ এবং ডাঃ জীবরাজের প্রতি। এযাবৎকাল রাজকোট জেলা কংগ্রেস কমিটী কোন পক্ষেই ছিল না, কিন্তু বর্তমানে এখানেও দুটি ভাগ হয়ে গেছে। রাজকোটের একদল কংগ্রেসকর্মী প্রদেশ কংগ্রেসের 'অহেতুক হস্তক্ষেপ'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং শ্রীচিমনলাল শা র নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের বিরোধীরূপে নিজেদের ঘোষণা করেছে। তার কারণ রাজকোট জেলা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রভাতগিরি গোসাইকে প্রদেশ কংগ্রেস পার্টির অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছে। এরূপ জনরব যে, যশদানের কুমার শিবরামকে খুশি করার জন্য শ্রীগোসাইকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। যশদানের কুমার নাকি কংগ্রেস নেতাদের বলেছেন, তিনি তাঁদের বেশী ভোগাবেন না, যদি

শ্রীগোসাইকে যশদান শরের বাইরে রাখা হয়। এই বিষয়ে মীমাংসার জন্য শ্রীমোরারজী দেশাইএর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। এখন শোনা যাচ্ছে কংগ্রেসকর্মীদের মতভেদ মীমাংসা করার জন্য শ্রী ইউ

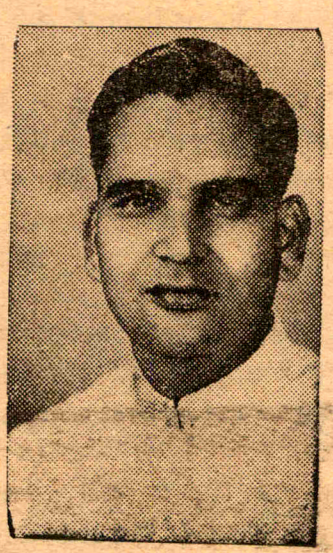

● শ্রীমানুভাই শাহ

এন চেবর রাজকোটে আসছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহের ওপর রাজকোটের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ করার চেষ্টাও চলছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে রাজকোট জেলায় শ্রীমাসানীর বিরুদ্ধে শ্রীমানুভাইকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করানোর ব্যাপারে পথ প্রস্তুত রাখার জন্য এটা এক অগ্রিম ব্যবস্থা।

**মাদ্রাজ ঃ**

মাদ্রাজের পৌরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা ও ডি-এম-কের সাফল্য রাজনৈতিক মহলে দারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিচার করলে, বাস্তবিকই ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ আছে। এই ব্যাপার নিয়ে চারদিকে তুমুল আলোচনা হচ্ছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য নানা প্রস্তাব উঠছে। প্রদেশ কংগ্রেসের জনৈক প্রতিনিধি এই নির্বাচনের ফলাফলকে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের কারণ বলে মত ব্যক্ত করেও বলেন, কিন্তু ডি-এম-কের এই জয়লাভের জন্য কংগ্রেসকে আসন হারাতে হয় নি। স্বতন্ত্র এবং দু'একজন কমিউনিষ্ট আসনের পরিবর্তে তারা আসন লাভ করেছে। এমন কি কংগ্রেস ও কয়েকজন স্বতন্ত্রকে হারিয়ে আসন লাভ করেছে। মাদ্রাজের পৌরসভা নির্বাচনের একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, স্বতন্ত্র প্রতিনিধিদের বিলোপ সাধন এবং পৌরসভা পরিষদ পরিষ্কারভাবে আদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত হয়ে গেল।

এই পৌর নির্বাচনে ডি-এম-কে মুসলিম লীগের সাথে সমঝওতা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ডি-এম-কে লাভ করেছে ৪৯টি আসন, মুসলিম লীগ ৫টি, ডি-এম-কে সমর্থিত স্বতন্ত্র ২টি। সুতরাং একশতটি আসনের মধ্যে ডি-এম-কের পক্ষে লাভ হলো ৫৬টি। অপরপক্ষে কংগ্রেস ৪০টি লাভ করেছে। গতবারের তুলনায় কংগ্রেস তিনটি আসন বেশী পেয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেস সমর্থিত স্বতন্ত্র একটি করে আসন লাভ করেছে। সমাজতন্ত্রী শিবিরের বিরোধী শক্তি হিসাবে মুসলিম লীগের পুনরভ্যুত্থান একটি লক্ষণীয় ঘটনা। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পর দেশে বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও জাতীয় ভাবধারা পরিপুষ্টির পরও মুসলিম সম্প্রদায় আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

নির্বাচনে ডি-এম-কে এবং মুসলিম লীগের পক্ষে রাজাজীর ভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি কংগ্রেসের বিপর্যয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনের পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, ডি-এম-কের পরাজয় হলে সেটা তাঁরই পরাজয় বলে তিনি মনে করবেন। ডি-এম-কে রাজাজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছে, রাজাজীর প্রভাবাধীন ব্রাহ্মণ ভোটদাতারা যদি সক্রিয় না হতেন, তবে তাঁদের এত সহজে জয়লাভ হত না। রাজাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আবেদন করেছিলেন যে, শ্রীকামরাজ নেতৃত্বকে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে পরাজিত করা ব্রাহ্মণদের 'ধর্মীয় কর্তব্য'। অপরদিকে এই 'ধর্মযুদ্ধে' রাজাজীর দোসর হয়েছিলেন মহম্মদ ইসমাইল। সুতরাং ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম সম্প্রদায় এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ডি-এম-কে'কে সমর্থন করে।

তবে এই নির্বাচনের আর একটি দিকও আছে। রাজাজীর নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও, ভোটদাতারা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সমর্থন করে নি। একথা ভোটের সংখ্যা থেকে জানা যায়। ১৯৫৯ সালে ডি-এম-কে মোট ভোট পেয়েছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার, এবার পেয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার। কংগ্রেস ১৯৫৯ সালে পেয়েছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার, এবার পেয়েছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার, অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার ভোট বেশী। পার্সেণ্টেজ ভাগ করলে মোট ভোটের ডি-এম-কে পেয়েছে ৩৯ ৩ ভাগ, আর কংগ্রেস পেয়েছে ৩৮ ৩ ভাগ। ডি-এম-কে কংগ্রেস থেকে মাত্র ১৫ পার্সেণ্ট বেশী পেয়েছে। এবং একথাও অনস্বীকার্য, ডি-এম-কের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পেছনে রয়েছে স্বতন্ত্র পার্টি এবং মুসলিম লীগের সমর্থন আর এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন রাজাজীর মত ঝানু কূটনীতিজ্ঞ।

কংগ্রেসের আসন লাভের ব্যাপারে কমিউনিষ্টদের সমর্থনের মূল্যও কম নয়। তিরুচী এবং তাঞ্জোরে কমিউনিষ্টদের প্রভাব ছিল। সেখানে ডি-এম-কে'কে পরাজিত করার জন্য

কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্ট গঠন করেছিল। ফলে ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট ফ্রন্ট ৩২টি আসন পেয়েছে। কিন্তু কোয়েম্বাটুর এবং মাদুরাইতে এই ঐক্য কার্যকরী হয় নি। সেখানে দু' পক্ষই ঐক্যের ওপর তেমন গুরুত্ব দিতে পারে নি। মাদ্রাজের পৌর নির্বাচন রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, এই নির্বাচন---আগামী সাধারণ নির্বাচনের 'ড্রেস রিহার্সাল'। প্রতিক্রিয়াশীল-সাম্প্রদায়িক শক্তি বেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগামী নির্বাচনে যদি কংগ্রেস এবং গণ-তান্ত্রিক শক্তিকে জয়লাভ করতে হয়, তবে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাজিত করেই সেই জয়লাভ সম্ভব। মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্মীরা এই নির্বাচনের শিক্ষায় বুঝতে পেরেছেন যে, কেবলমাত্র প্রচার ও বক্তৃতার জোরে ডি-এম-কের মত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে কোণঠাসা করা যাবে না। তার জন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গঠন প্রয়োজন।

## মধ্যপ্রদেশ ঃ

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে শ্রী ভি ভি দ্রাবিড়ের বিদায় গ্রহণ একটি যুগের অবসানরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। শ্রীদ্রাবিড় একজন আদর্শবাদী মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনিই রাজ্যের শ্রম দপ্তরকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাকে পরিচালিত করেছেন। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে তিনি এমন বহু আইন প্রবর্তন করেছিলেন, যার জন্য প্রগতির দিক থেকে মধ্যপ্রদেশের মর্যাদা বেড়েছে। এই ব্যাপারে অসংগঠিত শ্রমিকদের যোগ্য মর্যাদা দানের জন্য তাঁর সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দৃঢ়তা এবং পরিচালন ক্ষমতা দেখা গেছে চম্বল প্রজেক্টের ব্যাপারে, যেখানে কোনরূপ দুর্নীতি সুযোগ করতে পারে নি। এমন কি তাঁর অতি বড় শত্রুও একথা স্বীকার করেছেন যে, আদর্শের বিরোধ হলেই তিনি আপোষের পরিবর্তে পদত্যাগে ইতস্তত করেন নি। এই মনোভাবের প্রমাণ দেখা গেছে বি-এন-সি মিলসের শ্রম বিরোধের সময়ে। শ্রমিকদের ছাঁটাই করার বিষয়ে তিনি আপত্তি করলে বড় বড় ব্যবসায়ী-মহল ও কোন কোন মন্ত্রীও তাঁর ওপর চাপ দেন। শহরের ব্যবসায়ী তাঁর বিরুদ্ধে বৈরিতা প্রকাশ করেন এবং কৃষি দপ্তরের গুপ্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগপত্র পেশ

● শ্রীকামরাজ নাদার

করলে, তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণের দাবিতে অভিযানে নামেন। শ্রীদ্রাবিড়ের একমাত্র দোষ তিনি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ব্যাপারে এবং তাদের চক্রগত দলাদলিতে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং এর জন্য সমগ্র মধ্যপ্রদেশে শিল্প-বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দোষ সত্ত্বেও তিনি গান্ধীবাদী শ্রমনীতিতে বিশ্বাস করতেন এবং তাকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করতেন। এদিক থেকে মন্ত্রি-সভা এমন এক নকে হারালেন যিনি সত্যই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন।

## বিশ্বের চোখে ভারত

### সিডনি মর্নিং হেরাল্ড (অষ্ট্রেলিয়া)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আক্রমণ ও আক্রমণের আশংকায় জটিল হয়ে উঠেছে এবং অন্ধকারের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, তবু অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খুশি হবার মত অন্তত একটি ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য ঘটনাটি ঘটেছে এক রাষ্ট্রের ওপর অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ হবার ফলেই। ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণের পর থেকে আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনা আক্রমণের ফলে যে সংকট-কালীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দুই দেশের সমস্বার্থের উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে। ভারতের নিরপেক্ষ-তার রাষ্ট্রদর্শন পরিবর্তনে এটা সাহায্য করেছে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরাও এই ঘটনা থেকে বেশী করে বুঝেছে, ইউরোপ নয়, তাদের নিজেদের এলাকার সমস্যার প্রতিই তাদের বেশী করে- নজর দিতে হবে।

ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাস্তবে রূপ গ্রহণ করেছে। অষ্ট্রেলিয়া ভারতকে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড সামরিক সাহায্য দিয়েছে। ---অষ্ট্রেলিয়ার কাছে এশিয়ায় ভারতের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর কোন দেশ নেই। যদি ভারত চীনা আক্রমণের ফলে পরাজিত হয়, অথবা যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে উন্নয়নের জন্য ভারতের পরীক্ষা চীনের কমিউনিষ্ট পদ্ধতির কাছে হেরে যায়, তবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তাও নষ্ট হবে। সুতরাং, ভারত ও তার সমস্যার প্রতি আমাদের সমস্বার্থবোধ ও ভারতবাসীর প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য স্যার রবার্ট মেঞ্জিসের কি দিল্লী যাবার এই সব চেয়ে প্রকৃষ্ট সময় নয় ?

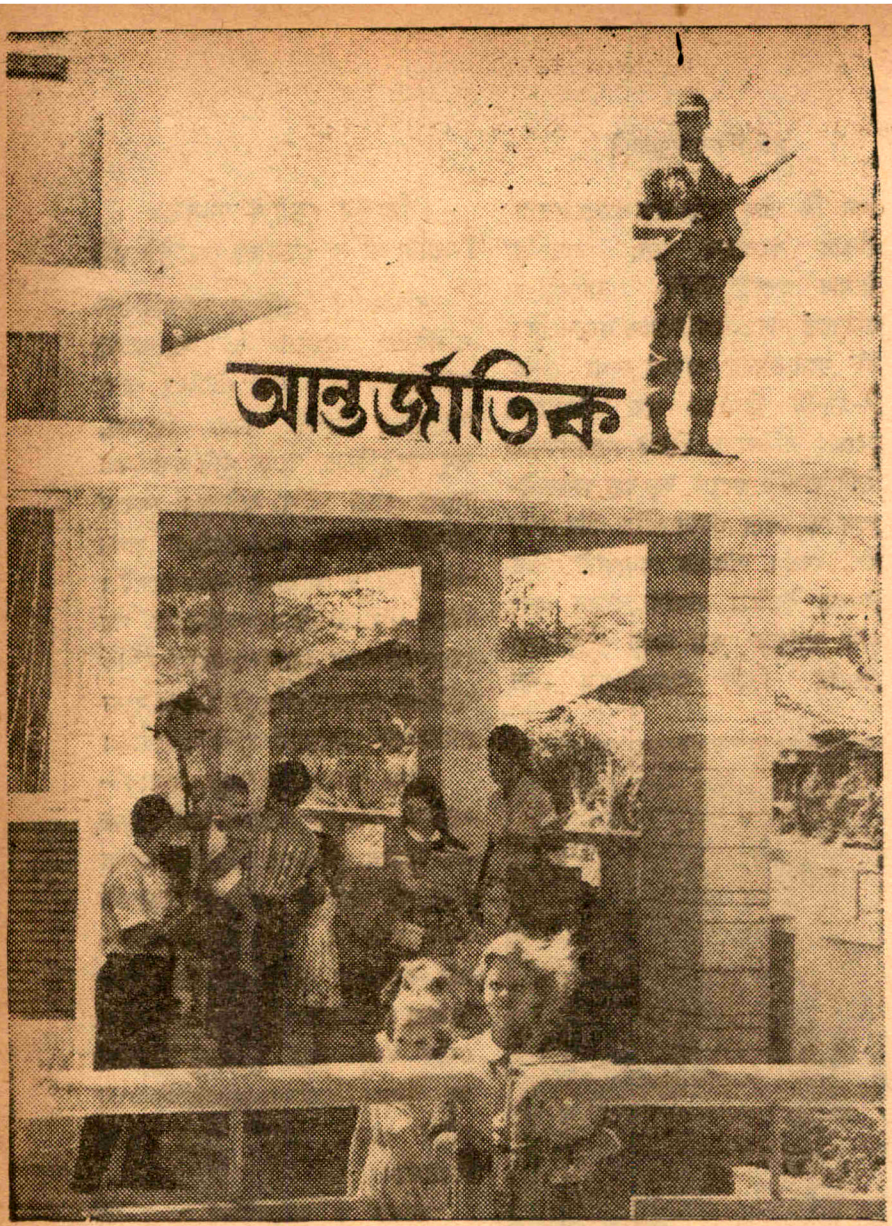


* সায়গনে সামরিক প্রহরাধীন বিদ্যালয়

## দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

সায়গনের ১৫,০০০ মার্কিন সৈন্য ও অসামরিক নর-নারী, শিশু আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সন্ত্রাসবাদী ভিয়েৎ কং মার্কিনীদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ সুরু করেছে।

গত সপ্তাহে যখন সায়গনের 'কিন দো' সিনেমা হলে মার্কিন সৈন্যেরা সিনেমা দেখছিল তখন অতর্কিতে সেখানে সন্ত্রাসবাদীরা বোমা নিক্ষেপ করে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিনেমা হলটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শোনা যায়, কিছুদিন পূর্বে ভিয়েৎ কং জাতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, মার্কিন সৈন্য ও অন্যান্য নাগরিকদের দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে তাড়াতে হবে এবং তার জন্য বেপরোয়া 'হত্যা' সুরু করতে হবে। 'প্রতিদিন দু'জন করে মার্কিনীকে হত্যা করা চাই'---এই নাকি রণধ্বনি। সন্ত্রাসবাদীরা নানা-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষের ফাউণ্টেন পেনে ক্ষুদে পিস্তল এবং মেয়েদের চুলের কাঁটায় হাত-বোমা লুকোনো আছে, এরূপ শোনা যাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে মার্কিন-কর্তৃত্ব মুক্ত করে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ফরাসী প্রস্তাবের পর থেকে ভিয়েৎনামের সৈন্য ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও বেশ কিছুসংখ্যক ফরাসী প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে পড়েছে। এবং মার্কিন-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক শাসকগোষ্ঠীর প্রধান জেনারেল নেগুইন খাঁনের বিরুদ্ধেও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। ভিয়েৎ কং বাহিনী এই সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম সুরু করার এই হল প্রকৃষ্ট সময়।

সামরিক, অসামরিক মার্কিনী মাত্রই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন ছেলেমেয়েদের স্কুলে সামরিক পাহারা বসেছে--- সামরিক পাহারায় বাস যাতায়াত করছে। দূতাবাস, হাসপাতাল সর্বত্র কড়া পাহারা বসেছে। এমন কি, খেলার মাঠেও সশস্ত্র প্রহরাধীনে খেলতে হচ্ছে। মায়েরা প্রকাশ্যেই বলাবলি করছে, 'বাচ্চাদের আমেরিকায় ফেরত পাঠাতে হবে।' মার্কিনীদের এমন অসহায় অবস্থা আর কখনও হয় নি। একথা সকলেই জানে, সৈন্যবলে মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকার পক্ষ কমিউ-নিষ্ট অনুগামী ভিয়েৎ কং থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। তবু ভিয়েৎ কং-এর ভরসা, মার্কিন-বিরোধী অভিযানে জনসাধারণের সমর্থন তারা পাবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যাতে পুরো-পুরি মার্কিন কর্তৃত্বে থাকে তার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ মিনের শাসনের পরিবর্তে খাঁনকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নেগুইন খাঁনের মার্কিন আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় থাকলেও সৈন্যবাহিনী বা জন-সাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাব বিশেষ কিছু নেই। শাসন বজায় রাখার জন্য খান যাঁদের ওপর ভরসা করছেন, তাঁরাও রাজনীতিক্ষেত্রে জনপ্রিয় নন। ভিয়েৎনামীদের মধ্যে যে ব্যাপক অংশ কমিউনিষ্ট বিরোধী, খাঁন তাদেরও আস্থা অর্জন করতে পারছেন না, ভিয়েৎ কং গেরিলা-বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করতে পারছেন না।

এ অবস্থায় কেবল মার্কিন সৈন্যের ওপর ভরসা করে ক'দিন চলবে ?

মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিনীদের ওপর হামলা এবং ভিয়েৎ-কং-এর শক্তিবৃদ্ধিতে বিচলিত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ

* মিঃ হেনরি ক্যাবট লজ

মার্কিন সামরিক প্রস্তুতি বৃদ্ধির পরিকল্পনা দিয়েছেন—আগামী পাঁচ থেকে সাত বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সকল বিদ্রোহ নির্মূল করতে হবে। পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্কও ঘোষণা করেছেন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কিছুতেই নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত হতে দেওয়া হবে না।

একদিকে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি বাড়বে, অপরদিকে ভিয়েৎ কং-ও মরণপণ চেষ্টা করবে—দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সংঘর্ষ বেশ ভাল রকমেই বেধে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। হো-চি মিনের (উত্তর) ভিয়েৎনামই কি চুপ করে থাকবে ?

## সাইপ্রাস :

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। নিরাপত্তা পরিষদে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলাই ষ্টিভেনশন ও বৃটেনের প্যাট্রিক ডীন অবিলম্বে সাইপ্রাসে তদারকী ফৌজ প্রেরণের প্রস্তাব করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকোলাই ফেডোরেঙ্কো 'ন্যাটো'র চক্রান্ত থেকে সাইপ্রাসকে বাঁচাবার আবেদন করেছেন এবং গ্রীসের ডিমিট্রি বিটাসিওস সাইপ্রাসের ওপর তুরস্কের সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকার কথা বলেছেন।

এর পর নিরাপত্তা পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশন মুলতুবী রেখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টের ওপর মীমাংসা আলোচনা চালাবার দায়িত্ব দেয়া হয়। ইউ থাণ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি মীমাংসা প্রস্তাবে উপনীত হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ইউ থাণ্টের প্রস্তাব সম্ভবত নিম্নরূপ : (১) ১০,০০০ সৈন্য সম্বলিত একটি আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী সাইপ্রাসে মোতায়েন করা হবে। কানাডা, আয়ারল্যাণ্ড ও সুইডেনের মত দেশ থেকে এই সব সৈন্য সংগ্রহ করা হবে, তবে একজন বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ এই শান্তিবাহিনীর অধিনায়কত্ব করবেন। (২) একটি 'পরামর্শদাতা মণ্ডলী' এই শান্তিবাহিনীর কাজ তদারক করবে—ব্রেজিল, মরক্কো ও নরওয়ে থেকে এর জন্য সদস্য গ্রহণ করা যেতে পারে। (৩) সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে তিন মাসের ভেতর একটা মীমাংসা-সূত্র আবিষ্কারের জন্য একজন নিরপেক্ষ সালিশ নিয়োগ করা হবে।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউ থাণ্টের এই প্রস্তাব সহজেই গ্রহণযোগ্য হলেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সাইপ্রাস এই প্রস্তাব পুরোপুরি মানবে কিনা বলা শক্ত। সোভিয়েট ইউনিয়ন চাইছে, পরামর্শদাতাদের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যকে রাখা হোক। রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়সের মতে, ৭ হাজারের বেশী বাইরের সৈন্য সাইপ্রাসের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তবু আশা হচ্ছে, সকল পক্ষের সম্মতিতে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।

## গ্যাবন :

মাত্র ৪,৫০,০০০ জন মানুষের দেশ, আফ্রিকার অতি ক্ষুদ্র প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ গ্যাবনে ৪২ ঘণ্টার একটি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বহু দেশেই বিপ্লবের পর আবার প্রতি-

* মিঃ ইউ থাণ্ট

বিপ্লব দেখা যায় এবং বিপ্লবের অবসান ঘটে। কিন্তু গ্যাবনের ঘটনায় ফরাসী হস্তক্ষেপ বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে এবং আফ্রিকার রাজনীতিতে ফরাসী নীতির পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

গ্যাবনের ৬২ বৎসর বয়স্ক রাষ্ট্রপতি লিয়ঁ মবার পেছনে জনসমর্থন বিশেষ ছিল না। বিরোধী দলের নেতা জিন-হিনেরী আউবামের সহযোগিতায় তিনি শাসন চালাচ্ছিলেন। কিন্তু গত বৎসর থেকে আউবামের সঙ্গে মবার মতবিরোধ সুরু হয়েছে, এবং মবা আউবামেকে বাদ দিয়ে গ্যাবনে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন।

গ্যাবনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা মাত্র ৪০০। বিদ্রোহের নেতা লে ডানিয়েল মবেনের নেতৃত্বে এই সৈন্যদলের অধিকাংশ মবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মবাকে বন্দী করে সৈন্যদল তাঁর পদত্যাগ আদায় করে এবং আউবামেকে রাষ্ট্রপতিপদে নিয়োগ করে। অতি সামান্য সময়ের মধ্যে একরূপ বিনা প্রতিবাদে বিদ্রোহী সৈন্যদল ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু

পরের দিনই খাস দ্য গলের নির্দেশে ফরাসী প্যারাস্যুট বাহিনীর ৬০০ সৈন্য গ্যাবনের রাজধানী লিবারভিলেতে অবতরণ করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করে পুনরায় মবাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

ফ্রান্স গ্যাবনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল কেন? এর পূর্বে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ টোগো, কঙ্গো (ব্রাজভিলে) ও দাহোমেতে যখন বিদ্রোহ হয়, তখন ত' ফ্রান্স কোন হস্তক্ষেপ করে নি, বরং নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে।

গ্যাবনে বিদ্রোহ দমনে হস্তক্ষেপের কারণ স্বরূপ ফ্রান্স বলছে, ১৯৬০ সালের গ্যাবনের স্বাধীনতাকালীন চুক্তিতে বলা হয়েছিল, গ্যাবনের আইনানুমোদিত সরকার কোন সাহায্য চাইলে ফ্রান্স সে সাহায্য দেবে। সুতরাং আইনানুমোদিত সরকারের প্রধান মবার আহ্বানে ফরাসী সৈন্য গ্যাবনে সাহায্য করতে গেছে। কিন্তু এই অজুহাত কে বিশ্বাস করবে? মবা ত' জেলে, সুতরাং ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাল কে?

আসল কারণ, গ্যাবনে ফরাসী অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য ফ্রান্সকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। খনিজ সম্পদে গ্যাবন খুবই সমৃদ্ধ—ইউরেনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় এখান থেকে। তা'ছাড়া রয়েছে বিরাট বনসম্পদ। প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির মধ্যে গ্যাবনেই বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশী। এই অবস্থায় গ্যাবনের কোন সরকার ফরাসী কর্তৃত্বের বাইরে থাকবে দ্য গল কোন মতেই তা সহ্য করতে পারেন না। জাঞ্জিবারের ঘটনাতেও দ্য গল চিন্তিত। পশ্চিমী বিরোধী মনোভাব সংক্রামক ব্যাধির মত সর্বত্র ছড়াচ্ছে। তাই অজুহাত যাই হোক, বিপ্লব সুরু হতে না হতেই ফরাসী সৈন্য গ্যাবনে এসে হাজির। ফ্রান্স কি ইদানীংকালে অনুসৃত নিরপেক্ষ মনোভাব ত্যাগ করে আফ্রিকার ঘরোয়া রাজনীতিতে বেশী করে হস্তক্ষেপ করবে? গ্যাবনের ঘটনার পর আফ্রিকার নেতারা এই প্রশ্নই করছেন।

## পাকিস্তান:

চৌ-এন-লাই-এর পাকিস্তান সফরকালে প্রকাশিত চৌ-আয়ুব যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের মস্ত বড় কূটনৈতিক জয় হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। চৌ-এন-লাই কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের দাবি স্বীকার

* চৌ এন লাই

করেছেন। তিনি বলেছেন, কাশ্মীরের অধিবাসীদের মতানুসারেই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ গণভোট গ্রহণ করতে হবে। কাশ্মীর সম্পর্কে চীনের নীতির এ এক বিরাট পরিবর্তন। ১৯৫৬ সালে চৌ-এন-লাই স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কাশ্মীর ভারতের। ১৯৬২ সালের ভারত আক্রমণের পরও চীন ভিন্ন সুরে কথা বলে নি। গত বৎসর পিকিং-এ ভুট্টোর সঙ্গে চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশবিশেষ গ্রাসের সময়ও চীন গণভোটের দাবী তোলে নি। এবারও সফরের সুরুতে প্রথম কয়েক দিন চৌ-এন-লাই কাশ্মীরের ব্যাপারে মুখ খোলেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, পাকিস্তানের গণভোটের দাবী চীন সমর্থন করেছে।

চীনের দিক থেকে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার নজীর খুব কমই দেখা যাবে। একজন প্রধানমন্ত্রী কিভাবে পূর্বেকার ঘোষণা বিস্মৃত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য রাখতে পারেন? কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য কাশ্মীরবাসীদের গণভোট গ্রহণ করতে হয়, তবে তিব্বতের ব্যাপারেই বা কেন গণভোট গ্রহণ করা হবে না? তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য ত আরও বেশী। তাইওয়ানের (ফরমোজা) প্রশ্নও তাহলে গণভোটের কথা উঠবে। তাইওয়ানবাসীরা নিশ্চই কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে না।

আসলে এর পেছনে কোন নীতির সমর্থন নেই—আছে নেহাৎ ভারত-বিরোধিতার মনোভাব। ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যে অভিযান, তাতে মস্ত বড় দোসর পাকিস্তান। তাই ভারতকে জব্দ করার জন্য চীন আজ কাশ্মীরের গণভোট প্রস্তাব সমর্থন করেছে। সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ আছে, আটদিনব্যাপী পাকিস্তান সফরকালে চৌ-এন-লাই ভিক্টেটর প্রেসিডেণ্ট আয়ুব ও তাঁর পররাষ্ট্রসচিব ভুট্টোর সঙ্গে ভারত-বিরোধী চক্রান্তের আরও জাল বুনেছেন। ভারতের এই দুই শত্রু নতুন কি আক্রমণ সুরু করে, তা লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ভারত-বিরোধী অভিযানের বিশ্বস্ত মিত্র পাকিস্তানকে খুশি করার জন্য বিশ্বের পয়লা নম্বর বিপ্লবী কমিউনিষ্ট চৌ-এন-লাই অনেক মজার কথা বলেছেন। যেমন, বর্তমান শাসকদের আমলে পাকিস্তান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি করেছে। (হায়, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন! সেখানে

সার্বজনীন ভোটাধিকার নেই, বিনা-বিচারে আটকবন্দীদের মুক্তি নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের আন্দোলনের

* আয়ুব খান

প্রয়োগ নেই।) তারপর চৌ আরও বলছেন, পাকিস্তান 'সিয়াটো', 'সেণ্টো' প্রভৃতিতে যোগ দিয়ে কিছু অন্যায় করে নি। আশ্চর্য, এর পর কি চৌ বলবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিকামী।

চে-এন-লাই পাকিস্তানকে যে এত খাতির করলেন, বিনিময়ে

* ডীন রাস্ক

পাকিস্তান চীনকে কি দিচ্ছে? অবশ্যই অপ্রকাশ্যে আয়ুব চীনকে ভারত আক্রমণে পুরোপুরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি বলেছেন, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। আয়ুবের এই ওপর-পড়া খবরদারি মার্কিন কর্তাদের ভাল লাগে নি। ডীন রাস্ক তো রীতিমতো ধমকের সুরেই বলেছেন, আয়ুবকে এ বিষয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

চৌ-এন-লাই-এর স্বরূপ কারও জানতে বাকি নেই, আয়ুবকেও সকলেই চেনেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের এই অদ্ভুত মিতালী পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী কতদিন সহ্য করবে। একদিকে পশ্চিমী সামরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকা, আবার তাদের প্রধান শত্রু চীনের সঙ্গে দোস্তি করব, এ কি করে সম্ভব?

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক হিউমের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর একটি মূল বিষয়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। বৃটেন কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চায়। কিউবায় বৃটিশ ব্যবসায়ীরা বাস বিক্রি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাতে ভীষণ আপত্তি। তাদের ধারণা, এতে করে বিভেদপন্থী কিউবার শক্তিবৃদ্ধি হবে ও মার্কিন মুলুকে গণতন্ত্রের শক্তি ব্যাহত হবে। তারপর সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে নতুন করে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও চটেছে। লণ্ডনের মিডল্যাণ্ড ও অন্যান্য কয়েকটি ব্যাঙ্ক সোভিয়েট ইউনিয়নকে কয়েক লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। এই অর্থ থেকে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল, জন ব্রাউন, ষ্টোন প্ল্যাট, ফিসনস্ প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বড় বড় ফ্যাক্টরী তৈরির যন্ত্রপাতি কেনা হবে।

কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে এরূপ বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নেই। অথচ এই সেদিনও সোভিয়েটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গম বিক্রি করেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হিউম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসনকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে বাণিজ্য না করলে বৃটেনের চলবে না। বৃটনকে ত' খেয়ে বাঁচতে হবে। এই কারণেই বহু পূর্ব থেকে কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে বৃটেন সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা এ বিষয়ে ঠিক বিপরীত। কমিউ-

* আলেক হিউম

নিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বপ্রকারে অসহযোগিতা করা এবং তাদের বিপদে ফেলাই মার্কিন নীতি। কেনেডি এ ব্যাপারে সোভিয়েট প্রসঙ্গে যে কিছুটা উদার নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন, জনসন বোধ হয় তাও চাইছেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরাও বৃটেনের ওপর চটেছে। বৃটেনের সঙ্গে তারা বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। দেখা যাক, সত্যি সত্যি 'বাণিজ্য বয়কট'-এর মত কিছু মার্কিনীরা করে কি না।

## সিংহল ঃ

চৌ-এন-লাই-এর সিংহল সফর শেষ হয়েছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক আশা

* শ্রীমতী বন্দরনায়ক

করেছিলেন, চৌ-এন-লাইকে তিনি কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি মানাতে সক্ষম হবেন এবং অদূরভবিষ্যতে নেহরু-চৌ বৈঠক সম্ভব হবে। শ্রীমতী বন্দরনায়কের আশা সফল হয় নি বলেই মনে হচ্ছে।

বার্মার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনের দিল্লী সফর এবং চৌ-এর কলম্বো গমনের পূর্বে রেঙ্গুন-কলম্বো কূটনৈতিক তৎপরতা থেকে অনেকের আশা হয়েছিল, চৌ-এন-লাই বুঝি এবার কলম্বো প্রস্তাব মেনে নেবেন, এবং ভারতের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। সিংহল সফরের সুরুতে চীন-সিংহল মৈত্রী সমিতির সভায় চৌ-এর নরম ভাষণ ও সিংহল পার্লামেণ্টে শ্রীমতী বন্দরনায়কের বক্তৃতা থেকেও অনেকের এরূপ ধারণা হয়েছিল। এমন সংবাদও রটেছিল যে, কলম্বো থেকেই চৌ-এন-লাই সোজা দিল্লী আসবেন।

কিন্তু সফর শেষে যুক্ত বিবৃতি থেকে দেখা গেল, কাজের কাজ কিছুই হয় নি। চৌ-এন-লাই সিংহল ও অন্যান্য কলম্বো রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পুরোণো কথাও বলেছেন, কিন্তু কলম্বো প্রস্তাব 'পুরোপুরি মানার' প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন নি। লাডাক থেকে ৭টি চীনা 'চেক পোষ্ট' সরিয়ে নেবার জন্য শ্রীমতী বন্দরনায়ক যে প্রস্তাব করেছিলেন, চৌ-এন-লাই তাতেও রাজি হন নি দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে দিল্লী থেকে প্রচারিত সংবাদে জানা যায়, চীনারা লাডাকে ভারতীয় অঞ্চলে তাদের ঘাঁটিতে পাথর দিয়ে সীমারেখাকে স্পষ্ট করছে।

সুতরাং, সিংহল, বার্মা ও অন্যান্য কলম্বো শক্তির বোঝা উচিত, চীন কিছুতেই তাদের যুক্তি মানবে না এবং ভারতের সঙ্গে কোনরূপ সীমাংসাও করবে না। এখন, সিংহল বা

* জেনারেল নে উইন

আর কেউ কি অন্য কোন চেষ্টার কথা ভাববে?

## জাঞ্জিবার ঃ

লবঙ্গদ্বীপ জাঞ্জিবারে সুলতানের শাসনের অবসান ঘটিয়ে আফ্রো-শিরাজী পার্টি ও উম্মা পার্টির যুগ্ম নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বেশ কিছুদিন পার হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার জাঞ্জিবারের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং স্থির হয়েছে কেনিয়ার ভারতীয় হাইকমিশনার জাঞ্জিবারেও ভারতের কূটনৈতিক দূতরূপে কাজ করবেন।

জাঞ্জিবার আফ্রিকার কিউবা হবে কি না, কিংবা চীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত মহম্মদ বাবুর প্রভাবাধীন নতুন সরকার চৌ-এন-লাইয়ের কথামত চলবে কি না, এ সব সম্পর্কে এখন থেকেই জোর করে কিছু বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক, জাঞ্জিবারের বিপ্লবের পেছনে মূল কারণ কমিউনিজম নয়, জাতীয়তাবাদ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকাবাসীরা অল্পসংখ্যক আরবের কর্তৃত্ব মানতে চায় নি, তাই আফ্রিকীয় জাতীয়বাদের প্রভাবে আরব প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে আফ্রিকীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ঘটনার তাৎপর্য এবং লবঙ্গদ্বীপ জাঞ্জিবারের ভারতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে স্বাভাবিক ভাবেই ভারত সরকার নতুন সরকারকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া বাস্তব অবস্থার দিক থেকেও এই স্বাভাবিক।

আমেরিকা, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিলাণ্ডেও জাঞ্জিবারের নতুন সরকারের স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত করেছে।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# রঙ্গরাগ

## হিন্দী ছবির প্রযোজকদের অনুকরণ স্পৃহা

হিন্দী ছবির জগতে এক একটা হুজুগ আসে। কোন ছবি যদি নূতন রূপে উপস্থিত হয়ে 'হিট' হবার সৌভাগ্য লাভ করে, তারপরে প্রযোজকরা সবাই জোটেন একই ধাঁচের ছবির পেছনে। মধ্যপ্রদেশের দস্যুদের নিয়ে রাজকাপুর 'জিস দেশমে গঙ্গা'---ছবি করে অসাধারণ সাফল্য লাভ করলেন। সেই একই রকমের গল্প নিয়ে পরপর কয়েকটি ছবি তৈরি হলো। শশধর মুখার্জীর 'লাভ ইন সিমলা' সাফল্য লাভ করলো। ব্যস, আর যায় কোথা, সুরু হলো---'আও প্যার কর', 'দেখা প্যার তুমহারা'---ইত্যাদি বহু প্যারের ছবি। প্যার-পর্ব এখনো চলছে। এবার এসেছে ভোজপুরী ছবির পালা। 'গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়রি চড়াইব'---অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। ফলে এবার প্রযোজকদের নজর পড়েছে---ভোজপুরী ছবি করার দিকে। গঙ্গা মাইয়া'র পরে আরো দু'টি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। বোম্বাই-এর স্টুডিওতে কয়েকটি নির্মীয়মাণ, বর্তমানে কলকাতার স্টুডিওতেও তার ধোঁয়া লেগেছে---'গরিয়া চলি নেহার ধাঁ'। বিমল রায়ের মত প্রযোজকও এই ঝোঁক সামলাতে পারেন নি। তিনিও ভোজপুরী ছবি করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

চিন্তার ক্ষমতা যখন কমে যায়, মানুষের জীবনের সঙ্গে যখন সম্পর্ক থাকে না, নিজের দেশের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে যখন অনুসন্ধিৎসা থাকে না, তখন নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। অনুকরণ ও অনুসরণ তখন হয় একমাত্র উপায়। এই হুজুগ দেউলিয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ---সুজন।

## চিত্র-আলোচনা

### দি গোল্ডরাশ

'লাইম লাইট'-এর প্রৌঢ় কমেডিয়ান বলেছিল : I must go on. That is progress. চার্লি চ্যাপলিনের জীবনের কথাও তাই। অসাধারণ দারিদ্র্য ও সংকটপূর্ণ কিশোর কাল থেকে আজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান চুয়াত্তর বছরের শিল্পী চার্লি চিন্তায় ও সৃষ্টিতে একই গতিতে এগিয়ে চলেছেন। শিল্পীজীবনের প্রতি পদক্ষেপে, বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে, নতুন পরিবেশে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন; এবং পরিবর্তনের সঙ্গে সমান-তালে অগ্রসর হয়েছেন। চার্লি চ্যাপলিনের শিল্পীজীবনটাই হচ্ছে পৃথিবীতে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক বিরাট সংগ্রামের ইতিহাস। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় পরিচালক ভিত্তোরিও ডি-সিকা বলেছেন : 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত সিনেমা-শিল্পের সব চেয়ে বড় শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন।' শুধু বিশ্বযুদ্ধের পর কেন, সিনেমার জন্মের সুরু থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন শিল্পী, নাম তাঁর জানা নেই, যাঁর প্রতিভা চ্যাপলিনের প্রতিভাকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখার জন্য সারা বিশ্বে প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। এত আগ্রহসত্ত্বেও ভারতে 'লাইম লাইট'-এর পরে তার নতুন ছবি মুক্তিলাভ করতে পারে নি। কয়েকমাস পূর্বে তাঁর 'দি কিড' ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল। সম্প্রতি 'দি গোল্ডরাশ' এলিট সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটি ১৯২৫ সালে নির্মিত হলেও, এই ছবি নতুনত্বের বিস্ময়ে আজো পরম আকর্ষণীয়। বিশ্বের চলচ্চিত্র পর্যালোচকদের মতে চ্যাপলিনের শিল্পী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি; সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। চ্যাপলিন নিজেও বলেছেন : This is the picture I want to be remembered.

এই ছবিতেও সেই ভবঘুরে। এবার সে সোনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তুষারমণ্ডিত রামধনুর দেশে। আশার আলোয়, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষায়। হঠাৎ এলো ঝড়। চার্লি একটা ডেরায় আশ্রয় নিল; ডেরাটির মালিক এক মস্ত গোঁয়ার। এখানে তিনজন লোকের মধ্যে মারামারি আর শেষ পর্যন্ত আপোষে সাধারণ মানুষের সীমাহীন লাঞ্ছনা, দুর্শাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে এসেছে নাচঘরের একটি মেয়ে। যাকে চার্লি ভালবেসেছে। অথচ সে ভালবাসা প্রকাশের স্পর্ধা তার নেই। তারপরে

● 'অশান্ত ঘূর্ণি'তে অনিল চট্টোপাধ্যায়

লক্ষপতি চার্লির সাথে তার জাহাজে পুনর্বার সাক্ষাৎ এবং স্ত্রী বলে পরিচয় দান।

ছবিটির কয়েকটি দৃশ্য দর্শক-মনে গেঁথে থাকবে নিবিড়ভাবে। এই দৃশ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য, ক্ষুধার তাড়নায় চার্লির নিজের জুতা সিদ্ধ করে খাওয়া, জীমের বিভ্রান্তি---চার্লিকে মোরগ মনে করে মারতে যা য়া, নববর্ষের নির্জন রাতে নিজের ঘরে নাচঘরের মেয়েটির জন্য প্রতীক্ষারত চার্লির দু'টি কাঁটা-চামচ নাচানো, আর কল্পনায় সেই মেয়েটির প্রশংসা। এই দৃশ্য সিনেমায় কল্পনার জগতে অসাধারণ বিস্ময়, শিল্পের দিক ছাড়া অর্থনীতির দিক থেকে বিচারে গোল্ডরাশের বক্তব্য ধনিক সভ্যতার সাধারণ মানুষের জীবন ও হৃদয়ানুভূতির এক নির্মম চিত্র। তাই হাসির উচ্ছ্বাসে এই ছবি জীবন্ত, কিন্তু মর্মবাণী পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ডিঙিয়ে এক সত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে। দর্শকরা হাসির মধ্যে সেই সত্যকে মর্মে মর্মে অনুভব করবেন।

## আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো
## জুলিয়া সলনৎসেবা

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসবে যে ছবিগুলি দেখানো হবে তার মধ্যে একটি 'ষ্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স'। এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো এবং ছবিটি পরিচালনা করেছেন তাঁর স্ত্রী ও সহকর্মী জুলিয়া সলনৎ-সেবা।

চলচ্চিত্র জগতে আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো অদ্বিতীয় শিল্পী বলে সুপরিচিত। কাব্যিক ধারায় চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে তাঁর সমতুল্য নেই। ডব-ঝেঙ্কোর 'আর্থ' ছবিটি আজো পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বারটি ছবির একটি। ১৯৩০ সালে ব্রুসেলস চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকগণ সর্ব-

● বিশ্ববিখ্যাত আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো।

● জুলিয়া সলনৎসেবা

প্রথম এই ছবিটিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত ছবিগুলি : 'জেনিগোরা' (১৯২৮), 'আর্সেনাল' (১৯২৯), 'আইভান' (১৯৩২), 'এরোগ্রাড' (১৯৩৫), 'স্কোর্স' (১৯৩৯) এবং 'মিচুরিন' (১৯৪৮)। চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে ডবঝেঙ্কোর খ্যাতি রয়েছে। নিজের ছবির জন্য ছাড়াও তাঁর লিখিত চিত্রনাট্যগুলি অন্য পরিচালকের পরিচালনায় রূপ লাভ করেছে এবং জগতের উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় স্থান লাভ করেছে। তাঁর লিখিত চিত্রনাট্য : ডিসকভারি অব দি এনটারটিক, তরাস বুলবা, পোয়েম অব দি সী, ষ্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স, দি এনচেনটেড দেশনা। এই রচনাগুলি যেমন ছবিতে প্রকাশ লাভ করেছে, তেমনি সাহিত্য হিসাবেও বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে।

আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো নামটি চিত্র পরিচালক, সমালোচক ও চিত্রামোদীদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়, এবং বিশেষ এক প্রেরণা জাগায়। তিনিই প্রথম চলচ্চিত্রে কাব্যধারা বিকশিত করে চলচ্চিত্রকে নূতন পথে অগ্রসর হবার পথ দেখিয়েছেন। কবি যে দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করেন ছবিতেও তাকে উপস্থিত করে দর্শকদের মধ্যে কবির অনুভূতিকে মেলে ধরা সম্ভব একথা তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'I am the son of my age and belong entirely to my contemporaries...'

'...The purpose of the artist is to show the world that life is beautiful, that life in itself is the greatest blessing bestowed on man. It is regrettable and surprising that we do not always have clarity of vision enough to grasp the daily joy of living, so inconsistent in its constant changing from tragic to the gay and vice-versa. That is why so much beauty passes unseen before our eyes...'

আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কোর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৪ সালে উক্রাইনের এক কৃষক পরিবারে। যে ছোট কুটিরে তিনি জন্মেছিলেন দেশনা নদীর তীরে, সেই বাড়িটি আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে। ডবঝেঙ্কো ছিলেন মনেপ্রাণে উক্রেনীয়। উক্রেনকে তিনি এত ভালবাসতেন যে : এবং মানুষ তাদের ইতিহাস সেখানকার

প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ এত নিবিড় ছিল যে, তাঁর ছবি ও চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে এদেরই নিয়ে। উক্রেন মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করেছেন। জীবনকে দেখেছেন তিনি গতি হিসাবে, নানা বাধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই গতি, বাধা ও দ্বন্দ্বকে তিনি দেখেছেন বস্তুবাদী শিল্পীর দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতা ও আণবিকতার শিক্ষায়। এই কারণে মানবসংস্কৃতির বিকাশরূপে তাঁর ছবি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

১৯৫৬ সালের ২৫শে নভেম্বর রাত্রিতে আকস্মিকভাবে আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কোর মৃত্যু হয়। তখন তিনি 'পোয়েম অব দি সী' ছবির প্রস্তুতি কাজ করছিলেন। তখনও চিত্রগ্রহণ সুরু হয় নি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনা করেন তাঁর স্ত্রী জুলিয়া সলনৎসেবা। ১৯৫৮ সালে ছবিটি মুক্তিলাভ করে; ১৯৬০ সালে ফ্রান্সে এই ছবিটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি হিসাবে সম্মান লাভ করে এবং সংবাদপত্রের চিত্র-পর্যালোচকদের বার্ষিক পুরস্কার লাভ করে।

## জুলিয়া সলনৎসেবা

জুলিয়া সলনৎসেবা আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কোর স্ত্রী, বান্ধবী, এবং সহকর্মী। তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার নির্ভরযোগ্য রূপদাত্রী। ডবঝেঙ্কোর সাথে জুলিয়া ২৫ বছর কাজ করেছেন। তাঁর আনন্দ ও হতাশার সময়, সাফল্য ও প্রতিবন্ধকতার মুহূর্তে পাশাপাশি থেকে ডবঝেঙ্কোর সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হয়েছেন। ডবঝেঙ্কোর প্রত্যেকটি ছবিতে জুলিয়া ছিলেন সহকারী।

জুলিয়া চলচ্চিত্র শিল্পে অভিনেত্রী হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম অভিনয় আলেক্সী, টলষ্টয় লিখিত উপন্যাস অবলম্বনে

● সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ভারতে আগতা অভিনেত্রী মিস জিনাইদা কিরেনকভকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন বেতার ও তথ্য বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীশ্যামনাথ।

'আয়েলিটা' ছবিতে। ইয়াকুভ প্রোটাঝানভ পরিচালিত এই ছবিতে তিনি ভিন্ন গ্রহের বালিকা আয়েলিটার ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেন। ছবিটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, রাশিয়ায় নবজাত কন্যার আয়েলিটা নাম রাখার হুজুগ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে এক মিলন-উৎসবে জুলিয়া সলনৎসেবা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই উৎসবে জুলিয়া অভিনীত কয়েকটি পুরাণো ছবি দেখানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে একদল মেয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে, তাদের সকলেরই নাম আয়েলিটা, তাদের জন্মের সাল ১৯২৪, 'আয়েলিটা' ছবির মুক্তির বছর। তাঁর আর একটি ছবিতে অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন এনেছিল। এই ছবির নাম 'দি সিগারেট ভেণ্ডার ফ্রম মসেলপ্রম'। তারপরে তিনি ওডেসা ষ্টুডিওতে কাজ করতে যান। এখানে পরিচয় হয় ডবঝেঙ্কোর সাথে। তিনি লিখেছেন: 'ষ্টুডিওর একটি ঘরে বসে আমার ছবির কয়েকটা নমুনা দেখছিলাম। পায়ের শব্দ শুনলাম। কে যেন এগিয়ে এল এবং আমার পেছনে দাঁড়ালো। তার পরে সেই 'কে' একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন ছবির ওপর, তার পরে বলে উঠলেন—এই ছবিটা ভাল, এটাও—, কিন্তু এটি—খারাপ, ফেলে দাও। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ডবঝেঙ্কো দাঁড়িয়ে আছেন।

ডবঝেঙ্কোর সাথে জুলিয়ার বিয়ে হয় ১৯২৯ সালে। তারপরে তিনি অভিনয় ছেড়ে দেন। ডবঝেঙ্কোর সাথে ছবি তৈরির কাজে যেতে যান। এবং তাঁর নাম প্রকাশ পেতে থাকে ডবঝেঙ্কোর পাশে সহকারী পরিচালক হিসাবে। 'পোয়েম অব দি সী' এবং 'ফ্লেমিং ইয়ার্সে'র তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন। ডবঝেঙ্কোর শেষ চিত্রনাট্য 'অপরাজেয় দেশনা'র চিত্ররূপের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন।

### সন্ধ্যানাড়ের 'আবর্তন'

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশিক্ষায়

তন হলে সন্ধ্যানীড় সংস্থার 'আবর্তন' নাটক অভিনয় হয়। প্রিষ্টলের 'আই হ্যাভ বিন হিয়ার বিফোর' নাটকের বাংলা ভাবানুবাদ 'আবর্তন' ইতিপূর্বে এই সংস্থা অভিনয় করে দর্শক ও পর্যালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। পুনর্বার অভিনয়েও 'সন্ধ্যানীড়' তাঁদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। নাটকটির অনুবাদ, পরিচালনা এবং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট নাট্যবিদ ও সাহিত্যিক শ্রীঅশোক সেন। নাটকটির একমাত্র নারী চরিত্র অতসী মল্লিকের ভূমিকায় শ্রীমতী বিনতা রায়ের অভিনয় অনবদ্য। সুখময় সেনের দার্শনিক অধ্যাপকের চরিত্রাভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। গদাধর সেনের শ্যামবাবু অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। সমর সরকার ও অশ্রুমুকুল সেনের অভিনয়ও যথাযথ। একমাত্র অমল ঘোষ কিছুটা দুর্বল। এককথায় সন্ধ্যানীড়ের 'আবর্তন' একটি সার্থক নাটক হিসাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ**

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"---স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
---স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" ---স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস---নূতন সৃষ্টি

বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

**শ্যাম-সোহাগিনী**

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**

কলিকাতা--১২

## রঙ-রূপ-এর ইতিবৃত্ত

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে রঙ-রূপ সংস্থা মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিবৃত্ত' নাটক অভিনয় করে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে সঞ্জয় হালদার, শঙ্কর সাহা, শ্যামল দে, সুশীল সরকার, অরুণ ঘোষ, দীপ্তি ভট্টাচার্য।

## স্টুডিও খবর

অগ্রদূত পরিচালিত জনপ্রিয় 'বাদশা' ছবির হিন্দী চিত্রস্বত্ব কিনেছেন প্রযোজক শ্রীঅনন্ত সিংহ। বোম্বাই-এর সত্যেন বসুর পরিচালনায় শীঘ্রই চিত্রগ্রহণের কাজ সুরু হবে। বাদশা চরিত্রে রূপ দেবার জন্য অশোক কুমারের সাথে কথা হচ্ছে।

* * *

সত্যজিৎ রায় 'নষ্টনীড়' ছবির কাজ শেষ করেছেন। এবার তিনি দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাতা নর্তকী শ্রীমতী বালাসরস্বতীর জীবন অবলম্বনে একটি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি করবেন।

* * *

'বাদশা'র সাফল্যের পর অগ্রদূত গোষ্ঠী 'অন্তরাল' নামে একটি ছবির কাজ সুরু করেছেন। এই ছবিটি হবে অগ্রদূত গোষ্ঠীর ২৫তম ছবি। ভূমিকায় থাকবেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী।

* * *

চিত্রতীর্থের প্রথম প্রয়াস 'ঠিকানা'র চিত্রগ্রহণ সুরু হয়েছে। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন কানাই রায়।

* * *

অভিনেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় মাধবী পিকচার্সের 'মোমের আলো' ছবির রাজগীরে বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে।

## সংবাদ-কণা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ ও ভারত সরকারের বেতার দপ্তরের যুগ্ম উদ্যোগে আগামী ৬ই মার্চ থেকে কলকাতার নিউ এম্পায়ার সিনেমায় সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে: 'মেডেনস্প্রিং', 'স্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স', 'ইভানস চাইল্ডহুড', 'নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার', 'গার্লস', 'মামলুক'।

* * *

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে মার্চ মাসের শেষের দিকে সুইডিস ছবির উৎসব হবে।

### শোক-সংবাদ

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওর পরিচালক ও চিত্রপ্রযোজক শ্রীকানাই ঘোষাল গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৫৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর প্রযোজিত প্রথম ছবি 'বন্দী' (১৯৪২)। তাঁর প্রযোজিত ছবিগুলির মধ্যে

কানাই ঘোষাল

রয়েছে 'সন্ধি', 'সুলহা', 'শান্তি', 'প্রতিমা', 'স্যার শঙ্করনাথ', '১০৯ ধারা', 'আশাবরী', 'প্রফুল্ল', 'কেরাণীর জীবন' প্রভৃতি।

* * *

হিন্দী চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও গায়িকা শ্রীমতী শান্তা আপ্তে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৪১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

# খেলাধূলা

## বাংলার হকি আজ কোন্ পথে

কলকাতা ময়দানের ১৯৬২-৬৩র ক্রিকেটের পালা এখনও সাঙ্গ হয় নি, অপেক্ষায় আছে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির। শীতের আমেজ কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছে, দক্ষিণে বসন্তের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। বসন্তের সেই হাওয়ার দোলায় মেতে উঠেছে কলকাতার অগণিত ক্রীড়ামোদীর মন। কচি সবুজের ছোঁয়া লেগেছে ময়দানের গাছে এবং ঘাসের বুকে; উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আবার নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ময়দানকে কেন্দ্র করে। ময়দান এখন নবরূপে চঞ্চল এবং সেই চঞ্চলতাও যেন সংক্রামিত হয়েছে খেলা পাগল কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে।

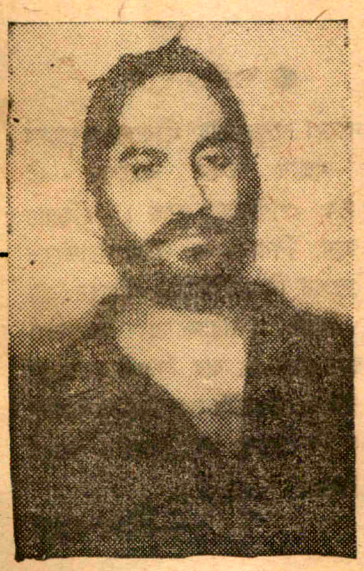

● যোগীন্দার সিং

ক্রিকেটের বিদায়ের অপেক্ষা না রেখেই হকি ময়দানের বুকে এসে স্থান নিয়েছে। গত মরশুমের মত এবারও কলকাতার নামী দলগুলি ভিনদেশী নামী খেলোয়াড় জড় করেছেন নিজ নিজ দলে। এবারকার বৈচিত্র্য এই যে, নামী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভূপাল থেকে আগন্তুকের সংখ্যাই বেশি। মোহনবাগান এবার সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছে। মোহনবাগানের গোলে খেলছেন লি-খ্যাত ভারতীয় গোলরক্ষক ক্রিষ্টি। ফরোয়ার্ডে শক্তিবৃদ্ধি করেছেন ইষ্টবেঙ্গল থেকে আগত ইমানুর, আনিস্থর, সঈদ এবং বালু। মহারাষ্ট্র থেকে নবাগত ইয়াসীন চৌধুরী এর মধ্যেই ময়দানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ইষ্টবেঙ্গল কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে হারালেও, বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানী করে দলীয় শক্তি খর্ব হতে দেয় নি। ভারতীয় আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় যোগীন্দার সিং পুনরায় ইষ্টবেঙ্গলেই যোগ দিয়েছেন। সার্ভিসেসের যা-লন্দর, আলিগড়ের ইকবাল এবং ভূপালের কয়েকজন খ্যাতনাম খেলোয়াড় এবার ইষ্টবেঙ্গল দলের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। বি এন রেল, কাষ্টমস এবং মহামেডান নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে বটে, কিন্তু মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত শক্তি তাদের নেই।

লীগ খেলাগুলিতে মোহনবাগান দলের গোল করার ধুম দেখে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তিন সংখ্যার কোঠায় তারা হয়ত পৌঁছে যাবে। অবশেষে ফুটবলের মত হকিতেও মনে হয় আবার সেই দুই প্রধান মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য। প্রথম ডিভিশন হকি লীগে বিভিন্ন দলের মধ্যে দলগত শ[illegible] একটা বিরাট বৈষম্য চোখে [illegible]ড় পারে না। দু'একটি দল [illegible]র ভা[illegible]টে খেলোয়াড় সংগ্রহ [illegible]রে শক্তিশালী দল গঠন করেছেন তাঁদের তুলনায় স্থানীয় খেলোয়াড় [illegible]ন্বিত অন্যান্য দলগুলি দুর্বল, শক্তি[illegible]ন। তাই অনায়াসে এই শক্তিশালী দলগুলি হেসে-খেলে গোলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে দুর্বল দলগুলিকে। তাঁদের সমর্থকরা আনন্দে মশগুল, তাঁরা ভাবছেন দল গঠনের পেছনে যে টাকা ঢালা হয়েছে তা সার্থক হয়েছে। কিন্তু লীগ খেলার যে আসল উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, বাংলার হকির বনিয়াদ ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, এই সত্যটি উপলব্ধি করার সুবুদ্ধি কারও জাগ্রত হচ্ছে না। ছোট ছোট দলগুলি না পাচ্ছে ভরসা, না পাচ্ছে উৎসাহ। জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যশালী দলে আজ বাঙালী খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়া যায় না। তা দেখলেও দুঃখ হয়। স্থানীয় তরুণ প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবার সমস্ত পথই এখানে প্রশস্ত, কিন্তু নতুন প্রতিভা উন্মেষের দ্বার এখানে রুদ্ধ। কয়েকটি ট্রফি এবং ঝুটো মান-

● ইমানুর রহমান

সম্মানের জন্য আজ বাংলার রথী-মহারথী দলগুলি বাংলার খেলাধূলার সামগ্রিক কল্যাণের কথা বিস্মৃত হতে

চলেছেন। অদূরভবিষ্যতে স্থানীয় খেলোয়াড়েরা ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে এবং ভিনদেশী ভাড়া করা খেলোয়াড়ে ভরে যাবে কলকাতার ময়দান, একথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

## ক্লে অসম্ভবকে সম্ভব করল

He will fall
The round I call,

ক্লে প্রমাণ করলেন যে, তিনি একজন ভাল ভবিষ্যদ্বক্তাও বটে। বলেছিলেন—লিষ্টনকে আট রাউণ্ডের

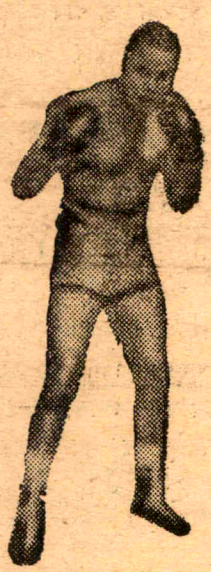

● লিষ্টন

মধ্যে হারাব ; আর ঠিক ছ' রাউণ্ডের পরেই লিষ্টন রিং ছেড়ে পালালেন। বকবকিয়ে ক্লে যে অসম্ভবকে সম্ভব করবেন একথা কেউ কল্পনাই করতে পারেন নি। প্রতি ন'জন লোকের মধ্যে আটজন ক্লের নিশ্চিত পরাজয় সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৫ সালের পর মুষ্টিযুদ্ধের আসরে এত বড় ওলট-পালট আর হয় নি। লিষ্টনের শিক্ষক-উপদেষ্টা বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই বলেছিলেন যে, ক্লে দু'রাউণ্ডের বেশি টিকতে পারবে না। আর বলেছিলেন যে রিং-এর ধারে ধারে না থাকলে বোকরা লিষ্টনের হাতে মার খেয়ে মরে যাবে।

ফ্লোরিডার দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত মিয়ামী বীচ। সারা শহরে উৎসাহ এবং উত্তেজনার অন্ত নেই। সারা বিশ্বের ক্রীড়ামোদীরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে লড়াইয়ের ফলাফল জানার জন্যে। টেলিভিসনের সাহায্যে লোকেরা দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছেন ; মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান প্রচুর অর্থব্যয় করে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন এই অবিস্মরণীয় লড়াই।

ক্লে যখন মিয়ামী বীচে কনভেনশন-মাল হলের রিংয়ে উঠলেন ; সমবেত দর্শকরা ক্লে-কে অভিনন্দন জানালেন ও তাঁর নিশ্চিত পরাজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ক্লে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক দৈত্যকায় যোদ্ধা লিষ্টনের সঙ্গে ছ' রাউণ্ড যুঝলেন সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং শরীরের শেষ শক্তি নিঃশেষ করা ঘুষির জোরে। অবশেষে সতেরো মাসের ভোগ করা সম্মান লিষ্টন ক্লে-কে দিতে বাধ্য হলেন প্রায় ন' হাজার উদ্ভ্রান্ত, উত্তেজিত এবং বিস্মিত দর্শকদের সম্মুখে। সপ্তম রাউণ্ডে লিষ্টন পনরায় রিংয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেও, তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে কোনক্রমে নিরস্ত করেন। লিষ্টনের অবসর গ্রহণ করার জন্য ঘোষণা হল যে, সপ্তম রাউণ্ডে টেক নক্যাল নক আউট হয়ে লিষ্টন পরাজিত হয়েছেন। মিয়ামী বীচের কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে, যে আঘাতের জন্য লিষ্টন অবসর গ্রহণ করেছেন, তা দু'জন চিকিৎসক পরীক্ষা করবেন এবং তারপর লিষ্টন তাঁর প্রাপ্য টাকা পাবেন।

প্রথম রাউণ্ডে ক্লে লিষ্টনকে প্রত্যক্ষ করলেন খুব সাবধানে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ক্লে মার্জারের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আঘাত করলেন লিষ্টনকে। সমবেত দর্শকরা উল্লসিত হয়ে উঠল লিষ্টনের মার-খাওয়া দেখে। চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউণ্ডে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত লিষ্টন আক্রমণ চালাতে লাগলেন তরুণ ক্লের উপর, কিন্তু ক্লে কোনক্রমে সেই আক্রমণধারা প্রতিরোধ করলেন। ষষ্ঠ রাউণ্ডে কিন্তু ক্লে আবার বেকায়দায় ফেললেন

● ক্যাসিয়াস ক্লে

লিষ্টনকে। ক্লে তাঁর জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করলেন এই বিংশতম পেশাদার যুদ্ধে। কুড়িবার লড়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখেন নি। লিষ্টনের জীবনে এটা হল দ্বিতীয় পরাজয়ের আস্বাদ। লড়েছেন মোট ৩৭ বার, বিজয়ী হয়েছেন ৩৫ বার। ফিরতি লড়াইয়ে ঘা-খাওয়া লিষ্টন কি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন দেখা যাক।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# মাইকেল গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ।

মূল্য—১৷৷০ টাকা।

---

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

# দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, ২। নীলদর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

২য় ভাগে—১। সধবার একাদশী, ২। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৩। পোড়ামহেশ্বর, ৪। কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা, ৮। পদ্য সংগ্রহ।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

---

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

# কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ—

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲

---

সর্ব্বপুরাণ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

# স্তবকবচমালা

( পঞ্চম সংস্করণ )

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্ব্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

---

পৃথিবীর অরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

# সার ওয়াল্টার স্কটের

## গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর

লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ

দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

---

# কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর

## গ্রন্থাবলী

**রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেশ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"**

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

**কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ**

**মূল্য তিন টাকা**

---

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Thursday, 5th March, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : {34-7771, 34-7773.

# See India by Ambassador !

Our country abounds in natural riches which invite appreciation and exploration. The Ambassador provides easy access to ideal spots for holidaying, picnicking, camping, hiking, and every avenue leading to closer contact with nature. Designed as a family car, it carries upto six adults in relaxed comfort, plus ample luggage in its spacious boot. O.H.V. engine power, combined with a sturdy build, ensures fast and dependable performance at a modest fuel consumption. It is the ideal vehicle for enriching the experience and expanding the horizon of you and your family!

HINDUSTHAN **Ambassador**

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA

AUTHORISED DEALERS

• INDIA AUTOMOBILES (1960) LTD., 12, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • HINDUSTAN AUTO DISTRIBUTORS, 17, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • WALFORD TRANSPORT LTD., 71, Park Street, Calcutta (for other Districts of West Bengal)

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

## পাক বুলেটের শিকার

বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • March 12, 1964 • Vol. 68, No. 42

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কালোকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
**সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল**—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

**সাধনার**
# মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন)
এফ. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর
কলেজের ধন্বন্তরিশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য্য।

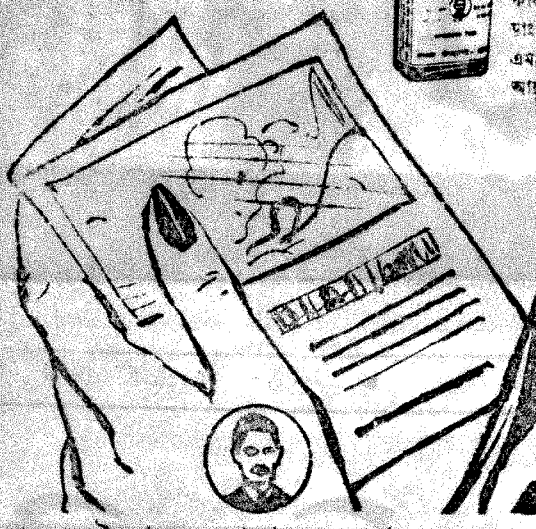

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
·003/3
Y. 64 m042


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২২৯১ |
| আজকের মানুষ | ... | ২২৯২ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২২৯৩ |
| লণ্ডনের চিঠি | অমিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২২৯৭ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২২৯৯ |
| দুরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৩০৪ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২৩০৬ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৩০৯ |
| নগর বন ( গল্প ) | দুলাল পাল | ২৩১১ |
| পৃথুমালিনী কথা ( রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২৩১৫ |



যে সব বই হাতের কাছে না রাখলেই চলে না

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা**

( চতুর্থ সংস্করণ )

প্রাচীন, মধ্যযুগের ও অতি আধুনিক যুগের উপন্যাসের প্রাঞ্জল সমালোচনা। দাম ২০·০০

**সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ-সঙ্গমে**

সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা কৌতূহলোদ্দীপক রসগর্ভ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। দাম ১২·৫০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের

**ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন**

১৮৬০ থেকে ১৯১০, এই অর্ধ-শতকের সময়সীমার মধ্যে পঁচাত্তর জন গীতিকবির পাঁচশত গীতিকবিতার সুন্দর সংকলন। প্রতি গ্রন্থাগারে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে সযত্নে রক্ষণীয়। দাম ১২·০০

আরও কয়েকখানি পরিপূরক বই

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের

**ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ**

অষ্টাদশ শতকের যুগসন্ধির অন্ধকারে দুই দীপশিখা, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, সেই দীপশিখা বাঙালীকে পথের আলো দেখিয়েছে। সেই যুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এবং পরিশিষ্টে ভারতচন্দ্রের সত্যপীরের পাঁচালী ও রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও পদাবলী বইটির বৈশিষ্ট্য। দাম ৮·০০

**ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা**

বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় বিচিত্র বারমাস্যার সংকলনে রচিত এই আলোচনা গ্রন্থটি বাংলার লোকসাহিত্য ও লোক-সংগীতের অধ্যয়ন-আলোচনায় বিচিত্র ইঙ্গিত সংকেতে সমৃদ্ধ। দাম ৬·৫০

ডক্টর বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের **বাংলা গাথাকাব্য**

গাথাকাব্য ও কবিতার পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস। প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক গাথা, নীতিকথামিশ্রিত গাথা, ধর্মাশ্রিত গাথা, বারমাসী গাথা, আধুনিক গাথা প্রভৃতি গাথাকাব্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। দাম ৮·০০

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-৩১০৫, ৩৪-৮৪৫১

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নক্ষত্রের আলো | অন্নদাশঙ্কর রায় | ২৩১৯ |
| কবি ও তাঁর গান ( কবিতা ) | বৈশম্পায়ন | ২৩২৩ |
| রাজা ত্রিশঙ্কু ( কবিতা ) | অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী | ২৩২৩ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২৩২৪ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৩২৫ |
| সংবাদ বিচিত্রা | সাংবাদিক | ২৩২৮ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৩২৯ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৩৩৪ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৩৩৯ |
| খেলাধূলা | ... | ২৩৪৩ |

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১।।০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

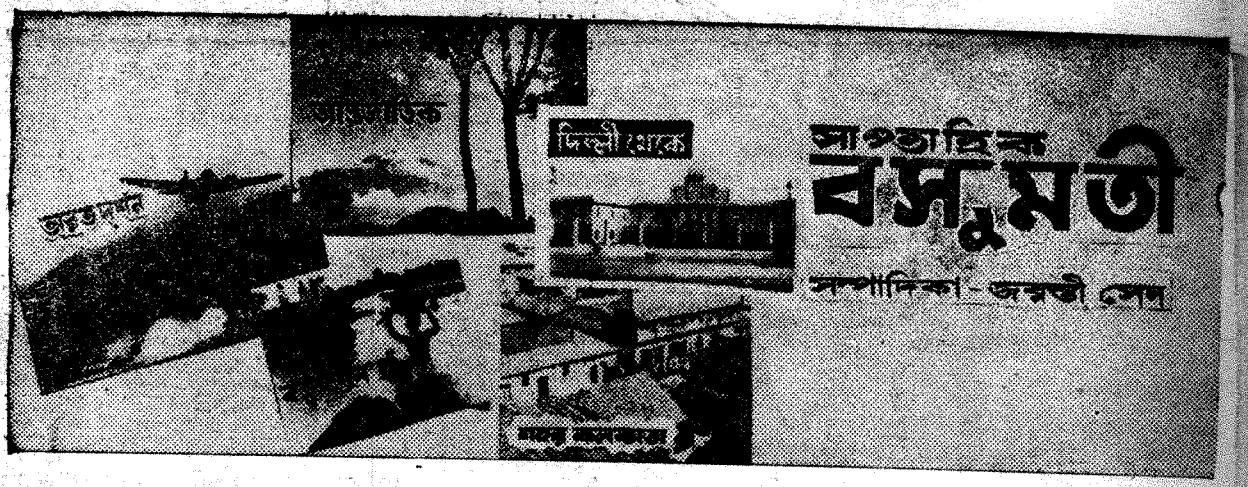


৬৮ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২৮শে ফাল্গুন ১৩৭০

25 Nave ause
Thursday, 12th March 1964

# পাঁচ মিনিটের মধ্যে

আজ ব্যথা অসীম, বেদনা অপরিসীম। কিন্তু একে ভাগ্যের পরিহাস বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। সমস্ত জাতির আত্মরক্ষা-দপ্তরের কোনো বিভাগে যদি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা না ভেবে উপায় নেই। তখন সেই ত্রুটি দূর করার উপায় ভাবতে হয়, নতুবা সমস্ত জাতি সহজেই নিজেদের অসহায় বলে বিবেচনা করতে পারে। বিশেষত, আমাদের দুই শত্রু সব সময়-ই প্রস্তুত; তাই আমাদের নিজেদের প্রস্তুতি আজ হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। কিন্তু ভারতীয় বিমান-বহর আজ কোন পর্যায়ে রয়েছে? এক নয় দু'টি দৈব দুর্ঘটনা নয় কয়েক মাস ধরে পর পর কয়েকটা ভারতীয় বিমান দুর্ঘটনায় পড়লো, প্রাণহানি হল বহু সামরিক ব্যক্তির; এইসব দুর্ঘটনা দূরীকরণের যদি কোনো চেষ্টা হয়েও থাকে, তাহলে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে গত ৪ঠা মার্চ। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে বিমান ছাড়া হয়েছিল, তা চোখের পলকে কিভাবে জলতে জলতে ধ্বংস হয়ে গেল তা কল্পনাও করা যায় না। ব্যারাকপুরের কাছে হুগলী নদীতে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত বাইশটি প্রাণ কোনদিনই ফিরে এসে কোনো প্রশ্ন করবে না। কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনীর মধ্যে যাঁরা আজ অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আর ঐ নিরাপত্তা কোনো ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তাঁদের মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

মাত্র পক্ষকাল পূর্বে, সতেরই ফেব্রুয়ারী জম্মুতে বিমান-হরের ইলুশিন বিমানের 'নিখোঁজ' ব্যাপারটিও কম চাঞ্চল্যকর নয়। ঐ বিমানে সামরিক বাহিনীর পনের জন জলজীন্ত যাত্রীর নিরাপত্তার কথা দূরে যাক, তাদের কোনো পাত্তা পর্যন্ত আজো পাওয়া যায় নি। যাহোক, নিখোঁজ বিমানের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে অন্যান্য বিমান যে নতুন রহস্য ভেদ করেছে তা গভীর ষড়যন্ত্র-মূলক। ষড়যন্ত্র বলে অনুমিত হওয়ার কারণ এই যে, আজাদ কাশ্মীর কিংবা পাকিস্তানী এলাকা থেকে একটি ভুতুড়ে বেতার কেন্দ্র বারবার এই সন্ধানী বিমানগুলিকে ভুল নির্দেশ দিয়েছে। এই রহস্যজালের সূত্র ভেদ করলে হয়তো হুগলী নদীতে সদ্য বিধ্বংস বিমানেরও ধ্বংসের কারণ জানা যাবে। মনে রাখতে হবে, পাক-গুপ্তচক্র কোনো এক বিশেষ স্থল থেকেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করছে না। সারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থল-গুলিতে তারা ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ উদ্দেশ্যে বিগত দাঙ্গার সময় কলকাতা বন্দরে পাকিস্তানী গুপ্তচরবৃন্দ পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছিল। এইসব কারণে মনে হয়, হুগলী নদীতে নিমজ্জিত বিমানটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মধ্যেও পাক-গুপ্তচরদের হীন কার্যকলাপ বর্তমান। এই গুপ্তচরবৃত্তি অবিলম্বে দূর করা সম্ভব না হলে আমাদের সামরিক শক্তি যে অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে সরকার আশু একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করুক—এই আমরা চাই।

সম্পাদকীয়

# আমাদের মানুষ

'অধিকার' বলে একটা কথা আছে। এ 'অধিকার' কখনও জন্মগত কখনও বা অভিজ্ঞতালব্ধ। কিন্তু এ দুয়ের সমন্বয়ে যে 'অধিকার' তা বাস্তবে—বিশেষত রাজনীতিতে একান্ত প্রয়োজন। গোলাম মহম্মদ সাদিক সেই 'অধিকার' বলেই আজ কাশ্মীরের নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী। মননে তিনি বিদগ্ধ। বহুদর্শী, বিচক্ষণ। অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ। প্রথম দর্শনে শান্ত-আয়েসী চেহারার এই মানুষটির অতীত বৈপ্লবিক জীবনের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ বিপ্লব দিয়েই তার সুরু আর আজও কাশ্মীরে মহাসন্ধিক্ষণে তার পূর্ণাভিষেক। শ্রীনগরে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন সাদিক। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আইনে স্নাতক হয়েছেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। কর্মের উদ্যমে স্থির লক্ষ্য নিষ্ঠায় সাদিক তখনই সকলের চোখে পড়েছিলেন। দেশের মানুষকে ভগত সিং-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আঠারো বছরের তরুণ সাদিক সেদিন রাত জেগে পোষ্টার লিখেছেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে প্রবল ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করে চাঞ্চল্য এনেছেন শ্রীনগরে। কাশ্মীরের নবজাগরণের পেছনে সাদিক-পরিবারের অনবদ্য অবদান আছে। লাহোর কলেজের ছাত্র জি এম সাদিক সেই অবদানকেই অবিস্মরণীয় করেছেন মুসলিম কনফারেন্সে আর্থিক তহবিলে চাঁদার খাতায় আত্মোৎসর্গ করে।

আলিগড় থেকে স্নাতক হয়ে এসেই সাদিক যোগ দিলেন মুসলিম কনফারেন্সের প্রথম রাজ্য আইন সভায়। তখন থেকেই প্রজাসভার এম-এল-এ ইত্যাদি নানা দায়িত্বে তিনি আইন সভার সাথে জড়িত আছেন। এই সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি-মূলক শাসনের দাবীতে কারাবরণ করেছেন সাদিক। পলাতক হ'য়েছেন মহারাজার বিরুদ্ধে 'কাশ্মীর ছাড়' আন্দোলনকে আরও সুসংবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। সমাজের উঁচু মহলের মানুষ হ'য়েও তিনি নির্বিশেষে জনতার পাশে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অনুপ্রাণিত হ'য়েছেন মার্ক্সবাদে। এক সময় ন্যাশনাল কনফারেন্সে তিনিই ছিলেন মার্ক্সবাদীদের প্রতিনিধি। এই কনফারেন্সের কার্যধারাকে প্রগতিমুখীন ও জনস্বার্থে প্রণোদিত করার জন্য সাদিক তীব্র সংগ্রাম করেছেন। ভারত যখন ভাগ হ'ল তিনি শেখ আবদুল্লার মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন উন্নয়নমন্ত্রীর পদে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ওই পদেই সুনামের সাথে থেকেছেন। সে সময়ে 'শের-ই-কাশ্মীর' শেখ আবদুল্লার সাথে তাঁর মতানৈক্য হ'ল। সাদিক পদত্যাগ করলেন। সভাপতি হলেন রাজ্য গণপরিষদের। '৫৩ সালে আবদুল্লা কারারুদ্ধ হ'লে তিনি বক্সী গোলাম মহম্মদের নেতৃত্বে আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে এলেন। এবার সাদিক শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু সাদিকের বিপ্লবী মন তাঁকে যেন নিয়ত প্ররোচিত করছে আপোষের বিপক্ষে। বক্সী গোলামের সাথেও তাঁর মত-বিরোধ হ'ল। জাতীয় সম্মেলন ত্যাগ করে সাদিক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জাতীয় সম্মেলন গঠন করলেন '৫৭ সালে। '৬১ সালে আবার ফিরে এলেন আগের দলে। '৬৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বক্সী গোলাম মহম্মদের মন্ত্রিপরিষদেই থেকেছেন। অবশেষে কামরাজ পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে বক্সী গোলামের সাথে সাদিকও পদত্যাগ করেন। এরপরে সামসুদ্দীনের মন্ত্রিসভায় তিনি আর যোগ দেন নি। কিন্তু আজ দেশের সঙ্কটের দিনে কাশ্মীরের জনগণ আবার তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন নতুন দায়িত্ব নিতে। সামসুদ্দীনের পদত্যাগের পর তাই জনতার অকৃত্রিম বন্ধু—পরিষদের অবিসংবাদিত প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছেন গোলাম মহম্মদ সাদিক।

কাশ্মীরের পূর্ণ ভারত ভুক্তির তিনি একজন দৃঢ় প্রবক্তা। কাশ্মীরের বর্তমান পটভূমিতে তাঁর ভূমিকা তাই গুরুত্বপূর্ণ।

গোলাম মহম্মদ সাদিক

দুর্যোগ-তুফানেও যিনি শক্ত হাতে হাল ধরে রাখতে পারেন তাঁকেই বলি যথার্থ কাণ্ডারী। কাশ্মীরে আজ রাজনীতির জটিল-কুটিল ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। বিশ্বজুড়ে উঠেছে তার আলোড়ন। এই মাহেন্দ্র মুহূর্তে সাদিক কেমন অনড়চিত্তে সেই সার্থক কাণ্ডারী হ'য়ে ওঠেন—তা'ই আজ সকলের লক্ষণীয়।

# বঙ্গ দর্শন

● আমেরিকার শিশু সাহিত্য বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী ইউনিস বোহানন শিশু সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাথে আলোচনা করছেন।

**রাজধানী ঃ**

আবার বিমান দুর্ঘটনা। এবার আর জম্মু কিংবা পুঞ্চে নয় এবার একেবারে রাজধানী কলকাতার কাছে। বারাকপুরে। কিছুদিন যাবতই আমাদের দেশে সামরিক বিমান দুর্ঘটনা একের পর এক করে ঘটে যাচ্ছে। এমনি বিমান দুর্ঘটনার পেছনে কোন অশুভ-শক্তি আছে কি না আমরা সে প্রসঙ্গে যাবো না। কেন না প্রতিরক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তদন্ত করে এর মর্ম-সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু এমনিভাবে আমাদের সামরিক বিমানগুলো দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যে মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করছে তাতে দেশবাসী শুধু শোকার্ত কিংবা বেদনার্তই হচ্ছে না---শোকস্তব্ধভাবে নিয়তির এই অমোঘ ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করছে তারা অসহায় পঙ্গু দর্শক হিসেবে। কেন না, এ যেন সকলের হাতের বাইরে। কিন্তু তবু আমরা জানাতে চাই---আজ বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে সব কিছুকে নিয়তির খেলা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা তাই সামরিক বাহিনী ও সরকারকে বলতে চাই যে, নিয়তি বলে এসব ঘটনাকে উপেক্ষা করে গেলে আগামী ইতিহাস নিশ্চয়ই তাদের ক্ষমা করবে না। জম্মু কিংবা পুঞ্চে যা ঘটেছে তা কিছুটা রহস্যময় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বারাকপুরে যা ঘটল তাতে আমরা সত্যিই বিস্মিত হচ্ছি। ঘটনায় প্রকাশ, আকাশে ওড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমানটির যন্ত্র বিকল হয়ে নীচ আকাশেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং জলন্ত অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা নিয়ে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিমান ওড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যদি বিমানের যন্ত্র বিকল হয়, তবে বিমানটি ওড়ার সময় ঠিক ছিল কি না এ প্রশ্ন অবশ্যই মনে জাগে। এ কথাও মনে করা অন্যায় হবে না সামরিক বাহিনীর বিমান-বহর-এর কর্মিবৃন্দের মধ্যে যে শিক্ষা বা স্পেসালাইজড লোক থাকলে এসব দুর্ঘটনা থেকে বিমানগুলো রক্ষা পেতে পারে তার অভাব আছে। বিমান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার আছে কি না তাও এ প্রসঙ্গে তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন সামরিক বিমান ঘাঁটিগুলিতে বিশেষ করে, কারণ আমাদের বিমান-বহর নানা দেশের তৈরি বিমানে ভর্তি। আশা করি ভারত সরকার জম্মু, পুঞ্চ কিংবা বারাকপুরের ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে এর সামগ্রিক তদন্তের ভিত্তিতে এরূপ শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করবার উপায় নির্ধারণ করবেন। পরিশেষে বারাকপুরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বৈমানিক-বৃন্দ ও অফিসারদের প্রতি আমাদের নীরব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং এঁদের পরিবারবর্গের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আমরা তাদের মতই সমবেদনা বোধ করছি। এই শ্রদ্ধা ও বেদনা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরকারকে এই বলে সাবধান করে দিতে চাই যে, কোনরূপ গাফিলতি কিংবা অবহেলা যেন আমাদের দেশের বীর সৈনিকদের অমূল্য জীবন অপচয়ের কারণ না হয়ে ওঠে, দেশের এই দুর্দিনে, এই বিপদসঙ্কুল সময়ে।

* * *

রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কিত বিতর্ক থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় বিভিন্ন সদস্যদের কণ্ঠ থেকে নির্বিচারে পুলিশী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিধানসভায় এ সম্পর্কে উত্তেজনার সৃষ্টিও হয়েছে। বাজেট বিতর্কের সুরুতেও নতুন নতুন নির্যাতনের কাহিনী জনসাধারণকে শুধু বিস্মিত নয়, আতঙ্কিতও করে তুলেছে।

গাইঘাটার ছোট্ট মেয়ে মমতা পালের ওপর বর্বর নির্যাতনের অভিযোগের রেশ মেলাতে না মেলাতেই গণতান্ত্রিক দেশের আইন-প্রণেতাদের কাছে সুমতি বিশ্বাস ওরফে শান্তিলতা বিশ্বাসের কাহিনী বিচারের আশায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। সীমান্তের জেলাগুলিতে হিন্দু চাষীদের ওপর জঘন্য অত্যাচারের কাহিনী শুধু নয় নারীত্বের মর্যাদাহানির গুরুতর অভিযোগ এসেছে। বিরোধী সদস্য-

দের বানানো অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবার পথ এবার বন্ধ। প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুরের চিঠি এবার বিধানসভার উভয় পক্ষের সদস্যদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শ্রীঠাকুরের লেখা বলে একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করেন শ্রীঅপূর্ব মজুমদার। চিঠিখানি পড়ে শোনান বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু। শ্রীঠাকুর নাকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই

শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর

বিচারের আশায় এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। উক্ত চিঠিতে শ্রীঠাকুর অভিযোগ করেছেন---পুলিশের দ্বারা নির্যাতিতা কৃষকবধূ শান্তিলতা তাঁর বাড়িতে আশ্রয়ের সন্ধানে গেলে একদল পুলিশ শুধু শান্তিলতাকেই নির্যাতন করেন নি; শ্রীঠাকুরের পুত্র বধূও তাদের হাত থেকে রেহাই পান নি। ক্ষুব্ধ শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছেন, একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রীর গৃহে যদি এই ধরণের জবরদস্তি চলে, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থার কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

বিধানসভায় শ্রীঠাকুরের চিঠি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিগণ ধিক্কার দিয়ে ওঠেন। সরবে না হলেও কংগ্রেস সদস্যগণ সেই ধিক্কার ধ্বনির সঙ্গে নীরবে গলা না মিলিয়ে পারেন নি। সরকার পক্ষ থেকে কিন্তু শ্রীঠাকুরের চিঠি সম্পর্কে কোন জবাবই দেওয়া হয় নি।

বিধানসভার কক্ষ থেকে হাবড়ার কাহিনী আর শোনা না গেলেও, লবী কিন্তু এই সপ্তাহেও হাবড়া নিয়ে মুখর ছিল। আটজন কংগ্রেস সদস্য সরেজমিনে হাবড়ার দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন। প্রকাশ্যে না বললেও অপ্রকাশ্যে হাবড়া সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমস্ত অভিযোগেরই সমর্থন তাঁরা করেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, উক্ত আটজন সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি গোপনীয় রিপোর্ট পেশ করেছেন। হাবড়া থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষের বিরুদ্ধেও নাকি তাঁরা অত্যাচারের প্রশ্রয় দানের অভিযোগ করেছেন।

* * *

গত সপ্তাহের অধিবেশনে স্পীকারের একটি রুলিং-এর ব্যাখ্যার দাবী করে বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিধানসভায় স্পীকারের নিকট লিখিত একটি চিঠি পাঠ করেন। গত বছর চৈনিক আক্রমণের সময় তদানীন্তন কারামন্ত্রী 'দেশদ্রোহী' শব্দটি ব্যবহার করলে স্বাধিকারের প্রশ্ন ওঠে। শ্রীবসু সেই প্রশ্নে স্পীকারের রায় সম্পর্কেই ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। স্পীকার শ্রীকেশব বসু তাঁর পূর্ব রুলিং-এর ব্যাখ্যা করে বললেন, বিধানসভায় কোন সদস্যের পক্ষে অপর সদস্যকে 'দেশদ্রোহী' বলা সংসদের রীতি-বিরুদ্ধ। তবে শ্রীমুখার্জী বিধান-সভার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহী' শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। শ্রীজ্যোতি বসু এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি লবীতে এসে জানান, স্পীকারের বিরুদ্ধে তাঁরা যে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়ে-ছিলেন এই ব্যাখ্যার পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

প্রত্যাহার তো হলো---কিন্তু শ্রীজ্যোতি বসু বিধানসভায় যে চিঠি-খানি পাঠ করলেন তাতে স্পীকারের রুলিং-এর সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়েছে। ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য এই কথাটি বিধানসভায় তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, এ রকম নজীর রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেস-সদস্যরা কিন্তু এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করলেন না।

* * *

বিধানসভায় উত্তেজনা কমে

শ্রীজ্যোতি বসু

এলেও লবী এখন সরগরম। রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পর্কে কমিউনিষ্ট দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। রাজ্যসভায় শ্রীভূপেশ গুপ্ত আর বিধান পরিষদে শ্রীসুহৃৎ আচার্য চৌধুরী এবং শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্তের মনোনয়ন সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির বাম ও দক্ষিণপন্থী অংশ সম্মুখ সমরের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। সেন-লাহিড়ী গোষ্ঠী কিছুতেই আচার্য চৌধুরী ও দাশগুপ্তকে ভোট দেবেন না। আপোষপন্থী জ্যোতিবাবু আপোষের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তিন পক্ষে যে রণং দেহি মনোভাব চলছে তাতে শেষ পর্যন্ত কি হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকার শিশু সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মিসেস ইউনিস বোহানন কলকাতায় ইউ-এস-আই-এ -এর প্রেক্ষাগৃহে বাংলা দেশের শিশু

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে এক আলোচনা বাসরে মিলিত হন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি কলকাতার বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনী, পুস্তক বিক্রেতা ও বিশেষত শিশু পুস্তক প্রকাশনীগুলি পরিদর্শন করেন। বাংলা দেশের শিশুসাহিত্যের বিকাশ ও তার গতিধারাতে মিসেস বোহানন মুগ্ধ হয়েছেন।

**হাওড়া :**

কয়েক দিন যাবৎ মেথর-ধাঙড় ধর্মঘটের ফলে হাওড়া যে নরককুণ্ডের আকার ধারণ করেছে তা হাওড়ার শিবপুর, কদমতলা, সালকিয়া, ইছাপুর, সাঁতরাগাছি প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে এলেই বোঝা যাবে। এই ধর্মঘটের ফলে এসব অঞ্চলে জঞ্জাল জমে ভাগাড়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোথাও কোথাও খাটা পায়খানার পূতিগন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে হাওড়া এক নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মিবৃন্দ ও উড়িষ্যা থেকে আনীত কিছু ধাঙড় হাওড়ার এই মলমূত্র নিষ্কাশনের চেষ্টা করছেন, কিন্তু সে চেষ্টা যে সাগরে বিন্দুবৎ তা বোধহয় বলা বাহুল্য।

হাওড়ার এই শোচনীয় অবস্থার কথা জেনেও ধাঙড় নেতৃবৃন্দরা চুপ করে আছেন। তাঁরা এ বিষয়ে কোন গা করছেন না। অপর দিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ সমূহ সর্বনাশ জেনেও ধাঙড়দের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনায় রাজী হচ্ছেন না। ফলে সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। আমরা বলতে চাই, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ হোক কিংবা পৌরকর্তৃপক্ষই হোক—হাওড়ার ছ' লক্ষ অধিবাসীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে তা তাঁরা বলবেন কি? গরম পড়ে গেছে। এমনিতেই গরমের দিনে হাওড়া শহরে মহামারী সুরু হয়। বসন্ত কলেরার রাজত্ব সুরু হয় হাওড়ার ঘিঞ্জি অঞ্চলে। এর মধ্যেই হাওড়ার কয়েকটি ঘনবসতি অঞ্চলে বসন্ত সুরু হয়েছে। হয়তো কলেরাও সুরু হবে। হাওড়াকে পরিষ্কার রেখে এখানকার পৌরকর্তৃপক্ষ এইসব সংক্রামক রোগের হাত থেকে এই শহরকে বাঁচাতে পারেন নি। এবার অবস্থা অন্যরূপ। হাওড়া শহর জঞ্জালের স্তূপ—মলমূত্রের ভাগাড়। এখনও অবস্থা কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে আছে। এখনই উপায় নির্ধারণ করলে হয়তো হাওড়া শহরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে। যদি হাওড়াতে একবার সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সুরু হয়, তবে হাওড়ার প্রতিবেশী শহর কলকাতাতেও যে এর প্রতিক্রিয়া সুরু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া থাকতে পারে কিন্তু সে দাবী আদায় করতে ছ' লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন করতে হবে কিংবা পৌরসভা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত প্রেস্টিজ রক্ষার হেঁয়ালিতে পৌরজনের প্রাণ নিয়ে খেলা করবেন তা হতে পারে না। দরকার হলে সরকার হাওড়া পৌরসভাকে বাতিল করে এডমিনিষ্ট্রেটারের সাহায্যে এ দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাবেন কিংবা জরুরী আইন প্রয়োগ করে শ্রমিকদের কাজে নামাতে বাধ্য করবেন, এটাই হাওড়ার সাধারণ মানুষের দাবী। শ্রমিকদের বোঝা উচিত মানুষের প্রাণধারণের সুযোগ সুবিধাগুলিকে বানচাল করে নিজেদের বাঁচার আন্দোলন কখনও জোরদার হয় না—তাই হাওড়ার মেথর-ধাঙড়দের দাবী-দাওয়ার প্রয়োজনকে স্বীকার করলেও হাওড়াবাসী এই অবাঞ্ছিত ধর্মঘটকে কোন মতেই সমর্থন করছে না। অপর দিকে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবন নিয়ে পৌরকর্তৃপক্ষের এই অবহেলাও নগরবাসীর কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে।

**২৪ পরগণা :**

কাঁকিনাড়া স্টেশন আজ আর আগের যুগে নেই। অনেকেই হয়তো জানেন না এটি বর্তমানে একটি স্পেশাল ক্যাটাগরির স্টেশন। তা ছাড়া নৈহাটি স্টেশন ইয়ার্ডের সদর দরজাও এই কাঁকিনাড়া স্টেশন। দেশ ভাগের পর এই স্টেশনটির গুরুত্ব আরো বেড়েছে, কারণ এই স্টেশনের সন্নিহিত মাদরাল-নারায়ণপুর অঞ্চলে বহু পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষ তাঁদের বসতি স্থাপন করেছেন। ফলে এই অঞ্চলের লোকবসতি বেড়ে গেছে এবং আর্থিক ও সামাজিক বনিয়াদ আরও শক্ত হয়েছে। এর মধ্যেই নারায়ণপুর অঞ্চলে একটি বালকদের ও একটি বালিকাদের উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া মাদরালে একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে মাদরালে একটি বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হয়েছে এবং এই বৌদ্ধমন্দিরকে কেন্দ্র করে এ স্থানে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া এ অঞ্চলের জয়চণ্ডীর মন্দির বহু প্রাচীন কাল থেকে একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। প্রতি বছর দোলের সময় এখানে মেলা বসে। বহু স্থান থেকে ধর্মার্থী হিন্দু নরনারী এই সময় জয়চণ্ডীতে আসেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতসব থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের দু'টি প্রধান রাস্তা কাঁকিনাড়া-আমডাঙা ও কাঁকিনাড়া-মাদরাল বা মাদরাল-নারায়ণপুর অঞ্চলের একমাত্র যাতায়াতের পথ তা সংস্কারের অভাবে সম্পূর্ণভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কত কটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হলেও এই দু'টি রাস্তা সংস্কারের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। অথচ এই দু'টি পথ দিয়েই এ অঞ্চলের শাকসব্জী বাইরে যায় এবং বাইরের জিনিষ গ্রামে আসে। যদি অবিলম্বে এই দু'টি রাস্তার সংস্কার না হয়, তবে আগামী বর্ষায় এ অঞ্চলের লোকের খুবই অসুবিধা হবে। এ বিষয়ে

জেলা বোর্ডের কাছে স্থানীয় অধিবাসীরা বহুবার আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হয়েছেন। অবিলম্বে সরকার এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং আগামী বর্ষার পূর্বেই আলোচ্য রাস্তা দু'টির সংস্কারের দিকে নজর দেবেন এটা আশা করা কি অন্যায় হবে?

**হুগলী :**

হুগলীর ধনিয়াখালী গ্রামে বিজলী বাতি নিয়ে যে প্রহসন চলছে তাতে সাধারণ গ্রামবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ধনিয়াখালীতে বহু দিন হয়ে গেল বিজলী সরবরাহের জন্য খুঁটি পুঁতে তার লাগানো হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সব কিছু হয়েও এখনো ধনিয়াখালীতে বিজলীর আলো ফোটে নি। ধনিয়াখালীর রাস্তায় আলো না জ্বললেও এ অঞ্চলের একজন বিশেষ ব্যক্তির গৃহে আলো জ্বলছে দেখে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন সুরু হয়েছে। রাস্তার বেলায় বিজলী সঙ্কট, জরুরী অবস্থার দোহাই দিলেও সেই লাখপতির গৃহে যে বিজলীর চমকের মধ্যে হাজারী দেড় হাজারী সেবকদের আপ্যায়ন হচ্ছে; ভূরিভোজের আসর বসছে তাতে যে বিজলীর শ্রাদ্ধ হচ্ছে এটা ধনিয়াখালীর সাধারণ মানুষেরা বোঝেন না—যদি কর্তৃপক্ষ তা ভেবে থাকেন তবে তাদের জানাতে চাই, সাধারণ লোকেরা অজ্ঞ সেই যুগ আর নেই। আশা করি পশ্চিমবঙ্গের ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। ধনিয়াখালীর এই বিজলী প্রহসন শেষ হোক। তা না হলে এই প্রহসনের খরচ সরকারকে জনসাধারণের বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা ও বিক্ষোভের ফসল কুড়িয়েই দিতে হবে।

* * *

হুগলী জেলার ডি-ভি-সি'র খালে এখন জল থৈ থৈ করছে। এই জল এখন নদী আর খালের দু' পাশের পতিত জমিতে থৈ থৈ করছে দেখে চাষীরা অবাক হচ্ছেন। অবাক হচ্ছেন ডি-ভি-সি'র জলের এই অপচয় দেখে। এই জল ধরে রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে ছাড়লে এই জেলার হাজার হাজার বিঘায় বোরো চাষ হতে পারতো। চৈত্র মাসে ছাড়লে পাট চাষ হতে পারতো আমন জমিতে দোফসলা হিসেবে। কিন্তু চাষীদের অভিযোগ হচ্ছে যে, প্রয়োজনের সময় ডি-ভি-সিতে জল চেয়ে পাওয়া যায় না। আবার যখন প্রয়োজন নেই তখন ডি-ভি-সি অঢেল জল দিয়ে পতিত জমিকে জলের সাগরে পরিণত করেন। ডি-ভি-সি'র কর্মকর্তাদের এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কোন যোগ্য কারণ খুঁজে পান না চাষীরা। গত বছর তারকেশ্বরের আকনাপুর এলাকায় বোরো ফসল হয়েছিল ৭০ বিঘার স্থলে হাজার বারশো বিঘায়। এ অঞ্চলের চাষীরা পরীক্ষামূলকভাবে এ অঞ্চলে বোরো চাষ করছেন এবং এতে সফলও হচ্ছেন অনেক পরিমাণে। সরকার যদি ডি-ভি-সি মারফত উপযুক্ত সময়ে চাষীকে জল সরবরাহ করেন, তবে তাঁদের এই উদ্যোগ নিশ্চয়ই আরো সফল হবে। আশা করি, সরকার ডি-ভি-সি'র কার্যোদ্যোগ সম্পর্কে সতর্ক হবেন এবং ডি-ভি-সি'র কার্যকলাপ যাতে চাষীদের কাছে জনপ্রিয় হয় তার প্রতি নজর দেবেন।

**পশ্চিম দিনাজপুর :**

করণদীঘি থানার অন্তর্গত বিলাসপুর গ্রামে একটি হিন্দুনারী (হরিজন) মুসলমান মনিবের বাড়িতে তার মজুরী আনতে গেলে কতিপয় মুসলমান দুর্বৃত্ত বলপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে এবং লাঞ্ছিত করে। উক্ত সংবাদ পেয়ে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়স্বজন এর প্রতিবাদ করতে গেলে দুর্বৃত্তগণ তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে। ফলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির উপক্রম হয়। উত্তরবঙ্গের সাপ্তাহিক পত্র 'জনমত'-এর সংবাদে আরো প্রকাশ যে, উক্ত বিলাসপুর ও রাঘবপুর এই থানার বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। পাক-ভারত সীমান্ত এখান থেকে বেশী দূরে নয়। বলা যায়, উক্ত গ্রাম দু'টি পাক অনুপ্রবেশকারীদের গোপন ঘাঁটি। সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী সকল প্রকার কার্যকলাপেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অভ্যস্ত।

শুধু দুর্বৃত্তদের ধরে আদালতে চালান দিলেই এই সীমান্ত সমস্যার সমাধান হবে না। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের কলকাঠিকে সমূলে ধ্বংস করতে গেলে আমাদের আরো সবল হাতে এই রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশের অশান্তি-সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তদের দমন করতে হবে। রাষ্ট্রদ্রোহী,—সংখ্যাগুরুই হোক, আর সংখ্যালঘুই হোক যে দেশের সুস্থ নাগরিক নয়, এই সহজ কথাটা সরকার যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল।

**স্মরণে : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য**

প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী সুখলাল কারনানী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে 'অন্ত্যেষ্টি,' 'তীর ও তরঙ্গ,' 'বন্ধনহীন গ্রন্থি,' 'তথাপি', 'ছোট-বড়-মাঝারী' ও 'সবার সাথে' উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি গল্প-সংকলন চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি আহেরী ও অগ্রণী পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'তথাপি,' ও 'ছিন্নমূল' বাংলা ভাষায় ও 'পরিচয়' হিন্দী ভাষাতে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে একসময় বাংলা দেশের সুধী-সমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল।

স্বর্ণকমলের এই নীরব মৃত্যু বাংলা দেশের সুধীসমাজের কাছে নিশ্চয়ই এক মর্মান্তিক সংবাদ তাতে সন্দেহ নেই। স্বর্ণকমলের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক দরদী হৃদয় সাহিত্যসেবীকে হারাল। আমরা স্বর্ণ-কমল ভট্টাচার্যের এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক বোধ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের বেদনায় আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

# লণ্ডনের চিঠি

● লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীর বাহ্যদৃশ্য। সামনে ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারা।

**অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়**

## ন্যাশনাল গ্যালারী

লণ্ডনে ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঠিক সামনের দিকে ন্যাশনাল গ্যালারীর বিরাট বাড়ি। এমন অপরূপ, আর এমন বিরাট আর্ট গ্যালারী পৃথিবীতে তিন-চারটির বেশী নেই। ট্রাফালগার স্কোয়ার সামনের দিকে আর পেছন দিকে অরেঞ্জ ষ্ট্রীট, বাঁ দিকে সেণ্ট মার্টিনস্ প্লেস আর ডান দিকে সুইটকম্ব ষ্ট্রীট---এই চৌহদ্দির ভেতর পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে লণ্ডন শহরের দু'টি অনবদ্য কলা-নিকেতন--ন্যাশনাল গ্যালারী আর ন্যাশনাল পোরট্রেট গ্যালারী।

লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীর প্রথম-পত্তন হয় ১৮২৪ সালে আর বর্তমানের এই বিরাট বাড়িটি গড়ে ওঠে ১৮৩০ সালের অব্যবহিত পরে। ১৮৩০ সালের পরেই ন্যাশনাল গ্যালারী এখন যেভাবে রয়েছে, প্রায় সেইভাবে গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পীদের অনেক ঐতিহাসিক চিত্র যে সব চিত্র সম্পর্কে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর দেশে দেশে আলোচনা হয়েছে, গবেষণা হয়েছে, অনুশীলন হয়েছে---সেই সব মূল ছবি এই গ্যালারীতে রয়েছে। দু' হাজারেরও বেশী মূল ছবি আছে এই গ্যালারীতে। এই গ্যালারীর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত আশ্চর্য সুন্দর ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তার খুবই ভালো সংগ্রহ রয়েছে এখানে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের নানা অঞ্চলে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশে যত উচ্চাঙ্গের ছবি অঙ্কিত হয়েছে, তাদের অভিনব সংগ্রহও এই গ্যালারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতালীয় চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির দু'খানি মূল চিত্র---একটি কার্টুন চিত্র আর একটি বিখ্যাত এক ঐতিহাসিক চিত্র---Virgin on The Rocks---এই গ্যালারীতে রয়েছে। স্পেন দেশের শিল্পী ভেলাসকোয়েজ ও ডাচ শিল্পী রেমব্রাণ্ট-এর অনেকগুলো মূল ছবি আছে এই গ্যালারীতে। নেদারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধতম চিত্রশিল্পী জ্যান ভেন আইক-এর তিনটি মূল ছবি---তার মধ্যে একটি সেই বিখ্যাত বহুবিদিত শ্বেত প্রতিকৃতি চিত্র---আর্নলফিনি ও তাঁর স্ত্রীর প্রতিকৃতি---এখানে রাখা আছে। ইতালীর আর একজন পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উচেনো-র দু'খানি মূল ছবিও আছে এখানে। পৃথিবীর ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ শিল্পী গয়ার পাঁচখানি মূল চিত্র এই গ্যালারীতে ছিল। তার মধ্যে একখানি চিত্র ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের প্রতিকৃতি, যা সমস্ত পৃথিবীর চিত্র-ভাণ্ডারের একটি বিশিষ্ট সম্পদ, সেই প্রতিকৃতিটি গত ১৯৬১-র আগষ্ট মাসের এক সন্ধ্যাবেলা এই গ্যালারী থেকে চুরি যায়। লণ্ডনের পুলিশ কর্তৃপক্ষ সেই চিত্রের চোর ধরার জন্য কত চেষ্টা করেছেন, আজো করছেন, কিন্তু এখনো চোর ধরা পড়ে নি। ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের এই প্রতিকৃতিটি গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। বৃটিশ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বৃটেনের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রতিকৃতি চিত্রশিল্পী রেনল্ডস ও গেইনস্বরোর অনেকগুলো ছবি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট শিল্পী উইলসন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট শিল্পী কনষ্টেবল এবং টার্নারের অনেকগুলো উচ্চাঙ্গের ছবি এই গ্যালারীতে রয়েছে। এই গ্যালারীতে চিত্রশালার কক্ষ সবশুদ্ধ ৩৮টি আর যে সব চিত্র জনসাধারণের দেখবার জন্য নয়, এমন ধরণের চিত্রাবলী রাখা হয়েছে ৯টি স্বতন্ত্র কক্ষে। প্রতিদিন পৃথিবীর দেশ-বিদেশের বহু উৎসাহী দর্শক এই গ্যালারী দেখতে আসেন।

লণ্ডনের ন্যাশনাল পোরট্রেট গ্যালারীর প্রথম পত্তন হয় ১৮৫৬ সালে। বৃটিশ জাতির ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের প্রতিকৃতি এই গ্যালারীতে রয়েছে। এই গ্যালারীর যখন পত্তন হয়, তখন এদেশে ফটোগ্রাফীর মাত্র প্রথম যুগ; কোন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির খুবই চমৎকার তৈলচিত্র তৈরি করা হয়ে থাকে সাধারণত ফটোর ওপর ভিত্তি করে। পোরট্রেট গ্যালারী গড়ে তোলার জন্য যখন সেই যুগে এদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের তৈলচিত্র তৈরি করা ও সংগ্রহ করা সুরু হয়, তখন দেখা গেল ফটোগ্রাফী যথেষ্ট

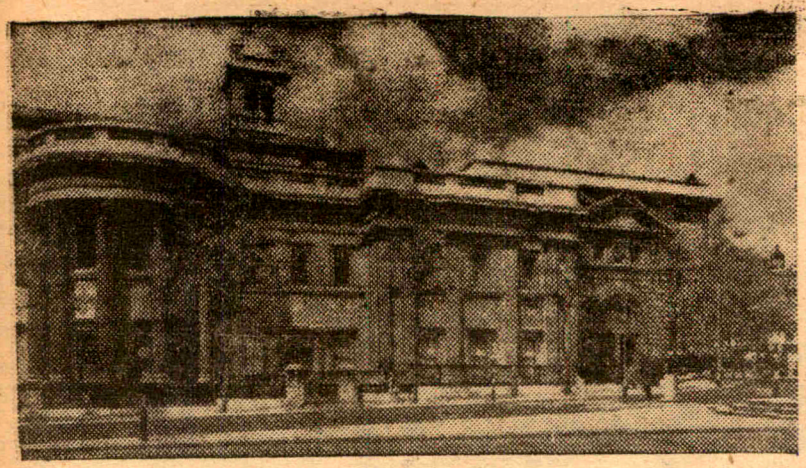

লণ্ডনের ন্যাশনাল পোরট্রেট গ্যালারীর সুরম্য ইমারত। এই বাড়িটির নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৮৯৬ সালে। বাড়িটির গঠন-পরিকল্পনা করেছিলেন বিখ্যাত স্থপতি ইউয়ান ক্রিশ্চিয়ান।

ওঠে নয় বলে শুধুমাত্র ফটোর ওপর ভিত্তি করে তৈলচিত্র তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। জর্জ সার্ফ নামে এক তরুণ অঙ্কন-শিল্পী তখন ফটোগ্রাফী ছাড়াই ছবহু যাতে ব্যক্তি বিশেষের চেহারা হাতে স্কেচ ক'রে আঁকা যায়, সেই ব্যবস্থা সুরু করলেন। অসাধারণ অঙ্কন-শিল্পী ছিলেন জর্জ সার্ফ, অবিকল ফটোগ্রাফীর মতো নিখুত করে যে-কোন মানুষের মুখ, চেহারা হাতে আঁকতে পারতেন। ন্যাশনাল পোরট্রেট গ্যালারীতে সাজানোর জন্য সে যুগে অধিকাংশ তৈলচিত্রই অঙ্কন করা হয় জর্জ সার্ফ-এর হাতে আঁকা স্কেচগুলোর ওপর ভিত্তি করে।

এত বৃহৎ আর এমনি বিচিত্র ধরণের প্রতিকৃতি চিত্রশালা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বৃটেনের রাজা ও শাসক, ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক নেতা, কবি লেখক যোদ্ধা সেনাপতি, বিভিন্ন রাজ-পরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, বিশপ, ব্যারণ, লর্ড ডিউক প্রভৃতির যত ছবি যেখানে যেখানে যেকালে পাওয়া সম্ভব ছিল, সেই সমস্ত এক সঙ্গে একটি আর্ট গ্যালারীতে সাজিয়ে রাখার পরিকল্পনা থেকে এই গ্যালারীর সূত্রপাত। ১৮৫৬-র ৪ঠা মার্চ হাউস অব লর্ডসের এক বিশিষ্ট সদস্য ফিলিপ হেনরী—যাঁর পরবর্তী নাম পঞ্চম আর্ল ষ্ট্যানহোপ—হাউস অব লর্ডসের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ: 'মহারাণীর কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, মহারাণী যেন বিবেচনা করে দেখেন বৃটেনের ইতিহাসে যে-সব ব্যক্তিরা অসাধারণ প্রখ্যাতনামা, তাঁদের সকলের চিত্রাবলী একটি গ্যালারীতে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন করা হয়।' মহারাণী তখন ভিক্টোরিয়া।

প্রস্তাবটি সেদিন পেশ করা হলেও এই ধরণের গ্যালারী গড়ে তোলার সঙ্কল্প ষ্ট্যানহোপের ছিল বহুকাল পূর্ব থেকে। এর দশ বছর আগে ১৮৪৬ সালে ষ্ট্যানহোপ হাউস অব লর্ডসে প্রথম এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ১৮৫২ সালে পরে আর একবার ষ্ট্যানহোপ এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তখন বিখ্যাত বৃটিশ রাজনীতিবিদ ডিসরেলী ছিলেন চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার। সেই সময়ে ডিসরেলী প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তারও অনেক আগে ১৮৩১ সালের ২৯শে মে রবিবার—ষ্ট্যানহোপের বয়স তখন মাত্র ২৬—ষ্ট্যানহোপ লর্ড মেকলের সঙ্গে লণ্ডনের হল্যাণ্ড হাউসে এক সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার আহার করছিলেন, তখন এই মহান উদ্দেশ্যে ষ্ট্যানহোপকে উদ্বুদ্ধ করেন লর্ড মেকলে। ট্রাফালগারের যুদ্ধের বছরে ষ্ট্যানহোপের জন্ম। ষ্ট্যানহোপ ছিলেন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা আর খুব ভালো ঐতিহাসিক।

এই গ্যালারীর প্রথম প্রত্তন হয় লণ্ডনের ২৯নং গ্রেট জর্জ ষ্ট্রীটের তিনতলার কয়েকটি কক্ষে। ১৮৫৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ বাড়িতেই গ্যালারীতে সংগৃহীত সমস্ত তৈলচিত্রগুলো জনসাধারণের জন্য খোলা রাখা থাকতো। ১৮৬৯ সাল নাগাদ আরো জায়গার দরকার দেখা দিল, তখন সাউথ কেনসিংটনে ডিপার্টমেণ্ট অব সায়েন্স এ্যাণ্ড আর্ট-এর একটি বিভাগে অনেকগুলো তৈলচিত্র সরিয়ে নেওয়া হ'ল। পরে সেখানে আবার দেখা দিল আগুন লাগার ভয়, তাই বেথনাল গ্রীন-এর মিউজিয়ামে তখন ঐ তৈলচিত্রগুলো আবার স্থানান্তরিত করা হল।

১৮৭৮ সাল থেকে গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সুরু করলেন যে, গ্যালারীর জন্য নিজস্ব বাড়ি চাই: দিন দিন সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, প্রতি বছরই আরো কত ছবি এসে জড় হচ্ছে, নিজস্ব বাড়ি না হলেই চলবে না। গ্যালারীর জন্য নিজস্ব বাড়ি তৈরির প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। ১৮৮৯ সালে বৃটেনের এক দানবীর গ্যালারীর নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার জন্য অনেক টাকা দান করতে এগিয়ে এলেন। এই দানবীরের নাম ডবল্যু এইচ আলেকজাণ্ডার।

এখন ন্যাশনাল পোরট্রেট গ্যালারী যে বাড়িটিতে রয়েছে, সেই বাড়ির উদ্বোধন হয় ১৮৯৬ সালে। এই বাড়িটি বৃটিশ জাতির প্রতি সেই দানবীরের দান। এই বাড়ি আরো সম্প্রসারণের জন্য ১৯৩৩ সালে লর্ড ডাভিন অনেক টাকা দান করেন। লর্ড ডাভিনের দানের ফলে ১৯৩৩ সালে এই বাড়ির বিরাট পশ্চিম দিকের ব্লকটি নির্মিত হয়।

এই গ্যালারীতে সযত্নে রক্ষিত পোরট্রেটের সংখ্যা চার হাজার তিনশ', আর এই গ্যালারী বাড়ির একতলায়, দোতলায় সবশুদ্ধ ৩৯টি বিরাট কক্ষে পোরট্রেটগুলো সযত্নে সাজানো রয়েছে।

সুশীল রায়

# অনলআয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তারিণী দেবী। অদূরে ঐ মন্দিরে স্থাপিত তাঁর বিগ্রহের নাম মনে-মনে জপ করে, তিনি মনে-মনেই তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।

পাইক-বরকন্দাজেরা ফটকের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রামমোহনকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে দেখে তারা চমকিত হয়ে উঠল।

রামমোহন বললেন, পাল্‌কী উঠাও।

দেখতে-না-দেখতে উঠে পড়ল পাল্‌কী। কোন্ দিকে যেতে হবে? জানতে চাইল বেয়ারারা।

রামমোহন বললেন, ফিরে চল। যে-পথে এসেছ, সেই পথে।

দপ্তরে সেই ডিগবি সাহেব, সান্ধ্য বৈঠকে সেই হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামী আর স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী। তিন সপ্তাহ বাদে ফিরে এসেছেন রামমোহন, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর মুখের ভাবে যেন পরিবর্তন এসে গেছে অনেকটা। চিবুকের ওপর যেন দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

এ-পরিবর্তনের কারণ জেনেছেন সকলেই। সকলের সহানুভূতি থাকলেও সমর্থন যেন নেই সকলের। সংস্কার বলে তো একটা কথা আছে। সে জিনিষ গায়ের চামড়ার মতই অনেকটা —বর্জন করা কঠিন।

এইজন্যে রামমোহনের যুক্তি তাঁরা মানছেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায়কে স্বীকার করে নিতে যেন বাধছে।

হরিহরানন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। রাঙাবাস পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত ঐ মানুষটির মুখের দিকে তাকান রামমোহন।

এই মানুষ তান্ত্রিক বামাচারী। এই আসরে এঁরই পাশে বসে আছেন জন-কয়েক মাড়োয়ারী জৈন ব্যবসায়ী। এঁদের সঙ্গে জৈনধর্ম নিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে রামমোহন কল্পসূত্র অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

তা নিন। তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। শান্তি নেই নানা কারণে। মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যে-শপথ করে এসেছেন তা পালন করার জন্যে তাঁকে যদি প্রস্তুত হতে হয়, তাহলে রংপুরে থাকলে তা হবে না। চাকুরিটার ওপর মায়া কমে গিয়েছে আগে থেকেই, এখন ক্রমশই সে-মায়া আরো শিথিল হয়ে আসছে। তার ওপর, অশান্তির আরও কারণ ঘটাচ্ছেন দেওয়ান গৌরীকান্ত। তিনি নাকি রামমোহনের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে তুলছেন কতকগুলো বদলোককে। ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবাদ প্রচারের অধিকার সকলেরই থাকা উচিত, গৌরীকান্ত কেন-যে তা ব্যক্তিগত আক্রোশ মনে করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছেন, বোঝা কঠিন।

এইভাবে দিন কাটছে একে একে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে চলেছে ক্রমশ। ক্রমশ বছরও কেটে গেল।

বছর তো অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রামমোহন অগ্রসর হতে পেরেছেন কতখানি? তাঁর শপথ রক্ষার জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন কতটা? মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। রংপুর পরিত্যাগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি; মনে হয়, প্রকৃত কর্ম-ক্ষেত্র থেকে দূরে বসে থাকলে প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র যেন তিনি পাবেন না।

বিষয় কার্যেই তিনি এখানে লিপ্ত আছেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কাজ তিনি বিস্মৃত হন নি। প্রত্যহই সন্ধ্যার অবসর কেটে যাচ্ছে ধর্মালোচনা করে ও শাস্ত্রীয় তর্ক করে। এর দ্বারা হয় তো প্রত্যহই তিনি তাঁর অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হতে পারছেন —এক এক সময় নিজের উপর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তিনি এই রকম ভাবেন।

ভাবেন, এ বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে যেতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু ডিগবি সাহেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় আবদ্ধ হয়ে আছেন বলেই হয় তো ছেড়ে আসতে পারেন না রংপুর।

কলকাতায় আসার জন্যে তিনি বিশেষ ব্যাকুল হয়েছেন। মনে-প্রাণে তিনি কলকাতাকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছেন। কিন্তু এই শহরের অবস্থা কেমন? এখানকার জল আবহাওয়া তাতে এই স্থানটি তাঁর কর্মের জন্যে প্রশস্ত কি-না, কে বলবে।

চারদিকে কেমন ক্লেদ আর গ্লানি। পথ-ঘাটের অবস্থাও যেমন সমাজের অবস্থাও তেমনি। রাস্তার দু-পাশে খাড়া খাড়া নালায় পচা জল নোংরা হয়ে জমে মশার বাসা তৈরি করেছে, জঞ্জালে জঞ্জালে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছির ঝাঁক। দিনে মাছি, রাতে মশা। পথঘাট তৈরি হবে হচ্ছে করেই সময় কেটে চলেছে। বৌবাজারের বুকে নেবুতলা থেকে একটা রাস্তা পটলডাঙ্গার গা দিয়ে পুবদিকে সোজা চলে এসে মিশেছে মাণিকতলার কাছে। শিয়ালদার কাছে বৈঠকখানা থেকে সার্কুলার রোড টেনে মাণিকতলা পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা হয়ে আছে কিছুকাল হ'ল, কিন্তু এখনো জায়গাগুলো বন-বাদাড়ে আর খান-খন্দেই ভরে আছে। পোস্তা থেকে চিৎপুর ভেদ করে যে রাস্তাটা শিয়লে পার হয়ে মাণিকতলা পর্যন্ত সটান চলে গেছে তার অবস্থারও কোনো উন্নতি হয় নি। শুকনোর দিনে ধুলো, বর্ষার দিনে কাদা।

আর, পাড়ায় পাড়ায় চলেছে আখড়াই ও হাফ আখড়াই। নন্দোৎসবের কীর্তনে আর দোলযাত্রার আবিরে মগ্ন হয়ে আছে সকলে। বুলবুলির লড়াই আর ঘুড়ির খেলা ধনীনন্দনদের আনন্দের উপকরণ।

ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণদের মহোৎসব চলেছে বলা যায়। তাঁরা তাঁদের পাদোদক ও পদধূলি দিয়ে ধনোপার্জন করে চলেছেন। তাঁরা নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এমন নিপুণ-ভাবে যে, তাঁদের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও অর্থ উৎসর্গ করলেই ইহলোকের সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

যুবকেরা বীণ, সেতার, তবলা ও গণিকা নিয়ে মহা আনন্দে দিনপাত করে চলেছে। কৃষ্ণযাত্রা আর কবির লড়াইও তাদের কাছে বড়ই শখের আর সুখের জিনিষ।

এইভাবে কাটছে কলকাতার দিন। এমনি একদিন সকালবেলা ছাতুবাবুর লোক ঘোড়া নিয়ে ছুটে চলেছে শোভাবাজারের দিকে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ছে পথের ধুলো।

রাজা রাজকৃষ্ণের গৃহের সিংহ-দরজার সামনে দাঁড়াল এসে সেই অশ্বারোহী দূত।

ঘোড়া থেকে নেমে দারোয়ানকে সে বলল, রাজাবাহাদুরকে খবর দাও—হরুঠাকুর মারা গিয়েছেন।

কবির দলের পৃষ্ঠপোষক বলে তাঁর পিতা নবকৃষ্ণের মত রাজা রাজকৃষ্ণের খ্যাতি ও খাতির আছে; তাই তাঁর কাছেই খবরটা এল প্রথম।

এখানে প্রথম খবর আসতেই, অবিলম্বে চারদিকে ছড়িয়ে গেল সে-সংবাদ—চড়কডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে কাঁটাপুকুর পর্যন্ত, বাদুড়বাগান, নেবুতলা, গোয়াবাগান, হরীতকী বাগান, ঠনঠনিয়া, শাঁখারিপাড়া সর্বত্র। নদীর স্রোত পার হয়ে ওপারেও—ভাগীরথীর পশ্চিম কিনারে।

চুঁচুড়ার কানাগিন্নি হালদার বাড়ির ফটক পার হয়ে হন হন করে ছুটছে। কি একটা দুঃসংবাদ বহন করে যেন সে চলেছে রায় বাড়ির দিকে। সংবাদটার গুরুত্ব হয় তো ততটা বোঝে নি, কিন্তু হালদার মশাইয়ের পুত্র নীলরতনবাবুর হালচাল দেখে তার মনে হয়েছে খবরটা খুব বড়। খুবই মর্মাহত হয়েছেন তিনি, কানাগিন্নি স্বচক্ষে দেখে এসেছে। যে-খবর সে নিজে পেয়ে গেছে, সে-খবরটা আর পাঁচজনকে না জানালে যেন শান্তি নেই।

রায় বাড়ির পাকা উঠোনে পা ফেলতে ফেলতে সে উঠে এল রোয়াকে, সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলতে লাগল, ওরে চাঁপা, ওরে চাঁপি শুনেছিস খবর?

কানাগিন্নির গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাধা। তার বলার ভঙ্গিতে তার দু-পায়ের চরণপদ্ম বেজে উঠল ঝুম ঝুম করে। জিজ্ঞাসা করল, কি গো গিন্নি, কি খবর, চাঁপা তো আসে নি।

—তা না এল। তাকে দিয়ে আমার কোন্ কাজ?

—কিন্তু কি খবর বলছিলে?

কানাগিন্নি বলল, রামরাম বসু মরেছে, শুনে এলাম ও-বাড়িতে।

রাধা বলল, সে আবার কে গো!

—কে জানে কে। কোর্ট উইলাম কলেজে নাকি পণ্ডিতি করত, শ্রীরামপুরে কেরি সাহেবের নাকি মুন্সি ছিল, অনেক কেতাব নাকি লিখেছে।

রাধা তাকে বুঝি রাধা দিল, বলল, বুঝলাম বুঝলাম। তা, এ-খবর নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন।

কেন ব্যস্ততা, কি করে বোঝাবে কানাগিন্নি। নিজে থেকে আর কি সে ব্যস্ত হয়েছে; নীলরতনবাবু ব্যস্ত হয়ে রওনা হচ্ছেন রামরামের মৃতদেহ দেখতে—তাতেই তার মনে হল বুঝি খুব বড় খবর এটা।

কানাগিন্নি বলল, ও-বাড়ির কাণ্ডই আলাদা। এই তো, দিন-কতক আগে ও-বাড়ির কর্তাবাবুর যে কি শোকের ঘটা। শোভাবাজার থেকে পেয়াদা এসে খবর দিল—হরুঠাকুর মরেছে। খবর শুনেই হুকুম হল, ঘোড়াও বজরা, কলকাতা যাব। বলামাত্র কাজ, ঘোড়া-চড়া চড়িয়ে বুড়োকর্তা রওনা হলেন কলকাতায়।

রাধা বুঝি চমকেই উঠল, বলল, সে কি গো গিন্নি? মরেছে নাকি হরু-ঠাকুর? আমার যে বড় সাধ ছিল গিন্নি, এ-বাড়িতে একবার কবির আসর বসাই। তাদের লড়াই দেখার বড় সাধ আমার। আমার কোনো সাধই কি পূর্ণ হবে না গিন্নি?

কানাগিন্নির আস্ত চোখের পাতা

বুঝি নৃত্য করে উঠল, রাধা নীচু করে রাধার চরণপদ্মের দিকে চেয়ে বলল, হবে গো হবে। সব সাধ পূর্ণ হবে। চাঁপা আসবে না আজ? আলতা যে মুছে গেছে দু' পায়ে, রাঙা করে দেবে না সে?

রাধা হাসল, উত্তর দিল না এ-কথার।

হুগলী-নদীতে স্ফীত হয়ে উঠছে জল, আবার সে-জল নেমে যাচ্ছে ভাঁটার টানে। রাধার বুক দু'টিও আশায় অমনি স্ফীত হয়ে ওঠে, আবার কখন নেমে আসে নিরাশার ভাঁটা, স্তিমিত হয়ে আসে বুকের বাসনা।

এমনি ওঠানামা চলেছে নদীর জল, আর রাধারাণীর বুকের আশা-নিরাশাও অমনি ফুলে ফুলে উঠে আবার দুলে দুলে নেমে যাচ্ছে।

হুগলীতে হঠাৎ উঠল হাহাকার। কি ব্যাপার? কি হল কার?

দেশের আর দশের সেবায় যাবতীয় ঐশ্বর্য উৎসর্গ করে বেহেস্তে নাকি চলে গেছেন হাজি মহম্মদ মহসীন।

দূর-দূরান্তের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি নদীর জলতরঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। দরগায়-দরগায় উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।

চাঁপা বলল, নদীতে লোক ধরে না। কলকাতার ধনীরা বজরা ভাসিয়ে ভাসিয়ে এসে পৌঁছেচে নদীর ঘাটে। ধনীদের এত অস্থির হওয়ার দরকার কি বুঝি না। অধীর হবে গরিব-দুঃখীরা—তারাই উপকার পেত ওই মানুষটার দৌলত থেকে।

রাধা নিশ্বাস ফেলে বলল, ধনীদের বুঝি শখ থাকতে নেই? তারা শখ করে বিয়ে করতে পারে, শখ করে শোক করতে বুঝি পারে না?

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পর পর তিনটে মৃত্যুর খবর শুনল রাধা। এতে বিচলিত সে হয় নি, কিন্তু হয় তো ভাবছে তার নিজের মৃত্যু হয় না কেন। এই দাসী-বাঁদীর অরণ্যে, প্রাসাদতুল্য এই বিরাট অট্টালিকার বাদশাজাদীর এ-ভাবে উপেক্ষিত একটা অসহায় প্রাণীর মত বেঁচে থেকে লাভ কি।

মুরলী আর নবীন মাঝে-মাঝে আসে, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তারা। তাদের মুখের দিকে চেয়ে রাধা ভাবে, কত সুখী ওরা, ওরা কত স্বাধীন। মেয়ে হয়ে না জন্মে যদি সেও ছেলে হয়ে জন্মাতো তাহলে অমনি মনের আনন্দে সেও নিশ্চয় ঘুরে বেড়াতে পারত।

অমনি স্বাধীন একটা জীবন চায় রাধা—অমনি বাধাহীন অমনি বন্ধনহীন, অমনি সহজ, আর অমনি সরল।

রূপনারায়ণের কথা মনে হতেই, বুঝি বিতৃষ্ণায় আর ঘৃণায় ভরে ওঠে মন, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। নিজেকে বুঝি সংযত করার চেষ্টা করে রাধারাণী। আশ্চর্য পুরুষ-মানুষ। নেশা নিয়ে আর বাগানবাড়ির ফুর্তি নিয়ে মেতে আছে লোকটা। তার বাড়ির এই অন্তঃপুরে তারই অপেক্ষায় বসে আছে যে এক প্রাণী—এ কথা তার মনে পড়ে কবে?

নদীর এ পারে এই দীর্ঘনিশ্বাস, কিন্তু ওপার বুঝি শুধু আনন্দের নিকেতন? কলকাতা দেখে নি আজও রাধা, দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। অনেক দিন আগে খেয়া নৌকায় পার হয়েছে নদী, চানকে মামারবাড়ি যেতে। তারপর নদীটাও পার হয় নি, পার হওয়া দূরের কথা—এক দিন নৌকোতেও চাপল না। তা না হয় না হল, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে হয়। সমাজ-সংসার সব জলাঞ্জলি দিয়ে। ওপারে বোধ হয় অনন্ত সুখ।

কিন্তু সুখ হচ্ছে শুঁটকি মাছ, জিভকে ছোটলোক না করলে আর পাওয়া যায় না। রাধা তার চাহিদাকে অনেক ছোট করে নিয়েছে সন্তবত তা না হলে অত সহজে সুখের প্রত্যাশা সে করে কি করে; একটা নদী পাড়ি দিতে পারলেই যদি

অনন্ত সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তাহলে সুখ বড় সুলভ হয়ে যেত সংসারে ; কলকাতার জন্যে লালায়িত হয়েছে রাধা। চাঁপা তার কানে কোনো মন্ত্র দিয়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু রামমোহনকে মন্ত্র দেয় নি কেউ, তিনি নিজেই নিজের মন্ত্রের উদ্‌গাতা। নিজের উচ্চারিত সেই মন্ত্রে তিনি নিজেই মত্ত। এ অনেকটা কস্তুরী-মৃগের মত অবস্থা। তিনি তাই ব্যাকুল হয়েছেন ; তিনি কর্মের ক্ষেত্র খুঁজছেন এখন।

আর মাত্র একটা বছর ঘুরেছে ; সহসা সুযোগ এসে গেল তাঁর ; ডিগবি সাহেব ইংলণ্ড রওনা হলেন ; রামমোহনের মনে হল, তিনি যেন মুক্ত। মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বিষয়-কর্ম পরিত্যাগ করে তিনি পদার্পণ করলেন কলকাতায়।

মাতার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর বছর তিনেক কেটে গেছে। ক্ষুণ্ণ মাতাকে তিনি ক্ষুব্ধ করেছেন ; তাই তাঁর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা কোনো সমাদর পেলেন না। রাধানগরের নিকটেই রঘুনাথপুরে কি দিনমাত্র বাস করে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। মাণিকতলার বাগানবাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন।

এতদিন বুঝি কেবল প্রস্তুতিই চলেছিল, এইবার আরম্ভ হল তাঁর জীবনের কাজ, তাঁর শপথ পালনের ব্রত। তিনি তাঁর ব্রত প্রচারের জন্যে চারটি পন্থা অবলম্বন করবেন স্থির করলেন—পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, কথোপকথন ও আলোচনা-সভা স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করে দিলেন অবিলম্বেই।

তাঁর কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর ভ্রাতৃবধূর সেই করুণ আর্তনাদ। এখনো মনে পড়ছে তাঁর মায়ের নিষ্ক্রিয় সেই মূর্তিটি। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে, আত্মীয় বন্ধুদের এত বড় স্পর্ধা যে, বাড়ির বধূকে নিয়ে গিয়ে তারা অনায়াসে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারে। বাড়ির যে-গৃহকর্তার অঙ্গুলি-নির্দেশে আর চোখের ইশারায় চলাফেরা করে সকলে, যাঁর প্রতিটি কথার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের পদক্ষেপ মেলানো, সেই কুলঠাকুরাণীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, তাঁর নির্দেশ না নিয়ে অত বড় ঘটনা ঘটে গেল, এ কথা মেনে নিতে কিছুতেই পারেন নি রামমোহন—কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

মাণিকতলার বাগানবাড়িতে বসে তিনি তাঁর শপথ পালনের জন্যে তাই প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন নিজেকে।

শাস্ত্র মন্থন করে করে তিনি খুঁজছেন ঐ নির্দেশ, কোথায় আছে সেই বিধানটি—স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ করে আত্মবিসর্জন দিতে হবে নারীদের। বেদ-বেদান্তেই যদি এ বিষয়ে ভট্টাচার্যদের একান্ত নির্ভর তাহলে সেসব পুঁথিতে পরিষ্কার করে এ-বিষয়ে নির্দেশ থাকা সঙ্গত।

ঋগ্বেদের সুক্তটি তিনি দেখেছেন—'আরোহন্ত জনয় যোনিমগ্রে'। এর অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিরা করুন। এই সুক্তটিকে বিকৃত করে না নিলে এর কোনো বিকৃত অর্থ হতে পারে না। এই জন্যই নিশ্চয় রটানো হয়েছে সেই বিকৃতি, করা হয়েছে আরোহন্ত জনয় যোনিমগ্নেঃ।

এই বিকৃতের দরুণ শ্মশানের পুরোহিতদের সুবিধা হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। অগ্নির নাম গন্ধ নাই যে সুক্তিতে, সেখানে অগ্নিকে আনা হয়েছে নিজেদের সুবিধার জন্যেই। অগ্রে বেদীর দিকে অগ্রসর হও ব'লে নির্দেশ দেওয়া আছে ঋগ্বেদে, তাই দাঁড়িয়েছে—অগ্রসর হও অগ্নিতে।

সামান্য একটু পরিবর্তনে অর্থের তফাৎ হয়ে গিয়েছে কতটা। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের মনে পড়ে সেই ইংরেজি প্রবচনটি, যার অর্থ হচ্ছে—একটি সুচের ছিদ্র দিয়ে উট গলে যেতে পারে কিন্তু অমুক কাজটি তার চেয়েও অসম্ভব। সুচের উটের কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও মূল গ্রীক প্রবচন থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে ঘটেছে ঐ বিকৃতি ; এবং সে বিকৃতি সকলে নির্বিবাদে মেনে নিয়ে তাই ব্যবহার করে চলেছে। প্রকৃত-পক্ষে মূলে আছে—একটি সুচের ছিদ্র দিয়ে রজ্জু, গলে যাওয়াও সম্ভব কিন্তু ইত্যাদি। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা খোঁজ করে দেখতে পাবেন, গ্রীক ভাষায় উট আর রজ্জু প্রায় একই ধরণের দুটি কথা। অনুবাদকের অজ্ঞতার জন্যে ঐ অনুবাদটি হয়ে গেছে, সকলে তা মেনেও নিয়েছে। এতে অবশ্য কারো কোনো ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু বেদের উক্তিকে বিকৃত করে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধা করে নিয়েছে নিশ্চয়ই ; সেই সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিয়ে এসেছে কত বড় একটা সর্বনাশ। এক একটা সতীদাহে তাদের প্রাপ্য কত হয় তার খোঁজ নিয়েছেন রামমোহন। সমাজের সর্বনাশই যাদের মূলধন তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই।

গ্রীক প্রবচনের বিকৃতি মেনে নিয়েছে দুনিয়ার মানুষ, বেদের সুক্তির বিকৃতিও তেমনি মেনে নিয়েছে এখানকার অজ্ঞ মানুষেরা। কিন্তু এই অনাচার আর কতদিন এখানে চলবে? এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান তিনি।

ভ্রাতৃজায়া অলকমণির মুখ ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সম্মুখে। সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর মন দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে ; পিতার সঙ্গে এ বিষয় নিয়েও তাঁর মতপার্থক্য ছিল, এ নিয়েও অনেক কথা হয়েছে তাঁর। সেই মনের পর আপন ভ্রাতৃজায়ার নিদারুণ পরিণতির চিত্রটি যতই তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মন ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

শহরের নিভৃত এই কোণে তিনি তাঁর বাসস্থান নির্বাচন করেছেন—এই মাণিকতলায়। আম জাম লিচু কাঁঠাল ও নারিকেলের গাছ দিয়ে সাজানো সুন্দর এই বাগানের প্রায় মাঝখানে তাঁর বাসগৃহ। বিত্ত তাঁর পূর্ব থেকেই কিছু ছিল, কয়েক বছর কোম্পানীর কাজ করে তিনি বিত্ত অর্জন যেমন করেছেন, সঞ্চয়ও করেছেন তেমনি। এখন তাই তিনি বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্নই হয়েছেন। আসবাবে, আলোর ঝাড়ে, গালিচায়, পর্দায় সুসজ্জিত করে নিয়েছেন এই বাগানবাড়ির ঘরগুলি।

এখানে বসে তাঁর চারদফা কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চলেছে।

তখনও স্পষ্ট করে আলো হয় নি, সকাল হয় নি পুরোপুরি। আচকানে, পাগড়ী-টুপীতে আপাদমস্তক আবৃত করে তিনি ফিরে এলেন প্রাতর্ভ্রমণ সেরে। হাঁটতে হাঁটতে উন্মুক্ত মাঠ পার হয়ে শিয়ালদার দিকে চলে গিয়েছিলেন আজ পায়ে-হাঁটা পথ ধরে ধরে—গড়পার, পাশিবাগান, রাজাবাজার পার হয়ে। এই পথ ধরে হাটুরেরা আশপাশের গ্রাম থেকে শাক-সবজি নিয়ে আসে বৈঠকখানায় কিংবা বৌবাজারে।

গৃহে ফিরে প্রশস্ত ফরাসের ওপর জোড়াসন হয়ে বসলেন, পাশের কামরা থেকে হরিহরানন্দ এসে বললেন, কি, বেড়ানো হল?

—হল। শহরের এ দিকটায় কারো দৃষ্টি নেই, তীর্থস্বামী। এখান থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত একটা টানা রাস্তা করে সার্কুলার রোডের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বেশ হয়।

—হাঁটার সুবিধে হয় বুঝি? তীর্থস্বামী এসে বসলেন পাশে, বললেন, ভালোই হয় তাতে, শহরের একটা দীঘাও বাঁধা হয়ে যায়।

রামমোহন বললেন, হবে হয়তো যথাকালে। একটা বড় কাজ তো হয়ে গেল।

—কিসের কথা বলছেন?

—টাউন হল। তৈরি তো হয়ে গেল। সৎ কাজে টাকার অভাব হয় না, তীর্থস্বামী। উদ্যোগ চাই। উদ্যোগ ক'রে লটারি করা হয়েছিল বলেই টাকাটা জুটে গেছে। এখনো আরো লটারির দরকার।

খানসামা চা দিয়ে গেল। চা পান সমাপ্ত করে তিনি উঠে গিয়ে বসলেন পাশের ঘরে। সেখানে ধড়াচূড়া পরিত্যাগ করে কটিবাসে শরীর আবৃত করে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নীচে। ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন অনেকটা। খুরপাই দিয়ে মাটি তুলে তুলে গাছের গোড়া আলগা করে দিচ্ছিল মালী।

রামমোহন বললেন, কিছু লোক লাগাও, রামদাস! বাগানটা পরিষ্কার করিয়ে নাও। অনেক জঞ্জাল জমেছে আম বাগানে। পাতা কুড়ুনিরা বুঝি আর আসছে না?

রামদাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসে বাবু, কিন্তু আসতে দিই না। ডাল ভেঙে নেয়, গাছ জখম করে দেয়।

—তবে তুমি নিজেই ব্যবস্থা কর।

ব'লে তিনি লিচুগাছ দিয়ে ঘেরা নিভৃত স্থানটির দিকে গেলেন। ওখানেই তিনি প্রত্যহ ব্যায়াম করেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ঘরে।

বিশ্রাম করা হয়ে গেলে তিনি এসে বসলেন চিঠিপত্র নিয়ে। যে-গুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক, একে একে তার উত্তর দিলেন।

চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া শেষ হলে তিনি গমন করলেন অন্দরে। বারান্দায় বসলেন জোড়াসন হয়ে। ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে লম্বা চুল। দুই জোয়ান ভৃত্য প্রস্তুতই ছিল, তারা তাঁর সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করতে আরম্ভ করল। তিনি বসে বসে মুগ্ধবোধের সূত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ যেন তৈলমর্দন নয়, তৈলস্নান। এ-যেন তাঁর স্নানের প্রস্তুতি নয়, জ্ঞানার্জনের প্রস্তুতি। তাঁর সর্বাঙ্গে গড়াচ্ছে তেল, ভৃত্যেরা তাদের যথাশক্তি প্রয়োগ করে সে-তেল বসিয়ে দিচ্ছে তাঁর শরীরে।

অনেকক্ষণ এই তৈলচর্চার পর রামমোহন তাঁর পূর্ণ দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে একটু নেমেই বালকের মত লাফ দিয়ে পড়লেন বিশালাকৃতি জলের টবে।

ঘণ্টাখানেকের মত নিশ্চিন্ত। স্নানের সঙ্গে সঙ্গে আরবি পার্শি ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি চলবে। তার আগে তিনি উঠবেন না ঐ টব থেকে। ওখান থেকে উঠে এসে বসবেন আহারে। তার আয়োজন প্রায় সমাপ্ত। কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি পেতে, তার পার্শে ঝারপোষ দিয়ে গেলাসের জল ঢেকে রাখা হয়েছে। কাগজপত্র নিয়ে গোলকদাস নাপিতও তৈরি হয়ে আছে, আহারের সময় তাঁকে পড়ে পড়ে শোনাবে।

ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল, দুধ—সবই তৈরি আছে। তিনি এসে বসলেই তাঁকে দেওয়ার জন্যে খানসামারা অপেক্ষা করছে।

যথারীতি আহার সমাপ্ত করে, গোলকদাসের কাছে যাবতীয় সংবাদ শুনে, তিনি ঘরে গিয়ে শরীর টান করে শুয়ে পড়লেন দীর্ঘ টেবিলটার ওপর। একটা চাদরও বিছানো নেই টেবিলে। ঐ কাঠের ওপর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে বিশ্রাম করে তিনি উঠলেন। পড়ার ঘরে গিয়ে তিনি বসলেন। কাগজ-কলম নিয়ে তিনি বসেছেন মনোনিবেশ সহকারে বেদান্ত অনুবাদে।

ক্রমশঃ

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত কাহিনী বিচিত্র

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

॥ পাঁচ ॥

'সমর বাবাজীর চাকরীটা হয়ে গেলই শুভদিনে শুভক্ষণে লাগিয়ে দাও, আর কি ?'

বটকেষ্টর প্রস্তাব শুনে সমর অপ্রস্তুত। সে জীবনে কাউকে প্রতারণা করে নি। বটকেষ্ট-নন্দিনীর প্রণয় গ্রহণ তার পক্ষে অসম্ভব। একথা সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। বটকেষ্ট সমরের স্পষ্টবাদিতায় আরও বেশী আকৃষ্ট হয়।

—'এই রকম চরিত্রবান সত্যবাদী ছেলেই তো আমি খুঁজছি নৃপেনবাবু। বিয়ে করব না সবাই বলে থাকে। চণ্ডীর মা'র সাথে যখন আমার বিয়ে ঠিক হয়, তখন আমি কি লাফিয়ে পড়েছিলাম 'আমার বিয়ে' বলে ? আমিও বলেছিলাম, বিয়ে করব না। সে আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজ ? আজ সেই চণ্ডীর মা ছাড়া একটি মুহূর্ত আমার কাটে না। সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যাই বল নৃপেনবাবু, এ ছেলে যেন হাতছাড়া না হয়। যখন আমার সঙ্গে কোম্পানীর অফিসে যেতে চায় না তখন একাই যেতে দাও। ওর ঠিক হয়ে যাবে। তবে ঐ এম-এ পাশ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কথাগুলো যেন চেপে যায়। ওগুলো বললে জানোই তো বড় সাহেবরা একটু ভয় পেয়ে যান।' আজ আসি বলে, করজোড়ে নমস্কার করে বটকেষ্ট সচণ্ডী মেসবাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

নির্ধারিত সময় মতন সমর কোম্পানীর অফিসে ইণ্টারভিউ দিতে যায়। দু'চারজন লোকের ইণ্টারভিউ-এর পরই তার ডাক পড়ে।

অত্যন্ত আদর করে তাকে চেয়ারে বসিয়ে কোম্পানীর বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম সমর সান্যাল ? কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাল আমাকে বলছিলেন তোমার কথা।'

মাথা নীচু করে সমর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম সমর সান্যাল। তবে আপনাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের সাথে আমার পরিচয় নেই। তাঁর নাম শুনেছি মাত্র।'

—'নো নো মাই বয়। তিনি তোমাকে বিলক্ষণ চেনেন। তোমার চরিত্র, তোমার আকৃতি, তোমার সমস্ত কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে তিনি গতকালই আমাকে টেলিফোনে সব কিছু বলে দিয়েছেন। তোমার 'নেচার' সম্বন্ধেও বলে দিয়েছেন। হুড আর এ শাহ বয়। তোমার সাথে পরিচয় হওয়াতে খুশি হলাম। কোম্পানীতে তোমার চাকরী হয়ে গেল। আমার কথাই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। যাও, ভেতরে বসো গিয়ে।'

সমর ভেতরের ঘরের দিকে গেল।

এর ভেতর পিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বড় সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

পিওনকে বললেন, পত্রবাহককে ভেতরে নিয়ে আসতে।

ফুটফুটে চেহারার একজন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন।

বড় সাহেব বললেন, 'হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ কইন্সিডেন্স। এই এক্ষুণি একটি ছেলে এসেছিল। ঠিক তোমার মতনই দেখতে। অত্যন্ত শাই টাইপ। আর সব চেয়ে বড় মজার ব্যাপার হ'ল, তার নামও ঐ কি বললে তোমার মামা ?'

—'আজ্ঞে সমর সান্যাল।'

—'ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব কালকের টেলিফোনের সেই কথাগুলিই এই চিঠিতে পুনরাবৃত্তি করেছেন। তোমার তো নিশ্চয়ই চাকরী হবে। তবে সেই বেচারা সমর সান্যালের কি করা যায় ? দেখা যাক কি করতে পারি ?'

সমরের চাকরী হয়ে গেল।

চাকরীর প্রথম দিনে সকলের সাথে অল্প-বিস্তর পরিচয়ও হয়ে গেল। সমর সান্যাল নাধার-টুও বেশ অমায়িক শান্ত গো-বেচারা ভাল মানুষ। মাত্র ম্যাট্রিক পাশ।

সমরের চাকরী হয়েছে তাতেই সে খুশি। এই ছেলেটির ওপর এর ভেতরেই তার একটা স্নেহাকর্ষণ হয়েছে। তার নামের সাথে ওর নামের মিলের জন্যই সমরের এই চাকরীটি হল। দু'জনে এক সাথে বসে চা খেল। জলখাবার খেল। ছেলেটির চাকরী হলেই তার বিয়ে হবে। অল্পক্ষণের পরিচয়ে সেকথাও সে জানিয়ে দিল। ছেলেটি প্রেমে পড়েছে। সমস্ত দিনই সে শুধু তার প্রণয়িনীর গল্প করে কাটাল।

সমরের মন্দ লাগলো না। পরনিন্দা

কাহিনীর চেয়ে প্রেমাসক্ত প্রণয়ীর প্রেম-কাহিনী নিশ্চয়ই মধুরতর।

—'কি বলব দাদা, তার ঠোঁট দু'টির সাথে আপনার ঠোঁট দু'টির অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। সেই থেকে আমি তাই লক্ষ্য করে আসছি।'

—'তাহলে আমি তোমার শালাবাবু হতে পারি, কি বল ভায়া?'

বলে দু'জনেই হো হো করে অনাবিল সরল হাসিতে ঘরখানা ভরে ফেলে।

চশমাটা নাকের ডগায় দিয়ে কোম্পানীর অবজেকশন স্পেশালিষ্ট বৃদ্ধ চাকলাদারবাবু বসে হিসাব করছিলেন। স্নেহমিশ্রিত ধমকের সাথে বলে উঠলেন, 'বলি অত হাসি কেন? নতুন রিক্রুট না? হেসে নাও, হেসে নাও। দু' পাঁচ দিন যত পার। একবার এ কোম্পানীতে যে ঢুকেছে, হাসির রেখা মুছতে তার দেরী হয় নি। অট্টহাসি। পরে মৃদু হাসি। ক্রমে চাপা হাসি। পরে গোমড়া হাসি। পরে সব সাফ—ব্যস্। লক্ষ্মীর বরপুত্র এ-কোম্পানী। এদের মুখের আদর্শ হ'ল প্যাঁচা। হেসে নাও। হেসে নাও দু' পাঁচদিন যত পার হেসে নাও।'

এর ভিতর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে চাকলাদারকে সবিনয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালো।

চাকলাদার বললেন, 'কি ব্যাপার মশাই? নিশ্চয়ই পেনসন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। গত তিনমাস বিছানায় শুয়েছিলাম। আসতে পারি নি।'

চাকলাদার বললেন, 'কোন্ গ্রুপ?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আঠারোশো তিরানব্বুই-এর রিক্রুট। তিরিশ বছর হল রিটায়ার করেছি।'

চাকলাদার বললেন, 'ভাগ্যবান মশাই, ভাগ্যবান! পুকুরের মাছ খেয়েছেন, খাঁটি ঘি খেয়েছেন। কোম্পানীর আপনারা বরপুত্র। কেষ্টার বাপ শরৎ তো রিটায়ার করার পরের দিনই টেঁশে গেলো। পেনসনের হিসাব থেকে আমাকেও নিষ্কৃতি দিয়েছে। তা হ্যাঁ, মেডিকেল সার্টিফিকেট এনেছেন স্যার?'

বৃদ্ধ জড়সড় হয়ে বললেন, 'তা একটা এনেছি বই কি।' বলে একখানা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

চাকলাদার চশমাটা নাকের ডগায় তুলে কাগজখানা দূরে নিয়ে বিচক্ষণতার সাথে নিরীক্ষণ করে বলেন, 'আগষ্ট মাসের সার্টিফিকেট। বেশ কথা, ডাক্তার লিখছে—আগষ্ট মাসে আপনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু মশাই, জুন-জুলাই-এর সার্টিফিকেট কোথায়? জুন-জুলাই মাসে যে আপনি বেঁচেছিলেন—তার প্রমাণ? কোম্পানীর চুলচেরা কানুন। এতে ফাঁকি দেবার উপায়টুকু নেই। জুন-জুলাই-এর মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আগে জোগাড় করুন। তারপর এ শর্মা তো রয়েইছে বসে আপনাদের পেন্‌সন পেশ করতে। আজ তিনবছর এক্সটেনশনে আছি। তেত্রিশ বছরের চাকরী, বন্ধুত্ব করতে গিয়ে খোয়াবো কি করে বলুন?'

সমর হাঁ করে একবার বৃদ্ধের দিকে, একবার চাকলাদারের দিকে তাকায়। প্রেমাসক্ত সমর নাম্বার-টু এ সব বোঝে সোঝে না। তার মনে এখন সানাই বাজছে। সেই সানাই-এ সে মন-প্রাণ দিয়ে মশগুল।

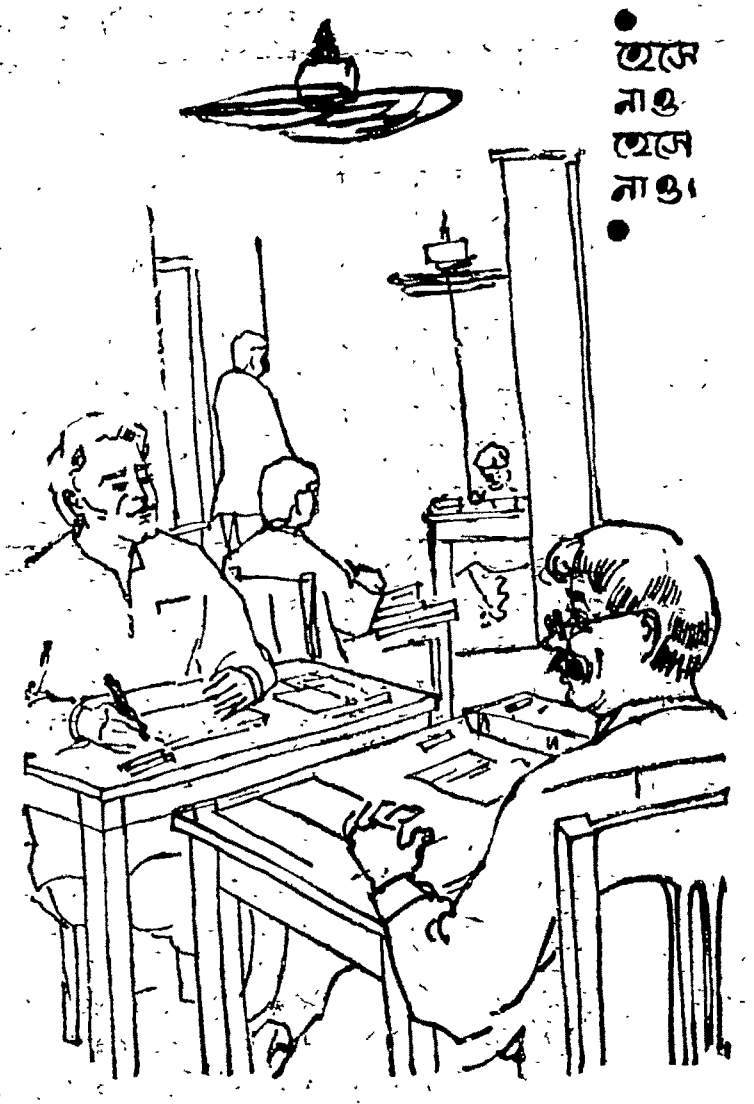

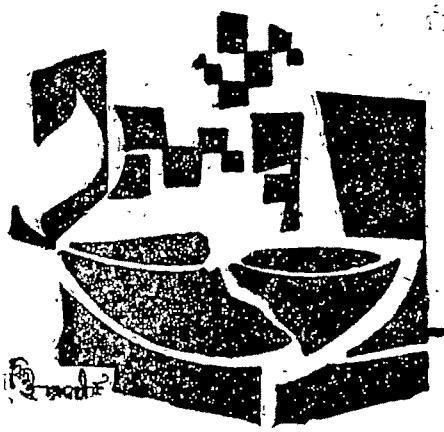

ধারাবাহিক উপন্যাস

# তন্তুর মাটির পাত্রে

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

### আটত্রিশ

অনেকক্ষণ থেকে বিজয় রাঙাদা'র ঘরের সামনে পায়চারি করছিল। ইনা দোরগোড়ায় বেরিয়ে এসে বলল, ও, বিজয় ঠাকুরপো তুমি? আমি ভাবছিলাম কে আবার ঘোরা-ঘুরি করছে।

বিজয় জিজ্ঞেস করল, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম?

—কি বল।

বিজয় ইতস্তত করে, রতন কোন্ স্কুলে পড়ে তুমি জান?

ইনা প্রথমটা বুঝতে পারে নি, প্রশ্ন করল, কোন্ রতন?

—তুমি যাকে নিয়ে এসেছিলে, রেবুকার ছেলে।

—ও তো বালিতেই পড়ে, ওদের বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে।

—নাম কি, ঠিকানা জান?

—না।

বিজয় চিন্তিত হয়, তাহলে?

—বলতো আমি রেবুকাকে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারি।

—না, না, তার দরকার নেই, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, ইনা বলল, স্কুলটা G. T. Road-এর ওপরেই, ষ্টেশন থেকে ওদের বাড়িতে যেতে রাস্তায় পড়ে।

বিজয় আর কোন কথা বলল না, সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তা পেরিয়ে তেওয়ারীর সেলুনে গিয়ে ঢুকল।

তেওয়ারীর সেলুন ছোট, বলতে গেলে দু'খানা সিট, আর একখানা ভাঙা চেয়ার, অবশ্য কোণের দিকে আছে। কারুর দাড়ি কামাবার তাড়া থাকলে ঐখানে বসিয়ে দেওয়া হয়, তেওয়ারীর ছেলেটা অন্য নাপিতদের ফাই-ফরমাস খাটে; প্রয়োজন হলে দাড়িও কামিয়ে দেয়।

দু'জন ভদ্রলোক চুল কাটছিলেন, তেওয়ারী বিজয়কে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, দাদাবাবু, চুল না দাড়ি?

বিজয় বলল, ইচ্ছে ছিল দু'টোরই। কিন্তু তোমার সিট ভর্তি, দেরী হয়ে যাবে, বরং তোমার ছেলে আমার দাড়িটা কেটে দিক।

তেওয়ারী হাঁক দিল, লক্ষ্মণ, চটপট দাদাবাবুর দাড়ি বানিয়ে দে।

কোণের চেয়ারে বসে বিজয় আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখে। কোনদিনই সে সুন্দর ছিল না, কিন্তু মুখের ওপর যে তার প্রৌঢ়ত্বের ছাপ এত গভীরভাবে পড়েছে তা সে সত্যিই লক্ষ্য করে নি। মাথার চুল প্রায় সব সাদা। দাড়িও তাই, কপালে অনেকগুলো রেখা পড়েছে, চোখের তলায় কালি। গাল দু'টো বসে গেছে। কণ্ঠার হাড় দু'টোও প্রকট হয়ে উঠেছে, নিজেকে চিনতেই যেন কষ্ট হয় বিজয়ের।

অবশ্য শরীরের আর দোষ কি? তার ওপর কম অত্যাচার করা হয় নি। মাঝে কয়েক বছর তো সে দিন নেই, রাত নেই গুঁড়িখানাতে পড়ে থাকত। এতদিনে যে বড় রকমের কোন রোগ ধরে নি তাই আশ্চর্য।

তেওয়ারীর ছেলে লক্ষ্মণ ব্রুশে সাবান লাগিয়ে বিজয়ের গালে ক্রমাগত ঘষছে। সাদা ফেনায় দাড়ি দেখতে বেশ লাগে আয়নায়, বিজয় সেই দিকে তাকিয়ে ভাবছে অতীতটার কথা। যদি তার কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হত, যদি সে এতদিনে মারা যেত, কি দুঃখ ছিল তার। কিছুই না, বেঁচে থাকার কোন অর্থ বিজয় তো খুঁজে পায় নি। আত্মহত্যা করার সাহস তার ছিল না, নয়ত স্বেচ্ছায় সে এই নিঃসঙ্গ একক জীবনের একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেত। মৃত্যু তার কাছে মুক্তির দ্বার খুলে দিত, কিন্তু দুর্বল বিজয় তা পারে নি। নীরবে সহ্য করেছে এই দিনগত পাপক্ষয়ের যন্ত্রণা।

লক্ষ্মণ ক্ষুর চালিয়ে বিজয়ের গালটা পরিষ্কার করে কামিয়ে দিল। বিজয়ের মনে হল এখন তবু খানিকটা ভাল দেখাচ্ছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গুলো আরও যেন তাকে কিম্ভূত করে তুলেছিল। আয়না দিয়ে দেখল, তারই পিছনে যে ভদ্রলোক চুল কাটছিল সে নাপিতকে দিয়ে পিছনে আয়না ধরিয়ে ঘাড়টা দেখছে। লোকটির বয়স বেশি নয়, ভাল স্বাস্থ্য দিব্যি চেহারা। সরু করে গোঁফ রেখেছে। বড় বড় চুল, যত্ন করে আঁচড়ান। মাসে দু'বার করে অন্তত তাকে সেলুনে আসতে হয়, একই

নাপিতের হাতে চুল কাটে। শুধু পয়সা নয়, সময়ও লাগে।

বিজয় ঘুরে বসে লোকটিকে ভাল করে দেখে। যৌবনের দম্ভভরা চেহারা, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সামনে, হয়ত এখনও বিয়ে হয় নি, বাড়িতে কথাবার্তা চলছে, কিম্বা কোন কুমারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এখন প্রণয় পর্ব চলছে, যার সম্ভাব্য পরিণতি বিবাহে। ছেলেটি দেখছে তার সামনে উন্নতির সোপান। এক এক ধাপ করে উঠে যেতে পারলে সে ঐ উঁচুতে আরোহণ করবে, কতজনের ঈর্ষার পাত্র।

বিজয় মুখ ফেরাল, ওপর ভদ্রলোকটির চুল তখনও কাটা হচ্ছে। কচ কচ কচ কচ শব্দ হচ্ছে কাঁচির। চুলগুলো ঝরে পড়েছে পিঠে গায়ে। সাদা চাদর কালো হয়ে যাচ্ছে। কেন জানা নেই বিজয়ের মনে হল, ঐ যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা যুবক, কে বলতে পারে ভাগ্য-নিয়ন্তা তার স্বপ্নকে সার্থক করবেন কি না, হয়ত অমনি কবেই কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে ফেলে দেবেন। জীবনের কথা কে বলতে পারে, বিজয়ও তো বাঁচতে চেয়েছিল, বড় হতেও যে চায় নি তা নয়। সুযোগও তো এসেছিল জীবনে, পেয়েছিল সুন্দরী স্ত্রী, ভাল চাকরী, কিন্তু কিছুই তো টিকল না বরাতে। তবু মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে, ভাবে অন্যের জীবনে যা ঘটেছে তা সে এড়িয়ে চলতে পারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কি সম্ভব হয়, অন্ধকার মাঠে হাঁটতে গিয়ে একটা গর্ত এড়িয়ে গেলেও আর একটার মধ্যে যে পড়তেই হয়।

লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করল, বাবু, দাড়ি তো কাটা হয়ে গেছে। চুল কাটবেন বলে বসে আছেন?

বিজয় উঠে পড়ল, না যাই, তাড়া আছে।

—পয়সাটা?

—দিই নি বুঝি? এই নে।

পয়সা দিয়ে বিজয় সেলুন থেকে বেরিয়ে এল।

ঘরে ফিরে এসে দেখল কলঘরে কোন তেল নেই। এ ক'দিন সে বিনা তেলেই স্নান করেছে। কাঁধে গামছাটা নিয়ে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা ছেলে কোণায় বসে দু'চারটে শিশি নিয়ে কি যেন করছিল। বিজয় আস্তে আস্তে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, খোকা, একটু তেল এনে দেবে?

ছেলেটা না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি তেল?

—যা হোক একটা তেল, মাথায় দিতাম।

ছেলেটা গম্ভীরভাবে বলল, আমার এখন সময় হবে না; এক ঘণ্টা বাদে এস।

বিজয় আর তাকে ঘাঁটাল না, সেখান থেকে সরে এল। ওপর থেকে দেখল, নীচে উঠোনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে মাথায় তেল দিচ্ছে। চিনতে পারল না, কার মেয়ে। নিশ্চয় ভাইঝি, ভাগ্নী কেউ হবে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার কাছেই গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে বিজয়ের দিকে তাকায়।

বিজয় হাত বাড়িয়ে বলল, একটু তেল দাও না।

মেয়েটি হাসল, তুমি তো তেল মাখো না বিজয় মামা।

বিজয় বলল, না, মাখি না। মাথাটা আজ বোধহয় গরম হয়েছে, একটু তেল পেলে মাখতাম।

—তোমার ঘরে তেল নেই?

—না।

—এই নাও, এ শিশিটা তোমার কাছে রেখে দাও।

বিজয় দেখল প্রায় আধ শিশি তেল রয়েছে, ভুর ভুর গন্ধ। বলল, এত তেল নিয়ে আমি কি করব?

মেয়েটা হাসতে হাসতেই বলল, ঘরে রেখে দাও, আবার যেদিন মাথা গরম হবে, মাখবে।

বিজয় আর কোন কথা বলল না, শিশিটা নিয়ে ওপরে চলে এল। ভাবতে লাগল, মেয়েটা কে? আজকাল তো কেউই তার সঙ্গে হেসে কথা বলে না। বারান্দা থেকে সে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

মেয়েটি বলল, আমায় চিনতে পার নি? আমি তো চুমকি।

বিজয় ভাববার চেষ্টা করে, চুমকি—

মেয়েটি বলল, আমি নিমকির ছোট বোন।

—ও, তুমি সদুপিসীর নাতনী? তোমরা সব কত বড় হয়ে গেছ, তাই আজকাল চিনতে পারি না।

স্নান করতে করতে বিজয়ের মনে পড়ল নিমকির কথা। প্রথম সমাদ্দার কি পেছনেই লেগেছিল ওকে সিনেমায় নামাবার জন্যে। নিমকি তখন নাচ শিখত। কথাবার্তায় খুব চটপটে ছিল। এখন বিয়ে থা হয়ে গেছে, দু'টো বাচ্চাও যেন হয়েছে, গোলগাল মোটা গিন্নী। আগের নিমকিকে দেখলে এ নিমকিকে চেনা যায় না। নিমকি বড়লোকের বউ, নিমকি সুগৃহিণী।

নিমকি সুখী হয়েছে?

বিজয়ের মাথায় এ প্রশ্ন জাগল কেন? নিমকি কি এই জীবনই চেয়েছিল? এ জিজ্ঞাসার উত্তর কে দেবে। নিমকিকে জিজ্ঞেস করলেও সে তো কিছু বলবে না।

যে মেয়েটা আজ তেল দিল, সে চুমকি। বিজয় তাকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছিল, এখন সেও বড় হচ্ছে। তারও মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার বুদ্ বুদ্ কাটছে। রঙীন বুদ্‌বুদ্। কিন্তু কতটুকু জীবন তার। একটু নাড়া লাগলেই তো ফট্ ক'রে ফেটে যাবে।

তবু এই সত্যি, তবু এই জীবন।

স্নান সেরে, চুল আঁচড়ে, বিজয় আলমারী খুলল। ধোপদুরস্ত জামা কাপড় একটাও নেই, কাচতেই দেওয়া হয় নি। গেঞ্জিগুলো ময়লা, তাতে কিছু আসে

যায় না, ভেতরে পাকবে। একটা আস্ত পায়জামা বেরু বাড়িতে কাচা, ইস্ত্রী হয় নি। ধাতির তুলনায় ওটাই ভাল। পাজামার ওপর একটা হলদে রঙের পাঞ্জাবী পরল বিজয়, তারও অবস্থা একই রকম। দেরাজের মধ্যে পাঁচ টাকার একখানা নোট ছিল, কাল এটা সে চেয়ে এনেছে মায়ের কাছ থেকে। ঐ টাকাটার জন্যেই দাদার বাড়িতে যেতে হয়েছিল। টাকাটা পকেটে নিয়ে বিজয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বেলা তখন বারটা, কড়া রোদ উঠেছে। লোক কম হলেও জি টি রোডের ওপর গাড়ি চলাচলের কমতি নেই। বিজয় সাবধানে রাস্তা পার হল। সামনেই একটি স্কুল, আগে বোধ হয় কোন জমিদারের বাড়ি ছিল, এখন স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। গেটের কাছে দু'তিনটি চাকর দাঁড়িয়ে টিফিনের খাবার নিয়ে এসেছে, বাচ্চাদের জন্যে। বিজয় জিজ্ঞেস করল, কখন ছুটি হবে?

একজন উত্তর দিল, এই তো, এখুনি।

বিজয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কুলের বাড়িটা দেখে, প্রকাণ্ড প্রাসাদ। যথেষ্ট জমি-জায়গা রয়েছে, ছেলেদের খেলা-ধুলো করার অসুবিধে নেই। নিজের স্কুল-জীবনের কথা মনে পড়ল বিজয়ের। ওদের স্কুলের নিজস্ব কোন মাঠ ছিল না, তাই টিফিনের সময় চুপচাপ বসে কাটাতে হত উঠোনের মধ্যে। স্পোর্টসের দিন স্কুল থেকেই ওদের নিয়ে যেত কাছেই একটা পার্কে। কিন্তু সারা বছর যে ছেলেদের দৌড়নো অভ্যেস নেই, তারা একদিনে ছুটবে কি করে?

টিফিনের ঘণ্টা পড়ল।

হুড়মুড় করে ছেলেরা বেরিয়ে আসছে। যারা সঙ্গে করে টিফিন নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই গিয়ে দাঁড়াল মাঠে, গাছের তলায়। খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে নেবে ট্যাঙ্ক থেকে। যাদের খাবার চাকর নিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে, তারা এল গেটের কাছে। অন্যদিকে খাবার বিক্রিও হচ্ছে—আলুর দম, কচুরী, অনেকে কিনেও খাচ্ছে সেখানে। ছেলের পর ছেলে আসছে-যাচ্ছে। কিন্তু রতনকে কোথাও দেখতে পেল না বিজয়। তাহলে বোধহয় এ স্কুল নয়, অন্য কোথাও পড়ে।

প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে বিফল মনোরথে বিজয় যখন চলে আসবে ভাবছে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল দোতলার বারান্দায় অনেকগুলি ছেলের সঙ্গে রতন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিজয় হাত নেড়ে ডাকল, রতন।

রতন প্রথমটা চেঁচামেচির মধ্যে শুনতে পায় নি। কিন্তু বিজয়ের দ্বিতীয় ডাকে সে গেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, সাড়া দিয়ে বলল, দাঁড়াও, আমি আসছি।

রতন ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, বন্ধু, তুমি কখন এসেছ?

বিজয় বলল, অনেকক্ষণ।

—আমায় ডাক নি কেন?

—তোমার স্কুল তো আমি চিনতাম না। ঠিক জায়গায় এসেছি কি না বুঝতে পারি নি।

রতন সগর্বে স্কুলের দিকে ফিরে তাকাল, বলল, এইটেই আমাদের স্কুল। ঐ যে কোণের ঘরটা দেখছ, ঐখানে আমাদের ক্লাশ হয়। তুমি আমার চিঠি পেয়েছ?

—পেয়েছি।

—উত্তর দাও নি কেন?

বিজয় হাসল, তাই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

রতন চিন্তিত স্বরে বলল, এখনও যে আমার ক্লাশ রয়েছে? তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব কি করে?

—বাড়িতে গিয়ে কি হবে, এই তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—বাঃ, মা, দাদু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে যে। বলেছে শুনব তোমার বন্ধু কি রকম গল্প বলতে পারে। তিনটের সময় আমাদের ছুটি হবে, তুমি ততক্ষণ থাকতে পারবে না?

বিজয় তাড়াতাড়ি বলল, না রতন, বেলুড়ে একটা কাজে আমায় আসতে হয়, একটু ফাঁক পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম। আবার এখুনি কাজে যেতে হবে যে।

—তাহলে আবার কবে আসবে বল। সেদিন তোমায় ঠিক ধরে নিয়ে যাব।

বিজয় রতনের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, সময় পেলেই আসব। এখন তো তোমার স্কুল চিনে গেলাম।

ওয়ার্নিং বেল পড়ল।

রতন বলল, বন্ধু এখন আমায় ক্লাশে যেতে হবে।

—যাও। পকেট থেকে বিজয় একটা ছোট প্যাকেট বার করে, এটা তোমার জন্যে এনেছি।

—কি আছে এতে?

—ছুটির পর খুলে দেখ, এখন এটা তোমার কাছে রেখে দাও।

রতন মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি, নিশ্চয় এর মধ্যে লজেন্স আছে।

ছেলেরা যে যার ক্লাশে ফিরে যাচ্ছে, রতনও আর দাঁড়াল না। প্যাকেটটা নিয়ে বলল, এটা আমার বইয়ের বাক্সর মধ্যে রেখে দেব, বাড়ি গিয়ে খুলব, কি বল?

বিজয় বলল, সেই ভাল।

রতন স্কুলের দিকে যেতে যেতে আবার ফিরে এল, বলল, আজ তো গল্পই হল না। কাল পরশু'র মধ্যে আবার আসবে কিন্তু।

বিজয় কথা দিল, আসব।

রতন ছুটতে ছুটতে চলে গেল ক্লাশে, বিজয় একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্য সবাই চলে গেছে, সে একলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

রতন তার মনে নতুন একটা আশার আলো জ্বেলেছে। আশা, ছলনাময়ী আশা, জীবনের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েও এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

নিজের অজান্তে বিজয়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই বুক ভরে সে নিশ্বাস নিল। (ক্রমশ।

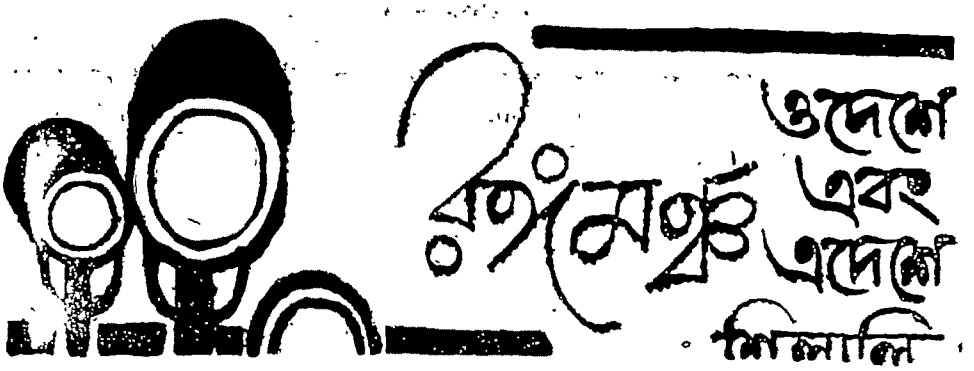


( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

তৎপরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় দুইটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—প্রথমে 'সঙ্গীত সংঘ' স্যার আশুতোষ ও লেডী প্রতিভা চৌধুরী কর্তৃক ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয় এবং 'সঙ্গীত সম্মিলনী' প্রমদা চৌধুরী (ডাঃ বি এল চৌধুরীর সহ-ধর্মিণী) কর্তৃক স্থাপিত হয়।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়, লেডী আর এন মুখার্জি, শ্রীযুক্তা কে সি দে, লেডী হাণু মুখার্জি, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীঅনাদি দস্তিদার, শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ প্রমুখের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত সম্মিলনী বিদ্যালয় ধীরে ধীরে আজ সারা ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষালয় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

শিক্ষা সমাপনান্তে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের এখানে দু'টি উপাধি দেওয়া হতে—গীতশ্রী এবং সুরশ্রী। উপাধি দু'টির নামকরণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

সঙ্গীত সম্মিলনী এই দীর্ঘকাল ধরে শুধু গান এবং নাচ শিখিয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে এবং উপাধি বিতরণ করেই ক্ষান্ত হন নি। রবীন্দ্রনাথের বহু গীতি এবং নৃত্যনাট্য ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্নভাবে মঞ্চস্থ করে এসেছেন বছরে বছরে।

বর্তমানে সঙ্গীত সম্মিলনীর গীতশ্রী এবং সুরশ্রী উপাধিগুলি বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন কর্তৃক অনুমোদিত অর্থাৎ এই উপাধি থাকলে যে কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা সেকেণ্ডারী এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ঐচ্ছিক সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষকতা করতে পারবেন। তাছাড়া সঙ্গীত সম্মিলনীর কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এফিলিয়েটেড হয়েছে।

সম্মিলনীর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমতী ইভা দত্ত এবং অধ্যক্ষা শ্রীমতী মাধুরী

● স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

চৌধুরীর বিশেষ পরিচিতি আছে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। তাছাড়া সংগঠক, পরিচালক এবং প্রযোজক হিসাবেও এঁদের অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় পেয়েছি—বহুবার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যের প্রদর্শনীতে।

১৯৬১ সালে সঙ্গীত সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করেন। সে সময় এঁরা মঞ্চস্থ করেন কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। চণ্ডালিকার এই মঞ্চরূপায়ণ দেখে সত্যিই চমৎকৃত হয়েছিলাম। এক শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে যে অন্য কোন সংস্থা এত সুন্দরভাবে নাচ এবং গানের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, এ ধারণা আমার আগে ছিল না।

কিন্তু কেন যে সম্মিলনী চণ্ডালিকার আরও কয়েকটি প্রদর্শনী করলেন না বা এই নৃত্যনাট্যটি নিয়ে সারা ভারতে সফরে বেরুলেন না, তা বুঝতে পারলাম না। শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাল জিনিষ কৃচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়—সেক্ষেত্রে এঁদের এই সার্থক শিল্প রূপায়ণটির বহুল প্রচার হওয়া উচিৎ ছিল।

তাছাড়া আর একদিকে সঙ্গীত সম্মিলনীর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যগুলি ঠিক সাধারণ নাট্য-সংস্থা বা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দ্বারা মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় না। সঙ্গীত সম্মিলনী যদি নিয়মিতভাবে এইসব নাটকের মঞ্চরূপ দিতে থাকেন, তবে শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যিই একটা বড় কাজ করা হবে।

সঙ্গীত সম্মিলনীর অধ্যক্ষা শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরীর সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা হলো সেদিন। তিনি

বললেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁরাও চিন্তা করছেন এবং হয়তো আসছে বছরেই দু'একটি রবীন্দ্র গীতিনাট্য এবং কাব্যনাট্য তাঁরা রসপিপাসু দর্শকদের কাছে পরিবেশন করতে পারবেন।

শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরীর কার্য-ধারা এবং দক্ষতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সাঙ্কেতিক নাট্যের মঞ্চ-রূপায়ণে সঙ্গীত পরিচালনা করতে দেখেছি মিসেস চৌধুরীকে। পেশা-দারী সংস্কার পরিবেশনায় ঐসব নাটকের সঙ্গীতাংশ যে কত দুর্বল হয়ে পড়ে, তা মিসেস চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনা থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। আসল কথা হচ্ছে রবীন্দ্র-নাথের নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা তো সহজ কথা নয়—রবীন্দ্র সঙ্গীতে একদিকে যেমন সুর, আবার অন্য-দিকে তেমনি ভাবের প্রাধান্য। শুধু সুরজ্ঞান থাকলেই চলবে না—ভাবধারা বোঝবার মত সত্যিকার বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তি থাকা চাই পরি-চালকের। শ্রীমতী চৌধুরী দর্শনশাস্ত্রে এম-এ এবং গীতভারতী উপাধিধারী। সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে তাঁর যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তার ভেতরেও তাঁর বিশুদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকে Incidental Music এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মিসেস চৌধুরীর মতামত জানতে চাইলাম। উত্তরে বললেন—দেখুন অনেকেরই ধারণা নাটক অভিনয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সংলাপ না বলে, গান করাটা একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। এসব লোককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, থিয়েটার জিনিষটাই artificial—মঞ্চে অভিনয় করাটাও অস্বাভাবিক, শেক্সপীয়র বা কালিদাসের নাটকের কাব্য-সংলাপ বলাটাও অস্বাভাবিক। এ সবই যখন সাদরে গৃহীত হচ্ছে, তখন incidental music-ই বা অস্বাভাবিক বলে বর্জিত হবে কেন?

তাঁর একটি ছোট ইংরাজীতে লেখা প্রবন্ধ—Incidental Music সম্বন্ধে আমাকে পড়তে দিলেন। লেখাটি ভারি সুন্দর লাগল। দু'একটি জায়গা এখানে তুলে দিচ্ছি:

'Incidental music which is introduced during the action of a play, is the combination of drama and music, and is the result of deliberate selection and representation. To the connoisseurs of music and drama such a thing is nevertheless natural, must be natural, in the sense of meeting a human

● শ্রীমতী মাধুরী চৌধুরী

need, or we should not find it all over the world and in every possible period of history—in the Greek plays, in the ritual of various religious, in the mediaeval miracle play, in the masque of the Elizabethan age, in the opera, in the Sanskrit drama, and at last in the plays of Madhusudan, Girish Chandra, Kshirod Prosad, Dwijendralal and Rabindranath.'

বা,

'William Mann says that the essence of incidental music is mood painting, ensurance of continuity, and extra visual (or in broadcasting extra-auditory details). This is by for the best known definition of Incidental music. Those who have heard Debussy's incidental music in Pelleas and Melisande know what a lovely work was produced in it. Maeterlinck's mysticism and melancholy are reproduced by a directness of method unparalleled in the whole history of Opera. There is little attempt at musical beauty as such, though much musical beauty results.'

গত বছর আর একটি বড় কাজ সঙ্গীত সম্মিলনী করেন—বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীতিমিরবরণের সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রা, রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' এঁরা প্রডিউস করেন নিউ এম্পায়ার ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে।

কলকাতায় রসজ্ঞ মহলে শিশু-তীর্থের এই সুর-রূপায়ণ প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছিল। অর্কেষ্ট্রা ইউরোপের জিনিষ—শ্রীযুক্ত তিমির-বরণের এই অভিনব প্রডাকসনটি শুনতে বহু বিদেশীয়েরাও এসেছিলেন এবং অকুণ্ঠভাবে শিশুতীর্থের প্রশংসা করে গিয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরে আমি রাউরকেল্লা থেকে ফেরবার পথে এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এই শিশুতীর্থ সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রার আলোচনা সুরু হয়। ভদ্রলোক বললেন, ইণ্ডিয়াতে যে এত ভাল সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রা হতে পারে এ ধারণা তাঁর আগে ছিল না। আরও খেদ করলেন যে, এসব জিনিষ যদি ভারত সরকার ইউরোপে পাঠান, তবে ওসব দেশের লোকও ভারতের সঙ্গীত-শিল্পের সত্যিকার উচ্চস্তরের কার্যধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

ধনবিলাসবাবু ছেলের চিঠি পড়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কোথায় নিজের সম্বন্ধে দু'চারটে ভালমন্দ কথা লিখবে, তা নয়; কেবল বন। বন। আর বন। ছেলেটা খুনো হয়ে গেল।

এতদিন তো সবকিছু নিজের চোখে দেখেছেন। পিরামিডের মত উঁচু ছোট ছোট পাহাড়। এখানে ওখানে বেহায়ার মত ঘাড় উঁচু করে মিছিমিছি কি দেখার চেষ্টা করে। গায়ে সবুজ চামড়া। চোখ মেলে যে অন্য কিছু দেখবে, তার উপায় নেই। গাছপালাগুলোর বলিহারি ইচ্ছা—প্রত্যেক বছর গরমের সময় তাপের হাতে মার খেয়ে হাড়গিলে হয়ে যায়; কিন্তু আকাশ থেকে একটু জল পড়তে না পড়তে আবার পাতা গজাতে আরম্ভ করে। রোজ সকালে দু'চোখ মুছে নদীভঙ্গীদের মুখ দেখো, ছোট্ট কোয়েল নদীর বিরামহীন কল কল শব্দে কান ঝালাপালা হোক, আর রাত্তের বেলায় জন্তু জানোয়ারের ডাকাডাকি বা ওদের গুণ্ডারাজীর খবর শোনো—এই তো রাবা তোর জঙ্গল। আরে জঙ্গল জঙ্গলই। ওতে আছে কি? ওর ভেতর সৌন্দর্য খোঁজা যা', কাকের কাছে মিষ্টি সুর আশা করাও তা'।

কি বিশ্রী একঘেয়ে। সেগুন গাছ তো সেগুন গাছ। এক নাগাড়ে চলল তার আর বিরাম নেই। তারপর শাল গাছের জঙ্গল দেখা দিল। ব্যস, মনে হবে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই রকম চলবে। শাল, সেগুন, মেহগনি কি আবার। সবই তো গাছ। সব জঙ্গল। বলি গাছগুলো কি কথা বলতে পারে, না তোর মনের কথা বুঝতে পারে? ওরা যদি এতই ভাল, তবে মানুষ সভ্য হওয়ার সাথে সাথে শহর না তৈরি করে জঙ্গল সৃষ্টি করত। কিন্তু বিমানকে বোঝাবে কে?

ওর ওখান থেকে আসার সময় বলেছিলেন চিঠি দিতে; তা' সেই চিঠির ভেতর যে জঙ্গল ভরে দেবে তা' কে জানতো।

বাবা,—তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ছোট্ট রোহিত পাহাড়ের কথা। ওকে দেখে আমার মনে হয়, ও যেন বিজন বনানীর শ্যামলনন্দন। লোভাতুর আকাশের প্রচ্ছন্ন হাতছানি ওকে ডাকে। তবু ও নীরব। কোন্ অচিন দেশের রাজকুমারীর জন্য ওর তপস্যা কে জানে? হয়ত তপস্যার বয়েসে অতীতের কোন অজানা তারিখে, ইতিহাসের কোন অন্ধকার অধ্যায়ে—ধীরে ধীরে ওর বিশাল দেহ ঘিরে সবুজ অরণ্যের কোমল হাতের স্পর্শ পড়ল। তবু ও নিস্পন্দ। ওর চিরবাঞ্ছিতনয়ন-আলো স্বপনসুন্দরীর দেখা আজো মেলে নি। ওর পায়ের নীচে তপঃকৃশা ক্ষীণকায়া কোয়েল নদী। ব্যর্থ ধরিত্রীর প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক প্রতিমূর্তি। ধ্যানগম্ভীরের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য কত সুমধুর নূপুরধ্বনি করে, কিন্তু তার প্রাণের বার্তা আর একটা প্রাণের

রুদ্ধদ্বারে আঘাত খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে শুধু।

'আমাদের ঘরের পেছনে নির্জন পাহাড়ী জায়গায় আমলকি বন—প্রকৃতি সেখানে বড় একান্ত। ওখানকার একটা এমন বৈরাগী মাধুর্য আছে যেটা সহজেই মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। দূরে মহুয়া পাহাড়ের ক্রমবিলীয়মান ছায়া ছায়া দেহ দিকচক্রবালের উদার অংকে অদৃশ্যপ্রায়। আর নিকটে ক্ষীণকটি রূপালী বর্ণা স্রোতস্বিনী আনন্দে উচ্ছ্বসিত। দু'তীরের শ্যামল বন-উপবন সুন্দরীর কৃষ্ণনয়নের মত রহস্যময় স্নিগ্ধ। ওখানকার বাতাস অত্যন্ত অমায়িক। প্রতি গাছ তরুলতার গায়ে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে যায়। অস্থিরতার সামান্যতম পরিচয় তার ভেতর নেই। পাহাড়ী পথগুলোর লিপিল অবয়ব কোন ইউরোপীয় সুন্দরীর শুভ্রচেলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর রাত্রি! পিঠভরা তারার ওড়না উড়িয়ে পাহাড়ের সাথে কানাকানি করতে নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। অথবা পাহাড়টা যে উড়ে যায় ঐ দূর আকাশের কাছে।

'---সেদিন রোহিত পাহাড়ে উঠেছিলাম। রুদ্ধঘরে আলো চুরি করে চোকে। তারপর দোর খুলে দিলে ঘরে আলোর প্লাবন হয়।

চোখের সামনে সেদিন আমার জানা জগৎ হঠাৎ কেমন বিশাল হয়ে গেল। ক্ষণমধ্যে পরিচিত শিশুজগৎ বিপুলকায় উন্নতবক্ষ যুবকে পরিণত হল। এ যেন অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। কোয়েল নদী হারিয়ে গেল অজানা দিগন্তে। রোহিত পাহাড় ডিঙিয়ে, পরিচিত সংক্ষিপ্ত জনপদ পার হয়ে দৃষ্টি আমার হারিয়ে গেল অসীমের সীমানায়। চির চেনা যে জগৎ ভোরের ঘোমটা-ঢাকা প্রকৃতিকে নিয়ে, দুপুরের রুদ্রমূর্তিকে ধরে আর বিকেলের বিষণ্ণ-মধুর বিধবাকে সামনে এনে—আমার কাছে রোজ দেখা দিত, তাকে নতুন ভাবে দেখলাম। বলতে ইচ্ছে হল: 'নয়ন তিরপিত ভেল'।

'প্রকৃতির এই সহজ সরল সবল সবুজ সৌন্দর্যে ভরা প্রাণ আমার পাগল করে তোলে। একটা আশ্চর্য উন্মাদনাময় আনন্দে আমাকে স্নান করিয়ে দেয়। তবু তুমি একে ভালবাসতে পারলে না,—এ তোমার জীবনের এক মস্তবড় ক্ষতি।'

রাখ্ ব্যাটা তোর ক্ষতি। আমিও তো একসময় গ্রামে থাকতাম, না কি? ও আমাকে জঙ্গল চেনাচ্ছে। রাতের বেলা হর সর্দারের বাঁশঝাড়ের নীচে কি ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। আর পাঁচু বৈরাগীর সেই গাব গাছটা। এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

পাহাড়! সন্ধ্যেবেলা ওর দিকে তাকাও—মনে হবে একটা উজবুক কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। সে কি শীতে, কি গরমে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখো ওর কালো হাঁড়ির মত রূপ। রোদ তো ওরই মাথায় আটকে যায়। আর সাদা সাদা তুলোর মত কুয়াশাগুলো ওর গায়ে লেপটে থাকে; ওকে দেখলে তখন আমার শুঁয়োপোকার কথা মনে আসে।

বিমানটা যে দিন দিন কি হচ্ছে। ওকি ভুলে গেল পিয়ন রামস্বরূপের গরুটার কথা। একদিন সন্ধ্যেবেলা গরুটা সময়মত ফিরল না। রামস্বরূপ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেল। সারারাত গরুর চিন্তায় চোখের পাতা এক হল না। শেষে সকালবেলা একটা লোক বলল—ওই পাহাড়টার কোথায় যেন গরুটার হাড়গোড়গুলো পড়ে রয়েছে। যে পাহাড়ের গুহায় গুহায় এইসব অযন্য হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বাস করে—তাকে কল্পনা করছে ধ্যানমগ্ন। ধন্য বিমানের ভাববিলাস!

'—বাগানে কাঁঠালচাপা ফুটল। সমস্ত দিক তার সুগন্ধে ভারী হয়ে উঠল। অথবা বরফের মত জমাট বেঁধে ছিল স্বর্গীয় আনন্দ। হঠাৎ প্রকৃতির খেয়ালে পৃথিবীতে সেই আনন্দের উপহার নিয়ে আসে পাখি। কি চঞ্চল! কি প্রাণময় ওদের গতিবেগ। আমলকি গাছের ডালে ডালে ওরা উড়ে বেড়ায় অথচ হাওয়ায় ওদের চলাচলের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের এই উড়ে-যাওয়া দেখে আমার যে-রোমাঞ্চ হয়, সেই রোমাঞ্চ আমি অনুভব করি, ভোরবেলায় অবাক-চোখে জেগে-ওঠা সূর্যের লাজুক কিরণ দেখে। কি নিঃশব্দে স্পর্শ করে! অথচ সে স্পর্শের কোন চিহ্ন আমার দেহে থাকে না। পাখিগুলোকে তাই সূর্যকিরণ বলে ভাবতে ইচ্ছে করে।

'তুমি সেবার একটা সাপ দেখে কি ভয়ই না পেয়েছিলে। অথচ ওরা কি নিরীহ। অন্যের পায়ের শব্দ শুনতে পেলে নিঃশব্দে আড়ালে চলে যায়। ওরা বোধ হয় জানে, ওদের চেহারা কুৎসিত—ভীতিকর। সেজন্য অত্যন্ত লাজুক—ঠিক খারাপ চেহারার কোন মেয়ের মত। তাই কোন ফাঁক-ফোঁকর পেলে সেখানে লুকিয়ে থাকে। তুমি ওদের চলার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করো একবার। কি চমৎকার ছন্দ! জন্ম থেকে এরা অক্লেশে এই ছন্দকে আয়ত্তে এনেছে। যখন কোন নর্তকীর নাচ দেখি, তখন সাপের এই চলার কথা মনে পড়ে।

'সেদিন—জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, আমার বন্ধু বিপুল এসেছিল। বললে, 'রাতের বেলা হরিণ শিকার করবে।' ---তুমি তো জান যে, আমি শিকার জিনিষটা একদম পছন্দ করিনে। শিকারের কথা উঠলে আমার জেলের কথা মনে পড়ে। নবীন জেলে। একদিন ডাকাতি করতে এসে ডাকাতরা কেটে ফেলল। ওঃ! কি কান্নাটাই না কাঁদল ওর বাড়ির সবাই। একটা হরিণ মারা পড়লে নিশ্চয়ই ওইরকম ধরণের কিছু হয়। হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একটা কাক মরলে অন্য কাকরা কেমন করে?

'বিপুল গাছোড়বান্দা। বেতেই হলো। স্পট লাইট নিয়ে একটা জীপে করে রাত দশটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিছু পাওয়া গেল। মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় কানে এল একটা শব্দ, জলাশয়ে কোন জানোয়ার জল খাচ্ছে। বিপুল স্পট লাইট ফেলল। একটা ছোট্ট হরিণ। নিশ্চিন্তে জল খাচ্ছে। আলো দেওয়ায় আমাদের দিকে তাকাল। শিশুর মত সরল দৃষ্টি। ওর পাশের জঙ্গল সহসা নড়ে উঠল। বিপুল আলো নিভিয়ে দিল। হরিণটা দৌড় দিল আর তার পেছনে একটা নেকড়ে।

সেদিন কিছু মারা যায় নি। বিপুল আমার ওপর খুব চটে গিয়েছিল। ওর আর ছুটি ছিল না হাতে—চলে গেল পরদিন সকালে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

বনবিলাসবাবুর মনে পড়ল সেই অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা।

একদল জেলে সুন্দরবনে গিয়েছিল মাছ ধরতে। অল্প অল্প শীত পড়েছে তখন। একজন শুয়েছিল নৌকার মুড়িতে। কাঁথা গায়ে দিয়ে।

শেষ রাতের দিকে নৌকাটা একবার ভীষণ দুলে উঠল। সবার ঘুম গেল ভেঙে—চোখ মেলে যা দেখল, তাতে আত্মারাম খাঁচাছাড়ার অবস্থা। নৌকার মুড়িতে শুয়ে-থাকা লোকটাকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে 'বড় শেয়াল'। কাঁথা মুড়ি-দেওয়া অবস্থায়। মাঝে মাঝে তার দেহটা একটু একটু কেঁপে উঠছে। ওই লোকটা কি দোষ করেছিল—প্রশ্ন করলেন বনবিলাসবাবু। বনের পশুদের আবার সৌন্দর্য—ওরা আবার নিরীহ!

পঙ্কা গাইনের মেয়েটা কি দোষ করেছিল? পঙ্কা গাইনের বাড়িটা একটু জঙ্গলের ভেতরে। বিয়ে হবার পর মেয়ে প্রথম এসেছে বাপের বাড়ি। সঙ্গে স্বামী। রাতে শুয়েছে। মশারি টাঙিয়ে। সকাল বেলা জামাই উঠে দেখে মেয়েটা বেহুঁশ। লোকজন ডাকা হল। ওঝা এল, বলল, 'সাপে কেটেছে'। ব্যস, সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পঙ্কা গাইন কি চেষ্টাই না করল। কিন্তু বাঁচল না মেয়েটা। বলি, মেয়েটা কি দোষ করেছিল? দোষ করেছিল ওর বাপ—ওইরকম জঙ্গলের ভেতরে কেউ কখনও বাড়ি করে?

আরে, জঙ্গল হল গিয়ে অমঙ্গলের আড্ডাখানা।

'বাবা, গতকাল দুধের দাম দিতে গিয়ে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। পৃথিবীর বুকে যে এখনও কিছু খাঁটি সোনা আছে, সেটা ভেবে বড় আনন্দ পেলাম। মনে হল, এদের জন্যই পৃথিবী এখনও ধ্বংসের গহ্বরে প্রবেশ করে নি।

'বুধনের নাম মনে আছে তো! সেই যে আমাদের দুধ দেয়। এবার ওকে আমিই টাকা দিলাম। টাকা দেওয়ার আগে আমার কেমন ইচ্ছা হ'ল ওকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ওর দুধের দাম হয়েছিল পনের টাকা। ওকে পাঁচ টাকা দিয়ে বললাম, 'হল?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। পরম শ্রদ্ধা-ভরে একটা নমস্কার জানিয়ে বলল, 'যাই।'

'আমি লজ্জা পেলাম।

'কি করে যে ওকে আরো দশটা টাকা দেব সেটা ভেবে উঠতে পারলাম না। আমাকে আবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল, 'এই নাও, আরো দশ টাকা—তোমার ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খেতে দিও। এবার বুধন আরো গভীরভাবে নমস্কার জানাল। ওদের বনজীবনে এমন দাক্ষিণ্য বোধ হয় কোনদিন কেউ দেখায় নি। আমার উদ্দেশ্যে সে ভগবানের কাছে অসংখ্য শুভ-প্রার্থনা জানাতে জানাতে চলে গেল; কিন্তু আমার মন সেই আশীর্বাদে জলে-ভেজা মুড়ির মত মিইয়ে গেল।

'মিথ্যে দিয়ে একটা সত্য সরল নিষ্পাপ মনের আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করলাম।

'বাবা, তোমার কি মনে হয় না, এই লোকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সোজাসুজি এই মিথ্যে জুয়াচুরি জালিয়াতিতে ভরা কদর্য পৃথিবীর বুকে আচমকা এসে গেছে। মন্দিরে মাটি পাথরের দেবতার মূর্তিগুলো সরিয়ে আমার এই রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছে করে।

'বনজীবনের সমস্ত সৌন্দর্য এদের ভেতরে জমা হয়েছে—এরা যেন সবাই এক একটা রজনীগন্ধার মতই সুন্দর ও মনোরম।'

এক বুধনেই দেখি ব্যাটার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। অথচ ও সেই ঘটনার কথাটা ভুলে গেল: কার মেয়েকে

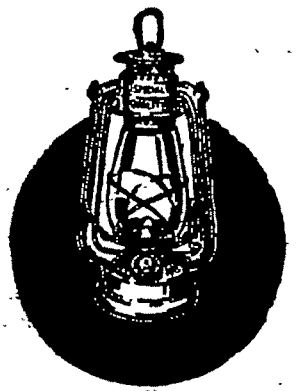
কিমান
নবীন সবোত্তমী
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৩,৩য় চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৩৮০

কে চুরি করেছিল। তারপর সেই চোরের মুণ্ড খুঁজে পাওয়া গেল এক পাথরের খোঁড়লে। শুনেছিলাম দা-এর এক কোপে নাকি মুণ্ড নামিয়ে দিয়েছে। ওঃ, কি সাংঘাতিক। আর নামগুলোই বা কি? শুনলে গা গুলিয়ে ওঠে। রামথুক রামের থুথু। রাম পুরীষ। ওরাক থু। ভক্তির কি বাড়াবাড়ি। ছিঃ ছিঃ। মানুষের কি প্রবৃত্তি! বুনো তো আর কি হবে? ওরা আবার মানুষ—এক একটা পাথরের কালো মূর্তি। হাসত যখন কি ভীষণ লাগত। অন্ধকারের বুক চিরে যেন বিজলী ঠিকরে বেরোচ্ছে। (আমার তো সব সময় দুর্গাঠাকুরের অসুরের কথা মনে পড়ত।) আর ব্যাটারা কথা বলত কি করে—যেন সব সময় তেঁতুল খাচ্ছে। একদিন ওদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। এক জোড়া মুরগী কিনতে।

দাম জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'আট আনা—নিবি নাকি?'

'বেশ সস্তা তো, মাংস হবে কতটুকু?' বলেছিলাম।

'নিবি কি না বল্—বেশী কথা বলতে হবে না।'

আমাকে মারে আর কি। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর! ওরা আবার দেবতা!

এর পরের যে চিঠিটা বনবিলাসবাবু পেলেন, সেটা খুব সংক্ষিপ্ত। এত ছোট চিঠি তার ছেলে কোনদিন লেখে না।

তুলুকে তো তুমি কি ভালবাসতে; গত পরশু রাত্রে আমার এক বন্ধু এসেছিল—ও যাওয়ার সময় আমাকে আনাতোল ফ্রাঁসের Thais-টা দিয়ে যায়। বইটা পড়তে পড়তে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, ঘুমোবার আগে তুলুকে ঘরে তোলার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

'সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি উঠোনে খানিকটা জায়গা রক্তে কালো হয়ে গেছে। সবাই বললে, আজকাল এদিকে একটা বিশ্রী হিংস্র হায়েনা এসেছে।

'তুলুর জন্য আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। হায়েনাকে মারবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি—পারি নি। আর এখানে এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছে না—হিংস্রতার ভারী হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'পুনঃ—আমি দু'মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি—আগামী রবিবার রওনা হব।'

। না, না, না—বিমান যেন না আসে। গত পরশু বিকেল বেলার কথা বনবিলাসবাবুর মনে দুঃস্বপ্নের মত জেগে আছে।

পাশের বাড়ির ছেলেটা বাইরে বাজনা হচ্ছে শুনে রাস্তায় বেরিয়েছিল—আর ফিরে এলো না। ওর দেহটা পড়েছিল একটা ড্রেনের কাছে—ভুঁড়ি-কাড়া।

শহরে দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে।

আজ সকালে বনবিলাসবাবু হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ভাগ্নেকে দেখার জন্য। রাস্তা পার হচ্ছিলেন, দেখেন, একটা মানু। রাস্তায় পড়ে গেল হঠাৎ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তার গলার কাছে থেকে।

এখন গলিগুলো কসাইখানা—লোক মারবার। আর রাত্রিটার সারা দেহ জুড়ে যেন অসংখ্য ছোরা ঝুলছে। যেদিকে যাও না কেন, তোমার দেহে আঘাত লাগবেই।

না, বিমান যেন না আসে এই মানুষের শহরে। একটা বিষাক্ত হাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তাগুলো সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে। মানুষের মত দেখতে অসংখ্য জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আইন এখন বইয়ের পাতায় বন্দী হয়ে কাঁদছে। এর চেয়ে জঙ্গল ভালো। ওখানকার বাসিন্দাদের জন্য কোন আইন নেই, তবু—অনেক রীতিনীতি ওরা মেনে চলে। বিনা আইনে বেড়ে-ওঠা ওই জীব-জন্তু—অসভ্য মানুষ—সব বেশ সুন্দর। ওখানে রাত্রি এত ভয়ঙ্কর নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়—পথ এত দুর্গম নয়।

'বিমান, তুই আসিসনে। এখানে দাঙ্গা সুরু হয়েছে। আমি পুলিশের সাথে ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি এখানকার সবাইকে নিয়ে রওনা হচ্ছি।'

—যাও—যাও—ঠাকুরপো, তুমি এখন এস। কলকাতা থেকে—

—উনি উনিই কি শিবু? আমার বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—চারুদাদাকে আমিই খুন করেছিলাম। চীৎকার করে উঠল শিবু—বলেই ছুট, বাইরে চলে গেল।

রাধার চোখ দু'টো জলে ভরে গেল।

অনেকদিন জেলে থেকে থেকে ওরকম হয়ে গেছে।

আমাকে মাদুর পেতে বসতে দিল রাধা।

অনেক—অনেকদিন ভেবেছি বিলপাড়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো। কিন্তু পারি নি—

—কেন তোমাকে কেউ ঘৃণা করে না—কেউ নিন্দা করে না—

—করে না। কিন্তু ভোলে নি একজনও দাদাবাবু,—বলতে বলতে একটু কেশে নিল রাধা। বিড় বিড় করে নিজের মনেই বলল, আমি জন্মপাপিষ্ঠিনী দাদাবাবু। নরকেও আমার স্থান হবে না। আমি—থামল রাধা। বকুলগাছের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, সময় সময় আমার মনে হয়, আমি একটা মাছি। ঘা পুঁজ রক্ত খেয়ে খেয়ে বেড়াই। আমার গায়ে গায়ে খারাপ ঘায়ের বিষ—

—বোষ্টুমী আছো না কি গো—

রাধার মুখখানা বিষিয়ে উঠল।

—কি মনে করে এখন?

লোকটা কোন উত্তর দিল না। জীতেনদা'র বয়সী লোক। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। আর গায়ে খাকি জামা। কোট-গুলো মিলিটারীদের মত।

—ধান পাতান আদায় করেছো? অঘ্রাণ তো যায়—যায়—

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

—দরকার। চোখ দু'টো আধ-বোজা করে গুন্ গুন্ হাসল সে। দরকার নিশ্চয়ই আছে। উত্তর পাথারের জমিটা দেবোত্তর নয়। রাধামাধবের জমির ভেতরে ওটা পড়ে না। ওর যাবদ ধানটা এবার আমাকে দিতে হবে বোষ্টুমী—

কোন কথা বলল না রাধা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মুখখানাকে অসম্ভব শক্ত করে তুলল। হাসল। মৃদু হাসি। শান্ত—খুব শান্ত গলায় বলল, জরীপের সময় উত্তর পাথারের জমি রাধামাধবের বলেই লেখানো হয়েছে—নিজের চোখে দেখেছি। তুমি আসতে পারো—

—কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কে তোমাকে রাধামাধবের নামের জমি ভোগ করার অধিকার দিয়েছিল—কে তোমাকে—দেখি—উত্তর পাথারের জমির ধান কেমন করে তুমি খলায় তোলো—চীৎকার করে শাসাতে শাসাতে বাইরে চলে গেল লোকটা।

—কে?

—কে আবার?—আমার শত্রু—ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল রাধা—ওরা আমার সুখ সহ্য করতে পারছে না—সেদিন হারু ঘোষালের বিধবা বৌটা এসে বলে কি, বের কর সোনার গয়না, ওর অনেক গয়না নাকি আমার কাছে আছে। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল রাধা। প্রবল কান্নার ভেতরে তার কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে তলিয়ে গেল।

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। বলল, সে বেঁচে থাকতে যাত্রা-ওয়ালারা আমার বাড়িতে আসতো। অনেকেই আসতো। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাই বলে কি

রোমাঞ্চকর
গ্রামসার কাহিনী
( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

# পুষ্পমালিনী কথা...

সুভাষ সমাজদার

তারা আমাকে অঢেল সোনার গয়না দিয়েছে—দিয়ে শাড়ি ? সবাই তো শুধু—

হঠাৎ থামে সে।

—যাই দাদাবাবু, স্নানের বেলা হলো। কলকাতা যাওয়ার আগে দেখা করবেন—

বেরিয়ে এলাম। রাধার কান্না-জড়ানো ভারি ভার কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগল। তার বিষণ্ণ করুণ মুখখানা আমার মনের ভেতরে যেন আঁকা হয়ে গেল। হঠাৎ অদ্ভুত একটা আবেগে আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল আর রাধার মুখচ্ছবিটা যেন মাটি থেকে অনেক—অনেক উঁচুতে উঠে যেতে লাগল।

রাধা সত্যিই ভাল।

বড় ভাল।

সৎ।

নির্দোষ।

এক একটা করে দিন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল। জ্যাঠামশাই কিছু-দিন থেকে বেশি অসুস্থ বোধ করছিলেন। পেটটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছিল। শহর থেকে ডাক্তার এসে বলে গেল ফ্লুইড হয়েছে পেটে—জল জমেছে—উদরী।

—উদরী। কাঁদতে সুরু করলেন জেঠিমা—

খুবই কঠিন অসুখ। বালুরঘাট, হিলিতে যত বড় বড় ডাক্তার ছিল একে একে তাদের সবাইকে ডেকে পাঠানো হলো। প্রত্যেক ডাক্তার বলল, কলকাতায় যাওয়াই ভাল।—

—তুই তো কলকাতায় থাকিস। তুই ব্যবস্থা কর বাবা, জেঠিমা কেঁদে বললেন।

আমি কলকাতায় রওনা হওয়ার আগে বালুরঘাটে গেলাম। জ্যাঠা-মশাইকে প্লেনে নিয়ে যেতে হবে।

এরোপ্লেনের টিকিট কাটতে হলে বালুরঘাটে না গেলে উপায় নেই।

সিটি বুকিং অফিস বালুরঘাটে। টিকিট কাটতে যেয়ে দেখি প্যাসেঞ্জারদের নামের ভেতরে আমার পরিচিত একটি নাম জ্বল জ্বল করছে।

—মণীন্দ্রনাথ রায়। রিটায়ার্ড পুলিস ইন্সপেক্টর। বালুরঘাট, চক-ভবানী।

তাহলে হিলির সেই ও-সি হবেন আমার সহযাত্রী। ভালই। আর ইচ্ছে নেই আমার চারুর খুনের রহস্য নিয়ে খোঁজ খবর করার। কি হবে? হয়তো সত্যিই ডাকাতরাই মেরেছে তাকে। আর যদি কিছু রহস্য থাকে—থাক না। বিলপাড়ার ধু ধু মাঠে, টলটলে জলে ভরা পুকুরে, নিবিড় সবুজ ধান-ক্ষেতের ভেতরে চিরকাল সেই রহস্য নিঃশব্দে লুকিয়ে থাক। কোন ক্ষতি হবে না কারো।

হয়েছিল। হয়েছিল কৌতূহল—নিজের দেশের ঘটনা বলেই। থাক।

—হঠাৎ খুব মুস্কিলে পড়ে গেলাম। জ্যাঠামশাই বেঁকে বসলেন। যাবেন না—যাবেন না কলকাতায়। অসুখ সারাতে হবে না।

—কেন আপনি ওরকম করছেন?

—নারে তোরা আর জোরাজুরি করিস না। আমি বাঁচবো না। আমার এই অসুখ সারবে না। ভাল হবে না—

—কি—কি বলছো তুমি—ছেলে-মানুষের মত কাঁদতে লাগলেন জেঠিমা। কান্নার ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, এত অসুখ থাকতে উদরী হলো কেন? কি—কি পাপে----

কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তারকে চিঠি লেখা হয়েছিল। হাসপাতালে খবর দেওয়া হয়েছিল। ঠিক নির্ধারিত দিনে না গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। কি করা যায়—কি করা যায়।

—মণিবাবুকে চিঠি দিয়ে দে, তিনি যেন কাল অনুগ্রহ করে হাস-পাতালে চিঠিটা দিয়ে দেন। সিটটা থাকবে তো—একটু ভেবে আবার বললেন, জীতেনদা'।

—মণিবাবুকে তো বলতে হবে না। তিনি খুব বুড়ো হয়েছেন। বাবার চেয়ে বেশি বয়স। তাঁর ছেলেকে বলিস। ছেলেব নাম ফণী। আমার বাল্যবন্ধু—আমার সঙ্গে পড়তো—

সাইকেলে বালুরঘাট রওনা হলাম। সন্ধ্যা হবো হবো সময়ে পৌঁছলাম।

—ফণীন্দ্রনাথ রায় বাড়িতে আছেন?

—কে বাবা তুমি?

—আমি হরিশ চৌধুরীর ভাইপো—

—আরে—এস, এস—আমার কাছে উঠে এস। তুমি আমার নিতান্ত নিজের লোক। তুমি-তো ফণের বন্ধু জীতেনের ভাই। কলকাতায় থাকো।

আমি সাইকেলটা আমগাছে ঠেস দিয়ে বারান্দায় উঠে এলাম। ইজি-চেয়ারে শুয়ে রয়েছেন হিলি থানার সেই ত্রিশ বছর আগের ও-সি মণীন্দ্রনাথ রায়। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দাঁতগুলো পড়ে গেছে। আর বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করেন নি। সেইজন্যই আরও বেশি বুড়ো দেখায়।

—ওহে শোন, তুমি নাকি চারু দাসের খুনের কেসটা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছো। আমি সব শুনেছি লোকের মুখে। ভেবেছিলাম, তোমাকে ডেকে পাঠাবো। কিন্তু দেখ, তুমি নিজেই এসে গেছ—

একটু থামলেন বুড়ো, বহুদিন পর একজন শ্রোতা পেয়ে তিনি যেন খুব উচ্ছ্বসিত বলে মনে হল।

—একটু চায়ের কথা বলি? চা খাবে তো?

—না, না, মাফ করুন। আমি খুব জরুরী ব্যাপারে এসেছি। জ্যাঠা-মশাইয়ের অসুখ। আপনি কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ বাবা। আমার হার্টের অসুখ। চোখেও ছানি পড়েছে। বেশি বয়সে যা হয় আর কি। যেতে দাও ওসব কথা—

—আরে শুনুন শুনুন। আমি বেশিক্ষণ বসতে পারবো না। কলকাতায় পি-জি'তে মানে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হসপিট্যালে একটা খবর—

—ওসব ফণেকে বলো। মণি-বাবুর কোঁচকানো চোখ দু'টোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আমাকে ছুঁয়ে গেল। স্টাডি করছেন বলে মনে হল।

—তুমি কি কলকাতা পুলিশের আই-বি'তে চাকরি কর?

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

—করো না? তাহলে পুরণো একটা হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তোমার অত 'ইণ্টারেষ্ট' কেন?

আমি চুপ করে থাকলাম। মন ভাল না। কথা বলতে ভাল লাগছিল না।

—ও বুঝতে পেরেছি! ক্রিমিনোলজি পড়তে বুঝি ভালো লাগে?

বৃদ্ধ মানুষ। তার একটা কথারও উত্তর না দেওয়া অশোভন। তাই কারণটা বললাম। পূর্ণ মণ্ডল, বীরেন আর রাধার কাছে যতটুকু শুনেছি, যেটুকু বুঝেছি সব বললাম। বললাম আমার সাহিত্যচর্চার কথা। সব শুনে সেই মুখর মানুষটা হঠাৎ যেন একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তুমি বেশ সুন্দর চিন্তা করেছো। সত্যিই আমাদের উত্তর বাংলার গ্রামদেশের লোক বড় নিরীহ। কিন্তু আমার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের পুলিশের চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই নিস্তেজ নিরীহ অদৃষ্টবাদী মানুষগুলো যখন কোন কারণে একবার ক্ষেপে ওঠে তখন আর রক্ষে নেই। তাহলে শোন বলি, ইনভেষ্টিগেটিং অফিসারস ম্যানুয়ালে রিপোর্ট অন দি ভিলেজ ওয়াকে ও দেখবে ছাপা আছে সেই কেস। পতিবামের কাছে আত্রাই নদীর চরের ওপরে সাঁওতাল মেয়ের চোখ দু'টো একটা শক্ত আর ছুঁচলো কাঠি দিয়ে গেলে দিয়েছিল এক সাঁওতাল যুবক। মেয়েটির অপরাধ খুব সামান্য। সে বাগদত্তা হয়েও কেন-কেন পাড়ার অন্য একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিল। ভাবতে পারো কি নৃশংস খুন!

আরও বলি একটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর রাত। তুমি পাড়াগাঁর ছেলে। নিশ্চয়ই জানো, বৃষ্টি হলেই পুকুর থেকে মাছ উজিয়ে ওঠে। আর খাল, নালা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে যেতে থাকে। এইসব দুর্যোগের রাতে গ্রামে গ্রামে মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। একজনের পুকুর থেকে মাছ বেরিয়ে নালা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সেই মাছ ধরেছে আর একজন। ধরো পুকুরের মালিকের নাম রাম আর একজনের নাম শ্যাম। রাম শ্যামের কাছে মাছ ফেরত চাইল। সে আপত্তি করল। কথা কাটাকাটি হতে হতেই কোদালের উল্টো পিঠ দিয়ে এক বাড়ি মাথায়। মাথা দু'ফাঁক। সঙ্গে সঙ্গে লাশ চলে গেল বৃষ্টির জলে ভরা পুকুরের দামের নীচে, ঠাণ্ডা ঘন থকথকে কাদার ভেতরে।

আরও কত—কত কেসের কথাই যে মনে হয়। বড় ক্লান্ত মনে হল বৃদ্ধকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল।

—আপনি আর কথা বলবেন না। হার্টের রোগী—

—তুমি? দেখছি ফণের মত কথা বলছো। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বললেন, সারাদিন আমাকে একটা কথা বলতে দেয় না বাবা, ওরা। ওই ব্যাটা আর ব্যাটার বৌ। কথা বললে বকে। খিচ খিচ করে। দস্তুরমত খারাপ ব্যবহারই করে। কি করবো, বুড়ো হয়েছি। ফণের মা নেই—থামলেন মণিবাবু। মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন।

ঘুরিয়ে নিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারও বেশ ঘন হয়ে এসেছে। তবুও—

—তবুও বুঝতে অসুবিধা হল না। বৃদ্ধের চোখ দু'টো চিক চিক করছে। বুঝতে অসুবিধে হল না বিপত্নীক মণিবাবু বড় নিঃসঙ্গ। আর দুঃখী।

সংযত করলেন নিজেকে। বললেন, বয়স হয়েছে বাবা, মনটা কেমন নরম হয়ে গেছে। থাক শোন, ফণে গেছে ধান আদায় করতে স্যারণ গ্রামে। ফিরতে রাত হবে। তুমি একটু অপেক্ষা ক'রে যাও না বাবা—

আমার মনে পড়ল জ্যাঠামশায়ের কথা। তাঁর কঠিন অসুখের কথা। কিন্তু বাড়িতে তো জেঠিমা আছেন। জীতেনদা' আছেন। আর ফণীবাবু না এলে, তার সঙ্গে দেখা না হলে কাজ হবে না।

—কি ভাবছো? চলে যাবে?

—না। বলুন আপনি। চারু দাসের খুনের তদন্তের কথা। কেন আপনারা কোন কিছু—কিনারা করতে পারলেন না—

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

—সবরের ভেতর ভূত থাকলে ত' তাকে কেউ তাড়াতে পারে না বাবা।

—তাহলে কি রাধা নিজেই?

মাথা নাড়লেন। বললেন, পুরাণে আছে বাবা—দেবাসুরের যুদ্ধের

কথা। পৃথুমালি আর তার স্ত্রী পৃথুমালিনী নামে এক অসুর দম্পতীকে দেবতারা হত্যা করেছিল। তাদের রক্ত থেকে বটগাছের মত এক ধরণের গাছ জন্মো। এই গাছের রস বা নির্যাস মারাত্মক বিষ। স্থাবর-জঙ্গমের ভেতরে অত ভয়ঙ্কর বিষ আর নেই। স্বাধে বোষ্টুমী হলো সেই পৃথুমালিনী, বুঝলে বাবা—যাকে ভালবেসেছে, যাকে একবার স্পর্শ করেছে তার অবস্থাই হয়েছে ওই হতভাগা চাকর মত, শিবে—ক্ষ্যাপার মত, খাক—তুমি আমার ছেলের চেয়েও ছোট। তোমাকে আর কি বলবো—

হঠাৎ গলাটা নামিয়ে নিলেন। চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠল। ফিস ফিস করে বললেন, হয়েছে কাজ। আমি কথা বলছি নমিতা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো তুমি—

—না। বৈঠকখানার মাঠের ওপর দিয়ে কারা যেন যাচ্ছে। আমি বললাম।

—ও। শোন, চারুর খুনের রহস্যটা আমার কাছে আজও দুর্বোধ্য। আমার চাকরি জীবনে সব চাইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। খুনীকে ধরার জন্য পুলিশ এমন কিছু নেই যা করে নি। তখনকার দিনের বিখ্যাত গোয়েন্দা অরবিন্দ বোসকে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম তোলপাড় করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই হ; নি—বুঝলে।

শুধু মংলার ষ্টেটমেণ্ট থেকে নয়, আরও নানা কারণে সন্দেহ করেছিলাম নিরঞ্জন সরকারকে। কিন্তু ভুল—মস্ত ভুল করেছিলাম। যাক শোন—

চারু দাস খুন হওয়ার ঠিক একমাস পর। সরকারমশায়ের বাড়িতে ভাগবত পাঠের আসর বসেছে। বরুণের পুত্রের নাম ভৃগু। ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান। এসে দাঁড়ালেন পিতার কাছে।

ঋষি বরুণ বললেন—বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান কেউ কাউকে দিতে পারে না। যিনি গুরু তিনি ধ্যান-ধারণার নিয়ম বা বীজমন্ত্র শুধু দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্যকে তপস্যা করে লাভ করতে হয়—ব্রহ্মজ্ঞান।

আরও বললেন, যা থেকে এই সমস্ত ভূত জন্মায় —জন্মের পর যার দ্বারা জীবিত থাকে, শেষে আবার লয় পায়—চিন্তা করে দেখ বাবা, তাকেই বলে 'ব্রহ্ম'।

বরুণের উপদেশ মাথা পেতে নিয়ে ভৃগু তপস্যা করতে সুরু করলেন। কিছুদিন পর ভৃগু এলেন পিতার কাছে। বললেন, আমার মনে হয়, অন্নই 'ব্রহ্ম'। কেন না জীব জন্মের পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—আবার অন্নের ভেতরেই—

—তুমি আরও কিছুদিন তপস্যা কর—বরুণ বললেন।

ভৃগু আবার তপস্যা সুরু কর করলেন।

অদ্ভুত কণ্ঠস্বর ভাগবত-পাঠকের। চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন। কপালে চন্দনের কোঁটা। গলায় দুলছে বেলীফুলের মালা। কথা বলার ঝোঁকে ঝোঁকে মালাটা কাঁপছে।

সরকারমশা। বিভোর হয়ে শুনছেন। শুনছে শ্রোতারা। বাইরে চাঁদের আলো থৈ থৈ করছে। চারিদিক দিনমানের মত লাগছে।

কারো কিন্তু লক্ষ্য নেই বাইরের দিকে। কখনো ভৃগু বলছেন, প্রাণই ব্রহ্ম—কখনো বলছেন, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম—সেই ভৃগুর উপাখ্যান শুনছে সবাই।

কিন্তু এর ভেতরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

হঠাৎ বাইরে একটা দারুণ চীৎকার শোনা গেল—ওরে বাবা-রে কে-রে—কে এখানে?

থেমে গেলেন ভাগবত-পাঠক। শ্রোতারাও খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

—কে—কে—কে?

সবই তুমি নিশ্চয়ই জানো শঙ্কর, পাড়াগাঁয় এইসব রাত্রে চুরি-টুরি খুব বেশি হয়। সবাই চলে আসে বাড়ি ছেড়ে গান শুনতে কিম্বা যাত্রাটাত্রা দেখতে। আর পাড়াগাঁর ভেতরে এসব তো বড় একটা হয় না। তাই নিতান্ত যারা বুড়ো কি অথর্ব তারা বাদে সবাই চলে আসে।

—কেউ জায়গা থেকে উঠবে না। আমি দেখছি—বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে উঠলেন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নিরঞ্জন সরকার। ঘরে গিয়ে বন্দুক নিয়ে এলেন।

ভাগবত পাঠে বাধা পড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সরকারমশায়। বাইরে এলেন। বাড়ি থেকে বেরোতেই সরু গলির রাস্তা। রাস্তাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে গাঁয়ের একটি বুড়ি।

কি নাম তা আজ আর মনে নেই। সরকারমশা। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, কাঁপছো কেন? কাকে দেখেছিলে?

বিড় বিড় করে কি বলল বুড়ি—কেউ বুঝতে পারল না।

—ভাল করে বলো। তুমি কাকে দেখেছিলে?

—একটা লোক এখানে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। আমি এসে দাঁড়াতেই দৌড়ে পালিয়ে গেল নন্দীদের বাড়ির দিকে—

হুঁ—একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন সরকারমশায়। বুঝতে পেরেছি, শীগগিরই গাঁয়ে ডাকাতি টাকাতি হবে হয়তো।—

এই ঘটনার পর ভাগবতপাঠ আর তেমন জমল না।


নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

( নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ )

মূল্য এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

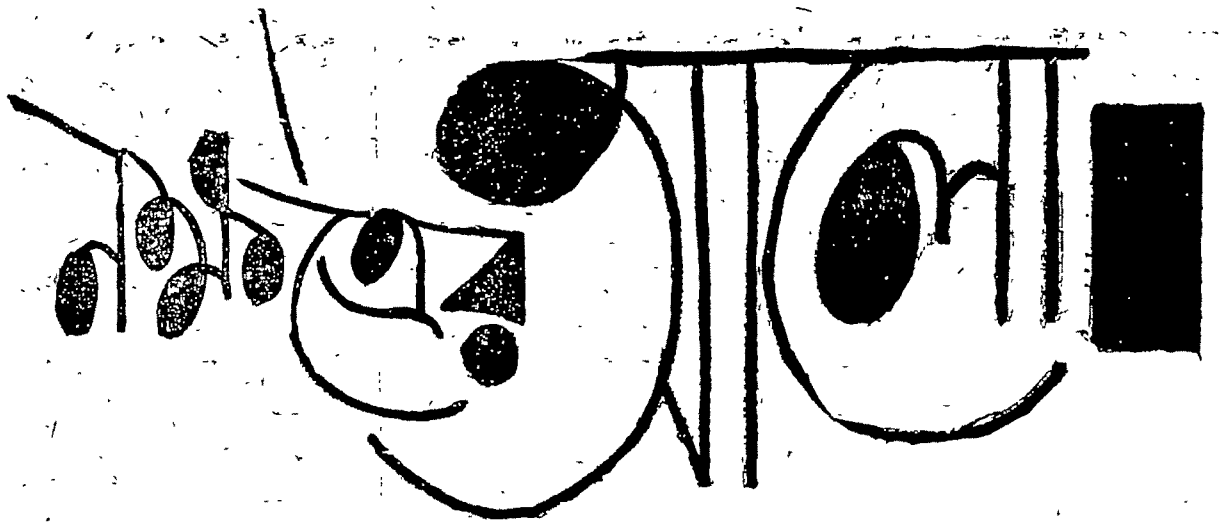

শান্তিনিকেতন,
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৪

মৈনাক—

প্রীতিভাজনেষু,

প্রথমে শ্রীনগরে, তার পরে খুলনায়, তার পরে কলকাতায় ও তার পরে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঝড়ের বেগে ঘটে গেল তাদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো আমি পাই নি। নানা জনের মুখে যা শুনেছি আর চিঠিতে যা পড়ছি তার সঙ্গে খবরের কাগজের বিবরণ ও রেডিওর সমাচার জুড়ে মোটামুটি একটা নক্সা এঁকে নিচ্ছি। আপনি তাতে আরো এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিলেন। এ কালি কোনো রকম চূণকামেই মুছতে পারে না।

দাঙ্গা যারা করেছে তারা গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে করে নি। দাঙ্গা যারা থামাতে গেছে তারাও গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে থায় নি। যে যার অশুভবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হয়েছে। অসহায় বোধ করেছে কেবল তারাই যাদের ধারণা নিজেদের একটা গবর্ণমেণ্ট হয়েছে বলে সে গবর্ণমেণ্ট সর্বশক্তিমত্তার সনদ পেয়েছে। স্বরাজ মানে সর্বশক্তিমত্তা নয়। বার্লিন শহরের মাঝখানে একটা দেয়াল দেওয়া হয়েছে। নদীর মাঝখানেও একটা কাল্পনিক দেয়াল দিয়ে নৌকোয় চড়ে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী। চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা অসহায় হয়ে দেখছেন এ-পক্ষের বা ও-পক্ষের গবর্ণমেণ্ট। তারপর যথারীতি প্রতিবাদ। তার যথারীতি উত্তর প্রত্যুত্তর। ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চোখের জলও কি শুকিয়ে যায় নি?

আগেকার দিনে আমরা যাকে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে জানতুম এ জিনিস সে জিনিস নয়। এখন দু'দিকে দু'টো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে। পাকিস্তান ছোট বলে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম নয়। তার মনে সমস্তক্ষণ সন্দেহ ভারত হয়তো তাকে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম মনে করে। ভারত সরকার এটা জানেন বলেই তার সঙ্গে সাবধান হয়ে ব্যবহার করেন। কিন্তু ভারতীয় জননায়কদের ব্যবহার সব ক্ষেত্রে সাবধান নয়। তাঁদের অনেকের বিশ্বাস যে পাকিস্তান যখন ছোট তখন তার উপর চাপ দেওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। ভারত সরকার চাপ দিতে পারতেন, দিচ্ছেন না তার কারণ তাঁদের তোষণনীতি বা মুসলিম প্রীতি। ওদিকে পাকিস্তানী জননায়কদের অনেকের ধারণা ভারত যখন বড় তখন পাকিস্তানের উপর চাপ দেবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারবে না। তাকে সংযত করতে হলে চাই আরো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। আরো জবরদস্ত মিত্র। মার্কিন জোগাবে অস্ত্রশস্ত্র। চীন হবে মিত্র।

এই যে চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার বা একে পাল্টা চাপ দিয়ে প্রতিহত করার প্রস্তাব এর কোনো শেষ নেই। সেইজন্যে গান্ধীজী প্রথমত চেয়েছিলেন একটাই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন দ্বিতীয়ত চাইলেন দুই রাষ্ট্রের একটাই সৈন্যদল, কিংবা দুই সৈন্যদলের একটাই কমাণ্ড। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন তৃতীয়ত চাইলেন যে ভারত-পাকিস্তান যে যার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করবে ও পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা না করে ভারত তার আপন কর্তব্য অবিচলিতভাবে করে যাবে। ভারত সরকারকে যে নীতি নির্দেশ করা হলো সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো কি না দেখে তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবেন ও সেখানকার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অনুরূপ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়ে নেবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। বেঁচে থাকলে তিনি নোয়াখালীতেই 'করতেন কিংবা মরতেন'। করতে পারলে আজকের এই সমস্যার উদয়

হতো না। মরলেও কিছু সুফল ফলত। পাকিস্তানের বিবেকীদের মনে একটা দাগ থেকে যেত। যেখানে বিবেক কাজ করছে না সেখানেও বিবেক সাড়া দিত।

গান্ধীজী যে নীতি নির্দেশ করেছিলেন তার চেয়ে ভালো কিংবা কার্যকর নীতি আমার জানা নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আমিও সেই একই নীতিতে উপনীত হই। এদিকে ভারত সরকার ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের ধন প্রাণ ও মান রক্ষা করবেন, পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। ওদিকে গান্ধীজীর মতো কয়েকজন সত্যাগ্রহী নোয়াখালীতে তথা পূর্ববঙ্গের জেলাতে জেলাতে 'করবেন কিংবা মরবেন'। বুকে হাত দিয়ে বলবার সময় এসেছে, সত্যি কি ভারতের প্রত্যেকটি জায়গায় গান্ধী-নির্দিষ্ট নীতি পালন করা হয়েছে এতদিন? না মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে? আর নোয়াখালীতে ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় গান্ধীজীর মতো সত্যাগ্রহীরা কি অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন?, মাঝে মাঝে প্রাণ বিপন্ন করেছেন কি?

পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন এই সম্প্রতি হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে স্বধর্মীর হাতে মৃত্যু বরণ করেছেন। একজনের নাম জানতে পেরেছি। আমীর হোসেন চৌধুরী। সুপরিচিত লেখক ও সমাজসেবী। ঢাকার নবাবপুরে দিনে দুপুরে পশ্চিমা মুসলমান দাঙ্গাবাজের হাতে নিহত হন। ইনি অমর। শান্তি মিছিল বার করতে গিয়ে আরো কয়েকজনও অমর হয়েছেন। সবাই মুসলমান। এঁরাই প্রকৃত ধার্মিক। এঁরাই ইসলামকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচালেন। এদিকে হিন্দুত্বকেও কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন মিশ্রীলালের মতো ধার্মিক তথা অমর। এই অন্ধকার মেঘলা রাত্রে আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি, এখানে ওখানে জ্বলতে থাকা এরকম সাত আটটি তারার আলোয়। এঁরাই সব চেয়ে সংখ্যালঘু। এঁরা অভয় দিয়ে গেলেন যে, সংখ্যালঘুদেরও সহায় আছে, তারা একেবারে অসহায় নয়।

পূর্ববঙ্গে আমি অনেকদিন কাজ করেছি। পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এমন গ্রাম আছে যেখানে রাস্তাঘাট নেই। পুলিশ সহজে পৌঁছতে পারবে না। তা ছাড়া একটা থানায় ক'জনই বা কন্‌টেবল! হাজার ঘর মুসলমানের মাঝখানে পাঁচ সাত ঘর হিন্দু বাস করছে কার উপর ভরসা করে? পুলিশের উপর না প্রতিবেশীর উপর? হিন্দুর বিপদে আপদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তেমনি মুসলমানদের আপদে বিপদে হিন্দু। এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক চুক্তি নেই। এটা মানুষের ধর্ম। তা ছাড়া লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে লৌকিক মুসলমান ধর্মের ঘরোয়া একটা রফা বহু শতক ধরে চলে এসেছে। নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান এটা মানে। লেখাপড়া শিখলেই পুঁথিপত্র এসে সব গোলমাল করে দেয়। কিংবা মোল্লা এসে ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে যায়। ধর্মের সঙ্গে যদি রাজনীতি যোগ দেয় তবে আর রক্ষা নেই।

রাজনীতি ঢুকল নির্বাচনের সূত্র ধরে। মুসলমানের আলাদা একটা নির্বাচকমণ্ডলী। তার থেকে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি যদি বলে বেড়ান ইসলামের মহাবিপদ তা হলে মুসলমানের মনে ভেদবুদ্ধি জাগবেই। কতক মুসলমান তা সত্ত্বে মুসলিম লীগকে ভোট দেয় না। কৃষক প্রজা পার্টিকে দেয়। তখন পাকিস্তানের নামে ভোট চাওয়া হলো। নিজেদের নবাব বাদশারা ফিরে আসবেন, শুধু একটা ভোটের অপেক্ষা। ভোট না দেবে কোন্ মুসলমান? তার পরের ধাপটি ডাইরেক্ট অ্যাকশন। সাধারণ দাঙ্গা নয়। একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের দ্বারা যেটা স্থির হবার কথা সেটা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলে স্থির হলো। এক বছর যেতে না যেতেই দেশ ভাগ হয়ে গেল, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক ১৫ই অগাষ্টের দিন সাতেক আগে আমি পূর্ববঙ্গ থেকে বদলি হয়ে আসি। তখনো আমি সেখানকার হিন্দুদের মনে সন্ত্রাস দেখি নি। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার তুলনাই হয় না। তবে একথাও আমি শুনে আসি যে কলকাতায় যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় তবে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর উপর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। কলকাতার হিন্দুরা নাকি ১৫ই অগাষ্ট দিন ঠিক করেছে যে সারা বছরের শোধ নেবে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের আপ্রাণ প্রয়াস সার্থক হলো। সেদিন যা ঘটল তা বিজয়া দশমীর কোলাকুলি। কলকাতায় শান্তি, সুতরাং পূর্ববঙ্গেও শান্তি। শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন যিনি তিনি গৃহবিবাদের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। সেদিন গান্ধীজীও চান নি, কোনো পক্ষের কোনো নেতাই চান নি যে, সব হিন্দু এপারে চলে আসে ও সব মুসলমান ওপারে চলে যায়। তাই যদি হতো তবে তার উপযোগী লগ্ন ছিল ১৫ই অগাষ্ট। সেদিন যদি কলকাতায় হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে হানা দিত তা হলে পুলিশের এত জোর ছিল না যে বাধা দেবে, মুসলমানদেরও এত জোর ছিল না যে রুখবে। হাজার হাজার মুসলমান কাটা পড়ত, যারা বাঁচত তারা পালাত, যারা পালাত তারা নাচাত। সঙ্গে সঙ্গে ওপারেও শুরু হয়ে যেত হিন্দুনিধন ও বিতাড়ন। এক মাসের মধ্যেই এক কোটি লোক এসে পঞ্চাশ লাখ লোকের ঘরবাড়ি ও মসজিদ দখল করে বসত। কোথায় মিলিটারী যে বাংলার হিন্দু মুসলমানকে

সেই সঙ্কটে ত্রাণ করত! তার বদলে ছিলেন এক মহাত্মা। তিনি একাই এক ডিভিজন সৈন্য। মাউন্টব্যাটেন বলেন, 'ওয়ান-ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স।'

সেই যুগসন্ধি চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সরকারের উদ্যোগে প্ল্যান করে লোকবিনিময় হয় না। হতে পারে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে কতক লোককে সীমান্ত পার করে দেওয়া। ওদিক থেকে আসবে এক দল। এদিক থেকে যাবে আরেক দল। কিন্তু তার ফলে কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। দু'দিকেই থেকে যাবে অধিকাংশ সংখ্যালঘু। রাখাখান থেকে পঙ্গু হবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন। মানুষ তো রাক্ষস হয়ে যাবেই, শহরে ও গ্রামে প্রবর্তিত হবে জঙ্গল আইন। আর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন এক জাতিবৈর সৃষ্টি হবে, যার জের চলবে পুরুষানুক্রমে। প্রতি দশ বিশ বছর অন্তর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধবে, দফায় দফায় লোক-বিনিময় হবে। পাঞ্জাবের যা হবার তা এক দফাতেই হয়ে চুকেছে। বাংলার যা হবার তা সাত দফাতেও হারা হবে না।

কিন্তু কেন? সত্যি কি এর কোনো দরকার আছে? দেশভাগ হয়েছে বলে কি লোকবিনিময়ও ঘটা উচিত? অনেকের মনে এখনো এই যুক্তি কাজ করছে। মুসলমানরা কেন এ রাষ্ট্রে বাস করবে? এটা তো ওদের স্থান নয়। এ মনোভাব এখনো সক্রিয়। বলা বাহুল্য এঁরা শিক্ষিত সজ্জন। এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেই এঁরা প্রশ্ন করেন, তা হলে দেশ ভাগ হলো কেন? ইতি-মধ্যেই এঁরা ভুলে গেছেন যে, দেশ ভাগ না হলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজত্বে বাস করতে হতো না। হতো নিখিল বঙ্গে মুসলিম লীগ রাজত্বে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতবার রাজার রাজায় দেশ ভাগ হয়েছে। কই, লোকবিনিময় তো হয় নি? এই প্রথম বার আমরা দেখতে পেলুম পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে সে রকম একটা অনর্থ ঘটে গেল। সেটা রাজায় রাজায় একমত হয়ে লোকবিনিময় নয়। সেটা আপনা আপনি ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। তাতে করে প্রমাণ হলো না যে ভারতে মুসল-মানের স্থান নেই। তাই যদি হবে তো কাশ্মীরের ওপরে আমাদের কিসের দাবী? ভারতের সংবিধান হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান ভেদ স্বীকার করে না। সমাজে এসব থাকতে পারে, রাষ্ট্রে এসব নেই। সংবিধান রচনার চোদ্দ বছর বাদে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটেছে বলে কি আমরা সংবিধানের নির্দেশ উপেক্ষা করব?

মুসলমানকে বিদায় করা চলতে পারে না, এটা এখন স্বতঃসিদ্ধ। তা হলে লোকবিনিময় কথাটার কোনো অর্থ হয় না। যাবে না একজনও, আসবে এক কোটির মতো লোক। এতগুলি পাকিস্তানী ন্যাশনালকে তাদের রাষ্ট্র আসতে দেবে কি না সন্দেহ। একবার একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হবার পর সহজে নিষ্কৃতি নেই। ভারতীয়দের অনেকে ইংলণ্ডের নাগরিক হয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তো কন্‌স্ক্রিপশন থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাঁরাও হয়তো চাইবেন ভারতে পালিয়ে আসতে। সে সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি রাজী হবেন তাঁদের ছাড়তে? পাকিস্তানের সঙ্গে আগে থেকে বন্দোবস্ত হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ স্থলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের এক্তিয়ার থাকবে। সেটা কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্যে নয়। একটা রাষ্ট্রের অর্থনীতি নষ্ট করে দেবার জন্যেও নয়। তার উপক্রম দেখলে পাকিস্তান নিশ্চয় প্রতিবাদ করবে। কতক লোক যেমন করে হোক চলে আসবেই। কেউ তাদের আটকাতে পারবে না। আটকাতে হলে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেটা পাকিস্তান সরকারের কর্তব্য।

ঘটনাপরম্পরার আরম্ভ পূর্ববঙ্গে নয়, কাশ্মীরে। বিনা অপরাধে শাস্তি পেলো পূর্ববঙ্গের হিন্দু। পাকিস্তান সরকার যদি হিন্দুর আস্থা হারান তা হলে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে সরকারকে সরানোর ক্ষমতা সংখ্যালঘুর নেই। কিন্তু হিন্দুদের অনাস্থা ক্রমে মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। কর্তাদের আসন টলবে। এটা যদি তাঁরা বুঝে থাকেন তাঁরাই আস্থাভাজন হতে যত্নবান হবেন।

অনেকদিন আগে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপন দেখতুম। 'জামাকাপড় পরে সবাই তৈরি, কিন্তু যাবার নেই কোথাও।' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলাধুলা করার জায়গা নেই ধারে কাছে। পাকিস্তানী লড়নেওয়ালাদের দশা কতকটা লণ্ডনের খেলনেওয়ালাদের মতো। সর্বাঙ্গে হাতিয়ার। মুখে রণহুঙ্কার। চোখে কাশ্মীরের ভূস্বর্গের মৃগতৃষ্ণা। কিন্তু রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর দূর অস্ত। খেলার মাঠে পা বাড়াবার জো নেই। ভারত বলে দিয়েছে কাশ্মীর আক্রমণ মানে ভারত আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও আক্রান্ত হবে।

জনসাধারণকে যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুদ্ধের জন্য তাতিয়ে তোলা হয় তা হলে একদিন তাদের কতক বেপরোয়া হয়ে সামনে যাকে পায় তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের স্বাদ দাঙ্গায় মেটায়। এ হলো স্নায়ুযুদ্ধের অনিবার্য পরিণাম। মানুষকে যদি যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করে যুদ্ধ না দেওয়া হয় তবে সে তার সেই উত্তেজনা নিয়ে করবে কি? ভিতরকার গরম বাইরে বেরোতে না পেলে মানুষ যে ছটফট করে বুক ফেটে মারা যাবে। পাকিস্তানের মতো

দেশে বিপ্লব হয় না। হয় দাঙ্গা। দাঙ্গার অবকাশ মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানেও মেলে। বছর দশেক আগে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। বড়লাট গুলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করেন। কিছুদিন আগেও শিয়াদের উপর হামলা হয় শুনেছি। ঠিক মনে পড়ছে না সব কথা। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু থাকলে আর মুসলমান মারতে হতো না। পূর্বপাকিস্তান যখন হিন্দুশূন্য হবে তখন মোহাম্মদীরা হানাফিদের নেরে হাতের সুখ পাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ইহাই নিয়ম।

তবে ইতিহাস এখন বিংশ শতকের তৃতীয় পাদে পৌঁচেছে। ইসলামী দেশগুলোও লাল হয়ে যাচ্ছে। চীনের কুলীবকে যাঁরা খাল কেটে ঘরে ডেকে আনছেন তাঁদের কি খেয়াল নেই যে একদিন তাদের প্রিয় দাঙ্গাবাজরাও লাল হয়ে যাবে? সেদিনকার দাঙ্গার নাম হবে বিপ্লব, রূপ হবে বৈপ্লবিক। সেদিন হয়তো এমন দৃশ্যও দেখা যাবে যে দমদমের বিমান বন্দরে অবতীর্ণ হয়েছেন চাকার পলাতক মুহম্মদ তুঘলক সম্প্রদায়। মানুষ শিকারে যাঁদের আনন্দ। আর একদল রেফিউজীকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতে হবে।

পাকিস্তান কবে ভাঙবে, জানিনে। কিন্তু বাঙালী জাতি যে চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামছাড়া শহরছাড়া রাজ্যছাড়া হয়ে যারা দিগ্‌বিদিক ছুটছে তারা হিন্দু কি মুসলমান সেটার চেয়ে বড় কথা তারা বাঙালী। ইসলামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সাতশ' বছর কেটে গেছে। বাঙালী চিরটাকাল তার ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে আছে। যাদের জীবিকার জন্যে দূর দেশে যেতে হয়েছে তারাও বছরে একবার পুজোর সময় ঘরে ফিরেছে। এমন ঘরমুখো জাতি আর নেই। সেই জাতিরই কপালে ছিল এই দুঃখ। কিন্তু কেন? কোথায় এর মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা? এটা কি ধর্মযুদ্ধের শতাব্দী? ক্রুসেড বা জেহাদ কি দুনিয়ার আর কোনো দেশে আজকের দিনে ঘটছে?

না। এর পিছনে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নেই। সেটা হয়তো ছিল লক্ষ্মণসেনের আমলে। সেকালেও বাঙালী জাতি ভেঙে যায় নি। তার সমাজবিন্যাস, তার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় নি। কতক বাঙালী ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভাষা বা সংস্কৃতি বর্জন করে নি। ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ও অনুপাত বেড়েছে, কিন্তু বাঙালীর বাসভূমি ও বাংলার আবহাওয়া বদলায় নি। সুলতানী আমলে যা ঘটল না, নবাবী আমলে যা ঘটল না, ইংরেজ আমলে যা ঘটল না তাই ঘটে চলেছে পাকিস্তানী আমলে। দাঙ্গা যে সব সময় ওপারেই শুরু হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো বার এপারেও আগে বেধেছে। পশ্চিমবঙ্গে না হোক উত্তর প্রদেশে বা মধ্যপ্রদেশে। সেসব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে অনর্থের বীজ বুনে যাচ্ছে তার ফসল কাটার সময় ডাক পড়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। উত্তর প্রদেশে গোহত্যা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার উত্তর দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলোর জন্যে হিন্দী-ওয়ালারাও দায়ী। স্বাধীনতার পর থেকে উত্তর প্রদেশে উর্দুর উপর যে জুলুমটা চলেছে সেটার জবাবও দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। আসাম থেকে অনধিকার প্রবেশের জন্যে যেসব মুসলমানকে পূর্বপাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে তাদের জন্যেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। এর পিছনে যা আছে তার নাম ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নয়, গায়ের ঝাল ঝাড়া। ঐ করতে গিয়ে গাঁ উজাড়, শহর উজাড়, চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য বানচাল।

কবে শিক্ষা হবে, জানিনে। শিক্ষাটা এই যে হিন্দুর ক্ষতিতে মুসলমানেরও ক্ষতি। তেমনি মুসলমানের ক্ষতিতে হিন্দুরও ক্ষতি। এবার সে ক্ষতি চরমে উঠেছে দেখে আশা হয় এ অধ্যায়টা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু বার বার আশাভঙ্গের পর বাজী রেখে বলতে পারছিনে যে এই শেষ। তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি যে একের সর্বনাশে অপরের সর্বনাশ। পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দু যদি চলে আসে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হবে আর পশ্চিমবঙ্গে চালের মণ হবে এক শ' টাকা। প্রাণে বাঁচবে ক'জন। হিন্দুরা মরীয়া হয়ে হিন্দুর ঘরেই হানা দেবে, মুসলমানের ঘরে আর কতটুকুই বা পাবে। ওপারেও দেখা যাবে একই দৃশ্য। মুসলমান লুট করছে মুসলমানের দোকান, মুসলমানের গোলা। সেবারকার মন্বন্তরের মতো রাস্তার ধারে খাবারের দোকান আস্ত রেখে মরবে না কেউ। পুলিশের বন্দুকে ক'টা গুলী আছে যে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুকে মারবে।

রম্যা রঁলার উক্তি মনে পড়ছে। 'পথে প্রবাসে'র থেকে তুলে দিচ্ছি।

'প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে দেখছি যুদ্ধের অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।'

দাঙ্গাও এক জাতের যুদ্ধ। হিন্দু মুসলমান যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক সম্প্রদায়ের ক্ষতিতে সব সম্প্রদায়ের ক্ষতি, দাঙ্গা ততদিন থাকবেই। ভারত পাকিস্তানের ইতিহাসে দেখছি দাঙ্গার অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। আলো জ্বালাতে হবে। আলো জ্বালাতে হবে। দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলতে হবে। যেমন করে জ্বালিয়ে গেছেন আমীর হোসেন চৌধুরী, মিশ্রীলাল ও আরো কয়েকজন তেমনি করে। তা যদি না পারি তো রম্যা রঁলা যেভাবে জ্বালাতে বলেছিলেন সেই ভাবে। দাঙ্গার প্রতিষেধ—শিক্ষা।

আমার নমস্কার। ইতি। ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

# কবিতা

## হেন্‌রী ওয়াড্‌স্‌ ওয়াথ লংফেলোর দু'টি কবিতা

### কবি ও তাঁর গান

পাখিরা যেমন আসে বসন্তকালে,
অজ্ঞাত কোন দেশ থেকে জানা নেই ;
তারকা যেমন আসে সন্ধ্যার ভালে
বাতাসের গভীরতা থেকে আকাশেই ;

বৃষ্টি যেমন জমে মেঘডম্বরে,
মৃত্তিকা থেকে নদী নিজে ছুটে যায় ;
যেমন সহসা, ধীরে বা উচ্চ স্বরে,
তুফীম্ভাবে শব্দেরা গর্জায় ;

দ্রাক্ষালতায় যেমন আঙুরগুচ্ছ,
আর নানা গাছে ঝোলে কত শত ফল ;
বাতাসে যেমন কাঁপে দেবদারু উচ্চ,
তরঙ্গ এসে সমুদ্রে উচ্ছল ;

যেমন জাহাজে অমল-ধবল পাল
দূর সাগরের বুকে হয় একাকার ;
হাসিতে যেমন হয় সে ওষ্ঠ লাল ;
কেনা হতে চায় ঢেউয়ের অলঙ্কার ;

তেমনি সকল সঙ্গীত কবি পায়,
হঠাৎ বাহির হয় তার লয় সুর
কুহেলিকাময় দেশ থেকে বাহিরায়,
কোথায় সে দেশ—কে জানে তা কত দূর।

তার সে-কবিতা, অথবা নয় তা তার
সে-ই গায় গান, তাদের যা সম্মান
হয় তার, তবু সকল প্রশংসার
মাঝখানে থাকে নাম যে অনির্বাণ।

কতো না কণ্ঠ তাকে করে অনুসরণ,
তা শুনেই নেই রাত্রেও নিস্তার,
দেবদূত বলে : 'লিখো' দৈবাৎ যখন,
অতিযতে পারে সে বাণী সাধ্য কার।

অনুবাদক—বৈশম্পায়ন

### রাজা ত্রিশঙ্কু

বিশ্বামিত্র কোন যাদুকর
মন্ত্রে তন্ত্রে ঝাড়-ফুঁকে
দিলেন ছুঁড়ে ত্রিশঙ্কুরে
দেবরাজের সেই মুলুকে।

রুষ্ট নিজে ত্রিদিবপতি
দেবতাগণ ততই ক্রুদ্ধ,
দুয়ের দ্বন্দ্বে ত্রিশঙ্কুরাজ
মধ্যপথে হলেন রুদ্ধ।

আশাই করে উর্ধ্বচারী
দ্বিধাই টানে নিম্নস্রোতে,
তাই তো মানবহৃদয় ঝোলে
স্বর্গমর্ত্যের মধ্যপথে।

অনুবাদক—অক্ষয়কুমার চন্দ

# গ্রন্থমেলা

জয়ন্তী সেন

**প্রথম পদক্ষেপ ঃ** রামপদ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক সাহিত্য ভবন, ৪।৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'প্রথম পদক্ষেপ' উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র গতির কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা জটিল জীবনধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রাম্য হলেই যে তা সরল ও সহজ হবে—এমন কোনো কথা নয়। মৃত পরম বন্ধুর যুবতী স্ত্রীকে সহায়তা দান করেছিল উপন্যাসের নায়ক অনাদি। অনাদির স্ত্রীর চোখে সেটা ভালো ঠেকে নি। ঈর্ষা ও দ্বেষের আগুনে দগ্ধ স্ত্রী সুবলা লক্ষ্য করেছিল স্বামীর আশ্রিতা নয়নতারার ব্যভিচার। কিন্তু অনাদি নিষ্পাপ। তবু স্ত্রীর কাছে সে সন্দেহ-মুক্ত ছিল না। অবশেষে সেই অনাদি হারালো তার ছেলে, স্ত্রী হল আত্ম-মতিনী। অবশ্য ঔপন্যাসিকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শক্তির গুণে হিংসা, দ্বেষ, প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মানবমনের ঔদার্য। জীবনের অবশ্যম্ভাবী গতির ধারায় দেখা গেছে অনাগত বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। একালে গ্রামীণ জীবনের যে পরিণতি ঘটছে, লেখক উপসংহারে তারই সংক্ষিপ্ত রূপ অবলোকন করেছেন। অন্যান্য চরিত্রের মনের কথাও লেখক এমন সূক্ষ্মভাবে টেনে বের করেছেন যে বিভিন্নধর্মী মানুষের সঙ্গে 'প্রথম পদক্ষেপ'-এ আমাদের অনিবিড় পরিচয় ঘটে। উপন্যাসটির কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতি অনস্বীকার্য।

**মহারাণী কুন্তী ঃ** মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম : ২'৭৫ নঃপঃ।

স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ বাগচী কর্তৃক কুন্তী চরিত্রের ব্যাখ্যা উজ্জীবন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই তত্ত্বসমন্বিত ব্যাখ্যা 'মহারাণী কুন্তী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিতে কুন্তী, তাঁর সবলতা দুর্বলতা সব কিছুই যুক্তির সাহায্যে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তা আধুনিক পাঠকের কাছে চির নতুন আদর্শের প্রতীক বলে প্রতীয়মান হবে। কুন্তী শুধু জননীই নন, একজন আদর্শ নারী এবং সাধারণ সুখ-দুঃখে জর্জরিত মহীয়সী মানবী। এই ধরণের চরিত্র-ব্যাখ্যা পেয়ে সকলেই উপকৃত হবেন।

**মীরা ভজনমালা ঃ** (১ম খণ্ড) —শ্রীসুধাময় গোস্বামী। হৃষীকেশ সঙ্গীত বিদ্যালয়, নবদ্বীপ।

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

সুরকার শ্রীগোস্বামী শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নন, একজন ভক্ত-রসিক। উপরোক্ত গ্রন্থটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত তা হচ্ছে এই যে, বাংলা দেশের সঙ্গীত-শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মীরার ভজন গান স্বরলিপির মাধ্যমে প্রচলন করা। অবশ্য ভজন গানের স্বরলিপি জানলেই সব জানা যায় না, যদি প্রাণের আকুতিতে তার ভাবার্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী ভজন গানগুলির ভাবার্থ সন্নিবেশ করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উপকার করেছেন, একথা অনায়াসে বলা যায়। ২৫টি পদের মধ্যে ৬খানি শ্রীপরমেশ সিংহ রচিত। স্বরলিপি শ্রীগোস্বামীর। এই গ্রন্থ সঙ্গীতের দরবারে সহজ-প্রবেশাধিকার লাভ করবে বলে আমরা আশা করি।

**দেশ বিদেশের রোমাঞ্চ কাহিনী ঃ** জীবন চৌধুরী।

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ২২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১। মূল্য : ২'৫০ নঃ পঃ।

ছোটদের চিত্তের উপযোগী বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। এমন কি, ঐ প্রকার রচনার অনুবাদের সংখ্যাও নগণ্য বলা চলে। আলোচ্য গ্রন্থে 'দুরন্ত অভিযান', 'অজ্ঞাত যুবক,' 'সার গাওবাইনে ও বীর যুবক' ও 'প্রতিশোধ' নামক চারটি গল্প বিদেশী সাহিত্য অবলম্বনে লিখিত হয়েছে। গল্পগুলিতে বীরত্ব ও আদর্শ ফুটিয়ে তোলা মৌলিক উদ্দেশ্য হলেও, শিশুমনে রোমাঞ্চ সৃষ্টিতেও লেখক সার্থক হয়েছেন। তবে ভাষা আরো সহজ ও সরল হওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়।

**বাটানগর রিক্রুয়েশন ক্লাব ম্যাগাজিন ঃ** সম্পাদক : শ্রীঅশোককুমার ভাদুড়ী। বাটানগর, ২৪ পরগণা।

দ্বিভাষিক এই পত্রিকাটি চতুর্দশ বৎসরব্যাপী সাধারণত সদস্য-সদস্যাদের রিক্রিয়েশনের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হলেও, এর সমুদয় রচনার মান উল্লেখযোগ্য। কর্মী মানুষের মধ্য দিয়ে কি ভাবে মানসিক আত্ম-প্রকাশ ঘটতে পারে, এই পত্রিকাটি পাঠ করলে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন রচনা এই পত্রিকাটির উপজীব্য। এতে লিখছেন ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রায় ২৮ জন লেখক। ক্লাব-সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বাইরের খ্যাতনামা যে সব লেখক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী দিনেশ দাস, সুশীল রায়, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, দুর্গাদাস সরকার, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ অন্যতম।

# শহর কলকাতা ✻ শ্রীপদাতিক

## আদি-অধুনার ইলিয়ট রোড এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা

ইলিয়ট রোড রাজপথ নয়। বিস্তার তার দৈর্ঘ্যে সীমিত, প্রস্থেও পরিমিত। তার এক মুখ ওয়েলেসলি স্ট্রীটের ওষ্ঠদেশে উৎপীড়িত, অন্য মুখ তার সমর্পিত সার্কুলার রোডের বলিষ্ঠ অঙ্কে। সুতরাং দুই মুখের দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর বলেই মহানগরীর সরণী-রূপে খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয় ইলিয়ট রোড। তবে তার নির্মেদ দেহলতা থেকেই উৎকীর্ণ হয়ে যে-অসংখ্য উপরাস্তার পরিবেষ্টন ঘটেছে ডাইনে-বাঁয়ে এবং প্রতিপথে অনিয়ন্ত্রিত হলেও—সংসার-যাত্রার যে-মাত্রাহীন হাট বহু-বৈচিত্র্যে সন্নিবিষ্ট, তাতে বসতি অঞ্চলরূপে আজ আর তা উপেক্ষার নয়।

আজ যে সার্কুলার রোডের এক-ভাগ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আরেক ভাগ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামাঙ্কনে মহিমান্বিত, জব চার্ণকের যুগে সে-রাস্তাই তো ছিল খর্গী-প্রতি-রোধ-পরিখা। পরিখা হলেও, পল্লীর নিসর্গ-লালিতা নদীর মতোই যে তার বিস্তার ছিল এবং গভীরতাও ছিল বিপত্তিহীন, তা হয়তো আজ আর কারো কাছেই অবিদিত থাকবার কথা নয়। বাগবাজার থেকে সুরু হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে তার বর্তিলাভ ঘটেছিল খিদিরপুরের আদি গঙ্গায়। সুতরাং গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ ছিল বলেই জোয়ার-ভাঁটার ঘুলনযাত্রায় অপাঙক্তেয় ছিল না সে-ও। সুতরাং অনায়াসেই নৌকো ভাসতো তার বুক বেয়ে, পণ্যবাহী নৌকো। পালে পালে ঢেউ দোলাতো হাওয়া, গানে গানে ক্লান্তির গায়ে হাত বুলোতো মাঝি। আর রাস্তা শাড়ির আঁচল ছড়িয়ে তীরে এসে দাঁড়াতো বধূ-বরণ গোধূলি। তারপর হাসতে হাসতেই সে হঠাৎ পালিয়ে যেতো দূরে তেপান্তরে অথবা অরণ্যে।

এই খর্গী-প্রতিরোধ-পরিখার পশ্চিম তীরেই এক অনাদৃত, অনাবাদী ও বসতিহীন অঞ্চলরূপে অনেককাল উপেক্ষিত ছিল বর্তমান ইলিয়ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। তখন এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের বিশেষ কোনো সমতা ছিল না। কোথাও আগাছাকীর্ণ জলাভূমি, কোথাও নিরুপদ্রব বাঁশের ঝাড়, কোথাও বা বর্ণচোরা বাদামীবীথি এবং কোথাও হয়তো টিলা বিশিষ্ট তৃণাঞ্চলের ধারে-কাছে কিছু তালবৃক্ষের অবস্থান ছিল এলোপাথারি। এখান থেকে অনেক দূর উত্তরে ছিল কৃষাণ পল্লী, জেলে-পল্লী, এবং দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ-ঘেঁষে ছিল তন্তুবায়-পল্লী ও নাথ-যোগীদের বিক্ষিপ্ত বসতি। এ-সমস্ত পল্লীর বাসিন্দারা বর্তমান ইলিয়ট রোড অঞ্চলের তৎকালীন ভূমিখণ্ড মাড়িয়েই নদী-সমীপ সেই পরিখার ঘাটে আসা-যাওয়া করতো। জেলেরা আসতো মাছ ধরতে : কৃষাণরা আসতো স্নানে অথবা গৃহপালিত পশুকে জলপান করাতে ; আর তন্তুবায় শ্রেণী আসতো এই পরিখা-পথেই তাদের তাঁতজাত বস্ত্রাদির চালান দিতে। তাদের পায়ে-পায়েই কয়েকটি মেঠো পথের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল জলা-ভূমির পাশ দিয়ে, তালবীথির ধার ঘেঁষে এবং বাদামতলার ঝরাপাতার ওপর দিয়ে। এ সমস্ত পথের দীঘল রেখা যেন একাধিক পল্লীবালার মলিন মুখে শুভ্র হাসির অপরিবর্তিত উদ্ভাস। কোনো আড়ম্বর নেই, প্রসাধন নেই, চাতুরী বা ছলনাও নেই। দিনের আলোয় যেমন উজ্জ্বল, তেমনই দিনান্তে অন্ধকারের কোলেও তাদের নির্লিপ্ত শুভ্রতায় কোন বিকারের প্রকাশ সহজে ঘটতো না। তাই এ-সমস্ত পথ বেয়ে বিশেষ ক'রে জেলের দল তখন গভীর রাত্রেও চলাচল করতে পারতো মাছ ধরার তাগিদে।

বর্তমান ইলিয়ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার তৎকালীন ভূমিখণ্ডের সেই প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থা জব চার্ণকের আমল থেকে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্যন্ত ঠিক সেভাবেই ছিল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হতেই একদিকে সিরাজের পতন এবং অন্যদিকে শাসকরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সারা বাংলায় যে-পরিবর্তনের জোয়ার নামায় —তার প্রচণ্ড ঢেউ কলকাতাতেই আসে প্রথম। কলকাতার গড়-গোবিন্দ-পুর তখন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গোবিন্দপুরের সমগ্র ভূ-ভাগ কোম্পানীর খাস দখলে আসায়, উক্ত গ্রামের বিত্তশালী মহল যেমন স'রে আসেন চোরবাগান বা সুতানুটী অঞ্চলে, ঠিক তেমনই সেখানকার কিছু তন্তুবায়, জেলে এবং সেই সঙ্গে কিছু নাথ-যোগী স'রে এসে নতুন বসতি গ'ড়ে তোলে বর্তমান ইলিয়ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার তৎকালীন ভূমি-খণ্ডে। ফলে ভরাট হয়ে ওঠে জলাভূমি, অপসারিত হয় বাঁশবন, সঙ্কুচিত হয় বাদামতলা, সমতলে নেমে এসে সাম্য রক্ষা করে টিলা বিশিষ্ট তৃণাঞ্চল। এভাবেই পরিবর্তনের প্রসাদ পেয়ে পরিখার পশ্চিম তটবর্তী ভূমিখণ্ড হঠাৎ রূপান্তরিত হয় এক নতুন পরিবেশের শরণে এসে। তারপর সম্ভবত উক্ত পরিবেশেরই উৎরাই পথে বিলম্বিত চরণ ফেলে, ধীরে ধীরে অস্তাচলে চ'লে পড়ে অনেক ক'টি যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ইলিয়ট রোড এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কোনো ইতিহাস নেই। অথবা থাকলেও, আজ তা আবিষ্কার করা সহজ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের ঠিক পরেই ইলিয়ট রোড অঞ্চলের পরিবেশগত চিত্র পূর্বাবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন পরিখা স'রে গেছে। এপারের সমগ্র অঞ্চলে মাথা তুলেছে অজস্র কোঠাবাড়ি, একাধিক বস্তি, দু'একটি উপাসনা গৃহ। তাছাড়া বসতির আশে-পাশে একাধিক অলিগলি সহ দু'-একটি পথেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তন্মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—তখনই তার নামকরণ হয়েছে আহাম্মদ জমাদারের রাস্তা। ওদিকে জব চার্ণকের আমলের সেই বাদামতলারও রূপান্তর ঘটেছে সমাধিক্ষেত্রে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আহাম্মদ জমাদারের রাস্তাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র অঞ্চলব্যাপী যে বিস্তৃত বসতির বিন্যাস —তার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী এবং এই বিদেশীদের মধ্যে পর্তুগীজ, ইংরেজ, আর্মানী ও চীনদেশীয়রাই উল্লেখ-যোগ্য।

ইতিহাস বলে: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইলিয়ট রোড অঞ্চলের উল্লেখিত মিশ্র-বসতির মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে থাকতো অসংখ্য চোর, ডাকাত এবং কিছু গুণ্ডা শ্রেণীর অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাদের অব্যাহত উপদ্রবে তখন শহর-কলকাতার শান্তি বিপন্ন হয়ে পড়তো প্রায়ই। বিশেষ ক'রে যোশেফ নামক একজন ডাকাত ছিল সব চাইতে দুর্ধর্ষ। সে তার দলবল সহ হানা দিতো কলকাতার সর্বত্র। তবে তার দ্বারা গরীব বা মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো ক্ষতিসাধন হতো না। তৎকালে এ-দেশীয়দের মধ্যে যাঁরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য বিত্তশালী এবং বিদেশীয়দের মধ্যে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ-পুরুষ, কেবল তাদের গৃহেই সে হানা দিতো অতর্কিতে। অর্থের সঙ্গে তার রমণী-লিপ্সাও ছিল তীব্র। তাই যখন যেখানে সে হানা দিতো, তখন সেখানে কোনো সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ পেলে, তাকে সে রেহাই দিতো না। তার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে: একদিন এক প্রেক্ষাগৃহে কোনো এক উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর বিবাহিতা পত্নীকে দেখে যোশেফের ভালো লাগে। সে জানে, তার মত একজন কুখ্যাত ডাকাতের প্রেমের ডাকে সাড়া দেবে না সেই রমণী। অর্থের বিনিময়েও তাকে লাভ করা দুষ্কর। তাই সে গোপনে উক্ত রমণীর বসতবাটীর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে একদিন গভীর রাত্রে দলবলসহ হানা দেয়। রমণীর স্বামী সে-রাত্রে গৃহে ছিলেন না। সম্ভবত কোনো কার্যোপলক্ষে সে-রাত্রের মতো তিনি কলকাতার বাইরে অথবা অন্য কোথাও ছিলেন। সুতরাং উক্ত রমণীকে সেদিন হাতের কাছে পেতে কোনো অসুবিধাই হলো না যোশেফের। রমণীকে সে দলবলের সাহায্যে নিয়ে আসে বর্তমান ইলিয়ট রোডের তৎকালীন এক ঘন বস্তির অভ্যন্তরে। সেখানে এক নিভৃত কক্ষে তাকে আটক রেখে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে যোশেফ। সে বলে: এ-প্রস্তাবে রমণী যদি রাজি হয়, তাহলে তার স্বামীর সঙ্গে আইন-সিদ্ধ উপায়েই তার বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যবস্থা সে করবে। কিন্তু যোশেফ একজন কুখ্যাত ডাকাত। তাছাড়া দেহ-গঠনে বলিষ্ঠ হলেও, দেখতে সে কদাকার। মুখ-মণ্ডলে তার বন্য-জন্তুর বীভৎসতা। অতএব এমন এক পুরুষকে কোনো নারীর পক্ষে ভালোবাসা তো দূরের কথা, একটু সহানুভূতির মন নিয়ে খানিকক্ষণ সান্নিধ্য দান করাও কঠিন। তাই যোশেফের উক্ত প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করে সেই রমণী। যোশেফও নাছোড়বান্দা। রমণী তার হাতের কাছে। সুতরাং বলপূর্বক যে-কোনো মুহূর্তেই তাকে সে ভোগ করতে পারে। কিন্তু এবার কেবল ভোগ করাটাই তার উদ্দেশ্য নয়। এই রমণীকে সে পেতে চায় চিরকালের মতোই। তাই তাকে ভালোবেসে জয় করার এক প্রবল বাসনা আলোড়ন তুলেছে তার মনে। সুতরাং রমণীকে সে উক্ত কক্ষেই আটক রাখে এবং তাকে চিন্তা করার সময় দেয় কিছুদিন। কিন্তু কিছুদিন পরেও রমণীর মনে পরিবর্তনের কোনো সুর নেই। সে নির্বিকার, নীরব। তাই উপায়-গতিক না দেখে যোশেফ এবার তাকে খুন করবে ব'লে শাসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোরাও বের করে। সম্ভবত ছোরা দেখেই আঁৎকে ওঠে রমণী এবং কাঁপতে কাঁপতেই সে নিজেকে সমর্পণ করে যোশেফের বুকে। সম্ভবত সে কারণেই তখন যোশেফের হাত থেকেও মাটিতে খ'সে পড়ে তীক্ষ্ণধার ছোরা।

ভয় দেখিয়েই হোক অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, উক্ত রমণীকে খানিকটা জয় করতে পেরেই আবেগে বেসামাল হয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ ডাকাত যোশেফ। তাই সুযোগ পেয়ে যোশেফের কাছ থেকে রমণীও এবার ধাপে ধাপে আদায় করে তার স্বাধীনতা। তারপর একদিন যখন রমণীর পাশেই নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে যোশেফ, রমণী তখন নিঃশব্দে বাইরে এসে বস্তিরই একজন গরীব মজুরকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে তার স্বামীর কাছে পাঠায় চিঠি দিয়ে। চিঠি পেয়ে ইলিয়ট রোডের তৎকালীন বস্তি-অঞ্চলে ছুটে আসেন তার স্বামী। সঙ্গে আসে পুলিশবাহিনী। আর আসেন পুলিশবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালক স্যার জন্ ইলিয়ট। তিনি এসেই গ্রেফতার করেন যোশেফকে এবং যোশেফের দলবলের গোপন ঘাঁটিও তিনি আবিষ্কার করেন কৌশলে।

পরে দিন-কয়েক বিচারের পর

যোশেফের ফাঁসি হয় এবং কঠোর শাস্তিবিধান হয় তার দলবলেরও। ফলে স্বাভাবিক শান্তি ফিরে আসে কলকাতায়। যদিও যোশেফকে গ্রেফতার করার মূলেই ছিলেন সেই রমণী, তবু কৃতিত্ব পেলেন ইলিয়ট সাহেবই। যোশেফের ফাঁসি হয় এবং তার দলবলের শাস্তিবিধানের পর ইলিয়ট সাহেবের নামই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কলকাতায় এবং তখনও যে সামান্য ক'জন বিদেশী চোর-ডাকাত আত্মগোপন ক'রে ছিল, তারাও ইলিয়ট সাহেবের নাম জড়িয়েই Dacoit's Song বা ডাকাতের গান বাঁধে :

'Here a health to the jolly Dacoit's,
Who are hung in the Law's fatal chain!
Here's a health to John Elliot whose daring exploits
I never shall witness again!

এই ইলিয়ট সাহেবের নাম অনুসারেই পরে আহাম্মদ জমাদারের রাস্তা রূপান্তর লাভ করে ইলিয়ট রোডে। বিংশ শতাব্দীতে রাস্তার আরও সংস্কার সাধিত হয় এবং পরে ট্রাম-লাইন স্থাপিত হওয়ার একদিকে যেমন তার পরিসর বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে তেমনই এক উল্লেখযোগ্য রাস্তারূপেও তার প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে জন-সমাজে।

স্যার জন ইলিয়ট প্রথমত কলকাতায় এসে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন প্রেসিডেন্সী কলেজে। তারপর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আবহাওয়া দপ্তরের প্রতিনিধিরূপে গণ্য ছিলেন। এই আবহাওয়া দপ্তর থেকে স'রে এসেই তিনি যথাযথ যোগ্যতার সঙ্গে পুলিশ-বাহিনীর পরিচালনার পদ গ্রহণ করেন এবং শহর-কলকাতার বহু দুর্নীতির বিলোপ সাধনে সক্ষম হন। সম্ভবত উক্ত পদে বহাল থাকা অবস্থাতেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সি-আই-ই এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কে-সি-এস-আই

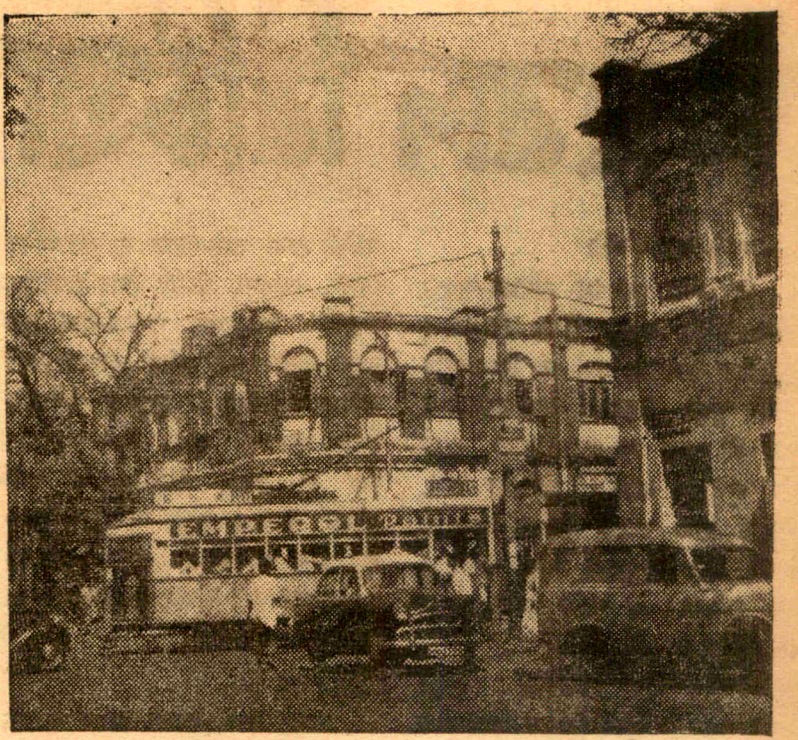


● ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ও ইলিয়ট রোডের মোড়ের দৃশ্য

উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই আবার নবরূপে পরিবর্তন সুরু হয় ইলিয়ট রোড-সংলগ্ন সমগ্র এলাকার। অবশ্য আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এ-অঞ্চলের আর কোনো বাহার বা শ্রী নেই। ঘনবসতির চাপেই আজ পরিবেশও তার স্বাস্থ্য-পরাঙমুখ। এ-অঞ্চল আজও cosmopolitan. চীনা, ফিরিঙ্গী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে এ-দেশীয় বাঙালী এবং অবাঙালী সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে যাঁরা বিত্তশালী, সমাজ তাঁদের সম্পূর্ণ আলাদা। অজস্র দরিদ্র-সাধারণের সঙ্গে তাঁদের কোনো মিল নেই, যোগাযোগও নেই। তাই এ-অঞ্চলের দরিদ্র-সাধারণ আজ নিজেদের মধ্যে নিজেরাই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে—যদিও অভাবের অবিরাম পীড়নে আজ তারা বিপর্যস্ত এবং সে-কারণেই জীবনীশক্তির নিত্য বিকাশও তাদের সূর্যাস্তের রক্তরশ্মির মতোই ম্লান এবং ক্ষণ-স্থায়ী।

এ-অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য এবং সুদৃশ্য বসতবাটীর প্রায় প্রত্যেকটিই আজ একে একে দেহ ঢেকেছে ঘনবসতির গভীর অন্তরালে, তাই ইলিয়ট রোডে দাঁড়িয়েও তাদের সঠিক চিত্রের আভাস পাওয়া অসম্ভব। এ-অঞ্চলে অধিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস নিঃসন্দেহেই বিখ্যাত, এখানে পৃথিবীর চল্লিশটি ভাষার মুদ্রণ-কার্য প্রায় প্রতিমাসেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া ইলিয়ট রোডের মধ্যভাগের উত্তরদিকে অধুনা প্রতিষ্ঠিত নরেন্দ্রপুর স্কুলও উল্লেখযোগ্য। এই স্কুলের নবীন দৃশ্য বেশ খানিকটা মনোহারী পরিবেশের বিকাশ ঘটিয়েছে একালের ইলিয়ট রোড অঞ্চলে।

# সংবাদ বিচিত্রা

**অর্থসারময় কথা :**

ফ্রান্সের মোশেফ মণিয়ার অবশ্য উণ্ডাওবাসীর ওপরে টেক্কা দিয়েছে। কুকুরকে কামড়ান নয়, সে দিনের পর দিন কুকুর উদরসাৎ করে চলেছে। তার স্ত্রী এবং ছয় ছেলেমেয়ের খাদ্য হল কুকুরের মাংস। মণিয়ার বলে, যক্ষ্মার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল কুকুরের মাংস খাওয়া। তার পরিবারে এ পর্যন্ত কেউ যক্ষ্মায় ভোগে নি।

সম্প্রতি এক শিকারীর কুকুর হজম করে মণিয়ার বিপদে পড়েছে। শিকারীটি তার নামে মামলা করছে।

* * *

তবে কুকুর মানুষকে কামড়ালেও সংবাদ হয় এবং জোরালো সংবাদ হয় আমেরিকায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেখানে ডাকপিওনদের মহাশত্রু হ'ল কুকুর। শুধু ১৯৬২ সালে সাত হাজার তিন শ' বাহাত্তর জন ডাকপিওনকে কুকুরে কামড়িয়েছে। কুকুরদের হাত থেকে ডাকপিওনদের বাঁচাবার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। মিষ্টান্ন দিয়ে কুকুরদের ভোলান যায় নি। বৈদ্যুতিক ছড়ি দিয়ে কাবু করা যায় নি। সম্প্রতি এক ধরণের বন্দুক আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে বাঁঝাল তরল পদার্থ বেরিয়ে আসবে। তার গন্ধ নাকে ঢুকলে কুকুর লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে, কিন্তু ডাকপিওনদের কোন ক্ষতি হবে না।

শীঘ্রই আমেরিকাতে ডাকপিওনদের কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ও হাতে শট্ গান নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে চিঠি বিলি করতে দেখা যাবে।

**অধর্মঘট :**

সচরাচর যে সব দাবী তুলে ধর্মঘট করা হয়ে থাকে তা হল অধিক বেতন, বোনাস, ছাঁটাই রোধ ইত্যাদি। সম্প্রতি সিংহলের বন্দরকর্মীরা এক নতুন দাবী তুলে ধর্মঘট করে। পোর্ট কমিশন বিনামূল্যে দুপুরের খোরাকি দিয়ে থাকে। খেতে বসে একদিন মাছ না পেয়ে প্রায় সাত শ' কর্মী ধর্মঘট করে। ফলে বন্দরের কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়। উনিশটি জাহাজকে ব্যর্থ পাবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

**জলের দর :**

জলের দরে সময়ে সময়ে অনেক কিছুই বিক্রি হয়। বিপাকে পড়ে নামমাত্র মূল্যে পৈতৃকবাড়ি, জমি, আসবাব-পত্র বেচে দিতে হয়েছে অনেককে। কিন্তু জলেরও যে দর আছে এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে বেশ উঁচুতে ওঠে সম্প্রতি তা জানা গিয়েছে।

কিউবা সরকার গুয়ান্তানামোস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটিতে জল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে জাহাজে জল আনান ছাড়া উপায় ছিল না। এতে প্রতি হাজার গ্যালন জলের জন্য খরচ হয়েছে সাত ডলার পঁচানব্বই সেণ্ট (প্রায় চল্লিশ টাকা)। এই জলই বোধহয় পৃথিবীতে সব চেয়ে দামী জল।

কিউবা সরকার জল সরবরাহ বন্ধ করার আগে হাজার গ্যালন জলের জন্য মার্কিন সরকারকে দিতে হত মাত্র পঞ্চাশ সেণ্ট। অবশ্য কিউবা সরকার পেত মাত্র তেইশ সেণ্ট। বাকীটা খরচ হত জল পরিশোধনের জন্য।

* * *

চোখের জলের দাম অনেক বেশি। যুগে যুগে দেশে দেশে কত কবি অশ্রু বন্দনা করে গিয়েছেন। ইতি হাসের অনেক কাহিনীর মূলে আছে দুই বিন্দু অশ্রু। ষোড়শ শতকে স্বামী যুদ্ধে গেলে বহু নারী কাচের পাত্রে নিজেদের অশ্রু সঞ্চয় করে রাখতেন স্বামী অনুরাগের নিদর্শন হিসাবে। মিশরী নারী আবার সেই সঞ্চিত অশ্রু মৃত্যুর পর নিজ দেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করার নির্দেশ দিয়ে যেতেন।

কিন্তু চোখের জলের ব্যবহারিক প্রয়োগের খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সম্প্রতি সায়গনে লিনসন প্যাগোডায় কংক্রীটের বুদ্ধমূর্তির অশ্রুবর্ষণের সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার ভক্ত ছুটে আসে সেই জল সংগ্রহের জন্য। ওদের বিশ্বাস, এই জল বহু দুরারোগ্য ব্যাধি উপশম করতে পারে।

**রোমাঞ্চ অভিযান :**

বিগত যৌবন দম্পতিও সংবাদ সৃষ্টি করেছে তাদের দুরন্ত 'দুঃসাহসিক অভিযান আর আমোদ তৃষ্ণার' জন্য।

ওকল্যাণ্ডের হার্গ কোরামের বয়স পঞ্চাশ বছর, স্ত্রী মার্জ এক বছরের ছোট। তারা পঞ্চাশ ফুটের দুই মাস্তুল বিশিষ্ট এক ক্ষুদে জাহাজে বেরিয়েছে পৃথিবী পরিক্রমায়।

কোরাম মনে করে, পৃথিবী ঘুরতে তাদের দু বছর লাগতে পারে কিংবা কুড়ি বছরও হতে পারে।

মার্জ বলে, দুঃসাহসিক অভিযানে বেরোব, এ আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। আর দেরি করলে এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে না কোনদিনই। তাই বেরিয়ে পড়লাম।

তাদের সাথী হয়েছে আর এক দম্পতি, উইলি ফাষ্ট আর ভায়োলা। উইলির বয়স তিপান্ন বছর, ভায়োলার উনপঞ্চাশ।

—সাংবাদিক

● সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী জওয়ানদেরও মাঝে মাঝে এরূপ আনন্দ-উৎসবের সুযোগ করে নিতে হয়।

**রাজধানী :**

ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের আসল রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শিখ সম্প্রদায় সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব হিন্দু বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি আঁকড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে কয়েক হাজারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। অবশিষ্ট যা কিছু ছিল—তারাও আজ স্বজনহারা হয়ে অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে আসছে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় ভারতে। যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তারাও রেহাই পায় নি। চট্টগ্রাম থেকে বহু বৌদ্ধ অনেক আগেই কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে ভারতে।

এবার সুরু হয়েছে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়ন করার পালা। সর্বশেষ অঙ্কে লিখিত হবে যে সংলাপ—তা হচ্ছে এই যে, 'পাকিস্তান একমাত্র ইসলামধর্মীদের বাসভূমি।' এই কলঙ্কিত নাটকের একমাত্র ডাইরেক্টর যিনি তিনি হচ্ছেন, রাষ্ট্রপতি আয়ুব। এবং তাঁর সহকারী হচ্ছেন শ্রীভুট্টো—যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'পাকিস্তান থেকে দশ হাজারের মত খৃষ্টান ভারতে চলে গেছে।'

নাটকীয় এ্যাকশন সৃষ্টিতে ভুট্টোর তুলনা নেই। স্বস্তি পরিষদে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মিথ্যা কথায় আসর জমানোতে তাঁর মত ব্যক্তির জুড়ি নেই। একমাত্র মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র—এই কথাটা গোপন রেখে তিনি খৃষ্টানদের পালিয়ে আসার জন্য ভারতের ওপরেই দোষারোপ করেছেন।

আর ভারতের একমাত্র দোষ এই যে, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, এবং অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মানুষদের সাহায্য, সহানুভূতি দান করতে ভীত হয় না। হাজার হাজার খৃষ্টানকে যদি ভারত আশ্রয় না দিতো তা হলে তাদের ডুবে মরতে হত বুড়ি গঙ্গায়। ভুট্টোর দল এটাই আশা করেছিলেন। ভারত সে আশায় ছাই দিয়েছে বলে আজ ভুট্টোর রাগ হয়েছে ভারতের ওপর।

কিন্তু ভুট্টো বিতাড়িত খৃষ্টানদের যে সংখ্যা দিয়েছেন, তাও ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত বিশ্ব চার্চ পরিষদের সভ্য এম হেনরী স্যামুয়েল নয়াদিল্লীতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, নিরাশ্রয় ও নির্যাতিত এক লক্ষ খৃষ্টান পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। মিঃ স্যামুয়েল বিশ্ব চার্চ পরিষদ এবং জাতিসঙ্ঘের কাছে মানবতার দোহাই দিয়ে কিছু একটা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিন্তু শুধু অনুরোধের দ্বারা কালক্ষেপের কি এখন সময় আছে। নাটক এখন পঞ্চম অঙ্কের কাছাকাছি।

কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র ও চীন শ্রোতার আসনে বসে বাহাবা দিয়েছে পাকিস্তানকে। শরিয়তী শাসনে তিন হাজার খৃষ্টানের ওপর মেসিনগান চালিয়েছে পাকিস্তানের সীমান্তবাহিনী। ঘটনাটা কোনোমতেই কাল্পনিক নয়। বিলাতের সাপ্তাহিক 'অবজার-ভার' পত্রিকার প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতা জেম্‌স্ মাইকেল মেসিনগানের ধ্বনিটা শুনিয়েছেন কলমের মারফত। তবু কি আসন টলবে পাকিস্তান-প্রেমী রাষ্ট্রগুলির। না, শেষ পর্যন্ত নাটকের শেষ অঙ্ক দেখাই তাদের অভিপ্রায়।

* * *

ভারতীয় লোকসভার একত্রিশ জন সদস্য 'মানবতা' ও 'শান্তির' নামে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং বিশ্বের রাজনীতিকদের কাছে সম্প্রতি এক আবেদন জানিয়েছেন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর বীভৎস নির্যাতনের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে এই আবেদনে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তান সংখ্যালঘু জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে উৎপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে পাকিস্তান সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

লোকসভার সদস্যগণের এই আবেদন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের এবং বিশ্বের রাজনীতিবিদদের বিবেককে কতটা সাড়া জাগাতে পারবে বলা কঠিন। আর বিশ্বের জনমত সচেতন হলেও শুধুমাত্র সদুপদেশ দিয়ে পাকিস্তানকে তার বীভৎস আচরণ

থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে এটা প্রত্যাশা করা অবাস্তব। কারণ, বিশ্বের জনমতের নৈতিক চাপ কার্যকরী করতে হলে যে ন্যূনতম নীতিবোধ থাকা দরকার, পাকিস্তানের বর্তমান স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর যে তা নেই একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে বিশ্বের মানুষ যাতে পাকিস্তানী বর্বরতার প্রকৃত স্বরূপটা স্পষ্ট বুঝতে পারে সেজন্য এ ধরণের আবেদন প্রয়োজন ছিল।

* * *

'কালোটাকা'র ব্যাপার নিয়ে কিছু দিন থেকে আলোচনা চলছিল। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য 'কালো-টাকা'র লেনদেন নানাভাবে চলে আসছে। এই ব্যাপারে চলচ্চিত্র শিল্পের নামই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই 'কালোটাকা'র রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিশেষ অভিযান সুরু করা হচ্ছে এবং তদন্তের জন্য উচ্চপদের ১৪ জন অফিসারকে নিয়ে এক দল গঠিত হয়েছে। এঁদের প্রথম অভিযান চলবে চলচ্চিত্র শিল্পে। চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রথম গ্রহণ করার কারণ, সম্প্রতি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ এখানে 'কালো-টাকা' লেনদেনের যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে সে বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে 'কালোটাকা' লেনদেনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। দু'জন বিখ্যাত চিত্র-তারকা চুক্তি সম্পাদন করে অল্প টাকার চেক গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পরে অন্তরালে চুক্তির টাকা অপেক্ষা বেশি টাকা আদায় করেছেন।

এই তদন্তের ব্যাপারে অফিসার-দের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং চলচ্চিত্র শিল্প ছাড়াও প্রয়োজন বোধে অন্য ক্ষেত্রেও তাঁরা তদন্ত করবেন। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে তদন্তকারী অফিসারদের সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রমোশন এবং উৎসাহ দানের কথাও অর্থ মন্ত্রীদপ্তরের বিবেচনাধীন রয়েছে।

* * *

ভারতের সীমান্ত প্রহরী জওয়ানরা সদা জাগ্রত। কর্তব্যে তাঁরা অটুট, আদেশ রূপায়ণে সদা প্রস্তুত। ভারতের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করাই তাঁদের জীবন-পণ। কর্তব্যে অনড় থাকার মধ্যেও জীবনের আনুষঙ্গিক দিকগুলির চর্চাও তাঁরা স্বাধীনভাবে করে থাকেন একান্ত অভিনিবেশে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নানা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। সীমান্ত অঞ্চলে ক্লেশকর দিনগুলিতেও এক জায়গায় মিলিত হয়ে ঐ সব জওয়ানরা নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ধর্মোপাসনার অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে থাকেন।

## আসাম ঃ

ভারতের সীমান্ত রাজ্য আসামে কিছুকাল ধরে যে অবস্থা চলছে তা শুধু আসামের পক্ষেই নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে গভীর উদ্বেগজনক। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম রাজ্যটি পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের দীর্ঘ-দিন ধরে সব চেয়ে বড় ঘাঁটি হয়ে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, পাক-আসাম সীমান্তে এমন বহু এলাকা আছে যেখানে গ্রামের পর গ্রামে ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়; কিন্তু পাকি-স্তানী মুসলমানরা জবরদখল করে সেখানে যে শুধু বসে আছে তাই নয় —আসামকে কেমন করে পাকিস্তান বানানো যায় তারই স্বপ্ন দেখছে। এই সব পাকিস্তানী মুসলমানরা যে কতদূর উদ্ধত ও সাহসী হয়ে উঠেছে সম্প্রতি কতকগুলি ঘটনায় তার প্রমাণ মিলেছে হাতেনাতে। আসাম বিধান-সভায় বিরোধী পক্ষের অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে পরি-স্থিতিটা কতখানি গুরুতর হয়ে উঠেছে তা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না। বিবৃতিটিতে বলা হয়েছে—

● পাক রাইফেল বাহিনীর গুলীবর্ষণ থেকে এরাও রেহাই পায় নি।

'গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মুরাজপুর থানার ফরিওনি গ্রামের আব্দুল মালেক, মহম্মদ আলি ও নারেশ আলি 'নারায়ে তকদির' ও 'আল্লা হো আকবর' বলে ধ্বনি তোলে। ঐ ধ্বনি মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামগুলি মুরাজপুর থানা এলাকার পাঁচ মাইলের মধ্যে এবং এখানে প্রধানত পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানরাই বাস করে। ধ্বনি শুনে মুসলমানরা দলে দলে আলো ও লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে। ঐ অঞ্চলে অল্পসংখ্যক হিন্দুর বাস। তাঁরা ব্যাপার দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জুরিয়া, গোরাজান ও মধ্যপাড়াতেও পাকিস্তানী মুসলমানদের দাপটের ফলে ১৪৪ ধারা জারী করতে হয়েছে।'

সরকারী বিবৃতিটি এই পর্যন্ত। কিন্তু বিরোধী পক্ষের বিশিষ্ট সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, ঐ সব পাকিস্তানী মুসলমান 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তলতে কসুর করে নি। এদের মারমুখী আচরণের ফলে নওগাঁয় সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ রাখতে হয়েছে। এবং পুলিশ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নি। বহু এলাকায় পাকিস্তানী মুসলমানরা এবং বিদেশী গুপ্তচরেরা বিভিন্ন বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছে বলেও আসাম বিধানসভায় অভিযোগ করা হয়েছে।

সমস্ত ঘটনা থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসামে পাক সীমান্তবর্তী এমন বহু অঞ্চল আছে, যেখানে ভারতীয় নাগরিকরা সংখ্যায় কম এবং পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা সংখ্যায় বেশি। এই সব অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানীদের অত্যাচারে ভারতীয় নাগরিকদের সর্বদা শঙ্কিতচিত্তে কালযাপন করতে হচ্ছে এবং গভর্ণমেণ্ট এই সব পাকিস্তানীদের বিতাড়ন করতে পারেন নি, এদের হাত থেকে ভারতীয়দের রক্ষা করতেও পারছেন না। আসামে এই বিপজ্জনক অবস্থা একদিনে ঘটে নি---এর পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আসামকে গ্রাস করবার জন্য পাকিস্তানের পরিকল্পনা অনেক দিনের এবং পরিকল্পনা অনুসারেই পাকিস্তান লাখে লাখে মুসলমানদের আসামে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানী নেতারা মনে করেন যে, আসামে যদি পাকিস্তানী মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি করে ফেলা যায়, তবে তাদের দিয়ে একদিন ইসলাম বিপন্নের জিগির এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে যোগদানের জন্য গণভোটের আওয়াজ তোলানো সম্ভব হবে। পাকিস্তান মনে করে, আসামের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের ষড়যন্ত্রকে সফল করবার পক্ষে সহায়ক হবে। কিন্তু পাকিস্তানের এই মতলব যদি আসামের ভেতর থেকে সমর্থন না পেত, তবে এতদূর অগ্রসর হতে পারত কি?

আসাম বিধানসভায় জনৈক বক্তা অভিযোগ করেছেন যে, অর্থমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আমেদ কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যস্তসমস্তভাবে জানাচ্ছেন যে, ঐ রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির স্থান সঙ্কুলান করা অসম্ভব---কিন্তু পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। অথচ পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করতে পারলে ঐ সব এলাকায় বহু হিন্দু উদ্বাস্তুর বসবাসের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব।

কিন্তু সম্ভব হলেও সেদিকে চেষ্টা নেই। কারণ ফকরুদ্দীন আমেদ এবং তাঁর অনুগামীরা আসাম রাজনীতির অনেক গভীর জলে বিচরণ করছেন। তার ফলে আসাম যে আজ একটা গুরুতর অবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং নিজের নিরাপত্তা ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তাও বিপন্ন করে তুলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বহিঃশত্রু এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুদের এই সাঁড়াশা আক্রমণের মুখেও কিন্তু আসামের রাজনীতিক নেতারা দূরদৃষ্টির কোন পরিচয় দিতে পারছেন না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত তাঁদের প্রধান কাজ ছিল বাঙালী ঠেঙানো। তারপর পার্বত্য উপজাতিগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর তিক্ত হয়েছে। আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ আর স্বাভাবিক খাতে বইছে না, তা বলাই বাহুল্য। সীমান্ত রাজ্য আসামের এই অবস্থা চলতে দিলে ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে---এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## মাদ্রাজ ঃ

পি-এস-পিতে অশোক মেহতার সমর্থক দল আগামী মাসে কংগ্রেসে যোগদান করবেন, এ সুনিশ্চিত

● শ্রীঅশোক মেহতা

বলা চলে। এই যোগদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অশোক মেহতার সমর্থক দল আগামী মাসে মাদ্রাজে এক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। তামিলনাদের পি-এস-পি নেতা শ্রী ভি রাধাকৃষ্ণাণ বলেছেন, এই সম্মেলনেই কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং এরই জন্য মাদ্রাজে সম্মেলন আহ্বানের তাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণাণ দিল্লীর সভাতেও উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

সম্ভবত এই সম্মেলনে কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারকে আমন্ত্রণ করা হবে এবং শ্রীকামরাজ কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য পি-এস-পি সদস্যদের এখানে পুনর্বার আহ্বান জানাবেন। শ্রীঅশোক মেহতা এ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন।

**রাজস্থান ঃ**

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনে এবার জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। গত সাধারণ নির্বাচনে এই দু'টি দল সমঝোতাও করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি জনসঙ্ঘকে পরাজিত করে সংখ্যাধিক্য লাভ করে; এখানেই সাধারণ নির্বাচনের 'ঐক্য' ভেঙে যায় এবং দু'টি দলের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

রাজ্যসভায় রাজস্থানের তিনটি আসন শূন্য হয়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান শক্তি ৯৫। এই শক্তির জোরে নিশ্চিত-ভাবে কংগ্রেসের দু'টি আসন প্রাপ্য। স্বতন্ত্র দলের শক্তি ৪০; এই শক্তিতে তাদেরও একটি আসন নিশ্চিত। এই অবস্থায় জনসঙ্ঘ একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে এবং স্বতন্ত্র, সোস্যালিষ্ট, কমিউনিষ্টদের সমর্থন অর্জন করার চেষ্টা করে তারা একটি আসন লাভ করতে চায়। এই একটি আসনের জন্য প্রার্থী হবেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মাষ্টার অদিতেন্দ্র। কংগ্রেস সম্ভবত কয়েকজন স্বতন্ত্রপ্রার্থীকে হাত করে এ ব্যাপারে জনসঙ্ঘকে সাহায্য করবে।

**মধ্যপ্রদেশ ঃ**

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস মহলে এখন সাজ সাজ রব পড়েছে কংগ্রেস কমিটী নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে। এই নির্বাচন শেষ করতে হবে ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী দখলের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য মন্ত্রিসভা-সমর্থক দলের পক্ষ থেকে সম্ভবত শ্রীশ্যামসুন্দর মুশরাণ অথবা শ্রী ভি ওয়াই তামশ-করকে প্রার্থী করা হবে। প্রথমোক্ত জন সম্প্রতি বীণা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় জন বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, গত বছর তিনি পি-এস-পি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পক্ষ থেকে সভাপতি পদের জন্য প্রার্থীরূপে দু'জনের নাম শোনা যাচ্ছে। এই

শ্রী মান্দলই

দু'জন হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি শ্রী বি এ মান্দলই এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজগমোহন দাস।

প্রদেশের রিটার্ণিং অফিসার শ্রীআবিদ আলী ইতোমধ্যে ৪৭টি নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য রিটার্ণিং অফি-সার নিযুক্ত করেছেন এবং সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট লাখের বেশি, অথচ সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা মাত্র ১১ হাজার। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে চক্রগত দলাদলি কামরাজ পরিকল্পনার দরুণ অবদমিত ছিল নির্বাচনকে উপলক্ষ করে তা আবার গুরুতর-ভাবে দেখা দিচ্ছে। সুরুতেই প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি, শ্রীমান্দলই-এর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগৌতম শর্মা প্রথম বাজীমাৎ করেছেন। এডহক কমিটীর সভায় তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, শ্রীমান্দলই সভা থেকে বেরিয়ে যান এবং সভা স্থগিত রাখতে হয়।

**কেরালা ঃ**

কেরালার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন রূপ গ্রহণ করার পথে অগ্রসর হচ্ছে। শ্রীচাকোর বিদায় গ্রহণের পর অনেকে মনে করেছিলেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করবেন এবং শ্রীচাকোকে নিয়ে তাঁর দল আসর গরম রাখার চেষ্টা করবে। আগামী নির্বাচনের মুখে শ্রীশঙ্কর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করাই হবে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীচাকো এত সোজা পথে চলার লোক নন, অতি চতুর বলে তাঁর নামও আছে। তিনি ঘোষণা করে বসেছেন— একজন সৎ কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন। এই ঘোষণার কারণ, প্রথমত শ্রীচাকো নিজেকে অন্য কংগ্রেস সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান না, দ্বিতীয়ত শ্রীশঙ্কর এখন পর্যন্ত বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের এবং কংগ্রেস সংগঠনের আস্থাভাজন, তৃতীয়ত তিনি জানেন শ্রীশঙ্করের পেছনে হাই-কম্যাণ্ডের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং এখন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধতা না করে 'সৎ কংগ্রেসী' হয়ে থাকাই ভাল। সর্বাপেক্ষা বড় কারণ, সাধারণ নির্বাচনের আর তো মাত্র এক বছর বাকি। ১৯৬৫ সালে সাধারণ নির্বাচন হবে, সুতরাং এই সময়টুকু সাংগঠনিক প্রস্তুতি চালানো বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে চাকোর দল একেবারে বসে নেই। পদত্যাগের পর শ্রীচাকো যখন তাঁর নিজের জেলা কোট্টায়ামে ফিরে আসেন তখন তাঁর সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে তাঁকে বিজয়ী বীরের মত সম্মান দান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, একটি সভায় রাজ্যপাল শ্রীগিরিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং শ্রীগিরি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাকোর প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন। অবশ্য এই সম্বর্ধনা দান কেবল কোট্টায়াম জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। জেলা কংগ্রেসের একদল এই সম্বর্ধনাকে ভাল চোখে দেখছেন না। তাঁরা বলছেন, 'বিতাড়িত মন্ত্রীকে নির্লজ্জ সম্বর্ধনা।' শ্রীচাকোর সমর্থকরা তাঁকে একটা এম্বাসাডর গাড়ি দেবার জন্য জেলা কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ করাতে চেয়েছিল, কিন্তু এই বিরোধী অংশের জন্য তা ব্যর্থ হয়েছে। চাকোর দলের আর একটি বড় রকমের ব্যর্থতা হয়েছে নায়ার এবং খৃষ্টানদের যুক্তফ্রন্ট গঠনে ব্যর্থতা। এই ঐক্য গঠিত হয়েছিল শ্রী পি গোপালনের অনশনের সময়, কিন্তু মন্ত্রিত্ব থেকে শ্রীচাকোকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই ফ্রন্ট ভেঙে যায়। শ্রীচাকো সাধারণ কংগ্রেস সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আর এক কারণ কংগ্রেসের হাই-কম্যাণ্ডের সিদ্ধান্তের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর চাকো-কাহিনীর একটা দিক প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ 'চাকোর ঘটনা' সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া মনোভাব পোষণ করেন। শ্রীচাকোর 'গাড়ি কেলেঙ্কারী'র ব্যাপার জানার পর এবং তদন্ত রিপোর্ট পাবার পর শ্রীনন্দ মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীচাকোর পদত্যাগ দাবী করতে বলেন। শ্রীচাকো শ্রীনন্দের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে শ্রীনন্দ আরো কঠোর হয়ে ওঠেন এবং শ্রী পি গোপালনের অনশনে মন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় দেবার সুযোগ এসে যায়।

কেরালার সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য এখন আগামী সাধারণ নির্বাচনের দিকে। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমাধবন নায়ার বলেছেন, এখন তাঁর চেষ্টা হবে কয়েকমাসের মধ্যে কেরালা কংগ্রেসের বিবদমান দুই দলকে ঐক্যবদ্ধ করা। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্য গঠনের ব্যাপারে চাকোর ঘটনা সহায়ক হয়েছে। এই ঘটনাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা-সমর্থক দল আর

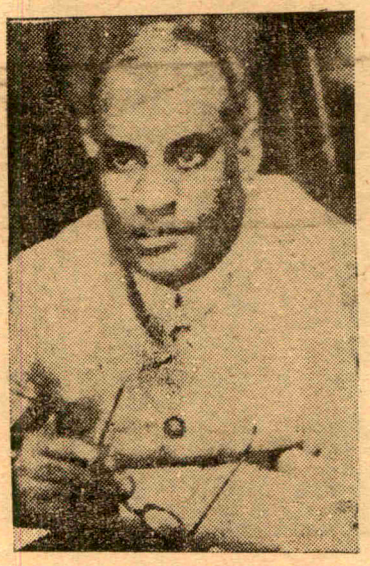

● শ্রীগিরি

সাংগঠনিক দল পরস্পরের খুব নিকটে চলে এসেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বও ১৯৬৫ সালের নির্বাচন রণকৌশলের দিক থেকে কাজ সুরু করেছে। রাজ্য পরিষদের সভায় গণতান্ত্রিক দল ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের প্রতি ন্যূনতম কার্যসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদ কার্যকরী কমিটীর ওপর দায়িত্ব দিয়েছে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে তার ভিত্তিতে দলিল প্রস্তুত করে রাজ্য পরিষদের বিশেষ পুনারী অধিবেশনে পেশ করার জন্য।

মুসলিম লীগ পড়েছে উভয়-সঙ্কটে। কংগ্রেসের সাথে অতীতের অভিজ্ঞতা, সাধারণ মুসলিমদের মনোভাব এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের শিক্ষা—মুসলিম লীগকে পুনর্বার কংগ্রেসের সঙ্গে থাকার অপেক্ষা দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একদিকে শ্রীমাধবন নায়ারের নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্ব এবং অপরদিকে লীগ নেতাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট ভীতির জন্য অবস্থার হয়ত পরিবর্তন হতে পারে।

নির্বাচনের নীতি নির্ধারণে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিপদ হয়েছে সব চেয়ে বেশি। পি-এস-পি'র সর্বভারতীয় লাইন হচ্ছে কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট, দুই দল থেকে দূরে থাকা। অথচ ছোটখাট ব্যাপারে এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সঙ্কটে বিধানসভায় পি-এস-পি দল কমিউনিষ্টদের সঙ্গে ভোট দিয়েছে। পি-এস-পি নেতারা বর্তমানে দ্বিধাগ্রস্ত। আগামী মাসের দিকে তাদের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যাবে।

নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 'মুক্তি সংগ্রামে'র সহযোগী শ্রীকুন্থলনাথ শঙ্কু পিল্লাই-এর নেতৃত্বে স্বতন্ত্রদের গ্রুপ গঠন। এঁরা জনগণের স্বার্থে সরকার গঠনের জন্য কমিউনিষ্টদের সহ উদারভাবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান প্রকাশ্যে জানিয়েছেন। সত্যিই এঁরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে সমর্থ হবেন কি না, বিশিষ্ট স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রাক্তন কংগ্রেসকর্মীদের টেনে আনতে পারবেন কি না, এ বিষয়ে ধারণা করার সময় এখনো হয় নি। তার জন্য এঁদের কার্যকলাপ আরো লক্ষ্য করতে হবে।

* *

দেবীকুলমের সাম্প্রতিক লাঠি-চার্জের ঘটনায় রাজনৈতিক মহল আবার গরম হয়ে উঠেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং চাকোর দল ব্যাপারটাকে নিয়ে মাতামাতি করার চেষ্টা করছে।

* মার্কিনী রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজের সঙ্গে আলোচনা করছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শক্ত মানুষ জেনারেল নেগুইন খান।

## দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

ভিয়েৎনাম কি দ্বিতীয় কোরিয়া রণাঙ্গনে পরিণত হবে? প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ ভিয়েৎনামের সঙ্কট আজ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম শাসনের অবসানের পর থেকেই কমিউনিষ্ট ভিয়েৎ কং বাহিনীর প্রভাব বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে মেকং বদ্বীপ অঞ্চলে এদের প্রাধান্য যথেষ্ট বেড়েছে। সম্প্রতি ভিয়েৎ কং সন্ত্রাসবাদীরা সরাসরি মার্কিন সৈন্য ও নাগরিকদের ওপর হামলা সুরু করায় মার্কিন কর্তৃপক্ষ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উত্তর ভিয়েৎনামীদের সাহায্যপুষ্ট ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনী বা গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই তা চাইতে পারে না। মার্কিনীদের ওপর হামলা আরও অসহ্য।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে? উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিষ্ট প্রাধান্যযুক্ত সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে না। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম উত্তর ভিয়েৎনামের কবলিত হোক, এ সে চাইতেই পারে না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ফরাসী প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে?

বিপুল সৈন্যবাহিনী, অস্ত্র ও অর্থবলের জোরে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিরকাল দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করতে পারবে? একথা অনস্বীকার্য, ঠিক এই মুহূর্তে এখান থেকে মার্কিন সৈন্যদল চলে গেলে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট ভিয়েৎ কং তথা উত্তর ভিয়েৎনামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নেগুইন খান বা অন্য কারও সাধ্য নেই, অকমিউনিষ্ট শাসনকে রক্ষা করে। ভিয়েৎ কং গেরিলাদের পেছনে যে উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থন আছে, একথা সকলেই জানে—ধৃত ভিয়েৎ কং গেরিলাদের কাছে উত্তর ভিয়েৎনামের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। অনেকেরই ধারণা, চীনা কমিউনিষ্টরাও আছে এর পেছনে। আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পতনের অর্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিষ্ট শক্তি বৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই চায়, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট বিরোধী শাসন বজায় থাকুক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সেখানে অব্যাহত থাক। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনীকে চিরতরে বিনাশ করার জন্য, এমন কি প্রয়োজন হলে উত্তর ভিয়েৎনামকে জব্দ করার জন্যও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বেশি সৈন্য নিয়োগ করতে হবে—রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এই ধারণা। সত্যি সত্যি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও সৈন্যদল পাঠিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযানকে চরম পরিণতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সম্মুখ লড়াইকে উপলক্ষ করে বড় রকমের কোন যুদ্ধ বেধে যাওয়া আশ্চর্য নয়। সেক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসনের

জন্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি হবার পর জনসনকে এই প্রথম একটা বড় রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারাকে

* রবার্ট ম্যাকনামারা

জনসন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য পাঠিয়েছেন। ম্যাকনামারা ফিরে এলেই একটা যা-হোক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে যেভাবে পেণ্টাগন বাহিনীর প্রভাব জনসনের ওপর বাড়ছে, তাতে আক্রমণাত্মক নীতি নির্ধারিত হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ, নৌবাহিনীর আক্রমণ ও উড়ো জাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপের প্রস্তাব বিবেচনাধীন বলে শোনা যাচ্ছে। সব দিক দিয়েই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

## সাইপ্রাস :

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে শেষ পর্যন্ত সাইপ্রাস সমস্যার ওপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। পাঁচটি অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে মীমাংসা-প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নও তাকে সমর্থন করেছে।

স্থির হয়েছে, সেক্রেটারী জেনারেলের তত্ত্বাবধানে একটি শান্তি-বাহিনী সাইপ্রাসে মোতায়েন করা হবে। আয়ার্ল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া ও যুগোশাভিয়া থেকে এই বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ভারতের লেঃ জেঃ প্রেম সিং জ্ঞানীর ওপর বাহিনীর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পড়েছে। লেঃ জেঃ জ্ঞানী ঘোষণা করেছেন, বৃটেনের সম্মতি পেলে তিনি ব্রিগেডিয়ার আর-এন-পি কারভাবকে সহকারী অধিনায়ক পদে নিয়োগ করবেন। তাছাড়া, তিন মাসের মধ্যে সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করার জন্য সেক্রেটারী-জেনারেল একজন সালিশ নিয়োগ করবেন।

আন্তর্জাতিক দিক থেকে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান নিকটবর্তী হলেও, সাইপ্রাসের অভ্যন্তরে কিন্তু এখনও নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে-সেখানে সংঘর্ষ তো লেগেই আছে, তারপর প্রাক্তন 'ইয়োকা' (Eoka) বাহিনীর লোকদের দিয়ে রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়স গ্রীক সাইপ্রাস-বাসীদের পুলিশ দল গড়ে তুলছেন বলে

* লেঃ জেঃ জ্ঞানী

তুর্কীরা বিক্ষুব্ধ। বাইরের চেষ্টা সত্ত্বেও সাইপ্রাসের গ্রীক-তুর্কী বিরোধ কতটা মেটানো সম্ভব হবে, জোর দিয়ে বলা শক্ত।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

পাকিস্তান সম্পর্কে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোহমুক্তি সুরু হয়েছে? নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কে বৃটেনের প্রতিনিধির মত চড়া সুরে কথা না বললেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেখানে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে চৌ-এন-লাই-এর পাকিস্তান সফরের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই পাকিস্তানের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকায় ওয়ারেন উন্নার এক প্রবন্ধে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের আঁতাত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ পাকিস্তানের মতিগতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। পাকিস্তানের চীনপ্রীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব জর্জ বল নিজেও একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই কথাই বলেছেন। 'সিয়াটো' ও 'সেণ্টো'র সদস্য হয়ে পাকিস্তানের এভাবে চীনের সঙ্গে দোস্তি করাকে তাঁরা মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। পাকিস্তানের সকল প্রচেষ্টা যে ভারতের বিরুদ্ধে, কমিউনিষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, এ কথাও আর কারও জানতে বাকি নেই।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় রেভারেণ্ড জেমস অলটারের একটি চিঠি বেরিয়েছে। রেভারেণ্ড অলটার ১৯৪৫ থেকে দীর্ঘকাল উত্তর ভারতে ছিলেন এবং বর্তমানে প্রিন্সটনে (নিউ জার্সি) বাস করছেন। ভারত সম্পর্কে তিনি কিছুটা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি ধরা যেতে পারে। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের বক্তব্য সমর্থন করা যায় না। তিনি ভারতের কাশ্মীর-নীতির পক্ষে বলেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ত্যাগ করবে এবং কাশ্মীর ও অন্যান্য ব্যাপারে ভারতকে সমর্থন করবে, এমন আশা এখনই কেউ করতে পারেন না। পশ্চিমী সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহজে ছাড়তে পারে না। এই সেদিনও পাকিস্তানকে তারা সাবমেরিন দিয়েছে। তবু মার্কিন জনমত যে পাকিস্তানের প্রতি ক্রমে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, তা নানা-ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

**বৃটেন ঃ**

বৃটেনের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সেদিক থেকে দু'টি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে শ্রমিক দলের নেতাদের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রমিক দলের সহকারী নেতা জর্জ ব্রাউন লণ্ডনে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির ভোজসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিক দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তারা কাশ্মীরের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে, এমন কি, নীতির থেকে তা প্রায় বিপরীত হবে। বর্তমান বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক হিউম পাকিস্তানকে পুরোপুরি সমর্থন করছেন। নিরাপত্তা

* প্রেসিডেণ্ট জনসন

* প্যাট্রিক ডীন

পরিষদে স্যার প্যাট্রিক ডীনের বক্তৃতায় ভারতবাসী মাত্রেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এই বিষয়কে উপলক্ষ করে ভারতের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে---কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার দাবী জোরদার হয়েছে। তাই বৃটেনে নির্বাচনের ফলাফল কি হয় ও শ্রমিক দল কাশ্মীর সম্পর্কে কতটা পরিবর্তিত নীতি গ্রহণ করে, ভারতবাসী তা সাগ্রহে লক্ষ্য করবে।

দ্বিতীয় মন্তব্যটিও বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন নিউ ইয়র্কে মন্তব্য করেছেন, শ্রমিক দল ক্ষমতা পাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে দেবে না, বরং এই সম্পর্ককে তারা আরও উন্নত করার চেষ্টা করবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে ঘরোয়াভাবে উইলসন এই মন্তব্য করেন। দু'টি দিক থেকে এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বর্তমানে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাল নয়, এই মন্তব্যে তার স্বীকৃতি আছে। হিউমের সাম্প্রতিক মার্কিন সফরের পর কমিউনিষ্ট দেশ-গুলির সঙ্গে বাণিজ্যের প্রশ্নে এই সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে। বৃটেনের স্বার্থে এই সম্পর্কের উন্নতি প্রয়োজন এবং শ্রমিক দল তার জন্য চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত, অনেকের ধারণা শ্রমিক দল ক্ষমতা পেলে বৃটেন আরও বেশি করে সোভিয়েট-ঘেঁষা হবে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে সরে যাবে। উইলসনের বর্তমান মন্তব্য এই ধারণাকেও অনেকখানি দূর করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উইলসন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান

* হ্যারল্ড উইলসন

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সালিশের ভূমিকাও তারা গ্রহণ করবে না। সত্যি সত্যিই যদি শ্রমিক দল এই নীতি গ্রহণ করে তবে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব ভাল লোকের হাতেই আছে। অর্থাৎ, তিনি জনসনের প্রশংসা করেছেন তাঁর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেছেন।

**পানামা ঃ**

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন তাঁর

সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে পানামা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, পানামার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পাদিত চুক্তির পরিবর্তন প্রয়োজন। ১৯০৩ সালের চুক্তি অনেকবার পরিবর্তন হয়েছে। তবু আরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পানামাবাসীরা অহেতুক মার্কিন কর্তৃত্ব আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়। মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা এই কথাটি উপলব্ধি করলে মীমাংসা সহজেই হয়ে যায়।

পানামার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মোটেই কমিউনিষ্টপন্থী নয়। বরং তারা কমিউনিষ্ট বিরোধী। রাজনৈতিক দিক থেকে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগামী। কিন্তু পানামা খালে মার্কিন কর্তৃত্বের প্রশ্নে যে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যথাযথভাবে তার নিষ্পত্তি না হলে ভবিষ্যতে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘরের কাছে দ্বিতীয় কিউবা সৃষ্টি হতে দেবে না বলেই মনে হয়।

**মালয়েশিয়া ঃ**

মালয়েশিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার বিবাদ মেটাবার চেষ্টা আবার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাঙ্ককে এই বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও, মালয়েশিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী আবদুল রাজাক, ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যালভেডর লোপেজ যে সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে কোন মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব হয় নি।

মালয়েশিয়া-বোর্নিও থেকে ইন্দোনেশিয়ার গেরিলা বাহিনীকে সরাতে হবে, এই ছিল ইন্দোনেশিয়ার দাবী। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া তাতে রাজি হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার বক্তব্য, মালয়েশিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে করা হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে বৃটেনের আক্রমণের লক্ষ্য। সুতরাং মালয়েশিয়া নিয়ে একটা সামগ্রিক রাজনৈতিক মীমাংসা না হলে সীমান্ত-বোর্নিও থেকে তারা গেরিলা বাহিনী সরাবে না।

অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠছে। সীমান্ত বরাবর যে যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, ইন্দোনেশিয়া তা মানছে না, মালয়েশিয়া স্পষ্টই এই অভিযোগ তুলেছে। মালয়েশিয়া তার স্বাধীনতা

• টুঙ্কু আবদুল রহমান


শুভমুক্তি ১৩ই মার্চ, শুক্রবার!

বাংলার প্রথম অভিনেত্রী পরিচালিত—

মঞ্জু দে-র

স্বর্গ হতে বিদায়

রাধা • পূর্ণ • লোটাস • পদ্মশ্রী • আলোছায়া

নিউ তরুণ • যোগমায়া • উদয়ন • পারিজাত মায়াপুরী

ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

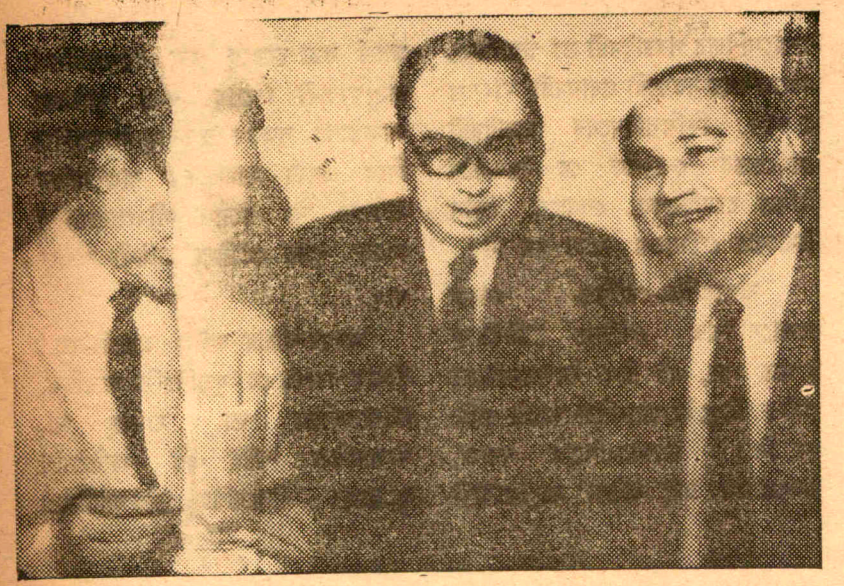

* মালয়েশিয়া আলোচনার তিন নায়ক : সুবান্দ্রিয়ো, আবদুল রাজ্জাক ও লোপেজ।

রক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবে ও দরকার হলে পাল্টা-আক্রমণ করবে, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান এই ঘোষণা করেছেন।

**সিংহল :**

চৌ-এন-লাই-এর সিংহল সফর শেষ হবার পর এখন শোনা যাচ্ছে, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক নেহরুকে একটি চিঠি দেবেন। ভারত কোন্ কোন্ সর্তে চীনের সঙ্গে এখনই আলোচনায় বসতে রাজি আছে, শ্রীমতী বন্দরনায়ক তাঁর এই চিঠিতে সেকথা জানতে চাইবেন।

যেভাবেই হোক চীনের এখন ভারতের সঙ্গে একবার আলোচনা বৈঠকে বসা প্রয়োজন। মীমাংসার কোন প্রয়োজন নেই, আলোচনায় বসে চীন দেখাতে চায় যে সে সত্যি সত্যি শান্তিকামী! চীন যে বাস্তবিকই শান্তি চায়, আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে কলম্বো শক্তিগোষ্ঠীর কাছে তা দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের কাছে প্রশ্নটি অত্যন্ত পরিষ্কার। ভারত প্রথম থেকেই কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। চীন যদি কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করে তবেই আলোচনা হতে পারে। তার পূর্বে আলোচনার সুযোগ কোথায় ?

* ডালাসে জ্যাক রুবীর বিচারের জন্য মনোনীত জুরীগণ। প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত লী হার্ভে অসওয়াল্ডকে হত্যার অভিযোগে জ্যাক রুবীর বিচার চলছে।

# রঙ্গরাগ

## সিনেমায় বিজ্ঞাপন চিত্রের উৎপাত

চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ সিনেমায় যায়। সারাদিনের ক্লান্তির ভারে কষ্টার্জিত অর্থে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে চায়। ছবিঘরে প্রবেশ করে দর্শকরা চায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত ছবি দেখতে। কিন্তু তার পরিবর্তে দীর্ঘক্ষণব্যাপী একইরূপ বিজ্ঞাপন চিত্র যদি দেখতে হয়, তবে মন ও চোখ পীড়িত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। দিনের পর দিন দর্শকরা এভাবে বিরক্ত হয়ে উঠছেন। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের লোভের মাত্রা এত বেশি যে, তাঁরা দর্শকদের এই অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না। ফলে বহু দর্শক মূল ছবি সুরু না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থাকেন, ছবি সুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন। এতে ছবির প্রারম্ভ মুহূর্ত দেখতে সময় সময় অসুবিধা হয়। বাস্তবিকপক্ষে সিনেমায় বিজ্ঞাপন এক বিরক্তিকর দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বহুরকম মাধ্যম রয়েছে। সিনেমাকে যদি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করতে হয়, তবে তাও সীমিতভাবে হওয়া দরকার। সিনেমার মালিকদের যেমন এ ব্যাপারে সংযত হওয়া উচিত, তেমনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। বিদেশী ছবির প্রেক্ষাগারগুলি এ ব্যাপারে অনেক সংযত। দেশীয় ছবির প্রেক্ষাগারের মালিকরা কি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অতি লাভের লোভ সম্বরণ করতে পারেন না ?

---সুজন।

## চিত্র-আলোচনা

### জীবন কাহিনী
( আরটি ফিল্মস )

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

মানব জীবনের এই শাশ্বত কামনা। বহুবিধ দুঃখ, কষ্ট এবং প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ বেঁচে থাকে। পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। সৌন্দর্য অনুভূতি মানুষের জন্মগত। বাঁচার জন্য সংগ্রামের নামই জীবন, জীবন অপরাজেয়। এই অপরাজেয় জীবনের বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালক রাজেন তরফদার তাঁর সদ্যমুক্ত 'জীবন কাহিনী' চিত্রে।

'জীবন কাহিনী'র নায়ক নামে নবজীবন হলেও দারিদ্র্যের চরম কশাঘাতে, হতাশা ও ব্যর্থতায় পদে পদে সে পরাজিত। তবু সে বাঁচতে চায়; এত দুঃখ ও অপমানের মধ্যে বেঁচে থাকার দাবিই যেন তার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু একদিন কন্যার চরম ধিক্কারে সে মরতে যায়। মরতে গিয়েও তার মরা হয় না। তারই মত মৃত্যু-ইচ্ছুক এক যুবককে সে বাঁচায়। এবার তার মধ্যে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে দারিদ্র্যপীড়িত মনের বৈষয়িক সত্তা। যুবকের নাম অমর; এই নামটিও যেন বঞ্চিত মানুষের প্রতি প্রহসন। অমরকে দিয়ে সে অঙ্গীকার করায়, যুবক মরবে নবজীবনের বাঁচার জন্য। অর্থাৎ মরার আগে অমর একটা জীবনবীমা করবে নবজীবনকে অছি নিযুক্ত করে। তারপরে সুরু হয় মৃত্যু আর বাঁচার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বার বার অমর মরতে যায়, নবজীবন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে মৃত্যুর শুভসংবাদটির জন্য, কিন্তু প্রতিবারই সে ফিরে এসে নবজীবনকে হতাশ করে জানায় মৃত্যু পরাজিত, জীবনই জয়ী। এমনি বাঁচা-মরার যুদ্ধের মধ্যে অমরের মন রঙিন হয়ে ওঠে নবজীবন-দুহিতা শ্যামলীর প্রেমের স্পর্শে। জীবন এখন তার কাছে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এবার সত্যিই নবজীবন

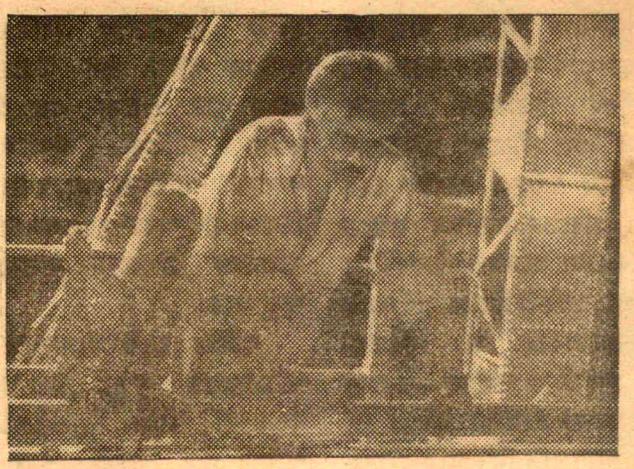

● 'জীবন কাহিনী' চিত্রের নবজীবন বিকাশ রায়ের বিস্ময়কর প্রতিভায় প্রাণবন্ত।

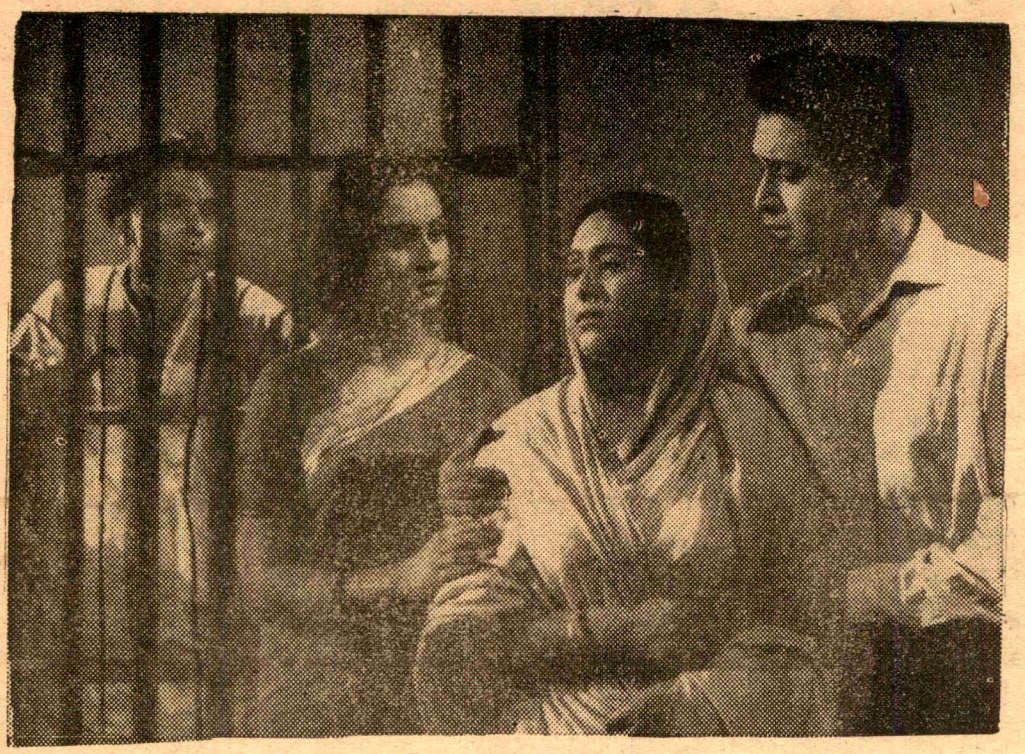

ইকনামক প্রোডাকসন্সের আগতপ্রায় 'গোধূলি বেলায়' ছবির একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যারাণী, মাধবী মুখার্জী ও বিকাশ রায়।

পরাজিত, সে মৃত্যু-সংকল্প করে আত্মহননের ব্যবস্থা করে, কিন্তু এখানেও বাঁচার অদম্য আগ্রহ, মৃত্যু পরাজিত হয়ে পুনর্বার ঘোষণা করে, জীবন অপরাজেয়।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত এই 'জীবন কাহিনী'র অবলম্বন শক্তিপদ রাজগুরুর একটি গল্প। চিত্রনাট্যকার রাজেন তরফদার সেই কাহিনীকে চলচ্চিত্র উপযোগী করে পত্রে-পুষ্পে বিস্তারিত করেছেন। তাঁর এই চিত্রনির্মাণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় এই ছবিটিকে দর্শকরা সানন্দে গ্রহণ করবেন। ভারতের চলচ্চিত্র জগতে এ ধরণের চিত্র প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়। কিন্তু এরূপ কাহিনী চিত্রের সার্থকতার পথে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের যে বলিষ্ঠ ও সমাজচেতনাসম্পন্ন চিন্তাধারা থাকা প্রয়োজন ছবিতে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। বরঞ্চ গোঁজামিলের চোরাবালিতে ছবির সংগ্রামধর্মিতা ব্যাহত হয়েছে। বাঁচার জন্য সংগ্রামের বিজয়বার্তা তাই অমরের শ্রমশক্তির দ্বারা ঘোষিত হয় নি, হয়েছে জনৈক ধনীব্যক্তির বদান্যতার দ্বারা। পরিচালক বাস্তবনির্ভরশীল হয়েও সংগ্রামের পরিবর্তে ধনীকে উপস্থিত করেছেন ত্রাণকর্তারূপে। কল্পনার এই দৈন্য ছবিটির বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক। পরিচালনা বিষয়েও ছবিটি কিছুটা ভারসাম্যহীন। ছবিটি সম্পূর্ণভাবে সিরিও-কমিক আঙ্গিকে গঠিত হলে উপভোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেতো এবং সিরিও-কমিক আঙ্গিক জোটাবার জন্য কল্পনার আতিশয্য প্রয়োগেও বাধা ছিল না। অথচ আতিশয্যের আশ্রয় পরিচালক নিয়েছেন বাস্তববোধকে ক্ষুণ্ণ করে।

ছবিটির স্থানে স্থানে দৃশ্য রচনায় পরিচালকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। নতুন শাড়িপরিহিতা শ্যামলীর উঠোনে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া, শূন্য খাঁচা দোলানো, গঙ্গার বাঁধে অমরের মৃত্যু কল্পনায় নবজীবনের উল্লাস, নবজীবনের আফিম খেয়ে মৃত্যু কল্পনার দৃশ্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সংলাপ এই ছবির সার্থকতার অন্যতম অবলম্বন ছিল। কিন্তু প্রথমাংশের সংলাপ বড় দুর্বল। ছবিতে দু'টি গানই রচনায় ও সুরে প্রশংসনীয়। সুগীত গান দু'টি দর্শক দ্বারা সমাদৃত হবে। প্রবীর মজুমদারের সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়াংশে নবজীবনরূপী বিকাশ রায় এবং শ্যামলীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় উল্লেখযোগ্য। অনুপকুমার শক্তিশালী অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও পরিচালক অমরকে আশানুরূপ ভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথভাবে দেখা দিয়েছেন তরুণকুমার, ভানু ব্যানার্জী, রেণুকা রায়, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ।

**উয়ো কোন থী**

(পৃথ্বী পিকচার্স)

পরিচালনা : রাজ খোসলা। কাহিনী ও চিত্রনাট্য : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : কে এইচ কাপাডিয়া।

সঙ্গীত: মদনমোহন। শিল্প নির্দেশনা: এস এস সামেল। সম্পাদনা: ডি এন পাই।

নান্দীমুখ থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাসপেন্সে পরিপূর্ণ। ডাঃ আনন্দ যুবক। কাজের শেষে কোন এক বর্ষারাতে নিজের গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে। শহর প্রান্তের নিরিবিলি রাস্তায় হঠাৎ চোখে পড়ে রহস্যময় এক নারীমূর্তি। তরুণ ডাক্তার কৌতুকে গাড়ি থামায়। জিজ্ঞাসা করে: কে তুমি? কোথা থেকে আসছো? কোথায় যাবে? এত প্রশ্নের পর রহস্য যেন আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে নারীমূর্তির স্বল্প জবাবে। গাড়িতে তাকে তুলে নেয় ডাক্তার। পৌঁছে দেয় গন্তব্য স্থানে। রহস্যময়ী যুবতী নারীর প্রতিটি কথা যেন রহস্যে ভরা। গন্তব্য-স্থলে গাড়ি থামিয়ে ডাঃ আনন্দের আর এক বিস্ময়। গাড়ি থেকে নেমে সম্মুখস্থ কবরখানায় প্রবেশ করে সে নারী। বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা কবর-খানায় ঘসা কাচের মতো কুয়াশার আবরণ। সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যেতেই ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের গান ভেসে আসে। তরুণ ডাক্তার আনন্দে, উৎকণ্ঠায়, ভয়ে, বিস্ময়ে ঘেমে উঠেছে। মনে মনে প্রশ্ন করে, 'উয়ো কোন থী?'

নান্দীমুখেই সাসপেন্স। পরি-সমাপ্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে সাসপেন্স দর্শকদের পাগল ক'রে রাখে। প্রতি মুহূর্তে রহস্য আর রোমাঞ্চ। এক অশরীরী নারীকে কেন্দ্র করে কাহিনী জমে উঠেছে সাবলীল গতিতে। হিন্দী ছবিতে এমন পরিষ্কার অথচ ভয়, বিস্ময়, কৌতুক, রহস্য, রোমাঞ্চ ভরা ছবি খুব কমই দেখা যায়। এ জন্য প্রথমেই প্রশংসা জানাতে হয় চিত্রনাট্যকারকে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক রাজ খোসলার মুন্সিয়ানার কথা বলতে হয়। গোড়া থেকেই পরিচালক 'সাসপেন্স ড্রামার' ধর্মকে রক্ষা করে চলেছেন। কাহিনীর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে 'হিন্দী ছবি'র কথা মনে ক'রে অনায়াসে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য বিভাগের কাজ উঁচু দরের। বিশেষ করে চিত্রগ্রহণ ও দৃশ্যসজ্জা প্রসংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মদনমোহন।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই প্রশংসা জানাতে হয় দ্বৈত-চরিত্রের ভূমিকায় সাধনাকে। তাঁর অভিনয় এক কথায় অতুলনীয়। মনোজ কুমারের সুঅভিনয়ের গুণে তরুণ ডাক্তারের জটিল মানসিক দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্র যথাযথ ফুটে উঠেছে। দু'টি ভূমিকায় হেলেনের মিষ্টি চলন-বলন আর কে এন সিং-এর জিজ্ঞাসাবোধক অভিনয় ছবির প্রাণসঞ্চার করেছে। অন্যান্যের মধ্যে ধূমল, রাজ মেহেরার কথা উল্লেখযোগ্য।

## মুকুলবীথির বার্ষিক উৎসব

গত ১লা মার্চ রঙমহল থিয়েটারে মুকুলবীথির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে নৃত্য, গীত ও 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনের ডাঃ জে সি মুখার্জী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মিঃ আর টি এণ্ডারসন।

## বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি

আগামী জুন মাসে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' প্রদর্শিত হবে। বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবে উৎসাহী এবং কূটনৈতিক মহলের ধারণা এবার 'মহানগর' গোল্ড ট্রফি লাভ করবে।

## সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন

গত ৫ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সোভিয়েট ইউনিয়নের কন্সাল জেনারেলের নিকট হতে একটি ফিল্মের রোল গ্রহণ করে সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রচার ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার সোভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রশংসা করে বলেন, সোভিয়েট ছবি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত।

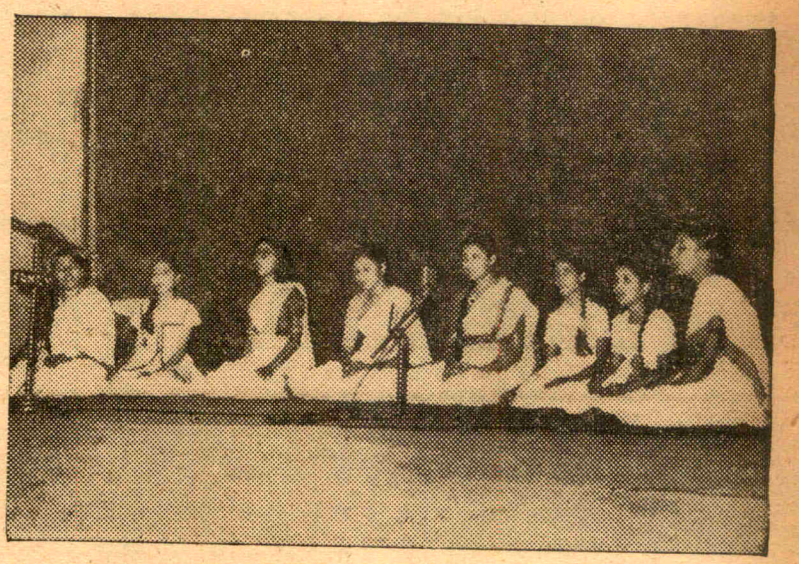

● মুকুলবীথির বার্ষিক উৎসবে সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রীরা 'সোনার বাংলা' প্রশান্ত গাইছেন।

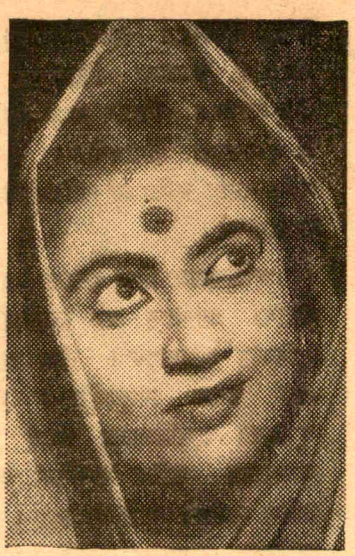

রঙমহলের 'স্বীকৃতি' নাটকে শেখর চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, জহর রায়।

## নাটকের কথা

জানা গেল, বিশ্বরূপা থিয়েটারের পরবর্তী নাটকের নাম 'লগ্ন'। নাটকটির রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্য।

* * *

থিয়েটার সেন্টারের নতুন নাটক নিশাচর' ১৪ই মার্চ মুক্তি লাভ করবে। নাটকের লেখক ধনঞ্জয় বৈরাগী। অভিনয়ে থাকবেন তরুণ রায়, প্রণতি ঘোষ, দীপান্বিতা রায়, নরেশ চক্রবর্তী, পান্নালাল চ্যাটার্জী প্রমুখ।

## স্টুডিও খবর

পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবার একটি হিন্দী ছবির পরিচালনায় হাত দিয়েছেন। গত ২রা মার্চ টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে তাঁর এই নবপ্রচেষ্টা 'চিমনী কা ধুঁয়া'র মহরত অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিনার প্রোডাকসন্সের এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলরাজ সাহানী, মালা সিংহ, হেলেন, ধূমল জহর রায় এবং নবাগত মধুকর ও গীতা পণ্ডিত। ছবিটির জন্য কাহিনী, সংলাপ এবং গীত রচনা করেছেন আর এস প্রীতম। এই হিন্দী ছবিটি ছাড়াও একটি বাংলা কাহিনী-চিত্র ও হীরালাল সেনের জীবনী-চিত্র নির্মাণেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

* * *

আশুতোষ মুখার্জী রচিত 'সন্দেশ' অবলম্বনে 'শঙ্খবেলায়' নামে একটি ছবি তৈরির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অগ্রগামী গোষ্ঠী।

## সংবাদ-কণা

গত ৩রা মার্চ এক সাধারণ সভায় অভিনেতৃসংঘের ১৯৬৪ সালের জন্য নির্বাচিত কর্ম পরিষদে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি---পাহাড়ী সান্যাল। সহ-সভাপতি---জহর গাঙ্গুলী, অজিত ব্যানার্জী, মিহির ভট্টাচার্য। সম্পাদক---হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী। সহ-সম্পাদক---সুশীল দে, তারক ঘোষ।

সুরশিল্পী হেমন্ত মুখার্জী দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানা গেল। এবার তাঁর পরিক্রমা হবে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, জাপান। এসব স্থানে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন ধরণের চিত্রগৃহ তৈরি হচ্ছে বলে জানা গেল। এ সকল ছবিঘরে এমন ব্যবস্থা আছে যে, একসঙ্গে দু-দল দর্শক দু'টি ছবি দেখতে পাবে। নতুন ছবি দেখার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এই অভিনব ব্যবস্থা।

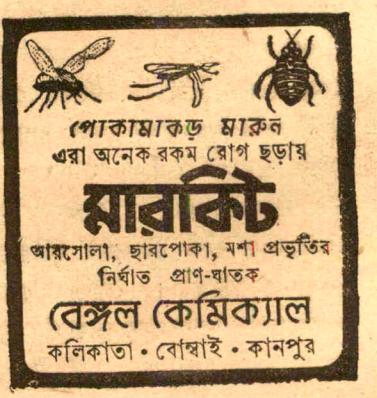

# খেলাধুলা

## ম্যানুয়েল সান্তানার স্বপ্ন কি সফল হবে?

১৯৬৩ সালের উইম্বলডেন খেলা চলছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার খেলোয়াড়দের কেউ বাকি নেই। সবাই এসেছে টেনিস তীর্থ উইম্বলডেনে। বর্ণবিদ্বেষের বালাই নেই, সাদা-কালো সবাই টেনিস ব্যাট হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোণের একটি টেনিস কোর্টে দু'টি যুবক অনুশীলন করছে। একজন অষ্ট্রেলিয়ান আর একজন স্প্যানিয়ার্ড। মাঠে মাত্র দু'তিনজন দর্শক। খেলোয়াড়দের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'জনের র‍্যাকেট থেকে টেনিসে মণি-মুক্তা অজস্রধারে ঝরে পড়ছে। প্রতিটি ষ্ট্রোক নিখুঁত। এ যেন কর্ণার্জুনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা। দু'জনের তূণীরেই হরেক-রকমের অস্ত্র এবং অস্ত্র প্রয়োগের দক্ষতাও অতুলনীয়। উইম্বলডেনের বৃদ্ধ মালি শুধু আপন মনেই বলল—উইম্বলডেনের ফাইন্যাল খেলাও এত সুন্দর হয় না। সেই তরুণ দু'টির একজন ম্যানুয়েল সান্তানা, অন্যজন রয় এমার্সন। আজ ম্যানুয়েল সান্তানার কথাই বলব।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের সেরা টেনিস ক্লাবে একটি কিশোর বালক মালির কাজ করে। বল কুড়োয়, কোর্ট ঝাঁট দেয়, ফাই-ফরমাস খাটে আর যতক্ষণ খেলা চলে ছেলেটি একমনে লক্ষ্য করে মাঠের এক-কোণে দাঁড়িয়ে। ছেলেটির পিতাও ছিল এই ক্লাবের কর্মচারী। বাবা মারা যাবার পর ছেলেটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের দয়ায় কাজটি পেয়েছে। দিনের শেষে ছেলেটি যখন ছুটি পায় তখন সমস্ত মাঠ নিঝুম হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে যায় ছেলেটি। কিন্তু সারাক্ষণ টেনিসের স্বপ্নে বিভোর থাকে। টেনিসের দুর্বার আকর্ষণ ছেলেটির মনকে বইয়ের পাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। টিলডেন, কোশে, ডোনাল্ড বাজের জগৎজোড়া নাম; এদের কথা তার কানে এসেছে। মনে মনে ভাবে সেও একদিন মস্ত বড় টেনিস খেলোয়াড় হবে।

কল্পনার পক্ষীরাজে সওয়ার হয়ে মন তার উড়ে যায় পীরেনীজ পর্বত পার হয়ে দেশ-দেশান্তরের টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে—ইংলণ্ডের উইম্বলডেন, আমেরিকার ফরেষ্ট হিল, ফরাসী লন টেনিস প্রতিযোগিতায়। লেখাপড়া ছেলেটির হয় নি। কিন্তু সে চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, বড় হতে, নিজের দৈন্যদশা ঘোচাতে। কিন্তু হায়, তার সম্বল শুধু দু'টি পেশীবহুল হাত এবং

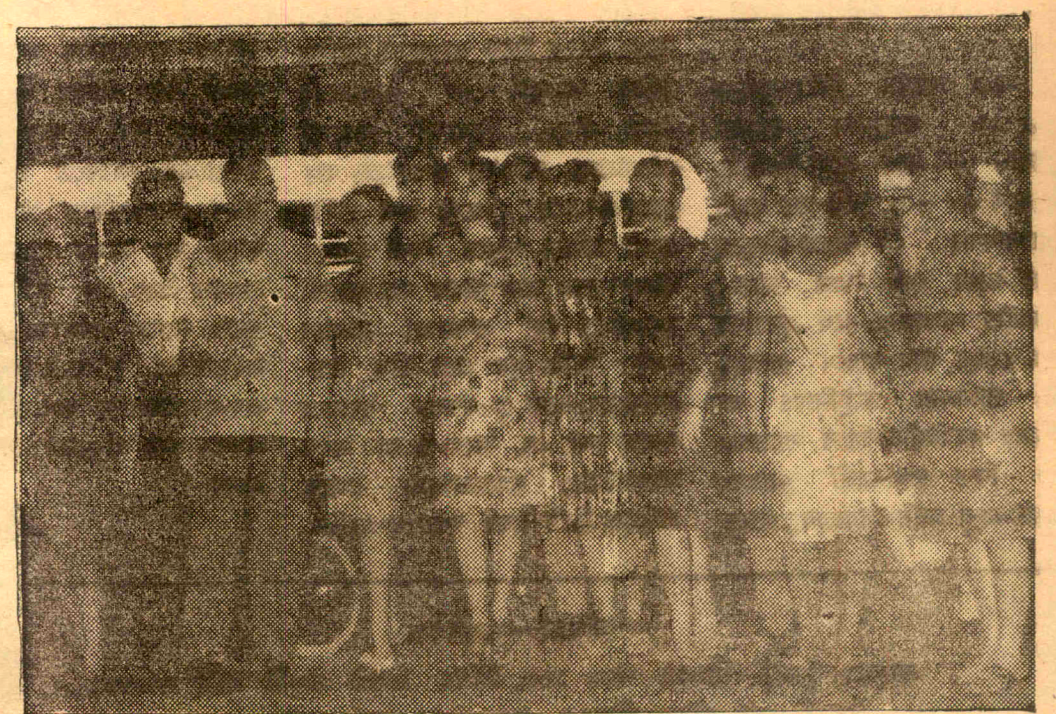

● হাওড়া ষ্টেশনে সোভিয়েট সার্কাস দলের সদস্যদের সম্বর্ধনা জানান হয়।

অদম্য বাসনা। তাই সে টেনিস ক্লাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমত টেনিসের চর্চা সুরু করে দিল। একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের যে ক'টি গুণ থাকা প্রয়োজন ছেলেটির মধ্যে সব ক'টি গুণই সুপ্ত ছিল। নিরলস সাধনায় তার স্বাভাবিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটল; ছেলেটির খেলা দেখে ক্লাবের সভ্যরা তাকে সাহায্য করল এবং উৎসাহ দিতে লাগল। ছেলেটির বহুদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলল। মাত্র তিন বছরের সাধনায় ছেলেটি অসম্ভবকে সম্ভব করল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছেলেটি জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের দুর্লভ সম্মান লাভ করল। নতুন স্পেনের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান হিসাবে তখন ম্যানুয়েল সান্তানার ছবি ছাপা হল মাদ্রিদের সংবাদপত্রগুলিতে। মাত্র ২২ বছর বয়সে ছেলেটি সমগ্র ইউরোপের সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য হল। সান্তানাই প্রথম স্পেন দেশের হয়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে ফরাসী জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতাটি জিতে স্বদেশকে বিশ্ব টেনিসের দরবারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করল।

১৯৬৩ সালের উইম্বলডেনের হাতছানিতে ম্যানুয়েল সান্তানা পীরেনীজ পার হয়ে এসে উপস্থিত, মনে মনে এই খেতাব ও ট্রফি জয় করার অদম্য বাসনা। উই লডেন জিততে পারলে ভাগ্য তার ফিরে যাবে; পেশাদারীর আহ্বানের সঙ্গে লক্ষাধিক টাকার তোড়া তার সামনে ঝুলছে। বিশ্ব তালিকায় অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনের পর দ্বিতীয় স্থানে সান্তানার নাম। কিন্তু ভাগ্যদেবী বোধহয় অলক্ষ্যে ক্রূর হাসি হাসলেন; হাতে এসেও ফস্কে গেল লক্ষাধিক টাকার তোড়া। অষ্ট্রেলিয়ার অনামী খেলোয়াড় ফ্রেড ষ্টোলের কাছে হঠাৎ হেরে গেল সান্তানা।

খেলার শেষে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরল সান্তানাকে, উত্তরে সে শুধু বলল, আমার সামনে দু'টি পথ খোলা। হয় টেনিস, নয় অন্য পেশা। কারণ আর সময় নেই। এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে আগামী বছর। উইম্বলডেন জিততে পারলে পেশাদারী টেনিসের পথ প্রশস্ত, আর ব্যর্থ হলে অন্য পথ।

আগামী ১৯৬৪ সালের উই লডেনের দিকে চেয়ে আছে স্পেনের সেরা খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানা।

## সন্তোষ ট্রফি ও রঙ্গস্বামী কাপে বাংলা দল

ভারতের দুই প্রান্তে হচ্ছে বাংলার শক্তি পরীক্ষা। একদিকে মাদ্রাজের কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে বাংলা ফুটবল দল তার একচ্ছত্র প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে; অন্যদিকে চারজন লিয়ঁ-খ্যাত খেলোয়াড় সমন্বিত বাঙালী-হীন বাংলা হকি দল অবতীর্ণ হয়েছে রাজধানীর মাঠে। বাংলা দলের দিকে তাকালেই বাংলার হকির অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। ভিনদেশী ভাড়াটে খেলোয়াড়ে বর্তমানে কলকাতার মাঠ ছেয়ে গিয়েছে; এদের জন্য স্থানীয় তরুণ প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে। বাংলা দলে স্থান পাবার মত বাঙালী খেলোয়াড় কি কলকাতা ময়দানে নেই? বাংলা দল প্রথম দিন মহাকোশলের সঙ্গে ড্র করল। সবচেয়ে মজার কথা যে, বাংলা দলের সমস্ত আক্রমণধারা মহাকোশলের গোলে দাঁড়িয়ে যিনি রক্ষা করলেন সেদিন, তিনি একজন বাঙালী খেলোয়াড়। অনেকে হয়ত আমার অভিমতকে প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট বলে মন্তব্য করবেন। কিন্তু এখানে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্নই আসছে না। সবচেয়ে বড় কথা যে, এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে বাংলার হকির ভবিষ্যৎ।

বাংলা ফুটবল দল ফুটবলের একচ্ছত্র প্রাধান্যকে মাদ্রাজের মাঠে বিসর্জন দিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। দুর্বল উত্তরপ্রদেশ দলের সঙ্গে প্রথম দিন ড্র করল, দ্বিতীয় দিনে জিতে কোনক্রমে মানরক্ষা করল। মাদ্রাজ দল নিজেদের মাঠে প্রথম দিনে বাংলাকে প্রায় ঘায়েল করে দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের খেলায় একটা পেনাল্টিতে গোল দিয়ে মাদ্রাজ গতবারের বিজয়ী বাংলা দলকে ফিরতি ট্রেনে বাড়ি পাঠাল। চূর্ণী বিহীন বাংলার পুরোভাগ ছন্নছাড়ার মত মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। নামী দলের দামী খেলোয়াড় হলে কি হবে, পুরোভাগের অনেক খেলোয়াড় বল নিয়ে অনেক কেরামতিই দেখাতে পারেন, পারেন না কেবল ঠিকমত গোলে সট মারতে। গোলের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চাইতে অপব্যবহার করতে এঁরা ওস্তাদ বলে বাংলার পরাজয় হয়েছে মাদ্রাজের মাঠে। মনে হয় গোলে থঙ্গরাজের পরিবর্তে অন্য কোন তরুণ গোলরক্ষককে খেলালে বোধহয় বাংলা দল অনেক লাভবান হত। দলগত ঐক্য এবং সংহতির অভাব বাংলা দলের পরাজয়ের মূল কারণ। সর্বভারতীয় ফুটবলের আসরে বাংলার একচ্ছত্র প্রাধান্য রাখতে হলে কর্তৃপক্ষকে সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

## প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

### মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক ও ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

**শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**

এবং

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নিত্যপ্রসিদ্ধ

**শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী**

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পাঠক
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হইবে এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

# হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

### দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ গ্রাস করিয়াছে বিদেশী সভ্যতা। বাংলার ভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন এডুকেশনাল ডিরেক্টর শ্রীযাদব শ্রীহরি এমি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। আমাদের প্রাথমিক হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এই ধারণা যদি বইখানি পড়াই। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই দেওয়া থাক, এ আমার বড় ইচ্ছা।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"ধর্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

# জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিষ্মান নাট্যগ্রন্থ, কালিদাস, কাব্যনাট্য শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, শূদ্রক, রাজশেখর প্রভৃতির সাহিত্য-মন্থিত অমৃতধারা—বালজাকের বিভীষিকা, মোপাসাঁর গল্পসুধা, জোলার রসরঙ্গ, পিয়ের লোতীর সম্মোহন, মোলিয়েরের কৌতুক-যৌতুক, স্বাধীন ভারতের গৌরবদীপ্তি, রাজপুত শৌর্যের অলৌকিক প্রভা, তরবারি আস্ফালনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত।

মূল্য ১৲ টাকা

২য় খণ্ড—মিলিতোনা, শোণিত-সোপান, হত্যাকারের পর, সবুজ শয়তান, অলীক বাবু, বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পরীক্ষা, বালনের অবরোধ, দর্পণ, ইংরেজ বণিত ভারতবর্ষ, মুখোশপরা, নাচের মজলিস, মা, জল্লাদ, জ্যোৎস্না রাতে, থুকুমণি, শেষ পরীক্ষা, ঘণ্টা, অভিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ত।

মূল্য ১৲ টাকা

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মাল্‌বিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত।

মূল্য ১৲ টাকা

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্বজনপ্রমোদন—অমরকীর্তি উপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী'

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—মরণী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কাজলা, অপরাধী, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, সংবেদন, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আলো, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্বজন চিত্তবিনোদন—সর্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমগ্র ১৷৷৹

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, লেপ্‌চাজল, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার বালা, দেশের ডাক, মুক্তি, সমাজপতি প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের গল্প, নরাকুশের নাটা ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷৹ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমগ্র—বাঘলা, মমতা, নিষ্কৃতি, অতঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের সৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাটা, দুষ্টুবীরাম, পান-সুপারি। এই সর্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷৹ টাকায়।

---


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : [illegible] Regd. No. C 71

12 MAR 1964

স্বচ্ছ **কাঁচের** আবরণ

সেরা কাঁচের
দরকারে সর্বদা
এইচ, পি, জি,
কাঁচই নেবেন

বর্ষায়, ঝড়ে অথবা দারুণ ঠাণ্ডায়—যে কোন অবস্থায়ই আপনি আরামে ঘরে বসে আপনার বাগানের শোভা উপভোগ করতে পারেন। ঘরে স্বচ্ছ কাঁচ লাগিয়ে নিলেই হলো। কাঁচে ঝামেলা কম, খরচা অল্প আর তা দেখতেও চমৎকার। কাঁচ লাগালে আপনার ঘর প্রশস্ত মনে হবে, বাইরের আলো ঘরে আসবে কিন্তু আওয়াজ ও ধুলোময়লা ঢুকবার পথ পাবে না। আর কাঁচ পরিষ্কার করতেও কোন ঝামেলা নেই। কাঁচ অবশ্য কাজে আসে—অফিসে, স্কুলকলেজে, হাসপাতালে, দোকানে, হাজারো জায়গায়। নানা মাপের নানা রকম পুরু কাঁচ পাওয়া যায়। আপনার যে কোন প্রয়োজনে এইচ্, পি, জি, কাঁচের শীট ব্যবহার করতে পারেন।

## হিন্দুস্থান-পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

এজেন্সি এরেঞ্জস : তারুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

EWTHP 5444

সাপ্তাহিক

# বসুমতী

কলকাতায় সোভিয়েত সার্কাসদলের
রোমহর্ষক ক্রীড়া-কৌশল ও
চিরায়ত চলচ্চিত্রাভিনয়

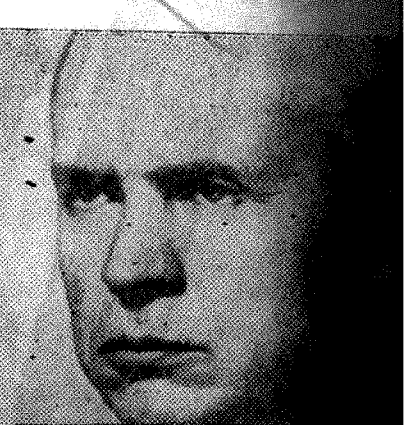

বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৫ই চৈত্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • March 19, 1964 • Vol. 68, No. 43

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস •

অপরূপ
ডিজাইন
চমৎকার
কারিগরী

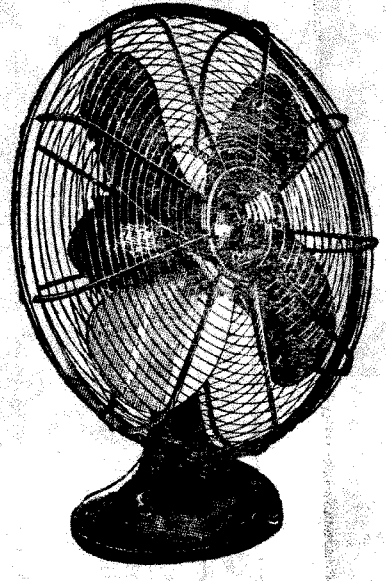


# ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা

নিখুঁত সৌন্দর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যক্ষমতা,
ব্যবহারে অর্থ-সাশ্রয়ী—এসব ছাড়াও
অনেক কিছু গুণ থাকার ফলে
ওরিয়েন্ট পাখা ভারতে আজ সবচেয়ে
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

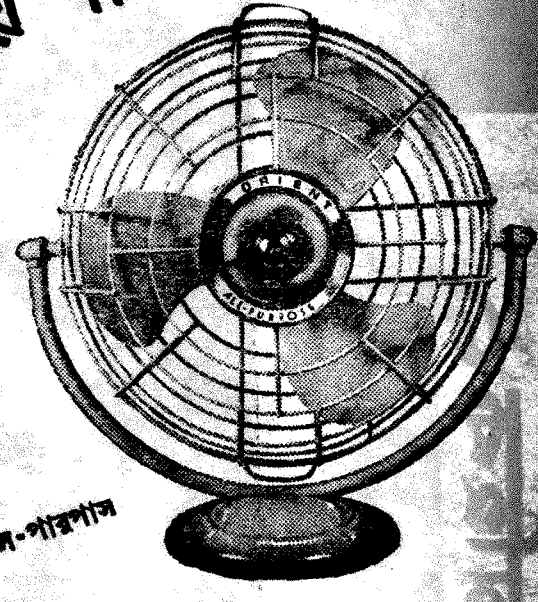


ওরিয়েন্ট পাখা

এল-পারপাস

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, কলিকাতা-১১

ডিষ্ট্রিবিউটারস

হিন্দুস্থান ডিলার্স লিঃ, ৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ ; ফোন : ৩৪-৫৩৯৩ (২ লাইন)। গ্রাম : DEALHIND. * চমচনিয়া বাদার্স (পি) লিঃ, ফ্রেজার রোড, পাটনা। ফোন : ২১৬৯. গ্রাম : ORIENTFANS * হিন্দুস্থান ডিলার্স লিঃ, ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটি, ফোন ; ৬৭৪, গ্রাম ; DEALHIND.

# সূচীপত্র

756-3
*003/3
X.68
no. 43


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৩৪৭ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৩৪৮ |
| রঙ্গদর্শন | | ২৩৪৯ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৩৫৩ |
| ভালবেসো না ( কবিতা ) | জ্যোতিকুমার | ২৩৫৬ |
| মুখের আলোয় ( কবিতা ) | মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ২৩৫৬ |
| দুষ্টু পরীরা ( গল্প ) | অসিত গুপ্ত | ২৩৫৭ |
| দুরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৩৬৬ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২৩৬৮ |



মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত
**বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭৲**
সুভাষচন্দ্র বসুর
**তরুণের স্বপ্ন ২৷৷০ নূতনের সন্ধান ২৲**

গোপাল ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস
**শেষ প্রদীপ শিখা**
চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস
**জবানবন্দি ৬৷৷০**

তপতী রায়ের উপন্যাস
**একটি সোনা মন ৬৲**
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সদ্য প্রকাশিত
**মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫৷৷০**
সুমথ ঘোষের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
**মেঘ ভাঙা রোদ ৫৷৷০**
অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ
**সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫৷৷০**
দায়রা আদালতের আইনের অভিযুক্ত আসামীদের জীবনালেখ্য
চিত্রগুপ্তের
**এরা অভিযুক্ত আসামী ৩৷৷০**

অভিযাত্রীর উপন্যাস
**স্মৃতির মুকুর ৬·৫০**
অনির্বাণ শিখা ৫৲
মষ্টচন্দ্রের আলো ৬৲
পূর্ণচন্দ্র গুঁই-এর উপন্যাস
**পথ হতে পথে ৩৲**
প্রবোধ সান্যালের
গল্প সঞ্চয়ন ৪৲ বন্দীবিহঙ্গ ৩৷৷
এক বাণ্ডিল কথা ৪৲ জনতা ৩৲
প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস
লাল পাথর ৩৲ সমান্তরাল ৩৷৷
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
ঋণশোধ ৩৷৷ স্মৃতি ৩৲
রামপদ মুখোপাধ্যায়
দুরন্ত মন ৩৲ মাটির গন্ধ ৪৲
মনকেতকী ৬৲
সলং বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫৷৷

তারাশঙ্কর বন্দ্যো—রবিবারের আসর ৩৲
আশুতোষ মুখো—জামলার ধারে ৪৲
বনফুল—উঞ্ছলা ৩৷৷
জগদীশ ঘোষ—যাত্রিদল ৬৷৷
বিভূতি মুখো—আনন্দ মঠ ৩৲
শক্তিপদ রাজগুরু—বনমাধবী ৩৷৷
আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩৷৷
সত্যব্রত মৈত্র—বনদুহিতা ২৷৷
মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩৲
নির্ম্মলকান্তি মজুমদার—স্মৃতির দিগন্ত ৩৷৷
ইনা দেবী—আর এক জীবন ৩৲
নিরা মুখো:—জটাশিবতলার ঘাটে ৩৷৷
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য—আতপ্ত কাঞ্চন ৩৲
বেলা দেবী—জীবন তীর্থ ৩৲
অখিল নিয়োগী—বহুরূপী ৩৲
বামাপদ ঘোষ—আমার পৃথিবী তুমি ৩৲
প্রভাবতী দেবী—উদয় অস্ত ২৲
বিমল কর—দিনরাত্রি ৩৲
দেবব্রত ভৌমিক—দুরন্ত নদী ৩৲
মতিলাল দাস—মন্দার পর্ব্বত ৪৲
হিরণ্ময়ী বসু—পরিচয় ৩৲
গৌরীন্দ্র মুখো—লেকরোড ৩৲
গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪৲
সুবোধ চক্রবর্ত্তী—একটি আকাশ ৬৷৷
রাজকুমার মুখো—শয়তানের জলা ২৲
তারকদাস চট্টো—কুমারী ধরম ৫৲
কৃশানু বন্দ্যো—কালো চোখের তারা ৩৷৷

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪**

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পৃথুমালিনী কথা ( সোমাপ্পকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২৩০৩ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২৩৭৬ |
| আজকের পশ্চিম জার্মানী | মৈত্রেয় | ২৩০৯ |
| জাপানী সঙ্কেত | সন্দীপ ঠাকুর | ২৩৮২ |
| ভারত দর্শন | | ২৩৮৫ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৩৮৯ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৩৯৩ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২৩৯৪ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৩৯৫ |
| খেলাধূলা | ... | ২৩৯৯ |



ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·০০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০
( প্রত্যেক বিক্রেতা ও বিক্রয়কেন্দ্রকে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন দেওয়া হচ্ছে )

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]
( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
যাযাবর রঙ্গ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পূণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম খণ্ড | ১·৫০ | ২য় খণ্ড | ২·৫০ |
| ৩য় খণ্ড | ১·০০ | ৪র্থ খণ্ড | ২·৫০ |

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৮৮ বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৫ই চৈত্র ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 19th March 1964

# স্বর্গ নয়, একফালি ঠাঁই

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশা সাক্ষাৎ-দর্শনের পর কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এতদিনে মুখ খুলেছেন। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরে তিনি কূটনৈতিক কলা-কৌশল দেখিয়ে আসছেন। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার তদানীন্তন চেয়ারম্যান সুকুমার সেনের বলিষ্ঠ চিন্তা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তার কাছে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা সুকুমার সেনের মতো ব্যক্তিত্বকে চিরকালের জন্য হারিয়েছি। তাঁর মৃত্যুর পর পরিহাসের মতো আবার সুরু হয়েছে নতুন করে হাজার হাজার অসহায় উদ্বাস্তুদের আগমন।

ঐসব উদ্বাস্তু কিভাবে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে তা শ্রীখান্নার বর্ণনা থেকেই বেশ কিছুটা উপলব্ধি করা যায়, রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন, উদ্বাস্তুরা তাঁকে বলে দিয়েছে যে, তারা আর কোনমতেই পাকিস্তানে ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়। তাছাড়া, শ্রীখান্না একটি হাসপাতালও পরিদর্শন করেছেন, যেখানে বুলেটবিদ্ধ উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। উদ্বাস্তুরা শ্রীখান্নাকে জানিয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসাও খুব কঠিন ব্যাপার। রাত্রির অন্ধকারে বা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তাদের আসতে হচ্ছে। এই অসুবিধা সত্ত্বেও আরো অনেকে আসতে বাধ্য, কেন না সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক আচরণ করা হচ্ছে। শ্রীখান্নার বর্ণিত এই বাস্তব কাহিনী শুনে মনে হয়, পুনর্বাসনমন্ত্রীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে হয়তো কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। একান্ত নিরুপায় অবস্থার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত যারা নিজেদের জন্মস্থানের পবিত্র মৃত্তিকার স্পর্শ ত্যাগ করে ভারতভূমিতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে—তাদের জন্য শ্রীখান্নার দরদ কতটুকু—তার পরিচয় আমরা অনেক পেয়েছি।

তিনি বলেছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি পনের হাজার উদ্বাস্তু আসে, তাহলে তাদের জন্য তিনি একটা 'নতুন স্বর্গ' রচনা করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন—পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর কাছ থেকে কখনো কি স্বর্গের প্রার্থনা করা হয়েছে? স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছে যে সব উদ্বাস্তু, তাদের জন্য আজ শুধু মাথা রাখার ঠাঁইটুকুর পরিবর্তে অমন ব্যঙ্গাত্মক কথা শুনতে কেউ প্রস্তুত নয়। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একটা প্রতিশ্রুতি আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মতো জাতীয় সমস্যাকে তিনি বানচাল করে দেবার উপক্রম করেছেন। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত এখন শ্রীখান্নার কূটনৈতিক চালের সম্মুখীন। খান্নাজীর মনোনীত চীফ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর সংস্থার চেয়ারম্যানের ওপর খবরদারী করে অযথা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন। খান্নাজীর কাছে তাই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বদলে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করাই বড় কথা। সেই কারণে পুনর্বাসনের প্রশ্নে রাজ্যসভায় তাঁকে যদি সকল সময়েই একটা খোঁচা খেতে হয়, তার জন্য দায়ী কে—তা কি তিনি কখনো ভেবে দেখেছেন? আরো বড় খোঁচা যদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকে তার জন্যও তাঁর প্রস্তুত থাকা দরকার।

সম্পাদকীয়

# আমাদের মানুষ

এক, দুই, তিন, চার---এমনি করেই তাঁর বয়স আজ একাত্তরের চৌকাঠও পার হয়ে গেছে। পেছনে রইল এক বিরাট কর্মক্ষমতার দৃষ্টান্ত, অধ্যবসায়ের আদর্শ আর সাফল্যের ইতিহাস। বয়সের হিসেবে তিনি অবশ্যই বৃদ্ধ। কিন্তু মনে? তারুণ্য যেন বাসা বেঁধেছে চিরন্তনের। বলছিলাম অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের কথা। সমস্যাজর্জর ভারতের উন্নতিকল্পে যোজনা প্রয়াসে যাঁর অবদান প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ঠিক পরেই। বিশ্বের চোখে তিনি বিদগ্ধ গাণিতিক। আর অগণিত ভারতবাসীর কাছে ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক কল্যাণযজ্ঞের অপরিহার্য পুরোহিত। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর অনন্য মেধা আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিল।

১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন। তারপর ট্রাইপোজ পেলেন কেম্ব্রিজে—প্রথমে অঙ্কশাস্ত্রে, পরে পদার্থবিদ্যায়। এই কেম্ব্রিজেই গবেষণার স্বপ্ন হয়েছিলেন তরুণ প্রশান্তচন্দ্র; স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছিলেন। এমনি ভাবে কীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেদিন তাঁর শিক্ষার্থী-জীবন শেষ হ'ল, তিনি ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। মনে উচ্চাভিলাষ আর প্রাণে নিরন্তর কঠিন কর্মসাধনার ব্রত। তখন ১৯১৫ সাল। শ্রীমহলানবীশ যোগ দিলেন Indian Educational Service-এ। অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে অধ্যাপনায় নিরত হলেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাছাড়া একই সাথে নানা দায়িত্ব সুসম্পন্ন করবার মত ক্ষমতা আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক থাকাকালীনই তিনি বিভিন্ন সময়ে Indian Statistical Institute-এর meteorologist Secretary এবং Director, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পত্রিকা 'সংখ্যা'র প্রতিষ্ঠাতা---সম্পাদক, বিশ্বভারতীর সম্পাদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্বও নিয়েছেন। ১৯৪৫ সালে তিনি তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ ও অবিভক্ত বাংলা সরকারের পরিসংখ্যান বিষয়ে উপদেষ্টা হলেন।

অধ্যাপক মহলানবীশ তাঁর ব্যাপক কর্মজীবনে বহু দুর্লভ সম্মান পেয়েছেন। তিনি ১৯৪৮ সালে অবসর নিলেন Indian Educational Service থেকে। অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে তাঁর কর্মজীবন প্রসারিত হল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। U. N. statistical committee-র সহ-সভাপতি, sub-committee on statistical Sampling-এর সভাপতি, পরিশেষে statistical committee-র অধ্যক্ষ, প্রভৃতি পদে চিন্তানায়ক প্রশান্ত মহলানবীশ তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতাও প্রমাণ করেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি নিযুক্ত হলেন ভারত সরকারের অবৈতনিক পরিসংখ্যান উপদেষ্টা। এই তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায়। বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতায় তিনি এ সময় ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হয়েছেন। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করার পন্থা অধ্যাপক মহলানবীশেরই পরামর্শ। নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করবার অনমনীয় মনোবল তাঁকে নানা সংশয় সংঘাত থেকে উত্তীর্ণ করেছে। স্বীয় আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাটুকু তাঁর নিজস্ব সম্পদ। Indian Statistical Institute-এর প্রশাসনিক শিথিলতার মুহূর্তে তিনি তাই দৃঢ় হাতে এর পুনর্গঠন করেছেন। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-ধন্য অধ্যাপক মহলানবীশের এই বিপুল কর্মপ্রতিভার উৎস কোথায় —তা ভাবীকাল সন্ধান করবে। আপাতত তাঁর কর্মযোগের

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

সাথে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জীবনের যে ঘনিষ্ঠতা আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক বিবর্তনের সাথে ঘটেছে—সেইটেই সবচেয়ে সত্যি কথা। একথা দ্বিধাহীনভাবে তাই বলা চলে: ভারতের পরিকল্পনার স্বপ্ন যতই বাস্তবে রূপান্তরিত হ'বে, ততই যে নিরলস নিঃস্পৃহ কর্মবীরের নাম প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত হ'বে---সে নাম 'পি সি মহলানবীশ'।

# বঙ্গদর্শন

● দুর্গাপুরে পর্যটক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

## রাজধানী

দেশের সমস্ত সমস্যা তথা দেশবাসীর মনোভাবের প্রতিফলনের ক্ষেত্র বিধানসভা। বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীদের বক্তব্যে সরকারী নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসাধারণ তথা সরকারের গোচরে আনা হবে, আবার গণতান্ত্রিক দেশের সরকার বিগত বছরের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার কথা সমানভাবে তুলে ধরে বিধানসভাকক্ষেই আগামী বছরের নীতি ঘোষণা করবেন। বিশেষ করে বাজেট অধিবেশনে যখন ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা হয়, তখন তো জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক।

গত সপ্তাহে সুযোগও ছিল প্রচুর। এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রাণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পুলিশ, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পূর্ত এবং মৎস্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী গৃহীত হল। সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মুখ্য সমস্যাই এই সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এই সপ্তাহটি পশ্চিম বাংলার সামনে হাজির হয়েছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশা কি পূরণ হয়েছে?

* * *

গতানুগতিকতার পুনরাবর্তন ছাড়া নতুন কোন ইঙ্গিত গত সপ্তাহের বিধানসভার অধিবেশন দেশের সম্মুখে রাখতে পারে নি। বিরোধীদের আক্রমণের ধারা আর সরকার পক্ষের বক্তব্যে গত বছরের চেয়ে কোন নতুন কথা ছিল কি? তবু গত বছর চৈনিক আক্রমণের মুখে দেশের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির একটা লক্ষণ ছিল, কিন্তু এবার!

সারা পশ্চিম বাংলায় নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, পুরাতন সমস্যা হয়েছে আরও জটিলতর। জনমনে শুধু বিভ্রান্তি আর হতাশা। বিধানসভার মুকুরে সেই হতাশারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বিরোধী পক্ষ বা সরকার পক্ষ কোন পক্ষই নতুন আশার সঞ্চার করতে পারেন নি দেশের সম্মুখে। তাই মাঝে মাঝে বিক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে বিতর্কে। সারা সভাকক্ষ উত্তেজনায় মাঝে মাঝে ফেটে পড়েছে এ সবই সত্য, কিন্তু সাধারণভাবে বিধানসভাকক্ষ ছিল নির্জীব, নিষ্প্রাণ।

* * *

তবু চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে বিতর্কে নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ এক-ঘণ্টাকালীন ভাষণে পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। দপ্তরের দায়িত্ব তিনি অল্প দিন গ্রহণ করলেও তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। হাসপাতালে অস্বাভাবিক ভিড়, মফস্বলে চিকিৎসার বিপুল সমস্যা, হাসপাতালে দুর্নীতি সব কিছুর স্বীকৃতি ছিল তাঁর ভাষণে। তাই বিরোধী পক্ষ খুব নতুন কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে নি।

কিন্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে অভিজ্ঞ মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতির ভাষণে অভিজ্ঞতার নিরিখে সমস্যার উপলব্ধি তথা সমস্যাপূরণে আন্তরিকতার আভাস পাওয়া যায় নি। তাই বিরোধীদেরই শুধু নয়, সমর্থনের নামে কংগ্রেসী সদস্যদেরও আক্রমণের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। ত্রাণ খাতে প্রতি বছরই যে বরাদ্দ থাকে, খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই কমিউনিষ্ট সদস্য শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উক্তি 'পাপিয়সী! তুই নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি' উল্লেখ করে বললেন, মাননীয়া ত্রাণমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের কথা নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলেন কিন্তু সেজন্য প্রস্তুত হইলেন না।

পুনর্বাসন খাতে সরকারী নীতির ব্যর্থতার কথা জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করে শ্রীনিখিল দাস আবার ত্রাণমন্ত্রীকে দরদহীনা, সহানুভূতিহীনা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে জোর গলায় চ্যালেঞ্জ জানালেন, বৈধ কলোনীগুলির একটি ব্যক্তিও আজ পর্যন্ত কি জমির মালিকানা পেয়েছেন! পুরাতন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ করে বিরোধী সদস্যদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যও নবাগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলায় এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবী জানালেন।

দণ্ডকারণ্যের অব্যবস্থার অভিযোগও তুলেছেন অনেকে। নতুন কোন আশ্বাস না দিলেও পুনর্বাসনমন্ত্রী

শ্রীমতী আভা মাইতি: ক উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতির ভুল স্বীকার করতে হলো।

পূর্ত খাতে বিতর্কে সব সদস্যই, এমন কি চীনাপন্থী বলে যাঁদের আখ্যা দেওয়া হয়, সেই কমিউনিষ্ট সদস্যরাও অভিযোগ তুললেন, অরক্ষিত সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপজ্জনক। পূর্তমন্ত্রীকে আমতা আমতা করে উত্তর দিতে হল। মৎস্য খাতে বিতর্কে নির্দলীয় সদস্য শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা উক্তিতেই বাংলা দেশের মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যায়। তিনি বললেন, 'মাছ খাওয়া তো ভুলে গিয়েছি—তবু বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে পেরেই যেন মাছের আস্বাদ পাচ্ছি।'

পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে ইংরেজ আমল থেকেই মানুষের যে মনোভাব ছিল, স্বাধীনতালাভের ১৬ বছর পরেও তার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তাই প্রতি বছর পুলিশ বাজেটকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক জমে ওঠে। এবার তো অবস্থা আরো খারাপ। সাম্প্রতিক হাঙ্গামা উপলক্ষ করে পুলিশী জুলুমের অভিযোগ হচ্ছে রোজই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বাজেট সম্পর্কে জনসাধারণের ছিল বিরাট আগ্রহ। দর্শক গ্যালারী একেবারে ভরপুর। বিরাট প্রত্যাশায় সকলেই উন্মুখ। কিন্তু বিতর্ক জমলো না। মুখ্যমন্ত্রী প্রারম্ভিক ভাষণে হয়তো বা ইচ্ছে করেই হাল্কা সুরে আরম্ভ করায় কক্ষ স্তিমিত হয়ে পড়লো। কমিউনিষ্ট সদস্য শ্রীনিরঞ্জন সেন স্বভাবতই ধীরগতি। আক্রমণের ভাষা তাঁর জোরালো হয় না। তাই তিনি বিতর্ক উদ্বোধন করায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। শ্রীনিখিল দাস কিছুটা উত্তাপ সঞ্চার করলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে নীতিগত আক্রমণ চালালেন তিনি অনেকগুলো উদাহরণের সাহায্যে। কিন্তু তবু বিতর্ক জমছে না। শেষ সময় সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ করে ঘটে গেল তুমুল কাণ্ড। বোঝা গেল ঘটনার পেছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি। শুক্রবারের সন্ধ্যা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু পুলিশী

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের কোন আভাস পাওয়া গেল না।

* * *

স্পীকারের সঙ্গে ট্রেজারী বেঞ্চ তথা সরকার পক্ষের মধ্যে বিরোধ জমে উঠেছে কি? এই প্রশ্নটি রাজনৈতিক মহলে বার বার শোনা যাচ্ছে। স্পীকার পদত্যাগ করবেন বলেও গুজব উঠেছে। কিন্তু বিগত এক

শ্রীবীজেশ সেন

সপ্তাহের মধ্যে তিনটি ঘটনায় স্পীকার ও সরকার পক্ষের মধ্যে যে বিতণ্ডা হয়েছে তাতে স্পীকারের বক্তব্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউ করতে পারেন নি। প্রথমত স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তর দেওয়ার সময় 'আরও একটু বিনয়ী' হতে অনুরোধ করেছিলেন আর জানিয়েছিলেন যথাসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে। বিরোধী পক্ষ যেভাবে প্রশ্ন করেন তার বিরুদ্ধেও তিনি মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে—একদিন ২২টি প্রশ্নের মধ্যে ১৬টি 'হেল্ডওভার' করা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে। ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী মাইতিকে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রীদের আর একটু তৎপর হতে হবে। এতে ত্রাণমন্ত্রীর উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ ছিল না। তৃতীয় ঘটনা ঘটে—পুলিশ বাজেটের হৈ-হৈ কাণ্ড সম্পর্কে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে শ্রীবীজেশ সেন অধিবেশন চলাকালেই কক্ষে ঘুরে ঘুরে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এটা অন্যায় বলে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত কক্ষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড সুরু হয়ে যায়। স্পীকারকে অধিবেশন মুলতুবী রাখতে হয়। পরে অধিবেশন আরম্ভ হলে তিনি শ্রীবীজেশ সেনকে তাঁর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য করেন। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী স্পীকার ঐ নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে স্পীকারের সঙ্গে সরকার পক্ষের বিরোধের কথা উঠছে কেন?

* * *

কলকাতাকে মিছিলের শহর বলে আঁৎকে ওঠার কারণ আছে তা জানি। তবুও কলকাতার মিছিল শুধু মিছিলের অরণ্য নয়—কলকাতার মিছিল জীবন-স্পন্দনের মিছিল। কিছুকাল ধরে কলকাতা শান্ত ছিল। মিছিল নেই, সমাবেশ নেই—সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা সব মিলিয়ে কলকাতাকে বেশ শান্তশিষ্ট করে তুলেছিল। আজকাল কলকাতা আবার সরব হয়ে উঠেছে। মিছিলে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'

শোনা যাচ্ছে ; 'আমাদের দাবী মানতে হবে' এর পুকারে কলকাতার পথঘাট মুখরিত হচ্ছে। এমনি একটি মিছিল সেদিন বেরিয়েছিল কলকাতার পথে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে। কলকাতার পথঘাটের যান-বাহন স্তিমিত হয়েছিল সেদিন কয়েকটি প্রধান প্রধান সরণীতে। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের 'সংখ্যালঘু বাঁচাও' আন্দোলনের সমাবেশেও ময়দান মুখরিত হয়েছিল। সত্যি কলকাতা আবার মিছিল হতে সুরু করেছে : মানুষের চাপা ক্রোধ যেন মিছিলে দানা বাঁধছে। মিছিল আন্দোলন হচ্ছে। আসল কলকাতা বুঝি জাগছে।

এমনি একটি আন্দোলনের হিন্দোলিত শরীর আপনার চোখে পড়বে কোনদিন রাজভবনের সম্মুখে কার্জন পার্কের পাশে এলে। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় ছাত্র শান্তি কমিটির উদ্যোগে কিছুকাল ধরেই কলকাতার ছাত্ররা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছেন তাঁদের দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে অনেক ছাত্র কারাবরণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে ১৩ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়েছে। এই ১৩ দফা দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল ভূদেব সেনের হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ভবিষ্যতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। অন্যান্য দাবীর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছাত্রদের শিক্ষার সকল দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগমনেচ্ছু সকলকে পশ্চিম বাংলায় আনয়ন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা উল্লেখযোগ্য। ছাত্র-সমাজের এ দাবী খুব অসঙ্গত নয় কিংবা অযৌক্তিক নয়। ইতোমধ্যেই ভূদেব সেনের মৃত্যু বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কয়েকটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সরকার এখন পর্যন্ত ছাত্রদের এ দাবী সম্বলিত স্মারকলিপির কোন দাবীকেই প্রকৃত মর্যাদা না দিয়ে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। জনমতের অভিব্যক্তিতে মুখর এ ন একটি সুস্থ স্মারকলিপিকে সরকার অগ্রাহ্য করেছেন তাতে আরও শঙ্কিত হচ্ছি। এর মধ্যে ছাত্রদের সাজ সাজ রব উঠেছে। ছাত্র সত্যাগ্রহের গতি-প্রকৃতিতে মনে হচ্ছে এর মধ্যে সরকার তাদের দাবী না মানলে ছাত্র সত্যাগ্রহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এ বিষয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—ভূদেব সেনের

● স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু

মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করলে মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা নষ্ট হবে না বরং ন্যায় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরো বৃদ্ধি পাবে। পুলিশ বাহিনীর কৃতকর্মের আগুনে ছাই চাপা দিলে আগুন ঢাকা পড়বে না। ছাত্র বিক্ষোভের এ আগুন নেভাতে হলে যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, সেই সাহস ও আত্মবিশ্বাস আশা করি, মুখ্যমন্ত্রীর আছে। তাই বলি, মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি আবার বিবেচনা করে দেখুন।

কথায় বলে নিয়তি কেন বাধ্যতে! তবু সেদিনের ঘটনাটিকে শুধু নিয়তি বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা এখানে শেওড়াফুলি রেল ষ্টেশনে ডাউন দানাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ঘটনা সম্বন্ধে বলছি। সত্যি সেদিন শেওড়াফুলিতে যা ঘটে গেছে তা যেমন ন্যক্কারজনক তেমনি দুঃখের। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল—মানুষ কতদূর মাত্রাজ্ঞান ও সংযম হারালে এমনি বিশ্রী ঘটনা ঘটতে পারে। এই ঘটনার দর্পণে জাতীয় চরিত্রের যে রূপটি আজ প্রতিফলিত হ'ল তাতে দেশের চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই নিশ্চয় শঙ্কিত হবে। এ কথা আজ বোঝবার দিন এসেছে যে, সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি অথবা শান্তিভঙ্গ করার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। একথা সত্যি, সাম্প্রতিক কালে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে বাংলা দেশে। বিশেষ করে গুজব বাংলা দেশে সম্প্রতি আগুনের শিখার মতো কাজ করছে। তা ছাড়া পাকিস্তানী চর, সীমান্ত আক্রমণ ও দেশে উদ্বাস্তু আগমনের অবিরাম স্রোত দেশের আবহাওয়াকে বেশ তপ্ত করেছে। এই পটভূমিকায় যে একদল সুযোগসন্ধানী মানুষ উত্তেজনাকর ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করে অবস্থাকে সেদিন আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে সরকারকে আরেকটি বিষয়ে যত্নবান হতে বলবো। আজকাল প্রায়ই ট্রেন বিলম্বে চলে। তাতে যাত্রী-সাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অফিস লেটের হাত থেকে রেহাই পেতে হয়তো অনেক সময় ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের রিজার্ভ করা গাড়ির কথা মনে থাকে না। দানাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের রিজার্ভ করা কামরায় জোর করে যাত্রী ওঠার পেছনে এই মনোবৃত্তি কাজ করেছে কিনা তা কে বলতে পারে ? বরযাত্রীদের রিজার্ভ করা কামরায় জোর করে যাত্রীদের ওঠা, আসন দখল করা, বচসা

এবং ধচসার পরিণতিতে বর-যাত্রীদের পক্ষ থেকে গুলী ছোড়া এবং অবশেষে খণ্ড লড়াইয়ে বহু লোকের আহত হওয়ার ঘটনা আজ আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, আমরা কোথায় চলেছি। সভ্যতার বিকৃত মুখের প্রতিচ্ছবি বুঝি আমাদের সকলের মুখে। যে কারণেই এ ঘটনা ঘটে থাকুক, বরযাত্রীদের পক্ষের দোষ থাকুক অথবা ডেলি-প্যাসেঞ্জারদেরই থাকুক ; আমরা জানি সুস্থ চিন্তা থাকলে নিশ্চয়ই এ ঘটনা আয়ত্তের বাইরে যেতো না। কোন রকম ক্ষ্যাপামিতে যেন আমরা আবদ্ধ না হই। গুজবে কান দিয়ে যেন আমরা এমনিভাবে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা না করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ট্রেনের রিজার্ভ করা কামরার যাত্রীদেরও বলবো রিজার্ভ করা হলেও, তাঁরা যদি সুযোগ সুবিধা বুঝে ভীড়ের সময় দু'চারজন নিত্য যাত্রীর সুবিধা করে দেন তবে তাঁদের এমন কিছু ক্ষতি হবে না। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, এই সহযোগিতার অভাবেই সেদিন দানাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের রিজার্ভ করা কামরার যাত্রী-সাধারণ ও নিত্য যাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে। নিজ নিজ ক্ষমতা জাহির না করলে মনে হয় এই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতো না। আমরা মনে করি, এ হাঙ্গামায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি মাত্রেরই নিজ নিজ নিন্দনীয় আচরণের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত, ভবিষ্যতে যাতে এমনি ন্যক্কারজনক ঘটনার আর অবতারণা না হয় তার জন্য সকলেরই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

**বর্ধমান :**

**দুর্গাপুর :** দুর্গাপুরে একটি মনোরম ও স্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত পর্যটক ভবন (ট্যুরিষ্ট লজ) প্রতিষ্ঠিত হল। দুর্গাপুর ষ্টীল প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানে একটি পর্যটক ভবনের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। এখন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্যটক ভবনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পর্যটকদের নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধে হবে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে ভবনের একটি কক্ষ নিয়ে থাকা ও আহারাদি বাবদ কোন পর্যটকের খরচ পড়বে প্রত্যহ পঁচিশ টাকা। আহার্যের উৎকর্ষতা, কক্ষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে হয়তো খরচ খুব বেশি নয়—তবু আমাদের মনে হয় এই খরচ হয়তো সাধারণ মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পকেটের আয়ত্তের বাইরে। শুধু উচ্চবিত্তদের সুযোগ-সুবিধার জন্য যদি পর্যটক ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে পর্যটক ভবনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সরকার নিশ্চয়ই দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে পর্যটনের আনন্দকে পৌঁছনোর জন্যই ধ্যবিত্তদের এরূপ ভবন তৈরি করেছেন, কিন্তু কম খরচে থাকতে না পারলে সাধারণ মধ্যবিত্তদের কাছে এরূপ ভবন অর্থহীন হয়ে পড়বে। আশা করছি পর্যটনের সুবিধা, বিবিধ উন্নয়নের কাজ এবং পরিকল্পনার সাথে সাথে সরকার জনসাধারণের আর্থিক যোগ্যতার প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলবেন।

**বীরভূম :**

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে 'বীরভূম বার্তার' বিভিন্ন সংখ্যায় ময়ূরাক্ষী মেকানিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের নানারূপ খবর যা স্থূল চোখে দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে, তা প্রকাশিত হয়েছে। কিভাবে এই মেকানিক্যাল দপ্তরের অধীনে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ টাকার নানারূপ দুর্লভ যন্ত্রাদি নষ্ট হচ্ছে, কিভাবে যন্ত্রাংশ লোপাট হচ্ছে, কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণের সময়েও গঠনকালীন সময়ের মতোই ব্যয় হচ্ছে, কিভাবে সাইকেল গাড়ি প্রভৃতির অপব্যবহার হচ্ছে, কিভাবে খালাসীদের অফিসারদের ব্যক্তিগত কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা কিভাবে মাষ্টার রোলে বেশি লোক দেখিয়ে সরকারী অর্থ শ্রাদ্ধ হচ্ছে—সেসব বিষয়ে উক্ত সাপ্তাহিক পুঙখানুপুঙখরূপে আলোচনা করেছে। সহযোগী পত্রিকাটি এই মর্মে অভিযোগ তুলেছে যে, সরকার সব জেনে শুনে চুপ করে আছেন। এতে আমরা বিস্ময় বোধ করছি। দেশ থেকে যখন দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন এবং রাজ্যে রাজ্যে দুর্নীতির উৎসাদনে তিনি রাজ্যের কর্ণধারদের সাহায্য চেয়েছেন, তখন যেভাবে এই দুর্নীতির বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে—এই অভিযোগে বিস্মিত হওয়ারই কথা। উক্ত ডিপার্টমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ তুলে উক্ত সহযোগী পত্রিকা আরো বলেছে, হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে ব্যারেজ ক্ষেতে যে সমস্ত গৃহ নির্মাণ করা হল এবং যাতে বন্যা নিরোধ ও সমস্ত সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছনোর জন্য ব্যারেজ সাইটে একজন অফিসার থাকবেন বলে ঠিক হয়েছিল—এখন পর্যন্ত সেখানে একজন করণিক ছাড়া আর কেউই নেই কেন ? এমনও অভিযোগ হয়েছে উক্ত দপ্তরের অফিসাররা নাকি নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশকে বিকৃত করে তাঁদের অধীন সাধারণ কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করে থাকেন। ভাগ-বাটোয়ারায় অসুবিধা হবে বলে মনে করে উক্ত দপ্তরের অফিসারেরা নাকি কয়েকজন ১৫।১৬ বছরের কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এঁদের দোষ— এঁরা নাকি সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধ করতে চান। সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি অবিলম্বে সেচমন্ত্রীর নজর দেওয়া প্রয়োজন। যদি এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্তের ব্যবস্থা না হয়, তবে কি এই মনে করতে হবে যে, সরকারের দুর্নীতি রোধের শ্লোগান শুধুমাত্র শ্লোগান—ওতে জীবন-সত্য বলে কোন বস্তু নেই। যা হোক, এ বিষয়ে আমরা সরকারকে বিশেষ করে সেচমন্ত্রীকে অবহিত হতে বলবো।

# শহর কলকাতা

● বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের দৃশ্য

## বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের বিচিত্র কথা

সেতো আজকে নয়! এখানে মাঠ ছিল, অনুচ্চারিত গান ছিল সবুজের। এখানে মুক্তি ছিল, নির্ভাবনার নদী ভাসাতো মন-পবনের নাও। এখানে ছায়া নাচতো, বন-বিতানের চূড়ায় নেমে শাড়ি বদলাতো আকাশ। আলোর পসরা মাথায় তুলে, মেঠোপথে হেঁটে যেতো দিন। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে, বার বার ফিরে আসতো রাত। রাতের কোলে দেহ জুড়োতো সারাদিনের ক্লান্তি; ঘুমিয়ে পড়তো মাঠ। আবার ঘুমের ঘোর কাটতেই ভোরের মুখ ভাসতো শুকতারার কোলে: দিকে দিকে শুভ্র উচ্চারণের সাড়া পড়তো প্রাণের মেলায়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতো আনন্দের তৃতীয় নয়ন; তার পাশে এসেই লজ্জায় রাঙা হতো যন্ত্রণার মুখ। কিন্তু---সেতো আজকে নয়!

আজ থেকে অনেক যুগ, অনেক বছর, অনেক দিন আগে---যখন ইংরেজ কেবল কৃপা-ভিক্ষুক এ-দেশের, তখন সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতাপ ছিল, জৌলুশ ছিল। এখান থেকে সামান্য দূরেই ছিল তাঁদের কাছারীবাড়ি, নাট-মণ্ডপ, আর দোল-মঞ্চ। সেখানে শঙ্খনাদে সংশয় ঠেলে, খোল-করতালে মঞ্জীর তুলে এবং ঢাকের বোলে দুলতে দুলতে আসতো বারো মাসের তেরোটি পার্বণ। তন্মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ছিল দোল-যাত্রার। প্রায় পক্ষকাল ধরে তার উৎসব চলতো দিবারাত্রি। প্রথম সপ্তাহ কেটে যেতো পূজায়, পালা-কীর্তনে, আর কথকতায়। দ্বিতীয় সপ্তাহের পাঁচ দিন হোলিখেলা। তখন হাওয়ার গায়ে আবির ভাসতো অবিরাম; হাজার মনের মোহানা হতো রঙিন; লালে লাল হতো পদ্ম-বিধৃতা দীঘি; আর ফুলবনের ফুলের আগুন জ্বলতো নানাবর্ণে মধুর হয়ে। তারপর শেষ দুইদিন বসন্তের মিলনোৎসব বা মেলা। সেই মেলা বসতো কাছারী-বাড়ি থেকে অনতিদূরের এই মাঠে। তাই মাঠ তখন মুখর হয়ে উঠতো নারী-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমাহারে। দূর-দূরান্তর থেকে আসতেন রাজা, জমিদার। তাঁরা কেউ আসতেন ঘোড়ায়, কেউ পাল্কিতে। আর আসতো সাধারণ শ্রমজীবী পায়ে-হেঁটে---যারা উপেক্ষিত, অনাদৃত, অথচ দীনতার

### শ্রীপদাতিক

দুর্বিপাকে জরাজীর্ণ ছিল না এবং ভাগ্যের পান্থশালায় বসে দৈব-প্রাপ্তি-যোগের অপেক্ষাও করতো না। তারা বলিষ্ঠ, তারা নিরীহ, তারা নির্লোভ এবং নিষ্পাপ। তাদেরই পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আসতো অজস্র বাউল ---যারা ধরকে করেছে পর, পথকে করেছে আপন। তারা মেলায় এসে আসর জমাতো গাছতলায়, গান গাইতো একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে। তারা হাট করতে আসতো অধরার সন্ধানে, কিন্তু অধরা কাছে এলে আর ধরতে চাইতো না। তাকে সরিয়ে দিতো দূরে, আরও দূরে। তারপর দূরের পথে আবার তারা পাড়ি জমাতো তাকেই ধরবে ব'লে।

দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে যেতো মেলার দুইদিন। তারপর আবার সেই মাঠ, মেঠোপথের ধার ঘেঁষে নিঃসঙ্গ বন-বিতান। দিন-কয়েক সারামাঠে গড়াগড়ি যেতো মেলার উচ্ছিষ্ট, বন-বিতানে বেজে চলতো মেলাবসানের হায়-হায় আর্তি। কিন্তু দিন-কয়েক কেটে গেলেই নেমে আসতো ফাল্গুনের অন্তিম হাওয়া। সে তার প্রবল পুচ্ছ বুলিয়ে সরিয়ে দিতো মাঠের জঞ্জাল; তীক্ষ্ণ নখরে ছিঁড়ে ফেলতো আড়ষ্টতার উত্তরীয় বন-বিতানের। তাই মাঠ আবার হেসে উঠতো এবং বন-বিতানের অলকগুচ্ছে দোলা দিতো চৈত্র দিনের প্রস্তুতি। ---এ-মাঠের মেঠোপথ ধ'রে বছরের পর বছর পা চালিয়ে যেতো এভাবেই।

কিন্তু ইংরেজ কি কেবল কৃপার ভিক্ষান্বেষী হয়েই থাকবে? না, তারা গুছিয়ে নিতে জানে। অনেক দিনের অনেক চাতুরীর বিনিময়ে, অনেককাল পরে তাদেরই অধিকারে এলো সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীবাড়ি। তারপর দেখতে দেখতে আশপাশের জমিরও ভোগদখল নিলো তারাই। এ-প্রান্তের সব ছেড়ে, অনেক দূরে স'রে গেলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের পরিবার।

সুতরাং এবার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীবাড়িতেই প্রতিষ্ঠা পেলো ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অফিস। পাশেই গ'ড়ে উঠলো ফ্যাক্টরী বিল্ডিংস, সেনা-নিবাস, গীর্জা, নাট্যশালা ইত্যাদি, এবং এদিকে-ওদিকে অধিষ্ঠান ঘটলো তাদেরই সুরম্য বসতবাটীর। আর এখান থেকে অনতিদূরের সেই মাঠে—যেখানে দোলযাত্রার মেলা বসতো সাবর্ণ চৌধুরীদের, দিনে দিনে ঘন-বসতির প্রকাশ ঘটলো সেখানেও। সেখানে বেশির ভাগ বাসা বাঁধলো তারাই—যারা ইংরেজদেরই অনুপন্থী অথবা অনুচর। অর্থাৎ ডাচ, আর্মানী এবং পর্তুগীজদেরই প্রাধান্য ঘটলো সেখানে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগে থেকেই যে-পর্তুগীজ বস্তির অবস্থান ছিল—তারও কিছু অংশ স'রে এলো সেই মেঠোপথের ধারে। অবশ্য এ-দেশীয়দেরও কিছু বসত-বাটীর উন্মেষ ঘটলো সেখানে। তন্মধ্যে ধনকুবের রাণা মুদীর দোকান সমেত যে-বসতবাটীর প্রতিষ্ঠা ঘটে, তা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। অর্থবলেই হোক, অথবা বুদ্ধিমত্তার যোগ্য প্রয়োগবলেই হোক, উক্ত বসতির সমগ্র বাসিন্দার মানসলোকে অল্পকালের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করে রাণা মুদী। সম্ভবত সে-কারণেই তার গৃহ-পার্শ্ববর্তী রাস্তা বা কিছুকাল আগের সেই মেঠোপথ লোকের মুখে-মুখেই নাম ধারণ করে 'রাণা মুদীর গলি।'

তারপর দিনে দিনে, বিশেষ এক উন্নত সরণীরূপেই সংস্কার সাধিত হলো রাণা মুদীর গলি এবং তার উভয়-পার্শ্ববর্তী বসতি অঞ্চলও সুদৃশ্য হয়ে উঠলো ক্রমানুয়ে। দেখতে দেখতে জনসংখ্যারও প্রসার ঘটলো। তাছাড়া উল্লেখিত বাসিন্দাদের পাশে এসে আবার নতুন বাসগৃহ গড়ে তুললেন কিছু দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী এবং জন-কয়েক অবসরপ্রাপ্ত নীলকর সাহেব—যাঁদের আন্তরিক অভীপ্সাবশেই Cosmopolitan অঞ্চলেও দানা বেঁধে উঠলো ঐক্যবোধ, গ'ড়ে উঠলো এক নতুন সমাজ। তাই সম্পূর্ণ নতুন চালে আবার যাত্রা সুরু হলো দিন-পঞ্জীর।

কিন্তু আকস্মিকভাবেই এগিয়ে আসে ১৭৫৬ সাল—যা ঘনিয়ে তোলে দুর্যোগের মেঘ ইংরেজের ভাগ্যাকাশে। দিল্লীর বাদশাহ, অথবা মুর্শিদাবাদের নবাব কলকাতায় দুর্গ-প্রতিষ্ঠার কোন অনুমতি দেন নি, অথচ তা সত্ত্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করায়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কলকাতায় ছুটে এলেন তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলা। তিনি অতর্কিতে এসেই ঘিরে ফেললেন ইংরেজ বাহিনীকে, রাণা মুদীর গলি-পথেই সুরু হলো তাঁর অবিরাম গোলা-বর্ষণ। তাই রাণা মুদীর গলিতে যে-সমস্ত ইংরেজ, আর্মানী এবং পর্তুগীজ—তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল কোম্পানীর দুর্গে। কিন্তু দুর্গ থেকেও তখন ক্যাপ্টেন ড্রেক সহ বিশিষ্ট সেনানায়কবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দল, দুর্যোগের আভাস পেয়েই ভাঙা জাহাজে ভেসে পালিয়ে গেছে ফলতায়। বাকি আছে কেবল হলওয়েল। সে নিরুপায় হয়ে, তার দুর্বল বাহিনী সহ এগিয়ে এলো নবাব-বাহিনীর সামনে এবং সেদিন বাধ্য হয়েই মাথা পেতে নিল ইংরেজ-ভাগ্যাকাশবাহী কালো মেঘের সমস্ত বজ্র। সর্বান্ত হয়ে বন্দী হলো হলওয়েল। বাধা দেবার আর একজনও নেই। সুতরাং সারা কলকাতার শিখর-দেশে নিজ বৈজয়ন্তী তুলে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন নবাব।

কিন্তু হায়! ১৭৫৭ সালেই পতন ঘটলো নবাবের। মীরমদন মোহন-লালের রক্তলাঞ্চিত পলাশী বাংলার স্বাধীন সূর্যের নিরঞ্জন ঘটালো চিরতরে। সেদিন এ-দেশবাসীরই

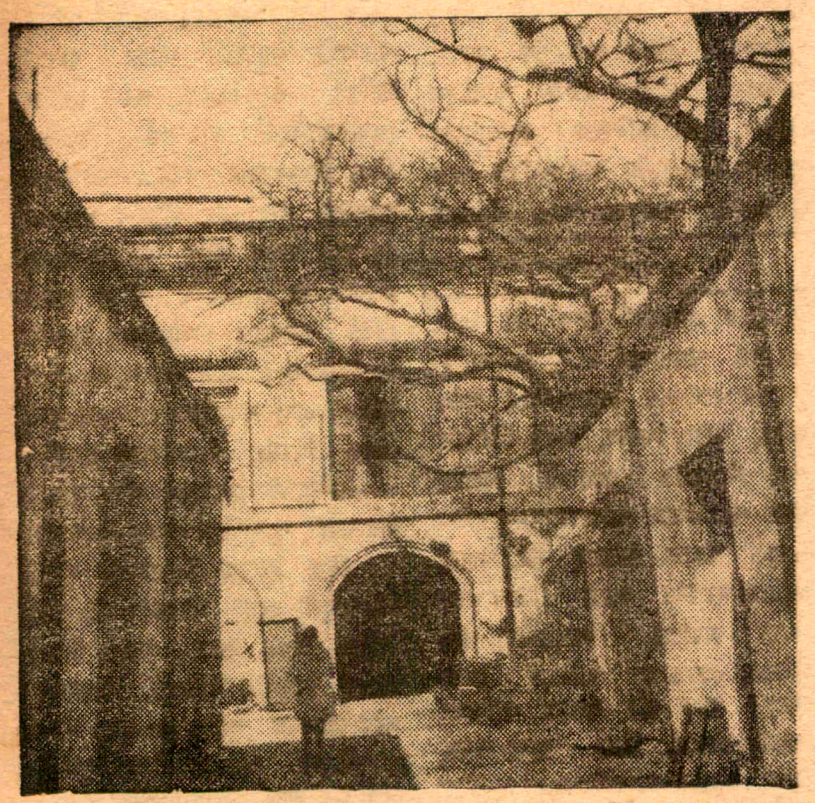

● বৃটিশ এসোসিয়েশন বিল্ডিং

বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ আবার ফিরে এলো। কেবল যে কলকাতাতেই ফিরে এলো তা নয়, তাদের আধিপত্য এবার কায়েম হলো সমগ্র দেশে। তাই ইংরেজ-পরিকল্পিত কলকাতার সার্থক রূপায়ণ ঘটলো আবার। রাণা মুদীর গলিতে ফিরে এলো পলাতক ইংরেজ, আর্মানী এবং পর্তুগীজ বাসিন্দারা। আগের তুলনায় আরও প্রশস্ত হলো পথ। গোলা-বিধ্বস্ত গৃহরাজি আবার মাথা তুলে দাঁড়ালো নবীন কলেবরে। দিনের পর দিন, নাগরিক জীবনযাত্রার উদ্ব্যস্ত পদ-সঞ্চারে মুখর হয়ে উঠলো রাণা মুদীর গলি।

তারপর পায়ে পায়ে সময়ের সিঁড়ি ভেঙে, একে একে অতিক্রান্ত হলো প্রায় একশ'টি বছর। এই অতিক্রান্ত প্রায় একশ' বছরের ইতিবৃত্তে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে তার উল্লেখ অপরিহার্য নয়। তাই এবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের পর থেকেই নিরুদ্দেশ অতীতের অন্বেষায় একটু আবিষ্ট হ'লে ক্ষতি নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর, অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভূ-স্বামী রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে সারা বাংলার জামিদার শ্রেণীর এক সক্রিয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জমিদার শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষা এবং সেই সঙ্গে প্রজানুরঞ্জনের সঠিক পথ নির্ধারণ করাই ছিল উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যদিও এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব স্বয়ং বেথুন সাহেব, তবু এ-দেশে অবস্থানকারী কিছু ইংরেজ রাজপুরুষের প্রতিবাদে উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করেন ইংরেজ সরকার। তাঁদের এই ঘোষণার পশ্চাৎ-পটে ছিল ইংলণ্ড-পার্লামেণ্টের নির্দেশ। অতএব, স্বাভাবিক কারণেই

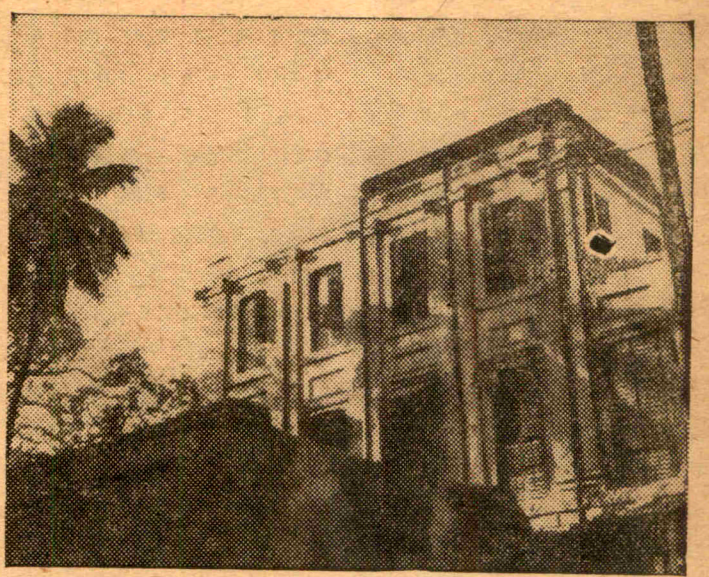

● ধ্বংসোন্মুখ কোঠাবাড়ি

রামগোপাল, দিগম্বর মিত্র প্রমুখের পরিকল্পনা বাস্তব রূপায়ণের সুযোগ-লাভে বঞ্চিত হয়। তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই এবার অবলম্বন করেন অন্য-পথ। প্রথমত তাঁরা ইংরেজের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান দেশবাসীকে। তারপর তাঁরা প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর কর্তৃক পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholder's Association এবং ভারতীয় ইংরেজ জমিদার জর্জ টমসন প্রতিষ্ঠিত British India Society একত্র ক'রে, অর্থাৎ এ-উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থগত ঐক্য ঘটিয়ে অন্য এক নতুন জমিদার-সভা বা সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনাকে বাস্তব-ক্ষেত্রে মূর্তিমান করার উদ্দেশ্যে তাঁদের যে-বিরতিহীন প্রচেষ্টা—অবশেষে তা সার্থক হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন: ঐক্যের ফলে কেবল যে সম্প্রীতিই বাড়বে তা নয়, নীতিগত দিক থেকে শক্তির ওজনও বৃদ্ধি পাবে অনেক। অতএব ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে উক্ত উভয় সংগঠনের মিলনান্তে নতুন সংগঠনের নামকরণ হলো 'British Indian Association'. এই নবপ্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হলেন যথাক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন দিগম্বর মিত্র এবং সমিতির সক্রিয় সদস্য-পদে অলঙ্কৃত হলেন: রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরও অনেকে। তারপর ইংরেজ সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের পর, উক্ত সংগঠন বা British Indian Association তার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে রাণা মুদীর গলিতে—যা এ-কালেও বর্তমান আগের মতোই। এই British Indian Association-এর অবস্থান হেতুই পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে রাণা মুদীর গলি। অর্থাৎ পরে তার নামকরণ হয় 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট।'

বিংশ শতাব্দীর মধ্যরেখা অতিক্রম করেও চৌরঙ্গীর উত্তর-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজও জেগে আছে বৃটিশ-

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট এবং আগের মতো বহাল-তবিয়তে সেখানেই অধিষ্ঠিত British Indian Association. একাল-সেকালের অজস্র কোঠাবাড়ির পাশে অতীতের সেই বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়িটিও দাঁড়িয়ে আছে সদম্ভে। বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে আজ যা আর্ট প্রেসের গৃহ, পূর্বে তা-ই ছিল ট্রেল কোম্পানীর কার্যালয়। তারও আগে সে-গৃহেই বসবাস করেছে পর পর একাধিক পরিবার এবং তখনই সেখানে ভূতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন অনেকে। এমন কি, তৎকালীন হেনরী হবলশ সাহেব—যিনি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না, তিনিও ভূত দেখেছেন। তৎকালেই লিখিত তাঁর ডায়েরী বা দিন-পঞ্জীর পাতায় উল্লেখ আছে :

'It was like this, that when he lived in a chummery in the neighbourhood the inmates were repeatedly visited by a ghostly Sikh, who when persued disappeared through locked doors or solid walls.'

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের অজস্র প্রাচীন বাড়ির মধ্যে যে বাড়িগুলি বর্তমানে সংস্কার সাধিত, সেগুলি আরও কিছুকাল টিকে থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-সমস্ত বিশাল অট্টালিকা সংস্কার-বর্জিত হয়েই প'ড়ে আছে আজও, বর্তমানে সেগুলি বিপজ্জনক বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।

---আজ থেকে বছর-চারেক আগে, এই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটেই একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি একাধারে যেমন বিস্ময়জনক, তেমনই মর্মান্তিক :

কোনো এক প্রাচীন বাড়ির এক অংশে বসবাস করতেন একটি মুসলিম পরিবার। বাড়ির অন্য অংশে উক্ত পরিবারেরই একটি বৃহৎ ছাপাখানা ছিল। একদিন হঠাৎ এক অজানা-অচেনা ফকির এসে বাড়ির মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বলে যে, তাঁর বাড়ির মধ্যে দিন-দু'য়েক পরেই এক বিরাট বিপর্যয় আসবে। সুতরাং তিনি যেন সাবধান থাকেন।---এ-কথা শুনেই বাড়ির মালিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় জিজ্ঞেস করেন ফকিরকে। ফকির তখন একঘটি মন্ত্রপড়া জল দেয় তাঁকে এবং সমস্ত বাড়িতে তা ছিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। বাড়ির মালিক ফকিরের নির্দেশে উক্ত একঘটি জল ছিটিয়ে দেন সত্য, কিন্তু ছিটিয়ে দেন কেবল ছাপাখানাতেই। কারণ ফকিরের কথা সর্বাংশে বিশ্বাস করেন নি বলেই যে-অংশে বসবাস করেন, সে-অংশে ছিটিয়ে দেবার মতো এক ফোঁটা জলও আর তিনি অবশিষ্ট রাখেন নি।

কিন্তু অতি আশ্চর্যের ব্যাপার দিন-দু'য়েক পর একদিন বিপর্যয় সত্যই আসে। অর্থাৎ একদিন গভীর রাত্রে আকস্মিকভাবেই ধ্ব'সে পড়ে বাড়ির বিশাল ছাদ। ছাদ ধ্ব'সে পড়ায় এক সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে পরিবারের আটজন, কেবল আহত হয়ে বেঁচে থাকে দু'জন নাবালিকা। কিন্তু বাড়ির সেই অংশ অক্ষতই থাকে—যে অংশে ছিল ছাপাখানা এবং যেখানে ফকিরের মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ির মালিক !----

এ-সংবাদের প্রকাশ ঘটেছিল একাধিক সংবাদপত্রে। অতএব আজ তাকে গল্প বা কিংবদন্তী মনে করার কোনো কারণ নেই ॥

## ভালবেসো না

জ্যোতিকুমার

ভালবাস ওই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকে
আর ভালবাস ভাল না বাসার সুখ ;
ষোড়শী তনুর গালে খুঁত
আগুনের পোড়া দাগ আর
আধপোড়া ক্ষতমুখে পাউডার মাখা
ছোট চুলে রঙ করা পাটের বাঁধুনি ;
সব ভাল তবু ভালবাসা যেত যদি
সে মেয়েকে—ভাল না বাসার বাসনা ;
তাহলে, তাহলে তুমি সুখেভরা নদী
হয়ে বয়ে যাবে জানি ঢেউ হয়ে ঢেউয়ে
যবনিকা অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাত
কিন্তু শেষে অকস্মাৎ আর একদিন
সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে হবে আবির্ভূত.

## মুখের আলোয়

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাতিটা খারাপ ছিলো ক'টি রাত বাড়ির সুমুখে
মিস্ত্রী কেউ এসে নাকি জ্বালিয়ে দিয়েছে পরে কবে
কিন্তু আমি বুঝি দূরমনস্ক ছিলাম---
সন্ধ্যার মালাইওলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
পাড়ায় ঘুরেছে রোজ কিন্তু আমি গোল
পুথুল কলস তার দেখি নি, শুনেছি ভারি ঠাণ্ডা বাগ্র স্বর

মালতীরা এলো আজ রাত্রির গাড়িতে পুরী থেকে
খোঁপায় শাঁখের মালা মালতীকে মানাচ্ছে সুন্দর
ট্যাক্সির ভিতরে ক্লান্ত মুখ যেন জ্বলে উঠলো রাস্তার আলোয়..
বাতিটা জ্বেলেছে কেউ মিস্ত্রী এসে কবে
কিন্তু আমি বুঝি দূরমনস্ক ছিলাম
সান্ধ্য আজ চোখে পড়লো মালতীর মুখের আলোয় ॥

অমিত গুহ

# দুষ্টু পরীরা

গরমকালের এক স্যাঁতসেঁতে রাত্তিরে, শহরের একেবারে প্রান্তসীমায়, একটি রাস্তার ধারে আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম। একটি স্ত্রীলোক এক প্রকাণ্ড ডোবার জল-কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে পা ছুড়ছে এবং ছোট ছেলেদের মতো সেই নোংরা জল-কাদা ছেটাচ্ছে চারিদিকে। ছেটাতে ছেটাতে এক বিশ্রী গান গাইছে অনুনাসিক সুরে, 'টমী' নামটির সঙ্গে 'রুদী' শব্দটি জুড়ে যা'র ছন্দ মেলানো হয়েছে। সেদিন বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস বয়েছিল শহরে এবং বেদম বৃষ্টিতে ভিজে, রাস্তার নরম মাটি কাদায় কাদা হয়ে গিয়েছিল; ডোবাটা ছিল গভীর এবং স্ত্রীলোকটির পা তা'তে প্রায় হাঁটু অবধি ডুবে গিয়েছিল। তা'র গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিল, সে খুব মদ খেয়েছে। তা'র নাচের যা বহর তা'তে একবার পা হড়কালে কাদার মধ্যে তা'কে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি আমার জুতোর ডগাটা উঁচু ক'রে তুলে ডোবার জল-কাদার মধ্যে গেঁদুলুম এবং সেই নাচওয়ালীকে হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে শুকনো ডাঙায় তুললুম। প্রথমটা সে খুব ভয় পেয়েছিল, মনে হ'ল এবং খানিক দূর বেশ অনুগত-ভাবেই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল, তারপর হঠাৎ শরীরের সব শক্তি দিয়ে, এক হেঁচকায় তা'র ডান হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে, আমার বুকে লাগালে এক ধাক্কা এবং তারপরে 'বাঁচাও, বাঁচাও' ব'লে চেঁচাতে লাগল। তারপর রুখে গিয়ে আমাকে শুদ্ধ টানতে টানতে সেই ডোবার জল-কাদার মধ্যে নামালে।

'চুলোয় যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' সে বিড়বিড় ক'রে বকে। 'তোমাকে ছাড়াই আমার চলবে, এখন তুমিও আমাকে রেহাই দাও তো বাপু।'

ইতিমধ্যে অন্ধকারের গা ঘেঁষে এক পাহারাওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কাছ থেকে পাঁচ পা দূরে এসে সে থামলে এবং খুব তেরিয়াভাবে জিজ্ঞেস করলে, 'কে এসব ঝামেলা পাকাচ্ছে কে, উঁ?'

আমি বললুম, 'আমার ভয় হয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি হয়ত কাদার মধ্যে ডুবে যাবে, তাই ওকে টেনে তুলতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ।'

পাহারাওয়ালা তখন মাতাল স্ত্রী-লোকটিকে বেশ ক'রে নজর করলে, থক্ থক্ ক'রে থুথু ফেললে খানিক তারপর হুকুম দিলে, 'ও হে উঠে এস তো।'

'আমি উঠতে চাই না।'

'উঠে এস বলছি।'

'উঠব না।'

'মজা দেখাচ্ছি তোমায়, নোংরা মেয়েছেলে কোথাকার।' পাহারাওয়ালা শাসালে বটে, কিন্তু গলায় তা'র উপযুক্ত রাগ প্রকাশ পেলো না। আমার দিকে ভালো মানুষের মতো ফিরে বকবক করতে লাগল, 'এই কাছে পিঠেই থাকে। দড়ির ফেঁসো কুড়িয়ে বেড়ায়—ফ্রলিহা। সিগ্রেট আছে নাকি?'

আমরা সিগারেট ধরালুম। মেয়ে-ছেলেটি চীৎকার ক'রে ডোবার মধ্যে অকুতোভয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, 'প্রভু এয়েছেন সব। আমিই আমার নিজের প্রভু। আমি যদি চাই, আমি এখানে সাঁতার কাটব।'

'কাটাচ্ছি তোমায় সাঁতার।' হোমরা-চোমরা দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি ফের শাসাল। 'প্রত্যেক রাত্তিরেই ও একরকম গণ্ডগোল বাধায় মশাই। বাড়িতে ওর একটা ছেলে আছে, পা নেই তা'র।'

'ও কি এখান থেকে অনেক দূরে থাকে না কি ?'

'ওকে মেরে ফেলা উচিত।' পাহরাওয়ালাটি আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে।

'ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া উচিত।' আমি প্রস্তাব করলুম।

পাহারাওয়ালাটি তা'র দাড়ির ভেতর একরকম চিঁহিহি শব্দ করলে, সিগারেটের আঁচে তাকালে একবার আমার দিকে, তারপর চটচটে মাটির ওপর জুতোর ঠোক্কর মা তে মারতে গটগট ক'রে এগিয়ে এল।

'নিষে যান। শুধু আগে ওর মুখের দিকে একবার তাকাবেন।'

স্ত্রীলোকটি সেই নোংরার মধ্যে ব'সে আঁজলা আঁজলা ক'রে কাদা তুলতে লাগল। গান গাইতে লাগল নাকি সুরে, 'সা-আ-আ পরের ওপর দিয়ে'---

আমাদের মাথার ওপরে কালো শূন্যতার ভেতর থেকে একটা তারার ছায়া ভাসছিল নোংরা, তেলতেলে জলের ওপর। ডোবার জলে লহরী উঠতেই সেই ছায়া মিলিয়ে গেল। আমি আবার থপ্‌থপ্‌ ক'রে জল-কাদার মধ্যে প্রবেশ করলুম এবং পাহারাওয়ালাকে হাতের তলায় চেপে, হাঁটু দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে বেড়ার বাইরে আনলুম। সে বেড়াটির গায়ে হেলান দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকেই দাবড়াতে লাগল, 'মারো না মারো আমাকে। কুছ পরোয়া নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোক—মারো দেখি।'

বেড়ার গায়ে ঠেসে ধরে আমি তা'কে জিজ্ঞেস করলুম, সে থাকে কোথায়। তা'র নেশায় চুরচুরে মুণ্ডটি তুলে, কালো বিন্দুর মতো চোখ দু'টি দিয়ে সে আমার দিকে তাকালে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম তা'র নাকের হাড়টি একেবারে বসা, শুধু ডগাটুকু বোতামের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে ; মুখের বিকৃতির দরুণ ওপরের ঠোঁটটা ঠেলে উঠেছে, ফলে ছোট ছোট দাঁতগুলো বেরিয়েই থাকে আর ফোলা-ফাঁপা মুখে তা'র সে হাসি কি ঘিনঘিনে কি বলব।

'ঠিক আছে, চল যাই।' সে বললে।

বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা এগিয়ে চলি। মেয়েছেলেটির ঘাগরার তলাকার ভিজে অংশটি আমার পায়ে পত পত ক'রে আছড়ে পড়তে থাকে।

'চল হে বঁধু, যাই।' গজগজ ক'রে ওঠে সে। এতক্ষণে মনে হয়, যেন খানিকটা আতস্থ হয়ে আসছে। 'চল আমি তোমায় যত্ন-আত্তি করব, আরামও দেব কিছু কিছু।'

মস্ত এক দোতলা বাড়ির উঠোনে আমাকে নিয়ে আসে। অতি সাবধানে, অন্ধ মেয়ের মতো, ঠেলাগাড়ি, পিপে, বাক্স এবং ইতস্তত ছড়ানো কাঠের গাদার ভেতর দিয়ে সে পথ ক'রে নেয়, তারপর বাড়ির ভিতের গায়ে গর্তের মতো একটা জায়গায় এসে থামে এবং আমাকে বলে, 'ঢুকে পড়তে।'

চটচটে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে ; যদিও সামলাতে পারছিলুম না, কেবলি পিছলে পিছলে যাচ্ছিল তবু মেয়ে-ছেলেটির কোমর এক হাত দিয়ে জড়িয়ে, কোনমতে আমি পেছল সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি, হাতড়ে হাতড়ে দরজার আঁকশী আর পশমী কাপড়ের হাতলটি পাই। তারপর দরজা খুলে অন্ধকার এক গহ্বরের সামনে, চৌকাঠের গোড়ায় থমকে দাঁড়াই—আর এগোতে ইতস্তত করছিলুম।

'মা, তুমি ?' অন্ধকার থেকে মৃদু একটি কণ্ঠ এল।

'আমি, আমি।'

আবর্জনা এবং রজনজাতীয় একটা কিছুর উষ্ণ গন্ধ যেন আমার নাকে এসে ধাক্কা মারে। একটা দেশলাই জ্বলে ওঠে এবং সেই সামান্য স্ফুলিঙ্গ-টুকু একটি পাংশু শিশুর মুখকে মুহূর্তের জন্যে আলোকিত ক'রে আবার মিলিয়ে যায়।

'আর কে আসবে তোমার কাছে ?'

'আমিই।' আমার গায়ে হেলান দিয়ে স্ত্রীলোকটি ব'লে চলে।

আবার দেশলাই জ্বলে ওঠে, কাচের ঠুং ঠাং শব্দ এবং রোগা, বিশ্রী এক হাত ছোট একটা কুপি জ্বালায়।

'বাছা আমার'—ব'লে মেয়েছেলেটি টলে গিয়ে কোণের দিকে পড়ল, সেখানে ইটের মেঝে থেকে একটু উঁচু ক'রে একটা চওড়া বিছানা পাতাই ছিল।

দপদপ ক'রে শিষ উঠে ধোঁয়া ছাড়ছিল ব'লে ছেলেটি কুপিটার পলতেটা একটু নাবিয়ে দিলে। ওর ছোট মুখখানি ভারী গম্ভীর, টিকলো নাক, মেয়েদের মতো ফোলা ফোলা ঠোঁট। খুব সূক্ষ্ম তুলিতে যেন যত্নে-আঁকা একখানি মুখ—এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গর্তে একেবারেই বেমানান দেখায়। আলোটাকে ঠিক-ঠাক ক'রে ছেলেটি আমার দিকে তাকালে, আমি দেখলুম ওর চোখের পল্লব, ভুরু বেশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া।

'মদ খেয়েছ বুঝি ?' আমাকে শুধোলে।

ওর মা তখন বিছানায় প'ড়ে ফোঁপাচ্ছে, ঘোঁত ঘোঁত ক'রে শব্দ হচ্ছে নাক দিয়ে।

'ওর জামাকাপড় ছাড়ানো দরকার।' আমি বললুম।

'ছাড়াও তাহলে।' ছেলেটি চোখ নামিয়ে বললে।

আমি যখন মেয়েছেলেটির ভিজে ঘাগরা-টাগরাগুলো বদলে দিতে লাগলুম, ছেলেটি তখন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'আলো নিভিয়ে দেব ?'

'কেন।'

সে চুপ ক'রে যায়। তারপর আমি যখন তা'র মা'কে ময়দার বস্তার মতো টানতে টানতে হিমসিম খাচ্ছিলুম তখন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখি, জানলার নীচেই মেঝেতে চওড়া

ভক্তার-বসানো একটা কাঠের বাক্সের ভেতর সে ব'সে আছে, যে বাক্সটির গায়ে কালো কালো হরফে লেখা :

সাবধান

এন আর কোং।

চৌকো জানলার চৌকাঠটি ছেলেটির কাঁধের সমান। দেয়ালের গায়ে সরু ছোট ছোট তাকের সারি, তা'র ওপর পাঁজা পাঁজা সিগারেট আর দেশলাইয়ের বাক্স সাজানো। যে-বাক্সে ছেলেটি বসেছিল ঠিক তা'র পাশেই আরেকটা হলুদ রং-করা বাক্স —মনে হয় সেটি টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অদ্ভুত করুণ হাত দু'খানি ঘাড়ের পেছনে রেখে ছেলেটি জানলার কালো-ঘুটঘুটে শার্সিগুলোর দিকে তাকিয়েছিল।

মেয়েছেলেটির পোশাক বদলে, তা'র ছাড়া ভিজে জামাকাপড়গুলো উনুনের পাড়ে ফেলে রেখে, ঘরের কোণে ছিল এক মাটির হাত-ধোয়ার জালা তা'তে হাত ধুয়ে নিলুম। তারপর রুমালে হাত মুছতে মুছতে ছেলেটিকে বললুম, 'তাহলে চলি!'

আমার দিকে চেয়ে, সামান্য একটু আধো-আধো ভাবে ছেলেটি বলে, 'আমি কি আলোটা নিভিয়ে দেব?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ! থাকবে না?'

আমি মহা বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকলুম। আমার ডান দিকে এক বেঢপ চুল্লীর ওপরটা, উনুনের পাড়ে নোংরা বাসনপত্র, বাক্সটার পেছনদিককার কোণে টুকরো টুকরো আলকাতরা-মাখানো দড়ি, এক পাঁজা দড়ির ফেঁসো, কাঠের মোটা গুঁড়ি, কুচো কাঠ এবং একটি জোয়াল। মেয়েছেলেটি তা'র হলদেটে শরীরটা চিতিয়ে আমার পায়ের কাছেই নাক ডাকাতে থাকে।

'তোমার সঙ্গে একটু বসব?' ছেলেটিকে শুধোলুম।

সে আমার দিকে কেমন একটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে চাইলে, তারপর বললে, 'সকালের আগে আর ও উঠছে না।'

'নাই বা উঠল।'

আমি ওর বাক্সের ঠিক পাশেই ব'সে ওর মা'র সঙ্গে কি ক'রে দেখা হ'ল তাই বলতে থাকি মজা ক'রে ক'রে। 'তারপর, বুঝলে, ব'সে সে কি কাদা ছেটানো যেন দাঁড় বাইছে আর গানের কি ঘটা ---!'

ছেলেটি মাথা নাড়ে, ফিকে একটু হেসে, সরু, ছোট্ট বুকটি চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'মদ খেয়েছে কিনা, তাই। এমন কি যখন ভালো থাকে তখনো মাথার খালি দুষ্টুবুদ্ধি। আসলে মা সব সময়ই বাচ্চাদের মতন।'

এতক্ষণে আমি ওর চোখ দু'টোর দিকে ভাল ক'রে নজর করি; সত্যিই ঝাঁকড়া, রোমশ চোখ। পল্লবগুলো অস্বাভাবিক রকম লম্বা আর পাতার ওপর ছোট ছোট কোঁকড়া ঘন চুল গজিয়েছে। চোখের নীচে নীলাভ ছায়া, তা'তে রক্তশূন্য চামড়ার ফ্যাকাশে ভাবটা আরো প্রকট মনে হয়। নাকের হাড়ের ওপর একটি ভাঁজ, উঁচু কপালটি কোঁকড়া লালচে চুলের এলোমেলো গুচ্ছে ঘেরা। মুখে বলা যায় না, চোখের দৃষ্টি এমন শান্ত এবং মনোযোগী। আমার পক্ষে সেই আশ্চর্য অথচ অমানুষী দৃষ্টি সহ্য করা অসম্ভব হচ্ছিল।

'পায়ে কি হয়েছে তোমার?'

সে ওপাশে সরে যায় এবং কাঁথা-কম্বলের তলা থেকে শুকনো চিমসে একটা পা বার ক'রে আনে, যেন উনুন খোঁচাবার ছোট এক শিক, হাত দিয়ে ধ'রে তুলে বাক্সের ওপর এক ধারে রাখল।

'জন্ম থেকেই দু'টো পা এইরকম। হাঁটে না, কোন কম্মের নয়।'

'ওই বাক্সগুলোয় কি আছে?'

'ওটা তো চিড়িয়াখানা।' পা-টা হাত দিয়ে ধরে যেন একটা লাঠি তুলছে, আবার বাক্সের নীচে সেই কাঁথা-কম্বলের তলায় চালান


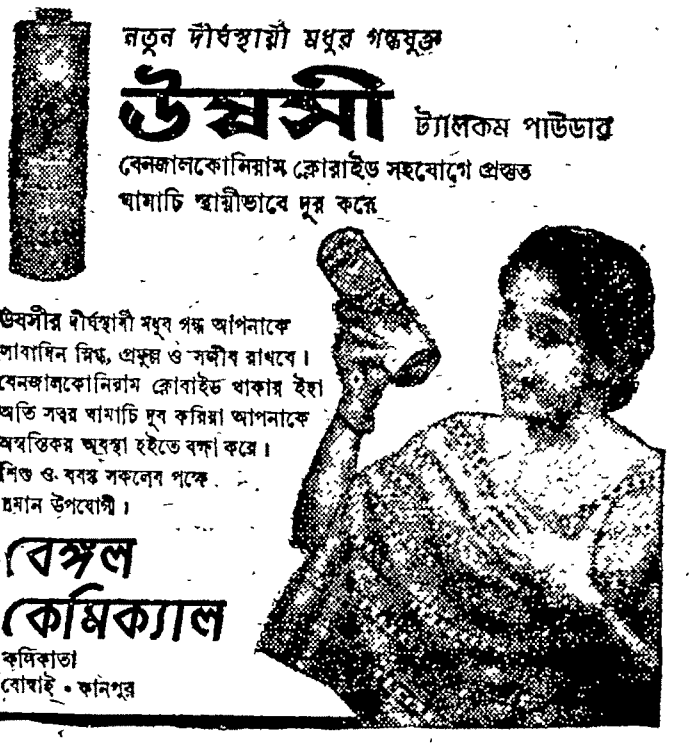

করে দেখ। তারপর একগাল হেসে আমাকে বলে 'তুমি কি চাও, আমি তোমায় সব দেখাই? তাহলে বস, এমন জিনিষ তুমি কখনো দেখ নি।'

রোগা আর বেবাড়ারকম লম্বা হাত দু'টো দিয়ে নিপুণ কৌশলে সে তা'র শরীরটা ঠেলে তোলে এবং তাক থেকে একটার পর একটা বাক্স পেড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে থাকে।

'দেখ, তবে খুলো না যেন। পালিয়ে যাবে সব তাহলে। কান পাত। কি শুনছ?'

'কি যেন নড়ছে ভেতরে।'

'ওঃ। ওটা সেই ছোট্ট মাকড়সাটা, হতভাগ্য। ওর নাম বাজিয়ে। ভারী চালাক।'

ছেলেটির সেই আশ্চর্য চোখ আস্তে আস্তে কোমল হয়ে ওঠে এবং নীলচে মুখে মৃদু হাসি খেলা করতে থাকে। কৌশলে এবং চটপট হাত চালিয়ে বাক্সগুলো তুলে তুলে নিজে কান পেতে শোনে আর আমাকে শোনায়। 'এই যে আনিসিম, আর লাবেটার দেমাক যেন সেপাইয়ের মতো। এটা হ'ল একটা মাছি, শ্রীমতী সরকারী কর্মচারী, এমন বজ্জাত মেয়েছেলে তুমি যদি আর একটি দেখেছ। সারাদিন ভনভন ক'রে বেড়ায়, সবাইকে গাল পাড়ে, এমন কি মা'র চুল ধ'রে টেনেছিল পর্যন্ত। না, মাছিটা নয়, সরকারী কর্মচারীর বৌটা, ওই যে দেখছ না, যার বাড়ির জানলাগুলো রাস্তার দিকে—মাছিটা অবিকল তা'রই মতো। আর এই যে, কালো বড় আবহুলা, বড়কর্তা। লোকটা ভাল তবে লজ্জার কথা বেহেড মাতাল। ভীষণ মদ খেয়ে, ন্যাংটো হ'য়ে ওর ভারি লোমঢাকা শরীরটা নিয়ে কালো কুকুরের মতো উঠোনে হামা দিয়ে বেড়ায়। এই হ'ল গুবরেপোকা, চাচা নিকোদিম, আমি একে উঠোনে পাকড়িয়েছিলুম। জান, এ একজন তীর্থযাত্রী, আসলে বেটা ঠক. সব সময় ভাণ করে যেন গীর্জের জন্যে টাকা তুলছে, মা ওকে চীফগেষ্ট ব'লে ডাকে, মাকে ভারী পছন্দ ওর। নাক না থাকলে হবে কি মা-কে সবাই খুব ভালবাসে।'

'মা তোমাকে মারে না?'

'আমায়। কি যে বল তুমি। আমাকে ছাড়া থাকতেই পারে না। মা এমনিতে ভাল, তবে মাতাল এই যা। অবশ্য আমাদের এ রাস্তায় সকলেই ত' মাতাল। আমি মা-কে যত বলি অত ভোদকা খেও না, বোকা, তাহলে তোমার পয়সা হবে কিন্তু মা কি শোনে, খালি হাসে আর হাসে। মেয়েমানুষ কিনা, তাই ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। তবে মনটা ভাল, যখন জেগে উঠবে তখন দেখো।'

এমন মোহিত ক'রে হাসে ছেলেটা যাতে মনে হয় আমি শহরের প্রত্যেকটি লোককে চীৎকার ক'রে, সগর্জনে জানিয়ে দিই যে, ছেলেটার প্রতি কি অসহ্য মমতা আর করুণা আমার বুকে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। ওর সুন্দর মাথাটি সরু গলার ওপর কোনো বিদেশী ফুলের মতো দুলতে থাকে, ওর উজ্জ্বল ও উত্তেজক চোখ দু'টি আমাকে নিবিড় করে টানে।

ওর কথা শুনতে শুনতে মুহূর্তের জন্য আমি ভুলেছিলুম কোথায় ব'সে আছি। তারপর হঠাৎ দেখলুম সেই জেলখানার জানলা, ছোট্ট আর বাইরের কাদার ছিটেয় মাখামাখি, চুল্লীটার কালো হাঁ, কোণে দড়ির ফেঁসোর ভাঁই, আর দোরের কাছে ন্যাকড়া-ঢোকড়ার পাঁজার ওপর শায়িত, সেই মেয়েছেলেটির মাখনের মতো হলদেটে শরীর—এই ছেলেটির জননী।

'কি আমার চিড়িয়াখানা খুব ভাল মা?' ছেলেটি সগর্বে জিজ্ঞেস করে।

'খু-উ-ব।'

'জান, আমার একটাও প্রজাপতি বা মথ নেই।'

'তোমার নাম কি?'

'লেন্‌কা।'

'আমার নামও তাই।'

'তাই বুঝি। আচ্ছা তুমি কি ধরণের লোক?'

'এই আর কি! বিশেষ কিছু নই।'

'না, তুমি মিছে কথা বলছ। সকলেই কিছু না কিছু—আমি জানি, হ্যাঁ। তুমি লোক ভাল।'

'হবে।'

'তবে তুমি ভীতুও বট।'

'ভীতু কেন?'

'হুঁ-হুঁ আমি জানি।' চালাকের মতো হেসে ছেলেটা আমার দিকে চোখ মটকালে।

'কিন্তু আমায় ভীতু বলছ কেন?'

'এই যে আমার কাছে ব'সে আছ; তার মানে রাতে বেরুতে তুমি ভয় পাও।'

'কিন্তু এখন ত' আলো ফুটছে।'

'ও! তাহলে ত' তোমার যাবার সময় হয়েছে।'

'আমি আবার আসব।'

সে আমার কথা বিশ্বাস করলে না। চোখ দু'টো বন্ধ করলে, তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে শুধোলে, 'কেন?'

'তোমার সঙ্গে একটু বসব ব'লে। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে খুব। আসব ত'?'

'যাও। সবাই আমাদের দেখতে আসছে কিনা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, 'তুমি আমায় ঠকাবে।'

'না, সত্যিই আসব।'

'বেশ, এস। তুমি আমাকেই দেখতে আসবে, মা-কে নয়। চুলোয় যাক মা। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'চমৎকার। তুমি একটু বয়সে বড় অবশ্য। যাক তা'তে কিছু এসে যায় না। কত বয়স তোমার?'

'একুশ।'

'আমার বারো। আমার কোন বন্ধু নেই—কেবল কাত্যিয়া। জল দেয় যে ভারী তা'র মেয়ে। কিন্তু আমায় দেখতে আসে ব'লে ওকে খুব মারে। আচ্ছা, তুমি কি চোর?'

মা। চোর হ'তে যাব কেন?'

'তোমার মুখ কি ভীষণ দেখতে, বাবা! রোগা, আর ওরকম নাক ত' শুধু চোরেদের থাকে। এখানে দু'চৌ চোর আসে। একজন হ'ল সাশকা, যেমন বোকা তেমনি ছোট তার মন। কিন্তু ভানেচকা ভারী ভাল, কুকুরের মতো ভালবাসার প্রাণ। আচ্ছা, তোমার কাছে ছোট ছোট বাক্স আছে?'

'আমি জোগাড় করব'খন।'

'করো। আমি মা-কে বলব না যে, তুমি আসবে।'

'কেন?'

'এমনি। কোন কোন লোক এক-বারের বেশি দু'বার যদি আসে মা অবশ্য তা'তে খুব খুশি হয়। লোকজন খুব ভালবাসে কিনা। মা পনের বছর একলা ছিল তারপর আমি হয়েছি। তুমি কখন আসবে?'

'কাল সন্ধ্যাবেলা।'

'সন্ধ্যাবেলা হ'লেই মা'র মদ খাওয়া সুরু হয়ে যাবে। তুমি যদি চুরি মা-করতে ত' কর কি, এঁ্যা?'

'আমি বাভারিয়ান মদ বেচি।'

'সত্যি? এক বোতল এনো ত'?'

'আনব। কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে।'

'যাও। আসছ তাহলে?'

'নিশ্চয়।'

সে তা'র লম্বা বাহু দু'টি বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। আমি নিজের দু'হাত দিয়ে ওর সেই রোগা, ঠাণ্ডা, হাড়-বার করা হাত দু'টিতে চাপ দিই, ঝাঁকাই তারপর ওর দিকে একরকম না-তাকিয়েই সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে আসি মাতালের মতো। ফর্সা হচ্ছিল; একগাদা স্যাঁৎসেঁতে নড়বড়ে বাড়ি-ঘরের ওপর শুকতারা নিভে আসছে দপদপ ক'রে। বাড়িটার দেওয়ালের নীচের দিককার একটা নোংরা গর্ত থেকে বাড়ির ভিতের চৌকো জানলার খোলাটে এবং ময়লা সাশিগুলো আমার দিকে একটা মাতাল স্ত্রীলোকের চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে। ঢোকবার মুখে এক লালমুখো চাষী তা'র গোদা গোদা খালি পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে, তা'র ঘন কড়া দাড়ি, ভেতরে সাদা দাঁতের ঝিলিক, আকাশের দিকে ঠিকরে উঠেছে। আমার দিকে এগিয়ে আসে একটা বুড়ো কুকুর, পিঠের মাঝখানটায় লোম নেই, বোধহয় ফুটন্ত জল প'ড়ে জ্বলে গেছে। আমার পা শুঁকে বোধহয় খিদেয় কেঁউ কেঁউ করে ওঠে। আমি কেন জানি না, ওর প্রতি করুণা অনুভব করলুম। পথে পথে জল জমেছিল, ভোরের আকাশের নীল-গোলাপী ছায়া পড়েছে তা'তে। নোংরা জলের ডোবাগুলোয় সেই প্রতিচ্ছবি বীভৎস, বেয়াড়া এবং পীড়া-দায়ক মনে হয়।

পরের দিন পাড়ার ছেলেদের বললুম গুবরেপোকা আর প্রজাপতি ধরতে। ওষুধের দোকান থেকে কয়েকটা সুন্দর দেখে ছোট ছোট বাক্স কিনে নিই। তারপর দু' বোতল মদ, কেক-বিস্কুট, টফি-লজেন্স আর ছোট পাঁউরুটি নিয়ে লেন্‌কার বাড়ির দিকে চললুম।

লেন্‌কা আমার উপহারগুলো পেয়ে খুব অবাক। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। দিনের আলোয় সেই চোখকে আরো অদ্ভুত দেখায়।

'ও-ও-ও!' বড়দের মতো গলায় সে বিস্ময় প্রকাশ করে। 'কত কি এনেছ! তুমি কি বড়লোক না কি! কিন্তু কি ক'রেই বা বড়লোক হবে, যা বিশ্রী জামাকাপড় পরেছ, তারপর আবার বললে তুমি চোরও নও। বাক্সগুলো দেখ। ও: আমি ছুঁতে পর্যন্ত চাই না ওগুলো, আমার হাত পরিষ্কার নেই। ওখানে, ওটা কে? আ—একটা ফড়িংবাবাজী। কি শক্ত আর সবুজেও বটে। বেরিয়ে পালিয়ে যাবে না তো ওগুলো?'

তারপর হঠাৎ সে বেদম খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে: 'মা, নীচে নেমে এস, আমার হাতটা ধুইয়ে দাও। দেখ এসে কত কি জিনি। এনেছে। সেই সে কাল রাত্তিরে তোমাকে পুলিশের মধ্যে পাকড়ে এনেছিল যে-লোকটা, সে-ই সব এনেছে। ওর নামও আবার লেন্‌কা।'

'ওঁকে ধন্যবাদ জানাও।' আমার পেছন দিক থেকে একটা কোমল, অদ্ভুত গলা শুনতে পেলুম।

ছেলেটা খুব ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললে, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।'

মাটির তলাকার সেই ঘরটিতে শুঁয়ো শুঁয়ো চুলের মতো ধুলোর জাল মেঘের মতো ঘনিয়ে ছিল। তারই ফাঁক দিয়ে অনেক কষ্টে আমি দেখতে পেলুম একটি রমণীর এলোমেলো চুল, বিকৃত মুখ, তা'র দস্তরুচি এবং অনায়াস, অনতিক্রম্য হাসি।

'এই যে।'

'এই যে!' স্ত্রীলোকটির কোমল নাকি সুরের গলা বেশ উৎকুল্ল শোনায়। চোখ টেরা ক'রে আমার দিকে এমন তাকালে যাতে মনে হয় আমাকে সে বিদ্রূপ করছে।

লেন্‌কা আত্মহারা হ'য়ে মিষ্টি কেক চিবোয়, বাক্সগুলো সাবধানে খুলে খুলে বিড়বিড় করতে থাকে। চোখের পল্লব ওর গালে ছায়া ফেলেছে, তা'তে চোখের নীচের নীলচে ভাবটি আরো স্পষ্ট দেখায়। জানলার মরলা শার্সি দিয়ে বৃদ্ধের মুখের মতো নিষ্প্রভ সূর্যের আলো উঁকি মারছে এবং সেই আলো ছেলেটির লালচে চুলের ওপর। লেন্‌কার শার্ট-এর বুকের বোতাম খোলা, তা'র পাতলা হাড়ের তলায় হৃৎপিণ্ডটি ধুকধুক করছে।

ওর মা ভিজে তোয়ালে নিয়ে লেন্‌কার বাঁ হাতটি মোছাতে যায়।

'বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে' ব'লে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে এবং তা'র সমস্ত শরীরটা বাক্সের চারপাশে কুঁকড়ে যায়, নোংরা দুর্গন্ধ, ন্যাকড়া-কাঁথাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতেই নীল, অসাড় পা দু'টো বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকটি হাসে এবং ন্যাকড়াগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে সে-ও চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে, 'ধর ধর।'

নিজেই ফড়িংটিকে ধ'রে হাতের তালুতে রাখে এবং তা'র সেই শীতকালীন মৌসুমী ফুলের মতো নীল চোখ দু'টি দিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'এরকম অনেক আছে।'

'চেপ্‌টে দিও না যেন।' ছেলে সাবধান করে দিলে। 'একবার মদের ঘোরে আমার চিড়িয়াখানার ওপর ব'সে কতকগুলোর দফা রফা ক'রে দিয়েছিল।'

'সে কথা ভুলে যাও সোনা।'

'তারপর আমি সেগুলোকে কবর দিয়ে চলি সমানে।'

'পরে আমি নিজে তোমার জন্যে কতকগুলো ধ'রে এনে দিই নি?'

'বোকা! তুমি যেগুলো চেপ্‌টে দিয়েছ সেগুলো ছিল বিদ্বান, পণ্ডিত। যারা মরে যায় আমি তাদের ওই চুল্লীর তলায় কবর দিই, ওটা আমার কবরখানা। জান, আমার একটা মাকড়সা ছিল, মিনকা মা'র একজন বন্ধু আসত অবিকল তা'র মতো দেখতে, লোকটা এখন জেলে আছে, এই মোট্‌কা আর ভারী আমুদে।

'ও আমার মাণিক, আমার সোনা', ছেলের কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে মেয়েছেলেটি আদর করে তার কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে বলে, 'আমার ছেলে দেখতে সুন্দর না?' ওর চোখটা কেমন বল, উঁ?'

'বরং আমার একটা চোখ নিয়ে দু'টো পা দাও', ফড়িংটাকে দেখতে দেখতে লেন্‌কা হাসিমুখে বলে। 'বাবা: জবর শক্ত! কি মোটা! সেই সাধুটার মতো মা, যার জন্যে তুমি একটা মই তৈরি করেছিলে, মনে পড়ে?'

'আবার সেকথা কেন!' ব'লে একটু হেসে সে নিজেই সেই কথা বলতে লাগল।

'এক লম্বা-চওড়া সাধু এখানে এসে একদিন উপস্থিত। আমাকে বললে, ওহে শ্রীমতী দড়ির ফেঁসোকুড়ুনী, দড়ি দিয়ে আমায় একটা মই বানিয়ে দিতে পার? জন্যে ওরকম মইয়ের কথা শুনি নি। বললুম, না বাপু আমি জানি না কেমন ক'রে বানাতে হয়। সে বললে, আচ্ছা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। সে তা'র গায়ের ঢোলা জামাটি খুলে ফেললে, তা'র পেটে একটা সরু, শক্ত, লম্বা গোছের দড়ি পাক দিয়ে জড়ানো। আমাকে শিখিয়ে দিলে। বুনতে বুনতে আমি ভাবি, এটা নিয়ে করবে কি লোকটা? গীর্জায় ঢুকে চুরি ফুরি করবে না কি?'

হাসতে হাসতে সে ছেলের কাঁধ জড়িয়ে আদর করে। 'যখন নিতে এল আমি তা'কে জিজ্ঞেস করলুম, সত্যি কথা বল ত' চুরি করবার জন্যে এটা তোমার দরকার না কি, তাহলে তোমায় দেব না। সাধু ধূর্তের মতো হেসে বললে, না পাঁচিল পেরোবার জন্যে। আমাদের মঠ ঘিরে আছে উঁচু পাঁচিল আর আমরা হচ্ছি পাপী, পাপ স্বভাবত আমাদের পাঁচিলের বাইরেই রাখে। বুঝতে পারলে? বুঝতে আমি ঠিকই পেরেছিলুম, রাত্তিরে স্ফূর্তির ব্যবস্থা আর কি। তারপর সে আর আমি খুব হাসতে লাগলুম।'

'তুমি তো হাসতে এক ওস্তাদ।' ছেলেটি এমনভাবে বলে যেন সে-ই বড়, 'কিন্তু চা করবার উনুনটা ধরালে হ'ত না।'

'আমাদের একটুও চিনি নেই।'

'কিনে নিয়ে এস গে।'

'পয়সা নেই ঘরে।'

'মাতাল কোথাকার। ওর কাছ থেকে নাও কিছু।' আমার দিকে ফিরে বললে, 'তোমার কাছে হবে নাকি?'

আমি মেয়েছেলেটিকে কিছু পয়সা দিলুম। সে চট ক'রে লাফিয়ে উঠে চুল্লীর ওপর থেকে দাগধরা তোবড়ানো একটা কেট্‌লী পেড়ে দরজার পেছনে অদৃশ্য হয় নাকি সুরে গান গাইতে গাইতে।

'মা।' ছেলেটি চেঁচিয়ে বললে, 'জানলাটা খুলে দিও, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মা ভারী ভাল বুঝলে?' স্যাঁৎসেঁতে দেওয়ালে ইটের ফাঁকে ফাঁকে ফাটলে পোঁতা পেরেকের সঙ্গে চৌন সুতোয় বাঁধা পিচবোর্ডের তাকের ওপর পোকার বাক্সগুলো ঠিকঠাক ক'রে গুছিয়ে রাখতে রাখতে সে ব'লে চ'লে 'কি কেজো। যখন দড়ির ফেঁসো তোলে তখন এমন ধুলো ওড়ায় যে নিশ্বাস নেওয়া যায় না। আমি চেঁচিয়ে বলি, মা আমাকে বাইরে নিয়ে চল, গেলুম যে দম বন্ধ হ'য়ে। মা জবাব দেয়, একটু সহ্য কর, তোমাকে ছাড়া আমার ভাল লাগে না। আমাকে সত্যি খুব ভালবাসে। দড়ির ফেঁসো তোলে আর গান গায়, হাজার হাজার গান জানে।'

ওর সেই অদ্ভুত চোখগুলো চকচক ক'রে ওঠে, মন ভুরু কাঁপিয়ে উত্তেজিত হয়ে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় গান গেয়ে ওঠে, 'পালকের শয্যায় শুয়ে আছে ওই ওরিনা---'

একটু শুনে আমি বলি, 'গানটা ভারী নোংরা।'

'সব গানই তাই'—লেন্‌কা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় এবং হঠাৎ চমকে উঠে বলে, 'ওই যে বাজনা এসেছে। আমাকে তুলে ধর, জলদি।'

পাতলা হাড়, ধূসর-চামড়ায় পোরা ওর হাল্‌কা শরীরটি তুলে ধরি আমি। জানলা দিয়ে অসীম ব্যগ্রতায় মাথা বাড়িয়ে ও যেন জমে শক্ত হয়ে যায়। ছিনেপড়া পা দু'টো অসহায়ভাবে দুলতে থাকে, বাড়ি খায় দেওয়ালে। উঠোনে একটা হাত-অর্গ্যান বিরক্তিকর ক্যাঁ-কোঁ শব্দে কি যেন এক ছেঁড়া ছেঁড়া সুর ঘুলিয়ে তুলছিল। একটি শিশু উল্লাসে চেঁচাচ্ছে এবং একটি কুকুর বাজনাটার তালে তালে ঘেউ ঘেউ জুড়েছে। মন দিয়ে শুনে লেন্‌কা দাঁতের ফাঁক দিয়ে সুরটা গুনগুন করে ভাঁজতে থাকে। এখন ঘরের বাতাস একটু পাতলা। ধুলোগুলো একটা স্থায়ী স্তর রচনা করেছে। ওর মা'র বিছানার মাথায় একটা সস্তা ঘড়ি ঝুলছে; পয়সার মত তার দোলকটি চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। উনুনের

ওপর অপরিষ্কার বাসনগুলো প'ড়ে আর সর্বত্র মোটা ধুলোর আস্তরণ, বিশেষ ক'রে কোনো কোণে ময়লা ন্যাকড়ার মতো ঝুলন্ত মাকড়সার জালের ওপর। লেন্‌কার এই আস্তানা যেন এক আঁস্তাকুড়, যে তাকাবে এই গর্তটার দিকে তাকে ভয়ংকর, নিষ্করুণ দারিদ্র্য প্রতি পদে পীড়িত করবে। চায়ের উনুনটি গনগন করতে আরম্ভ করেছিল; বাজনাটা সহসা থেমে যায় এবং একটি ককর্শ কণ্ঠের চীৎকার লাফিয়ে ওঠে, 'বেরোও।'

'আমাকে নাবিয়ে নিয়ে চল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেন্‌কা বললে, 'ওরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

আমি ওকে ওর বাক্সের ওপর বসিয়ে দিই। ও মুখ সিঁটকে ঘুকে হাত ঘষে, কাশে সাবধানে। 'আমার ঘুকে একটা ব্যথা আছে, খোলা বাতাসে বেশি নিশ্বাস নেওয়া আমার পক্ষে ভাল নয়। আচ্ছা শোন। তুমি কখনো জুজু দেখেছ?'

'না।'

'আমিও দেখি নি। রাত্তিরবেলা চুল্লীর নীচে আমি কত তাকিয়ে থাকি, যদি আসে ওরা, কিন্তু দেখা পাই না। কিন্তু জুজুরা ত' গোবিস্থানেই থাকে, তাই না?'

'তুমি কি করবে ওদের সঙ্গে?'

'ভাল লাগে। আচ্ছা, এমন কোন জুজু থাকতে পারে না যে দয়ালু? ভারী-র মেয়ে কাতিয়া গুদামে একটা পুঁচকে জুজু দেখে বেজায় ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আমি ভয় পাই না।'

পা দু'টো ন্যাকড়া আর কাঁথায় জড়িয়ে সে সোৎসাহে বলতে থাকে, 'এমন কি ওদের আমি ভালবাসি অব্দি। আমি খারাপ খারাপ স্বপ্নও ভালবাসি। একবার স্বপ্ন দেখলুম। একটা গাছ উল্টো হয়ে গেছে, পাতাগুলো সব মাটির ওপর আর শেকড়গুলো আকাশের দিকে। সমস্ত গা ঘেমে আমি ভয়ে জেগে উঠি। একবার মা স্বপ্ন দেখেছিল যে, উদম হয়ে পড়ে রয়েছে আর একটা কুকুর ওর তলপেটে খাচ্ছে, একবার করে কামড়ায় আর ফেলে দেয়, কামড়ায় আর ফেলে দেয়। আর একবার---আমাদের বাড়িটা হঠাৎ লম্বে উঠে রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করলে, যেতে যেতে দরজা-জানলা সব আছড়াচ্ছে আর সরকারী কর্মচারীর বৌয়ের বেড়ালটা পেছন পেছন দৌড়চ্ছে।'

ওর খোঁচা খোঁচা কাঁধ দুলতে থাকে। একটা টফি নিলে, তা'র রঙীন কাগজটা সযত্নে সমান ক'রে জানলার ধাপে রাখলে। এই কাগজগুলো দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিষ বানিয়ে আমি কাতিয়াকে দেব। ও সুন্দর জিনিষ খুব ভালবাসে—কাচ, চীনে মাটির টুকরো, কাগজের টুকরো—সব। আচ্ছা শোন, একটা আরসুলাকে যদি তুমি খাওয়াতে থাক তবে কি সেটা বেড়ে বেড়ে ঘোড়ার মতো বড় হবে?'

'যদি তুমি ভাল করে খাওয়াও তা বড় হবে বৈকি।'

'নিশ্চয়।' আনন্দে লাফিয়ে ওঠে প্রায়। 'কিন্তু মা খালি হাসে, বুদ্ধুভুতুম।' মেয়েদের পক্ষে ভারী অপমানজনক আরেকটি গালাগাল দিলে।

'বেড়ালকেও কষে তাড়াতাড়ি খাওয়ালে তুমি ঘোড়ার মতো বড় করে ফেলতে পার? পার না?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'ইস, কিন্তু আমার যে খাবার নেই। কি মজাই না হ'ত।'

ছেলেটি উত্তেজনায় কাঁপছিল, বুকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে।

'কুকুরের মতো বড় বড় মাছি উড়ে বেড়াবে চারদিকে। আরসুলা দিয়ে তুমি ইটের গাড়ি টানাতে পারবে; ঘোড়ার মতো বড়সড় হ'লে তার গায়ে ঘোড়ার মতো জোরও হবে তাই না?'

'মুস্কিল হচ্ছে যে ওদের শুঁড় রয়েছে।'

'শুঁড়ের জন্যে মুস্কিল কি! শুঁড়-গুলো হবে লাগামের মতো। কিংবা ভাব, একটা মাকড়সা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সত্ত মাকড়সা কিন্তু কার মতো বড়? বাবা বেড়াল ছানার মতো বড় হলেও ত' সেই মাকড়সা দেখলে ভয় হবে। আমার যে যে পা নেই, কিন্তু যদি থাকত।


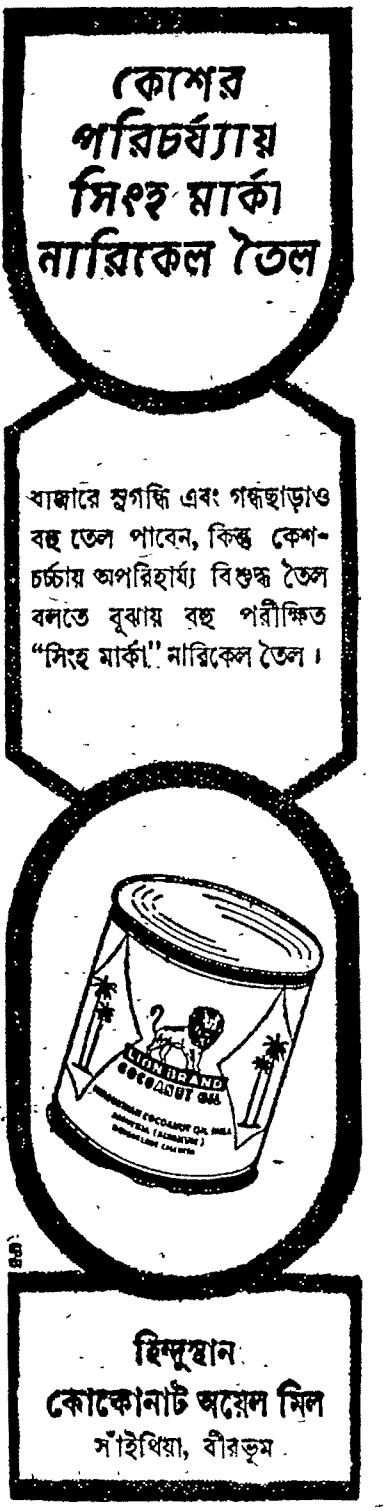

তাহলে আমার চিড়িয়াখানার সব জন্তুদের আমি খেটে খাওয়াতুম। তারপর সেগুলো সব বেচে মা-কে খোলা মাঠে একটা বাড়ি কিনে দিতুম। গেছ না কি তুমি, খোলা মাঠে?'

'গেছি বৈকি!'

'কি রকম দেখতে বল দিকি?'

তখন আমি তা'কে মাঠ-ময়দানের কথা বলতে থাকি। সে আমাকে একটুও বাধা না দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সব শুনতে থাকে, তা'র পল্লবগুলি চোখের ওপর নেমে আসে, ছোট্ট মুখটি আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে যায় যেন ঘুমে ঢলে পড়েছে। দেখে আমি আস্তে কথা বলতে থাকি। এমন সময় ওর মা এল—হাতে চায়ের কেট্‌লী, বগলে কাগজের ঠোঙা, বুকে একটা ভদ্‌কার বোতল।

'এসে গেছি।'

'চমৎকার।' চোখ বড় বড় ক'রে, নিশ্বাস ফেলে ছেলেটি বলল। 'সেখানে আর কিছু নেই, শুধু ঘাস আর ফুল। মা, তুমি একটা গাড়ি জোগাড় ক'রে আমায় খোলা মাঠে নিয়ে যেও নইলে আমি মরে যাব, আর কোনদিন দেখা হবে না ওদের। মা, তুমি সত্যি ভারী পাজী।' অত্যন্ত বিমর্ষ ও আহত হয়ে সে চুপ ক'রে যায়।

ওর মা আস্তে ক'রে বকলে ওকে, 'ওসব কথা বলতে নেই; ছিঃ। তুমি এখনো ছোটটিই আছ!'

'বলতে নেই। তোমার কি, তুমি যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছ, কুকুরের মতো। তোমার বরাত ভাল। আচ্ছা শোন' ব'লে আমার দিকে ফিরে বললে, 'ভগবান্ বুঝি খোলা মাঠ-ময়দান তৈরি করেছেন?'

'হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'যাতে মানুষ হাঁটতে-বেড়াতে পারে।'

'মাঠ-ময়দান!' ছেলেটি চিন্তিতমুখে হাসলে তারপর নিশ্বাস ফেললে, 'আমি আমার চিড়িয়াখানাটা সেখানে নিয়ে যাব, সকলকে ছেড়ে দিয়ে বলব, যাও, ঘরকুণো জীবেরা চরে বেড়াও। আচ্ছা শোন, ভগবান কোথায় তৈরি হয়, ভিখিরীদের বাড়িতে?'

ওর মা ককিয়ে, হাসতে হাসতে বিছানার গড়িয়ে প'ড়ে পা ছুড়তে লাগল, 'ও ভগবান! আমার সোনা! হ্যাঁ, ওই যে সন্তায় মূর্তি বানায় যে আঁকিয়ে সে-ই ভগবান তৈরি করে---ওঃ আমি এত জোরে হাসছি, কি রগুড়েই হয়েছিস বাপু তুই---'

লেন্‌কা তা'র মা-কে অমন হাসতে দেখে একটা যা-তা কথা বললে। 'ছোট মেয়ের মতো হেসে খুন হচ্ছে। হাসতে খুব ভালবাসে।'

আবার সেই খারাপ কথাটা উচ্চারণ করলে

'হাসুক।' আমি বলি। 'তা'তে ত' তোমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

'না, তা হচ্ছে না।" লেন্‌কা বুঝতে পারলে। 'যখন জানলা ধোয় মা তখনি আমি খালি মা'র ওপর রেগে যাই। আমি বার বার বলি, জানলা ধোও, আমি দিনের আলো দেখতে পাই না—তবু মা কেবলি ভুলে যায়।'

মেয়েছেলেটি চায়ের ডিস্ ধুতে ধুতে হাসছিল, আমার দিকে তা'র নীল চোখটি মটকে বললে, 'কি, আমার ছেলে চমৎকার নয়? ও যদি না থাকত আমি কবেই ডুবে মরতুম, সত্যি সত্যি। গলায় দড়ি দিতুম।'

এই কথা বলতে বলতে মেয়ে-ছেলেটি হাসতে থাকে।

লেন্‌কা অকস্মাৎ আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসে, 'আচ্ছা, তুমি কি আহাম্মক?'

'জানি না ত'! এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'মা বলে তুমি এক আস্ত আহাম্মক।'

'কেন বলেছিলাম জান? বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে মেয়েছেলেটি বললে, 'তুমি একটা মাতাল মেয়েমানুষকে রাস্তা থেকে বাড়ি নিয়ে এলে, তা'কে বিছানায় শুইয়ে চ'লে গেলে, এইজন্যে। কোনরকম খারাপ ভেবে আমি কিছু বলি নি। আর তুই কিনা আমাকে বলছিস---'

সে শিশুর মত কথা বলে, অপরিণত শিশুর মতো, ওর চোখও শিশুর মতো সরল কিন্তু ওর নাকহীন মুখ, উঁচু ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া দাঁত ভীষণ কুৎসিত দেখায়। রাত্রি-কালের দুঃস্বপ্নের মতো অথচ কৌতুককর।

'চা খাওয়া যাক, এস।' আনুষ্ঠানিক ভাবে সে আমাদের আহ্বান জানায়। চায়ের উনুনটা ছিল লেন্‌কার পাশে একটা কাঠের বাক্সের ওপর। তোবড়ানো সিসের নীচে দিয়ে ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলী তা'র ঘাড়ে এসে ঠেকছিল। সে তা'র তলায় নিজের একটা হাত পেতে দেখে এবং যখন তালুটা বাষ্পে ঘেমে ওঠে তখন সেটা সে মাথায় মোছে একান্ত একাগ্রতায় চোখ ছোট ছোট করে।

'আমি যখন বড় হব'—সে বলতে থাকে, 'মা আমাকে ছোট্ট একটা কাঠের গাড়ি বানিয়ে দেবে আর আমি পথে পথে ভিখিরীর মতো ঘুরে বেড়াব। যখন আমি কিছু পাব, তখন আমি খোলা মাঠে গড়িয়ে বেড়াব।'

'ও-ও।' ওর মা নিশ্বাস ফেলে, তারপর অল্প হেসে বলে, 'ও ভাবে খোলা মাঠ বুঝি স্বর্গ, হা হতভাগা! ওখানে শুধু তাঁবু খাটানো থাকে আর থাকে পোড়ারমুখো গোরাগুলো আর মাতাল চাষাগুলো।'

'মিথ্যে কথা।' লেন্‌কা তা'কে বাধা দেয়, ভ্রূকুটি ক'রে বলে, 'ওকে জিজ্ঞেস কর, জায়গাটা কি রকম, ও দেখেছে।'

'আর আমি দেখি নি, বুঝি?'

'তুমি ত' মদ খাও।'

মা-বেটাতে ছোট ছেলের মতো তর্ক জুড়লে, তেমনি আবোল-তাবোল, গরমাগরম। ইতিমধ্যে বাইরে এক উষ্ণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রক্তিম আকাশে পুরু, ধূসর গোলাপী রঙের মেঘ নিশ্চল

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলাকার এই ঘরটা অন্ধকারে ছেয়ে এল।

ছেলেটি তার মগের চা শেষ করলে। ঘামছিল খুব, একবার আমার দিকে আরেকবার তা'র মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, 'যা খাবার আমি সব খেয়েছি, কিন্তু এখন আমার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে।'

'ঘুমোও তাহলে।' ওর মা পরামর্শ দিলে।

'কিন্তু ও যে চলে যাবে। চ'লে যাবে না কি তুমি?'

'আমি ওকে যেতে দেব না।' আমাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে মেয়েছেলেটি বললে।

'যেও না, অ্যাঁ।' লেন্‌কা অনুনয় করে; চোখ বন্ধ ক'রে আরামে শরীরটাকে ছড়িয়ে ও বাক্সের মধ্যে শুয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ মাথাটা একটু তুলে তা'র মাকে মৃদু অনুযোগের সুরে বললে, 'তুমি বরং ওকে বিয়ে করো, শুধু শুধু সকলের সঙ্গে ঝুলে না থেকে অন্য মেয়েদের মতো বিয়ে করলেই পার, সবাই ত' তোমাকে মারধর করে, কিন্তু এ কি ভাল, দয়ালু।'

'এখন ঘুমোও বাবা।' মেয়েছেলেটি খুব নরম গলায়, ঝুঁকে প'ড়ে বললে।

'ও খুব বড়লোক।'

স্ত্রীলোকটি এক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, পেয়ালা থেকে তা'র সেই বিকট ঠোঁট দিয়ে চায়ে চুমুক দেয় অল্প অল্প। তারপর আমি যেন তার পুরণো বন্ধু এইভাবে বলে, 'এই হচ্ছে আমাদের জীবন, আমি আর ও, আর কেউ নয়। বাইরের লোকেরা সকলে আমাকে অপদার্থ বলে। কিন্তু তা'তে কি? কাককে ত' আমার লজ্জা পাবার নেই। তাছাড়া দেখ, আমি দেখতে কি খারাপ। সকলেরই বোঝা উচিত আমার পক্ষে কি পারা সম্ভব। আহা, ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার সোনা। ছেলেটা ভাল না?'

'হ্যাঁ, চমৎকার।'

'বেশি আর ওর কথা কি বলব! বেশ চালাক-চতুর না ও?'

'হ্যাঁ, খুব সপ্রতিভ।'

'ঠিক। ওর বাবা ছিল ভদ্রলোক—একজন বৃদ্ধ। ঐ যে কি বলে যেন—? আহা তাদের অফিস যাকে—হা, ভগবান। দলিল টলিল লেখে?'

'নোটারী?'

'ঠিক, ঠিক, সেই ছিল। বুড়ো খুব চমৎকার লোক, দয়ালু। আমি ওর বাড়িতে ঝি ছিলুম, আমাকে ভালবেসেছিল।'

সে তার ছেলের অনাবৃত পা দু'টো কাঁথা-ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে দিলে, মাথার তলার বালিশটা দিলে সোজা ক'রে, তারপর আবার কথা বলতে থাকলে, 'বুড়ো হঠাৎ একদিন মারা যায়। রাত্তিরবেলা, আমি সবে তা'র ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। লোকটা মেঝেতে পড়ল আর মারা গেল। তুমি নাকি বাজারিরায় মদ বিক্রি কর?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের হ'য়ে?'

'না, মালিকের।'

মেয়েছেলেটি তখন আমার কাছে ঘন হয়ে আসে এবং আমাকে বলে, 'আমাকে যেন ঘেন্না করো না, এখন আর আমি দূষিত নই, তুমি রাস্তায় যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পার, সবাই জানে।'

'না, আমি তোমাকে ঘেন্না করছি না।'

আমার হাঁটুর ওপর ছোট্ট হাতখানা রাখলে সে। ভাঙা না, নখের মাংস উড়ে গেছে। স্নিগ্ধ স্বরে সে বলতে লাগল, 'লেন্‌কার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আজ তুমি কতখানি সময় নষ্ট করলে ওর জন্যে। খুব ভাল কাজ করেছ তুমি।'

'আমি এবার যাই।' আমি বলি।

'কোথায়?' খুব অবাক হ'য়ে ও জিজ্ঞেস করলে।

'কাজ রয়েছে।'

'থাক না।'

'না, তা পারি না।'

সে তা'র ছেলের দিকে তাকালে, তারপর জানলা দিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'কোন রকমে থাকতে পার না? রুমাল দিয়ে আমি মুখ ঢেকে রাখব'খন। ছেলের জন্যে তোমার কাছে আমার যে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঢেকে রাখব, কেমন?'

সে এমন করুণ, মধুর ভাবে কথাগুলি বলছিল যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং তা'র চোখ, বিকৃত মুখের 'পরে তা'র সেই শিশুর মতো সরল চোখ হেসে উঠল, যে হাসি গরীব ভিখিরীর হাসি নয়, বড় মানুষের ঐশ্বর্য তা'তে যার নাকি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত উপায় আছে।

'মা!' ছেলেটি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে তার শরীর, 'ওরা গুঁড়ি মেরে আসছে, মা এখানে এস।'

'দুঃস্বপ্ন দেখেছে বোধ হয়।' ছেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে সে।

আমি বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম। খোলা জানলা দিয়ে একটা নাকি সুরের গান গড়িয়ে আসে উঠোনে। অদ্ভুত কথাগুলোকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ ক'রে মা তা'র ছেলের জন্যে ঘুমপাড়ানী গান গাইছে:

"দুষ্টু পরীরা সব আসছে
ওরা দুঃখু আনে সাথে ক'রে
ওরা দুঃখু আনছে
ওরা আমাদের হৃদয় খণ্ড খণ্ড
ক'রে দেবে।
হায়, বেদনা আমার, হায় বেদনা
কোথায় আমরা লুকোই,
হায় কোথায়?'

দাঁতে দাঁত চেপে, যাতে কেঁদে না ফেলি, আমি দ্রুত বেরিয়ে এলুম উঠোন ছেড়ে।

---

ম্যাক্সিম গর্কির একটি গল্পের ছায়াবলম্বনে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

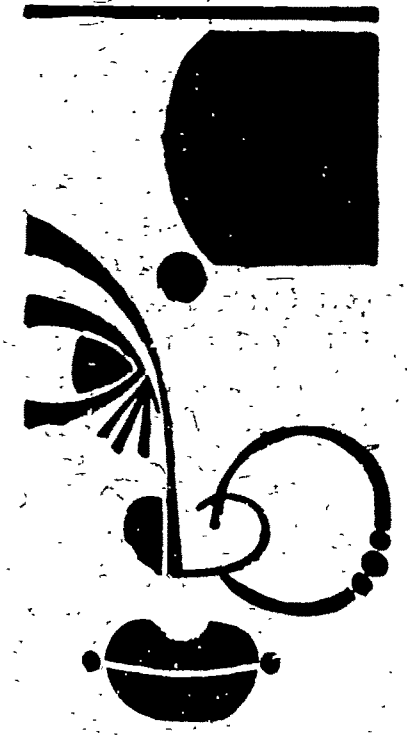

# দুরন্ত দেহলী

তার কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা আছে। সেও আজকাল একখানা বড় আয়না কিনে ফেলেছে। সৌন্দর্যচর্চায় মনোযোগ দিয়েছে। পটলার পিছু পিছু ছোটে। মাধাই-এর ক্ল্যাসিক্যাল গান অব্যাহত গতিতেই চলছে। গুন্ গুন্ করতে করতে ঘরে ঢুকে সেও সমরকে একটা লাইন গেয়ে অভিনন্দন জানায়। সবাই মার মার করে তাকে তেড়ে আসে। থাম্ থাম্—আবার সুরু করেছিস? তার সঙ্গীতচর্চার অত্যাচারে ম্যানেজার তাকে মেস ছেড়ে যেতে নোটিশ দিয়েছে। তবুও বীর বিক্রমে সে এখনও তার সঙ্গীত-আরাধনা চালিয়ে চলেছে। 'যাদু ভরি তেরে নয়না আঁ আঁ আঁ'—গাইতে গাইতে সে কেটে পড়ে।

ভবানী মাসল্ ফুলিয়ে ছাতিখানা তে মালে ঢেকে ঘরে ঢুকে সমরকে অভিনন্দন জানায়। তোয়ালে না থাকলে সবাই নজর দেয়।

—'এইবারে ভায়া শরীরচর্চা সুরু কর।' বলে সে সমরের পিঠে এমন এক রদ্দা বসিয়ে দিল যে বেচারা সমরের ক্ষীণ প্রাণটুকু অতি কষ্টে রক্ষা পেল।

জগা গদাধর বিশু দাবা খেলছিল। সমরকে সবাই ভালবাসে। তার চাকরী হয়েছে শুনে তারা সত্যি খুশি। জগাই বলল, 'হুঁ হুঁ বাবা, সমর ভায়ার এ বোড়ের চাল নয়, একেবারে মন্ত্রী দিয়ে মাৎ।'

নৌকোটা টেনে এনে গদাধর বলে উঠল, 'তা তো হলো ব্রাদার, এই মাও কিস্তী। বাঁচাও রাজাকে।' দাবা খেলার সময় সে অন্য কথা ভাবতে পারে না।

বিশু বলল, 'দাবার ছকটা বড্ড পুরণো হয়ে গেছে। সমর ভায়ার কাছ থেকে একটা নতুন ছকের দাবী জানিয়ে আসি।'

বিশু এসে বলল, 'নৃপেনদা' সমরের চাকরীতে সবাই খুশি। যাকে যা খুশি দাও না কেন মেসবাড়িকে একটা নতুন দাবার ছক কিনে দিতে হবে। ভুলো না যেন।'

—'সব হবে, সব হবে।'

নৃপেন তাদের শান্ত করে।

কানাই অতি কষ্টে বুক চেপে বসেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠলো; 'গেল, গেল ওগো ও নৃপেনদা', হৃদয়খানা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কবে নিয়ে যাচ্ছো সেই প্রাসাদ বাড়িতে গো।

॥ ছয় ॥

নৃপেনের মেসবাড়ি। কানাই বলাই নৃপেনকে ঘিরে বসেছে। সমরের চাকরী হওয়াতে সবাই খুব খুশি। পটলা পর্যন্ত সিনেমার রিহার্সাল বন্ধ করে এসে সমরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। চপেন ঘন ঘন ঘুর ঘুর করছে। সকলকে সে মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে।

বিনু এসে বলল, 'নৃপেনদা'-----

সমরের তো চাকরী জুটেছে একটা। আর কত দেরী?'

বলাই তাতে সায় দেয়। বলাই-এর জখমটা ততখানি বেশি হয় নি।

নৃপেন ললিতের কাছ থেকে আরও কিছু টাকা ধার নিয়ে এসেছে। সমর দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে, অন্তত এই টাকা কটা ললিতকে ফেরৎ দিতেই হবে। সেই টাকাতেই আজকের এই জল-যোগের আয়োজন।

খানিকক্ষণের ভেতর বৃদ্ধ বটকেষ্টও এসে হাজির। সমরের চাকরী সম্বন্ধে সে বিশেষ চিন্তিত ছিল। তা কেন হবে না? ভাবী জামাই। সাথে তার বারো বছরের মেয়ে চণ্ডীকে আনতে সে ভোলে নি।

সমর আদর-অভ্যর্থনা করে বৃদ্ধকেও মিষ্টি জলখাবার খেতে দিল। বৃদ্ধ মানুষ এসেছে খুশি হয়ে। তাছাড়া সমরের মনটাও বেশ প্রফুল্ল।

বৃদ্ধ বটকেষ্ট কিন্তু তার অন্য অর্থ করল। তার ধারণা হ'ল তার কন্যার পাণিগ্রহণে এটা সমরের অব্যক্ত স্বীকৃতি।

নৃপেন এ সুযোগটুকু ছাড়ল না। সে বলে উঠল, 'আ হা হা সমর, বটবাবু তো আছেনই। তার অভ্যর্থনাতেই তুমি ব্যস্ত। অন্য লোকগুলোর দিকেও একটু নজর রাখো।' বটকেষ্টকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখলেন বটবাবু, কি রকম জামাই জোগাড় করেছি? আদর-অভ্যর্থনায় মেয়েদেরও হার মানায়। বলুন সত্যি কি না।'

সমর বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। চণ্ডী মুখখানা নীচের দিকে নামিয়ে রইল। সে চোরা কিছুই স্পর্শ করল না। কনে-বউটির মতন এসে অবধি সে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তের জন্য মুখ উঁচু করল না।

নৃপেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এইবার সবাই মিলে একখানা ভাল দেখে বাড়ি দেখে দাও তো। বাড়ি পেলেই সমরের একটা বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাক। বহু দিন বিয়ে-বাড়ির মুখ দেখি নি।'

কানাই বুকে হাত চেপে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'গেল গেল। ওগো ও নৃপেনদা', হৃদয়খানা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কবে নিয়ে যাচ্ছো সেই প্রাসাদ বাড়িতে গো।'

সাধনা দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য্য

# সুশীল রায়

# অনলআয়ী

সাম্প্রতিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

শাস্ত্রের বিধানরূপে প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন সংস্কার প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রেরই বিধান কি না, সকলের তা জানা আবশ্যক। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদীরা নানারকম বিধানের প্রবর্তন করেছে, তারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে।

দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রের বিধানাবলী লিখিত। বঙ্গভাষায় সেই সকল অনুবাদ করে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করতে পারলে অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া বন্ধ হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। এইজন্যে তিনি প্রথমেই হাত দিয়েছেন বেদান্তে। সহজ-বোধ্য বঙ্গভাষায় তিনি এর অনুবাদ করবেন, এই তাঁর সংকল্প।

দেশটা ভরে আছে অশিক্ষায়। এই কলকাতা শহরটা যেমন চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়া থেকে আরম্ভ করে কলুটোলা-বাগবাজারের দেশী পাড়া পর্যন্ত কেবল নালায় ও নর্দমায় পরিপূর্ণ—যত সব ব্যাধির বাসা রূপে বিরাজ করছে শহরের বুকের ওপর। অশিক্ষাও তেমনি মানুষের মনের নালা-নর্দমা বিশেষ। ওগুলি বন্ধ করতে না পারলে স্বাস্থ্যোন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে তাঁর বিশ্বাস।

শ্রীরামপুরে পাদরী কেরী স্ত্রী-লোকদের শিক্ষাদানের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, সে শিক্ষাটা অবশ্য বেশির ভাগই মিশনারী শিক্ষা। তা হোক, অশিক্ষার থেকে কুশিক্ষাটা অবশ্য খারাপ জিনিষ, কিন্তু মিশনারী শিক্ষাটা রামমোহনের মনোমত না হলেও তিনি সেটা কুশিক্ষা বলে মনে করছেন না। কিন্তু আপত্তি আছে একটি জায়গায়। হিন্দুধর্মের আচার-আচরণের চাপে পড়ে দেশের মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে। পরিত্রাতা যীশুর নাম শুনে তারা নিজেদের উদ্ধার সম্ভাবনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। সকলে তো আর রামরাম বসু নয়, অতদিন ধরে পাদরীদের মুনশিগিরি ক'রে, খ্রীষ্টবাণীর অনুবাদ ক'রে ক'রে কলম পাকিয়ে, কেরীর সহায়তায় কোম্পানীর কলেজে পণ্ডিত-গিরির কাজ পেয়ে এবং সর্বদা পাদরীদের সঙ্গে বসবাস করেও নিজের ধর্মটি বিসর্জন দেয় নি। কতবার কত গুজব উঠেছে—রামরাম খ্রীষ্টান হয়ে গেল; কিন্তু সে সব জনরব মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিয়েছে রামরাম। রামরাম এখন আর ইহজগতে নেই, তাই তাঁর আত্মার উদ্দেশে বুঝি শ্রদ্ধাই নিবেদন করেন—রামমোহন।

নিজের ধর্ম পরিহার করার অর্থ হয় না কোনো—নিজের ধর্মে যদি কোনো গ্লানি চোখে পড়ে থাকে, তাহলে সে গ্লানি দূর করে নিজের ধর্মকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পার।

লোকে তাঁকে বলে, মৌলভী রামমোহন। সত্যি, মানুষ কত সহজে নিজের মত তৈরি করে নিতে পারে! আশ্চর্যই লাগে রামমোহনের। হিন্দু-ধর্ম নামে যে-বিকৃত ধর্মটা এখন চলছে, রামমোহন তার সংস্কারপ্রয়াসী, রামমোহন তার সমালোচক—এই জন্যেই বুঝি তিনি হিন্দু নন? তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানী, এই পোশাক তাঁর পছন্দ—এই জন্যেই বুঝি তিনি মুসলমান—তিনি মৌলভী! পোশাক পরিবর্তন করলেই যদি ধর্ম বদল হয়ে যায়, তাহলে যে দেশী মানুষেরা কোট-পাতলুন পরে—দু-একজন আজকাল পরছে—তারা বুঝি সকলেই পাদরী? আর, ফিরিঙ্গীরা ধুতি আর নিমাস্তিন জামা পরলেই নিশ্চয় হিন্দু? তা যদি হবে, তবে গরিবটির ঐ ফিরিঙ্গী কবিয়ালকে হিন্দু বলে গ্রহণ করছে না কেন সমাজে? সে তো ধুতি-জামা পরেই কবি গায়, তার ওপর তার গৃহিণীটি তো আসলে একজন ব্রাহ্মণী।—তাকে অ্যাণ্টনি পুরোহিত বল না কেন, কেন তাকে তবুও বল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী।

যুক্তি নেই কারো কোনো উক্তিতে। যুক্তিই যদি থাকবে তাহলে মানুষের ধুলো-মাখা পা ধুইয়ে সেই জল পান করলেই মোক্ষলাভ হবে বলে ধারণা হয় কেন? মোক্ষলাভ?—পরলোক

প্রাপ্তিই যদি মোক্ষলাভ, তাহলে হয় তো ধারণাটা কিছু সত্যি। গায়ের ঐ ধুলোতে কত রোগের বীজ থাকে তার কি ঠিক আছে? সেই ধুলো-গোলা জল গিললে পরলোকপ্রাপ্তি অবশ্য সহজেই হতে পারে। আর, আর স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করলেই অনন্ত স্বর্গ—আশ্চর্য অন্ধ বিশ্বাস, আশ্চর্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

এই বিশ্বাস ও এই ব্যাখ্যা—এই দু'টি বিষয় থেকে যদি মুক্ত করা যায় দেশের মানুষকে তাহলেই দেশের মুক্তি। নইলে এর ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার। এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই রামমোহনের।

যারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ক'রে, সমাজে জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে নিজেদের জীবিকার সুবিধা করে নিয়েছে, সমাজের তারা পরগাছা।—সমাজের গা থেকে এদের টেনে না নামালে সমাজের কোনো উন্নতি নেই, বরঞ্চ মৃত্যু অনিবার্য। এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

বেদান্তের তরজমা করতে করতে বিকেল হয়ে এল। পাথরের রেকাবিতে আঙুর, পেঁপে আর কলা নিয়ে সামনে রেখে গেল খানসামা। ধীরে ধীরে আহার সমাপ্ত করে রামমোহন উঠে গেলেন সাজঘরে।

সাজগোজে তাঁর সময় একটু বেশি লাগে। এজন্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। এতে তুষ্টই হন রামমোহন। সর্ব-সাধারণের সম্মুখে যখন বের হতে হবে, তখন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই কর্তব্য। রাজদরবারে যাওয়ার সময়ই কেবল পোষাক হতে হবে রাজোচিত; কেন, রাজার পোষাকের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে? অমন ব্যর্থ প্রয়াস না করে এই রকম সার্থক সাজ পরলেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে হবে?

কিন্তু তর্ক করেন না রামমোহন। কোনো যুক্তির কথাও তোলেন না। রাজ-পোষাকে পরিপাটি হতে না পারলে তাঁর মন যেন পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বোধ হয় না। মনকে উৎফুল্ল রাখতে না পারলে মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ হবে কি করে?

প্রকাণ্ড আরশির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর মাথার দীর্ঘ চুল জড়িয়ে নিয়ে তার ওপর পাগড়িটা বসিয়ে নিতে নিতে নিজের মনেই একটু হাসলেন—হ্যাঁ। মৌলভীই বটে। সাজটা তাঁর মনের মতই হয়েছে।

কেউ বলে তিনি মুসলমান, কেউ বলে তিনি খৃষ্টান। নবকিশোরের কথা মনে হচ্ছে তাঁর, তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র নবকিশোর। জগন্মোহনের ও রামমোহনের বিষয়কর্ম তত্ত্বাবধান করা নিয়ে নবকিশোর হাজির হয়েছেন রংপুরে। রংপুরে রামমোহনকে তখন বেশির ভাগ দিনই খেসারির ডাল খেতে হয়, তাতে ঘি পর্যন্ত দেওয়া হত না। এইভাবে আহার করতে করতে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি তখন এক হাকিমের পরামর্শ নিলেন। রামমোহনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হাকিম তাঁকে মাংস খেতে বিধান দিলেন। বৈষ্ণব বংশে জন্ম তাঁর, এ-পর্যন্ত কখনো মাংস স্পর্শ করেন নি। কিন্তু এবার তিনি আরম্ভ করলেন মাংস খেতে। নবকিশোর রামমোহনকে মাংস আহার করতে দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন, দেশে ফিরে গিয়ে ফুলঠাকুরাণীকে বললেন, খুড়ি, রামমোহন গোল্লায় গিয়েছে, পাঁঠা খেতে আরম্ভ করেছে, খৃষ্টান হয়েছে। মুসলমান চিকিৎসক পরামর্শ দিল মাংস খেতে, সেই মুসলমানের নির্দেশে মাংস খেয়ে তিনি হয়ে গেলেন কি না খৃষ্টান।

কেউ হিন্দু বলে স্বীকার করতেই রাজি না তাঁকে। এ বড় মজার ব্যাপার। হিন্দু-ধর্মের ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেই যদি হিন্দুত্ব যায়, তবে যাক সে ধর্ম। যে-ধর্ম এত ঠুনকো, তার তবে টিকে থেকে লাভ কি। কিন্তু দোষ তো ধর্মের নয়, দোষ ওই ওদের—ঐ ধর্মব্যবসায়ীদের, সমাজের যারা পর-গাছা। ধনকে তারা এমনভাবে আগলে রাখতে চায়, যেন ওটা তাদের নিজের সম্পত্তি, ওর বিষয় কেউ কোনো কথা বলে এও ওদের অভিপ্রেত নয়। ওরা ওদের ঘরের বৌকে বুঝি এমনভাবে আগলে রাখে না। ওরা নিশ্চয় মুখস্থ করে রেখেছে—দেশে দেশে কলত্রাণি; এক বৌ গেলে অন্য বৌ নিশ্চয় পাবে; কিন্তু ধর্মটা যদি কোনো প্রকারে হাত-ছাড়া হয়ে গেল তবে যে ভাতে মারা যাবে ওরা।

মুষ্টিমেয় ক'জন লোক বাঁচল কি মরল, তা দেখে কোনো দরকার নেই, জনসাধারণের কল্যাণ কিসে, সেইটেই কেবল দেখার বিষয়।

বেদান্তের পুঁথি ভাঁজ করে রেখে রামমোহন এবার ঘর থেকে বের হলেন।

পুরণো পাল্কিটায় চারটে ঢাকা লাগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পাল্কিটা এখন তাই আর পাল্কি নয়, পাল্কি-গাড়ি। ঘোড়া জুতে দিল সহিস।

তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময় গড়পারের নিমাইচরণ মিত্র এসে উপস্থিত হলেন। রামমোহন পরিহাস করে বললেন,—কি হে মিত্রজা? ঘরে বুঝি মন বসে না?

—মন বসে। কিন্তু আমি বসি না। আমি চলে এলাম, কিন্তু মন পড়ে রইল ঘরেই। কিন্তু, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

রামমোহন বললেন, তোমরা তো সব ব্ল্যাক আদমি; তোমরা যাকে বল হোয়াইট টাউন, জোড়াসাঁকো হয়ে সেই দিকে যাব।

—কিন্তু নিমাই মিত্র একটু কিন্তু হয়ে বললেন, কিন্তু একা-একা যাওয়া কি ঠিক হবে। সবাই যে ক্ষেপে আছে, খুব শাসাচ্ছে।

—বটে? হাতের ছড়িটা দেখালেন রামমোহন, বললেন, আক্রমণের নয়, আত্মরক্ষার অস্ত্র রইল সঙ্গে।

—ওই লাঠি দিয়ে কি হবে?

রামমোহন বললেন, মুখের মতো এই ওষুধ। কিন্তু এটা শুধু নিরাপত্তির

লাঠি নয়,—এর ভিতরে হাত আছে।

হাতের গুপ্তিটা তিনি একটু নাড়লেন, নেহাৎ আবরণে আবৃত, তা না হলে বিকালের এই পড়ন্ত আলোতেও ওর অভ্যন্তরের শাণিত ইস্পাত নিশ্চয়ই ঝিলিক দিয়ে উঠত।

রামমোহন বললেন, রংপুরেও এ-ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে মিত্রজা। জ্ঞানচন্দ্রিকার লেখক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য আমাকে জ্ঞান দেবার জন্যে একদল মানুষকে ক্ষেপিয়েছিল। তারাও কিছু করতে যখন পারে নি তখন ভরসা করি, এখানেও নিজেকে রক্ষা করতে পারব।

—সহিস তো যাচ্ছে সঙ্গে?

হেসে উঠলেন রামমোহন, বললেন, হ্যাঁ, সেই তো সাহস।

ঐ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, পায়জামায় আচকানে আর পাগড়ি-টুপীতে বিশাল আর বিরাট দেখাচ্ছে। এই মানুষটিকে আক্রমণ করতে যদি কেউ আসে, তাহলে তাকেও সাবাস দিতে হবে। তার সাহসও নেহাৎ কম নয়।

—রাত্রে আসছ তো মিত্রজা? আমি কিছুকালের মধ্যেই ফিরে আসব।

খৃষ্টান, না মুসলমান এই মানুষটি? এর মধ্যে খৃষ্টানত্ব কোথায়, মুসলমান এ কোন্‌খানে? নিমাই মিত্র দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগল।

চাকা-লাগানো পাল্কিটাকে টেনে নিয়ে রওনা হল ঘোড়া। কোনো লাগাম নেই, বল্গা নেই; মোটা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটা পাল্কির সঙ্গে বাঁধা। সহিসকে পাশে বসিয়ে ঘোড়ার মুখের দড়ি ধরে বসেছেন রামমোহন।

দুষ্টু লোকের কি অভাব আছে সংসারে? নির্বোধ লোকের সংখ্যাও তো কম না। হঠাৎ যদি কেউ আক্রমণ করেই বসে তাহলে ঐ একটি গুপ্তি দিয়ে সে-আক্রমণ রোধ করা সম্ভব কি না, হয়তো ভাবছিল গড়পারের নিমাইচরণ।

রামমোহন বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে এসেছেন রংপুর থেকে। বিত্ত অর্জন ও বিত্ত সঞ্চয়ও করেছেন। এখানে এসে তিনি চারি প্রকারের কর্মসূচী নিয়ে কার্যারম্ভ করেছেন। সবই ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর আছে আরো একটি কর্ম—সেটা বিষয়কর্মের মধ্যেই অবশ্য পড়ে। যে কোনো কাজ করতে গেলেই অর্থের দরকার। অর্থ উপার্জনের পথও যখন তাঁর কাছে অচেনা নয়, তখন সেই চেনা পথটি পরিত্যাগ করাও অর্থহীন। জোড়াসাঁকোয় তিনি ব্রজমোহন মজুমদার আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে—সাহেব-পল্লীতে যান নি। সাহেব-পল্লীতে যাবার কারণ বৈষয়িক—রামমোহন তাঁর অবসর সময়ে বেনিয়ানের কাজ করছেন—সময়ের অপচয় বিশেষ নেই, কিন্তু সাহেবলোকদের জন্যে কেনাবেচার এই কাজে মুনাফা আছে।

এককালে চিত্তেশ্বরীর মন্দির থেকে কালীঘাটে যেতে হলে নিবিড় বন ভেদ করে নানা হিংস্র পশুর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে হত যাত্রীদের, কিন্তু এখন সে-পথ পরিষ্কার হয়েছে। লাল-বাজারের গা থেকে চিৎপুর ও কসাইটোলা হয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত সোজা সড়ক তৈরি হয়েছে।

দুই পাশে বড় বড় নালা, মাঝখানে পথ। ঘোড়ার মুখের রাশ ধরে সেই পথ-বরাবর চলেছে রামমোহনের গাড়ি। দু'পাশ থেকে লোকে চেয়ে দেখছে গাড়িটা।

জোড়াসাঁকোয় তিনি গাড়ি থেকে নামেন নি। ব্রজমোহনের বাড়ির ফটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাঁক দিয়েছেন—কই হে ব্রজবাবু, আছেন নাকি বৈদান্তিক-মশায়?

রামমোহনের সঙ্গে বেদান্তচর্চায় তাঁর খুব উৎসাহ, এই জন্যে রামমোহন তাঁকে বৈদান্তিক বলেই পরিহাসচ্ছলে সম্বোধন করছেন আজকাল।

ব্রজমোহন অন্দরে আছেন জেনে তিনি আর দাঁড়ালেন না, ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলেন ঠাকুরবাড়ির দিকে। দ্বারকানাথের সঙ্গে সোজাসুজি পরিহাস চলে না, নেহাৎ বালক সে। রাম-মোহনের বয়সের অর্ধেকও বয়স তার হয় নি এখনো। কিন্তু বয়সে তরুণ হলে হবে কি, দ্বারকানাথ রামমোহনের একজন সহায় ও সহচর হয়ে যে উঠবেই—এ বিষয়ে রামমোহনের যেন অসীম বিশ্বাস।

সম্মুখের খোলা চত্বরে সাদা জরির কাজ করা ঝালরদার পাল্কি রাখা। দ্বারকা কোথাও যাচ্ছে বুঝি? কোথায় চলেছে?

বরকন্দাজ এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বলল, মাণিকতলায়, মাণিকতলার বাগান-বাড়িতে।

মানুষটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি বরকন্দাজ। রামমোহন তা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন বলেই তিনিও অপেক্ষা করলেন না। সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে চিৎপুরে পড়ে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ির গা দিয়ে সোজা চললেন সাহেব-পল্লীতে।

মাণিকতলার বাগানবাড়িতে ইতি-মধ্যে একে একে সমাগত হয়েছেন অনেকে। গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, নন্দ-কিশোর বসু এসেছেন কিছু পূর্বে, একে একে দু'টি পাল্কি এল তারপর, এলেন ব্রজমোহন মজুমদার ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিছুক্ষণ পরে এলেন হলধর বসু ও নিমাইচরণ মিত্র।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, সমস্ত কলকাতা নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য। কিন্তু আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে এই বাগানবাড়ির প্রশস্ত ঘরগুলি। সুউচ্চ ছাত থেকে ঝলমল করে ঝুলছে বেলোয়ারি ঝাড়, দেয়ালগিরিতে কাচের গেলাসে জ্বলে উঠেছে সাদা মোম। আলোর ফুলঝুরি বুঝি ঝরে পড়ছে ছাত থেকে।

বিরাট ফরাসের ওপর শুভ্র তাকিয়া। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে আলাপ করছেন সমাগত অতিথিবৃন্দ। হিন্দু-ধর্মের আচার ও আচরণ নিয়ে,

সমাজের হিতসাধনের উপায় সম্বন্ধে, কলকাতার নালা-বন্ধের জন্যে উদ্যোগী হওয়া। বিষয়ে।

শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে ফটক ভেদ করে চুকল রামমোহনের গাড়ি।

তিনি ধীর প্রদক্ষেপে প্রবেশ করলেন আসরে। প্রবেশ করেই বললেন, দেরি করি নি। সন্ধ্যাটা আগেই নেমে পড়েছে।

তাঁর পরিহাসে সকলেই হেসে উঠল।

হাতের গুথিটা সোটাবরদারের হাতে দিয়ে তিনি ফরাসের ওপর উঠে এলেন, বললেন, নিমাইচরণের ভয় ছিল। আমার নাকি অনেক শত্রু, পথে কোনো বিপদ না হয়।

দ্বারকানাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, বললেন, তা আছে বৈকি। পুতুলপুজোর বিরুদ্ধে আপনি যতটা রুষ্ট, এখানকার সকলে আপনার ওপর তার চেয়েও বেশি রুষ্ট হয়ে আছে।

—সকলে? রামমোহন বললেন, ভুল হল। সকলে না। এই শত্রুরাজ্যে অনাত্মীয়ের দেশে আমার আত্মীয় আছে অনেক।

হলধর বসু বুঝি বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কারা সেই আত্মীয়?

মৃদু হাস্য করে রামমোহন বললেন, এই আসরে যাঁরা সমাগত—এঁরাই আমার আত্মীয়।

হরিহরানন্দ সানন্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, বললেন, ঠিক।

রামমোহন বললেন, ধর্মের নামে সমাজকে শোষণ করছে একদল, আর একদল ধর্মের দোহাই দিয়ে উৎকট আমোদে মত্ত। সঙ বের হচ্ছে পথে পথে। এসব ঠিক কিনা, আমরা সকলে তা চিন্তা করব, তারপর আমাদের অভিমত আমরা প্রকাশ করব অকপটে। এতে যদি কারো আপত্তি থাকে—

বাধা দিয়ে উঠলেন দ্বারকানাথ, বললেন, আপত্তি থাকবে কার?

—থাকতেও পারে তো কারও। যদি থাকে, আমরা জেনে নেব তাঁরা আমাদের আত্মীয় নন।

এর পর আরম্ভ হয় বেদান্ত নিয়ে আলোচনা, ব্রজমোহন এ বিষয়ে একটু বেশি উৎসাহী, তিনি এগিয়ে বসলেন।

ভেতরের ঘর থেকে অনুবাদটি আনিয়ে রামমোহন পড়তে লাগলেন সেই অনুবাদ। নিখুঁত গদ্যে বেদান্তের বাংলা তর্জমা।

জয়কৃষ্ণ সিংহ বলে উঠলেন ভট্টাচার্যরা খুবই বিচলিত হয়েছেন। পৌত্তলিকতার পক্ষে তাঁদেরও নাকি কিছু বলার আছে।

—বাধা নেই কিছু। তাঁরাও বলুন। যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন, এ-গৃহে পদধূলি দিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি।

একটু থেমে রামমোহন আবার বললেন, যদি পক্ষেই তাঁদের কিছু বলার না থাকে তা হলে তাঁরা এর সমর্থক হবেন কেন।

অনেক রাত্রি অবধি এই আলোচনা চলল। কিছু তর্ক-বিতর্কও হল। যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকলেই যে রামমোহনের মতের সমর্থক নন, এই আলোচনার ফলেই তা সহজে বোঝা গেল।

রামমোহন বললেন, এইটেই ভালো হল। যাঁর যা মত তিনি তা পোষণ করবেনই। এতে তিক্ততাও নেই, রুষ্ট হবারও কারণ নেই। আলোচনার দ্বারাই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে।

এইভাবে নিয়মিত আলোচনা-সভা বসেছে মাণিকতলার বাগান-বাড়িতে। এতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়তো হচ্ছে কারও, কিন্তু কেউ তার পরিমাণ করতে ইচ্ছুক নন। বেদান্তের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ ইতিমধ্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। এখন তার দ্বারানুবাদে রত আছেন রামমোহন।

ইতিমধ্যে আত্মীয়দের নিয়ে যে-সভা তার নামকরণ হয়েছে। টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, তেলিনী পাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ রায় এই সভায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। ব্রজমোহন, দ্বারকানাথ, হলধর আর নন্দকিশোর বসু নিয়মিত যোগ দিচ্ছেনই। কিছু দিন হল রাজনারায়ণ সেনও আসছেন।

হৃষ্টমনে এঁদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় দিনাতিপাত হচ্ছে তাঁর। রংপুরে থাকাকালে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল কলকাতার জন্যে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, সে ব্যাকুলতা অকারণ নয়, এখন সত্যিই যেন তিনি পেয়ে গিয়েছেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। কর্মের উদ্যমও তাই বেড়ে গিয়েছে তাঁর। তিনি উপনিষদ অনুবাদেও ব্রতী হয়েছেন।

আত্মীয়-সভার অধিবেশন নিয়মিত বসছে। এখন যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হচ্ছেন তাঁরা কেবল আত্মীয়

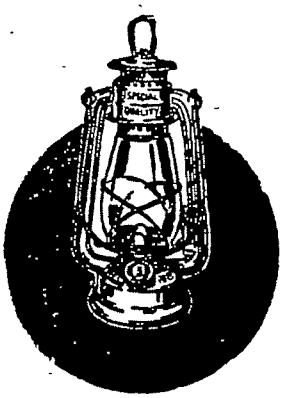

গৌরমোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৩,৪র্থ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬০৮০

যেন নন, আত্মীয়। বাইরে লোকে যা-খুশি মনে করুক,—তিনি খৃষ্টান কিংবা মুসলমান—তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। আত্মীয়-সভাব কাছে তিনি যে অশেষভাবে আত্মপরিচয় দিতে পেরেছেন, এতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন তিনি। বীজ বপন করা মাত্রই মহীরুহ হয়ে ওঠে না, তাঁর মালী রামদাস এই কথাটা প্রায়ই বলে, রামদাসের কথাটা মনে বড় আশা দেয়; বাইরের লোক আজ তাঁকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রচারিত এই মতের বীজ যেদিন মহীরুহ হয়ে উঠবে সেদিন কেউ তাঁকে ভুল নিশ্চয় বুঝবে না।

শহর কলকাতার জীবন এখনো চলেছে সনাতন প্রথায়। এখনো উৎসবের ঘট আছে, এখনও ঘটা আছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে নিয়মিত চলেছে উচ্ছৃঙ্খলতা। দোলের ফাগ ছোড়াছুড়ি, পিচকারী দিয়ে রং ছিটানো, হৈ হৈ উৎকট আনন্দ। জন্মাষ্টমীর উৎসব, নন্দোৎসবের সমারোহ।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, আমাদের বলাগড়ের পাশেই শ্রীপুর গ্রাম। সরস্বতী পূজার খুব জাঁক হল। বাগ্‌দেবী নাকি বিদ্যার দেবী। কিন্তু উৎসাহটা কুলুন। বিজয়ার দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জনের মিছিল চলেছে। শ্রীপুরের নলোরম ভট্টাচার্যের পুত্র মনোময় এক সঙ বের করে ঐ সঙ্গে। বিরাট কদাকার একটি পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়ে সেটা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় রেখে সম্মুখে রাখে এক জলপাত্র। পুলিশ খবর পেয়ে সঙশুদ্ধ মনোময়কে ধরে নিয়ে যায়, দেবতার সম্মুখে এ প্রকার কদর্য্যাচার সঙ করায় অনেক ধমক দেয়; হয়তো শাস্তিও হত বড় রকমের; কিন্তু বলাগড় নীলকুঠির কুঠিয়াল বুড়ো কুটিস সাহেব তাকে খালাস করে নিয়ে আসেন। কুটিস মানুষটা ভালো, তাই তাঁর কৃপায় বেঁচে গেল মনোময়।

রামমোহন হাসতে লাগলেন, বললেন, মনোময় তো বেঁচে গেল, কিন্তু মেরে গেল বোধহয় ঐ গ্রামের মানুষদের। ঐ সঙ দেখে তারা কি শিখল? তারা নিশ্চয় বুঝল, সরস্বতী হচ্ছেন সঙের ঈশ্বরী। যাঁরা পূজার সমর্থক, তাঁরা ঐ ব্যাপারে বাধা দিলেন না কেন?

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, তাঁরা মজা দেখছিলেন। প্রথম বাধা দেন ঐ কুটিস। তাঁর কথা না শোনায় তিনিই খবরও দেন পুলিশকে এবং তিনিই শেষ পর্যন্ত ছোঁড়াটাকে বাঁচান।

—লোকটা কে হে অন্নদাপ্রসাদ?

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর সম্বন্ধে যতটা জানেন সব বললেন। একজন আর্ত মহিলাকে পরিত্রাণ করে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন। তিনটি পুত্র আছে তাঁর এবং এক কন্যা।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুনলেন রামমোহন সেই সমাচার। এই কথা শুনতে শুনতে তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই দৃশ্যটা। সেই লেলিহান আগুনের শিখা, ঘাতকের দলের মত সেই বলিষ্ঠ মানুষের মিছিল; কানের মধ্যে বেজে উঠল আর্ত নারীর হাহাকার, আর ঢাক-ঢোল কাঁসির শব্দ। সেদিন অলকমণিকে পরিত্রাণ করতে পারে নি কেউ।

ধরা গলায় রামমোহন বললেন, খুব সাহস আছে।

—কার কথা বলছেন? ওই ম্যাকগ্রেসর কুটিসের নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, তারও সাহস আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সাহস ঐ মহিলার। সমাজের অত্যাচারকে তিনি অস্বীকার করতে পেরেছেন।

—জব চার্নকও এই রকম করেছিল।

—করেছিল। কিন্তু তা পুরণো হয়ে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তাই তার সাহস ততটা বুঝতে পারছিনে। কিন্তু এ যে একেবারে চোখের সামনে। আমার চোখের সামনে যতটা, আপনার তো তার চেয়েও বেশি। আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন তাকে।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, চাক্ষুষ দেখেছি তো আরও একজনকে—অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গীকে।

রামমোহন বললেন, ঐ কবিয়ালকে পছন্দ করিনে আমি, কিন্তু ঐ মানুষটাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ ব'লে ওকে মনেই করে না কেউ; ওর পরিচয়, ও হচ্ছে একজন কবিয়াল। যদিও জানি, মুখে মুখে কবিতা বাঁধা সহজ কাজ নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে রুচি নিয়ে। ঐ রুচি যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে সরস্বতী পূজার সঙও স্বীকার করতে হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কি জিনিষেরই প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন।

অন্নদাপ্রসাদ হয়তো এ বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে পুরো একমত হতে পারলেন না, সেইজন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন, ওদের শক্তিও তারিফ করার মত, ওই শক্তির সঙ্গে যদি উপযুক্ত শিক্ষা ওদের থাকত তাহলে কবিয়াল নয়, কবি হয়ে উঠত ওরা। ভারতচন্দ্রের মত অন্নদামঙ্গল লিখতে পারতো।

শিক্ষার কথা হচ্ছে। শিক্ষার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে অনেক হয়েছে। সে শিক্ষার সুযোগ এখন দেশের মানুষ নিলেই হল।

চিৎপুরে শেরবোর্নের সেমিনারী খোলা হয়েছে পঁচিশ-ত্রিশ বছর হল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এখানেই শিক্ষালাভ করেছেন। কলুটোলায় রামজয় দত্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন; তারপর নিত্যানন্দ সেনও খুলেছেন একটা স্কুল; জোড়াবাগানে রামনারায়ণ মিত্র স্কুল বসিয়েছেন। হাটখোলায় বসেছে রীড সাহেবের স্কুল, ধর্মতলায় বসেছে ধর্মতলা অ্যাকাডেমি—চার-পাঁচ বছর হল ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ক্রমশ।

ভাগবত-পাঠকের নাম গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়। আছেন সরকার-মশায়ের বাগানবাড়িতে। অদ্ভুত অমায়িক ভদ্রলোক। জলপাইগুড়ির দিকে কোথায় বাড়ি, জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভাগবতপাঠ করাই তাঁর একমাত্র জীবিকা। আবার নেশাও বটে। কোন কারণে একদিন আসর না বসলে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে যায়।

সকালে দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেও কথায় কথায় শাস্ত্র আলোচনা সুরু করেন। বলেন, আরে ভাগবতের মত এমন শাস্ত্র কি আছে? সেই মৈত্রেয়ী আর নচিকেতার অমৃতত্ব পাওয়ার কাহিনী—আরও কত যে কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

আরো একদিন। তোমার জ্যাঠা-মশায়ের বাড়িতে ভাগবতের আসর বসল। আবার লোকে লোকারণ্য চারিদিক। আসর জমে উঠেছে খুব। আবার এক কাণ্ড ঘটে গেল।

তোমার জ্যেঠামশায়ের বাড়ির উল্টোদিকে হচ্ছে—তুমি জানো, যোগী সরকারের বাড়ি। আসর যখন গোপীবাবুর সুললিত ভাষ্যের ঝঙ্কারে একেবারে মুগ্ধ, তখন একেবারে একটা ভগ্নদূতের মত এসে ঢুকল যোগী। আর সে কি কান্না।

হরিশবাবু কাছে গেলেন,—কি হয়েছে—কি হয়েছে যোগী?

—আমার শোবার ঘরের জানলার নীচে কে একজন আড়ি পেতে দাঁড়িয়েছিল—ডাকাতি হয়তো করবে, চৌধুরীবাবু।

তোমার জ্যাঠামশায় বললেন, তুমি ভয় করো না যোগী। আমরা পাঁচজনে তো আছি—

সেদিনও আসর আর বসল না। গোপীনাথের মুখেও চিন্তার ছায়া নামল। জ্যাঠামশায়কেও বিমর্ষ মনে হল। শ্রোতারা যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল। তাদের সকলের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। রাত্রে তাদের গাঁয়ে কে আসে, কারা আসে। কেন লোকের বাড়ির আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে? কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা যেন বিলপাড়ার ওপরে খড়্গের মত ঝুলছে।

একদিন সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেল সব কিছু। থাক সেসব কথা। পরে বলব।

আগে বলি কেমন করে তোমাদের গ্রামের লোকেরা মস্ত একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে বেঁচে গেল।

সরকারমশায়ের বাড়িতে যেদিন আসর বসেছিল। সেদিন এক বুড়িও যেন কাকে দেখেছিল, ভয় পেয়েছিল। সরকারমশা। তখন যা ভেবেছিলেন, চৌধুরীমশাই মানে তোমার জ্যাঠামশা ও তাই ধারণা করলেন।

কি সেই ধারণাটা?

গ্রামে ডাকাতি হতে পারে। কোন বড় রকম ডাকাতি হওয়ার আগে ডাকাতদের গুপ্তচররা গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির আশেপাশে ঘোরে। দেখে রাখে কোথায় খিড়কীর দরজা, কোথায় শোয়ার ঘর, কোন ঘরে থাকে সিন্দুক। তারপরে একদিন চল্লিশ-পঞ্চাশটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে মার মার করে এসে পড়ে সেই বাড়ির ওপরে। তাই—

বিলপাড়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর দায়িত্ব, তাঁর কর্তব্য গ্রামকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা।

তিনি গ্রামের যুবকদের ডাকলেন। বললেন, তোমরা একবার ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি করেছিলে। আবার করতে হয়, বুঝলে। এবার ধানটান ভাল হয় নি। চুরি-ডাকাতি খুব বেশি হবে—

ছেলেরা চুপ করে থাকল।

—কি, তোমরা চুপ করে রইলে যে? তোমাদের অসুবিধা কি—বাধা কি, বলো—

—গোটা ছয়েক টর্চ চাই আর লাঠি চাই—

—ও এই কথা। হাসলেন সরকার-মশা। বললেন, আমি আজই বগলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বালুরঘাট। আট ব্যাটারীর টর্চ নিয়ে আসবে ছ'টা। আর তোমরা রাত্রে আমার বাগান-বাড়িতেই সেণ্টার করবে। চা-টা ইত্যাদির সব ভার আমার—

ছেলেরা খুশি হয়ে চলে গেল। এলেন গোপীনাথবাবু। বললেন, আমি আজই চলে যাবো সরকারমশা—

—কোনদিকে যাবেন?

দেশের দিকে মানে জলপাইগুড়িতেই ফিরে যাবো। আপনাদের এ অঞ্চলের অবস্থা খুব ভাল নয়। বায়না-টায়না আর তেমন পাচ্ছি না—

কয়েকদিন পর।

গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীর ছেলেরা বেশ মন দিয়ে কাজ করছে। ওরা ছোট ছোট এক একটা দলে ভাগ হয়ে গ্রামের চারিদিকে টহল দিত। দূরে অন্ধকার মাঠে হয়তো দপ্ করে জ্বলে উঠতো আলো। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠতো এই—হো—হো—হো—হো—

সেই চীৎকার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দল উত্তর করতো হেঁকে। দেখা যেত মাঠের সেই আলো নিভে গেছে।

তুমি নিশ্চয়ই জানো শঙ্কর, গ্রামে ডাকাতি করার কায়দা-কানুন একটু অন্যরকম। যে গ্রাম দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য, সেই গ্রামের চারিদিকে ওরা রাত্রে ঘোরে। হাতে থাকে মশাল। কোন গ্রামের লোক যদি জেগে থাকে, তাহলে সেই আলো দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠবে। আর যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। একেবারে বিনাবাধায় চলে আসে। সঙ্গে থাকে ঢেঁকি।

ঢেঁকিটা দু'টো বাঁশ দিয়ে ঝুলিয়ে ধাক্কা দেয় দরজায়। তারপর বন্যার জলের মত ওরা চুকে পড়ে হু হু করে।

শুধু বিলপাড়ায় নয়। এ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গ্রামেই শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে সুরু করে একেবারে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রাত্রে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বিলপাড়ার ডিফেন্স পার্টি বেশ কাজ করছিল। কিন্তু—

একদিন অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। একেবারে অদ্ভুত। তুমি বিলপাড়ার যে কোন প্রাচীন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।

মাথা নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন মণীন্দ্রবাবু। বিচিত্র দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ধীরে ধীরে চাপা গলায়—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মনে বেশ দৃঢ়তা আছে বাবা। তাই কিন্তু এত কথা বলছি। কাউকে বলো না যেন—

—না বলবো কেন?

আচ্ছা, সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা তোমাকে বলার আগে দু'টো ডেভেলপমেণ্ট বলা দরকার। এক নম্বর, ঠিক একমাস দশ দিন পর জামিনে খালাস হয়ে গেল রাধা। সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। শুধু শুধু সাসপেক্টেড বন্দীকে আর কতদিন রাখা যায়?

খুনের কেস। 'সাসপেক্টেড' আসামী। জামিনে ছেড়ে দেওয়া মুস্কিল ছিল। কিন্তু ওর বাবা রতন ঘোষ চৌকিদার। তার বাড়িঘর আছে খাসপুরে। অতএব বেল পেয়েছিল। কিন্তু—

শিবু, যতীন, মংলা, যাত্রাদলের আরও ছেলেরা, যাদের হাজতে রাখা হয়েছিল, তাদের কেউই ছাড়া পেল না। যাক ওদের কথা—

দুই নম্বর হচ্ছে, তদন্ত যখন জোর চলছে, তখন একদিন আমার কাছে এল একটি ঘোমটাপরা বৌ। সরকার-মশায়ের বাগানবাড়িতেই ছিল পুলিশের ডেরা।

সেপাই এসে বলল, দারোগাবাবু, একটি মেয়েছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

—ভেতরে নিয়ে এস।

এল। বুক অবধি ঘোমটা। মুখ দেখার উপায় নেই। তবে গলার আওয়াজ শোনা গেল—

—দারোগাবাবু,—আপনার তদন্তের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে এসেছি—

উচ্চারণ স্পষ্ট। কলকাতার মত ভাষা। বিলপাড়া, খাসপুরের মত একটুও টান নেই। অবাক হলাম।

—আপনার পরিচয়?

—আমি আপনাদের সন্দেহ করে ধরে রাখা যে ক'জন আছে, তাদের একজনের বৌ।

—কে মংলা?

—না।

—রাইচরণ সরকার?

—না।

—ঘোষাল?

এবার ঘাড় কাত করল সে। ঘোমটার ভেতর থেকেই চারদিকে তাকিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, দারোগাবাবু সে-ও তো ঐ রাধার ওখানে ওঠাবসা করতো। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ঘোষালের বৌ। বলল, রাধা কিছু করুক আর নাই করুক ওকে ছেড়ে দিলেন কেন আপনারা? কেন খালাস করে দিলেন—গ্রামের কোন্ বাবু ওই মাগীর বশ নয়?

হাঁফাতে লাগল। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। বুকের ভেতরটা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। বলল, দারোগাবাবু যদি ওই বেশ্যাটাকে ছাড়িয়েই দিলেন তাহলে একটা—একটা অনুরোধ করবো—ওকে—ওকে ছেড়ে দেবেন না—খবরদার ছেড়ে দেবেন না—বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে। খসে পড়ল ঘোমটা। আর আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রীতিমত সুন্দরী। বুদ্ধিমতী। পাশাপাশি হারু ঘোষালের বোকা-সোকা মোটা চেহারাটা মনে পড়ল। মেয়েটির জন্য দুঃখ হল। মনে হল বানরের গলায় মুক্তোর মালার উপমাটা কত সত্যি আর কি নিষ্ঠুর।

---কাঁদতে কাঁদতে বলল, দারোগাবাবু, বিয়ের পর—সেই চার-পাঁচ বছর থেকেই এই জ্বালায় জ্বলছি। বাবা দিয়েছিলেন ওর হাতে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না এই আশায়। সে-অভাব নেই। কিন্তু—

—আচ্ছা—আচ্ছা দেখছি, আমি কি করতে পারি—বলে তাকে আশ্বস্ত করে পাঠিয়ে দিলাম। আর ওর চেয়ে বেশি কি বলতে পারি বলো? হাজতে আটকে রাখা, খালাস দেওয়া কি আমার একার হাত নয়।

কিন্তু আমার এবং ডি-এস-পি সাহেবের মনে হল, হারু যে হঠাৎ অত চটে উঠেছিল—কেন? শুধু কি চারুর বইয়ের জন্যই না আর কিছু।

কিন্তু অসুবিধে কি জানো, হারু ঘোষালের বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ নেই। তুমি হয়তো ভাবছো, পুলিশের তো প্রচুর বদনাম আছে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কেস সাজানোর। কিন্তু তুমি জেনে রেখ, পুলিশ অর্থাৎ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এক্সিকিউটিভের সঙ্গে জুডিশিয়ালের সম্বন্ধ অহি-নকুলের মত। একটু ফাঁক পেলেই হাকিম একেবারে কেসের দফা রফা করে দেবে। সেই সঙ্গে ইনভেস্টিগেটিং দারোগাটির সার্ভিস বুকে পড়বে কালির দাগ। যাক সে-সব কথা।

এই ঘটনাটা বললাম, তার কারণ তুমি বুঝতে পারবে, চারুর কেসের উপসংহারটা আর ত্রিশবছর আগে গ্রামদেশের মানুষের নৈতিক চরিত্র কি রকম ছিল, কি ভাবে জীবনযাপন করতো তারা—সে সম্বন্ধেও তোমার ধারণাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মণীন্দ্রবাবু বুড়ো মানুষ। হয়তো বহুদিন পর আমার মত শ্রোতা পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছেন। একসঙ্গে একদমে সব—সব কথা বলে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ক্লান্ত—খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবুও তিনি ধীরে ধীরে আবার বলতে সুরু করলেন, এবার শোন, ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির ব্যাপারটা। হঠাৎ একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গ্রামে কারো কাছে শোনো নি তো?

—না।

—তোমার জ্যাঠামশাই কিছু বলে নি তোমাকে?

—এসব কথা তুললে বড় বিরক্ত হন তিনি।

—বিরক্ত হন? হাসলেন মণীন্দ্রবাবু। হাসিটা বেশ অর্থপূর্ণ মনে হল। অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে আমার মন জ্বলে যেতে লাগল। জ্যাঠামশাই---- মনে হল মাটি না খুঁড়তে গেলেই ভালো হতো। ত্রিশটি বছরের পলি পড়েছে যে ঘটনার ওপরে—সেই ঘটনা তো মাটির বহু—বহু নীচে অন্ধকারেই লুকিয়ে আছে। তাই থাকতো। এখন যদি এমন কিছু বেরিয়ে পড়ে যাতে জ্যাঠামশাই—

—হ্যাঁ শোন, তোমাকে আগেই বলেছি ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পাড়ার পাড়ায় ঘুরতো। তোমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তোমাদের গ্রাম বিলপাড়ার উত্তরে হলো মশানকালীর থান। তার পাশে একটা পুকুর আছে। পুকুরটার নাম—

—আমার মনে নেই। আমি জানি না—

—হ্যাঁ মনে পড়েছে ভূতকুঁড়ির পুকুর। সেই পুকুরের পুবপাড়ে ছিল দু'টো বেলগাছ। জোড়া বেলগাছ। সেই বেলগাছের নীচে দাঁড়ালে দেখা যায় ধুধু ফাঁকা ধানের মাঠ আর তার বুক চিরে চলে গেছে সেই রাস্তাটা—

বাউল-খাসপুরের রাস্তা। তার দু'দিকে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে অনেক আলপথ। আল ধরে ধরেই নিশাচর দুর্বৃত্তরা যাওয়া-আসা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাই পাহারাদার ছেলেরা এই বেলগাছের নীচে একটা ডেরা বাঁধল। ডেরা মানে আর কি—বাঁশের তৈরি একটা মাচা। মাচার ওপরে তারা বসতো বিশ্রাম করতে। রাউণ্ড দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো তারা। কিন্তু এই মাচার ওপরে বসলে একসঙ্গে দু'কাজই হতো। আলপথ দিয়ে ডাকাতরা যাওয়া-আসা করতো মশাল জ্বালিয়ে। সেই মশালের আলো তারা লক্ষ্য করতো। পাহারা দেওয়াও হতো—আড্ডাও হতো।

আর, আরও একটা বিশ্রামের জায়গা ছিল ওদের।

তোমাদের ওই পশ্চিমপাড়ার কামরাঙাতলার পুকুর।—তুমি চেন তো! সেই পুকুরের দক্ষিণ পাড়েও ওদের আরও একটি মাচা ছিল।

ওদের যে দল পশ্চিমপাড়ায় রাউণ্ড দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা বসতো কামরাঙাতলার পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের মাচায়।

একটা দল বসেছিল ভূতকুঁড়ির পুকুরের পাড়ের মাচায়। তারা বিশ্রাম করছিল। বিড়ি ফুঁকছিল। গল্প-গুজব করছিল। হঠাৎ তাদের একজন, বোধ হয় নিশি তার নাম—নিশি বলে উঠল—এই থাম তো তোরা—দেখ—চারু দাসের তালাবন্ধ বাড়িটার দিকে কে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

(ক্রমশ)

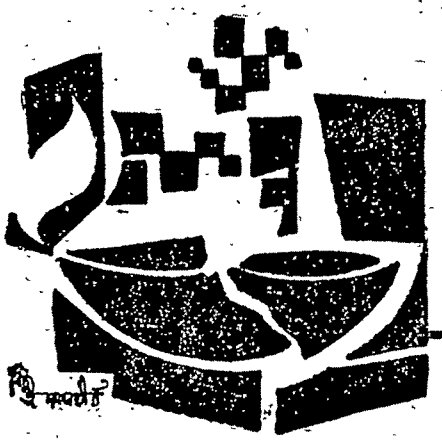

* ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'তন্তুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

উনচল্লিশ

প্রদীপ নিভে যাবার আগে হঠাৎ এক সময় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনিই যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বিজয়। আনাগোনা সুরু করল রতনের স্কুলে। সুবিধে পেলেই টিফিনের সময় গিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, সামর্থ্য মত কখনও নিয়ে যায় সন্দেশ, রসগোল্লা, কখনও বা কেক-বিস্কুট, নয়ত লজেন্স-চকোলেট।

প্রতিদিন টিফিনের সময় রতন ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে আসে, উৎসুক চোখে খোঁজে তার বন্ধুকে, বিজয়কে দেখলে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, এই তো বন্ধু এসেছে।

বিজয় মৃদু হেসে তার কাছে এগিয়ে আসে।

বালক রতন বিজয়ের পকেটের ওপর উঁকি মারে, আজ কি এনেছ দেখি।

বিজয় পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি বল তো-কি?

—নিশ্চয় মিষ্টি এনেছ।

উঁহুঁ, হেরে গেলে, আজ শুধু লজেন্স এনেছি।

রতন ঠোঙাটা হাতে নিয়ে তার স্কুলের সঙ্গীদের ডাকে, এদিকে আয়, বন্ধু তোদের জন্যে লজেন্স এনেছে।

হুড়মুড় করে এক ঝাঁক ছেলে ছুটে আসে, নিমেষের মধ্যে ঠোঙা খালি হয়ে যায়, মুখে লজেন্স পুরে তারা কলরব করতে থাকে।

এক এক দিন তারা সদলবলে বিজয়কে টানতে টানতে নিয়ে যায় স্কুলের পিছন দিকের মাঠে গাছের ছায়ায় বসিয়ে আবদার ধরে, আমাদের গল্প বল।

বিজয় হয়ত আপত্তি করত, আমি তো গল্প জানি না।

তারা সেকথা উড়িয়ে দেয়, যা রতন যে বলে বহু চমৎকার গল্প বলতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে রতনও যোগ দেয়, গল্প বল না, ওরা তো কখনও শোনে নি তোমার মুখে।

অগত্যা বিজয়কে গল্প বলতে হয়, বেশির ভাগই এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, মকের ধনের সন্ধানে দুঃসাহসিক বাঙালী যুবক গেছে নাম-না-জানা দেশে। ছোটবেলায় পড়া গল্প বিজয়ের আবছা মনে পড়ে, তারই সঙ্গে পরিণত বয়সের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা যোগান দিয়ে এক উদ্ভট রহস্যময় গল্পের সৃষ্টি করে। ছেলেরা তন্ময় হয়ে শোনে, তারা মনে মনে প্রার্থনা করে টিফিন শেষের ঘণ্টা বাজাতে দারোয়ান যেন ভুলে যায়, কিন্তু সে ভোলে না। আধঘণ্টা বাদেই ঘণ্টা বেজে ওঠে, ছেলেদেরও উঠে পড়তে হয়, তারা সমস্বরে অনুরোধ করে, বন্ধু, কাল তুমি এস কিন্তু, গল্পটা শেষ হল না।

ধারাবাহিক উপন্যাসের মতই প্রতিদিন ক্রমশ ক্রমশ করে গল্প বলতে হত বিজয়কে। অবশ্য এ ধরণের গল্প বলার সুবিধেও আছে, সারা দিনে ভেবে রাখতে পারত কোথা থেকে গল্পের সূত্র টানবে। রতনের বন্ধুদের গল্প শোনার চাহিদা মেটাতে বিজয়কে আজকাল কিছু কিছু ছেলেদের গল্প-উপন্যাস পড়তে হয়, বাড়িতে সে ছেলেদের কাছে খোঁজে, হ্যাঁ রে তোদের গল্পের বই আছে? দে না পড়ে ফিরিয়ে দেব।

তারা খুশি হলে দেয়, নয়ত দেয় না।

অন্যমনস্কভাবে বিজয় একদিন ইনা বৌদির কাছেও পড়বার জন্যে বই চেয়েছিল।

ইনা কিন্তু না হেসে পারে নি, এ আবার তোমার কি খেয়াল ঠাকুরপো, হঠাৎ বাচ্চাদের বই পড়বে কেন?

নির্বিকার বিজয় বলে, দাও না, দরকার আছে।

ইনা খানদুই ইংরিজী গল্পের বই দিয়েছিল, ছেলেদের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস, বিজয় তাও মন দিয়ে পড়েছে। সে গল্পও শুনিয়েছে রতন আর তার সাঙ্গপাঙ্গকে।

কিন্তু শুধু তো গল্প বলাই নয়, আরও অনেক কথাই হয় রতনের সঙ্গে, যেদিনই তারা দু'জন একলা থাকে।

রতন হয়ত জিজ্ঞেস করে, তুমি আমার মাকে দেখেছ? বিজয় চমকে ওঠে, রতনের কথার অর্থ সে পরিষ্কার বুঝতে পারে না।

—তোমার বাবা— বিজয় থেমে যায়।

রতন প্রশ্ন করে, তোমাদের বাড়িতেই তো থাকতেন।

—হ্যাঁ।

—আমি কখনও দেখি নি?

বিজয় কৌতূহল দমন করতে পারে না, জিজ্ঞেস করে, কেন?

রতন সগর্বে বলে, আমার বাবা যে দেশের কাজ করতেন। ইংরেজরা ওঁকে ভয় করত, নেতাজীদের মত জেলে ভরে রাখত। কেন, তুমি এসব কথা জান না?

বিজয় মৃদুস্বরে বলল, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তুমি কার কাছে শুনলে?

—বাঃ, মা আমায় বলে যে। বাবার যে এত কাজ, তাই তো আমাদের কাছে আসতে পারে না। দাদুর কাছে আমাদের রেখে গেছে। আমি কিন্তু বড় হয়ে বাবার সঙ্গে কাজ করব।

বিজয় কোন উত্তর দেয় না, লক্ষ্য করে রতনের চোখ-মুখ বাবার কথা বলতেই কি রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কতখানি শ্রদ্ধা, কতখানি ভালবাসা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রতন বলে, তোমার সঙ্গে যদি বাবার কখনও দেখা হয়, বলো, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

বিজয় দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, বেশ বলব।

এ প্রতিশ্রুতির হাত থেকে কিন্তু বিজয় সহজে অব্যাহতি পায় নি। প্রায়ই রতন জিজ্ঞেস করে, তোমার সঙ্গে বাবার দেখা হয় নি?

বিজয়কে বলতে হয়, না।

—নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছেন, যখন বাড়িতেই আসতে পারছেন না।

মানুষের যে শুধু নেওয়ার লোভই বাড়ে তা নয়, দেওয়ার লোভও বেড়ে যায়। বিজয়ের এখন আর সামান্য মিষ্টি লজেন্স রতনকে দিতে মন ওঠে না, সে চায় আরও কিছু কিনে দিতে। কিন্তু সেখানে সেই চিরন্তন প্রশ্ন, টাকা যোগাবে কে?

বিজয় মনস্থির করল সে চাকরি করবে, কিন্তু এই বয়সে কাজ পাওয়াও শক্ত। শরীরে জোর কম, বয়সও হয়েছে, কি কাজের জন্যেই বা লোক তাকে নেবে। তবু সে রাঙাদা'র কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দাও না।

রাঙাদা' বিস্মিত হলো, চাকরি, হঠাৎ?

—না মানে, বসেই তো আছি। একটা কিছু করলে হয়।

রাঙাদা' না বলে পারল না, সারা জীবনটাই তো বসে রইলি।

বিজয় অন্যদিকে তাকাল, নির্বিকার স্বরে বলল, ভুল হয়ে গেছে।

—বড় দেরীতে বুঝলি।

চাকরি নিয়ে কিন্তু রাঙাদা' বিশেষ উৎসাহ দেখাল না, মনে মনে ভাবল, কি হবে বিজয়কে চাকরিতে ঢুকিয়ে। পয়সার অভাবে এখন হয়ত কম মদ খায়, হাতে টাকা এলে মাত্রা বাড়াবে। তার চেয়ে যেমন আছে থাক।

বিজয় কিন্তু দমল না, গেল ঝণ্টুর সঙ্গে দেখা করতে, ঝণ্টু লুঙ্গি পরে বাগানে ফুল গাছে জল দিচ্ছিল। বিজয়কে দেখে মুখ না তুলেই বলল, কি টাকার দরকার? দু'টাকার বেশি কিন্তু আমি দেব না।

বিজয় গম্ভীর গলায় বলল, না, টাকার জন্যে আসি নি।

ঝণ্টু এবার চোখ তুলে দেখল, তবে? কি ব্যাপার?

—একটা কাজে ঢুকিয়ে দাও না।

—কাকে? তোকে? দু'দিন বাদেই তো ছেড়ে দিবি।

—না, এবার আমি কাজে মন দেব।

ঝণ্টু এড়িয়ে গেল, দেখি, যদি কোন সুবিধে মত কাজ পাই তোকে বলব।

বিজয় তবু বলল, বেশি মাইনে চাই না, এখন যা হোক কিছু পেলেই হবে।

—কেন, নেশার পয়সা জুটছে না বুঝি?

বিজয় প্রথমটা চুপ করে রইল, তারপর বলল, আমি আর মদ খাই না, ছেড়ে দিয়েছি।

একথা ঝণ্টু বিজয়ের মুখে আগে এতবার শুনেছে যে না হেসে পারল না, কবে থেকে? আজ সকাল থেকেই বোধহয়।

বিজয় বুঝল ঝণ্টু তার একটা কথাও বিশ্বাস করছে না, সেইদিনই গিয়ে দেখা করল বিশ্বনাথের সঙ্গে তার বাড়িতে। বিশ্বনাথ তখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ড্রইংরুমে বসে গল্প করছিল, এমন সময় বিজয়কে দেখতে পেয়ে বিরক্ত হল, চেঁচিয়ে বলল, তুই বাইরে বোস, আমি আসছি।

বিজয় চুপচাপ একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে রইল। ভেতরে গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে করল না। দাদাদের ঘর থেকে হাসির উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। বড়লোক বন্ধুরা মিলে গাড়ি করে কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে, তারই তোড়জোড় চলেছে আর কি।

বিজয় বসেই রইল, কখন বিশ্বনাথের সময় হবে, কে বলতে পারে? যদি একটা চাকরি সে পেয়ে যায়, প্রতিদিন রতনের কাছে যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না, ছুটি পাবে না কাজ থেকে, কিন্তু সপ্তাহে একদিন অন্তত সে যাবেই। মাইনের টাকা হাতে থাকলে জিনিষ-পত্তর কেনার কোন অসুবিধে হবে না। মন দিয়ে চাকরি করলে নিশ্চয় উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে। ঘরদোরগুলো গোছালে হয়, নোংরায় ঝুলে ভর্তি হয়ে আছে। পরিষ্কার করে দেয়ালে রঙ দিলে আবার চমৎকার দেখাবে। রতন আসবে, গল্প করবে, জীবনটাকে বোধহয় ফেলে সাজানো যায়। অনেকেই তো দেরীতে জীবন সুরু করে। বিজয়ও না হয় তা করল।

কিছু আনবার জন্যে বিশ্বনাথ ঘর থেকে বেরল, বিজয়কে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এই যা, তুই বুঝি তখন থেকে বসে আছিস, কথা বলতে বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম; মা'র কাছে গেলি না কেন?

বিজয় বলল, না, তোমার সঙ্গেই একটা কথা ছিল।

—আজ থাক রে, আমি বড় ব্যস্ত, পকেট হাতড়ে এক টাকার নোট বার করে বিজয়ের হাতে ধরিয়ে দেয়, আর একদিন আসিস।

বিজয় বাধা দিয়ে বলল, দাদা আমায় একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে?

বিশ্বনাথ কথাটা কানেই তুলল না, বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, সব দেব। দেখছিস না ওঘরে অনেকে বসে আছে আমার জন্যে। নে ধর, আর একটা টাকা রেখে দে।

বিশ্বনাথ আর দাঁড়াল না, দ্রুত বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল বিজয়। বুঝল এরা কেউই তাকে চাকরি করে দেবে না, দোষ তাদেরও দেওয়া যায় না। বিজয় তো তাদের কম জ্বালায় নি। কে আর ভরসা করে এখন তার জামিন হবে। তার চেয়ে দু'পাঁচ টাকা সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত।

সেদিন দু'টাকার ভাল কচুরি আর সিঙ্গাড়া কিনে বিজয় হাজির হল রতনের স্কুলে। ছেলেরা আনন্দ করে খেল, কিন্তু রতন খুশি হতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোমার বন্ধু? মুখ শুকনো কেন?

বিজয় জানাল, কিছু না।

—অসুখ করে নি তো? দেখি কপালে হাত দিয়ে—জ্বর হয়েছে কিনা।

ছেলেরা কেউ কপালে হাত দিল, কেউ গায়ে, শেষ পর্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করল, না, জ্বর হয় নি।

ছেলেরা গল্প বলার জন্যে অনুরোধ করেছিল, বিজয় বলল, না, আজ আর পারছি না। আর একদিন বলব।

গল্প বলা হবে না শুনে আস্তে আস্তে ছেলেরা চলে গেল। রতন বলল, বন্ধু, একদিনও বিকেলবেলা তুমি আসছ না; মা তোমার সঙ্গে খুব দেখা করতে চাইছেন।

বিজয় দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখা ঠিকই করব।

—কবে?

—তা তো বলতে পারছি না। যেদিন ছুটি পাব, সেইদিন।

—তাই বলব মাকে।

বিজয় রতনের স্কুল বসে যাবার পর হাঁটতে হাঁটতে চলে এল স্টেশনে। এক ভাঁড় চা কিনে খেল, আরও দু'চারজন বসে গল্প করছে। হঠাৎ কানে গেল, একজন বলছে, ভাল লোক একটা দাও না। ঠিকাদারির কাজ, কত আর একলা সামলাব? রাত্রের ঘুম বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে।

বিজয় মনে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেল সে ভদ্রলোকের কাছে, লোক খুঁজছেন? আমি কাজ করতে পারি। ভদ্রলোক তখন চায়ের ভাঁড় শেষ করে পান চিবুচ্ছেন। বিজয়ের আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন, কি করেন?

বিজয় মাথা নাড়ল, কিছু না।

—কি পারেন?

—সব রকম পারি।

—পড়াশোনা?

—আই-এ ফেল।

ভদ্রলোক সত্যিই লোকের জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন, সাগ্রহে বললেন, ওতেই চলবে, লিখতে পড়তে জানলেই হল। মালপত্তর এলে চালান দেখে বুঝে নেওয়া, মিস্ত্রীরা কাজ করছে কিনা দেখা, এই সবই তদারক করতে হবে, বুঝলেন না? কাজ তেমন একটা কিছু নয়। পারবেন তো?

বিজয় বলল, পারব।

আর একজন বুদ্ধি দিল, আহা ভদ্রলোকের রেফারেন্স নাও, ছট্ করে কাজে ঢুকিয়ে নিচ্ছ যে?

ঠিকাদার এ কথায় হাসলেন, ওসব আমি বিশ্বাস করি না। অনেক হোমরা-চোমরা লোকের চিঠি নিয়ে লোক এসেছে, দেখেছি, পরে হয়ত বেরিয়েছে এক নম্বর চোর। আমি নিজে কাজ বুঝি, লোক রাখব, দেখব সে কিরকম কাজ করে, ব্যস। এবার বিজয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তবে আর কি? চলুন আজ থেকে কাজে লেগে পড়বেন। স্টেশনের কাছেই আমার গুদাম, আগে থেকে বলে দিচ্ছি, মাইনে বেশি দিতে পারব না। প্রতি হপ্তা পনের টাকা, চলবে তো?

বিজয় সাগ্রহে জানাল, হ্যাঁ চলবে।

—কোথায় থাকেন?

—কলকাতায়।

—এই সেরেছে, যেতে আসতেই তো দু'ঘণ্টা নষ্ট হবে। এদিকে থাকলে হয় না। বলেন তো আমার গুদামেই একটা ছোট ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। খাটিয়া টাটিয়া সবই আছে, শুধু খাবার ব্যবস্থাটা করে নেওয়া।

জলে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন খড়কুটো চেপে ধরে তেমনি বিজয় এ চাকরির প্রস্তাব আঁকড়ে ধরল, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব, যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই থাকব, যা মাইনে দেবেন তাই নেব।

ভদ্রলোকের চোখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল, তবে আর কি চলুন।

বিজয় ভদ্রলোকের সঙ্গে রিক্সায় উঠে বসে, উনি অনর্গল কথা বলে চলছেন, কিন্তু বিজয়ের কানে কিছুই ঢুকছে না, সে আবার সেই ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন দেখছে, হপ্তায় হপ্তায় টাকা আসছে, মাইনে বাড়ছে, বাড়ির ঘরগুলো সে সাজিয়েছে, নতুন রঙ, পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র, রতন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তার স্কুলের সঙ্গীরাও এসে গল্প করছে। বাড়ির সবাই অবাক হয়ে দেখছে, শেষ পর্যন্ত বিজয় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, কারুর কাছ থেকে সাহায্য না পেয়েও।

তার চোখের সামনে একটা ছবি ভাসছে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে, খাটের ওপর বিজয় বসে, রতন হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকল, কিন্তু বারে বারে ফিরে তাকাচ্ছে দরজার দিকে, কেউ যেন আসবে তারই প্রতীক্ষা করছে।

বিজয় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, দরজার ওপাশে কে আত্মগোপন করে রয়েছে। রেণুকা কি?

বিজয় মাথা নাড়ল, না, সে আর নেই, তবে যে আসতে পারে সে হলো রতনের মা, যে বিজয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

(ক্রমশ)

# আজকের পশ্চিম জার্মানী

—মৈত্রেয়

## নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার···

জনচিত্তে জার্মানীর পরিচয়ের সঙ্গে যেন যুদ্ধ এই শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে এই স্বভাব-যুদ্ধবাজদের চিত্ত সংশোধনের চিন্তা রাশিয়ার যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার। শক্তিমান বীভৎস হিটলারের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীশক্তির ধ্বংস হয়। কিন্তু তবুও 'হিটলার মরে নি' একথা ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ হিটলার-বাদীদের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এলো কূট-নীতির মারপ্যাঁচ। এলো রাজনীতির গুরুত্ববোধ। জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হ'ল। এক খণ্ড পশ্চিমীদের তাঁবে। অপর খণ্ড রাশিয়ার। দুই জার্মানীর দুই পথ।

পটপরিবর্তনে দেখা গেল পশ্চিমী-গোষ্ঠীদের জার্মান-ভীতিটা কেটে গেছে। পক্ষান্তরে এলো কমিউনিজম-ভীতি। অতএব পশ্চিম জার্মানীকে অর্থনৈতিক সুযোগ দাও। ওরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। এলো অর্থনৈতিক সাহায্য আমেরিকা থেকে। পশ্চিম জার্মানী দেখতে দেখতে কয়েক বছরে অর্থে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে আবার বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে। কিন্তু হিটলারের আ । অশরীরীর মতো বুঝি আস্তানা করে বসেছে পশ্চিম জার্মানীর প্রশাসন মহলে। তাই ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানীর উচ্চ মহলে বৈদেশিক নীতিতে দেখা দিয়েছে সামরিক মানসিকতার পথ। যে পথে একদিন হিটলার তার শক্তিকে বাড়িয়ে নিয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সহানুভূতিতে ; সেই কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে চ্যান্সেলার আদেনুর পশ্চিম জার্মানীর শক্তি এমন বাড়িয়েছে যে, তাকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড আজ ভাবতে সুরু করেছে। যে ন্যাটো চুক্তিতে ছিল না এতটুকু নাক গলাবার অধিকার, তাতে পশ্চিম জার্মানী আজ অংশীদার হতে চায়, এমন কি পারমাণবিক বোমা তৈরি করার অধিকার চাইতে দ্বিধা বোধ করছে না।

কিন্তু যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পটভূমিকার ভাগ্যও আজ সীমাবদ্ধ। আবার আঞ্চলিক বিস্তার হবে, উপনিবেশ হবে কিংবা এসব দেশের সাম্রাজ্য হবে এ চিন্তা আজকের দুনিয়ায় অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। হিটলারের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী যা পারে নি, যা ইংরেজ-ফরাসী আজ হারাচ্ছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শক্তিমান আমেরিকাও যখন একচেটিয়া কর্তৃত্ব

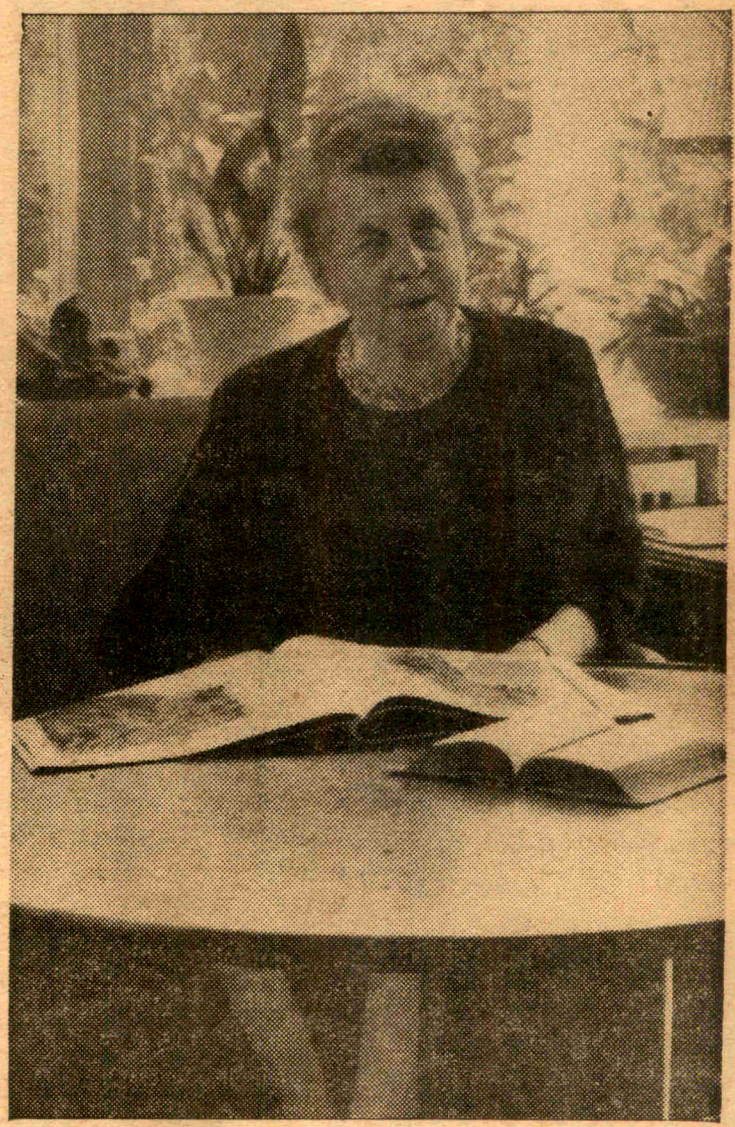

● শ্রীমতী লুইসে এরহার্ড সাংবাদিক বৈঠকে উত্তর দিচ্ছেন।

'পেশাশিক্ষায়' পশ্চিম জার্মানীর মেয়েরা পিছিয়ে নেই। অষ্টাদশী এই মেয়েটি 'ড্রেস-ডিজাইনার' স্কুলের শিক্ষানবিশ।

স্থাপন করতে গিয়ে পিছপা হতে বাধ্য হচ্ছে, তখন পশ্চিম জার্মানীর এমন সামরিক মানসিকতা, যা আদেনুর-এর পররাষ্ট্রনীতির মূল বীজ, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বুঝি ওদেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের মধ্যেও প্রশ্ন জেগেছে আদেনুর-এর নীতি নিয়ে, তাই বুঝি আদেনুরকে বয়স বৃদ্ধির অজুহাতে সরিয়ে দেওয়া হ'ল ক্ষমতা থেকে।

নতুন চ্যান্সেলার অধ্যাপক এরহার্ড। অর্থনীতির জাহাজ বললে ভুল বলা হবে না। তাঁর পররাষ্ট্র-নীতির পরিচয়ও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। গম্ভীর ও রূঢ় আদেনুর-এর পর এই স্বভাব-মিশুকে, রহস্যপ্রিয় অধ্যাপক চ্যান্সেলারকে নিয়ে তাই গোটা পশ্চিম জার্মানীতে নানা জল্পনা-কল্পনা। বাইরের জগতেও কম নয়। বিশ্বের রাজনীতির ভাষ্যকার থেকে সাংবাদিক মহলে এরহার্ডের আলোচনা সর্বক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস লুইসে এরহার্ড। বস্তুতপক্ষে ইনিই প্রথম 'মিসেস চ্যান্সেলার'। আদেনুর-এর স্ত্রী ছিল না। তাই লুইসে এরহার্ডকে নিয়েও কম আলোচনা হচ্ছে না।

ভেনুসবার্গ। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন শহরের গায়ে লাগানো গাঁ। গুল্মগুচ্ছ আর অরণ্যানীর ভেতর এই ছোট্ট গ্রামের মধ্যে গুরুত্ব-পূর্ণ এক 'ভি-আই-পি উপনিবেশ', লম্বা ব্যারাকের মতো একটি গৃহের দু'টি ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করেন বর্তমান চ্যান্সেলার এরহার্ড। সেদিন তাঁর বাড়ির প্রশস্ত হলঘরে সাংবাদিকদের হাট বসে গেছে। লক্ষ্য 'মিসেস চ্যান্সেলার' লুইসে এরহার্ড। প্রশস্ত কক্ষের ভেতর তখন মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। ওপাশের বড় বারান্দার লম্বা লম্বা লতাগুল্মের ওপর মিসেস লুইসে এরহার্ডের পোষা পাখিগুলি এসে কিচির মিচির রব তুলে সকাল-বেলার মিষ্টি আবহাওয়াকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। এ দেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি অধ্যাপক এরহার্ডের মাধ্যমে কিভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে পশ্চিম জার্মানীর নর-নারীর মধ্যে আশা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আবার কৌতুক দেখা দিয়েছে জনসাধারণের মধ্যে মিসেস এরহার্ডকে নিয়ে। তিনি সকাল থেকে রাত অবধি কি করেন। স্বামীর গুরুদায়িত্বে তিনি একেবারে উদাসীন না, সহযোগিনী। এমনি আরও দশটা প্রশ্নের আবর্তে জনসাধারণের কৌতূহল-প্রবণ মন যেন মেতে উঠেছে। সাংবাদিকরা তাই হাট জমিয়েছে ভেনুসবার্গের এই সরকারী গৃহে। যেখানে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক, সাংবাদিকদের সঙ্গে বাস করছেন পশ্চিম জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলার) ডক্টর এরহার্ড।

গোটা পশ্চিম জার্মানীর নারী-সমাজে মিসেস চ্যান্সেলার-এর স্থান তৃতীয়। প্রথম পশ্চিম জার্মান গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, দ্বিতীয় গণতন্ত্র দিবসের প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, তৃতীয় এই চ্যান্সেলারের স্ত্রী। যদিও বলা যেতে পারে বস্তুত চ্যান্সেলারের মতো মিসেস চ্যান্সেলারই রাজনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর গুরু দায়িত্ব-শীলা। চ্যান্সেলারের নীতি নির্ধারণ, চিন্তাধারার ওপর গোটা জাতির সমস্ত কিছু নির্ভর ক'রছে। তাই রাষ্ট্রের চ্যান্সেলার-এর স্ত্রীকে নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

শতাধিক সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফারের সম্মুখে স্মিত হাসি নিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস লুইসে এরহার্ড। আসন ছেড়ে উঠলেন সবাই তাঁর সম্মানে। মিসেস লুইসে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

কৌতূহলী সাংবাদিকদের প্রশ্নে মিসেস এরহার্ড বললেন,—'কোন কিছু আলোচনার পূর্বে আমরা উভয়েই অর্থনৈতিক রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তা করে থাকি। আমার স্বামী গোটা পশ্চিম জার্মানীর যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেসব সমস্যা সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পছন্দ করেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি নুরনবার্গে সমাজ বিজ্ঞান ও ইকনমিক্স ইউনিভার্সিটি থেকে এ্যাকাউণ্টেসিতে এম-এ পাশ করেন। ডক্টর এরহার্ডের সঙ্গে লুইসের এ দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর প্রথম স্বামী মারা যান। একমাত্র সম্বল শিশুকন্যা। মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে তিনি নুরনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই সময়েই তাঁর এক বান্ধবীর ভাই লুধভিক এরহার্ডের সঙ্গে পরিচয়; ১৯২৩ সালে এম-এ পাশ করেই লুইসে এরহার্ডকে বিবাহ করেন। এখন তিনি পাকাপোক্ত গিন্নি। তিনি হেসে হেসে বলতে থাকেন, 'আমি নিজের হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ করে থাকি। রান্না করা আমার সবচেয়ে বড় 'হবি' বলতে পারেন।' মিসেস লুইসে এরহার্ডের মূলত ছবি তোলা বা আঁকা, গাড়ি চালানো এরকম কোন আধুনিকা মেয়েদের মতো 'হবি' নেই। তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন পড়তে ভালবাসেন। পড়ার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—'বর্তমান লেখকদের নভেল ইত্যাদি পড়তে মোটেই পছন্দ করি না। এই সমস্ত লেখকদের লেখাগুলি বড়ড সমস্যামূলক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহ্য ও ভয়াবহ।

বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর সমাজে নারীজাতি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, অফিস দপ্তর, ক্লাব, সুইমিংপুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমান তালে। এই পরিবেশে আজও মিসেস লুইসে এরহার্ড নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় একাকীত্বের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকেন স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে। স্বামীর প্রতিনিধিত্ব বা সহযোগিতার মধ্যেই নারীজাতির সার্থকতা, এই তাঁর মত। তিনি মনে করেন, এমন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হওয়ার ফলেই তাঁর জীবনে 'সুসংবদ্ধ জীবনের ছায়াপাত হয়েছে'। তিনি সাংবাদিকদের বলেন,—স্ত্রীসমাজের স্থান বর্তমানে অনেক ওপরে। স্ত্রীজাতিকেই সর্বপ্রথম একথা মনে রাখতে হবে।'

যখন এমনি ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করছেন পশ্চিম জার্মানীর অন্যতমা প্রধানা রমণী, তখন গোটা পশ্চিম জার্মানীতে তুমুল বিতর্কের ঝড় বয়ে চলেছে। বিষয়: স্ত্রীশিক্ষা কি একটি বিলাসের বস্তু? সমাজে স্ত্রীজাতির কর্তব্য ও স্থান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কসভায় ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সংক্রামিত হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাদের সমাজের রং পাল্টে গেছে। ছেলেমেয়েরা আজ পথে পথে, স্কুলে, কলেজে, দপ্তরে পাশাপাশি। কিন্তু এতটা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বিপর্যয়ও কম দেখা দেয় নি। ঘরে মন টেকে না মেয়েদের। তাই পুরুষদের ঘরে নেই আশ্রয় বা বিশ্রামের কোন আরামদায়ক ব্যবস্থা। পুরুষদের মধ্যে স্বভাবজাত সমালোচনা-প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীজাতি একান্তভাবে পরিবারে, না, কারখানায় স্থান পাবে?—এ প্রশ্ন বুড়োদের সঙ্গে সঙ্গে নব্যযুবকদেরও মুখে মুখে। রান্নার খাসনপত্রের আড়ালে, না, বেঞ্চ-বেঞ্চের ওপর স্থান পাবে?—এমন বিষয় আজ কলেজ, ইউনিভার্সিটির বিতর্কসভার বিশেষ আলোচ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। একজন স্ত্রী কি ভাবে তার 'চাকরী জীবন' আর 'সাংসারিক জীবন'-এর সামঞ্জস্য রক্ষা করে কর্তব্য নির্ধারণ করবে?

এমনি বিভিন্ন প্রশ্নাবলীতে শুধু উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনও কোন সমাধান মন্তব্য শোনা যায় নি, (একমাত্র লুইসে এরহার্ড ছাড়া) যার ফলে এই উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। তবে আজকের এই বিতর্কঝড়ের মূলে রয়েছে একটি বাস্তব সত্য চিত্র। পশ্চিম জার্মানীর সমাজে বর্তমানে স্ত্রীজাতিকে দু'দিকেরই তাল সামলাতে হয়। একদিকে সংসারের কাজকর্ম, অন্যদিকে তার চাকরী জীবনের কর্তব্যপরায়ণতা। বহু আলোচিত সমস্যায় অনেকের মত হ'ল—বর্তমান যুগে একটি সংসারের অর্থোপার্জন অর্থাৎ চাকরী জীবনের কর্তব্য পালন এবং সংসারের ঘরোয়া কাজ ও সন্তান লালন-পালনের কাজ একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন কোনমতেই সম্ভব নয়। শিশুসন্তান লালন-পালনের গুরুদায়িত্ব এবং সংসারের কাজকর্মের ভার স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বহন করতে হবে। সমাজের অনুমতি পেলে স্ত্রীজাতি চাকরী জীবনে আসবে গোটা সংসারের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু তাকে আবার সংসারের অন্যান্য কাজেও বাধ্য করালে সুফল হয়তো হবে না।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বাস্তব অসুবিধা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই সমগ্র দেশ আজ এমন সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থা স্ত্রীজাতির জন্য চাকুরী জীবনের দরজা খুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী—সংসারের রান্না করা, অন্যান্য টুকিটাকি, সন্তান পালন প্রভৃতি যাবতীয় কাজও করতে হচ্ছে। ফলে দু'দিকের কোন দিকেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। সাধারণ লোকে মনে করে, একটি স্ত্রী বিয়ে বা সংসারের কাজকর্ম না করে যদি চাকরী জীবনে লিপ্ত থাকেন, তবে তিনি সাধারণ মেয়ে নন।

বস্তুত 'পেশাশিক্ষার' দাম বিচারে স্ত্রীর চাইতে আজও পুরুষ যুবকদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবুও যেমনভাবে এই পেশাশিক্ষায় স্ত্রীজাতি অংশগ্রহণ করছেন, তাতে অল্প কয়েক বছরেই প্রতিটি কারখানা, কারিগরি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, দপ্তরে তাদের সংখ্যা কম হবে না। সামাজিক এমন বিপর্যয় বা বিবর্তনকালে মিসেস লুইসে এরহার্ডের মতব্য তাই গোটা দেশে আলোচ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

# জাপানী সন্দেশ

যে কোন জাপানীকে জিজ্ঞাসা কর, 'বেশ গরম, নয় কি ?' জবাব পাবে, 'হ্যাঁ, বেশ গরম।' যদি জিজ্ঞাসা কর, 'বিশেষ গরম নেই, তাই না ?' জবাব আসবে, 'হ্যাঁ, তেমন গরম নয়।' বিদেশীদের পক্ষে এই ধরণের জবাব হজম করা মুস্কিল ব্যাপার। এদের মেণ্টালিটির সঙ্গে খাপ খেতে বেশ কিছু সময় লাগে বিদেশীর। সত্যি কথা বলতে এদের কোন negative প্রশ্ন না করাই ভাল। কারণ ওর জবাব সর্বদাই affirmative-এ পাবে।

লেখার ব্যাপারেও এদের ধরণ আমাদের উল্টো। আমরা লিখি বাঁ দিক থেকে ডাইনের দিকে। এদের লেখা ওপর থেকে নীচের দিকে। আমাদের বইয়ের যেখানে শেষ এদের বইয়ের তা' প্রথম পৃষ্ঠা। foot note সবই ওপরের দিকে লেখা।

চিঠির ঠিকানা লেখার সময়ে প্রথমে শহরের নাম আর সব শেষে যার কাছে চিঠি যাচ্ছে তার নাম। যেমন ধর :

ভারত, কলিকাতা, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বসুমতী সাপ্তাহিক সম্পাদিকা, জয়ন্তী সেন শ্রীমতী।

অনেক ব্যাপারেই এদের ব্যবহার আমাদের ঠিক উল্টো। যদি কাউকে দূর থেকে হাত নেড়ে কাছে ডাকে তা'হলে হাতের তেলো বাইরের দিকে দেখিয়ে সবেগে হাত নাড়ে। আঙুলে গোনার সময়ে প্রথমে আঙুলগুলি সোজা রেখে এক দুই করে আঙুল মুড়ে যায়। সুরু হয় বুড়ো আঙুল দিয়ে।

দোকানে জিনিষ কেনার সময়ে ভাঙানি, ছোট রেজকী দেবে সবচেয়ে পরে। প্রথমে বড় টাকার নোট। পরে ছুটকো-ছাটকা। এদের মতে ভাঙানি দেবার সময়ে বড় টাকার নোটগুলি প্রথমে দিয়ে দিলেই দায়িত্ব গেল কমে। ছোট রেজকী তেমন important নয়। এরা ছোট রেজকী গোনে না। ওটা হ'ল কৃপণের কাজ।

এদেশের বেশির ভাগ লোকই গরীব হলেও—ভাণ করে যেন অর্থ কিছুই নয়। দুই বন্ধুর মধ্যে যদি সামান্য কিছু দেনা পাওনা থাকে তো যার পাওনা সে বলে দরকার নেই, তুমি ওটা রাখো। এই ব্যাপারটা সচরাচর অনেক দূর এগোয়। ধর, জনকয়েক বন্ধু একসঙ্গে চা খেতে

**সন্দীপ ঠাকুর**

ঢুকেছে। সবশেষে ঐ দলের একজন সবার বিল শোধ করে। পরে যে তাকে নিজেদের ভাগের দাম দিতে হবে তা' এরা মনে রেখেও ভুলে যায়। যদি তা' না কর, তা'হলে কৃপণ হিসেবে নাম কিনবে। কারণ পরে তোমাকেও হয়তো দশজনের চায়ের দাম দিতে হবে একদিন।

জাপানী ছুতার মিস্ত্রী যখন করাত দিয়ে কাঠ চেরে বা কাঠ কাটে, র‍্যাঁদা মারে তখন প্রথম টান মারে বাইরের থেকে নিজের দিকে। আবার দেশলাই ঘষবার সময়ে কাঠি ঘষে বাইরের দিকে।

বাঁশের জাপানী ছাতার হ্যাণ্ডেলের দিকটা ঝোলে নীচের দিকে। ছাতার পর দিকে একটি আংটি আছে। সেইটি থেকে ছাতা ঝোলে।

দিক দেখানোর সময়ে এরা বলে পশ্চিম-উত্তর। পূর্ব-উত্তর। আমাদের ঠিক উল্টো। এরা বলে পশ্চিম-দক্ষিণ। আমরা বলি দক্ষিণ-পশ্চিম। বিদেশীর পক্ষে অনেক কথা উল্টো বুঝলে এদের সত্যি মানে বেরিয়ে আসে। সব সময়ে সেটা করা অবশ্য কঠিন কাজ।

জাপানীদের গরম জলে স্নান-প্রিয়তার কথা আগেই বলেছি। আমরা স্নান করি দেহ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। এরা স্নান করতে ভালবাসে স্নান করারই জন্য। অনেকের দিনে ৪।৫ বার স্নানেও আপত্তি নেই। অবশ্য গরম জলে। জাপানে প্রচুর গরম জলের ফল্গু নদী আছে। সেখানে গিয়ে দেখবে অনেকে হোটেলের bath-room-এ ঘন ঘন যাতায়াত করছে। ঐ গরম জলের sprig-এর চারপাশে অগুণতি ছোট-বড় হোটেল। স্নানের ঘরে ঐ গরম জল আসছে পাইপে করে। রাজগীরে থাকাকালে দেখতুম বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবাবু রোজ আসতেন মোটরে চেপে কুণ্ডের জলে স্নান করতে। সামান্য খরচ করলেই কর্তৃপক্ষেরা রাজগীরে চমৎকার একটি Spa খুলতে পারেন। অবশ্য তাতে সশরীরে স্বর্গলাভের পথে বাধা পড়বে হয়তো কিছুটা !

এদেশে কারুর বাড়িতে সন্ধ্যের দিকে গেলে প্রথমেই যদি স্নানের আমন্ত্রণ পাও তো বুঝবে রান্নাঘরে তোমার ভাগও তৈরি। আমাদের দেশে কোন অতিথিকে স্নান করতে বলা আর অপমান করা একই কথা। এ দেশে ওটা হ'ল আতিথেয়তার বিরাট একটা দিক।

ফরম্যাল্ ডিনার পার্টিতে খাওয়ার

পূর্বেই আরম্ভ হয় host-এর speech. প্রধান অতিথি তার উত্তর দেন তারপরে। আমাদের মত এরাও সব খাবার এক সঙ্গে সাজিয়ে দেয় অতিথির জন্য। পার্টি সুরু হবার বহু আগেই সব খাবার সাজানো হয়ে যায়। যতক্ষণ না ঐ speech শেষ হচ্ছে ততক্ষণ খাবারে হাত দেবার জো নেই। লোভে হয়তো জিভে জল এসে গেছে, তবু চোখ বুজে ঐ speech শুনে যেতে হবে। ঘণ্টাখানেক তো বটেই। জাপানী নিয়ম। প্রথমেই Beer ও নানান ধরণের পানীয়। 'সাকে', অরেঞ্জ জুস ইত্যাদি। তারপরে সুরু হবে খাওয়া। সবশেষে আসবে ভাত ও চাটনী!

পাশ্চাত্যের দেশে আছে after dinner speech. এদেশে হলো before dinner speech. পাশ্চাত্যে খাওয়ার পর drinks-এর গ্লাসে চুমুক দিয়ে শোনো after dinner speech. এদেশে শোনো before dinner speech, drinks-এর দিকে সতৃষ্ণ চাউনি রেখে!

হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার আছে। পার্টি শেষ হবার আগেই host কেটে পড়েন! বেশ কিছু আগেই। এর একটা প্রধান কারণ হল—এরা পার্টি দেয় বাড়িতে নয়—হোটেলে। টাকা ফেলো—পার্টি দাও। বন্দোবস্ত সবই হোটেলওয়ালাদের হাতে। Host-এর গিন্নী হয়তো খাবার ঠিক গোছানো হয়েছে কি না—বা ফুলদানীর ফুল সাজানো ঠিক হয়েছে কি না শুধু দেখে নেন একবার। Menu তৈরির ব্যাপারেও host-এর হাত নেই।

এই সব পার্টিতে social বন্ধন বিশেষ কিছুই নেই। Host-ও সাধারণত কোম্পানীর expense account-এর দৌলতে পার্টি দেন। এই পার্টির আসল মতলব হ'ল মদ টেনে মাতলামো ও আনন্দ করা। hostess-এর কাজ করে ভাড়া করা গেইশার দল। অনেকক্ষণ ধরে চলে এই তামাসা। ঐ ফাঁকে যে host সরে পড়বেন তা আর আশ্চর্য কি। এদের ফরম্যাল্ পার্টি পাশ্চাত্যের ককটেল পার্টির মত। যখন খুশি যাওয়া আসা। কিন্তু host-এর আগে সরে পড়ার ব্যাপারটা জাপানের নিজস্ব।

উপহার বিনিময়ের ব্যাপারেও জাপানীদের নিজস্ব নিয়ম। কারুর বাড়ি যাবার সময়ে খালি হাতে যাওয়া একটা অভাবনীয় ব্যাপার। বড় একটি ফুলকাটা রুমালে (ফুরোশিকি) সযত্নে মুড়ে নিয়ে যেতে হবে ঐ উপহার। এই উপহার বিনিময়ের ব্যাপারটা খরচসাপেক্ষ। কাজে কাজেই যত কম লোকের বাড়ি যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। ফলে হয় কি—জাপানীরা সচরাচর বন্ধুহীন। কেউ কারুর বাড়িতে যাতায়াত করে না বিশেষ। উপহার বিনিময়ের জাপানী নাম 'ওমিয়াগে'। খরচসাপেক্ষ ওমিয়াগের দৌলতে জাপানীদের সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক কিছুরই অভাব দেখা যায়। প্রথমত ছোটবেলা থেকে সোসাইটি বলে যে একটা বস্তু আছে তা' এদের অজানা। তার অভাবও অবশ্য তেমন বোধ করে না এরা। দ্বিতীয়ত বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশাও করতে এরা ঐ উপরোক্ত কারণেই অক্ষম। বন্ধুর বাড়িতে যেতে হলে যদি ৫।১০ টাকার 'ওমিয়াগে' কিনতে হয়—তার চেয়ে বন্ধুর বাড়ি না গিয়ে সিনেমা দেখাই শ্রেয়!

আমাদের কেউ উপহার পেলে তা' পাওয়া মাত্রই খুলে দেখে, জিনিষটার কদর করে। এখানে ওটি চলবে না! যতক্ষণ না অতিথি বিদায় হচ্ছেন ততক্ষণ ওটি খুলে দেখা চলবে না। জাপানী আদবকায়দা। খাওয়া দাওয়া সেরে অতিথি বাড়ি ফেরার সময়ে ঐ উপহার দেবেন Host-এর হাতে। বলবেন, 'আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করুন।' ভিতরে কি আছে তা host জানতে পারছেন না! তবু বিনীতভাবে বলছেন, 'আহা আপনার কি দয়া! মনে করে আমাদের জন্য চমৎকার একটি উপহার এনেছেন' ইত্যাদি!

এদের মনে উচ্ছ্বাসের অভাব। এরা সত্যিই Oriental self-expression জিনিষটা ভাল চোখে দেখে না। সব কিছুই understatement-এর ধার দিয়ে যায়। ঐ ভাবে কথা বলাতেই এদের আনন্দ। আনন্দের সময়ে মুখে চাপা হাসি। প্রাণ খুলে হো হো করে হাসা এদের সয় না।

জাপানী হোটেলের নাম 'রিওকান'। এই হোটেলে ঢুকে কেউ ঘরভাড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজখবর করে না। ওটা অভদ্রতা। হোটেলের কর্তৃপক্ষরাও এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে না। যতক্ষণ না হোটেল ছাড়ার সময় হয়েছে ততক্ষণ অতিথিরা কত টাকা দিতে হবে তা জানতে পারেন না। যদি মনে হয় বেশি টাকা দিতে হচ্ছে খামাখা; সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক করাও বারণ।

স্বনামধন্য লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় যখন জাপানে আসেন—কিওতো হয়ে জাপানী 'রিওকানে' একরাত কাটাবার সখ গেল ভদ্রলোকের।

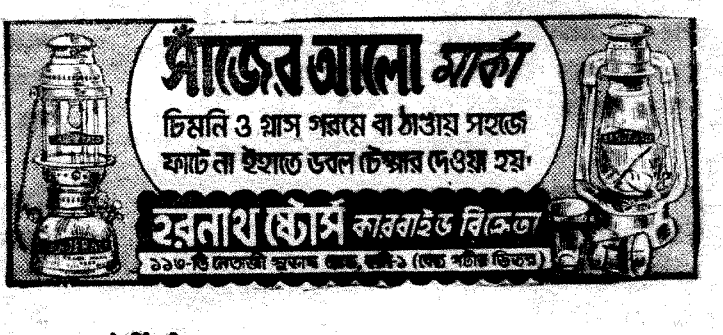

আগেভাগে খোঁজ করে জানলম যে, চল্লিশ ... র মত লাগবে। পরদিন, সকালে ভদ্রলোক বিল শোধ করলেন সাত পাউণ্ড—মানে প্রায় চুরানব্বই টাকার মত। রেগে আগুন ভদ্রলোক। কিন্তু বাক্‌বিতণ্ডা তো আর করা যায় না।

Tipping-এর ব্যাপারটা অতি ঝামেলার—এদেশে। তবে সচরাচর tip দেওয়া বারণ। সব বিলে ধরা আছে। বেশ মোটা tipping-ই ধরা থাকে সচরাচর। অনেক সময়ে হোটেল ভাড়ারও কিছু বেশি। পুলতাত শ্রীপ্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয় সপরিবারে এসে উঠলেন টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেলে। ঘরভাড়া একরাতে দশ পাউণ্ড। পরদিন সকালে বিল এল ২৩ পাউণ্ডের। এদেশের পোর্টার কুলীর দল, ট্যাক্সিচালকের দল অবশ্য পাশ্চাত্যের কুলীদের মত টিপ্ দাবী করে না সচরাচর।

জাপানী হোটেলে শোয়া, বসা, খাওয়া সবই প্রাইভেট রুমে। কিন্তু মুখ ধোয়া, কুল্লী করা, স্নান করা এই সবই কমনরুমে।

জাপানের রাস্তার numbering-ও এক মজার ব্যাপার। বেশির ভাগ বাড়িতেই নম্বরের ঝামেলা নেই। একই পাড়ায় হয়ত ৫।৭টি রাস্তার নাম এক। অতএব কারুর বাড়ি খুঁজে পাওয়া সত্যিই মহা কঠিন কাজ। কোথাও যেতে হলে—বিশেষত অজানা জায়গায়—সময়মত না গিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা আগে যাওয়াই মঙ্গল। বাড়ি খুঁজে বার করতে সময় লাগে। এরা পাড়া-পড়শীদের নামধাম সচরাচর জানে না। হয়তো পাশের বাড়ির লোকেরও নামধাম, ঠিকানা কিছুই জানা নেই এদের। অত্যন্ত un-sociable এ বিষয়ে এরা।

এই উল্টোপাল্টার মধ্যে একটি কথা না বললে অনেক কিছুই চাপা থেকে যায়। সেটা হচ্ছে পুরুষের superiority-র কথা। পুরুষ সব বিষয়েই উচ্চ। কোথাও যেতে হলে, ঘরে ঢুকতে হলে, গাড়িতে চাপতে হলে—পুরুষ আগে—মেয়েরা পরে। স্নানঘরের গরম জল আগে পুরুষের জন্য। পরে গৃহিণী ও মেয়েদের জন্য। ঘরে খাবার খাবেন আগে পুরুষ। chivalry জিনিষটা জাপানে অচল। শতশত বছরের fendalism-এর খোলসে আজ এদের ভাবনা-চিন্তা বিশেষ বদলায় নি। তাই প্রায় একশ' বছর ধরে industrialization-এর ফলেও আজ এদের চিন্তা ফিউডালিষ্টিক। তাই বিদেশীরা এসে প্রথম প্রথম চমকে যায়।

জাপানী পণ্ডিতের দল আজ পূর্ব এশিয়ায় জাপানীর leadership-এ উন্নতি হবার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের মতে জাপানই আজ এশিয়ার লীডার। অনেক দিক দিয়েই এ কথা সত্যি। আবার অনেক দিক থেকেই একথা সত্য থেকে দূরে। লীডারশীপ তো কতরকমেরই আছে। কয়েকটা মেশিনের সাহায্যেই যদি মানুষের মন বদলানো যায়, তা'হলে এদেশের লোকের অনেকরকম উন্নতিই হতো। কই একশ' বছর ধরে industrial revolution-এর পরেও তো তেমন superior মানুষ দেখা যাচ্ছে না এদেশে!

সময় অবশ্য বদলাচ্ছে দ্রুত গতিতে। feudalistic ভাবধারাও কমে আসছে আজকের ছেলেমেয়েদের মনে। তবে জাতীয় standard গড়ে তুলতে বেশ কিছু সময় লাগবে জাপানীদেরও।

# কবিতা

**মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

অনেক কাঁটার দুঃখ অতিক্রান্ত। জন্মের প্রথম লগ্নে
বাজে নি কাঁসর-ঘণ্টা, সূর্য তাকে দেয়নিকো রং
মৃত্যুর সীমান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবনের কোনো এক অতন্দ্র প্রদেশে
নিজের সুরভি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো
আপন বোধিতে।

তোমার কাঁটার পথে মগ্ন মন আমাদের উচ্চকিত হয় বার বার
বেদনার এক ফোঁটা কালি নেই, গাঙ্গুরের জলে
স্বপ্নের পৃথিবী আর চেতনার কোনো গূঢ় আলো
নির্দেশ দিয়েছে তাকে মহেঞ্জোদড়োর স্বপ্ন
—শিলীভূত অপঠিত তোমারই পাথর।

তবুও আনন্দ আছে, জীবনে কবিতা আছে
ঝরণার স্তরে স্তরে গান—
গড্ডলিকা স্রোতে আনে বাঁচার অপার শান্তি
যুগে যুগে কবিতা আমার।

# ক্রান্তি

**অমূল্য মাইতি**

আত্মিক সম্বেগ যেন ছিল এক নিরুদ্ধ এষণা—
চেতনার অধিগমে বিকাশের ছিল নাক পথ;
ভুলরাঙা তৃষ্ণা ফেলে মাথা কুটে বিশুষ্ক বাসনা;
ভাবময় মনোভূমি ছিল শুধু বেদনা-বিহ্বল।

আর কেন? মিছে মিছে শুধু আঁকা শূন্যে চিলঘর—
দৈন্যের কাতর চোখে অতলান্ত হেমন্ত জড়তা,
জীবনের স্বপ্নসাধ মনে হ'ত পলাশ বেহাগ:
ধূসর ক্লান্তির পথে এনেছিল শুধু নাস্তিকতা।

হঠাৎ মোহন মন্ত্রে ডাক দিলে বাসন্তী সকাল,
আবেশ-উন্মনা হিয়া শুনে কার নেপথ্য-সঙ্গীত
এই জীবন-বলাকা পেলো যেন অমৃত-সন্ধান—
তুমি এলে মূর্ত হয়ে—ধন্য করে মোর মরু-প্রাণ।

## রাজধানী :

রাজধানীতে এখন আলোচনার শেষ নেই। নানা জল্পনা-কল্পনা। চায়ের আড্ডায় যেমন আলোচনার ঝড় চলছে, তেমনি অফিসে। এখানকার রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলে যেন একটা মাতামাতি পড়ে গেছে। এতদিন আলোচনার বিষয় ছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস অত্যাচারে রাজধানীর বুকে এক প্রবল বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। আজ আলোচনার বিষয় প্রধানত কাশ্মীর ও মিঃ ট্যালবট। আমেরিকার সহকারী ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ ট্যালবট ভারত ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ করে গেছেন। এই পরিভ্রমণ যে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে মিঃ ট্যালবট কাশ্মীর সমস্যা তথা ভারত-পাক বিরোধ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে কি করবেন। তিনি তো ভারতের এবং পাকিস্তানের তাপ-মাত্রা বুঝে গেছেন। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের গত অধিবেশনে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর দুই প্রধান রাষ্ট্রের মনোভাব সম্পর্কে এখানে যে তৃপ্তীভাব দেখা গেছে, তাতে ট্যালবট সাহেব বেশ সতর্কতার সাথে কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর এই সতর্কতায় এখানের রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন এবারেও আমেরিকা-বৃটেন পাকিস্তানের পক্ষে থাকবেন। তবে সেটা গতবারের মত নয়। এবার তাঁরা অন্য কৌশল অবলম্বন করবেন। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এবার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে এগিয়ে দেবে, নিজেরা পেছনে থেকে। সম্ভবত এই কাজের জন্য তাঁরা আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশকে ব্যবহার করবেন। মনে হচ্ছে পাকিস্তানের হয়ে প্রস্তাব তুলবে মরক্কো এবং আইভরি কোষ্ট; এবং প্রস্তাব সমর্থন করবেন বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অনুন্নত লাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে

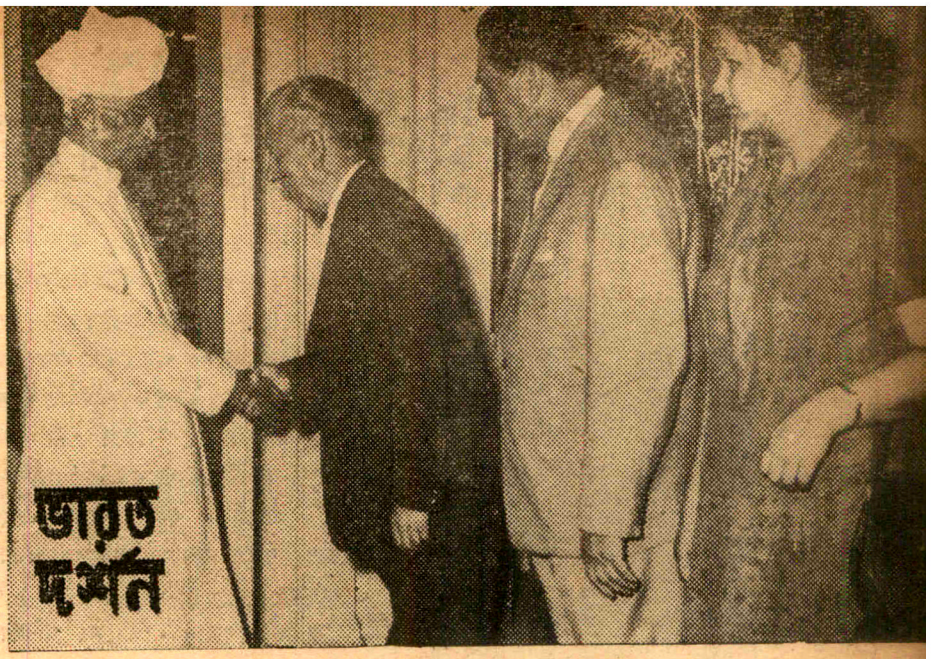


● রাষ্ট্রপতি সকাশে সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল।

ব্রাজিল এবং বলিভিয়া। এভাবে যদি ছোট ছোট দেশগুলিকে দলে ভেড়ানো এবং কাজে লাগানো যায়, তবে কিছুটা পরোক্ষে থেকে পাকিস্তানকে সমর্থন করা চলবে। তা যদি ব্যর্থ হয়, তবে ইঙ্গ-মার্কিন রাজনৈতিক শিবিরে একটু অসুবিধা দেখা যেতে পারে। কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মন জয় করার জন্য তাদের চেষ্টার বিরাম না থাকলেও ওদের মতিগতি বোঝা বড় মুস্কিল। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার একটা ঝোঁক ওসব দেশে রয়েছে।

পশ্চিমী শিবিরের এ দু'টি প্রধান রাষ্ট্র এবার আরও সতর্কতার সাথে চেষ্টা করবে যাতে ভারতের মনোভাব একটু নরম করা যায়। এমনও হতে পারে যে, বিকল্প সমাধানেও যদি ভারতকে রাজী করা না যায়, তবে স্বতন্ত্র কাশ্মীরের প্রশ্ন এনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা নতুন মোচড় দেওয়া যায়।

রাজধানীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বৃটেন-আমেরিকার মতিগতি খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছেন। তাঁরা মনে করছেন বলিভিয়াকে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে কাজে লাগাতে পারবে কি না। সেটা গভীর সংশয়ের কথা। কারণ বলিভিয়া পূর্বে নিরপেক্ষ মনোভাব প্রকাশ করেছে। এখন যদি পূর্ব মনোভাব পরিবর্তন করে তবে তা করবে আমেরিকার চাপে। অন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফরাসীরা মার্কিনদের ধারে-কাছেও যাচ্ছে না; সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চেকোস্লোভাকিয়া তো আগেভাগেই ভারতের পক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ভারতকে অবিরাম সন্ত্রাসের মধ্যে রাখার যে চক্রান্ত চলছে সেটা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তবু ভারতকে যে কোন প্রতিকূল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

* * *

কাশ্মীর-চীন-পাকিস্তান এসব প্রশ্ন ছাড়াও মিঃ ট্যালবটের ভারত আগমনের আর এক উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জল্পনা-কল্পনা চলছে। মিঃ ট্যালবটের এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেবল আমেরিকা নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ কৌতূহলী। পণ্ডিত নেহরুকে সামনে রেখে আসলে কে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে? এমন একটা কথা উঠেছে। সোজা কথায় নেহরুর পরবর্তী কে? মিঃ ট্যালবটও এই কথাটা জানবার জন্য এসেছিলেন; এটা ছিল

তাঁর অন্যতম গোপন দায়িত্ব। এ বিষয়ে মিঃ ট্যালবট ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে কি রিপোর্ট দেবেন জানি না; তবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে,

● মিঃ ফিলিপস ট্যালবট

মিঃ ট্যালবট যাবার সময় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ওয়াশিংটন যাবার জন্য একটা আমন্ত্রণপত্র দিয়ে গেছেন। এই আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে নেহরুর পরবর্তী কে প্রশ্নের কি কোন যোগ আছে?

* * *

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তান এবার আর এক নতুন চাল চালছে। এবার কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর নির্ভর না করে গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। আগামী ২২শে থেকে ২৬শে মার্চ আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশিয়ান সংহতি সংস্থার পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিষদ সভায় পাকিস্তান চীনের সাহায্যে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য চেষ্টা করছে। আফ্রো-এশিয়ান সংগঠনের কোন সভায় এযাবৎ কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনা হয় নি। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোশী সম্মেলনে এবং সেপ্টেম্বর মাসে নিকোশিয়ায় কার্যকরী কমিটীর সভায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে মতবিরোধ হয়েছিল। এবারও যে মতবিরোধ হবে তাতে সন্দেহ নেই। পরিষদ সভায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে থাকবেন মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহ, ইনি কাশ্মীরের মুফতি, বর্তমানে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে থাকেন এবং পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলে মরক্কো এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে পরিভ্রমণ করে এসেছেন।

আফ্রো-এশিয়ান সংগঠনের পরিষদ সভায় ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঐতিহাসিক ডাঃ তারাচাঁদ। তাঁর সঙ্গে কাশ্মীরের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও থাকবেন।

আফ্রো-এশিয়ান সংগঠনে ভারতীয় কমিটীর সদস্যরা মনে করছেন পরিষদ ভারতের বক্তব্যই সমর্থন করবেন; অর্থাৎ কাশ্মীর প্রশ্ন ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার এবং পরিষদে আলোচনার যোগ্য নয়।

* * *

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে মে মাসের শেষ সপ্তাহে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে এই খসড়া প্রস্তাব আলোচিত হবে। জানা গেল, যে মৌলিক ভিত্তির ওপর এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তা হলো বার্ষিক গড়পড়তা শতকরা সাতভাগ বৃদ্ধি। তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল শতকরা পাঁচভাগ। অবশ্য একদল বিশেষজ্ঞ মনে করছেন গড়-পড়তা সাতভাগ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ, তৃতীয় পরিকল্পনায় শতকরা পাঁচভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য থাকলেও কার্যত আড়াই ভাগের বেশি বৃদ্ধি হয় নি।

* *

চার বছর আগে ভারতীয় এলাকা থেকে পাক-দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক কর্ণেল জি এল ভট্টাচার্যের অপহরণের সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই মর্মাহত হয়েছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বার বার কর্ণেল ভট্টাচার্যের প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানো হলেও পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি। উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানে 'অনধিকার প্রবেশ, অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোপনীয় দলিলপত্র রাখার' অপরাধে পাক সামরিক আদালত তাঁকে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পরে অবশ্য পাক প্রেসিডেণ্ট ও পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর বিশেষ ক্ষমতা-বলে ৪ বছর দণ্ডাদেশ হ্রাস করেন। অর্থাৎ উভয়ের ৪ বছর করে দণ্ড-হ্রাসের ফলে কর্ণেল ভট্টাচার্যের ৮ বছরের দণ্ডাদেশ সম্পূর্ণ মকুব হয়ে গেছে—এ-ই ছিল দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কর্ণেল ভট্টাচার্যের আপীলের বিষয়বস্তু। কিন্তু ঢাকা হাইকোর্ট

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

সে আপীলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণর নিজে কোনও দণ্ডাদেশ মকুব করেন নি—তিনি পাক প্রেসিডেণ্টের হুকুম তামিল করেছিলেন মাত্র। এই উদ্ভট যুক্তির বিরুদ্ধেই কর্ণেল ভট্টাচার্য

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিলেন। কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কর্ণেল ভট্টাচার্যের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যেই ঢাকা গিয়েছিলেন। কিন্তু পাক সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ শ্রীরায়ের যুক্তি মেনে নিতে রাজী হন নি। পাক প্রেসিডেণ্ট ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের 'দু'টি পৃথক ও সুস্পষ্ট আদেশে'র দ্বারা কর্ণেল ভট্টাচার্যের ৮ বছর দণ্ডাদেশ সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়েছে—ভারতীয় কৌঁসুলি শ্রীরায়ের এ সওয়াল পাক সুপ্রীম কোর্ট অগ্রাহ্য করে ঢাকা হাইকোর্টের দণ্ডাদেশই বহাল রেখেছে।

কর্ণেল ভট্টাচার্যের আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য করার ভেতর দিয়ে যে সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তা হচ্ছে এই যে, পকিস্তানের বিচারালয় তার শাসন-ব্যবস্থারই বশংবদমাত্র, অর্থাৎ পরিষদীয় গণতন্ত্রে তা'র যে স্বাধীন ভূমিকা থাকার কথা, তা পাকিস্তানে একান্তভাবে অনুপস্থিত।

সামরিক আদালতে কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিচারের জন্য পাক প্রেসিডেণ্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার বহু পূর্বে। এই একটিমাত্র কারণেই সে-বিচারের বৈধতা কতখানি, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর যেখানেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বর্তমান রয়েছে, সেখানে হামেশাই সুপ্রীম কোর্টে সরকারী আইনের পরাভব ঘটতে দেখা গেছে, যে আইনের বলে কোন ব্যক্তি নিম্ন আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন, সুপ্রীম কোর্টের রায় তাঁর অনুকূলে গিয়ে সংবিধানের সংশোধন ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু পাকিস্তানের বিচার-ব্যবস্থা বিচিত্র। শ্রীরায় এ প্রশ্নটির দিকে মাননীয় বিচারপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে জানানো হয় যে, এ। অসুবিধাজনক ও অস্বস্তিকর। সরল ভাষায় এর অর্থ হল. ঢাকা হাইকোর্টে কর্ণেল ভট্টাচার্যের দণ্ডাদানের মাধ্যমে যে-সরকারী ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে, তা নাকচ করা দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের পক্ষেও অস্বস্তিজনক।

* * *

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের (পার্লামেণ্ট) একটি প্রতিনিধি দল ভারতে তিন সপ্তাহের জন্য এক শুভেচ্ছা সফরে এসেছেন। দশজনের এই প্রতিনিধি দলটির নেতা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের ইউনিয়নসমূহের সভাপতি শ্রীইভান স্পিরিদোনভ। অন্যান্য সদস্য-দের মধ্যে আছেন শ্রীমতী ভারভারা মারকিনা, শ্রীমতী লিদিয়া রুঝিৎস্কাইয়া, শ্রী কাফুর কাসিম কাসুমাভো। ভারতের লোকসভার স্পীকার সর্দার হুকুম সিংহের নেতৃত্বে ভারতীয় লোকসভার সদস্যদের এক প্রতিনিধি দল গত বছরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান এবং সোভিয়েট পার্লামেণ্ট সদস্যদের এক প্রতিনিধি দলকে অনুরূপ ভারত সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

এই সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল রাজধানীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রী গোলাম মহম্মদ সাদিক এই প্রথম রাজধানীতে এলেন। রাজধানীর লোকেরা তাঁর প্রতি যে যোগ্য সম্বর্ধনা জানিয়েছেন সেটা তাঁরই প্রাপ্য। এই বিরাট সম্বর্ধনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে শ্রীসাদিক রাষ্ট্র পরিচালনাভার ঠিকভাবেই গ্রহণ করেছেন। কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রীসাদিকের যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা মানুষের মনে গভীর আস্থা জাগিয়েছে।

মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শ্রীসাদিক সর্বতোভাবে রাজধানীর সমর্থন লাভ করেছেন। মন্ত্রিসভার বাকি পদগুলি তিনি পূরণ করবেন বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের পর।

## মাদ্রাজ ঃ

এখানে মুসলিম লীগ নেতাদের কথাবার্তায় সরকারী মহল বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাশ্মীর এবং পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের শয়তানী চক্রান্ত ও 'লড়কে লেঙ্গে' মনোভাবের মুখে মাদ্রাজের মুসলিম লীগ নেতাদের চাল-চলন মোটেই ভারত রাষ্ট্রের অনুকূল হচ্ছে না বলে অনেকে মনে করছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে মুসলিম লীগের সভাপতি 'কায়েদে মিল্লাত' জনাব মহম্মদ ইসমাইল নমাজের পরে মসজিদে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা কেউ ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি নাকি কলকাতার হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, মুসলিমরা যদি কংগ্রেসের উপর নির্ভর করে থাকে, তবে জান বাঁচাতে পারবে না। তাঁর কথার মধ্যে আবার সেই দুই জাতিতত্ত্বের সুরই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কলকাতার ঘটনার উল্লেখ করেছেন, অথচ পূর্ববঙ্গে যা ঘটেছে তাকে সেভাবে নিন্দা করেন নি। আর একজন মুসলিম লীগ নেতা জনাব আবদুল সামাদ লীগের সভাপতিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ইনি কেবল লীগের নয়, ডি-এম-কেরও একজন মুখপাত্র। পৌরসভা নির্বাচনে জয়ের পর এক সভায় তিনি বলেছেন, 'যে কংগ্রেস সরকার পয়গম্বরের পবিত্র স্মারক রক্ষা করতে পারে না, সে সরকার দেশ শাসনের অযোগ্য।' তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, দুই জাতিতত্ত্বকে এখনো বাতিল করা চলে না। মুসলিম লীগ এখনো সংখ্যালঘু জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি। ডি-এম-কে যদিও দ্রাবিড়স্থানের দাবী ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এখনো দ্রাবিড়দের নিজ ভাগ্য নিজেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী।

● শ্রীগোলাম মহম্মদ সাদিক

মুসলমান জনসাধারণের উপর লীগের এই যে কর্তৃত্ব এটা সরকারী মহলে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। পৌরসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে লীগের জয়লাভ এবং লীগ সমর্থিত অ-মুসলমান প্রার্থীদের জয়লাভ রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে নতুন করে ভাববার কথা। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যদি ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসার লাভ করে তবে তার চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে? এরূপ সংকীর্ণতার একটা প্রতিক্রিয়াও আছে। সেই প্রতিক্রিয়া আজ সরকারবিরোধী অ-সাম্প্রদায়িক দলের মধ্যেও এসে পড়েছে। এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টি পর্যন্ত আজ দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ সমর্থন করছে। জানা গেল, সোস্যালিষ্ট ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিধানসভার সম্মুখে এক বিক্ষোভ আয়োজন করা হচ্ছে; এই বিক্ষোভে দাবী হবে মুসলিম লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী।

## বিশ্বের চোখে ভারত ঃ মরোক ইনফরমেশন (মরক্কো) ঃ

চল্লিশ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে যে বিরাট ও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা চলছে, তা আজ সাফল্যের পথে। সমস্যার বিরাটত্ব, বৈচিত্র্যের বৈপরীত্য ও ব্যাপক প্রয়োজন ভারতের এই সব অসুবিধার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, উৎসাহের প্রাবল্য ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সাহায্যে ভারত নতুন সমাজ গড়ে তুলছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভারত যে পথ বেছে নিয়েছে, তা সম্পূর্ণ নতুন এবং এই কাজে ভারত অবশ্যই আমাদের সকল সমর্থন ও সহানুভূতি দাবী করতে পারে। আমরা এই লক্ষ্যের সাফল্য কামনা করি, কারণ ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় এক জনগোষ্ঠী ব্যক্তির অধিকার ও মূল্যবোধ রক্ষা করেও ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করে ও সমাজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোণো নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে ভারত তার স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে অহিংসার সাহায্যে সংগ্রামের সাফল্য ও শান্তির দৃঢ় শক্তির শিক্ষা দিয়েছে। বর্তমান সময়েও ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বিশ্বের সম্মুখে জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরেছে এবং বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক মীমাংসা-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছে।

# আন্তর্জাতিক

সায়গনে (বাম দিক থেকে) রবার্ট ম্যাকনামারা, জেনারেল টেলর, হেনরি ক্যাবট লজ প্রমুখ

## দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আজ বিস্ফোরণের মুখোমুখি। যে কোন সময় আগুন জ্বলে উঠতে পারে। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা গত সপ্তাহে সায়গনে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও এসেছেন, সি-আই-এ'র জন ম্যাককন, এ-আই-ডি'র ডিরেক্টর ডেভিড বেল, সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর এবং দূর প্রাচ্য সম্পর্কে নতুন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম বাণ্ডি। ম্যাকনামারার সহ-যাত্রীদের নাম থেকেই বোঝা যাবে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ম্যাকনামারা মিশনের ওপর কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট গেরিলাদের দমন ও এখানকার গণ-তান্ত্রিক শাসন রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, তার কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে কি না, ম্যাকনামারার কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পর রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসনকে তা স্থির করতে হবে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অবস্থার যেমন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর বিলম্ব করা চলে না। ভিয়েৎ কং বাহিনী ক্রমেই শক্তিবৃদ্ধি করছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের পক্ষ থেকেও স্বীকার করা হয়েছে, মোট ৪২টি প্রদেশের মধ্যে ৩৫টি 'উপদ্রুত'।

কমিউনিষ্টদের দমন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই দাবী ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ম্যাকনামারাকে সায়গনে দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—প্রথম, উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না? দ্বিতীয়, নেগুইন খানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারকে দিয়ে কাজ চলবে কি না?

অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক ও বর্তমানে পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশিষ্ট কর্তা রস্টো ভিয়েৎনাম সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন, তার আসল বক্তব্য হল দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামকে রক্ষা করতে হলে উত্তর ভিয়েৎ-নামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। উত্তর ভিয়েৎনাম, ও তার মারফৎ চীনের সাহায্য না পেলে ভিয়েৎ কং বাহিনীর পক্ষে এভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার ও মার্কিন সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং উত্তর ভিয়েৎনামকে জব্দ করতে হবে। রস্টো পরিকল্পনার প্রস্তাব—প্রথম, উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধান বন্দর হাইফং অবরোধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হাইফং অবরোধে কোন কাজ না হলে উত্তর ভিয়েৎনামের বন্দরগুলির ওপর জাহাজ থেকে বোমা নিক্ষেপ করতে হবে। তৃতীয়ত, বন্দরের ওপর বোমা নিক্ষেপেও যদি কোন কাজ না হয়, তবে উড়ো-জাহাজ থেকে উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয়ে বোমা ফেলতে হবে। মোট কথা যেভাবে হোক, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ব্যাপারে উত্তর ভিয়েৎনাম যাতে কোন অংশ না নেয় তা করতে হবে।

রস্টো পরিকল্পনায় অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, উত্তর ভিয়েৎনামের ৩, ০০, ০০০ সৈন্য তো সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়বেই—সঙ্গে সঙ্গে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকেও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। রস্টোর ধারণা।

চীন-সোভিয়েট সম্পর্ক বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্তত উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থনে এগিয়ে আসবে না এবং সোভিয়েট দূরে থাকলেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক যুদ্ধের আশংকাও থাকবে না।

যুদ্ধের আশংকার কথা প্রেসিডেণ্ট জনসনকে অবশ্যই ভাবতে হবে, কিন্তু কঠোরতর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেও জনসনের উপায় নেই, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন দায় অনেকখানি। সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অবস্থানগত গুরুত্ব ও কমিউনিজম প্রতিরোধের প্রশ্ন ছাড়াও, এখানে প্রতিদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক লক্ষ ডলার ব্যয় করছে —কয়েক শত মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি ইতিমধ্যে ভিয়েৎ কং বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পিছু হটতে হয়, তবে অন্যত্র তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হবে।

আগামী নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে লিণ্ডন জনসনকে তাই শীগ্‌গিরই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করতে হবে।

## দক্ষিণ রোডেশিয়া ঃ

আফ্রিকার কৃষ্ণকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে শ্বেতকায় প্রভুত্বের দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই দক্ষিণ রোডেশিয়ার নাম করতে হয়। বত্রিশ লক্ষ আফ্রিকানের এই দেশে মাত্র সোয়া দুই লক্ষ শ্বেতকায় তাদের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

গত সপ্তাহে সলিসবেরী এলাকায় আফ্রিকান ছাত্ররা স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে শ্বেত-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ছোট-খাটো সংঘর্ষ প্রায়ই হচ্ছে। বৃটেন, আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকার, এই তিন পক্ষকে কেন্দ্র করে এখানকার রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়া এখনও বৃটেনের অধীন। যে কোন কারণেই হোক বৃটেন চায়, এখানকার শাসনভার আফ্রিকানদের হাতে আসুক। কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন ফিল্ড স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, বৃটেন আফ্রিকানদের হাতে শাসনভার দেবার চেষ্টা করলে ফিল্ড সরকার বৃটেনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে পৃথকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। অপর-দিকে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সবচেয়ে

প্রেসিডেণ্ট জনসন

জনপ্রিয় নেতা জোশুয়া এন-কোমো বলেছেন, তাঁরা বৃটেনের সঙ্গেই থাকতে চান---শ্বেতকায় কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে আফ্রিকান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁদের দাবী।

ফিল্ড অবশ্য একটু মুস্কিলে পড়েছেন। তাঁর মুরুব্বী দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরউর্ড বৃটেনের সঙ্গে ফিল্ডের বিবাদ পছন্দ করছেন না। সুতরাং, ফিল্ড পৃথক হবার চেষ্টা করলে ভেরউডের সমর্থন হয়তো তিনি পাবেন না। সেক্ষেত্রে বৃটেন ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফিল্ডের পক্ষে শ্বেতকায় প্রাধান্য বজায় রাখা শক্ত।

জাতীয়তাবাদী শক্তিও অবশ্য কম বিভক্ত নয়। জোশুয়া এন-কোমো নরমপন্থী বলে যারা একটু বেশি সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন তারা এন-কোমোর 'পিপলস ক্যারেকটার কাউন্সিল' পার্টি ত্যাগ করে রেভারেণ্ড এন-দাবালিঙ্গি সিথোলের 'জিমবাবুই আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়নে' যোগ দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী শক্তি যদি নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে একযোগে কাজ করতে পারে, তবে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় ফিল্ড শাসনের অবসান ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথে কোন বিলম্ব ঘটবে না।

## বৃটেন ঃ

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, শাসন সংক্রান্ত মূল নীতি সম্পর্কে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের বক্তব্য তত বেশি পরিষ্কার করে রাখার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অনেক বিষয়েই দলের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। কোন কোন বিষয়ে আবার দলের বক্তব্য ভোট সংগ্রহের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। এক্ষেত্রে দল নীতিকে সমর্থন করবে, না ভোট পাবার প্রয়োজনে বিপরীত কথা বলবে? সম্প্রতি লেবার পার্টি এরূপ এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

কমনস্ সভায় সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল, স্কটল্যাণ্ডের হোলি লচ-এ যে মার্কিন সাবমেরিন ঘাঁটি আছে, লেবার পার্টি সরকার পেলে তা উঠিয়ে দেবে, না, রাখবে? এ উত্তরের জবাব হ্যাঁ' দেওয়াও যেমন শক্ত, 'না' বলাও তেমনি কঠিন। লেবার পার্টির সহকারী নেতা জর্জ ব্রাউন এই প্রশ্নকে 'ঠকানোর মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয়েছে'

বলে এড়িয়ে গেছেন—'হ্যাঁ' 'না' কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু এভাবে তো এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। দেশে বিদেশী ঘাঁটি রাখার বিষয়ে মনস্থির করতে হবে।

ওয়াশিংটন সফরকালে লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন নাকি বলেছেন, তাঁর দল সরকার পেলে হয়্যাল নেভিকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে দিয়ে দেবে। উইলসন এই বিবৃতির সত্যতা অস্বীকার করলেও সমগ্র বৃটেনে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে উইলসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

**সাইপ্রাস :**

সাইপ্রাসের ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব গ্রহণের পর যাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন। একদিকে সাইপ্রাসে নতুন করে গ্রীক-তুর্কী দাঙ্গা সুরু হয়েছে এবং অপর দিকে তুরস্ক সাইপ্রাসে সৈন্য প্রেরণের হুমকী দিয়েছে।

সাইপ্রাসের পশ্চিম উপকূলবর্তী শহর ফাটিমায় গত সপ্তাহে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেছে। ৭ জন নিহত ও ৩৪ জন আহত হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ইংরেজ সৈন্যও আছে।

ম্যাকারিয়স ধৃত তুর্কীদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করার পরেও নতুন করে এই দাঙ্গা সুরু হওয়ায় সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন স্থানে 'অস্ত্রত্যাগের' সিদ্ধান্ত হলেও তা কেউই প্রায় মানছে না। তাহলে কি কিছুতেই এই দ্বীপের দাঙ্গা থামবে না ?

তুরস্ক ঘোষণা করেছে, সাইপ্রাসে গোলযোগ না থামলে তুরস্ক সেখানে সৈন্য প্রেরণ করবে। ম্যাকারিয়স সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলেছেন, এই হুমকীকে তাঁরা অগ্রাহ্য করবেন। তবু তুরস্কের এই হুমকীর ফলে সমস্যা আরও জটিল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অপরদিকে, সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত পালনেও অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তদারকি শান্তি বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য ইউ থাণ্ট যাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে একমাত্র

সুইডেন এ পর্যন্ত রাজী হয়েছে। আর ব্রেজিলের পক্ষে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হবে না বলে জানানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিভাবে সৈন্য সংগ্রহ হবে তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও জানা গেছে, সাইপ্রাসের জন্য রাষ্ট্র-সংঘ সালিশের পদ গ্রহণে কাউকে সম্মত করা যাচ্ছে না। ইউ থাণ্ট

* ইউ থাণ্ট

এখন গুয়াতেমালার জোশে রইজ বেনেটকে রাজী করাবার চেষ্টা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

মোট কথা, সাইপ্রাসের সমস্যা সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। যত শীঘ্র মীমাংসা-চেষ্টা সুরু হয় ততই মঙ্গল।

## সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের কথা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। প্রায়ই চীন সীমানা অতিক্রম করছে এবং এই নিয়ে চীন-সোভিয়েট মনকষাকষিও হয়েছে। চীন অন্তত ৫০০০ বার সীমানা লংঘন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি জানা গেছে, চীন-সোভিয়েট সীমানা বিরোধ আলোচনার জন্য উভয় দেশ একটি যুক্ত কমিটী নিয়োগ করেছে। ভারত সফররত সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের নেতা আই ভি স্পিরিদনোভ দিল্লীতে এই কথা বলেছেন।

চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেকখানি জায়গা দাবী করেছে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে সোভিয়েটকে সে ছেড়ে দেয় নি। এখন দেখা যাক, উভয় দেশের যুক্ত কমিটী কোন মীমাংসায় পৌঁছুতে পারে, না শেষ পর্যন্ত এই সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বড় রকমের কোন সংঘর্ষ সুরু হয়।

## চীন ঃ

রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী আইয়ন মরার নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিনিধি দল গত সপ্তাহে পিকিং পৌঁচেছেন। দীর্ঘকাল পূর্ব ইউরোপের কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র চীনে এরূপ প্রতিনিধি দল পাঠায় নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, রুমানিয়া প্রতিনিধি দলের হঠাৎ চীন আগমনের কারণ কি? এ প্রশ্নে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা একমত নন।

অনেকের ধারণা রুমানিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে

আইয়ন মরার

মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্বার্থে চীন-সোভিয়েট বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত, এই বক্তব্য নিয়ে রুমানিয়া উভয়ের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং আরও কোন কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের নাকি প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে এই প্রচেষ্টার পেছনে। আবার অনেকে বলছেন, রুমানিয়া প্রতিনিধি দলের চীন সফরের মধ্য দিয়ে ক্রুশ্চেভ তাঁর উদার নীতির পরিচয় দিতে চাইছেন। তিনি দেখাতে চান, রুমানিয়া তাঁর অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও পিকিং-এর সঙ্গে রুমানিয়ার বন্ধুত্বে তাঁর আপত্তি নেই। প্রতিনিধি দলের বুখারেষ্ট


সাপ্তাহিক বসুমতীর
পরবর্তী আকর্ষণ ঃ
প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
'কৃষ্ণচূড়া'


বিমান বন্দর ত্যাগের সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বলে এঁদের ধারণা। আর এক পক্ষের ধারণা, চীনের সঙ্গে রুমানিয়ার নতুন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে রুমানিয়ার ক্রুশ্চেভ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এককালের কট্টর ষ্ট্যালিন-পন্থী ঝর্গে ঝর্গিউ-দেজের নেতৃত্বাধীন রুমানিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি ক্রুশ্চেভকে ত্যাগ করে মাও-কে গ্রহণের পথে পা বাড়িয়েছে। এ তারই ইঙ্গিত। আবার আর এক দল বলছেন, আসল কারণ আদর্শবাদ বা রাজনীতি নয়, নিক অর্থনৈতিক স্বার্থ। তৈল-সমৃদ্ধ রুমানিয়া চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করছে। চীনেরও তৈল শোধনাগারের বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে রুমানিয়ার সাহায্য খুবই মূল্যবান।

দীর্ঘকাল কমিউনিষ্ট-রাষ্ট্রশিবিরে আলবানিয়া ছাড়া চীনের আর কোন বন্ধু ছিল না---সোভিয়েট-বিরোধী কূটনীতিতে সে প্রায় একা। রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের এই নতুন সম্পর্কে এদিক থেকে চীনের পক্ষে খুবই লাভজনক, সন্দেহ নেই।

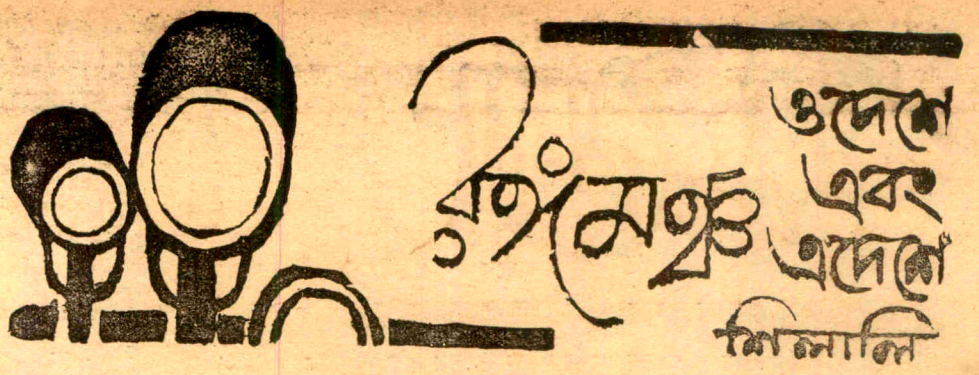


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

## রবীন্দ্রনাট্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রপ্রতিভা বহুমুখী---কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা, নাটক, চিত্রশিল্প, সব কিছুই আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এবং যা পেয়েছি শিল্প হিসাবে তা প্রায় সবক্ষেত্রেই একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

কবিপ্রতিভার একটি বিশেষ দিক নিয়ে, অর্থাৎ নাট্যরচয়িতা হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করবো এখানে।

নাট্যকার হিসাবেও রবীন্দ্রপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে বহুভাবে এবং বহু-দিকে। কবির নাটকে চিন্তার পর্যাপ্ত খোরাক, বহু শিক্ষণীয় বিষয় ও জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যার আলোচনা পাওয়া যায়। একদিকে কবি প্রেম, ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক, যথা, 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি রচনা করেছেন। তেমনি আবার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে 'ডাকঘর', 'রাজা' প্রভৃতি নাটকে। ধনতন্ত্র, শোষণ-নীতি, যান্ত্রিকতার---বিকৃতির স্পষ্ট আলেখ্য পাওয়া যায় 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে।

## রবীন্দ্রনাট্যে অভিব্যক্তিবাদ

ইউরোপীয় নাটকে অভিব্যক্তি-বাদের প্রাধান্য দেখা দেয় ১৯১০ সালে এবং ১৯২৪ সাল অবধি এই ধারায় নাট্যরচনা চলতে থাকে। এরপর পাশ্চাত্যের নাট্যকারেরা দেখতে পেলেন, পৃথিবীর যে সোনালী ভবিষ্যতের ছবি একদিন তাঁরা কল্পনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, যথাসময়ে তার রূপায়ণ হল সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। এই ব্যর্থতার ফলে তাঁদের আন্দোলনও ভেঙে গেল। এ বিষয়ে বিদেশী সমালোচকেরা লিখলেন :

'The hatred of war and the hope that after the war a new and better world would be built up became the central idea of Expressionism. The troubled time after the war involved the failure of their ideals and breakdown of the Movement was inevitable. The stabilisation of Europe along lines that did not correspond to their hopes brought the Movement to an end about 1924. [ Expressionism---Samuel and Thomas.]

'মুক্তধারা' [ বৈশাখ ১৩২৯ (১৯২২)], 'রক্তকরবী' [১৩৩১, (১৯২৬)], 'রথের রশি---কালের যাত্রা' [৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯, (১৯৩২)]। 'তাসের দেশ' ও [ভাদ্র ১৩৪০ (১৯৩৩)] একটা আষাঢ়ে গল্পের (প্রথম প্রকাশ ১৮৯২) নাট্যরূপ---সম্পূর্ণ Expressionistic style-এ লেখা। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, আগে থেকেই ঠিক করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় নাটকগুলি রচনা করেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শিল্পীদের চিন্তাধারাটা একই গতিতে একটা নির্ধারিত পথ ধরে চলেছে। সহজ কথায় একে বলতে হয়, 'Collective activity displayed by writers and artists of the world.'

( ক্রমশ।

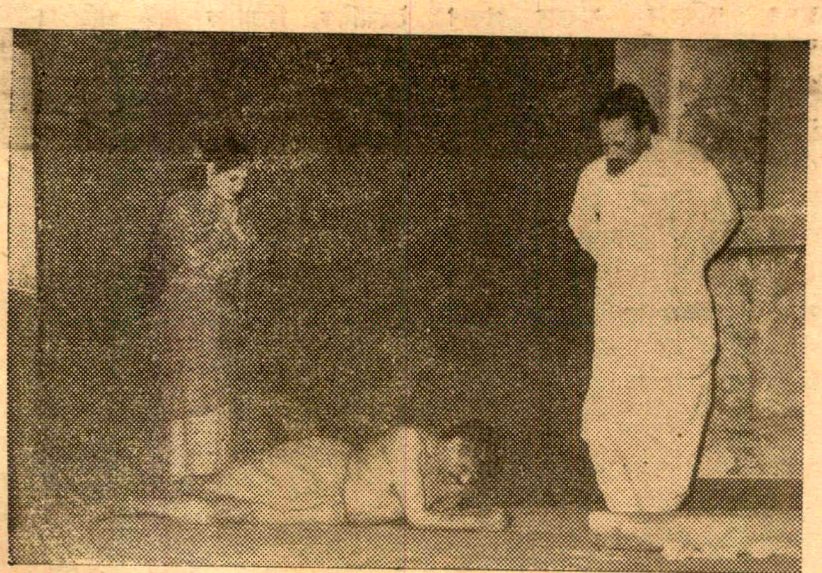

● সন্ধ্যানীড়ের 'রক্তকরবী' নাটকে- নন্দিনী, পালোয়ান ও অধ্যাপকের ভূমিকায় মাধুরী চৌধুরী, অমিয় মৈত্র ও চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি।

# গ্রন্থমেলা

জয়ন্তী সেন

**সাগরে মিলায় ডন** ( দ্বিতীয় খণ্ড)—মিখাইল শলোখফ। অনুবাদক : সুধীন্দ্র সরকার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। মূল্য : সাত টাকা।

আধুনিক রুশ-সাহিত্যে শলোখফ এক স্মরণীয় প্রতিভা, এই পুস্তকটি তাঁর রচিত Don Flows Home to the Sea-এর অনুবাদ।

অনুবাদ চমৎকার। কেবল চরিত্রের নামকরণই মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—এই রচনাটি অনুবাদ।

প্রাবন্ধিক Ralph Fox তাঁর 'The Novel and the people' গ্রন্থে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'The novel is not merely fictional Prose, it is the prose of man's life, the first art to take the whole man and give him expression' এই উপন্যাস সেইরূপ পূর্ণাবয়ব মানবজীবনেরই শিল্পরূপ। গ্রিগরের জীবনকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। গ্রিগর নিজে একজন কসাক এবং কসাক বিদ্রোহে যোগদান করে লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব এই পুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সে কসাকদের বীভৎস অত্যাচারকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছে, আবার সরাসরি লালফৌজে যোগদানের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বাধা। শেষ পর্যন্ত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ডন নদীর জলে নিক্ষিপ্ত করে সে এসে দাঁড়াল জীবনের শেষ সঞ্চয় ছেলের হাত ধরে বাড়ির পানে চেয়ে। যা তাকে আরো কিছুকাল দিতে পারবে মাটির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন, শীতল সূর্যের নীচে উজ্জ্বল এই পৃথিবীর সঙ্গে আরো কিছুকালের যোগাযোগ।

গ্রিগরের চরিত্র এমনভাবে আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে যে, কখনও মনে হয় না অনুবাদ পড়ছি। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে ঘটনা সংস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রিগর যেন আধুনিক পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালের চরিত্রের প্রতিনিধি। তার অন্তর্দ্বন্দ্বটা যে কোন সংবেদনশীল মানুষের সমস্যা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই উপন্যাসটি পাঠকদের চিত্তকে জয় করবে।

**সদ্‌গুরু শরণে**—স্বামী বিষ্ণুপুরী। মূল্য : ১'২৫ নঃ পঃ।

হিন্দুধর্মের মধ্যেই রয়েছে নানা শাখা প্রশাখা, তাই নানা মতানুসারে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা পাওয়া এ সমাজে দুর্লভ। লেখক এই গ্রন্থে দীক্ষার মৌলিক বিষয়টাকে সুন্দর কথিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বহুবিধ জটিল বিষয়কে প্রশ্নাকারে অবতারণা করে লেখক সমস্যাগুলিকে সমাধান করেছেন। কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা এই আলোচনাকে স্পর্শ করে নি। লেখকের নির্ভীক বক্তব্যের মধ্যেও পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে।

আলোচনাটি স্বচ্ছ, সরল ও সরস। সম্প্রদায় নির্বিশেষে উৎসুক পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে লাভবান হবেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

**অদূরে জলের শব্দ** : পরেশ মণ্ডল। পরিবেশক : সিগনেট বুক-শপ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য : দু'টাকা।

সমসাময়িক কালের তরুণ কবিদের কাব্যচেতনার দুরূহতা ও অস্পষ্টতা সম্পর্কে কিছুটা বাদ-বিতর্ক আছে। অনুকরণলিপ্সা ও জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই সেই দুরূহতা বা অস্পষ্টতার কারণ মনে হয়। 'অদূরে জলের শব্দ' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা পরেশ মণ্ডল ঐ অভিযোগ থেকে একেবারেই মুক্ত বলে মনে হয়। কেন না, গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি হলেও কবি অন্তর্জগতের ব্যথা-বেদনা-আকাঙ্ক্ষা ও জিজ্ঞাসা থেকে সেই গভীরে এসে পৌঁচেছেন যেখানে—

'সূর্য ডুবে গেলে আমি মগ্ন হই
সন্ধ্যার তিমিরে
তার আগে এ-আলোক মিশে থাক
বাতায়ন ঘিরে।'

তাছাড়া 'পদাবলী' অংশে রয়েছে—

'তাছাড়া নিরালা আমি এই ঘরে
এই সন্ধ্যা মাখি,
মাঝে মাঝে যন্ত্রণার কুণ্ড থেকে
কাকে যেন ডাকি।'

ওপরে উদ্ধৃত কবিতার আংশিক পঙ্‌ক্তিগুলি মিলিয়ে দেখলে সার্থক কবি-চিন্তার অভিব্যক্তিটা পাঠকের কাছে অনুধাবনযোগ্য হবে।

**রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা** : (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) —সম্পাদক : শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭। মূল্য : প্রতি সংখ্যা—এক টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক দ্বিভাষিক এই পত্রিকার সৎ দৃষ্টান্ত বাংলা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত হওয়া উচিত। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা একাডেমী থেকেই এই ধরণের উন্নতিশীল সুরুচিসম্পন্ন একটি পত্রিকা বের হয়ে থাকে। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, কবিতা ও কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় সর্বশ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন দেবনাথ, অজিতকুমার ঘোষ, শোভন গুপ্ত, অগ্নিদূত, শীতাংশু মৈত্র, সুভাষ বসু, শিবানী চট্টোপাধ্যায়, সমর ভৌমিক, দীপক বড়ুয়া ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনা বিশেষ মূল্যবান।

# রঙ্গরাগ

## নতুন বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র

নতুন বাজেটে চলচ্চিত্র প্রযোজকরা কিছুটা সুবিধা পেয়েছেন। গত বাজেটে চলচ্চিত্রের ওপর একটা উৎপাদন-শুল্ক বসেছিল। সেই শুল্কনীতি অনুযায়ী ৩২৫০ মিটারের উর্ধ্বে ছবির ওপর অতিরিক্ত কর দিতে হতো। ১৪টা প্রিণ্টের জন্য এই করের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১,৬০২ টাকা। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই কর ছিল গোদের ওপর বিস্ফোটের তুল্য। তাই সেই করের বিরুদ্ধে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। এ বছরের নতুন বাজেট অনুযায়ী ট্যাক্সের হার কমে গিয়ে দাঁড়াবে ১৪টি প্রিণ্টের জন্য ৫০৪৪ টাকা। প্রায় অর্ধেক টাকা রেহাই পাওয়া কম কথা নয়। তবে বাংলা ছবির গড় দৈর্ঘ্য ৫৮২০; সুতরাং ৪ হাজার মিটার পর্যন্ত ছাড় দেওয়ায় বাংলার প্রযোজক অপেক্ষা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রযোজকরাই লাভবান হয়েছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রযোজকদের বিরুদ্ধতার জন্যই করের ন্যূনতম সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। বাংলা ছবির জন্য সরকার যদি সহানুভূতিশীল হতেন, তবে এত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সরকারের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হত না। তবুও আজ যে সুবিধা পাওয়া গেছে সেটাও কম কথা নয়

—সুজন।

## চিত্র-আলোচনা

### সোভিয়েটের পাঁচটি ছবি

সোভিয়েট চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে গত ৬ই থেকে ১২ই মার্চ নিউ এম্পায়ার সিনেমায় ছ'টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র ও ছ'টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছ'টি ছবির মধ্যে ছিল:

* 'নেইডেন স্প্রীং'—একটি নাচ-গানের রঙিন ছবি। সোভিয়েটের একটি নাচের দল এক প্রমোদতরীতে করে সফরে চলেছে। ঘাটে ঘাটে তারা নৃত্য প্রদর্শন করছে। ছবিতে নাটকীয়তা জমাবার চেষ্টা হয়েছে এক নর্তকীর প্রতি মুগ্ধ এক তরুণের জাহাজে পাচকের কাজ নিয়ে সফরে যাত্রা করার ঘটনায়।

* 'মামলুক'—মধ্যযুগে সাদা চামড়ার দাসদের নিয়ে ব্যবসার এক করুণ চিত্র।

* 'গার্লস'—একটি কৌতুকরসের চিত্র। তুষারাচ্ছন্ন বনে কাঠ কাটা হচ্ছে। সেখানে পাঁচটি মেয়ে আছে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে, তাদের মধ্যে একজন নতুন পাচিকাকে মধ্যমণি করে কাহিনীতে কৌতুককর ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে।

* 'দি ষ্টোরী অব ফ্লেমিং ইয়ার্স'—ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের কালে সোভিয়েট তরুণের সংগ্রাম ও জীবনের কথা। এই একটি চিত্রের মধ্যে যুদ্ধকালীন রাশিয়ার ইতিহাস, জীবন ও বাণী প্রকাশিত হয়েছে।

* 'আইভানস চাইল্ডহুড'—যুদ্ধ কালে পিতৃমাতৃহারা এক কিশোরের বীরত্ব, ভাবনা ও স্বপ্নের কাহিনী। শেষ পর্যন্ত এই কিশোরকেও নৃপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তারই এক মর্মস্পর্শী চিত্র।

শেষের দিনের ছবি 'নাইন ডেজ অব ওয়ান ইয়ার' ছবিটি আমরা দেখতে পারি নি।

এই পাঁচটি ছবির মধ্যে একটি মধ্যযুগের ইতিহাসভিত্তিক ছবি, যার পটভূমি সোভিয়েট জর্জিয়া অঞ্চল এবং মিশর। মধ্যযুগের বর্বরতার মধ্যেও সাধারণ মানুষের মানবিকতা, প্রেম এবং যুদ্ধমান দু'পক্ষের সৈনিকরাই যে সামন্তপতিদের দাস এবং তাদের স্বার্থ অভিন্ন, অথচ তারা পরের স্বার্থরক্ষার জন্য অযথা প্রাণ দেয়, এই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'নেইডেন স্প্রীং' ও 'গার্লস' দু'টি কমেডি চিত্র সোভিয়েটের শান্তিকালের। প্রথমটি নির্মিত হয়েছে জর্জিয়ার বিখ্যাত নৃত্য দলকে কেন্দ্র করে। এই দলটি কলকাতায় নৃত্য প্রদর্শন করে গেছে, সুতরাং বহু চেনামুখ পর্দায় দেখতে বেশ ভাল

● আন্দ্রেই তারকভস্কি
সোভিয়েট ফিল্ম ডিরেক্টর

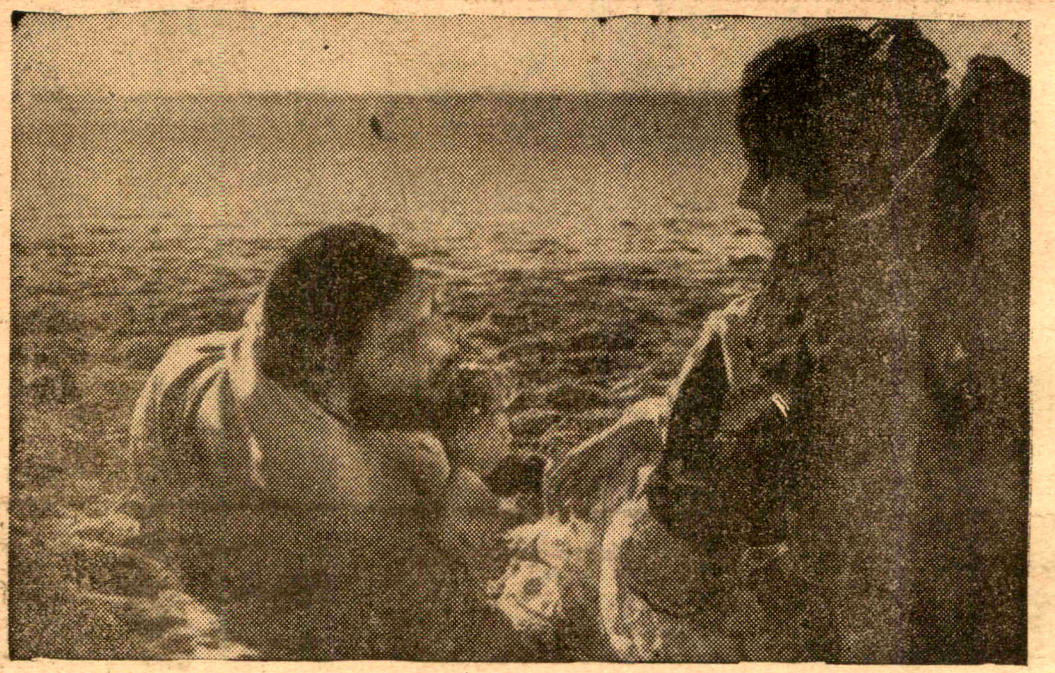

● 'চারুলতা' চিত্রে---শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

লেগেছে। ছবিটিতে কয়েকটি বিস্ময়কর লোকনৃত্য বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়। বাকি ছবি দু'টির মধ্যে 'ফ্লেমিং ইয়ার্স' সোভিয়েটের সুবিখ্যাত আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে তাঁর স্ত্রী জুলিয়া সলনৎসেবা পরিচালনা করেছেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র জগতে এই ছবিটি একটি মহৎ চিত্রের মর্যাদা-লাভের যোগ্য। কিন্তু সপ্তাহব্যাপী উৎসবে 'আইভানস চাইল্ডহুড' মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত এই ছবিটিকে একালের একটি মহৎ চিত্ররূপে বিনা দ্বিধায় চিহ্নিত করা চলে। ছবির নায়ক কিশোরটি মনকে এমন অভিভূত করে তোলে যে, তাকে ভোলা অসম্ভব। সার্বজনীন আবেদনে এই ছবিটির যুদ্ধবিরোধী, বিশেষ করে ফ্যাসিবাদবিরোধী বক্তব্য অত্যন্ত শক্তিশালী। ছবিটির তরুণ পরিচালক আঁদ্রেই তারকভস্কি চমকপ্রদ শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে 'ফ্লেমিং ইয়ার্স' ও 'চাইল্ডহুড' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছবি।

'আইভানস চাইল্ডহুড' এবং 'ফ্লেমিং ইয়ার্স' ছাড়া অন্যান্য ছবিগুলি সাধারণ মানের। আইজেনষ্টাইন-ডবঝেঙ্কো-পুডভকিনের উত্তরসূরী হিসাবে আমরা আরো উন্নতমানের সোভিয়েট ছবি দেখব আশা করেছিলাম। এদিক থেকে দু'টি ছাড়া অন্য ছবিগুলি আমাদের তেমন আকর্ষণ করে নি। তবে 'মেইডেন স্প্রীং'-এ সুরসিকা পাচিকাদের ব্যবহারে, 'গার্লস'-এ নবাগতা পাচিকার আত্মসম্মানবোধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে সোভিয়েট সমাজে নারীদের সমমর্যাদাপূর্ণ স্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। একটা নতুন সমাজচিত্র দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্বেকার সোভিয়েট ছবির সঙ্গে বর্তমান সোভিয়েট ছবির মেজাজ ও রসবোধের তারতম্যও দৃষ্টি এড়ায় না। সোভিয়েট চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে দর্শক মনোরঞ্জনের ঝোঁকটা বেশ স্পষ্ট করেই দেখা গেছে এবং তার জন্য স্থূলভাবে যৌন আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা ধনিক দেশ অনুসারী বললে অত্যুক্তি হয় না। এ কারণে 'মেইডেন স্প্রীং'-কে মনে হয়েছে উদ্দেশ্যহীন; 'গার্লস'-এর পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

কিন্তু পাঁচটি ছবিতেই চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং রঙ মেশাবার যে কৃতিত্ব দেখা গেছে---তার তুলনা হয় না। ফটোগ্রাফির নৈপুণ্য এত উচ্চমানের যে, বিস্ময়ে মুগ্ধ করে 'আইভানস চাইল্ডহুড'-এ আইভান ও তার মা'র কূয়ার ওপর থেকে দেখা, জলে ঢেউ খেলানো, কূয়ার নীচে থেকে ওপরে দেখার স্বপ্নদৃশ্য, বালুচরে ছেলেমেয়েদের খেলা এবং আইভানের দৌড়ে একটা বালিকাকে অতিক্রম করে যাওয়া, অথবা জলাভূমিতে আঁধারের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোকচ্ছটা ---চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে অসাধারণ বিস্ময়। শিল্পবোধসম্পন্ন ফটোগ্রাফির এই বাহাদুরীর জন্যও ছবিটি বারবার দেখার মত আকর্ষণীয়। রঙের কৃতিত্ব আর হেলিকপ্টারে তোলা ফটোগ্রাফির নৈপুণ্যের সমন্বয় ঘটেছে 'ফ্লেমিং ইয়ার্স'-এ। 'মামলুক'-এ যুদ্ধদৃশ্যটি

বিশেষ করে অশ্বারোহীদের আক্রমণ করার দৃশ্যটি অসাধারণ।

এই পাঁচটি ছবিতে যে অভিনয়-ক্ষমতা দেখেছি তাও এককথায় অনন্য-সাধারণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আইভানস চাইল্ডহুড' ছবির কিশোর অভিনেতা। 'মেইডেন স্প্রীং'-এর সুরসিকা পাচিকা এবং 'গার্লস'-এর সবাগতা পাচিকা অভিনয়ে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফ্লেমিং ইয়ার্স'-এর নায়ক-নায়িকাকেও আমরা ভুলতে পারি না। এরা দীর্ঘদিন আমাদের মনে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের দীপ্তিরূপে জেগে থাকবে।

## টুকিটাকি খবর

* রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় নির্মিত ছবির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়েছে 'চারুলতা'। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড এই পরিবর্তিত নাম অনুমোদন করেছেন। আর ডি বি প্রযোজিত এই ছবির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়।

### চিরায়ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

গত বৃহস্পতিবার ১২ই মার্চ ললিতকলা ভবনে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে চিরায়ত চলচ্চিত্রের সাতদিনব্যাপী এক উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেন শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় চিরায়ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রথম দিন ১৯১৮ সালে নির্মিত ডেকলা বায়োস্কোপ প্রযোজিত, রবার্ট উইন পরিচালিত 'দি ক্যাবিনেট অব ডাঃ কালিগরি' প্রদর্শিত হয়। ২০শে মার্চ পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি চিরায়ত চিত্র দেখান হবে। ফিল্ম সোসাইটির এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। কয়েকটি দুর্লভদর্শন ছবি দেখার সুযোগ সোসাইটির সদস্যরা লাভ করলেন। একাডেমি-হলে এত জনসমাবেশ হয়েছিল যে, বহু দর্শক দাঁড়িয়ে এবং ব্যালকনির সিঁড়িতে বসে দেখেছেন; অনেকে দাঁড়াবার স্থান না পেয়ে ফিরে চলে গেছেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরও অনেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

### সুইডস ছবির প্রদর্শনী

সিনে কাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে সুইডিস ছবি প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে। আগামী ২৭শে থেকে ৩০শে মার্চ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নিম্নোক্ত ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। ছবিগুলি দেখার জন্য সিনে ক্লাব থেকে বিশেষ প্রবেশপত্র নিতে হবে।

২৭শে—ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ, ২৮শে—মিস জুলি, ২৯শে—দি ম্যাজিসিয়ান, ৩০শে—দি ভার্জিন স্প্রীং।

## নাটকের কথা

### বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবছরের মত এবারও বিশ্বরূপা থিয়েটার প্রাঙ্গণে বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হয়েছে ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ। বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা নাটক ও নাট্যমঞ্চ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

২৮শে মার্চের অধিবেশন সেক্সপীয়ারের চার শততম জন্মবার্ষিকীর কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই উপলক্ষে শেক্সপীয়ারের নাটকাবলীর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী এপ্রিল-মে-জুন মাসে।

## সংবাদ-কণা

* বিদেশী ছবির অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে: ফেদারিকো ফেলিনির '৮½' (ইতালী), পোলান রোমানস্কির 'লাইফ ইন দি ওয়াটার' (পোল্যাণ্ড), 'লস টারানটস' (স্পেন), 'দি রেড ল্যাণ্টার্ন' (গ্রীস)। 'টুইন সিষ্টার্স অব কিরাটো' (জাপান)।

* পরিচালক মৃণাল সেন এই সপ্তাহে দিল্লী যাচ্ছেন 'প্রজাতন্ত্র দিবস' প্রামাণিক চিত্র নির্মাণের জন্য। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসনের উদ্যোগে তিনি এই রঙিন ছবিটি নির্মাণ করছেন।

* 'মাদার জোয়ান অব দি এঞ্জেলস' নামে যে পোলিশ ছবিটি সেন্সার বোর্ড কর্তৃক প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছিল, এখন ছবিটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা হচ্ছে জানা গেল।

### সোভিয়েট সার্কাস

সার্কাস দেখার জন্য আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাই আগে পা বাড়ায়। অনেক কৌতুক, অফুরন্ত আনন্দ, অজস্র কসরৎ-এর মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্তবিনোদন করে থাকে আমাদের দেশের সার্কাস দলগুলি। তাঁদের মধ্যে যে কোনরকম নৈপুণ্যের অভাব আছে, তা নয়, একমাত্র যে অভাব দেখা যায়—তা হচ্ছে সার্কাসের মধ্যে সূক্ষ্মশিল্প। সোভিয়েট সার্কাসের মধ্যে গভীর শিল্পচর্চা দেখে অন্তত সেই কথাটাই মনে হলো। সংস্কৃতির আদান-প্রদানে শিল্পের মহান স্থান স্বীকৃত। সোভিয়েট সার্কাস দল সেই মহান ভূমিকায় বাংলা দেশের সংস্কৃতির

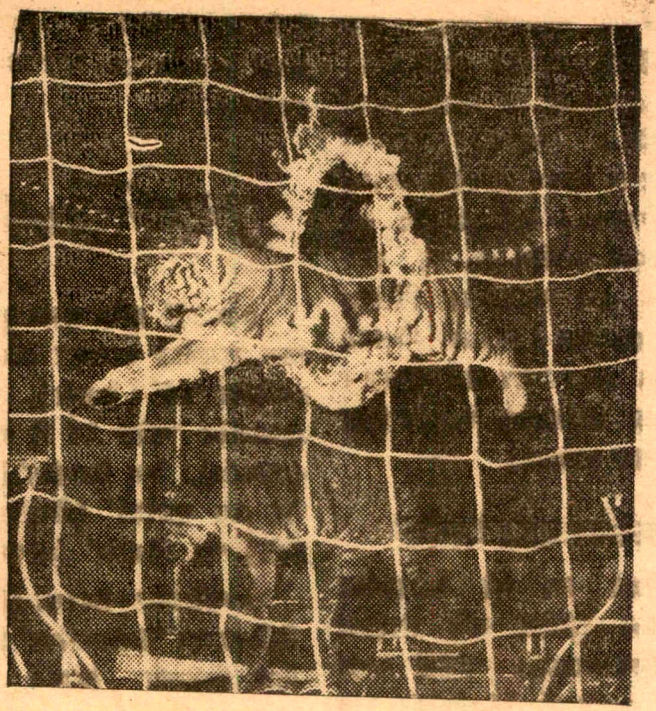

● সোভিয়েট সার্কাসের একটি বাঘের খেলা

অন্যতম পীঠস্থান কলকাতায় ৫ই মার্চ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। মাত্র কয়েকদিনের জন্য অবতীর্ণ হলেও আমাদের স্মরণপথে দীর্ঘকাল ধরে বিচরণ করবে এই সোভিয়েট সার্কাসের শিল্পসুষমামণ্ডিত প্রতিটি খেলা, তাঁদের প্রযোজনা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা। দুঃখ রয়ে যাবে তাঁদের মনে—যাঁরা পরিমিত স্থানের জন্য অর্থের বিনিময়েও দর্শন-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন।

সময় মাত্র আড়াই ঘণ্টা। বিদ্যুতের গতিতে প্রতিটি খেলার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সার্কাস। সার্কাস শেষে বাড়িমুখো নানা জাতি নানা বর্ণের দর্শক পরস্পরকে নিজের বিস্ময়ানুভূতি জ্ঞাপন করে আনন্দ পায়। সার্থক হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান।

সোভিয়েট সার্কাস দলের প্রতিটি খেলা এমন উচ্চমানের যে, তা আমাদের ধারণা বা কল্পনার বাইরে। কেন না, তাঁরা শিল্পের সঙ্গে যোগসাধন ঘটিয়েছেন আধুনিকতম যন্ত্রপাতির। আমাদের দেশে 'নেট' ব্যবহার করতে অন্তত বেশ কিছুটা সময় নেয় এবং নেটের ব্যবহার আমাদের আনন্দকে কিছুটা ব্যাহত করে, কিন্তু সূক্ষ্ম তারের ব্যবহারের মধ্যে সোভিয়েট সার্কাস-এর শিল্পীরা শূন্যদেশে যেসব বিস্ময়কর খেলা দেখিয়েছেন, তা আমাদের দেশের সার্কাস দলগুলি অনায়াসে অনুসরণ করতে পারেন।

দৈহিক কসরৎ, তীক্ষ্ণ সময়-জ্ঞান প্রতিটি খেলার প্রধান বস্তু হলেও খেলাগুলি নানা বিষয়কে অবলম্বন করেই রচিত। যেমন সুরুতেই দেশেভস্কি-দম্পতি যে খেলা দেখিয়েছেন, তা হাস্যরসাত্মক। শূন্যে 'বারে' ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যেও আমরা অনুভব করছিলাম—এমন দ্রুতগতিতে যারা ঘুরপাক খেতে পারে, তাদের পক্ষেই এক মহাব্যোমযানে চড়ে পৃথিবী ঘোরাটাও সম্ভব।

সর্বাপেক্ষা আমাদের যা আশ্চর্য করেছে—তা হচ্ছে সুদীর্ঘ রণপায়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া। উল্লেখযোগ্য, পৃথিবীতে এমন আর কেউ নেই, যিনি এই ভয়ঙ্কর খেলা দেখাতে পারেন। এই খেলার অনুষ্ঠাতা গৌরবাচফ পৃথিবীর একটিমাত্র নাম হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পায়ের সাহায্যে স্বামী, স্ত্রী ও কিশোরী কন্যা এক-যোগে যে খেলা দেখিয়েছেন তা চমৎকার। কিশোরী কন্যার নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে।

পশুর খেলা দেখানোতেও সোভিয়েট সার্কাস দল অতুলনীয়। সোভিয়েটের ও বাংলার বাঘ একযোগে বিশ্বজনের চিত্ত হরণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সব বাঘ খেলা দেখিয়ে এসে বাংলা দেশে মিলিত হয়ে দেখিয়ে দিল কিভাবে আগুন-জ্বালা চাকা ভেদ করে অনায়াসে পার হওয়া যায়। তেমনি দক্ষ রিং মাষ্টার। হঠাৎ শুয়ে পড়লেন তিনি লম্বালম্বি চারটে শান্ত বাঘের ওপর। ছোট ছেলেরা যেমন পোষা কুকুরের লেজ ধরে টানাটানি করে, তেমনি তিনি ভয়ঙ্কর বাঘগুলির লেজ ধরে টানাটানি সুরু করলেন। তাছাড়া পাখির খেলাগুলিও অনন্য। আশ্চর্য হয়েছি আমরা ভালুকের মোটর সাইকেল চালনা দেখে।

এইসব খেলার মধ্যমণি হচ্ছেন 'রুশ ফেডারেশনের সম্মানিত শিল্পী' উপাধিভূষিত ক্লাউন বোরিস ভিয়াৎকিন। নিছক ভাঁড়ামি নয়, ক্লাউনরাও যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে—এই মন্তব্যের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'বল'টাকে দূর থেকে তার কাছে ছুড়ে দেওয়া যদি দর্শকদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে মুখের একটা কাঠিতে 'বল'টাকে ধরা কখনোই অসম্ভব নয়—এই ধরণের অপূর্ব খেলা তিনি আমাদের দেখিয়েছেন।

সোভিয়েট সার্কাস আমাদের কাছে আজ শুধু দর্শনীয় নয়, শিক্ষণীয়ও—একথা আমরা অনুভব করলে সোভিয়েট সার্কাস প্রদর্শনী সার্থকতর হয়ে উঠবে।

# খেলাধূলা

## ভারতীয় ফুটবলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চুণী

খেলাধূলার আলোচনায় বলাইদা' পঞ্চমুখ। মন তাঁর সুদূর অতীতে চলে যায়, মনের তারে তাঁর বেজে ওঠে কত হারানো সুর। দীর্ঘদিন ক্রীড়া-জগতের সঙ্গে তিনি জড়িত, কত ভাল ভাল খেলোয়াড় যে তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই কথা প্রসঙ্গে বললেন—আমি যে ছেলেটির কথা বলতে যাচ্ছি তার নাম আজ বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে কেন, সর্বভারতীয় ক্রীড়াজগতে অবিস্মরণীয়। পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহের গোস্বামী পরিবারে এর জন্ম। কিন্তু ছেলেটি জন্মের পর থেকেই কলকাতা-বাসী। খিদিরপুর এবং পরে বালিগঞ্জের তীর্থপতি স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেটি আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়। বি-এস-সি পাশ করে ছেলেটির খেয়াল হল ল' কলেজে পড়ব, তাই ল' কলেজে কিছুদিন সে যাতায়াত করল। খেলাধূলার কথা বলতে গিয়ে লেখাপড়ার কথা বলছি এই কারণে যে, অনেকের ধারণা—খেলাধূলার চর্চা করলে মা-সরস্বতী কৃপা করেন না। চুণী অবশ্য খেলাধূলায় মেতে থাকলেও পড়াশুনায় ফাঁকি দেয় নি।

চুণী তখন ক্লাশ ফোরের ছাত্র। সেই সময় কলকাতায় একবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। গোলমালের জন্য যেদিন ময়দানে যেতে পারতাম না, দেশপ্রিয় পার্কে অথবা ত্রিকোণ পার্কে বসে ছোট ছেলেদের খেলা দেখতাম। আমার মত দুনিয়ার অনেক ক্রীড়াশিক্ষকই শিশুমহল থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে, ভবিষ্যতের সেরা খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। শত শত ছেলের মধ্যে সেদিন চুণীকে আমার চিনতে ভুল হয় নি। অন্যান্য প্রতিভার মত ক্রীড়া-প্রতিভাও সহজাত। কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলছি। বিদেশের কোচেরা এমন সব প্রতিভা-সম্পন্ন খেলোয়াড় খুঁজে বার করেছেন, যাদের বিনা trial-এ দেশের প্রতি-

● চুণী গোস্বামী

নিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ভারতেরই রক্তে গড়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-নিবাসী সোনি রামাধীনের নাম। ইংলণ্ডের মাটিতে পা দেবার আগে রামাধীনের নাম কেউ জানত না। সে-বার রামাধীন বোলিং-এ ভেল্কি দেখিয়ে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডকে। রামাধীনের এই প্রতিভা জন্ম থেকে পাওয়া। আর একজন জগদ্বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাঁর নাম Sir Donald Bradman. ছেলেবেলায় বেশির ভাগ সময় তিনি গুলী-ডাণ্ডা খেলতেন। একদিন বাবার সঙ্গে খেলার মাঠে গিয়েছিলেন বাবাদের দলের খেলা দেখতে। সেদিন ভাগ্যক্রমে দলের একজন খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকায়, ছেলেটি দলে স্থান পেল। সেই খেলায় ছেলেটি ৭৫ রান করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। তাই বলছিলাম যে, প্রতিভা সহজাত।

চুণীরা দুই ভাই ও আমার নিজের ছেলে একসঙ্গে খেলাধূলা করত। তবে চুণীই ছিল এই Trio-এর টেক্কা। তখন খেলোয়াড় ধার করার খুব রেওয়াজ ছিল। এপাড়া-ওপাড়া থেকে চুণীকে ধার করার জন্যে ছেলেরা আমার কাছে ধর্ণা দিত। প্রতিভা উন্মেষের মুখে এই সব কিশোর খেলোয়াড়রা আজে বাজে জায়গায় খেলতে গিয়ে জখম হয় এবং ফলে তাদের খেলার বারোটা বেজে যায়। তাই আমি যথাসাধ্য বাধা দিতাম। তবে আমার কড়া নিষেধ ছিল এই সব খেলতে গিয়ে তেলেভাজা বা দালদায় ভাজা কোন খাবার না খেতে। রসগোল্লা, সন্দেশ বা রাবড়িতে কোন আপত্তি নেই। চা খাওয়ায় কড়া নিষেধ। যদিও বড় হয়ে একটু-আধটু খেত লুকিয়ে, তবে বাড়িতে তার চায়ের পাট ছিল না। স্কুলে থাকতেই চুণী অল্প বয়সে বাংলা দলে খেলার সুযোগ পেল। আর এই খেলাতে সে বেশ নামও কিনেছিল। এই বয়সে একদিন ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে মোহনবাগানের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলায় দু'ঘণ্টা ব্যাট করে অপরাজিত ছিল। তখনই আমি বুঝলাম যে ক্রিকেটেও চুণী কম যায় না।

এই সময় মোহনবাগানের ফুটবল দলের 'C' টিমে চুণী খেলতে সুরু করল। আমি তার ওপর কড়া নজর দিলাম আর তাকে আমার কাছছাড়া হতে দিলাম না। এদিকে অন্য দু'ভাই আমার কথা না শুনে জর্জ টেলিগ্রাফ আর

স্পোর্টিং ইউনিয়নে যোগ দিল। তখন একদিন একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে। সেদিন ইষ্টবেঙ্গল আর জর্জ টেলিগ্রাফের খেলা। দাদাদের খেলা দেখার জন্য চুণী ভীষণ ব্যস্ত। আমার নিষেধ না শুনে একটা টিকিটের জন্য জর্জ টেলিগ্রাফের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, শেষে টিকিট না পেয়ে মনক্ষুণ্ণ হয়ে আমার কাছে এল। আমি তাকে সেদিন বললাম—দেখবি, এমন একদিন আসবে সেদিন তোর পেছন পেছন ওই দাদারা ঘুরবে। চুণী এরপর মোহনবাগানে 'C' টিম থেকে 'B' টিমে এবং পরে 'A' টিমে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে দলভুক্ত হল। ১৯৫৫ সাল থেকে চুণী মোহনবাগানের নিয়মিত দলে তার আসন পাকা করে নিল।

আশুতোষ কলেজে প্রথম বছর চুণী কোনক্রমে কলেজ ফুটবল দলে স্থান পেল। দ্বিতীয় বছর সে স্থান পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চুণীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্যার আশুতোষ ট্রফি ঘরে এনেছে। কাবুল সফরে চুণী মনোনীত হল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক। মোহনবাগানে খেলার প্রথম বছর আই-এফ-এর একটা দল রাঁচিতে খেলতে যাবে এবং চুণীকে সেই দলে স্থান দিল কর্তৃপক্ষ। এই সময় আই-এফ-এর সম্পাদকের কাছে চিঠি এল রাঁচির লোকেদের কাছ থেকে; তারা লিখল যে, চুণীকে না খেলালে টিকিট বিক্রি কম হবে। রাঁচিতে প্রথম দিন চুণীকে খেলান হল না। দ্বিতীয় দিন চুণী মাঠে খেলতে নেমে তার অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর সাহায্যে সমস্ত রাঁচিবাসীর মন জয় করে নিল। এরপর সুরু হল সুবিমল গোস্বামী ওরফে সর্বজনপ্রিয় চুণীর জয়যাত্রা। পরের বছর চুণীর খেলা দেখে কর্তৃপক্ষ তাকে বাংলা দলে স্থান দিতে বাধ্য হলেন। সেই থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সে বাংলা দলে খেলেছে, এমন কি অধিনায়কের গুরুদায়িত্বও বহন করেছে। ১৯৬৩ আর '৬৪ সালে ট্রেনিং-এর জন্য আর আঘাতের জন্য বাংলার পক্ষে খেলতে পারে নি। ১৯৫৭ সাল থেকে ভারতের পক্ষে প্রতিটি প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫৮ সালে টোকিওর এশিয়ান গেমস, ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক এবং ১৯৬২ সালের জাকার্তা এশিয়ান গেমস। সবচেয়ে গৌরবের কথা যে, সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এক লক্ষ বিরুদ্ধ দর্শকের সামনে জাকার্তায় শক্তিশালী কোরিয়াকে পরাজিত করে ভারত হল এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ান আর সেই বিজয়ী দলের অধিনায়ক আমাদেরই চুণী।

বাংলার বাইরে চুণী খুবই জনপ্রিয়, দিল্লী আর বোম্বাইয়ের ক্রীড়ামোদীরা বলে যে, কলকাতার দল না এলে যেমন খেলা জমে না, তেমনি মোহন-বাগান আর তার মধ্যমণি চুণী না হলেও মন ভরে না। অবাঙালী দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হওয়া একটা বিরাট সৌভাগ্যের কথা। বলাইদা' বাংলার বাইরের বহু মাঠেই খেলেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে দু'একটি মজার ঘটনা তুলে ধরলেন। বললেন—তবে শোন। তখন বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা ১৯২৩ সালে রোভার্সের আসরে অবতীর্ণ হয়েছি। সমুদ্রের প্রচণ্ড হাওয়ায় আমরা এক গোলে হারছি। স্থানীয় দর্শকেরা ঠাট্টা করে আমাদের বলতে লাগল— when next train to calcutta and have you got your birth booked. আমি তখন ছুটে গিয়ে দলের খেলোয়াড়দের ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—লড়ে যোগ্য প্রত্যুত্তর দাও এই অপমানের। প্রাণপণে খেলে আমরা ১০ মিনিটে তিন গোল দিয়ে সেই খেলায় ৩—১ গোলে জিতে গেলাম। আর একবার হয়েছে কি, আমি খসরুবাগ মাঠে এ্যাথলেটিকসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি। ওখানকার লোকেরা আমাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভাবল। আমি প্রাইজ নেবার সময় নিজেকে বাঙালী বলে বোঝাবার জন্যে পণ্ডিত জওহরলালের পিতা মতিলালের কাছে ধুতি পরে প্রাইজ নিতে গেলাম। তখন লোকেরা বলতে লাগল—'আরে বাঙালী চিংড়ী এতনা জিতা।' বাংলার বহু লোক, এমন কি কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত চুণী গোস্বামীকে ক্রিকেটার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান না। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, বাংলার স্বনামধন্য ক্রিকেট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়, হেমাঙ্গ বোস এবং বলাই চ্যাটার্জী দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। গতবার রঞ্জী ট্রফির খেলায় হায়দ্রাবাদ এবং বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করে চুণী তার সমালোচকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে তাকে ভারতীয় টেস্ট দলে আবির্ভূত হতে দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী চুণী গোস্বামী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জুন পুরস্কার এবার চুণীকে দেওয়া হয়েছে। একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সমস্ত কাম্য এবং প্রাপ্য সম্মানই সে পেয়েছে।

বলাইদা' কাহিনীর পরিসমাপ্তি করলেন এই বলে—ছোটবেলা থেকে যাদের খেলা শিখিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি এগিয়ে যেতে, তাদের সার্থকতায় আমাদের মত ক্রীড়াশিক্ষকদের অন্তর ভরে ওঠে। এই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। —শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২,
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# মাইকেল গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—১৷৷০ টাকা।

---

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা— হাস্যরসাবতার— নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

# দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা. ২। নীল-দর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

২য় ভাগে—১। সধবার একাদশী, ২। বমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৩। পোড়ামহেশ্বর, ৪। ভুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা, ৮। পদ্য সংগ্রহ।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

---

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি— সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্যোতি— প্রতিভা ও মনীষীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র— সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

# কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ—

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲

---

সর্ব্বপুরাণ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

# স্তবকবচমালা

(পঞ্চম সংস্করণ)

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভাক্তনিবেদন অতি যত্নে সুনির্ব্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

---

পৃথিবীর অরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

# সার ওয়াল্টার স্কটের

## গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর

লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ

দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

---

# কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর

## গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

---

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পথ চলার নির্দেশ— ৫

# কি শৃঙ্খলা!

নিশ্চয়ই ! ইচ্ছে করলে আরও বেশী শৃঙ্খলাপরায়ণ আমরা হ'তে পারি।

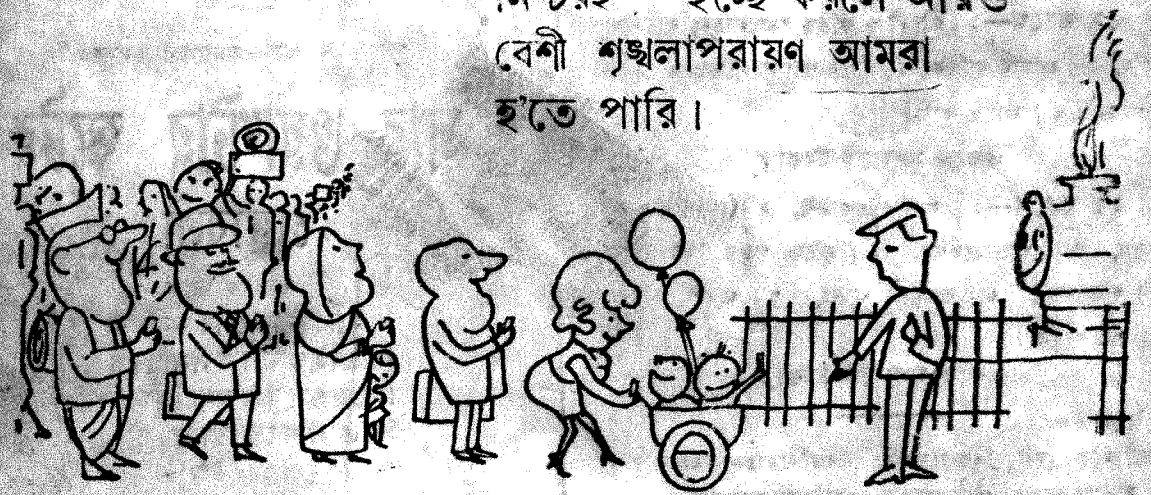

এক দিনে, এক মাসে বা এক বছরে কোন অভ্যাস হয়ত গড়ে না'ও উঠতে পারে। কিন্তু আজই সুরু করতে দোষ কী !

***আপনাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন***

পূর্ব রেলওয়ে

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারার (ডানে) নেতৃত্বে মার্কিন তথ্যসন্ধানী দল দক্ষিণ ভিয়েৎনাম-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এলেন।

বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১২ই চৈত্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • March 26, 1964 • Vol. 68, No. 44

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

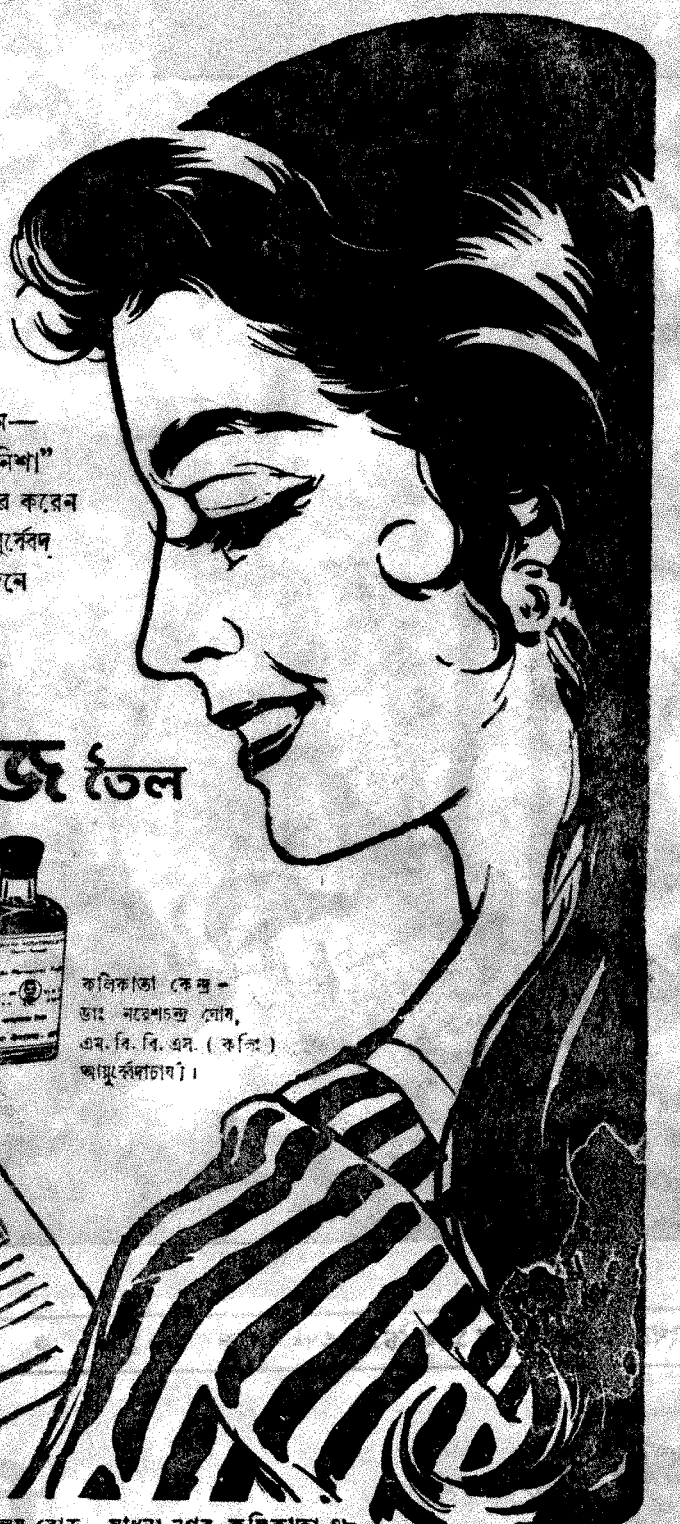

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
**সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তৈল**—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

**সাধনার**
# মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
·003/3
Yr. 68 no. 4


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৪০ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৪০ |
| ভাব-দর্শন | | ২৪০ |
| সূর্য, সময় ( কবিতা ) | দিনেশ দাস | ২৪৮ |
| হিন্দু পর্বে আপিস ছুটি ( প্রবন্ধ ) | চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৫০৯ |
| চোরের গল্প আজ ( কবিতা ) | ছন্দপ্রসাদ মিত্র | ২৪১০ |
| লণ্ডনের চিঠি | অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৪১১ |
| অনন্ত আয়ুতা ( উপন্যাস ) | সুশান্ত রায় | ২৪১৪ |
| জাপানী সন্ধেশ | সন্দীপ ঠাকুর | ২৪১৯ |
| পৌষের আসন থেকে ( কবিতা ) | আবুলকাশেম রফিমউদ্দীন | ২৪২৩ |
| পৃথুমালিনী কথা রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২৪২৪ |



# কবিকঙ্কণ চণ্ডী

**মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী**

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক )

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নিষ্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সকলজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

**—বর্তমান গ্রন্থে আছে—**

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ( ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

**মূল্য সাড়ে চার টাকা**

## নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

**মূল্য সাড়ে তিন টাকা**

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

**ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব**

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

**শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

## মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পাড়া কাহিনী ( গল্প ) | লীলা মজুমদার | ২৪২৭ |
| প্রেমের প্রত্যুষ থাকে ( কবিতা ) | মনীশ ঘটক | ২৪৩৫ |
| অন্তরালে ( কবিতা ) | রঞ্জত রায় চৌধুরী | ২৪৩০ |
| সীমান্ত সুন্দরী | তরুণ মিত্র | ২৪৩১ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২৪৩৪ |
| দুরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৪৩৭ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৪৪০ |
| রঙ্গদর্শন | ... | ২৪৪৩ |
| পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন প্রচেষ্টার কয়েকটি দিক | মৃত্যুঞ্জয় মাইতি | ২৪৪৬ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৪৪৮ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৪৫২ |
| খেলাধূলা | ... | ২৪৫৫ |



ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ অল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু —১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

( প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড )
( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬৮ বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১২ই চৈত্র ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 26th March 1964

# নব পর্যায়রূপে এক বছর

ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ মানবতা-বিরোধী দিনগুলির মধ্যে কল্যাণ-সাধনায় নিরত নবপর্যায়-সাপ্তাহিক বসুমতীর এক বছর অতিক্রান্ত হলো। বরেণ্য লেখকবৃন্দ, প্রবাসী বন্ধু-বান্ধব, অনুসন্ধিৎসু ও রসপিপাসু অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন-দাতাসমূহ ও পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের কঠিন দায়িত্বের পথে যে শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি দান করেছেন—তা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে যেমন ঋদ্ধ করেছে, তেমনি আগামী দিন-গুলিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

সাপ্তাহিক বসুমতীকে নবপর্যায়রূপে রূপান্তরিত করার স্মরণীয় দিনটিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আমরা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করেছি। একদিকে রসসাহিত্য, অন্যদিকে সুরুচিসম্পন্ন সংবাদ পরিবেশন, দেশ-দেশান্তরের বাছাই করা সংবাদের পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী নানা আন্দোলন ও সংঘাতের কাহিনী জ্ঞাপনের মতো জটিল দায়িত্ব থেকে আমরা কখনোই পশ্চাদপসরণ করি নি। বাঙালীর জীবনে যে সমস্যা ও দুর্যোগ রয়েছে, সেই সমস্যা নিরসন ও দুর্যোগাবসানের জন্য আমাদের ওপর যে গুরু দায়িত্ব ভার রয়েছে, তা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই নি। দেশ ও দশের কল্যাণের কথা স্মরণে রেখে 'মুক্ত মন' নিয়ে আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় জাতীয় কর্তব্য পালন করেছি।

সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রমবর্ধমান পাঠক-পাঠিকার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রবল সমর্থন দেখে মনে হয়, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তবু একথা আমরা সর্বদাই অনুভব করি যে, আমাদের এই পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলা দরকার। সেই কারণে মূল্য বৃদ্ধি না ঘটিয়েও পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়েছি। পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদার কথা মনে রেখে ধারাবাহিক রচনা সন্নিবেশ করেছি। পাশাপাশি আরো নানা জাতীয় রচনার সঙ্গে গ্রন্থমেলা, ভারতদর্শন, বিশ্বের চোখে ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছি। তাছাড়া বর্তমান সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় লিখিত চিন্তাধর্মী লেখকদের মূল্যবান রচনাও দিয়েছি।

পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭০ সালে যে রবীন্দ্র-সংখ্যা ও শারদীয় পূজোর প্রাক্কালে ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন স্বাদের যে সাহিত্যের শারদ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলাম, তা সর্বসাধারণ পাঠকের গভীর আস্থা ও অকুণ্ঠ অনুরাগ লাভ করেছে। তাঁদের আনুকূল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত থেকে আগামী দিনগুলিতেও আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবো। বলা বাহুল্য, আমাদের এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। এমন কি, সত্য নির্ধারণের খাতিরে কখনো কখনো অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছি। তবু রাজনৈতিক কোন্দল বা কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে আমরা কখনো থাকি নি এবং থাকবো না। বাংলা ও বাঙালীর ঐতিহ্য রক্ষা, জাতির জীবনে সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক ভাব আদান-প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য। 'বসুমতী' দীর্ঘকাল ধরে যে আদর্শ স্থাপন করে এসেছে 'নবপর্যায়-সাপ্তাহিক বসুমতী' তারি উত্তরসাধক।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

তরুণ তীক্ষ্ণধী। সাহসী শক্তিমান। এমন সমন্বয় না হ'লে ত' চিহ্নিত হওয়া সম্ভব নয়। উদ্দামতা আর প্রাণপ্রাচুর্য। বিশ্ববরেণ্য অগ্রজ প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির সম্ভাবনাময় অনুজ রবার্ট কেনেডি। ১৯৫৪ সালে তাঁকে Juninor chamber of commerce স্বীকৃতি দিয়েছিল 'One of the ten outstanding youngman in the united states' হিসেবে। আর আজ ১৯৬৪ সালে—মাত্র দশ বছরেই তিনি বিশ্বের 'One of the outstanding persons'—বলা বাহুল্য, এখনও 'youngman'.

ম্যাসাচুসেটসের ব্রুকলিনে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন রবার্ট। স্থানীয় 'মিল্টন অ্যাকাডেমি'তে পড়াশোনা করেছেন শৈশবে। অন্যান্য ভাইদের মতই '৪৮ সালে হার্ভাড থেকে স্নাতক হয়েছেন। তারপরে '৫১ সালে University of Virginia Law School থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাবা ছিলেন তদানীন্তন ইংলণ্ডস্থিত আমেরিকার এ্যামবাসাডর। রাজনীতির আহ্বান তাই এই পরিবারের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। প্যালেষ্টাইনের আটচল্লিশের যুদ্ধ দেখেছিলেন তরুণ স্নাতক রবার্ট। তখন তিনি সাংবাদিক। 'বোষ্টন পোষ্টের' জন্য ধারাবাহিক রচনা লিখছেন। তারপরে অগ্রজ জন কেনেডি যখন রাজনীতিতে এলেন নতুন উদ্দীপনা অঙ্গীকার নিয়ে—তাঁর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন রবার্ট কেনেডি। জন কেনেডির সেনেটর হওয়া থেকে সুরু করে প্রেসিডেণ্টের সম্মানলাভের পেছনেও তাঁর অবদান অমূল্য। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জনসনের সাথে কোনদিনই তাঁর হৃদ্যতা ছিল না। জনসন যখন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তখন রবার্ট উত্তেজিত হয়ে তীব্র বাধা দিয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির এই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ অনুজের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি এই বিরোধের আবর্ত থেকে তাঁকে সরিয়ে এনে আমেরিকার এ্যাটর্নি জেনারেলের পদে নিযুক্ত করলেন। একই মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ দুই জ্যোতিষ্কের মত আমেরিকার রাজনীতির আকাশে সেদিন ফুটে উঠেছিল এই দুই ভ্রাতার কর্মপ্রতিভা।

বহুবিশ্রুত সেনেটর ম্যাকাথি খুব পছন্দ করতেন তরুণ রবার্টকে। আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর সুচিন্তিত সাহায্য তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। স্পষ্টবাদী অমোঘ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি সংগঠনের কাজে বরাবরই সফল হয়েছেন। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় তাঁর পর্যটন নিয়ে বিপুল আলোড়ন উঠেছিল। সে সফর সর্বাঙ্গীন সফল না হলেও তাঁর মহৎ প্রয়াসের মূল্য তাতে কিছু কমে নি। ১৯৬০ সালে জাতীয় নির্বাচনে গণতান্ত্রিক

রবার্ট কেনেডি

দলের জয়লাভে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল—মালয়েশিয়ায় বিপুল সম্বর্ধনায় তাই যেন অভিনন্দিত হল। প্রাণখোলা হাসি নিয়ে এখনও তিনি কাজের অবসরে নিয়মিত খেলার আসরে মজে থাকেন। গল্‌ফ, ফুটবল, টেনিসের মাঠে আমেরিকার শক্তিধর এক সংগঠকের ভিন্নরূপ অনেকেই দেখেছেন। এখনও দুর্বার ছন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ভালবাসেন রবার্ট ওরফে 'ববি' কেনেডি। এমনিভাবেই একদিন সমস্ত দুস্তর দুর্গম বাধা অতিক্রম করেই তিনি তাঁর শহীদ অগ্রজের আদর্শের শীর্ষে হাজির হবেন—বিশ্বাস করি। আর সেদিন হয়ত খুব দূরেও নয়।

## রাজধানী :

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দীপ্ত ঘোষণায় নয়াদিল্লীর পর্যবেক্ষকরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কাশ্মীর সীমান্তে অবিরাম সংঘর্ষ জীইয়ে রাখবার জন্য পাক হানাদারদের বার বার আক্রমণের মুখে নেহরুর স্পষ্ট বক্তব্যে আর কিছু না হোক ভারতের দৃঢ়তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, পাক হানাদাররা যদি সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তাদের বিতাড়িত করার জন্য প্রয়োজন হলে ভারতীয়বাহিনী যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করবে। এই পরিষ্কার কথাটাকে যাতে বিকৃত ব্যাখ্যা করতে না পারে, তার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পার হয়ে পাক অধিকৃত এলাকা আক্রমণ করতে ভারত চায় না। কেবল আত্মরক্ষা এবং নিজ সীমান্তে শান্তিরক্ষার প্রয়োজনেই ভারতকে পাক হানাদারদের বিতাড়িত করবার জন্য যে এই সিদ্ধান্ত এতে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। তা হলেও আমরা জানি পাকিস্তান এই ঘোষণার বিকৃত অর্থ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন আর পাকিস্তানের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার দিন নেই। ভারতকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এতে আমাদের দেশের মানুষের পক্ষে যেমন চিন্তা করার সহায়ক, তেমনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শক্তিরও সহায়ক। কারণ পাক-শাসকরা এই কাশ্মীরের দোহাই দিয়ে, সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে রেখে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে উত্তাপ সৃষ্টি করে রাখছে এবং এই উত্তাপের দ্বারা গণতান্ত্রিক শক্তিকে দলন করার জন্য ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাশ্মীর বিরোধের সুযোগে নিজেদের কোলে ঝোল টানছে। এই সীমান্ত সংঘর্ষের পেছনে যে তৃতীয় শক্তির উস্কানী আছে, একথা আজ আর কারো অজানা নেই। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণায় এই তৃতীয় পক্ষও আমাদের দৃঢ়তা বুঝতে পারবে। ওদিকে সুচেতগড়ে ভারত ও পাকিস্তানের কমাণ্ডারগণ এক মিলিত বৈঠকে রায়গড় কবরখানা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা রক্ষার জন্য ঐ অঞ্চলের পরিখা ও ব্যাঙ্কারগুলি থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত করেছে। এই সিদ্ধান্ত একটা শুভ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করলেও একে পাকিস্তানের পশ্চাদপসরণের লক্ষণ বলে মনে করার কারণ নেই।

● কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন আগরতলায় সম্প্রতি-আগত উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন।

● শ্রীনেহরু

* * *

শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বাজেট বেশ উত্তাপের সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেসের বামপন্থী-মহল কেবল নয়, যাঁরা মধ্যপন্থী বলে পরিচিত তাঁরাও প্রশ্ন তুলেছেন—এই বাজেট কি ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? লোকসভা ও রাজ্যসভায় এই বাজেট নিয়ে তুমুল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীমহলে এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলেও এই বাজেট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এই বাজেটে যে প্রতিফলিত হয় নি, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিরোধীপক্ষ এই বাজেটের দরুণ কংগ্রেসকে সমালোচনার সুযোগ পেয়েছে।

কংগ্রেসের কর্মী এবং বিরোধী দল উভয় পক্ষের বক্তব্য : এই বাজেট দ্রব্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে, এই বাজেট কৃষি উৎপাদনে সহায়ক হয় নি।

সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক হয়েছে, অর্থমন্ত্রী বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি ডেকে আনছেন। কংগ্রেসের একাংশ এবং কমিউনিষ্টরা অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ-মাচারীকে এভাবে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির জন্য দরজা খুলে দেওয়ায় তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন, তিনি বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সুযোগ দিয়ে দেশের বিপদ ডেকে আনছেন। এই বাজেট এতদিনকার শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত নীতিকে দুর্বল করে দেবে; কয়েকটি পরিবার ও ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করবে এবং একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দেবে। যা কোন রকমেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের সহায়ক নয়। অন্যদিকে স্বতন্ত্র দলের প্রতিনিধি মনে করছে এতদিনে সরকার ঠিক পথে এসেছেন। তাঁদের এক মাত্র সমালোচনা, সরকার কেন আরো খোলাখুলি পূর্বনীতিকে অস্বীকার করে অগ্রসর হলো না। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ সম্পত্তিকর, ব্যয়কর, লাভের ওপর কর এবং বোনাসের অংশের জন্য বাজেটকে সমালোচনা করছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য এসব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তাঁর জবাব সমালোচনার যুক্তিসঙ্গত প্রত্যুত্তর নয়; তিনি কেবল এই দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, যত বিরোধীই হোক না কেন, তাঁর বাজেট শিল্প-উন্নয়নের সহায়ক এবং তিনি ঠিক পথেই চলেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বড় শিল্পপতিরা এতে কিছুটা সুবিধা লাভ করেছে। তবে চারদিক থেকে তাদের ওপর যেরূপ ট্যাক্স ধার্য হয়েছে তাতে এই সুবিধা এমন কিছু নয় এবং তাঁর বক্তব্যে এটুকু বোঝা গেছে—সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র যাই বলা হোক না কেন তাঁর বাজেট 'স্বাধীন সমাজ' গঠনের সহায়ক হয়েছে। এই 'স্বাধীন সমাজ' বলতে অর্থমন্ত্রী কি বোঝান জানি না। তবে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির অবাধ রাজত্বে সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব অর্থহীন, এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

* * *

দিল্লীতে ফেডারেশন অব চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর তিনদিন-ব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এই সংগঠনের প্রতিনিধিদের কথা-বার্তায় এবার বেশ আত্মসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এঁরা প্রচার করছেন, ভারতীয় অর্থনৈতিক সংকট মোচনের একমাত্র প্রতিষেধক হলো—ব্যক্তিগত পুঁজিতে পরিচালিত শিল্পগুলিকে

● শ্রীকৃষ্ণমাচারী

বাড়তে দেওয়া এবং ব্যক্তিগত মালি-কানার ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ দেওয়া। এই মারাত্মক প্রচারের কোরাসে অর্থমন্ত্রী এবং প্ল্যানিং কমিশনের একজন ডেপুটী চেয়ারম্যানও সুর মিলিয়েছেন। আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না যদি ধনিক-বণিকদের এই ফেডারেশন অবাধ পুঁজি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের ক্ষেত্রে আরো কিছু সুবিধা চেয়ে বসে।

ফেডারেশনের বিদায়ী সভাপতি শ্রী ভারতরাম জাতীয়করণের এবং সমবায় গঠনের দাবির তীব্র সমালোচনা করেছেন। ব্যাঙ্ক থেকে চালের কল এবং পাইকারী ব্যবসায় পর্যন্ত জাতীয়-করণের যে কথা উঠেছে তাকে তিনি ক্ষতিকারক মনে করেন। কোন কোন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ও রাজ্যমন্ত্রী যে জাতীয়করণের দাবি সমর্থন করেন এটা তাঁর কাছে অসহ্য। ফেডারেশন যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে কেবল জাতীয়করণের বিরোধিতা করা হয় নি, সমবায় ধরণের সংগঠন যে দেশে বিস্তারলাভ করছে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে—ব্যবসায় ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরিচালিত এবং সরকারী সহায়তায় গঠিত সমবায় ব্যবসার দরুণ স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

ফেডারেশনের এই প্রস্তাব এবং আলোচনায় পর্যবেক্ষক মহল দস্তর-মত শঙ্কিত। তাঁরা বলছেন, ভুবনেশ্বর প্রস্তাবের যদি কোন অর্থ থাকে এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ঘোষণা যদি কথার কথা না হয়ে থাকে, তবে এসব শিল্পপতি ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করার এখনো সময় আছে।

* *

কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন 'কালো টাকার' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। তিনি নাকি অর্থমন্ত্রী শ্রী টি-টি-কৃষ্ণ-মাচারীর কাছে এক পত্রে জানিয়েছেন 'কালো টাকা' উদ্ধার করা এখনো সরকারের ক্ষমতার মধ্যে আছে। 'কালো টাকা' উদ্ধারের ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর আগামী সভায় আলোচনা হবে। সেই সভা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কেন্দ্রীয়

শ্রীকামরাজ নাদার

সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হবে। শ্রীকামরাজ প্রস্তাব করেছেন—'কালো টাকা' উদ্ধারের জন্য সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণকে উৎসাহ দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের কালো টাকার সন্ধান যারা দিতে পারবে, তাদের শতকরা ১০ ভাগ কমিশন দেওয়া হবে। এছাড়া তিনি পুলিশের একটি 'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ' গঠনের কথাও বলেছেন, যারা কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের গোপন টাকা এবং গোপন সূত্রে ব্যবসা ও লাভের দিকটা অনুসন্ধান করবে।

* * *

দেশব্যাপী স্কুলের লাইব্রেরীগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য যে কেন্দ্রীয় কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর তা অনুমোদন করেছেন। এই কার্যসূচী ১৯৬৪-৬৫ সালেই রূপায়িত করা হবে। এই কার্যসূচী অনুযায়ী স্কুলের লাইব্রেরীগুলিকে সম্প্রসারিত করা হবে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেকটি সেকেণ্ডারী স্কুলে ভাল লাইব্রেরী থাকবে। স্কুল লাইব্রেরীগুলিকে ভাল করার জন্য এখন থেকে সরাসরি কেন্দ্র নজর রাখবে। এতে স্কুলের লাইব্রেরীগুলিতে লাইব্রেরীয়ান নিয়োগের ব্যবস্থাও থাকছে।

* * *

১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতীয় বিমান বহরের যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে সেসবের তদন্ত ইত্যাদি করে জানা গেছে—প্রায় অর্ধেক দুর্ঘটনার কারণ বিমান-চালকের ভুল এবং যান্ত্রিক গোলযোগ। বাকি দুর্ঘটনার কারণ ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। উল্লিখিত সময়ে যত দুর্ঘটনা হয়েছে, কাশ্মীরের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা সহ প্রত্যেকটির তদন্ত করা হয়েছে।

* * *

পূর্ব বাংলার নরককুণ্ড থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ভারতে আসছেন তাঁদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য, পাটনা ও ভুবনেশ্বর সফর করে এসেছেন।

## মহারাষ্ট্র ঃ

সীমান্ত বিরোধ কথাটার সাথে গত ক'বছরে আমরা যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সীমান্ত বিরোধ যে শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে রাজ্যে সীমান্ত বিরোধের দুর্বুদ্ধি জোগাবে সে কথা কে জানতো! মহারাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরোধ অনেকদিন থেকে চলছে এবং দিন দিন তা বেড়ে চলেছে। কিন্তু সম্প্রতি মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীমোহন ধারিয়ার বিবৃতিতে আর এক নতুন বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে বলে জানা গেল। এই বিবৃতিতে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশের চারটি তহশীল বুরহানপুর, শাওনগড়, ওয়ারাসোওনি ও মুলতাই মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য শীঘ্রই দাবি করা যেতে পারে। কারণ এই চারটি তহশীলের মানুষ মারাঠি ভাষায় কথা বলে, তাদের সংস্কৃতি মারাঠি।

এই বিবৃতি কেবল যে মধ্যপ্রদেশেই বিরক্তির সৃষ্টি করেছে তা নয়, অনেক মারাঠিও একে বিরক্তিকর মনে করছেন। তাঁরা বলছেন, যখন দু'টি রাজ্যের এতদিনকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলা দরকার তখন এরূপ বিবৃতি নতুন বিরোধ সৃষ্টি করা ছাড়া মীমাংসায় সাহায্য করে না।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদকের বিবৃতি প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশ প্রদেশ কংগ্রেসের জনৈক প্রতিনিধি বলেছেন, যদি মহারাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রদেশ ভাষার অজুহাতে কোন অঞ্চলের সংযুক্তি দাবি করে, তবে মধ্যপ্রদেশেরও একই যুক্তিতে অঞ্চল দাবি করার অধিকার আছে। মহারাষ্ট্রের মধ্যেও এমন তহশীল আছে যেখানকার অধিবাসীরা ভাষায় ও সংস্কৃতিতে মধ্যপ্রদেশের কাছাকাছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোন্দিয়া, নাগপুর, সাওনের এবং অচলপুর তহশীলের উল্লেখ করা যেতে পারে।

উক্ত প্রতিনিধি আরো বলেন, শ্রীধারিয়ার বিবৃতির সমধিক আপত্তিকর অংশ হচ্ছে—তিনি সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংযুক্তির জন্য দাবি তুলতে এবং আন্দোলন সুরু করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এতে বাস্তবিকপক্ষে সংঘর্ষের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত এই বিবৃতির প্রতিবাদ

শ্রী এস জি বাডে

# সূর্য, সময়

দিনেশ দাস

সূর্যদেব হাজার হাজার জিভ বের ক'রে
পৃথিবীর সমস্ত রস শুষে নেয়,
ফুলগুলি বিবর্ণ কুৎসিত :
নতুন পাতাগুলো শুকনো হয়ে ঝরে পড়ে।
নদী নালা পুষ্করিণী সব ম'রে গেল,
তাদের বুকের নীচে
জলচর সন্তানগুলিও সব মৃত।

সূর্যদেব হাজার হাজার জিভ বের ক'রে
চুষে নেয় যত প্রাণীদের হাড়ের শেষ রসটুকু।
আমার দেহের রক্তস্রোত বাষ্প হয়,
হাড়গুলো শুকনো, ফাঁপা :
সমস্ত অস্থিগুলো উত্তাপে গুঁড়ো হয়ে
ধুলো হয়ে মাটিতে মিশবে,
শুধু চোখ দুটো চেয়ে থাকবে আকাশের দিকে—
যে আকাশে লেখা আছে লক্ষ লক্ষ জিজ্ঞাসা।

---

না করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, এমন সময় এই প্ররোচনা-মূলক বিবৃতি দেওয়া হলো—যখন মধ্যপ্রদেশ নিজ উদ্যোগে বাগ, পেঞ্চ, তাপ্তি প্রজেক্ট সম্পর্কে মহারাষ্ট্রের সাথে বিরোধ মীমাংসার জন্য মধ্যপ্রদেশের স্বার্থত্যাগ করে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্ধ্রের সঙ্গে কৃষ্ণা-গোদাবরী বিরোধের মীমাংসার এখনো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মহারাষ্ট্র সরকার ট্রিবিউ-নালের জন্য জিদ করছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিপক্ষীয় গোল টেবিল বৈঠকে মীমাংসা হবে মনে করে।

নগরহাবেলীর ব্যাপারটাও বিশ্রী রকমের হয়ে উঠছে। গত মাসে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর নগরহাবেলী পরিদর্শনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাধা আরোপ করা যেমন কেউ সমর্থন করছে না, তেমনি মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস নেতার মনোভাবও কেউ সমর্থন করছে না। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না এই পর্তুগীজ উপনিবেশের 'স্টাটাস-কো' নির্ধারণ না করছেন, ততক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন না করাই ভাল। কিন্তু নগরহাবেলীর নেতারা বা মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কেউ এ ব্যাপারে সংযত ও নিরপেক্ষ হতে রাজী নয়।

* * *

তৃতীয় ফাইন্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান পদে মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী শ্রী এস জি বার্ভেকে নিয়োগের প্রস্তাব হয়েছে। এতে মহারাষ্ট্র মন্ত্রি-সভায় কিছুটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। শ্রীবার্ভে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করছেন। ফাইন্যান্স কমিশন এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। এই কমিশনই আয়কর এবং অন্যান্য বিভাজ্য কর-সমূহ কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে কিভাবে বণ্টন হবে তা সুপারিশ করে।

* * *

শ্রীবার্ভে ফাইন্যান্স কমিশনে যোগ-দানের জন্য পদত্যাগ করলে তাঁর স্থলে কে মন্ত্রী হবেন, এ নিয়ে নানা গুজব শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত তিনি ভাওসাহেব হীরে দলের মধ্য থেকে একজনকে মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এই দলের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাবান লোক আছেন, অথচ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের উপেক্ষা করছেন বলে একটা অভিযোগ চলে আসছিল। মখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক যদি এ গ্রুপের একজনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চিতভাবে তাঁর সুবিধে হবে। এতে নায়েক-মন্ত্রিসভার প্রভাব আরো বৃদ্ধি হবে।

## মহাশূর :

মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমান্ত বিরোধ নিয়ে কেন্দ্রে আবার উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্বেগের কারণ রাজ্যে সীমান্ত সম্পর্কে মহীশূর সরকার তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। মহীশূরের বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রী বি ডি জাত্তি বলেছেন, মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমান্ত সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। তিনি অবশ্য বলেছেন, এদিক-ওদিক দুদিকে কয়েকটি গ্রামের সংযুক্তি নিয়ে অবশ্য আলোচনা করা যেতে পারে। তাও হবে স্টেট রি-অর্গানিজেশন এ্যাক্টের নীতি অনুসারে। এই বিবৃতিতে মহারাষ্ট্র সরকার বেশ চটে গেছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মহারাষ্ট্র সরকার বলেছে, এখন আর দুই রাজ্যের মধ্যে সরাসরি কোন কথা বলে কোন লাভ হবে না।

শোনা যাচ্ছে, এই দুই রাজ্যের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মধ্য-প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী এইচ ভি পটাশকরের সাহায্য নেওয়া হবে। তিনি পরবর্তী রাজ্যপাল শ্রী কে সি রেড্ডিকে কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়ার পরই তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। শ্রীপটাশকর নাকি মাদ্রাজ-অন্ধ্র সীমান্ত বিরোধ সন্তোষজনকভাবে

শ্রী এইচ ভি পটাশকর

মীমাংসা করে দিয়েছেন। আন্তঃ রাজ্য সীমান্ত বিরোধের মীমাংসায় পটাশকর-ফর্মুলা কার্যকরী বলে কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেয়েছে।

# হিন্দু পর্বে আপিস ছুটি

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বর্তমানে পর্ব উপলক্ষে বছরে আঠারো দিন ছুটি পেতে পারেন। এর মধ্যে সকল ধর্মীয় পর্ব এবং অন্যান্য উপলক্ষে ছুটির হিসাব ধরা হয়েছে। এই ছুটি খুব বেশি বলে মাঝে মাঝে সমালোচনা হয়। দেশে এখন কারো ছুটি উপভোগ করবার সময় নেই। অবিরাম কাজ করে জাতির উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। চাষী, মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের কোনো বিশ্রাম নেই। অথচ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দান থেকে সরকারী কর্মচারীদের ছুটির ব্যবস্থা করা হয়।

এই অভিযোগ কিন্তু আজকের নয়। বলতে গেলে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ছুটির আধিক্য সম্বন্ধে অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ ওঠবার একটি প্রধান কারণ এই যে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান—এই তিন ধর্মের পর্ব উপলক্ষে আপিস ছুটি রাখতে হয়। যে-দেশে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্য সেখানে এই সমস্যা দেখা দেয় না। হিন্দুকর্মীর সংখ্যা আপিসে বেশি, সুতরাং তাদের পর্বে আপিস বন্ধ রাখতেই হয়। মুসলমানরা অল্পদিন পূর্বেও দেশের রাজা ছিল, সুতরাং মুসলমান পর্ব সমাজ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং ছুটি দিতেই হয়। ইংরেজরা দেশের শাসক, অতএব খ্রীষ্টান পর্বে আপিস ছুটি থাকবে।

প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে কলকাতার আপিসগুলি নিম্নলিখিত হিন্দু পর্ব উপলক্ষে ছুটি থাকত: দশহরা—১; স্নানযাত্রা—১; রথযাত্রা—১; উলটারথ—১; রাখীপূর্ণিমা—১; জন্মাষ্টমী—২; মহালয়া—১; দুর্গাপূজা—৮; শ্যামাপূজা—২; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—১; কার্তিকপূজা—২; জগদ্ধাত্রীপূজা—২; শ্রীপঞ্চমী—২; শিবরাত্রি—২; দোলযাত্রা—৩; বারুণী স্নান—১; চড়ক—১। মোট ছুটি এক বছরে ৩২ দিন। মুসলমান পর্ব উপলক্ষে ছুটির সংখ্যা ছিল আরও বেশি। এর ওপর ছিল খ্রীষ্টানদের ছুটি।

১৮৩৩।১৮৩৪ সালে হিন্দু পর্বে ছুটি কমানোর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বেশ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রস্তাবটি করেছিলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ। তাঁদের প্রস্তাব ছিল হিন্দু পর্ব উপলক্ষে ছুটি দেবার রীতি একেবারেই তুলে দেওয়া হোক। কারণ পর্বের দিনে এত ছুটি থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য আপিসের ছুটি বাতিল করা যদি সম্ভব না-ও হয়, অন্তত ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারী যেন ছুটির আওতার মধ্যে না পড়ে। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইংরেজ পরিচালিত ও ভারতবাসী পরিচালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত বাদানুবাদ চলেছে। হিন্দু পরিচালিত উদারপন্থী সংবাদপত্র 'রিফর্মার' ছুটির সমর্থন করে বলেছেন যে, এই ছুটি খ্রীষ্টানদের প্রতি সপ্তাহে রবিবাসরীয় ছুটির মতোই পবিত্র।

'রিফর্মার' এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। এই পত্রিকা প্রশ্ন করেছেন যে, যদি কয়েকজন ভারতীয় রাজা বাহাদুর বলপ্রয়োগ অথবা ছলনা দ্বারা ইংলণ্ড অধিকার করেন তাহলে সেই মুষ্টিমেয় বিদেশী শাসকরাই লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান জনসাধারণের জন্য আইন প্রণয়ন করবেন। যদি ইংলণ্ডের হিন্দু গভর্ণমেণ্ট আদেশ করেন যে, রবিবার বড় বড় আপিসগুলি স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য খোলা রাখতে হবে এবং ইংরেজরা যদি আবেদন করে যে, এই আদেশের ফলে তাদের ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, তাহলে ইংলণ্ডের হিন্দু গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহযোগী 'কুরিয়ারের' ন্যায় উদারতার সহিত উত্তর দিতে পারবেন যে, এই আদেশ ধর্মানুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জারী করা হয় নি। এতদিন জনসাধারণের অসুবিধা করে যে দিনগুলি আলস্যে কাটানো হত, সেই দিনগুলিতে কয়েকটি বড় বড় আপিস খোলা রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র। আবেদনকারীরা রবিবার যদি আপিস করতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে ঐ দিনে কাজ করবার জন্য ইচ্ছুক ও উপযুক্ত কর্মীর অভাব হবে না। কারণ, হিন্দু ইংলণ্ডে গেছে ভাগ্যান্বেষণে; ছুটির বিলাসের জন্য সে উৎসুক নয়। ইংলণ্ডের হিন্দু-গভর্ণমেণ্ট যদি এরূপ আদেশ জারী করত তাহলে কি তা ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করা হতো, অথবা সহ্য করা হতো? খ্রীষ্টানরা কি এই অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করত না? রবিবার প্রধান প্রধান আপিসগুলি খোলা রাখবার অর্থ কি এই নয় যে, ছোট আপিসগুলি এবং ব্যবসায় কেন্দ্রগুলি খোলা থাকবে? ইংলণ্ডের হিন্দু গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই আদেশ দ্বারা রবিবারের ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে না কি?

এই সম্বন্ধে বেঙ্গল 'ক্রনিকল'-এর সংবাদদাতা লিখছেন যে, হিন্দু পর্বোপলক্ষে ছুটি বন্ধ করবার জন্য

# চৈত্রের গন্ধরাজ

হরপ্রসাদ মিত্র

তোমাকে সম্পূর্ণ করে দেখবো
সেই দেখার ইচ্ছেতে
ক্রমে হাওয়া লাগছে জোর—
মনে হয়,
যতো দিন যায়;

তোমাকে সুস্পষ্ট রূপে
ধরা যাবে পুষ্পিত প্রয়াসে।
অসম্পূর্ণ সে-প্রয়াস—
এ-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে
মনে হোলো চৈত্রশেষে
গন্ধরাজে তীব্র অবসান।
সময় সুস্থির ব্যাধ
হাতে তার যন্ত্রণার বাণ।

সময় আস্থির ব্যাধ
সময় অশান্ত স্রোত তীব্র
প্রত্যেক ঢেউয়ের নিচে
এই সব ইচ্ছের প্রহার।

ইচ্ছের সংযম নেই,
অফুরন্ত ইচ্ছের নদীতে
করেছি সময় সৃষ্টি।
তারপর, নিজেরই শোণিতে
চেতনা ভিজিয়ে দেখি
যেন সেও শীর্ণ গন্ধরাজ—
ক্ষণ এক চৈত্রশেষে
জীবনের সুগন্ধ-সংবাদ।

---

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল যে আবেদন করেছে তার সঙ্গে চেম্বার অব কমার্সও যোগ দিয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। কারণ এই আবেদনের ভিত্তি অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এই আবেদন ফলপ্রসূ হবে না। অর্থের জন্য ধর্মানুষ্ঠান অবহেলা করতে পারে এমন লোকের অভাব নেই সত্য। সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই এরূপ লোক পাওয়া যাবে। কিন্তু যারা চাকরির মোহে ধর্ম ও উৎসব-অনুষ্ঠান অবহেলা করতে দ্বিধা করে না, তাদের নিযুক্ত করলে কর্তৃপক্ষের গৌরব ক্ষুণ্ন হবে বলেই মনে করি। আয়র্লণ্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে অনুরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করলে মঙ্গলজনক হবে না। হিন্দু সমাজের উচিত তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করা। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের আবেদনের বিরুদ্ধে তাদের একটি আবেদন করা কর্তব্য।

এই প্রস্তাবে কাজ হল। হিন্দু পর্ব উপলক্ষে ছুটি বন্ধ করবার বিরুদ্ধে এক আবেদনপত্রে কয়েকদিনের মধ্যে তিন হাজার লোক স্বাক্ষর করল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেনও ছিলেন। এই আবেদনে বলা হল যে, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের নানা অত্যাচার ও দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। ইংরেজ শাসন কায়েম হবার ফলে হিন্দুদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে, তারা প্রার্থনা করেছে, এদেশে ইংরেজ শাসন যেন চিরস্থায়ী হয়। এ পর্যন্ত হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার ইংরেজ শাসনের ওপর তাদের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি হিন্দু প্রজাদের ওপর কর্তৃপক্ষের স্নেহ শিথিল হবার লক্ষণ দেখে হিন্দুরা বিশেষরূপে উদ্বিগ্ন হয়েছে। রাজার কর্তব্য প্রজাদের সন্তানের ন্যায় পালন করা এবং তাদের ধর্ম রক্ষা করা। ইংলণ্ডে এরূপ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আয়র্লণ্ডের ধর্ম পৃথক হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার নাগরিকরা তাদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা পায় না এবং সরকারী দপ্তরে উচ্চ পদ লাভ করবার অধিকারও তাদের আছে।

হিন্দু নাগরিকদের আবেদনের উত্তরে গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন: 'কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট আবেদনে স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গকে এবং সাধারণভাবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে দৃঢ়তার সহিত জানাচ্ছেন যে, গভর্ণমেণ্ট নিজ অধিকার বলে হিন্দু পর্বোপলক্ষে ছুটির সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য হস্তক্ষেপ করবেন না। সরকারী অথবা বেসরকারী আপিসে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা এই বিষয় স্থির করা হবে।

'ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যে ছুটি প্রয়োজন হিন্দু সমাজকে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু তাই বলে বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা ঐ সব ছুটির দিনে কাজ চালাবার পক্ষে বাধা নেই। কাজে যোগদানের জন্য হিন্দু কর্মচারীদের ওপর জোর করা হবে না। ধর্মানুষ্ঠানের দিন কাজ করা না করা হিন্দু কর্মচারীর নিজের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে। যে সব কর্মচারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তারা আলস্যে সময় না কাটিয়ে আপিসের দরকারী কাজ করতে পারে। এ ব্যবস্থায় কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।'

● হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস

## একটি নতুন শিল্পপ্রতিভা

শিল্প এবং সাহিত্য যখন সর্বসাধারণের পরিচিত মানুষ, বস্তু এবং ঘটনাকে অবলম্বন করে রূপময় মূর্তিময় রসময় হয়ে ওঠে, তখন তা শিক্ষিত অশিক্ষিত সরল জটিল নাগরিক গ্রামীণ নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে উপভোগ্য হয়। কিন্তু যেই তা শিল্পীর বা সাহিত্যিকের একান্ত নিজস্ব চেতনার রঙে রাঙা হয়, তখনই তার পরিভোগের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। রামায়ণের নিষাদের ক্রৌঞ্চবধের কাহিনী শুনতে শুনতে গোবিন্দপুরের শরদিন্দুনিভাননীর ঘোলাটে চোখ অকৃত্রিম অশ্রুতে অনায়াসে নির্বাধায় ভরে উঠতে পারে, কিন্তু---

'একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির
মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার---উষ্ণ লাল
হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে
অনেক পুরাণো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক---
নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।'

এই পঙক্তিগুলিকে উপলক্ষ করে এক কাব্যপ্রিয় বেকার যুবকের ওপর তার M. Com অগ্রজের যে ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হতে শুনেছি, 'পায়রা কবির বকবকানি'-ও তার কাছে অতি তুচ্ছ। ঠিক তেমনি দক্ষিণ ভারতের নটরাজের প্রলয়-নৃত্যভঙ্গিমা একজন দীনতম কৃষকের মনকেও স্পর্শ করবে অকেশে, কিন্তু একটি গাছের বাঁকানো ডালকে প্রায় অবিকৃত রেখে তার সাহায্যে শিল্পী যখন হিরোশিমার প্রলয়ার্তনাদ ফুটিয়ে তোলেন তখন তা বোঝার জন্যে চাই শিক্ষিত দরদী রসিক সহৃদয় মন। শিল্প যতক্ষণ মূর্ত থাকে, ততক্ষণ তার মধ্যে যতই অমূর্তের অরূপের ব্যঞ্জনা থাক্ না কেন, তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয় না। কিন্তু যেই তা বিমূর্ত হয়ে ওঠে, বস্তুজগতের অনুকরণ ছেড়ে নিজস্ব চেতনার অনুরণনকে আশ্রয় করে, তখনই তা সাধারণের অনুভবের বাইরে চলে যায়। শুধু সাধারণ কেন, সমসাময়িক কালের বিদগ্ধদের কাছেও কোন স্বীকৃতিই পান নি, মৃত্যুর বহু বছর পরে তাঁদের রচনার যোগ্য সমজদার জুটেছে, এমন কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক পৃথিবীর ইতিহাসে মোটেই বিরল নন।

আধুনিক সভ্যতা যতই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে, ক্রমাগত

**অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়**

পরিমার্জনের ফলে মানুষের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য, অতএব একাকীত্ব যত বাড়ছে, ততই শিল্প বিমূর্ত মনোময় মন্ময় হয়ে উঠছে---কিউবিজম, ইমপ্রেশনিজম, ইত্যাদি। ইতিহাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের এই পালা বদল যে অনিবার্য, অবধারিত, এমন কি সুস্বাগত, একথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি হল এই বিমূর্ত শিল্পের নাম করে শিল্পকলার জগতে ধোঁকাবাজি আর ধাপ্পাবাজির চর্চা।

পশ্চিমী আর্টের হাল-তম ফ্যাশন হ'ল বড় একটা ক্যানভাসের ওপর অনেকগুলো রংয়ের টিউব ছড়িয়ে রেখে তার ওপর চালিয়ে দিতে হবে মোটর গাড়ি, মোটর গাড়ির চাকার চাপে রংয়ের টিউব থেকে পিচকারির রংয়ের মতো ক্যানভাসের ওপর রং ছড়িয়ে পড়ে পড়ে যে একটা যেমন তেমন ধরণের বিচিত্রিত ফর্ম দাঁড়াবে, তাই হবে এ যুগের সেরা বিমূর্ত ছবি ---নাম তার এ্যাকশন পেণ্টিং।

ইউরোপের যুগান্তকারী চিত্রশিল্পী পিকাসো স্বয়ং কিছুকাল আগে স্বীকার করেন যে, তিনি কলাজগতের সিংদরজায় ঢুকেছিলেন একেবারে কলা দেখিয়ে। পিকাসো প্রথম জীবনে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ীই সাধারণভাবে ছবি আঁকতেন। কিন্তু বহুদিন ধরে চিরাচরিত রীতির ছবি এঁকেও পিকাসো তেমন কোন খ্যাতি অর্জন করতে পারছিলেন না, দিকে দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ছিল না। একদিন আমেরিকার একজন অত্যন্ত ধনী মহিলাকে বেশ একটু চমকে দেবার জন্য পিকাসো আঁকলেন এক আবোল তাবোল ছবি: অর্থহীন সঙ্গতিহীন একটি বিমূর্ত চিত্র। যেহেতু ছবিটির ভাব স্পষ্ট নয়, অর্থ মোটেই সুসমঞ্জস নয়, মহিলার মনে হ'ল

ছবিটির মধ্যে একটি বিশিষ্ট 'আর্ট' আছে। অনেক টাকা দিয়ে সেই মহিলা কিনে নিলেন ছবিটা। মহিলার বান্ধবীদের মনে হ'ল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক অবোধ্য আর্ট আছে, সঙ্গে সঙ্গে তারাও পিকাসোকে অনুরোধ জানালো ঐ ধরণের ছবি তাদেরও চাই। পিকাসোর বিমূর্ত ছবিগুলোর কদর বাড়তে লাগলো, ঐ ধরণের অনেক ছবি পিকাসো আঁকতে লাগলেন রাতারাতি: অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো পিকাসোর এই নতুন ধরণের অঙ্কনরীতি। পিকাসো চিত্রশিল্পে যে বিমূর্ত রীতির উদ্ভাবন করলেন, তা পরবর্তীকালের আরো অনেক শিল্পীর হাতে বহুতর শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগলো। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁকে অনেক সময় আঙ্গিকের চাপে কল্পনার অপমৃত্যু ঘটে, কিন্তু এরই মধ্যে আবার মাঝে মাঝে এমন কোন কোন চিত্র-শিল্পীর সন্ধান মেলে যাঁদের ছবি রীতি, আঙ্গিক সব কিছু ছাড়িয়ে মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তেমনি একজন সার্থক শিল্পী হলেন স্পেন দেশের এক চিত্রশিল্পী—নাম এ্যাবেইয়ো।

হাল আমলের ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পে যে সমস্ত শিল্পী যথার্থই নতুন পথের দিশারী, নিঃসন্দেহে এ্যাবেইয়ো তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইউরোপের প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে চিত্রশিল্প বিগত চার-পাঁচশ' বছর ধরে সুকুমার আঙ্গিক ও অত্যন্ত সৌষ্ঠবময় অনুশীলনের এক বাঁধা ধরা পাকা রাস্তা ধরে ক্রমেই উন্নততর, সুষ্ঠুতর হয়ে উঠছে; চিরাচরিত শিল্পধারার এক বিরাট পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজস্ব একটি শিল্পরীতিকে প্রকাশমান ক'রে তোলা দুর্লভ ক্ষমতা-সাপেক্ষ। এই দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছেন স্পেন দেশীয় শিল্পী এ্যাবেইয়ো। শিল্পরীতির দিক থেকে আজকের দিনের ইউরোপের কোনও চিত্রশিল্পী যতই কেন উন্নত ও পরি-মার্জিত না হোক, তাকে কাঞ্চন-কৌলীন্যের খাতির পেতে হলে তাকিয়ে থাকতে হবে আটলাণ্টিকের ওপারে—ধনকুবেরের দেশ আমেরিকার দিকে। এদেশের যে-কোন কথাশিল্পী বা সাহিত্যিকের চরম লক্ষ্য হ'ল তার বই আমেরিকা থেকে প্রকাশ করানো, চিত্রশিল্পীর চূড়ান্ত স্বপ্ন হ'ল আমেরিকাতে তার আঁকা ছবি বিক্রি করাতে পারা। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ্যাবেইয়োর অনেক ছবি আমেরিকাতে বিক্রি হয়েছে।

জুয়ান এ্যাবেইয়ো

আমেরিকা এবং জাপানের বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে এ্যাবেইয়োর ছবি খুবই গৌরবের সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

স্পেন দেশের ক্যাটালেসিয়া অঞ্চলের বার্সিলোনা শহরের খুবই কাছাকাছি এ্যাবেইয়োর বর্তমান নিবাস। কিশোর বয়সে এ্যাবেইয়ো এক বেদের দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি ছেড়ে। বেদের দলের সঙ্গে থাকতে থাকতে কিশোর এ্যাবেইয়ো পরিচিত হয়ে ওঠে জীবনের বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে, প্রকৃতির নির্মল পরিবেশের মধ্যে স্বাধীন, সহজ জীবনযাপনের যে অফুরন্ত আনন্দ, তার স্বাদ পেতে থাকে এ্যাবেইয়ো। বেদের দলের সঙ্গে এদেশে-ওদেশে ভ্রাম্যমান অবস্থায় এ্যাবেইয়োকে আবিষ্কার করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কারলোস পেলিকার। এ্যাবেইয়োকে দেখেই পেলিকার বুঝতে পেরেছিলেন দুর্লভ শিল্পপ্রতিভার অধিকারী এই যাযাবর কিশোর, তারপর পেলিকার এ্যাবেইয়োকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, সুরু হ'ল এ্যাবেইয়োর নিরলস শিল্পসাধনা। কারলোস পেলিকার যথার্থই এ্যাবেইয়োর শিল্পগুরু। এ্যাবেইয়োর চিত্রশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, কবিতায় ও কথাসাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের যে দ্রুতলয়ের বিস্তার রয়েছে, তাই যেন বাস্তবভাবে ফুটে ওঠে এ্যাবেইয়োর ছবিতে রূপময় হয়ে, আবার সঙ্গীতের মধ্যে যে রূপ-বোধের ব্যঞ্জনা, তাই যেন জীবন্ত হয়ে ধরা পড়ে এ্যাবেইয়োর ছবির রঙে ও রেখায়। ছবির মধ্যে কবিতার বিচিত্র আবেদন প্রস্ফুট করে তোলা আর সেই সঙ্গে ছবিকে সঙ্গীতের মতোই সুরসমৃদ্ধ, সঙ্গীতের মত রসঘন করে তোলা এ্যাবেইয়োর এক অভিনব সৃষ্টি। এ্যাবেইয়ো নিজেও এদিকে সঙ্গীতের খুবই উঁচুদরের সমজদার এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিক। স্পেনীয় ভাষায় এ্যাবেইয়ো বেশ ভালো ভালো কয়েকখানি বই লিখেছেন, এ্যাবেইয়োর একটি খুবই জনপ্রিয় ও বহুকথিত বই হল L' Hora Del Te—অর্থাৎ 'চা-পানের সময়'। বার্সিলোনা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে মোলেট অঞ্চলে সমসাময়িক ইউরোপীয় চিত্র-কলার খুবই চমৎকার সংগ্রহশালা এ্যাবেইয়ো স্বীয় প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন। এ্যাবেইয়োর এই সংগ্রহ-শালায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের প্রায় ছয় শ' উৎকৃষ্ট ছবি, প্রচুর লিথো-গ্রাফ ও স্কেচ রয়েছে। এখনকার কালের বহু সমসাময়িক শিল্পী এ্যাবেইয়োর প্রতিকৃতি এঁকেছেন—সবসুদ্ধ ১৩৫টি

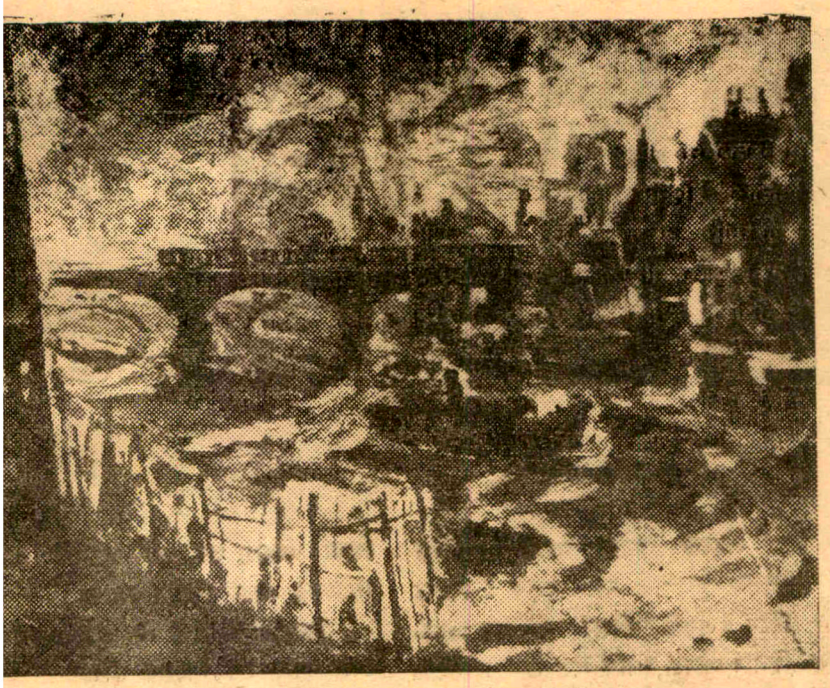

● লণ্ডনের শহরতলী কিংসটন। টেমসের ওপর কিংসটন ব্রিজ। এ্যাবেইয়োর এই ছবিটি অক্সফোর্ড প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

—এগুলিও এ্যাবেইয়োর এই ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। শিল্পীরা এই প্রতিকৃতি রচনা করে শিল্পীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে পিকাসোও আছেন।

গত বছরের মাঝামাঝি এ্যাবেইয়ো লণ্ডনে আসেন। টেমস নদীর ধারে সারে অঞ্চলে শিল্পী এ্যাবেইয়ো লণ্ডন শহরের নানা দিক অবলম্বন করে অনেকগুলো ভালো ভালো ছবি আঁকেন। টেমস নদীর জলে আকাশের ছায়া পড়েছে আর নদীর ওপর কিংসটন ব্রিজ, অপূর্ব এই ছবিটি। এক অর্ধোন্মাদ বৃদ্ধা, কোটে বোতাম নেই, খোলা কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ মহিলার যথেষ্ট পয়সা-কড়ি আছে---ছবির মত সাজানো গোছানো বাড়ি লণ্ডনের রিচমণ্ড পার্কের ধারে, সেই খামখেয়ালী বৃদ্ধা মহিলা সারি সারি কয়েকটা কেৎলী সাজিয়ে রেখেছেন : এ্যাবেইয়োর আঁকা ষ্টিল লাইফ ছবি। 'মিসেস ব্রাউনের কেৎলী' আঙ্গিকের দিক থেকে অসাধারণ।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে অক্সফোর্ডের হ্যালিফ্যাক্স হাউসে এ্যাবেইয়োর বিচিত্র চিত্রকর্মের একটি একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ইয়োলণ্ড নামে একজন কলারসিক ফরাসী মহিলা। জলরং, গোয়াশ, প্যাষ্টেল, তেলরং মিলিয়ে সবসুদ্ধ ৪৩টি ছবি পেশ করা হয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। লণ্ডনের শহরতলী সারে অঞ্চলের বাড়িতে বসেই এই ৪৩টি ছবি এঁকেছেন এ্যাবেইয়ো। লণ্ডনের বাজার, রাস্তা-ঘাট, গৃহস্থবাড়ি, পার্ক, লণ্ডনের রোদ, লণ্ডনের ধারে শহরতলীর মাঠে পাকা ফসল ইত্যাদি হল ছবিগুলোর উপজীব্য। ইংলণ্ডের শিল্প-রসিকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পায় এ্যাবেইয়োর এই সব ছবি। এ্যাবেইয়োর ছবিতে খুবই উল্লেখ-যোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল, এ্যাবেইয়ো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি রচনা করেন প্যাষ্টেলে, অথচ সাধারণত চিত্রশিল্পীরা প্যাষ্টেল ব্যবহার করে থাকেন শুধুমাত্র প্রতি-কৃতি অঙ্কনের জন্য। এ্যাবেইয়োর আঁকা একটি অপূর্ব ছবি 'লাষ্ট সাপার' সম্প্রতি পোপকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

সুশীল রায়

# অনলআয়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে অনেকই। এখন স লে শিক্ষার সুযোগ নিলেই হয়। গত বছর হাটারম্যান নামে এক সাহেব বৈঠকখানায় একটা নতুন স্কুল খুলেছেন। চারদিকেই কিছু-কিছু বিদ্যালয় বসেছে। সব নাম এখন মনেও পড়ছে না অন্নদাপ্রসাদের। এ ছাড়াও, প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্যে একটা স্কুল খুলেছেন মিসেস পিট, পিট বিবির স্কুল নামে তা পরিচিত হয়ে উঠেছে—মেয়েদের শিক্ষার জন্যে এ-ধরণের স্কুল এর আগে আর হয় নি।

বেলা তখন বেশি হয় নি। অন্নদাপ্রসাদ আজ খুব সকাল সকাল এসেছেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছেন এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা এসে পড়বেন বলে অপেক্ষা করছেন। টাকী থেকে কালীনাথ রায় আর জোড়াগাঁকো থেকে দ্বারকানাথ এসে পৌঁছলেন এইমাত্র।

এঁরা কথা বলছেন এখানে, আর ঐ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরা চলেছে তাদের স্কুলে।

মৌলালি থেকে বছর ছয়-সাতের ফুটফটে একটি ছেলে ধর্মতলার রাস্তা ধরে চলেছে, হাফ প্যাণ্ট ও গলাখোলা কোট তার পরণে, গলায় একটা চওড়া রঙিন মাফলার জড়ানো, হাতে বই। তার চোখ দু'টো জলজল করছে।

কয়েক বছর আগে মৌলালির দরগার লাগোয়া মাঠে চড়ক উৎসবের দিনে একটি শিশুর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম আমরা, পৃথিবীতে তার পদার্পণের সংবাদ জানা গিয়েছিল সেই কণ্ঠস্বরে। এই ছেলেটি সেই—ডিরোজিও সাহেবের বাচ্চা।

সেই বাচ্চাটি আজ কিশোর হয়ে উঠেছে। তার নাম হয়েছে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ওর শরীরের অনুপাতে নামটা যেন বেজায় বড়।

স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্যে পিছনে পিছনে চলেছে পেয়াদা। সঙ্গে কেউ আছে কি না-আছে সে খেয়ালই নেই তার। নিজের মনে সে দ্রুত পা ফেলে চলেছে আগে আগে।

কঁজো সাহেবের পাঠশালায় চলেছে ডিরোজিও। তার নামটা শরীরের তুলনায় বড় বলেই বুঝি বড় বড় পা ফেলে চলেছে ও। হয়তো তার নামের অনুপাতে বড় হয়ে ওঠার জন্যে তার এই ব্যস্ততা।

ডেভিড ড্রামণ্ড মানুষটা কুঁজো। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলার অ্যাকাডেমিটা ঐ নামেই বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া স্কুলটার একটু বিশেষত্বও আছে, এখানেই প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং শ্লোকের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়, এই জন্যেই এর পরিচয়ও একটু বিশেষ ধরণের।

কিশোর বালকটি ঐ স্কুলে একজন সেরা ছাত্ররূপে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ছেলেটা এরই মধ্যে দু-এক ছত্র ইংরেজি ছড়া বলতে আরম্ভ করেছে নিজে বানিয়ে বানিয়ে।

ড্রামণ্ড সাহেব তার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর দাঁড়াবার এই ভঙ্গি দেখে কোনো কোনো ছাত্র মজা পায়, কেউ-কেউ আবার ভয় পায়, কিন্তু ডিরোজিওর মজাও নেই, ভয়ও নেই, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ড্রামণ্ডের চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে সিকোয়েন্স অব টেন্স আর অ্যাপ্রপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে চটপট করে।

ড্রামণ্ড তাঁর নিজের পিঠটা কুঁজো করে দাঁড়িয়ে ওর মসৃণ পিঠে চাপড় দিয়ে বলেন, ভেরি গুড, নটি বয়।

এখানে পড়ানো হয় গ্রামার, কিন্তু অন্যান্য স্কুলে চলেছে ওয়ার্ড-মীনিং এবং খুব বেশি হলে স্পেলিং।

ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে ছেলেরা শিখছে ইংরেজি ভাষা, আর অন্যান্য বেশির ভাগ স্কুলের ছেলেরা শিখছে ইংরেজি শব্দ।

বৈঠকখানায় হাটারম্যান সাহেবের পাঠশালায় তখন সোরগোল পড়ে

গিয়েছে। সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলে উঠছে—পমকিন—লাউকুমড়ো, অমনি অন্যান্য ছাত্রেরা সমস্বরে বলছে—পমকিন—লাউকুমড়ো।

হাটাবম্যান সাহেব ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন। সর্দার পোড়ো একটা একটা শব্দ ঐভাবে বলে উঠছে, তা শুনে ছাত্রের দল একসঙ্গে বলে উঠছে ঐ শব্দ ও শব্দার্থ। অবশেষে একসঙ্গে তারা ছড়া কেটে চীৎকার করে মুখস্থ করছে পাঠ—

পমকিন লাউকুমড়ো, কোকে স্বর্ণ শশা,
ব্রিনজেল বার্তাকু, প্লোম্যান চাষা।

আবার বলছে—

আই কাছে, নিয়র কাছে,
নিয়রেস্ট অতি-কাছে,
ফট্ কাট, কট্ খাট,
ফলোয়িং পাছে।

বিভিন্ন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা চলেছে এইভাবে। কিন্তু ধর্মতলা অ্যাকাডেমির পঠন-রীতি আলাদা। সেখানে ঘোষণার রীতি নেই।

কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলের ছেলেরাও পাঠ মুখস্থ করে চলেছে—

গাড্ ঈশ্বর লাড্ ঈশ্বর,
কাম মানে এস
ফাদার বাপ, মাদার মা,
সিট্ মানে বোসো।
ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন,
ফাদার-সিস্টার পিসি
ফাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর,
মাদার-সিস্টার মাসি
আই মানে আমি,
আর ইউ মানে তুমি
আস মানে আমার-দিগের,
গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন,
আর নাইট মানে রাত
উইক্‌কে সপ্তাহ বলে,
রাইস মানে ভাত।
ফিলজফার বিজ্ঞলোক,
প্লোম্যান চাষা,
পমকিন লাউকুমড়ো,
কোকোম্বর শশা।

ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রচলন চলেছে এইভাবে। শব্দের অর্থ এই-ভাবে কণ্ঠস্থ করাকেই রামমোহন শিক্ষার প্রচলন বলেছেন কি না ঠিক ধরা যায় নি। ধরা যায় নি বটে, কিন্তু এই শিক্ষাই তাঁর কাছে যে চরম শিক্ষা বলে স্বীকৃত এমন বোধ হয় না। বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গে মহীরুহ হয়ে ওঠে না। এইভাবে তারা যাই শিখুক না কেন, এর দ্বারা ক্রমশ নিজেদের অন্ধসংস্কার থেকে মুক্ত হবার পথ তারা অবশ্যই দেখতে পাবে একদিন।

আমাদের দেশে এসে বিদেশীরা অনেক কিছু নিয়ে যাচ্ছে, পণ্য নিয়ে যাচ্ছে তো বটেই, সেইসঙ্গে পুণ্যও নিয়ে যাচ্ছে বলা যায়। তাদের সংস্পর্শে এসে আমরাও না হয় তাদের কিছু নিলাম; কারো কাছ থেকে কিছু নিলে ক্ষতিটা কোথায়। তাদের ভালোটুকু গ্রহণ করার মত মনের উদারতা থাকবে না কেন। কিন্তু কিছু নিতে হলে তাদের অনুকরণ নয়, কিছুটা তাদের অনুসরণ করতে হবে। আজ 'ফিলজফার বিজ্ঞলোক প্লোম্যান চাষা' বলে চীৎকার না হয় করা গেল, বিজ্ঞলোক হতে হলে এইভাবেই এগুতে হবে, নইলে চিরকাল যে থেকে যেতে হবে চাষা। —প্লোম্যানের মত চাষা নয়, চাষার মত চাষা।

কোন্ বিজ্ঞলোক পুরস্ত্রীকে নিক্ষেপ করতে রাজি হয় আগুনে? কোন্ বিজ্ঞের বিধান এটা?

রামমোহন তাঁর পুঁথি প্রকাশ করে চলেছেন, আত্মীয়-সভার অধিবেশন চলেছে নিয়মিত। সেই সভায় নূতন এক আত্মীয়ের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল তাঁর।

যাকে বলা যায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল আলোড়িত করা, রামমোহন অনেকটা সেইভাবে সতীদাহ-প্রথা বন্ধের এবং পৌত্তলিকতা বর্জনের ও একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর এ ত্রিবিধ অভিযানে বিচলিত হয়ে উঠেছে চারিদিক, তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুর দল উঠেছে উত্তেজিত হয়ে।

এমনি একদিন বৈঠক বসেছে আত্মীয়-সভার। আমন্ত্রিতেরা সকলে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন, তারই মধ্যে অচেনা ও অনিমন্ত্রিত একটি মুখ দেখতে পেলেন রামমোহন।

সভা যতক্ষণ চলল ততক্ষণ রামমোহন কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন একে-একে, আমাদের দেশের মেয়েরা শারীরিক শক্তিতে পুরুষদের চেয়ে হীন, এই সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের ওপর নানাভাবে উপদ্রব করে থাকে। তারা হীন, এ কথা স্বীকার করে নিলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তাদের কি কোনোদিন সুযোগ দিয়ে দেখা হয়েছে যে, তাদের যোগ্যতা তারা প্রমাণ করতে পারে কি না। আপনারা সকলেই লীলাবতী ও ভানুমতীর কথা জানেন; তাঁরা নারী, তবুও তাঁরা কি তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারেন নি? যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং মৈত্রেয়ী সম্যকরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। এই যদি শাস্ত্রের উক্তি, এ-উক্তি অস্বীকারের উপায় কি। স্ত্রীলোকেরা যে হীন, তার প্রমাণ তবে কোথায়? আমরা আমাদের পুরস্ত্রীদের অন্তঃপুরের বন্দিশালায় আবদ্ধ রেখে তাদের অজ্ঞান করে রাখব এবং তাদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করব যে, তারা হীন। আমরা কি তাদের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার মত শক্তির অধিকারী নই?

অনেকক্ষণ কথা হ'লে রামমোহন বললেন, মুখে কিছুটা বললাম, সংকল্প আছে প্রবর্তক আর নিবর্তকের কথোপকথন ছলে এ বিষয়ের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে রচনা করব।

এ সংকল্পের কথা শুনে আত্মীয়-সভায় কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার হল। তৈলিনীপাড়ার অন্নদাবাবু আর জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ দুজনে দুই তাকিয়ার কনুইয়ের ভর রেখে কাছাকাছি হয়ে চাপা গলায় কি যেন পরামর্শ করতে লাগলেন। তাঁদের পরামর্শের ধরণ দেখে বোঝা গেল, তাঁরা আজ রামমোহনের কথা শুনে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছেন।

সভা ভঙ্গ হলে একে একে সকলে গিয়ে নিজ নিজ পাল্কিতে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সোটাবরদার পেয়াদা বরকন্দাজ আর খানসামা পাল্কি-বেহারার ভিড়ে গৃহের প্রাঙ্গণ প্রায় পরিপূর্ণ।

বেহারাদের নিশ্বাসপাতের হুশহাশ শব্দ সমেত এক-একটা পাল্কি যাত্রা করতে লাগল ক্রমশ।

সমস্ত মাথা ভরা বিরাট টাক, সযত্নভাবে কামানো দাড়ি আর গোঁফ, পরণে কোট আর পাৎলুন, কে এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি?

রামমোহন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে ইংরেজিতে বললেন, মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে বিশেষ আনন্দিত হব।

আত্মীয়-সভার অনিমন্ত্রিত আগন্তুক বিদেশী ভদ্রলোকটি স্মিত হেসে বললেন, আমার কোনো পরিচয় নেই—আয়্যাম এ ট্রেভার ইন কুকস অ্যাণ্ড ওয়াচেস। আমার নাম ডেভিড হেয়ার।

তাঁর করমর্দন করে রামমোহন বললেন, আর, আমার নাম—

—আই নো ইউ। ইউ আর রামমোহন রায়। হু নোজ ইউ নট ইন ক্যালকাটা?

রামমোহন বললেন, আপনার নাম শুনেছি, আজ পরিচয় হল।

ডেভিড হেয়ার হেসে বললেন, আমিও আপনার নাম শুনে আসছি, আলাপ করার লোভ হল তাই আজ এসে পড়লাম—আন-ইনভাইটেড। ইউ গেভ এ ভেরি ফাইন স্পীচ টু-ডে।

একটু আশ্চর্য হলেন রামমোহন, তিনি তাঁর বক্তব্য তো জানালেন বাংলায়, এই বিদেশী ভদ্রলোকটি তা বুঝতে পারলেন কি করে, তাঁর ভালো লাগল কি করে। ইনি কি শুধু ভদ্রতা করার জন্যেই ও-কথা বললেন?

—নো স্যার, নো। আই কাণ্ট স্পীক বেঙ্গলি ওয়েল, বাট আই ক্যান ফলো ভেরি গুড।

—বাংলা আপনি বোঝেন?

—বুঝি। যে-দেশে আছি, সে-দেশের ভাষা না বুঝলে ব্যবসা চলবে কি করে?

দুজনে হেসে উঠলেন একসঙ্গে। দুজনে করমর্দন করতে লাগলেন। হেয়ার এবার থেকে যেন নিয়মিত আসেন, এই অনুরোধ জানালেন রামমোহন। সানন্দে তিনি তাতে স্বীকৃত হলেন।

কোনো বাহন নিয়ে আসেন নি ডেভিড হেয়ার, না পাল্কি, না ঘোড়া। এসেছেন পদব্রজে।

—কোন্ দিকে থাকেন?

—লালদীঘির কাছে, বাঁকশালে।

এখান থেকে মাইল তিন রাস্তা হবে বাঁকশাল। এ-পথ নাকি বিশেষ কিছু না। এই বাগানবাড়ির পিছনেই যে রাস্তা, ওই রাস্তা ধরে লেবুতলায় পড়ে বৌবাজার দিয়ে সোজা হাঁটা দিলেই তো লালদীঘি।

বিদায় নিয়ে রওনা হলেন ডেভিড হেয়ার।

চার দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন রামমোহন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ তাঁর চলেছে। সেই কাজের সঙ্গে অর্থকরী কাজও করতে হচ্ছে তাঁকে। চার দফা কর্মসূচী কেবল আলাপ-আলোচনা আর কাগজে-কলমে জড়িয়ে রাখলেই কাজ হল না। তা প্রয়োগ করতে হবে কার্যক্ষেত্রে—তার জন্যে অর্থ দরকার। বেদান্তের অনুবাদ মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন, এতেও প্রয়োজন হয়েছে অর্থ। সংগতিসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই তিনি, সঞ্চিত অর্থ ধীরে ধীরে ব্যয় করে গেলে একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, এই জন্যে অর্জন করা দরকার।

বিকালের দিকে পাল্কি-গাড়ি চেপে তিনি তাই চলে যান সাহেব-পাড়ায়। প্রত্যহ নিজে না গেলেও হয়, তবু তিনি নিজেই যান একবার করে। এতে কাজের শৃঙ্খলা থাকে বলে তাঁর ধারণা।

দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা সময়। একটা দিনের পক্ষে এ-সময় যথেষ্ট। যারা কাজ করে তাদের সময়ের অভাব হয় না। সময়ের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারলে সময় সর্বদাই সদয় ব্যবহার করে। কিন্তু তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সময় বিরূপ না হবে কেন। প্রত্যহ প্রভাতে দরজা খোলামাত্র অনুগত ভৃত্যের মত দুয়ারে এসে হাজির হয় সে; সে চায় হুকুম। কখন কি করতে হবে, কোন্ কাজের পর কোন্‌টা তার নির্দেশ জানতে চায়। একটা পল কিংবা একটা বিপল ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু দুয়ারে দণ্ডায়মান সেই সময়ের মুখের দিকে না চেয়ে যদি তাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা ক'রে তার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় অছিলায় আর আলস্যে, সময় তখন বক্রনেত্রে একবার মাত্র চেয়ে দেখবে সেই অবহেলার অপমানকে, তারপর তার যাত্রা আরম্ভ করবে দ্রুতগতিতে। বিফল হয়ে পার হয়ে যাবে প্রভাত, হঠাৎ দেখা দেবে পরিতাপের দ্বিপ্রহর। তখন অনুশোচনা করলেও ফিরে আসবে না সে সময়। নিজেদের সময়ের কাঙাল মনে করে যতই আক্ষেপ করা যাক না কেন—ফিরে এসে সে আর ভরে দেয় না ভাণ্ডার। আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞান তার অসাধারণ, একবার উপেক্ষিত হলে সে শর্ত অনুনয় সত্ত্বেও আর আত্মসমর্পণ করতে চায় না।

মানুষ সে চেনে, তাই মানুষের আর্তরবে তার বুক বেদনায় ব্যথিত হয়ে ওঠে না। যারা তাকে অবহেলা করে, সে জানে, তারাই দুর্বাক্য ব্যবহার করে তার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার ত্রুটি কোথায়, তা কখনো সন্ধান করে দেখে না কেউ, এইটুকুই মাত্র তার আক্ষেপ। এ আক্ষেপ বহন করে চলেছে সে আবহমান কাল ধরে ; কিন্তু তবু সে প্রত্যেকের দরজায় প্রতিটি প্রহরে এসে হাজিরা দিয়ে আছে। তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে যারা উৎসাহী, তাদের কাজ করে দিতে তার উৎসাহ তার দ্বিগুণ। কাজের লোকদের কাছে সে তাই বড় প্রিয়, অমূল্য সম্পদের মত মূল্যবান। কিন্তু যারা বিপরীত চরিত্রের লোক, তারা সত্যিই বড় বিপরীত, তারাই বলে, সময় ফাঁকি দিল আমাকে ; দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা বড় কম সময়।

সময়কে ভাগ ভাগ করে নিয়ে যথা-রীতি কাজ চলেছে রামমোহনের। তাই সময় নিয়ে টানাটানি নেই তাঁর। সময়ের সম্মুখে বাঁকড়া চুলের ঝুঁটি আছে কি না তিনি জানেন না, থাক বা না-থাক, তিনি যেন দৃঢ় মুঠিতে ধরে আছেন সেই ঝুঁটিটাই।

বেদান্ত, উপনিষদ, আত্মীয়-সভা, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ, অন্নদাপ্রসাদ, ভট্টাচার্যগণ—সকলের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে আত্মীয়তা চলেছে তাঁর, আলাপ-আলোচনা চলেছে। হরিহরানন্দ আছেন নিত্যসঙ্গী। আর একটি জিনিস আছে তাঁর আত্মার আত্মীয়-রূপ, সেটি হচ্ছে তাঁর সেই সংকল্পটি।

এতজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি ভুলে যাচ্ছেন না কারো কথাই ; মা'র কথাও মনে পড়ছে, মনে পড়ছে বৌদি অলকমণির কথা।

সময় বয়ে চলেছে তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্যে নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভাবছেন কিছুদিন হল। এ-বিষয় নিয়ে হেয়ার সাহেবের সঙ্গে কথাও হয়েছে। ঘড়ির ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন হেয়ার। তিনি নিজে লেখাপড়া বেশি করার সুযোগ পান নি। এই জন্যেই বুঝি লেখাপড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ টান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত সময় এবং সমস্ত অর্থ তিনি এ-বিষয়ে নিয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত আছেন। এ কথা জেনে রামমোহন যেন পেয়ে গেছেন একজন অকৃত্রিম সহায় ও সঙ্গী।

সেদিন সকালবেলা হেয়ারের সঙ্গে রামমোহন বের হলেন কলকাতার বিভিন্ন পল্লীর স্কুলগুলি দেখতে। চিৎপুরের বয়েজ বোর্ডিং স্কুল ও শেরবোর্ন সেমিনারী, কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুল ও পিট বিবির স্কুল ঘুরে ঘুরে তাঁরা ফিরে এলেন আবার কলু-টোলায়—নিত্যানন্দ সেনের স্কুলে।

ছাত্রেরা তখন সমস্বরে চীৎকার করে শব্দার্থ মুখস্থ করছে।

এঁদের আবির্ভাবে শিক্ষক মহাশয় তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘোষাব ?

রামমোহন তাকালেন হেয়ারের মুখের দিকে, তারপর ফিরে তাকালেন শিক্ষক মহাশয়ের দিকে।

শিক্ষক মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘোষাব ? গার্ডেন, না, স্পাইস ?

বাগান, না, মসলা—ছেলেরা এই বিষয়ে কতকগুলো শব্দার্থ শিখেছে শিক্ষক মহাশয় তা জানাবার জন্যে যেন ব্যগ্র।

রামমোহন বললেন, আচ্ছা, গার্ডেন ঘোষান।

শিক্ষকের নির্দেশে ছেলেরা যেন তাদের বিদ্যা ঘোষণা করতে লাগল—

পমকিন্ লাউকুমড়ো,
কোকোম্বর শশা,
ব্রিনজেল বার্তাকু,
প্লোম্যান চাষা।

—বেশ বেশ বেশ !

সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা এলেন ধর্মতলাব। ডেভিড ড্রামণ্ডের অ্যাকাডেমিতে।

কুঁজো সাহেব এগিয়ে এসে তাঁদেব সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'বে তাঁদের নিয়ে গেলেন তাঁব স্কুলেব ক্লাস দেখাতে।

ছোট ছোট ছেলেবা ভাষা শিক্ষা কবছে। পাঁচ-ছয় বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে এই বিরাট পুরুষটির দিকে।

রামমোহন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট'স ইয়োর নেম প্রিজ।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, মাই নেম ইজ উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে।

ছেলেটার শরীরের অনুপাতে নামটা যেন অস্বাভাবিক বড়। রামমোহন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বললেন, গুড। টেক ইয়োর সীট।

পাশের ক্লাসে আর গেলেন না তাঁরা, তাঁদের জানা হল না যে, ঐ

ক্লাসে এই রকম লম্বা নামের আর একটি ক্ষুদে ছেলে বসে বসে তার পাঠ প্রস্তুত করছে।

ড্রামণ্ড সাহেব বললেন, আই হ্যাভ টু ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্টস ইন মাই স্কুল দাউ। ওয়ান ইজ ভিভিয়ান ডিরোজিও, অ্যাণ্ড দি আদার ইজ দিস—মেকপিস থ্যাকারে।

প্রথম ছেলেটিকে দেখার জন্যে তাঁরা আর ফিরে গেলেন না। স্কুল সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার জন্যে তাঁরা বেরিয়েছেন, সে ধারণা হয়েছে তাঁদের।

হেয়ার সাহেব ফিরিঙ্গী মানুষ, এখানকার ফিরিঙ্গীদের খবরাখবর তিনি রামমোহনের থেকে বেশি রাখেন। তিনি বলতে বলতে চললেন যে, ডিরোজিওরা থাকে মৌলালিতে, ভদ্রলোক ইটালিয়ান, বিয়ে করেছেন এদেশী এক মহিলাকে—তাঁদেরই বাচ্চা নিশ্চয় ওই ভিভিয়ান। আর, থ্যাকারে? ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে থাকে ওরা। ওর গ্র্যাণ্ডফাদার লাস্ট সেঞ্চুরিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ নিয়ে এদেশে আসেন, ওর ফাদার এখন আলিপুরের কালেক্টর। ফিলিপ ক্রান্সিস যে-বাড়িতে বাস করতেন থ্যাকারে ফ্যামিলি সেখানে বাস করে। এখন তো ফিলিপ ক্রান্সিস মিটার নন, স্যার হয়েছেন।

সেই পুরণো কাহিনী জড়িয়ে আছে যে-বাড়িটার? সেই ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড। সেই স্ক্যাণ্ডাল?

—ইয়েস। দ্যাট ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড ইজ নাউ এ গ্র্যাণ্ড ওল্ড লেডি।

চন্দননগরের সেই মেয়ে, কোনো স্ক্যাণ্ডালকে ভ্রূক্ষেপ না করে ক্রমশ ধাপে ধাপে সোসাইটির কোন্ উচ্চে উঠে গেল। ফরাসী দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নজরে পড়ল, ফরাসী দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী তালেরঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রিন্সেস অব তালেরঁ নামে পরিচিত হল। এই নূতন প্রণয় ও নবীন পরিণয়ও ভেঙে গেছে। অগাধ অর্থের অধিকারিণী হয়ে এখন তিনি বাস করছেন ইউরোপে। এখন তিনি গ্র্যাণ্ড ওল্ড লেডি, তবুও সোসাইটিকে এখনো উচ্চকিত রেখেছেন তাঁর রূপে। আর কিছু তাঁর নেই এখন এদেশে, শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে একটি ছবি।

রামমোহন বললেন, আই মো দি স্টোরি।

রামমোহনের বয়স যখন ঐ মেকপিস থ্যাকারে কিংবা ঐ ভিভিয়ান ডিরোজিওর মত, সেই সময় ঘটেছিল এই ঘটনা। ফিলিপ ক্রান্সিস প্রাচীরে মই লাগিয়ে মিস্টার গ্র্যাণ্ডের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিল মিসেস গ্র্যাণ্ডের কাছে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় ক্রান্সিস। হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী যে, চাঁদপাল ঘাটে যার জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে তোপধ্বনি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়মের বুরুজ থেকে, দুটি তোপ কম পড়েছিল বলে হেস্টিংসের সঙ্গে যার শত্রুতা আরম্ভ, সেই ক্রান্সিসকে হাতে-নাতে পাকড়াও করল মিস্টার গ্র্যাণ্ডের ভৃত্য। এলিজা ইম্পের আদালতে এই নিয়ে মামলা চলল কতদিন ধরে।

সেসব কথা মনে পড়ার কথা নয় রামমোহনের। তখন তাঁর সে বয়স নয়। কিন্তু পরে তিনি সবই শুনেছেন, সবই জানেন।

ক্রান্সিস যে-বাড়িতে থাকত, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের সেই বাড়িতে থাকে ঐ থ্যাকারে।

ঐ বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে বেজে চলেছে ক্রান্সিসের দীর্ঘনিশ্বাস। ম্যাডামের প্রতি তার প্রণয়ের ব্যাকুলতা ক্ষুধার্ত হয়ে নিশ্চয় দেয়ালে-দেয়ালে আঘাত হেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর, সেইসঙ্গে খোলা আদালতে সেই কুৎসা-কাহিনী বিস্তৃত করে বর্ণিত হচ্ছিল যখন, তখন অপমানের দীর্ঘনিশ্বাস নিশ্চয় হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওই বাড়ির সর্বত্র।

তিনমহলা ঐ বাড়ি, বিরাট বটগাছ অপর্যাপ্ত ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে তার সর্বাঙ্গ। বাড়িটার সর্বাঙ্গ শীতল হয়েছে বটে, কিন্তু ক্রান্সিসের বুকের তাপ তাতে নিশ্চয় কমে নি।

এখন ক্রান্সিস হচ্ছেন স্যার ফিলিপ ক্রান্সিস। তিনিও এখন গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান। কিন্তু শরীরের বয়স আর মনের বয়স কি এক? তাই যদি হবে, তবে চল্লিশ বছর বয়সে কি তিনি একটি পনের বছরের মেয়ের সান্নিধ্য পাবার জন্যে তাঁর সম্মান-মর্যাদা-পদগৌরবের কথা, এমন কি বয়সের কথাও, ভুলে গিয়ে নিতান্ত বালকের মত রাত্রির অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ঐ বালিকার কাছে?

সেই বাড়িতে বাস করছে ঐ বালক—ঐ মেকপিস থ্যাকারে। উত্তরকালে যদি ঐ বালক কবি হয় কিংবা হয় ঔপন্যাসিক, তাহলে এই গৃহটিকে কেন্দ্র করে অবশ্যই সে লিখবে এক পরম রমণীয় কাহিনী। কিন্তু হায়, যাঁরা আজ বেঁচে আছেন, তাঁরা হয়তো সেদিন থাকবেন না, যদি সে-কাহিনী লেখা হয়ও, তাঁদের আর তা পাঠ করা হবে না। না হোক, তবু যেন লিখিত হয় সে-কথা, ভাবীকালের মানুষেরা সে-কাহিনী পাঠ করে, আর কিছু না হোক, প্রাক্তন কলকাতার নিশীথ রজনীর প্রেমগুঞ্জন শুনতে পাবে নিশ্চয়। ওদের জীবনের স্ক্যাণ্ডালটি বাদ দিয়ে যদি কেবল প্রণয়-সংবাদটুকু তুলে আনা যায়, তাহলে তা অবশ্যই কলঙ্ককাহিনী হবে না, সে হবে প্রেমগাথাই।

বলাগড়ের প্রান্তরে-প্রান্তরে এখনো হয়তো বেজে চলেছে সেই পাগলটার গলা—গ্রাণ্ডি-বিবি রাণ্ডি হল। তা বাজুক। তবু সেই গ্রাণ্ডি-বিবিকে সামান্য মেয়ে বলে অবজ্ঞা করা চলে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

(ক্রম।।

# জাপানী সন্দেশ

## এ বছরটা ড্র্যাগনের
( ১৯৬৪ )

আজকের জাপানের দুটি মুখ। এ যেন তার Noh নাট্যের মুখোশের মত। একবার মুখোশ খুলছে আবার পরছে। কোনটা যে আসল মুখ তা জানতে সময় নেবে। হয়তো দুটিই সত্য। মুখোশটাই হয়ত মিথ্যার পরিচয়।

একটা মুখ অতি পুরাতন। জাপানের ঐতিহাসিক বহু যুগের মুখ। কালের প্রকোপে হয়ে গেছে মলিন, নরম ও গভীর। আরেকটা মুখ হলো ঝকঝকে তকতকে। নব-যুগের ফ্ল্যাশ বাল্বের আলোর ঝিলিকের মত। আলো দেয় বটে, তবে সে আলো গভীর নয়। নতুন যান্ত্রিক যুগের সাফল্যের আলো।

বহুকালের পুরাতন একটা প্রথার এখনও চলন আছে এদেশে। বছরের প্রথম দিনে পেশা চালের বড়া (Mochi) খাওয়া। এই মোচি যেমন ভাবে ইচ্ছা খাও। পুড়িয়ে; সুপে ডুবিয়ে সিদ্ধ করে বা ছোট টুকরো করে কেটে মাখনে ভেজে। স্বাদও চমৎকার।

## ড্র্যাগন কাহিনী

এ বছরটা শুধু ড্র্যাগনেরই নয়, অলিম্পিকেরও। গত খরগোসের বছরটার পিছনে তেড়ে এসেছে এই ড্র্যাগন। আমাদের যেমন প্রতি মাসের একটি করে symbol আছে, এদের তেমনি প্রতি বছরের একটি করে symbol. মাসের নয়। ধর যেমন বরাহ, গাভী, ঘোড়া, ইঁদুর, মেষ, বাঁদর, খরগোস, মুরগী, বাঘ, ড্র্যাগন ইত্যাদি। সবকটি প্রাণীগুলির মধ্যে এই ড্র্যাগনই হলো অস্তিত্ব-বিহীন। এর স্থান শুধু গল্প-পুরাণের মধ্যে। ড্র্যাগনের জাপানী নাম 'রীউ'।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের পুরাতন কথা ও কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায় ড্র্যাগনের নানান বিবরণ। বোধ-হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিরাট প্রাণীগুলিকে সব মিলিয়ে-মিশিয়েই মানুষের মন এই ড্র্যাগনকে জন্ম দিয়েছে। এর সাপের মত দেহ, মাছের আঁশ দিয়ে ঢাকা। মাথা আর সামনের দুটি

**সন্দীপ ঠাকুর**

পা সিংহের মত। কোন কোন ড্র্যাগনের আবার পাখাও আছে। দেশ বিশেষে ড্র্যাগনের চেহারার পার্থক্য আছে। ধর, চীনার যেমন হরিণমুখো ড্র্যাগন, ভারতের হাতীমুখো ড্র্যাগন ইত্যাদি।

সাধারণত ড্র্যাগনের নাক দিয়ে বেরোয় আগুনের হল্কা; মেঘের মত এর গর্জন; যক্ষের মত আগলে থাকে যুগ যুগের গুপ্তধন; বাসস্থান পর্বতগুহায়, সরোবরে কিংবা নদীতে, আবার মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে। এর সঙ্গে জড়িত আছে কত দুর্গম পথ, কত সঙ্কট ও কত বীরের প্রাণ। এর কৃপা পেতে হলে চাই মানুষের কত স্বার্থত্যাগ ও প্রাণত্যাগ। সাধারণত সুন্দরী রাজকুমারীর। আছে কত ড্র্যাগন বধের কাহিনী। কেমন করে বীর ড্র্যাগনের মাথা কেটে ফেল্লে তলোয়ারের ঘায় আর তার ফলে লাভ করল রাজকন্যের পাণি।

'কোজিকি' হ'ল জাপানীদের 'ঠাকুরমার ঝুলি'। জাপানের 'পুরাকালের ইতিহাস'। The Record of Ancient Matters, এদেশের সবচেয়ে পুরাতন বই। দ্রুতগতি, বীরবাহন মহারাজকুমার সুসানো সুরা পান করিয়ে মাতাল করে তোলেন অষ্টমস্তক ড্র্যাগনকে। ওর মাতলামীর ফাঁকে ইয়া লম্বা শাণিত তরবারির কোপে এক এক করে কেটে ফেলেন আটটা মাথা। সুন্দরী কন্যার প্রাণ দিলেন ফিরিয়ে।

Izumo দেশের Hi নদীর Tori-kami নামে এক নগর।

● ড্র্যাগন

রাজকুমার সুসানো হঠাৎ দেখতে পেলেন নদীর জলে ভেসে চলেছে একজোড়া জাপানী কাঠি-চামচ, chopsticks. নদীর জন্মস্থানের কাছাকাছি যে মানুষের বসবাস আছে তার আভাষ পেয়ে রাজকুমার চল্লেন উত্তরে। অনেক দূর এগিয়ে দেখা পেলেন ক্রন্দনরত এক বুড়ো আর বুড়ির। তাদের মাঝে বসে আছে একটি পরমা-সুন্দরী যুবতী। তিনজনেই গলা ছেড়ে কেঁদে চলেছে।

সুসানো জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? বুড়ো জবাব দিলে, আমি এক দেবতা। 'মহাপর্বতরক্ষীদেব', আমার পিতার নাম। আমার নাম 'পদাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দাদা'। আমার স্ত্রীর নাম 'হস্তাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দিদি'। এই যে মেয়েটিকে দেখছো এ আমাদের একমাত্র সন্তান। এর নাম রাজকুমারী 'আশ্চর্যবতী'।

রাজকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের এই ক্রন্দনের কি কারণ? বুড়ো জবাব দিলে, আমাদের সব মিলিয়ে ছিল আটটা কন্যা। প্রতি বছর আট-মাথা Koshi-র ড্র্যাগন এসে একটি করে কন্যা গিলে ফেলে। এই 'আশ্চর্যবতী'ই আমাদের শেষ সম্বল, অন্ধের যষ্টি। 'আটমাথা'র আগমনের সময় এসেছে। তাই আমাদের চোখে জল।

Koshi-র ড্র্যাগন দেখতে কেমন? শীতের চেরীফলের মত লাল টকটকে চোখ। আটটা মাথা আর আটটা ল্যাজ। খেজুর গাছের মত দেহের ওপর ঘন সবুজ শ্যাওলা। আটটা পাহাড় আর উপত্যকার ওপর বিছিয়ে আছে এর বিরাট দেহ। পেটটা সব সময়ে যেন আগুনের ওপর রক্তের কড়া টগবগ করে ফুটছে। ভয়াবহ ব্যাপার। শীঘ্রই আসবে সে।

দ্রুতগতি, বীরবাহন মহারাজকুমার সুসানো বুড়োবুড়িকে বল্লেন, এ যদি তোমাদের মেয়ে হয় তাহলে আমি চাই একে আমার রাণী করতে। আমার নাম রাজকুমার দ্রুতগতি বীরবাহন সুসানো। আমার পিতার রাজ্য স্বর্গে।

পদাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দাদা ও হস্তাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দিদি আনন্দে গদ গদ। জোড়হাতে বল্লে, তাই যদি হয় তবে আশ্চর্যবতী তোমার। এই শুনে সুসানো আশ্চর্যবতীকে ছুঁতেই রাজকুমারী বদলে গেল চমৎকার একটি ছোট্ট চিরুণীতে। চিরুণীটি নিজের চুলে গুঁজে পদাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি ও হস্তাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি দাদা-দিদিকে বল্লেন, মদ চোলাই করতে হবে। সবচেয়ে সেরা সুরা চাই। সেই মদে গুলে দাও আটরকম যতকিছু পাও। অষ্টশাক, অষ্টধাতু সব। আর তৈরি কর একটি বেড়া ঐ আটটি মদের কড়ার চারপাশে। ঐ বেড়ার থাকবে অষ্টদ্বার। প্রতি দ্বারের সঙ্গে বাঁধা থাকবে একটি করে উঁচু পাটাতন। প্রতি পাটাতনের ওপর থাকবে বিরাট মদের কড়া আর প্রতি কড়ায় ঢালবে অষ্টশাকি-অষ্টধাতু সুরা। এই কাজ কটি সেরে চুপটি করে বস ধৈর্য ধরে। অন্য যা সব করার তা আমার হাতে ছেড়ে দাও।

সব কাজ সারার কিছু পরেই আবির্ভাব হলো বিরাট আটমাথা ড্র্যাগনের। মদের ভুরভুরে গন্ধ পেয়েই সে তার আটটা মাথা ডুবিয়ে পান করলে আটকড়া সুরা। মাথা উঠলো ঝিমঝিম করে। আট পাটায় মাথা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অষ্টমস্তকী ড্র্যাগন।

দ্রুতগতি বীরবাহন মহারাজকুমার সুসানোর দশহাত লম্বা তলোয়ার বেরিয়ে এলো খাপ থেকে। নিঃশব্দে কেটে ফেল্লেন আটটা বিরাট মাথা। ড্র্যাগনের দেহটাকে কুঁচো কুঁচো করে কেটে ফেল্লেন সুসানো। Hi নদীর জলের রং গেল বদলে। লাল রক্তের রং। মধ্য ল্যাজের ডগার দিকটা কাটার সময়ে সুসানোর দশহাতি তলোয়ারের ডগাটা গেল ভেঙে। আশ্চর্য হয়ে একটু ভাল করে দেখতেই—পেলেন ল্যাজের ভিতরে লুকোনো এক অত্যাশ্চর্য তরবারি। এটি লাভ করে মহা খুশি সুসানো। এ তলোয়ার যার হাতে সেই এই পৃথিবীর হর্তাকর্তা বিধাতা।

পরে Izumo-তে suga অঞ্চলে রাজকুমার তৈরি করলেন বিরাট এক প্রাসাদ। মাথার চিরুণীকে আবার বদলে ফেল্লেন রাজকুমারী আশ্চর্যবতীতে। দুজনে গেয়ে উঠলেন পবিত্র সঙ্গীত—

অষ্ট মেঘের উদয় হোক।
অষ্ট বেড়ার পর্দার আড়াল
সঙ্কটহীন দাম্পত্য জীবন।
অষ্ট বেড়ার, অষ্ট মেঘের জয়।

পদাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দাদা আর হস্তাঙ্গুলি-শুড়শুড়ি-দিদিকে বল্লেন, তোমরা আমার প্রাসাদের মহারক্ষী আর মহারক্ষিণী। তোমাদের নাম আজ থেকে 'Suga শহরের অষ্ট-কর্ণদেব ইনাদা মন্দিরের দেবদেবী।'

## নানান্ দেশের ড্র্যাগন

পৃথিবীর নানা দেশের নানা গাথায়, পুরাণে কত ড্র্যাগনবধিদের কথা জানা যায়। যেমন ধর—বুদ্ধদেব, থর, আর্চএঞ্জেল মাইকেল, জীয়ুস, পারসিয়ুস, হারকিউলিস অ্যাপোলো, সীগফ্রিড, ফীবুস, হোরাস (মিশর) সেণ্ট জর্জ, ইংলণ্ডের Patron saint, আর বারো শতাব্দীর Laird of Laristone যে 'slew the Worme of Wormington in Rox Burgshire'—ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ ড্র্যাগন যাদের বধ করা হয়েছে তাদের নাম :—

কীমেরা, হাইড্রা, পাইথন্, টাইফাস্, Zohak (পারস্য) এবং লেভিয়াথান (হীব্রু)। St. John the Divine-এর মতে ড্র্যাগন, শয়তান আর devil এরা সব একই জিনিষ (Rev. 12 : 9) এবং এই মতকে ইহুদীরাও অনেক জায়গায় সমর্থন করেছেন (Ps, 74 : 13, 14; IS, 51 : , 27 : 1),

অনেক পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ব্যাবিলনের পূজিত ড্র্যাগন যাকে ড্যানিয়েল বধ করেন—সে হলো মিশরের জ্যান্ত কুমীর দেবতাগুলির অন্যতম। ওয়েলশ্ দেশের 'Peredur' গল্পেও পাওয়া যায় 'addanc' ড্র্যাগনের নাম। অথচ এই 'addanc' শব্দটির তখনকার মানে কুমীর।

জাপানে ও চীনে নানান পার্বণে ড্র্যাগনের মিছিল বেরোয়। শত শত লোকজন বিরাট কাগজ বা কাপড়ের তৈরি ড্র্যাগন কাঁধে-মাথায় চাপিয়ে নেচে গেয়ে আমোদ করে। ফরাসী দেশেও 'প্রোভেন্স' অঞ্চলের 'তারাসকন্' শহরে এই ধরণের মিছিল বেরোয় আজও। এই ড্র্যাগনের নাম 'তারাসক'। একে বধ করেছিলেন সেণ্ট মার্থা।

● 'ড্র্যাগনের বছর' এটা। তাই পথে পথে উৎসব চলছে ড্র্যাগন নিয়ে। এ উৎসব অতি পুরনো।

## চীনে ড্র্যাগনের গল্প

ড্র্যাগনরা শিকারীদের দল মানুষকে রক্ষা করতেন অপদেবতা বা ড্র্যাগনদের হাত থেকে। অবশ্য সব ড্র্যাগনই যে খারাপ তা' নয়। চীনদেশের ড্র্যাগন সাধারণত ভাল। অবশ্য এঁদেরও তুষ্ট রাখতে হলে চাই অনেক উপহার ও পূজা। নবম শতাব্দীর সময়ে চীনেরা এঁকে ক'রে চাপিয়ে মিছিলে বেরোয়। আকাশে ড্র্যাগন ছাপ আঁকা ঘুড়ি ওড়ে॥

চৈনিক উপকথায় Hsia Dynasty (২২০৫—১৫৫৭ খ্রি. পূ.)তে ড্র্যাগনরা অচরাচর পূর্বপুরুষ পূজা ও মেয়েদের সন্তানসম্ভাবনার ব্যাপারেই ড্র্যাগন পূজার মেতে থাকত। সন্তান যদি না জন্মায় অমনি ড্র্যাগনকে পূজা দাও।

জনৈক রাজার কাছে তাঁর দুজন পূর্বপুরুষ এসে হাজির ড্র্যাগনের রূপ নিয়ে। তাঁদের কথামত সন্তান-বিহীন রাজা ওই ড্র্যাগন-যুগলের ঠোঁটের কোণের ফেনা আঙুল দিয়ে তুলে নিয়ে একটি কৌটোয় মধ্যে রেখে দিলেন, বহুদিন কেটে গেল এই ঘটনার পর। কত রাজা এলো কত রাজা গেল। সবাই নিঃসন্তান। অবশেষে Chou Dynasty-র দশম রাজার সময়ে (১১০০-২২১ খ্রি. পূ.) ঐ কৌটো হলো খোলা। সারা প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল সেই ড্র্যাগনের ঠোঁটের ফেনা॥ রাজা তখন তাঁর অসংখ্য রাণীদের উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন সারের পর সার। সেই ফেনা হঠাৎ কালো রঙের টিকটিকিতে পরিণত হ'য়ে ঢুকে পড়ল রাণীদের পেটের মধ্যে। প্রত্যেকটি রাণীই হলেন অন্তঃসত্ত্বা॥

বহুদিন আগেই জাপানী ও চীনেরা ড্র্যাগনকে পাঁচটা ভাগে বিভক্ত করেছে। নীল প্রাণ ড্র্যাগন—পূর্বাচারী সম্রাট লাল প্রাণ ড্র্যাগন—দারোগারী সম্রাট হলুদ প্রাণ ড্র্যাগন—প্রতিষ্ঠাচারী সম্রাট সাদা প্রাণ ড্র্যাগন—শিরমন্ত্র সম্রাট কালো প্রাণ ড্র্যাগন—কুহক-সাগরের সম্রাট॥

এই ড্র্যাগনের দল ক্ষতি করে না মানুষের। সাধারণত এরা যুগ যুগের ধনরত্ন আগলে থাকে। আমাদের যক্ষের ধনের যক্ষের মত। ড্র্যাগনের বছরে যাদের জন্ম তাদের ভাগ্য নাকি ভাল। জীবনের সিঁড়িতে অনেক দূর উঠতে পারে। ধনরত্ন প্রচুর পাবে। এত উঁচুতে উঠবে যে, তার চেয়ে উঁচু মানবজীবনে নাকি আর যেতে পারে না কেউ। তবে নীচের দিকে নামতেও দেরী হবে না তাদের, যদি না থাকে সাবধানে। অতএব ড্র্যাগন বছরে যাদের জন্ম—সাবধান।

## বলদ্বীপের পূর্বদিকে

ড্র্যাগন বছরের কথায় মনে পড়ে যায় কোমোদো দ্বীপের 'কোমোদো' ড্র্যাগনের কথা। লম্বায় নাকি দশফুট, আগুনের হল্কার মত জিভ বের করে বেরোয় তাদের চেরা জিভ। হেলেন আর ক্রাফ্ট প্রাইডার ন্যাশনাল জিও-গ্রাফিকের ১৯৬৩ সালের অগাষ্ট সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'ইস্ট ফ্রম বালী'। তারই খানিকটা তুলে দিচ্ছি এখানে।

ছয় কোটি বছর আগের ম্যামথ

গিরগিটি আর আজকের ড্র্যাগন গিরগিটির ( ভারানাস কোমোদো এনসিস ) মধ্যে বিশেষ তফাৎ দেখা যায় না। ফ্লোরেস আর কোমোদো দ্বীপের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এদের বাস। এদের ঐতিহাসিক বয়সের তুলনায় এই দ্বীপগুলির বয়স নেহাৎ কম। এই গিরগিটিদের এক একটার ওজন প্রায় দেড়শ' কিলোগ্রাম। দশফুট লম্বা। মাংসাশী। রাত্রে বেরোয় না। শুধু দিনে বেরোয় মাংসের সন্ধানে। অত্যন্ত দ্রুতগতি এদের। দৃষ্টি প্রখর ও অনেক দূর থেকে মাংসের আঘ্রাণ পেতে ওস্তাদ। পৃথিবীতে এদের মত তেজীয়ান ধুরন্ধর গিরগিটি আর নেই। লম্বা চেরা জিভের রং হলুদ-কমলা রংয়ের। এদের দেখেই হয়তো চীনেরা তাদের ড্র্যাগনের জিভে আগুন আছে বলে মনে করে।

'আমাদের ড্র্যাগন দেখার বেজায় ইচ্ছা দেখে গ্রামের সর্দার বল্লে, আটজন গাইডের প্রয়োজন হবে আমাদের। ড্র্যাগন গিরগিটির দল থাকে এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। দুটো নৌকোরও প্রয়োজন। ঐ গ্রাম থেকেই ভাড়া করা যাবে।

'আমরা একটা নৌকো আর চারজন গাইড ভাড়া করতে রাজী হলুম শেষ পর্যন্ত।

'পরের দিন সকালে আমরা কোমোদো দ্বীপের দিকে পাড়ি জমালুম। যতই এগোই ততই মনে হয় এই ধরণের জায়গায় মানুষের চেয়ে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর বাসই স্বাভাবিক। এবড়ো-খেবড়ো প্রবালের মধ্যে নানা রংয়ের শামুক গেঁথে বসেছে। দূরের করাতমাথা পাহাড়গুলোকে আদিম যুগের ম্যামথ-গুলোর কাঁটাওয়ালা পিঠের মত দেখাচ্ছে।'

'ঘন কালো মাটির তীরে যখন পৌঁছান গেল, তখন মাথায় প্রায় ফাটল ধরে এসেছে সূর্যের প্রখর তাপে। সামনেই দেখা গেল সরু পাকদণ্ডী। তারপরেই ঘন বনের সুরু। পাঁচফুট লম্বা 'আলাং আলাং' ঘাসের খসখস শব্দ। আমরা এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে দু'একটা বুনো শুয়োর এদিকে-সেদিকে ছুটে চলেছে আমাদের পদশব্দে বিব্রত হয়ে। হঠাৎ চমকে দিচ্ছে আমাদের হলদে ঝুঁটিমাথাওয়ালা কাকাতুয়ার ডাক।

'যখন আমরা থামলুম তখন প্রায় দুপুর হ'য়ে এসেছে। দারুণ গরম। ঘামে গা সপসপ করছে। আমাদের লীডার সুলেমান আঙুল দিয়ে দেখালে আমাদের একটা শুকনো ডোবার মত জায়গা। ছোটবড় শুকনো কাঠকাঠরায় ঢাকা সেই ডোবাটা। বল্লে, এখানে গিরগিটিরা আসে মাংসের খোঁজে। দলের গাইডদের অর্ডার করলে বড় একটা মাংসের খণ্ড ঐ ডোবার পাশে একটা গাছে টাঙিয়ে দিতে। মাংসের টুকরো ঝুলতে লাগল জমি থেকে বেশ কয়েক ফুট উঁচুতে।

'বিরাট এক হাই তুলে সুলেমান বলে, এবার শুধু অপেক্ষা। বলেই মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ড্র্যাগনের ভয় নেই লোকটার। কি আশ্চর্য। হেলেন ও আমি দুজনে ভয়ে ভয়ে এদিক-সেদিক দেখছি। ঘণ্টাখানেক পরে আমাদেরও ঘুম এসে গেল প্রায়। ঝুলন্ত মাংসখণ্ডটার বোঁটকা গন্ধই বোধহয় আমাদের জাগিয়ে রেখেছে। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ মাছির দল এসে মাংসখণ্ডটার ওপর ছেয়ে বসেছে। দুর্গন্ধটা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। এই দ্বীপের দু'শ' বর্গমাইলের যে কোন স্থান থেকে ড্র্যাগন গিরগিটিকে টেনে আনার পক্ষে সত্যিই যথেষ্ট।

'দুপুরের পর সত্যিই মনে হলো যে, এই কোমোদো ড্র্যাগনও বোধহয় পুরাণের পাতার রাজ্যের জীব। চীনের পবিত্র ড্র্যাগনেরই মত এরাও বোধহয় অস্তিত্ববিহীন।

'বেলা তিনটের সময় পাহাড়ের নালার মধ্যে থেকে ঝরাপাতার খসখসে শব্দে আমরা আবার সতর্ক হয়ে উঠলুম। ছায়ার দিকে চেয়ে চোখ মেলে দেখতেই দেখা গেল পাইথনের মত মাথাওয়ালা একটা জীব ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে। কমলা রংয়ের জিভটা লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘন ঘন। ফুঁসফুস শব্দে হাওয়ায় কি যেন শুঁকছে।

'ধীরে ধীরে ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে এলো গিরগিটিটা। তার বেঁটে মোটা পাগুলোর ওপর ভর করে। জমি থেকে তার দেহ প্রায় আধ ফুট উঁচু। মাংসের টুকরোটার নীচে এসে সাপের মত মাথাটা দুলিয়ে শরীর খাড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাংসখণ্ডের দিকে। শরীরটা পাঁচ ফুট লম্বা। মাংসটা ছুঁতে না পেরে যেন একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেছে ড্র্যাগনটা। দেখতে সত্যিই ভয়াবহ। তবে আমরা যে ডাইনসোর জাতীয় কিছু একটা দেখব বলে আশা করেছিলুম—তার তুলনায় তেমন ভয়াবহ নয় এই ড্র্যাগন গিরগিটি।

'পরের দিন সকালে আমরা আরো একটা নৌকো ও চারজন গাইড—সব মিলিয়ে আটজন গাইড আর দুটি নৌকো নিয়ে পাড়ি জমালুম ঐ ছোট্ট দ্বীপের দিকে। আমাদের ড্র্যাগন-শিকারী দল ভারি হওয়াতে গ্রামসর্দার বেজায় খুশি।

'ইতিমধ্যে দুটি বিরাট গিরগিটির আগমন হয়েছে। মাংসর দুর্গন্ধটা আরও যেন তীব্র হয়ে উঠেছে। গিরগিটি দুটো লাফাচ্ছে ঘন ঘন। আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলুম। ভাল করে দেখার জন্য। ড্র্যাগন দুটো আমাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না।

'সুলেমানকে ইঙ্গিত করতেই সে মাংসর টুকরোটাকে দড়ি টেনে একটু নামালে। এক পলকে উবে গেল ঐ বিরাট নারকেলের মত বড় একটা মাংসখণ্ড। গিলে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে। বোঝা গেল যে সত্যিই এরা হরিণ, ছাগল, শুয়োর ইত্যাদি হাড়গোড় শুদ্ধ

লব খেয়ে ফেলতে পারে অতি কম সময়ে।

'সর্দার আমাদের বলে, এগুলোর চেয়ে আরো অনেক বড় ড্র্যাগন দেখাতে পারে আমাদের। তবে আরো কিছু-দিন অপেক্ষা করতে হবে সে জন্য। দেখা যাবে ওদের মধ্যে জন্তু শিকার এবং ড্র্যাগন যুদ্ধ।

'এদিকে মনসুন আসতে দেরী নেই। প্রতিদিনই হাওয়ার গতি বদলাচ্ছে। সাইক্লোন আসতে পারে কিছুপরেই। বিকেলের দিকে আকাশের রং ঘন কালো। সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠছে প্রতিদিন। আমাদের গন্তব্যস্থান টীমর—পাঁচশ' মাইল দূরে। এ স্থান ছেড়ে যেতেই হবে আমাদের। ড্র্যাগনগুলোকে আরো ভালভাবে Study না করায় বেশ মন খারাপ। অথচ থাকাও চলে না আর এখানে। আমরা পুবের বড় একটা দ্বীপ ফ্লোরেস—সেখানে যাবার তোড়জোড় করতে ব্যস্ত হলুম।'

একদিকে ড্র্যাগন আনে ভয়াবহ ভয়ঙ্কর ঘটনা, আবার অন্যদিকে আনে আনন্দ ও শান্তি। আবার ড্র্যাগন হলো শক্তি আর দ্রুতগতির Symbol, সারা পৃথিবীতে আজ এই ভয়ঙ্কর আনন্দ শান্তি শক্তি ইত্যাদির যেন একটা বিরাট কমপিটিশন চলেছে। এই ড্র্যাগনের বছরটায় একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে কি? অনেকের মতে এ বছরটা হলো Crucial। দেখা যাক কি হয়। জাপানীরা ভয়ঙ্করী গৃহস্বামিনীদেরও ড্র্যাগন (বীউ) বলে ডাকে ঠাট্টার ছলে—এই ড্র্যাগনের অবশ্য অভাব নেই কোন দেশে। নয় কি?

# দৈবের আসন থেকে

**আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন**

পরিমিত ঊর্ধ্বে একা অধিষ্ঠিত তুমি; তুমি এক
গীর্জার নিঃসঙ্গ চূড়া মৌন শূন্যে; আরও ঊর্ধ্বলোকে
আরোহণ সাধ্যাতীত, নেমে আসা নিম্নেও কঠিন।
কালের দাক্ষিণ্যভারে জীর্ণ গীর্জা যদি কোনোদিন
শিথিল বাহুর বৃন্তে দুর্বিষহ ভেবে
অর্ঘ্য দেয় নগ্ন বুকে কারণিক ক্ষত্রিয় দিনের,
তাহলে প্রচণ্ডবেগে অধোযাত্রা হয়তো তোমার
সেদিনই সম্ভব শুধু; কিন্তু লাভ নেই,
কেন না সেদিন তুমি অনস্তিত্ব প্রস্থানের দ্বারে
অতি দীন নৈবেদ্য কেবল।
অবশ্যই বলতে পার
সে-অন্তিম সত্য হোক; নিদারুণ স্থিতির করাত
ধীরে কাটে তীব্রতর; দৈবের আসনে
অস্থির মৃত্যুর মতো তুমি আজ বৃথা অলৌকিক।

আশেপাশে কত লীলা, ফুলভারে আনত বকুল;
আশ্বিনে মালিনী হাওয়া সারারাত মৃদু পদক্ষেপে
ফুল তোলে, ফুলশয্যা পাতে ছায়াতলে;
আবার সে নিয়মিত শয্যা তোলে
ফিরে গেলে প্রিয় অন্ধকার।
এবং অনতিদূরে শুক্রাচার্য বনস্পতি
অমৃতের প্রথম ঈশ্বর;
নীলাকাশ ছত্র তার আজানুবাহু অনন্ত সমর।
অখ্যাতির বৃহস্পতি-পুত্রকুল তার পাদদেশে
কুটিল তপস্যা-দানে জয় করে সুন্দরের বাণী।
অননুমোদন শুধু সব তীর্থে তোমার তরেই।

ধারনারী কৃষ্ণচূড়া,
সে'ও দূরে নগ্নতনু মধ্যাহ্নের নাচের আসরে।
পাশে তার অষ্টাদশী নদী
বুকের আঁচল খুলে চিত্রার্পিতা; দৈনন্দিনী বেশ
বীতংসের কান্তি নিয়ে বুকে তার প্রতিবিম্ব রাখে;
এবং নির্লজ্জ গানে অস্বীকৃত বিহঙ্গকুমার
সে-নদীর নির্বোধের করুণ উচ্ছ্বাসে
প্রত্যহ প্রস্তাব আনে। তুমি শুধু দৈবের পাখী
কিংবা ব্যর্থ অলঙ্কার অগতি শূন্যের;
নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে অচৈতন্য ইচ্ছার গোধূলি,
তবুও কি মুক্তি আছে সে-দৃশ্যের শরাঘাত থেকে?

প্রত্যহ তোমারই কণ্ঠে যন্ত্রণার আঘাতে আঘাতে
প্রার্থনার ঘণ্টা বাজে—যা তোমার বিশাল ক্রন্দন।
অথচ তা শ্রবণেই অভিজাত পাপের পূজারী
সহজে উদ্ধার করে ক্রুশবিদ্ধ শুভ্র আশীর্বাদ।
কিন্তু তুমি? তোমার হিসেব নেই; ঈশ্বরের খাতা
বালখিল্য বল্মীক-বিহার; তুমি তাই
ডাকলেও পিছিয়ে যাবে কাপুরুষ দেউলে বিধাতা॥

গল্প-গুজব থামিয়ে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ছেলেরা। রাধা গোলাস পেয়ে ওই বাড়িতেই আছে। তার বাবা খাসপুরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, যায় নি সে। তাদের পাড়ার এক বুড়িকে ডেকে এনে তার বাড়ির বারান্দায় শুইয়ে রেখেছিল। পুলিশেরও লক্ষ্য ছিল বাড়িটার ওপরে। এই বাড়ির দিকে কে যাচ্ছে—কে যেতে পারে?

সেই ছায়ামূর্তি চলেছে দ্রুত পায়ে। চারিদিকের মাঠে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অন্ধকারটা বেশ ফিকে ফিকে। আকাশে ঝক ঝক করছে তারা। তারার আলোতেই অন্ধকারটা পাতলা মনে হচ্ছে। কিন্তু সে আলোতেও তাকে তারা চিনতে পারল না। আবার খুব বেশি কাছে কাছেও যেতে পারছে না। যদি সে দেখে ফেলে। ওরা আল ছেড়ে দিল। মাঠের ওপর দিয়ে আলের পাশে পাশে গুঁড়ি মেরে ওরা এগোতে লাগল।

ওদের বুকের ভেতরটা চিপ চিপ করছে। যে কোন মুহূর্তে তাদের দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা আরও একটা মুস্কিলে পড়ল। হঠাৎ সেই রহস্যজনক মূর্তিটা যেন চারুর বাড়ির পাশের লাটা-ঝোপের জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে গেল।

তাহলে কি ঝোপের ভেতরে বসে পড়েছে? ছেলেরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। হঠাৎ তারা চমকে উঠল। রাধার ঘরের ভেতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—

—না—না আমি যাবো না যাও—

—চলো না! চলো—চলো। আরে ওসব কোন ঝামেলা তো আর নেই। বাবু,—

—তুমি বেরিয়ে যাবে কি না—চীৎকারটা মুহূর্তে কান্নার ভেতরে ডুবে গেল। সে কি বুকফাটা কান্না। মনে হল ওর কান্নার ভেতরে বহুদিনের কোন ব্যথা লুকানো আছে।

—সড়—সড়-সড়াৎ—লাটা-ঝোপের ভেতরে অদ্ভুত একটা শব্দ শোনা গেল। সেই ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ ভুস করে অন্ধকারের সমুদ্র থেকে ডুব দিয়ে উঠল।

—কে—কে—তুমি?

—ধর—ধর রে—

—নিশ্চয়ই ডাকাতদের স্পাই রে।

ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর আর আটটা আট-ব্যাটারির টর্চের আলো রাইফেলের গুলীর মত আছড়ে পড়ল তার মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা—

হ্যাঁ। ছেলেরা, বুঝলে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। আত্রাই নদীটা যদি হঠাৎ শুকিয়ে যেতে দেখতো তাহলেও বোধ করি, অতটা অবাক হতো না তারা। লোকটি নিরঞ্জন সরকার নয়, শিবু নয়, কি আর কেউ নয়। একেবারে স্বয়ং—

—গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সেই ভাগবত-পাঠক।

কিন্তু আশ্চর্য! রহস্যের পর রহস্য। ডিফেন্স পার্টির ছেলেদের বুকগুলো ভেঙে যে পড়ে নি, সেটাই আশ্চর্য! গোপীনাথ মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, চুপ!—একেবারে কেউ কথা বলো না একটা—বলেই ছেঁড়া নোংরা জামাটার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখালো। টর্চের আলোয় লেখাটা জ্বল জ্বল করে উঠল, অরবিন্দ বোস। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। এ্যাডভাইসার টু দি ইণ্টেলিজেন্স ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা পুলিশ।

রোমাঞ্চকর
মামলার কাহিনী
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

# পৃথ্বমালিনী কথা...

সুভাষ সমাজদার

—তোমরা শীগগির দু'জন বাড়ির পেছনে যাও তো,— মিঃ বোস হুকুম দিলেন। কিন্তু তাঁর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে মানকচু আর আনারসের জঙ্গল ভেঙে যেন কেউ ছুটে চলে যাচ্ছে।

—ধরো—ধরো ওকে, চীৎকার করে উঠলেন মিঃ বোস।

কিন্তু অন্ধকারে যেন ছায়াটা পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝোপঝাড়, পুকুর, গাছের ডালপালা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে দেখা হলো—কোথাও পাওয়া গেল না। চিনতেও পারা গেল না তাকে।

মিঃ বোস বললেন, তোমরা যে-কোন একজন ভেতরে এস—

নিশিকে নিয়ে ভেতরে এলেন মিঃ বোস রাধা—রাধা—দরজা খোলো—

মিঃ বোস পিছনে থাকলেন। ছেলেদের শিখিয়ে দিলেন ক্রশ করতে।

—তোমার এখানে কে এসেছিল?

—কি করে বলবো ভাই নিশি। আমি রাতে বাড়িতে একেবারে একা আছি। তোমাদের গাঁয়ে কেউ কি ঘুমিয়েছে? হাসল। একটু থেমে আবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মনের দুঃখে আছি, আমার শরীরও ভাল নয়—আমাকে আর বিরক্ত করো না ভাই—

—কে এসেছিল?

কেরোসিনের ডিবের আলোয় তার সেই মুখের চেহারাটা আমি ভুলতে পারবো না শঙ্কর। মুহূর্তের জন্য একটা ছুরি যেন ঝিকিয়ে উঠল তার চোখে। কঠিন হয়ে বলল, মাতাল। মদ খেয়ে কে মাতলামো করতে এসেছিল, কেমন করে বুঝবো এই অন্ধকারে!—

ছেলেরা বেরিয়ে এল। মিঃ বোস নিঃশব্দে হাসলেন। ছেলেরা ভয়ে তার সঙ্গে একটা কথা বলছে না। পাড়াগাঁর মুখ্যু-সুখ্যু ছেলে। আর তিনি কতবড় লোক। তবুও তার ভেতরেই যা হোক, নিশির একটু সাহস-টাহস আছে। সে বালুরঘাটে কিছুদিন স্পেশাল পুলিশ কনষ্টেবল হয়ে কাজ করেছিল। সে বলল,—স্যার—আপনি কতদিন আগে আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেন?

—দিন পনের হলো। ভাগবতের আসরই তো বসালাম দু'দিন। সেই সময় প্রত্যেক বাড়ির আনাচে-কানাচে ওয়াচার বসিয়েছি। কিন্তু—

থেমে গেলেন অরবিন্দ বোস। আর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। হয়তো তাই ভাবলেন।

মিঃ বোস রিপোর্ট দিয়ে গেলেন ডি-এস-পি মিঃ চ্যাটার্জীর কাছে। রিপোর্ট পড়ে মিঃ চ্যাটার্জী বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে কেমন করে তিনি কি করবেন। কিন্তু—

মণীন্দ্রবাবু কথা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বরটা নামিয়ে আমাকে আবার বললেন, সাবধান, তুমি কিন্তু কাউকে বলো না।

আমি আবার তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। তিনি বলতে সুরু করলেন শোন, অরবিন্দ বোস ভাগবত-পাঠকের ছদ্মবেশে গোপনে তদন্ত করে যাওয়ার পরে যেমন চাঞ্চল্য এসেছিল, তেমনি একটা আশঙ্কার ছায়া নেমেছিল সারা বিলপাড়া গ্রামে।

বোস সাহেব কি রিপোর্ট দিয়ে গেছেন, তা কেউ জানে না। কে যে কোন দিক দিয়ে জড়িয়ে রয়েছে—তা কেউ বলতে পারে না। সকলেরই বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

আরও একটা ব্যাপারে সবাই খুব অবাক হলো।

নিরঞ্জন সরকার আর ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকসানে ষ্ট্যাণ্ড করলেন না। বললেন, এক নাগাড়ে বিশ বছর ধরে প্রেসিডেণ্টগিরি করছি। আর বেশিদিন থাকা ভাল দেখায় না—

—কিন্তু সরকার মশাই, জন-সাধারণ যে আপনাকে এখনও চায়, বিলপাড়া স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার প্রবোধ বলল।

—না প্রবোধ। আমি চাই আমার বদলে নিউ ব্লাড আসুক—আর—

চুপ করে যান বিলপাড়ার জন-নেতা বৃদ্ধ নিরঞ্জন সরকার। বললেন, সব সময় পাবলিকের কাজে ছুটোছুটি করা, তাদের কমপ্লেন শোনা, আর এই বয়সে পেরে উঠি নে। এত-খানি বয়স হলো একদিনও ঠাকুর ঘরে বসতে পারি নে—একটি মুহূর্তের জন্যও ঠাকুরের নাম নিতে পারি নে— বলতে বলতে গলাটা কেমন ধরে এল তাঁর।

মানুষটাই আমূল পাল্টে গেলেন। শুধু প্রেসিডেণ্টগিরিই ছাড়লেন যে তা নয়, বাইরের সব কাজ থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিলেন। মেতে উঠলেন পূজা-অর্চনা আর সমাজ-সেবা নিয়ে।

পিতৃপিতামহের আমলের বিগ্রহ এতদিন অযত্নে আর অবহেলায় পড়েছিল, তার জন্য খামারবাড়িতে নতুন ঘর করে দিলেন। বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাতদিন সাতরাত ধরে চলল মঙ্গলচণ্ডীর গান। তারপর একদিন হাটখোলায় একটা মিটিং ডাকলেন। জনসভা। বললেন, আমি গ্রামে একটি কুটিরশিল্প গড়ে তুলতে চাই—কুটিরশিল্প মানে আর কিছু নয়, খানকয়েক তাঁত কিনে দেবো, আর কয়েকটা চরকা থাকবে। গ্রামের দুঃস্থা অনাথা মেয়েরা সেগুলো চালাবে। আমার বাগানবাড়ির উত্তর ভিটের ঘরটা ছেড়ে দেবো ভেবে রেখেছি।

সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল। লোকের মুখে মুখে তাঁর কি অজস্র প্রশংসা। এমন মানুষ হয় না।

যে কথা সেই কাজ। উত্তর ঘরের সামনে সবুজ জমিতে সাইনবোর্ড টাঙানো হলো—বিলপাড়া কুটিরশিল্প—

পুলিশ লক্ষ্য করেছিল, কোন্ কোন্ [illegible] সরকার মশাই তাঁর পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ঘোষপাড়ার ধনকুমারের বিধবা বৌ পাঁচী।

পশ্চিমপাড়ার ক্ষিতীশের বোনটা যাকে স্বামীতে নেয় না, নামটা—মনে নেই—

আরও জনছয়েক আছে। কিন্তু রাধা নেই। সব চেয়ে আশ্চর্য। রাধা নিজেই এসেছিল। গায়ে পড়ে বলেছিল সরকার মশাইকে। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন—

—তোমাকে নিতে পারলে খুবই ভাল হতো রাধা, মাথা নীচু করে বললেন সরকার মশাই। বললেন খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু পাঁচজন পাঁচ কথা বলবে যে—

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলে গেল রাধা। এই ঘটনায় সরকার মশাইয়ের নাম আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ল। যাক্ তার কথা—

ইতিমধ্যে আবার একটা ব্যাপার ঘটল। হারু ঘোষালের বৌ এসে স্মরণ করিয়ে দিল তার সেই অনুরোধের কথা।

হারুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। ওকেও শীগ্‌গির ছেড়ে দেওয়া হবে। বালুরঘাটের সদর থানায় খবর দিলাম—হারু ঘোষাল রিলিজ হওয়া মাত্র যেন আমার সঙ্গে দেখা করে—

ঘোষাল এল। সোজাসুজি সদর থেকে এসে হাজির হলো আমার চেম্বারে। সত্যিই অধিকারী অধিকারী চেহারা। গলায় তিন থাক তুলসী কাঠের মালা। ঘাড় পর্যন্ত বড় বড় চুল। বেশ তেল চকচকে আর যত্ন করে আঁচড়ানো।

—আপনাকে একটু প্রয়োজন—

—হেঁ-হেঁ-হেঁ—অধীনের ওপর আজ্ঞা করুন—আপনাদের প্রয়োজনেই তো কিছুদিন হাজতে বাস করে এলাম। আবার হাসল হারু ঘোষাল। পান খাওয়া দাঁতগুলো একটা কালো রেখার মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। হাত দুটো জোড় করেই রইল। আর মোটা মোটা বেগুনী ঠোঁটে সেই বিগলিত হাসি লেগেই থাকে।

—আচ্ছা ঘোষাল মশাই, আপনার কি মনে হয়?

—কিসের হুজুর?

—এই চারুর খুনের ব্যাপারটা।

হঠাৎ ঘোষালের মুখখানা কালো হয়ে গেল। চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল,

—হরি! হরি!—হরি বলো-হে—

—কোন ভয় নেই আপনার?

—ভয়! আপনি থাকতে ভয় করবো কেন স্যার? আবার হাসল অধিকারী ঘোষাল মশাই—তবে শুনুন বলি, শাস্ত্রে একটা কথা আছে, জনপদবধূ। আমাদের চারুর বৌ ছিল সেইরকম। এই ধরণের মেয়েলোকের স্বামী যে, তাকে দুর্ভোগ ভুগতে হয় অনেক। মানে—

থামল ঘোষাল। চোখ বন্ধ করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বলল, স্যার যদি মনে কিছু না করেন, তাহলে একটা উপমা দেব?

—খুব উঁচু খাড়া পাহাড়। তার মাথায় মেঘ-রোদের লীলে চলছে হুজুর। কখনো ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে বৃষ্টি—কখনো কালো কালো চাপ চাপ মেঘ একেবারে ঢেকে দিচ্ছে পাহাড়টাকে। আর সেই উঁচু খাড়া পাহাড়ের নীচে—অনেক নীচে একটা আলো জ্বলছে দপ্ দপ করে। আলো দেখে অনেক কীটপতঙ্গরা উড়ে উড়ে আসছে। পাহাড় কিন্তু জানে না তার পায়ের নীচে অন্ধকারে চলেছে আদিম জীবলীলা। মানে কাঁচা মাংসের জন্য ছোঁক ছোঁক, কামড়াকামড়ি—

—আপনিও কি একজন সেই আলো দেখে ছুটে যাওয়া পতঙ্গ?

—ছিঃ ছিঃ, জিভ কামড়ালো অধিকারী। খসখসে কালো (পানের রসে রসে স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে ফেলেছে) জিভের ডগাটা পোকার মত একবার গর্ভের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েই আবার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

—আমার স্ত্রী পরম গুণবতী সুন্দরী, স্যার। আমি কেন যাবো তার কাছে। তবে—

—আপনার স্ত্রী এসেছিলেন ঘোষাল মশাই—

—এঁ্যা! মুহূর্তে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তার। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, হরি—হরি-হরি বলো! সত্যি সত্যি বলছেন স্যার, রেণু এসেছিল—এসেছিল রেণু?

—হ্যাঁ ঘোষাল মশাই, আমি চারিদিক তাকিয়ে নীচু গলায় বললাম, অনেক কাঁদলো—অনেক কথা বলল ঘোষাল মশাই। সত্যি কথা বলুন তো, —রাধার ওপরে আপনারও কি একটু—

—হরি বলো—হরি বলো—ছিঃ ছিঃ! কি বলেন স্যার। রেণু বলেছে এ সব। বুঝেছি স্যার—সব বুঝতে পেরেছি, গম্ভীর হয়ে গেল ঘোষাল। চোখ দুটো কেমন ছল ছল করে উঠল। মাথা নীচু করে বলল, স্যার চারুকে খুন করেছি আমি—আমি—আমাকে আপনি আবার এখুনি—এখুনি হাজতে পুরুন

(ক্রমশ)

ছাত্রদের অপরিহার্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
—ইহাতে আছে—
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "পালামৌ সমালোচনা" এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ক্রতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# পাড়া কাহিনী

নীলা মজুমদার

প্রায় বছর কুড়ি পশ্চিমে থাকার পর অতুল পিসেমশাই হঠাৎ কলকাতায় বদলি হয়েই যখন শহরের দক্ষিণ দিকের ছিমছাম এক রাস্তায়, সুশ্রী এক বাড়িতে এসে উঠলেন, আত্মীয়-স্বজনরা একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। প্রিয়জনরা সৌভাগ্যলাভ করলে যেমন হয়ে থাকে, নানাজনে নানান কথা বলতেও ছাড়লেন না। তার অর্ধেকও যদি আন্নাপিসির কানে উঠত তিনিও ছেড়ে কথা কইতেন না। সে যাই হ'ক, কতকটা পুরণো স্নেহের সম্পর্কের কথা মনে করে, কতকটা স্রেফ কৌতূহল চাপতে না পেরে, একদিন সকালে উঠলাম গিয়ে সেখানে।

বাস্তবিক খাসা বাড়িখানি। ছোটখাটো কিন্তু ভারি দেখতে ভালো, তার উপরে গুছোনোও বটে। নজর করে দেখে মনে হল, আগে হয়তো আশেপাশের অন্য পাঁচটা বাড়ি থেকে বিশেষ তফাৎ ছিল না ; তারপরে কোনো এক সময়ে কেউ এই বাড়িটিকে যত্ন করে সাজিয়েছিল। সামনের রকটি আগাগোড়া জাল দিয়ে মোড়া ; জাল বেয়ে একটি লতানে গোলাপ উঠেছে। তাতে থোপা থোপা সাদা ফুল ফুটেছে, তারি গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে।

জালের মাঝখানের ছোট্ট লাল ফ্রেমের লোহার দরজাটি ঠেলা দিতেই তেল মাখানো কবজার ওপরে চাপ পড়ে নিঃশব্দে খুলে গেল। আমি ঢুকতেই আবার ছোট চাকার কলের উপর তেমনি নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। খুশি না হয়ে পারলাম না ; সত্যি কথা বলতে কি, খুশির সঙ্গে একটু হিংসাও হল, কারণ আন্নাপিসির কপালযশের আধখানি পেলেও আমি বর্তে যেতাম।

দরজার সামনেই ছোট হলঘরের ধারে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, তার সাদা লাল রেলিং ফুটফুট করছে। হলঘরের দেয়ালে হাতে আঁকা নানান রঙের জন্তু-জানোয়ারের ছবি। ইতস্তত করছি, তারি মধ্যে ডান পাশের বসবার ঘর থেকে আন্নাপিসির গলার স্বর শুনে, আগে সেই দিকেই গেলাম।

বেশ বড় ঘর, ফিকে গোলাপি নেটের পর্দা লাগানো বড় বড় দুটি জানলায় এক দিকের দেয়াল প্রায় ভরে থাকাতে যেন আরো বড় দেখাচ্ছে। তখনো বাতাসে শীতের আমেজ লেগেছিল, ঘরময় সকালবেলার মিষ্টি রোদ, দেয়াল জোড়া কাচের আলমারীর লাল নীল দরজা, তার নিচে সারি সারি হাঙ্গর তিমি শুশুক মাছের ছবি আঁকা, নেপথ্যে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম কলকল হাসি, খুটখুট ছোট ছোট পায়ে হাঁটার শব্দ।

নীল রঙের স্টীলের চেয়ার থেকে আমার আন্নাপিসি উঠে এসে আমার গালে চুমু খেয়ে বললেন, অবাক হবার কিছু নেই, এ সব আমার কীর্তি নয়।

বাস্তবিক আন্নাপিসি এতটুকু বদলান নি, সেই টেনে চুল বাঁধা, গলাবন্ধ কনুই-হাতা সাদা জামা গায়, পরণে সেই চেনা পাড়ের ধনেখালি কাপড়, পায়ে সাধারণ চটি, এ ঘরের সঙ্গে এতটুকু খাপ খাচ্ছেন না। আশ্চর্য হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, ঘরে যে আরেকজন গিন্নি-বান্নি মহিলা বসে আছেন, এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল।

আন্নাপিসি বললেন, ইনি উকিল বাবুর বৌদি, আমরা কেমন গুছিয়ে বসেছি দেখতে এসেছেন। এ আমার ভাইঝি, দিদি।

ভদ্রমহিলা ফিক করে একটু হেসে ফেলে বললেন—তা বলতে পারো ভাই, খানিকটা তোমরা কেমন গোছগাছ করলে দেখতে এসেছি, খানিকটা এত কাণ্ডের পর, জায়গাটাকে কেমন দেখতে লাগছে তাই দেখতে এসেছি।

শুনে আমি চেয়ার থেকে দু'হাত লাফিয়ে উঠে বললাম—এঁ্যা ! ভূতের বাড়ি নয় তো ?

উকিলবাবুর বৌদি স্টীলের ঝুড়ির মতো চেয়ারটিতে অনেক কসরত করে পা তুলে বসে বললেন—আরে না, না, সেরকম কিছুই নয়, তবে যে বাড়ির সাজগোজে মেমের হাত পড়েছিল, সেখানে এঁরা কেমন গুছিয়ে বসলেন সেটা দেখতে চাওয়াটা কি

খুব অস্বাভাবিক? পনেব বছব এ পাড়ায় বাস করি ভাই, একরকম বলতে গেলে আমাদের পায়ের তলা দিয়েই এ রাস্তা তৈরি হল। এখানকার প্রত্যেকটি বাড়ির প্রত্যেকটি গলিঘুঁজি আমার জানা, প্রত্যেকটি লোক আমার হাড়ে হাড়ে চেনা। তবে এমন কেলেঙ্কারি কাণ্ড আমার বাপের কালেও দেখি নি, এ আমি একশোবার বলব।

এই বলে উকীলবাবুর বৌদি চুপ করলেন, ইচ্ছেটা যে আমরা তাঁকে প্রশ্ন করি। করলামও তাই। রহস্যের গন্ধ পেয়েছি, না করেই বা উপায় কি। বললাম—কি ব্যাপার বলুন তো?

তিনি বললেন—আগে সমস্ত বাড়িটি দেখে এসো তো, আর পাঁচটা বাঙালী বাড়ির সঙ্গে কোথাও মিল পাও কি না বল।

আন্নাপিসি আর আমি সত্যিই উঠে পড়লাম, ভদ্রমহিলাও উঠে সঙ্গ নিলেন। সত্যিই বাড়িটা ভারি আশ্চর্য, দোতলার হলে ছাদ থেকে পেতলের আঁকড়া ঝুলছে। উকিলবাবুর বৌদি বললেন—আরো সুন্দর ছিল, কোনোটা থেকে পাখির খাঁচা, কোনোটা থেকে ফুলের টব, কোনোটা থেকে দড়ির দোলনা ঝুলত। ঐ তাকের ওপরে সারাদিন কলের বাজনায় নাচের সুর বাজত।

বললাম—গ্রামোফোন না রেডিও।

গ্রামোফোনও নয়, রেডিও-ও নয়, টেপ-রেকর্ড। নইলে আর কি বলছি। ওরকম তো পাঁচ জায়গায় বাজে। এখানে গানের সঙ্গে নাচ হত, বাজনার সঙ্গে ড্রিল হত। কত বড় হল দেখেছ, পুবের ঘরের দেয়াল ভেঙে দিয়ে এত বড় ঘর হয়েছে। আমি অবাক হয়ে পশ্চিমের ঘরটিতে ঢুকতে যাচ্ছি, ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—ওটা মিসেস বনামির ঘর ছিল, ওখানে কিচ্ছু নেই।

বাস্তবিক এ ঘরটি একেবারে সাধারণ দেখতে। দুটি নেয়ারের খাটে পিসিদের বিছানা পাতা, আলমারি, ট্রাঙ্ক। সঙ্গে লাগা ছোট একটি স্নানের ঘর। পশ্চিমের সরু বারান্দাটি জালে ঘেরা, দেয়ালে কয়েকটি কাঠের তাক। উকিলবাবুর বৌদি বললেন—ওখানে মিসেস বনামির আয়া রাঁধত। নিচের রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের মাঝখানকার দেয়াল ভেঙে টিফিনঘর হয়েছিল কি না আর উঠোনে সারি সারি কলঘর। এক কোণে এক ফুট উঁচু পাঁচিল ঘেরা বালির গাদা।

ভারি বিস্মিত হয়ে জানলা দিয়ে নিচে তাকালাম। উঠোনের আর কিছু বাকি নেই, এক দিকে এক সারিতে গোটা তিনেক কলঘর, অন্য ধারে সারি সারি খাঁচা। ভদ্রমহিলা বললেন, ওতে খরগোস, সারস, বেজি, গিনিপিগ এইসব থাকত।

এতক্ষণে চোখে আলো দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,

মিসেস বনামি বাচ্চাদের স্কুল খুলেছিলেন বুঝি? তাই বলুন, এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

উকিলবাবুর বৌদি বিরক্ত হয়ে বললেন, ছাই বুঝেছ। আমরাও গোড়ায় তাই ভেবেছিলাম। আর বাবুদের উৎসাহ দেখে কে। এবার পাড়ার মধ্যে এসে মেম বাস করবে। গিন্নিরা তাহলে কিছু শিখবে, অন্তত ভেতো ভাবটি ছেড়ে একটু করিৎকর্মা হবে। বুঝলে মা, দু'বেলা হেসেল ঠেলে পাঁচজন অবুঝ ব্যাটা ছেলে আর সাতজন বেয়াড়া ছোট ছেলের মন জুগিয়ে অষ্ট প্রহর চলাটা ওঁদের কাছে করিৎকর্মার লক্ষণ নয়, আমাদের শিখতে হবে ঐ মেমের কাছে।

বুঝতেই পাচ্ছ, তাকে তখনো কেউ চোখে দেখে নি, বাড়িতে মিস্ত্রী খাটছে, দেয়াল ভাঙছে, রঙ মাখাচ্ছে, নানান আসবাব এসে পৌঁছুচ্ছে, এদিকে পাড়ার যত গিন্নি সবাই মেমের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা ট্যাক্সি চেপে কুকুর, বেড়াল, কাকাতুয়া নিয়ে ছাই-রঙের একটা গাউন পরে, সত্যি সত্যি এক মাদ্রাজী আয়া সঙ্গে করে এসে পৌঁছল সে।

প্রত্যেকটি বাড়ির জানলার আড়াল থেকে গিন্নিরা তাকে দেখল। মেম না আরো কিছু। পেতি ফিরিঙ্গি, গায়ের রং আমার চেয়ে হয়তো এক পোঁচ হাল্কা। তবে মানুষটা খুব মন্দ নয়, ফিটফাট থাকে, ফটফট ইংরিজি বলে, কোনো অহংকার নেই, নিজেই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কার্ড বিলি করল। তাতে ইংরিজিতে লেখা—মিসেস বনামির বেবি স্কুল। বাবুরা অমনি গলে জল।

নাকি কুড়ি টাকা করে মাইনে, সকাল ন'টায় চান করিয়ে তৈরি রাখলে মাদ্রাজী আয়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাচ্চা-বাচ্চাগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। তারা ছড়া বলবে, খেলবে, নাচবে, গাইবে, লেপটরাইট করবে; বেলা এগারোটায় সবাইকে ডিম রুটি কলা দুধ খেতে দেওয়া হবে। তারপর ছোট ছোট মাদুর পেতে এক ঘণ্টা ঘুমুবে; মিসেস বনামি তখন খাওয়া দাওয়া সারবেন। ঘুম থেকে উঠে আধ ঘণ্টা সবাই এ-বি-সি শিখবে আধ ঘণ্টা ওয়ান-টু-থ্রি গুণবে, তার পর মাদ্রাজী আয়া আবার সব কটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। তখন বেলা তিনটে, গিন্নিদের খাওয়া দাওয়া গালগল্প বিছানায় গড়ানো শেষ হয়েছে।

বুঝতেই পাচ্ছ দেখতে দেখতে মিসেস বনামি কেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। গিন্নিরা একটু রেহাই পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, ছেলেমেয়েরা সাহেবদের মতো কেতাদুরস্ত হচ্ছে বলে বাবুরাও মহা খুশি। গরীবরা ছাড়া কেউ আর মোড়ের মাথার বড় স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠায় না; এমন কি অনেকের অর্থে কুলোয় না, তবু রোববারের পাঁঠা খাওয়া বন্ধ করে মিসেস বনামির বেবি স্কুলে ছেলে পাঠায়।

আমি বললাম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কুল উঠে গেল কেন? মরে গেল বুঝি মিসেস বনামি?

আন্নাপিসি জিভ কেটে বললেন, না, না, মরবে কেন, তবে অনেক

ব্যাপার, আমার কাছে সবই অবিশ্যি শোনা কথা। বলুন না দিদি ওকে।

উকিলবাবুর বৌদিও তাই চান। মুখে একটা পান ঠুসে, দাঁতে একটু চুণ লাগিয়ে বললেন—

পাড়া সুদ্ধ সব ঠাকুরপুজো করত ঐ মেমকে। একটু রং মাখলেও দেখতে সাদামাটা, কাঁধ অবধি ফ্যাঁকড়া চুল কিপ্ দিয়ে আঁটা, গায়ে বড় বড় ফুলের ছাপ দেওয়া সুতির গাউন, হাঁটুর নিচে নেমেছে, পায়ে কালো জুতো, কিন্তু জানে না এমন বিদ্যে নেই। গিন্নিরা কর্তাদের খোঁচা সইতে না পেরে সন্ধ্যাবেলায় মেমের জন্য এটা ওটা নিয়ে গিয়ে নানারকম সহজ বিলিতী রান্না শিখে আসত, বাচ্চাদের জামা কাটিয়ে আনত। ভাঙা ভাঙা হিন্দী বলত মেম, তাতেই দিব্যি কাজ চলে যেত। মেম মাসে কত টাকা কামাত জানো? পনেরোটি থেকে বাড়তে বাড়তে এপাড়া ওপাড়া নিয়ে সত্তরটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল শেষটা, তার মানে চোদ্দ শো টাকা। গিন্নিরা ফল তরকারি ঘি মাখন মিষ্টি আচার জলি, রান্না মাছ মাংস নিয়ে যেত, ঘরে ওর বিশেষ হাঁড়ি চড়াতে হত না।

তার ওপর যখন শোনা গেল একা পেরে উঠছে না তাই একজন গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্ট নেবে কি না ভাবছে, তখন পাড়ার সব বি-এ পাশ বৌ-ঝিরা দোরগোড়ায় ঠিক লাইন না দিলেও দুবেলা জামা জুতো হ্যাণ্ডব্যাগ রুমাল ইত্যাদি উপহার দিয়ে মন গলাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার ফলে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি থেকে একটু মন কষাকষিও চলতে লাগল।

কর্তারা কিন্তু সবাই একবাক্যে মেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। না হয় তেমন ফর্সা রং নয়, কিন্তু গায়ে মেমের রক্ত আছে তো, কেমন শিক্ষা ওদের। লাদাসিধা বাড়িটাকে দুটো পর্দা টাঙিয়ে, দুটো ছবি আঁকিয়ে, দুটো ফুলের টব ঝুলিয়ে করে ফেলেছে নন্দনকানন। অথচ বাড়তি আধ হাতও জমি নেই, যেখানে অন্য গিন্নিদের ছেঁড়া কাঁথা শুকোয়, সেখানে মিসেস বনামির অর্কিড ফুল ফোটে। তার উপর কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি সময়-নিষ্ঠা, কি ভদ্রতা! বাচ্চাগুলো পর্যন্ত কথায় কথায় গুড মর্নিং থ্যাঙ্কু শিখে ফেলেছে। সবার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গায়ে ফর্সা জামা, মাথায় লাল ফিতে বাঁধা তালপাতার হ্যাট। পাড়ার চেহারা বদলে গেছে। পঞ্চাশটা বাঙালী গিন্নি যা পারে নি, একটা মেম—আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় ফিরিঙ্গি মেমই—এসে এক বছরে তার পাঁচগুণ করে ফেলল।

ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করবার আগে বুড়ো কর্তারা মিসেস বনামিকে জিজ্ঞাসা করে আসতেন। মেম রোববার সকালে হ্যাট মাথায় গির্জায় যেত বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মকে এতটুকু ঘেন্না করত না। সরস্বতী পুজোর সময় পাঁচ টাকা চাঁদা দিল, স্কুল দুদিন বন্ধ রাখল, পার্কে পুজো দেখে এল পর্যন্ত।

উকিলবাবুর বৌদি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলে যেতে লাগলেন—এক দিক দিয়ে মন্দ ছিলাম না। এক ফোঁটা দম্বলে যেমন এক হাঁড়ি দুধ দই হয়ে যায়, তেমনি একটা কালো-পানা মেম এসে আমাদের পাড়ার পুরোণো হালচাল সব বদলে দিয়েছিল। এমনি সময় সুখদাবাবুর ছেলের বৌ-ভাতে আমার ভাগ্নী রূপু এসে সব পণ্ড করে দিল। মেমকে দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠে, তাকে বুকে জড়িয়ে গালে চুমু খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে পুঁটি তুই মেম সেজেছিস কেন? আমি তো প্রথমটা চিনতেই পারি নি।

ঘর সুদ্ধ সবাই হাঁ। মিসেস বনামি কোনো রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে উঠে বললেন, কাহে বোলতা পুঁটি? হাম মিসেস বনামি। বলে খাওয়া দাওয়া না করেই বাড়ি পালাল। সবাই মিলে রূপুকে খুব বকলাম; একে অতিথি, তায় মেম, ছি! তার কাছে এমন গেঁয়োমি করতে আছে,—রূপু তো কেঁদে সারা, কিসের বনামি, ও আমাদের পুঁটি ঘোষ, ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে এসেছি, ওকে আমি কখনো ভুল করতে পারি? অমন থ্যাঁদা নাকে কালো আঁচিল আরেকটা দেখাও দিকি।

অনেক কষ্টে রূপুকে সেই রাত্রেই ঠাণ্ডা করা গেল বটে, কিন্তু সেই যে পাড়াময় বনামির নামে চি-চি পড়ে গেল, সে ঠাণ্ডা হতে একটি বছর লেগেছিল। কর্তারা সব শুনে চটে কাঁই, এত বড় আস্পর্ধা মেয়েব, পাড়া সুদ্ধ লোককে বোকা বানিয়ে ভোগা দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছে। এমন জোচ্চোর, এমন ভণ্ডের আসল জায়গা হল জেলখানা। কোথায় মিসেস বনামি আর কোথায় পুঁটি ঘোষ! সব ছেলেমেয়ের নাম কাটিয়ে স্কুল ছাড়ানো হল, গিন্নিরাও তাদের খোসামুদির কথা মনে করে বনামির মুখ দেখা বন্ধ করল। ক'দিন থাকতে পারে মানুষ একঘরে হয়ে? শেষটা একদিন

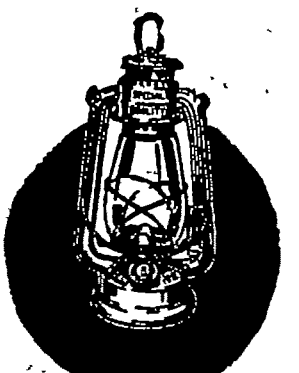
কিয়ান
নবীন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৬,৩ও চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

স্কুলের সাইনবোর্ড নামল, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হতে লাগল, পাড়ার লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এই অবধি বলে দেখি উকিল-বাবুর বৌদি পানের কৌটো বন্ধ করে ওঠবার জোগাড় করছেন। আমি শেষটা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ওকি, উঠছেন যে? শেষটুকু বলে যান, বনামির কি হল?

তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে উকিলবাবুর বৌদি দরজার দিকে পা বাড়ালেন—

শেষটা আর আমাকে জিগগ্যেস করে কেন লজ্জা দাও বাছা, মোট কথা সে এখান থেকে চলে গেছে। তার বিয়ে হয়েছে।

উকিলবাবুর বৌদির চলে যাওয়ার রকম দেখে অবাক হয়ে আন্নাপিসির দিকে তাকাতেই, পিসি একটু হেসে বললেন—

পুঁটির জন্যে ভাবিস নে, তারা দুজনে খুব সাফল্যের সঙ্গে পাটনায় আমাদের বাড়িতে বনামি বেবিস স্কুল চালাচ্ছে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছে, আমাদের পাড়া সুদ্ধ সবাই তাদের ঠাকুরপুজো করছে।

আমি আরো আশ্চর্য হই।

তোমার বাড়িতে? তুমি তাকে চেনো নাকি? আর 'তারা দুজনে' মানে?

আন্নাপিসি বললেন—

উকিলবাবুর ভাগ্নী রূপুর দাদা অমরনাথ কি একটা সামান্য কাজ করত, কিন্তু ভারি সাযেবি কায়দা তার। আমরা তাকে চিনতাম, সে-ই আমাদের জন্যে বাড়ির খোঁজ করছিল। এ বাড়ি থেকে লরিতে জিনিষ তোলা হচ্ছে, কিন্তু কেউ সাহায্য কচ্ছে না দেখে, সেই এগিয়ে এসে হাত লাগাল। তারপর পুঁটিকে বমাল সমেত পাটনায় আমাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা আর আমাদের এখানে স্থানান্তরিত করা, অমরনাথের মতো চালাক ছেলের পক্ষে কিছুই নয়। এ বাড়িটা পুঁটিকে ভাগ্যিস তার দাদা-মশাই দিয়ে গেছিলেন, নইলে বড় কষ্টে পড়ত সে। এর মধ্যে কোন ফাঁকে দুজনার মধ্যে ভাবসাব হল, বিয়ে হল। গাউন জুতো মোজা কেনাই ছিল, অমরনাথ সবরা কোট পেণ্টেলুন পরত, এখন দুজনায় রেজিষ্ট্রি আপিসে গিয়ে বিয়ে করে উকিল দিয়ে নাম বদলে, সত্যিকার বনামি হয়ে গিয়ে প্রশংসার সঙ্গে স্কুল চালাচ্ছে, অ্যাসিষ্টেণ্ট রাখারও দরকার হচ্ছে না।

আন্নাপিসি গল্প শেষ করে রান্নাঘরের দিকে এগোলেন, আমার তখনো কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকছিল। বললাম—

আশ্চর্য, মিসেস বনামির কাছে যে বিদ্যে শিখে পাড়া সুদ্ধ সবাই কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছিল, পুঁটি ঘোষের কাছে তা শিখতে কেউ রাজি নয়। পাটনা গিয়েও নাম বদলে নিতে হল।

একটা বোয়েম থেকে সুজি ঢালতে ঢালতে আন্নাপিসি বললেন—

সে আর এমন আশ্চর্যটা কি? মেমদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয়? তারা কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত কায়দাদুরস্ত। কোথায় মিসেস বনামি আর কোথায় পুঁটি ঘোষ। কি যে বলিস।

# প্রেমের প্রত্যূষ থেকে

আহমেদ হাসিম

(তুর্কী কবি)

প্রেমের প্রত্যূষ থেকে যাত্রা সুরু, যাব কোথা জানি না সঠিক—
আঁধারে অজানা দিশা। বৃথা খুঁজে মরা দিগ্বিদিক।
আগের পথিক গেছে যারা,
বিগত দিনের শোকে তারাও কি হয় দিশাহারা?
হয়তো ফিরতে চায়, কিন্তু ফেরা, সে কি সোজা কথা
বুকেতে রাত্রির ছোঁয়া বিছায় যে নীরব কৃষ্ণতা।
অসীম বিদিশা থেকে অন্ধকার দু'হাত বাড়ায়
দুইটি হিয়ার 'পরে মিলনের মালাটি জড়ায়॥

অনুবাদ—মনীশ ঘটক

# অন্তরালে

রজত রায় চৌধুরী

অন্তরাল উন্মোচিত হলে, চমকেরা
শিউরিয়ে উঠে; বজ্ররব প্রতিবাদ
শব্দহীন নিমেষ-গর্জনে। কম্পমান
অস্বীকার দ্বিখণ্ডিত তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে।
অন্তহীন অন্ধকারে প্রাচীরের তলে
সন্ধানী দস্যুর দল নিরন্তর রন্ধ্র
খুঁজে চলে। সহায় স্বপ্নের ঘোর।
বিশ্বাসঘাতক এই ছায়া পার্শ্বচর
অসতর্ক মুহূর্তের খুলে দেয় ডোর।

তারপর মৃত্যু হয়।
খ্যাতি, যশ, সততা, সম্মান
মিথ্যার কুয়াশাজালে একেবারে
হয়ে যায় লয়। নিঃশব্দ অবিশ্বাস্য
তীব্র আক্রমণে, পরিচিত সচেতন
বিনাসর্তে পরাভব মানে।
আরবার জন্মলগ্ন উদয়ালোকের
রশ্মি মাঝে। নিজের শয়তান রূপ
নিজেকেই দগ্ধে মারে লাজে

কিরাত-কন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। রূপে তার অগ্নিকণা। রোমাঞ্চকর শিহরণ তার প্রতি অঙ্গে। তাই ধ্যানের অমন বিরাগী মনে চাঞ্চল্য আনবার জন্যে স্বয়ং উমা গ্রহণ করলেন কিরাত-কন্যার রূপ। মনে হ'ল, যেন তিল তিল সৌন্দর্যকে রূপকার তুলে এনেছে কিরাত-কন্যার রূপ-লাবণ্যে। এবার অর্জুনের ধ্যানভঙ্গ হবে নিশ্চয়ই। সুন্দরী যুবতী কন্যার রূপসাগরে কে না ডুব দিয়েছে। ও রূপের আগুনে দগ্ধ হয়েও যেন তৃপ্তি আছে। পাহাড়ী পরিবেশের মধুরতম রমণীয়তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে ভয়ঙ্কর পাহাড়ী প্রকৃতির হিংস্রতা। তাই কিরাত-কন্যা একদিকে যেমন অনুপমা তন্বী রমণী, অপরদিকে বিষধর ভুজঙ্গিনী প্রতিমা। সাধুর বৈরাগ্য, বৈরীর বিরোধিতা সমস্ত এক লহমায় উবে যায় অমন কিরাত-কন্যার রূপদর্শনে। এ পুরাণের কথা। পুরাণে উল্লিখিত কিরাত জাতি হিমালয়ের একেবারে দক্ষিণে বসতি স্থাপন করেছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রবন্ধ— 'কিরাত-জন-কৃতি' নামক প্রবন্ধে (১৯৫০ সালে 'জার্নাল অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত) উল্লেখ আছে, এরা হচ্ছে মোঙ্গলীয় মহাজাতির তোট-বুদ্ধ ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা বসতি স্থাপন করেছিল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে। মহাভারতের সভাপর্বে লোহিত বিভাগের অধিবাসী কিরাতদের কথা উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, রামায়ণ প্রভৃতিতেও এই কিরাত জাতির কথা রয়েছে। ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে, নেফা অঞ্চলের মিরি, মিশমি, দফলা, বনকা উপজাতি 'এরা হচ্ছে কিরাত জাতির মানুষ।' এই কিরাত সুন্দরীদের রূপমাধুরী আর গুণপনার বর্ণনায় পঞ্চমুখ প্রাচীন বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

পুরাণের কাল থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একইভাবে বিজয়িনীর বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এই পাহাড়ী-তনয়া সীমান্ত সুন্দরীদের। আহোম-রাজাদের একচ্ছত্র আধিপত্য তখন উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র-তীরের সমতল-ভূমির সে রাজ্যে মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ার মতো উষ্ণ বাক্যের ঝড় ওঠে কিরাত জাতির বংশধর দফলা মেয়েদের নিয়ে।---

---রাজ্য সীমান্তে তৎকালীন এক রাজকুমার এসেছেন মৃগয়ায়। তার হঠাৎ নজর পড়ে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী নারীর প্রতি। কথা কথা সোনা দিয়ে তৈরি সৌন্দর্যময়ী দফলা-কন্যা। তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় রাজকুমার অস্থির হয়ে ওঠেন। পাহাড়ী ঝর্ণা বইছে, অরণ্যচেরা রমণীয় প্রকৃতির রাজ্যে সেই ঝর্ণার জলে নাইতে নেমেছে প্রকৃতি-কন্যা দফলা সুন্দরী। সঙ্গে নেই পরিধেয় বস্ত্র। কণ্ঠে, কর্ণে, বাহুতে নেই অলঙ্কার। প্রকৃতির বিশাল মুক্তির সুন্দর নগ্নতায়, সেই নিরাবরণ কন্যা অভিষিক্তা এক অনন্যার দিব্যাসনে। এগিয়ে এলেন রাজকুমার। দৃষ্টি বিনিময় হলো উভয়ের। সুনিরতা দফলা সুন্দরী বেতসলতার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজকুমার আত্মহারা। আরও এগিয়ে আসতে চান। কিন্তু অতর্কিতে সুন্দরীর মৃণাললতাবাহু দ্রুতগতিতে কেশ-বেণী থেকে ধারালো 'রক্ষাস্ত্র' বের করে ছুড়ে মারে রাজকুমারের বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজকুমারের দেহ। স্বর্ণাভ জল রাঙা হ'য়ে ওঠে রাজকুমারের বুকের রক্তে। হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে যায় দফলা-কন্যা অরণ্যের অন্ধকারে। এখানেই কিন্তু যতি পড়লো না এ ঘটনায়।

— দফলা-সমাজ গর্জে উঠলো। সমতলভূমির লোক নজর ফেলেছে ওদের মেয়েদের প্রতি। গভীর রাতে দল বেঁধে দফলারা দামামা বাজিয়ে নানা ধরণের অস্ত্র হাতে সমতলে নেমে এলো হামলা করতে। আহোম-রাজাকে ওরা মানে না। খুন-খারাপিতে ওরা সিদ্ধহস্ত, একটি মেয়ের জন্যে সে রাত্রেই ওরা লুঠতরাজ করে শতাধিক পুরুষ, নারী, শিশুদের ধরে নিয়ে এলো পাহাড়ে ঘেরা ওদের রাজ্যে—সুবনসিরিতে। আহোম-রাজা উদয়াদিত্য সিং এ খবর পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। সুবনসিরির দুর্দান্ত দফলা উপজাতিদের উচিৎ শাস্তি দেবার জন্যে রাজা স্বয়ং উদ্যোগী হলেন। রাজা অভিযাত্রীদল পাঠিয়ে হুকুম দিলেন: সুন্দরী কন্যার দেমাক দেখবো নিজের চোখে,. ওকে আনা চাই। কিন্তু যুদ্ধে আহোম-সৈন্যদলের হ'ল শোচনীয় পরাজয়। বহু লোকক্ষয়, বনসম্ভার নষ্ট করে ফিরে এলো সেনাপতি।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মীরজুমলার বিরাট সৈন্যবাহিনীর ছাউনি পড়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। বিদ্রোহীদের, ঠাণ্ডা করতে করতে মোগল সেনাপতি আসামে এসে উপস্থিত। এদিকে বর্ষাকালের আব-হাওয়ায় — সেনাপতির কার্যক্রম আর কার্যকরী করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ-দিন তাই তাঁকে গোটা সৈন্যদল নিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে এই পাহাড়ে ঘেরা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রকৃতি-রাজ্যে। নিজের তাঁবুতে বসে নক্সা সম্মুখে খুলে যতক্ষণ সেনাপতি অন্যান্যদের নিয়ে রণনীতির পরামর্শ করছেন; ততক্ষণ সেনাপতির অন্যতম সঙ্গী বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাঁর সহ-যোগী হিরাতের মোল্লা দরবেশকে নিয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন প্রকৃতি-রাজ্যের অমূল্য সম্পদ, উপজাতির মানুষদের সামাজিক জীবন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ফাঁকি পড়ে না কিছু। তাঁরা চোখ চেয়ে দেখেন আর লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা। উভয়ে দেখছেন, জানছেন এইসব উপজাতি নরনারীদের হাবভাব, চালচলন, কেউ লিখছেন, 'এ হচ্ছে আর এক পৃথিবী। এখানকার লোকজন অন্য ধাতুতে তৈরি। এই সব অজ্ঞ লোকের অন্তঃকরণের মতো হিংস্রতায় পরি-পূর্ণ এখানকার বিশাল অরণ্যানী।'

সহযোগীর কথার বিরোধিতা করেন না সিহাবুদ্দিন। কিন্তু তাঁর অভিমত একটু অন্য ধরণের। তাঁর ধারণা এরা শুধু হিংস্র নয়, এরা স্বাধীনচেতা। তিনি দফলাদের সম্বন্ধে লিখেছেন— 'এরা আহোম-রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকারের কথা চিন্তাও করে না। বরং মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই তাঁর রাজ্যের ওপর এসে হামলা করতো।' কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনে একই অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন। এইসব সীমান্ত সুন্দরীদের রূপ বর্ণনায় উভয়েই পঞ্চমুখ। কুঁচ-বরণ দেহে মাখন-মসৃণ লাবণ্যের সঙ্গে যে প্রকৃতি স্বভাব উজ্জ্বলতা আর তীব্রতা দেখেছেন পাহাড়ী মেয়েদের প্রতি অঙ্গে, তা লিপিবদ্ধ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন বলেছেন —'মিরি-মিশমি মেয়েরা অসমীয়া মেয়েদের চাইতেও বেশি শ্রীময়ী। এই লাবণ্যশ্রীতে উজ্জ্বল রৌদ্র-রঙের মতো রূপমাধুরীতে রয়েছে প্রকৃতিশ্যামা দুটি নয়নতারা। পুষ্ট দেহশ্রীতে রয়েছে ঝর্ণা-চঞ্চল যৌবন। তুঙ্গস্তনী দেহ যেন পর্বত-প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য।'

পাহাড়ী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন সিহাবুদ্দিনের সহযোগী কবি হিরাতের মোল্লা দরবেশ। বিদেশী লোক দেখে এসব মেয়েরা যেমন কৌতুকে চোখ দুটো টান টান করে মেলে চেয়ে থাকে, ভরসা পেলে সখ্যতা পাতাতেও বেশি দেরী করে না, তেমনি সরল বিশ্বাসে ওরা বিদেশী পুরুষদের সঙ্গও দিতে পারে। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে যেন ওদের রক্ত মাথায় ওঠে। 'বড় বেয়া (খারাপ) জিনিষ হ'ল এই বন্দুকগুলি। হাতে বন্দুক দেখলেই চীৎকার করে ওঠে পাহাড়ী মিরি-মিশমি মেয়েরা। কিন্তু পালাবে না। ছুটবে না ভয়ে। বীরাঙ্গনার মতো পেটের বস্ত্রে গোঁজা অস্ত্র বের করে, এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকবে।' হিরাতের মোল্লা দরবেশের মতে, গোলাপ ফুলের কাঁটা আছে। তেমনি এইসব অনুপমা সুন্দরীদের আছে ব্যাঘ্রিনী স্বভাব।

আহোম আমলের ইতিহাসে নেফায় শুধু একটানা অরাজকতার

ইতিহাস কি বা অজ্ঞ এক উপজাতিদের হিংস্র বন্য পশুজীবনের ইতিকথা রয়েছে ভাবলে ভুল ভাবা হবে। কামেঙের মেয়েরা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' সুর-সঙ্গীতে যে প্রাণ ভরিয়ে তুলতো সে কথা যেন মনে রাখি। কোন কোন অঞ্চলের মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হত বৈষ্ণবগীতি। সমতলবাসীদের সঙ্গে পার্বত্যভূমির এসব উপজাতিদের মধ্যে যেমন বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধবিগ্রহ চলতো, তেমনি সামাজিক ঘনিষ্ঠতারও পরিচয় পাওয়া যাব।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আহোম-রাজা পুরন্দর সিংহের কাছ থেকে আসামের শাসনভার গ্রহণ করবার পর সীমান্ত উপজাতিদের প্রতি নজর ফেললো। তারা সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলো ওদের সঙ্গে মিতালি করবার। কিন্তু একদিনে সম্ভব হ'ল না। ঘোরাফেরা করতে, নাড়ী দেখতে দেখতে কেটে গেল চার দশক। ১৮৮২ সালে সদিয়ায় নিযুক্ত করা হ'ল একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল অফিসার। কিন্তু ইতিমধ্যে নারীঘটিত গণ্ডগোলে অনেক ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাণ হারাতে হয়েছে।

১৮৮৩ সালে আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। সীমান্ত সুন্দরীকে কেন্দ্র করে। কলকাতায় তখন এক প্রদর্শনী চলছিল। সেই প্রদর্শনীর এক কর্মচারী প্রেরিত হ'ল নেফা অঞ্চলে। সে অঞ্চলের কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি সংগ্রহই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজ কর্মচারীটি বালিপাড়ার নিকটস্থ আকা জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে তাদের জীবনযাপন দেখে মোহিত হ'য়ে পড়ে, বিশেষ করে নরনারীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা। আকা যুবতীদের যেমন দেহশ্রী, তেমনি উচ্ছল চলনবলন। ইংরেজ কর্মচারী এই সব দেখে অতি উৎসাহে প্রস্তাব করে বসলো সবচেয়ে সুন্দরী আকা রমণী তাদের রাণীকেও সালঙ্কারে কলকাতার প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবে। রাণীর প্রতি আকাদের শ্রদ্ধা গভীর। রাণীর প্রতি অসম্মান আচরণ করার ধৃষ্টতায় তাদের মাথায় তখন খুন চড়ে গেছে। সরকারী কর্মচারীকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বন্দী করে রেখে ওরা সদলবলে চললো বালিপাড়া চড়াও হতে। ইংরেজের ফৌজ উপস্থিত হয় অকুস্থলে। কিন্তু সংঘর্ষ চললো দীর্ঘ কয়েক বছর। ১৮৮৮ সালে শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কাছে ওরা সন্ধি স্থাপন করে। এইভাবে আকাদের উপদ্রব থেকে বালিপাড়ার শাসকদল রেহাই পেলেও, মনে মনে বুঝতে পেরেছে আকা নারী যেমন তার সৌন্দর্য-মেখলায় এদের নাড়ীতে চাঞ্চল্য আনে, তেমনি অতিরিক্ত অভিলাষ ব্যক্ত করায় সেই সীমান্ত সুন্দরীই আনে অনর্থ। ধীরে ধীরে আকাদের সঙ্গে বৈরিভাব দূর করে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল ১৯১৪ সালে ক্যাপ্টেন নেভিল-এর কৃতিত্বে। সেই আকা অভিযাত্রীদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন ইংরেজ লেখক কেনেডি। তিনি লিখেছেন—'আরও পূর্বদিকে যে সব পাহাড়ীরা আছে তাদের চেয়ে আকারা অনেক উন্নত এবং সভ্য। এদের পুরুষরা যেমন জাতযোদ্ধা, তেমনি নারীরা স্বভাবসুন্দরী। এদের সমাজের ভিত গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চাবিকাঠি রয়েছে রাণীর হাতে। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হ'ল রাণী পরিচালিত গণতান্ত্রিক আকা-সমাজে নারীদের মর্যাদা অপরিসীম।

রাণীকে ওরা বলে নুগুম। এই নুগুম সমগ্র আকা-সমাজের গৌরবের বস্তু। নারীশ্রেষ্ঠা, সুন্দরতমা নুগুম যেমন বিলাস, আরাম ও ঐশ্বর্য উপভোগের অধিকারিণী, তেমনি সমাজের যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষিকা। শুধু রাণীই নয়, আকা সুন্দরীরা তাদের রূপলাবণ্যকে আরও চমকপ্রদ করে রাখবার জন্যে রকমারি অলংকার ব্যবহার করে থাকে। বিলাস-প্রবণতা এই সব আকা সুন্দরীদের স্বভাবজাত ধর্ম যেন। রূপেই শুধু ভোলাবে এমন ধরণের মেয়ে এরা নয়। গুণপনার দিকও রয়েছে। চারুকলার প্রতি অনুরাগ আশ্চর্যজনক, অঙ্কন-বিদ্যায় আকা মেয়েদের দক্ষতা লক্ষণীয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ব্যাপক অঞ্চলে বিচিত্র পরিবেশে একাধিক বিচিত্রতর উপজাতি বাস করছে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। আর এই বৈচিত্র্যের হাটে সবচেয়ে কৌতূহলের বস্তু এই সব উপজাতি সুন্দরী নারীরা। ফরাসী নৃতত্ত্বসন্ধানী বার্টাণ্ড গেব্রিয়েল আসাম পার্বত্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে যে পুস্তক লেখেন, তাই বুঝি তার নামকরণ হয় 'Secret Lands where Woman Reign.' আপা-তানি সমাজের নারীদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'এদের রূপ যেমন বাঁধন-ছাড়া, তেমনি প্রকৃতিতে রয়েছে লাগামছাড়া উন্মাদনা। সাবালিকা হবার ঢের আগে থেকেই এদের যৌনস্পৃহা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাগ্-বিবাহ যৌনসম্পর্কে এদের সমাজপতিরা নির্বিকার। প্রকৃতি-কন্যাদের মর্জি-মাফিক অবিবাহিত নরনারীর যৌন-সম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় না। অভিজাত মেয়েরা যেমন সুন্দরী, তেমনি বিলাসপ্রবণ। ওদের মধ্যে অদ্ভুত এক পছন্দ সংক্রামিত রয়েছে। অভিজাত মেয়েরা সঙ্গলাভের জন্য বেশি পছন্দ করে থাকে দাস-পরিবারের সুন্দরকান্তি যুবকদের। কিন্তু এত যে অবাধ মেলামেশা তা শুধু বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত। বিবাহের পরে নরনারীর মধ্যে ব্যভিচার অসম্ভব।'

আজ নেফা যেমন সমগ্র ভারতের আলোচ্য বিষয়। তেমনি নেফার অধিবাসী—সীমান্ত সুন্দরীরাও। ভারত সরকারও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের দিকে। ভারতীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় আজ এইসব উপজাতিদের মধ্যে এসেছে মৈত্রীর সম্পর্ক। তাদের উন্নয়নই প্রশাসনের লক্ষ্য। মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ বা জীবনচর্চার ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটলেও এখন এরা মার্জিতরুচির অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে। নিজের দেহকে যেমন অনুভব করে, তেমনি 'মন' নামক জিনিসটার অনুভূতিও আজ তাদের কাছে কম নয়।

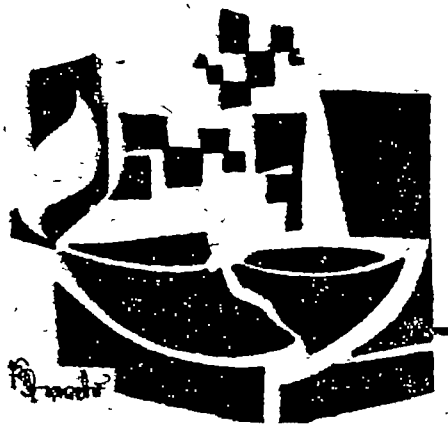

ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'তপ্তুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

চল্লিশ

নতুনভাবে জীবন সুরু করল বিজয়।

ঠিকাদারের গুদামে এক কোণায় ছোট্ট একফালি ঘরে তার খাটিয়া পাতা থাকে। পাশে একটা ছোট স্যুটকেশ, তাতেই খানকয়েক জামা-কাপড় আছে। এ গুদামের দরোয়ান বৃদ্ধ লোক, বিহারের বাসিন্দা, হাসিখুশি মানুষ। বিজয়ের খাওয়ার অসুবিধে দেখে সে নিজে থেকেই বলেছিল সপ্তাহে পাঁচ টাকা তাকে দিলে সকালে ছাতু, ভাত, একটা তরকারি আর রাত্রে ভাতের জায়গায় রুটি বানিয়ে সে দিতে পারে। রাজি হয়েছিল বিজয়, কারণ এর কমে বাইরে হোটেলে খাওয়া সম্ভব নয়। দরোয়ানকে পাঁচ টাকা করে দিলেও সপ্তাহে দশটা টাকা তার বাঁচবে, বিজয়ের পক্ষে এ-কম কথা নয়। নিজের টাকার ইচ্ছেমত জিনিষ কিনে সে রতনকে দিতে পারবে।

এ কাজ নেওয়ার পর থেকে বিজয়ের প্রতিদিন টিফিনের সময় রতনের কাছে যাবার উপায় ছিল না। প্রায়ই তাকে মিস্ত্রীদের কাজের তদারক করতে বেরুতে হত, কিন্তু প্রথম সপ্তাহের টাকা পেয়ে বিজয় মালিকের কাছে আধবেলার ছুটি চেয়ে নিল, ছুটল কলকাতায়, মার্কেটে গেল রতনের জন্যে প্যাণ্ট আর সার্ট কিনতে। ভেবেছিল দশ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু পছন্দ মত জিনিষ নিতে পুরো পনের টাকাই লেগে গেল। ভয় চুকল দরোয়ান না আবার চেঁচামেচি করে, তার পাঁচ টাকা তো এ সপ্তাহে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, দরোয়ান নিজে থেকেই বলল, তাতে কি হয়েছে, পরে দিয়ে দেবেন, কি বাজার করলেন দেখি।

বিজয় প্যাণ্ট আর সার্ট দেখাল।

—এতো খুব কিমতি জিনিষ এনেছেন, লেড়কার জন্যে বুঝি?

বিজয় কোন উত্তর দিল না, হাসল।

—হামিও যখন দেশে যাই লেড়কাদের জন্যে উমদা উমদা চিজ কিনি। সবাই আমায় দোষ দেয়, বলে আমি পয়সা নষ্ট করি। বাবু, পয়সা কামাই করছি কার জন্যে, লেড়কাদের জন্যেই তো?

কথাটা যে কতখানি সত্যি বিজয় তা এখন মনেপ্রাণে বুঝতে পারে। বলল, দরোয়ানজী, এই জামা দুটো আমি এখন একটু দিয়ে আসব? ফিরতে আসার এক ঘণ্টা লাগবে।

দরোয়ান উদার গলায় বলল, যান না। দিয়ে আসুন।

বিজয় ভয়ে ভয়ে বলে, বাবু যদি এসে পড়েন, কাল আধবেলা ছুটি নিয়েছিলাম, আজ আবার এসে দেখতে না পেলে—

—কিছু ভাববেন না, হামি যখন আছি, বাবুকে ঠিক বুঝিয়ে দেব।

বিজয় ছুটল রতনের স্কুলে।

রতন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে—কি হয়েছিল তোমার বন্ধু, এতদিন আস নি কেন?

—বড্ড কাজ পড়েছে, ছুটি পাই না।

—আমরা সবাই যে তোমার জন্যে বসে থাকি।

—কাঁক পেলেই আসি আসব। দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি।

সার্ট প্যাণ্ট দেখে রতন উৎফুল্ল হয়, বাঃ, কি সুন্দর জামা।

—তোমার রঙ পছন্দ হয়েছে?

—এই রকমই তো একটা জামা আমি পুজোর সময় কিনতে চেয়েছিলাম। দাদু দেখলে খুব খুশি হবেন। একটু থেমে বলে, চল না আজকে আমাদের বাড়ি।

বিজয়ও হাসে, সময় নেই রে পাগলা, পরশু-তরশু আবার এই সময় আসব।

দরোয়ানের কাছে একটি ছেলে প্রায়ই আসে, দেখলে মনে হয় কলেজের ছাত্র। রোগা লম্বা, কিন্তু চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে।

বিজয় একদিন দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিল, ও ছেলেটি তোমার কাছে আসে কেন?

দরোয়ান খৈনী টিপতে টিপতে বলল, হামি ওর ব্যাঙ্ক আছি।

—তার মানে?

—হামার কাছে ও টাকা জমা রাখে।

—কিসের টাকা?

—ওর নাম সমর, ইনস্যুরেন্সের কাজ করে। হামিও ওর কাছে পলিসি নিয়েছি, লেড়কা বড় ইমানদার আছে।

সমরের সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় হল। সমর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ। ছোটবেলা থেকে জীবনকে সে দেখেছে, কিন্তু হতাশ

হয় নি। চোখে মুখে তার উজ্জ্বল আশাবাদ। সে বলে, 'বিজয়বাবু, আমরা শুধু অন্যের দোষ ধরি, কি পাই নি তার জন্যে দুঃখ করি। কিন্তু যা পেয়েছি সেইটেকে মূলধন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি না।

উত্তরে বিজয় বলেছে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ ভাই, এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। সব হিসেব কিরকম যেন গোলমাল হয়ে যায়।

সমর বলল, এখন পর্যন্ত অন্তত সংসারটাকে খুব গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে না। আমার বাবা-মা মারা গেছেন খুব ছোটবেলায়। কাকার কাছে মানুষ হয়েছি। বলতে গেলে একরকম ওদের বাড়ির চাকরের মতই ছিলাম। সে নিয়ে কাকার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। ঐ সময়টা যদি উনি আশ্রয় না দিতেন, কোথায় ভেসে যেতাম কে বলতে পারে। অন্তত এইটুকুর জন্যেও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিজয় চুপ করে কথাগুলো শোনে, জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এখনও কাকার কাছেই থাক?

—না; চাকরি করি, এখানেই একটা মেসে থাকি। টিউশানি করে স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করেছি।

—এখনও কাকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

সমর হাসল, যোগাযোগ মানে, প্রায়ই তো আমি যাই। নিজে রোজগার করি, খুড়তুতো ভাইবোনগুলোকে জিনিষপত্র কিনে দিই। তারাও আমাকে ভালবাসে, কাকীমা আর আমায় চাকর মনে করেন না, রীতিমত খাতির করেন। কারণ ক্রমশ আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছি।

—সমর তোমার কথাগুলো শুনতে খুব নতুন রকমের লাগছে, আগে কাউকে বলতে শুনি নি।

সমর বলল, বিজয়বাবু আমি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল মানুষ। ক'দিন থেকে আপনার কথাই আমি ভাবছি, নিশ্চয় আপনার ঘর-সংসার আছে।

—আছে।

—এ সামান্য রোজগারে আপনার চলবে কি করে? ঠিকাদার ভদ্রলোককে তো চিনি, এখানেও কিছুদিন আমি খাতা লিখেছি কি না। ভদ্রলোকের সব ভাল, কর্মচারীদের মাইনে দেবার বেলাই শুধু খারাপ।

বিজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমার কোন উপায় নেই। কে আমায় চাকরি দেবে?

—কিছু মনে করবেন না, আপনি বড় পেসিমিষ্ট।

—সংসার আমায় তাই করে দিয়েছে ভাই।

—একথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি ইচ্ছে করলেই রোজগার বাড়াতে পারেন।

—কি করে?

—আসুন, আমার সঙ্গে ইনস্যুরেন্সের কাজ করবেন, এ চাকরি আপনাকে ছাড়তে বলছি না, দালালীটা হবে আপনার উপরি রোজগার।

বিজয় মাথা নাড়ে, ইনস্যুরেন্সের কাজ আমি কি জানি। ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সমর দৃঢ়স্বরে বলে, কেন হবে না? কিছুই তো করবার নেই? দরোয়ানজীর মুখেই শুনেছি আপনার আত্মীয়স্বজন অনেকেই অবস্থাপন্ন লোক। আজকের দিনে সকলেই জীবনবীমা করে, আমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করে দিন, কাজ যদি বার করতে পারি দালালীর অর্ধেক টাকা আপনি পাবেন, অর্ধেকটা আমার।

বিজয় এড়িয়ে যায়, আচ্ছা ভেবে দেখব।

কিন্তু সমর নাছোড়বান্দা। একরকম জোর করেই সে বিজয়কে ধরে নিয়ে গেছে প্রথমে রাঙাদা'র কাছে। বিজয় রাঙাদা'র সামনে কিছুই বলতে পারল না। কোনরকমে সমরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বাকী যা কিছু বলার বলল সমর। আশ্চর্য ওর কথা বলার ক্ষমতা, মানুষের হৃদয় জয় করার শক্তি। শেষ পর্যন্ত যখন বলল, রাঙাদা', বকর বকর করে আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি। চা মিষ্টি ধ্বংস করেছি, আর জ্বালাতন করব না। শুধু এইটুকু অনুরোধ, যদি কোন নতুন পলিসি নেন, এই অধমকে সেবা করার সুযোগ দেবেন, তাতে শুধু আমিই নই, আপনার একজন দুঃস্থ আত্মীয়ও উপকৃত হবে।

বলেই রাঙাদা'র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আমি এখন আসি, চলুন বিজয়বাবু।

রাঙাদা' হেসে ফেলেন, তুমি তো খুব কর্মিষ্ঠ হে, লেগে থাকলে তোমার উন্নতি হবে।

—সে আপনাদের আশীর্বাদ।

—পরশু আমার অফিসে একবার দেখা করো। বিজয় চেনে, সন্ধ্যের দিকে এস। দেখি যদি তোমায় কোন কাজ দিতে পারি।

সমর সহাস্যে বলল, এইটুকু যে বললেন, তাতেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করি।

বিজয়ের সাহায্যে সমর প্রথম কাজ আদায় করে রাঙাদা'র কাছ থেকে। একখানা করকরে একশ' টাকার নোট এনে সে বিজয়ের হাতে তুলে দেয়, আসুন বিজয়দা', আপনার দালালীর ভাগ।

বিজয় নোটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, সামান্য ক'দিনের চেষ্টায় সে এ টাকা রোজগার করেছে, এ দিয়ে সে আরও কত জিনিষ রতনের জন্যে কিনতে পারবে। কানে আসে সমর বলে যাচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে ক'দিন ঘোর বিজয়দা'! কাজ আমি ঠিক আদায় করে নেব। বাড়ি বসে মাস গেলে তোমার দু'শ' টাকা রোজগার হবে।

বিজয় সম্মতি জানিয়ে বলে, আমি চেষ্টা করব সমর, তোমাকে নিয়ে ঘুরব, আগে যাদের চিনতাম তাদের কাছে যাব। এতদিন ভাবতাম হেরে গেছি, আর পারব না, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'বার পর এখন মনে হচ্ছে সময় বোধহয় যায় নি।

—সময় কখনই যায় না বিজয়দা', সময়কে নিজের মত করে নিতে হয়।

টাকা নিয়ে কলকাতায় এল বিজয়, বাড়ি-ঘর নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে, তালা বন্ধ থাকে, একটা লোক লাগিয়ে সাফ করাল। থাকুক না থাকুক, ঘরগুলো পরিষ্কার রাখা দরকার।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, তোকে আজকাল আর দেখি না বিজয়।

বিজয় বলে, আমি বাইরে কাজ নিয়েছি।

—কোথায় ?

বিজয় তার উত্তর দেয় না, তবে ওর পরিষ্কার জামা-কাপড় দেখে তারা বোঝে বিজয় মিথ্যে কথা বলছে না।

সন্ধ্যের ঝোঁকে প্রমথ সমাদ্দারের আড্ডাতেও বিজয় গিয়েছিল, সেই আগের মতই টেবিলের চারপাশে বেঁটে কেষ্ট, মিঃ মিটার, আর অন্যরা বসে। টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল, গেলাস আর সোডা, ইজিচেয়ারে পা তুলে, প্রমথ সমাদ্দার আধশোয়া অবস্থায়। পাশের ঘর থেকে ধেনো মদের গন্ধ আর মাতালদের হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। বিজয়কে দেখে ভূত দেখার মত প্রথমটা যেন সবাই চমকে উঠল, তার পরেই উদ্দাম, আরে বিজু সোনা, কতদিন বাদে এলে, বুকে এস মাইরি।

বিজয় মিটি মিটি হাসল, তোমাদের সব দেখতে এলাম।

—আমরা সেই আগের মতই আছি। তোমার কি খবর বল। এস এক পাত্তর খাওয়া যাক।

বিজয় বলল, না, ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

নেশার ঘোরে বেঁটে কেষ্ট চেঁচিয়ে উঠল, সেকি, এ যে ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি।

বিজয় বলল, না ভাই, এ হলো অভাবে স্বভাব নষ্ট।

—অভাব কিসের ? আজ তো আমরা তোমাকে খাওয়াব।

বিজয় মাথা নাড়ল, না।

এতক্ষণে প্রমথ সমাদ্দার কথা বলে, নিশ্চয় বিজু সোনার অভিমান হয়েছে, এস তোমার মান ভাঙাচ্ছি। বিনা পয়সায় পুরো বোতল, বিলিতি মাল।

বিজয় তবু বলল, না ভাই, ওসব ছেড়ে দিয়ে বেশ শান্তিতে আছি।

প্রমথ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, বাহাদুরি করো না, বিজু সোনা, দুম করে অসুখে পড়ে যাবে। মাল এমনই জিনিষ যত দিন খাবে এ তোমার বন্ধু, ছাড়লেই তোমার ঘোর শত্রু। সাবধান।

পাঁচটা মামুলী কথাবার্তার পর বিজয় চলে আসছিল, প্রমথ বলল, মাঝে মাঝে এস বিজু সোনা।

বিজয় কোন কথা দিল না, বলল সময় পেলে আসব।

—আলতা তোমার খোঁজ করছিল। অনেকদিন যাও নি বোধহয়।

—না, যাওয়া হয় নি।

সেই দিনই হাওড়া ষ্টেশনে এসে বিজয়ের খেয়াল হল আলতার সঙ্গে একবার দেখা করলে হয়।

আলতার ঘরে বোধহয় অন্য কেউ ছিল, তবু সে বেরিয়ে এসে দেখা করল বিজয়ের সঙ্গে, খুশি হয়ে বলল, সেই যে তুমি রাগ করে চলে গেলে গোঁসাই, তারপর আর এলে না। সেকথা মনে পড়লেই নিজের ওপর বিরক্ত হই। কেন তোমাকে মিছিমিছি খোঁটা দিয়েছিলাম।

বিজয় বলল, ভালই করেছিলে আলতা, তোমার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েই বোধহয় নিজেকে শোধরাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

আলতা তাকিয়ে তাকিয়ে বিজয়কে দেখছিল, বলল, হ্যাঁ, আগের চেয়ে তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে।

বিজয় হাসল, সে বোধহয় পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেছি বলে।

—এমন অসময়ে এলে গোঁসাই ঘরে নাগর রয়েছে, তোমাকে একটু বসতে বলতেও পারলাম না।

—অন্য একদিন আসব। তবে আগের মত আর বসব না।

—কেন ?

—মদ ছেড়ে দিয়েছি।

—সত্যি গোঁসাই ?

—হ্যাঁ আলতা, অনেক কষ্টে ছেড়েছি। এখনও সন্ধ্যে হলেই মাথা ঝিম ঝিম করে, জিভ শুকিয়ে যায়, তবু জোর করে নিজেকে চেপে রাখি, এই দেখ, পকেটে আমার টাকা রয়েছে। তবু, শুঁড়িখানায় যাচ্ছি না।

আলতা বিজয়ের হাতটা টেনে নিয়ে বলল, খুব ভাল করেছ গোঁসাই, এ জীবনটা তো দেখছি, একবার এ রসে মজলে কেউ বেরতে পারে না। শুধু ছটফট করে।

কথা শেষ হ'ল না, বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় আলতার নাম ধরে ডাকলো।

আলতা বিরক্ত হয়ে বলল, যাই গোঁসাই, ডাকছে, না গেলে চেঁচামেচি করবে।

—যাও।

—তুমি আবার এস কিন্তু।

বিজয় কিন্তু এখানেও কোন কথা দিল না, ঐ একই কথা বলল, যদি সময় পাই তো আসব।

মনের আনন্দে বাজার করেছিল বিজয়, রতনের জামা-কাপড়, খেলনা, আরও কত টুকিটাকি জিনিষ, একটা স্যুটকেশ কিনে তার মধ্যে ভরে দিল। পুরো একশ' টাকাই সে খরচ করেছে।

পরের দিন স্যুটকেশ হাতে করে বিজয় হাজির হল রতনের স্কুলে। রতন ছুটতে ছুটতে এল, বন্ধু পাঁচ দিন ধরে তোমায় খুঁজছি, আসছ না।

বিজয় হেসে জিজ্ঞেস করল, কেন, কি হয়েছে ?

—তুমি যে প্যাণ্ট আর সার্টটা দিয়েছিলে, আমি রোজ বাক্স করে নিয়ে আসি, তোমাকে ফেরত দেব বলে।

বিজয় অবাক হয়, কেন ফেরত দেবে ?রতন মুখ নীচু করে বলে, মা বকেছে। —কেন ?

—মা বলেছেন অত দামী জিনিষ কারুর কাছ থেকে নিতে নেই।

বিজয় হাসবার চেষ্টা করে, আমি তো তোমার বন্ধু।

—তবু না। তুমি দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

রতন চলে গেল, বিজয় হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতে পারে না সে কি করবে। বাক্স ভর্তি রতনের জিনিষপত্র কত সাধ করে সে কিনে এনেছে। কিন্তু রতন তো নেবে না। রেনুকা নিতে দেবে না। আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বিজয়ের ইচ্ছে করল না, রতন ফিরে আসার আগেই স্যুটকেশ হাতে করে আস্তে আস্তে নিজের আস্তানার দিকে ফিরতে লাগল। কোনদিকেই বিজয়ের খেয়াল নেই, এতদিন যে স্বপ্ন সে দেখছিল, মনে হল এ শুধু স্বপ্নই, কখনও সত্য হয় না।

কে যেন ডাকল, শোন।

বিজয় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। অদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রেনুকা। আগের চেয়ে শীর্ণ, মুখের ওপর ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, পরণে সরু কালো পাড় সাদা শাড়ি, হঠাৎ দেখলে বিধবা বলেই মনে হয়।

বিজয় ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

রেনুকা বলল, তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা আছে।

বিজয় মুখ নীচু করে বলল, বল।

—এখানে নয়, আমাদের বাড়িতে চল। —চল।

(ক্রমশ)

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

।। পাত ।।

নতুন চাকরী। তাতে তিন-তিন ছুটি নিয়েও সমর কোনো বাড়ি খুঁজে পেল না। নৃপেনের মতন ঝানু লোকও ঘায়েল হয়ে গেল।

দিল্লী শহরে বাড়ি যে খালি নেই তা নয়। বহু বাড়ি রয়েছে। নতুন নতুন বাড়ি। সব বাড়ি ওয়ালারই এক কথা—'বিয়ে করেছেন মশাই? বিয়ে? আইবুড়ো জওয়ান ছেলেকে বাড়ি ভাড়া দিতে পারি না।'

আরেকজন বললেন, 'কটি ছেলে-মেয়ে? পরিবার কোথায়?'

আরেকজন বললেন, 'বিয়ে কোথায় করেছেন? বলেন কি মশাই এখনও বিয়ে করেন নি? সত্যি কথা বলতে কি এই উড়নচণ্ডী টাইপের লোকের কাছে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বহুবার ঠকেছি মশাই। শাঁখ-সানাই বাজিয়ে বিয়ে করুন। একটি ফুটফুটে গৃহিণী নিয়ে আসুন। পাঁচ টাকা কম নিয়ে বাড়ি ভাড়া দেব। বাড়ি যখন করেছি ভাড়াটে চাই বৈকি। আচ্ছা নমস্কার মশাই। হলদে চিঠিখানা দিতে ভুলবেন না যেন।'

অনেক ভেবে চিন্তে নৃপেন সমরকে বলল, 'দেখ সমর, যুধিষ্ঠিরের যুগ চলে গেছে। বাড়ি একটা পেতেই হবে। না হলে আমার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে যে বৈজ্ঞানিকরা এক্স-পেরিমেণ্ট চালাচ্ছে তাদেরও কোনো শাস্তি হচ্ছে না। তুই একটা সামান্য মিথ্যে কথাকে ভয় পাচ্ছিস? শোন আমার ফন্দীটা। যা বলার আমি বলব। তুই চুপটি করে বসে থাকবি। যদি না পারিস তখন অন্য তত্ত্ব চিন্তা করিস। কানাই বলাইকে নিয়ে চমৎকার একখানা বাড়ি আমি দেখে এসেছি। ইউনি-ভার্সিটির একেবারে কাছে। তোর কোম্পানীর দপ্তর থেকেও বেশি দূরে নয়।' চোখটা টিপে নৃপেন আরও বলল, 'সঙ্গীরও অভাব হবে না। সব দেখলেই বুঝতে পারবি।'

সমর বলল, 'নৃপেনদা যা খুশি কর। দেখো আবার জাল-জুচ্চুরি করে জেলে না জীবনটা কাটাতে হয়।'

বিকেলবেলা কোম্পানীর অফিস থেকে এসে সমর চা খেতে বসেছে। উপেন চা দিচ্ছে। তার বেশভূষায় অনেকখানি চেউ খেলেছে। জামাটা ছেঁড়া হলেও কলারটা তোলা। ধুতি পরা সে ছেড়ে দিয়েছে। আর্টিষ্ট হতে হলে চুড়িদার কুর্তা চাই। তা একটা করতে দিয়েছে। দর্জি সেটার ডেলিভারী এখনও দেয় নি। সমরের বকশিসের টাকা পেলেই সেটা উদ্ধার করে আনবে। পাজামাটা টাইট। মাথায় দু' আনা চোদ্দ আনা ছাঁট। গোঁফটা চার্লি চ্যাপলিনের ছায়া অবলম্বনে।

উপেন বলল, 'আজ্ঞে আর কিছু আনব? নিম্‌কিন? এক কাপ চা? চায়ে চিনি কম হয় নি? গরম আছে?'

এতখানি আদরে সমর প্রায় গলে পড়ছিল। হঠাৎ তার আদরের উৎসটার কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'হ্যাঁ রে উপেন, তোর বকশিসের টাকাটা তো নিস নি। এই নে পাঁচ টাকা। মাইনে পেলে আরও পাঁচ টাকা দেব। দেখতো নৃপেনদা ফিরেছে নাকি।'

বলতে বলতেই নৃপেন স্বয়ং হাজির হ'ল।

—'চল সমর। বাড়ি তো নয় বাঘের চোখ। দিল্লী শহরে আজ-কাল টাকা খরচ করলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাচে-লারদের একখানা বাড়ি পাবার উপায় নেই। শোন ভায়া, আমার সব চেয়ে বড় ভয় তোমাকেই। তুমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সাজতে

গিয়েই তো আমাকে দুর্ভোগে ফেলছ। চুপটি করে বসে থাকবে। যেন বাসরের বর।'

ট্যাক্সিতে চেপে দুজনে ইউ-নিভার্সিটির দিকে যাত্রা করে।

গাড়িখানা হুশ করে একটা গেটের সামনে থামলো। নৃপেন গাড়িখানা থামিয়েই রাখলো। ভেতরে প্রবেশ করতেই প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক তাদের অভ্যর্থনা করলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর নৃপেন জানাল, তারা বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে একবার এসেছিল। বাড়ি দেখেও গেছে। এবার আসল ভাড়াটেকে বাড়িখানা দেখাতে চায়।

নাকের ওপর চশমাটা টেনে ভদ্রলোক বললেন, 'ভাড়াটের আবার আসল আর নকল আছে নাকি মশাই। হ্যাঁ শুনেছিলুম তিন-চারটি জওয়ান ছোকরা বাড়ি ভাড়ার জন্য এসেছিল। তা শুনেছেন বোধ হয় বাড়ি ভাড়ার সর্তগুলো? দাঁড়ান। বাড়ির আসল মালিককে ডেকে আনি।' বলে ভদ্রলোক ভেতরের দিকে গেলেন।

নৃপেন সমরকে ইসারায় বলল যেন চালে কোনো ভুল না হয়ে যায়। ভেতর থেকে বেরুলেন কিংকংয়ের নারী সংস্করণ। পরণে লাল পেড়ে শাড়ি। কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ। মুখে এক গাল পান। এসে হেসে সবাইকে নমস্কার করে বললেন, 'আচ্ছা, এর কথাই সেদিন বলছিলেন। কি নাম বললেন? সমরবাবু না? সমরবাব কোথায় কাজ করেন?'

সমর বলল, 'আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। কত ছোটো তাছাড়া—'

নৃপেন ওর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'সেজন্য কোনো চিন্তা নেই। কোম্পানী দপ্তরে কাজ করে। পয়লা তারিখেই আপনারা বাড়ি ভাড়াটা পেয়ে যাবেন।'

—'তা বেশ তা বেশ। ওটা বাড়ি ভাড়ার জন্য বলি নি, তবে জানা দরকার তো। কোথায় বিয়ে করেছো বাবা!'

সমর আমতা আমতা করছে দেখে নৃপেন বলল, 'হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটি গ্রামে। সেখানে অবশ্য যায় নি কখনও।'

—'ও মা তাই নাকি। কোন্ বাড়ি? আমার বাপের বাড়িও তো ওর কাছেই জনাই গাঁয়ে। কোন্ বাড়ি গো? মুখার্জিদের বাড়ি নয় তো?'

নৃপেন বলল, 'ঠিক ধরেছেন মাসিমা। ঐ বাড়িতেই বিয়ে করেছে। এখনও সে গ্রাম দেখে নি সমর।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওমা সে কি? কার মেয়েকে বিয়ে করেছো? মুখার্জিরা যে আমাদের আত্মীয় গো? তাহলে তো তোমরাও আত্মীয় কি বল? আত্মীয়দের কিন্তু বাড়ি ভাড়া দেওয়া চলে না। কি বল গো?'

কর্তা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক কথা। ঠিক কথা।'

বেগতিক দেখে নৃপেন বলল, 'কি রে সমর, কথা বলছিস না কেন? মুখার্জিদের বাড়ি না কি?'

এদিকে তখন সমরের কপাল বেয়ে ঘামের গঙ্গা-যমুনা ছুটছিল। সে কোন কথাই বলল না।

নৃপেন বলল, 'যতদূর জানি মাসিমা, সমরের শ্বশুর পশ্চিমেই মানুষ। মাঝে মাঝে কখনও সখনও গ্রামে গেছেন। সমরের স্ত্রী আগ্রা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এ পাশ করেছে।'

—'ওমা তাই নাকি? তাহলে তো বেশ হবে। আমার অরুণার একটি সাথী হবে বল। বেচারাকে একটু লেখাপড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। উনি ওর রিটায়ার্ড বন্ধুদের নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। মেয়েটার পড়াশুনার এত ঝোঁক। কি বলি তোমাদের বাবা।'

নৃপেন ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন, 'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন। সরমারও একজন সাথী জুটবে। মেয়েটাও ঠিক এই সমরের মতনই গো-বেচারা ধরণের। কারুর সাতে পাঁচে নেই। পাড়া বেড়ানো নেই। পরনিন্দা পরচর্চা জানে না। দিনরাত কেবল বই নিয়ে পড়ে থাকে।'

—'ওমা তাই নাকি?' বলে লেডি কিংকং খিল খিল করে হেসে ফেললেন। মনে হল যেন আটটা


সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ,
কালিদাসে রনাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে
মহাকবির নাট্য-মাধুর্যের প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

# সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

( প্রথম ভাগ )

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী ক্লিওপেট্রা—
অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—
অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রযুগল—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—
অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

( দ্বিতীয় ভাগ )

—এই ভাগে আছে—

১। ওথেলো—অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
(নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত)
২। মার্চেণ্ট অব ভেনিস—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। মেজার ফর মেজার—অনুবাদক ঐ
৪। সিম্বেলিন—অনুবাদক ঐ
৫। কিং লিয়র—
অনুবাদক যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৬। টুয়েলফথ নাইট—
অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য
একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মটকার জল একসাথে কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

—'তাছাড়া আমাদের সমরও খুব কৃতী ছাত্র ছিল। দরকার পড়লে সেও আপনাদের মেয়েকে লেখাপড়া দেখিয়ে দিতে পারবে। জানেন তো এম-এ তে সমর ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিল। সেদিন বলছিল বাড়িটা ইউনিভার্সিটির কাছে হলে ভালোই হবে। মাঝে মাঝে পড়াশুনোর চর্চাটাও রাখা যাবে। তাছাড়া সবচেয়ে যেটা বেশি জরুরী সেটা হল ওর স্ত্রী সরমারও ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করতে অসুবিধে হবে না। সরমাকে ইতিহাসেই এম-এ-তে ভর্তি করার ইচ্ছে আছে ওর। তাই না রে সমর?'

সমর অতি কষ্টে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

লেডি কিংকং মহা খুশি বলেই মনে হ'ল। ভাড়াটে, একটা স্ত্রী টিউটর, মেয়ের ও তার নিজের একজন সঙ্গিনী পাচ্ছেন। এতে তো খুশি হবারই কথা।

নৃপেন তাড়া দিয়ে উঠে পড়ছিল, 'আচ্ছা, আজ আসি তাহলে, বাইরে আবার ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বাড়িওয়ালা ঋণেনবাবু ভদ্রলোক বুঝলেন গৃহিণী এদের প্রতি প্রসন্ন। দুজনের শ্বশুরবাড়িও প্রায় এক গ্রামে। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বলেন কি? বলেন কি মশাই? এক কাপ চা তো খাবেন। তারপর আপনারা কবে বাড়িতে আসছেন ঠিক করলেন? এখন আছেন কোথায়?'

নৃপেন বলল, 'সেটা তো আপনার হাতে। যেদিন অনুমতি দেবেন সেইদিনই ও আসতে পারে। আপাতত আমাদের মেসবাড়িতেই আছে। ভয়ানক অসুবিধে বুঝতেই পারছেন। দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসে। মেসের হট্টগোল ওর ভাল লাগবে কেন? আপনারা অনুমতি দিলে এই আগামী রবিবারেই আসতে পারে। তারপরে আবার ছুটি নিতে হবে। নতুন চাকরী। ছুটি পেলেই সরমাদের নিয়ে আসবে। কি রে সমর, ঠিক কি না?'

সমর অতি কষ্টে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

লেডি কিংকং ফিক্ করে হেসে বললেন, 'আমাদের জামাই কিন্তু মাই বল বাবা, ভয়ানক লাজুক। নয় কি?'

কর্তা একটু হতভম্ব হয়ে গৃহিণীর দিকে কটাক্ষ করেন। গৃহিণী ব্যাখ্যা করে বলেন, 'গ্রাম সম্পর্কে জামাই হল না? ভাগ্নীমহাটির মুখুজ্জেদের জামাই মানেই আমাদেরও জামাই? কি বলো গো?'

বলেই খিল খিল করে হেসে ফেলেন। মনে হল যেন আটটা মটকার জল একসাথে কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

সবাই লেডি কিংকংয়ের হাসিতে যোগদান করে।

ভৃত্য এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। মনে হল বাড়িতে আর কেউ নেই। নৃপেন একটু উস্‌খুস্ করে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, 'আপনাদের বাড়িতে আর কেউ নেই?'

লেডি কিংকং বললেন, 'ঐ তো দুঃখু বাবা। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। আমাদের একটিমাত্র মেয়ে অরুণা। বি-এ পড়ে। সে তার ঘরে বসে পড়ছে। দাঁড়াও ডাকছি তাকে।' বলেই তিনি ভেতরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, 'অরুণা!'

আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। ফর্সা রঙ। চুলগুলো অবিন্যস্ত, বোধহয় আজ সকালেই শ্যাম্পু করেছিল। বিকেলে বাঁধে নি। অপরূপ সুন্দরী। হেসে দাঁড়ালো এসে, 'ডাকছিলে?'

হাসলে মেয়েটার গালে টোল পড়ে। অরুণার মা বললেন, 'এঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দি। এঁর নাম সমরবাবু, উনি নৃপেনবাবু। সমরবাবু আগামী রবিবার আমাদের বাড়ি আসছেন। ওঁর স্ত্রীও বি-এ পাশ।

কর্তা একটুখানি গর্বের সাথেই যেন বললেন, 'সমরবাবু ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। তোমার ভালই হবে, কি বল?'

অরুণা একবার সমরের দিকে আর একবার নৃপেনের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে সোফায় বসলো। অরুণার চোখ দুটো টানা টানা। উজ্জ্বল। যেন মনের ভেতরটাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

নৃপেন এই সব মেয়েদের ভয় পায়।

সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা চল সমর।' ওদের দিকে তাকিয়ে নমস্কার বিনিময় করে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো। যাবার আগে পুরো মাসের ভাড়াটা দিয়ে নৃপেন একটা রসিদ নিতে ভুলল না।


বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাষ
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের প্রথম প্রকাশ
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

মূল্য—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, শেখ বহারী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

২৪৩৭

পার্ক ষ্ট্রীট ও ক্যামাক ষ্ট্রীটের মোড়ের দৃশ্য

## একাল-সেকালের ক্যামাক ষ্ট্রীট অঞ্চল

ডানকান সাহেব কে? তিনি এদেশে এলেন কবে, কী-ভাবে এবং কেন---ইতিহাস তার সদুত্তর দেবে কি না---জানি না। তবে প্রাচীন জনশ্রুতির ম'জে আসা নদী---যেখানে কৌতূহলের নুড়ি ছুড়লেই আজও খানিকটা স্তিমিত গুঞ্জনের সাড়া পড়ে, বহুবার সেখানেই কান পেতে শুনেছি: এ-দেশে ডানকান সাহেব এসেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর সারাহ্নবেলায়। জন্ম তাঁর বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জে। পিতা ছিলেন মৎস্য-ব্যবসায়ী। তাই পিতার সঙ্গে কিশোর বয়সেই তাঁর সমুদ্রে ভাসার অভ্যাস ছিল এবং দিনে দিনে সমুদ্রের সঙ্গেই গ'ড়ে ওঠে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। তখন থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন: একদিন সমুদ্র-পথেই তিনি ভেসে যাবেন দূরে---নিরুদ্দেশে। তারপর নিরুদ্দেশেরই নতুন দেশে বাসা বাঁধবেন---শান্ত সমাহিত একটি বাসা। সে-বাসার ঠিকানা জানবে না বন্ধু-বান্ধব, সেখানে ভীড় ক'রে আসবে না আত্মীয়-পরিজন, আর গায়ে প'ড়ে পায়ের ধুলো ঝাড়ার সুযোগ পাবে না দুর্বিনীত শুভার্থী। তিনি থাকবেন আপন ঘরে একা; গান গাইবেন আপনমনে উদাসীন। সেদিন তাঁর নতুন বাসার উত্তরে-দক্ষিণে যারা ঘর তুলবে---সবাই তারা অপরিজন; পূর্ব-পশ্চিমে যারা বাসা বাঁধবে---সবাই তারা অপরিচিত। দিনে দিনে তাদেরই তিনি জয় করবেন, তাদের সঙ্গেই মিশে যাবেন। তারপর তাদের নিয়েই

### শ্রীপদাতিক

গ'ড়ে তুলবেন নতুন একটি পৃথিবী---যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না বাইরের।

সম্ভবত কৈশোরের সেই স্বপ্ন-সূত্রেই যৌবনের উন্মুখ প্রত্যূষে তিনি সঙ্গী হন বণিকদের। তারপর তাদের সঙ্গেই সমুদ্রে ভেসে প্রথম আসেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজে নেমেই তিনি বণিকদলের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে হারিয়ে গেলেন তীরবর্তী জনারণ্যে। তারপর জনারণ্য পার হয়ে, আরও দূর জন-পদে এসে খুঁজে পেতে চাইলেন নতুন দেশ। কিন্তু নতুন দেশ খুঁজতে গিয়েই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো এক পর্তুগীজ পাদরীর সঙ্গে। পাদরী তাঁকে আশ্রয় দিলেন নিজ মিশনে এবং সেখানেই তাঁকে দীক্ষা দিয়ে বললেন: 'মেরীর নামে উৎসর্গ কর জীবন, তিনি তাঁর অপার কোলের শরণ দেবেন পরকালে।'

কিন্তু ডানকান সাহেব চান ইহ-কালের একটি নতুন পৃথিবী। তাঁর পরকাল তখনো অনেক দূরে। তাই তিনি অত কাতর নন তার দুশ্চিন্তায়। তাঁর দুরন্ত মন দূর-পিয়াসী; দুর্জয় প্রাণ দুঃসাহসিক। সুতরাং পাদরী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কারাকক্ষে তিনি আবাসী হতে পারেন না। ধর্মের অনুশাসনে দুঃশাসিত অভীপ্সা তাঁর পরকালের দ্বারোদ্‌ঘাটনেও রাজি নয়। অতএব সে-কারণেই তিনি মাদ্রাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভাসলেন আবার এবং ভাসতে ভাসতেই দক্ষিণ ছেড়ে সরে এলেন উত্তরে, অর্থাৎ বাংলা দেশে। সমুদ্র পেরিয়ে গঙ্গার পূর্ব-উপকূলে জাহাজ ভিড়তেই তাঁর নজর-বন্ধনে ধরা দিল গড়-গোবিন্দপুরের হরিৎ-স্বরলিপি। তিনি মুগ্ধ হলেন; মনে মনে, অচঞ্চল আবেগের সেতুবন্ধে দাঁড়িয়ে ভাবলেন: এই তাঁর নতুন দেশ! তিনি তাঁর জীবন পাতবেন এখানেই, বাসা বাঁধবেন অচেনা বনের ছায়ায়, গ'ড়ে তুলবেন নতুন পৃথিবী অপরিজনের তীর্থে।

তাই একদিন সকলের অলক্ষ্যে জাহাজ ছেড়ে তিনি গোবিন্দপুরে পালিয়ে এলেন। সেখানে আশ্রয়হীন হয়ে, তিনি আনমনে পায়চারী করলেন কিছুদিন। তারপর একদিন---যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি ঠাঁই পেলেন এক জমিদারের কাছারীবাড়িতে। সেখানে তাঁর আহার-বিহার এবং যথারীতি পরিচর্যার ব্যবস্থাও হলো জমিদারের নির্দেশে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। জমিদারের কাছারীবাড়িতে বসেই, মনে মনে নতুন পৃথিবীর মানচিত্র আঁকেন ডানকান সাহেব। কিন্তু পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ কী-উপায়ে কোন পথে আসবে---তা তিনি ভেবে পান না।---ঠিক এমনই দিনে হঠাৎ এক খবর পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন গড়-গোবিন্দপুরের জমিদার-শ্রেণী। তাঁরা খবর পান: পরিখার

পূর্ব-সীমান্তবর্তী অরণ্যে এসে আস্তানা গ'ড়েছে বর্গী দস্যুর দল। তারা সদল-বলে হানা দেবার উদ্যোগ করছে গোবিন্দপুরে। এ-খবর ডানকান সাহেবও পেলেন। কিন্তু জমিদারদের মতো তিনি অত বেশি বিচলিত হলেন না। বরং সবাইকে আশ্বস্ত ক'রে তিনি ছুটে গেলেন পরিখার পূর্ব-সীমান্তবর্তী অরণ্যে। তাঁর সঙ্গে গেল কিছু-সংখ্যক বল্লমধারী পাইক। এই পাইকদের সাহায্যেই ডানকান সাহেব লতাপাতার আড়াল থেকে অজস্র অগ্নি-গোলক ছুড়ে মারেন বর্গীদের আস্তানায়। আকস্মিক অগ্নিবৃষ্টির ফলেই হঠাৎ ভয় পেয়ে ক্ষেপে যায় তাদের সমস্ত ঘোড়া। এই ক্ষ্যাপা ঘোড়াগুলিকে শান্ত করতে গিয়েই যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে সমস্ত বর্গীকুল, তখন বনের আড়াল থেকেই আবার ডানকান সাহেবের নির্দেশে অবিরাম নিক্ষেপ করা হয় ধারালো বল্লমরাজি। সুতরাং এমন এক অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলেই, জন-কয়েক হতাহত হবার পর আস্তানা ছেড়ে স'রে পড়তে বাধ্য হয় দস্যুর দল।

কৌশলে এই বর্গী দস্যুদের বিতাড়িত করার ফলেই একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মিত্র, অন্য-দিকে তেমনই জমিদারশ্রেণীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন ডানকান সাহেব। তিনি নতুন বাসা বাঁধতে চান, গড়তে চান তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী---জমিদারশ্রেণী তা জানতে পেরেই, তাঁরা একযোগে একখণ্ড জমিদান করেন তাঁকে। এই জমিখণ্ড তখন পতিতাবস্থায় প'ড়ে ছিল অরণ্যের পূর্ব-প্রান্তিক বাদাম-তলার দক্ষিণে। জমিদারদের সাহায্য-লাভে এখানেই এসে নতুন বাসা বাঁধলেন ডানকান সাহেব। তিনি নির্ভীক ; বীরত্বে তাঁর তুলনা নেই। হয়তো সে-কারণেই সান্নিধ্য তাঁর নিরাপদ ভেবে, দিনের পর দিন তাঁরই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এসে বসতির বিস্তার ঘটাতে সুরু করে তন্তুবায়শ্রেণী,

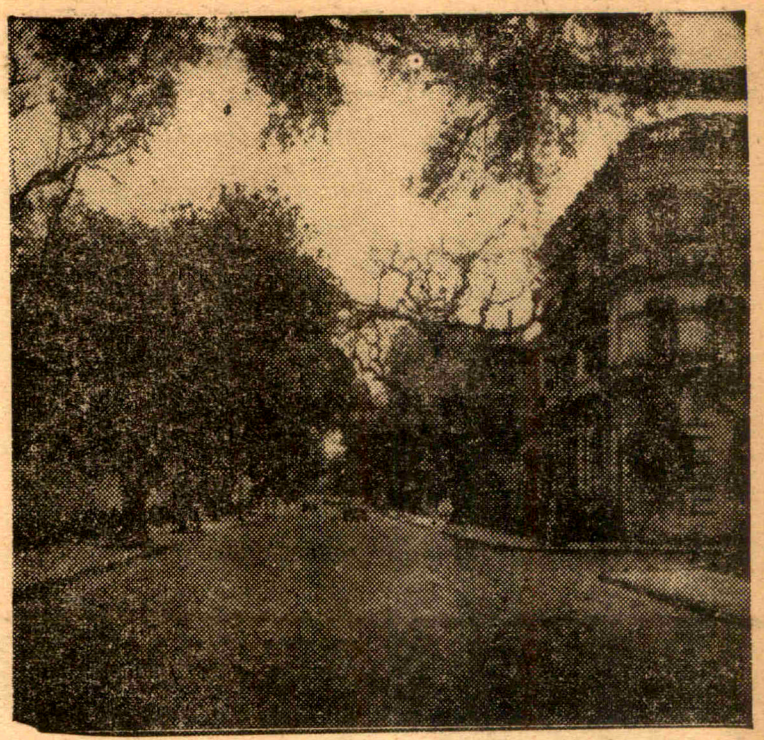

● ক্যামাক ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

কুম্ভকারগোষ্ঠী, সূতসম্প্রদায় এবং কিছু পর্তুগীজ পরিবার।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুকাল। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ডানকান সাহেবের সমগ্র ভূমিখণ্ডে যে-বিশাল বসতির ক্রমপ্রকাশ ঘটে, লোকের মুখে মুখে তখন তার নাম হয় 'ডানকান সাহেব কা বস্তি।' প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা তার কিছু পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই 'ডানকান সাহেব কা বস্তি'-রই অবস্থিতি ছিল বর্তমান ক্যামাক ষ্ট্রীট অঞ্চলে। তখন এই ঘনবস্তির বিস্তৃতি ঘটেছিল বর্তমান ক্যামাক ষ্ট্রীট থেকে উড ষ্ট্রীট পর্যন্ত। তাই তখন উড ষ্ট্রীটও ছিল ঘনবস্তির গভীর দেশে নিমজ্জিত।

সমগ্র ক্যামাক ষ্ট্রীট অঞ্চলে তৎ-কালে এই 'ডানকান সাহেব কা বস্তি'-র অবস্থিতি যে সত্যই ছিল---তার ইতিহাস আছে। কিন্তু ডানকান সাহেব সংক্রান্ত যে-কাহিনীর এখানে প্রকাশ---তা নিছক জনশ্রুতি, ইতিহাস-গ্রাহ্য নয়। অতএব সত্যাসত্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কাহিনীটি কেবল মুখরোচক বলেই আজ তা নিবেদিত হলো প্রিয় পাঠক সমাজের উদ্দেশে। হয়তো ডানকান সাহেবের জীবনালেখ্য কোনো প্রাচীন গ্রন্থে থাকবে---বহু অনুসন্ধান করেও আমরা যার হদিস লাভে বঞ্চিত। এ-সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব বা তথ্য যদি কারো জানা থাকে এবং তিনি যদি সে-বিষয়ে আমাদের অবহিত করতে দ্বিধা না করেন, তাহলে তাঁর কৃতজ্ঞতার পাশে চিরাবদ্ধ থেকে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাবো আমরাও।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে অথবা তার কিছু আগেই সম্ভবত তিরোধান ঘটে ডানকান সাহেবের। তাঁর তিরোধানের পরেই উল্লেখিত বস্তির বুক চিরে উত্তরে-দক্ষিণে প্রকাশ ঘটে একটি সরু পথের এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখেই তখন তার

নামকরণ হয় 'ডানকান সাহেব-বস্তি কা রাস্তা।' এই রাস্তারই সামান্য পশ্চিমে, অর্থাৎ তৎকালীন চৌরঙ্গীর পূর্ববর্তী একখণ্ড জমিতে অবস্থিত মোরাভিয়ান পরিবারের একটি উদ্যান-শোভিত বসতবাটী ক্রয় করেন উইলিয়াম ক্যামাক। তাছাড়া বসবাসের জন্য অন্য এক নতুন বসতবাটীও তিনি গ'ড়ে তোলেন সেখানে। সম্ভবত তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিশের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি একজন দক্ষ স্থপতি এবং একজন স্বাধীন ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠার যোগ্যাসনে অধিষ্ঠিত হন তৎকালেই। ত্রিপুরা এবং ঢাকার আদালতে বিচার-পতিরূপেও তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন কিছুকাল। সম্ভবত ঢাকা থেকে কলকাতায় আসার পরেই তিনি মোরাভিয়ান পরিবারের উল্লেখিত বাসভবন ক্রয় করেন 'ডানকান সাহেব-বস্তি কা রাস্তা'-র পশ্চিম-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই বাসভবনে তিনি এবং তাঁর পরিবার কোনোদিন বসবাস করেছিলেন কি না—জানবার কোনো উপায় নেই। তবে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত বসতবাটীই তিনি আবার বিক্রি করার উদ্দেশ্যে যে-বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তা আজও সংরক্ষিত রয়েছে ক্যালকাটা গেজেটে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

'For sale, that upper-roomed garden-house with about five Jigghas of land, on the road leading from Chowringhee to the burial ground, which formerly belonged to the Moravions. It is very private from the number of trees on the ground, and having lately received considerable additions and repairs, is well adapted for a black family.'

পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ইংরেজ সরকার কর্তৃক সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কার্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ডানকান সাহেবের বস্তির সাবিক বিলুপ্তি ঘটে। এবং তারপর থেকেই উক্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ সংস্কার-সাধিত হয়ে, বিত্তবান এবং সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের এক সুদৃশ্য বসতি অঞ্চলরূপে রূপায়িত হওয়ার সুযোগ পায় ধীরে ধীরে।

সময় এগিয়ে চলে। ইংরেজদেরই অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টার ফলে, দিনে দিনে আরও বিস্ময়কর, আরও অতীন্দ্রিয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে মহানগরী কলকাতা। সময়ের সুনিয়ন্ত্রিত পথে পা ফেলেই সে এগিয়ে আসে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সম্ভবত তখনই তৎকালীন 'ডানকান সাহেব-বস্তি কা রাস্তা-'র রূপ বদলিয়ে নাম ধারণ করে ক্যামাক ষ্ট্রীট। ক্যামাক ষ্ট্রীটের পশ্চিমে একই মর্যাদার অহঙ্কার-ভূষিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে রাসেল ষ্ট্রীট এবং পূর্বে উড ষ্ট্রীট। তাছাড়া আরও পূর্ব-প্রান্তিক ইলিয়ট রোড অঞ্চলের উত্তর বাহুতে প্রতিষ্ঠা পায় রয়েড ষ্ট্রীট। সম-সাময়িক কালে গ'ড়ে ওঠা এই সরণীসমূহ তৎকালীন সম্মানীয় এবং গুণান্বিত ব্যক্তিদের নামেই নামাঙ্কিত হয়। কারণ তখন এমনই এক রীতির প্রচলন ঘটেছিল কলকাতায়। এ-সম্বন্ধে ইতিহাস-অনুরাগিণী শ্রীমতী বিচেনডেনের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

'The custom of naming streets after the most important resident has perpetuated the memory of Sir Henry Russell, a former Chief Justice, of Sir John Royds, a judge of the Supreme Court, who lived in the house afterwards the Doveton College ; and of Lieutenant Camac, an Engineer officer, who, when the town was spreading southward, took up land in a hitherto unbuilt locality, and erected dwelling-houses as a speculation—as did Colonel Wood, another Engineer officer, on an adjoining piece of land.'

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অথবা তার কিছু পরবর্তীকাল থেকে যে-ক্যামাক ষ্ট্রীট পরিবর্তনের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে আশ্চর্য লাবণ্যে রমণীয় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে—আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল অতিক্রম করেও কোনো অংশেই তার কান্তির ছায়া পড়ে নি। যৌবন তার আগের মতোই নবীন, দেহ-বল্লরী তার আজও নেশা ধরায় এবং অস্তিত্বে তার কাব্যের কাকলি বর্তমানেও অব্যাহত।

এ-পথে সাধারণ মানুষের ঠাঁই নেই। এখানে মিঃ ডি জে কোহেন, জে কার্মাইকেল, সি সি বেনেট প্রভৃতি অক্ষয় বিত্তবানদের উদ্ধত মহল যেমন


সাপ্তাহিক বসুমতীর

পরবর্তী আকর্ষণ :

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ধারাবাহিক উপন্যাস

'কৃষ্ণচূড়া'


প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তেমনই বিংশ শতাব্দীর শিখরদেশে যাঁদের কৃত্রিম খ্যাতির পতাকা ওড়ে এবং সেই সূত্রে বিত্তের দেবতাও যাঁদের নজর-বন্দী—সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে আজিমগঞ্জের রাজা, শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আই সি এস, লেঃ কর্ণেল কে কে চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ এস কে দত্ত, ডাঃ পি সি দত্ত—প্রভৃতির উদ্যান-পরিবেষ্টিত বসতবাটীর সমাহার ঘটেছে বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাঁদের জন্যেই অজস্র সুষমা বিলাসে আজও যৌবনবতী ক্যামাক ষ্ট্রীট। তার ক্লান্তি নেই, উৎকণ্ঠা নেই। বার্ধক্য তার পা ছুঁয়েই পিছিয়ে যায় সসম্ভ্রমে।

# রঙ্গদর্শন

**রাজধানী :**

যখন ভারত শিল্পে অনগ্রসর ছিল, তখন কলকাতা তথা বাংলা দেশ ছিল শিল্পে অগ্রণী। আর আজ যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে সমগ্র ভারত শিল্পোন্নত হতে চলেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য।

১৯৬১ সালের জনগণনায় প্রকাশ পেয়েছে, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল, এই দশ বছরে সারা ভারতে জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিকের শতকরা পরিমাণ ৩৯'১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩'০ হয়েছে। অথচ এই সময় পশ্চিমবঙ্গে এই শতকরা হিসাব ৩৪'৫ থেকে কমে ৩৩'২ হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প গড়ে ওঠে নি বলে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে পারে নি। কেবলমাত্র লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে এ সমস্যাকে ধামাচাপা দিলে চলবে না। অন্যান্য রাজ্যেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার দিক থেকে চিত্রটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আজকের দিনে ব্যাপক শিল্পায়ন ভিন্ন বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে বাঙালী কাজ পায় না, এ অভিযোগ অনেক দিনের। এ রাজ্যের অধিকাংশ কল-কারখানা অবাঙালীর হাতে। অবাঙালী শিল্পপতিরা বাঙালীদের কাজ দিতে চান না—তাঁরা অন্য রাজ্যের অধিবাসীদের, বিশেষ করে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের লোকেদের কাজ দেন। বাঙালীরা শ্রমবিমুখ, তাই তারা কল-কারখানায় কাজ করতে চায় না, এমন কথা বলার চেষ্টা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষও এই কথা বলেছিলেন, । কিন্তু বাঙালীর নামে এই অপবাদ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ও ভিত্তিহীন। বাঙালী যুবক আজ যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। কায়িক পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে বাঙালী শ্রমিক অন্য যে-কোন রাজ্যের শ্রমিকের মতই দক্ষ। ১৯৬৩ সালে অক্টোবর মাসের শেষে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রসমূহে যে ৫,১৮,০০০ বেকারের নাম তালিকাভুক্ত ছিল, তাদের অধিকাংশই কল-কারখানায় কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু কে এদের কাজ দেবে?

বাংলা দেশের কল-কারখানায়

শ্রীঅতুল্য ঘোষ

বাঙালীদের কাজ দেওয়া হোক, এ দাবীর পেছনে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা নেই। জাতীয় সংহতি নষ্ট হবার কোন আশংকা নেই। বাংলা দেশের যুবক বাংলা দেশে কাজ না পেলে কোথায় যাবে? আর তা ছাড়া এখন সব রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠছে, বরং বাংলার চেয়ে বেশি হচ্ছে। প্রত্যেকে আজ নিজের রাজ্যেই কাজ পেতে পারে। বেকার সমস্যার চাপে জর্জরিত, উদ্বাস্তু সমস্যায় প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গে আজ যদি কল-কারখানায় বাঙালী কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যের লোকেরা পায়, তবে বাঙালী বাঁচবে কি করে?

এই রাজ্যের কল-কারখানা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের ( অর্থাৎ বাংলা দেশে জন্ম, বাংলা দেশে পুষ্ট, বাঙালী বিহারী যেই হোক ) অগ্রাধিকার দিতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত করেছেন। শিল্পপতিরা যাতে এই সিদ্ধান্তমত কাজ করেন তার জন্য নানা ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বাঙালী শ্রমিকের ( ব্যাপক অর্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসী বাঙালী, বিহারী, নেপালী সবাই) সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় এখনও অতি নগণ্য।

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পে অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকের তুলনায় এই রাজ্যের স্থানীয় শ্রমিকের সংখ্যা কত ছিল, তার এক হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

কাপড় কলে মোট শ্রমিকের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪৪'৭৪ জন বাঙালী—শতকরা ৫৫'২৬ জনই বহিরাগত। পাট শিল্পের অবস্থা খুবই শোচনীয়। —এখানে মাত্র শতকরা ২১'২৯ জন বাঙালী, ৭৮'৭১% জন শ্রমিক অবাঙালী। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা

৫৩'৬০। এই শিল্পে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। ১৯৬১ সালে এই শিল্পে শতকরা ৫৪'১০ জন শ্রমিক ছিল বাঙালী, আর ১৯৬২ সালে তা কমে হয়েছে ৫৩'৬০%। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৪০'০৫ জন। এই শিল্পে বিহার থেকে আগত শ্রমিকের সংখ্যা ২৮'২২%, আর উত্তর প্রদেশবাসী শ্রমিক ২০'৬৫%। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা : কাচ---৪৪'৮০%, রাসায়নিক দ্রব্য---৫৬'৯১%, কাগজ---২৫'২৬%, রবার---৫০-৩০%।

সমস্ত কল-কারখানা এক সঙ্গে হিসাব করলে দেখা যায়, মোট শ্রমিকের মধ্যে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩৯'৯১ জন, অর্থাৎ এখানকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকই বাংলার বাইরের।

কল-কারখানার বাইরে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে, সেখানেও বাঙালীর অবস্থা একই রূপ। ম্যানেজিং এজেন্সীতে বাঙালী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৫৩'৬৬%, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে ৫৮'৬৫%, ইঞ্জিনীয়ার-কনট্রাক্টরদের অধীনে ৫৫'৭১%, বিমান পরিবহনে ৪৫'৩৩%, জলপথ পরিবহনে ২০'৪৩%। এবং কলকাতার ট্রাম কোম্পানীতে ২৫'৮১%।

এই হিসাবে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের কর্মসংস্থানের বিবরণ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানে বাঙালী শ্রমিকের তুলনায় অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পে সরকারী চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালীর কর্মসংস্থানের এই চেহারা। নিজের দেশে আজ বাঙালী কাজ পায় না।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দীর্ঘদিন পরে বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বিরোধী সদস্যগণ পার্লামেণ্টারী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রীবসুর ভূমিকা সত্যই উল্লেখযোগ্য। ভূদেব সেনের মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে বিরোধীপক্ষ সরকারপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য প্রয়োজন মত অনুনয়-বিনয় থেকে সুরু করে, তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ বর্ষণ কোনটাই বাদ যায় নি। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিরোধী-

● শ্রীজ্যোতি বসু

পক্ষ বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করেন নি। অবশ্য এই বিষয়ে কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেরই সম্ভবত নীরব সমর্থন ছিল। তাই প্রবল উত্তেজনার মুখেও কংগ্রেস সদস্যগণ আশ্চর্যকর সংযম প্রদর্শন করেন।

কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন এই দিন প্রথম দিকে সেখান থেকে তিনি একটু সরে দাঁড়াতেই তাঁকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। এই দিন তিনি বলেন যে, ভূদেব সেনের মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তাই বিচার বিভাগীয় তদন্ত দূরের কথা বিভাগীয় তদন্তও হবে কি না বলা মুস্কিল।

বিরোধীরাও সুযোগ পেয়ে গেলেন---তাঁরা বললেন মুখ্যমন্ত্রী পূর্বে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাও আর পালন করতে চাইছেন না। এতে বিধানসভারই অবমাননা করা হচ্ছে। সারাদিন নির্ধারিত কার্যসূচী বাদ দিয়েই দু-পক্ষে বাদানুবাদ চলতে থাকলো। বিরোধী দল নাছোড়-বন্দা তেমনি মুখ্যমন্ত্রীও কিছুতেই নতুন কোন কথা বলবেন না।

এরপর শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসে এমন যুক্তি দিলেন যে, বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিধানসভাকক্ষ দু-পক্ষের আইনজ্ঞদের আইনের প্রশ্ন বিবেচনার ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ালো। শঙ্করবাবুর যুক্তিটা প্রায় এই দাঁড়ালো যে, বর্তমান অবস্থায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের আইনগত বাধা রয়েছে। অপরদিকে বিরোধীপক্ষ বলছেন---না, তা নেই। তাহলে কি করা যায়। মধ্যপন্থা হিসাবে এ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নেওয়ার প্রস্তাব করলেন বিরোধী পক্ষ। তিনি যদি বলেন আইনগত অসুবিধা নেই, তাহলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি চাই।

সরকারপক্ষ নিজের জালে জড়িয়ে পড়লেন---শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নীরব রইলেন বটে, কিন্তু ডেপুটি স্পীকারই বললেন তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেলের অভিমত নিয়ে আইনগত বাধা না থাকলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন। নিরপেক্ষভাবে বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে সেদিন বিরোধীপক্ষ পার্লামেণ্টারী কায়দায় সরকারপক্ষকে ঘায়েল করেছেন।

তার পরের দিনও প্রায় এক ঘণ্টা এই বিষয়েই আলোচনা হল। বিরোধীপক্ষ এই দিনও মুখ্যমন্ত্রীর সুস্পষ্ট অভিমত দাবী করেছিলেন। ঐ দিনও কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক, শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত এবং শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলতে উঠে নিজেদের যুক্তি ভালভাবে উপস্থিত করতে

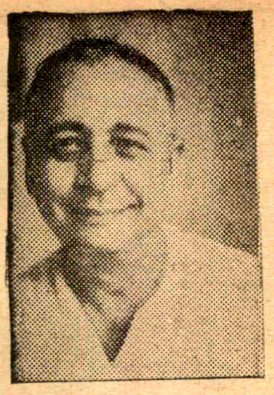

শ্রী শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

না পারায় বিরোধীদের আর এক রাউণ্ড জয় সূচিত হয়।

* * *

বিরোধীপক্ষের সুবিধা ছিল, এই ব্যাপারে জনমত তাঁদের স্বপক্ষে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ছাত্র-সমাজ বিক্ষুব্ধ। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার মত কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। তাই ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের নামে ছাত্র-সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে। কলকাতা আর হাওড়ার রাজপথে ও বিদ্যায়তনে চূড়ান্ত বিশৃংখলা প্রকাশ পেয়েছে। অবস্থা দিনের পর দিন জটিল হয়ে পড়ছিল। বিরোধী দলের বক্তব্যে জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল। সত্য কথাটা যে মুখ থেকেই আসুক উড়িয়ে দেয়া মুস্কিল। সেই সুযোগটাই বিরোধীপক্ষ নিয়েছিলেন।

* *

আলোচ্য সপ্তাহে প্রশাসনিক খাতে ব্যয়-বরাদ্দের বিতর্কে বিরোধী নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ উল্লেখযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রীও এইদিন দীর্ঘ বক্তৃতাতে প্রশাসনিক খাতে সরকারের কৃতিত্বের কথা বলেন। অন্যান্য বছরের মত প্রশাসনিক খাতে আলোচনায় বিরোধী-পক্ষ দুর্নীতির নতুন কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তলে ধরতে পারেন নি। সারা রাজ্য জুড়ে বড বড কয়েকটি ধর্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ চললেও শ্রম খাতে বিরোধীপক্ষ তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। তাই বিতর্কের উত্তরদান-কালে শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার গর্বের সঙ্গেই বললেন, শ্রম-দপ্তরের কাজের যে উন্নতি হয়েছে বিরোধীদের আক্রমণের ধারা থেকেই তা অনুভব করা যায়।

বাজেট-বরাদ্দ উত্থাপন করে শ্রমমন্ত্রী শ্রীনাহার পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেছেন, চাকুরীমুখীন মনোভাব পরিবর্তন করতে না পারলে বাঙালীর বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। শ্রীনাহার আর একটি কথাও স্পষ্ট করে বলেছেন, এ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য বাঙালীর হাতে নেই। বাঙালী ধনিকগোষ্ঠীও এজন্য দায়ী। শিল্পে অর্থলগ্নী করতে তাঁরা চান না।

জরুরী অবস্থা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ দাবী সম্পর্কিত বিতর্কে বিরোধী-পক্ষসমূহের মতানৈক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কমিউনিষ্ট পার্টি, আর-এস-পি, আর-সি-পি-আই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পক্ষে অভিমত দেন। অপরপক্ষে ফরোয়ার্ড ব্লক ও পি-এস-পি সদস্যগণ জরুরী অবস্থার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা অভিযোগ করেন যে, সরকার জরুরী অবস্থার অপব্যবহার করেছেন। বিতর্কের উত্তরদানের সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও আর-এস-পিকে আক্রমণ করেন। মোটামুটিভাবে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকের বক্তব্য সমর্থন করেন।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে বিধানসভায় কমিউনিষ্ট ব্লকের ডাঃ গোলাম ইয়াজদানীর কয়েকটি ছাঁটাই-প্রস্তাব সমস্ত মহলকেই স্তম্ভিত করেছে। এমন কি তাঁর ব্লকের নেতৃবৃন্দও তাঁকে সমর্থন করতে পারেন নি। ছাঁটাই-প্রস্তাবে এমন সব কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যা পাকি-

শ্রী বিজয়সিং নাহার

স্তানের হাতকেই শক্তিশালী করবে। বিধানসভায় সমস্ত দলের সদস্যই এই ছাঁটাই-প্রস্তাব সমূহের জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রস্তাবক দুটি প্যারা প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ছাঁটাই-প্রস্তাব সরকারী ছাপাখানায় পুস্তিকা-কারে ছাপান হয়েছে। কে জানে এই মুদ্রিত অনুলিপি ইতোমধ্যেই পাকিস্তানী চমুদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে কি না?

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৃত্র-সংহার কাব্য

---দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ---

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত

নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা

( নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ )

মূল্য এক টাকা

ধন্বন্তরি

( কোদণ্ড-মণ্ডনম্ )

মূল্য আট আনা

অহল্যা উপাখ্যান ১৲

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

# পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন প্রচেষ্টার কয়েকটি দিক

কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে দেশের সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক ভাগ্য নির্ণয়ের একচেটিয়া অধিকার তুলে দেওয়ার মধ্যে যে অপরিসীম বিপদের আশংকা থাকে, জাতির জীবনে তার চেয়ে ভয়ংকর কিছু কল্পনা করা যায় না। কারণ সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিধি কোন এক শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর পলিমাটি দিয়ে গড়া নয়। হাজার হাজার বছরের, হাজার হাজার মানুষের নিঃশব্দ সাধনায় তা গড়ে ওঠে। কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে (সে দল যত বিরাট শক্তিশালী হোক না কেন) এমন কোন হাতিয়ার আছে বলে আমরা স্বীকার করি না। যে হাতিয়ার দিয়ে তাঁরা এই হাজার হাজার বছরের মন্দির প্রাঙ্গণের মাটি খুঁপিয়ে তাকে জলে ফেলে দিতে পারেন।

বস্তুত রাজনৈতিক দল, সমগ্র জনতার বা সমগ্র অধিবাসীর ভগ্নাংশ মাত্র। এ দাবি করলে তা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে যে, তাঁরা দেশের সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। স্বাধীনোত্তর কালের কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তবু ধরা যাক, যদি কোন দল এই প্রতিনিধিত্ব করেও থাকেন, তবে তাঁদের হাতে দেশের নাম পরিবর্তন করবার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক অধিকারের ছাড়পত্র আছে কি না, তা পূর্বাহ্নে বিচার করা দরকার।

একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। কোন প্রার্থীকে আমি ভোট দিয়ে বিধান সভায় পাঠালাম। এর অর্থ কি এই যে, তিনি যা কিছু খুশি করতে পারেন? না, পারেন না।

দেশের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সীমাকে ধ্বংস করার তাঁর অধিকার নেই, ভোটের সঙ্গে এ অধিকার আমি তাঁকে দিই নি। গণতন্ত্রে এর সমর্থন নেই। গণতন্ত্র বলবে, এই অধিকার তাঁকে পেতে হলে, সংশ্লিষ্ট বিবদমান বিষয়টিকে ভিত্তি করে তাঁকে আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। এই নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা সূচিত হবে—তিনি অধিকার পেয়েছেন কি-না।

## রাজনীতি এবং সংস্কৃতি

রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ সচরাচর ঘটে না, ঘটা উচিতও নয়, যদিও রাজনীতি সর্বদাই সংস্কৃতিকে নিজের লোমশ হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। তার এই চাওয়া, সংস্কৃতি-প্রীতি থেকে আসে নি। এসেছে রাজনৈতিক জীবন আরও নিরুপদ্রব, আরও নিশ্চিত এবং আরও ফলবান করার লোভ থেকে। যে কোন রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা, গুণীজন সংবর্ধনা এ-সবই রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার ও দলের পরিধি বৃদ্ধির এক একটি মাধ্যম মাত্র। যেগুলি অতি সুকৌশলে পরিচালিত হয়। সাম্প্রতিক কালের বহু ঘটনা আমাদের এই অভিমতকে সমর্থন করবে।

তাছাড়া প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষকেও রাজনীতি প্রায়ই সহ্য করে না। কারণ রাজনীতি স্বার্থের দিকে চোখ রেখে চলে। যার মধ্যে সত্যিকারের সংস্কৃতিবোধের জন্ম হয়েছে, যার জীবনে সত্য এবং সংস্কৃতির জন্য সাধনা আছে, এমন মানুষের স্থান, আমাদের পরিচিত রাজনীতির মধ্যে সচরাচর হয় না। কারণ রাজনীতির ব্যবসা, বর্তমানে সত্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, স্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই সত্য উপলব্ধির জন্য গান্ধীজীকে, শেষ জীবনে গভীর বেদনার মধ্যে বারবার নিজের মৃত্যু কামনা করতে হয়েছে, তাঁর কণ্ঠে কান্নার আভাষ বেজে উঠেছে। রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে, আবার সেবাগ্রামের নির্জন জীবনে তিনি ফিরে যেতে চেয়েছেন। তাঁর অপরাধ, যা তিনি সত্য বলে মনে করেছিলেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে গ্রাহ্য না করেও তিনি তা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা বহু আগে এই একই জিনিষ ঘটতে দেখেছি। যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন শ্রেষ্ঠ হোতা, পরবর্তীকালের বাংলা দেশের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি আর যুক্ত হন নি। তিনি বলছেন—

'চাতুরীর দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেকদিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল।'

অতএব যে রাজনীতি স্পষ্টত দেশের প্রকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, দেশের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন এবং একদল লোভী অগভীর মানুষের পেশায় পরিণত হয়েছে, সেই রাজনীতি দেশের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে—এ ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না।

## পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি

দেশের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের চেষ্টা নানা কারণে অপরিণত এবং অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে। সর্বভারতীয় স্তরে,

চীনা এবং পাকিস্তানী আক্রমণ আজ আরো আসন্ন হলে এবং এই আক্রমণ বহুমুখী হবে বলে লোকসভায় সরকার পক্ষ বলেছেন। কাজেই দেশের সংহতি যখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময় এই দুর্বল সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করছেন, যে প্রস্তাবটি অত্যন্ত বিতর্ক সাপেক্ষ এবং যে বিতর্কে সার্থকভাবে যোগ দেবার মত ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা হয়ত অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে অনুপস্থিত। বাংলা দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও আচার-বিচার কিভাবে গড়ে উঠেছে তা জানা সাধারণত রাজনৈতিক দলের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি নিরপেক্ষভাবে গভীরতর চিন্তার দাবি এনেছে যে, এই নাম পরিবর্তন সত্যই সমীচীন কি না!

দ্বিতীয় প্রশ্ন, আজ পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু চলে আসছে, যারা না এসে এখনো সেখানে আছে এবং যারা কখনো আসবে না—এমন যে কয়েক কোটি পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালী মুসলমান —তাদের সকলের সম্পর্কে আমাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে কি না? দেশ বিভাগ হয়ে গেলেই সব কিছু কি ভাগ হয়ে যায়? আমরা দু' ভাই যখন পৃথক হয়ে যাই, তখন কি মাও আমাদের পৃথক হয়ে যায়? না যেতে দেওয়া যায়? না সে মা-কে আমরা অস্বীকার করি? এই মা-ই হ'ল দেশের মাটি এবং সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিকে রাজনীতির ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায় না।

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের যে ক্ষীয়মান যোগসূত্র এখনও অব্যাহত আছে, সে যোগসূত্র সাংস্কৃতিক। রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার ঊর্ধ্বে এখনও এই সাংস্কৃতিক জন্য আমাদের কাছে একমাত্র আশ্রয়স্থল। পশ্চিমবঙ্গের স্থলে শুধু 'বঙ্গদেশ' নাম, আমাদের সেই সাংস্কৃতিক আশ্রয়কে অনাবশ্যকভাবে আক্রমণ করছে।

এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমগ্র ৯০ লক্ষ হিন্দুকে পূর্বাপেক্ষা আরও নিশ্চিতভাবে চলে আসতে হতে পারে। কারণ যে কয়েক কোটি বাঙালী মুসলমান, পূর্ববঙ্গে বাস করেন—তাঁদের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক আজও অক্ষুণ্ণ আছে, আজও যে কয়জন মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বাঙালী হিন্দুদের রক্ষা করেছেন—তাঁদের সঙ্গে আমাদের নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে; যদিও তাঁরা বাংলা ভাষার জন্য, আমাদের হবু 'বঙ্গদেশ'বাসীর নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা, মহত্তর আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের এই 'বঙ্গদেশ'-এ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা (?) করার বহু আগে, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়েছে।

অতীতকালে হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিভক্ত কোন দেশ, নিজেদের নাম পরিবর্তনের চেষ্টা করে নি। পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর ভিয়েৎনাম তার প্রমাণ দেবে। আমাদের দেশ বিভাগের প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব পাশ এবং সেই প্রস্তাবকে কিভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল তা শুনলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়!

প্রস্তাবটির খসড়া রচনা করার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের সময় লেগেছিল মাত্র চারঘণ্টা, এটলি সরকার প্রস্তাব পাশ করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ মিনিট, আর র‍্যাডক্লিফ সারা ভারতকে কেটে দু'টুকরো করেছিলেন মাত্র তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে। এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যে যে দেশ ভাগের জন্ম ও বৃদ্ধি, তা আদৌ নিষ্ঠা এবং শুভেচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা সম্পূর্ণ প্রলেপ মাত্র।

জিন্নাও জানতেন না যে, বাংলা দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তিনিও বলেছিলেন, মানুষটি সর্বাগ্রে বাঙালী, তারপর ভাবা যাবে সে হিন্দু না মুসলমান।

এক অপদার্থ রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে, একান্ত স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমরূপে একদিন যে বঙ্গবিভাগের দুঃখকর জন্ম হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা তার ওপর আরও নিষ্ঠুর আঘাত হানতে চলেছি।

## রাজনৈতিক লাভ ও লোভ

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, নাম পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির বিনিদ্র চিন্তা থেকে আসে নি। পশ্চিমবঙ্গে এই 'বঙ্গদেশ'-এর ভাষা আজও উপেক্ষিত, স্বাধীনতা অর্জনের ২০ বছর পরেও। সরকার একজন নিরক্ষর মানুষকে আজও চিঠি লেখেন অমার্জিত ইংরেজী ভাষায়, যা প্রভু ইংরেজ দাস বাঙালীদের জন্য লিখতেন। বাংলা ভাষা, দেশের শ্রেষ্ঠ ভাষা হলেও, ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নাম শ্রুত নয়, তাঁদের সাহিত্য প্রচারিত হওয়া ত' দূরের কথা। এঁদের চেয়ে অনেক নিম্নমানের লেখক, যাঁরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখেন, তাঁদের নাম এই সব দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বস্তুত রাজ্য সরকারগুলির পরোক্ষ সমর্থন তাঁদের এই সাফল্যের মধ্যে রয়েছে। 'বঙ্গদেশ' নামকরণের জন্য যাঁরা এত উদগ্রীব, তাঁরা কি এই সংবাদ রাখেন?

তাহলে প্রশ্ন আসছে, এই নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনীতি প্রসূত। এবং যে রাজনীতি প্রসূত প্রস্তাব, দেশের সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক জীবনকে বিধ্বস্ত করতে চায়, বিচ্ছিন্ন করতে চায়—সে প্রস্তাব সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আমার নৈতিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকার।

বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষদের এ-বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে।

# আন্তর্জাতিক

● মেক্সিকো সফরে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গল। বিমান-বন্দরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট ম্যাটিয়স।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

**অধিকার বিল ঃ** সামাজিক অধিকার বিল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রাটিক পার্টি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে। সকল ক্ষেত্রে শ্বেতকায়দের মত সমান অধিকার দাবী করে মার্কিন নিগ্রোরা দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে, বর্তমান অধিকার বিল তারই ফল। ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে বর্তমানে নিগ্রোদের প্রতি যে বৈষম্য করা হয়, এই বিলে তা বিলোপের কথা রয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রায় ১০ লক্ষ নিগ্রো ভোটাধিকার পাবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, বিদ্যায়তনে প্রবেশে সমানাধিকার প্রভৃতি নিগ্রোদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবীও এতে মানা হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, কোন রাজ্য এই সব অধিকার ভঙ্গ করার চেষ্টা করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

দল হিসেবে ডেমোক্রাটিক পার্টি এই বিলের সমর্থক। নিগ্রোদের অধিকার রক্ষার জন্য কেনেডি যে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন, অনেকের মতে, তার জন্যই তাঁকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। নতন রাষ্ট্রপতি জনসনও এই বিলকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধিসভায় ২৯০-১৩০ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়েছে।

বর্তমানে বিলটি সেনেটের সম্মুখে রয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে সেনেটে এই বিলের ওপর আলোচনা সুরু হয়েছে। সেনেটে ডেমোক্রাটিক পার্টির বিপুল সংখ্যাধিক্য রয়েছে। মোট ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৬৭ জন ডেমোক্রাটিক দলভুক্ত। এই বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিন্তু সেনেটের ডেমোক্রাটিক দলনেতা মাইক ম্যান্সফিল্ড ও এই বিলের 'ফ্লোর ম্যানেজার হামফ্রে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এর কারণ, ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্য থেকেই এই বিলের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি বিরোধিতা এসেছে। দক্ষিণাঞ্চলের ডেমোক্রাটিক সেনেটরদের এক বড় অংশ এই বিলকে বাধা দেবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন। এঁরা জানেন, শেষ পর্যন্ত বিলটিকে আটকাতে তাঁরা পারবেন না---সেনেটে এই বিল পাশ হবেই। তাই আপাতত এঁদের চেষ্টা হচ্ছে, বিল পাশে বিলম্ব ঘটানো এবং সুবিধামত কিছু কিছু সংশোধন করা। সেনেটে দীর্ঘ বক্তৃতা (মার্কিন সংসদীয় ভাষায় যাকে বলে 'টকেথন') চালিয়ে অন্তত কয়েক মাস অনায়াসেই বিলকে আটকে রাখা যায়। জর্জিয়ায় সেনেটর রিচার্ড ব্রেভার্ড রাসেল এই অধিকার বিল-বিরোধী ডেমোক্রাটিক পার্টি গ্রুপের নেতা। আলাবামার কুখ্যাত গভর্নর ওয়ালেসের সমর্থনপুষ্ট রাসেলের পেছনে বেশ কয়েকজন ডেমোক্রাট সেনেটর আছেন, এঁদের মধ্যে আলাবামার লিস্টার হিল, মিসিসিপির জন স্টেনিস, লুসিয়ানার আলেন এলেণ্ডর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায় ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা ম্যান্সফিল্ড তাঁর নিজের দলের উত্থাপিত বিল পাশ করার জন্য নিজের দলের সদস্যদের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। তিনি সমর্থন পাচ্ছেন, সেনেটে রিপাবলিকান পার্টির নেতা এভারেট ডার্কসেনের কাছ

থেকে। অবশ্য কয়েকজন রিপাবলিকান সেনেটরও বিলের বিরোধিতা করছেন।

মোট কথা, অধিকার বিলের ব্যাপারে দলগত আনুগত্য কেউ মানছে না। সাধারণত উত্তরাঞ্চলের সেনেটররা এই বিলকে সমর্থন করছেন—ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলের সদস্যরাই। আর দক্ষিণের উভয় দলের রক্ষণশীল সেনেটররাই এর বিরোধী। দল ব্যবস্থার এ এক বিচিত্র

* গভর্নর ওয়ালেস

অবস্থা। বৃটেন ও ভারতের সংসদীয় রাজনীতি ও দল ব্যবস্থার সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের কাছে বিষয়টি খুবই অদ্ভুত মনে হবে। এত বড় একটা মূল বিষয়ে যারা একমত নয়, তারা এক দলের মধ্যে আছে কি করে?

উত্তরাঞ্চলের সদস্যরা দ্রুত অধিকার-বিলটি পাশ করতে চাইছেন। এর জন্য প্রয়োজন হলে ম্যানসফিল্ড 'আলোচনা বন্ধ' বা 'closure motion'-ও আনবেন। রিপাবলিকান দলনেতার সমর্থনে 'আলোচনা বন্ধের' জন্য সেনেটে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ করতে পারবেন বলে তিনি আশা রাখেন।

**হেনরী ক্যাবট লজ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের কাজ সুরু হয়েছে। নিউ হ্যাম্পশায়ারে রিপাবলিকান পার্টির প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফলে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। হেনরী লজ্ এই প্রাথমিক নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৩৩,০০৭ ভোট, আর তাঁর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে গোল্ড ওয়াটার ২০,৬৯২, রকফেলার ১৯,৫০৪ ও নিকসন ১৫,৫৮৭ ভোট পেয়েছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও গত নির্বাচনে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ৬১ বৎসর বয়স্ক লজ্ আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়াতে চান না। নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাথমিক নির্বাচনের সময় তিনি দেশে ছিলেনও না, সেই সময় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ম্যাকনামারা ও টেলরের সঙ্গে তিনি ভিয়েৎ কং গেরিলাদের জব্দ করার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যস্ত। তবু রিপাবলিকান দলের প্রথম প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর বিপুল সংখ্যায় ভোটলাভ নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থী-পদে দাঁড়াবার সম্ভাবনাকে জোরদার করে তুলবে।

**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম:**

পাঁচদিনব্যাপী সফর শেষ করে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাক-নামারা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসেছেন। প্রতিরক্ষাসচিবের পদ গ্রহণের পর এই নিয়ে ম্যাকনামারাকে চার বার দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আসতে হল।

ওয়াশিংটন ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাকনামারা জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দক্ষিণ ভিয়েৎ-নাম সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। ১৩ই মার্চ ম্যাকনামারা ফিরেছেন, আর ১৫ই মার্চ প্রেসিডেণ্ট জনসন টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে জনসনের বক্তব্য—(১) দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কিছুতেই কমিউনিষ্টদের জয়ী হতে দেওয়া হবে না; (২) দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে যদি কমিউনিষ্টরা জয়ী হয়, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও তারা জয়ী হবে—এ অবস্থা কোনমতেই ঘটতে দেওয়া চলে না

* জেনারেল নেগুইন খান

এবং (৩) উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কোন পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতির কোন মৌলিক পরিবর্তন হবে না বলেই মনে হচ্ছে। রস্টোর পরিকল্পনা-মত উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঝুঁকিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন নেবে না।

কমিউনিষ্ট ভিয়েৎ কং বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য জেনারেল নেগুইন খানকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হবে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জন্য মার্কিন

সাহায্য বৃদ্ধি করা হবে এবং ভিয়েৎ কং-এর বিরুদ্ধে সৈন্যবল বাড়িয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে তীব্রতর করা হবে। প্রয়োজনমত উত্তর ভিয়েৎনামে নাশকতামূলক কাজ করার জন্য আরও লোক পাঠানো হবে।

গত দু' বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ৬৯ কোটি ডলার খরচ করেছে। তাছাড়া ১৫৫০ জন মার্কিন স্থল ও বিমানবাহিনীর উপদেষ্টা পাঠানো হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে। এর ওপর নেগুইন খান এখনই আরও আড়াই কোটি থেকে পাঁচ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। ম্যাকনামারার সুপারিশ ক্রমে এই অর্থ সাহায্য করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ভিয়েৎ কং বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্য অস্ত্র ও অর্থ দেবার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন কার্পণ্য করবে না।

ম্যাকনামারার দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সফরের সব চেয়ে বড় লাভ, নেগুইন খানের মর্যাদা বৃদ্ধি। মেকং বদ্বীপে ভিয়েৎ কং গেরিলাদের শক্তিবৃদ্ধি, ভিয়েৎনামের নিরপেক্ষতার জন্য ফ্রান্সের চাপ, মার্কিন সাহায্য প্রত্যাহারের গুজব এবং সৈন্যদলের মধ্যে নেগুইন খানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ —এই যখন সামগ্রিক অবস্থা, সেই সময় নেগুইন খানের প্রতি ম্যাকনামারার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা নিশ্চিতভাবে এই ক্ষুদ্রকায় জেনারেলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

## ফ্রান্স :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গল ক্রমেই বেশি তৎপর হচ্ছেন। মার্কিন পত্রিকা 'মনিটর' বিদ্রূপ করে বলেছে, ফ্রান্সের মার্কিন-বিরোধী নীতি জোরের সঙ্গে প্রচারের জন্য দ্য গল বিশ্বের মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখে প্রত্যেকটি ছোটো-খাটো সমস্যায় নাক গলানোর চেষ্টা করছেন। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটু বেকায়দায় পড়েছে সেখানেই দ্য গল ছুটেছেন।

দ্য গলের সাম্প্রতিক মেক্সিকো সফর নিশ্চিতভাবেই এই মার্কিন-বিরোধী কূটনীতির অঙ্গ। কেবল মেক্সিকো নয় ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্র মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। দ্য গল কি এই ক্ষোভকে জাগিয়ে তুলতে চান?

মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ম্যাটিয়সের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দ্য গল

* ক্রুশ্চেভ

মেক্সিকোর অনেক প্রশস্তি গেয়েছেন এবং অনেক বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমানে মেক্সিকোর বৈদেশিক বাণিজ্যের তিন-চতুর্থাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। দ্য গল ভরসা দিয়েছেন, কমন মার্কেটে মেক্সিকোকে সহযোগী সদস্যরূপে গ্রহণ করে মার্কিন নির্ভরশীলতার হাত থেকে তিনি মেক্সিকোকে উদ্ধার করবেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই খারাপ। গত বছর পরমাণু বোমা পরীক্ষা বন্ধের আবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে ফ্রান্স সোভিয়েট ইউনিয়নের আরও চক্ষুশূল হয়েছে। মস্কো পিকিং ও প্যারিসকে প্রায় এক পর্যায়ে ফেলেছে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য দ্য গল আগ্রহী হয়েছেন। ফরাসী অর্থমন্ত্রী গিসকার্ড ডেষ্টিং জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘুরে এসেছেন এবং বিপরীত দিকে সোভিয়েট কাউন্সিলের সহ-সভাপতি রুদলেভ ও পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দলের নেতা-রূপে ক্রুশ্চেভের বিশ্বস্ত সহকর্মী পড়্‌গরণী ফ্রান্স সফর করে গেছেন। প্রাক্তন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এডগার ফরেও সোভিয়েট ভ্রমণে যাচ্ছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দ্য গল নিজেই যাবেন সোভিয়েট ইউনিয়নে—ক্রুশ্চেভের কাছ থেকে সফরের আমন্ত্রণ তিনি অনেক দিন আগেই গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য আছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। চীনের স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রবেশাধিকার, সাইপ্রাসে 'ন্যাটো' সৈন্য নিয়োগ না করা, কম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি, ভিয়েৎনামের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে দ্য গল ও ক্রুশ্চেভের মত একই রকমের। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মৈত্রীসম্পর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ক্রুশ্চেভ দ্য গলের মত এতটা উগ্র মার্কিন-বিরোধী হবেন কি না বলা শক্ত।

## সাইপ্রাস :

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসংঘের তদারকী সৈন্যের প্রবেশ সুরু হয়েছে। ক্যানাডীয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম দল নিকোশিয়ায় অবতরণের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে, দাঙ্গাবিধ্বস্ত দ্বীপে ক্রমে শান্তি ফিরে আসছে। উত্তেজনা থাকলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বন্ধ হচ্ছে। এ নিশ্চিত শুভ লক্ষণ। রাষ্ট্রসংঘের চেষ্টায় সাইপ্রাসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এবং গ্রীক-

তুর্কী সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটুক, এই সকলের কাম্য।

কিন্তু তুরস্কের আচরণ মোটেই মীমাংসার অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না। আঙ্কারা-ইস্তানবুলে তুর্কী ছাত্ররা ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। সাইপ্রাসের উপকূল থেকে মাত্র ১১০ মাইল দূরে ইস্কেন্দ্রনে তুরস্ক বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে তুরস্কের এই প্ররোচনার ফলে যে-কোন মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনুর কাছে দু'টি চিঠি পাঠিয়েছেন। ইনোনুকে লেখা চিঠিতে ক্রুশ্চেভ তুরস্কের এতদিনের সংযমকে প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সংযত থেকে সাইপ্রাস সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ম্যাকারিয়সের নিকট লেখা চিঠিতে নাকি ক্রুশ্চেভ সম্ভাব্য যে-কোন প্রকার তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তুরস্ক কিন্তু ক্রুশ্চেভের চিঠিকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তুর্কীদের ধারণা, সোভিয়েট ইউনিয়ন সাইপ্রাসের পক্ষে---যেমন গ্রীকদের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুর্কীদের পক্ষে। এথেন্সে জনসনের ফেজ-পরা তুর্কী ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে মিছিল হয়েছিল। আর এবার ইস্তানবুলে তুর্কী যুবকেরা ক্রুশ্চেভের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে।

সাইপ্রাসের রাজনীতি থেকে বাইরের সকল রাষ্ট্র যদি হাত না সরায় তবে সাইপ্রাস সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন হবে।

## পাকিস্তান :

ভুট্টোর বাড়া ভাতে আর একবার ছাই পড়ল। বড় আশা নিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে ছুটেছিলেন। ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তান তার মুরুব্বী বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকিয়েছিল। কিন্তু ভারতের তীব্র আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত বৈঠকের আলোচনা মুলতুবী রাখতে হয়েছে, ৫ই মে পর্যন্ত। মে মাসে ভারতের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

এখনই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক করতে হবে, পাকিস্তানের এই জিদ টেকে নি। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রতি-

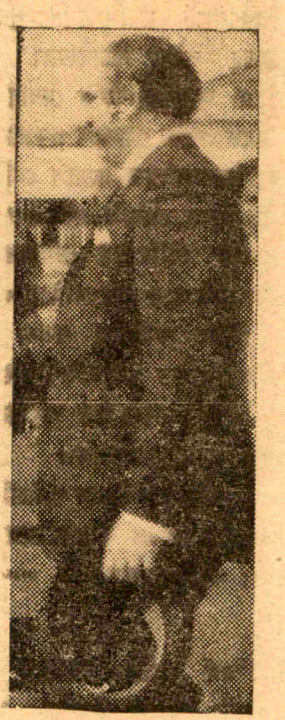

* ভুট্টো।

ক্রিয়ায় ভয় পেয়েছে। গত বারের অধিবেশনে কাশ্মীরের প্রশ্নে পাকিস্তানকে পুরোপুরি সমর্থন করার ফলে ভারতে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা দেখে এবার তারা একটু সাবধান হয়েছে বলে মনে হয়। তবু তারা কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের সমর্থক, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

নিরাপত্তা পরিষদের বিগত অধিবেশন ভুট্টোর অনুরোধে মুলতুবী রাখা হয়। এবার ভারতের অনুরোধে আবার বন্ধ করা হল। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাশ্মীরের ব্যাপারে যে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি এ-বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা প্রায় একমত। আসল কথা হল, কাশ্মীরের প্রশ্ন নয়, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতন---এই আজ নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত।

## সিংহল :

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক তাঁর দলের সদস্যদের সম্মুখে সিংহলের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। তিনি তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রেখেছেন। প্রথম, বর্তমান সরকারের পরিবর্তে কয়েকটি দলের কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে ; দ্বিতীয়, কয়েকটি মূল বিষয়ের ওপর একমত হয়ে সকল দলের জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে---এর জন্য দক্ষিণপন্থী ইউনিয়ন, ন্যাশনাল পার্টি ও ভারতীয়দের তামিল ফেডারেল পার্টি থেকে সুরু করে মার্ক্সবাদী দল, লঙ্কা সমসমাজ পার্টিকেও ডাকা হবে ; আর, তৃতীয়, বর্তমান সংসদীয় শাসন ভেঙে দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শ্রীমতী বন্দরনায়কের বক্তব্য, সিংহলে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়। হয় দলাদলি ভুলে সকলকে একযোগে তার সম্মুখীন হতে হবে, নয়তো দলীয় ও সংসদীয় শাসনের পরিবর্তে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা ব্যর্থ হলে যে হতাশা দেখা দেয়, তার থেকেই জন্ম হয় একনায়কতন্ত্রের। বার্মায় তাই হয়েছে। সিংহলও কি একই পথে অগ্রসর হচ্ছে ?

# রঙ্গজগৎ

## চলচ্চিত্রে কালো টাকার উৎপাত

**কালো** টাকা বা ব্ল্যাক মানির উৎপাত চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বেশি। একথা প্রায় সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন এবং উচ্চস্তরের ১৪জন অফিসারকে নিয়ে এক তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে। এই দলের প্রথম কাজ চলচ্চিত্র-শিল্পকে নিয়ে শুরু হয়েছে। কারণ এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের রিপোর্টে চলচ্চিত্র-শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের দুজন চিত্রতারকা সম্পর্কে রিপোর্টে সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ বলা হয়েছে, তাঁরা আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অল্প টাকার চেক গ্রহণ করে পরে গোপনে প্রকাশ্য চুক্তির টাকা অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করেছেন। বড় বড় 'তারকা'দের এভাবে বেশি টাকা গ্রহণ করে কম দেখাবার যেমন রীতি হয়ে গেছে, তেমনি এমন এক ধরণের ব্যবসায়ী রয়েছে যারা চলচ্চিত্রে বেশি অর্থ বিনিয়োগ দেখাবার জন্য কর্মীদের প্রাপ্য অপেক্ষা কম টাকা দেয়। প্রকৃত লাভের অংক কম দেখিয়ে একদিকে আয়করের ব্যাপারে সরকারকে ফাঁকি দেয় অন্যদিকে কর্মীদের বঞ্চনা করে। এরূপ অসাধু প্রযোজকদের মধ্যে কয়েকজন তথাকথিত 'প্রগতিশীল'ও রয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের মধ্যেও কেউ কেউ চুক্তির সর্ত অনুসারে প্রাপ্য অংশ ছাড়াও ছবির মুক্তির জন্য গোপনে অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

সিনেমায় কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান যদি যথার্থভাবে পরিচালিত হয়, তবে এই তদন্ত ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। কেবল 'তারকা'দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রযোজক এবং প্রদর্শকদেরও ধরা দরকার। ------সুজন।

● সত্যজিৎ রায়

## চিত্র আলোচনা

### স্বর্গ হতে বিদায়

( দিবিত্রি ফিল্মস )

শ্রীমতী মঞ্জু দে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী। অভিনেত্রী থেকে এবার তিনি আত্ম-প্রকাশ করলেন চিত্র পরিচালিকা রূপে। এই নতুন পরিচালিকাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শ্রীমতী দের প্রথম পরিচালিত ছবি 'স্বর্গ হতে বিদায়' সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। প্রেমের ব্যর্থতা মানুষের জীবনকে যেমন অধঃপাতে নামিয়ে দেয়, আবার প্রেমের যাদুস্পর্শে অধঃ-পতিত মানুষ নিজের হারানো জগৎকে খুঁজে পায়; সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই মর্মবাণী ছবিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অমলের জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কমল ভালবেসেছিল বড় লোকের মেয়ে শিপ্রাকে; শিপ্রা কিন্তু কেবল ভালবাসার অভিনয় করে গেছে। কেন? সে কথা শিপ্রার বাবা একদিন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। অমল আর শিপ্রা দুজন দুই সমাজের মানুষ। একজন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের আর একজন ধনী ও অভিজাত সমাজের। সুতরাং তেলে জলে সম্পর্কের মত এই দুই জাত এক হতে তো পারে না প্রণয়ের ব্যর্থতায় হতাশাগ্রস্ত অমল জীবনের পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়। যে কোন উপায়ে অর্থ অর্জন করে সে শিপ্রাদের জাতে উঠতে চায়। এবং এই বিভ্রান্তিতে সে চতুর অপরাধীতে পরিণত হয়। বিনা চাবিতে সিন্দুক খুলে চুরিতে সে এমন ওস্তাদ হয়ে ওঠে যে, শহরের পুলিশ বিভাগ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে তার সহকর্মী শম্ভু ধরা পড়ার পর তারও এল অনুশোচনা। এই অপরাধীর জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে সে গাড়ি চেপে বসলো। পথে দেখা চন্দনার সাথে। এই পরিচয়ের সূত্রে তার ভেসে যাওয়া জীবন নোঙর ফেললো পাটনায়। এখানে চন্দনার ভালবাসা, সাজানো গোছানো বাড়ি, আর সৌখীন দ্রব্যের বিপণি খুলে তার জন্য যেন স্বর্গ রচিত

হলো। তাদের ভালবাসা যখন পরিণয়ে পৌঁছবার পথে, এমন সময় তাদের রচিত স্বর্গ হতে তাকে বিদায় নিতে হলো। চন্দনারই ভগ্নীপতি গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় চালান দিল। ছবিটির চিত্রনাট্যের অবলম্বন---অভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্প।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ছবিটি কোন মহৎ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা বা শিল্পগত প্রেরণায় নির্মিত হয় নি। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, দর্শক মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেই চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা হয়েছে। সুতরাং হাল্কা রসে মনোরঞ্জনের উপাদান ছবিতে দর্শকরা পাবেন। মনোরঞ্জনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার ফলে পরিচালিকা বিশ্বাস্য পরিবেশের ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারেন নি। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। এই দৃশ্যটি পুলিশের কর্তব্যপরায়ণতার এক অতি-কল্পনার চিত্র। যে অমল অনুশোচনায় অপরাধীর জীবন ত্যাগ করে চলে এসেছিল, সে সিন্দুক খোলার যন্ত্রটি কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিল যৌক্তিকতায় তা বোঝা যায় না। সর্বোপরি এরূপ গতানুগতিক অপরাধ কাহিনী চিত্রের পরিবর্তে আমরা নতুন পরিচালিকার কাছে আরো সমাজ চেতনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করেছিলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাহিনী বিশ্লেষণ হলে ছবিটির সম্ভাবনা আরো বাড়তো। স্থানে স্থানে অবশ্য পরিচালিকার শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে। ক্যাবারে সঙ্গীতের এবং আরো কয়েকটি দৃশ্যে শব্দের ব্যবহার এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

প্রধান দুটি চরিত্রে দিলীপ মুখার্জি ও মাধবী মুখার্জি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। একটি পার্শ্ব চরিত্রে জহর রায়ের অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখার্জি, পাহাড়ী সান্যাল, সুমিতা সান্যাল, আশা দেবী প্রমুখ। হেমন্ত মুখার্জি পরিচালিত আবহসঙ্গীত ছবির মেজাজ যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে। জিন ম্যাকনামারার ইংরেজী গানটি এবং আরো কয়েকটি বাংলা গানে ছবিটি উপভোগ্য হয়েছে।

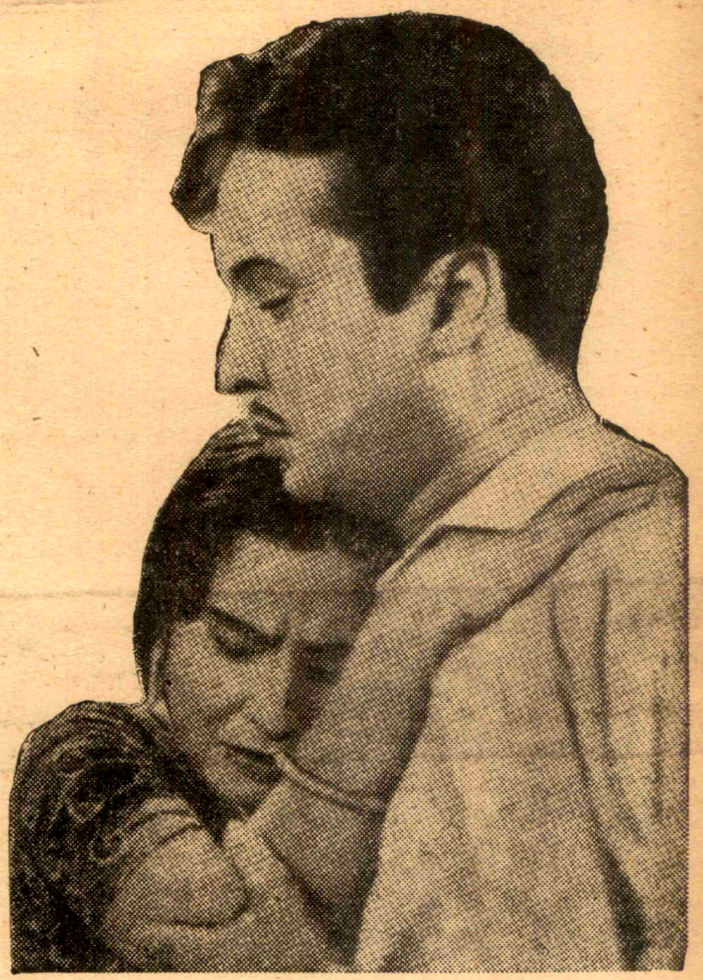

● 'স্বর্গ হতে বিদায়' ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জি ও দিলীপ মুখার্জি।

## অপ্রতিদ্বন্দ্বী চলচ্চিত্র স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রতিযোগিতা করবে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রতি-যোগিতা করছে ভারতের রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায়। পরিষ্কার করে বললে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের দিক থেকে ভারতের স্থান দ্বিতীয় কি তৃতীয়। অথচ বিদেশের চলচ্চিত্র মানচিত্রে আমাদের তেমন স্বীকৃতি ছিল না। সত্যজিৎ রায়ই বাংলা চলচ্চিত্রকে স্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি নির্মাণ করেছেন 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'পরশপাথর', 'দেবী', 'জলসাঘর', 'অভিযান', 'তিনকন্যা', 'কাঞ্চন সংঘ' এবং 'মহানগর'। প্রাথমিক জীবনীচিত্র রূপে তাঁর নির্মিত 'রবীন্দ্রনাথ' এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

চলচ্চিত্রকে নাটকের বেড়াজাল

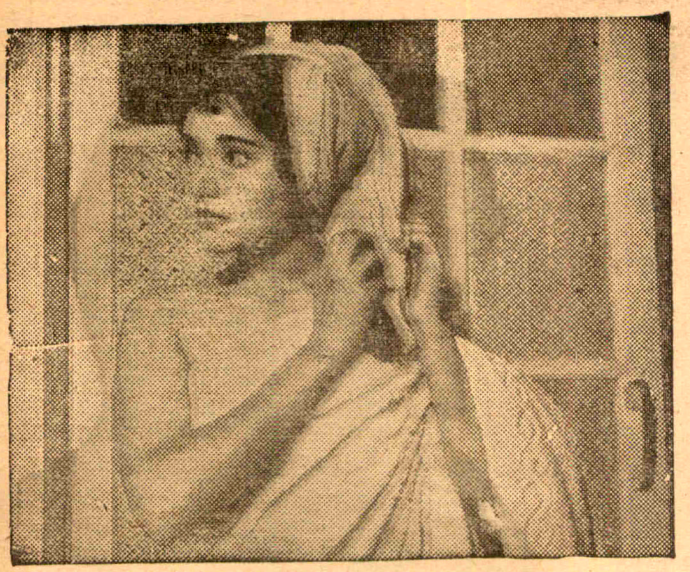

'লীডার' ছবিতে বৈজয়ন্তীমালা

থেকে মুক্ত করে তার একান্ত নিজস্ব ভাষায় নিজের গল্প শোনাবার জন্য ইউরোপে যে চলচ্চিত্র আন্দোলন সুরু হয়েছে, সত্যজিৎ রায় বাংলা দেশে সেই চলচ্চিত্র স্বাধীনতার আন্দোলন সূত্রপাত করেছেন। তারই অনসারী হয়েছেন আরো কয়েকজন তরুণ পরিচালক। এঁদের সংখ্যা আজ বেশি নয়, কিন্তু একদিন এঁরাই বাংলা চলচ্চিত্রে নেতৃত্ব করবেন। বাস্তবের পথে চলচ্চিত্রের এই যে অভিযান এ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছেন: ইতালীয় ছবির বাস্তবতা, সারল্য আর মানবতাই এ যুগের চলচ্চিত্র-শিল্পে যথার্থ সুরের সন্ধান দিয়েছে। সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত সহজ সরল উপায়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করে থাকেন। এই সহজ সরলতা তাঁর উপার্জিত সম্পদ। তাঁর ছবিতে মানবতাবোধ প্রবল। তিনি সমাজ সচেতন। এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণে তিনিই 'মহানগর' এবং 'দেবী'র মত ছবি করতে পারেন। তাঁর প্রয়োগপদ্ধতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং ব্যবসায়িক দিক উপেক্ষা করে তাঁর ছবি বিকাশ লাভ করে।

সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমেরিকার 'পাটিশান রিভিউ' পত্রিকায় পলিন কায়েল লিখেছেন: Although Indian film industry is the second or third largest in the world, Roy is the only Indian director; he is, as yet, in a class by himself. Despite the financial conditions under which he works, despite official disapproval of his themes, despite popur indifference to his work, he is in a position that almost any film-maker anywhere in the world might envy.

সত্যজিৎ রায়ের বিদেশী এই স্বীকৃতি বাস্তবিকই গৌরবের। অনেক শিল্পী আস্তে আস্তে সাফল্যের সোপান পেরিয়ে চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁচেছেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় এমন শিল্পী যিনি একটি মাত্র এবং প্রথম ছবিতেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনখণ্ড অপু নিয়েই সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছেন। পলিন কায়েল বলেছন: সত্যজিৎ রায় যদি তিনখণ্ড অপু তৈরি না করতো তা হলেও তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলতে বাধা থাকতো না। সর্বক্ষেত্রে 'দেবী'কে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে স্বীকৃতি দিতে বাধা থাকতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'দেবী' ছবি বিদেশে প্রদর্শনে সেন্সার বোর্ড বাধা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে সে-বাধা অপসৃত হয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয়তাবাদীর নামাবলী পরিহিত কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'দেবী'র বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছিল।

সত্যজিৎ রায় একাধারে তাঁর ছবির প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রচারবিদ। সঙ্গীতের ব্যাপারে যেমন তাঁর অনুরাগ, তেমন তাঁর ক্ষমতা আছে। বাংলা ছবিতে চলচ্চিত্র সঙ্গীতের এক নতুন রূপ তিনিই প্রবর্তন করেছেন। এই সঙ্গীতরূপে ব্যবসায়ী মহল সন্তুষ্ট না হলেও শিল্প-রসিকমহল নতুন রসের স্বাদ পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের কথায়: সিনেমা হচ্ছে এমনই একটি শিল্প যেটির মধ্য দিয়ে দৃশ্যে, শব্দে, বর্ণে, জীবনের হুবহু রূপটি প্রকাশ করা যায়। যা অন্য কোন শিল্প মাধ্যমে এমন করে সম্ভব হয় না। চলচ্চিত্রের কাঁচামাল তাই জীবন, জীবন আর জীবন। পরিচালকের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন: জীবনের যে দিকগুলি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা, ধ্যান ধারণা গভীর ও সঠিক সে দিকগুলিই তিনি ছবির মালমশলা হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। যা জানি না তা নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক কেবল নয়, মারাত্মক প্রবঞ্চনা। যেহেতু চলচ্চিত্রের কাঁচামাল জীবন, সেহেতু সেখানে কোন ভাণ পাপ।

( সত্যজিৎ রায় ও আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে পাঠকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যোগ্য বিবেচিত হলে রঙ্গজগৎ-এ প্রকাশ করা হবে।

মঃ সাঃ বঃ )

# খেলা ধুলা

## খেলাধুলায় মনস্তত্ত্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও সুরু হয়নি। কলকাতার ময়দানে মহামেডান দলের একাধিপত্য। মহামেডানের খেলা থাকলে মাঠে মেলা বসে যেত। অখণ্ড ভারতের মুসলমান খেলোয়াড়দের বাছাই করা টিম। ফরোয়ার্ড লাইন যেন হিটলারের সাঁজোয়া বাহিনী, আর রক্ষণভাগ ঠিক যেন ম্যাজিনো লাইন, এক চুল নড়ায় কার সাধ্য। রসিদ, রহমৎ, আব্বাস সেলিম, রহিম—ছবির মতন তাদের খেলা। ধরমতলা, চাঁদনি, রাজাবাজার, পার্ক-সার্কাস উজাড় করে লুঙ্গির মিছিল, খেলার শেষে নামাজের ঘটা, যেন 'ঈদ'-এর মেলা। মাঠে ঢোকাই মুস্কিল। ঢুকলে মুখ সামলে চলতে হয়। রসিদ একটি সুন্দর গোল করল। 'সাবাস রসিদ—নবাবকা লেড়কা—কিয়া খেলিস!" একটা সহজ গোল মিস করল অমনি শত কণ্ঠে গর্জন, 'নিকালো শালেকো—খানসামাকো লেড়কা।' হয়ত কোন দর্শক মন্তব্য করল রহমতের খেলা অপূর্ব। অমনি পাশ থেকে টিপ্পনি—'রহমৎ আচ্ছা খেলেগা, না তেরি বাপ খেলেগা।' লীগের রাজত্ব, ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতি একাকার। দেমাকে মুসলমানরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

অতি দর্পে হত লঙ্কা। খেলার ব্যাপারেও কথাটা খাটে। কালীঘাটের সঙ্গে মহামেডানের খেলা। খেলাটা হচ্ছে মহামেডানের মাঠে। কালীঘাট টিম ঘাবড়ে গেছে। টিটকিরির ঘরনা চলল কয়েক মিনিট ধরে। দর্শকদের মধ্যে কালীঘাটের সমর্থক মুষ্টিমেয়, তারাও ভয়ে ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। কালীঘাট দল বলে আক্রোশটা বেশি।

সোনালি রোদ্দুর সবুজ ঘাসের বুকে ঝিকমিক করছে। খটখটে শুকনো মাঠ। বাঁশী বাজাতে না বাজাতে দুর্ধর্ষ মহামেডান দুর্বল কালীঘাটের টুঁটি চেপে ধরল। দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কয়েক মিনিট এই

**শ্রীঅমিতাভ**

প্রচণ্ড চাপ কালীঘাট দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল। কালীঘাটের ফরোয়ার্ড লাইন তখন পিছিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করছে। হঠাৎ পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল একটা বল জন যোশেফ জয়া কালীঘাটের এই ট্রায়োর খেলা খুলে গেল। তাদের পায়ে যেন আঠা লাগান। নূর মহম্মদ, আকিন আমেদ ও মাসুমের মত দুর্ধর্ষ হাফ লাইনকে তারা বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়ল এবং টুক করে একটা গোল ঢুকিয়ে দিল অতর্কিতে। মাঠে কোন আওয়াজ নেই—একমুঠো কালীঘাটের সমর্থকের ক্ষণিকের উল্লাস। কিন্তু সেন্টার করার সঙ্গে সঙ্গেই মহামেডান আবার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল এবং সেই প্রবল আক্রমণের মুখে কালীঘাটের রক্ষণভাগের পতন হল। এক মিনিটেই গোল শোধ। মহামেডানের সমর্থকরা কুৎসিতভাবে নৃত্য সুরু করে দিল। কিন্তু আবার চাকা ঘুরে গেল, কালীঘাটের ফরোয়ার্ড লাইন সেদিন যে খেলা দেখাল তার তুলনা নেই। নিখুঁতভাবে বল আদান-প্রদান করে তারা আর একটি গোল করল। কিন্তু মহামেডান সেদিন শত চেষ্টা করেও সে গোল শোধ করতে পারল না।

এইরকম উৎকট দম্ভ ও অহঙ্কারের পটভূমিকায় আর একটি ফুটবল খেলার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৩৮ সালের কথা। বার্লিনের ষ্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ-দুটি জাত চিরশত্রু। হিটলারের দাপটে সারা ইউরোপ তখন ভয়ে কম্পমান। খেলার আগে হুকুম হল; ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দেরও জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে হিটলারী ঢঙে নাজী স্যালুট দিতে হবে। খেলোয়াড়রা বেঁকে বসল। এ অপমান তারা সহ্য করবে না। ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন খেলোয়াড়দের বোঝালেন, এটা ভদ্রতা। এর ব্যতিক্রম হলে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হবে। এমন কি খেলার পর খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অগত্যা খেলোয়াড়রা রাজী হল।

জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা মাঠে নামল। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডান হাত বাড়িয়ে নাজী স্যালুট দিল। কিন্তু তাদের মুখে প্রতিজ্ঞার মৌন ছায়া—এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। জার্মানীর খেলোয়াড়দের চাল-চলনে ঔদ্ধত্যের চরম বিকাশ। যেমন তাদের সুগঠিত চেহারা, তেমনি তাদের বিরাট আকার; মনে হয় যেন সব এক ছাঁচে গড়া। তুলনায় ইংলণ্ডকে মনে হচ্ছে সার্কাস পার্টি; কোনটা বেঁটে, কোনটা লম্বা, কোনটা রোগা, কোনটা দোহারা। দল হিসাবে জার্মানী বেশি শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া নিজেদের মাঠে বিপুল দর্শকের সমর্থন তাদের অতিরিক্ত শক্তি যোগাবে। কিন্তু বন্ধুবিহীন

ইংলণ্ড অপমানের প্রতিশোধের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে খেলা আরম্ভ করল। ফুটবলের যাদুকর ষ্ট্যানলী ম্যাথুজ জার্মানীর রক্ষণভাগকে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে একটি অপূর্ব সুযোগ করে দিলেন। লেফট ইন সেই চলতি বলের ওপর ভলি মারলেন। গোলকীপার কিছু বোঝার আগেই বল গোলে ঢুকল। পর মুহূর্তেই জার্মানী গোলটি পরিশোধ করল। কিন্তু ম্যাথুজ ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠলো এবং তার অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপণ্যের ফলে হাফ টাইমের আগেই ইংলণ্ড ৪ গোলে অগ্রগামী হল এবং জার্মানী ২টি গোল পরিশোধ করল।

দর্শকরা আশা করল, জার্মানী হয়ত বিরতির পর ইংলণ্ডকে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে। জার্মানী ২টি গোল পরিশোধ করল বটে, তবে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ৬-৩ গোলের ব্যবধানে এই আন্তর্জাতিক খেলাটি জিতল। খেলার পর ইংলণ্ডের অধিনায়ক এডি হ্যাপগুড বললেন—

'হিটলারী দম্ভই আমাদের অতিরিক্ত প্রেরণা যুগিয়েছিল এই খেলাতে। অন্য পরিবেশে খেলার ফলাফল অন্য রকম হতে পারত।'

## পরাজয়ের গ্লানিতে

কুের কাছে হেভি ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব খেতাব হারানোর পর সোনি লিস্টনের এখন যেন শনির দশা চলছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়া সোনি লিস্টনের কাছে নতুন কিছুই নয়। ওদেশের পুলিশের কালো খাতায় বহুদিন আগেই একজন কুখ্যাত দাগী হিসাবে সোনির নাম উঠেছে। ছোট-খাট মারামারি, ডাকাতি, খুন-জখমের অভিযোগে সোনি বহুবারই জেল থেকে ঘুরে এসেছেন। জেলের মধ্যেই সোনির বক্সিংয়ের হাতেখড়ি। বক্সিংয়ের মাধুর্যে লিস্টন আকৃষ্ট হয়ে জেলের মধ্যেই নিরলস কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন। তাঁর অপরাধ-প্রবণ মনে এল অনেকটা পরিবর্তন। নিজেকে একজন মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে সোনি বললেন যে,

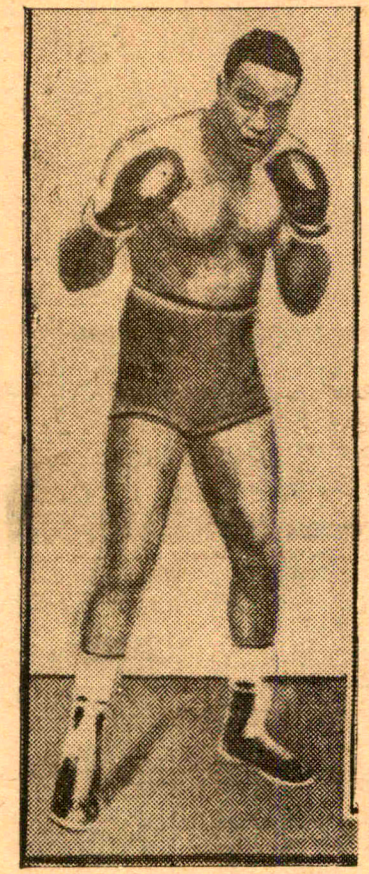

● লিস্টন

'আমাকে ভাল হবার সুযোগ দেওয়া হোক, আমি ভাল হব।'

এক নিগ্রো পরিবারে ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জন্ম। জ্ঞান হয়েই দেখেছেন পারিবারিক অশান্তি, শৈশবে বা কৈশোরে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসার আস্বাদ কোনদিন পান নি। কচি-কোমল মন তাঁর অল্পতেই পোড় খেয়ে গেল; এই বয়সে পেটের তাগিদায় যখন উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়ালেন, সমাজের অন্ধকার দিকটার হাতছানিকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। সোনির ভাগ্যটাই খারাপ। তিনি কোনদিনই লোকের ভাল চোখে পড়লেন না। মাত্র কয়েকদিন আগে নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে পাগলের মত ৭৬ মাইল বেগে লাইসেন্স-বিহীন অবস্থায় গাড়ি চালান এবং কার্তুজভরা পিস্তল রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন সোনি লিস্টন।

## ফুটবলার না স্বর্ণখনি

একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের মূল্য ৯০,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। একথা বিশ্বাসই যেন করা যায় না। আমাদের দেশে পেশাদারত্বের চল নেই বলেই এই রকম টাকার অঙ্ক দেখলেই আমরা চমকে যাই। আমাদের দেশে ফুটবলে স্যামেচারিজমের (অর্ধ পেশাদার) চল আছে। দেশের নামী খেলোয়াড়দের তলায় তলায় যে তোড়া দিয়ে ঘায়েল করা হয়, তার অঙ্কটা আমাদের দেশের তুলনায় কম নয়। তবে খাতায় কলমে এটা পকেট খরচ হিসাবেই চালান হয়, গায়ে অপেশাদারের নামাবলী চড়িয়ে। ইংলণ্ড, ইতালী, স্পেন, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে এক একজন জাত খেলোয়াড় হলেন এক একটা স্বর্ণখনি। এঁদের দলে টানার জন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্লাব ওৎ পেতে আছে। আর এই সব বিভিন্ন দলের টানা-হেঁচড়ায় নিলামের মত এই সব খেলোয়াড়দের দামও তাই ঊর্ধ্বগামী হয়। ইংলণ্ডের যে ভাগ্যবান খেলোয়াড়টি ৯০,০০০ পাউণ্ড লাভ করেছেন, তাঁর নাম হল ক্রেগ পিকারিং। পিকারিংয়ের বয়স মাত্র ২২ বছর। ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিসনের ব্যাক বার্নের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন তিনি। ৯০,০০০ টাকার তোড়া নিয়ে তবে পুরণো দল ছেড়ে তিনি এভারটনে যোগ দিয়েছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ।

# হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

## হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আতঙ্কে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। ছদ্মনামের কীর্তি, ৫। যেসা দেওগে তেসা পাওগে, ৬। খুড়োর খামখেয়ালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্কলন—চাবি ও খিল, একরাত্রি মাটি, চোরাই বাড়ী, হেলেখেলায় একদিন ও যম-যাদাড়। ৮। ভৌতিক কাহিনীর সঙ্কলন—এক রাত্রের ইতিহাস, করাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাপকাটা হাঁচি, শয়তান, তেলকির হমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জামা। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথের ওওকথা, ১১। হলিউডের টাকার পাহাড়।

**মূল্য তিন টাকা**

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

—যৌনশাস্ত্র ও যৌনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা—

।। জটিল প্রশ্নগুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ ।।

* * পাঁচটি খণ্ডে গভীর তত্ত্ব ও প্রচুর তথ্যের অভাবনীয় সমাবেশ * *

অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

# যৌন মনোদর্শন

( নরনারীর দেহমিলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ )

দ্বিতীয় খণ্ডে : স্বয়ংরতি—মূল্য ৪·০০ ॥ তৃতীয় খণ্ডে : কামাবেগের বিশ্লেষণ—মূল্য ৩·০০ ॥ চতুর্থ খণ্ডে : প্রেম ও পীড়া—মূল্য ৪·০০ ॥ পঞ্চম খণ্ডে : কামাবেগের নিয়ত কালিকলের ব্যাপারসমূহ—মূল্য ৪·৫০ ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম, সর্বাঙ্গীণ, নিরপেক্ষ আলোচনা

# রবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

১৩ খানি মুদ্রাপ্য আলেখ্য ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত

মূল্য ১ টাকা ৫০ নঃ পঃ মাত্র

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্তিমান বিকাশ

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্বরসের সাগর-

একাধারে বিশ্বশ্রুত-কীর্তি শক্তিমান,

সর্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

## রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলমীক, শঙ্খশূল, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, প্রফুল্ল চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, লয়লা-মজনু। মূল্য ১৲ টাকা।

২য় ভাগে—হিরণ্ময়ী, হরিষের লীলা, লোভেজ-গবেজ, টাটকা-টোটকা, বনভূষণ, বেদুয়ে বাঙালী বিবি, জড়, সাময়িক কবিতা। ৮খানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

বিখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দের

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-রত্নাকর ৷৷০

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-পূজাপদ্ধতি সম্বলিত )

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মদিরা

( ১ম ভাগ )—১৲ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্বাণ ৷৷০

ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ৷৷০

বিপিনবিহারী মিত্রের

সোরাব ও রস্তম্ ৷৷০

( অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদিত )

লোকনাথ ভট্টাচার্যের

আয়তি ১৲

সংসারত্যাগী রাজর্ষি কবি ভর্তৃহরির

শান্তিশতকম্

( তীব্র বৈরাগ্যের শান্তিস্তব ) ৵০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

12 APR 1964

# বাগানের শোভায় ঘর ভরে তুলবে

## স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ

সেরা কাঁচের দরকারে সর্বদা এইচ, পি, জি, কাঁচই নেবেন

বর্ষার, ঝড়ে অথবা দারুণ ঠাণ্ডায়—যে কোন অবস্থায়ই আপনি আরামে ঘরে বসে আপনার বাগানের শোভা উপভোগ করতে পারেন। ঘরে স্বচ্ছ কাঁচ লাগিয়ে নিলেই হলো। কাঁচে ঝামেলা কম, খরচা অল্প আর তা দেখতেও চমৎকার। কাঁচ লাগালে আপনার ঘর প্রশস্ত মনে হবে, বাইরের আলো ঘুরে আসবে কিন্তু আওয়াজ ও ধুলোময়লা ঢুকবার পথ পাবে না। আর কাঁচ পরিষ্কার করতেও কোন ঝামেলা নেই। কাঁচ অফিস কাজে লাগে—অফিসে, স্কুলকলেজে, হাসপাতালে, দোকানে, হাজারো জায়গায়। নানা মাপের নানা রকম পুরু কাঁচ পাওয়া যায়। আপনার যে কোন প্রয়োজনে এইচ, পি, জি, কাঁচের শীট ব্যবহার করতে পারেন।

**হিন্দুস্থান-পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড**

রেজিঃ এজেন্টস: তালুকদার ন' অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

IWTHP 2666

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

সম্পূর্ণ রোগমুক্তির পর শ্রীনেহরু নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পর্ষতের সভায় সভাপতিত্ব করছেন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১২শে চৈত্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • 2nd April, 1964 • Vol. 68, No. 45

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

*With best compliments from :*

# KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly Kesoram Cotton Mills Ltd.)

LARGEST COTTON MILL IN EASTERN INDIA.

*Manufacturers & Exporters of*

**QUALITY FABRICS AND HOSIERY GOODS.**

***Managing Agents :***

## BIRLA BROTHERS PRIVATE LTD.

15, India Exchange Place,

Calcutta-1

**Phone : 22-3411 (16 lines)** **Gram : "COLORWEAVE"**

***Mill at :***

**42, Garden Reach Road, Calcutta-24**

**Phone : 45-3281 (4 lines)** **Gram : "SPINWEAVE"**

# সূচীপত্র

756.3
·003/3
X.68
no. 45


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৪৫৯ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৪৬০ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২৪৬১ |
| আজকের যুগোশ্লাভিয়া | মৈত্রেয় | ২৪৬৫ |
| বর্ষশেষ ( কবিতা ) | ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার | ২৪৬৮ |
| গ্রন্থমেলা | .. | ২৪৬৯ |
| দূরন্ত দেহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৪৭০ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২৪৭২ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে ( উপন্যাস ) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২৪৭৮ |
| পৃথুমালিনী কথা ( রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী ) | সুভাষ সমাজদার | ২৪৮২ |
| অপরাহ্ণ ( কবিতা ) | মৃত্যুঞ্জয় মাইতি | ২৪৮৫ |
| লাল জল নীল জল ( গল্প ) | সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ | ২৪৮৬ |



রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

**উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

**বাঙলা কথাশিল্পী**

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

**বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী**

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহাজয়া, সপ্তপদী

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

**অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

**বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থাবলী**

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

**বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী**

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

**যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী**

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

**শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২**

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| খবর ( কবিতা ) | সুমিত মিত্র | ২৪৯০ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৪৯১ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৪৯৩ |
| দৃশ্যের সম্ভার ( কবিতা ) | কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত | ২৪৯৬ |
| বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ( কবিতা ) | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ২৪৯৬ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৪৯৭ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৫০১ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৫০৬ |
| পাঠক মন | ... | ২৫১০ |
| সংবাদ বিচিত্রা | সাংবাদিক | ২৫১১ |
| খেলাধূলা | ... | ২৫১২ |

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১।।০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক
# বসুমতী
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৬৮ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১৯শে চৈত্র ১৩৭০

25 Naya Paise
Thursday, 2nd April 1964

## পাক-অনুপ্রবেশকারী

ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গার নামে যে বিপর্যয় ঘটে গেল—তার জন্যে পাকিস্তানী চররাই একমাত্র দায়ী—তাদের মারাত্মক মুষল-মুদ্গরগুলির একাংশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একথা আজ প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের সরকারের দূরদৃষ্টির অভাবেই পাকিস্তানীরা ভারতের বুকে তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপ নির্বিবাদে এতোদিন ধরে চালিয়ে এসেছে। একদা আসামের হানাহানির মধ্যেও তাদের গুপ্ত হস্ত যে কার্যকর ছিল—তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যা হোক, অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ঠকে শেখার পর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের চোখ খুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত পাক-গুপ্তচরদের সংখ্যাটাও আজ আর আন্দাজ করা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতীয় সংসদের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিং-এর হিসেব অনুযায়ী ঐ তিনটি রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বে-আইনীভাবে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের সংখ্যা কম পক্ষে পনের লক্ষ। কেবল আসামের কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ সদ্য আসাম সফরান্তে জানিয়েছেন যে, শুধু সেখানেই পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা তিন লক্ষ।

এইসব অনুপ্রবেশকারীরাই সারা দেশব্যাপী অঘটন সৃষ্টির জন্যে দায়ী। এদের বহিষ্কার করার একটা সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এবং পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ নিবারণের জন্য আসাম সীমান্তে একমাইল সম্পূর্ণ জনশূন্য রাখার ও নিরাপত্তা-বাহিনীর শক্তি-বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখন 'ঘটা' করে কিছু করার মতো সময় নেই। যা করণীয় তা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। কেন না, পাকিস্তান ভারত আক্রমণের নেশায় মশগুল। ঐ কারণে তারা তৈমুরপ্রেমী চীন শাসকবন্দের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছে। দিন কয়েক পূর্বে স্বয়ং ভুটোই ভারত আক্রমণের কল্পনায় সেকথা স্বীকার করে ফেলেছেন। অথচ ভারতের বুকে এই সময় পাক অনুপ্রবেশকারীরা কী রকম তৎপর, তা শ্রীরঘুনাথ সিং দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত করেছেন। এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে, কয়েকজন পাক অনুপ্রবেশকারীকে ভারত ত্যাগের নোটিশ দেওয়া হলে সেই দিনই সন্ধ্যায় পাকিস্তানী রেডিও থেকে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু আশ্চর্য হবার মতো ঘটনা নয়, এ যেন তাজ্জব ব্যাপার। এইসব ব্যাপার থেকে আমাদের নিজেদের অসামর্থ্য ও দেশের প্রতি দায়িত্বহীনতার কথাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শ্রীনন্দের কথামতো এ কথা যদি সত্য হয় যে, পাক অনুপ্রবেশকারীদের কিছু লোক আশ্রয় দিচ্ছে—তাহলে বিপদ শুধু বাইরেই নয় ভেতরেও রয়েছে এবং শিলংস্থ পাকিস্তানের সহকারী হাই কমিশনের অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপও গুরুতর অপরাধজনক।

তাই এখন কোনোরকম নোটিশ জারী করলেই ভারত সরকারের কর্তব্য শেষ হবে না। পাক অনুপ্রবেশকারী ও তাদের সহায়কদের কঠোর হস্তে দমন করার সংকল্প গ্রহণ করলেই ভারত তার গুপ্তচরদের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। মনে রাখা দরকার, দিন-তারিখ দেখে সিদ্ধান্ত নেবার মতো সময় আর একদিনও নেই।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

অনেক যুগ আগেকার কথা। তখন ইরাকে আব্বাসী খলিফাদের আমল। সেই তখনই বাগদাদ ছিল সকল দেশের বিদ্বজ্জনের স্বর্গভূমি। সেই আমলেও বাগদাদে সাদরে অভ্যর্থিত হতো ভারতের চিৎসিকবৃন্দ। সেই দূর দেশ থেকে সংস্কৃতির বাণী নিয়ে ছুটে এসেছেন একালেও একজন। কতো রাজনৈতিক উত্থান-পতন হলো। শেষ হলো কত ঝড়-ঝঞ্ঝার। তবু রাজনীতিবিদের বাণীতেই ঘোষিত হয় আজ সোচ্চারে—'ভারত ও ইরাকের মধ্যে যে নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বর্তমান, তা আমার এই সফরে দৃঢ়তর হবে।' যিনি শিল্পীর মতো দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, দেশ-দেশান্তরের ঐক্যের সেতু নির্মাণ করাই যাঁর কাজ—তিনি রাজনীতিবিদ্ বা অন্য যাই হোন না কেন—আমাদের কাছে বরেণ্য তিনি সংস্কৃতির দূত হিসেবেই। সংস্কৃতির অগ্রদূত মহাত্মা আলবেরুণীর পর আজ আবার আরব দেশগুলি থেকে যাঁকে পেলাম তিনি হচ্ছেন ইরাকের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আবদুল সালাম মহম্মদ আরিফ।

সংস্কৃতির যিনি প্রবক্তা, সৈনিক জীবন থেকে বর্তমানে যিনি ফিল্ড মার্শাল, স্বদেশের যিনি রাষ্ট্রপতি—তিনিই আবার ঘনায়মান সমস্যার মুহূর্তে আহূত হন আরব শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতির সম্মানিত আসন গ্রহণের জন্য। গত জানুয়ারী মাসে শ্রীআরিফ সেই কঠিন দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে সারা আরব জগতে শ্রদ্ধার পাত্ররূপে স্বীকৃত হয়েছেন। এখন তিনি ভারতের মহান অতিথি।

সামান্য ঘরের ছেলে একজন সামান্য সৈনিকের মনে কতটুকুই বা আশা থাকতে পারে? শ্রীআরিফও একজন পেশাদার সৈনিক হিসেবেই হয়তো জীবনপাত করতেন। কিন্তু প্যালেস্তাইন রণক্ষেত্রের পরাজয় করে তুললে তাঁকে চঞ্চল; সন্ধান পেলেন তিনি বৃহত্তম জীবনের। আবিষ্কার করলেন স্বদেশের রাজনৈতিক চরিত্র। হীন শাসকবৃন্দের জন্যই প্যালেস্তাইনের পরাজয় তাঁকে প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির ক'রে তুললো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন: জঘন্য নূরি অল্ সৈয়দ রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ করা কি সম্ভব। বিশেষত তাঁর মতো একজন নামমাত্র কর্নেলের পক্ষে। আবদুল করিম কাসেম তখন একজন জবরদস্ত জেনারেল। তবু দুজনের মিলন হলো। আরিফের ওপর অর্পিত হলো গুরুদায়িত্ব। ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই ঝড়ের মতো ক্ষিপ্র বেগে রাজপ্রাসাদ অধিকার করে তিনি সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করলেন। সফল হলো হাসেমাইট বংশের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিদ্রোহ। প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো সারা ইরাকে। কিন্তু আরিফের আশা এখানেই শেষ হবার কথা নয়; নাসের ভক্ত আরিফের সম্মুখে রয়েছে আরব সংহতির প্রশ্ন ও প্রচেষ্টা। এখানেই মতভেদ ঘটলো কাসেমের সঙ্গে আরিফের। অথচ একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন কাসেম। তাই অনন্যোপায় শ্রীআরিফ বিপ্লবের চার মাস পরেই দেশের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে রাষ্ট্রদূতের বেশে যাত্রা করলেন পশ্চিম জার্মানী। কিন্তু ক'দিন পরেই ফিরে এলেন বন থেকে বাগদাদে। কেন না, যে বিশ্বাস তিনি মনে মনে লালন করেন, প্রাণ দিয়ে তাকে প্রতিপালন করতে চান। তাই এখন তিনি পুরোদস্তুর বিদ্রোহী। সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। কাসেমও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আরিফের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন যে, তাঁকে সে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে দারুণ অপরাধী।

আবদুল সালাম মহম্মদ আরিফ

মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত হল না, এবার এল অন্য অভিযোগ। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কাজে শ্রীআরিফ লাভ করলেন মৃত্যুদণ্ড। চিত্ত কিছুটা দ্রবীভূত হলো কাসেমের। সত্যিই যদি আরিফ ভুল বোঝে একদিন নিজের। তাই মৃত্যুদণ্ডের বদলে আরিফ লাভ করলেন বিশ বছরের কারাদণ্ড। নির্জন কারাবাসে আরিফের মন বদলেছে ভেবে মুক্তির আদেশ দেওয়া হলো তাঁকে ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে। দু' গালে চাপ চাপ দাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি কারাগার থেকে। মুখের ভাব ঢাকা পড়েছে শ্মশ্রুর আড়ালে। কিন্তু পরে বোঝা গেল তখনও তিনি অচল এবং অটল। কাসেমকে গদীচ্যুত করাই তাঁর একমাত্র পণ। ১৯৬৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী কাসেমের শাসনের যবনিকা পতন হলো। সৈন্যবাহিনী ও বাথিষ্টদের সাহায্যে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হলেও বাথিষ্টরা প্রতারিত করতে চাইলো তাঁকে। জনগণও বাথদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এগিয়ে এলেন আবার মুক্তিদাতা আরিফ। তারপর এলো কুর্দ-বিদ্রোহ। কিন্তু কোনো কিছুই হার মানাতে পারলো না শ্রীআরিফকে। দেশের কাছে আত্মোৎসর্গীকৃত ৪৩ বৎসর বয়স্ক এই পুরুষ আমাদের দেশে সংস্কৃতির যে বাণী শুনিয়ে গেলেন, তা যুগে যুগে সত্য হোক দুই দেশের অমলিন সেতুবন্ধনে।

# রাজধানী :

চৈত্রের প্রচণ্ড রোদে পশ্চিম বাংলার বুক তপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হতে চলেছে। বাংলার সরস মাটির সোহাগভরা আকুল আহ্বান আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসছে একটানা একটা যন্ত্রণাকাতর দীর্ঘনিশ্বাস। প্রতিকারহীন বেদনায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

এমনি মর্মান্তিক, দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি স্বাধীন ভারতের অংগরাজ্য পশ্চিম বাংলাকে আর কোন দিন হতে হয় নি।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে এই রাজ্যের মানুষের আত্মীয়পরিজন একবস্ত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন সীমান্তে। যাঁরা এখনও সেখানে পড়ে রয়েছেন তাঁদের চিন্তা, যাঁরা এসেছেন তাঁদের ভবিষ্যতের ভাবনা সমাজদেহকে পীড়িত ক'রে তুলেছে। মা সরস্বতী দেশবাসীর শিক্ষা-সংহারের সঙ্কল্প দেখে বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ করে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টান পড়েছে অনেক কাল আগেই। বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে ধ্বকগুলো জমজমাট হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশের এই চিত্র দেখেই বোধহয় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা জাতির দুর্ভাগ্যদশার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন।

তিনি সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ীদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধনকালে বলেছেন, জাতি এখন একটা আগ্নেয়গিরির অবস্থার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র জাতির ক্ষেত্রে একথা সত্য হলেও পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে অবস্থা আরও খারাপ। এই রাজ্য এখন অগ্নিগর্ভ। ভেতরে তার বেদনার, আত্মগ্লানির, আত্মপ্রবঞ্চনার গলিত লাভা টগবগ করছে। মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর বিস্ফোরণও যে না হচ্ছে

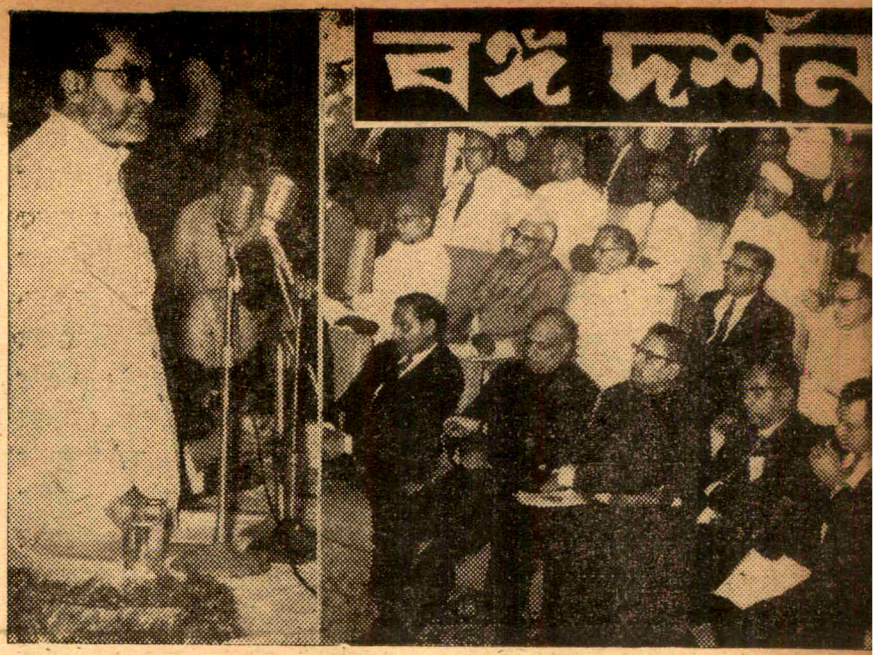

# বঙ্গ দর্শন

● শ্রীঅশোক মেহতা ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন

তা' নয়। এই বিস্ফোরণই বছরের প্রথম দিকে শহর কলকাতা ও তার আশেপাশে ঘটেছিল। সেদিনও এই বিস্ফোরণের ফলে বালখিল্যের দল বিদ্যায়তন ধ্বংসের জিগির তুলেছিল।

এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে অচিরে রচনাত্মক শুভ শক্তিতে রূপায়িত করে তুলতে না পারলে বিপদ অনিবার্য। এর জন্য যে উদ্যম ও প্রয়াস প্রয়োজন তার ইঙ্গিত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত। তাঁদের দাবী এক হলেও আন্দোলন পরিচালিত হবে আলাদা ভাবে। সকলেই চান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, ভূদেব সেনের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত, আরও কত কি। কিন্তু কোন দলের কাছ থেকেই দেশবাসীর কাছে উত্তেজনাময় পরিবেশের পরিচয় ছাড়া গঠনমূলক কোন কর্মসূচী আসছে না। এমন কি, চরম আঘাত পেয়ে যাঁরা উদ্বাস্তু নাম নিয়ে আমাদের দ্বারে এসেছেন তাঁদের একটু সান্ত্বনার কথা শোনাবার প্রয়োজনও যেন নেতারা বোধ করছেন না।

বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের কম নয়। এবার অবস্থাটা প্রথম থেকেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। জনমতের চাপে পড়েও অনেকে উদ্বাস্তুদের সমালোচনায় বিরত ছিলেন। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার ঘটনাবলী আবার বায়ুকে বিষিয়ে তোলবার অবস্থা করে তুলছে। এর প্রতিকারের প্রয়াস পূর্ব থেকেই করা উচিত ছিল। এখানে বিরোধী দলগুলির দায়িত্বও কম নয়। তাঁদের সকলের সংস্থাই সর্বভারতীয় সংস্থা। বাংলার দলগুলোর নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হলেই বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে তাঁদের কমরেডদের দিয়ে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। তা' না করে কলকাতার রাস্তায় মিছিল করে এবং মালা পরে সহাস্য বদনে পুলিশের গাড়িতে উঠে কারাবরণ করলে সমস্যার কোন সুরাহা হবে না। হতেও পারে না।

* * *

আমরা জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একবার বলেছিলাম, দণ্ডকারণ্যে আট হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের বসবাস সম্ভব হতে পারে। এখন শুনছি দশ হাজারের বেশি সম্ভব নয়। এর মধ্যে এক লক্ষ বিশ হাজারের মত উদ্বাস্তু এসে পৌঁচেছেন। অগণিত মানুষ গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছে। শীগগিরই

তারাও এসে পড়বে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার মেহেরবানি আমরা আগেও শুনেছি। শোনা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দণ্ডকারণ্যের বিলি-ব্যবস্থায় শ্রীখান্নার ভূমিকা সম্পর্কে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি না কি, এ বিষয় বিস্তারিতভাবে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের সাথে আলাপ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও খান্না সাহেবের কাজে সন্তুষ্ট নন। সব দিক মিলিয়ে উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ যেন ঘোরালো হয়ে উঠছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য চাই তৎপরতা, অদম্য সাহস ও বিরাট সংহতি। তাতে সরকারের দায়িত্ব প্রধান হলেও বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা একেবারে নগণ্য নয়। তাঁরা বাইরে থেকে নিশ্চয়ই সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

* *

উদ্বাস্তুর চাপ ও বেকার সমস্যা মিলে পশ্চিম বাংলায় যে ভয়ানক দুর্গতির সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করতে হলে শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। কৃষির প্রসারে আর তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। অনাবাদী জমির অভাবই তার প্রধান কারণ। দেশের শিল্পায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছোট, বড় ও মাঝারী শিল্পের মালিকদের এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে পূর্ণ আঁতাত। আমাদের দেশে সেইটির অভাব বেশি। বাংলার যুবশক্তিকে আরামপ্রিয় চাকুরী জীবনের মোহমুক্ত হওয়ার দিন এসে গিয়েছে। তা' করতে না পারলে সমস্যার সুরাহা সুদূরপরাহত হয়েই থাকবে। এ কাজে রাজ্য সরকার অগ্রণী হলেই কাজটা সহজ ও সুগম হবে। শিল্পায়নের জন্য সকলের আগে প্রয়োজন কাঁচা মালের সরবরাহ ও তৈরি মালের উপযুক্ত বাজার। এ ছাড়া পরিবহন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থার প্রশ্ন রয়েছে।

বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাবার প্রশ্নটি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীঅশোক মেহতার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার দাবী মেটাবার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় আর্থিক আনুকূল্যের আবেদনের বিষয়ে শ্রীমেহতার মতামত আজও জানা যায় নি। কেন্দ্রের মত যাই হোক না কেন, পশ্চিম বাংলার দাবী যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পশ্চিম বাংলা সাহায্য পাচ্ছে ১৫৬ কোটি টাকা। সর্ত ছিল রাজ্য সরকারকে তুলতে হবে ৯০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার ৯০ কোটি টাকার অধিক তুলতে পারলে পরিকল্পনার

● শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না

আয়তন বাড়িয়ে ২৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি কেন্দ্র থেকে পাবার আশা পশ্চিম বাংলা সরকার করছেন, তাঁরা ১৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি তুলতে পারবেন। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় পশ্চিম বাংলার উদ্যম সত্যি প্রশংসনীয়।

শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থার চিত্র দিয়ে বলেছেন যে, অনেক রাজ্য তাঁদের পরিকল্পনা রূপায়ণের দেয় অংশের প্রতিশ্রুত টাকা তুলতে পারে নি। তাঁরা কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিক অর্থ সাহায্য চাইছেন। তা' না পেলে তাঁদের পরিকল্পনার অঙ্গচ্ছেদ করতে হবে। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বাংলার দাবীর ভিত্তি খুবই পাকাপোক্ত। সে তার সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু তার সমস্যার সমাধান আরও ২৭ কোটি টাকা ভিন্ন অসম্ভব। এই ২৭ কোটির ২০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে না পেলে শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। শিক্ষকদের বর্ধিত বেতনও সে দিতে পারবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শেষের দিক থেকেই পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুতের ঘাটতিতে শিল্পের অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই কারণেই পশ্চিম বাংলার শিল্পায়নের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের রাজ্য পরিকল্পনাটি সচদেব কমিটীর সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিম বাংলার এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার অর্থ সাহায্যে নয়াদিল্লীর নারাজ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

* * *

রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের বাজেট অধিবেশনের আকস্মিক সমাপ্তি ঘোষণায় বিরোধী মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ২৬শে মার্চ, বৃহস্পতিবার যেভাবে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা' কিছুটা অভাবনীয় সন্দেহ নেই। বিধান পরিষদে ৩০শে মার্চ, সোমবার বে-সরকারী প্রস্তাবের ওপর বিতর্কের কথা ছিল। বিধানসভাও স্পীকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার বেলা ১টায় সুরু হওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের আদেশে ৩০শে মার্চ থেকে বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণায় বিরোধী দলগুলির বিস্মিত হওয়া আশ্চর্যের কিছুই নয়।

বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বাজেট অধিবেশনের এই আকস্মিক সমাপ্তি ঘোষণাকে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্য আইনসভার অধিবেশন এবার প্রায় সাত সপ্তাহ চলেছে। এই সাত সপ্তাহে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের নিস্তরংগ কক্ষে উথালি-পাথালি তরংগাঘাতে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিও হয়েছে। অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ ছাড়া কাজের কাজ কতটা হয়েছে তা' ভাববার দিন এসেছে। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের ছাত্রের মৃত্যুর তদন্তের দাবী থেকে সুরু করে ২৪ পরগণা ও নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে পুলিশের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে বিতর্কের তুফানে একটা খণ্ড প্রলয়ের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একজন মহিলা সদস্যার প্রতি ডিম নিক্ষেপ করতেও কসুর করা হয় নি। কিন্তু কোন বিষয়েরই সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ দেশবাসী তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছ থেকে পায় নি। আইনসভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণায় বিরোধী পক্ষ যেমন হতবাক হয়েছেন, ঠিক তেমনি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাণ্ড-কারখানা দেখে দেশের মানুষও বিব্রতই বোধ করছেন।

পশ্চিম বাংলার বুকে অশান্তির সম্ভাবনা দেখে সকলের আগে তার প্রতিকারের দাবীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে নেমেছিল দেশের যুব-সমাজ ও ছাত্র মহল। সম্পূর্ণ শান্তির পথে তারা মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে। এ নেতৃত্ব আসা উচিত ছিল দেশের রাজনৈতিক দল এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মানুষের কাছ থেকে। ভূদেব সেনের মৃত্যুতে ছাত্রসমাজ হতচকিত হয়ে পড়ে। তারাও হয়ে পড়ে নেতৃত্ববিহীন। ফলে কিছু সংখ্যক বিকারগ্রস্ত বিমূঢ়বুদ্ধি সমাজ-বিরোধীরা আসর জমিয়ে তোলে। শিক্ষক-সমাজ ও দেশের নেতারা, এমন কি, দেশের সরকার এর পরিণাম চিন্তা করে এদের সঠিক পথে টানবার চেষ্টা করলে আজ বিদ্যামন্দিরগুলির দ্বার রুদ্ধ থাকতো না। প্রগতিশীল দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে শিক্ষার পথে সঙ্কট এড়াতে সমগ্র জাতি সদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অচলায়তন সৃষ্টি করেন নি। আমাদের সরকার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন উদ্বেগের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে না।


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যসংকলন

**শরৎ নাট্যসংগ্রহ (১ম খণ্ড) ৫·০০**

প্রবোধকুমার সান্যালের নতুন বই — সতীনাথ ভাদুড়ীর নতুন বই

**দুই পাখী ৩·৫০** • **অলোক দৃষ্টি ৩·৫০**

শংকর-এর

**চৌরঙ্গী (১০ম সং) ১০·০০** **যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ (৮ম সং) ৪·৫০**

**এক দুই তিন (৯ম সং) ৪·০০** • **পাত্র-পাত্রী (৩য় সং) ২·৫০**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে ৩·০০** **নিশিপদ্ম (৫ম সং) ৪·০০**

জরাসন্ধের

**মসিরেখা (৩য় সং) ৯·০০** **আশ্রয় (৫ম সং) ৩·৫০** **পাড়ি (৭ম সং) ৩·৫০**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের — শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**কুয়াশা ৩·০০** **কচিৎ কখনো ৩·৫০** **হৃসন্তী (২য় সং) ৪·৫০**

বিমল মিত্র রচিত — সৈয়দ মুজতবা আলীর

**স্ত্রী (৩য় সং) ৪·০০** **ভবঘুরে ও অন্যান্য (২য় সং) ৬·৫০** **শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ৫·০০**

নারায়ণ সান্যালের (বিকর্ণ) — শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**অন্তর্লীনা (২য় সং) ৫·৫০** **নৈমিষারণ্য ৯·৫০** **দ্বিতীয় অন্তর ৯·৫০**

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর (শ্রীনিরপক্ষ) — দেবজ্যোতি বর্মণের

**নেপথ্যদর্শন ৭·৫০** • **আমেরিকার ডায়েরী ৭·৫০**

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত

**বি বিবেক ১০·০০**

**বাক্-সাহিত্য** ঃ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৭৪৩৫

বিধানসভা সদস্যদের ভোটে রাজ্যসভার এবং বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচন শেষ হয়েছে। রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ ফুলরেণু গুহ, মহম্মদ ইসাক, শ্রীধরমচাঁদ সারোগী, কমিউনিষ্ট প্রার্থী শ্রীভূপেশ গুপ্ত এবং নির্দলীয় সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থী শ্রী এস পি রায় পরাজিত হয়েছেন। শ্রীরায়ের পরাজয় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি করে। অবশ্য পরে শ্রীসারোগী পদত্যাগ করে শ্রীরায়কে নির্বাচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত প্রার্থিগণের মধ্যে ডাঃ ফুলরেণু গুহ দমদমসেবীরূপে সুপরিচিতা।

বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের সর্বশ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, সুকুমার দত্ত, ইসমাইল ইব্রাহিম, ধ্বজাধারী মণ্ডল, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রীসৌরাংশুকান্ত আচার্য, শ্রীআবদুল হালিম ও ফরোয়ার্ড ব্লকের অধ্যাপক নির্মল বসু। শ্রীবর্মণ অতীতে লোকসভার সদস্য এবং রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। অধ্যাপক নির্মল বসু বয়সে নবীন ও বিধান পরিষদে নবাগত হলেও, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য তিনি জেলে ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। তিনি একজনবিশিষ্ট সাংবাদিকও বটেন।

**বীরভূম :**

অজয় নদের ওপর নতুন সেতু নির্মিত হওয়ার পর ইলামবাজার থেকে দুবরাজপুর-সিউড়ী-সাঁইথিয়া হয়ে কান্দী রাস্তাটির গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা থেকে এ রাস্তাটিই বীরভূম-মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা, সুতরাং এ রাস্তায় বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ির চলাচল যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মালবাহী ট্রাকের যাতায়াত। এই দৈত্যাকৃতি ভারবাহী ট্রাকগুলির বেপরোয়া চলাচল পথচারী নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি সিউড়ীতে একটি ছোট্ট শিশুকে এ পথে যাতায়াতকারী একটি ট্রাক অসতর্কভাবে ধাক্কা দিয়ে গুরুতরভাবে আহত করেছে। এ প্রসঙ্গে 'বীরভূম বার্তা' জনবহুল সিউড়ী শহরের ওপর দিয়ে ভারবাহী গাড়িগুলির চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং এজন্য সিউড়ী-দুবরাজপুর রাস্তার রেল লাইনের দক্ষিণে কড়িধ্যা-হাটজন বাজার হয়ে যে রাস্তা কলেজের পাশ দিয়ে গিয়ে সাঁইথিয়া রাস্তায় মিশেছে তার যথাযথ উন্নতি করে সে রাস্তাকেই বিকল্প রাস্তা হিসেবে গ্রহণ করে ঐ পথে ভারবাহী গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছে। সড়ক উন্নয়ন বিভাগের জরুরী দৃষ্টি 'বীরভূম বার্তা'র যুক্তিসম্মত দাবীর প্রতি আকৃষ্ট হবে এ প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

● ডাঃ ফুলরেণু গুহ

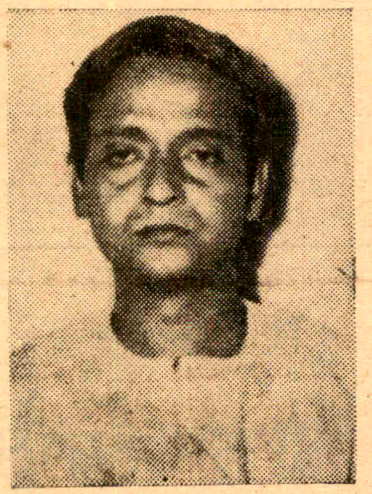

● অধ্যাপক নির্মল বসু

**বর্ধমান :**

শ্রী এন সি চ্যাটার্জী, এম-পি সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তাতে জানা গেছে যে, তিনি বর্ধমান, বিশেষ করে দক্ষিণ বর্ধমানের দীর্ঘ দিনের সর্বসম্মত দাবী সদরঘাটে দামোদর ব্রীজ নির্মাণের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রকে আছে কি না অনুসন্ধান করায় উক্ত মন্ত্রক তাঁকে জানিয়েছেন যে, এরূপ ধরণের কোন প্রস্তাব এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো হয় নি। ডি-ভি-সিও এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করছে না। বর্ধমান সদরঘাটে দামোদর ব্রীজ নির্মাণের দাবী দীর্ঘ দিনের এবং ডি-ভি-সির জন্মের বহু পূর্ব থেকে। দেশ স্বাধীন হবার পর এবং বিশেষ করে নতুন সংবিধানে বিধানসভা গঠিত হবার পর প্রতিটি অধিবেশনেই এই দাবী দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থিত হয়েছে। কখনো বলা হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হলে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, কখনো বলা হয়েছে বর্তমানে দামোদরের প্রবাহের ওপর দিয়ে সেতু করা সম্ভব না।

যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, তা হলে বর্ধমানেরও বহু নিম্নে হরিণ খোলায় কিভাবে সেতু মঞ্জুর করা হল---কৌশলে এ প্রশ্ন এড়িয়ে বলা হয়েছে, ওটা দামোদরের ওপর নয় ---মুণ্ডেশ্বরীর ওপর। বাস্তবে দামোদরের মূল প্রবাহ এখন মুণ্ডেশ্বরীর ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয় এবং ওটাই বর্তমানে জীবন্ত দামোদর।

সেহারা বাজারে দামোদর সেতুর দাবীতে বিরাট সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী সেতু নির্মাণের চেষ্টা করব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, তা শ্রীচ্যাটার্জীর বিবৃতির পর আজ সকলের নিকট রহস্যজনক ঠেকছে।

# শিল্পীমন ঃ শিল্পী সমাজ

আতসবাজীর মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জ্বলে উঠলো। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি সব আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে হাউইয়ের মতো জ্বলে ওঠা নাৎসী জার্মানদের রণহুঙ্কারে। মাত্র কয়েক বছর পর নাৎসীরা আবার হাউইয়ের মতো পড়লো। কিন্তু গোটা ইউরোপে রেখে গেল অত্যাচারের নগ্ন প্রকাশ। নাৎসী আক্রমণে যেমন ফ্রান্স, রাশিয়ার মতো বিরাট দেশে ধ্বংসের যবনিকা নেমে এসেছিল, তেমনি পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়ার মতো ছোট ছোট রাষ্ট্রেরও কম ক্ষতি হয় নি। যুগোশ্লাভিয়ার একাংশ নাৎসী জার্মানরা দখল করে বসেছিল। ব্যাপক নরহত্যা আর সম্পত্তি নষ্টের হিসাব-নিকাশে দেখা গেছে একমাত্র যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষতির পরিমাণ পঁয়ত্রিশ হাজার মিলিয়ন ডলার। ছোট্ট একটা দেশের এমন ক্ষতি কেউ কোনকালে ইতিহাসে লেখে নি। যুদ্ধের পর নয়া জমানা সুরু হয় উনিশ শ' একচল্লিশ সালে জে বি টিটো যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সশস্ত্র সংগ্রামে জে বি টিটো গোটা জাতিকে জমায়েত করেছিলেন নাৎসীদের অমন অমানুষিক আক্রমণের মধ্যেই। ১৯৪৫ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্রী সরকার।

যে কোন সভ্যতার পরিচয় মেলে সে দেশের সংস্কৃতিতে। সমাজদর্পণে শিল্প-সভ্যতার রূপ-রেখা প্রতিফলিত হয়। সমাজের শিল্পীমন সজাগ হয় সামাজিক পরিবেশের তৎপরতায়। সামন্তপ্রথা যখন সারা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপকতর বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তখন সে সমাজচিন্তা তৎকালীন শিল্পী-মনকেও আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। তারপর এলো রূপ বদলের পালা। সারা বিশ্বে এলো রেনেসাঁ আন্দোলন। কমবেশি সমস্ত দেশেই এলো চিন্তার বিপ্লব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন এলো জনগণমন চিন্তা, তেমনি

● 'বুল' : শিল্পী—সুপরিচিত যুগোশ্লাভ ভাস্কর ভজিন বকিচ

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। শিল্প-সাধনার পরিবর্তন দেখা দিল। এলো চিত্রকলার রূপকল্পনার বিবর্তন।

যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ। এ দেশেও একদিন ছিল সামন্তপ্রথা। ছিল শিল্পসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্যময় ধারা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোলাবর্ষণ আর বোমার আঘাতে, সে দেশের বহু প্রাণ সম্পদ আর সম্পত্তির সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতিরও বহু কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নাৎসী

**মৈত্রেয়**

অত্যাচারের ভয়ে অনেক শিল্পীকে দেশত্যাগী হ'তে হয়েছিল। আবার স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতেও কত শিল্পীকে যে তাদের শিল্পচর্চা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় তার ঠিক নেই। তাদের মধ্যে আবার প্রাণ সঞ্চার হয় যুগোশ্লাভিয়ায় সোস্যালিষ্ট ফেডারেল রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হওয়ায়। যারা দেশত্যাগী হয়েছিল তারা ফিরে এলো তাদের নিজের দেশে। যারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা আবার নতুন করে শিল্পচর্চার কথা চিন্তা করতে থাকে। তারা এখন গুলীর বদলে তুলি তুলে নিলো হাতে। অসির বদলে মসি।

সারা যুগোশ্লাভিয়ার ছটি রিপাব্লিক। ছ'টি অঙ্গরাজ্যে একাধিক ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। তাদের সংস্কৃতি-চিন্তার বৈচিত্র্য রয়েছে, রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পচিন্তা। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে সমাজতন্ত্রের সমাজচিন্তা পথনির্দেশ করছে, তা থেকে শিল্পীমন দূরে থাকতে পারে না। আজ যুগোশ্লাভিয়ার শিল্পী-মনে দানা বেঁধেছে নতুন সমাজবাদ। প্রতিফলন দেখা দিয়েছে তাদের শিল্পচিন্তায়। একদিকে দেশের প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক রূপমাধুর্য, অন্যদিকে নতুন সমাজ-বোধ। এই তিনটির প্রভাবে আজকের যুগোশ্লাভিয়ার শিল্পীমন বৈচিত্র্যের মধ্যেও সংহতি রক্ষা ক'রতে সক্ষম হয়েছে তাদের শিল্পকলার মাধ্যমে। চিত্রকলার একটি নির্দিষ্ট মান, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সমকালীন

যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রকলায়। দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন লক্ষণীয় যুগোশ্লাভিয়া শিল্পীমনের স্বচ্ছতা, তেমনি পদ্ধতিতেও ধরা পড়ে নব নব চিন্তার নিদর্শন; গোটা দেশের এই শিল্পীমন আজ নতুন সমাজদর্শনে সুসংবদ্ধ। তাদের নিজস্ব এক জগৎ গড়ে উঠেছে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল চিন্তায়।

যুগোশ্লাভিয়ার আজ একাধিক শিল্পী বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁদের নিজস্ব শিল্পকলার মাধ্যমে। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন চিত্রকলাকার, তেমনি রয়েছেন ভাস্কর। এই সব শিল্পীদের চিহ্নিত চিত্রগুলি সম্প্রতিকালের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বতন্ত্র মানসিকতায় নতুন নতুন পটভূমির আবিষ্কারক যুগোশ্লাভিয়ার আধুনিক শিল্পিবৃন্দের চিত্রবক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কন আঙ্গিকের দুঃসাহসিক অনুসন্ধান যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রশিল্পে বিরল। অনেকেই স্ব স্ব শিল্পচাতুর্যে আন্তর্জাতিক প্রাইজ লাভ করেছেন। চিত্রশিল্পী ও সেরামিস্ট ভেলিমির ভুকিসেভিস্ এমনি একজন শিল্পী। ১৯১৪ সালে ভুকিসেভিস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সৃষ্ট চিত্রসম্ভার বিশ্বের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ১৯৫৯ সালে সার্বিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শ্রেষ্ঠ প্রাইজ ও ওস্টেণ্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী থেকে আন্তর্জাতিক রৌপ্যপদক লাভ করেন। যুগোশ্লাভিয়া তথা ইউরোপের সমসাময়িক কালের চিত্রশিল্পী, সেরামিস্ট, ভাস্করদের সঙ্গে শিল্পী ভুকিসেভিস্-এর পার্থক্য নানা দিক দিয়ে। তাঁর মৃদু-তীব্র বর্ণলেপন, ব্যঞ্জনাধর্মী ফিগার শিল্পের সচেতনতা চিত্রবক্তব্যকে সহজে ফুটিয়ে তোলে। প্রসঙ্গত তাঁর সেরামিক ফিগার 'কোঞ্জানিক' উল্লেখযোগ্য। ফিগার ড্রইং, স্পেস্ এ্যারেঞ্জমেণ্ট এবং সর্বোপরি বোধগম্য মননশীল ঘেঁষা প্যাটার্ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই জাতীয় ইমেজ সৃষ্টিতে বস্তুবাদ শিল্পীর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে ভাবা যায়।

যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত ক্ষমতাশালী শিল্পী হলেন, এ্যালবার্ট কিনার্ট। ১৯১৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে জেগ্রেব আর্ট একাডেমি থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি তাঁর স্বদেশের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রসম্ভার নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে সাওপলো, ভেনিস, বার্লিন, লুগানো, এ্যালেকজেণ্ড্রিয়া, ব্রাসেলস্, প্যারিস-এর প্রদর্শনীতে তাঁর অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী আমাদের দেশে দিল্লী শহরেও অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর বিখ্যাত খোদাই কাজ 'আইল্যাণ্ড'-এর জন্য স্লোভেনিয়ার কালচার এ্যাণ্ড এডুকেশান কাউন্সিল পুরস্কার লাভ করেন। চিত্রশিল্পী ও খোদাই-শিল্পী এ্যালবার্ট কিনার্ট-এর ড্রইংয়ের হাতটি সুদক্ষতার পরিচয় দেয়। রিয়ালিস্ট ও সমাজচেতনতা তাঁর চিত্র ও খোদাই কাজে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে স্বীয় প্রতিভায় এ্যালবার্ট কিনার্ট চিত্রকলা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্বের কলা-রসিক মহলে তাঁর বিশেষ আসন নির্দিষ্ট হয়েছে, চিত্রশিল্পে শিল্পীর রোমান্টিক শিল্পী-সত্তাকে অনুভব করা যায় বলে।

ভজিন বকিস্ যুগোশ্লাভিয়ার একজন সুপরিচিত ভাস্কর। বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ইভান মেষ্ট্রোভিসের প্রিয়তম শিষ্য এবং প্রকৃত উত্তরসূরী। যুগোশ্লাভিয়ার ভাস্কর্যশিল্পে এই তরুণ শিল্পীর অবদান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাথর ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন কাজে শিল্পী তাঁর স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাসেলস্ বিশ্বমেলায় যুগোশ্লাভিয়া প্যাভিলিয়ন-এর সম্মুখভাগে

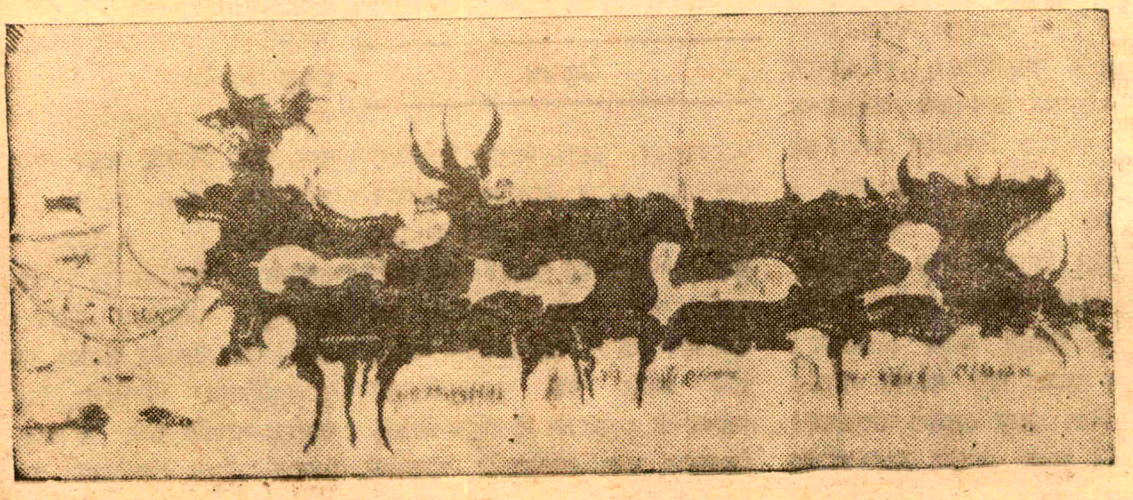

● আইল্যাণ্ড : এ্যালবার্ট কিনার্ট অঙ্কিত।

তাঁরই সৃষ্ট 'বুল' ভাস্কর্য শিল্প-ফলক অসংখ্য কৌতুকী জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক শিল্প প্রগতিতে ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি লক্ষণীয়।

অধুনা সমাজব্যবস্থায় দেশের এই শিল্পসম্পদকে আরও উন্নত করবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সচেতন। এই শিল্পীসত্তাকে সজাগ রাখবার জন্য গঠিত হয়েছে ক শিল্পীজগৎ। যে জগতের মূল উ হ'ল শিল্পীমনকে সমস্ত রকম দুশ্চি থেকে রেহাই দেওয়া। গোটা দেশের সমগ্র শিল্পীদের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হ'ল 'দি ফেডারেশান অফ আর্টিস্টস্ অফ যুগোশ্লাভিয়া'। এই প্রতিষ্ঠানে দেশের পরিচিত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, গ্র্যাফিকশিল্পী সব ধরণের শিল্পীরই স্থান রয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার ছ'টি রিপাব্লিকে এমনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছ'টি শিল্পীসংস্থা আছে। স্ব স্ব রাজ্যের শিল্প চিন্তা ধারার ওপর এসব সংস্থা প্রতিটি শিল্পীর 'প্রটেক্টার কাম ফিলসফার'। ফেডারেশান অনুশাসন ও শিল্পী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সব রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কার্য পরিচালনা ক'রে থাকে। চার বছর অন্তর অন্তর ফেডারেশান অফ্ আর্টিস্টস্-এর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে দেশের বিভিন্ন শহরে। সে কংগ্রেসে আগামী চার বছরের জন্য ফেডারেশানের কার্যকরী সমিতির সভ্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকে। এই কংগ্রেসে ফেডারেশানের আর্ট কাউন্সিল কর্মকর্তাও নির্বাচিত হয়। ফেডারেশানের শিল্পনীতি নির্ধারণের সঙ্গে জড়িত এই কাউন্সিল।

প্রতিটি শহরেই একটি করে এমনি প্রতিষ্ঠান আছে তা নয়, প্রতিটি রাজ্যের (রিপাব্লিক) শিল্পসংস্থার কেন্দ্র-দপ্তর সে রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত। যদিও কোন কোন অঞ্চলে ভিন্ন সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রতিটি শিল্পীই, সে সরকারী কর্মচারী

● একটি প্রাচীরচিত্র : সাধুর প্রতিকৃতি।

হোক, আর না হোক, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। তারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার সুযোগ পায় সরকারের পক্ষ থেকে। তাদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা ও আহার বাসস্থানের জন্য তারা প্রত্যেকেই 'চিলড্রেন এ্যালাউন্স' পাবার অধিকারী। শিল্পী-দের কর্মজীবনের সায়াহ্নে, বৃদ্ধ বয়সে অবসর-বৃত্তি লাভের সুযোগ আছে। পুরুষ শিল্পীদের পক্ষে পঞ্চান্ন বছরের পর এবং স্ত্রী শিল্পী-দের পক্ষে পঞ্চাশ বছরের পর সরকার কর্তৃক প্রত্যেক শিল্পীকেই অবসর-বৃত্তি দিয়ে থাকে। এই সমস্ত ব্যবস্থায় ফেডারেশানের চূড়ান্ত মতকে সরকার কোনভাবেই অবহেলা করে না। এই সমস্ত সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে 'সুপরিচিত শিল্পী'দের তেলা মাথায় তেল দেওয়ার রেওয়াজ এদেশে একেবারেই অচল। অর্থাৎ স্ব স্ব শিল্পচাতুর্যে কোন শিল্পী দেশে ও বাইরে সুপরিচিত হবে। তার জন্যে হয়তো উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকবে। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ছোট বড় সকল

শিল্পীই সমান সুযোগ লাভ করবে।

এইসব শিল্পী ও শিল্পীসংস্থা শুধু যে শিল্পজগতেই আবদ্ধ তা নয়। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে এরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সঙ্গেও জড়িত। এমন কি স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে সুরু ক'রে সোস্যাল ইন্সুয়োর অফিসে পর্যন্ত এদের গতি সমান। যুগোশ্লাভিয়ার চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা আছে দেশাভ্যন্তরে ও বাইরের জগতে। উত্তর অঞ্চলের যুগোশ্লাভ রিপাব্লিকের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত 'দি বিনিয়াল' এদেশের একটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্পপ্রদর্শনী। যেসব দেশে গ্র্যাফিক আর্টের উন্নতি উল্লেখযোগ্য সে সব দেশ এই প্রদর্শনীতে তাদের চিত্র-সম্ভার পাঠিয়ে থাকে। নতুন চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে বেলগ্রেডের 'অক্টোবর সেলুন' ও 'ট্রেনিয়াল অফ যুগোশ্লাভ আর্ট' আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছ'টি রিপাব্লিকের অন্যতম সারবিয়ার বাৎসরিক শিল্পসৃষ্টির পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই 'অক্টোবর সেলুন'। আর ট্রেনিয়াল সমগ্র যুগোশ্লাভ শিল্পের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রতি বছর শিল্পীসংস্থাগুলির নিজস্ব শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পী-সংস্থাগুলি পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে পারে। অনেক শিল্পী আবার শিল্পচিন্তার দিক দিয়ে এবং বন্ধুত্বের খাতিরে এক একটি শিল্পিগোষ্ঠী তৈরি করে শিল্প আলোচনা চক্র গড়ে তুলেছে। এমনি চক্রের অস্তিত্ব এক বেলগ্রেডেই কয়েক ডজন। এমনি গোষ্ঠী দেশের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে।

একক চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী সারা দেশে সব সময়েই লেগে আছে। চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, গ্র্যাফিকশিল্পী প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিল্পসম্ভার নিয়ে হাট বসাতে সদা ব্যস্ত। যুগোশ্লাভিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। তিনটি আর্ট একাডেমি এবং এক ডজন আর্ট স্কুল রয়েছে সারা দেশে। এছাড়া এ্যাপ্লাইড আর্টের জন্য অসংখ্য একাডেমি ও স্কুল আছে। বছর বছর এইসব স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে শিল্পীর দল এসে মিশছে সমাজজীবনে। অভিজ্ঞ শিল্পীদের পাশে চলে এদের নতুন কর্মপদ্ধতি। বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে তাই নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের মেলামেশার সুযোগ পায় আর্টিস্ট কলোনীতে। আট বছর আগে প্রথম এই ধরণের আর্টিস্ট কলোনীর পত্তন। গ্রীষ্মের মিষ্টি আব-হাওয়ায় এক মাস এই উপনিবেশে সরকার শিল্পীদের থাকবার, খাবার ও শিল্পপ্রদর্শনীর ও শিল্পচর্চার ব্যবস্থা করে থাকেন। উদ্দেশ্য গ্রীষ্মের এমন মিষ্টি রোদ-হাসানো দিনগুলিতে দেশের সমস্ত দিক থেকে বিভিন্ন শিল্পিবৃন্দ আসবে খোলাখুলি মেলা-মেশার জন্যে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান, ঘরে শিল্পীমনের সবরকম চাহিদা পূরণের সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে এসে শিল্পীরা বছরের সেরা শিল্পও সৃষ্টি করে থাকে। চিত্রকলা-প্রদর্শনী বা সমালোচনার জন্য রয়েছে খোলামেলা ব্যবস্থা। এই একমাস ধরে যেসব শিল্পী এই শিল্প উপনিবেশে অবস্থান করবে, তাদের একটি সর্ত রয়েছে। গ্রীষ্মের শেষে এই উপনিবেশে যে চিত্রশিল্প প্রদর্শনী হবে তাতে প্রত্যেকের স্ব স্ব চিত্রসম্ভার নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ যদিও প্রত্যেক শিল্পীর আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যবস্তু অন্তত পক্ষে একটি ক'রে কিনে থাকেন। এমনি শিল্পী উপনিবেশ সারা দেশে এ পর্যন্ত আটটি রয়েছে। প্রত্যেকটি, প্রত্যেকটি থেকে ভিন্ন ধর্মের। যেমন, কোনটি হয়তো কেবলমাত্র চিত্র-শিল্পীদের জন্য; আবার কোনটিতে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী উভয়েরই স্থান রয়েছে; আবার কেবল মাত্র ভাস্কর-দের জন্য ভিন্ন উপনিবেশ রয়েছে।

সারা দেশের শিল্পীমন ও শিল্পী-সমাজকে পরিচালনার মূলে যে প্রতি-ষ্ঠান 'ফেডারেশান অফ যুগোশ্লাভ আর্টিস্ট' এটি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কৃতি প্রকল্প গ্রহণ ক'রে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শিল্পীসংস্থার (A, I. D. P.) সদস্য।

# বর্ষশেষ

**ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার**

দৃষ্টি আমার যায় না সরে কোনক্রমেই
বাঁধা, বুকের, দগ্ধ মাটির আস্তরণে;
ঘরের প্রদীপ নেভালে, কি হৃদয় সেই?
দৃষ্টি আমার যায় না সরে কোনক্রমেই।

মৃত্যুও কি এমনি রেখে অনামনে
বর্ষশেষের মতন যাবে গহন বনে?
দৃষ্টি আমার যায় না সরে কোনক্রমেই
বাঁধা, বুকের, দগ্ধ মাটির আস্তরণে।

# গ্রন্থমেলা

**লেখিকা মন ঃ** বাণী রায় সম্পাদিত। সাহিত্যায়ন, ৮-এ, কলেজ রো ; কলকাতা-৯। মূল্য : আট টাকা।

শুধু বিষয় বৈশিষ্ট্য নয়, একটি উজ্জ্বল আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রখ্যাতা লেখিকা বাণী রায় এই গ্রন্থ সুচারুরূপে সম্পাদনা করেছেন। একমাত্র মহিলা লেখিকাদের গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের একটি সংকলনের অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছিল। যদিও বিশালকায় এই গ্রন্থটিতে বাংলা দেশের সমস্ত লেখিকাদের সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নি এবং সম্পাদিকা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আশা পোষণ করেছেন, তবু বলা যায় শ্রীযুক্তা রায়ের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। একালের মহিলা লেখিকাদের সমষ্টিগত শক্তির মূল্যায়নের জন্য প্রকাশিতব্য ২য় খণ্ডটিও যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। বর্তমান সংকলনে মোট কুড়িজন লেখিকার এক-একটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে। কয়েকটি গল্পের নামকরণের মাধ্যমে গল্পের মেজাজ ও ভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়, যেমন 'তিনটি দৃশ্য', 'ধূমকেতু', 'ওস্তাদজি', 'সেকালেব বনভোজন', 'রাশিয়ান ক্যাট', 'সাক্ষো' ইত্যাদি। 'তিনটি দৃশ্য'-এর লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। সংকলিত অধিকাংশ গল্পই যেমন দুর্লভ ও সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয়েছে, তেমনি স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প সংগ্রহ করা ব্যাপারেও ঐ কথা সত্য। গল্পটি ১৩৩৪-এ বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মহিলা লেখিকাদের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর যথার্থ নৈপুণ্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই গল্প দিয়ে শ্রীযুক্তা বাণী রায় প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, কাঞ্চনমালা দেবী (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী), 'লাইকা' রচয়িত্রী হেমনলিনী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সরসীবালা বসু, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রভাবতী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, সুলেখা সান্যাল, বাণী রায় প্রমুখের গল্পগুলি শুধু অনন্য পট-ভূমিকায় রচিত নয়, গল্পগুলির অসাধারণত্বে লেখিকাদের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিবালা দেবী ('সেকালের বনভোজন')—যিনি আজো দীর্ঘায়ু হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন তিনি সেকালে গ্রামের মেয়েদের এমন জীবন্ত চিত্র অংকন করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলে উল্লিখিত হবে। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র লেখিকাদের (যাঁদের গল্প সংকলনে নেই, তাঁদের সম্পর্কেও) মূল্যায়ন সম্পর্কিত ভূমিকাটি চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান।

**সন্দেশ ঃ** সম্পাদক : লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়। সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩। বৈশাখ সংখ্যা : এক টাকা ; আশ্বিন সংখ্যা : ১'২৫ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন যে, প্রাক্ বঙ্কিমযুগে যে সব 'ছেলে ভুলানো ছড়া' দিয়ে মন ভুলানো হতো তা ছিল অপাঠ্য। সেই প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শিশুসাহিত্য রচনার কৃতিত্ব সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। অবশ্য শিশুসাহিত্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনোই উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য রচনা পড়ে উদাস বা গম্ভীর হওয়া যায় ; কিন্তু শিশুরা খিল খিল করে হেসে ওঠে কি ? বাস্তবিক পক্ষে, শিশুদের মন মাতানো গল্প-ছড়া-কবিতা যিনি রচনা করলেন তিনি হচ্ছেন উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী। তারপর এলেন হাসির ফোয়ারা ফুটিয়ে তাঁরই পুত্র সুকুমার রায়। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে সেই সঙ্গে দিয়ে গেলেন ছেলেদের পড়বার উপযোগী মনের মতন পত্রিকা 'সন্দেশ'। শুধু লেখায় নয়, রেখাতেও অদ্বিতীয় ছিল ঐ পত্রিকা। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে একমাত্র সন্দেশ—'সন্দেশ' পত্রিকা। দীর্ঘকাল পরে ঐ পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেন সত্যজিৎ রায়। পুনঃপ্রকাশিত সন্দেশের বয়স এখন মাত্র তিন বছর। কিন্তু নয়-দশ-বারো বছরের ছেলেরা থেকে বুড়োরাও ঐ পত্রিকার স্বাদ পাবার জন্য প্রতি মাসে হাঁ করে থাকেন। সকলের সেরা লেখক-লেখিকারা সবার সেরা লেখাটি সন্দেশে দিতে পেরে যেন সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান। কেন না, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাঁদের লেখা পাবার জন্য। লেখা দিয়েও তাই তাঁদের অনেক আনন্দ। সত্যজিৎ রায় শুধু চলচ্চিত্র রচনা করেন না, কবিতাও লেখেন। প্রমাণ ? সন্দেশের পাতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের 'হট্টমেলার দেশে' কী মজার উপন্যাস। পরিমল গোস্বামীর 'এক যে ছিল কাল' বারবারে সে কী বিরাট কাল। সত্যজিৎ রায়ের 'শিবু আর রাক্ষসের কথা', কী চমৎকার। সুখলতা রায়ের 'পাখির দেশ' পড়লেই বোঝা যাবে সে কোন দেশ। তাছাড়া আছে ম্যাজিক, কবিতা, নিজে হাতে করে দেখ, হাত পাকাবার আসর, প্রতিযোগিতা, ধাঁধা, সম্পাদকের চিঠি—আরো কত কী, কত খেলা—'মাথার ওপর খাটানো নীল বিনি পয়সার তাঁবু। নীচে সবুজ গালচে পাতা খেলা দেখে যান, বাবু।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। তাছাড়া বৈশাখ সংখ্যায় আছে উপেন্দ্রকিশোরের গল্প-কবিতা-ছবি। এমন ছবি—যা ছেলে-মেয়েরা শুধু মনে মনে কল্পনাই করে।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

।। আট ।।

শনিবার। রাত।

নৃপেনের মেসবাড়ি। কানাই, বলাই, মাধাই, ভবানী জগা, বটকেষ্ট ও তার শিশু কন্যা চণ্ডী সবাই নৃপেনের ঘরে সমবেত হয়েছে।

কাল সমর নতুন বাড়িতে উঠে যাবে। মেসে আজই তার শেষ রজনী। সমরের চোখও একটু ছলছল করছে। এই মেসবাড়ির সাথে তার অনেক স্মৃতি জড়িত। বিরাট দিল্লী শহরের এই ভগ্ন নীড়ের এক প্রান্তে দিবা-যামিনী কাটিয়েছে সে দীর্ঘ সাতটি বছর। ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ সব পরীক্ষাগুলো এই শাল্মলী তরুর ক্রোড়ে বসেই দেখতে দেখতে বেশ সম্মানের সাথে পাশ করে গেল। কত বঙ্গপল্লীর নিরাশ্রয় যুবক করোল-বাগের এই মেসবাড়িতে মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে বেঁচেছে। পাখির দল এসেছে, গেছে। কেউ দাঁড়িয়েছে জীবনে, কেউ হতাশ হয়ে এই শহর থেকে ফিরে গেছে।

কানাই বলাই-এর আজও চাকরী জুটলো না। মাধাই, বলাই, জগা, গদাধর, পটলা, উপেন সবাই নিজেদের একটা না একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে কোনক্রমে দিনাতিপাত করছে। সমরের পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই। ভবঘুরে সমর একদিন একটা ঝড়াক্রান্ত পাখীর মতনই এই মেসবাড়িতে ছিটকে এসে পড়েছিল। পরম আত্মীয়ের মতন এই মেসবাড়ির সদস্যরা তাকে সেদিন নিজেদের কাছে টেনে নিয়েছিল। লেখাপড়ায় চিরদিনই সে বেশ ভালো। সেজন্য মেসবাড়ির সকলেরই গর্ব। গৃহকোণের ঐ ভাঙা খাটিয়াতে বসে বসে সে পড়া তৈরি করেছে। যেদিন সে এম-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হ'ল, ইউনিভার্সিটিতে সেদিন সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে—অধ্যাপক, বন্ধু-বান্ধব, ইউনিভার্সিটির কেরাণীবৃন্দ সকলেই। তাতে সে আনন্দিত হয়েছে। মেসে যখন খবরটা পৌঁছল নৃপেন সকলকে নিয়ে তখন যে কাণ্ডটা করেছিল সে দৃশ্য এখনও তার চোখের সামনে ভাসছে। তাদেরই একজন আজ আপন নিরালা নীড় তৈরি করে সেখানে চলে যাচ্ছে। তাতে সবাই আনন্দিত। সেখানে মানসিক বেদনা, ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতার জায়গা নেই।

চার্লি চ্যাপলিন পটলা অভিনয়ের সুরে বলল, 'ভায়া সমর, তোমার জীবন সুখী হোক। সিনেমাতে ঢুকে নি একবার। তোমাকে কম্‌প্লিমেণ্টারী টিকিট দিতে কখনও ভুলব না। এসো কিন্তু আমার দো দেখতে।'

ভবানী ব্রতী সঙ্ঘের চ্যাম্পিয়ান। সে বলল, 'ব্রাদার, শরীরটার দিকে এবার নজর দাও। সকালে একটা, বিকেলে একটা ডন-বৈঠক দিতে ভুলো না।' বলেই সে বুকের ওপরের তোয়ালেটা সরিয়ে ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়াল।

তার ভয়ে সমর একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। মাধাই এখনও কলাকেন্দ্র ছাড়ে নি। এতক্ষণ সে গুন্ গুন্ করে 'বাজু বন্ধ খুল খুল যায়' তাল ভাঁজছিল। সে বলল, 'ভায়া, আমার অনেকদিনের সখ্ তুমি একটা গানের মজলিশ বসাও।'

সবাই একেবারে খাঁই খাঁই করে উঠল। জগাই বলল, 'মাধাই ভায়া, জানো তো সমর নতুন বাড়ি নিয়েছে। দেখো তার ওপর বাড়িওয়ালা যেন নোটিশ জারী না করে।

শেষ রাতে সঙ্গীতচর্চার জন্য মাধাই-এর ওপর মেসবাড়ির নোটিশ এখনও ঝুলছে। এমনিতে বললে হবে হবে কি, মাধাইকেও সবাই ভালবাসে।

নৃপেন বলল, 'দেখো ভায়া, নতুন বাড়িতে মজলিশ বসানোতে ঝুঁকি আছে। সে পাটটা আজই মিটিয়ে ফেল না কেন? ধরো একটা গান।'

কানাই চেঁচিয়ে উঠলো, 'নৃপেনদা গো, গেলো গেলো, হৃদয়খানা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মাধাইদাকে একটা প্রেমের গানই গাইতে বলো গো।'

বলে সে নিজের বুকটা চেপে ধরল।

কানাই-এর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সবাই তার এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়।

মাধাই নিধুবাবুর টপ্পা ধরে, 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নি।' সকলের জন্য উপেন চা নিয়ে আসে। সাথে জলখাবার।

ভবানী বুকের ওপরের তোয়ালেটা সরিয়ে একবার ছাতিটা ফুলিয়ে নেয়।

পটলা তার পটল-চেরা চোখে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের ছায়া অবলম্বনে গোঁফ নাচায়।

ঘটকেষ্টর দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সে একবার নৃপেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো, ভায়া, আমার কথাটা যেন ভুলে যেও না।'

চণ্ডী মাথা নীচু করেই বসেছিল। সে বেচারা এখানে আসতে চায় না। কিন্তু বটের তাড়নায় না এসে উপায় নেই। কি করবে?

বটের প্রস্থানের পর নৃপেন একটা বিরাট কাপড়ের বাণ্ডিল খুলল। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সমরও।

নৃপেন নাটকীয় ভঙ্গিমায় সে বাণ্ডিল খুলে রাশীকৃত পুরণো বই-এর স্তূপ দাঁড় করালো।

সবাই বলল, 'এগুলো কি হবে নৃপেনদা?'

নৃপেন বলল, 'দেখো ভায়া সমর, মেসবাড়ির আমরা সবাই গরীব মানুষ। তোমাকে একটা বিদায় বেলার উপহার দিতে চাই। বহু বটে পুরো বই-এর দোকান ঘেঁটে এই বইগুলো সংগ্রহ করেছি। বইগুলো শুধু তোমার পড়ার জন্য নয়। এগুলো এনেছি সাহিত্য-মহলে তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

সমর আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'সাহিত্যিক? আমি? আমি তো জীবনেও সাহিত্যচর্চা করি নি নৃপেনদা। তুমি তো তা জানো?'

—'তা জানি বলেই তো এনেছি। এতদিন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। তারপর চাকরীর উমেদারী করে দিন কেটেছে। এখন সুরু কর সাহিত্য। কিছুই শক্ত নয়। এই ধরো এই বইগুলো—ও হেনরি, টমাস হার্ডি, মরাভিয়া, সমারসেট মম, লরেন্স, মপাসাঁ, চেকভ। বইগুলো অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। মরাভিয়ার হিরোইনের চরিত্রটার সাথে চেকভের হিরোকে জুড়ে দাও। তারপর টমাস হার্ডির খানিকটা মেরে দাও। ফাইনালি একটা ফিনিশিং টাচের জন্য তাদের বাংলা দেশের একটা গ্রামে পাঠিয়ে দাও। তোমার বই দাঁড়িয়ে গেল। যদি না দাঁড়ায় তাহলে আরও কিছু ট্যাক থেকে খসাতে হবে। সমালোচক-গুলোকে একদিন বিরাট করে পার্টি দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, বার্ণাড শ'র ডোরার চরিত্তির পড়লেই তালিমটা ভালো মতন হয়ে যাবে। খাড়া তো কর একখানা বই। জয়ডঙ্কা বাজানোর ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। কি বল তোমরা?'

মেসবাড়ির সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঠিক কথা। ঠিক কথা। সমর যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে।'

পটলা তার পটল-চেরা চোখ নাচিয়ে বলল, 'বই একখানা লিখেই তো ফেলো দাদা। তাকে সিনেমায় চালু করার ভার আমার।'

উপেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপটি করে সব শুনছিল। পটলার দিকে তার চোখ পড়তেই পটলা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'কোনো চিন্তা নেই উপেন। একবার ঢুকে তো নিই। তোকে পার্ট দেব না? বলিস কি?'

—'দেখো ভায়া, জীবনে চাল্ দিতে ভুল করো না। ঠিক মতন চালটা দিলে ঘোড়েও মোকা মাফিক মন্ত্রী হয়ে যায়, জানো তো?'

গদাধর ও বিশু তাকে সমর্থন করে। আজ দীর্ঘ মেসবাড়ির জীবনে তারা প্রথম দাবাহীন সন্ধ্যা যাপন করল।

সমর তাদের একটা নতুন দাবার ছক কিনে দিয়েছে।

একে একে সবাই চলে গেল। সমর একা তার গৃহকোণে শয্যা গ্রহণ করল। একটা নতুন পুলকে তার মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। এ রকম একটা ভাব তার মনে পূর্বেও একবার এসেছিল। যেদিন প্রাসাদ বাড়িতে সে বনানীকে দেখে এসেছিল। সে জানে না এ অপরূপ অব্যক্ত আনন্দের উৎস কোথায়? কথাটি পৃথিবীতে অন্য কেউ জানে না। কাল রবিবার। সমর নতুন বাড়িতে যাবে। অরুণার সাথে তার নিশ্চয়ই দেখা হবে। অরুণাও কি ভাবছে তার কথা? (ক্রমশঃ)

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত এই প্রাচীন ভাস্কর্যটি ভারতীয় কেশবিন্যাসের একটি ঐতিহ্যময় সাক্ষ্য। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্য্যের।

**অলিভ অয়েল** দিয়ে তৈরী ক্যালকোমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

**ক্যান্থারল**

সুরভিসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯।

সুশীল রায়

# অন্নদাময়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

একটি দুর্বল মুহূর্তে দৈবাৎ ঘটে গিয়েছিল পদ-স্খলন। সে-ঘটনা নিয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হল চার ধারে, স্বামী তাকে করল পরিত্যাগ, আশ্রয় নিল না সে ফ্রান্সিসের কাছে। হুগলীর জলে তো ভেসে যাবার কথা ঐ মেয়েটির। কিন্তু মনে নিশ্চয় জোর ছিল তার, নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। তাই হুগলীর জলে না ভেসে, সে ভেসে চলল সাগরে। বঙ্গোপসাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর মন্থন ক'রে, উত্তমাশা অন্তরীপের কিনার দিয়ে, অতলান্তিকে ভেসে ভেসে উপস্থিত হল নূতন দেশে। সেখানে সে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে, ফরাসী রাজ্যের অধিপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কেউ আর অপবাদ দিতে পারবে না, বলতে পারবে না যে, সে কোনো দিন ঐ ফিলিপের সাহায্য নিয়েছে, কিংবা তার নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছে।

দিন কেটে চলেছে কলকাতায়। এখানেও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে নিত্য নব নব।

শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর নূতন প্রয়াস সুরু করেছেন। তিনি কম্পোজিটরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্যে এসেছেন কলকাতায়।

ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বসে তিনি কথা বলছেন রামচাঁদ রায়ের সঙ্গে। বললেন, উদ্যোগই আসল জিনিষ হে রামচাঁদ! বইয়ের ব্যবসা এদেশে আগে কেউ করে নি বলেই কোনো কালে কেউ করতে পারবে না, এটা কি একটা কথা?

অন্নদামঙ্গল পুঁথির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হাসতে লাগলেন গঙ্গাকিশোর, বললেন, এই বিদ্যাটা একেবারেই বাঙালি মেয়ে। সুন্দরের খপ্পরে পড়ে ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করে ফেলল। তার হাত থেকে বাঁচার কোনো পথই রাখল না। কিন্তু জান তো সেই মেয়েটার কথা?

রূপচাঁদ তাকাল গঙ্গাকিশোরের মুখের দিকে, গঙ্গাকিশোর বললেন, সাদাম গ্রাণ্ড। আশ্চর্য মেয়ে, নেপোলিয়ন তৈরি হয়েছে ইংলণ্ড আক্রমণ করবে ব'লে, কামান দাগে দাগে। শ্রীরামপুরে থাকাকালে চন্দননগরের ফরাসী ফিরিঙ্গীদের তখন দেখছি। এখানে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের কত ব্যস্ততা। কিন্তু হঠাৎ খেমে গেল সব। কি ব্যাপার হয়েছিল জান নিশ্চয়। সাদাম গ্রাণ্ডের বিস্তর টাকা তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে জমা, অত টাকা নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে নেপোলিয়নকে গিয়ে সে বোঝাল। নেপোলিয়নের মত মানুষ সেও বুঝে ফেলল। মেয়েটার উদ্যোগ দেখ, বিক্রম দেখ তার।

রামচাঁদ বলল, কথাটা রটেছে, কিন্তু সত্যি কি না কে যাচাই করছে।

—তা বটে। কিন্তু যা রটে তার কিছু তো বটে। সবটা সত্যি না হলেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বই ছাপার কাজে নেমেছেন গঙ্গাকিশোর। ছাপাখানা আছে মাত্র কয়টা। লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস; ললুলালের সংস্কৃত প্রেস, বাঙ্গালা প্রেস; শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা; আর এই ফেরিস কোম্পানী। এখানে গঙ্গাকিশোর সচিত্র অন্নদামঙ্গল ছাপার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। রামচাঁদ ধাতু ও কাঠ খোদাই করে চিত্র বানিয়েছেন কয়েকটা।

এদিকে এই সচিত্র বই ছাপার কাজ চলেছে, সেইসঙ্গে বই বিক্রয়ের জন্য গঙ্গাকিশোর বাংলা দেশের বিভিন্ন শহরে ও মফস্বলে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাও করে রাখছেন। বই প্রকাশিত হলে তাঁদের মারফৎ বিক্রয় করবেন।

তাঁর এই উদ্যোগ আছে বলেই তিনি উদ্যোগীর হয়তো বিশেষ অনুরক্ত। এই জন্যেই হয়তো সাদাম গ্রাণ্ডের কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে।

গঙ্গাকিশোর বললেন, পঞ্চানন হচ্ছে অক্ষরের রাজা, আর তুমি হলে চিত্রের। সুন্দর ছবি হয়েছে রামচাঁদ।

তোমার বৌদাইয়ের হাত বেশ খুলেছে। পঞ্চাননও খুদে খুদে কত ছোট ছোট অক্ষর বানায় অনায়াসে। কিন্তু তোমাদের কেউ চিনল না, এইটে বড় দুঃখ রামচাঁদ।

রামচাঁদ হাসতে হাসতে বলল, হাজার হাজার লোকের চিনে কাজ কি। দু-একজন লোক ভালো করে চিনলেই হল। আর, চিনেই-বা কি দরকার। যার যা কাজ, সে তা করবে। তার জন্যে দুনিয়া-সুদ্ধ লোক এসে তাকে চিনে যাবে; এ আবার কেমন কথা।

—চেনা মানে মুখ-চেনা নয় হে, কদর দেওয়া।

—তোমার কাছে কদর পেয়েছি এই ঢের। তোমার ছাপা প্রথম বইয়ের আমি চিত্রকর।

ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানায় তখন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কম্পোজ করা হচ্ছে।

দিন-কয়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হল সে-বই। তারই এক খণ্ড হাতে নিয়ে অন্নদাপ্রসাদ এসে উপস্থিত হয়েছেন মাণিকতলার বাগানবাড়িতে।

দ্বারকানাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে ওটা কি বই নিয়ে এলেন অন্নদাবাবু।

—বাংলা দেশের প্রথম সচিত্র বই।

—কে বের করল।

অন্নদাপ্রসাদ প্রায় ঘোষণা করার মত করেই যেন বললেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এদেশের প্রথম পুস্তক প্রকাশক হল লোকটা।

রামমোহন ভিতরের ঘর থেকে এলেন, ফরাসের ওপর উঠে বসে দেখলেন বইটা, বললেন, তারিফ করি। একটা কাজ আরম্ভ তো করেছে লোকটা।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, বই ছাপা আরম্ভ হলেই আপনার ঐ কবিয়ালদের কদর কমবে। কবিয়ালদের তখন আর হয়তো চাইবে না লোকে, চাইবে কবিদের।

—তাই। রামমোহন বললেন, দেশের মানুষের রুচির নিন্দা করি আমরা। বোধহয় ভুল করি। তাদের আমরা আম না দিয়ে যদি আমড়া দিই, আর বলে বেড়াই, ওরা আমড়ার বড় ভক্ত, আম ভালবাসে না, সেটা অন্যায্য অভিযোগ করা হয়।

দেশের লোককে অজ্ঞ করে রেখে তাদের অজ্ঞানতার জন্যে তার প্রতি করুণা দেখানোও ঐ ধরণের অন্যায্য কাজ। সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যেই সর্বসাধারণের মধ্যে রামমোহন বিনামূল্যে বিতরণ করছেন শাস্ত্রের মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ। ভট্টাচার্যদের চক্রান্তের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে না পারলে, যে-ধর্ম নিয়ে এত ষড়যন্ত্র, সে-ধর্ম রক্ষা করবে কারা। মহাশ্মশানে কি কোনো ধর্ম বিরাজ করে?

অন্নদাপ্রসাদ পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলেন অন্নদামঙ্গলের। দেখতে দেখতে স্মিত হেসে বললেন, ইনিও কিন্তু ভট্টাচার্য। যিনি প্রকাশ করেছেন এই বই। ইনি সৎকাজ করেছেন কিন্তু।

অট্টহাস্য করে উঠলেন রামমোহন, হাসি থামিয়ে বললেন, ভট্টাচার্য কি পদবী দিয়ে হয়, ওটা হল মনে। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা পদবীতে ভট্টাচার্য নন, কিন্তু তাঁদের মনটা ঐ কোশাকুশি আর ঘণ্টাকে কেন্দ্র করে পড়ে আছে। তাঁরা হিন্দু-ধর্মকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন, আর যজমান-বাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে করে ঘুরে বেড়ান। আপত্তিটা তাদের নিয়ে। এই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে নিয়ে নয়।

বৃদ্ধ হরিহরানন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিলেন সব, কোনো কথা নেই তাঁর মুখে। সব কথা শুনে তিনি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে এই যুক্তিতে তাঁর সম্মতি জানালেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তারপর তিনি বললেন, কত অসহায় নারী কত কঠিন প্রাচীরের অন্তরালে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে খোঁজ আমরা ক'জন রাখি? কত জনের কত বাসনা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে তার হিসাব নেবারই-বা আমাদের সময় কোথায়। আমরা আছি আমাদের নিজেদের নিয়েই আত্মহারা। এর নাম অধর্ম।

একটু থেমে বললেন, অধর্মই এখন চলেছে ধর্ম নামে। পণ্যের বাজারে অসাধু ব্যবসায়ী ঢুকলে সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু সংসারের নিত্যগৃহকর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে অসাধুরা, তার জন্যে কেউ বিচলিত নয়।

হরিহরানন্দের কথা শুনে আত্মীয়-সভার সভ্যবৃন্দ যেন বিচলিত হয়ে উঠল এক সঙ্গে।

হরিহরানন্দ বললেন, এ আমার এ তোমার পাপ।

হেয়ার সাহেব তাঁর মাথা আন্দোলিত করতে লাগলেন।

ঠিক ঐভাবে মাথা আন্দোলিত করছেন চুঁচুড়ার কানাগিয়ি। বলছেন, এ পাপ, এ পাপ। নিজের মনকে

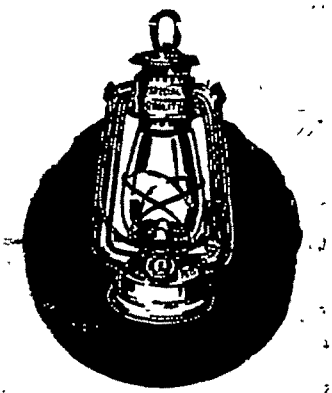
কিয়ান
দর্শন মনোহারী
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬,৩শু চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬০৮০

উপোসী রাখলে নিজের আত্মাই রুষ্ট হয়ে ওঠে।

বাসনা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে নাকি কত নারীর। কই, অপূর্ণ তো থাকছে না। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা পূর্ণ হচ্ছে বৈকি।

রূপচরণ গত হয়েছেন গত বছর। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই তাঁর স্ত্রী তাঁর মাতার অসুস্থতার অজুহাতে চলে গেছেন পিত্রালয়ে। খুব বুদ্ধিমতী নারী। এখানে থাকলে তাঁর জীবন রক্ষা নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়তে হত তাঁকে। রূপচরণের মৃত্যুর পরই তাঁকে তাঁর পিত্রালয় থেকে আনাবার জন্যে হরিনাথ ভট্টাচার্যের অসম্ভব পীড়াপীড়ি আরম্ভ হয়।

বার বার তিনি বলেছেন, তাঁকে আনাবার জন্যে লোক পাঠাও, রূপনারায়ণ। যোগ্য পুত্র তুমি, তুমি বর্তমান থাকতে এত বড় অনাচার হয়ে যাবে এই রায়বাড়িতে? সতী হবেন না তোমার মাতা।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রূপনারায়ণ, কোনো প্রতিবাদও করে না, কোনো অভিমতও জানায় না।

তবু পীড়াপীড়ি করেন পুরোহিত হরিনাথ, বলেন, তুমি এখন এ-গৃহের মালিক, তুমি অভিভাবক, এ-গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ এখন তোমাকেই দেখতে হবে।

রূপনারায়ণ ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, কবে তিনি চলে গিয়েছেন, কেন তিনি চলে গিয়েছেন আমি কিছুই জানিনে। আজ তাঁকে আনতে পাঠালে তিনি কি আসবেন?

—তবু চেষ্টা করতে হবে। তিনি বালিকাও নন্ এবং আশা করি অন্তঃসত্ত্বাও নন, সুতরাং বাধা নেই কিছু।

কিন্তু রূপনারায়ণ নিষ্প্রাণ। নিচের হল-ঘরে বসে কথা হচ্ছে।

হল-ঘরের ছাদের ঠিক মাঝখানে কিয়দংশ উন্মুক্ত, বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে সেই উন্মুক্ত স্থানটি ঘেরা। ওপরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে চাঁপা ও কানাগিন্নির।

চাঁপার কানে-কানে কানাগিন্নি বলল, মরণ। তোর মা পালাল কখন জানবি কি করে, তোর বাপ ম'লো কখন তারই কি খোঁজ রাখিস। সে-হুঁশ আছে?

ঘাড় ফিরিয়ে তারা দেখল, রাধা আছে কি না কাছেভিতে। নেই দেখে ওরা মনের আনন্দে ফিসফিস করে রূপনারায়ণের বাপান্ত করতে লাগল।

কাঁদবার কেউ নেই। কেবল ভবসুন্দরী থেমে থেমে বার-কয়েক ডুকরে ডুকরে উঠেছে। হালদার-বাড়ির বৌরা যখন পাল্কি চেপে এসেছিল তখন একবার, প্রাণকৃষ্ণ লাহার বাড়ির মেয়েরা যখন এসেছিল তখন একবার, তারপর লালমোহন পালের স্ত্রী যখন এসেছিলেন তখন একবার। ওর ঐ লোক-দেখানো কান্না দেখে শরীর জ্বলে যায় চাঁপার ও কানাগিন্নির।

মড়া পড়ে আছে তুলসীতলায়। দাহের ব্যবস্থা হতে পারছে না মৃতের স্ত্রীর অভাবে।

রাধা সব শুনছে ও মনে-মনে জ্বলে উঠছে। তার শাশুড়িটি খুব করিৎকর্মা আর বুদ্ধিমতী, তিনি না হয় সময়মত সতর্ক হতে পেরেছিলেন বলে বেঁচে গেলেন। কিন্তু রাধা যখন পড়বে এই অবস্থায়, তখন তাকে বাঁচাবে কে। পিত্রালয়ে পালিয়ে গিয়েও রক্ষা নেই তার, চুঁচুড়া থেকে পেয়াদা গিয়ে তাকে ধরে আনতে কতক্ষণ। যেরকম অনাচার করে চলেছে রূপনারায়ণ, যে কোনো মুহূর্তে ওর যেমন-তেমন হয়ে যাবার কথা। আজ কত বছর হল? দশ বছরের কথা। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দর্শন পাওয়া গেল না যে-মানুষটার তার জন্যে মরতেও যে লজ্জা করে।

লজ্জা করারই কথা। কিন্তু লজ্জার থেকে ভয় তার বেশি, ঐ জ্বলন্ত আগুনে কি করে সমর্পণ করা যায় নিজেকে?

পুরোহিত হরিনাথ নাকি এখনো আশা দিচ্ছেন রূপনারায়ণকে।

কিন্তু পাথরে চাপ দিলে কি পাথর টোল খায়? অটল হয়ে বসে আছে রূপনারায়ণ।

তাকে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে পুরোহিত-মশায় বিরক্ত হয়ে উঠলেন, উচ্চ গলায় বললেন, আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে এ-খবর জানেন তো?

চমকে তাকাল রূপনারায়ণ, বলল, সাবধান।

হরিনাথ করজোড়ে বললেন, মাপ করবেন। সে কথা বলি নি।

—খাজাঞ্চিবাবু। গুরুগম্ভীর গলায় ডাকল রূপনারায়ণ, এ-গলা যেন মনিবপুত্রের না, স্বয়ং মনিবের। এখন থেকে মনিব হয়েছে রূপনারায়ণ, অন্য কোনো হুঁশ না থাকলেও এ-হুঁশ তার আছে, বলল, খাজাঞ্চিবাবু, ইনি কি চাচ্ছেন দিয়ে দিন।

ব্যস, আর কোনো কথা নয়। রূপনারায়ণ উঠে চলে গেল তার আসরে—নরহরি ও মতিলাল তটস্থ হয়ে উঠল তার আগমনে।

শেষকৃত্য হয়ে গিয়েছে রূপচরণের। সতী হতে পারল না তার স্ত্রী, এ-আক্ষেপ এখনো বাজে হরিনাথের বুকে। নদীর কিনার-বরাবর খবর চলতে থাকে এদিক-ওদিক। গরিটির শ্মশানে খোঁড়া মনোহর খবরটা শুনে চমকে উঠে ল্যাংচাতে থাকে।

একটি বছর গত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ভবসুন্দরী মাঝে-মাঝে এ-বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার কিছুদিন বাদেই ঘটে তার আবির্ভাব। তার ধারণা, কেউ বোঝে না তার গতিবিধি। কিন্তু কোথায় সে যায়, কোথা থেকে ফিরে আসে আবার কানাগিন্নি আর চাঁপাও যেমন বোঝে, রাধাও বোঝে তেমনি।

রাধা ভাবে, এই ঠিক। এই ভাবে জব্দ করতেই হয় এ-বাড়ির মানুষকে। নইলে হুঁশ হবে না এদের, মানুষ হবে না এরা।

কিন্তু কি কথা যেন হচ্ছিল?— বাসনা পূর্ণ। রাধা তার বিবাহ বার্ষিক উৎসব করছে আজ। নিজেই করছে নিজের উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষে কবির গান হবে আজ সারা রাত। রূপনারায়ণের কাছে বার্তা পাঠিয়ে পাঠিয়ে সে তার মত নিয়েছে।

হরুঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ শুনে সে জানিয়েছিল তার মনের সাধ, এ-বাড়িতে কবির আসর বসাই। সে সাধ তার পূর্ণ হয়েছে আজ।

কবিরা এসে পৌঁছে গেছে একে একে। বাইরের বাগানে তাদের জন্যে ছাউনি ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাত্রে গান হবে।

এসেছেন অনেক কবিয়াল। চন্দননগরের বুড়ো কবিয়াল নিতাই বৈরাগী, কলকাতার ভোলা ময়রা, রাম বসু ও তস্য রক্ষিতা যজ্ঞেশ্বরী, আর গরিটির এ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী তাঁদের ছাউনিতে বসে তাঁরা গুলতানি করছেন ও গাঁজা টানছেন। মেজাজ তৈরি করার জন্যে তাঁরা সকলেই ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে ঢোলক নিয়ে এসেছে চুলিরা। তারাও নেশাটা-আশটা করছে ও ডুগডুগ শব্দে ঢোলের চামড়ায় কাঠি ঠুকছে।

অন্যদের থেকে অনেক তফাতে আছে তারা। তবু মাঝে-মাঝে সেই শব্দ এসে পৌঁচচ্ছে এখানেও। রাধার পুলক ধরে না।

যাবতীয় গহনায় আজ সে সজ্জিত করেছে নিজ অঙ্গ। পদতলে বসে চাঁপা তার দুটি চরণ রঞ্জিত করে তুলেছে আলতায়।

চাঁপাও সেজেছে আজ। রাঙা চওড়া পেড়ে শাড়ি পরেছে সে, নাকে দিয়েছে ফাঁদি নথ।

কানাগিন্নির অঙ্গে কোনো ভূষণ নেই। তার শরীরের লোল চামড়া বেষ্টন করে ধবে আছে দুধ-সাদা থান শাড়িটা। ভূষণ নেই, কিন্তু বড় পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে কানাগিন্নিকে।

রাধার খুতনি ধরে আদর করে ছড়া কাটতে লাগলেন কানাগিন্নি, গানের গলা এখনো আছে কানাগিন্নির, ছড়া গাইতে লাগলেন তিনি—

চেঁড়ি চাঁপি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল,
নাসার নিশ্বাসে কর্ণে দুলিছে দোদুল।
পরেছ গলায় এই তেনরী সোনার
নিতম্বে পরেছ কন্যা চারুচন্দ্রহার।
শংখের সম্মুখে হাতে সুবর্ণ কঙ্কন
এ-বেড়িতে বাঁধা পড়ে কোন্ বাছাধন।
পরান-বান্ধান লোহা সুকোমল হাতে
পতির আয়াতচিহ্ন সোহাগ ইহাতে।

হঠাৎ থেমে গেল কানাগিন্নি। দেখল, রাধার চোখে জল। পতির আয়াতচিহ্ন আর সোহাগ ধরা আছে কি না হাতের এই লোহায়, এ পুরাতন প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করে কাজ নেই।

নিমন্ত্রিতেরাও এসে পৌঁচেছেন একে একে। নীচের হল-ঘরে কবির আসরের বন্দোবস্ত। ভারি চিক ফেলে প্রশস্ত হল-ঘর দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, মেয়েরা বসবেন এখানে।

আসরে এসেছেন কবিয়ালরা। ওই যে ভোলা ময়রা, ঐ রাম বসু, তার পাশেই ঐ যজ্ঞেশ্বরী, আর ধুতি পরা, কাঁধে সাদা চাদর, ও হচ্ছে ফিরিঙ্গী এ্যাণ্টনি।

এ্যাণ্টনি-ফিরিঙ্গী? নিকদি বুঝি আসে নি সঙ্গে? এলে বেশ হত। দেশের মানুষকে দেখতে পেত রাধারাণী।

ভোলাতে আর এ্যাণ্টনিতে প্রথম লড়াই। তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দুই দল। ফরাসেরা আরো আলো বসিয়ে দিয়ে গেল দেয়ালে; ওপর থেকে ঝরছে ঝাড়ের আলো।

সদলবলে এসে বসেছেন রূপনারায়ণ। চুঁচুড়ার নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আসন নিয়েছেন।

এ্যাণ্টনি উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করে, গুন্ গুন্ শব্দে গান গেয়ে বুঝি প্রার্থনা করে নিল—

আমি সাধন-ভজন জানি না মা
জেতেতে ফিরিঙ্গী
যদি দয়া করে কৃপা কর মোরে,
হে শিবে মাতঙ্গী।

তারপর এ্যাণ্টনি বলল, বাবুগণ, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আমার আজকের প্রতিপক্ষকে। বলি—

হে ভোলানাথ, তোমার নামে
মাথা নত হচ্ছে আমার।
কিন্তু পাচ্ছিনে তো মাথায় জটা
গলাতে নেই সাপের ঘটা
তবে কেন নাম এতটা
করলি লম্বা-চৌড়া আবার?

উঠে দাঁড়াল ভোলানাথ। বেজে উঠল ঢোল। গেয়ে উঠল সে—

আমি সে-ভোলানাথ নইরে আমি
সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা
শ্যামবাজারে রই।
যদি সেই সে-ভোলানাথ হইবে তবে
বিল্বপত্রে পূজলি কই।

এ্যাণ্টনির কথার উত্তর দিয়েই গালিগালাজ আরম্ভ করল ভোলানাথ, গেয়ে উঠল—

ওরে সাহেবের পো আনটুনি
তোর কটা বাপ বল্ শুনি।
না বলতে পারলে দেখবি আজ
ভোলার কেমন শক্ত-খানি
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে
তোর পাদরি-শিবা
তোর মত হাবা-গোবা
আমি আর দেখি নি।
পথে-ঘাটে দেখিস যারে,
বলিস বাপ অমনি তারে
যেতে হবে শীঘ্র গোরে,
তার কিছু তুই করলি নি।
শোন রে গুণধর, তোর নাই বংশধর
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে
তোর বামনি।

বারবার ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল ভোলানাথ। ভোলানাথের এই কড়া প্রশ্নের কি উত্তর দেয় ওই ফিরিঙ্গী, তা শোনার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল সকলে।

এ্যাণ্টনি উঠে দাঁড়াল। বলল, বাবুগণ, ভোলা বড় শক্ত প্রশ্ন করেছে আমাকে, আমার ক'টা বাপ, আর আমার বংশরক্ষার কি হবে উপায়—

বেজে উঠল ঢোল, সেই তালে এ্যাণ্টনি বলে উঠল—

কি হবে উপায়।
আমার বংশরক্ষার জন্যে বল দাঁড়াব
কার দোর-গোড়ায়।
ঐ ময়রা-ভোলার ভার্যা আছে
ভাবছি যাব তারই কাছে
ঐ পুণ্যবতী চিন্তামণি শুনছি নাকি
সব তরায়।

সুর বদল করে বলল এ্যাণ্টনি—

ভালো কথা বলেছে দোস্ত
বংশরক্ষার বন্দোবস্ত
করবে নাকি ব্রাহ্মণী আমার।
একথা এতই সত্য
শুনলে জ্বলে ওঠে পিত্ত
সত্যকে কদর্য করা পেশা কি
তোমার।

এ্যাণ্টনি বলল, বাবুগণ, আর একটা কঠিন কথা বলেছেন আমাকে ভোলানাথ, আমার ক'টা বাপ। বাবুগণ, কবির আসরে খিস্তি-খেউড় আছে, কিন্তু খিস্তি-খেউড়েরও পরিমাপ আছে বাবুগণ। ভোলানাথের প্রশ্নের উত্তর আমি দেব, কিন্তু কঠিন কথা বলতে পারব না, মাফ করবেন।

একটু থেমে নিল এ্যাণ্টনি, হাত প্রসারিত করে বলে উঠল—

অত রকম বাপের খবর রাখে
না তো এই অধম
ভোলানাথের যতটা বাপ, (আমার)
বাপের সংখ্যা এগারো কম।
এই তো আমার একটি বচন,
আমার বাবা একবচনে,
অমন ধারা কুশ্রী কথা এন না আর
ঐ বদনে।
এমন গুণধরের যিনি গর্ভধারিণী জননী
তাঁকে দেব গালাগালি, বলুন বাবু,
কি কারণে।
তবু যদি আমার কথায়
কিছু বলা হয়েই থাকে—
তাঁকে কিছু বলি নি আজ,
বলেছি তাঁর পুত্রটাকে।
ভোলানাথের যতটা বাপ (আমার)
বাপের সংখ্যা এগার কম
দিতে যখন বলল ভোলা,
দিলেম গালাগালের চরম।

হাসাহাসি পড়ে গেল চারদিকে। চিকের আড়াল থেকেও চাপা হাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

এ্যাণ্টনি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাতজোড় করে দুই চোখ বন্ধ করে স্তোত্র পাঠ করার মত করে গাইল—

আমি হালুইকরের দোকান
খুলি নি তো শ্যামবাজারে
আমার বুকে খুলেছি হাট,
রসায়েছি শ্যাম-রাধারে।
তাঁরই পাদ-পদ্মতলে
আমার কেনাবেচা চলে
নাই লোকসানের অঙ্ক মুনাফা
রোজ পাই হাজারে।

আসন গ্রহণ করল এ্যাণ্টনি। করতালি দিয়ে উঠল সমবেত শ্রোতাগণ। চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বসে সে ভোলানাথের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। প্রত্যুত্তরে ভোলানাথ হেসে বলল, সাবাস!

অনেকক্ষণ ধরে চলেছে গান। রাত্রিও গভীর হয়ে আসছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে আলোগুলো যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আলো না, চোখের দৃষ্টি বুঝি ঝাপসা হয়ে আসছে সকলের।

এবার মজার লড়াই হবে, যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে ভোলানাথের। এবার কেমন খিস্তি হয়, কেমন খেউড় হয় শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে চিকের এপার আর ওপার।

যজ্ঞেশ্বরী ঘাঁটাতে চাইল না ভোলানাথকে, তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রথমেই বলল—

ভোলানাথ আমার পুত্র
আমি ভোলানাথের মাতা।

কিন্তু এতে তার মুখ বন্ধ করা বুঝি গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে করজোড় নমস্কার জানিয়ে ভোলানাথ বলল, মহাশয়গণ, যজ্ঞেশ্বরী আজ এ-আসরে আমার মাতা সেজেছেন। তাহলে প্রথমেই মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি গাই—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী, সর্বকার্যে শুভকরী
তোমার ঐ পুরণো এঁড়ে রাম বসু বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা,
ভোলানাথের অভয়দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিল খাপ।
এখন মা, শুধাই তোরে
কেন এসে এ-আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি-তোমার হয়েছে কাল
বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত জাঁক।
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর
সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে নাই
তুমি আমার গাভী-মাতা,
চল, তোমায় ধরাতে যাই।

হাসির হল্লোড় পড়ে গেল হলঘরে। চমৎকার, চমৎকার ঘা-টা দিয়েছে ভোলানাথ।

ভোলানাথ বলল, বাবুগণ, শাস্ত্রে বলে, পঞ্চপিতা সপ্তমাতা। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা শ্বশুর উপনয়ন-কর্তা ও জন্মদাতা—এই পাঁচজন পিতা। আর, গুরুপত্নী ব্রাহ্মণপত্নী রাজপত্নী গর্ভধারিণী পৃথিবী ধাত্রী আর গবী—এই সাতজন মাতা। যজ্ঞেশ্বরী নিজেকে আমার মাতা বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু সে আমার গুরুপত্নী নয়, সে ব্রাহ্মণপত্নী নয়, সে রাজপত্নী নয়, সে আমার গর্ভধারিণী নয়, সে পৃথিবী নয়, সে আমার ধাত্রীও নয়, সুতরাং সে ঐ সপ্তম শ্রেণীর মাতা। সে আমার গাভী-মাতা।

যজ্ঞেশ্বরী বসে রইল মাথা নীচু করে। রাস বসুর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল. শক্ত হয়ে বসল

গ্রাম বসু। এর উত্তর সে দেবে সুযোগ পেলে। যজ্ঞেশ্বরীও যে দিতে পারবে না, এমন নয়। কিন্তু এ-আসরে যজ্ঞেশ্বরী এসেছে গান গাইতে, খিস্তি করতে নয়, খিস্তির মুখ সে একবার ছাড়লে ভেসে যাবে ভোলানাথ, এ-কথা সকলেই জানে। ভোলানাথও জানে।

রাত দ্বিপ্রহর হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। আবমানি গির্জার ঘড়ি থেকে এখন আর একসঙ্গে বেশি ঘণ্টা বাজছে না। কিছুক্ষণ আগে যে শব্দ হল, সে বুঝি বাত দুটোর।

যতই রাত ভোর হতে থাকবে ততই খেউড় আরম্ভ হবে, এই আশায় আসন ছেড়ে উঠছে না কেউ। ভোলানাথ যে যা দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরীকে, এবার যজ্ঞেশ্বরী তার উত্তর দেবে এই বুঝি সকলের আশা।

নাকে নথ পরে নিচ্ছে যজ্ঞেশ্বরী, তার এই অলংকার-ধারণের বহর দেখে প্রত্যেকেই উৎসুক হয়ে উঠল, ভোররাত্রে এই মোহিনী-বেশ ধারণ করছে কেন যজ্ঞেশ্বরী। এখন কি সে মাতার বেশ পরিত্যাগ করে রঙ্গিনী সেজে ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

রূপনারায়ণ চিকের দিকে তাকাচ্ছে না। লাল মখমলে আবৃত মোলায়েম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

চিকের ওপারে বসে তার চেহারাটা বুঝি ভালো করে দেখে নিচ্ছে কেউ এই অবসরে। সত্যি, আশ্চর্যই লাগে। এতটুকু কৌতূহলও থাকতে নেই, অন্দরমহলের বধূটির ব্যবহার কেমন জানতে ইচ্ছে হয় না একদিন। কেমন সে কথা বলে, কেমন সে হাসে, কেমন সে তাকায়, কেমন সে—

—কেমন লাগছে গান?

কানাগিন্নির কথার উত্তরে রাধা সংক্ষেপে বলল, ভালো।

আরও অনেক সময় কাটার পর যজ্ঞেশ্বরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবুমশায়গণ, আর চিকের আড়ালে আছেন যে বিবিসাহেবরা, আপনাদের আসরে আদর করে ডেকে এনেছেন, আজ এ-আসরে গান গাইব। খিস্তি-খেউড় অনেক হয়েছে, একটু গান গাই আজ, বিরহের গান। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে দেখা নেই অনেক কাল, হঠাৎ তার সখার সঙ্গে দেখা; তখন তার কাছ থেকে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।—

ক্যানক্যান শব্দে বেজে উঠল সারেঙ্গী। যজ্ঞেশ্বরী গান ধরল, নথ নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল—

অনেক দিনের পরে সখা
তোমারে দেখতে পেলাম চোখেতে,
ভাই, বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভাল তো আছেন প্রাণেতে।
তার মনে তো নাই অধিনীরে
তার মনে তো নাই অধিনীরে
নবীনার প্রাণধন হয়ে তিনি এখন
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।
ভাল, সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই
আমায় ফেলে গেলেন কেন
শাঁখের করাতে।

চিকের দিকে চেয়ে চেয়ে গাইছিল যজ্ঞেশ্বরী, এবার ঘুরে দাঁড়াল বাবুদের দিকে মুখ করে, গাইতে লাগল—

বল বল প্রাণনাথেরে
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে' যেতে
যদি থাকে ধার না হয় শুধেই আসব তার
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে
আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে।
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বোঝে না বললে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

দেখি পাপদেশের পাপবিচার
দোহাই আর দিব কার
সদাই প্রাণ দহে কোকিলের স্বরেতে।
মদন তা বুঝে না বললে শুনে না—

চিকের আড়ালে অস্ফুট শব্দে গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

ঘুরে ঘুরে গান করছে যজ্ঞেশ্বরী—

তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না, বললে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

গান থামাল যজ্ঞেশ্বরী। থেমে একটু তাকাল চারদিকে। চিকের ওপার থেকে অস্ফুট গুঞ্জনের শব্দ তার কানে এসেও পৌঁচেছে, সেদিকে একবার তাকাল, বলল, বাবুগণ, এই আমাদের কষ্ট। পিঞ্জরের পাখি আমরা, পরের অধীনে আছি, আমাদের দুঃখ কেউ বোঝে না। আমার কথা বলছি না বাবুমশায়গণ, আমার প্রাণের মানুষ এ-আসরে আছে, সে স্বতন্তর হয় নি। কিন্তু আমার কথা ভেবে এ গান বাঁধি নি। যাঁদের কথা ভেবে গেঁথেছি, ঐ চিকের আড়ালে হয়তো আছেন তাঁদের কেউ কেউ। এ-গান যদি তাঁদের ভালো লেগে থাকে, তাহলেই সে হল আমার গান-বাঁধার দক্ষিণা।

রূপনারায়ণ নড়ে বসল, কোনো দিকে তাকাল না সে। মসৃণ মসলিনের বেনিয়ান তার গায়ে। আলবোলার রূপালী নল তার বাহুতে বেষ্টন করে আছে, মাঝে মাঝে নলটি মুখে দিচ্ছে সে।

(ক্রমশঃ)

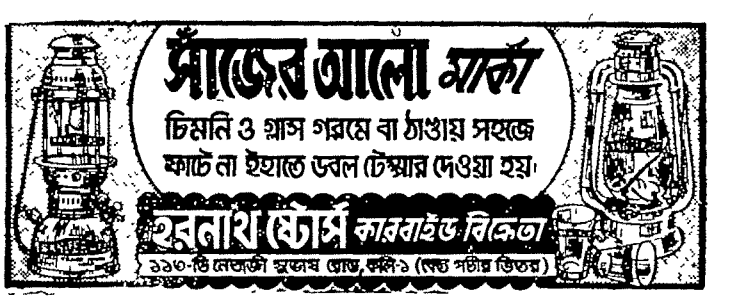

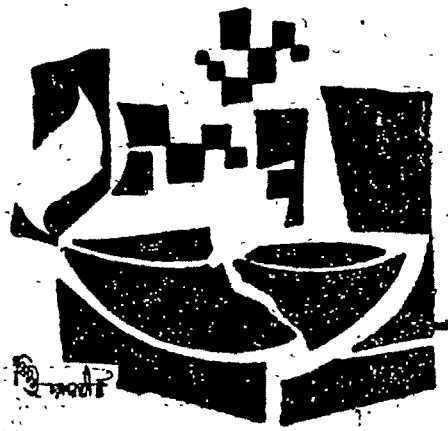

ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'তন্দুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

একচল্লিশ

রেণুকা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, পিছনে যন্ত্রচালিতের মত হাঁটছে বিজয়। একজনের মনে প্রশ্ন, সে জবাব চায়। আর একজনের মনে এতটুকু কৌতূহল নেই, যেতে হয়, সে চলেছে।

রেণুকাদের বাড়ি।

এইখান থেকেই অপমানিত হয়ে উন্মত্ত বিজয় ম্লানমুখে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সে গ্লানি কোথায় যেন ধুয়ে মুছে গেছে। ভাবতে বরং হাসি পেল বিজয়ের। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান, এরই মধ্যে মনের কত না পরিবর্তন হয়েছে। যৌবনের উগ্রতা বিদায় নিয়েছে, স্তিমিত প্রৌঢ়ত্বকে স্বলাভিষিক্ত করে।

রেণুকা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে বলল, নীচের ঘরেই বসা যাক।

বিজয় কোন উত্তর দিল না। রেণুকার নির্দেশ মত সিঁড়ির নীচের ছোট ঘরে চেয়ারে গিয়ে বসল।

রেণুকা দাঁড়িয়ে। কিভাবে কথা সুরু করবে মনে মনে তাই বোধহয় আওড়াচ্ছে। হঠাৎ সুরু করল, কেন তুমি খোকনের কাছে আস? কেন ওকে জিনিষপত্র দাও?

বিজয় ছোট্ট উত্তর দিল, দিতে ইচ্ছে করে।

—খোকন বাচ্চা ছেলে, ওর মনে মিথ্যে কৌতূহল জাগিয়ে লাভ কি? প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি, ও বন্ধু বলছে কাকে? সে সময়ে খানিকটা উৎসাহই দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে যখন শুনলাম বন্ধু প্রায়ই টিফিনের সময় দেখা করতে আসে। তখন থেকেই সন্দেহ হয় নিশ্চয় তুমি। খোকন তোমায় বলে নি যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই?

বিজয় সামনের টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, হ্যাঁ, বলেছিল।

—তাহলে দেখা কর নি কেন?

—যদি আবার চেঁচামেচি হয় সেই ভয়ে।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুজনের কাছেই দুজনে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। এক্ষেত্রে কথা বলার অসুবিধা অনেক। কোথায় যেন খেই হারিয়ে যায়।

রেণুকা প্রশ্ন করল, কি চাও তুমি?

বুঝতে না পেরে বিজয় রেণুকার দিকে মুখ তুলে তাকাল, বলল, কিছু না।

—তুমি আজকাল থাক কোথায়? ইনাদি আমায় লিখেছে তোমার ঘর বন্ধ থাকে।

—বাইরে থাকি।

রেণুকার মুখ কুঁচকে উঠল, এখনও স্বভাব বদলাল না? সেই প্রমথ সমাদ্দারদের আড্ডায় রাত কাটাও।

বিজয় মুখ নীচু করে রইল।

—খোকনের জন্যে যে জিনিষপত্র কিনে আন, টাকা পাও কোথা থেকে?

বিজয় নিরুত্তর।

রেণুকা আরও বিরক্ত হয়, যা হোক কিছু বল। চুপ করে বসে কি ভাবছ?

বিজয় হাসবার চেষ্টা করল, আমাকে প্রশ্ন করে কি লাভ? তুমি কি চাও, তাই বল?

রেণুকা কঠিন স্বরে বলল, আমাদের আর বিরক্ত করো না।

—করি না তো।

—খোকনকেও না।

বিজয় দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, বেশ। আর জিনিষপত্র দেব না।

—দেখাও করো না। ছেলে বড় হচ্ছে, তুমি কে তা সে জানতে চাইবেই।

বিজয় বলল, ভয় নেই। আমি গল্প বলে ওকে ভুলিয়ে রাখব।

—তা হয় না। আমাদের জীবন তো নষ্ট হয়ে গেছেই, ঐ বাচ্চাটাকে তার মধ্যে টানাটানি করে কি লাভ। আমি চাই ও একটা সুস্থ জীবন পাক।

বিজয় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, বেশ তাই হোক। তেষ্টা পেয়েছে একটু জল দেবে?

রেণুকা জল আর মিষ্টি নিয়ে এল।

বিজয় তৃপ্তি সহকারে মিষ্টি দুটো খেয়ে জলের গ্লাস শেষ করে বলল, আঃ, দুপুরবেলা আজ খাওয়া হয় নি।

সে সন্দেহ রেণুকারও হয়েছিল,

তবু খাবার কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, আরও দুটো মিষ্টি এনে দেব?

বিজয় উঠে পড়ল, না। এখন যাই।

রেণুকা দরজা থেকে সরে দাঁড়াল, বিজয় আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রেণুকা বলল, তুমি বাক্সটা ফেলে গেলে।

—ও, হ্যাঁ।

বিজয় ফিরে এসে বাক্সটা হাতে নেয়। বলে, এটা যে সঙ্গে এনেছি ভুলে গিয়েছিলাম। যাকে দেবার ছিল দেওয়া হল না।

রেণুকা বুঝতে পেরেও চুপ করে রইল।

বিজয় উঠোন পেরিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল। ওকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, রেণুকা জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

বিজয় অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, যদি দেখা না করে কখনও কখনও দু'একটা জিনিষ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই তাতেও কি খোকনের ক্ষতি হবে?

রেণুকা নিরভিমানে বলল, কি দরকার?

—এ বাক্সটা তাহলে ফিরিয়েই নিয়ে যাই।

—তাই যাও।

সেইদিন থেকেই বিজয়ের মন ভেঙে পড়ল। প্রতিবাদ করবার কিছু নেই, যে ছেলেকে আশৈশব রেণুকাই মানুষ করেছে, তার ওপর বিজয়ের অধিকার কতটুকু। শুধু মনে হয় রতনের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

জিনিষপত্র ভরা বাক্সটা বিজয় নিজের ঘরে তাকের ওপরে তুলে রেখেছে। পাছে ধুলো পড়ে ময়লা হয়, তার ওপরে সযত্নে চাদর চাপা দিয়ে রেখেছে, মাঝে মাঝে নামিয়ে দেখে, বিশেষ করে নতুন কোন জিনিষ চোখে পড়লে কিনে এনে ওরই মধ্যে ভরে রাখে।

সমর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বিজয়দা, ঐ বাক্স ভর্তি জিনিষ জমাচ্ছ, যাকে দেবার পাঠিয়ে দাও না।

বিজয় ম্লান হেসে বলে, উপায় থাকলে পাঠিয়ে দিতাম।

—কেন, সে অনেক দূরে থাকে বুঝি?

বিজয় বলে, হ্যাঁ, অনেক দূরে।

—টিফিনের সময় তুমি যে কোন স্কুলে যেতে? আর তো যাও না।

সাধনা দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ মহেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

—নাঃ, সে পথও বন্ধ।

—কি বলছ আবোল-তাবোল ?

—ঠিকই বলছি রে সমর, জীবনটা বড় গোলমেলে। কি যে চাই, আর কি চাই না সেইটে বুঝতেই এতগুলো বছর কেটে গেল। একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না রে। ভুল করলে কিছুতেই শোধরান যায় না। এখন কি মনে হয় জানিস ? যদি জীবনটা আবার প্রথম থেকে সুরু করতে পারতাম।

সমর সহানুভূতি প্রকাশ করে, তোমার কথা আমায় খুলে বল। যদি মনে কিছু সাহায্য করতে পারি।

—বলব। একদিন সময় পেলে বলব।

বিজয়কে সমরের ভাল লেগে-ছিল। ওর মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছিল একজন পথ-ভোলা ক্লান্ত পথিককে, যে সম্পূর্ণ একলা সীমাহীন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে যাবে তারই পথ খুঁজছে। অথচ এ খোঁজার মধ্যে কোন আগ্রহ নেই।

প্রতি সন্ধ্যায় বিজয়ের কাছে সমর আসে, তার সঙ্গে গল্প করে, কথার ছলে আস্তে আস্তে জেনে নেয় বিজয়ের অতীতটাকে। সেই সঙ্গে বুদ্ধিও দেয়, কেন তুমি তোমাদের যে পৈত্রিক বাড়ি তা পার্টিশান করে নিচ্ছ না। তোমার অংশটুকুও তো রতনকে দিয়ে যেতে পার।

প্রথমটা বিজয় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, সে অনেক ঝামেলা, আমার দাদা কি সহজে রাজী হবে।

প্রবীণ ঔপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

—হতেই হবে। তোমার অংশ রয়েছে, ওরা তোমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। পার্টিশান করতে না চায় কেস করতে হবে।

—সে-সব আমি পারব না।

—তুমি না পার, আমি পারব। আমি কাউকে ঠকাতেও চাই না, নিজেও ঠকি না। তুমি ঠকবে তা সহ্য করব কেন ?

বিজয় হাসে, সমর, তোমার সঙ্গে যদি আমার বছর দশেক আগে দেখা হত। যখন আলাপ হল তখন যে ঠকেই বসে আছি।

—ওসব কথা আমি শুনব না, রাঙাদা তোমাকে ভালবাসেন। চল, তাঁরই সঙ্গে পরামর্শ করব।

শুধু পরামর্শ নয়, আলাপ-আলোচনা, তর্ক, ঝগড়া, সবের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত পার্টিশান করাই সাব্যস্ত হল।

বিশ্বনাথ শেষ পর্যন্ত বলেছিল, বিজয় ভুল করল। চিরটাকাল বদ সঙ্গে মিশে বদবুদ্ধি অনুযায়ী আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। আমি বলে দিচ্ছি বিজয়ের নেশুড়ে বন্ধুরা নেশার ঝোঁকে বিজয়কে দিয়ে ওর অংশটা লিখিয়ে নেবে।

রাঙাদা আর ঝণ্টুও যে প্রথমটা রাজী হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সমরের উৎসাহ দেখে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করতে পারে নি। সমরের চেহারার মধ্যে এমন একটা ঐকান্তিকতা আছে, যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

দলিল নিয়ে এসে বিজয় যেদিন বাক্সের মধ্যে ভরল, সমর আবদার ধরল, বিজয়দা, আজ আমাদের চা মিষ্টি খাওয়াও।

বিজয় পাঁচটা টাকা বার করে দেয়।

—পাঁচ টাকায় হবে না, দশটাকা দাও।

বিজয় হাসল, আর কে খাবে ? তুমি, আমি আর তো দরোয়ানজী।

—তুমি বেরিয়ে যেও না, আমি মিষ্টি নিয়ে আসছি।

সমর চলে যাবার পর বিজয় চৌকির ওপর শুয়ে পুরণো দিনের কথাই ভাবছিল। ছোটবেলা থেকে যে বাড়িতে মানুষ হয়েছে, সেই হৈ চৈ ভরা, জম-জমাট প্রকাণ্ড বাড়িখানা, এক অংশের সে মালিক। এই রকম ভাগ হতে হতে ঐ বাড়িটা আর থাকবে না। নাই বা রইল, ক্ষতি কি, কালের নিয়মে সবই তো শেষ হয়ে যায় একদিন। মানুষও থাকে না, তার কীর্তিও না। তবু যে কটা দিন বেঁচে থাকা তারই মধ্যে মন কষাকষি, ঝগড়া, বিচ্ছেদ। কেন এগুলোকে এড়িয়ে চলা যায় না। ক'বছর আগে রেণুকার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল, এখন তো তা নেই, অনেক ঝড়-ঝাপটা তো বয়ে গেল। তবু কেন রেণুকা বিজয়কে ক্ষমা করতে পারছে না। কেন ভয় পাচ্ছে রতনের সঙ্গে দেখা হলে পরে বিপদ আসতে পারে।

এতই কি অসম্ভব নতুন করে সংসার পাতা ? ছোট একটা বাসা নেওয়া, খান দু'তিন ঘর। রেণুকা রোজগার করছে, বিজয়েরও রোজগার আছে, তার ওপর কলকাতার বাড়িটা ভাড়া দিলেও কিছু টাকা পাওয়া যাবে। রতন স্কুলে পড়বে। সামাজিক কোন বাধা নেই, তারা স্বামী স্ত্রী। তবু—, মেলবার কোন উপায় নেই।

আশ্চর্য মানুষের মন। নিজেকে কি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না। বিজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস সে পারবে। কিন্তু রেণুকা, তার পক্ষে বোধহয় অন্যরকম কিছু চিন্তা করাই অসম্ভব। স্কুলে মা টীচারী করে সে ছেলেকে মানুষ করবে, এই তার প্রতিজ্ঞা। এ থেকে এক চুল নড়চড় হবে না। দোষ দেওয়াও যায় না রেণুকাকে। তার স্বপ্নের

নৌকো, রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় ফুটো হয়ে ডুবে গেছে। আর সে স্বপ্ন দেখতে চায় না, কিন্তু তবু এই মান-অভিমানের উর্ধ্বে কি যাওয়া যায় না ?

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। কারা জিজ্ঞেস করছে, সমরদা আছ, সমরদা ?

বিজয় শুয়ে শুয়েই উত্তর দিল, বেরিয়েছে, এখনই আসবে।

—ভেতরে যাব ?

বিজয় উঠে বসল, জনা দশেক ছোট ছোট ছেলে, গুটি গুটি পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বিজয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, চেঁচিয়ে উঠল, রতন ?

রতন ছুটে এল, বন্ধু, তুমি আর স্কুলে যাও না।

—না, বড় কাজ, সময় পাই না।

—তোমার জন্যে আমরা সবাই বসে থাকি।

একজন জিজ্ঞেস করল, বন্ধু, তুমি বুঝি এইখানে থাক ?

—সমরদা আমাদের মিষ্টি খাওয়াবে বলে ডেকেছে, কি মজা তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

বিজয় জিজ্ঞেস করে, সমরকে তোমরা চিনলে কি করে।

রতন বলল, বাঃ, সমরদা ঐ শঙ্করের দাদা হয়।

—তাই বুঝি, আমি জানতাম না।

ছেলেরা ঘিরে ধরল বিজয়কে গল্প বলার জন্যে। আজ আর বিজয় না বলতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে শিকারের গল্প বলে চলল। কিছুক্ষণ বাদে সমর ফিরে এল, এক ঝুড়ি খাবার নিয়ে। ছেলেদের মহা আনন্দ। হৈ হৈ করে তারা খেল, খেলল। সন্ধ্যের মুখে যে যার ফিরে গেল বাড়িতে। কিন্তু বলে গেল, আবার আরেকদিন তারা আসবে। বিজয় আর সমর তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরের গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

সমর জিজ্ঞেস করলে, তুমি খুশি হয়েছ, বিজয়দা ?

—সত্যিই রতনকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, প্রথমটা মনে হল, বুঝি স্বপ্ন দেখছি।

—শঙ্কর আমার খুড়তুতো ভাই, রতনের চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে, ওকে দিয়েই সবাইকে ডাকিয়ে এনেছি। কি ভাবছ ?

বিজয় ম্লান হাসল, ভাবছি রেণুকা যখন জানতে পারবে, আমি এখানেই আছি, আরও বিবক্ত হবে।

—দেখাই যাক না।

বাচ্চারা কিন্তু মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে এখানে খেলতে আসত। বিজয় কাজ থেকে ফিরে প্রতিদিন অপেক্ষা


সাপ্তাহিক বসুমতীর

পরবর্তা আকর্ষণ :

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ধারাবাহিক উপন্যাস

'কৃষ্ণচূড়া'


করে থাকে যদি তারা আসে। বেশির ভাগ দিনই হতাশ হতে হয়, তারা এলে বিজয় তক্ষুনি খাবার আনতে পাঠায়, অনর্গল গল্প করে, রতনকে কোলের উপর বসায়। তারা চলে গেলে ভাবে, রেণুকা কি এখনও জানতে পারে নি ? না, জেনেও রতনকে আসতে দিচ্ছে।

আবার আশার একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে ওঠে।

কিন্তু সে মাত্র ক'দিনের জন্যে। ক'দিন পরে ছেলেরা এল, রতন এল না।

ব্যাকুল বিজয় প্রশ্ন করল, রতন এল না ?

তারা বলল, ওর সর্দি হয়েছে। তাই আসে নি।

বিজয় আশ্বস্ত হয়, পরের দিন নিশ্চয় নিয়ে এস।

তারা বলল, রতন তো আগেই আসবে, তুমি তো ওর বন্ধু।

কিন্তু ওদের কথা মিলল না। বিজয় যথারীতি ছেলের দলের অপেক্ষা করে থাকে, তারা আবার এল, কিন্তু সেদিনও রতন এল না।

বিজয় উদ্বিগ্ন হয়, সে কি, এখনও রতনের শরীর সারে নি ?

তারা বলল, সেরে গেছে, কিন্তু আজকাল বিকেলবেলা ও পড়ে, তাই আমাদের সঙ্গে আর খেলতে বেরয় না।

বিজয় কিছু বলতে পারল না, এতদিন যে আশঙ্কা সে করছিল, তাই যে ঘটেছে বুঝতে পেরে নিমেষের মধ্যে মুখ তার শুকিয়ে গেল।

বাচ্চারা আবদার ধরল, বন্ধু, আমাদের গল্প বল।

বিজয় একেবারে অন্য কথা ভাবছিল, বলল, তোমাদের বন্ধু পালিয়ে গেছে।

—কোথায় ?

—তা তো জানি না, কোন ঠিকানা রেখে যায় নি।

—তাহলে তুমি কে ?

কি মনে হ'ল বিজয় হঠাৎ বলল, আমি তার ভূত।

সবাই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, ভূতের গল্প বল। আমরা শুনব।

তারা নাছোড়বন্দা, থামে না।

বিজয় বলল, তোমরা বসো, আমি আসছি।

বিজয় আস্তে আস্তে চলে গেল। ছেলের দল বসে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল বিজয়ের জন্য। কিন্তু সে ফিরল না। অন্ধকার নেমে আসছে, ভূতের ভয়ে গা তাদের ছম ছম করে উঠল। এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারা আর কখনও আসে নি।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

—সে কি—আপনি—

—অবাক হচ্ছেন? শুনলে আরও অবাক হবেন, আমি একটা যাত্রা দলের অধিকারী মানুষ। পাঁচটা লোক নিয়ে আমার কারবার। নতুন বই ধরা, তালিম দেওয়া, বায়না নেওয়া, কণ্ট্রাক্ট করা—কত, কত কাজ আমার। কিন্তু শান্তিতে কিছুই করার উপায় নেই—সব সময় ও রাগে গমগম করবে—বলবে! কেন—কেন তুমি বিয়ে করেছিলে, দিন নেই, রাত নেই বাইরে বাইরেই ঘুরবে যদি? নিন ঠ্যালা বুঝুন এবার। আরে বাপু রে দিনে রাতেই তো আমার বাইরের কাজ—বেশি চেঁচামেচি করে সন্ন্যেসী হবার ভয় দেখালে কেঁদে বলে কি—তোমাকে ভালবাসি। অমন ভালবাসার মুখে আগুন—অমন ভালবাসার মাথায় ঝাঁটার বাড়ি—হঠাৎ উত্তেজিত গলার স্বরটা নামিয়ে সে বলল, কি মনে হয় জানেন দারোগাবাবু বাড়িতে নয়, ঘরে নয়—একটা জেলখানায় বাস করছি—যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল ঘোষালের মুখে—আবার বলল, একদিন বুঝি রাধার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। সেই থেকে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

আমি ঘোষালকে যেতে বললাম। দেখলাম, বিখ্যাত প্রাইভেট গোয়েন্দা অরবিন্দ বোসের রিপোর্ট। মিঃ চ্যাটার্জী তাঁর রিপোর্টটা দেখতে পাঠিয়েছেন আমাকে। শুধু তাই নয়, আমাকে মন্তব্য করতে বলেছেন।

বিলপাড়ায় পুলের নীচে চারু দাসের খুনের তদন্ত সম্বন্ধে রিপোর্ট।

আমি বিলপাড়ায়, খাসপুরে, খরলপাড়ায়, পোড়ামাধবে আরও বিভিন্ন গ্রামে কখনো ভাগবতপাঠকের ছদ্মবেশে, কখনো ভিখারীর ছদ্মবেশে ঘুরেছি। রাত্রে প্রত্যেক বাড়ির আনাচে কানাচে ভূতের মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার মনে এসেছে তিনটে সন্দেহ।

(ক) চারুকে যে খুন করেছে সে কারো নির্দেশে করেছে।

(খ) বিলপাড়ার লোক নয় খুনী।

(গ) আবার এমনও হতে পারে, যে খুন করেছে, সে হয়তো সাধারণ চোর-ডাকাতের মত পয়সার লোভেই করেছে।

এই তিনটি সিদ্ধান্তের মূলে যে যে কারণ আছে তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি—

(ক) সাধারণত কারো নির্দেশে খুন যে করে, তার মনে হত্যার বিভীষিকা ততটা ভয়াবহ রূপ না, যতটা হয়, সরাসরি ধনীর (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যে খুন করে)। তাই হারু ঘোষাল, শিবু, যতীন, রাইচরণ, নিরঞ্জন, যখনি যার ওপরে সন্দেহ হচ্ছে তার সঙ্গে আলাপ করে কথা-বার্তা বলে দেখেছি—তাদের ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ নেই। চোখে এতটুকু চিন্তার ছায়া পড়ে না।

(খ) উপরোক্ত ব্যক্তিদের বাড়ির পেছনে, রাত্রে তাদের শয়নঘরের দেওয়ালের আড়ালে আড়ি পেতে তাদের অন্তরঙ্গজনের সঙ্গে আলাপ শোনবার চেষ্টা করেছি। কোন আভাস পাই নি—তাদের ব্যবহারে, চাল-চলনে, গতিবিধিতেও কোন সন্দেহ হয় নি। তাই মনে হয়, যে খুন করেছে, সে বিলপাড়ার লোক নয়।

(গ) খাসপুর-বাউলের রাস্তা। জেলা-বোর্ডের রোড কনষ্ট্রাকশান ডিপার্টমেণ্টের খাতাপত্র খোঁজ করে দেখা গেল, রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল তেত্রিশ বছর আগে। তখন দেশে গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন চলছে। সেই সময়

শিবনাথ ঘোষ মানে এক ডেটিনিউ, মানে সরকারের অন্তরীণ রাজবন্দীর উদ্যোগে এবং অধিবাসীদের সহযোগিতায় সৃষ্টি হয়েছিল এই খাসপুর-বাউলের রাস্তা। তৈরি হওয়ার অনেক পরে জেলাবোর্ড থেকে তার ভার গ্রহণ করেছিল।

শিবনাথ ঘোষের মাথায় কেন এসেছিল এই রাস্তার কথা। খাসপুরে হাট বসে রবিবারে, সোমবারে মদনগঞ্জ, মঙ্গলবারে বোল্লা, বুধবারে আবার খাসপুর, বৃহস্পতিবারে ভাটরা শুক্রবারে আবার বোল্লা আর শনিবারে বসে বিলপাড়ার হাট। তাহলে খাসপুর-বাউলের ভেতরে একটা রাস্তা হলে গ্রাম-গ্রামান্তরের দোকানীদের, হাটুরেদের খুব সুবিধা হয়। এই পথে রাত্রে যারা চলাফেরা করে তারা হাটুরে। কিংবা হাটফেরত দোকানী। কিন্তু দশ-বারো বছর আগে বোল্লায় আর একবার দেবীপুরে হাটুরেদের ওপরে বড় বড় দুটো ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর তারা বেশি রাত্রে আর চলাফেরা করে না।

উপরোক্ত যে বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করা হলো, তা ছাড়াও এই রাস্তার দুদিকে ধূধূ ধানের মাঠের শেষে কাজলকালো দিগন্তের ভেতরে ভেতরে ডুব দিয়ে বসে আছে অসংখ্য গ্রাম। তাদের অধিবাসীরা সাঁওতাল—ওঁরাও ইত্যাদি। অভাবের সময় তাদের যদি কিছু টাকা দেওয়া যায়—তাহলে তারা অনায়াসে খুনও করতে পারে।

এরা গ্রামে গ্রামে সংখ্যায় যেমন অজস্র, গ্রামও তেমনি অনেক। কাজেই খুনীকে কিংবা খুনীদের সনাক্ত করা খুব কঠিন। শুধু যে নির্দেশে এরা খুন করে তা নয়—অভাবের জ্বালায় এরাই গায়ে কালি মেখে হাতে মশাল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরোয়।

চারু দাসের ঘাড়ে ছিল আসামী মুগার চাদর, পায়ে চটি, এ অঞ্চলের পক্ষে বেমানান রকমের ফর্সা জামা। তাই দুর্বৃত্তদের পক্ষে ভাবা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, সে একটি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। রুচিসম্মত পোষাক-পরিচ্ছদও তার অপঘাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

আরও দশদিন থাকা কয়েকটি কারণে প্রয়োজন মনে করলাম। ভাগবতপাঠকের ছদ্মবেশেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন ডিফেন্স পার্টির ছেলেদের হাতে পড়েছিলাম। সেদিন দেখেছিলাম কালো একটা ছায়ামূর্তি চারুর বাড়ির দিকে দ্রুত যাচ্ছে। তার হাতে কিছু একটা ছিল। অন্ধকারে থেকে থেকে চিক চিক করে উঠছিল হাতের সেই জিনিষটা। তাকে অনুসরণ করেছিলাম দীর্ঘ পথ। সেই শিবপুকুর, সরকার মশাইয়ের বাগানবাড়ির কাছ থেকে একেবারে খাসপুর-বাউলের রাস্তা ধরে চারু দাসের বাড়ি পর্যন্ত। হঠাৎ আমার মনে হল—ওটা তেল দিয়ে কালো কুচ কুচে করা কোন লাঠির পিতল দিয়ে বাঁধানো গিঁট। পিতলে বাঁধা গিঁটগুলি ঝিকমিক করছে রাত্রের অন্ধকারে।

সাধারণত পশ্চিম দেশীয় দারোয়ানেরা এই রকম লাঠি ব্যবহার করে। কিন্তু ঐ গ্রামে পশ্চিমা দারোয়ান আছে একমাত্র ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট নিরঞ্জন সরকারের। নাম—বগলু।

কিন্তু তাও নিশ্চিত হতে পারলাম না, সেই ছায়ামূর্তি যখন তার দু' এক মিনিট পরে বেরিয়ে গেল, তখন তাকে দেখতে পেলাম না।

খুনের বাড়ি বলে যে সেপাইকে মোতায়েন করা হয়েছিল, সে ছিল বাড়ির সামনে। আর যখন ঘরের ভেতরে ফিস ফিস কথাবার্তা চলছিল তখন ঘরে ঢুকি নি। তার কারণ, প্রথমত সে সাবধান হয়ে যাবে—সতর্ক হয়ে যাবে। রাধার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করবে। দ্বিতীয়ত, রাধার স্বামী নেই। আর স্বামী থাকাকালীনও ওর একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারে, সেটা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে জড়িত তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই একটি

নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত

উষসী ট্যালকম পাউডার

বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড সহযোগে প্রস্তুত
ঘামাচি স্থায়ীভাবে দূর করে

উষসীর দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল ও সতেজ রাখবে। বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড থাকায় ইহা অতি সত্বর ঘামাচি দূর করিয়া আপনাকে অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষে সমান উপযোগী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর

মেয়ের স্নেহ প্রীতি-ভালবাসার জীবনের ভেতরে হাত দেব কেন।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। একদিন গভীর রাত্রে বুড়ো-পুকুরের পাড়ে সেই উঁচু জামগাছের ডালে বসে আছি। এই জামগাছটা এত বেশি লম্বা যে গ্রামের কোথায় কি হচ্ছে সব স্পষ্ট দেখা যায়।

একদিন চোখে কিছু পড়ল না কিন্তু শব্দ শুনতে পেলাম। অদ্ভুত একটা শব্দ—খট—খট—ঝিক, খট—খট—ঝিক—খট-খট-খট—ঝিক—

কলকাতার লোক। যদিও বহু গ্রামে ঘুরেছি। তবুও অভিজ্ঞতাটা তো খুব পাকা হয় নি। ভাবলাম এ আবার কি পোকা রে বাবা!

চারদিকে ঘোর অন্ধকার। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। সমস্ত মাঠে, গাছ-পালায় যেন কে একেবারে কালি ঢেলে দিয়েছে। শুধু দূরে সরকার মশাইয়ের বাগানবাড়ির বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে। পেট্রোম্যাক্সের জোরালো আলো। অন্ধকারের সমুদ্রে যেন একটা আলোকস্তম্ভ। ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে আছড়ে পড়েছে সেই আলো।

গ্রামে গ্রামে ডাকাতি হচ্ছে বলে সরকার মশাই সারারাত গ্রামের হিতার্থে লাইট জ্বালিয়ে রাখেন। দুর্বৃত্তরা বুঝতে পারবে যে, গ্রামের লোক জেগে আছে।

ওদিকে শব্দটা—সেই অদ্ভুত শব্দটা ক্রমশ—ক্রমশ খুব, খুব কাছে আসছে। খট—খট—ঝিক, খট—খট—ঝিক—।

হাটখোলার দিকের ঘন অন্ধকারে একটা আবছায়া সাদা মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করছে।

খট-খট—ঝিক—

খট-খট-ঝিক—

লোকটা ক্রমশ এদিকে আসছে। অর্থাৎ আমার গাছের নীচে দিয়েই যাবে মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমি যে গাছে চড়ে আছি তার পাশের আমগাছের একটা ডাল হুড়মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ল।

আমি চমকে উঠলাম। মূর্তিটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই ভাঙা আম ডালটার সামনে। হঠাৎ তার হাতের টর্চটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। জোরালো আলোর রশ্মি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করছে—কেন ভাঙল এই আমগাছের ডাল? তার হাতে জ্বলছে টর্চ। মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁহাতে একটা লাঠির মত কি যেন। ধপ করে তার সামনে গাছ থেকে নেমে পড়লাম। আর ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম।

—আপনি—এত রাত্রে—

—হ্যাঁ, এই আমার সময় বোস-বাবু। কার কি দুঃখ, কার কি অভিযোগ সমস্ত আমি জানতে পারি আমার এই গোপন নৈশবিহারে, বলেই হাঁটতে সুরু করলেন সরকার মশাই। আর লাঠিটা একবার মাটিতে ঠুকে দিলেন। শব্দ উঠল, খট-খট—ঝিক—

পরে দেখেছিলাম লাঠির ডগায় একটা পেরেক দিয়ে চাকতি আঁটা আছে। লাঠিটা মাটিতে ঠুকলেই শব্দ হয়—খট-খট—ঝিক। সাপ পোকা-মাকড় তাড়ানোর লাঠি।

অন্ধকারে সরকার মশাইয়ের লুঙ্গি পরা লম্বা বিশাল কালো দেহটা মিলিয়ে গেল। যারা দুঃস্থ, যারা অভাব-গ্রস্ত তাদের খোঁজখবর নেবেন। রাধাও তো এখন বিপদের ভেতরে আছে। তার দিন চলবে কিসে। হয়তো রাধার বাড়িতেও তিনি যাবেন। আর তাঁকে অনুসরণ করা চলে না।

পরিশেষে বলা যায়, নিরঞ্জন সরকার অবস্থাপন্ন এবং হৃদয়বান বলে এ-অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি যা করেন তারই গায়ে একটা লেবেল ঝুলিয়ে দেন, মহৎ কোন কাজের লেবেল, যেমন সমাজসেবা, দেশসেবা, ইত্যাদি---

যদি তিনি এই রহস্যময় হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলেও এমন কোন সূত্র তিনি রাখেন নি যাতে করে তাঁকে ধরা যায়।

বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের এই জমিদার-জোতদার যাদের বিশাল অট্টালিকা কি চকচকে টিনের বাড়ি নবম সবুজ দিগন্তের ভেতরে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দূর থেকে মনে হয় মখমলের সবুজ জাজিমের ভেতরে যেন একটা চকচকে ছুরি আমূল বিঁধে আছে। বিঁধে আছে গ্রাম-দেশের হৃৎপিণ্ডের ভেতরে।

এই সব ধনী ব্যক্তিদের চরিত্রের দ্বৈত একটা সত্তা আছে। বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তন করবে। সারা গ্রামের লোককে খাওয়াবে। সাত দিন সাত রাত কারো বাড়িতে হাঁড়ি চাপাতে দেবে না। আবার দু' ইঞ্চি মাটির জন্য হয়তো লাঠিয়াল লাগিয়ে পাঁচশো লোকের মাথা ফাটিয়ে একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। অতি তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন করে রাতারাতি পুকুরের এঁদো কাদার ভেতরে পুঁতে ফেলতে পারে। আবার পরদিনই হয়তো দেখা যাবে, গায়ে চাদর জড়িয়ে অষ্টপ্রহরের আসরের সামনে চেয়ারে বসে আছে। এদের—বোস সাহেবের রিপোর্ট শেষ হলো।

কোনদিন ধরা যায় না—কোন-দিন ধরা যাবে না। তাই তোমাকে আগেই বলেছি, ভুল—মস্ত ভুল করেছিলাম আমরা। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীন্দ্র-বাবু থামলেন।

—ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং সাইকেলের বেল বেজে উঠল। স্মরণগ্রাম থেকে ধান আদায়ের কাজ শেষ করে ফিরলেন ফণীবাবু—

—একি তুমি এই ঠাণ্ডায় বারান্দায় এখনও বসে আছো?

—এই যাই বাবা। হরিশবাবুর ভাইপো এসেছেন কলকাতা থেকে। তাই একটু কথাবার্তা বলছি—

পরিচয় হল। জীতেনদা'র কথা বললাম। তিনি বললেন, জীতেন যাচ্ছে না হরিশকাকার সঙ্গে। আপনি যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কলকাতায় আমারই তো চেনা-জানা খুব বেশি—

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। আকাশে সপ্তর্ষি জ্বলছে, জ্বলছে বৃশ্চিকরাশি। কিন্তু সব কেমন ঝাপসা আর আবছায়া—হঠাৎ চমকে উঠলাম।

বৈঠকখানার বারান্দায় কার যেন ছায়াদেহ দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি জ্যাঠামশাইয়ের শরীর আরও খারাপ হয়েছে?

—কে ওখানে? জীতেনদা!

—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এত রাত হলো যে—

বললাম। বললাম একে একে সব কথা। মণীন্দ্রবাবুর অনুরোধে সেই কয়েকটা পয়েন্ট বাদ দিয়ে সব কথাই বললাম।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন জীতেনদা।

—অতিরিক্ত সুখ, অতি স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে বুঝলে শঙ্কর—

—কেন ও কথা বলছেন দাদা!

—সরকার মশাইয়ের মৃত্যুটাই দেখ না। বারো তের বছর আগে লিভারের অসুখেই উনি মারা গেলেন। অতিরিক্ত মদ খেয়ে খেয়ে লিভার একেবারে পচে গিয়েছিল। থামলেন জীতনেদা। বাগানের অন্ধকার গাছপালার দিকে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—গোয়েন্দা অরবিন্দ বোসের রিপোর্ট, মণিবাবুর কথা শুনে আপনার কি মনে হয় সরকার মশাই—

—তাদের (পুলিশদের) যা মনে হয়, তাই আমার মনে হয়েছিল। কবে জানো?

—কবে?

—যেদিন মারা গেলেন, সেদিনই তাঁর ছেলেরা যখন উইল খুলল। পড়ল। আর একেবারে গুম হয়ে গেল। বুঝতে এল বাবার কাছে। আমি সব শুনলাম তাদের আলোচনা। সেই আলোচনা শুনে আমার মনে হয়েছিল—

খোকা—

জেঠিমা ডাকলেন। আমরা দুজনেই গেলাম। লক্ষ্য করলাম। জ্যাঠামশাইয়ের পেটটা আরও একটু উঁচু মনে হল।

—শঙ্কর। তুমি মণি দারোগার বাড়িতে গিয়েছিলে? চারু দাসের খুনের গপ্পো জোড়ে নি। নিশ্চয়ই বলেছে।

জ্যাঠামশাইকে যেন খুশি খুশি মনে হচ্ছে। হয়তো শরীরটা ভাল আছে। বললেন, জানো অদ্ভুত লোক ওই মণি দারোগা। সেই কেসের যাবতীয় রিপোর্ট, কাগজপত্রের নকল রেখেছে। যে যাবে তাকেই শুনিয়ে দেবে চারু দাসের খুনের কাহিনী।

—বাবা, কলকাতা যেতে আপত্তি করছো কেন?

—চলুন না জ্যাঠামশায়। বেষ্ট পসিবল ট্রিটমেণ্ট তো সেখানে ছাড়া হবে না।

হাসলেন জ্যাঠামশায়। শুকনো হাসি। মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। শুকিয়ে আমসী হয়ে যাওয়া মুখ। মুখের সব রস যেন এসে ঢুকেছে পেটে। পেট ঠেলে ওপরে উঠছে। হাত, পা, বুক, পিঠ, গলা চারিদিক থেকে রস শুষে নিয়ে স্ফীত হচ্ছে পেট।

—আচ্ছা, এখানকার ডাক্তাররা পেটের ভেতরের জল বের করে দিতে পারে না রে। জ্যাঠামশাইয়ের কথাগুলো কেমন করুণ শোনালো। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন, কি হবে কলকাতা যেয়ে—এ অসুখে তো কেউ বাঁচে না—

—তুমি কি বলছো গো? হাউ হাউ করে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন জেঠিমা।

ঘরের বাতাসটা অত্যন্ত—অত্যন্ত ভারি মনে হল। কেমন একটা গুমোট গরম। আমি বেরিয়ে এলাম।

মনটা ভার হয়ে গেল। সত্যিই অসুখটা কঠিন। কিন্তু এত রোগ থাকতে জ্যাঠামশাইয়ের এই রোগ কেন হলো—কেন—ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই মনে পড়ল, জ্যাঠামশাই না গেলেও আমাকে যেতেই হবে। আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে—

মনে পড়ল, রাধা বোষ্টুমী বলেছিল, কলকাতায় যাওয়ার আগে আর একবার তার সঙ্গে দেখা করতে—

রওনা হলাম রাধার বাড়ির দিকে।

(ক্রমশঃ)

# অপরাহ্ণ

মৃত্যুঞ্জয় মাহাত

যে নদী ধূসর বর্ণে শেষবার স্তব্ধ হয়ে গেল
সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে, আজ তার স্তব্ধতার পাশে
উপদ্রুত নগরীর সব রুক্ষ কোলাহল ফেলে
আবার দাঁড়াবো একা।

এই তৃণে তটে ও আকাশে
যখন দিনের ক্লান্ত আলোকের যতো স্নিগ্ধ স্নেহ
দশাহীন ঝরে গেছে মুক্ত মাঠে, অবিচ্ছিন্ন স্রোতে;

যখন রাত্রির প্রেমে এনেছে গভীর তৃপ্তি
তখন আবার আমি বিনু দাঁড়াবো একা
আমার প্রেমের কাছে উচ্চারিত মন্ত্র, শ্লোক
শীতার্ত রাত্রির বর্ণ আমি প্রতীক্ষায় আছি।

এ-ধরিত্রী মুগ্ধ চিরবধূ
অন্য কোন গোপন আলোতে;
অসমাপ্ত পথের প্রদোষে
শব্দহীন প্রার্থনার মতো,
আমি এক সমর্পিত দীপ
আমি আজ শুভ্র শুদ্ধ নত।
ব্যাপ্ত হলো সমগ্র আকাশে
পদশব্দ যদি ফিরে আসে।

# লাল জল নীল জল

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

এই বাঁশবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে, কি সব অদ্ভুত শব্দ শুনতে রোমগুলি শির শির করে কাঁপতো; মনকে গুলতির মতো ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে অঞ্জলি তখন আরো অভ্যন্তরে—অতি ভয়ে ভয়ে। গুলতি-মন কখনো ছুয়েছে হলুদ-কালো কোন পাখি, ঘেঁটুফুলের ঝোঁটা, বেতফল---এবং অনেক দূরে একপাশ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অঞ্জলির মনে হত, কোন এক দিন ওর আড়ালটা পুরোপুরি খুঁজে দেখবে---কি আছে, কিছু গোপনীয়, মৃত্যু অথবা ভালবাসা, যারা কাঁদে, ফিস ফিস করে, পাতাগুলি ঝরিয়ে ফেলে নাড়া দিয়ে।

কিন্তু এখন ঘন কালো পাঁকে গোটা বাঁশবনটা নির্বাক ও শ্বাসরুদ্ধ মনে হয়। অঞ্জলি দেখল বা অনুভব করল, অভ্যন্তরটা সবই পচা রক্তে কুচ্ছিত; ইষ্টিকুটুম নেই, ঘেঁটুফুল নেই, বেতফল্‌গুলি হয়তো কোনদিনই ফোটে নি। অঞ্জলি অবিরাম ঘনতায় চোখ বুজে থাকল। চোখ খুললে বিজুর মাথা ও গলার কালো রক্তগুলি অবিকল দেখতে পাবে। সুতরাং ছপছপে শিশিরভেজা বাঁশের পাতা ওর কাঠকঠোর মাংসে ক্রমাগত খোঁচাখুঁচি করলেও একটু না নড়ে মন্তো গিরগিটির মতো জড়িয়ে থাকল ওপরে।

বাইরে কোথাও এতক্ষণ শব্দ হচ্ছিল। মানুষের শব্দ। সবই থেমে গেছে এবং থেমে গেছে বলেই অস্বস্তিতে যেন গা ঘিন ঘিন করে। বাইরের এই গুটিকয় লোক গ্রামের লোকগুলির মতো 'আল্লাহ আকবর' বলে চীৎকার করছিল না। এদের কণ্ঠস্বর ছিল খসখসে, ঈষৎ ফাটা। বাঁশবনে খরগোস দৌড়লে যেমন শব্দ ওঠে। এরা বারকয় তীক্ষ্ণ চীৎকার করে অবশ্যি অঞ্জলিকে ডেকেছিল। অঞ্জলিকে এরা আরাম ও প্রীতির কথা শোনাতে চাচ্ছিল। 'অঞ্জলি, তবে বাঁচাইতে আইছি। অঞ্জলি, তুই বাইর-অ----' অঞ্জলি ঘাড় গুঁজে রেখেছিল পিছল মোটা মোটা বাঁশে। নিজেকে আরো লুকোচ্ছিল। তারপর লোকগুলি ওর শরীরের নীচে নীচে চলাফেরা করল। বাঁশের গায়ে লাঠি মারল। বাঁশগুলিও যেন বলল, 'অঞ্জলি এহানে নাই। পলাইয়্যা গেছে।' বাঁশের পাতাগুলি শব্দ করে বলল, 'অঞ্জলি এ্যাহন ইন্দ্রাণীর নবজীবন কলোনীতে।---সুরেন্দ্রের পোলা মহেন্দ্র অঞ্জলিরে নেছে।' অঞ্জলি সুরেন্দ্র নন্দীর ছেলে মহেন্দ্র নন্দীর কথা ভেবে কাঁদবার জন্যে প্রস্তুত হল। মহেন্দ্রকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল পেরিখালির বাজার থেকে বেরিয়ে খেয়া পেরিয়ে আসতে। তারপর মহেন্দ্র যাবে তাদের পানের বরজে। বরজে একটি কি দুটি সবুজ রঙের সাপ দেখে থমকে দাঁড়াবে---পুরুষ না মেয়ে---। মহেন্দ্র ছিপনৌকোর পাড়ি দিয়ে এককলি গান ধরলেও অঞ্জলি ওর কথা ভাবে নি। মহেন্দ্র পেরিখালির বাজার পেরিয়ে খেয়া পেরিয়ে কাঁধের ঝোলায় হাত পুরে দিলেও অঞ্জলির মনে হয় নি, বাজার থেকে কি কি কিনল---অথচ এখন মহেন্দ্রের জন্যেই কোন একসময় চোখ খুলতে পারবে পৃথিবীতে, এমত বিশ্বাস লালিত হচ্ছে মনে। বিশ্বাসটায় ডিমের ওপর পাখির মতো তা দিচ্ছে; কখনো হয়ে আছে কিছুটা মন এখনো। ভোরের দিকে নেমে যেতে পারবে অঞ্জলি। সে-দেশটা কতদূরে না জেনেও সোজাসুজি পশ্চিমে পা চালাবে। কাশবন, নদী, খাল, বিল, চৈতালীর

হলুদ ফুল ভেঙে। ইন্দ্রাণীর নবজীবন কলোনীতে মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তর আশায় দিন গুনছি, আইতে পারলি রে ছেমড়িডা? মহেন্দ্র মোটা মোটা দাঁত খুলে পরিচিত ভঙ্গীতে রসিকতা করবে।

'বিজু? বিজুডারে কোহানে ফ্যালাইয়া আইলি?'

অঞ্জলি কান্নায় গুঁড়ো হয়ে মহেন্দ্রের বুকে মুখে গভীর সিক্ততায় সঞ্চারিত হবে।

'কাঁদস না, কাঁদস না। আমি তো রইছি---মুহের দিকে চাইয়া দ্যাখ।'

ক্রমাগত গান ঘষল হিম পিচ্ছিল বাঁশে। অতিশয় হিমে বাঁশবনের অভ্যন্তরটাও ক্রমে আড়ষ্ট। বিজুর রক্তের গন্ধটা নিঃশ্বাসে আর পাওয়া যায় না। কেবল পলকে পলকে উগ্র খর জর্দার গন্ধ একটা। ক্যাপটান সাহেবের। ক্যাপটান আসমত আলীর ঠোঁটের। আনসার বাহিনীর লোকেরা অঞ্জলিকে 'বাঁচাতে' এসেছিল।

তীব্র ভয়ে নড়ে উঠল অঞ্জলি। মনে হল ওরা তার পায়ের নীচেই অপেক্ষা করছে। আসমত আলীর ছাগলদাড়িটা থির থির করে কাঁপছে। ঘোলাটে চোখে একটা জব্বর ইচ্ছার ঘোর। তিনটি বিবি নিয়ে একটুও সুখে নেই বেচারা। সুতরাং 'অঞ্জলি, তরে লইবার আইছি। দুঃখ করস না---চাঁই একডা হয়্যা যাইব মে।'

আসমত আলী ওর কাঁধে হাত রেখেছিল। 'দুঃখু করস না। শয়তানরা কথা শোনে না। কইছিলাম মাখনদাদার ঘরে যাবি না---ছেমড়িডা বড় পেরেশানে রইছে। শুনল না।'

চোখের সুমুখে বিজুর মাথায়---উঃ মাগো! অঞ্জলি কাঠ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিজুর মুখ, আর্তনাদ ---'দিদি, দিদি, আমারে লাগছে, খুব লাগছে দিদি---এবং ইস্পাতের চকচকে একফালি রেখা বিজুকে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে বিজুর আত্মাকে, পাখির মতো আত্মাকে কোথায় নিয়ে যায়---'আমারে বাঁচাইয়া রাখ্যো না---মারিয়া ফ্যালাও---' কেউ শোনে না কানে। অঞ্জলিকে যা চেয়েছিল, অঞ্জলি তা কোনমতে দিতে পারল না বলে, বিজুকে ওরা রক্তে স্নান করাল।

'যা, হাত ধরিয়া লইয়া যা।' আশ্চর্য, বুড়ো খোনকার হাসছিল বিজুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। 'কলমাডা পড়াইয়া লস আগে রে ছ্যামড়ারা।' বিজুর চুলের প্রান্ত ছুঁয়ে ছিল ওর পা। একটু কাঁদতে পারলে অনেক শক্তি মেলে সম্ভবত। অঞ্জলি কোন কথা ভাবতে চায় না, মহেন্দ্র ছাড়া, অথচ সব কথাই বুবুদের মতো—এবং সব সুখই; ক্রমাগত ভাসছে পচাটে ঘন অন্ধকারে। বাঁশবনটা এইসব নরকে ভরে আছে, কোনদিন ভাবতে পারে নি অঞ্জলি।

'দিদি, আমারে লাগছে---খুব লাগছে।'

একটা পাখি হঠাৎ ডেকে ডেকে বলল। বিজু যন্ত্রণা পাচ্ছিল। ছ'বছরের আত্মা স্পষ্ট পরিস্ফুট করতে পারে নি যন্ত্রণাটার বর্ণনা। অঞ্জলির ইচ্ছে হচ্ছে, খুব জোরে চেঁচিয়ে একবার মহেন্দ্রকে ডাকে। মহেন্দ্র এসে লোকগুলিকে রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাক। তীক্ষ্ণ উগ্র এই স্পৃহাটা বিচলিত করছে---অথচ সবই এখন আশ্চর্য শান্ত। হিম অন্ধকারে শিশিরের শব্দ। পাতা কাঁপে অল্প হাওয়ায়। একবার পাখিটা বিজুর মতো ডেকে ওঠে। থেমে যায়। ডাকে। আবার থেমে যায়।

বাইরের শব্দগুলি অনেক আগে থেমেছে। এখন মনে হয় শব্দগুলি নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে নীরবতার খোলে ওর পায়ের নীচের মাটিতে। এবং আবার বেরিয়ে পড়বে। অঞ্জলির জন্য মাটিও অপেক্ষা করে আছে। মাটি কাঁপবে। অঞ্জলিকে যেতে দেবে না। ---আশংকার দুঃখে পাগল হতে চাচ্ছে অঞ্জলি। কিছুই পারছে না। শুধু আসমত আলী, খোনকার, যুবক লোকগুলি বার বার নীরবতার বিস্তার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চেতনায়। চেতনাটা কোন নদীর লাল জলের মতো মনে হয়। মস্ত স্রোত নেই, ঘূর্ণি থেমেছে, শুধু উৎকট স্থিরতা। লাল রঙটা ফুরিয়ে যায় না স্রোতে। ফুরিয়ে যায় না কচুরিপানার দামের মতো আসমত আলীরা। ওরা ক্রমাগত শব্দ করে। কথা বলে।

আস্তে আস্তে চুপি চুপি মুখ তুলল অঞ্জলি। হিম নৈঃশব্দে কিছু নিঃশব্দ কথা ছুড়তে চাইল। কিছু নিঃশব্দ প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি শুধু ওটিকয় 'কেন'। কেন এই রক্ত, লাল নদী, দুঃখ---কেন, কেন, কেন---এবং অঞ্জলি গভীর আবেগে যেন শেষবারের মতো বাঁশবনের অভ্যন্তরটাকে নিরীক্ষণ করতে থাকল। ইষ্টিকুটুম পাখি, ঘেঁটুফুল, বেতফল---যদি কোথাও থাকে, ভিন্ন রঙে ছোপানো; কোন এক বোদ ও পরবর্তী বৃষ্টির জন্যে সব হয়তো ধুয়ে যেতে পারে।

শেষ রাতের কুয়াশায় ঘননীল হয়ে গেছে বাঁশবন। কাঠবেড়ালীর ক্ষিপ্রতায় যেন ঘুম থেকে জেগে নামল অঞ্জলি। কোন ভয়ের অনুভূতি টের পাচ্ছে না। হাত পা চোখ অতিশয় প্রাণবন্ত ও সতেজ। জ্বর-জ্বর ভাবটাও নেই। শীত নেই। এবং নীচে আর কেউ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না। ভীষণ হিমময়তা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তাদের। অঞ্জলি স্পষ্ট দেখল লোকগুলি শেষ রাতের জন্যে প্রচুর তাপ পাবার ইচ্ছেয় নিজ নিজ বিবিগুলির বুকে গাঢ় হয়ে আছে অঞ্জলির কথা ভুলে। একটু রোদ পেলে বেরিয়ে আবার তারা অঞ্জলির কথা ভাববে। ছোটাছুটি করবে। অন্য অন্য অঞ্জলির উদ্দেশ্যে দ্রুত ধাবিত হবে। অন্য অন্য বিজুকে রক্তে ভাসিয়ে পাখির মতো ছোট ছোট আত্মাদের ধরে রাখার জন্যে চীৎকার করে ঈশ্বরকে ডাকবে।

অঞ্জলি আড়ষ্ট পায়ে, ঘাস ও জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে—কখনো ঈষৎ

উঁচু হয়ে, চলতে চলতে হঠাৎ-হঠাৎ টের পেল, ওদেরও একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি অঞ্জলির ঈশ্বরের মতোই নিস্তব্ধ। তাকে অনেকবার ডেকেছিল অঞ্জলি। কেউ এল না। সুতরাং বিজুকে যন্ত্রণা পেতে হল। সুতরাং অঞ্জলিকে ছুটে যেতে হল। সুতরাং কোন বাধা রইল না মহেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হতে। হঠাৎ-হঠাৎ এই-সব কথা ভেবে উত্তেজিত হতে পারল সে। তারপর বাঁশবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মুখ তুলে তাকাল।

একটা হলুদ পাখি। অস্ফুট ডাকছে। অঞ্জলি মনে মনে বলে উঠল, বিজু, ভাইটি আমার---তরে লইয়া যাইতে পারছি না---অঞ্জলির নাক ঝরল। চোখের জল যেন কোঁটায় কোঁটায় শুকিয়ে যায়, ঝরে না। দুবার চোখ পিট পিট করে খরগোসের মতো ধাবিতা হল সে। এবং নীচে খালের জলে একটা লোক দেখে থমকে দাঁড়াল। ঘাসের জঙ্গলে—ওপারে, একটি শরীর। এত ভোরে শিশিরভেজা ঘাস কাটতে মাঠে নেমেছে।

রোদ না ওঠা অব্দি খেতের জঙ্গলে চুপচাপ থেমে থাকল অঞ্জলি। তারপর লোকটিকে মুখ ফেরাতে দেখল। ওর মুখ দেখে মাটিতে বুক ঝরতে হচ্ছে অঞ্জলিকে। আকাশ আলী। সর্দারের পোলা। এত ভোরে ঘাস কাটার পেছনে যেন কিছু ভীতিকর আছেই---এমত বিহ্বলতায় অঞ্জলি একটুও নড়তে পারছে না।

অথচ পাখিটা ডাকছে। থেমে থেমে ডাকছে।

অঞ্জলি অনুভব করছে, সে চলে যাবে অন্য দেশে অন্য ঘরে। পাখিটা যাবে না। অঞ্জলির স্মৃতির জগৎটা ঐ পাখির জগতে ধারাবাহিকভাবে মেশা, সেই সবটুকু অতীত সময় পাখিটার কাছে কোনমতে ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এইসব গাছ বন কাশকুশ মোত্রাঘাস বেতফল এবং নদীতে যে-সব জল সতত নীল হয়ে থাকে, তারা পাখির জগতে অবিনশ্বর। অথচ মানুষ, মানুষেরা ও অঞ্জলির সব জল লাল হয়ে যায়। সব গাছ বন কাশকুশ মোত্রাঘাস বেতফল বাঁশবনের অভ্যন্তরে কালো রক্তে কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। মানুষ ও মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণায় কাতর অঞ্জলি বারবার ফিস ফিস করে পাখিটাকে বলল, আমি যদি পাখি হইতাম---তারপর, বিজুর পাখি হয়ে ওঠা আত্মার কথা ভেবে পরিমিত সুখে আশ্বস্তা হতে পারছে অঞ্জলি। 'বিজু রে, পাখি হয়ে থাকন অনেক সুখের।---বিজু রে, ক্যান আমি মানুষ হইয়া জন্মালাম।' এ সময় বাবার কথা মনে পড়ছে অঞ্জলির। পীরাল্দির মেলায় বাবা নৌকো ভাসিয়ে চলে গেল। একটু-একটু মনে পড়ে। অঞ্জলি ও বিজুকে রেখে গেল মাসির কাছে।

'অ মাসি, আমাগো লইয়া গেল না ক্যান?'

'পীরের থনে মানত দিতে গেছে। আইয়া পড়ব নে।'

'ক্যান মাসি?'

মাসি জবাব দেয় নি। মৃদু হেসে-ছিল। এবং পরে জেনেছিল অঞ্জলি, বাবা সুরেন্দ্র নন্দীর পোলা মহেন্দ্রকে তার জন্য ঠিক করতে গেছে। মহেন্দ্র তখন গাঙ পেরিয়ে পশ্চিমে কোথায় দোকান খুলেছে। অন্য কোন দেশে। স্পষ্ট বুঝত না অঞ্জলি। কেবল মহেন্দ্রর ছিপছিপে শরীরটা দেখতে পেত পেরিখালির বাজার থেকে খেয়া পেরিয়ে আসতে। ওর কাঁধের ঝোলানো থলের কি সব থাকে---সুখপ্রদ প্রীতি-কর অনেক কিছু।---সুরেন্দ্র নন্দী বলেছিল, 'এহানে থাকবার পারুম না মাখনদা, যাইতেই অইব একসময়। বরঞ্চ যাইয়া কথাডা পাকাপাকি করব নে।' পাগল বাবাটা বলেছিল, 'আমি যে যাইবার পারুম না দাদা। দ্যাশডা মোরে নাড়ীতে জড়াইয়া রাখছে। কোহানেও যাইবার পারুম না। দয়া কারয়্যা মাইডারে শুধু লইবার ব্যবস্থা করো।'

বাবা এসব বলত সবসময়। 'আমাগো কোথাও যাইয়া সুখ নাই রে, সবহানেই জল যেন দুঃখে রঙ ধরিয়া আছে।'

কাশবনের গভীরে ডুবে যেত বাবা। জঙ্গলের আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে কিছু সুখ সংগ্রহ করত। এই মাটি ও আকাশের সবটুকু তাৎপর্য টের পেয়েছিল যেন।

মরে যাওয়া মাও। মাসি যেতে চেয়েছিল। যেতে দেয় নি বিধবা বোনকে। ভাগ্যিস, যেতে দেয় নি। মা যেন জানতো, মরে যাবে। বিজু ও অঞ্জলিকে পালন করার জন্যে একটি মারী থাকার দরকার। মাসি---মাসিটাকেও ধরে নিয়ে গেল কারা। মাত্র কদ্দিন আগে। গভীর রাতে। এবং অঞ্জলি পরে শুনল, মাসি, হতভাগিনী মাসি 'কলমা' নামে কিসব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করেছে। গতকাল সকাল অব্দিও অঞ্জলি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারে নি। শুধু ভাবছিল---বোকা মাসিটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। তারপর ভেবেছিল—কোন এক সময়ে নিশ্চিত মাসি ফিরে আসতে পারে এই ইচ্ছায় অপেক্ষা করছে। গোপীনাথ, ভবেশ, নিরঞ্জনের মতো, মানীপিসি, জোনাকি, মালতীদের মতো রাতেনিভৃতে পাড়ি দেবে অন্য দেশে অন্য কোথাও। মহেন্দ্র যেখানে কারবার খুলে রয়েছে। যেখানে ওর মাসি চলে যাবে বলে প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখত।

মাসি এল না। এল কতিপয় লোক। তাদের হাতে কিসব ছিল। বিজুর আত্মাটিকে পাখি করে দেয় তারা। লক্ষ লক্ষ বিজু পাখি হয়ে যাচ্ছে তাদের হাতে। মহেন্দ্রদা কি জানে এসব, জানতে পারছে?

পীরাল্দির থেকে বাবা আর ফেরে নি। পথেই নদীর নীল জলে সবটুকু রক্ত মিশিয়ে নদীর জল লাল করে দিল।

বারবার এমনি করে সব নীল লাল

হয়ে যেতে দেখেছে অঞ্জলি। তবু পা ওঠে নি কোথাও চলে যেতে। মাসির তীব্র ইচ্ছাও তাকে বাধ্য করতে পারে নি। বাবার ইচ্ছাগুলি ওকে লাগামপরা ঘোড়ার মতো ধরে রেখেছে শক্ত টানে। 'আমি যামু না মাসি, কাইটা ফেললেও না। আমার ভয় লাগে।' মাসি একদিন ওর চুল টেনে ধরেছিল। সেই থেকে দারুণ উদ্বেগে মাসির প্রতি সতত তৎপর থেকেছে। মাসি যেন ওকে কোথাও বেচে ফেলতে চায়।

ক্রমাগত কুচ্ছিত গাল দিয়েছিল মাসি। এবং গভীর রাতে যখন মাসিকে ধরে নিয়ে গেল, মাসি তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'তর ইচ্ছাটাই পূর্ণ হইল অঞ্জলি রে—আমি বাঁচুম না' —ঠিক তখনই অঞ্জলি ভেবেছিল, অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল দেশ ছেড়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? খেতে দেবে কে? তখনও মহেন্দ্রর কথা ভাবতে পারে নি অঞ্জলি।

বাঁশবনের শীর্ষে হিমের জলে ভেসে থাকা পশ্চিমের একটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। তার দিকে ক্রমাগত তাকিয়ে থেকে প্রথম বার মনে হয়েছে, হয়তো ওরা মহেন্দ্র নামে একটি যুবাপুরুষও এমনি করে তার দিকে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে থেকেছে—যেখানে ভালবাসার আকাশ এখনো সতত নীল হয়ে আছে।

এখন বেতের কাঁটায় বিদ্ধ হতে হতে অঞ্জলির মন যুগপৎ দুঃখ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। বেতের ফলের মতো। অঞ্জলি বেতফল হয়ে জড়িয়ে আছে বেতের ডালে। যন্ত্রণার কাঁটার লাল রক্ত এবং ভালবাসার নীল জল তবু কোথায় হয়তো স্থিরতর—অনেক দূরে।---অল্প অল্প রোদের তাপে বিন্দু বিন্দু উত্তেজনা। বুক কাঁপে। পেছনে পাখিটা ডেকে ওঠে। অঞ্জলি দেখে খালের ওপারে ঘাসের বনে আকাশ আলী ঘাসের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এই আকাশ আলী, সর্দারের পোলা আকাশ আলী অঞ্জলির চোখে-চোখে তাকাতে পারত না। মুখ নীচু করে বলত, 'কি করছস রে, মাসিটা গেল কোহানে?'

'মাসি মাঠে গেছে আকাশদা। গাইডারে লইয়্যা গেছে।'

'অ।' আকাশ আর কিছু বলত না। দুপা এগিয়ে হঠাৎ থেমে কি ভাবত। হয়তো বলতে পারত না।

'মাসির লগে কাজ আছিল আকাশদা?'

'নাঃ। এমনি জিগাইলাম।'

আকাশ আলী দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেছে। পেছনে ফিরেছে আবার—কিছু দূরে। কিছু ভেবেছে।

এবং সেই আকাশ আলী তার না-বলা কিছু কথা নিয়ে হয়তো সারাজীবন কাটিয়ে দিত। এখন অঞ্জলিকে দেখলে, এই দুঃসময়ে---এখন সব কিছু সহজ হয়ে ওঠে, রক্ত সহজ, অশ্রু সহজ, হিংসা ঈর্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা, প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, অনুরাগ ও বিরাগ, সব—সব কিছু সাবলীল হতে পারছে, আকাশ আলী ঘাসের বোঝা ফেলে অঞ্জলিকে---

এটুকু ভেবেই অঞ্জলি নিঃসাড়। দেখল, আকাশ আলী ঘাসের বোঝা নিয়ে সত্যি এদিকে এগোচ্ছে। খালে ওর ছোট্ট নৌকোটা ভাঁটার স্রোতে অল্প দুলছে। কাদায় মুখ ঘষছে। তারপর নৌকোয় চেপে এপারে আসতে থাকলে অঞ্জলি পিছু হটে পিছু হটে আবার বাঁশবনের ভেতর ঢুকল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল অঞ্জলি পরক্ষণেই। ক্যাপটান সাব। বদনা হাতে দাঁড়িয়ে ক্যাপটান আসমত আলী। 'ইয়া আল্লা! ছেমড়িডা হকল রাত্তির ধইরা বাদায় ঘুরছে দেহি।' ছুটে পালাতে যাচ্ছিল অঞ্জলি। পা ওঠে না। যেন সবই একটা উদ্ভট দুঃস্বপ্ন। তারপর আসমত আলী বদনাটা ছুড়ে মারল ওর পায়ে। প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠল। অঞ্জলি পায়ে আঘাত পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ক্যাপটান আসমত আলী ওর হাত ধরে টানল। 'ক্যান, পলাইবি ক্যান? মোগো ছাইড়া যাবি কেমনতে? অ্যাঃ?' আসমত আলী প্রচণ্ড হাসছে। কি বা ক্রোধ প্রকাশ করছে। 'দ্যাশডারে শ্মশান করিয়্যা যাবি। ওঃ হো রে আল্লা, একডাও খাপসুরুত মাইয়া থাকব না দ্যাশে! ক্যান?' আসমত আলীর ঠোঁটের পান-জর্দার তীব্র গন্ধ লাগে। অঞ্জলি বন্দুকাহত পাখির মত তাকিয়ে ওর মুখ দেখছে।

আকাশ আলী উঠে এসেছে খাল থেকে। 'ক্যাপটান সাব!'

'হ, আওরে সর্দারের পোলা, ছেমড়িডা পলাইবার চায়। দ্যাহো না!'

অঞ্জলি এতক্ষণে, যেন কতদিন পরে, ডুকরে কেঁদে উঠতে পারল। তীব্রস্বরে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকল। 'আকাশদা, মোরে মারিয়্যা ফ্যালাইব। বাঁচাও মোরে। আকাশদা, আল্লা তোমারে দোয়া করব।' অবিকল মাসির কথাগুলি ওর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। অঞ্জলির বিপন্ন মুখ ভেসে অশ্রু। আকাশ আলী থেমে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। 'দ্যাশে একডাও মানুষ নাই---সব, কি য্যান হইয়া গেল' মাসির শেষ কথাটাও উচ্চারণ করল অঞ্জলি।

'আকাশ আলী!' আসমত আলী ডাকল।

'কন।'

'মাখনদার বেটিরে লইয়া যা।' আসমত আলী হঠাৎ হেসে উঠল। 'বুড়া হইছি। বুঝছস?'

আকাশ আলী মাথা নাড়ল। সে বুঝেছে।

'কলমাডা সময় মতন পড়াইয়া লবি রে ব্যাটা।' আসমত আলী বদনাটা কুড়িয়ে নিয়ে খড়ম পায়ে চলে যাচ্ছে।

আকাশ ডাকল, 'অঞ্জলি।'

'ওঠ !'

'ঘরে যা !'

অঞ্জলি টের পেল কোথায় একটা রুদ্ধ দরজা সশব্দে খুলে যাচ্ছে। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলল অঞ্জলি। বিজুর কথা, মাসির কথা, নিজের কথা।

আকাশ আলী বলল, 'সব থামিয়া যাইব নে। ঘরে যা।'

'আকাশদা।' ফিসফিস করে বলল অঞ্জলি।

'ক।'

'ঘরডা জ্বালাইয়া দিছে।'

'অঞ্জলি।'

'কও।'

'অঞ্জলি, তোরা ই গোপার দ্যাশে থাকিস না।'

'আমারে লইয়া যাইবা, বডার পার করিয়া---?'

'অঞ্জলি, আমাগো ঘরে যাবি ? বিশ্বাস কর, তরে ভালো বই মন্দ করুম না। তর কিরে। 'যাবি ?'

অঞ্জলি খালের জলে ভেসে আকাশ আলীর ঘাসের বোঝায় মাথা রাখল।

রাতের অন্ধকারে অঞ্জলি ও আকাশ আলী নৌকো ভাসিয়ে যায়।

'কেডা যায় ?'

'ধর্মারের গোরা।'

'আর কেডা ?' টর্চের লম্বা আলো টাঙ্গুরী নৌকোর পর্দায়। ভেতরে অঞ্জলি কাঁপছে বুক ফিরিয়ে।

'পরিবার। আবার কেডা।' ঘড় ঘড় করে কাশল আকাশ আলী।

'দেহি তো একবার। থামাও---'

দুপাশে দুটি নৌকো।

'অঃ, মাখনদার বেটিরে লইছ দেহি। কলমাডা পড়াইছ তো ?'

নির্বিকার কণ্ঠে আকাশ আলী জবাব দিল, 'পড়াইয়া লব নে। এ্যাহন পীরাল্দির মেলায় যাব। ফিরিয়া আইতে দ্যাও।' আকাশ আলী হাসছে। 'মানত দিতে হইব না ? সিন্নি ?'

নৌকো দুটি সরে গেছে। ক্রমান্বয় অন্ধকারে নদীর জল কাঁপছে। লাল রঙটা এখন কালো।

ফিসফিস করে ডাকল আকাশ, 'অঞ্জলি।'

অঞ্জলি পর্দা তুলে বেরলো।

'পীরাল্দির মেলা যাইছ কহনো ?'

'হ।' মিথ্যা বলল অঞ্জলি। এক অদ্ভুত আশংকায় হঠাৎ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠছে।

'এ্যাহন মেলা বসছে পীরের থানে। দেখিয়া যাইবা ?'

'ক্যান আকাশদা ?' বুক কাঁপে অঞ্জলির।

আকাশ চুপ করে গেছে। কিছু সাধ যেন শেষবারের জন্যে ওর নীরবতাকে বুনল ক্ষিপ্র আঙুলে, কিছু রঙচঙে নকশা—যা অন্ধকারে কালো হয়ে ওঠে সবটুকু।---

অঞ্জলির ঘুম পেয়েছিল। হঠাৎ চমকে ওঠে। মুখের ওপর লস্কর আলো। আকাশ আলী ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। নৌকোটা ঘুরপাক খাচ্ছে। অঞ্জলি লাফিয়ে উঠে বসল।

'আকাশদা।'

আকাশ তেমনি নিস্তব্ধ। চোখ দুটি নিষ্পলক সাপের মতো। অঞ্জলিকে কলমা পড়ানোর কথা ভাবছে ? অঞ্জলি কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

'কাঁদো না। কাঁদবা ক্যান ?' আকাশ ফিসফিস করছে। 'শ্যামবারের জন্যে দেখিয়া লই। তবা চলিয়া যাইলে দ্যাশডা আস্তে আস্তে আন্ধার হইয়া গ্যাল ম্যান। যা, সব চলিয়া যা। সব সোন্দর, মাইয়ামানুষ---সব---'

# খবর

## সুমিত মিত্র

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি এলো,
ধূসর খামেতে মোড়া চিঠি।
আমি আর কারো চিঠিতে আস্থা রাখি না,
আর কাউকেই পাঠাই না কোনো খবর।

যে-সব বন্ধুরা আসাদের খবর রাখতো,
কিংবা যারা আমাদের দেখেছিল জোড়াগীর্জার ধারে
কোনো কোনো নির্জন সকালে,
তাদের খবরাখবর পাই না অনেক, অনেকদিন যাবৎ।
ইথার-তরঙ্গ বেয়ে কিছু কিছু খবর আসে,
কিছু কি খবর পার হয়ে আসে
বৃষ্টিভেজা জানলার কাচ।
কোনো নির্ভর নেই,
কোনো প্রত্যাশা নেই
তাদের কাছে।
সারানের বুদ্বুদগুলি যে-সব শিশুদের ঘিরে বড়ো হয়,
হাওয়ায় ফেটে যায় ক্রমশ,
তাদের জন্যেও আমার কোনো আর্জি নেই বিধাতার কাছে।

আমার জীর্ণ টেবিলে উইপোকাদের পদশব্দ,
অশ্বত্থচারার ভারে
পুরোণো কার্ণিশগুলি ভেঙে পড়ে।

আমি এ-সবের প্রতি প্রাণপণে উদাসীন থেকে
গিয়েছিলাম তোমার বাগানে।
আমি তোমার বাগানে গিয়েছিলাম
সকালের ফুলগুলির সংবাদের আশায়।

তোমার বাগানে কেউ ছিল না,
কেউ নেই, সব নির্জন।
তোমার পুষ্পিত বাগানে
বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায়।
কেউ নেই বসে।

গ্রীষ্মের পরিত্যক্ত ছাদে
টাঙানো কাপড়গুলি দেখলাম হাওয়ায় উড়ছে কেবলি।

# রঙ্গমঞ্চ ও দেশে এবং এদেশে

## সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদের আবির্ভাব

জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমাদের চোখে প ড়বে যে, সাহিত্যে নানা ধরণের শ্রেণীগত এবং আন্দোলনগত বিভেদ-সৃষ্টির দ্বারাই পণ্ডিতেরা জার্মান সাহিত্যের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের স্ব প আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় শ্রেণীগত বিভেদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে—Storm and Stress, Classicism, Romanticism. Young Germany, Naturalism, Impressionism ও Neo-Romanticism. বিবর্তনের দিক দিয়ে এর পরের phase-ই হল Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ।

১৯১০ সাল থেকে ১৯২৪ সাল অবধি, অর্থাৎ প্রায় পনের বছর অবধি এই নতুন আন্দোলনটি চলেছিল।

এই কয়েক বছর ইউরোপে দারুণ দুর্যোগের সময়—মাঝে আবার ঘটে গেল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের আগে থেকেই এক জাতীয় চিন্তাশীল শিল্পী দেখা দিলেন, যাঁরা তদানীন্তন জীবনধারা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, দেশের শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে একটা বিরাট অনাচার লক্ষ্য করে, এসবের ভেতরে একটা আমূল পরিবর্তন আনবার প্রয়োজনীয়তা মনেপ্রাণে অনুভব করছিলেন। এঁদের কাছে বিষবৎ লাগছিল নিও-রোমান্টিক শিল্পীদের রচনাপদ্ধতি—

'Its cult of the past, its mystic adoration of nature, its worship of the aesthetic personality, its dissection of the soul, its aristocratic approach to art—

[R. Hinton Thomas—Expressionism]

অভিব্যক্তিবাদীরা চাইলেন জীবনকে এবং সমস্ত জাগতিক সমস্যাকে সত্যের আলোকে ভাল-মন্দয় মিশিয়ে

### শিলালি

দেখতে। জীবনের থেকে আলগা করে নিয়ে সৌন্দর্যকে দেখবার চেষ্টা করাটাই যে একটা অবাস্তবতা এবং এক ধরণের escapism এই সত্যেরই ওপর তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিতে লাগলেন তাঁদের নিজেদের রচনায়। তাঁদের লেখার ভঙ্গিটা অবশ্য naturalistic ছিল না—ছিল symbolistic. অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীর দল যেন আগে থেকেই অনুভব করছিলেন যে, এক মহা সঙ্কটের সময় এগিয়ে আসছে। সেই হিসাবে এঁরা যেন ইঙ্গিত দিলেন আসন্ন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বলাকার দুই নম্বর এবং চার নম্বর কবিতার কথা মনে এসে যায়—

'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে ভেসে যায় গো।'

এই দুই নম্বর কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'য়ুরোপীয় যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) তরিৎবার্তা এই কবিতা (২) লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আবার—

'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে,
এ কি রে দুর্দৈব।'

এই চার নম্বর কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই কবিতা (৪) যে-সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ সুরু হতে দু'মাস বাকী আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঔদ্ধত্যে

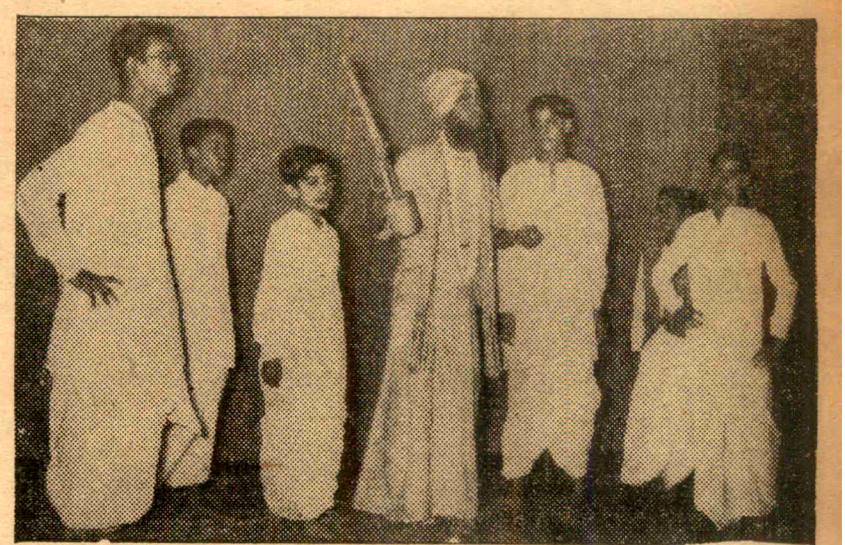

● সন্ধ্যানীড়ের 'রাজা' নাটকে [illegible] ও বালকবেশে ঠাকুর্দার ভূমিকায় প্রভাতভূষণ।

হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে-যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার-স্বরূপ।'

স্বভাবতই যুদ্ধকালীন সময়ে জাতির intellectual life-এর ওপর অভিব্যক্তিবাদী-শিল্পীদের প্রভাব খুব বেশি করেই পড়তে লাগল। যুদ্ধ নারকীয় ও সর্বতোভাবে বর্জনীয় এবং যুদ্ধের শেষে পৃথিবী আবার নূতনভাবে, সুন্দরতরভাবে গড়ে উঠবে—এই ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের ঘোষণা।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন যুদ্ধ শেষ হল, দেখা গেল যে অভিব্যক্তিবাদী-দের নির্ধারিত আদর্শপথে পৃথিবী মোটেই চলছে না। ফলে তাদের আন্দোলনটা আপনা থেকেই ভাঙতে সুরু করল এবং ১৯২৪ সালে ঘটল এর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটলেও যে ভাবধারার মূলে রয়েছে সত্য, তা কখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হতে পারে না। তাই আজও ইউরোপে ওয়েটিং ফর গোডো এবং লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার-এর মতো নাটক দিনের পর দিন মঞ্চস্থ হয়ে লোকের চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, মুক্তধারা, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

যাই হোক, বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সমাজ-জীবনে, রাজনীতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে একটা বিরাট ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার পাকা গাঁথুনি গড়ে তুলতে গিয়ে ধর্ম, ব্যক্তিসত্তা, হৃদয়, আত্মা সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে করে ফেলেছিল কলে তৈরি পুতুলের মত।

যান্ত্রিক যুগের ভাবাবেগবর্জিত প্রাণশক্তিহীন এই সব পুতুল-মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে T. S. Eliot লিখলেন :

'We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning to-gether
Head piece filled with straw ! Alas !
Our dried voices, when
We whisper to-gether
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats feet over broken glass
In dry cellar
Shape without form, shade
without colour
Paralysed force, gesture
without motion,
Those who have crossed
With direct eyes, to death's
other Kingdom
Remember us—if at all—not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.'

যুদ্ধোত্তর যুগের সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ প্রভৃতির ভেতরকার আসল চেহারাটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠল চাপেকের R. U. R, Kaiser-এর Gas, Toller-এর Man & the Masses প্রভৃতি নাটকে। জার্মান নাট্যকার Hasen Clever-ও তাঁর নাটকে অভিব্যক্তিবাদের ব্যবহার করেছেন।

আমেরিকার ও'নিল তাঁর The Hairy Ape-এ। মোসী ট্রেডওয়েল Machiaal-এ, জন্ হওয়ার্ড লসন Roger Bloomer ও Processional-এ এবং এলমার রাইস The Adding Machine ও The Subway নাটকে Expressionistic Style পূর্ণভাবে অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু রক্তকরবী, মুক্তধারা, তাসের দেশ, রথের রশি প্রভৃতি নাটকে অভিব্যক্তিবাদ এমন একটা পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যা অন্য দেশের নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ ধরণের নাটকের বিশেষত্ব এই যে, পাত্র-পাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রযুগের মানুষ। নাট্যকারেরা তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই সব মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তাদের চরিত্রের সত্য স্বরূপকে সবার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সমাজের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে তার ভেতরকার আসল চেহারাটাকে সবার সামনে তুলে ধরতে। রাজনীতির আড়ালে আসল শক্তির চাবিকাঠি কিভাবে কাজ করে তা আমাদের কাছে ফাঁস করে দিতে।

( ক্রমশ )

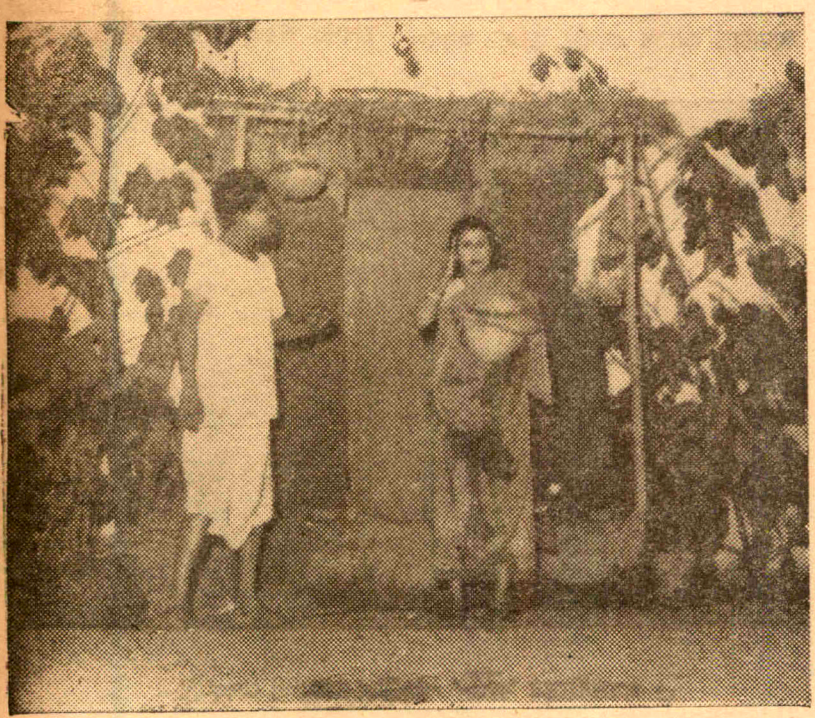

● রূপকারের 'শান্তি' নাটকে ছিদাম ও চন্দরার ভূমিকায় সবিতাব্রত ও গীতা দত্ত।

# ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট-অঞ্চলের আদি-নবীন চিত্র

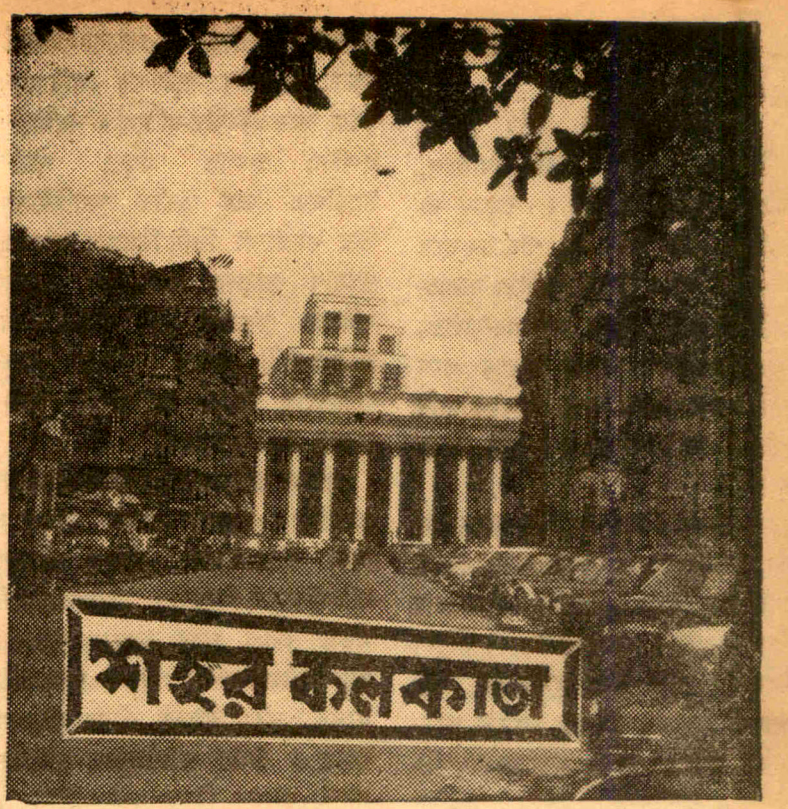


ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য।

গঙ্গা তখন স্ফীতকায়া। একালের অবস্থিতি থেকে আরও দূর-পশ্চিমে তার বিস্তার। পূর্বভাগে তার অবারিত প্রান্তর—যা বহুযুগের উপেক্ষায় বালিয়াড়ি, নির্মম নিঃসঙ্গতায় গৈরিক এবং সূর্যের নিরবধি দহনজ্বালায় নিষ্প্রাণ। এই বালিয়াড়ি প্রান্তর ছেড়ে আরও দূর-পূর্বে সমভূমি—সবুজ সংরাগে বিধৃত, তরু-ছায়ার উদার অঙ্কে শরণার্থী এবং অবিরাম নিরুদ্বিগ্নতায় মন্দমধুর। তার দক্ষিণে অরণ্য—গভীর, ভয়ঙ্কর এবং শ্বাপদের হিংস্র দৌরাত্ম্যে পীড়িত। উত্তরে বসতি—শান্ত, আসন্ধ্যা-সকালের বর্ণমালায় বিচিত্র এবং আত্মভোলা আপন খেয়ালের নিসর্গে এখানে দুঃখ ফোটে সুখের পরিব্যাপ্ত সুষমায়, শান্তি নামে বেদনার দৈনন্দিন পদযাত্রায়। এখানে তুলসীতলার শঙ্খে বাজে নৈঃশব্দের গায়ত্রী; নৈঃশব্দের কণ্ঠে ঝরে অনির্বেদের কলালাপ। ঘরে ঘরে তাঁতীর তাঁত চলে, কুমোরের চাকা ঘোরে গুঞ্জনস্বরে; আর পায়ে-পায়ে ঢেঁকি নাচে, হাতে-হাতে দাক্ষিণ্যের আকুতি। বসতির পাশে লাঙল চলে—লাঙল চালায় মাটির ঈশ্বর! ফালের সঙ্গে সংসক্ত লীলায় গর্ভধারণ করে যৌবনবতী জমি। তারপর তার প্রসন্ন আর্তির উৎসুক পরিমণ্ডল জন্মদান করে গণনাতীত শিশু—শরীর যাদের স্নিগ্ধ অগ্নি-শিখার মতো সবুজ, শান্ত এবং সুন্দর। তারা হাওয়ার গলা জড়িয়ে দোল খায় এবং দেখতে দেখতে এভাবেই যেদিন জয় করে যৌবনের সোনা, সেদিন সেই মাটির ঈশ্বর উৎসবের মন্দিরা বাজায় ঘরে ঘরে।

বসতির এক প্রান্তে জমিদারের উদ্ধত মহল। সে-মহলের সামনে পুকুর, চারদিকে বাগান। তার প্রাচীর তোলা প্রশস্ত অঙ্গনে শিব, বিষ্ণু এবং সিংহ-বাহিনীর মন্দির। কারণ জমিদার এক সঙ্গে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতে আস্থাভাজন। তাই ত্রিধর্মের সমন্বয় ঘটেছে তাঁর গৃহে। তিনি দেবকুলের সেবায়েতরূপে নিযুক্ত করেছেন একাধিক পুরোহিত। তন্মধ্যে যিনি জয় করেছেন প্রজ্ঞা-পারমিতার শ্রেষ্ঠ বর—নাম তাঁর মহেন্দ্র। মাত্র ত্রিশ বৎসরের যুবক তিনি। তাঁর সৌম্য, সুদর্শন, মুখাবয়বে যেন দিব্য-দীপান্বিতার প্রতিভাস—যা

## শ্রীপদাতিক

দুর্যোগেও নির্বাণমুখী নয়, অন্ধকারেও মানিমার সহযাত্রী হতে জানে না। শোনা যায়: জমিদারবাড়ির এক অষ্টাদশী তন্বী তরুণী—নাম যার সুশোভনা এবং মহল ছেড়ে যার বাইরে আসার অভ্যেস নেই, সে একদিন বাতায়ন-পথে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতেই কোনো এক মন্দিরের সোপানদেশে দর্শনলাভ করে মহেন্দ্রের। তারপর তখনই সে নাকি প্রাসাদের দ্বিতল কক্ষ থেকে নেমে আসে নিচে এবং ললিত পদ-সঞ্চারে মহেন্দ্রের সম্মুখবর্তী হয়েই বলে: 'আমি দেবতার পূজা দেবো।'

সুশোভনার মুখের দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মহেন্দ্র। হয়তো মনে-মনে ভাবেন: মহল ছেড়ে বাইরে আসা যার নিষেধ, সে হঠাৎ মহেন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ালো কোন্ সাহসে!---দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে, ধীরে অথচ অবিচলিত গম্ভীর কণ্ঠে মহেন্দ্র বলেন: 'পূজা দেবে? তাহলে এসো, মন্দিরের দ্বার খুলে দিই।'

সুশোভনা বলে: 'না। পাথরের নিষ্প্রাণ বিগ্রহে আমার বিশ্বাস নেই। সশরীরে জীবন্ত দেবতার সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি। আমি আজ তাঁকেই বরণ করতে চাই, মালা পরাতে চাই তাঁর গলায়।'

অতি বিস্ময়ে ভ্রূ-কুঞ্চন করেন মহেন্দ্র। তারপর বলেন: 'কোথায় তোমার সেই দেবতা?'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয় সুশোভনা : 'তিনি আমার সামনেই।'

সুশোভনার এই শেষ কথার প্রতিধ্বনি জাগে মন্দির-অলিন্দে, চমকে ওঠেন মহেন্দ্র। কয়েক পা পিছিয়ে এসে তিনি মৃদু শাসনের সুরে বলেন : 'আমি ব্রাহ্মণ, তাছাড়া সংসার-ধর্মে বিবাগী। তুমি জমিদার-দুহিতা, আর কোনোদিন আমার সামনে এসে যদি এমন প্রস্তাব কর, তাহলে আমি তোমায় অভিশাপ দেবো। তুমি ফিরে যাও।'

সুশোভনা ফিরে যায়, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়, পরাজয় স্বীকার করেও নয়। কেবল সেদিনের মতো সে মাথা পেতে নেয় তার দেবতার আদেশ। সে বিশ্বাস করে : ভক্তি তার দুর্বল নয়, তার আত্ম-নিবেদনেও দ্বিধার কোনো প্রতিফলন নেই। অতএব হৃদয়ের ঐকান্তিকতার বেদীমূলে দেবতা একদিন চরণ রাখবেন অবশ্যই।

মহেন্দ্রের সঙ্গে জমিদার-দুহিতা সুশোভনার এই সাক্ষাতের ঘটনাটি কিন্তু চাপা থাকে না। অন্য এক মন্দিরের অন্তরাল থেকে সব-কিছুই অবলোকন করে মহেন্দ্রেরই এক সহকর্মী পুরোহিত। যে-কোনো কারণেই হোক, ঘটনাটির কথা সে সবিস্তারে বর্ণনা করে জমিদার-সমীপে। জমিদার এ-ঘটনা অবগত হওয়া মাত্রই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অপরিসীম। তাঁর কন্যাকেই তিনি তিরস্কার করলেন প্রথম। তারপর মহেন্দ্রকে ডেকে সবিনয়ে বললেন যে, তিনি যেন জমিদারবাড়ি থেকে বিদায় হয়ে জমিদারের ইজ্জৎ বা সম্মান রক্ষা করতে সাহায্য করেন।

অতএব জমিদারবাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে যথারীতি বেরিয়ে এলেন মহেন্দ্র। তিনি পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন দক্ষিণাঞ্চলের অরণ্যে। তখন অরণ্যের গভীর দেশে পরম সত্যের সাধনায় মগ্ন চৌরঙ্গীনাথ। তিনি নাথযোগী হলেও, তাঁর কাছেই দীক্ষা চাইলেন মহেন্দ্র। উদার যোগীপুরুষ চৌরঙ্গীনাথের কোনো বিকার নেই। নির্বিকার ভাবেই তিনি মহেন্দ্রকে গ্রহণ করলেন, দীক্ষাও দিলেন। তারপর নদীতীরের কোনো এক বিবিক্ত পরিবেশে কুটির বেঁধে, পরম সত্যের সন্ধানে একাকী সাধনা করার নির্দেশ দিলেন মহেন্দ্রকে।

তাই মহেন্দ্র এবার একটি খড়ো-চালের কুটির তুললেন সেই সমভূমির তরুতলে—যা দক্ষিণের অরণ্য এবং উত্তর-বসতির মধ্যবর্তী রেখায় অবস্থিত এবং সামনে যার গৈরিক বালিয়াড়ি প্রান্তর ভাগীরথীর কুটিল কার্পণ্যে নিষ্প্রাণ। এখানেই কঠোর সাধনার যোগাসনে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করলেন মহেন্দ্র।

ওদিকে যথাসময়ে মহেন্দ্রের সাধন-কর্মের সংবাদ আসে জমিদার-দুহিতার কাছে। সংবাদ পেয়েই সে মনে-মনে শপথ নেয় : মহেন্দ্রের ধ্যান সে ভাঙবে। সুতরাং জমিদার-বাড়ির সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা ক'রে, একদিন সন্ধ্যা-লগ্নে সে দুজন সহচরীর সঙ্গে গোপনে আসে মহেন্দ্রের কুটিরে। তারপর মহেন্দ্রের দৃঢ় আপত্তি সত্ত্বেও সে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করে বাহুপাশে এবং ভগ্নকণ্ঠে বলে : 'তুমি আমাকে গ্রহণ কর, নচেৎ আমি আশ্রয় নেবো গঙ্গায়।'

এমন অবস্থায় আর অন্য কোনো উপায় না দেখে, মহেন্দ্র এবার বাধ্য হয়েই সুশোভনাকে বুঝিয়ে বলেন : 'যেদিন আমার সাধনার সমাপ্তি ঘটবে, আমি সেদিনই তোমাকে গ্রহণ করবো সম্পূর্ণরূপে। ততদিন মাঝে মাঝে এখানে এসেই তুমি সাক্ষাৎ করো আমার সঙ্গে।'

মহেন্দ্রের এ-কথার পর আশ্বস্ত হয়েই ফিরে যায় জমিদার-দুহিতা। যাবার সময় ব'লে যায় : পরদিন এমন সময়ে আবার সে আসবে।

কিন্তু সেদিন রাত্রেই এক অনুচর মারফত নির্জন নদীতীরের এই গোপন সাক্ষাতের সংবাদও কানে উঠলো জমিদারের। জমিদার এবার কন্যাকে কিছুই বললেন না। এমন কি, তিনি যে এ-সংবাদ অবগত আছেন—তাও কোনো-ক্রমে অনুমান করার সুযোগ দিলেন না সুশোভনাকে। কেবল একজন বলিষ্ঠ পাইককে কাছে ডেকে গোপনে কী-যেন বললেন।

পরদিন যথাসময়ে, সুশোভনা

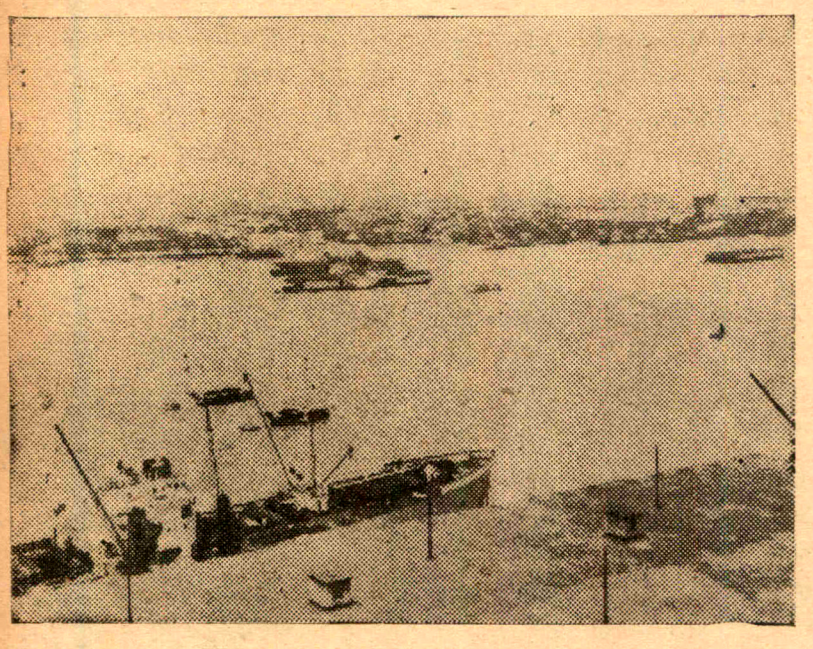

ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের সন্নিকটে গঙ্গাতীরের দৃশ্য

আবার যখন সহচরীদের সঙ্গে মহেন্দ্রের কুটিরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়---তখন আচমকা চমকে উঠেই সে দেখে : মুক্তদ্বার কুটিরের অভ্যন্তরে প'ড়ে আছে রক্ত-লাঞ্ছিত দেহ মহেন্দ্রের---যে-দেহের নিবাস ছেড়ে মহাপ্রয়াণ ঘটেছে তাঁর জীবনের !

কাহিনীর শেষ এখানেই। পরে জমিদার-দুহিতা সুশোভনার কী-গতি হলো---তার কোনো বিবরণ বা বর্ণনা নেই কাহিনীতে। তবে আরও শোনা যায় : কিছুকাল পর মহেন্দ্রের সেই কুটির ভেঙে-ছড়িয়ে উড়ে যায় হাওয়ায়। তারপর সেখানেই কঠিন মাটি বিদীর্ণ করে আকাশ-পথে মাথা তোলে একটি শিমূল। এই শিমূল গাছটির অস্তিত্ব নাকি এখানে অনেককাল পর্যন্তই ছিল এবং দিনে দিনে সংস্কারবাদী লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল : এ-গাছ নিছক গাছ নয়, মহেন্দ্রের নিষ্কাম আত্মার রূপান্তর। তার অজস্র অগ্নিবর্ণ ফুল মহেন্দ্রেরই অনাবিল রক্তের অভিজ্ঞান।

ষোড়শ শতাব্দী অতিক্রান্ত হতেই খাস ব্যবসা-সূত্রে ডাচ বা ওলন্দাজদের আবির্ভাব ঘটে বাংলা দেশে এবং মোগল সম্রাটের অনুমতিক্রমে তারা এ-অংশেরই গৈরিক বালিয়াড়ি প্রান্তর কেটে গতি-বিবর্তন ঘটায় গঙ্গার---সেই শিমূল গাছটির অস্তিত্ব নাকি তখনো ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডাচ বণিকরাই উক্ত শিমূল গাছটির উচ্ছেদ ঘটিয়ে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করে একটি কোঠাবাড়ি---যা জলকর আদায়ের প্রধান কার্যালয়-রূপে গণ্য হয়। ডাচদেরই খনন-কার্যের ফলে যে-অংশে গতি-বিবর্তন ঘটে গঙ্গার, সে-অংশে অন্য কোনো কোম্পানীর জাহাজ বা নৌকো চলাচল করলেই জলকর আদায় করতো তারা। এ-অধিকার তারা লাভ করে মোগল সম্রাটের আদেশ বা ফর্মান অনুযায়ীই। করদাতারা তাদের নির্ধারিত কর গঙ্গাতীরের উক্ত গৃহ বা কার্যালয়েই এসে জমা দিতো।

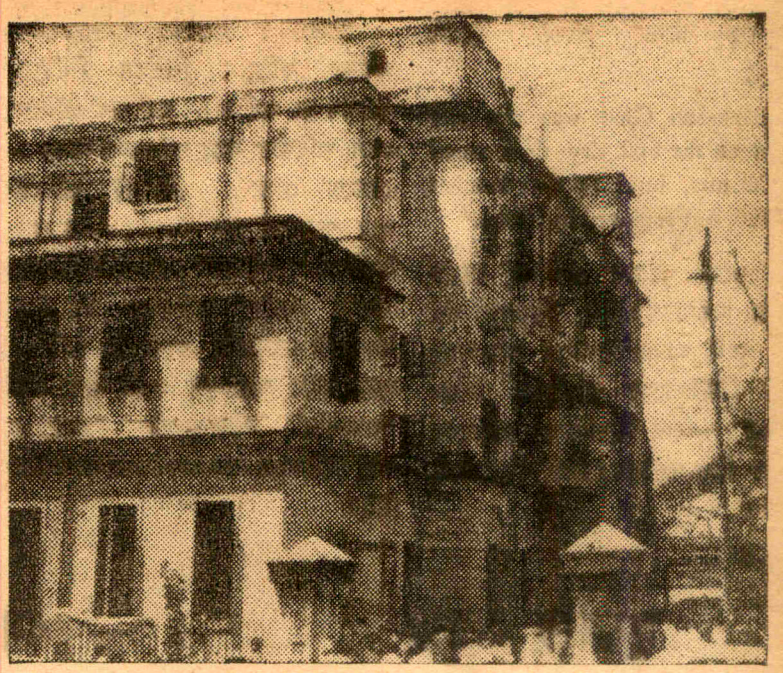

● ব্যাঙ্কশাল কোর্ট।

এই বাংলা কর শব্দটির ইংরেজী অর্থ Toll এবং এই Toll শব্দটি ডাচ বা ওলন্দাজদের ভাষায় Zoll. এই Toll বা Zoll যে-গৃহে জমা হতো---তা গঙ্গার Bank বা তীরে অবস্থিত ছিল বলেই তখন তার নাম-করণ হয় 'Bank-zoll.' পরে আবার Zoll শব্দের Z অক্ষরটির স্থান অধিকার করে S. তাই স্বাভাবিক কারণেই 'Bank-zoll' শব্দের রূপান্তর ঘটে 'Bank-soll'-এ। ঐতিহাসিকদের মতে এই 'Bank-soll'-এর অপভ্রংশ রূপই পরবর্তী কালের 'Bankshal' এ-সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ টলবয়েজ হুইলার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'The term—'Bank-soll' has always been a puzzle to the English in India. It is borrowed from the Dutch or Danish 'Zoll', the English 'Toll'. The 'Bankshal' was thus place on the 'Bank' where all tolls or duties were levied landing goods.'

তাছাড়া নৃতত্ত্ববিদ এবং সেইসঙ্গে ঐতিহাসিক মিঃ এ কে রায়---যিনি রচনা করেছেন শহর-কলকাতা সংক্রান্ত এক বৃহৎ গ্রন্থ, তিনিও বলেছেন :

'The Dutch deepening the drybed of the Hooghly between Betor and Kidderpur and levying their zoll (toll) upon boats and ships that used deepened channel at a spot on the river bank in Calcutta which acquired the name of Bankshall (Bank-zoll).'

অনেক কাল পর, না জানি কী-কারণে ডাচ বা ওলন্দাজ বণিকদের অপসারণ ঘটে এ-দেশ থেকে। তাদের পরিবর্তে আসে ইংরেজ, অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। দিনে দিনে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে তাদের আধিপত্য বিস্তার ক'রে কলকাতা মহানগরীর পত্তন ঘটায়---সে-ইতিহাস আজ আর কারো কাছেই অবিদিত নয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই তাদের প্রথম ডক প্রতিষ্ঠা করে এখানে এবং পূর্বের সেই ডাচ-নির্মিত গৃহই সংস্কার সাধিত হয়ে উক্ত ডকের কার্যালয়রূপে ব্যবহৃত হয়। এ-সম্বন্ধে মিঃ

এ কে রায়ের গ্রন্থেই উল্লেখ আছে :

'Bankshall Ghat was the site on which the first dry dock stood in Calcutta, built by Government in 1790, but removed in 1808...'

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এ-অঞ্চল থেকে ডকের অপসারণ ঘটলে, কিছুকাল পর উক্ত গৃহই আবার রূপান্তর লাভ করে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের বসত-বাটীতে —যার সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের বিস্তার ছিল বর্তমান ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত।

তারপর ? লাফিয়ে লাফিয়ে চলে সময়ের ফড়িং। পিছিয়ে পিছিয়ে বর্তমান হয় অতীত। ভবিষ্যৎ এগিয়ে এসে অধিকার করে বর্তমানের আসন। দেখতে দেখতে এভাবেই হারিয়ে যায় বৎসরের পর বৎসর।---সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতেই ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় তাঁর বসতবাটী। তারপর সেখানেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট এবং এই 'ব্যাঙ্কশাল' শব্দ-সূত্রেই কোর্টের পার্শ্ববর্তী রাস্তা নাম ধারণ করে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট।

আজ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট জনারণ্যের অবিশ্রাম মুখরতায় ভারাক্রান্ত। এখানেই অধিষ্ঠিত স্মল কজ কোর্ট, পুলিশ কোর্ট এবং ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান কার্যালয়েরও বিন্যাস ঘটেছে এখানে। তাছাড়া দিনে দিনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একাধিক বিপণি এবং মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য অফিস সংক্রান্ত আরও অনেক কোঠাবাড়ি। তাদেরই অন্তরালবর্তী ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট আজ বিচিত্র দ্বিপদচারীদের অক্লান্ত পদাঘাতে গুঞ্জরিত।

## দৃশ্যের সম্ভার

**কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত**

কিছুই থাকে না আর। মুগ্ধ দৃশ্যগুলি
কালের তিমির জলে
ডুবে যায়। মেদ মাংস আকাঙ্ক্ষারা যত
মিশে যায় একদিন কালের হাওয়ায়
ছ' ফুট জমির সেই
অনিবার্য ভরাবহতায়।

সিগ্ধ এই শাখাগুলো। সময় হলেই
ঝরবে গাছের পাতা। বৃক্ষ হতে ক্রমে বনস্পতি
কতো গাছ! মাটির গভীরে বীজ
সাড়া দেবে মৃত্তিকার কণ্ঠস্বর শুনে।
উদ্যত কুঠার এসে গাছের বাকলে
বৃত্ত পূর্ণ করবেই, নির্দয় আঘাতে।
শাখা পাতা বীজ আর ফুল
আসবেই ঘুরে ফিরে ঋতুতে ঋতুতে,
ঝরবে আবার।

কিছুই থাকে না স্থির। অনিবার্যতায়
সবাই নশ্বর একদিন। ফুল, ঋতু, পাখী
সব একাকার। তবু একবার

দেখে যাব দূর স্মৃতিপটের আড়ালে
উন্মোচিত মুহূর্তের তিমির দুয়ার।
মেদ মাংস আকাঙ্ক্ষা ভাসিয়ে স্থির জলে
উদ্‌ঘাটিত অন্তরঙ্গ দৃশ্যের সম্ভার॥

## বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

**নচিকেতা ভরদ্বাজ**

বসন্ত এসে গেছে বুঝতে পারি। আকাশের রঙ পাল্টেছে।
বাদামী শুকনো পাতা পা'র তলে মচমচ করে।
পলাশে লেগেছে রঙ। দেবদারু সবুজে মেতেছে।
ঝংকৃত নতুন দিন চারিদিকে আলো হয়ে ঝরে
আকাঙ্ক্ষায়। নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এল।
তাছাড়াও অজস্র কণ্ঠ ঘুমভাঙা পাতার আড়ালে
ধ্বনিত তন্ময়। মগ্ন কোলাহল-কল্লোলিত ভোর
জানালার পর্দায় কী যেন সম্মোহ রেখে গেল।
এলোমেলো হাওয়া কাঁপছে। মঞ্জরিত গাছেদের ডালে
যৌবনের স্বর্ণস্বর। প্রকৃতির ডাকঘরে নতুন মোহর।

আয়নার মত স্থির স্বচ্ছ জল---নীলাঞ্জন আকাশের মুখ
ফেলেছে মুখর ছায়া। প্রান্তরের সবুজে ওখানে
ওরা কারা বসে আছে---গল্পের গভীরে
ডুবে আছে দুইজন। ঐ তো দু'জন ফের নিবিষ্ট চিবুক—
বিশাল বৃক্ষের ছায়া-ঘিরে আছে কী এক আশ্চর্য অভিজ্ঞানে :
বর্ণাঢ্য শাড়ির রঙ, স্বাস্থ্যদীপ্ত যুবকের উজ্জ্বল শরীরে
বিকেলের গিনি-রোদ। পরিচিত পাখীটারও স্বর
খুব স্পষ্ট শোনা যায়। যেদিকে তাকানো যায় বর্ণের প্রহর
পরিপার্শ্বী চেতনায়---উন্মুখ আনন্দ হয়ে আছে।

এমন কি ভিখারীটা তারও ছিন্ন গোপীযন্ত্রতারে
চঞ্চল আবেশী মুদ্রা। কয়েকটি শিশু নারী দোলানো ফ্রকের
রঙবেরঙ ছন্দ নিয়ে---অনন্য---ঘুরছে আশেপাশে।
এমন কি আসন্ন রাত্রির অভিজাত অনন্য আঁধারে
কী যেন স্পর্শ বর্ণ ব্যথা সমাহিত। দ্যাখো দীপ্ত বিকেলের
কোমল রৌদ্রের ধারা পরিস্নাত আকাশ পৃথিবী।

এখুনি নামবে সন্ধ্যা চাঁদ তারা রহস্যে বিপুবী॥

● আসানের গারো পাহাড়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পরিদর্শনরত শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

## রাজধানী ঃ

৪৪ কোটি নরনারীর দেশ ভারতবর্ষ। দেশ যেমন বিশাল, সমস্যাও তার তেমনি বিরাট। প্রাকৃতিক নিয়মে এ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারত আজ সত্যি একটা চরম সঙ্কটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তর সীমান্ত জুড়ে জঙ্গী চীন হিংস্র থাবা বিস্তার করে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। চীনের নয়া দোসর পাকিস্তান অশান্ত করে তুলেছে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তকে। ভীতিবিহ্বল মানুষ কসাইয়ের শাণিত ছুরিকার আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কাতারে কাতারে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ভারতের বুকে। দ্রব্যমূল্যের আকাশ-ছোঁয়া ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে করে তুলেছে উদ্বেগ-সঙ্কুল। জাতির কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই সঙ্কটের কথা মনে রেখেই রোগমুক্তির পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, ভারতে বহু সম্প্রদায়ের বাস। পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রেখে বাস করতে না পারলে, অপরের প্রতি বিশ্বাস ও অপরের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে না পারলে মহান ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় পারস্পরিক সম্প্রীতিতে বাস করে আসছে। এইটিই ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য---তার সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। ভগবান বুদ্ধ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। সম্রাট অশোকের কাল থেকে এই মনোভাবই আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার ঘোষিত হয়েছে। গান্ধীজীও এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যই আত্মদান করে গেছেন। এই মহান ঐতিহ্য আমাদের সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করতে হবে। অন্যথা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সর্বনাশের মধ্যে পড়ে মহান ভারত রাষ্ট্র গঠনের সাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শ্রীনেহরু ভারতের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের একনিষ্ঠ পূজারী। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা রয়েছে। তাই দাঙ্গা, পারস্পরিক হানাহানি অতি সহজেই তাঁকে পীড়িত করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধে যাঁরা শ্রদ্ধাবান, গণতন্ত্রে, শান্তির নীতিতে এবং প্রগতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রীনেহরুর আবেদনে সাড়া দেবেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত বিদ্বেষ বিষ সঞ্চার করা ভিন্ন কোন কোন সমস্যার সমাধান আনতে পারে না। ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, বৈদেশিক পরিস্থিতি চিন্তা করলে সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মৈত্রী নির্ভর করে পারস্পরিক মনোভাবের ওপর। এক তরফা কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে মৈত্রী রক্ষা করা খুবই মুস্কিল। এক দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পনা মাফিক নির্যাতন, নিপীড়ন চলতে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া অপর দেশে দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতায় বিশ্বাসী পাকিস্তানে যতদিন পর্যন্ত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রম নিরাপদ না হচ্ছে, ততদিন ভারতের পক্ষে পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধান কষ্টসাধ্যই হবে। শ্রীনেহরু এ বিষয়েও সচেতন সন্দেহ নেই। তাই তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর কাছে বার বার আবেদন নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নীতির যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন, তাঁরা ভুলে যান আয়ুবশাহী পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের দায়িত্ব সমধিক। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের, ব্যক্তিস্বাধীনতার বালাই নেই। মানবিক মূল্যবোধ সেখানে ধূলায় লুণ্ঠিত। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে দেশের মানুষের কাছে তাদের কোন কাজেরই জবাবদিহি করতে হয় না। গণতন্ত্র ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখেই পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপ দেখে, ভারত জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান সরকারের কাছে মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা এবং সাম্প্রদায়িক প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টায় উভয় দেশে যুক্ত পরিভ্রমণের প্রস্তাব করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

সাম্প্রদায়িক শান্তিরক্ষার জন্য আয়ুবের কাছে যুক্ত বিবৃতি প্রচারের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আয়ুব তখন সে প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবারে দেখা যাচ্ছে আয়ুব খাঁর হৃদয় গলেছে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। শীগগিরই রাজধানীতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার জন্য আসছেন।

আলোচনার প্রধান বিষয় হবে উভয় দেশের মাইনরিটিদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা, সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের ভারতে আগমন এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে বে-আইনী পাকিস্তানীদের বহিষ্কার। এই আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হবে, সে বিষয়ে রাজধানীর প্রতিটি মানুষের মনে সন্দেহ জেগেছে। কারণ ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে হাজার হাজার হিন্দু নরনারী জবাই হওয়ার পর নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির কথা আমাদের স্মরণ আছে। পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে দুশমনি মনোভাব নিয়ে ভারতকে পদে পদে বিপদে ফেলবার যে চেষ্টা চালিয়েছিল তা এখনও অব্যাহত গতিতে চলেছে। বরং তার ভারত-বিদ্বেষ আরও তীব্রতর হতে চলেছে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে অনেক ভাল কথাই ছিল। সে অঙ্গীকার পাকিস্তান রক্ষা করে নি। অপর পক্ষে ভারত চুক্তির মর্যাদা এক তরফা রক্ষা করে আসছে।

১৯৫৮ সালের তথাকথিত বিপ্লবী শাসনের বিরুদ্ধে আজ পূর্ব পাকিস্তানে জবরদস্ত আন্দোলন চলেছে। আয়ুবের তক্ত আজ টলটলায়মান। ময়মনসিংহের খৃষ্টানদের উৎখাতের প্রচেষ্টা পাক-দরদীদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তুলেছে। এই অবস্থায় পড়ে আজ আয়ুব খাঁ ভারতের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই তাঁর আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক। তা' ছাড়া, আলোচনাকালে পাকিস্তান ভারত থেকে বহিষ্কৃত পাকিস্তানীদের সমস্যা তুলে ধরবার সুযোগও পাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রস্তাবিত বৈঠককে বানচাল করে দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আর এক দফা অপপ্রচারে পাকিস্তান নামবে না, একথাও বলা চলে না। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আন্তরিকতা ও উদ্বেগ সত্ত্বেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কোন সুফল আশা করা খুবই শক্ত।

পাকিস্তান আলোচনাকালে কিরূপ কূটনৈতিক চাল দেবে সে

● আয়ুব খান

চিন্তা আলাদা ব্যাপার। ভারতের জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মৈত্রী বজায় রাখা যে একান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের মনে কোন প্রকার দ্বিধা থাকতে পারে না। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শ্রীনেহরুর জাতির প্রতি আবেদন খুব সময়োচিতই হয়েছে। ভারতে কোন প্রকার অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলে, কেবল ভারতের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী নয়; তা ছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানে যে গণজাগরণ দেখা দিয়েছে তাও আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে, মানুষ তার মৌলিক অধিকার পেলেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সহজ ও সুগম হবে। ভারতের সংযম ও তার আদর্শ পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষদের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করবে।

## আসাম ঃ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সম্প্রতি আসাম সফর করে গেছেন। শুধু সফর বলা ঠিক হবে না, এক সপ্তাহকাল তিনি বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে গেছেন। কোন রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই গুরুত্ব নিয়ে আসামের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। এই জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে আসামের রাজনৈতিক দলগুলির চেহারা কিছুটা প্রকাশ পাচ্ছে। আসামের প্রতি কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে শ্রীনন্দর আগমনে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আসামের বাইরের ও ভেতরের নিরাপত্তা সম্পর্কে কেন্দ্রকে বার বার জানানো সত্ত্বেও এতকাল কেন্দ্র সে বিষয়ে মনোযোগ দেয় নি। অথচ রাজ্য সরকার অনুভব করেছে যে, রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্র যদি দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে এককভাবে আসামের পক্ষে এতবড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। শ্রীনন্দর সঙ্গে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দপ্তরের সেক্রেটারী এবং গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল। সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসাম সফরের গুরুত্ব এতে আরো প্রমাণিত হয়েছে। দেশ বিভাগের পর থেকেই আসামের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভৌগোলিক কারণে আসামের সাথে ভারতের যোগাযোগ খুব দুর্বল। যদিও বিংশশতকের বর্তমান পর্যায়ে এই দুর্বল যোগাযোগের

কারণ স্বীকৃত হতে পারে না। তথাপি আজ ১৬ বছর যাবৎ এই অবস্থা রয়ে গেছে। পঞ্চাশ দশকের মধ্যকাল থেকে নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণ লেগে রয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ভয়ানকভাবে বিঘ্নিত। তার ওপর পাকিস্তানের সাথে আসাম সীমান্তের পরিধি প্রায় ৬২০ মাইল। পাকিস্তান অবিরাম ভারতের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করছে, নাগা বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং আসামের মধ্যে পাকিস্তানীদের ঠেলে পাঠাচ্ছে। আসামের সীমান্তে রয়েছে পাকিস্তানীদের পরিখার মধ্যে সতর্ক পাক-ফৌজ। এযাবৎকাল কেন্দ্র আসামের এই উদ্বেগ ও সমস্যা বুঝতে চায় নি। সর্বভারতীয় নেতারা আসামের এই সমস্যাকে ভারতের সমস্যা বলে গ্রহণ করেন নি। এমন কি, দলে দলে পাকিস্তানীরা যে আসামের অভ্যন্তরে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করছে এ বিষয়েও কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় নি। তাঁরা মাঝে মাঝে এই সমস্যার বিষয়ে যা বলেছেন তা মামুলী কর্তব্য পালন। অথচ পাকিস্তানীদের অবৈধ প্রবেশে আসামের অর্থনৈতিক সমস্যা কেবল জটিল হয়ে ওঠে নি, বিরাট রকমের রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অবৈধ প্রবেশকারী পাকিস্তানীরা আসামের রাজনীতিকে কলুষিত করছে। কেন্দ্র এযাবৎকাল প্রায় দিবানিদ্রা ভোগের মত এসব ব্যাপারে উদাসীন ছিল, এই অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে রয়েছে।

১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণে আসামের প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ে। কেন্দ্রের নেতারাও একটু নড়েচড়ে ভাবতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের অভিযোগ---চৈনিক আক্রমণের পরেও কেন্দ্র কেবল রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ওপর নজর দিয়েছে, অর্থাৎ বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধের কথা ভেবেছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিপদ ১৬ বছর যাবৎ আসাম তথা ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে তার কথা ভাবে নি।

এবার শ্রীনন্দর আগমনে যদি অহল্যার অভিশাপ মুক্তির মত আসামের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র মনোযোগ দেন, তবে তা কেবল আসামের শাপমুক্তি নয়, ভারতেরও বিপন্মুক্তি।

শ্রীনন্দ আসামের সমস্যাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এতে আশা করা যায়, কেন্দ্রও আসামের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবে। শ্রীনন্দ প্রায় ৫০টির অধিক স্মারকলিপি পেয়েছেন এবং বিভিন্ন দল ও অঞ্চলের দুই শতাধিক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছেন। বে-সরকারী প্রতিনিধি ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন।

আসামের সমস্যার সমাধান বিষয়ে রাজ্যের কংগ্রেস কমিটী এবং মন্ত্রীদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস নাকি দাবি করেছে, সকল অবৈধ প্রবেশকারীকে ৩১শে মার্চের মধ্যে রাজ্য হতে বহিষ্কার করা হোক। কিন্তু সরকারী মহল এরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা এবং এরূপ কঠিন কাজ এত অল্প সময়ে করা সম্ভব নয় মনে করেন। যারা নিজেদের ভারতীয় বলে দাবী করছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বলে অভিযোগ রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের প্রস্তাবে প্রদেশ কংগ্রেস আপত্তি করেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন ন্যাশনালিটি নির্ণয়ের কাজ কেবলমাত্র পুলিশের ওপর ছেড়ে না দিয়ে ট্রাইবুন্যাল গঠন করা উচিত। এসব মতবৈষম্যের জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতবিরোধ ও বিরক্তি তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক কংগ্রেসকর্মী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলেন, সীমান্ত অঞ্চল থেকে কেবলমাত্র মুসলমানদের

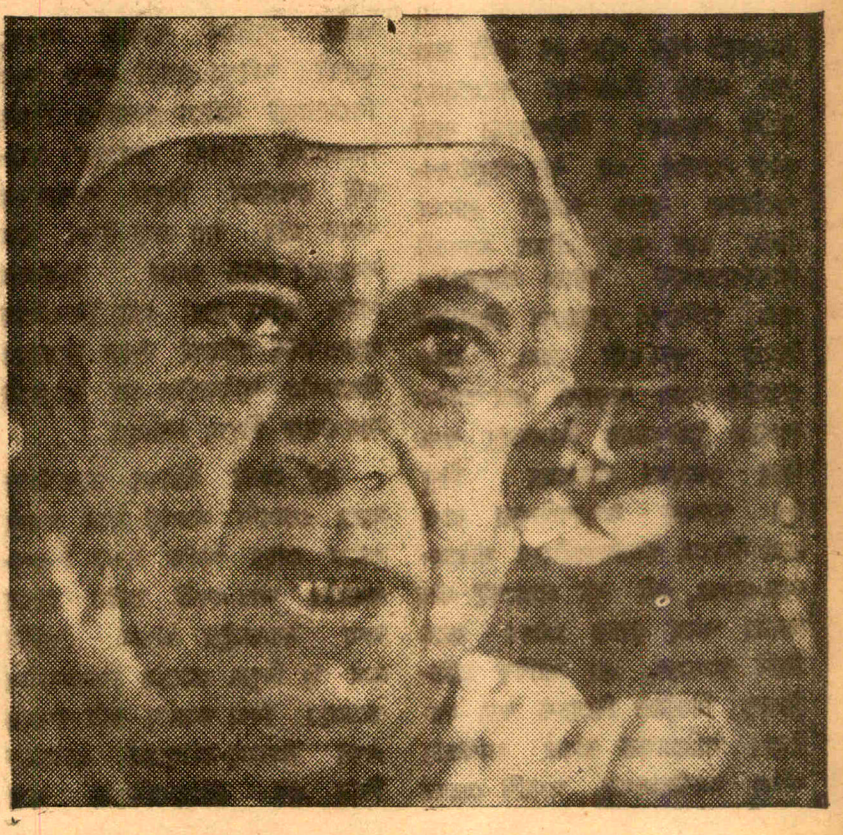

● জাতির উদ্দেশে ভাষণরত শ্রীনেহরু

অপসারণ করা হোক। সরকারি অবশ্য এরূপ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিরোধী দলগুলির মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারকে এই প্রশ্নে সমর্থন করছে। ট্রাইবুন্যাল সম্পর্কেও কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারী মতের সমর্থক। সীমান্ত অঞ্চলের কিছু দূর পর্যন্ত স্থান বসতিশূন্য রাখার প্রস্তাবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী এবং কমিউনিষ্ট পার্টি একমত। কিন্তু হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ এবং আরো কিছু সংখ্যক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে, তারা দাবী করে কেবলমাত্র মুসলমানদের অপসারণ করা হোক। অবশ্য রাজ্যের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এক দল রাতারাতি ভিন্ন নামে দল গঠন করে হিন্দু মহাসভার সাথে হাত মিলিয়েছে।

শ্রীনন্দ অবশ্য প্রতিনিধিদের বলেছেন, এসব প্রশ্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভূমিকা থেকে বিচার করতে। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা সাত-আট লাখ বলে যে দাবী করা হয় তারও বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে বলা যায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা আড়াই লাখের বেশি হবে না। শ্রীনন্দ সরকারী শাসনব্যবস্থাকে আরো পাকাপোক্ত করা, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে আরো কার্যকরী করা, চেক পোষ্টের সংখ্যা বাড়ানো এবং অধিক সংখ্যক ট্রাইবুন্যাল নিয়োগের কথা বলে গেছেন। সীমান্তের কিছু দূর স্থানকে জনবসতিশূন্য রাখা এবং সীমান্তে বসবাসকারীদের পরিচয়-পত্র দেওয়া, এই দুই প্রস্তাবেই তাঁর সম্মতি আছে বোঝা গেল। তবে তিনি বলেছেন, এর আর্থিক প্রতিক্রিয়ার দিকটাও বিবেচনা করা দরকার। পরিচয়পত্র রাখার ব্যাপারটা যদিও অমর্যাদাজনক, তথাপি দেশের স্বার্থে এটুকু মূল্য প্রয়োজন হলে দিতে হবে।

শ্রীনন্দর আসাম পরিদর্শনের পর সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী ও কংগ্রেস মহলে বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। সকলের মধ্যেই আস্থামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। সকলে আশা করছে এবার কেন্দ্রীয় সরকার আসাম সম্পর্কে উৎসাহ দেখাবেন এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এভাবে যদি চলে তবে দলত্যাগী কংগ্রেসী বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারবে না।

## মহারাষ্ট্র ঃ

মহারাষ্ট্র-মহীশূর বিরোধের কথা বহুবার বলা হয়েছে। এই বিরোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার আরো তীব্র হয়ে ওঠার দিকে যাবে মনে হয় গোয়াকে নিয়ে। দুই রাজ্যই চায় গোয়ার অধিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। গোয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য যখনই মহারাষ্ট্র রাধানগরী থেকে ৬৬ কিলোওয়াট লাইনে ব্যবস্থা করছে, তখনই মহীশূর দোণ্ডী থেকে ১১০ কিলোওয়াট লাইনে গোয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মহারাষ্ট্র গোয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। গোয়া থেকে রাধানগর পর্যন্ত লাইন পাতা এবং ট্রান্সমিশন সাব-ষ্টেশন গঠনের কাজ হয়েছে। ডিচোলীর অধিবাসীরা তো জানুয়ারী মাস থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছে।

দুই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে পোপলি জয়গড় হয়ে কয়না থেকে গোয়া পর্যন্ত ২২০ কিলোওয়াটের আর একটি লাইন খোলার জন্য মহারাষ্ট্রের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ বোর্ডের বিবেচনাধীন রয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড এখন মহারাষ্ট্র-মহীশূরের গোয়াকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতার কথা ভেবে, বিশ্রী রকমের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে আশঙ্কা করছে। এবং এ কারণে স্বতন্ত্রভাবে গোয়াতে দুটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবছে। দুধসাগর প্রজেক্ট এরূপ চিন্তারই একটি পদক্ষেপ। দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হবে ৪ কোটি টাকা।

মহারাষ্ট্রের পক্ষে গোয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়বহুল বলে অভিজ্ঞরা মনে করছেন। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে যুক্ত হলেই যে গোয়ার উপকার হবে একথা বোঝাবার জন্য মহারাষ্ট্র এই ঝুঁকি নিয়েছে। ওদিকে মহীশূরও ছাড়বার পাত্র নয়। মহীশূরের দোণ্ডী থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কম ব্যয়সাপেক্ষ। মহীশূর গোয়াতে বোঝাচ্ছে মহীশূরের সঙ্গে যুক্ত হলেই তাদের কল্যাণ হবে।

এখন কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন তার প্রতিই সকলে নজর রেখেছে।

## মাদ্রাজ ঃ

দ্রাবিড় কাঝাগাম সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক কাজ বন্ধ করে সমাজসেবার কাজ করবে মাত্র। দ্রাবিড় কাঝাগামের নেতা শ্রী ই ভি রামস্বামী পেরিয়ার সম্প্রতি দলের সদস্যদের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখন থেকে দ্রাবিড় কাঝাগাম দল হিসেবে আর কোন রাজনৈতিক কাজ করবে না। এই নির্দেশের পরে ৩ হাজার সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে এঁদের কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়। এরূপ অনুষ্ঠান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হবে। কাঝাগাম দলের সদস্যরা বলছেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি মজবুত করার জন্যই তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করছেন।

শ্রীপেরিয়ার নিজে অবশ্য কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না। তিনি বলছেন, এ বয়সে কংগ্রেসের বাইরে থেকে তিনি ভালভাবে কংগ্রেসকে সাহায্য করতে পারবেন।

## মেক্সিকো :

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল তাঁর বহু আলোচিত মেক্সিকো সফর শেষ করে গত সপ্তাহে চার দিনের জন্য ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যাত্রা করেছেন। এ যাত্রায় তিনি আরও কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশও ভ্রমণ করবেন।

দ্য গল বিশ্বরাজনীতিতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেমেছেন এবং সর্বত্র তিনি মার্কিন-বিরোধী কূটনীতির দোসর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মেক্সিকোতেও দ্য গল এই উদ্দেশ্যেই আসছেন, ওয়াশিংটনের কর্তারা এই ভেবে যথেষ্ট চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। মার্কিন অর্থনীতির প্রভাবাধীন মেক্সিকোর মনে মার্কিন-বিরোধী ক্ষোভ যতই থাক না কেন, প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চটাবার ক্ষমতা মেক্সিকোর নেই। তাই মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি অ্যাডলফো লোপেজ ম্যাটিয়সকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হয়েছে, যাতে দ্য গল তাঁর মেক্সিকো সফরকে মার্কিন-বিরোধী অভিযানে ব্যবহার না করেন।

দ্য গলকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রথমেই ম্যাটিয়স বলেছেন, 'ফ্রান্সের সঙ্গে মেক্সিকোর আঁতাত ধরোয়া ধরণের ও এর জন্য কোন কূটনৈতিক কায়দা-কানুনের ( protocol ) প্রয়োজন নেই এবং এই মৈত্রী-প্রচেষ্টা কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়।' স্পষ্টতই 'কোন রাষ্ট্র' বলতে এখানে ম্যাটিয়স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেয়েছেন। দ্য গলও ম্যাটিয়সের সম্মান রক্ষা করেছেন, তিনি কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। এমন কি, সফর শেষে দুই রাষ্ট্রপতির নামে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দ্য গলের অতি-প্রিয় 'এ্যাংলো স্যাকশন' কটাক্ষপাত নেই।

মেক্সিকো সফরকালে দ্য গল কিন্তু সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে —বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জা যেখানেই তিনি

* রাষ্ট্রপতি দ্য গল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের গোয়াডেলুপ দ্বীপপুঞ্জে সফরে গেলে সেখানকার সুন্দরীগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান

গিয়েছেন, মেক্সিকোবাসী স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। মেক্সিকোবাসী দ্য গল তথা ফ্রান্সকে একান্ত আপনজন ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কূটনৈতিক প্রয়োজনে সরকারী পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে সংযমের পরিচয় দেওয়া হোক না কেন, মেক্সিকোর সাধারণ নাগরিক মার্কিন কর্তৃত্বে বেশ ক্ষুব্ধ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, ইউরোপের বাজারে মেক্সিকো প্রবেশের অধিকার চায় এবং সে ব্যাপারে ফ্রান্স তার সহায়ক হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, সাংস্কৃতিক দিক থেকে মেক্সিকোর সঙ্গে ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ফরাসী বিপ্লব ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রচিন্তা আজও মেক্সিকো ও ল্যাটিন আমেরিকান দেশে জন-সাধারণকে অনুপ্রাণিত করে। স্প্যানিশের পরেই সর্বত্র ফরাসী ভাষার কদর। ফরাসী ভাষা জানাকে সবাই রীতিমত সম্মানের বিষয় বলে মনে করে। দ্য গল এই সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। মেক্সিকোবাসীদের সমাবেশে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনের মত 'এ্যাংলো স্যাকশন' দেশের থেকে ফ্রান্স যে মেক্সিকো তথা ল্যাটিন আমেরিকার অনেক বেশি কাছাকাছি, এই কথা তিনি প্রমাণ করতে চান।

মেক্সিকোকে দ্য গল বোঝাতে চেয়েছেন, ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্র ফ্রান্স, আর ল্যাটিন আমেরিকার প্রধান রাষ্ট্র মেক্সিকো যদি এক পথ গ্রহণ করে, তবে কেবল এই দুই অঞ্চলই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকাতেও তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। ম্যাটিয়স দ্য গলের সঙ্গে এতটা চলতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক, ফরাসী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকান দেশে দ্য গল কেমন সাড়া পান।

## পানামা :

পানামা খালের মার্কিন এলাকায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামার পর থেকেই পানামা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী প্রভাবে অনুপ্রাণিত পানামাবাসীর দাবী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯০৩ সালের খাল চুক্তি পালটাতে হবে---পানামাকে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ১৯০৩ সালের চুক্তি পরিবর্তন করা প্রয়োজন, এ যুক্তি মেনে নিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে গড়িমসি করায় পানামা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে।

'আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান' (Organisation of American State) বলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির যে সঙ্ঘ রয়েছে, তার পক্ষ থেকে পাঁচজন পানামা সমস্যা মীমাংসার একটা চেষ্টা করছিলেন। দুই রাষ্ট্রের সঙ্গেই তাঁরা কথা চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা মীমাংসা-প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব খুব সহজ---প্রথম, অবিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এবং দ্বিতীয়, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর ৩০ দিনের মধ্যে উভয় রাষ্ট্র একজন করে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন---তাঁরা খাল-সমস্যা মীমাংসার বিষয়ে আলোচনা চালাবেন।

পানামা এই প্রস্তাব মেনে নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা বর্জন করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসনের বক্তব্য, পানামাতে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, এই প্রস্তাব পানামার রাষ্ট্রপতি রবার্টো এফ চিয়ারির জয় সূচিত করছে---এবং কূটনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় হয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে জনসন মীমাংসা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ---তাঁর মতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্মানজনক।

আসল কথা, দুই রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আসন্ন। মে মাসে পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। খাল-সমস্যার ব্যাপারে চিয়ারির কৃতিত্ব প্রদর্শন নির্বাচনী প্রচার অভিযানের দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। আবার নভেম্বরে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সেখানে জনসনই বা কি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অস্বস্তিকর সমালোচনা নীরবে হজম করেন। তাই পর্যবেক্ষকদের ধারণা, দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হবার পূর্বে খাল-সমস্যা তথা পানামা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

লিণ্ডন বি জনসনের রাষ্ট্রপতিরূপে ১০০ দিন শাসন শেষ হবার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসনের সাফল্য ও অসাফল্যের চুলচেরা বিচার চলছে। বিশেষ করে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদেশিক নীতির দিক থেকে জনসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

* লিণ্ডন জনসন

প্রভাব কমে গেছে, এমন সমালোচনা হয়েছে। ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মার্কিন নীতির বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা সংক্রান্ত নীতিরও সমালোচনা হয়েছে।

সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে মার্কিন নীতির পুনর্বিবেচনা করার জন্য জনসন চেষ্টা করেন। ল্যাটিন আমেরিকার ১৬টি রাষ্ট্রের মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং 'আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের' অধিবেশন আহ্বান করেন।

'আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের' সভায় জনসন স্বীকার করেছেন, ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে 'ভুল ত্রুটি' আছে। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'উন্নতির জন্য আঁতাত' (Alliance for progress) কার্যক্রমকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করা হবে এবং এই অঞ্চলের সকল দেশকে উন্নত করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা হবে। কেনেডির নীতি অনুসরণ করে জনসনও এই কার্যক্রমের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন।

আর একটি বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত কোন ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে নতুন সরকার গঠিত হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বীকার করত না। সংবিধান-বিরোধী পন্থায় সরকার পরিবর্তনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরতর আপত্তি এবং বিদ্রোহী সরকারকে সে সহজে স্বীকৃতি দানের বিরোধী। গত কয়েক বছরে আর্জেণ্টিনা, পেরু, গুয়াতেমালা, ইকুয়েডর, ডোমিনিকান রিপাবলিক, হণ্ডুরাস প্রভৃতি রাষ্ট্রে একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান ও সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে মেনে না নেবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই সব রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এবার তাই বলা হচ্ছে, সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে কোথাও সরকার পরিবর্তন হলেও অবস্থা বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করা হবে। ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি জনসনের নতুন পরামর্শদাতা টমাস ম্যানের পরামর্শমত নাকি এই নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

## কঙ্গো ঃ

চার বছর পূর্বে যখন কঙ্গোকে স্বাধীনতা দান করা হয়, তারপর থেকে বেলজিয়াম সরকারের সঙ্গে কঙ্গো সরকারের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। কঙ্গো থেকে কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শোম্বে যে চেষ্টা করছিলেন, তার পেছনে বেলজিয়ানদের হাত আছে, এমন অভিযোগ কঙ্গো সরকার করেছে।

তবু কঙ্গো ও বেলজিয়ামের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। বেলজিয়ানদের দিক থেকে, এখনও কঙ্গোতে ৬০,০০০ বেলজিয়ান রয়েছে (স্বাধীনতার পূর্বে ছিল এক লক্ষ), এবং কঙ্গোর বিভিন্ন শিল্প, বিশেষ করে খনিতে বেলজিয়ান মূলধন রয়েছে। অপরদিকে, কঙ্গোর সরকারী ঋণের একাংশ বেলজিয়াম সরকারের গ্রহণ করার কথা এবং কঙ্গোর খনি শিল্পে, বিশেষ করে বিখ্যাত 'ইউনিয়ন মিনিয়েরের' কর্তৃত্ব নিয়ে বেলজিয়ান কোম্পানী ও কঙ্গো সরকারের দ্বন্দ্ব মীমাংসারও প্রয়োজন। তাছাড়াও রয়েছে, কঙ্গোর শাসন ও সৈন্য পরিচালনায় বেলজিয়ানদের ব্যবহারের প্রশ্ন। আর তিন মাসের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যদল কঙ্গো ত্যাগ করবে। তাই একটা মীমাংসা প্রয়োজন।

* কঙ্গোবাসীদের সঙ্গে পল হেনরী স্পাক (চশমা পরিহিত)

গত সপ্তাহে বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরী স্পাক কঙ্গো এসেছিলেন। বেলজিয়ান শাসন অবসানের পর এই প্রথম একজন মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তি কঙ্গো এলেন। স্পাক সর্বত্রই ভাল সম্বর্ধনা পেয়েছেন। কোথাও কঙ্গোবাসীদের বেলজিয়ান-বিদ্বেষ প্রকাশ পায় নি। অবশ্য স্পাক কঙ্গোর কেন্দ্রীয় শাসন, অর্থাৎ সিরিন আডুলার সরকারকে বরাবর সমর্থন করেছেন এবং বেলজিয়ামের যাঁরা শোম্বেকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন, তিনি তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। ময়সে শোম্বের নেতৃত্বে হীরক খনি-প্রধান কাসাই প্রদেশ নিয়ে কাটাঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টার পেছনে বেলজিয়ানদের হাত ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৈন্যবাহিনীর চেষ্টায় এই চক্রান্ত সফল হয় নি। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আডুলা বেলজিয়ানদের ওপরে খুবই খাপ্পা হয়েছিলেন। তবে পরবর্তীকালে বেলজিয়াম সরকারের সংযত আচরণ ও আপোষ-মীমাংসার চেষ্টার ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বিশেষ করে স্পাকের মত উদারপন্থী রাজনীতিক ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কূটনীতিকের চেষ্টার ফলে মীমাংসার পথ সুগম হয়েছে।

স্পাকের চেষ্টায় কঙ্গোর সঙ্গে বেলজিয়ামের একটা মোটামুটি মীমাংসাও হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর লিওপোল্ডভিলে ঘোষণা করা হয়েছে: (১) 'ইউনিয়ন মিনিয়েরে' কঙ্গো সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে—ভবিষ্যৎ মালিকানার বিষয় পরে স্থির করা হবে; (২) সরকারী ঋণের কিছুটা বেলজিয়াম সরকার দেবে, বাকি অংশ কঙ্গো সরকার বহন করবে; (৩) কঙ্গোর উন্নতির জন্য, বিশেষ করে কুটিরশিল্পের জন্য বেলজিয়াম ঋণ দেবে এবং (৪) কঙ্গোর পঁয়ত্রিশ হাজারী সৈন্যদলে ১৫০ জন বেলজিয়ান অফিসার থাকবে।

লিওপোল্ডভিলের সংবাদপত্রগুলি এই মীমাংসা-প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে এবং আগামী দিনের কঙ্গো-বেলজিয়াম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে গভীর আশা প্রকাশ করেছে।

## কম্বোডিয়া ঃ

কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ও ফ্রান্সের

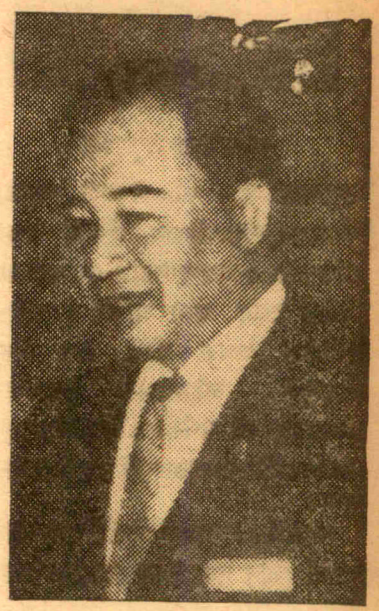

* প্রিন্স সিহানুক

রাষ্ট্রপতি দ্য গলের কাছে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের অভিযোগ করে চিঠি পাঠিয়েছেন।

কয়েকদিন পূর্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিমানবাহিনী থেকে কম্বোডিয়ার গ্রাম চানত্রিয়ায় বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং এতে ১৬ জন নিহত হয়। কম্বোডিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সীমান্ত থেকে চানত্রিয়া কম্বোডিয়ার ৪ মাইল অভ্যন্তরে। সুতরাং এই হামলা নিশ্চিতভাবে পররাষ্ট্র আক্রমণ এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পশ্চাতে এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে। সিহানুক

* নিকিতা ক্রুশ্চেভ

ক্রুশ্চেভ ও দ্য গলকে অনুরোধ করেছেন, কম্বোডিয়ার সীমান্ত রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবার ব্যাপারে এক সম্মেলনে মিলিত হবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ওপর তাঁরা চাপ দিন। সিহানুক রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্টকেও চিঠি দিয়েছেন, এই বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের জন্য।

কম্বোডিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সম্পর্ক ভাল নয়, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ আছে এবং নিরপেক্ষতাবাদী কম্বোডিয়া ও মার্কিন প্রভাবাধীন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশংকাও রয়েছে, তথাপি চানত্রিয়ার ঘটনা নিয়ে সিহানুক একটু বাড়াবাড়ি করছেন মনে হয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম স্বীকার করেছে, তাদের অন্যায় হয়েছে। এর জন্য তারা ক্ষমা চেয়েছে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, মানচিত্র ঠিকভাবে বুঝতে না পারার জন্যই এই ব্যাপার ঘটেছে—ভিয়েৎকং গেরিলা বাহিনীকে তাড়া করতে গিয়ে ভুল করে তারা চানত্রিয়ায় বোমা ফেলেছে। চানত্রিয়া অঞ্চলকে তারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছে।

কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে যে সব সীমান্ত বিরোধ রয়েছে, তার মীমাংসার জন্য কম্বোডিয়ার রাজধানী নম্‌পেনে বর্তমানে দুই দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা চলছে। চানত্রিয়ার ঘটনা এই আলোচনাকে নষ্ট করবে না বলেই পর্যবেক্ষকরা আশা করছেন।

## চীন ঃ

রুমানিয়া প্রতিনিধি দল চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেকার মতবিরোধের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করছিলেন বলে যাঁরা আশা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন।

রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী আইয়ন মরের-এর চীন সফর শেষ করে উত্তর কোরিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। চীনে মাও-সে-তুং ও লি-শাও-চি'র সঙ্গে আলোচনা করলেও মরের কোন সাড়া পান নি বলেই মনে হচ্ছে। চীন সফরের শেষে উভয় প্রতিনিধি দলের যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তার ভাষাও ছিল নিতান্ত মামুলি।

মরের-এর চীন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে

* মাও-সে-তুং

'বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিভেদপন্থী' বলে আক্রমণ করে পিকিং রেডিও আবার তীব্র সমালোচনা সুরু করেছে।

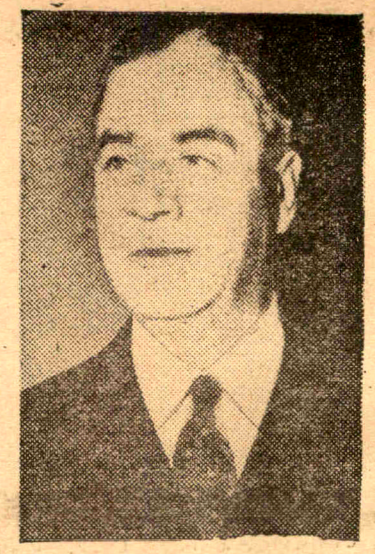

* আইয়ন মরের

কৃষ্ণ সাগরের তীরে গাগরীতে মরের ক্রুশ্চেভ, মিকোয়ান প্রভৃতির সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তার সুর পিকিং-এর চেয়ে অনেক বেশি হৃদ্যতাপূর্ণ।

তবে কি, চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্ব মীমাংসায় ব্যর্থ হয়ে রুমানিয়া পুরোপুরি সোভিয়েটকে সমর্থন করবে? চীন-সোভিয়েট বিরোধ কি আরও তীব্র হবে?

## বৃটেন :

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে উপলক্ষ করে বৃটেনে আবার বর্ণবৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শ্রমিক অধ্যুষিত বার্মিংহামের উপকণ্ঠে স্মেথউইক নির্বাচন কেন্দ্রে রক্ষণশীল দলের প্রার্থী পিটার গ্রিফিথ্‌স্ ভোটদাতাদের উদ্দেশ্য করে নাকি বলেছেন, 'যদি 'নিগারদের' সঙ্গে প্রতিবেশী হয়ে থাকতে চান তো শ্রমিক দলকে ভোট দিন।' অর্থাৎ কৃষ্ণকায় লোকদের বিরুদ্ধে শ্বেতকায় ইংরেজদের উত্তেজিত করে রক্ষণশীল দল ভোটে জয়লাভ করতে চায়।

গ্রিফিথ্‌স্ এরূপ মন্তব্য করেন নি বললেও, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে

বৃটেনের নির্বাচনী রাজনীতির আসর গরম হয়েছে। শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন তীব্র ভাষায় এই মনোভাবের সমালোচনা করেছেন।

বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ ভারতীয়, পাকিস্তানী, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজবাসী ও অন্যান্য কৃষ্ণকায় লোক বৃটেনে বাস করে। প্রগতিশীল ইংরেজরা সমাজ-জীবনে এদের সঙ্গে এক হয়ে বাস করতে চাইলেও, অনেকের কাছেই যে এরা অসহ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অধিকাংশই শ্রমিক। তাই এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল দল খুব চাতুর্যের সঙ্গে শ্রমিক দলের ওপর টেক্কা মারার চেষ্টা করছে। স্মেথউইক কেন্দ্রটি ১৯৪৫ সাল থেকে বরাবর শ্রমিক দলের দখলে। এবার বর্ণবৈষম্যের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে রক্ষণশীল দল যদি জিততে পারে!

ভারতে নানাভাবে নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার আমরা দেখেছি, তাই নির্বাচনকালে এরূপ উত্তেজক প্রশ্ন যে সর্বনাশা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। দেখা যাক, বৃটেনে এবার কি হয়।

## পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করার জন্য সরকার-নিযুক্ত 'ভোটাধিকার কমিশনের' সুপারিশ আয়ুব সরকার অগ্রাহ্য করার পর থেকে সর্বত্র এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জন-সাধারণ, বিশেষ করে ছাত্র-সমাজ সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ, আর অপরদিকে আয়ুব সরকার যে-ভাবে হোক একে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

আয়ুব এমন কথাও বলেছেন, ইসলামে বিরোধী দলের স্থান নেই।

* হ্যারল্ড উইলসন

যারা সরকারের বিরোধিতা করছে, তারা কাফের। কিন্তু এতে কেউ বিভ্রান্ত হয় নি। আন্দোলন দমনের জন্য সর্বপ্রকার দমননীতির আশ্রয় আয়ুব সরকার গ্রহণ করেছেন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে, হরতাল হয়েছে, ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে, সমাবর্তন বয়কট হয়েছে এবং সর্বত্র কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়েছে। জনসাধারণের সকল অংশ এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। সরকার ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে, শত শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, আতাউর রহমানের মত নেতার ওপর রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, বহু ছাত্রকে 'রাষ্টিকেট' করেছে এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এত করেও এই আন্দোলন দমনের সাধ্য কারও নেই।

## সিংহল ঃ

বেলগ্রেড ধরণের জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব সুরু হয়েছে। সম্মেলনের মূল আহ্বায়ক যুগোশ্লাভিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সিংহলের আহ্বানে ২৩শে মার্চ কলম্বোতে যোগ-দানকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনে ঠিক হয়েছে, কায়রোতে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ৭০টি রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হবে। অ্যাঙ্গোলার মত যারা এখনও স্বাধীনতা পায় নি, তাদেরও ডাকা হবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ছাড়া, নিরস্ত্রীকরণ, ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবৈষম্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে মনে হয়। মূল সম্মেলনের আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে একটি সম্মেলন বসার কথা আছে।

বান্দুং ধরণের এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের চেয়ে এই জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে।

* শ্রীমতী বন্দরনায়ক

এদিক থেকে চীন, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক পরাজয় হল।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

**কবিকঙ্কণ চণ্ডী**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক

মূল্য—সাড়ে চার টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিঃ**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

# নবজগৎ

## রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের দৃষ্টভঙ্গী

প্রতীক্ষিত রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের এখনো হয় নি। তা সত্ত্বেও সামগ্রিক ফলাফল দেখে বিচার পদ্ধতি ও বিচারের মান সম্পর্কে এবারও আমরা উৎসাহিত হতে পারলাম না। এই বিচার যতটা শিল্পভিত্তিক তার চেয়ে বেশি ব্যবসায়ভিত্তিক; অথবা কোন নির্দিষ্ট মানহীন এরূপ মনে করার অবকাশ রয়েছে। যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন তাঁরা এতে উৎসাহিত হবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের অবশ্য একটি ছবি সর্বভারতীয় এবং তিনটি ছবি আঞ্চলিক পুরস্কার লাভ করায় এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত দুটি ছবির স্বীকৃতিতে একক শিল্পী হিসেবে তিনিও সম্মানিত হওয়ায় আমাদের আনন্দের কথা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্পদৃষ্টিতে বিচার ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশের সহায়ক নয়।

—সুজন।

## চিত্র আলোচনা

### কয়েকটি চিরায়ত চলচ্চিত্র

২রা থেকে ২০শে মার্চ আটটি চিরায়ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি এক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আটদিনে সমিতির সদস্যরা কয়েকটি দুর্লভ-দর্শন ছবি দেখবার সুযোগ পেলেন। এই আটটি ছবির মধ্যে চারটি জার্মানীর, তিনটি ফরাসীর ও একটি সোভিয়েট ইউনিয়নের। চিত্র-স্রষ্টাদের মধ্যে দর্শকরা যাঁদের সৃষ্টি দেখলেন, তাঁরা হলেন—রবার্ট উইন, এফ ডবলিউ মারনো, আইজেনষ্টাইন, ফ্রিৎজলাঙ, থিওডর ড্রেয়ার, রেনে ক্লেয়ার, স্টার্নবার্গ। ছটি নির্বাক, দুটি সবাক ছবি। অতীতের সৃষ্টি-কর্মের সাথে বর্তমান কালের দর্শকের এই যে পরিচয় তা রীতিমত বিস্ময় ও রোমাঞ্চের ব্যাপার।

এই ক'টি ছবির মাধ্যমেই ধারণা জন্মে যে, নির্বাক যুগের অগ্রগামী স্রষ্টাদের ছবি শিল্পমূল্যের ও বক্তব্যের দিক থেকে আজো অপরাজেয়। ছবি দেখতে বসে বারবারই মনে হয়েছে শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে একালের স্রষ্টারা এমন কি বেশিদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন? অন্তত ভাবধারার দিক থেকে আমাদের কালের স্রষ্টারা যে এগিয়ে নেই একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তার একটি কারণ বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ী পণ্যরূপে নির্মিত হচ্ছে। সেকালের স্রষ্টারা অর্থের চেয়ে কীর্তিকে বড় মনে করতেন এবং যাঁরা কীর্তিমান বলে স্বীকৃত লাভ করেছেন তাঁরা প্রগতি-শীল আদর্শবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে জীবনের সামনে যদি আদর্শ না থাকে, সমাজসচেতন মন ও রাজনৈতিক পর্যালোচনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে, তবে স্রষ্টার সম্মান পাওয়া যায় না। বাজারের জন্য পণ্য তৈরি করা যায় মাত্র। চলচ্চিত্রকে এভাবে পশারিণী সাজাবার ফলে আজ অসংখ্য চিত্রপরিচালকের উদয় হয়েছে, কিন্তু স্রষ্টার সংখ্যা নিতান্তই কম।

* * *

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি 'ক্যাবিনেট অব ডাঃ কালিগরি'। ১৯১৮ সালে নির্মিত এই জার্মান ছবিতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানীর অরাজক ও উন্মত্ত অবস্থা একটা প্রতীক গল্পের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। মেলায় ডাঃ কালিগরির সম্মোহক কার্য ও অন্তরালে বীভৎস ঘটনায় কাহিনীর সুরু; ডাঃ কালিগরির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অর্থাৎ কাহিনী

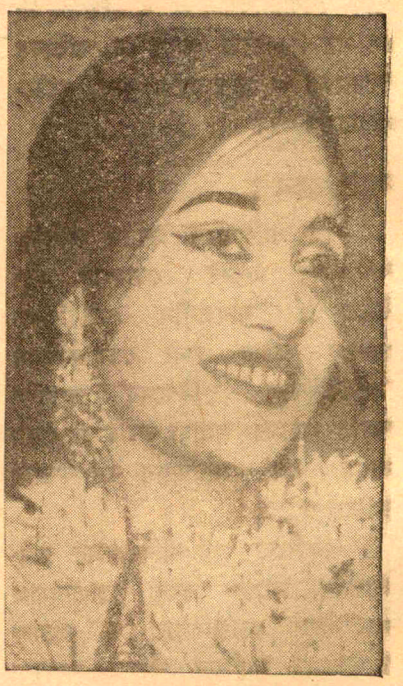

সুচিত্রা সেন

বর্ণনাকারী ফ্রান্সিস কর্তৃক কালিগরিকে চিনতে পারায় কাহিনী শেষ। ছবিটিতে তৎকালীন জার্মানীর অস্থির অবস্থা, এক মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা

নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মত নাৎসীবাদের আত্মপ্রকাশ এবং স্বপ্নচারী সীজারের মধ্যে হিটলারের ব্রাউন সার্টবাহীকে যেন প্রতীকের মধ্যে দেখা যায়। চিত্রনাট্যকার ফার্লমায়ার ও হান্স্ জানোউৎজ এবং পরিচালক রবার্ট উইন গভীর দূরদৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্বক্তার মত অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বর্তমান কালের ফটোগ্রাফীর কলাকৌশল নৈপুণ্যের দিক থেকে বিচার করলে ছবিটি মঞ্চানুরূপ এবং অভিনয় প্রধান। কিন্তু দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্য কারো দৃষ্টি এড়ায় না।

* * *

আইজেনষ্টাইনের 'ব্যাটলসিপ পটেমকীন' বহু আলোচিত ছবি। ১৯২৫ সালে নির্মিত এই ছবির মত আর কোন ছবি পৃথিবীতে এত আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। এই ছবি ভাবধারার দিক থেকে যেমন বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তেমনি চলচ্চিত্র জগতেও বিপ্লব এনেছে। মন্তাজ, সম্পাদনা এবং সময় মূল্য সম্পর্কে আইজেনষ্টাইনের তত্ত্ব এখানে চলচ্চিত্রকে নতুন ভাষা এবং নতুন এক শিল্পমাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ছবিটির নির্মাণ পর্ব আরম্ভ হয়েছিল ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে। বিরাট ইতিহাসের মধ্য থেকে আইজেনষ্টাইন কেবলমাত্র রণতরী পটেমকীনের বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোট একটি ছবির মধ্যে ১৯০৫ সালের রাশিয়ার অন্তরের ছবি তুলে ধরলেন। এই একটিমাত্র ছবির জন্য আইজেনষ্টাইন চলচ্চিত্র জগতে অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর ছবিও চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। 'ব্যাটলসিপ পটেমকীন' সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে স্বীকৃত।

* * *

জার্মান পরিচালক ফ্রিৎজলাঙ 'মেট্রোপলিস' ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন ১৯২৭ সালে। এখানে তিনি ধনতান্ত্রিক বিকাশের রূপ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, ধনতন্ত্রের সেবায় বিজ্ঞানের দাসত্ব ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরেছেন বিজ্ঞান কাহিনীর ধরণে। লাঙ-এর শ্রেণী সমন্বয়ের চিন্তাধারা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় না হলেও সিনেমার অপরিণতকালে ছবিটিতে যেভাবে বিরাট পরিধিতে দৃশ্যসৃষ্টি, রবোট কল্পনা, আত্মবিক্রিত বিজ্ঞানীর ভূমিকা দেখানো হয়েছে তাতে পরিচালকের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাক্ষমতা ফুটে উঠেছে। জার্মানীর পরবর্তীকালের ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে বিচার করলে এই দূরদৃষ্টি বিস্ময়কর।

* * *

ফ্রান্সের চিত্রস্রষ্টা কার্ল থিওডর ড্রেয়ারের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'দি প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক'। ছবিটির নির্মাণকাল ১৯২৮ সাল। এখানে জোয়ানের সংগ্রামের অংশ দেখানো হয় নি। কেবলমাত্র বন্দী অবস্থায় বিচার দৃশ্য, জোয়ানের ওপর নির্যাতন, জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা এবং জনগণের প্রতিক্রিয়াতে ছবিটি সীমাবদ্ধ। জোয়ান এখানে সাধারণ সরল যৌন আকর্ষণহীনা কৃষক নারী। বিশ্বাসে অবিচল। গ্রীক চিত্রকলার পদ্ধতিতে চরিত্রগুলির মুখের ক্লোজ আপ শটে তাদের মনের অবস্থা প্রতিফলিত। সর্বক্ষণ ক্লোজশটে জোয়ান দর্শকদের মনের গভীরে রেখাপাত করে। পক্ষান্তরে বিচারক ধর্মযাজকদের মুখোস উদ্‌ঘাটন করে, তাদের শঠতা, ভীরুতা দর্শকমনে বিরক্তি উৎপাদন করে। জোয়ানের ভূমিকায় শ্রীমতী ফালকোনেটির অভিনয়ের তুলনা হয় না।

* * *

সমসাময়িককালে (১৯২৭) ফরাসী দেশের আর এক প্রতিভা রেনে ক্লেয়ারের সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় পেলাম 'দি ইতালিয়ান ষ্ট্র হ্যাট' এবং 'লে মিলিয়ন' (১৯৩১) ছবিতে। রেনে ক্লেয়ার যে চার্লি চ্যাপলিনের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর ছবিতে তার পরিচয় রয়েছে। চ্যাপলিন যেমন অত্যন্ত সমাজসচেতন এবং সমাজের মূল ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করার দক্ষতায় শক্তিমান, রেনে ক্লেয়ারও সেই গুণের অধিকারী। 'দি ইতালিয়ান ষ্ট্র হ্যাট' ছবিতে একদিকে নায়কের বিয়ে অন্যদিকে এক মহিলার জন্য টুপী সংগ্রহ

● 'প্যাশন অব দি জোয়ান অব আর্ক' ছবির একটি দৃশ্য।

● 'ক্যাবিনেট অব ডাঃ কালিগরি' ছবির একটি দৃশ্য।

করার ঘটনার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের নানা দিকের প্রতি অনাবিল হাস্যরসে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিটি সবাক চিত্রের প্রারম্ভিক যুগের ছবি। বুর্জোয়া সভ্যতার ভণ্ডামীর প্রতি কশাঘাতে এই ছবি কৌতুকমুখর। শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে রেনে ক্লেয়ারের শিল্পসম্মত জ্ঞানের উপলব্ধি এই ছবিতে লাভ করা যায়।

* * *

১৯৩১ সালে আর একজন জার্মান পরিচালকের সার্থক সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় 'দি ব্লু এঞ্জেল' ছবিতে। ছবিটি সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগায়, এই ছবির গান 'ফলিং ইন লাভ এগেন' সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক নাইট ক্লাবের নর্তকী-গায়িকা আর এক অধ্যাপকের প্রেমকে নিয়ে কাহিনী। এই দুটি চরিত্র মার্লিন ডায়েট্রিস এবং এমিল জেনিংস অনন্যসাধারণ অভিনয়ে তেত্রিশ বছর কালের অধিক তিন পুরুষের দর্শকচিত্ত জয় করে রয়েছেন।

এই ছবির প্রতিভাবান পরিচালক জে ভি স্টার্নবার্গ। এখানে প্রতীক এবং শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত অর্থ-পূর্ণ। অধ্যাপককে নর্তকীর সাজঘরের দিকে দেখা যায় জালে আটকে পড়ছে। অধ্যাপক রক্ষণশীল রীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু বন্দী হয়ে পড়ে আরো জটিল ও হীনতম পরিবেশের দাসত্বে। সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করলো তখন সে নিঃশেষপ্রায়।

এই চিরায়ত চিত্রগুচ্ছে নির্বাক যুগের শেষ অধ্যায়ে এবং সবাক যুগের প্রারম্ভে চিত্রস্রষ্টাদের চিন্তাধারা এবং কলাকৌশলের বিকাশের নিদর্শন দেখা গেছে। যে ছবিগুলির জন্য আজ চল্লিশ বছর পরেও দর্শকদের আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু এই অধিবেশনে চিরায়ত চিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি। গ্রিফিথ, ডবঝেঙ্কো, চ্যাপলিন সহ ধারানুক্রমিক বিকাশ দেখাতে পারলে চিরায়ত চিত্র প্রদর্শন সার্থক হতো।

## সুইডেনের চলচ্চিত্র প্রদর্শন

২৭শে মার্চ নিউ এম্পায়ার সিনেমায় সুইডেনের চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন ডাঃ ত্রিগুণা সেন। সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এবং সুইডেনের বাণিজ্য প্রতিনিধির যুগ্ম উদ্যোগে এই উৎসবে চারটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

সুইডেনের চলচ্চিত্র ইতিহাস তাৎপর্যপূর্ণ। সংখ্যার দিক থেকে অল্প হলেও, শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে সুইডিস ছবি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে ভিক্টর সোসট্রম এবং মরিস স্টিলার ছবির স্বতন্ত্র শিল্প মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, চলচ্চিত্র কেবল জনমনোরঞ্জনের সস্তা উপাদান নয়। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, শিক্ষা ও অভিনয়ের সাথে দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয়মলক একটি নবগঠিত শিল্প—চলচ্চিত্র।

এই দুজনের পরে সুইডিস চলচ্চিত্রে নবজীবনের সঞ্চার করেন ইঙ্গমার বার্গম্যান। বার্গম্যানের

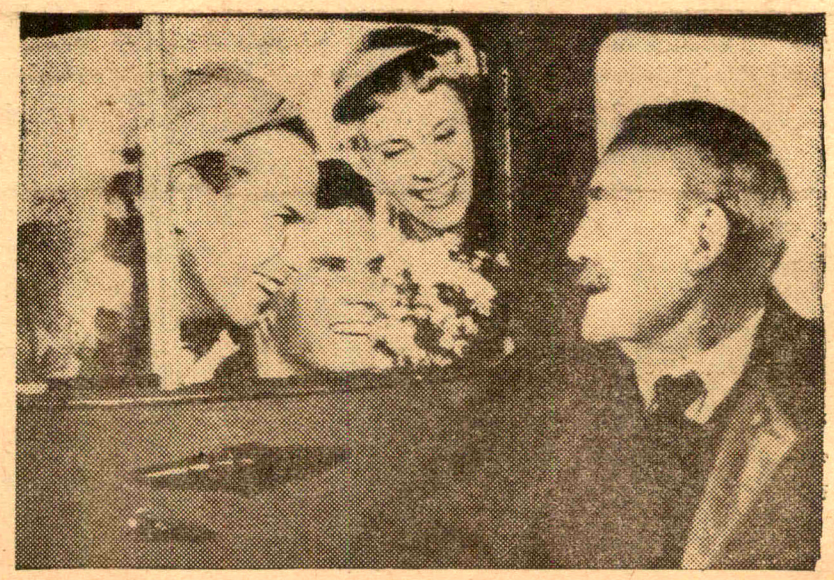

● ইঙ্গমার বার্গম্যান পরিচালিত 'ওয়াইল্ড ষ্ট্রবেরি' ছবির একটি দৃশ্য।

'সেভেনথ সীল'। স্মাইলস্ অব এ সামার নাইট', 'দি ভার্জিন স্প্রিং', 'এজ ইন এ মিরর' প্রভৃতি গভীর অন্তরদর্শী ছবি। ইঙ্গমার বার্গম্যানের পরে নবাগত পরিচালকদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছেন, একম্যান, মাটসন, ওয়ার্নার, জেনে ন, ফ টম্যান, আর্নে সাক্সডর্ফ। সাক্সডর্ফ ভারতে থেকে মুরিয়া উপজাতিদের নিয়ে চিত্র নির্মাণ করেছেন 'ফ ুট এ্যাণ্ড দি এ্যারো।'

সুইডেনের ছবির নিজস্ব রীতি ও বক্তব্য রয়েছে। অভিনয় রীতিতেও এঁরা নতুনে র দাব করেন। গত ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় এই রীতি গড়ে উঠেছে। প্রদর্শিত চারটি সুইডিস ছবি সম্পর্কে আমরা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো।

### এবারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবার (স্বর্ণপদক) লাভ করেছে হিন্দী ছবি 'শেহর আউর স্বপ্না'। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কমিটীর বিবেচনায় ১৯৬৩ সালে নির্মিত ভারতীয় ছবির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ ছবি। শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে নির্বাচিত 'শেহর আউর স্বপ্না'র প্রযোজক ২০ হাজার টাকা এবং পরিচালক ৫ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাবেন। তেলেগু ছবি 'নর্তনশালা' দ্বিতীয় এবং বাংলা 'মহা-নগর' তৃতীয় ছবি বলে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ছবির প্রযোজক ১০ হাজার এবং পরিচালক আড়াই হাজার টাকা নগদ পাবেন। তৃতীয় ছবি 'মহানগর' সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করবে মাত্র। শিশু চলচ্চিত্র 'পাঁচ পুতলিয়া' (হিন্দী) সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে।

আঞ্চলিক পুরস্কার লাভ করেছে 'উত্তর ফাল্গুনী' (বাংলা), 'বন্দিনী' (হিন্দী), 'মনিরাম দেওয়ান' (অসমিয়া), 'জীবন-সাথী' (উড়িয়া)। এই ছবিগুলি রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করবে। এছাড়া সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করবে— 'মেরে মেহবুব', 'সাতপাকে বাঁধা', 'জতুগৃহ' ও 'নারী' (ওড়িয়া)।

তথ্যচিত্রের মধ্যে 'সঙ অব দ্যে রাষ্ট্রপতির পরস্কার লাভ করেছে। শিক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছে 'ইণ্ডিয়ান ওসেন এক্সপিে শন'। স্বর্ণপদক লাভের জন্য কান ছবি যোগ্য বিবেচিত হয় নি।

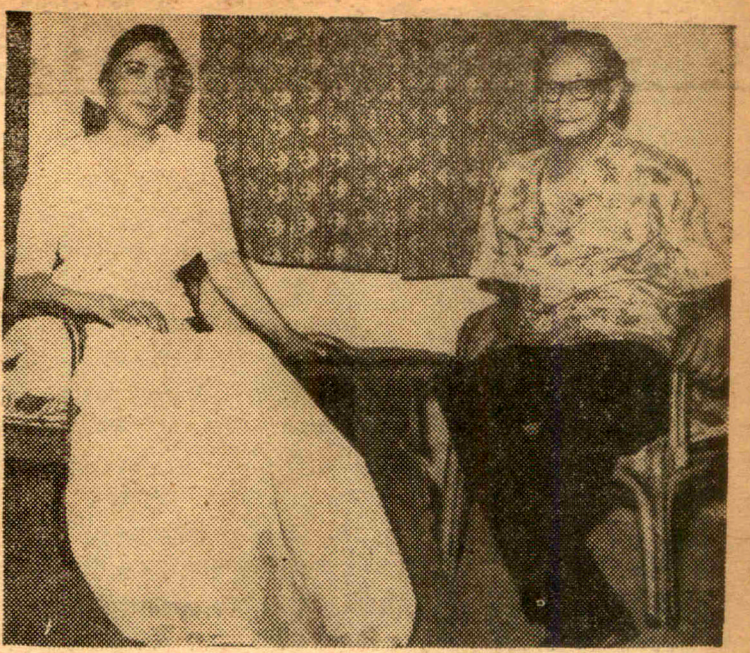

● 'নিশাচর' নাটকে ললিতা ও পরেশের ভূমিকায় যথাক্রমে দীপান্বিতা রায় ও তরুণ রায়।

### লোক ও নাটকের নবতম প্রয়াস

'লোক ও নাটক' আগামী ১৫ই এপ্রিল থিয়েটার সেণ্টার হলে শ্রীনীহার গুণ রচিত সাম্প্রদায়িক কলহকে কেন্দ্র করে একটি নতুন নাটক 'সূর্য-প্রতীক্ষা' মঞ্চস্থ করছে। নাটকটি পরিচালনা করবেন : শ্রীঅহীন্দ্র ভৌমিক।

## নাটকের কথা

### থিয়েটার সেণ্টারের নতুন নাটক নিশাচর

বাংলার রঙ্গমঞ্চে নতুন আঙ্গিকে নাটক প্রযোজনায় মুখোস নাট্য-গোষ্ঠী নাট্যরসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এঁদের নতুন নাটক 'নিশাচর' আর একটি নতুন সংযো-জনা। 'এক পেয়ালা কফি'র পর নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর এই রহস্য নাটক তাঁর কল্পনা ও চরিত্র চিত্রন শক্তির আর একটি পরিচয়রূপে অভি-নন্দনীয়। গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে বিদেশে বহু নাটক সাফল্যলাভ করেছে, আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে 'নিশাচর' একটি অনাস্বাদিত স্বাদের পরিবেশক। থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে এই নাটকটি দেখার সুযোগ সেদিন আমাদের হয়েছে। একটি রহস্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাট্যকার যে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, চরিত্রগুলি যেভাবে রহস্যজাল বিস্তার করেছে, তাতে সারাক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে গভীর উৎকণ্ঠা জেগে থাকে। রোমাঞ্চকর নাটক হিসেবে 'নিশাচর' এদিক থেকে সার্থক নাটক। এই সার্থকতার মূলে যে পরিচালকের ক্ষমতা অনেকখানি সেকথা বলা বাহুল্য। চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি এবং তার সঙ্গে শব্দ ও আলোর সমন্বয়ে যে ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নাটকটি বাস্তবিকই উপভোগ্য।

অভিনয়ে যাঁরা সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তরুণ রায় (পরেশ), পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় (প্রফেসর), অরুণ চট্টো-পাধ্যায় (রাধু), অনুকূল দত্ত (জগবন্ধু) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ললিতার চরিত্রে দীপান্বিতা রায়ের অসাধারণ অভিনয় আর একবার প্রমাণ করলো, তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠা অভি-নেত্রীদের অন্যতমা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সমরেশ চক্রবর্তী, প্রণত ঘোষ, বিভাস মুখার্জী, সনৎ দে। আলোক সম্পাত, শব্দ ও আবহসঙ্গীতের কাজ নৈপুণ্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন যথাক্রমে বিমল দাস, দীপক দত্ত ও শশাঙ্ক ঠাকুর। 'নিশাচর' থিয়েটার সেণ্টারে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে।

নব পর্যায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' ২৬শে মার্চ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। যে দেশে সাহিত্য পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু প্রায় কাছাকাছি ঘটনা, সে দেশে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার এক বছরের নিরুপদ্রব শৈশব, আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তা মনে করি না। কারণ, যে অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতাকে ভিত্তি করে পত্র-পত্রিকার রুগ্ন জন্ম সচরাচর দেখা যায়, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার তালিকার মধ্যে পড়ে না। পত্রিকার জন্ম, কেবল ব্যবসার প্রয়োজনে নয়—তার ব্যবসার দিক থাকতে পারে, কিন্তু আসল প্রয়োজন জাতির। যে পত্রিকার ভিত্তিভূমিতে এমনি কোন আদর্শের, এমনি কোন কল্যাণবোধের শক্ত গাঁথুনি নেই—সে পত্রিকা যতই উজ্জ্বল হ'ক, তার প্রচার সংখ্যা যতই দিগন্তপ্রসারী হ'ক, তবু দেশের বৃহত্তর মানবসমাজের তাতে কিছু যায় আসে না। আনন্দের বিষয়, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' স্বরূপ দুর্বল, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গীর অল্প পরিসরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। কাজেই এই 'সাপ্তাহিকের' এক বৎসরের সুস্থ জীবনের মধ্যে, কোন বিস্ময় নেই। যেহেতু আদর্শ এবং কল্যাণবোধ এই পত্রিকার দীর্ঘজীবনযাত্রার পথে পাথেয় হয়ে আছে।

### সাপ্তাহিক বসুমতীর চরিত্র

বাংলা দেশে যে কটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র স্থান তার মধ্যে স্বতন্ত্র। এই সাপ্তাহিক কেবল সাহিত্য নিয়ে নয়, সংবাদ নিয়েও। বর্তমানে আমাদের চেনা-শোনা পরিবেশের মধ্যে এই ধরণের সাপ্তাহিক পত্রিকা আর নেই। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাহিত্যের ভাগ পুরোপুরি থাকে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সাহিত্য এবং সংবাদকে সমান স্থান দিয়েছে। মুদ্রণের কথা ছেড়ে দিলে, সম্পাদনা এবং বিভিন্ন 'ফীচার' ও গ্রন্থমেলার জন্য পত্রিকাটি স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে। বর্তমান কোন পত্রিকায় নিরপেক্ষভাবে গ্রন্থ সমালোচনা হয় না। গোষ্ঠীভুক্ত লেখক না হলে তাকে জবাই করার এক প্রকার নীচতা, বর্তমান সাহিত্য সমালোচনার বাজারে দৃষ্টিকটুভাবে প্রবল। তাছাড়া সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার অন্যতম মাধ্যমও হল, এই সব সমালোচনার সুযোগ। প্রয়োজনবোধে কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হয়—কিন্তু সেখানেও সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারকের আসনে বসা উচিত। বস্তুত এইরূপ বিচারক-সমালোচকের মান আজকাল ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সমালোচনা বিভাগ সেদিক থেকে সত্যিই প্রশংসনীয়।

### সম্পাদকের দায়িত্ব

সম্পাদকের প্রথম যোগ্যতা চাই লেখা চেনার, দ্বিতীয় যোগ্যতা চাই—লেখক তৈরি করার। অবশ্য দু'টি বিষয়ই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। লেখা চেনার ক্ষমতা থাকলে নতুন লেখকের আবির্ভাব সহজতর হয়। প্রতিষ্ঠিত লেখকরা চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না এবং চিরকাল তাঁদের বেঁচে থাকারও কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই নতুন লেখকদের আবির্ভাবকে সুস্পষ্ট করা এবং তাঁদের লেখার সুযোগকে সহজসাধ্য করা সম্পাদকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তব্য। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যোগ্যতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছে। পূজো সংখ্যার বিরক্তিকর ভীড়ের মধ্যে, যিনি এই সাপ্তাহিক পূজো সংখ্যাটি লক্ষ্য করেছেন তিনি এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র যে কোন সংখ্যা খুললেই প্রায়ই একজন না একজন নতুন লেখকের নাম চোখে পড়বে। অধিকাংশ সাপ্তাহিক নাকি নতুন লেখকের লেখা পড়া ত' দূরের কথা খামটাও খোলেন না। এ প্রয়োজনীয়তাও তাঁদের নেই। কারণ পুরনো প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরই ভীড় সামলানো দায়। কিন্তু সম্পাদকের কর্তব্য তা হওয়া উচিত নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, নতুন লেখক তৈরি করা সম্পাদকীয় কর্তব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এদিক থেকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করে।

### সামগ্রিক সাফল্য

একমাত্র পূজো সংখ্যার কথা ছেড়ে দিলে, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার এক বছরের জীবনে আশাতীত বা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে—একথা মনে করলে ভুল বলা হবে। আমি তার স্বাতন্ত্র্য, তার চরিত্র, তার উদারতা ও নিরপেক্ষতা—সম্পাদনার যোগ্যতার কথা আলোচনা করেছি এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তার সাফল্যের কথা বলেছি, কিন্তু এই সবকিছু মিলেও পত্রিকাকে উন্নত শ্রেণীর মর্যাদা দেবে, তার কোন মানে নেই। তার জন্য প্রয়োজন আরও কিছু বিষয়ের যেমন প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা। কোন একটি পত্রিকার প্রসার ও সাফল্য, অন্যান্য বিষয়ের মত এই দু'টি বিষয়ের উপরেও নির্ভরশীল। পত্রিকার পাঠক হিসেবে এই বিষয় দু'টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। কাজেই, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এখনো যদি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে না পেরে থাকে তাহলে তার কারণ কি, অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

পাঠক হিসেবে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র এক বছরের জীবনে যা আমরা পেয়েছি এবং সম্পাদনা বিষয়ে আমাদের যে ধারণা ও বিশ্বাস আছে তার প্রতিফলন পত্রিকার জীবনে কতটুকু হয়েছে—আমাদের এই মূল্যায়নের মধ্যে তারই উল্লেখ থাকল। আমি বলতে চাই—'সাপ্তাহিক বসুমতী' আজকের দিনে একটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পত্রিকা, যে প্রতিশ্রুতি তার শৈশবের নানান ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত। বৃহত্তর পাঠক-সমাজের এবং লেখক-সমাজের কাছে, এই লাভটুকুর মূল্যও কম নয়।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য বাংলা দেশ নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে থাকবে।

এই প্রতীক্ষা সফল হ'ক।

—সুরজিৎ বাগচি
অধ্যাপক, তমলুক কলেজ।

# সংবাদ বিচিত্রা

### ভিক্ষার চাল

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের প্রায় চার হাজার ভিখারীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের দিকে নজর রেখে ভিক্ষার মান উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে।

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে উত্তর প্রদেশের ভিখারীদের দু' নয়া পয়সার কমে ভিক্ষা নিতে নিষেধ করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এক নয়া পয়সার কোন বাজার মূল্য নেই, অতএব তা নেওয়ার কোন মানে হয় না।

সভার শেষে ভিখারীরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যায় এবং দু' নয়া পয়সার কমে কোন দান নিতে অস্বীকার করে।

* * *

আমেরিকার কুমারী টেরেসা লিণ্ডেয়াল জীবনের শেষ বিশ বছর ভিক্ষায় কাটিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর জানা গেল যে, যাঁরা তাকে করুণা করে অর্থ দান করেছিলেন তাঁদের অনেকের থেকে ধনী ছিল সে। সম্প্রতি প্রকাশিত তার উইল থেকে জানা যায় যে, প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার (প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি রেখে গিয়েছে।

### কাচ নয়, হীরে

এজেকিয়েল জীবনে হীরে দেখেনি অথচ দক্ষিণ আফ্রিকার জাগের ফণ্টেন হীরে খনিতে সে কাজ করে।

সেদিন সে খনিতে জঞ্জাল সাফ করছিল। হঠাৎ কনভেয়ার বেল্ট থেমে গেল। এজেকিয়েল নীচু হয়ে দেখল কাচের মত কি একটা বেল্টের মধ্যে পড়ে আছে।

অফিসারের কাছে সে নিয়ে গেল। এটা কি দেখুন তু, বলল সে।

লাফিয়ে উঠল অফিসার। হীরে, হীরে পাওয়া গিয়েছে, চেঁচাতে চেঁচাতে অফিসার ছুটল আরও বড় অফিসারের কাছে।

আর এজেকিয়েল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরের দিন আরেক বার সে অবাক হল। বড়কর্তার ঘরে তার ডাক পড়ল। একটা ট্রেতে এক দুই তিন করে গুণে গুণে দেওয়া হল প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। তার কমিশন।

এ পর্যন্ত অত বড় হীরে (সাড়ে সাতচল্লিশ ক্যারাট) কোন শ্রমিক দিতে পারে নি কর্তৃপক্ষকে। হীরেটার দাম কত হবে কর্তৃপক্ষেরা অবশ্য তা বলেন নি।

* * *

ভারতের রসুল মহম্মদ কিন্তু জানত হীরে কি। হীরে সে দেখেছে। জানত মধ্যপ্রদেশের পান্নায় হীরে পাওয়া যায়। গত বছর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে সে গিয়েছিল পান্নায়।

ফিরে এল সাতচল্লিশ ক্যারাটের হীরে হাতে করে। পান্নায় এত বড় হীরে এর আগে পাওয়া যায় নি। নীলামে দাম উঠল চার লক্ষ টাকা। তা থেকে আশী হাজার টাকা পেল অশিক্ষিত রসুল মহম্মদ।

### গঞ্জু বুলেট

গঞ্জু বুলেট নামে মারার কোন নতুন বুলেট নয়। দেরাদুনের একাদশ গুর্খা রাইফেল বাহিনীর শিক্ষণ কেন্দ্রের সুবেদার গঞ্জু লামার দেহে বুলেটটি বিশ বছর অবস্থান করার পর সম্প্রতি বেরিয়ে এসেছে।

১৯৪৪ সালের জুন মাস। বর্মায় গঞ্জু লামার ছোট কোম্পানীর গতিরোধ করে শত্রুপক্ষের দুটি ট্যাঙ্ক। গঞ্জু লামা একলা এগিয়ে যায়। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের সাহায্যে ট্যাঙ্ক দুটিকে অচল করে। ট্যাঙ্কচালকরা নিহত হয় তারই নিক্ষিপ্ত হ্যাণ্ড গ্রেনেডে।

গঞ্জু লামা সেই সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়। এই অসামান্য বীরত্বের জন্য তাকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ দেওয়া হয়।

কিন্তু লামার অস্বস্তির শেষ নেই। সব বুলেটই ডাক্তার বের করে দিয়েছে। ডান উরুতে বুলেটটা যে কোথায় ঢুকে রয়েছে তা কেউ খুঁজে পায় নি। একাধিক ডাক্তারের সন্ধানী ছুরিকে উপেক্ষা করে বুলেটটি আত্মগোপন করে রইল।

কিছুদিন আগে গঞ্জু লামার ডান উরুতে বুলেটের দাগের কাছে ফুলতে থাকে। ফোড়া হচ্ছে মনে করে সে গরম পুলটিশ লাগায়। হঠাৎ একদিন তা ফেটে যায় আর বেরিয়ে আসে বিশ বছর আগের সেই বুলেট।

গঞ্জুর বন্ধুরা ঐ বুলেটের নাম দিয়েছে গঞ্জু বুলেট। শিক্ষণ কেন্দ্রের যাদুঘরে এটি সযত্নে রক্ষিত হবে।

### একখানি বাসা

স্কটল্যাণ্ডের ডোরিয়ান কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর জনৈক বড়কর্তার বাড়ি তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ মেরুতে সাউথ জর্জিয়ায়। স্কটল্যাণ্ড থেকে দশ হাজার মাইল দূরে।

বাড়ির কাঠামো আগাগোড়া স্কটল্যাণ্ডের পার্থ শহরে তৈরি হয়েছে। এখন সেটিকে সাউথ জর্জিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে কোম্পানীর আটজন কর্মী।

বাড়িটি এমন মজবুত করা হয়েছে যাতে ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগের ঝড় ও বগফুট প্রতি ত্রিশ সের ওজনের বরফের চাপ সহ্য করতে পারে। জাহাজে সাউথ জর্জিয়া পৌঁছতে মাত্র এক মাস লাগে।

তবে, ধরণীর এক কোণে ভদ্রলোক একখানি বাসা পেলেন।

---সাংবাদিক

# খেলা ধুলা

## উড়ো বিপদ

ক্যাসিয়াস ক্লের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত এক উড়ো বিপদের আবির্ভাব হয়েছে। বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ সংস্থা এবং এর সভাপতি ল্যাসম্যান উঠে পড়ে ক্যাসিয়াসের পেছনে লেগেছেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হল কোন একটা অজুহাত খাড়া করে ক্লের বহু কষ্টের পাওয়া বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান-শীপের সম্মান বাতিল করে দেওয়া। কে লিস্টনকে পরাজিত করবার পর হঠাৎ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে ঘোষণা করলেন যে, তিনি কালা মুসলিম দলের একজন সভ্য। বিশ্ব বক্সিং সংস্থা ক্লের এই মুসলমান ধর্মগ্রহণকে মোটেই ভাল চোখে দেখেন নি। আবার ক্লে আর এক কাণ্ড করেছেন। $ 50,010 (২৫,00,000 টাকা) ষ্টার্লিং পাউণ্ডের বিনিময়ে তাঁর পরবর্তী মুষ্টিযুদ্ধ সংগঠনের ভার লিস্টনের ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টাল প্রমোশান ইনকরপোরেশনের ওপর অর্পণ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। বিশ্ব বক্সিং সংস্থার মতে ক্লের এই চুক্তি নাকি সংস্থার আইনবিরুদ্ধ। নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বক্সিং সংস্থার পক্ষে। ক্লের পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য তাঁরা প্যাটার্সন, জোন্স, ম্যাচেন এবং উইলিয়ামকে মনোনীত করেছেন। এই চারজনের মধ্যে এক বাতিল যুদ্ধে যে বিজয়ী হবে, সেই হবে ক্লের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশেষে ক্লে নিস্তার পেয়েছেন।

## ভারতের পরাজয়

গত সপ্তাহে ইডেনের ইনডোর রঞ্জী স্টেডিয়ামে ভারত টেবিল টেনিস

শ্রীঅমিতাভ

টেষ্টে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ৫-১ খেলার ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। অবশ্য টেবিল টেনিসে ভারত একেবারেই শক্তিহীন। এই খেলায় আভন্ত এবং প্রবীণ যুগোশ্লাভ দলের কাছে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে ভারতের। কলকাতার টেষ্টে ভারতের পক্ষে একমাত্র ভোরা যুগোশ্লাভিয়ার হারবাউকে পরাজিত করেন। বিদেশী দলের তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভোজোসিলভ ছিলেন সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। খোদাইজী ও ভেক্সোর মধ্যে উদ্বোধনী খেলাটিও খুবই আকর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়।

## প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ

ভারতের ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ সম্মান রঞ্জী ট্রফির বিজয়ীর তালিকায় আবার একবার বোম্বাইয়ের নাম লেখা হল। ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্য আজ পর্যন্ত কেউই ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। ক্রিকেটের পীঠস্থান বোম্বাই নতুন প্রতিভা উন্মেষের ক্ষেত্র। এ-বছর রাজস্থান ফাইন্যালে উঠে বোম্বাইয়ের আক্রমণের সম্মুখে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। প্রথম ইনিংসে রাজস্থান শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে।

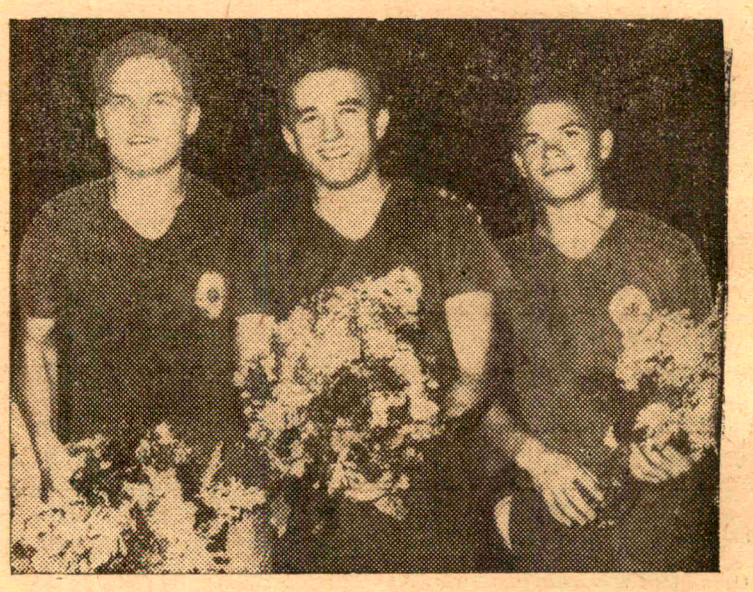

● যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেবিল টেনিস টেষ্টের ভারতীয় খেলোয়াড়গণ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

## প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

### মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

**শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**

এবং

ভাগবতাচার্য্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

**শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী**

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত হউক।

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

# হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

### দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ গ্রাস করিয়াছে বুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি কমলমনে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীযাদব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। যদিদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই পৌঁছা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"ধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিজাতি ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

---

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

# জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোতিদীপ্ত নাট্যরাজি, কালিদাস, কাঞ্চনাচার্য শ্রীহর্ষদেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, শূদ্রক, রাজশেখর প্রভৃতির সাহিত্য-মন্থিত অমৃতধারা—বালজাকের বিভীষিকা, মোপাসাঁর গল্পসুধা, জোলার রসরঙ্গ, পিয়ের লোতীর সম্মোহন, মোলিয়েরের কৌতুক-যৌতুক, স্বাধীন ভারতের গৌরবদীপ্তি, রাজপুত শৌর্যের অলৌকিক প্রভা ভরবারি আস্ফালনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন।

১ম খণ্ড—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, ধনঞ্জয় বিজয়, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

২য় খণ্ড—মিলিতোনা, শোণিত-সোপান, হত্যাকাণ্ডের পর, সবুজ শয়তান, অলীক বাবু, বেড়ালের স্বর্গ, শেষ পাঠ, বালনের অবরোধ, দর্পণ, ইংরেজ বাজত ভারতবর্ষ, মুখোশপরা নাচের মজলিস, মা, অন্নদান, জ্যোৎস্না রাতে, খুকুমণি, শেষ পরী, ঘণ্টা, অতিশপ্ত বাড়ী, তার ভুল হয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

৩য় খণ্ড—মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবোধচন্দ্রোদয়, কর্পূরমঞ্জরী, চণ্ডকৌশিক, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, মহাবীরচরিত।

**মূল্য ১৲ টাকা**

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব-জনপ্রমোদন—অমরকীর্তি উপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—ধরণী, প্রেয়সী, যুদ্ধ পাখী, বন্দী, কঙ্কনা, স্পর্শী, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গবেষণা, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, নেপথ্যে, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের ডাক, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নরাযুগের নাটা ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ম্মম, অতঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

---

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# See India by Ambassador !

Our country abounds in natural riches which invite appreciation and exploration. The Ambassador provides easy access to ideal spots for holidaying, picnicking, camping, hiking, and every avenue leading to closer contact with nature. Designed as a family car, it carries upto six adults in relaxed comfort, plus ample luggage in its spacious boot. O.H.V. engine power, combined with a sturdy build, ensures fast and dependable performance at a modest fuel consumption. It is the ideal vehicle for enriching the experience and expanding the horizon of you and your family!

HINDUSTHAN **Ambassador**

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA

AUTHORISED DEALERS

• INDIA AUTOMOBILES (1960) LTD., 12, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • HINDUSTAN AUTO DISTRIBUTORS, 17, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • WALFORD TRANSPORT LTD., 71, Park Street, Calcutta (for other Districts of West Bengal)

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

## ভারতীয় বিমান বাহিনীর গৌরবময় একত্রিশ বছর।

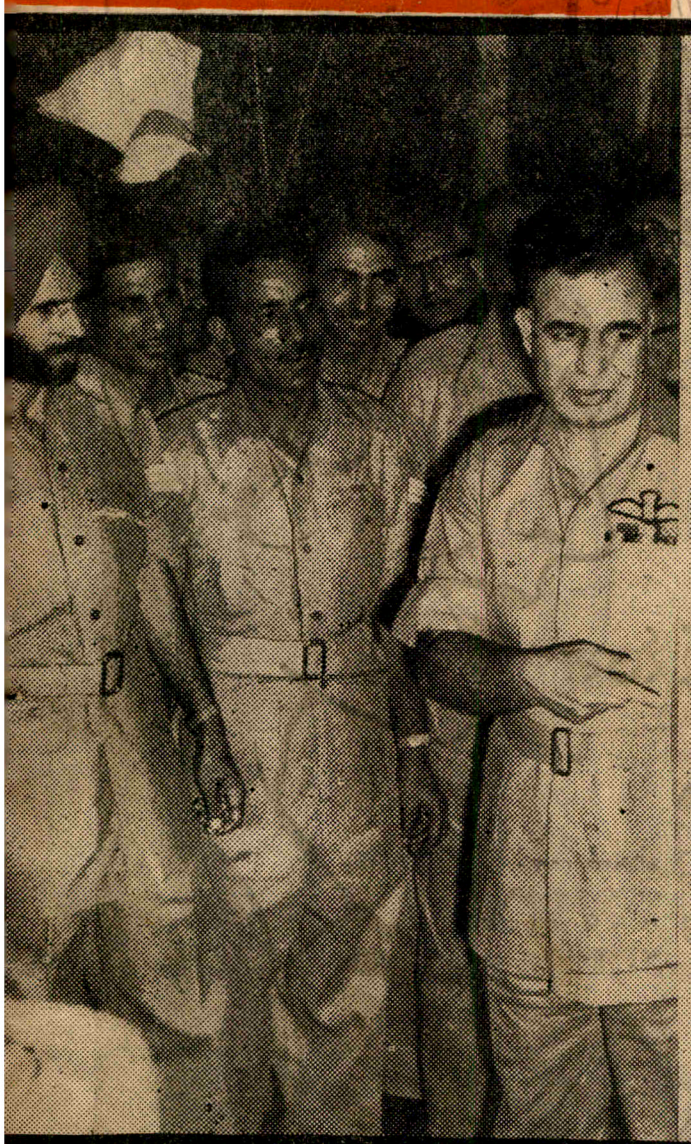

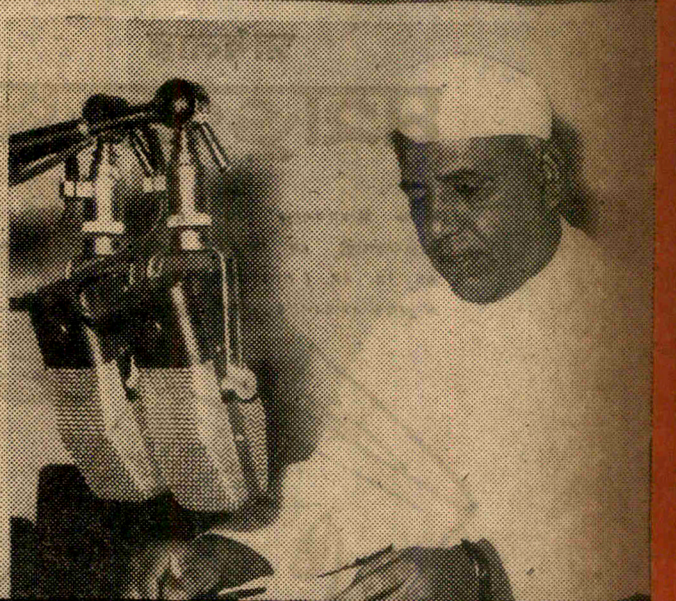

বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৬শে চৈত্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ • 9th April, 1964 • Vol. 68, No. 46

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন **সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল**—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

**সাধনার**

# মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য্য।

**সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা** • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
.003/3
Yr.68
no.46


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৫১৫ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৫১৬ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২৫১৭ |
| লণ্ডনের চিঠি | অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৫২১ |
| দুরন্ত দেহলী (কাহিনী বিচিত্রা) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৫২৪ |
| অনল আয়তী (উপন্যাস) | সুশীল রায় | ২৫২৬ |
| পৃথুমালিনী কথা (রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী) | সুভাষ সমাজদার | ২৫৩১ |
| ভঙ্গুর মাটির পাত্রে (উপন্যাস) | ধনঞ্জয় বৈরাগী | ২৫৩৪ |
| সূর্য তারার গল্প (গল্প) | মিহির পাল | ২৫৩৯ |



# কবিকঙ্কণ চণ্ডী

**মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী**

**( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক )**

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

**—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—**

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ( ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

**মূল্য সাড়ে চার টাকা**

## নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

**মূল্য সাড়ে তিন টাকা**

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

**ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান তৎপূর্ব্ব**

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

**শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

## মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| শহর ও কাব্য | শ্রীপদাতিক | ২৫৪৩ |
| একটি মৃত্যুতে ( কবিতা ) | নবনীতা সেন | ২৫৪৬ |
| কোথায় আমার মুক্তি নদিয়া ( কবিতা ) | অলকেন্দুশেখর পত্রী | ২৫৪৬ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৫৪৭ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৫৪৯ |
| সাপ্তাহিক | ... | ২৫৫৭ |
| গ্রন্থমেলা | ... | ২৫৬১ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৫৬২ |
| পাঠক মন | ... | ২৫৬৬ |
| খেলাধূলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৫৬৭ |



ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
৩০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০৩
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

**রাজভাষা**

( ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ )
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

**মহাভারত**

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]
( প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা )
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

**ডিকেন্স গ্রন্থাবলী**

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

**দামোদর-গ্রন্থাবলী**

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক
# বসুমতী
সম্পাদিকা - জয়ন্তী সেনগুপ্তা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৬৮ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২৬শে চৈত্র ১৩৭০

25 Nava Paise
Thursday, 9th April 1964

# কলেজ শিক্ষকদের মৌন মিছিল

দেশের শিক্ষকবৃন্দই সম্মানের উচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় দৃষ্টিতে তাঁদের ঐতিহ্য জাতীয় সম্পত্তি-রূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে। আমাদের রাষ্ট্রপতিও শিক্ষকরূপে পূজিত।

গুরুর মর্যাদা রক্ষার জন্য শিষ্যের গুরুদায়িত্ব পালনের কতো গল্পই না এদেশে প্রচলিত আছে। একদা ঐসব গল্প আমাদের দেশের ছাত্ররা শিশু-বিদ্যালয়ের গণ্ডীতেই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পাঠ করতো। একালের বিদ্যাকে সরকারী ভাঁড়ার থেকে বিলি করা হয় বলেই হয়তো ঐ সব লোপ করার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুরু হয়েছে। কেউ কেউ একথা শুনে বলতে পারেন, এটাই কালের পরিবর্তন। প্রশ্নপত্র কঠিন হলে ছাত্ররা যেমন শিক্ষককে শাসায়, তারা মিটিং করে, মিছিল করে—তেমনি যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষা-পদ্ধতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, এটাই যথার্থ আধুনিকী-করণ এবং এর দ্বারা নিশ্চয়ই গুরুমারা বিদ্যে শেখানোর প্রমাণ হয় না। আমরাও একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু সরকারী টালবাহানার জন্যে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ফেষ্টুন হাতে বিরাট মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিমুখে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তখন প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়—তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? বৃহৎ বৃহৎ জাতীয় সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় এগিয়ে এসেছে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোনোদিন তাদের বাধা দিই নি, এমন কি প্রয়োজন বোধে কেউ কেউ তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরাও শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের দাবীর জন্যে এগিয়ে যে আসবে না—তা কেই বা বলতে পারে?

শিক্ষক-সমাজের পক্ষেও তাদের তখন বাধা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। ক্রমবর্ধিত দ্রব্যমূল্যের দিনে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ন্যায্য মাহিনা বৃদ্ধির দাবী তখন রাজনীতির পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। তাই মাহিনা বৃদ্ধির আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব বৃদ্ধির কথাই শুধু ওঠে না, নিজেদের প্রাপ্য সম্মান রক্ষার কথাও প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করা উচিত। কেন না, সম্মান সহজে দান করা যায়, গ্রহণ করাই কঠিন। ক্ষুধিত পেটে সম্মানের কাঙাল তাঁরা হোন, একথা আমরা বলছি না—আমরা বলতে চাই কোনোরকম ধর্মঘট বা জটিল কার্যক্রম গ্রহণের আগে তাঁরা সংবাদপত্র ও সর্বভারতীয় সাধারণ মানুষের মাধ্যমে তাঁদের মনোভাব আরও জোরদার করে ব্যক্ত করুন। কিন্তু সরকার কি এই ধরণের কিছু একটা ঘটুক—তা প্রত্যাশা করেন? মাত্র কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে রাজ-নীতির অনুপ্রবেশের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু দুর্মূল্যের দিনে গণতন্ত্র সম্মত উপায়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করা নিশ্চয়ই অপরাধ-জনক ব্যাপার নয়।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বর্তমান দাবী অসঙ্গত নয় এবং তা ইউ জি সি'র সুপারিশ ও ১৯৬০ সালের উপাচার্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত-সম্মত। গত ৩রা এপ্রিল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের শান্তিপূর্ণ মৌন-মিছিলের সম্মুখীন না হবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর রাইটার্স বিল্ডিংস ত্যাগের কথা যদি সত্যই হয়, তা'হলে শিক্ষক-সমাজের রুটির সংগ্রামকে কঠিনতর করে তোলার জন্য সরকারকেই শেষ পর্যন্ত দায়ী

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

এইবার আসর জমেছে। ভানুমতীর খেল। খাঁচায় বন্দী বাঘ ছাড়া পাবে আর তারই সামনে দাঁড়াবে রিং-মাষ্টার?—উদ্‌গ্রীব দর্শক তাই লক্ষ্য করছে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমেরই। বিনা সর্তে শেখ আবদুল্লা দীর্ঘ এগারো বছর কারাবাসের পর মুক্তি পাচ্ছেন। শেখজীকে আমরা সবাই চিনি। 'শের-ই কাশ্মীর'—তার চেয়েও স্পষ্টভাবে কাশ্মীর রাজনীতি-মঞ্চের বিস্ময়, বিড়ম্বনা। একটা আশ্চর্য বৈপরীত্য দিয়ে গড়া মানুষ। আর তাই বুঝি চরিত্রের প্রধান ধর্ম—'বিপুব'। শেখজী একদিন (আজ থেকে এগারো বছর আগে) কাশ্মীর-রাজন্যদের উচ্ছেদ সাধনে সুরু করেছিলেন আন্দোলন। সেদিন 'কুইট কাশ্মীরের' দুর্দান্ত নেতা শেখ আবদুল্লা সাম্প্রদায়িকতা জানতেন না—সেদিন তিনি সমাজতন্ত্রবাদী—শ্রেণী-সংগ্রামের মুখ্য সেনাপতি, 'বিভেদ ও অনৈক্যের মূলে ধর্ম নয় অর্থনীতি---রাজনীতিতে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে, তারা হয় নিজেরাই শোষক গোষ্ঠীভুক্ত নয়ত' বা শোষক গোষ্ঠীর দালাল'—এই বিশ্বাস তাঁর মানবতার দিককে সেদিন উদ্ভাসিত করেছিল—নিপীড়িত আপামর জনতার বন্ধু শেখজীকে সেদিন আমরা অন্যরূপে দেখেছিলাম। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে তিনি তখন কাশ্মীরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। শেখজী তখন ভারতের কংগ্রেস আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন।

কাশ্মীর আন্দোলনকে ভারতীয় কংগ্রেস সমর্থন করেছিলেন। মনে বল পেয়েছিলেন শেখজী। অপরপক্ষে সেকালের তীক্ষ্ণধী কূট রাজনীতিবিদ জিন্না তাঁকে সমর্থন বা সাহায্য করেন নি। স্বভাবতই শেখ আবদুল্লার মত দৃঢ়চেতা মানুষ এতে বিচলিত হন নি। সবচেয়ে মজার কথা এই মানুষটির রাজনৈতিক জীবনের সুরু সাম্প্রদায়িকতায়। 'মুসলমানদের ব্যাপক কর্ম-সংস্থান'-এর শ্লোগান তুলে তিনি প্রথম তাঁর আগমনের খবর জানিয়েছিলেন। পরে তিনিই আবার ধর্ম-নিরপেক্ষতার দাবীতে প্রচার করেছেন অক্লান্ত বাণী—বক্তৃতা। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 'স্বাধীন কাশ্মীর' দাবীর নেতারূপে। এ ঘটনা ১৯৫৩ সালের। আবদুল্লা আর তাঁর অনুচরেরা প্রচণ্ডভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। 'স্বাধীন কাশ্মীরের' দাবীতে '৫৩ সালের মে মাসে সুরু করলেন অজস্র ভারত-বিরোধী বক্তৃতা। তাঁকে কোনমতেই বিরত করতে পারলেন না মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রফি আহমেদ কিদওয়াই-এর মত বরেণ্য নেতা। থামাতে পারলেন না তাঁর দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীজওহরলাল নেহরুও। শ্রীনেহরু তাঁকে বুঝিয়েছিলেন : মাত্র ১৬০০ বর্গমাইল কাশ্মীর উপত্যকার (জম্মু ও লাদাক তাঁর তথাকথিত 'স্বাধীন কাশ্মীরের' অন্তর্ভুক্ত ছিল না) পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেবে না কখনই। উপরন্তু তাঁর এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম মিত্রতার অন্তরায়—ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু এই সদুপদেশ তাঁর কাছে তিক্ত লাগল।

অবশেষে উন্মত্ত শার্দুল সানুচর শেখ আবদুল্লা তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করবার অভিপ্রেত দিনটির মাত্র দু'দিন আগে—১৯৫৩ সালের ৯ই অগাষ্ট কারারুদ্ধ হলেন। তাঁদের অভিযুক্ত করা হ'ল 'কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলায়'। সেই থেকে রাজনৈতিক দুর্ধর্ষ শেখজীর কণ্ঠ আমরা আর

শেখ আবদুল্লা

এতদিন শুনি নি। এবার তাঁর মুক্তি আসন্ন—। দুর্যোগ না সুযোগ—তাই ভাবছি। এতদিন যে আগ্নেয়গিরি সুপ্ত ছিল, এবার তার বিস্ফোরণ না হয়! কেন না, একথা আজ মানতেই হবে শেখজীর পুরনো আশঙ্কা : 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কাম্য। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে স্বাধীন কাশ্মীর যে শক্তিদ্বন্দ্বের ক্রীড়াভূমি হ'য়ে উঠবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়?'—এখন ত' প্রায় সত্যি হ'তেই চলেছে। শেখ আবদুল্লার জীবন-কথা তাই আজ এখানেই শেষ নয়। তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণও এখনই সম্ভব নয়। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন। অনিশ্চিতের মধ্যে থাকতে হবে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসাদিক বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত—অন্তত তাঁর পুনরভ্যুদয়ের (?) লগ্ন অবধি।

● হাবড়ার সীমান্ত সম্মেলনে শ্রী এন সি চ্যাটার্জি বক্তৃতা করছেন

**রাজধানী :**

এবারে পশ্চিম বাংলার বুকে গ্রীষ্মের দাবদাহ একটু আগেভাগেই সুরু হয়েছে। তার কিছুটা পরিচয় বঙ্গদর্শনের পাঠকগণ গেল সপ্তাহেই পেয়েছেন। গত বছর এমনি দিনেই গরম আরম্ভ হয়েছিল। সুরুতেই কিন্তু বেশ এক পশলা বর্ষণ বাংলার মাটিতে কয়েকটা দিন স্নিগ্ধ-শ্যামল করে রেখেছিল। এবারেও একদিন বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে বৃষ্টি নতুন কোন আশার ইঙ্গিত বয়ে আনতে পারে নি। ধরণীর দহনজ্বালাকে সে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গরম হাওয়ার সাথে সাথে বাজারও হয়ে উঠেছে গরম। বাঙালীর রান্নার প্রধান উপকরণ সরষের তেলের দাম চড় চড় করে বাড়তে সুরু করেছে। প্রতি কিলো এখন তিন টাকার কমে পাওয়ার উপায় নেই। গিন্নীরা সবাই সরষে-ফুল দেখতে আরম্ভ করেছেন। যে-পরিমাণে ব্যবসায়ী মহল হৈ-চৈ সুরু করে দিয়েছেন তাতে সরষের তেলের দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে, বলা শক্ত।

রব উঠেছে—পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে সরষের ফলন ভালো হয় নি। পশ্চিম বাংলায় প্রতি বছর সরষের প্রয়োজন হয় প্রায় ৬০ লক্ষ মণ। নয় লক্ষ টনের বেশি সরষে পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন হয় না। বাকিটার জন্য হা-পিত্তেস নয়নে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় অন্যদের অনুগ্রহের ওপর। চৈতালীর ফসল ওঠবার সময়ে প্রতি বছরই তারা তেলের বাজারে একটা সঙ্কট সৃষ্টি করে মুনাফা শিকারের মওকায় নেমে পড়ে। গেল বছরও ঠিক এই কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি করতে কালোবাজারীরা কসুর করে নি। তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে পড়ে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি শেষ পর্যন্ত সম্পাদিত হয়েছিল। ঠিক ছিল তেলের দাম হবে প্রতি কিলো ২ টাকা ৪০ থেকে ৫০ নয়া পয়সা।

সাম্প্রতিক হাঙ্গামা ও দলে দলে উদ্বাস্তু এসে পড়ায়, এবার প্রতিরোধ-আন্দোলন তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। মুনাফাশিকারীর দল এই সুযোগে খুশিমত সাধারণ মানুষের পকেট কেটে চলেছে অবাধে।

শুধু তেল নয়, শাক-সবজীর বাজারে গিয়েও শূন্য ঝোলা নিয়েই ফেরবার উপক্রম হয়েছে। নতুন ডাঁটা উঠেছে বাজারে। বেশ কচি, দেহটিও তার নধরকান্তি। কিন্তু হাত দেবার উপায় নেই। জলসিক্ত সপল্লব ডাঁটার দাম প্রতি কিলো ৪০ নয়া পয়সা; পটলের দাম শুনে অনেক পটলচেরা চোখও ছানাবড়ার মত হয়ে ওঠে। বছর কয়েক আগেও চৈত্র মাসে কলকাতার বাজারে বেগুন আমরা দু'পয়সা সের কিনেছি। এবারে পঞ্চাশটি নয়া পয়সা না ঠেকালে এক কিলো বেগুন পাওয়ার উপায় নেই। মাছ ও মাংসের কথা নতুন করে না তোলাই ভাল। আমাদের সুযোগ্য মৎস্যমন্ত্রীর কেরামতিতে সরকারের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যই এখন সর্বনিম্ন মূল্যে পরিণত হয়েছে। মাছের বাজারে গিয়ে কথা বললেই মেছুনী অমনি গলা চড়িয়ে বলে, এই দেখো না বাবু, তোমাদের সরকারই তো দাম বেঁধে দিয়েছেন। আমাদের অপরাধটা কোথায় ?

সত্যি কথা, তারাই বা করবে কি ? যে-পথ অবলম্বন করলে এর সুরাহা করতে পারতেন, আমাদের সরকার সে পথে পা ফেলতে নারাজ। রাঘব বোয়ালের দল তাই এখনও যথেচ্ছভাবে বিচরণ করে চলেছে। চুনো-পুঁটিরা সেখানে কি-ই বা করতে পারে।

আমরা বহুবার বলেছি, সরকারের বলিষ্ঠ নীতি এবং সক্রিয় কর্মপদ্ধতির অভাবেই বারবার বাজারে সৃষ্টি হচ্ছে—কৃত্রিম সঙ্কট। বাজারে চাল, ডাল, তেল, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় কোন জিনিষেরই অভাব নেই। সরকারের বাঁধা দামে ন্যায্য-মূল্যের দোকান ছাড়া আপনি চাল পাবেন না। সপ্তাহের প্রথম দিনটিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে না পারলে ন্যায্যমূল্যের দোকানে চাল পাওয়া কঠিন। চাহিদা মাফিক চাল না কি দোকানগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে না। ৯০ নয়া পয়সার কম একমাত্র খেসারী ছাড়া কোন ডাল পাবেন না। ভাজামুগ আভিজাত্য লাভ করেছে সব চাইতে বেশি। তার মূল্য প্রতি কিলো পাঁচ সিকে। বাজারের অবস্থা সাধারণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে—চড়ক পূজোর ঢাকের বাদ্যি সুরু হতে-না-হতেই সকলের চোখ চড়কগাছে উঠছে।

মার্ক্সবাদের ধ্বজাধারী পশ্চিম-বাংলার সাতটি রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ফয়সালার জন্য সংগ্রাম সুরু করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি, আর-এস-পি, আর-সি-পি-আই, মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এস-ইউ-সি একযোগে পূর্ব বাংলা থেকে যে সব সংখ্যালঘু এদেশে আসতে চাইছেন, তাঁদের যাত্রাপথ সুগম করা, এখানে এলে তাঁদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ, ভারতের দাঙ্গা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ব্যবস্থা এবং ভূদেব সেনের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে আন্দোলন চালাচ্ছেন। মহারথী শ্রীমাখন পাল, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীরেন দাশগুপ্ত, শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, শ্রীবিশ্বনাথ দুবে এবং শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁদের দলের ২৫৬ জন ৩০শে মার্চ সন্ধ্যা থেকে ২৪ ঘণ্টাকাল অনশন ধর্মঘট করেছেন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। এঁদের প্রতিনিধিদল দাবী আদায়ের জন্য দিল্লীর দরবার পর্যন্ত ধাওয়া করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভাগ্যহত উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নি বলা সত্যের নিছক অপলাপ মাত্র। সাম্প্রদায়িক প্রীতি বজায় রাখার জন্য এই সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জাতির উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর সারল্য, হৃদয়বত্তা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোন দ্বিধা কারো মনে থাকতে পারে না। ভারতের বুকে বিমূঢ়মতি সমাজবিরোধী মুষ্টিমেয় ক'জনের প্ররোচনায় অপ্রীতিকর সামান্য কয়েকটি ঘটনায় গৃহহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভারত সরকার যেভাবে দরাজ হৃদয়ে করে চলেছেন, তার সামান্য ছিটেফোঁটা পেলে পূর্ব-বাংলা থেকে আগত মানুষগুলো নিজেদের সত্যি ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। এসব কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমাদের বামপন্থী কমরেডগণ এ নিয়ে জল ঘোলা করে শত্রুর হাতই সবল করবেন। পাকিস্তান সুযোগ পাবে এন্তার। তার অপপ্রচার ভারতের বিরুদ্ধে আরো জোরদার হয়ে উঠবে।

* * *

ডি-ভি-সির ব্যারেজগুলোর সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং সেচের ব্যবস্থাপনার ভার পশ্চিম বাংলা সরকারের সেচ দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ১লা এপ্রিল থেকে। ১৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৫ বছর পর এমনি করে ভাগ করে দেওয়াতে শ্রী এন সি চ্যাটার্জি এক বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন, প্রশ্নটি কেবল কয়েকশত কর্মচারীর বেতন হ্রাস অথবা কয়েকশত বেকার কর্মচারীর পরিবারবর্গের জীবিকা সংস্থানের নয়, এর সাথে জড়িত রয়েছে জাতীয় প্রশ্ন।

শ্রীচ্যাটার্জি যে সকল আপত্তি ডি-ভি-সির নয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুলেছেন, তার মধ্যে চিন্তা করবার অনেক কিছুই রয়েছে। ডি-ভি-সি একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পরিকল্পনা। এর প্রতিটি অঙ্গ পরস্পর নির্ভরশীল। একটি অঙ্গকে আলাদা করে দিলেই ব্যাধিমুক্ত হয়ে সংস্থাটি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠবে এরূপ আশা করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বন সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের ব্যবস্থাদি ছিল পরিকল্পনাটির মূল লক্ষ্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামান্য সাফল্য ভিন্ন আর কোন দিকেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ এগোয় নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন।

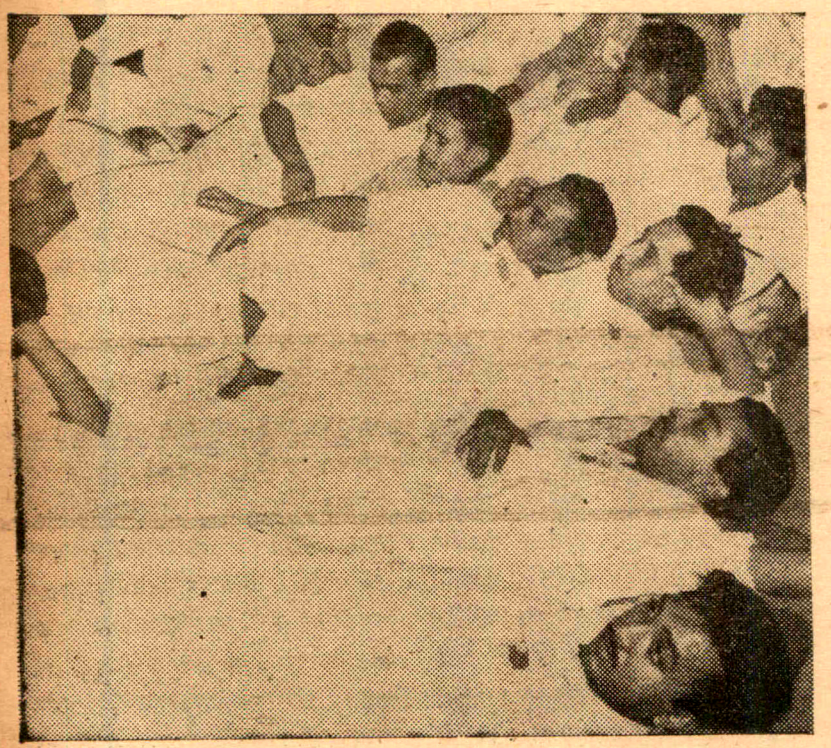

● রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রতীক গণ-অনশনের দৃশ্য

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যারেজগুলোর পূর্ণ দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া এতে আর কিছুই নতুনত্ব নেই। সেচের জল বিতরণের কাজ পূর্বে ন্যস্ত ছিল রাজ্য সরকারের ওপর। আগের মতোই ডি-ভি-সির জল ছাড়ার কারবারটি নির্ভর করছে ডি-ভি-সির কর্তাদের মর্জির ওপর। সোজা কথায় আসল চাবিকাঠিটি তাদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। প্রয়োজনের সময় জল সরবরাহ না করে অসময়ে জল ছেড়ে দিয়ে বন্যার গতিবেগকে দুর্বার করে তোলবার অভিযোগ ডি-ভি-সির বিরুদ্ধে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সময়ে 'আল বেঁধে বহু শাল' পাবার মত প্রচেষ্টার অথবা বন্যা-প্রতিরোধের সমস্যার আশু কোন সমাধান এতে নেই।

রাজ্য সরকার কাজ করবেন ডি-ভি-সির এজেণ্ট হিসেবে। টাকাটা আসবে ডি-ভি-সির ভাণ্ডার থেকে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সেচের ব্যবস্থাদির উন্নয়নের জন্য পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে। গেল তিন বছরের মধ্যে ডি-ভি-সির কর্মকর্তারা এক কোটি টাকার অধিক ব্যয় করে উঠতে পারেন নি। পশ্চিম বাংলার সেচ দপ্তর আগামী দু'বছরে বাকিটা খরচ করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এমন ভরসা করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

রাজ্য সরকার ১৭ জন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং ৪২ জন ওভার-শিয়ারকে কাজে বহাল রাখছেন। বাদবাকি সকলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। প্রায় ৯৬০ জন কর্মী বেকার হয়ে পড়লে তার পাঁচজন মানুষের মুখে অন্ন উঠবে না।

দীর্ঘকাল এই কর্মীরা ডি-ভি-সির সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি কাজে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছেন। এঁদের বাদ দিয়ে কাজ সুষ্ঠুভাবে নিশ্চয়ই পরিচালিত হবে না।

কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা যাঁদের রয়েছে তাঁদের পশ্চিম বাংলা সরকারকে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও লোকসভায় জানিয়েছেন। এর পরও যাঁরা পড়ে থাকবেন তাঁদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে বলে ডঃ রাও আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারী দপ্তরখানার পুনর্বিন্যাসের সময় কর্মচ্যুত

● ডঃ কে এল রাও

কর্মচারীদের বিকল্প ব্যবস্থার অতীত-অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ডি-ভি-সির কর্মীদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলে নিশ্চয়ই তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবেন।

**মেদিনীপুর :**

আমাদের মাছের চাহিদা মেটাবার প্রয়াসে রাজ্য মৎস্য দপ্তর দীঘা থেকে সাত মাইল দূরে, সাগরের উপকূলে দু'হাজার বিঘা জলাভূমিতে, মাছের চাষের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এখানে ১৪টি ভাসা বাঁধ নির্মিত হবে। পাঁচটি বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে। সমুদ্রের জোয়ারের জলে ভেসে আসা সামুদ্রিক মাছ সংরক্ষণ করে বেশি পরিমাণে মাছের উৎপাদনের কাজ এর মধ্যেই চালু হয়েছে।

খুবই সুসংবাদ! সরকার এর সাথে সাথে খাল, বিল এবং মজা জলাশয়গুলি সংস্কার করে মাছের চাষ সুরু করলে, সমস্যার কিছুটা সুরাহা নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু মাছের কারবারে সরকারের কেলেঙ্কারীর অভাব নেই। গভীর জলের মাছ থেকে সুরু করে কলকাতার সরকারী পুকুরগুলিতে পর্যন্ত কাগজে-কলমে মাছের উৎপাদনের কাহিনী অনেকবার প্রচারিত হয়েছে। কোন পরিকল্পনার মাছ সরকারী জালে ধরা দেয় নি। দীঘার মাছ বাঁধ ভেঙে সমুদ্রবক্ষে ফিরে যাবে এমন ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছেন কি না হলপ করে বলা মুস্কিল। তা ছাড়া, সংবাদে বলা হয়েছে, দীঘার মাছের দাম ২ টাকা ৫০ থেকে ৭৫ নয়া পয়সা ধার্য হয়েছে। পরিবহন খরচ দিয়ে কলকাতার বাজারে পৌঁছতে তার দাম যা দাঁড়াবে তাতে তাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের রসুইখানায় পৌঁছে দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। তথাপি আমরা সরকারের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অন্তত সরকারের হাত আসুক।

**২৪ পরগণা :**

ক'দিন আগে শ্রী এন সি চ্যাটার্জি এম-পি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সীমান্ত-সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি জেলা—খুলনা, যশোহর ও রাজশাহীকে ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবী উঠেছে। এছাড়া, সীমান্তে সুদৃঢ় প্রহরার ব্যবস্থা করা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি, পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুদের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চলেছে, সে বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মৌলিক অধিকার কমিটী ও আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশনের কাছে উত্থাপন প্রভৃতি বারোটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে।

প্রস্তাবগুলোর কয়েকটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন

অবকাশ থাকতে পারে না। ভারত থেকে কোন সংখ্যালঘু আর প্রাণভয়ে পাকিস্তানে গিয়ে পাড়ি জমাতে প্রস্তুত নয়। সামান্য যে-ক'জন খুলনার হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ায় আশঙ্কিত হয়ে পাকিস্তানের দুয়ারে গিয়ে দু'দিন ধর্ণা দিয়েছিলেন, যথেষ্ট আক্কেল-সেলামী দিয়ে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন পশ্চিম বাংলার বুকে ফিরে আসতে। পাকিস্তান কোন সুযোগই হাতছাড়া করে না। এই নিয়ে তারা গগন-বিদারী চীৎকার সুরু করে দিয়েছে। হুমকী দিয়েছে—ভারত থেকে উদ্বাস্তু পাকিস্তানের মাটিতে প্রবেশ করলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতের কাছ থেকে ভূমি দাবী করতে তাঁরা কসুর করবেন না।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এলাকা থেকে দণ্ডকারণ্যের মানা শিবির পর্যন্ত পাকিস্তানের জল্লাদদের হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানবতার আকুল আর্তনাদ উঠেছে। প্রায় দু'লক্ষ নরনারী এর মধ্যেই ভারতে প্রবেশ করেছে। আগামী বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গতিতে সংখ্যালঘুরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসবে। বর্ষা সমাগমের পর যাতায়াতের অসুবিধায় এই গতিধারা কিছুটা শ্লথ হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, জুন মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষের কাছা-কাছি ছিন্নমূল মানুষের ভিড় হবে ভারতের মাটিতে। ভারত সরকার এঁদের পুনর্বাসনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। কিন্তু কোন উপায়েই আগত ভাই-বোনেদের বাংলায় রাখা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন যে-তিনটি জেলাকে ফিরিয়ে পাওয়ার দাবী হাবড়ার সম্মেলনে হয়েছে তা' কার্যকর করতে পারলে উদ্বাস্তুদের ঘরছাড়া হয়ে অপর রাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে না। পাকিস্তান আগেভাগে যে জিগির তুলেছে, ভারতের পক্ষ থেকে সে প্রশ্নটি তোলা অযৌক্তিক নয়। এ প্রশ্ন সেদিন দিল্লীর সাংবাদিক মহল শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে তুলেছেন। শ্রীশাস্ত্রী প্রশ্নটির সরাসরি কোন জবাব দেন নি। তিনি বলেছেন, এসব বিষয়ে পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বিবেচনা করতে পারেন। আসন্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ বিষয়টি উত্থাপন না করলে ভারত সরকার ভুল করবেন বলেই আমরা মনে করি।

পাকিস্তানের গুপ্তচরদের চক্রান্ত-জাল যে-হারে দিনের পর দিন বিস্তার লাভ করছে, তার প্রতিরোধের জন্য যে-কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাকিস্তানী নাগরিকদের বে-আইনী প্রবেশ বন্ধ করা। এই রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলোতে পাকিস্তানের মুসলমানেরা তাদের আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের ঘরে এসে প্রথম কিছু দিন থাকে গা-ঢাকা দিয়ে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সেজে। এমনি করে পাকিস্তান গুপ্তচরের বেড়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে।

আসাম অপেক্ষা পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চল ঢের বড়। তা' ছাড়া, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন দপ্তরে, এমন কি, প্রতিরক্ষা দপ্তরে পর্যন্ত পাকিস্তানী নাগরিকরা খোশ মেজাজে ও বহাল-তবিয়তে দিন কাটাচ্ছেন। কাজেই পশ্চিম বাংলার সমস্যা সমধিক। ভারত সরকারের এ রাজ্যের সীমান্ত-এলাকা সম্পর্কে অবিলম্বে নজর দেওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন হলে সীমান্তের কিছুটা এলাকা জনবসতিশূন্য এবং সীমান্তবাসীদের জন্য পরিচয়-পত্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা উচিত হবে। এতে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন যেখানে সেখানে ব্যক্তিগত অসুবিধা মাথা পেতে নিতে কোন দেশের নাগরিক কুণ্ঠা-বোধ করতে পারেন না।

আজ পাকিস্তানে ধর্মীয় উন্মাদনার বিকারে যে-নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—তার জন্য দায়ী পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসুক, এ কামনা ভারত করে না। কাজেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রস্তাবটি খুব যুক্তিসহ বলে আমরা মনে করি না। পূর্ব পাকিস্তানে এখনও ৯০ লক্ষ সংখ্যালঘু রয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ এতে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

**কুচবিহার :**

উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন সংস্থার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কুচবিহার। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ পথগুলিতে স্টেট বাস চলাচল করে।

বর্তমান বাসগুলি মেরামতের অভাবে প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁচেছে। গুরুত্বপূর্ণ পথগুলিতে স্টেট বাস চলাচলের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, যাত্রীর চাপ বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ পথ ভ্রমণে এক অমানুষিক অত্যাচার যাত্রীদের নিরুপায় অবস্থায় সহ্য করতে হচ্ছে।

পথিমধ্যে যে কোন বাসের 'ব্রেক ডাউন' ঘোষণা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে যাত্রী সাধারণের কি দুর্দশা ঘটে তা সহজেই অনুমেয়।

রেলপথের অভাবে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে মালদহ-মাণিকচক পথে যাত্রিগণ কলকাতায় যাতায়াত করে থাকেন। পথে ৫।৭ বার ওঠা-নামা দৌড়ঝাঁপ করে কলকাতায় যেতে হয়। অথচ কোথাও একটিও স্টেট বাস স্ট্যাণ্ড নেই। গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার ওপর নিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে অসহায় যাত্রী বাসে চড়েন। বাস স্ট্যাণ্ড যখন নেই, তখন বিশ্রামা-গারের জন্য আবেদন জানান একে-বারেই নিষ্ফল। যাত্রী সাধারণ আজ একমাত্র এই কথাই বোঝে যে, নিরুপায় অবস্থার মধ্যে অধিক ভাড়া দিয়ে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ কি সরকারের কাছে এই দুর্ভোগ দূরীকরণের কোনো আশাই করতে পারে না?

# লন্ডনের চিঠি

রেমিংটন কোম্পানীর অত্যন্ত আধুনিক ধরণের টাইপ রাইটার তৈরি করার কারখানা হিলিংটনে। বৃটেনের সর্বত্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য টাইপ রাইটার যন্ত্র এখানে তৈরি হয়।

## অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

## সাহিত্যিক অনুশীলন

রাজশেখর বসুর হাতের লেখা ছিল অতি সুন্দর। প্রতিটি অক্ষর সুগোল, সুডৌল আর অত্যন্ত পরিপাটি। তাঁর বাংলা লেখার মধ্যে কোন শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ কাটতে হলে তিনি তা মূল রচনা থেকে একেবারে কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দিতেন এবং নতুন এক টুক্‌রো কাগজে বিকল্প শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশটি লিখে, সেই টুক্‌রো কাগজ কাটা জায়গায় আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলতেন, 'আমি তো লেখক নই, লেখার মিস্ত্রী।' লেখার মিস্ত্রী বৈকি, প্রেসের কম্পোজিটরের মতো প্রতিটি অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে দাঁড় করাতেন। হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর হওয়া লেখকের অবশ্যই একটা মস্ত অবলম্বন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের লেখা ছিল খুব খারাপ, 'প্রবাসী' প্রেসের কম্পোজিটররা পড়তে পারতেন না। ঐ প্রতিষ্ঠানের দুই-একজন পুরানো কর্মচারী এখনো হয়তো তার সাক্ষ্য দেবেন। সুরেশ সমাজপতির হাতের লেখা ছিল আরো খারাপ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি পৃষ্ঠা লিখে সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরো পৃষ্ঠাটি স্পষ্টতর হস্তাক্ষরে কপি করে নিয়ে তবে অন্য পৃষ্ঠায় আবার লেখা সুরু করতেন। মাইকেল মধুসূদন কদাচিৎ স্বহস্তে বাংলা লিখতেন। মুখে বলে যেতেন, সংস্কৃত পণ্ডিত মশাইদের দিয়ে কপি করাতেন। অবশ্য মাইকেল তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন অন্য কারণে, নিজ হাতে বাংলা লেখায় তিনি খুব অভ্যস্ত ছিলেন না বলে। আর রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা? অতুলনীয়, অনবদ্য। যে-কোন বাঙালী পাঠকই রবীন্দ্র-হস্তলিপির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত।

এ দেশের লেখকরা এ যুগে কিন্তু কেউ প্রায় হাতে লেখেন না। চিঠিপত্রও কদাচিৎ হাতে লেখেন। একমাত্র অটোগ্রাফ দেওয়া ছাড়া এ দেশের লেখকদের আজকাল স্বহস্তে লেখার প্রায় চর্চাই নেই। প্রকৃতই নেই। কি ভাবে লেখেন তাঁরা তা হলে গল্প উপন্যাস কবিতার বই? খুট খুট খুট টাইপ রাইটার? নিজস্ব সেক্রেটারী যে সব লেখক বা পত্রিকা সম্পাদকের নেই, তাঁরা টাইপ রাইটারে দরকারী চিঠিপত্র বা অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লেখালেখি টাইপ করে থাকেন। কিন্তু ঠিক সাহিত্যিক রচনা যা, তা আজকাল এ-দেশের লেখকরা রচনা করে থাকেন টেপ রেকর্ডারে। মুখে বলে যান, রচনা করে যান প্রাণ যা চায়, তাই, সঙ্গে সঙ্গে তা তোলা হয়ে যায় টেপ রেকর্ডারে। তারপর সেই টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে বাজিয়ে অন্তত দুই-তিনজন শ্রুতিলিখন দ্রুত লিখনক্ষম লিখিয়ে টাইপ রাইটারে টাইপ করে রচনাটি লেখকের সামনে পেশ করে। লেখক মশাই তখন একবার দুইবার তিনবার চারবার, প্রয়োজন বোধে পাঁচবার ছয়বার করে সেই মূল লেখা বা কাঁচা লেখা পড়ে পড়ে, তা রিভাইজ করে, কেটে ছেঁটে চূড়ান্ত লেখা বা পাকা লেখা দাঁড় করান।

এ দেশের এখনকার কালের কবি ও সাহিত্যিকরাই যে শুধু টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করে থাকেন, তাই নয়, দ্রুত লিখনক্ষম কাউকে দিয়ে সাহিত্যিকের রচনার বিষয়বস্তু লিখিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ এ দেশে অনেক বছর ধরেই চলছে। এ দেশের, বিশেষ করে আমেরিকার কোন কোন সাহিত্যিক সমাজে গত পঞ্চাশ বছর ধরেই এই চর্চা চলছে। এ দেশের অনেক কথাশিল্পীর আবার ধারণা হ'ল মুখে বলে বলে লেখাতে গেলে রচনার স্বাদ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্ট হতে পারে, মনের কথা, মনের ভাব একাগ্রচিত্তে কাগজে-কলমে নিজে নিজে লিখতে না পারলে লেখা ঠিক জমে না।

এক্ষেত্রে অবশ্য বিভিন্ন কথাশিল্পীর বিভিন্ন মত। এ দেশে আর এক জাতের কথাশিল্পী আছেন, যাঁরা ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নের ঘোরে অর্থাৎ ঘুমুতে ঘুমুতে পুরো গল্পটি বা গল্পের পুট অথবা গল্পের আরম্ভ কিংবা শেষটুকু বলে যান; কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত থাকেন, রাত জেগে জেগেও অনেক সময় প্রস্তুত থাকেন, কথাশিল্পীর সেক্রেটারী বা অন্য কোন 'কমিশনড' ব্যক্তি—ঘুমিয়ে থাকা কথাশিল্পীর যখন মুখ খোলে তখন সেই ব্যক্তি লিখতে আরম্ভ করে। এ দেশের কোন কোন কথা-শিল্পী আবার রাত্রিতে নয়, দিনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ দিবা-স্বপ্ন দেখতে দেখতে গল্প লিখে থাকেন, অর্থাৎ গল্প বা গল্পের পুট মুখে বলে যেতে থাকেন। দিবা-স্বপ্ন দেখা অবস্থায় সাহিত্যিকের গল্পও যে অনেক সময় কত অসা-ধারণ গল্প হয়ে ওঠে তারই একটি নমুনা নীচে পেশ করা হল:

ষ্টকহোম ছাড়িয়ে ওয়্যাক্সহোম পেরিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে অগুণতি ছোট বড় দ্বীপ। কোলাহল নেই, সভ্যতার কলরব নেই, শুধু ঢেউ, বালি, পাহাড় আর পাইন বনের মাঝখানে প্রকৃতির নগ্ন নির্জন রূপ। এই রকম একটি জন-মানবশূন্য দ্বীপের পটভূমিকায় একটি অতি-প্রাকৃত ভালোবাসার আশ্চর্য কাহিনী আছে এই গল্পটিতে।

মিঃ ম্যালোনি, মিসেস ম্যালোনি, তাঁদের সুন্দরী মেয়ে জোয়ান, ক্যানা-ডার এক যুবক ছাত্র পিটার স্যাংগ্রি আর পরিবারবন্ধু মিঃ হাবার্ড—এই পাঁচজনের একটি দল ছুটি কাটাতে এল একটি ছোট দ্বীপে। স্বাধীনতার খোলস আপনি খসে পড়ে, অবদমনের আবরণ ভেদ করে আদিম প্রবৃত্তি বন্যবেগে উৎসারিত হতে চায়—এমন জায়গা সেই নির্জন দ্বীপ।

সুন্দরী জোয়ানকে শহরের পরি-বেশের মধ্যে মনে হত কেমন যেন বেমানান, কেমন যেন খাপছাড়া, আর এই নির্জন দ্বীপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানের সহজ সৌন্দর্য বন্য তরুর মত বিকশিত হয়ে উঠলো। জোয়ানকে ভালোবাসলো স্যাংগ্রি। স্যাংগ্রির তীব্র ক্ষুধাতুর আর্ত প্রেমের দৃষ্টি জোয়ানের চৈতন্যকে ছায়ার মত অনুসরণ করে ফিরতে লাগল। প্রথম রাত্রেই মিঃ হাবার্ডকে জোয়ান বলল—আমাকে কখনও এ ছেলেটির সঙ্গে একলা ছেড়ে দেবেন না, আমার ভীষণ ভয় করে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে একদিন সকালে জোয়ান বলল—কাল রাত্রে আমি কুকুরের ডাক শুনেছি। প্রথমে কেউই জোয়ানের এ কথা বিশ্বাস করতে চাইছিল না, কেন না সমস্ত দ্বীপে কুকুর তো দূরের কথা একটা বাচ্চা খরগোস পর্যন্ত নেই: সবাই মিলে কয়েক বার করে সমস্ত দ্বীপটি পূর্বেই পরিক্রমা করে এসেছিল। কিন্তু যখন জোয়ানের তাঁবুর কাছে কুকুরের পায়ের দাগ স্পষ্ট-ভাবে দেখা গেল, তখন আর কারোরই সন্দেহ করবার উপায় রইলো না। ঐ একই ধরণের কুকুরের পায়ের দাগ আবার স্যাংগ্রির তাঁবুর কাছেও দেখা গেল। স্যাংগ্রি বলল—কুকুরটা আমার কাছেও এসেছিল তা'হলে, আমি মড়ার মত ঘুমোই, কিচ্ছু টের পাই নি।

এর পর একদিন রাত্রে জোয়ানের তাঁবু ছিঁড়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল জন্তুটা। তার পর দিন রাত্রে মিঃ হাবার্ড হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখতে পেলেন, স্যাংগ্রির তাঁবুটা নড়ছে, দুলছে। খানিকক্ষণ বাদেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল স্যাংগ্রি নয়—একটা জন্তু, একটা অদ্ভুত অবাস্তব জন্তু। জন্তুটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মিঃ হাবার্ড দৌড়ে স্যাংগ্রির তাঁবুতে গিয়ে দেখলেন—অঘোরে ঘুমোচ্ছে স্যাংগ্রি, সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে দুমড়ে কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে। অনেক-বার করে নাড়া দিয়ে স্যাংগ্রিকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন মিঃ হাবার্ড। তাঁবুর দরজায় একটা ছায়া পড়ল। মিঃ হাবার্ডের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল—জন্তুটা ফিরে এসেছে। স্যাংগ্রির ওপর লাফ দিয়ে পড়ল জন্তুটা, তারপর যেন ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল। একটা ঝাঁকি দিয়ে জেগে উঠল স্যাংগ্রি। মিঃ হাবার্ড বুঝলেন, বন্দুকের কর্ম নয়, এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন একমাত্র তাঁর অতি-প্রাকৃত বিশারদ এক ডাক্তার-বন্ধু।

ডাক্তার-বন্ধুর কাছে খবর পাঠালেন মিঃ হাবার্ড। তিনি এলেন। তিনি সমস্ত কাহিনী শুনে বললেন, এ কুকুর নয়, মানুষের কামনাশরীর। যাদের দেহ তত জোরালো নয়, অথচ অনুভূতি তীব্র, তাদের স্থূল দেহ থেকে এই দ্বিতীয় শরীর কখনো কখনো বেরিয়ে পড়ে। মানুষ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় ঘটনা খুবই বিরল হয়ে এসেছে। কিন্তু তেমন তেমন পরিবেশে ঘটে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়—বুনোদের মধ্যে এ ধরণের ব্যাপার প্রায়ই ঘটে থাকে।

মিঃ ম্যালোনি বললেন—আপনাকে আমার একটা কথা জানানো উচিত। স্যাংগ্রি ছেলেটির শরীরে শুনেছি রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে।

অতিপ্রাকৃত বিশারদ ডাক্তার বললেন—এই অতিপ্রাকৃত ব্যাধি সারানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল, যা'কে সে চায়, তার কাছে তাকে—

ডাক্তারকে বাধা দিয়ে মিঃ ম্যালোনি বললেন—কি বলতে চান? তবে কি, জোয়ান?

হ্যাঁ, জোয়ান—বললেন ডাক্তার।

কুয়াশা ঢাকা কালো রাত। মেয়েদের তাঁবুর দিকে মিঃ ম্যালোনিকে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তার মিঃ হাবার্ডকে সঙ্গে নিয়ে স্যাংগ্রির তাঁবুর সামনে দাঁড়ালেন। জন্তুটা বেরিয়ে এল—চোখমুখ অবিকল স্যাংগ্রিরই মত, শুধু জন্তুর রূপে রূপান্তরিত। ডাক্তার ভদ্রলোক কোমলকণ্ঠে বললেন—স্যাংগ্রি, স্যাংগ্রি, আমাকে চিনতে পারছো? ইস বেচারা। এই কথা

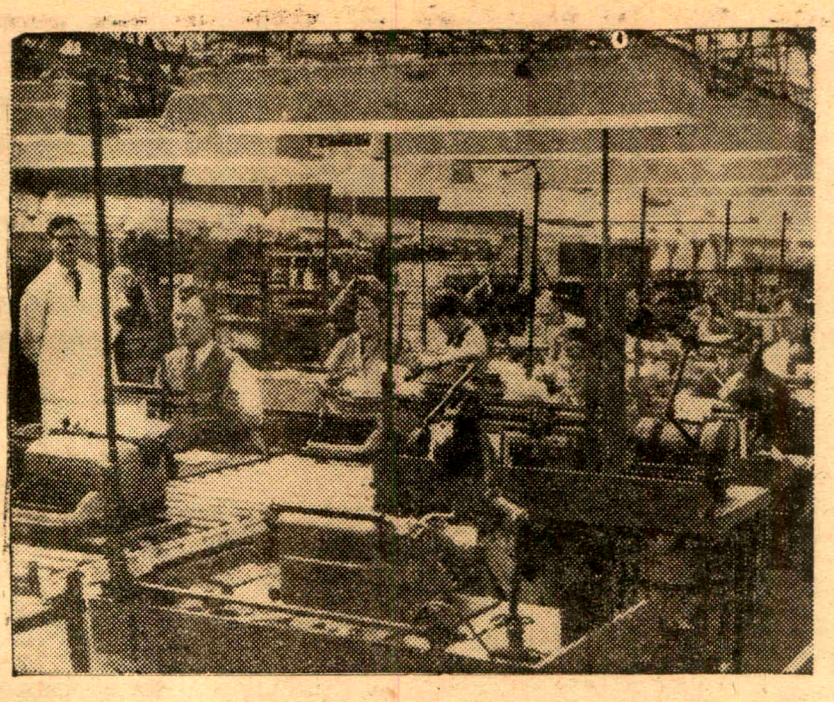

● কথাশিল্পীদের জন্য বিশেষ ধরণের শব্দহীন টাইপ রাইটার তৈরি করার কারখানার অভ্যন্তর ভাগ। কারখানাটি গ্লাসগো-তে।

শুনে জন্তুটা আর্তনাদ করে উঠল। সে আর্তনাদ একই সঙ্গে জন্তুর আর মানুষের। তার পরই শোনা গেল অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে আর একটি মিষ্টিমধুর তীক্ষ্ণ ডাক। ডাক্তার বললেন—ঐ শোনো, জোয়ান তোমার কথার উত্তর দিচ্ছে।

সমুদ্রের ধারে উন্মুক্ত জায়গাটিতে দৌড়ে গেলেন দুজনে। জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—তন্দ্রাসম্মোহিত, ঠোঁটে অপূর্ব স্মিত হাসি, সারা মুখ সেই হাসির ছটায় আলো হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার বললেন—ওরা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে, ওরা দুটিতে মিলে এক সত্তা। ওদের চেতন মনে, স্বাভাবিক সহজ মনে এই বোধটুকু এলেই স্যাংগ্রির ব্যাধি সেরে যাবে।

ওঁদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে জোয়ানের কাছে এগিয়ে গেল স্যাংগ্রির দ্বিতীয় শরীর, জোয়ান মাথাটি তুলে ওর দিকে এগিয়ে এল, ঠিক সেই মুহূর্তে সমুদ্রের ধারে ক্যানোর ওপর দাঁড়িয়ে উঠে 'জোয়ান, সরে যা, লেগে যাবে' —এ কথা বলতে বলতে পিস্তল ছুঁড়লেন মিঃ ম্যালোনি, লাফ দিয়ে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল স্যাংগ্রির সূক্ষ্ম দেহ, জোয়ান চোখ খুলে বিহ্বলভাবে চারিদিক তাকিয়ে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল, স্যাংগ্রির তাঁবু থেকে প্রত্যুত্তর এল করুণ আর্তনাদে। ডাক্তার গর্জন করে উঠে মিঃ ম্যালোনিকে বললেন—ছেলেটাকে জখম করলেন আপনি? একটু তর সইলো না। নির্বোধ---।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অসুস্থ স্যাংগ্রির তাঁবুতে ওর বিছানায় বসে বসে আধো ঘুমে ঢুলছিলেন মিঃ হাবার্ড। উষালগ্নে তাঁবুর দরজায় দেখা দিল জোয়ানের মূর্তি। সেই মুহূর্তে বিছানায় উঠে বসল স্যাংগ্রি, চীৎকার করে উঠল, 'জোয়ান জোয়ান।'

জোয়ান বলল—আমি এসেছি, চিরদিন তোমার সঙ্গে থাকব।

—জানতাম তুমি নিশ্চয় আসবে একদিন, বলল স্যাংগ্রি।

—আমি প্রথমে তোমাকে বুঝতে পারি নি, স্যাংগ্রি—তোমার দিকে তাকালেই আমার ভীষণ ভয় করতো।

—এখন আর আমার ভেতর কোন কিছুকে তোমার ভয় করে?

—না, না, না, এখন আর কোন ভয় নেই আমার।----

* * *

টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে মুখে বলে বলে গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা সম্ভব হলে অথবা টাইপ রাইটারে লেখা সম্ভব হ'লে লেখকের এত বেশি সময় বাঁচে যে. ঐ সময়টা লেখক অনায়াসেই লেখার উৎকর্ষের জন্য, লেখার চমৎকারিত্বের জন্য কাজে লাগাতে পারেন। এ দেশে আজকাল তাই টাইপ রাইটার যে-কোন লেখকের নিত্য সঙ্গী। ফাউণ্টেন পেন-এর মতো টাইপ রাইটারও এ দেশের লেখকদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বিচিত্র ধরণের টাইপ রাইটারও আজকাল এ দেশে ও আমেরিকায় অনেক বেরিয়েছে।

রেমিংটন কোম্পানীর হালের উদ্ভাবন হ'ল শব্দহীন টাইপ রাইটার। কী বোর্ডের ওপর আঙুল বুলানোর মতো ক'রে হাতের আঙুল চালিয়ে গেলেই লেখা তৈরি। তারপর সেই লেখাকে লেখক যত খুশি, যেমন খুশি মেজে-ঘসে, কেটে-ছেঁটে দাঁড় করাতে পারেন। লেখকদের উপযোগী বিশেষ ধরণের টাইপ রাইটার—নানান মডেলের অত্যন্ত ছোটখাটো টাইপ রাইটার তৈরি করার জন্য রেমিংটন টাইপ রাইটার কোম্পানী অনেক নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটী বসিয়েছেন, সকল শ্রেণীর লেখক, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মতামত গ্রহণ করছেন। সেই সব মতামতের ওপর ভিত্তি ক'রে নতুন নতুন সব পরিকল্পনা করছেন। লেখার কাজে মস্তিষ্কের ব্যবহার ছাড়া অতিরিক্ত কায়িক শ্রম যা'তে বেশি না হয়, তার জন্য এ দেশের টাইপ রাইটার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচিত্র সব প্রয়াসের অন্ত নেই।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্র

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

রবিবার।

নৃপেন সমরের জন্য একখানা ভালো পালঙ্ক, একটা টেবিল, খান দুই চেয়ার ভাড়া করে দিয়েছে। পুরোনো মেসবাড়ির মায়া সমরকে পরিত্যাগ করতে হল।

জিনিষপত্র নিয়ে যখন সে নতুন বাড়িতে হাজির হল তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। নৃপেন বলেছে বিকেলে আসবে।

উপেন বলেছে সে সমরের খাবার দুপুরবেলায় নিয়ে যাবে। বাসনপত্রের পাট সমরের কোনদিনই ছিল না। ধীরে ধীরে সব করাতে হবে। উপেন বলেছে একটা চাকরও সে জোগাড় করে দেবে। সাথে বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা ট্যাক্সিতেই সব কিছু এসে গেছে।

খগেনবাবু সকাল থেকেই গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলেন। ভাড়াটের চেয়েও তাঁর যেটার বেশি প্রয়োজন সেটা হ'ল একজন সঙ্গী। লেডী কিংকং বোধ হয় বাড়ির ভেতর কাজ করছিলেন।

ড্রইংরুম থেকে অপরূপ মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছিল, 'সে কোন্ বনের হরিণ---'

খানিকক্ষণের জন্য সমর সত্যি যেন হকচকিয়ে গেল। সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না, এখন কি করতে হবে তাকে।

খগেনবাবু বাড়ির ভেতর থেকে গৃহিণীকে ডেকে বললেন, 'দেখো দেখো, একেবারে সাহেব মানুষ। দশটায় আসব বলে ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়ে এসেছেন সমরবাবু।'

সমর হাত তুলে দুজনকে নমস্কার করল। খগেনবাবু চাকরকে ডেকে জিনিষপত্রগুলো তার ঘরে তুলে দিতে সহায়তা করেন। ধীরে ধীরে সমর একটু একটু করে যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। খগেনবাবু সমরকে প্রায় জোর করেই হাত ধরে নিজের ড্রইংরুমে নিয়ে এলেন।

লেডী কিংকং খিল খিল করে হেসে বললেন, 'যাই বল তুমি, জামাই বড় লাজুক ছেলে।'

অরুণা তখনও অর্গান বাজিয়ে গান গাইছিল, 'সে কোন্ বনের হরিণ'---

সমর ঘরে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করল। জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলেন?'

খগেনবাবু বললেন, 'তুমি গান গাইছিলে খেয়াল কর নি। সমরবাবু অনেকক্ষণ হ'ল এসেছেন।'

অরুণা বলল, 'তাই নাকি? আমাদের কলেজে মেয়েরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করছেন। আমাকে গান গাইতে হবে। সেখানে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।'

সমরের লাজুক ভাব খানিকটা কেটে গেছে। সে বলল, 'আপনার কিসের পার্ট?'

অরুণা বলল, 'পার্ট? আমি অভিনয় করতে পারি না। শুধু ষ্টেজের পেছন থেকে গান গাইব। যাবেন বৌদিকে নিয়ে? আগামী শনিবার হবে।'

লেডী কিংকং বললেন, 'অত তাড়াতাড়ি কি বৌমা আসছেন? নৃপেনবাবু যা বলে গেলেন।' বলেই ফিক করে হেসে ফেললেন।

অরুণা ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ও। তাহলে আসতে দেরী আছে?'

সমরের কপাল দিয়ে ঘাম ছুটছিল। অতি কষ্টে বলল, 'আপনি কিন্তু বেশ গান করেন। ঘর সাজাতে সাজাতে আমরা আপনার গান শুনছিলুম। বেশ গলা।'

অরুণা লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'বৌদি নিশ্চয়ই গান করেন?'

এবার সমর বিপদে পড়ল। মাথা নীচু করে রইল।

খগেনবাবু বললেন, 'তা জানবেন বৈকি ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট ছেলের সাথে যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে সেও নিশ্চয়ই তেমনি গুণবতী।'

লেডী কিংকং বললেন, 'কি বলছো গো? শুধু কি গান? ভাণ্ডারহাটির মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়েরা সব এক একটি ডানা কাটা পরী। দেখো নি তো।'

খগেনবাবু বললেন, 'ভাগ্গিস ভাণ্ডারহাটি যাই নি। প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছিলাম। কি বল গো? জনাই তো কাছেই। সেখানকার পরীদের ডানা ও কাটা না?'

বলেই ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই প্রাণখোলা হাসিতে ঘরখানা স্নিগ্ধ করে দিলেন।

অরুণা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনি বুঝি ভাণ্ডারহাটিতে বিয়ে করেছেন। বৌদিকে নিশ্চয়ই দেখতে খুব সুন্দর?'

সমর একটু মৃদু হাসলো। কোন জবাব দিল না। সমরের লাজুকতায় লেডী কিংকং খিল খিল করে হেসে ফেললেন। মনে হল যেন আটটা মটকার জল এক সাথে কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

খগেনবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে সমর দুপুরবেলা তাদের সাথে আহারাদি করল।

বিকেলবেলা আবার নৃপেন আসবে। নৃপেন না হলে তার একটি দিনও কাটতে চায় না। আবার নৃপেনের কাজে কর্মে তার ভয়ও করে যথেষ্ট। কে জানে আবার কবে নৃপেনের জন্য তাকে কারাবরণ করতে হয়? সমর সত্যবাদী ধর্মভীরু আদর্শবাদী সরল যুবক। নৃপেন অসৎ নয়। সে আদর্শবাদী নয়।

সন্ধ্যার সময়ে নৃপেন এসে হাজির। হাতে কিছু কাগজ, বইপত্র। ঝড়ের মতন গেট খুলে প্রবেশ করল। অরুণা বারান্দায় পায়চারি করছিল। তাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'সমর আছে বাড়িতে?'

—'আছেন বোধহয়।

সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম করে ওপরে গিয়ে উঠলো। সমর একখানা বই পড়ছিল। সে একটু নার্ভাস টাইপের ছেলে। নৃপেনের কাণ্ডকারখানায় সে একেবারে হকচকিয়ে গেছে।

—'এসো নৃপেনদা, কানাই বলাইকে আনলে না?'

—'না রে, প্রথম প্রথম একটু সাবধানে থাকাই ভালো। খগেনবাবু ভালো লোক। তবুও একগাদা জোয়ান ছেলের হৈ হল্লা বরদাস্ত নাও করতে পারেন। বুঝলি না। একি দুপুরবেলা খাস নি। খাবার দেখছি সব পড়ে রয়েছে।'

—'না দুপুরবেলা খগেনবাবুবাই খাওয়ালেন। যাই বল নৃপেনদা, ঐ মেয়েটাকেই আমার সবচেয়ে ভয়। কথায় কথায় কেবল জিজ্ঞাসা করে তার বৌদির কথা।'

মুচকি হেসে নৃপেন বলল, 'তুই কি জবাব দিস? নিশ্চয়ই তোর চোখ কান মুখ লাল হয়ে যায়। যাক গিয়ে লেডী কিংকংকে এমন জবাব দিয়েছি যে অন্তত ছ' মাসের জন্য সে এখন তোকে ও প্রশ্ন নিয়ে জ্বালাতন করবে না।'

সমর একটু ভীত হয়ে পড়ে। 'তারপর যখন সত্যিকার ব্যাপারটা ধরা পড়বে?'

—'ততদিনের ভেতর একটা সমাধান নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।' বলে নৃপেন দুষ্টুমির হাসি হাসে।

সমর বলল, 'যাই বল নৃপেনদা, এটা কি ভালো হবে?'

নৃপেন বলল, 'তোমার আপ্তবাণী শুনতে আমি এখানে আসি নি। একটা প্রকাশকের সাথে তোমার বই প্রকাশের কথাবার্তা বলে এসেছি। বই লেখা সুরু করে দাও। এই তো বেশ দক্ষিণের জানালা রয়েছে দেখছি। দক্ষিণ সমীরণ, নব বসন্তের কোকিল, প্রিয়তমার মধুচুম্বন এই কথাগুলো যেন থাকে তাতে। যৌন আলোচনাটাই একটু বেশি রেখো। তাহলে বই-এর বেশি কাটতি হবে।'

বেশ সুন্দর বাঁধানো একটা খাতা দিয়ে নৃপেন বলল, 'আজ রাতেই সুরু করে দে। বলা যায় না প্রকাশকের মত বদলাতে পারে। তাকে বলেছি ম্যানাসক্রিপ্ট তৈরি। লেখক বিরাট স্কলার। কিছুদিন হল গত হয়েছে। প্রকাশকরা এমনিতেই সাহিত্যিকদের ফাঁকি দিতে চায়। তার ওপর সে গত হয়েছে শুনলে তো ঝামেলাই গেল। তাছাড়া পাঠকরাও তাহলে একটু সমবেদনা দেখায়। বাংলা দেশ মৃত সাহিত্যিকের সম্মান দিতে জানে। জীবনে যাকে তারা মালা দেয় না, মরণে তাকে ঠিক ফুলে ঢেকে দেয়। তারা ছাপুক বা না ছাপুক তোকে এ বই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এতগুলো বই দিয়ে গেলাম। অন্তত পাঁচখানা বই-এর মাল-মসলা এতে যেন হয়ে যায়।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নৃপেন সমরকে বই লেখার তালিম দেয়। নৃপেন হঠাৎ খানিকটা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অন্য ব্রুণ্টের খবর কি? বলি, অরুণা কি বলে?'

সমর নাক মুখ কান লাল করে সরম রক্তরাগে কনে বৌটির মতন বলল, 'যাঃ। কি যে বল নৃপেনদা?'

(ক্রমশঃ)

সুশীল রায়

# অনলআয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

ভোর হয়ে এসেছে। ফাল্গুনের হাওয়া দিয়েছে ঝাউ আর পাকুড় গাছের মাথায়। সেই বাতাসের উষ্ণ এসে পৌঁচচ্ছে এখানে। পাখাপুলার টেনে চলেছে পাখা।

আর একটা গান গাইবার জন্যে অনুরোধ উঠল চারধার থেকে। চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দাসীরা, গিন্নিমা ও দিদি-বৌদিদের হয়ে তারা অনুরোধ জানাল যজ্ঞেশ্বরীকে।

রাম বসুর পাশে বসে যজ্ঞেশ্বরী জিজ্ঞাসা করল, কি গাইব বল। এখন তো মনে পড়ছে না আর কিছু।

—এঁদের যা পছন্দ সেইরকম গাও একটা। এতক্ষণ বিরহের গান গাইলে, এবার একটা মিলনের গাও।

তাই। ঠিকই বলেছে রাম বসু। গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল যজ্ঞেশ্বরী। গুন্‌গুন্‌ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, বিরহের গান গেয়ে আপনাদের অনেকের মনে দুঃখ দিয়েছি হয়তো। আমার যিনি প্রাণসখা তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন—

যজ্ঞেশ্বরীর কথা চাপা দিয়ে উচ্চহাস্য করে উঠল হল-ঘরের প্রত্যেকে একসঙ্গে, যজ্ঞেশ্বরী হেসে বলল, তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন একটা মিলনের গান গাইতে। তাঁর কথা-মত আমি গাইছি। সখার সঙ্গে দেখা নেই, সখী তাই কাতর। হঠাৎ একদিন এক শুভক্ষণে সখীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন সখা, সখী তাই দুঃখ জানিয়ে বলছেন—হঠাৎ যদি এখানে এসেছ সখা, তাহলে দুটো প্রাণের কথা শুনে যাও।

কোমরে কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিল যজ্ঞেশ্বরী, নথটা ঠিক করে নিল, তাকাল চারদিকে, আসরের মানুষদের চোখমুখের ভাব বুঝি দেখে নিল একটু, তারপর সুর ধরল, গুন্‌গুন্‌ করতে করতে গাইতে আরম্ভ করল—

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি
প্রাণ।
আমায় বন্দী করে প্রেমে
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ-আশ্রমে।

তারযন্ত্র বেজে যেতে লাগল করুণ কান্নার মত ধ্বনি তুলে, যজ্ঞেশ্বরী পুনরায় আরম্ভ করল—

আমি কুলবতী নারী
পতি বই আর জানি নে
এখন অধিনী বলিয়ে
ফিরে নাহি চাও
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ পরের ধন
আগুলে বেড়াও।

চিকের আড়ালে সালঙ্করা রাধা চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করল, কি; কি বলল যেন কথাটা?

চাঁপা বলল, ওই শোনো।

যজ্ঞেশ্বরী গাইতে লাগল—

নাহি চেন ঘর-বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও
রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্যে না
কুলাও।
তোমার মন হল বা'র-বাগে
গেল জন্মটা ঐ পোড়া-রোগে
আমার সঙ্গে দেখা দৈবাৎ যোগে,
কথা কহিছ আমার সনে
মন রয়েছে সেখানে
প্রাণ-মনে কর, সখা,
পাখা পেলে উড়ে যাও।

রাধা বলল, আশ্চর্য। এ কার কথা বলে গাইছে ঐ কবিষালনী। ও এত জানল কি করে চাঁপা?

যজ্ঞেশ্বরীর গান থামে নি, সে গেয়ে চলেছে—

নাহি চেন ঘর-বাসা, কি বসন্ত
কি বরষা।
সতীরে করে নিরাশা
অসতীর আশা পুরাও

খুব জমে উঠেছে আসর। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে এক মনে কান পেতে শুনছে ঐ গান—

সতীরে করে নিরাশা
অসতীর আশা পুরাও।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে রাধারাণী। তার মনে হচ্ছে তার জবানিতে যজ্ঞেশ্বরী এ-আসরে বলে গেল এত কথা। ঐ একটা কথা মনে বড় গেঁথে বসেছে রাধার, অসতীর আশা পুরাও।

চুচুড়ার আকাশে ডেকে উঠেছে ভোরের পাখি। মুক্তপক্ষে তারা উড়ে বেড়াচ্ছে ডাল থেকে ডালে। তাদের পাখায় নতুন আলোর উল্লাস এসে ছড়িয়ে পড়েছে, হয়তো এই জন্যেই তাদের গলায় এমন অনাবিল কূজন উঠেছে মুখর হয়ে।

পিঞ্জরের পাখি যারা তাদের পাখায় কোনো বন্ধন নেই বটে, কিন্তু মুক্তপক্ষ বিচরণে বাধা অলঙ্ঘ্য। ঐ বাধা লঙ্ঘন ক'রে পিঞ্জরার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে উদার দিগন্তে পাখা মেলে দেবার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কে বেঁধেছে ও-গান?

চাঁপা বলল, কে জানে। ওর নিজেরই বাঁধা নিশ্চয়।

গান থেমেছে যজ্ঞেশ্বরীর, গান থামিয়ে সে বলল, একটাও মিথ্যে কথা নেই বাবু এ-গানে। অনেক দেখে অনেক জেনে তবেই বেঁধেছি এ-গান।

চাঁপা বলল, ঐ শোনো। ওই বেঁধেছে এ-গান।

গলার তেনরী খুলে রাধা বলল, এটা রাখো চাঁপা, সকালে ওরা যখন নৌকোয় উঠবে ওকে দিয়ে এস। কে দিয়েছে বলার দরকার নেই। বলো, কোনো একজন তাকে ভালোবেসে দিয়েছে এটা।

তেনরীটা চাঁপা তার হাত থেকে নিয়ে বলল, আচ্ছা।

আসর ভাঙতে সুরু করেছে। রূপনারায়ণ বসেই আছে, আলবোলার নল ঠোঁটের সঙ্গে স্পর্শ করানো। কিছু চিন্তা করছে নাকি ও?

রাধা নিজের ঘরে চলল, একটা সাধ পূর্ণ হল তার। কিন্তু তার জীবনে সাধ একটাই না।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে মনে মনে সে গাইতে লাগল—

সাধি চেনা ঘর-বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও
রাজ্যে থেকে ভায়ের প্রতি কার্যে না কুলাও।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ বৌদি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাধা বলল, অদৃষ্টের কথা।

## অষ্টম স্ফুলিঙ্গ

নতুন ঢেউ উঠছে হুগলীতে। নতুন উল্লাস, নতুন আনন্দ, কখনো-বা নতুন বেদনা। আবার সে-ঢেউ প্রবল বাতাসের আলিঙ্গনে ভেঙে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। নতুন জোয়ারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে উভয় কূল।

কোন্ সুদূরে আছে সেই বঙ্গ-সাগর, কোন্ গ্রহের বিপুল আকর্ষণে স্ফীত হয়ে ওঠে সে, তার সেই আনন্দ একা উপভোগ করতে বুঝি সাধ হয় না তার, তাই আনন্দকে সে ছড়িয়ে দেয় জোয়ারের রূপে। সাগর সংগমের দেশ থেকে সেই আনন্দ ক্রমে ক্রমে এসে ছড়িয়ে পড়ে চুঁচুড়ার এই কিনারে। ছলছল করে ওঠে জল।

আনন্দকে বিতরণ করে দেওয়া যায়; কিন্তু দুঃখ বড় বেয়াড়া জিনিষ, একে বিলি করে দেওয়া যায় না পাঁচজনের মধ্যে। বুকের মধ্যে চেপে বসে থেকে কেবলই এ যেন জানায়—এমন দুঃখ আর কারো নেই, এমন দুঃখী আর কেউ নেই ত্রিসংসারে। দুঃখটা তাই আপনজন, কিন্তু সুখ যেন সর্বজনীন। জিজ্ঞাসা কর কোনো সুখী লোককে, সে বলবে পৃথিবীর সকলেই তার মত সুখী; জিজ্ঞাসা কর কোনো দুঃখী লোককে, সে বলবে পৃথিবীতে তার মত দুঃখ কারো নেই।

রাধারও এই রকম ধারণা। তার বিশ্বাস, তার মত দুঃখী আর নেই কেউ। রাজরাণীর মত ঐশ্বর্যের মধ্যে বসেও সে কাঙালিনী।

রাধার দুঃখকে ক্ষুদ্র করে দেখার ইচ্ছে আমাদেরও নেই, তাই যদি থাকবে তা হলে রাধার কাহিনী নিয়ে আমরা এতটা বিব্রত হয়ে আছি কেন।

মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধ চুঁচুড়াকে উচ্চকিত করে ভেসে আসে হাহা রব। প্রায়ই আসে, কিন্তু আজ ঐ আর্তনাদ একটু বেশি যেন প্রবল বলে বোধ হল রাধার।

উঠে বসল সে বিছানায়, ডাকল, ওরে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী রে।

সাড়া না পেয়ে ডাকল, এত অকাতরে, ঘুমাচ্ছিস তোরা? ওরে ও সরস্বতী ঐ যে কেঁদে-কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে, কি হল রে ওর?

সুউচ্চ প্রাচীরের আড়ালে সুরম্য প্রাসাদের অন্তরালে সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে দিন যাপন করলে সকলের খবর রাখা যে দায়।

লক্ষ্মী জেগেছে, বিরাট ঘরের একপ্রান্তে অনুচ্চ চৌকিতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল সে, বলল, কি বৌদিমণি? কি হল?

—কিছু না। শুনছিস ঐ কান্না; কে কাঁদে রে?

অনেকক্ষণ যেন কান পেতে বসে রইল লক্ষ্মী, বলল, কি জানি বৌদিমণি। ঠিক তো বুঝতে পারছি নে।

বুঝতে পারছে না, বোঝার কোনো চেষ্টাও বুঝি নেই। কিন্তু ও-কান্না বেশি দূর থেকে আসছে না, এই বারবাড়ির প্রাচীরের ওপাশের ঐ যে ক্ষুদ্র গৃহটি, এ কান্না আসছে সেখান থেকে।

ভাসিনী কাঁদছে।

পরদিন চাঁপার মুখ থেকে শুনেছে রাধা। সব বৃত্তান্ত শুনেছে মনোযোগ দিয়ে, শুনে বলেছে, বেকুব। নির্বোধ।

চাঁপা বলল, বুদ্ধি সব সময় ঠিক থাকে না বৌদি। হয়তো মানত করেছিল মনে-মনে। সে মানত রক্ষা করেছে, কিন্তু দেবতারা যে এমন বেইমান হবে কে জানবে বল।

জলচৌকির ওপর বসে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে আলতা পরছে রাধা, বলল, ওকে ডেকে আনা যায় না রাধা? ওকে একবার দেখব।

—তা আর আনা যাবে না কেন। দুঃখী মানুষ ওরা, কোথাও একটু সান্ত্বনা পাবে শুনলেই ছুটে আসবে।

সেদিন বিকালেই ছুটে এল ভামিনী। মোটাসোটা শরীর, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে বড় জোর। পরণে আধময়লা শাড়ি, রুক্ষ চুল গড়িয়ে পড়েছে চোখে-মুখে।

নীচের বারান্দায় বসে মাছ কুটছিল দাসীরা। এই অলুক্ষুণে মেয়েকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখে যেন চমকে উঠল, নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগল, এই পুতখাগী ভাতারতাড়ানি মাগীটা আবার এ বাড়িতে ঢুকেছে কেন রে, হুঁদয়?

হুঁদয় পিক গিলে নিয়ে বলল, আমাদের বৌদির বুঝি হুঁদয়েশ্বরী হতে এসেছে। ব্যাটা ছেলে তো পেল না বৌদি, এখন বুঝি দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়। বেশ গোলগাল গড়ন আছে মাগীটার, বৌদির পছন্দ হবে নিশ্চয়।

ভবসুন্দরী কোথায় যেন গিয়েছিল, ফিরে এসেছে পরশু। সে কোন কথা বলল না, আড়চোখে চেয়ে রইল শুধু। কিছুক্ষণ বাদে মুখ খুলল, বলল, আবাগী মাগী, স্বামীর সোহাগ পাওয়ার লোভে পুত্র বিসর্জন দিল। ঠিক শিক্ষাই হয়েছে। স্বামী এখন ঠাণ্ডা নিয়ে—

রাধার ঘরে ঢুকে মেঝেয় ওপর বসে পড়ল ভামিনী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শুধু, বলল, কি উপায় হবে, কি করলাম আমি। কেন করলাম।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে চরাচর। কলকল্লোলের শব্দে জোয়ার এসেছে জাহ্নবীতে। সেই রাত্রের কথা বলতে লাগল ভামিনী। তার এক মাত্র পুত্র কোলে নিয়ে সে বেরিয়েছে পথে।

বলল, স্বামীকে পাই না, তাই স্বামীকে চাই; এ কি পাপ? হ্যাঁ, পাপ পাপ পাপ। আমি পাপ করেছি মা-ঠাকরুণ।

অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে ভামিনীর। বয়স তখন তার হয়তো দশ কিংবা এগারো। তার বাড়ি বল্লভপুরে, মাহেশের গায়েই। সেখানে বেশ সুখে ছিল সে, ঘুরে বেড়াত মাঠে-ঘাটে। তখন কখনো বুঝতে পারে নি যে তার জীবনে এমন কষ্ট আসবে কোনোদিন। হঠাৎ একদিন সে শুনল তার বিয়ে। চুঁচুড়ায় বিয়ে হবে তার। শুনে খুশি লাগল খুব। নতুন মানুষটার কথা ভেবে খুশি হল না, খুশি হল নতুন দেশটার কথা ভেবে। ভাবল, ইংরেজদের দেশ থেকে ওলন্দাজদের দেশে যাবে, কত মজা হবে। মনে হল, ওখানকার মানুষ বুঝি আলাদা রকমের, ওখানকার আদব-কায়দাও বুঝি অন্য ধরণের।

মাঝখান থেকে চাঁপা বলল, এখনো তো সেই ওলন্দাজদেরই দখলে আছে ও-জায়গা, আদব-কায়দা কি আর আলাদা হয়েছে? ইংরেজদের কলকাতাতেও যেমন, ফরাসীদের চন্দননগরেও যেমন, ওলন্দাজদের এ চুঁচুড়াতেও তেমনি।

তাই। সব তেমনি। সব জায়গার মানুষ ওই একই ধাঁচের। কোন তফাৎ নেই কারো চরিত্রে; সকলের স্বভাব একই রকম।

বিয়ে হল ভামিনীর। বিয়ে হল, কিন্তু বরটা যেন কেমন ছন্নছাড়া। ভামিনীর দিকে ফিরেও চায় না। পাঁচজনে বলাবলি করল, ওর আছে কি যে ওর দিকে ফিরে চাইবে। অত কচি মেয়ে নিয়ে করবে কি সে, পুতুল-খেলা খেলবে?

কিন্তু পুতুল নয়, বুঝি প্রতিমাই হয়ে উঠল ভামিনী। ভাগর হয়ে উঠল সে। তার দিকে ফিরে তাকাবার মত গতরই হয়ে উঠল তার। পাঁচজনে ফিরে ফিরে তাকাতে আরম্ভ করল, কিন্তু যার ভালো করে তাকাবার কথা তার মন পড়ে রইল বাহির-বাগে।

রাধা যেন বিচলিত হয়ে উঠল। যজ্ঞেশ্বরীর গানের কলি যেন বেজে উঠল তার মনের মধ্যে তারস্বরে। বলল, তারপর?

বছর কাটে। বছরের পর বছর। মনে কত লালসা কত বাসনা কত কামনা জাগে। কত মানত, কত পূজা, কত তপস্যা করে সে। কিন্তু ফল হয় না।

—কিন্তু ফল হল মা-ঠাকুরুণ। হঠাৎ একদিন দর্শন পেয়ে গেলাম তাঁর। অভাগীকে তিনি বুকে তুলে নিলেন।

তপস্যায় কি না হয়। ভামিনীর গর্ভে এল সন্তান। সে-রোমাঞ্চ সে-আনন্দ সে-সুখ আর সেই শান্তি চিরদিন মনে রাখার মতন।

চিরদিন মনে রাখার মতন বটে, কিন্তু সুখের স্বাদ মনের মধ্যে পুঁজি করে রাখলেই সুখলাভের সাধ দূর হবে কেন।

দূর হল না বলেই তার কষ্ট। দূর করতে সে চায় নি বলেই তার আজ এই অনুতাপ। এ অনুতাপ সহ্য করতে পারছে না ভামিনী।

পুত্রলাভ করল ভামিনী। কিন্তু ওইটুকুই তার জীবনের লাভ হয়ে রইল। স্বামীকে আর দ্বিতীয় কোনোদিন সে পেল না।

রক্তের স্বাদ একবার পেয়েছে যে-বাঘ, তাকে রক্তের জোগান না দিলে আর রক্ষে থাকে না। ভামিনীর বুঝি সেই দশা হল। তাই সে মানত করল তার পুত্রকে। এক পুত্র বিসর্জন দিয়ে শতপুত্রের জননী হবার জন্যে লালসা এল তার মনের মধ্যে।

—এ কি পাপ? বলুন মা-ঠাকুরুণ। এ কি পাপ?

এ কথার কোনো উত্তর দিল না রাধা। ভামিনীর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। আলুথালু বেশ, চোখ

দুটো ফুলে উঠেছে কেঁদে, কেঁদে, পিঠে কতকগুলো কালো কালো রেখা আঁকা হয়ে আছে।

তারপর এই এক পূর্ণিমার রাত্রি। জলকল্লোল বেজে উঠল গঙ্গায়। জোয়ারের জলে থৈ থৈ করছে জাহ্নবী। শিশুপুত্র কোলে নিয়ে যাত্রা করেছে ভামিনী। পথের ধূলোর ওপর ছায়া চলেছে তার সম্মুখে হেঁটে হেঁটে। আদর করে মুখচুম্বন করতে লাগল সে তার পুত্রের।

ঘুমন্ত শিশুটি দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল তার মাকে, দুই হাতে কাড়াকাড়ি করতে লাগল মাতার বক্ষ-দুটি।

পীতাম্বর বসাকের বাঁধাঘাটে এসে দাঁড়াল ভামিনী। ধীরে ধীরে নেমে গেল সোপান ভেঙে, নেমে গেল গলা-জলে। চন্দ্রসাক্ষী রেখে মকর-বাহিনীর পায়ে সমর্পণ করল সে তার পুত্রকে।

চীৎকার করে উঠল রাধা; বলল, এ কি করলে ভামিনী, এ কি করলে?

পাথরের মত অটল, হয়ে বসে ভামিনী বলল, বিসর্জন করলাম তাকে ঐ জোয়ারের জলে।

—কিন্তু, কিন্তু কোনো ফল পেলে তুমি?

—না। ফল পাই নি। ফলের আর আশাও নেই। তার বদলে যা পাচ্ছি তার দাগ আছে এই পিঠে। বাড়ি থাকে না, হঠাৎ যখন একদিন আসে তখন সে—

ফুঁপিয়ে উঠল ভামিনী।

দাগগুলির দিকে তাকাল রাধা, তাকাল চাঁপা; লক্ষ্মী আর সরস্বতী তফাতে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু উঁকি দিল মাত্র।

রাধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আশ্চর্য।

কি আশ্চর্য? এই দাগগুলি, ওই পুরুষটা, না, এই মেয়েটা?

আশ্চর্য সবই। কিন্তু কিছুই বুঝি চিত্তির নয়। ভামিনী ভুল নিশ্চয় করেছে, কিন্তু কে তাকে এমন ভুল করার প্রলোভন দিয়েছে; কে তাকে শিখিয়েছে যে, এমন মানত করলে প্রসন্ন হয়ে প্রার্থনা পূরণ করেন দেবতারা?

—এমন কেন করলে ভামিনী।

ভামিনীর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, আঁচল দিয়ে জল মুছতে মুছতে বলল, মাদুলি নিয়েছিলাম। বামুন-ঠাকুর বললেন, মাদুলির কাজ না রে ভামী। তোকে অন্য পথ নিতে হবে। তাঁকে দক্ষিণা দিলাম, পূজো দিলাম। মন্ত্রপাঠ করে দিলেন হরিনাথ ভট্চাজ। আমি মানত করলাম।

চাঁপা বলল, সে কি গো, তাঁর বিধান তো কখনো নিষ্ফল হয় না। নিশ্চয় তোর ত্রুটি আছে কোথাও।

ভামিনী বলল, ত্রুটি তো আছেই চাঁপিদি। তুমি জান না? নষ্ট মেয়ে না হলে টান হয় না ওদের।

চাঁপা রাধার মুখের দিকে তাকাল।

নিত্যরাত্রে কান্না বেজে ওঠে ভামিনীর ঘরে। শুয়ে শুয়ে সে হয়তো স্বপ্ন দেখে যে, মকরবাহিনী তার শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন ভামিনীর কোলে। জেগে উঠেই তাই চীৎকার করে ওঠে। ভামিনীর ঘুম তো নেই-ই, রাধার ঘুমেরও বিঘ্ন করতে আরম্ভ করেছে সে।

দিন কয়েক পরে চুঁচুড়ার গঙ্গা-কিনারে কোলাহল বেজে উঠল হঠাৎ, মাঝি-মাল্লারা চীৎকার করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চেঁচামেচি শুনে লক্ষ্মীকে ডাক দিল রাধা।

কিন্তু লক্ষ্মী কিছু জানে না। যে জানে, সে এসে পড়ল একটু বাদেই, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল চম্পা নাপিতানি।

—কি হয়েছে রে চাঁপা? এত হট্টগোল কেন?

চাঁপা বলল, ডুবে মরেছে ভামিনী। তার লাস খুঁজছে মাঝি-মাল্লারা।

শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রাধা বলল, বেঁচেছে। এবার বুঝি নিজেকেই মানত করেছিল। এবার ফল পাবে, এবার শান্তি পাবে ও।

রাধার বুঝি বিশ্বাস গঙ্গার পশ্চিম কূলেই দুঃখের নিকেতন। ওপারে অনন্ত সুখ। কিন্তু রাধা কি সব জানে? ওপারের পাথুরেঘাটায় নন্দরাম শেঠের পুত্র মুকুন্দরামের ঘরের কথা তার জানা নেই। অথচ, মুকুন্দরাম তার পতিরই পরম বন্ধু।

এখানে রাধার জীবন যেমন চলছে ওপারে মুকুন্দরামের স্ত্রী বাসন্তী-বালার জীবনও তেমনি চলছে কি না, এ খবর জানার কৌতূহল হয়তো কারো নেই। না থাকারই কথা। কত বাসন্তীবালার কথা আর জানা যেতে পারে। আর, তাদের কথা জানার সুযোগই বা কোথায়। তারাও তো অন্তঃপুরের নিভৃতে অন্তঃপুরিকা মাত্র।

কিন্তু মুকুন্দরামের দেখা পাওয়া কঠিন নয়। কলকাতার একজন সেরা

বাবু বলে নিজেকে সে মনে করে। ধনিয়া, বুলবুল আর আখড়াই গান নিয়ে সময় কাটছে তার; পো রেকের বাহার তাঁর কম না—চাপকান পাজামা পাগড়ি পরিহিত হয়ে তিনি যান টালার নীলাম-ঘরে, কখনো বসেন পাশা নিয়ে, কখনো ওড়ান পায়রা। সদা-সর্বদা সঙ্গে খলিপা আছেই। রূপনারায়ণের ইয়ার তিনি, রূপনারায়ণ মস্ত ধনী। মুকুন্দরামও কম ধনী নয়। কিন্তু ইদানীং ধনের কিঞ্চিৎ টানাটানি পড়েছে।

খলিপা বলল, দমদমার বাগানে কাল মস্ত মজার হাট বসাব। এক হাজার টাকা চাই।

কিন্তু হাজার টাকা এখনি এত সহজে দিতে পারছে না মুকুন্দরাম।

খলিপা এতে নিরুদ্যম হল না, বলল, বাবুজী, এই বান্দা যতদিন আপনার নিকটে আছে ততদিন টাকার জন্য মজা নষ্ট হবে না। আপনি শুধু একটি দস্তখৎ দেবেন, ব্যস।

এত সহজেই টাকার জোগাড় হবে জেনে মুকুন্দরামের আহ্লাদ ধরে না। বেশি বিদ্যে তার না থাক, নিজের নাম সই করার বিদ্যে তার আছে। সম্মত হল মুকুন্দরাম—বাগান-বাড়ির মজার কথা ভেবে তার খুশিতে ভরে উঠল প্রাণ।

খলিপা সংবাদ দিয়েছে, সংবাদ পেয়ে দালাল এসে উপস্থিত হল। মুকুন্দরামের কি পরিমাণ টাকার দরকার আবশ্যিক বৃত্তান্ত জেনে তারা চলল মহাজনের কাছে।

মুকুন্দর পিতা নন্দরামের খুব বড় সওদাগরী কারবার—বেলেঘাটায় চুণের গোলা আছে, হাটখোলায় ধানের গোলা, চুণাগলিতে বস্ত্রের দোকান। মহাজন এসব বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে টাকা দিতে সম্মত হল, বলল, হাজার টাকা দেব, কিন্তু খত সই করতে হবে পাঁচ হাজারের। বাবুর সঙ্গে রফা কর। তোমরা দালালি নেবে ঐ বাবুর কাছে।

দালালের কাছ থেকে সর্ত জেনে নিরুৎসাহ হল না মুকুন্দ। বাগান-বাড়ির মজার কথা তখন তার মগজের মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

পাঁচ হাজারের খত লিখে দিয়ে মুকুন্দরাম হাতে পেল আটশ টাকা, দুশ টাকা গেল দালালি দিতে।

কিন্তু তাতে দুঃখ নেই কোনো। দমদমায় ফূর্তি সেদিন হয়েছিল মনের মতই। অনেক বন্ধু আর ইয়ারও এসেছিল। ফরাসডাঙা থেকে হলধর মিত্রের পুত্র জটাধর আর মল্লিকদের মেজকর্তা শ্রীপতি এসেছিল। আর এসেছিল চুঁচড়ো থেকে রূপনারায়ণ রায়। জমজমাট হয়েছিল আসর। মুকুন্দ ভুলবে না।

মজার নেশার চুর হয়ে থাকে অন্তরাত্মা। মাঝে-মাঝেই মজার খবর বয়ে নিয়ে আসে খলিপা মনসুর।

মুকুন্দ বলে, কিন্তু মনসুর। দস্তখৎ দিলে কি এখন আর টাকা আনা যাবে? অনেক দস্তখৎ তো দিয়ে ফেলেছি। এখনো কোনো টাকাই শোধ দিতে আরম্ভ করলাম না।

অর্থাৎ, মুকুন্দ না বুঝুক, মনসুর নিশ্চয় বুঝছে—চার পাঁচ গুণ টাকার খতে সই করে করে সওদাগরী কারবার এবার নীলামে যাবার জোগাড় হয়েছে।

সে বলল, কিন্তু বাবুজী, মজা তবে কি বন্ধ হয়ে যাবে?

মনসুরের একথা তো বড় চিন্তার কথা হল। ভাবতে বসল মুকুন্দরাম পেঠ। অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল। ভেবে ভেবে কোন পথই সে খুঁজে পেল না। দস্তখৎ করে দিতে এখনো সে রাজি, কিন্তু দস্তখতের দাম যেন একটু কমেছে, খলিপা মনসুরও এখন আর তাকে অমন পরামর্শ দিচ্ছে না, লক্ষ্য করছে মুকুন্দরাম।

রূপনারায়ণের কাছে লোক পাঠাবে কি না সে ভাবল একবার। রূপনারায়ণও তো লুচ্চা বলে নিজের নাম করেছে খুব। গরাণহাটায় রামবাগানে আর হাড়কাটায় তার তো খুব খাতির।

সে যদি মজার খবর পায় তাহলে নিশ্চয় টাকার কোনো অভাব রাখবে না।

দিন দুই ভাবল মুকুন্দরাম। চিন্তা না করলে কি মাথা খোলে? ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি খুলে গেল মুকুন্দরামের।

মুকুন্দরামও তো রূপনারায়ণদেরই একজন। একই খোপের লক্ষ্মা তারা, ওড়ার ভঙ্গি আলাদা হবে কেন। মুকুন্দরামের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই তার গৃহের অন্তঃপুরের। এর আগে কবে সে শেষ পদার্পণ করেছে তার অন্দরে, ঠিক মনে করতে পারছে না মুকুন্দ।

তাতে কি আছে। তার গৃহ, তার ভার্যা, তারই অন্তঃপুর। প্রয়োজন হলেই যেতে হবে সেখানে, এতে আর জড়তার আছে কি। মুকুন্দরাম ভেতরে গেলে ধন্য হয়ে যাবে নিশ্চয় বাসন্তীবালা।

দুধে-আলতার রং বাসন্তীর। দেখতে ভালো, কিন্তু খুঁতের মধ্যে মুখে কয়েকটা বসন্তের দাগ। সে দাগের জন্যে তার সৌন্দর্য যেন খুলিতাই হয়েছে।

সর্বাঙ্গ তার অলংকারে পূর্ণ। গলায় সাতনরী হার, হাতে রোয়াদানি, পায়ে, পাঁইজোর, ওপর-হাতে অনন্ত, আর নীচ-হাতে অন্তহীন গয়নায় ভরা। নিতম্বে হীরে বসানো রূপালি-চন্দ্রহার। রক্তিম আভা মাখানো নিতম্বে এই চন্দ্রহার দেখে মনে হচ্ছে রক্তসন্ধ্যার বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে যেন সাদা মেঘের মালা।

জলের মত স্বচ্ছ মসলিনে অঙ্গ জড়ানো, কিন্তু বস্ত্রের আভাস পর্যন্ত দেখা যায় না, কেবল সোনালি পাড় পা আর কোমর বেষ্টন করে কাঁধে উঠে গিয়েছে। আবরণে অঙ্গ ঢেকেও যেন অনাবৃত মূর্তি নিয়ে অন্দরে পরিক্রমা করে বেড়ায় বাসন্তীবালা।

(ক্রমশঃ)

॥ ছয় ॥

রাধার সঙ্গে দেখা হলো না। মাধুকরীতে ( ভিক্ষা করতে ) গেছে।

—কি দাদাবাবু, কোন হদিস করতে পারলেন? রাস্তায় দেখা হলো পূর্ণ মণ্ডলের সঙ্গে। তার মুখে চাপা হাসি ঝিকমিক করছে।

—তুমি হাসছ কেন পূর্ণ?

—কৈ আমি হাসি নি তো। একটু থেমে টেনে টেনে আবার বলল, ভাবছি পুরনো একটা ব্যাপার নিয়ে কেন যে আপনি এতটা ঘাঁটাঘাঁটি করলেন—কাজে চলে গেল পূর্ণ।

আমি দু' পা এগোতেই বাধা পেলাম।

—দাদাবাবু—ও—দাদাবাবু—

ছুটতে ছুটতে বীরেন এল। খাসপুর-বাউলের রাস্তায় একটা গরুর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এল।

—কি ব্যাপার—

—যাচ্ছি—দাদাবাবু। বৌ নিয়ে সদরে যাচ্ছি। বাসা করে থাকবো। তার মুখখানা অত্যন্ত প্রসন্ন মনে হল। খুব—খুবই সুখী হয়েছে সে।

—দারোগাবাবুর কাছে গিয়েছিলেন দাদাবাবু?

—হ্যাঁ।

ভয় পেল। ফিস ফিস করে বলল, আমার কথা আবার বলেন নি তো?

—না-না তোমার কথা বলবো কেন।

—অনেক কিছু জানেন, না? বুড়োর পেটের ভেতরে কেসের সব কথা যেন একেবারে গজগজ করছে। বুড়োর সবচেয়ে দুঃখ কি জানেন?

—কি—

—চারুর কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। কিছু করতে পারলে মোটা রিওয়ার্ড পেত, প্রমোশান হতো। অথচ কিছুই করতে পারলো না। বলতে বলতে হঠাৎ থামল সে। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল কি যেন—

—হেই বাবু—চলি আসেন—চলি আসেন—মা খুব আগ (রাগ) করোছে বুঝিছেন? কহছে ঘাঁটার (রাস্তার) উপরে ডাঁড়ে (দাঁড়িয়ে) অত ফুসুর ফুসুর কিসের—

বীরেন হাঁটতে সুরু করল। প্রায় দৌড়ানোই বলা চলে। আমার কেন যেন মনে হল, লোকটা খুব সুখী।

হাটখোলার দিকে যেতে যেতে বুড়ো পুকুরের কাছে এসে মনে হল বুড়ো দারোগাবাবু—মণীন্দ্র রায়ের কথাগুলো। দাঁড়ালাম সেই ঝাঁপড়া জামগাছের নীচে, যেখানে একদিন গোয়েন্দা অরবিন্দ বসু আত্মগোপন করেছিল।

গাছটা বুড়ো হয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। হয়তো একদিন ঝড়ো বাতাসে পড়ে যাবে। এই তো সেই খাসপুর-বাউলের রাস্তা যেখানে নিশিরাতে চাকতি বাঁধা লাঠি নিয়ে নৈশবিহারে বেরিয়েছিলেন নিরঞ্জন সরকার। এইখানেই আম-গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল। ওই তো বিলপাড়ার পুল, ছেলেদের ডিফেন্স পার্টির সেই জোড়া বেলগাছের নীচে বিশ্রামের জায়গা—সব—সব আছে। শুধু সেইকালের সেই ত্রিশবছর আগের মানুষগুলো নেই। বাতাসে তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তাপ ভাসছে; পথের ধুলোর ভেতরে তাদের পায়ের ধুলো মিশে রয়েছে। নির্জন সকালে সেই হাটখোলায় বসে আমার হঠাৎ মনে হল, এখানকার মাটিতে, বাতাসে লাস্যময়ী রাধার উচ্ছ্বসিত খিল খিল

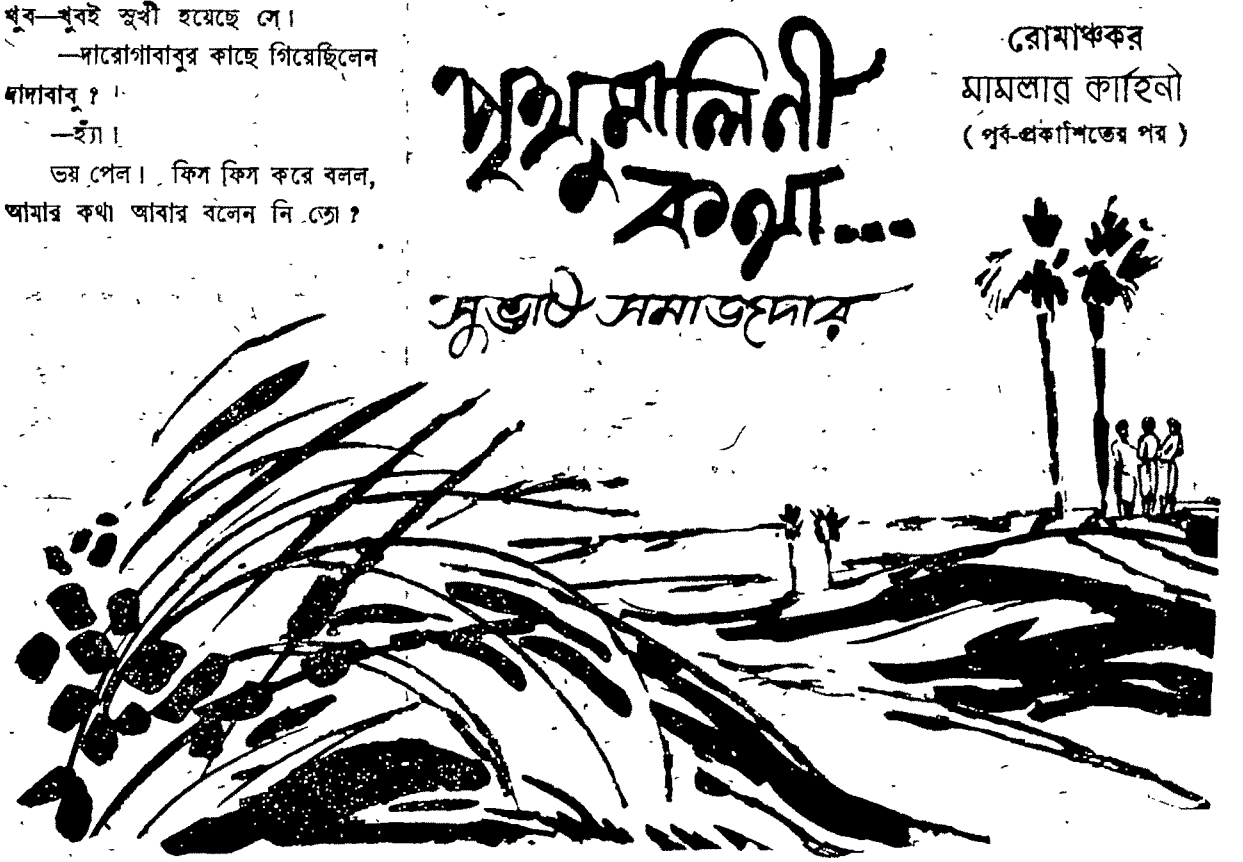

হাসি, যতীনের বাঁশীর সুরের মূর্ছনা, শিবুর নাটুকে কথা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। জমাট স্তব্ধতার ভেতরে যেন এই গ্রামের ত্রিশবছর আগেকার নরনারীর সুখ-দুঃখ হাসি-গান আনন্দ-ব্যথা মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। একটি —একটি মাত্র আঘাত করলে সব—সব জেগে উঠবে আর সুখ-দুঃখ জড়ানো সেই ত্রিশবছর আগের জীবনের মুরলী বাতাসে ছন্দোসুরভিত হয়ে উঠবে।

বৃন্দাবন কমলিনী রাই আমাদের
বৃন্দাবন ও-ও-ও—

বহুদূরে রোদজলা দিগন্ত থেকে যেন ভেসে এল গানের সুর।

রাধার গলা মনে হচ্ছে। দূরে অনেক দূরে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠে রাধাকে মনে হল একটা কালো বিন্দুর মত। বোয়ালদাড়ের আলের ওপর দিয়ে চলেছে সে। বাতাসে ভেসে আসছে তার গানের ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ গানের সুর—

বৃন্দাবনো—ও—ও—
কমলিনী রাই-----

সূর্য মাথাখানে। আকাশ জ্বলছে। মাটির ভেতর থেকে তাপ উঠছে। কাছে দূরে যতদূর চোখ যায় রোদের মরীচিকা জ্বলছে। থেকে থেকে আগুনের হল্কার মত গরম বাতাস চোখে মুখে ঝাপটা মারছে। এই রোদ মাথায় করে মাধুকরী করছে রাধা!

—ও—গো—শুনছো—ও—ও—

থামল রাধা। আমার দিকে হাঁটতে লাগল। ক্রমশ কাছে এল। মাথার ওপরে পাট করে দেওয়া আছে একটা ভিজে গামছা। একটু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেঁড়া কাঁথায় তৈরি ভিক্ষের ঝুলিটা একটু একটু দুলছে।

—কি দাদাবাবু! এখানে বসে যে?

তার কথার উত্তর দিলাম না। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, রোদে পোড়া জন্তুর মত কেমন তামাটে দেখাচ্ছে তার মুখখানা। ঝিন্দু ঝিন্দু ঘাম ঝরছে।

—কেন তুমি ভিক্ষা করো? রাধা-মাধবের দেবত্তর জমি তো আছে—

মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করল।

—কবে কলকাতা যাচ্ছেন দাদা-বাবু। শুনলাম বাবুকেও নিয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ। কঠিন অসুখ—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধা। কুঞ্চিত চোখ দুটো ছোট—আরও ছোট করে দূরে তাকিয়ে রইল। মাঠের পর মাঠ জুড়ে যেন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। ঠিক এই রকম —এই রকম আগুনের ঝড় তার মনেও বয়ে চলেছে নিশ্চয়ই।

আমাকে সন্ধ্যায় যেতে বলে চলে গেল রাধা।

বাড়িতে এলাম। জীতেনদা'র হাসি হাসি মুখ। আমার খটকা লাগল।

—শেষ পর্যন্ত কলকাতা যেতে রাজী হয়েছে রে আমাদের ওল্ডম্যান।

—তাই না কি!

জেঠিমা বললেন, তুই পারবি তো বাবা শঙ্কর। পি-জি মি-জি বড় বড় সব হাসপাতালের ব্যাপার বাপু—

—পারবো জেঠিমা।

—তাহলে খোকা যাবে? আমিও যাবো—

কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি চলতে লাগল। জ্যাঠামশাইকে বেশ প্রশান্ত মনে হচ্ছে। বহু দিন পর—ছোকরা চাকরকে ডেকে গা ঠাসতে বললেন। সেই ডবল ব্যারেলের বন্দুক আর টোটার বেল্টটাও খাটের ওপরে দেখলাম।

—দেখতো শঙ্কর। পেটটার ফুলো কি একটু কমেছে?

কাছে গেলাম। মনে হল না কমেছে। তবুও বললাম। বলতে হয়—কমেছে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো বলি সুরেশ ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছি। কমতে বাধ্য—

—আরও কমে যাবে জ্যাঠামশাই। কলকাতার বড় বড় ডাক্তারদের কাছে এ রোগ কিছু না।

আমি চলে যাচ্ছিলাম।

—শোন, কেন—কেন আমার সারবে না বল? আমরা হচ্ছি দীর্ঘ-জীবীর বংশ রে। তোর ঠাকুর্দা কতদিন বেঁচে ছিল জানিস----

জেঠিমা ইসরা করলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। বললেন, কেন যেন পুরনো কথা খুব বেশি করে বলছেন।

—ও কিছু না।

রোদ পড়তেই রাধার বাড়িতে গেলাম। ক্যাপা ওরফে শিবু একমনে বঁড়শিতে সুতো পরানোর চেষ্টা করছে। সে রাধার শোয়ার ঘরের বারান্দায় বসে রয়েছে হেলান দিয়ে। মাটিতে পড়ে আছে একটা ছিপ। এবার সত্যি সত্যি বুঝি কিছু মাছ ধরবে শিবু।

—রাধে বোষ্টুমী কোথায়?

—কেন তাকে কি দরকার আপনার! সুতো বাঁধা চশমার হ্যাণ্ডেলটা একটু ওপরে তুলে দিল সে। স্বর রুক্ষ! আর কর্কশ।

—ও। দাদাবাবু যে আসুন—আসুন—ঘরের ভেতরে আসুন—বাইরে বেরিয়ে এল সে।

সকালে যাকে রোদে পোড়া মনে হয়েছিল, এখন তাকে বেশ সজীব আর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেছে। ফুলো ফুলো মুখ। ভারি দলমলে চেহারার মানুষটাকে বেশ সুখী আর নিশ্চিন্ত মনে হল।

—বসুন।

ঘরের বাতাসটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। কেমন মিষ্টি মিষ্টি একটা ধূপের গন্ধ। জানালা মাত্র একটা। তাও এত ছোট যে আলো আসে না। তাই ঘরের ভেতরে শ্যাওলার মত সবুজ সবুজ অন্ধকার।

—বাবুকে দেখতে যাবো রোজ ভাবি। হয়ে ওঠে না—হরি হরি রাধামাধব—

—তার মতন মানুষের যে কি পাপে এই কাল রোগ ধরল!

—পাপ! অদ্ভুত বিচিত্র চোখে

আমার দিকে তাকালো রাধা। গায়ের ভেতরটা শির শির করে উঠল। বার্ধক্যের প্রান্তে এসেও তার চোখের ধার যায় নি!

পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যই বোধহয় হেসে উঠল সে।

—যাক—যাক যেতে দিন ওসব পাপ-পুণ্যের বড় বড় কথা। ওসবের আমি কি বুঝি দাদাবাবু? একটু থামল সে। বলল, তবে তেরবছর বয়সে বিয়ে হয়ে এই গাঁয়ে এসেছিলাম। আজ বাহান্নর কোঠায় পৌঁচেছি—এর ভেতরে আপনার জ্যাঠামশাইকে কখনো কারো সঙ্গে এতটুকু কড়া কথা বলতে দেখি নি—কখনো কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে বলে শুনি নি। খুব—খুব ভালবাসতো, স্নেহ করতো তাকে। লোক পেলে আর আড্ডা পেলে আর কিছু চাইতেন না আপনার জ্যাঠামশাই। বলতে বলতে তার গলার স্বরটা গভীর খাদের ভেতরে ডুবে গেল।

—শিবু ঠাকুরপো—

—কি বলছো—বল—চিনি আনতে হবে বুঝি যতীনের দোকান থেকে—চোখ দুটো চকচক করছে।

—কি যে তুমি যার তার সঙ্গে ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর করো, হঠাৎ চীৎকার করে বলতে লাগল, সারাটা জীবন তো তাই করলে। তোমার কাছে হারু ঘোষাল, সরকার মশাই, চৌধুরী—

—শিবু ঠাকুরপো—আর্তনাদ করে উঠল রাধা। লজ্জায় অপমানে তার মুখ কালো হয়ে গেল। আমারও মনে হল কে যেন দুর্গন্ধময় কাদা ছুড়ছে মুখে থাবা থাবা। তাহলে জ্যাঠামশাইও—

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

—চলে যাচ্ছেন দাদাবাবু? আমার হয়েছে মরণ। এই পাগল ভাল থাকতেও আমাকে ছাড়তো না, এখনও আমাকে ছাড়ে না। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে যা-তা বলে—ঐসব পুরনো সাতকালের বাসি কথা জড়িয়ে যা খুশি তাই বলে। বলতে বলতে ভার হয়ে উঠল তার গলার স্বর। কান্না থমথম করতে লাগল মুখে।

আমি দু'এক পা করে হাঁটতে সুরু করলাম।

—কিছু মনে করবেন না দাদাবাবু। আমার হয়েছে মরণ—আমি মরলেও সেই অপবাদ—সেই কলঙ্ক কিন্তু আমার যাবে না—

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল রাধা। মাঠ জুড়ে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার তার মুখে নেমেছে। আমি তার বাড়ির সামনের আল ধরে ধরে দ্রুত—দ্রুত—অত্যন্ত দ্রুত হাঁটছি। কিন্তু বুঝতে পারছি তার চোখের দৃষ্টি বিঁধছে আমার পিঠে। পিঠটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ত্রিশবছর আগের সেই মূর্তিমতী কলঙ্ক যেন শুধু আমাকে নয়, আমার জ্যাঠামশাইকে, আমার বংশকে, গ্রামের সবাইকে একটা গভীর অন্ধকার অতল খাদের ভেতরে নামিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ল বুড়ো দারোগাবাবুর কথা—ও—যে সে নয়—ও পৃথুমালিনী বাবা—কানের কাছে বাজতে লাগল তার নিজের কথা। একদিন রাধা আমাকে নিজে বলেছিল, মনে হয় কি জানেন, আমি একটা মাছি—উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি—আমার গায়ে পায়ে রক্ত পুঁজ—

কিন্তু তখনো বাকী ছিল—অনেক বাকী। ভুল—ভুল ভেবেছিলাম। ভুল বুঝেছিলাম।

বাড়িতে এলাম। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে অনেক—অনেক লোক। সরকার মশাইয়ের সেই খাকি মিলিটারী সার্ট পরা ছেলেটি, যতীন, পূর্ণ, আরও গাঁয়ের অনেকে ভীড় করে এসেছে।

উঃ! পারি না—আর পারি না। হা ভগবান, তপ্তাপোষের ওপরে কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছেন জ্যাঠামশাই। জীতেনদা'র মুখখানা কালো। জেঠিমার চোখে আসন্ন বৈধব্যের ছায়া। আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

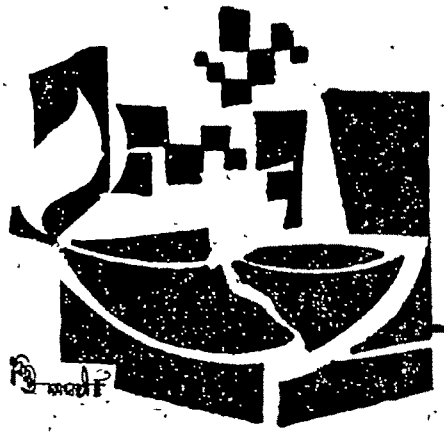

ধারাবাহিক উপন্যাস

# 'তপ্তুর মাটির পাত্রে'

## ধনঞ্জয় বৈরাগী

বিয়াল্লিশ

আজকাল আর সন্ধ্যেবেলাটা যেন কাটতে চায় না। কাজ-কর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরলেই বিজয়ের মনে হয় অলস মন্থর সন্ধ্যা, ভারি পাথরের মত তার বুকের ওপরে চেপে বসল। বিজয় এই চিন্তাতেই হাঁফিয়ে ওঠে, দম নেবার জন্যে ছটফট করে।

তবু সন্ধ্যা কাটে না।

আগে বাচ্চারা আসত, তাদের কলরবে গুদামঘর, উঠোন পূর্ণ হয়ে থাকত, তারা আসে না বলেই এই নীরবতা এতখানি পীড়াদায়ক মনে হয়। অবশ্য সময় সময় পেলেই বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু বিজয়ের আর তাকে ভাল লাগে না। সমরের কথাগুলো বড় একঘেয়ে মনে হয়, বেশি টাকা রোজগার কর, জীবনের ওপর আস্থা হারিও না। আবার নতুন করে পথ চল।

হিতোপদেশ।

আশৈশব বাড়িতে গুরুজনদের কাছ থেকে এইসব হিতোপদেশ বিজয় শুনেছে, সমরের মুখ থেকে তার পুনরাবৃত্তি শুনতে বিজয়ের বিরক্তই লাগে। ইচ্ছে করেই সমরকে আজকাল সে এড়িয়ে চলে। বাইরে কাজ সেরে বেশির ভাগ দিন আর ঘরে ফেরে না। সোজা চলে যায় ময়দানে। বিরাট একটা মাঠ আছে কাছেই, অনেকে সেখানে বেড়াতে যায়। রাস্তার ধারে ধারে তারা ঘোরে যেখানে আলো জ্বলে। কিন্তু বিজয় ঘাসের বুক চিরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় মাঠের মাঝখানে। কেউ কোথাও থাকে না, ফাঁকা মাঠ, ওপরে অনন্ত আকাশ, কখনও সেখানে তারা ফোটে, কখনও অন্ধকার। নীচে নরম ঘাসের বিছানা।

ক্লান্ত বিজয় গা এলিয়ে দেয়। তবু কিছুক্ষণের জন্যেও শান্তি পায় মনে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পুরোন দিনের কথা মনে পড়লে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় বিজয়, সেইজন্যে এক আধটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার প্রয়োজন হয়।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কোথা দিয়ে কিভাবে এতগুলো বছর কেটে গেল। ছোটবেলায় একটা গানের রেকর্ড বিজয় প্রায়ই বাজাত। রেকর্ডটা ফেটে গিয়েছিল। তাই রাঙাদা'রা সেটা বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু বিজয়ের দলবল মহানন্দে সেই ফাটা রেকর্ডটা বাজাত, ছাদের ওপরে একটা নড়বড়ে গ্রামোফোনে। সেটিও জীর্ণ। কোন কর্তার ছিল, এখন পরিত্যক্ত। বাজিয়ে বাজিয়ে একই গান বার বার শুনে ভাষা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তার অর্থ বোঝে নি বিজয়। এতদিন বাদে জীবনের একপ্রান্তে পৌঁছে, এই অন্ধকার নির্জন মাঠে শুয়ে শুয়ে সেই গানটা সে যেন শুনতে পায়, নিজের জীবনের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল। বিজয় নিজের মনেই আওড়ায়—

'ঘরেও নহে, পারেও নহে,
যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যেবেলা কে ডেকে নেয় তারে,
ফুলের বাহার নাইক যাহার,
ফসল যাহার ফলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।'

এখন শুধু বসে থাকা, কখন নৌকো আসবে, তাতে চড়ে বসতে হবে, সেইজন্যে কলকাতায় ফিরতে আর ভাল লাগে না, কার জন্যে ফিরবে, কে আছে সেখানে। এখানেও আর নতুন করে আশা করার কিছু নেই। রতনের মাধ্যমে রেণুকার সঙ্গে মিটমাটের ক্ষীণ আশাও বিলীন হয়ে গেছে। আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে, বিজয় কি নিয়ে থাকবে।

রাত্রি বাড়ে, তবু বিজয়ের ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। শেষে যখন ঘুম ঘুম পায় আস্তে আস্তে নিজেকে টেনে তোলে।

বাড়ি ফিরে দেখে, দরোয়ানজী মেঝের ওপর রুটি ডাল আর তরকারি থালায় ঢেকে রেখে শুয়ে পড়েছে, ইচ্ছে করলে বিজয় খায়, আবার অনেক রাত্রে খায় না। খিদেই থাকে না তার।

দরোয়ানজীর কাছে এ খবর পেয়ে সমর একদিন দুপুরবেলা বিজয়কে ধরেছিল, তুমি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছ না, অসুখে পড়বে।

বিজয় ম্লান হাসল, না রে শরীর আমার দিব্যি আছে।

—উঁহুঁ, দেখে তা মনে হচ্ছে না, বেশ রোগা হয়েছ, কাজ-কর্মের পর রোজ সন্ধ্যেবেলা কোথায় যাও ?

বিজয় মিথ্যে কথা বলল, একটা টিউশানি নিয়েছি।

সমর শুনে খুশি হল, ভাল করেছ, যত কাজ করবে, মন তত ভাল থাকবে, রোজগারও বাড়বে। এতদিন বাদে দেখছি বিজয়দা, তুমি আমার কথামতই কাজ করছ। এখন তুমি কম টাকার মালিক, ঠিকাদারির মাইনে, টিউশানির টাকা, ইনসিওরেন্সের কমিশন, পৈত্রিক ভিটের অংশ, তাছাড়া পাঁচ হাজার টাকার পলিসিটা চালু রয়েছে।

বিজয় একটু অবাক হল, সে পলিসি তো আমি শুধু সই করে দিয়েছিলাম, টাকা তো দিই নি।

সমর মুরুব্বিচালে হাসল, তুমি তো কোন হিসেব রাখ না বিজয়দা, আমি যে তোমার কমিশনের টাকা দিই তাই থেকে কেটে কেটে, ও পলিসিটা আমি চালু রেখেছি।

বিজয় না হেসে পারল না, তুই এত পারিস বাবা। আমার হাতে থাকলে ও পলিসি কবে নষ্ট হয়ে যেত।

সঙ্গে সঙ্গে সমরের হিতোপদেশ সুরু হয়, বয়সটা কিছু নয় বিজয়দা, সাহসে বুক বাঁধ, কাজের মধ্যে ডুবে যাও। পুরোনদের সঙ্গে না বনে, নতুনকে আহ্বান জানাও—

সমর অনর্গল বলে চলে, বিজয় ড্যাবলা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু একটা কথাও শোনে না। তার মনে হয়, সমরের মুখখানা যেন নড়বড়ে ভাঙা গ্রামোফোন, ফাটা রেকর্ডে গান বাজছে—

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর মন।'

সত্যিই বিজয়ের মনকে ভুলিয়েছে সেই মাঠ, সেই অন্ধকার, সেই নির্জন পরিবেশ। অন্ধকারের একটা মোহ আছে, সেই মোহ প্রতি সন্ধ্যেবেলা বিজয়কে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ দুর্নিবার, দিনের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় সে সেখানে হাজিরা দেয় যেমন দিত যৌবনের উচ্ছলতায় প্রমথ সমাদ্দারের আড্ডায়।

সেদিন দুপুর থেকে শরীরটা ভাল ছিল না। মাথা টিপ টিপ করছে, গা হাত পায়ে কেমন যেন আড়ষ্ট ব্যথা, কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল, বিছানায় শুয়ে পড়বে বলে। কিন্তু কিছুতেই বিজয়ের ঘুম এল না, ক্রমাগত ছটফট করল।

বিকেলের দিকে মনে হল, সমর এসেছে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দরোয়ানজীর সঙ্গে। এখুনি হয়ত এসে পড়বে, আবার সুরু হবে তার হিতোপদেশ শোনাবার পালা।

বিজয় আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কোন রকমে একটা গায়ে জামা দিয়ে খিড়কির পথে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

আজ কিন্তু হাঁটতে ইচ্ছে করল না। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে মাঠে গেল। ইচ্ছে ছিল অল্প একটু বসে ঘরে ফিরে যাবে, কিন্তু পারল না। মাঠের মধ্যে বসে পড়তেই সব কিছু সে ভুলে গেল। ঝির ঝির হাওয়া বইছে। আঃ, কি নরম বিছানা, হাত দিয়ে ঘাসগুলো স্পর্শ করল বিজয়। আকাশে কত তারা, ঝিক ঝিক করছে, অন্ধকার নামছে, তার কালো চাদর সযত্নে বিছিয়ে দিল বিজয়ের গায়ের ওপরে। একটু শীত শীত করছিল। ঠিক সময়মত চাদরটা পেয়ে আরাম করে শরীরটাকে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল বিজয়।

গভীর ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙল বিজয়ের মনে হল সর্বাঙ্গে ব্যথা, কিছুতেই উঠতে পারছে না। দাঁড়াতেই মাথা টলমল করে উঠল, এভাবে কি সে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু কাকে ডাকবে, কেউ তো কোথাও নেই, খানিকটা গিয়ে আবার বসে পড়ল, মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরল, মা, মাগো।

ছেলেবেলায় খালি অসুখে ভুগত বিজয়, হাঁপের টান ধরত, ঘুম আসত না, একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে বিছানায় ছটফট করত, তার ইর্ষা হত অন্যদের ওপর। সবাই ঘুমোত, শুধু একজন জেগে থাকতেন, নশারির ফাঁক দিয়ে বিজয় দেখেছে, সে তার মা। মা এখন কোথায় ? বেঁচে আছে কি ? দাদার মা আছেন, বিজয়ের মা নেই। মারা গেছেন অনেকদিন।

বিজয় আবার উঠে দাঁড়াল, চলতে সুরু করল, মাঠ যেন শেষ হয় না। উঃ, আরও কত চলতে হবে। দূরে কিসের শব্দ হচ্ছে, ঝন ঝন করে কি যেন ভেঙে গেল, গেলাস ভাঙছে। একটার পর একটা কাচের গেলাস। মাতালরা উন্মত্ত হয়েছে। কিন্তু এ যে থামে না, এত কাচের গেলাস তারা পেল কোথা থেকে ? তবে এ শুধু গেলাস নয়, কাচের টেবিল, কাচের চেয়ার, কাচের বাড়ি। সব তারা ভাঙছে, ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। প্রমথ সমাদ্দার, বেঁটে কেষ্ট, আলতা, তার বাবুরা সবাই মিলে তাণ্ডবনৃত্য

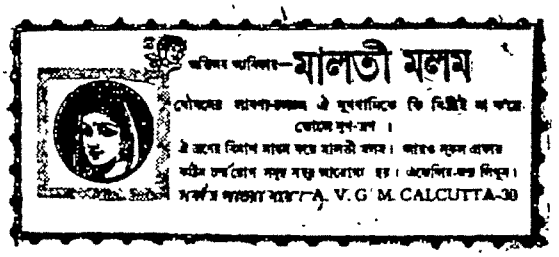

করছে। তারা হাসছে, বিজয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, হাসছে। উপহাসের হাসি। বিজয় প্রাণপণে কান দুটো চেপে ধরল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, মনে হল, একটা লোক যেন এদিকে আসছে। বিজয় তাকে হাত নেড়ে ডাকল, লোকটা এগিয়ে আসছে, বিজয় চিনতে পারল, মুখে ফুটে উঠল নিশ্চিন্ত হাসি, বলল, রাঙাদা', তুমি এসেছ ? বড় কষ্ট হচ্ছে, এবার তোমার কথা শুনব, আমাকে নিয়ে চল।

লোকটা বলিষ্ঠ হাতে বিজয়কে তুলে নিল, জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ির ঠিকানা।

বিজয় কোনরকমে গুদামের ঠিকানাটা বলেছিল। লোকটি অত রাত্রেও তাকে দরোয়ানজীর জিম্মায় দিয়ে চলে যায়।

বেশ কয়েকদিন জ্বরের ঘোরের মধ্যে বিজয় পড়ে রইল। সে বুঝতে পারত সমর আসছে, ডাক্তার আসছে, ঠিকাদার ভদ্রলোকও আসছেন, ওষুধপত্র দিচ্ছেন। কিন্তু সবই কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা। শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আমি এখানে কি করে এলাম, মাঠ থেকে কে নিয়ে এল ?

সমর উত্তর দিল, এক ভদ্রলোক। উনিও মাঝে মাঝে এসে তোমার খবর নিয়ে যান।

—আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম, রাঙাদা'।

কথাটা সমরকে সজোরে নাড়া দিল, মনে হল এ তার আগেই উচিত ছিল, রাঙাদা'কে নিয়ে আসা। কাল-বিলম্ব না করে সে ছুটল কলকাতায়।

খবর পেয়েই রাঙাদা' আর ঝণ্টু দুজনেই এল, সঙ্গে ডাক্তার ভাই। বিজয় তখন ঘুমোচ্ছে, অন্যদের মুখে বিজয়ের সব কথাই শুনল তারা।

অনেকক্ষণ বাদে বিজয় চোখ মেলে চাইল।

রাঙাদা' জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস বিজয় ?

বিজয় কোন উত্তর দিল না, চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ডাক্তার বলল, খুব ক্লান্ত।

বিজয় তাকাল, আর কত স্বপ্ন দেখব ?

সমর বুঝিয়ে বলে, স্বপ্ন নয়, বিজয়দা', রাঙাদা'রা এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বিজয়ের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল, বলল, জ্বান রাঙাদা', অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে তোমার কথা আমার মনে পড়ছিল। আর মায়ের কথা, আমার মা, যে মরে গেছে।

রাঙাদা' বিজয়ের কপালের ওপর হাত রেখে বলল ওসব কথা এখন থাক বিজয়, আজই তোকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব।

বিজয় মাথা নাড়ল, না রাঙাদা', আমি যাব না। শেষ ক'টা দিন এখানেই থাকব।

ঝণ্টু বলল, বেশ তো, সেজ খুড়ী-মাকে কাল এখানে নিয়ে আসব।

—না থাক। বয়স হয়েছে, মিছি মিছি কষ্ট দিয়ে কি লাভ ?

বিজয় একে একে সকলের মুখের দিকে চাইল, হাসবার চেষ্টা করে বলল, তোমরা এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি।

রাঙাদা'র ডাক্তার ভাই বলল, তুই মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছিস বিজয়, এক সপ্তাহের মধ্যে তোকে সারিয়ে তুলব।

ক'দিন শুধু আমাদের কথা শুনে চলতে হবে।

বিজয় হাসল, সারা জীবনটাই শুনলাম না, এখন শুনব কি করে!

—তুই নাকি মদ ছেড়ে দিয়েছিস ?

বিজয় সম্মতি জানাল।

—একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। তোর সিস্টেম এ্যালকহল চায়। অল্পবিস্তর খেতে হবে।

বিজয় রাঙাদা'র দিকে তাকাল, শোন—তোমার ডাক্তার ভাই কি বলছে। তুমি এতদিন আমাকে বললে মদ ছেড়ে দেবার জন্যে। তোমার ভাই আবার তা ধরতে বলছে। এখন কার কথা শুনব, দাদার না ভাই-এর ?

রাঙাদা' বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, না রে বিজয়, তুই বুঝতে পারছিস না। ও এখানে এসে থেকেই আমাকে বলছে ওষুধ হিসেবে অন্তত তোকে এ্যালকহল খেতে হবে।

বিজয় বলল, না। ওসব আর নয়।

ডাক্তার ভাই সাবধান করে দেয়, তা না হলে কিন্তু তোকে সারিয়ে তোলা শক্ত হবে।

—নাই বা সারলাম, বিজয়ের মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত হাসি।

এ হাসি দেখে রাঙাদা' শঙ্কিত হল, এর তাৎপর্য তার অজানা নয়, বিজয়ের চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তুই ঘুমিয়ে পড়। রেস্ট দরকার।

অন্যদের বলল, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, বিজয় ক্ষীণ স্বরে ডাকল, রাঙাদা', শোন।

রাঙাদা' তার বিছানার কাছে ফিরে আসে, কি রে বিজয়।

বিজয় তাকের ওপর রাখা স্যুটকেশটা দেখায়, ঐ বাক্সটা তুমি রতনের কাছে পাঠিয়ে দিও।

—দেবো।

—কথা দিচ্ছ তো।

—দিচ্ছি।

বিজয়ের মুখ শান্তিতে ভরে যায়, তাহলে আর ভাবনা নেই। তুমি পাঠালে রেণুকা আর আপত্তি করবে না। রতনকে নিতে দেবে। ওকে বলো ওর বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে।

রাঙাদা' উদ্গত অশ্রু কোন রকমে সংবরণ করে বলল, তুই শুয়ে পড়, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল বিজয়। গভীর ঘুম।

ঠক ঠক করে লাঠির শব্দ হচ্ছে, একেবারে বিছানার পাশে এসে শব্দ থামল, ন'ঠাকুর্দা দাঁড়িয়ে, এইমাত্র বোধহয় বেড়িয়ে ফিরছে না। বাইরে

বোধহয় গঙ্গাধরের গাড়ি, ছেলেমেয়েরা উঠোনে জড় হয়েছে, ন'কর্তার সেদিকে খেয়াল নেই, বিজয়ের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলছেন, ছোটবেলা থেকে আমাদের বলা হয়েছিল মানুষ হবার জন্যে, সারা জীবন সেই চেষ্টাই করেছি, ভুলে যেও না কোন্ বংশের ছেলে তুমি। তোমার বাবা, জ্যেঠা, কাকাদের কথা চিন্তা কর। সমাজের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে আজো তাঁদের স্মরণ করে? তুমিও তাঁদের উপযুক্ত হও, প্রকৃত মানুষ হও।

কথা শেষ করে উনি আর অপেক্ষা করলেন না, খট খট শব্দ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

চোখ মেলে তাকাল বিজয়, ঘর ফাঁকা, কেউ নেই। মনে পড়ল ন'কর্তা মৃত্যুর দিন এই কথাগুলোই ভিক্টোরিয়ায় বেড়াতে বেড়াতে বিজয়কে বলেছিলেন। বিজয় চোখ বুজে পূর্বপুরুষ দেব উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, তোমাদের উপযুক্ত হতে পারলাম না।

আবার দরজা খুলে গেল, ও কে? রতন? কিন্তু আগের মত উচ্ছল নয়। অতি সাবধানে মৃদু পায়ে সে এগিয়ে আসছে, মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, বন্ধু, তোমার অসুখ করেছে?

বিজয় তখনও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, জিজ্ঞেস করল, কে তোমায় নিয়ে এল রতন।

—কেন, রাঙা জ্যেঠু।

বিজয় খুশি হয়ে বলে, ও, রাঙাদা' নিয়ে এসেছে, এস, বস আমার কাছে।

রতন জিজ্ঞেস করল, তোমার খুব জ্বর হয়েছে বুঝি?

—না বেশি নয়।

—তুমি সেরে উঠে আবার আমাকে গল্প বলবে।

বিজয় রতনের হাতটা টেনে নিয়ে বলল, সে তো এখুনি বলতে পারি, কিসের গল্প শুনবে রতন? শিকারের, যুদ্ধের, না রূপকথার?

রতন দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ থাক, তুমি সেরে ওঠ, তারপর শুনব।

—কেন?

—আজ তোমাকে বিরক্ত করতে বারণ করেছে।

—কে?

—মা।

বিজয়ের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল, পাছে রতন চোখের জল দেখতে পায় তাই সে মুখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু শুনতে পেল রতন বলছে, মা তোমার ওপর রাগ করে নি। আমায় বলেছে বন্ধু তোমার জন্যে কতগুলো জিনিষ কিনে রেখেছে, তুমি নিয়ে এস।

বিজয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঐ যে বাক্সটা ওপরে রয়েছে, কে পেড়ে দেবে, রাঙাদা', সমর, কে আছ?

রাঙাদা' কাছেই অপেক্ষা করছিল, বাক্সটা বিজয়ের কাছে নামিয়ে দিল।


প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সামাজিক উপন্যাস

'কৃষ্ণচূড়া'

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবে। সাঃ বঃ সঃ


বিজয় চাবি দিয়ে বাক্স খোলে, কত রঙের জামা, কাপড়, খেলনা, গল্পের বই-এ ভরা বাক্স।

রতন অবাক হয়ে জিনিষগুলো দেখছিল, খুশি ভরা গলায় জিজ্ঞেস করে, এসব আমার?

—সব। তোমার জন্যেই তো কিনে রেখেছি, পছন্দ হয়েছে?

রতন উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে, মায়ের কাছে নিয়ে যাই, বলব যে বন্ধু আমায় কত ভাল ভাল জিনিষ দিয়েছে দেখ।

রাঙাদা' বলল, দাঁড়াও আমি সমরকে ডাকছি তোমাকে নিয়ে যাবে।

সমর এসে বাক্স হাতে নিয়ে চলল।

রতন বলল, বন্ধু, আমি আবার আসব কাল, তার মধ্যে তুমি সেরে উঠবে তো?

বিজয় হেসে বলল, হ্যাঁ।

—গল্প বলবে?

—বলব।

—আমি তাহলে বাড়ি যাচ্ছি বন্ধু।

—এস।

রতন চলে গেল, সেইদিকে বিজয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, রাঙাদা' পাশে দাঁড়িয়ে।

বিজয় বলল, ওকে নিয়ে এসে তুমি বড় ভাল করেছ রাঙাদা', নিজের হাতে জিনিষ ক'টা ওকে দেবার ইচ্ছে ছিল। তুমি না এলে হত না। রেণুকা আসতে দিত না।

রাঙাদা' বলল, রেণুকাও এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকব?

বিজয় রাঙাদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, না থাক।

—কেন?

—কি বলব? আমার তো কিছু বলার নেই। আর সেই বা কি বলবে, তারও তো কিছু বলার নেই।

রাঙাদা' গম্ভীর গলায় বলল, তাহলে থাক। পরে আর একদিন বরং—

—আর একদিন, বিজয়ের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।

রাঙাদা' সভয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বল, শরীরে খুব কষ্ট হচ্ছে?

বিজয় মাথা নাড়ল, তার কোন কষ্ট নেই। তোমরা এলে, রতন এল, রেণুকা এসেছে, ন'ঠাকুর্দাও এসেছিলেন।

রাঙাদা' বিজয়ের পাশে বসে শংকিত কণ্ঠে বললেন, কি বলছিস তুই?

—ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ন'ঠাকুর্দা এলেন, ঐখানে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়ে গেলেন, মানুষ হবার জন্যে।

বিজয় হেসে ফেলে, ওঁদের এখনও ধারণা, চেষ্টা করলে আমি বোধহয় মানুষ হতে পারব। হওয়া যায় না। আমি তো পারলাম না, ভুল করে ফেললে শোধরান শক্ত।

—বিজয় তুই আমার কথা শোন, বাড়ি ফিরে চল্। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই সেরে উঠবি, রেণুকা আর রতনকেও নিয়ে যাব, ডাক্তাররা যা বলছে কথা শোন। শরীর যখন চাইছে ওষুধ হিসেবে—

বিজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আর আমাকে অনুরোধ করো না। তোমার সব কথাই তো শুনেছি, হয়ত সময় মত নয়, কিন্তু পরে ঠিকই শুনেছি। এবার আমাকে ক্ষমা কর।

রাঙাদা'র কিছু বলার ছিল না। চুপ করে শুনতে লাগলো বিজয়ের স্বগতোক্তি।

—শেষের এই ক'দিন নিজের কথা ভাবছিলাম। চেষ্টা করছিলাম কি পাই নি তার হিসেব মেলাতে। অনেক কিছুই পেয়েছি। কিন্তু পাই নি কারুর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। জন্মেছিলাম আগাছার মত, বেঁচে থাকবো তোমরা কেউ ভাব নি। ছোটবেলা থেকে সকলের চোখে দেখেছি অবজ্ঞা আর অবহেলা। বড় হয়ে তা সহ্য করতে পারলাম না বলেই মদ খেতে সুরু করেছিলাম। মদ খেলে নেশার ঘোরে নিজেকে অন্যদের সঙ্গে সমান মনে হত।

বিজয়ের গলা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তবু সে থামে না। বিয়ের পর নিজের স্বাস্থ্যের দৈন্য যেন আরও প্রকট হয়ে উঠল। রেণুকার অবজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে মদের মাত্রা বাড়ালাম। হিতে বিপরীত হল। ভেতরের জন্তুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তখন আর তাকে সামলাতে পারলাম না।

রাঙাদা' বিজয়কে থামাবার জন্য বলল, এসব কথা তো আমরা জানি।

বিজয় মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করল, না জানো না। বাড়ির লোকে আমাকে কখনো মানুষ বলে মনে করলো না, কি করে আমি মানুষ হব বলতে পারো।

একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলল, কিন্তু আজ আমার কোন অভিমান নেই কারুর ওপর। রতন আমাকে সত্যিই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ঐতেই আমার মন ভরে গেছে। রাঙাদা' এত ধমকে বকে তোমরা আমার যে মদ খাওয়া ছাড়াতে পারলে না, কিন্তু ঐ বাচ্চা ছেলেটা আমাকে ভালবেসে তা ছাড়িয়ে দিল। ওর শ্রদ্ধার মর্যাদা আমি রেখেছি।

রাঙাদা' এবার জোর করে বিজয়কে থামিয়ে দিল, আর কোন কথা নয়, চুপ করে শুয়ে থাক্।

বিজয় ম্লান হেসে বলল, মাথার জানলাটা খুলে দিয়ে যাও।

জানলা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে ঘর ভরে গেল।

বিজয় ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে বলল, আঃ, কি ঠাণ্ডা হাওয়া। শরীর মন জুড়িয়ে গেল। রাঙাদা', পৃথিবী বড় চমৎকার জায়গা অথচ এতদিন তা বুঝতে পারি নি। চোখের ওপর যেন ছানি পড়েছিলো। আমার জন্যে আর চিন্তার কারণ নেই, যারা অপেক্ষা করছে বাইরে, নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যেতে বল।

বিজয়ের চোখমুখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো, রাঙাদা', আমি সব পেয়েছি।

রাঙাদা' যখন বিজয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সকলের উদ্বিগ্ন চোখ তার দিকে। একটাই প্রশ্ন, বিজয় কেমন আছে।

রাঙাদা' অত্যন্ত ভারী গলায় উত্তর দিল, ওকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। আমরা এ ঘরেই অপেক্ষা করি।

আর কেউ কথা বলতে পারলো না।

চোখে তাদের নীরব জলের ধারা।

দূরে মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজছে।

এঘরে আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় শোকাচ্ছন্ন আত্মীয়ের দল মনে মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বিজয়ের আত্মার সদ্গতির জন্যে।

ওঘরে মুক্তির আনন্দে রিভোর বিজয় কান পেতে ঘণ্টার ধ্বনি শোনে। অজানা পথে পাড়ি দেবার জন্যে যে প্রস্তুত। ঐ তার ডাক এসেছে। পাথরের দেবতা এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

নিজের বাড়িতে বসে নতুন পাওয়া খেলনা নিয়ে রতন খেলা করছিল দাদুর সঙ্গে। মন্দিরের ঘণ্টা শুনে ভুল করলো, বলল, ঐ স্কুলে টিফিন হ'ল। সেরে উঠে বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। গল্প বলবে। এবার আমি ঠিক বন্ধুকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

রতন কথা শেষ করতে পারলো না। কে যেন তাকে ডাকলো, 'বন্ধু'।

রতন অবাক হয়ে চারদিকে তাকালো, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'ল রতন।

রতন বলল, কিছু না।

সমাপ্ত

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি
নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ
উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস।
মূল্য ৩৷৷০।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়া ও তজ্জাত দীর্ঘ ও বিলম্বিত একটা শব্দের ঢেউ ওঠার মত দীপেন মনের ঢাল বেয়ে বেয়ে তার প্রকাণ্ড ইচ্ছে আর অমিত বাসনা-টাকে দ্রুত ক্লান্তি ছড়াতে ছড়াতে নামতে দেখল। আর গড়াতে গড়াতে সেই শক্তি-শালী ইচ্ছা ও বাসনার দেহটা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছিল। অবশেষে এক সময় তলদেশ ভূমি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার প্রায় ক্রিয়মান দেহটা অবয়ব হারিয়ে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে দীপেন পার্শ্বে উপবিষ্টা উমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করল।

অন্যমনস্ক উমা খানিক দূরে বসে আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে সবুজ ঘাস ছিঁড়ছিল আর গঙ্গার বুকে নোঙর ফেলা রংচটা বিবর্ণ মালবাহী জাহাজটার 'পরে চোখ রেখেছিল। ভাঁটার টানে জল ও ভাসতে থাকা নানা টুকরো টুকরো পরিত্যক্ত জঞ্জাল ও নোংরা সাগর-মুখো এগোচ্ছিল। এখানে ওখানে ভাসমান বয়াগুলো যেন প্রবল আগ্রহে দক্ষিণমুখো ঝুঁকে পড়েছিলো। ইতস্তত কয়েকখানা নৌকো ঢেউয়ের বুকে নাচছিল বা কখনও সখনও এক-আধটা লঞ্চ গঙ্গার বুকে ঢেউয়ের কুঞ্চন জাগিয়ে ও একটানা শব্দের গুঞ্জন তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বসে থাকা তৃণল জমিটা টাল খেয়ে জলের মাঝে নেমে গিয়েছিলে। সেই জলসীমার কাছাকাছি ঝকঝকে সুদৃশ্য দুটো পোর্টলঞ্চ আর কতকগুলো নৌকোও নোঙর বেঁধেছিল।

দীপেন তাকিয়ে দেখল উমা এসব কিছু দেখছে না। এসব দেখার চোখ উমা হারিয়েছে। প্রাণময় সতেজ সজীব সুন্দরের আকর্ষণে আজকাল উচ্ছ্বসিত হওয়া দূরে থাক, মনের মাঝে ঈষৎ চঞ্চলতা অনুভব করতেও উমা ভুলে গেছে।

অথচ উমা একদিন সত্যি সত্যিই পাখির মত চঞ্চল ছিল, নদীর ঢেউয়ের মত উচ্ছ্বসিত ছিল, বসন্তের বৃক্ষ-রাজির মত সবুজ ছিল। উমা জীবন্ত ছিল। উমা তখন ফুল ফোটাতে চাইত। তাই ফুল ফোটাবার গানে উমার কণ্ঠ অপরূপ হয়ে উঠত। জ্যোৎস্নারা সেখানে এসে খেলা করত। বনময়ূর-ময়ূরীরা সে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত। আর হরিণ সোহাগে হরিণীর পিঠে শিং বোলাত। উমা দীপেনকে সেদিন কবি করে তুলেছিল। অফিস ছুটি শেষে উমা তখন অসহিষ্ণু পায়ে ইডেন গার্ডেনের কোণায় এসে অপেক্ষা করত। তারপর দীপেনকে নিয়ে ঢেউ দেখত, আকাশ দেখত, ঘাসে ঘাসে গাছে গাছে ফুলে ফুলে আনন্দের শিহরণ কান পেতে শুনত। হাওয়ার টানে গ্যাস বেলুনের মত উমা তখন মাতাল হয়ে উড়তে চাইত।

এক একদিন উমা দীপেনকে নিয়ে গঙ্গার বুকে ভাসত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো দুলত। উমা দীপেনের বাহুমূল শক্তহাতে জড়িয়ে ধরত।

দীপেন জিজ্ঞেস করত—উমা ভয় করছে!

উমা সংক্ষেপে জবাব দিত—না।

—তবে?

—এমনি ভাল লাগছে। উমার বুকের মাঝ থেকে যেন এককলি গান ছড়াত।

উমা ফুল ফোটাবার জন্যে অধীর হয়েছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে উদ্যত বিষাক্ত কীটের হুল উমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এমন কি তার অস্তিত্বের সম্ভাবনাও উমার ভাবনায় কোন ছায়া ফেলে নি। কিন্তু সেই উন্মুখ বসন্তের আঙিনায় হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। আর উমার জীবনের ছবির সূক্ষ্ম কারুকার্য কে যেন মুছে দিয়ে মোটা রেখায় কালো রঙে তুলি বোলাল। উমার দাদা শঙ্কর দু'দিন রোগ ভোগের পর চারটি শিশুসন্তান ও স্ত্রী কৃষ্ণাকে চাকুরে বোনের হাতে তুলে দিয়ে

আকস্মিকতা ব পৃথিবী থেকে ডুব মারল। এ ল দুঃখে উমা তখন ডুকরে কেঁ ছিল। চোখ হতে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু মাঝে পুত্র হারাবাব বেদনায় মুহ্যমান মা ও বাবা, স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা স্ত্রী কৃষ্ণা ও সদ্য পিতৃহারা শিশু ক'টি—সবাব মুখই ভাসছিল। উমা ক'দিন অফিস কামাই করে শুধু শোকেব ঢেউয়ে আছাড় খেয়েছে। তারপর মহাকাল সেই ঢেউটাকে একসময় ধীরে ধীরে শুষে নিয়েছিল। উমা নিজেকে একসময় শুকনো ডাঙায় আবিষ্কার করেছিল। তখন তার মনে হচ্ছিল, দাদা মরে গিয়ে তার চরম শত্রুতা করে গেল। দুঃখের চেয়েও প্রচণ্ড এক হিংস্রতা ক্রমে ক্রমে দলা পাকাচ্ছিল তার বুকের মাঝে। পিতা উপযুক্ত ছেলের মৃত্যুতে শয্যা নিলেন। সেই শয্যা ছেড়ে তিনি আজ দু'বছর উঠে দাঁড়ান নি। ম্লানমুখী কৃষ্ণা নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে নীরব ও নত। আর মা গত দু'বছর ধরে নিঃশব্দ বিলাপে মুখর।

অন্যমনস্ক উমা এখন গঙ্গার পাশে বসে বসে কি ভাবছে—দীপেন জানে না। হয়ত উমা ভাববার মত আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। জীর্ণ সংসারেব পরিকীর্ণ ক্ষুধা আর সর্বগ্রাসী অভাব-অনটন অসুবিধের স্তূপের মাঝে বসে বসে জীবনের আর যৌবনের স্বাভাবিক অর্থ সে আজ বিস্মৃত। অনেক কষ্টের সাথে লড়াই করতে করতে সে-সব অর্থ অতীতের দেযাল চাপা পড়ে গেছে। চুণ-বালি খসে পড়া শেওলা জমা বাড়িব মত উমার ক্ষয়িষ্ণু চেহাবা। তার চোখের কোণে কালি জমেছে, গলার আর চোয়ালেব হাড় প্রকট, কপালে হাল্কা তিনটি রেখা স্থির। উমা পেটের গোলমালে ভুগছে। স্বাস্থ্য খাবাপ হয়ে যাবার অজুহাত হিসেবে উমা বরাবর এ যুক্তিই দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার পাড়ে বসে গল্প করতে করতে সে আজকাল আর চিনেবাদাম চিবোয় না। অথবা চিনেবাদাম চিবানো বন্ধ হবার সাথে সাথে উমার গল্পের ভাঁড়াবও শূন্য। উমা আজকাল আর কথা বলে না বা দীপেনকে কথা বলায় না।

অথচ কিছুকাল আগেও উমা দীপেনের সামনে একই ধরণের সমস্যাব প্রায় ক্লান্তিহীন পুনবাবৃত্তিতে মুখর হত আর স্বল্পবাক দীপেনকে টেনে টেনে সে কথার মাঝে নামাত।

—জানো, কাল কি এক কাণ্ড!

দীপেন ঘাড় ফেরাল, কি?

—তুমি চলে আসাব পর মাযেব সে কি কান্না। বলে, 'ও' কেন আসে, কি চায়।

—তারপর?

—তারপর আর কি! আমি ভীষণ চটে গিযেছিলাম। আমার বক্তে দপ করে আগুন ধরে গিযেছিল। মাকে থামিযে দিয়ে বলে উঠেছিলাম, মা, তোমার ন্যাকামি বাখ, ওসব আমার সহ্য হয় না। 'ও' কেন আসে, কি চায়—তা তোমায় কি এতদিন বাদে আমাব ব্যাখ্যা করতে হবে। তুমিই তো 'ও'কে এতদিন আসতে বলতে। তখন দেখতাম স্নেহে তোমার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে আসত। 'ও'র আরামেব জন্যে, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তুমি ছোটাছুটি কবতে কম নয়।

বুঝলে। তারপব দেখলাম মা কান্না থামিযে দেবতাব মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাবপর এক সময আমার হাত জড়িযে ধরে আবার কেঁদে ফেললেন, তুই আমাদের ছেড়ে যাস নে খুকু, তুই আমাদের ছেড়ে যাস নে।

উমাব মুখেব 'পরে স্থির দীপেনের চোখ দুটো যেন বলল, তাবপব?

উমা বলে যেতে লাগল, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি বৌদি বুকের কাছে গোটা দুই বাচ্চাকে জড়ো করে ধূসর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে। ওপাশে বাবার ঘন ঘন কাশিব শব্দের মাঝে কি যেন অশুভ ঘোষণা। আমি যেন কেমন অমানুষ হযে গেলাম। নিজেকে স্থির রাখতে আর পাবলাম না। ধরিত্রীর বুকে বসেও আব সর্বংসহা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি সজোরে মায়েব হাত সরিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। তখন যদি তোমায় হাতের কাছে পেতাম, কি যে হত জানি নে।

উমা নিজের আবেগেব রাশ চাপবার জন্যে নিজেকে থামাল। পরে বলল, কাল রাতে আমাদের কারও আর খাওয়া হল না।

দীপেন দেখল, একরাশ স্বচ্ছ জলে উমার চোখ দুটো ভাসছে। বলল, ছিঃ, কাঁদতে নেই, চোখ মোছ। আর সাথে সাথে সেই থমকে থাকা জল উপচে গাল বেয়ে নামতে সুরু করল। উমা চোখে আঙুল চাপা দিল।

খানিক বাদে শান্ত চোখে উমা দীপেনের দিকে তাকাল। আকাশের বুকে সন্ধ্যাতারার মত একটি নির্মল প্রশ্ন তুলে ধরল। বলল, আমাদের কি হবে?

—নতুন কথা আমি আর কি বলব বল। যা বলবার তোমায় তো জানিয়েছি।

অনেক গভীর চিন্তার পরিণত রূপ পরিবেশনের সঙ্গে শান্তকণ্ঠে উমা উত্তর কবলে, না তা হয় না। তুমি বাবাকে চেন না। বাবার আত্মাভিমান বড় প্রখর। বিবাহিত কন্যার কাছ থেকে সাহায্য তিনি নেবেন না। তিনি বরং আত্মহত্যাকে শ্রেয় বলে বিবেচনা কববেন।

দীপেন বলতে চেযেছিল, মৃত্যু-পাণ্ডুর বোগজীর্ণ পিতার মৃত্যুতে, উমা, তোমার আর কি ক্ষতি হবে! বরং তুমি এক নিষ্প্রাণ নিরানন্দ দায়িত্ব-ভার হতে অব্যাহতি পাবে।

কিন্তু দীপেন তখন উমাকে সে কথা বলতে পারে নি।

উমাকে এখন ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে, অসহায় আব ক্লান্ত। হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে উমা চুপচাপ বসে।

উমার দিকে তাকিয়ে এখন

বন্ধু মুকুল কথিত সমুদ্রস্নানের কাহিনীটি দীপেনের মনে পড়ছে। মুকুলের পুরীতে সমুদ্রস্নানের সেটা দ্বিতীয় দিন। মুলিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকেই মহানন্দে সে ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে ভাসছিল। অন্যমনস্কভাবে অথবা স্রোতের টানে বেলাভূমি হতে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের মাঝে এক সময় সে নিজেকে আবিষ্কার করেছিল। মুকুল হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। কাছাকাছি আর কেউ নেই। শুধু চারপাশে রোদে ভেসে যাওয়া আকাশ আর এক সমুদ্র নীল জল। আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের মত নিজেকে জনহীন দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী বলে তার বোধ হচ্ছিল। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় তীরের দিকে এগুবার প্রাণপণ প্রয়াস তার বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। কে যেন তাকে ঠেলে ঠেলে আরও দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। বেলাভূমির পরের মানুষগুলোকে দেখাচ্ছে তখন বিন্দুর মত। সমুদ্রতীরের হোটেলগুলো সব খেলনা। আর স্বর্গদ্বারকে দৃষ্টি দিয়ে সে ছুঁতে পারছে না। অথচ সমুদ্রের সাথে মুকুলের প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্ত ছিল কত মধুর। সকালের নরম রোদে সাইকেল রিক্সা চড়ে আসতে আসতে ঝাউবনের মধ্য দিয়ে হয়েছিল তার প্রথম শুভদৃষ্টি। আর সাথে সাথে সমুদ্র-ভালবাসায় মুকুলের বুক ভেসে গিয়েছিল। কেমন এক মানবিক বোধে সে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তখন থেকে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে, হোটেলের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে মুকুল ক্রমশ সমুদ্র-ভালবাসায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। অথচ যখন ঢেউয়ের টানা-পোড়েনের মাঝে সে শক্তি হারাচ্ছিল তখন সমুদ্রকে তার ভয়ানক জীবন্ত ও হিংস্র মনে হচ্ছিল। সেই প্রসন্ন ভালবাসার রূপ মুছে গিয়ে এক দানবীয় মূর্তিতে সমুদ্র প্রকট হয়েছিল। প্রকাণ্ড ঢেউগুলোর মাঝে কি এক বিধ্বংসী শক্তি। কি এক প্রকাণ্ড আক্রোশে তারা ফুঁসছে।

আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘাস ছিঁড়তে থাকা উমার দিকে তাকিয়ে দীপেনের মনে হচ্ছে ভালবাসা পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তি বা বস্তু আশ্রয়ী ভালবাসা কোনও বিশেষ আবহাওয়ায় ভূমিষ্ঠ ও লালিত হয়। সেই আবহাওয়ার পালাবদল ভালবাসার মূল ধরে নাড়া দেয়। নাড়া খেয়ে খেয়ে ভিত আলগা হওয়ার দরুণ মৃত্যুর করাল ছায়া এগিয়ে এসে ভালবাসা-তরুকে গ্রাস করে। উমার ভালবাসার উষ্ণতাও আজ অবসিত। উপচীয়মান অভাব-অনটন-দারিদ্র্যই এর প্রাণরস শোষণ করেছে নিঃশেষে। শুধু শুষ্ক তরুটি এখন সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে অথবা সময়পুরুষ রূপোর কৌটো হতে উমার ভালবাসার প্রাণভ্রমরাকে হরণ করে তার প্রাণ সংহার করেছে, তাই উমা শীর্ণা ও শুষ্কা। উমার মুখে হাসি নেই। উমার অন্তরে আনন্দ নেই, সুখ নেই। উমা শুধু হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে বসে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘাস ছিঁড়ছে আর বিবর্ণ, বিশ্রী, রংচটা মালবাহী জাহাজটার পরে চোখ রেখেছে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল-কাল রঙের জাহাজটার কোথিও ফুঁড়ে ওঠা মোটা চোঙা হতে কোন ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। উমা এখন সেই ধোঁয়াহীন চোঙাটা দেখছে।

উমার ভালবাসার প্রগাঢ় বোধের মরে যাওয়া ফ্যাকাশে চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝে এক প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষায় দীপেন খরতাপে জ্বলে। এক বিরাট বাসনার দীপ্ত শিখা দীপেনকে দাহ করে প্রচণ্ড শক্তিতে। জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে দীপেন একেবারে সূর্য হয়ে যায়। সূর্য। তেমনি জলন্ত দীপ্ত জীবন্ত। তেমনি ঋজু ও বলিষ্ঠ। তার মাঝে সীমাহীন শক্তি ও প্রখর প্রদীপ্ত আলোর বন্যা। সেই প্রচণ্ড শক্তি ও চোখ ধাঁধান আলো তার মাঝখান হতে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীময়। পৃথিবীর গোটা ভূভাগ যে আলোয় উজ্জ্বল আর সে আলোর পরশে সমস্ত মানুষ তাদের পঙ্গুতা, দুর্বলতা, রুগ্নতা কাটিয়ে জীবনে উজ্জীবিত।

অনুভূতির গাঢ়তায় ও উপলব্ধির সমুচ্চ স্রোতে সম্মুখের দৃশ্যমান বহতা গঙ্গা, নৌকো, লঞ্চ, মালবাহী নোঙর ফেলা জাহাজ, তৃণল জমি, পেছনে শব্দের টানা ধ্বনি তুলে বেরিয়ে যাওয়া বাস লরী কার ইত্যাদি সমস্ত ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দীপেন শুধু এক দীপ্ত সূর্য হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে শক্তি বিকিরণ করতে লাগল অব্যাহতভাবে।

তারপর এক সময় দীপেন তার প্রকাণ্ড ইচ্ছা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষাটাকে মনের সমুচ্চ শীর্ষদেশ হতে ঢাল বেয়ে বেয়ে গড়াতে দেখে, আর তার বিশাল দেহটা ক্ষয়িত হতে হতে ক্লান্তি ছড়ায়। এক সময় তার ক্ষুদ্রতম দেহটুকুও মিলিয়ে যাবার পর দীপেন নিজেকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখে। একটু দূরে বসে অন্যমনস্ক উমা আঙুলে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘাস ছিঁড়ছে আর হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে গঙ্গার বুকে নোঙর


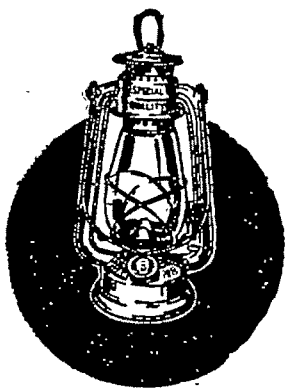

কিয়ান
লক্ষ্মন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৮,৪নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

ফেলা রংচটা বিবর্ণ বিশ্রী মালবাহী জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সাথে সাথে দীপেনের চোখে ভাসে উমার দাদা মৃত শঙ্করের চেহারা, শুয়ে শুয়ে কাশতে থাকা প্যাকাটির মত শুকনো উমার বাবার প্রতিমূর্তি, ম্লানমুখী কৃষ্ণা ও নিথর শঙ্কিতদৃষ্টি উমার মায়ের নির্জীবতা। তখন চুপচাপ উমার পাশে বসে থাকাটা দীপেনের খারাপ লাগে। উমার উঁচিয়ে ওঠা কণ্ঠা ও চোয়ালের হাড়, উমার চোখের কোণে ঘনিয়ে আসা কালির আস্তরণ, কপালের 'পরে স্থির তিনটি রেখা বড়ড প্রকট হয়ে দীপেনের চোখে পড়ে। দেখে দেখে ক্লান্ত দীপেনের ঘুম পায়। জীবনানন্দের ভক্ত দীপেনের তখন মনে পড়ে 'গভীর ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত'। দীপেন জানে আজ এইক্ষণে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করলেও অনুযোগে উমা ঘাড় বাঁকাবে না বা চোখে ভ্রূকুটি হানবে না। অথচ এক সময় প্রতিবাদের ঝড় তুলতে এই একটি লাইনই যথেষ্ট ছিল। উমা এটাকে বলত মৃতদের কবিতা।

দীপেন জানে উমা পাল্টে গেছে। আজ এ কথা বলার ক্ষমতা উমার নেই। এমন কি এসব কথা ভাবতেও উমা বিস্মৃত হয়েছে। উমা আর কিছুই করতে পারে না, হতে পারে না। তারা দুজনে দুই সমান্তরাল রেখা ধরে হাঁটছে, হেঁটেই যাচ্ছে আবহমান কালের শূন্যসীমা অবধি। কেউ কারও উত্তাপের স্বাদ কোনদিন নিতে সক্ষম হবে না। শুধু অভ্যাসের বশে তারা দুজন এখনও অফিস শেষে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়। ইডেন গার্ডেনের কোণায় দীপেন উমার জন্যে অপেক্ষা করে অথবা উমা দীপেনের প্রতীক্ষায় থাকে। তারপর সারাটাদিন অফিস করায় ক্লান্ত দুজন কেউ কারও কাছে কোন প্রত্যাশা না করে হাঁটতে থাকে—পাশাপাশি, চুপচাপ। কেউ কারও দিকে না তাকিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড় অবধি তারা চলে যায়। পোর্ট কমিশনের রেল লাইন পেরিয়ে, জোড়া বটগাছের গা ঘেঁসে এগিয়ে গিয়ে তারা কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে বসে পড়ে। তারপরই নীরবতার মধ্যে হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে উমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে আর দীপেন তার প্রচণ্ড ইচ্ছে-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবতে থাকে।

দীপেন আজ রুগ্ন ক্ষীণজীবী উমার দিকে তাকিয়ে ভাবছে—না সে পারে না। সূর্য যা পারে—সে তা পারে না। তার পক্ষে সূর্য হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা শুধু সম্ভব। সত্যি সত্যিই সে সূর্য হয়ে যেতে পারে না। সূর্য কোটি কোটি মাইল দূর হতে পৃথিবীর বুকে প্রাণের জাল ছড়িয়ে দিচ্ছে, পৃথিবীর বুকে প্রাণের হর্ষকে মুক্তি দিচ্ছে। আর সে বা তারা পৃথিবীর বুকে বাস করেও পৃথিবীর এখানে-ওখানে সর্বত্র জাঁকিয়ে বসা চাপ চাপ আঁধারকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না।

উমার পাশে বসে প্রাক্ সন্ধ্যার রক্তের মত টকটকে লাল অথচ নিষ্প্রভ সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীপেন আজ একটা নতুন কথা ভাবছে। সূর্য হবার ক্ষমতা ওদের নেই। কিন্তু প্রত্যেকে তো ওরা তারার মত টিমটিম করে জলতে পারে! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা তাহলে কি পৃথিবীর বুকে কম আলো জোগাবে? নিরুত্তাপ পিণ্ড না হয়ে যদি উমার বাবা তারা হতেন? উমার মা বা শঙ্করের স্ত্রী? দীপেন ভাবছে—আমরা কেন তারাও হতে পারছি নে।

রংচটা বিবর্ণ বিশ্রী নোঙর করা মালবাহী জাহাজটার পাশ দিয়ে তরতর করে জল এখনও দক্ষিণমুখো নামছে। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। শুধু খানিক লাল আগুনের আঁচ পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে ছিল। গঙ্গার বুকে, পেছনে কোর্ট উইলিয়ামের 'পরে ঘনিয়ে আসা কাল ছায়াটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে থাকা উমা যেন সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

উমা চকিতে একবার মুখ তুলল, দীপেনের মুখ পড়বার চেষ্টা করল, তারপর বলল, কি ভাবছ।

দীপেন নিরুত্তর। ভাবছে, কি বলে।

উমা কথাটা পুনরুক্তি করল। কতকটা যেন অভ্যাসবশে।

দীপেন বলল, কি ভাবছি জান, আমার মাঝে এক প্রকাণ্ড ইচ্ছা জন্ম নিয়েছে।

উমা খানিক উৎসুক হল।

দীপেন একটু ভেবে নিয়ে বলল (এবং মিথ্যে বলল), উমা, প্রবল এক আকাঙ্ক্ষায় আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে চারপাশের এই লোকজনের মাঝে তোমায় বুকে চেপে ধরি। এ খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে চুমুতে চুমুতে তোমায় আচ্ছন্ন করে দিই।

এই আবছা আলোর মাঝেও দীপেন যেন দেখল উমার ফর্সা মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। তার পরক্ষণেই অন্ধকার এসে উমাকে গ্রাস করল। উমার মাঝে ক্ষণিকের জন্যে দীপেন তারার দীপ্তি প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু উমা আবার কঠিন বস্তুস্তূপে পরিণত হল। দীপেনের মনে হল, এ পোড়া পৃথিবীতে বুঝি তারা হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
—ইহাতে আছে—
ঋষি-বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ক্রতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটের ত্রিকালের কথা

● ওল্ড কোর্ট হাউসের স্থলাভিষিক্ত সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চ

ভূ-স্বামী চৌধুরীদের সেকাল, একালের নতুন হাটে আর হাট করতে আসে না। কারণ তার অগস্ত্যযাত্রার লক্ষ্যস্থল থেকে বর্তমানের পথ কেবল দীর্ঘ নয়, দুর্গম। এ-পথের প্রথম ভাগ যেমন স্মরণের সূর্য-প্রস্থানে তমসাবৃত, অন্য ভাগ তেমনই অবিচল অসম্পৃক্তের কাঁটাকুঞ্জে আকীর্ণ। তাই সেকাল আজ একালের উদ্দেশে পা বাড়াতে চাইলেও, পথের বৈরাচরণে তার বিপদগামী হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনই একালের বাস্তব-বিলাসী সন্ধিৎসা সেকালের উদ্দেশে তীর্থযাত্রী হতে চাইলেও, তার পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয় কাঁটাকুঞ্জের বাধা। তবে বাস্তব চেতনারই সূক্ষ্ম স্তর থেকে উদ্বুদ্ধ যে-কৌতূহল, যার তৃষ্ণার তাগিদ আছে—নিবারণের ব্যাকুলতা নেই এবং যার ধমনীতে কেবল সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার, সে কাঁটাকুঞ্জের ঘায়ে জর্জরিত হয়েও পা বাড়ায়, অন্ধকারেও হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে এবং অতলান্ত পাথারেও ডুব-সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলে কেবল তৃষ্ণার আনন্দেই! তাই মাঝে মাঝে তারই স্বার্থ-পরাঙমুখ দাক্ষিণ্যে ভেসে আসার সুযোগ পায় দূরাতীতের কণ্ঠ। সে-কণ্ঠ অস্পষ্ট এবং অনেক সময় ইতিহাস-গ্রাহ্য না হয়ে পুরাতত্ত্ববিদের বিচার্য হলেও, তাকে কেবল ধরতে পারা গেছে বলেই খানিকটা বিজয়ীর মতো হয়তো অনায়াসেই বলা যায়: 'এ আমার অহঙ্কার, অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।'

আজ ঠিক সেভাবেই, ভূ-স্বামী চৌধুরীদেরও সেকাল, তার মৃদু-কণ্ঠের সামান্য বার্তা পাঠিয়েছে একালের দ্বারে—যা ইতিবৃত্তে অনুক্ত হলেও, ব্যঞ্জনা তার দুর্বোধ্য নয়। সুতরাং কষ্টিপাথরের অপেক্ষা না করেই প্রত্যয়ের বেদীমূলে তার প্রতিষ্ঠা যদি ঘটেও, তাহলে খুব একটা দোষের হবে না সম্ভবত।

ভূ-স্বামী চৌধুরীরা জমিদার হলেও, সেকালে আচার ছিল তাঁদের রাজসিক। দাপট, দৌলত এবং জৌলুশ ছিল রাজা-মহারাজাদের মতোই। যেমন বিলাসী, অনাচারী এবং খেয়ালি, তেমনই ধার্মিক, দয়াবতার এবং মেজাজী ছিলেন তাঁরা। তাঁদের তিনটি মন্দিরে পূজা হতো নিয়মিত; মন্দিরদ্বারে দরিদ্র-ভোজন হতো প্রত্যহই। আবার

## শ্রীপদাতিক

বাঈজীর নূপুরে চঞ্চল হতো অন্দর-মহলের রাতগুলি; রাতের প্রতিটি প্রহর ভাসতে ভাসতে ডুবে যেতো মদের পেয়ালায়। খেয়াল ছিল তাঁদের হরেকরকম। তাঁদের খেয়ালেই হাতী-দৌড়-ঘোড়াদৌড়ের অনুষ্ঠান হতো মাঠে; বাইচ খেলার উৎসব জমতো গঙ্গায়। আর বৎসরে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হতো মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। তার আখড়া ছিল জমিদারবাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে। কারুকার্যখচিত প্রাচীরের পরিবেষ্টন ছিল আখড়ার চারদিকে এবং প্রাচীরের গায়ে-গায়েই সংস্থাপিত ছিল অজস্র আসন দর্শকজনের। পর্দার অন্তরাল থেকে তা উপভোগ করার ব্যবস্থা ছিল নারীমহলেরও। দূর-দূরান্তর থেকে আসতো বাছাই করা মল্লযোদ্ধা। যে বীর পর পর অনেক ক'জনকে পরাস্ত ক'রে আসন পেতো শীর্ষে, জমিদার তাকে উপহার দিতেন সোনার প্রদীপ। এই প্রদীপ জালিয়ে উক্ত মল্লবীর প্রথমত শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের নির্দেশে আরতি করতো ত্রি-দেউলের দেবতা। তারপর জমিদারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে সে তা গ্রহণ করতো আপন অর্জিত সম্পত্তিরূপে।

একদিন এমনই এক প্রতিযোগিতা-মূলক মল্লযুদ্ধের আয়োজন হয় সেখানে। জমিদারের আমন্ত্রণে সেদিন সমাগম ঘটে বিভিন্ন প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় মল্লযোদ্ধাদের। তন্মধ্যে দক্ষিণদেশ থেকে আসে এক বীরাঙ্গনা নারী। সমবেত বীরদের মধ্যে বীরাঙ্গনা সে একাই। পরপর প্রত্যেক বীরকে পরাস্ত ক'রে যে-বীরের অভিষেক ঘটবে শীর্ষাসনে, শেষে তার সঙ্গেই মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণা হবে বীরাঙ্গনা—

এমন ব্যবস্থা হয় জমিদারের নির্দেশে। তাছাড়া উক্ত বীর যদি কোনোক্রমে বীরাঙ্গনার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাহলে বীরাঙ্গনার সঙ্গে সেদিনই তাকে আবদ্ধ হতে হবে পরিণয়সূত্রে—পারিষদদের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক গোপন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন জমিদার। এই বীরাঙ্গনার নাম দামিনী, তার দেহের গঠনশৈলী যেমন পেশীবহুল, তেমনই বিশাল এবং বলিষ্ঠ—যেন রূপকথার এক সুন্দরী রাক্ষসী। সেদিন কেবল তারই লড়াই দেখার অভূতপূর্ব উৎকণ্ঠা নিয়ে দর্শক-সমাকীর্ণ হয়ে ওঠে সমগ্র আখড়া। পর্দার অন্তরালে জ'মে ওঠে নারীমহলেরও নিশ্ছিদ্র সমাহার।

যথাসময়ে শিঙ্গা বাজে। প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণে নেমে আসে যোদ্ধারা। প্রচণ্ড করতালির মাধ্যমে সুরু হয় তাদের যুদ্ধ। প্রথম এগিয়ে আসে গজাসুর নামে এক বীর এবং একে একে সে-ই প্রত্যেককে পরাভূত ক'রে অর্জন করে বিজয়ীর গৌরব।

এবার বিজয়ী গজাসুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পালা দামিনীর। সে এক সুন্দরী রাক্ষসীর মতোই এগিয়ে আসে দৃপ্ত পদক্ষেপে। কিন্তু বিজয়ী গজাসুর তাচ্ছিল্যভরে জানায়: নারীর সঙ্গে সে লড়াই করবে না। কারণ তার মতো একজন বীরের পক্ষে তা অপমানকর।

গজাসুরের এই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রই গর্জন ক'রে ওঠেন জমিদার। গজাসুরের মতো তিনি বীর না হলেও, অর্থে-সামর্থ্যে এবং প্রতিপত্তিতে তাঁর যে তুলনা নেই—সে-কথা গজাসুরও জানে। সুতরাং জমিদারের রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে তার পক্ষে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা আর সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই সে এগিয়ে এলো দামিনীর মুখোমুখি এবং মনে মনে ভাবলো: প্রথম ক্ষেপেই সে দামিনীর দম্ভ চূর্ণ ক'রে তাকে ইহজীবনের মতো এক উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু গজাসুরের নিয়তি বিমুখ। তাই সে দামিনীকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেই দামিনী তাকে লুফে নেয় শূন্যে এবং শূন্য থেকেই প্রচণ্ড বেগে তার পতন ঘটে মাটিতে। তারপর মাটি থেকে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করার আগেই দামিনী বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে লড়াইয়ের যবনিকা নামে সেখানেই।

শিঙ্গা আবার বেজে ওঠে। দামিনীর হাতে ওঠে সোনার প্রদীপ। দেবতার আরতি হয় এবং জমিদারের গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উলুধ্বনির পাশাপাশি জাগে শঙ্খধ্বনি। দামিনীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয় গজাসুর।----- কিন্তু গজাসুরের জীবনে এ যেন এক চরম লাঞ্ছনা, অনভিপ্রেত কলঙ্ক। দামিনীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অর্থই এবার থেকে সে দামিনীর দাসানুদাস। হাড়ে হাড়ে তার আগুন জ্ব'লে ওঠে, জ্বলন্ত যুগল চিতার মতো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে চক্ষুদ্বয়—যেন তখনই সে ভস্ম করতে চায় দামিনীকে। কিন্তু কী-ভেবে সে তখনকার মতো নীরব থাকে এবং সন্ধ্যার পর রাত্রি নামতেই সে জমিদারবাড়িরই নিভৃত কক্ষে শয্যা গ্রহণ করে দামিনীর সঙ্গে।

পরদিন ভোর হ'তেই দেখা গেল: জমিদারবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে গজাসুর। দামিনীও বিদায় নিয়েছে ইহজীবনের মতো। কেবল তার ক্ষতবিক্ষত নিষ্প্রাণ দেহভার প'ড়ে আছে কাছারীবাড়ির সামনে—যেখানে এক পুকুর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খনন-কার্য চলছিল এবং যার মধ্যবর্তী অংশে জ'মে ছিল কিছু পাতাল-উৎক্ষিপ্ত জল। জলের রঙ তখন দামিনীর দেহ-নির্গত রক্তেই লালে লাল।---কে জানে, পরে যখন বিপুলায়তন রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় পুকুর, তখন সে জন্যলগ্নের সেই দামিনীর রক্তকে স্মরণ করেই নাম রাখে 'লাল দীঘি' কি না।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই

ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

এ-ধরণের মল্লযুদ্ধের প্রতি বিরূপ ভাব জাগে জমিদারের। সম্ভবত সে-কারণেই জমিদারবাড়ির সীমানা থেকে চিরকালের মতোই চুকে যায় মল্লযুদ্ধে বীরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পালা। ফলে দীর্ঘদিনের অব্যবহারে বা অযত্নে ধ্ব'সে পড়ে আখড়ার কারুকার্যখচিত প্রাচীর। তারপর যে-কোনো কারণেই হোক, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত আখড়া বা তার অধিকৃত ভূমিখণ্ড, জমিদার একদিন হস্তান্তরিত করেন জব-চার্নকের সমসাময়িক বুর্শায়ার (Bourcier) নামক এক বণিকের কাছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাতঃকালেই, অর্থাৎ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে বুর্শায়ার উক্ত আখড়াস্থলেই নির্মাণ করেন এক বৃহদায়তন গৃহ। তারপর তাঁরই প্রচেষ্টায় সে-গৃহে প্রতিষ্ঠা পায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং সেকালের অনাথ খৃষ্টান বালকবালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি আশ্রম। এ-ব্যাপারে নানাভাবে সহযোগিতা করেন খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ এবং কনষ্টানটাইন নামক জনৈক ইংরেজ দান করেন প্রায় সাত হাজার টাকা।

এই অবৈতনিক স্কুল এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পর, যখন ভূ-স্বামী চৌধুরীদের সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় ক'রে এবং অন্যদিকে সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তখন তারাই বিশেষভাবে অনুভব করে একটি দায়রা আদালত-গৃহের অভাব। এই অভাব পূরণ করার উদ্দেশ্যেই বুর্শায়ার উক্ত স্কুল এবং আশ্রমগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন আরও বর্ধিত আকারে এবং তার এক বৃহৎ অংশ দায়রা আদালতরূপে ব্যবহার করার সুযোগ দেন কোম্পানীকে। এখানে দায়রা আদালতের প্রতিষ্ঠা ঘটায় পরে সমগ্র গৃহটির নামকরণ হয় 'কোর্ট হাউস'। এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অমি লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'বুর্শায়ার নির্মিত গৃহটি একতল হইলেও বিস্তৃতায়তন ছিল। উহাতে মেয়রের কাছারী বা দায়রা আদালত বসিত।'

স্কুল বা আশ্রমগৃহে আদালত প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে মাসে প্রায় আটশ' টাকা বুর্শায়ারকে স্কুল-আশ্রমের সাহায্য-কল্পে দান করতো কোম্পানী। উক্ত অর্থ বুর্শায়ার কর্তৃক ব্যয়িত হলেও, তিনি প্রতিমাসে তার হিসেব দাখিল করতেন কোম্পানীর কাছে।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্কুল এবং আশ্রম কোর্ট হাউস থেকে অন্যত্র অপসারিত হওয়ায় বুর্শায়ার কর্তৃক সমগ্র গৃহটিই এবার হস্তান্তরিত হয় কোম্পানীর কাছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তখন গৃহটির আরও অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং সেখানেই তাঁদের বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম চালিয়ে যান আরও কিছুকাল।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠিক অন্তিম পর্বে সুসজ্জিত বিচারশালা অন্যত্র স্থাপিত হওয়ায় বুর্শায়ার প্রতিষ্ঠিত গৃহ 'ওল্ড কোর্ট হাউস'-রূপে পরিত্যক্ত হয় কোম্পানী কর্তৃক। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে 'ওল্ড কোর্ট হাউস'-এর অবস্থান হেতুই তার সম্মুখবর্তী সুদীর্ঘ রাস্তাও নাম ধারণ করে 'ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট'। এ-রাস্তা প্রতিষ্ঠা করেন ইঞ্জিনীয়ার ওয়াটসন—যিনি ফোর্ট উইলিয়ামেরও প্রতিষ্ঠাতা।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্কচ রেভারেণ্ড ডঃ জেমস ব্রাইস সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওল্ড কোর্ট হাউসের রূপান্তর ঘটে গীর্জায়। গীর্জার নতুন গৃহ নির্মাণ করেন মেসার্স বার্ণ কুরি এণ্ড কোম্পানী। তার নির্মাণ খরচ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

সেণ্ট এণ্ড্রুস-এর জন্মদিবসে উক্ত গীর্জাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন লর্ড ময়রার পত্নী কাউণ্টেস অব লাউডন এবং সম্ভবত সেদিনই তার নামকরণ হয় 'সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চ'। এই চার্চের পবিত্র সত্তার গভীরেই চিরতরে নিরঞ্জন ঘটে ওল্ড কোর্ট হাউসের। কেবল তার স্তিমিত স্মৃতি বহন ক'রে চলার প্রয়াস পায় জনারণ্যে উৎপীড়িত এক সরণী।

গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল

এই সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চের প্রতিষ্ঠা-কালে কচ রেভারেণ্ড ব্রাইস এবং কিছু ইংলিশ-সেন একটি কলহসূচক ঘটনার উৎপত্তি করে—যা বেশ মুখরোচক এবং খানিকটা প্রণিধানযোগ্যও বটে।

চার্চের চূড়াকে কেন্দ্র ক'রেই গোড়াপত্তন ঘটে ঘটনাটির। চার্চের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড ব্রাইস জাতিতে স্কচ এবং কলকাতার তৎকালীন বিশপ মিঃ মিড্‌লটন জাতিতে ইংরেজ। চার্চের আকাশচুম্বী চূড়া নির্মাণের প্রথা ইংরেজদেরই অধিকারে এবং তাঁরাই তার জন্মদাতা। সুতরাং ইংরেজদের একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য অপহরণ ক'রে ব্রাইস যাতে সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চের চূড়া নির্মাণ করতে না পারেন—তজ্জন্য পূর্বাহ্নেই এক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান মিঃ মিড্‌লটন। কিন্তু ব্রাইস উক্ত আন্দোলনের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ঘোষণা করেন: সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চের উপরি-ভাগে তিনি অবশ্যই চূড়া নির্মাণ করাবেন এবং সে-চূড়া হবে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জন চার্চের চূড়া অপেক্ষা উচ্চতর। তাছাড়া সুউচ্চ চূড়ার শীর্ষদেশেও তিনি স্থাপন করবেন একটি ওয়েদার কক্—যা মাঝে মাঝেই কর্কশ ডাক ছেড়ে ব্যঙ্গ করবে মিডলটনকে। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে সক্ষম হন সহজেই। তবে পরাজিত মিড্‌লটনকে খানিকটা সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই তৎকালীন ইংরেজ সরকার P. W. D.-কে নির্দেশ দেন: প্রয়োজনে সেণ্ট এণ্ড্রুস চার্চের সংস্কার করার সময় তার চূড়া এবং চূড়াস্থ ওয়েদার কক্ ভগ্নদশা হয়ে খসে পড়লেও যেন মেরামত করা না হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সে-নির্দেশও ঠিকমতো কার্যকরী হয় নি। কারণ চূড়ায় সন্নিবিষ্ট সেই ওয়েদার কক্ এদিনেও ব্যঙ্গ ক'রে চলেছে মিড্‌লটন সাহেবের প্রেতাত্মাকে।

আগে ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের বিস্তার ছিল চার্চের উপকণ্ঠ থেকে খিদিরপুর ব্রীজ পর্যন্ত। কিন্তু আজকাল তা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে নাম ধারণ করেছে একাধিক। বর্তমানের ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট সংকীর্ণ এবং সীমিত। কেবল গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের সীমানা থেকে ম্যাঙ্গো লেনের মোড় পর্যন্তই তার বিস্তার। তাই সেকালের 'ওল্ড কোর্ট হাউস'-এর স্থলাভিষিক্ত যে-গীর্জা—তাও আজ বিরাজ করছে রাস্তার বহির্ভাগে।

এককালে এ-রাস্তারই কোনো এক বসতবাটীর অধিবাসী ছিলেন কাউন্সিল সদস্য জেনারেল কেুভারিং এবং বর্তমান এজরা ম্যানশনেই সম্ভবত বসবাস করতেন তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দী অভিনেত্রী সুদর্শনা এসথার লিচ। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পার্ক ষ্ট্রীটের সাঁ-সুশী প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের সময় তাঁর জমকালো পরিচ্ছদে হঠাৎ অগ্নিসংযোগের ফলেই তিনি দেহান্তরিতা হন। প্রথম টেলিগ্রাফ অফিসেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এ-পথেই। সম্ভবত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে কলকাতার প্রথম টেলিগ্রাফ অফিস আত্মপ্রকাশ করে তৎকালীন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্র্যানফাদারের পরিকল্পনায়।

আজ গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল ছাড়াও পাশাপাশি এ-পথেই বিরাজ করছে অজস্র রাজকীয় প্রতিষ্ঠান বা দোকান। তন্মধ্যে ম্যানটন, হ্যামিলটন, কুক কেলভী, বাথগেট, ওয়াল্টার বুশনেল প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। এ-পথের র‍্যাঙ্কিনের পোষাক, অসলার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন অনুপমেয়, তেমনই নজর-বন্ধনে নিঃসন্দেহে সুন্দর ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলের শো-রুম। নিউম্যান এবং স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচারের কার্যালয়ও তাদের সদম্ভ-অস্তিত্ব ঘোষণা করছে এখানে। আজ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের কোনো অংশে ইংরেজ রাজপুরুষদের পদ-লাঞ্ছনার স্বাক্ষর না থাকলেও, জেগে আছে তাঁদের সুবিনীত প্রভাবের বিরামহীন প্রতিভাস—যা বৈচিত্র্যে অভিনব, অথচ জটিল! আভিজাত্যে রমণীয়, অথচ কুটিল এবং কার্পণ্যে অদ্বিতীয়।

## একটি মৃত্যুতে

**নবনীতা সেন**

সেই দুর্গম দুরত্যয়ের দ্বীপে
ঘন্দু-জুড়োনো মন্দ মলয় আসে
অন্ধ আকাশ বন্ধ অন্তরীপে।

যৌবন বুঝি দক্ষ দৌবারিক
খানাতে রুদ্ধ লুব্ধ জীবনচুরি
খদ্যোতে হয় প্রদ্যোত চৌদিক।

কোথা বিবিক্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মলোক!
মৃত্য হৃদয় বিধৃত অবিন্যাসে
ঘনিষ্ঠ প্রেমে বৈবস্বত শোক॥

## কোথায় আমার মুক্তি তুমি

**অলকেন্দুশেখর পত্রী**

কোথায় আমার মুক্তি তুমি?
মুক্তধারা:
সেই কুড়িয়ে এ-প্রান্তরের-প্রান্তরিমার—
সুপ্তি বুকের মুক্তি তোমার আলোকধারা।
মিলতে হ'বে তোমার সঙ্গে সঙ্গোপনে
সেই আমাদের সকল চাওয়ার সকল পাওয়া,
হয়তো হবে বনাহরের মুক্তি এবং
এ-নির্বেদে হয়তো পাবো জয়ের মালা।
ঘরে ফেরার দিনের শেষের শেষ লীলান্তে
এমন করেই তুলবে যেদিন রঞ্জনীয় মূর্চ্ছনাকে
সেদিন আবার ফেরার বুকের কালান্তরেই
শুরু হ'বে নতুন প্রাণের নবীন মুক্তি খোঁজা॥

# রঙ্গমঞ্চ ও দেশ এবং এ দেশে

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী জীবনের প্রতিলিপিকার নন---তিনি হচ্ছেন জীবনের ভাষ্যকার। অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথায় কাহিনীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে তিনি নাট্যরচনা করেন না ; বা ঘটনার যথাযথ বিবরণ দেওয়াটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়---কিভাবে চরিত্র বা ঘটনার ভেতরকার নিহিত সত্যকে সবার সামনে পরিস্ফুট করে তোলা যায়, এই হল তাঁর কাজ। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'তাসের দেশ'-এ এই দিকটাই লক্ষ্য করে দেখবার মত। এর কোনটিতেই বিশেষত 'রক্তকরবী' এবং 'তাসের দেশ'-এ কাহিনীর দিকটা এমন জোরালো নয়। কিন্তু জীবনের অনেক গভীর সত্যকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই রচনারীতির মাধ্যমে। Expressionism-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচক Elmer Rice বলেছেন---

'Expressionism attempts to go beyond mere representation and to arrive at interpretation. The author attempts not so much to delict events faithfully as to convey to the spectator what seems to be their inner significance. So achieve this end, the dramatist often finds it expedient to depart entirely from objective reality and to employ symbols, condensations and a dozen devices which to the conservative must

অভিব্যক্তিবাদ শব্দটি সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কলাশিল্প সব বিষয়েই প্রযোজ্য---এক কথায় যে কোন দিক দিয়েই শিল্পী যখন

## শিলালি

নিজেকে ঘনীভূতভাবে প্রকাশ করতে চান বা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক, তখনই তিনি এই রীতির সাহায্য নেন।

অভিব্যক্তিবাদ শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী চিত্রশিল্পী Julian-Auguste Herve. তিনি ১৯০১ সালে প্যারিসে Solon des Independants-এ 'Expressionismes' এই সংজ্ঞা দিয়ে আটটি ছবির প্রদর্শনী করেন। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই শব্দটির প্রচলন হয় আরও পরে। ফাইন আর্টসে সর্বপ্রথম শব্দটিকে ব্যবহার করেন Wilhelm Worringer। স্টার্ম পত্রিকার অগাষ্ট সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ বের হয় 'Young Parisian Synthetists and Expressionists, Cezamne, Van Gogh, Matisse সম্বন্ধে। ১৯১৪ সাল অবধি সাহিত্যে এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় নি। Edschmid বলেন, ১৯১৫ সালে তাঁর কতকগুলি গল্প Die Sechs Mundungen প্রকাশিত হবার পর সমালোচকেরা এসব গল্প অভিব্যক্তি-বাদী ভঙ্গীতে লেখা বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি নিজে

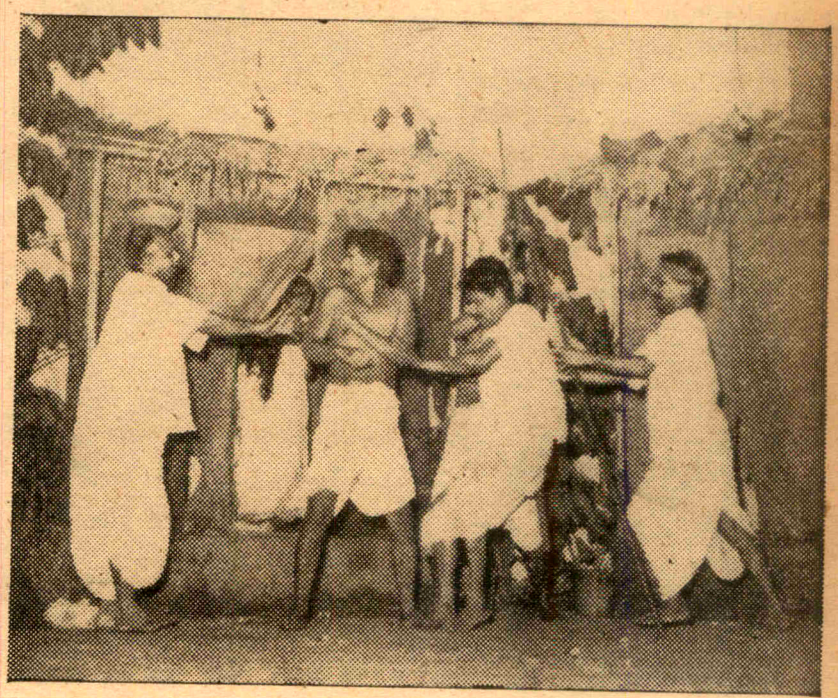

রূপকারের 'শাস্তি' নাটকে—নায়েব, বড় বৌ, দুখীরাম, ছিদাম ও পাইকদ্বয়—সন্তোষ দত্ত, বাণী দাশগুপ্তা, ভবরূপ ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত, শক্তি দত্ত, কেদার মল্লিক।

রূপকারের 'মাল্যদান'-এ গীতা দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত—কুড়ানা ও যতীনের ভূমিকায়।

অবশ্য স্বীকার করেন যে, এ শব্দটি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁর তখন ছিল না।

যাই হোক, সাহিত্যে এবং ফাইন আর্টসে অভিব্যক্তিবাদের (Expressionism) প্রচলন হয় ভাবাভিব্যক্তিবাদের ( Impressionism ) প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

অভিব্যক্তিবাদীরা ফটোগ্রাফারের কাজ করেন না—তাঁরা সত্যিকার দ্রষ্টা। তাঁদের কাজ চিরন্তনকে নিয়ে। ক্ষণিক সম্বন্ধে তাঁদের কোনই উৎসাহ নেই। বর্ণনা দ্বারা কোনো জিনিষকে বোঝাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাঁরা করেন না—অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই তার রূপায়ণে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা প্রতিলিপিকার নন, আসল স্রষ্টা।

ভাবাভিব্যক্তিবাদীদের প্রচেষ্টা হলো কোন বস্তু বা ঘটনার যে ছাপটা তাঁদের মনের পর্দায় পড়ল তার একটা সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা। আর অভিব্যক্তিবাদী চেষ্টা করেন ঐ বস্তু বা ঘটনার অন্তর্লীন সত্যস্বরূপকে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করতে।

Kasimir Edschmid বলেন :

'A house is no longer merely a subject for an artist, consisting of stone, ugly or beautiful; it has to be looked at until its true form has been recognised, until it is liberated from the muffled restraint of a false reality, until everything that is latent in it is expressed.'

মানুষ সম্বন্ধেও তাই—এলোমেলো ভাবে বাহ্যিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার না করে, তার আসল মনুষ্যত্বের যাচাই করাটাই অভিব্যক্তিবাদীর কাজ।

'Everything else is 'facade'; Showing a 'bourgeois' attitude that is to be destroyed with its superficial judgments of right or wrong. Once the bourgeois mask is torn away the link with eternity given to every human being will be revealed.'

( Samuel & Thomas.)

অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 'রক্তকরবী' নাটকে দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত বস্তুতন্ত্রবাদ কিভাবে মানুষকে আলোর জগৎ থেকে, আনন্দের জগৎ থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা সহজ, যা সুন্দর, যা প্রাণময় সে সবকে ত্যাগ করে মানুষ মৃত এবং জড়বস্তুর সাধনায় মেতে উঠেছে। মিথ্যা মরীচিকায় ভুলে ক্রমাগত যেন অন্ধকারের ভেতর চলে যাচ্ছে। যেমন নন্দিনী এক জায়গায় বলছে—

নন্দিনী

'অবাক হয়ে দেখছি। সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন। পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।'

( ক্রমশঃ )

● রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সকাশে ইরাকের প্রেসিডেণ্ট আরিফ

## রাজধানী ঃ

ফিরে যাওয়া শীতের শেষ পরশটুকু রাজধানীতে এনে দিয়েছিল একটা বিষণ্ণতা। জাতীয় জীবনের নানা বিপর্যয়, পূর্ব পাকিস্তানের লাঞ্ছিত, নির্যাতিত নরনারীর ক্রন্দন, ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল বেশ কিছুটা দিন রাজধানীর গণমানসকে। উত্তর প্রদেশের বিধানসভা ও হাইকোর্টের ক্ষমতার এক্তিয়ারের লড়াই, উড়িষ্যা ও বিহারের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পর থেকে বিষাদে আচ্ছন্ন পরিবেশ অনেকটা কেটে গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের বিধানসভা ও হাইকোর্টের প্রশ্নটি রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সুপ্রীম কোর্টে মীমাংসার জন্য প্রেরণের পর থেকে অবসান ঘটেছে এ নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনার।

উড়িষ্যার হাঙ্গামায় পাকিস্তানের গুপ্তচরবাহিনী ও কুচক্রীদের চক্রান্তের বিবরণ শ্রীবিজু পট্টনায়ক তুলে ধরার পর শুধু রাজধানী নয়, ভারতের মানুষ কতকটা সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। সবাই বুঝতে পেরেছে, ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বান-চাল করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টার সাথে সাথে ভারতের সংখ্যালঘু বিপন্ন এই জিগির বিশ্বময় তোলবার আশায় পাকিস্তান বেছে বেছে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর আশে-পাশে সংখ্যালঘুদের উস্কানী দিয়ে উত্তেজিত করে তুলেছে। কাজেই এর প্রতিরোধের জন্য চাই সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও ঐক্য এবং সাথে সাথে পূর্ব পাকি-স্তানের উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বাসন।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দের আহ্বানে নয়াদিল্লীতে মিলিত হয়ে পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্য-মন্ত্রিগণ এ সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনান্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রিগণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য শিল্পায়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পশ্চিম বাংলার বুকে স্থানাভাবের কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই। কাজেই পশ্চিম বাংলার শহরগুলোতে এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলে ছোট, মাঝারী ও ভারী শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে উদ্বাস্তু সমাগমের চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিম বাংলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে নেমে আসবে বিরাট বিপর্যয়। যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই রাজ্যে প্রবেশ করার পর দণ্ডকারণ্যে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা ছাড়াও বহু উদ্বাস্তু এসে উঠেছেন আত্মীয়-পরিজনের গৃহে। স্বাধীনভাবে পশ্চিম বাংলায় জীবিকার প্রয়াসী তাঁরা। সরকার এঁদের উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে আর্থিক সাহায্য না দিতে পারেন। কিন্তু এঁদের জীবিকার প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারবেন না। এই বিষয়টি বিবেচনা করে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শিল্পায়নের কয়েকটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেছেন। এ বিষয় তিনি কলকাতায় শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সাথে আলোচনাকালেও উত্থাপন করেছিলেন।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা, সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ খুব বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। এ নিয়ে আবার দিল্লীতে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা সুরু হয়েছে। এই আলোচনার পরই পুনর্বাসনের কাজ দ্রুততর করতে না পারলে সমস্যা আরও বিরাট এবং জটিল হয়ে দেখা দেবে।

* *

সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির প্রতিকারের পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে শ্রী কে শান্তনমকে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিটীর রিপোর্টটি বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ লোকসভায় পেশ করেছেন। কমিটীর সুপারিশগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। প্রশাসনিক দপ্তরের সংস্কার সাধন থেকে সুরু করে রাজ-নৈতিক দলগুলো এবং আইনসভার সদস্যদের আচরণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় কমিটী সে-সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন।

মন্ত্রী পর্যায়ে দুর্নীতি নিরোধের জন্য শান্তনম-কমিটী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একটি জাতীয় সংস্থা (ন্যাশনাল

প্যানেল) গঠনের কথা বলেছেন। এই কমিটী কাজ করবে স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল হিসেবে। ব্যবসায়ী মহল ও শিল্প সংস্থাগুলো থেকে রাজনৈতিক দলগুলো যে সাহায্য পেয়ে থাকে তা বন্ধ করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর হিসেব পরীক্ষার ব্যবস্থার সুপারিশও করা হয়েছে।

কর ফাঁকি ও লাইসেন্স বিভাগের কার্যকলাপের চাঞ্চল্যকর তথ্য কমিটীর রিপোর্টে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ব্যাপকহারে বিশেষ করে উচ্চ আয়ের লোকদের কর ফাঁকি দেওয়ার ফলে বছরে ৪৫ কোটি টাকার মত লোকসান হয়েছে।

মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, সংসদ সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের এবং করপোরেশনগুলোর কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতি-দমনের ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব পর্যন্ত কমিটী করেছেন।

এই সুপারিশগুলো সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করবেন কি না জানা যায় নি। সুপারিশের মধ্যেও ফাঁক নেই এমন নয়। সে ফাঁকগুলো বন্ধ করার প্রয়োজনও রয়েছে। দুর্নীতি আমাদের সমাজদেহে দুষ্ট ক্যান্সারের মত শিকড় বিস্তার করে ফেলেছে। একে দমন করতে হলে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণের সাথে সাথে প্রয়োজন হবে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের। সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই দেশেরই প্রাচীন শাস্ত্রকার বলে গেছেন, মাছ কখন জল খায় আর সরকারী কর্মচারী কখন ঘুষ নেয়, কেউ বলতে পারে না। অর্থাৎ মাছ যেমন জলেই ডুবে আছে তেমনি দুর্নীতির পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যেই সরকারী কর্মচারীরা বিচরণ করছে। দেখা যাচ্ছে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই ক্লেদ সমাজদেহ হতে দূর হবে না। এই দিকটি স্মরণ রেখেই শান্তনম-কমিটী খুব রূঢ় ভাষাতেই বলেছেন—'এ খুবই দুঃখের কথা যে, কি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ, কি দেশের বড় বড় নেতা—কেউ এ জাতীয় দুর্নীতি সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং এর নিবারণের জন্য উপযুক্ত সংস্থা গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি। অথচ এঁরাই রয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের গদীতে উপবিষ্ট।'

* * *

ভারতীয় বিমানবাহিনীর একত্রিংশতম বার্ষিক উৎসব রাজধানীতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দেশ বিভাগের পর দুটি স্কোয়াড্রন ও বহু স্থায়ী বিমান ঘাঁটি হারালেও ভারতের বিমানবাহিনী আজ গৌরবের দাবী করার মত যোগ্যতা নানা দিক দিয়েই করতে সক্ষম হয়েছে। ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড ওয়াপিটাস থেকে সে মিগ বিমানের যুগে এসে পদার্পণ করেছে। আজ আমাদের নানা ধরণের জেট বিমান আর হেলিকপ্টার রয়েছে—তৈরিও হচ্ছে দেশেই।

হিমালয়ের তরাইয়ে ওঠানামা করছে ভারতীয় বিমান। সেখানে বিমান চালনার ক্ষেত্রে সত্যিই সৃষ্টি হয়েছে নতুন ইতিহাসের। হিমালয়ের দুর্ভেদ্য অরণ্য আর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আমাদের বৈমানিকরা বিমান

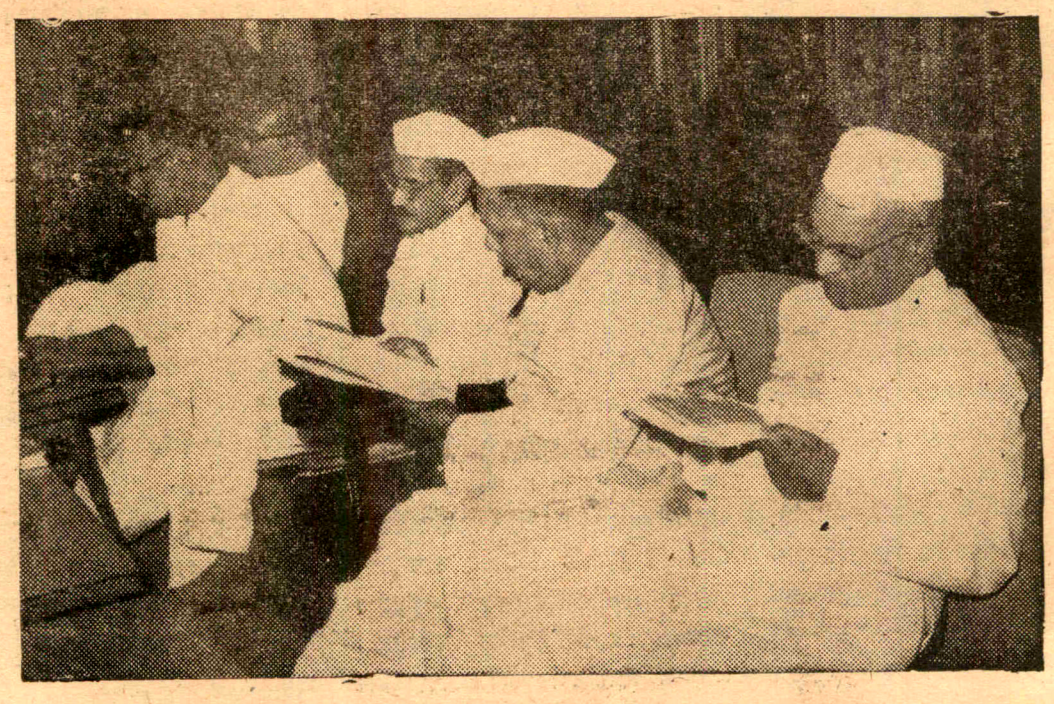

● নয়াদিল্লীতে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ ভাষণ দিচ্ছেন।

অপরূপ
ডিজাইন
চমৎকার
কারিগরী

গীরিন

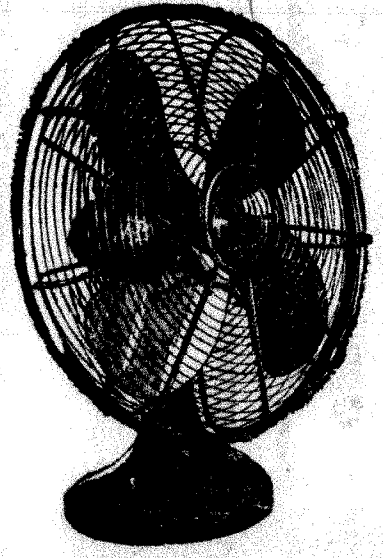

অসিলেটিং

# ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা

নিখুঁত সৌন্দর্য্য, নির্ব্বঝাট কার্য্যক্ষমতা,
ব্যবহারে অর্থ-সাশ্রয়ী—এসব ছাড়াও
অনেক কিছু গুণ থাকার ফলে
ওরিয়েন্ট পাখা ভারতে আজ সবচেয়ে
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ওরিয়েন্ট পাখা

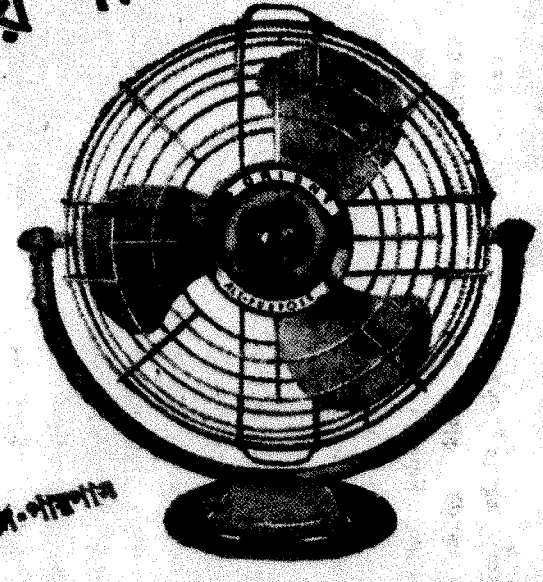

জল-পরপাস

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, কলিকাতা-১১

ডিষ্ট্রিবিউটারস

হিন্দুস্থান ডিলার্স লিঃ, ৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ ; ফোন : ৩৪-৫৩৯৩ (২ লাইন)। গ্রাম : DEALHIND. ● চলচনিকা ব্রাদার্স (পি) লিঃ, জেডার রোড, পাটনা। ফোন : ২১৬৯, গ্রাম : ORIENTFANS. ● হিন্দুস্থান ডিলার্স লিঃ, ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটি, ফোন : ৬৭৪, গ্রাম : DEALHIND.

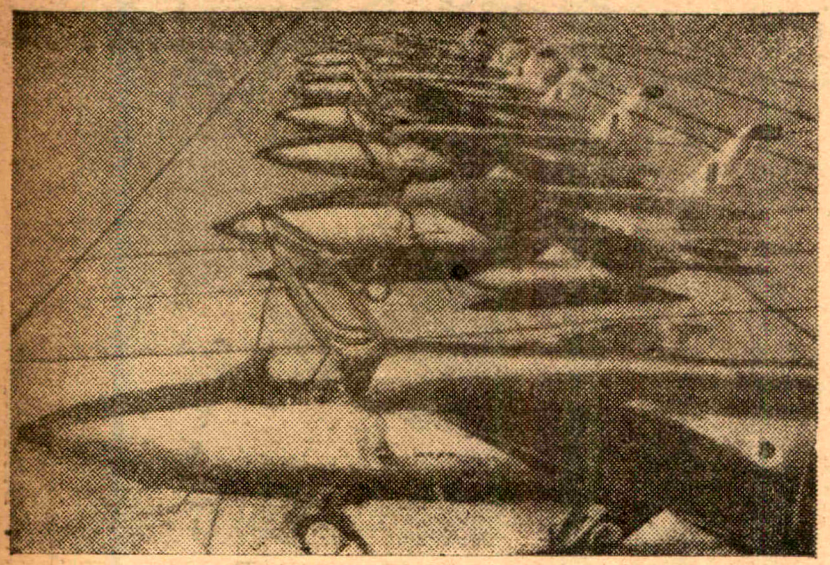

● ভারতীয় বিমানবহরের 'নাট' জঙ্গী বিমান

ও হেলিকপ্টার চালিয়ে নতুন ঐতিহ্যের অধিকার লাভ করেছেন।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর বার্ষিক দিবস উপলক্ষে বেতার ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন দেশের প্রতিরক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতীয় বৈমানিকদের অপরিসীম সাহস, কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, দেশের আকাশপথ রক্ষা ও ভূপৃষ্ঠস্থ সেনাদের রসদ সরবরাহ, দ্বৈত কর্তব্য পালনে বিমানবাহিনীর কর্মীরা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন চালু শিক্ষণ ব্যবস্থাগুলোর সম্প্রসারণের সাথে সাথে চলেছে নতুন শিক্ষণালয় স্থাপনের কাজ। নতুন নতুন বিমান-ক্ষেত্র নির্মিত হচ্ছে এবং চালু-গুলোর উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। আমাদের দেশেই সুপারসনিক বিমান, এইচ এফ—৪ বিমান এবং মিগ —২১ বিমান নির্মাণের উদ্যোগপর্ব সুরু হয়েছে।

শ্রীচ্যবন ভারতীয় বিমানবাহিনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে-চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে দেশবাসী নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবেন। চীনের ভারত আক্রমণ এবং তার চেলা আয়ুব খাঁ মুহুর্মুহু ভারত আক্রমণের হুমকীর পর ভারতের বিমানবাহিনী অতি আধুনিক ধাঁচে শক্তিশালী হয়ে উঠুক, এইটি ভারতবাসী মাত্রেরই একান্ত কামনা। বর্তমান যুগের প্রতিরক্ষায় বিমানবাহিনীর গুরুত্ব সমধিক। স্থলবাহিনী এবং নৌ-বাহিনী তার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

শ্রীচ্যবন শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। দুর্ঘটনায় ভাইস এয়ার মার্শাল পিণ্টোর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতির কথাও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। সামরিক বিভাগের এক একটি কর্মী ও অফিসার তৈরি করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং নামজাদা যোদ্ধা। এঁদের স্থান পূরণ করা সহজসাধ্য নয়। এমনি ধারা বিমান দুর্ঘটনা ঘটলে এবং বিমান নিখোঁজ হতে থাকলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে ভারত সরকারের আগে থেকেই সতর্ক থাকা উচিত ছিল। সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি থাকলে পর পর এমন শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না।

* * *

ইরাকের প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আবদেল সালাম মহম্মদ আরিফ ছ'দিনব্যাপী ভারত সফরের পর দেশে ফিরেছেন। বর্তমান উত্তেজনা হ্রাস করে এবং সরাসরি আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা উচিত—ভারতের এই বক্তব্য প্রেসিডেণ্ট আরিফের দৃঢ় সমর্থন লাভ করেছে।

সফর শেষে প্রচারিত নেহরু-আরিফের স্বাক্ষরিত যুক্ত বিবৃতিতে এই সমর্থনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এ সমর্থনকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বক্তব্যের প্রতি এবং স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর আলোচনায় ভারতের আপত্তির প্রতি ইরাক সরকারের সমর্থন বলে মনে করছেন।

চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আরিফ কলম্বো প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ভারতে পাঁচ কোটি মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সমান অধিকার ভোগ করছে দেখে প্রেসিডেণ্ট আরিফ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশ-গুলোতে প্রবল ভারত-বিরোধী প্রচার সুরু হয়েছে। চীনের পক্ষ থেকেও ভারত-বিরোধী প্রচার কম হচ্ছে না। এসব অপপ্রচার যে প্রগতিশীল আরব জাতির মনে রেখাপাত করে নি, ভারত সফরকালীন প্রেসিডেণ্ট আরিফের নানা উক্তি, সর্বোপরি নেহরু-আরিফ যুক্ত বিবৃতিতে তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

## কাশ্মীর :

দীর্ঘ এগার বছর কারাগারে আটক রাখার পর হঠাৎ শেখ আব্দুল্লাকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কাশ্মীর সরকার খুবই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। লোকসভার সদস্যদের মধ্যেও এ নিয়ে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন, শেখ আব্দুল্লার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করলেও, তাঁর মুক্তির সিদ্ধান্তটি যেরূপ আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিস্মিত হয়েছেন।

লোকসভায় আলোচনার পর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের কর্মপরিষদে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিনা সর্তে শেখ আব্দুল্লাকে মুক্তিদানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করে অনেকে নাকি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

মুক্তিদানের যে-সময় বেছে নিয়েছেন শ্রীসাদিক তাতে ভারত সরকারের পক্ষে বিস্ময়বোধ স্বাভাবিক। কেন্দ্রের এই মনোভাব নাকি পরিষদীয় দলের কর্মপরিষদে আলোচনাকালে শ্রীশাস্ত্রী চেপে রাখতে পারেন নি।

শেখ আব্দুল্লার মুক্তির সংবাদে সর্বাপেক্ষা উল্লসিত হবে ভারতের শত্রু পাকিস্তান এবং তার পরম সুহৃদ নয়া চীন। দই দোস্তে মিলে উচ্চগ্রামে সুর তুলে ভারত-বিরোধী আর একদফা প্রচারকার্যে নামতে নিশ্চয়ই কসুর করবে না। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান বক্সী-দরদী হয়ে পড়েছে। তাদের মতে বক্সী গোলাম মহম্মদ কাশ্মীরের আসল ও তোফা নেতা। সাদিকের প্রতি কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের চোখে তিনি হলেন ভারত সরকারের হাতের পুতুল। দীর্ঘ কারাবাস কালের মধ্যে শেখ আব্দুল্লার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন প্রমাণ দিতে না পেরেই তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে, এমন প্রচার চীন ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। তা ছাড়া, মুক্তি দেওয়া হল সেই দিনটিতে যেদিন আরম্ভ হল পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। এই মুক্তির প্রশ্নটি নিয়ে কুচক্রী পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত আলোচনার পরিবেশকে ঘোরালো করে তুলতে পারে।

১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে সদর-ই-রিয়াসত যুবরাজ করণ সিংয়ের আদেশে কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের একচ্ছত্র নেতা, শের-ই কাশ্মীর শেখ

● শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

আব্দুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর চার মাস আগে মার্কিন মুল্লুকের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ শ্রীএডলাই ই ষ্টিভেনসনের সাথে তাঁর গোপন বৈঠক হয়। এই গোপন শলা-পরামর্শের পর থেকেই শের-ই কাশ্মীর চঞ্চল ও অশান্ত হয়ে ওঠেন। এই সময় ওঠে কাশ্মীরের অঙ্গচ্ছেদের উদ্ভব পরিকল্পনা। জম্মুর ভারতভুক্তি, শ্রীনগর সহ কাশ্মীর উপত্যকার স্বাধীনতা এবং তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেবার প্রস্তাবে ভারত-বিরোধীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এই তে-ভাগা আন্দোলনের গুঞ্জনধ্বনি এবারেও ফিলিপস ট্যালবট সাহেবের ভারতভূমিতে পদার্পণের সময় উঠেছিল। ১৯৫৩ সালে শেখ আব্দুল্লার গ্রেপ্তারের সংবাদেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর একাংশ উল্লাসে নৃত্য করেই উঠেছিল এবং কাশ্মীর গেল গেল জিগির তুলেছিলেন। কিন্তু বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন গ্রেপ্তারের আট দিন পর উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী মীমাংসার সূত্র সন্ধানের জন্য আলোচনা বৈঠকে বসেছেন।

কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ ভারতভুক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে। এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার দাবীতে, কাশ্মীর সরকারের অনুমতি নিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের কাশ্মীরে প্রবেশের নীতির প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালের ১১ই মে কাশ্মীরে প্রবেশ করে শেখ আব্দুল্লার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ২৩শে জুন কারাগারে তাঁর অমূল্য জীবনের অকাল অবসান ঘটে। এগার বছর পর দোর্দণ্ড প্রতাপ শের-ই কাশ্মীরের মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে এবং তাঁর শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। এ বিশ্বাস দ্বিধাহীন চিত্তে করা, অনেকের পক্ষেই দুষ্কর।

শেখ আব্দুল্লা যে পটভূমিকায় আজ মুক্তি পেলেন—পেছনের ভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যাবে, হজরতবল মসজিদের পবিত্র কেশ অন্তর্ধানের পরবর্তী আন্দোলন তাঁর মুক্তিপথের প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেছে অনেকখানি। এই আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রবল উস্কানী থেকে যাঁরা কাশ্মীরের জনসাধারণকে রক্ষা করেছিলেন তাঁদের নেতা ছিলেন মৌলানা মাসুদী। মাসুদীর মতে, শেখ আব্দুল্লাকে কারাগারে রেখে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দীদারের

পর আন্দোলনের মোড় ফিরেছে মাত্র —অবসান হয় নি। এই আন্দোলনের অংশীদার একদল পাকিস্তানপন্থী, কিছু সংখ্যক প্রতিক্রিয়াশীল এবং শেখ আব্দুল্লার পৃষ্ঠপোষক ও সহকর্মীরা। এদের নিয়ে গঠিত এ্যাকশন কমিটীর আসল নেতা হলেন শেখ আব্দুল্লার শিষ্য-সেবকগণ। যতদিন তিনি জেলে থাকবেন ততদিন তাঁর অনুচর বাহিনী কাশ্মীরের বর্তমান আন্দোলনের অবসান ঘটাবে এমন কোন ভরসা করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিই সম্ভবত সাদিককে দুঃসাহসী করেছে।

এই আন্দোলনের মোড় ফেরাতে হলে আব্দুল্লার মুক্তির প্রয়োজন

● শ্রীসাদিক

হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। শেখ সাহেব এগার বছর আগে যে খোয়াব দেখেছিলেন তারও পট পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান গণতন্ত্রের কবর দিয়েছে। স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেই কবর থেকে। চীন ভারতের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। কাজেই এগার বছরে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত না হয়ে থাকলে তিনি নিজের সর্বনাশই ডেকে আনবেন। মুক্তির পর শেখ সাহেবের শ্রীমুখ-নির্গত বাণী না শোনা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপাতত সংযতবাক থাকাই কাশ্মীর সহ ভারতের প্রতিটি রাজ্যের মানুষের পক্ষে উচিত হবে। তা' করতে না পারলে পরিবেশ আরও জটিলই হবে।

## মধ্যপ্রদেশ:

রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে আবার উপদলীয় কোন্দল প্রকট হয়ে উঠেছে। অচিরে এর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে অবস্থা আরো জট পাকিয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর আসন নিয়ে সঙ্কটের সৃষ্টি হবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে।

রেওয়া রাজ্যের সোহাগপুরের প্রাক্তন জায়গীরদার শ্রীরাজেন্দ্র বাহাদুর সিং এবং গোয়ালিয়রের প্রাক্তন জায়গীরদার সর্দার ডি কে যাদবের পরিবর্তে ডঃ কে সি বাঘেলকে সমর্থন করায় কংগ্রেস দলের 'অভিজাত উপদল' মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের ওপর অত্যন্ত বিরূপ হয়েছেন। এঁদের সমর্থনেই গেল সেপ্টেম্বর মাসে শ্রী-মিশ্রের ক্ষমতালাভের পথ সুগম হয়েছিল। তা' ছাড়া ডঃ কে সি বাঘেল রাজ্যসভার নির্বাচনের কয়েক মাস আগে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও ছিলেন না। দলের সদস্যদের দাবী উপেক্ষা করে নির্দলীয় প্রার্থী ডঃ বাঘেলকে সমর্থন করায় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চটে গিয়েছেন।

এ্যাডহক এক্সিকিউটিভ কমিটী প্রার্থী মনোনয়নের কাজে অসমর্থ হলে পর প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রী বি এ মান্দলই এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের ওপর এই কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছিল। কংগ্রেসের টিকিট পাওয়ার ভরসায় ৯৯ জন আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন। অভিযোগ উঠেছে এঁদের উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বশম্বদ শ্রীভবানীপ্রসাদ তেওয়ারী এবং পার্লামেণ্টের বিদায়ী হরিজন সদস্য শ্রীদয়ালদাস কারেকে মনোনয়ন করেছিলেন। তৃতীয় প্রার্থী কেন্দ্রের ইস্পাত, খনি ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠীর মনোনয়নে অবশ্য কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নাকি পার্টির অতিরিক্ত ২১টি ভোট ডঃ বাঘেলের জন্য ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হন নি একজন প্রাক্তন জায়গীরদারকে নৈতিক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি

● শ্রীমান্দলই

দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমর্থকদের ভাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। উক্ত জায়গীরদার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভাগ্য পরীক্ষায় নেমেছিলেন। অবস্থা দেখে তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে মানে মানে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভোটের ফলাফল সদস্যদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। দলের তিনজন প্রার্থীর প্রত্যেকের জন্য ৪২টি ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

একমাত্র শ্রীতেওয়ারী ভিন্ন আর কেউ ৪২টি ভোট পান নি। শ্রীকারে পেয়েছেন ৩৬টি ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স ভোট। কিন্তু ডঃ বাঘেল পেয়েছেন শ্রীশেঠীর সমান ৪১টি ভোট। বিজয়ী প্রার্থীদের অতিরিক্ত সেকেণ্ড প্রেফারেন্স ভোট ২৯টি না পেলে শ্রীকারে নির্বাচিত হতে পারতেন না। অবশ্য শ্রীবাঘেল দাবী করেন যে, তিনি নির্দলীয় ও প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সমর্থন পেয়েছেন।

বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জন-সঙ্ঘই ভোটের ব্যাপারে সংহতির পরিচয় দিয়েছে। জনসঙ্ঘের রাজ্য শাখার সভাপতি ৩৯টি ভোট পেয়ে প্রথম দফাতেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল সহ অপর বিরোধী দলগুলোর মধ্যে উপদলীয় সংঘাতই প্রকাশ পেয়েছে। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থীকে ভোট-বৈতরণী পাড়ি দিতে হয়েছে কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী দলের ভেলায় চেপে। সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যগণ ভোট দিয়েছেন আগামী দিনে তাঁদের সাথে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের মিলনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। তা ছাড়া তিনি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীতেওয়ারী ও শ্রীশেঠীর অতিরিক্ত সেকেণ্ড প্রেফারেন্সের ভোট পেয়েছেন।

রামরাজ্য পরিষদ, হিন্দু মহাসভা, লোকতান্ত্রিক দল এবং একদল নির্দলীয় সদস্য পড়েছিলেন কতকটা যেন বিভ্রান্ত হয়ে। কমিউনিষ্ট পার্টির দুজন সদস্য না কি কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছেন।

* * *

দণ্ডকারণ্যের বাইরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের একটি কর্মসূচী রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে ১০ হাজার পরিবারকে সুরগুজা, পান্না এবং ছাতারপুর জেলায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত মখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এবং ভূপালে পার্লামেণ্টের সদস্যদের সাথে আলোচনা কালে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য শিল্পায়নের প্রস্তাব উথাপন করেছেন।

## মাদ্রাজ ঃ

সম্প্রতি রাজ্যসভায় নির্বাচনের ফলাফলের জন্য কংগ্রেস শিবিরে বেশ হতাশা এসেছে। মাদ্রাজের জন্য এবার ছটি আসন শূন্য হয়েছিল। কংগ্রেস আশা করেছিল, এই ছটির মধ্যে পাঁচটি আসন কংগ্রেস লাভ করবে। আশা করার পেছনে যুক্তি ছিল এই—মাদ্রাজ ইলেকটোরাল কলেজের মোট সদস্য সংখ্যা ২০৬। তার মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য ১৩৮। ডি-এম-কে এবং স্বতন্ত্র দল মিলিতভাবে ৫৯। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস চারটি আসন লাভ করার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে কংগ্রেস আরো কিছুদূর বেশি অগ্রসর হয়েছিল। কারণ ডি-এম-কের দুজন সদস্য কারান্তরালে রয়েছে, সুতরাং তারা ভোট দেবে না। দুজন কমিউনিষ্ট এবং চারজন স্বতন্ত্র সদস্যও কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার কথা। উপরন্তু এমনও আশা করা গিয়েছিল যে, কয়েকজন ডি-এম-কে সদস্যও বিগড়ে যেতে পারে। তার কারণ ডি-এম-কে প্রার্থী দুজনের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র দলের অপরজন মুসলিম লীগের। এই দুজনকে ডি-এম-কের অনেকেই পছন্দ করে না, সুতরাং কংগ্রেস পাঁচটি আসন লাভের কথা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই ভেবেছিল।

প্রার্থীর জেতবার জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৩টি প্রথম প্রেফারেন্স ভোট। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কংগ্রেসের চারজন প্রার্থীকে প্রথম প্রেফারেন্স ভোটটি দিয়ে পঞ্চমজনকে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোট দিলে, বেশি সংখ্যক ভোটের জন্য পঞ্চম প্রার্থীও জিতে যাবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী শ্রী এস এস মারিস্বামী পেয়েছে ৩৫ ভোট এবং লীগ প্রার্থী পেয়েছে ৩০ ভোট। যেখানে ডি-এম-কের পাওয়া উচিত ৫৭ ভোট, সেখানে পেয়েছে ৬৫। এই অতিরিক্ত আট ভোট কোথা থেকে এল? কংগ্রেস মহলে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হতাশা এসেছে। এই অতিরিক্ত ভোটের দুটি কমিউনিষ্ট-দের এবং চারটি স্বতন্ত্রদের কাছ থেকে যে পায় নি, সে বিষয়ে কংগ্রেসের সকলে একমত। স্বতন্ত্র দল এবং লীগের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের যা ক্রোধ তাতে ওরা স্বতন্ত্র দলের বা লীগের পক্ষে ভোট দিতে পারে না। তা হলে? কংগ্রেসের ভেতর থেকেই কি কেউ কেউ সাবোটেজ করেছে? কংগ্রেস মহলে সকলেই একমত যে, কংগ্রেসের কোন কোন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ডি-এম-কে আটটি ভোট বেশি পেয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একমাত্র ডাঃ চন্দ্রশেখরণ ছাড়া আর কোন কংগ্রেস প্রার্থী ৩৩টি ভোট পান নি। পঞ্চম-প্রার্থী শ্রীরাজারাম নাইডু মাত্র ২২টি ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ভোটের প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, একদল কংগ্রেসী যারা প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পায় না এবং চিন্তাধারার দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, অথচ কংগ্রেসের সাংগঠনিক সুবিধা ভোগ করবার জন্য কংগ্রেসে রয়েছে, তারাই এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে ডি-এম-কের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। এই বিষয়ে একটা তদন্তের কথা উঠেছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন। জনসমক্ষে আর ঘরের কেচ্ছা প্রকাশ করে কি লাভ হবে?

ওদিকে ডি-এম-কে শিবিরে উল্লাস। বিজয়ী শ্রীমারিস্বামী প্রকাশ্যেই

বলেছেন, কংগ্রেসের ভেতরে ন্যায়-বিচারশীল লোক না থাকলে তিনি এত সম্মানের সাথে জয়লাভ করতে পারতেন না।

* * *

কংগ্রেসের সাথে ডি-এম-কের আর একটি শক্তি পরীক্ষা হবে আগামী ১৫ই এপ্রিল। এই শক্তি পরীক্ষার স্থল লোকসভা আসনের জন্য আরুপুকোটাই উপনির্বাচন কেন্দ্র। এখানে শ্রীমখরামলিঙ্গম খেবরের মৃত্যুতে আসন খালি হয়েছে। শ্রীখেবর ফরোয়ার্ড ব্লকের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসলে তিনি স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে আপোষ করে কাজ করতেন। এবারের

● রাজাজী

উপনির্বাচনে বাস্তবিক পক্ষে রাজাজীই শ্রীভেলায়ধন নায়ারকে প্রার্থী মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে ফরোয়ার্ড ব্লকের লেবেল নিতে বলেছেন। শ্রীনায়ার একজন এডভোকেট। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকাশীনাথ দোরাই রামনাদের রাজার ভাই এবং সখ করে তিনি নামের পেছনে জমিদার কথাটা ব্যবহার করেন।

এই উপনির্বাচন দুই পক্ষের কাছেই মর্যাদার লড়াইতে পরিণত হবে। এমন কি, একদিকে শ্রীকামরাজ আর একদিকে রাজাজী প্রচারকার্যে নেমে যেতে পারেন। কংগ্রেসের সমর্থনে যে দলগুলি আছে তাদের মধ্যে কমিউনিষ্টরা নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত। অন্যদিকে নজর দেবার মত তাদের সময় এবং মন কোথায়? দ্রাবিড় কাজাগামের নেতা শ্রীপেরিয়ার কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অন্যদের তেমন সমর্থক কোথায়? একমাত্র ভরসা মহারাজার পরিবারের দোহাই দেওয়া। এই নির্বাচকমণ্ডলী পশ্চাৎপদ অঞ্চল—শিক্ষায় ও ধ্যানধারণায় এখনো সামন্তযুগের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং রাজার পরিবারের লোক বলে জিতেও যেতে পারেন।

তবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করার মত ঘটনাও আছে। তার মধ্যে অন্যতম বাসের ভাড়াবৃদ্ধি। বাসের ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে এখানে প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে।

## বিশ্বের চোখে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু

পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে বর্বর আক্রমণ ও পাশবিক নিপীড়ন ঘটে গেছে, সে সংবাদে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত। বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের সংবাদ এবং মর্মান্তিক কাহিনী প্রকাশ করেছে। এই সংবাদ প্রকাশের ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, বিংশ শতকের প্রায় শেষভাগে সভ্য মানুষের কাছে এই বর্বরতা অচিন্তনীয় ঘটনা। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিম্নে প্রকাশিত হলো :

**ইতালী :** 'ইল মেসাগ্গেরো'—পাকিস্তানে ধর্মীয় বিদ্বেষ এত প্রবল হয়েছে যে, আজ আর কেবল হিন্দুরা নয়, খৃষ্টানরাও তার শিকার হয়েছে। বিশেষ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নরনারীর ওপর ভয়ানক আক্রমণ চলেছে ; ১৮ই জানুয়ারী থেকে ৫২,২৩৮ জন উদ্বাস্তু আসামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৫০০ খৃষ্টান পরিবার আছে। এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুরা মুসলমানদের দ্বারা নিষ্ঠুর অত্যাচারের দরুণ তাদের বাড়িঘর সম্পত্তি ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভারতে ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি রেভারেণ্ড জেমস নক্স পোপের নিকট একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন একটা বিরাট সমস্যা।

**গ্রেট বৃটেন :** 'দি টাইমস'—গত দুইমাস যাবৎ শত শত উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে দণ্ডকারণ্যের দিকে যাচ্ছে। এই হতভাগ্য হিন্দুরা ক্ষুধার্ত, নিঃসম্বল। তাদের অনেকে প্রিয়জনকে হারিয়েছে ; আবার পথে আসতে কারো কারো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই হতভাগ্যরা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ কি। নিষ্ঠুর অত্যাচারে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

গারো পাহাড়ের পথে হাজার হাজার খৃষ্টান পাকিস্তান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। খৃষ্টানদের ওপর অত্যাচারে উদ্বাস্তু সমস্যার ওপর সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

**ক্যানাডা :** 'গ্লোব এবং মেইল'—হিন্দু এবং খৃষ্টানরা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি—মুসলিম পাকিস্তান ছেড়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু-ভর্তি ট্রেন কতকগুলি নিপীড়িত মানুষের করুণমূর্তি বয়ে নিয়ে চলেছে। কত লোক যে উদ্বাস্তু হয়েছে, আর কত লোক যে হত হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। কোন কোন অঞ্চলে নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে ; এই সংখ্যা হাজার অতিক্রম করে গেছে। সরকারী মতে ঢাকায় প্রতিদিন ১০ হাজার লোক দেশত্যাগের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছে। পাকিস্তানে এখনো জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের জিগির শোনা যাচ্ছে।

# আন্তর্জাতিক

* বামপন্থী সমাবেশে সস্ত্রীক গুলার্ট

## ব্রেজিল :

ব্রেজিলের বামপন্থী রাষ্ট্রপতি জোয়াও গুলার্টের শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ সফল হয়েছে। গুলার্ট পদত্যাগ করেছেন এবং রিও ডি-জেনেরো থেকে ব্রাসিলা ও পোর্টো আলেগ্রে হয়ে প্যারাগুয়েতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। গুলার্টের স্থানে ব্রেজিল কংগ্রেসের চেম্বার অব্ ডেপুটির সভাপতি রেনিয়েরি ম্যাজিলি নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

বিদ্রোহের সংবাদে প্রকাশ, ১লা এপ্রিল সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি কম্যাণ্ডের সৈন্য ব্রেজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অতি দ্রুত ২৭টি রাজ্যের মধ্যে ৭টি রাজ্যে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও সৈন্যদল রিও'র পথে রওনা হয়। রিও'র প্রহরী কোপাকাবানা দুর্গও বিদ্রোহীদের হাতে এসে পড়ে। ইতিমধ্যে সংবাদ বেরোয়, গুলার্ট রিও ত্যাগ করে অজ্ঞাতস্থানে চলে গিয়েছেন। গুলার্টের সমর্থনে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত 'জেনারেল কনফেডারেশন অব্ ওয়ার্কার্সের' ডাকে রিও'তে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরাই জয়ী হয় এবং নতুন শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। সেনেটের সভাপতি আলড্রেডের ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য, সুতরাং চেম্বার অব্ ডেপুটির সভাপতি ম্যাজিলিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচন করা হল। ব্রেজিলের সংবিধানে কোন উপ-রাষ্ট্রপতি নেই, সুতরাং রাষ্ট্রপতির পরেই পদাধিকার বলে চেম্বারের সভাপতির স্থান।

এই বিদ্রোহে যাঁরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে সেকেণ্ড আর্মির কম্যাণ্ডার ক্রুয়েল, সাও পোলোর গভর্নর জেনারেল এ্যাডেমোর বারোস, সৈন্যবাহিনীর 'চীফ অব্ দি জেনারেল স্টাফ' জেনারেল হামবার্টো কষ্টেলো ব্রানচ্, গুয়ালাবারার গভর্নর কার্নোস ল্যাকের্ডো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৬১ সালে গুলার্ট রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকেই ব্রেজিলে দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ চলছে। গুলার্ট কমিউনিষ্ট নন, কিন্তু তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ অনেকের পক্ষেই হজম করা শক্ত। ল্যাটিন আমেরিকার এই দেশে বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের দ্বন্দ্ব চলছে। কৃষকের সঙ্গে জমিদারদের বিরোধ চলছে। শিল্পে শ্রমিক বিরোধ সুরু হয়েছে। সৈন্যবাহিনীও দ্বিধাবিভক্ত। সম্প্রতি একদল নৌ-সৈন্য দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তারা গুলার্টের প্রচ্ছন্ন সমর্থন লাভ করে। তৈল-শোধনাগার জাতীয়করণ, ব্যাঙ্ক অব্ ব্রেজিল থেকে গুলার্ট-বিরোধী ব্যাঙ্ককে ঋণদান বন্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় স্থলপথ, রেলপথ প্রভৃতির পার্শ্ববর্তী জমি সরকার কর্তৃক দখলের নীতি প্রভৃতির জন্য গুলার্টের বিরুদ্ধে বিত্তবান শিল্পপতি ও ভূমি-মালিকেরা ক্ষিপ্ত। নিরক্ষর লোকেদের ভোটাধিকার দান, সৈন্যদলের মধ্যে ভোটাধিকারের প্রসার, রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্বাচিত হবার বাধা অপসারণ প্রভৃতির জন্য গুলার্ট সংবিধান সংশোধনের যে চেষ্টা করেন, তাই তাঁর কাল হয়। রিও'তে শ্রমিক-সমাবেশ থেকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে গুলার্টকে সমর্থন জানানো হলেও, সাও পোলোতে ৫ লক্ষ মানুষের বিরাট সমাবেশ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। এত বড় সমাবেশ ব্রেজিলে এর পূর্বে কখনও হয় নি।

যে-কোন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পটভূমিকায় বিচার করলে গুলার্ট যা করার চেষ্টা করেছেন, তা অত্যন্ত ন্যায্য বলে মনে হবে। কিন্তু গুলার্ট বড্ড তাড়াহুড়ো করে এগোবার চেষ্টা করেছেন। বিদ্রোহের ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, সাধারণ দেশবাসী গুলার্টকে সমর্থন করে নি। সংগঠিত শিল্প-এলাকায় শ্রমিকের সমথন পেলেও বিরাট দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে গুলার্টের সমর্থন বিশেষ দৃঢ় ছিল না। ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে রাতারাতি বিপ্লব করতে গেলে—এই হয়। ব্রেজিল কিউবা নয়, গুলার্টও ক্যাষ্ট্রো নন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিদ্রোহে খুশি হয়েছে। ক্যাষ্ট্রোকে নিয়ে এমনি-তেই মার্কিন কর্তারা ব্যতিব্যস্ত, তার ওপর গুলার্টও তাঁদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণপন্থীদের বিদ্রোহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই অভিনন্দন জানিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিলি সরকারকে স্বীকৃতি দান করেছে।

## দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

গত ২৪শে মার্চ ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা ঘোষণা করেছেন,

* রবার্ট ম্যাকনামারা

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্টদের উচ্ছেদ করার জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খান আরও ৫০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করবেন। ম্যাকনামারা এই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে প্রতি সপ্তাহে আরও ১০ লক্ষ ডলার করে সাহায্য দেবে--- অতিরিক্ত সৈন্য ও সমরায়োজনের ব্যয় নির্বাহের জন্যই এই বাড়তি অর্থসাহায্য দেওয়া হবে। কমিউনিষ্ট গেরিলাবাহিনীকে দমন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। ম্যাকনামারা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিছুদিন পূর্বে যখন ম্যাকনামারা সদলবলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম পরিদর্শনে যান, তখনই বোঝা গিয়েছিল কমিউনিষ্ট ভিয়েৎ কং বাহিনীকে দমন করা তথা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কমিউনিষ্ট-বিরোধী শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও বিস্তৃত ও কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও নেগুইন খানের শাসনের পরিবর্তনের কথাও এই প্রসঙ্গে শোনা গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, এতখানি 'বৈপ্লবিক' সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরং নেগুইন খানকে সমর্থন করছে---ম্যাকনামারা সায়গনে থাকতেই নেগুইন খানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

কেবলমাত্র সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে ও অর্থব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কমিউনিষ্টদের সত্যি সত্যি দমন করা যাবে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির দ্বারাই কেবল এ কাজ করা সম্ভব এবং তার জন্য চাই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা। এ বিষয়ে

* জেনারেল নেগুইন খান

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, প্রচুর মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও।

## সৌদ আরব :

বিপুল তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ সৌদি আরবে একটা ছোটখাটো 'প্রাসাদ বিপ্লব' হয়ে গেল। রাজা সৌদ নিজের স্বাক্ষরিত আদেশবলে ঘোষণা করেছেন, এখন থেকে তিনি 'রাজত্ব' করবেন, কিন্তু 'শাসন' করবেন না--- শাসন করবেন তাঁর ভ্রাতা ক্রাউন প্রিন্স ফয়জল। রিজেণ্টরূপে ফয়জলই হবেন সৌদি আরবের প্রকৃত শাসক, রাজা সৌদ নামে মাত্র রাজা থাকবেন--- তাঁর হাতে কোন ক্ষমতাই থাকবে না।

রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কেবল রাজভ্রাতা, রাজপরিবার বা রাজন্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, সাধারণ দেশবাসীও রাজার খামখেয়ালী কাজ, অপব্যয় ও অপদার্থ শাসন ব্যবস্থায় বিরক্ত। তৈল খনির 'রয়্যালটি' থেকে রাজা যে কোটি কোটি পাউণ্ড পান, তার সাহায্যে তিনি দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি না করে বিলাসব্যসনে এই অর্থ নষ্ট করেন।

১৯৫৮ সালে জনমতের চাপে রাজা সৌদ ফয়জলের হাতে শাসনভার দিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য 'চিকিৎসার ব্যাপারে' বিদেশযাত্রা করেন। গত বছর দেশে ফিরে আসার পর থেকেই রাজা এই ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য বার বার চেষ্টা করেছেন এবং নিজস্ব সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে ফয়জলের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টাও করেছেন।

এই দ্বন্দ্বেরই পরিণতি, রাজা সৌদের সম্পূর্ণ পরাজয় ও ফয়জলের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ। বারো জন উলেমা রাজাকে 'শাসনের অযোগ্য' বলে ঘোষণা করেছেন এবং রাজন্য, উপজাতীয় শেখ ও উলেমাদের নিয়ে গঠিত সৌদি আরবের সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে---এখন থেকে শাসন সংক্রান্ত সব ক্ষমতা ফয়জল ব্যবহার করবেন, রাজা সৌদ নামমাত্র শাসক থাকবেন। আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক কোন বিষয়েই রাজার সম্মতির প্রয়োজন হবে না। রাজার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ১০,০০০ সৈন্য সম্বলিত 'হোয়াইট আর্মি' এখন থেকে সৌদি আরবের সাধারণ সৈন্যবাহিনীর অংশ বলে গণ্য করা হবে।

রাজা সৌদের কাল শেষ হয়েছে। এখন দেখা যাক, ফয়জল কি করেন। সৌদি সম্পদ জনগণের স্বার্থে ব্যবহারে ফয়জল ব্যর্থ হলে, সৌদি আরবও ইয়েমেনের মত প্রজাতন্ত্রের পথ গ্রহণ করবে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

## বার্মা :

বার্মার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইন নিজের দল 'বার্মা সোস্যালিষ্ট প্রোগ্রাম পার্টি' ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। ২৮শে মার্চ 'জাতীয় সংহতি রক্ষা

* জেনারেল নে উইন

আইন' নামে একটি আইন প্রবর্তন করে নে উইন রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করেছেন। এই আইন অনুসারে কোন দল গঠনের চেষ্টা বা এই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল দেওয়া হবে।

নে উইনের মতে, বার্মার রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে, সুতরাং জাতির স্বার্থেই এদের বিলোপ সাধন প্রয়োজন। তাঁর নিজের দল সরকারের নীতিকে কার্যকরী করার সাহায্য করছে বলে তা অন্যান্য দলের সমগোত্রীয় নয়।

মিশরে (পরে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) বিপ্লবের পর প্রথমে সকল দলের বিলোপ ও পরে নাসেরের নিজস্ব দল গঠিত হয়েছে। পাকিস্তানেও সকল দলের বিলোপ ও পরে আয়ুবের একক দল গঠনের চেষ্টা হয়েছে। বার্মা এখন কোন্ পথে যায়, তাই লক্ষ্য করার বিষয়। শ্রমিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত নেই বলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত একদলীয় শাসন এখানে হবে না। তবে যাই হোক, নে উইন যে ধীরে ধীরে সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিচ্ছেন এবং বার্মা নিশ্চিত এক-নায়কত্বে পরিণত হচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

## পাকিস্তান :

কাশ্মীরের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই, কিন্তু পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য নয়—এই কি পাকিস্তান সরকারের নীতি ?—বিরোধী দলের সদস্যদের এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গত ২রা এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সভায় তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে। পরিষদের স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জলফিকার আলি ভুট্টো সদস্যদের কাছে চরম নাজেহাল হয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের একীকরণ সংক্রান্ত একটি মুলতুবী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের কামারুজ্জমা বলেন, কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তোলার আগে পাকিস্তান সরকারের পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবী মেনে নেওয়া উচিত। এই বক্তব্যে স্পীকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপত্তি করেন। তাঁদের বক্তব্য—এতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে এবং ভারতের সুবিধা হবে। কিন্তু এত করেও বিরোধী সদস্যদের কণ্ঠরোধ করা যায় নি। আওয়ামী লীগের অপর সদস্য জনাব মনসুর, বেলুচিস্তানের খইর বক্সমার্রি এমন কি, বিরোধী দলের নেতা খটক পর্যন্ত সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমন মন্তব্যও করা হয়েছে, ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি এম সি চাগলার বক্তৃতার জবাব দিতে পারেন নি এবং নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ভুট্টো খালি হাতে ফিরেছেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের বক্তব্য কত অসার, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এই বিতর্কই তার প্রমাণ। পাকিস্তানের শাসকরা সত্যি সত্যি কারও জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ চায় না।

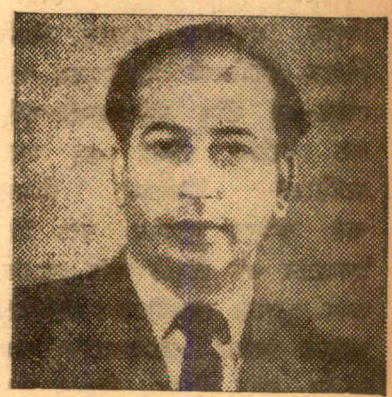

* জুলফিকার আলি ভুট্টো

তা না হলে, আগে নিজের দেশের লোকের জন্য তার ব্যবস্থা করে পরে কাশ্মীরের ব্যাপারে দাবী জানাত। আসলে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' কথা বিশ্ব-বাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য। যে পাকিস্তানের ১০ কোটি লোক গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত, তার শাসকদের মুখে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ভূতের মুখে রাম নামের মত। বিশ্ববাসী এই 'রাজনৈতিক অসাধুতা' যত শীঘ্র বোঝে ততই মঙ্গল।

## সোভিয়েট ইউনিয়ন :

চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী

আইয়ন মরের ও তাঁর সহযোগীরা চীনে গিয়ে মাও-সে-তুং, লি-শাও-চি, চৌ-এন-লাই প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলে একটা মিটমাটের যে চেষ্টা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হবার পর থেকেই দু' দিক থেকে তীব্র আক্রমণ সুরু হয়েছে। মরেরের পিকিং ত্যাগের পরই পিকিং রেডিও সোভিয়েট ইউনিয়নকে 'এ যুগের সব চেয়ে বড় বিভেদকামী' বলে আখ্যা দিয়ে তীব্র ভাষায় বিষোদ্‌গার করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পাল্টা জবাব দিয়েছে তীব্রতম ভাষায়। মিখাইল সুসলভের নামে 'প্রাভদায়' সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির যে দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে—তা তীব্র সমালোচনায় পূর্ণ। এত কঠোর ভাষায় এর আগে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনকে আর কখনও আক্রমণ করে নি। সুসলভের এই বিবৃতি যখন বেরোয়, তখন ক্রুশ্চেভ হাঙ্গেরীতে। সেখানেও য়ানোস কাদার সোভিয়েটের পক্ষ সমর্থন করে চীনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় মত প্রকাশ করেছেন।

সুসলভ তাঁর বিবৃতিতে চীনের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। এই অভিযোগগুলি হল: (১) চীন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট ঐক্যের 'প্রধান বিপদ'; (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে চীন বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে; (৩) ক্রুশ্চেভকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চীন ষড়যন্ত্র করছে; (৪) সর্বত্র কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য চীন চেষ্টা করছে; (৫) চীন উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করছে, নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য; (৬) ভারত আক্রমণ করে চীন একটি বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি অন্যায় করেছে ও কমিউনিজমের ক্ষতি করেছে এবং (৭) মার্কিন সামরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে দোস্তি করে চীন নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকার পরিচয় দিয়েছে।

এই বিবৃতিতে সুসলভ চীনকে সতর্ক করে দিয়েছেন। চীনের বিভেদ-নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্পষ্ট বক্তব্য নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে

* মিখাইল সুসলভ

বিশ্বের সকল কমিউনিষ্ট পার্টির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে বলেও সুসলভ ঘোষণা করেছেন।

প্রস্তাবিত এই সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন প্রকাশ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে কি না অদূর ভবিষ্যতেই তা জানা যাবে।

## টিউনিসিয়া ঃ

টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হবিব বরগুইবা ভারতের একজন বন্ধু বলেই পরিচিত। বৈদেশিক নীতির দিক থেকে টিউনিসিয়া ও ভারতের মধ্যে মতৈক্য আছে। উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নীতিতে বিশ্বাসী। টিউনিসিয়া মুসলমানদের দেশ হলেও ধর্মোন্মাদ নয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টিউনিসিয়ার মুক্তি সংগ্রামে ভারতবাসীর সমর্থনের জন্য বরগুইবা ভারতের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, বরগুইবা ভারতের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন এবং প্রকারান্তরে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী পর্যন্ত বলেছেন। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেরিত ও 'কাশ্মীরের গ্র্যাণ্ড মুফতি' মীর ওয়াইজ মহম্মদ ইউসুফ শাহের নেতৃত্বে পরিচালিত 'কাশ্মীর প্রতিনিধিদলের' টিউনিসিয়া পরি-দর্শনের পরই বরগুইবার মত পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রতিনিধিদলের কাছে বরগুইবা কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাশ্মীরের জনগণের 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' অধিকার সমর্থন করে বরগুইবা বলেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে টিউনিসিয়া পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। পাকিস্তান কাশ্মীরবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য চেষ্টা করছে এবং ভারত তাতে বাধা দিচ্ছে—বিশ্বের সর্বত্র পাকিস্তান এই বক্তব্য উপস্থিত করছে। টিউনিসিয়ার পক্ষে এই প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভারতের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রচার রাখলে তবেই এই বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব। কাশ্মীরের পূর্বাপর ইতিহাস, পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণ, পাকিস্তান কর্তৃক রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশ অগ্রাহ্য, কাশ্মীরের বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের বক্তব্য ঠিকমত উপস্থিত করতে পারলে পাকিস্তানী অপপ্রচার বন্ধ করা যায়।

ভারতের পক্ষ থেকে অবিলম্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা প্রয়োজন। 'গ্র্যাণ্ড মুফতির' দল ইতিমধ্যেই লণ্ডন, প্যারিস, মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়া ঘুরেছে। ভারতের পক্ষ থেকেও এইভাবে ঘুরে কাশ্মীরের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন।

# গ্রন্থমেলা

**কার্ল মার্ক্স** (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—ই স্তেপানোভা। অনুবাদ: কল্পতরু সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড; ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম: দু'টাকা।

ডারউইন, কার্ল মার্ক্স ও ক্রয়েড—এই ত্রয়ীর কাছে পৃথিবীর ঋণ অপরিশোধ্য। অবশ্য পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীর মহান মুক্তি সংগ্রামে মার্ক্স হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তিনিই হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও আধুনিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং মার্ক্স সম্পর্কে সব কিছুই জানার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। হয়তো সেই উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছেন ই স্তেপানোভা এবং ঐ জীবনীর বাংলা ভাষায় সহজ সুন্দর অনুবাদের কাজে অসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছেন শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত। অবশ্য গ্রন্থটি পাঠ করে এরকম প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সত্যিই কি এটি জীবনী হয়েছে? কেন না গ্রন্থকার রীতিগত অলৌকিক, অনৈসর্গিক অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক কোনো ঘটনাকেই (যা গতানুগতিক জীবনীর পর্যায়ে পড়ে) তুলে ধরেন নি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'কে কখনোই গতানুগতিক আত্মজীবনীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। জীবন স্মৃতিতে সেই স্মৃতি কবি উদ্‌ঘাটন করেছেন যা কাল-পরিবেশে কবির কাব্য জীবনকেই লাভ করতে সাহায্য করে। ঠিক তেমনি ভাবে কার্ল মার্ক্সের এই জীবনী রচিত হয়েছে—যা তার বস্তুবাদী মতাদর্শের দিঙ্‌নির্ণায়করূপে নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হবে: যেমন, 'কাঠ চুরি সম্পর্কিত আইন বুঝতে গিয়ে এবং মসেলে (Moselle) কৃষকদের অবস্থা অনুসন্ধান তাঁর চিন্তাকে শুদ্ধ রাজনীতি থেকে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিষয়ে এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিবর্তিত করেছিল।' তারপর ধীরে ধীরে সুরু হয়েছে তাঁর সাহসিক অভিযানের কথা—যে অভিযানের অর্থ আজীবন সংগ্রাম। পত্রিকা সম্পাদন, দেশ থেকে বিতাড়ন, এঙ্গেলসের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে সুরু করে মার্ক্সের প্রতিটি প্রবন্ধ ও রচনা তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে কি রকম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার ইতিবৃত্ত—উপরোক্ত গ্রন্থটিতে রয়েছে। এ কারণে গ্রন্থটি শুধু জীবনীই নয়, অর্থনৈতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রন্থটিতে দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি বিশেষ সম্পদ স্বরূপ। অনুবাদের ক্ষেত্রে শ্রীসেনগুপ্ত একটা নতুন কীর্তি সৃষ্টি করলেন, বলতে পেরে আমরা আনন্দিত।

**জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা:** সম্পাদনা: ধীরেন মুখোপাধ্যায়। ফ্রানজ যোশেফ পাবলিক, হেনরিখ হাকার। দীপায়ন প্রকাশনা ভবন, ২৮ সি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-২৬। দাম: দশ টাকা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বাংলা ভাষা নিজেই সমৃদ্ধশালী সেই ভাষায় অন্য দেশের সাহিত্যের অনুবাদ কতখানি কার্যকর। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে প্রকাশকের নিবেদনে অনুবাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রসঙ্গ উল্লিখিত হলেও বর্তমান কালে স্বভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা এবং বিশেষ ভাবে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের জন্য অনুবাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। ভারতবর্ষের সঙ্গে জার্মানদের সাংস্কৃতিক সংযোগ অনেক কালের। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে রূডলফ ফন এমস বারল্যাম ও যোশেফাটের কাহিনী রচনা করেন বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকে। যে জার্মান ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্ত করে আসছে ভারতীয় সাহিত্য থেকে, সেই জার্মান সাহিত্য আমরা কতটুকু জেনেছি? জাতীয় সুখ-দুঃখ ব্যক্তিক আনন্দ-বেদনা নৈর্ব্যক্তিকরূপে উচ্চারিত হয় সাহিত্যেই। যুগচেতনা-লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যই যুগোত্তীর্ণ। জার্মান সাহিত্যের কাব্যসম্পদে ঐসব মহদ্ গুণ বিধৃত হয়ে রয়েছে।

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) থেকে সর্বাধুনিক মহিলা কবি ইনগেবার্গ বাখমানের (১৯২৬ জন্মসাল) কবিতায় যে সর্বমানবীয় জীবনের স্পর্শ লাভ করা যায় তদ্দ্বারা যে কোনো বাঙালী পাঠক অনুবাদের মধ্য দিয়েও আত্মানুসন্ধান লাভ করবে। বিশেষত অনূদিত অধিকাংশ কবিতাই গীতিধর্মী হওয়ায়, বাংলা সাহিত্যের গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় একটা নিবিড় ঐক্য অনুভব করা পাঠকদের পক্ষে সহজ হবে। জার্মান কবিতায় ভারত-চিন্তা কিভাবে বিচ্ছুরিত, তাও কয়েকটি কবিতা ('বিশ্বামিত্র বিচিত্র এই লীলা', 'বুদ্ধ') পাঠে অনুভব করা যায়। বাংলা সাহিত্যে সে জাতীয় অন্বেষণ নগণ্য বলা যায়। জার্মান জাতির জীবন প্রায় নিরলস বলা যায়,—যুদ্ধবিগ্রহে বারম্বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার দেহ—তবু মানসিক ঐশ্বর্যে সে কতখানি বিত্তশালী 'জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি' সোচ্চারে তা প্রমাণ করবে। ৩১ জন জার্মান কবির প্রায় ৮১টি কবিতার অনুবাদকগণ অধিকাংশ খ্যাতনামা। তবু ছন্দ ত্রুটিও লক্ষণীয়, যেমন—'পশ্চিম আদেশ দিলেন অবগাহনের' মতো পংক্তিতে।

# রঙ্গজগৎ

## একটি সংবাদ-চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখা হলো কেন ?

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রমকালে সংখ্যা-লঘুদের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি সংবাদ-চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার জন্য কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছবিটি না কি প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে ফিল্ম ডিভিশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সংবাদ-চিত্রটির প্রদর্শন বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ আসে।

প্রকাশ যে, প্রস্তাবিত ভারত-পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের প্রাক্কালে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর পাশবিক পীড়নের চিত্রটি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এই চিত্রটি ফিল্ম ডিভিশনেরই একটি ইউনিট গ্রহণ করেছিল এবং তাতে গারো ও হাজং রমণীদের ওপর পাক-ফৌজের অত্যাচারের প্রামাণিক দৃশ্যও ছিল।

চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করার সংবাদে আমরা বিস্মিত হয়েছি। যখন কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘু-পীড়নের চিত্র প্রদর্শন প্রয়োজন। যখন সভ্যজগতের ধিক্কারে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল ও বর্বর শক্তির মুখোস খুলে দেওয়া দরকার, তখন চিত্রটির প্রদর্শন বন্ধ রাখা বর্বরতার নিকট নতিস্বীকার করার মত মনোভাব প্রকাশ করে। ভারত-পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক এবং সর্বপ্রকারে আপোষ চেষ্টা অভিনন্দনীয়। কিন্তু---সত্যকে গোপন করে নয়; বর্বরতাকে প্রচ্ছন্ন রেখেও নয়। বর্বরতাকে প্রচ্ছন্ন রাখা---কাপুরুষতা। ---সুজন।

● সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আর ডি বনশাল প্রযোজিত 'চারুলতা' ছবিতে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত।

## চিত্রআলোচনা

### গোধূলি বেলায়

(ইকনমিক প্রোডাকসন্স)

চিত্ত বসু পরিচালিত 'গোধূলি বেলায়' ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন ডাঃ নীহার গুপ্ত লিখিত গল্প। ছবিটি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।

কাহিনীর নায়ক স্বপন নিজের পিতাকে হত্যার অপরাধ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ওপর দায়িত্ব নিয়ে পলাতক হয়। নিত্য নতুন সাজে সে পুলিশকে ফাঁকি দিতে থাকে। জজ সাহেবের মেয়ে সুচিরা যখন তার প্রতি আসক্তা হয়ে উঠেছে, তখন পুলিশও তাকে ধরবার জন্য বেশ ভালভাবে অগ্রসর হয়েছে। স্বপনকে বাঁচাতে গিয়ে তার বাল্যদত্তা গ্রাম্য বালিকা চিত্রা পুলিশের গুলীতে প্রাণ দেয়। আর তাকে নিশ্চিত দণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃত হত্যা-কারী স্বপনের বাবা এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং অপরাধ স্বীকার করে।

চিন্তাশীল মন নিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই কাহিনী বিশ্বাস্য হতে পারে না। সাধারণত দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যে সব ছবি তৈরি হয়---'গোধূলি বেলায়' তারই মত একটি ছকে বাঁধা ছবি। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য তাই স্বপনরূপী বিশ্বজিৎ পাঁচ রকমের রূপসজ্জা নিয়ে বিভিন্ন ভাষা ও স্বরভঙ্গীতে উপস্থিত হয়েছেন। প্রণয়রসের দিক থেকে শহুরে আধুনিকার রূপসজ্জায় মাধবী মুখার্জী এবং গ্রাম্য সরলতা ও সাদা-সিদে সজ্জায় সুমিতা সান্যালকে উপস্থিত করা হয়েছে। সুচিরা-স্বপনের মাঝখানে আধা ভিলেন হিসেবে উপ-স্থিত হয়েছে পুলিশ অফিসার (দিলীপ রায়)। বাৎসল্য রস পরিবেশন করেছেন স্নেহময়ী মাতা সন্ধ্যারাণী আর একদিকে প্রতিশোধ, করুণা ও অনুতাপে রস-সিক্ত করেছেন স্বপনের পিতারূপী বিকাশ রায়। ছবিতে পরিমাণমত সর্বরস সিঞ্চন করা হয়েছে। মানবেন্দ্র মুখার্জী আবহসঙ্গীতে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে

না পারলেও ভোজপুরী, বাংলা, গ্রাম্য ও আধুনিক সুরের পাঁচটি গানে সুর দিয়েছেন। তার মধ্যে গোধূলি বেলায় গানটি সুগীত। সুতরাং ছবিটির মনোরঞ্জনী শক্তি অস্বীকার করা যায় না।

চিত্র গ্রহণের কাজ মামুলী, রসায়নাগারের কাজ ত্রুটিপূর্ণ।

# সুইডেনের চলচ্চিত্র রূপায়ণ ধারা

সুইডিস ছবির দুজন মহারথী মরিৎস স্টীলার ও ভিক্টর সোসট্রম। নির্বাক যুগে এঁদের অগ্রগামিতায় সুইডিস ছবি চলচ্চিত্র মানচিত্রে স্থান লাভ করেছিল। তারপরে সবাক যুগে হলিউডের হাতছানিতে পরিচালক ও শিল্পীরা অনেকেই পাড়ি দিলেন সেই মায়ারাজ্যের পথে। তখন থেকে সুরু হয়েছিল সুইডিস ছবির আকাল।

মাঝখানের অন্ধকার থেকে প্রথম আলোর রোশনাই দেখালেন ১৯৪০ সালে আলফ্ সোবার্গ। সেদিন সুইডিস

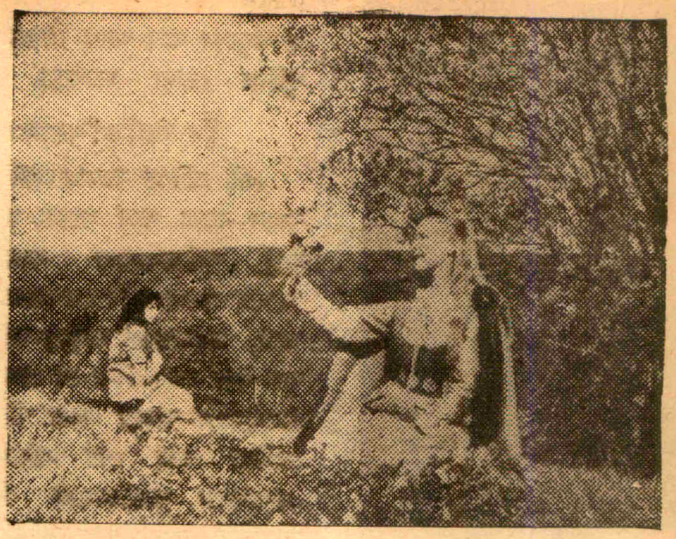

● ইঙ্গমার বার্গম্যানের দি ভার্জিন স্প্রীং' ছবিতে ব্রিজিটা প্যাটারসন ও গানেল লিণ্ডব্লম।

ছবির জগতে তিনি বিদ্রোহী। তিনি প্রচলিত চিত্রগ্রহণরীতি ও প্রয়োগপদ্ধতি বর্জন করে এমন এক ধারা প্রবর্তন করলেন, যাতে ছবি জীবন্ত হয়ে উঠলো। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, আলোকচিত্র ইত্যাদির সংমিশ্রণে সময় জ্ঞানের গাণিতিক হিসেবে তিনি চলচ্চিত্রকে নতুনরূপে সাজিয়ে তুললেন। সুইডিস ছবি রীতিনীতির বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর সব দেশের মত সুইডেনেও নতুন ভাবধারা, নতুন রীতি নিয়ে বহু তরুণ-পরিচালক উদয় হলেন। যুদ্ধোত্তর কালের একদিকে নৈরাশ্য, অপরদিকে নব জীবনবাদের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলেন কাজ সুনক, গুসতাফ মুলাণ্ডার, আর্নে সাক্সডর্ফ এবং ইঙ্গমার বার্গম্যান। সাহিত্য ও নাটকের মত চলচ্চিত্রের ভাবধারায় রূপান্তর ঘটে গেল। সুইডিস ছবিতে এই রূপান্তরের প্রকাশ দেখা গেল আলফ্ সোবার্গের বাস্তববোধ, ইঙ্গমার বার্গম্যানের অধ্যাত্মবাদ, আর্নে সাক্সডর্ফের কাব্যিক মননশীলতা।

চারটি সুইডিস কাহিনীচিত্র এবং চারটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমরা সুইডেনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জীবনধারা, প্রকৃতি ও মানুষ এবং কর্মের সম্পর্কে পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছি। এই ছবি সিনে ক্লাব

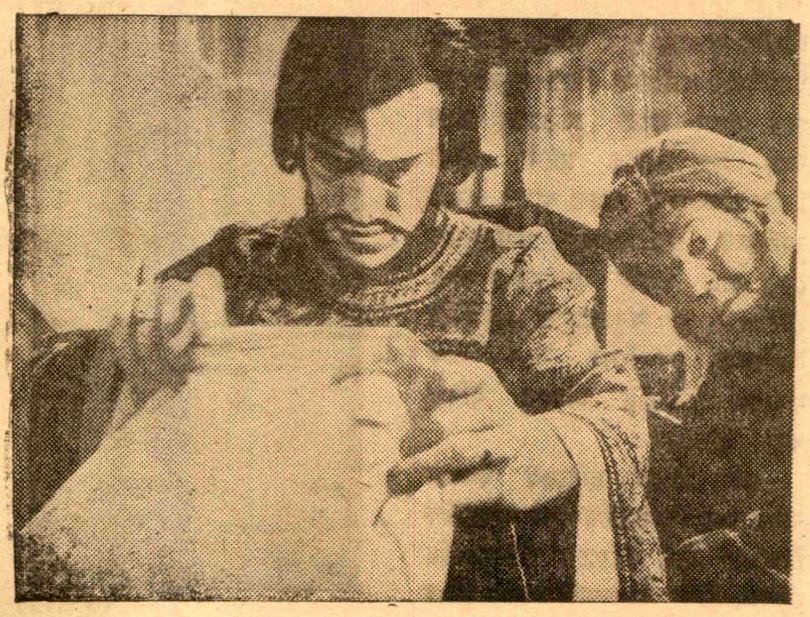

● 'দি ম্যাজিশিয়ান' ছবির মুখ্য অভিনেতা মাক্স ভন সাইদ্ব

● 'অয়নান্ত' ছবিতে সৌমিত্র ও সুচন্দ্রা।

অব ক্যালকাটার উদ্যোগে কলকাতায় ২৭-২৮-২৯-৩০শে মার্চ প্রদর্শিত হয়েছে।

### ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ :

ইঙ্গমার বার্গম্যানের এই ছবির নায়ক এক বৃদ্ধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। জীবন সায়াহ্নে তিনি অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণের জন্য মোটরে করে লুণ্ড শহরে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে পুত্রবধূ মেরিয়ানা এবং পথে জুটেছে এক তরুণী ও দুই তরুণের একটা দল। একটা দুঃস্বপ্নে সেদিন বৃদ্ধের ঘুম ভেঙেছিল। পথে যেতে যেতে নিজের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ ও ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশ করছেন। স্বপ্ন ও বাস্তবতার যোগাযোগে রহস্যময় বিশ্লেষণে এখানে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী সুর ও মানুষের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসার কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

### দি ম্যাজিশিয়ান :

এই ছবিতে সম্মোহনকারী ভগলার সদলে বনের পথে আসার সময় এক মুমূর্ষু অভিনেতাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। শহরে পৌঁছলে তাদের গ্রেপ্তার করে, ভগলারকে হাতুড়ে বলে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সে রাজপুরুষ ও রাজবৈদ্যের সামনে নানা ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত শবব্যবচ্ছেদাগারে রাজবৈদ্যকে বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত করে তার শক্তির পরিচয় দেয়। এখানে যুক্তি এবং বিশ্বাসের সংঘাতের মধ্যে বলা হয়েছে—শিল্পকলা এবং মায়া বা বিভ্রান্তি (illusion) ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেমন, মানুষের যৌন জীবনেও মায়ার স্থান রয়েছে। মনের বাসনাকে মানুষ অবদমিত করে রাখে এবং আসল চরিত্র গোপন রাখার চেষ্টা করে। শিল্পীর কাজ মুখোস খুলে দেওয়া।

### দি ভার্জিন স্প্রীং :

এই ছবির অবলম্বন ১৩শ শতকের একটি লোকগাথা। হাস্যময়ী কারিন গীর্জায় যাওয়ার পথে ধর্ষিতা ও নিহত হয়েছিল। কারিনের পিতা দুষ্কৃতকারীদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং হত্যার স্থানে গীর্জা নির্মাণের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। কুমারী কারিনের পবিত্রতার প্রতীকরূপে দেখা দেয় একটি ফোয়ারা। পাপ, প্রতিশোধ ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে নৈতিকতা সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভণ্ডামীর দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই তিনটি ছবিতেই ইঙ্গমার বার্গম্যানের শিল্পরুচির সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি রহস্যবাদী হলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে ছবিগুলি উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় সৌন্দর্য লাভ করেছে।

বার্গম্যানের জীবন আরম্ভ নাটক পরিচালক হিসেবে। তাঁর ছবিতে চলচ্চিত্র রীতির সঙ্গে অভিনয় প্রাধান্যের যোগাযোগ ঘটেছে এবং তাঁর ওপর শেক্সপীয়ারের প্রভাব রয়েছে। বার্গম্যানের প্রত্যেক ছবিতেই স্বপ্ন, যৌনতা এবং প্রতীক ও ফ্ল্যাশব্যাকের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

### মিস জুলী :

আলফ্ সোবার্গের মিস জুলী অভিজাত ঘরের তরুণী। গ্রীষ্মের উৎসব রজনীতে সাধারণ মানুষের যৌবনোচ্ছ্বাসে সে অভিভূত। দুরন্ত যৌবনবেদনায় শেষ পর্যন্ত সে এক পরিচারকের কাছে হৃদয় নিবেদন করে। কিন্তু পরিচারকের জুলীকে গ্রহণ করার মত সাহস ছিল না। হতাশায় ও গ্লানিতে জুলী আত্মহত্যা করে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বৈষম্য এবং

● 'কোহ্‌রা' ছবিতে ওয়াহিদা রহমান

মানাসক দ্বন্দ্বের মধ্যে ছবিতে আভিজাত্যের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠেছে। শ্লেষ, কৌতুক, আনন্দ ও বিষাদের মুহূর্ত রচনায় পরিচালকের ক্ষমতা বিস্ময়কর। ছবিটির আবেদন সহজগ্রাহ্য। আমাদের দর্শকদের কাছে বার্গম্যানের রহস্যবাদ অপেক্ষা সোবার্গের বাস্তববাদের আবেদন অনেক বেশি।

সুইডিস ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য চিত্রগ্রহণের নৈপুণ্য এবং অভিনয়-রীতি। শিল্পীদের মধ্যে নির্বাক যুগের অগ্রপথিক ভিক্টর সোস্ট্রম চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অভিনয়ে সোস্ট্রম এবং ইংগ্রিড থুলিন (মেরিয়ানা এবং যাদুকরের স্ত্রী) অতীত ও বর্তমান দুটি কালের প্রতিনিধি। ইংগ্রিড থুলিন অত্যন্ত শক্তিময়ী অভিনেত্রী। অন্যান্যদের মধ্যে মাক্স ভন সাইদা (যাদুকর), অনিতা বোর্ক (জুলী) এবং ব্রিজিটা প্যাটারসনকে (কারিন) বিবি এণ্ডারসনকে (সারা) দর্শকরা মনে রাখবেন।

## নাটকের কথা

### বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন ২৭-২৮-২৯-৩০শে মার্চ চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বরূপা থিয়েটার প্রাঙ্গণে সমাগত সুধিবৃন্দ, নাট্যকার ও অভিনেতাগণ এবং নাট্য পর্যালোচকগণ নাটক, অভিনয়, আঙ্গিক এবং মঞ্চের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মন্মথ রায়, ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জী, অধ্যক্ষ পি কে গুহ, ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য, ডাঃ অজিত ঘোষ, বনফুল, সলিল সেন, সুধীপ্রধান গুহ-সত্ত্ব বসু, রণজিৎ দত্ত।

## মূকাভিনেতা

### অরুণাভ মজুমদার

বাংলা নাট্যজগতে মূকাভিনয় সম্প্রতিকালীন প্রচেষ্টা। স্বতন্ত্র শিল্প-রূপেও এই শিল্প জনপ্রিয়তা অর্জন

● মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদার

করছে—তার মূলে কয়েকজন শিল্পীরই নাম করা যেতে পারে। অরুণাভ মজুমদার তাদের অন্যতম উদ্যোক্তা। অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠানে এবং একক অনুষ্ঠানে শ্রীমজুমদার দর্শক-বৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

সম্প্রতি অরুণাভ মজুমদার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মূকাভিনয় পরিবেশন করেছেন। এই সফর শেষে দুর্গাপুর ও গরিফায় দুটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

জনসন এ্যাণ্ড নিকলসন ড্রামাটিক ক্লাবের প্রযোজনায় গরিফায় গত ২১শে মার্চ শ্রীঅরুণাভ মজুমদারের কয়েকটি 'ফিচার', যেমন 'টাগ অফ ওয়ার', 'বেকার যুবকের করুণ কাহিনী', 'আধুনিকা' উপস্থিত দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

### রূপশিল্পী শমসের আলীর জীবনাবসান

ঢাকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র রূপশিল্পী জনাব শমসের আলী বা শ্যামবাবুর গত ১৯শে মার্চ জীবনাবসান হয়েছে। তিনি নির্বাক যুগে কলকাতায় ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ সুরু করেছিলেন ; দেশ বিভাগের পরে ঢাকায় চলে যান।


আগামী শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল শুভমুক্তি!

রহস্যের কুয়াসায় ঢাকা সঙ্গীতসমৃদ্ধ এক স্মরণীয় প্রণয়-কাহিনী

রুক্মী ০ বসুশ্রী ০ বীণা ০ পূর্ণশ্রী

আলোছায়া ০ মৃণালিনী (দমদম) ও অন্যত্র

শুধু বাংলা দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে পাঠক অপেক্ষা লেখকদের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য এখানে লেখক বলতে সরব এবং নীরব—দুই দলকেই আমি বুঝি। আর পাঠক বলতে আমার ধারণায় সৎ পাঠকই অবস্থান করেন। দুঃখের ব্যাপার এই যে, বাংলা দেশে সৎ পত্র-পত্রিকার সংখ্যা এমনই নগণ্য যে—সৎ পাঠকদের পক্ষে হা-হুতাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেখানে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য এবং নিজেদের স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয় সেখানে ভাল পত্রিকার প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমার মনে হয়, আপনারা এই উভয় উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ( যার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল ধরে আমরা গভীরভাবে অনুভব করছিলাম ) আপনাদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও এ ধরণের পত্রিকা দুর্লভ। কেন না এই পত্রিকার কাছে আমরা পাচ্ছি দেশ-বিদেশের সামগ্রিকভাবে সাপ্তাহিক খবর। যেমন ধরুন, বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি—ঐ সঙ্গে রয়েছে 'আজকের মানুষ'-এর জন্য নিয়মিত একটি পৃষ্ঠা। তাছাড়া পত্রিকাটির অন্যতম মূল্যবান সম্পদ শিলালির—রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে আর রঙ্গজগৎ।

তাই বলা যেতে পারে—সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদকীয় প্রভৃতি পত্রিকাটিকে বৈশিষ্ট্যে ভরপুর করে তুললেও এর মধ্য থেকে আমরা রসাস্বাদ ও গ্রহণ করতে পারি। বাংলা দেশে মামুলি গল্প-কবিতা ও উপন্যাসের পাঠক প্রচুর আছে। কিন্তু 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিক্ষাপ্রদ আন্তর্জাতিক পাঠ করে চলমান জগৎ সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারেন যে সব পাঠক—তাঁদের কাছেই আপনারা তুলে ধরতে পারেন যথার্থ সাহিত্যকে এবং আপনারা তা সার্থকভাবেই পেরেছেন। অন্যান্য পত্রিকায় সাহিত্য পরিবেশিত হয়—কিন্তু সৎ পাঠক সৃষ্টি করা হয় না। আমার মনে হয়—এই এক বছরের মধ্যেই আপনারা সৎ পাঠক সৃষ্টি করেছেন।

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'কে ভালবাসি। সেই কারণে আরো দু-একটি কথা বলা উচিত মনে করি। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি—তা অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। তবু এই পত্রিকা ঐতিহ্যমণ্ডিত, সেই কারণে আমরা আপনাদের পত্রিকায় প্রায় ৭।৮ মাস পূর্বে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় দেখেছি—পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ রাখার চমৎকার যুক্তি। ঐতিহ্য বলতে যা একদা ছিল—তার হুবহু অনুসরণ বোঝায় না, বোঝায় সেই বস্তুর প্রতি নব মূল্যায়ন। যেমন মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্যে করেছেন। আপনারা রবীন্দ্রনাথ - দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তাঁদের সাহিত্যের নব মূল্যায়ন করেছেন। নেতাজী সংখ্যাটিও আমাদের মুগ্ধ করেছিল। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে অবশ্য স্মরণীয় রচনা অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'নক্ষত্রের আলো'। প্রবন্ধটির শেষাংশ বাঙালী জাতির সর্বনাশ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত লেখক করেছেন—তা কি সমগ্র বাঙালী জাতি আজ ভেবে দেখেছেন?

শহর কলকাতার মতো বাংলা দেশের বিভিন্ন জ্ঞাত-অজ্ঞাত অঞ্চল নিয়ে নতুন কোন বিভাগ খোলা যায় না কি? আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থাটি জানার জন্যেই ঐ রকম কিছু দরকার। অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে নিয়মিত পৃষ্ঠা থাকা উচিত নয় কি? এছাড়া আমরা চাই এমন একটা তালিকা যাতে থাকবে বাংলা দেশে প্রতিমাসে কি কি ও কত বই প্রকাশিত হচ্ছে, বিদেশ থেকে কি কি বই আমদানী হল ইত্যাদি। গ্রন্থ-মেলাকে আগের মত করে তুলুন না। গ্রন্থমেলায় যেমন প্রচ্ছদের ছবি চাই, তেমনি দামের বা ঠিকানার উল্লেখ থাকার কি দরকার? আমরা ভাল বইয়ের সমালোচনা চাই। তেমনি কোন বিশেষ দিকে বিশু সাহিত্যের আলোচনা হোক—এও আমাদের প্রার্থনীয়। কবিতার সংখ্যা কমিয়ে প্রতি সংখ্যায় ২।৩টি ভাল কবিতা দিলেই ভাল হয়। আরো ভাল গল্প দিন। অন্তত মাসে দুটো ভাল গল্প পেলে আমরা খুশি হবো। অন্যান্য জায়গাতেও গল্পের দশা দেখে কান্না আসে। আপনারা সে বিষয়ে সচেতন থাকলে আমাদের আনন্দের কারণ হবে। আমার একটা অভিযোগও রয়েছে। পত্রিকায় যে লেটারিং হয়ে থাকে তা খুব চিত্তাকর্ষক নয়। অবশ্য পত্রিকার ছাপার অবস্থাও ভাল নয়। তাছাড়া পত্রিকা যখন দেরীতে হলেও হাতে এসে পৌঁছয়, তখন অনেক পাতাও ছিঁড়ে যায়। এমন কেন হয় জানি না।

আশা করি, আপনার পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে উপরোক্ত কথাগুলি জ্ঞাপন করার অধিকার আমার অবশ্যই রয়েছে।

অনাদিভূষণ মুখোপাধ্যায়
ধানবাদ।

# খেলা ধূলা

## শ্যাটনী থেকে যাত্রা হল সুরু

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোট রেস প্রতি বছরই টেমস নদীর জলে বহু আলোড়নের সৃষ্টি করে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এই বোট রেসের ফলাফল অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। এ বছর ২৮শে মার্চ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বহু আগে থেকেই এই দুই দলের দাঁড় চালনার অনুশীলন দেখে বিশেষজ্ঞদের মনে ধারণা হয়েছিল যে, শক্তির দিক দিয়ে অক্সফোর্ড দল অজেয়। এ-ধরণের শক্তিশালী দল বহুদিন অক্সফোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করে নি। ঘোড়দৌড়ের আগে রেসুড়েরা যেমন অশ্বের পদক্ষেপের দ্রুততার চুলচেরা হিসেব করে বাজী ধরেন, সেই রকম এই বোট রেসের দাঁড়ীদের দাঁড় ফেলার ছন্দময় দ্রুততার বিচার করে বিশেষজ্ঞরা বাজী ধরেছিলেন অক্সফোর্ড দলের ওপর। কেম্ব্রিজের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি।

কিম্বদন্তী আছে এই বাচ খেলা দেখবার জন্য নাকি জলদেবতাদের আবির্ভাব হয়। জলদেবতা নেপচুন যাদের আশীর্বাদ করেন, জয়মাল্য তাদের গলেই ওঠে। এই বিজ্ঞানের যুগে ইংলণ্ডের মতন দেশে এ ধরণের অন্ধ বিশ্বাস আজ আর নেই। তবে বোট রেসের ফলাফল দেখে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, কিম্বদন্তীটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তা নইলে কেম্ব্রিজ দল অক্সফোর্ডকে হারাল কি করে এবার।

মাচ মাসের শেষ শনিবারে ২৮শে মার্চ উভয় কূলে কৌতূহলী দর্শকদের অফুরন্ত ভিড়। কলকাতায় যেমন ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকেরা নিজের দলকে জেতানোর জন্যে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এ ধরণের উন্মাদনা ও উত্তেজনা ইংলণ্ডের দর্শকদের মধ্যেও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কেউ চায় অক্সফোর্ড জিতুক, কেউ চায় কেম্ব্রিজ জিতুক। কেউ বাজী ধরেছে অক্সফোর্ডের ওপর, কেউ বা ধরেছে কেম্ব্রিজের ওপর।

জলদেবতার আশীর্বাদ এবার কেম্ব্রিজের ভাগ্যেই বোধহয় জুটেছিল। তাই তারা টসেও জিতল এবং

---

শ্রীঅমিতাভ

---

পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাদের আনুকূল্য করল। কেম্ব্রিজ সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে নৌকা পরিচালনা করে অতি সহজেই শক্তিশালী অক্সফোর্ডকে পরাজিত করল। আর একবার প্রমাণিত হল খেলাধূলার ফলাফল অঙ্কের হিসেবে চলে না, অচিন্তনীয় অনিশ্চয়তাই এর প্রধান আকর্ষণ।

এই প্রসঙ্গে অতীতের পাতা থেকে ১৮৭৭ সালের বোট রেসের কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। সেই অবিস্মরণীয় বোট রেসের জীবন্ত সাক্ষী এখনও ইংলণ্ডে খুঁজলে হয়ত পাওয়া যাবে। সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল হয়েছিল 'ডেড হিট'। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের বোট রেসে এ ধরণের ফলাফল অতীতে আর দ্বিতীয়বার হয় নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে বলে মনে হয় না।

সেদিনও ছিল ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসের শেষ শনিবার, যদিও সকালটা ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল, কিন্তু শীতের তীব্রতা বোট রেস উৎসাহীদের অনেককেই ঘরে আটক করে রেখেছিল। টেমসের ধারে ধারে প্রতীক্ষমাণ দর্শকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তবে বোট রেসের সুরু থেকেই কতকগুলি অঘটন ঘটতে লাগল। প্রথমত নির্দিষ্ট সময়ে বোট রেসটি আরম্ভ করা যায় নি। এটা ইংরেজদের স্বভাব বিরুদ্ধ। কেম্ব্রিজের নৌকায় দাঁড় ও হালগুলি ঠিক মত ফিট করা ছিল না। বোট রেসটি তাই নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরেই সুরু হয়। দ্বিতীয়ত অতিরিক্ত উৎসাহী দর্শকদের বোঝাই নৌকা একটা হঠাৎ বোট রেসের গতিপথে এসে পড়ল। খুব অল্পের জন্য একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা কোনক্রমে এড়ান গেল। অক্সফোর্ডের নৌকার দাঁড় এই যাত্রীবাহী নৌকাকে শুধুমাত্র স্পর্শ করল। এটাই একমাত্র বাধা নয়। চলার পথে আরও দু-একটি জলযানের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বোট রেসটিকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছিল। কিন্তু কোন বাধাই দু'পক্ষের যোদ্ধাদের মনোবল একটুও ক্ষুণ্ণ করে নি। প্রভাতের তীব্র শীতেও তাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছিল এবং কখনও অক্সফোর্ড কখনও বা কেম্ব্রিজ এগিয়ে থাকছিল। কিন্তু কোন দলই একটানা প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে নি। শেষ মুহূর্তে নৌকা দুটি মর্টলেকের মদের ভাঁটি পার হয়ে গেল। সে সময় এই বোট রেসের শেষ সীমানায় নির্দিষ্ট কোন চিহ্নিত সীমানা ছিল না। বিচারক 'ফেলপস' যখ

ঠিক করতেন তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হত। এদিন 'ফেলপস' ঠিক জায়গাতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন এবারের প্রতিযোগিতা সমান সমান হয়েছে, অর্থাৎ ডেড হিট। কিন্তু অক্সফোর্ডের সমর্থকরা হৈ চৈ করতে লাগল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরই দল জিতেছে। কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত বিচারক ফেলপস যা রায় দিলেন তাই বজায় রইল।

এই প্রসঙ্গে এক কৌতুককর গল্পের প্রচলন আছে। সেদিনের শীতটা ছিল কনকনে। সকাল থেকে বিচারক ফেলপস মর্টলেকের ধারে অপেক্ষা করছিল; প্যাটনী থেকে কখন দু'দলের বোট আসবে। কিন্তু রেসটা দেরীতে আরম্ভ হওয়ায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পাশেই ছিল মদের ভাঁটি। তাই সে শরীরটাকে গরম করার জন্য দু-এক পাত্তর খেয়ে নিল। শরীরটা চাঙ্গা হল বটে, কিন্তু মদের পরিমাণ বেশি হওয়ায় নেশাটাও বেশ জমে ওঠে। ফেলপস নেশায় বুঁদ হয়ে গাছের তলায় বসেছিল, যখন নৌকা দুটো পার হয়ে গেল, তখন লোকজনের হৈ চৈতে তার হুঁস হল। কাদের নৌকা আগে গিয়েছে তা সে কিছুই দেখে নি। তাই বুদ্ধি করে বলে উঠল, ডেড হিট।

প্রচলিত এই গল্পটি কতদূর সত্য তা জানি না, তবে ১৮৭৭-এর রেস যে সমান সমান হয়েছিল সে নজীর রেকর্ড বুকে আছে। তবে ফেলপসের ভুলের জন্যেই হয়ত ১৮৭৭-এর বোট রেসটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, একথাও ঠিক অস্বীকার করা যায় না। তবে সব খেলারই ইতিহাসে এরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বিরল নয়।

## অসময়ে ইডেনের অতিথি

সত্যই কি বিচিত্র এই কলকাতার ক্রীড়াজগতের কর্মকর্তারা। শীত তার তল্পিতল্পা নিয়ে অনেকদিন হল বিদায় নিয়েছে, সৌরভে সুরভিত বসন্তের বিদায়ের পালাও সমাগত, প্রখর তাপের পশরা নিয়ে বৈশাখের আগমনের পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। এই বিচিত্র পরিবেশে ক্রিকেট আবার ক'দিনের জন্য ইডেনের অতিথি হচ্ছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি ইডেনের বুকে ক্রিকেটের আগমন, ঠিক যেন

সোবার্স

অসময়ের কমলালেবু। প্রদর্শনী খেলাটিতে অংশগ্রহণ করবেন বিদেশী খেলোয়াড় সমন্বিত সোবার্স্টন একাদশ এবং সম্মিলিত ভারতীয় একাদশ। খেলা সুরু হবে ১১ই এপ্রিল, শেষ হবে ১৫ই---মাঝখানে একদিন বিশ্রাম। এই প্রদর্শনী খেলাটির পশ্চাতে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। দেশের সমর প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্য প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ। সংগৃহীত অর্থ থেকে একটা অংশ প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাহায্য ভাণ্ডারেও দেওয়া হবে।

সফরকারী দলের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের গ্যারফিল্ড সোবার্স এবং সেমুর নার্সের নামই উল্লেখযোগ্য। কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। সি-এ-বি কর্তৃপক্ষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অন্তত কিছুটা নজর দিতে হবে। গত ইঙ্গ-ভারত টেষ্ট খেলায় সি-এ-বি'র চরম অব্যবস্থার জন্য সাধারণ দর্শকদের যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণও তাই। এবার এই অসময়ের ক্রিকেট খেলায় কর্তৃপক্ষের কাছে একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যেন দর্শকদের দিকে কিটুটা নজর রাখেন।

## কলেজের খেলাধুলায় অপ্রীতিকর ঘটনা

কলকাতার ময়দানে খেলায় গণ্ডগোল অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু কলেজের বা স্কুলের খেলায় কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা খুবই বেদনাদায়ক। তবে আজকাল প্রায় সবক্ষেত্রেই আম্পায়ার এবং রেফারীর ভুলের জন্যই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় এবং সেই ভুলকে খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করলেই সবচেয়ে সুখের কথা। অবশ্য বর্তমানে এমনও লোক আম্পায়ার বা রেফারী হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন যাঁদের খেলা পরিচালনা করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাই নেই। আন্তঃকলেজ ক্রিকেট ফাইন্যালে সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং হেরম্বচন্দ্র খেলাটির গোলযোগের জন্য একমাত্র দায়ী আম্পায়ারের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অবশ্য মাঠে কয়েকজন খেলোয়াড় আউটের জন্য যে সব এবং যে রকম আবেদন করেছেন তা সত্যিই বড় দৃষ্টিকটু। তিনজন খেলোয়াড়কে শাস্তি দিয়েছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সেই সিগারেট

যা দামে

# কম

অথচ যার গুণ

# বেশী

২৫ নয়া পয়সায় ১০টি
৫০ নয়া পয়সায় ২০টি

**খুলুন** সদ্য তৈয়ারী এই জনপ্রিয় সিগারেটের প্যাকেট।

**দেখুন** এতে কেমন সোনালী ভার্জিনিয়া তামাকের বিশেষ সংমিশ্রণ আছে।

**স্বাদে** এটা শ্রেষ্ঠ গুণ বিশিষ্ট ধূমপান।

**বিচার করুন** বেশী দামী সিগারেটের সঙ্গে এই সিগারেটের গুণের তুলনা করুন।

Thursday, 9th April, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Page No. 0 19
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" Phone : { 34-7721, 34-7722, 34-7723.

# আপনার নিজের ব্যাপার হলে...

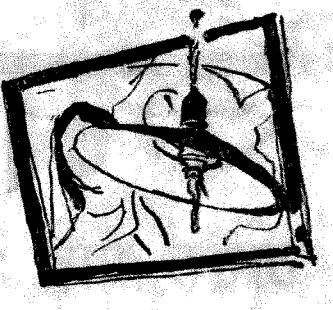

9 APR 1964

আপনার নিজের সম্পত্তি যদি চুরি যায়, স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তৈরী নিজের জিনিষপত্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে' থাকতে দেখেন, তাহ'লে কি নির্লিপ্ত দর্শক হ'য়ে আপনি থাকতে পারেন? আপনারা প্রত্যেকেই তো রেলের সম্পত্তির অংশীদার।

**আপনাদের সতর্কতাই**
**এর রক্ষাকবচ**

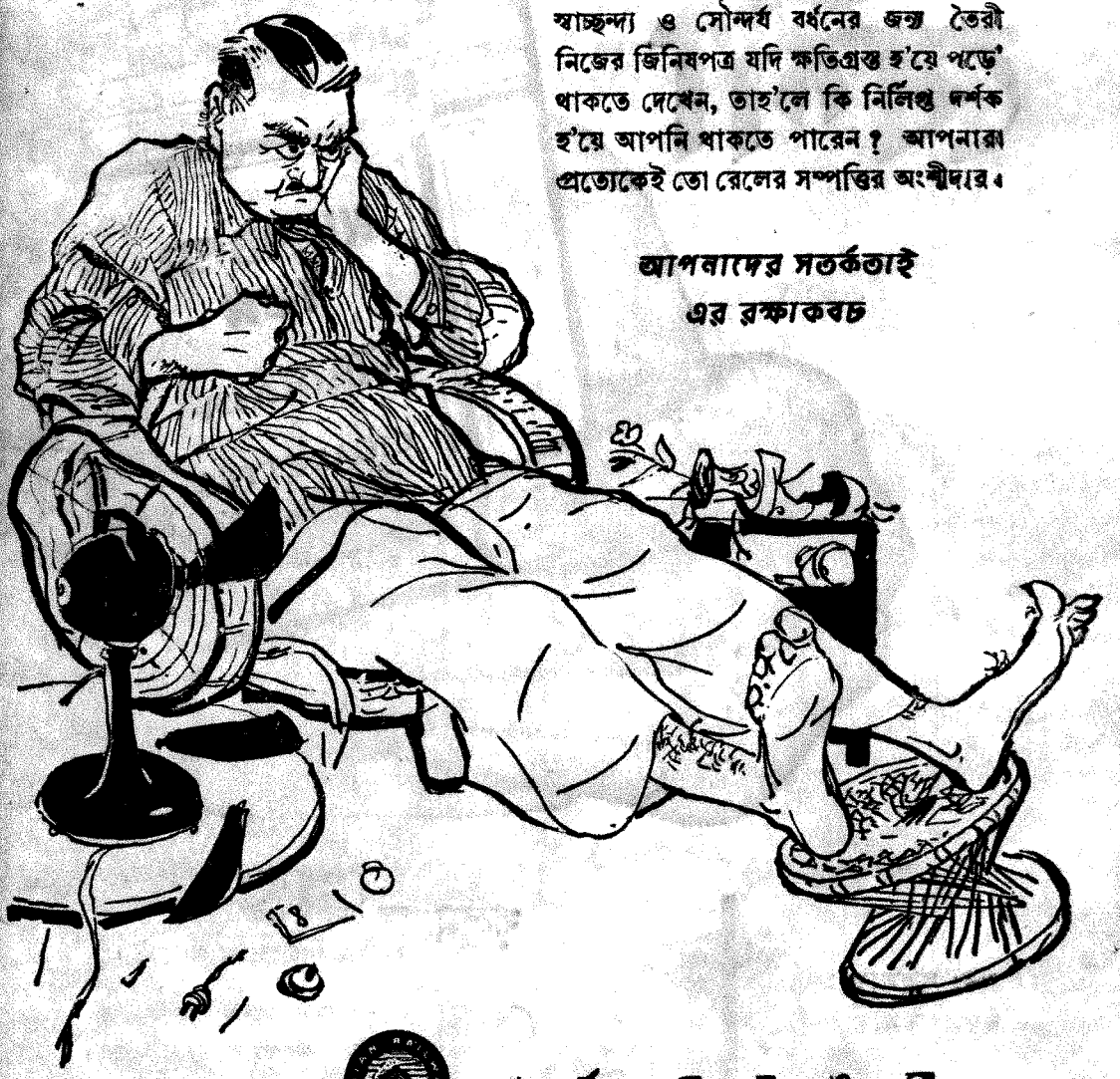

পূর্ব রেলওয়ে

E. R. 1.49

সাপ্তাহিকী

# বসুমতী

বিভীষিকার রাজ্য পাকিস্তান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য আগত উদ্বাস্তুদের দুর্দশার চিত্রগ্রহণ করছেন দু'জন বিদেশী সাংবাদিক।

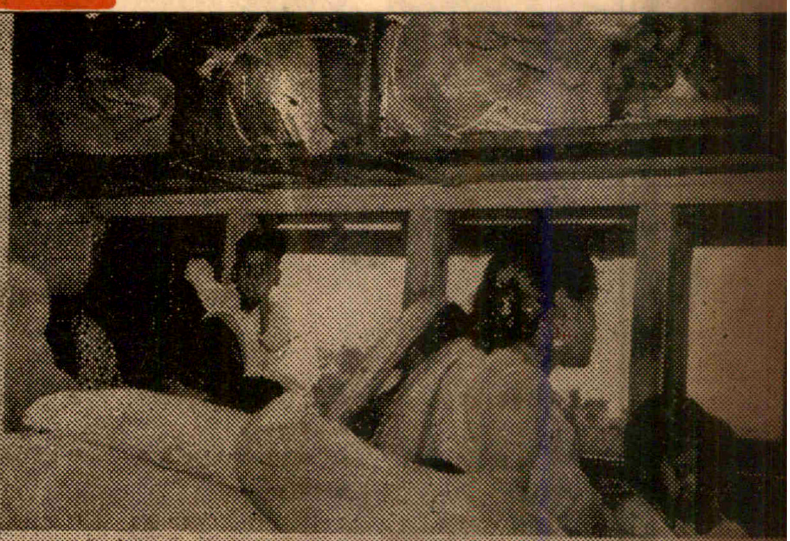

বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৩রা বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • • 16th April, 1964 • Vol. 68, No. 47

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

# সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

**প্রথম ঃ শ্রীঅজয় গুপ্ত**
৬।৪।১, শচীন মিত্র লেন, কলিকাতা-৩।

**দ্বিতীয় ঃ শ্রীসুপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়**
ছাতনা, বাঁকুড়া।

**তৃতীয় ঃ শ্রীমঞ্জুলা সেনগুপ্ত** C/o শ্রীসরল কুমার গুপ্ত
১৭৯, ব্যাচারাম চাটার্জি রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪

**॥ অবশিষ্ট ২২টি পুরস্কার ॥**

| লেখক | ঠিকানা | লেখক | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| শ্রীবীথিকা ঘোষ | ৩২/১, ডিহি শ্রীরামপুর রোড, কলিকাতা-১৪ | শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব | পোঃ শান্তিনিকেতন জিঃ বীরভূম |
| " গীতা চট্টোপাধ্যায় | ১৮, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ | " মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী | শান্তিনগর পোঃ রহড়া |
| " প্রফুল্ল সরকার | ১৫৮বি, পিয়ারী মোহন রায় রোড, কলিকাতা-২৭ | " অচিরা চৌধুরী | ৮, আনন্দ লেন, কলিকাতা-৪ |
| " সুধীর কুমার মল্লিক | ঘোষপুর উচ্চ বিদ্যালয় পোঃ হাউস, মেদিনীপুর | " আশীষ বসুমল্লিক | ৭২/৪, দেশবন্ধু রোড, (পূর্ব) কলিকাতা-৩৫ |
| " কল্যাণ কুমার দে | ৪ জে, খেলাৎ বাবু লেন, কলিকাতা-২ | " অনিমা মিত্র | ২৬/২বি, রূপনারায়ণ মন্দন লেন, কলিকাতা-২৫ |
| " রথীন সেনগুপ্ত | সহ সীমাধিকারিক কালিম্পঙ | " কমল সেনগুপ্ত | সিনিয়র বেসিক স্কুল পোঃ কল্যাপুর, আসানসোল |
| " সরিৎ শর্মা | কিউ-এ—ই১-৭০/এ দুর্গাপুর-৭ | " জয়দেব বসু | ১২১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ |
| " শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩২, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬ | " সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় | ষ্টেশন ইকুইপমেণ্ট সেকশন এরোনটিক্স, বোম্বাই-৩৩ |
| " মায়া ঘোষাল | C/o শ্রীআশুতোষ ঘোষাল নগেন্দ্র নগর, কৃষ্ণনগর, জিঃ নদীয়া | " গিরিজা বন্দ্যোপাধ্যায় | ১১০, বনমালি নস্কর রোড, কলিকাতা-৩৪ |
| " উৎপল কুমার গুপ্ত | বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ | " চিত্রা সেনগুপ্ত | C/o শ্রীতারক সেন, প্রকাশ মল্লিকের বাড়ী, জিঃ হুগলী |
| " অনিন্দিতা নিয়োগী | ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা-২৫ | " প্রশান্ত কুমার রায় | জিয়াগঞ্জ |

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,** সভাপতি — **শ্রীসাগরময় ঘোষ,** সম্পাদক

**সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি**

**সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২**

এই গল্পগুলি প্রকাশক এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
কর্তৃক পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

# সূচীপত্র

756·3
·003/3
Yr. 68
no. 47


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৫৭১ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৫৭২ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২৫৭৩ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২৫৭৬ |
| ওয়াশিংটনের চিঠি | বিজন চট্টোপাধ্যায় | ২৫৭৭ |
| পৃথুমালিনী কথা (রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী) | সুভাষ সমাজদার | ২৫৮০ |
| কৃষ্ণচূড়া (উপন্যাস) | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৫৮৩ |
| দুরন্ত দেহলী (কাহিনী বিচিত্রা) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৫৮৬ |
| অনল আয়তী (উপন্যাস) | সুশীল রায় | ২৫৮৮ |
| উৎসবের শেষে (গল্প) | দিলীপ মিত্র | ২৫৯৩ |



মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত

**বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭৲**

সুভাষচন্দ্র বসুর

**তরুণের স্বপ্ন ২৷৷০ নূতনের সন্ধান ২৲**

গোপাল ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস

**শেষ প্রদীপ শিখা**

চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস

**জবানবন্দি ৬৷৷০**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

**ভুবনপুরের হাট**—যন্ত্রস্থ

জগদীশচন্দ্র ঘোষের নূতন উপন্যাস

**শহীদ ৫·৫০**

তপতী রায়ের উপন্যাস

**একটি সোনা মন ৩৲**

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সদ্য প্রকাশিত

**মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫৷৷০**

সুমথ ঘোষের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

**মেঘ ভাঙা রোদ ৫৷৷০**

অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

**সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫৷৷০**

দায়রা আদালতের আইনার অভিযুক্ত

আসামীদের জীবনালেখ্য

চিত্রগুপ্তের

**এরা অভিযুক্ত আসামী ৬৷৷০**

অভিযাত্রীর উপন্যাস

**স্মৃতির মুকুর ৬·৫০**

অনির্বাণ শিখা ৫৲

নষ্টচন্দ্রের আলো ৬৲

পূর্ণচন্দ্র শুঁই-এর উপন্যাস

পথ হতে পথে ৩৲

প্রবোধ সান্যালের

গল্প সঞ্চয়ন ৪৲ বন্দী বিহঙ্গ ৩৷৷

এক বাণ্ডিল কথা ৪৲ জনতা ৩৲

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস

লাল পাথর ৩৲ সমান্তরাল ৩৷৷

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ঋণশোধ ৩৷৷ স্মৃতি ৩৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত মন ৩৲ মাটির গন্ধ ৪৲

মনকেতকী ৬৲

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুন্দরী কথাসাগর ৫৷৷

তারাশঙ্কর বন্দ্যো-রবিবারের আসর ৩৲

আশুতোষ মুখো—জানালার ধারে ৪৲

বনফুল—উজ্জ্বলা ৩৷৷

জগদীশ ঘোষ—যাত্রিদল ৬৷৷

বিভূতি মুখো—আনন্দ নট ৩৲

শক্তিপদ রাজগুরু—বনমাধবী ৩৷৷

আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩৷৷

সত্যব্রত মৈত্র—বনদুহিতা ২৷৷

মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩৲

নিরা মুখো—জটাশিবতলার ঘাটে ৩৷৷

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য—আতপ্ত কাঞ্চন ৩৲

বেলা দেবী—জীবন তীর্থ ৩৲

প্রভাবতী দেবী—উদয় অস্ত ২৲

বিমল কর—দিবারাত্রি ৩৲

গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪৲

রাজকুমার মুখো—শয়তানের জলা ২৲

তারকদাস চট্টো—কুমারী ধরম ৫৲

কৃশানু বন্দ্যো—কালো চোখের তারা ৩৷৷

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী (কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট) : কলিকাতা—৬** ফোন—৩৪-২৯৮৪

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৫৯৮ |
| সনেট (কবিতা) | বিষ্ণু দে | ২৬০২ |
| বিশল্যকরণী বৃক্ষদের জন্য | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ২৬০২ |
| এই চৈত্রের বাংলা (কবিতা) | গোবিন্দ চক্রবর্তী | ২৬০২ |
| শহর কলকাতা | শ্রীগদাতিক | ২৬০৩ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৬০৬ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৬১৩ |
| রঙ্গ জগৎ | ... | ২৬১৮ |
| পাঠক মন | ... | ২৬২২ |
| খেলাধূলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৬২৩ |

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১।।০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬৮ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৩রা বৈশাখ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 16th April 1964

# নতুন বছর

নতুন বছরের নবীন দিনগুলি আমাদের সকলের শুভেচ্ছা ও আনন্দে উজ্জ্বল এবং দীপ্ত আশার সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। পুরাতন গ্লানি, নিরুপায়-বেদনাকে বিদায় দিয়ে আমরা নব পথের পথিক—এই শুভবুদ্ধির দ্বারা আমরা জটিলতার দিনে সহজভাবে যেন পরিচালিত হতে পারি। কিন্তু জীবন যতোই দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে, যুগের ক্রান্তিরেখা সে অতিক্রম করছে, ততোই তাকে পৃথিবীর কঠিন ভূমিতে চলার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে, তবু সেই কঠিন ভূমিতে জটিলতার আবর্ত ভেদ করে সকলের মুখোমুখি হওয়া যায় যখন সহজ আনন্দে—তখন মানুষের মন স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়।

ভারতের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ব্যাহত ও শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে অনেক দিক দিয়ে—একথা নতুন বছরেই বলা যেতে পারে। পুরাতন গ্লানিকে বিদায় দেবার মত সাহস অর্জন করা যেমন দরকার, তেমনি গ্লানির কারণগুলিকে অনুসন্ধান না করে আমরা যদি নতুন দিনের আনন্দে অকারণে নিমগ্ন হয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের দুঃখ ও আশঙ্কার পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব নয়। সুতরাং সে ব্যাপারে সাবধান থাকা আমাদের কর্তব্য। গত বছরের ঘটনা বলে মনে হলেও —পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, সেখানে অবলাদের প্রতি প্রবলদের ঘৃণ্য আচরণ আমাদের মন থেকে এখনো মুছে যায় নি। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে লাঞ্ছনার সে অসহনীয় কাহিনীর অবসান কবে হবে? ভারত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গঠনে যখন দারিদ্র্যের অবসান চায়, দেশকে শিল্পে কৃষিতে সর্বোন্নত করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য সমস্যা যদি তার ওপর এসে পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সেই সমস্যার সৃষ্টি করছে অন্তরালবর্তী আমাদের শত্রুরাই। নতুন বছরে এই শত্রু-দের সম্বন্ধে সাবধান থাকা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই একান্ত প্রয়োজন।

বছর সুরু হওয়ার কিছু পূর্বে পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের সুবুদ্ধির বলেই যে এই সব কাজ সম্ভব হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। তবে ভারত সরকারের সদুদ্দেশ্যের সম্মান কতটুক রক্ষিত হবে, তার ফলাফল এখনই বিচার করা সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণের বুদ্ধি, বিবেচনা ও সতর্কতাও দরকার।

বিগত বছরে বিশ্বের সঙ্গে এক-যোগে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করেছি। এ বছর সারা বিশ্বে শেক্সপীয়রের চার শততম জন্ম-বার্ষিকী পালিত হবে। এদিক দিয়ে বাংলা দেশ পিছিয়ে নেই এবং বিশ্বের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারত কখনো পিছিয়ে ছিল না। উন-বিংশ শতাব্দীতে পরাধীন অবস্থার মধ্যেও আমরা শেক্সপীয়রের মহান ঔদার্য অনুভব করেছি। বর্তমান বছরে গভীরতর হবে সেই কার্যকর অনুভবের অতুলনীয় তাৎপর্য। একদিকে জীবন-সংগ্রাম, আর এক-দিকে অপরাজেয় মনোভাব শুদ্ধ স্বাধীনচিন্তা ও ঐক্যের জন্য আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হোক নতুন বছরের প্রতিটি দিনে, প্রত্যেক মুহূর্তে।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

চীন যেদিন আকস্মিকভাবে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করলো—সেদিন যথার্থ পরীক্ষার দিন এলো ভারতীয় জনসাধারণের। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিও সে পরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা পেল না। সেদিনই প্রমাণিত হলো আসল দরদী কে? আন্তর্জাতিকতার বড়াই করেন যাঁরা, তাঁদের কেউ রইলেন মুখ বুজে, কেউ হাসলেন মুখ টিপে, কেউ বা গেলেন কারাভ্যন্তরে। তবু সাম্যবাদী হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করেও সেদিন যে ক'জন ভারতের ন্যায্য স্বার্থে চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই মত প্রতিষ্ঠার জন্যে অকুতোভয়ে যাত্রা করেছিলেন বিদেশের দিকে—তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে। দেশ, দল এবং আপন বিবেক। দলকে অস্বীকার না করেও তাঁর বিবেক যেন গেয়ে উঠেছিল—

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।'

জাতীয়তার জয়-কেতন ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার করে গেছেন আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীডাঙ্গে সেই চিন্তা এবং আদর্শেরই একজন বাহক। বিশ্বমানবতার ঐক্যসূত্রের সন্ধানী হবার আগে তিনি স্বদেশের সাধারণ মানুষের একজন আসল বন্ধু। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি ভারতের জনজীবনের সঙ্গে মিশে আছেন। শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টাতেই তাঁর সমস্ত কর্মজীবন পরিব্যাপ্ত। গৃতীকলে, কারখানায়, খনির অন্ধকারে—যেখানে শ্রমিকজীবন ক্ষত-বিক্ষত সেখানেই ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে তাঁর অসীম সহানুভূতি। বৃটিশ আমলে মালিক পক্ষ ও সরকারের অমানুষিকতার বিরুদ্ধে এত বড় যোদ্ধার সংখ্যা ভারতে নগণ্য বললেই চলে। এই কারণে কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর আচরণ তাঁকে কম সহ্য করতে হয় নি। দীর্ঘ তেরো বছর কাটিয়েছেন তিনি বৃটিশ কারাগারে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শ্রমিক-স্বার্থে তিনি কারাবরণ করেছেন। তবু তিনি কোনোদিন অবনত হন নি। শ্রমিক আন্দোলনের যে ইতিহাস তিনি সৃষ্টি করেছেন—তার সারবত্তা সকলেই ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন আজ।

এই শ্রমিক-যোদ্ধাকে আজ আবার নতুন করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আজ সেই রক্তচক্ষু বৃটিশ-রাজ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনেন নি। বিচারশালা আজ পার্টির জাতীয় পরিষদ। ফরিয়াদী দলে পিকিংপন্থী কমিউনিষ্টবৃন্দ। আর আসামী হচ্ছেন পার্টির চেয়ারম্যান ডাঙ্গে। অপরাধের কারণ হিসেবে যে দলিল পেশ করা হয়েছে তা 'গাঁজাখুরি' রহস্য-রোমাঞ্চের সমপর্যায়ভুক্ত। দলিল অর্থাৎ তদানীন্তন ভাইসরয়কে লিখিত শ্রীডাঙ্গের চল্লিশ বছর আগেকার চিঠি—যাতে তিনি না কি বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্যে বৃটিশ সরকারের কাছে সনদ লিখে দিয়েছিলেন। বর্তমান পার্টির মতে, এই চিঠি শুধু আত্মবিক্রয় নয়—মারাত্মক ধরণের বিশ্বাসভঙ্গও বটে।

সারা দেশে যখন রুশপন্থী ও পিকিংপন্থী হিসেবে দুটি দল প্রকাশ্যে লড়াই সুরু করেছে, রুশ-চীনের মনোমালিন্য যখন তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে, তখন রুশপন্থী শ্রীডাঙ্গের বিরুদ্ধে আকস্মিকভাবে চীনপন্থীদের আবিষ্কৃত চিঠির কি ভাবে উদয় হলো তা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ফাটলকে আর কোনোমতে জোড়া লাগানো যাবে না।

১৮৯৯ সালের ১০ই অক্টোবর জন্ম হলেও শ্রীডাঙ্গে এখনো জরাগ্রস্ত নন। ঋজু দেহ, দৃঢ় মন আর সবল চিন্তা নিয়ে পার্টির মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চারের কথা তাঁকে নতুন করে ভাবতেই হবে। একদা লোকসভায় তীক্ষ্ণধী বক্তা হিসেবে তাঁর পরিচয় পেয়েছি। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড য়ুনিয়নসের ভাইস প্রেসিডেণ্ট-রূপে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজন সুবিদিত। বৃটিশ কারাগারে

শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে

বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নরত শ্রীডাঙ্গেকে আমরা দেখেছি। বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—নিজেরই দলের সেই সব বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত—যাঁরা তাঁকে অপদস্থ করার জন্যে আর এক অভিনব অভিসন্ধি নিয়ে ওৎ পেতে বসে রয়েছেন। তাঁদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে শ্রীডাঙ্গের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে আর দুদিনও সময় লাগবে না।

● নতুন বেতন হার চালু ও অন্যান্য দাবীতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের মৌন মিছিলের একাংশ।

**রাজধানী :**

বছর দুই আগে রাজ্য সরকার ডঃ ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে মূল্যবৃদ্ধি তদন্ত কমিটী গঠন করেছিলেন। কমিটীর সুপারিশ নাকি মাস চারেক আগে রাজ্য সরকার পেয়েছেন। সরকার এখনও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। পণ্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি প্রতিরোধের জন্য কমিটী খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে এবং পশ্চিম বাংলার বাইরে চালের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এ ছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, কাপড়-চোপড়, তেল, ডাল, চিনি, মশলা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মূল্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠনেরও সুপারিশ করেছেন। এই মূল পরিষদের অধীনে থাকবে বিভিন্ন পণ্যের জন্য এক-একটি উপ-উপদেষ্টা পরিষদ। তাঁরা বাজারের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।

ব্যবসায়ীদের সাথে ভদ্রলোকের চুক্তি নিরর্থক বলে কমিটী মন্তব্য করেছেন। তাঁদের ধারণা, চুক্তি প্রয়োজনের ঠিক সময়টিতে অকেজো হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের সাথে পশ্চিম বাংলা সরকারের ভদ্রলোকের চুক্তি কিভাবে মুনাফাশিকারীর দল বানচাল করে দেয়, সে সম্পর্কে আমরা বারবার আলোচনা করেছি। উড়িষ্যার চাল ও ধান আমদানীর ভার ব্যবসায়ী-দের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরাসরি সরকারের হাতে রাখবার কথা আমরা বারবার প্রস্তাব করেছি। ন্যায্য-মূল্যের দোকানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল, গম, আটা ও চিনি বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির কথা আমরা বলেছি। কমিটীর সুপারিশেও ঠিক এই কথাগুলো রয়েছে। আসল কথা, মুনাফাবাজদের অতিরিক্ত মুনাফার ফিকির-ফন্দি বন্ধ করতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অসময়ের জন্য সরকারের গুদামে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কম নয়।

পশ্চিম বাংলার বুকে দিনের পর দিন আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ধানের জমিতে আমরা বিদেশী মুদ্রা অর্জনের খাতিরে পাট চাষ করে প্রায় লাখ তিনেক টন চাল উৎপাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এর ওপর শিল্পনগরী কলকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চল জুড়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকার ভাই-বোনেরা রয়েছেন। এঁদের সকলের ধকল সামলানো রাজ্য সরকারের একার কাজ নয়। এর সমাধান করতে ভারত সরকারের সাহায্য সর্বতোভাবে প্রয়োজন। খাদ্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে রাজ্য সরকারের ভাণ্ডারে টান পড়লে তার ঘাটতি পূরণেও ভারত সরকারের কার্পণ্যের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না।

এখন কথা হল, এই বিরাট কর্মযজ্ঞে রাজ্য সরকার কতটা উদ্যোগী হবেন। এ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সঙ্কটকালে সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত কোন চেষ্টা আমরা দেখতে পাই নি। সরকার সমস্যার সমাধানের জন্য আইনের সাথে এগিয়ে না এসে বরাবরই পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

ডাল, তেল, চিনি, মশলা, কাপড় প্রভৃতি পণ্যের ওপর রাজ্য সরকারের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব নেই। সরকার ইচ্ছে করলে পাইকারী পর্যায়ে এ-গুলোর মূল্য-কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এদের কঠোর শাস্তি দেবার আইন-কানুনেরও অভাব নেই। এ কাজের জন্য প্রশাসনযন্ত্রও খুব দুর্বল বলে মনে হয় না। চুনো-পুঁটি খুচরা দোকানদারদের ওপর সময়ে-অসময়ে হামলা না করে রাঘববোয়াল ধরবার জন্য জাল বিস্তার করলে নিশ্চয়ই চোরাবাজার সায়েস্তা হবে।

দীর্ঘদিনের পর কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী যাত্রীসাধারণের কথা ভাববার সুযোগ পেলেন। তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য কোম্পানী বোম্বাই ট্রাম কোম্পানীর কাছ থেকে ৪৪খানা ট্রাম কিনে এনে এই বছরই কলকাতার রাস্তায় চালু করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। বোম্বাইয়ের ট্রাম কোম্পানী মার্চ মাসের মাঝামাঝি পাততাড়ি গুটিয়েছে।

সে কোম্পানীর ট্রামের নিশ্চয়ই রাস্তায় চলবার মত ক্ষমতা আর নেই। বলা হচ্ছে, ট্রামগুলো ঢেলে সাজিয়ে তারপর চালু করা হবে। অবশ্য এই নতুন ব্যবস্থার জন্য যাত্রীদের অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে হবে।

অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়েও যাত্রীদের শেষ পর্যন্ত সুবিধা কতটা হবে বলা কঠিন। কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর এখন ট্রাম রয়েছে ৪৮০ খানা। অধিকাংশই পুরোনো মডেলের এবং জরাজীর্ণ। তার ফলে প্রায়ই তারা মাঝপথে যায় বিগড়ে। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে 'ডিফেকটিভ কার' বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে ট্রাম তখন চলে ডিপোতে। অতিরিক্ত যে ৪৪খানা ট্রাম বোম্বাই থেকে আসছে, তাদের অবস্থা এর চাইতে ভাল হবে আশা করবার কোন কারণ নেই। এদের মেরামতের কাজে বছর বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। এই ট্রাম চালাতে গিয়ে কোম্পানীর যে ব্যয় পড়বে তা দিয়ে নতুন ট্রাম কম সংখ্যায় ক্রয় করলে কোম্পানী যেমন লাভবান হতেন, যাত্রীরাও তেমনি নিশ্চিন্তে ট্রামে বসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারতো। সেদিকে কোম্পানী চিন্তা করেন নি।

ভারতের মাটিতে বিদেশী কোম্পানীগুলো এমনি ঝরঝরে যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ চালাচ্ছেন। তাতে খরচ বেশি দেখিয়ে মুনাফা-লাভের ফাঁকটা থাকে অনেক বেশি। নিজেদের ভাই-ব্রাদারদের অকেজো মাল চালিয়ে দেবার সুবিধাও থাকে অনেকখানি। সে দিক দিয়ে বিচার করলে কলকাতা ট্রাম কোম্পানী ঠিকই করেছেন।

শুধু ট্রাম নয়, পশ্চিম বাংলা পরিবহন সংস্থা নতুন একশ' বাসও এই বছরেই কলকাতার রাস্তায় নামাচ্ছেন।

* * *

গেল সপ্তাহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে সহস্রাধিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মৌন মিছিল করেছেন। পশ্চিম বাংলার বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের বেতন-সমস্যার অচিরে একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। এঁদের দাবীর আন্দোলনকে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিলে ভুলই করা হবে। শিক্ষা জগতের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব যাঁদের ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের উপেক্ষা করে শিক্ষাসংস্কার অথবা শিক্ষাবিস্তার কোনদিনই সম্ভব নয়।

* * *

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতায় এক সমাবেশে পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী

● শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায় যক্ষ্মারোগের উচ্ছেদের কাজে সরকার ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে 'যক্ষ্মা-রোগ নির্মূল হইবেই' বলে তিনি মনে করেন। কলকাতার মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বেশি। যক্ষ্মারোগ ব্যাধি নয়, ঠিক সময় ধরা পড়লে চিকিৎসা করা যায়। শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ সকলকে পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছেন।

অজ্ঞ ও তথ্য পরিবেশনে আমাদের কার্পণ্য কোনদিনই ছিল না—এখনও নেই। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়ণের আগ্রহের অভাবটা বেশি। মানুষের জন্মের পরই তার দেহে প্রবেশ করে যক্ষ্মার বীজাণু। পুষ্টির অভাব-জনিত দুর্বল দেহে সে হয়ে ওঠে সবল। এ বিষয়ে আজ আর কেউ অজ্ঞ নেই। কিন্তু সামর্থ্য কোথায়? আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশু মাতৃস্তন ভিন্ন দুধের স্বাদ কি তা জানে না। ডাল-ভাত পর্যন্ত দুবেলা খেতে পায় না, এমন পরিবার নিতান্ত কম নয়। পুষ্টিকর খাদ্যের কথা চিন্তা করাও এদের কাছে কল্পনা-বিলাস মাত্র। মাথা গোঁজবার ঠাঁই যাদের নেই, তাদের কাছে কোন্‌টা স্বাস্থ্যকর আর কোন্‌টা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সে উপদেশ নিরর্থক। কলকাতা শহরে বছরের পর বছর খাটা পায়খানা পরিষ্কার হচ্ছে না, এমন ঘটনাও রয়েছে। পৌরপ্রধান নিশ্চয়ই এ খবর রাখেন।

রোগ নিরাময় বড় কথা নয়। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধই হল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। দশটা হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তার আগে দরকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। তা' ছাড়া যক্ষ্মারোগীদের নিরাময়ের পর সমাজ-জীবনে পুনর্বাসনের সমস্যার কথাও আমাদের মন্ত্রীমহোদয়া এবং সমাজ-সেবীরা নিশ্চয়ই জানেন।

যক্ষ্মারোগের ব্যাপক সংক্রমণে জাতি আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার করতে না পারলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

**কুচবিহার :**

পূর্ব-পাকিস্তানে মাতৃত্বের ওপর নির্মম লাঞ্ছনা ও অবমাননার আর একটি করুণ কাহিনী বহন করে এনেছেন দিনহাটায় আগত উদ্বাস্তুগণ। গোয়ালন্দ

স্টীমার স্টেশনের কাছে ফরিদপুরের রাজবাড়িটিকে পূর্ব-পাকিস্তানের আন্সার-বাহিনী হিন্দু যুবতীদের গুদামঘরে পরিণত করেছেন। আন্সারবাহিনীর প্রহরায় মেয়েদের লঞ্চ ও স্টীমার-যোগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাগল, গরু, ভেড়ার মত তাড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে এই গোপন কেন্দ্রটিতে। তারপর এখান থেকে তাদের বিক্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সংবাদে ভীত হয়ে পড়েছে ফরিদপুরের হিন্দুরা। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ফরিদপুর থেকে দলে দলে হিন্দুরা চলে আসছে। ফরিদপুর থেকে এখানে আগত শ্রী-কর্মকার আন্সারবাহিনীর প্রহরাধীনে শতাধিক হিন্দু রমণীকে গোয়ালন্দে স্টীমার থেকে নামাতে দেখে এসেছেন।

১লা এপ্রিল শ্রীরাহার স্ত্রীকে দিনহাটা আগমনের পথে পাকিস্তানীরা বামনডাঙা স্টেশনের কাছে ছিনিয়ে নিয়েছে। শ্রীরাহাকে ছুরিকাহত করে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। পাশের কামরার একজন সহৃদয় মুসলমান ইঞ্জিনীয়ারের সহায়তায় রক্তাপ্লুত মৃতদেহ রেললাইন থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। শ্রীমতী রাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে নারী নিগ্রহের এমন ঘটনা মানব-জাতির পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ হয়ে থাকবে। পাকিস্তানের নারীসমাজ নারীত্বের এই চরম অবমাননা কি করে নীরবে সহ্য করছেন, আমরা ভেবে পাচ্ছি না! তাঁদের আহত মাতৃত্ব কি সত্যই আয়ুবের স্বৈরাচার একেবারে স্তব্ধ করে ফেলেছে? তারা একবার রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকালে পাকিস্তানের পশুবলের নারকীয় অত্যাচারের অবসান নিশ্চয়ই ঘটবে। তাঁরা যেন ভুলে না যান—মানুষ যখন মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নামে তখন সে বিচার-বিবেচনা করে, জাতি ও শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে না। মহাপাতকের প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী। যুগে যুগে মানবসভ্যতার ইতিহাস সে সাক্ষ্য দিয়েছে।

**হুগলী :**

স্মরণকালের মধ্যে হুগলী জেলার কৃষিজীবীদের এত বড় দুর্দিন আর আসে নি। এ বছর মহামারী 'ধ্বসা' রোগের প্রকোপে জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আলু একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চাষের খরচাটুকু তুলতেই যেখানে বিঘা প্রতি অন্ততপক্ষে পঁচিশ মণ ফসলের প্রয়োজন সেখানে গড় ফসল বিঘা প্রতি দশ মণও হয় নি। পাট প্রভৃতি চাষীরা উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গত দাম না পাওয়ায়, যথোপযুক্ত কৃষি অর্থনীতি গড়ে না ওঠায় কৃষিজীবী সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যে কি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে তা ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রই জানেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির চাপও সর্বাধিক বিপর্যস্ত করেছে কৃষিজীবী সম্প্রদায়কেই। এই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল সংসার চালাচ্ছে যৎসামান্য কৃষির আয় থেকে এবং ক্রমাগত ঋণ করে। শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী আজ ঋণ-জর্জরিত। বাঁচার প্রয়োজনে সুযোগ পেলেই এতদিন তারা ঋণ করেছে—শোধ করবার সঙ্গতি অধি-কাংশেরই হয় নি। ১০।১৫ বছরের ঋণের বোঝা আজও জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসে আছে। এক একটি থানায় লক্ষ লক্ষ টাকা কেবলমাত্র সরকারী ঋণই বাকী পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি আলু চাষের বিপর্যয়ে জেলার কৃষক-সাধারণ যখন কি করে বছর কাটবে—এ চিন্তায় দিশেহারা, ঠিক তখন সুরু হয়েছে সরকারী অভিযান —সার্টিফিকেট কেস, অস্থাবর নীলাম ইস্তাহার, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রভৃতি জুলুম। গোদের ওপর উঠেছে যেন বিষফোড়া। সরকারী ঋণ আদায়ের এই ভীষণ চাপ যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে বহু কৃষিজীবীকে অচিরেই ভূমি বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়তে হবে।

কৃষিজীবীদের দুর্দশার কথা সহানুভূতির সঙ্গে পর্যালোচনা করে সার্টিফিকেট অফিসের সর্বপ্রকার কাজ অবিলম্বে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে—এক বছর পর হতে এ সকল ঋণ কিস্তিতে শোধ নেবার এবং তৎপরে কেউ কিস্তি খেলাপ করলে, গুদামজাত সেই কিস্তির টাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার বিধি প্রণয়ন করে দুর্গত কৃষকসমাজকে বাঁচাবার জন্য জেলার কৃষিজীবীদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট করুণ আবেদন জানানো হয়েছে। আশা করি, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

**পুরুলিয়া :**

৫ই এপ্রিল পুরুলিয়ায় সপ্তাহ কালের জন্য সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। ২রা এপ্রিল জারী করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

সমাজবিরোধী কারা তা আমাদের পুলিশবাহিনীর অজানা নেই। তাদের গায়ে হাত না দিয়ে ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তোলাই যেন আমাদের পুলিশ নতুন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সরকারী সূত্রের খবর অনুযায়ী সৈনিক বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গঙ্গা-বাড়ি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনৈক দর্জি নিহত হয়। এই ঘটনা নিয়ে নাকি পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল শ্রীমামুদ অত্যধিক আগ্রহ-শীল হয়ে পড়েন। খুনের মামলার তদন্তের জন্য পুলিশ কুকুর লাকিকে তলব করা হয়।

খুনের মামলার যথাযথ তদন্ত ও আসামীকে খুঁজে শাস্তি দেওয়া সকলেরই কাম্য। লাকির তলবে কাজেই কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু পলিটেকনিক হোস্টেল থেকে অস্ত্রোপচারের পর অসুস্থ একজন ছাত্রসহ চারজন ছাত্রকে গ্রেপ্তারের পরই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ছাত্রদল বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে তারা থানায় গিয়ে বিক্ষোভ আরম্ভ করে। সমাজবিরোধী ও গুণ্ডার দল এই বিক্ষোভের পূর্ণ সুযোগ নেয়। ফলে, শান্ত পুরুলিয়ায় অশান্তি নেমে আসে।

# গ্রন্থমেলা

**ওয়েটিং ফর গোডো ঃ** স্যামুয়েল বেকেট। অনুবাদক : অশোক সেন, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম : ১'৫০ নঃ পঃ।

'ওয়েটিং ফর গোডো' একটি নিগূঢ় সাংকেতিক নাটক। মাত্র পাঁচটি চরিত্র : এষ্ট্রাগন, ভ্ল্যাডিমার, পোজো, লাকি এবং বয়। বয় অবশ্য ভ্ল্যাডিমারকে বলেছে যে—সে কাল আসে নি, আজই এসেছে। তবু প্রথম দিনে আগত বয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনে আগত 'বয়ে'র ঐক্য সাধন করে—নাটকটির (বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে) প্রথম অভিনয় করেছেন ভবানীপুর সন্ধ্যানীড় ক্লাবের সভ্যরা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, অনুবাদের চরম সার্থকতা ও অভিনয় পরিচালনার জন্যে নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল স্টেট্‌স্‌ম্যানে (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। 'ওয়েটিং ফর গোডো' অনুবাদের কাজ ও অভিনয় পরিচালনা খুবই কঠিন ব্যাপার। কেন না এই নাটকটির ফরাসী থেকে যখন ইংরেজীতে অনুবাদ ও তার অভিনয় হয়—তখন সারা য়ুরোপের সুধীমহলে একটা ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সব দেশেই সাধারণ মানুষ 'হেজিপেজি' নাটকে অভ্যস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এবং এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর মুখোমুখি হবার মতো তাদের সাহস নেই। 'ওয়েটিং ফর গোডো'র নাটকের মুখোমুখি হওয়া আরো কঠিন। কিন্তু বাংলা দেশে এ হেন কঠিন ব্যাপারের সম্মুখীন হয়েছেন শ্রীঅশোক সেন। একথা ভেবে একটা দৃঢ় স্বস্তির ভাব জাগে। এই স্বস্তির কথাও রয়েছে 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকে। ফরাসী দেশে অবশ্য বর্তমানে Existentialist মতবাদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দুর্লভ নয়। তবু এই নাটকে আমরা যা পাই, তার বিচার করতে হবে যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য নাট্য-সমালোচকের মতানুসারে lenity of time এই নাটকে থাকলেও বোধির দিক দিয়ে সে সময় বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'গ্রাম্য পথ : সময় সন্ধ্যা।' মাত্র দু'দিনের খণ্ডিত সময় নাটকে প্রতিফলিত—যদিও জীবনের সঙ্গে যোগ রয়েছে অসীম কালের। অবশ্য যে জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তা স্থির মনে হলেও দ্রুতগতি-সম্পন্ন। আমরা দেখি, 'দিনের আলো হঠাৎ স্তিমিত হয়ে আসবে। একটু পরে বোঝা যাবে যে, রাত্রি হয়েছে। পেছনে চাঁদ উঠতে থাকবে এবং আকাশের ওপরে গিয়ে থেমে পড়বে। চাঁদের আলো এসে দৃশ্যের ওপর পড়বে।' (stage direction) 'কাল তিনি আসবেন তো?' এই 'কাল' ও চিরকালের কাল—যার জন্যে যুগে যুগে মানুষ গোডোর অপেক্ষায় থাকবে। পোজোর একটা কথা মূল্যবান : 'সময় দিয়ে সব কিছু মাপতে চাও কেন বলত।' গাছ, জুতো, টুপি, দড়ির সঙ্গে জীবনের যোগ-বিয়োগ কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট আকারে অনুভব করা গেলেও—বিশ শতকের পথভ্রান্ত মানুষের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকে। বলা বাহুল্য, নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট সমাধানের লিষ্ট হাজির করেন নি, তিনি সমাধানের গুপ্ত ইংগিত দান করেছেন মাত্র। বাংলা দেশে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য এই নাটক পাঠ করা এবং এর অভিনয় দেখা। গ্রন্থভুক্ত নাট্য-পরিচিতি লিখনেও সাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় অনুবাদকের।

**স্বর্গরাণীর মিলন-ডাক :** ভক্ত-মাধব। ২২২, আপার সার্কুলার রোড, ফ্ল্যাট নং, বি-৩, কলকাতা-৪ দাম : ৫৲ টাকা।

বিশ্বশান্তির ঐশীবাণীরূপে কতকগুলি পদ্যের সমষ্টিতে 'স্বর্গরাণীর মিলন-ডাক' স্ফূর্ত। বস্তুত একটাও কাব্য হয় নি। কবির অভিপ্রায় ভালো, এটাই বড় কথা। তিনি বলতে চেয়েছেন—প্রাণময় সহানুভূতির অভাবে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। ইষ্ট দর্শনের জন্য তাই আজ বিশ্ববাসীকে বিশ্বমাতা মিলনের ডাক দিচ্ছেন। দুঃখের ব্যাপার, কাব্যে অন্ত্যমিল প্রয়োগেও লেখক যেন উদাসীন।

**মহানগরী ঃ** সম্পাদক : সন্তোষ দত্ত। সহ-সম্পাদক : আনন্দ দে। মৃণালিনী ভবন, ২, পোলক এভিনিউ, কলকাতা-২৮। প্রতি সংখ্যা ২০ নয়া পয়সা।

পত্রাকারে পত্রিকাটির এখন প্রথম বর্ষ চলছে। এটি ৭ম সংখ্যা। পত্রিকাটিকে প্রথম পৃষ্ঠার নিউজ উইকলি বলে ঘোষণা করা হলেও, এর পৃষ্ঠায় সংবাদ-সংস্কৃতি সমুচিত মর্যাদা পেয়েছে। এই সংখ্যায় বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রধান ঘটনাগুলিকে যেমন স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমনি ধারাবাহিক উপন্যাসও বাদ যায় নি। 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' ফিচারটি শিক্ষণীয় এবং বিশেষ আনন্দদায়ক। 'এ্যামেচার নাটক পার্টি' 'মঞ্চ ও পর্দা' প্রভৃতি বিভাগগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'মহানগরী'তে ছাপা একটি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সম্পাদক নির্লিপ্ত মনে হয়। কেন না 'মহানগরী' খবরের অন্তরালের খবর দেবে, শুধু মতামত দেবে না'—এই প্রতিশ্রুতি তাঁরা রক্ষা করতে পারেন নি, হয়তো সৎ সম্পাদনার কাজে তা সম্ভবও নয়। আমরা নির্ভীক সম্পাদনাই প্রত্যাশা করি।

জয়ন্তী সেন

# ওয়াশিংটনের চিঠি

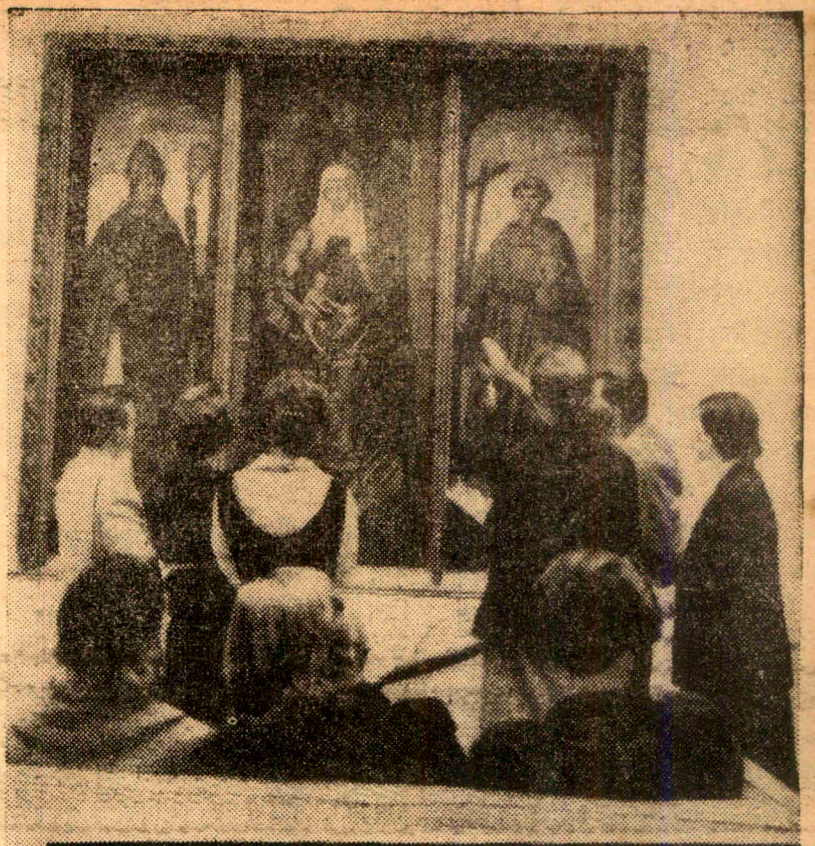

● ওয়াশিংটনের ন্যাশন্যাল গ্যালারী অব আর্টে দর্শকবৃন্দকে ছবির মর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবিজন চট্টোপাধ্যায়

কত শত বর্ষের, কত বর্ষার কত ধনঘটা, কত মেঘ উড়িয়ে দিয়ে ভারতের উত্তরপ্রান্ত বেয়ে চলে গিয়েছে। তাকে ভাষা দেওয়ার জন্য কত আয়োজন হয়েছে যুগে যুগে। কিন্তু বর্ষার সেই অন্তরের কথা ও মানবাত্মার সেই চিরন্তন আকূতি বাণী পেয়েছিল কবি কালিদাসের কণ্ঠে, তার বহুকাল পরে। তেমনই যুগ যুগ ধরেই আকাশ-পৃথিবী মিলে আছে সাগরের দূর-দিগন্তে, আকাশে মেঘ উধাও হয়ে গিয়েছে। শিল্পীরা বারে বারে রং ও রেখায় তাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কে একজন টার্নার, একজন হুইসলার এসে অমর তুলিকাসম্পাতে সেই মেঘপুঞ্জের রূপকে, আকাশ-পৃথিবীকে চিরকালের জন্য ধরে দিয়ে গেলেন।

কুবেরের রাজ্য আমেরিকায় অভ্রভেদী হর্মরাজির অরণ্যে বাইরে থেকে মনে হয়, এ বুঝি যক্ষপুরী, নিয়মের জড়-শৃংখলে বন্দীমানব, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর দেশ। কিন্তু এখানে এলে দেখা যায়, মানুষটা যন্ত্রের অধীন না হওয়ার জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে। বেঁচে থাকার জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা তা বিপুল পরিমাণেই আহরণ করছে এবং এই হুইসলারের দেশে, জনসাধারণের জীবনকে ছন্দোময়, শান্ত ও সুন্দর করার জন্য, বিশ্বছন্দের সঙ্গে নিজেদের মেলাবার জন্য তাঁদের প্রয়াসের ও উপকরণ সংগ্রহেরও অন্ত নেই। কলাশিল্প আমেরিকায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। গানে গানে, রং-এ রং-এ জীবনকে ভরিয়ে দেবার জন্য আয়োজন চলেছে শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল ঋতুর আবর্তনে। এই বিপুল উপকরণ দূর ভবিষ্যতে হুইসলারের মতই আর একজন অমর শিল্পীর স্পর্শের জন্য হয়তো পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

এখন এখানে বসন্ত। চারদিকে শুকনো শাখায় এসেছে হরিতের জোয়ার, রং-বেরং-এর ফুলের সমারোহ। প্রচণ্ড শীতের শেষে, দুঃখরাত্রির অবসানে যেন প্রভাতসূর্যের অভ্যুদয়। তাকে আবাহনের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। বসন্তের বান ডেকেছে প্রতিটি মানুষের মনে।

আয়োজন চলছে সুন্দরের পূজার---থিয়েটার, গান, গল্প আর চিত্র-প্রদর্শনীর। কাজের জগতের মাঝে ঝরেছে আনন্দের ঝরণা, আলোর ঝোরা। তা নইলে একখানি ছবি দেখার জন্য এত ভিড় হবে কেন। গত বছর ইতালীর অমর শিল্পী দা ভিঞ্চি অঙ্কিত মোনালিজার ছবিটি দেখার জন্য আট লাখেরও বেশি দর্শকের সমাগম হয়েছিল। শিল্পী দা ভিঞ্চি মোনালিজার মুখে যে হাসি ফুটিয়ে গিয়েছেন শত শত বছর আগে, সেই হাসির সৌরভ আজও একটুও ম্লান হয় নি। জনসাধারণকে দেখাবার জন্য বাইরে থেকে এই ছবিটি ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

তবে তৃষিত যে সেই তো তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আসে সরোবরের কাছে। রসের পেয়ালা উপচে পড়ছে, কিন্তু গ্রহণ করছে কজন। অর্থাৎ এই রসের ভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রস্তুতি চাই।

কারুশিল্প যন্ত্রসাহায্যে সৃষ্ট হতে পারে, অনুকৃত হতে পারে। কিন্তু শিল্প যে মনের সৃষ্টি, ভাবের সৃষ্টি। সে পরিমিত নয়, সে যে নিমিতি, নির্মাণ নয়। অর্থাৎ পরিমিতিকে ছাড়িয়েই তার স্থান। সেই শিল্পদৃষ্টি স্বাতী নক্ষত্রের জলের মত খোলা ঝিনুকের বুকে পড়ে ও মুক্তা হয়ে ওঠে, বহুকালের বহু মানুষের সাধনার ফলে। আমেরিকার এই শিল্পদৃষ্টি গড়ে তোলার জন্য কী চেষ্টাই না হচ্ছে, একে হুজুগই বা বলি কি করে। নিয়মিতভাবে নানা সাধনার মাধ্যমে তাকে রূপদান করা হচ্ছে। দেশের সর্বজনের, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা এদেশে হয়েছে। বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক হার্বার্ট রীড, চিন্তানায়ক জন ডিউই প্রভৃতির মানবজীবনের বিকাশে শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী, জনসাধারণ ও দেশের শিক্ষাব্রতিগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে

এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন, 'চারুকলার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের, বিভিন্ন দেশ ও কালের জীবনযাত্রার মর্মরূপ গভীরভাবে উপলব্ধি করি। চারুকলার উদার আঙ্গিনায় আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানিমা থেকে মুক্তি পাই, পূর্ণতা লাভ করে নিত্যকার জীবনের বহু অতৃপ্ত আকাংক্ষা। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় জীবনযাত্রা যেখানে বহুলাংশে ছাঁচে ঢালা, তার মধ্যে শিল্পকলার বহুমুখী ভাবনা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক। চারুকলা যুগজীবন ও গণমানসের মূর্তরূপ। এই আনন্দের ভোজের অধিকারী যাতে সকলেই হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

কিন্তু মাত্র কয়েক দশক আগেই বেশির ভাগ লোকের ধারণা ছিল যে, চিত্রকলা মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারী বা ধনী-গৃহেরই অঙ্গসজ্জার উপকরণ। এ সকল চিন্তানায়কদের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পরই আমেরিকায় আসে নতুন শিল্প-ভাবনা, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়ে আসে নতুন চেতনার জোয়ার। এখন সমাজের ধনী সম্প্রদায় মাত্রই নয়, সমাজের সকলেই শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষক। আমেরিকার সকল বয়সের, সকল শ্রেণীর লোকই যাতে শিল্পানুশীলন করতে পারে, তার ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই হয়েছে। তার জন্য রয়েছে বহু চারুকলা প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম ও পাঁচশ'রও বেশি কলা-বিদ্যালয়। তাছাড়া আছে অসংখ্য স্কুল, কলেজের শিল্পানুশীলন-ব্যবস্থা। ত্রিশ লাখেরও বেশি রয়েছে পেশাদার ও শখের চিত্রশিল্পী। রং-এ, রেখায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে তাঁরা নতুন শিল্প-শৈলী সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। এই শখের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আছেন—ব্যবসায়ী, কারখানার শ্রমিক, গৃহস্থ ঘরের ঘরণী প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার বিরাট শিল্পায়োজনের শিল্প-শিক্ষা ও শিল্পচর্চার শ্রেষ্ঠ অবদান, শিশুরা যে ক্রিয়েটিভ বা সৃজনী শক্তিধর এই বিষয়টির আবিষ্কার। তিন বছর বয়স থেকেই তাদের সেই সৃজনীশক্তি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির আয়োজন চলে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্র্যাফিক (চারুকলা) ও কম্যার্শিয়াল (প্রচারভিত্তিক চিত্রকলা) পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ শিক্ষায়তন এবং মিউজিয়াম বা শিল্প সংগ্রহশালাসমূহেও শিল্পানু-শীলন হয়ে থাকে। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের বাপ-মার সঙ্গে মিউজিয়ামের চারুকলা শিক্ষার ক্লাসে বক্তৃতা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীতে যোগ দিয়ে থাকে।

আমেরিকার বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের মিউজিয়াম আছে এক হাজারেরও বেশি। এ সকল মিউজিয়াম কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেই নয়, আমেরিকার সকল পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। অধিকাংশ মিউজিয়ামের শিল্পশালার নিদর্শন-সমূহের তাৎপর্য ও মর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ঐ সকল মিউজিয়ামে নামমাত্র ভাড়ায় প্রাপ্ত হেডফোন কানে লাগিয়ে ছবির সামনে দাঁড়ালেই সেই ছবির তাৎপর্যমূলক বর্ণনা শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া যে দেশের শিল্প দর্শকবৃন্দকে দেখানো হয়, সেই দেশের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচয় সাধনের ব্যবস্থাও থাকে মিউজিয়ামে।

মৌলিক চিত্রকর্ম বা অরিজিন্যাল কোন পেন্টিং-এর মালিক হওয়া সাধারণ লোকের কাছে এই কিছুদিন আগেও ছিল স্বপ্নের মতো, আর পৃথিবীর নানা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শিল্পকীর্তি দেখার কল্পনাও সাধারণ লোক করতে পারতো না। এ দুটো বিষয়ই এখন আর সাধারণের পক্ষে দুরাশা নয়।

মৌলিক চিত্র সামান্য ভাড়ায় দর্শকদের দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে যদি তিনি ছবিটি নিজের কাছে রাখতে চান (যা প্রায়ই ঘটছে) তাহলে সেটা তিনি কিনেও নিতে পারেন। কোন কোন ভাড়া দেওয়া ছবির মূল্য ১৫০০ ডলার পর্যন্ত নির্ধারিত হলেও, বেশির ভাগের দামই বেশ পরিমিত। ডালাস মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস-এ কোন ছবির দামই ৫০০ ডলারের উপরে যায় না। ছবির দামের তারতম্য অনুসারে ভাড়ার হার বছরে ৫ ডলার থেকে ৫৫ ডলার পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। এক বছর থেকে দু'বছরের মধ্যে এই দাম শোধ দেওয়া চলে।

স্যানফ্রান্সিসকো মিউজিয়াম অব আর্টের এই পরিকল্পনা এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, অন্যান্য মিউজিয়ামেও এই ব্যবস্থা দ্রুত অনুসৃত হচ্ছে। মিনিয়া-পোলিশ শহরের ওয়াকার আর্ট সেণ্টার

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে এক মাসের জন্য শিল্পীদের আঁকা ছবির অনুলিপি বিনামূল্যে ধার নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ম্যুজিয়াম থেকেও ডাকযোগে চিত্রের অনুলিপি কিনতে পারা যায়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠছেন। 'এসোসিয়েটেড আমেরিকান আর্টিস্টস' নামে এক শিল্পীগোষ্ঠীও মাত্র দশ ডলারের বিনিময়ে বিশিষ্ট শিল্পীদের চিত্রকর্ম ডাকযোগে পাঠিয়ে থাকেন।

এ সকল উদ্যোগ-আয়োজন ছাড়া বড় বড় শহরে নানা চিত্র-প্রদর্শনী তো লেগেই আছে। আর আছে পথের ধারের চিত্র-প্রদর্শনী। আমেরিকার কোন কোন শহরে পথ চলতে গেলে এ সকল প্রদর্শনী চোখে পড়বে। নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ গ্রামের প্রদর্শনীটি এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি বছরে দ'বার অনষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কোন কোন রাজ্যে কেবল ক্ষুদ্র শহরেই নয়, পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত, সেখানকার জনসাধারণকেও শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শনসমূহ দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ বিষয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ভার্জিনিয়ার ম্যুজিয়াম অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র শহরে বা পল্লী অঞ্চলে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করার পক্ষে যে সকল অন্তরায় রয়েছে, তা তারা এক অভিনব উপায়ে দূর করেছেন। এখন পল্লী বা ক্ষুদ্র শহরে এ সম্পর্কে উপযুক্ত স্থান, নিরাপত্তা বা প্রদর্শনীর উপযুক্ত অন্যান্য ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। এই অভিনব উপায় হচ্ছে একটি অভিনব মোটরবাস, একে নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্টমোবাইল'।

এই মোটরবাসটি একটি সম্পূর্ণ আর্ট গ্যালারী বা শিল্পশালা। এতে যে গ্যালারী রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট। গাড়িটির মোট দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট। বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের, রেকর্ড বাজানোর, তাপ নিয়ন্ত্রণের এবং

আমেরিকার Cleveland Museum of Art-এ রক্ষিত ভারতের রাজস্থানী শিল্পে বংগাল-রাগিণীর এক আশ্চর্য মুহূর্ত।

বিশেষ আলোকপাতের ব্যবস্থা এতে রয়েছে। রেকর্ডসমূহে প্রত্যেকটি চিত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। এর দেয়ালসমূহ ঠিক ম্যুজিয়ামের দেয়ালের মত, তাতে ছবিগুলি সাজানো থাকে। বাইরের দেয়ালে থাকে ঐ প্রদর্শনী সম্পর্কে, শিল্পী সম্পর্কে নানা কথা। ছবি দেখাবার সময় ঐ ব্যাখ্যামূলক রেকর্ড বাজে, তা দর্শকবৃন্দের ছবির রস গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। ভার্জিনিয়া ম্যুজিয়ামের দুটি 'আর্টমোবাইল' আছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় যান্ত্রিক ব্যবস্থার দিক থেকে উন্নততর। কোন নতুন জায়গায় এসে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে তার লাগে মাত্র কুড়ি মিনিট। এই গাড়িচালকই ঐ ভ্রাম্যমাণ ম্যুজিয়ামের কিউরেটারের কাজ করেন। তিনি গত ন' বছরের মধ্যে ইতালী, হল্যাণ্ড, মিশর প্রভৃতি নানা দেশের বহু রকমের শিল্পসম্ভার পল্লীবাসীদের কাছে এনে হাজির করেছেন। বহু লোক এই প্রদর্শনী দেখেছেন।

কলাশিল্পের কদর যে আমেরিকায় দিন দিনই বাড়ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের অন্যতম প্রিয়শিল্পী প্রেনডার গাস্টের বাণী, 'শিল্পকলা জীবনে মহৎ প্রেরণা সঞ্চার করে, যতই দিন যাচ্ছে শিল্পকলা আমার কাছে ততই আকর্ষণীয় আর রহস্যময়ী হয়ে উঠছে' ---এই কথাও আজ সেখানে অনেকেই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেন। কিন্তু আমেরিকায়ও পেণ্টার বা স্কালপ্‌চার শিল্পী ও ভাস্করের অন্ন-সমস্যা এখনও মেটে নি। কেবল শিল্পকর্ম বেচে তাদের অন্নের জোগাড় আজও হয় না।

যাও—যাও ঘরে কেউ ভিড় করো না—জীতেনদা বললেন—রোগীর ঘরে এত লোক থাকা ভাল নয়—

সবাই চলে গেল। জ্যাঠামশাই ছটফট করছেন। কোন পাশেই শুয়ে শান্তি পাচ্ছেন না। অথচ দুপুর-বেলাই দেখে গেলাম, ভাল। বেশ হাসলেন। কথা বললেন। এখন দেখলাম পেটটা যেন বেশ ঠেলে উঁচু হয়ে উঠছে।

—শঙ্কর, তুমি থাকো। আমি বালুরঘাটে যাচ্ছি—বড় ডাক্তার—উৎর্বশ্বাসে বাইরে গেলেন জীতেনদা।

এক একটা মিনিট এক একটা যুগ মনে হতে লাগল। ব্যথাটা কম। হাঁফাচ্ছেন। কপালে ঘাম। হঠাৎ জেঠিমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর হাতে গায়ে পরম মমতার সঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন জ্যাঠামশাই—

—জীতেন রইল বুঝলে - - - আর দেখ ওই মধুটুকী আমগাছটা—

—কি বলছো—কি বলছো তুমি ও-তা—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন জেঠিমা—

—তুমি বাঁচবে গো—বাঁচবে—তোমাকে বাঁচতে হবে—প্রায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি। তাঁর জলভরা চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে.

—কৈ জীতেন—খোকা—এল না—বলতে বলতে জ্যাঠামশাইয়ের সারা গা কেঁপে উঠল। হড় হড় করে বমি করলেন সবুজ সবুজ পিত্তি বমি। কপাল ঘামতে লাগল।

—হা ভগবান, আমাকে নাও আর পারি না—আর পারি না ভগবান—অসহ্য যন্ত্রণায় হাত দুটো শূন্যে তুলে কাতর গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি থামলেন। আবার বালিশে এলিয়ে পড়লেন। মৃদু অস্ফুট স্বরে বললেন, শোন আর কোন পাপ—তো করি নি। শুধু মধুটুকী আমগাছ—উঃ ব্যথা করছে—পেট ব্যথা করছে—যন্ত্রণায় চীৎকার করতে লাগলেন—সে দৃশ্য দেখা যায় না।

আমার বুকের ভেতরটা ব্যথা করছে।

বাইরে এসে অন্ধকারে ডুবে থাকা খাসপুর-বাউলের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কখন—আর কখন আসবেন জীতেনদা।

ভেতরে মুমূর্ষু রোগীর কাতরোক্তি। বাইরেও নিস্তব্ধ অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়েও আমার শান্তি নেই। কেন পূর্ণ মণ্ডল মুচকি মুচকি হাসছিল, কেন গাঁয়ের লোক এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার কৌতূহল দেখে খুব খুশি হতো না—কেন রীতিমত বিরক্ত বোধ করতেন জ্যাঠামশাই—সব-সব যেন এক একটা ছুঁচের মত আমার মনে বিঁধতে লাগল।

—শঙ্কর—শঙ্কর—বাবা এদিকে আয়—

ছুটে গেলাম। জেঠিমার চুল খুলে পড়েছে। কেমন একটা বদ্ধ উন্মাদিনীর মত দু'হাতে সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে জাপটে ধরে আছেন জ্যাঠামশাইকে।

—ধর—ওরে ধর—ওর গায়ের ভেতরটা কেমন কাঁপছে—বমি করবো বলছে—বলতে বলতেই জেঠিমার গায়ের ওপর বমি করলেন—

—বাবা—বাবা ছুটে এল জীতেনদা। এলেন ডাক্তার। কিন্তু—

তখন সব শেষ। ঘরে বহুক্ষণ পর শান্তি নামল। মৃত্যুর শান্তি।

# পূর্ণিমালিনী কথা...

রোমাঞ্চকর মামলার কাহিনী

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

সুভাষ সমাদ্দার

কাষ্ঠগড়ের শ্মশান। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে। নদীর জলের চেউয়ে চেউয়ে তার ছায়া দুলছে। শ্মশান-বন্ধুরা একটু দূরে বসে জিলাপী খাচ্ছে। আর গল্প-গুজব করছে।

চিতার কিছুদূরে একটা উঁচু ধালিয়াড়ির ওপরে বসে আছি আমি আর জীতেনদা। সব বলে একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে—ঠিক এইরকম করে বললেন, শ্মশানে বসে বললাম বলে আবার ভেব না যেন দার্শনিকতা করছি—এর ভেতরে কোন দর্শন নেই, কাব্য নেই। পরিষ্কার বাস্তব-জীবন আর জগতের কথা হে—শঙ্কর। সেই নিউটনের 'লজ অফ মোশান' পড়ো নি? থার্ড ল'টা মনে আছে? এভরি এ্যাকশান হ্যাজ গট ইকোয়াল এ্যাণ্ড অপোজিট রি-এ্যাকশান।—আবার মৃত্যুটা হলো সেই রি-এ্যাকশান, বুঝলে শঙ্কর।

পাঠকবন্ধুগণ! পিতার মৃত্যুর শোকে কাতর জীতেনদার কথায় প্রচুর ভাবাবেগ ছিল (যা খুব স্বাভাবিক) উচ্ছ্বাস ছিল। আমি এখানে শুধু সেই-টুকু বলছি, যেটুকুর জন্য আপনারা অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে আরও একটা কথা উল্লেখ করি। 'রেকর্ডস অফ ভিলেজ ক্রাইম'-এর পাতায় ফুট নোটে আমার গ্রামের ত্রিশ বছর আগের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়ে যে কৌতূহল হয়েছিল তা চরিতার্থ হলো—কিন্তু বহুকালের পুরনো একটা ধারণাই এযুগে—এই ডেমোক্রাসি, এ্যাটম বোমা—রকেট স্পেসের যুগেও সত্য হয়ে রইল। বদলালো না। একটুও পরিবর্তন হলো না। আমার দুঃখ এইখানে। যাক—

জীতেনদা ও জ্যাঠামশাই আমার ওপর খুব প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁদের মৃদু একটা আপত্তি ছিল কেন—কেন আমি পুরনো এই ঘটনাটা মিথ্যা নাড়া-চাড়া করছি। শুধু তাই নয়। আছে, আরও আছে—যেদিন সরকার মশাইয়ের ছেলে রাধার সঙ্গে রাধামাধবের সেবত্তর জমি নিয়ে ঝগড়া করেছিল, যখন কৌতূহল প্রকাশ করেছিলাম আসি—কেন—কেন রাধার মত একটা স্ত্রীলোককে রাধামাধবের সেবাইত করা হয়েছিল—তখন বলেছিলেন জীতেনদা, পরে শুনবে সেসব। সে আর এক উপন্যাস।

সেই উপন্যাস না উপাখ্যান। বিলাপাড়ার দুই যুগ আগের পুরনো সেই উপাখ্যানই নিজের বাবার চিতার লেলিহান শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কখনো থেমে, কখনো গলার স্বর নামিয়ে বলে গিয়েছিলেন জীতেনদা একবারও চোখে জল দেখি নি—

সরকার মশাই। নিরঞ্জন সরকার—ছিলেন বিলপাড়া, বোয়ালদাড় ইত্যাদি অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। লোকটার হৃদয় ছিল খুব দরাজ। এমন লোক নেই যে তাঁর কাছে উপকৃত নয়। কিন্তু সূর্যেও থাকে কলঙ্ক; কলঙ্ক থাকে চাঁদে। ছিল তাঁর ঐ এক দোষ।

পরমা সুন্দরী স্ত্রী বিমলার চোখে-মুখের রেখায় রেখায় লেখা আছে তাঁর হাজারো ব্যভিচারের ইতিহাস। পর পর দুটি সন্তান হয়ে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই চিররুগ্ন। সরকার মশাইয়ের বিশাল বাড়ির এককোণে একটা পুরনো আসবাবের মত পড়ে থাকতো সে। আর সরকার মশাইয়ের জীবনের উদ্দাম স্রোত বিপুল গর্জনে বয়ে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

চৌকিদার রতন ঘোষের মেয়ে রাধা। পালা-লেখক চারু দাসের বৌয়ের ওপর তাঁর নজর পড়ল। তার আবার একটু ইতিহাস আছে।

কাষ্ঠগড়ের ঘাটে বারুণী স্নান উপলক্ষে মেলা হয় পৌষ-সংক্রান্তিতে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গিয়েছিল রাধা। হঠাৎ নদীর পাড়ের ওপর থেকে নিরঞ্জন সরকার তাকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, যেন কোন দেবী-মূর্তি। সূর্যের আলোর গোলকটা একটা জ্যোতির মত তার মাথাকে ঘিরে ছিল। কনক চাঁপার মত গায়ের রঙ। ভিজে কাপড়ের আড়ালে তার উদ্ধত যৌবনের ছায়াময় লোভনীয়। তারপর—

যা হয়। যা হয়ে থাকে। আর বেশি করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। তার কারণ চারু দাস ভাবুক মানুষ। কবি মানুষ। সংসার—উদাসীন। তাই রাধা বিপথে যাওয়ার সুযোগ পেত।

যখন চারুর লেখা বই কোন গ্রামের দল নতুন ধরতো, তখন চারু খাওয়া দাওয়া ভুলে সেখানে পড়ে থাকতো। ওদিকে যে একজন তার কথা ভাবতে পারে, একজন তা যেন একেবারে ভুলে যেত।

কবি হলেও বাস্তববুদ্ধি থাকা দরকার। বড় কবি, বড় লেখকদের এই বাস্তববুদ্ধিটুকুর অভাব নেই।

যাদের নেই তারা কখনো বড় লেখক হতে পারে না। চারুর মত দুর্ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন তাদের। জীতেনদার দৃঢ় বিশ্বাস তাই।

নির্জন দুপুরে, নিশি রাতে, সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরঞ্জন সরকার যেত রাধার কাছে। গ্রামের কাকপক্ষীটি পর্যন্ত টের পেত না।

কেমন করে এত কথা জীতেনদা জানতে পেরেছিল। সেও একটা মজার ব্যাপার। ছোটবেলা থেকে জীতেনদা অত্যন্ত বেশি বাইরের বই পড়তেন। সরকার মশাইয়ের মাথার গঠন, মুখাকৃতি, গায়ের রঙ দেখে তিনি মনে করতেন, লোকটার গায়ে আর্য রক্ত আছে। তাই অমন হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হাসতে পারে। বলতে পারে উঁচু গলায় স্পষ্ট স্পষ্ট কথা। তাঁকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে জীতেনদার মনের ভেতরে ছায়াময় একটা ছবি ফুটে উঠতো :—সিন্ধু নদীর ওপার থেকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসছে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় এক পুরুষ---

তাঁর কথাগুলো শোনবার জন্য মনের ভেতরে দুর্বার একটা আকর্ষণ

হবতেন জীতেনদা। তাই এলেও বাবার বৈঠকখানার বন্ধ দরজায় আড়ি পাততেন।

হরিশ চৌধুরী (আমার জ্যাঠা-মশাই) ছিলেন জোতদার মানুষ। কৃষি, শাস্ত্রাদি, ভাগবতধর্ম, চণ্ডী ইত্যাদি তাঁর মুখস্থ ছিল। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে দীর্ঘকাল কর্মহীন জীবন-যাপন করলে মানুষ একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যায়। তিনিও তাই হয়েছিলেন। একটা কাজ তিনি করতেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আড্ডা বসাতেন সরকার মশাইয়ের সঙ্গে। এক একদিন ওঁদের আলাপ শুনতে শুনতে শিউরে উঠতেন জীতেনদা।

হ্যাঁ। জানতেন—হরিশ চৌধুরী জানতেন সেই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের কথা।

স্মরণ গ্রামের লাঠিয়াল দুই ভাই নুটু আর টুনু চারুকে জখম করে ফেলে রেখে চলে যাবে। আর কিছু নয়। হাসপাতালে থাকতে হবে দীর্ঘদিন। তাতে দুটো কাজ হাসিল হয়। ভবিষ্যতে ছোট জাতের ছেলের (গ্রামের উঁচু বর্ণদের হিংসার কারণ ছিল) কাব্য-রোগ আর খ্যাতি, ছুটে যেতে পারে। আর একটা—

বলা নিষ্প্রয়োজন। কামনার জ্বরে তখন সরকার মশাই একেবারে বেহুঁস। কিন্তু হুঁস হয়েছিল সেইদিন—সেই কাল রাত্রে যখন মরণোন্মুখ চারুর বুকফাটা আর্তনাদ চাঁদের আলোয় ভরা প্রান্তরের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে দূরে—বহু দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তিনি রাধাকে নিয়ে তালপুকুরের কাজলকালো জলে প্রমোদতরীতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। নৌকোর ছইয়ের ভেতরে ছিল মদের বোতল আর—

গোলাপী ওড়নায় মুখ ঢাকা তন্বী সুঠামতনু এক বিলাস-সঙ্গিনী। তার পায়ে ছিল ঘুঙুর। কণ্ঠে ছিল গান—কিন্তু—

সব ফেলে ছুটে এসেছিলেন। লাঠিয়াল দুটো একটু বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছিল। (এসব কাজের আগে তারা খায়) অবশ হাতের দুর্বল ঘায়ে চারুর কিছু হলো না দেখে ওরা গরুর খুঁটো পোঁতা একটা কাঠা বা কাঠিয়া (বড় ভারি একখণ্ড কাঠ) দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে মেরেছিল তাকে। কাঠাটা কাঁঠালগাছের। ওদের একজনের হাতে ছিল। কাঠাটা সরকার মশাইয়ের গোলার সামনে পড়েছিল—সেইখান থেকে নিয়ে ছিল ওরা।

এই কঠটা নিয়ে এসেছিলেন সরকার মশাই। তাঁর তখন সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। পা-দুটো যেন তাঁর নিজের পা নয়। কোন বশ নেই। বুকের ভেতরটা খিল এঁটে গেছে। কি করবেন—কোথায় যাবেন।—চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম জমে উঠল। সেই শেষ রাতের ঠাণ্ডায় চারুর সদ্য মরা দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডুকরে তাঁর কাঁদতে ইচ্ছা করল।

তাঁর বন্ধু—তাঁর পরম বন্ধু হরিশ চৌধুরীর বাড়িতে এলেন তিনি। তখন জীতেনদা হঠাৎ উঠেছিলেন বাথরুমে যাবার জন্যে। হঠাৎ বাবার বসার ঘরে অন্ধকারে ফিস ফিস কথা শুনে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন নিঃশব্দ পায়ে—কানে পড়লো এই কথাগুলো—তুমি—তুমি বাঁচাও ভাই—তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই। এই কাঠাটা তুমি কোথাও রাখো ভাই—পুলিশ তোমাকে সার্চ করবে না—তোমার—

তার পরদিন হরিশ চৌধুরীর লক্ষ্য পড়েছিল হঠাৎ মধুটুকী আমগাছটার নীচের মাটিটা কেন আলগা হয়ে আসছে। অতএব ওর ভেতরে শক্ত একটা কিছু দিয়ে তার ওপর দেওয়া দরদার মাটি। তাই সেই বস্তুটিকে মাটির ভেতরে পুঁতে রেখে আবার দেওয়া হলো মাটি।

বস্তুটি নয়। কাঠা বা কাঠিয়া নয়—ত্রিশ—ত্রিশবছর আগের একটা নরহত্যার পাপকেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই মধুটুকী আমগাছের নীচের মাটিতে।

একটা পাপ আরেকটার হাত ধরে নিয়ে আসে। তারপরে সরকার মশাইয়ের গোপন দানপত্র বা উইলেও স্বাক্ষর করতে হয়েছিল তাঁকে। রাধা সেবাইত হবে গৃহবিগ্রহ রাধামাধবের আর দেবত্তর জমি যতদিন বাঁচবে ভোগ করবে—এই সর্তে তাঁর মন পীড়িত হয়েছিল। কিন্তু—

উপায় নেই। প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনী বন্ধু। আর চৌধুরী মশাই নরম ব্যক্তিত্বের মানুষ।

সেইদিন থেকেই (যেদিন কাঠিটা রেখেছিলেন লুকিয়ে) পাল্টে গিয়েছিলেন তিনি। কারো সঙ্গে একটা কথা বলতেন না ভাল করে। ডিসপেপসিয়ায় ভুগলেও ওষুধ খাওয়ানো যেত না। একগুঁয়েমি বেড়ে গিয়েছিল। খাওয়ার অত্যাচার করতেন। করতে করতেই তাঁর কাল রোগ—থাক—

বক্তব্য শেষ করে নদীর ওপারে ভোরের আবছায়া আলোয় ধূ ধূ বালুচরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন জীতেনদা—ধনী, প্রতিপত্তিসম্পন্ন বন্ধুর কাছে কখনো নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দিও না শঙ্কর—একটু থেমে বলেছিলেন আবার, পাপ করা অন্যায় আর বন্ধু বা প্রিয়জনের পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া আরও বেশি অন্যায়—

সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে নদীর পাড়ে নিভু নিভু চিতার সামনে তাঁর কথাগুলো পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মত মনে হয়েছিল।

—শেষ—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

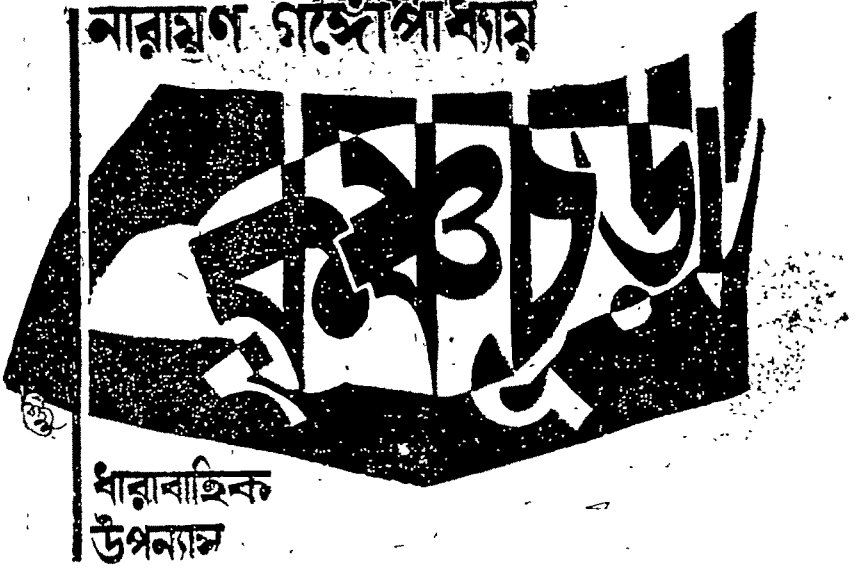


॥ এক ॥

প্রকাশক বন্ধু বললেন, আমি বলছি, আপনি যান। আপনার ভালো লাগবে।

—নির্জন ?

—একেবারে।

—কেউ এসে বিরক্ত করবে না ?

—দিনের বেলায় অন্তত নয়।

—তা হলে রাতের বেলায় না কি ?

—কিরণ চমকে উঠল : ডাকাত পড়বে ?

প্রকাশক হাসলেন : কুড়ি বছরের ভেতরে ওদিকটায় কোনো চুরি-ডাকাতি হয়েছে বলে শুনি নি। সেজন্যে নয়। নির্জন বাড়িতে মশাই যদি রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব সুরু হয়, সেজন্যে আমি দায়ী নই।

—তবে কি একটা ভূতুড়ে বাড়িতে পাঠাচ্ছেন আমাকে ?

—না-না, তা-ও নয়। কিন্তু মাঝ-রাতে আপনাকে একা পেয়ে হঠাৎ যদি কেউ—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কিরণ বললে, এসেই পড়ে, তা হলে ভালো করে আলাপ করা যাবে। পরলোক সম্পর্কে আমার প্রচুর কৌতূহল আছে।

চা এসেছিল। একটা পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রকাশক বললেন, আর বেশ একটা ভূতুড়ে উপন্যাস লিখে ফেলবেন। কণ্ট্রাক্ট করা যাক—অ্যাডভান্স দিচ্ছি, বইটা আমাকেই দেবেন।

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে যাচ্ছিল কিরণ, নামিয়ে ফেলল। বললে, আপনি এম-এ পাশ করেছেন, অভিজাত পাবলিশার, আপনার মুখে এই কথা। ভূতুড়ে উপন্যাসের ফরমাস দিচ্ছেন শেষ পর্যন্ত! ছি-ছি, লোকে বলবে কী।

প্রকাশক হাসতে লাগলেন : বাজার দেখছেন তো। সিরিয়াস বই পড়তে হলে লোকে আজকাল চটে যায়। বলে, জীবনে অনেক দুঃখ আছে, বই পড়ে তার ভার আর বাড়ানো কেন। ভূতুড়ে কারবার পেলে সবাই পড়ে খুশি হবে, গা ছমছম করবে—অথচ ছাড়তে পারবে না। আর বাংলা-সাহিত্যে 'ড্রাকুলা'র মতো বই তো একখানাও নেই—বেশ নতুন একটা লাইন খুলে যাবে আমার। মাসে তিনটে ইম্প্রেশন দেব, আপনার পকেট ভরে যাবে, দু'পয়সা আমারও আসবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কিরণ বললে, তা হলে আমাকে মাপ করুন, এ-সবের ভেতরে আমি নেই। রইল আপনার বাড়ি আর নির্জনতা, আর পাহাড় আর শালের বন, আমার এই ধুলো-ধোঁয়ায় ভরা কলকাতাই ভালো।

—আচ্ছা—আচ্ছা, ভূতুড়ে বই লিখতে হবে না আপনাকে। কিছুই লেখবার দরকার নেই। আপনি মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে শরীরটাকে ভালো করে আসুন, তা হলেই আমি খুশি হবো।

সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে দিলেন প্রকাশক। তারপর শেল্‌ফ থেকে খানকতক ইংরেজি বই নামিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলোও সঙ্গে নিয়ে যান—পড়বেন।

ভদ্রলোকের বাড়ির অবস্থা ভালো, পাব্‌লিকেশন তাঁর পেশা নয়, নেশার ব্যাপার। সাহিত্যকে ভালোবাসেন বলেই সাহিত্যের মুদীখানা খুলে বসতে পারেন নি। ব্যবসা যে খুব ভালো চলে তা নয়, কিন্তু লেখকদের সঙ্গ পাওয়াটাই তাঁর কাছে লাভের ব্যাপার বলে মনে হয়। আর প্রিয় লেখকদের মধ্যে মধ্যে বিদেশী বই উপহার দেন—ওইটুকুই তাঁর ইনভেস্টমেণ্ট।

থাবা দিয়ে বইগুলো তুলে নিতে নিতে কিরণ বললে, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

প্রকাশক যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেই রকম।

বাংলো-বাড়িটা পুরোনো হলেও এখনো বেশ মজবুত। তিনখানা ঘর—দু' ধারেই টানা বারান্দা। বাড়ির সামনে ঢেউ-খেলানো নীচু প্রাচীর—লোহার গেটের দু'ধারে লবঙ্গলতার ঝাড়, গেট পেরিয়ে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত লাল সুরকির রাস্তা, দু'পাশে ফুলের বাগান। পেছন দিকে উঁচু প্রাচীর, উঠোনে কিছু কিছু সব্জীর চাষ, ইঁদারা, গোটা কয়েক পেঁপে গাছ। খিড়কির দরজা দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলে একটি পাহাড়ী নদী জ্বলে ওঠে চোখের সামনে, এখন শুধু শাদা বালির কংকাল আর রাশি রাশি নুড়ি—মাঝখান দিয়ে নীলজলের একটি উজ্জ্বল

যারা তলোয়ারের ফলার মতো ঝকঝক করছে। সেই নদী পেরিয়ে শালবন—দূরের আকাশ পাহাড়ের মাথার ওপর নুয়ে পড়েছে।

বাড়ির সামনের দিকে অনেকখানি পর্যন্ত মাঠ, ঘাস আর নুড়িতে ছাওয়া—এখানে ওখানে এক আধটা ছাড়া ছাড়া লাল মাটির স্তূপ; ডান দিকে খানকটা এগিয়ে তিনটি গাছ ফুলে ফুলে আগুন জ্বেলেছে—তলায় বিছিয়ে দিয়েছে ঝরা পাপড়ির মখমল—গাছ তিনটি কৃষ্ণচূড়া। তারও পরে আবার অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ মাঠ—লাল মাটির স্তূপ, একটা গ্রাম, শালবন, আবার পাহাড়ের রেখা। মাঠে কয়েকটি রাখাল, কিছু গরু-ছাগল, আর—আর সেই আশ্চর্য নির্জনতা, যা কলকাতায় বসে কল্পনাও করা চলে না।

আসবার সময় স্টেশনের কাছাকাছি কিছু সাজানো বাড়িঘর চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু লোকজন বড়ো কেউ আছে বলে মনে হয় নি। চেঞ্জারের জায়গা। এক সময় অনেকে হয়তো আসতেন হজমের গোলমাল সারিয়ে নেবার আশায়, কিংবা সস্তা দুধ-মুরগীর সন্ধানে। কিন্তু সে-সব দিন আর নেই। মুরগীর দাম বেড়েছে, দুধে জল বেড়েছে। তা ছাড়া যে বাঙালী এক সময় সাঁওতাল পরগণার সীমায় পা দিয়েই অনেক দূর চলে আসা হয়েছে বলে বিশ্বাস করত, তারাও আর নেই; এখন বাঙালী চেঞ্জারের বেড়ানোর পরিধি আলমোড়া থেকে উটকামণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। নিতান্তই পেন্‌শন-পাওয়া বুড়ো মানুষ ছাড়া কলকাতার অতি কাছে এই সাঁওতাল পরগণা কারো আর চোখেই পড়ে না—ঝড়ের মতো উড়ে-চলা মেল ট্রেনের জানলা দিয়ে ছোট স্টেশনের দু-তিনটি আলো বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

সুতরাং কিরণের মনে হল, নিজেকে নিয়ে চমৎকার থাকা যাবে এখানে। ঘন্ধ নেই, আড্ডা নেই, সাহিত্যচর্চা নেই, দশজন সাহিত্যিক একসঙ্গে জড়ো হয়ে পরনিন্দাও নেই। বারান্দায় দুটো ডেক চেয়ার পাতা ছিল, তারই একটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে কিরণ খুশি হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল সেদিকেই যেখানে কৃষ্ণচূড়ার আরক্তিম আনন্দের উচ্ছ্বাস নির্মল আকাশের দিকে অঞ্জলি তুলে ধরেছে।

কৃষ্ণচূড়া!

তার ছেলেবেলার ফুল। দূর উত্তর বাংলার গ্রামে তাদের সেই ছোট বাড়িটি। দরজার সামনেই মস্ত একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। কতদিন সকালে সেই গাছটার নীচে মাদুর পেতে তারা পড়তে বসত, সে আর তার ছোট বোন সবিতা। সবিতা শ্লেটের ওপর গোটা কয়েক 'বল', 'চল', 'কর' লিখেই পেন্‌সিল চুষতে থাকত, তারপর ঘাসের ভেতরে লোনা পোকা খুঁজত। আর দুলে দুলে 'এ বিগ ফিগ', 'এ ক্যাট অন দি ম্যাট' পড়তে পড়তে কিরণ ধমক দিত: 'এই লিখছিস না?'

'লিখছি তো।'

'লিখছি তো! পেন্‌সিল মুখে পুরে দিয়ে খুব লেখাপড়া হচ্ছে তোর! হয়-লে!—নইলে উঠে যা এখান থেকে।'

'রা-রে, কেন উঠব? আমিও তো পড়ছি।'

'ছাই করছিস। উঠে যা এখান থেকে, নইলে চড় মারব একটা।'

মারবার দরকার হত না। তার আগেই চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠত সবিতা: 'মা—দাদা আমাকে মারছে।'

মা দেখা দিতেন দোরগোড়ায়।

'কী হচ্ছে খোকন? আবার হাত তুলেছিস ওর গায়ে?'

'কখন হাত তুললাম? কী লক্ষ্মী-ছাড়া এই মিথ্যুক মেয়েটা।'

'তুমি যে বললে, চড় মারবে?'

'মেরেছি নাকি?'

মা হেসে ফেলতেন: 'থাক, গোলমালে দরকার নেই। উঠে আয় বুলু—তোকে আর পড়তে হবে না এখানে।'

বুলু সবিতার ডাক নাম। স্লেট-পেন্‌সিল নিয়ে উঠে যাবার সময় ভেংচি কেটে যেত দাদাকে। কিরণ লাফিয়ে ওঠবার উপক্রম করত, কিন্তু তার আগেই মা-র নিরাপদ আঁচলের ছায়ায় বুলু বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এ ডগ র‍্যান এ রেস'। 'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন—'

একটু পরেই বুলু বেরিয়ে আসত আঙুল চাটতে চাটতে। মন-মেজাজ ভারী খুশি। স্লাই ফক্সের কথা ভুলে গিয়ে কিরণ উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করত: 'এই—কী খাচ্ছিস রে?'

গম্ভীর হয়ে বুলু বলত, 'আমের আচার।'

'আমাকে দিবি?'

'আর বকবে না আমাকে?'

'কক্ষণো না।'

সন্ধি হয়ে যেত। সেই মাদুরে বসে আচার খেত ভাইবোনে, বক বক করে গল্প করত, আশে পাশে শালিক নেচে বেড়াত আর দু-জনের মাথায় টুপটাপ করে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি ঝরে পড়ত।

বুলুর বিয়ে হল কিরণ যখন ফিফথ ইয়ারের ছাত্র। মোটর দুখানা দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচেই। কান্না, উলু আর শাঁখের শব্দের ভেতর দিয়ে বুলু যখন মোটরে গিয়ে উঠল, তখনো তার গায়ে কৃষ্ণচূড়ার ক'টা পাপড়ি ঝরেছিল—সেকথা কিরণের আজও মনে আছে।

ঠাকুরমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁর নামাবলীর ওপর দু-তিনটি ফুল পড়েছিল। আর—

আর সেই বিকেল। পশ্চিমের আকাশ জুড়ে কালবৈশাখী মেঘ ডানা মেলেছে। হাওয়া উঠল তারপর, দেখা দিলে ধুলোর ঘূর্ণি, রাশি রাশি শুকনো পাতা উড়ল আর হাওয়ার ঝাপটায় পাগলের মত হাহাকার করে কৃষ্ণচূড়া

গাছটা যেন তার সব কিছু একসঙ্গে উজাড় করে দিতে চাইল।

এখন আর ফুল ঝরছে না—একটা লাল ঝড় বয়ে চলেছে, ফুলের ঝড়। তার ভেতরে জ্যোৎস্না যে কেমন করে তার বুকের ভেতরে এসে পড়ল সে-কথা আজ আর মনে পড়ে না।

'জ্যোৎস্না, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি?'

'আমিও বাসি। ছাড়ো—ছাড়ো—কেউ এসে পড়বে—'

সেই ফুলের ঝড়ের ভেতরে ডুরে শাড়িপরা কিশোরী মেয়েটি হারিয়ে গেল।

হারিয়েই গেছে। সে বাড়ি এখন পাকিস্তানে। জ্যোৎস্না যে কোথায়—কোন ভাগ্য যে তাকে কত দূরে নিয়ে গেছে সে কথার উত্তরই বা কে দেবে। শুধু জানতে ইচ্ছে করে, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা এখনো আছে কি না, এখনো বসন্তের হাওয়ায় হাওয়ায় আগুনের শিখার মতো তার পাতায় পাতায় ফুল জ্বলে ওঠে কি না, এখনো এক-একটা চৈতালি বাতাসের ঝাপটায় তার ফুলগুলো লাল ঝড়ের মতো বয়ে যায় কি না।

কৃষ্ণচূড়া।

স্বপ্নেভরা ছেলেবেলা, বিয়ের সানাই, মৃত্যু, প্রেম। কিরণের সব দিনগুলোকে ঘিরে যেন কৃষ্ণচূড়ার একটা বৃত্ত দাঁড়িয়ে আছে। যেন মাথার ওপর রক্তাভ ফেনা নিয়ে তার চারদিক ঘিরে একটা সবুজের ঘূর্ণি ঘুরছে, যেন একদল সাঁওতাল মেয়ে খোঁপায় কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী সাজিয়ে নাচের তালে তালে প্রদক্ষিণ করছে তাকে।

কিরণের ধ্যান ভাঙল।

বাড়ির মালী শম্ভু ডাকল: বাবু!

—কি হে?

—চা দিয়েছি।

কখন সামনে একটা টিপয় এনে দিয়েছে, সাজিয়ে দিয়েছে চা আর জলখাবার। কৃতজ্ঞ হয়ে কিরণ খাবারের থালাটা হাতে তুলে নিলে।

—কী খাবেন বাবু এ বেলায়?

—তোমার যা খুশি রান্না করো।

শম্ভু মাথা চুলকোল। বললে, তা হলে স্টেশনের কাছ থেকে তো কিছু বাজার করে আনতে হয়। যাবেন আপনি?

—পরে হবে। আজ তুমিই যাও, যা হয় কিনে আনো।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিয়ে শম্ভুকে বিদায় করল।

চা খাওয়া হলে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। নেমে এল বারান্দা থেকে, গেট পার হল, সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে গিয়ে হাজির হল সেখানে—যেখানে তার ছেলেবেলার কৃষ্ণচূড়া এখানেও ঘাসের ওপর লালের মখমল বিছিয়েছে। তিনটি গাছের মাঝখানে লাল মাটির একটি ছোট ঢিবি, কেউ যেন তারই জন্যে বসবার একটি জায়গা তৈরি করে রেখেছে। তারই ওপরে রুমাল পেতে কিরণ বসে পড়ল।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—সকালের রোদ এখনো ধারালো হয়ে ওঠে নি। সেই হাওয়ায় ফুল ঝরছে। সেই রঙ, সেই লালে-হলুদে মেশানো মোটা মোটা পাপড়ি, সেই একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। কিরণ নিজের ভেতরে তলিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথার ওপর এক ঝাঁক পাখির কিচিমিচি শোনা গেল, চেয়ে দেখল, হরিয়াল। পকেট থেকে ডায়েরী আর পেন্সিল বের করল, একটুখানি যা খুশি লিখতে ইচ্ছে করল, কিন্তু কিছুই লেখা গেল না। ডায়েরীটাকে পাশে নামিয়ে রেখে আবার নিজের এলোমেলো ভাবনার ভেতরে তলিয়ে গেল সে।

হঠাৎ পায়ের কাছে কিসের নিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল সে। কালো আর পাটকিলে রঙে মেশানো একটা বড়ো কুকুর। ব্যাপারটা কিছু বোঝবার আগেই কুকুরটা তার ডায়েরীখানা মুখে তুলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

—আরে—আরে—আরে—

ব্যতিব্যস্ত হয়ে কুকুরটাকে তাড়া করল কিরণ। আর তখনই—সমস্ত মাঠ ছাপিয়ে—কৃষ্ণচূড়া ঝরার শব্দ আর হরিয়ালের ডাক ছাপিয়ে—অনেক ক'টি গলায় হাসির কলঝঙ্কার বেজে উঠল একসঙ্গে।

(ক্রমশঃ)

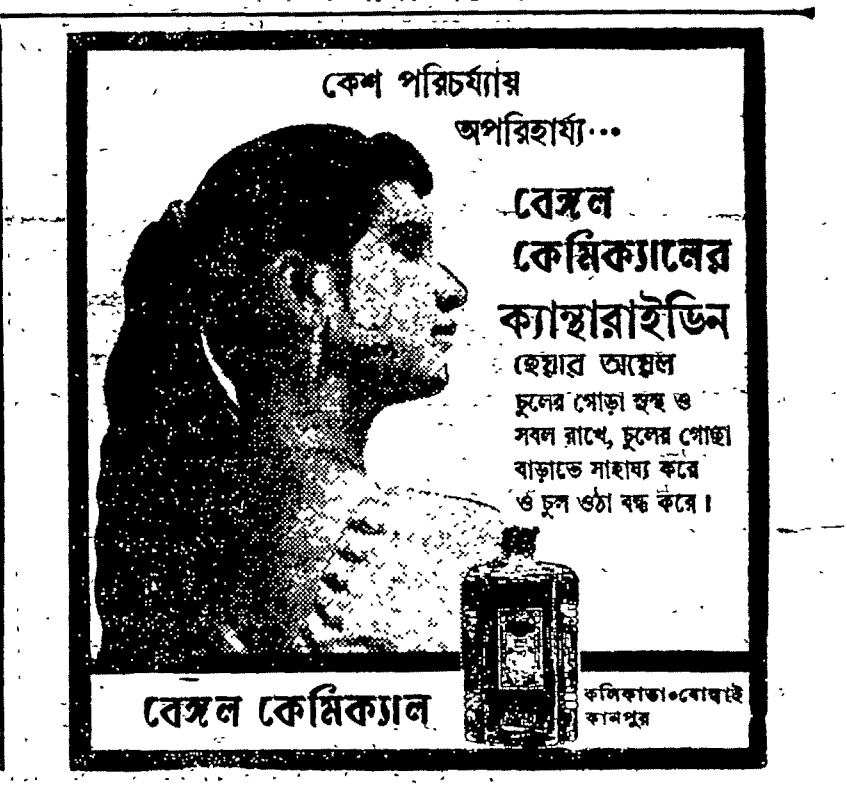

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত চেতনা

॥ দশ ॥

সমরের অফিস !

এর ভেতরেই বড় সাহেব জানতে পেরেছেন যে সমর ছেলেটি গুণী। এম-এ-তে ফা র্ট ক্লাস ফা র্ট। তার কথায়-বার্তায়, মধুর ব্যবহারেই বড় সাহেব খুব খুশি। প্রায়ই তাকে ডাকেন। জরুরী কাজ-কর্ম থাকলে সমরের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। আজ বিকেলের দিকে সমরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সমর কামরায় ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াতেই দেখল সাহেবের মুখটা যেন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শরীরে যেন কিসের একটা অব্যক্ত বেদনার ছাপ।

সমর চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেকেছিলেন স্যার? শরীর ভালো আছে?'

বড় সাহেব অতিকষ্টে বললেন, 'সমর এসেছো? বড় কষ্ট।'

সমর এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে কাছে ঝুঁকে পড়ে দেখল, বড় সাহেব প্রায় অচৈতন্য। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সুপুরুষ। অতি সুন্দর স্বাস্থ্য। কি হতে পারে? সমর তাড়াতাড়ি কোম্পানীর ডাক্তারকে টেলিফোন করল। পাঁচ মিনিটের ভেতর ডাক্তার এসে পড়লেন। পরীক্ষা করে বললেন, 'এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এ অসুখ তো ক্রনিক, কতদিন বলেছিলাম ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে।'

অফিসের সবাই ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাক্তার নিজের গাড়িতেই বড় সাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সাথে সমরও গেল। রোগীর সেবায় সে ছোটবেলা থেকে সিদ্ধহস্ত।

ডাক্তার সমরকে বললেন, 'বাড়িতে টেলিফোন করেছিলেন?'

সমর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তার-বাবু। মিসেস সেন বাড়িতে নেই। সেই সকালে বড় সাহেবকে অফিসে ছেড়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। খানসামা বলল, মেমসাহেব রাত্তিরেও দেরিতেই ফিরবেন বলেছেন। কোথায় পার্টি আছে।'

দিল্লীর হায়ার সার্কল-এ মিসেস সেনের জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। বিগতযৌবনা হলেও তিনি সুন্দরী। তিনি সাজতেও ভালবাসেন। শহরের বিখ্যাত কোন প্রতিষ্ঠানই তাঁকে ছাড়া চলে না। নিন্দুকেরা রটিয়েছে, স্বামী বড় চাকুরে বলেই তাঁর এত প্রতিপত্তি। মিসেস সেনের ধারণা সৌন্দর্যের জন্যই তাঁর এই প্রতিষ্ঠা।

মিসেস সেন সেদিন সকালবেলায় স্বামীকে অফিসে পৌঁছে দিয়েই মহিলা সমিতির অফিসে গেছেন। বিদেশী একদল ডেলিগেট আসছে আজ শহর পরিদর্শন করতে। মার্কিন রেড-ক্রশের সভানেত্রী মিস রোস আসছেন তাঁদের সাথে। মিসেস সেন ক'দিন থেকেই তাই এত ব্যস্ত।

বড় সাহেবের শরীর কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থ। অফিসের অপরিসীম পরিশ্রম, তার ওপরে বাড়ির অযত্ন। সব মিলিয়ে তাঁর শরীর এই অল্প বয়সেই ভগ্নপ্রায়। ডাক্তার দু-পাঁচবার মিসেস সেনকে সে কথা যে না বলেছেন তা নয়। তবে মিসেস সেনকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল।

মহিলা সমিতির কাজ, রেডক্রশের বিশেষ অধিবেশন, নারীকল্যাণ সমিতির চ্যারিটি শো নিয়ে তিনি আজকাল এত ব্যস্ত যে, স্বামী বলে যে জীবটি বাড়িতে আছে তার দিকে দৃষ্টি ফেলার তাঁর ফুরসৎটুকুও নেই। নাম, ডাক, যশ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির মাদকতায় তিনি এতই প্রমত্তা যে, নিজের চোখের নীচে কি হচ্ছে তা দেখবার অবসরটুকুও পাচ্ছেন না আজকাল।

ভৃত্য খানসামা যা খুশি তাই করে চলেছে। বড় সাহেবের সুনাহারের দিকে তাকাবার পর্যন্ত লোকটি নেই। মৃত্যুপথযাত্রী মিঃ সেন অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বললেন।

নার্স বলল, বলবেন না স্যার। এক্ষুণি সেরে যাবে ব্যথা।'

সমর ঘন ঘন মিসেস সেনকে টেলিফোন করে চলেছে। বলা যায় না অপারেশনে কি হবে। বঙ্গললনা। স্বামীর শেষ সময়ে পাশে দাঁড়াতে না পারলে পরে হয়তো আপশোষের সীমা থাকবে না, এই ভেবেই সে মিসেস সেনকে টেলিফোন করছিল। তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বাড়ির কেউই তাঁর কোনো খবর জানে না।

সমর মহিলা সমিতিতে টেলিফোন করল। নারীকণ্ঠে জবাব এলো, 'মিসেস সেনকে আজ আপনারা কি করে এখানে আশা করছেন? বিদেশী

ডেলিগেটদের নিয়ে তিনি শহর দেখাতে বেরিয়েছেন। মিসেস সেনের মতন কর্মঠ সভানেত্রী আছেন বলেই আজও এই সমিতি বেঁচে রয়েছে। দেশের মান, নারীসমাজের মাথা তাঁর অকান্ত পরিশ্রমেই আজ এত উঁচু। আপনি কোথা থেকে টেলিফোন করছেন বলতে পারেন কি?'

সমর টেলিফোনের রিসিভারটা ছেড়ে দেয়।

হতাশ হয়ে সে মিসেস সেনকে খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছেড়ে দিল। তিনজন ডাক্তার একত্রিত হয়েছেন। খানিকক্ষণের ভেতরেই অপারেশন হবে।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে দুটি নার্স এসে বলল, 'বিদেশিনী ভদ্রমহিলাকে নিয়ে একজন ভদ্রমহিলা হাসপাতাল দেখাতে এসেছেন। সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলোই দেখানো হয়ে গেছে। তিনি এখন এই ডিপার্টমেণ্ট দেখতে আসতে চাইছেন। আমরা বলেছি এদিকে এখন একটা সিরিয়াস কেস আছে। খানিকক্ষণ পরে আসবেন। তিনি কিছুতেই শুনছেন না। বলছেন আমার নামে রিপোর্ট করবেন।'

একজন ডাক্তার নার্সের সাথে এলেন। তিনি তাঁদের মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে বললেন। কেসটা একটু ঘোরালো। রোগীর জীবনাশঙ্কা আছে। বঙ্গললনা চুপ করে রইলেন। মার্কিন রমণী বললেন, 'ঠিক কথাই তো। ওদিকটা আমরা দশ মিনিট পরেই না হয় দেখলাম। সরি ডক্টর। আপনি আপনার অপারেশন থিয়েটারে ফিরে যান।'

বঙ্গললনা খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। মুখখানা হাঁড়ির মত করে তিনি মার্কিন রমণীকে নিয়ে হাসপাতালের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

মার্কিন রমণী ভারতীয় নার্সদের 'স্মার্টনেস' ও তাদের কর্মকুশলতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রেডক্রশের কাজে কলকাতায় তিনি বহুদিন ছিলেন।

বঙ্গললনা জানালেন, নার্সিং-এ তাঁরও এলিমেণ্টারী ট্রেনিং ছিল। নার্সিং-এর আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক দিকের ওপর তিনি বিদেশিনীর কাছে সারগর্ভ বক্তৃতা পরিবেশন করতে লাগলেন।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে নার্স এসে খবর দিল অপারেশন হয়ে গেছে। বিদেশিনী ও বঙ্গললনা এখন ওদিকে যেতে পারেন।

বিদেশিনীকে নিয়ে বঙ্গললনা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথে বললেন 'জানেন মিস বোস, শুধু ভারতবর্ষের ভেতর নয়, সমস্ত এশিয়ার ভেতর এত বড় হাসপাতাল আর নেই।' দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন।—'সেবাই আমাদের ধর্ম। ভারতবর্ষে সেবার ভেতরেই আমরা মুক্তি খুঁজি।'

সমরের মনে হল বঙ্গললনাকে সে যেন কোথায় দেখেছে। পরিচিত মুখ। কিন্তু সে ঠিক নির্ণয় করতে পারছিল না।

মার্কিন রমণী পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করলেন। বঙ্গললনার চঞ্চলতাটুকু যেন একটু বেশি। ইসারা দিয়ে মিস বোসকে এদিক-ওদিক সব দেখাতে দেখাতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল রোগীর দিকে।

মার্কিন রমণীকে ছেড়ে রোগীর কাছে এসে যেন তাঁর সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মিস বোস হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চেনেন নাকি এঁকে?'

বঙ্গললনার বাক্স্ফূর্তি হল না। তিনি নির্বাক নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মতন বসে পড়লেন।

ডাক্তার ঘোষ রোগী দেখতে এলেন। বঙ্গললনাকে নমস্কার করে বললেন, 'কখন এলেন মিসেস সেন? সমরবাবুর টেলিফোন পেয়েছিলেন কি? অতি কষ্টে এ যাত্রা বাঁচানো গেল। আমরা একটু দেরিতে খবর পেয়েছিলাম। সমরবাবুর সেবাতেই উনি বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।'

সমর মিসেস সেনকে নমস্কারটুকু পর্যন্ত করতে ভুলে গেল।

মার্কিন রমণী প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তাহলে আপনি চেনেন ওঁকে।'

মাথা নীচু করে বঙ্গললনা বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি আমার স্বামী।'

আকাশ থেকে পড়ে মার্কিন রমণী মিসেস সেনের হাতখানা ধরে বললেন, 'বড়ই দুঃখিত মিসেস সেন। আমি তাহলে চলি। আজকের পার্টি ক্যানসেল করে দিন। সমাজসেবা, জনকল্যাণ, নারী সমিতি সব ভালো কাজ। রেড-ক্রশের লোক আমরা। পৃথিবী জুড়ে রোগীর পরিচর্যা করাই আমাদের কাজ। তবে বান্ধবী হিসেবে বলছি ভাই, ভুল বুঝবেন না। স্বামী-পুত্র-কন্যা অবহেলা করে যেকি সমাজ সেবার দোহাই দিয়ে ছুটোছুটি করলে বিধাতাও অসন্তুষ্ট হন। আমি সন্ন্যাসিনী, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানেন। আচ্ছা আসি।'

সমর বিদেশিনীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তিনি যেন তারই মনের কথাগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলছিলেন।

মিসেস সেন মিস বোসকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিলেন। বিদেশিনী তাতে বাধা দিয়ে বললেন, 'না না। কোনো দরকার নেই। এখন আপনার একমাত্র স্থান হল ঐ চেয়ার।' বলে বড় সাহেবের শিয়রের পাশের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিলেন।

সমর বিদেশিনীকে এগিয়ে দিতে এলো। এই পুণ্যাত্মা বিদেশিনীর মুখে মিষ্টি বাংলা কথা তাকে মুগ্ধ করেছে।

বড় সাহেব চোখ মেলে আস্তে আস্তে ডাকলেন, 'সমর।'

সমর তখন বাইরে। মিসেস সেন বললেন, 'ডাকছো আমাকে?'

'কখন এলে? তোমার পার্টি আছে না আজ?'

অভিমানের সুরটুকু কানে বাজে।

মিসেস সেন কোনো কথা বললেন না। তাঁর দুচোখ বেয়ে টলমল করে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু।

(ক্রমশঃ)

সুশীল রায়

# অনলআয়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

কোনো আক্ষেপও নেই, অনুযোগও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই ; সে যেন পেয়ে গিয়েছে জীবনের যা-কিছু চাহিদা সবই। সে পেয়ে গিয়েছে ঐশ্বর্য। তার অঙ্গের হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা নিয়ে সে বিচ্ছুরিত করে বেড়াচ্ছে তার সৌন্দর্যের ছটা।

কিসের অভাব তার ? মুকুন্দরাম তার কাছে আসে না, না আসুক। তবু তার অভাব নেই কোনো। এইজন্যে মুখ তার কখনো ম্লান নয়, চোখ কখনো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে না।

হয়তো এমনিই চলত। কিন্তু দুর্ঘটনা জীবনে কম নয়। বাসন্তীবালা কিছুদিন থেকে তাই একটু ম্লান হয়ে আছে। খবর পাঠিয়েছে বহির্বাটীতে, খবরও পেয়েছে মুকুন্দরাম, কিন্তু সময় করতে পারে নি।

বাসন্তীবালা ঐশ্বর্যের আনন্দে ডুবে আছে, তার এখন যে উদ্বেগ তার কারণ আলাদা।

ঐশ্বর্যের আনন্দে ডুবে আছে বটে, কিন্তু তারই বা অবস্থা ক্রমশ কি দাঁড়াচ্ছে, সে-সংবাদ এতগুলি প্রাচীন আর এত পুরু-পর্দা ভেদ করে অন্তঃপুরে পৌঁছবার কথা নয়।

যে কিছু জানে না, তার কথা আলাদা ; কিন্তু কিছু জানে যে, সেই মুকুন্দরামও ও-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। যতদিন তার হাতে জোর আছে এবং যতদিন মহাজনদের সিন্দুকে টাকা আছে, সে দস্তখৎ করে যেতে রাজি আছে ততদিন।

কিন্তু মনসুর আর দস্তখতের কথা তুলছে না দেখে অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হয়েছে মুকুন্দরামকে।

তাই আজ অন্তঃপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে মুকুন্দরাম।

ম্লান হয়েছিল যার মুখ, অতর্কিত আনন্দে সেই বাসন্তীবালার মুখ স্বস্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মিষ্টি করে হেসে ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে সে বলল, এলে ?

—এলাম বাসন্তী। তোমার জন্যে মন কেমন করল।

খিল খিল করে হেসে উঠল বাসন্তী, ঝলমল করে উঠল কানের দুল। সোনালি আওয়াজে বেজে উঠল হাতের চুড়ি, কাঁধের ওপর থেকে পিছলে নেমে গেল সোনালি পাড়। পাশে ঘন হয়ে বসে বাসন্তী বলল, মন তবে আছে ? ভেবেছিলাম, তোমাদের মন বলে কিছু নেই, আছে শুধু বাগানবাড়ি আর আছে শুধু ফুর্তি।

—কি যে বল। বাসন্তীর কাঁধের ওপর একটা হাত তুলে দিয়ে অন্য হাতে বাসন্তীর দুহাত একসঙ্গে ধরে মুকুন্দরাম বলল, বিশ্বাস হয় না বুঝি মন আছে ব'লে ?

মুকুন্দর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে বাসন্তী বলল, উঁহুঁ, একটুও না। খবর পাঠিয়েছি তবু আস নি।

—বড় ব্যস্ত ছিলাম বাসন্তী। আজ হঠাৎ যেই মনে পড়ল অমনি ছুটে এলাম তোমার কাছে।

মুকুন্দ মাথাটা একটু তফাতে সরিয়ে বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, বাঃ, কি মেখেছ গায়ে, বেশ গন্ধ তো।

—আতর। বাসন্তী হেসে বলল, আদর তো পাই নে, তাই আতর মাখি অঙ্গে।

—কেন। এটা কি পাচ্ছ ?

—ছাড়। দাসীরা আছে কাছেই।

কিন্তু মুকুন্দ এসেছে আজ প্রয়োজনে, সেইজন্যে অত সহজেই সে ছেড়ে দিতে চায় না। বাসন্তীর বাধা মানতেই চায় না সে।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, কি খেয়েছ ? তোমার মুখে তো বেশ গন্ধ।

—ও একটা জিনিস।

—তা জানি। জিজ্ঞাসা করছি—ব্রাণ্ডি, না, হুইস্কি।

মুকুন্দ বলল, হবে ওরই মধ্যে একটা। কিন্তু ওকথা এখন কেন।

—এখন না হলে কখন হবে বল। তোমাকে আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম, আবার কবে পাব কে জানে।

মিথ্যা আশ্বাস দিতে লাগল মুকুন্দরাম, বলতে লাগল, পাবে, পাবে। আমি

যে তোমার স্বামী তা কি ভুলে গেছি ভাব।

—না না না। কিছুই ভাবি নে। আমাদের কিছু ভাবতে নেই জান না? আমরা যে বন্দী পাখি গো।

অনেক কথা জানার। কৌতূহল হতে লাগল বাসন্তীর। যাদের নিয়ে ফূর্তি করে ওরা বজরায়, যাদের নিয়ে মজা করে বাগানবাড়িতে তাদের সঙ্গে ঠিক এইভাবেই কথা বলে কি না মুকুন্দ। বাসন্তী কেভাবে কথা বলছে তারাও অবিকল এইভাবেই কথা বলে কি না মুকুন্দদের সঙ্গে। কিন্তু ওসব কথা কি করে জিজ্ঞাসা করা যায়। ওদের সঙ্গে তাহলে যে নিজের তুলনা করে ফেলা হয়। ওরা সৌভাগ্যবতী, কিন্তু তবু ওদের সঙ্গে নিজেকে এক করতে পারবে না কিছুতে বাসন্তীবালা। তার জীবনে যে ঘটনাই ঘটে থাক্, তবু সে আর-কেউ নয়, সে বাসন্তীবালাই।

এতক্ষণে কথা পাড়ল মুকুন্দরাম। বলল, জান তো স্বামী ছাড়া গতি নেই স্ত্রীদের।

—নতুন কথা কি গো?

—স্বামীর বিপদ, স্ত্রীরও বিপদ।

বাসন্তী বলল, জানি গো। তাই, হয়েছে কি।

কিন্তু বাসন্তী জিজ্ঞাসা করতে পারল না, স্ত্রীর বিপদও স্বামীর বিপদ কি না। এ-কথা কি এমন খোলসা করে জিজ্ঞাসা করা যায়? কেবল সে চেয়ে রইল তার স্বামীর মুখের দিকে।

মুকুন্দরাম মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বলল, বিপদে পড়েছি, তুমিই রক্ষা করতে পার আমাকে।

—কি আবার করে এলে কোথায়?

—কোথাও কিছু করি নি। টাকার অভাবে পড়েছি।

—তা, আমি বুঝি টাকা দেব, আমি পাব কোথায় গো?

—টাকা নয়। মুকুন্দরাম বলল, তোমার গলার ঐ সাতনরীটা দাও। তাতেই আমার হয়ে যাবে।

মুচকি হাসল বাসন্তীবালা, বলল, গলার হার কেন গো, চন্দ্রহারটা নাও না, ওতে হীরে বসানো আছে, ওতেও চলবে কাজ।

একটা বিশ্রী রসিকতা করল মুকুন্দরাম, বলল, থাক্ না ওটা ওখানে, নইলে ইয়ে দেখাবে না?

ঘাড়টা এগিয়ে বাসন্তীবালা বলল, কে আসছে গো দেখতে।

এ-কথার কোনো উত্তর দিল না মুকুন্দ। এখন সে তার স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্যে ব্যস্ত। মনে হচ্ছে করানো যাবে রাজি। এই জন্যে আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে সে চায় না।

শক্ত হয়ে বসেছে বাসন্তীবালা, তার মনেও বুঝি এসেছে কোনো অভিপ্রায়। সে বলল, না গো। না নিলে।

কথাটা শুনেই মুকুন্দরামের মুখ বুঝি আর্ত হয়ে উঠল, বলল, সে কি কথা। আমার বিপদ—

—বিপদটা কি আগে বল? ফূর্তির টাকায় টান পড়েছে, এই তো? বৌয়ের গয়না বেচে মজা লুটবার মতলব। তা ঢের বুঝেছি।

এ-কথা শুনেও হাসতে লাগল মুকুন্দরাম, বলতে লাগল, রাগ করো না। দাও ওটা খুলে।

উঠে দাঁড়াল বাসন্তী, সহসা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল মুকুন্দরামের দিকে। বলল, দিতে পারি। একটা কড়ারে।

বিপন্ন মুকুন্দরাম ব্যগ্র হয়ে বলল, কি, বলো।

—কথা রাখবে?

—রাখব।

গলার হার খুলতে খুলতে বাসন্তী বলল, সবাইকে বলতে হবে এর মধ্যে রোজ রাত্রে তুমি আমার ঘরে আসতে, আমার কাছে থাকতে।

এ আর বেশি কথা কি। এর জন্যে বাসন্তীর এত শপথ করিয়ে নেবার কি দরকার। নিজের স্ত্রীর কাছে রোজ এসেছে, এতে আবার অন্যায়টা কোথায়।

মুকুন্দরাম বলল, বলব। সবাইকে বলব।

বাসন্তীর হাত থেকে হার নিয়ে মুকুন্দরাম রওনা হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের ওপর উঠে বসে বাসন্তী ডাকল, ওরে ও রাজুবালা।

রাজুবালা ছুটে এল, বলল, কি মা।

—চামর আন। হাওয়া কর।

—শরীর খারাপ নাকি, মা।

—না রে না, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।

পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে চামর বীজন করতে লাগল রাজুবালা। সেই হাওয়ায় শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল বাসন্তী। চোখ বুজে পড়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ ধরে হাওয়া করতে করতে বাসন্তীর কপালে হাত দিয়ে রাজু বলল, গা তো গরম নেই।

বাসন্তী বলল, বললাম যে, জ্বর ছেড়েছে।

এর চেয়ে আর পরিষ্কার করে বলতে চায় না বাসন্তী। তার অশান্তি আর তার উদ্বেগ কিছুটা দূর করে দিয়ে গিয়েছে মুকুন্দরাম।

মুকুন্দরাম খুশি। তার প্রয়োজনের জিনিষ পেয়ে গিয়েছে সে। এই তার আনন্দ। এ-আনন্দের মধ্যে, আশ্চর্য, ভুলে যায় নি সে তার শপথ।

তার বৈঠকে বসে আছে তার ইয়ার ও সাগরেদরা, বসে আছে মোসায়েব আর খলিফা।

মুকুন্দ বলল, কিছুদিন হল অন্দরমহলে রাত কাটাচ্ছি। বেশ লাগছে হে। এ-জীবনটাও মন্দ না।

টাকার তাগাদায় এসেছে দালাল, তাকে দেখেই বলল, টাকা হবে। আছি বেশ আনন্দে। অন্দরমহলে কাটালাম কয়েকটা রাত। তারপর খবরাখবর শুনি। ওলন্দাজরা নাকি চুঁচড়ো ছেড়ে দেবে ইংরেজদের হাতে।

—শুনছি তো তাই। কিন্তু দেব-দিচ্ছি করেও নিশ্চয় সময় নেবে কিছু। মেয়েমানুষও যেমন নেশা,

জমির নেশাও তেমনি, বাবুজী। ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না। ছাড়ি ছাড়ি করেও সময় কেটে যায় অনেক।

—তা বটে।

দালাল বলল, কিন্তু মহাজন বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে. বলছে—

তেতে উঠল মুকুন্দরাম, তারা টাকা পাবে, তারা যা বলার বলুক, কিন্তু তুমি এত কথা বলতে এসেছ কেন? তোমার দালালি তুমি তো পেয়ে গিয়েছ কবে।

একটু শান্ত হয়ে মুকুন্দরাম বলতে লাগল, তোমাদের জ্বালায় এ বৈঠকখানা ছাড়তে হবে দেখছি। দেখছি, অন্দরই ভালো। কয়েকটা রাত্তির ওখানে কাটিয়ে দেখলাম ওখানে অনেক শান্তি।

দালালের মুখের দিকে চেয়ে মনসুর তাকে ইশারা করল চলে যাবার জন্যে। সেলাম জানিয়ে চলে গেল দালাল।

যাকে পাচ্ছে তারই কাছে ঐ একই কথা বলছে মুকুন্দরাম। অন্দরে কয়েকটা রাত কাটিয়ে কত শান্তি পেয়েছে সে। সেকথা প্রকাশে তার যেন কত আনন্দ।

মুকুন্দরামের এ ঘোষণার কথা পৌঁছে গেছে অন্দরে। বাসন্তীর কানেও পৌঁচেছে। খবর শুনে বাসন্তীর শান্তির সীমা নেই, কিন্তু দাসী-বাঁদীরা পড়ল আকাশ থেকে। দাদাবাবু অন্দরে এসে রাত কাটিয়ে গেল, তারা জানতে পারল না ঘুণাক্ষরেও—এ কেমন কথা হল।

পুরনো দাসী ক্ষান্তমণি ধমক দিল সকলকে, বলল, চুপ। রাত-বিরেতে কোথায় কি ঘটছে, সবই বুঝি জানতে পারবি তোরা? তোরা না দাসী, তোরা না বাঁদী।

অতএব চুপ করে গেছে সকলে।

চামর বীজন করছিল রাজুবালা, বাসন্তী শুয়ে আছে গা এলিয়ে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল রাজু, শরীরে কি হয়েছে মা?

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরে গেল বাসন্তীর, বলল, জানিস নে? ক্ষান্তমণিকে জিজ্ঞেস কর।

চামর ফেলে তখনই গেল না রাজু। কিছুক্ষণ পরে সে নীচে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ও ক্ষান্তমাসি, মায়ের কি হয়েছে গো?

ক্ষান্তমণি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, আহা, নেকি আমার। যেন কিছুই জানেন না।

—সত্যি বলছি জানি নে।

—জেনে কাজ নেই।

রাজু জিজ্ঞাসা করল, জ্বর, না জারি, না পেটের পীড়া।

ফিক করে হেসে ক্ষান্তমণি বলল, পেটের পীড়া।

রাধার বিশ্বাস ভাঙতে চাইনে আমরা। তার যা ধারণা, সেই ধারণা নিয়েই সে না হয় থাক। তার মত দুঃখী আরো যে কেউ আছে এ-কথা তাকে জানালেও তার দুঃখের কোনো লাঘব হবে না। আর, সকলের কথা কি আমরাই জানি। চারদিকে কত অগণ্য অন্তঃপুর আছে, সব অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকারই বা আমাদের কোথায়, সময়ই বা কই।

মনস্থির করে ফেলেছে রাধা। যা থাকে অদৃষ্টে, সে মুক্তি চায় এই পাষাণপুরীর বন্দীশালা থেকে।

বাসন্তীর কথা সে জানে না। কিন্তু সে জানে তার কদম-মাসির কথা, অনেকদিন পরে তার কথা মনে পড়ছে আজ। আর মনে পড়ছে ভামিনীর কথা।

চৈত্রের খরানি উঠেছে, শুকনো পাতা নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে উত্তপ্ত বাতাস, এলোমেলো ভাবে হাওয়া বয়ে চলেছে, গাছের থেকে পা পিছলে যাচ্ছে কাকেদের।

চৈত্রের এটা শেষাশেষি। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমার আর দেরি কত? এবার সে রাজি করাবেই রূপনারায়ণকে, যেমন করে হোক। এবার সে যাবে মাহেশের স্নানযাত্রায়। এভাবে না হলে তার আর মুক্তি নেই।

রূপচরণের মৃত্যুর পর একেবারে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ। এখন শুধু সেই যাচ্ছে না ফুর্তির কাছে, ফুর্তিরা এসে এখন হাজির হচ্ছে তার দুয়ারেই।

তার বিবাহের সময় গেলাসী ঝাড় দিয়ে তার শ্বশুর সাজিয়েছিলেন বাইরের বাগান, এখন সেখানে নিত্য উৎসব লেগে আছে। কখনো কাশীর বাই, কখনো কাশ্মীরী নর্তকী নিয়ে প্রত্যহ মহোৎসব হচ্ছে সেখানে। রোজ রাত্রে নতুন নতুন বিয়ে হচ্ছে বুঝি রূপনারায়ণের। এ কি সহ্য করা যায়, না, সহ্য করতে আছে?

পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছেন তার শাশুড়ি, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায় রাধারাণীও।

নর্তকীদের নূপুরের ধ্বনি এসে পৌঁছয় কানে। আরমানি গির্জায় বেজে যায় রাত-দুটো। তবুও থামে না নূপুর-নিক্কণ। বড় সুমধুর বোলেই বাজে ও-নূপুর, কিন্তু রাধার কানে কি তা মধুর লাগার কথা? সুউচ্চ পালঙ্কে, শুয়ে সে এ-পাশ ও-পাশ করে। ঘুম আসে না দু'চোখে।

তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, এতেও আশা মিটছে না বুঝি কারো, আবার একদিন ডাক পড়বে বুঝি তার। হরিনাথ পুরোহিত এসে আদেশ দেবে—

শিউরে ওঠে সারা গা। জ্বালা করে ওঠে সর্বাঙ্গ। মনে হয়, তার বুকে বাঁশ দিয়ে কারা বুঝি চেপে ধরেছে তাকে জলন্ত আগুনে।

দম বন্ধ হয়ে আসে রাধারাণীর।

পরদিন সকাল না হতেই কানাগিন্নি এসে উপস্থিত হল। কেমন যেন শুকনো মুখ তার, কেমন যেন দুঃখের বেশ।

—কি গো গিন্নি, দেখা পাইনে কেন? এমন সাজ কেন?

কানাগিন্নি নিশ্বাস ফেলে বলল, আর ও-নামে ডেকো না, বৌ। আর গিন্নি না। এখন দাসী।

তাজা চোখটি সজল হয়ে উঠল তার, কানা চোখটির কিনার দিয়েও

জল গড়াল। বলল, দুঃখী মানুষ আমরা। তা বলে ও এমন তাচ্ছিল্যি করতে আছে ?

—কেন, হল কি ? কিছু করেছি নাকি আমি ?

—না গো, তুমি করবে কেন। কত নতুন বৌ আসছে চুঁচড়োয়। তারা ভাবে, আমি বুঝি ভদ্দর ঘরের মেয়ে না। এঁটো কুড়িয়ে খাই খিদের জ্বালায়, তারা তা বোঝে না।

—কি হয়েছে বল।

কিছু বলতে চায় না কানাগিন্নি। কিন্তু কষ্টের কারণ তার আছে। পালেদের বাড়িতে নতুন বৌ এসেছে, তারা চেনে না কানাগিন্নিকে—ভেবেছে বুঝি সে ভিখিরি। তেমনি ব্যবহারই করেছে তার সঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়েছে, দক্ষিণদুয়ারি ঘরের রোয়াকে বসেছিল কানাগিন্নি। ছোট বৌ তর তর করে ওপর থেকে নেমে এসে মেজ জাকে ডেকে বলে উঠল, ও মেজদি, কাঙালিনীকে বিদায় কর। কানাটা ওখানে বসে আছে কেন, এ কি অলুক্ষুণে কাণ্ড।

কথা শুনেই উঠে দাঁড়াল কানাগিন্নি। বলল, কাঙালি আমি নই গো নতুন-বৌ। অমন কথা বলো না।

নথ সুদ্ধ মুখঝামটা দিয়ে উঠে প্রায় তেড়ে এল সেই ছোট বৌ, বলল, আমরা বাগবাজারের মেয়ে, কে কাঙালি, কে ভিখিরি, কে চোর সব চিনি।

—কি বললে ?

ওপর থেকে শাশুড়ি বললেন, কাকে কি বলছ ছোট বৌ ?

ছোট বৌ গলাটা মিহি করে নিয়ে বলল, চোরকে চোর বলছি, মা।

আর দাঁড়ায় নি কানাগিন্নি। বুঝতে পেরেছে, এখানে নতুন মানুষেরা আসছে এখন, এই পুরনো লোকটাকে তারা চিনতে পারবে না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, রাতটা হালদারদের আঙিনায় কাটিয়ে ভোর হতেই ছুটে এসেছে এই রায়-বাড়িতে।

কানাগিন্নির মনের অবস্থা ভালো না। বুঝতে পারল রাধা। তাই তাকে বলল, ও গিন্নি ! অমন মুখ করে বসে থাকলে ভালো লাগছে না। সেই যে তুমি নেচেছিলে একবার, অমনি নাচ দেখার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কত-দিনের কথা হয়ে গেল। কাশীর বাই এসেছে, কাশ্মীরের নাচিয়ে এসেছে, জান না ? না হয়, গাও। ষড়েশ্বরীর সেই গানটা, গানের কলিগুলো জানো তো ?

—জানি। কিন্তু নাচ-গান আর আসছে না বৌ। এ রাজ্যি এখন আর আমাকে চায় না।

আর কোনো কথা বলে নি, চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ উঠে সেই-যে সেদিন চলে গিয়েছে কানাগিন্নি, আর আসে নি এ-বাড়িতে। হালদার-বাড়িতেও নাকি আর যায় নি। তবে গেল কোথায়।

কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। চুঁচুড়ার ত্রিসীমানায় তাকে আর দেখে নি কেউ, হয়তো আর কোনোদিন দেখতেও পাবে না। চুঁচুড়াকে কানা করে দিয়ে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে কানা-গিন্নি।

কিন্তু চাঁপা আসে। নিত্যই আগমন ঘটছে নিয়মিত। চাঁপার মনে এখন বেশ আনন্দ। এতদিনে তার বৌদির সুমতি হয়েছে, এতদিনে মনস্থির করতে পেরেছে সে।

চাঁপা বলল, হ্যাঁ বৌদি। তাই জানাও দাদাবাবুকে। মাহেশের স্নান-যাত্রায় চল। তারপর তো আমি আছি।

কে আছে, কে না আছে—অত হিসেব দিয়ে কোনো কাজ নেই রাধারাণীর। চম্পা নাপিতানি যার নেই, তার জীবনে কি মুক্তি আসতে নেই ? এই নরকযন্ত্রণার থেকে আসল নরকে ঝাঁপ দেওয়া অনেক ভালো—এ-বিষয়ে রাধার আর কোনো ভুল নেই।

চাঁপা চেয়ে দেখে লক্ষ্মীরা ঘরে আছে কি না। নেই তারা। চাঁপা-গলায় বলে, অনেক সুখে থাকতে পারবে বৌদি। মাথায় মুকুট করে রাখবে, চোখের মণি করে রাখবে। যা চাইবে তাই পাবে। বুঝেছ ?

রাধা চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে একটু অধৈর্য গলাতেই যেন বলল, তবে আবার স্নানযাত্রার জন্য অপেক্ষা করা কেন, একদিন পালিয়ে গেলেই হল।

—তা হল বটে। কিন্তু সেটা যে হল

কত না দ্রব্য রয়েছে সাজানো
আমাদের বিপণীতে,
শুভ বৈশাখে হোক আগমন
দু'হাত ভরিয়া নিতে ॥
নেপাল শঙ্কর ষ্টোর্স
৮৫, বাসবিহারী এভিনিউ · কলিকাতা-২৬
ফোন ৪৩-৪৪২৫
॥ কাঁচ, চীনামাটি ও ষ্টেনলেশ ষ্টীলের বাসন বিক্রেতা ॥

পালানো। তাতে কত কেচ্ছা কত কেলেঙ্কারি, খুঁজে বের করার জন্যে কত পুলিশ, কত দারোগা, কত চৌকিদার, কত লেঠেল লেগে যাবে। অমন ঝক্কি নিতে রাজিও হবে না গো কেউ।

—তার নামটা বল চাঁপা। তার পরিচয়টা শুনি।

—সে কথা এখন না বৌদি। ঠিক জায়গায় তাকে পাবে, ঠিক সময় তার পরিচয় জানবে।

চাঁপার চটক যেন বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যেই। রায়-বাড়ির বৌকে নিয়ে এখন কারবার তার, এ-কাজে পাওনাগণ্ডাও মোটা। এ তো যেমন-তেমন বৌ না, রূপে চন্দননগরের সেই গাঁদি বিবিকেও হার মানিয়েছে নাকি গাঁদিকে কারা ফারা দেখেছে কে জানে, কিন্তু সবার মুখে ঐ কথা। কচি বৌ যেজে যখন এসেছিল, তখন রূপ ছিল এক রকম, গাঁদার কুঁড়ির মত; এখন রূপ যেন ফুটন্ত গাঁদা—ওরই পাপড়ির মত অঙ্গের রং, মুক্তোর মত দাঁতের পাঁতি, হরিণের মত টানা দুটি চোখ। আর কিসের মত কি ভাবতে পারে না চম্পা মাপিতানি। এর দাম যে অনেক, সোনা দিয়ে এই সোনার অঙ্গ ওজন ক'রে দাম দিতে হবে এর। তেমনি দামই আদায় করবে চম্পা। চটক তাই বেড়ে গিয়েছে তার।

লেগে থাকলে মেগে খায় না—কথাটা খুবই সত্যি তাহলে। দশ বছর ধরে সে লেগে আছে যার সঙ্গে, তাকে সে বুঝি হাত করতে পেরেছে এতদিনে। এতদিনে সুমতি হয়েছে রাধা-বৌদির।

চৈত্রের সংক্রান্তি এসে গেছে প্রায়। গাজনের সন্ন্যাসীরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছে। বাবা তারকনাথের জয়ধ্বনি উঠছে চারদিকে।

সন্দেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখের চত্বরে বসেছে চড়কের গাছ; সেখানে লোক জমে উঠছে ক্রমশ, হোগলার ছাউনি পড়ছে—মেলা বসবে।

এখান থেকেই শোনা যায় কলরব। দিন যতই ঘনিয়ে আসছে সন্ন্যাসীদের আর্তস্বর বাড়ছে ততই। কাতারে কাতারে লোক আসছে মেলায়। সন্দেশ্বরের মন্দির বুঝি ঢেকে যাবে লোকের ভিড়ে।

চাঁপা এল ছুটে, তুলসীর মালা কিনেছে মেলা থেকে। সে-মালা গলায় জড়িয়ে সে এসে দাঁড়াল রাধার সামনে।

হেসে ফেলল, রাধা, বলল, এ কি সাজ আবার চাঁপা।

—না বৌদি। সংসারটা বিষম জায়গা। এখানে শুধু শঠের আর লম্পটের রাজ্য। বৈষ্ণবী হয়ে যাব ঠিক করেছি।

কান পেতে শুনতে লাগল রাধা, চুপ করে থাকে।

যেন নতুন কথা শুনছে সে, বলল, হঠাৎ টের পেলে কেমন ক'রে।

—ঐ যে গো ঐ মেলায়। দলে দলে মানুষ এসেছে। তারা তীর্থ করতে এসেছে ভেবেছ? মাগীগুলোর কি ছেনালিপনা, দেখলে ঘেন্না লাগে। আর ব্যাটাছেলের কী হ্যাংলামো, মেলায় এসেছে সব এক মতলবে—মাদুর, মদ আর মেয়েমানুষ।

রাধা যেন বদলে গেছে অনেক, খিলখিল করে হেসে উঠল গা দুলিয়ে, বলল, তাহলে সত্যিই তুই বৈষ্ণবী হয়ে যাবি?

—চেষ্টা তো করি। তুলসীর মালা পরলাম, এর পর তেলক আঁকতে আরম্ভ করব।

যেন অমনি বৈষ্ণবী হয়ে যাবে চম্পা নাপিতানি। রঙ্গ করে করে সে বলতে লাগল রাধাকে। বলতে লাগল, রাধারও জীবনের বদল আসছে চাঁপারই বা আসবে না কেন। বদলাতে হয় সকলকেই। বদল না হলে কি জীবনে আস্বাদ পাওয়া যায়?

চড়কের মেলার প্রাঙ্গণ থেকে হল্লার শব্দ ভেসে আসে, তার সঙ্গে শব্দ আসে হুগলী নদীর জলকল্লোলের এবং আরমানি গির্জার ঘণ্টাধ্বনির। সন্দেশ্বরের চোখের ঘুম বুঝি পালিয়েছে, এত হৈ-চৈ এর শব্দে দেবতার চোখেই কি ঘুম আসে? আর, এখানেও ঘুম আসে না রাধার চোখে, বাইরের ঐ বাগান থেকে মৃদঙ্গের শব্দ আসছে।

রাধার বুকের ভেতরটা কাঁপে বুঝি থরথর করে—ওই-যে চৈত্রের খরানিতে নিমগাছের কচি পাতাগুলো যেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে, অবিকল তেমনি।

কলঙ্কের কালি লেপে দিতে সাধ হয় রূপনারায়ণের মুখে, তার অহংকার চূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে হিংস্র হয়ে ওঠে রাধারাণী মনে মনে। কিন্তু হিংস্রতা প্রকাশ করে না সে।

দিন কেটে চলেছে একে একে। দশমীর রাত্রি আজ, জ্যৈষ্ঠের দশমী রাত্রি, পূর্ণিমার আর ক'টা দিন বাকি? আঙুলের কড় গোণে রাধা।

চাঁপা বলল, ওকি বৌদি নাম জপছ কার? সন্ধ্যা করছ, না, আহ্নিক করছ? তুমিও কি বৈষ্ণবী হয়ে যাবে না কি বৌদি?

চোখ দুটো একটু বড় করে তাকালো রাধা, বলল, না রে। আমি হব ভৈরবী। শক্তির সাধনা করছি আমি।

তা বটে। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে রাধা। দয়া করে রূপনারায়ণ যদি একবার পদার্পণ করে এই কক্ষে, তাহলে সে তার আবেদনটি পেশ করবে।

হৃদয়বালার হাত দিয়ে রাধা লিপি পাঠালো রূপনারায়ণের কাছে। প্রশস্ত ফরাসের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সে তখন পানদানি থেকে আলগোছে পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলছে। ফরাসের অপরপ্রান্তে এক চাপ মাংসের মত জড়ো হয়ে পড়ে আছে কি ওটা? কাশীর বাইটা বুঝি?

(ক্রমশঃ)

# উৎসবের শেষে

দিলীপ মিত্র

ডিসেম্বর কুসুম সূর্য আর একটু পরেই ডুবু ডুবু হবে। তার শেষ আলোর টিপ এক সময় কাজলের রূপ নিয়ে হারিয়ে যাবে চারদিকে।

ওরা দুজনেই গঙ্গার ধারে এসে বসল। এ জায়গাটা মোটামুটি নির্জন। দু'একজন কুলি-কামিন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ছেলেটি মেয়েটির গা ঘেঁষে বসল। ওর শাড়ির আঁচল হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে।

ছেলেটির নাম জয়ন্ত। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলল, এই নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে আমি বড্ড বেমানান, না?

মেয়েটি কোন কথা বলল না, শুধু হাসল, ওর মুখে পুরু করে পাউডারের প্রলেপ লাগানো, পরণেও ঝকঝকে শাড়ি।

মাঝ নদীতে একটা স্টীমার ভোঁ---ও---ও, এক ধরণের একটানা শব্দ করে থেমে গেল।

সন্ধ্যার প্রদীপ শিখা আকাশের দুয়ারে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে, ছাই রঙের ধোঁয়াটে টেনে প্রকৃতি এখন খানিকটা ক্লান্ত। যেন এতক্ষণ ধরে দীর্ঘ সংলাপ বলে বলে অবসন্ন।

জয়ন্ত আরেকটা সিগারেট ধরাল।

—দীপঙ্করের কথা ভেবে এই মুহূর্তে আমার হাসি পাচ্ছে, বোকা। একদম বোকা, ও কি কোনদিন জানতে পারবে যে তুমি আর আমি প্রায়ই—

জয়ন্তর মুখের কথা শেষ হল না। ও তাকিয়ে দেখল কাবেরীর চোখ দুটো মাঝগঙ্গায়। একটা স্টীমার জলের মধ্যে ভূমিকম্প তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।

—কি ভাবছ তুমি?

—কি আবার ভাবব! কাবেরী হাসল।

—দীপঙ্করের কথা? জয়ন্ত অনেকটা বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল।

কাবেরী এবার কোন কথা বলল না। শুধু নিঃশব্দে হাসল।

ওর পরণের দামী শাড়িটা এখনও জয়ন্তর অধিকারত্বকে সগর্বে ঘোষণা করছে। কিছুক্ষণ আগে দুজনে পাশাপাশি বসে একটা সস্তা ইংরেজী ছবি দেখেছে।

—চল, ওঠা যাক। এখানে আমার ভাল লাগে না। কাবেরী ওপর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসকে চেপে রাখল।

—কেন, এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখতে তোমার ভাল লাগে না? আগে তো তুমিই বলতে আমার এক-এক সময় নদীর ধারে একা চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কথা বলে জয়ন্ত আরও ঘন হয়ে বসল, কাবেরীর হাত দুটো নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। বড্ড ঠাণ্ডা মনে হল।

অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে। দূরের হাওড়া ব্রিজের উঁচু লাল বাতিটা রক্তচক্ষুর মত দপদপ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে নদীর চেউ-এর শব্দ কাবেরীর মনটাকে চমকে দেয়।

কাবেরীর মনে হল, বোকাই তো! সত্যি বড় বোকা সে। শ্রদ্ধা, প্রেম, মন—কথাগুলো ভাবতেই ওর মনে হল, কতকগুলো বিষের তীর বুকের মধ্যে যেন কোন অদৃশ্য তীরন্দাজ বারবার ছুঁড়ে মারছে।

এই মুহূর্তে সে যদি কোন হোটেল, কফিহাউস কিংবা কোলাহলমুখর রাজধানীর পথে হাঁটত, তাহলে বোধহয় মনের মধ্যে এই রক্তাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হত না।

জয়ন্ত হেসে বলল, দীপঙ্করের

সঙ্গে তোমার কোন কথা হয় না? আমি যেভাবে—

ও, নীচের ঠোঁট কামড়ে পশুর মত হাসছিল।

—কি কথা বলছ না সে?

তারপর যুদ্ধজেতা জেনারেলের মত হেসে বলে, হি ইজ এ কাওয়ার্ড। একটা ভীরু, ভাল ছেলে। আমার করুণা জাগে এক-একসময় ওর জন্য।

কাবেরী এবারও হাসল। স্বভাবতই খুব কম কথা বলে। ও নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

—চল, ওঠা যাক। আর ভাল লাগছে না। চা-পাব।

কাবেরীর গলার স্বরে উঠে পড়ার তাড়া। জয়ন্তও উঠে দাঁড়াল। তারপর ওরা দুজনেই একসঙ্গে হাঁটতে থাকে রাজপথ ধরে।

কালো মৃত সাপের দেহের ওপর পা রেখে ওরা কথা বলতে বলতে এগোয়। দূরে লিপটন মানেই ভাল চা'র বিজ্ঞাপন একবার জ্বলছে আর নিভছে। মাঝে মাঝে ভদ্রবেশী মানুষ বাঁকাচোখে কাবেরীকে দেখে নিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে জয়ন্ত ভাবে, এ সময় যদি কোন প্রকারে একবার দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা হত! আঃ, তাহলে খুব মজা হত! আদর্শ প্রেমিক প্রবরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম সবকিছু।

বলতাম, প্রভু যীশুখৃষ্ট! এই যা দেখছ, এরই নাম লভ। বাংলা ভাষায় কাব্য করে যাকে বলে প্রেম। নাথিং বাট এ বায়োলজিক্যাল নেসেসিটি। আর সবচেয়ে বড় কথা সিলভার টনিকে স-ব কেনা যায়। এভরি থিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড! এমন কি তোমাদের মত নির্বোধরা যাকে 'হৃদয়' বলে, সেই মহামূল্য বস্তুটিও।

বন্ধুদের কাছে কয়েকদিন আগেও জয়ন্ত গল্প করেছে এসব নিয়ে।

—জানিস, দীপঙ্করের দেবীকে তো আমি অলরেডি---

কথা বলতে গিয়ে রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত জিভ চাটছিল জয়ন্ত। যেন এইমাত্র রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা সবকিছুর স্বাদ উপভোগ করে এল।

চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক তুলে বলেছিল, আরে, কত দেখলাম এ জীবনে। খুব বড় বড় কথা বলত দীপঙ্কর। কত শ্রদ্ধা, কত প্রেম, কত বিশ্বাস! হু! হু! হু!

জয়ন্তর হাসি যেন ব্যঙ্গের চাবুক মারছিল অদৃশ্য দীপঙ্করকে।

—বুঝলি, হোপলেস্‌টা কতদিন বলেছে আমাকে, না, ও একটু অন্য জাতের মেয়ে। চীপ্ নয়। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। খুব গভীরতা আছে ওর।

—তা, গভীরতা আছে বৈকি। এক-ধরণের অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল জয়ন্ত। বন্ধুরা সব হো হো করে হেসে উঠেছিল।

সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে জয়ন্ত বলেছিল, এখন তো ওর সামনেই কাবেরীকে নিয়ে বেড়াব। চ্যাম্পিয়াজি করব। প্লাসে, ওই আইডিয়াল প্রেমিক প্রবর পারে মেয়েদের মন? ওদের পেতে হলে শুধু কতকগুলো ট্রিক্‌সের দরকার। জালে ফেলে ধীরে ধীরে জাল গুটোব। প্রেম করতে এসেছেন মহাপ্রভু। বোজগার তো যা করিস সে সবাই জানে। একটার বেশি ভাল জামা জোটে না।

অন্য একজন বন্ধু বলেছিল, দীপঙ্কর কিন্তু কাবেরীকে সিরিয়াসলি ভালবাসে। শ্রদ্ধাও করে। এর বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ওর সামনে কাবেরীর নিন্দে করলে খুব আঘাত পায়।

—কিন্তু এ ধরণের বোকা ফিলিংস-এর কে মূল্য দেবে বল? আহা, আমি তোমাকে মন দিয়েছি। মন কি হাওয়ার ওপর ভাসে? তারও একটা অবলম্বন চাই।

অন্য একজন বলেছিল, ওর দেবী কি বলে ওঁর সম্বন্ধে জয়ন্ত?

—কি আর বলবে? মেয়েরা ওসব আদর্শ প্রেম-ট্রেম চায় না। ওরা পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চায় লতার মত। দীপঙ্কর সম্বন্ধে কিছু বললে, ও কোন জবাবই দেয় না। শুধু হাসে, সি ফিস নো ইনট্রারেস্ট? কোন চিন্তাও করে না ওর সম্বন্ধে।

সামনে একটা ট্রাম পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরঘর শব্দ করে আবার চলে গেল এঁকে বেঁকে।

জয়ন্তর এতক্ষণের চিন্তায় যেন বাধা পড়ল। দ্যাখে, কাবেরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ট্রামের লাল আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লাল আলো, নীল আলোর বিজ্ঞাপনের শূন্য পেয়ালার চা আবার ভরে উঠেছে।

—চল, কাফে দ্য মনিকো-তে বসি গিয়ে।

জয়ন্তর পিছু পিছু কাবেরীও এসেছিল। একটা কেবিনে বসল দুজনে। বয় পর্দাটা টেনে দিয়ে অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

নদীর ধার থেকে পালিয়ে এসে কাবেরী যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চা, পেয়ালা, পিরিচের মিলিত কোরাস সুর মাঝে মাঝে উঠছে। কাঁটা, চামচ, ছুরি, প্লেটের যৌথ সঙ্গীত বাজছে কানের মাঝে। উর্দিপরা বেয়ারা, আলোর রহস্যে ভরা এই রেস্টুরেণ্ট, এ যেন অন্য এক জগৎ।

অনেকক্ষণ ধরে চলবে মিলিত অভিনয়। তারপর অভিনয় শেষে নায়ক-নায়িকা, সাইড ক্যারেক্টার —সবাই ক্লান্ত হয়ে যার যার ঘরে ফিরবে ভিন্ন ভিন্ন পথে।

—এত রাত হয়। তোমার বাড়িতে কিছু বলে না?

এক টুকরো মাংসের হাড় চুষতে চুষতে জয়ন্ত তাকায় কাবেরীর দিকে। ও কোন জবাব দিল না কথাটার। চোখে জল।

—উঃ, বড্ড ঝাল লাগছে। কাবেরী ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা জল খেল।

দু'ফোঁটা মুক্তোর বিন্দু টপ টপ করে ওর গাল বেয়ে নামল।

কাবেরী তখনও উঃ, আঃ করছিল।

জয়ন্ত দেখছিল কাবেরীকে। পিঠের দু'পাশে ঝোলানো বেণী। গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের মত। বাবুই পাখির বাসার মত শান্ত দুটি বড় বড় চোখ। প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েটিকে বড় নিষ্পাপ লাগে!

জয়ন্ত ভাবল, কাবেরীর এই সৌম্য, শান্ত, প্রার্থনার মত রূপই কি তাহলে দীপঙ্করকে মুগ্ধ করেছে? পাগল করেছে! কাবেরীর গালের ধুলোকে নিজের হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে মনে মনে বোধহয় দীপঙ্কর বলেছে—আমি ধন্য!

—দীপঙ্করের সঙ্গে কোনদিন তুমি খাও-টাও নি?

জয়ন্ত আবার বোকার মত কথা বলে হাসল।

—আমি ওর সঙ্গে কথা বলি?

—কেন বল না?

—বলি না।

—বয়কে ডাকো। আরেক গ্লাশ জল দিক আমায়। কাবেরী কথাটা বলে বাইরের দিকে তাকাল, যেন বয় এক্ষুণি আসবে।

জয়ন্ত হাসল।

—ওঃ, তোমাদের সব কথা বুঝি চোখে-চোখে। মনে-মনে?

বয় এসেছিল। কাবেরী জল খেল। রুমাল দিয়ে সযত্নে মুখ মুছে ব্যাগটায় পুরে রাখল।

তারপর আরও অনেকক্ষণ ওরা দুজনে একই রেস্টুরেণ্টে কাটিয়েছে। গল্প করেছে। হেসেছে। বাড়ি ফেরার সময় জয়ন্ত কাবেরীকে বাসে তুলে দিয়ে হাত নেড়েছে।

বাসে ওঠার আগে জয়ন্ত বলল, কালকে বাস ষ্টপেজটার তলায় সাতটার সময় এসো। আমি থাকব।

কাবেরী মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়েছে।

বাসের জানলার ধারে বসেছিল কাবেরী। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ভিড়টাও কম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল।

আলোর বিন্দুগুলো অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা অন্তর সারি সারি দাঁড়িয়ে। আকাশে কয়েকটি তারা, অন্ধকারের মধ্য থেকে গাছ-গাছালিগুলো হাওয়ায় মাথা নাড়ে, যেন না, না ভাব!

—টিকিট।

—কারো কাছে পয়সা একটা।

পয়সা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল কাবেরী।

—টিকিটটা।

—ও, হ্যাঁ। হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিয়ে কাবেরী আবার বাইরের দিকে তাকাল।

—ভাল আছো, তোমার পরীক্ষা কবে?

—সামনের মাসে।

—টিকা নাও নি তুমি? খুব পক্স হচ্ছে এ-পাড়ায়।

—না। আমার মরণের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ওঃ!

কাবেরী চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর ডাকল।

—কিন্তু একটা কথা—

—কোন কিছু আর শোনার নেই। যে আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করে—

—সন্দেহ যদি কিছু করে থাকি, সেটা ভালবাসারই প্রকাশ। আমাকে ক্ষমা করো। তুমি তো জান—

দীপঙ্করের ভেজা ভেজা গলার স্বরটা যেন এখনও স্পষ্ট করে বাজছে কানের মধ্য দিয়ে বুকের মাঝে।

—কাবেরী।

ধরা গলায় ডেকেছিল দীপঙ্কর। কিন্তু কাবেরী শোনে নি। গটগট করে চলে গিয়েছিল পাশ দিয়ে।

কয়েকদিন ধরে কাবেরী জয়ন্তর সঙ্গে ঘুরেছে। বেড়িয়েছে নানা জায়গায়। নানাজনের মুখ থেকে ঘটনাটা দীপঙ্কর-এর কানে গেছে।

কাবেরী মনে মনে ভেবেছে, যাক কানে। আমার যা ইচ্ছে তাই করব। কেউ আঘাত পেলে এতে, বয়ে গেল আমার।

কাবেরীর সঙ্গে এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত দীপঙ্কর কথা বলে নি। ফিরেও তাকায় নি। ইচ্ছে করেই দূরে সরে থেকেছে।

কিন্তু কাবেরীর আরেকটা মন সব লক্ষ্য করেছে। দীপঙ্করের বিষণ্ণ মুখ। করুণ কোমল, সর্বস্ব হারানো চাউনি।

এই মুহূর্তে বাসের মধ্যে দীপঙ্কর যেন সব হারানো চাউনি নিয়ে ধরা গলায় ডাকছে, কাবেরী।

ওর দু'চোখ যেন বলছে, বড় নিষ্ঠুর তুমি। আমি হলে কিন্তু এমন করতে পারতাম না। তুমি আঘাত পাও, এমন কোন কাজ—

কাবেরী যেন মনে মনে দীপঙ্করের কথার জবাব দিল। আমি কি করব তার? মেয়েরা ভালবাসায় দ্বিতীয় সইতে পারে না। তুমি তোমার আইডিয়া নিয়েই থাক। পারবে আমাকে তুমি, তোমার করে নিতে? সে সাহস তোমার নেই।

দীপঙ্কর যেন অসহায় চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর সামনে।

বলছে; বোঝ তো আমার অবস্থা। আমাকেই বা তুমি সহানুভূতি দিয়ে বুঝবে না কেন?

অদৃশ্য দীপঙ্করের কথা শুনে কাবেরী মনে মনে বলল, তোমার মত লোক কোনদিন নারীকে কাছে পাবে না। তুমি ভালবাসবে, তোমার কল্পনার মানসীকে। আমি শুধু তোমার কল্পনার মানসী নই। রক্ত-মাংসের নারীও।

—গড়িয়াহাটার মোড়। তাড়াতাড়ি করুন। ছাড়ুন।

বাস কণ্ডাক্টারের গলার স্বর শুনে তাড়াতাড়ি নেমে গেল কাবেরী। বাস কণ্ডাক্টার মিনমিনে গলায় বলল, এতক্ষণে খেয়াল হল।

এরপর একদিন দল বেঁধে জয়ন্ত আর কাবেরী মাঝগঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে ফিস্ট করেছে। সমস্ত দিন জুড়ে মাইকে সস্তা হিন্দী গান হয়েছে। কয়েকজন ছেলে তালপাতার টুপি পরে 'দিল দেকে দেখো' নাচ নেচেছে। তাস নিয়ে জুয়ো খেলেছে জয়ন্তরা। সঙ্গে আরও দু-একজন মেয়েও ছিল। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে থাকলে, তাদের বলতে সুবিধে হয়। সঙ্গে তো অন্য মেয়েও ছিল। আমি তো একা ওর সঙ্গে যাই নি।

সারাদিন সবাই আনন্দে মত্ত ছিল। কাবেরী রান্নাবান্না করেছে। কখনও ডুগিতবলা বাজিয়েছে। তাস খেলেছে পুরুষদের সঙ্গে।

সন্ধ্যার শেষ আলো খাঁচল বিছোতেই দলটাকে আসর গুটোতে হল। নৌকোর গলুইয়ে ফুলঝুরি পড়ছিল, কয়েকটা দিশী বাজিও পুড়ে পুড়ে একসময় শেষ হয়ে গেল। বাজি পোড়ার পর খানিকটা ধোঁয়া শূন্যে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের সঙ্গে।

দলের অনেকে তখন নৌকো ভাড়া করে যার যার সঙ্গী নিয়ে ঘুরছে। কিছুটা বেড়িয়ে যার যার ঘরে ফিরবে।

জয়ন্ত বলল, এসো একটু বেড়াই। তোমাকে ঠিক টাইমে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেব।

কাবেরী কোন আপত্তি করল না। জানে, বাড়িতে কিছু বলার নেই কেউ।

চারিদিক এখন কেমন যেন শান্ত।

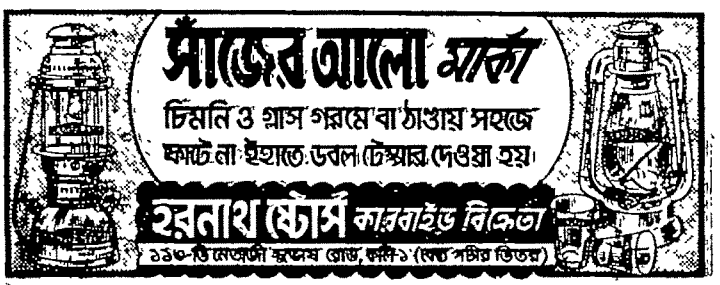

দূরের গাড়ির শব্দকেও বেমানান লাগছে না। যেন ওই শব্দটুকু এই অন্ধকার নদীর নূপুরধ্বনি। মাঝ নদীর নৌকোর লোকজনের কথা-বার্তাকেও প্রেমিক-প্রেমিকার অস্ফুট সংলাপ মনে হয়।

মাঝি নৌকো বাইছে। কাবেরী আর জয়ন্ত পাশাপাশি। তির-তির করে শব্দ উঠছে নৌকোর গা থেকে জলের স্পর্শে।

দূরের সীমাহীন অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল কাবেরী। মাঝে মাঝে আলোর বিন্দুগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কাবেরীর বুক থেকে।

মনের জানলার পর্দা তুলে সেই সুন্দর ছবিটা যেন নির্জন অন্ধকারের সুযোগে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাবেরী।

ডাক শুনে ওর বুকের ভেতর থেকে যেন কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছিল। এতক্ষণ এতো কিছুই মনে পড়ে নি। কাজের চাপে সেই ছবিও সামনে আসার সুযোগ পায় নি।

উঃ, মুখ দিয়ে খানিকটা হাওয়া বের করে দিল কাবেরী। ওর মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির আয়নায় মুখ রেখে কেউ যেন এই নীরবতার সুযোগে বার বার ওকে বলছে, কাবেরী, এই যে আমি। তোমাকে ভুলে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুযোগ পেলেই বার বার আমি তোমার কাছে এমনি করে আসব। যতই তুমি আমার মুখকে তোমার আয়না থেকে সরিয়ে রাখতে চাও।

অন্ধকারের দিকে মুখ রেখে কাবেরী বসেছিল।

মাঝে মাঝে জলের ঘূর্ণি উঠছে। কাবেরীর মনে হচ্ছিল, নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে এই অন্ধকার নদীর বুকে মাথা রেখে নিজের বুকের জ্বালা জুড়োয়।

জয়ন্তর হাত দুটো এই অন্ধকারে পাথর থাবার মত হয়ে আছে।

কাবেরীর ইচ্ছে করছিল, এই নিস্তব্ধ নদীর ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে, আমাকে বাঁচাও।

জয়ন্ত হাত দিয়ে কাবেরীকে আরও একটু কাছে টেনে নিতে চাইছিল। ওরা দুজনেই নৌকোর ধারে বসেছিল। কাবেরী একটা ধাক্কা দিয়ে জয়ন্তর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, এই পরিবেশে তোমার মনে এসব আসে? সরো—

বিরক্তভরা গলার স্বর কাবেরীর।

জয়ন্ত টাল সামলাতে না পেরে বলছিল, তুমি আমাকে এই অন্ধকার নদীর মধ্যে ফেলে দিতে চাইছ?

—বাঃ বাঃ, তোমার কথার কি ছিরি।

জয়ন্ত রেগে বলল, জানি, জানি। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বা নির্জনতার মধ্যে একাকী থাকলে তুমি কার কথা ভাব। আমি বোকা নই।

কাবেরী চুপ করে রইল। ওর মুখ তখনও সেই অন্ধকার প্রকৃতির দিকে।

জয়ন্ত মাঝিকে বলল, নৌকো ঘোরাও, এবার ফিরব।

মনে মনে ভাবল, এখানে এই নির্জন পরিবেশে তোমাকে এনে ভুল করেছি। আর কোনোদিন চুপচাপ থাকতে দেব না তোমাকে। সব সময় আনন্দে, গানে ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করব, নইলে নির্জনতার সুযোগে—

দাঁতে দাঁত ঘসছিল জয়ন্ত।

তীরে এসে একসময় ভাবল, আসলে বোকা সে নিজেই।

একটা সময় সবকিছু শান্ত হয়ে আসবে, যখন উৎসবের সমস্ত বাতি নিভে যাবে। সেই অন্ধকারের সমুদ্রে কাবেরী ডুবে থাকবে একা-একা।

সেখানে যে আরেকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জয়ন্ত। নিষ্ঠুর প্রকৃতির আড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকজনের আশ্রয়-পাওয়া চোখ।

জয়ন্ত অনুভব করল, যতই সে চেষ্টা করুক, উৎসবের শেষের অন্ধকার সমুদ্রের গভীরে ও কোনদিন পৌঁছতে পারবে না।


কেশের পরিচর্য্যায় সিংহ মার্কা নারিকেল তৈল

বাজারে সুগন্ধি এবং গন্ধছাড়াও বহু তেল পাবেন, কিন্তু কেশ-চর্চ্চায় অপরিহার্য্য বিশুদ্ধ তৈল বলতে বুঝায় বহু পরীক্ষিত "সিংহ মার্কা" নারিকেল তৈল।

হিন্দুস্থান কোকোনাট অয়েল মিল
সাঁইথিয়া, বীরভূম

# রক্তকরবী ও তাসের দেশ এবং একটি প্রবন্ধ

অধ্যাপক উত্তর দিচ্ছে—

অধ্যাপক

'আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে নাব মুঠোর মধ্যে।'

এক জায়গায় রাজা বলছে—

নেপথ্যে

'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না।'

এখানে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে অভিব্যক্তিবাদী প্রথায়। ধনতন্ত্র পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ যে শক্তি অর্জন করতে ব্যস্ত, তাই বোঝা হয়ে ক্রমাগত তাকে পিষে ফেলছে।

যান্ত্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মানুষের সৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষমতা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায় এবং যান্ত্রিক মানুষ সব কিছুরই মূল্য ঠিক করে বাস্তব উপযোগিতা অনুসারে। তাই বিশু বলছে—

বিশু

'যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরেও অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়। এইটিই সর্বনেশে।'

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন সময়েই যন্ত্র-বিরোধী ছিলেন না। যান্ত্রিকতার সহায়তায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে অসাম্য ও পীড়নের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যান্ত্রিকতার বিকৃত ভয়াবহ রূপটাকেই তিনি কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন।

'রক্তকরবী' নাটকে তদানীন্তন রাষ্ট্র-শাসনের ভয়ঙ্করী রূপটাকেও অতি সুস্পষ্টভাবে কবি উদ্ঘাটিত করেছেন। বিশেষত পরাধীন ভারতে বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর পাশবিক শাসনের নারকীয় স্বরূপটি ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত

## শিলালি

হয়েছে নানা দৃশ্যের ভেতর দিয়ে। শাসকদের নানা পর্যায় আছে—সবার ওপরে রাজা—তারপর ক্রমে ক্রমে, বড়, মেজ, ছোট সর্দার—আরও আছে মোড়ল, গুপ্তচর প্রভৃতি। আছে প্রপাগ্যাণ্ডার ব্যবস্থা।

'রথের রশি' নাটকটিও প্রধানত অভিব্যক্তিবাদী। কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিবর্তিত রূপের একটা চমৎকার ইতিহাস অভিব্যক্ত হয়েছে এই নাটকে।

আমাদের সমাজজীবনের যে ভাষ্য কবি এ নাটকটিতে দিয়েছেন, তা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকেরই মনের তারে গিয়ে ঘা দেবে।

নাটকটির মূল বক্তব্য হলো—কালের রথ অচল হয়েছে। কারণ কালের সঙ্গে তাল রেখে জীবন আর এগিয়ে আসতে পারছে না। যারা এতকাল এই রথ চালাচ্ছিল, তারা বিকৃতভাবে কালের ব্যবহার করেছে বলেই কালের অগ্রগতিতে বাধা পড়েছে—জীবনের সঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটেছে। শূদ্রের দলকে অপাংক্তেয় করে রাখবার ফলেই ঘটেছে এই মহাসর্বনাশ। সেই জন্যই যেই শূদ্রেরা এসে রথের রশিতে হাত দিল, অমনি ঘটল বিকৃত অবস্থার অবসান এবং মহাকালের রথ পুনরায় সচল হলো।

'তাসের দেশ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের আর একটি সেরা অভিব্যক্তিবাদী নাটক। জর্জ কাইজারের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মত এ নাটকের চরিত্রগুলিও নামহীন, এবং অবাস্তব —রবীন্দ্রনাথি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভি-ব্যক্তিবাদী।

'The Expressionist dramatist is not concerned with depicting life as it reveals itself to his senses. He is not interested in verisimilitude. He exaggerates and generalises in order to convey his 'idea.' He defines the stage as a 'magnifying glass.'

( Samuel & Thomas )

নাটকটির বাইরে দেওয়া রয়েছে একটা ব্যঙ্গ-কৌতুকের আবরণ—ভেতরে রয়েছে তত্ত্ব। শুষ্ক নিয়মানু-বর্তিতা সর্বনাশের পথে নিয়ে যায় এবং মানুষকে মৃতকল্প করে ছাড়ে। এ যেন আমাদের সনাতনপন্থী নির্জীব, অলস, বিশেষত্বহীন, পরিবর্তন পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষকেই কবি 'তাসের দেশ'-এর ভেতর দিয়ে দেখিয়েছেন। আবার এই তত্ত্বই বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে 'ফাল্গুনী' 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকে এবং নানা কবিতায়, অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে। 'তাসের দেশ'-এর বেশির ভাগ গান সংকেতধর্মী। এগুলির ভেতর একটা অসীমের জন্য ব্যাকুলতার ভাব ফুটে উঠেছে, একটা অতীন্দ্রিয় ভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান

**অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঃ** রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি ছিল বিরাট এবং ব্যাপক, একথা আগেই বলা হয়েছে এবং এই কারণেই জীবনের এত দিক নিয়ে আলোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। একদিকে কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য, অন্যদিকে সঙ্গীতের প্লাবন—এই দুইয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায় রবীন্দ্রনাট্যে। শেক্সপীয়ারের পর এত বড় প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মেছেন কি না সন্দেহ।

বার্নার্ড শ' বড় নাট্যকার একথা আজ সর্ববাদীসম্মত। তবু তাঁর নাটকের বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শুধু জড় জীবনের সমস্যা নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু বাস্তব দিকটাই তো শুধু মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়।

সামাজিক জীবনে অনেক অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়—তার ফলে অনেক সময়েই মানুষের জীবনে আসে অসহনীয় দুঃখ দৈন্য। এইসব মানুষের জীবনের বিষাদময় ইতিহাস দরদের সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি তাঁর নাটকে। কিন্তু এছাড়াও জীবনের আরও অনেক গভীরতর দিক আছে—তার পরিচয় গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাটকে পাওয়া যায় না। মেটারলিঙ্কে আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আর ষ্ট্রীণ্ডবর্গে মিস্টিসিজমের।

ইবসেনের মধ্যেও প্রতিভার ব্যাপকতা আছে। কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে নাট্যরচনা করেন নি। শ'-এর মত তাঁর নাটকেও জড়বাদই প্রাধান্য পেয়েছে। ইবসেনের সম্বন্ধে Allardyce Nicoll তাঁর World Drama বইয়েতে লিখেছেন :

"His plays, when placed against the greatest achievements of the theatre are seen to lack that balance and poise out of which alone the highest dramatic achievements can come...He was forced to devote his energies to the cultivation of the realistic stage, yet the realistic stage could not offer him the scope desired.'

নাটকের আঙ্গিকের ব্যাপার নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। অঙ্ক ও দৃশ্য সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়মে না চলে, সুবিধামত এ সবের ব্যবহার করেছেন। সময় সময় দৃশ্য, অঙ্ক ইত্যাদি তুলে দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে নাটককে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ কবি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আর্টের জন্যই টেকনিক, টেকনিকের জন্য আর্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতই গীতধর্মী। এই জন্যই তাঁর বেশির ভাগ নাটকেই ভাব এবং ছন্দপূর্ণ ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। Good stage-play যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহিত্যমূল্যের মাপকাঠিতে নিজের কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করতে পারছে, ততক্ষণ তাকে good drama বলা যায় না। good stage-play-র আবেদন সাময়িক—good drama-র আবেদন সর্বকালের জন্য।

সাহিত্যমূল্য আছে বলেই কালিদাস, ইস্‌কাইলাস, সোফোক্লিস ইউরিপিডিস ও এ্যারিস্টোফিনিসের নাটক আজও সবার এত প্রিয়। এই সাহিত্যমূল্যের জন্যই শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে সবাই স্বীকার করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। এই একই দিক থেকে বিচার করে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্য-সাহিত্যকে এবং বিশেষভাবে মলিয়ের ও রেসিনের নাটকগুলিকে সর্বজনপ্রিয় করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইবসেন ও ষ্ট্রীণ্ডবার্গের প্রাধান্যের মূলেও ঐ একই কথা। আর এই সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকও যে অতুলনীয় ঐশ্বর্যসম্ভারমণ্ডিত একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

আবার সাঙ্কেতিক নাট্যকারদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের স্থান সবার উর্ধ্বে। তাঁর 'ডাকঘর' এবং 'রাজা' নাটক প্রাশ্চাত্যের অনেক দেশেই অভিনীত হয়েছে এবং বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে জার্মানী ও প্যারিসে। রবীন্দ্রনাথের আগে আমাদের পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাট্য রচিত হয় নি—একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'-কে ঠিক সাঙ্কেতিক নাটক বলা যায় না—এটি রূপকনাট্য।

রবীন্দ্রনাথ গীতধর্মী একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু সুরের খেলা দেখাবার জন্যই তিনি সুর সৃষ্টি করেন নি। সুরকে তিনি সব সময়েই ব্যবহার করেছেন ভাবের বাহক হিসেবে। সুরের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করেছেন ভাবের আবেগে। তীব্র ভাবানুভূতিই কবিকে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের জগৎকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয়তার দিকে আকর্ষণ করেছে। বাস্তবকে অতিক্রম করে অতিবাস্তবের দিকে আহ্বান করেছে।

অতীন্দ্রিয়, অতিবাস্তব, আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রকাশ করবার সহজ ভঙ্গী হচ্ছে—সঙ্কেতের সাহায্যে, আভাসে, ইঙ্গিতে-ইশারায় বলবার চেষ্টা করা। জমকালো প্লট বলতে যা বোঝা যায়, সাঙ্কেতিক নাটকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশের মধ্যেও জটিলতা থাকে না। এক কথায় সব জিনিষটাই সহজ সরল ভাবে তুলে ধরতে হয়।

'রক্তকরবী'র প্রস্তাবনায় কবি বলেছেন : 'এইটি মনে রাখুন, রক্ত-করবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়েই তাঁর আত্ম-প্রকাশ। ---সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ তাকিয়ে দেখেন, তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে সে দায় কবির নয়।'

ইয়েটস, মেটারলিঙ্ক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের সাঙ্কেতিক নাট্যকারদের লেখায় দেখা যায়, অবচেতন মানসের প্রতিক্রিয়া—এই জন্যই এঁদের লেখাকে ঘিরে থাকে একটা ধোঁয়াটে morbidity.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় অবচেতন মনের সমধিক প্রাধান্য নাই তাঁর লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মন শিশির-ভেজা ঘাসের মত হয়ে ওঠে।

নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপটাদির ব্যবহারকে রবীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক উৎপাত হিসেবেই গণ্য করতেন। 'তপতী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে নিক্ষিপ্ত।'

**রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়ঃ** আজকাল পেশাদারী মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় যেন প্রায় উঠেই গেছে। আমাদের ছাত্রজীবনেও নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'যোগাযোগ' (উপন্যাসের নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ হতে দেখেছি। এসব নাটকের অভিনয় দেখবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে, তাঁরাই জানেন, সুপরিচালনা ও সুঅভিনয় হলে রবীন্দ্রনাট্য stage-play হিসেবে কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পারে। আমার তো মনে হয়, 'যোগাযোগ'-এর মধুসূদনের রূপায়ণে শিশিরকুমার নিজেরই সৃষ্ট 'ষোড়শী'র জীবানন্দকেও অনেকটাই পেছনে ফেলে এসেছিলেন। 'শেষরক্ষা'র অভিনয় যতবারই দেখেছি—শেষদিকে — শ্রীরঙ্গমেও অনেকবার এ নাটকের অভিনয় হয়েছে—শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে মনে হয়েছে, মঞ্চ এবং দর্শকদের মধ্যেকার সমস্ত ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে। তখনকার দিনে চন্দরদা ও বিনোদরূপী শিশিরকুমার ও রবি রায়ের 'ও ভোলা মন' ইত্যাদি কবিতার আবৃত্তি আজও যেন কানে লেগে আছে। বৈকুণ্ঠের খাতায় নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার করতেন কেদারের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বৈকুণ্ঠের রোলে মাঝে মাঝে অভিনয় করেছেন। তাছাড়া অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীশৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি। প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় হতো অনবদ্য।

আজকাল এসব নাটক যে কেন পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় হয় না, বুঝতে পারি না।

এর আগে নাট্যমন্দিরের মঞ্চেও শিশিরবাবু সাফল্যের সঙ্গে 'বিসর্জন' ও 'তপতী' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। তেমনি আর্ট থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র—তিনকড়িবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকাবাবু, দুর্গাদাস ব্যানার্জি প্রভৃতি অভিনেতাদের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে 'চিরকুমার সভা' নাটকের অভিনয় করেন। এ ছাড়াও এই সম্প্রদায় 'শেষের রাত্রি' এবং 'রাজা ও রাণী' অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

শেষের দিকে নাট্যনিকেতনে নরেশবাবুর পরিচালনায় 'গোরা' (উপন্যাসের নাট্যরূপ) অতি সুখ্যাতির সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

শ্রীরঙ্গমে কয়েক রাত্রির জন্য তিনকড়িবাবুকে নিয়ে শিশিরবাবু আবার 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় করেন। তখন তিনকড়িবাবুর বয়স সত্তরের ওপর। কিন্তু এই বয়সেও অক্ষয় চরিত্রে গান সহযোগে যে অভিনয় তাঁকে করতে দেখেছি, তার তুলনা হয় না। মনোরঞ্জনবাবু রসিককে এমন মাধুর্যমণ্ডিতভাবে রূপায়িত করতেন, বা শুধু তাঁর মত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব। চন্দ্রবাবু যে শুধু ক্যাপাটে মানুষ নন, তাঁর চরিত্রেরও যে একটা গভীর দিক আছে, তাঁর চিন্তাধারাটা যে ঠিক হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়—এইসব দিকগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতো শিশিরকুমারের অভিনয়ে।

এই সব অভিনয় দেখে বার বার মনে হতো, যে দেশের মঞ্চাভিনয় এত উন্নত, সে দেশ কখনই অন্য দেশের তুলনায় কৃষ্টি বা সভ্যতার দিক দিয়ে এতটুকু ছোট নয়।

'মালিনী' নাটকটি নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের খুব প্রিয় নাটক ছিল। অনেক সময়েই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন: 'এটি একটি পারফেক্ট প্লে।' আমার নিজের মন অবশ্য এ-কথায় সায় দেয় নি। এমন কি, আমার 'রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা'তে আমি স্পষ্টভাবেই বলেছি—

'বিসর্জন' বা 'রাজা ও রাণী'তে dramatic emotion যে ব্যাপ্তি এবং পূর্ণতা পাইয়াছে, মালিনীতে তাহার অভাব সকলেরই চোখে পড়ে। জয়সিংহ এবং অপর্ণার কথাবার্তায় বেশ বুঝা যায় যে, ধীরে ধীরে তাহাদের অন্তরে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। সুপ্রিয় এবং মালিনীর মধ্যে যে প্রেমের দিকটা বর্ণিত হইয়াছে তাহা যেন ঠিকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। অপমানিত রঘুপতি এবং পরাহত ক্ষেমঙ্করের মানসিক প্রতিক্রিয়া তুলনা করিলে A. C. Bradley-র ভাষায় বলিতে হয়—

'The resemblance between a a volcano in eruption — a flameless fire of coke'

কিন্তু তাই বলে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নট এবং নাট্যাচার্যের মতটাকে তো উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শিশিরকুমার এ নাটককে মঞ্চস্থ করে যেতে পারেন নি, একবার রিহার্সালেও ফেলেছিলেন জানি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নি। মঞ্চস্থ হলেই নাটকটির ভেতরকার ঐশ্বর্য আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। কারণ নাটকের

আসল পরিপূর্ণতা বোঝা যায় একমাত্র অভিনয়ের মাধ্যমে।

স্যার হেনরি আরভিং তাঁর একটি বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছেন যে, Shakespeare-এর নাটক পড়ে যা রস পাওয়া যায়, তার থেকে নাটকগুলিকে অনেক বেশি উপভোগ করা যায় যখন ঐ সব নাটকের অভিনয় দেখা যায়। শুধু তাই নয়—একজন সাধারণ লোক যখন কোনো নাটক রিডিং পড়েন, আর সেই নাটকেরই রিডিং যখন কোনো ভাল অভিনেতার মুখ থেকে শোনা যায়, তখনই বোঝা যায় দুটি রিডিং-এ কত তফাৎ।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার 'রবীন্দ্র-নাট্যপরিক্রমা' লেখবার সময় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 'তপতী', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি কয়েকটি নাটক আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক এবং শিশিরকুমারের মুখে তার পাঠ শোনা—এ যে কি বিরাট এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, তা ঠিক বলে বোঝানো যায় না। 'রক্তকরবী' নাটকের বহু জটিলতা এভাবে শিশিরকুমারের রিডিং-এ আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। আজও সেদিনকার সকালবেলার কথাটা মনে পড়ে। নাট্যাচার্য 'রক্তকরবী'র রাজার এই সংলাপটা পড়ছিলেন—'আমি প্রকাণ্ড মরু-ভূমি' ইত্যাদি। তাঁর অদ্ভুত বাচন-ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে 'রক্তকরবী' নাটকের আঁধারের স্তরে স্তরে যেন নতুন আলোকসম্পাত হতে লাগল। 'তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে। ওই একটু-খানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।'—কণ্ঠস্বরে যে শুষ্কতার সৃষ্টি করেছিলেন শিশিরকুমার, তা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে The Waste Land-এর এই লাইনগুলো আমার মনে পড়ল—

'Here is no water but only
Rock,
Rock tho water and the
Sandy Road,
The Road winding among the
mountains,
Which are mountains of rock
without water'.

নাট্যাচার্যকে একথাটা বলাতে তিনি খুব উত্তেজিতভাবে বললেন —'দেখ, কত জট পড়তে পড়তে কিরকম অদ্ভুতভাবে আপনা থেকেই ছাড়িয়ে যায়।'

এইভাবেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার রিডিং থেকে বিশ্বকবির সব থেকে জটিল নাটকটি সম্বন্ধে আমি একটা নতুন দিকের সন্ধান পেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আজকের দিনে 'রথের রশি' নাটকটির কথাই সবার আগে মনে আসে। সমাজ-সমস্যা নিয়ে এত শক্তিশালী এবং সার্থক নাটক বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব বেশি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের দেশে তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যামূলক নাটক লিখতে গিয়ে নাট্যকার নাটককে sentiment এবং emotion-এর ভাপে ভরা ফানুস তৈরি করে তোলেন। এর ফলে শ্রোতা বা পাঠক ভাবাহত হয়ে পড়েন, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে নাটকটির সমস্যাকে বিচার করে দেখবার অবসর পান না। এই প্রসঙ্গে Shaw-এর Widower's Houses, Mrs Waren's Profession এবং Galsworthy-র Strife, Justice প্রভৃতি নাটকের কথা ভেবে দেখুন। এসব নাটকে ভাবাবেগের চাপে বা করুণ রসাত্মক কাহিনীর অতিরিক্ত ভারে আসল সমস্যাকে কোথাও পিষ্ট করে ফেলা হয় নি।

পেশাদারী থিয়েটারের কর্তাব্যক্তি এবং নাট্য-প্রযোজকদের কাছ থেকে প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যায় যে, তাঁরা ভাল নাটক খুঁজে পান না। তাই যদি হয়, তবে কবিরচিত সত্যিকার ভাল এবং যুগোপযোগী 'রথের রশি' নাটকটিকে নিয়মিতভাবে কেউ মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করেন না কেন, বুঝি না। Waiting for Godot নাটকটিও তো ঠিক এই জাতীয়। এ নাটকটি যদি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে রাত্রির পর রাত্রি অভিনীত হয়ে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করতে পেরে থাকে, তবে 'রথের রশি'ও কোনো পেশাদারী মঞ্চে ঠিকভাবে মঞ্চস্থ হলে বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আর একটা কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। ইংলণ্ডে Shakespeare-এর নাটকের নিয়মিত অভিনয় হয় Old Vic Theatre-এ (বর্তমানের National Theatre) এবং Seasonal productions হয় Stratford-Upon-Avon-এর Shakespeare Memorial Theatre-এ। আমাদেরও এইবার এমন একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা দরকার যেখানে নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাট্যের মঞ্চরূপ দেওয়া হবে। এর দ্বারা শুধুমাত্র জনশিক্ষারই প্রসার হবে না—ভারতীয় সাধনার ধারা, ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা, জাতীয় চরিত্রের দোষগুণ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মতামত সুন্দরভাবে প্রচারিত হতে পারবে জনসাধারণের মাঝে তাঁর নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে।

সমাপ্ত

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী
৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# কবিতা

## সনেট

বিষ্ণু দে

যত গর্ব অন্তর্গত, সেই জন্যই, বা তবুও, হৃদয়ে
আরক্ত জীবনস্মৃতি, যৌবনের গোলাপবাগান
আজও তাই ঘরে ঘরে শাদা কালো খোদাই আধারে
পাণ্ডুর সৌরভে ধরি, সময়ের অজিত সম্ভারে
চৈতন্য স্বচ্ছল মুক্ত, রাবীন্দ্রিক সঙ্গীতবিতান,
যেমন বিজয়ী কীর্তি অশীতির ব্যর্থ পরাজয়ে।

বস্তুত বৃদ্ধই শিশু, আলো মুক্তি পায় যে আকাশে
সূর্যাস্তে সে প্রাক্ত কিংবা সূর্যোদয়ে সদ্য স্বচ্ছ শুচি,
তারই আভা গন্ধরাজে, বেলি চামেলিতে কিংবা ঘাসে,
মিলনে বিরহে প্রেমে দেহে মনে সেই বররুচি।

অতএব হাহাকার অবান্তর ; আশাভঙ্গ—আশা
সমস্তই পেয়ে যায় নবারুণ আলোর রঞ্জনা
সপ্তাশ্বের সমমূল্যে, এমন কি রাত্রির ব্যঞ্জনা,
অরুন্ধতী। জেনো দীর্ঘ রশ্মিময় একই ভালোবাসা ॥

## বিশল্যকরণী বৃক্ষদের জন্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমলকী হরীতকী বিশল্যকরণী ;
তোদের প্রার্থনা যেন রাত্রিদিন শুনি
আমি নিরীশ্বর
অবাক যন্ত্রণা নিয়ে বুকের ভিতর।

কেন রে এমন হয় ? আমি ঈশ্বরের
পুত্র হ'তে চাই না রে ; তার চেয়ে ঢের
ভাল ঈর্ষা, অপ্রেম আমার।
বুকের ভিতর তবু হাত রাখবি ? মুখ দেখবি তার ?

শোন। আমি আরেক জন্মে অন্ধকার ঘরে
ছিলাম অনেক ভাল জ্বর বুকে করে ;
সেদিন কাউকে আমি করিনি প্রণাম।---
কী হবে সে প্রেম দিয়ে যদি তাতে ঈশ্বরের নাম।

এ জন্মে সকলি ভুল ; রাত্রিদিন একটিই প্রার্থনা
আর আমার আমার যন্ত্রণা ॥

## এই চৈত্রের বাংলা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এখন পাকছে নোনা দিকে-দিকে অপরূপ বনান্তে ও বনে।
এই চৈত্রে বাংলাদেশ বড় তীব্র জেগে ওঠে মনে যে-কারণে ;
নীল-সন্ন্যাসির নাচ, গাজন কি চড়কের জন্যে শুধু নয়—
গহন ঘনিষ্ঠরূপে কী-রূপসী, কী-রূপসী বাংলা এ সময়
না দেখেছে—যে না তাকে, জানবে বা জানাবে কী করে!
বসন্ত-বউরীর ঝাঁক ঘুরে-ঘুরে বারবার উড়ে এসে পড়ে
ঘেঁটু আর ভাঁট ঝোপে ; নিমের কুলন্ত ডালে ফুল ঝুড়ি-ঝুড়ি!
আর যত গাছে-গাছে কচি আম, লিচু, জাম, সবুজ সুপুরী।
আর চারিদিকে ওই আলো করে, আলো করে আছে পাকা
নোনা
অগণন তাল-বাঁশ, কাচের আকাশ—এরা কে বা কল্পনা ?
সোঁদাল যুবতী নাচে। জলকুমারীর মত গায় হলদে চুল।
কুঁ দিয়ে ওড়ায় তুলো ওকেই না ইশারায় আকন্দ-শিমুল ?
আগানে-বাগানে নোনা। অচেল, অচেল গাঁব। অফুরন্ত বেল।
আহা, আহা আমাদের এরাই ত' অনুপম আখরোট-আপেল।
দোয়েল, পাপিয়া ডাকে। কোকিলের গলাও কি না
শুনেছিলাম ?
এদের সবার দলে খুঁজে দেখো—আছে, আছে আমারও
যে নাম।
তাই যদি কোনোদিন ফিরি ফের পৃথিবীতে জন্মের সুবাদে ;
আমি আসব বাংলাতেই। বিনিময়ে যেতে পার যে চাও
সে—চাঁদে।

# ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের কথামালা

এইতো সেই হাইকোর্ট—দাপট যার দুর্নিবার, প্রভাব যার প্রচণ্ড, সম্ভ্রম যার অসীম এবং ঔদ্ধত্যে যার সীমা নেই। অথচ নিরপেক্ষতার অক্ষমালায় সে একক, নীতির উপদ্রুত পথে সে নির্বিরোধ পান্থ, সঙ্কটের ঘোর তমিস্রায় সে জ্যোতির্ময় সাক্ষী এবং পাপের দণ্ড রচনায় সে নিষ্কারুণ্যের অবতার। পাদদেশে তার ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের অশান্ত গতিমত্ততা—যা তাকেই কেন্দ্র ক'রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মুখর বৈচিত্র্যে, পাথরের কর্কশ আবেষ্টনে এবং ব্যস্ততার নির্মম নিপীড়নে। তবু সব মিলিয়ে সে-পথেই সপ্রকাশ এক স্বাতন্ত্র্যের ধারা—যার ঘাটের আবেদন সর্বজনীন। সেখানে আমির-ফকির প্রকারভেদে কোনো পৃথক মর্যাদা পায় না—যদি নীতি তার কুলত্যাগ না করে এবং সত্যের আত্মাহুতি না ঘটে অপলাপের যজ্ঞে।

তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সেকালের অদ্বিতীয় স্থপতি মিঃ ওয়াল্টার গানভিল—যাঁর নক্শা অনুযায়ীই প্রতিষ্ঠা ঘটে বর্তমান হাইকোর্টের। নির্মাণকার্য সুরু হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এবং তার সমাপ্তি ঘটে দশ বৎসর পর, অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অন্তিম পর্বে। তৎকালীন ইংলণ্ডের টাউন হলের অনুকরণে এবং 'গথিক' ভঙ্গীতে তার আত্মপ্রকাশ। তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য: 'To protect the natives from oppression and to give India the benefits of English Law.

প্রাতঃপর্বে উল্লেখিত উদ্দেশ্যের অনুপন্থায় হাইকোর্টের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল কি না জানি না; তবে কিছু পরবর্তীকালে ইংরেজদের ভাষায় যারা Natives, তাদেরই প্রমিত প্রজ্ঞার সনাতন দিগন্তে উদয়লাভ ক'রে, হাইকোর্টের মঞ্চে চরণ রাখেন অজস্র

● হাইকোর্টের দৃশ্য

জ্যোতিষ্ক—যাঁরা উক্ত উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হন বিজয়ী। তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মল্লিক—প্রভৃতির নাম স্মৃতির শোভাযাত্রায় অনির্বাণ বর্তিকা; অন্যদিকে তেমনই দ্বারকানাথ মিত্র, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

## শ্রীপদাতিক

আব্দার রহীম, সৈয়দ আমির আলি, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু—প্রভৃতি সময়ের চিরন্তন সোপানে মৃত্যুঞ্জয়।

হাইকোর্টের পূর্ববর্তী বিচারশালা সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সুকান্ত অধিষ্ঠান ছিল হাইকোর্ট অধিকৃত ভূমিখণ্ডেই। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পূর্বে বুর্শায়ার নির্মিত ওল্ড কোর্ট হাউসই ছিল একমাত্র বিচারশালা। পরে উক্ত ওল্ড কোর্ট হাউস বিচার বিভাগের পক্ষে সংকীর্ণ বিবেচিত হওয়ায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আত্মপ্রকাশ করে সুপ্রীম কোর্ট—যার বিচারপতিরূপে অভিষিক্ত হন কুখ্যাত ইলিজা ইম্পে ছাড়াও ভারত-বন্ধু উইলিয়াম জোন্স এবং মানব-দরদী স্যার হাইড ইস্ট। ইলিজা ইম্পে কর্তৃক এই সুপ্রীম কোর্টেই মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হয়। নন্দকুমার—ইংরেজ-পূজারী গঙ্গাগোবিন্দ, কান্ত মুদী প্রভৃতির মতো স্বদেশের স্বার্থ বিক্রয় করতে চান নি, বরং নবাব মীরকাসেমের অনুগামী হয়ে অস্ত্রধারণ করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাই তৎকালীন কলঙ্কভূতি হেস্টিংস মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার করেন মহারাজাকে। হেস্টিংসের ইঙ্গিতে সুপ্রীম কোর্টেই ইলিজা ইম্পে কর্তৃক বিচারের এক প্রহসন সৃষ্টি ক'রে মহারাজার গলায় পরানো হয় ফাঁসির রজ্জু।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের পিউনী-জজ নিযুক্ত হন স্যার উইলিয়াম জোন্স। তাঁর বসতবাটী ছিল খিদিরপুরের মুচিখোলা পল্লীতে। সেখান থেকে প্রত্যহ পায়ে-হেঁটেই তিনি কোর্টে আসতেন। কোর্টের বিরাম

কক্ষেই তিনি অতিবাহিত করতেন তাঁর প্রাত্যহিক অপরাহ্ণ। তখন পণ্ডিত এবং মৌলবীদের সাহচর্যে সেখানেই তিনি পাঠ গ্রহণ করতেন আরবী, ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষার। তাছাড়া উক্ত ভাষাসমূহের বিভিন্ন গ্রন্থরাজি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করার কাজেও আত্মনিয়োগ করতেন সেখানে। জন্ম তাঁর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে। শিক্ষিত তিনি ও-দেশেরই শিক্ষায়। অথচ তা সত্ত্বেও তাঁর শিরোধার্য হয় এ-দেশের সনাতন সভ্যতা, এ-দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। তিনি ভালোবেসেছিলেন এ-দেশের মাটিকে এবং এ-দেশের সেই মাটির মানুষদেরই তিনি গ্রহণ করেছিলেন একান্ত সুহৃদরূপে। তাই তাদের অনাবিল সান্নিধ্য ত্যাগ ক'রে তিনি কোনোদিন আর তাঁর স্বদেশ বা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নি।

বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট-ও ছিলেন এ-দেশের একজন অকৃত্রিম বান্ধব। নিজেকে নানাভাবে বিপন্ন করেও, এ-দেশবাসীর উন্নতিকল্পে তিনি যে-ভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, ইতিহাসে তা বিরল দৃষ্টান্ত। সম্ভবত সে-কারণেই তিনি যখন সুপ্রীম কোর্টের কার্যভার ত্যাগ ক'রে স্বদেশের পথে যাত্রা করেন, তখন এ-দেশের তৎকালীন গুণীজন তাঁর উদ্দেশেই এক বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন করেন সেকালের টাউন হলে। এ-সম্বন্ধে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণে' যে-সংবাদ পরিবেশিত হয় তা এই :

"সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত স্যার হাইড ইস্ট সাহেব ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক উপকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ কলিকাতার টাউন হলে ২১ ডিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন। সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে, অদ্যকার সভার সভাপতি শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব। ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন।---"

সুপ্রীম কোর্টের আমলে তার সম্মুখবর্তী রাস্তার উভয়দিকে ছিল ইংরেজ রাজপুরুষদের সারিবন্দী বসতবাটি। রাস্তাও ব্যবহার করতেন কেবল তাঁরাই। তখন এ-রাস্তায় সাধারণের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। তবে এ-রাস্তারই মিসেস ফে নামে এক ইংরেজ মহিলার বাড়িতে যেদিন কলকাতার প্রথম ডাকঘর প্রতিষ্ঠা পায়, সেদিন স্বাভাবিক কারণেই সে-পথে জনসাধারণের গমনাগমনের বাধা-নিষেধ শিথিল হয়ে পড়ে অনেকাংশে।

মিসেস ফে তৎকালীন কলকাতার একজন বিখ্যাত মহিলা। তাঁর স্বামীর নাম এ্যাণ্টনি ফে। পেশাগত দিক থেকে তিনি ব্যারিস্টার। এ-দেশের আদালতে আইন-ব্যবসার উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন। তিনি মিসেস ফে বা তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন মিশর হয়ে লোহিত সাগরের জলপথে। তাঁদের জাহাজ যেদিন কালিকটের তীরভূমিতে এসে নোঙর তোলে, সেদিনই তাঁরা মহীশূরপতি হায়দার আলির নির্দেশে বন্দী হন। হায়দার আলি তাঁদের নিক্ষেপ করেন কারাগারে। দিন-কয়েক পর, একজন সান্ত্রীর সহায়তায় তাঁরা সেই কারাগার থেকে পালিয়ে আসার সুযোগ পান এবং সুযোগ পেয়েই তাঁরা পালিয়ে আসেন মাদ্রাজে। তারপর মাদ্রাজ থেকে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় তখন যোগ্য ব্যারিস্টার বিশেষ ছিল না বললেও চলে। সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যেই বেশ পশার জ'মে ওঠে এ্যাণ্টনির। তাঁর দক্ষতাই আহরণ করে আনে বিপুল খ্যাতির বরমাল্য। তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন উচ্চমহলে এবং এ-দেশীয় রাজা এবং জমিদারদের নাচঘর থেকেও তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে প্রত্যহ। শোনা যায় : একদিন এমনই এক নাচঘরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে কোনো এক সুন্দরী বাইজীর ললিত তনুলতা নেশা ধরায় এ্যাণ্টনির চোখে। দাপট তাঁর রাজা-মহারাজাদের মতোই, বিত্তেও তিনি খর্ব নন কোনো অংশেই। অতএব সেই জোরেই তিনি করায়ত্ত করেন উক্ত বাইজীকে। গোপনে ভিন্ন পাড়ায় একটি ঘর ভাড়া নেন তিনি। তারপর বাইজীর সঙ্গে সেখানেই নাকি সুরু হয় তাঁর প্রত্যহের মধুযামিনীতে রতিবিলাসের রাসলীলা।

এ্যাণ্টনি ফে-র এই কীর্তি-কলাপ দিন-কয়েকের মধ্যেই অবগত হন মিসেস ফে এবং অবগত হয়েই তিনি এ্যাণ্টনির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের আর্জি পেশ করেন আদালতে। আদালত এ্যাণ্টনিকে তাঁর পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেন। কিন্তু এ্যাণ্টনি থাকেন নীরব। সুতরাং তিনি নীরব থাকেন বলেই আদালত সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই তাঁর রায় প্রকাশ করেন মিসেস ফে-র পক্ষে।

স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, মিসেস ফে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন, এ-দেশীয় কোনো এক রাজকুমারের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁর আলাপ হয় এবং সেই রাজকুমারকেই নাকি তিনি সঁপে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর উদ্বৃত্ত যৌবন। কিন্তু সম্ভব হয় নি। কারণ সনাতনপন্থী রাজকুমারের পিতা রাজকুমারকে উদ্ধার ক'রে তার বিয়ে দেন এ-দেশীয় এক রাজকন্যার সঙ্গে। তাই হতাশমতী মিসেস ফে সব দিক থেকেই বঞ্চিত হয়ে এবার পাড়ি জমান ইংলণ্ডের পথে। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে তিনি কিছুকালের মধ্যেই আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে আসে বহুমূল্য পোষাকাদি এবং বিক্রেতার কাজ জানা দু'জন রূপসী মহিলা। তাদের নিয়েই তিনি বিলেতি পোষাকাদির এক দোকান প্রতিষ্ঠা

করেন সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখবর্তী রাস্তায় এবং বসবাসের জন্য সেখানেই তিনি নির্মাণ করেন একটি গৃহ। তৎকালে তিনি একজন লেখিকারূপেও পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত এই লেখা এবং দোকানকে অবলম্বন ক'রেই অবশিষ্ট জীবনে তিনি ভাসতে চেয়েছিলেন নির্ভাবনার স্রোতে। কিন্তু ভাবনা তাঁকে মুক্তি দেয় নি। পুরাতন স্মৃতির ক্ষুরধার শায়ক তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে বারে বারেই। কখনো তিনি অবচেতনায় অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন দুর্বহ বেদনায়, আবার কখনো বা আশার কুহক-সঙ্কেতে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছেন অকস্মাৎ। বার বার হাত বাড়িয়েছেন অসীম শূন্যে, কিন্তু নাগাল পান নি কিছুরই। এ-সম্বন্ধে তাঁর কোনো এক নিবন্ধেই উল্লেখ আছে :—'had produced only a long train of blasted hopes and heart-rending disappointments.'

মিসেস ফে-র স্বরচিত 'Original letters from India' নামক গ্রন্থের প্রকাশকালে, অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্থিব মায়ার শিথিল বন্ধন ছিন্ন ক'রে ত্রিদশালয়ে যাত্রা করেন।

মিসেস ফে-র মৃত্যুর পর, সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখবর্তী তাঁর গৃহেই প্রতিষ্ঠা ঘটে প্রথম ডাকঘরের। তারপর পরবর্তী-কালে দেখতে দেখতে যখন আরও অনেক ডাকঘর মাথা তুলে দাঁড়ায় কলকাতার বিভিন্ন অংশে, তখন সেই প্রথম ডাকঘরটি সাধারণ লোকের মুখে-মুখেই নাম ধারণ করে 'ওল্ড পোষ্ট অফিস'। এই ওল্ড পোষ্ট অফিসের সূত্রেই তার—পার্শ্ববর্তী রাস্তারও নামকরণ হয় 'ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট'—যার জরাজীর্ণ শরীর যান্ত্রিক সংস্কারের প্রসাধন বৈচিত্র্যে নতুনত্বের সহযাত্রী একালেও।

সুপ্রীম কোর্ট এবং সেই ওল্ড পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠার অনেককাল আগে, অর্থাৎ ইংরেজ যখন কেবল দিল্লীর সম্রাটের প্রজারূপেই গণ্য

ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

ছিল এ-দেশে, তখন এ-অংশ ছিল অরণ্যের পার্শ্ববর্তী এক অসমতল ভূমিখণ্ড। ডাচ বা ওলন্দাজ বণিকদের আমলে ভূ-স্বামী চৌধুরীদের আস্তাবল নাকি স্থানান্তরিত হয়েছিল এখানেই। শোনা যায় : উক্ত আস্তাবলেই ছিল সেই বিখ্যাত ঘোড়া—জমিদার আদর ক'রে যার নাম রেখেছিলেন পক্ষীরাজ। পক্ষীরাজ কেবল পক্ষীরাজের মতোই তেজীয়ান ছিল তা নয়, বুদ্ধিতেও তার স্থান ছিল মানুষের পাশাপাশি। জমিদার একদিন নাকি এই পক্ষীরাজ চেপেই সন্ধ্যালগ্নে ফিরে আসছিলেন কোনো এক দূরের গ্রাম থেকে। আসার পথে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে একদল দস্যু। দস্যুরা জমিদারকে বন্দী করে এবং ঘোড়াসহ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় তাদের অরণ্যের আস্তানায়। সেখানে মুক্তির বিনিময়ে তারা জমিদারের কাছে দাবি করে প্রচুর অর্থ। পক্ষীরাজ সবই বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরেই সে নাকি দস্যুদের কবলমুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে জমিদারবাড়ি। তারপর আকারে-ইঙ্গিতে পাইক-পেয়াদাদের খবর দিয়ে, তাদের নিয়েই আবার সে ফিরে যায় দস্যুদের আস্তানায় এবং মুক্ত করে জমিদারকে। এ-কাহিনী আজ আজগুবির মতোই অনেকটা। এখানে সত্য যদি কিছু অংশে আত্মগোপন ক'রে থাকেও, আজ তা প্রমাণের কোনো উপায় নেই।

আস্তাবলের আমল স'রে গেছে এবং হারিয়ে গেছে তার পরবর্তী-কালের সুপ্রীম কোর্টের পরিবেশও। কেবল তার পরিত্যক্ত পাষাণ বেদীতে জেগে আছে হাইকোর্টের আমল—যার বিনাশ নেই এবং স্বাভাবিক কোনো পরিবর্তনও নেই। ওল্ড পোষ্ট অফিসের অস্তিত্বও দূরাতীতের অন্ধকারে লীন। তবে তার প্রতিবেশী সেণ্ট জন গীর্জা আজও দাঁড়িয়ে আছে—যেন সেকালের নীরব-নির্বিকার এক সাক্ষী।

আজ হাইকোর্টের প্রয়োজনেই সমগ্র ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট রূপান্তরিত এ্যাটর্নী পাড়ায়। এ্যাটর্নীদের অজস্র কার্যালয়ের অবিচল অধিষ্ঠান হেতুই এ-রাস্তা যেমন মর্যাদাভূষিত, তেমনই ব্যস্ততার বিরামহীন ঘটিকায় সে আজ বিপর্যস্ত আসন্ধ্যা-সকাল।

* প্রেসিডেণ্ট জোয়াও গুলার্টকে উচ্ছেদ করে ব্রেজিলের পুলিশবাহিনীর লোকেরা রাস্তায় আনন্দ-উৎসব করছে।

**ব্রেজিল :**

বিনা রক্তপাতে ব্রেজিলের বিপ্লব যে-ভাবে সংঘটিত হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। দক্ষিণ-পন্থীদের ঠেকিয়ে রাখবার প্রস্তুতি-পর্ব প্রেসিডেণ্ট জোয়াও গুলার্ট চালিয়েছিলেন---বছর দুই আগের থেকেই। সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের সময়ও তিনি জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয় । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি লড়ে যাবো।' কিন্তু চারঘণ্টা পর তাঁর আবেদনের সমর্থনে কংগ্রেসের কোন সাড়া না পেয়ে তিনি দেশত্যাগ করে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। গুলার্টের এই নাটকীয় বিদায় বিপ্লবের রূপটিই দিয়েছে পাল্টে---বিপ্লবীরা পেয়েছেন কতকটা যেন আইনানুগ মর্যাদার আসন।

তাঁর বিদায়ের পর সাময়িকভাবে প্রেসিডেণ্টের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন রেনিয়েরি ম্যাজিলি। সংবিধান অনুসারে একমাসের মধ্যে কংগ্রেসকে নির্বাচন করতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেণ্ট। নতুন সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৬৬ সালের জানুয়ারী) কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট বহাল থাকবেন। সবটা মিলিয়ে ব্রেজিলের সামরিক অভ্যুত্থান একটা নিয়মতান্ত্রিক মর্যাদা পেয়ে গেছে।

সহজ পথে বিপ্লব এলেও ব্রেজিলের সকল সমস্যার সমাধানের পথ এতে সুগম হবে কি না, এ প্রশ্ন উঠেছে চিন্তাশীল রাজনৈতিক মহলে। বিপ্লব সাধারণ মানুষেরও কাম্য ছিল। তাই গুলার্টের সমর্থক কমিউনিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিকদের ধর্মঘট সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা জয়ী হয়েছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস---ব্রেজিলের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের কাজে বিপ্লব হবে সহায়ক। তাঁদের ধারণা বে-আইনী ধর্মঘটের সমর্থন করে, মন্ত্রিসভার খেয়াল-খুশিমত রদবদল করে এবং স্বেচ্ছাচারীর মত আদেশ দিয়ে আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন।

গুলার্টের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় অভিযোগ হলো---দেশের ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক বিচার-বিবেচনার পর বেতন হ্রাস ও অপরাপর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য গৃহীত তিনসালা পরিকল্পনা রূপায়ণে বরাবর গাফিলতি প্রদর্শন করেছেন। কফির অস্বাভাবিক চড়া বাজার পেয়েও তিনি এর ১৯৬৩ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নি। কাজেই বিপ্লবের সাথে সাথে ব্রেজিলের সঙ্কট কেটে যাবে, এরূপ ভাববার কোন কারণ নেই।

গুলার্টের পরিত্যক্ত গদীতে অন্তর্বর্তীকালে যিনি বসবেন তাঁর পক্ষেও তা কণ্টকময়ই থাকবে---কাঁটার খোঁচায় তাঁকেও সারাক্ষণ ছটফট করতে হবে। নতুন প্রেসিডেণ্টকেও কৃচ্ছ্রতার ব্যবস্থাদি রূপায়ণ এবং অবাধ মুদ্রাস্ফীতি, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশ চিন্তা করেই বিপ্লবের পর সামনের সারিতে আসবার সুযোগ পেয়েও ধুরন্ধর রাজনীতিক ল্যাকের্ডা এবং কুচিতশেচক অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেণ্ট হতে রাজী হন নি।

ভরসা একমাত্র আমেরিকার সাহায্য। গুলার্টের পরাজয়ে আমেরিকা খুশি। প্রেসিডেণ্ট জনসন এর মধ্যেই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, আমেরিকার সাহায্য বৃদ্ধির চেষ্টায় গুলার্ট নিজে ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

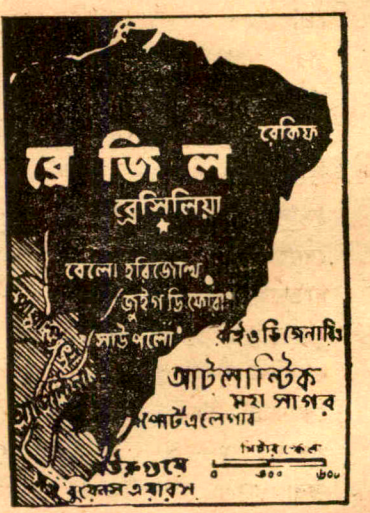

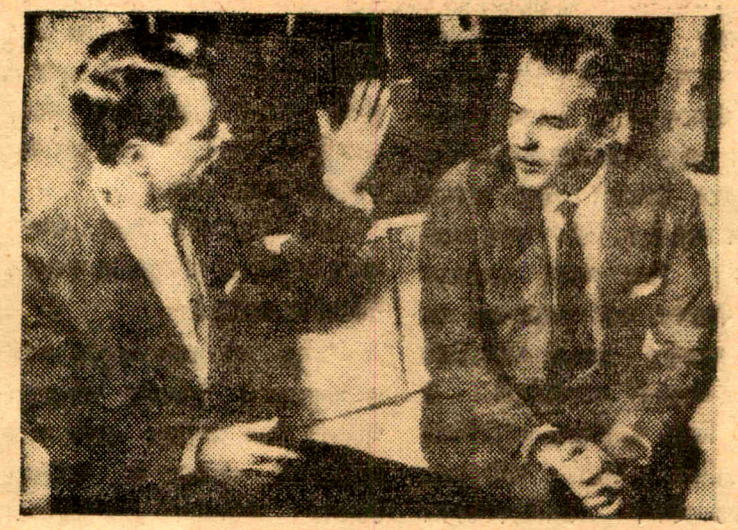

● প্রেসিডেণ্ট গুলাটির সঙ্গে ( ১৯৬৩ সালে ) আলোচনারত রবার্ট কেনেডি

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

ওয়াশিংটন: আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী হবেন কি না, এ নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে। আততায়ীর গুলীতে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির জীবনাবসানের পর থেকেই রবার্ট কেনেডি এসে পৌঁচেছেন একেবারে প্রথম সারিতে—আসন লাভ করেছেন গণমনে। তিনি এখন তরুণ—বয়স মাত্র ৩৮ বছর। আগামী নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন পর্ব সমাপ্তির পর এ্যাটর্নি জেনারেলের পদে ইস্তফা দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ ভিন্ন আর কোন ইঙ্গিত তিনি এখনও দেন নি। উত্তরাঞ্চলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জনপ্রিয়তার তিনি আজ উত্তরাধিকারী। দক্ষিণ দেশের শ্বেতকায় উগ্রপন্থী ভোটদাতারা অবশ্য তাঁর বিরোধী। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র নিগ্রোদের সমান নাগরিক অধিকার দানের প্রেসিডেণ্ট কেনেডি প্রবর্তিত নীতি রূপায়ণের প্রধান রূপকার বলেই তাঁকে গণ্য করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের ভোট অবশ্যই তিনি পাবেন। কিন্তু একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, প্রেসিডেণ্ট জনসন এবং রবার্ট কেনেডির মধ্যে সম্পর্কটা তেমন মধুর নয়। প্রকাশ, ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে নিউ হ্যামশায়ার, নিউ ইয়র্ক এবং উইসকনসিনে রবার্ট কেনেডিকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের তিনি বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মনোনয়নের সাধারণ রীতি অনুযায়ী পার্টি কর্তৃক মনোনীত প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করেন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। মনোনয়নের আঠার ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেণ্ট ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী মনোনয়ন করেন।

প্রেসিডেণ্ট জনসন কিছুদিন আগে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেণ্ট জনসনকে মনোনীত করা হবে। তিনি বলেছেন, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকেই বেছে নেবেন। রবার্ট কেনেডি ছাড়া ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদের মনোনয়নলাভের সম্ভাব্য প্রার্থী হলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আত্মীয় 'পীস কোরের ডিরেক্টার' আর সার্জেণ্ট শ্রিভার, রাষ্ট্রপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এডলাই স্টিভেনসন, সিনেটর হিউবার্ট হাম্পফ্রি এবং সিনেটর উইলিয়াম ফুলব্রাইট। ফুলব্রাইট সিনেটের বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত কমিটীর চেয়ারম্যান। হাম্পফ্রি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নাগরিক অধিকার বিল পরিচালনা করছেন। এডলাই স্টিভেনসন কিন্তু প্রেসিডেণ্টের পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই-দুইবার জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন পাবেন তা এখন প্রেসিডেণ্ট জনসনের ওপর নির্ভর করছে।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের খামারগুলোর দারিদ্র্য-মোচনের জন্য নতুন ধাঁচের সমবায় আন্দোলনের প্রস্তাব এনেছেন প্রেসিডেণ্ট জনসন। তাঁর প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে কৃষক, জোতদার ও কৃষি-ব্যবসায়ীদের মিলিতভাবে সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে একযোগে ক্রয়-বিক্রয় ও পণ্যদ্রব্যের যুক্ত সমবায় গড়ে তুলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সকল

● প্রেসিডেণ্ট - নসন

* এডলাই স্টীভেনসন

প্রকার আর্থিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমাজ-তন্ত্র-বিরোধী ও ব্যক্তিগত মালিকানার যে প্রবল ঝোঁক রয়েছে সেদিক থেকে বিচার করলে প্রেসিডেণ্ট জনসনের প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি গো-মহিষাদির খাদ্য যোগানো এবং পশু-চারণের অথবা খামার গ্রুপগুলোর গো-মহিষাদি ক্রয়-বিক্রয়ের সমবায় গঠন করতেও বলেছেন। এই সমবায় আন্দোলন খামারের পরিবারগুলোর মালিকানা নিয়ন্ত্রণের জবাব বলে কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী অরভিল এল ফ্রীম্যান মন্তব্য করেছেন। কৃষকদের দারিদ্র্যমোচনের সংগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ে সমবায় সংস্থা গড়ে তোলবার কাজে অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব যাতে গ্রহণ করা হয়, সেজন্য প্রেসিডেণ্ট জনসন কংগ্রেসের সামনে তাঁর সুপারিশ-পত্র পেশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীদের মতে ছোট ছোট কৃষক নতুন ব্যবসা পত্তন করতে অসমর্থ ; কিন্তু একশ' জন একযোগে স্থানীয় সম্পদ একত্রিত ক সরকারী সাহায্যে বিক্রয়যোগ্য ৎপাদন করতে পারবে।

•

'অধিকার রক্ষা বিলের' রচয়িতা টমাস জেফারসনের ২২০তম জন্ম-জয়ন্তী ১৩ই এপ্রিল উদ্‌যাপিত হল। ভার্জিনিয়ার একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে ১৭৪৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আইন-জীবী। আইন ব্যবসায়ে পশারও তাঁর বেশ জমে উঠেছিল এবং আইনজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিও তিনি অর্জন করে-ছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তা ত্যাগ করেন। ১৭৬৯ সালে তিনি প্রবেশ করলেন রাজনীতিতে। ঐ বছরই তিনি তদানীন্তন ভার্জিনিয়ার ঔপনিবেশিক রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হন। উপনিবেশগুলোর

* ফ্রীম্যান

অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরদার করে তুলে অচিরেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আমেরিকার বারটি উপনির্বাচনের প্রতিনিধিদের সাথে তিনি নির্বাচিত হন ভার্জিনিয়া রাজ্যের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, জন এ্যাডামস, জেমস মনরো এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের মত স্বনামধন্য পুরুষেরা। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন ছাড়া অপর সকলেই পরে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পদ অলংকৃত করেছিলেন। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতাই তাঁদের লক্ষ্য—এই ঘোষণা সম্বলিত প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেন ১৭৭৬ সালে ২রা জুলাই। দুদিন বাদেই তাঁরা গ্রহণ করেন আমেরিকার উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রখ্যাত দলিল।

এই ঘোষণাপত্রে টমাস জেফার-সনের নিম্নলিখিত অবিস্মরণীয় কথাগুলি সন্নিবেশিত রয়েছে :—

'ঈশ্বর সৃষ্ট সকল মানুষই সমান ও মানুষমাত্রেই কতগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার নিয়ে জন্মায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জীবন ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকার, সুখান্বেষণের অধিকার। এ সকল আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে করি। মানুষ যাতে এই অধিকারগুলো অর্জন করতে পারে তারই জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা, শাসিতের সম্মতির মধ্যেই রয়েছে সরকারের ন্যায্য শক্তি।'

মানবিক অধিকারের উদ্‌গাতা, প্রতিভাধর রাজনীতিক টমাস জেফারসন ছিলেন সেকালের আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক। সামাজিক ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবর্তকও তিনি। কিছু কিছু অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অধিকারের সর্তাধীনে

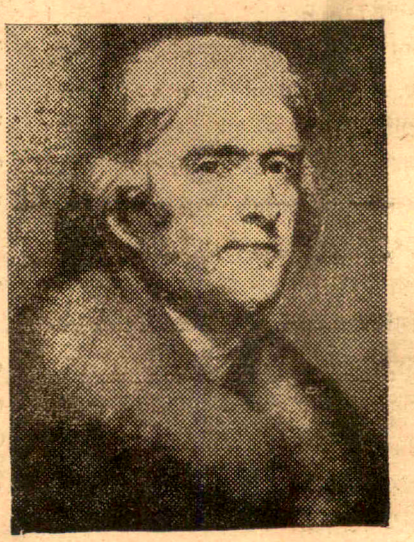

• টমাস জেফারসন

সীমায়িত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। এই মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবেই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দশটি সংশোধন সম্বলিত অধিকার রক্ষা বিল গৃহীত হয়েছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জর্জ ওয়াশিংটনের অধীনে আমেরিকার প্রথম সেক্রেটারী অফ ষ্টেট নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর সহকর্মী ট্রেজারীর সেক্রেটারীর সাথে মতবিরোধের ফলে তিনি পদত্যাগ করেন। পরে তিনি ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠন করেন। ১৮০১ সালে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৮০৫ সালে পুনরায় তিনি প্রেসিডেণ্টের পদলাভ করেন। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল অগাধ। আইন, সরকার, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, শিক্ষা, সঙ্গীত, স্থাপত্যবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, লাতিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। দেশের ও জাতির কল্যাণে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ও দক্ষতাকে। তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষ। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ এবং সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর মতবাদ ও আদর্শ সার্বিক মর্যাদালাভ করেছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর সমাধিতে স্থাপিত স্মৃতিফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলো সন্নিবেশ করার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। দেশবাসী গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁদের নেতার শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছেন। তাঁর সমাধিফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে—

এখানে শায়িত আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার রচয়িতা, ভার্জিনিয়ার ধর্মীয় স্বাধীনতা বিধানের স্রষ্টা এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক টমাস জেফারসন।'

* হেনরি ক্যাবট লজ

কংগ্রেসের সূত্রে জানা গিয়েছে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজ পদত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় নৌবিভাগের অবসর-প্রাপ্ত কমাণ্ডাণ্ট জেনারেল ডেভিড এম শুপকে ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। গেল সপ্তাহে ক্যাবট লজ হ্যামশায়ারে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রাথমিক প্রেফারেন্সে জয়ী হয়েছেন। দেশে ফিরে রিপাব্লিকান দলের মনোনয়ন লাভের অভিযান চালাতে তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে।

* * *

প্রেসিডেণ্ট জনসনের খুব ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কনেকটিকাট থেকে নির্বাচিত সিনেটের সদস্য ডেমোক্রাটিক পার্টির মিঃ ডড দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের জবাবে উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেছেন, ভিয়েৎ কং গেরিলাদের আক্রমণের পেছনে রয়েছে পরদেশীদের পরিকল্পনা, সংগঠন এবং অস্ত্রশস্ত্র। হো-চি-মিনের এজেণ্টরাই এই নটের গুরু। সিনেটর ডড মনে করেন, ভিয়েৎ কং গেরিলাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ অবাধে চলতে থাকলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হবে।

* *

সম্প্রতি জে ডবলিউ ফুলব্রাইট সেনেটে ভাষণদান প্রসঙ্গে মার্কিন বৈদেশিক নীতির মৌলিক পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে এক জোরালো বক্তৃতা দিয়েছেন। ফুলব্রাইট পণ্ডিত ব্যক্তি বলে পরিচিত। মার্কিন রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবও যথেষ্ট।

ফুলব্রাইট কমিউনিষ্ট দুনিয়া, বিশেষ করে চীন, কিউবা ও পানামা সম্পর্কে মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এ সব বিষয়ে বাস্তব-সম্মত ও যুক্তিবাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বক্তৃতাকালে উল্লেখযোগ্য যে কথাগুলি বলেন, তা নিম্নরূপ :

(১) কমিউনিষ্ট জগৎকে ভয়াবহ ও সভ্যতার শত্রু বলে ভাবা উচিত নয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক

* ফুলব্রাইট

স্থাপন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবার যোগ্য। ফুলব্রাইটের বক্তব্য, সোভিয়েট

ইউনিয়ন ও অনুরূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে কমিউনিষ্ট জগতের অন্তর্দ্বন্দ্বকে 'স্বাধীন জগতের' কাজে বেশি করে ব্যবহার করা যাবে।

(২) কিউবা সম্পর্কে অযথা উত্তেজিত হবার নীতি পরিহার করতে হবে। এ কথা ঠিক, ক্যাস্ট্রো লোক ভাল নন এবং মার্কিন জীবনধারার দিক থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। কিন্তু ক্যাস্ট্রোকে শাসন থেকে উচ্ছেদ করাও সম্ভব নয়। আর ক্যাস্ট্রো সমগ্র আমেরিকান মহাদেশের বিপদ, এতটা ভাবাও ঠিক নয়। ফুলব্রাইটের মত, ক্যাস্ট্রোকে সহ্য করতে হবে এবং ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে মার্কিন নীতি স্থির করার সময় ক্যাস্ট্রোকে অগ্রাহ্য করতে হবে। ক্যাস্ট্রোর ভূত মার্কিন বৈদেশিক দপ্তরের কর্তাদের ঘাড় থেকে নামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা তথা ল্যাটিন আমেরিকা সকলেরই মঙ্গল।

(৩) পানামা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে। অতি-ক্ষুদ্র এই দেশটি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিদ করা নেহাৎ বোকামি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এত শক্তিশালী একটি দেশ পানামার প্রশ্নকে মর্যাদার বিষয় করেছে, ফুলব্রাইটের কাছে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। দুর্বল ও নির্ভরশীল প্রতিবেশী পানামার প্রতি উদার হয়ে তার দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(৪) কমিউনিষ্ট চীনকে এখনই স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশাধিকার দেবার দাবী সমর্থন না করলেও ফুলব্রাইট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। চীনে কমিউনিষ্ট শাসন আজ কঠোর বাস্তব। কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এই সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার ... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তুত

প্রধান প্রধান প্রায় সব বিষয়েই ফুলব্রাইটের বক্তব্য বর্তমান মার্কিন বৈদেশিক নীতির বিরোধী। কেনেডির আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে

* সুসলভ

সম্পর্কের উন্নতি ও শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও ফুলব্রাইট প্রস্তাবিত এতটা উদার নীতি গ্রহণ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখনই সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। ফুলব্রাইট নিজেই বলেছেন, তিনি ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকে এই বক্তব্য রাখছেন না, বা এই বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গেও তিনি কোন পরামর্শ করেন নি। তবু ফুলব্রাইটের এই স্পষ্ট বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা সুরু হয়েছে। পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক ইতিমধ্যেই ফুলব্রাইটের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেছেন।

এখনই হয়তো ফুলব্রাইটের প্রস্তাব গৃহীত হবে না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে উদার নীতির হাওয়া বইতে সুরু করেছে ফুলব্রাইটের বক্তৃতা তার প্রমাণ। ফুলব্রাইট নিজেই তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে প্রয়োজনের সময় সাহসের সঙ্গে নতুন নেতৃত্ব দিতে হবে। দরকার হলে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। নেতৃত্বের পরীক্ষা এখানেই।

## সোভিয়েট ইউনিয়ন :

চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর পক্ষে সুসলভের কঠোরতম সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর, গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য সংবাদ—সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির তিনজন বিখ্যাত নেতার দল থেকে বহিষ্কার। এঁরা হলেন জর্জি ম্যালেনকভ, ভি এম মলোটভ ও লাজার ক্যাগানোভিচ।

বহিষ্কৃত নেতারা সকলেই কট্টর স্ট্যালিনপন্থী। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর, বিশেষ করে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতালাভের পর থেকে, এঁদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। ম্যালেনকভ ও মলোটভ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাগানোভিচ পার্টির বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ---এঁরা চীনকে সমর্থন করছিলেন এবং ক্রুশ্চেভ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মাও-সে-তুং ও ক্রুশ্চেভের মধ্যে যে বিরোধ অতি দ্রুত পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের এই বহিষ্কার তার অন্যতম প্রমাণ। এঁদের দমন করে ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট

* মাও-সে-তুং

ইউনিয়নের অভ্যন্তরে চীনের সমর্থকদের কোণঠাসা করছেন। অবশ্য এই সঙ্গে ক্রুশ্চেভ তাঁর নিজের ক্ষমতাকেও

সংহত করার চেষ্টা করছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মাও-সে-তুং সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসন ক্ষমতা থেকে ক্রুশ্চেভকে বিতাড়নের চেষ্টা করবেন, এই স্বাভাবিক। সুতরাং, ক্রুশ্চেভকে সম্ভাব্য চক্রান্ত থেকে সাবধান হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বুলগানিন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর সভাপতি ক্লিমেণ্ডি ভরোশিলভ, মিখাইল পারভকিন ও ম্যাক্সিম সাবুরভের মত বিশিষ্ট স্ট্যালিনপন্থীরা সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ-বিরোধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অতীতে অভিযোগ করা হয়েছে। দেখা যাক, এঁদের ভাগ্যে কি ঘটে।

## লিবিয়া ঃ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের দাবী জানিয়েছিলেন—লিবিয়া থেকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল সামরিক ঘাঁটি তুলে নিতে হবে। ইস্রায়েলকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধী কার্যে লিপ্ত, আরব রাষ্ট্রগুলির এই অভিযোগ। পশ্চিমের আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ করা ও আরব-এর স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সামরিক ঘাঁটির অপসারণ প্রয়োজন।

নাসেরের বক্তৃতার পরদিনই সঙ্গে সঙ্গে লিবিয়া সরকার ঘোষণা করেছে, বর্তমান চুক্তির সময় শেষ হলে নতুন করে সামরিক ঘাঁটি রাখার চুক্তি করা হবে না। ১৯৭০ সালে এই চুক্তির সময় শেষ হবে। ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে আরব জাতিসমূহের তীব্র মনোভাব সম্পর্কে লিবিয়া সচেতন—লিবিয়াবাসীরাও এর বিরুদ্ধে। তাই ভবিষ্যতে এই ঘাঁটি রাখা হবে না, সরকারকে এই কথা ঘোষণা করতে হয়েছে।

কিন্তু নাসের এত দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট নন। তিনি এখনই এসব ঘাঁটির অপসারণ চান। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রও নাসেরের দাবীর সমর্থক। লিবিয়ার ওপর নতুন করে তাই চাপ দেওয়া হচ্ছে।

ট্রিপলির কাছে সিনামে মার্কিন সৈন্যঘাঁটি রয়েছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে মার্কিন বিমান বহরের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি রয়েছে এখানে। ট্রিপলি ও বেনগাজিতে রয়েছে বৃটিশ সৈন্যঘাঁটি। ইদ্রিস ও আন আদামে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বড় ঘাঁটি আছে। 'ন্যাটো' সামরিক প্রস্তুতির অন্যতম

• রাষ্ট্রপতি নাসের

ঘাঁটি আজ লিবিয়া। আরব জাতীয়তাবাদের চাপে যদি শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে লিবিয়া থেকে তাদের সৈন্য অপসারণ করতে হয়, তবে কোথায় তাদের এই ঘাঁটি করবে তাই হল সমস্যা। প্রায় সব আরব রাষ্ট্রই সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিরোধী।

## জাপান ঃ

টোকিও ঃ ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জেনারেল চার্লস দ্য গলের স্বীকৃতি সত্ত্বেও জাপান লালচীনকে স্বীকার করবে না বলে জাপানের নেতৃবর্গ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক লেনদেন যে-হারে বেড়ে চলেছে, তাতে চীনকে কার্যত মেনে নেয়া হচ্ছে। একথা আর 'ঢাক ঢাক' করে চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পিকিংয়ের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যের অসম্পূর্ণ রিপোর্ট অনুসারে গেল বছর জাপান নয়াচীনের ৭৫ কোটি টাকার কারবার চালিয়েছে। পূর্ব বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ব্যবসা পরিচালিত হয়েছে। সারা বিশ্বে জাপানের মোট বাণিজ্যের পরিমাণের তুলনায় খুব নগণ্য হলেও, চীনের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কটা বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে, বলতে হবে। জাপানের কয়েকজন নেতাও একথা উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন, জাপান ও চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইকেদা এবং জাপানের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ কিন্তু এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা বলেছেন, জেনারালিসিমো চিয়াং কাইসেকের তাইওয়ান সরকারের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর।

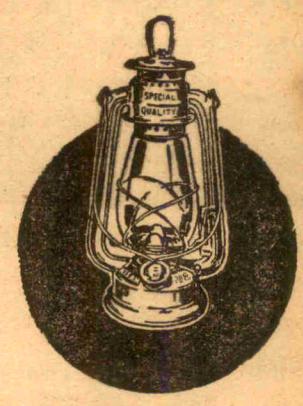


কিয়ান
লক্ষ্মন সর্বোৎকৃষ্ট

•

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬,৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

তাইওয়ানের সঙ্গে জাপানের 'শান্তি' চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৫২ সালে। তখন কোরিয়ায় চলেছে যুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী লালচীন ও উত্তর কোরিয়ার কমিউনিষ্ট বাহিনীর মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। জাপানীরা এখনও অবশ্য তাইওয়ান ও লালচীনকে আলাদা করেই দেখে থাকেন। সরকারীভাবে এই মনোভাব প্রকাশিত না হলেও, সংবাদ পত্রগুলো এবং প্রাক্তন অফিসারদের বিবরণে মনে হয়, নয়াচীনকে কমিউনিষ্ট চীন এবং তাইওয়ানকে জাতীয়তাবাদী চীন বলে তাঁরা মনে করেন।

লালচীনের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথাও কিছু কিছু

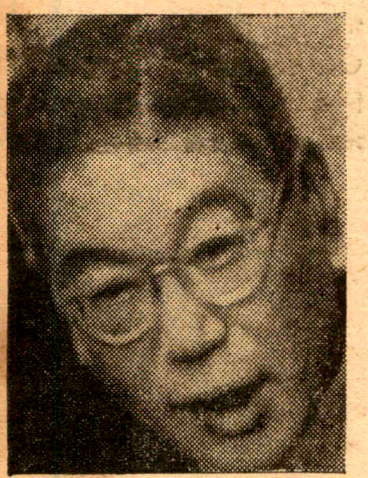

* প্রধান-মন্ত্রী ইকেদা

প্রভাবশালী ব্যক্তি চিন্তা করছেন। মন্ত্রিসভার প্রাক্তন দুজন সদস্য নয়াচীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও ইতিমধ্যে করেছেন। জাপানের যাঁরা প্রধান তাঁরা এ প্রস্তাবে এখনও নীরব।

জাপানের অঘোষিত আর্থিক রিপোর্টে এমন কথাও নাকি রয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের মধ্যে অন্তত ছ'টি জাপানী ব্যবসায়ী সংস্থার অংশীদার হবে কমিউনিষ্ট চীন। ১৯৬৬ সালের মধ্যে চীনের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দু' শ' কোটি টাকা বলে মনে করেন জাপানের প্রধান কয়েকটি বাণিজ্য সংস্থা। তাঁদের মতে, পিকিং থেকে ১৯৬৬ সালে এক শ' কোটি টাকার লোহা, কয়লা, চাল প্রভৃতি আমদানী করা হবে। এ সব বাস্তবে রূপায়িত হলে জাপানের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদার অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও বৃটেনের থেকে চীন খুব দূরে থাকবে না। অবশ্য বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে জাপানের বড় অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে।

জাপানের সঙ্গে এমনি করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে খুবই সুদূরপ্রসারী। বামপন্থীদের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি হতে থাকবে চীনকে স্বীকৃতি দানের। জাপান নাকি এর মধ্যেই চীনের সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্যিক প্রতিনিধি বিনিময়ে সম্মতি দিয়েছে। চীনের সঙ্গে যোগাযোগও আগের চাইতে ঢের বেশি। ১৯৬৩ সালে দু' হাজার জাপানী চীনে ঘুরে এসেছেন। এঁদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী।

## সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

**কায়রো ঃ** বহু বিতর্কমূলক হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস ক্লের নবলব্ধ উপাধিটি শেষ পর্যন্ত থাক আর নাই থাক ; তিনি ধীরে ধীরে মিশর ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ঐশ্লামিক যোদ্ধার সম্মানের আসন পেতে চলেছেন। তিনি আর এখন ব্যায়ামবীর নেই। তাঁকে কেন্দ্র করে রাজনীতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। তাঁকে নিয়ে সংগ্রাম এখন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণগত বৈষম্যের প্রশ্ন থেকে সুরু করে জর্ডনের জল পর্যন্ত এসে গড়িয়েছে।

ক্যাসিয়াস নিজেকে ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্বের একজন বলে ঘোষণা করায় পশ্চিম আফ্রিকা অত্যন্ত উল্লসিত। তাঁকে মহম্মদ আলি ক্লে নামে সম্বোধন করাই সকলে পছন্দ করেন। পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমান নেতা এল হজ ইব্রাহিম বলেছেন, পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যাসিয়াস এলে তাঁকে এদেশের সন্তান বলেই গণ্য করা হবে।

লিস্টনের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হবার পরই মিশরের ঐশ্লামিক কাউন্সিলের প্রধান মহম্মদ টি আওয়েইদা ক্যাসিয়াসকে মিশরে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

* ক্যাসিয়াস ক্লে

ক্যাসিয়াসের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে উত্তর আমেরিকায় ঐশ্লামিক আন্দোলন গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েই সবাই এখন খুব খুশি। 'মুসলমান বলে আমাকে কেউ আক্রমণ করলে তা' কায়রো, মিশর, মক্কা ও সৌদি আরব আক্রমণের সামিল হবে।'—ক্যাসিয়াসের এই উক্তিতে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে।

আমেরিকার কূটনীতিকদের মতে, ক্যাসিয়াস একটু সংযতবাক হয়ে বিচক্ষণতার সাথে পদক্ষেপ করলে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেতে পারতেন।

## রাজধানী :

রাজধানীতে এখন প্রবল উত্তেজনা, উদ্বেগ ও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। রাজনৈতিক মহলে ব্যস্ততার বিরাম নেই। রাজধানীর বুকের ওপর অনেক প্রশ্ন নিয়ে সকলে মাথা ঘামাচ্ছে, অনেক লোকের আসা-যাওয়ায় রাজনৈতিক মজলিস সরগরম হয়ে উঠেছে। একদিকে পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক, যার ওপর নির্ভর করছে সংখ্যালঘুদের ভাগ্য ও জীবন। পূর্ব বাংলার কোন দূর গ্রামের অসহায়া সংখ্যালঘু নারী থেকে সুদূর দণ্ডকারণ্যের মানা শিবিরে প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ উদ্বাস্তু পর্যন্ত চেয়ে আছে এই বৈঠকের দিকে। ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সংখ্যালঘুদের উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি রয়েছে এই আলোচনার প্রতি। আর হয়তো পূর্ব বাংলার কোন অবমানিতা নারীত্ব অপহৃতা নারী, আমাদেরই কোন বোন ক্ষীণ আশায় তার মুক্তির কথা ভাবছে আকাশকুসুম কল্পনার মত। এই বৈঠকে যদি তার মুক্তির কোন উপায় ঘটে।

বৈঠকের পূর্বেই সকলে ধারণা করেছিলেন, পাকিস্তান সংখ্যালঘু সম্পর্কিত অন্য প্রশ্নগুলি সহজেই মীমাংসা করবে, কিন্তু বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্নেই জিদ ধরে থাকবে এবং তার চেষ্টা হবে ছলে চাতুরীতে অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিক বলে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। পাকিস্তানের এতদিনের মতিগতি দেখে এই ধারণা ঠিক প্রমাণিত হতে চলেছে। এই একটি মাত্র প্রশ্নে পাকিস্তান আলোচনার চতুর্থ দিবসেও এক জায়গায় রয়েছে। পাকিস্তানের একগুঁয়েমির ফলে হয়তো এত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

রাজধানীতে অন্যতম আলোচনার বিষয়—ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি। একথা প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে, একটি কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙে দুই পার্টিতে পরিণত হবে।

● পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক : সর্বশ্রী বিমলা সাদ চালিহা, শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, হবিবুল্লা খান ও শ্রী ফুল্লচন্দ্র সেনকে দেখা যাচ্ছে।

এস এ ডাঙ্গের এক চিঠিকে কেন্দ্র করে এই ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়েছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় কমিটীর সাতজন সদস্যকে বহিষ্কার করায় নিশ্চিতভাবে বলা চলে এপ্রিল মাসেই দুটি কমিউনিষ্ট পার্টি পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।

সম্প্রতি মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ভারত মহাসাগরে ৬ সপ্তাহব্যাপী পরিক্রমার সংবাদে, বিশেষ করে বামপন্থী মহল চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

* * *

বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে নাগাল্যাণ্ডের সরকারের আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট যে চেষ্টা সুরু করেছিলেন, তা আর বেশিদূর অগ্রসর হবার পূর্বেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তিনি ফিজোর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। মাইকেল স্কটকে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিজো ও বিদ্রোহীদের নেতারা নাগাল্যাণ্ডের গঠনতন্ত্রসম্মত অবস্থা মেনে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ আলোচনা চালিয়ে লাভ নেই। এরূপ আলোচনা কেবল সময় নষ্টের নামান্তর এবং এতে বিদ্রোহীরা উৎসাহ বোধ করবে।

ফিজো এই প্রারম্ভিক সর্ত গ্রহণ করে নি। বিদ্রোহীরা যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনা চালাতে রাজী আছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। মাইকেল স্কট যদি বিদ্রোহীদের গঠনতান্ত্রিক অবস্থাকে মেনে নেবার জন্য বুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন, তবে সরকার তাদের সাথে আলোচনা চালাতে রাজী আছে। নাগা-সরকার তার জন্য স্কটকে সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে।

● রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট

এদিকে মাইকেল স্কট মিশন সম্পর্কে নানা কথা উঠেছে। তাঁর ডিমাপুর পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ডিমাপুর হচ্ছে বিদ্রোহী নাগাদের প্রকাশ্য যোগাযোগের কেন্দ্র। এখানে অনেকে

● ফিজো

অনুগত সেজে আছে, কিন্তু গোপনে বিদ্রোহীদের পক্ষে কাজ করছে। এখান থেকে একদিকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর একদিকে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে। শান্তির উদ্যোগী স্কট নতুন করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যই প্রথমে ডিমাপুর গিয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করছে। এমনও আশঙ্কা করা হচ্ছে, মাইকেল স্কটের শান্তি মিশনের আসল উদ্দেশ্য—বিদ্রোহীদের আশার বাণী শুনিয়ে তাজা করা এবং তাদের পুনর্গঠিত হতে সুযোগ দেওয়া।

ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ যে চারজন সদস্যের শান্তি মিশনের (ওখা প্রস্তাব) প্রস্তাব দিয়েছে সে সম্পর্কে অনেকে মনে করছেন, এই প্রস্তাব রচনার স্থান নাগাল্যাণ্ড নয়, বিদেশ থেকেই এই প্রস্তাব এসেছে। তাঁদের মতে, ব্যাপটিষ্ট মিশন যদি এ ব্যাপারে সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেন, তবে এই প্রস্তাব নিয়ে তাদের বহুপূর্বে আসা উচিত ছিল। যখন বিদ্রোহীরা প্রবল ছিল, জনসাধারণের ওপর তাদের প্রভাব ছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা পাল্টে গেছে। এখন বিদ্রোহীরা ক্ষীণবল, তাদের সমর্থকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে। তখন গীর্জার নেতাদের এই প্রস্তাব সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সরকারের এখন অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। যাতে কোন রূপে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, যাতে 'শান্তি মিশনের' আড়ালে বিদ্রোহীরা পুনঃসংগঠিত হতে না পারে।

## কেরালা ঃ

### কংগ্রেসে গৃহবিবাদ

রাজ্যসভার আসনে নির্বাচনকে উপলক্ষ করে কেরালা কংগ্রেসে গৃহবিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং চরম সংকটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে শৃংখলা-বিরোধী মনোভাবের দরুণ মুসলিম লীগ সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করেছে। রাজ্যসভার তিনটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বিধান-সভার ১২৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ৬৭টি আসন রয়েছে, সুতরাং দুটি আসন লাভ করা এমন কঠিন ছিল না, যদি কংগ্রেস সদস্যরা সকলে ভোট দিত। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীমতী আলি থায়িলের পরাজয়ের প্রথম কারণ, কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই বলছেন যে, কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দ্বিতীয় কারণ, কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড প্রদেশ কংগ্রেসের সুপারিশ উপেক্ষা করে নিজেদের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী এই দুটি আসনের জন্য শ্রী সি কে গোবিন্দন নায়ার এবং শ্রী এ ভি জোসেফের নাম সুপারিশ করেছিল। শ্রীমতী আলি থায়িলের কোনরূপ জনপ্রিয়তা না থাকা সত্ত্বেও, প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীমাধবন নায়ার হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীমতী থায়িলকে ভোট দেবার জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ সমর্থিত স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীসালে মহম্মদ সেট কোচিনের একজন বিরাট শিল্প-পতি, তিনি কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি, নিজের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এবার রাজ্যসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন।

বিধানসভায় কংগ্রেস দল এই নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করার জন্য একটি তদন্ত কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত করেছে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে। তদন্ত যদি ঠিকভাবে হয়, তবে অনেক কথা বেরিয়ে পড়তে পারে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবার ভয়ে তদন্ত ঠিকভাবে হবে কি না, সেটাই হচ্ছে কথা। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী সি কে গোবিন্দন নায়ার ৩৩ ভোট পেয়েছেন, প্রয়োজন অপেক্ষা এক ভোট বেশি। কমিউনিষ্ট-প্রার্থী শ্রী কে দামোদরণ শ্রীনায়ারের সমান ভোট পেয়েছেন। স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীসেট পেয়েছেন ৩২ ভোট। শ্রীমতী

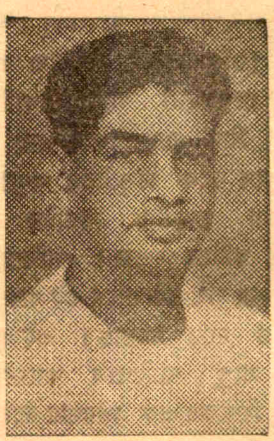

● শ্রী আর শঙ্কর

থায়িল পেয়েছেন ২৬ ভোট। যে সাতজন এম-এল-এ পার্টির নির্দেশ অমান্য করেছেন তাঁরা শ্রীচাকোর সমর্থক।

**বাজেট অধিবেশনে বিপদ-সংকেত**

এবার কেরালা বাজেট অধিবেশন অত্যন্ত প্রাণহীন হয়েছে। সময় সময় উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে—যখন চাকোর গ্রুপ কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদানে

শ্রীচাকো

বিরত থেকেছে। কয়েকবারই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশঙ্করকে বিপদে ফেলার জন্য চাকোর দলের কেউ কেউ ভোটের সময় অনুপস্থিত থেকেছে। শ্রীশঙ্কর অবশ্য শেষরক্ষা করতে পেরেছেন। এই অবস্থা দেখে কমিউনিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছিল, শ্রীশঙ্কর যখন কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন পাচ্ছেন না, তখন তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলেছেন যে, তিনি যদি মঞ্জুরী বিল পাশ করাতে না পারেন, তবে নিশ্চয় পদত্যাগ করবেন।

এদিকে শ্রীচাকোর দল বাইরে শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নেমেছে। প্রকাশ্যে তারা শ্রীশঙ্করকে নিন্দা করে বক্তৃতা দিচ্ছে আর শ্রীচাকোকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছে। শ্রীচাকো সমর্থিত কয়েকটি সংবাদপত্র শঙ্কর-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করে অভিযান সুরু করেছে।

**কমিউনিষ্টদের উভয়সংকট**

১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের রণকৌশলের বিষয়ে কেরালার কমিউনিষ্ট পার্টি এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। দক্ষিণপন্থী এবং ক্ষমতাশীল দল মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে। শ্রী এ কে গোপালন আর এক কদম এগিয়ে এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগের সাথে প্রকাশ্য ফ্রন্ট গঠনের কথা বলেছেন। শ্রীগোপালনের বিবৃতির পরে দক্ষিণপন্থী পাঁচজন এম-এল-এ আর এক পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন। পরে পার্টির সেক্রেটারিয়েট এক বিবৃতিতে মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ সমর্থন করেছেন, কিন্তু দলের নেতাদের এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি না দিতে বলেছেন। কিন্তু সর্বভারতীয়

**আসন্ন রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে উহাতে বিভিন্ন রাজ্য অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ভারত পরিক্রমার একটি তথ্যবহুল পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত করা হবে। —সম্পাদিকা**

ক্ষেত্রে ভাঙনের মুখে কেরালায় কমিউনিষ্ট পার্টি আর কতক্ষণ জোড়াতালি দেবে।

**রাজস্থান ঃ**

**সরকারী পরিচালনায় খাদ্যশস্য ব্যবসা**

ভারতে রাজস্থান প্রথম রাজ্য যেখানে সরকারী পরিচালনাধীনে খাদ্যশস্যের ব্যবসা সুরু হলো। এখানে সরকার গমের নিম্নতম দর বেঁধে দেবে এবং কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করার জন্য 'মণ্ডি'তে নিজেদের এজেণ্ট নিয়োগ করবে। এভাবে ক্রয় করা গম সরকারী দোকান মারফৎ বিনা মুনাফায় বিক্রয় করা হবে।

ব্যবসায়ীদেরও গমের ব্যবসা করতে দেওয়া হবে, যদি তারা লাইসেন্স গ্রহণ করে এবং সরকারী সর্ত মেনে চলে। খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে

শ্রী এ কে গোপালন

সরকারী ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য ব্যবসায়ীদের চক্রান্তকে পরাস্ত করার জন্যই সরকার খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিজ হাতে গ্রহণ করেছে। কয়েক মাস পূর্বে গমের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়েছিল। আন্দোলনের ফলে সরকার রাজ্য থেকে বাইরে গম রপ্তানী নিষিদ্ধ করে নির্দেশ এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী লাইসেন্স অর্ডার জারী করে। এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবীতে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীরা গত ১লা এপ্রিল হরতাল পালন করেছিল এবং সরকারের সমালোচনা করে বলেছিল যে, নিম্নতম ও উর্ধ্বতম দর বেঁধে দেওয়া ছাড়া সরকারের আর কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না; ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তারপরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারী পরিচালনায় খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের কথা স্থির হয়।

**বিহার ঃ**

**যাজীর পরাজয়ে সহায়ের বিপদ**

শীলভদ্র যাজীর পরাজয়কে কেন্দ্র করে বিহার কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ

চরমে উঠেছে এবং এই বিরোধ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করার দিকে নিয়ে চলেছে। রাজ্যসভায় কংগ্রেসী সদস্য শীলভদ্র যাজীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পুনর্নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী মহল মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় এই পরাজয়ের জন্য দায়ী। তাঁরা প্রকাশ্যে শ্রীসহায়ের পদত্যাগ দাবী করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি দলের সকল প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে পারেন নি। শ্রীসহায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এমন স্তরে পৌঁচেছে যে, পাঁচজন যুব কংগ্রেস নেতা বিহার প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন সুরু করেছে। তাদের দাবী—শ্রীসহায়ের পদত্যাগ চাই, শীলভদ্র যাজীর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটী চাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি এন ঝা-এর

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

হস্তক্ষেপে অনশন প্রত্যাহৃত হয়েছে। অনশন ভঙ্গের দিন শ্রীঝা বলেছেন, তদন্তের দাবী যুক্তিসঙ্গত এবং তিনি আশা করেন, কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তদন্ত করবেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য অর্থের লোভে দলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে নি।

অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রাজেন্দ্র মিশ্রকে সভাপতি নিযুক্ত করে এক তদন্ত কমিটী গঠন করেছেন। কিন্তু কমিটীর একজন সদস্য বলেছেন, তদন্ত কমিটী বসুক আর কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড থেকে তদন্তই হোক অথবা এ-আই-সি-সি-র শৃংখলা রক্ষা কমিটীই আসুক কিছুতেই তাদের দাবী পূরণ হয়েছে বলে তারা মনে করবে না। ঘটনার গুরুত্ব আরো বোঝা যাবে পণ্ডিত রাজেন্দ্র মিশ্রের চিঠি থেকে। তিনি এ-আই-সি-সি-কে এক পত্রে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটী নিয়োগের অনুরোধ করেছেন। পণ্ডিত মিশ্র স্বীকার করেছেন, একজন ধনী নির্বাচনপ্রার্থী প্রত্যেকটি ভোট ক্রয় করার জন্য দু' হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম দিয়েছেন। শ্রীসহায় তিনজন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটী গঠনের কথা ঘোষণার সময় নিজেও স্বীকার করেছেন যে, 'প্রায় জন-কয়েক কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয় নি।' শীলভদ্র যাজী পরাজিত হলেন, কিন্তু বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ জৈন স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। এরূপ অভিযোগ যে, মুখ্যমন্ত্রীর দলের কোন কোন সদস্য সক্রিয়ভাবে শ্রীজৈনকে সাহায্য করেছেন।

## আসাম ঃ
### চালিহার বিদায় কি আসন্ন ?

কথায় বলে, 'কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।' আসামের রাজনীতিতে এই প্রবাদবাক্য প্রযোজ্য। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছে তাকে উপলক্ষ করে, আসাম কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রী-বিরোধী দল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহাকে পদচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শ্রীচালিহাও চুপ করে নেই। তিনিও শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রী-বিরোধী উপদল শ্রীচালিহার স্থলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে চাচ্ছেন। শ্রীমেধী বর্তমানে মাদ্রাজের রাজ্যপাল। শীঘ্রই তিনি অবসর নিয়ে আসামে ফিরে আসছেন।

কংগ্রেসের এই উপদলের 'মাথা' শ্রীদেবেশ্বর শর্মা বিধানসভার মধ্যে নিজেদের দল ভারী করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাদের প্রধান শ্লোগান হয়েছে 'অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী মুসলিমদের হটাও।' এই শ্লোগান অসমীয়া এবং বাঙালীদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করায় এদের পক্ষে সুবিধা হয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, যাঁরা বাস্তবিকই ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের ছিলেন, তাঁরাও আজ পূর্ববঙ্গের ঘটনার পর সাম্প্রদায়িকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন ; পাহাড়ী উপজাতিরাও কমবেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী-বিরোধী কংগ্রেসের উপদল, এই মনোভাবকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাবার জন্য শ্রীচালিহার ওপর সমস্ত দোষ চাপাচ্ছে। তারা দলবৃদ্ধির জন্য শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার কাছেও গিয়েছিল। শ্রীবড়ুয়া বর্তমান মন্ত্রিসভার একজন সংগঠক এবং স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু শ্রীবড়ুয়া তাদের সঙ্গে শ্রীমেধীর সমর্থনে আসবেন কেন? তিনি নিজেও যে একজন মুখ্যমন্ত্রীর পদাকাঙ্ক্ষী।

অবস্থা এখনো অনিশ্চিত এই কারণে যে, শ্রীচালিহার দলও ছোট নয়, দ্বিতীয়ত তিনি কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ডের আস্থাভাজন।

## বিশ্বের চোখে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু

### সুইডেন :

'আফটেনপোস্টেন' —এ পর্যন্ত ৮০ হাজারের অধিক হিন্দু ও খৃষ্টান আসামে পালিয়ে এসেছে। বিশ্ব গীর্জা পরিষদ এই কথা ঘোষণা করেছে। আরো দলে দলে উদ্বাস্তু আসামের দিকে আসছে। উদ্বাস্তুরা বলছে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানরা তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়েছে, সম্পত্তি লুঠ

করেছে, তাদের শস্যক্ষেত্রে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সীমান্ত অতিক্রমের সময় পাকিস্তানী সীমান্তরক্ষীরা তাদের অনেককে হত্যা করেছে।

'ভার্ডেনগংগ'—দলে দলে নারী ও শিশু পূর্ববঙ্গ থেকে আসামে এসে পৌঁচেছে। ওরা নিঃসম্বল। এদের মধ্যে যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা আছেন, তাঁরা বলেছেন—অনেক খৃষ্টান গ্রাম পাকিস্তানীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। ২০শে জানুয়ারী এভাবে আগুন দেবার পর লোক যখন ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আসছিল, তখন পাকিস্তানী রক্ষীরা তাদের ওপর গুলী চালিয়েছে। এতে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে।

## নিউজিল্যাণ্ড :

'দি ইভনিং পোস্ট'—৫০ হাজার হতে ৮০ হাজার অমুসলমান পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছে। তাদের বাড়িঘরে এবং ক্ষেত খামারে আগুন দেওয়া ও লুঠ করার দরুণ ওরা দেশত্যাগ করেছে। এসব উদ্বাস্তুদের মধ্যে নারী, শিশু এবং বালক-বালিকারাও রয়েছে। আসামে এ পর্যন্ত ৩৫ হাজার খৃষ্টান আশ্রয় নিয়েছে। একজন গারো ব্যাপটিস্ট মিশনারী বলেছেন, নলিতাবাড়ি গ্রামে মুসলমানরা আগুন লাগালে তাঁরা চলে আসেন। আসার পথে সীমান্তরক্ষীরা গুলী চালায়। একজন নারীর পিঠে রক্ষিত দুটি শিশু গুলীতে মারা গিয়েছে, মা হাসপাতালে আছে।

## আমেরিকা :

'ওয়াশিংটন পোস্ট' —প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় বলেছেন, পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষীর বর্বরতায় ২ জন শিশুসহ ১১ জন আহত হয়েছে। আসাম সরকার এক তারবার্তায় পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেছে—তারা যেন উদ্বাস্তুদের পশ্চাদ্ধাবন করে গুলী না চালায়। ভারতের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী-দপ্তর কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে 'পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড' বলে নিন্দা করে তা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেছে।

তুরা (আসাম) থেকে 'লণ্ডন অবজার্ভার' পত্রিকার মিঃ জেমস মিচেল ৫০ হাজার খৃষ্টান উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে বলে লিখেছেন। তুরাতে উদ্বাস্তুরা বলছে, প্রায় তিন হাজার উদ্বাস্তুদের ওপর পাক-পুলিশ উন্মত্তের ন্যায় মেসিনগানের গুলী চালিয়েছে।

## লেবানন :

'লা-ওরিয়েণ্ট' —গত কয়েক সপ্তাহ ৬০ হাজার নরনারী ও শিশু জঙ্গলের পথে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের বেশির ভাগ খৃষ্টান। ৮ই জানুয়ারী থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মীয় জেহাদ চলেছে। সেদিন গারো পাহাড়ের হাজার হাজার উপজাতি দেশত্যাগ করে আসামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ৩ হাজার উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রমের সময় পাকিস্তানী পুলিশ তাদের ওপর আক্রমণ করে। বহু লোক আহত ও নিহত হয়। মাত্র দেড় হাজার সীমান্ত অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। এ-এফ-পি প্রতিনিধি উদ্বাস্তুদের শিবির পরিদর্শন করেছেন। উদ্বাস্তুরা তাঁকে বলেছে, দলবদ্ধভাবে তাদের ওপর পাকিস্তানী মসলমানেরা আক্রমণ করেছে। তাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, জিনিষপত্র লুঠ করেছে, গরু, ছাগল, এমন কি মেয়েদের পর্যন্ত হরণ করে নিয়ে গেছে।

## জাপান :

'উমুরী' (টোকিও) : হাজার হাজার নগ্নপদ খৃষ্টান নরনারী ও শিশু দুর্গম পাহাড়াঞ্চল অতিক্রম করে গারো পাহাড়ে এসে পৌঁচেছে ; তাদের অভিযোগ—পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিমরা ওদের ওপর অত্যাচার করছে। মৈমনসিংহ জেলা থেকে ৬০ হাজার উদ্বাস্তু আসামে এসে পৌঁচেছে। দেশ ভাগের পর এই প্রথম খৃষ্টানরা উদ্বাস্তু হলো।

## মরক্কো :

'লা পেতিত মারোকেইন' (রাবৎ) : গত কয়েক সপ্তাহে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ৬০ হাজার লোক ভারতের পার্বত্য অঞ্চল আসামে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই দেশত্যাগ ঘটেছে ১৮ই জানুয়ারী থেকে ধর্মীয় অভিযান সুরু হবার পর। সীমান্ত অতিক্রমের সময় তিন হাজার উদ্বাস্তুর ওপর পাকিস্তানী পুলিশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণের মধ্যে মাত্র ১৫ শত উদ্বাস্তু ভারতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক উদ্বাস্তু অভিযোগ করছে—গত মাস থেকে তারা ধর্মীয় উন্মত্ততার শিকার হয়েছে। সশস্ত্র আক্রমণকারীরা তাদের গ্রামের ওপর হানা দিয়ে শস্য, গরু ইত্যাদির সঙ্গে যুবতী মেয়েদেরও লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে।

* * *

মালয়েশিয়ার 'মালয়নাড়ু', 'স্ট্রেট্স টাইমস', 'মালয়ান টাইমস', কেনিয়ার 'দি ইষ্ট আফ্রিকান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', গ্রেট বৃটেনের 'গার্ডিয়ান', 'দি সানডে টেলিগ্রাফ' এবং 'অবজার্ভার' প্রভৃতি পত্রিকায় পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নিধনের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
—ইহাতে আছে—
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# রঙ্গজগৎ

## ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র মূল্যায়ন !!

প্রতি বছরের মত এবারেও বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন নামক সংস্থা ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ইত্যাদি নির্বাচন করেছেন। সমিতির সম্পাদক এই সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরণ করেছেন (সাপ্তাহিক বসুমতী ব্যতীত)। সমিতির বিচারক্ষেত্র কেবলমাত্র বাংলা ছবিতে সীমাবদ্ধ নয়; হিন্দী এবং বিদেশী ছবি বিচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা, হিন্দী, বিদেশী প্রায় আড়াই শতাধিক ছবি দেখে তার কলাকৌশল অভিনয়ের দিক সহ বিচার করা অত্যন্ত কঠিন এবং বিরাট শ্রমসাধ্য কাজ, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র-সমালোচকরা যেখানে ৫০টা ছবির বিচার করতেই হিমসিম খেয়ে যান, কলকাতায় আমাদের সহকর্মীরা অনায়াসে আড়াই শতাধিক ছবির বিচার করে ফেলেন! সুতরাং বিচারের ফলাফল যা প্রকাশ হয় তা গর্ব করে প্রকাশ করা চলে না; চিত্র-সাংবাদিকদের চিন্তাও বিচার ক্ষমতার দৈন্য প্রকাশ করে মাত্র।

চিত্র-সাংবাদিকরা অনেকেই রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত ফলাফলের বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে থাকেন। অথচ তাঁরাই ভারতীয় ক্ষেত্রে 'দিল এক মন্দির' এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ক্যান ক্যান' 'দি ভি-আই-পিজ' ইত্যাদির মত ছবিকে দশটি শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অনুমান করা যায় বি-এফ-জে-এর সকল সদস্য সব ক'টি ছবি দেখে মতামত দেন নি, সকলের পক্ষে সব ছবি দেখা এবং কলাকৌশল বিচার করাও সম্ভব হয় নি। সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। সুতরাং এই 'এ্যাওয়ার্ড' চিত্র-সমালোচকদের অভিমতের মর্যাদা লাভের পরিবর্তে সাধারণ দর্শকদের মতামত হয়ে উঠেছে।

—সুজন।

## প্রতিটিই আমার শেষ ছবি

—ইঙ্গমার বার্গম্যান।

অনেকে মনে করেন ব্যবসা-ভিত্তিক চলচ্চিত্র শিল্পে নৈতিকতা নেই, অথবা দুর্নীতির ওপরই এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। শিল্পরুচি ও সুনীতির দিক থেকে এখানে কিছু করা যায় না। এখানে গলদের শেষ নেই। ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিতে হয়, তারাই আমাদের নিয়োগ করে; তারাও চলচ্চিত্র বলতে অস্বাভাবিক কিছুকেই মনে করে। আমাদের কাজকেও অনেকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারেন। আমি মনে করি, অন্য কাজের মত এখানেও নৈতিকতার স্থান রয়েছে। আমি নিজেকে এখানে সেই পুরাতন গল্পের ইংলিশম্যানের মত মনে করি, যে নৈশভোজের জন্য প্রত্যহ দাড়ি কামায় এবং পোষাক পরে ছিমছাম থাকে। সে বনের পশুদের তুষ্ট করার জন্য এরকম ছিমছাম থাকে না, নিজেকে তুষ্ট করার জন্য। সে যদি এই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা ত্যাগ করে, তাহলে জঙ্গল তাকে গ্রাস করে নেবে।

আমিও জানি, যদি আমার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বল হয়, যদি আমার শিষ্টাচার শিথিল হয়, তবে আমিও জঙ্গলে পড়ে যাব। সুতরাং আমি এমন এক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস করি, যা তিনটি বিধানের দ্বারা পরিচালিত। প্রথম শুনতে কথাটা ভাল মনে না হতে পারে। এর কার্যকারিতা আছে।

(১) সর্বদা আনন্দদায়ক হও—অর্থাৎ দর্শকরা, যারা পয়সা দিয়ে আমার ছবি দেখে এবং আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তারা আমার কাছে আশা করে আনন্দ, চমক এবং অনুপ্রেরণাময় অভিজ্ঞতা। অবশ্য এ থেকে এমন বোঝায় না যে, আমি আমার প্রতিভাকে বারবনিতার মত ভাড়া খাটাবো।

(২) সব সময় নিজের শিল্প-চেতনাময় বিবেক মেনে চল—এটা বড় কঠোর এবং চাতুরীপূর্ণ নির্দেশ। কারণ এতে কোনরকমে আমি মিথ্যা বলতে, চুরি করতে, ঘটনা বিকৃত করতে বা আমার প্রতিভাকে অন্যায়-ভাবে খাটাতে পারি না। তা সত্ত্বেও আমি মিথ্যাচারণ করতে পারি, যদি তা শিল্পের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত হয়। আমি মিথ্যাও বলতে পারি, যদি সেই মিথ্যা সুন্দর হয়। আমি ছবিতে আমার বন্ধুকে বা নিজেকেও হত্যা করতে পারি, যদি তা আমার শিল্পকে সাহায্য করে। যদি কেউ নিজের শিল্পচেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যেক পদক্ষেপে ব্যবহার করে, তখন সে নিজেকে মনে করবে যেন একটা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে; এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে যে, যে কোন সময় নীচে পড়ে যেতে পারে। বাধ্য-বাধকতা এবং হতবুদ্ধি এ দুটোই আমাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে, সৃষ্টির সাথে আনন্দ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জি, শৈলেন ও সৌমিত্র

যুক্ত হয়ে থাকে নি। কেউ তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করতে পারে, বড়ও করতে পারে। কিন্তু শিল্পচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একদিন তার ফল সে পাবে।

যাতে সঙ্কীর্ণ পথে খাদে পড়ে না যাই তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে আমি তৃতীয় নির্দেশকে মেনে চলি।

এই তৃতীয় নির্দেশ—মনে কর এটাই তোমার শেষ ছবি।

কেউ মনে করতে পারেন, এটা একটা কথার কথা, অথবা একটা আত্মতুষ্টির জন্য শুনতে ভাল এমন কথা। আসলে তা নয়। কয়েক বছর আগে সুইডেনে চলচ্চিত্র তৈরির কাজ খুব বাধা পেয়েছে। সে সময় আমার বাধ্যতামূলক কর্মহীনতায় আমি বুঝেছিলাম আমার কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ব্যবসায়িক জটিলতার দরুণ আমি যে কোন মুহূর্তে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি এবং কখন যে শিল্প থেকে বিতাড়িত হলাম তা আমিও জানবো না। এ সম্পর্কে আমার অভিযোগ নেই। আমার ভয়ও নেই। আমি বিরক্ত হয়েও উঠি নি। এই পরিস্থিতি থেকে কেবলমাত্র এই যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, প্রত্যেকটি ছবিই আমার শেষ ছবি।

আমার কাছে একটিমাত্র আনুগত্যের প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে, যে ছবির জন্য আমি কাজ করছি সেই ছবির প্রতি আনুগত্য। ছবি মুক্তির পরে কি হবে সেটা বড় কথা নয়, নির্মাণের কালটাই আমার কাছে বড়। এতে আমি আশ্বাস এবং শিল্পসম্মত বিশ্বাস লাভ করি। বস্তুগত আশ্বাস সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমার কাছে শিল্পগত বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি মনে করি—এটাই আমার শেষ ছবি।

এই চিন্তা আমাকে অন্যভাবেও শক্তি দেয়। আমি এমন চলচ্চিত্র কর্মী দেখেছি, যারা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। অথচ তাদের কর্তব্য করে যাচ্ছে। হতাশা ও একঘেয়েমির মধ্যে নিরানন্দভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে। প্রযোজকদের কাছে তারা অবমানিত। সমালোচকরা তাদের প্রতি অবজ্ঞা করে। ক্লান্ত শ্রান্তভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে, যতক্ষণ না তাদের বিদায় নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

হয়তো আমার প্রতিও জনসাধারণ একদিন বিমুখ হয়ে উঠবেন। হয়তো হতাশা দেখা দেবে। ক্লান্তি ও শূন্যতা-বোধ আমাকে পেয়ে বসবে, মনে আসবে ভয়। যদি এমন অবস্থা আসে, তবে মালপত্র গুছিয়ে আমি নিজের খুশিমত বিদায় নেব। যা করেছি তার মূল্যায়ন করতে বসবো না। মধ্যযুগে জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা রাত্রিতে কফিনে ঘুমাতেন—প্রতি মুহূর্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং জীবন ও প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল

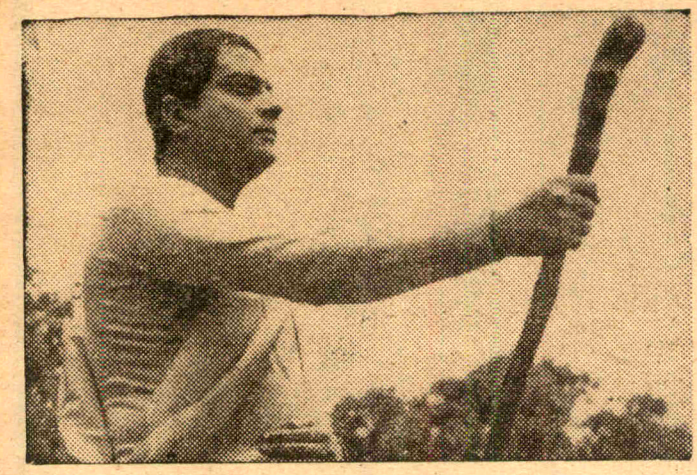

মধু বসু পরিচালিত 'বারেশ্বর বিবেকানন্দ'

এটা মনে রাখার জন্য। আজকের দিনে অতটা কঠোরতার দরকার নেই; তবে চলচ্চিত্র জগতের এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে আমি ভেবে থাকি—প্রত্যেক ছবিই আমার শেষ ছবি।

## শেক্সপীয়ারের জন্মের চতুর্থ শতবার্ষিকী

আগামী ২৩শে এপ্রিল মহাকবি শেক্সপীয়ারের জন্মের চারশত বছর পূর্ণ হবে। সারা বিশ্বে মহা ধুমধাম করে এই উৎসব পালিত হবে। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে থাকবে শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বক্তৃতা, নাট্যাভিনয়, বিভিন্ন সময়ে তোলা শেক্সপীয়ারের নাটকের ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা, ব্যালে এবং অপেরায় রূপান্তরিত শেক্সপীরীয় নাটকের মঞ্চরূপ এবং শেক্সপীয়ার সম্পর্কিত একজিবিশনস্।

খালি লণ্ডন শহরেই ফেষ্টিভ্যাল প্রোগ্রাম এইভাবে প্রতিপালিত হবে:

অল্ডুইচ থিয়েটার (রয়্যাল শেক্সপীয়ার থিয়েটার): মার্চ ২০—১৩ই জুন। মহাকবির চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী পালনে বিশ্বব্যাপী নাট্যোৎসব। এতে যোগ দেবেন—২০শে মার্চ—২৮শে মার্চ: প্যারিসের বিখ্যাত কমেডি ফ্রাঁসেজ। ৩০শে মার্চ—৪ঠা এপ্রিল: শিলার থিয়েটার, বার্লিন। ৭ই এপ্রিল থেকে ১৮ই এপ্রিল—নেপল্‌সের পেপ্পিনো দা ফিলিপ্পো ও তাঁর সম্প্রদায়।

এপ্রিল ২১শে থেকে ২রা মে: এ্যাবি থিয়েটার, ডাবলিন। মে ৫ই—১৬ই: ওয়ারসর থিয়েটার, ওজ-পোলেজেসনি। মে ১৮ই—২৩শে: টেকনিস থিয়েটার, এ্যাথেন্স। মে ২৬শে—জুন ১৩: মস্কো আর্ট থিয়েটার। ওল্ড ভিক্ (ন্যাশনাল থিয়েটার কম্পানি।): ওথেলো নাটকের নাম-ভূমিকায় স্যার লরেন্স অলিভিয়ার—পরিচালনায় জন ডেক্সটার।

রিজেণ্টস পার্ক ওপন্ এয়ার থিয়েটার (নিউ শেক্সপীয়ার কম্পানি): মে ২৫শে—জুলাই ১১: হেনরি ফিফথ। জুলাই ১৩—অগাষ্ট ১৫: টু জেণ্টেলমেন অফ ভেরোনা।

মারমেড থিয়েটার: অভিনয় হবে ম্যাকবেথ এবং টেম্পেষ্ট বা জুলিয়াস সিজার—এখানে পাকাপাকিভাবে এলিজাবেথীয় ষ্টেজ সেটিং তৈরি করা হবে।

সাউথওয়ার্ক (জর্জ ইন্): ১৮ই জুলাই—রিচমণ্ড শেক্সপীয়ার সোসাইটি টেমিং অফ দি স্রু মঞ্চস্থ করবেন।

ফুলহাম ওপন এয়ার থিয়েটার: রিচমণ্ড শেক্সপীয়ার সোসাইটির প্রযোজনায় টেমিং অভ দি স্রু।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড আপন এভন (রয়্যাল শেক্সপীয়ার থিয়েটার):

২৩শে এপ্রিল: রিচার্ড দি সেকেণ্ড—দু সপ্তাহ বাদেই এর রেপারটরীতে যুক্ত হবে হেনরী ফোর্থ ১ম ও ২য় পর্ব।

জুনের প্রথমে—হেনরী ফিফথ।

জুলাই ও অগাষ্ট—ওয়ারস অব্ দি রোজেস-এর ট্রিলজি, অর্থাৎ হেনরী দি সিক্সথ্, এড্‌ওয়ার্ড দি ফোর্থ ও রিচার্ড দি থার্ড।

এই তো গেল ওদেশের কথা। বাংলা দেশ চিরকাল শেক্সপীয়ারের ভক্ত। কলকাতাতেও মহাসমারোহের সঙ্গে শেক্সপীয়ারের চতর্থ জন্ম

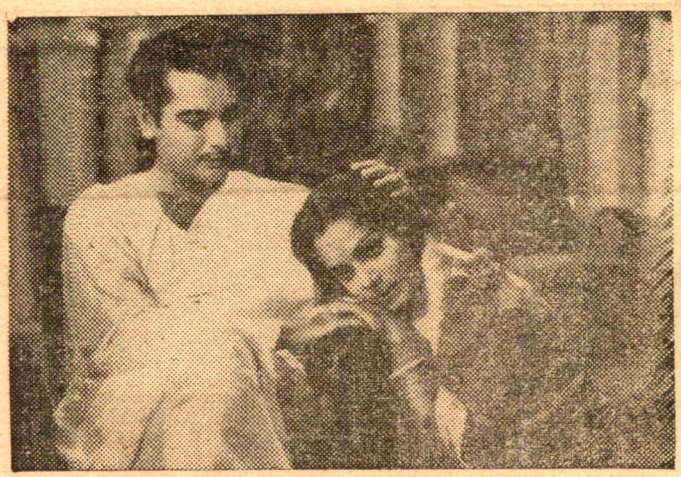

'কোহ্‌রা' ছবিতে একটি দৃশ্যে বিশ্‌জিৎ ও ওয়াহিদা রহমান

তবার্ষিকী উৎসব পালনের ব্যবস্থা হয়েছে।

পরিচালক-অভিনেতা শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারে Othello (ইংরাজীতে, ২৩শে এপ্রিল), 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' (বাংলা ২৭, ২৮ ও ২৯শে এপ্রিল), রোমিও জুলিয়েট (২৪, ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল), জুলিয়াস সীজার মঞ্চস্থ করছেন।

এ ছাড়া ১৭ই এপ্রিল ময়দানে সর্বসাধারণের কাছে শ্রীদত্তের দল দৃশ্য বিশেষ অভিনয় করবেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২৩শে এপ্রিল মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস (ইংরেজীতে) এবং ১২ই মে বাংলাতে ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ করবেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজস্ব স্টেজে।

শেক্সপীয়ার চতুর্থ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালন কমিটীর উদ্যোগে মহাজাতি সদনে মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস (২৫শে এপ্রিল, ইংরাজীতে), জুলিয়াস সিজার (২৮শে এপ্রিল, বাংলায়), সংস্কৃতে মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস (২৭শে এপ্রিল) মঞ্চস্থ হবে। ইংরাজী মার্চেণ্ট অব্ ভেনিসের পরিচালনা এবং শাইলকের চরিত্রে অভিনয় করবেন নবীণ বিদগ্ধ নট শ্রীকান্তি মুখার্জি। এ নাটকে পোর্সিয়ার চরিত্রে নামছেন শ্রীমতী বিনতা রায়।

'দি এমেচারস' সংস্থা ৭ই, ৮ই এবং ৯ই মে-তে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 'মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং' মঞ্চস্থ করছেন ইংরাজীতে।

'ড্রামাটিক ক্লাব অফ্ ক্যালকাটা' ২১, ২২ এবং ২৩শে মে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ইংরাজীতে ওথেলো নাটকের অভিনয় করবেন। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চারটি শেক্সপীয়ার ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন।

মোটামুটি এই হলো শহর কলকাতায় মহাকবির জন্মোৎসব পালনের কার্য-সূচী। এ ছাড়া অন্যান্য বহু ক্লাব এবং সভা-সমিতিতে বিভিন্নভাবে নানা সময়ে শেক্সপীয়ারের জন্মোৎসব দিবস উদযাপন করা হবে।

# নাটকের কথা

## কবি

সম্প্রতি আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ক্যানসার ক্লিনিক তহবিলের সাহায্যার্থে 'শিল্পীবাসর' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' নাটকটি মঞ্চস্থ ক'রে নাট্য-রসিকদের প্রশংসা লাভ করেন। নাটক ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন চিদানন্দ গোস্বামী। আশা-নৈরাশ্যে সংঘাত-সঙ্কুল, হৃদয়ধর্মী ও চিন্তামূলক

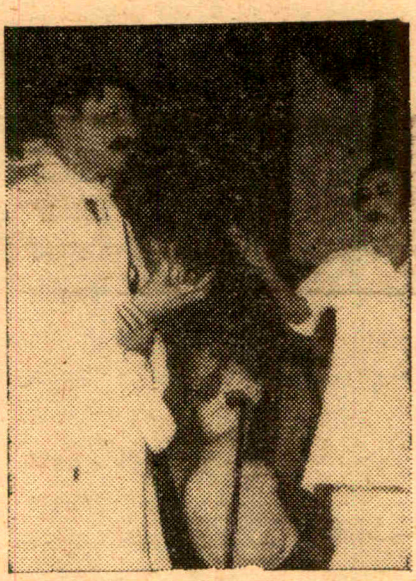

● 'শিল্পীবাসর' অভিনীত 'কবি'র একটি দৃশ্য।

নাটকটি সঙ্গীতমাধুর্য, অভিনয়োৎকর্ষ এবং সুপরিচালনায় রসসমৃদ্ধ হয়েছে।

অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে-ছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে চিদানন্দ গোস্বামী (নিতাই কবি) হীরালাল সেন (রাজেন), নমিতা সিন্‌হা (বসন), বীণা পাল (ঠাকুরঝি), বিমান মুখোপাধ্যায় (বিপ্রপদ) ও বেণুধর গোস্বামী (ওঝা) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, শান্তি ভট্টাচার্য, নন্দিতা বর্ধন, গোষ্ঠ দত্ত, রণজিৎ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী সিনহা, কল্যাণ ভট্টাচার্য, সুধীন আচার্য, কৃষ্ণ দাস ও ইরা ঘোষ অভিনয় করেছেন যথাযথ। রূপসজ্জা অনুকূল। ত্রিপুরার নাট্যানুশীলন ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগে 'শিল্পীবাসরের' প্রয়াস স্থানীয় সুধী-সমাজে প্রশংসিত হয়েছে।

## ইতিবৃত্ত

গত ৬ই এপ্রিল, সোমবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে রঙ-রূপ-এর (টালিগঞ্জ) তরুণ শিল্পিবৃন্দ মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন জনপ্রিয় নাটক 'ইতিবৃত্ত'-এর পুনরভিনয় করলো। নাটকের আঙ্গিক নতুন, সংলাপ ক্ষুরধার, কাহিনী বাস্তব এবং বলিষ্ঠ। শিল্পীদের দলগত প্রচেষ্টায় নাটকখানি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, পুনরায় দর্শকদের প্রশংসা কুড়োতে সক্ষম হয়। আবহসঙ্গীতে পার্শ্বনাথ সাহা ও সম্প্রদায় এবং স্মরজিৎ গোস্বামী কৃতিত্বের দাবী রাখে। নাটকটি পরি-চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুশীল দাস ও পীযূষ দত্ত। বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে, সঞ্জয় হালদারের 'হরেন কুণ্ডু' ও শঙ্কর সাহার 'বলাই'।

# স্টুডিও খবর

* বোম্বাইয়ের খবর হচ্ছে---মুসলমান-দের সামাজিক কাহিনী নিয়ে কে জি নন্দা 'শাইর' ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। পরিচালনা করছেন হার্মেশ মালহোত্র। পরিচালক চিত্র গ্রহণের জন্য লক্ষ্ণৌ আসছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন পদ্মিনী, ভারতভূষণ, শৈলেশ কুমার, ইন্দ্রাণী মুখার্জি, নাজির হোসেন।

* পরিচালক কে বি লাল 'ফির বাজে সানাই'-এর চিত্রগ্রহণ সুরু করেছেন। ছবির কাহিনী রচিত হয়েছে রাজস্থানের পটভূমিতে। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন সায়রা বানু।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আমি একজন পাঠক। আগ্রহসহকারে—নবপর্যায়ে সুরু হবার পর থেকে, 'সাপ্তাহিক' আমি পাঠ করে আসছি। বহুদিন থেকেই এই পত্রিকা প্রসঙ্গে কিছু লিখবো ভাবছিলাম। তারপর, দ্বিতীয় বর্ষের সুরু থেকে যখন আপনারা 'পাঠক মন' প্রকাশ করলেন তখন আমি ভরসা পেলাম।

প্রথমে জানাই, 'পাঠক মন' প্রকাশের মাধ্যমে আপনারা পাঠকদের বক্তব্য প্রকাশের ব্যবস্থা করায়, আমার মতো অনেক পাঠক-পাঠিকার প্রথম অভিযোগটি পূরণ করেছেন। লেখার সমালোচক পাঠকরা না হলেও তাদের সমালোচনা বড় কম নয়, একথা আজকের দিনে কেউ অস্বীকার করে না। দ্বিতীয় বর্ষের সুরুতে এ ব্যবস্থা করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই, এমনি আরও দু-একটি অপরিহার্য বিষয়ের নিয়মিত 'ফিচার' প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি। আজকের বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞান বিষয়ক নিয়মিত তথ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কি আপনাদের সংবাদ-তথ্যপূর্ণ পত্রিকায় একেবারেই অপাংক্তেয় ? আমার মনে হয়, এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা-পূর্ণ 'ফিচার' আপনারা সংযোজন করলে এ পত্রিকা আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। 'শহর কলকাতা'র ইতিকথা যেমন নিয়মিত জানাচ্ছেন, তেমনি পল্লীগাথা, বাংলার কথাও জানাতে পারেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে রয়েছে যে সংস্কৃতির চিহ্ন, জন-জীবনের যে পরিচয় রয়েছে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন মেলা, উৎসবে, প্রাচীন ও বর্তমান পল্লীবাংলার জনচিত্তে রয়েছে যে শিল্প-সংস্কৃতির তৃষ্ণা, এই সংস্কৃতির তৃষ্ণা মেটাতে ভগীরথের মতো এসে-ছেন যে-সব সারথি, তাঁদের কথা তো এখনও অনেক অজানা। আমার মনে হয়, এদিকে নজর দিয়ে এই ধরণের তথ্যমূলক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করলে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র চরিত্রানুযায়ী কাজই করা হবে।

হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি স্ববৈশিষ্ট্য 'চরিত্র' দেখা দিয়েছে। সংবাদ ও সাময়িকত্ব নিয়ে সাপ্তাহিক সাহিত্য আজকের কর্মবহুল জীবনে যে অপরিহার্য —এই 'সাপ্তাহিক বসুমতীর চরিত্র'। তাই 'আজকের মানুষ' যেমন স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে পরিচিত, নবাগতদের কবিতাগুচ্ছ। 'গ্রন্থমেলা' যেমন সাপ্তাহিক গ্রন্থবার্তা নিয়ে হাজির হচ্ছে পাঠক-পাঠিকার সামনে একেবারে সূত্রধারের মতো, তেমনি প্রতি সংখ্যায় নতুন নতুন ছোট গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। স্বল্প পরিচিত এবং একেবারে নবাগত লেখক-লেখিকার কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশে সত্যিই আপনাদের সম্পাদনার কৃতিত্ব রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কয়েকটি গল্প সাম্প্রতিকালের চিহ্নিত ছোট গল্প। তবে 'থ্রিলার' বা ঐ জাতীয় লেখার বদলে মাসে একটিও যদি সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের গল্প প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, মনে হয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। 'আন্তর্জাতিক' যেমন সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদ সমালোচনার মনোজ্ঞ নিবন্ধে পরিণত হয়েছে, তার তুলনা হয় না। বাংলা ভাষার কোন গ্রন্থ-পত্রিকায় এমন প্রাঞ্জল ভাষায় নিয়মিত বিশ্বসংবাদ নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা নেই। তেমনি সুখপাঠ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজজীবনের চিত্ররূপ—লণ্ডনের চিঠি', 'আজকের যুগোশ্লাভিয়া', 'জাপানী সন্দেশ', 'আজকের জার্মানী' ও 'ওয়াশিংটনের চিঠি'। এই ফিচার-গুলির নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ করবেন না। অন্যান্য ফিচারের মধ্যে 'রঙ্গদর্শন' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'রঙ্গজগৎ'-এর মত এমন একটি অপরিহার্য বিভাগকে এতো ছোট করে রাখা, মনে হয় পাঠকদের ঠকানো হচ্ছে। 'সুজন' কর্তৃক লিখিত চলচ্চিত্র-জীবনের নানা সমস্যা-পূর্ণ মন্তব্য সহকারে 'রঙ্গজগৎ' নিঃসন্দেহে যেমন তথ্যমূলক তেমনি মনোজ্ঞ। কিন্তু আরও দুটো পৃষ্ঠা এ বিভাগে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই জানিয়েছি আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত পাঠক। পাঠকের যে দাবী আছে, সে দাবীতে আমি আরও কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে চাই। জানবেন এর পেছনে রয়েছে পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা। এতো পরিশ্রম সার্থক হবে, যদি পত্রিকার কাগজ ও ছাপার 'কোয়ালিটি' বাড়ান। বোধ করি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সবচেয়ে বড় ত্রুটি ও-দুটি। 'কভার'-এর পাতা একটু মোটা হলে আরও ভাল হয়। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ও ছাপা যত সুন্দর ততটা সুন্দর দেখাচ্ছে না এর অভাবে। লেখার 'লেটারিং' সম্পূর্ণ পাল্টানো আশু কর্তব্য। গল্পের 'ইলাস্ট্রেশানে' আরও সূক্ষ্মতার পরিচয় দিলে ভালো হয়। বাঁধাই সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার কথায় সম্পাদিকার কার্যোল্লেখ করাটা হয়তো বাতুলতা হবে, তবু উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য শেষ করার আগে, এমনভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বৃত্তিতে আমি একজন নাট্যাভিনেতা। 'মেকআপ' ভাল না হ'লে খুঁত-খুঁত করা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। ভাল লাগলে প্রকাশ করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ি। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র শ্রী কামনা করি বলেই এ চিঠি লিখলাম।

—প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায়
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

# খেলা ধূলা

## ক্রীড়া কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন

দিল্লীতে ভারতীয় ক্রীড়া কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল কয়েকদিন আগে। উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা যা বলেছেন তা সবই প্রায় ক্রীড়ামোদীদের মনের কথা। তাঁর কথাগুলি যদি কার্যে পরিণত হয় তবে ক্রীড়ামোদীদের আনন্দের সীমা থাকবে না। বৃটিশ-ভারতে খেলাধূলা যে পর্যায়ে ছিল, স্বাধীন ভারতে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা বহু উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু সব কিছু হলেও বিভিন্ন খেলাধূলার মান আশানুরূপ উন্নত হয় নি। এর জন্য দায়ী বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার কর্মকর্তারা। শ্রীচাগলা বলেছেন, শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল খেলাধূলা এবং পড়াশুনার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলাকেও উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি খেলার মাঠ এবং স্টেডিয়ামের সংখ্যার স্বল্পতায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা কলকাতার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের পীঠস্থান কলকাতায় আজ পর্যন্ত কোন স্টেডিয়াম গড়ে উঠল না। একমাত্র গড়ের মাঠ ছাড়া কলকাতায় আর অন্য কোন স্থানে ভাল খেলার মাঠ নেই। কলকাতার অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব মাঠ বলে কিছুই নেই। শ্রীচাগলার মতে আমাদের দেশীয় গ্রাম্য খেলাধূলাগুলিকে আবার চালু করা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেট আমাদের শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে প্রচলিত না হলে আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের আসন উঁচু করা খুবই শক্ত। শ্রীচাগলা বলেছেন যে, সরকারের বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার পরিচালনা বা আভ্যন্তরীণ কার্যে হস্তক্ষেপ না করা

**শ্রীঅমিতাভ**

উচিত, কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনাগুলিকে কার্যে রূপ দিতে এই সমস্ত সংস্থার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয়। তবে একটা কথা শ্রীচাগলা উল্লেখ করেন নি। কথাটা হল রাজনীতির আর খেলাধূলার সম্পর্ক। বর্তমানে ক্রীড়াজগতে রাজনীতি প্রবেশ করেছে, কিন্তু খেলাধূলার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রাজনীতিকে ক্রীড়াঙ্গন থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়।

## খেলার মাঠের সত্যাগ্রহ

খেলার মাঠে সত্যাগ্রহ একটা দর্শনীয় ঘটনা। তবে গড়ের মাঠে এরূপ ঘটনা বার দুয়েকের বেশি ঘটেছে বলে ত' আমার মনে পড়ছে না। এই প্রসঙ্গে অতীতের একটি মজার সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করছি। ময়দানের ক্রীড়া ইতিহাসে এই সত্যাগ্রহই প্রথম। অতীতের এই অভিনব ঘটনা আমার চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তবে ঘটনাটি শুনেছি একজন প্রবীণ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে, যিনি সেদিন খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

এখন ময়দানের পাশে ফোর্ট উইলিয়ামের শীর্ষে গঙ্গার হাওয়ায় পতপত করে ওড়ে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত, অশোকচক্র শোভিত জাতীয় পতাকা, কিন্তু তখন ওখানেই উড়ত ইউনিয়ন জ্যাক ; সৈনিকদের ব্যাণ্ডে বাজত না ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'—সুর উঠত 'গড সেভ দি কিং'। কারণ সনটা

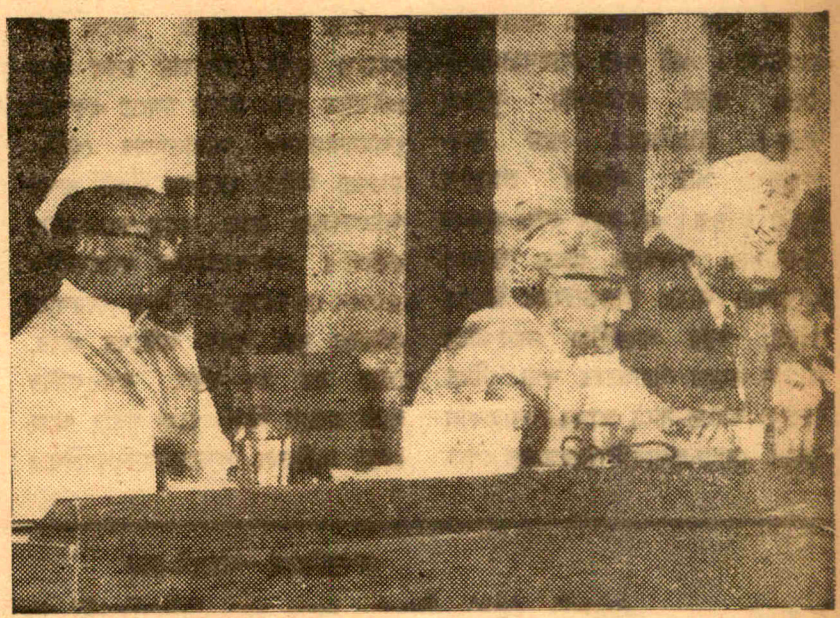

● দিল্লীতে ক্রীড়া কংগ্রেসের সভায় শ্রীচাগলা ভাষণ দিচ্ছেন

ছিল ১৯৩৫, পুরোদমে চলছে তখন বৃটিশ রাজত্ব। সাহেব-সুবো টিম আর মিলিটারী দলগুলির যুগ তখনও শেষ হয় নি। অস্তমিত সূর্য যেমন সমস্ত পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি এই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ দলগুলি কলকাতা ময়দান থেকে বিদায় নেবার আগে উদ্ভাসিত করেছিল ময়দানের আঙিনা।

তবুও তখন শ্বেতাঙ্গ দলগুলির মধ্যে ক্যালকাটা আর ডালহৌসির প্রতাপ অখণ্ড আর মিলিটারী দলগুলিরও কেউ কেউ আবার কম যায় না। বাঙালী দলের মধ্যমণি মোহনবাগান খ্যাতির উচ্চ শিখরে। আর ঠিক ১৯৩৪ সালে কলকাতা ফুটবলের প্রথম বিভাগে নবোদ্গীত মহামেডান স্পোর্টিং-এর তখন দুর্বার গতিবেগ, প্রথম বিভাগে প্রথম বছর এসেই সবাইকে টপকে লীগ জয় করল। ১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড বিজয়ের পর মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে বাঘা বাঘা শ্বেতাঙ্গ দলগুলিও যথেষ্ট ভয় পেত।

১৯৩৫ সালের কথা ; লীগের আসর জমজমাট। কার ভাগ্যে যে লীগের জয়মাল্য জুটবে তা বলা একেবারে অসম্ভবই ছিল। মহামেডান, মোহনবাগান আর ক্যালকাটা সমানভাবে এগোচ্ছে। এই সময় মোহনবাগানের খেলা পড়ল ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে। হারজিতের সঙ্গে মান-সম্মান আর লীগের সম্মানের প্রশ্নও জড়িত। এই রকম খেলা থাকলে তখন সারা কলকাতা ভেঙে পড়ত। শ্বেতাঙ্গরা আসত জাতভাইদের উৎসাহ দিতে, আর বাঙালীরা মনে-প্রাণে সাহেব দলের পরাজয়ের কথা চিন্তা করতে করতে মাঠে আসত। আজকাল যেমন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা মানে ঘটি-বাঙালে ঠোকাঠুকি, আর তখন ছিল বাঙালী আর শ্বেতাঙ্গে। বহু প্রবীণ খেলোয়াড়ের কাছে শুনেছি যে, তখন বাঙালী দলগুলি খেলত ১১ জন খেলোয়াড়ে আর শ্বেতাঙ্গ দলগুলি ১৪ জনে। মানে ১১ জন খেলোয়াড় ছাড়া রেফারী আর দুদিকে দুই লাইন্সম্যান। শ্বেতাঙ্গ রেফারীরা যেন তেন প্রকারেণ জাতভাইয়ের দলের পরাজয় রোধ করতেন। এই রকম নানা ঘটনার জন্য হাতের মুঠোর মধ্যে লীগের সম্মান মোহনবাগানের এসেও বহুবার ফস্কে গেছে। যাই হোক, সেদিন দুই দলই মাঠে খেলতে নামল। মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন তখন 'চাইনিজ ওয়াল' গোষ্ঠ পাল। যথারীতি খেলা সুরু হল। কিন্তু দেখা গেল ক্যালকাটার খেলোয়াড়দের বলের চাইতে মানুষের দিকেই লক্ষ্য বেশি। বলে লাথি না মেরে তারা খেলোয়াড়দের গায়েই পা চালাতে লাগল। ক্যালকাটার খেলোয়াড়েরা অযথা ফাউল করে খেলার আবহাওয়া খারাপ করে দিল। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, বহু মারাত্মক এবং বিপজ্জনক ফাউল শ্বেতাঙ্গ রেফারীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা অযথা মার খেয়েও কোন প্রতিকার পেল না। এইভাবে খেলা চলতে চলতে এক সময় মোহনবাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর আক্রমণধারা রচনা করল ক্যালকাটার গোলে। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডের একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে একেবারে গোলের মুখে ব্যাক লাইনের ধারে, গোল হয় হয়—হঠাৎ ক্যালকাটার ব্যাক পেছন দিক থেকে গলায় ধাক্কা মেরে লাইনের বাইরে ফেলে দিল। অবস্থা চরমে উঠল যখন রেফারী এই ঘটনা দেখেও দেখলেন না। মোহনবাগানের সমর্থকেরা ক্রোধে ফেটে পড়ল, মাঠের মধ্যে সমবেত হয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, রেফারীর এই অন্যায় এবং পক্ষপাতমূলক পরিচালনার প্রতিবাদে তাঁরা মাঠের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন, বল স্পর্শ করবেন না। ক্যালকাটা খেলা সুরু করল কিন্তু মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বিনা বাধায় মোহনবাগানের অরক্ষিত গোলে পর পর দুটো গোল দিল ক্যালকাটা। এই অভিনব পরিস্থিতিতে খেলা চালান অসম্ভব দেখে অগত্যা রেফারী বিরতি ঘোষণা করলেন। এই ঘটনা নিয়ে তখন ক'দিন চারদিকে তুমুল আলোড়ন চলল, তারপর সব চাপা পড়ে গেল। এরপর দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের ইতিহাসে গড়ের মাঠে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে কি না তা আমার জানা নেই। কিন্তু মাত্র কদিন আগে হকি লীগে ইস্টবেঙ্গল এবং পাঞ্জাব স্পোর্টসের খেলায় এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। আম্পায়ারের একটি গোলের সিদ্ধান্তে পাঞ্জাব স্পোর্টসের খেলোয়াড়েরা ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবাদে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ৬টি গোল হবার পর আম্পায়ার খেলা শেষ করে দেয়। এইরকম সত্যাগ্রহের স্থান রাজনীতিতেই থাকা ভাল, ক্রীড়াঙ্গনে এর প্রবেশ খুবই ভয়ের কারণ। তবে বর্তমানে রেফারী ও আম্পায়ারের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্যই যত কিছু গণ্ডগোলের উদ্ভব হচ্ছে। তবে যে কারণেই হোক না কেন খেলার মাঠে এই ধরণের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্য-সম্রাট—বঙ্গেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

# বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

— উপন্যাস —

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [ সচিত্র ] মূল্য ৩৲ টাকা।

— সাহিত্য —

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য ২৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—ধর্ম্মতত্ত্ব ( ১ম ভাগ অনুশীলন ), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য় ), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, ললিতা। মূল্য ২৲ টাকা।

---

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# মাইকেল গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—১৷৷৹ টাকা।

---

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

# দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা ২। নীল-দর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

২য় ভাগে—১। সধবার একাদশী, ২। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৩। পোড়ামহেশ্বর, ৪। কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা, ৮। পদ্য সংগ্রহ।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

সর্ব্বপুরাণ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

# স্তবকবচমালা

( পঞ্চম সংস্করণ )

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্ব্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

---

পৃথিবীর অরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

# সার ওয়াল্টার স্কটের

## গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর

লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ

দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

---

# কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর

## গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Thursday, 16th April, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : 54-7771, 54-7772, 54-7773

16 APR 1964

# নববর্ষে পূর্ব রেলওয়ে-র শুভেচ্ছা

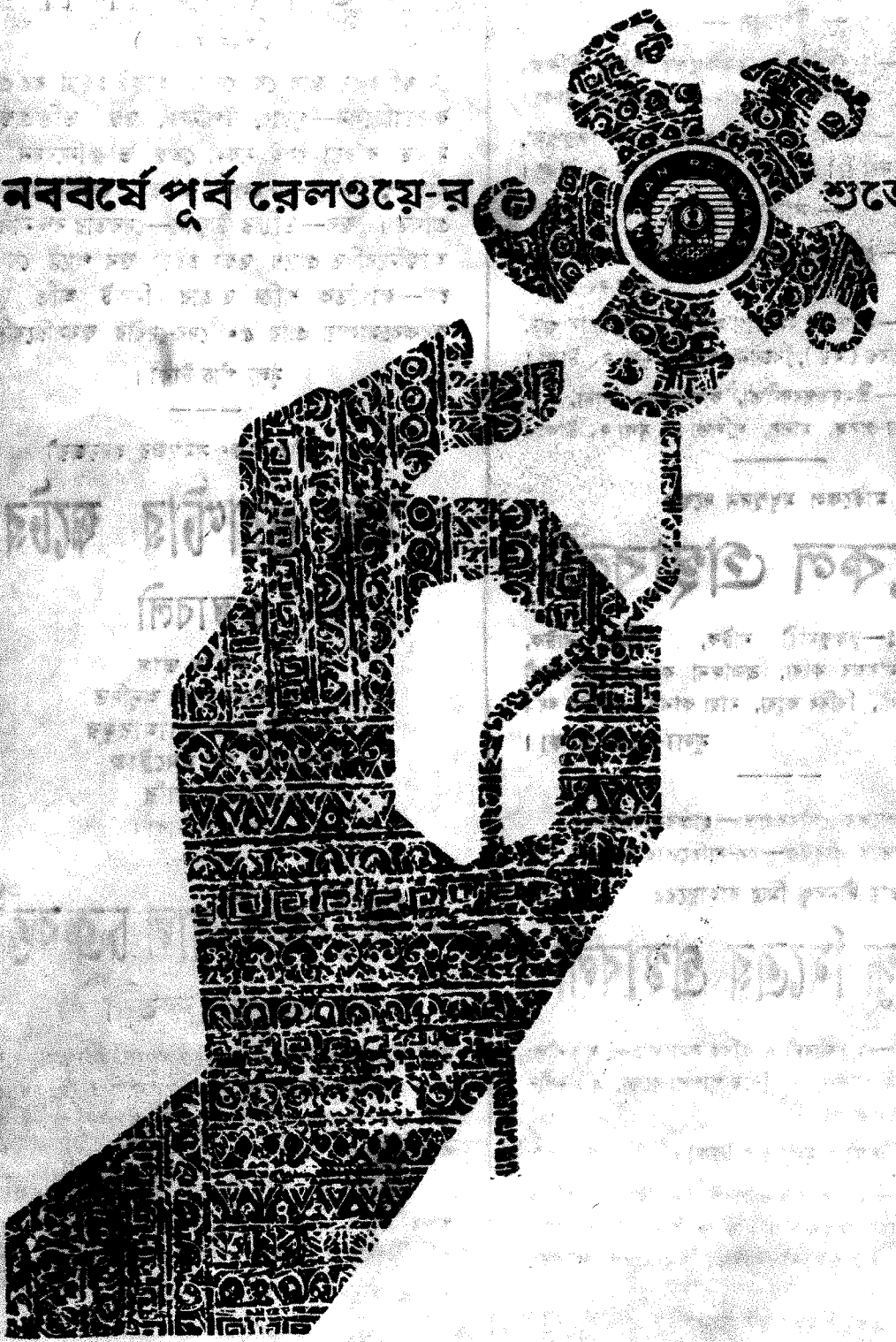

CENTRAL LIBRARY

# সাপ্তাহিক বসুমতী

স্ট্র্যাটফোর্ডে অভিনীত শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটকের চরিত্র-রূপায়ণে শিল্পীবৃন্দ।

বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • • • • 23rd April, 1964 • Vol. 68, No. 48

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন **সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল**—বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

**সাধনার**

# মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

প্রণেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এফ. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

**সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা** • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
'003/3
Yr. 68
no. 48


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৬২৭ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৬২৮ |
| বাংলা সাহিত্য-মননে শেক্সপীয়র ( প্রবন্ধ) | হরপ্রসাদ মিত্র | ২৬২৯ |
| শেক্সপীয়র কেন লণ্ডনে গিয়েছিলেন | হিমানীশ গোস্বামী | ২৬৩১ |
| রূপকার শেক্সপীয়র (প্রবন্ধ) | রণজিৎকুমার সেন | ২৬৩৩ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২৬৩৫ |
| জাপানী সন্দেশ | সন্দীপ ঠাকুর | ২৬৩৯ |
| একটি অনুভব ( কবিতা ) | অরূপ রুদ্র | ২৬৪০ |
| মহুয়ার বিগলিত জ্যোৎস্না ( কবিতা ) | অমিতাভ চক্রবর্তী | ২৬৪০ |
| শ্বেত সর্প ( গল্প ) | কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬৪১ |
| সেক্সপীয়র স্মরণে ( কবিতা ) | বিমলচন্দ্র ঘোষ | ২৬৪৮ |
| দি প্যাশনেট পিলগ্রিম ( কবিতা ) | বৈশম্পায়ন | ২৬৪৮ |
| আমার প্রিয়ার চোখ ” | সুশীল গুপ্ত | ” |
| স্মৃতি ” | শ্যাম রায় | ” |
| কৃষ্ণচূড়া ( উপন্যাস ) | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৬৪৯ |



রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

**উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বাঙলা কথাশিল্পী

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

**বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী**

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

**অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

**বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী**

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

**বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী**

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

**যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী**

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

**শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# সূচী পত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৬৫২ |
| মহাকবি উইলিয়ম সেক্সপীয়র (প্রবন্ধ) | তরুণ মৈত্র | ২৬৫৫ |
| দূরন্ত দেহলী (কাহিনী বিচিত্রা) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৬৫৮ |
| নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্ম্মের উদ্ভব : অ্যানিমিজম্ (প্রবন্ধ) | নরেন ভট্টাচার্য | ২৬৬২ |
| নট-নটাদের বিচিত্র কাহিনী | দেবনারায়ণ গুপ্ত | ২৬৬৬ |
| রসদর্শন | ... | ২৬৬৭ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৬৭১ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৬৭৪ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৬৭৯ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৬৮৫ |
| খেলাধূলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৬৮৮ |


**প্রচ্ছদ পরিচয় :**

শেক্সপীয়রের জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ডে অভিনীত মহাকবির বিভিন্ন নাটক 'হ্যামলেট', 'টিটাস এ্যাণ্ড্রোনিকাস', 'দ মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'কিং লিয়ার অন ট্যুর' প্রভৃতি নাটকে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের রূপসজ্জায় মার্ক ডিগনাম, ভিভিয়েন লে, প্রুনেলা স্কেলস্, ডেভিড উইলিয়ম ও টীব রবার্টসন।


ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

**রাজভাষা**

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

**মহাভারত**

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

**ডিকেন্স গ্রন্থাবলী**

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি : বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

**দামোদর-গ্রন্থাবলী**

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

৬৮ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১০ই বৈশাখ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 23rd April 1964

# মহাকবি শেক্সপীয়র

উইলিয়ম শেক্সপীয়রের চারশত জন্মবার্ষিকী উৎসব বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। আজ তাঁর জন্মদিন। এ দিনটিতে আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মহাকবির মিলনবার্তা, প্রতিটি মানুষের মনে মূর্চ্ছিত হচ্ছে মানবতার অমর বাণী। এই পৃথিবীর বুকে অনেক সংঘাত, ক্ষয়-ক্ষতি ও বহু রাজ্যের অদল-বদল হয়ে গেছে, তবু বিলীন হয় নি মানুষের মন থেকে শেক্সপীয়রের অক্ষয় স্মৃতি। নাটকে, কবিতায়, গানে মহাজীবনের যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত রয়েছে, তা-ই সমস্ত মানুষকে বেদনা, গ্লানি ও পরাজয়ের মধ্য থেকে নতুন জীবনমন্ত্র দান করেছে। মানুষ সেই জীবনমন্ত্রে চিরভাস্বর হবার সাধনায় যুগে যুগে বহন করে চলেছে শেক্সপীয়রের পুণ্য স্মৃতি। চারশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরাও আজ স্মরণ করছি মহাকবিকে। কিন্তু এই স্মরণ যেন আমাদের মধ্যে নামমাত্র স্মরণ না হয়। বিশেষ আয়োজন যেন নিছক আড়ম্বরেই শেষ হয়ে না যায়। চারশত জন্মবার্ষিকী পালনের তাৎপর্য যদি বোধগম্য হয়, তাহলেই নির্ধারিত হবে একদা উৎসব পালনের মূল্য। তাই, এই উৎসবের মধ্যে প্রধান বিচার্য বিষয় হচ্ছে, শেক্সপীয়রকে আমরা আমাদের জীবনে কতোখানি গ্রহণ করতে পেরেছি—আর যা পারি নি—তার জন্যে আমরা প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি কি না।

বাংলাদেশে শেক্সপীয়রের এই চারশত জন্মবার্ষিকী বিশেষভাবে নাটক অভিনয়ের মধ্যে পালিত হবে। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে দর্শকবৃন্দ যেমন রসগ্রহণ করতে পারে, তেমনি উপলব্ধি করতে পারে জীবনদর্শন। শেক্সপীয়রের নাটক উভয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় তার সার্থক মঞ্চাভিনয় করা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সব সময়ে যেন মনে রাখি, আমরা যে কারণে উৎসব পালনে প্রস্তুত হচ্ছি, তা সুসম্পন্ন করা বড়ই কঠিন। তবু তার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ এবং মহান কবির সঙ্গে চিরকালের মানুষের নিজের স্বীকৃতি।

বর্তমান বছরে বাংলাদেশে শেক্সপীয়রের সাহিত্য আলোচনা ও মঞ্চাভিনয়ের বিশেষ ব্যবস্থা হলেও আজ একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে আমরা কম সচেতন ছিলাম না। সেই ইংরেজ শাসকের আমলে বাঙালী চিত্তকে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রথম আগ্রহী ক'রে তুলেছিলেন হিন্দু কলেজের দুই অধ্যাপক—ডি এল রিচার্ডসন এবং ডিরোজিও। সে যুগে ডেভিড হেয়ার একাডেমী ও ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয়েছিল। জুলিয়াস সীজার নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল প্যারীমোহন বোসের জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে। তাছাড়া ঐ শতকেই শেক্সপীয়রের সমস্ত নাটকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আজকের দিনে আমরা স্মরণ করি তাঁদেরও—যাঁরা আমাদের অন্তরে প্রথম বহন করে এনেছিলেন শেক্সপীয়রের বাণী।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

আবার আমন্ত্রণ এলো সেই স্মরণীয় তারিখে। যে তারিখ চিহ্নিত হ'য়ে আছে একটি মনে। যে তারিখ জড়িয়ে আছে একটি শক্তিমান জীবনের ওঠা পড়া—পথচলার সঙ্গে। সেই ১৬ই এপ্রিল প্রবীণ কংগ্রেসনেতা শ্রীমহাবীর ত্যাগী আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন মন্ত্রীরূপে। ১৯৫২ সালে (সেটা লোকসভার জন্মকাল) তিনি লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। আর ১৬ই এপ্রিল তারিখে হলেন মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম মন্ত্রী। প্রথম দিকে—'৫২ সালের অগাষ্ট পর্যন্ত ছিলেন অর্থদপ্তরের রাষ্ট্র-মন্ত্রী। তারপর রাজস্ব আর ব্যয় বিভাগের এবং পরিশেষে প্রতিরক্ষা সংগঠন ও ব্যয় বিভাগের মন্ত্রী। এইভাবে পাঁচ বছরের মন্ত্রিত্ব-কাল কেটেছে। তারপরও সেই ১৬ই এপ্রিল—১৯৫৭ সালে—শ্রীত্যাগী অপসারিত হলেন মন্ত্রিসভা থেকে। এরপর ১৯৬৪ সালের ১৬ই এপ্রিল আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে এলেন।

স্পষ্টবক্তা তীক্ষ্ণধী এই মানুষটির সরব উপস্থিতি লোকসভার আসরকে সচকিত করে রাখে। স্বপক্ষ-বিপক্ষ কারুরই রেহাই নেই। কখনও বলছেন: এ সরকারের অবসর গ্রহণ করা উচিত। কখনও বা দৃঢ়কণ্ঠে বুক পেতে বিরোধী দলের আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন সরকারের হ'য়ে। মোটকথা নিজের চিন্তায় যা ন্যায্য—নিজের বিচারে যা কর্তব্য তাকে তিনি কারুর মুখ না চেয়েই প্রতিষ্ঠা করবার সাহস রাখেন। বিপুলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে দাঁড়াতেও পরোয়া নেই। তাতে নাই বা পেলেন কারও সমর্থন, সাহায্য—আত্মপ্রবঞ্চনার ঘৃণ্য লজ্জা ত' ঘুচল।

এই দুর্দম সংগ্রামী মনের আত্মপ্রকাশ সত্যসাধক গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়। তারপর একাধিক কারাবরণ-লাঞ্ছনায় হ'য়ে উঠেছেন ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল। আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে ১৯ শতকের শেষ বছরের শেষ দিনে দরিদ্র সাধারণ কৃষিজীবীর ঘরে জন্ম শ্রীমহাবীর ত্যাগীর। জন্মস্থান উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ। গ্রামের নাম ধারবসি। গরীব শিবনাথ তাঁর সামর্থ্যের বাইরেও ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন গ্রামের স্কুলের পর মীরাটের স্কুলে। চারিদিকে তখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। মহাবীর গেলেন যুদ্ধে। পারস্যের পূর্ব প্রান্তে সঙ্গীন কাঁধে তিনি তখন অতন্দ্র সৈনিক। কিন্তু তাঁর আপোষ-হীন স্বাধীন ব্যক্তিচেতনা সেখান থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল। মহাবীর ত্যাগী ফিরে এলেন দেশে। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসে যোগ দিলেন—সম্পাদক হলেন। বিধানসভায় রইলেন দীর্ঘ ন'বছর। তাঁর কৃতিত্বের নজীর রইল 'ত্যাগী পুলি বাহিনী।' নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে আছেন কমপক্ষে চল্লিশ বছর। এতদিন তিনি ছিলেন পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটীর চেয়ারম্যান।

আজ ভারতকে নানা সঙ্কট কাটিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে। তবুও আজ ভারতের সর্ব-প্রধান খবর: পাকিস্তানের পাশবিকতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক টুকরো আশ্রয়-আশ্বাসের জন্য বন্যার মত উদ্বেলিত

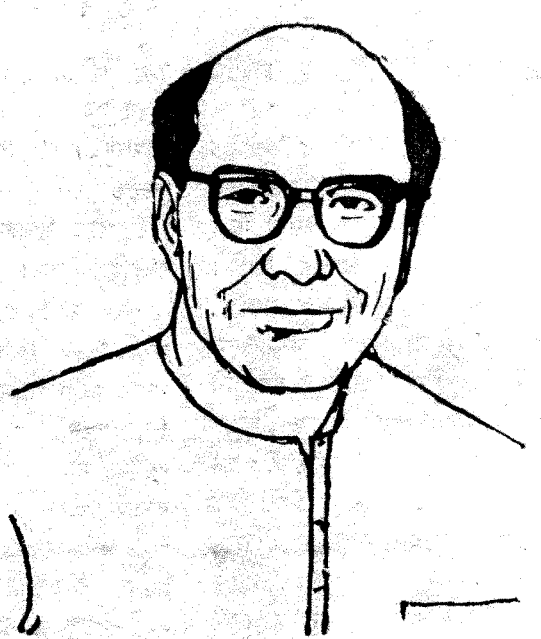

শ্রীমহাবীর ত্যাগী

জনস্রোত আসছে ভারতে। আজ তাই সমগ্র ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা: তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন। আর তার জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র একটি পুনর্বাসন মন্ত্রী-দপ্তর। লোকসভা এটা অনুমোদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীও সেই সঙ্গে পুনর্বাসন মন্ত্রী-পদে আহ্বান জানিয়েছেন শ্রীত্যাগীর মত দায়িত্বশীল নির্লোভ ক্ষমতাবান মানুষকে। এতে আশার সঞ্চার হয়েছে সকলের মনে। বিশ্বাস জেগেছে—দিশাহারা এই বিশাল অসহায় জনতা এবার হয়ত খুঁজে পাবে নিশ্চিন্ত পথের ঠিকানা।

# বাংলা সাহিত্য-মননে শেক্সপীয়র

হরপ্রসাদ মিত্র

১২৮৯ সালের ভাদ্রের 'ভারতী'তে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাতে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁর এই বোধ ব্যক্ত হয় যে, সাহিত্যের রাজ্যে একদল আসেন 'সৃজন'-সামর্থ্য নিয়ে, অন্যদল আসেন শুধুই গড়তে ; যাঁরা গড়তে আসেন তাঁরা সব-কিছুই কোনো-এক চলতি ছাঁচে ফেলে বানিয়ে তোলেন ; যাঁরা সৃষ্টি করতে আসেন, তাঁদের কিন্তু ছাঁচ থাকে না। এই শ্রেণী-নির্ণয় ও শ্রেণীভেদের প্রসঙ্গ ধরেই তাঁর সেই আদি-পর্বের লেখাটিতে শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, শেক্সপীয়র নিজেকেই 'কখন বা হ্যামলেটরূপে কখন বা ম্যাকবেথরূপে' রূপান্তরিত করে গেছেন। যথার্থ স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের কাজই তাই। তাঁরা তো শুধু ছাঁচে ফেলে বানিয়ে তোলেন না, তাঁরা 'আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন'!

'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) সংগ্রহের 'আত্মময় আত্মবিস্মৃতি'তে ('ভারতী' মাঘ, ১২৮৮ সাল) এই আত্মপ্রক্ষেপের গূঢ়ার্থ চোখে পড়ে। তাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'ভাবুকগণ কবিগণ সর্বদাই নিজেকে ভুলিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের নিজেকে মনে করাইয়া দিবার জন্য পর কেহ উপস্থিত থাকে না। নিজের সহিত ব্যতীত আর কাহারো সহিত ইঁহারা ভাল করিয়া মেশেন না বলিয়া ইঁহারা নিজের কথা ভাবেন না। ইঁহারাই যথার্থ আত্মময় আত্মবিস্মৃত।' তাঁর এই লেখাটিতে স্পষ্টভাবে শেক্সপীয়রের নাম ছিল না বটে, তবে নিজেকে নানাভাবে, নানা-রূপে আস্বাদন-প্রয়াসের কথা ছিল। শেক্সপীয়র তো তাই-ই করে গেছেন।

বলা বাহুল্য, শেক্সপীয়র বড়ো স্রষ্টা, বড়ো ভাবুক এবং বড়ো নাট্যকার ছিলেন, বা এই ধরণের অন্য কোনো মন্তব্য আজ শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, —পৃথিবীর সাহিত্যলোকে এসব কথা সকলেরই অতিশয় পরিচিত,—এবং সেই কারণেই পরিত্যাজ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের মেঘনাদবধ কাব্য—সম্পর্কিত আলোচনায় ম্যাকবেথ এবং হ্যামলেটের কথা উল্লেখ করেছিলেন শেক্সপীয়রের চিরায়ত আবেদন স্মরণ ক'রে। তাঁর আগে,—বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রথম সাহিত্যচর্চার আগে 'বীটন সোসাইটি'র সভায় ১৮৫২-র ১৩ই মে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে Venus and Adonis-এর কথা তোলেন। শেক্সপীয়র এদেশে তারও আগে পদার্পণ করেছেন! বিভিন্ন বিদ্যায়তনে তাঁর নাট্যাংশ আবৃত্তি বা অভিনয় করা জনপ্রিয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিম এসে তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হিসেবে শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এরর্স', 'হ্যামলেট', 'কিং লীয়র', 'ওথেলো' ইত্যাদির বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করেন। কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নবকুমার যেখানে অরণ্যে কাষ্ঠাহরণে যান এবং সেই দুর্যোগে সহযাত্রীরা তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়, সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরো-ভূষণ ছিল 'কিং লীয়র'-এর উক্তি—Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!' নায়িকা কপাল-

কণ্ডলাও কতকটা 'The Tempest' নাটকের মিরাণ্ডার ছায়া। 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'শকুন্তলা, মিরন্দা, দেসদিমোনা' প্রবন্ধটির কথাও স্মরণীয়। 'কপালকণ্ডলা'র চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'Othello' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের দু-ছত্র উক্তি তুলে দিয়ে কাপালিকের সঙ্গে ইয়াগো চরিত্রের কিঞ্চিৎ ভাবগত সাদৃশ্যের ইশারা জাগিয়ে তুলেছিলেন পাঠকসমাজের মনে। কপালকুণ্ডলার ঐ চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ছিল 'হ্যামলেটে'র উক্তি। এইরকম তাঁর আরো নানা রচনায় শেক্সপীয়রের নানা উল্লেখ দেখা গেছে। কিন্তু এসব উল্লেখও আজ বাহুল্য। শেক্সপীয়র যে তাঁর স্বদেশ থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই ক্রমবিস্তারই প্রকৃতির নিয়ম। প্রতিভার দীপ্তি সূর্যকিরণের মতন। একমাত্র এইরকম সাহিত্য-প্রতিভার পক্ষেই এ-কথা সহজ কথা হয়ে ওঠে যে, মানুষের মনোজগতের কোনো আঞ্চলিক বেড়া নেই। শেক্সপীয়র এদেশে এসে সেই কথাই এদেশের একালের পাঠকমনে জানিয়ে দিয়েছেন —'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'!

রবীন্দ্রনাথের সেই আদি-পর্বের লেখাটিতে তাঁর এই সামর্থ্যের দিকটিই ইশারায় দেখানো হয়েছিল। শেক্সপীয়র যে নিজেকেই 'কখন বা হ্যামলেটরূপে কখন বা ম্যাকবেথরূপে' রূপায়িত করে গেছেন, সে-মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলে গেছেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতার সন্তান তাঁর এইসব চরিত্র। তিনি বানিয়ে বলেন নি, তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। জর্জ ব্রাণ্ডিস ইয়াগোর কথা-প্রসঙ্গে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন— 'Shakespeare not only knew that such wickedness exists : he seized it and set his stamp on it, to his eternal honour as a psychologist.'

কিন্তু শেক্সপীয়রের চিরায়ত আবেদন, তাঁর অভিজ্ঞতার অকৃত্রিমতা ইত্যাদি বহু-আলোচিত প্রসঙ্গের পাশাপাশি—বাংলা দেশে শেক্সপীয়র-চর্চার ধারায় এই কথাটিও স্মরণীয় যে, এদেশে সৃষ্টা-সাহিত্যিক তাঁর প্রভাব স্বীকার করেও এখানকার সমাজ ও যুগরুচির বিশেষ চাহিদার কথাও অনুভব করেছেন। যেমন, রাজনারায়ণের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে মধুসূদন জানিয়েছিলেন—

'Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape.'

মধুসূদন শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গ এইভাবে ভেবেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

সাপ্তাহিক বসুমতীর নতুন আকর্ষণ :
"সাহিত্যের দেশ দেশান্তর"
লিখছেন—ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

ভাবনাতেও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, ঐক্য-অনৈক্যের কথা আর-একভাবে দেখা দিয়েছিল—আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে,—ভারতীয় এবং ইউরোপীয় নাটকের প্রকৃতিগত শ্রেণী বিভাগের দিকটি দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'ভারতবর্ষ যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক—ঐসকল কাব্য, নাটক নহে। শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না। কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়।' এইভাবে শেক্সপীয়ারের 'টেম্পেস্ট' তাঁর মতে পৃথিবীর বিরল উপাখ্যান কাব্য; 'ওথেলোর' সঙ্গে তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ওথেলো-তে নাটকের গুণ অনেক বেশি।

এসব বিচার, বিশ্লেষণ, তুলনা, ব্যাখ্যানের ধারা বাংলার সাহিত্যলোকে প্রায় শ' দেড়েক বছর চলে আসছে। বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, তাছাড়া প্রধানত নাট্যকার যাঁরা, অভিনয়-শিল্পে যাঁদের মনন ও অভিব্যক্তি—তাঁরাও এসব দিক—এবং শেক্সপীয়রের অন্যান্য প্রসঙ্গ খুবই আগ্রহ এবং প্রযত্নের সঙ্গে ভেবেছেন। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শিশিরকুমার,—এবং নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নানা মনীষীর নাম মনে আসে। বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক অতিথিশালা থেকে শেক্সপীয়র প্রবেশ করেছেন আমাদের সাহিত্যচিন্তার আরো ভেতর-মহলে। তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর দেশ-কাল সম্বন্ধে একালের আধুনিকতর সাহিত্য-চেতনা আরো অনুসন্ধিৎসু হবে। তাঁর সৃজনীশক্তির যথার্থ স্বাতন্ত্র্য এবং অনন্যতা আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গভীর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যে আত্মময় আত্মবিস্মৃতির কথা বলে গেছেন, মধুসূদন যে ভিন্ন দেশ-কালের ভিন্ন প্রকৃতির ইশারা দিয়ে গেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণে ক্ষণে যে তাঁর নামোল্লেখ করে গেছেন,—এই তিন বিচারেই শেক্সপীয়রকে আমাদের একালে পুনরায় ভেবে দেখতে হবে। এই কামনাই তাঁর উদ্দেশে বাংলা দেশের একালের প্রণতিতে নিবেদিত।

# শেক্সপীয়র কেন লণ্ডনে গিয়েছিলেন

## হিমানীশ গোস্বামী

আমি এই প্রবন্ধ লিখবার জন্য পাঁচ দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েছি। প্রথম দু'দিন নানারকম সাময়িক পত্র পড়ে কাটিয়েছি—তৃতীয় ও চতুর্থ দিন দু'টি গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছি। পঞ্চম দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে কাগজ কলম নিয়ে ছ'ঘণ্টা ধরে এই প্রবন্ধ লিখেছি। আমি এই প্রবন্ধ লিখতে কোনো পুস্তকের সাহায্য নিই নি, কারণ নেবার উপায় ছিল না—তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় বই কে বা কারা নিয়ে চলে গিয়েছিল, কিংবা আমিই সম্ভবত খুঁজে পাই নি। মাত্র একটি রেফারেন্স বই হঠাৎ বরাত জোরে পেয়ে গিয়েছিলাম বলেই এ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হল।

আমার গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল শেক্সপীয়র কেন স্ট্র্যাটফোর্ড প্রায় চিরকালের জন্য ত্যাগ করে—হেঁটে লণ্ডন গিয়ে পৌঁচেছিলেন? এ স্থানে কোনো কোনো সমালোচক বলতে পারেন, শেক্সপীয়র কখনো স্ট্র্যাটফোর্ড ত্যাগ করেন নি, কারণ তিনি নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন এবং বেন জনসনের মতে তিনি জানতেন 'স্মল ল্যাটিন অ্যাণ্ড লেস গ্রীক', অতএব তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে হেঁটে লণ্ডনে যাবার উপযুক্ত লোক মোটেই ছিলেন না। অর্থাৎ, তিনি এমনি অশিক্ষিত ছিলেন যে, স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে লণ্ডনে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে নিতান্তই দুরূহ ছিল। কোনো সমালোচকের মতে তিনি ছিলেন, 'ইগনর‍্যাণ্ট অ্যাণ্ড অ্যাবসলিউটলি আনলেটার্ড', তিনি আরোও মত প্রকাশ করেছেন যে, শেক্সপীয়র ছিলেন 'ড্রানকেন'। তাই, একজন অশিক্ষিত লোকের পক্ষে স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে লণ্ডনে পৌঁছনো হয়ত অসম্ভব নয়। হেঁটে যাওয়া কষ্টসাধ্য হলেও এটাও অসম্ভব তা আমার বলবার মতলব নেই। অবশ্য তাঁর সাইনবোর্ড পড়তে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত সাইনবোর্ড পড়তে না পেরে বা ভুল পড়ে স্কটল্যাণ্ডেও গিয়ে পৌঁছুতে পারতেন। পারতেন না তা নয়। তর্কের খাতিরে ধরেই না হয় নেওয়া গেল শেক্সপীয়রের সাইনবোর্ড পড়বার মত বিদ্যে ছিল। কিন্তু হাঁটা পথে লণ্ডনের রাস্তায় অন্তত হাজারখানেক সরাইখানা কি পড়ত না? এবং তা দেখে তাঁর দু-এক পাত্র খেতে ইচ্ছে করত না? আর প্রতিটি সরাইতে দু এক পাত্র টানলে তিনি কি আদৌ লণ্ডনে পৌঁছুতে পারতেন? অতএব ধরে নিতে হবে হয় বেন জনসন, নয়তো বেকন এই কর্মটি করেছিলেন। আরো বহুলোক এমন কর্ম করে থাকতে পারেন, কিন্তু শেক্সপীয়র কিছুতেই নয়।

*

কিন্তু উপরের মন্তব্য আমার নয়। শেক্সপীয়রের সমালোচকদের। শেক্সপীয়রের সমালোচকেরা এযাবৎ হাজার সাতেক বই লিখেছেন—যাঁরা বিশ্বাস করেন শেক্সপীয়র স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে লণ্ডনে হেঁটে আসেন নি তাঁদের লেখা বই-এর সংখ্যাই এই। এ ছাড়া

শেক্সপীয়র সম্পর্কে লেখা বই-এর সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। এত বই লিখেও কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত এখনো হয় নি শেক্সপীয়র কতখানি হাঁটতে পারতেন, এবং তিনি লণ্ডনে হেঁটে গিয়েছিলেন কি না এবং হেঁটে গেলে কেনই বা গিয়েছিলেন। এসব জানতে হলে শেক্সপীয়রের জীবনকাহিনী খানিকটা জানা প্রয়োজন।

উইলিয়ম শেক্সপীয়রের জন্ম হয় ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যু হয় ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে। এই দুটিই শেক্সপীয়রের জীবনের আশ্চর্য যোগাযোগ। কয়েক হাজার সমালোচকের মতে শেক্সপীয়র ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনের পথে যান। আমারও তাই রীতিমত বিশ্বাস। শেক্সপীয়র ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের দিকে যান। কিন্তু কোনো সমালোচকই বা গবেষকই স্থিরভাবে বলতে পারেন নি, তিনি কেন যান? একথার উত্তর দেবার আগে উইলিয়ম শেক্সপীয়রের পরিবার সম্পর্কে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। সকলেই জানেন শেক্সপীয়রের বাবা মুদীখানা চালাতেন। এবং তখনকার আমলে কেউ পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনতে চাইত না। মধ্যযুগীয় বিনিময় প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। ফলে, যে লোকটা নাচ জানত সে এসে মুদীখানায় খানিক নেচে দু' সের আলু নিয়ে চলে যেত, সে আরো খানিক নেচে খানিক মাখন নিয়ে চলে যেত। যে লোক ম্যাজিক জানত, সে শেক্সপীয়রের বাবাকে ম্যাজিক দেখিয়ে তার দরকারি জিনিষপত্র নিয়ে যেত। শেক্সপীয়রের বাবা ওতে কিছুতেই আপত্তি করতে পারতেন না, কারণ তখন বিনিময় প্রথা চালু। এইভাবে শেক্সপীয়রের পরিবারের ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি হতে লাগল। তাঁর দোকানে রোজই দু-একটা নাচওয়ালা, দু-পাঁচটা ম্যাজিকওলা এসে হাজির হত। কেবল তাই নয়, কোত্থেকে জানা যায় না হাকিম বদ্যিরাও এসে শেক্সপীয়রের পরিবারে চিকিৎসা করত আর তার বদলে নিয়ে যেত দোকান থেকে যা খুশি। এই বিনিময় প্রথা অবশ্য পরে বন্ধ হয়ে যায়—কিন্তু ইতিমধ্যে শেক্সপীয়ররা না খেয়ে থাকতে বাধ্য হন।

কয়েক বছর উপবাসের পর

উইলিয়মের মনে হয় অন্যেরা যেমন বিনিময় প্রথার সাহায্যে তাদের খাবার নিয়ে গেছে—তিনিও বিনিময় করে খাবার আনবেন। কিন্তু শেক্সপীয়র কি বিনিময় করবেন? শেক্সপীয়র স্থির করলেন তিনি কাক সাজবেন। কাক সেজে লোককে আনন্দ দেবেন। তার বদলে তিনি খাদ্য নিয়ে আসবেন। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট গ্রীনের লেখা—শেক্সপীয়র জাতীয় লোকদের সম্পর্কে,

'Trust them not, for there
is an upstart crow
Beautified by our feathers
that with his
Tyger's heart wrapped in a
players hide'....ইত্যাদি।

*

রবার্ট গ্রীন লিখেছিলেন ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে। শেক্সপীয়র লণ্ডনে রওনা দিয়েছেন ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু রওনা দেবার আগেও তিনি যে কাক সেজে থাকবেন সে বিষয়ে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। তিনি গ্রামের লোকেদের কাছে তাঁর কাক-সাজ দেখাতেন, কিন্তু পরিবর্তে কিছুই জুটত না। পরিবর্তে লোকেরা হাসত। একদিন তিনি সার টমাস লুসির বাগানে গিয়ে হরিণ চুরি করলেন। খিদে পেলে বাঘে ধান খায়, অতএব শেক্সপীয়র যে হরিণ চুরি করবেন সে বিষয়ে দ্বিমত থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তা ছাড়া তাঁর কাক-সাজ দেখে সার টমাস হেসেও হয়ত থাকবেন, বিদ্রূপও করে থাকবেন।

রাত দুটোর পর শেক্সপীয়র হরিণটি চুরি করেন। হরিণটির ওজন ছিল প্রায় দেড় মণ। শেক্সপীয়র বুঝতে পারলেন না হরিণটি দিয়ে তিনি কি করবেন। কারণ দশ হাজার সমালোচকের মতে শেক্সপীয়রের একার পক্ষে দেড় মণি হরিণ খাওয়া ছিল নিতান্তই অসম্ভব। তিনি স্থির করলেন, তিনি হরিণটিকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন, কারণ তাঁর দুই দাদা, স্ত্রী এবং বাবা মা সবাই বহুদিন ধরে না খেয়ে ছিলেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর দুই দাদাকে (এখন থেকে তাঁদের বলব বড়দা এবং মেজদা) সে হরিণ দেখাতে তাঁরা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বড়দা কোত্থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসে হরিণটির গলা কেটে ফেললেন, মেজদা চামড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। এই সব চলছে—এমন সময় হাজির হল সার টমাস লুসির বাড়ি থেকে এক পেয়াদা। সে এসে সব দেখল। বলল, হরিণের ঘরের সামনে কাকের পালক দেখেই সে বুঝেছে এ কার কাজ। তা ছাড়া সার টমাসের অতি আদরের হরিণটিকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কার কাজ আমরা জানি। উইলিয়মের কাজ এটি।

একথা শুনে উইলিয়ম শেক্সপীয়র পালাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে পালানো সম্ভব হয় না। বড়দা মেজদা বাবা মা, এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলেন। তিনি সমস্তই সহ্য করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীকেও শেষ পর্যন্ত অন্য দলে দেখে হৃদয় দুঃখে ভেঙে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তুমিও শেষ পর্যন্ত! পরে জুলিয়াস সিজার নাটকে এই ঘটনাই প্রতিফলিত হয়—।

সার টমাস উইলিয়মকে বিচার করেন এবং শাস্তি দেন। তাঁকে চাবুকই সম্ভবত মারা হয়। দুঃখে ক্ষোভে তিনি বাড়ি ছেড়ে চললেন লণ্ডনের দিকে। তিনি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন লণ্ডনে হরিণ চুরি করার যথেষ্ট সুযোগ এবং শাস্তি সেখানে কম।

অবশ্য লণ্ডনে গিয়ে যখন দেখলেন সেখানে হরিণ চুরি করবার খুব সুবিধে নেই, তখন তিনি নিরুৎসাহ হয়ে যাত্রা-দলে যোগদান করেন। এর পরের ঘটনা সকলেই জানেন। উইলিয়ম শেক্সপীয়র আস্তে আস্তে বিখ্যাত হতে থাকেন। তাঁর প্রতিভা যাত্রাদলে বিকশিত হতে থাকে। (মতান্তরে, বেকন ইত্যাদির প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে—কিন্তু সে তর্কে আজ যাব না।)

*

উইলিয়ম শেক্সপীয়রের লণ্ডন যাত্রার মূলে উপরের ঘটনা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। শেক্সপীয়রের চতুর্থ শত-বার্ষিকীর হুজুগ না থাকলে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কিছু বই থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারতাম, কিন্তু আগেই বলেছি, তার কোনো উপায় নেই। পরে এক সময় তাঁর অন্য অন্য ব্যাপার নিয়ে কিছু গবেষণা করবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু এই হুজুগটি না গেলে আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

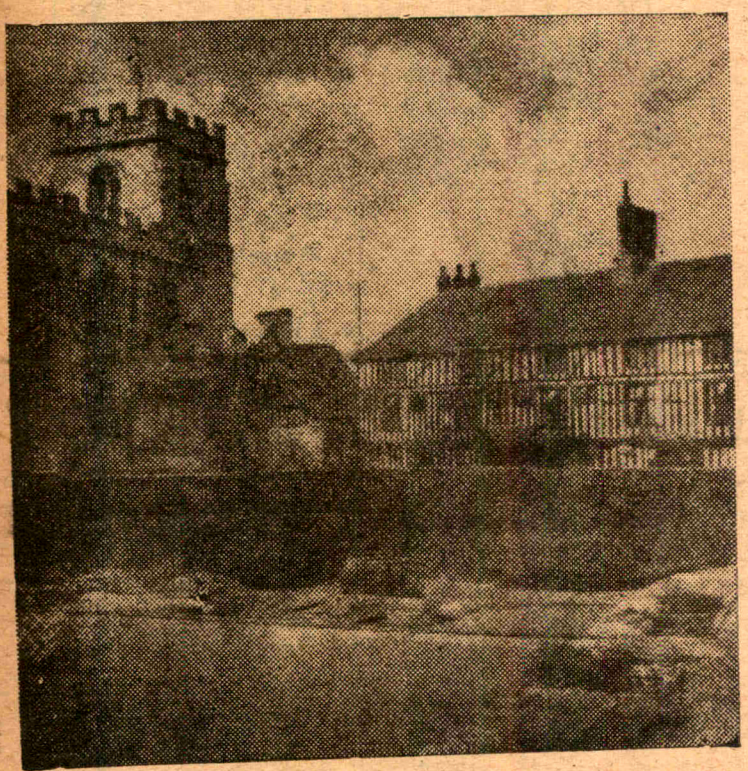

● নিউ প্লেসের ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ। এখানে শেক্সপীয়র তাঁর অবসর জীবন কাটিয়েছিলেন

# রূপকার সেক্সপীয়ার

রণজিৎ কুমার সেন

সেক্সপীয়ার ও দান্তে সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে কার্লাইল এক সময় বলেছিলেন : 'Dante and Shakespeare are a peculiar Two. They dwel apart, in a kind of royal solitude; none equal, none second to them ; in the general feeling of the world, a certain transcendentalism, a glory as of complete perfection, invests these two . . . We will look a little at these Two, the poet Dante and the poet Shakespeare : What little it is permitted us to say here of the Hero as Poet will most fitly arrange itself in that fashion.'

সেক্সপীয়ারের কোনো সমালোচকই বোধ করি কার্লাইলের মতো এমন বীরের সঙ্গে কবিকে তুলনা ক'রে সুন্দর ভাষায় তাঁকে মহত্তর আসন দেন নি। তাঁকে বিচার করেছেন তিনি দান্তের অলৌকিক প্রতিভার ভিত্তিতে। এখনে যে বিশেষ সত্তায় তাঁকে কার্লাইল এঁকেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ, সন্দেহ নেই। শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রকেই আমরা বলে থাকি ঋষি ও সাধক। তাঁর সাধনা সকলের সঙ্গে সমন্বিত হবার সাধনা, তাঁর ধ্যান মানব-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটনের ধ্যান, তাঁর কর্ম কাল থেকে কালান্তরের পথে প্রবাহিত।

সেক্সপীয়ার সম্পর্কে এসব কথাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, অথচ মহাবিদ্রোহী। জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে তিনি যে সুধা আর যে গরল আহরণ করলেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ক'রে তুলবার জন্য তা ছিল অপরিমিত। তাঁর জীবনসায়াহ্নে কনিষ্ঠা কন্যা জুডিথ প্রশ্ন করলো ; 'তুমি যে এত নাটক, এত বই লিখেছ বাবা, তা কি সবই তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ?'

সেক্সপীয়ার বললেন : 'সবই কি কল্পনা করা যায়, জীবন থেকেই যে বিশেষ ক'রে সব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা ?'

জুডিথ ব'ললো : 'তোমার শীতের গল্প প'ড়লে মনে হয়—তুমি নিজেই যেন রাজা লেয়ন্টিস, আর মা হার্মিওন, আর ম্যামিলিয়াস ঠিক যেন আমাদের মৃত ভাইটি।'

এ কথার কি জবাব দেবেন সেক্সপীয়ার ? জীবন-সত্যকে যেখানে তিনি নাট্য-সত্য ও কাব্য-সত্য ক'রে তুলেছেন, সেখানে সমস্ত জবাবই যে সব প্রশ্নের অতীত।

এ শুধু এ বই ব'লে নয়, প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পিছনেই রয়েছে সেক্সপীয়ারের ব্যক্তি-জীবনের সম্পর্ক বা অভিজ্ঞতা। প্রথম জীবনে ভাগ্যান্বেষণে যখন তিনি স্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে এসে 'রোজ থিয়েটার'-এর মালিক ফিলিপ হেন্সলোর কাছে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন, তখন 'রোজ থিয়েটার' কীড, মার্লো ও গ্রীনের ট্রাজিক ড্রামায় প্লাবিত। এখানে সামান্য একজন প্রম্পটারের চাকরী থেকে ক্রমে অভিনেতা ও পরে নাট্যকারের ভূমিকার সুযোগ পেয়ে গেলেন সেক্সপীয়ার। ট্রাজিক ড্রামা তখন দর্শকদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। হেন্সলোর অনুরোধে কমেডি রচনার কলম ধরলেন সেক্সপীয়ার। কিন্তু তিনি মনে মনে এটাও স্পষ্ট বুঝলেন যে, ট্রাজেডিকে যদি নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা যায়, তবে দর্শকেরা সে-নাটক না দেখে ফিরে যেতে পারবে না। এই ভাবের অবশ্যম্ভাবী দুটি নাটক 'টাইটাস এ্যাণ্ড্রনিকাস' এবং 'লাভ্স লেবার লস্ট'। সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাগ্য ফিরে গেল রোজ থিয়েটারের, তেমনি সেক্সপীয়ারেরও। তাঁর 'তৃতীয় রিচার্ড'ও হেন্সলোর অনুরোধেই লেখা।

ক্রমে সাদাম্পটনের জমিদার হেনরী রিয়টেস্‌লীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে। কুবেরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান রিয়টেস্‌লী। অন্তরে তার কামনার অগ্নিশিখা। তার শিকারী মেয়েকে খুশি ক'রবার জন্য সে চাইল সেক্সপীয়ারের অন্তর নিংড়নো ভাষা। তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে ইতি-মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন 'ভেরোনার ভদ্রযুগল'। এবারে

রিয়টেসলীর পণয়িনীর অনিন্দ্য রূপ-লাবণ্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন —তাঁর স্ত্রী এ্যান তাঁকে একটি দিনও যে তৃপ্তি দিতে পারে নি, এই নায়িকার মধ্যে হয়তো সেই তৃপ্তি লুকিয়ে আছে! এই নায়িকাকেই নাটকের মুখ্য চরিত্রে রূপায়িত ক'রে লিখলেন তিনি, 'রোমিও-জুলিয়েট।' জুলিয়েট ছাড়া তাকে যেন আর কোনভাবেই রূপ দেওয়া যেতো না। লণ্ডন শহর ভেঙে প'ড়েছিল সেদিন, রাত্রির পর রাত্রি এই নাটক দেখতে। কিন্তু এ নাটক দেখে সেই নায়িকা নিজেই যখন একদিন ছুটে এলো সেক্সপীয়ারের কাছে, তখন তিনি দেখলেন—সেই নায়িকা তাঁর সম্ভোগের পাত্রী নয়, ক্ষণিকের প্রভাদানে নতুন আঁধার সৃষ্টি ক'রে সে চায় দূরে সরে যেতে।

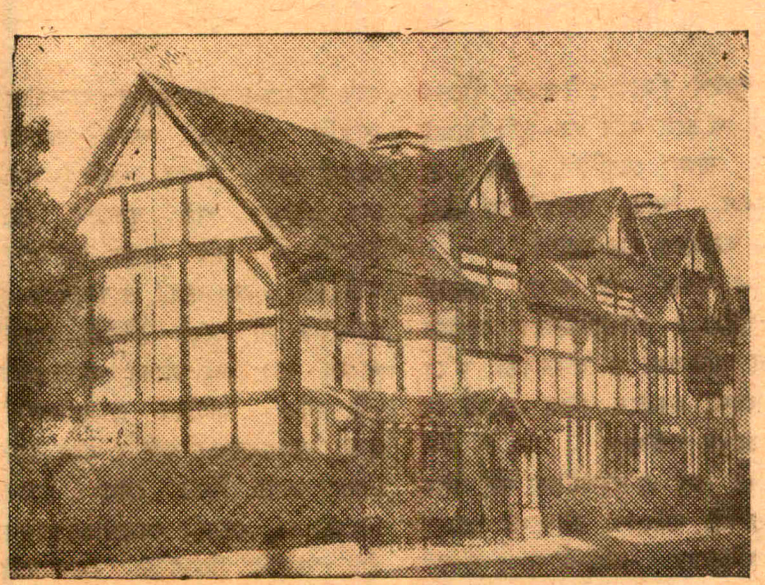

● এই বাড়িতে সেক্সপীয়ারের জন্ম হয়

এ ঘটনার অব্যবহিত কালের মধ্যে সেক্সপীয়ারের একমাত্র পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে যেভাবে মর্মাহত করে, তা বর্ণনার অতীত। এ সময়ে অনেক কালের মধ্যে তিনি আর নাটক রচনায় কলম ধরতে পারেন নি। এমনি ক'রে কিছুকাল কেটে যাবার পর অকস্মাৎ এক সময় রচনা করলেন তিনি 'চতুর্থ হেনরী'। এ নাটকের ফলস্টাফ চরিত্র একটি বিশেষ কৌতুক-রসাশ্রিত। এ সময়ে সেক্সপীয়ার কবি ও নাট্যকার হিসেবে যে-খ্যাতি অর্জন করেন, তা রাণী এলিজাবেথের মনকে গিয়ে অবধি গভীরভাবে নাড়া দেয়। নাটকের মতো তাঁর সনেটও এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সেক্সপীয়ার পৃথিবীর চোখে নতুনভাবে খুলে দিয়েছেন, এ গৌরব যে রাণীরই। তাই তাঁর দরবারে সম্মানিত অতিথি তিনি। কিন্তু রাণীর সহচরী মেরী ফিটনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে আবার তিনি আত্মহারা হলেন। কিন্তু ভুল করলেন সেখানেই। মেরী ফিটন যেন চিরকালের নন্দনবাসিনী উর্বশী। সে জানে শুধু তার কামনা চরিতার্থতার জন্য পুরুষের সাহচর্যকে; তার অধিক নয়। নানা বিরুদ্ধ-স্বভাবের সমাবেশে গর্বিতা মেরী ফিটন। সেই স্বভাব তীব্র আঘাত দিল সেক্সপীয়ারকে। এ সময়ে তাঁর একটি নাটক পড়া ছিল, নাম হচ্ছে 'ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের প্রতিশোধ।' এই নাটক ও মেরী ফিটনের চরিত্রকে জুড়ে এবারে তিনি রচনা ক'রলেন তাঁর 'হ্যামলেট'। মানুষের জীবন-দর্শনের পূর্ণ আলেখ্যের জীবন্ত রূপ যেন ফুটে উঠলো এই নাটকের মধ্য দিয়ে।

অলক্ষ্যে রাণী এলিজাবেথের জীবনদীপ ধীরে ধীরে এক সময় নিভে এলো। অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে সেক্সপীয়ার গিয়ে তাঁর হাতে মৃদু চুম্বন ক'রে শেষ বিদায় নিয়ে এলেন রাণীর কাছ থেকে। এরপর কত নাটকই তো লিখলেন তিনি, লিখলেন কত কবিতা, কিন্তু রাণীর প্রশংসাবাণী এসে আর তাতে যুক্ত হ'লো না। একটা বিরাট বিপুল স্বর্ণময় রেনেসাঁ যুগের অবসান ঘটে গেল ইংলণ্ডে। রাণী মেরীর ছেলে তখন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করে বসলেন প্রথম জেম্‌স নামে। কিন্তু এলিজাবেথান যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়ারের কলম কিন্তু বন্ধ হ'য়ে গেল না। রচনা ক'রলেন তিনি ম্যাকবেথ, টেম্‌পেস্ট, তারপর আরও---আরও, আরও অনেক। টেম্‌পেস্টের 'প্রসপারো' আর 'মিরাণ্ডা'---এ তো তিনি নিজে আর তাঁর জীবনসঙ্গিনী। যে ঝড় মাথা পেতে সহ্য ক'রে ক'রে তিনি সারা-জীবন কাটালেন, তাকে ফুটিয়ে তোলার মতো আর কি আধার হতে পারে তিনি নিজে ভিন্ন। এই হোক্ তাঁর অটোবায়োগ্রাফী। কিন্তু তা কি তাঁর সারা জীবনের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে নেই? শিল্পী-জীবনের বৃহত্তর বেদনাই যে রূপ নেয় তাঁর মহৎ শিল্পে। সেক্সপীয়ারের জীবনে আমরা তার পরম প্রকাশ দেখে কখনও বিস্মিত, আবার কখনও বা মর্মাহত হয়েছি। বোধ হয় এই ত্রয়ী রূপই হচ্ছে মহৎ শিল্প, আর তার রূপকারই হ'চ্ছেন জীবনশিল্পী।

# অনলআয়তী

সুশীল রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পেয়াদা বরকন্দাজ ফরাশ আবদার সচকিত হয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে।

ঘোমটা দিয়ে নাক ঢেকে হৃদয়-বালা লিপিটা দিলা পেয়াদার কাছে, যথাসম্ভব নম্র আর নত হয়ে পেয়াদা সে-লিপি দিল রূপনারায়ণের হাতে।

একটু বুঝি বিস্মিতই হল রূপনারায়ণ। বেশি কিছু পড়তে না জানলেও সে পিঠের নীচে তাকিয়া চেপে নিয়ে পড়তে লাগল—

প্রাণেরসর, তোমার দেখা না পেয়ে এ অভাগী কাতর।

পায়ের ধুলা দিয়ে দাসীকে রক্ষা কর। সময় করে একবার এলে চিরদাসী হয়ে থাকবে তোমার দাসী রাধারাণী।

চোখের কোণে কালি পড়েছে রূপনারায়ণের, সেই কালির কিনার দিয়ে ঝলকে উঠল বুঝি খুশি। তখনি আবার ব্যঙ্গে ভেঙে পড়ল সে তাকিয়ার ওপর। ডাকল, আবদার। লে আও।

বাইরে দাঁড়িয়ে ভীত হয়ে উঠল হৃদয়বালা। কা'কে ধরে আনতে আদেশ দিচ্ছেন বাবু—তাকে না তো?

দাঁড়াল না হৃদয়বালা। সেখান থেকে সে প্রায় ছুটে পালাল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল সে রাধার কাছে।

—কি রে হৃদয়, কি হল?

হৃদয় বলল, বলে উঠল—লে আও। ভাবলাম আমাকেই বুঝি, পালিয়ে এলাম তাই।

একটু দম নিয়ে হৃদয় বলল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বুঝি তোমাকেই নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দিলেন দাদাবাবু।

—আমাকে? বলিস কি রে হৃদয়বালা। তেমন ভাগ্য করে কি এসেছি। নাচ জানি না, গান জানি না, ঢং জানি না। কিছুই যে জানা নেই আমার।

দু' চোখ ছলছল করে উঠল রাধার। ঢোক গিলে বলল, শিখে নেব, শিখে নেব, শিখে নেব। সব শিখে নেব হৃদয়বালা।

হৃদয় বলল, ছি, জল আনতে নেই চোখে। পুরুষমানুষরা অমন একটু করবেই। তাতে কি রাগতে আছে?

রাগ নয়, দুঃখ নয়, অনুতাপ নয়। এ শুধু তার নিজের ওপর নিজের অভিযোগ। এতদিন কেটে গেল অযথা, এতদিন সে বৃথাই ক্ষয় করল সময়। অমনি বং, অমনি ঢং, অমনি নাচ অমনি গান শিখে নিতে ক'দিন লাগে? এতদিনে শিখে নিতে পারলে আজ মিনতি করে ডেকে পাঠাতে হত না। নিজে থেকেই এসে ঝাঁপ দিত ঐ পতঙ্গটি সেই আগুনের শিখায়।

রাধা বলল, শিখে নেব সব। সব শিখতে হবে আমাকে।

কিছুক্ষণ বুঝি প্রতীক্ষাতেই কাটল সময়। যে-বার্তা নিয়ে এল হৃদয়, সেই বার্তা অনুযায়ী, কই, কাজ তো হচ্ছে না। নিতে তো আসছে না তাকে কেউ। যদি আসে কোনো আরদালি বা কোনো পেয়াদা, সব লজ্জা ভয় জড়তা দূরে নিক্ষেপ করে সে রওনা হবে তার সঙ্গে। ঐ কাশ্মীরের নর্তকী কিংবা কাশীর বাইয়ের পাশে বসে সে এক হয়ে যাবে তাদের সঙ্গে। তখন রূপ-নারায়ণ কি করে তাই দেখবে।

কিন্তু পেয়াদা-বরকন্দাজরা কেউ এল না। দিন দুই বাদে, কি আশ্চর্য, দিনের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল নাকি? চন্দ্রের দীপ্তির মত শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে করতে স্বয়ং রূপনারায়ণ এসে উপস্থিত। গলবস্ত্র হয়ে রাধা প্রণাম করল রূপনারায়ণকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মখমলে মোড়া কেদারা দেখিয়ে বলল, বসো।

রূপনারায়ণ বসল, তার পাশে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল, শরীর ভালো আছে তো?

বাবরি চুল কালো পশমের মত ঝুলে আছে কাঁধ পর্যন্ত, উজ্জ্বল

গৌরবর্ণ ভেদ করে চোখের কোণের কালি ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। রূপনারায়ণ গদগদ গলায় বলল, ভালো আছি। আমার কথা তুমি বুঝি সত্যি ভাব?

—ভাবি। কিন্তু ওদের মত ভাবতে বোধ হয় পারি না। অত ভালো কবে ভাবতে বুঝি শিখি নি।

ঘাড় উঁচু করে রাধার মুখের দিকে তাকাল রূপনারায়ণ, জিজ্ঞাসা করল, কাদের কথা বলছ?

রাধা নিশ্বাস বন্ধ করে বলার মত করে বলল, কাশ্মীর থেকে আর কাশী থেকে যাদের আনিয়েছ।

একটু চুপ করে রইল রূপনারায়ণ, তারপর বলল, এবার ওদের বিদায় দেব। অনেক দিন হয়ে গেল।

রাধা সায় দিয়ে উঠল, তাই বেশ। নতুন কাউকে আনাও। না হলে কেমন একঘেয়ে লাগে। সেই একই নাচ, একই গান।

—দেখলে কি করে?

—দেখি নি। এত দূরে পড়ে আছি বটে, কিন্তু শব্দ তো আসে কানে। আমারি কেমন পুরনো ঠেকে, তোমার তো লাগবেই।

রূপনারায়ণের ধারণা তবে ভুল। নবহরি আর মতিলালও তবে বাজে ভয় দেখিয়েছে। কই, রাধা তো কোনো জুলুম করছে না, নাকী কান্না কেঁদে কেঁদে দুঃখ জানাচ্ছে না। এ তো বেশ সুন্দর ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করে ব্যাটাছেলেরা অবিকল তেমনি ব্যবহার।

রাধা বলল, বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। চল, শোবে চল।

হেসে উঠল রূপনারায়ণ, বলল, দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস করছি জানতে পারলে লোকে কি বলবে বল।

রাধাও হাসল, বলল, লোকের ভয় তবে আছে তোমারও? ভেবেছিলাম, তুমি ভয় কর না কাউকে। কিন্তু দেখছি তুমি আমারই মত ভীতু। চল, শোবে চল।

চাঁপা এসে পড়েছে কখন যেন। দরজার বাইরে একজোড়া লপেটা দেখেই সে থমকে থেমে গিয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে সরে গিয়েছে তফাতে।

নীচে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঝিয়েদের ঝংকার। বাড়িতে এমন-একটা অঘটন ঘটনা ঘটেছে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে তারা। বাইরে অমন বাইদের ফেলে ভেতরে ঢুকে কি নিয়ে খেলা করছেন তাদের দাদাবাবু?

ভবসুন্দরী চাপা গলায় বলল, মিষ্টি খেয়ে জিভ জড়িয়ে এলে একটু তেঁতুল চেটে নিতে হয় রে বিন্দে। অল্পেই অত চমকালে চলবে কেন। মাহেশে যাবার দিন এসে গেছে, বজরা, ভাউলে, পিনিস থক থক করছে গঙ্গায়, গাঁদি লেগে গিয়েছে নৌকোর। সেখানে যাবার আগে একবার দেখা করে যাবে না?

ভবসুন্দরীকে ভয় পায় বিন্দুবাসিনী। তবু বলল, দেখা করতে এতই সময় লাগে বুঝি।

অকথ্য ইঙ্গিত করে ভবসুন্দরী বলল, ক' দণ্ড সময় লাগে জান না? সব জেনে-শুনে ঠেকার করা হচ্ছে।

শুয়ে আছে রূপনারায়ণ। সুউচ্চ পালঙ্কে দেড় হাত পুরু বিছানার ওপর শুয়ে একটু আরামই লাগছে বুঝি তার।

মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে রাধা বলল, আমি যাব। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

—এই জন্যে বুঝি ডেকে পাঠিয়েছ আমাকে?

—না গো না। এজন্যে নয়। স্ত্রী ডাকবে স্বামীকে, তার মধ্যে কি কোনো জন্যে আছে না কি? তুমি এসেছ, কত ভাল লাগছে আমার। আমার কথা শুনেছ, কত গর্ব হচ্ছে আমার।

একটু থেমে রাধা বলল, কিন্তু আর একটি কথা শুনতে হবে তোমাকে। আমি যাব। আমাকে নিয়ে চল।

বালিশের ওপর মাথা দোলাতে লাগল রূপনারায়ণ, বলল, না। তা হয় না।

—না নিয়ে গেলে ফিরে এসে দেখবে আমি নেই। ওই ভাগিনীর মত ডুবে মরেছি ঐ গঙ্গায়।

অনেকক্ষণ যেন ভাবল রূপনারায়ণ কি করে সে বোঝাবে তার স্ত্রীকে যে, ওসব জায়গায় যেতে হয় না ঘরের বৌকে। কখনো যায় না তারা। যারা যায় তারা সব অন্য রকমের মেয়ে।

রাধা আজ বড় অন্তরঙ্গভাবে পেয়েছে রূপনারায়ণকে। জীবনে তার এই প্রথম এমন করে পাওয়া। সে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যে সংকল্প করে ফেলেছে। বাজি না করিয়ে সে আজ ছাড়বে না কিছুতে।

প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল রূপনারায়ণ, রাধার হাত ধরে বলল, তোমাকে আজ ঠিক পরস্ত্রীর মত লাগছে।

—তা লাগবে বৈ-কি। পর করেই তো তুমি রেখেছ আমাকে। কোন-দিন কি ভাবতে পেরেছ আপনজন বলে!

একটা নিশ্বাস ফেলে রাধা বলল, তোমাকেও আজ পরপুরুষ বলে মনে হচ্ছে আমার।

উঠে বসার চেষ্টা করেই শুয়ে পড়ল রূপনারায়ণ, বলল, কি রকম?

রাধা ধরতে পেরেছে রূপনারায়ণের লেগেছে কোথায়, তক্ষুণি সে তাই বলল, দেখছ না, কেমন তফাৎ তফাৎ আছি। গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে লেগে বসতে কেমন সংকোচ ঠেকছে।

রূপনারায়ণ বলল, সংকোচের কি আছে, সরে এস।

কিন্তু সরে গেল না রাধা, যেমন-ভাবে বসে ছিল ঠিক তেমনিভাবেই

সে বসে রইল অচল হয়ে। আর বেশি সরে বসতে তার যেন ঘৃণা হচ্ছে। সত্যিকারের পরপুরুষকে আর সত্যি ঘৃণা করে না বাধা।

কিন্তু ঘৃণার কথা বলার বা ঘৃণা প্রকাশের সময় এ নয়। আজ রূপনারায়ণের কাছ থেকে কথা নেবে সে, তার সম্মতি নেবে সে আজ।

মাথার কাছে বসে আছে সে, রূপনারায়ণ তাই তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে মুখের ওপর বেদনার, বিদ্বেষের আর বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে উঠছে অনবরতই।

রূপনারায়ণ বলল, এলে না? সরে এলে না?

—এই তো এসেছি। একটু ঝুঁকে পড়ে বলল রাধা।

—সামনে এস। তোমাকে দেখতেই পাচ্ছি নে।

আঃ, বড় আক্ষেপ রূপনারায়ণের। যাকে দেখতে পাচ্ছে না তাকে দেখার জন্যে যেন কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে সে। তাই আজ তার এই ব্যাকুলতা।

দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে বাইরে। কোন্ অলক্ষ্যে বসে ছাদ-পাখা টেনে চলেছে পাংখাবরদার। কিন্তু ও হাওয়ায় ঠাণ্ডা হচ্ছে না শরীর।

এদিক-ওদিক তাকাল রাধা। কোথায় হাতপাখা, কোথায় চামর। দাদাবাবুকে দেখে কোথায় পালিয়েছে দাসীরা। কারো পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

অগত্যা উঠতে হল রাধাকেই। চরণপদ্ম বেজে উঠল ঝুমঝুম্ করে। চমকে তাকাল রূপনারায়ণ, কাদের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ বলে হঠাৎ মনে হল তার। বিছানার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে সে চলে গেল পায়ের দিকে।

—কোথায় চললে?

—যাই নি। আসছি।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঁচু খাট থেকে সে মেঝের ওপর নামল। নিয়ে এল চামর, নিয়ে এল পাখা।

আবার সে এসে বসল নিজের জায়গায়, বলল, বাতাস করি। তুমি ঘেমে উঠছ। যা গরম পড়েছে।

হাওয়া করতে লাগল রাধারাণী। চোখ আধো বুজে এই পরিচর্যা উপভোগ করতে লাগল রূপনারায়ণ। বলল, বা, বেশ।

—কি বেশ। রাধা বুঝি ব্যঙ্গ করেই জিজ্ঞাসা করল, এই হাওয়া, না, এই গরম? কোন্‌টা বেশ?

কি কি বেশ সে-ফিরিস্তি পেশ করল না রূপনারায়ণ। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, এই সবই বেশ। এই বিছানা, এই বালিশ, এই হাওয়া, এই দুপুর। আর, তার সঙ্গে আরও যেন একটা কি। নানা জায়গায় অনেক ফুর্তি পায়, অনেক আমোদ পায়, কিন্তু এমন আরাম বুঝি পায় না সে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ চিন্তা করে রূপনারায়ণ বলল, তুমি বড় ভালো।

রাধাও চোখ বুজল, আনন্দে না বিদ্বেষে বোঝা গেল না, বলল, তুমি তার চেয়েও ভালো।

উভয়ে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে উভয়ের সঙ্গে, এইভাবে কথা বলতে লাগল দুজন। কখনো সে কথার মানে হচ্ছে, কখনো বা হচ্ছে না। কিন্তু তাদের সে-খেয়াল নেই।

রাধা এবার অন্য কথা তুলে বলল, ওদের বিদায় করে দিচ্ছ, তাহলে তোমার সঙ্গে যাবে কারা?

হাসতে লাগল রূপনারায়ণ, হাসতে হাসতে বলল, মেয়েমানুষের কি অভাব। টাকা ফেললেই জুটে যাবে। মেয়েমানুষরা আর কিছু চেনে না। চেনে শুধু টাকা।

বুকের মধ্যে বিষম যা লাগল রাধার। আর কিছু চায় না নাকি? রাধাকেও বুঝি অমনি একজন মেয়েমানুষ বলেই মনে করে রূপনারায়ণ? তাই টাকার হরিলুঠ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঐশ্বর্যের আর আড়ম্বরের ভিড়ের মধ্যে ফেলে রেখেছে তাকে!

রূপনারায়ণ বলল, ঐ জন্যেই তোমার কথা রাখতে বাধছে। ওখানে সঙ্গে যাবে সব বাইজী-নর্তকীরা, তার মধ্যে কি তোমার যাওয়া ঠিক?

—ঠিক। কিচ্ছু বেঠিক না। আমি যদি ঠিক থাকি, তবে কিছুই খারাপ না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরা নরকেও যেতে পারে, কিন্তু এ তো মাহেশের স্নানযাত্রা।

উঠে বসল রূপনারায়ণ, মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। যাবে।

উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠল রাধা, বলতে লাগল, মত দিলে তো? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আমায়, আমার কি আনন্দ, আমার কি গর্ব। এতদিন তুমি আমাকে এমনভাবে উপেক্ষা করেছ, সব শোধ হয়ে গেল আজ। আমি তবে তৈরি হই।

—হও। সময়ও আছে। আমাদের নৌকো ছাড়বে পরশু।

মাহেশের স্নানযাত্রায় যাবে রাধারাণী।

পা কাঁপতে লাগল তার। সে তার সংকল্প পালন করতে পেরেছে, এ যেমন একটা আনন্দ; সমাজের নিয়ম সে লংঘন করবে, এও তেমনি একটা উল্লাস।

পালঙ্ক থেকে নেমে এসেছে রাধা। চরণপদ্ম বেজে উঠছে ঝুমঝুম শব্দে, সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলতে লাগল, আমাদের সেই বিয়ের মিছিলের কথা মনে পড়ছে, অমনি মিসলবন্দী হয়ে রওনা হবে আমাদের ময়ূরপঙ্খী।

নেমে দাঁড়াল রূপনারায়ণ, বলল, হবে হবে। কত নৌকো চাও বলো। নৌকোর কোনো অভাব হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা জানা-জানি হয়ে গেলে লোকে কি বলবে তাই ভাবছি।

—ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দাও। লোকেদের অত ভয় করে চললে লোকেদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। আরো ভয় দেখাতে আরম্ভ করে তারা। তোমার সঙ্গে আমি যাব, এ শুধু তোমার-আমার কথা, এর মধ্যে বাইরের লোক আসছে কি করে।

রূপনারায়ণ বুঝে ফেলল যুক্তিটা, বলল, তা ঠিক।

চলে যাচ্ছিল সে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সেজেগুজে নিয়ো ভালো করে। বেনিয়ান রূপচরণ রায়ের পুত্রবধূ তুমি, মনে রেখো। এ-বাড়ির কোনো অমর্যাদা না হয় দেখো। বিয়ের সময় দেখেছ তো কারা সব এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে?

—দেখি নি। শুনেছি। আমীর-ওমরাও, সাহেব-সাহেবান, মোগল-পাঠান।

—আর, তোমার সঙ্গে দাসী যাবে কে?

রাধা বলল, বেশি কাউকে নেব না। সঙ্গে যাবে চাঁপা।

উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্নানযাত্রার মহোৎসব আছেই, তার ওপর এর দিন পনের পরেই রথযাত্রা। মাহেশ তাই এখন লোকে লোকারণ্য। এত লোকের সমাগমে মাহেশের নদীকিনার জনসমুদ্রের মত দেখাচ্ছে এরই মধ্যে। জগন্নাথ দেবের স্নান তো পরশু; কিন্তু আগে থেকে না এলে ঠাঁই মিলবে না ব'লে আগে থেকেই এসে পৌঁছে গিয়েছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দল। কেউ গো-গাড়িতে, কেউ পাল্কিতে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা নৌকো চেপে—পানসিতে, ডিঙিতে, পালোয়ারে আর বজরায় এরই মধ্যে ভরে উঠেছে মাহেশের কিনার।

ডাঙায় লোক ছড়িয়ে গেছে অনেক-দূর অবধি—নোয়াপাড়া থেকে আরম্ভ করে রিষিড়া, চাতরা, মাহেশ, বল্লভ-পুর, আকনা পার হয়ে শ্রীরামপুর পর্যন্ত গ্রাম পূর্ণ হয়ে গিয়েছে মানুষের ভিড়ে। এখনো লোকের আগমনের বিরাম নেই। এখনো দু'দিন বাকি স্নানযাত্রার।

স্নানযাত্রা তো একদিনের ঘটা; এরপরই রথযাত্রা—সে হচ্ছে নব-রাত্রির মেলা। মেলা বসতে আরম্ভ করেছে বল্লভপুর থেকে মাহেশ পর্যন্ত। বাঁশের খুঁটি পুঁতে হোগলার চাল ফেলা হচ্ছে, রাস্তার এ-পারে আর ও-পারে। যারা স্নানযাত্রায় এসেছে, এই দোকান-সাজানোর ঘটা দেখতেই তাদের কত আনন্দ, দল বেঁধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তারা, আর মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছে বাঁশের খুঁটি পোঁতার ব্যস্ততা।

দূর-দূর জায়গা থেকে আসছে ব্যাপারীরা। পাকা কলা, কাঁচা কলা, আনারস, ডাব স্তূপ হয়ে পড়েছে একধারে। অন্যদিকে কাপড়ের আর পিরানের দোকান বসছে; আরশি কাঁকুই, বাক্স, টুপী, মাদুর, হুঁকা, খেলনা—দোকানের অন্ত নেই।

পাশেই ছোট তাঁবু। তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে বসে সাদা কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে ছবি আঁকছেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। মেলার ছবি বুঝি। দূর থেকে চেনা যাচ্ছিল না। এবার চেনা গেল। ইনি সেই মহিলা, কয়েক বছর আগে কলকাতার চৌরঙ্গীতে এঁকে আমরা দেখেছি। কয়েকটা বছর কেটেছে বটে, কিন্তু ইনি দেখতে ঠিক তেমনিই আছেন। একমনে ছবি এঁকে চলেছেন শ্রীমতী বেলনস।

কলকাতার কালিঘাট থেকে পটুয়ারা এসেছে পট নিয়ে। দু-দু পয়সায় মজাদার-মজাদার পট বিক্রি হবে এখানে। তাদের জন্যেও ঘর বাঁধা হচ্ছে।

পানউলিরা পানের দোকান খুলে বসেছে—পয়সায় চারটে করে গোলাপি খিলি; সেই খিলির সঙ্গে উপরি-পাওনাও আছে, মুচকি হাসি আছে দিল-খোলা।

ওপাশের মাদুরের দোকানের ছোকড়াটা খোঁটার ওপর বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে এদিকে চেয়ে হাসছে আর গান গাইছে—

বিমলি বসেছে দোকানে
ও সে কিসের দোকান কে জানে।

কাঁচা-মিন্‌সের গানের ওই কলি শুনে এপারে হাসির ফোয়ারা উঠছে বুকের মধ্যে। কিন্তু তা আড়াল করে বসে নিজের মনে গোলাপি খিলি তৈরি করে যাচ্ছে। চোখের পাতা দুটো যেন বেজায় ভারি, চোখ তুলে চাইতে কষ্ট হয়, তাই ভুরুটা টেনে তুলে একটু তাকায় মাত্র ওদিকে। ওদিক থেকে গান ভেসে আসেই—

ঝুমকো দুলেছে দু'কানে
ও সে কিসের দোলন কে জানে।
বিমলি বসেছে দোকানে।
ও সে কিসের বেসাতি কে জানে।

কোদাল কুপিয়ে রাস্তা চওড়া করে দিচ্ছে সাঁওতাল মজুর। মজুর-নীরা চাঙারী ভর্তি মাটি মাথায় করে নিয়ে ফেলছে ও-পাশে।

(ক্রমশঃ)

# জাপানী সন্দেশ

## মুক্তার উপকথা

রাজকন্যের চোখে জল। মুক্তা ঝরে পড়ছে যেন। রাজকন্যের মুক্তা-অশ্রুর কথা কে না জানে। ঠাকুরদা' আর ঠাকুরমা'র ঝুলির সেই মুক্তা আর আজকের জাপানের cultured pearl-এ কোন তফাৎ নেই তেমন।

জাপানী মুক্তার কথা সকলেই জানে। পৃথিবীর যেখানেই যাবে, সেখানেই দেখবে, জহুরীরা বিক্রি করছে জাপানী কাল্‌চারড্ পার্ল। এই সূর্যোদয়ের দেশ কাল্‌চারড্ ও ইমিটেশন মুক্তা তৈরি করে সারা জগতে নাম কিনেছে। কী সুন্দর এই জাপানী মুক্তা।

পুরাকালের জাপানীরা মুক্তা দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করত না। মুক্তা-শামুক অবশ্য তখনও ছিল, আজও যেমন আছে। এরা বরাবরই সমুদ্র-শামুক খেতে ভালবাসে। এদেশের সেরা মুক্তা-শামুকের নাম 'আকোয়া গাই'। Shiznoka prefecture-এর Akoya Bay হলো এই শামুকের জন্মস্থান। নানান্ রকম শামুকের মধ্যেই পাওয়া যায় মুক্তা। শুধু এ রকম নয়। পুরাকালে জাপানীরা এই শামুকের মধ্যে পাওয়া মুক্তা চূর্ণ করে হরেক রকম ওষুধ তৈরি করত। কী ব্যারামের জন্য তা' আজও সঠিক জানা যায় নি।

বহুদিন ধরে জাপানীদের ধারণা মুক্তার নাকি প্রাণ আছে। ওরা নাকি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও নেয়। বাক্সবন্দী করে রাখলে নাকি শুকিয়ে মরে মুক্তার দল। সত্যিই মুক্তার মধ্যে কিছুটা তৈলজাতীয় ভিজে পদার্থ থাকে। শুকনো আবহাওয়ায় বেশি দিন থাকলে মুক্তার জলুষ যায় কমে আর ঐ সঙ্গে দামও কমে। অনেকের ধারণা মুক্তাকে যতই ব্যবহার করবে ততই নাকি বজায় থাকবে ওর জলুষ। দেহের ঘাম ইত্যাদি পদার্থে ওর সামান্য ভিজে থাকাও চলবে। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবে ও বেশ কিছুদিন আরো।

জাপানের আবহাওয়া সচরাচর ভিজে, স্যাঁৎসেঁতে। মুক্তার তাই শুকিয়ে মরার ভয় নেই। তবে বৈজ্ঞানিকরা—দেহের সংস্পর্শে এলে মুক্তা যে ভাল থাকে—এ ধারণা

সন্দীপ ঠাকুর

দিয়েছেন ভেঙে। ঘামে থাকে কত রকম এ্যাসিড যা' মুক্তার পক্ষে ভাল নয়। সব সময়ে ধারণ না করাই ভাল। মানে মুক্তার পক্ষে আর কি। যারা জানে তারা ব্যবহারের পরে নরম কাপড় দিয়ে মুছে বা জল দিয়ে ধুয়ে রাখে মুক্তা। শুধু জল বা সাবান-জলে ধুলে কোন ক্ষতি হয় না।

মুক্তার জন্ম বেশ একটা মজার ব্যাপার। ধর একটা মুক্তা-শামুকের মধ্যে একটি বালির কণা কিংবা ছোট্ট কিছু একটা পদার্থ হঠাৎ পড়ল ঢুকে। অয়েস্টারের (মুক্তা-শামুকের) সুরু হলো গাত্রদাহ। সেই জ্বালাকে থামাতে হবে তো। শামুকের পেটের মধ্যে একরকম সাদাটে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে ঢেকে ফেললো ঐ বালির কণাকে সবদিক দিয়ে। ঐ জলীয় পদার্থটি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে পরিণত হল মুক্তায়।

অনেকের ধারণা যে, লোনা জল ছাড়া মুক্তা জন্মায় না। এ ধারণা ভুল। মিষ্টি জলেও নানান শামুকের পেটে পাওয়া যায় অতি সুন্দর মুক্তা। তবে এই মুক্তার দাম লোনা জলের মুক্তার চেয়ে বেশ কিছুটা কম। ন্যাচারালই হোক আর কাল্‌চারড্ হোক, মুক্তার দর হচ্ছে তার সাইজ, গঠন, জৌলুষ, আর তার রংয়ের বাহার দেখে।

মুক্তার রং নির্ভর করে প্রত্যেকটি মুক্তা শামুকের উপর। ঐ শামুকের

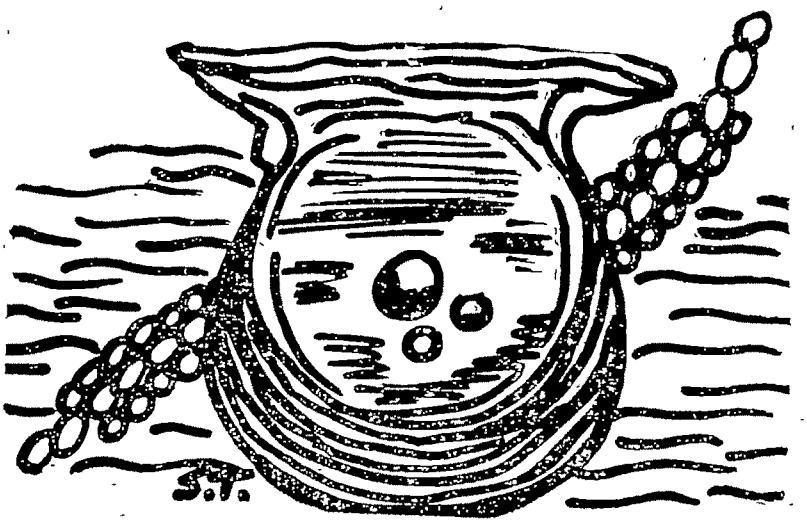

আকোয়া গাই

ভিতরকার রং প্রতিফলিত হয় মুক্তায়। তাছাড়া জলের টেম্পারেচার, স্বাদ ; লোনা কিংবা মিষ্টি : —শামুকের স্বাস্থ্য ও কী ধরণের খাবার খেয়ে-বেঁচে আছে ঐ শামুক,—ইত্যাদির উপরই মুক্তার রূপের অনেক কিছুই নির্ভর করে।

কত রকমই রং আছে মুক্তার। গোলাপী, ক্রীম, সাদা, কালো, তামাটে, খয়েরী, আর নানা শেডের ল্যাভেণ্ডার, নীল, হলদে, সবুজ ও জামরং। তবে দাম সবচেয়ে বেশি হলো গোলাপী, ক্রীম, সাদা আর কালো মুক্তার।

পৃথিবীর সেরা ন্যাচারাল পার্ল পাওয়া যায় পারস্য-উপসাগরের ছোট ছোট শামুকের ( Pinctada Vulgaris) মধ্যে। অন্যান্য দেশেও ন্যাচারাল মুক্তা পাওয়া যায়। যথা—অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, ভেনেজুয়েলা, টাহিটি, মেক্সিকো দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও ক্যালিফোর্নিয়া-উপসাগর ইত্যাদি। জাপানের নানা স্থানে আজ pearl cultured করা হচ্ছে। জাপানই এই ব্যাপারটিকে দিয়েছে সম্পূর্ণতা। এদেশী cultured pearls-ই হলো জগতের সেরা।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে এরা experiment করতে সুরু করে pearl culture-এ। পুরাকালে চীনেরা তৈরি করতো half-pearl. সেগুলি বসানো হতো বুদ্ধমূর্তির দেহে। সেই নিয়মকে মেজে ঘষে জাপানী তৈরি করলে cultured pearls অনেক research-এর পর এরা আবিষ্কার করলে যে—যদি ছোট্ট একটি mother of pearl-এর বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় মুক্তা-শামুকের Mantle parenchyma-র মধ্যে তাহলেই জন্মায় সুন্দর মুক্তা। রাতারাতি তৈরি হয় না cultured pearl. বেশ কয়েক বছর সময় লাগে এই মুক্তার পূর্ণাবয়ব হতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরই এরা প্রথম সুন্দর ও গোল মুক্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

আজ এই মুক্তা তৈরির টেকনিক এতো উন্নত হয়েছে যে, সত্যিকারের expert ছাড়া কেউ ধরতে পারে না natural ও cultured pearl-এর প্রভেদ। তাও হয় মুক্তা ছেঁদা করে দেখতে হবে, নয় special x-ray টেকনিকের মাধ্যমে। সত্যি অতি কঠিন ব্যাপার এই প্রভেদ ধরা।

স্বর্গত মিকিমোতে কো-কিচি হলেন জাপানী পার্ল কালচারের পায়োনীয়ার। ইনি একদিন গর্ব করে বলেছিলেন, 'সারা দুনিয়ার মেয়েদের অঙ্গে শোভা পাবে আমাদের জাপানী মুক্তা।' আজ সেই প্রতিজ্ঞা পরিণত হয়েছে বাস্তবে। এই 'জহরতের রাণী' কত সুন্দরীর কণ্ঠ জড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশে।

জাপানী ভাষায় মুক্তার নাম 'শীনজু'।

## একটি অনুভব

অরূপ রুদ্র

দ্যুতিময় আলোক সরোবরে কোনো একদিন
সন্ধ্যা নামবে
হীরকের মত তীক্ষ্ণ অনুরাগে
অঙ্গারের স্তম্ভিত রূপান্তরে—
তারপর বিস্মিত এক সারস
কুয়াশার পাখনায় ঢেকে দেবে
সাদা জ্যোৎস্নার পাখনায় ঢেকে দেবে
কোনো এক মৃত্যুমুখী নক্ষত্রের জীবনের
মরকত-প্রাসাদ ঢেকে দেবে উজ্জ্বল সমাধিতে

সন্ধ্যা এলে তবু থাকে
দিনের আলোর রেখা
ভালোবাসা ভুলে গেলে
পড়ে থাকে রিক্ত কী বেদনা
মধ্যরাতে জোনাকিরা জ্বলে গেলে
পাখনায় তবু দ্যুতিচ্ছটা

ফুলগুলি তখনো অন্যমনে
কখন যে মৃদুল স্পর্শে
ভরে ওঠে অন্যতর সৌরভে।

## মহুয়ার বিগলিত জ্যোৎস্না

অমিতাভ চক্রবর্তী

হলুদ ঠোঁটের নীড়ে ঘুমাইতেছে স্বপ্নের শরীর
নীলের সুগন্ধ গায়ে মেখে বাতাসেরা বহিতেছে
উড়িতেছে শিশিরের ঘুম ভেঙে প্রজাপতি পাখি
অদূরে জলের ঢেউ—সৌম্যসুর চোখের কাজলে।

যে গেছে চলে সে বুঝি কোনোদিন ফিরিবে না আর
চিকন বালির 'পরে রেখে গেছে কত না স্মৃতির
দাগ—স্নিগ্ধ—মধুময়, দীপের শিখার মত মুখ
মনে পড়ে—মনে পড়ে মহুয়ার বিগলিত জ্যোৎস্না।

ঘাসের হৃদয় ছুঁয়ে চলে গেছে সময়ের গান
কতদূরে পূরবীর মুক্তাবিন্দু তরল অনলে ;
এখনো সূর্যের স্বাদ নিয়মিত ফুলের বাগানে
রাত্রির উৎসব যেন ভালোবেসে মৃত্যুর যন্ত্রণা।

হলুদ ঠোঁটের নীড়ে ঘুমাইতেছে স্বপ্নের শরীর
ভাসিতেছে আকাশের দূরস্মৃতি মেঘের ঠিকানা।

# বসন্তান বন্দ্যোপাধ্যায়

# শ্বেত সর্প

বসন্ত তখন শেষ হয়ে আসছে।

উত্তর ভারতের তীব্র গরম এখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। সন্ধ্যা অতিক্রম করেছে বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে। আগ্রাদুর্গ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। স্বর্ণখচিত পালঙ্কের উপর এইমাত্র নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছেন শাহজাহান—ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট শাহজাহান।

জাহান আরা পিতার পদপ্রান্তে বসেছিলেন। সম্রাট নিদ্রিত হলে তিনি উঠে পড়লেন। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কক্ষের বাইরে এলেন। মমতাজের মৃত্যু হয়েছে আজ বহু বছর। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করবার পর মাত্র তিন বছর জীবিত ছিলেন তিনি। মাতার মৃত্যুর পর পিতার পরিচর্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন জাহান আরা।

অলিন্দে তখন তাঁর চারজন পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে সম্রাট-নন্দিনী বললেন, তোরা এবার বিশ্রাম কর গিয়ে। আমি একাই নিজের মহলে ফিরে যাব।

পরিচারিকারা ইতস্তত করে অলিন্দ অতিক্রম করবার জন্য পা বাড়াল। জাহান আরা তখন কিছুদূর এগিয়ে গেছেন। সেখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে একজনকে আহ্বান করলেন, মরিয়াম—

—পাদশাহ বেগম— ? মরিয়াম ছুটে এল।

শাহজাহান তাখতে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রিয় কন্যাকে 'পাদশাহ বেগম' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং যাতে এই উপাধির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় তাই একলক্ষ মোহর ও ছয়লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা জাহান আরাকে করে দিয়েছিলেন।

মরিয়ামের দিকে তাকিয়ে জাহান আরা বললেন, আজ সুন্দর একটি রোবাই লিখেছি। নসিকাকে ডেকে নে। তোদের দুজনকে রোবাই শুনিয়ে তবে ছুটি দেব।

অলোকসামান্যা রূপবতী এই তাবতাই কুমারী মোগল রাজ পরিবারের রত্ন স্বরূপ। অন্যান্য বহু গুণাবলী ছাড়াও ফার্সিতে রোবাই রচনায় তিনি সিদ্ধহস্তা।

দীর্ঘ অলিন্দের উপর দিয়ে মরিয়াম ও নসিকাকে নিয়ে এগিয়ে চললেন জাহান আরা। তাঁর তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ দেহের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মূল্যবান সূক্ষ্ম মসলিন। চলার তালে তালে মসলিনের ওড়হনা পক্ষবিস্তার করে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে।

অল্প দূরত্বের ব্যবধানে অলিন্দ-গাত্রে অসংখ্য দীপাধার। চতুর্দিক আলোকিত হয়ে রয়েছে। থমথমে নিশ্চিন্ত পরিবেশ। হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটে গেল, অলিন্দের বাঁকের মুখে জাহান আরার ওড়হনা দীপাধার স্পর্শ করল। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। মরিয়াম ও নসিকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই সম্রাট-নন্দিনী লেলিহান অগ্নির জঠরের মধ্যে নিমজ্জিতা হলেন। সাহায্যের জন্য আর্ত চীৎকার করে উঠলেন। ততক্ষণে

সম্বিৎ ফিরে এসেছে বেগমের। সে সাপটে ধরল জাহান আরাকে। মরিয়ম তখন চীৎকারে চতুর্দিক মুখরিত করে তুলেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ আগ্রাদুর্গ মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল। প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটা কি ঘটেছে প্রথমে কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। উন্মুক্ত তলবারি নিয়ে খোজারা ছুটে এল ঘটনাস্থলে।

অলিন্দের উপর শায়িতা অবস্থায় জাহান আরা তখন ছটফট করছেন। যন্ত্রণাকাতর সুন্দর মুখ তখন সহস্র কুঞ্চনে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। অর্ধদগ্ধা হতভাগ্য নাসিকাও একধারে পড়ে রয়েছে। প্রচণ্ড কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল শাহজাহানের। কক্ষের বাইরে এলেন তিনি। দ্বারের সম্মুখেই তাঁর দেহরক্ষীদের অধিনায়ক নিয়াজ খাঁ দণ্ডায়মান ছিল।

সম্রাট ক্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এত কোলাহল কিসের নিয়াজ?

কুর্নিশ করে নতমস্তকে নিয়াজ বলল, আলিজা, পাদশাহ বেগম অগ্নিদগ্ধা হয়েছেন।

—কি বললে, জেহান অগ্নিদগ্ধা হয়েছে?

আর সেইখানে অপেক্ষা করলেন না প্রৌঢ় সম্রাট। উন্মাদের মত ছুটে চললেন প্রিয় কন্যার কাছে। জাহান আরাকে তখন তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর কক্ষে।

এই মর্মন্তুদ সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র আগ্রায়। প্রখ্যাত চিকিৎসকবর্গ জাহান আরার ভার গ্রহণ করলেন। শাহজাহান তাঁদের জন্য ধনাগার উন্মুক্ত করে দিলেন। সমস্ত খাক—তিনি শুধু প্রিয়তমা কন্যার প্রাণ ফিরে পেতে চান। তাঁর এই সুলক্ষণা কন্যাকে কখনই হারাতে প্রস্তুত নন সম্রাট।

এখন বারংবার মনে পড়ছে সেইদিনের কথা, শাহজাহানের তখন পরিপূর্ণ যৌবন। অবশ্য সিংহাসনের অধিকারী তখন তিনি নন। জাহাঙ্গীর শাসিত। মোগল সাম্রাজ্যের পশ্চিম-প্রান্তে তখন বিশৃংখলা চলেছে। উদয়পুরের রাণাকে কোনক্রমেই দমন করা যাচ্ছে না। বরং তিনিই মোগল পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। চিন্তিত জাহাঙ্গীর শেষে পুত্র খুরামকে প্রেরণ করলেন অমর সিংহকে পরাস্ত করবার জন্য। সসৈন্যে খুরাম ধাবিত হলেন। আজমীরে মোগলরা সম্মুখীন হল রাজপুতদের। প্রবল যুদ্ধ হল। কিন্তু সেদিন জয়পরাজয়ের কোন নিষ্পত্তিই হল না। রণক্লান্ত খুরাম শিবিরে ফিরে এলেন।

পূর্ণগর্ভা মমতাজও সঙ্গে এসেছেন। নিজের শোচনীয় শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর সঙ্গ ছাড়েন নি। ক্লান্ত স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন মমতাজ। খুরামের মাথার উপর থেকে শিরস্ত্রাণ তুলে নিলেন।

খুরাম তাঁর হাত চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তুমি নিজের এই শরীর নিয়ে বিছানা থেকে কেন উঠে এলে বানু?

—আমি আজ ভালই আছি। অল্প হেসে মমতাজ বললেন, আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, যুদ্ধের কি হল?

—যুদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের জয়লাভ অসম্ভব।

—সেকি হজরৎ!

খুরাম মমতাজকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, আজ আট হাজার মোগল সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। বাকীদের মনোবলও ভেঙে পড়েছে। আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি বানু। পরাজিত হবার পূর্বে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চাই।

মমতাজ অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন, এই বিপদের মুখে আপনাকে একা ফেলে আমি কিভাবে যাব হজরৎ।

—অবুঝ হয়ো না। এই পরিস্থিতিতে তোমাকে আর এখানে রাখা চলে না। ভোরে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে তুমি আগ্রার পথে যাত্রা করবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি।

বিপন্ন মমতাজ আর কিছু বলতে পারলেন না। স্বামীর বুকে মুখ রেখে নিশ্চুপ রইলেন।

কিন্তু খুরামের এই পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিতে পারল না। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর থেকে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন মমতাজ। সারা দিনের পরিশ্রান্ত খুরাম, পত্নী অসুস্থা হয়ে পড়ায় একরকম বিনিদ্রই কাটিয়ে দিলেন রাত্রি। ভোর হল। সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল চতুর্দিক।

—জনাব—

যুদ্ধ ও পত্নী সম্বন্ধে চিন্তিত, পদচারণারত খুরাম মুখ তুললেন। সামনেই ব্যগ্র দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিলির খাঁ।

—কি সংবাদ খাঁ সাহেব?

—সকলে প্রস্তুত জনাব। আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি।

মমতাজকে ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আজ আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় নেই। কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা সমস্ত কিছুকে বলিদান দিতেই হয়।

তিনি বললেন, তুমি যাও। প্রস্তুত হয়ে আমি আসছি।

দিলির খাঁ প্রস্থান করবার পর খুরাম পত্নীর নিকটে গেলেন। মমতাজ তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। পরিচারিকারা তাঁর যন্ত্রণা উপশমের সাধ্যমত চেষ্টা করছে। বিমর্ষ-চিত্তে তিনি শিবির পরিত্যাগ করলেন। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধে। প্রবল বিক্রমে রাজপুতরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মোগলদের উপর। সারাটা দিন মৃত্যু মহোৎসব চলল। বিস্ময়ের বিষয় হীনবল মোগলেরা অমিততেজে রাজপুতদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল।

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, মোগলদের, তখন জয়সূর্য উদিত হল। রণক্ষেত্রে উড্ডীন হল মোগল পতাকা। অমর সিংহ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন। অবিশ্বাস্য ঘটনায় স্তম্ভিত খুরামের

মনে এখন আনন্দের সাড়া জাগছে না। তাঁর মন পড়ে রয়েছে শিবিরে —যেখানে যন্ত্রণাকাতর মমতাজ রয়েছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবেগে শিবিরের দিকে রওয়ানা হলেন। শিবিরের সম্মুখেই একটি পরিচারিকা দণ্ডায়মান ছিল। অভিবাদন কুর্নিশ করে সে বলল, শুভ-সংবাদ জনাব। বেগাম সাহেবা কন্যার জননী হয়েছেন।

উৎফুল্ল খুরাম বললেন, বানুর সম্বন্ধে তো কিছু বলছো না। তার শরীর কেমন?

—ভাল আছেন তিনি।

নিজের হাত থেকে বহুমূল্য আংটি খুলে পরিচারিকার হাতে দিয়ে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন খুরাম। সহাস্যে মমতাজ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের পাশে শায়িত শিশুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, সংবাদ পেয়েছি জয়লাভ করেছেন, এই গোলাপটি আপনাকে উপহার দিলাম।

—ধন্যবাদ বানু। এর জন্য কখন হয়েছে?

—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পরই।

—আমার সৌভাগ্য। দুহাত দিয়ে কন্যাকে তুলে নিয়ে খুরাম বললেন, আল্লার অপার মহিমা বানু। কন্যার ছদ্মবেশে আমার সৌভাগ্যকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য হওয়ার দরুণই নিশ্চিত পরাজয়ের হাত এড়িয়ে আমরা জয়লাভ করেছি।

এরপরের ইতিহাস, সর্বক্ষেত্রে খুরামের জয়লাভের ইতিহাস। তাই সুলক্ষণা জাহান আরাকে এত অধিক তিনি স্নেহ করেন।

একমাস অতিক্রম করেছে।

জাহান আরা এখনও নিরাময় হন নি। বরং তাঁর দেহের অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। চিকিৎসকরা বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছেন না। কন্যার এই অসুস্থতার দরুণ শাহজাহান দরবারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। দিবারাত্রি কন্যার কক্ষে অবস্থান করছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোদার কাছে প্রার্থনা করছেন। তারপর এক হাজার মুদ্রা জাহান আবার উপাধানের তলায় রেখে দিচ্ছেন। সেই মুদ্রা প্রতিদিন দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধ নসিকা মারা গেছে।

এইভাবে যখন সময় কাটছিল তখন একদিন প্রাতে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ম্রিয়মাণ মুখে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। সম্রাট তখন একাগ্র দৃষ্টিতে জাহান আরার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

—পিতা—

—কে, দারা? কিছু বলতে চাও?

—দীর্ঘদিন হল আপনি দরবারে যান নি পিতা। চতুর্দিকে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।

অসহায় দৃষ্টিতে শাহজাহান দারার দিকে তাকিয়ে বললেন, জাহানকে এই অবস্থায় ফেলে আমি কি ভাবে দরবারে যেতে পারি?

—কিন্তু পিতা—

—শোনি দারা, মোগল রাজ পরিবারের প্রথানুসারে আমার পরই সিংহাসনে অধিকার তোমার। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে এখনও তুমি রাজকার্য পরিচালনা করতে পার।

সম্রাটের কথায় দারা অত্যন্ত পুলকিত হলেন। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে একবার কায়েমি হয়ে বসলে আওরঙ্গজেবের সাধ্য কি তাঁকে টলাতে পারে।

সম্রাট আবার বললেন, আরেকটা কথা, অবিলম্বে শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে জাহানের অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ কর। যাও—

দ্বারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন দারা। সসঙ্কোচে বললেন, পিতা—

—বল।

—আপনার প্রদত্ত সমস্ত আদেশ আওরঙ্গজেব উপেক্ষা করেছে সংবাদ পেয়েছি।

গম্ভীর কণ্ঠে শাহজাহান বললেন, তার ঔদ্ধত্য ক্রমেই গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে। জাহান সুস্থ হয়ে উঠবার পরই আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন দারা। জাহান আরার অসুস্থতার সংবাদ বাংলা ও গুজরাটে শুজা এবং মুরাদের নিকট প্রেরিত হল। দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকারী আওরঙ্গজেবকে এ সম্পর্কে কোন সংবাদই দেওয়া হল না। কাজেই শুজা ও মুরাদ রাজধানীতে এসে উপস্থিত হবার পরও আওরঙ্গজেব এলেন না। এই সম্পর্কে সম্রাটকে সচেতন করলেন দারা। আওরঙ্গজেবের অনুপস্থিতি যে সম্রাটের আদেশকে আরেক দফা উপেক্ষা প্রদর্শন, একথা তিনি সালংকারে বর্ণনা করলেন।

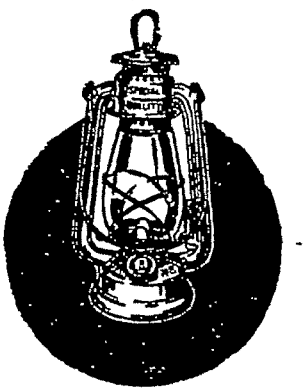

কিন্তু লোক পরম্পরায় জাহান আরার অসুস্থতার সংবাদ ক্রমশ জ্ঞাত হলেন আওরঙ্গজেব। অবিলম্বে তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে আগ্রায় উপনীত হলেন। দীর্ঘ পথের ক্লেশকে উপেক্ষা করে বিশ্রাম না করে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে দেখবার জন্য তাঁর মহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেন না। দ্বাররক্ষক খোজারা তাঁর পথ রোধ করল। তাদের মধ্যে একজন নত-মস্তকে বলল, আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা সম্রাটের আদেশ পালন করছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর গৌরবর্ণ ললাটের উপর কুটিল ভ্রূকুটি দেখা দিল। তিনি অনুমান করে নিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত গড়ে উঠেছে।

সেখানে আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি জেনানা মহল থেকে সোজা চলে গেলেন মুরাদের প্রাসাদে। মুরাদ তখন মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে পাত্রের পর পাত্র সরাব উজাড় করে চলেছেন। রক্তাভ চোখে আওরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে মুরাদ বললেন, দাক্ষিণাত্য থেকে কবে এলেন?

আওরঙ্গজেব জাজিমের উপর সরে বসতে বললেন, আজই।

মুরাদ তাঁর এই বড় ভাইটিকে শ্রদ্ধা এবং ভয় দুই করতেন। তাঁর ধারণা ছিল আওরঙ্গজেব তাঁর একজন পৃষ্ঠপোষক।

—আপনাকে একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছে?

—হুঁ। পাদশাহ বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর মহলে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। শুনলাম সম্রাটের নাকি আদেশ নেই।

—ষড়যন্ত্র। আরেক পাত্র সরাব গলায় ঢেলে দিয়ে মুরাদ বললেন, সম্রাটের প্রিয়পাত্র, আমাদের বড় ভাই দারার ষড়যন্ত্র এই সমস্ত। তারই জন্য আমাকে মরুভূমির রাজ্য গুজরাটে পড়ে থাকতে হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আওরঙ্গজেব বললেন, তুমি কি ভাব আমার এ সম্বন্ধে অজ্ঞতা রয়েছে? ও নয় মুরাদ, আমি সব বুঝি। দারার সঙ্গে বোঝাপড়া আমার একদিন হবেই। কিন্তু উপস্থিত সম্রাটের সঙ্গে যে আমার একবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হয়। তিনি পাদশাহ বেগমের মহল থেকে মোটেই বেরুচ্ছেন না। নইলে—

—আজ কি বার? জুম্মা না। সপ্তাহের এই দিনটি সম্রাট বৈকালিক নামাজের পর তাজমহলে যান। আপনি সেই সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

মৃদু হেসে আওরঙ্গজেব মুরাদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন।

বৈকালিক নামাজ বহুক্ষণ আগেই শেষ করেছেন শাহজাহান। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল দর্শন করে ফিরে চলেছেন প্রাসাদে। জাহান আরা অসুস্থ হয়ে পড়বার পর তাঁর কোন কাজই সঠিক নিয়মে চলছে না। শুধু এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম—প্রত্যেক জুম্মায় আগে-কার মত এখনও ঠিক তাজমহলে যাচ্ছেন। অবশ্য এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

চিন্তিত মনে অশ্বারোহণে প্রাসাদে ফিরে চলেছেন সম্রাট। তাঁর সঙ্গে দারা ও এক সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন। দেহরক্ষীরা তো আছেই। এখনও জাহান আরার রোগ নিরাময় হবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নি। পারস্য থেকে পারস্য-সম্রাটের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আগ্রায় এসে-ছিলেন। তাঁকে দিয়েও চিকিৎসা করান হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় শাহজাহান তাই সর্বদা বিশেষ চিন্তিত।

এই সময় আওরঙ্গজেব সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁকে দেখে সম্রাট ভ্রূকুঞ্চিত করেছেন। আওরঙ্গজেব পিতাকে সম্মান প্রদর্শন করবার পর বললেন, আমাকে পাদশাহ বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় নি পিতা। আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি।

—নিজের মান-অপমান সম্বন্ধে যে তুমি অত্যন্ত সচেতন তা আমি জানি। ওই সঙ্গে এও জানি, নিজের গুরুজন-স্থানীয়দের অপমান করতে তুমি পেছপা নও।

—আমি কোন গুরুজনকে অপ-মানিত করি নি পিতা।

অশ্বের লাগাম দৃঢ়হস্তে চেপে ধরে সম্রাট বললেন, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেক না। তোমার পিতা ভারত সম্রাট শাহজাহানের একাধিক আজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তুমি তাঁকেই অপমানিত করেছ।

নীরব রইলেন আওরঙ্গজেব।

—নীরব রইলে কেন? যাক, ওকথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আজ কয়েকমাস ধরে জাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সংবাদ পেয়েও তুমি এতদিন তাকে দেখতে আস নি। এখন এসেছ দায়সারাভাবে কর্তব্য শেষ করতে?

—পাদশাহ বেগম অসুস্থ একথা আমি জানতাম না। আমাকে কোন সংবাদ প্রেরণ করা হয় নি।

—মিথ্যা কথা। দারা তোমাকে সংবাদ পাঠিয়েছে।

দৃঢ়তার সঙ্গে আওরঙ্গজেব বললেন, মিথ্যা কথা আমি বলছি না পিতা। যাকে আপনি সংবাদ প্রেরণ করতে বলেছিলেন, সেই আপনাকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে।

—স্তব্ধ হও কুক্কুর। দারা নিকটেই ছিলেন। ঝলসে উঠলেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যে ভদ্রতার মুখোস ছিঁড়ে পড়ল। কুক্কুর সম্বোধনে আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

—সংযত ভাষায় কথা বল নইলে---

—নইলে তুমি কি করবে? আমি আবার বলছি তুমি দাক্ষিণাত্যের ক্ষিপ্ত কুক্কুর—দারার কথা শেষ হবার

সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আওরঙ্গজেব। সেই মুহূর্তে একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যেতে পারত; কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত নিয়াজ খাঁ আওরঙ্গজেবের তরবারিকে প্রতিহত করে দারার জীবন রক্ষা করল।

আচম্বিতে এই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শাহজাহান। বিস্ময় কিছুক্ষণ তাঁকে বাকরোধ করে রাখে, তারপর তিনি বললেন, আমার সম্মুখে তরবারি খাপ মুক্ত করা গুরুতর অপরাধ নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই। সেই অপরাধের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তোমার প্রতি আমি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করলাম, মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ থেকে বিচ্যুত করা হল।

কঠিন মুখে নিজের শাস্তি বাক্য বরণ করলেন আওরঙ্গজেব। একটি কথাও বললেন না। নিজের কথা শেষ করে শাহজাহান অগ্রসর হলেন।

এই ঘটনার পক্ষ মাস দেড়েক অতিক্রান্ত হয়েছে।

অপমানিত, অবহেলিত আওরঙ্গজেব আগ্রাতেই আছেন। এদিকে জাহান আরার অবস্থার অবনতি ঘটেছে আরো। তাঁকে বোধহয় সত্যই বাঁচান যাবে না। রাজধানীতে বিষাদের ছায়া। নামাজ শেষ করে নিজের প্রাসাদের একটি কক্ষে অন্যমনস্ক-ভাবে বসেছিলেন আওরঙ্গজেব। এই সময় কক্ষে প্রবেশ করল আরিফ খাঁ। উন্নত বক্ষ, দীর্ঘকায়, রূপবান যুবা। আরিফকে কয়েক বছর পূর্বে সম্রাট ক্রীতদাস হিসেবে ক্রয় করেছিলেন এবং প্রদান করেছিলেন আওরঙ্গজেবকে। সেই থেকে সে আওরঙ্গজেবের কাছেই আছে। বিশ্বস্ততা ও কর্মকুশলতায় তাঁর মন জয় করেছে।

অন্যান্য কথাবার্তার পর আওরঙ্গজেব আরিফকে প্রশ্ন করলেন, পাদশাহ বেগমের অবস্থা এখন কেমন, কিছু জান?

—তাঁর অবস্থা ভাল নয় শাহজাদা।

—এত চিকিৎসার পরও যে তিনি কেন নিরাময় হচ্ছেন না, বিস্ময়ের বিষয়।

—আমি বোধহয় তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারি।

—তুমি! বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন আওরঙ্গজেব।—বিখ্যাত চিকিৎসকরা এত পরিশ্রম করে যা করতে পারছেন না, তা তুমি কিভাবে পারবে আরিফ?

—আমাদের দেশীয় একটি প্রলেপের কথা আমার জানা আছে শাহজাদা। সেই প্রলেপ বেগম সাহেবার ক্ষত নিশ্চয়ই শুকিয়ে দেবে।

—এতদিন একথা বল নি কেন?

—ভয় ছিল আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না মেহেরবান।

ক্ষণেক চিন্তা করলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যদি আরিফ পাদশাহ বেগমকে সুস্থ করে তুলতে পারে তাহলে---

তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি পত্র লিখে দিচ্ছি, মুরাদের কাছে যাও। সে তোমাকে জেনানা মহলে নিয়ে যাবে। মনে রেখো, যদি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সুস্থ করে তুলতে পার; আমি তোমাকে সোনায় মুড়ে দেব।

—আল্লা আপনাকে দীর্ঘ আয়ু দিন।

আরিফ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। আওরঙ্গজেব পত্র রচনায় ব্যস্ত হলেন।

পত্র নিয়ে আরিফ তখনই রওয়ানা হল মুরাদের নিকট। মুরাদ তাকে নিয়ে গেলেন জেনানা মহলে। সমস্ত শুনে সম্রাট সাগ্রহে আরিফকে চিকিৎসা করবার জন্য আদেশ দিলেন। এখন তাঁর অবস্থা অতল জলে নিমজ্জিত মানুষের মত। খড়-কুটো যা হাতের কাছে পাচ্ছেন, তাকেই অবলম্বন করতে চাইছেন তিনি।

একান্ত নিরাময় জাহান আরার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করল আরিফ। দশদিনের মধ্যেই ফলাফল বুঝতে পারা গেল। জ্বর সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে, ক্ষত ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। শুধু সম্রাট নন, সমস্ত আগ্রাবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বিখ্যাত চিকিৎসকবর্গ যা করতে পারেন নি সামান্য ক্রীতদাস সেই অসাধ্য সাধন করেছে।

এই সমস্ত ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ অবশ্য জাহান আরা জানেন না। কি করেই বা জানবেন, অসুস্থতার দরুণ প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই এতদিন তাঁর কেটেছে। আজ নিজেকে বেশ সুস্থ বোধ করছেন। একটু বেলাতেই ঘুম ভেঙেছে তাঁর। চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন বিছানায় এতক্ষণ। এবার চোখ মেলতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল পরিচারিকা মরিয়ামের সুন্দর মুখের উপর। সে তাজা ফল কেটে পাত্রের উপর রাখছিল। তখন কক্ষে আর কেউ ছিল না। কন্যার সুস্থতা লক্ষ্য করে সম্রাট বহুদিন পরে নিজের কক্ষে বিশ্রামের জন্য গেছেন।

জাহান আরা চোখ মেলেছেন লক্ষ্য করেই মরিয়াম নিজের হাতের কাজ ফেলে তাঁর নিকটে এগিয়ে গেল। বলল, কেমন আছেন পাদশাহ বেগম?

—ভাল। আমাকে সাহায্য কর। আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাই।

জাহান আরা বিছানার উপর উঠে বসলেন। পালঙ্ক থেকে নিজের দুটি পা নামিয়ে দিয়ে মরিয়ামকে অবলম্বন করে দাঁড়াতে যাবেন—ঠিক সেই সময় কে বলে উঠল, বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। শরীর বেশি নাড়া-চাড়া এখন ঠিক নয়।

জাহান আরা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে একজন রূপবান যুবক। তার হাতে কিছু ঔষধপত্র। তিনি বিস্মিত হয়ে মরিয়ামের দিকে তাকালেন, মরিয়াম

তখন মেহময় দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে। ঔষধপত্র তার হাতে দিয়ে যুবক জাহান আরাকে সম্মান জানাল, তারপর নিষ্ক্রান্ত হল কক্ষ থেকে।

সাগ্রহে জাহান আরা প্রশ্ন করলেন, মরিয়াম, কে এই যুবক?

সসম্ভ্রমে মরিয়াম উত্তর দিল, আপনার জীবনদাতা সাহেবা।

—আমার জীবনদাতা!

এরপর সমস্ত ঘটনা পুঙখানুপুঙখভাবে শুনলেন তিনি মরিয়ামের মুখ থেকে। এই ক্রীতদাস যুবকের অসাধ্য সাধনে তিনি বিস্মিত হলেন।

মাসদেড়েক কেটেছে এরপর। সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেছেন জাহান আরা। সম্রাট এই উপলক্ষে ভোজ ও উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। বিরাট মোগল পরিবারের সর্বজনসমক্ষে কন্যাকে তিনি দশলক্ষ মোহর উপহার দিলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, এবার তুমি নিজের মুখে আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নাও জাহান।

—আপনি আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়েছেন পিতা। আবার---

—তা হোক। তুমি বল?

সুস্থ হয়ে উঠবার পর আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। তিনি শুনেছিলেন সম্রাট কর্তৃক আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ থেকে চ্যুত হয়েছেন। নিজের কনিষ্ঠদের তিনি ভালবাসেন। তাছাড়া এই যুদ্ধে যদি ভ্রাতৃবিরোধ জটিল আকার ধারণ করে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হবে।

তিনি বললেন, আপনি আমার একটি অনুরোধ পূর্ণ করুন। এছাড়া আর কিছু চাইবার নেই।

—বল, জাহান?

—আপনি আওরঙ্গজেবকে আবার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করুন পিতা।

জাহান আরার এই কথায় সমস্ত আত্মীয়-পরিজনরা বিস্মিত হলেন। দারার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সম্রাটের মুখের উপর বিরক্তির ছায়া নামল। তিনি বললেন, আমি তোমার অন্য যে কোন অনুরোধ নিশ্চয়ই রাখব জাহান।

—আমার এই অনুরোধ আপনি কেন রাখবেন না পিতা?

—আওরঙ্গজেবের ঔদ্ধত্যের কথা তুমি জান না। ওর শাস্তি ভোগ করাই এখন উচিত। ও শ্বেত সর্প।

—আপনার কোন্ পুত্র উদ্ধত নয়? বর্তমানে ও প্রশ্ন নিরর্থক পিতা। আমার জীবন ফিরে পাবার জন্য আপনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। জলের মত অর্থ ব্যয় করছিলেন। কিন্তু কেউ আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারে নি। বিস্মৃত হবেন না, শেষে আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচর আরিফ খাঁ আমাকে জীবনদান করেছে। কাজেই শাহজাদার প্রতি আমার এবং আপনার কৃতজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই ভাষায় সম্রাটকে অন্য কেউ কিছু বললে অনর্থ ঘটে যেত। কিন্তু জাহান আরার কথা স্বতন্ত্র। শাহজাহান ক্ষণেক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা তখন তাই হোক। এই মুহূর্ত থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।

জাহান আরা আনন্দিত হলেন। বলা বাহুল্য, আওরঙ্গজেব আনন্দিত হলেন। কিন্তু দারা---

খাওয়া দাওয়া শেষ হল ক্রমে। এবার আরম্ভ হবে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আগ্রার সুবিখ্যাত বাইজী সাকিলা খানামও এসেছে। সেই প্রথমে অনুষ্ঠানের সূচনা করবে। জাহান আরা উৎসব ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। ক্লান্ত বোধ করছিলেন। শরীরে এখনও তেমন বল সঞ্চয় হয় নি।

উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল উদ্যানে। উদ্যান অতিক্রম করে জাহান আরা প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সম্পূর্ণ একা তিনি নিজের মহলে ফিরে চলেছেন। মরিয়াম সঙ্গে নেই। অন্যান্য পরিচারিকাদেরও আজ তিনি ছুটি দিয়েছেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন মাত্র, দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। বুকে হাত বেঁধে গম্ভীর মুখে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জাহান আরা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দারা?

—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—কিছু বলবে?

—আমি ভাবতে পারি নি আপনি এইভাবে আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করবেন?

—প্রয়োজন হলে আমি তোমাকেও সমর্থন করব। ভুলে যেও না আমি তোমাদের বড় বোন।

দৃঢ়কণ্ঠে দারা বললেন, আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করে আপনি ভাল কাজ করেন নি। সে পিতার সমস্ত আদেশকে উপেক্ষা করেছে। সে সাম্রাজ্যের মধ্যে অশান্তি ছড়াবার চেষ্টা করছে।

জাহান আবার কণ্ঠেও দৃঢ়তা প্রকাশ পেল, উচিত বিবেচনা করেই যা করবার করেছি। তোমার আর কিছু বলবার নেই নিশ্চয়ই?

—আছে। আপনি তাকে কেন সমর্থন করলেন তার গূঢ় রহস্যটা জানা আছে আমার।

—রহস্য! কি বলতে চাও তুমি?

ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে দারা বললেন, আপনাকে সুস্থ করে তুলেছে আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচর। কাজেই ওর পক্ষ অবলম্বন আপনি করবেনই। তাছাড়া আমার অজানা নয় যে, আপনার জীবনদাতা যুবক এবং রূপবান।

—স্তব্ধ হও। বাঘিনীর মত গর্জে উঠলেন জাহান আরা।—বয়ঃজ্যেষ্ঠার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সে শিক্ষা আজও তোমার হয় নি। এত সাহস। কদর্য ইঙ্গিত করছ আমার সম্পর্কে?

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই জাহান আরা নিজের গতি মন্থর করলেন। কেউ কোথাও নেই। উৎসবে মেতে আছে সকলে। মন থেকে রাগ ক্রমেই মুছে যাচ্ছে আর সেই স্থান অধিকার করছে একরাশ চিন্তা। দারা যে ইঙ্গিত দিল, সত্যই সেই কারণে আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করেছেন তিনি? নিজের মনের গহনে নেমে গেলেন জাহান আরা। মানসপটে ভেসে উঠল আরিফের সুন্দর কান্তি। এক অজানা কারণেই মনের মধ্যটা হু-হু করে উঠল বর্ষীয়ান কুমারীর।

আরিফকে আশাতীতভাবে সম্রাট পুরস্কৃত করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি—তিনি তাঁর জীবনদাতাকে সাধারণ ভদ্রতা হিসেবে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানান নি! লজ্জিতা হলেন জাহান আরা। আরিফকে একান্তে ডেকে দু'চার কথা বলার তীব্র তাগিদ অনুভব করলেন। মনস্থির করলেন তৎক্ষণাৎ। নিজের মহলে ফিরে গিয়ে মরিয়মকে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন আরিফকে। তারপর—

তিনি আবার দ্রুত এগিয়ে চললেন। তাঁর সুন্দর মুখের উপর অল্প একটু হাসি খেলা করছে তখন। তসবির মহল অতিক্রম করে তিনি অলিন্দে এলেন। আজ অলিন্দ একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলোর জেল্লা তেমন নেই। উৎসবের আনন্দে সমস্ত পরিচারকরা মেতে থাকায় এই অবহেলা। জাহান আরা অলিন্দের বাঁক অতিক্রম করলেন। কয়েক মাস পূর্বে এখানেই তিনি অগ্নিদগ্ধা হয়েছিলেন।

কিন্তু ওকি - - - কারা দুজন ওখানে দাঁড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। তিনি আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। শুনতে পেলেন, নারী-কণ্ঠে একজন বলছে, আঃ ছাড়, এখুনি কেউ এসে পড়বে—

মৃদু হেসে পুরুষ বলল, কেউ এদিকে আসবে না। সকলে এখন উৎসবে মত্ত।

হাল্কা আলোর মধ্যেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন—মরিয়ম ও আরিফকে। নিজেদের নিয়ে তন্ময় দুই নরনারী। ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। বুভুক্ষুর মত প্রণয়ী-যুগলকে লক্ষ্য করলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চাষতাই কুমারী জাহান আরা আবার ফিরে চললেন উৎসব প্রাঙ্গণে।


মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—
কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র
সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার
সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

# বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—
অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা, উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# কবিতা

## শেক্সপীয়র স্মরণে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

রোমাঞ্চিত স্তব্ধতার গভীরে তোমার অনুভব
সূক্ষ্মতম প্রজ্ঞাদৃষ্টি সংলাপে সংকেতে স্বাধিকারে
প্রতিষ্ঠিত করে গেছ। রাজন্যের ঈশ্বরের স্তব
তোমার সৃষ্টির মঞ্চে কম্পমান বিদ্রূপ ঝঙ্কারে।
নিগূঢ় প্রাণের স্পর্শে প্রতীকে আপাত-অবান্তর
কাব্যনাট্য সুভাষিত ব্যঞ্জনায় বিস্ময় সম্ভারে
বিমুগ্ধ করেছে চিত্ত। পার হ'য়ে দুস্পার অর্ণব
দীর্ঘ যুগযুগান্তের, দীপ্ত হলে বিশ্বদীপাধারে।

সেক্সপীয়র! নাম নয়, ভাবগর্ভ সৃষ্টির স্মারক
লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রমূর্ত শিল্পিত ইতিহাস,
লঘুরুচিপ্রিয়তার ক্ষমহীন রুচিসংহারক
বলিষ্ঠ দুর্জয় নাম বহুদশী প্রজ্ঞার আশ্বাস।
তুমি কবি লোকোত্তর সংস্কৃতির অচ্যুত সম্মান
মানবিক চেতনায় উদ্বেলিত সমুদ্র মহান।

## 'দি প্যাশনেট পিলগ্রিম'

শেক্সপীয়র

তবুও সৌন্দর্য বড় অভিমানী, অনিশ্চিত শুভ,
সহসা বিবর্ণ তার খর দীপ্তি, বাহ্য শোভা ম্লান;
যেন ফুল হতে গিয়ে প্রথম মুকুলে মৃত ধ্রুব;
ভঙ্গুর কাচের মতো আচমকা সে ভেঙে খান খান,
অনিশ্চিত শুভ, বাহ্য শোভা, কাচ, ফুল সকলেই
বিবর্ণ, ভঙ্গুর, ক্ষত, মৃত হয় এক নিমেষেই।

যেমন হারানো দ্রব্য লোকচক্ষু হতে লুক্কায়িত
যেমন বিবর্ণ শোভা ফেরে নাক' ঘষায় মাজায়,
যেমন সে-মৃত ফুল শুষ্ক আর ধূলায় লুণ্ঠিত,
যেমন লাগে না জোড়া ভাঙা কাচে যোগ-প্রক্রিয়ায়,
তেমনি সৌন্দর্য হয় কলঙ্কিত যদি একবার
ঔষধে, বর্ণনে, দণ্ডে, কোনো মূল্যে সে
ফেরে না আর।

অনুবাদ: বৈশম্পায়ন

## আমার প্রিয়ার চোখ

শেক্সপীয়র

আমার প্রিয়ার চোখ মোটেই সূর্যের মতো নয়;
পলা চের লাল তার লাল অধরের তুলনায়;
তুষার সফেদ যদি, কেন মেটে তার স্তনদ্বয়;
চুল যদি তার, তবে কালো তার মাথায় জন্মায়।
দেখেছি গোলাপ আমি বুটি-তোলা, রক্ত ও ধবল;
দেখি না চিবুকে তার আমি কোনো তেমন গোলাপ;
এবং সৌরভে কোনো আছে বেশী আনন্দ উচ্ছল
সেই নিঃশ্বাসের চেয়ে যা প্রেয়সী থেকে ছাড়ে তাপ।

ভালোবাসি শুনতে তার কথা, তবু বেশ মনে জানি
সংগীতে যে সুর আছে তা অনেক বেশী তৃপ্তিকর;
দেখি নি কখনো কোনো দেবী চলে যেতে
আমি মানি,
যখন আমারি প্রিয়া চলে, হাঁটে মাটির উপর:
এবং, ঈশ্বর সাক্ষী, তবু ভাবি প্রিয়া তারি মতো
অসামান্যা যাকে মিথ্যা করে মিথ্যা উপমায় যত।

অনুবাদ: সুশীলকুমার গুপ্ত

## স্মৃতি

শেক্সপীয়র

এখন শুধুই নীরব মিষ্টি ভাবনা পর্ব
এখনো আমার পুরোনো স্মৃতিরে যাচাতে যাই
অনেক হারাই দীর্ঘশ্বাসেই, তবুও সর্ব-
পুরোনো দুখেতে শুধুই নতুন হতাশা পাই।

ডুব দিতে চায় আমার আঁখি কি, বৃথাই বুঝি,
রাত্রি-গভীরে সব বন্ধুরা ডুবেছে যেথা,
নতুন অশ্রুপ্রবাহে-পুরোনো দুখের খুঁজি
হারানো দিঠির বদলে শুধু জমে থাকে ব্যথা।

তা হলে কি শুধু অভিযোগে পুরে আমার দুখ
পুরোনো ব্যথার গভীর হতেও বেদনা গড়ে?
ইতিহাসে রচি ভাঙা হৃদয়ের ভগ্ন-বুক
আমি দিই শুধু মূল্য কি তার নতুন করে?

কিন্তু, যখন তোমাকেই ভাবি বন্ধু, প্রিয়
সব ফিরে পাই, দুখ-শেষ হয় কি রমণীয়!

অনুবাদ: শ্যাম রায়

॥ দুই ॥

হাসিটা উঠে এল যেন চারদিকের পৃথিবী থেকে। যেন বয়ে এল দূরের পাহাড় থেকে, ছোট ছোট লাল মাটির ঢিবিতে ছাওয়া মাঠ থেকে, সকালের এই আলো থেকে, এখানে বসে যে ছোট নীল নদীটাকে দেখা যায় না—তা থেকে, আর পাপড়ি ঝরো ঝরো এই কৃষ্ণচূড়ার বন থেকে। কিরণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকালের এই মাঠকে যতখানি নির্জন মনে হয়েছিল, দেখা গেল তা নয়। খানিক দূরেই একটি ছোট্ট খাটো দল—দুটি ফ্রকপরা ছোট মেয়ে, ক্যামেরা কাঁধে পনেরো-ষোলো বছরের একটি কিশোর এবং দীর্ঘাঙ্গী একটি ভদ্রমহিলা। হাসিটা সেখান থেকেই আসছে এবং কুকুরটা ডায়েরীখানা মুখে নিয়ে এরই মধ্যে তাঁদের কাছে পৌঁছে গেছে।

প্রায় মিনিটখানেক কিরণ সেদিকে চেয়ে রইল—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন অবাস্তব বোধ হল তার। তারপর ডায়েরীটা উদ্ধার করবার জন্যে ধীরে ধীরে সামনের দিকে পা বাড়াল।

ওঁরাও এগিয়ে আসছিলেন। ছেলেমেয়েদের হাসি তখনো বন্ধ হয় নি, ভদ্রমহিলা তাদের ধমক দিলেন একটা। দুজন থামল, কিন্তু বছর দশেকের সব চাইতে ছোট মেয়েটির হাসি ঠেকানো গেল না। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, কেকা, খুব অসভ্যতা হচ্ছে কিন্তু!

কিরণ সামনে এসে পড়েছিল। বললে, মিথ্যেই রাগ করছেন ওর ওপরে। ব্যাপারটা দেখে আমারই হাসি পাচ্ছে—ঠিক এই রকম জায়গায় এমন একটি চোরের আশঙ্কা মনেও ছিল না। এখন দয়া করে যদি ডায়েরীটা ফেরৎ দেন—

কুকুরের মুখ থেকে ভদ্রমহিলা এর আগেই ডায়েরীখানা উদ্ধার করেছিলেন। কিরণের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, সব সময় এদিক-ওদিক থেকে

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

# কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

এটা-ওটা কুড়িয়ে এনে কুকুরটার এমনি বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে, যে শেষে আমাদের পর্যন্ত চোর বানিয়ে ছাড়ল!

ছোট মেয়েটি বললে, পরশু আবার কোত্থেকে একটা ছেঁড়া জুতো মুখে করে এনে বাবার ইজি-চেয়ারের ওপর রেখে দিয়েছিল। বাবা দারুণ চটে গিয়ে—

সবাই হেসে উঠল আবার, কিরণও বাদ গেল না। আসামী কুকুরটা কী ভেবে খুশি হয়ে খানিকক্ষণ ল্যাজ নাড়ল, তারপর কিরণের গা শোঁকবার জন্যে এগিয়ে এল।

কিরণ চমকে তিন পা পিছিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

কিশোর ছেলেটি অভয় দিয়ে বললে, ও কাউকে কামড়ায় না।

—কামড়াবার কথা ভাবছি না, কিন্তু পকেট মারতে পারে তো?

আরো একবার হাসির ঢেউ ভাঙল। ছেলেটি কুকুরটাকে ছোট্ট একটা চড় কষিয়ে বললে, এই ডগলাস—শুনছিস? তোর জন্যে আমাদের কী দারুণ বদনাম হয়ে যাচ্ছে?

—ওর নাম ডগলাস নাকি?

মেয়েদের ভেতরে—বড়োটি জবাব দিলে, বাবা নাম দিয়েছেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্। কুকুরকে অত বড়ো নামে ডাকা যায় নাকি? আমরা তাই ছোট করে বলি—ডগলাস।

কিরণ বললে, কিন্তু নামটা সার্থক। থিফ্ অব বাগদাদ মনে পড়িয়ে দেয়।

ছেলেমেয়েরা রসিকতাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু ভদ্রমহিলা মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনাকে অনর্থক ডিসটার্ব করা হল—কিছু মনে করবেন না। আর পারেন তো অবোলা জীব কুকুরটাকে ক্ষমা করবেন।

—কুকুর অবোলা জীব?—কিরণ হাসল: বলেন কি। আমাদের পাড়ার কুকুরগুলোর চিৎকারে তো রাতে ঘুমুনো যায় না। তা ছাড়া ডগলাসের ওপর রাগই বা করব কেন, ওই তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

ভদ্রমহিলা বললেন, আলাপ আর কোথায় হল, আপনি আমাদের চেনেন না। আর আপনিও তো এখানে নতুন।

—একেবারে নতুন। আজই ভোর রাতে এসে পৌঁচেছি।

—কোথায় উঠেছেন? রজনীবাবুর বাংলোতে?

—কী করে জানলেন?

—এদিকে তো এ ছাড়া আর

কোনো বাড়ি নেই। আর স্টেশনের কাছে কোথাও উঠলে আগেই আমরা জানতে পারতুম। আমাদের এখানে লোকজন খুব কম, কাজেই কারো বাড়িতে গেস্ট এলে তিন দিন আগে থেকেই খবর পাই আমরা।

—আপনারা—

—স্টেশন থেকে বেরিয়েই ডান দিকে বাড়িটা। সামনে ঢেউ তোলা প্রাচীর, বাগানে তিনটে ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ আছে। ডাক্তার এ কে রায়-চৌধুরীর বাড়ি। এরা তাঁরই ছেলেমেয়ে —বাসব, লেখা আর কেকা। —ছোট মেয়েটির মাথার লাল রিবনটি আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে খেলা করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন, আর আমি এদের কাকিমা। শর্মিলা।

শর্মিলা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কিরণ তাকিয়ে দেখল শর্মিলার দিকে। একটা সময়ের পরে মেয়েদের বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, তবু মনে হল সাতাশ-আটাশের বেশি নয়। আর চোখে পড়ল পরণে সাদা জরিপাড় শাড়ি, পায়ে শাদা জুতো, বাঁয়ের মণিবন্ধে একটি সোনালি ঘড়ি ছাড়া শাদা হাত দুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, কুমারীর মতো শাদা সিঁথি। অনুমান করতে দেরী হল না—শর্মিলা বিধবা।

ছোট একটা ধাক্কা লাগল মনের ভেতরে, সকালের হাওয়ায় এমন করে রং-ঝরানো কৃষ্ণচূড়ার পটভূমিতে এই মেয়েটির শুভ্র-বৈধব্য কোথায় যেন তাল কাটল। কিরণ সহজ হল পর-ক্ষণেই, বললে, নমস্কার। আমার নাম কিরণ বসু।

—কিরণ বসু? —চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল শর্মিলার: যিনি লেখেন?

—অকীর্তি খানকতক আছে বটে। কিন্তু আপনারাও খবর রাখেন সে আশা করি নি।

শর্মিলা হাসলেন: বলেন কি! আপনি রীতিমত নামকরা লেখক—খবর রাখব না? আমরাই তো আপনাদের বই পড়ি।

—শুনে আশ্বস্ত হবো কি না বুঝতে পারছি না।—কিরণ আবার শর্মিলার মুখের দিকে তাকালো, চোখের দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল মাথার সেই উজ্জ্বল শাদা সিঁথিটার ওপর। আস্তে আস্তে বললে, পাঠক-পাঠিকার মুখোমুখি না পড়াটাই লেখকের পক্ষে নিরাপদ। বই পড়ে তাঁরা যা বলেন সেটা কানে শুনতে পাই না বলেই সুখে থাকি, কিন্তু একেবারে সামনা-সামনি—

শর্মিলা এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন।

—আশ্চর্য বিনয় আপনার। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল। একবার পুরীতে একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর কোন্ কোন্ বই আমি পড়েছি—তাঁর লেখা আমার ভালো লাগে কি না, কতখানিই বা ভালো লাগে।

—ওঁরা ভালো লেখেন, তাই আত্মবিশ্বাস আছে।

—আপনি বুঝি ভালো লেখেন না?

—একেবারেই না। বই ছাপা হয়ে বেরুলেই আমার কান্না পায়। আর সেটা দ্বিতীয়বার পড়তে গেলেই মনে হয়—এমন একটা বাজে বই লেখবার অর্থ কী, আর লোকেই বা সেটা পয়সা খরচ করে পড়তে যাবে কেন।

শর্মিলা প্রসন্ন মুখে বললেন, আপনার বই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে পাঠকদের মতভেদ আছে। কিন্তু আপনিও কি নিজের থিয়োরী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন? তা হলে পর পর বই লিখে যান কী করে?

—ওইটেই তো কন্ট্রাডিক্‌শন। বই লিখে খারাপ লাগে—আবার বই লেখার লোভও সামলাতে পারি না। কী করা যায় বলুন তো?

—কিছু করতে হবে না, আপনি বই-ই লিখুন।

বাসব লুকিয়ে নভেল পড়তে শিখেছে। কিরণের বইও না পড়েছে তা নয়। কান পেতে সে আলোচনা শুনছিল। কিন্তু মেয়ে-দুটি অধৈর্য হয়ে উঠল। কেকা বললে, কাকিমা, যাবেন না?

কিরণ বললে, ঠিক কথা। মাঠে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে গল্প হয় না। যদি সময় থাকে, আমার বাংলোতে বরং কিছুক্ষণ বসবেন চলুন। যদিও আমার সম্বেধন নীলমণি শ্রীমান শঙ্কুকে তাপাতত বাজারে পাঠিয়েছি, কিন্তু আপনাদের এক পেয়ালা চা করে আমি খাওয়াতে পারব।

—কেন, মিসেস বসু সঙ্গে আসেন নি?

এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল কিরণ। যে নেপথ্য-যন্ত্রণাটাকে সব সময়ে ভুলে থাকতে চায়—চকিতের জন্যে সেটা চেতনার ওপর বিদ্যুৎ হানল। ঘাসের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে গেল, কৃষ্ণচূড়ার বীথি থেকে হরিয়ালের ডাক কানে এল, গাঢ় লালের সঙ্গে হলুদ মেশানো কয়েকটা ঝরা পাপড়ি উড়ে এল এদিকে।

তারপর কিরণ বললে, না।

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, শর্মিলা সেটা বুঝতে পারলেন। অল্প একটু হেসে, সব সহজ করে নিয়ে বললেন, তা হলে ফাঁকা বাড়ির আতিথ্য নিয়ে কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে আজ সন্ধ্যায় আপনিই বরং আসুন না আমাদের এখানে। চা খাবেন। ডক্টর রায় চৌধুরী এক সময়ে কবিতা লিখতেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেও আপনি খুশি হবেন।

—দেখি।

—দেখি নয়, নিশ্চয় আসতে হবে। —শর্মিলা বাসবের দিকে তাকালেন: বাসু, তুমিও রিকোয়েস্ট করো ওঁকে। ওঁরা বড়ো লেখক—সাধাসাধি না করলে আসবেন কেন?

বাসব বললে, আসবেন বইকি। না এলে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।

কিরণ বিব্রত হয়ে বললে, আমাকে অত সম্মান করবার দরকার নেই, আমি এমনিতেই যেতে পারি। কিন্তু আজই—

—কোনো কাজ আছে আপনার?

—একটু।

—তা হলে কাল সকালে?

—আচ্ছা, আসব।

নমস্কার-বিনিময়ের পালা শেষ হল, আবার এগিয়ে গেল দলটা। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কিরণ চেয়ে রইল সেদিকে। শর্মিলার শাদা শাড়ির জরি-পাড়টা রোদে চিকচিক করছে, খুব সম্ভব কুকুরটার ডায়েরী চুরির ব্যাপারটা নিয়ে হেসে উঠছে ঘাসব আর লেখা, ডগলাস কেকার চারদিকে একবার পাক খেয়ে দৌড়ে গেল সামনের দিকে, কেকা ছুটল তার পেছন পেছন। একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিরণ—ধীরে ধীরে আবার সেই তিনটি কৃষ্ণচূড়ার তলায়—সেই লাল মাটির ঢিবির সিংহাসনে এসে বসে পড়ল। মাথার ওপর ডেকে চলল হরিয়াল, তার সর্বাঙ্গে ফুল ঝরতে লাগল।

নীল ডায়েরীটার পাতা খুলল একবার। আজকের এই ঘটনাটুকু লিখে ফেলা যাক।

তারপরেই মনে হল, কী হবে লিখে?

এই সকালে, এই ঘাস, পাহাড়, হাওয়া আর কৃষ্ণচূড়ার ভেতরে এই যে ছোট্ট ব্যাপারটুকু ঘটল—এর কি এমন কোনো রূপ আছে যাকে কথা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়? এ একটা রঙের ছোপের মতো, ঘন মেঘের পর্দা ছিঁড়ে মাটিতে হঠাৎ ঝরে পড়া খানিক আলোর মতো, চলন্ত ট্রেনে দেখা কোনো নববধূর মুখ থেকে হঠাৎ চেলির ঘোমটাটি সরে যাওয়ার মতো। ডায়েরী লেখা যায় না, স্বরলিপি সাজানো চলে; কথা গোছানো যায় না—ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে. আর সেই ছবিতে বাসের টান-ওলো যেন ফ্রেমের সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

এখানে সবাই যেন নিজেকে ছাড়িয়েছে। দূরের পাহাড় যেন ঢেউ তুলতে তুলতে পৃথিবী পার হয়ে চলে গেছে, এই মাঠটাকে মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত তৃণভূমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে কোনো মেরুর তুষার রেখায় গিয়ে নিস্তব্ধ হল, এই কৃষ্ণচূড়ার বীথি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে স্মৃতির দিগ্বলয়ে বিলীন। এরই মাঝখানে আজকের এই ছবি, এই রঙ, এই আলোটা এল। এ তার লেখার মধ্যে ধরা দেবে না।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তো সব কিছু। কিন্তু যাওয়া যায় ছাড়িয়ে? ছেলেবেলায় একদা কবিতা লিখত কিরণ, অনেক দিন সে-সব কোথায় মুছে গেছে, তবু দুটো-একটা লাইন মনের ভেতরে ধরা পড়ে আছে।

আকাশ ভাবে আপনাকে সে ছাড়িয়ে
চলে যাবে
হাঁসের মতো মেলবে ডানা
দিগন্তরের পারে—
মেঘের মুঠি বাড়িয়ে সে কোন্
বজ্র-মাণিক পাবে
বুকের তিমির উঠবে জ্বলে আগুন
উপচারে—

আকাশের স্বপ্ন। বজ্র-মাণিকের আকৃতি।

আর তখনি মনে এল শর্মিলার কথা: মিসেস বসু আসেন নি?

মিসেস বসু। প্রতিমা। হৃৎপিণ্ড কুঁকড়ে এল কিরণের। নেপথ্য-যন্ত্রণার ওপর থেকে আবরণটা সরে গেল।

একটা দড়ি দিয়ে বারান্দার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে প্রতিমাকে। মাথার চুল উড়ছে ঝড়ের মেঘের মতো। ধারালো নখ দিয়ে পরণের শাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে—ফেনা পড়ছে মুখের পাশ দিয়ে, বিকৃত বীভৎস গলায় চিৎকার করতে করতে বলছে—'জানি, জানি—তোমরা সবাই মিলে আমাকে বিষ খাওয়াতে চাও!'

প্রতিমা পাগল।

( ক্রমশ: )

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

# শেক্সপীয়র ও তাঁর দেশ

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি---'

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৪ সালে সেক্সপীয়ারের জন্মের চতুর্থ শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সাড়া পড়ে গেছে সারা পৃথিবীময়। চারশো বছর আগে ১৫৬৪ সালের ২৩শে এপ্রিল এই বিশ্ববরেণ্য মহাকবি এবং সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্ম হয় ইংলণ্ডের স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এ্যাভনের হেনলী ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে। উইলিয়ামের মা মেরী আর্ডেন ছিলেন রবার্ট আর্ডেন নামে উইলমকোটের এক বর্ধিষ্ণু কৃষক ভদ্রলোকের মেয়ে। বাবা জন সেক্সপীয়ার কখনও কৃষিকার্য, কখনও পশমের ব্যবসা, আবার কখনও দস্তানা তৈরির কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। উইলিয়াম ছিলেন বাপ-মায়ের তৃতীয় সন্তান---তাঁর ওপরে দুজন বোন ছিলেন। কবির জন্মের সময় জন সেক্সপীয়ার বেশ অর্থশালী এবং প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। নগরের পৌরসংঘের কাজে তিনি বেশ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন এবং ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে 'বেলিফ অফ দি বরো' পদে নিযুক্ত হন।

নানা ধরণের কাল্পনিক কাহিনীর প্রচলন থাকলেও সেক্সপীয়ারের শৈশবকালের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় নি। বোধহয় স্থানীয় গ্র্যামার স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ভ্রাম্যমাণ নাটকে দল যখন স্ট্র্যাটফোর্ডে অভিনয় করতে আসতেন তখন বালক উইলিয়াম নিশ্চয়ই এঁদের অভিনয় দেখতেন।

আঠারো বছর অতিক্রম করার কিছু পরেই উইলিয়াম সটারীর এ্যান হ্যাৎওয়েকে বিয়ে করেন। তারপর তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড ত্যাগ করেন---কি

**শিলালি**

কারণে তার কোনো সঠিক নির্দেশ নেই। এর কিছু পরেই তাঁকে দেখা যায় লণ্ডনে---প্রথমে অভিনেতা হিসেবে এবং তারপরে নাট্যকাররূপে। অন্যের লেখা নাটকের পরিমার্জন এবং পরিশোধনও তিনি করতেন।

১৫৯২ সাল থেকেই তার নাটকের গুণাবলী এবং জনপ্রিয়তা তাঁর সমসাময়িকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। এই সময় থেকেই তিনি যে অভিনেতা দলের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়---তাছাড়া তাঁর নাটকও এ সময় থেকেই মঞ্চস্থ হতে থাকে।

নাট্যকার হিসেবে সাফল্য এবং থিয়েটারের মালিকানার অংশীদার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট অর্থোপার্জন হয়---আর এই টাকা দিয়ে তিনি লণ্ডন ও স্ট্র্যাটফোর্ডে কিছু কিছু সম্পত্তি কেনেন।

১৫৯৭ সালে সেক্সপীয়ার নিউ প্লেস নামে স্ট্র্যাটফোর্ডে একটি বড় বাড়ি কিনে ফেলেন এবং রিটায়ার করবার পর ১৬১০ সালে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে এখানেই বসবাস করতে আসেন।

১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে সেক্সপীয়ার মারা যান। হোলি ট্রিনিটির প্যারিশ চার্চের পূর্বাংশে তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

সেক্সপীয়ারের মৃত্যুর কয়েক বছরের ভেতরেই স্ট্র্যাটফোর্ড তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাইরে থেকে বহু দর্শক এখানে

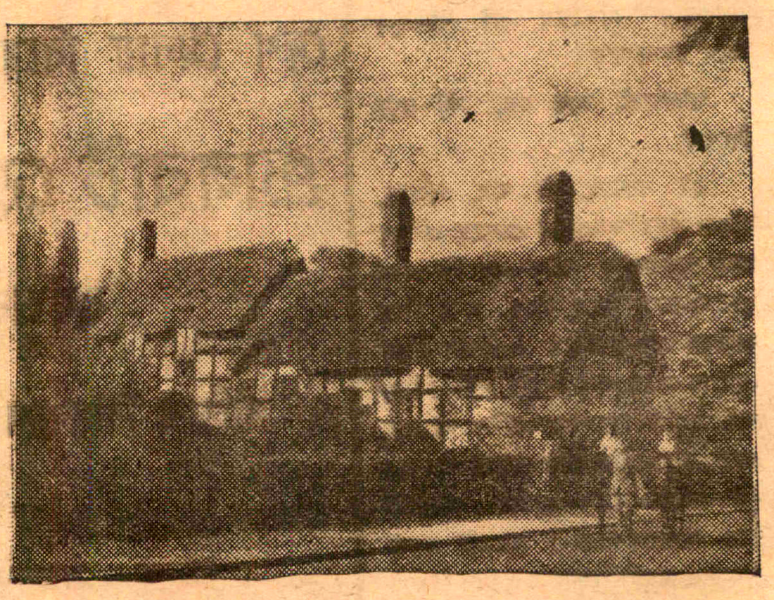

এ্যান হ্যাৎওয়ের কটেজ

আসতে সুরু করেন---তাঁদের সব প্রচণ্ড আগ্রহ যে নিউ প্লেসে এসে সেক্সপীয়ারের নিজে হাতে পোঁতা মালবেরী গাছটি দেখবেন। দর্শকের ভিড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে দেখে বাড়িটির তদানীন্তন মালিক ঐ গাছটিকে কেটে ফেলেন।

১৭৬৯ সালে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক স্ট্র্যাটফোর্ডে প্রথম সেক্সপীয়ারের জন্মোৎসব পালন করেন। চারদিকে এ ব্যাপারটা এত প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, ক্রমশ এর পর থেকে স্ট্র্যাটফোর্ড শিল্পবিদ এবং সাহিত্য-রসিকদের কাছে সাহিত্যিক তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সেক্সপীয়ারের জন্মোৎসব পালন করতে ক্রমাগত যাত্রীর ভিড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহাকবির বাড়ির তদানীন্তন মালিক বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিতেন দর্শনার্থী-দের কাছ থেকে, বাড়িটি এবং আশ-পাশের নানা দর্শনীয় জিনিষপত্র দেখিয়ে।

১৮৪৭ সালে সেক্সপীয়ারের বাসগৃহটি বিক্রি করবার কথা ওঠে---স্থানীয় লোকজন এবং সারা ইংলণ্ডের জনমত অনুসারে এই বাড়িটিকে তখন জাতীয় স্মারকচিহ্ন হিসেবে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়। এর পরিচালনের ভার দেওয়া হয় একটি ট্রাস্টের ওপর। এখন এই ট্রাস্টের নাম---Trustees and Guardians of Shakespeare's Birthplace.

এই ট্রাস্ট নানা দিক থেকে খুব সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে এসেছে প্রথমাবধি। কবি যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন সেটি ছাড়াও কবির স্ত্রীর আদিবাড়ি (Ann Hathway's Cottage). অবসর গ্রহণের পর যে বাড়িতে তিনি বাস করতেন এবং যেখানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (New Place), সেই বাড়িটি কবির মায়ের বসতবাড়ি (Mary Arden's House), কবির কন্যা Susanna এবং Dr. John Hall-এর বাড়ি

● হোলি ট্রিনিটি চার্চ—এর অভ্যন্তরে রয়েছে কবির কবর

(Hall's Croft), Shakespeare's Birthplace Trust-এর পরিচালনাধীনে চলে আসে।

এই সব সম্পত্তি এবং আশ-পাশের সংলগ্ন বাগান ইত্যাদি দেখতে প্রতি বছর পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু টুরিস্ট আসেন।

এ ছাড়াও ট্রাস্ট আরও অনেক কিছু করেছেন —যেমন মিউজিয়াম, লাইব্রেরী এবং বিশ্ব পাঠকদের সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার জন্য নানা অমূল্য জিনি পত্র সংগ্রহ। ট্রাস্টের সম্পত্তির মধ্যে আছে বিখ্যাত Quiney letter addressed to William Shakespeare. এছাড়া কবির রচনার সমস্ত ফোলিও এডিসনের কপি এবং কিছু কোয়ার্টোস্।

**সেক্সপীয়ার ফেস্টিভেল্ঃ** কবির জন্মোৎসব পালনের আইডিয়াটা প্রথম কল্পনা করেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিক। ১৭৬৯ সালে তিনি প্রথম এই উৎসব পালন করেন। এরপর পঞ্চাশ বছর ধরে স্ট্র্যাটফোর্ডের বড় বড় দালান বা বাড়িতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে বাইরে থেকে অভিনেতার দল আসতেন সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করতে এই উৎসব উপলক্ষে। ১৮২৭ সালে এই উৎসব

● কবিজননী মেরী আর্ডেনের বসত বাড়ি

পালন করতে সেক্সপীয়ার ক্লাবের সভ্যেরা চ্যাপেল লেনে একটি সেক্সপীয়ার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও পরে অর্থাভাবে এই থিয়েটারটি উঠে যায়। কিন্তু ক্রমশই মহাকবির জন্মোৎসব পালনের উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে জনসাধারণের মাঝে। ১৮৬৪ সালে সেক্সপীয়ারের তিনশত জন্মবার্ষিকী পালিত হয় মহা-সমারোহের সঙ্গে।

এর দশবছর বাদে চার্লস এডওয়ার্ড ফাউলার সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ফাউলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি কোথাও সেক্সপীয়ার থিয়েটার চালাতে হয় তার জন্য আদর্শ স্থান হচ্ছে কবির নিজস্ব জন্মভূমি স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এ্যাভন্। এই উদ্দেশ্য অনুসারে ১৮৭৯ সালের ২৩শে এপ্রিল প্রথম সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়। টিউডরী স্টাইলে রঙ্গালয়টি তৈরি করা হয় W. F. Unsworth-এর ডিজাইন অনুসারে।

১৯২৬ সালে আগুন লেগে এই থিয়েটারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ছ' বছর বাদে বর্তমানের নতুন মেমোরিয়াল থিয়েটারটি তৈরি হয়। এর ডিজাইন করেন মিস্ এলিজাবেথ স্কট।

বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা এবং প্রডিউসার নর্মান মার্শাল তাঁর বিখ্যাত বই 'The Other Theatre'-এ সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটার বলে একটি চ্যাপ্টার লিখেছেন। সুরুতেই তিনি লিখেছেন—একটা বিরাট সুযোগের কিভাবে অপচয় হতে পারে তারই ইতিহাস এই অধ্যায়ের কাহিনীর বিষয়বস্তু। ১৯২৬ সালের বসন্তকালে সেক্সপীয়ার মেমোরিয়াল থিয়েটারটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। থিয়েটারের পক্ষে এর মঞ্চাগারটি ছিল সর্ববিষয়ে অনুপযোগী এবং কদাকার। যদিও কিছু লোক সেণ্টিমেণ্টের দিক থেকে থিয়েটারের বাড়িটি পুড়ে যাওয়ায় দুঃখিত হয়েছিলেন তবে বেশির ভাগ লোকই মনে মনে আনন্দিত হয়েছিলেন বার্নার্ড শ'-এর মত। শ' স্ট্র্যাটফোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের এইভাবে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন—

Congratulations. You must be delighted.'

এরপর যে নূতন Memorial Theatre-টি করা হলো গভর্নিং বডির অব্যবস্থার দোষে সেটির ভেতরও বহু দোষ-ত্রুটি দেখা গেল। এ বিষয়ে নর্মান মার্শালের নিজের লেখা থেকেই কিছুটা তুলে দিই—

'The fundamental weakness in the design of the Memorial Theatre is the gulf between stage and auditorium. This would be a serious enough defect in any theatre, but is doubly so in a theatre built for the plays of Shakespeare which were written for a platform stage with no proscenium arch and no barrier of any sort between actor and audience.

It is true that at Stratford there is a forestage in front of the proscenium, but it is so badly related to the stage proper that it has every appearance of being an after thought. It is impossible to combine satisfactorily a forestage and a conventional picture-frame stage. At Stratford when an actor moves forward on to the forestage he steps, quite literally, 'out of the picture' framed in the proscenium arch. A producer attempting to use both forestage and picture-frame stage is faced with the insoluble problem of combining two totally different conventions of acting and production.

(ক্রমশঃ)

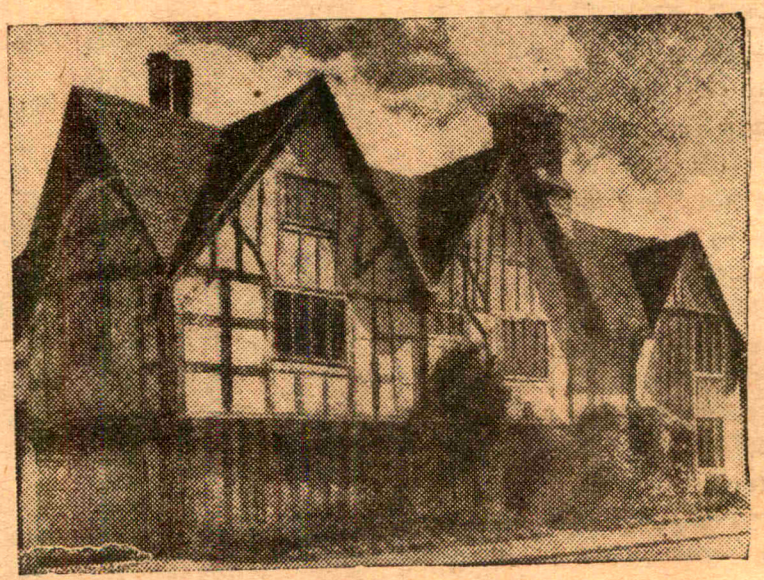

● হলস্ ক্রুক্ট

মানুষের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন লোকোত্তর কবি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা কেবল সাহিত্যে নতুন প্রবর্তনা দান করেই ক্ষান্ত থাকেন না, মানুষের ইতিহাসকে নতুন পথে চলতে প্রেরণা দান করেন। মানুষের প্রকৃত ধর্মরূপ সমাজে প্রচার করেন। মানুষের জয়গান করেন। তাঁদের ছাড়লে তাঁদের দেশকে ও মানুষের ইতিহাসকে জানা যায় না; ভাবা যায় না। এঁরাই হলেন প্রকৃত মহাকবি। গ্রীসে হোমার, রোমে ভার্জিল, ইটালীতে দান্তের মতো ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র, ইতিহাসের রথচক্র নতুন পথে পরিচালনাকারী এই সব কবি সমাজের বর্ণিত অর্থে মহাকবি। তাঁদের বাদ দিলে তাঁদের দেশের ইতিহাস খণ্ডিত হয় সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে মানুষের যে বিচিত্র ও ব্যাপক ইতিহাস তার সমস্তটা জুড়ে তাঁদের আসন। এই অর্থে মহাকবি উইলিয়ম সেক্সপীয়র জনগণের মহাকবি। সমস্ত জগৎ জুড়ে তাঁর আসন পাতা।

আজ থেকে তিনশ' নিরানব্বই বছর পূর্বে ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র শহর ওয়ার-উইকশায়ারের ষ্ট্রাটফোর্ডের এক ব্যবসায়ীর ঘরে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কে জানতো সেই শিশু তার কোমল ক্ষুদ্র মুষ্টিতে ধারণ করেছিল বিধাতার আশীর্বাদপূত বিশেষ ক্ষমতা। এমন তো কত শিশু নিত্যনিয়ত ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তাদের সরল সুন্দর মুখে স্বর্গীয় বিভা-মণ্ডিত; স্বর্গের কাছে পৃথিবী যে আশ্বাস প্রত্যাশা করে সেই অক্ষয়বাণী অক্ষরহীন-ভাবে তাদের ললাটে লিখিত; এ সমস্ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেদিনের সেই বরণীয় শিশুটি তার অধিক কিছু হাতে নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিল। সেটি একটি বিশেষ অধিকার, একটি বিশেষ সনদ, স্বদেশের ও গোটা মানব-জাতির অদৃষ্টচক্র চালনার গৌরবময় এক দুরূহসৌভাগ্যের দাবি। তখন কিন্তু সে গৃহস্থ জানতে পারে নি, যে কল্যাণ-শঙ্খের মাধ্যমে নবজাতককে আহ্বান জানান হচ্ছে, সে আহ্বান গৃহের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ রইলো না; স্বদেশের বিস্তৃত দিগন্ত লঙ্ঘন করে বিশ্বমানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিকে তরঙ্গিত হ'য়ে চললো। এসব কথা সেদিন জানবার নয়। গত তিনশ' নিরানব্বই বছরের ইতিহাসে আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, তেইশে এপ্রিল মহাকবি উইলিয়ম সেক্সপীয়রের জন্মদিন; সমগ্র মানবজাতির জন্মপুণ্যাহ।

উনিশশ' চৌষট্টি সালের তেইশে এপ্রিল মহাকবি শেক্সপীয়রের জন্মের চারশত বৎসর পূর্ণ হ'ল। বিশ্বমানসে আজ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার হিসেবে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু নাট্যাবলীই নয়, তাঁর রচিত সনেট বিশ্ববাসীর কাছে পথনির্দেশরূপে আজও সমাদৃত। পৃথিবীব্যাপী বোধ করি সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে তাঁর রচনাসম্ভার। একমাত্র বাইবেল ছাড়া আর কোন সাহিত্যকর্ম এত বেশি ভাষায় এখনও অনূদিত যে হয় নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন লেখকই এত গভীরভাবে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। সেক্সপীয়র তাই শুধু ইংলণ্ডবাসীর নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর মহাকবি, পথপ্রদর্শক।

সেক্সপীয়রের কাব্যপ্রবাহের মধ্যে দ্বিধাচিহ্নিত একটি মনোরম দ্বীপ দৃষ্ট হয়। দ্বীপটি নদীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও, দুই তীর থেকে কিছু অস্বাভাবিকভাবে বিবিক্ত। মাটির তলায় যে যোগটুকু প্রত্যাশিত এক্ষেত্রে তারও যেন অভাব। অনেক সময় মনে হয়, এই কাব্য-ভূখণ্ড যেন গ্রহান্তরের প্রক্ষেপ, তাই এমন অপার্থিব, তাই কেমন অলৌকিক। এর মনোরমতা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি এর রহস্যময়তা আবিষ্কারকের কাছে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকর্ষণে ও অন্তরায়ে, মনোরমতায় ও রহস্যময়তায় দ্বিধাচিহ্নিত সেক্সপীয়রের কাব্যপ্রবাহের এই দ্বীপটি একটি দুর্গম সমস্যা। দ্বিধাচিহ্নিত এই দ্বীপটির নামান্তর সেক্সপীয়র নাট্যসম্ভার ও সনেট। নাটক ও সনেট স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশ পেলেও একই মানসিক ভূখণ্ডের অন্তর্গত। এই মানসিক ভূখণ্ডের উপকূল-ভাগের ঠিক পরেই বিস্তৃত 'হিস্টারল্যাণ্ড' আছে, যার নামান্তর কবিচিত্ত। এই কবিচিত্তে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। কঠিন বলেই আজ প্রশ্ন উঠেছে—কে এই সেক্সপীয়র? তিনি কোন্ দেশের, কোন্ কালের? প্রকৃত সমস্যা হ'ল, এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, মহাকবির জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে।

উইলিয়ম সেক্সপীয়রের নাম নিয়ে পরবর্তীকালে নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। বহু রকমের ব্যাখ্যা হয়েছে তাঁর নাম নিয়ে। একথা নিঃসন্দেহে

-লা যায়, সে সব ব্যাখ্যার পেছনে যুক্তির যাক্তিকতা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অনেকে বলেন, সেক্সপীয়র মোটেই ইংলণ্ডবাসী নন। উনিশশ' আটান্ন সালের নভেম্বরে একজন ভারতীয় গবেষক ঘোষণা ক'রে বসলেন, সেক্সপীয়র আসলে একজন ভারতীয়। তাজ্জব ব্যাপার! ক ক'রে সম্ভব? তাঁর মতে, দক্ষিণ ভারতের একজন অধ্যাপক শেশাপ্পা আয়ার হলেন সেক্সপীয়র। তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে করাচীতে যান এবং 'শেখপীর' নামে পরিচয় দেন এবং সেখান থেকে ইংলণ্ডে এলে সেক্সপীয়রে রূপান্তরিত হ'ন। নিউজিল্যাণ্ডের একটি পত্রিকা সাড়ম্বরে এই গল্পটি প্রকাশ করেন। আবার অনেকে বলেন, সেক্সপীয়র একজন। একজনের পক্ষে বহু দেশ-কালিক ঘটনাবলী সম্বলিত সেক্সপীয়র-নাটক লেখা সম্ভব নয়। আবার অনেকে চিন্তা করেন—ইংলণ্ডবাসী হলেও সেক্সপীয়র জার্মানী, ইতালী এবং ডেনমার্ক ভ্রমণ করেছেন। তিনি স্যার ফিলিপ সিডনীর সঙ্গে নেদার্ল্যাণ্ডস্-এ একজন সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ ক'রেছেন।

প্রকৃত সেক্সপীয়রের জীবনী জ্ঞাত না থাকায় এত কথার আমদানী হয়েছে। তবে এ ধরণের ব্যাখ্যার মূলে কিছু যুক্তি কাজ করছে বইকি। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলের পক্ষে কি ক'রে সম্ভব হয়, যে কবিতা ও নাটক সেক্সপীয়রের রচিত বলে জেনে আসছি? তা'ছাড়া যেটুকু জানা যায়—এই বালকপুত্র বিশেষ অপরাধে পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে নিজের শহর থেকে ইংলণ্ডে পালিয়ে যায়। তখন তার আর্থিক অনটন চলছে। পকাগত তেমন কোন গুণাগুণের পরিচয় দিতে পারে নি। কাজ নিলো এক নাট্যশালায়। কিসের কাজ? যে সব শিল্পী, অতিথি গাড়ি চেপে আসবেন নাট্যশালায়, তাদের গাড়ির ঘোড়াগুলো পাহারা দেওয়া আর সেবা করা। ছেলেটি কোনদিন বিত্তবান ব্যবসায়ীর পুত্র ছিল, পতার ব্যবসায় ক্ষতি দেখা দিলে পার্থিক অসঙ্গতি দেখা দেয়। সে সময় বালক ব্যবসায়ে প্রবেশ করে। কিন্তু হঠাৎ এমন এক কাজ করে বসে (খুনও হতে পারে)। যার ফলে শহর-পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে আসে। ছেলেটি দেশ ছাড়তে বাধ্য হল। নাট্যশালায় ঘোড়া সেবার কাজ নেবার ঘটনার পর আর সেক্সপীয়রের জীবনের কোন ঘটনার তথ্য পাওয়া যায় নি। এমনি কেটে গেল দীর্ঘ দশ বছর। এর পর সেক্সপীয়রকে দেখা গেল নাট্যকার হিসেবে। অভিনয় ক'রতেও দেখা গেল পরবর্তীকালে সসম্মানে নিজের দেশে ঘরবাড়ি তৈরি করে শান্তিতে বসবাস করেছেন। এই ধরণের যুক্তির উপর নির্ভর করে প্রকৃত সেক্সপীয়র কে?—এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত-তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। সেক্সপীয়র যে কোনদিন ইংলণ্ডের বাইরে গিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, বরং এমন সব পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয়, তিনি কখনও দেশের বাইরে যান নি।

তবে একথা সত্যি যে, তাঁর নাটকে ইংলণ্ডের বাইরের বহু দেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন্ অভিজ্ঞতায় সে সব বর্ণনার দৃশ্য সম্ভব হয়েছে? শিল্পীর কাছে, মানবতাবাদী স্রষ্টার কাছে কল্পিত রূপ বর্ণনা অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। লক্ষণীয় যে, সেক্সপীয়রের নাটকে যে সব ভিন্ন দেশের বর্ণনা-দৃশ্য অঙ্কিত হ'য়েছে সে সবের মধ্যে ইংলণ্ডের স্থানীয় রূপই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'হ্যামলেট'-এ ডেনদের নাম হয়েছে ইতালীয়। কিন্তু তাদের কথোপকথনের ভেতর যে সমস্যা ফুটে উঠেছে, তা প্রচ্ছন্নভাবে ইংলণ্ডের। 'মেজার ফর মেজার' নাটকে ভিয়েনার দৃশ্য থাকলেও, তাতে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা থেকে মনে হবে ঘটনাটা সত্যিই ভিয়েনায় সংঘটিত হয়েছিল। এ রকম অনেক নাটকে ইংলণ্ডের বাইরের দেশের দৃশ্য রয়েছে। যেমন, 'টু জেন্টেলম্যান অব ভেরোনা'তে ভ্যালেন্টাইন ভেরোনা থেকে মিলানে যাচ্ছে সমুদ্রপথে। 'দ টুইটারস টেল'-এ বোহেমিয়া উপকূলের একটি দৃশ্য রয়েছে। 'টেম্পেস্ট'-এর প্রসপারো জাহাজটিকে মিলানের যারপথে নিয়ে গিয়েছেন। না, সেক্সপীয়র তাঁর সময়ের ইউরোপকে জানেন নি বাস্তব চোখে। তাঁর এ অভিজ্ঞতা ইতিহাস আশ্রিত। তিনি মানবজাতিকে জানতেন। তিনি স্রষ্টা, তিনি দর্শক, তিনি শিল্পী, তিনি মানব-জাতিকে বর্ণনা করতে স্বদেশের বাইরের দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তাঁর নাটকে। মূলত ইংলণ্ডের আলো বাতাস-ভরা মাটিতে ভর ক'রেই আকাশ-ভরা সূর্য-তারা দেখেছেন।

সেক্সপীয়রের এমন বিশ্বজনীন প্রতিভা তাঁর জাতীয়তাবাদী মননশীলতার উপর নির্ভরশীল। তিনি গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীর প্রতি মমতা এবং কর্তব্য অপরিসীম। তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে এই স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন, তাঁর জাতীয়তাবাদের পরিচয় মেলে। 'পঞ্চম হেনরি'র দেশাত্মবোধক অংশগুলি, 'রাজা জন'-এর শেষ কয় পংক্তি, 'রাজা তৃতীয় রিচার্ড'-এ ইংলণ্ডের প্রশংসায় জন অব গণ্ট-এর পংক্তিগুলি পুরুষানুক্রমে তাদেরই অনুপ্রাণিত করে এসেছে, যারা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্য-বাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে এবং হিটলারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ যখন চরমে পৌঁছায় তখন উইলিয়ম পিট মন্ত্রিসভার অধিবেশন স্থগিত রেখে ছুটে গিয়েছিলেন বালক-অভিনেতা চেটির হ্যামলেট অভিনয় দেখতে। এই অভিনয় দেখার পেছনে তখন কোন আমোদ-বিলাসের গন্ধ ছিল না। ছিল সেক্সপীয়রের দেশাত্মবোধক নির্দেশ গ্রহণ। হল্যাণ্ডে বৃটিশ সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে অস্থায়ী সিনেমা প্রদর্শনী দেখতে। সেখানে তখন চলচ্চিত্র 'পঞ্চম হেনরি' প্রদর্শিত হচ্ছে। সৈনিকেরা উৎসাহিত হয়েছে সে ছবি দেখে। তারা সেক্সপীয়রকে জাতীয় কবি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

সেক্সপীয়রের জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এতটুকু ভেজাল ছিল না। শত্রুদের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিষ্করুণ। তাঁর প্রথম নাটক 'ষষ্ঠ হেনরি'-তে জোয়ান অব আর্ক চরিত্র চিত্রণ কালে বাড়াবাড়ি রকমের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় তিনি দেন। তিনি তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ডকে প্রাণের চাইতেও ভাল-বাসতেন। দেশবাসীর কল্যাণ কামনা তাঁর ইষ্টমন্ত্র ছিল। তাই তাঁর লেখনীতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে স্বাদেশিকতার উজ্জ্বলতা, স্বদেশবাসীকে মহৎ কাজে, স্বদেশ প্রেমে উৎসাহিত করবার মন্ত্র;

তেমনি আঘাত দিতে, দেশবাসীকে নিয়ে বিদ্রূপ করতেও বাদ দেন নি। —হ্যামলেটকে মস্তিষ্ক বিকৃতির সন্দেহে ইংলণ্ডে পাঠাবার কথা হয়েছিল। কারণ সেখানে গেলে হয়তো হ্যামলেট কিছুটা সুস্থ বোধ করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলা হয় যে—যদি সে সেখানে সুস্থ বোধ না-ও করে, তা হলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ 'There the men are all as mad as he.' এই কথা কটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে রয়েছে স্বদেশবাসীর স্বভাবকে নিয়ে বিদ্রূপ। কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মহাকবির অন্তরে যে জাতীয়তাবোধের ফল্গুনদীটি প্রবাহিত তারই স্পর্শ পাওয়া যায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই সেক্সপীয়র নিজের দেশের লোককে নিয়ে এভাবে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনগণের কবি। তদুপরি তিনি ভারতের জাতীয় কবি, একান্ত বাংলার কবিসন্তান। তিনি স্বদেশকে ভালবেসেছিলেন, স্বদেশবাসীকেও। তাই তিনি ক্ষোভে, দুঃখে বাঙালীর সমকালীন প্রাণহীন সত্তাকে বিদ্রূপ ক'রে লিখেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করো নি।'

সেক্সপীয়রের জীবনকাহিনীর যে যৎসামান্য তথ্য জানা যায় তাতে যতই তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠুক, এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তিনি ইংলণ্ড-বাসী ছিলেন। যে সেক্সপীয়র বিচারালয়ের ভয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এসে নাট্যশালার ঘোড়া সেবার কাজ গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালের দশ বছরের তাঁর কার্যক্রমের কোন খোঁজ না পাওয়ায় খুব আশ্চর্য হবার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে করি না। তৎকালীন বৃটিশ ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেই দশ বছর (১৫৮৪-৯২) বৃটিশ ইতিহাসে ঘনায়মান দুর্দিন। তখন চলেছে বৃটিশ ইতিহাসের এক অতি সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়। জাতির অস্তিত্ব নিয়ে সে সময় বিরাট ঝড় উঠেছে। আশঙ্কার কালো মেঘে ইংলণ্ডের আকাশ অন্ধকার। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বৃটিশ জাতির স্বাধীনতা রক্ষার, অস্তিত্ব রক্ষার। ক্ষ্যাপার মতো গোটা জাতি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। বৃটেন তখন ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। শক্তি হিসেবে বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের গ্লানি তখনও জাতির মন জুড়ে ছিল। বিব্রত জাতি তখনও দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মাশুল বহন করে চলছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখা দিল ধর্মীয় সংঘর্ষ। জোড়াতালি দেওয়া জাতির মেরুদণ্ডে আবার আঘাত পড়লো। গোটা বৃটিশ জাতি তখন যথেষ্ট দুর্ভোগের মধ্যে বিরাজ করছে। এমনি প্রতিকূল আবহাওয়ায় বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অকস্মাৎ বিঘ্নিত হয় তৎকালীন শক্তিশালী স্পেনীয় রাজার সশস্ত্র আক্রমণের ফলে। সে কালটা ছিল বৃটিশ জাতির কাছে অনিশ্চিতের কাল। সেকালে এমন একটি লোক যিনি বড় হয়েছেন স্বচ্ছল ব্যবসায়ী পরিবারে আরামের মধ্যে, সহসা যাঁকে দারিদ্র্যের চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছে, যাঁকে দুর্ভাগ্যক্রমে বিচারের ভয়ে পলাতক জীবন যাপন করতে হয়েছে। সেই অখ্যাত যুবককে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের মধ্যে তাঁর স্বভাব-মনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

সেক্সপীয়রের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই এ রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দুঃখকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। কোন কোন গবেষক পণ্ডিতব্যক্তিরা হয়তো সেক্সপীয়রের সাহিত্যকর্মের গভীরতায় ও ব্যাপকতায় বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন, হয়তো মনে ক'রতে পারেন একজন মানুষের পক্ষে এইভাবে দুঃখকষ্ট এবং দুর্দৈবকে জয় করে এমন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়; কিন্তু ইতিহাস বলে এ-ও সম্ভব। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ করে সেক্সপীয়রের মতো ব্যক্তি-সত্তার পক্ষে এমন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। হ্যামলেটের নিপীড়িত আত্মাই ছিল সেক্সপীয়রের আত্মা। যুদ্ধ প্রস্তুতি-কালীন অনিশ্চয়তা কি নিদারুণ মানসিক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করতে পারে তা তিনি জ্ঞাত ছিলেন বলেই অ্যাজিন-কোর্টে 'রাজা পঞ্চম হেনরি'র শিবিরের দৃশ্য ঐভাবে বর্ণনা করতে পেরেছিলেন। তিনি জনতার একজন অংশীদার। তিনি জানতেন জনতার চাপল্য। তাই নিখুঁত বর্ণনায় এই জনতার চাপল্যকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন 'জুলিয়াস সীজার' এবং 'রাজা ষষ্ঠ হেনরি' নাটকে। বৃটেনের এক সঙ্কটময় কালের এই প্রতিভাবান স্রষ্টা তাই বৃটেনের ইতিহাসে যে কোন সঙ্কটকালে প্রেরণার উৎস হয়ে দেখা দিয়েছেন। ইংলণ্ডবাসীর বড় রকমের বিপদের মুহূর্তে এবং কঠিনতম পরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে তাঁর নাটকাবলী দলে দলে দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছে। তাঁর নাটকাবলী অভিনীত হয়েছে থিয়েটারে, হলে, উদ্যানে, প্রাসাদপ্রাঙ্গণে এবং গ্রামীণ প্রান্তরে। তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে রেডিওতে, বহু নাটক রূপায়িত হয়েছে চলচ্চিত্রে।

কিন্তু সেক্সপীয়র কেবল তাঁর স্বদেশেরই মহাকবি নন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আজ মধ্যাহ্নগগনে উদ্ভাসিত এই মহাকবি কেবল স্বদেশের নন—নব্য মানুষের মহাকবি। অনন্ত-কালের বিশ্বমানবের মহাকবি। স্বদেশকে অবলম্বন ক'রে যিনি মানবের মহাকবি পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেই তাঁকে, আমাদের মহাকবিকে আজ এই পুণ্য জন্মদিনে জানাই প্রণতি।

সেক্সপীয়রের নাটক সাগরবৎ,
কালিদাসে রনাটক নন্দনকাননতুল্য।
—বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে
মহাকবির নাট্য-সৃষ্টির প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ

সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী

( প্রথম ভাগ )

—এই ভাগে আছে—

১। ম্যাকবেথ—অনুবাদক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
২। মনের মতন (As You Like It)—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। আণ্টনী কিুওপেট্রা—
অনুবাদক দেবেন্দ্রনাথ বসু
৪। রোমিও জুলিয়েট—
অনুবাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। ভেরোনার ভদ্রমুগল—
অনুবাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৬। জুলিয়াস সীজার—
অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একত্রে মূল্য আড়াই টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্রা

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

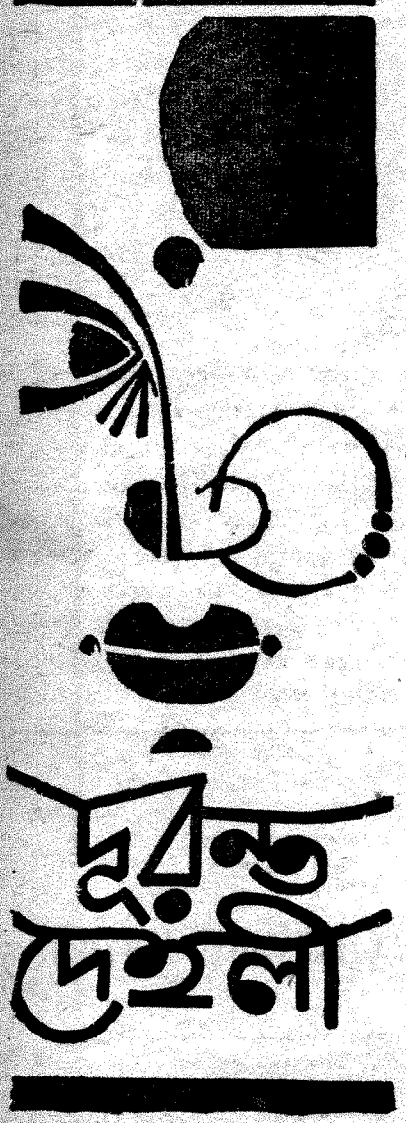

# দুরন্ত দেহলী

॥ এগারো ॥

বাড়ি ফিরতে সমরের একটু দেরী হয়ে গেল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল অরুণা বারান্দায় পায়চারি করছে।

সুন্দর একখানা ঢাকাই শাড়ি পরেছে। কবরীতে বেঁধেছে রজনী-গন্ধার গুচ্ছ। চকিতা হরিণীর মতন এদিকে তাকাচ্ছিল। সমরকে দেখে মহা খুশি হয়ে বলল, 'কি ভাবিয়েই না তুলেছিলেন। একটা খবর নেই। এত রাত তো কোনোদিন হয় না। সেই আটটা থেকে তো ভেবেই অস্থির।' বলেই নিজের প্রগলভতার জন্য যেন একটু লজ্জা পেল।

সমর হাঁ করে অরুণার দিকে তাকিয়ে ছিল। জীবনে বহুবার দেরী করে বাড়ি ফিরেছে। ছাত্র পড়িয়ে, বড় লোকের ভাষণ লিখে, রোগীর সেবা করে, চাকরীর উমেদারী করে অবসন্ন দেহে প্রায়ই তাকে দেরীতে ফিরতে হয়েছে। কোনোদিন তার জন্য কেউ ভাবে নি। জীবনে সর্বপ্রথম কিসের একটা শিহরণ সে অনুভব করল। বেশ মিষ্টিভাবে সে অরুণাকে বলল, 'তাই নাকি? আপনি আমার জন্য এত ভাবছিলেন? আমার জন্য কেউ এত চিন্তা করছে, তা ভাবতেই পারি নি। আমার জন্য, সত্যি বলতে কি কেউ কখনও ভাবে নি।'

অরুণার যেন করুণা হল। তার মনেও মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন হয়। লোকটা শিশুর মত সরল। তাকে কেউ দেখার নেই। সে বলল, 'কেন বৌদি? তিনিও আপনার জন্য ভাবেন নি?' বলেই দুষ্টুমিভরা চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে রইলো।—'কিছু বলছেন নাযে?'

সমর অত শত খেয়াল করে বলে নি। চিন্তায় পড়ল।

সমর বলল, 'আসল কথা হল কি, তাঁরও বেশি ভাববার সময় ছিল না। নিজের পড়াশুনো নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন কি না?'

—'তাই আপনিও নিজের ইচ্ছে মতন ছন্নছাড়া যাযাবর জীবন যাপন করেছেন? আমাকে তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন তো একবার। আমি তাঁকে চিঠি লিখে সব কথা খুলে জানাতে চাই।'

—'কি জানাবেন?'

—'জানাতে চাই, এত বড় শহরে একটা অন্যমনস্ক লোককে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়ার যথেষ্ট বিপদ আছে। তাছাড়া, কে জানে হাতছাড়া হবার ভয়ও তো থাকতে পারে?'

সমর মৃদু হেসে বলল, 'হুঁ, ঐ শেষ ভয়টাই মোক্ষম! তাই না? দেব, দেব, তাঁর ঠিকানাটা যথা সময়ে নিশ্চয়ই দেব। তবে অত সহজে নয়।'

—'আমি কিন্তু সন্ধ্যা থেকে আপনার অপেক্ষায় বসেছিলাম। আপনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, আজ আপনার আমাকে পড়ানোর কথা ছিল। শুধু বাংলা পড়ালেই হবে। অন্য বিষয়গুলো প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। তবে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি—কোনো পড়া জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না। বাংলাতে আমি নিতান্তই কাঁচা। আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না, আমার বাংলার প্রফেসার নিযুক্ত করার কথা নিয়ে মা-বাবার ভেতর কতদিন কত মনকষাকষি হয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে কেবলমাত্র পড়ানোর বিনিময়েই এই বাড়িতে থাকতে পারতেন—পুরো ভাড়াটিই বাঁচাতে পারতেন।'

সমরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সমর বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকালেই বই নিয়ে আসবেন। দেখি, যদি বুদ্ধিতে কুলোয়, তাহলে নিশ্চয়ই খুশি হয়ে পড়িয়ে দেব। কাল আমার ছুটি।'

একটা অব্যক্ত আনন্দে সমরের মন ভরে গেছে। তার জন্য অরুণা চিন্তা করছিল: ভাবতেও তার আনন্দ। দুঃখে বেদনায় আনন্দে শোকে যারা পাশে দাঁড়ায় তারাই তো জীবনসাথী। বিরাট জীবনযাত্রার পথে কেউ কখনও তাকে একটা সমবেদনার কথা বলে নি। তার দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ ভোগ করার কোন সাথী কখনও জোটে নি। নৃপেন হয়ত খানিকটা সহানুভূতি দেখিয়েছে। জীবন-রঙ্গমঞ্চে সে বেচারারই বা প্রতিষ্ঠা কতটুকু?

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা শেষ করলো।

ধীরে ধীরে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। একখানা বই টেনে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু পড়ায় তার মোটেই মন বসল না। অর্ধশায়িত অবস্থায় সে অরুণার কথাই ভাবছিল। কথায়-বার্তায় অরুণার একটা স্নিগ্ধ মোহ আছে।

অরুণার একটা জিনিষ সে লক্ষ্য করেছে। মেয়েটা খুবই সরল। আধুনিকাদের আলট্রা-মডার্নিজম তাকে স্পর্শ করে নি। এখনও অনাঘ্রাত গোলাপের মতনই সে পবিত্র। অকপটভাবে মনের কথাটা সে যখন-তখন বলতে পারে। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে সে শুনেছে যে, বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে তারা নাকি খুব তাড়াতাড়ি অন্তরঙ্গ হতে পারে। নির্ভয়ে কাছাকাছি এসে পড়ে। অরুণার কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছে, 'নিজের ইচ্ছে মতন ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছেন। আমাকে তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দেবেন তো একবার। আমি তাঁকে চিঠি লিখে সব কথা জানাতে চাই।'

সেই না-দেখা লোকের না-জানা ঠিকানার জন্য অরুণা এত উতলা কেন? কেন এ অকারণ কৌতূহল? কেন তার এ ব্যগ্রতা? সমরের হাসি পেল। কার ঠিকানা দেবে অরুণাকে?

অরুণা হয়ত ঠিকই বলেছে। তার এই ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনের কথা সেও যে মাঝে মাঝে ভাবে না তা নয়। সমস্ত জীবনটাই মাঝে মাঝে একেবারে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। এমন কি প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামকে অর্থশূন্য বলে মনে হয়। কিন্তু অরুণা যার ঠিকানা খুঁজে চেয়ে বসেছে, তার ঠিকানা সংগ্রহ এখনও হয় নি। নানা চিন্তা করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, সমরের তা খেয়ালও ছিল না।

অরুণার ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে খর রৌদ্রখণ্ড এসে ঘরখানা ঝলমল করছিল। জানলা দিয়ে রজনীগন্ধার বৃন্তগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। অদূরে সাইপ্রাস, দেবদারু, ইউক্যালিপটাসের শাখাগুলি মৃদু হাওয়ার তালে নাচছিল। হাল্কা মেঘখণ্ড দুরন্ত শিশুর মতন আকাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। কৃষ্ণচূড়ার শাখায় দুটো পাখী উঁকিঝুঁকি মেরে লুকোচুরি খেলছিল। অরুণা আবার ডাক দিল—'ঘুমুচ্ছেন?'

সমর তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। এত দেরীতে সে কখনও ঘুম থেকে ওঠে না। গতকাল হাসপাতালে যথেষ্ট ছুটোছুটি করে সে ক্লান্ত ছিল। নানা চিন্তা করতে করতে ঘুমুতেও দেরী হয়েছিল অনেক।

অরুণা বলল, 'দরজাটাও বন্ধ করেন নি? চারিদিকে যা চোরের উপদ্রব?'

মেসবাড়ির অভ্যাস সমর এখনও পরিত্যাগ করে উঠতে পার নি। দরজা-জানলা খোলা রেখেই শোয়।

—'একটা গরীব প্রাণীর হৃদয় ছাড়া চুরি করার মতন বিশেষ কিছু নেই এখানে।'

অরুণা বলল, 'সকাল বেলা চাকরটা আপনাকে ডাকতে এসে দেখে গেছে—আপনি ঘুমিয়ে। আমি নিজেই বেরিয়ে এসে ভদ্রলোককে বললাম পরে আসতে।'

বিস্মিত হয়ে সমর বলল, 'কাকে?'

—'একজন বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন। চোখে পুরু লেন্সের চশমা, পায়ে মোজা, বুট, ধুতির তলায় শার্ট গোঁজা।

সমর বলল, 'সঙ্গে কি একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে ছিল?'

—'হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। কেমন করে জানলেন?'

সমর বলল, 'ভদ্রলোক ঐ মেয়েটিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।'

—'তাই নাকি? ভদ্রলোকের সাহস আছে বলতে হবে। তা আপনি তাঁকে কি বললেন?'

—'আমি কিছুই বলি নি। ওর ধারণা আমি অবিবাহিত। ভদ্রলোক কন্যা-দায়গ্রস্ত, তাই ধরেছেন এসে। বাংলা দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সাধারণত যা করেন, উনিও তাই করছেন। তবে অনেকে এ বিষয়ে টু-উ লেট হয়ে যান। উনি একটু টু-উ আলি।' বলেই দুজনে হো হো করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল।

—'কিন্তু সত্যি যদি ঐ দুকৌটা মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হত, তাহলে কি হত?'

—'তাহলে সে খুব সৌভাগ্যবতী হত। এ বিষয়ে আপনার কোন মতভেদ আছে?'

হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে অরুণা বলল, 'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো নারীই আপনাকে পেয়ে খুশি হবে। জানি না, এ বিষয়ে বৌদির কি মত? আজ এখন আর পড়াশুনো করা চলে না, কি বলুন? আপনিও নিশ্চয়ই কাল থেকে খুব ক্লান্ত। আমি সন্ধ্যার সময়ে আসব। যদি আপনার কোনো বিশেষ কাজ না থাকে, তাহ'লে আপনি পড়াবেন কি আজ?'

সমর বলল, 'খুব ভালো কথা। সন্ধ্যার সময়ে আসবেন। বিশেষ

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

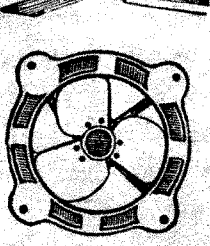

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

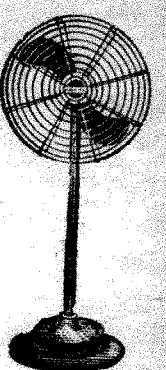

কাজ থাকলেও আপনাকে পড়ানোটা বাদ দেওয়া যায় না। আপনাদের বাড়িতে আছি। অনুগ্রহ করে স্থান দিয়েছেন। আপনাদের বাড়ি নেবার সময়ে আপনাকে পড়ানোটা তো আমার চুক্তির ভেতরেই ছিল, জানেন না আপনি?'

অরুণার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, 'ছি ছি, কি বলছেন? ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র আপনি। এত বড় দিল্লী শহরে বাংলা পড়াবার প্রফেসার পাওয়া যায় না। তাই বাবা আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন। আপনি তার অন্য অর্থ নিচ্ছেন কেন?'

সমর বলল, 'আহা রাগ করছেন কেন? সন্ধ্যার সময়ে বই নিয়ে আসবেন।'

সমস্ত দিনটা সমরের কাছে অত্যন্ত মধুর বলে মনে হল। এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের জীবন-সংগ্রাম যেন সার্থক হ'ল। সে যে ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় নি তা নয়। বহু ছাত্রীকেও তার পড়াতে হয়েছে। ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকেরাই তার জন্য সে কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন। সে সব মেয়েদের মুখের দিকে কখনও সে তাকায়ও নি। এই নিয়ে ছাত্রীসমাজে মুখ টিপে হাসাহাসিও কম হয় নি।

চব্বিশটা বছরের জীবন-সংগ্রামে রোমান্স, মধুরালাপ, প্রেমচর্চা করার কোনো সময়ই তার হয় নি। নৃপেনের অনেক কথার ভেতর একটা সার কথা তার মনে লেগেছে। নৃপেন প্রায়ই হাসতে হাসতে বলেছে, মেয়েদের পেছনে ছুটো না। অপেক্ষা কর, দেখবে তারাই তোমার পেছনে ছুটবে, সমরের জীবনে বহু নারী এসেছে। গেছে। তাদের কেউ তার মনে একটা রেখাও টানতে পারে নি। বনানীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল সত্যি। তার চেয়েও বেশি হয়েছিল নার্ভাস। নৃপেনের পাল্লায় পড়ে সেদিন সে যে অভিনয় করেছিল, তাতে সে নিজের ওপর কিম্বা নৃপেনের ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নয়। এখন যে নৃপেন তাকে দিয়ে একটা নতুন নাটক সুরু করেছে, তাতেও সে কম চিন্তিত নয়। কিন্তু এর ভেতর সে একটা অনির্বচনীয় অব্যক্ত আনন্দ পাচ্ছে।

সমর সারাটা দিন কুঁড়েমি করে কাটালো। জীবনে যারা প্রতি মুহূর্ত সংগ্রাম করে চলেছে, অলস মুহূর্তগুলো তাদের কাছে একটা মহার্ঘ বিলাস। আজ সকালেই সে ঠিক করে রেখেছিল—কোনো কাজ করবে না, কোথাও যাবে না। উপেন দুপুরবেলায় খাবার দিতে এসেছিল। এখনও মেস থেকেই তার খাবার আসে। উপেনটা মহা পাগল। চিত্রজগতে সে নামবেই নামবে। দুপুরবেলা সে সমরকে খানিকক্ষণ সিনেমার রিহার্সেল করে দেখিয়েছে। হাত জোড় করে বলে গেছে, 'দাদাবাবু, তোমার বইখানা এমন করে লিখো, যেন তাতে নিশ্চয়ই আমার একটা পার্ট থাকে।'

সেদিন উপেন চুপি চুপি সমরের কান ঘেঁসে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?'

সমর বলল, 'কি?'

উপেন বলল, 'নীচে যে একজন সুন্দর দিদিমণি থাকে—কে সে?'

সমর বলল, 'কেন রে?'

উপেন বলল, 'সে খুব ভালো। আমাকে খুব আদর-যত্ন করে, অনেক গল্প-সল্প করে।'

সমর বলল, 'কি রকম গল্প?'

—'হি হি হি দাদাবাবু, কি বলব তোমাকে? জিজ্ঞাসা করে, কি—দাদাবাবুর বৌকে দেখেছিস?'

—'তুই কি বললি?'

—'কি আর বলব? বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, প্রতিমার মতন রূপ। বলেই পটলবাবুর মতন হাত দু'খানা নেড়ে নেড়ে তার বর্ণনা দিলুম।'

সমর হেসে বলল, 'কেন মিথ্যে বললি? তুই কবে আমার বৌকে দেখেছিস। হ্যাঁ, আর কি বলে?'

উপেন হাত-পা নেড়ে বলল, 'কি আর বলব দাদাবাবু। তোমাদের খেয়ে পরে আছি। তোমাদের খুশি করতে হলে দুটো-একটা মিথ্যে টিথ্যে যদি বলতে হয় তো আর কি করি? বল? না হয় দু-ঘণ্টা নরকেই বাস করে নেব।'

সমর বলল, 'কেন? আছিস কোথায়? এখন স্বর্গে আছিস বুঝি। তুই এর মধ্যেই দিদিমণি সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছিস? তোর দিদিমণি আর কি বলে?'

—'আবার কাউকে বলতে মানা করে দিয়েছে যে। তুমি আবার বলতে যেও না। গরীব মানুষ—সন্দেশটা, মণ্ডাটা যা জুটছে হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেদিন আমাকে কাছে ডেকে হাসতে হাসতে বলল, তোমার দাদাবাবুর বৌকে দেখতে খুব সুন্দর, না উপেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক একেবারে পরীর মতন। কি তার রঙ, কি তার চাহনি! দেখলাম তার মুখটা প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। তখুনি বললাম, তবে জানো দিদিমণি! তোমার চেয়ে সুন্দরী নয়।'

দিদিমণি বলল, 'উপেন, তুমি এখানে যখনই আসবে আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। একটু জল খেয়ে যেও। হ্যাঁ, এই দুটো টাকা নাও—মিষ্টি খেও। আমার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়, ওপরে গিয়ে আবার বলে দাও না তো?'

সমর বলল, 'তুই কি বললি?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উপেন বলল, 'সে কি আর আমাকে শেখাতে হবে দাদাবাবু, পরিষ্কার বলে দিলুম—কি যে বল দিদিমণি! মা কালীর দিব্যি, এর একটি কথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউ জানতে পারবে না।'

ঠিক সন্ধ্যার সময়ে অরুণা এসে ঘরে ঢুকলো? রজনীগন্ধার প্রতি তার একটু দুর্বলতা আছে। এ

বেলাও তার খোঁপায় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ঘরখানা মৃদু গন্ধে ভরে গেল। অরুণা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'সত্যি বলব কি আমার পড়তে আসতেই লজ্জা করছিল। সকাল-বেলা আপনি যে রকম বাড়িতে থাকার কথা বললেন। সারাটা দিন আমার মনটা খারাপ গেছে। বাড়ি তো দেখুন—কত লোকেরই থাকে। মূর্খ, বোকা, অজ্ঞ লোকেদেরও বাড়ি থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যা, পাণ্ডিত্য শিক্ষা দেবার ক্ষমতা ক'টা লোকের থাকে? আপনি বোধ হয় জানেন না—বাড়িখানা আমারই নামে করানো হয়েছে। মনোকষ্টটা তাই এত বেশি।'

সমর দেখলো অরুণার মনে আঘাত লেগেছে। তাকে খুশি করার জন্য অন্য কথা পাড়ল।

—'এই রজনীগন্ধা আপনাদের বাড়িতে হয়েছে, না? এই ফুলটা আমার স্ত্রী সরমারও খুব প্রিয়।' বলেই মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'অনেক ব্যাপারে দেখছি আপনাদের দুজনের অসম্ভব রকমের মিল আছে। দুজনে একটুতে রেগে যান। আবার দুজনে একটুতেই খুশি।

—'নিশ্চয়ই সারাটি দিন তার কথাই ভেবেছেন?'

সমর বলল, 'কি করে ধরলেন বলুন তো?'

অরুণা বলল, 'কেন? মেঘভরা আকাশ, রজনীগন্ধার মৃদু গন্ধ, দক্ষিণ সমীরণ, গাছের পাতার হাওয়ায় নাচন, এই সব দেখে কি মনটা ঠিক রাখা যায়?'

সমর বলল, 'কে বলল, বাংলায় আপনি কাঁচা? এ রকম বাংলা লিখলে যে কোনো পরীক্ষক আপনাকে পুরো নম্বর দিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনি ও-সব মনের কথা জানলেন কি করে? এ বিষয়ে তো আপনার কোন অভিজ্ঞতা না থাকারই কথা। কি বলেন?'

অরুণা একটু লজ্জা পেল। ঠিকই তো? বাচক নভেলে ছাড়া এ মধুময় জীবনের আস্বাদ সে পেল কবে? স্মার্ট মেয়ে। হারবার পাত্রী নয়। সে বলল, 'থাক গিয়ে। ঘরখানা এখনও সাজানো হয় নি। একখানা ছবিও নেই আপনার? দেওয়ালটা কখনও ও-রকম খালি রাখতে নেই।' বলেই বাইরে ঝোলানো একটা ছোটো মানি প্ল্যান্টের টব এনে দেওয়ালের একদিকে ঝুলিয়ে দিল। সমরকে বলল, 'আপনাদের বিয়ের কোনো ছবি নেই? এর ঠিক উল্টো দিকটায় আপনাদের দুজনের একটা ছবি বেশ সুন্দর মানাবে। আছে এখানে—আপনার হাতের কাছে কোনো ছবি?'

সমর দ্বিধাহীনভাবে বলল, 'ছবি আছে বোধ হয়। তবে ঠিক জানি না—কোথায় আছে? উপেন জানতে পারে। কই দেখি—আপনার বই। আজ দিনটাও ভালো আছে। আজ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই সুরু করব আমাদের পড়া। কি বলেন?'

সঞ্চয়িতাখানা খুলে ধরে অরুণা বলল, 'এই নিন—উর্বশী। মিস সেন বলেছেন—এটা এবার পরীক্ষায় আসবেই।' আবৃত্তিতে বাংলা দেশে সমরের বেশ নাম ছিল। প্রবোধ সান্যাল, শম্ভু মিত্রের পরই তার স্থান। সমর কোমল কণ্ঠে মৃদুভাবে আবৃত্তি করল—

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ,
সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে
স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল
সন্ধ্যাদীপখানি।
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পবক্ষে
নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত
বাসর শয্যাতে
শুভ্র অর্ধরাতে।'

আরও চুপ করে থেকে সমর বলল, 'বুঝেছেন কিছু?'

—'উর্বশী সাধারণ নারী নয়। সে মা নয়, সে কন্যা নয়, সে কোন গৃহবধূ নয়। তবে সে কে? যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সুন্দরের উপাসনা করে এসেছে, যে নারীর ভিতর পরম সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে, যে নারী সত্য ও সুন্দরের প্রতীকরূপে ধরা দিয়েছে, সেই মহান সুন্দরকে কবি বন্দনা করেছেন—এই কবিতায়। পৃথিবীতে এই সুন্দর কবিতাটুকুর কোনো তুলনা নেই। নারী—নারী। এইটেই তার যথেষ্ট পরিচয়। মানুষ সেই পরম সুন্দর, পরম সত্যের পিছনে যুগ যুগ ধরে ছুটে আসছে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পরম সুন্দরের বন্দনা গেয়েছেন।'

মুগ্ধ নয়নে অরুণা সমরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের কলেজের অধ্যাপিকা নন্দিতা সেনও অত সুন্দর পড়াতে পারেন না।

সমর পড়াবার সময়ে যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। অরুণার দিকে তাকিয়ে অভ্যাসমতন বলল, 'বুঝতে পেরেছো?' মুহূর্তমাত্রের ভেতরেই নিজেকে শুদ্ধ করে বলল, 'বুঝতে পেরেছেন?'

অরুণা এতক্ষণ সমরের দিকে অপলক নেত্রে তার অপরূপ সুন্দর মুখখানা দেখছিল। সমরের কণ্ঠস্বরে আজকাল তার মনের ভেতরটা কি রকম করে ওঠে। এতক্ষণ সমরের একটা কথাও তার কানে যায় নি।

সমর আবার বলল, 'বুঝতে পেরেছেন?'

অরুণা মাথা নাড়িয়ে জানালো —সে বুঝতে পেরেছে।

(ক্রমশঃ)

# নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্মের উদ্ভব : অ্যানিমিজম

নরেন ভট্টাচার্য

## এক

ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের টাইলর কথিত অ্যানিমিজম দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। অ্যানিমিজমই হচ্ছে ধর্মের উদ্ভব বিষয়ক প্রথম নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এবং টাইলরের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে থাকা মানুষদের অভ্যাস এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চালিয়ে নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। অ্যানিমিজম কথাটির যোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া শক্ত এবং তার প্রয়োজনও এমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। সে যাই হোক না কেন, দীর্ঘকাল ধরে টাইলর কথিত এই অ্যানিমিজম ধর্মের উদ্ভবের একটি ভাল ব্যাখ্যা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আজ অবশ্য নৃতত্ত্ব বিষয়ক ধারণার পরিসর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে টাইলরের মতবাদের সমালোচকের অভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও টাইলরের যুক্তির সারবত্তা একান্তভাবে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি।

অবশ্য অ্যানিমিজম কথাটি টাইলরের নিজস্ব আবিষ্কার নয়। এই শব্দটি তাঁর পূর্বেও ব্যবহৃত হয়েছে। Stahl তাঁর Theoria Medica Vera গ্রন্থে অ্যানিমিজম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য একেবারে ভিন্ন অর্থে। কিন্তু বহুপ্রচলিত আমাদের আলোচ্য এই অ্যানিমিজম তত্ত্বটির প্রকাশ ঘটে প্রথম টাইলরের Primitive Culture নামক বিখ্যাত পুস্তকে। এই গ্রন্থে টাইলরের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট স্তরে মানুষ প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে কোন না কোন ধরণের আত্মার অস্তিত্ব আরোপিত করেছিল। অর্থাৎ আদিম মানুষের চোখে যা কিছু পড়েছিল—যেমন গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত প্রভৃতি—সমস্ত কিছুর মধ্যেই সে তার নিজের মতই জীবনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই তার আশেপাশের দৃশ্যাবলীর মধ্যে তার নিজের অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন আশা করেছিল এবং তার বিচারের মাপকাঠি ছিল সাদৃশ্যজ্ঞান। তার আশেপাশের বস্তুসমূহের অবস্থান পরিবর্তনের কারণ সে খুঁজে পেয়েছিল তার নিজের চলাফেরার সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে। সে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, তার নিজের যা কিছু দৈহিক প্রক্রিয়া তার মূলে আছে কোন আত্মার কার্যকারিতা এবং তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে সে এই কল্পনা করেছিল যে, দৃশ্যমান প্রকৃতি অসংখ্য আত্মায় পরিপূর্ণ—কেন না, যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তু তারই মত জীবন্ত, অর্থাৎ তারা আত্মার দ্বারাই সঞ্জীবিত। টাইলরের মতে আত্মা বিষয়ক এই আদিম ধারণা থেকেই ধর্মের উদ্ভব খুঁজতে হবে। আদিম মানুষ এবং তার কল্পিত অসংখ্য আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছে, কেন না, সৎ ও বলিষ্ঠ আত্মাদের প্রসন্ন করা এবং অসৎ ও দুর্বুদ্ধি আত্মাদের তাড়িয়ে দেবার আদিম জৈবিক প্রচেষ্টা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। অতঃপর টাইলরের মতবাদের বিস্তারিত বিবরণে আসা যাক।

## দুই

টাইলরের মতে পৃথিবীতে এমন কোন আদিম জাতির নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় না যাদের মধ্যে কোন না কোন ধরণের ধর্মবিশ্বাস নেই। অবশ্য ধর্মাচরণশূন্য বহু আদিম জাতিরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এমন কি, স্যার জেমস ফ্রেজারের মত প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অষ্ট্রেলিয়ার কয়েক শ্রেণীর আদিম জাতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়ের অনেক জাতির মধ্যেই ধর্মচেতনা গড়ে ওঠে নি, তাদের মধ্যে যা গড়ে উঠেছে, তা হল যাদুবিশ্বাস বা ম্যাজিক, আর ফ্রেজারের মতে ধর্মের সঙ্গে যাদুবিশ্বাসের সম্পর্ক হচ্ছে তেলের সঙ্গে জলের মত। টাইলর এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে ধর্মের যে 'আপাতলক্ষণ' আমাদের দৃষ্টিপথে থাকে, সেটি ভ্রান্ত। যে বিশেষ লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি দেখে আমরা কোন জাতির উপর ধর্মহীনতা আরোপ করি, সেই লক্ষণগুলিই বিচারের মানদণ্ড নয়। এই কারণেই টাইলর ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। ধর্মের সর্বনিম্ন সংজ্ঞা হিসাবে কোন পরম শক্তিমান দেবতায় বিশ্বাস, বা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে বিচার পাবার ধারণা, মূর্তিপূজা বা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রভৃতির উল্লেখ—টাইলরের মতে এগুলি দিয়ে ধর্মচেতনা বিকাশের কতকগুলি ধারার ব্যাখ্যা চলতে পারে, কিন্তু এগুলির পিছনে যে গভীরতর উদ্দেশ্য আছে তাকে ছোঁয়া যায় না। এই কারণেই ধর্মের সর্বনিম্ন সংজ্ঞা বলতে তিনি বলছেন, 'আত্মায় বিশ্বাস, সূক্ষ্ম দেহধারী সত্তায় বিশ্বাস।' এই আত্মায় বিশ্বাস, যা ব্যাপকভাবে সর্বকালে সর্বসমাজে প্রচলিত, টাইলর তার নাম দিয়েছেন, 'অ্যানিমিজম'।

যদিও প্রথম নজরে ধর্মের এই নিম্নতম সংজ্ঞাটিকে খুবই সংকীর্ণ, এবং 'প্রায় কিছু নয়' বলেই মনে হবে, তথাপি টাইলর বলছেন যে, কাজ চালাবার পক্ষে এইটুকু সংজ্ঞাই যথেষ্ট। অ্যানিমিজমে দু'টি ধারণার সমন্বয় ঘটেছে এবং তার ফলে একটি 'সুসঙ্গত অদ্বৈতের' সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ধারণাটি হচ্ছে একক জীবের আত্মা সংক্রান্ত, দেহের মৃত্যু বা বিনাশের পরেও যে আত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে। দ্বিতীয় ধারণাটি হচ্ছে প্রথম ধারণাটিরই ব্যাপ্তি, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল অসংখ্য সঞ্চরমান আত্মার ধারণা, যার সর্বশেষ পরিণতি দেবকল্পনায়। টাইলরের নিজের ভাষায় বলতে গেলে, ধর্মের সুরু হয় আত্মায় এবং শেষ হয় দেবতায়। টাইলরের মতে অ্যানিমিজমের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের যোগ হয়েছে অনেক পরে যখন মানবসমাজ অনেকটা উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে এ সংযোগ ঘটে নি।

## তিন

টাইলরের মতে প্রেতাত্মা বা ভৌতিক আত্মার কল্পনার মূলে আছে দু'টি ধারণা। আদিম মানুষের কাছে এই প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মানুষ কেন জেগে থাকে, ঘুমায়, তন্দ্রাভিভূত হয়, রোগগ্রস্ত হয়, মারা যায়? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আবিষ্কার করেছিল যে, মানুষের মধ্যে এমন কোন একটা বিশেষ বস্তু আছে, যার উপস্থিতিতেই মানুষ বেঁচে থাকে এবং যার অনুপস্থিতি মৃত্যুর কারণ। এই বিশেষ বস্তুটির নাম দেওয়া যাক 'আত্মা'। দ্বিতীয় যে ধারণাটি মানুষের মনে এসেছিল—তা হচ্ছে এই যে, স্বপ্নে এবং তন্দ্রায় যে সব মানুষের আকার দেখা যায়—তারা কারা? যে লোকের সঙ্গে সে সারাদিন কাটিয়েছে; তাকেই যখন সে স্বপ্নে দেখছে তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা জন্মাচ্ছে যে, মানুষের একটি সূক্ষ্মশরীর আছে যা তার মূল দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে এবং পুনরায় সেই দেহকেই আশ্রয় করতে পারে। এই সূক্ষ্মশরীরের নাম দেওয়া যাক ভূত। এখন, টাইলর বলছেন, এই দুইটি ধারণা, অর্থাৎ আত্মা ও ভূতের ধারণা একত্রিত হবার জন্যই ভৌতিক আত্মার কল্পনা সম্ভবপর হয়েছে।

এই ভূত বা আবছা মূর্তি, যা আদিম মানুষ স্বপ্নে দেখত, অনেকটা ছায়ার মত, এই কারণেই 'ছায়া' কথাটি প্রায়শ আত্মার সমার্থক। টাইলর বহু ভাষা থেকে উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন যে, সর্বত্রই ছায়া ও আত্মা অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াকেও অনেক সময় জীবন, এমন কি খোদ আত্মার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি আদিম ও সভ্য উভয় সমাজেই প্রচলিত আছে। তৃতীয়ত, টাইলর বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অ্যানিমিষ্টিক চেতনার দ্বিতীয় স্তরে মানুষ তার আত্মাবিষয়ক জটিল ও বিভ্রান্তিকর ধারণাসমূহ নিয়ে সেগুলির সঙ্গে জীবন ও চিন্তার বহুতর বিকাশের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। তা সত্ত্বেও মানসিক বিশৃংখলা এড়ানোর জন্যই আদিম মানুষ আরও নিবিড়ভাবে আত্মার সংজ্ঞা নিরূপণের ও শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেছিল। ফলে তার মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছিল যে, মানুষের মধ্যে বহু ধরণের আত্মার অস্তিত্ব বিরাজমান এবং প্রত্যেক আত্মারই নিজস্ব কাজ আছে।

## চার

অতএব দেখা যাচ্ছে, অ্যানিমিষ্টিক চেতনার প্রথম স্তরে জীবিত ও মৃতের পার্থক্যকারী আত্মা এবং স্বপ্নে দেখা সূক্ষ্মশরীর এই উভয় ধারণার সহযোগে ভৌতিক আত্মা বা প্রেতাত্মার কল্পনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে অসংখ্য আত্মার বিশ্বাস, যে আত্মাসমূহ জীবদেহ ভর করে যে কোন কর্মের হেতু হতে পারে। তৃতীয় স্তরে দেখা যাচ্ছে যে, এই আত্মাসমূহ শুধুমাত্র মানুষের কর্মের হেতুই হচ্ছে না; উপরন্তু মাঝে মাঝে জীবদেহ পরিত্যাগ করে ভাল ও মন্দ দুই-ই ঘটাচ্ছে। এই আত্মাই হচ্ছে মানুষের দৈহিক, কর্মগত ও মানসিক পরিবর্তনের হেতু। দেহ থেকে আত্মার স্বল্পকালীন নিষ্ক্রান্ত হবার ধারণা প্রায় সারা জগতেই পরিব্যাপ্ত। বহু আদিম সমাজের পুরোহিত বা চিকিৎসক বা ওঝার কাজই হচ্ছে দুষ্ট আত্মাসমূহকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া। এই একই যুক্তির দ্বারা আদিম মানুষের স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব। Cranz তাঁর Greenland পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, গ্রীনল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা বিশ্বাস করে যে রাত্রে আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, নাচ-গান করে, শিকার করে, এমন কি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। এই ধরণের বিশ্বাসের অজস্র উদাহরণ টাইলর দিয়েছেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ থেকে আত্মার বহির্গমনের ধারণা আদিম মানুষ থেকে সুরু করে উন্নততর জাতিসমূহের চিন্তাধারার মধ্যেও অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যাবে। Auguste Comte তাঁর Philosophie Positive গ্রন্থে আদিম মানুষের মানসিক গঠন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, বাহ্যিক বস্তুসমূহ, তারা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যাই হোক না কেন, যে আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত, এই ধারণাই অপদেবতায় বিশ্বাসের হেতু। টাইলর এখানে Comte-এর সঙ্গে একমত, তবে তাঁর মতে আত্মাবিষয়ক ধারণাকে পাকা করার জন্য স্বপ্নে বা তন্দ্রায় দেখা সূক্ষ্মদেহকে যথেষ্ট প্রয়োজন, কিন্তু কেন?

## পাঁচ

টাইলরের মতে আদিম মানুষ ছিল একান্তই যুক্তিশীল ও অভিজ্ঞতাবাদী। চোখে না দেখে তার পক্ষে কিছুই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের মানুষের কাছে ভূতের কোন মূল্য নেই, কিন্তু আদিম মানুষের কাছে ভূত যথেষ্টই মূল্যবান, কেন না, রক্তমাংসের মানুষের মত সূক্ষ্মদেহধারী মানুষও তাদের কাছে একান্তই বাস্তব। টাইলর বেশ জোর দিয়েই একথা বলেছেন যে, সভ্যতার নিম্নতম পর্যায়ে মানুষের কাছে আত্মা কোন বিদেহী সত্তা নয়; তার বস্তুরূপ তাদের কাছে অবিসংবাদিত। প্রতিনিয়ত সরূপ আত্মা তাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে—তাদের স্বপ্নে, তাদের রোগে, তাদের ক্লান্তিতে, তাদের মানসিক উত্তেজনায় বা তাদের নেশায়।

আত্মারূপ সূক্ষ্মদেহের যে তার রক্ত-মাংসের দেহটার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, এ বিশ্বাস আদিম-সমাজে বহুল প্রচলিত। দেহের বিকৃতিকরণের প্রভাব যে আত্মার উপর পড়ে আদিম মানুষের এই সক্রিয় ধারণা এই বিশ্বাসেরই পরিণতি। তা ছাড়া আত্মার দৃশ্য-মানতা ভিন্ন তার কণ্ঠস্বর আছে, এ বিশ্বাসও আদিম মনে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। এমন কি আত্মা যে বাস্তব উপাদানে গঠিত, এমন ধারণাও দুষ্প্রাপ্য নয়। বেশির ভাগ আদিম জাতির মধ্যেই এই ধারণা বর্তমান যে, আত্মা অনেকটা বাষ্পীয় ধরণের, পাতলা ধোঁয়ার মত। বিদেহী, আয়তনহীন এবং বস্তুনিরপেক্ষ

আত্মার দার্শনিক ধারণার উদ্ভব আদিম মানুষের মনে হয় নি। মোটের উপর আত্মার প্রকৃতি ও কার্যকলাপ আদিম মানুষের কাছে বেশ সহজ ও সরল, বর্তমান মানুষের কাছে যা বেশ জটিল। আত্মার ধোঁয়াটে পাতলা দেহ, তার দৃশ্যমানতা, গতি এবং বাক-শক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফলে আদিম অ্যানিমিষ্টদের আর কোন অতিরিক্ত কল্পনার প্রয়োজন হয় নি।

## ছয়

টাইলরের মতে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর আত্মার মুক্তি ঘটে, তখন আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়, নিজের ইচ্ছামত যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে। কিন্তু এটুকু বিশ্বাস নিয়েই আদিম মানুষ সন্তুষ্ট ছিল না। যাতে তাড়াতাড়ি আত্মা দেহবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তারা মানুষকে কেটে ফেলে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই প্রকৃতিকে সাহায্য করত। মুণ্ড শিকারের (Head Hunting) যে প্রথা বহু আদিম-সমাজেই বিশেষ-ভাবে আদৃত, তার মূলেও এই বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গতভাবেই কার্যকরী। মৃত্যুর পর প্রেতকার্যে নরবলিদানের মূলেও ঐ বিশ্বাস বর্তমান, তাদের কোন নেতা বা দলের লোক মারা গেলে, তারা তার চাকর-বাকর ও স্ত্রীদেরও হত্যা করত। তারা বিশ্বাস করত—এবং এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত—যে পরলোকগত নেতার আত্মা যাতে সেবা পায় তার জন্য নেতার স্ত্রীদের এবং ভৃত্যদের আত্মাদেরও এক পথের পথিক করে দেওয়া উচিত। সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে এটা হয়ত খুব প্রকট নয়; আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যারা একটু উপরে উঠতে পেরেছে, তাদের মধ্যে এই প্রথা বলবৎ আছে। পারলৌকিক কাজে পশুবলির মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কারণ, নিম্নতম জাতিসমূহের কাছে পশু ও মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদজ্ঞান সম্ভব ছিল না। গাছপালার ক্ষেত্রেও এই একই কথা।

টাইলরের মতে সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে অভ্যন্তরস্থ আত্মা এবং দেহনিরপেক্ষ সূক্ষ্মদেহ এই দুটি ধারণা মানুষের মনে অনিবার্যভাবে প্রথিত। আদিম মানুষ যে, আত্মায় বিশ্বাসের ধারণা কোন উন্নততর জাতির সংস্পর্শে এসে পেয়েছিল এমন বিশ্বাসের কোন হেতু নেই। টাইলরের নিজের কথায় বলতে গেলে—'what has been treated here as the primitive animistic theory is thoroughly at home with the savage who appear to hold it on the very evidence of their senses, interpreted on the biological theory which seems to them most reasonable'.

পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদিও যে আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত এবং সে সব আত্মাও যে গুণগত দিক থেকে মানুষের আত্মার সঙ্গে অভিন্ন—আদিম মানুষের এ বিশ্বাসও টাইলরের মতে একই অ্যানি-মিষ্টিক ধারণার প্রকাশ।

## সাত

তিরিশ বছরেরও অধিককাল ধরে টাইলর কথিত এই অ্যানিমিজম ধর্মের উদ্ভবের কারণ হিসাবে গবেষকদের প্রভাবিত করেছে। অ্যানিমিজম যে সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট স্তরে সর্বজাগতিক বিশ্বাস ছিল, এই কথাকে মোটামুটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবু এর বিপক্ষেও অনেক কিছু বলবার আছে, অনেকে মনে করেন ধর্মের উদ্ভবের কারণ হিসাবে এই অ্যানিমিজম খুব সন্তোষজনক নয়। অ্যানিমিজমকে সর্বপ্রাথমিক ধর্ম বলা যায় না, বরং Hoffding একে বলেছেন, আদিমতম দর্শন। টাইলর নিজেও তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'Animism is, in fact, the groundwork of the philosophy of religion, from the savages upto that of civilized men.'

তা ছাড়া প্রশ্ন উঠতে পারে, অপরাপর কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে আদিম মানুষ কেনই বা আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেল? তার উপাসনার সামগ্রীর মধ্যে এমন কিছু থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, যা তাকে উদ্দীপ্ত করবে, অলৌকিকতায় বা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ধর্মের একটি অঙ্গ, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যানিমিজমে তার কোন স্থান নেই। কারণ যারা মানুষ নয়, অ্যানিমিজম তাদের উপর মানবিক শক্তি আরোপ করে, কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে আস্থা সেখানে স্থাপন করা হয় না। Jevons নদীর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, নদীর অবিশ্রান্ত গতি বর্তমান মানুষের ন্যায় আদিম মানুষের মনেও একটা স্বাভাবিকতার ভাব উদ্রেক করে। টাইলরের মত মানতে গেলে, নদীর গতির পিছনে আদিম মানুষ কোন অতিপ্রাকৃত বা রহস্যময় শক্তির ইঙ্গিত উপলব্ধি করে নি। সে মনে করেছে অপরাপর বস্তুর ন্যায় নদীও আত্মার দ্বারা সঞ্জীবিত, সে যেমন নিজ আত্মার ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই চলে ফিরে বেড়ায়, নদীও ঠিক তেমনি নিজ আত্মার অভিপ্রায়ের বশবর্তী হয়েই ছুটে চলেছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। কিন্তু যা মানুষের মনে কোন বিশেষ আবেগ জাগায় না, তা কি করে ভয় বা ভক্তির পাত্র হতে পারে? যা তার আবেগকে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করে—মানুষ তাকেই ভয় বা ভক্তি করে। কিন্তু অ্যানিমিজমে সে সুযোগ নেই এবং এই কারণেই অ্যানিমিজম ধর্মের উদ্ভবের কারণ নয়।

দ্বিতীয়ত—অ্যানিমিজমের উৎস সন্ধানে টাইলর কতকগুলি Pathological বা অস্বাভাবিক অবস্থার উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করেছেন। এপিলেপ্সি, হিষ্টিরিয়া, ডিলিরিয়াম, ম্যানিয়া প্রভৃতি রোগের ফলে রোগী যে অবাস্তব মূর্তি চোখের সামনে দেখে—এগুলিকেও টাইলর তাঁর অ্যানিমিজম তত্ত্বের আওতায় ফেলেছেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অ্যানিমিজম তত্ত্বে এরা অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া পদ্ধতিগত বিভ্রান্তিও কিছু কিছু আছে।

তৃতীয়ত—অ্যানিমিজমকে দর্শনের প্রথমাবস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হলেও অ্যানিমিজম একান্তই আদিম নয়। আত্মার ধারণা গঠন করার পিছনে দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট বস্তু হিসাবে আত্মার ধারণা ঠিক সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্যায়ের চেতনা হতে পারে না বলে অনেকে মনে করেন। কোন ধর্মীয় চেতনাহীন অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রতিটি বস্তুর উপর আত্মার আরোপণ অসম্ভব। এই কারণেই ম্যারেট (Marett) প্রমুখ অপরাপর পণ্ডিতবর্গ ধর্মের একটি প্রাক-অ্যানিমিজম অবস্থা (Pre-animistic

stage) করনা করেন। Marett এই অবস্থার নাম দিয়েছেন অ্যানিমেটিজম (animatism).

## আট

তথাপি Emile Durkhiem তাঁর Elementary Forms of Peligious Life গ্রন্থে বলেছেন যে, টাইলরের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী ক্লাসিক পর্যায়ের। সংক্ষেপে অ্যানিমিজম হচ্ছে—প্রকৃতিতে 'জীবন ও ইচ্ছাশক্তির' ব্যাপ্তির চেতনা। টাইলর হয়ত কোন কোন বিষয়ের উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচকদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল—তিনি ইউরোপের Age of Reason-এর মোহে পড়েই আদিম মানুষকে অতিযুক্তিশীল করে দেখেছেন; যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে চিন্তা করেছেন, সেই পদ্ধতিই তিনি আদিম মানুষের চিন্তায় আরোপ করেছেন।

টাইলরের সমালোচকরা যে তাঁর প্রতি কতদূর ন্যায়বিচার করেছেন, এই মুহূর্তে তা হয়ত স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয়, টাইলরের সমালোচকরা যে একটি প্রাক-যুক্তিশীল অবস্থা বা Per-logical state-এর কথা বলেন, তার সবটুকু হয়ত সত্য নয়। কারণ, মানুষের দৈহিক গঠন, অপরাপর জীবের তুলনায় তার বহুগুণ শক্তিশালী মস্তিষ্ক এবং জটিল স্নায়ুতন্ত্র থেকে একান্ত আদিম মানুষরাও বঞ্চিত ছিল না। Reason Romanticism and Revolution নামক গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন,

'Taking place in the context of the law-governed physical nature biological evolution is also a rational process. Life is neither an inextricable category called Intuition; nor it is a mysteriously purposive urge; it is a determined physical process.... The reason in man is an echo of the harmony of the universe.'

উপরি উক্ত বক্তব্যের সত্যতা নিঃসন্দেহে আরও অধিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুমোদন সাপেক্ষ, তবে সম্প্রতি ফ্রকফোর্ট, ক্রীথটন, মুজান ল্যাঙ্গার প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণা উপরি-উক্ত বক্তব্যের সত্যতাকেই যেন সমর্থন করে। আমার মনে হয়, Crawley ঠিকই বলেছেন যে, সংস্কৃতির নিম্নতম পর্যায়ে আত্মার ধারণা বুদ্ধিরই একটি অভিব্যক্তি এবং সর্বস্তরে তারই বিকাশ সত্যান্বেষণেরই সূচনা করে এবং এই অন্বেষণের মূলে সেই কৌতূহলের প্রবৃত্তিই বর্তমান, যা হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল উৎস।

# চিরন্তনী

'হইতাম আমি যদি তোমাদের মত,
পারিতে টলাতে মোরে, হতে যদি
পারিতাম কৃপাপ্রার্থী অপরের,
তা হলে নিশ্চয় প্রার্থনাও অপরের
পারিত টলাতে মোরে;
কিন্তু জেনো, নহি আমি অপরের
মত।
আমি স্থির অবিচল ওই ধ্রুবতারা সম—
স্থৈর্যে-গুণে অতুল যে গগন-মণ্ডলে।
শোভিছে আকাশে বটে অসংখ্য
নক্ষত্র-রাজি।
সকলের জ্যোতির্ময়—সবাই উজ্জ্বল,
কিন্তু তাহার মাঝে আছয়ে একটি শুধু—
যে রহে অচল স্থির আপন আসনে।
সেইরূপ ধরাতেও আছয়ে অসংখ্য জন,
রক্ত-মাংস-বুদ্ধি-বলে যাহারা সমান;
কিন্তু তাহার মাঝে আছে জানি
একজন—
যে শুধু অটলভাবে আছে প্রতিষ্ঠিত।
সে নহে অপর কেহ—সে আমি
সীজার; আর,
এ কাজেও তার কি; দিব নিদর্শন।
ছিলাম অটল আমি দিলাম আদেশ
যবে—
'এখনি সে সিন্ধার হউক নির্বাসিত।'
অটল এখনো আছে সেই সে
আদেশ মোর,—
সিন্ধার সে নিবাসিত রহিবে এখনো।'
(জুলিয়াস সীজার, ৩য় অঙ্ক,
প্রথম দৃশ্যান্তর্গত সীজারের সংলাপ)

'তিষ্ঠ ক্ষণকাল, মহাশয়! আছে
কিছু বক্তব্য আমার।
মম সাধ্যমত সাধিয়াছি রাজহিত
কিন্তু, জানে সবে—
আলোচনা নাহি প্রয়োজন তার।
একমাত্র মিনতি আমার—
যবে নিদারুণ সমাচার রাজ্যেশ্বরে
করিবে প্রেরণ—
অবিকল যথাযথ করিয়ো বর্ণন,
নাহি কর দোষ আবরণ,
কিংবা দ্বেষ-ভরে রঞ্জিত কাহিনী
অভাগার।
বোল, প্রেমান্ধ বাতুল—
কিন্তু ভালবাসা ছিল তার অতুল
জগতে।
নহে স্বভাবের দোষে,
কুচক্রীর ছলে পড়ি সংশয়-কবলে
হয়ে মতিচ্ছন্ন—
হারায়েছে হিতাহিত জ্ঞান।
তাই না করি যতন দুর্লভ সে মুকুতা
রতন—
জঞ্জাল যেমন, দেছে ফেলে বর্বরের
মত।
বোল—অশ্রুহীন নীরস নয়ন
গলে নি কখন যার
আজি নিদারুণ ঘায় বর্ষে বারিধার,
বনস্পতি রস যথা অজস্র ধারায়।
রাজপদে নিবেদিয়ো এ সব বারতা।
আর এক কথা—
একদিন আলিপো নগরে,
উষ্ণীষ-মণ্ডিত দুষ্ট তুর্কী একজন,
অপযশ ঘোষিয়ে রাজার,
করেছিল রাজভক্ত প্রজায় প্রহার।
ধরি গ্রীবা তার—
উপেক্ষিয়ে নিশ্চিত মরণ—
দিছি সে কুকুরে আমি দণ্ড এইমত।'
(বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ)।
(ওথেলো, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যের
অন্তর্গত ওথেলোর সংলাপ)

# নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

## তেত্রিশ

### মামলার ফল

১৯০১ সালে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার থেকে 'রঙ্গালয়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যদিও 'রঙ্গালয়' প্রকাশের আগে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় থিয়েটারের নাটক সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশিত হতো, কিন্তু থিয়েটার সম্পর্কিত তেমন সংবাদ বা নিবন্ধ বড় একটা প্রকাশিত হতো না। এই অভাব মোচন করার জন্যে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' প্রকাশ করেন।

রঙ্গালয়ের অনুষ্ঠান-পত্রে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'নানাবিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক, প্রতিপদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা। যদি প্রয়োজন হয়,—উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ, আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রমাণ করিব। আপাততঃ স্থানোপযোগী হইবে না বলিয়া বিরত হইলাম।

একে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষগুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন—'অমুক স্থানটি ভাল হয় নাই!'—কেন ভাল হইল না, মন্দ কোনখানটার, এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে, সে সকল কথা কেহ বা বলে, আর কেহ বা শোনে!! অথচ আমাদের এমন কোন উপায় নাই যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য, আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়। রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে, 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত হইবে।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ওপর সম্পাদনার ভার দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' চালাতে লাগলেন। দীর্ঘ চার বৎসরকাল 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়'কে জনপ্রিয় করার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করেছিলেন। রঙ্গালয়ের গ্রাহকদের 'অমর গ্রন্থাবলী', 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' উপহার দেওয়া, এমন কি রঙ্গালয়ের গ্রাহকদের বছরে একদিন বিনামূল্যে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এর দ্বারায় প্রচুর গ্রাহক হয়েছিল 'রঙ্গালয়'-এর। অমরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, রঙ্গালয়ের এক লক্ষ গ্রাহক করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই পয়সা, অথচ প্রতিটি সংখ্যা ছাপাতে সে সময় খরচ পড়তো ছয় পয়সা। এইভাবে চার বৎসর সাপ্তাহিক 'রঙ্গালয়' চালিয়ে অমরেন্দ্রনাথের ষাট হাজার টাকা লোকসান হয়। 'রঙ্গালয়'-এর নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি তদানীন্তন কালের দিকপাল নাট্যকারেরা।

এই চার বৎসর কাগজ চালানোর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে দুটি মামলার সম্মুখীন হতে হয়। একটি 'নবযুগ'-এর সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে, অপরটি 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

প্রথমটি 'নবযুগ' সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের নামে মানহানির মামলা করেন অমরেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়টি অমরেন্দ্রনাথের নামে মামলা করেন 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ। পূর্ণবাবুর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করার ব্যাপারে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন। পূর্ণবাবুর ইচ্ছা ছিল তিনিই সম্পাদক হন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়িবাবুকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। পরে পূর্ণবাবু তাঁর কাগজে অমরেন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে প্রবন্ধ লেখেন, এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মামলা সুরু হয়। আর অপর মামলাটি হয়, রঙ্গালয়ে উপেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে মামলাটি সহজেই মিটে যায়। কিন্তু পূর্ণবাবুর সঙ্গে যে মামলা চলে, সে মামলাটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। নিম্ন-আদালতের বিচারে পূর্ণবাবুর কারাদণ্ড হয়। পূর্ণবাবু হাইকোর্টে আপীল করেন। দীর্ঘদিন মামলা চালাতে গিয়ে পূর্ণবাব বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে আসেন ও অমরবাবুর ঘরে প্রবেশ করেন। অমররাবু সসম্মানে তাঁকে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পূর্ণবাবুর মুখে তাঁর আর্থিক অভাবের কথা জানতে পেরে সেইদিনের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ পূর্ণবাবুর হাতে তুলে দেন। সেদিন অমরেন্দ্রনাথের মহত্বে মামলারই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটে না, সেই সঙ্গে বন্ধুত্বেরও চরম নিদর্শন চিহ্নিত হয়ে থাকে।

**রাজধানী :**

পর্বত আবার মূষিক প্রসব করেছে। পাঁচদিন ধরে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার পর একটি যুক্ত ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার মামুলী সঙ্কল্প ঘোষণা ভিন্ন আসল সমস্যার কোন সুরাহাই হয় নি।

অবধারিত ফলই ফলেছে। পাক-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তাবনা-কালেই আমরা যা বলেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, তাঁদের নিরাপদে ভারতে প্রবেশের সুযোগ দেবার প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গিয়ে ভারত থেকে বিতাড়িত পাকিস্তানী নাগরিকদের প্রশ্নটি কৌশলে তুলে ধরেছে। এই বে-আইনী অনু-প্রবেশকারীদের বিতাড়নের ফলে পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা হয়েছে বলে তাঁরা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। এখানেই শেষ নয়। এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য ভারত, পাকিস্তান এবং অপর কোন দেশের হাইকোর্টের তিনজন জজকে নিয়ে ট্রাইবুন্যাল গঠনের উদ্ভট প্রস্তাবও তারা করে বসেছে।

যুক্ত ইস্তাহারে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বৈঠক ভেঙে যায় নি---চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র। আরেক চক্কর আলোচনা হবে করাচী অথবা রাওয়ালপিণ্ডিতে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আগামী দিনের বৈঠকে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে আশার বাণী প্রচার করেছেন। আশা করা ভাল। আশাবাদীরা গেয়ে গেছেন, 'আশা কর জগৎবাসী, আশায় মরা বাঁচে।' কিন্তু আশারও একটা সীমা আছে। অলীক মায়া-মরীচিকার পেছনে ধাবিত হলে প্রাণ বাঁচানো তো দূরের কথা প্রাণ নাশেরই সম্ভাবনা বেশি। জন্মলগ্ন থেকে ভারতের শত্রুতা সাধন যাদের একমাত্র উপজীব্য তাদের পেছনে ধাবিত হওয়া নিরর্থক।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ভারত

● দণ্ডকারণ্যের পথেও উদ্বাস্তুদের বিষাদক্লিষ্ট চোখেমুখে ভাবনার এক শেষ---আবার ঘর হবে গড়া কবে?

অক্ষরে অক্ষরেই মেনে চলেছে। পাকিস্তান সে-চুক্তিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষাই করে নি, তারা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নয়া অর্ডিন্যান্স জারী করেছে---নিষিদ্ধ করে দিয়েছে হিন্দুর সম্পত্তি হস্তান্তর পর্যন্ত। দাঙ্গায় যাঁরা নিঃস্ব হয়েছেন তাঁরা ঘরবাড়ি তোলবার সরঞ্জাম কেনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করেও সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি পান নি। আলোচনা কালে শ্রীনন্দ এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীহবিবুল্লা খাঁ এক কথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান তার নিজের সর্ত অর্থাৎ বিতাড়িত পাকিস্তানী নাগরিকদের ভারতে ফিরিয়ে পাঠাবার সর্তে মীমাংসা ভিন্ন কোন বিষয়েই আলোচনায় সম্মত নয়। সম্মতি তারা দিতেও পারে না। পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিকল্পনা মাফিক। উদ্বাস্তু সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হলেই তাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। কয়েক বছর ধরেই তারা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে অমুসলমানদের উচ্ছেদ করে চলেছে। বছর কয়েক আগে রাজসাহীর সীমানার হিন্দুদের বিতাড়িত করেছে। এবারে তারা যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকা সাফ করার কাজে হাত দিয়েছে।

পাকিস্তানের দিক থেকে সামান্য-তম আন্তরিকতা থাকলেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটতো। আলোচনা চলা-কালে চলে আসতো না হাজারে হাজারে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষগুলো তাদের পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে---আসতো না দলে দলে চাকমা উপজাতি চাটগাঁর পার্বত্য এলাকা থেকে।

এই চাকমা উপজাতিরা বৌদ্ধ। এদের মতই ময়মনসিংহের কৃষিজীবী খৃষ্টানেরা পাকিস্থানের রাজনীতির সাতে-পাঁচে ছিল না। সীমান্ত অঞ্চল অমুসলমানশূন্য করা ভিন্ন এই নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

সীমান্ত এলাকা থেকে হিন্দু

বৌদ্ধখৃষ্টানদের উচ্ছেদে ভারতের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন দশমনি চালাবার, ভারতকে নানাভাবে বিব্রত ও নাজেহাল করার কাজটা হবে অত্যন্ত সহজ। অপর দিকে আটকা পড়বে সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানের খাঁচায়।

এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। পাকিস্তানের নরককুণ্ড হয়ে উঠবে

● শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

আরও বীভৎস। সংখ্যালঘুদের এই নরক যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে উচিত ছিল আরও বলিষ্ঠ নীতি অথবা 'আদার এখড' অনুসরণ করা। তা' সম্ভব হয় নি। কিন্তু একথাও ঠিক পাকিস্তানের বদ্ধ কারাগারে অসহায়ের ক্রন্দন উঠলে ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই যারা মুক্তির আশায় এপারে চলে আসছে তাদের পথ সহজ ও সুগম করে তোলার এবং এপারে এলে একটু মমত্ব দিয়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয়-দানের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।

আমরা কি এ কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করে উঠতে পারছি? সরেজমিনে সীমান্ত এলাকায় উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা যাঁরা দেখে এসেছেন, দণ্ডকারণ্যের মানা শিবির যাঁরা ঘুরে এসেছেন, তাঁরা একবাক্যে বলেছেন—উদ্বাস্তুরা তপ্তখোলা থেকে ছিটকে আগুনের মধ্যেই পড়েছে।

এ কাজে সর্বাধিক দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল পশ্চিম বাংলার। উদ্বাস্তুরা তাদেরই স্বজন। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস গারো পাহাড়ে বিনা মাইগ্রেশনে সমাগত খৃষ্টান উদ্বাস্তুদের জন্য প্রতিদিন আসাম সরকার লক্ষ টাকা ব্যয় করলেও পশ্চিম বাংলা সরকার গোড়া থেকেই ফতোয়া জারী করে বসে আছেন, বিনা মাইগ্রেশনে যারা আসবে তাদের দায় ও দায়িত্ব সরকারের নয়। সীমান্তে পশ্চিম বাংলার কর্মচারীদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মাইগ্রেশন যাদের আছে তাদের বাছাই করে ট্রেনে তুলে দিয়ে দণ্ডকারণ্যে পাচার করা। আর যারা মাইগ্রেশন ছাড়া দীর্ঘপথ হেঁটে, পাকিস্তানের দস্যুদের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে আসছে, তাদের দিকে তাকাবার, এমন কি, একটা সহানুভূতির কথা বলবার মানুষ পর্যন্ত সেখানে রাখা হয় নি। দিনান্তের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দেহে এই একান্ত অসহায় মানুষগুলো এলিয়ে পড়ছে যেখানে সেখানে। এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় পুলিশের হাতে জোর জুলুম এবং লাঞ্ছনার অভিযোগেরও অভাব নেই।

আমাদের প্রতিনিধি দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনের পর প্রশ্ন তুলেছেন, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, নিখিল ভারত নারী সম্মেলন, বিভিন্ন সেবা সংস্থাগুলো আজ কোথায়? কলকাতার বুকে বসে যাঁরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেন, তাঁদের পাত্তা নেই কেন? মাঠে-ময়দানে উদ্বাস্তুদের দরদে যাঁরা গলাবাজী করেন তাঁরাই বা কোথায়? পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসই বা কি করছেন? ত্যাগ ও সেবাব্রতের জন্য যে-জাতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেই বাঙালী জাতির এই অধঃপতনের কথা শুনলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রতিনিধি ঠিকই বলেছেন, অধঃপতন ঘটেছে গোটা বাঙালী জাতটার এতে কোন সন্দেহ নেই। কেন এমন হল? একটা জাতির জীবনে অধঃপতন ঘটে তখনি যখন নেতৃত্ব হয় আদর্শভ্রষ্ট। জাতির কর্ণধার-গণ যখন ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তখন জাতিকে পথ দেখাবার লোকের হয় অভাব—জাতি হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। পশ্চিম বাংলার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা আজ আর বলিষ্ঠ হাতে হাল ধরতে পারছেন না।

উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের তঞ্চী মনোভাব আজকের নয়। নয়া বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আমল থেকে সুরু করে আজকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমল পর্যন্ত একটানা একই ইতিহাস চলে আসছে।

একমাত্র শ্রীমতী রেণুকা রায় এবং তাঁর সময়ের কমিশনার শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দরদের সঙ্গে

● শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বাস্তুদের কথা কেউ ভাবেন নি। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ভবন একটু তৎপর হলে উদ্বাস্তুদের কল্যাণে অযথা যে-টাকা জলের মত ব্যয় হয়েছে, তা' দিয়ে উদ্বাস্তু সমস্যার তো সমাধান

হতেই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে এ রাজ্য আরও সমৃদ্ধ হতে পারতো।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছেন, তিনি উদ্বাস্তুদের এত দাবী, এত হাহাকার কেন, তার 'মানে' বের করতেই এখনও হিমসিম খাচ্ছেন। এই ভদ্রলোকের অযোগ্যতা, উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর বিমুখতার জন্য সকলেরই তিনি বিরাগভাজন। শোনা যাচ্ছিল শ্রী জে কে রায় এই দপ্তরের ভার নেবেন। কিন্তু কোন গোপন হস্তের কারসাজিতে, কি করে তিনি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল রইলেন, বোঝা যাচ্ছে না।

ভাগ্যের আবর্ত এমনি কঠোর যে, কেন্দ্র থেকে বীর বিক্রমে এসে উদ্বাস্তুদের মুক্তিদাতার ভূমিকায় প্রধান নায়ক যিনি হলেন, তিনি সমস্যাটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছেন।—সবটাই একেবারে ল্যাজে-গোবরে জড়িয়ে গেল। তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় বিরাট অর্থ ব্যয়ের পরও আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হল না।

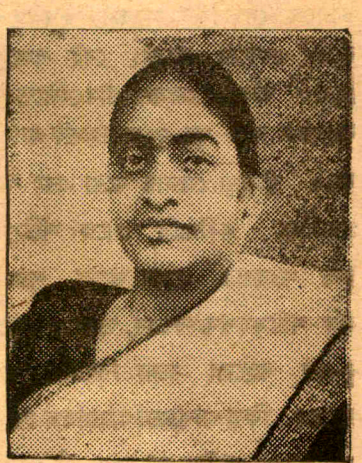

● শ্রীমতী আভা মাইতি

এই গর্বিত পাঠানের দাপটে স্বর্গত সুকুমার সেনের মত যোগ্য ও দূরদর্শী ব্যক্তি পর্যন্ত বিব্রত বোধ করেছিলেন। খাদ্য-জনসন চক্র আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে জাতির চরম বিপদের দিনেও নাকি শ্রীশৈবাল গুপ্তকে পদে পদে বাধা দিচ্ছেন। ফলে, মানা ও কুরুট শিবিরে উদ্বাস্তুদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে। আর পশ্চিম বাংলার মুরুব্বিরা খাদ্যার হাতের গঞ্জিকা টেনে শিবনেত্র হয়ে বসে আছেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরাও আজ বলতে বাধ্য হচ্ছেন, পশ্চিম বাংলা তার কর্তব্য পালন করে নি। মধ্যপ্রদেশের একজন অফিসার আমাদের প্রতিনিধিকে বলেছেন, 'পশ্চিম বাংলা তাড়াহুড়ো করে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠিয়ে নিজের দায় সারছে। এখানে এঁদের ভাগ্যে কি ঘটছে না ঘটছে, তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ নেই।'

এ অভিযোগ মিথ্যে নয়। যেখানে মাত্র দশ হাজার উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছিল সেখানে শ্রীখাদ্যার শ্রীমুখের আশ্বাস পেয়ে ৬৫ হাজার লোককে নিয়ে গাদা করার অর্থই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। সেখানে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই, তাঁবু ছাড়া এই কাঠফাটা রোদে মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। কাজেই রোগ দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে। এই ৬৫ হাজার মানুষের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র ছ'জন। অথচ, আমাদের উদ্বাস্তু-মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি এসব কথা একবাক্যে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শ্রীনির্মলেন্দু দে, শ্রীবীজেশ সেন এবং শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর কিন্তু তাঁর মত ফাঁকা আওয়াজ করতে পারেন নি। আমরা আরেকবার যা' বলেছিলাম, সেই কথাটি পুনরায় শ্রীমতী মাইতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ফাঁকা বুলিতে বিপদ আছে। যে বিপদে তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব একবার পড়ে নাজেহাল হয়েছিলেন। ফলে, আজ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিসভায় তাঁর পুনর্বাসন সম্ভব হয় নি। শ্রীমতী মাইতি নারীত্বের গৌরব নিয়ে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে নেমে পড়লে ভালই করবেন। দেশের মানুষ ও উদ্বাস্তুরা তাঁকে স্নেহময়ী জননীরূপে পেলে দু'হাত তুলে আশীর্বাদই করবে। তা' করতে না পারলে

● শ্রীনির্মলেন্দু দে

উদ্বাস্তুদের জীবনে যে-ট্র্যাজেডি দেখা দেবে তা' থেকে তিনি নিজেও মুক্তি পাবেন না। তিনি যেন ভুলে না যান, অধিকাংশ উদ্বাস্তু তাঁর মত পরিবারেরই সন্তান। এদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান ছাড়াও মানসিক বিকাশের খোরাক প্রয়োজন। দণ্ডকারণ্যে তার কোন সম্যক ব্যবস্থা নেই। বাংলার পক্ষ থেকে এ সকল সমস্যা তাঁকেই তুলে ধরতে হবে। উদ্বাস্তুদের সামগ্রিক পুনর্বাসন ভারত সরকারের দায়িত্ব হলেও এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার এবং সে রাজ্যের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রীর। কর্তব্য পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ক্ষমার চোখে দেখবে না।

* * *

রিভার স্টিম ন্যাভিগেশন এবং ইণ্ডিয়ান জেনারেল ন্যাভিগেশন কোম্পানী দেশীয় মালিকানার হাতে আসতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এই কাজটি সাধিত হলে পূর্ব ভারতের নদীপথে বৃটিশ কোম্পানীর একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটবে।

এই কোম্পানী দু'টি জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানী বলেই অভিহিত হয়। পূর্বপাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আসাম ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে মাল বহনের কাজ এরা করে। এদের কারসাজিতে ভারতীয় লস্কর জাহাজগুলোতে কাজ পাচ্ছে না। পাকিস্তানের লস্করদের ধর্মঘটের পর এদের ক্ষতির খেসারত এরা চেয়ে বসেছে ভারত সরকারের কাছে। সে অর্থ না পেলে কোম্পানী পাততাড়ি গোটাবে বলেও নাকি হুমকি দিয়েছে।

বর্তমান আলোচনা কার্যকরী হলে বিড়লা নেবেন ২৫ ভাগ শেয়ার এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম নেবেন ২৫ ভাগ শেয়ার।

## দার্জিলিং :

**শিলিগুড়ি :** মহানন্দা পাড়ার বুকের উপর হঠাৎ একটি মদের দোকান গজিয়ে ওঠার পর থেকে শহরময় বিরাট তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত এই পল্লীটিতে ভদ্রলোকের বাস। কিন্তু আমাদের শাসনতন্ত্রের কেরামতিই আলাদা—কখন, কার স্বার্থে, কি ভাবে সে যন্ত্র পরিচালিত হয়, বোঝা ভার। এই দোকানটিকে তুলে ভিন্ন জায়গায় নেবার আবেদন ডেপুটি কমিশনারের কাছে বারবার করা হয়েছে। তিনি নাকি এ বিষয়ে সহানুভূতিশীলও, কিন্তু সে সহানুভূতি সহায়ক হচ্ছে না কাজের বেলা। তিনি নাচার—জানিয়েছেন এ কাজ তাঁর ক্ষমতার বাইরে। ভদ্রপল্লীর শান্তি ও সম্ভ্রম বিপন্ন হলে তাঁর করণীয় কি কিছুই নেই ?

প্রথম দিকে স্থানীয় লোকের আন্দোলনের চাপে পড়ে দোকানটি একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। কোন গোপন স্থানের মদত পেয়ে আবার গা'ঝাড়া দিয়ে উঠে পাকা-পাকি ব্যবস্থার কাজ সুরু হয়ে গেছে। গেল ২৩শে মার্চ নাকি দোকানটির জমি রেজেষ্ট্রী হয়। পৌরসভার প্ল্যান ছাড়াই বাঁশের বেড়া দিয়ে দোকানের পত্তন করা হয়েছিল। এখন চলেছে পাকা গাঁথুনির কাজ। নিশ্চয়ই পেছনে বেশ পাকা হাতও কাজ করে চলেছে ? স্থানীয় লোকদের অভিযোগ, পৌরসভার প্ল্যান যার নেই, সেখানে সিমেণ্ট এলো কোন অদৃ লোক থেকে ? এখানে আমাদের প্রশাসনের বাহুগুলো —পুলিশ ও পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট বাহিনী নীরব কেন ?

মদের দোকান খোলায় আমাদের আপত্তি নেই। পশ্চিম বাংলায় আজও এ মালটি সাধারণ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি। কিন্তু ঐ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, মদ্যাসক্তদের প্রতি সমাজজীবন সুপ্রসন্ন নয়—তারা এখনও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে কিছুটা অপাংক্তেয়। মদের দোকানের লাইসেন্স তাই সরকার যত্রতত্র দিতে পারেন না। এ কাজ করা সমাজদ্রোহিতার সামিল বলে আমরা মনে করি।

আশা করি, এই সব দিক চিন্তা করে আমাদের সরকারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হবে। মহানন্দা পাড়ার দোকান-টিকে তুলে দিয়ে নিরাপদ স্থানে তাকে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন। স্থানীয় অধিবাসীরা, জাতীয় মহিলা সমিতির নেত্রী শ্রীমতী শঙ্করী চৌধুরী ও শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই দোকানটি স্থানান্তরের আবেদন আবগারী বিভাগের মন্ত্রী থেকে সুরু করে পার্লামেণ্টের সদস্য ও সদস্যার কাছে পর্যন্ত পেশ করেছেন। এঁদের আবেদন ব্যর্থ হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা বেশি।

## মেদিনীপুর :

এই জেলার সবং ময়না ও নারায়ণ-গড় থানা এলাকার বাঁধে সংস্কারের অভাবে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। জমিদারী আমলের বাঁধগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে সরকারের সেচ দপ্তরের হাতে। সরকারের গাফিলতিতে ৩০ বর্গমাইল পরিমিত জমির জল নিকাশ সম্ভব হচ্ছে। এই জমিগুলোতে ধান ও পাট দুই-ই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ নিয়ে আবেদন-নিবেদন স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে কম হয় নি।

খাদ্যসঙ্কট যে-রাজ্যে চরমে এসে পৌঁছেচে সে রাজ্যের ৩০ বর্গমাইল জ.ন নিষ্ফলা করে রাখা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ। অবিলম্বে এর প্রতিকার হওয়া উচিত।

## বাঁকুড়া :

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও নিদারুণ জলকষ্ট সুরু হয়েছে। অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল শুকিয়ে গেছে, কুয়োগুলির অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তা থেকে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায় তা একটি ছোট পরিবারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। বছরের পর বছর যেখানে এই দশা চলেছে, সেখানে জলকষ্ট দূর করার মতো কোনো প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। বাঁকুড়া জেলার গ্রামগুলিতে জল সরবরাহ করা খুব দুঃসাধ্যজনক ব্যাপার নয়। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে এবং পাশে প্রবাহিত নদীগুলি থেকে পরিস্রুত জল সরবরাহ করার জন্যে সরকার যদি পরিকল্পনা করেন, তাহলে জলকষ্ট দু-এক বছরের মধ্যে নিবারিত হতে পারে। কিন্তু আপাতত প্রয়োজন হচ্ছে, অন্ততপক্ষে পানীয় জলের। এই সমস্যা থেকে বাঁকুড়ার নিরুপায় মানুষগুলিকে বাঁচাতে হলে সরকার গ্রামগুলিতে অবিলম্বে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করুন

# পার্ক ষ্ট্রীটের কথা-বিচিত্রা

কেবল সরণীরূপেই সার্থক বা সুশোভন নয়, বিত্ত-বৈচিত্র্যের উত্তম উদাহরণ পার্ক ষ্ট্রীট। স্থিতি-বিন্যাস তার বিধৃত এক মহিমান্বিত ছন্দে। তার প্রতুল বর্ণের অভিরাম সাযুজ্যে যে-আভিজাত্যের প্রণয়ন—তা বৈষম্যের অপঘাতে একদেশদর্শী নয়। তার সার্বিক চিত্রের সুসংগত বহিঃপ্রকাশ যেমন অনির্বেদ গাম্ভীর্যে অটল, তেমনই সর্বজনগ্রাহ্যে অতি সরল। পূর্ব থেকে পশ্চিমের আসীমান্তে সে মুখর, কিন্তু কোলাহল বিধ্বস্ত নয়, পায়ে-পায়ে তার ব্যস্ততার মঞ্জীর বাজে মৃদুরোলে; সেখানে উদ্ভ্রান্ততার চরণ নিক্ষেপে কোনো উচ্ছৃঙ্খল ঝঙ্কারের পদসঞ্চার নিষিদ্ধ। তার উত্তর এবং দক্ষিণ বাহু যেমন বিপণি সম্ভারের অক্ষয় অলঙ্কারে বিভূষিত, তেমনই সুনিয়ন্ত্রণের সেতুবন্ধে অধিষ্ঠিত যে মহলসমূহ—তাদের শালীন-কারুকার্য তাকে মাধুর্যাভিষিক্ত করেছে অনেক বেশি। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এবং সূর্যাস্তের পর মধ্যযামের মন্থরাভিসার পর্যন্ত—নানাজনের শান্ত মিছিল চলে এখানে। কত বিচিত্র তাঁদের বেশ, কত বৈভব তাঁদের সজ্জায়! তাঁদের জন্যেই অক্লেশে দ্বার খোলা রাখে বিপণি, অনাহত অনুপম বিস্তৃতি পেতে অপেক্ষা করে ফুটপাথ এবং রাজপথ তার দীঘল কৃষ্ণাঙ্গের লাবণ্য তুলে ধরে আলোয়। শীত-গ্রীষ্ম অথবা বর্ষা-বসন্তেও তার নিত্য-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। কেবল নগর-নিসর্গের খেয়ালসূত্রেই মাঝে মাঝে তার রূপ বদলায়, তবু মহানগরীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর এখানে নিষ্কলুষ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা তার অতিক্রান্তির লগ্নে বিশেষ এক বিবিক্ত অঞ্চলরূপেই পরিগণিত ছিল পার্ক ষ্ট্রীট। তখন তার অবস্থান ছিল কোনো এক আদি-অরণ্যের উপকণ্ঠে। বুকে তার বিক্ষিপ্ত বাদামবৃক্ষের সমাহার ছিল শোনা যায়। তাই সেকালের জনসমাজ তার নামকরণ করেছিল বাদামতলা।

এই বাদামতলারই দক্ষিণ ভূমিখণ্ডে দিনে দিনে প্রতিষ্ঠা পায় ডানকান সাহেবের বস্তি—যার বিস্তার ছিল বর্তমান ক্যামাক ষ্ট্রীট থেকে উড ষ্ট্রীট পর্যন্ত। ডানকান সাহেবের সঞ্জীবনী

● চৌরঙ্গী থেকে পার্ক ষ্ট্রীটের সূচনার অংশ।

প্রেম এবং বরাভয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই তাঁর বস্তির আয়তন বৃদ্ধি করে অজস্র তন্তুবায়, সূত সম্প্রদায় এবং কৃষক-সমাজের পাশাপাশি কিছু নাথযোগী। তাছাড়া ঘর-কয়েক ফিরিঙ্গী পরিবারের আবির্ভাব ঘটে সেখানে। তখন বিধানের এমন কঠিন বন্ধনে অসহায় ছিল না কেউ; শাসনের ধনুকবন্দী শায়কের মুখোমুখি ভয়ার্ত ছিল না স্বাধীনতার মন। তাই তখন ডানকান সাহেবের সেই বস্তি-সমাজের স্বাধীন পরিক্রমা ছিল

## শ্রীপদাতিক

আপন খেয়ালের কক্ষপথে এবং দিনের পর দিন সেভাবেই সেখানে প্রতিষ্ঠালাভ করে একটি নির্বিবাদী পৃথিবী।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাদামতলার পূর্বপ্রান্তিক রেখায় প্রতিষ্ঠা ঘটে সমাধিক্ষেত্রের। এই সমাধিক্ষেত্র রচনা করেন সে-যুগের খৃষ্টান সমাজ। সেই সূত্রেই বর্তমান চৌরঙ্গী থেকে, বাদামতলার বুক চিরে সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি সংকীর্ণ পথের—যা নাম ধারণ করে 'Road to burial ground.' এই Road to burial ground সরু অথবা সংকীর্ণ হলেও, সপিল ছিল না। লাল ইটের গুরকি বিছানো পথটি ছিল একান্তভাবেই নির্জন এবং ছায়াঘন। তার উভয় দিকে, বাদামবৃক্ষের পাশাপাশি নতুনভাবে রোপণ করা হয় কিছু পাইন, অজস্র ঝাউ এবং অসংখ্য দেবদারু। স্বল্পকালের ব্যবধানেই যৌবন-প্রাপ্তি ঘটে তাদের; ঘন সবুজ অলক-গুচ্ছের স্বরগ্রামে ঝরে বোদের সোনা; শুরু হয় চপল হাওয়ার লুকোচুরি। তাদের সঙ্গেই আলাপে-প্রলাপে দিন কেটে যায় বাদামতলার, কাল কেটে যায় নিলিপ্ত লাল পথের।

তারপর দেখতে দেখতে উত্তীর্ণ হলো লর্ড ক্লাইভের কাল। তিনি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কলকাতায় এলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। হেষ্টিংসের সহায়করূপে এলেন অসংখ্য ইংরেজ রাজপুরুষ। তন্মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের কুখ্যাত বিচারক এলিজা ইম্পে অন্যতম। এই এলিজা ইম্পেই তাঁর বসতবাটী নির্মাণের স্থান নির্বাচন করেন বাদামতলার পূর্বপ্রান্তিক সীমায় এবং অচিরেই সে-বসতবাটীর গাথিক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ ঘটে হেষ্টিংসের নির্দেশে। হেষ্টিংসের অন্যতম প্রণয়িনী, অর্থাৎ মিসেস এলিজা ইম্পের বাতিক অনুসারেই, বসতবাটীর সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে রচিত হয় এক মনোহারী পার্ক বা উদ্যান। এই উদ্যান বা পার্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য: হরিণশিশু প্রতিপালন। সুন্দরবন থেকে আহরণ করে আনা হয় অজস্র হরিণশিশু। তারপর তাদেরই অবাধ বিচরণ-ভূমিরূপে সে-উদ্যান নির্বাচিত হওয়ায়

তার নামকরণ হয় 'Deer Park'. এই Deer Park প্রতিষ্ঠার পরেই তার পার্শ্ববর্তী Road to burial ground সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয় এবং তা রূপান্তর লাভ করে মহানগরীর এক অন্যতম সরণীতে। তারপর উল্লেখিত পার্কের সূত্রেই Road to burial ground যে আবার নামধারণ করে 'পার্ক ষ্ট্রীট'—তা কিছুদিন আগেই বিবৃত হয়েছে এই পর্যায়ের ক্রী-স্কুল ষ্ট্রীট সংক্রান্ত নিবন্ধে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই পার্ক ষ্ট্রীটেই প্রতিষ্ঠা ঘটে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির—যা এদিনেও বিদ্যমান আগের মতোই অথবা আগের চাইতে আরও অনেক পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপে। তার প্রতিষ্ঠাতা ভারতবন্ধু স্যার উইলিয়াম জোন্স। তিনি তৎকালেই তাঁর এক স্বরচিত নিবন্ধে সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

'The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature.'

এই সোসাইটি-গৃহ নির্মাণ করেন তৎকালীন ফরাসী স্থপতি মঁসিয়ে জ্যাকো পিচার। গৃহ-নির্মাণ বাবদ সেকালেই খরচ হয়েছিল ত্রিশহাজার টাকারও বেশি।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় পনেরো বছর পর 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে এক মুখপত্রের প্রকাশ ঘটে এখানে। এই মুখপত্রের স্থিতিকাল ১৭৯৯ থেকে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ। তারপর সাংবাদিক জে ডি হারাট কর্তৃক সোসাইটির পক্ষ থেকে 'গ্লিনিংস ইন সাইন্স' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেমস্ প্রিন্সেপ কর্তৃক উক্ত পত্রিকাই আবার নব-রূপায়ণে নাম ধারণ করে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক অব বেঙ্গল'।

প্রথমদিকে ইংরেজ সরকার সোসাইটির সাহায্যকল্পে কোনো ভাতার প্রবর্তন করতে নারাজ ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে 'অনারেবল বোর্ড অব ডাইরেক্টস' প্রতি মাসের ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করেন পাঁচ শ' টাকা। তারপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের 'The Imperial Government' উক্ত পাঁচ শ' টাকার সঙ্গে যোগ করেন আরও প্রায় আড়াই শ'।

প্রয়োজনবোধে সোসাইটির সংগ্রহশালা চৌরঙ্গীর যাদুঘরে স্থানান্তরিত হলেও, আজও এখানে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, উর্দু এবং সংস্কৃতের পাশাপাশি তিব্বতীয়, চীনা, বর্মীয়, শ্যামীয়জ—প্রভৃতি ভাষার বহুমূল্য প্রাচীন গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি এবং চিত্রসম্ভার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক এবং টিপু সুলতান প্রতিষ্ঠিত মহীশূর-পাঠাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজিরও সমাবেশ ঘটেছে এখানে। তাছাড়া প্রথমদিকে এখানেই 'গুলিস্তাঁ'র আদি পাণ্ডুলিপি, মোগল বাদশাহ আকবর স্বাক্ষরিত 'কোরাণ', 'বাদশাহনামা'—প্রভৃতি দুর্লভ গ্রন্থসম্ভারেরও সংরক্ষণ ঘটেছিল। পরে সেগুলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয় ইংরেজ সরকারের আবেদন অনুসারে।

পার্ক ষ্ট্রীটের যে-অংশে অধিষ্ঠান ঘটেছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং স্কুলের, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেখানেই প্রতিষ্ঠা পায় 'সাঁ-সুশী' (Sans-Souci) থিয়েটার-গৃহ। এই থিয়েটার-গৃহেরই প্রথম-রজনীর অভিনয়ে অবতীর্ণা হন সে-যুগের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী মিস্ এস্থার লিচ—যিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন 'for talent and personal attractions without a rival, even in England'. কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত প্রথম রজনীর অভিনয়-মুহূর্তেই হঠাৎ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন এবং দিন-কয়েক পর সে-কারণেই তাঁর দেহান্তর ঘটে কলকাতার এক নিভৃত চিকিৎসালয়ে।

মিস্ এস্থার লিচ ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের সার্জেন-মেজর জন লিচের রূপসী দুহিতা। শৈশবে তিনি শিক্ষালাভ করেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অবস্থিত তৎকালীন শিশু-বিদ্যালয়ে। তারপর কলকাতার কোনো এক মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভের পর অভিনয়-শিল্পে যোগদান করেন কিশোরী এস্থার লিচ। কৈশোর থেকে যৌবনের মধ্যাহ্নকাল অবধি, তাঁর অজস্র রজনীর বিস্ময়কর অভিনয়ই মহিমামণ্ডিত করে কলকাতার একাধিক থিয়েটার-গৃহকে। যৌবনকালে তিনি যোগদান করেন চৌরঙ্গী থিয়েটারে। শোনা যায় : সেখানেই এক সুদর্শন অভিনেতা মিস্ লিচের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন এবং মিস্ লিচ-ও নাকি উক্ত অভিনেতার ঐকান্তিক প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। পরস্পরকে তাঁরা উপলব্ধি করেন গভীরভাবে এবং হৃদয়গত দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে দান-প্রতিদানের পালা চলে বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন, তাঁদের পূর্বরাগের পর অনুরাগের পর্ব যখন অন্তহীন গভীরতার সন্ধানার্থী, ঠিক তখনই হঠাৎ অগ্নি-সংযোগের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় চৌরঙ্গী থিয়েটার। তাই অবসর পেয়ে এস্থার লিচ এবার রওয়ানা হন ইংলণ্ড দর্শনে। যাত্রাকালে তিনি তাঁর প্রেমিক অভিনেতাকে প্রতিশ্রুতি দেন : ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেই তাঁর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন পরিণয়সূত্রে।

কিছুকাল পরেই ইংলণ্ড থেকে যথারীতি ফিরে আসেন মিস এস্থার লিচ। তিনি ফিরে আসতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তৎকালীন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ইষ্টকেলার। মিঃ ইষ্টকেলারের একান্ত ইচ্ছা : তিনি এক নতুন থিয়েটার-গৃহের পত্তন ঘটাবেন—যদি মিস লিচ সেখানে অভিনয় করতে রাজি হন। প্রস্তাব অতি উত্তম, অর্থাৎ তা মিস লিচের নিগূঢ় অভীপ্সারই অনুসারী। তাই এ-ব্যাপারে তাঁর গররাজির কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অতএব, মিঃ ইষ্টকেলারের প্রচেষ্টাতেই পার্ক ষ্ট্রীটে গড়ে ওঠে সাঁ-সুশী থিয়েটার-গৃহ—যার প্রথম রজনীতেই আবার পুনঃ প্রকাশিতা হবেন অদ্বিতীয়া এস্থার লিচ।

সাঁ-সুশী থিয়েটারে যোগদান করতে এগিয়ে আসেন মিস লিচের প্রেমাসক্ত সেই অভিনেতাও। উক্ত অভিনেতার ধারণা ছিল : মিস লিচ তাঁর প্রতিশ্রুতির সূত্রে এবার অবশ্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হবেন অভিনেতার সঙ্গে। কিন্তু 'সাঁ-সুশী' থিয়েটার-গৃহের নির্মাণকার্য শেষ হতেই মিস লিচ নাকি ঘোষণা করেন : প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই তিনি স্বামীরূপে বরণ করবেন মিঃ ইষ্টকেলারকে। এ-সংবাদে আশাহত অভিনেতা হারিয়ে ফেলেন তাঁর মানসিক স্থৈর্য। তবু কী-ভেবে তিনি মিস এস্থার লিচের পার্শ্ব-চরিত্ররূপে অভিনয় করতে এগিয়ে আসেন 'সাঁ-সুশী' প্রেক্ষাগৃহে।

তখন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের কোনো এক বিশেষ দিন। অভিজাত দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ সাঁ-সুশী থিয়েটার-গৃহ। সামনে সুসজ্জিত মঞ্চ। তখনো ইলেকট্রিক বা গ্যাস-নিয়ন্ত্রিত আলোর প্রচলন হয় নি। তাই সাঁ-সুশীর রমণীয় রঙ্গমঞ্চকে উদ্ভাসিত করার ব্যবস্থা হয়েছে অজস্র কেরোসিন-প্রদীপের আলোয়। প্রথমেই আবির্ভূতা হবেন অনুপমা এস্‌থার লিচ। তাই দর্শকমহলে নেমে এসেছে এক রোমাঞ্চকর উৎকণ্ঠার গভীর নৈঃশব্দ!... ঠিক এমন সময়ে, বিপুল উৎকণ্ঠার অন্তিম অথবা চরম মুহূর্তেই হঠাৎ চমকে ওঠে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ। আগুন, আগুন! কোনো এক কেরোসিন-প্রদীপ থেকেই অলক্ষ্যে অগ্নি-সংযোগ ঘটেছে এস্‌থার লিচের জমকালো পোষাকে। তিনি মুক্ত মঞ্চে ছুটে এসেই সকাতরে চিৎকার করছেন সাহায্যের জন্য। কিন্তু কে তাঁকে সাহায্য করবে! সমগ্র প্রেক্ষাগৃহেই অগ্নি-সংযোগ ঘটেছে ভেবে বিভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলী এবং ওদিকে অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে পরিচালক-গোষ্ঠী পর্যন্ত দিশেহারা। তবু জন-কয়েক ছুটে আসে তাঁকে সাহায্য করতে। কিন্তু যখন আসে, তখন তাঁর ক্ষীণাস্থি দেহের সর্বাংশেই গভীর স্বাক্ষর এঁকেছে ক্ষমাহীন বৈশ্বানর।

তারপর? এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দিন-কয়েক পরেই দেহান্তরিতা হন অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী মিস এস্‌থার লিচ। লোকে বলে: তাঁর সেই প্রেমাসক্ত অভিনেতার হতাশাই রূপান্তর লাভ করে প্রতিহিংসায়। এস্‌থার লিচের পরিচ্ছদে, কৌশলে তিনিই অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে গ্রহণ করেছেন চূড়ান্ত প্রতিশোধ!

কিছুকাল পর সেন্ট জন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে উক্ত সাঁ-সুশী প্রেক্ষাগৃহই প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেন ডাঃ ক্যারু। পরবর্তীকালে সেন্ট জন্স কলেজই নামান্তরিত হয় সেন্ট জেভিয়াস কলেজে—যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন অধ্যক্ষ ফাদার ল্যাফট—যাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি, তিনিই কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে প্রথম Spectroscopic Observatory স্থাপন করেন কলেজে। সেই

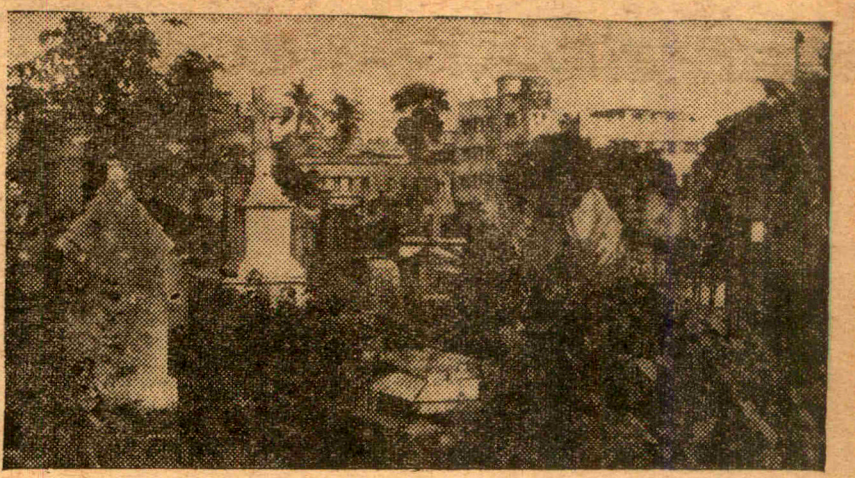

● পার্ক ষ্ট্রীটের সে-যুগের খৃষ্টান সমাধিক্ষেত্র।

বিখ্যাত Observatory শহর-কলকাতার এক অমূল্য সম্পদরূপে আজও উল্লেখযোগ্য।

পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্বসীমায় অবস্থিত South and North Burial Ground. এ-উভয় কবরখানাই আজ জনসাধারণের ব্যবহার-বহির্ভূত এবং উপেক্ষিত। দক্ষিণ কবরভূমিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড, স্যার উইলিয়াম জোন্স, কর্নেল কীড, আলেকজাণ্ডার কলভিন্, জর্জ হাইড। প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের জরাজীর্ণ সমাধি। তা' ছাড়া একাধারে যীশু এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত কর্নেল স্টুয়ার্ট সাহেবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাধিও এখানে ঘোষণা করছে তার অস্তিত্ব। স্টুয়ার্ট সাহেব খৃষ্টান এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরকে সমভাবেই আরাধনা করতেন ব'লে তাঁর সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ রয়েছে যীশু ও কৃষ্ণ ছাড়াও ভগীরথ, পৃথ্বীদেবী এবং অন্য আরও অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি।

ভারতবন্ধু স্যার উইলিয়াম জোন্সের সমাধিটি আজ বিশেষভাবেই উপেক্ষিত। দিনে দিনে আজ তা আরও জরাজীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্বনাশের মুখোমুখি। তার স্তম্ভে উৎকীর্ণ পঙক্তিসমূহ অনেকটা অস্পষ্ট হলেও পড়তে খুব একটা অসুবিধা হয় না আজও:

'Here was deposited the mortal part of a man who feared God, but not Death, who thought none below him but the base and unjust, none above him but the wise and virtuous.'

তৎকালীন বিখ্যাত কবি এবং শিক্ষাবিদ ডিরোজিও সাহেবের সমাধিও রয়েছে এখানে। আর রয়েছে কবি ল্যাণ্ডর নামক এক হতভাগ্য প্রেমিকের স্বপনচারিণীর কবর—নাম যাঁর মিস আইলমার রোজ। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে। তাই শোকে অভিভূত হয়ে কবি ল্যাণ্ডর রচনা করেন:

'Rose Aylmer whom these
wakeful eyes
May weep, but never see,
A night of memories and of sighs
I consecrate to thee,'

উত্তর এবং দক্ষিণ সমাধিক্ষেত্র ছাড়াও, দি ফ্রেঞ্চ অথবা টিরেটাজ বোরয়াল গ্রাউণ্ডের অবস্থিতিও ঘটেছে এই পথে—যা এদিনেও পথিকের মানস-মুকুরে প্রতিফলন ঘটায় বিস্মৃত-অতীতের।

পার্ক ষ্ট্রীটে এককালে ইংরেজ রাজপুরুষদেরই বসবাস ছিল অধিক। সম্ভবত সে-কারণেই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত জেগে আছে রাস্তার অবিনশ্বর আভিজাত্য। ইম্পে প্রতিষ্ঠিত সেই বিখ্যাত পার্কের বিলয় ঘটেছে বহুকাল আগেই। কিন্তু তার বিনিময়ে আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্ক, এলেন গার্ডেন এবং রকেয়া পার্ক। সারিবন্দী বিপাণ, বার, রেস্তোরাঁ এবং অজস্র সুশোভন বসতবাটীর পাশাপাশি এ-পথেই আধষ্ঠিত গলস্টোন ম্যানসন, পার্ক ম্যানসন, শিল্পকলাকেন্দ্র, আর্টিস্ট্রী হাউস এবং মুর্শিদাবাদ নবাবের উদ্যান-পরিবেষ্টিত প্রাসাদ। সব মিলিয়ে, এ-যুগের শহর-কলকাতার এক সার্থক চিত্রে বিধৃত পার্ক ষ্ট্রীট।

● আফ্রো-এশীয় প্রস্তুতি সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের জাকার্তায় যাত্রার পূর্বে গৃহীত চিত্র।

## রাজধানী ঃ

শেখ আব্দুল্লা কোন্ পথে? এইটিই হচ্ছে এখন রাজধানীর প্রতিটি মানুষের আলোচ্য বিষয়। আব্দুল্লার হাবভাবে উদ্বেগবোধ খুবই স্বাভাবিক। শুধু রাজধানী নয়, সারা ভারতেই তাঁকে নিয়ে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে স্বর্গসুখ পাওয়া তো দূরের কথা, গেল সতেরটি বছর কাশ্মীর নিয়ে ভারতকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির আশাতেই সাদিক সরকার আব্দুল্লাকে বন্দীশালার বাইরে এনেছেন। মুক্তি পাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে কাশ্মীরের জনমত যাচাইয়ের অছিলায় শের-ই-কাশ্মীর যে-হারে তর্জন-গর্জন সুরু করে দিয়েছেন, তাতে পরিস্থিতি কিছুটা ঘোরালো হয়েছে সন্দেহ নেই।

তাঁর উক্তি দুঃখজনক বলে প্রধানমন্ত্রীও পার্লামেণ্টে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী শেখ আব্দুল্লার প্রকাশিত উক্তি সম্পর্কে শুধু বিস্ময়ই প্রকাশ করেন নি, বলেছেন, আব্দুল্লা কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে প্রচারকার্য চালালে সরকার কোন মতেই তা' বরদাস্ত করবেন না। এরপর আব্দুল্লার সুর একটু নরম হয়েছে। তিনি স্বতন্ত্র কাশ্মীরের কথা কোনদিনই তোলেন নি বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি চূড়ান্ত বলে তিনি মেনে নিচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে শ্রীচাগলার উক্তির বিরূপ সমালোচনা করতেও শেখ আব্দুল্লা কসুর করেন নি। তাঁর কথা হল, কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন কাশ্মীরবাসী। দেখা যাচ্ছে তাঁর উক্তি কতকটা পরস্পর-বিরোধী। স্বতন্ত্র কাশ্মীর তাঁর দাবী নয়, পাকিস্তানের প্রতি অহেতুক দরদও যদি তাঁর না থেকে থাকে, তবে গণভোটের জিগির কেন? দীর্ঘকাল রাজনীতিতে তিনি আছেন। রাজনীতিই তাঁর ধর্ম-কর্ম। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি যে, কোন দেশের অংগরাজ্যের মানুষের খেয়ালখুশি মত গণভোট গ্রহণ সম্ভব নয়। সে নীতি স্বীকৃত হলে টেকসাস অঞ্চল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে যেতে পারতো।

শেখ আব্দুল্লার মুক্তিতে কাশ্মীরের দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক আকাশে বিরাট ঝড়ের তাণ্ডব দেখা দিতে পারে বলে আমরা তাঁর মুক্তির পূর্বেই মত প্রকাশ করেছিলাম। ঝড়ের তাণ্ডব-লীলা কেবল সর্বনাশই আনে না, অনেক সময় বিষাক্ত, আবহাওয়াকে যায় উড়িয়ে নিয়ে—ডেকে আনে নতুনের সম্ভাবনাকে। তাই আমরা বারবার বলছি, আব্দুল্লাকে নিয়ে বেশি বাদানুবাদ না করাই হবে বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শেখ আব্দুল্লার কতকগুলো উক্তি দুঃখজনক বললেও, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু বলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর সংযম আমাদের পথ দেখাবে।

* * *

সেদিন পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যে-ভাবে তুলে ধরেন তা' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রোগমুক্তির পর পার্লামেণ্টে এই প্রথম তিনি ৩৫ মিনিট ধরে ভাষণ দিলেন।

তিনি বলেছেন, লাদাকের সৈন্য-মুক্ত এলাকার সাতটি ঘাঁটি ছেড়ে দেবার কোন প্রস্তাব চীন সরাসরি ভারতের নিকট করে নি। চীন এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব করলে ভারত তা' বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত আছে।

তিনি আশা পোষণ করেছেন যে, একদিন ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের কাছাকাছি আসবেই, এমন কি, সাংবিধানিক দিক থেকেও তা' সম্ভব হবে। ভারত সম্পর্কে চীন ও পাকিস্তানের বড় রকমের একটা মতলব রয়েছে। তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

● শেখ আব্দুল্লা

পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধিতে গভীর আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন. তাঁরা ভাল মানুষ। তাঁদের

শ্রীনেহরু

উত্তেজিত করলেই তাঁরা নৃশংস হয়ে ওঠেন।

তিনি মনে করেন, পাকিস্তানে উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার। পূর্ব পাকিস্তানে শৃংখল তেমন শক্ত হয় নি, তাই সেখানে বারবার সৃষ্টি হচ্ছে দাঙ্গার। তিনি একথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত তার জাতীয় মর্যাদা ও অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করে কোনদিনই পাকিস্তান অথবা চীনের সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি করবে না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী চিরকালই আশাবাদী। কিন্তু একথা আজ বাস্তব সত্য যে, চীন ভারতের বিরাট এলাকা দখল করে বসে আছে। কলম্বো প্রস্তাব চীন গ্রহণ করে নি। ভারত বরাবরই সম্মানজনক সর্তে বিরোধের মীমাংসার কথা জানিয়ে আসছে। চীনের পক্ষ থেকে কোন সাড়া আজও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই পরিস্থিতি চিরকাল থাকতে পারে না। সীমানা বিরোধের মীমাংসার প্রস্তাব এখন চীনের পক্ষ থেকে আসা উচিত হবে।

পাকিস্তান সম্পর্কেও তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানে সত্যি আজ আশার আলো দেখা দিয়েছে। তাঁদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হলেই পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পত্তন হবে—অবস্থার নিশ্চয়ই ঘটবে পরিবর্তন। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতের সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটা তিনি যে-ভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে প্রগতিপন্থী পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষের সংগ্রামের পথ হবে সহজ—পাবে তাঁরা নতুন শক্তি।

জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আফ্রোশীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বের ব্যাপারে ভারত যে-ভাবে সক্রিয় ভূমিকায় নেমেছে—পাকিস্তান ও চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের প্রতিনিধি-মণ্ডলী যতটা সফল হয়েছেন তার পাশাপাশি শ্রীনেহরুর পার্লামেণ্টের ভাষণ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ভারত তার জোটনিরপেক্ষ নীতিতে অবিচল। এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠ পন্থাই প্রধান-মন্ত্রী নেহরুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এ বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় ছিল না, এমন নয়। তা' ছাড়া, ১৯৬২ সালের অক্টোবরে

শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন

ভারতের ওপর চীনের আক্রমণের পর থেকে অনেকের মনেই এই সংশয় বড় করে দেখা দিয়েছিল। সেই সংশয় দূর করার জন্যই ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে পররাষ্ট্র বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে বিষয়টি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিষয়টি আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। এবারের পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় বিষয়টি পরিষ্কার হল।

* * *

পাকিস্তানী রেলওয়ে গার্ডের হাতে নারীর শালীনতাহানির সুনির্দিষ্ট অভি-যোগকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন যে-ভাবে এড়িয়ে গিয়ে বাংলার সংবাদপত্রের ওপর অতিরঞ্জনের দোষ চাপিয়েছেন, তা' খুবই পরিতাপের বিষয়। শ্রীমতী গীতারাণী শিয়ালি ও শ্রীমতী মঞ্জুরাণী ডাকুয়া বনগাঁর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিচার-প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তানী গার্ডকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল তারপরই সৃষ্টি হল গোলযোগের পাকিস্তানী গার্ডরা বায়না ধরলেন ট্রেন নিয়ে এ পারে আসবেন না। পেল অভিযুক্ত গার্ড মুক্তি! এ সব সংবাদ খবরের কাগজে আকাশ থেকে এসে পড়ে নি।

বিচারের শেষে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে, আমাদের বলবার কিছুই ছিল না। বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে লাঞ্ছিতা দুটি অসহায়া নারীর আবেদনকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি নারীসমাজকেই অপমানিত করেছেন। নারীর সমগ্র সত্তা—তার নারীত্ব যেখানে লুণ্ঠিত সেখানে অপর একজন নারীর মুখে, তিনি যত বড়ই হোন না কেন, এ ধরণের উক্তি সত্যি বিস্ময়কর!

* * *

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার কবল থেকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র পুনর্বাসন দপ্তর গঠিত হয়েছে। নব গঠিত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী শ্রীমহাবীর ত্যাগী। প্রকাশ, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দপ্তর থেকে পুনর্বাসন দপ্তরকে আলাদা করার

প্রস্তাব শ্রীখান্নাই দিয়েছিলেন। এ সংবাদ সত্য হলে বুঝতে হবে শ্রীখান্নার শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছিল। পুনর্বাসনের কাজের ব্যাপারে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিশৃংখলাদি

● শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না

সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়। এবারে তিনি উদ্বাস্তুদের নানা শিবিরে ঠেলে নিয়ে গিয়েও অবিমৃষ্য-কারিতার পরিচয়ই দিয়েছেন।

শ্রীমহাবীর ত্যাগী কর্মঠ ব্যক্তি। পার্লামেণ্টেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। খুবই উৎসাহী ও নির্ভর-যোগ্য মানুষ তিনি। তা' ছাড়া, উদ্বাস্তুদের সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। তাঁর ওপর পুনর্বাসন ও ত্রাণ-কার্যের ভার ন্যস্ত হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজ সুরু হবে বলেই আমরাও আশা পোষণ করি।

* *

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙন এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পার্টির জাতীয় পরিষদে বাম ও দক্ষিণ-পন্থীদের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত বাক-বিতণ্ডার পর শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ ৩২ জন সদস্য সভা বর্জন করেন। জাতীয় পরিষদ এই ৩২ জনের সদস্য-পদ সাময়িকভাবে শুধু বাতিল করেন নি, তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা কেন অবলম্বিত হবে না। তার কারণ দর্শাতে বলা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রীভূপেশ গুপ্ত, ডঃ রণেন সেন এবং কেরলের সাতজন সদস্য নাকি আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেছেন।

অনেকের ধারণা, শ্রীডাঙ্গে পার্টির চেয়ারম্যানের আসন থেকে নেমে এলেই পার্টির ভেতরে অনৈক্য দূর হবে। চীনা-মতবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যাঁরা সংগ্রামে নেমেছেন তাঁরা এত সহজে নরম হবেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে তাত্ত্বিক মীমাংসার বৈঠক যখন চলেছিল সে সময় আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা কালে বলেছিলাম—ফাটল জোড়া লাগার নয়। শুধু তাই নয়, এ ফাটল যত বড় হবে ততই বিশ্ব কমিউ-নিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যেও ভাঙন ধরবে।

● শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার

এশিয়া ও আফ্রিকার অকমিউনিষ্ট দেশগুলোর কমিউনিষ্ট নামধেয় দল-গুলোও হবে দ্বিধাবিভক্ত। সুসলভের বিবৃতির পর চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, তারপর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্য রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। অনিবার্য কারণেই তাদের আলাদা করে ঘর বাঁধতে হবে।

## কাশ্মীর :

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক ১৬ই এপ্রিল জম্মুতে একটি অনুষ্ঠানে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যের জনমণ্ডলী একবার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা' অপরিবর্তনীয়—কোন অবস্থাতে, কোন প্রকার চাপই তার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

শেখ আবদুল্লার সাম্প্রতিক ভাষণের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, বিভিন্ন স্থানে লোকে ধৈর্য ধরে আবদুল্লার বক্তৃতা শুনেছে বলেই কাশ্মীরবাসীরা তাঁর সঙ্গে একমত বলে করবার কোন কারণ নেই।

কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ যে গণভোটের পক্ষপাতী নয়, তা' শেখ আবদুল্লার সফরের পর পরিষ্কার হয়েছে। আবদুল্লার দক্ষিণহস্ত মীর্জা আফজল বেগের ঘাঁটি ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর বক্তৃতাকালে গণভোটের পক্ষে সমর্থনের ধ্বনি শোনা যায় নি। আফজল বেগের অনুচরদের মধ্যেও এই গণভোটের দাবী নিয়েই মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

## মহারাষ্ট্র :

কৃষ্ণা-গোদাবরী জলের বিরোধ এবং মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যের সীমানা সমস্যার একটা সুষ্ঠু মীমাংসার পথনির্দেশের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়েক আচার্য বিনোবা ভাবের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে।

তিনি 'পরমধাম' আশ্রমে বিনোবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রায় এক ঘণ্টাকাল এ বিষয় নিয়ে আলোচনাও

● শ্রীবসন্তরাও নায়েক

নাকি করেছেন এবং এই বিরোধের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের বক্তব্য আচার্যের কাছে পেশ করেছেন।

প্রকাশ, আচার্য ভাবে জানিয়েছেন, মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিংগাপ্পা এবং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর অবস্থা বুঝে কতটা সাহায্য তিনি করতে পারবেন তা পরে জানাবেন।

কৃষ্ণা-গোদাবরী জলের ব্যাপারটার যাতে তাড়াতাড়ি একটা আপোষ মীমাংসা হয়ে যায়, তার জন্য অপর দুটো পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি অনুরোধ জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

## গুজরাট :

আগামী ১লা মে শিশু গুজরাট রাজ্য চার বছর পূর্ণ করে পাঁচ বছরে পা দিচ্ছে। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ১৯৬০ সালে দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যের থেকে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বৃটিশ আমলে সৌরাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিল ছোট-বড় দেশীয় রাজ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাই সে এখনও একেবারে এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবমুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। প্রায় ২৩ হাজার বর্গমাইল এর পরিধি। লোকসংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২২ হাজার। কচ্ছও ছিল দেশীয় রাজ্য। জনসংখ্যা তেমন বেশি নয়। পরিধি হবে প্রায় ১৭ হাজার বর্গমাইল। মরু বালুচরের অভাব নেই। বর্ষায় আবার রূপটি হয় জলাভূমির মত। গরমকালে সে ওঠে তেতে। গুজরাটে ছিল ঐতিহ্যপূর্ণ বরোদা রাজ্য। এই অংশ উন্নতও অন্যান্য অংশের চাইতে ঢের বেশি। গুজরাটের পরিধি ১৪৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ।

নাগাভূমিকে বাদ দিলে গুজরাট ভারতের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্য। এই নতুন রাজ্যকে গড়ে তোলবার, তাকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পাশে মর্যাদার আসনে বসাবার চেষ্টা চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ কাজে রাজ্যের সাধারণ মানুষও সাড়া দিয়েছে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে।

মাহি, তাপি, সবরমতী এবং নর্মদা ছাড়াও বহু নদী প্রবাহিত হয়েছে গুজরাট রাজ্যের বুকের ওপর দিয়ে। এই নদীগুলোর জলধারাকে দেশের কল্যাণ-কার্যে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন রাজ্য সরকার। তাপি নদীর ওপর বৃহত্তম উকাই বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শেষ হবে। শেষাদ্রি ও সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

● আচার্য বিনোবা ভাবে

● শ্রীনিজলিংগাপ্পা

বিশেষজ্ঞের মুখাপেক্ষী না হয়ে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে।

উকাই বাঁধের কাজ শেষ হলে বন্যার ভয়াল আক্রমণ হবে বন্ধ। চাষের জল যাবে এখান থেকে ৩,৯১, ৬৫০ একর জমিতে। সুরাট, বরোদা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব মোচন হবে। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ১ লক্ষ ৩০ কিলোওয়াট।

উকাই পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থ ব্যয় হবে ৬১ কোটি টাকা। ভাকরা, হীরাকুদ, নাগার্জুন এবং রিহান্দের সমকক্ষ হবে উকাই।

## ভুটান :

ভুটানের মহারাজার তৎপরতায় গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। তিনি ইউরোপ থেকে অসুস্থ শরীরে ফিরে এসেই সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার কাজে হাত না দিলে ভুটানে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হ'ত তাতে ভারতের নিরাপত্তাও হত বিঘ্নিত।

তিনি ভুটানে এসেই প্রথম আদেশ দেন প্রধানমন্ত্রী জিগমী দোরজির হত্যাকারীকে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে। এই আততায়ীর সঙ্গে কথা-বার্তার পরই তিনি বুঝতে পারেন

ভূটানে চলেছে কূটচক্র---বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে অপসারণের জন্য গোপন গুহায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। এর পরই ১৩ই এপ্রিল মহারাজা তাঁর ডেপুটি সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্দী করেন নিজের প্রাসাদে। তাঁকে ও আরও ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভূটান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মহারাজা নিজে।

● নিহত প্রধানমন্ত্রী জিগমী দোরজী

৫ই এপ্রিল ফুণ্টসোলিং-এ দোরজি জিগমী আততায়ীর হাতে নিহত হন। এখন দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনার পেছনে ছিল বিরাট চক্রান্তজাল এবং তার অধিনায়ক ছিলেন ভূটান বাহিনীর ডেপুটি সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার নামগয়াল এবং অবসরপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল তাশোপাকো। এঁর মদত পেয়েছেন নয়াচীনের কাছ থেকে।

ভূটান প্রকারান্তরে ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্য। ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুসারে ভূটানের পররাষ্ট্র বিষয় নির্ভর করছে সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের ওপর। তিব্বত গ্রাস করার পর চীনা সৈন্য ভূটানের ঘাড়ের ওপর থাবা বিস্তার করে রয়েছে, এই অবস্থায় সিকিম ও ভূটানের ব্যাপারে ভারত সরকারের সতর্ক থাকা উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী দোরজি জিগমীর হত্যার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এইটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভারতের পলিটিক্যাল এজেন্টের কোন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি, দোরজির হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের কাজেও কোন বিচক্ষণতার নজীর পাওয়া যায় নি। হত্যাকারীর সন্ধানে শেষ পর্যন্ত প্রধান সহায়ক হয়েছিল পুলিশ কুকুর। এই কুকুরের সাহায্যে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলে ভূটানে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সুরু হত এবং তার আঘাত থেকে ভারতও অব্যাহতি পেত না।

## উড়িষ্যা ঃ

শিল্পনগরী রাউরকেল্লার হাঙ্গামা মিটেছে অনেকদিন। কিন্তু তার জের টেনে পুলিশবাহিনী প্রতাপ জাহির করে চলছে বাঙালী সমাজের ওপর। হাঙ্গামার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তি সকলেরই কাম্য। নির্বিচারে নিরপরাধের ওপর জুলুমবাজী কোন সভ্যসমাজই বরদাস্ত করতে পারে না। পূর্ব বাংলার অত্যাচারের নির্মম কাহিনী শুনে সাধারণ মানুষের মন উত্তেজিত হয়েছিল। তারা কেউ বদলা নিতে নামে নি। উড়িষ্যার জননায়ক শ্রীবিজু পট্টনায়কই বলেছেন, হাঙ্গামার পেছনে উস্কানী ছিল পাকিস্তানী গুপ্তচরবাহিনীর। এর পর আমাদের পলিশের প্রাথমিক দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল উস্কানীদাতাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া। তারা সেদিকে না গিয়ে বেছে বেছে বাঙালীদের ওপর তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে।

প্রায় চারশ' বাঙালী বিনা বিচারে হাজতে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, বিয়েতে পাওয়া বেনারসী শাড়ি, ঘড়ি প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী পুলিশ লুটের মাল সন্দেহ করে আটক করে বসে আছে। তার রসিদ না দেখাতে পারলে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এ এক মর্মান্তিক পরিহাস। বিয়ের যৌতুকের ক্যাশমেমো দাবী করার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

যাদের ওপর এই অন্যায় জুলুম চলেছে তারা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ---চাকুরিজীবী। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব থেকে সুরু করে উড়িষ্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, বাংলারই সন্তান শ্রীবীরেন মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। তাঁরা জানেন, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার সর্বদাই হাঙ্গামা থেকে অনেক দূরে থাকেন। এদের যাতে অযথা নির্যাতন ভোগ করতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে উড়িষ্যার নেতাদের আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

*

শ্রীবীরেন মিত্রের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব ৪৮---৭৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়েছে। অনাস্থা প্রস্তাব এসেছিল দুটি। একটি উত্থাপন করেছিলেন বিরোধী দলের নেতা শ্রী আর এন সিংহ দেও এবং অপরটি উত্থাপন করেছিলেন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

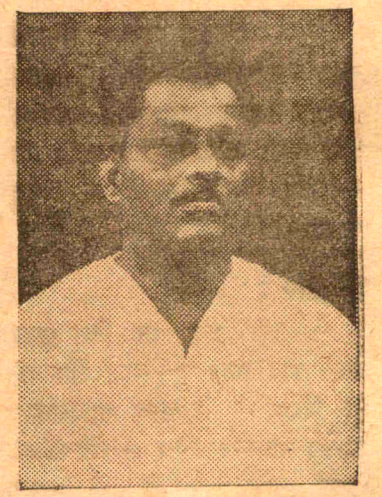

● শ্রীবীরেন মিত্র

রাউরকেল্লা ও উড়িষ্যার অন্যান্য এলাকার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতাই ছিল আলোচনার বিষয়। তিন ঘণ্টাকাল এ নিয়ে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধও চলেছিল।

* পাকিস্তান সরকারের ছাত্র-দলন, সংবাদপত্র দমন প্রভৃতি স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে ঢাকা পল্টন ময়দানে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ।

## ফিলিপাইনস ঃ

ম্যানিলায় 'দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা' বা 'সিয়েটো'র (SEATO) বৈঠক গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। বৈঠক শেষে বিভিন্ন প্রশ্নে যোগদানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'সিয়েটো'র মূল উদ্দেশ্য কি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, না যে-কোন প্রকার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা, এই প্রশ্নে পাকিস্তান অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হতে পারে নি। আবার, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক প্রস্তুতি সমর্থনের ব্যাপারেও ফ্রান্স একমত হয় নি। তাই আশংকা দেখা দিয়েছে, মূল দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য শেষ পর্যন্ত 'সিয়েটো'র মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি না করে।

'সিয়েটো' জোটের সদস্য ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া। এরা সকলেই ম্যানিলা বৈঠকে উপস্থিত ছিল। পাকিস্তানের প্রতিনিধি মালিক তাঁর বক্তৃতায় চীনা আক্রমণের বিপদের কথা ভুলক্রমেও উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি ভারতের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য সকলেই প্রায় তাঁদের বক্তৃতায় চীনা আক্রমণের প্রশ্নকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কেউই পাকিস্তানের মনোভাবকে সমর্থন করেন নি। অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারউইক ও নিউজিল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলিয়োক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি সম্পর্কে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক ম্যানিলা বৈঠকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযানকে শক্তিশালী করার কথা বলেন। তিনি মালয়েশিয়া গঠনকেও অভিনন্দন জানান। ফ্রান্স দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করে; —ফ্রান্সের অভিমত, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থানাট খোমান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে সমর্থন করে জোরালো বক্তৃতা দেন। ফ্রান্সকে আক্রমণ করে খোমান বলেন, ফ্রান্সের মত যে সব দেশ 'সিয়েটো'র কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না, তাদের 'সিয়েটো' ত্যাগ করা উচিত।

বৈঠক শেষে 'সিয়েটো'র পক্ষ থেকে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কমিউনিজম দমনের

* বারউইক

অভিযানকে শক্তিশালী করার কথা থাকায় ফ্রান্স এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে নি।

সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, পাকিস্তান 'সিয়েটো' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং তার পক্ষে হয়তো এই সিদ্ধান্ত মেনে চলা সম্ভব হবে না এমন কথা ঘোষণা করেছে। ১৮ই এপ্রিল ম্যানিলায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-সচিব জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রসচিব স্যালভেডর পি লোপেজের স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতিতে এই কথা বলা হয়েছে। এই বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সর্বপ্রকার আক্রমণ এবং তা যে দিক থেকেই আসুক না কেন, সে সব প্রতিরোধ করাই হল সিয়েটোর উদ্দেশ্য।' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 'পরোক্ষ' আক্রমণ বলতে এখানে ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মার্কিন কূটনীতির প্রভাবাধীন ফিলিপাইনস হঠাৎ এভাবে কেন পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে গেল, তা ভাববার বিষয়। সম্ভবত মালয়েশিয়ার প্রতি ভারতের সমর্থনের জন্যই ফিলিপাইনস ভারতের ওপর চটেছে। ফিলিপাইনস ভারতের বিরুদ্ধে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কাশ্মীরের

ব্যাপারেও পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। যুক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীর প্রশ্নে কাশ্মীরবাসীর মৌলিক অধিকারের দাবী স্বীকার করেছেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ওপর জোর দিয়েছেন।

## ইন্দোনেশিয়া ঃ

বান্দুং ধরণের দ্বিতীয় এশিয়া আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য জাকার্তায় যে প্রস্তুতি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, গত ১৫ই এপ্রিল তা শেষ হয়েছে। ১৯৫৪ সালে বান্দুং সম্মেলনে যে সব রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তুতি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন. সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আজিম হোসেন ছিলেন প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা।

বেশ কিছুদিন ধরে চীন ও ইন্দোনেশিয়া এরূপ একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য চেষ্টা করছে। চৌ-এন-লাই এই সম্মেলনের পক্ষে মত সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় দীর্ঘ দিন ধরে সফর করেছেন। পাকিস্তানও এই প্রস্তাবের সমর্থনে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিংহল ও যুগোশ্লাভিয়ার উদ্যোগে যে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার গুরুত্ব হ্রাস করার জন্যই চীন ও পাকিস্তান এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের ব্যাপারে এত উৎসাহী।

জাকার্তা প্রস্তুতি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় কূটনীতি এখানে আংশিক সাফল্য ও আংশিক ব্যর্থতা অর্জন করেছে। চীন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং গিনির মত আফ্রিকীয় দেশ পুরোপুরি ভারতের বিরোধিতা করেছে। তা সত্ত্বেও সম্মেলন অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান নির্বাচনে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আগামী বৎসর মার্চ মাসে আফ্রিকার কোথাও এই সম্মেলন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ বৎসর অক্টোবর মাসে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনের পূর্বেই

* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিন প্রধান : সোয়েকানো, টেঙ্কু ও ম্যাকাপ্যাগল—আফ্রো-এশীয় বিশ্বের বাইরে টেঙ্কুকে রাখাই সোয়েকার্নোর কামনা।

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠানের চীন ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হওয়া নিশ্চয়ই খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলজিরিয়া, সিংহল ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ এ ব্যাপারে ভারতকে সমর্থন করেছে।

কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মালয়েশিয়াকে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ভারত যে প্রস্তাব করেছে, তা শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। অবশ্য প্রস্তাবটি বাতিলও হয় নি। এই প্রশ্নে সম্মেলনে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে চীন। সোভিয়েট ইউনিয়ন মূলত ইউরোপীয় দেশ এবং রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুতরাং তাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, এই হল চীনা বক্তব্য। ভারত অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই যুক্তি খণ্ডন করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এক বিরাট অংশ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং এশিয়া-আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রায় সব সম্মেলনেই সোভিয়েট ইউনিয়ন অংশ গ্রহণ করে আসছে। বান্দুং সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়নকে না ডেকে যে ভুল করা হয়েছে, তা সংশোধন করা উচিত। চীনের প্রবল বিরোধিতায় সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব গৃহীত না হলেও বিষয়টি এখনও 'বিবেচনাধীন' রাখা হয়েছে। তবে সোভিয়েটের যোগদানের আশা কম। মালয়েশিয়ার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি আপত্তি ইন্দোনেশিয়ার। ঠিক হয়েছে, 'যত শীঘ্র সম্ভব' মালয়েশিয়াকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ডাকা হবে। অর্থাৎ, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মালয়েশিয়ার মত-ভেদ মিটলে তবে ডাকা হবে। ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া বিরোধ শীগ্‌গিরই মিটবে বলে মনে হয় না, সুতরাং মালয়েশিয়ার যোগদানের আশাও বিশেষ নেই।

প্রথম বান্দুং সম্মেলনে যে-সব রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল ও দ্বিতীয় এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে যারা স্বাধীনতা পাবে, তারা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হবে। এ ছাড়া পর্তুগীজ অধিকৃত এ্যাঙ্গোলাকেও ডাকা হবে। এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মৈত্রীর প্রসার, নিজেদের মধ্যে সংহতি-সাধন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের নিন্দা, এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুত্থান, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামকে শক্তিশালী করা, বর্ণ বৈষম্য ও বৈদেশিক শোষণের বিরোধিতা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়েছে।

কিন্তু চীনের খপ্পরে পড়ে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান যেভাবে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে, তাতে এই সম্মেলন কতটা সাফল্যলাভ করবে বলা শক্ত।

## গ্রেটবৃটেন ঃ

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম ঘোষণা করেছেন, অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ধারণা মত বসন্ত বা গ্রীষ্ম-

* আলেক ডগলাস হিউম

কালে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে শরৎ-কাল পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন বলেছেন 'ইতি-মধ্যেই বহু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নের বিবেচনা স্থগিত রাখা হয়েছে।' নির্বাচন পিছিয়ে গেলে, এ সবও পিছিয়ে যাবে। উইলসনের মতে স্যার হিউম 'সাহস ও বিবেচনার' পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ কথা সত্য, রক্ষণশীল দল ঠিক এই মুহূর্তে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছে। বৃটেনের জনমত স্পষ্টতই রক্ষণ-শীল দলের বিরুদ্ধে। সর্বশেষ 'গ্যালপ-পোলের' ফলে দেখা যায়, শ্রমিক দল রক্ষণশীল দল অপেক্ষা শতকরা ১১·৫ বেশি এগিয়ে আছে। এ হিসেব নির্ভুল না হলেও, জনমতের হাওয়া কোন দিকে বইছে, তা এ থেকে বোঝা যায়।

গত সপ্তাহে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় হিউম ও দলের অন্যান্য নেতাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছে। ১০০টি আসনের মধ্যে শ্রমিক দল ৬৪টি ও রক্ষণশীল দল মাত্র ৩৬টি আসন লাভ করেছে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে শ্রমিক দলকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে গত জুলাই মাসে রক্ষণশীল দল 'জেরিমেণ্ডারিজম্' নীতি অনুসরণ করে শহরতলীর কয়েকটি এলাকা লণ্ডন কাউন্টির সঙ্গে যোগ করে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে। শহরতলী এলাকায় রক্ষণশীল দলের প্রভাব বেশি, সুতরাং সব মিলিয়ে রক্ষণশীল দলের সংখ্যাধিক্য থাকবে, এই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সব এলাকাতেও রক্ষণশীল দলের পরাজয় রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেবল শ্রমিক দলের ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধিই নয়, হিউমের দুশ্চিন্তার কারণ, রক্ষণশীল দলেও নানারূপ বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকায় 'জনৈক রক্ষণশীলের' নামে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধে রক্ষণশীল সরকারের বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট রক্ষণশীল নেতারা প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের অযোগ্য শাসনের তীব্র নিন্দা করছেন। হিউমের নেতৃত্বের যোগ্যতাকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় হিউম নির্বাচনে নামবেন কোন্ ভরসায়? তাই নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে তিনি ভাবছেন, এর মধ্যে রক্ষণশীল দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং বৃটেনের অবস্থার কিছু উন্নতি করে সাধারণ ভোটদাতাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারবেন।

আগামী সাধারণ নির্বাচনের

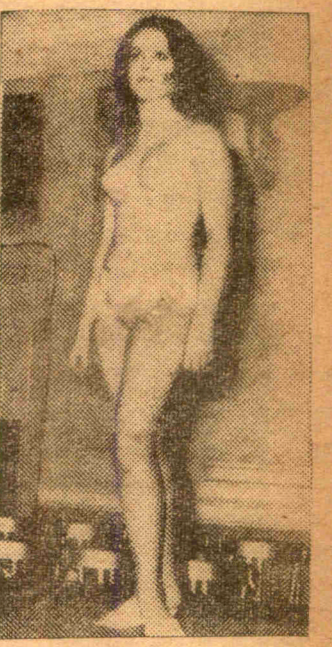

* ক্যারোলিন মডলিং

পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বৃটেনে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অর্থমন্ত্রী রেজিনাল্ড মডলিং-এর অষ্টাদশী সুন্দরী কন্যা ক্যারোলিন মডলিং সম্প্রতি লণ্ডনের একটি চ্যারিটি

* সস্ত্রীক হ্যারল্ড উইলসন

ফ্যাশন শোতে 'বিকিনি সাঁতারু' পোষাকে অনগ্রা অবস্থায় যোগ দিয়েছিলেন। শ্রমিক দলের বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'ডেলি মিররে' ক্যারোলিনের এই ছবি প্রকাশ করে ছবির নীচে লেখা হয় 'ক্যারোলিন মডলিং-এর বাজেট রূপ'। পরের সপ্তাহে অর্থমন্ত্রী মডলিং পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করবেন, তারই প্রতি ইঙ্গিত করে বাজেটের দৈন্যদশা দেখাবার জন্যই এই মন্তব্য করা হয়েছে। অপর দিকে আবার এই ছবিকে উপলক্ষ করেই রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'ডেলি এক্সপ্রেস' মন্তব্য করেছে, ক্যারোলিনের এই ছবি তার পিতার নির্বাচনে কোন ক্ষতি তো করবেই না, বরং এই ছবির জন্যই তিনি বেশ কয়েক শ' ভোট বেশি পাবেন।

'ডেলি এক্সপ্রেস'-এর এই মন্তব্য যদি সত্যে প্রমাণিত হয়, তবে তা খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে কে কত প্রায়-নগ্ন মেয়েকে নামাতে পারে, তার ওপরেই কি নির্বাচনের সাফল্য নির্ভর করবে? বৃটেনে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র যে বিরাট আঘাতের সম্মুখে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

**রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ঃ** দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ্ রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী-রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, রিপাবলিকান পার্টির বহু সদস্য তাই চান। ক্যাবট লজ্ কিন্তু নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক নন। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হয়তো বন্ধুদের চাপে তাঁকে রাজি হতে হবে। দলের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন লাভের জন্য ক্যাবট লজের অপর তিনজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন, সেনেট-সদস্য ব্যারি

* গোল্ডওয়াটার

* রিচার্ড নিক্সন ও ক্যাবট লজ

গোল্ডওয়াটার, নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার এবং প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ও বিগত রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে পরাজিত রিচার্ড নিক্সন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে রকফেলার সংস্থার একজন ডাক্তারের বিচ্ছেদ করা স্ত্রী হ্যাপি মারফিকে বিয়ে করার পর থেকে রকফেলারের জনপ্রিয়তা অনেক কমে এসেছে। সুতরাং রক-ফেলারের মনোনয়ন পাবার আশা কম। গোল্ডওয়াটার বা নিক্সনের চেয়েও ক্যাবট লজের মনোনয়নের সম্ভাবনা বেশি।

এদিকে আবার মার্কিন মহাকাশ-বিজয়ী ৪২ বৎসর বয়স্ক জন গ্লেন ওহিও থেকে ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থীরূপে সেনেটের আসনের জন্য ৭২ বৎসর বয়স্ক বর্তমান সেনেট-সদস্য স্টিফেন ইয়ং-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। গ্লেনের জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রায় সকলেই আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্নানঘরে পড়ে গিয়ে গ্লেন মাথা ও কানে আঘাত পান এবং চিকিৎসকরা তাঁকে নির্বাচনী প্রচারে না নামবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। গ্লেনের সমর্থকরা তা সত্ত্বেও গ্লেনকে নির্বাচনে নামবার জন্য চাপ দিয়েছিলেন—তাঁদের ধারণা, কোনরূপ প্রচার অভিযান ছাড়াই গ্লেন জয়ী হবেন। কিন্তু গ্লেন মহাকাশ বিজয়ের নাম ভাঙিয়ে জয়লাভ করতে চান না। তাই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

**নাগরিক অধিকার বিল ঃ** মার্কিন কংগ্রেসে প্রতিনিধি সভা থেকে পাশ হয়ে এখন সেনেটে নাগরিক অধিকার বিলটি আলোচিত হচ্ছে। মিনেসোটার ডেমোক্রাটিক পার্টির সেনেট-সদস্য হুবার্ট হামফ্রে এই বিল পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। হামফ্রে বিলের সমর্থনে জোরালো ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, বহু পূর্বেই এই বিল পাশ করা উচিত ছিল। এই বিলের সাহায্যে ঘৃণ্য

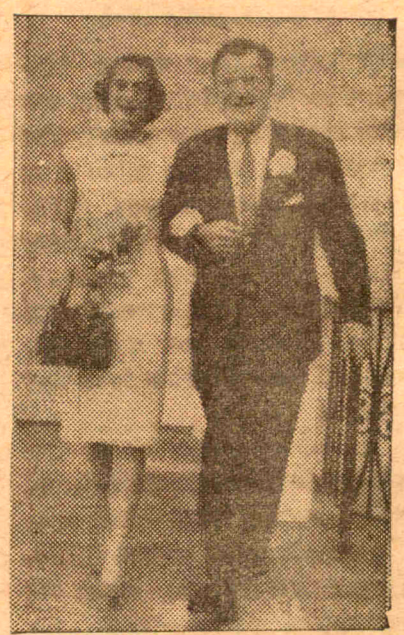

বিয়ের পর—নেলসন রকফেলার ও হ্যাপি মারফি

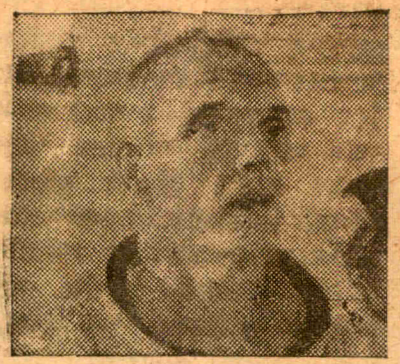

গ্লেন

বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা সম্ভব হবে এবং নিগ্রোদের মানুষের মত মর্যাদা দেওয়া হবে।

সেনেটে আলোচনা চলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও নাগরিক অধিকার দাবীর সংগ্রাম জোরদার হচ্ছে। বহুসংখ্যক শ্বেতকায় মার্কিন নাগরিক এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। সম্প্রতি নিউ ইংল্যাণ্ডের কেমব্রিজের বিশপের স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানের মাতা মেরি পিবডিও নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এসেছেন। পিবডি সেন্ট অগস্টিনে গিয়ে শ্বেতকায়দের জন্য নির্দিষ্ট একটি হোটেলে পাঁচজন নিগ্রোকে নিয়ে

মেরি পিবডি

প্রবেশ করেন এবং তার জন্য অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। পিবডি জামিন নিতে অস্বীকার করেন এবং দু-দিন দু-রাত্রি জেলে কাটান। মুক্তি পাবার পর আবার তিনি অগস্টিনে গিয়ে বর্ণ বৈষম্য আইন ভঙ্গ করার কথা ভাবছেন। এদিকে আলাবামায় কুখ্যাত গভর্নর ওয়ালেসের প্রায় চোখের সম্মুখেই বার্মিংহামে শ্বেতকায় ও নিগ্রোদের এক যুক্ত সমাবেশে ৩৫ হাজার নরনারী নাগরিক অধিকারের দাবী সমর্থন করে। বিলি গ্রাহাম এই সভায় বক্তৃতা করেন। এই বার্মিংহামেই কয়েক মাস আগে গভর্নর ওয়ালেসের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কেনেডিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল।

**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন :** গত ৯ই এপ্রিল নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্রে 'জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীন সমাজের উদ্দেশ্য' বিষয়ে এক ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব জর্জ ডব্লিউ বল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনের কথা বলেন। সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে মিঃ বল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জর্জ বল

অনুন্নত দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রে জেনেভা সম্মেলন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে বলে মিঃ বল আশা প্রকাশ করেন।

১২২টি রাষ্ট্রের মোট প্রায় ২০০০ প্রতিনিধি জেনেভা সম্মেলনে যোগদান করেন। এবারের সম্মেলনে অনুন্নত দেশের প্রতিনিধিরাই প্রাধান্য স্থাপন করেন। মিঃ বল বলেন, সামান্য বৈদেশিক সাহায্য অথবা দ্রব্যবিশেষের চুক্তির দ্বারা অনুন্নত দেশের উন্নতি করা যাবে না, কিংবা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে না। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে মুষ্টিমেয় দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাদের আজ দায়িত্ব আধকাংশ অনুন্নত দেশের অর্থনীতির মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। বিশেষ করে আফ্রিকার বিরাট এলাকায় যে সীমাহীন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি রয়েছে, তা দূর করার জন্য উন্নত দেশগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। যে-সব দেশ তাদের প্রাক্তন উপনিবেশে নিজেদের সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থে বাণিজ্য পরিচালনা ও উন্নয়নকার্যে অংশ গ্রহণ করছে, মিঃ বল তাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সঙ্কীর্ণ জাতীয় বাণিজ্য স্বার্থের ঊর্ধ্বে আজ উন্নয়নের প্রশ্নকে স্থান দিতে হবে।

দায়সারা গোছের কর্মসূচী, বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চেষ্টা নয়, অনুন্নত দেশগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশগুলির আজ এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

## সোভিয়েট ইউনিয়ন :

১৫ই এপ্রিল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ তাঁর ৭০তম জন্মদিবস পালন করলেন। এই উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনও ক্রুশ্চেভের প্রতি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেছে। মাও-সে-তুং ক্রুশ্চেভকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন, চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে। ক্রুশ্চেভও বলেছেন, চীন-সোভিয়েট মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কিন্তু সৌজন্যমূলক এই বাণী বিনিময়ের অন্তরালে যে চিত্র, তা কিন্তু মোটেই আশাপূর্ণ নয়। 'ইজভেস্তিয়া' আবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চীনা কমিউনিষ্ট নেতাদের বিভেদপন্থী বলে তীব্র ভাষায় গালাগাল করেছে। পিকিং রেডিও থেকে তো অবিরাম গালিবর্ষণ চলছে। হংকং থেকে একটি চীনা কমিউনিষ্ট পত্রিকা ক্রুশ্চেভকে 'স্টুপিড' পর্যন্ত বলেছে।

ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির আরও সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্য। তাঁর ইচ্ছা, এখনই একটি বিশ্ব কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন ডেকে চীনকে নিন্দা করা হোক। ক্রুশ্চেভ এ কাজে আংশিক সাফল্য লাভ করলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া অবশ্য ক্রুশ্চেভকে পুরোপুরি সমর্থন করেছে। পোল্যাণ্ড চীনকে সমালোচনা করলেও, ক্রুশ্চেভের প্রস্তাবিত বিশ্ব-কমিউনিষ্ট সম্মেলন সম্পর্কে নীরব। আর রুমানিয়া এখন পর্যন্ত চীনকে সমালোচনাই করে নি।

* হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী কাদারের সঙ্গে করমর্দনরত ক্রুশ্চেভ

## পাকিস্তান ঃ

পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন চলছে। আন্দোলন দমনের জন্য সরকারের কোন চেষ্টাই সফল হচ্ছে না।

স্বাধীনতার পর সতেরো বৎসর পার হলেও এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের অধিবাসী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করতে পারে নি ১৯৬২ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে যে নির্বাচন হয়েছে, তাতে গণতন্ত্রের কোন চিহ্নই নেই। পাকিস্তানের ছয় কোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৮০,০০০ 'বেসিক ডেমোক্রাট'কে নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী জাতীয় আইনসভা গঠন করেছে।

সরকার নিযুক্ত ভোটাধিকার কমিশনই সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করেছে। রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ কমিশনের এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে ভোটাধিকারের দাবীতে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সুরু হয়েছে। ছাত্র-সমাজ এই আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে।

মৌলানা ভাসানী, আতাউর রহমান, খাজা নাজিমুদ্দিন, মৌলানা আক্রাম খাঁ, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার—সবাই আজ এই আন্দোলনে রয়েছেন। মৌলানা ভাসানী একটি সভায় বিদ্রূপ করে বলেছেন, আয়ুব কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য গণভোট চান, কিন্তু পাকিস্তানের অধিবাসীদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে নারাজ।

মার্চ মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সম্মেলন এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্মেলনের পর থেকে প্রদেশের সর্বত্র হাজার হাজার জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘট প্রভৃতি হয়েছে। গ্রেপ্তার, লাঠি চার্জ, গুলীচালনা, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্র-বহিষ্কার কোন কিছুই বাকি নেই। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, রাজসাহী রংপুর প্রভৃতি আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি।

আয়ুব সরকার আন্দোলন দমনের জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছেন। সংবাদপত্রের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না। 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক' ও 'আজাদের' কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত চাওয়া হয়েছে। ঢাকায় পল্টন ময়দানে বিরাট জনসমাবেশে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন।

## ব্রেজিল ঃ

ব্রেজিলের বামপন্থী রাষ্ট্রপতি গুলার্টকে অপসারণ করেই দক্ষিণপন্থীরা ক্ষান্ত হয় নি। ব্রেজিলে নতুন এক শাসন প্রবর্তন করার জন্য তারা পরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি রেনিয়েরি ম্যাজিলির জায়গায় গত সপ্তাহে ব্রেজিল কংগ্রেস জেনারেল হামবার্টো কস্টেলো ব্রাঙ্কোকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেছেন। বলা বাহুল্য, ব্রাঙ্কো বিদ্রোহী সৈন্যদলের প্রার্থী। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ব্র্যাঙ্কো রাষ্ট্রপতি থাকবেন, তারপর নতুন নির্বাচন হবে। আরও ঠিক হয়েছে, সামরিক বাহিনীর ৩ জন প্রধান আগামী দু'মাস রাষ্ট্রপতির সমান ক্ষমতা ভোগ করবেন, দু'মাস পরে ব্র্যাঙ্কো এককভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ চালাবেন।

সামরিক নেতাদের নির্দেশে 'ইনষ্টিটিউশনাল এ্যাক্ট' নামে একটি আইন ব্রেজিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাশ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে যে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে, যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে ও বহিষ্কার করা চলবে। এই আইনের বলে রাষ্ট্রপতি একতরফা বাজেট প্রস্তুত করতে পারবেন এবং যে কোন আপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ৪০ জন ডেপুটিকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং ৬০ জন বিশিষ্ট ব্রেজিলবাসীর নাগরিক অধিকার দশ বৎসরের জন্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে

* কস্টেলো ব্রাঙ্কে

# রঙ্গজগৎ

## চলচ্চিত্রে পদশোভা

দেহের নিম্নাঙ্গ বলে পা মানে খাটো। তাই পা-চাটা, পায়ে পড়া ইত্যাদি অপমানজনক ব্যাপার। ক্ষেত্র বিশেষে এই পা আবার শ্রীচরণ হয়ে ওঠে। শ্রীচরণকমলেষু, দেহি পদপল্লব, পাদপদ্ম ইত্যাদিতে বিভূষিত হয়। পদমর্যাদার মাপকাঠিতে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণয়ের রেওয়াজ সকল দেশেই প্রচলিত।

সৌন্দর্য ও প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন পদ-প্রশস্তি আছে, পদসৌষ্ঠবের আর্থিক-মূল্যও তেমন এ যুগের অবদান। সুন্দর পা'র বাজারদর কত হতে পারে, তা আপনার আমার ভাবনার বাইরে। হলিউডের অভিনেত্রী এন্ধি ডিকিনসনের পদযুগল দশলক্ষ ডলারে ইনসিওরেন্স করা হয়েছে। অভিনেত্রী মার্লিন ডায়েট্রিসের পা'ও ইনসিওরেন্স করা ছিল। পাশ্চাত্য দেশের সিনেমা জগতে অভিনেত্রীর পা একটি বিশেষ সম্পদ। সেখানে মেয়েদের অনাবৃত পা তাদের অন্যতম 'বিউটি জোন'। অনেক সময় ছবির চরিত্র ও কাহিনীতে মাথার চেয়ে পায়ের গুরুত্ব বেশি দেখা যায়।

এদেশে শাড়ি, সালোয়ারে পদশোভা দেখাবার সুযোগ তেমন নেই। আমাদের পশ্চিমী-প্রেমিক প্রযোজক, পরিচালকদের এটা একটা আপশোষের কথা। ভারতীয় সিনেমায় স্যাক্স আমদানী করেও পায়ের মর্যাদা বাড়ান যায় নি। তাই আমাদের মাথামোটা পরিচালকরা সেই সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। আর এই সুযোগে অনেক চিত্রকন্যা কেবলমাত্র পায়ের পাহাড় দেখিয়ে অভিনেত্রীর তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে। সম্প্রতি দেখলাম 'কোহ্‌রা' ছবিতে এমনি পায়ের খেলা। বেশ দীর্ঘক্ষণব্যাপী স্নানরতা – তরুণীর পদযুগল নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে, বাথ টাবে নেমে একটা পা তুলেও দেখানো হলো।

ভারতীয় ছবির বাজারে যে উলঙ্গ পায়ের বাজারদর বাড়ছে, এ দৃশ্য তারই ইঙ্গিত। মাথায় খাটো হলে পায়ে বাড়ে। —সুজন।

## চিত্রআলোচনা

### কোহ্‌রা

( গীতাঞ্জলি পিকচার্স )

ভৌতিক পরিবেশে এবং সর্বক্ষণ রহস্যময়তার মধ্যে 'কোহ্‌রা'র কাহিনী অগ্রসর হয়েছে পরিণতির দিকে। কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত—ক্যামেরার সৌন্দর্য কাজে ছবিটি বিস্তারলাভ করেছে। ক্যামেরার কাজের সৌন্দর্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

প্রতাপগড়ের জমিদার অমিতের নববধূ রাজশ্রী। অনেক সুখের আশা নিয়ে সে স্বামীর ঘরে এসেছিল। কিন্তু অমিতের প্রথমা স্ত্রী মৃতা পুনমের স্মৃতি সর্বক্ষণ তাকে অস্থির

● 'বিংশতিজননী' ছবিতে গীতা দে। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়

করে তোলে। তাকে যেন মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকে। একদিন চরম মুহূর্তে সে অমিতের কাছে শুনলো পুনমের মৃত্যু-কাহিনী। পুনম ছিল দ্বি-চারিণী, তাই তাকে অমিত হত্যা করেছিল। এই স্বীকারোক্তির পর অমিত বিচারালয়ে উপস্থিত হয়। রায় দানের মুহূর্তে সমস্ত ঘটনার উপর কুয়াশা কেটে গিয়ে সত্য প্রকাশ হয়। ধাই-মা এসে আদালতে জানালো—পুনমকে অমিত গুলী করে হত্যা করার পূর্বে সে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে। সুতরাং সে-ই এই হত্যার জন্য দায়ী। আদালত এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে অমিতকে মুক্তি দিল।

ঘটনার যৌক্তিক বিন্যাস বা বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে এই কাহিনী গতানুগতিক হিন্দী ছবির পর্যায়ভুক্ত। সমগ্র পরিবেশকে দর্শকদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এই দুর্বলতা কাটাবার জন্য টুকরো টুকরো ভাবে কয়েকটি চমকপ্রদ মুহূর্ত এবং উদ্বেগ জাগিয়ে রাখা হয়েছে। এই উদ্বেগ অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় দর্শকদের কাছে কিছুটা

একঘেয়ে মনে হয়। দর্শক আকর্ষণের জন্য ছবির সুরুতেই উলঙ্গতার ইঙ্গিতপূর্ণ স্নানের দৃশ্য দিয়ে পরিচালক কিছুটা আদিরসেরও অবতারণা করেছেন। যৌন-আকর্ষক স্থূল দৃশ্য সৃষ্টির দিক থেকে বাঙালী পরিচালকের রুচি কম যায় না।

অভিনয়ে ওয়াহিদা রহমানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বজিতের উচ্চারণে ত্রুটি অবাঙালী দর্শকদের কানে লাগবে। লতা মুঙ্গেশকরের একটি গান বিশেষ জনপ্রিয়তার দাবি রাখে। হেমন্তকুমারের সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়।

## জুল ভার্নের বিস্ময়কর জগৎ

এলিট সিনেমায় নতুন আকর্ষণ 'দি ফেবুলাস ওয়ার্ল্ড অব জুলে ভার্নে' সকল বয়সের দর্শকদের দর্শনীয় ছবি। জুলে ভার্নে রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'এ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ' এবং 'টুয়েনটি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী' দর্শকদের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমান ছবিটিও বিস্ময়কর ঘটনা ও বিচিত্র দৃশ্যে পরম উপভোগ্য; জুলে ভার্নের এই বিস্ময়ের জগতে আকাশে বেলুন, জলের নীচে সাবমেরিন, অদ্ভুতদর্শন জলচর প্রাণীর বিচরণ। নির্জন দ্বীপে একদল জলদস্যু আধুনিকতম যন্ত্রপাতির এক বিজ্ঞানকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। তাদের উদ্দেশ্য বিশ্বের সমস্ত ধন-সম্পদ তাদের করায়ত্ত হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা দু-জন বৈজ্ঞানিককে অপহরণ করে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টির নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে এক বিধ্বংসী সেল আবিষ্কার করে। অপরজনের কাছে দস্যুদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল, সে বেলুনে চড়ে এই দ্বীপে রক্ষিতা এক তরুণীসহ পলায়ন করে। শেষ পর্যন্ত সহযোগী বৈজ্ঞানিক নিজের ভুল এবং দস্যুদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল; তখন তারই আবিষ্কৃত সেলের বিস্ফোরণে দস্যুদের সমগ্র দ্বীপটি ধ্বংস হয়ে গেল।

এই রোমাঞ্চকর ছবির মর্মবাণী—মানবতার সেবায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ, মুষ্টিমেয় দস্যুর স্বার্থে হয়ে ওঠে অভিশাপ। ছবিটি ব্রুসেলস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করেছে।

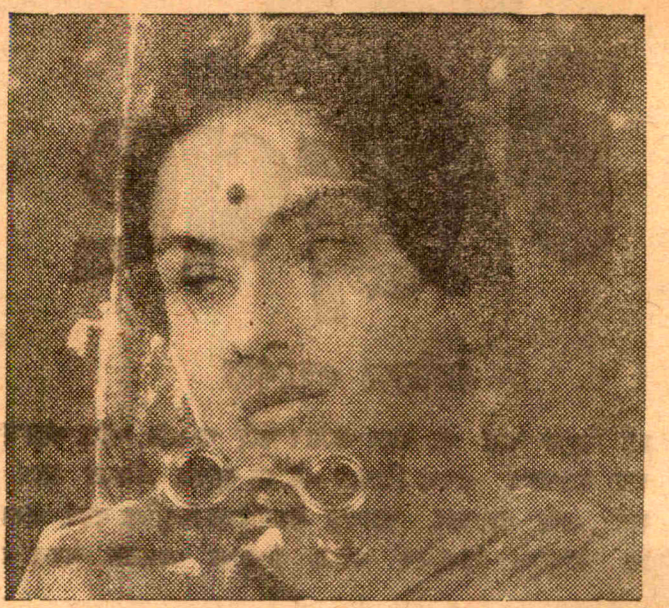

'চারুলতা' ছবিতে মাধবী মুখার্জী

## একটি শিশুর কামনা

গত ১লা বৈশাখ সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে জ্যোতি সিনেমায় একটি উপভোগ্য পোলিশ ছবি—'ভিজিট ফ্রম দি প্রেসিডেণ্ট' প্রদর্শিত হয়েছে। চারটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারের অধিকারী এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে একটি শিশুকে কেন্দ্র করে। চিত্রনাট্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ জনিত সন্তানদের সমস্যা এবং স্নেহকাতর সন্তানের অবরুদ্ধ মনস্তত্ত্বকে রমণীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। সন্তানের মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, পিতাও দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পেতেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও শিশুকে নিয়েই তার দিন কাটে। প্রথম পক্ষের পুত্রের মনে স্নেহলাভের অতৃপ্ত বাসনা; বাবাকে সে ভালবাসে, স্নেহ কামনা করে, কিন্তু বাস্তব জগতে তার বাবা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। এক রূপকথার রাজ্যের প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে সে কল্পনার রাজ্যে চলে যায়, তার অতৃপ্ত বাসনাকে স্বপ্নে দেখে।

পরিচালক শিশুর স্বপ্ন ও দৃষ্টি দিয়ে কাহিনীকে রূপায়িত করেছেন। শিশুর স্বপ্নে অরণ্যরাজ্যে পশুদের ঐকতান সঙ্গীত ইত্যাদির মত পরম কৌতূহলোদ্দীপক ও উপভোগ্য দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন। গভীর আবেদনশীল ছবিটি দর্শকদের বিচলিত করে তোলে; এবং বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

## নাটকের কথা

### বিশ্বরূপায় 'লগ্ন'

বিশ্বরূপা থিয়েটারের পরবর্তী নাট্য-নিবেদন 'লগ্ন'। এতে বহু বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাওয়া যাবে শোনা যাচ্ছে। বহুস্তর ও থিয়েটার স্কোপ মঞ্চপ্রথার প্রবর্তন করে নাটকীয়তায় গভীর প্রভাব সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। এই নাটক

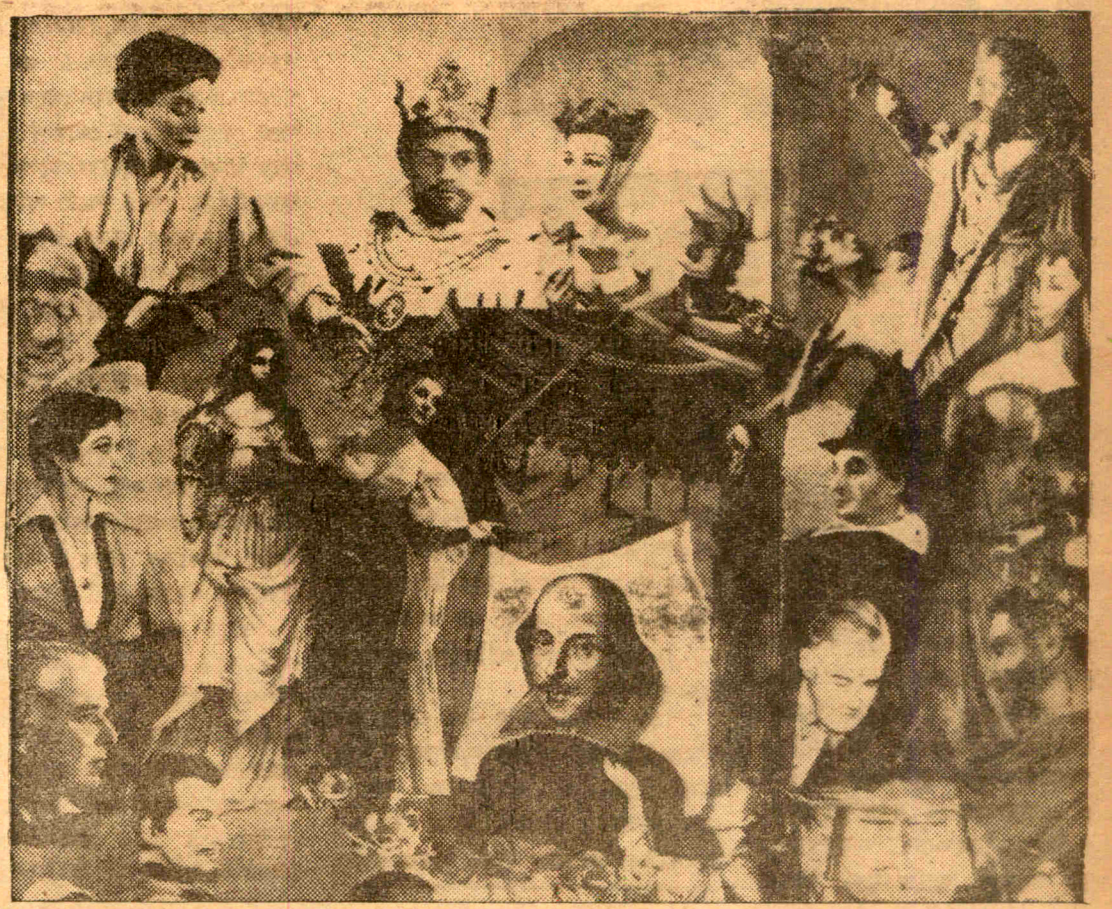

● শেক্সপীয়রের চিরন্তন নাটকগুলিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দ : মার্গারেট লিটন, হ্যারি এ্যাণ্ড্রুজ, হিথার স্ট্যানার্ড, এলান ব্যাডেল, মাইকেল রেডগ্রেভ, ভিভিয়ান লে, ডায়না ওয়াইনার্ড, লরেন্স অলিভার, মিচেল, উইলিয়মস্, গ্লীন ব্যম শ ( সহঃ পরিচালক ), এণ্টনি কোয়েল, জন গিলগাড।

পরিচালনা করছেন বিশ্বরূপার অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার। এতকাল তিনি নাটক প্রযোজনা করছিলেন, এবার তিনি প্রযোজনা ও পরিচালনা উভয় দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য।

### শৌভনিকের ওথেলো

মহাকবি শেক্সপীয়রের চারিশত জন্মশতবার্ষিকীতে 'শৌভনিক' নাট্য সম্প্রদায় 'ওথেলো' নাটক থেকে নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করবে আগামী ২৫শে এপ্রিল।

### সি-এল-টির বিদেশ সফর

চিলড্রেন লিটল থিয়েটারের ২৬ জন শিশু শিল্পী, ৬ জন টেকনিশিয়ান এবং ২ জন প্রতিনিধি সহ ইউরোপ যাত্রা করছে। ভারতীয় শিশুশিল্পী দলের এই প্রথম বিদেশ সফর। সি-এল-টির শিশুশিল্পীরা আন্তর্জাতিক চিলড্রেন থিয়েটার সম্মেলনে যোগদান করবে এবং ১৬ই মে 'অবন পটুয়া' ও 'মিঠুয়া' প্রদর্শন করবে।

### ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার্সের 'কালের যাত্রা' অভিনয়

গত পয়লা বৈশাখে কলকাতা শিল্পমেলার লোক-মাঙ্গলিক মঞ্চে প্রগতিধর্মী নাট্যসংস্থা ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার্স গ্রুপ শরদিন্দু দত্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকটি অভিনয় করেন। এই নাটকে অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন জয়শ্রী, মঞ্জুশ্রী, কাজল দেব, নলিনী ও গোপাল। কবি ও সন্ন্যাসীর চরিত্রে পরিচালক শরদিন্দু দত্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটার্সের পরবর্তী নিবেদন রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'।

## স্টুডিও খবর

* বাংলার চারণকবি মুকুন্দ দাসের জীবনী অবলম্বনে আর বি ফিল্মসের প্রযোজনায় 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' নামে একটি ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

* সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিতে একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন বোম্বাইয়ের কিশোরকুমার।

# খেলা ধুলা

## স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন

ইডেনের শীতের দুপুর ক্রীড়ামোদী-দের স্বপ্ন, আর টেস্ট ক্রিকেটের আসর ত' অমৃত সমান। কিন্তু এপ্রিলের মাঝা-মাঝি কাঠফাটা গরমের দুপুরে ইডেন যেন দুঃস্বপ্ন। একমাত্র টেস্ট ক্রিকেটের সময়ই ঘুম ভাঙে ইডেনের। সে জাগে, সজ্জিতা হয় নববধূর সাজে; তারপর ক'দিন একটানা হুল্লোড় মাতামাতির পর আবার ইডেন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। এবার অসময়ে সোয়াল্টন সাহেব দলবল নিয়ে ক্রিকেটের অকালবোধন করলেন ইডেনে, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে ইডেন তাকে বরণ করল।

ক্রিকেটের এই অকালবোধনে চারদিনের মহাযজ্ঞের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দুই খেলোয়াড় বিচ বেনো আর গ্যারাফল্ড সোবার্স। এর সঙ্গে সেমুর নার্স আর রামাধীনের নামও করতে হবে। ইতিপূর্বে ইডেনে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের বেনো এবং সোবার্সের খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। টেস্টের আসর থেকে বেনো বিদায় নিয়েছেন এবং ক্রিকেট মাঠ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে ইডেনে এই তাঁর শেষ খেলা। যে দর্শকরা এই প্রচণ্ড তাপকে উপেক্ষা করে ইডেনে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরাই হলেন সত্যিকারের ক্রীড়ামোদী, সত্যই তাঁরা ভালবাসেন ক্রিকেটকে। এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা যে, কলকাতায় এরূপ দর্শকের অভাব নেই। এই প্রদর্শনী খেলায় প্রতি মনটে, প্রতি বলে, প্রতি মারে ছিল উত্তেজনা, ছিল আকর্ষণ। গরমের ইডেনে গরম ক্রিকেট দর্শকদের দিয়েছে প্রচুর আনন্দ। 'ব্রাইট ক্রিকেট' যার দর্শন আজকাল আর ক্রিকেট মাঠে বলতে গেলে পাওয়াই যায় না, যার ঠাঁই হয়েছে বইয়ের পাতায়, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত 'ব্রাইট ক্রিকেট'-এর আবির্ভাব হয়েছিল ইডেনে।

সমস্ত ক্রীড়ামোদীর মন এবার জয় করেছে দুই ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান, সোবার্স আর নার্স। সোবার্স ব্যাটে-বলে অনবদ্য এবং দুর্বোধ্য। বর্তমানে তিনি যে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার,

শ্রীঅমিতাভ

একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর বলের বক্রগতি আর কুটিল স্পিন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৩ রানে ৬জন ব্যাটসম্যানকে তিনি ফেরালেন আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ জনকে। ব্যাট হাতে প্রথম থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করলেন। চারের বাড়ি, আর ছয়ের বাড়ি মেরে সেঞ্চুরী করলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নাস দেখিয়েছেন যে, তিনি একজন সত্যিকারের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান। তিনিও সেঞ্চুরী করলেন বটে, কিন্তু সোবার্সের খেলা তাঁর খেলাকে ঢেকে দিল। সোবার্স যে কলকাতার দর্শকদের কত প্রিয় তা দেখা গেল শেষ দিন। ভারতীয় একাদশ তখন প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন, সোয়াল্টনের দলের জয়ের জন্য তখন প্রয়োজন মাত্র ১৩ রান, হা ত ৮টি উইকেট এবং যথেষ্ট সময়। ছন্দপতন হল, বেনো ৬৯ রান করে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন। এই সময় দৃপ্ত পদক্ষেপে প্যাভেলিয়ান থেকে উইকেটের পথে পা বাড়ালেন সোবার্স। উল্লাসে আর আনন্দে আত্মহারা হলেন দর্শকরা, করতালিতে ফেটে পড়ল সমস্ত ইডেন। এই অভিনন্দনের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন সোবার্স তাঁর ব্যাট থেকে। প্রয়োজনীয় রান তাঁর দলের উঠে গেল, দলও গেল জিতে, নার্স ও তিনি রইলেন অপরাজিত। কিন্তু তাঁর সেই ক্ষণিকের অবস্থানেও যে খেলা তিনি দেখালেন তা দর্শকরা কোনদিনই ভুলবে না। বিদায় বেলায় বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত। মারে মারে তিনি আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলেন ইডেনে, দেখালেন ব্যাটে-বলে তিনি সমান।

ভারত প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৩৪৮ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৫ রান সংগ্রহ করার পর সমাপ্তি ঘোষণা করেন বোরদে। সোয়াল্টন একাদশের প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা হল ৩২১। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৪৩ রান সংগ্রহ করে সোয়াল্টন ৭ উইকেটে জয়ী হল।

তবে এবার সি-এ-বি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করতেই হবে। এই দারুণ গরমে ক্রীড়ামোদীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁরা এবার যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন। সি-এ-বি কর্তৃপক্ষের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যই অভিনন্দন যোগ্য। দুটি ব্যাট নিলামে বিক্রি করে ১০,২০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

ভারতের পরাজয় বলতে গেলে বিপক্ষ দলের ৩ জন খেলোয়াড়ের জন্যই হয়েছে। সোবার্স, নার্স এবং বেনোর খেলাই একটা পুরোপুরি ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটাল। তাই ভারতের শক্তির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়ামোদীদের মনে। এই বছরই আসছে অষ্ট্রেলিয়া এবং তারপরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ভারতকে এখন সময় থাকতেই প্রস্তুত হতে হবে, কারণ আগামী শক্তি-পরীক্ষায় ভারতের মাথা যেন নত না হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

## শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত

এবং

ভাগবতাচার্য্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

## শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পাঠ
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

# হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ গ্রাসে করিয়াছে মুনাফী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু লেখক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

---

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

# কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ—

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲

গত প্রায় ২০ বৎসর এই অদ্ভুত ভক্তিগ্রন্থখানি মহাত্মা শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাই চরিতের' পরই সর্ব্বজনসমাদৃত।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তের কণ্ঠহার পবিত্র তুলসীমালা সদৃশ মহাগ্রন্থ।

মূল্য চার টাকা মাত্র।

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব-জনপ্রমোদন—অমরকীর্ত্তি

ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী'

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—দরদী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কল্পনা, স্পর্শ, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গরবেলা, বারোক্রোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ, উদ্ধার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, দেশাত্মা, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের ডাক, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নব্যযুগের নাটা ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ব্বর, অতঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিজয় আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

---


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Thursday, 23rd April, 1964 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34-7771, 34-7772, 34-7773.

1 MAY 1964


# হিন্দুস্থান জেনারেল

## ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

### সেবা ও নিরাপত্তার জন্য

চেয়ারম্যান
ডঃ এন, এন, লাহা
এম-এ, পি-এইচ ডি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রী পি, এন, তালুকদার
এম-এ (ক্যাণ্টাব)

শাখাসমূহ :
বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, নয়াদিল্লী, হায়দরাবাদ (ডেকান), কোচিন, বাঙ্গালোর, কটক, ইন্দোর, আসানসোল, নাগপুর, গৌহাটী, পাটনা, জলপাইগুড়ি, কাটিহার, ঢাকা, বরোদা, ডিব্রুগড়, ধানবাদ, জামসেদপুর, কোডারমা, শওগাঁ

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

অগ্নি-নৌ-মোটর এবং অন্যান্য বহুবিধ
দুর্ঘটনার বীমা লওয়া হয়

# সাপ্তাহিক বসুমতী

রাষ্ট্রপতি-চলচ্চিত্র-প্রতিযোগিতায় সর্বভারতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রসমূহের এক-একটি
চিরন্তন মুহূর্ত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

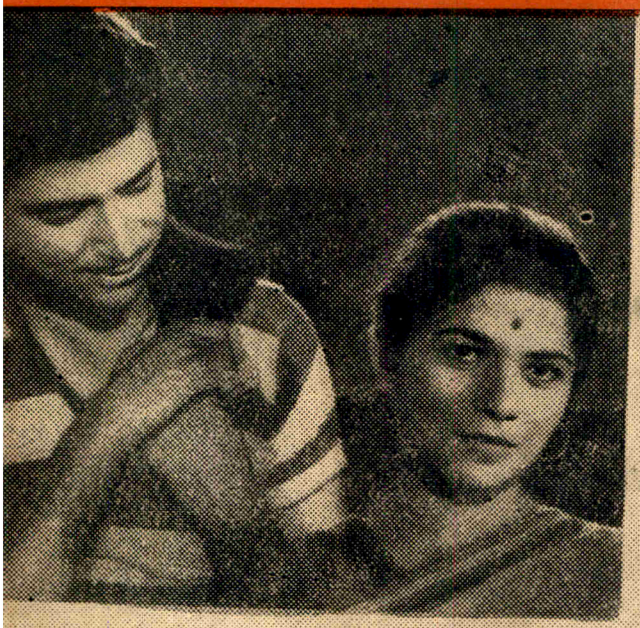

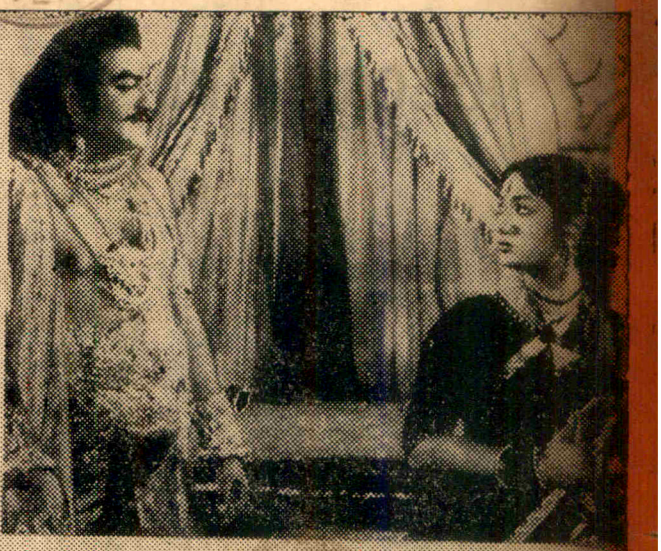

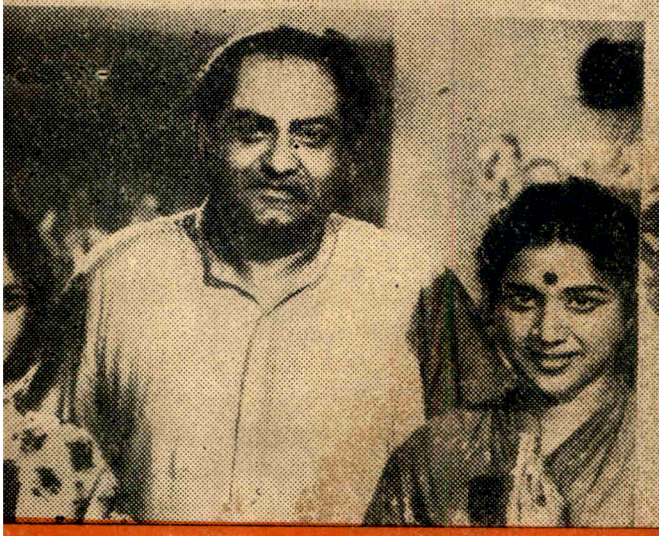

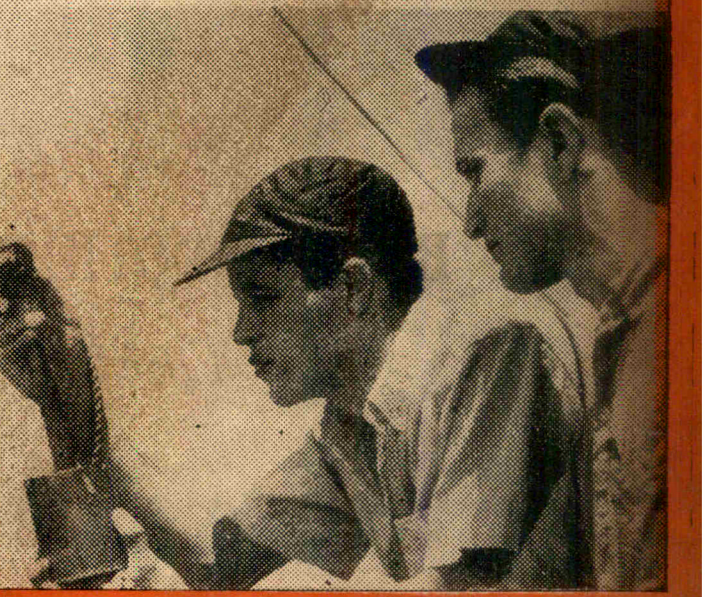

বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • • • • 30th April, 1964 • Vol. 68, No. 49

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

*With best compliments from :*

# KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LTD.

(Formerly Kesoram Cotton Mills Ltd.)

LARGEST COTTON MILL IN EASTERN INDIA.

*Manufacturers & Exporters of*

QUALITY FABRICS AND HOSIERY GOODS

*Managing Agents :*

## BIRLA BROTHERS PRIVATE LTD.

15, India Exchange Place,

Calcutta-1

**Phone : 22-3411 (16 lines)** **Gram : "COLORWEAVE"**

*Mill at :*

**42, Garden Reach Road, Calcutta-24**

**Phone : 45-3281 (4 lines)** **Gram : "SPINWEAVE"**

# সূচীপত্র

756.3
003/3
Yn 68
no.49


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৬৯১ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৬৯২ |
| সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর | ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র | ২৬৯৩ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২৬৯৭ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৭০৪ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৭০৩ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৭০৯ |
| লণ্ডনের চিঠি | অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৭১৫ |
| দুরন্ত দেহলী (কাহিনী বিচিত্রা) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৭১৮ |
| আয়না (গল্প) | পারুল ভট্টাচার্য | ২৭২১ |

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈরাপিন ও বসন্তে। মূল্য—৩·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২৭২৪ |
| কৃষ্ণচূড়া ( উপন্যাস ) | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৭২৯ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২৭৩২ |
| কুড়ি বছর পরে ( গল্প ) | রজত রায় চৌধুরী | ২৭৩৪ |
| পঞ্চমী পুরাণ ( ধারাবাহিক রহস্য-গল্প ) | লীলা মজুমদার | ২৭৩৬ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৭৪০ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৭৪৩ |
| সংবাদ বিচিত্রা | সাংবাদিক | ২৭৪৭ |
| নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী | দেবনারায়ণ গুপ্ত | ২৭৪৮ |
| পাঠক মন | ... | ২৭৫০ |
| খেলাধূলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৭৫১ |



# কবিকঙ্কণ চণ্ডী

**মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী**

**( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক )**

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

**—বর্দ্ধমান গ্রন্থে আছে—**

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ( ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

**মূল্য সাড়ে চার টাকা**

## নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

**মূল্য সাড়ে তিন টাকা**

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

**ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব**

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

**শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

## মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬৮ বর্ষ, ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ১৭ই বৈশাখ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 30th April 1964

# শ্রীমহাবীর ত্যাগী ও দণ্ডকারণ্য

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের পূর্ণ-মন্ত্রীরূপে শ্রীমহাবীর ত্যাগী কর্তব্য-ভার গ্রহণ করেছেন।

সতর্ক ও সচেতন শ্রীত্যাগী দণ্ড-কারণ্যের ইতিহাস নিশ্চয়ই জানেন। নিজের খামখেয়ালীর রাজত্বে খান্না সেখানে শ্রীজনসনকে খাড়া করে খর্ব করতে চেয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্তের কর্মক্ষমতা। এইসব কারণে খান্না পুনর্বাসন সমস্যাকে---জাতীয় সমস্যা তে দূরের কথা, কোনো সমস্যা হিসেবেই দেখেন নি। শ্রীত্যাগী সেই সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে উদ্বাস্তুদের প্রতিষ্ঠা দিয়ে দেশের কল্যাণকর্মে তাদের নিযুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

উদ্বাস্তুদের চোখে দণ্ডকারণ্যের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। নতুন জগৎ, নতুন সমাজজীবন গড়ার স্বপ্ন বিলীন-প্রায়। আজো তরঙ্গের পর তরঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছে উদ্বাস্তুর দল। তাদের পুন-র্বাসনের জন্য 'শ্রমিকবাহিনী' গঠন ও ঐ কারণে শিল্পপতিদের সহ-যোগিতা কামনা করেছেন শ্রীত্যাগী। তবু যে সব রাজ্য এই উদ্বাস্তুদের সাহায্য দিতে চেয়েছেন তাঁদেরও ওপর বর্ষিত হোক শ্রীত্যাগীর শুভেচ্ছা। কিন্তু দণ্ডকারণ্যকে জীবন-মরুদ্যান করে গড়ে তুলতে হলে সেখানে শায়েস্তা করতে হবে জনসনদের, ভাঙতে হবে কুটিল চক্র। তাই দরকার শ্রীত্যাগীর অপরিমেয় সৎসাহস।

পুনর্বাসনের বিভিন্ন সমস্যাও আছে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থানাভাব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে যদি বহিরাগত লোকেরা ঠাঁই পায়, তাহলে সেখানে অকৃষিজীবী বাঙালী উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দিলেই কি নীতির মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? দণ্ডকারণ্যে অর্ধ লক্ষাধিক গেছে, প্রতিদিন দু-তিন হাজার গিয়ে মিলিত হচ্ছে। এদের নেই আশু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। স্বভাবতই সৃষ্টি হচ্ছে আশ্রয়হীন মানুষের দুর্বল আশ্রয়ে সামাজিক জটিল সমস্যা---যা সমস্ত জাতির পক্ষে ভবি-ষ্যৎ মঙ্গলের পথে বিঘ্নস্বরূপ। এই সব উদ্বাস্তু, বিশেষত শিশুদের দেখাশোনার জন্য সাময়িকভাবে বে-সরকারী কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। দণ্ডকারণ্যে যে সব উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে তাদের যথার্থ শিক্ষার জন্য মাতৃ-ভাষার ব্যবস্থা থাকা এবং স্কুল-কলেজ বৃদ্ধি করাও দরকার। ঐ স্কুল ও কলেজগুলি প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারা পরিচালিত হওয়া অনিবার্য-ভাবে প্রয়োজন। দণ্ডকারণ্যে যে বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ নেই তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ব্যবস্থায় ও সরকারী ব্যয়ে সুযোগ থাকাও বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি, শ্রীত্যাগী উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাব্যবস্থার জটিলতার হাত থেকে মুক্ত করবেন।

দণ্ডকারণ্যে কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে তা পরিদর্শনের জন্য নিরপেক্ষ দেশহিতৈষীদের সুযোগ দিলে সর্বসাধারণের মধ্যেও একটি স্বস্তির ভাব ফিরে আসবে, একথা বলা বাহুল্য। শ্রীত্যাগীর আগামী দিনের কর্মসাফল্যে জাতীয় সমস্যা সমা-ধানের ফলাফল নির্ভর করছে, একথা তিনি যেন কদাপি বিস্মৃত না হন।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

ছোট্ট সাজানো শহর লাওস। তখনও ঘুম-ঘুম আমেজটুকু কাটে নি। কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া তরুণ সূর্য উঁকি-উঁকি করছে। পাখীর কলকণ্ঠে: 'ভোর ভয় ভোর ভয়'। কিন্তু হঠাৎ একি দুরন্ত ভীষণ শব্দের স্রোত? গোলাবৃষ্টি হচ্ছে শহর জুড়ে। প্রলয় বুঝি বাধে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র সৈন্য টহল দিচ্ছে। দক্ষিণপন্থী সেনারা ঘিরে ফেলেছে নিরপেক্ষতাবাদী মন্ত্রীদের ঘরবাড়ি, ব্যাঙ্ক—এমন কি সব যোগাযোগ কেন্দ্রগুলিও। বেতারে প্রচারিত হ'ল: জেনারেল কুপ্রাসিত অভয় ও জেনারেল সিহোর পরিচালনায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে ভিয়েনতিনে। প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমা সেনাবাহিনীর সশস্ত্র বিপ্লবী সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছেন দেশের শাসনভার। কিন্তু স্বয়ং প্রিন্স সুভান্না কোথায়?—খবর এলো পরিশেষে। তিনি বন্দী। বন্দী দক্ষিণপন্থীদের হাতে। বিস্ময়ের ঘোর তখনও মেলায় নি। খবর এলো—জেনারেল কুপ্রাসতের সঙ্গে লুয়াং প্রবাং-এ রাজার কাছে গিয়েছেন সুভান্না। রাজা সুভান্নার পক্ষ নিলেন। পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত সামরিক দলের নেতারাও কয়েকটি সর্তে রাজী হলেন তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তুলে দিতে।

একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গৃহযুদ্ধের আগুন নিভিয়েছিলেন সুভান্না ফুমা। দক্ষিণপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান সে আগুন আবার উস্কে দিয়েছিল। আবার তাঁকে দিয়েই এই দুর্যোগের অবসান হ'ল। তারই প্রগতিশীল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি বিশ্বমঞ্চে পদমর্যাদা বাড়িয়েছে লাওসের। পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক পালাবদল তিনি দেখেছেন তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনিশ্চিত ভাগ্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নতুন নয়।

রাজবংশের কুলতিলক সুভান্না লাওসের এক অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্ব। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর উদার অপার। অথচ যৌবনে রাজা সিসোভান ভঙ্গ ছেলেকে ফ্রান্সে পাঠালেন শিক্ষালাভের জন্য—তখন কে জানত উত্তরকালে রাজনীতির হাওয়া তাঁকে সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ারের পদ থেকে টেনে এনে প্রতিষ্ঠা করবে একটি ঘটনাবহুল রাজ্যের নেতার সম্মানে? '৫১ সালে প্রিন্স সুভান্না ফুমা হলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। ওই একই দায়িত্বে ছিলেন '৫৪ সাল পর্যন্ত। আবার '৫৬ সালে ওই পদের জন্যই আহ্বান এলো। কিন্তু মাত্র দু'বছর পরই ত্রিপক্ষীয় সরকারের পতন হ'ল। প্রধানমন্ত্রী সুভান্না ফুমা হ'লেন ফ্রান্সের এ্যামবাসাডর। দক্ষিণপন্থীরা তখন রাজ্য পরিচালনা করছেন। '৬০ সাল পর্যন্ত এইভাবে কাটল। তারপর কোয়ালিশন সরকার পুনর্গঠিত হ'ল। ক্যাপ্টেন (অধুনা জেনারেল) কঙ্ থে সুভান্নাকে ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী হ'বার জন্য। তবুও এ টানাপোড়েন মিটল না এত সহজে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল সরকার আর বামপন্থী পাথেট লাও গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রিন্স সুভান্না গেলেন কম্বোডিয়ায়। এরই মধ্যে কমিউনিষ্ট-বিরোধী দলও সক্রিয় হয়ে উঠল। প্রিন্স বোন ওয়াম কমিউনিষ্ট-বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করে প্রধান মন্ত্রিত্ব অধিকার করলেন। সুভান্নাকে আহ্বান জানিয়ে প্রত্যর্পণ করলেন এ দায়িত্ব। এ ঘটনার আরও দু'বছর পরে '৬২ সালে জেনেভা সম্মেলনে চোদ্দটি শক্তি মিলিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিল লাওসের নিরাপত্তা রক্ষার। নিরপেক্ষতাবাদী সুভান্নার নেতৃত্বে ত্রিপক্ষীয় সরকারের পুনরভিষেক হ'ল।

তার পর থেকে আশ্চর্য সমতায় তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলছিলেন শান্তির মিনার। তখনও আশঙ্কা করেন নি যে, তলে তলে সেই মিনারেই ফাটল ধরেছে। দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধ জমে উঠছে প্রচুর। দক্ষিণপন্থী কুমি নোসাভান প্রমুখ নেতারা মার্কিন সাহায্য পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছেন ক্রমশ—অভিযোগ জানালো বামপন্থীরা। পাল্টা অভিযোগ উঠল, বামপন্থী পাথেট লাও গোষ্ঠী কমিউনিষ্ট ভিয়েৎনামের সাহায্যে দিনে দিনে দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। ফলে দেশের নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা, সংহতি বিপর্যস্ত হচ্ছিল। ধ্বসা নামছিল প্রিন্স সুভান্নার এত আশায় গড়া শান্তির মিনারে। গত ১৯শে এপ্রিল এই সংঘর্ষই পৌঁছল চরমে। দক্ষিণপন্থীদের সামরিক অভ্যুত্থান হ'ল। কিন্তু স্বল্প সময়ে ত্বরিত রূপান্তরে গতির মোড় ফিরল সহসা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সুভান্নাকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানালেন। অবশেষে এক সময়ে আকস্মিক প্রলয়ের প্রশমন হ'ল। প্রিন্স সুভান্নার নেতৃত্বে লাওসের নিরপেক্ষতাবাদী দলের হঠাৎ পতনের দুঃসংবাদে শান্তিকামী সকল

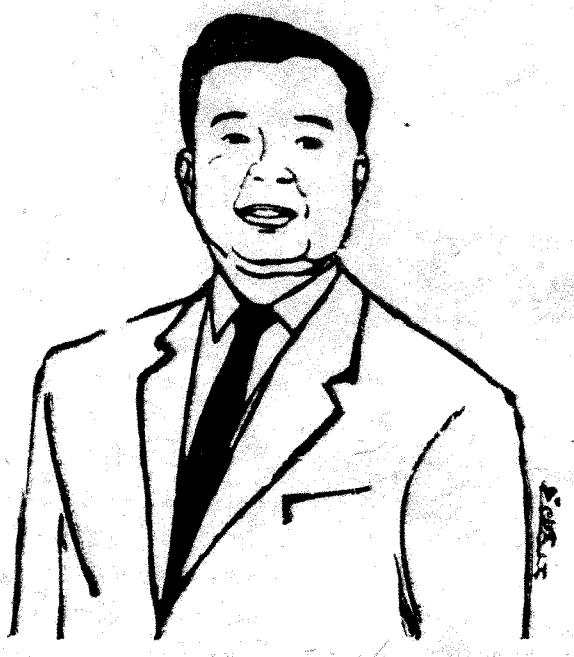

প্রিন্স সুভান্না ফুমা

দেশই মর্মাহত হয়েছিল। আবার তাঁকে রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে স্বীকার করা হ'লে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সকলে। আজ বিশ্বে দ্বৈতশক্তির ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার দিনে তৃতীয় কোন শক্তির—বিশেষত নিরপেক্ষ শক্তির অধিষ্ঠান একান্ত কাম্য। প্রিন্স সুভান্না সে পথেরই অতন্দ্র সেনানী। লাওসের বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি অপরিহার্য মানুষ। দৃঢ়তর, বিচক্ষণ, দূরদর্শী সুভান্না ফুমাকে আজ তাই আবার নতুন উদ্দীপনায় হাত লাগাতে হবে শান্তিমিনারের শ্লথ ভিত্তিকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে।

# সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

## হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর মানে দিনচিত্রের চিত্ররেখা নয়। তথ্য, তত্ত্ব, অনুভূতির সমতলে আর তরঙ্গপথে নানা শীর্ষ ধরে ধরে এ যেন অন্তর্লোকের পরিক্রমা। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। ১৩১৮ সালের ১৭ই ফাল্গুন শিলাইদা থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার পুরাতন চিঠি-পত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা।'

জগতের আনন্দ-যজ্ঞে তাঁর যে পরমাশ্চর্য নিমন্ত্রণ ছিল, সে-কথা তিনি তাঁর কবিতায় বলে গেছেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের কাছে লেখা তাঁর এই চিঠিতেও সে-উপলব্ধির উল্লেখ ছিল। সেই ধারাতেই তিনি তাঁর সেই চিঠিতে লিখেছিলেন: 'দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানালায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র এবং মাটিপাথরজল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভমুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্টসুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি।'

এই অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশাধিকার কি সহজে মেলে? জীবনের পথে সুখ-দুঃখের ঢেউ পেরিয়ে পেরিয়ে মানুষকে চলতে হয়। প্রাণের দেবতা বলছেন—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো! সেই কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো আজ তেইশে এপ্রিল, ১৯৬৪। রাজশেখর বসু লোকান্তরিত হন সাতাশে এপ্রিল, ১৯৬০।

তাঁর সেই তিরোধানের দিনটি মনে আসছে। বকুলবাগান থেকে কেওড়াতলার ঘাট পর্যন্ত শবানুগমনের মিছিলে যোগ দিতে পারিনি। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। যখন ঘাটে পৌঁছলুম, তখন গ্যাসচুল্লির চাকনা বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে শ্বেত শতদলের স্তূপ। মাথার ওপর আকাশ অন্ধকার।

সেই বিষাদের মধ্যেই 'কচি-সংসদ'-এর দার্জিলিং যাত্রার জল্পনা মনে পড়েছিল। যেন বিষণ্ণ গ্রীষ্মের ওভারকোট তুচ্ছ করে শরৎকালের হঠাৎ আবির্ভাব সেটা। মৃত্যু যেন মৃত্যু নয়! অবসান যেন অবসান নয়!

'শরওরান' লিখেছিলেন—'কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে।---কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে।'

পাঠকমাত্রেরই মনের গভীরে মাঝে মাঝে এই রকম দূরযাত্রার আবেগ দেখা দেয়। তখনকার পাঠ ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু ভ্রমণ তো শুধু চর্মচক্ষুর পিপাসা নয়,—কেবল লোকদৃষ্টির পথে পথে নয়। ভ্রমণ দেশে এবং কালে,—স্বপ্নে, ধ্যানে, অনুধ্যানে। সেখানে দেশ-দেশান্তরের যাত্রীর যাত্রা।

সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে। 'দত্তা' উপন্যাসের কয়েকটি কথা—'গলির সুমুখে হাজরা-দের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হইল।'

এইসব ক্ষেত্রে আড়াল মানেই যন্ত্রণা। মানুষ স্থিতিও চায়, গতিও চায়। যেমন অতিগতি ভালো নয়, তেমনি অতিস্থিতিও ভালো নয়।

এসব পুরোনো কথা। কিন্তু সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরের ভাবনায় এই-সব পুরোনো কথা কি পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা যায়? তবু, দেশ-দেশান্তরের কথা বলতে গেলে তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের দিকে কিঞ্চিৎ আত্ম-শাসন দরকার। স্থূল আড়ালের কথা থেকে অতি সূক্ষ্ম আরো যে সব আড়ালের ভাবনা মনে আসে, সে সব অন্যত্র বিবেচ্য। আপাতত শরৎচন্দ্রের কথাটুকুই মনে আসুক। তার বেশি নয়।

সেই আড়ালের যন্ত্রণাতেই,—কলকাতার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো-এক গ্রামের তুলনা মনে এসেছিল 'দত্তা' উপন্যাসের বৃদ্ধ বনমালীর মনে। কন্যা বিজয়াকে তিনি বলে-ছিলেন—'তুই তো জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুল-বাগানের ধারের ছোট্ট নদী এতক্ষণ সোনার জলে টলটল

করে উঠেছে; আর তার পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনো সুয্যিঠাকুর যাই যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি।'

তবু মায়া কাটাতে হয়। সূর্য-দেব দেশ-দেশান্তরের মায়া কাটিয়ে চিরকালের আকাশে বিদ্যমান। এক মায়ার বন্ধন নাই যদি ঘোচে, তাহলে অন্য মায়ার আমন্ত্রণে সাড়া দেবেন কে? পৃথিবীর মানুষের মন এই মায়ামোহের টানেই নিয়ত ঘুরে চলেছে। সাহিত্যেও সেই ছায়া। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'চিরনূতনের অভিষেক চিরপুরাতন বেদীতলে।'

মনের ছায়া পড়ে রচনায়। রচনা কি শুধু ছায়া? দর্পণে যেমন দেহের বিম্ব?—সরোবরে যেমন আকাশের প্রতিফলন?

পিটার ফ্লেমিঙের চোখ দিয়ে ব্রেজিলের আরণ্যভূমির ছায়া দেখা যাক্। রিবিরোআ—প্রেটো ছেড়ে ইগারাপাভা,—সেখান থেকে আরো উত্তরে রমণীয় গয়াজ,—সেই পথেরই একপাশে উবেরাবা শহরের দিকে মুখ রেখে মোটর গাড়ির বাহিনী এসে থামে, কিন্তু পথের শেষ কোথায়? অভিযান এগিয়ে চলে আরো উত্তরে। সন্ধ্যার রাঙা আকাশ, আর উৎক্ষিপ্ত ধূলোর কুণ্ডলী পড়ে থাকে পেছনের পথে। তারপর রাত্রি, অন্ধকার, আকাশে লক্ষ লক্ষ তারার দীপাবলী। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইভাবে যে অভিযান এগিয়ে চলে ব্রেজিলের গভীর থেকে গভীরে। রাত্রে বিশ্রাম,—খুব ভোরে উঠে আবার যাত্রা শুরু হয়। এক পেয়ালা কালো কফি খেয়ে নিয়ে লরী বোঝাই করা টুকিটাকি বিচিত্র সব মালপত্র গাজিয়ে গুছিয়ে, বাইরের ঠাণ্ডা ভোরে সামনের পথে বিয়ে পড়া। শহরের পথে পথে তখনো আলো জ্বলে, দূর থেকে ভেসে আসে ব্যারাকের বিউগ্‌ল্-এর ভোরাই। মোটরের ইঞ্জিনের গর্জনে সে-শব্দ ডুবে যায়। শেষ রাত্রির স্তব্ধতার ওপর ধীরে-ধীরে দিনের প্রথম অস্ফুট যেসব শব্দের জন্ম হয়, সেসব শব্দ আর কানে আসে না, সব ডুবে যায় একরাশ ইঞ্জিনের আওয়াজে।

এমন সময়ে খাজনা আদায়ের একটা ঘাঁটিতে দাঁড়াতে হয়। শহরের বাইরে এসে আবার একবার প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ সেটা। দিন তখন আরো এগিয়ে গেছে, ভোর হয়েছে। কুকুর আর মোরগের ডাক উঠেছে, কোথায় একটা চাবুক শাঁই করে উঠলো, কে যেন কোথায় কুড়ুল চালাচ্ছে ধপাধপ্ কাঠের ওপর।

সন্ধ্যার আওয়াজ অন্য রকম, দুপুরের শব্দগুলোও সেরকম নয়। চোখ বুজে থাকলেও ভোরের এই বিশেষ শব্দ, বিশেষ সুরটা ঠিকই চেনা যায়। পাহাড়ের চূড়ায় আর লম্বা লম্বা গাছের মাথায় লেগেছে অরুণরশ্মি; সমস্ত জলাশয়ের ওপর নীলচে কুয়াশা। সেই আশ্চর্য আলোর একটি রেখা যেন হঠাৎ গিয়ে পৌঁছেচে পথের পাশেই যে কুটিরটি, সেই কুটিরের জানলায়। তাতে ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। আধা-শ্বেত আধা-নিগ্রো রক্তের একটি মেয়ে সেই ঘরে বসে-বসে একটা আখ চিবুচ্ছে। প্রত্যেক কামড়ের সঙ্গে তার মাথাটি বেঁকিয়ে সে একটু পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছে। তার ঘাড়ের পেশী ফুলে উঠছে, আর, আখের রস চুষে নেবার সময় তার গালের হাড় আর মুখের ছুঁচোলো ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বল্লমের ফলার মতো সূর্যের আলো যেন বিদ্ধ করছে সেই আশ্চর্য দৃশ্যপট। কিন্তু সেও ক্ষণ-স্থায়ী। আবার গিয়ারের শব্দ, আবার গাড়ি এগিয়ে চলে। পেছন দিকের ঘরে বসে আখ-চিবোনো সেই মেয়েটির ছবি পড়ে থাকে পেছনে। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু শুধু, রিক্ত পাখির ছোঁ-দেবার ভঙ্গির মতো ঢালু রাস্তা ধরে সবেগে এগিয়ে যাওয়া। রাস্তা এঁকেবেঁকে দূর থেকে দূরান্ত ছুঁয়েছে। দিগন্ত কখনো ঝাঁপিয়ে সামনে আসে, কখনো হেলায় পেছনে সরে যায়। কিন্তু রেলগাড়ি থেকে রেলের সঙ্গে পাল্লা-দিয়ে-চলা রাস্তাটা যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীর মতন মনে হয়, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়ে রাখে দোদুল্যমান দিগন্ত। প্যারাকীট ( Parrakeets ) পাখি উড়ে যায় পথের ওপর দিয়ে,—বন-স্থলীর এক প্রাকার থেকে নেমে বৃহৎচঞ্চু টুকানের ( Toucans ) ঝাঁক উড়ে যায় অন্য প্রাকারের শিয়রে। তারা সব সময়েই জোড় বেঁধে থাকে কিন্তু পাশাপাশি নয়, যেন দূরে দূরে থাকবার চিরাচরিত কোনো প্রথার খাতিরে একটির পেছনে থাকে অন্যটি,—যুগলের মধ্যে কেবল অনুসরণ আর অন্তর্ধানের খেলা চলেছে যেন। দীর্ঘকায় সেক্রেটারি পাখিরা বোকার মতন হেঁটে যায় রাস্তার এপার থেকে ওপারে, পাশে অষ্টাবক্র চণ্ডের গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে মোটরবাহিনী দেখতে আসে ধূসর, মৌনী, বিহ্বল একটা এমুপাখি। সামনের গাড়িটা থেকে একসঙ্গে এক ঝাঁক রিওলভার গর্জন করে ওঠে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়!

দিনের প্রহর বাড়তে থাকে। প্লোভার ( Plover ) আর নানারকম ঘুঘু, পার্টরিজ আর কাটঠোক্‌রা—কমলারঙের কী সুন্দর ঘাড় তাদের,—নানারকম চিল,—দিন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা অদৃশ্য হয়। এবড়ো-খেবড়ো, শুকনো জমিতে প্রাণের সাড়া নেই। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে শুধু বড়ো বড়ো গিরগিটি, আর গাছের ছায়াতে ছায়াতে উন্নতকোকুদ জেবু ষাঁড়ের ( Zebu ) দল।

মনের এই সব আঁচড় পড়েছিল কাগজে। পিটার ফ্লেমিঙের নিজস্ব জগৎ এসব। এ তো শুধু ছায়া নয়,—কেবল প্রতিলিপি নয়, প্রতিফলন নয়!

এইরকম দেশ-দেশান্তর গড়ে উঠেছে দেশে দেশে, কালে কালে। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতও তাই। পশ্চিমের ইলিয়ড-অডিসিও তাই। ট্রয়ের যুদ্ধও সেই একই মায়াবতীর মায়ার টান। মনে আসছে সেসব কথা। সেই যুদ্ধ আর তার পরের ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে দীর্ঘ কাহিনীর এক অধ্যায় হলো হোমরের 'ইলিয়ড',—আর এক অধ্যায় তাঁর 'অডিসি'। সাহিত্য-সৃষ্টিপ্রয়াসী পশ্চিমের শিল্পি-মনের সার্থক অভিব্যক্তির নমুনা আছে এই মহাকাব্য দুখানির মধ্যে। গ্রীক সামন্ত নরপতি অ্যাগামেম্ননের সেনাবাহিনীর অধীনে প্রাচীন ট্রয় নগরীর পুরো দশটি বছর অবরোধে কেটেছে; সেই দশ বছরের কিছু আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করেই 'ইলিয়ড' মহাকাব্যের আসল প্রসঙ্গ বা কথাবস্তুর পরিকল্পনা। ট্রয়ের বুড়ো রাজা প্রায়াম-এর অনেকগুলি ছেলে,—তাদেরই একজনের নাম প্যারিস। মানচিত্রে এশিয়া-মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণে, ইজিয়ান সমুদ্রতীরের পুরোনো শহর হিসারলিক-ই বোধ হয় সেকালের প্রসিদ্ধ 'ট্রয়' বা 'ইলিয়ম' নগরীর অবশেষ। গ্রীসের অন্যতম সামন্তরাজ মেনিলেয়স-এর সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে হরণ ক'রে প্যারিস সেকালে ট্রয়ের সেই ঘোর দুর্দিন ডেকে এনেছিলেন। গ্রীকরা ভেবেছিলেন যে, সারা গ্রীসের বিরুদ্ধে সেটা দুঃসহ লাঞ্ছনা। ফলে, দেশে জেগে ওঠে বিক্ষোভ। অন্যান্য সামন্তরাজাদের সাহায্যে পুষ্ট হ'য়ে অ্যাট্রিয়াস-এর ছেলে অ্যাগামেম্ননন, আর তাঁর ভাই মেনিলেয়স এক বিপুল গ্রীক-বাহিনীর নেতা হয়ে দেখা দেন। ট্রয় ধ্বংস করবার দৃঢ় সংকল্প তাঁদের মনে মনে। ট্রয়ের সমুদ্রতীরে সারি সারি গ্রীক জাহাজ দাঁড়িয়ে যায় নোঙর ফেলে। তার এপাশে তটের ওপর সৈন্যদের ছাউনি। সেইসব ছাউনির ওদিকে সমুদ্র, আর এদিকে অনতিদূরে ট্রয়ের নগর-প্রাকার।

হোমরের ইলিয়ড-এর আসল গল্পটির বিস্তার খুব বেশি নয়। অ্যাগামেম্ননের সঙ্গে মতান্তরের ফলে সাময়িকভাবে অ্যাকিলিস-এর যুদ্ধ-ত্যাগ,—এবং অবিলম্বে সে-বিরোধ মিটমাটের ফলে পুনরায় তাঁর যুদ্ধে যোগদান,—আর তাঁরই হাতে ট্রয়ের রাজপুত্র হেক্টরের নিধন এবং নিহত সন্তানের পিতা প্রায়াম-এর চেষ্টায় অ্যাকিলিসের কবল থেকে মৃতদেহ


# রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায়
এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

## ৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

**॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥**

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ করতে পারেন সে জন্যে নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশনে ৪ঠা মে থেকে এই কয়টি কেন্দ্রে তাঁরা পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

**বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়**
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

**বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়**
২১০ বিধান সরণী,
কলিকাতা—৬

**বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ**
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলিকাতা—৭

**দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি**
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

**জিজ্ঞাসা**
১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা—২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

**দামোদর পুস্তকালয়**
বর্ধমান

**বিশ্বভারতী শিক্ষসদন**
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

**পত্রিকা সিণ্ডিকেট**
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী

**ছইলার ডিস্ট্রিবিউটারস্**
১৫ এলগিন রোড, এলাহাবাদ

**ভারতী ভবন**
গোবিন্দ মিত্র রোড,
পাটনা

পূর্ব পাকিস্তান

**বুক সেন্টার**
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

**॥ পুস্তকবিক্রেতাদের পৃথক পত্র দেওয়া হল না ॥**

## বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

উদ্ধার ও পরিশেষে হেক্টরের সমাধির দৃশ্য,—হোমরের নামে প্রচলিত ইলিয়ড-এর কাহিনী এই পর্যন্ত এসেই থেমেছে। 'অডিসি'র আগেই 'ইলিয়ড' রচনা শেষ হ'য়েছিল বলে মনে হয়।

এইসব ব্যাপারে দশ বছর কাটিয়ে, গ্রীক যোদ্ধারা ফিরতি পথে ফিরতে গিয়ে, আবার যেসব বীরত্বের সুযোগ পেয়েছিলেন, 'অডিসি'র মধ্যে হোমরের দেওয়া তারই চিত্রমালা আছে। একে একে প্রত্যেকের কথা বলা হয়েছে। তাঁদেরই একজনের নাম অডিসিয়াস (Odysseus)। তিনি গ্রীসের পশ্চিম উপকূল-পারের 'ইথাকা' দ্বীপের রাজা ছিলেন। মেনিলেয়স, অ্যাগামেম্‌ননন, নেস্টর এবং বিশেষভাবে অডিসিয়াস,—এই চারজনের ভ্রমণবৃত্তান্তের দিকেই হোমরের বেশি আগ্রহ ছিল,—তবে, অডিসিয়াস সম্বন্ধে সর্বাধিক; এবং তিনিই সে-কাব্যের ভ্রাম্যমাণদের মধ্যমণি। ট্রয়ের নরপতি বা অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিষয়ে প্রায় মৌনী থেকে, কেবল রাজা প্রায়াম-এর মেয়ে ক্যাসাণ্ড্রার মৃত্যুর কথাটা হোমর ব'লে গেছেন। দুর্দশার অবসানে ট্রয়ের অধিবাসীরা জীবনের নতুন কোন্ পর্বে পুনর্যাত্রা শুরু করলেন, সে-কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যায়। দশ বছর ধরে ট্রয় অবরোধের পালা, —আরো দশ বছর এইসব ভ্রমণ ও অভিযানের প্রসার,—এই বিশ বছরের মধ্যে অডিসিয়াস ইথাকায় ফেরেন নি। সমুদ্রদেব পসিডন তাঁর শত্রু। তাঁকে তুষ্ট না করে ফেরা কি সহজ কথা? এদিকে, ইথাকার রাজপ্রাসাদে আছেন তাঁর সতী রাণী পেনিলোপি, আর, রাজপুত্র টেলিমেকাস। পেনিলোপির সৌন্দর্যের খ্যাতিতে, আর, অডিসিয়াসের রাজসিংহাসনের লোভে লুব্ধ ভ্রমরের মতো ইথাকা এবং তার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নানান রাজা-রাজড়ার ভিড় জমেছে। এদিকে দেবতারাও সভায় বসেন। সেই সভাতেই অডিসিয়াসকে দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন অডিসিয়াসের প্রতি অনুগ্রহবর্তী দেবী এথেন (Athene) নিজে আসেন ইথাকার প্রাসাদে। টেলিমেকাসকে তিনি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন।

অন্য দেশে, অন্য কালে, অন্য পরিবেশে ধনপতির ছেলে শ্রীমন্ত নিরুদ্দিষ্ট বাপের সন্ধানে গিয়েছিলেন। তিনিও কি তেমনি উদ্যত হবেন? এইখান থেকেই অডিসিয়াসের সূত্রপাত।

কিন্তু আমি ইলিয়ড-অডিসির গল্প বলতে বসি নি। আমার এ-লেখা ভ্রমণকাহিনী নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর কাহিনীও নয়। পৃথিবীতে কতো সাহিত্য! সাহিত্যে কতো ভ্রমণ! আমি কতোটুকুই বা পড়েছি! আমি কী-ই বা জানি! 'সাহিত্যের 'দেশ-দেশান্তর' নাম দিয়ে আমি কোনো কোনো অনুভূতির হাওয়া ধরবার চেষ্টা করছি। সেই ভ্রমণের কথাই লিখতে বসেছি। আমার অভিজ্ঞতার পরিধি সামান্যই। রামনাথ বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত আমাদের এই বাংলাদেশের গণ্যমান্য অসংখ্য যাত্রীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ বা শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বা অন্নদাশঙ্কর রায় বা শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, সৈয়দ মুজতবা আলী বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অমিয় চক্রবর্তী বা শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্রবর্তী বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীদের পথ বিচিত্র,—পথের বিস্ময়ও অফুরন্ত। আমি তাঁদের সকলের সহযাত্রী নই। তাঁদের এবং আরো কোনো কোনো লেখকের পাঠক মাত্র। আমি সাহিত্য-পাঠক। ততোধিক কিছুই নই আমি। এই আমার নিবেদন। পাঠকরা আমাকে ভুল বুঝবেন না, এইটুকুই আমার সবিনয় নিবেদন।

আমার জগৎ ছোটো বটে, তবু আমারও সান্ত্বনা আছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখা থেকে আমি সেই আশার কথা পেয়েছি। ছোট্ট একটি জেলার মধ্যেও তিনি দেশ-দেশান্তরের স্বাদ পেয়েছিলেন।

তিনিই লিখেছেন যে, কুশীপ্রাঙ্গণের ভৌগোলিক সীমানা খুব বিস্তৃত নয়। কোপারিয়া, তারপর সাহাবসরা—দুটো মহকুমা আর গোটা ষোল থানা নিয়ে চার হাজার বর্গমাইলের বিরাট কুশীপ্রাঙ্গণ,—সমস্তটাই সেদিন পর্যন্ত ছিল ভাগলপুর জেলার মধ্যে। সেই জেলার বৃত্তান্ত নিয়েই তাঁর 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' প্রকাশিত হয় ১৩৬০-এর আশ্বিনে। মিথিলার কুশী নদীর প্রাঙ্গণ। নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের শাখা লাইন হয়ে মানসী থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল ভেতরে। বাদলাঘাটিকে (বাদলাঘাট) থেকেই মিথিলার সূচনা। মিথিলা হলো ত্রিহুত বা তীরভুক্তি। তাঁর লেখাতে পথের তথ্য পরিবেষণ আর প্রকৃতি উপভোগ একসঙ্গে মিশে গেছে। যেমন: 'বাদলাঘাটের পর ধামারাঘাট। এই রকম জনহীন, তৃণহীন, শূন্যতার মাঝখান দিয়ে এলাম চলে। কোপারিয়ায় যখন পৌঁছলাম রোদ একবারে পড়ে এসেছে। সূর্য চোখের সামনে আস্তে আস্তে নেমে গেল, নিস্তেজ হয়ে গেল, শেষে বিরাট নগ্ন আকাশে একটা বর্ণছত্র বিস্তার করে অস্ত গেল। কোনো গ্রামের আড়ালে নয়, কোনো গাছের নীল রেখার পিছনে নয়; পৃথিবী আর আকাশের ক্ষীণ মিলনসূত্রটি ধীরে ধীরে নেমে গেল। ---মুঙ্গের থেকে দুপুরে করেছি যাত্রা। সূর্য আজ আমার এতটুকু অ-দেখা থাকে নি, যখন আকাশপথে নামল, কোনো কিছুই তাকে এতটুকুর জন্যে আড়াল করতে পারে নি।'

আবার, সূর্যাস্তবেলার গ্রীষ্ম-প্রকৃতির রূপ তিনি তাঁর বর্ণনায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে ছবিটুকু আঁকা হয়েছে এইভাবে: 'অস্ত গেল, মরুভূমি কিন্তু এখনও জ্বলছে। মহিষের ক্ষুরে যে ধূলির স্তম্ভ উঠেছে, বা ঘাসওয়ালীদের পায়ে পায়ে, অস্তমান সূর্যের রাঙা আভা পড়ে সেগুলো মনে হচ্ছে অগ্নিশিলা; যেখানে যেখানে ছায়া একটু জমাট বেঁধে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন অঙ্গার, জ্বলন্ত মাটির দগ্ধাবশেষ।'

'এক এক করে পাঁচটি নদী এই মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ মাইলের মধ্যে।'

মনে পড়ছে কুশীপ্রাঙ্গণের সেই অল্প ভ্রমণের অতলতা। শুনতে পাচ্ছি সেই পথের গান—

চলে গোরুর গাড়ি দূরে তরুর সারি
গাড়োয়ান গুন্‌গুন্ গায়
চলে পথের পাশে সাঁঝে আঁধার আসে
গাড়োয়ান জোরসে হাঁকায়।

কিন্তু আমার কলম কি জোরে চলবে? আমি কি জোরে হাঁকাতে পারবো?

সব মানুষ কি সব পারে? পথে বেরিয়ে পড়া যাক। তারপর পথের ভাবনা পথেই ভাবা যাবে। 'পথ আমারে পথ দেখাবে'। পথের কি শেষ আছে?

(ক্রমশঃ)

## রাজধানী :

কালবৈশাখী সুরু হয়েছে। এই তার প্রথম আগমন নয়। প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সে চৈত্রের শেষের দিকে। নাম তার কালবৈশাখী। বৈশাখ মাসেই তার দাপটও হয় অধিক। ঈশান কোণ থেকে মেঘের জটাজাল বিস্তার করে বিরাটকায় মহাবলের বেশে এসে সে তছনছ করে দিয়ে যায়—ধরার বুকে তোলে থরহরি কম্প। তার আগমন সঙ্কেতে প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভীত ও স্তম্ভিত। বিশাল বনস্পতি পর্যন্ত ভয়ে আকুল হয়ে পড়ে। সমগ্র বনভূমি হয় ম্লান। তারপর রুদ্র বৈশাখের প্রলয় টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় প্রলয় নাচন। চৈত্রের চিতাভস্মকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে নিয়ে কালবৈশাখী জড়িয়ে দেয় সকল জ্বালা—মুক্তি পায় তাপদাহে দগ্ধ জীবকুল। তার বজ্রনির্ঘোষে সুরু হয় ধারিধারার—সঞ্জীবনী ঢেলে দেয় ধরার বুকে। ধুয়ে মুছে যায় সকল দৈন্য ও গ্লানি। সুরু হয় নবজীবনের।

কালবৈশাখী রুদ্র দেবতারই খেলা। তাঁর কঠোর তপস্যায় উদ্বোধন হয় নব নব সৃষ্টির। এবারে পর পর ক'দিনের কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতি যে একেবারে হয় নি তা নয়। পূর্ব বাংলার যশোহরে কয়েকটি গ্রামকে সে শ্মশানে পরিণত করেছে। পশ্চিম বাংলাতেও গৃহপতনে একজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নববিধানে আশাও যে জাগিয়েছে। প্রখর সৌরকরে চৌচির মাটির বুকে আবার শোনা যাচ্ছে সোহাগ-ভরা আহ্বান। কেটে গিয়েছে তার জড়ত্ব—দিকে দিকে বেজে উঠেছে নবীনের আগমনী সুর।

সেই সুর, মহাকালের ডাক কিন্তু পশ্চিম বাংলার জনজীবনে—তার রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। এ জড়তা যেন কাটবার নয়। তাই সর্বহারা মানুষের আর্তকণ্ঠ, নারীর লাঞ্ছনা, পুত্রহারা জননীর অশ্রুধারা আমাদের তাপিত, বেদনাদগ্ধ করতে পারে নি। আমরা এখনও নিশ্চল, নিস্তব্ধ—নীরব দর্শক মাত্র।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটী আন্দোলন সুরু করেছেন পঁচিশে মার্চ থেকে। অত্যন্ত মামুলী আন্দোলন—নতুনের কোন সাড়া এতে নেই—বেদনাক্রান্ত নিস্তব্ধ গণ-মনকে উজ্জীবিত করে তোলবার নেই কোন কর্মসূচী। এ আন্দোলনের

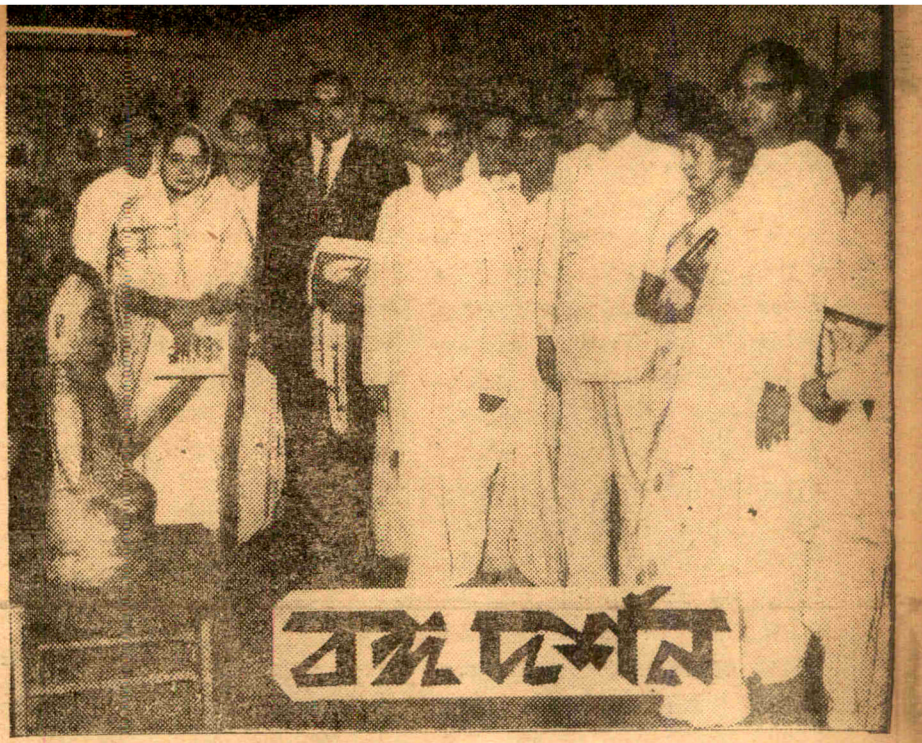


● কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে জৈন চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন

শেষ কথা হল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থ-নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে একুশে মার্চ থেকে পাকিস্তানগামী মালগাড়ি আটকের অভিনয় হয়েছে সুরু। যথারীতি পুলিশ এসে গাড়ি আটককারীদের তুলে নিচ্ছে। দু'দিন আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার প্রমুখ আটজন নেতাকে।

এমনি ধারা গ্রেপ্তারও খুবই দুঃখজনক। কারণ এতে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সৃষ্টি হয় অযথা উত্তেজনার। রাজ্য সরকার গণতন্ত্রের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে সমস্যা নিয়ে কমিটীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় পেয়েছিলেন প্রচুর। উদ্বাস্তু সমস্যা যেমন বিরাট, তেমনি রয়েছে এর পেছনে একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর পরিস্থিতি। এ সব দিক বিচার করে সরকারেরই উচিত ছিল সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটীকে ডেকে একটা সামগ্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করা। তা তাঁরা করেন নি। আগেই বলেছি. মহাকালের দুশ্চর তপস্যা কাউকেই উত্তপ্ত করে জাগিয়ে তুলতে পারে নি।

কালের বিবর্তনের ইঙ্গিত ধরতে পারলে সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটীর দৃষ্টি হতো স্বচ্ছ। তাঁরা দেখতে পেতেন, দক্ষিণ আফ্রিকাকে জব্দ করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তানেরও এই পথে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হওয়ার কোন কারণ নেই। অতীতেও এই আন্দোলন একবার হয়েছিল। সে আন্দোলন কোন সুফল প্রসব করে নি।

* * * *

এবারে কালবৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে পর পর দু'দিন বসুন্ধরারও হৃৎকম্প উঠেছিল। সেই কাঁপুনি থেমে গেছে। কিন্তু তার জের রয়েছে পড়ে। ভূমিকম্পের পরই শোনা গেল খাদ্যাভাব ঘটবে না বলে যে-জোর আওয়াজ সরকার তুলেছিলেন সব ফাঁকা। আমরা যেখানে ছিলাম তার চাইতে অধঃপতন ঘটেছে খাদ্যের ব্যাপারে। এবারে ভারতে গম ভাল উৎপন্ন হয় নি। উড়িষ্যা থেকে প্রতিশ্রুতিমত চাল পাওয়ার নেই কোন সম্ভাবনা। শুধু কি তাই, বিহারে খাদ্যের ঘাটতির জন্য খোদ পশ্চিম বাংলা থেকেই না কি বিহারে চাল পাচার হয়ে গিয়েছে। জুন মাস থেকেই পশ্চিম বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। এ সংবাদে হৃৎকম্প সুরু হয়েছে বাংলার ঘরে। নতুন লাইসেন্সের প্রবর্তনেও জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। খুচরা দোকানদার—যার দোকানে দশ-বিশ বস্তার বেশি চাল থাকে না, সে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেছে। চাল মেপে, রসিদ কেটে দিয়ে হিসাব-দুরস্ত খাতা রাখবে কি করে, ভেবে পাচ্ছে না।

* * *

আমাদের মৎস্যমন্ত্রী পড়েছেন অকূলে। তাঁর সকল কেরামতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ভেড়িওয়ালারা নতুন ভেল্কিবাজী সুরু করেছে। কলকাতার বাজার তারা বয়কট করেছে। মৎস্য-মন্ত্রী আইনের জাল ফেলেছেন কলকাতা ও তার আশে-পাশে। আইনের বেড়াজালের বাইরে গিয়ে রুই-কাতলারা নতুন পাইকারী বাজার জমজমাট করে তুলেছে। এই অকূলে কূল পাওয়ার জন্য আমাদের মৎস্যমন্ত্রী হাওড়ার মেছোহাটায় পাইকারী ব্যবসায় হাত দিয়েছেন। উড়িষ্যা থেকে সামান্য কিছু মাছ আসছে সরকারের হাতে। তাই নিয়ে সুরু হয়েছে সরকারী ব্যবসা। ভিন্ন রাজ্য থেকে তিনি মাছের সরবরাহ পাবেন বলে আশা রাখেন। মাভৈঃ মৎস্যমন্ত্রী! আপনার প্রয়াস সফল হোক। আটঘাট কিন্তু শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। না হলে আমাদের ও ক্রেতাসাধারণের সদিচ্ছা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না—আখেরে দেখতে পাবেন সব ফসকে গিয়েছে।

* * *

'নিজের বাড়ি নিজে বানাও'—পশ্চিম বাংলা সরকারের বহুল প্রচারিত গালভরা পরিকল্পনা—খড়ের ঘরে, টিনের চালায় বাসের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে গ্রামের মানুষকে পাকাবাড়িতে বাসের এবং বন্যার বিধ্বংসী হাত থেকে গ্রামবাসীর কষ্ট-লাঘবের জন্য এই পরিকল্পনা করেছিলেন স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। এ পরিকল্পনার নাকি প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সরকার তাই এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে নিযুক্ত আড়াই শ' কর্মীর ওপর জারী করেছেন ছাঁটাইয়ের নোটিশ। এঁরা ইট নির্মাণের কাজ শেখাতেন। সরকারী অর্থব্যয়েই এঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করে এই কর্মীরা বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। আজ এঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই সরকারের কাছে নেই। কোন বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা না করেই ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩১শে মার্চ বিদায় নেবার কথা ছিল। করুণাপরবশ হয়ে চাকুরীর মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে এই আড়াই শ' কর্মীকে।

অথচ এঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা খুব একটা বড় সমস্যা নয়। সরকার রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজের জন্য, গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনার জন্য নতুন নতুন কর্মী নিয়োগ করছেন। নতুন লোক না নিয়ে অভিজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগ অনায়াসেই করা যেতে পারে। আমাদের সরকারী দপ্তরখানার ব্যাপারই আলাদা। সমস্যার সহজ সমাধানের পথটি এড়িয়ে চলে

● শ্রীচেষ্টার বোল্‌স

সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতেই এঁরা যেন ওস্তাদ।

* * *

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত যথাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনী অনুষ্ঠানে ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন। পৌর-কল্যাণ ব্লকের ২ জন এবং নির্দলীয় ৬ জন সদস্য ভিন্ন বিরোধী দলের কোন সদস্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি। সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯৫২ সালের পর এই দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচন বয়কট করলেন। কংগ্রেস দলের অগণতান্ত্রিক মনোভাবই না কি তাঁদের বিরাগের প্রধান কারণ। কংগ্রেস দলের সঙ্গে নির্দলীয় সদস্য ডাঃ পরিমল সেনগুপ্ত, শ্রীমোহনলাল ঘোষ এবং ডাঃ হিমাংশু দাস প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। পৌরকল্যাণ ব্লকের শ্রীপান্নালাল দাস, শ্রীবিমান মিত্র এবং নির্দলীয় সদস্য শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু ও শ্রীশ্যামল দত্ত ভোট দেন নি।

আমরা নতুন করে নির্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

* * *

বর্ণবৈষম্যের আমরা ঘোর বিরোধী। সরকারের বিঘোষিত নীতিও তাই। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের বিরোধও এই নিয়ে। এ সত্ত্বেও, কলকাতার বুকে সাদা আদমী পরিচালিত ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে আমাদের স্থান নেই—ভারতীয়েরা সেখানে অস্পৃশ্য। এ নিয়ে বছর দুই আগে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী মিহির সেন প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। কিন্তু ক্লাবটির কর্তাদের টনক নড়াতে পারেন নি। আমাদের সরকার এ বিষয়ে একেবারে নীরব।

বর্ণবৈষম্য অপসারণ করে সকলের সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা নিজের দেশে তুমুল লড়াই করে চলেছেন, ভারতে তাঁদের রাষ্ট্রদূত শ্রীচেষ্টার বোলসের না কি কলকাতার এই কুখ্যাত ক্লাবটির প্রতি নজর পড়েছে। প্রকাশ, মার্কিন সরকারের কলকাতার কর্মীদের সুইমিং ক্লাবটি বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীবোলস এ কাজটি করে বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছেন। স্থান ও পরিবেশের ভেদে অথবা আইনের খুঁটিনাটি মারপ্যাঁচের জন্য নীতির তারতম্য হতে পারে না। এর পর, আশা করি, আমাদের সরকারের চোখও খুলবে। ক্লাবটির প্রতি সরকারের অহেতুক আর কোন অনুকম্পার নিশ্চয়ই কারণ থাকতে পারে না।

বোম্বাইয়ের সুইমিং ক্লাবেও অশ্বেত মানুষের স্থান ছিল না। আন্দোলনের চাপে পড়ে তাঁরা ক্লাবের বিধান পাল্টিয়েছেন। কলকাতার সাদা আদমী-দের এরপরও শুভবুদ্ধির উদয় না হলে

দেশের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় জীবনের এই কলঙ্কমোচনের কাজে।

* * *

১৯শে এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তী সপ্তাহ উপলক্ষে এক জৈন চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল একাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রাচীন দেবালয়ের সারা অঙ্গ জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে জৈন ভাস্কর্য চিত্রকলা। অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকা সে সব ছবি। অনলস সাধনার ফলশ্রুতি। নিষ্ঠা ও সাধনার সমন্বয় ছাড়া এমন অমূল্য সাফল্য এমন যুগান্তকারী উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব নয়। শিল্প যুগের প্রতিচ্ছবি—দেশের, জাতির, সংস্কৃতি-সভ্যতার ভাষ্যকার। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পাশে পাশেই উদ্ভাসিত হ'য়ে এসেছে জৈন ধর্মের আদর্শ ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর। শুধু ভারতেই নয়, সারা এশিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের এই কীর্তিগাথা। জৈন ধর্মের এই বিশেষ দিকটির প্রতি আলোকপাত করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীসেন এক মনোগ্রাহী ভাষণ দেন। জৈন ধর্মের পথদ্রষ্টা মহাবীরের আবির্ভাব স্মরণে জৈন শিল্পের এই প্রদর্শনীর যথার্থতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

**বর্ধমান :**

প্যাকেজ এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড়শুল শিক্ষা-শিবিরে বহু উৎসাহী চাষীর সমাবেশ হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে এত চাষীর সমাগম প্রমাণ করে যে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধিক ফসল পাওয়ার জন্য চাষীসমাজ অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে হলে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তা কি রাজ্য সরকার সত্যি করতে চান? একদিন বা একবার সারা জেলায় চাষীদের ডেকে এনে দু'টো বক্তৃতা দিলে কোনদিনই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এই সত্যটা প্রকাশ পেয়েছে কৃষি দপ্তরের ডিরেক্টার ডঃ এইচ কে নন্দীর ভাষণে। তিনি বলেছেন, ১৯৫৩ সালে দামোদর ক্যানেল প্রবর্তনের পর একর প্রতি ফলন ছিল ১৭২ মণ। কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করেও প্যাকেজ কর্মসূচীতে একর প্রতি ফলন হয়েছে ১৭৩ মণ। অর্থাৎ ১ মণ মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। ডঃ নন্দীর কথা সত্যি হলে, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলতেই হবে।

প্যাকেজ কর্মসূচীর পরিণতি এত শোচনীয় কেন, তার সন্ধান ডঃ নন্দী দেন নি। তিনি অভিজ্ঞ লোক। চাষের উন্নতি করতে হলে প্রথম দরকার মাটি যাচাই করে দেখা। কোন মাটিতে কি ধরণের সার চলতে পারে—সে জ্ঞান চাষীদের সম্যক থাকা উচিত। এ সব কথা ডঃ নন্দীর অবিদিত নয়। তিনি কি চাষীদের এ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা, প্যাকেজ এলাকায় উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছেন। তা' না করতে পারলে যত অর্থই প্যাকেজ কর্মসূচীতে খরচ করুন না কেন, সবই ভেসে যাবে দামোদরের জলে।

প্যাকেজ কর্মসূচী বর্ধমানে প্রথম চালু করা হয়। শস্যসম্ভারে বর্ধমান আবার পশ্চিম বাংলায় শীর্ষস্থান পাবে এই আশাই তখন পোষণ করা হয়েছিল। সে আশা ফলবতী হয় নি। আগামী মরশুমে যাতে করে আবার নিরাশার বাণী শোনাতে না হয়, তার জন্য চাই এখন থেকেই সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা। চাষীদের উৎসাহে একবার ভাটা পড়লে আর তাদের উজানপথে ঠেলে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না।

**বাঁকড়া :**

বাঁকুড়া শহরে নতুন হাসপাতালের জন্য নির্মিত ভবনসমূহে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন সুরু হয়েছে। সম্মেলনের স্থান বাঁকড়া সম্মিলনী মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের প্রায় সংলগ্ন।

মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল নামে কথিত হলেও এ হাসপাতাল দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসপাতালও নয়। রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালন ভার গ্রহণের পরও হাসপাতালটির উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নি। পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের উপযুক্ত ঘরবাড়ি সাজসরঞ্জাম নেই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। এমন কি সব রোগের চিকিৎসার বিভাগ এ হাসপাতালে নেই। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও সহকারী ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী কর্মীর সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প। ঝাড়ুদার-মেথর প্রভৃতি কর্মীর অভাবে রোগশয্যায় শায়িত রোগীদের ক্লেশের সীমা থাকে না। হাসপাতালের বহির্বিভাগে দাতব্য চিকিৎসার জন্য যে সকল রোগী আসে, তাদের পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সংখ্যা নিতান্ত কম। দাতব্য বিভাগে দরিদ্র রোগীরা ওষুধের অভাবে ওষুধ পায় না। এক্স-রে যন্ত্র বিকল অথবা ফিল্ম না থাকায় রোগীদের বিনামূল্যে এক্স-রে ফটো তোলা হয় না। শয্যা সংখ্যা অল্প ও অন্যান্য ব্যবস্থা অপ্রচুর থাকায় প্রত্যহ বিভিন্ন বিভাগের বহু দূরাগত রোগী হতাশ মনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অথচ এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চলের একমাত্র বড় হাসপাতাল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, যাঁরা কংগ্রেসের সম্মেলনে উপস্থিত আছেন স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে এই হাসপাতালটি একবার পরিদর্শন করতে অনুরোধ জানিয়ে সঙ্গতভাবেই আশা করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন হাসপাতালের সমস্যাগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে আশু প্রতিবিধানে তৎপর হন। দরিদ্র বাঁকুড়াবাসীদের এ আবেদনে নেতৃবৃন্দ সাড়া দেবেন কি?

**পুরুলিয়া :**

আসছে ১৩ই মে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচনপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বিহার থেকে পশ্চিম বাংলায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে এই হবে মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্বাচন। ২ জন মহিলাসহ মোট ৫৪ জন প্রার্থী প্রথম মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। একজন মহিলাসহ ১১ জন মনোনয়নপত্র শেষ দিনে প্রত্যাহার করেছেন। মোট আসন হল ২০টি। তিনটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। বাকী ১৭টি আসনের প্রার্থীরা ভোট ভিক্ষায় নেমেছেন। ভোটদাতাদের মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখে প্রার্থীরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। গণদেবতা কার ভোটের বাক্স ভারি করবেন কেউই ঠাওর করে উঠতে পারছেন না। প্রার্থীরা কোন রাজনৈতিক দলের মার্কা নিয়ে না নামলেও কে কোন্ দলের তা' সাধারণ মানুষ জানেন।

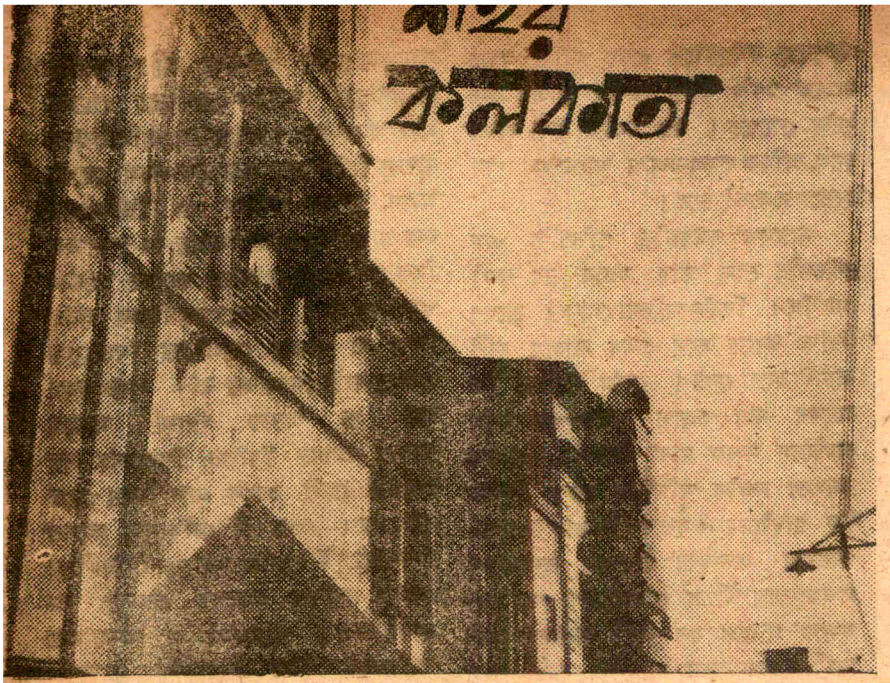


● ফ্যান্সী লেনের এক প্রাচীন অট্টালিকা

## ফ্যান্সী লেনের কথকতা

এবারের আলোচ্য অপ্রখ্যাত একটি গলি। ভাগীরথীর উপকণ্ঠেই তার অবস্থান। শহর-কলকাতার এভিনিউ, রোড অথবা ষ্ট্রীট সাধারণ ভাবে যে-আকার বা পরিবেশের মর্যাদায় ভূষিত, আলোচ্য গলির পক্ষে তেমন কোনো সম্পদের স্বাধিকার লাভ তো দূরের কথা, নিজেকে সাধারণ্যে উপস্থাপনের কোনো কিঞ্চিৎ মূল্যের অভিজ্ঞানও তার নেই। সে প্রস্থে সঙ্কীর্ণ, দৈর্ঘ্যে সঙ্কুচিত। তার দেহ-ভঙ্গীতে সামান্য সৌকর্যেরও নির্মম বৈরাগ্য যেমন প্রকট, তেমনই তার বিস্তারেও কোনো বৈশিষ্ট্যের চিত্রার্পণ পরিলক্ষিত হয় না। কোনো মহান প্রতিষ্ঠানের গৌরব-খচিত সে নয়, কোনো কাল-জয়ীর নামাঙ্কনেও সে ধারণ করে নি কোনো ঐতিহ্যের নামাবলী। এমন কি, আদিকালের আত্মপ্রকাশেও বৈচিত্র্যের কোনো বালাই ছিল না তার। এক কথায় সে চিরকাল নিঃস্ব। তবে এই নিঃস্বতার অন্তরালেই ছড়িয়ে আছে কিছু ইতিবৃত্তের উপকরণ —যা সযত্নে চয়ন করলে, অতীতের কোনো এক মর্মান্তিক অধ্যায়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়তো অসম্ভব হবে না।

আলোচ্য গলির নাম Fancy Lane. এই Fancy থেকেই Fascination—যার বাংলা প্রতিশব্দ

### শ্রীপদাতিক

রুচি-সদৃশ অথবা পছন্দসই। আবার Fancy শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় সৌখীন অর্থে। সুতরাং অর্থগত দিক থেকে সৌখীন, পছন্দসই, বা রুচি-সদৃশ্য এক সঙ্গে যদি Fancy শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়, তাহলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ করবেন না কেউ—এমন কথা বলা যায়।

এই Fancy শব্দটিকেই নির্ভর-শীল ভেবে, আপন অভীপ্সা অনু-সারে আজকাল অনেকেই অনুমান করেন: ইংরেজ-আধিপত্যের উন্মেষ্ পর্বে বর্তমান ফ্যান্সী লেনের পরিবেশ ছিল রমণীয়। সেখান থেকে অনতি-দূরেই ছিল ভাগীরথীর মোহনীয় বিস্তার। তখন তার যৌবন ছিল অফুরন্ত, আবেদন ছিল অন্তহীন এবং প্রভাব ছিল অসামান্য। সুতরাং তারই প্রভাব-বন্দী বর্তমান ফ্যান্সী লেনের তৎকালীন নিসর্গ ছিল নিষ্কলুষ লাবণ্যে বিধৃত। তাই সে-যুগের সৌখীন সম্প্রদায় আপন বসত-বাটী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দিনে দিনে নিলিপ্ত শরণলাভ করেন সেখানেই। তারপর তাঁদেরই দায়িত্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে উল্লেখিত গলির। পরবর্তী-কালে সে-গলি তার নিখুঁত লাবণ্যের সূত্রে, অথবা তার উভয় বাহুতে সংস্থাপিত সৌখীন সম্প্রদায়কে স্মরণ করেই নাম ধারণ করে Fancy Lane!

কিন্তু সত্যই কি তাই? উক্ত অভিমতের স্বপক্ষে গবেষকমণ্ডলীর সমর্থন দুর্লভ। তাঁদের আবিষ্কৃত ইতিহাস বলে অন্য কথা—যা সত্যই মৌনাতীতের এক আর্ত পরিচ্ছেদের চিত্র আঁকে উপলব্ধির বিবর্ণ দিগন্তে:

সেকালের সুতানুটী অঞ্চলে বিদেশী জব চার্নকের পদার্পণ ঘটে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। এ-দেশে বাণিজ্যোপলক্ষেই তাঁর আগমন। তাই এ-দেশীয় পাটোয়ার বা কারবারীদের সঙ্গে কিছুকালের মধ্যেই যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনি। তারপর বাগবাজারের বন্দর ছাড়াও অন্য একটি উপবন্দরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বৈঠকখানা অঞ্চলে। তখন বৈঠকখানার সম্মুখবর্তী সমগ্র সার্কুলার রোড বর্গী-প্রতিরোধ-পরিখা—বিস্তার যার নদীর মতো এবং বাগ-বাজার থেকে সুরু হয়ে চক্রাকারে যার সমাপ্তি ঘটেছিল খিদিরপুরের আদি গঙ্গায়। এই পরিখা থেকেই উৎপত্তি ঘটেছিল অন্য আরেকটি খালের—যা পশ্চিমবাহিনী হয়ে বর্তমান ক্রীক রো অঞ্চলের বুক বেয়ে অতিক্রম করে তৎকালীন কসাইটোলা। তারপর সামান্য একটু বাঁক নিয়ে বর্তমান হেস্টিংস ষ্ট্রীটের তৎকালীন তৃণাঞ্চল বিদীর্ণ করে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই খাল এবং সেই পরিখাপথেই কারবারীদের পণ্যবাহী নৌকোসমূহের সমাগম ঘটতো

বৈঠকখানার উপবন্দরে। তখন ভাগীরথী এবং পরিখার জলপথ দস্যুদল কর্তৃক উপদ্রুত ছিল ভয়ানক। তারা যে কেবল লুঠ-তরাজ করেই ক্ষান্ত হতো তা নয়, সুযোগ পেলে খুন-জখম করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। ফলে, অকালে অনেকেরই পতন ঘটতো অনস্তিত্বের নিঃসীম আবর্তে, অর্থাৎ অপমৃত্যুর চিরশীতল পাতাল-পুরীতে।

দিনে দিনে দস্যুদলের এই অত্যাচার যখন চরমে ওঠে এবং ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কারবারীরাও যখন তাঁদের জলপথের বাণিজ্যে ইস্তফা দান করেন একে একে, তখন জব চার্নকের নেতৃত্বেই দস্যুদলের দমন-কল্পে গ'ড়ে ওঠে একটি সশস্ত্র সান্ত্রীর দল। জব চার্নক এই সশস্ত্র দলটির স্বপক্ষে অনুমোদন লাভ করেন তৎকালীন সুবাদারের। তা ছাড়া একাধিক জমিদারের সহ-যোগিতা লাভেও সে-দলের শক্তি বৃদ্ধি পায় অপরিমিত।

এবার থেকে উক্ত সশস্ত্র দলটির সুনিয়ন্ত্রিত তৎপরতার ফলেই দিনে দিনে গ্রেপ্তার বরণ করে দস্যুদল। জব চার্নক তাঁর আপন বিবেচ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে শাস্তিবিধান করতেন তাদের। এই শাস্তিবিধানের জন্য সুবাদার বা নবাবের কোনো অনমোদনের প্রয়োজন হতো না তখন।

একদিন সশস্ত্র সান্ত্রীদলের হাতে ধরা পড়ে কোনো এক পর্তুগীজ দস্যুদলের দুর্ধর্ষ নেতা। সান্ত্রীদল তাকে যথারীতি উপস্থিত করে জব চার্নকের বিচারশালায়। জব চানক তাকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত ক'রে আটক রাখেন এক কৃত্রিম কারাগারে। কিন্তু সে জাত দস্যু বলেই যে-কোনো কারাগার থেকে মুক্তি পাবার কৌশল তার আয়ত্তাধীন। দিন-দুয়েক পরেই সে তার বলিষ্ঠ হাতে গরাদ ভাঙে জানালার। তারপর উক্ত পথেই সে কারাগার থেকে

● ফ্যান্সী লেনের একালের দৃশ্য

নিষ্ক্রান্ত হয় সন্তর্পণে। পালাবার পথে তার সাক্ষাৎ ঘটে কোনো এক ফিরিঙ্গী রমণীর সঙ্গে। রমণী হঠাৎ আঁতকে উঠে চীৎকার করার আগেই দস্যু তার কণ্ঠনালী চেপে ধরে এবং ওভাবেই তার অপমৃত্যু ঘটায় নির্বিবাদে। তার পর স'রে পড়ে। ---জব চার্নক খবর পেয়েই সশস্ত্র সান্ত্রীদলের সাহায্যে আবার তার খোঁজ-খবর সুরু করেন। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়েও আর কোনো হদিস পাওয়া গেল না দস্যুর।

সপ্তাহখানেক পরের এক গভীর রাত্রে, যখন সারাদিনের ক্লান্তিকে শান্ত ক'রে জব চার্নক তাঁর বাঙালী সহধর্মিণীর পাশে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন সম্ভবত প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত শয়নকক্ষে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে সেই দস্যুর। কক্ষের স্বল্পালোকেও জব চার্নককে সনাক্ত করা খুব একটা কঠিন হলো না তার পক্ষে। প্রতিশোধের প্রচণ্ড উত্তেজনায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপর। মুহূর্তেই ঘুম ভেঙে যায় জব চার্নকের। তিনি আহত হয়েও ক্ষিপ্রবেগে চেপে ধরেন দস্যুর হাতের ছোরা। ওদিকে তাঁর সহ-ধর্মিণীও দস্যুর কবলমুক্ত হয়ে কী-এক ঘণ্টা বাজিয়ে সংকেত পাঠান বাইরে। সম্ভবত উক্ত সংকেত-সূত্রে নিমেষান্তেই কক্ষে প্রবেশ করে সশস্ত্র সান্ত্রীর দল। তারপর তাদের হাতেই আবার বন্দিত্ব বরণ করতে বাধ্য হয় সেই কুখ্যাত দস্যু।

পরদিন প্রাতেই আবার সুরু হয় বিচার। বিচারে উক্ত দস্যুর এবার মৃত্যুদণ্ডই নির্ধারণ করেন জব চার্নক। বর্তমান হেস্টিংস ষ্ট্রীটের বুক বেয়ে তৎকালে যে-পশ্চিমবাহিনী খাল সংযোগ রক্ষা করেছিল ভাগীরথীর সঙ্গে, তারই পার্শ্ববর্তী এক নির্জন বনস্পতির পাদদেশে রচিত হয় ফাঁসী-মঞ্চ। বনস্পতির এক বিশিষ্ট শাখায় রজ্জু স্থাপন ক'রে, সেখানেই একদিন

সমর্থিত হবে। বামপন্থী গ্রুপের সর্দার সুরজিতের চেষ্টার ফলেই দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলেরা পর্যন্ত মহাল কালাঁয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করছে। অপরদিকে

● মাষ্টার তারা সিং

যদি সর্দার চমক এই নির্বাচনে হেরে যান, তবে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থী রাজ্য কমিটীর বিরুদ্ধে 'নাশকতা-মূলক কার্যের' অভিযোগ আনতে পারবে।

তাই দেখা যাচ্ছে, মহাল কালাঁ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী দলের শক্তি পরীক্ষা যেমন চলছে, তেমনি চলছে কমিউনিস্ট পার্টি, আকালী ও অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যেও অন্তর্দলীয় বিরোধ।

* * *

পাঞ্জাব রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ প্রকাশ্য রূপ ধারণ করেছে। জাতীয় কর্ম-পরিষদের সাসপেণ্ড-করা সদস্য বামপন্থী গ্রুপের নেতা সর্দার হরকিষণ সিং সুরজিৎ এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে 'বুর্জোয়াদের' দালাল ও কংগ্রেস দলের সমর্থক বলে গালাগাল করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, রাজ্যের অধিকাংশ পার্টি-সদস্য তাঁদের উপদলের সমর্থক।

পাল্টা জবাবে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কাউন্সিলের সম্পাদক সর্দার অবতার সিং মালহোত্রা আর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন, সর্দার সুরজিৎ ও শ্রীদেশরাজ চড্ডা পার্টির ৪০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এই অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগ আগামী দিনের ব্যাপকতর বিরোধের প্রস্তুতি। রাজ্য কমিটীর বক্তব্য, বামপন্থীদের প্রভাব প্রাক্তন পেপসু এলাকা এবং জলন্ধর ও হোসিয়ারপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র সীমাবদ্ধ।

## বিশ্বের চোখে ভারত

লেবাননের একটি সংবাদপত্রে সম্প্রতি ভারতকে প্রকৃত স্বাধীন ও জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে উল্লেখ করে বলা হয়, ভারত আরব নীতির অত্যন্ত কাছাকাছি। সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকায় পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতির সমালোচনা করা হয়।

বেইরুট থেকে আরব ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা "আল সাবে"র 'ভারত, পাকিস্তান ও আমরা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়, "পাকিস্তান যদি সত্যি সত্যি আরবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়, তবে পাকিস্তানকে অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে।------

'পাকিস্তানের বোঝা উচিত, ধর্ম বা এইরূপ কোন ভাবপ্রবণ বিষয়ের ভিত্তিতে আরবদের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়---কেবলমাত্র জাতীয় ও মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তা সম্ভব।'

'প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে পাকিস্তানের মনোভাব যাই হোক না কেন, এর কোন কার্যকারিতা নেই, কারণ পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্বের জন্যই তার পক্ষে প্যালেস্টাইনের আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের প্রতি কোন সমর্থন জানানো সম্ভব হবে না।' প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে পাকিস্তান 'মুখে আরবদের পক্ষে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধে।'

'যদি প্যালেস্টাইন নিয়ে যুদ্ধ সুরু হয়, তবে পাকিস্তান কি আরবদের

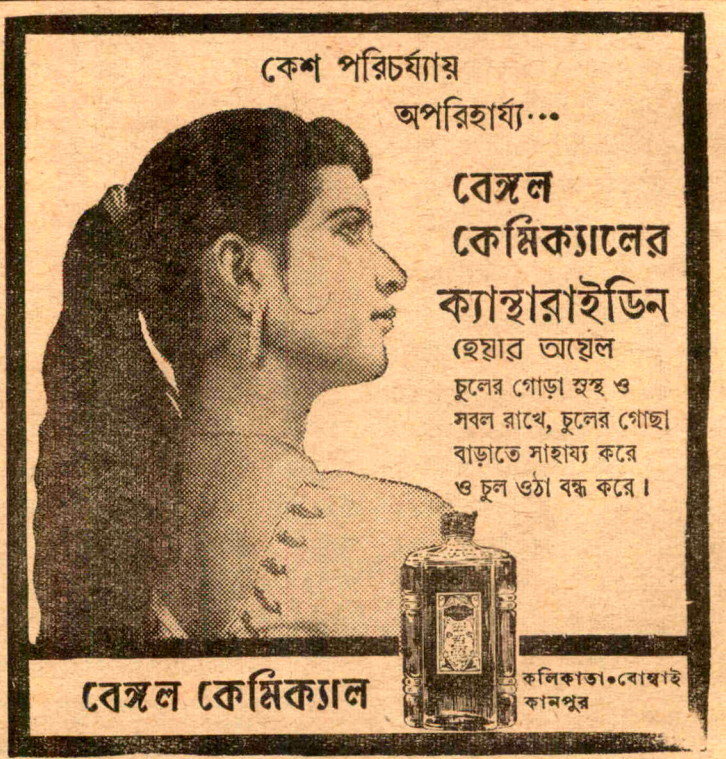

# ভারতদর্শন

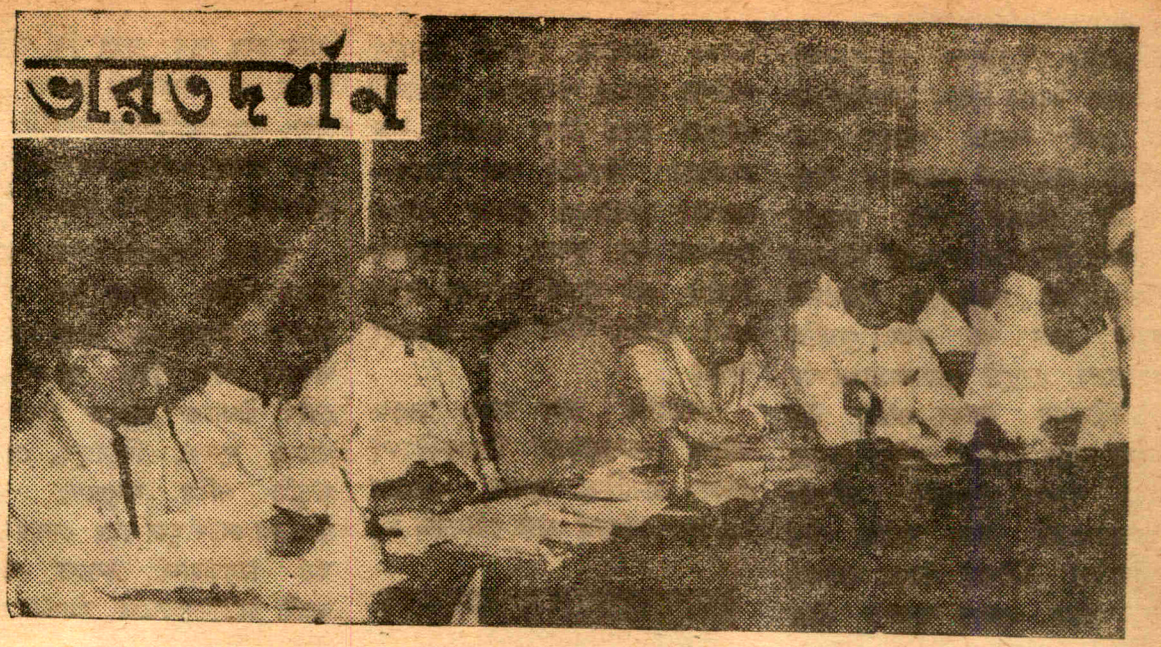

● নয়াদিল্লীতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ভাষণ দিচ্ছেন

## রাজধানী ঃ

রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত ৭৫ জন সদস্য এসে আসন গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ৪৪ জন একেবারে নতুন। নতুনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসভার চেহারাটা গেছে পাল্টে। প্রধান বিরোধী দলের গৌরবের আসন হারিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি---তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কমিউনিস্ট-বিরোধী উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র দল। দীর্ঘ চোদ্দ বছর যে আসন দখল করেছিলেন শ্রীভূপেশ গুপ্ত---সে আসনে এসে বসেছেন শ্রীদয়াভাই প্যাটেল। এ পরিবর্তন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ভেতরে ফুটে উঠেছে ভারতের আগামী দিনের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট ছবি।

এ পরিবর্তন অভাবনীয় নয়। বিপ্লবের বুলিতে যাঁরা সোল এজেন্সির এতদিন দাবী করে এসেছেন, তাঁদের মুখোস গেছে খুলে। দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে, ভারতের রাজনীতিতে বিরাট একটা বিকল্প রূপ দেবার যে-সুযোগ কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল তা সে কাজে লাগাতে আদৌ চেষ্টা করে নি। এমন কি, কোন বলিষ্ঠ নীতি ও আদর্শও তার সামনে ছিল না। তাই কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অকুণ্ঠ সমর্থক হতে পেরেছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাকে ঘায়েল করে দিয়েছে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের প্রস্তাব। কাজেই নলচে একেবারে না পাল্টালে, আসর জমানো তার পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু নলচে পাল্টাবার মত অবস্থাও আজ আর কমিউনিস্ট পার্টির নেই। অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে ত্রিধাবিভক্ত করে ছেড়েছে। চীন-প্রেমিক বামপন্থী কমিউনিস্টরা বিপ্লবের নামে গণ-আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে, প্রগতি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে শক্তিশালী।

কমিউনিস্ট পার্টির পরই স্থান ছিল প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের। এই দলকে অনেকে কংগ্রেসের বি টিম বলেই মনে করতেন। আসলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরই অংশ-বিশেষ। জোড়াতালির ঘর একটু নড়বড়েই থাকে। এদের একটা শক্তিশালী অংশ মার্কিন মুল্লুকের মুখাপেক্ষী হলেও, অন্যেরা কিন্তু শ্রীনেহরুর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। কংগ্রেসের বিরোধী দল হিসেবে সক্রিয় কোন কর্মসূচী ছিল না। সোস্যাল ডিমোক্র্যাট আন্দোলনের পুরোধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও একে একে সরে পড়ছেন। গোড়ায় ছিলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। তারপর কংগ্রেস ত্যাগ করে এসে জুটেছিলেন আচার্য কৃপালনী। সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ দেউটি যিনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, তিনিও আর আলাদাভাবে কংগ্রেসের বিরোধী সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। শ্রীঅশোক মেটা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর থেকেই প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলেও তে-ভাগা আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। শ্রীমেটা শীগ্‌গিরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিচ্ছেন। তার আগে তিনি সরকারীভাবে কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করবেন। শ্রীমেটার পাণ্ডিত্যের সুনাম আছে। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তিও। মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাস্তব-বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছেন। অদূর

ভবিষ্যতে কংগ্রেসের স্থান দখল ভারতের অপর কোন রাজনৈতিক দল গ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করাই হবে বড় কাজ। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ ও মন্ত্রিসভার আসন পেলে তাঁর একক যতটা করণীয়, সেটুকু দেশের জন্য করবার সুযোগ শ্রীমেটা পাচ্ছেন। এই সহজ কথাটা তাঁর অনুগামীরা স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর যাঁরা একান্ত অনুগত তাঁরা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেই ফিরে আসবেন। কিছু অংশ গিয়ে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার দল ভারী করবে। বাকীটা হয়তো আরও কিছুদিন ওয়াশিংটনের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। তারপর কালে কালে গিয়ে মিশবে ওয়াশিংটনের তবিলদার স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে।

কংগ্রেসের বিরোধী দল নামধেয় আর যে-সব পার্টি রয়েছে তারা প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রধান দল ক'টির ফ্যাঁকড়া মাত্র। সঙ্কটকাল কোনদিন এলে এরা আবার প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মতই ঝাঁকে ফিরে যাবে।

দেখা যাচ্ছে, এই রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র দল।

* * *

এদিকে দেশব্যাপী চলেছে একটানা দারিদ্র্যের মিছিল। সে-দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে জাতীয় আয়ের হিসেব কষে আত্মপ্রসাদলাভের অভিযানটাই চলেছে পুরোদমে। এই প্রচারকার্য যে কত বিভ্রান্তিকর তার পরিচয় পাওয়া যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের গ্রামের মানুষদের মাথায় ঋণের বোঝার পরিমাণ ছিল তিন হাজার কোটি টাকা। ভারতের ৭ কোটি ৪০ লক্ষ পরিবার গ্রামের বাসিন্দা। প্রত্যেকটি পরিবার ৪০৬ টাকা ঋণভার বয়ে চলেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে—একমাত্র ১৯৬১-৬২ সালেই গ্রামের মানুষকে ঋণ করতে হয়েছে ১৩৩২ টাকা। এর পরের ক'বছরে ঋণের চাপে গ্রামীণ জীবন ভেঙে পড়বারই কথা।

এখানেই শেষ নয়। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসেব-নিকেশ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ভারতের ৫০ লক্ষ লোকের মাথা গোঁজবার মত

● শ্রীঅশোক মেটা

ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নেই। কত মানুষ বছরে ক'দিন খেতে পায় না, ক'জনের ভাগ্যে দিনান্তে অর্ধাহার জোটে তার একটা তথ্য নিলে এমন একটা সংখ্যা পাওয়া গেলেও, বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ যাঁদের সামনে তাঁরা আবাদী কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বঞ্চিত মানুষের কতটুকু সুখের ব্যবস্থা করেছেন? শ্রীমেটা বলেছেন, ১৯৮২ সালের আগে দেশের সকল মানুষের রুটি জোগানো সম্ভব হবে না। কবে কি পরিমাণ রুটির ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে তা তিনি খোলাখুলি বলেন নি। মাথার ওপর যাদের আচ্ছাদনটুকু নেই তাদের প্রসঙ্গটা না তোলাই ভাল।

গ্রামের দৈন্যদশা যত বাড়বে, মানুষ ততই ধাবিত হবে শহরের দিকে। শহরে এসে এখানে-সেখানে অবস্থান করা ভিন্ন তাদের আর কোন উপায়ও থাকতে পারে না। গ্রামের কৃষক, দিনমজুর, দোকানী প্রভৃতি দরিদ্র মানুষদের ঋণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে দেবার কাজে যত টালবাহানা চলতে থাকবে, ততই চারিদিক থেকে সমস্যার চাপ যাবে বেড়ে।

* * *

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা আমরা বার বার আলোচনা করেছি।

আমাদের শিক্ষা কোন কাজেরই নয়। এ শিক্ষা না ঘরকা, না পরকা। এ শিক্ষা না একমুখী, না সর্বতোমুখী। কেবলমাত্র কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ভিন্ন আমাদের শিক্ষায় মানুষের শারীরিক চর্চা, ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল, আদর্শ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ সামাজিক জীব, আদর্শ মানুষের কথা ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে সমাজের কথাটাও। এই জন্যই শিক্ষাটা সমাজের প্রয়োজন মাফিক হতে হবে। এখন সমাজও আর ছোট্ট গণ্ডীটির মধ্যে আবদ্ধ নেই। আগে মানুষের গৃহ-প্রাঙ্গণের মধ্যেই ছিল মানুষের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ। এখন সারা বিশ্ব তার গৃহের দরজায় প্রতিদিন করাঘাত করছে। বর্তমান শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে এই পরিবেশটি মনে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার মন্ত্রী

শ্রীঅশোক সেন ঠিক কথাগুলোই তুলে ধরেছেন রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে।

তিনি বলেছেন, জাতির ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, অভাব-অভিযোগ, অক্ষমতা এবং সর্বোপরি তার আত্মার এষণাকে প্রকাশ করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক ভাবধারার ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধন অপরিহার্যরূপেই প্রয়োজন। শিক্ষাকে যদি আমরা খণ্ড খণ্ড করে পৃথক পৃথকভাবে দেখি, তা'হলে মানুষের মন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত হয়ে

● শ্রীঅশোক সেন

অর্থহীন অনুসন্ধানে মরুপথে হারিয়ে যেতে পারে। বৃহত্তর আদর্শ ও লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি স্থাপন করতে পারলেই দেশ গঠনের সঙ্কল্পে অটুট সুদক্ষ মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হবে। এই মানুষ গঠন সেই শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সহজ, যে শিক্ষায় সহজে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তির ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। শ্রীসেন প্রথম জীবনে শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের প্রশ্নে তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পেরেছেন, মানুষ ও তার মন একবার ঠিক পথে এলে চরিত্র তার স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠবে।

দেশের প্রয়োজনে কারিগরী বিদ্যার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে আমাদের পাঠ্যতালিকায় জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ রূপটিও থাকতে হবে। তা' না হলে সম্পদের সদ্ব্যবহার হবে না। তাই শ্রীসেন বলেছেন, শিক্ষাকে সভ্যতা, মানবতা ও জীবনযাত্রার প্রকৃত সত্যের ওপর স্থাপন করতে হবে। তা' করতে পারলেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা সাধারণ স্বার্থ গড়ে উঠবে, দূর হবে মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসম্বাদ। তা' করতে পরলেই বিশ্ব-সভ্যতা আজ যে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে তার সমাধান করা সম্ভব হবে।

* * *

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা দেশের শিক্ষাকে ঢেলে সাজাবার কথা বলছেন। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেছেন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনার আর্থিক ব্যবস্থার জন্য সরকারের একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষা কমিশন আমাদের দেশে কম হয় নি। শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার লক্ষ্য, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব, শিক্ষকের কর্তব্য থেকে সুরু করে, অনেক ভাল ভাল কথা সেই কমিশনগুলোর রিপোর্টের প্রতি পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যাবে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষার স্বরূপ কি হবে, তা মুদালিয়ার কমিশন ভাল করেই বলে দিয়েছেন। কাজেই নতুন কমিশন গঠনের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। কমিশন একান্তই গঠন করা আবশ্যক হলে সে কমিশনের কাজ হবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এবং সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয় পর্যালোচনা করা। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মুদালিয়ার কমিশন যা বলে গেছেন, তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে রূপ দিলেই মা সরস্বতী কৃতকৃতার্থ হবেন।

* * *

আগামী বছর হংকং-এ একটি ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলে স্থির হয়েছে। গত কয়েক বছরে হংকং-এ ভারতের বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী আশা করেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই বাণিজ্যের পরিমাণ আরও অনেকখানি বাড়বে।

তামাক, রসায়ন ও সামুদ্রিক দ্রব্য সম্পর্কিত রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদগুলির উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে তিনটি ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দল হংকং পরিদর্শন করেছে। প্রতিনিধি দলের মতে, হংকং-এ এই সব ভারতীয় দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

ভারত হংকং-এর বাজারে তামাক, কাপড়, হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের রপ্তানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তান, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমে ভারতকে এই বাজার দখল করতে হয়েছে।

এই বছর হংকং-এ ভারতের পশমী সূতার রপ্তানীও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিখ্যাত 'বুিডিং মাদ্রাজ' শাড়ির চাহিদাও হংকং-এর বাজারে আছে।

**পাঞ্জাব :**

মহাল কালাঁ বিধানসভা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিরোধী দলগুলির

সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দলগুলির নতুন করে জোট বাঁধার রাজনীতি উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করার মত।

মহাল কালাঁ কেন্দ্র থেকে গত

শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রো।

সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির সর্দার হরনাম সিং চমক নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচন ট্রাইবুনাল কর্তৃক এই নির্বাচন অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় নতুন করে নির্বাচন হচ্ছে। সর্দার চমক পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছেন বিধান পরিষদের সদস্য সর্দার রণজিৎ সিং নানেওয়ালিয়া।

অন্যান্য প্রার্থী থাকলেও, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট প্রার্থীর মধ্যে এই কেন্দ্রে প্রায় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। নাম প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অন্যান্য প্রার্থীরা নাম প্রত্যাহার করতে পারেন নি। কিন্তু এখন সকল দলই সর্দার চমককে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন।

পাঞ্জাবের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ, মাস্টার তারা সিং ও সন্ত ফতে সিং-এর আকালী দলের উভয় অংশ, স্বতন্ত্র পার্টি, প্রজাতন্ত্র পার্টি, এমন কি প্রগতিশীল নির্দলীয় পার্টিও সর্দার চমকের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছে। এদের সকলের উদ্দেশ্য, কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করে একথা প্রমাণ করা যে, সর্দার কায়রোঁর পেছনে জনসমর্থন নেই। পত্তি নির্বাচনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য বিরোধী দলগুলি উঠে পড়ে লেগেছে। পত্তি উপনির্বাচনে বিরোধীরা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও সন্ত ফতে সিং-এর আকালী দল একদিকে, আর অন্যান্য সব বিরোধী দল অপর দিকে। ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস জয়লাভ করে। এবার তাই মহাল কালাঁতে বিরোধী দলগুলি সবাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে।

বিরোধী দলগুলি অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোন যুক্তফ্রন্ট গঠন করে একসঙ্গে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে না। কমিউনিস্ট পার্টি (ডাঙ্গে দল) ও সন্ত ফতে সিং-এর আকালী দল অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে এক প্ল্যাটফরম থেকে নির্বাচনী প্রচারে রাজি নয়। তবে তারা চায়, সবাই তাদের পৃথকভাবে সমর্থন করুক। এইভাবেই সব দল সর্দার চমকের পক্ষে প্রচারে নেমেছে।

কংগ্রেস দল মহাল কালাঁর উপনির্বাচন নিয়ে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিরোধী দলের সর্বাত্মক বিরোধিতায় কংগ্রেস জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না। কংগ্রেসীদের কোন কোন মহলে আতংকের ভাবও দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস সমর্থক একটি পাঞ্জাবী দৈনিকে মাস্টার তারা সিং কর্তৃক সর্দার চমককে সমর্থনের নিন্দা করা হয়েছে। ইংরেজ আমলে এই সর্দার চমককেই গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভায় বসতে দিতে মাস্টার তারা সিং আপত্তি করেছিলেন---মাস্টারজীর মতে সর্দার চমক শিখদের সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন না। তবে এখন মাস্টার তারা সিং সর্দার চমককে সমর্থন করছেন কেন?

অপরদিকে আবার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও এই উপনির্বাচনকে উপলক্ষ করে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে। সর্দার চমক সর্দার হরকিষণ সিং সুরজিতের বামপন্থী গ্রুপের সমর্থক বলে পরিচিত। কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী রাজ্য কমিটী একরূপ বাধ্য হয়েই সর্দার চমককে মনোনয়ন দিয়েছে, কারণ সর্দার চমকই সাধারণ নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দক্ষিণ ও বামের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলেও দক্ষিণপন্থী রাজ্য কমিটী বামপন্থী সর্দার চমকের পক্ষে জোরের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করছে। যদি রাজ্য কমিটী নির্বাচনের কাজে সামান্য অবহেলার পরিচয় দেয়, তবে সর্দার চমকের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আসলে শাসক দল কংগ্রেসের সমর্থক এই অভিযোগ করা হবে। পাঞ্জাব কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটীর পক্ষে অবস্থাটা প্রায় ছুঁচো গেলার মত হয়েছে।

এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী উপদলের স্বার্থ কম নয়। সর্দার চমক সুবলাভ করলে তাদের

সন্ত ফতে সিং

প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং [illegible]কে পরাজিত করার জন্য সকল বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের নীতি

অজস্র জনসমাগমের সাক্ষাতে ফাঁসীর বন্ধনে জীবনাবসান ঘটে দস্যুর।

তারপর? তারপর জব চার্নক কর্তৃক উক্ত ফাঁসীমঞ্চে আর কোনো ব্যক্তির পরলোক প্রাপ্তি ঘটেছে ব'লে জানা যায় নি। তবে উক্ত ফাঁসী-মঞ্চই পরে বিদ্রোহী 'নেটিভ'দের শাস্তিবিধানকল্পে ব্যবহার করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তৎকালীন ইংরেজ শাসিত অঞ্চলের যে-সমস্ত অধিবাসী ইংরেজ-প্রভুত্বের কাছে মাথা নত করতে চায় নি, তাদের অনেককেই সেদিন উল্লেখিত ফাঁসী-মঞ্চের চরম দণ্ড গ্রহণ করতে হয়েছিল নির্বিচারে। তাছাড়া দূর-দূরান্তরের কিছু বিদ্রোহী নীলচাষীকেও প্রাণের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হয়েছিল উক্ত ফাঁসীমঞ্চেরই মসী-লাঞ্ছিত ঋণ—যার নীরব সাক্ষ্যে আজও উন্মীলিত বৃদ্ধা ভাগীরথীর ছানি পড়া চোখ।

পরবর্তীকালে, উক্ত ফাঁসী-মঞ্চেরই পার্শ্বে-প্রবাহিত যে-পশ্চিম-বাহিনী খাল—তার এপারে-ওপারে উন্মেষ ঘটে শহর-কলকাতার। খালের বিভিন্ন ভাগে গ'ড়ে ওঠে একাধিক সেতু এবং সেই সেতুসমূহের মাধ্যমেই স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপিত হয় ওপারের সঙ্গে এপারের। ফাঁসীমঞ্চের পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডেরও রূপায়ণ ঘটে বসতি অঞ্চলে। তারপর সেই বসতি অঞ্চলেরই বুক চিরে এবং ফাঁসীমঞ্চের কোল ঘেঁষে দিনে দিনে আত্মপ্রকাশ ঘটে যে-সংকীর্ণ পথের, কিছুকাল পর তা ফাঁসীমঞ্চকেই স্মরণ ক'রে নাম ধারণ করে ফাঁসী লেন। বঙ্গ-ভাষার এই 'ফাঁসী' শব্দই রোমান অক্ষরের সন্নিবেশে Phansi. এবং ইংরেজীতে তার সঠিক উচ্চারণ ফান্সী অথবা ফ্যান্সী। এই ফান্সী অথবা ফ্যান্সী সাধারণের শ্রুতিতেই প্রাধান্য বিস্তার করে প্রথম। পরে লেখিত আকারেও তার রূপান্তর ঘটাতে বাধ্য করে কলমকে। তাই পরবর্তী-কালের নির্বিকার কলম আদিকালের Phansi-কে সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তেই লেখে Fancy. সেই একই সূত্রে সেকালের ফাঁসী লেনও উচ্চারণ-গত দিক থেকে নিজের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েও লিখিত আকারে নাম ধারণ করে Fancy Lane. এ-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আর্চডিকন্ হাইড তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

'The creek took a half turn round this battery and crept eastwards beneath three gated bridges, until the fences turned downwards from it at Fancy Lane. One of the bridges opened from the burying place, occupied when the plan was made by the mausoleum of Charnock and by many towers, pyramids, and obelisks, and perhaps having even then the Post Office squeezed in at its corner. The second bridge opened from the spacious yard, where sentries guarded the great bell-shaped magazine of masonry, where the Company stored its gunpowder. But why should the town fences at the third bridge sharply swerve from the natural boundary of the creek? If Fancy be the native Phansi, the reason is revealed. They here avoided a gallows-tree. Fancy Lane is the entrance to the bailey that ran round the whole town within the palisades.'

সেই অশুভ ফাঁসীমঞ্চকে এড়িয়ে থাকার জন্যেই সেদিন শহর-কলকাতা যে তার প্রাকৃতিক সীমা থেকে সামান্য স'রে এসে অথবা খানিকটা বাঁক নিয়ে রচনা করে এক কৃত্রিম সীমানা—তা উল্লেখ করেছেন মিঃ হাইড। মিঃ হাইডের এই উক্তিকে অনুসরণ ক'রে ঐতিহাসিক মিঃ হেনরী কটনও তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন:

'At the third bridge (where Fancy Lane opens into Wellesley place) the fence sharply swerved from the natural boundary of creek, for the reason, as Mr. Hyde suggests that 'Fancy' is a corruption of the native Phansi, and there stood a gallows-tree. However this may be, Fancy Lane was the entrance to the bailey which encircled the whole town within the palisade.'

বর্তমান ওয়েলেস্‌লি প্লেস থেকে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট পর্যন্তই ফ্যান্সী লেনের বিস্তার। সে-যুগে ইংরেজ, আর্মানী এবং ওলন্দাজদেরই বসবাস ছিল এখানে। বর্তমানে তাঁদের বিলোপ ঘটেছে আদিকালের সেই ফাঁসীমঞ্চের মতোই। এ-গলিতে আজকাল স্থায়ী বাসিন্দারূপে অধিষ্ঠান ঘটেছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, চীনা, পার্সী এবং ঘর-কয়েক ভারতীয় পরিবারের। দু' একটি অফিস এবং কিছু বিপণি সম্ভারেরও সমাবেশ ঘটেছে ইতস্তত। তবে দৈহিক বিন্যাস তার আজও তেমন শ্রীমণ্ডিত হতে পারে নি। ঐতিহ্যগত দিক থেকেও কোনো উজ্জ্বল স্মৃতির ধারক অথবা বাহক সে নয়। প্রতুল বয়সের ভারে জর্জরিত তার ক্ষীণ দেহলতা। সেখানে আজও যে-স্তিমিত স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া দোল দিয়ে যায় মাঝে মাঝে—তা রোমাঞ্চকর নয়, ভয়ঙ্কর আনন্দের রশ্মি-নিক্ষেপে উজ্জ্বলও নয় এবং আর্তির অপঘাতে আ র।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পক্ষ সমর্থন করতে পারবে? নিশ্চয়ই সে তা' পারে না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী চুক্তির সঙ্গে পাকিস্তান যুক্ত। তার পক্ষে নিজের মতানুসারে জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা সম্ভব নয়। অপর দিকে, ভারত নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে থাকবে—কারণ, সে প্রকৃতই স্বাধীন ও জোট-নিরপেক্ষ। সুতরাং আরবদের সঙ্গে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে।'

'আমাদের মতে, ভারত আরব নীতির অত্যন্ত কাছাকাছি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই।''

## বিশ্বের চোখে কাশ্মীর সমস্যা

বেইরুটের প্রভাবশালী আরব দৈনিক ''আল মুহারির''-এর 'পাকিস্তান ও কাশ্মীর: তারা কি চায়?' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়:

''কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি হবার পনেরো বছর পরেও পাকিস্তানের নিজস্ব বক্তব্যের সমর্থনে ধর্মীয় জিগির তোলা ছাড়া অন্য কিছু বলার নেই।-----

'পাকিস্তান যখন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করে, আমরা তখন তার সঙ্গে একমত হতে পারি না। পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ তাঁদের অন্ধ গোঁড়ামির দ্বারা আরব রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটিয়েছেন।'

'কিছুদিন ধরেই পাকিস্তান কাশ্মীরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। এর জন্য সে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হচ্ছে এবং সমস্যাটিকে ধর্মীয় সমস্যারূপে চিত্রিত করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করার কথা বলছে। কিন্তু পাকিস্তান ভুলে যাচ্ছে যে, এই সমস্যার সঙ্গে আরও বহু বিষয় জড়িত রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।'

'১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে বলেন যে, 'জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব আর মহারাজার করায়ত্ত নেই। ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চল যুক্ত হবার ফলে, তার সার্বভৌমত্বও ভারতের সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'----

'নিরাপত্তা পরিষদের ৭৬৫ তম অধিবেশনে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি বলেন, 'কাশ্মীর সমস্যা কাশ্মীরের জনসাধারণ নিজেরাই সমাধান করে ফেলেছে এবং তারা নিজেদের ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার সিদ্ধান্ত করেছে।'

'৭৬৮ তম অধিবেশনে কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ কমিটীর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে কম্বোডিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'কমিটী কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্যের অবস্থানকে আইনের দিক থেকে কোনমতেই স্বীকার করে নি।'

'২৭শে অক্টোবর বৃটেনের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউম বলেন, 'চীনারা ভারতের অভ্যন্তরে ১৫ মাইল প্রবেশ করেছে। সুতরাং তিনি কাশ্মীরকে ভারতীয় ভূখণ্ডের অংশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।'

'নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন সময়ে এই সব মন্তব্যের পরেও কেন পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলতে চায়? গতবার পাকিস্তান এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছে, যার প্রতি সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

ঘটনাটি হল একটি মসজিদ থেকে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ অপহরণ। সত্যের খাতিরে একথা আমাদের বলতেই হবে, এই ঘটনাকে পাকিস্তান নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। যখন কেশ পুনরুদ্ধার করা হল, তখনও কেশটি জাল, একথা বলে পাকিস্তান গোলমাল করার চেষ্টা করেছে।'

'---গত কয়েক বছরে পাকিস্তান বারে বারে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছে যে, ভারত কাশ্মীরকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নিচ্ছে। প্রত্যেকবারই অবশ্য পাকিস্তান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, ভারত কাশ্মীর ও জম্মুতে গণভোট গ্রহণে রাজি হচ্ছে না। ভারত এর উত্তরে বলেছে এবং নিরাপত্তা পরিষদ সে কথা স্বীকারও করেছে যে, গণভোটের পূর্ব সর্ত হল, এই অঞ্চল থেকে পাকিস্তানের সৈন্য অপসারণ। গত ১৬ই জানুয়ারী পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘে অভিযোগ করেছে, পূর্বের মত একটি মুসলিম পরিষদের দ্বারা মনোনয়নের পরিবর্তে কাশ্মীরের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারতীয় প্রতিনিধি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'এতে অন্যায় কি হচ্ছে?' আমরাও বিস্মিত না হয়ে পারি না: এর মধ্যে অন্যায় কে থায়? পাকিস্তানের বক্তব্য, এর দ্বারা অঞ্চলের আইনের পরিবতন করা হচ্ছে। জবাবে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘ কমিটীর সুপারিশমত এই পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য পাকিস্তান ভারতকে এই অঞ্চলে আক্রমণকারী বলে কি করে?

'আমরা আবার বলতে চাই, কাশ্মীর সমস্যা তৈরি হবার পনেরো বছর পরেও পাকিস্তান তার বক্তব্যের সমর্থনে সেই পুরোনো ধর্মের বুলি তোলা ছাড়া অপর কোন যুক্তি উথাপন করতে পারে নি।''

* নিউ ইয়র্ক বিশ্বমেলায় ভারতীয় মণ্ডপে যে সব প্রদর্শিকা কাজ করছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

**বিশ্ব শিল্পমেলা ঃ** গত ২২শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আয়োজিত বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পমেলার উদ্বোধন করেছেন। ৬১টি রাষ্ট্র ও ৩৫০টি যৌথ প্রতিষ্ঠান এই শিল্পমেলায় অংশ গ্রহণ করছে। উদ্বোধন প্রসঙ্গে জনসন বলেছেন, 'পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে শান্তি' স্থাপনের নীতি ও জাতিগত বিরোধ মীমাংসার জন্য সকল জাতির প্রচেষ্টার পথ গ্রহণ না করতে পারলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা যাবে না। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল যে সম্ভব তাই নয়, শান্তি আজ আয়ত্তের মধ্যে। তিনি আশা করেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলে পরবর্তী বিশ্বমেলা যখন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হবে, তখন ভিন্ন এক আমেরিকাকে দেখা যাবে—যেখানে কোন দরিদ্র থাকবে না, কোন মানুষকে তার গায়ের রং বা ধর্মবিশ্বাসের জন্য বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হবে না।

বিশ্বমেলায় ভারতকে বিশেষ সম্মানের আসন দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সকল বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করা হয়। অনুষ্ঠান-মঞ্চে রাষ্ট্রপতি জনসন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান, নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার ও নিউ ইয়র্কের মেয়র ওয়াগনারের পাশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপবিষ্টা ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, 'কোন রাষ্ট্রই একক স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় এবং কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জাতিসমূহকে আজ অপরের মর্যাদা রক্ষা করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশ যদি জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের জিনিষ থেকে বঞ্চিত থাকে তবে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতির কোন সার্থকতা নেই।'

অতীতে যেভাবে নিউ ইয়র্ক বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকেদের সাদরে গ্রহণ করেছে, তার সপ্রশংস উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, ভারতও এভাবে চিরকাল বিদেশীদের গ্রহণ করেছে। প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে পশ্চিম এশিয়া থেকে ইহুদীরা এসেছে এবং তারপর এসেছে খৃষ্টান, পার্শী ও মুসলমানেরা। চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর এসেছে তিব্বতীরা এবং বর্তমানে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ও হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসছে।

**চীন ও পাকিস্তানের দিক থেকে বিপদ ঃ** শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবার নিউ ইয়র্কে চীন ও পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতের বিপদ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, পাকিস্তান চীনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, মার্কিন অস্ত্র তারা চীনের বিরুদ্ধে বা কমিউনিজম প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করবে না—এই অস্ত্র তারা কেবল ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তবে চীন আবার ভারত আক্রমণ করবে। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবাসীর শুভেচ্ছা হারাচ্ছে। ভারত-বাসীর ধারণা, পশ্চিমী জোট পাকিস্তানের পক্ষে। শ্রীমতী গান্ধীর এই মন্তব্য 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ তিন কলম জুড়ে ছাপা হয়।

২৩শে এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘ সাংবাদিক সমিতির ভোজসভায় প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ না করলে, ভারত ও পাকিস্তান এতদিনে নিজেরাই কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য পাক-ভারত সমস্যার মীমাংসা করে ফেলত। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন, ভারতের পক্ষে কাশ্মীর প্রশ্নকে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে আসা ঠিক হয় নি। তিনি বলেন, বহু ভারতীয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করেন, ভারতের নিজেরই সংগ্রাম করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল।

**নাগরিক অধিকার সংগ্রাম ঃ** দক্ষিণের সদস্যদের অপচেষ্টায় সেনেটে নাগরিক অধিকার বিল পাশ হতে যত বিলম্ব হচ্ছে, বাইরে নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ততই তীব্র হচ্ছে। গত ২২শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে বিশ্ব শিল্প-মেলা উদ্বোধনের সময় নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সমর্থকরা বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা রাষ্ট্রপতি জনসনের বক্তৃতার সময়েও বাধা দেয়। এই বিক্ষোভ মিছিল ভাঙবার জন্য পুলিশ বেপরোয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আন্দোলনের দুজন বিশিষ্ট নেতা জেমস্ ফার্মার ও বায়ার্ড রাষ্টিন সহ ১০০ জনের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাগরিক অধিকার বিলের বিরোধী সেনেট-সদস্য রাসেল পর্যন্ত

• জেম্‌স্ ফার্মার

স্বীকার করেছেন, ব্যাটন দিয়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের এমন ভাবে মেরেছে যে বহুজনের মাথা থেকে রক্তপাত হচ্ছিল।

**বৃটেন ঃ**

**শেক্সপীয়রের চারশত জন্ম-বার্ষিকী ঃ** সমগ্র বৃটেনে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শেক্সপীয়রের চারশত জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। মূল অনুষ্ঠানটি হয় শেক্সপীয়রের জন্মস্থান 'ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এ্যাভনে'। প্রায় সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও ডিউক অব এডিনবরা এই আন্তর্জাতিক শেক্সপীয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি ১৯৬৪ সালের জন্য মার্কিন শেক্সপীয়র সমিতির সভাপতি ইউজিন ব্ল্যাক এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নতুন শেক্সপীয়র সেণ্টারটির উদ্বোধন করেন। ১১৫টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পতাকা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতেরা উত্তোলন করেন এবং তারপর জন্মবার্ষিকী শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয় এবং সর্বশেষে মহাকবির সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। আর্ল অব্ এ্যাভন (স্যার এষ্টনি ইডেন) এই উপলক্ষে আয়োজিত ভোজসভায় শেক্সপীয়রের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

**কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন ঃ** আগামী জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। নানাদিক থেকে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃটেনের রক্ষণশীল সরকার বিভিন্ন ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় কমন মার্কেটে প্রবেশ করে ইউরোপের রাজনীতিতে নেতৃত্ব করার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। আফ্রিকার সমস্যা সমাধানে, বিশেষ করে দক্ষিণ রোডেসিয়া ও জাঞ্জিবারের ব্যাপারে বৃটেন উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে নি। ইউরোপের রাজনীতিতে মার খেয়ে রক্ষণশীল দল এখন কমনওয়েলথের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক-ডগলাস হিউম আশা করছেন, প্রধান প্রধান বিষয়ে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে, কমন-ওয়েলথে বৃটেনের নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তিনি কিছুটা সুবিধা করতে পারবেন।

দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রশ্নে স্যার আলেক-ডগলাস হিউম রীতিমত বিব্রত। নতুন প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথ আফ্রিকীয়দের ভোটাধিকার দানের ঘোরতর বিরোধী। বৃটেন এখন আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাই সে যেমন দক্ষিণ রোডেসিয়ায় আফ্রিকীয়দের ভোটাধিকার দানে আগ্রহী, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিভিন্ন আফ্রিকীয় দেশে অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক সাহায্য দানে সচেষ্ট।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে ভারত থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যোগ দেবেন, এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সর্বত্র উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর, বিশেষ করে তাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই প্রথম ভারতের বাইরে যাচ্ছেন।

• ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এ্যাভনে নতুন শেক্সপীয়র-কেন্দ্র পরিদর্শনকালে এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপকে শেক্সপীয়র মেডেল উপহার দেওয়া হয়।

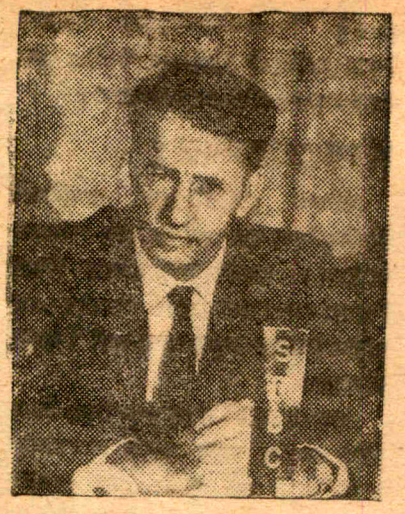

* আয়ান স্মিথ

**দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী :**

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবীতে লণ্ডনে গত সপ্তাহে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিউনিসিয়ার মঙ্গি শ্লিম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব

* মঙ্গি শ্লিম

করেন। মঙ্গি শ্লিম সম্মেলনে ঘোষণা করেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বন্ধ করার জন্য শান্তিপূর্ণ পন্থা ব্যর্থ হলে আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ নিজেরা যে কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। বৃটিশ লেবার পার্টির নেতা হ্যারল্ড উইলসন সম্মেলনে এক বাণী প্রেরণ করে বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে সকলের সমর্থন করা উচিত। আফ্রিকীয় নেতা নেলসন ম্যানডেলা ও ওয়াল্টার পিসুলুকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করার জন্যও হ্যারল্ড উইলসন সম্মেলনের প্রতি আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী কে কে শাহ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের আহ্বান জানান।

সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের প্রস্তাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সকল রাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

## উত্তর রোডেসিয়া :

উত্তর রোডেসিয়ার প্রধানমন্ত্রী কেনেথ কৌণ্ডা মে মাসে লণ্ডন যাচ্ছেন, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তর রোডেসিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার তারিখ স্থির করার জন্য। ইতিমধ্যেই স্বাধীন উত্তর রোডেসিয়ার সম্ভাব্য সংবিধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসে উত্তর রোডেসিয়া স্বাধীনতা পাবে আশা করা যাচ্ছে।

কেনেথ কৌণ্ডা উত্তর রোডেসিয়ার অবিসংবাদী নেতা। উত্তর রোডেসিয়া, দক্ষিণ রোডেসিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ড নিয়ে গঠিত 'সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন' ভেঙে যাবার পর গত জানুয়ারী মাসে উত্তর রোডেসিয়ায় যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ৬৫টি আসনের মধ্যে ৫৫টিই দখল করে কেনেথ কৌণ্ডার 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি'। নির্বাচনের পর উত্তর রোডেসিয়ার প্রথম আফ্রিকীয় প্রধানমন্ত্রীরূপে কেনেথ কৌণ্ডা তাঁর সরকার গঠন করেন।

আফ্রিকার গান্ধী বলে পরিচিত কেনেথ কৌণ্ডা ১৯৫৩ সালে 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' সাধারণ সম্পাদকরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ত্যাগ করে তরুণ ও সংগ্রামী সহকর্মীদের নিয়ে 'জাম্বিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে নতুন দল গঠন করেন—এই দলেরই নাম হয় পরে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি'। রয় ওয়েলেনস্কির শ্বেতকায় শাসনের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেন। কেনেথ কৌণ্ডা উত্তর রোডেসিয়ায় অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজনীতিতে তিনি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেন। উত্তর রোডেসিয়ার এশীয় ও ইউরোপীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি

* কেনেথ কৌণ্ডা

গঠনমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেসিয়ার বর্ণবৈষম্যের তিনি ঘোর বিরোধী।

## ট্যাঙ্গানিকা :

গত ২৩শে এপ্রিল দার-এস সালামে ট্যাঙ্গানিকার রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নিয়েরে ও জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রপতি আবিদ কারুমে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করেছেন, ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবারকে নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে। ট্যাঙ্গানিকা ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী ও জাঞ্জিবার বিপ্লবী পরিষদ, উভয়েই এই চুক্তিকে অনুমোদন করেছে। ঠিক হয়েছে, রাষ্ট্রপতি নিয়েরে এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং জাঞ্জিবারের বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবিদ

কারুমে ও ট্যাঙ্গানিকার বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি আর এম কাওয়ায়া, এই দুজন হবেন উপরাষ্ট্রপতি।

কিছুদিন পূর্বে জাঞ্জিবারে সুলতানের শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবিদ কারুমে

* আবিদ কারুমে

জাঞ্জিবার ও পেম্বাকে নিয়ে এক নতুন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে বিপ্লবী পরিষদ এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি শাসন করে আসছে। এখানকার শাসকরা চীনের প্রভাবাধীন, এমন কথাও বিভিন্ন মহল থেকে শোনা গেছে। গত রবিবারের যখন ট্যাঙ্গানিকার রাষ্ট্রপতি নিয়েরে জাঞ্জিবার যান তখনও কেউ জানত না, আর তিন দিন পরে দুই রাষ্ট্রের সংযুক্তিকরণের মত এমন উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করা হবে। লক্ষ্য করার বিষয়, জাঞ্জিবার বিপ্লবী পরিষদের প্রভাবশালী নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জাঞ্জিবারে উপস্থিত ছিলেন না—তিনি তখন শুভেচ্ছা সফরে পাকিস্তানে।

রাষ্ট্রপতি নিয়েরে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ বলে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবারের সংযুক্ত রাষ্ট্র সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, এই আশা করা যায়। ট্যাঙ্গানিকা, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও জাঞ্জিবার নিয়ে বৃহত্তর পূর্ব আফ্রিকা রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিয়েরের যে আশা, বর্তমান প্রচেষ্টায় অন্তত তা কিছুটা সাফল্য লাভ করল।

এই সংযুক্তিকরণের ফলে, আফ্রিকার একটি বৃহত্তম রাষ্ট্রের সঙ্গে আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের মিলন হল। ৩৬১,৮০০ বর্গমাইল আয়তনের দেশ ট্যাঙ্গানিকার লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ। আর মাত্র ১,০২০ বর্গমাইল এলাকার জাঞ্জিবারের লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ। এই দুই দেশের মধ্যে 'পার্টনারশিপ' কেমন চলে, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে, নিয়েরের আরও বড় রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা।

## কিউবা ঃ

কিউবাকে কেন্দ্র করে আবার সংকট দেখা দিয়েছে। কিউবার ওপর দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চালানো বন্ধ করার জন্য কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফাইডেল ক্যাস্ট্রো যে অনুরোধ করেছিলেন, মার্কিন

* ফাইডেল ক্যাস্ট্রো

যুক্তরাষ্ট্র তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইতিমধ্যে শত শত মার্কিন জেট বিমান বিধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে কিউবায় আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ফ্লোরিডায় বিমান ও নৌবহর ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনী পুরোদস্তুর প্রস্তুত।

রাষ্ট্রপতি জনসন ও অন্যান্য মার্কিন নেতা কিউবার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, কিউবার ওপর দিয়ে যাতায়াতের সময় সাধারণ মার্কিন বিমানকে গুলী করে নামাবার চেষ্টা হলে তার প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর হবে। কিউবা এই হুমকীকে আক্রমণাত্মক বলে অভিহিত করেছে।

অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবার প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। 'ইজভেস্তিয়া'-তে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ" করলে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবা রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।

## দক্ষিণ রোডেসিয়া ঃ

দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন ফিল্ড গত ১৩ই এপ্রিল পদত্যাগ করেছেন। গভর্নর স্যার হামফ্রে গিবস্ ফিল্ডের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং আয়ান স্মিথকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ফিল্ড লণ্ডন থেকে ফেরেন, তখন থেকেই ক্ষমতাসীন রোডেসিয়ান ফ্রন্ট পার্টির একাংশের সঙ্গে ফিল্ডের বিরোধ সুরু হয়েছে। বর্ণবৈষম্যের ঘোরতর সমর্থক রোডেসিয়ান ফ্রন্টের দক্ষিণপন্থী অংশ অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বৃটেনের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বৃটেন এই মুহূর্তে দক্ষিণ রোডেসিয়াকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়। বর্তমানে কেবলমাত্র শ্বেতকায় অধিবাসী এখানে ভোটের অধিকারী। এ অবস্থায় স্বাধীনতা পেলে দক্ষিণ রোডেসিয়া আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত হবে। তাই বৃটেন চায়, আরও কিছুদিন দক্ষিণ রোডেসিয়া বৃটেনের অধীন থাকুক এবং

* উইনষ্টন ফিল্ড

ইতিমধ্যে কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করুক। কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা এ বিষয়ে বৃটেনের মনোভাবের সমর্থক।

ফিল্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের অভিযোগ, লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের কাছে

ফিল্ড দক্ষিণ রোডেসিয়ার স্বাধীনতার দাবী জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে পারেন নি। আরও বড় অভিযোগ, বৃটেনের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে ফিল্ড দক্ষিণ রোডেসিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন না।

নতুন প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথের কর্মনীতি কি হবে এখনও জানা যায় নি। বৃটেনের বিরুদ্ধে গিয়ে দক্ষিণ রোডেসিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করার মত সাহস তাঁর হবে কি না দেখা যাক।

## সাইপ্রাস ঃ

রাষ্ট্রসংঘবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেও সাইপ্রাসে শান্তি স্থাপিত হয় নি। প্রায়ই ইতস্তত গ্রীক-তুর্কী সংঘর্ষ হচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায়, ২৫শে এপ্রিল সেণ্ট হিলেরিয়নে এক সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন তুর্কী ও ১ জন গ্রীক নিহত হয়েছে। সাইপ্রাসের দক্ষিণ উপকূলে পাহাড়ী গ্রাম আইয়স থিওডোরোসেও দু'পক্ষের মধ্যে জোর লড়াই হয়েছে।

এদিকে সাইপ্রাসে গ্রীকদের মধ্যে জেনারেল জর্জ গ্রিভাসকে গ্রীস থেকে সাইপ্রাসে ফিরিয়ে আনার দাবী জোরদার হচ্ছে। জেনারেল গ্রিভাস ইংরেজ শাসন থেকে সাইপ্রাসকে মুক্ত করে গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের সংযুক্তিকরণের ('এনোসিস') সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও মুখ্য নেতা ছিলেন গ্রিভাস। আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স বৃটেন, তুরস্ক, গ্রীস প্রভৃতির সঙ্গে এক-যোগে সাইপ্রাসের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা মেনে নেবার জন্য গ্রিভাস ম্যাকারিয়সের তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন, লণ্ডন ও জুরিখ চুক্তি মেনে নিয়ে ম্যাকারিয়স সাইপ্রাসের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে গ্রিভাস সাইপ্রাস ত্যাগ করে গ্রীসে চলে যান এবং তখন থেকে তিনি গ্রীসে অবসর-জীবন যাপন করছেন।

সাইপ্রাসের অনেক গ্রীকেরই ধারণা, বর্তমান অচল অবস্থার অবসানের জন্য গ্রিভাসের নেতৃত্ব প্রয়োজন। তুর্কীদের শায়েস্তা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রিভাস গ্রহণ করতে পারবেন। ম্যাকারিয়স কোন মতেই গ্রিভাসের সাইপ্রাস প্রত্যাবর্তন চাইতে পারেন না। অথচ গ্রিভাসকে ফিরিয়ে আনার দাবী ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থায় ম্যাকারিয়স এথেন্সে গিয়ে সোজাসুজি গ্রিভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ম্যাকারিয়স পরিষ্কার বলেন, গ্রিভাস যদি সাইপ্রাস যান তবে ম্যাকারিয়সের নির্দেশ-মত তাঁকে চলতে হবে। গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রী পাপানড্রিউ-ও এ ব্যাপারে ম্যাকারিয়সকে সমর্থন করেন এবং বর্তমান অবস্থায় গ্রিভাসের সাইপ্রাস প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত গ্রিভাস এথেন্সেই থাকতে রাজি হয়েছেন।

গ্রিভাস সাইপ্রাসে এলে কেবল যে নেতৃত্বই তাঁর হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা তাই নয়, আবার হয়তো গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসকে যুক্ত করার আন্দোলন জোরদার হবে। আর তার ফলে গ্রীক তুর্কী সম্পর্ক আরও খারাপ হবে। তাই গ্রিভাস বর্তমানে সাইপ্রাসে আসছেন না, এই সংবাদে বৃটেন ও তুরস্ক তো বটেই, রাষ্ট্রসংঘ মহলও আশ্বস্ত হয়েছেন। এ ব্যাপারে গ্রীক প্রধানমন্ত্রী প্রশংসনীয় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

## লাওস ঃ

নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমার নেতৃত্বে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কোয়ালিশন সরকারের বিরুদ্ধে লাওসে গত সপ্তাহে এক দক্ষিণপন্থী সামরিক বিদ্রোহ হয়েছে। ১৯শে এপ্রিল

* সুভান্না ফুমা

সৈন্যবাহিনীর একদল অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিদ্রোহের ফলে সুভান্না ফুমার সরকারের পতন ঘটে এবং ভিয়েনটিয়েনে সুভান্না ফুমা স্বগৃহে বন্দী হন। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, সুভান্না ফুমা পদত্যাগ করেছেন এবং সামরিক বাহিনীর 'বিপ্লবী কমিটী' ক্ষমতা দখল করেছে। জেনারেল বৌপ্রশিথ অভয় এই বিদ্রোহের নায়ক।

দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতাদের এই

দেশ সেবায় নিয়োজিত

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বিদ্রোহে লাওসের বিদেশী দূতের অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছে, তারা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে না—তারা চায় প্রিন্স সুভান্না ফুমার নেতৃত্বে লাওস সরকার পরিচালিত হোক। ১৯৬২ সালে ১৪টি রাষ্ট্রের জেনেভা সম্মেলনে গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত লাওসের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দক্ষিণপন্থী, কমিউনিষ্ট-অনুগামী প্যাথেট লাও ও নিরপেক্ষতাবাদী, এই তিন পক্ষের যুক্ত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রিন্স সুভান্না ফুমা এবং তাঁর দুই সহযোগী হবেন দক্ষিণপন্থী নেতা জেনারেল ফুমি নোসাভান ও কমিউনিষ্ট-অনুগামী প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানোভং। জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই মীমাংসা-প্রস্তাব কার্যকরী করার বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। তাছাড়া ভারত, ক্যানাডা ও পোল্যাণ্ডকে নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক কমিশন লাওসে জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে রূপদানের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নিরপেক্ষতা-বাদী সুভান্না ফুমার নেতৃত্বে লাওসের ত্রিপক্ষীয় শাসন চলছে। অবশ্য এই শাসনে গোলমাল লেগেই আছে। একদিকে দক্ষিণপন্থী আর অপর দিকে কমিউনিষ্ট-অনুগামী, এদের একসঙ্গে চালানো কঠিন কাজ। প্রিন্স সুভান্না ফুমা খুবই কৌশলের সঙ্গে এই কোয়ালিশন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কূটনৈতিক চাতুর্য নানা অসুবিধার মধ্যেও এই সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে। এই কারণেই পশ্চিমী রাজনৈতিক মহল প্রিন্স সুভান্না ফুমার নেতৃত্বকে সমর্থন করছে। তাদের ধারণা, প্রিন্স সুভান্না ফুমা ছাড়া আর কেউ এভাবে সরকার চালাতে পারবেন না। তাছাড়া জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব তো আছেই।

বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের মতে প্রিন্স সুভান্না ফুমা জাতির স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্যাথেট লাও-এর বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে পারেন নি। সম্প্রতি প্রিন্স সুফানোভং ত্রিপক্ষীয় সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রিন্স সুভান্না ফুমা 'প্লেন অব্ জারস'-এ তিন পক্ষের এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এই

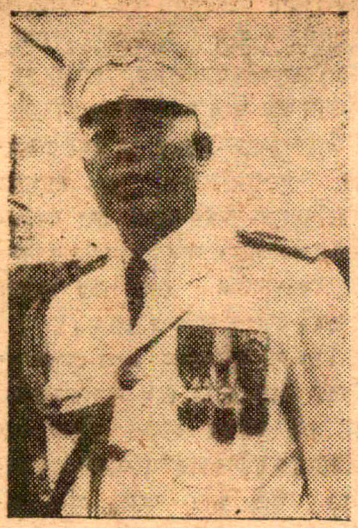

* জেনারেল কৌপ্রশিথ অভয়

শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হবার পরই সৈন্যদলের বিদ্রোহ হয়েছে। দক্ষিণপন্থী সহকারী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ফুমি নোসাভান সম্ভবত বিদ্রোহীদের সমর্থন করছেন না—প্রিন্স সুভান্না ফুমার মত নোসাভানকেও বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। তবে বিদ্রোহের নায়ক জেনারেল কৌপ্রশিথ অভয় ও জেনারেল সিহো লামফোকাচুল দাবী করেছেন, আঞ্চলিক সামরিক কমাণ্ডাররা সবাই তাঁদের 'বিপ্লবী কমিটীর' সমর্থক। প্রিন্স সুভান্না ফুমার দৃঢ় সমর্থক বলে পরিচিত জেনারেল আমখা সুখাভং-ও বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছেন।

জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য ভারত, ক্যানাডা ও পোল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতেরা প্রিন্স সুভান্না ফুমার সঙ্গে বিদ্রোহীদের একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন। এঁরা সকলেই প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে প্রধানমন্ত্রী রাখতে চান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক-ডগলাস হিউম, দুজনেই একথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। ভারত থেকেও প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সুভান্না ফুমার কাছে এক চিঠি লিখে আশা প্রকাশ করেছেন, তাঁর নেতৃত্বেই লাওসের সরকার পরিচালিত হবে। এই সব রাষ্ট্রদূতেরা প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে নিয়ে লুয়াং প্রবাং-এ রাজা সুভান্না ভট্টানার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। রাজা নিজেও প্রিন্স সুভান্না ফুমার সমর্থক।

এখন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রিন্স সুভান্না ফুমার কোন মীমাংসা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যায় নি। বিদ্রোহী সেনানায়কেরা সরকারের কর্তৃত্বে থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুভান্না ফুমাকেই তাঁদের প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নিতে হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এই সুযোগে বিদ্রোহীরা সুভান্না ফুমাকে দিয়ে তাঁদের অনেকগুলি মত মানিয়ে নিতে চায়। বিদ্রোহীদের পছন্দমত কোন কোন ব্যক্তিকে হয়তো মন্ত্রিসভাতেও নিতে হবে।

প্যাথেট লাও ও চীনের পক্ষ থেকে লাওসের এই বিদ্রোহের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভিয়েনটিয়েনের মার্কিন দূতাবাসের কোন কোন ব্যক্তির উস্কানি থাকলেও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও খাস মার্কিন সরকার এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি।

* দক্ষিণপন্থী সামরিক অভ্যুত্থানের দু'দিন পূর্বে গৃহীত প্রিন্স সুভান্না ফুমা (মাঝখানে) বামপন্থী প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানোভং (বাঁয়ে) ও দক্ষিণপন্থী নেতা জেনারেল ফুমি নোসাভানের চিত্র।

● জে লায়ন্স-এর রান্নাবাড়িতে 'সুইস্ রোল' তৈরি করা হচ্ছে। কোন কোন 'সুইস্ রোল' দেখতে বাংলাদেশের পিঠে পাটিসাপ্টার মতো।

## লণ্ডনের চায়ের রেস্তোরাঁ

আমাদের দেশে এখন বিদেশী মুদ্রার যথেষ্ট টানাটানি। এই টানা-টানির সময়ে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা রোজগার করার ব্যবস্থা তেমন করে হচ্ছে কোথায়? ভারতবর্ষের অনেক অনেক পণ্যের চাহিদা এ দেশে প্রচুর, সেই সব পণ্য এ দেশে রপ্তানী হতে পারে আরো ব্যাপকভাবে, আরো বহত্তর পরিমাণে। সেই সব প্রসঙ্গের আলো-চনা করতে গেলে ভারতীয় অর্থ-নীতির ওপর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়, আপাতত সেই চর্চা মুলতুবী রেখে এখন শুধু চায়ের কথা বলি। এ দেশে ভারতীয় চায়ের অসাধারণ আদর।

এদেশীয়রা কথায় কথায় বলে, Indian Tea, আমাদের দেশের চায়ের নানা গুণাগুণও এরা বিলক্ষণ জানে, দিব্যি রসিয়ে-রসিয়ে এদেশিনী চা-চুমুকিনী তির্যকভঙ্গিতে বলে, Assam Tea. Darjeeling Tea. Jalpaiguri Tea. কোন কোন ক্লিমেণ্টাইন বা ক্যাথারিন, জুলিয়ান বা বারবারা হয়তো বলে উঠবে, তোমাদের সেই ঘন অরণ্যের দেশ ইণ্ডিয়া, দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে শাল তাল তমাল হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়ামুন দেশ (মেঘদূত-এর ইংরেজী অনুবাদ এদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় কি না) আর দূর পাহাড়ের ধার ঘেঁসে পাইন বনের আড়ালে সবুজ, ধূসর গুচ্ছ গুচ্ছ চা গাছের সার: দুটি পাতা একটি কুঁড়ি--- ভারতীয় চা অত্যন্ত প্রিয় এদেশীয়দের কাছে। শুধুমাত্র, ঘরোয়া লাঞ্চ ডিনার সাপারের আগে পরেই নয়, এদেশের হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোতেও ভারতীয় চায়ের কদর খুব বেশি। আর লণ্ডনের চায়ের রেস্তোরাঁ জাতে কুলীন, চটকদার সাজসজ্জায় উজ্জ্বল, নিওন আলো উদ্ভাসিত আর রূপ রস গন্ধমদির হওয়া সত্ত্বেও সেই চা-চক্রের আড্ডা, সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প-গোকুল গুলজার সব এখানে এদেশীয় রেস্তোরাঁগুলোতে দিব্যি রয়েছে।

কলকাতার চায়ের রেস্তোরাঁগুলোর মতোই এদেশে চায়ের রেস্তোরাঁ রয়েছে বিস্তর। ভারতবর্ষের সর্বত্র তো বটেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যন্ত কলকাতার সেই সব ছোট ছোট আর মাঝারি রেস্তোরাঁ-গুলো অত্যন্ত সুপরিচিত। কলেজ

**অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়**

ষ্ট্রীটের সেই বিখ্যাত 'বসন্ত কেবিন' ছাত্র, অধ্যাপক, আধা-অধ্যাপক, হবু-অধ্যাপক, বেকার, চালিয়াৎ সকল ধরণের সব মানুষের নিটোল নিভাঁজ বহু বিলম্বিত, দীর্ঘায়ত আড্ডার জায়গা সেই 'বসন্ত কেবিন'। আর মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের 'ফেভারিট কেবিন'। বৃষ্টি ঝম ঝম ঘন বর্ষার দিনে 'ফেভারিট কেবিন'-এর ভেতর ডবল হাফ কাপ চা নিয়ে সেই জমাটি আড্ডা। 'ফেভারিট কেবিন'-এর ভেতর সেই কোণের ধারের জানলার কাছে সেই বিখ্যাত চায়ের টেবিলটি—কাজী নজরুল ইসলাম সেই টেবিলটিতে গরম চা নিয়ে চেয়ারে বসে কত বৃষ্টি-ভরা সন্ধ্যায় কত আড্ডা জমাতেন, চায়ের টেবিলে তাল ঠুকে ঠুকে সুর ভাঁজতেন:

কে বিদেশী মন উদাসী---

কাজী নজরুলের সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যিক সমাজের পরম দরদী গভীর স্নেহপরায়ণ পবিত্রদা'। আজো মনে পড়ে, সেই কিশোর বয়সের কথা। কলেজ ষ্ট্রীটের এলবার্ট হল উঠে গিয়ে তখন সবে 'কফি হাউস'-এর পত্তন হয়েছে। পবিত্রদা'র সঙ্গে দেখা বইয়ের পাড়ায়—শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটে—গভীর আপ্যায়নের সুরে বলে উঠলেন, 'চল্ কফিত হয়ে আসা যাক'—

'কফিত' হওয়া, সে আবার কি? বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটতেই বুঝলাম 'কফিত' হওয়া, অর্থাৎ কফি পান করা। তারপর হ্যারিসন রোডের 'জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকান'? কলেজী পড়ুয়াদের কথা-থই-থই আড্ডার জায়গা এই চায়ের দোকান। প্রায় ঘরজোড়া লম্বা টেবিলের দুইধারে সরু বেঞ্চি পাতা আর একধারের সাদা দেওয়ালের ওপর দিকে হালখাতার লাল সিঁদুর দিয়ে বড় বড় ট্যারা বাঁকা অক্ষরে লেখা—

মা কালীর কৃপায় এই কারবার করিয়া খাইতেছি।'

লণ্ডনের চায়ের রেস্তোরাঁ নানান ধরণের, নানাবিধ বৈচিত্র্যের। এদেশের একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য যে সকল চায়ের রেস্তোরাঁ রয়েছে, তাদের কোনটা টি বার (Tea Bar), কোনটা কফি হাউস (Coffee House)—নামে কফি হাউস হলেও এখানে চা পাওয়া যায়—কোনটা কাফে (Cafe), কোনটা ট্যাভার্ন (Tavern), কোনটা ইন (Inn), কোনটা (Pub) পাবলিক বার। আবার কিঞ্চিৎ নিম্নিদ্ধ ধরণের চা-খানাও এদেশে রয়েছে বিস্তর, যেমন শিঙ্কি ডেন (Shinky Den), টড্রী (Tawdry)।

এই সব চা-খানায় অত্যন্ত বে-আব্রু আর খুবই অশালীন অশোভনভাবে স্কার্টপরা জ্যাকেটপরা এদেশীয় মহিলাদের চর্চা বড্ড বেশি: এই সব জায়গার চা-পসারিণীরা খুচরা রোমান্সের নায়িকাও বটে, আবার প্রাণ আই-চাই ছন্দ পতনের মরসুমী সঙ্গিনীও বটে। লণ্ডন শহর কালচার্ড সাহেবদের সুসভ্য মহানগরী তো বটেই, কিন্তু এই মহানগরীতেও যে কত নোংরামি, কত বেলেল্লাপনা হয়ে থাকে, তার অন্ত নেই। অত্যন্ত উগ্র নেশাখোরদের কুৎসিত আড্ডার বিশেষ বিশেষ জায়গাও এই শহরের কোথাও কোথাও রয়েছে, উপর উপর চা-খানার আড়ালে।

এদেশে ইন, ট্যাভার্ন বা পাব ইত্যাদি রয়েছে সেই শেক্সপীয়রের আমল থেকে। চা-পানের চলন এদেশে সুরু হতেই ইন, ট্যাভার্ন, পাবগুলোতেও চা পাওয়া যেত। টমাস হার্ডি, ডিকেন্স, কীটস, শেলী, বায়রনের আসা-যাওয়ার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে লণ্ডনের কোন কোন অঞ্চলের ইন, ট্যাভার্ন, পাব—পরে সেই সব আলোচনার অবতারণা করা যাবে। শুধু চা পরিবেশনের জন্য চায়ের রেস্তোরাঁর আমদানী লণ্ডনে এই তো মাত্র সে দিন থেকে হয়েছে। নিছক চায়ের জন্য চায়ের রেস্তোরাঁ লণ্ডনে পঞ্চাশ বছর আগেও খুব বেশি ছিল না। এই শীতের দেশে উষ্ণকর পানীয়ের জন্য সরাইখানার রেওয়াজ হাজার বছরেরও বেশি পুরাণো, কিন্তু চায়ের রেস্তোরাঁর প্রচলন মাত্র সেদিনকার।

লণ্ডন শহরের দোকান-পসার রাস্তা-ঘাট পার্ক-ময়দান এখন ঠিক যে ছকের মধ্যে রয়েছে, সেই ছকটি প্রায় চারশো বছরের পুরাণো। এদেশে চায়ের প্রচলন সুরু হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে। লণ্ডন শহরের ছোট ও মাঝারি আকারের চায়ের রেস্তোরাঁগুলো চালু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। সারা লণ্ডন শহর জুড়ে রয়েছে জে লায়ন্স কোম্পানীর চায়ের দোকান। লণ্ডনের সর্বত্র আর লণ্ডনের বাইরেও নানা জায়গায় ছোট ও মাঝারি আকারের বিস্তর চা-রেস্তোরাঁ চালু রেখেছে আরো নানা প্রতিষ্ঠান, নানা কোম্পানী, নানাবিধ সংগঠনী। জে লায়ন্স কোম্পানীর চা রেস্তোরাঁগুলোই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি আর বহুতরো বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ছাত্রছাত্রীরা যে সব রেস্তোরাঁয় খুব কম পয়সায় আহারাদি করতে পারে, যেখানে গিয়ে যতক্ষণ খুশি আড্ডা দিতে পারে, সাহিত্য রাজনীতি শিল্পকলা নিয়ে যেখানে যখন-তখন চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে পারে, তার জন্যে রয়েছে জে লায়ন্সের সেলফ সার্ভিস বার। এখানে পয়সা দিয়ে যেমন খুশি খাবার, চা হাত-ট্রেতে করে নিয়ে আসা যায়, টিপ্‌সের মাশুল দিতে হয় না।

আর রয়েছে উইম্পি বার (Wimpy Bar), নানাবিধ পশু-মাংস পেঁয়াজ, লেটুস পাতা ইত্যাদি দিয়ে সদ্য সদ্য ভেজে দেয়, ছোট্ট আকারের প্লেটের আধখানা জুড়ে যাওয়া এক এক টুকরো ভাজা মাংস, তার ওপরে তলায় দুটো গোল গোল, তুলতুলে রুটি—নাম উইম্পি। আর উইম্পি বারের ওয়েটারদের পরিধানে ধবধবে সাদা উর্দি, মাথায় মস্ত উঁচু লম্বা সাদা চর্চাশীল টুপি আর ওয়েটারনীদের মাথায়ও বিশেষ এক ধরণের সাদা টুপি। জে লায়ন্সের একটু বনেদী চা-রেস্তোরাঁও অনেক রয়েছে, ওয়েটারনীরা সেখানে সযত্নে চা এবং টা সার্ভ করে দিয়ে যায়। চায়ের টেবিল অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো।

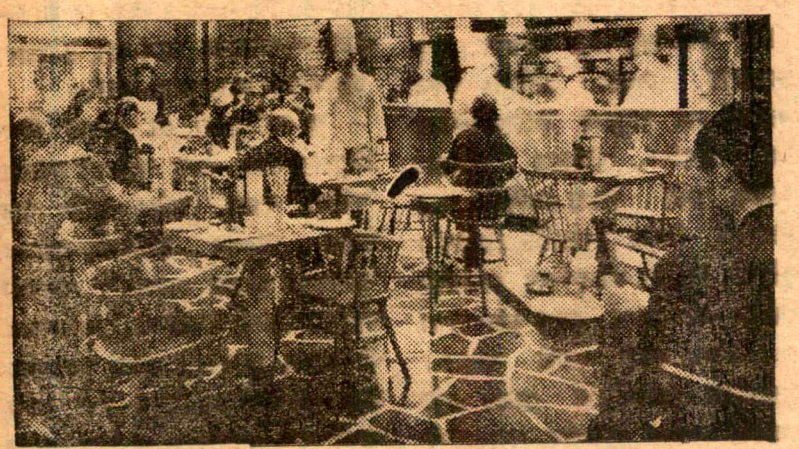

লণ্ডনে চায়ের রেস্তোরাঁ—একটি উইম্পি বার

দেয়াল মেঝে তকতকে ঝকঝকে। সব কিছুই অত্যন্ত ফিটফাট, ছিমছাম। এগুলো হল লায়ন্স কর্নার হাউস।

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে লায়ন্সের চা-রেস্তোরাঁ এদেশে গড়ে উঠতে থাকে। লণ্ডনের মেয়েদের আপিসে আদালতে কাজ করার রেওয়াজ তখনো সুরু হয় নি, বড় জোর কোন কোন মেয়ে হয়ত স্কুলে কাজ করতেন। পিকাডিলীতে অক্সফোর্ড সার্কাসে জিনিষপত্র কিনতে আসত বাড়ির মেয়েরা, বাজার করতে করতে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তাদের ইচ্ছে হত গরম চা-পানের। এদেশের রক্ষণশীল ঘরের মেয়েরা তখন কোন পাবলিক বার, ইন, বা ট্যাভার্ন জাতীয় সার্বজনীন সরাইখানায় চা-পান করতে যেত না। দোকানে দোকানে ঘুরে জিনিষপত্র কিনতে আসা রক্ষণশীল ঘরের মেয়েদের পরিবারের আর পাঁচজনকে নিয়ে বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের সাথে একসঙ্গে বসে চা-পানের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে ১৮৯৪ সালে লণ্ডনের পিকাডিলীতে প্রথম চা-রেস্তোরাঁর পত্তন করলেন স্যালমন গ্লাকস্টেন।

গ্লাকস্টেনের এমনিতে ছিল তামাকের কারবার। ভার্জিনিয়া ও জ্যামাইকা থেকে থরে থরে ভারে ভারে তামাক পাতা আনিয়ে সারা ইংলণ্ড জুড়ে ব্যবসা চালাতেন গ্লাকস্টেন। ১৮৮৭ সালে নিউ কাসলে এক প্রদর্শনী হয়, প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে চায়ের দোকান করেছিলেন গ্লাকস্টেন। দোকানের বিক্রি দেখে ব্যবসায়ী গ্লাকস্টেনের মনে ধরে গেল ব্যাপারটা। লণ্ডন শহরে এমনি ঘরোয়াভাবে চা-পানের ব্যবস্থার জন্য দোকান করা যায় না? তোড়জোড় করতে করতে ভাবতে ভাবতে আরো কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে লণ্ডন শহরের অলিম্পিয়াতে আবার একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হল, সেই প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণেও চায়ের দোকান খুললেন গ্লাকস্টেন। সেই দোকানই স্থায়িভাবে এনে চালু করলেন পিকাডিলীতে ১৮৯৪ সালে। পিকাডিলীতে চায়ের দোকানের বিলিব্যবস্থা দেখে গ্লাকস্টেন ভাবলেন আরো বড় করে আরো জমিয়ে এই চায়ের কারবার ফাঁদতে হবে। হাত মেলালেন এক প্রভূত ধনী আত্মীয়ের সঙ্গে, তাঁর নাম যোসেফ লায়ন্স। তাঁকে চায়ের ব্যবসায়ে নামিয়ে ঐ বছরেই একটি লিমিটেড কোম্পানীর পত্তন করলেন, কোম্পানীর নামকরণ করা হল জে লায়ন্স এণ্ড কোং, আর যোসেফ লায়ন্স হলেন ঐ কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সাধারণ একটি চায়ের দোকান, তাকে নিয়েও একটি কোম্পানী গড়ে তোলা! ইংরেজ জাত যথার্থই ব্যবসায়ী জাত। ১৮৯৪ সালে এই কোম্পানী পত্তন করার তিন বছরের মধ্যে সারা লণ্ডন শহরে ১৭টি চায়ের দোকান গড়ে উঠল জে লায়ন্সের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে বছর সুরু হয় সেই ১৯৩৯ সালে সারা লণ্ডনে জে লায়ন্সের চায়ের দোকানের সংখ্যা ছিল ২০০, লণ্ডনের বাইরে নানা জায়গায় ৫০; যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে জে লায়ন্সের চায়ের দোকানের সংখ্যা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। আর শুধুই কি চায়ের দোকান? এই কোম্পানী খাবার তৈরি করে আলাদা বিক্রি করে, খোলা চা প্যাকেটে ভরে চা বিক্রি করে নিজেদের দোকানগুলো থেকেই। জে লায়ন্স এক ধরণের কেক তৈরি করে, নাম সুইস রোল, প্রতিদিনের চাহিদা মেটানোর জন্য এদের খাদ্যবিভাগ যতগুলো সুইস রোল তৈরি করে, তা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে তার দৈর্ঘ্য হবে ৪০ মাইল। প্রতিদিন এরা ৫০ লক্ষটি আইস-ক্রীম তৈরি করে আর সিকি পাউণ্ডের চায়ের প্যাকেট তৈরি করে প্রতিদিন ১০ লক্ষটি।

এমন এক সময় ছিল, যখন Lyons-এর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারলেই একটা চাকরি কুড়িয়ে পাওয়া যেত। ফরেন এক্সচেঞ্জের সেই সস্তা-গণ্ডার দিনে যখন বিদেশ যাত্রা ভাগনেকুলের একচেটিয়া হয়ে যায় নি। পাশপোর্টের গেরো ছিল আপনা থেকেই ফস্‌কা, তখন লোটা কম্বলও সম্বল না করে দরিয়ায় ভেসে পড়া বহু বেপরোয়া তরুণ উচ্চাশী এই Lyons-এর দোকানে কাপডিশ ধুয়ে, আলু ছাড়িয়ে লেখা-শেখা পড়া-শোনা দেখা-চাখা করেছে।

এখন অবশ্য সে-দিন আর নেই। জমিদারের পাকা ধানে মই পড়েছে, নতুন জমিতে ধান বোনার তোড়-জোড় চলছে, কাজে কাজেই চাল বাড়ন্ত। তবু সেদিন চার্চিং ক্রস রোডের লায়ন্সে এক হাস্যমুখ সাদা টুপি বাঙালী ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শনি-রবি খাটে, তাই দিয়ে সপ্তাহের বাকি দিনগুলো মার্কেটিং-এর ডিগ্রীর বাইনা বাটে।

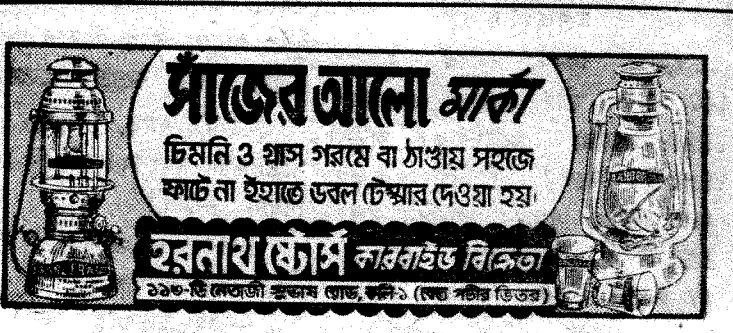

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী চিত্র

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

## ॥ বারো ॥

লেডি কিংকং মাঝে মাঝে চটে যান। তাঁর রাগের একমাত্র টার্গেট বেচারা খগেনবাবু। অনুরাগেরও টার্গেট তিনিই বলে দুজনে সুখে দুঃখে এতদিন মন্দ কাটে নি। খগেনবাবুর জীবনে তাই বিরাগ এলেও বৈরাগ্য আসে নি। প্রভাতের হাল্কা মেঘখণ্ডের মতনই সে মনোবেদনা লেডি কিংকংয়ের এক ঝলক হাসিতে আবার উড়ে গেছে।

সেদিন হঠাৎ লেডি কিংকংয়ের মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। তিনি খগেনবাবুকে বলছিলেন, 'কতবার তোমাকে বলেছি ভালো ছেলের সন্ধান নিতে। তোমার নাকের ওপর এত ভালো ছেলেটা ছিল। তুমি একটিবার তার খবর পেলে না? ভাণ্ডারহাটি গ্রাম থেকে এসে মুখুজ্জেরা ওকে মেয়ে ধরিয়ে দিল। এত সুন্দর দেখতে। এত ভালো চরিত্তির, এত গুণ সে কি আমার অরুণার ভাগ্যে জুটবে।'

খগেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আহা-হা চিন্তার কি আছে? একটা মাত্র মেয়ে। দেখতেও সুন্দরী। একখানা বাড়িও যৌতুক দেব। এই এত বড় শহরে একটা পাত্র জুটবে না? বল কি গো? তবে হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত—সমর ছেলেটি সত্যিই খুব সৎ ও গুণী।'

লেডি কিংকং বললেন, 'তাহলে শোনো আমার কথা। এই আসছে রবিবার চল গুরুদেবের মন্দিরে। সারাটা দিন ওখানেই কাটানো যাবে। ওখানেই প্রসাদ পাব। যদি বল তো সমরকেও নিয়ে যেতে পারি। ওর স্ত্রীর কল্যাণের জন্য, আমার মনে হয় সমরেরও যাওয়া উচিত।'

অরুণা ছুটতে ছুটতে গিয়ে সমরের ঘরে হাজির হল। সমর বলল, 'এসো এসো অরুণা। মনে খুব আনন্দ বলে মনে হচ্ছে। কোনো শুভ সংবাদ এনেছো?'

অরুণা বলল, 'আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন? আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?'

—'হঠাৎ এতবড় দার্শনিক প্রশ্ন কেন বলো তো?'

—'এই রবিবারে আমরা গুরুদেবের আশ্রমে যাচ্ছি। গুরুদেব সাক্ষাৎ কল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে? আমার কিন্তু ওঁর কাছে যেতে বড় ভয় করে। ঐ দেখুন মা-ও বোধ হয় আসছেন জিজ্ঞাসা করতে।'

লেডি কিংকং ঘরে প্রবেশ করলেন। সমর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে অতিকষ্টে বললেন, 'আর বাবা বল কেন? এই কয়েকটা সিঁড়ি, তাতেই কি কষ্ট দেখো।'

সমর বলল, 'সত্যিই তো আপনি এত কষ্ট করে উঠলেন কেন? আমাকে ডাক দিলেই আমি হাজির হতাম।'

লেডি কিংকং বললেন, 'তাড়াতাড়ি আমি নিজেই চলে এলুম। অরুণা আবার গুরুদেবকে মোটেই মানে না। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে। তোমাকে কিছু উল্টো শিখিয়ে দেবার আগেই আমি এসে পড়লাম। গুরুদেবের আশ্রম শহর থেকে বেশি দূরে নয়। জায়গাটা খুব সুন্দর। শত শত ভক্ত প্রতিদিন প্রসাদ পায়। যে যা কামনা করে সে তাই পেয়ে যায়। বৌমা এখানে থাকলে তাকেও নিয়ে যেতুম। যাবে তুমি?'

অরুণা বলল, 'চলুন না আমাদের সঙ্গে। বেশ হবে। আমি অন্তত একজন সাথী পাব। আমার ঐ গুরুদেবকে বড় ভয়। গতবার তিনি প্রায় আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে ফেলেছিলেন। তাঁর আবার মেয়েদের প্রতি একটু বেশি দয়া কি না।'

লেডি কিংকং বললেন, 'ছি অরুণা। গুরুদেব সম্বন্ধে ওরকম বলতে নেই।'

সমর বহুদিন শহরের বাইরে যায় নি। ভাবলো জায়গাটা দেখে এলে মন্দ কি? তা ছাড়া অরুণাও যখন এত করে বলছে। রবিবার সকালে সবাই মিলে গাড়িতে করে গুরুদেবের আশ্রম অভিমুখে রওনা হ'ল। লেডি কিংকং ও খগেনবাবু পিছনে বসলেন।

অরুণা ও সমর সামনে বসলো। গাড়ির স্টিয়ারিং সমরের হাতে। সমর যে কবে গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছে সে খবর বাড়ির কেউ পায় নি।

অরুণার মাথায় সর্বদাই একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে বেড়ায়। সে ইচ্ছে করেই সমরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাইবেন আপনি গুরুদেবের কাছে?'

লেডি কিংকং মেয়ের দুষ্টুমিতে স্বামীর গায়ে ঢলে পড়ে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মনে হ'ল যেন আটটা মটকার জল এক সঙ্গে কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

সমর খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে অরুণাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি চাইব তা তো এখনও ঠিক করি নি। আপনি কি চাইবেন বলুন তো?'

লেডি কিংকং খিল খিল করে হেসে বললেন, 'বল এবার কি চাইবি তুই? সমর কি চাইবে সে তো আমি জানি। তুই কি চাইবি বল।'

অরুণা বলল, 'আমি গুরুদেবকে মানিই না। চারিদিকে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে দিনরাত ঢলাঢলি করলে তার কোনো দৈবশক্তি থাকে?'

সমর, অরুণা, খগেনবাবু, লেডি কিংকং যখন আশ্রমে পৌঁছুলেন তখন বেলা সাড়ে দশটাও বাজে নি।

সমর দেখল এর ভেতরেই আশ্রমটি লোকে ভরে গেছে। অধিকাংশ ভক্তই নারী। প্রায় সবাই বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের বলে মনে হল।

একটা হলঘর থেকে কীর্তনের আওয়াজ আসছিল। খগেন-দম্পতি সেখানে কীর্তনে যোগদান করতে গেলেন। সমর নাস্তিক নয়। তবে এসব দৈবশক্তির বুজরুকিতে বিশ্বাস করে না।

অরুণা বলল, 'কি রকম লাগছে? কত শত সুন্দরীর সমাবেশ দেখছেন?'

সমর হলঘরে প্রবেশ করল। নরনারীর সমাগমে ঘরখানা গম গম করছিল। ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সুরে গাইছিল, 'গুরুর জয়, জয় গুরু' হলের পাশেই একখানা কুটির। দশ-বারোটি সুন্দরী রমণী গুরুদেব স্বামী বিপুলানন্দর পদসেবা করছিলেন। বিপুলানন্দ মাঝে মাঝে অর্ধ মীলিত চোখে সুন্দরীদের দিকে দৃষ্টি ফেলছিলেন। যাঁরা এর ভেতর একটু ভাগ্যবতী তাঁদের মাথায় ও কাঁধে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছিলেন। দূর থেকে অরুণাকে দেখেই বললেন, 'বৎসে, এসো এসো? কখন এলে?'

অরুণা সমরকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চলো চলো পালিয়ে চলো। কি দেখছো? আমি জানতুম এই হবে।'

সমর বলল, 'তাহলে এসেছিলে কেন?'

সমরকে সম্ভাষণে অরুণা মাঝে মাঝে আপনিকে 'তুমি' করে ভুল করে ফেলছে। ক'দিন থেকে সমর সেটা লক্ষ্য করেছে। তাতে সে খুশিই হয়েছে।

অরুণা বলল, 'এসেছিলাম, আপনাকে এই জায়গাটা দেখাতে। আমার সম্পত্তির অর্ধেক শীঘ্রই ঐ ঘুঘুটির নামে লিখে দেওয়া হবে। এ রকম কত শত অজ্ঞ নরনারীর সম্পত্তি ঐ মেকি সন্ন্যাসীটার করতলগত হয়েছে তার সীমা নেই। কি জানি কি করে ও এত লোককে মোহান্ধ করেছে।'

সমর বলল, 'খুব সহজ ব্যাপার। এইটুকু বুঝতে পারছো না? এর অর্ধেক লোকই ওর মাইনে করা। তারা ঘণ্টা হিসাবে পয়সা পায়।'

অরুণা বলল, 'ঠিক বলেছেন। এ কথাটা কোনোদিনই আমার মনে আসে নি। এই কথাটা আপনি বাবা-মাকে বলতে পারবেন?'

—'কি দরকার মনে কষ্ট দিয়ে? প্রকৃত সত্য কখনও লুকোনো থাকে না। একদিন সে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে।'

অদূরে খোলা মাঠ। ওপরে অনন্ত নীলাকাশ। মাঝে মাঝে দুটো-একটা গাছপালা। সৈনিকের মতন দাঁড়িয়ে।

অরুণা বলল, 'সত্যি বলছি জায়গাটা তত খারাপ নয়।'

সমর বলল, 'কেন গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেলে নাকি?'

অরুণা বলল, 'লোকটার পছন্দ মন্দ না। নিরিবিলি জায়গাটা কিন্তু বেশ খুঁজে বার করেছে।'

সমর বলল, 'হ্যাঁ প্রেমালাপ, বিশ্রম্ভালাপ করার পক্ষে মন্দ নয়। এখানকার আকাশে বাতাসেও যেন একটা উদাস উদাস ভাব রয়েছে! তাই না?'

অরুণা বলল, 'কেন? আপনার কি বৌদির জন্য মন কেমন করছে? আপনি লোকটি তো বড় শ্রৈণ। স্থানে অস্থানে যখন-তখন স্ত্রীর জন্য আপনার মন কেমন করে। সেটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।'

—'তার জন্য তো নাও ভাবতে পারি। যদি ধরো তার কথাই ভেবে থাকি তাতে কোনো অপরাধ হয় নি। পুরুষ নারীর পেছনে আর নারী

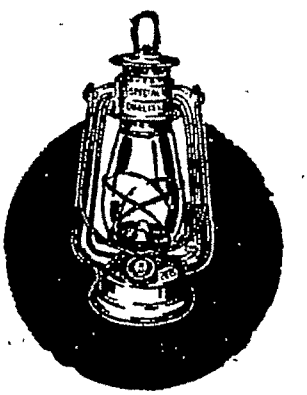

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৩,৩৫ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

পুরুষের পেছনে ছুটে চলেছে বলেই তো সৃষ্টিটা টিঁকে আছে।'

—'কেন তার চিঠি পান নি? অবশ্য আমাদের বাড়িতে আসার পর আপনার একখানা চিঠিও আসে নি। ঠিক কি না। বলুন।'

—'কি করে জানলে? কোম্পানীর ঠিকানাতেও তো আসতে পারে।'

—'কোম্পানীর ঠিকানায় কোনো প্রেমপত্র আসে না। তবে আপনার স্ত্রী যদি খোলা চিঠি পাঠাতে চান তাহলে অন্য কথা।'

সমরের হঠাৎ খেয়াল হ'ল সত্যিই তো। এতদিনে তার একখানা চিঠিও আসে নি। কালই অফিসে বসে একখানা চিঠি নিজের নামে তাকে ফেলতে হবে। নৃপেনের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তাকে কারা-বরণ না করতে হয়।

অদূরে একটি ছোট নদী কুলু-কুলু রবে বয়ে চলেছিল। আঁকা বাঁকা পথে তার গতির দিকে সমর হাঁ করে তাকিয়েছিল। যেন ঠিক নারীচরিত্রের একটা প্রতিচ্ছবি। চিরচঞ্চলা রহস্যময়ী।

অরুণা বলল, 'আবার কি হ'ল? নাঃ, দেখছি আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

অস্তরবির রাঙা আবির এসে অরুণার মুখে পড়েছিল। চূর্ণকুন্তল কপালে মৃদু হাওয়ার নাচ-ছিল। সমর অপলক দৃষ্টিতে খানিক-ক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ অরুণার চোখে চোখ পড়াতে সে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। অরুণা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে যেন বলল—'আপনি কি রকম লোক বলুন তো? ওরকম ভাবে কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে হয়?'

লেডি কিংকং বললেন, 'কি চাইলে তুমি সমর? আমি তো বাবা আজ পর্যন্ত যা চেয়ে এসেছি এখানে পেয়েছি। অরুণার একটুও বিশ্বাস নেই। দেখা—যাক।'

খগেনবাবু বললেন, 'জায়গাটা কেমন লাগলো সমর?'

সমর বলল, 'জায়গাটাতো বেশ ভালোই।'

সমর গাড়িতে স্টার্ট দিল। দুপুরে খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে ছিল। আশ্রমের সবাই সমরদের বেশ খাতির-যত্ন করেছে। মোটা চাঁদা দিলে তা হবে না কেন? খগেন-বাবু মোটা রকমের চেক দিয়ে এসে-ছেন। ভবিষ্যতে সম্পত্তিরও অংশ দেবার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

লেডি কিংকং খুব খুশি। তিনি স্বামী বিপুলানন্দের কাছে মনে মনে শেষ আর্জি পেশ করে এসেছেন। অরুণার জন্য তিনি সমরের মতন একটি জামাই চান। জীবনে তাঁর আর অন্য কিছুতে লোভ নেই। খগেনবাবুও খুশি।

গেট দিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময়ে অরুণা দেখলো উপেন বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সমরকে গাড়ি চালাতে দেখে উপেন বিস্ময়ে হতভম্ব।

উপেনের বেশ দেখে অরুণা হাসি চাপতে পারল না। একটা লক্ষ্ণৌ-কাট ফুলকাটা কুর্তা, চুড়িদার পাজামা, মাথায় একটা টুপি। প্রথমে তো অরুণা তাকে চিনতেই পারে নি। হাসতে হাসতে উপেন এগিয়ে এলো, 'নমস্কার দিদিমণি। সেই দুপুর থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সমরবাবুর খাবার নিয়ে এসেছিলাম। দেখলাম বাড়িতে কেউ নেই। চিন্তায় মাথাটা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। কোথায় গিয়ে-ছিলেন?'

সমর এতক্ষণ খগেনবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। সে এসে অবাক-ভাবে বলল, 'আরে উপেন নাকি? একি পোষাক তোর?'

হেসে উপেন বলল, আজ্ঞে দাদাবাবু আর কটা মাস শুধু কষ্ট। তারপর সব ঘুচে যাবে।'

সমর বলল, 'কেন রে। সিনেমায় ঢুকে পড়েছিস নাকি?'

—'আজ্ঞে পটলাবাবুর কাছে চিঠি আসতে সুরু করেছে। তিনি ঢুকলেই আমিও ঢুকব। আপনি যে বক্শিস্ দিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়েই তো এই ড্রেস করেছি। ওস্তাদী ড্রেস। খাতির আছে। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব আজ্ঞে।' বলে নিজেই বোকার মতন হাসতে থাকে।

অরুণা বলল, 'আহা বেচারা সিনেমায় ঢুকতে চায়। ওকে গুরু-দেবের ওখানে পাঠিয়ে দিন না কেন? তিনবার গুরুর জয় বললেই যা চাইবে তাই পাবে।'

উপেন বলল, 'কোথায় যেতে হবে বললেন দিদিমণি?'

সমর বলল, 'বেচারা গরীব মানুষ। দু-পাঁচটাকা জমিয়ে রেখেছে বিপদ-আপদের জন্য। সেটাও গুরুর সেবায় আর নাই বা লাগালে।'

উপেন বলল, 'ঠিক আছে দিদিমণি, কাল আপনার কাছ থেকে ঠিকানা-পত্তর নিয়ে যাব। মেসের ম্যানেজারটা আবার ভারী রাগী। এমনিতেই খাঁ খাঁ করে। আমাকে আজকাল আবার রাজপুত্তুর বলে ডাকতে সুরু করেছে। বলেছে শীগ্‌গিরই তাড়িয়ে দেবে। সিনেমায় একবার ঢুকেই নি। ওরকম কত ম্যানেজার তখন 'চিনি গো তোমারে চিনি' বলে ছুটে আসবে না?' বলেই উপেন এমন একখানা অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালন করলো যে সমর ও অরুণা দুজনেই খিল খিল করে হেসে ফেলল। দুজনের হাসিতে খুশি হয়ে উপেন বলল, 'যাই এখন। বড়ই চিন্তা ছিল আপনাদের জন্য। তিনবার না তিনশো বার 'গুরুর জয়' বলতে রাজী আছি দিদিমণি। সিনেমার পার্ট চাই কিন্তু। ঠিকানাটা না নিয়ে নড়ছি না।'

(ক্রমশঃ)

পারুল ভট্টাচার্য্য

# আয়না

হঠাৎ করে মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন আগুন ধরে গেল প্রতিমার। তীক্ষ্ণ কঠিনস্বরে সে জিজ্ঞাসা করলো,—কি? কি বললে?

আগের কথাটাই আবার বললেন সুবাসিনী,—মনীশ বিয়ে করেছে। করেছে অনেকদিন আগেই। এতদিন বলতে সাহস পায় নি সে। আজ বেরোবার সময় আমায় বলে গেছে।

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে প্রতিমা—আজ বলে যায় নি মা, বলেছে সে অনেকদিন আগেই। শুধু আমাকেই তোমরা কেউ বল নি এতদিন। শুধু শুধু মিথ্যে কথাগুলো কেন বলছো বুড়ো বয়সে।

খোঁচা খেয়ে ক্রুদ্ধ হ'লেন সুবাসিনীও। বললেন,—হ্যাঁ তাই। তাই যদি হয়, কি হ'য়েছে কি তা'তে শুনি। বেটা-ছেলে, বিয়ে যদি ক'রেই থাকে তাতে এত গা-জ্বলুনীটা কিসের?

নাঃ কিচ্ছু নেই। চাপা বিদ্রূপে হিসিয়ে উঠলো প্রতিমা। কিন্তু একটা পয়সা রোজগার নেই যার, তার বিয়ে করবার সখটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায় মা। ব'লে দিও তোমার ছেলেকে, সত্রীক তাঁকে খাওয়াবার সামর্থ্য নেই আমার।

খাওয়াতে তোমাকে হবেও না। সে মেয়ে নিজেও চাকরী করে। সে তোমার ভার হ'য়ে আসবে না, বুঝলে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝলাম। কর্পোরেশন স্কুলের আশি টাকা মাইনের মাষ্টার। বেশ তো দাদাকে বলো বৌ নিয়ে যেন আলাদা বাসা করে। আমার এখানে থাকা চলবে না।

তাই ক'রবে তারা। এখানে থাকবে তারা কেবল যে কটা দিন ভাল একটা ঘর-টর না পায়।

এক দিনও না, এক দিনও না। নিষ্ঠুর আক্রোশে প্রায় হিংস্র হ'য়ে উঠলো প্রতিমা। একদিনও থাকা চলবে না বুঝলে, এই আমার শেষ কথা। ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্র হাতে টেনে টেনে চুলের বিনুনীটাকে প্রায় ছিঁড়তে থাকে প্রতিমা, তার অফিসের সময় হ'য়েছে।

কটুকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন সুবাসিনী। অত অহঙ্কার করিস নে, ধর্মে সইবে না। না হয় ঢাকা রোজগারই করিস তুই; তাই বলে এত বাড় ভাল না।

স্থির অগ্নিবর্ষী চোখে এক পলক মা'র দিকে চেয়ে দেখে প্রতিমা। তারপর স্থিরস্বরে বলে, ধর্মে সহ্য হোক আর নাই হোক, বৌ নিয়ে দাদা যদি এ-বাড়িতে ঢোকে আমি সহ্য করবো না। এ কথাটা আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি মা। সোজা বাড়ি থেকে বার করে দেবো—মনে থাকে যেন। কঠিন পায়ে কলঘরে ঢুকে যায় সে। স্নান করে না নিলে অফিসের দেরি হ'য়ে যাবে তার।

রান্নাঘরে কি যেন একটা পুড়ছিল। হুড় হুড় ক'রে খানিকটা জল ঢেলে দেন সুবাসিনী। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল

তাঁর। এতই যা কিসের তেজ রে বাপু। না হয় উপার্জনই করিস, তুই। তাই বলে তোর জন্যে ছেলে-বৌকে বাড়ি ঢুকতে দেবেন না তিনি। না হয় তাঁকে বলে কয়েই করে নি বিয়ে। না হয় মনীশ কথাটা লুকিয়েই রেখেছিলো। তবু বিয়ে সে করেছে যে এই তিনি ভাগ্যি বলে মনে করেন। নইলে মনীশের বিয়ের আশা তিনি তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। ওদের বাবা বেঁচে থাকতে কি কম চেষ্টা করেছেন তাঁরা তার বিয়ের জন্যে। তখন প্রাইভেট ফার্মের ভাল চাকরীও করতো মনীশ। কতো খোসামোদ, কত অনুনয়, কত ভাল ভাল মেয়ে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। ছেলের এক গোঁ—বিয়ে সে করবে না। কিছুতেই তাকে টলানো যায় নি।

আর তারপর তো কত ঝড় বয়ে গেল সংসারের ওপর দিয়ে। করোনারী থ্রম্বসিসে কর্তা বাবা গেলেন, আর তিনটি ভাই-বোন শুদ্ধ এতবড় সংসারের ভার পড়লো ওদের দুই ভাই-বোনের ঘাড়ে। বি-এ পাশ প্রতিমাও চাকরী নিল। দুই ভাইবোনে মিলে মেজ মেয়ে অসীমার বিয়ে দিলো। রমা আর শেখরের পড়বার ব্যবস্থা করলো। ভালই চলছিল সব। হঠাৎ কি যে শনির নজর পড়লো সংসারের ওপর। দুম্ করে মনীশের অমন চাকরীটা চলে গেল। আর তারপর এই চারটি বছর বেকার বসে। দুটো ট্যুইশানী সম্বল। তাইতেই নিজের হাতখরচটা চালায় কোন রকমে। দিন রাত মুখ চুণ করে ঘুরতো দেখে বুক ফেটে যেতো তাঁর। বেটাছেলে, কবে কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা হ'য়েছে তা তিনি জানবেন কেমন করে। মাস কয়েক আগে ছেলে এসে তাঁকে বললো, সে বিয়ে ক'রবে বেজিষ্ট্রী করে। তাঁর আশীর্বাদ চায়।

কি বলবেন তিনি? না—বিয়ে করো না। অতবড় সাবালক ছেলেকে তাই বলা যায় না কি। তা ছাড়া মনীশ বলেছিল মেয়েটি খুব গরীবের মেয়ে, স্বভাবও খুব ভাল। মনীশের কাছেই ম্যাট্রিক পড়ছে। যদি পাশ করতে পারে কোথাও একটা কাজ দেখে নেবে। আর ততদিন মনীশের একটা কিছু হ'য়ে যাবেই। পাঁচ রকম ভেবেই মত দিয়েছিলেন তিনি। এখন সে পাশ করেছে, চাকরী করছে। এখন আর সে বাপের বাড়ি পড়ে থাকতে চায় না। ছেলেও রাখতে চায় না তাকে। তিনি আর কি করবেন। ছেলেকে বলবেন,—না তুমি বৌ এনো না। তা কি হয় কখনও। মেয়ের মুখ রাখতে ছেলেকে ত্যাগ করতে তো আর পারেন না তিনি। আর তোরই বা কিসের এত লাফালাফি রে বাপু। বেটাছেলে বিয়ে করেছে কুলিগিরী করে খাওয়াবে। না হয় চাকরীই নেই। তাই বলে বয়সের ছেলে চিরকাল আইবুড়ো থাকবে নাকি! সাধ আহ্লাদ নেই তার? এতগুলো মুখে যদি জোটে, আর একটা মুখেও দু'মুঠো জুটবে। ডালে কাঁটা দিচ্ছিলেন, আর ক্রুদ্ধস্বরে গজ গজ করছিলেন সুবাসিনী। মেয়েছেলের এত তেজ ভাল না। বাড়ি থেকে বার করে দেবে! হুঁ—অমনি দিলেই হলো। তাঁরও হয়েছে যেমন পোড়া কপাল, বুড়ো বয়সে মেয়ের রোজগার খেতে হচ্ছে।

অসহ্য ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল প্রতিমারও। স্বার্থপরতারও একটা সীমা আছে। নির্লজ্জতারও একটা মাত্রা থাকে, এদের বোধ হয় সেসব বালাইও নেই। নীচ, নীচ সব।

ভিড় কাটিয়ে কাটিয়ে পথ চলছিল আর ভাবছিল প্রতিমা। দাদা তার চেয়ে সাত বছরের বড়, বাড়ির বড় ছেলে, আজ চারটে বছর বেকার বসে-থাকা দাদা বিয়ে করেছে। তাও লুকিয়ে। তাকে জানাবার দরকারটাও মনে করে নি। আর তারই হয়ে মা এসেছিলেন ওকালতি করতে। সজোরে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে প্রতিমা। ছোটলোক ইতর সব। সাধ আহ্লাদ? সাধ আহ্লাদ যেন প্রতিমারই ছিল না। সাধ আহ্লাদ! বলতে মা'র একটু বাধলো না। চার বছর ধরে যে ঘরে একটা পয়সা আনে নি, অথচ যার মাথায় এতবড় সংসার। দুটো ভাই-বোনকে মানুষ করবার দায়িত্ব। বুড়ো মাকে পালন করবার দায়িত্ব। মেজ বোনের বিয়ের দরুণ যার মাথায় এখনও প্রায় হাজার টাকার দেনা। আর তার সেই সমস্ত কর্তব্যগুলো—দাঁতে দাঁত চেপে সব করে যাচ্ছে প্রতিমা, শুধু সুদিনের আশায়। তার আবার সাধ আহ্লাদ! তার আবার বিয়ে করা। নির্লজ্জ কোথাকার। ছাতের গোড়ায় মনীশকে পেলে কোন্ দম্ দিয়ে চড়িয়ে দিত প্রতিমা। সখ করে বিয়ে করেছে, থাকুক তাকে নিয়ে গিয়ে। তার কাছে জায়গা হবে না।

বুকের ভেতরটা যেন টনটন্ করে উঠছিল প্রতিমার। সাধ কি তার ছিল না। কল্যাণ তো তাকে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। মনীশের চাকরীটি যদি না যেতো তাহলে তো আজ সে কল্যাণের স্ত্রী হ'য়ে সুখেই থাকতে পারতো। কি দরকার ছিল তার এই চাকরীর জোয়াল ঠেলে নিজেকে ক্ষয় করবার। তুচ্ছ নগণ্য একটা সখ মেটাবার কথাও কখনো চিন্তা করে নি প্রতিমা। একদিন সিনেমা দেখতে ইচ্ছা হ'লেও পাঁচবার ভেবেছে সে। কখনও একটা ভাল শাড়ি পর্যন্ত পরে নি। মেজ মাসিমার মেয়ে অলকার বিয়ে হ'য়ে গেল, মেজ মাসিমা মনে করে দিয়ে যেতে লিখলেন তাকে। সে যেতে পারলো না শুধু একখানা চলনসই রকমের ভাল শাড়ির অভাবে। আর আজ কি না বিতৃষ্ণায় বিষাক্ত মনে হচ্ছিল সব। প্রায় বছরখানেক ধরে বিকেলের দিকে অসহ্য মাথা ধরে তার। অফিস থেকে যখন বেরোয়, মনে হয় চারদিক যেন অন্ধকার হ'য়ে আসছে। ডাক্তার বললেন চশমা নেওয়া খুব দরকার। আজ এক বছর হ'য়ে গেল টাকার অভাবে চশমা নিতে পারলো না সে। সমানে সেই যন্ত্রণা সহ্য করছে আর কাজ করে যাচ্ছে। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে এমন কি নিজের স্বাস্থ্যটাকে পর্যন্ত এই সংসারের পেছনে খেটে খেটে নষ্ট ক'রে ফেললো সে।

আর মনীশ কি না স্বার্থপরের মতো—গলার কাছটা ব্যথা করে কি যেন একটা ঠেলে উঠছিল। চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে আসতে চাইছিল। একটু সামলাবার জন্য একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো সে। এক খিলি পান দিতে বলে রুমালটা বার করে মুখটা মুছে নেয় সে। দোকানের আয়নায় তার প্রতিবিম্ব। পরিপূর্ণ ব্যর্থতার মূর্তি যেন। কালিপড়া মুখে গর্তে ঢোকা চোখ। বিবর্ণ শুষ্ক ত্বক আর কণ্ঠাস্থি প্রকট চেহারা। দেহ থেকে যৌবনের তলানিটুকুও শুষে নিয়েছে এই সংসার। বয়স হলো ত্রিশ। আর দেখায় যেন চল্লিশ। কে কবে কেমন ক'রে শরীরের ওপর বাড়তি দশটা বছরের আক্ষর এঁকে দিল, তাই

ভাবতে চেষ্টা করছিল প্রতিমা। ভাবছিল—আর আজ এতদিন পরে এই আজই প্রথম দেখতে পাচ্ছিল তার সারাজীবনের বঞ্চনার চেহারাটা। দেখছিল, আর বুক ঠেলে উঠতে চাইছিল একটা হায় হায় কান্না।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিতেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো, সত্যই এতটা প্রত্যাশা করে নি প্রতিমা। বারান্দায় একটি মোড়ার ওপর একটি অর্ধাবগুণ্ঠিতা বসে আছে। অনুমানে বোঝা যায় ঐ নতুন বৌ। ওপাশে একটা নতুন ট্রাঙ্ক, আর পুরানো সতরঞ্চিতে জড়ানো খুব সম্ভব বিছানা। একটা বাঁশের সাজিতে কি সব টুকিটাকি জিনিষপত্র। রমা আর শেখর হাত মুখ নেড়ে কি সব বলছিল। তার জুতোর সাড়া পেয়ে সভয়ে চুপ করে গেল। রান্না-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মনীশ বোধ হয় মা'র সঙ্গে কথা বলছিল। অপ্রতিভ বিপন্ন মুখ তুলে একবার তার দিকে চাইলো। ঘোমটার ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত চকিত দৃষ্টিপাত করলো নবাগতাও। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোধ হয় সেও বুঝতে পেরেছে। সমস্ত পরিস্থিতিটার ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে গম্ভীর ভ্রূক্ষেপহীন মুখে ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। উত্তেজনায় কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছিল তার। আর সর্বশরীরে বৈন পিঁপড়ের—মতো হেঁটে বেড়াচ্ছিল একটা কঠিন ঘৃণা। সাহস! স্পর্ধা! সে মানা ক'রে গেছে, তার পরেও বৌ নিয়ে এসেছে মনীশ। ভাল,—চরম অপমানই বরাতে আছে তার। আজ আর কাউকে রেয়াত করবে না প্রতিমা। কারও খাতির করবে না। অনেক সহ্য করেছে সে—আর না। দৃঢ়কঠিন হাতে জামা-কাপড় বদলালো সে। তারপর একখানা বই হাতে করে বসে রইলো। সে জানে মনীশ একবার তার কাছে আসবেই। সেইজন্য অপেক্ষা করে সে। যা হবে তারপর।

কিন্তু কই? একটু একটু করে অনেকক্ষণ কেটে গেল যে। কোন সাড়া শব্দ নেই কেন! ওরা কি তবে চলেই গেল। ছিলে পরানো ধনুকের মতো উত্তেজনায় টান হয়ে থাকা স্নায়ুগুলো তার শিথিল হয়ে আসতে থাকে। মনের মধ্যে জমতে থাকে একটা আকারহীন ক্ষোভ। আর তখনই দরজার কাছে একটা ফিস্ ফিস্ কথা শুনে চকিত হয় সে। রমার গলা। যাও না বৌদি, ভয় কি, দাদা বলেছে যাও না ভেতরে।

কঠিন এক টুকরো বিদ্রূপ ফুটলো প্রতিমার ঠোঁটে। ভেবেছে কি মনীশ, বৌকে পাঠিয়ে দিলেই গলে যাবে প্রতিমা। ভুল, ভুল ভেবেছে। আর সে ভুল ভাঙবেও এখনই। দরকার হ'লে আজ সে চরম ছোটলোক হবে। নিষ্ঠুর আক্রোশে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটাকে সজোরে কামড়ে ধরে সে।

শাড়ির খস্‌খস্ শব্দ। দুটো একটা চুড়ির ভীরু আওয়াজ। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। সামনে আসবার সাহস নেই। বোধ হয়,—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই মা'র কাছে মনীশের কথা শুনেছে সব। জানে প্রতিমাই তার আসল ভাগ্যবিধাত্রী। কিন্তু নাঃ। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। যা করবার এখনই করে ফেলা উচিত। শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিমা। একেবারে মুখোমুখি। থমথমে চেহারা। মস্তিষ্কের ঝিমিয়ে যাওয়া আগুনটা দ্বিগুণ জোরে জ্বলে উঠেছে আবার। কঠিন আরক্ত মুখ। দুই চোখে উদ্যত বর্শাফলকের মতো শাণিত দৃষ্টি। সামনে দাঁড়ানো শঙ্কিত, আড়ষ্ট মেয়েটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার সেই দৃষ্টির সামনে পড়ে মুহূর্তে যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। বুকের উপর পড়া শাড়ির আঁচলটা মুঠো করে ধরে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

কিন্তু কি হলো প্রতিমার? কি হলো? দুই চোখের সেই উদ্যত বর্শা-ফলকের মতো দৃষ্টিটা যেন ভোঁতা হ'য়ে আসতে থাকে। আসন্ন যুদ্ধোন্মুখ শিরাগুলো আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এলো। আর ছিলে পরানো ধনুকের মতো টান হ'য়ে থাকা মুখের রেখায় রেখায় যে কঠোরতা দানা বেঁধে ছিল, সেগুলোও যেন শিথিল হ'য়ে গলে যেতে চাইছিল। পাগল হলো না কি প্রতিমা? নইলে ডান হাতের উদ্যত তর্জনীটা জোর খুঁজে পাচ্ছে না কেন, কেনই বা পারছে না কড়া গলায় সোজা কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে।

না ভুল হয় নি প্রতিমার। এও সেই একই চেহারা। মার খাওয়া, হারমানা, শ্রান্ত, নির্জীব এক মেয়ে। ক্লান্ত কপালের কুঞ্চনে শ্রান্ত মুখের রেখায় রেখায়, আর কালিপড়া চোখের কোলে বিদায়ী যৌবনের আভাস। প্রতিমা ঠিক জানে ঐ স্বল্প চুলে গুছিয়ে বাঁধা খোঁপার ভেতরে সন্ধান করলে দু'চার গাছি শুভ্রতার সন্ধান ঠিকই পাওয়া যাবে। জীর্ণ শির ওঠা কর্কশ হাত একটু একটু কাঁপছে। সিঁথির দু'পাশের চুল উঠে গেছে। সেখানে বয়সের পদপাত সুস্পষ্ট। চিনতে দেরি হবার কথা নয়। সকালবেলা আয়নায় দেখা নিজের প্রতিবিম্বটাই যেন আরও একবার দেখতে পাচ্ছিল প্রতিমা। সংসারের শতমুখী দাবী মেটাতে মেটাতে সকল কামনা যার মূক হ'য়ে গেছে। নিরুপায় জানোয়ারের মতো বোবা ব'য়ে ব'য়ে সে ক্লান্ত। আর যে পারছে না বলেই খুঁজছে একটা বলিষ্ঠ আশ্রয়—যেখানে সে আপন ক্লান্ত জীবনের ভার রাখতে পারে। চোখ তুলে চাইলো প্রতিমা। কখন মনীশ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। অপ্রতিভ শঙ্কিত তার মুখেও জরা আর ব্যর্থতার ছাপ দেখতে পাচ্ছিল প্রতিমা।

এতক্ষণে আবার কথা বলতে পারলো সে। অবশ্য ডান হাতখানায় জোর খুঁজে পেলো যেন। অসাড় তর্জনী উঠিয়ে প্রায় আদেশের স্বরে বললো, শেখর জিনিষ-পত্তরগুলো ঘরে তুলে রাখ। কোমল মুখে করুণার ছাপ। স্নিগ্ধ হেসে বললো,—বসো বৌদি। দাদা ঘরে এসো না, লজ্জা পাচ্ছ না কি?

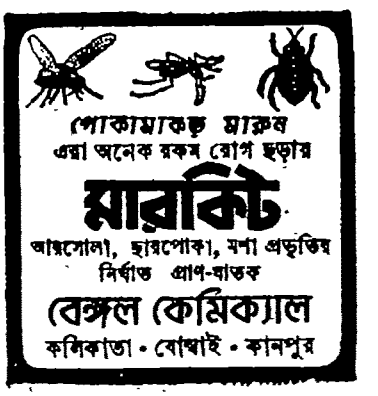

সুনীল রায়

# অনলআয়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চারদিকে হট্টগোল। এরই মধ্যে এসে গিয়েছেন পাদরি সাহেবরাও। হাতে একটি পুঁথি, রাস্তার একপাশে দুটি দেশী খৃষ্টান লোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা বাংলায় বলে চলেছেন—

বেতলেহামে ঘটল যীশু-চন্দ্রের উদয়
পৃথিবীর মনুষ্যরা গায় জয়-জয়-জয়।

কিন্তু ও-চন্দ্রের দিকে মনোযোগ নেই কারো। তারা তাকায় আকাশের দিকে। শিশুচন্দ্রের জন্যে নয়, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের জন্যে তারা লালায়িত।

পূর্ণচন্দ্রের বিভায় সৌখিন গিনিয়ের সুসজ্জিত কামরা আলোকিত করে চতুর্দশীর দুপুরে চাঁচুড়ার বিনা থেকে যাত্রা করেছে রাধা। রূপসী সে, কিন্তু আজ তাকে চতুর্গুণ রূপবতী দেখাচ্ছে। এতদিন ছিল বন্দিনী, কিন্তু আজ বুঝি সে বন্দনীয়া। স্বামীর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় চলেছে রাধারাণী।

অনেকদিন পেছনে চলে যায় তার মন। গৌরহাটির ঘাট থেকে যেদিন সে যাত্রা করেছিল শান্তিপুরে। মাইরাজা ছতে চলেছিল সে সেদিন। আজকের এই সমারোহের সঙ্গে সেদিনকার সেই দীন আয়োজনের কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তবুও তুলনা এসে যাচ্ছে তার মনে। সেবারের সেই নৌকোযাত্রার পর তার জীবনে এসে গিয়েছিল পরিবর্তন, কুমারী রাধা হয়েছিল বিবাহিতা বধূ; আজকের এই নৌকোযাত্রাও তার জীবনে পরিবর্তন আনবে বলে সে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে এইজন্যে যে, এবারকার পরিবর্তন সে নিজের ইচ্ছায় ঘটাবে বলে সংকল্প করেছে এবং এইজন্যেই তার যাত্রা। সেদিন তার ইচ্ছা, বাসনা, কামনা বা আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু ছিল না, সেদিন সে ছিল বালিকা। কিন্তু সে-রাধা এখন আর নেই সে; এখন সে বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে, সেদিন তার কোনো বেদনা ছিল না, কিন্তু আজ সে বেদনায় দীর্ণ। বালিকা-বধূ হয়ে সে প্রবেশ করেছিল যে-গৃহে সেই গৃহ তার প্রাচীরের উত্তাপ দিয়ে আজ তাকে করে তুলেছে—

তাদের পিনিসের পাশ দিয়ে তরতর করে তীরে বেগে বেরিয়ে গেল একটা ডিঙি, মাঝির পো গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে চলেছে—

ঐযায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল রাধা, শুনতে পেল গান—

মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারিনে।

চাঁপার মুখের দিকে তাকাল সে। চাঁপার কানেও গিয়েছে ঐ গান, কিন্তু তার তো বিচলিত হবার কিছু নেই। চুপ করে বসে রইল।

শান্তিপুরের সেই যাত্রার কথাটা বারবারই মনে পড়ে। ছোট একটা পানসিতে চেপে সে-বার গিয়েছিল গরীবের মেয়ে। কিন্তু এবার চলেছে রাজেন্দ্রাণীর মত এই সৌখিন পিনিসে। দক্ষিণের বাতাস উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে পাল, বারো-চোদ্দ জন মাঝিমাল্লা নৌকোটা নিয়ে তবু যেন কত ব্যস্ত।

পরিচ্ছন্ন কারুকাজে মণ্ডিত নৌকোটির দুটি ঘর। এ-ঘরে আছে চাঁপা আর রাধা, অন্য ঘরটিতে রূপনারায়ণ।

রূপনারায়ণ ও-ঘরে বসে একা-একাই চুমুক দিচ্ছে গেলাসে। আ, মজাটা মাটি করে দিল ঐ মেয়ে। কিন্তু মাটি করে কে, রূপনারায়ণও যেমন-তেমন মানুষ না, খুশি হলেই চলে যাবে ঐ বজরায়।

একটা বহরই বলা চলে, রূপনারায়ণের এই স্নানযাত্রায় চলেছে তার এক নৌবহর। পিনিসে আছে তারা স্বামী-স্ত্রী ও চাঁপা। আগে-পিছে আর পাশে পাশে চলেছে তার বজরা, ভাউলে আর পালোয়ার। বজরায় বাইজীদের নিয়ে আছে মতিলাল, নরহরি আর অন্যান্য ইয়ারেরা। ওখানে নাচ সুরু এখনো হয় নি।

ওরা কি করছে ওখানে জানবার একটু কৌতূহল যে না হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু হবে এখন? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসুক, এদিকে চোখেও রং ধরুক ভালো করে।

পালোয়ারে চলেছে ভৃত্যেরা—আবদার আছে, ফরাশ আছে, খান-সামারা আছে। রান্নাবাড়ির ব্যবস্থাও ওখানে। পোয়াদা, বরকন্দাজেরা কেউ কেউ পালোয়ারে, কেউ বা ভাউলেতে।

খুব সেজে চলেছে রূপনারায়ণ। দু' ভুরুর পাশে আর চোখের কোণে কালো রেখা পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার রূপ যেন একটু খোলতাই হয়েছে; কোঁকড়া চুল বাবরি কাটা, পরণে কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, গায়ে মসলিনের সূক্ষ্ম নিমাস্তিন জামা, চুনটকরা উড়ুনি গলায়, পায়ে বকলসবাঁধা চীনেবাড়ির জুতো। সৌখিন লক্কার মত দেখাচ্ছে রূপনারায়ণকে।

বাতাসের সুপ্রসন্ন দাক্ষিণ্য পেয়েছে তাদের নৌকো। হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল। মসৃণ দ্রুততায় ভেসে চলেছে রূপনারায়ণের নৌ-বহর।

ছলছল শব্দ হচ্ছে জলে, তার মধ্যেই বজরা থেকে ভেসে আসছে বীণ আর সেতারের ধ্বনি। হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে জানলার পর্দা সরিয়ে একবার ঐ দিকে তাকাচ্ছে রূপনারায়ণ।

তার কানেও গিয়েছিল ঐ গানটা, এখন গুন্‌গুন্ করে সে তা গাইতে লাগল—

মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারিনে
ঐ যায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে।

মনটা চন্‌মন্ করে উঠল রূপ-নারায়ণের। নতুন একটা খাসা বাইজী জোগাড় করেছে এবার মতিলাল। বেগম জানের, হিঙ্গুলের, এমন কি নিকির নাচ সে দেখেছে আগে, কিন্তু এটির —এই ফৈজ বক্সের— নাচ আগে দেখে নি। এটা একেবারে টাটকা আমদানি। তারিফ করতেই হবে মতিলালকে।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ তাঁর কাশীপুরের বাগান-বাড়িতে নাচের উৎসবে এনেছিলেন এই নর্তকীকে। নতুন বাইজী এসেছে শুনেই মতিলাল খোঁজ করে। আর, মতিলালের তো উদ্যোগ, শেষ পর্যন্ত তাকে সংগ্রহ করে এনে তুলেছে ঐ নৌকোয়।

সাধনা দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

নর্তকীর নামটা শুনে হেসেছিল রূপনারায়ণ, বলেছিল, তোমার এ নাচিয়ে ব্যাটাছেলে, না মেয়েমানুষ হে মতিলাল। নাম শুনে তো মেয়েলোক বলে মনে হচ্ছে না।

মতিলাল বলল, আসুক। পরীক্ষা করে দেখলেই হবে।

—তুমি তো দেখেছ?

—দেখেছি। নাম ফৈজ বক্স। কিন্তু একেবারে ফৈজী বেগমের মত। অবিকল, অবিকল। তারই বংশের কেউ কি না কে বলবে।

রূপনারায়ণ জিজ্ঞাসা করল, সে আবার কে।

মতিলাল বলছে, নবাব সিরাজদ্দৌলার সেই বেগমের কথা। নর্তকীর ব্যবসায় করে সে জীবন অতিবাহিত করত দিল্লীতে। তার অসামান্য সৌন্দর্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। সারা ভারতে তার মত সুন্দরী নারী না কি আর নেই। উত্তপ্ত কাঞ্চনের মত তার বর্ণ, অঙ্গ অতি কৃশ, গমন এমন স্বচ্ছন্দ-মন্থর যে, দৃষ্টিমাত্র তা মোহিত করে মানুষকে। সেই অনুপম রূপরাশির কথা শুনে সিরাজ অনেক অনুনয়-বিনয় করে ও লক্ষমুদ্রা সমর্পণ করে তাকে নিয়ে আসে মুর্শিদাবাদে।

মতিলাল বলল, এখানে অনুনয়-বিনয়ও দরকার হল না, লক্ষ টাকাও লাগল না। মাত্র দশটি হাজার টাকায় পাওয়া গেল এই ফৈজকে।

শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠল রূপনারায়ণ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যা পেরেছে, রূপনারায়ণকে দিয়ে তাহলে সম্ভব হল অনুরূপ একটা অবিশ্বাস্য কাজ!

মতিলাল বলল, হল। আগাম পাঁচ হাজার দেওয়া হয়েছে, বাকিটা দিতে হবে বিদায় দেবার সময়।

লক্ষমুদ্রার জীবন পেয়েছিল সিরাজ—ফৈজীর জীবন। রূপে যে ভূভারতে শ্রেষ্ঠা বলে স্বীকৃতা হয়েছিল, যার সূক্ষ্ম বক্ষ ভেদ করে প্রতিটি শিরা দেখা যেত স্পষ্ট, নৃত্যে যে ছিল—পরম পটিয়সী, সৌন্দর্যে যে ছিল—অলোকসামান্যা, প্রেমে ব্যর্থ সিরাজ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে জীবন্ত ফৈজীকে চারিটি প্রাচীরবেষ্টিত ঘরে বন্ধ করে, তার প্রতিটি দরজা-জানালা ইটে গেঁথে দিয়ে জীবন্তে কবর দিয়েছে তাকে। লক্ষ টাকার বিনিময়ে একটা জীবন পেয়ে গিয়েছিল সিরাজ।

কিন্তু দশ হাজার টাকায় রূপনারায়ণ তো পাচ্ছে মাত্র একটা রাত—একটি রাত্রির সঙ্গী। মতিলালের হয়তো এতে খুব উল্লসিত হওয়া বেহিসেবী কাজ হচ্ছে।

তাহলে কি হবে, ধনীর মোসায়েব হতে গেলে ওভাবে প্রলুব্ধ করে যেতেই হয়। এ নিয়ম বুঝি জানে মতিলাল।

কাশীপুরের গুরুপ্রসাদ বসু যেমন-তেমন লোক নয়। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পুত্র বলেই না, পাঁচ জনে তাঁকে খাতির-যত্ন করে, পাঁচটা বড় কাজের মধ্যে তিনি আছেন সর্বদা। চুঁচুড়ার নীলরত্ন যেমন, তেমনি। নীলমণি হালদারের পুত্র বলে তার খাতির নয়, নীলরত্ন বলেই তার আদর—লেখাপড়া করে, পাঁচজন মান্যগণ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গ করে। গুরুপ্রসাদও অমনি-ধারা একজন মানুষ। তিনি যখন পাঁচজন সাহেব-সুবাকে নেমন্তন্ন করে এনে নাচ দেখিয়েছেন এই নাচিয়ের, মতিলাল যতই ফৈজী বেগমের কথা বলুক, এ বাইজী তবে যেমন-তেমন বাই কখনোই নয়। দশ লেগেছে, পনের হাজার লাগলেও রূপনারায়ণ নিশ্চয় রাজি হয়ে যেত—একে পাবার জন্যে।

ঘটনাটা যেমন-তেমন সত্যিই না। কাশীপুরের বাগানবাড়ির এই নাচের খবর এশিয়াটিক জার্নালে ছাপাও হয়েছে।

রামমোহনের বাড়িতে বসে অন্নদাপ্রসাদ পড়ছিলেন—Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Persad Bhos.

নামটা নতুন দেখলেন অন্নদাপ্রসাদ। তাঁরা একজনের নাম জানেন—নিকি। বাচ্চা বয়স থেকে নাচছে এই শহরে; এখন বয়স এক হয়েছে; কিন্তু এতে ভালোই হয়েছে না কি; এখন একেবারে পোক্ত নর্তকী হয়েছে সে।

মাণিকতলার রাস্তা দিয়ে কলরব বয়ে চলেছে। সিমলার দিকে হেঁটে চলেছে দলবেঁধে লোকজন খানা-ডোবা, পচাপুকুর পার হয়ে। পোস্তার ঘাটের দিকে চলেছে তারা। বুঝতে পারা গেল—ওরা চলেছে মাহেশের স্নানযাত্রায়।

লোকজন যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে ব্যাপারীরাও। গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই করে নিয়ে চাকায় করুণ আর্তনাদ তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গো-গাড়ি।

দ্বারকানাথ এঁদের মধ্যে বয়সে তরুণ, তাই সকলকে একটু সম্ভ্রম করে চলেন। চুপ করে বসে ছিলেন তিনি, এবার বললেন, কলকাতা আজ ফাঁকা হয়ে যাবে। পড়ে থাকব বুঝি আমরাই জনকয়েক।

হলধর বসুও সায় দিলেন ঐ কথায়, বললেন, বাবুদের আজ পোয়া-বারো। স্নান করবেন জগন্নাথ, তার জন্যে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন বাবুসাহেবরা। শহরের সব ফুর্তি কুড়িয়ে-কাচিয়ে নিয়ে অর্পণ করছেন ঐ মাহেশের জলে।

হাতের জার্নালটি ফরাশের ওপর বিছিয়ে ধরে অন্নদাপ্রসাদ বললেন, একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে এখানে—ফৈজ বক্স।

হলধর বসু রসিকতা করে বললেন, কে ঐ মহামান্য ব্যক্তিটি?

হাসতে লাগলেন দ্বারকানাথ, হাসতে লাগলেন অন্নদাপ্রসাদ।

রামমোহন ভেতরে ছিলেন, ধড়া-চূড়া প'রে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। এ-ঘরে ঢুকেই বললেন, এত হাসি কি নিয়ে?

উত্তর দিলেন হলধর বসু, বললেন, আমরা হাসছিলাম একটা নর্তকীকে নিয়ে।

অট্টহাস্য করে রামমোহন বললেন, তাকে এখানে পাওয়া গেল কোথায়?

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর হাতের জার্নালটি এগিয়ে দিতেই, তাতে চোখ বুলিয়ে রামমোহন বললেন, গুরুপ্রসাদের কথা লিখেছে বুঝি। আমিও তো সেদিন নিমন্ত্রিত ছিলাম। দেখেছি তোমাদের নর্তকীকে। কিন্তু হাসির মত তো সেদিন কিছু দেখি নি। দেখে খুশিই হয়েছি। নেচে নেচে পদ্ম ফোটাচ্ছিল ফরাসে।

রামমোহনের গাড়ি তৈরি। প্রত্যহের মত এখন তিনি বের হচ্ছেন নিজের বৈষয়িক কাজে। বেশি সময় লাগবে না এতে। টেরিটি-বাজার আর চীনাবাজার ঘুরে এখনি ফিরে আসবেন।

তাঁর আত্মীয়সভার সভ্যবৃন্দ ইতি-মধ্যে নিজেদের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা করবেন, তারপর সন্ধ্যার সময় বসবে আসল বৈঠক।

রামমোহন একসঙ্গে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, বেরাদর, তোমরা একটু আছ নিশ্চয়। আমি ঘুরে আসি?

—আসুন। আমরা আছি।

রামমোহন রওনা হয়ে যাবার কিছু পরেই এলেন চুঁচুড়ার নীলরত্ন হালদার। লেখক হিসেবে এর মধ্যেই নীলরত্নের কিঞ্চিৎ খ্যাতি হয়েছে। অনেক গীতও তিনি রচনা করেছেন।

আসরে বসে তিনি বললেন, আজ এসে পৌঁছতে পেরেছি এখানে, যথেষ্ট ভাগ্য বলতে হবে। গঙ্গা আজ ভেসে যাচ্ছে।

অন্নদাপ্রসাদ এগিয়ে বসে বললেন, কি রকম?

—নৌকোয় কি গানবাজনা, কি মহোৎসব।

কোলের মধ্যে তাকিয়া টেনে নিয়ে নীলরত্ন হাসতে হাসতে বললেন, ঐ সব দেখে মনে পড়ে গেল কয়েকটা কথা, মনে-মনে বেঁধেছি তাই এই গান—

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ।

গান থামিয়ে নীলরত্ন বসলেন চুপ করে। তারপর বললেন, ঘরে আর শান্তি নেই বুঝি ওদের, ওরা তাই বেরিয়ে পড়েছে সকলে এক সঙ্গে।

এটা বৈদান্তিকদের সভা, বেদ-বেদান্ত নিয়েই আলোচনা এখানে বেশি। তার মধ্যে দু-একটি ঘরোয়া কথা, একটু রঙ্গতামাশা, একটু পরি-হাস আছেই। কলকাতার হালচাল নিয়েও আলোচনা আছে। এখন সেই সব কথাই হচ্ছে এখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন রামমোহন। সহিসের হাতে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর মজবুত শরীরের শক্ত পদক্ষেপ ফেলতে ফেলতে এলেন ঘরে। বললেন, আজ কল-কাতাতেও বুঝি মহোৎসব, মাহেশের ঢেউ এসে পৌঁচেছে এখানেও। চারদিকে বিষম ব্যস্ততা। কেবল পাল্কি আর পাল্কি। শাস্ত্রে কি নির্দেশ আছে নাকি হে এই সব উদ্দামতার আর উচ্ছৃংখলতার?

তিনিও বসলেন আসরে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল এর পর। উপনিষদের তরজমা কতটা এগিয়েছে, এবার এগুলি মুদ্রিত করে কিভাবে বিতরণ করা যেতে পারে জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু বিতরণ করলেই যে সকলে পড়বে, তার কোনো স্থিরতা কি। তাদের পড়াতে হবে; পড়াতে হলেই দর-কার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।

আত্মীয়সভায় অন্তরঙ্গ ভাবে আলোচনা চলেছে। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসছে এই বাগানবাড়ির ওপর।

অন্নদাপ্রসাদ একটা কথা জানার জন্যে একটু অধীর হয়েই আছেন বুঝি। তিনি তাই এবার জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা, বললেন, চরণপদ্মের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু পা দিয়ে পদ্ম ফোটানো বড় আশ্চর্য ঠেকেছে।

রামমোহন তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, গুরুপ্রসাদের বাড়ির নাচের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। গুরুপ্রসাদের বাড়ির কথাই জিজ্ঞাসা করছেন অন্নদাপ্রসাদ।

কিন্তু এ কোনো আজগুবি কথা নয়, একটু আশ্চর্য কথা বটে। আয়োজন থাকলে এবং নত্যের পা থাকলে সম্ভব বটেই।

দিল্লী থেকে এসেছে এই নাচিয়ে। তনুবাবুই প্রথমে এর খোঁজ পান। দিল্লীর বাদশাহ এই নর্তকীকে তার হারেমে নেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হারেমের জীবন সম্বন্ধে নর্তকীটি সবই জানত। সে একজন সামান্য নাচিয়ে, স্বাধীনভাবে সে তার জীবিকার্জন করে চলেছে। কেন সে চাইবে হারেমের বন্দীবিহঙ্গিনী হতে। বাদশাহের নজর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে সে দিল্লীর রেসিডেন্ট সার চার্লস মেট-কাফের আশ্রয় নিল। এবং তাঁরই সাহায্যে পালিয়ে এল কলকাতায়।

শোনা ছিল, এই নর্তকী নৃত্যের সঙ্গে দু-পায়ে ফুল ফোটায়। আগেও তার পরীক্ষা নাকি হয়েছে, গুরুপ্রসাদের বাগানবাড়িতে সেদিন তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে এসেছেন রামমোহন।

খুব হাল্কা শরীর, কৈফৎ বক্সের। ত্রিশ সের ওজনও বুঝি হবে না। ছোট একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সে অপূর্ব নৃত্যকৌশল দেখাল।

মখমলের ফরাস বিছানো হয়েছিল কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। বহু গণ্যমান্য বাবু ও সাহেবলোক এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

দু পায়ে ঘন করে আলতা পরে নিয়েছে ফৈজ। সুরু হল তার নাচ। পাক খেয়ে খেয়ে সে নেচে চলেছে, আর ঐ মখমলের ফরাশের ওপর অনবরত ছিটানো হচ্ছে গোলাব-পাশের গোলাপজল। ফরাশ ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঐভাবে। সেই সিক্ত ফরাশের ওপর আলতা মাখা পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে চলেছে ফৈজ।

নাচ যখন তার থামল, দেখা গেল ঐ ক্ষুদ্র বৃত্তটি ফুটে উঠেছে ফুল হয়ে। পায়ের আলতার ছাপ পড়ে ওখানে অঙ্কিত হয়েছে সুন্দর একটি পদ্ম।

সকলে শুনছিল উৎকর্ণ হয়ে।

দ্বারকানাথ বললেন, এ দক্ষতার জন্যে ওর পুরস্কার পাওয়া উচিত।

—পেয়েছে। পেয়েছে। রামমোহন হেসে বললেন, তনুবাবু রুমালে বেঁধে একগোছা মোহর ছুঁড়ে দিয়েছেন ওর পায়ের কাছে।

শুধু তনুবাবু কেন, কলকাতার আটবাবুর মধ্যে যে সাতবাবু এখন জীবিত আছেন, তাঁরা ঐ নর্তকীকে পুরস্কৃত করেছেন সকলেই, তার মধ্যে আছেন ঐ নীলরত্নের পিতাও।

ফৈজ বক্স কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তাই খ্যাত হয়ে উঠেছে।

সেই নর্তকীকে নিয়ে চলেছে রূপনারায়ণ। পায়ে যে পদ্ম ফোটায় সে তো সাধারণ নাচিয়ে নয়। রূপ-নারায়ণের চোখে সে গোলাপ ফুটিয়ে দিয়েছে।

চোখের সেই নেশায় চুর হয়ে বসে আছে সে, পিনিস থেকে সে চলে গিয়েছে বজরায়।

পিনিসে এখন রাধা ও তার সঙ্গী চাঁপা। এখানে বসে শোনা যাচ্ছে বজরা থেকে আগত গানের শব্দ।

জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে রাধা নদীর দু-কূল দেখছে। চন্দননগর, ফরাশডাঙ্গা পার হয়ে গিয়েছে তারা কখন তা টের পায় নি। রাত্রি নেমেছে তবু চতুর্দশীর পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে উভয় কূল। নৌকোর ভিড়ে নদী থই থই করছে। তারা চলেছে ভদ্রেশ্বরের কিনার ধরে। উৎকণ্ঠভাবে চেয়ে দেখছে রাধা, তার সমস্ত শরীরে অদ্ভুত শিহরণ। ক্রমে তাদের পিনিস এসে গেল গৌরহাটির ধারে।

রাধা ডাকল, চাঁপা, ঐ দেখ, ঐ দেখ।

চাঁপা সরে এসে উঁকি দিল রাধার কাঁধের পাশ দিয়ে।

—কি বৌদি?

—গৌরহাটি।

—ফিরিঙ্গি আন্টুনির ভিটে বুঝি এখানে?

রাধার চোখ ছল ছল করে উঠেছে সে বলতে পারল না—শুধু ফিরিঙ্গি আন্টুনির না, তার ভিটেও এখানে এরই কাছে।

ঐ সেই চালতে গাছ। ইশ, আজও ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে। জোয়ারে ফুলে উঠেছে জল, প্রায় ওর শিকড়ের গায়ে ছল ছল করছে নদী। ঐ গাছতলাটার কথা খুব ভালো করে মনে পড়ছে রাধার। ওখান থেকে খেয়ানৌকো নিয়ে সে যেত তার মামার বাড়ি। ওই তো ঐ পারেই চানক। কিন্তু সে পারটা অনেক দূরে, তাই উঠে গিয়ে ওদিকের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে সে দেখার চেষ্টা করল না তার মামার বাড়ির দেশ। সে চেয়ে রইল তার নিজের দেশের দিকে। আজ যদি এখন তেমনি ভাবে এখানে এসে দাঁড়াতেন তার বাবা, রাধা গৃহবধূ বেশে এখন গেলেও সেদিনের সেই খুকিটির মত নিশ্চয় চীৎকার করে উঠত—বাবা বাবা বাবা।

বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট বোধ করতে লাগল রাধা। আজ এখানে তার বাবা নেই, মা নেই, মুরলী নেই, নবীন নেই। আজ সে একা, সে আজ অসহায়।

রাধার বুঝি খেয়াল নেই, একা সে নয়, তার সঙ্গে আছে চাঁপা।

কিন্তু চাঁপার দিকে সে তাকাচ্ছে না, সে চেয়ে আছে ঐ চালতে গাছটির দিকে। একদিন এখানে দাঁড়িয়েছিল সে আর তার বাবা। সেদিন কি যেন একটা কাণ্ড ঘটেছিল এই গরিটির শ্মশানে। সেদিন সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু এখন তো তা বোঝে।

সেদিনের সেই ঘটনার পর তার বাবা অকারণেই কেমন শপথ করতেন—রাধার বিয়ে আমি দেব না, রাধার বিয়ে আমি দেব না।

অত শপথ করলেন বাবা, কিন্তু তিনি তাঁর শপথ রাখতে পারলেন না। এ বড় আক্ষেপ, এ বড় বেদনা রাধারাণীর। সে শপথ তিনি যদি রাখতেন, তাহলে রাধাকে আজ এই কঠিন সঙ্কল্প করে ঘরের বার হতে হত না। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গৌরহাটির কিনার। রাধার চোখ থেকেও ক্রমে মুছে যাক সব স্মৃতি, সব অতীত, সব বর্তমান।

সতীকে করে নিরাশা
অসতীর আশা পুরাও।

বজরার চলে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরীর গানের এই কলির প্রমাণ দাখিল করছে রূপনারায়ণ।

আশা পূরণ যদি হয়, তাহলে সতী হয়ে বসে থেকে লাভ? রাধা বুঝি নিজের সঙ্কল্পের কৈফিয়ৎ দিচ্ছে নিজেকেই।

( ক্রমশঃ )

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী
৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

॥ তিন ॥

গ্যারেজে গাড়িটা নেই, তার মানে ডাক্তার রায়চৌধুরী বেরিয়ে গেছেন। দলটা দুপদাপ করতে করতে লন পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। মাঝখানের বড়ো হলটিতে তখন মেজের ওপর একরাশ গরম কাপড় ছড়িয়ে বসেছেন কল্যাণী, শীত চলে গেছে, এবার এগুলো ধুতে পাঠাবেন হাজারীবাগে।

শর্মিলা হেসে বললেন, শাল-রিপেয়ারিঙের দোকান খুলেছ না কি দিদি?

কল্যাণী বললেন, অবস্থাটা সেই রকমই বটে। কাল এগুলো ধুতে পাঠাব। তোর দেবার আছে কিছু?

—না। আমি তোমায় সাহায্য করব দিদি?

—দরকার নেই। তুই বোস আমার কাছে।

একটা চামড়াবাঁধানো মোড়া টেনে নিয়ে শর্মিলা কল্যাণীর পাশে বসে পড়লেন।

কল্যাণী বললেন, কাণ্ডটা দ্যাখ্ একবার। তোর দাদার ট্রাউজারের পকেট থেকে এই চাবিটা বেরুল। অথচ সেদিন এই চাবি নিয়ে কী তুলকালামই না বাধালেন!

—কিসের চাবি?

—কিসের আবার? ওঁরই একটা আলমারীর। কোথাও খুঁজে পেলেন না—বাড়িশুদ্ধ সকলকে বকুনি, চাবিওলাও পাওয়া গেল না, শেষে তালা ভাঙতে হল। সেই চাবি রেখে দিয়েছেন এই ট্রাউজারটার পকেটে। সেই সঙ্গে দুটো দুশ টাকার নোটও পেলুম।

শর্মিলা বললেন, ডবল লাভ দিদি। চাবিটা দেখিয়ে এবার গালাগালির শোধ নিতে পারবে ভালো করে, আর নোট দুটো তোমার অনেস্ট ইনকাম—দাদার কোনো দাবীই নেই।

বিরক্ত হয়ে কল্যাণী বললেন, তুই আর জ্বালাস নি। এদিকে দ্যাখ্ ঘাসুর কীর্তি। কলকাতায় গিয়ে কতগুলো স্ট্যাম্প কিনে এনেছিল—সেগুলো হারিয়ে ফেলে তিন দিন ধরে সমান দাপাদাপি। এই সার্টটার পকেটে পাওয়া গেল। এদিকে কেকার কোটের পকেটে একটা আধ খাওয়া লজেন্স—আঠা হয়ে আটকে রয়েছে। পোকায় যে কেটে দেয় নি এত দিনে, এই ভাগ্যি। বলতো, এদের নিয়ে আমি কী করি?

শর্মিলা হেসে উঠলেন, বললেন, তোমার কিন্তু কম্‌প্লেন করা উচিত নয় দিদি, দাদা বোধ হয় ইচ্ছে করেই কম্‌পেন্‌সেশন হিসেবে দুখানা দশ টাকার নোট রেখে দিয়েছেন পকেটে।

কল্যাণী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁকে থেমে যেতে হল। বাইরে ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ লাফালাফি করছিল, কলধ্বনি, শোনা যাচ্ছিল তাদের, এইবার হল-ঘরে বাসবের আবির্ভাব ঘটল। ডগ্‌লাসের বকলস ধরে সে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এসেছে

সেই সঙ্গে মুখে আউড়ে যাচ্ছে স্বরচিত ছড়া :

ডগ্‌লাস দি ডগ-
ওয়েণ্ট টু ক্যাচ্ এ ফ্রগ
বাট্ ইট্ ভ্যানিশ্‌ড ইন এ বগ্
হা-হা-হা—লাফ্‌ড্ এ হগ—

কল্যাণী চেঁচিয়ে উঠলেন, আবার কুকুর এনে চোকালি এ ঘরে? এখুনি কাপড়-জামার ওপর এসে পড়ে সব ছত্রাকার করে দেবে। দু চক্ষে দেখতে পারি না লক্ষ্মীছাড়া কুকুরকে। বাসু, শীগ্‌গির বের করে দে ওটাকে।

বাসু গম্ভীর হয়ে বললে, ডগ্‌লাস, ব্লাম্মি ইজ অ্যান্‌গ্রিং। গো আউট।

ডগ্‌লাস কী বুঝল কে জানে, এক লাফে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কল্যাণী বললেন, এ এক আচ্ছা কুকুর বাপু! শুনেছিলুম অ্যাল্‌সেশিয়ান ওয়ানম্যান-ডগ—মনিব ছাড়া কাউকে মানে না। ভারভাত্তিক হয়, কিন্তু এ হতচ্ছাড়া নেড়ি কুত্তার ওপরেও এক কাঠি! যাকে দেখছে তারই কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়ছে, রান্নাঘরের আশপাশে ছোঁক ছোঁক করছে রাত দিন, আর হাড় লুকিয়ে লুকিয়ে উঠোনে লনে একরাশ কুয়ো খুঁড়ে ফেলল!

বাসু হেসে উঠল, শর্মিলা হাসলেন। বাসু বললে, ডগ্‌লাসের আজকের অ্যাচিভ্‌মেণ্ট কিন্তু সকলের ওপরে। যাকে বলে একেবারে দিনে-দুপুরে ডাকাতি।

কল্যাণী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তার মানে?

—কাকিমা, মা-কে বলেন নি এখনো?

শর্মিলার মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। মৃদু গলায় বললেন, সে একটা বিশ্রী কাণ্ড। এক ভদ্রলোকের একটা ডায়েরী চুরি করে এনেছিল।

—সে কি! কার ডায়েরী চুরি করল আবার?

বাসুর উৎসাহ বেড়ে উঠল : কাকিমা ভালো করে বলতে পারেন নি মা, আমি বলছি শোনো। মাঠের দিকটাতে ফাঁকা জায়গায় একটা বাংলো আছে না? সেই যে রাজেনবাবু, এখানে এলে বাবার কাছে ওষুধ-টষুধ নিতে আসেন? তাঁর সেই বাংলোয় উঠেছেন একজন নামজাদা লেখক—কিরণ বসু। ভদ্রলোক সকালবেলা বেশ মশগুল হয়ে মাঠের ভেতরে গাছতলায় বসে কিছু একটা পুট-ফুট ভাবছিলেন—আর ডায়েরীতে বোধ হয় নোট্ করছিলেন। হঠাৎ ডগ্‌লাস ছুটে গিয়ে তাঁর ডায়েরীটা মুখে করে—

কল্যাণী ব্যাকুল হয়ে বললেন, আমি আগেই জানতুম, একদিন লক্ষ্মীছাড়া কুকুরটা কোথাও একটা কেলেঙ্কারী করবে। তা কী হল? ছিঁড়ে টিঁড়ে দেয় নি তো?

—না, ছেঁড়ে নি। একটা দাঁতের আঁচড়ও পড়ে নি কোথাও। জানো মা, ডগ্‌লাস খুব কন্‌সিডারেট আর তেমনি ইণ্টেলিজেণ্ট।

কল্যাণী ধমকে বললেন, হয়েছে, থাম। ছি-ছি, কী ভাবলেন ভদ্রলোক?

বাসু বললে, কিছুই ভাবেন নি মা, খুব ভালো মানুষ। আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন অনেকক্ষণ। আর জানো মা—আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের এখানে চা খেতে আসবেন। আমিও ঠিক করেছি, আমার অটোগ্রাফের খাতায় ওঁকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নেব।

বাসুর শেষ কথাটা কল্যাণী শুনতে পেলেন না। তার আগেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে শর্মিলার দিকে তাকালেন।

—সত্যিই চা খেতে আসবেন না কি ভদ্রলোক?

শর্মিলা চোখ নামালেন। আবার একটুখানি লালের ছোপ পড়ল তাঁর গালে।

—আমিই নেমন্তন্ন করে ফেলেছি দিদি। কুকুর দিয়ে চুরি করানো যে আমাদের পেশা নয়, আসলে যে লোক আমরা ভালোই—এটাও ওঁকে বোঝাবার দরকার ছিল। অন্যায় হয়ে গেছে না কি?

কল্যাণী বললেন, না-না, অন্যায় আবার কি। ভদ্রলোক আসবেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু কী নাম বললি—কিরণ বসু?

বাসব আবার হাত-পা নেড়ে সুরু করল : জানো মা, খুব নামজাদা লেখক। কাকিমার ঘরেও তো ওঁর বই রয়েছে। 'ছায়াঘন দিন', 'তীর্থ-নিবাস'—

কল্যাণী সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন বাসবের দিকে।

—অনেক খবর রাখছিস দেখি আজকাল। পড়া হয় নাকি ও-সব?

বাসব একবার গলাটা খেলিয়ে নিল। একটু স্যাম্পল নিয়ে বেশ জোরালো গলায় নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বললে, বা-রে, উপন্যাস পড়ি নাকি আমি? কী যে বলো তুমি তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

—তা হলে এ-সব তথ্য জানা হল কী করে!

—আমি বই দেখেছি যে কাকিমার শেল্‌ফে—বলেই বাসবের মনে হল, আলোচনাটাই অত্যন্ত বিপজ্জনক দিকে যাচ্ছে, মা কে আর জেরা করতে দেওয়া ঠিক নয়।

বেরিয়ে যাচ্ছিল, কল্যাণী আবার ডাকলেন।

—এই বাসু!

—কী বলছ?

একটা ছোট হলদে খাম বাসুর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কল্যাণী বললেন, এটা কার?

—আরে—আরে, এই তো আমার সেই জাপানী স্ট্যাম্পগুলো!—বাসু

লাফিয়ে এসে শার্টটা কুড়িয়ে নিয়ে: কোথায় রেখেছিলে মা? আমি খুঁজেই পাই না।

—হুঁ, আমিই লুকিয়ে রেখেছিলুম বটে!—কল্যাণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে! নিজেরা কোথায় কী ফেলে রাখে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, যত দোষ আমার ওপরে। খুঁজে বের করলুম, এখন—

কথাটা শেষ করার আগেই দেখলেন, কখন টুক করে বাসু ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

—সবাই মিলে জ্বালিয়ে খেল আমাকে।—সমস্ত ব্যাপারটার ওপর এইখানেই ছেদ টেনে কল্যাণী আবার গরম কাপড়-জামা গোছাতে লাগলেন, আর শর্মিলা সেই মোড়ার ওপর চুপ করে বসে রইলেন। হাওয়ায় ঘরের পর্দাগুলো খস খস করে দুলছে, বাইরে থেকে বিলিতী ঝাউয়ের শাঁ-শাঁ আওয়াজ আর ইউক্যালিপ্টাসের পাতা ঝরার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েরা ছুটোছুটি করে কী যেন খেলছে, হাসি আর চিৎকার কানে আসছে তাদের, ডগ্‌লাসও নিশ্চয় সঙ্গে আছে তাদের, কারণ একবার কেকাকে বলতে শোনা গেল: 'ইস—ডগ্‌লাসটা কী বিরক্ত করছে, এই যা-না এখান থেকে!' বাসু স্বরচিত ছড়াটায় সুর দিয়ে জোরালো গলায় গান গাইছে:

'বাট ইট্ ভ্যানিশড্ ইন্ এ বগ্,
হা-হা-হা—লাফ্‌ড এ হগ্—হা-হা-হা'—

কল্যাণী কাজ করছিলেন, শর্মিলা মগ্ন হয়ে বসেছিলেন নিজের মধ্যে। একটা শান্তি আর আলস্য যেন নেশার মতো ঘিরে ধরছিল শর্মিলাকে, চোখের সামনে ছবি দেখছিলেন সারবাঁধা ক'টি কৃষ্ণচূড়া, রুমাল হাওয়ায় টপ্‌টাপ করে তার পাপাড় ঝরে যাচ্ছে, হরিয়ালের ডাকে ভরে উঠেছে চারদিক—

হঠাৎ কল্যাণী ডাকলেন: মিলা!

চমক ভেঙে শর্মিলা বললেন, দিদি?

—কী ভাবছিস?

—বিশেষ কিছু নয়।

কল্যাণী বললেন, কিরণ বোসের দু-একটা বই আমি পড়েছি। একটা মজা লক্ষ্য করেছিস ওঁর লেখায়?

একটু নড়ে বললেন, শর্মিলা: বলো, শুনি।

—একটা বইতে দেখেছি, ছেলেটিকে মেয়েটি ব্যবহার করল শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে, কাজ মিটে গেলে ওর দিকে আর ফিরেও চাইল না। আর একখানা বইতে পড়েছিলুম, স্ত্রী অদ্ভুত নিউরোটিক—স্বামীর জীবনটাকে একেবারে অসহ্য করে তুলেছে। আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক মেয়েদের একেবারে শ্রদ্ধা করেন না।

শর্মিলা হাসলেন: কিন্তু দেখে শুনে তো সে-রকম বোধ হল না।

—কী আশ্চর্য, তোর সঙ্গে প্রথম আলাপেই ঝগড়া সুরু করবে না কি? তা ছাড়া লেখকদের এমনিতে কিচ্ছু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে বেশ পরিপাটি, ছিমছাম, সাজানো ভালো ভালো কথা, কিন্তু কলম হাতে নিয়ে বসলেই ওদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসে।

—লেখকদের তুমি এত চিনলে কী করে?—শর্মিলার মুখে হাসিটুকু লেগেই রইল: দস্তুরমতো গবেষণা করেছ বলে মনে হচ্ছে আমার।

—গবেষণার দরকার হয় না। পড়লেই বোঝা যায়।

—তা হবে। কিন্তু আমি তো সায়েন্সের ছাত্রী, এত কথা আমার মাথায় ঢোকে না।

ভেতরের দরজা দিয়ে ঠাকুর গলা বাড়ালো: মা!

—কী হল?

—মাছ রান্নাটা দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

—সবাই মিলে পাগল করে তুলল!—কল্যাণী কাপড়ের ভাঁই সরিয়ে রেখে উঠে গেলেন, শর্মিলা ধীরে ধীরে চলে এলেন নিজের ঘরটিতে।

কাপড় বদলাতে যাচ্ছিলেন, তার আগে শেল্‌ফের দিকে চোখ পড়ল। কী আশ্চর্য যোগাযোগ, যেন আজকের দিনটিতেই বইখানাকে কে একেবারে সামনে এগিয়ে রেখেছে: 'ছায়াঘন দিন'—'কিরণ বসু'। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল বইটি পেয়েছিলেন তাঁর বিয়ের সময়—সাড়ে চার বছর আগে।

বিয়ের সময়। শেলফের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন, মাঝপথেই থেমে দাঁড়ালো হাতখানা। বিয়ের পর একটা বছরও পার হয় নি। কারখানায় সেই দারুণ এক্সপ্লোশন। এঞ্জিনীয়ার অমিতাভ রায়চৌধুরীর রক্তমাখা শরীর। হাসপাতালের সব ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টাও আধ-ঘণ্টার বেশি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি।

একবার দেওয়ালের দিকে চোখ তুললেন শর্মিলা। অমিতাভর ছবি। প্রসন্ন দৃষ্টি জেগে আছে তাঁর দিকে। এই মানুষটাকে পৃথিবীর কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, একথা ভাবাই যায় না।

বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী ফিরে এসেছেন।

(ক্রমশঃ)

# এন্ড মেলা

**যুগমি বিবেকানন্দ**—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। মূল্য : ২·৭৫ নঃ পঃ।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা নিয়ে লেখক উপস্থিত হন নি। তবে তাঁর জীবনকথা ও বাণীকে রসসমণ্ডিত করে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব তিনি অবশ্যই দাবী করতে পারেন। বক্তব্য বিষয়কে তিনি সহজ ও সরল করে বলেছেন, সেই সঙ্গে প্রতিটি ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি তা চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। এই গুণে গ্রন্থটি ছেলেদের ও বড়দের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

**বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে**—আশা রায়। পরিবেশক : মিত্রালয় ; ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

গ্রন্থটির নামকরণ থেকে এই ধারণা হওয়া সমীচীন নয় যে, বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক আলোচনা করাই লেখিকার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্মকে যুগ যুগ ধরে যাঁরা বহন করে নিয়ে আসছেন—তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর গৌতম বুদ্ধের গূঢ় জীবনী ও তাঁর বাণীর তত্ত্বকে শ্রীযুক্তা রায় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কিত আলোচনাগুলি সাধারণ মানবজীবনের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি ধম্মপদের সত্যকে আবিষ্কার করাও দরকার। লেখিকার ব্যাখ্যার গুণে ঐ সব বিষয় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধ অনাত্মবাদ ও নারীজাতির প্রতি বুদ্ধের উপদেশগুলিকে এমন প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব না করে থাকা যায় না। সে দিক দিয়ে লেখিকার অভিপ্রায় সফল হয়েছে বলে মনে হয়। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মূল্যবান ভূমিকায় লেখিকার উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

**জয়ন্তী সেন**

**শৃঙ্খল**—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। মূল্য : ১·৭৫ নঃ পঃ।

ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক ও কবি বনফুল একদা জীবনীমূলক নাটক রচনা করেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শৃঙ্খল তাঁরি হাতের অন্য আলোকে উদ্ভাসিত একাঙ্ক নাটক। এই নাটকটি পড়তে গিয়ে এর আঙ্গিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ নাটকগুলির আঙ্গিকের সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। আবার বক্তব্যের উপস্থাপনরীতিতে 'রক্তকরবী'র আঁচ এই একাঙ্ক নাটকটির গায়ে লাগলেও সম্পূর্ণ সাংকেতিকতার অনুরণন এতে অনুভব করা যায় না। বরং সাংকেতিকতা থেকে অলৌকিকতা, অলৌকিকতা থেকে আমাদিগকে বাস্তব ভূমিতে এই নাটকটি উপনীত করে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি বিবেকানন্দের মহৎ আদর্শকে বিচ্ছুরিত করতে চেয়েছেন নাটকের মধ্যে দিয়ে। সেই কারণে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে রয়েছে শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতি, বিভিন্ন মানুষের মানসিক ঘাত-সংঘাত এবং ক্রমানুয়ে বিবেকানন্দের আদর্শ বরণ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। একটি অলৌকিক মন্দির থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব শ্রুতবাণী। বলা বাহুল্য, এই বাণী হচ্ছে বিবেকানন্দের বাণী। বিবেকানন্দের বাণী কিভাবে মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং স্বামীজীরূপে তিনি কিভাবে আবির্ভূত হয়েছেন—'শৃঙ্খল' নাটকে ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। একাঙ্ক নাটকটি আদর্শমণ্ডিত বলে মনে হলেও—এই রকম নাটক সর্বসাধারণের সামনে অভিনীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।


ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

**পালামৌ**

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত শরৎচন্দ্রের জীবনী—শরৎ-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর শরৎ-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সেই সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। বাতাস দিচ্ছে। কলকাতায় শীতটা হঠাৎ বেশ জমে উঠেছে।

রাত প্রায় দশটা বাজে। পথঘাট নির্জন। লোক নেই বললেই চলে। নিতান্ত কাজ না থাকলে এমন রাতে কে আর ঘর থেকে বেরোয়। এমন সময় দেখা গেল একটি লোক এগিয়ে আসছে। ধীর পদক্ষেপে। সতর্ক দৃষ্টি। পরিধানে পুলিশের পোষাক। হাতে পুলিশী ছড়ি। পোষাকটা জানিয়ে দিচ্ছে লোকটি পুলিশ অফিসার। তার চালচলনও তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ। অবশ্য এটাই তার হাঁটার ধরণ। সুন্দর খাপ খেয়ে গেছে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে।

হাতের লাঠিটা কায়দা করে দোলাতে দোলাতে লোকটা এগিয়ে আসছে। সন্তর্পণে দৃষ্টি ফেলে দেখছে চতুর্দিক। মাঝে মাঝে কোন কোন দোকানের বন্ধ দরজায় লাঠির ঠোকা দিচ্ছে।

স্তব্ধ নির্জন রাত। জনশূন্য পথে একা প্রহরী সে। বেশ মানিয়েছে তাকে, এই রাতে এই পথে সত্যিই তাকে শান্তিরক্ষকের ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছে।

সমস্ত পল্লী নিদ্রামগ্ন। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল মোড়ের মাথার এক একটা পানের দোকানে আলো জ্বলছে। রাত্রিকালীন বেস্তোরাঁর দরজা এখনও উন্মুক্ত। আলো জ্বলছে সেখানে।

পাড়ার মাঝামাঝি এসে পুলিশ অফিসারটি তার চলার বেগ কমিয়ে ফেলল। একটা দোকানের সামনে একটা লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মিশে থাকা লোকটিকে ঠিক পুলিশটি দেখতে পেল। সে এগিয়ে এল। পুলিশটি এবারে দেখলে বন্ধ দোকানের দরজার সামনে দণ্ডায়মান লোকটির মুখে একটা সিগারেট। সিগারেটে তখনও আগুন দেওয়া হয় নি।

লোকটাও সব দেখছিল। যখন সে নিশ্চিন্ত বুঝতে পারল যে পুলিশটা তাকে দেখেছে এবং তার দিকেই এগিয়ে আসছে তখন সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ঠিক আছে স্যার, এখানে সব ঠিক আছে। কোন গণ্ডগোল নেই। পুলিশটি কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটা বলল, আপনি নিশ্চয় সন্দেহ করছেন এত রাতে এই অন্ধকার জায়গায় আমি কেন দাঁড়িয়ে আছি। আসলে আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। মানে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্য। এইখানেই তার সঙ্গে দেখা করার কথা। আর আজকের এই সাক্ষাৎ নির্দিষ্ট হয়েছিল কুড়ি বছর আগে—

লোকটা কয়েক মুহূর্ত থামল। তারপর বলল, আপনি নিশ্চয় ভাবছেন এ আবার কেমন কথা? আপনার নিশ্চয় সন্দেহ হচ্ছে। তাই আপনাকে সব খুলেই বলছি। এখানে, এই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাতে কুড়ি বছর আগে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। সুইট-ভ্যালী-রেস্তোরাঁ।

: পাঁচ বছর হল তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। পুলিশটি বলল।

: পাঁচ বছর? লোকটা পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরাল। ফস্ করে জ্বলে উঠল দেশলাইয়ের কাঠি। সেই স্বল্পালোকে লোকটার চেহারা দেখা গেল। চৌকো চোয়াল, ফ্যাকাশে মুখ। চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর ডান ভ্রূর কাছে একটা শাদা ক্ষতচিহ্ন। সিগারেটটা ধরাতে যেটুকু

[পরের পৃষ্ঠায়]

সময়—সেই কয়েক মুহূর্তের আলোয় জলজল করে উঠল তার নেকটাইয়ের হীরের পিনটা।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা বলল: কুড়ি বছর আগে এমনই এক রাত্তির বেলায় আমি আর শ্রীকান্ত সেন এই রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলাম। শ্রীকান্ত আমার প্রাণের বন্ধু। আমার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি তাকে দেখেন নি, কিন্তু সত্যিই শ্রীকান্তের মতন মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। সে আর আমি দুজনেই গোয়াবাগানের ফ্ল্যাটবাড়িতে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি। পাশাপাশি থাকতাম। একসঙ্গে পড়াশুনা, খেলাধুলা সব। ঠিক আপন ভাইয়ের মতন দুজনে বড় হয়েছি।

এমনি করে একদিন আমার বয়স হল আঠারো আর শ্রীকান্তের কুড়ি। তখন আমরা ঠিক করলাম এইবার আমরা যে যার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। সংসারে অভাব ছিল। অনটন ছিল। পড়াশুনায় রীতিমত ব্যাঘাত ঘটছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম পড়াশুনা চালানো আর সম্ভব হবে না। মা বাপ নেই। পিসীর কাছে মানুষ। সেখানেও দারিদ্র্য। অভাব। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, নিজের ভাগ্যকে গড়ে নেবার জন্য একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু শ্রীকান্ত এই প্রথম আমার মতে সায় দিল না। সে বলল, কলকাতায় থেকেও ভাগ্যকে গড়া যায়। তারজন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাবার দরকার হয় না। সে কলকাতা ছেড়ে নড়তে রাজি হল না।

একটুখানি বিরতির পর লোকটি আবার বলল, শ্রীকান্তের মতে কলকাতার মতন শহর আর হয় না। আমি কিন্তু ঠিক করলাম, শ্রীকান্ত না যাক, আমি যাব। যাবার আগের দিন রাতে আমরা এখানে এক সঙ্গে খেলাম। তারপর ঠিক হল ঠিক এই জায়গায় ঠিক এই সময়ে কুড়ি বছর পরে আমরা পরস্পর মিলিত হব। কিছুতেই তার অন্যথা করব না। কুড়ি বছর পরে আমাদের যে অবস্থাই হোক না কেন বা আমরা যত দূরেই থাকি না কেন—দেখা আমরা করবই। আমরা ভেবেছিলাম, কুড়ি বছরে নিশ্চয় আমরা আমাদের ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারব। ভেবেছিলাম, ততদিনে পৃথিবীতে আমরা আমাদের যথার্থ স্থান খুঁজে পাব।

: বেশ কৌতূহলজনক মনে হচ্ছে, পুলিশ অফিসার বললে, তবে আপনাদের পুনরায় মিলিত হবার ব্যবধানটা বড় বেশি। আমার তো তাই মনে হচ্ছে। যাক গে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনার বন্ধুর কোন খবরই আপনি পান নি?

: হ্যাঁ। প্রথম প্রথম খবর দেয়া-নেয়া চলতো। আমরা পরস্পর চিঠি লিখতাম। এরকম চলেছিল প্রায় বছরখানেক। তারপর চিঠি লেখায় ভাঁটা পড়ল। যা হয়ে থাকে আর কি। বছর দুয়েক পর থেকে আর চিঠি লেখালেখি নেই। তবে আসল ব্যাপার কি জানেন, আমাকে সারা বছর, আজ বোম্বাই, কাল হায়দ্রাবাদ, পরশু আমেদাবাদ এরকম এত জায়গায় সব সময় ঘুরে বেড়াতে হত যে, সময় পেতাম না চিঠি লেখবার। কিন্তু আমি জানি, শ্রীকান্ত যদি বেঁচে থাকে, সে আজ রাতে এখানে আসবেই। কথা দিয়ে সে চিরকাল কথা রেখেছে। সে কক্ষণো ভুলবে না। আর আমার কথাই দেখুন না। শুধু মাত্র কথা রাখবার জন্যই তো হাজার মাইল পথ ছুটে এসেছি। আমার ছুটে আসাটাও সার্থক হবে যদি আজ তার দেখা পাই।

লোকটা থামল। এবার সে পকেটথেকে বার করল একটা পকেট ঘড়ি। ঘড়িটা সুদৃশ্য। তার কাঁটায় ছোট ছোট হীরকখণ্ড বসানো। সেই হীরার দ্যুতিতে সময় দেখে লোকটা বলল, দশটা বাজতে তিন। ঠিক দশটার সময় কুড়ি বছর আগে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম।

পুলিশ অফিসার বললে, এতদিন পশ্চিমে থেকে আপনি নিশ্চয় ভালোমতন উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কি বলেন?

: তা ঠিক বলেছেন। আমার মনে হয় শ্রীকান্ত আমার অর্ধেকও করতে পারে নি। সে চিরকালই ভালো ছেলে, কিন্তু একটু ভোঁতা। আর আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য মাথা খাটাতে হয়েছে রীতিমত। ওখানকার বড় বড় টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে—তবেই না গড়তে পেরেছি নিজের ভাগ্য। আমার মনে হয় শ্রীকান্ত আমার অর্ধেকও করতে পারে নি। আসলে ব্যাপার কি জানেন, কলকাতায় থাকলে মানুষ একটু ভোঁতা হয়ে যায়—আর বোম্বাই-টোম্বাই এমনই জায়গা—সে ঠিক মানুষকে চালাক করে দেয়। না হলে সেখানে কেউ টিকতে পারবে না।

পুলিশ অফিসার তার হাতের লাঠিটি ঘনঘন করে ঘোরাতে লাগল। দু-এক পা এগিয়ে গেল। বলল, চললাম। আপনার বন্ধু যখন কথা দিয়েছেন, নিশ্চয় আসবেন। আচ্ছা, তিনি যদি ঠিক দশটার সময় না আসেন?—আপনি কি আরও কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করবেন না?

: নিশ্চয় অপেক্ষা করব। আমি অন্তত সাড়ে দশটা পর্যন্ত এখানে থাকবোই। আর আমার মনে হয়, সে যদি বেঁচে থাকে, এই সময়ের মধ্যে সে আসবেই।

: আচ্ছা চলি। গুড নাইট।

: গুড নাইট স্যার।

আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল ধীরে

ধীরে। একটা রিক্সাওয়ালা গামছায় কান মাথা ঢেকে চলে গেল। নির্জন রাত। নিস্তব্ধ পল্লী। জনশূন্য পথ। লোকটা পথের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। হাজার মাইল পথ পেরিয়ে সে এসেছে, কুড়ি বছর আগের এক বিচিত্র সাক্ষাৎকারকে স্মরণ করে। তার বাল্যের ও কৈশোরের বন্ধু আসবে। দেখা করবে তার সঙ্গে। এই একান্ত আশায় সে নিঃশব্দে ধূমপান করে যেতে লাগল।

কুড়ি মিনিট পার হল। এমন সময় দেখা গেল একটা লোক আসছে। লোকটি চাঙা। গায়ে লম্বা ওভারকোট। কলারগুলো তোলা। লোকটা দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে একেবারে দণ্ডায়মান ব্যক্তির সামনে এসে দাঁড়াল।

: আমার মনে হয় আপনিই রবীন সামন্ত? ঠিক বলেছি নিশ্চয়।

: আর তুমি নিশ্চয় শ্রীকান্ত সেন। দরজায় দাঁড়ানো লোকটা বলল।

আগন্তুক তখন দু-হাত দিয়ে অপর লোকটির হাত দুটো চেপে ধরল। কতদিন পর দেখা। রবীন কতদিন? আমি ঠিক জানতাম। আমি জানতাম তুমি যদি বেঁচে থাকো তুমি নিশ্চয় আজ এখানে আসবে। ওঃ কুড়ি বছর। কুড়ি বছর কেটে গেল এর মধ্যে। রবীন, সেই পুরোনো রেস্তোরাঁটা আজ আর নেই। আজ মনে হচ্ছে সেটা যদি থাকতো তাহলে আজ একসঙ্গে বসে খেতে পারতাম। থাক গে। এতদিনে তুমি পশ্চিম দেশটা কেমন দেখলে?

: চমৎকার। অপূর্ব। আমি যা চেয়েছি সেখানে সব পেয়েছি। কিন্তু তুমি বড় বদলে গেছ শ্রীকান্ত। আমি ভাবতেই পারি নি, তুমি এত লম্বা হয়ে গেছ।

: আমি কুড়ি বছরের পরও পেরেছি।

: যাক গে। এখনও কলকাতাতেই আছো তো? কাজকর্ম করছ কোথায়?

: কোনরকমে চলে যাচ্ছে। এই শহরেরই একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। কিন্তু রবীন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। চলো একজায়গায় বসা যাক। কত কথা জমে আছে কত দিনের। আজ কেবল পুরোনো দিনের গল্প করব বসে বসে।

হাত ধরাধরি করে দুজনে হাঁটতে লাগল। পশ্চিমের মানুষটি তার বিস্ময়কর উন্নতির আশ্চর্য আশ্চর্য সব গল্প করতে লাগল। আত্মপ্রশংসায় সে অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কেমন করে কতরকম অভিসন্ধি করে সে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলেছে তারই ইতিহাস সে বলে যেতে লাগল গভীর আত্মতৃপ্তিতে। অপর লোকটি নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল।

কিছু দূরেই কোণের দিকে একটা দোকান ছিল। দোকানের আলোর জায়গাটা আলোকিত। সেখানে পৌঁছে পরস্পর পরস্পরের দিকে ফিরে তাকাল। আর তখন, ঠিক তখনই পশ্চিমের মানুষটি সহসা থেমে পড়ল। চেয়ে রইল মুহূর্তকাল অপর লোকটির দিকে। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বললে, কে আপনি? আপনি শ্রীকান্ত সেন নন। কক্ষণো না। কুড়ি বছর দীর্ঘ সময় সন্দেহ নেই। কিন্তু কুড়ি বছরে কোনো লোকের খাড়া নাক খ্যাঁদা নাকে পরিণত হতে পারে না। কে আপনি?

: কুড়ি বছরে অনেক ভালো লোকও মন্দ লোকে পরিণত হতে পারে, লম্বা লোকটি বলল। রবীন সামন্ত। আপনাকে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হবে। বোম্বে পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। তারা জানতে পেরেছিল আপনি কলকাতায় আসবেন। তারা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছে। আমি আশা করি আপনি ভালোমানুষের মতন থানায় যাবেন। সেইটাই বিচক্ষণতার পরিচয় হবে।

লম্বা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল। তার দৃষ্টি শাণিত। একটা হাত পকেটে। অপর হাতে একটা চিঠি ধরা ছিল। সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে, যাক গে। এখন থানায় যাবার আগে আপনাকে একটা চিঠি দিচ্ছি। আপনি স্থানাভাবের সামনে দাঁড়িয়ে ওটা পড়তে পারেন। চিঠিটা দিয়েছেন অফিসার মিঃ সেন।

পশ্চিমের লোকটি ভাঁজ করা চিঠিটি খুলে পড়তে সুরু করল। যখন সে প্রথম পড়তে আরম্ভ করল, তখন তার হাত কাঁপে নি, কিন্তু চিঠিটা পড়া যখন তার শেষ হল তখন তার হাতটা একটু কেঁপে উঠল। চিঠিটি ছোট।

রবীন,

আমি ঠিক সময়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তুমি আমায় চিনতে পারো নি। আমিই সেই পুলিশ অফিসার, তুমি যার সঙ্গে গল্প করেছিলে। তুমি যখন দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালে, আমি তখন দেখলাম, এই সেই মুখ, যাকে ধরবার জন্য বোম্বে পুলিশ এত ব্যস্ত। কিন্তু আমারই একজন পুরাতন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করতে আমার মন সরল না; আর আমি তা পছন্দও করি না। তাই সে কাজটা সুসম্পন্ন করবার জন্য আমি একজন শাদা পোষাক পরিহিত লোককে পাঠালাম।

শ্রীকান্ত সেন।

---

(ও হেনরী'র গল্পের ছায়া অবলম্বনে।)

# পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

(ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)

॥ এক ॥

শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করেই তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চমীদিদি চাপা গলায় বললে—'এবার জানলা দিয়ে চেয়ে দেখ সত্যি করে কেউ আমার পাছু নিয়েছে কি না।'

বই বন্ধ করে উঠে এলাম, ভাবলাম এতে যদি পঞ্চমীদিদির মনগড়া ভয়গুলো কিছুটা কমে তাহলে হয়তো আমি নিজে একটু মন দিয়ে পড়ার সুযোগ পাব, পরীক্ষার তো আর খুব বেশি দিন দেরি নেই। আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে পঞ্চমীদিদি বললে, 'ঐ দেখ, ঐ।'

সত্যি মনে হল ছায়ার মতো কি একটা রাস্তার গ্যাসবাতির তলা থেকে সরে গেল বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার জ্বালায় কি পথ দিয়ে লোক চলবে না?'

পঞ্চমীদিদি খাটে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে চুলের গোড়ার বাঁধন আলগা করতে করতে বলল, 'তুমি তো বিশ্বাস করবে না কিছুই, কিন্তু আমি টের পাচ্ছি আমার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলছে।'

'কিসের আবার ষড়যন্ত্র?'

ফ্যাকাসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পঞ্চমীদিদি বললে—'আমাকে সবাবার জন্যে, আমার — আমার—'

গলা বন্ধ হয়ে গেল, আর কথা বেরুল না, খালি হাত দুটো কেবলি একসঙ্গে পাকাতে লাগল। ধরে দেখলাম বরফের মতো ঠাণ্ডা। ভয়ের কারণটা যতই না মনগড়া হোক, ভয়টা যে প্রকৃত সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে বললাম—

'তুমি রোজই বল কে তোমার সঙ্গ নেয়, কে ভিড়ের মধ্যে থেকে তোমাকে গাড়ির চাকার দিকে ঠেলে দেয়, ছাদের ওপর থেকে ইট খসায়, গাছের ডাল ভেঙে ফেলে ইত্যাদি। কিন্তু তুমি মলে কার কি সুবিধাটা হবে শুনি? তোমার আছে কি?'

পঞ্চমীদিদি বেগে গেল, গায়ের চাদরটা আরেকটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি জানি আমি গরীব, আমি একটা নিরাশ্রয় বিধবা, তোমার মাসির বাড়িতে থেকে তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করি, চল্লিশটি টাকার জন্যে। সেইজন্যে তুমি আমাকে যথেষ্ট ঘেন্নাও কর—কিন্তু তাই বলে কেউ আমাকে মেরে ফেলতে ক্রমাগত চেষ্টা করবে আর তুমি সেটা হেসে উড়িয়ে দেবে, এই কি তোমার উচিত হল?'

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে পঞ্চমীদিদি ভয়ে দুঃখে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। তখনকার মতো পড়াশুনোর আশা ছেড়ে তাকে বোঝাতে বসি।

'হেসে ওড়াব কেন পঞ্চমীদিদি, তোমার ভয়ের যে কোনো ভিত্তি নেই, তাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম। তোমাকে কেউ চেনে না জানে না, তুমি কোথাও যাও না, কারো অনিষ্ট কর না, তোমার কেন শত্রু থাকবে বল। প্রতি শনিবার দুপুরে মাসিমার সঙ্গে সুকু, মালা আর মেমি তাদের দিদিমার কাছে গেলে তুমি মোড়ের মাথায় বেলা আড়াইটার ফিল্ম দেখে আসো। আর রোজ ফিরে এসে বল কে তোমাকে মারবার চেষ্টা করছে। তুমি নিজেই বল কথাটার কি কোনো মানে হয়?'

পঞ্চমীদিদি চোখ থেকে কাপড় নামিয়ে ফোঁস করে ওঠে—'রোজ বলি মানে? আগে বলিচি কখনো? এই মাস দুই ধরে যেরকম ঘটচে তাই বলছি। বেশ, তাতে তোমার যদি অতই বিরক্ত লাগে, আর বলব না। সত্যিই তো আমি মলে কার কি এসে যায়।'

অনাবশ্যকভাবে পঞ্চমীদিদি তার নিজের আর আমার নেয়ারের খাটের উপরে আমার নিজের হাতে পরিষ্কার করে পাতা বিছানা ধরে টানাটানি করতে থাকে। আমি বই নিয়ে আবার বসি। একটু ভালো করে পড়লেই ভালো ফল হবে, কলেজের স্কলারশিপটা অন্তত পেতে পারব, এম-এ পড়ার কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে আর এখানে থাকতে হবে না, আমাদের কলেজের হস্টেলেই ফ্রী থাকতে পারব, স্কলারশিপ দিয়ে এম-এ পড়ার খরচ চলে যাবে। আর কারো কাছে সাহায্য চাইতে হবে না।

পঞ্চমীদিদি ঘরময় ঘুরঘুর করতে থাকে, চুল খোলে, জুতো ছেড়ে চটি পরে, ব্যাগ নামিয়ে রাখে আর ক্রমাগত নিজের মনে বকতে থাকে—

'গরীব বইকি, কিন্তু তাই বলে

যে একেবারে কিছুই নেই তাই বা কি করে বলি। তবে সে তো আর আমি জোর করে আদায় করি নি। দশ বছরের কাজে খুশি হয়ে মুনিব যদি কিছু দেয়, সেটা কি একেবারে কিছুই নয়? একটা সামান্য রূপোর হাঁসুলির জন্যে মানুষের প্রাণ গেছে বলে কত সময় শোনা যায় আর এতো উলুবেড়ের রেলস্টেশনের থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে দু'কাঠা জমি। তাই কি একেবারে কিচ্ছু না হয়ে গেল?'

না হেসে পারি না।

'তোমার দু'কাঠা জমির জন্যে তোমায় দুষ্টুলোকে খুন করবে পঞ্চমীদিদি আর বুড়ো দাদুর পাঁচশো বিঘার জন্যে তাঁকে করবে না?'

পঞ্চমীদিদি রে গে মে গে কোনো উত্তর না দিয়ে তার নেয়ারের খাটটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে এক হাত সরিয়ে, তার ওপরে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর থেকে ছাদের একটা টালি খুলে ঠকাস্ করে মেঝেয় পড়ে খান্‌খান্ হয়ে গেল। আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখে বললাম—'কি, অমন সাদা মুখ করে দেখছ কি? পুরোনো বাড়িতে এ রকম হয়েই থাকে। তাছাড়া ওটা তো আমার মাথাতেও পড়তে পারত। ওকি, বিছানা গুটিয়ে চললে কোথায়?'

পঞ্চমীদিদি বললে—'আর নয়। আজ থেকে তোমার মাসির খুকুদের ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শোব। ও ঘরের নতুন ছাদ, তার টালি তো আর খসবে না। বাবা! ঘরের ভেতরেও নিস্তার নেই।'

পঞ্চমীদিদি চলে গেলে পর টানা তিন ঘণ্টা নিরিবিলি পড়াশুনোর সুযোগ পেলাম। রাত ন'টায় ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসি ফিরল তিরিক্ষি মেজাজে, মায়ের সঙ্গে কিছু খিটিমিটি লেগে থাকবে। মেসোমশাই তখনো ক্লাবে। বর্ষার মেঘের মতো মুখ করে আমার ঘরে এসে বলল মাসি, 'পঞ্চমীকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। দেখি সুকুদের ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছে, না কি তার শরীর খারাপ। তোমার সঙ্গে কিছু হয়েছে বুঝি? নিজের বাড়িতেও কি এতটুকু শান্তি আশা করতে পারি না? ছেলেপিলের ঘরে ওসব অশিক্ষিত লোকের শোয়া আমি পছন্দ করি না।'

আমি বললাম, 'আমার সঙ্গে কিছুই হয় নি। ছাদ থেকে টালি খসে পড়েছে দেখে ভয়ে সে ওঘরে গিয়ে শুয়েছে।'

মাসি বিরক্ত হয়ে একবার ছাদের দিকে একবার মেঝের ওপরে ছড়ানো ভাঙা টালির টুকরোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তা পড়া আর আশ্চর্য কি? যে রকম খাট টানাটানি কর তোমরা, গোটা ছাদটা যে পড়ে নি তাই ভাগ্যি। তখন থেকে ঘরে বসে রয়েছ, এগুলো ঝেঁটিয়ে তোলবার সময় পাও নি; নাকি কলেজে পড়া মেয়ে ঝাঁটা ধরতে অপমান লাগে, এই বলে গজ্‌গজ্ করতে করতে মাসি নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিল। পঞ্চমীদিদি ওঘরে মালা মেমির জামা ছাড়াতে ছাড়াতে টালি খসার গল্প করছে কানে এল; অনেক রাতে মেসোমশাই ক্লাব থেকে ফিরলেন, আমি উঠে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে গেলাম। বাড়িতে কি হয় না হয়, ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারেন না।

পরদিন সকালে টালি খসার জের টেনে মাসি খুব রাগারাগি করতে লাগল। বাড়িটা তার বাবা যখন তাকে লেখাপড়া করে দিয়েছিলেন, তখন তো ভালোই ছিল, তবে রাখতে না জানলে কোন জিনিষটাই বা থাকে? দায় শুধু যে ট্যাক্স দেয় তার আর যারা নিশ্চিন্ত আরামে বাড়িতে বাস করে, দুবেলা খায় দায়, রাতে ছাপর খাটে শুয়ে ঘুম লাগায়, তাদের কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

ঘরে আমি ছাড়া দ্বিতীয় মানুষ ছিল না, কাজেই ঠেসটা যে কাকে দেওয়া হচ্ছে সে আর আমার বুঝতে বাকি রইল না। মেসোমশাই ডিম টোস্ট খেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেছেন, সারাদিন এমুখো হবেন না; পুরোনো এটর্নির আপিস, কাজের আর অন্ত নেই। তারপর কাজ শেষ হলে মিত্র সাহেবের বাড়িতে ব্রিজ্ খেলা চলে রাত সাড়ে দশটা অবধি। ততক্ষণে এ-বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে, মেসোমশাই খালি ঘরে একা বসে খাওয়া-দাওয়া করেন, আমি একটু দেখাশুনো করি। হারু খানসামা তাঁকে খাইয়ে তারপর রান্না-ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে গুদোমে শুতে যায়।

এতদিন এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি, আজ মাস দুই থেকে পঞ্চমীদিদির পেড়াপিড়িতে আমি রোজ রাতে রান্নাঘরের পাশে বাসনের ঘরের ছিটকিনিটি তুলে দিই, নইলে সেও ঘুমবে না আর আমাকে পড়তেও দেবে না, ঘুমোতেও দেবে না। আজ ভোরে অম্বলের ব্যথা সইতে না পেরে একটু গরম জলের খোঁজে নিচে এসে ছিটকিনি তোলা দেখে মাসি রেগে চতুর্ভুজ! এ-দরজায় কোনোদিন ছিটকিনি দেওয়া হয় না, তার বাপের আমলেও হত না, এখন যত সব

বাইরের লোক বাড়ির পুরোনো নিয়মগুলো পাল্টাতে আরম্ভ করেছে দেখা যাচ্ছে। খবরদার যেন কেউ এ দরজায় হাত না দেয়। সবাই মনে ভেবেছে কি ইত্যাদি কি না বলে যায় মাসি।

পঞ্চমীদিদি তখনো ছেলে-মেয়েদের ঘর থেকে বেরোয় নি, কাজেই ঝাল্টা পড়ল আমার ওপর। তাছাড়া আমিই যে ছিটকিনি তুলেছি এটাও ঠিক। পড়ব কি, এমনিতেই মেজাজ খারাপ, তায় বুক জ্বলুনি, মাসির বকুনি আর থামতে চায় না। চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম; আপনা থেকেই বকুনি এক সময় থেমেও যেত, মাঝখান থেকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পঞ্চমীদিদি বলে বসল, 'ওর দোষ নেই, আমিই বন্ধ করতে বলেছি।'

মাসি এমনি অবাক হয়ে গেল যে, কথার স্রোত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মাসির মতোই পঞ্চমীদিদিও একবার কথা বলতে সুরু করলে থামতে পারে না, পাঁচ মিনিটে গত দুই মাসের মধ্যে তার প্রাণহানির জন্যে ক'বার চেষ্টা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণী দিয়ে, টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে রইল, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাসি গরম জলের ক্যাপ হাতে করেই সবচেয়ে কাছের চেয়ারটাতে বসে পড়ল।

ততক্ষণে সুকু, মালা আর মেমিও নিচে খেতে এসেছে, পঞ্চমীদিদির শেষ কথাগুলো তারা হাঁ করে গিলছিল, সে থামতেই সুকু বলল, 'সিঁড়িতে সুতো বাঁধার কথা বললে মা?'

মাসি বলল, 'সে আবার কি?'

সুকু আর মালা একসঙ্গে বলে উঠল, 'যারা পঞ্চমীদিদিকে খুন করতে চায়, তারা একদিন রাত্রে সিঁড়িতে টানসুতো বেঁধে রেখেছিল, যাতে হোঁচট খেয়ে একতলায় পড়ে পঞ্চমীদিদির মাথা চৌচির হয়ে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়ে। তখন পটের বিবি মাও আমাদের দেখাশুনো করবে না আর মেনিমুখি টুনিদিদিও নয়।'

এই বলে তারা দুজন এমন করে হাসতে লাগল যে সবাই আঁচ করে নিল, কথাগুলো কার? পঞ্চমীদিদির নড়বার চড়বার ক্ষমতা চলে গেছিল, ঠিক সেই সময়ে মাসির ফিক্ ব্যাথাটা মাথা চাড়া দিয়ে না উঠলে হয়তো একটা বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যেত। মাসি একটা গোঙানি শব্দ করে টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ল, আর আমরা জল রে বরফ রে করে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। আধ ঘণ্টা বাদে মাসির মাদ্রাজি আয়া লছমি এল, তার কাছে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তবে বই নিয়ে বসতে পারলাম। মাসি ততক্ষণে কপালে জলপটি দিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছে, লছমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের পাশে মোড়ায় বসে ক্রুশ বুনতে সুরু করে দিয়েছে।

তারপর ছেলেমেয়েদের স্কুলের বাস এসে গেল, আমিও স্নান করে চাবটি মুখে দিয়ে কলেজের দিকে রওনা হলাম। পরীক্ষার তারিখ-ফারিখ গিয়ে জেনে আসা দরকার। মেসোমশাইকে লছমি টেলিফোন করে মাসির শরীর খারাপের কথা জানিয়েছিল, সন্ধ্যের আগেই তিনি এসে অনেকক্ষণ মাসির ঘরে বসেছিলেন। আরো অন্ধকার নামলে পর আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন।

মেসোমশাই লোকটি ভারি সুপুরুষ, বছর পঞ্চায় বয়স হয়েছে, এখনো চেহারার জৌলুস যায় নি। কৃতী এটর্নি, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসেন, মাসি কোথাও সঙ্গে যাবেন না কিছুতেই, কাজেই একাই পার্টিতে যান, তাই নিয়ে নিন্দুকরা খোঁটা দিতেও ছাড়ে না। মাসি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; মাসির চেয়ে দশ বছরের বড় মেজমাসির সঙ্গে আগে বিয়ে হয়েছিল, বছর পনেরো হল মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মেজমাসি মারা গেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েকে মাসি বোর্ডিং-এ রেখে মানুষ করছে, তাই নিয়েই নিজের মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি লেগে আছে।

বুড়ো দাদু থেকে থেকে মধ্যস্থতা করে সিটমাট করিয়ে দেন, আবার কিছুদিন বাদে মন কষাকষি সুরু হয়ে যায়। মেসোমশাই সব কিছু থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। এ-বাড়িতে বুড়ো দাদুই আমাকে এনেছেন, তখন মেজমাসি বেঁচে ছিলেন। তাঁকে আমার একটু একটু মনে পড়ে। তিনি মারা যাবার সময় আমার চার বছর বয়স, তাঁর যমজ ছেলেমেয়ে সাগর আর সোনালি আমার সমবয়সী, তারা এতকাল শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনো করছে, ছুটিতেও এ-বাড়িতে আসতে চায় না, দিদিমার কাছে যায়।

বুড়ো দাদু দিদিমার কি রকম ভাই হন, এককালে ভারি বড়লোক ছিলেন, তারপর ব্যবসা করতে গিয়ে সব খুইয়েছেন, থাকার মধ্যে আছে উলুবেড়ের জমিটুকু আর একটা লক্ষ্মীছাড়া বয়ে যাওয়া ছেলে, মোদো-মাতাল, আর চরিত্রের যা ছিরি সে বিষয় আর কিছু না বলাই ভালো। এসব মেসোমশাইয়ের কাছে শোনা, আমি নিজে তাকে চোখেও দেখি নি। মাঝে কিছুদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করবার ভালে ছিলেন বুড়ো দাদু, হয়তো ভালো মনে করেই, আমার যাতে একটা হিল্লে হয়ে যায় এই ভেবে। কিন্তু আমি এমনি তেরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, যে শেষ পর্যন্ত মেসোমশাই ও বিষয় নিয়ে কোনো কথা পাড়তে মানা করে দিয়েছিলেন।

তবু বুড়ো দাদুকে ভালোই বলতে হবে যে, সে জন্যে আমার ওপর কোনো আক্রোশ রাখেন নি বরং

আমাদের না জানিয়ে প্রায় তিন মাস আগে পঞ্চমীদিদির আর আমার নামে উলুবেড়েতে তাঁর নিজের জমি থেকে দু'কাঠা করে জায়গা একেবারে লেখাপড়া করে দিয়েছেন, যাতে তেমন তেমন অবস্থা হলে আমাদের দাঁড়াবার একটা জায়গা থাকে। আমি অবিশ্যি যখন কথাটা শুনেছিলাম, তখন লেখাপড়া সব হয়ে গেছে; খুব আপত্তি জানিয়েছিলাম দুজনেই। পঞ্চমীদিদি প্রথমটা বোধ হয় খুশিই হয়েছিল, পরে আমার দেখাদেখি সেও রাগ দেখাতে লাগল। শেষটা অনেক কষ্টে মেসোমশাই আমাদের ঠাণ্ডা করলেন, এই বলে যে, না হয় আমরাও উল্টে আমাদের যথাসর্বস্ব বুড়ো দাদুকে উইল করে দিয়ে দেব।

বুড়ো দাদুর বয়সটা সত্তরের কাছাকাছি হবে, কাজেই কথাটা বেশ হাস্যকর। তবু সত্যি আমরা দুজনেই মেসোমশাইকে দিয়ে ঐ রকম লেখাপড়া করিয়ে রাখলাম। এই ঘটনার দিন পনেরো পর থেকেই, পঞ্চমীদিদির ধারণা হল যে, কেউ ওকে খুন করবার চেষ্টা করছে, বোধ হয় ঐ দু'কাঠা জমির লোভেই, অবিশ্যি মুখে এ-কথা সে একবারও বলে নি।

বুড়ো দাদুকেই এক রকম আমার গাজিয়ান বলতে হবে, যদিও আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে আমার, আইনত আমি সাবালিকা। আসলে যে কথাটা এতক্ষণ গোপন করছিলাম সেটি হল যে ১৯৪৬ সালের হাঙ্গামার সময় একটা লুটপাট করা ভাঙাচোরা শূন্য বাড়ির গোয়ালঘরের মাচার ওপরে একটা ছালার মধ্যে আরো পাঁচটি আধ-খেয়ে বেহুঁশ শিশুর সঙ্গে আমাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। সমাজ-সেবকরা আমাদের উদ্ধার করে এনেছিল আর দয়া করে যে সব দেশ-বাসীরা আমাদের মানুষ করবার ভার নেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন, বুড়ো দাদু তাঁদের মধ্যে একজন। নিজের ঘরে কোনো মেয়েছেলে ছিল না, তাই আমাকে তিনি এক নিকট আত্মীয়ার কাছে দিয়েছিলেন; বহু বছর সমস্ত খরচপত্রও দিতেন, তারপর অবস্থা পড়ে যাওয়াতে সে সাহায্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই আত্মীয়াই মেজমাসিমা। সেই ইস্তক এই বাড়িতেই আমার বাস, আমার গাঁই গোত্র কেউ জানে না।

(ক্রমশঃ)


প্রকাশিত হল

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১ • বর্ষ ২০ সংখ্যা ৪

বিষয়সূচী

| | |
|---|---|
| সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| রামেন্দ্রসুন্দর-প্রসঙ্গ | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| রামেন্দ্রসুন্দর-প্রসঙ্গ | সুরেশচন্দ্র সমাজপতি |
| রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি |
| বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন | শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় |
| এক শতাব্দীর কাব্য | শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার |
| অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যসৃষ্টি | শ্রীলীলা মজুমদার |
| প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ | শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার |
| শান্তিনিকেতন | ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন |
| গ্রন্থপরিচয় : শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র |
| স্বরলিপি : 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল' | শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার |

চিত্রসূচী

| | | |
|---|---|---|
| অন্তিমশয়নে শা-জাহান | চতুর্বর্ণ | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | আলোকচিত্র | |
| বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন | আলোকচিত্র | |
| প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ | আলোকচিত্র | |

বিংশ বর্ষ পূর্ণ হল

একবিংশ বর্ষের জন্য গ্রাহকদের চাঁদা ৩০ জুনের মধ্যে পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৎসরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়—শ্রাবণ-আশ্বিন কার্তিক-পৌষ মাঘ-চৈত্র বৈশাখ-আষাঢ়
শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·০০ বার্ষিক চাঁদা ভি-পি ডাকমাশুল-সহ ৭·৫০।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

# সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড ও এলিজাবেথীয় নাটক

## তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ :

ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে রাজারাই ছিলেন সব ক্ষমতার অধিকারী। মধ্যযুগের শাসনপ্রণালী এবং শিক্ষা-দীক্ষার ধারাটা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হতো চার্চ অফ্ রোম্ থেকে। অষ্টম হেনরির (১৫২৯-৩৯) রিফর্মেশনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। হেনরির পর এবং প্রথম এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার আগের কিছুটা সময় চার্চ অফ্ রোমের প্রভাব আবার ফিরে আসবার মত হয়েছিল, কিন্তু রাণী হবার সঙ্গে সঙ্গেই এলিজাবেথ চার্চ অফ্ ইংলণ্ডকে সুদৃঢ়ভাবে প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর শাসক হিসাবে সব ক্ষমতা চলে এল রাণীর হাতে। অতীতের সঙ্গে সব কিছু সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো না বটে। কিন্তু ইংলণ্ডে রাষ্ট্রীক এবং ধর্মনৈতিক জীবনে এমন সব পরিবর্তন দেখা দিল, যার প্রভাব এসে পড়ল সাহিত্য, শিল্প এবং জীবন-দর্শনে।

এলিজাবেথীয় সাহিত্যের ভাষাটা —বিশেষত সেক্সপীয়ার প্রমুখ পেশাদারী লেখকদের রচনার ভাষাটা, সবরকম পাঠকের বোঝবার মত করে লেখা হতো। তখনকার লোক অবশ্য পড়তে চাইতো কম এবং শুনতে চাইতো বেশি। তেমনি মিলিতভাবে জীবন কাটাতে, মিলিতভাবে আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-চৈ করতেই তারা ভাল-বাসতো—এককভাবে জীবন কাটাতে বা জীবনকে উপভোগ করতে তারা অভ্যস্ত ছিল না। এই কারণেই—

'Elizabethan writing lacks the intimate conversation and psychology of the modern novel, but is supreme in expressing sensation and the outwards demonstrative aspects of feeling. It tends continually towards a superabundant eloquence, which arises both from popular sources and from the educational methods of the humanists'. (L. G. Salingar.)

আর এইজন্যই এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যসাহিত্যই ছিল সব থেকে বেশি

### শিলালি

জনপ্রিয়—তাছাড়া সর্বদেশে এবং সর্বকালেই জনগণের শিল্প বলতে আমরা নাটক এবং সঙ্গীতকেই বুঝে থাকি—তাই communal art বলতে একবাক্যে সবাই গান এবং অভিনয়ের নাম করে থাকে। এ যুগের নাটকের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করে দেখবার মত। সেটা হচ্ছে প্রচলিত সামাজিক মতামতের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব মতামতের সংঘর্ষ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনদর্শনের সৃষ্টি। আর একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। এলিজাবেথের পঞ্চাশ লক্ষ প্রজার বেশির ভাগই ছিল গ্রামবাসী—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সমৃদ্ধি নির্ভর করত বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপ্তির ওপর। রাজ্যের সব কিছু প্রধান ঘটনা ঘটতো বণিকদের অর্থসম্পদের ওপর ভিত্তি করে। স্পেনের সঙ্গে বিবাদ—আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে সুরু করে ইণ্ডিজ পর্যন্ত—বহু দূর অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। অকস্মাৎ হানা দিয়ে পড়ে স্প্যানিশ অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করবার প্রচেষ্টাটা, যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল এই সময়। তখনকার পরিচিত চারটি মহাদেশের সঙ্গেই ইংলণ্ডের তখন ব্যবসার সম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেক্সপীয়ারের লেখা একটি খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে, সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর একটা অন্তরের যোগ ছিল। শুধু তাঁর বেলাতেই একথা প্রযোজ্য নয়—সমগ্র ইংরাজ জাতির মধ্যেই যেন ক্রমবর্ধমানভাবে একটা সামুদ্রিক প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছিল। সেক্সপীয়ারের জীবদ্দশায় খনির কাজের বিস্তৃতি এবং শিল্পকর্মের ব্যাপকতা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল।

এর ফলে পুঁজিবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল—বিশেষত রাজশক্তির দাপটে ইংলণ্ড ক্রমশ ক্যাথলিসিজমের বিষাক্ত প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এ ছাড়া পিউরিটান নীতি, উপদেশ, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির মিলিত প্রভাবে সারা ইংলণ্ডে একটা জাতীয়তাবোধের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠছিল। যে কৃষ্টি এবং সভ্যতা এই সময়কার ইংলণ্ডে রূপ নিচ্ছিল, তা শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল ১৫৮০ সালের কাছাকাছি স্পেন্সার এবং সিডনীর সঙ্গে সঙ্গে। এঁরা দুজনেই হচ্ছেন এলিজাবেথীয় যুগের বিবাট নাট্যকারদের পূর্বসূরী দুই প্রতিভা, যাঁদের মধ্যে একটা চমৎকার সমন্বয় দেখা যায় তৎকালীন জাতীয় জীবনের সবকিছু শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর।

জি এম ট্রেভেলিয়ান তাঁর English Social History-তে লিখেছেন :

মধ্য টিউডর রাজত্বকালের সময় ইংলণ্ডে প্রায়ই অশান্তিজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো আর্থিক ও ধর্ম বিষয়ক নানা সমস্যা নিয়ে। কিন্তু এর পরেই এল ইংলণ্ডের স্বর্ণযুগ। এই গৌরবময় যুগেই কবি এবং নাট্যকার হিসাবে সেক্সপীয়ারের আবির্ভাব। শিল্পীর প্রতিভা স্ফূরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ অনেকটাই সাহায্য করতে পারে—

Shakespeare chanced upon the best time and country in which to live, in order to exercise with least distraction and most encouragement the highest faculties of man. The forest, the field and the city were there in perfection, and all three are needed to perfect the poet.

সে সময়ের ইংরাজরা তখনও বস্তুর কাছে নিজেদের আত্মাকে বিকিয়ে দিতে শেখে নি। এর আগে মধ্যযুগে সহজ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের নানা প্রতিবন্ধক ছিল। এ সব প্রতিবন্ধক অপসারিত হওয়াতে সাধারণ মানুষের জীবন অনেক বেশি সরল হয়ে উঠেছিল সেক্সপীয়ারের সময়ের ইংলণ্ডে। পিউরিটান বা অন্য জাতীয় গোঁড়ামি কখনও ইংলণ্ডের জীবনকে গ্রাস করে নেবার মত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে নি। Elizabethan English were in love with life, not with some theoretic shadow of life.

আগেকার তুলনায় দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির মান অনেকটা উন্নত হওয়াতে মানুষের জীবন প্রাচুর্যের আনন্দ এবং উৎফুল্লতায় ভরে উঠেছিল। এই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল প্রাণখোলা হাসি-ঠাট্টা, সঙ্গীত এবং গানের ভেতর। সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং তীক্ষ্ণতার দিক দিয়ে ইংরাজী ভাষাও এই সময় একটা চরম উচ্চশিখরে গিয়ে পৌঁছল।

বহুকাল বাদে দেশে আবার শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজ করতে লাগল—স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও দেশের অভ্যন্তরে কোন অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় নি।

দেশে রাজনৈতিক অশান্তি এবং অত্যাচার এর আগেও ছিল এবং কয়েক বছর বাদেও আবার দেখা দেয়। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের সময় দেশের লোক এসবের থেকে কিছু-কালের জন্য রেহাই পেয়েছিল এবং নিশ্চিন্তভাবে জীবনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিল। প্রজাদের কাছে এলিজাবেথ ছিলেন ঐক্য, প্রাচুর্য এবং স্বাধীনতার প্রতীক।

'With 1588 the crisis of the reign was past. England had emerged from the Armada Year as a first-class Power, She had resisted the weight of the mightiest empire that had been seen since Roman times. Her people awoke to a consciousness of their greatness, and the last years of Elizabeth's reign saw a welling up of national energy and enthusiasm focusing upon the person of the Queen. In the year following the Armada the first three books were published of Spenser's Faerie Queene, in which Elizabeth is hymned as Gloriana. poets and courtiers alike paid their homage to the sovereign who symbolized the great achievement Elizabeth had schooled a generation of Englishmen. (A History of the English-Speaking Peoples—Winston S. Churchill. )

যে ব্রোনোস্কি এবং ব্রুস ম্যাজলিস তাঁদের লেখা 'The Western Intellectual Tradition' বইয়েতে বলেছেন :

এলিজাবেথীয় যুগ সম্বন্ধে যথাযথ-ভাবে গুছিয়ে বলতে যাওয়াটা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কৃষ্টির দিক দিয়ে এ সময় ইংলণ্ড এমন একটা মহত্ত্বের স্তরে উঠেছিল, নানাদিক থেকে এত সব বিরাট বিরাট প্রতিভা এই সময় এদেশে জন্মগ্রহণ করেন —যে এ সব বিষয়ে গুছিয়ে বলতে গেলে এ নিয়েই একটা বিরাট বই লেখা যায়। হেনরি দি এইটথের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর শিশুপুত্র এডওয়ার্ড দি সিক্সথ কিছুদিনের জন্য রাজা হন। বয়স অল্প বলে আসলে একটি রিজেন্সিই তাঁর হয়ে রাজ্যশাসন চালাতো। এর পরে সিংহাসনে বসেন ম্যারী —ইনি ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী। ম্যারী স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসকে বিয়ে করেন এবং অষ্টম হেনরির রিফর্মেশনকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সৎ বোন এলিজাবেথ ( হেনরি ও এ্যান বলিনের মেয়ে ) সিংহাসন লাভ করেন।

ইংলণ্ড এই সময়ে সব দিক দিয়ে উচ্চতার চরম শিখরে ওঠে—এই সাফল্যের মূলে যে সব কারণ ছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে—the presence of a Puritan element ( like Hugnenots in France ), which now helped to transform England into a businees and manufacturing community.

কিন্তু প্রধানত যে কারণে ইংলণ্ড বড় হয়ে ওঠে তা হচ্ছে তার navigational achievements আর নৌবাহিনীকে গড়ে তোল-বার কৃতিত্ব ছিল ড্রেক, হকিন্স, ক্যাভেণ্ডিশ্, র‍্যালে প্রভৃতির। এই সব দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীর দল পশ্চিমাভিমুখেই তাঁদের অভিযান চালাতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন দেশ আবিষ্কার করে নিজের দেশের শাসনাধীনে আনা, নূতন কৃষিজাত দ্রব্যাদি আমদানী করে ইংলণ্ডে সে সবের চাষ করা (এইভাবেই র‍্যালে ইংলণ্ডে আলু এবং তামাকের চাষের প্রবর্তন করেন), এবং নানারকম দস্যুবৃত্তির সাহায্যে অর্থসম্পদ আহরণ করা।

এইভাবেই ইংলণ্ডের জলদস্যুরা স্প্যানিশ জলপোত আক্রমণ করে সোনা এবং রূপা লুঠ করে আনতো। এমন কি, এই সব ব্যাপারে রাণী এলিজাবেথও সময় সময় এই সব জলদস্যুদের অর্থ সাহায্য করতেন। ক্রমাগত এইভাবে আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব গড়ে ওঠে। এরই ফলে জন্ম নেয় স্প্যানিশ-আর্মাডা।

আর্মাডা অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও ছিল রোমান-ক্যাথলিক-স্পেনের ধর্মদ্রোহী প্রোটেস্ট্যাণ্ট-ইংলণ্ডকে সায়েস্তা করবার অভি-প্রায়। তবে অর্থনৈতিক প্রাধান্যের ব্যাপারে ইংরাজদের একেবারে শেষ করে দেব এই ইচ্ছাটাও দ্বিতীয় ফিলিপ মনে মনে পোষণ করতেন। ( ক্রমশঃ )

# রঙ্গজগৎ

## বাংলার চলচ্চিত্র সংকটে প্রেক্ষাগৃহ-মালিকদের দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটীর রিপোর্টে নাকি বাংলা চলচ্চিত্রের সংকটের জন্য প্রেক্ষাগৃহের মালিকদেরও দায়ী করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের বিরুদ্ধে চিত্রনির্মাতা এবং দর্শক উভয় পক্ষের অভিযোগ রয়েছে। অর্থলালসা-অন্ধ মালিকরা বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করে আজ হিন্দী ছবির সমর্থক। বাঙালীর অর্থে গঠিত সিনেমাগুলিতে হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে, অথচ বাংলা ছবি প্রেক্ষাগৃহের অভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে না। এক শ্রেণীর বাঙালী মালিক ছবির মুক্তির বিনিময়ে ঘুষের নামান্তর নজরানা দাবী করে। এই মোটা টাকা মেটানো সকল প্রযোজকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং ছবি মুক্তি পেতে পারে না।

প্রেক্ষাগৃহের বিরুদ্ধে দর্শকদেরও তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। শহরের কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ ব্যতীত অন্যগুলিতে বসবার আসনের অব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতার অভাব, এমন কি কোন কোনটিতে দুর্গন্ধময় পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারাও দর্শকগণ পীড়িত। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বা সরকার এ-বিষয়ে রহস্যজনক ভাবে উদাসীন।

তদন্ত কমিটীর কাছে এসব কথা অজানা নেই। তদন্ত কমিটীও যথারীতি রিপোর্ট পেশ করেছে। এখন পরিণতি কি হয় সেটাই দেখবার কথা। আমরা আশা করবো তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট ও সুপারিশ যেন বিক্ষোভ চাপা দেবার, লোক দেখানো তামাসামাত্র না হয়।

—সুজন।

# চিত্র আলোচনা

## সত্যজিৎ রায়ের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি

### 'চারুলতা'

(প্রযোজনা—আর ডি বনশল)

সত্যজিৎ রায়ের একাদশ ছবি 'চারুলতা' মুক্তিলাভ করেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে বাস্তবিকই একথা সগর্বে ঘোষণা করার মত। 'চারুলতা' শ্রীরায়ের চিত্রনির্মাণ কুশলতার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর শিল্পবুদ্ধির পরিণত রূপ। কাহিনী বিন্যাসে, মননশীলতায়, সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতায়, সংলাপ ব্যবহারে চলচ্চিত্র-ধর্মিতা রক্ষায়, সঙ্গীত ও শব্দপ্রয়োগে এবং আলোকচিত্রে শিল্পরুচির পরিচয়ে এবং অভিনয়নৈপুণ্যে এই ছবি একটি অনন্য-সাধারণ শিল্পসৃষ্টি। নরনারীর সম্পর্কের নিগূঢ় সত্য এতে উদ্ভাসিত: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পুরুষের প্রভু-মনোভাবের স্বরূপ ও পরিণতি এতে আলোচিত। নারীর অন্তঃসলিলা কামনা ও মর্যাদা বোধের প্রতি এখানে আলোকপাত ঘটেছে। সাধারণ দর্শকদের কাছে যেমন এই ছবি উপভোগ্য, যথার্থ চিত্ররসিকদের কাছেও তেমন পরম সমাদরের জিনিষ। 'চারুলতা'র চিত্রনাট্যের অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্প। নষ্টনীড়ের মত

● সত্যজিৎ রায়

মনস্তত্ত্ব-প্রধান গল্পকে চিত্ররূপ দেওয়া অতিশয় কঠিন কাজ; সামাজিক নীতি-বোধের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই কাজ আরো দুরূহ। কিন্তু শ্রীরায় এই অসম্ভব কাজকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে চিত্রে রূপায়িত করেছেন তাতে তাঁর গভীর বাস্তববোধের সঙ্গে নীতিবোধ ও চারুকলার সমন্বয় দেখে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। কাহিনী বিন্যাসে চিত্রনাট্যকার শ্রীরায় কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, তাতে মূল বক্তব্য প্রকাশ সহজতর হয়েছে।

ছবির প্রথমে দেখা গেল নিঃসঙ্গ চারুলতার দিন যেন কাটতে চায় না। স্বামী ভূপতি সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে, বাইরের ঘর থেকে যখন বই নিতে ভেতরে আসে তখন অন্তঃপুরিকা চারুলতাকে চোখেই পড়ে না। তার মনের খবর নেবার কথা তো ভাবনার বাইরে। দু-জনের ব্যবধান এত বেশি যে, বাইরের লোকটির মত ভূপতিকেও সে দূরবীণ দিয়ে দেখছে। এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য ভূপতি চারুলতার দাদা-বৌদিকে বাড়িতে নিয়ে এল। কিন্তু চারুলতা তো কেবল দিন কাটাবার সঙ্গী চায় না, সে চায় ভূপতির প্রেম, তার কর্মে ও চিন্তায় সহযোগী হতে। তাই মন্দাকিনীর সঙ্গে তাসখেলায় তাকে দেখা যায় উৎসাহহীন।

এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে এল অমল। সে প্রাণচঞ্চল। লেখা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অমলের সান্নিধ্যে চারুলতার জীবনে এই

প্রথম প্রেমের জন্ম হলো। চারুলতার অজানিতে বিশ্বম্ভর কাগজে অমলের লেখা প্রকাশ হলে এবং সে খবর প্রথমে মন্দাকিনীকে জানালে অভিমানে চারুলতা ফুঁসে ওঠে। লেখার চর্চা তো তাদের একান্ত অন্তরের জিনিষ, তাতো বাইরে প্রকাশের জন্য নয়। জিদ্ করে সেও বিশ্বম্ভরতে লিখলো; ছাপা কাগজখানা দিয়ে অমলকে আঘাত করে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের শক্তি এবং পাশাপাশি সে-ও যে দাঁড়াবার অধিকারিণী সে কথা জানালো। তারপরেই দেখা গেল নিজেকে প্রকাশ করতে পারায় আত্মসন্তুষ্ট চারুলতা নিজের হাতে পান সেজে অমলকে খাইয়ে দিল, তার যত্নে তৈরি নক্সি চটিজোড়া উপহার দিয়ে গেল।

নরনারীর সম্পর্কে নীতিবোধ ও সামাজিক শৃংখলার প্রশ্ন দর্শকমনে এসে পড়ে। এ সময় একটি দৃশ্যে চারুলতার দাদার বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গে ভূপতি বলছে,—নিজের ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সমাজে বাঁচা যাবে কি করে। এরূপ সক্ষোভ উক্তিতে অমল নিজেকে চিনতে পারলো। সে বিশ্বাসভঙ্গ করে সামাজিক নীতির সীমালঙ্ঘন করতে পারে না। সকলের অগোচরে বিদায় গ্রহণ করলো। এখানে দেখা গেল চারুলতার অন্তর্জ্বালা। বাইরে সে স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

চারুলতাকে নিয়ে ভূপতি হাওয়া পরিবর্তনে গেল। সেখানে বসে নতুন করে কাগজ বার করার পরিকল্পনায় ভুল সংশোধন করে চারুলতা নিজের নামটাও যোগ করে দিল। ভূপতির কাছে চারুলতা কেবল স্ত্রী, সে যে সহকর্মী হতে পারে সেকথা তার এতদিনের প্রভু-মনোভাবে আসে না।

ফিরে এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার প্রস্তুতিলগ্নে ভূপতিকে লেখা অমলের এক চিঠি নিয়ে চারুলতার প্রতিক্রিয়ার দুঃসহ যাতনার মধ্যে ভূপতি বুঝতে পারে তাদের নষ্টনীড়ের কথা।

তারপরে দেখা গেল উদ্‌ভ্রান্তের মত ভূপতি গাড়ি করে গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ালো। নিজের আত্মম্ভরিতা ও উপেক্ষার গ্লানিতে তার প্রভু-মনোভাব পরাজিত; তার মত পুরুষের চোখেও জল। শেষে বাড়িতে এল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার যেন শক্তি নেই। চারুলতা তাকে ডাকলো, তবু ভূপতির দ্বিধা। দু-জনেই হাত প্রসারিত করে দিল, কিন্তু দুটি হাত যেন আগের মত মিলতে পারলো না; তারা যেন নিষ্প্রাণ।

কাহিনী বিন্যাসে একস্থানে সত্যজিৎবাবু ইংল্যাণ্ডে উদারনৈতিক দলের জয়লাভে তৎকালীন প্রগতিশীলদের বিজয়-উৎসবের প্রাসঙ্গিক ঘটনা দেখিয়ে ভূপতির আন্তর্জাতিক চেতনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এতে ভূপতি চরিত্রের দ্বন্দ্ব, তার বাহির ও

● 'মহাতীর্থ কালীঘাট' ছবির একটি দৃশ্যে নবাগতা কৃষ্ণা বসু

অন্তরলোক প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিকতাবোধের ঐতিহ্যকে এবং তার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের অবদানকে দর্শকদের কাছে তুলে ধরে সুচারুভাবে যুগোপযোগী কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই দৃশ্য সংযোজনার জন্য শ্রীরায়ের চিন্তাশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চারুলতা ছবিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের নামোল্লেখে বাংলার রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের কাল প্রতিফলিত। তখনকার দিনে প্রগতিশীল উচ্চমধ্যবিত্তরা সমাজে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করছে। এই সমাজের পোষাক, পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জায় পরিবেশ রচিত হয়েছে। অতীতের রুচিবোধ অনুসারে দৃশ্যপট রচনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা হয়েছে। দর্শকমাত্রই এই দৃশ্যরচনায় মুগ্ধ হবেন। কিন্তু চারুলতার মনের কথা বুঝতে পারার পর ব্যথিত ভূপতি যখন গঙ্গাতীরে গেল, সেখানে কেল্লার সামনের রাস্তায় আধুনিক বিজলীবাতি দর্শন কাল-সঙ্গতি ব্যর্থ করে দেয়। এতবড় সতর্ক পরিচালকের ছবিতে এই অসতর্কতা দোষণীয়

সংলাপ ও শব্দের ব্যবহারে 'চারুলতা'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চিত্র এখানে কাহিনী বর্ণনা করেছে, কথা পাত্রপাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করেছে। সুতরাং বাস্তবধর্মী চিত্ররীতি অনুসারে কথা এখানে কম

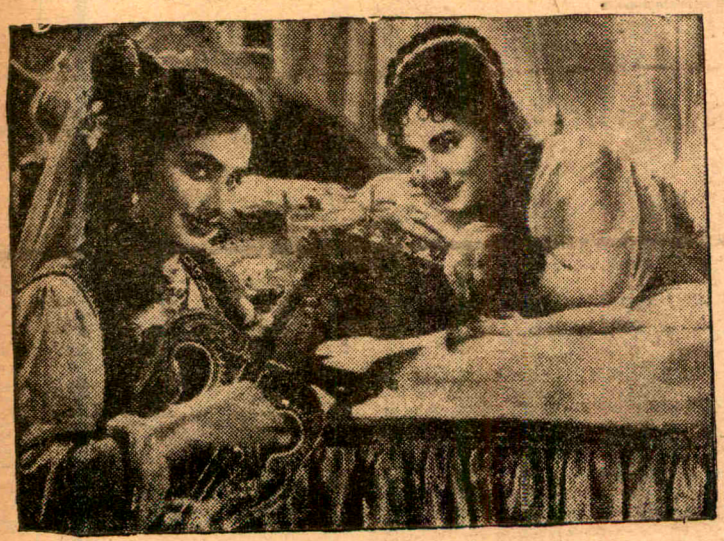

● 'চার দরবেশ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাইদা খান ও জীবনকলা

● 'রাধাকৃষ্ণ' ছবির একটি রূপসজ্জায় নবাগতা রমা দাস

এবং প্রতিটি কথা অর্থবহ। আবহসঙ্গীতের ব্যবহারও অত্যন্ত পরিমিত এবং এস্রাজের সুর কালোপযোগী পরিবেশ ও মুহূর্তকে ফুটিয়ে তুলেছে। কণ্ঠসঙ্গীতে নিধুবাবুর টপ্পা, রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের ব্যবহার কাহিনী বিকাশে সহায়ক। গান এখানে কেবল মনোরঞ্জনের উপাদান নয়।

অভিনয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায় চারুলতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। চারুলতা ছবির প্রধান চরিত্র। এই প্রধান ভূমিকা যথার্থ অভিনয়ের উপর ছবির সার্থকতা নির্ভর করেছে; এবং এদিক থেকে মাধবী মুখোপাধ্যায় অভিনন্দনীয়া। ভূপতির চরিত্রে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। দীর্ঘকাল যাবৎ মঞ্চ ও চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, শ্রীমুখোপাধ্যায় এবারই যথার্থ শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অমলকে এমন সার্থক রূপদান করেছেন যা আর কোন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে শ্যামল ঘোষাল (উমাপতি), গীতালি রায় (মন্দাকিনী), সুব্রত সেন, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ সকলেই প্রাণবন্ত অভিনয়ে ছবিটি উপভোগ্য করেছেন।

ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ অত্যন্ত উন্নত ধরণের। আলো-আঁধারির নিখুঁত কাজ আমাদের চলচ্চিত্র বিকাশে উৎকর্ষের পরিচায়ক। কলাকৌশলের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেছেন সুব্রত মিত্র (চিত্রধারণ), নৃপেন পাল (শব্দ গ্রহণ), দুলাল দত্ত (সম্পাদনা), বংশীচন্দ্র গুপ্ত (দৃশ্যসজ্জা)।

● সেক্সপীয়রের 'পঞ্চম হেনরি' নাটকের নাম-ভূমিকায় স্যার লরেন্স অলিভার (মধ্যস্থলে)

## অপ্রচলিত রবীন্দ্রসঙ্গীত

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০শে এপ্রিল এক অভিনব সঙ্গীতের আসর বসেছিল। স্থান—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেণ্টার অডিটোরিয়ম। এই আসরের পরিচালক ছিলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমজুমদার জানালেন রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গানে সুর আরোপ করতেন। রচনার দু একটি কথা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সুর পরিবর্তিত হতো এবং অনেক সময় কোন সুরটি গ্রহণ করবেন তার জন্য শিক্ষার্থীদের ভোট পর্যন্ত গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে সুর দিয়েছিলেন পরে পরিবর্তন করেছেন, অথচ প্রথম সুরের আস্বাদ

আমাদের পাবার কোন উপায় ছিল না। শ্রীমজুমদারের পরিচালনায় সেই প্রথম সুরের আস্বাদ আমরা লাভ করলাম। সাবিত্রী দেবীর সুললিত কণ্ঠে আর একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা গেল দক্ষিণী সুরে। সাবিত্রী দেবীর দু-টি গান এই আসরের পরম লাভের জিনিষ হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত হাসির গান এবং সুকুমার রায়ের 'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরে গান এই সঙ্গীত-আসরকে পরম উপভোগ্য করে তোলে।

## হাঙ্গেরীয় ছবি

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এবার ছয়টি হাঙ্গেরীয় ছবি প্রদর্শনের আয়োজন করছে। ১২ই মে থেকে ১৮ই মে নিউ এম্পায়ার সিনেমায় ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে। ছবিগুলির নাম: টু হাফ টাইম ইন হেল (জোল্টান ফেবরি) দি ফ্যানাটিক্স (ক্যাবলি ম্যাক), লিজেণ্ড ইন দি ট্রেন (টায়াসরেনী), মিলিটারী ব্যাণ্ড (এনড্রে মার্টন), ডলার ড্যাডি (ভিক্টর গার্টলার) ফিল্যার (ভিক্টর গার্টলার)।

● লেনিন

## অস্কার পুরস্কার

নিগ্রো অভিনেতা সিডনী পয়েটিয়ার এবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অস্কার পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে অস্কার পুরস্কার লাভ করেছে 'টম জোন্স' বৃটিশ চিত্র। 'ক্লিওপেট্রা' ছবিটিও কলাকৌশলের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন প্যাট্রিসিয়া নীল।

## 'লেনিনিয়ানা' এক নতুন ধরণের ছবি নির্মাণের উদ্যোগ

সোভিয়েট ইউনিয়নে এক ধরণের বিজ্ঞানচিত্র নির্মাণের আয়োজন সুরু হয়েছে। এই চিত্রাবলী উৎসর্গ করা হবে সোভিয়েটের রাষ্ট্রগুরু লেনিনের শততম জন্মবার্ষিক ও সোভিয়েট রাশিয়ার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে।

এই ছবিগুলির নাম হয়েছে 'লেনিনিয়ানা'। ১৪টি থেকে ১৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে এই চিত্রগুচ্ছ সম্পূর্ণ হবে। প্রত্যেকটি ছবিই হবে স্বতন্ত্র। এই ছবিগুলিতে লেনিনের জীবন ও কাজের বিভিন্ন দিক এবং পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র গঠনে লেনিনের অবদান দেখান হবে। এই চিত্রগুচ্ছের সুরু হবে ভ্লাডিমির ইলিচ লেনিন' নামক ছবি দিয়ে।

ছবি নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। বহুসংখ্যক চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান এবং সম্পাদক কাজে লেগে গেছেন। এই চিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্রকর্মীদের সঙ্গে টেলিভিসনের কর্মীরাও যোগ দিয়েছে।

## নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

নয়াদিল্লীতে সাতদিনব্যাপী এক চলচ্চিত্র উৎসব সুরু হয়েছে। সর্বভারতীয় এই উৎসবের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ২৫শে এপ্রিল বিজ্ঞান-ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ চলচ্চিত্র প্রতিযোগীদের গুণাগুণ বিচারের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদান করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ১২৮। রাষ্ট্রপতির মেডেল ও চলচ্চিত্রের গুণাগুণ উৎকর্ষের জন্য সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট লাভ করেছে যে ক'টি চলচ্চিত্র তার মধ্যে সাতটি হচ্ছে ফিচার জাতীয়, তিনটি ডকুমেণ্টারী, একটি শিশুদের উপযোগী এবং একটি শিক্ষামূলক ফিল্ম। সর্বোৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্ম হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে 'শেহর আউর সপনা' (হিন্দী)। উৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্মরূপে রাষ্ট্রপতির প্রথম ও দ্বিতীয় রৌপ্যপদক লাভ করেছে যথাক্রমে 'নানুম ওরু পেন্ন' (তামিল) ও 'নরখানাসালা' (তেলুগু)। শিশুদের উপযোগী ফিল্মের জন্য অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে 'পাঞ্চ পুথলিয়ান'। শিক্ষামূলক সর্বোৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র হিসেবে অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেছে 'ইণ্ডিয়ান ওয়েল' (ইংরেজী)।

● 'প্রভাতের রঙ' চিত্রের নায়ক বিশ্বজিৎ

# সংবাদ বিচিত্রা

## রেকর্ডের মোহ

শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাল অষ্ট্রেলিয়ার ডন ওয়েই। এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে দু হাজার ফুটের লেভেলে—যখন প্যারাচুট না খুললে আর তা খোলা যায় না—আসা পর্যন্ত রীলে রেসের মত বেটন এক হাত থেকে অন্য হাতে দেওয়ার মারাত্মক খেলায় সে নাম করেছিল। এর আগে সে এরোপ্লেন থেকে দু'শ নব্বুইবার লাফিয়েছে। কিন্তু সেদিন সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল।

ডন ওয়েই চেয়েছিল নতুন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করতে। সেদিন সে আরও আটজনের সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে। ঘণ্টায় একশ' কুড়ি মাইল বেগে তারা মাটির দিকে নামছিল, আর বেটন যাচ্ছিল একের হাত থেকে অন্যের হাতে। ওয়েই বোধ হয় গুণতে ভুল করেছিল—কবার বেটন হাত বদলাল। নতুন বিশ্ব রেকর্ডের সম্ভাবনায় সে তখন মশগুল। তার সঙ্গী দেখল দু হাজার ফুটের লেভেলে এসে পড়েছে তারা। প্রাণপণে প্যারাচুটের কর্ডে টান দিল সঙ্গীটি—প্যারাচুট খুলল। কিন্তু ওয়েই! তার যখন খেয়াল হল তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। অনেকটা নেমে এসেছে সে। প্যারাচুট আর খুলল না। হতভাগ্য ডন ওয়েই!

## হিমালয়ের ডাক

দুটো পা কেটে বাদ দিতে হল। আমেরিকার পিটার মালগ্র, ১৯৬১ সালে মাকালু অভিযানের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হিমকোস্কার জন্য দুটো পা ফুলে ওঠে, শেষে য়্যাম্পুট করা হয়। আজ কৃত্রিম পা নিয়ে হেঁটে বেড়ান পিটার মালগ্র। তবু হিমালয়ের ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেন নি। আগামী আগষ্টে তাঁকে দেখা যাবে হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ জয়ের অভিযানে।

*

পশ্চিম জার্মানীর পাঁচজন এসেছে হিমালয়ের চো ইউ শৃঙ্গ (২৬,৮৬৭ ফুট) জয় করতে। তবে তারা অভিনব উপায়ে শৃঙ্গে পৌছাবার চেষ্টা করছে। যদি সফল হয়, এই দলই প্রথম স্কী করে হিমালয়ের শৃঙ্গে পৌছাবে।

## নির্জন সৈকতে

ডানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর আত্মা ভর করেছে হল্যাণ্ডের তেইশ বছরের য়্যান্টন ভ্যান দ্য ওয়াটারের ঘাড়ে। সে রওনা হয়েছে এক নির্জন দ্বীপের দিকে। সেখানে সে ছ'মাস থাকবে। সে অবশ্য বান্ধবী আইনোককে বলে গিয়েছে যে ছ'মাস পরে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবে। তার আগে ছ'মাস ধরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় সে।

যাবার আগে ওয়াটার বলে, শহরে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। সেই নির্জন এভস ডি সোটাভেন্টো (বা পক্ষী দ্বীপ) দ্বীপে আমি হয়ত শান্তি পাব। তাছাড়া আমি দেখতে চাই নির্জন দ্বীপে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায় কি না।

এই নবীন রবিনসন ক্রুসো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে চব্বিশটা মুরগী, দুটো কুকুর আর বেতার যন্ত্র। যাবার আগে সে শিখেছে পা ভাঙলে কি করতে হয়, ঝুমুরের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হয়, লোনা জল কি করে মিঠে করতে হয়। বেতার যন্ত্র চালানো, বিষাক্ত গাছ-গাছড়া, মাছ ইত্যাদি চেনা আর ছাগল, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি ধরবার কায়দাও তাকে রপ্ত করতে হয়েছে।

## ধূমপান

দশজন বিশেষজ্ঞ মিলে মার্কিন সরকারের কাছে পেশ করল তাদের রিপোর্ট। বিষয়—ধূমপানের কুফল। এই দশজনের মধ্যে পাঁচজন ধূমপায়ী। রিপোর্ট পেশ করার পর তাদের মধ্যে একজন ধূমপান বন্ধ করে দিয়েছে। তিনজন এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চম জন জানায় নি সে কি করছে।

*

পাশাপাশি বসে ছিলেন নিউ অর্লিন্সের ডাঃ মর্টন ব্রাউন আর ডাঃ হাওয়ার্ড এ বোয়েকনার। ব্রাউনের মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম, হাওয়ার্ডের চকচকে টাক।

হঠাৎ ব্রাউন বললেন, বড্ড বেশি সিগারেট খাও তুমি। লাংস ক্যান্সারে নির্ঘাত মরবে।

বাজে বকো না, হাওয়ার্ডের নির্লিপ্ত জবাব, টেকোদের লাংস ক্যান্সার হয় না।

সুরু হল তর্ক, তারপর গবেষণা। একশ' ছিয়াশি জন লাংস ক্যান্সারের রোগীকে পরীক্ষা করে দুজন বিশেষজ্ঞ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, টেকোদের তুলনায় কৃষ্ণ-চূড়দের লাংস ক্যান্সার হয় তিন-চারগুণ বেশি।

*

শেষ অবধি আদালতের শরণাপন্ন হল আমেরিকার ম্যাকক্রো। ত্রিশ বছর ধরে একই দোকান থেকে সে সিগারেট কিনেছে। ফলে লাংস ক্যান্সার। পঁচিশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবী করে সেই দোকানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ম্যাকক্রো। তার অভিযোগ হল, দোকানটি বাজারে এমন এক সাঙ্ঘাতিক জিনিষ ছেড়েছে, যা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য।

## ত্রিয়াশ্চরিত্রম

লণ্ডনের উইলিয়াম জ্যাকবস সেদিনও টলতে টলতে বাড়ি ফিরছিল। রোজই তার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, পায়ের ঠিক থাকে না। দরজায় টোকা দিল। মার্গারেট দরজা খোলা মাত্র 'এত দেরি করলি কেন' বলে অন্যদিনের মতই জ্যাকবস মারবার জন্য হাত তুলেছিল। কিন্তু ঘরের কোণের চেয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। জ্যাকবসের ভারী দেহটা তার ওপরে গিয়ে পড়েছে।

রোজ রোজ মার খেতে খেতে মার্গারেট হাঁফিয়ে পড়েছিল। গোপনে সে যুযুৎসু শিখতে সুরু করে।

স্ত্রীর কাছে হারাতেই শেষ নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় স্ত্রীকেও হারাল জ্যাকবস।

—সাংবাদিক

# নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ চৌত্রিশ ॥

## আন্তরিক প্রয়াস

একদিন সকালে হঠাৎ রঙমহলের গাড়িটা এসে হাজির হলো। ড্রাইভার জানালো—শরৎদা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন। ড্রাইভারকে জানালাম—কিন্তু এখন যাই কি করে? অফিস আছে।

শরৎদার ড্রাইভারটিও ছিল তেমনি, মাড়োড়বন্দা! বললে—আপনাকে না নিয়ে গেলে বাবু বকাবকি করবেন, চলুন একবার দয়া করে, এখুনি গাড়ি করেই না হয় আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

কি করি! ড্রাইভারের পীড়াপীড়িতে গায়ে জামা চাপিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম।

গাড়ি আমাকে নিয়ে থিয়েটারে গেল না। গেল, শরৎদার সাহিত্য-পরিষদ ষ্ট্রীটের বাড়িতে। বাইরের ঘরে শরৎদার ছোটভাই বিনয়বাবু বসে আছেন। আর তাঁর চারদিকে খাঁচায় ভর্তি গিনিপিগ, খরগোস, বিলিতী ইঁদুর প্রভৃতি পরমানন্দে কলমী শাক চিবুচ্ছে!

আমাকে দেখে বিনয়বাবু বললেন—ওপরে যান। দাদা ওপরে আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি—শুনলাম বিকট নাসিকাগর্জন। ওপরে আর ওঠা হলো না। নেমে এলাম। বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—শরৎদা কি ঘুমোচ্ছেন নাকি?

—না দাদা ত' জেগেই আছেন।

—আমার ত' মনে হয় জেগেই ছিলেন। এখন ঘুমোচ্ছেন? আসুন ত'

বিনয়বাবু আমার সঙ্গে ওপরে এলেন। দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। শরৎদা সত্যিই ঘুমোচ্ছেন। ভারী আয়েসী মানুষ ছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশাই। পেতলের বক্‌ঝকে খাটের ওপর পুরু গদীতে শুয়ে আছেন। পরণে দেশী কালোপাড় ধুতি, গায়ে নেটের গেঞ্জি। নাক ডাকছে। কিন্তু হাতে আছে একটা জলন্ত সিগারেট।

বিনয়বাবু বললেন—দেখছেন ত' দাদার কাণ্ড! পাঁচ মিনিটও হয় নি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। আপনার কাছে গাড়ি পাঠান হয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করলেন। আর এর মধ্যেই দেখুন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই সিগারেট হাতে নিয়ে ঘুমোনর জন্যে দেখছেন ত' এমন বিছানাটার কি অবস্থা করেছেন।

সত্যিই। তাকিয়ে দেখি, বিছানার চার-পাঁচ জায়গায় সিগারেটের আগুনে পুড়ে ফুটো হয়ে গেছে।

—দাদা।

—কে?

বিনয়বাবুর ডাকে শরৎদা ধড়মড় করে উঠে বসলেন এবং সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—এস ভাই, এস। বস।

—কি ব্যাপার! সকালেই পেয়াদা পাঠিয়েছেন কেন?

—পাঠিয়েছি কি সাধে? তোমাকে আমার বড্ড দরকার। বসো। পরামর্শ আছে। ওরে চা দিয়ে যা—

—এই মাত্র চা খেয়ে আসছি। এখন আর চা খাব না। এখুনি খেয়ে অফিসে যেতে হবে।

—অফিসে আজ আর তোমার যাওয়া হবে না। থিয়েটার থেকে 'ভারতবর্ষ' অফিসে একটা টেলিফোন করে দাও।

—না না. মাসের প্রায় শেষাশেষি হয়ে এলো। কাগজ বার করার সময়। এখন কি কামাই করতে পারি?

—যা হোক করে আজকের দিনটার মত ডুব দাও ভাই। আমি প্রোগ্রাম করে ফেলেছি। আজ সারাদিনের মতই তোমাকে দরকার। এখুনি তোমায় নিয়ে বেরুবো।

—কোথায়?

—সে অনেক জায়গায়। মোটকথা

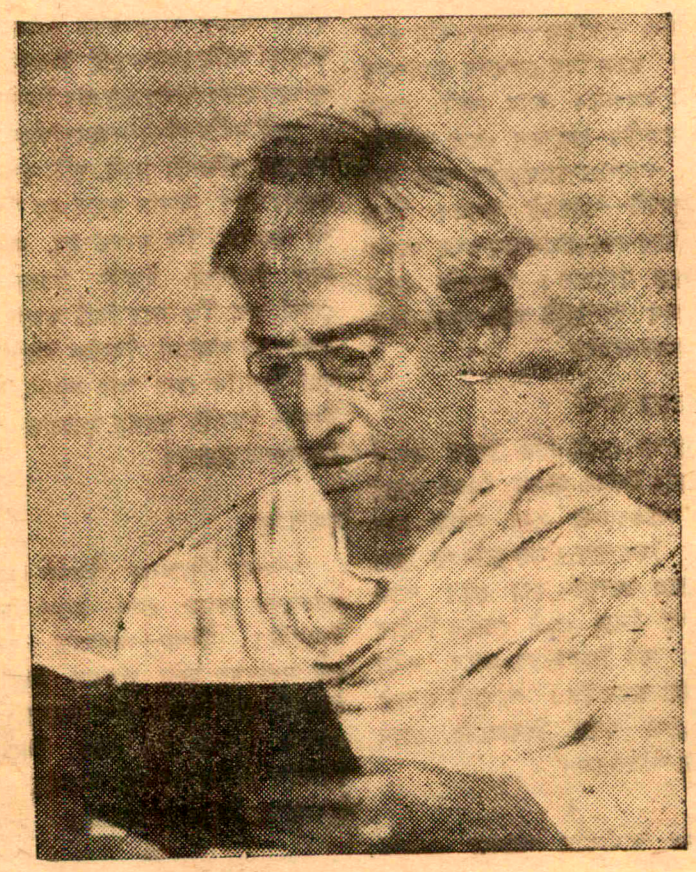

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করতে পার। বড় ভাই হয়ে জাহান্নমে তোমাকে নিয়ে যাব না। শোন, এই মাসেই বই খুলতে হবে।

—সে কি! নতুন নাটক দশরাত্রিও ত' হয় নি এখনো।

—না। তারাশঙ্করবাবুর অত ভাল লেখা। কিন্তু বেচাকেনা মোটেই সুবিধে হচ্ছে না।

—অভিনয় ত' বেশ ভালই হয়েছে। তাছাড়া Casting-ও ভাল। Production-ও ভাল। জোরদার নাটক—

—সব ভাল। কিন্তু তবুও চলছে না।

—কেন?

—কি জানি। সবই অদৃষ্ট! এখন অসুবিধে হয়েছে কি জান? বিরাট খরচ। যা পাচ্ছি, তাতে সব দিক সামলে উঠতে পারছি নে। যাক্, উপেন গাঙ্গুলী মশাইয়ের 'রাজপথ' পড়েছ?

—পড়েছি।

—নাটক করলে কেমন হয়?

—নাটক হতে পারে। তবে কিছু অদল-বদল করতে হবে। স্বাধীনতার আগে লেখা বই। স্বাধীনতার পরে করতে গেলে, তার কিছু পরিবর্তন করার দরকার।

—যা করার দরকার তা করো। চলো, আজ উপেনবাবুর কাছে। বসো। আমি Ready হয়ে নি।

—এখুনি বেরুবেন?

—হ্যাঁ।

—তা বাড়িতে ত' একটা খবর দেওয়া দরকার। দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও তোমার বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসুক।

ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার এলো। দু'জনে সেগুলির সদ্ব্যবহার করলাম।

শরৎদা গায়ে জামা চাপিয়ে বললেন—চলো।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। জীবজন্তুগুলি বাইরের ঘরে যথারীতি কলমী শাক চিবুচ্ছে। শরৎদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—দেখছ ত' কাণ্ডটা। নাটক না চললে কি হবে? এদের মুখ—ঠিকই চলছে। রোজ এক টাকার কলমী শাক!

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে ডাঃ শাস্ত্রীর ল্যাবরেটরী গিনিপিগ, খরগোস, বিলিতী ইঁদুর প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হতো। নাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে অহীনদা নিজে ডাঃ শাস্ত্রীর ভূমিকায় অবতরণ করতেন। নাটকটি সবদিক থেকে নূতনত্বের দাবী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাটকটি চলে নি।

শরৎদার নির্দেশমত তাঁর সঙ্গে ত' বেরুলাম। বেলা তখন ১০টা। থিয়েটারে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা ৬টা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুপুরের দিকে উপেনদার সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে 'রাজপথ' নাটক করার অনুমতি গ্রহণ করলাম। বাকী সমস্ত সময় শরৎদা অফিস পাড়া, হাইকোর্ট পাড়া, মধ্য কলিকাতা, বালীগঞ্জ প্রভৃতি নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চলে যান, আমি গাড়িতে বসে থাকি, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আবার ফিরে এসে গাড়িতে বসেন। গাড়ি চলতে থাকে। সুরু হয় 'রাজপথ' নাটক রচনা করা এবং তা মঞ্চস্থ করার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। এর মধ্যে বার দুই রেষ্টুরেণ্টে চা খাওয়া হয়েছে। বাকী সময় শুধু ঘুরে বেড়ান হলো। অন্তত পঁচিশ জায়গায় টুঁ মারলেন শরৎদা।

ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলাম—এত জায়গায় ঘুরলেন কেন? কি উদ্দেশ্য?

শরৎদা বললেন—ঘুরলাম কি সাধে? আজ ১০ তারিখ। মাইনে দিতে হবে। কিছুই হাতে ছিল না।

—তা জোগাড় হলো কিছু?

—হয়েছে বৈ কি।

—কত?

—তা বলতে পারব না। যেখানে যা পেয়েছি, নিয়েছি। থিয়েটারে গিয়ে হিসেব করব।

থিয়েটারে এলাম। শরৎদার সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শরৎদা এ-পকেট ও-পকেট থেকে নোট বার করতে লাগলেন। গুণে দেখা গেল, প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

বললাম—শুধু হাতে এতগুলো টাকা সংগ্রহ করলেন?

—না। হ্যাণ্ডনোট দিতে হয়েছে।

—এত ঝুঁকি নিয়ে এইভাবে থিয়েটার চালাচ্ছেন?

—এ আর এমন কি! আমার আগে যাঁরা থিয়েটার চালিয়ে গেছেন, তাঁরা এর চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে গেছেন। বাংলা দেশের থিয়েটার ত' এইভাবে আজো বেঁচে আছে ভাই।

শরৎদার কথাগুলো শুনে সেদিন সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। কোন উত্তর দিতে পারি নি। আজ থিয়েটারের সুদিনে, শুধু সেই দুর্দিনের কথাই বার বার মনে হচ্ছে—বাংলা দেশের থিয়েটারকে কি ভাবে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখে গেছেন। কি অপরিমেয় ভালবাসাই না ছিল তাঁদের থিয়েটারের প্রতি।

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ভিলেজ
মার্কনী ফ্যান
১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

# পাঠক মত

মাত্র এক বছর চললেও 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বাংলা পাঠকদের কাছে আজ কম পরিচিত নয়। সাধারণ সাপ্তাহিকের মতো শুধু সাহিত্য-পত্রিকা না হয়ে সাহিত্য ও সংবাদ পত্রিকা রূপে সাপ্তাহিক বসুমতী'র যে বৈশিষ্ট্য গোড়া থেকেই লক্ষণীয়, তা নিশ্চয়ই কল্যাণকর। আজকের কর্ম-বহুল জগতে মানুষের প্রতিদিন জানবার যেমন দরকার আছে নানা তথ্য, তেমনি প্রয়োজন রসাস্বাদনের। তাই এদিক দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা সে অভাব পূরণের কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, বৈকি। সব চেয়ে ভাল লেগেছে—আপনাদের নিয়মিত সংবাদ-তথ্য সম্বলিত 'ফিচার'-গুলো। যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের এমন সাজানো ডালি বিরল। 'আজকের মানুষ' থেকে সুরু ক'রে বিদেশী সমাজ-চিত্রের বিভিন্ন নিবন্ধ 'আজকের যুগো-প্লাভিয়া', 'লণ্ডনের চিঠি' প্রভৃতি, বঙ্গদর্শন, ভারত দর্শন, শহর কলকাতা, আন্তর্জাতিক' প্রতিটি লেখাই যেন প্রতিসংখ্যায় নতুনতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। বস্তুত 'আন্তর্জাতিক' পর্যায়ের নিবন্ধে এমন সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকৃত বস্তুকে তুলে ধরা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যেমন রচনাশৈলী তেমনি প্রতিটি রচনার সঙ্গে বিভিন্ন ছবি, আলোকচিত্র-সংযোজনা পাঠকদের কাছে নতুনের স্বাদ বৈ কি। এই প্রসঙ্গে একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে চাই। জানি, এ সমালোচনার অধিকার আমাদের মতো পাঠকদের আছে। ছবি যতটা ছাপানো হয়—বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণের দিকে নজর রেখে, তা তখনই সার্থক ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে—যদি সে ছবি পরিষ্কার-ভাবে ছাপানো হয়ে থাকে। প্রথম দিকে তো কোন কোন ছবি একেবারে দুর্বোধ্য ছিল। বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও—আরও পরিবর্তনের প্রয়োজন। ছাপানোর দোষে শুধু ছবিই নয়, লেখাও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এর মধ্যে আবার ভাঙা 'টাইপ' সত্যিই বিরক্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

এ সব টেকনিক্যাল দিক ছাড়া আরও একটি ত্রুটির কথা বলতে চাই। লক্ষণীয় যে, আপনারা যতটা সংবাদ-নিবন্ধের দিকে নজর রেখেছেন—ততটা যেন সাহিত্যের দিকে নয়। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, সংবাদ-তথ্য নিবন্ধের চাইতে ছোট গল্পগুলি প্রায়ই রসোত্তীর্ণ হয় না। কবিতা আজও পাঠকচিত্তে একটা বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে বলেই কবিতার মৃত্যু নেই। সেখানে ভাল কবিতা ভালভাবে ছাপানো আশা করি বৈকি। নারায়ণ গাঙ্গুলীর উপন্যাস সুরু করায় ধন্যবাদ! 'ভঙ্গুর মাটির পাত্র' ভাল লাগে নি। বোধ করি এবার ভারসাম্য রক্ষা করবে। আর একটি কথা 'থ্রিলার' একেবারে বন্ধ করতে পারেন—যদি প্রকৃত 'থ্রিলার' না পান। বরঞ্চ আপনাদের বৈশিষ্ট্যমূলক চিন্তা—আরও একটি রসসমৃদ্ধ, সুখপাঠ্য অথচ তথ্যমূলক গ্রাম-বাংলার উপর ফিচার দিতে পারেন। মনে হয় 'শহর কলকাতার' সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাংলার কথা জানানো প্রয়োজন।

তরুণ ভট্টাচার্য
দলগাঁ টি-এষ্টেট, জলপাইগুড়ি।

২৫ নয়া পয়সায় সাপ্তাহিক বসুমতী যা দিচ্ছে তার বেশি চাওয়া সত্যই 'শিশুর চাঁদ চাওয়া'। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাকে কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে তার একটা অর্থনৈতিক দিক আছে সেটা ভুললে চলবে না আমাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আপনাদের আর্থিক ক্ষতি হ'ক এটা আমাদের কাম্য নয়। আশা করি, সকলেই এ বিষয়ে একমত হবেন।

বর্তমানের নিয়মিত বিভাগগুলি ছাড়া আরও কতকগুলির সংযোজন করতে গেলে (পূর্বসংখ্যার আলোচনা অনুযায়ী বিজ্ঞান-বিভাগ, পল্লী-বাংলার কৃষ্টির সংবাদ ইত্যাদি) পত্রিকাটির কলেবর যে বৃদ্ধি করতে হবে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। আর, এর জন্য অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন আরও বেশি বিজ্ঞাপনে পত্রিকাটিকে ভরানো কিংবা মূল্যবৃদ্ধি। আমরা অবশ্য মূল্যবৃদ্ধিকেই শ্রেয় বলে মনে করি। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যার বাংলা অর্থ হ'ল 'দাবী অর্জনের জন্য অধিকার থাকা চাই'। আমরা উপরে উক্ত প্রস্তাব করেই (মূল্য-বৃদ্ধি) তবে জানাচ্ছি কয়েকটি দাবী—ঐ প্রস্তাবই আমাদের তথাকথিত অধিকারের নিরিখ।

নিয়মিত বিভাগগুলি ছাড়া (যাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে হয়ত কিছু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বো এই আশংকায় থেমে থাকছি) পূর্বে জানানো আরও কয়েকটি বিভাগ—যেমন বিজ্ঞান-বিভাগ ও পল্লী-বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ চালু হোক এ আমারও আকাঙ্ক্ষা। আমার চাওয়া আরও কিছু বেশি—প্রতি article-এর শেষে ফুটনোটে মহাপুরুষদের বাণী দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলা (অবশ্য, এটি হবে পাঠকদের উন্নত ও রুচিশীল আনন্দের খোরাক)।

অন্যান্য বহু পত্র-পত্রিকার মত বসুমতীকে দায়িত্বহীন হলে চলবে না। কেন না, বাংলার সমাজজীবনে তার একটা নৈষ্ঠিক দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বের পশরা আপনি মাথায় তুলে নিয়েছেন, তাই সস্তা আমোদের, যেগুলি প্রায়ই কুরুচিসম্পন্ন হয় এমন কোনও ব্যবস্থা করতে বলবো না। তবু গুরুভোজনের সুতৃপ্তির জন্য যেমন চাটনির প্রয়োজন সেরূপ সু-সাহিত্য প্রচারের গুরুদায়িত্বের মধ্যে একটু-আধটু হাল্কা চুটকি জাতীয় রচনা সন্নিবেশের কথা আপনাকে ভেবে দেখতে বলি (সাপ্তাহিক দেশে যেমন থাকে 'ট্রামে-বাসে' বিভাগ)।

'চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না' কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। তাই বহিরঙ্গের নতুন কিছু আহা মরি পরিবর্তন করতে বলি না, তবে সকলের মত আমিও বলি, পত্রিকাটির হরফের পরিবর্তনের কথা। অনেক সময় অনেক বাজে লেখাও পড়তে হয় কেবল তার ঝক্‌ঝকে ছাপার জন্যে। এ বিষয়ে একটু বেশি মনোযোগ দিলে আনন্দিত হব। অবশ্য, রাতারাতি নতুন কিছু করা সম্ভব নয়; তবুও কালক্রমে এ বিষয়ে আমাদের আবেদন পূর্ণ হবে এই আশাই করি।

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
১৮।৪ অক্রূর দত্ত লেন
কলিকাতা—১২।

# খেলা ধুলা

## একই মানুষ দুই রূপ

**শ্রীঅমিতাভ**

মানুষ একই, কিন্তু ভিন্ন রূপ ; দেখেছি তাঁকে ইডেনের অঙ্গনে এক মূর্তিতে, আবার তাঁকেই দেখলাম খেলার মাঠের বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। ক্রিকেট খেলার মাঠে তাঁর চালচলন রাজকীয়। বল হাতে তিনি যেন শাইলক---দিতে চান না একটাও রান, কিন্তু বক্রগতি আর কুটিল স্পিনে ভরা বল ব্যাটসম্যানকে দিয়ে নিতে চান উইকেট। উইলো-দণ্ড হাতে তিনি একেবারে দিল-দরিয়া---ছুটিয়ে দিতে চান রানের ফোয়ারা আর চান প্রতি বলে চার আর দুয়ের বাড়ি মারতে। ফিল্ডিং-এর সময় তিনি শার্দুলসম, হাত থেকে বল গলে না, সময় সময় অসম্ভব ক্যাচ লুফে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। অধিনায়ক হিসাবে তাঁর মত সাফল্য বোধ হয় ক্রিকেট জগতের অন্য কোন অধিনায়ক অর্জন করতে পারেন নি। অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের নেতৃত্বের ভার তরুণ বয়সে কাঁধে নিয়েছেন এবং মর্যাদা রক্ষা করেছেন তাঁর উপর অর্পিত সেই গুরুদায়িত্বের। টেস্ট সিরিজে অপরাজিত অধিনায়ক হিসাবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ক্রিকেট-ইতিহাসের পাতায়। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন, নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দিতে। নাম উল্লেখ না করলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে খেলোয়াড়টি কে? ক্ষারণ বিশ্ব ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় চরিত্র রিচি বেনোর নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

মোহনবাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রীসুশান্ত চৌধুরীর লেক টেরেসের বাড়িতে রিচি বেনোর সঙ্গে আগামী ইঙ্গ-অষ্ট্রেলিয়া এ্যাসেজ যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু আলাপ-আলোচনার সুযোগ হল। সুশান্তদা' একজন সত্যিকারের Sportsman. খেলার মাঠ থেকে

● রিচি বেনো

অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এখনও কলকাতা ক্রীড়াসহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সমধিক পরিচিত। বিদেশী যে কোন খেলোয়াড়ই তাই কলকাতায় আসুন না কেন, সুশান্তদা'র বাড়িতে সুযোগ পেলেই হাজির হন।

কয়েকদিন আগে সোয়ান্টন্ একাদশ কলকাতায় ইডেনে চারদিনের এক প্রদর্শনী খেলা খেলে গেল। বেনো, ম্যাকেঞ্জি, সোবার্স, নার্স এবং আরও কয়েকজন খেলোয়াড় দলের সঙ্গে এসেছিলেন। এই প্রদর্শনী খেলার শেষ দিন সন্ধ্যার সময় সুশান্তদা'র বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। অল্প অল্প বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সুশান্তদা'র সঙ্গে যখন বসবার ঘরে গেলাম রেডিওগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে, একদিকে বসে আছেন বৌদি আর সুশান্তদা'র ছোট্ট মেয়ে আর অন্যদিকে বসে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিচি বেনো আর ইংলবী ম্যাকেঞ্জি। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও জানলার ধারে ফুটপাথে বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমে গিয়েছে বেনোকে দেখার জন্যে। লক্ষ্য করলাম যে দর্শনার্থীদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশি।

সুশান্তদা' বেনোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বেনোকে বললেন---'ইনি আগামী ইঙ্গ-অষ্ট্রেলিয়া এ্যাসেজ যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চান।'

বেনো সেদিন সোজাই প্রায় খেলার মাঠ থেকে সুশান্তদা'র বাড়িতে এসেছেন। সারাদিন ব্যাট করে খুবই পরিশ্রান্ত, কিন্তু একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। খুবই উৎসাহভরে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, রিচি বেনো নিজেও একজন ক্রীড়া-সাংবাদিক।

বেনো সুরু করলেন---'ইঙ্গ-অষ্ট্রেলীয় এ্যাসেজ যুদ্ধ সারা পৃথিবীর ক্রিকেট মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগায় জানি। তবে দলীয় শক্তি দেখে মনে হয় এ্যাসেজ এবার অষ্ট্রেলিয়াই জিতবে।'

কথা বলতে বলতে বেনোর যেন মুহূর্তের জন্য কেমন একটু ভাবান্তর হল, মনে হল তিনি ইংলণ্ডগামী অষ্ট্রেলিয়া দলে না থাকলেও মন তাঁর

**ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে চলেছে।** ইংলণ্ডী ম্যাকেঞ্জি হ্যাম্পসায়ারের ক্রিকেট অধিনায়ক এবং ইংলণ্ডের লোক---বেনোর কথা শেষ হতে না হতেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন---'এবার কিছুতেই আমরা অষ্ট্রেলিয়াকে এ্যাসেজ নিয়ে যেতে দেব না'---বলেই তিনি পরিহাসচ্ছলে বেনোর দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করলেন।

প্রত্যুত্তরে বেনোও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বললেন---'শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে এ্যাসেজ ছিনিয়ে নেওয়া অত সোজা ব্যাপার নয়।'

আমি বেনোকে জিজ্ঞাসা করলাম---'আপনারা বোলিং আক্রমণধারা রচনায় স্পিন অথবা ফাস্ট বোলিং কোনটির ওপর নির্ভর করছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বেনো বললেন---'কোন একটি বিশেষ বোলিংকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি না এবার। তবে আমাদের দলে দুই ধরণেরই ভাল বোলার আছে। এবারের সফরে অলরাউণ্ডারদের সাফল্যের ওপরই আমাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। কথা প্রসঙ্গে বললেন---'এবার ইংলণ্ড সফররত বোলারদের মধ্যে সকলেই প্রায় তরুণ এবং নবাগত। ইংলণ্ডের উইকেট সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও আশা করা যায় যে, তাঁরা ভালই ফলাফল প্রদর্শন করবেন।'

অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই হেসে উত্তর দিলেন---'ববি সিম্পসন তাঁর যোগ্যতা এর মধ্যেই প্রমাণ করেছেন। অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব মাথায় থাকলে স্বাভাবিক ক্রীড়াপ্রতিভা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সেটা ব্যক্তি বিশেষের নার্ভের ওপর নির্ভর করে।'

তুলনামূলকভাবে কোন্ দেশের ব্যাটিং শক্তি শ্রেষ্ঠ এবং অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং শক্তি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি কৌশলে এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

আলাপ-আলোচনার শেষে জানালেন, আবার তিনি ভারতবর্ষে আসবেন অক্টোবর মাসে অষ্ট্রেলিয়ার খেলার সময়। যখন তিনি করমর্দন করলেন, অনুভব করলাম তাঁর মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁয়াচ। তিনি চলে গেলেন, বাইরের সমবেত লোকেরা বেনোর নামে জয়ধ্বনি দিল। হ্যাঁ জয়ধ্বনি দেবার মত লোকই বটেন। ভাবলাম খেলার মাঠের রিচি বেনো আর এখানে যে বেনোকে দেখলাম

● কৃষ্ণাণ

মানুষ একই, কিন্তু কত যে তফাৎ না দেখলে, না মিশলে ঠিক বোঝা যায় না।

## কলকাতার জয়জয়কার

প্রথমেই অভিনন্দন জানাই বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগান এবং বিজিত কাস্টমস দলকে। এই দুই দলের বিজয় গৌরব শুধু দলীয় নয়; এই জয় সারা কলকাতার, সারা বাংলার। সর্ব-ভারতীয় ফুটবল আসরে বাংলা উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে হকিতে কলকাতা ময়দানে ভিনদেশি ভাড়াটে খেলোয়াড়ে জমজমাট। এদের আগমনে বাংলার হকির দৈন্যদশা ঘুচেছে এবং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাংলার হকি মানেরও যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে। তবে কলকাতা ময়দানে বর্তমানে হকি ঠিক যেভাবে সমাদৃত হচ্ছে, সারা বাংলা দেশেও ঠিক অনুরূপভাবে হকির প্রসার দরকার, অন্যথায় বাংলা হকির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ রুদ্ধ।

গোল্ড কাপে কাস্টমসের কৃতিত্বই সকলকে অবাক করে দিয়েছে। গতবারের বাইটন বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেল এবং গতবারের গোল্ড কাপ বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিশের মত শক্তিশালী দলকে ঘায়েল করে কাস্টমস ফাইন্যালে উঠেছে; অবশ্য ফাইন্যালে তাকে মোহনবাগানের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। গোল্ড কাপের পর আগা খান কাপের খেলা সুরু হয়েছে বোম্বাইয়ে। কলকাতার দুই দল ইস্টবেঙ্গল এবং কাস্টমস পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছে। মোহনবাগান সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

## অবিচার

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাণ ইউরোপ এবং উইম্বলডেন সফরকারী দল থেকে বাদ পড়লেন। ভারতীয় টেনিসের উন্নতির মূলে যে খেলোয়াড়টি, সেই খেলোয়াড়টির প্রতি সত্যই অবিচার করলেন ভারতীয় লন টেনিসের কর্মকর্তারা। বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে ভারতের পতাকা বহন করেছেন কৃষ্ণাণ এবং তাঁর ওপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্বের মর্যাদাও তিনি রক্ষা করেছেন। এবার ভারতীয় লন টেনিস সংস্থা কৃষ্ণাণকে ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তিগত কাজে কৃষ্ণাণের পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কৃষ্ণাণের প্রতি টেনিস সংস্থার পরিচালকদের আচরণ চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ !

# হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

## হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার চাঞ্চল্যকর কাহিনীগুলি পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা এ তথ্যে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে হতবাক হয়, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যজ্ঞের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। খুদিরামের কীর্তি, ৫। খেলা দেওগে ভেলা পাওগে, ৬। খুড়োর কামধেনুরালী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্কলন—চাষি ও খিল, একরাত্রি মাটি, জোয়াই বাড়ী, ছেলেখেলায় একাদশ ও বন-বাদাড়। ৮। ভৌতিক কাহিনীর সঙ্কলন—এক রাতের ইতিহাস, কঙ্কাল সাথি, বিজয়ার প্রণাম, কাবকাটা হাত, শয়তান, ভেলাকির হমকী, ভূতের রাজা, শয়তানী জামা। ৯। নতুন বাংলার প্রথম কবি, ১০। জগন্নাথের ওপ্তকথা, ১১। হাঙরটের টাকার পাহাড়।

**মূল্য তিন টাকা**

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

—যৌনশাস্ত্র ও যৌনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা—

।। জটিল প্রশ্নগুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ ।।

●● পাঁচটি খণ্ডে গভীর তত্ত্ব ও প্রচুর তথ্যের অভাবনীয় সমাবেশ ●●

অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

# যৌন মনোবিশ্লেষণ

( নরনারীর দেহমনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ )

দ্বিতীয় খণ্ডে : বয়ঃসন্ধি—মূল্য ৪·০০ ॥ তৃতীয় খণ্ডে : কামাবেগের বিশ্লেষণ—মূল্য ৩·০০ ॥ চতুর্থ খণ্ডে : প্রেম ও পীড়া—মূল্য ৪·০০ ॥ পঞ্চম খণ্ডে : কামাবেগের নিয়ত কালিকলের ব্যাপারসমূহ—মূল্য ৪·৫০ ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম, সর্বাঙ্গীণ, নিরপেক্ষ আলোচনা

# রবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

১৩ খানি দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত

মূল্য ১ টাকা ৫০ নয় পঃ মাত্র

সাহিত্য-আনন্দরসের মূর্তিমান বিকাশ

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় সর্বরসের পরিবেশ

একাধারে বিশ্বপ্রথিত-কীর্তি নাট্যকার,

সর্বজনসম্মোহন ঔপন্যাসিক—

## রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—নরমেধ যজ্ঞ, বলদীপ, বজ্রশৃঙ্গ, চতুরালী, চক্রাবলী, প্রফুল্ল চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে মালিনী, বনজীর বদরে মুনির, নয়না-সন্ন্যাসী। মূল্য ১৲ টাকা।

২য় ভাগে—কিরণময়ী, হরিষের লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, টাটকা-বোটকা, বঙ্গভূষণ, যেমুনে বাঙালী বিবি, জজ, সাময়িক কবিতা। চখানি প্রেমলীলাহার। মাত্র ১৲ টাকা।

বিখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ— মূল্য ৩৷৷০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দের

## শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণস্তোত্র-রত্নাকর ৷৷০

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-পূজাপদ্ধতি সম্বলিত )

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মদিরা

( ১ম ভাগ )—১৲ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## নির্ব্বাণ ১৷০

## ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ১৷০

বিপিনবিহারী মিত্রের

## সোরাব ও রুস্তম ১৷০

( অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনূবাদিত )

লোকনাথ ভট্টাচার্য্যের

## আয়ুতি ১৲

সংসারত্যাগী রাজর্ষি কবি ভর্তৃহরির

## শান্তিশতকম্

( তীব্র বৈরাগ্যের শান্তিস্তব )

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Thursday, 30th April
Price : 25 nP. GRAM : "BASUMATI" PHONE : [illegible]

1 MAY 1954

# See India by Ambassador !

Our country abounds in natural riches which invite appreciation and exploration. The Ambassador provides easy access to ideal spots for holidaying, picnicking, camping, hiking, and every avenue leading to closer contact with nature. Designed as a family car, it carries upto six adults in relaxed comfort, plus ample luggage in its spacious boot. O.H.V. engine power, combined with a sturdy build, ensures fast and dependable performance at a modest fuel consumption. It is the ideal vehicle for enriching the experience and expanding the horizons of you and your family!

## HINDUSTHAN Ambassador

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA

AUTHORISED DEALERS

• INDIA AUTOMOBILES (1960) LTD., 12, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • HINDUSTAN AUTO DISTRIBUTORS, 17, Govt. Place East, Calcutta (for Calcutta & 24 Parganas) • WALFORD TRANSPORT LTD., 71, Park Street, Calcutta (for other Districts of West Bengal)

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

"জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ"

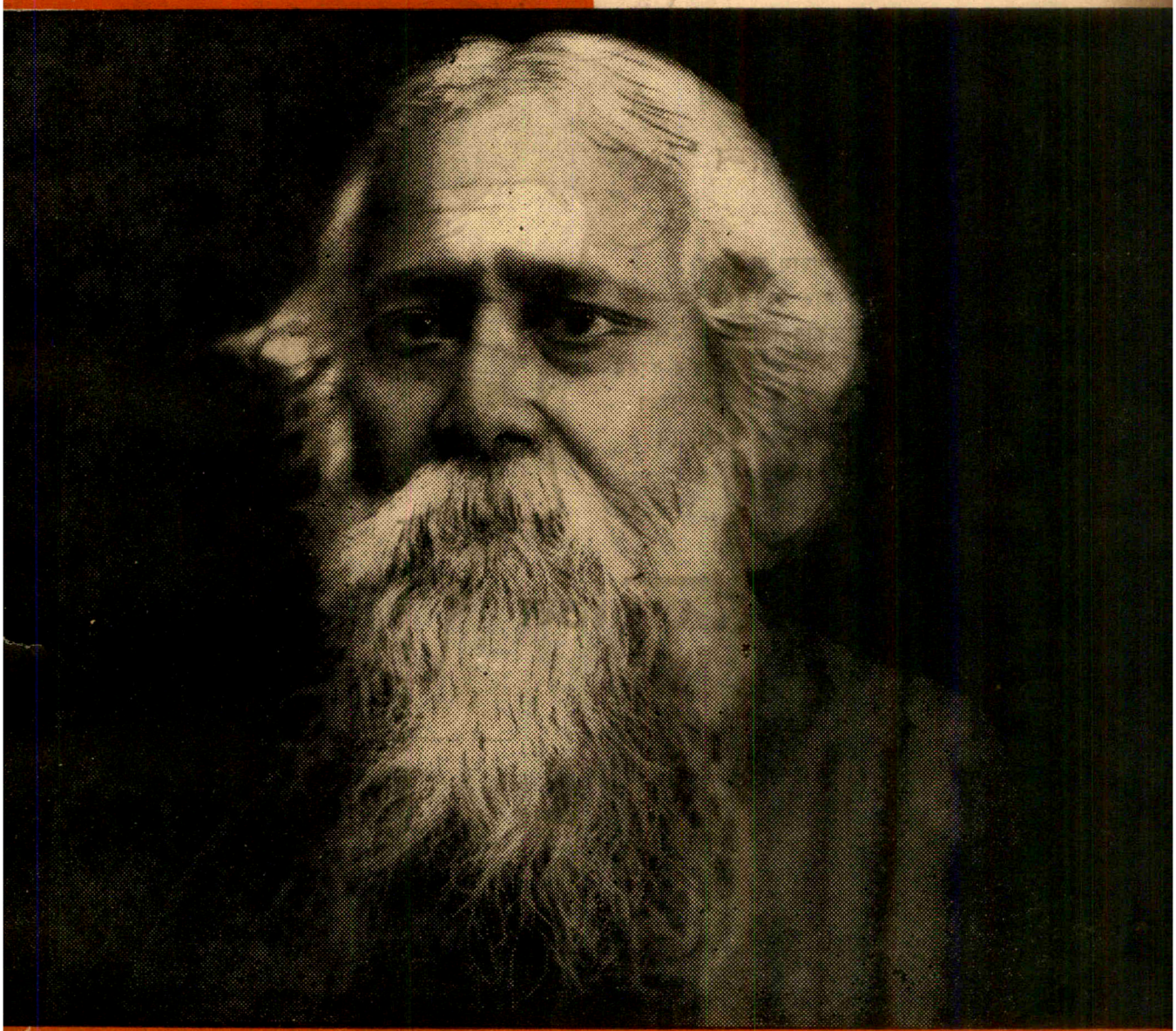

৮ বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 7th May, 1964 • Vol. 68, No.

ত্বকের মসৃণতা ও
কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিন সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

'যুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

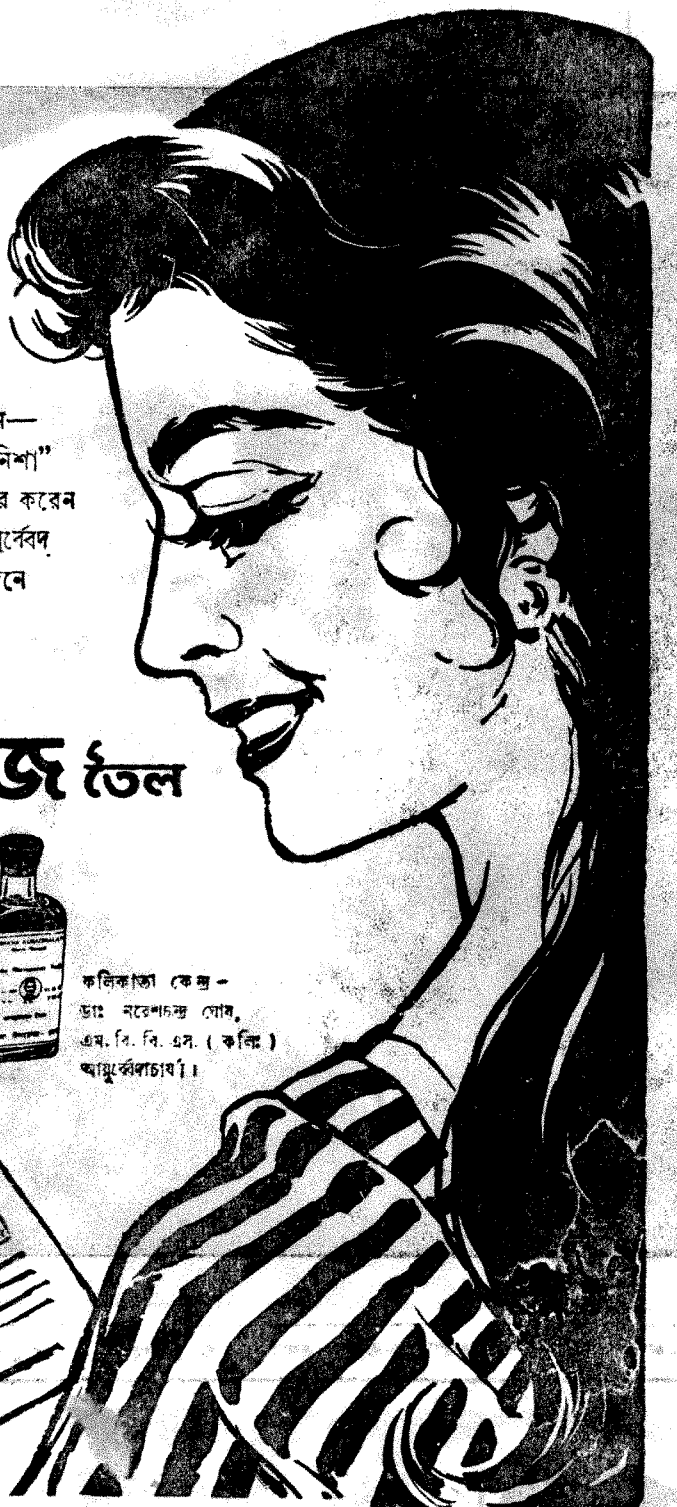

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

অধ্যাপক শ্রীগোবেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি.)
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

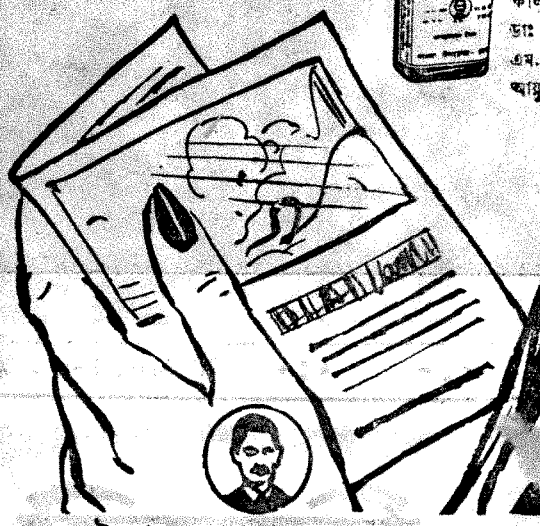

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
·003/3·
Sn.68
৩০.50


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৭৫৫ |
| আজকের মানুষ | হরপ্রসাদ মিত্র | ২৭৫৬ |
| অমৃতময় পুরুষ | সুধীরঞ্জন দাস | ২৭৫৭ |
| রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ | সুশীল রায় | ২৭৬১ |
| রাজস্থান ও রবীন্দ্রনাথ | সুশীলকুমার গুপ্ত | ২৭৬৪ |
| রবীন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্র | ধীরেন দেবনাথ | ২৭৭০ |
| কবিচিত্তে উজ্জয়িনী | তরুণ মৈত্র | ২৭৭৪ |
| ত্রিপুরায় কবি-স্মৃতি | সত্যব্রত চক্রবর্তী | ২৭৭৭ |
| রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপ্রদেশ | আদিত্য ওহদেদার | ২৭৮৩ |



## বিদ্যোদয়ের বই

প্রকাশিত হল

সুধীর করণের

### অরণ্যগুরু ৪·০০

ইংরাজ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের আদিবাসীদের সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন॥

গ্রাম-বাংলার ঘেটে-খাওয়া মানুষের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের অনবদ্য রূপায়ণ

গুণময় মান্নার উপন্যাস

### লখীন্দর দিগার ৫·০০

শিশির সরকারের উপন্যাস

### গিরিকন্যা ২·৫০

ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম আরণ্যপথে পলাতক বাঙালী যুবক শায়লা দাজু ও তার সঙ্গে ভুটানী মেয়ে শায়লীর যাত্রার পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এ গ্রন্থের রোমহর্ষক ও সেইসঙ্গে প্রেমমধুর কাহিনী।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিশ্বসাহিত্যের অমর গ্রন্থ

### চাহার দরবেশ

এ বই একবার পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না।

অনুবাদ ঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সদ্য ও অধুনা প্রকাশিত

ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের

### রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০·০০

"...এ গ্রন্থ থেকে পাঠক শিক্ষা-বিধায়ক রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য পরিচয় লাভ করবেন।" পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ॥

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

### নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১৩·০০

সুপ্রাচীন কাল থেকে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে যত কিছু রচিত ও আলোচিত হয়েছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যে বিরাট এই গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ॥

'যুবনাশ্ব' মনীশ ঘটকের

অসাধারণ উপন্যাস

### কনখল ৭·০০

হিন্দুর ছেলে কনখল, আর মুসলমান তরুণী আয়েষা। ভাল যদি তারা বেসেছিল একে অপরকে, তবু পেয়েছিল কি তারা পরস্পরকে?

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস

### মধুমিতা (২য় সংস্করণ) ৬·০০

### জীবনে প্রথম প্রেম ৪·৫০

* পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন

## বিশেষ ঘোষ

কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে ৬ই মে ১৪ই মে ১৯৬৪ পর্যন্ত আমাদের প্রব... উপন্যাস, প্রবন্ধ, কিশোর সা... জনশিক্ষা সাহিত্য জাতীয় সকল বাংলা ও ইংরাজী পুস্তকে সাধারণ ক্রেতাগণকে আমাদের কাউন্টারে শতকরা ১২½ কমিশন দেওয়া হইবে।

নারায়ণ চৌধুরীর

### সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০

সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত ষোলটি যুক্তিনিষ্ঠ ও চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধের সংকলন।

মোহিতলাল মজুমদারের

### সাহিত্য-বিতান ৯·৫০

নেপাল মজুমদারের

### ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রথম খণ্ড ১০·০০

এ গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রবীন্দ্র-জীবনের এমন একটি দিক, যে দিকটি অনেকের কাছেই হয়তো অজ্ঞাত।

বেদুইনের উপন্যাস

### যশাইতলার ঘাট ৩·০০

### পথে প্রান্তরে ঃ প্রথম পর্ব ৩·৫০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

### মঞ্চমায়া ৩·৫০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড • ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আসাম ও রবীন্দ্রনাথ | সতীন্দ্র ভৌমিক | ২৭৮৭ |
| রবীন্দ্রনাথ ও গুজরাট | সুভাষ সমাজদার | ২৭৯১ |
| রবীন্দ্রনাথ, কাশ্মীর ও একটি কবিতা | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ২৭৯৬ |
| ভারতপুরুষ ( কবিতা ) | দুর্গাদাস সরকার | ২৮০০ |
| রবীন্দ্রনাথ ( কবিতা ) | মৃত্যুঞ্জয় মাইতি | ২৮০০ |
| রবীন্দ্রনাথ ও পাঞ্জাব | নকুল চট্টোপাধ্যায় | ২৮০১ |
| উড়িষ্যা পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ | শিবানী চট্টোপাধ্যায় | ২৮০৪ |
| রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় | অশোক সেন | ২ ১২ |
| রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রচিন্তা | কল্পতরু সেনগুপ্ত | ২৮১৪ |
| মাদ্রাজে রবীন্দ্রনাথ | হরেন ঘোষ | ২৮১৭ |
| রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা | নির্মল বসু | ২৮১৮ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৮২৩ |


**প্রচ্ছদপট :** ১৯১৬ সালে টোকিওতে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ছবিটি শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।


মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত
**বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭৲**
সুভাষচন্দ্র বসুর
**তরুণের স্বপ্ন ২॥০ নূতনের সন্ধান ২৲**

গোপাল ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস
**শেষ প্রদীপ শিখা**
চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস
**জবানবন্দি ৬॥০**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**রবিবারের আসর ৩৲**
**ভুবনপুরের হাট**
( নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে )
জগদীশচন্দ্র ঘোষের নূতন উপন্যাস
**শহীদ ৫॥ যাত্রিদল ৬॥**

তপতী রায়ের উপন্যাস
**একটি সোনা মন ৬৲**
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সদ্য প্রকাশিত
**মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫॥০**
সুমথ ঘোষের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
**মেঘ ভাঙা রোদ ৫॥০**
অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ
**সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫॥০**
হাইকোর্ট আদালতের আপিলায় অভিযুক্ত
আসামীদের জীবনালেখ্য
চিত্রগুপ্তের
**এরা অভিযুক্ত আসামী ৩॥০**

অভিমাত্রীর উপন্যাস
**স্মৃতির মুকুর ৬·৫০**
অনির্বাণ শিখা ৫৲
নষ্টচন্দ্রের আলো ৬৲
পূর্ণচন্দ্র শুঁই-এর উপন্যাস
পথ হতে পথে ৩৲
প্রবোধ সান্যালের
গল্প সঞ্চয়ন ৪৲ বন্দী বিহঙ্গ ৩॥
এক বাণ্ডিল কথা ৪৲ জনতা ৩৲
প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস
লাল পাথর ৩৲ সমান্তরাল ৩॥
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
ঋণশোধ ৩॥ স্মৃতি ৩৲
রামপদ মুখোপাধ্যায়
দুরন্ত মন ৩৲ মাটির গন্ধ ৪৲
মনকেতকী ৬৲
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫॥

**রবিবারের আসর ৩৲**
**ভুবনপুরের হাট**
( নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে )
জগদীশচন্দ্র ঘোষের নূতন উপন্যাস
**শহীদ ৫॥ যাত্রিদল ৬॥**
আশুতোষ মুখো—জানলার ধারে ৪৲
বনফুল—উজ্জ্বলা ৩॥
বিভূতি মুখো—আনন্দ নট ৩৲
শক্তিপদ রাজগুরু—বনমাধবী ৩॥
আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩॥
সত্যব্রত মৈত্র—বনদুহিতা ২॥
মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩৲
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য—আতপ্ত কাঞ্চন ৩৲
বেলা দেবী—জীবন তীর্থ ৩৲
অখিল নিয়োগী—বহুরূপী ৩৲
বামাপদ ঘোষ—আমার পৃথিবী ভূমি ৩৲
প্রভাবতী দেবী—উদয় অস্ত ২৲
বিমল কর—দিবারাত্রি ৩৲
গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪৲
সুবোধ চক্রবর্তী—একটি আশ্বাস ৬৲
রাজকুমার মুখো—শয়তানের জলা ২৲
তারকদাস চট্টো—কুমারী ধরম ৫৲
কৃশানু বন্দ্যো—কালো চোখের তারা ৩॥

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২৯৮৪**

সাপ্তাহিক
বসুমতী
সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৬৮ বর্ষ, ৫০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ২৪শে বৈশাখ ১৩৭১

25 Naya Paise
Thursday, 7th May 1964

# পঁচিশে বৈশাখ

প্রতি বছরই আসে পঁচিশে বৈশাখ। এই শুভদিনটিকে কেন্দ্র করে আমাদের আশা-উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। বছরের অন্য দিনগুলি থেকে এ দিনটির পার্থক্য কোন্‌খানে, এই পুণ্যদিনে আমরা কোন্ মানসতীর্থে অবগাহন করে নবজীবনের প্রারম্ভে কোন্ নতুন পথে পদচারণা সুরু করি—তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। পৃথিবীর যাবতীয় ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় পঁচিশে বৈশাখ চিরন্তন হয়ে বিরাজ করবে, আর বিশ্বমানব বছর পরিক্রমান্তে এই তারিখেই দেখবে কবির মানস-চিন্তার দর্পণে প্রতিফলিত আপনার মুখ। যুগে যুগে এই দেখার যেমন শেষ নেই, নিঃশেষে তেমনি কবির কাব্য-গানের অমৃতরসে ভরে উঠবে মানুষের পিপাসার্ত চিত্ত।

কবির জন্মদিনে আমরা উৎসব করি, আড়ম্বরে মত্ত হই, কিন্তু কবির অনুচিন্তাকে আমরা হাতেকলমে কাজে লাগাতে পারি নি। কবির জন্মদিন আমাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনি পরীক্ষার দিনরূপে গণ্য হতে পারে—যদি বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে কবির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা প্রতিদিনের কর্মে লিপ্ত হই। মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, শ্রমিক বা কৃষক—যে যাই হোক না কেন—কবির কাব্য-রসাস্বাদনে সকলেরই সমান অধিকার। কিন্তু দুঃখের কথা কবির রচনাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য ক্ষেত্রেও যে রসজ্ঞ থাকতে পারেন—সে সন্ধান আমরা কতটুকুই বা করেছি? পঁচিশে বৈশাখে নাটক ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু লোক হয়তো যোগদান করেন—কিন্তু তদ্দ্বারা রবীন্দ্র-অনুভাবনার কি পরিমাণ প্রসার ঘটে, তাও আমাদের জিজ্ঞাস্য। অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষার দশাও শোচনীয়। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য-ভাবনাকে প্রসারিত করার জন্য কোনো পরিকল্পনা যদি বা গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা আমাদের মতো প্রায় অশিক্ষার দেশে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেন না, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ যদি গ্রহণক্ষম না হয়, তাহলে শুধু রবীন্দ্রচর্চা করেই বা কি ফল লাভ হবে? কেন না পরিবেশ-প্রভাবেই চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটে। তাই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উদার, উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে কবি বলেছেন,—

"আমার আদর্শ ছিল এই—শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হতে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক নির্বস্তুক কিছুতে পরিণত হওয়া তার উচিত নয়।"

রবীন্দ্রনাথ মানুষের শিশুজীবন থেকেই তাকে এমন পরিবেশের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে শুধু ক্লাসের শিক্ষাই নয়, সাহিত্য, সংগীত ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। কিন্তু সেই পরিবেশ আমরা কি সৃষ্টি করতে পেরেছি? যে উদাহরণ তিনি দেখিয়ে গেছেন—তাকে কি ব্যাপক করে তুলতে পেরেছি? নির্মম হলেও একথা সত্য যে, আমরা মুখে সেকথা বার বার বললেও কাজে কর্মে তা করে উঠতে পারি নি। ঐ কারণে রবীন্দ্রনাথের সত্যকে আমরা আজো সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি নি; ব্যাপক হয়ে ওঠে নি তাঁর আদর্শ। পঁচিশে বৈশাখে সে আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়ে যেন বলতে পারি:

"যাত্রা হল সুরু।"

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

সময়ের আবর্তে বার বার পঁচিশে বৈশাখের শুভ পুনরাবৃত্তি! কিন্তু কবির আয়ুর হিসেব কেবলি কি বর্ষচক্রের আবর্তনে পরিমেয়? রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের কবি। মানুষের ভাব, ভাবনা, আশা, আশংকা, প্রেম, অপ্রেম—সমস্ত চিত্তাবস্থার মধ্য দিয়ে যে-পথ অনন্ত থেকে অনন্তের দিকে অগ্রসর, তিনি আমাদের সেই পথের পথিক। সে পথ চিরকালের পথ।

আমরা প্রত্যেকেই এই চিরবিস্তারে বিদ্যমান। এখানে বিচিত্রতার অন্ত নেই। তবু এর গভীরে এক সুনিশ্চিত ঐক্যেরই চিরসত্য! এই বিচিত্রতা আর একতা,—এই বহু আর এক,—বিবিধতা এবং অদ্বৈতবোধ,—এ সমাবেশ একালের মননে সমাগত।

আজ থেকে প্রায় তিপান্ন বছর আগে,— ১৩১৮ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবল প্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে, তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত?'

১৩১৯-এর আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না—কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে—কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।'

অর্থাৎ স্থিতিতে-গতিতে, ঐক্যে-বিভিন্নতায় মিলেমিশে মানুষের জীবনসত্যের এই অনন্যতা! এই মানবস্বভাবের স্বাধীনতার কবি তিনি।

তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকে এই স্বাধীন মানবাত্মার ঋণ শোধের কথা আছে। জীবনে কর্ম ত্যাগ করে, তপস্যায় ফাঁকি দিয়ে পরিত্রাণ মেলে না। সন্ন্যাসী বলেছিলেন—'আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন?···আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। ···কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।'

কিন্তু সংসারের রোগ-শোক-গ্লানি-অক্ষমতার খর্বতা কি সন্ন্যাসীর এই সান্ত্বনায় ভোলা যায়? লোকসাধারণ কি সে সৌন্দর্যের অধিকারী?

রবীন্দ্রনাথ এ-প্রশ্নেরও অকুণ্ঠ জবাব দিয়ে গেছেন। লিখেছেন —'যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে— রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু, সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক—যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারও আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না।'

এ তাঁর ১৩২১ সালের আত্মচিন্তা—'সাহিত্যের পথের 'বাস্তব' প্রবন্ধটির মন্তব্য। এর ইঙ্গিত গভীর। বলা বাহুল্য, লোক-সাধারণের বৃহৎ বৈচিত্র্য তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। তিনি আমাদের জীবনের বাস্তবতা উপেক্ষা করেন নি। মানুষের স্বাধীনতা যেখানেই বাধা পেয়েছে, সেখানেই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ শোনা গেছে। কিন্তু সাহিত্যকে তিনি কখনোই সংসারের আর-পাঁচটা দল বা সংঘ বা চক্রের চর্চা বলে মানেন নি।

পৃথিবীর নানা জনতার সমারোহে এক-এক দেশের সাহিত্য যেন এক-এক বিশেষ মনোগতির ঢেউ। রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত সেই বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলার সঙ্গে,—ভারতবর্ষের সঙ্গে এইখানেই বিশ্বের গভীরতম যোগ! পঁচিশে বৈশাখ সেই যোগের অনুভূতিটিকে জাগিয়ে তুলুক। তিনি আমাদের আপন মানুষ,— তবু সুদূরের; তিনি চিরকালের। মনে পড়ে তাঁরই আপন কথা —'সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,—কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।'

হরপ্রসাদ মিত্র

# অমৃতময় পুরুষ

সুধীরঞ্জন দাস

আশ্রমবাসী আমরা সকলেই বছরের ৭ই পৌষ—শুভদিনটির জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকি। সারা বছরের কর্মক্লান্ত দেহমন নিয়ে প্রতি বৎসর এই দিনটিতে আশ্রমের ছাতিমতলার উপাসনা-বেদীমূলে মিলিত হয়ে আমরা উৎসব করে থাকি। আমাদের এই উৎসব কিসের উৎসব? কি ধন আমরা আকাঙ্ক্ষা করি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর যদি আমরা পাই তবেই সার্থক হবে আমাদের ৭ই পৌষের এই উৎসব।

আমরা যে অমূল্য মানবজন্ম লাভ করেছি তার একটি সুগভীর ও মহান অভিপ্রায় আছে। মুক্তাত্মা ঋষি বলেছেন যে আমরা সবাই অমৃতের সন্তান—সুতরাং আমরা অমৃতের অধিকারী। অমৃতের পুত্র হওয়াতে অমৃতলাভের অধিকার যেমন আমাদের আছে তেমনি অমৃতলাভের প্রচেষ্টা করবার দায়িত্বও আমাদের স্বীকার করতে হবে। অমৃতময় পুরুষকে জেনে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করবার দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে। জীবনের সেই চরম চরিতার্থতার সন্ধানে আমাদের নিশিদিন যত্নবান হতে হবে। এই সত্যানুসন্ধানই আমাদের জীবনের সাধনা। এই সত্যেরই খোঁজে আমরা সকলে জীবনপথে যাত্রা করেছি সমবিশ্বাসী সহযাত্রী সমভিব্যাহারে। পথ চলায় আনন্দ যেমন আছে তার গতিবেগে শ্রান্তিও তেমনি আসে। পথ চলার উদ্দাম আবেগের ক্লান্তি অত্যধিক হলে আমরা অভিভূত হয়ে পড়তে পারি এবং পথের মাঝে চলৎ শক্তিরহিত হয়ে বসে পড়লে আমাদের তীর্থযাত্রার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদের নিত্য অবহিত হতে হবে যে, পথ চলাটাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পথের শেষে যে তীর্থস্থানটি লক্ষ্য করে আমরা চলেছি সেই গন্তব্য-স্থানে পৌঁছনটাই আমাদের কাম্য। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা অমৃত অনুসন্ধানী পথিক, চলেছি অমরধামের উদ্দেশে।

তীর্থযাত্রী পথিক দিনান্তে যখন শ্রান্ত-দেহে ক্লান্তমনে একটি যাত্রীনিবাসে

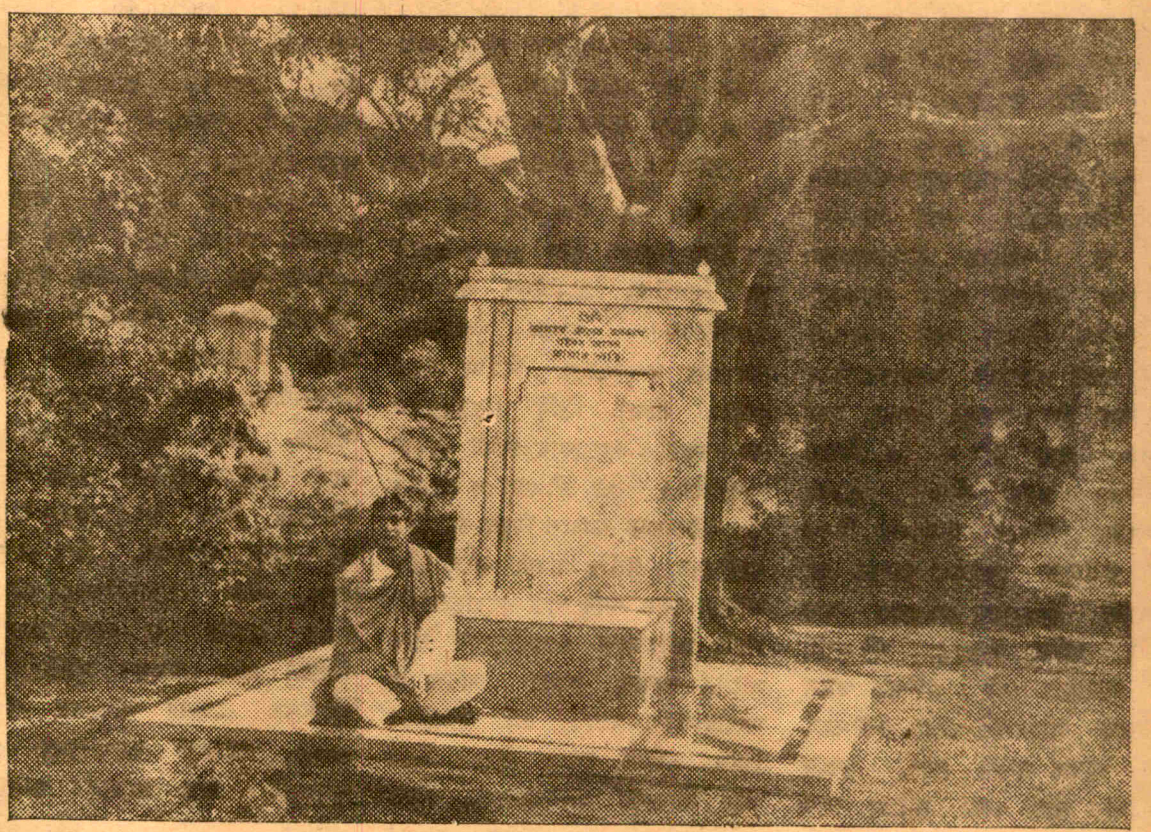

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

পৌঁছে তখন সে কুব্জদেহকে সিধে দাঁড় করিয়ে পেছন ফিরে দেখে কতখানি পথ চলা হোলো এবং পরক্ষণেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আরো কতখানি পথ চলতে হবে। আমরাও সেইরকম ৭ই পৌষ সারা বছরের পথ চলা শেষ করে আর একটি নতুন বছরের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়াই। একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সুদূর এক গন্তব্যস্থান লক্ষ্য করে আমরা গেল বছরের উৎসবান্তে রওনা হয়ে আর এক উৎসবদিনে এসে উপনীত হই।

৭ই পৌষ আমাদের ফিরে তাকাবার দিন। এই দিনে শান্ত শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে ভেবে দেখতে হয় যে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথে ঘুরে মরেছি, না, সত্য পথেই চলেছি। যদি আমরা বিপথগামী হয়ে থাকি তবে পেছনে ফিরে গিয়ে প্রশস্ত পথ খুঁজে নিয়ে আবার আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে। ভুল পথে এগিয়ে গেলে ত চলবে না। সে চলা ত আমাদের মহতী বিনষ্টির মধ্যেই নিমজ্জিত করে মৃত্যুর অন্ধকারে লুপ্ত করে দেবে। সেই শোচনীয় মরণ ত আমাদের মনুষ্যজন্মের স্বাভাবিক পরিণাম নয়। আমাদের সত্যাদর্শকে জীবনে লাভ করতেই হবে। তাই এদিনেই আমাদের ফিরে তাকাবার দিন। কতদূর এলাম, ঠিক পথেই এলাম কি না এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার দিন। তারপর আমাদের সামনে তাকাবার দিনও ৭ই পৌষেই আসে। জানতে হয় আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আর কতটা বাকি আছে। যদি জানি যে আমাদের সেই ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছতে আর বেশি দেরী নেই তবে মনে আশার সঞ্চার হবে, হৃদয়ে বল লাভ করব এবং মাভৈঃ রবে আবার আমরা নিঃসংশয়ে যাত্রা সুরু করতে সক্ষম হব। এই ফিরে চাওয়া এবং সামনে তাকানর জন্যে দরকার হয় কর্মবিরতি এবং এই কারণেই উৎসবের প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। এই জন্যেই আমরা প্রতি বছর এই পুণ্যদিনে উৎসব করে থাকি।

কিন্তু সকলে একত্র মিলিত হয়ে ধূপধুনো জালিয়ে ফুল দিয়ে বেদী সাজালেই ত উৎসব করা হয় না। উৎসব আমাদের অন্তরের জিনিষ। আমাদের প্রত্যেকের মনের নিভৃত মন্দিরে উৎসবের মঙ্গলদীপটি যদি জালাতে পারি তবেই আমাদের সত্যিকারের উৎসব হবে—সফল হবে আমাদের একত্র মিলন। নইলে শুধু প্রাণহীন নিয়মরক্ষা করাই হবে—তাতে আমরা ভবিষ্যতের জন্যে কোন প্রেরণাই পাব না। সত্যিকারের উৎসব সম্ভব হবে যদি আমরা ৭ই পৌষের উৎসবের মর্মনিহিত তাৎপর্যটিকে সত্যভাবে পুনরুপলব্ধি করে মনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। তাই এ দিনেই আমাদের হৃদয়ে আশা ও মনে বল সঞ্চয় করে আবার পথ চলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে।

আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে ৭ই পৌষ যে কত বড় দিন তা আমাদের অনুক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে। এই দিনটিতে মহর্ষিদেব সত্যলাভ করেছিলেন। আপন আত্মাকে পরমাত্মায় সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেবার দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন বহু বছর আগেকার এমনই একটি পুণ্যদিনে। এই দীক্ষার যে তাৎপর্য তা গুরুদেবের ভাষণে বিধৃত রয়েছে। মহর্ষিদেব গভীর সাধনা করে তাঁর জীবনে পরমা শান্তি লাভ করেছিলেন। তিনি ভগবানকে জেনেছিলেন তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি বলে। এই দিনটিতে তিনি মুক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর জীবনের পরম দেবতার হাতে নিজেকে নিঃশেষ করে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর পদচ্ছায়ে চির-আশ্রয় দিয়েছিলেন। মহর্ষিদেব এই দিনটিতে মঙ্গলময় বিধাতাকেই চিরবন্ধু চিরনির্ভররূপে হৃদয়ে বরণ করেছিলেন। এইখানেই উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্মল আকাশের চন্দ্রাতপতলে মহর্ষিদেব তাঁর ধ্যানের আসনটি বিছিয়েছিলেন আজ হতে শতবর্ষ আগে। বড় পুণ্যময় এই দিন। ছাতিম-তলার পবিত্র উপাসনা-বেদীটি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের হৃৎপিণ্ডের প্রতীক। সেখান থেকেই আমাদের আশ্রমের প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হচ্ছে বিগত শতবর্ষ ধরে। সেই প্রাণধারাকে জরা, মৃত্যু বিনাশ করে নি। আমাদের অযোগ্যতা, অক্ষমতা বা অকর্মণ্যতা তাকে খর্ব করতে পারে নি—ম্লান করতে পারে নি। মহর্ষিদেবের দীক্ষার হোমানল সেখানে শতাধিক বর্ষ ধরে আপন আলোকেই উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত রয়েছে এবং আশ্রমবাসী সকলকেই শুদ্ধ ও পবিত্র করে রেখেছে।

মহর্ষিদেবের সাধনালব্ধ সত্যকে গুরুদেব ভক্তির সংগে গ্রহণ করে শান্তিনিকেতন আশ্রমেই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ আরম্ভ ও সুসম্পন্ন করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতৃদেবের ধ্যানের আসনতলে নিজের জীবন দিয়ে মঙ্গলদীপটি জালিয়ে বসে নিভৃতে তপস্যা করে নীরবে নিজেকে দান করে গেছেন। তাঁর ধর্মজীবনের উদ্দীপনা, তাঁর দেশাত্ম-বোধ, তাঁর বিশ্বমানবিকতার প্রেরণা তিনি দেশের ও দশের কল্যাণে বিতরণ করে গেছেন। দুইটি মহৎ জীবনের সাধনায় আমাদের আশ্রম একটি শান্তিপূর্ণ তপোবনের মত পুণ্যভূমি হয়ে রয়েছে। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি যে শান্তিনিকেতন আর সে শান্তিনিকেতন

নেই। তা নেই। কিন্তু শিশু চিরকালই শিশু থাকে না, সে ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। তার চেহারার কিছুটা পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তত করে আশঙ্কার কোনো হেতু থাকে না যদি সেই পূর্ণবয়স্ক মানুষটির মধ্যে সেই শিশুটির অনাবিল চরিত্র ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি বজায় থাকে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাকৃতিক চেহারার বদল হয়েছে সন্দেহ নেই। এককালের কঙ্করময় মরুভূমি আজকে তরুলতা সুশোভিত উদ্যানে পরিণত হয়েছে। সে উন্মুক্ত প্রান্তর আর নেই। সুবৃহৎ অট্টালিকাগুলিতে আমাদের দৃষ্টি এখন অবরুদ্ধ। কিন্তু এই বাহ্যিক বেশ পরিবর্তন সত্ত্বেও এই আশ্রমের অন্তরস্থিত প্রাণধারাটি আজও নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে। সে জীবনপ্রবাহ শতাধিক বছর ধরে অবিরাম গতিতে নিজের চরম চরিতার্থতার দিকে চলেছে। সুতরাং আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। আশ্রমের বীজমন্ত্রটি যদি আমাদের হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে পারি তবে আমাদের আদর্শভ্রষ্ট হবার কোনই আশঙ্কা থাকবে না। এ হতে পারে যে, আমরা আত্মকলহে কিংবা পরশ্রী-কাতরতায় কিছুটা বিপথগামী হয়েছি অন্ততঃ সাময়িকভাবে। কিন্তু হৃদয়ে যদি ভক্তি থাকে, মনে যদি বিশ্বাস থাকে তবে আমরা আবার সুপথে ফিরে এসে আমাদের গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে নতুন করে যাত্রা সুরু করতে পারব। এই আত্মপরীক্ষার জন্যেই আমাদের ৭ই পৌষ উৎসবের আয়োজন। পিতাপুত্রের সাধনার পুণ্য-সঙ্গমে অবগাহন করে নিজেদের পবিত্র করে নেবার জন্যেই আমরা সমবেত হই গিয়ে ছাতিমতলায়। আমাদের হৃদয়পাত্রের শূন্যতা আশ্রম-দেবতার করুণাধারায় পূর্ণ করি। মহর্ষিদেব তাঁর সেই দীক্ষার দিনটি রেখে গেছেন আমাদের জন্যে। তাঁর প্রাণপ্রদীপের আলোক থেকে


প্রকাশিত হ'ল—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস ডঃ নীরোদবরণ চক্রবর্ত্তীর

**জয়ন্তী** ৩·০০ **বিচিত্র বিবেকানন্দ** ২·২৫

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস

**পৌষ ফাগুনের পালা** ১৫·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন উপন্যাস

**কালো হরিণ চোখ** ১০·০০

শংকর-এর

**চৌরঙ্গী** ১০·০০ **পাত্র পাত্রী** ২·৫০ **এক দুই তিন** ৪·০০

একাদশ সংস্করণ ৩য় সংস্করণ নবম সংস্করণ

প্রকাশিত হ'ল নিঃশেষিত প্রায়

বনফুলের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**মন্ত্রমুগ্ধ** ৩·০০ • **দূরবীন** (২য় সং) ৪·০০ **নিশিপদ্ম** (৫ম সং) ৪·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য সংকলন প্রবোধকুমার সান্যালের

**শরৎ-নাট্যসংগ্রহ** (১ম খণ্ড) ৫·০০ **দুই পাখি** ৩·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর বিমল মিত্র রচিত

**অলোক দৃষ্টি** ৩·৫০ **জলভ্রমি** ৩·০০ **স্ত্রী** (৩য় সং) ৪·০০

জরাসন্ধের

**মসিরেখা** (৩য় সং) ৯·০০ **আশ্রয়** (৫ম সং) ৩·৫০ **পাড়ি** (৭ম সং) ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রেমেন্দ্র মিত্রের

**হসন্তী** (২য় সং) ৪·৫০ **গরীয়সী গৌরী** (২য় সং) ৪·৫০ **কুয়াশা** ৩·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**শ্রেষ্ঠ গল্প** (৩য় সং) ৫·০০ **দ্বিতীয় অন্তর** ৯·৫০

শ্রীনিরপেক্ষ-র দেবজ্যোতি বর্মণের

**নেপথ্যদর্শন** (২য় সং) ৭·৫০ **আমেরিকার ডায়েরী** ৭·৫০

নীলকণ্ঠের প্রাণতোষ ঘটকের

**ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে।** (২য় সং) ৩·৫০ **রোজালিণ্ডের প্রেম** ৩·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **অযাত্রায় জন্মযাত্রা** ৪·০০ **দৈনন্দিন** ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর **চন্দন কুঙ্কুম** (২য় সং) ৩·০০ ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের

**পকেটমার** ৫·০০ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আজ রাজা কাল ফকির** (২য় সং) ৩·০০

মন্মথনাথ রায়ের **সমাজশিক্ষা প্রসঙ্গ** ৩·৫০ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **অঙ্গজ** ৩·০০

দিলীপকুমার রায়ের **দ্বিচারিণী** ২·৭৫ **ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী** ৫·০০

শৈলেশ দে-র **গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** ৩·৫০ বিশ্বনাথ রায়ের **আবর্ত** ৩·০০

**বাক্-সাহিত্য** ঃ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ফোন ঃ ৩৪-৭৪৩৫

জীবনশিখাটি জ্বালিয়ে নিতে হবে। সেই আমাদের ৭ই পৌষের উৎসব।

হে করুণাময় প্রভু পরমেশ্বর, ৭ই পৌষের পুণ্যদিনে তুমি আমাদের পথ নির্দেশ করে দাও। মহর্ষিদেবের সাধনা যেন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠে আমাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে নিত্য-কল্যাণকর্মে প্রণোদিত করে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে গুরুদেব তাঁর জীবনকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে চিরসুন্দরের যে আরতি করে গেছেন তার নির্মল আলোকশিখাটিকে আমরা যেন ম্লান হতে না দিই। তাঁর সেই প্রাণ-প্রদীপের অচঞ্চল আলোকশিখা আমাদের জীবনের পথকে সমুজ্জ্বল করে রাখুক। আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতায়, অকর্মণ্যতায় বা অনবধানতায় আমরা যেন আমাদের প্রিয় আশ্রমের মহান আদর্শের উপর মলিন কালিমা লেপন না করি। সে আত্মঘাতী অপরাধ থেকে, হে প্রভু, তুমি আমাদের নিত্য-নিয়ত রক্ষা কর।

মহর্ষিদেবের সাধনপূত আশ্রমে গুরুদেব যে কল্যাণপ্রদীপটি জ্বালিয়ে গেছেন তাকে সাগ্নিকের পুণ্যঅগ্নিসম আগলিয়ে রেখে যেন আমাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে আমরা দিয়ে যেতে পারি, অমলিন, কলঙ্কবিহীন। জীবনের কর্তব্যকর্ম সাধনে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে অনেক, সে সব অসার জঞ্জালের বোঝা পেছনেই পড়ে থাক। ৭ই পৌষের দিনে শান্ত শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে সংকল্প গ্রহণ করব যেন আমাদের আর পদ-স্খলন না ঘটে। ভগবান, তুমি সে সংকল্প পালনে আমাদের সহায় হও। প্রভু, তুমি আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে আমাদের প্রাণপ্রিয় আশ্রমের কল্যাণকাজে নিয়োজিত করে কর্তব্যকার্যে নির্দেশ দিও। আমরা তোমার আজ্ঞাবহ সেবকের মহান গৌরবে নির্ভীক হৃদয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যেন পারি। হে আশ্রমদেবতা, তুমি আমাদের কর্তব্যপালনে সহায় হও। যদি কখনো ক্লান্তি আসে, জীবনে যদি শুষ্কতা আসে তবে, হে মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি তোমার অপার করুণার অমৃতরস সিঞ্চনে আমাদের সঞ্জীবিত করে আবার পূর্ণ উদ্যমে কাজে লাগতে দিও। আমরা যেন আমাদের সকল বিত্ত অকাতরে দিতে পারি তোমার চরণসেবার নিত্য-কল্যাণ-কাজে। দূর করে দাও যত দ্বিধা, সংশয় ও ভয়। আমরা অযোগ্য, অক্ষম। তুমি আমাদের হৃদয়ে বল দাও, দেহে বীর্য দাও, প্রাণে ভক্তি দাও। আশ্রমসেবার যে মহান দায়িত্ব তুমি আমাদের দিয়েছ, সে দায়িত্ব-পালনের শক্তি তুমি আমাদের প্রত্যেককে দেবে, তা নিশ্চয় জানি। তোমার যে পতাকা তুমি আমাদের হাতে দিয়েছ, সে বিজয় পতাকা বহন করবার শক্তি তুমি আমাদের দেবে। সে পতাকার যেন অপমান না করি—তার গৌরব যেন জীবন দিয়ে রক্ষা করতে পারি। তোমার সেবার মহান দুঃখ যেন আমরা সহ্য করতে পারি হাসিমুখে, নির্ভয়চিত্তে।

তুমি আমাদের একমাত্র অবলম্বন ও গতি। আমাদের মনের গোপনে জমে উঠেছে কত কলুষ, কত না ফাঁকি। সে সকল কলঙ্ক কালিমা কেমন করে আমরা অপনোদন করব যদি না তুমি কৃপা করে তোমার স্নেহস্পর্শ দিয়ে সে অপবিত্রতা মুছে দাও। তোমার দয়া আমাদের স্বার্থ পাশ থেকে মুক্ত করুক। তোমার যে অপার করুণা তা দিয়ে তুমি আমাদের নিত্যনিয়ত রক্ষা কর। তোমার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তোমার দয়া দিয়ে আমাদের মনের কোণের সব মলিনতা ধুইয়ে দাও। আমাদের সবাইকে তোমার সেবার মহান কর্মে দীক্ষা দাও। হে জীবনদেবতা, করুণাময় বিধাতা, সকল হৃদয়মন তোমার চরণতলে লুটিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করি, তোমাকে ভজনা করি। হে নিত্য জাগ্রত ভগবান, তোমাকে ভক্তিভরে বারম্বার নমস্কার করি। প্রভু, পরমেশ্বর, তুমি আমাদের প্রণতি গ্রহণ কর এবং আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

# রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ

সুশীল রায়

পৃথিবীর আর-কোনো কবি এভাবে দেশ-বিদেশ পর্যটন করেছেন কি না ঠিক বলতে পারব না। বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি গিয়েছেন, স্বদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পদার্পণ করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের ইতিহাস খুঁজলে অনেক দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের ঘটে। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনটা ছিল একেবারে গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা। বাড়ির প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন ঘটে, কিন্তু তাঁর মন অবশ্যই সেই বাধা ডিঙিয়ে বাইরে পরিভ্রমণ করে বেড়াত। বাইরে বের হবার এই ব্যাকুলতা তাঁর ছিল বলেই পরিণত বয়সে তিনি তাঁর প্রথম বাহিরে যাত্রার ঘটনাটি অমন স্পষ্টভাবে মনে রাখতে পেরেছিলেন এবং এই জন্যেই বেশ স্পষ্ট করেই তিনি সে কথা প্রকাশ করেছেন—

> একবার কলিকাতায় ডেঙ্গু-জ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুর বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম। এই প্রথম বাহিরে গেলাম।

জোড়াসাঁকো থেকে পানিহাটীর দূরত্ব আর কতটুকু? তবুও এই দূরত্বই সেদিন খুব বৃহৎ বলে মনে হয়েছিল তাঁর এবং এই জন্যেই এ ঘটনাকে 'প্রথম বাহিরে গেলাম' বলে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছেন।

এবং তারও কিছুকাল পরে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রায় নির্গত হন। এই যাত্রার কথা যখন তাঁর কাছে উত্থাপিত হয় তখন আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন বালক-রবীন্দ্রনাথ—

> একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত।

যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে চাপা ছিল, পিতার একটি প্রশ্নেই সেই মনের ডালা যেন খুলে গেল এবং সেই উন্মুক্ত পথ দিয়ে আনন্দের বিপুল ধারা বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু চাপা দিতে হল সে ধারাটিকেও, সংযত করতে হল তাকে। পিতার সম্মুখে মনের আনন্দের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ সঙ্গত নয়।

হিমালয়ের পথে তাঁরা যাত্রা করলেন। যাবার পথে কয়েক দিন

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

ছিলেন বোলপুরে। তারপর বোলপুর থেকে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হল—প্রকৃত বাহিরে। জোড়াসাঁকো থেকে পানিহাটীতে নয়, কলকাতা থেকে অমৃতসরে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।—

> বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ দানাপুর এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে এইবারই তাঁর প্রথম বাহিরে যাত্রা, এইবারই তিনি প্রথম বাহিরে গেলেন এবং এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম ভারত পরিক্রমা।

কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রীতি তাঁর বালক বয়সেই মনের মধ্যে কতটা গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর প্রথম বাহিরে যাত্রার কথা ও হিমালয় যাত্রার কথা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও লিখেছেন, আবার সেই ঘটনাই লিখেছেন 'বৃহত্তর ভারত' (কালান্তর) প্রবন্ধে এইভাবে—

> আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গা-তীরের এক বাগানে কিছুকালের জন্য বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের এক বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহুদেশ বহুকাল ও বহুচিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে।

সেই অল্প বয়সের বালকের সঙ্গে সারা ভারতের নিবিড় আত্মীয়তা ঘটল, ভারতের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ঘটল ঐ নদীটির ধারার মধ্য দিয়ে। কেন না—

> হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই নদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকাল ক্রমাগত জ্ঞান-ধর্ম-তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তারপর হিমালয়ে পৌঁছে তিনি সেই পর্বতটিকেও একটি প্রস্তর পিণ্ডমাত্র মনে না ক'রে তার মধ্যে দেখতে পেলেন 'একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের'।

ভারতের মৃত্তিকার সঙ্গে নয়, ভারতের আত্মার সঙ্গে এই ভাবে যোগ স্থাপিত হল রবীন্দ্রনাথের।

● আন্না তরখড়—রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের অনেক রচনার প্রেরণাস্বরূপা। কবি এঁর নাম দেন 'নলিনী'।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রূপে কীর্তিত। বিশ্বের সমস্ত মানুষেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-বেদনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর রচনায়। কিন্তু তিনি প্রথমত যে ভারতের কবি এবং তার চেয়েও বেশি, তিনি যে একজন ভারতীয় কবি—এ কথা আমরা সব সময়ই অনুভব করি। নিজের পরিবারের প্রতি আকর্ষণ না থাকলে নিজের পল্লীর প্রতি আকর্ষণ থাকে না, তেমনি নিজের জন্মভূমির প্রতি মমতা না থাকলে বিশ্বভূমির প্রতি মমত্ব জন্মায় না। হৃদয়ের উদারতার সঙ্গে তিনি সব নিরীক্ষণ করতে পেরেছেন বলেই স্বদেশ ও বিদেশ তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছে—

হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

যাঁরা স্বদেশকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন, বিদেশের প্রতি মমতা কেবল তাঁদেরই সাজে। স্বদেশের প্রতি প্রীতির টান কম, অথচ বিদেশের প্রতি আকর্ষণ অধিক—এ জিনিষ যাঁদের মধ্যেই দেখা যায় তাঁদের আন্তরিকতার উপর সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বিদেশও তাঁদের বন্দনা করে না, স্বদেশেও তিনি থাকেন পরবাসী-বৎ।

কিন্তু বিশ্ববাসী যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের একজন বলে মনে করতে পেরেছেন, এর কারণ বুঝি আর কিছু না, সকলে বুঝতে পেরেছেন যে রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশবৎসল ব্যক্তি, তিনি স্বদেশপ্রাণ এবং তিনি স্বাধীন-প্রাণ। মন যদি পরিচ্ছন্নভাবে মুক্ত রাখা যায়, মনের এপাশে কিংবা ওপাশে যদি দেওয়াল তুলে না নেওয়া হয় তাহলেই স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করার পক্ষে মন উদার হয়ে উঠতে পারে। মনকে উদার করার জন্যে বিশেষভাবে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হয় না।

যে পরিবেশে ও যে পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, সেই আবহাওয়াই তাঁকে প্রথম থেকে একটি মুক্ত মন দিতে পেরেছে এবং সেই মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্যে সর্বদাই উৎসুক ও উন্মুখ ছিল। এবং এই জন্যেই বালক বয়সেই তিনি নদীর ধারা অবলোকন করে তাকে ভারতের আত্মার একটি অখণ্ড যোগসূত্র বলে মনে করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জীবনের শেষলগ্নেও তিনি মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীর ধূলার প্রশস্তি রচনা ক'রে বলেছেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

সমস্ত পৃথিবীর ধূলাকে নতমস্তকে নমস্কার করতে পেরেছিলেন দেশ-মাতৃকার উপর তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ ছিল বলেই।

কিন্তু কেবল কি দেশমাতৃকার ও দেশমৃত্তিকার উপরই তাঁর এই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি? দেশের বহিরঙ্গের প্রতিই তাঁর এই মমতা নয়, দেশের অন্তরঙ্গের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা। তিনি কেবল ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গেই নিজের নিবিড় আত্মীয়তা করে নেন নি, ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল নিবিড়। তাঁর বিবিধ রচনায় এবং তাঁর কাব্যে এই আত্মীয়তার প্রতিধ্বনি সর্বদাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গান-গুলির মধ্যে ভারত-আত্মার মর্মবাণী যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে এমন বুঝি আর কখনো অন্য কারো রচনায় হয় নি। এ কথা যখনই আমাদের মনে হয় তখনই বুঝতে অসুবিধে হয় না ভারতের চিত্তের

সঙ্গে তিনি নিজের চিত্তকে এক করে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এই জন্যে যে ভারতকে তিনি পুণ্যতীর্থ-রূপে বন্দনা করেছেন, সেই তীর্থের আহার্য্যে নিজের চিত্তকেও পরমতীর্থ করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে তাই সব ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়, মনে হয় তাঁর নিজের কাছেও শক-হূন দল পাঠানমোগল এক দেহে লীন হয়ে গিয়েছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজেকে মহিমান্বিত মনে করেছেন, সেই জন্যেই বলতে পেরেছেন—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।

সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম প্রান্তের পোরবন্দর, উত্তরের কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা। প্রতিটি অঞ্চলের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তিনি সমান দৃষ্টিপাত করেছেন এবং মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। সমুদ্র কখনো নদীর ধারা নির্বাচন ক'রে তা গ্রহণ বা বর্জন যেমন করে না, প্রতিটি ধারাই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভারতের যাবতীয় সংস্কৃতি একাই ধারণ করতে পেরেছিলেন।

সাহিত্যের মধ্যে তিনি যেমন সমস্ত ভারতের নির্যাস পরিবেশন করেছেন; তাঁর কর্মের মধ্যেও তেমনি ভারতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় সমস্ত ভারতের ছাত্রদের সাধনার পীঠস্থানরূপে তিনি গড়ে তোলেন, কিন্তু সেই স্থানটি ভারত-সন্তানদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়—সেখানে মিলিত হয়েছে সারা বিশ্বের বিদ্যার্থীর দল। এবং এইজন্যে এর নামও হয় বিশ্বভারতী।—

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি। আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। কিন্তু নিজেদের এই ভাগ্যের জন্যে কেবল গৌরব করলেই বুঝি আমাদের হবে না, তাঁর দেশের যোগ্য অধিবাসীরূপে যদি আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে পারি তাহলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতই আমরাও বলতে পারব—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।

এই সার্থকতা লাভ করতে হলে নিজের দেশের প্রতি আমাদের যেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করে তুলতে হবে, অন্যান্য সব দেশের প্রতি প্রীতিও তেমনি জাগ্রত করা চাই।


## সদ্য প্রকাশিত

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রখ্যাত বাঙালী শিকারী ও শিকার-প্রিয় ব্যক্তিদের রচনায় সমৃদ্ধ

**বিখ্যাত শিকার কাহিনী**

অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত তিন রঙের প্রচ্ছদপট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের উপযোগী গল্প-উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়।

মূল্য : ৮·৫০

অজিতকুমার শ্রীমানি-র

**দূর দুর্গমে**

দূরদুর্গমের পাড়ি শেষ করে বাড়ি ফিরলেই পরিচিত সবাই গল্প শুনতে চায়। পথের সঞ্চয়ের যেমন শেষ নেই—বলার আগ্রহেরও তেমনি সীমা নেই। এ গ্রন্থখানি সেই দূর দেখার কাহিনী। ৩১খানি আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ।

যুগান্তর বলেন—"...তাঁর বর্ণনায় আছে...এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি। অনুভূতি দিয়ে ভরা লেখনীর আঁচড়ে ফুটে উঠেছে দুর্গম পথের এক নূতন দিক। মূল্য : ৬·০০

অচ্যুত গোস্বামীর

**প্রতীক্ষিতা শর্বরী**

অকরুণ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের বলিষ্ঠ সংগ্রামের এক ইতিহাস। এই উপন্যাসের পটভূমিকা হল উদ্বাস্তুদের জবরদখল করা একটি বাড়ি। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র জীবননাট্য সৃষ্টি হয়েছিল তারই কাহিনী। চার রঙের প্রচ্ছদপট। মূল্য : ৮·৫০

| | | |
|---|---|---|
| দীপক চৌধুরীর **কীর্তিনাশা** ৫·০০ | কাজী নজরুল ইসলামের **গুলবাগিচা** ৩·৫০ | শ্রীভগীরথ অনূদিত **বঞ্চিতা** ৩·৫০ |
| শ্রীবাসবের **দূর কিনারে** ৫·০০ | প্রফুল্ল রায়ের **মরসুমের গান** ৫·০০ | শচীন সেনগুপ্তের **আর্তনাদ জয়নাদ** ১·৫০ |
| বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের **পিয়াসী মন** ৩·৫০ | নীলকণ্ঠের **ট্যাক্সির মিটার উঠছে** ৪·০০ | নীহাররঞ্জন গুপ্তের **কাচের স্বর্গ** ৩·০০ |
| পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত **বুভুক্ষা** ৪·৫০ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **নতুন করে পাওয়া** ৪·০০ | পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের **বিদুষী (নাটক)** ২·৭৫ |

অমর নন্দীর **মোদের বিশ্ব** ২·০০

**দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম** ঃ ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

# রাজস্থান ও রবীন্দ্রনাথ

সুশীলকুমার গুপ্ত

"কথা কও, কথা কও।
কোনো কথ কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।"
(কথা ও কাহিনী)।

রবীন্দ্রনাথ এখানে অতীতকে ইতিহাস রচনা করতে বলেছেন। কেন না তিনি জানেন যে, মানুষের তিনটি জন্মভূমির প্রথমটি পৃথিবী, দ্বিতীয়টি ইতিহাস এবং তৃতীয়টি আত্মিক লোক। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ (১৯৩৩)-এর পরিশিষ্ট 'মানবসত্য' প্রবন্ধে মানুষের দ্বিতীয় জন্মভূমির বিষয়ে তিনি লিখেছেন,—

"মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতি-লোক। অতীতকাল থেকে পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান—একদিকে পৃথিবী, আর-একদিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।"

অতীত কাহিনী ও স্মৃতির আশ্রয়ে জীবনের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখা যায়। নিখিল ইতিহাসের যে রূপ দেশ ও কালের সীমানায় নব নব ভাবে প্রকাশিত তাকে তিনি ধরতে চেষ্টা করেছেন। স্বদেশের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে তাঁকে বীরত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের বীরনেতৃবর্গকে স্মরণ করতে দেখা যায়।

আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের কাহিনীকে নিয়ে বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ একখানি বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেন।

● পৃথিবীর প্রখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে বিশ্ববরেণ্য গুরুদেব।

এই সময় তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়ার পথে বোলপুরে অবস্থান করছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়,—

"তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"
(জীবনস্মৃতি)।

ঠাকুরবাড়িতে দিনরাত সাহিত্যের হাওয়া বইত। বেশভূষা, কাব্য, গান, চিত্র, প্রভৃতি সকল বিষয়েই সেখানে একটা জাতীয়তার আদর্শ গড়ে উঠেছিল। এই আবহাওয়ায় থেকে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সাহায্যে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা বলে একটি মেলার সৃষ্টি করেন।

এই মেলার মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে অনুভব করার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ ১২৮১ সালের ৩০শে মাঘ (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) হিন্দুমেলায় 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে যে দেশপ্রেমমূলক কবিতা পাঠ করেন তার মধ্যে তিনি রাজস্থানের বীর পৃথ্বীরাজকে স্মরণ করতে ভোলেন নি। ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে এইটিই তাঁর প্রথম কবিতা।

"দেখেছি সেদিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।"

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লিটনের সময়ে হিন্দুমেলায় তিনি 'দিল্লিদরবার' শীর্ষক যে কবিতা পাঠ করেছিলেন, তার মধ্যে বৃটিশ-শাসনের ভয়কে তুচ্ছ করে দেশসেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুত বীরদের মহিমাও বিঘোষিত হয়েছে।

"বৃটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া,
মোগল-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুর রাজ,
ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তোয়াগিয়া লাজ,
আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!"

# বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

## ॥ জীবনী সাহিত্য ॥

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ** ৫·০০; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫·০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫·০০ ॥ মনি বাগচী : **শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার** ১০·০০; **রামমোহন** ৪·০০; **মাইকেল** ৪·০০; **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪·৫০; **কেশবচন্দ্র** ৪·৫০; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪·৫০; **রমেশচন্দ্র** ৫·০০; **সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ** ৫·০০; **রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ** ৬·০০; **শিক্ষাগুরু আশুতোষ** ৫·০০ ॥ শাজা আহমেদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪·০০ (ডঃ কোটনীসের অমর কাহিনী) ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবিচ্ছবি** ৬·০০ ॥ ডঃ সুশীল রায় : **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** ১০·০০ ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী** ১·৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১·০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী** ৪·০০ ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় : **সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু** ৬·০০ ॥ অবন্তী দেবী : **ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলের নবযুগ** ৬·০০ ॥

## ॥ সাহিত্য বিষয়ক ॥

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : **প্রবন্ধ সংগ্রহ** ৭·৫০ (ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫·০০; **পাঁচশত বৎসরের পদাবলী** ৭·৫০ ॥ অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২·০০ ॥ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : **মিলটনের অ্যারিওপ্যাগিটিকা** ৩·০০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : **মনসামঙ্গল** ৩·০০ ॥ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী : **ভারতচন্দ্র** ৩·০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬·০০ ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮·০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬·০০ ; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫·০০; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২·৫০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮·০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩·৫০ ॥ সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি পরিচয়** ৫·০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪·০০ ॥ আজহারউদ্দিন খান : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫·০০ ॥ ডঃ সুকুমার সেন : **বিচিত্র সাহিত্য** ১ম খণ্ড ৬·০০ ; ২য় খণ্ড ৬·০০ ॥ বিষ্ণু দে : **এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য** ৪·০০ ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : **সাহিত্যের নানাকথা** ৬·০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : **বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী** ৭·০০; **সাহিত্য বিচিত্রা** ৮·৫০ ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : **কাব্য পরিমিতি** ৩·০০ ॥ প্রশান্ত রায় : **সাহিত্য দৃষ্টি** ৪·০০ ॥

## ॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

গিরিশচন্দ্র সেন : **জ্ঞানদেব বিরচিত জ্ঞানেশ্বরী** (গীতা) ২০·০০ ॥ ডঃ সুকুমার সেন : **কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃত** ১০·০০ ॥ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ : **হিন্দু সাধনা** ৩·০০ (শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন কর্তৃক বিখ্যাত গ্রন্থ Hindu View Of Life-এর বঙ্গানুবাদ) ॥ কাকা সাহেব কালেলকর : **জীবনলীলা** ১০·০০ ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন : **রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি** ৩·০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : **রামায়ণতত্ত্ব** ৪·৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : **রামায়ণী কথা** ৪·০০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : **সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ৩·৫০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন-শাস্ত্রী : **রামায়ণের কথা** ১·২৫; **ভারত জিজ্ঞাসা** ৩·০০; **মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন** ২·৫০; **সীতার বনবাস** (বিদ্যাসাগর) ১·৫০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : **সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪·০০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : **পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ** ৩·৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকার : **ভারতের শিক্ষা** ৫·৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : **রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ** ১ম খণ্ড ৩·৫০ ॥ ২য় খণ্ড ৫·০০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : **আফ্রিকার চিত্র** ১·৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : **লাইবেরিয়ার উপকথা** ১·৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : **স্বাধীনতার আবোল তাবোল** ৫·০০ ॥ জন ষ্ট্রাচি : **মহাজাগরণ** ১·৫০ ॥ সত্যকিঙ্কর সাহানা : **মহাভারতের অনুশীলন তত্ত্ব** ২·৫০; **চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ** ২·৫০; **হিন্দুধর্ম** ১·৫০; **শকুন্তলা রহস্য** ২·৫০; **বিবিধ প্রবন্ধ** ২·৫০; **বিচিত্র প্রবন্ধ** ২·৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার : **প্রবাসী বাঙালীর কথা** ১·৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : **দেশ বিদেশের শিক্ষা** ৫·০০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : **মার্কসবাদ** ১·৫০ ; **দর্শন ও বিপ্লব** ১·৫০ ; **ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ** ১·৫০ ॥ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস : **কিশোর বিজ্ঞানী** (হাতে কলমে বিজ্ঞান গবেষণার গ্রন্থ) ২·৫০ ॥

## ॥ উপন্যাস ও গল্প ॥

সুবোধ বসু : **পুনর্ভব** ২·৫০; **মানবের শত্রু নারী** ২·০০; **স্বর্গ** ২·০০; **ঊর্ধ্বগামী** ৩·০০; **চিমনি** ৩·০০; **ইঙ্গিত** ২·৫০; **পদ্মা প্রমত্তা নদী** ৩·৭৫; **গল্পলতা** ৪·০০ ॥ বুদ্ধদেব বসু : **আমার বন্ধু** ২·০০; **চার দৃশ্য** ২·৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : **লক্ষ্মী** ২·০০; **হাসি** ২·০০ ॥ বাণী রায় : **শূন্যের অঙ্ক** ২·৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : **অন্তর ও বাহির** ২·০০; **পলাতক** ৩·০০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **কন্যা ও কুমার** ১·৭৫ ॥ সুকুমার রায় : **কয়েকটি গল্প** ১·০০ ॥ বিদ্যুৎমোহন চৌধুরী : **অনুস্মৃতি** ২·৫০ ॥

**জিজ্ঞাসা প্রকাশন বিভাগ ॥ ১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯।**

কবিতাটি তিনি হিন্দুমেলায় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রোতাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনও ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' (নভেম্বর, ১৮৭৫) নাটকে রাজপুত রমণীদের জহরব্রতের একটি দৃশ্য আছে। তিনি এই চিতাপ্রবেশের দৃশ্য সম্পর্কে একটি গদ্য বক্তৃতা রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ গদ্য বক্তৃতা ঐ জায়গায় খাপ খাবে না বলে স্থানোপযোগী একটি গান লিখে দেন।

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
--- --- ---
শিখিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরান অনলশিখে ॥"

সতীত্ব রক্ষার জন্যে রাজপুত রমণীদের আত্মোৎসর্গকে রবীন্দ্রনাথ এখানে এক দুর্লভ মহিমায় মণ্ডিত করেছেন।

'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রাজস্থান সম্পর্কে কয়েকটি উপাদেয় কাহিনীকবিতা আছে। প্রথমে 'কথা' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় [১লা মাঘ, ১৩০৬ (১৮৯৯)]। 'কাহিনী' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৩০৬ সালের (১৮৯৯) ২০শে ফাল্গুন তারিখে। মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত বিষয়ানুসারে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থের (১৯০৩) ৫ম ভাগে 'কাহিনী' ও 'কথা'র কবিতাগুলি দুইটি অংশে প্রকাশিত হয়। পরে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 'কথা' ও 'কাহিনী' একত্রে 'কথা ও কাহিনী' নাম দিয়ে বের করে [পৌষ, ১৩১৬ (১৯১০)]। 'কথা ও কাহিনী'র পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছিলেন,—

"একদিন এল যখন আর-একটা ধারা, বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্য-ভূগোলে আর-একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

---ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেই জন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে।"

একথা স্পষ্ট যে ইতিহাস-পরিক্রমার এক বিশেষ অবস্থায় কথার কবিতাগুলি জন্মলাভ করেছে। এই পরিক্রমার পথেই তিনি রাজস্থানে এসে পৌঁচেছেন। রাজস্থানের কাহিনী-গুলির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্নেল জেমস টডের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Annals and Antiquities of Rajasthan'-এর ওপর নির্ভর করেছেন। 'কথা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশের সময় গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,—

"রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজী শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।---মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশা করি সেই পরি-বর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইবে না।"

টডের বইটিও রাজস্থানের প্রামাণিক ইতিহাস নয়। তবে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বইটিতে রাজস্থানের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কোন ঐতিহাসিক নেই যিনি ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই বইটি থেকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হন নি। রাজ-স্থানের অতীত গৌরবের কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের বহু রচনাকারদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' ও 'শূরসুন্দরী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'মেবারপতন', বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যায়। এই সব গ্রন্থে সর্বত্র ইতিহাস যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নি। বস্তুত রচনাকার রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুযায়ী স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের বিষয়ে হাডসনের উক্তি সমস্ত ইতিহাসাশ্রয়ী রচনাকারদের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। হাডসনের মতে "It is the business of the historical novelist to bring creative imagination to bear upon the dry facts of the annalist and the antiquarian, and out of a mass of scattered material gleaned from a variety of sources, to evolve a picture having the fulness and unity of a work of art." রচনা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে ইতিহাস পুরোপুরি রক্ষিত না হলেও চলে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনী কবিতাবলীতে সত্যকার রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন সেখানে তাদের ইতিহাসচ্যুতি দমনীয় নয়।

'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের

মধ্যে রাজস্থান সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি কবিতাই বীররসাত্মক। 'মানী' কবিতায় বন্দী সিরোহিপতি সুরতানকে যখন বাদশাহ আরঙজেবের সামনে তাঁকে সেলাম করতে বলা হল তখন তিনি উত্তর দিলেন, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করি নে কারে প্রণিপাত।" বাদশাহের অনুচর এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর মস্তক ছেদনের ভয় দেখালে সিরোহিপতি হেসে বললেন,

"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি,
জানি নে কভু ভয় ডর।"

এই বীরত্বপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে বলে উঠলেন, "অচল হয়ে অচল গড়ে করো বাস।"

'রাজবিচার' কবিতায় রাজস্থানের রাজাদের ন্যায় নীতির কথা ঘোষিত হয়েছে। কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ধর্মনাশ করার জন্যে রাজা রতনরাও এক চোরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ রাজার নির্দেশে চোরকে হত্যা করলে যখন তাকে দূত ধরে নিয়ে এসে কি শাস্তি দেবে জিজ্ঞাসা করলে তখন রাজা তাকে বললেন, "মুক্তি চাও।"

'নকল গড়' কবিতায় কবি রাজপুতদের মহত্ত্ব ও বীরত্বের কথা তুলে ধরেছেন। চিতোরের রানা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতক্ষণ না তিনি বুঁদি নামে প্রতিপক্ষের কেল্লাকে ভূমিসাৎ করতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি জলস্পর্শ করবেন না। প্রতিপক্ষের মধ্যে হারাবংশীয় মহা মহা বীর থাকায় এই প্রতিজ্ঞা পূরণ অসম্ভব জেনে মন্ত্রীরা যুক্তি করে মাটি দিয়ে বুঁদির মতো একটি নকল কেল্লা তৈরি করে দিলে, যাতে রানা সেই কেল্লাটি ভেঙে দিয়ে প্রতিজ্ঞার সত্য রক্ষা করতে পারেন। রানার ভৃত্য হারাবংশী কুম্ভ বীরত্বের নামে এই ছেলেখেলাকে সহ্য করতে পারল না। রাজা কেল্লা ভাঙতে এলে সে নকল কেল্লা রক্ষা করতে করতে তীক্ষ্ণ তরবারির মুখে প্রাণ বিসর্জন দিলে। কবির ভাষায়,—

"ভূমির 'পরে জানু পাতি
তুলি ধনুশর
এক কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রানার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলাঘরের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি 'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়।"

রাজপুত রমণীরা বীরত্বের জন্যে সুবিদিত। 'হোরিখেলা' কবিতায় ভুনাগ রাজার রানীর দুঃসাহস, রণ-কৌশল ও বীরত্বের কথা কীর্তিত হয়েছে। যুদ্ধে হেরে গিয়ে শহর থেকে পালিয়ে ভুনাগ রাজার রানী কেতুন থেকে এক চিঠি লিখে পাঠান কেসর খাঁকে হোলিখেলার আমন্ত্রণ জানালেন। কেসর খাঁ সসৈন্যে হোলি খেলতে এলে রানীর সহচরীদের বেশে এক শত রাজপুত বীর যোদ্ধা পাঠানদের নিশ্চিহ্ন করে দিলে। তাই কবিতার শেষে কবির উক্তি,—

"যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুন-রাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুল-বাগানে
কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।"

'বিবাহ' কবিতাটি রাজপুতদের শৌর্যবীর্যে উদ্দীপ্ত। বিবাহসভায় মেত্রিরাজকুমার বিদ্রোহের খবর শুনে তা দমনের জন্যে গিয়ে প্রাণ হারালেন। চিতার মধ্যে মেত্রিরাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর সতীকার মিলন হল। কবির প্রাণস্পর্শী বর্ণনাটি এখানে উদ্ধারযোগ্য।

"বরের বেশে মোতির মালা গলে
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।
দোলা হতে নামল আসি নারী,
আঁচল বাঁধি রক্তবাসে তাঁরি
শিয়র-'পরে বৈসে রাজকুমারী
বরের মাথা কোলে 'পরে থুয়ে।
নিশীথ-রাতে মিলনসজ্জা-পরা
মেত্রিপতি চিতার 'পরে শুয়ে।"

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

● পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ

'পণরক্ষা' কবিতাটি রাজপুতবীর দুর্গেশ দুমরাজের বীরত্বগাথায় ঋদ্ধ। তিনি পণ করেছিলেন যে, বিনা সংগ্রামে আজমীর গড় মারাঠা দস্যুদের হাতে তুলে দেবেন না। কিন্তু শত্রুপক্ষের শক্তি দেখে তাঁর প্রভু তাঁকে মারাঠাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললে প্রভুর ধর্মে ও বীরের ধর্মে বিরোধ মেটাতে দুর্গদুয়ারে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

'পুনশ্চ' গ্রন্থ (১৯৩২)-এর 'প্রেমের সোনা' কবিতায় রাজপুত জীবনের আধ্যাত্মিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। চিতোরের মহারানী ঝালি রবিদাস চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছেন। বৃদ্ধ পুরোহিত যখন জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাসকে গুরু বলে মেনে প্রণাম করাতে ব্রাহ্মণের মাথা হেঁট হল বলে তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন তখন মহারানী বললেন,

"ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।"

'ছুটির আয়োজন' কবিতায় পূজার ছুটি উপভোগের ব্যাপারে কবি অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় রাজস্থানের আবু পাহাড়ের কথাও মনে করেছেন।

"ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড়, না মাদুরা,
না ড্যালহৌসী কিম্বা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের
দার্জিলিঙ।"

'খাপছাড়া'র (১৯৩৭) ৪৫ নং কবিতায় হাস্য-কৌতুক রসের সৃষ্টির সময় কবি রাজপুত বীরত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হলদিঘাটের কথা ভোলেন নি।

"খবর পেলাম কল্য,
তাঞ্জামেতে চড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চলল।
সময়টা তার জলদি কাটে;
পৌঁছল যেই হলদিঘাটে
একটা ঘোড়া রইল বাকি,
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরানহাটায় পৌঁছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল।"

দেশ কখন ইতিহাসের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে সে বিষয়ে 'ইতিহাস' গ্রন্থ (১৯৫৫)-এ 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' প্রবন্ধে লিখেছেন,

"দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো-একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল-আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহ-বদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থ-ভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো-একটি এক-অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো-একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।"

এই অভিপ্রায় যখন জাতির স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা হয়, তখন

তার পূরণে যে মহত্ত্ব ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটে তার তুলনা নেই। এই মহত্ত্ব ও বীরত্বের দীপ্তিতে জাতীয় ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, শুধু মহত্ত্ব ও বীরত্বের প্রকাশই জাতীয় ইতিহাসের চরম কথা নয়, সুপরিণত রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতাতেই জাতির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে স্বীকৃত রাজপুত, মারাঠা ও শিখদের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনামূলক বিচার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"রাজপুতনাতেও ইতিহাসের টুকরা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এক-একটি দলের, এক-একটি খণ্ডরাজ্যের ইতিহাস ; সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। কিন্তু মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে ; তাহা কেবল এক-একটি গোত্রবিশেষের গৌরব-কীর্তন নহে।

শিখগুরুদের ইতিহাসের মধ্যে শিখদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কিন্তু মারাঠার ইতিহাসের মতো এমন ব্যাপক এবং সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া উঠে নাই।"

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের দেশপ্রেম ও শৌর্যবীর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে কুমারসিংহ, শংকরপুরের রাণা বেণীমাধু, রয়ার রাজপুত অধিপতি নৃপৎসিং প্রমুখ রাজপুত নেতৃবর্গকে তিনি শুধু বিদ্রোহী বলেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের প্রকৃত বীরের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই সব বীরবৃন্দ "য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সঙ্গীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে, অমর হইয়া থাকিতেন।" তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন, "বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের এক প্রান্তে তাঁহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।" (ঝান্সীর রানী)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—জাতির আত্মোপলব্ধির জন্যে ইতিহাসচর্চার বিশেষ প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং আধুনিক অধিকাংশ সভ্য দেশে ইতিহাসের প্রতি যে আকর্ষণ আছে ভারতে তেমনটি ছিল না। আধুনিক ভারতের কথা মনে হতেই স্বাভাবিকভাবেই তিনি রাজপুতদের বিষয়ে বলেছেন, "---যে সময়ে রাজপুতদের জনবন্ধন দৃঢ় ছিল তখন তাহাদের মধ্যে, উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত চাষের মতো ইতিহাস আপনি উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত।" (ঐতিহাসিক চিত্র)।

দেশের লোকের মধ্যে ইতিহাস-জ্ঞানের অভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বেদনা অনুভব করতেন। তিনি মনে করতেন—লোকশিক্ষার জন্যে ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার মধ্য দিয়ে দেশের সর্বত্র প্রচার করা উচিত। এই ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ রাজপুত বীরদের কথা স্বভাবতই তাঁর মনে এসেছে। তিনি লিখেছেন,

"যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন ? এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন ?" (ইতিহাসকথা)।

রাজস্থানের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কবিকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। 'স্টেটসম্যান' থেকে প্রকাশিত 'Wonderful India' গ্রন্থে রাজপুতনার অপূর্ব-সুন্দর ছবি দেখে তার বর্তমান দুঃখময় অবস্থার কথা মনে করে কবি 'নবজাতক' গ্রন্থ (১৯৪০)-এর 'রাজপুতানা' কবিতাটি রচনা করেন। দেশীয় রাজাদের বিলুপ্ত প্রাচীন গৌরব ও মহিমার শূন্য সমারোহ ও অলীক অভিনয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছেন। অতীত গৌরবের পটভূমিকায় বর্তমানের দুঃখজনক অবস্থাকে স্মরণ করে কবি বলে উঠেছেন,

"এই ছবি রাজপুতানার ;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিষহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।
ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নির[illegible]
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মু[illegible]
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।"

তাঁর মতে রাজপুতানা যথাকালে প্রদীপ্ত স্মৃতিতে পর্যবসিত হলে সে বর্তমান মৃত্যুর চেয়ে অধিক লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ইতিহাসে স্বমহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। তাঁর ভাষায়,—

"তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে
প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ?
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে
করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের
বহ্নির আলোতে।"

প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী
অনূদিত ও ব্যাখ্যাত
শ্রীমদ্ভাগবতম্
মূলশ্লোক, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, শ্রীধরটীকা, তোষণীটীকা ও প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী কৃত বিস্তৃত বাংলা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সম্বলিত, ১০ স্কন্ধ—১মখণ্ড ২৪৲ ঐ ২য় খণ্ড ১৪৲ ঐ ৩য় খণ্ড (রাসলীলা) ২৪৲ (রেক্সিনে বাঁধাই), সম্পূর্ণ ভাগবত যন্ত্রস্থ।
হরিহর লাইব্রেরী
২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

# রবীন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্র

প্রবীর দেবনাথ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।

এই সুদূরের পিপাসাই মানুষকে ঘরের মায়া দেয় ভুলিয়ে, বিপুল বিশ্বের হাতছানিতে সে বেরিয়ে পড়ে পথে পথে। কবির অনুভূতিপ্রবণ মনে এ আহ্বান আরও তীব্র হয়ে বাজে। কোনো একটি স্থির লক্ষ্য-বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি থাকলেও তাঁর গতির তৃষ্ণা কখনই পরিতৃপ্ত নয়। এই অর্থে পরম প্রাপ্তির শেষতম সিদ্ধিতে কবি কখনই সৌভাগ্যবান নন। একদিকে মানস অভিঘাতের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য কবি ব্যাকুল, অপরদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েও তাঁর অনাসক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথও চঞ্চলের পদধ্বনি অনুভব করেছেন নাড়ীতে নাড়ীতে, 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'র আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন সারাজীবন। ভারতবর্ষের চিত্তদূতরূপে তিনি পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন।

শান্তিনিকেতনের নিভৃত সাধনায় যখন এসেছে অবসাদ, তখনই ছুটে এসেছেন কলকাতার জনারণ্যে। আবার কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রা যখন ক্লান্তি এনেছে, তখন পালিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে। এরই মধ্যে কখনও বা পাড়ি জমিয়েছেন সুদূরে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন—কখনও জমিদারীর তদারকে, কখনও নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, আবার কখনও বা বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। আর এই সব পরিক্রমার মধ্য দিয়ে মানুষের বিচিত্র মিছিলকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা কেউ বা দিয়েছে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, কেউ বা জুগিয়েছে কাব্যের প্রেরণা, আবার কেউ বা দিয়েছে অর্থের উপচার। মানুষের দানে তাঁর প্রাণের পাত্র উঠেছে ভরে—সে-মানুষের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অকৃপণ ভাষায়।

তবু এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কবিদের ক্ষেত্রে মানস পরিক্রমার মূল্যও অপরিসীম। আর মানস পরিক্রমায় কবিচিত্ত উন্মুখ সেখানেই—যেখানে তার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। প্রাচীন ভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত তীব্র। তাঁর অতীতচারী মন স্মৃতিতে রোমন্থন করে ফিরেছে প্রাচীন ভারতবর্ষকে। আধুনিক কালের মহারাষ্ট্রও কবিচিত্তের তেমনি একটি আকর্ষণ।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সময়ে মহারাষ্ট্র নামে কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্র বা প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল না। অধুনা মহারাষ্ট্র নামে যে রাজ্যটি আখ্যাত, তা গড়ে উঠেছে প্রাচীন বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের অংশবিশেষ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যে-মহারাষ্ট্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, সে-মহারাষ্ট্র মারাঠা জাতির বাসস্থান। মারাঠা জাতির ইতিহাস—বিশেষ করে শিবাজীর কাহিনী—রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। শিবাজী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব ভাষায় সুগভীর আবেগে—'শিবাজী-উৎসব' কবিতায়। কবিতাটি রচনার পটভূমি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন চাইলেন বাংলা দেশের রাজনৈতিক সচেতনতাকে বিনাশ করতে; ভেদনীতির প্রয়োগে বাংলা দেশকে দু'ভাগ করতে চাইলেন—মুসলমানপ্রধান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ এবং হিন্দুপ্রধান অবশিষ্ট অংশ। সারা ভারতে তখন প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা। মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তা-আন্দোলনের জন্ম হল। শিবাজীকে কেন্দ্র করে উৎসবের সূচনা—আর তা থেকেই দেশবাসীর মনে উত্তেজনার রসদ জুগিয়ে চলল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোখলে তখন জনচিত্তে আসীন। সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছলো বাংলা দেশে—বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরমে পৌঁছলো। দেশপ্রেমের মহামন্ত্রে সমগ্র দেশ একটি সঙ্কল্পে দীক্ষা নিয়েছে। যে শিবাজীকে বিদেশীর ইতিহাস দস্যু বলে অবজ্ঞা করেছে, যে শিবাজীর আদর্শকে সমসাময়িক বাংলা দেশ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে নি, সেই শিবাজীর এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের আদর্শই আজ প্রেরণা জোগাল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (২৭শে আগষ্ট, ১৯০৪) :—

এ কথা ভাবে নি কেহ
এ তিন শতাব্দকাল ধরি—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম
বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,
তোমার তপস্যা তেজ
দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণীরূপে
আনি দিবে নূতন পরান
নূতন প্রভাত।

মারাঠা জাতির চিত্তে একটি অভিপ্রায় জেগে উঠেছিল। সে অভিপ্রায় হল সমগ্র ভারতে একটি অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনা—আর এ অভিপ্রায়ের সৃষ্টা হলেন শিবাজী। মারাঠা জাতিই আধুনিক কালে একটি শিক্ষণীয় রাষ্ট্রিক ইতিহাস গড়ে তুলেছিল—এ ইতিহাসের নিয়ামকের হলেন শিবাজী। অবশ্য এ কথা মেনে নিতে হবে যে, যুগপরিবেশ অনুকূল না হলে কোনো মহাপুরুষেরই আবির্ভাব সম্ভব হয় না। কিন্তু এ স্বীকৃতি থেকে শিবাজীর মহত্ত্ব বা গৌরব খর্ব হয় না। দেশ

—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমাদর—

রবীন্দ্র পুরস্কার বিজয়ী

বিমল মিত্রের

**কড়ি দিয়ে কিনলাম** ১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

একক দশক শতক ১৪৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

জরাসন্ধের

**ছবি** ৪৲ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

প্রমথনাথ বিশীর

**লাল কেল্লা** ৩য় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ১৪৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর

**টুনি মেম** দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ৭॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**মগ্ন মৈনাক** দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুল ৪॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

ক্রান্তিকারী উপন্যাস

**কাল, তুমি আলেয়া** তৃতীয় মুদ্রণ ১২॥

**সাত পাকে বাঁধা**

ষষ্ঠ মুদ্রণ

সাড়ে চার টাকা

সুমথনাথ ঘোষের

**সোহাগরাত** ৪৲

মায়া বসুর

**কখন অন্যমনে** ৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**উপকণ্ঠে** পঞ্চম মুদ্রণ ৯৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

**কাঁচ-কাটা হীরে** ৩৲

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥

অবধূতের

**হিংলাজের পরে** ৫৲

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

কালীপদ ঘটকের

**মৃদঙ্গার** ৪॥

অপূর্বমণি দত্তের

**স্বর্গ হইতে বিদায়** ৪॥

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

**সন্ধ্যাদীপের শিখা** তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ৪৲

নলিনীকান্ত সরকারের

**দাদাঠাকুর** চতুর্থ মুদ্রণ ৫৲

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

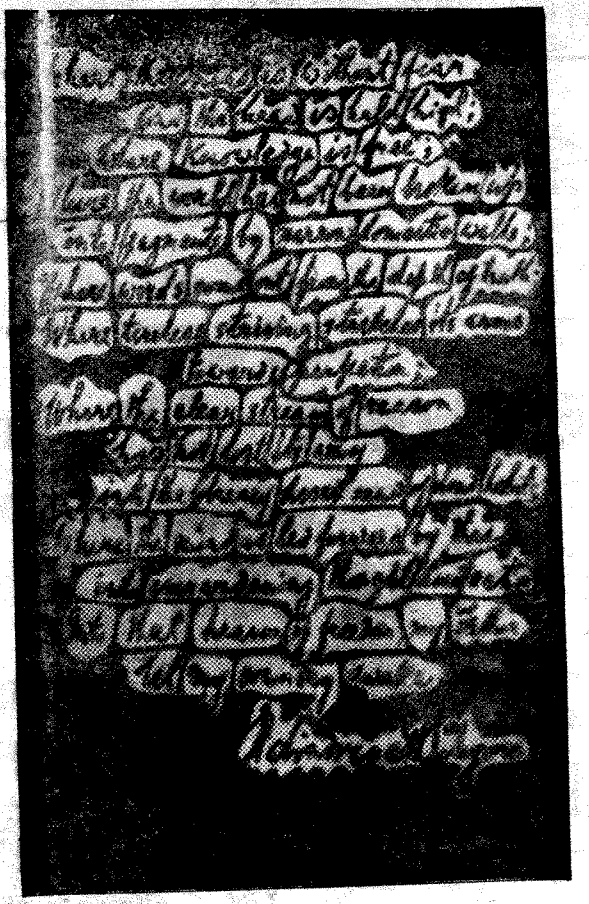

● "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"···কবিতার কবি কর্তৃক অনূদিত ইংরেজী সংস্করণ।

যদি তাঁকে গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছিল, তবে তিনিও তাঁদের অভিপ্রায়কে নিজের জীবনে ধারণ করবার ব্রত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক:

"মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড়ো করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড়ো হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাঁহাকে বড়ো করিয়া না তুলিত। বহুদিন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চ-নীচের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান ভেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন করিতেছিলেন। ভক্তির রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও বিশিষ্ট সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক ভগবানের অধিকারে তাঁহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন। মারাঠীয় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা সমস্ত দেশের ধর্মোদ্বোধনের সহিত জড়িত, এই জন্যই দেশের শক্তিতে তিনি ধন্য ও তাঁহার শক্তিতে দেশ ধন্য হইয়াছে।"

(ইতিহাস—শিবাজী ও মারাঠা জাতি)

শিবাজী ও মারাঠা জাতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ। সে ইতিহাসকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ধ্যান-নেত্রে। শিবাজীর আজন্মলালিত স্বপ্নের সিদ্ধি কামনা করেছেন। বাংলা দেশ একদিনের ঔদাসীন্যের যে অভিশাপ আজও বহন করে চলেছে, তা' থেকে মুক্তির পথ শিবাজী-নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন সবল কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

তোমারে চিনেছি আজি
চিনেছি চিনেছি হে রাজন,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে
আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।
সেদিন শুনিনি কথা—
আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে
ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।

কিন্তু শুধু কি মানস পরিক্রমণেই রবীন্দ্রনাথ খুশি ছিলেন? তাঁর বহু দেশ পর্যটনের তালিকায় কি মহারাষ্ট্রের নাম ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তিনি মহারাষ্ট্রে গেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আজকের দিনে যে মহারাষ্ট্রকে আমরা মানচিত্রে দেখতে পাই—এর জন্ম হয়েছে মাত্র বছর ছয়েক আগে। মহারাষ্ট্রের অঞ্চলগুলি এর আগে বোম্বাই ও সন্নিহিত কয়েকটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আহমদাবাদকে (গুজরাট) আলোচনা থেকে বাদ দিলে প্রথম বিলাত যাত্রার পথে বোম্বাই শহরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গেলেন সোলাপুর সপরিবারে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক "রাজা ও রানী" লিখিত হয়। সোলাপুর থেকে গেলেন পুণা। পরের বছর আবার গেলেন সোলাপুর। কোনো

কাজেই মন বসছিল না। তাই গেলেন মেজদার কাছে। সেখান থেকে অবশ্য মেজদাদের সাথে চললেন ইংলণ্ড। এদিকে বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছেন। প্রচুর টাকার দরকার। দেশে বিদেশে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করছেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'ভিক্ষাপাত্র কণ্ঠে নিয়ে' ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বোম্বাই ও পুণা সফর-তালিকা থেকে বাদ গেল না (১৩২৯ সন)। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন তো ফুরোয় না। তাই একাধিকবার বোম্বাই যেতে হয়েছে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। প্রতিবারই যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড তপশীলী হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথক নির্বাচক গোষ্ঠী তৈরি করতে চাইলেন। ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পুণা জেলে অনশন আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজীকে দেখতে গেলেন। অনশনভঙ্গে জল গ্রহণের সময় মহাত্মাজীর অনুরোধে তাঁর অতি প্রিয় গান রবীন্দ্রনাথ গাইলেন —'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা-ধারায় এসো।' ২রা অক্টোবর (গান্ধীজীর জন্মদিন) কবি পুণা শহরে 'অস্পৃশ্যতা বর্জন' সম্পর্কে লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। এর পর বছর (১৯৩৩) বোম্বাইয়ে 'রবীন্দ্রসপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হল। এতদুপলক্ষে কবির চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল। কবি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলেন বার্ধক্যের ক্লান্তি ও শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে।

আজকের মহারাষ্ট্রও যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উদাসীন নয়, এটি আনন্দের কথা। *

* রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবন-কথা' থেকে এ প্রবন্ধের কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।


॥ শক্তিপদ রাজগুরুর : নবতম উপন্যাস ॥

**নকল মানুষ ৪॥**

ছক বাঁধা নীতিবোধ, প্রেম আর মানবিকতার মুখোসের আড়ালে নির্মম ছলনার প্রতি, নীরব প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ কাহিনী।

॥ চলচ্চিত্রে রূপায়িত লেখকের অপর স্মরণীয় উপন্যাস ॥

**মেঘে ঢাকা তারা** (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সং) ৫৲

**দেবাংশী** (প্রখ্যাত লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস) ৩৲

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের : অভিনব সাহিত্য-আলোচনা গ্রন্থ

**ঘরে বাইরে সাহিত্য-চিন্তা** ৫৲

অমর গ্রন্থ : **উপমা কালিদাসস্য** ৩৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ৩ সর্বাধুনিক উপন্যাস ● চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

**পরিশোধ** ৬৲

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সদ্যপ্রকাশিত নতুন উপন্যাস

**অনেক আলোর অন্ধকারে** ৪॥

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—...'প্রবীণ লেখক পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের প্রাজ্ঞ জীবনবোধের স্পর্শে মর্মস্পর্শী হয়েছে'...

প্রেমেন্দ্র মিত্রের : অমর উপন্যাস
**আবার নদী বয়** ৩।০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি
**পঙ্কজা** (বিখ্যাত উপন্যাস) ৩৲
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের : উপন্যাস
**অবরোধ** ৩৲, **বনকপোতী** ৩।০
পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
॥ যুগান্তকারী উপন্যাস ॥
**সোনার পুতুল** ৩।০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের : চিরনতুন উপন্যাস
**হরফ** ৫৲ **নাগপাশ** ৩৲
**মাশুল** ৩॥০ **শান্তিলতা** ২॥০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস
**আধুনিকা** ৩॥০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**তামস তপস্যা** ৪৲
নীহার গুপ্তের : রহস্যোপন্যাস
**রঙের টেক্কা** ৪॥০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ
**পুরানো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী** ৩৲
**ভাববাদ খণ্ডন** ২॥০
দেশ-বিদেশের দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে,— আলোচনা করা হয়েছে ধর্ম, ইন্দ্রজাল ও দর্শনের সম্পর্ক।

সাহিত্য জগৎ—২০৩।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

# কবিচিত্তে উজ্জয়িনী

তরুণ মৈত্র

পথক্লান্ত পথিক বিশ্রাম গ্রহণ করে। শ্রান্তিতে যেমন হাত-পা এলিয়ে দেয়, তেমনি ক্লান্তিতে চিন্তার রেশ আসে স্তিমিত হয়ে। যখন আর পথ চলা যায় না—দৈহিক শক্তিতে ভাটা পড়ে, তখন চিত্ত ওঠে চঞ্চল হয়ে। হয়তো চোখ মেলে চাইতে পারে না, কিন্তু কল্পনার আলপনায় অদেখা জিনিষকে রূপময় করে তোলে। এমন তো হতে পারে, হয়তো দেখা হ'ল না তাজমহল। কিন্তু কল্পনা করতে তো বাধা নেই শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজমহলকে মহাকালের বিলুপ্তির মধ্যেও একবিন্দু নয়নের জল হয়ে জীবন্ত থাকতে। তাই তো কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে-কোন অদেখা জিনিষ। সাধারণ মানুষ চর্মচোখে যা দেখতে পায় না, অসাধারণ রূপকার তার রূপ-কল্পনায় তা সজীব করে তুলতে পারে। এমনি অসাধারণ রূপকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কল্পনার পরিধি ছিল অসীম দেশকালে বিস্তৃত। ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে বিশ্ব-রহস্যে পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের অনায়াস উপমা গঠনে, মহতের বর্ণনায় অদ্ভুত সাদৃশ্য রচনায় তাঁর মনের ও কল্পনার বিরাট ব্যাপ্তি ও উজ্জ্বল দৃষ্টির দীপ্তি দেখা যায়। বিচিত্র অনুভূতির বিচিত্র তালিকায় কবিমনের অসীম প্রাণশক্তি প্রকাশিত তাঁর কাব্যে, গানে। বিপুলা এ পৃথিবীর দিশে দিশে যে উত্থান-পতনের ঘূর্ণায়মান নাগরদোলা, মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমার ঝিলিমিলি কবিগুরু কখনো তা স্বচক্ষে দেখেছেন, কখনো বা কবিচিত্তে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে কল্পনার মাধুর্যে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কথকতা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। বিচিত্র পরিবেশের বিচিত্র রূপ-বর্ণনা দেখি কবিগুরুর কাব্যগাথায়। আসমুদ্রহিমাচল যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে তিনি যেতে পারেন নি পায়ে হেঁটে, যেখানে দেখতে পারেন নি চোখ মেলে; সেখানে তিনি কল্পনায় রূপরসগন্ধ স্পর্শ করেছেন।

পারিবারিক অনুশাসনে শিশুকালে কবিগুরু বাড়ির বাইরে ইচ্ছামত বের হতে পারতেন না। কবিচিত্তে প্রাণ-প্রাচুর্য স্বাভাবিক বিকাশের পথ পায় নি। কিন্তু নিভৃতে তাঁর স্বভাব-মন চুপ করে থাকে নি। এই রূপ-কল্পনার স্বভাবধর্ম কবির শেষ জীবন পর্যন্ত কাজ করে গেছে একইভাবে। পরবর্তী জীবনে জীবনের উৎসবে তাঁর কম নিমন্ত্রণ হয় নি। ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত দিক থেকে এসেছে আহ্বান। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা কবিকণ্ঠে উচ্চারিত। কিন্তু 'চির-আমি' রবীন্দ্রনাথের পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়ে নি, সেখানে ছুটে গেছে তাঁর কল্পনার দৃষ্টি। মূর্ত হয়ে উঠেছে সে পরিবেশ, সেকাল, সেকালের হৃদয়-স্পন্দন। মনে মনে যাকে কবি জানতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি ছুটে গিয়েছেন পায়ে হেঁটে অথবা কল্পমনে। সে উৎসবে তাঁর নিমন্ত্রণ হয় নি বলেই বুঝি সেই উৎসবের আনন্দ আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর মনের বাতায়নে সেই উৎসবের আলোর যে ক্ষীণ রশ্মিটুকু ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, তাতেই তিনি মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন,—কী আনন্দ প্রাণধারণে, কী গভীর সুখ প্রেম-প্রীতিতে, কী গভীরতা জীবনের পরতে পরতে। কবিগুরুর সমুদ্র-গভীর কাব্য রচনায় কতশত মণিমুক্তা। এখনও সে সব মুক্তারাশি রহস্যের ঝিনুক ভেঙে চোখ মেলে নি। আরও গভীর রহস্যময় তাঁর বিবিক্ত পরিবেশের রিক্ত মনের বেদনাসিক্ত প্রাণোচ্ছ্বাস। তাই বুঝি কবিগুরু তাঁর আপন হৃদয় গহনদ্বারে কান পেতে থাকতেন কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শোনবার জন্যে। যেখানে তিনি স্বচক্ষে দেখতে পারেন নি তাঁর কল্প-বস্তু, সেখানে তিনি আরও ভালভাবে দেখেছেন তাঁর রূপ-কল্পনায়। নির্জনতায় তাঁর মন তখন ছুটে চলে। সীমার মাঝে তাই অসীম মূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি-সৌন্দর্য মানুষকে ভাবুক করে তোলে। ভাবুক মনের ভাব-কল্পনা তখন চঞ্চল। এই চঞ্চলতা কখনো বা গভীরতাকে স্পর্শ করে, আবার কখনো ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে রহস্যময়তার জালে। সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। আষাঢ়ের নীলঘন আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। কালো মেঘে সবদিক অন্ধকার। দিনের আলো নেই, দিবাভাগ যেন রাত্রির অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে। যেমন ঝরঝর বৃষ্টি, তেমনি দুরন্ত বাতাস। ঝড়জলে তালতমাল আলুথালু। গোটা বনজঙ্গল যেন দু'বাহু তুলে হাহাকার করছে। এমনি ঝড়জলের ঘন অন্ধকারে কালো মেঘের জমাট ভার ছিঁড়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে উঠছে বিদ্যুৎ। যেন কোন এক অশরীরীর বক্র হাসি ছুরিকাঘাতের মতো মেঘ-ভারকে আঘাত করছে। জয়দেব কবি যেমন এমন বর্ষাদিনে দিগন্তের সীমানায় পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর দেখেছিলেন, ভারতের পূর্ব শেষে শ্যাম বঙ্গ দেশে। তেমনি কবিগুরু বর্ষার অন্ধকার রুদ্ধ-গৃহে একলা মেঘদূত পড়তে পড়তে মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে দেশদেশান্তরে উড়ে চলেছেন। শ্যাম বঙ্গ দেশের কবি তখন শিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনীর মহিমাচ্ছায়ায় আত্মমগ্ন। কবিচিত্তে উজ্জয়িনী তখন প্রাণবন্ত। ভারতের গৌরবসূর্য উজ্জয়িনীকে ঘিরে কবি রূপ-কল্পনার তুলিতে ছবি এঁকে চলেছেন। শিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে তখন রাত্রির যবনিকা। দিবাভাগের কর্মব্যস্ততা তখন নেই।

সদাকলরবরত পারাবতদল নিশি-দ্বিপ্রহরে সমস্ত প্রাণচাঞ্চল্য ভুলে উজ্জয়িনী ভবনে সুপ্ত। কেবল সেই নিশি-অন্ধকারে উজ্জয়িনীর রাজপথে বিদ্যুৎ-আলোর সাহায্যে মাত্র অভিসারিকা রমণী প্রেম-অভিসারে বের হয়েছে। বিরহ বেদনায় তার মুখ-মণ্ডলে পড়েছে অতৃপ্তির ছোপ। বিরহবিকার যেন তার সারা দেহে, চোখে মুখে। কবিচিত্তে তখন ভারতের মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর সেই স্বর্ণোজ্জ্বল কাল। যে কালে কবি কালিদাস পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘদূত লিখেছিলেন। সেই বিস্মৃত-কালের উজ্জয়িনীকে ঘিরে কবিগুরুর যাত্রা সুরু হয়েছে। দিব্যচোখে, কল্পকল্পরূপমাধুর্যে মূর্ত করে তুলছে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহর, তার প্রাসাদ, তার রাজপথ আর জনগণ-মন। তিনি স্বচক্ষে যেন দেখছেন : সেদিন, সেই কালিদাসের কালে, যেদিন মেঘ-দূতের মতো বিরহমনের কাব্যগাথা লিখিত হয়েছিল,—উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে মেঘের ঘনঘটা, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-ঝিলিক আর উদ্দাম পবনের ঘাড়ত্ব। চারদিকে শুধু গুরুগুরু রব। সেই গম্ভীর মেঘবর্ষণের শব্দে সহস্র বর্ষের পুঞ্জীভূত বিচ্ছেদ-ক্রন্দনের রূপই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই উজ্জয়িনীর আর্দ্র আবহাওয়ায় চিরদিবসের রুদ্ধ অশ্রুজল যেন কবি কালিদাসের কাব্যগাথায় প্রাণ পেয়ে সরবে প্রকাশ পেলো।

'বারোশ' সাতানব্বই সালের জ্যৈষ্ঠের বর্ষাঘন রাতে কবিগুরু 'মেঘদূত' কবিতা লিখেছিলেন। মেঘদূত কবিতা তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মানসী'র অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন সাহিত্য কবির মানসলোকে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। ভারতীয় শাস্ত্র, কাব্যগাথা তাঁর কবিজীবনের অন্যতম উৎসস্থল। কবির রূপ-কল্পনায় ভারতের স্থান সবার উপরে। 'বিশ্বকবি' রূপে তাঁকে আমরা বন্দনা করি। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে বিশ্বের, তার চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক অর্থে তিনি ভারতের। বিশ্বমৈত্রী রবীন্দ্র-ভাবনার একটি বিশেষ রূপ, আর ভারতের বিবিধ বিচিত্র সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়, শিক্ষা-সাধনা ও সংগ্রামের নিত্যসহচর ও শরিক যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি একান্তই আমাদের —ভারতবাসীর। সেই সুখ-দুঃখের শিকড় থেকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার সহস্র-দল পদ্ম বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি জন্মসূত্রে ; পেয়েছি এবং পেয়ে ধন্য হয়েছি। আসমুদ্রহিমাচল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ধরা পড়েছে। তাঁর রূপ-কল্পনায় ভারতের মহিমা ও সৌন্দর্যকে ভাবগত আত্মীয়তার সূত্রে পাওয়াই হ'ল আমাদের কাম্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করেছেন আমাদের ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চলের সমস্ত ভাব ও ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সভ্যতা। একালের ও সেকালের ভারত তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়েছে। 'মেঘদূত' ভারতের সেকালের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের এক জীবন্ত ছবি। মধ্যপ্রদেশ—উজ্জয়িনী সভ্যতার সিন্ধুপ্রমাণ পরিচয় এই কাব্যবিন্দুতে ধরা পড়ে আছে। উজ্জয়িনী কবিগুরুর স্বপ্নচারিণীও বলা চলে। কবিচিত্তে উজ্জয়িনীর স্থান কত গভীর তা প্রমাণ হয় 'স্বপ্ন' কবিতার মাধ্যমে।

কবির স্বপ্নলোক উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী প্রাসাদে রয়েছে তাঁর পূর্ব-জন্মের প্রথমা প্রিয়া। তাকে খুঁজে ফিরে দেখতে চান কবি। তিনি চলেছেন জনশূন্য পথে, সেই প্রিয়ার ভবনে। দ্বারে শঙ্খচক্র আঁকা রয়েছে। তোরণের দু' দুটি শ্বেতশুভ্র স্তম্ভের উপর দম্ভভরে সিংহের দুটি গম্ভীর মূর্তি। কবি দেখছেন আকাশপথে বনবিহার সাঙ্গ ক'রে প্রিয়ার কপোতদল ঘরে ফিরে এলো। আর প্রিয়ার প্রিয়তম ময়ূর তখন সোনার খাঁচায় ঘুমিয়ে পড়েছে সারা দিনের ক্লান্তি নিয়ে। এমনি সময় কবি তাঁর প্রথমা প্রিয়াকে দেখলেন। মেঘের মত তার নবীন মধুরগুরু বোঝাবেণী। তার মাঝে-মাঝে গজদন্ত সমান নিটোল হাতে শোভিত নীলপদ্ম কর্ণমূলে কুন্দকলি অনুপম রূপলাবণ্যে চঞ্চল, শিথিল কবরীতে কুরুবক রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা তনুদেহ, আধা আধা রোদ তুলেছে চরণে বাঁধা নূপুরখানি। দ্বারপ্রান্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো লক্ষ্মী প্রতিমার মতো। প্রিয়ার দেহগন্ধে কবির সর্বাঙ্গ যেন উতলা হয়ে উঠলো। তখন শিপ্রা-নদীতীরে রজনীর অন্ধকার উজ্জয়িনীকে ঢেকে দিয়েছে। কবি প্রিয়ার সম্মুখে বসে সন্ধ্যাপাখি-সম প্রতিমার সুগোল ওষ্ঠ 'পরে চেয়ে চেয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করছেন কোন্ জন্মে কবে দেখা হয়েছিল তাঁদের দুজনার। ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীকে ঘিরে নেমে এসেছে রাত্রির অন্ধকার। প্রিয়ার দীপশিখা নিবে গেছে দ্বারপ্রান্তে। শিপ্রানদী-তীরে শিবমন্দিরের পূজারতি বন্ধ। শুধু ওরা দুজনে মুখোমুখি।

বোলপুরে বসে ছত্রিশ বছরের


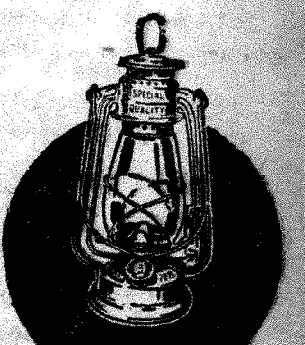

কিয়ান
নবীন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,এস্ত চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

● সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৪

কবিচিত্তে উজ্জয়িনী যেন দেখা দিয়েছে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার প্রিয়ক্ষেত্ররূপে। কেন এই রূপ-কল্পনা? ভারতের ঐতিহ্যময় যে সত্য-শিব-সুন্দরের আসন পাতা রয়েছে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্থানে, তারই অন্যতম স্থান হল সংস্কৃতি নগর উজ্জয়িনী। মধ্য-প্রদেশের এই নগর একদিন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় সত্যকে বহন করেছিল। সেদিন একদিকে যেমন ছিল রাজকীয় সভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তেমনি ছিল কাব্য, সংস্কৃতি চর্চার অমর প্রচেষ্টা। সে কাল, স্থান আজ কবির কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কল্পনা কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি প্রথমা প্রিয়ার সন্ধানে যে উজ্জয়িনীর প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন তা প্রাচীন সভ্যতার দ্বারে উপস্থিত হবারই নামান্তর। উপনিষদে আছে: নানা পুষায় শ্রীরস্তি। অর্থাৎ শ্রম ভিন্ন শ্রী হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রী-সুষমাকে রূপান্তরিত করেছেন তাঁর কাব্যে; ভাবশ্রীতে ঐশ্বর্যময় করেছেন আমাদের জাতীয় এবং মানবিক চেতনাকে। এই জাতীয় জীবনকে শ্রী ও সুষমায় মার্জিত করার, পুনর্জীবিত করার জন্য চাই আমাদের শ্রম, সাধনা এবং আদর্শপুষ্ট ঐকান্তিকতা। এই ঐকান্তিকতার রূপচ্ছবি কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। রূপময় ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি তাঁর আশ্রমের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করা এখনও আমাদের অনেক বাকী। সর্বভারতীয় কল্যাণচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ রবীন্দ্রনাথের ভারত-পরিক্রমা আশু প্রয়োজন। শতবর্ষ পর রবীন্দ্র-রচনাবলী এবং রবীন্দ্রচর্চার প্রতি আগ্রহ আমাদের মনে কিছু পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে। উগ্র ভাষা মোহান্ধতা এবং অন্ধ প্রাদেশিকতার শ্বাসরোধকারী পরিবেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই আমাদের জাতীয় ঐক্য ও ভাবসংহতির পথপ্রদর্শক। আজকের বিংশ শতাব্দীর প্রাণবন্ত পরিবেশে তাই বুঝি কবিমনে ভেসে উঠেছিল মনোহর পরিবেশের রূপ।

সেই কবিকল্প উজ্জয়িনী-পরিবেশ যেন ভারতের কাব্য-সাহিত্য সাধনার প্রকৃত পরিবেশ। তাই কবিগুরু তাঁর শান্তিনিকেতনে সাধনপর্বের স্থান নির্দিষ্ট করলেন তরুতলে। যেমন সেকালে উজ্জয়িনীতে 'রেবার তটে চাঁপার তলে, সভা বসতো সন্ধ্যা হলে।' আশাবাদী কবি তাই আজকের পরিবর্তনের মধ্যে কালিদাসের কালের উজ্জয়িনীর রূপটি খুঁজে পেতে চান। কবির মনে প্রবোধ আছে 'তেমনি বকুল ফোটে গাছে', 'ফাগুন-মাসে অশোক-ছায়ে অলস প্রাণে শিথিল গায়ে, দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।' আজকের যুগে আর সেকালের সাজসজ্জা নেই। কাষ্ঠ-পাদুকার পরিবর্তে এসেছে জুতো, মোজা। ভারতীয় ভাষার পরিবর্তন এসেছে অন্য দেশী চালে, তবুও কবি দেখেন সেই কটাক্ষ, 'আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য---যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।' কবিচিত্তে উজ্জয়িনী এতখানি স্থান জুড়ে নিয়েছিল যে, কবি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন কালিদাসের কালে। কারণ সেকালে জন্মগ্রহণ করতে পারলে শুধু দিন-যাপনের গ্লানি থেকে যেন মুক্তি পেতেন। কালিদাসের কালে জন্ম-গ্রহণ করলে একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিতেন 'উজ্জয়িনী বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি।

# ত্রিপুরায় কবি-স্মৃতি

## সত্যব্রত চক্রবর্তী

তারিখটা শ্রাবণের ২৩শে---১৩৪৮ বাংলা সাল। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব স্বর্গীয় মহারাজ বীরবিক্রম দেবমাণিক্য 'চেম্বার অব প্রিন্সেস'-এর স্টাণ্ডিং কমিটীর বৈঠকে যোগ দিয়ে বোম্বাই থেকে বাঙ্গালোরে ফিরে আসছেন। রায়চুর পেরিয়ে গুণ্টাকলের কাছাকাছি একটা ফাঁড়ি স্টেশানে হঠাৎ ট্রেন থেমে পড়ল। কি কারণ---সবাই উদ্বাস্ত। রাত শেষ হয়ে তখন ভোর হয়ে আসছিল। শ্রাবণ মাসের নরম রোদ তখনও প্লাটফর্ম স্পর্শ করে নি। এই সাত সকালেই প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে খবরের কাগজ। আর সে কাগজের দীর্ঘ শিরোনামা দখল করে একটা মোটা হরফের মর্মান্তিক খবর---রবীন্দ্রনাথ তিরোহিত হয়েছেন। বজ্রাহতের মত মহারাজ নিজের কামরায় বসে খবরটা শুনলেন। স্থির---অচঞ্চল কণ্ঠে বললেন,---'শুভক্ষণেই ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে রবির উদয় হয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ত্রিপুরার রাজগৃহে তারযোগে এই দুঃসংবাদ জানালেন। সম্ভবত শান্তিনিকেতন থেকেও এ খবর জানান হয়েছিল। সেদিনের শোকার্ত রাজধানীর চিত্র প্রবীণদের অনেকের স্মৃতিতেই হয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শোক-বিভূষিতা 'উজ্জয়ন্ত' রাজপ্রাসাদ। দিবসের সমস্ত উৎসব-বাহুল্য বর্জিত হল। প্রাসাদের অন্ধকার নহবতে শ্রাবণ-সন্ধ্যার আগমনী বাজল না। কেউ শব্দ করে কাঁদল না---কেউ আর্তনাদ করে উঠল না। ত্রিপুরার রাজকুল-লক্ষ্মী নির্জনে অশ্রুমোচন করলেন। কুঞ্জবন প্রাসাদ-এর উদ্যান-বীথি জুড়ে ---দেউদার-ঝাউবন থেকে বর্ষার অশ্রুসিক্ত কচি পাতা চিরে চিরে ঝরে পড়ল।

১২৮৭ থেকে ১৩৪৮ বাংলা সাল। এই ষাট বছরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার নিবিড়তর সম্পর্কের যোগসূত্র আবহমান বাংলা দেশের সঙ্গে এ প্রাচীন রাজ্যের সংস্কৃতিকে কতখানি গভীর ও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল---আজ তা আমাদের এক বিস্মিত গবেষণার বস্তু। কবির প্রাক-যৌবনেই (১২৮৭ বাংলা সাল) 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য 'ভারতী' পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল---এ তথ্য সকলেরই জানা আছে। কবির বয়স তখন ২০ বছর। চল্লিশোত্তর প্রৌঢ় রাজা বীরচন্দ্র দেবমাণিক্য সে সময় ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে আরূঢ়। এর দু'বছর পরে রাজা বীরচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হল। রাণী ভানুমতীর মৃত্যুতে রাজা শোক-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ভগ্নহৃদয় কাব্যখানা পাঠ করে তাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। তিনি আপ্লুত হন। রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরাধিপতি শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত করতে চান---শুধু এটুকু কথা জানাবার জন্যই ত্রিপুর দরবারের রাজ-প্রতিনিধি কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রেরিত হলেন। প্রাক-যৌবনেই এই রাজকীয় স্বীকৃতি কবির কাছে ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। জীবনের শেষ বৎসরে শান্তিনিকেতনে 'ভারত-ভাস্কর' সম্মান গ্রহণের সময়ে কবি ত্রিপুরার ভূতপূর্ব মহারাজা বীরবিক্রম দেবমাণিক্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

"একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কেবল আমাকে একথা জানাবার জন্য যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম।"

('ভারত-ভাস্কর' পদবী গ্রহণের সময়ে শান্তিনিকেতনে কবির ভাষণ ॥)

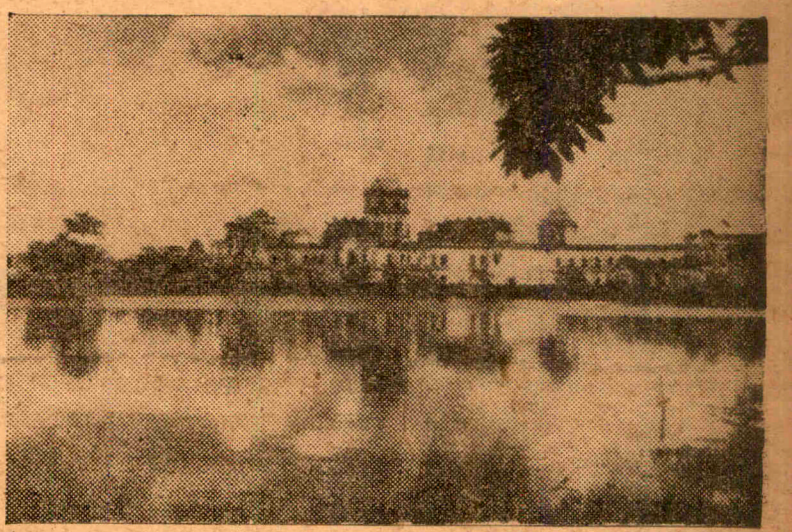

● কবিকর্তৃক নামাঙ্কিত ত্রিপুরার 'উজ্জয়ন্ত' রাজপ্রাসাদ আজও পথিকের তাঁর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

● কবি ও ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্যের এই চিত্রটি ত্রিপুরায় গৃহীত

সেই থেকে কবির সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্কের সূচনা। পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তা ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠতর হল। বয়সের প্রচুর ব্যবধান সত্ত্বেও রাজা এবং কবির মধ্যে একটা আশ্চর্য অকৃত্রিম হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩০৩ বাংলা সালে যুবরাজ রাধাকিশোর রাজ্যভার হাতে তুলে নিলেন। রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়েই ত্রিপুরার সঙ্গে কবির সম্পর্ক সর্বাধিক ঘনিষ্ঠরূপে দেখা দিয়েছিল। কবি ত্রিপুর রাজপরিবারেরই ঘনিষ্ঠ একজন হয়ে দাঁড়ালেন। চিঠিপত্রের শেষে 'আপনার চিরন্তন' লিখে মহারাজ নিজের নাম লিখতেন। কবি লিখতেন 'আপনার গুণানুরক্ত' অথবা 'চিরানুরক্ত রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি।

কবি প্রথমবার ত্রিপুরায় এলেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে ক্রমপ্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায়—রাজার আমন্ত্রণ তিনি অবহেলা করতে পারলেন না। ত্রিপুরায় তাঁর প্রথম আগমনের বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানতে পারি নি। সমকালীন অন্যান্যদের রচনায় তা প্রায়াংশে অনুপস্থিত। ত্রিপুরায় কবির স্নেহধন্য শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু তাঁর সংগ্রহ থেকে কবি-সম্বর্ধনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের দিয়েছেন,—"কবি-সম্বর্ধনার আয়োজন হইল পুরাতন কুঞ্জবনের সু-উচ্চ টিলায় শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বসন্তোৎসবে (১৩০৬)। ত্রিপুরার আদিবাসীদের টঙ ঘরের নমুনায় সম্বর্ধনা-মঞ্চ তৈরি হইল। মুলী বাঁশে তৈরি মঞ্চের গড়ন ও ফুল পাতায় সজ্জা পরিপাটি শিল্প শোভার নিদর্শন। মঞ্চের উপর হইতে নজরে পড়ে চারিদিকে উচ্চ নীচ পাহাড়গুলি থরে থরে ঢেউ খেলিয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশের নীল চন্দ্রাতপ দিগন্ত রেখাকে চুম্বন করিয়া ঋতু উৎসবকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরও সম্বর্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্যগীতরত মণিপুরী শিল্পিবৃন্দ। নগ্নগাত্র, পরিধানে বাসন্তী রঙের কাপড়, লম্বমান বাসন্তী চাদর গলায়—মাথায় বাসন্তী রঙের পাগড়ী, খোল, মন্দিরা, করতালের সমতালে পদবিক্ষেপ ও দেহভঙ্গিমা—দীর্ঘলয়ে কীর্তনের সুর এক মোহময় আবেশ রচনা করিতেছিল। দর্শক যাহারা, তাহারাও স্ত্রী-পুরুষ সেই বাসন্তী রঙের পরিচ্ছদে ভূষিত। এই পরিবেশের মধ্যে কবি ও রাজা মঞ্চোপরি ফরাস বিছানায় আসীন। কালোপযোগী নৃত্যগীত ও পুষ্প সজ্জার উপহার—রাজা প্রজার সম ব্যবহার—কবির মনকে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিল। ইহারই স্মৃতি—মহারাজ রাধাকিশোরকে— "কাহিনী" কাব্য উৎসর্গপত্র (২০শে ফাল্গুন—১৩০৬) বহন করে বলিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার মনে করেন।"

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের বিলাতে গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্যের এক আবেদন কবি প্রথমবারেই রাধাকিশোরকে জানিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের জন্য কবির কি অপরিসীম আশা ও আগ্রহ ছিল তার পরিচয় আমরা বহুভাবে পেয়েছি। সুখ্যাত জগদীশচন্দ্রের জন্য সাহায্য নেবার উদ্দেশ্যেই কবি ১৩০৮ বাংলা সালে দ্বিতীয়বার আগরতলায় এলেন। কবির এই দ্বিতীয়বার ত্রিপুরায় আসবার

বিবরণ 'রবীন্দ্র-জীবনী'র অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আগরতলা থেকে কবি আচার্যের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন এর আংশিক উল্লেখ প্রসঙ্গের সহায়ক হবে মনে করি।

"আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েকদিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই দু' এক মাসের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরও ১০ হাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহু কার্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই।" * * *

তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কি দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছু ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমার উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।"

(চিঠিপত্র ॥ ৬ষ্ঠ খণ্ড)

চিঠিখানাতে কবি আচার্য জগদীশচন্দ্রকে "বন্ধু" বলে সম্বোধন করেছেন এবং নীচে লিখেছেন "তোমার রবি—"। চিঠির শীর্ষভাগে লেখা ছিল—"আগরতলা, কার্তিক ১৩০৮।" জগদীশচন্দ্রের সাফল্যে কবির আগ্রহ এখানেও স্পষ্ট। এবং কবি যে মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আগরতলায় এসেছিলেন মহারাজের অকুণ্ঠ প্রতিশ্রুতিতে তাও পূর্ণ হয়েছে। কবি নাকি সেবার আগরতলায় 'জুরি-বাংলায়' কয়েকদিন কাটিয়ে যান। এখন অবশ্যি আর এই জুরি অথবা জোরা বাংলার অস্তিত্ব নেই। এই বাংলোতেই কবির ঘরোয়া সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে কবির "রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা" এবং "অয়ি ভুবন মনমোহিনী" সঙ্গীত দু'টি কবিকে গেয়ে শোনান হয়। অনুষ্ঠানে পিতা বীরচন্দ্র রচিত "জয় জগতবন্দিনী" গানটি রাধাকিশোর গেয়ে শোনান। এই বাংলোতে অবস্থান কালে কবি নাকি "বল দাও মোরে বল দাও" "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী" ইত্যাদি নৈবেদ্যর বহুশ্রুত গানগুলি বার বার গাইতেন। এ সময়ে বোলপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়েও মহারাজের সঙ্গে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

কবির সাহচর্য এবং অকৃত্রিম সহানুভূতি রাধাকিশোরকে অনেকাংশে কবির উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। তিনি সমস্ত কিছুর ব্যাপারেই কবির পরামর্শ চাইতেন। এই প্রিয়-নির্ভরতা ত্রিপুরার শুভাশুভ সম্পর্কে কবির দায়িত্ব এবং দুশ্চিন্তাকেও বাড়িয়ে তুলেছিল অনেকখানি। ১৩১২ বাংলা সালে তৃতীয়বার যখন মহারাজের আমন্ত্রণে আগরতলায় এলেন সে সময়টায় রাজ্যের নানাবিধ সমস্যা এবং দুর্ভাবনার দায়ভাগ রাজার সঙ্গে কবিকেও সমানভাবে ভাগ করে নিতে দেখেছি। কবি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার


নূতন বছরের নূতন বই

ঐতিহাসিক মধুসংলাপী নিগূঢ়ানন্দের
সুবৃহৎ উপন্যাস
একটি বেগমের অশ্রু

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
সর্বাধুনিক মনস্তত্ত্বপূর্ণ উপন্যাস
নিঃসঙ্গ যৌবন

রেলওয়ে মার্সেলিং ইয়ার্ডের পটভূমিকায় বিচিত্র জীবন রসের কাহিনী
অগ্নিমিত্রর
নীল ক্রৌঞ্চের ডানা

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ
চন্দ্রা ৫·০০

অ্যান্টন চেখভ
বেদনাহত ৪·০০

গোপাল ভৌমিক
সাহিত্য সমীক্ষা ৪·০০

॥ জ্ঞানতীর্থ ॥ ১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অশীতিবর্ষ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত ত্রিপুরার শেষ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। ইনিই কবিকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজদরবারেও যোগ দিয়েছিলেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর একদিনের স্মৃতি-কথায় বলছেন:

"চুড়িদার পায়জামা আর আচকান গায়ে দিলে পাগড়ী বাঁধার জন্যে আমি আর তাঁর (কবির) মাথা ছুঁতে পারি না। (কবি) বেশ কৌতুক করে স্মিতহাস্যে একখানা কেদারায় বসলেন। মনমতো করে পাগড়ী বেঁধেছিলুম। মজা হলো নিজের মাথায় যেমন করে পাগড়ী বাঁধি তা হলো না---হলো উল্টো। যেখানে বাঁ কান পাগড়ীর তলায় যায়---তার জায়গায় গেল ডান কান। যাকে বলে ড্যাব্‌রা-পাগড়ী। আমার ভুল হয়েছে বললেও কবি 'ওই ঠিক আছে' বলে কি সন্তুষ্টিই না প্রকাশ করলেন। পাগড়ী মাথায়---পায়জামা আচকানে তাঁকে অভিনবরূপে দেখা গেল। * *

দুঃখ এই---নিজের ফটো তোলার উৎসাহ---অথচ একদম ভুলেই গেলাম এই অভিনব রূপের ছবি রাখবার কথা। এখন আরও বিশেষ করে মনে ওঠে যখন কবির হাজার রকম ছবি দেখি---কিন্তু আমাদের এখানকার সেই মূর্তির প্রতিরূপ কোথাও খুঁজে পাই না।"

("ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি" ॥ সত্যরঞ্জন বসু, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ।)

বলাই বাহুল্য রাজকুমার ব্রজেন্দ্র-কিশোর আজীবন কবির অপরিসীম স্নেহচ্ছায়ায় সংবর্ধিত। তাঁর এই স্মৃতিকথায় কবির দরবারী পোষাক রপ্ত করার চিত্রটি কবির আনুষ্ঠানিক-ভাবে রাজসভায় যোগদানের কথাকেই স্পষ্ট করে তুলছে।

কবি এ বছর আগরতলার বর্তমান উমাকান্ত একাডেমী হলে আয়োজিত (১৭ই আষাঢ় ॥ ১৩১২) ত্রিপুর সাহিত্য সম্মেলনীর সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের যুগবাঞ্ছিত ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বহু আলোচিত 'দেশীয়-রাজ্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

আগেই বলেছি---রাজ্যের বৈষয়িক শুভাশুভের চিন্তা নিয়েই কবি অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনি করেই সেবারে আগরতলার ক'টা দিন কাটলো। কবি কলকাতায় ফিরে গেলেন। ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান চিন্তা আগরতলা থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত কবির পেছনে ধাওয়া করেছে। এ নিয়ে তিনি অনেক কিছু ভেবেছেন---তাঁর পরবর্তী চিঠিপত্রে এঁর ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবত এই সময়ে 'ভারত রাজন্য সভা' গঠনের একটা খসড়া পরিকল্পনাও রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছে উপ-স্থাপিত করেছিলেন। বাংলা সাল ১৩১২-তে কবি কর্তৃক নির্বাচিত অ্যাটর্নী এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের খ্যাতনাম ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় রাজ-মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ উপলক্ষেও কবি ঐ সময় সদলবলে চতুর্থবার ত্রিপুরায় এলেন। সে বছরে বরিশালে আয়োজিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কার্যসূচীভুক্ত সাহিত্য সম্মেলনে কবির পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল। সুতরাং কার্তিক মাসের ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে চৈত্র মাসের কোন এক সময়ে বরিশাল যাবার পথে কবি একই বছরে দ্বিতীয়বার আগরতলায় এলেন। এ রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বাজেট সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহারাজের সঙ্গে কবির আলোচনা হয়েছিল। মহারাজ এ বিষয়ে কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় আগ্রহশীল ছিলেন। বাজেটের মূল নীতি বিষয়ে একদিকে নিজের মতামত এবং রাজ্যের কল্যাণকর পন্থা নির্ধারণে সহায়ক যে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত নোট তিনি দিয়েছিলেন---সম্প্রতি এর পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিপুরার কল্যাণের

দিকে কবির চিন্তা কতখানি প্রসারিত ছিল আলোচ্য নোটটি থেকে তা আন্দাজ করা অনায়াসসাধ্য। কবির সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান দলিল সন্দেহ নেই।

বাংলা সাল ১৩১৫ (১৯০৯ ইংরেজী) তে রাধাকিশোরের আকস্মিক মৃত্যু হল। প্রিয়-বন্ধু বিয়োগের এই শোক কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। রাজ্যভার নিলেন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর। কবি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে উদ্দেশ্য করে বোলপুর থেকে লিখলেন :

" * * * দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় বিরত থাকিব না। যখন দেখিব তোমরা দুই ভ্রাতায় (বীরেন্দ্রকিশোর ও ব্রজেন্দ্রকিশোর) দৃঢ়ভাবে মিলিত হইয়া তোমাদের সিংহাসনকে সু-প্রতিষ্ঠিত এবং রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ—দেখিব তোমাদের রাজকোষ সচ্ছল, তোমাদের প্রজাগণ সুখী—সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সিংহাসনের চারিদিকে কোন কলুষ নাই—তখন আমার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইবে।"

( প্রবাসী, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৪৮-এ প্রকাশিত মহারাজা কুমারকে লেখা কবির চিঠি ॥)

রাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময়ে কবি ৬ষ্ঠ বার ত্রিপুরায় এলেন ১৩২৬ বাংলা সালে। কুঞ্জবনের মালঞ্চ-বাসে তিনি থাকতেন। এই সুন্দর বাসগৃহ এবং সম্মুখবর্তী প্রশস্ত উদ্যানটির জন্য কবির পরিতৃপ্তির অন্ত ছিল না। সেবারে তিনি আগরতলা 'উমাকান্ত একাডেমী' পরিদর্শন করলেন (১০ই নভেম্বর ১৯১৯)। কবিকে সেখানে অভিনন্দিত করা হল। সঙ্গীত ও চিত্রকলা-রসিক বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কবির স্নেহের সম্পর্ক গাঢ় হয়ে উঠেছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই মহারাজের চেষ্টায় সেখানে মণিপুরী নৃত্যাদি শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল।

১৩২৯ বাংলা সালে বীরেন্দ্রকিশোর লোকান্তরিত হলেন। এবার রাজ্যের ভার পড়ল নাবালক বীরবিক্রমকিশোরের উপর। তাঁর রাজত্বের সময়েই কবি শেষবার আগরতলায় এলেন বাংলা সাল ১৩৩২ (ফাল্গুন)-এ। কবি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কুমিল্লা পর্যন্ত এসে এ রাজ্যে প্রবেশে তাঁর সঙ্কোচ ছিল—'কি জানি নাবালক রাজা তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন কি না।' ব্রজেন্দ্রকিশোরের একান্ত আগ্রহে কবিকে আসতেই হল। এখানে ক'টা দিন তাঁর ভালই কেটেছিল। এবার তিনি ছিলেন কুঞ্জবন রাজপ্রাসাদে। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু স্মৃতিকথায় বলছেন :

"কুঞ্জবন প্রাসাদের পূর্ব অংশে অর্ধ বৃত্তাকার অলিন্দ। এখানেই ছিল কবির নিভৃত চিন্তার স্থান। প্রশস্ত অলিন্দে ছোট একখানা গালিচার উপর একখানা কেদারাই ছিল আসবাব। সংলগ্ন বটবৃক্ষে বাতাসের সন্ সন্ শব্দ, নানা রঙের নানা জাতীয় পাখির কাকলি, ফুলের সুবাস, মূর্ত বসন্তের আবির্ভাব কবিকে উন্মেলিত করিত।"

ব্রজেন্দ্রকিশোরের পরিবারের মেয়েরা কবিকে আনুষ্ঠানিক 'রাস-নৃত্য' দেখিয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের বালিকাদের এ নৃত্যকলায় কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এ থেকেই শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দেবার জন্য তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। ১২ই ফাল্গুন তারিখে 'কিশোর সাহিত্যসমাজ'-এর উদ্যোগে বর্তমান একাডেমী হলঘরে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হল। জনসম্বর্ধনার উত্তরে কবি বললেন :

" * * * জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই (৺বীরচন্দ্র) তা'র প্রথম সূচনা করে

নতুন দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধযুক্ত

উষসী ট্যালকম পাউডার

বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড সহযোগে প্রস্তুত
ঘামাচি স্থায়ীভাবে দূর করে

উষসীর দীর্ঘস্থায়ী মধুর গন্ধ আপনাকে সারাদিন স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল ও সজীব রাখবে। বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড থাকায় ইহা অতি সত্বর ঘামাচি দূর করিয়া আপনাকে অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করে। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষে সমান উপযোগী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা
বোম্বাই • কানপুর

● কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত প্রথম ত্রিপুরেশ্বর কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য।

দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন—তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তা'কেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।"

সম্বর্ধনার উত্তরে দীর্ঘ ভাষণে কবি ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর নিবিড় ও অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে ত্রিপুরার প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন। ভাষণটি ত্রিপুরা থেকে তৎকালে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য সাময়িকী 'রবি' (৪র্থ সংখ্যা ১৩৩২ বাংলা সাল)-এতে সম্পূর্ণ সংকলিত হয়েছিল। সেবারে (শেষবার) আগরতলা অবস্থানের সময় কবি 'দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয় আকাশে', 'ফাগুনের নবীন আনন্দে গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে', 'এসো আমার ঘরে। বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে', 'বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি' এবং 'আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে'—এই ক'খানা লিখেছিলেন বলে রবীন্দ্র-জীবনীকার উল্লেখ করেছেন। কবি ১০ই ফাল্গুন রাত্রিতে এসেছিলেন এবং ১৪ই ফাল্গুন এখান থেকে সদলবলে কলকাতা রওয়ানা হয়ে যান। এই তাঁর শেষ যাওয়া।

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজীবন-সম্পর্ক ব্যাপক এবং গভীর। সন-তারিখ এবং দু'একটি ঘটনা দিয়ে ইতিহাসের সময় নির্ঘণ্টকে চিহ্নিত করা হল মাত্র। কিন্তু কবির যে অপরিসীম ভালবাসা, মমতা এবং আশীর্বাদ এই দীর্ঘকাল ধরে অরণ্যতনয়া ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রাণরসকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল—ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন আন্তর-গতিবেগের সঙ্গেই তার একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক। কবির সঙ্গে এই প্রাচীন রাজ্যের গভীর সম্পর্কের কথা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থটিতে বিস্তৃত-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় কবির স্নেহধন্য শ্রীযুক্ত সত্য-রঞ্জন বসু এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র দত্ত এ সমুদয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

কবির অশীতিতম বয়ঃক্রম পূর্তি উপলক্ষে ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল এবং আলোচ্য অনুষ্ঠানেই ত্রিপুরাধিপতি কবিকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি দানের কথা ঘোষণা করলেন। ৩০শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির হাতে রাজকীয় মানপত্র তুলে দেওয়া হল। পরবর্তী শ্রাবণেই কবি লোকান্তরিত হলেন। ৬০ বছর পূর্বে ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র জোড়াসাঁকোর অখ্যাত কবিকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। ৬০ বছর পরে তাঁরই বংশের শেষ স্বাধীন উত্তর-পুরুষ ঐ কবিকে অন্তিম অভিনন্দনে সম্মানিত করলেন—এ যেন ইতিহাসের দিক থেকেই গভীর সঙ্গতিপূর্ণ।

তারপর ক্রমানুয়ে একটা যুগের ব্যবধানের প্রান্তে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই রাজ্যের সেদিনকার মানসিকতার সঙ্গে আজকের চিন্তা ও চর্চায় দূরত্ব এসেছে অনেকখানি। উজ্জয়ন্ত বা কুঞ্জবন পুষ্পবন্ত (শুনেছি কবিই এই নামকরণ করেছিলেন) রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে কিংবা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত মালঞ্চাবাসের নির্জনতায় দাঁড়ালে নিজেকে স্মৃতিচারী মনে হয়। কবির আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে আজ যখন নতুনকালের একটা রোমাঞ্চিত বোধকে আত্মস্থ করবার উন্মাদনা এখানেও তরুণ—কিশোরদের মধ্যে পর্যন্ত দেখতে পাই—তখন কবির আশীর্বাদের কথাই মনে পড়ে যায়। শিল্পে এবং জীবনে—আন্তর এবং বহিশ্চর্যায় নূতনের উপলব্ধির মধ্যেই তো কবির এ সম্পর্কের সার্থকতা॥

# রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরপ্রদেশ

আদিত্য ওহদেদার

'নৌকাডুবি'তে পড়ি রমেশ যখন কমলাকে জানালো যে, সে কমলাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাবে তখন লেখক কমলার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে—'পশ্চিমে' শুনিয়া কমলার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমে! যে লোক চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়াছে, এক 'পশ্চিম' বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়! পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস!"

এ কিন্তু কেবল কমলার মনোভাব নয়, এর মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে কমলারই স্রষ্টার অনুভূতি। বৃদ্ধ বয়সে কবি লেখেন—

মোরে হিন্দুস্থান
বারবার করেছে আহ্বান
কোন শিশুকাল হতে পশ্চিম
দিগন্তপানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা
করেছে শ্মশানে।...
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা
শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
শীর্ণ যুগান্তরে।
—নবজাতক।

এই পশ্চিম অথবা হিন্দুস্থানের মধ্যমণি হল উত্তর প্রদেশ। কবির জীবনে ভারতের এই প্রান্তর-পরিক্রমার সূত্রপাত ঘটে তাঁর বাল্যকালেই। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এগার বছর বয়সে যখন হিমালয় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন রেলপথে উত্তর প্রদেশের বড় বড় শহরগুলিতে থামতে থামতে তাঁদের যেতে হয়। এই থামতে থামতে যাওয়ার অর্থ হল শহরগুলির ষ্টেশন দেখতে দেখতে যাওয়া। কিন্তু বালক-মন কল্পনা-রঙীন করবার পক্ষে এই দেখাই তো যথেষ্ট।

হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর অনেকগুলি বছর কেটে গেল। বালক কবি গেলেন আমেদাবাদ, সেখান থেকে বিলেত। বিলেত থেকে ফিরে এসে নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চায় মন দিলেন। তারই ফলস্বরূপ বেরুল সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল।

এ-সমস্ত রচনার পীঠস্থান ছিল কলকাতা। কিন্তু কলকাতা কবির কাছে একঘেয়ে লাগতে লাগল। মন চাইল বাইরে যেতে—কলকাতার বাইরে কোনো এক স্থানকে কাব্যরচনার ক্ষেত্র করতে।

এবার স্থান নির্বাচনের পালা। কলকাতার বাইরে তো সারা ভারত পড়ে রয়েছে, কোথায় যাবেন কবি? তিনি চাইলেন পশ্চিমে যেতে। কারণ, "বাল্য-কাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোমাণ্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এই-খানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছে করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম।"

কবি যাত্রা করলেন গাজিপুরের উদ্দেশে। এত জায়গা থাকতে গাজিপুর

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ

কেন? কারণ: "শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপ-বিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"

তখন কবির বয়স সাতাশ। ১২৯৫ সালের বৈশাখ মাসে কবি তাঁর তরুণী বধূ ও এক বছরের কন্যা বেলাকে নিয়ে গাজিপুর পৌঁছুলেন। সেখানে ছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়—আফিম-বিভাগের একজন বড় কর্মচারী। তাঁর সাহায্যে কবির সব ব্যবস্থা সহজ হয়। একটা বড়ো বাংলো পাওয়া গেল গঙ্গার ধারের কাছাকাছি।

কিন্তু গাজিপুরে এসে কবির স্বপ্নভঙ্গ হল। এসে দেখলেন সেখানে 'ব্যবসাদারের গোলাপের খেত। বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই।"

তবু কবি থেকে গেলেন। থাকার আয়োজনটা ভালো ছিল। বড়ো বাংলোটা "গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার সর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।"

এই পরিবেশে আগ্রা-দিল্লী বা সিরাজ-সমরখন্দের স্পর্শ ছিল না। কিন্তু ছিল অখণ্ড অবসর। "মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল-হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।" এই নতুন পর্ব মানসী কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত 'বধূ' কবিতাটি এইস্থানে কাব্যরচনারই ফসল।

এখানকার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির বাসার কাছে থাকতেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক—সিবিল সার্জেন। কবির সঙ্গে সাহেবের পরিচয় হলে সাহেব একদিন জানতে উৎসুক হলেন কবি কী ধরণের লেখা লেখেন। কবি তখন তাঁকে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি ইংরেজিতে তর্জমা করে শুনিয়ে দেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির পূর্বাভাষ পাই এই ঘটনায়।

## ॥ দুই ॥

গাজিপুরের পর অবশ্য কবি আর কাব্যরচনার তাগিদে উত্তর প্রদেশে যান নি। কিন্তু তাই বলে উত্তর প্রদেশে যাওয়া বন্ধ হয় নি। অন্য একাধিক কারণে সেখানে তাঁকে যেতে হয়েছে। তবে বহু স্থানে গেছেন এমন কথা বলা চলে না। কয়েকটি স্থানের মধ্যেই তাঁর উত্তর-প্রদেশ-পরিক্রমা সীমিত। গাজিপুরকে বাদ দিয়ে আর যে কটি স্থান উল্লেখযোগ্য তা হল এলাহাবাদ, আলমোড়া, রামগড়, কাশী, লক্ষ্ণৌ, মীরাট। অবশ্য দিল্লীকেও ধরতে হবে।

গাজিপুরের পর উত্তর প্রদেশের অন্য যে-স্থানে কবি প্রথম যান তা হল এলাহাবাদ। সে হল ১৯০১ সাল। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় সবে স্থাপিত হয়েছে। কবিকে শান্তিনিকেতনে থাকতে হবে। কিন্তু সপরিবারে সেখানে থাকা অসুবিধা। কবি-জায়া ও তিন সন্তানকে থাকতে হয় শিলাইদাতে। স্থির হল বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে কবি-জায়া মৃণালিনী দেবীর কাছে রাখার। সাহানা দেবী থাকতেন এলাহাবাদে। কবি স্বয়ং গেলেন তাঁকে আনতে। পথে মোগলসরাইতে হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। সুরেন্দ্রনাথ জীবনবীমা সংক্রান্ত কাজে উত্তর ভারত সফর করছিলেন। তিনি কবির সঙ্গ নিলেন। তাঁরা এলাহাবাদে এডনওষ্টোন রোডে এক হোটেলে ওঠেন। কবি তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, "ভাগ্যি সুরেন আমার সঙ্গ নিলে, নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে কটা দিন কাটানো আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।"

এই সময় কবি ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ-দর্শন ঘটে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন এলাহাবাদে কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ। এক বৎসর হল 'প্রবাসী' সম্পাদনা করছেন। কবি সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় দেখা করতে আসেন। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে এই সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। বাড়ির হিন্দুস্থানী পাচক অন্দরমহলে খবর দিল যে, বাইরে দুজন রাজা ব্যক্তি এসে বসে আছেন। রামানন্দ জিজ্ঞেস করলেন কোথায় বসতে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। পাচকপুঙ্গব উত্তর দিলে, কেন, তাঁরা তো দিব্বি তার 'চারপাই' অর্থাৎ দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এই রাজা ব্যক্তি দুজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ।

১৯০১ ও ১৯০৪ সালে চোখের বালি ও নৌকাডুবি লেখা হয়। দুটি উপন্যাসেই নায়ক-নায়িকাদের কলকাতার বাইরে 'পশ্চিমে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চোখের বালিতে তো বিহারী ও বিনোদিনীর মিলন সংঘটিত হয়েছে এলাহাবাদে যমুনা-তীরে। এটি স্পষ্টই কবির এলাহাবাদে ভ্রমণের ফলশ্রুতি।

এলাহাবাদে কবি দ্বিতীয়বার যান ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে। ওঠেন ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের জামাই প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বাড়িটি প্রকাণ্ড, বাগানে ঘেরা। অবসর-উপভোগের পক্ষে প্রশস্ত। কবি তিন সপ্তাহ থাকলেন। সাহিত্য-সৃষ্টির দিক থেকে এই অবসর-যাপনের দিনগুলি অত্যন্ত সার্থক। এখানেই রচিত হয়েছে গীতালীর শেষ কয়েকটি গান, বলাকার একাধিক কবিতা ও গল্পগুচ্ছের দুটি গল্প। এদের মধ্যে 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গান, 'ছবি' ও 'শাজাহান' কবিতা এবং 'অপরিচিতা' গল্প তো কবি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই সময় এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস কবির কাব্যগ্রন্থ দশ খণ্ডে প্রকাশিত করে এবং কবির তাগিদে 'গীতালী' কাব্যগ্রন্থ এক সপ্তাহের মধ্যে ছাপিয়ে বার করে। প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় ছিলেন কবির একান্ত অনুরাগী।

এলাহাবাদের দিনগুলিতে কবির স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপরিহাসের অভাব ছিল না। সুনীল নামে একটি যুবক ওকালতি করত বটে কিন্তু পসার কিছুই জমে নি। কবি একদিন তাকে শোনালেন—

সুনীল ধরিল ওকালতি
হায়, ওকালতি ধরিল না সুনীলে!

আর একদিন কবি একটি ছেলেকে একটা বড় নদীর নাম করতে বললেন। সে টেমস্ নদীর নাম করল। কবি সহাস্যে বললেন, হায় রে, এর জন্যে তোমাকে এত দূর যেতে হল। আমি তো জানতাম তোমার হাতের কাছেই দু-দুটো বড়ো নদী রয়েছে।

তখন তো কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বকবি। একদিন তিনি একটা চিঠি পেলেন। পত্রলেখক একজন সরকারী কর্মচারী। তাঁর বক্তব্য কবি কোন বিশেষ কবিতাটির জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। পত্রলেখক স্বয়ং একজন কবি, তাই তিনি চেষ্টা করবেন যাতে ঐ ধরণের কবিতা লিখে তিনিও নোবেল প্রাইজ পান। কবি চিঠি পড়ে বললেন, ভাগ্যে এ চিঠি সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে নি, তাহলে লোকটির কপালে প্রাইজ পাওয়া দূরে থাক, চাকরিটাই যেত।

॥ তিন ॥

এরপর আলমোড়া ও রামগড়। ১৩১০ সালে বৈশাখ মাসে কবি তাঁর অসুস্থ কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় আলমোড়া যান। যাবার সময় পথে বেশ কষ্ট পান। একটি পত্রে কবি লেখেন, "যে সময়ে বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘণ্টা পরে পৌঁছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেই দিনই কাঠগোদামে আসিতে হইল। সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আলমোড়া যাইবার কুলি—সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া একার চড়িয়া রাণীবাগ নামক এক জায়গায় ডাকবাংলায় গিয়া কোনোমতে অপরাহ্নে আহারাদি করা গেল··· কোনো প্রকারে গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।" আবার অন্য পত্রে বলেছেন, "পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহস করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালোই করিয়াছি। স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই—বাড়িও বেশ ভালো পাওয়া গেছে।"

আলমোড়া পাহাড়ি জায়গা—সেখানে হিমালয়। একটি পত্রে কবি লেখেন, "প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে, পর্বতকে আমি এখনো হৃদয় দিতে পারি নাই।" কিন্তু হৃদয় যে শীঘ্রই দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'উৎসর্গ'-এর ছয়টি সনেটে—যাদের বিষয়বস্তু হল হিমালয়।

তবে কবিজীবনে আলমোড়া বাসের সার্থকতা রূপায়িত হয়েছে তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে। কবি নিজে বলে গেছেন যে, আলমোড়ার নূতন পরিবেশের জন্যেই 'শিশু'-র অন্তর্গত নূতন কাব্যরচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

আলমোড়ায় বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছা কবির ছিল, কিন্তু রেণুকার অনিচ্ছার জন্যে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। সেখানে আবার যান বহুকাল পরে ১৩৪৪ সালে। কবির বয়স তখন সত্তর বছর। ছিলেন দুমাস। থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করে দেন বশী সেন ও তাঁর আমেরিকার পত্নী শ্রীমতী এমার্সন। এখানে কবির সঙ্গে ছিল একরাশ বই যার বেশির ভাগই বিজ্ঞানের। লিখলেন তাঁর নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের বই—বিশ্বপরিচয়। আর লিখলেন 'ছড়ার ছবি'র কবিতা। আঁকলেন ছবি।

রামগড় আর একটি পাহাড়ি জায়গা—নৈনিতালের কাছে। কাঠগুদাম থেকে ষোল মাইলের পথ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এক সাহেবের ফলের বাগান কেনেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। পুত্রের ইচ্ছা পিতা একবার সেখানে যান। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে কবি সেখানে গেলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে এলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কবি তাঁকে আহ্বান করেন। এইখানে রচিত হয় গীতিমাল্যের গানগুলি। তাছাড়া সবুজপত্রের জন্যে কবিতা গল্প ইত্যাদি।

নূতন জায়গায় মন বেশ প্রফুল্লই ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেমন এক বিষাদের ছায়া তাঁর অন্তর জুড়ে বসল। সারা বিশ্বে কী এক অমঙ্গলের সূচনা দেখা দিচ্ছে—কবির যেন মনে হল। লিখলেন 'বলাকা'র তিনটি বিখ্যাত কবিতা—সর্বনেশে, আহ্বান ও শঙ্খ। য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ তখনো হয় নি। কিন্তু কবি যেন তার আসন্নতা পূর্বেই বেদনার মধ্য দিয়ে টের পেলেন।

এরপর কাশী ও লক্ষ্ণৌ। এ দুই জায়গাতে কবি যান নিতান্ত বাইরের আহ্বানে। ১৩২৯ সালে কাশীতে প্রথম প্রবাসী বাঙালির সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে কবিকে যোগদান করতে হয়। এখানে তাঁর ভাষণে কবি নিখিল ভারতের ভাষা সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

কাশীতে কবি আর একবার যান ১৯৩৩ সালে—কাশী হিন্দু বিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিতে এবং সেখানকার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মণ্টেসরি স্কুল উদ্বোধন করবার জন্যে।

১৯২৬ সালে কবি লক্ষ্ণৌ যান নিখিল ভারত সংগীত-সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সেখানে ওঠেন আউধের নবাব-প্রাসাদ 'ছত্রমঞ্জিল'-এ। কিন্তু যে-কদিন থাকার কথা ছিল, তা থাকা সম্ভব হয় নি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতা ফিরে আসতে হয়।


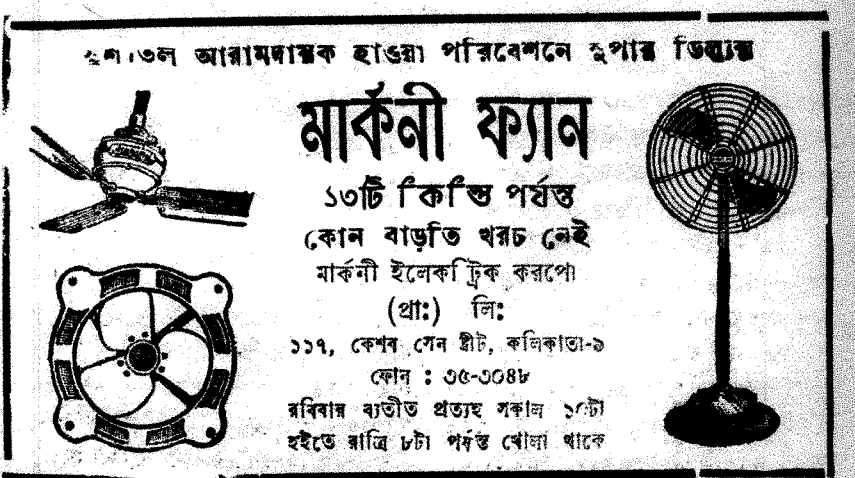

১৯৩৬ সালে বৃদ্ধ বয়সে কবি উত্তর-প্রদেশ-পরিক্রমা করতে যান বিশ্বভারতীর প্রয়োজনে। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র দল নিয়ে কবি যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচার ও বিশেষ করে বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল কিছুটা পূর্ণ করা।

প্রথম অভিনয় হল এলাহাবাদে ১৯শে মার্চ। তারপর ২৬শে মার্চ দিল্লীতে। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলে গান্ধীজী তাঁকে বারণ করলেন বৃদ্ধ বয়সে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে। বিশ্বভারতীর ষাট হাজার টাকার ঘাটতি পূরণের তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও গান্ধীজীর কথামতো অন্যান্য শহরে অভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা বাতিল করে দিলেন। কেবল মীরাটে যেতে হল, কারণ সেখানে আয়োজন তৈরি ছিল।

## ॥ চার ॥

উত্তর প্রদেশে কবি কয়েক স্থানে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন। কিন্তু হায়, সে সব স্থানে কোথাও কোনো মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন না। থাকলে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো কয়েকটি বই আরো পেতুম। আমাদের অজানা রয়ে গেছে এই সময়ে কবির দৈনিক জীবনচর্চা, অজানা রয়ে গেছে এই সময়ে কবি কতভাবে কত জনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এ-সম্পর্কে ছিটে-ফোঁটা তথ্য দু-এক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন ১৯৩৭ সালে আলমোড়া থাকা কালে কবি পরিচিত হন মাসানি, য়ুসুফ মেহের আলি ও বীরবল সাহনির সঙ্গে। ইতিপূর্বে ১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালে কবির সঙ্গে এলাহাবাদ-নিবাসী স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর পত্রালাপ হয়। কবি একটি পত্রে সপ্রুকে শান্তিনিকেতনে আসবার আমন্ত্রণ জানান। সপ্রু তার উত্তরে লেখেন যে, তাঁর কাছে শান্তিনিকেতনে যাওয়া তো তীর্থযাত্রার সমান। তাঁর সৌভাগ্য ও গর্ব যে, তিনি টেগোরের দেশের লোক। তিনি কয়েক বছর আগে যখন তুর্কি দেশে যান তখন সেখানে ভারতীয় হিসেবে তাঁর খাতির বেড়ে যায়, কারণ তিনি টেগোরের দেশবাসীরূপে পরিচিত হন। সপ্রু কবিকে জানালেন যে, এশিয়ার সেই সুদূর প্রান্তে একমাত্র টেগোর ছাড়া আর কোনো ভারতীয় নাম সেখানে তখন পরিচিত ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বলতে পারি উত্তর প্রদেশ নিবাসী একাধিক বাঙালির সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যাঁরা, তাঁরা হলেন লক্ষ্ণৌয়ের অতুলপ্রসাদ সেন ও ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কাশীর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ॥ পাঁচ ॥

উত্তর প্রদেশে কবির বাহ্য-পরিক্রমার পরিচয় তো কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল। এবার সেখানে তাঁর আন্তর-পরিক্রমা কতখানি ঘটেছে তার পরিচয় খানিকটা দেওয়া যাক। দেশের অন্তরে প্রবেশ করার একটি প্রশস্ত পথ হল সাহিত্য। সুতরাং হিন্দী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতখানি পড়েছে তার একটা আভাস পাওয়া দরকার। হিন্দীতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ হয় 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য দিয়ে। চিত্রাঙ্গদা বেরুবার পরেই তার অনুবাদ হয়। তারপর ১৯০০ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হিন্দী 'সরস্বতী' পত্রিকায় অনেকগুলি ছোটগল্পের অনুবাদ বেরোয়। এই অনুবাদ বাঙালিদেরই করা। ইণ্ডিয়ান প্রেসের গিরিজাকুমার ঘোষ 'পার্বতীনন্দন' ছদ্মনামে এবং মির্জাপুর-নিবাসী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ও 'বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে একজন মহিলা বেশ কয়েকটি গল্পের অনুবাদ করেন। এ সবই ১৯০০ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এদের প্রভাব হিন্দী ছোটগল্পে কিছুই পড়ে নি। কবি হিন্দী সাহিত্যকে প্রভাবিত করলেন নোবেল পুরস্কার পাবার পর। তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি হিন্দী গদ্য-কাব্যের একটা ধারার সূত্রপাত করে। কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি ১৯১৫ সালে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেন। তারপরেই কৃষ্ণদাসের 'সাধনা', বিয়োগী হরির 'ভরঙ্গিণী' ও চতুর সেনের 'অন্তস্তল' রচিত হয়। এই গদ্য-কাব্যগুলিতে ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রেরণা সুস্পষ্ট। তারপর, ১৯১৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত যে ছায়াবাদী কাব্যের প্রচলন হিন্দী-সাহিত্যে দেখা দেয় তার মূলে রবীন্দ্র-প্রভাব যথেষ্ট কাজ করেছে। পন্ত, 'নিরালা' ও মহাদেবী বর্মা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিরা রবীন্দ্র-ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে 'নিরালা'জীর 'রবীন্দ্র-কাব্য-কানন' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতে আছে রবীন্দ্রকাব্যের কিছু কিছু অনুবাদ এবং রবীন্দ্র-কাব্যধারার সহৃদয়-সংবেদ্য আলোচনা।

'ফাল্গুনী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ The Cycle of Spring-এর প্রভাবে হিন্দী প্রতীকী নাটক রচিত হবার পালা আরম্ভ হয়। জয়শংকর প্রসাদের 'কামনা', পন্তজীর 'জ্যোৎস্না' যদিও বিষয়বস্তুতে আলাদা, কিন্তু প্রতীকী নাটকের আদর্শটা Cycle of Spring থেকেই প্রাপ্ত।

কালিদাসের ওপর কবি যে কবিতা লেখেন তার প্রভাবে হিন্দী কবিরা ভারতের অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরান। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হন মৈথিলীশরণ গুপ্ত। তিনি তাঁর 'সাকেৎ' মহাকাব্যে ঊর্মিলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বে। যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও তুলসীদাস-পত্নী রত্নাবলী প্রমুখ উপেক্ষিতাদেরকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন।

## ॥ ছয় ॥

রবীন্দ্রনাথের ভারত-পরিক্রমা খুবই ব্যাপক। বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি গিয়েছেন এবং সে-পরিক্রমার প্রভাব তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন, "আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি।" ভারতের যেখানে যেখানে গেছেন সেখানে নূতন পরিবেশের প্রভাবে তাঁর কল্পনা নূতন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। উত্তর-প্রদেশ-পরিক্রমায় এ কথার সাক্ষ্য ভূরিপ্রমাণ। অন্যান্য প্রদেশ-পরিক্রমাতেও সে-সাক্ষ্য যথেষ্ট মিলবে।

কিন্তু সারা ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশই হল একমাত্র এমন স্থান যার আকর্ষণে কবি যৌবনে সেখানে যান নিছক কাব্যরচনার উদ্দেশ্যে। 'মানসী'র সব কবিতা গাজিপুরে রচিত হয় নি। গাজিপুর যাত্রার পূর্বে রচিত একাধিক কবিতা এতে আছে। তাছাড়া পরে কলকাতায় রচিত অনেক কবিতাই এতে আছে। কিন্তু তবু কবির কাছে 'মানসী'র প্রেরণা-উৎস হল গাজিপুর তথা 'পশ্চিম' বা উত্তর প্রদেশ। মানসীতে যদি কবির কাব্য-প্রতিভা স্বমহিমায় প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা যায়, তাহলে উত্তর প্রদেশ গর্ব করে বলতে পারে যে, কবি-প্রতিভার সে-বিকাশ-পর্ব উদ্বোধিত হয় তারই সান্নিধ্যে।

# আসাম ও রবীন্দ্রনাথ

সতীন্দ্র ভৌমিক

'খোলো খোলো দ্বার ঘুচুক আঁধার—
নবযুগ আসি ডাকে বার বার
দুঃখ আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।'

রবীন্দ্রনাথ শিলঙ থেকে যখন কবিতাটি লিখছিলেন, তাঁর মননতায় ভাবনায় এবং আদর্শে তখন শিলঙ উজ্জলিত। কবি ভারতবর্ষকে শুধু রচনার দ্বারা একীভূত করেন নি। ভ্রামণিক রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বত্র সমান আগ্রহ এবং সহানুভূতির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শুধমাত্র প্রাকৃতিক বৈভব কবিদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তিনি অপরিচিত জনগণের সঙ্গেও গভীরভাবে মিশেছেন। সমস্যা-সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষের ধর্ম প্রদেশ বা রাজত্ব ভাগে ভিন্ন বা খণ্ডিত নয়—প্রায় মানুষেরই লক্ষ্য এক, প্রকাশই বিভিন্ন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ মানতেন বলেই প্রতি প্রদেশের চিন্তাকে তিনি নিজের চিন্তা নিজের সমস্যা বলে ভাবতেন। তাই রবীন্দ্র-উক্তি এবং রচনায় সর্বভারতীয় ও সর্বদেশীয় আবেদন এতটা সংবেদনশীল।

অবশ্য কবিগুরুর শিলঙ-উপাখ্যানের প্রথম অঙ্ক প্রহসন দিয়ে সুরু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে আকস্মিকতার চটুলতা গ্রীনরুম থেকে বেরুবার পথ পায় নি। ফলে এ দু-যাত্রায় মোটামুটি গোছের একটা ট্রাভেলোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম যাত্রায় কবি রাণু অধিকারীকে (লেডি রাণু মুখার্জি) লিখছেন—

"...সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবৌঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্সতোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন আমাদের ভাগ্যদেবতা: তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি।'

এই বিনাটিকেটের ভাগ্যদেবতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কম রসিকতা করেন নি। প্রথমত গৌহাটির অপর পারে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মোটরে চড়বার জন্য প্রস্তুত কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে বন্যার ফলে ঘাটে এখনো মোটর নামানো হয় নি। এ অঞ্চলে দুটোর পর গাড়ি ছাড়তে দেয় না। গাড়ি এলো আড়াইটায়, ফলে স্নান প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রে দণ্ডায়মান শূন্য জাহাজে সেরে গাড়ি নিয়ে গৌহাটি শহরে বাড়ি খুঁজতে বেরুতে হোলো—রাত্রিবাসের জন্য। কিন্তু গাড়িটি কিছুদূর গিয়েই বিকল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গোয়ালন্দগামী ষ্টিমার ঘাটের একটি জাহাজে কবি আশ্রয় নিলেন। "সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বোমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি।" পরের দিন রবীন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টার পর একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি মোটর সংগ্রহ করলেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে সরস মন্তব্য করে রাণুকে লিখছেন, "গাড়ি তো বায়ুবেগে চলল, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। পূর্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েছেন। যা হোক শিলঙ-পাহাড়ে এসে দেখি পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকে নি, চোরে নি, নড়ে যায় নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।"

বেস্পতিবারের বারবেলা কিংবা গোপন সহযাত্রী ভাগ্যদেবতা, আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ভৌগোলিক অবস্থানগুলোর কোনো রদবদল করতে পারে নি। "আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর—নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরামকেদারায় আকীর্ণ। জানালাগুলো সমস্তই শাসির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ-বেরঙের ফুল যে ফুটেছে তার ঠিক নেই—কত চামেলি, কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ—আরো কত অজ্ঞাতকুলশীল ফুল।"

এবার আর তারিখে ভুল হয় নি। রবীন্দ্রনাথ পাঁজি মিলিয়ে লিখেছেন। ক্রকসাইড। শিলঙ। ২৮শে আশ্বিন। ১৩২৬ লিখবার কলমদানি টেবিল-চেয়ার ছোটো একটি ঘর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তাই রবীন্দ্রবচনার তালিকায় ভূমণ্ডলের ছোটোবড়ো নানা দেশেরই নাম বিভিন্ন আকারে আমাদের চোখে পড়ছে।

শিলঙের ক্রকসাইডে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন সপ্তাহকাল নিরিবিলিতেই কাটান। কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর কর্মময় পর্যটন সুরু হোলো। শিলঙের উচ্চকিত সমাজ সরকার পুষ্ট—তারা বৃটিশকোপের আতঙ্কে প্রথমবার কবিকে কোনো সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে নি। রবীন্দ্রজীবনীকার এ সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্ভ তাঁহার 'সার' পদবী ত্যাগ করিয়া যে কাণ্ডটা করিয়াছেন, তাহার পর সরকারী চাকুরেদের [ শিলঙে তাঁহারাই গণ্যমান্য ব্যক্তি ] পক্ষে কবি-সংবর্ধনা করা কঠিন।" রবীন্দ্রনাথও বলছেন, "গভর্মেণ্ট আপিসের কেরাণীদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর।"

১৯১৯ সালের ৩১শে অক্টোবরে গৌহাটির কার্জন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংবর্ধনা হচ্ছে। সমবেত শ্রোতৃবর্গ আচার্য রায়কে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি সকৌতুকে মন্তব্য করলেন, "বক্তৃতা করবার যোগ্যতম ব্যক্তি যিনি, যাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য আপনারা আগ্রহান্বিত, তিনি আসছেন—আপনারা ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকুন।" বাস্তবিক সেইদিনই রবীন্দ্রনাথের গৌহাটিতে এসে পৌছবার কথা।

২রা নভেম্বর কার্জন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি শাখা কবিকে সংবর্ধনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবর্ধনায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে সাহিত্য পরিষদের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "চারিদিকে শিক্ষা বিস্তার করে বিভিন্ন সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা সারা দেশময় যদি জ্ঞানের আলো জেলে দেয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত দেশবাসীর মধ্যে যদি নব-জীবনের সঞ্চার করে—তা হলেই এগুলো সকলের সমর্থন লাভ করতে পারে।"

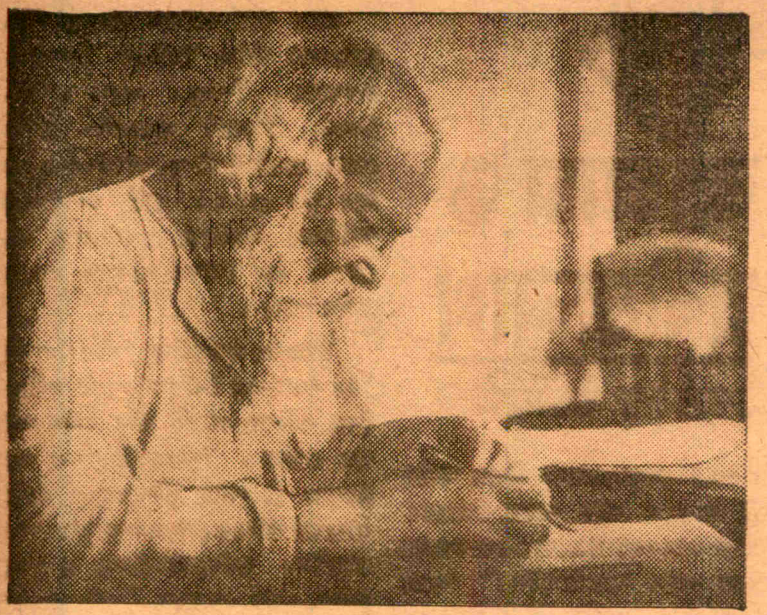

● সাহিত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ

কথিত, এই সংবর্ধনা সভায় কবি পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হয়ে 'অয়ি ভুবন মনমোহিনী' সংগীতটি আপন কণ্ঠে পরিবেশন করেন। দুপুরে আইন-কলেজের হলে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মিলনেও বক্তৃতাশেষে কবিগুরু দুটি গান করেন। বিকেলে ছাত্রসমাজে বক্তৃতা দেন। আবার সেই একই দিনে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রাঙ্গণে ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এখানে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উপর তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানান। গোহাটিতে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বাঙালীসমাজ কর্তৃকই সংবর্ধিত হন নি, অসমীয়ারাও আন্তরিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। স্থানীয় মহিলারা তাঁদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ কবিকে এণ্ডি ও মুগার কাপড় বুনে উপহার দেন।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট থেকে তারযোগে আমন্ত্রণ লাভ করেন। প্রথমে সিলেটের ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক ৺গোবিন্দনারায়ণ সিংহ কবিকে 'তার' করেন। কবিগুরু উত্তরে Journey long and tedious লেখেন। কিন্তু কবিগুরু এতে রেহাই পেলেন না। কেন না 'আঞ্জুমান ইসলাম' 'মহিলা সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বার বার আমন্ত্রণ লাভ করে শেষ পর্যন্ত কবিকে শ্রীহট্টে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সুদূরতম আমন্ত্রণও পারতপক্ষে উপেক্ষা করেন নি। আর এ তো 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' শ্রীহট্ট! অবশ্য দূরত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবেন নি। তিনি শঙ্কিত হচ্ছিলেন দুর্গমতা নিয়ে। তখন সিলেট-শিলঙ মোটর চলাচল সুরু হয় নি। আসাম-বেঙ্গল রেলপথ আর চেরাপুঞ্জী হয়ে খাবায় করে খাসিয়াদের পিঠে চেপে—এই দুই ধরণের যাতায়াতই তখন প্রচলিত ছিল। কবি মানুষের পিঠে উঠবেন না। ফলে আসাম-বেঙ্গল রেলপথে রওনা হলেন। কুলাউড়াতে তিনি ট্রেনের ভিতর রাত্রি কাটালেন। পরের দিন প্রাতে প্রেস্‌বিটেরিয়ান-চার্চের মিসেস ইথেল রবার্টস্ তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ট্রেনের ভিতরে এসে কবির সঙ্গে আলাপ করে যান। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের খ্যাতিচারকে penalty বলে পরিহাস করেছিলেন। দু-কড়ি নকল খ্যাতিতেই নাজেহাল হয়েছিল। কিন্তু আসল 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'-ও কম করুণ নয়। অনেক যশস্বীর মতো রবীন্দ্রনাথও এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

১৯শে কার্তিক। বুধবার। ১৩২৬। কবি এলেন শ্রীহট্টে।

গাড়ি যখন পৌঁছল ষ্টেশনে সংবর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন কবির পূর্বপরিচিত আবদুল করিম সাহেব, প্রাক্তন মন্ত্রী খানবাহাদুর আবদুল মজিদ, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত। মহিলা সমিতির তরফ থেকে ছিলেন নলিনীবালা চৌধুরী।

সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এই সম্পর্কে সুন্দর লিখেছেন, "সুরমা নদীর ঘাটে ছিল সুসজ্জিত মারবোট ও বজরা। কবি উঠলেন বোটে আর তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি উঠলেন বজরাতে। বোট সুরমার জলে ভাসল।···নদীতীরে কাজিরবাজার থেকে ডাকবাংলো অবধি আন্দাজ মাইল-খানেক বিস্তৃত বিশাল জনতা। নদীর উভয়তীরে সমবেত বিপুল জনসংঘের কণ্ঠনিঃসৃত বন্দেমাতরম্, রবীন্দ্রনাথকী জয়, আল্লা হো আকবর ইত্যাদি আনন্দধ্বনিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম হোলো।"

নৌকো থেকে নেমে কবি উঠলেন ফিটনে। এই সময় এক মজার কাণ্ড হোলো। বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আগ্রহী জনতা ফিটনের ঘোড়াগুলোকে নিষ্কৃতি দিয়ে নিজেরাই শহরের পথে কবিকে টেনে নিয়ে চললেন। মানুষের পিঠে চাপবার নির্মমতায় রবীন্দ্রনাথের চেরাপুঞ্জী যাওয়া হোলো না অথচ শ্রীহট্টে প্রায় তাই ঘটে গেল!

শহরের উত্তর-পূর্বাংশে একটি টিলার উপর থাকতেন টমাস পাদরি। দৃশ্যত অঞ্চলটি আকর্ষণীয়। কবির পক্ষে উপভোগ্য। টমাস সানন্দে ছেড়ে দিলেন তাঁর বাংলোর পাশের বাড়ি। কবি রয়ে গেলেন টিলার-বাসভবনেই।

রাত্রি হয়ে গেছে সন্ধ্যায় কবি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনা করবেন। বিকেল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। কবি গৈরিকবসনে আবির্ভূত হলেন। সংগীত দিয়ে কবি উপাসনা সুরু করলেন:

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে!

২০শে কার্তিক টাউনহলের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কবির সংবর্ধনা-সভা হয়। সৈয়দ আবদুল মজিদ সাহেব উর্দুভাষণে কবিকে অভিনন্দন জানান। রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট জনসমাগমে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল 'বাঙালীর সাধনা' সম্পর্কে সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন। আজকের দিনে আমাদের এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি সম্মুখের আয়না ভেঙে ফেলে দিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে বলতে পারেন, "আমাদের দেশকে

আমরা যদি মাতৃভূমি বলেই মানি তা হলে সর্বত্র মাতাকে উপলব্ধি করা তো চাই। সেই মাতা পলিটিক্সে নেই। বাণিজ্যে নেই। তিনি আছেন সেই জাগ্রত প্রেমে যে প্রেম আত্মদানের দ্বারাই আপনাকে সার্থক করে, যে-প্রেম সুযোগ-সুবিধার হিসাব করে না, যে-প্রেম ভেদ-পার্থক্যকে একান্ত করে দেখে না।"

দুপুরে কবি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজগৃহে মহিলা সমিতি কর্তৃক সংবর্ধিত হন। কবি মণিপুরী তাঁতশিল্প এবং তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখবার আগ্রহে মহিলা সমিতির সহযোগিতায় মাছিমপুরে গেলেন। কলানিপুণ মণিপুরীরা কবির যাত্রাপথে সুসজ্জিত তোরণ বসিয়ে তাঁদের সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। কবি কিছু কিছু তাঁতবস্ত্র কিনলেন। মাছিমপুরের ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে কবিকে রাখাল-নৃত্য দেখালো।

সন্ধ্যা সাতটায় কবি টাউনহলে বক্তৃতা দিতে এলেন। এই বক্তৃতায় কবি কতকগুলো সর্বকালীন কথা বলেছিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে একদিন এক ধর্ম নেমে আসবে এমন একটা মহৎ আশার কথা তিনি সেদিন শুনিয়েছিলেন। 'এক নয় দুই নয় বহু বহু রাজা আমাদের শোষণ করছেন'—উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ সেদিন এ কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেদিন শ্রীহট্টে কবির উপস্থিতিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

টাউনহলের ভাষণ শেষ করে কবি বাংলোয় ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তারপর এলেন কলেজ হোস্টেলে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার যথার্থতা আজো আমাদের কাছে সমানভাবেই প্রযোজ্য। আজও আমরা আমাদের বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা আকাঙ্ক্ষা বুঝে উঠতে পারি না। এরজন্য আমাদের ব্যবহারিক দৈন্য নয়, আত্মিক দীনতাই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "যার আকাঙ্ক্ষা বড়ো সেই তো গৌরব পায়। য়ুরোপ বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশি খবর রেখেছে বলেই আজকের দিনে মানুষের গুরু হয়েছে এ কথা সত্য নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ। তার আকাঙ্ক্ষা কোনো বাধাকে মানতে চায় না, মৃত্যুকেও না। মানুষের যে-বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সেটাকে বড়ো করে তুলে মানুষ বড়ো হয় না, ছোটোই হয়ে যায়। সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখির ওড়া। তাতে পাখার সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে। তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা। যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায়। রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়। দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে। তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়।... যদি মূলের দিকে তাকিয়ে দেখি তা হলে দেখব আমাদের যে দারিদ্র্য সে আত্মারই দারিদ্র্য। মানবাত্মারই অপমান চারিদিকে নানা অভাব নানা দুঃখরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। নদী যখন মরে যায় তখন দেখতে পাই গর্ত এবং বালি। সেই শূন্যতার সেই শুষ্কতার অস্তিত্ব নিয়ে বিলাপ করবার কথা নেই। আসল বিলাপের কারণ নদীর সচল ধারার অভাব নিয়ে। আত্মার সচল প্রবাহ যখন শুষ্ক তখন আচারের নীরস নিশ্চলতা।"

রাত্রিতে কবির বাংলোয় মণিপুরী বালকবালিকারা কবিগুরুর সম্মুখে তাদের জাতীয়নৃত্যের অনুষ্ঠান করল। কবি এই নৃত্যপ্রসঙ্গে আলোচনাকালে মন্তব্য করেছিলেন, 'Graceful best form of Physical exercise.'

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণও জীবনের এক অখণ্ড বিকাশ। তিনি পর্যটন করতে করতে যেখানে গ্রহণীয় বা অনুসরণীয় গোছের মহৎ কিছু পেয়েছেন সঞ্চয় করেছেন আপন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। প্রচার করেছেন রচনায় বা আলাপনে। শান্তিনিকেতনে তাই দেখি প্রবর্তিত হোলো মণিপুরী নৃত্যের ক্লাস। আকস্মিকভাবে কবির হাতে সুনামগঞ্জের পল্লীকবি দেওয়ান হাছন রোজার কিছু পল্লীগীতি আসে। তিনি তার ভাষার আঞ্চলিকতা এবং দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও ভাবের সার্বজনীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। এ কথা তিনি তোলেন নি তাই পরবর্তী জীবনে হিবার্ট লেকচারে দেওয়ান হাছনের উচ্চাদর্শের কথা বলেছেন।

বৈঠকী পরিবেশে কবির পরিহাসপ্রিয়তা কখনো ম্লান হয় নি। এখানেও খাবার টেবিলে আলাপচারীদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত রসালাপ করতেন। নলিনীবালা চৌধুরী প্রমুখের উপস্থিতিতে শ্রীহট্টের 'ডিঙামাণিক' নামক একপ্রকার সুদৃশ্য কদলী দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'হাঁ, মাণিকবে ডিঙিয়েছে বটে।' একদিন একখানি এগারো হাত গরদের বস্ত্র রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিলে তিনি দাতাকে বললেন: 'আমার মতো দেওালোক সিলেটে আছে না কি?'

শ্রীহট্টের অধিবাসীরা বাঙালী হিন্দু মুসলমান। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসাম প্রদেশভুক্ত। বহুদিন পরও কবি এই বেদনা বিস্মৃত হন নি। তাঁর এই কবিতায় তাই গভীর আন্তরিকতা লক্ষ্য করছি।

'মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে-বাঁধন চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।'

## দুই

রবীন্দ্রনাথ এর পর আরো দু'বার শিলঙে এসেছেন। ১৩৩০ এবং ১৩৩৪।

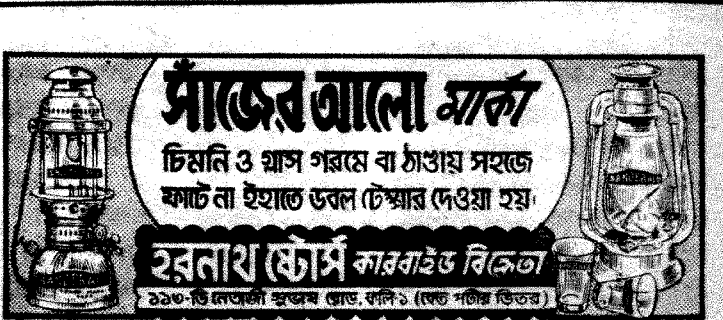

● "এই কটা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে"

প্রথমবার তিনি উঠেছিলেন 'ক্রক-সাইড'-এ দ্বিতীয়বার উঠলেন জিৎ-ভূমিতে। শেষবার লাইমোখরার uplands-এ। শিলঙে প্রথমবার কবি নিরিবিলিতে কাটালেও দ্বিতীয়বার থেকেই তিনি শিলঙেও 'কর্মী পুরুষ' হিসেবে পরিচিত হলেন।

কবির সর্বত্রই সমান কাজের চাপ। ব্যস্ততা এবং অনবসরতা। কি বিদেশের অচেনা শহর, কি স্বদেশের নির্জন শৈল-শিখর, কবির সঙ্গে সঙ্গে জনতা বক্তৃতা আলোচনা, অসুস্থতা এবং ডাক্তারি সহগামী হয়।

২০শে মে, ১৯২৭ কবি শিলঙ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, "একেবারে উল্টো। কলকাতার চেয়ে এখানে সময় আরো কম। প্রথম দফায় আমার বুকে ব্যথা হয়ে জ্বর গেল। দ্বিতীয় দফায় পুপের জ্বর। তৃতীয় আগন্তুকের সংখ্যা এখানেও কম নয়। চতুর্থ বিচিত্রার জন্য একটা গল্প চাই।"

চিঠি পোষ্ট করবার পর রবীন্দ্রনাথ হয় তো বুঝেছিলেন, একেবারে উল্টো'র দফা-রফা আক্রমণ সংখ্যায় আরো অনেক বেশি।

শিলঙে এই সময় ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত গল্পকথার মজলিশ বসত। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলত। একদিন কথাপ্রসঙ্গে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কথকতা হিসেবে ঘটনাটিকে নিতে পারেন নি। শ্রমিকদের আর্তনাদ তিনি যেন স্বকর্ণে শুনতে পেলেন—ভাবতে লাগলেন নাটকের কথা। আমেরিকা ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ঐশ্বর্যের বিলাসিতা, এখানে শুনলেন দারিদ্র্যের নির্মমতা। বসে বসে কবি দুই চরমতাকে ধরতে চাইলেন 'রক্তকরবী' নাটকে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন: "তুমি এবার শিলঙ এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটি লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।...ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩০।" 'কবিপ্রণাম' পুস্তকে হেম চট্টোপাধ্যায় 'শিলঙে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখছেন,... 'রক্তকরবী' কিছু কিছু লেখা আমাদের পড়ে শোনাতেন (রবীন্দ্রনাথ)। কী যাদু ছিল সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে; কথা শুনতে শুনতে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতুম।'

রবীন্দ্রনাথ কুইনটল হলে শিক্ষার উপর এক ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সভায় Col. L. W. Shakespeare D. I. G of Assam rifles উপস্থিত ছিলেন। হেমবাবু লিখছেন, "শেক্সপীয়র সাহেব সে-প্রবন্ধের ভাবসম্পদে এবং ভাষার মাধুর্যে এতই মুগ্ধ হন যে, একদিন কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে তিনি Uplands বাংলোতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।"

এই সময় আসাম-বেঙ্গল থিয়েটার পার্টিতে চিরকুমার সভার রিহার্সাল চলছিল। দিনেন্দ্রনাথ কবিগুরুর উপস্থিতিতে গানগুলোর রিহার্সাল নিচ্ছিলেন। অবশ্য যে-কোনো কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের দিন উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

শিলঙবাসীরা বলেন, শেষের কবিতার পটভূমিকায় লাবানপল্লীর এবং লাইমোখরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। শিলঙ থেকে ফিরবার কিছুকাল পরেই শেষের কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শেষের কবিতায় শিলঙ সম্পর্কে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না হঠাৎ হঠাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু সে অংশগুলো শুধুমাত্র নায়ক-নায়িকার চরিত্রের প্রতিফলন হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকার-চিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে।' কিংবা 'বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে, আর দুদান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলছে।...আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।'

হয়তো এ কথা ঠিক, শিলঙের পটভূমিকা না পেলে 'অমিতাচারের বন্যাধারা' 'ঝরনার মতো' এমন উচ্ছলিত হয়ে উঠত না।

# রবীন্দ্রনাথ ও গুজরাট

সুভাষ সমাজদার

"হঠাৎ গুমট ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার (সংস্কৃত 'স্বচ্ছতোয়া'র অপভ্রংশ) স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং সন্ধ্যা-ছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল---"

ওপরের এই লাইন কয়টি প্রায় আটষট্টি বছর আগে কবি লিখেছিলেন। তের শো' দুই সাল। শ্রাবণ মাস। কেমন করে তাঁর মনে এসেছিল এই স্তব্ধ গম্ভীর 'সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন' বনভূমির পরিবেশটি?

আর যাই হোক, গল্পের পটভূমি পরিবেশ কল্পনা করে লেখা যায় না। পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার রবীন্দ্রনাথও কখনো তা করেন নি।

শুস্তা নদী নয়। সাবরমতী। আর সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বনভূমি ঠিক সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে মলিন সাবরমতীর ওপারের দূর চক্ররেখায় আঁকা বনদেহ। 'জীবনস্মৃতি'তে স্পষ্ট নিজেই লিখছেন—

"শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ---মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না।---তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।'

অনেক দিন পরে 'ছেলেবেলা'য় লিখেছিলেন এই শাহিবাগের জজের বাসা সম্বন্ধে। লিখেছিলেন—"আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।" সর্বপ্রথমে লেখা লাইন কয়টি 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের।

বয়স বেশি নয়। কবির তখন বয়স মাত্র সতের। এই কিশোর বয়সে আমেদাবাদের আকাশ-বাতাস, সাবরমতীর ওপারে ধূ-ধূ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ বালুচর কবিমানসে কাব্যের গুঞ্জন তুলেছিল।

শাহিবাগের সেই বাদশাহি আমলের প্রাসাদ শূন্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী তখন বিলেতে। নির্জন দুপুরে, জনশূন্য ঘরে ঘরে কিশোর কবি ঘুরে বেড়ান। পড়েন। গুন্ গুন্ করে নতুন কোন গানের সুর ভাঁজেন। আর—

যখন রাত্রি নামে। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ একা একা হাসে, সাবরমতীর জল রূপালী রেখার মত ঝিক্‌মিক্ করে, তখন কবি সেই বিশাল বাড়ির ছাদের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করতেন। এমনি এক রাত্রে লিখে ফেললেন---"বলি ও আমার গোলাপ-বালা।" সাবরমতীনদীতীরে সেই ক্ষিপ্ত বালক নিদ্রাহারা গ্রীষ্ম-রজনীতে—গানটার বেহাগের সুর বসাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়াছিল—'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

"ছাদের ওপর নিশাচর্যা করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া গানগুলি সর্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলাম। 'নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনা'র ভেতরে নিশি রাতের স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন শাহিবাগের প্রাসাদোপম অট্টালিকার স্মৃতি পরিস্ফুট হয়ে আছে।"

আমেদাবাদ তথা এই গুজরাটের সঙ্গে কবির এই কৈশোরের আত্মীয়তা দূরকালে এক আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। সে কথা পরে বলবো।

শুধু গুজরাট নয়। পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্য, আমেরিকা, রাশিয়া যখন যেখানে গিয়েছেন, সেই দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে কবির নিবিড় সৌহার্দ্য হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় তে[illegible]ছি, এত অল্প সময়ে কেমন করে [illegible]য়েছে।

অনেক উপমার কথা মনে পড়ছে। কেউ বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ বিশাল কোন [illegible]তলা দালানের মত। এক এক তলায় এক এক রকমের কাজ চলছে অহর্নিশি। আবার কোথায় যেন পড়েছি, তিনি যেন আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত প্রসারিত অতিকায় একটি বীণা। তার তারে তারে পৃথিবীর সব সুর বাজে। রবীন্দ্রনাথ কি রকম? পৃথিবীর সব পর্বত, সব অরণ্য, সব সমুদ্র যদি কথা বলতে পারতো, পারতো গান করতে তাহলে সেই হতো রবীন্দ্রনাথ।

এই উপমাগুলোতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশালতা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কথাগুলো হাইপারবোলিক! উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তি! আমার মনে পড়ে, অতি প্রাচীন অশ্বত্থের কথা। অনেক দিন ধরে অনেক জায়গা জুড়ে ঝুরি নামিয়েছে, ছড়িয়েছে ডালপালা। মাটির সমস্ত রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে একটু একটু করে চারিদিকে মেলে ধরেছে। গ্রাস করার শক্তি যেমন অসাধারণ, তেমনি অতুলনীয় পরিপাক করার ক্ষমতা। তাই যখন যেখানে গিয়েছেন, যা দেখেছেন, তাই তাঁর মনের রসে জীর্ণ হয়ে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই কারণেই—

এই কারণেই গুজরাট, রবীন্দ্র-সাহিত্যে, রবীন্দ্রমানসে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে।

কবির শৈশবে সেই বাদশাহি আমলের প্রাচীন অট্টালিকার নির্জন ছাদে শুক্লপক্ষের রাত্রে একা একা ঘুরিয়া বেড়ানোর অনেক কাল পরের কথা।

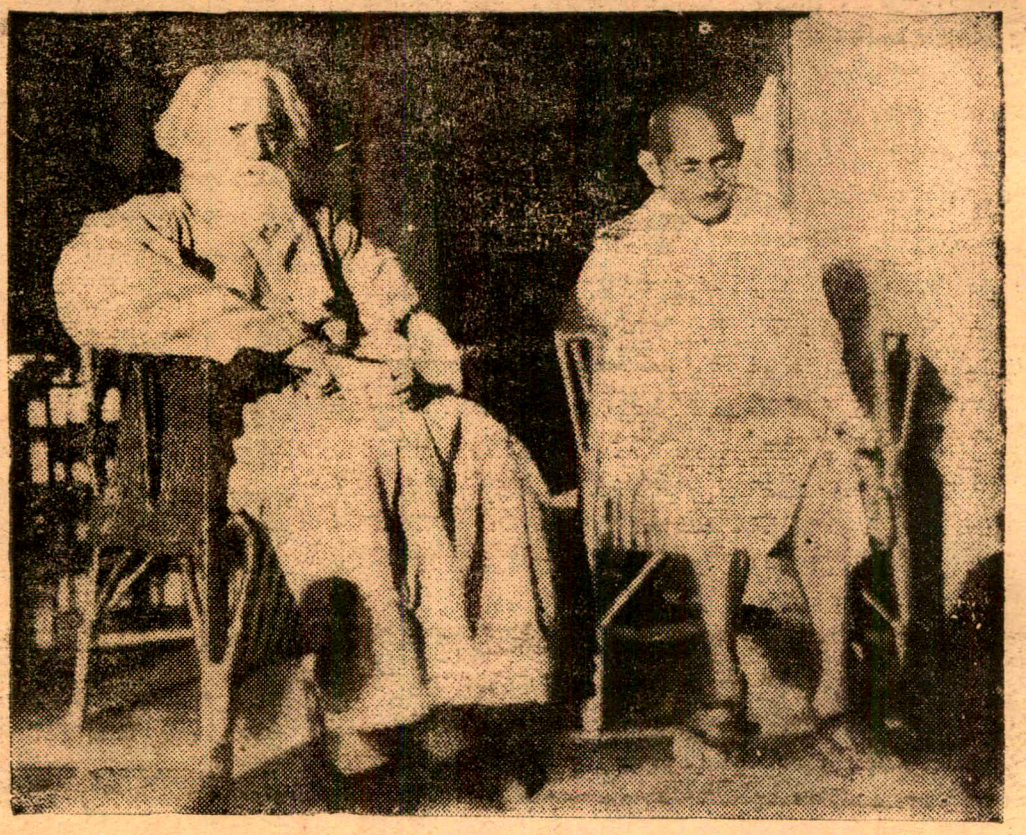

● রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

সাল ১৯২০। মহাত্মা গান্ধী তখন ভারতের রাজনীতির আকাশে উল্কার মত ছুটছিলেন। সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি গুজরাটী সাহিত্য পরিষদের উদ্যোক্তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস। তাঁকে সভাপতি করো।

কবি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কোথায় সতের আর কোথায় ঊনপঞ্চাশ বছর! কবিখ্যাতির সূর্য তখন মধ্যগগনে। আবার আমেদাবাদ। গুজরাটের সম্মানিত অতিথি। অম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি। এই অম্বালাল সরাভাইয়ের পরিবারের অজস্র সুখ্যাতি করেছেন কবি শেষ দিন পর্যন্ত।

সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল ২রা এপ্রিল ১৯২০। অভিভাষণের মূল বক্তব্য ছিল—

"যে কোন গঠনমূলক কাজের আড়ালে উদ্দেশ্য থাকবে; কিন্তু শিল্পসৃষ্টির নেপথ্যে থাকবে শুধু আনন্দ। Construction is purpose creation is for joy." বিখ্যাত এই বক্তৃতা অধ্যাপক সোয়ারস ( Soars ) কতৃক সঙ্কলিত Speehes Lectures by Rabindranath গ্রন্থে আছে।

সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত বক্তার মত রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা করেই ফিরতি ট্রেনের টিকিট কাটেন নি। কোথাও তিনি তা করেন নি।

সাহিত্যের আসর থেকে তিনি গেলেন মেয়েদের আশ্রমে। আশ্রমের নাম 'বনিতা-আশ্রম'। গুজরাটী মেয়েদের বললেন, "তাঁহারা যেন পুরুষদের অক্ষম, দুর্বল অনুকরণ না করেন, তাঁহারা যেন দেশের শিব বা মঙ্গলশক্তিকে তপস্যার দ্বারা জাগ্রত করেন---"

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী। শিল্পীর দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ আর কত সর্বব্যাপী হয় তার একটা নমুনা দিই। গুজরাটী মেয়েদের এই মহতী সভায় তিনি দেখলেন, সভার যতদূর চোখ যায়, যেন রঙের হাট বসেছে। কাথিওয়াড়ের মেয়েরা কড়া রঙের শাড়ি পরতে ভালবাসেন। সবুজ, লাল, হলদে, সব খুব উজ্জ্বল, ঝলমলে। অনেক দিন পরে মেয়েদের পোষাকের আলোচনা প্রসঙ্গে হয়তো এখানকার মেয়েদের শাড়ির রঙ দেখেই বলেছিলেন—

"বাঙলাদেশের মেয়েদের শাড়ি সর্বদাই সাদা। সাদাটাই প্রধান রঙ। মাঝে মাঝে যে এঁরা ঝকমকে রঙ লাগান না---তা নয়, সে একটা সৌখীন বাহার। কিন্তু যে রঙটা

দেশের রঙ সেটা সাদা। অথচ কাথিওয়াড়ে, রাজপুতানার ওদিকটায় যখন ঘুরেছি, আশ্চর্য হয়ে দেখতুম সাদা কাপড় চোখেই পড়তো না। সব কড়া রঙ, সবুজ, লাল, হলদে যত রকমের রঙ সম্ভব। কিন্তু—

সাদা কখনো পরতে দেখি নি। ওদের মরুভূমির দেশ কি না, প্রকৃতিতে রঙ নেই, চোখ তাই রঙ-এর জন্য তৃষিত হয়ে থাকে। তাই ভাবতুম, কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য জল নিয়ে আসে যেমন তেমনি চোখের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ওরা বইয়ে দিয়েছে রঙ-এর ঝরনা। কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশের প্রকৃতিই যে রঙীন, তার ঘন শ্যামলের মাঝখানে সাদা রঙ-এর কালো পাড়টি যেমন মানায়, এমন আর কিছু নয়—"

আমেদাবাদ থেকে ভাবনগর। ভাবনগরের প্রধানমন্ত্রী স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টানীর তত্ত্বাবধানে কবি বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন।

আমার মনে হয়, পৃথিবীর বড় বড় রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রনেতারা যে রকম জনতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনধন্য, ঠিক তেমন স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধা প্রায়ই কবি-সাহিত্যিকের কপালে জোটে না। কার একটা লেখায় পড়েছিলাম, রাজনীতিবিদদের যশোগাথা অত্যন্ত সরু কালিতে লেখা হয়ে থাকে আর জোলো কালিতে লেখা হয় সাহিত্যিকদের সুখ্যাতি। খবরের কাগজের হেড লাইনে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নাম ঝলমল করে আর কবি-শিল্পীরা স্থান পায় চতুর্থ কি পঞ্চম পৃষ্ঠায়। কিন্তু—

রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মত এখানেও তিনি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কেন?

"কাথিওয়াড়ের ছোট বড় সমস্ত স্টেশনে দশ-পনের মাইল দূর থেকে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের সময়ও সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষ মহিলারা হইতে সুরু করিয়া চাষী গৃহস্থরা পর্যন্ত একবার তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন---অসূর্যম্পশ্যা বধূরা শিশুসন্তানদের তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন---মেয়েরা মাল্যচন্দন দিত—বধূরা বরণ করিতেন---"

গুজরাট ভ্রমণের সহযাত্রী সন্তোষ মজুমদারের চিঠির ভেতরে গুজরাটে কবির অসাধারণ জনপ্রিয়তার ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কৈ, সেক্সপীয়র, দান্তে, হিউগো (Hugo) কি গ্যেটে তাঁদের স্ব স্ব জাতির মধ্যে দেশের ভেতরে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত এমন সর্বস্তরের মানুষের প্রীতি-শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন বলে জানা নেই। গ্যেটেও মহাকবি। হিউগোও অসাধারণ প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা এঁদের চেয়েও বেশি কি না তার বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, কবির জীবিতকালেই তাঁর নাম শোনামাত্র আসমুদ্র-হিমাচলের যে কোন লোকের দেহে যেমন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হতো—গ্যেটে কি দান্তের খ্যাতি এত সুদূরপ্রসারী ছিল না। কেন? সে আলোচনাও করা যায়, কিন্তু সেটা আমার এই নিবন্ধের বিষয় বহির্ভূত হবে। আবার গুজরাটের প্রসঙ্গে আসা যাক।

ভাবনগরে বড় বড় সব পণ্ডিত আর ধনী ব্যক্তিদের ভাবসাব খুব ভাল লাগছিল না কবির। না লাগবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ যে কবি। শুধু কবি নন, সঙ্গীতজ্ঞ, গানলেখক, নাট্যকার, লোকসঙ্গীত আর লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পুরোধা।

কানে পড়ল—ভাবনগরের বৈষ্ণব-সমাজের ভজনগান বিখ্যাত। অমনি রওনা। আমি আগেই বলেছি, সব কিছুকে গ্রহণ করার শক্তি তাঁর যেমন অসাধারণ তেমনি ছিল তাঁর কবিমনের জারকরসে তাকে জীর্ণ করার ক্ষমতা। কবি দেখলেন—

মন্দিরের দেবতার সামনে সুন্দরী তন্বী নারী অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে মন্দিরা বাজিয়ে ভজনগান করছে। তার চম্পক অঙ্গুলির ললিত বিন্যাসে


বাহির হইল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রণীত

মহাকবি শ্রীমধুসূদন

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বিশদ তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

[ মহাকাব্যের সংজ্ঞা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভারতীয় মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও মহাকাব্য, বাংলা মহাকাব্য—প্রাচীন ও আধুনিক মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকা, উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা মহাকাব্য, উনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতাবাদ, ক্লাসিক ও রোমান্টিক মহাকাব্য, মধুসূদন ও বাংলা মহাকাব্য প্রভৃতি বিষয়ে ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ]

মূল্য ৬·০০

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেবতার প্রতি প্রণিপাতের যে ভঙ্গী ফুটে উঠেছিল তা কবির মনে বিপুল আনন্দ দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, শান্তিনিকেতনে এই লোক-সঙ্গীতের প্রবর্তন করতে হবে। তিনি একজন ভজন গায়িকাকে সপরিবারে সেই সুদূর বরদিনাওয়াড় থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন। একদিন আম্রকুঞ্জে গানের আসর বসল।

গুজরাটী মেয়েটি দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা নিয়ে সাবলীল ভঙ্গীতে নাচল। এই নাচ দেখে, গান শুনে কবির মনে কবিতার গুঞ্জন ফুটল।

'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'--- বর্ষশেষের দিনটিতে এই বিখ্যাত গানটি তিনি রচনা করেছিলেন। দূর পশ্চিম প্রান্তের লোকসংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদকে তিনিই বাংলাদেশে ছড়িয়েছিলেন।

এখানে একটা কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ রূপোর চামচ মুখে করে জন্মেছেন ও বড়লোক-ঘেঁসা এবং সাধারণ জনতার সাদামাঠা জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরের লোক---এই রকম তত্ত্ব অনেক শিক্ষিত লোকের মুখেও শুনতে পাই। আমার মনে হয় রবীন্দ্রজীবন আর তার কাব্যসৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারা খুব ভাল করে অনুসরণ করলে উপরোক্ত থিয়োরী একেবারেই অমূলক বলে মনে হবে। বড়লোক-ঘেঁসাই যদি হবেন তাহলে গুজরাটের এই লোকনৃত্য-পটু চাষী পরিবারটিকে আদর করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন কেমন করে। কেমন করে জমিদার রবীন্দ্রনাথের সুদৃশ্য বজরায় আসতে সাহস করতেন কুষ্টিয়ার অশিক্ষিত, কপর্দকহীন সেই গায়ক লালন ফকির। কেমন করে তাঁর লেখনীতে 'ছুটি'র সেই দুর্দান্ত বালক 'ফটিক', বোবা মেয়ে 'সুভা', আরও বহু সরল, উদার ও কুচক্রী সব রকমের গ্রাম্য মানুষ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। গল্পগুচ্ছের গল্প-গুলো আর অনেক গান কবির জন-জীবনের প্রতি নিবিড় সৌহার্দ্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

সেক্সপীয়র সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম বিদেশী পত্রিকায়। প্রবন্ধ লেখক মহাকবির কাব্যে একটা দর্শন খোঁজবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'Eclectic'. আর মহাকবির যদি কোন দর্শন থাকে তা হলো Eclecticism. Eclectic কথাটার অভিধানগত অর্থ হলো, Drawing one's philosophy from various schools--বিভিন্ন মতবাদ থেকে, বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে খুঁটে খুঁটে নিজের জীবনদর্শন গড়ে তুলেছেন। এক কথায় বলা যায় চয়নপন্থী। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই বিশ্লেষণ খাটে। গুজরাটের বলিষ্ঠ চাষী মেয়ের লোকনৃত্য ভাল লাগল, আনো তাকে শান্তিনিকেতনে, জাপানের যুযুৎসু দেখে মুগ্ধ হলেন, খোঁজ কোন যুযুৎসুবিদকে, তাকে নিয়ে চলো শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের প্রয়োজনে, যেমন তাঁর নিজের গান, কবিতা, গল্প, নাটকের প্রয়োজনেও তেমনি যখন যে সুর, যে মতবাদ, যে দর্শন প্রয়োজন তাকেই নির্দ্বিধায় লাগিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে গতি-বাদের দার্শনিক বার্গস থেকে সুরু করে কাণ্ট, হেগেল, নীটসে শোপেন-হাউয়ের সমস্ত স্কুলের দার্শনিককে পাওয়া যাবে।

শুধু গুজরাটের ভজন গায়িকা নয়, কবির গুজরাটের সঙ্গে আত্মীয়তার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, গুজরাটি ও বাংলার সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে কি অদ্ভুত ভাব বিনিময়ের প্রবাহ উঠেছিল---এবার সে কথা বলবো।

উনিশ শো কুড়ির পরও আরও একবার (১৯২৩) কবি গুজরাটে গিয়েছিলেন। এবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন এণ্ড্রুস, ক্ষিতি-মোহন সেন আর গৌরগোপাল ঘোষ। এবার কবির একটু স্বার্থ ছিল। বিশ্ব-ভারতীর চাঁদা তোলা। গুজরাট সত্যিই মুক্তহস্তে দান করেছিল। আজ হয়তো অনেকে ভুলেই গেছেন কলাভবনের ভিত্তি পত্তনের আড়ালে গুজরাটের অকৃপণ দান রয়েছে।

শুধু টাকা নয়। গুজরাট এবার দিতে সুরু করল জ্ঞানী গুণী লোক। এলেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে নরসিভাই প্যাটেল। নরসিভাই ভালো জার্মান জানতেন। বিশ্বভারতীতে ইনি জার্মান শিক্ষা দিতেন। গুজরাটী ছাত্রদের গুজরাটীও শেখাতেন।

গুজরাটী শিল্পী সাহিত্যিক কবি ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। মহাদেব দেশাই আর নরীভাই পারেখ গুজরাটী ভাষায় ছন্দময় অনুবাদ করলেন 'চিত্রাঙ্গদা' আর 'বিদায় অভিশাপ'-এর। এই নরীভাই পারেখ কবির বিখ্যাত গান, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে---' আর 'তোর আপনজনের--' এ দুটোরও অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু কবির দেওয়া সুরই বজায় রেখে-ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কবির সম্প্রীতির ফলেও গুজরাট প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার ভেতরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা কারো অবিদিত নয়।

গান্ধীর দুইজন ঘনিষ্ঠ সহচর কবির কাব্যের মর্মকথা তাঁদের দেশের দিকে দিকে প্রচার করে-ছিলেন। তাঁদের নাম---

কাকাসাহেব কালেলকার।

মহাদেব দেশাই।

কাকাসাহেব শান্তিনিকেতনের ভিজিটিং প্রফেসার ছিলেন। কাকা-সাহেব হচ্ছেন গুজরাটী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সার্থক ব্যাখ্যা-কার। গুজরাটী ভাষায় অনূদিত কবির রচনাবলীর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন কাকাসাহেব।

কাকাসাহেব একটি আশ্চর্য

ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তাঁর ওপরে দুই দুইটি ধুরন্ধর বুদ্ধিজীবীর (মহাত্মা গান্ধী ও কবি) প্রভাব পড়েছিল। অনেকে বলেন, এই দুই মহাপুরুষের Harmonious blending হচ্ছেন কালেলকার সাহেব---

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রচারের জন্য শুধু দেশাই আর কালেলকার সাহেব নয়, আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন। 'বতাদকার' করেছেন কবির 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র অনুবাদ: 'গীতাঞ্জলি'কে ভাষান্তরিত করেছেন 'পথশুকা''। আরও যত দিন যাচ্ছে তত কবির প্রতি কৌতূহল ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

কারসানদাস মালেক।

গিরিধারী কপালনী।

নগিনদাস পারেখ।

রমণলাল শোনে।

এঁরা রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদ হয়েছে। আরও হচ্ছে প্রচুর। তাই সাময়িক কালের গুজরাটী সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া খুব স্বাভাবিক।

'ধূমকেতু' ছদ্মনামে এক গল্পলেখক গুজরাটী সাহিত্যে বিখ্যাত। তিনি 'পোষ্ট অফিস' নামে যে গল্প লিখেছেন তার ভেতরে 'কাবুলিওয়ালা'র ছায়া পড়েছে। ডাঃ কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী, প্রহ্লাদ পারেখ, সুরেশ যোশীর লেখায় কবির লেখার আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আরও অনেক অনুবাদ এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত গুজরাটী লেখকের নাম করা যায়। কিন্তু 'বিবিলিওগ্রাফী' সঙ্কলন আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার লক্ষ্য, রবীন্দ্রনাথের মনে গুজরাট কি ভাবপ্রবাহ তুলেছিল, তাই ব্যক্ত করা।

নিবন্ধের সুরুতে কিছু বলেছি, আবারও বলি—শুধু গুজরাট নয়, পাঞ্জাব নয়, মহারাষ্ট্র নয়, যে কোন জাতির প্রতি, দেশের প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ ছিল। আর ছিল মানুষের ওপরে, মনুষ্যত্বের ওপরে তাঁর বৃহৎ বিশ্বাস আর অগাধ শ্রদ্ধা। ১৩১৯ সালে ইউরোপে রওনা হওয়ার আগে বোম্বাইতে একদিনের জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই সময়েই সমুদ্রধারে ভ্রমণরত, পার্শী মুসলমান ও গুজরাটী বণিকদের দেখে 'পথের সঞ্চয়'তে লিখেছেন, "এদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই, তাহাতে জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায়--- গুজরাটীদের দানে মুক্তহস্ততা দেখি ---এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্তি উদার---"

আজ পত্র-পত্রিকা ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের গুজরাট প্রীতির পরিচয় খুঁজতে খুঁজতে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন কবিতায়, গল্পে, নাটকে আজও অদ্বিতীয় তেমন আন্তঃপ্রাদেশিক মৈত্রীর ক্ষেত্রেও তিনি সবচেয়ে অগ্রগামী এবং আজও অনতিক্রমণীয়। কেমন করে বলছি একথা? কত কাল আগে তিনি লিখেছেন—

"ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণভাবে মনের ভিতরে গ্রহণ করা প্রাচীনকালে সম্ভবপর ছিল না---কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তর বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত।---মহাভারত পাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভেতরে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন।"---

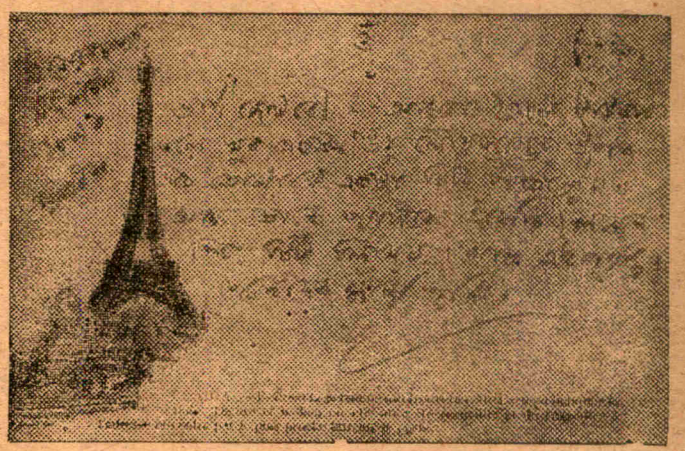

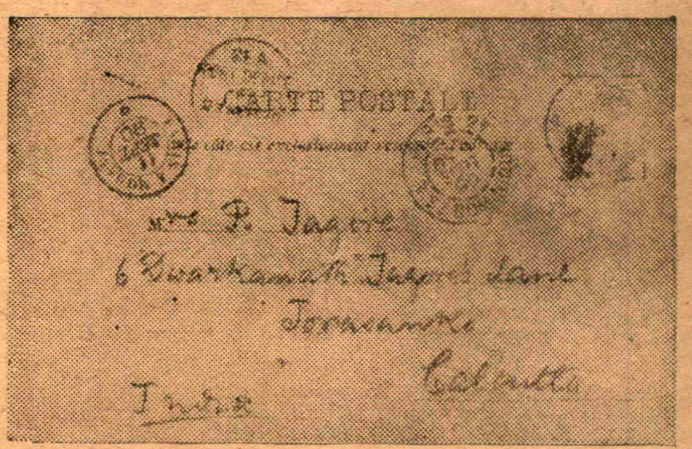


মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

# রবীন্দ্রনাথ, কাশ্মীর ও একটি কবিতা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

রবীন্দ্রনাথ এবং কাশ্মীর পর পর উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি নামও আমাদের স্মৃতিতে উন্মীলিত হয়ে ওঠে। সেটি হল 'বলাকা'। বলাকা কাব্যের নাম কবিতাটি (৩৬ সংখ্যক কবিতা) পড়েন নি এমন বাঙালী পাঠক দুর্লভ। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা স্রোতের কালো জলে তারা-ফুল নিয়ে ভেসে আসা রাত্রির প্রসারিত দিগন্তে অন্ধকার গিরিতটতলে সারি সারি দেওদার তরুর নিঃশব্দ পটভূমিকায় ধাবমান বলাকা শ্রেণীর রূপচিত্রটি আমাদের মর্মলোকে শাশ্বত মুদ্রিত হয়ে আছে। এই কবিতাটির অন্তত অংশ-বিশেষ মুখস্থ নেই, বা জীবনের কোনো নিবিড়, উদ্দাম, নির্জন, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি এর কোনো কোনো পংক্তি, এমন বাঙালী পাঠক দেখি নি। কবিতাটির কতকগুলি অংশ, আর অংশই বা বলি কেন, সমগ্র কবিতাটিই আমাদের সাহিত্যে ধ্রুব বা চিরায়ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে।

"মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে
দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

কিংবা—

"শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে, কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"

এবং সেই বহুশ্রুত বহুখ্যাত অন্তিম পংক্তিটি—যেখানে রোমাণ্টিক কবিচেতনার শেষতম হৃদয়-আর্তি শাশ্বত ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় শতধা বিদীর্ণ হয়ে ফেটে পড়ছে : যেখানে বিস্ময়ে, পুলকে, আনন্দে, যন্ত্রণায়, জিজ্ঞাসায়, সম্মোহে, শান্তিতে, আবেগে রূপ-লোকের রামধনুচ্ছটা উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাই অনন্ত রহস্যলোকের গোধূলি বিস্তীর্ণ গোপুর-দ্বারে :

"হেথা নয়, অন্য কোথা,
অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।"

বস্তুতপক্ষে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে সব কবিতা ত্রিকালজয়ী ঐশ্বর্যে উজ্জ্বলতম সৃষ্টির স্বাক্ষরে বর্ণে ও বেদনায়, আঙ্গিকে ও রূপকল্পে, প্রযুক্তি ও প্রকরণে, ভাবে ও কল্পনায় অনন্তায়িত হয়ে রয়েছে—'বলাকা' কবিতাটি তার মধ্যে অন্যতম এবং কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীর যাত্রার ফসল। কে জানে, হয়তো কাশ্মীরে না এলে 'বলাকা'র মত এমন একটি আশ্চর্য নিটোল কবিতা আমরা কবির হাত থেকে পেতাম না। অবশ্য কল্পনার সম্রাট রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ কথা জোর করে বলাও মুস্কিল। আগ্রায় না গিয়েও যিনি 'শাজাহান' কবিতা রচনা করতে পারেন, তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় কিছুই। তবে কাশ্মীরে না এলে কী হত—এ আলোচনা না করেও বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গে 'বলাকা' কবিতাটি যুক্ত হয়ে আছে চিরকালের জন্য। কবিতাটির শেষে উল্লিখিত রয়েছে—শ্রীনগর। কার্তিক, ১৩২২।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে মাটিতে এসে এমন সার্থকতম কবিতা রচনা করলেন—কবির নিজের কাছে কিন্তু সে দেশ তেমন ভালো লাগে নি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলা সন ১৩২২। আশ্বিনের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর যাত্রা করেন। "সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, তাঁহার পত্নী প্রতিমা দেবী, তদীয়া ভগ্নী কমলা দেবী এবং তাঁহার স্বামী হেমচন্দ্র মজুমদার। পরিবার পরিজন ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।"—২য় খণ্ড। রবীন্দ্রজীবনী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"কাশ্মীরের তদানীন্তন শিক্ষা-মন্ত্রী পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনিই কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীনগরের পাদমূলে বিতস্তা নদীবক্ষে টিকারী মহারাজার 'পরীস্থান' নামক গৃহ-নৌকাখানি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়।"—তদেব ॥

কবি কিছুদিন এখানে থাকবার প্রত্যাশা নিয়েই এসেছিলেন। শ্রীনগর থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত একটি পত্রে কবি জানাচ্ছেন, "এখন আমি কাশ্মীরে। দেড় মাস এখানে কাটাইয়া হয়ত দেশে ফিরিব। বিতস্তা নদীতে বোটে করিয়া কিছুদিন ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আছে।"—২১শে আশ্বিন—১৩২২। চিঠিপত্র। ৭ম ভাগ। পত্রসংখ্যা ৩৯ ॥

অথচ শেষ পর্যন্ত কবি মাত্র দিন পনেরোর বেশি কাশ্মীরে থাকেন নি। কিন্তু সৌন্দর্যের লীলাভূমি, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রতি কবির কেন এই অনীহা? তবে কি নির্জনতা-প্রিয় কবিচিত্ত এখানকার অতিরিক্ত অভিনন্দন অভ্যর্থনার ভারে পীড়িত হয়েই এই নিসর্গের অম্লান

সৌন্দর্যের প্রতি চোখ ফেরাতে পারেন নি? শ্রীনগরে পৌঁছেই কবি লিখছেন, "অভিনন্দন অভ্যর্থনা চলিতেছে, এখনও কাশ্মীরে পৌঁছাই নাই।" "I am technically in Kashmir, but still have not entered its gate. I am passing through the purgatory of public receptions and friendly solicitations; but paradise in sight." Letters to a friend—P. 70. Srinagar. 12 ths oct. 1915. শ্রীনগরে মহীদল কলেজে অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল—ঐশ্বর্যে ও আড়ম্বরে সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং এই ধরণের আরো অনেক অভিনন্দন অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল কবির উদ্দেশ্যে। তা ছাড়া সে বছরে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান বাঙালী কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিলেন। কবির নৌকা-বাসে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরাও প্রায়ই আসতেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। কবিমন যে বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল এই সব অবিরাম অভ্যর্থনা অভিনন্দন এবং দেখা সাক্ষাতের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত তা আর কবির ভাগ্যে জুটল না। তবে কি এই সব কারণেই "paradise in sight" হয়েও শেষ পর্যন্ত প্যারাডাইসের অন্তরে প্রবেশ করা অন্তব হল না? এবং এই জন্যই বোধ হয় শ্রীনগরের বাইরে বৃহত্তর কাশ্মীরের আর কোথাও গেলেন না। শ্রীনগরকে কেন্দ্র করেই যা কিছু সামান্য পরিক্রমা। জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখছেন, "একদিন কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নস্তূপ দেখিবার জন্য যান; এ ছাড়া ঐ দেশের বিখ্যাত প্রাক্ষাক্ষেত দর্শনে বেড়াইতে যান।"

কাশ্মীর ভ্রমণের এখানেই যবনিকা। কলকাতায় ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে গেলেন। সেখান থেকে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লিখলেন, "আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার তো কিছুমাত্র ভালো লাগলো না। আমি যেখানে যাই কেবলি গোলমাল—লোকজনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম—কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাই নি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। এখন মনে হয় এর চেয়ে রায়গড়ে গেলে শরীর মনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। যাহোক কাশ্মীরটা না দেখলে মনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত—সেইটে কেটে গেল—এইটুকুই যা লাভ।"—১৯শে কার্তিক ১৩২২। চিঠিপত্র। ৪র্থ খণ্ড। ২১নং চিঠি।

২০শে কার্তিক এই প্রসঙ্গেই কলকাতা থেকে প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন, "ফিরে এসেছি। কাশ্মীরে খুব যে আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি। এক লাইন লিখতে পারি নি; অথচ আজ হল ২০শে কার্তিক। দুই একদিনের মধ্যে শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা আছে—নইলে লেখাও হবে না, শ্রান্তিও শরীর মনে জড়িয়ে থাকবে।" —চিঠিপত্র। ৫ম খণ্ড। পত্র নং ৪৪। ২০শে কার্তিক, ১৩২২।

শিলাইদহ থেকে আবার চিঠি লিখছেন মীরা দেবীকে "এবারে কাশ্মীরে শরীর ভালো ছিল না। বড়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি। তাই শিলাইদহে কিছুদিন বিশ্রাম করতে এলুম। শিলাইদহের মত এমন মনের মত জায়গা আর তো কোথাও দেখলুম না।" —অগ্রহায়ণ, ১৩২২। চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড। ২২নং চিঠি।

—এই শেষোক্ত চিঠিতে অবশ্য কবির শারীরিক অসুস্থতার কথা জানা যায়। তবে কি এই শারীরিক অসুস্থতার জন্যই নয়নরোচন চিরশ্রী কাশ্মীর কবিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। আমার তো মনে হয় "এহো বাহ্য"। কারণ স্বল্প শারীরিক অসুস্থতা অনেক সময় আমাদের চিত্তকে বৃহতের দিকে প্রসারিত করে দেয়। সামান্য পীড়িত অবস্থায় আমাদের চেতনার চারদিকে যে একটি নির্জন বিবিক্তি জড়িয়ে থাকে, একটি ধূসর অন্তর্লীন বৈরাগ্য—তা অনেক সময়েই আমাদের জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিমানস সম্পর্কে একথা আরো সত্য। তাই মনে হয়, অসুস্থতা নয়, কাশ্মীর সম্পর্কে কবির এই যে অনীহা—এর মূল অন্য কোথাও।

অথবা সেই বহুখ্যাত আর্ষ উক্তি "জ্ঞানীরা ভালোবাসেন পাহাড়পর্বত,


॥ সুপ্রকাশের নূতন বই ॥

= বৈশাখে প্রকাশিত =

| বই | লেখক | বিষয় | দাম |
|---|---|---|---|
| আইসোলো বেলা | নীলকণ্ঠ | উপন্যাস | ৬·৫০ |
| কল্যাণী লোকাল | চতুর্মুখ | উপন্যাস | ৫·০০ |
| মাটি ও মানবী | প্রবোধ সরকার | উপন্যাস | ৫·০০ |

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ : ৯, রায়বাগান ষ্ট্রীট : কলিকাতা—৬

● আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ

কবিরা সমুদ্র"—অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথও সমুদ্রপ্রেমিক ছিলেন বলেই কাশ্মীরের নীরব নিঃশব্দ শৈলশ্রেণী কবিচিত্তের কাছে কোনো আবেদন জাগাতে পারে নি! না কি রবীন্দ্রনাথের চির চলমান নিত্য বহমান প্রতিভার সগোত্র বলেই কবির কাছে নদীকেন্দ্রিক সমতলের সৌন্দর্যই আকর্ষণীয় ছিল? পদ্মার প্রবহমানতাকে হয়তো কবি আপন সঙ্গীতধর্মী কবিচৈতন্যের প্রতীক ভেবে—তাকে এত আপন করে নিতে পেরেছিলেন অত সহজে! অন্য দিকে কাশ্মীরের পর্বত সমাকীর্ণ উপত্যকা—তাকে ডেকে নিতে পারে নি কোনোদিন!

এই প্রসঙ্গে আর একজন বিশ্ব-বিশ্রুত সাহিত্যিকের তাজমহল সম্পর্কিত উক্তিটি এখানে স্মরণীয়। "Nature, I repeat, did its best. But though it adorned, it could not improve the works of man. The Taj even at sunset, even reverberated upside down from tanks and river, even in conjunction with melancholy cypresses—The Taj was a disappointment."

"Architecturally the worst features of the Taj are its minarets. These four thin tapering towers standing at the four corners of the platform on which the Taj is built are among the ugliest structures ever created by human hands."—Jesting Pilate, by Aldous Huxley.

উপরোক্ত উক্তিটি অলডাস হাক্সলির। জেষ্টিং পাইলেট গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যদিও মানস গড়নে এবং কবিচৈতন্যের চরিত্র বিচারে অলডাস হাক্সলি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তের, তবু যথাক্রমে তাজ ও কাশ্মীর সম্পর্কে উভয়ের উক্তি স্মরণে রেখে শাশ্বত কবিদৃষ্টি সম্পর্কেও একটি স্থির সত্যের আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে: কবি বা শিল্পী মাত্রেই নিত্য নতুনের অভিলাষী। বহু ব্যবহারে জীর্ণ, গড্ডলের পদপাতে মুখর, খ্যাতির বিড়ম্বনায় লাঞ্ছিত কোনো বস্তু বা দৃশ্যের প্রতি, আমার মনে হয়, কবি বা শিল্পীর অনীহা চিরন্তনী। তার চেয়ে নামহীন, গোত্রহীন নির্জন নিভৃত কোনো নিসর্গ-সঙ্গম বা মানুষের সৃষ্টি—বহু মানুষের দৃষ্টিপাতে কলুষ-মলিন হতে পারে নি যে আকাশ, বহুজনের পদপাতে মুখর হয় নি যে ভূমি, বোধহীন সাধারণ মানুষের পরানুকৃতির হীন আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় নি যে পৃথিবী—পরন্তু যেখানে রয়েছে আবিষ্কারের আনন্দ, নতুন করে নিভৃতে দেখার আবেগ, আত্মার উন্মীলন যেখানে সহজ—তেমন বস্তু বা দৃশ্যের প্রতিই রয়েছে তাঁদের সহজাত আকর্ষণ। তবে কি যে কারণে Aldous Huxley-র কাছে—"Taj, a disappointment" এবং "ugliest structures ever created by human hands"—সেই একই কারণে রূপময় কাশ্মীরের প্রতি কবির অনীহা? এ কি সেই "Sweeter unheard melodies" -এর প্রতি শাশ্বত আকর্ষণের জন্যই কাশ্মীরের ভাগ্যে ঘটল এই অঘটন?

রোমাণ্টিক কবিচৈতন্যের কাছে "yarrow visited" কি চিরকালই ব্যর্থতার বার্তাবহ?

কিন্তু তাই বা বলি কী করে? 'বলাকা'র মত এমন সার্থকতম কাব্য রচনার যে উৎসভূমি, কবিচিত্তের মর্মমূলে তার কোনো ছায়া সম্পাতই ঘটে নি—এও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার অবশ্য জানিয়েছেন যে, শ্রীনগরে বাসকালে কবি মাত্র দুটি কবিতা লেখেন—মানসী (৭ই কার্তিক) ও বলাকা। এবং কয়েকজন সমসাময়িক বাঙালী কবির কবিতা অনুবাদ করেন। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা দুটি চিঠি থেকেও এর সাক্ষ্য মেলে। ২৪শে অক্টোবর কবি লিখছেন—"দ্বিজু রায়ের মন্দ্রের কবিতা ইংরাজিতে তর্জমা করার মত শক্তি আমার নেই। ---আর দুচারজন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জমা করা—নইলে তারা পীড়াবোধ করবে। কাশ্মীর দেশটা শুনেছি খুব সুন্দর, কিন্তু এখনো তার পরিচয় পাওয়া গেল না।"—চিঠিপত্র। ৫ম খণ্ড পত্র-সংখ্যা ৪৩।

পরবর্তী পত্রে কবি আবার লিখছেন, "তোমাকে কয়েকটা ইংরেজী তর্জমা পাঠিয়েছি। তোমার কাজে লাগবে কি না জানি নে।"—তদেব। পত্র-সংখ্যা ৪৪।

উপরোক্ত ঘটনার উপকরণ প্রয়োগে হয়তো প্রমাণ করা অসম্ভব নয় যে, ভূস্বর্গ কবিজীবনে কোনো-দিক থেকেই ফলপ্রসূ হতে পারে নি। সমগ্র শ্রীনগর বাসকালীন দুটি মাত্র কাব্য-ফসলে তাঁর সৃষ্টির সোনার তরী শূন্যই থেকে গেছে। তা ছাড়া কোনো মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভা যখন কেবলমাত্র অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন তখন অনেক সময়ই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাময়িকভাবে কবির সৃষ্টি-প্রতিভা অস্তগামী। বিশেষ করে অবিশ্রাম-লেখনী রবীন্দ্রনাথের মত বনস্পতি প্রতিভার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত আরো স্বাভাবিক। তবু মনে হয় "এহো বাহ্য।" এমন কি চিঠিপত্রে কাশ্মীর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি স্মরণ করেও আমি অপর একটি স্থির সত্যে অনিষ্ট হতে চাই। যেহেতু, রচনার সংখ্যা গণনায় নয়, পরন্তু উৎকর্ষ বিচারেই—কবিজীবনের কোনো বিশেষ কালের উর্বরতা বা বন্ধ্যাত্ব নির্ণীত হয়, তাই দুটি মাত্র কবিতা রচনা করেছেন বলে কাশ্মীর ভ্রমণের এই কালকে বন্ধ্যা বলতে আমি অসম্মত। কারণ গুণগত বিচারে কবিতা দুটির কলাসিদ্ধি বিস্ময়করভাবে অতুলন। এবং এই কবিতাটির নাম থেকেই এই যুগের রচিত কবিতাগুচ্ছের নামকরণ করা হয়—এ সংবাদটিও বিশেষ অর্থবহ এবং এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এই রসসিদ্ধ দীপ্তিমান কবিতাটি কোনো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একক রচনা মাত্র বলে আমার মনে হয় না, পরন্তু এমন একটি উৎসমুখ থেকে এর জন্ম—যা একটি সমগ্র যুগ ধরে অবিরাম হয়েছিল কবিচৈতন্যের মর্মমূলে। এবং এই উৎস সন্ধানে এগিয়ে গেলে আমরা পৌঁছাব গিয়ে কাশ্মীরে।

বলাকার পাঠকমাত্রেই জানেন এই কাব্যেই সর্বপ্রথম কবিচিত্ত ত্রিমাত্রিক অভিচেতনায় উত্তুঙ্গ মুখর হয়ে বহুধা বিচিত্র জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। শতধা তরঙ্গভঙ্গে আবর্তিত এক সার্বিক জীবনপ্রবাহের সার্থকতম কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রথম সংগ্রামী বিশ্বমানবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার" অভিমুখে অভিযাত্রী হয়েছেন ---যৌবনের উদাত্ত জয়গানে। বাংলা সাহিত্য এই প্রথম বিশ্বের প্রাঙ্গণে এসে 'বিশ্ব সাহিত্যে' রূপান্তর লাভ করল। বলাকা কাব্যগ্রন্থ থেকে, বিশেষ করে 'বলাকা' নাম কবিতার (৩৬নং) পরবর্তী রচনাগুলি থেকে তো বটেই, যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেতে পারে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবাহ এখন বিশ্বমানবতার সাগর-সঙ্গমে এসে কী গভীর পরিব্যাপ্ত উদ্দাম সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৪৫ প্রভৃতি কবিতা থেকে যে কোনো স্তবক আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। একটি উদার দূরব্যাপ্ত ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টিপাতে প্রতিটি কবিতা হয়ে উঠেছে মহাবিশ্বজীবনের জয়গাথা। একটি cosmic conception-এর মহোত্তম বর্ণসম্পাতে প্রতিটি কবিতা স্পন্দমান। এবং এই সমস্ত উজ্জ্বল কবিতাগুলির উৎস নির্দেশে আমি কিন্তু কাশ্মীরে রচিত সেই একটি কবিতার নামই উল্লেখ করব। যে ভাবের বীজটি এই কবিতাটির মধ্যে প্রাণ-প্রকাশের প্রেরণায় স্পন্দিত, তাই "লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা" হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বলাকা কাব্য-গ্রন্থে। আর শুধু 'বলাকা' কাব্যেই বা বলি কেন, আমার তো মনে হয় এ সময়ের পরবর্তী যৌবন বন্দনার মুখর অন্যান্য কবিকর্মেও রয়েছে বলাকার ভাবস্বাক্ষর। দারুণ সঙ্কটের মুহূর্তে যখন বিশ্বব্যাপী শুভবুদ্ধির উপরে নেমে এসেছে অশুভ কালো-ছায়া তখন কবি আবিশ্ব পবিত্র যৌবনের হাতেই আবিষ্কার করলেন বিশ্বমুক্তির চাবি-কাঠি। তত্ত্ব হিসাবে এর উৎসভূমি যেখানেই হোক, কাশ্মীরের ভূমিতেই যে এর পূর্ণাবৃত্তি এতে সন্দেহ নেই।

যে অর্থে কাশ্মীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে সে অর্থে হয়তো কাশ্মীর কবিচিত্তে সামান্যতম দোলা জাগাতে পারে নি,—ভূস্বর্গের অপরূপ সৌন্দর্য হয়তো অন্তর আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে নি কবিকে, পারে নি নিসর্গ সৌন্দর্যের তনায় রূপলোকে

# ভারতপুরুষ

**দুর্গাদাস সরকার**

দূর অতীতের সেই শান্ত স্নিগ্ধ বৃক্ষচ্ছায়া তলে
আর্ষ কণ্ঠে উঠেছিল যে উদাত্ত ধ্বনি অর্থবহ
হিমালয়-শৃঙ্গ থেকে প্রতিধ্বনি তার অহরহ
বেজেছিল দক্ষিণের সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোলে।
সে-ধ্বনির ব্যঞ্জনায় দীর্ঘদিন পর তুমি দিলে
আত্ম পরিচয়ে যেন প্রকৃতির নিগূঢ় সত্তার
পরিচয়। কঠিন সন্তোষে তুমি ভারত-আত্মার
ভিতরে প্রবেশ ক'রে নিজেকেই বিলালে নিখিলে।

আশ্চর্য ভারতবর্ষ; তারো চেয়ে আশ্চর্য মানুষ।
যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই পরম বিস্ময়।
বিচিত্র জীবন-ছন্দে সকলেরই অভিন্ন হৃদয়—
সত্য দৃষ্টি দিয়ে তুমি দেখালে তা, ভারতপুরুষ।
আমাদের চিত্ত হতে ভারত-আত্মায় স্থির তুমি।
চিরকাল মূর্ত র'বে তোমাতেই এ-ভারতভূমি।

# রবীন্দ্রনাথ

**মৃত্যুঞ্জয় মাইতি**

সে যেন বটের ছায়া, দগ্ধ মরু বৈশাখের পথে
আপন আবৃতি দিয়ে পথিকের যতো ক্লান্ত শ্রম
মুছে নিল মৌন স্নেহে। জননীর সেই স্পর্শটুকু
দুপুরের সব অশ্রু ঢেকে দিল সমুদ্র গভীরে!

নিজের মৃত্যুর দিকে কতোবার গোপন প্রার্থনা!
অসহ্য নির্জন দিন যন্ত্রণার অতলান্ত দিকে
টেনেছে সকল সত্তা; ততোবার আমি তার কাছে
সান্ত্বনার আশীর্বাদ পাব বলে দু'হাত পেতেছি!

সারাটা দিনের কাজে শুধু দুঃখ, অপমান, গ্লানি
জমে জমে দীর্ঘ হ'ল; দীর্ঘ হ'ল রাত্রির আকাশ
নির্ভয় ভোরের আলো দিগন্তের উদার মন্দিরে
আবির্ভূত হবে বলে সে আমাকে বলে গিয়েছিল।

তবু সে সান্ত্বনা নয়, আরো কিছু পরম আশ্বাস
যেখানে শব্দিত হয়, 'খুঁজি ছাখো নূতন জীবন'!

---

রহস্য-নিবিড় করে দিতে, কিন্তু নঞর্থকভাবে তীব্রতম বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়ে, চরমতম দারিদ্র্য ও ভীষণতম দুঃখের মুখোস খুলে দিয়ে, কাশ্মীরই কবিকে উদ্বোধিত করেছিল উজ্জ্বলতম জীবনস্তোত্র রচনায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সৌন্দর্যের পূজারী। এবং এ সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন তিনি সামঞ্জস্যে, সাম্যে, সংহতিতে, পূর্ণতায়। প্রকৃতিতে এই সাম্য আছে, এই সামঞ্জস্য আছে, তাই প্রকৃতি পূর্ণ, চিরশ্রী, অনন্ত। ঈশ্বর অনন্ত, কারণ তাঁর মধ্যে পূর্ণ সাম্য বিরাজমান।

মানুষের মধ্যেও—ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগতভাবে তিনি এই সামঞ্জস্যের সন্ধান করেছেন পূর্ণতম মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে। যে মানুষ একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে, অন্যদিকে শাশ্বত শুভ বা ভূমার সঙ্গে আযুক্ত—তিনিই রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত "বড় মানুষ"। ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে, সমাজে রাষ্ট্রে, এই বড় মানুষের উদ্বোধন সঙ্গীতই রবীন্দ্রসাহিত্য। যেখানে এই সামঞ্জস্য বা সাম্য নেই—সেখানেই তালভঙ্গ। এই তালভঙ্গের অপরাধই পাপ। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বত্র এই সাম্যের বা সামঞ্জস্যের, পূর্ণতার সন্ধান করে গেছেন।

কাশ্মীর ভ্রমণে এসে, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই সামঞ্জস্য বোধে তীব্রতম আঘাত লেগেছিল। এর আগেও নিশ্চয়ই ভারতব্যাপী দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্যের—চিত্র, মানবাত্মার লাঞ্ছনা কবিকে নানাভাবে আঘাত করেছে—একথা সত্য। কিন্তু কাশ্মীরের মত এমন বৈপরীত্যের সমাবেশ এর আগে কবি দেখেন নি। তাই তিনি দু-চোখ খুলে দেখতে পারেন নি ভূস্বর্গের নয়নরোচন নিসর্গ শোভা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ এখানে বিচ্ছিন্ন। আর যা কিছু খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত—তাই কবির কাছে বেদনাদায়ক। কবিচিত্ত তাই কাশ্মীরে এসে পীড়িত, ব্যথিত। কাশ্মীর উপত্যকায় একদিকে রয়েছে প্রকৃতির স্বর্ণাঞ্চল বিছানো, ফলে-ফুলে-পল্লবে রূপায়িত কাশ্মীর—আর তার মাঝখানে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। এ দুয়ের মাঝে কোনো মিল খুঁজে পান নি রবীন্দ্রনাথ। ক্ষুধায় অন্ন নেই, শীতে বস্ত্র নেই, মাথার উপরে আচ্ছাদন নেই, রোগ-শোক-অশিক্ষা-অর্ধাশনে-অনশনে বিষণ্ণ বিভ্রান্ত মানবতা ডুবে আছে অজ্ঞতার সীমাহীন অন্ধ তমসায়—! কাশ্মীরে গিয়ে যে কোনো অসতর্ক পথচারীরও দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়—এই সব ক্লান্ত করুণ জীবন-দৃশ্যাবলী। এই সব দৃশ্যের যন্ত্রণাই হয়তো কবির প্রত্যাবর্তনকে করেছিল ত্বরান্বিত। এবং এই যন্ত্রণার পথ ধরেই কবির অনুভূতির স্বর্ণরথ উত্তীর্ণ হয়েছে বিশ্বজীবনের তোরণদ্বারে।

অবশ্য এর আগের বিশ্ব ভ্রমণ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, আসন্ন বিশ্ব মহাযুদ্ধ, দেশে ও বিদেশে আরো নানা দ্রুত জাগতিক বিপর্যয় ও সংঘটনা হয়তো তাঁর কবিচিত্তকে বিশ্বতোমুখী করতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু তাঁর সেই নব-জীবনের উষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাবার ইতিবৃত্তে কাশ্মীরের অবদানও কম নয়। চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, আসলে ও-সব বহিরঙ্গ বক্তব্য মাত্র; আরও সুগভীর অন্তরঙ্গ আলাপনে আমার বার বার মনে হয়েছে, অতি স্বল্প দিনের হলেও, কাশ্মীর ভ্রমণ রবীন্দ্র-জীবনে ব্যর্থ হয় নি, পরন্তু সম্ভ্রান্ত উজ্জ্বল ফসলে ভরে দিয়েছিল তাঁর কাব্যসালঞ্চ

# রবীন্দ্রনাথ ও পাঞ্জাব

নরেন চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "Tagore was a poet in line with Vyas and Valmiki." কিন্তু পাঞ্জাবী সম্প্রদায় কবিকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মহাকবিদের সঙ্গে তুলনা করেই সন্তুষ্ট হন নি—তাঁরা কবিকে বিশ্বের মহামানবদের সারিতে বসিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। ডক্টর সত্যপাল তাঁর "Sixty Years of Congress" গ্রন্থে সমগ্র পাঞ্জাব ও তার অধিবাসীদের মনের কথাটি নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

"What Plato and Socrates were to the Ancient Western World, Rabindranath is to Modern World. The Punjab has special reasons to be extremely grateful to this standard bearer of Indian Nationalism. He took a very memorable stand when Punjab was bleeding and groaning, because of the indescribeable atrocities that had been committed and the ruthless repression that was carried on for a long time."

পাঞ্জাবের প্রতি কবিগুরুর প্রীতি ও মমত্ববোধ কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নি। হয়ত কোন বিশেষ ঘটনা কবির কাছে পাঞ্জাবকে আরও বেশি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাভারতের ভীম ও অর্জুনকে ভালবেসে ফেলেছিলেন তেমনি তিনি পাঞ্জাবীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। কারণ, তাঁরা যোদ্ধা! হয়ত তাঁরা কখনও পরাজিত হয়েছে কখনও বা জয়লাভ করেছে কিন্তু তাঁরা মনে-প্রাণে যোদ্ধা তো বটেই। সে সম্পর্কে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ কবিমনে ছিল না।

কবির বয়স তখন এগার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণে যাবেন। কবিরও অযাচিতভাবে সুযোগ এসে গেল পিতৃদেবের সঙ্গে যাবার। ট্রেনে করে বেড়াতে যাবার অভিজ্ঞতা কবির এই প্রথম। পথে কয়েক জায়গায় থেমে মহর্ষি ও বালক রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন অমৃতসরে। সে যাত্রায় কবিগুরু প্রায় একমাসকাল অমৃতসরে কাটান। সেখানে থাকাকালীন অমৃতসরের 'স্বর্ণমন্দির' বা 'দরবার সাহিব' বা শিখধর্মাবলম্বীদের 'গুরুদরবার'-এ যে কতদিন কত সময় কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই। এই 'গুরুদরবার' সম্পর্কে কবিগুরু তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

"অমৃতসরের গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলা পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়েছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীদের মুখে তাহাদের এই বন্দনানাম শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।"

মহর্ষি গুরুদরবারের 'অখণ্ড-পাঠ' এবং অহর্নিশ 'শব্দকীর্তন' শুনে এতই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মমন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা ব্রাহ্মধর্ম-পুস্তক পাঠ বা ব্রাহ্মসঙ্গীতের প্রচলন করেছিলেন।

অমৃতসরের পর মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথ আসেন ডালহৌসীতে। ডালহৌসীর বাক্‌রোটা পাহাড়ের উপর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মহর্ষি। ঐখানে কবি নিজের খেয়াল-খুশিমত ঘুরে বেড়াতেন এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে। কবি এই ভ্রমণের উল্লেখ করে শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে এক পত্রে লিখেছিলেন :

"আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন—তখন বোধহয় আমার বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ডালহৌসী পর্বতে ভ্রমণ করিতে যান—সেই আমার বাহিরের জগতের সহিত প্রথম পরিচয়। সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

—২৮শে ভাদ্র ১৩০৭।

পাঞ্জাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একেবারে বাহ্যিক ছিল না। ঠাকুর পরিবার বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল পাঞ্জাবের সঙ্গে। কবির দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল পাঞ্জাবের একজন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক স্বর্গীয় রাম্ভজ দত্ত-চৌধুরীর সঙ্গে। শ্রীরাম্ভজ দত্তচৌধুরী লাহোর কোর্টে ব্যারিস্টারী করতেন। রাজনীতি ও সমাজকল্যাণ কাজেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। এই পারিবারিক সম্পর্ক যে পাঞ্জাবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

মারাঠা, শিখ, রাজপুত গাথা নিয়ে কবিগুরুর যে সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কবি যেখানে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসকে তাঁর কবিতায় মূর্ত করে তুলেছেন তা আরও বেশি পাঠকের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

● সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

'কথা ও কাহিনী'তে সঙ্কলিত কবিতাগুলি প্রায়ই রচিত হয়েছিল ১৮৯৭—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তবে 'গুরুগোবিন্দ' শীর্ষক কবিতাটি রচিত হয়েছিল প্রায় তার ১০ বৎসর পূর্বে—কবির বয়স তখন ২৭ বৎসর। এই কবিতাটির মাধ্যমে তিনি শুধু সে মহান গুরু 'গুরুগোবিন্দ'-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিই অর্পণ করেন নি—শিখ ধর্ম ও পাঞ্জাবী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর প্রাণের আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে।

সর্বজনপ্রিয় কবিতা 'বন্দীবীর'-এর ছত্রগুলি সকলের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের বোধহয় এই কবিতাটির মাধ্যমেই পাঞ্জাবের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। তাছাড়া 'শিবাজী ও গুরু-গোবিন্দ সিংহ', 'কাজের লোক কে', 'বীরগুরু', 'শিখ স্বাধীনতা' প্রভৃতি রচনাগুলিকে পরবর্তীকালের কয়েকটি কবিতার খসড়ালিপি বলা চলে। এই প্রসঙ্গে 'গুরুগোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার' এবং 'কথা' কাব্যের 'শেষ শিক্ষা', 'প্রার্থনাতীত দান' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ-এর প্রতি কবির ছিল অসীম শ্রদ্ধা। কবি নিজেই লিখেছেন:

"শিখদের ধর্মগ্রন্থ এবং তাহাদের জনসম্প্রদায় গঠনের ইতিহাস একত্র সম্মিলিত। তাহাদের ধর্মমতে একেশ্বরবাদের মহান ঐক্য স্বভাবতই জাতীয় ঐক্যের কারণ হইয়াছিল। তাহারা যেমন ধর্মে এক তেমনি কর্মে এক, তেমনি বলে এক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ একই কালে পুরাণ এবং ইতিহাস।"

কবিগুরু গুরু নানকদেবের ভক্তি-মূলক শব্দকীর্তনের প্রতি এত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি এই শব্দ-কীর্তনের ভাব ও সুর বজায় রেখে দুটি ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। গুরু নানকদেবের শব্দ-কীর্তনটি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

"গগন মে থলে রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারা মণ্ডল জনক মোতি,
ধূপ মালা অনলো পবন ছাবরো করে,
সগল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।"

কবিগুরুর রচনাটি—

"তারে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সে বিশ্ব-শরণ, তার জগৎ
মন্দিরে,
অনাদিকাল অনন্ত গগন, সে
অসীম মহান মগন,
ছায় তরঙ্গ উঠে সঘন,
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।"

জাতীয় সঙ্গীতে অন্যান্য অনেক প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে 'পাঞ্জাব'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তা শুধুমাত্র ছন্দরক্ষার জন্য নয়। এটি পাঞ্জাবের প্রতি কবির গভীর ভালবাসারই পরি-চায়ক।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ও ইংরেজের বর্বরতার কথা স্থান পেয়েছে। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর একটি লোককেও খুঁজে পাওয়া গেল না যিনি মাথা উঁচু করে বলিষ্ঠ-ভাবে ইংরেজের এই বর্বরতার কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন বা প্রতিবাদ জানান। পাঞ্জাবের সে অন্ধকারময় দিনে যিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি পাঞ্জাবের একমাত্র দরদী বন্ধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন। এই ঘটনার পরই তিনি তাঁর বন্ধু ও ভক্ত এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে পাঠালেন মহাত্মা গান্ধীর কাছে একটি প্রস্তাব সহ। তিনি বলে পাঠালেন যে, পাঞ্জাবের এই দুর্দিনে যদি তিনি

(রবীন্দ্রনাথ) ও মহাত্মা গান্ধী দুজনে সামরিক আইন অমান্য করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগের এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। কবির আশা সফল হয় নি। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব গান্ধীজীর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। কবি তখন একেবারে একা!

এই ঘটনার ঠিক তিন বৎসর পূর্বে ইংরেজ সরকার কবিগুরুকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তিনি স্থির করলেন যে, ইংরেজের দেওয়া নাইট উপাধি বিসর্জন দেবেন। কবিগুরু নাইট উপাধি বিসর্জন দিয়ে লর্ড চেমসফোর্ডকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rules—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutory lessons".

* *

'The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous contact of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinction, by those of my countrymen who, for their so-called insignificance, and liable to suffer degradation not fit for human beings."

১৯২০ সালে যখন কবিগুরু আবার পাঞ্জাবে এলেন সেবার তিনি পাঞ্জাবী সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা ব্যক্ত করেন। সে যাত্রায় তিনি পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ভাই বীর সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনান। কবিতার গীতিময়তা ও ভাবদর্শন কবিকে চমৎকৃত করেছিল। পাঞ্জাবী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা হিন্দী, ইংরেজী এবং উর্দু ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরাও কবির প্রভাবমুক্ত নন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের রচনায় কবিগুরুর রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ছন্দ বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শতকের পাঞ্জাবী কবিদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে। ঐ সময়ের এমন একটি কবিরও নাম করা যায় না যিনি কবিগুরুর প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন। সেকালের পাঞ্জাবী তরুণ কবিরা যে কেবলমাত্র কবির রচনা ও তাঁর চিন্তাধারাকেই শুধু আদর্শ করেছিলেন তা নয়—এমন কি অনেকে কবির মত লম্বা দাড়ি পর্যন্ত রেখেছিলেন। লাহোরে কবিগুরুর নামে বিভিন্ন সোসাইটি ও পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল।

কবি অমৃতপ্রিতমের প্রথম যুগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনস্বীকার্য। উপমা ও শব্দচয়নে তিনি কবিগুরুর কবিতাকে কপিবুকের মত অনুকরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেম ও ঐক্যের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন প্রখ্যাত গল্পকার সর্দার গুরুবক্স সিং। কবিগুরুর মানবতাবাদকে তাঁর গল্পে ও প্রবন্ধে মূর্ত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। তবে ১৯৩১ সালের পরবর্তীকালের প্রত্যেক লেখকই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন এমন নয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তবে কবিগুরুর নিজের দেশে যেভাবে ও যে ভাষায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তেমনটি বোধহয় কোন দেশে হয় নি। অতীতে ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল সেগুলোকে "Bad Translation" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমভাগে যে সমস্ত অনুবাদক রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রভৃতি অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই মূল গল্পের ভাব ও রসকে বাদ দিয়ে গল্পের কাঠামোটাকে রেখে—মূল লেখককে গৌণ করে দিয়ে অনুবাদক হিসেবে নিজেদের নামের প্রচার করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না বলেই মনে করি। বর্তমান কালে যদিও এই কথা প্রযোজ্য নয়। কারণ অনেকেই মূল বাংলা ভাষা থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করছেন। ১৯৫৭ সালের পর কবিগুরুর যে সমস্ত গ্রন্থ পাঞ্জাবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুবাদকরা সঠিকভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে (১৯৬১) সাহিত্য আকাদেমী কয়েকটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঞ্জাবী ভাষায় প্রকাশ করেছে। কয়েকটি নাটকও পাঞ্জাবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

কবিগুরু শেষজীবনেও এই প্রদেশের কথা ভুলতে পারেন নি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ সদলবলে লাহোরে এসেছেন 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক অভিনয়ের জন্য। উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। নাটকটি কয়েকদিন অভিনীত হবার পর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অনুরোধে অভিনয় বন্ধ করে দেন। গান্ধীজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের মূল কারণ হচ্ছে তিনি চান নি যে কবিগুরু বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বৃদ্ধবয়সে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি কবিগুরুকে একটু বিশ্রামের অবকাশ করে দিতে চেয়েছিলেন।

# উড়িষ্যা পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ

শিবানী চট্টোপাধ্যায়

'জন গণ মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল
জলধিতরঙ্গ---'

দেশজননীর এই বন্দনাগান রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালে লিখেছেন। এ সংগীতে আসমুদ্র-হিমাচল প্রায় সব প্রদেশের সংগে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের প্রতিবেশী উড়িষ্যা প্রদেশের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উড়িষ্যার সংগে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে অনেক আগেই, সে সূত্রও এক পুরুষের নয়, পুরুষানুক্রমিকভাবে বয়ে এসেছে। ১৭৬৫ সালে নীলমণি ঠাকুর কোম্পানীর দেওয়ানী পেয়ে রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা করেন। সে সময়ই কালেক্টরের সেরেস্তাদার হয়ে তিনি উড়িষ্যায় যান এবং সেখানে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারীর পত্তন তিনিই করেন। তারপরে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এবং পরে বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও এজমালী সম্পত্তির দেখাশুনা করতে উড়িষ্যায় এসেছেন।

যতদূর জানা যায়, বার চারেক তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণে আসেন। প্রথমবার যখন উড়িষ্যা যান, তখনও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হয় নি। উড়িষ্যা ছিল বাংলাদেশেরই অংগ। ১৮৯১ সালের আগস্ট, অর্থাৎ বাংলা ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে কবি প্রথম উড়িষ্যায় যান। সে যুগে রেলপথ হয় নি; তাই খালে খালে, অর্থাৎ জলপথেই তাঁকে যেতে হয়। যাত্রাপথে জাহাজ একটা সুঁড়ি খালে আটকে যাওয়ার দরুণ আগের দিন বিকাল থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই কাটাতে হয়। সঞ্চরমাণ মশা ও আরশুলার উপদ্রব, চার-পাঁচটা নাকের ভৈরো রাগিণী, কতকগুলি আকার-প্রকারহীন ভাজা ময়দা খাওয়া—ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বিরক্ত হয়ে কবি ভাবলেন কলকাতায় ফিরে যাবেন; কিন্তু যখন শুনলেন এই জাহাজই কটকে পৌঁছে তবেই কলকাতা ফিরবে, তখন আর কলকাতা ফেরার ভরসা রইল না তাঁর।

কটকে এত কষ্ট করে পৌঁছে আপ্যায়নটাও খুব মধুর হয় নি। উকিল হরিবল্লভবাবুর বয়স হয়েছে; ভাবখানা অনেকটা কেষ্ট-বিষ্টুর মত। কাঁধে কোঁচানো চাদর, গায়ে এসেন্সের গন্ধ। দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, গড়ানে কপাল, বড় বড় ড্যাবা ড্যাবা চোখ আত্মম্ভরিতায় অর্ধ নিমীলিত। চোখ দুটি উল্টে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—'জ্যোতি কোথায়?' উত্তর শুনে বলেন—'আমি বীরেন্দ্রের সাথে পড়েছি।' তারপরেই বললেন—'কারও সংগে পরামর্শ না করে তোমার এখানে আসা বালকোচিত অবিবেচনার কাজ হয়েছে।' তখন কবির সেই ম্লান অপ্রতিভ অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

বালিয়ার ঘাটটি বেশ ভাল লেগেছিল কবির। খালের দু'ধারে বেশ বড় বড় গাছ, যা দেখে পুনার একটি ছোট নদীর কথা তাঁর মনে পড়ে। এই খালটিকে যদি নদী বলে জানতেন, যেন ভাল লাগত অনেক বেশি। দুই তীরে বড়ো বড়ো নারকেল গাছ, আম গাছ এবং নানা জাতীয় ছায়াতরু, চালু পরিষ্কার তট দুটি সুন্দর সবুজ ঘাস এবং নীল পুষ্পিত লজ্জাবতী লতায় ঢাকা। কোথায়ও বা কেয়া বন, মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। খালটি তার পরিষ্কার সবুজ শ্যাওলার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভংগীতে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। স্রোত খুব কমই। যেখানে খুব সংকীর্ণ—সেখানে পদ্মবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস। সব মিলিয়ে তাঁর মনে হয়েছে সবসুদ্ধ---একটা ইংরাজী stream-এর মত। কবি ভেবেছেন, এক শ' বছর পরে যখন দুই তীরের গাছগুলো আরও বড়ো হয়ে উঠবে, তকতকে সাদা মাইলস্টোন ফুঁড়ে শ্যাওলা ঢাকা পড়বে, লকের ওপরে খোদাই করা 1871. তারিখ যখন অনেক দূরের বলে মনে হবে, তখন যদি আমি প্রপৌত্র জন্মলাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়ার জমিদারী তদন্ত করতে যেতে পারি—তখন মনে ভিন্ন ভাবের উদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ভাগ্যে হয়ত আছে একটা কেরাণীগিরি, ঠাকুর-বাড়ির একটা ছিন্ন টুকরো মৃত উল্কাপিণ্ডের মতো জ্যোতিহীন নির্বাপিত হবে। কিন্তু না, বর্তমানে তাঁর উপস্থিত দুর্দশা এত বেশি যে প্রপৌত্রের জন্য বিলাপ করার আর সময় নেই। চারটের সময় তারপুরে পৌঁছান গেল। ছ'ক্রোশ পথ, সন্ধ্যে আটটার মধ্যে কুঠিতে পৌঁছানো যাবে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যায়। ছ'ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করায় বললে—আর তিন ক্রোশের বেশি পথ নেই। এদিকে পাল্কীর মধ্যে কবির অবস্থা ভয়ানক। পাল্কীতে কবির মত মানুষের আধখানা বই আর ধরে না; কোমর টন্‌টন্ করছে। পা ঝিন্‌ঝিন্ করছে। মাথা ঠক্‌ঠক্ করছে। যদি তিন-চার

ভাঁজ করে তাঁকে মোড়া যেত, তবে সুবিধা হত। রাস্তা অতি ভয়ানক। এক হাঁটু কাদা সর্বত্রই, পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে পা ফেলছে। তবু মাঝে মাঝে পা হড়কাচ্ছে। রাস্তা নেই, ধানক্ষেতের জলের মধ্য দিয়ে ছপ্‌ছপ্‌ করে তারা এগোচ্ছে। মেঘে ঢাকা রাত অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ্‌ করে, মশালটা তেলের অভাবে নিভে যাচ্ছে। আবার অনেক করে ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে। বেহারারা ত তাই নিয়েই বকাবকি সুরু করে দিলে। এমনি করে কিছুদূর এলে বরকন্দাজ জোড়হস্তে নিবেদন করলে—সামনে একটা নদী আছে। পাল্কী নৌকায় করে পার হতে হবে। নৌকা এসে তখনও পৌঁছায় নি। অতএব পাল্কী থামল। কিন্তু পাল্কী ত থেমে থাকল, নৌকা এসে আর পৌঁছায় না। মশাল যথারীতি নিভে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজ-গুলো ভাঙা গলায় উর্ধ্বশ্বাসে নৌকা-ওয়ালাকে ডাকতে লাগল—কিন্তু পরপার থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, আসে না নৌকাওয়ালা। কবি লিখেছেন—

'অমন কাতরস্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাস শিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন—কিন্তু আমাদের কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত-ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই,-----এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্কী এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকা আসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্কী মাথায় করে নদী পার করতে হবে। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোন রকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্কীটা খুব একটা নাড়া পেলে—অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতরটা ভারী ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে লাগল। তারপর থেকে অর্ধ-ঘুম অর্ধ-জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।'


নগদ টাকা বাড়িতে রাখবেন না
আজই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিন

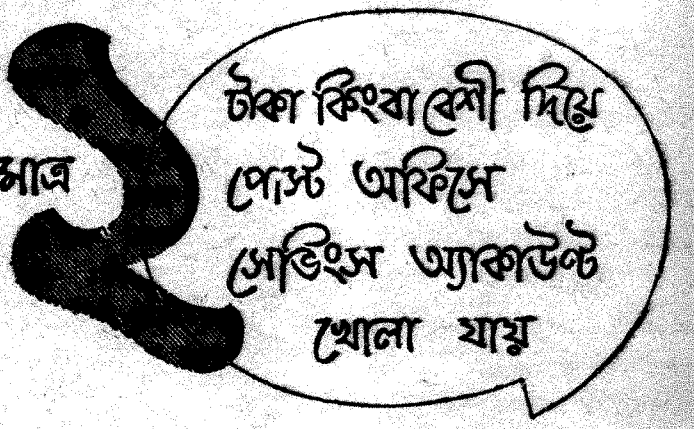


ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সহজে এবং নিরাপদে সঞ্চয় লগ্নী করার সুবিধা আছে। নিজ নামে, কিংবা যুক্ত নামে বা অপ্রাপ্তবয়স্কের নামে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। পাসবই বা চেকে টাকা তোলার সুবিধা আছে।

বার্ষিক সুদের হার ৩%

আপনি আপনার সঞ্চয় অন্যান্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতেও লগ্নী করতে পারেন

- ১২ বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৬½ %
- ১০ বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪½ %
- ১৫ বছর মেয়াদী অ্যানুইটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪·২৫ %
  ( চক্রবৃদ্ধি হারে )
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী ডিপোজিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩ % থেকে ৪·৩ %

এই সব লগ্নীর সুদ আয়কর মুক্ত
নির্দিষ্ট সঞ্চয়ের উপর সম্পত্তিকর লাগে না
সহজে কেনা যায়, সহজে রাখা যায় ও সহজে ভাঙানো যায়

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন।

আপনার প্রিয় সব কিছু রক্ষার জন্য আরও বেশী সঞ্চয় করুন

WB-33

পাণ্ডুয়ার কুঠিতে কবি সপ্তাহ-খানেক ছিলেন। পৌঁছাবার দু'দিন পরে চিঠি লেখেন—

'অনেকদিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সেকথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ যখন কাল---রোদ্দুর ভেঙ্গে পড়ল তখন যেন একটা নূতন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটা বড় চমৎকার হয়েছিল।---খুব একটা নিঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব।'

পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এই নিরালায় বসেই তিনি মহাভারতের অপরূপ কাহিনী 'চিত্রাঙ্গদা' রচনা করেন। মনের মধ্যে যে অব্যক্ত চিন্তাধারা তাঁর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পাণ্ডুয়া বাংলোয় তাই দিয়ে চিত্রাঙ্গদার কাঠামো তৈরি হল। খসড়ার তারিখ ২৮শে ভাদ্র, ১২৯৮। গ্রন্থটি পুরোপুরি রূপ নিল রাজসাহীতে বন্ধু লোকেন পালিতের বাড়িতে।

১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে জমিদারী তদারক করতে উড়িষ্যায় যান এবারও যাত্রা-পথ ঐ খালে খালে। কাঁথি যেতে পথে সাতমাইল নামে যে জায়গাটা পড়ে, সেখান থেকেই খালপথে কটকে যান। কটকে গিয়ে এবার উঠলেন সেখানকার জেলা জজ বিহারীলাল গুপ্তের বাসায়। দ্বিতীয় দলের বাঙালী সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের সহযোগী ছিলেন বিহারীলাল। রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে বিহারীলাল হাওড়ার জজ থাকাকালীন যে মন্তব্যলিপি বঙ্গীয় সরকারকে লেখেন, তারই ফলে ইলবার্ট বিলের জন্ম হয়। বিহারীলালের সংগে ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহু পূর্বেই ছিল, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কটক ভ্রমণের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'ছোটগল্প' নামক সংগৃহীত গল্পগ্রন্থটি ১৮৯৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে উৎসর্গ করেন। কটক থেকে কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে বিহারীলাল সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে পত্র দেন।

'বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মত ধাত আছে দেখলুম। তিনি সকল বিষয়েই ভারি ব্যস্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন।--- তিনি আমার মত খুঁৎ-খুঁৎ খিট্‌মিট করেন না—সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে। সমস্ত খুব চুপচাপ প্রশান্তভাবে সহ্য করতে পারেন। এ রকম স্বামী আমার বোধহয় পৃথিবীতে অতি দুর্লভ।'

কটকে বাসকালে কবির এমন একটি অভিজ্ঞতা লাভ হয় যা তিনি জীবনে ভোলেন নি। কয়েকটি গদ্য রচনায় সে স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন। বিহারীবাবুর বাড়ি এক ভোজসভায় স্থানীয় সরকারী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সেই নিমন্ত্রণ সভায় যে ঘটনাটি ঘটে তা 'ছিন্নপত্রে' উল্লেখ আছে। পত্রটি ইন্দিরা দেবীকে লেখা।

'জানিস বোধহয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের জুরী প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চারিদিকে একটা আপত্তি উঠেচে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে---তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low--- এখানকার life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হওয়ার যোগ্য নয়। আমার যে কি রকম করছিল সে তোকে কি বলব। আমার বুকের রক্ত একেবারে ফুটছিল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না।---- একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙালীর মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কি চক্ষে দেখে!'

এই পত্রখানিতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবদের প্রতি কবির অবজ্ঞা প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। পত্র লেখার সময় অন্তত তাঁর এই মনোভাব ছিল। সপ্তাহখানেক পরে কবি আবার ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন---

'তোকে কি লিখেছিলুম কিছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস

স্বরচিত কাব্যনাট্যে অভিনয়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজস্ব ধারাই সৃষ্টি করেন নি, সেখানেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময়।'

এই ঘটনা এবং পুরীতে এর পরেই আর একটি ঘটনা ঘটে যার যার ফলে দেড় বছর পরে লিখিত হয় 'অপমানের প্রতিকার'।

'পূর্ণ পরিণত জনবৃষ'---ইংরাজ অধ্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব জানিয়ে পত্র লেখার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল পুরী যাত্রা করেন। তখন রেলপথ হয় নি। ফিটনে করে কাঠযুড়ি নদী পর্যন্ত গিয়ে পাল্কীতে চাপলেন। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি ভালো।---

'আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই---সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। সবশুদ্ধ বেশ একটা তীর্থের ভাব আছে।'

বালুহন্তা আর ভার্গবী নদী পেরিয়ে সর্ধাইপুর ডাকবাংলো।---

'এখানকার ডাকবাংলাগুলি বেশ। ছোটোখাট, পরিষ্কার, গাছপালার মধ্যে ঢাকা, নিরালা'---কবির 'ইচ্ছে করে এইসব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই।'

'পুরীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দুই ধারের গাছপালা ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্দির আসছে এবং পান্থ-শালা ও বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে।---পুরী সমুদ্রের ধারে বলে এর কাছাকাছি তেমন বেশি গাছপালা নেই। পথের ডানদিকে একটা খুব দীর্ঘ বিলের মতো আছে, তার ওপারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে ক্রমেই খুব ঘন ঘন মন্দিরের সার এবং পথিকের ভীড়---হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।---পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে যে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না---এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরী করার উদ্যোগ করছে।'

পুরীর সমুদ্র কবির মন হরণ করেছিল---তাই রচিত হল—

'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা
সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে।
নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট
আদি অন্ত স্নেহরাশি। আদিঅন্ত
তাহার কোথা যে
কোথা তার তল। কোথা তার কূল।---
হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মনোভাষা। জান কি
তোমার ধরাতুমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে
এপাশ-ওপাশ;
------স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে
বারম্বার হানি
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময়
চুমা,
বলো তারে 'শান্তি, শান্তি', বক্ষে
তারে 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা'।'
(সমুদ্রের প্রতি)।


# কেন গ্রহকোপে কষ্ট পাচ্ছেন ?

অযথা হয়রানি না হয়ে

## * সৌভাগ্য অঙ্গুরী *

**ধারণ করুন। • বহু পরীক্ষিত। • গ্যারাণ্টিযুক্ত।**

স্বকীয় বাসনাপূর্ণ এবং মানসিক চাঞ্চল্য দূর করতে, চাকুরী, ব্যবসায়, ভাগ্যোন্নতিতে, মামলায় জয়ী হতে, শত্রুকে মিত্র করতে স্ববশে স্বমতে আনতে, স্বাস্থ্যের উন্নতিতে **সপ্তরত্ন** সমন্বিত, শোধনপুরশ্চরণসিদ্ধ অমিতগুণসম্পন্ন এই **সৌভাগ্য অঙ্গুরী** অবশ্যই ধারণ করুন। মূল্য—১নং ২১০৲ টাকা ৩০ দিনে; ২নং ১৪০৲ টাকা ৬০ দিনে; ৩নং ৬৫৲ টাকা ৯০ দিনে; সাধারণ টাঃ ৩২'৬৯ নঃ পঃ ১৮০ দিনে উপকার হয়। নচেৎ মূল্য ফেরৎ! ষ্ট্যাম্প গ্যারাণ্টি। কোন নিয়ম পালন করতে হয় না। ডাক ব্যয় টাঃ ২'৫০ নঃ পঃ (অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম সহ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলীর মাপ পাঠাবেন)।

জটিল জ্যোতিষ সংক্রান্ত কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়। **হাত দেখা বা কোষ্ঠি বিচার** সডাক ৬৲ (অগ্রিম)। স্বীয় সমস্যাবলী সমাধানে সাক্ষাতে অথবা ডাকে জানুন।

# লীলা জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির

**(গভঃ রেজিঃ নং ৩০৬৭) পোঃ কামারহাটী (২৪-পরগণা) পশ্চিমবঙ্গ**

**সাক্ষাতের সময়:**
বৃহস্পতিবার বাদে
সকাল ৮—১০টা, বৈকাল ৪—৮টা।

**পথ নির্দেশ:**
শ্যামবাজার হতে বাস ৭৮, ৭৮এ, ৭৮বি ষ্টপেজ—তেঁতুলতলা (আগড়পাড়া) ইলিয়াস রোড, সাহেববাগানের উত্তরে, নলকূপ সংলগ্ন

পুরীর পথও তাঁর মনে রেখাপাত করেছে। এই পথ দেখে কবির কালিদাসের মেঘদূতের কথা ক্রমাগত মনে পড়েছে।

'কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রামে কেয়ার বেড়া আছে। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী ব'লে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক।'

তারপর কবির সমস্ত যাত্রাপথই ত সেদিন মেঘাবৃত ছিল।

পুরীতে থাকাকালীন সময়ই রবীন্দ্রনাথ ও সস্ত্রীক বিহারীলাল সামাজিক শিষ্টতা রক্ষার জন্য স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়ালসের সঙ্গে দেখা করতে যান। দেখা কিন্তু মিঃ ওয়ালস করেন নি। কার্ড পাঠানোর মিনিট পাঁচেক বাদে বেয়ারা মারফত সংবাদ এল পরদিন সকালে সাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে। কবির নিজের ভাষায়—'আমরা সুড় সুড় করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে এলাম।' পরে জজ সাহেব এসেছিলেন জানতে পেরে সাহেবও দুঃখিত হয়ে পত্র দেন। কবি কিন্তু এই থেকে বিদেশী শাসকদের জাতের কাছে কিছুটা শিক্ষালাভ করেন। 'আমাদেরই দেশের লোকের দোষ তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারী করতে সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে। সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নীর উপর সামাজিক কর্তব্য রক্ষা স্বরূপ 'কল্' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি।---পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে পরদিন সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করবে আমি কি তাতে ভারি খুশি হয়েছিলুম? নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড় বেশি স্পষ্ট অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়—তাছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়।'

আগেই উল্লিখিত হয়েছে কটকের ঘটনা এবং পুরীর এই ঘটনার ফলই হচ্ছে 'অপমানের প্রতিকার' নামক প্রবন্ধ।

কবি পুরী থেকে কটক ফিরেছেন। সাধনা পত্রিকার লেখা ছহু করে এগিয়ে চলেছে। একখানি পত্রে সেই সময় তিনি সাময়িক ও ভাবী জীবনের আভাস দিলেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছিল—এমনি আত্মবিশ্বাসে লেখা সে পত্র। সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য কটকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। ২৬শে ফাল্গুন আচার্যের সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কটক থেকে লেখা একটি পত্রে তার উল্লেখ আছে—

'লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে।---এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা বিচার হয় না। আমার ত মনে হয় এ নিতান্ত অন্যায়। যাদের ধর্মবোধ ও সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরানো বাজে কথা কি রকম করে সহ্য করে আমি ত ভেবে পাই নে। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ।'

কটক থেকে বালিয়া যান ফেব্রুয়ারীর শেষে। পাণ্ডুয়ার কুঠিতে তিন-চার দিনের বেশি ছিলেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন এক মাসের বেশি—ঘুরেছেনও বিস্তর। এখন কোণের মধ্যে নিরিবিলি বসতে ইচ্ছে করে।

'ঘরের কোণও আমাকে টানে ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।---থাকবার জন্যে যেমন ছোট নীড়টি, ওড়বার জন্য তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালবাসি সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে।'

ফাল্গুন মাসে বর্ষা দেখা দিলে কবি কটক থেকে মেঘদূত সংগ্রহ করে নিয়ে যান। প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে বহু বই থাকত—নেপালীজ্ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচার থেকে আরম্ভ করে শেক্সপীয়র বৈষ্ণব কবিদের লেখা পদাবলী, সংস্কৃত বই, এমন কি Caird's Philosophical Essays পর্যন্ত। তাঁর বিচিত্র মনীষা ও অপূর্ব সৃষ্টির পিছনে এই গভীর অধ্যয়ন-তৃষ্ণা রয়েছে। পুরী, ভুবনেশ্বর ভ্রমণের সময় মেঘদূত হাতে না থাকায় কবির গভীর আফশোষ হচ্ছিল, কিন্তু মজা এমনই যে তখন তাঁর হাতে Philosophical Essays ছিল। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কবি পাণ্ডুয়া থেকে কটক ফেরেন। পাণ্ডুয়া থেকে কটক ফেরবার পথে বহুকাল পরে কবি তিনটি কবিতা লিখলেন। তালদণ্ডা খালে নৌকায় বসে ২২শে ফাল্গুন 'অনাদৃত' লেখেন। বোধহয় কোন জেলের জাল ফেলা দেখে প্রথমে কবিতাটির নাম 'জাল ফেলা' দেন। তিনি নিজেই কবিতাটি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—

'বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করবেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাব-গ্রহণ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়। অতএব এখনকার মতো এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা কর আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে?' ( ছিন্নপত্র )।

তলদেশ খালপথে ঝড়-বৃষ্টির ঝাপট খুব ভালভাবেই সহ্য করতে হয়েছে। পত্রধারায় উল্লিখিত আছে—

'এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো কিন্তু ছোট বোটটির মধ্যে দুইটি রুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠেকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তাহলে বেদনার উপশম হতেও পারে কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে।'

পত্রখানি তীরন থেকে লেখা। এই অবস্থাতেই নদীপথে রচিত হয়। (২৩শে ফাল্গুন, ১২৯৯)। এই ২৩শে ফাল্গুনই রচিত হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কবিতা 'দেউল'। কয়েকদিন আগে পুরী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরির মন্দির দেখে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়, তারই ফল 'দেউল'। কবি এই যাত্রায় পুরী থেকে কোণারকের ভগ্নাবশেষও দেখেছেন। উড়িষ্যার মন্দির দেখে কবির মনে হল—

একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথর-গুলির মধ্যে কথা আছে। সেকথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে। ঋক্-রচয়িতা ঋষিছন্দে মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র।---- দেখিলাম মন্দির ভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নেই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে। ছবি-গুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়। মানুষের ছোটবড়ো ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ---চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং ২২৭ গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।'

(মন্দির, ভারতবর্ষ)।

দেউল সেই ভাবধারারই কাব্যকৃতি। যখন 'দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি', ভিতর আর বাহিরে কোলাকুলি।' তখন বিশ্বজনের কল্লোলগান কবির কাব্যছন্দে ধরা পড়ল। 'বিশ্বনৃত্য' (২৬শে ফাল্গুন) কটক থেকে কল-কাতার পথে উড়িষ্যা স্টিমারে রচিত। কলকাতায় ফিরেই রাজসাহী যান—সেখানেই 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়।

এরপর একবার উল্লেখ আছে কবির জমিদারী সংক্রান্ত কাজে উড়িষ্যা যাওয়ার---সেটা বাংলা ১৩০৩ সাল। অন্যান্য বহুবিধ বইয়ের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature in Nepal বইটি থাকত। এবার এই বইখানি থেকে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপন্যাস অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করেন। তবে মূল উপাখ্যানের সঙ্গে কবির সৃজিত কাব্যের তফাৎ অনেক। অল্পকাল পরে কবি এই রচনার ইতিহাস দিয়েছেন—

'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।'

কবি তখন লণ্ডনে ছিলেন। উড়িষ্যা থেকে ফিরে এবার কবিকে মাসখানেক কলকাতায় কাটাতে হল। জমিদারী পার্টিশান সংক্রান্ত নানা অশান্তিই এর কারণ। এতদিন এজমালী সম্পত্তির তদারকী রবীন্দ্রনাথই করতেন। দেবেন্দ্রনাথ এবার গগনেন্দ্রনাথদের জমিদারী ভাগ করে দিলেন। সাজাদপুর ও উড়িষ্যার জমিদারী অবনীন্দ্রনাথদের অংশে পড়ল। উড়িষ্যার সঙ্গে জমিদারী সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক শেষ হল। সেটা ১৩০৩ সাল।

জমিদারীর কাজ শেষ হলেও অন্তরের যোগ হারিয়ে যায় নি কবির। ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে যোগ স্থাপিত হয়, তার ভিত্তি দৃঢ়—সে যোগ সংস্কৃতিমূলক। উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার যোগ দৃঢ় দেখে ইংরাজ সরকার এই ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হলেন। এক সময়ে উড়িষ্যা ও আসামে বাংলা ভাষাই শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল। বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা থেকে নির্বাসিত করার সরকারী প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যায় নি। একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু উদাহরণ দ্বারা দেখালেন উড়িষ্যা ভাষার সংগে বাংলা ভাষার পার্থক্য অতি সামান্যই। আর সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই ভাষার বিচ্ছেদকে স্থায়ী করা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'উড়িষ্যা ও আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙ্গিয়া একদিন গৃহবতী হইতে পারিত।---যে ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে


বিশ্বরূপা

অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ

( ৫৫-৩২৬২ )

শুভ উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার ৭ই মে সন্ধ্যা ৬॥ টায়
শনিবার ৯ই মে সন্ধ্যা ৬॥ টায়
রবিবার ১০ই মে ৩টা ও ৬॥ টায়
মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের

ডিরেক্টার্স কে ন ও বহুস্তর
প্রথাদ্বয়ের প্রবর্ত্তনায় ও
নাট্য নির্দ্দেশনায়
শ্রীরাসবিহারী সরকার

ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায়, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর স্বরূপ দৃঢ় উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা—তাহাকে স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং সর্বতোভাবে অশুভকর।'

(ভারতী, ১৩০৫)।

রবীন্দ্রনাথ সরকারের এই সব প্রয়াসের মধ্যে যে ভেদনীতি দেখেছিলেন তা প্রকাশ করতে কোন সংকোচ করেন নি।

কবি শেষবার উড়িষ্যায় যান ১৯৩৯ সালের ১৯শে এপ্রিল—উড়িষ্যার অতিথি হয়ে। ওখানকার নবগঠিত প্রদেশে তখন নতুন শাসন ব্যবস্থা, জাতীয় কংগ্রেস তখন রাজ্য শাসনের ভার হাতে নিয়েছে। নয়া শাসনতন্ত্রের মুখ্য নায়ক তখন বিশুনাথ দাস, বর্তমানে যিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল। পুরীতে এবার যখন এলেন, উড়িষ্যার জমিদারী ত নেই-ই, তিনি নিজে 'পোড়াবাড়ি' নামে পরিচিত যে বাড়ি কিনেছিলেন, সেটিও বিক্রি হয়ে গেছে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য। পুরীতে কবি সার্কিট হাউসে উঠেছেন। এই পুরীতে পঞ্চাশ বছর আগে বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে আসেন। আর এখন আশী বছরের কাছাকাছি কবির বয়স—পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে একে একে। তাই অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন—

'মনে পড়ছে এইখানে এই বাড়িতেই লিখেছিলুম 'হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।' সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল। তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেওয়ার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা।'

এই বয়সে তিনি তাই অনুভব করছেন—

এখনকার লেখায় সেদিনকার ঊর্ধ্বেন প্রাণের গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ।'

এবার কবি তিন সপ্তাহ পুরীতে ছিলেন। এর মধ্যে কবির জন্মদিন পড়ে (৮ই মে, ১৯৩৯)। সার্কিট হাউসে উড়িষ্যার কয়েকটি মহিলা সমিতি সম্মিলিতভাবে কবিকে জন্মদিনে অভিনন্দিত করেন। পরদিন গবর্নমেণ্ট পার্কে মুখ্যমন্ত্রী বিশুনাথ দাসের উদ্যোগেও কবির জন্মোৎসব মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল।

উড়িষ্যার জনগণ হাজারে হাজারে এসে সেদিন কবি-সম্বর্ধনায় যোগ দিয়ে নিজেদের ধন্য করলেন। পুরীর পুরুষোত্তমের প্রধান পূজারিগণ কবির আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ও প্রশস্তি উচ্চারণ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মানপত্রও প্রদত্ত হয়। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সেদিন পুরীতে। তিনিও কবির জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠ করেন। নবজাতক-এর 'জন্মদিন' নামে কবিতাটি তিনি ঐ দিনই লেখেন।

'তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনিনে আমি
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই
মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।'

পুরীতে থাকাকালীন এই সময়ে 'এপারে ওপারে', 'অত্যুক্তি' প্রভৃতি লেখেন। কবির দিনগুলি ভালই কাটছে। উড়িষ্যার যাঁরা নতুন রাষ্ট্র-নায়ক, কবি তাঁদেরই অতিথি। 'পুরাকালে রাজন্যবর্গ গুণীর সমাদর করতেন। তাঁরা স্বীকার করতেন মানব চিত্তোৎকর্ষের সর্বজনীন উত্তরাধিকার। ইংরাজ-রাষ্ট্র-ব্যবহারে গুণীদের কোন স্থান ছিল না। প্রাচ্য-রাষ্ট্র-ব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নাই' বলে কবি সন্তুষ্ট। কবি লিখছেন—

'আমার কোন কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোন ব্যবসায়িক পরামর্শ দাবী করেন নি। আমার শরীর মনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষাশীতল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যা প্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক।'

বস্তুত উড়িষ্যার নতুন রাষ্ট্র-শাসনভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রজাবাৎসল্য ও বিচক্ষণতা কবিকে মুগ্ধ করেছে। দেশের রাষ্ট্রনীতির যা গৌরবের, তা যেমনি তাঁকে তৃপ্ত করেছে, তেমনি যা অকল্যাণকর তার জন্যও তিনি তেমনি উদ্বিগ্ন। কবি বুঝতে পেরেছেন উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে মিলিত করতে পারে নি। দলগত মত-ভেদ রাজনীতিতে চিরদিনই আছে এবং থাকবেও। সকল শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রিক ব্যাপারে একই মত পোষণ করবে। কবি এই মতবাদ পোষণ করতেন না। 'রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত করে। বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজ-নীতিতে 'পোলিটিসিয়ানে'রা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে—ছাত্রদের বুদ্ধি স্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন। এমন কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।' কবি এই বৃদ্ধ বয়সেও পুরীতে এসে সেখানকার ছাত্রসমাজের এই মনোভাব দেখে দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন—

'এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট করে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না।'

কবি এই ঘটনাকে 'কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ড' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'আজ আমরা স্বরাজ্যর আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত করে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্য আবশ্যক সৃষ্টি করবার জন্য শক্তিচালনা, যে শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ।

তিনি এমন একদল লোককে দেখলেন যারা সকল বিষয়ে আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সংগে তারা আপোষ করতে নারাজ। কবির ধারণা, স্বভাবত অকর্মণ্যরাই অসহিষ্ণু। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ভয় এই অসহিষ্ণুতাকে 'যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্য ফল পেতে চায় তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড়ডা করে করে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ণ ধীরবুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত। ---যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি নে।' কবি ১৯৩৯ সালে একথা লিখেছিলেন, আজ স্বাধীনতা লাভের পরও সর্বশ্রেণীর মানুষ সে কথা স্পষ্টভাবে বুঝেছে বলে মনে হয় না।

দেশের বাইরে তখন প্রলয়-রাগিণী বেজে উঠেছে, য়ুরোপীয় মহাসমরের আয়োজন সর্বত্র। কোথায় কখন কি ভাবে প্রথম অস্ত্রাঘাত পড়বে---চলেছে তারই প্রতীক্ষা। কবি লিখছেন—

'ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগৎ জুড়ে, লুটোপুটি করছে ওষধি বনস্পতি। দোহাই পাড়ছে শাখা-প্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবে যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক পড়ে যাবে পাক ধরবার পূর্বেই, একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যাঁরা টিকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে—যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে কাজ করবে ভিতরের থেকে।'

(উড়িষ্যার অতিথি)।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহ তিনেক বাদে উড়িষ্যা ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফিরলেন। এরই দু'বছর বাদে কবি মহাপ্রয়াণ করেন, উড়িষ্যায় ঐটিই তাই তাঁর শেষ ভ্রমণ; কিন্তু চিরপথিক কবি প্রদেশে প্রদেশে যে মিলনের সেতুবন্ধন করে দিয়েছিলেন, সেই সেতু অটুট থাকলে সার্থক হবে কবির এই পরিক্রমা।


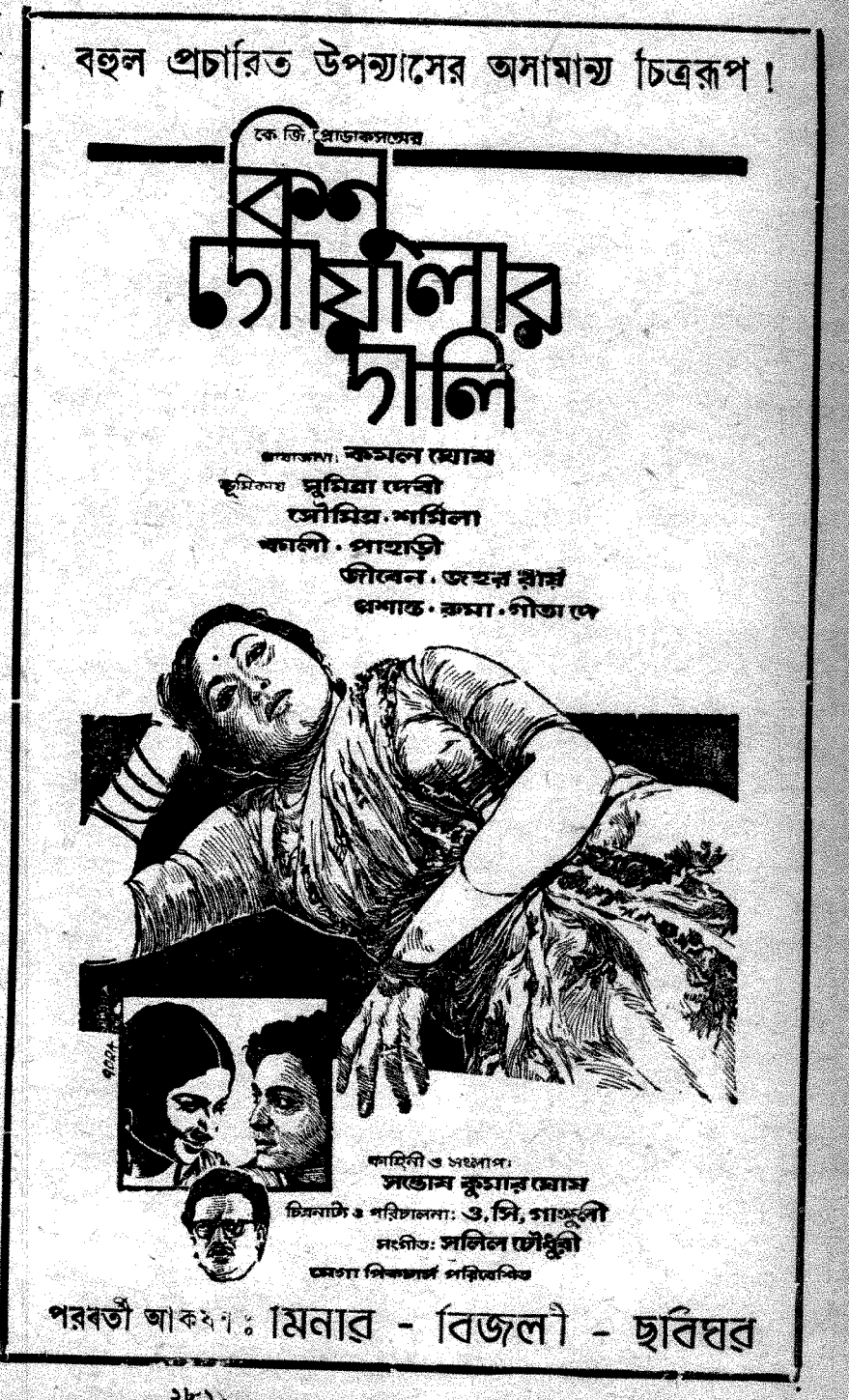

# রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়

অশোক সেন

নাটকের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, অন্যান্য সাহিত্যের মত এ ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কয়েকটি উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়েই নাটক পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। যেমন—

(১) নাটকের সাহিত্যিক রূপ
(২) মঞ্চ, দৃশ্যপট ইত্যাদি
(৩) অভিনেতা এবং অভিনয়
(৪) দর্শক

ঘরে বসে নাটকটি নিয়ে পড়লাম—এর দ্বারা নাটকের রসও উপলব্ধি করা যায় না বা নাটকের ভালমন্দও বিচার করা সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে শ্রদ্ধা করি, বছর বছর মহা সমারোহের সঙ্গে তাঁর জন্মোৎসব পালন করি, তাঁর সম্বন্ধে বিরাট বিরাট বক্তৃতা দিই, তাঁর নাটক সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখি, অথচ কবিগুরুর নাটক আমাদের দেশে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হয় না। যদি বা কুচিৎ কদাচিৎ হয় তবে ঠিকমত দর্শক হয় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে কিছু কিছু ছবি হয়তো তোলা হয়, তবে বেশির ভাগ সময়েই সে সব ছবি গড়ে ওঠে তাঁর ছোটগল্পের উপর ভিত্তি করে। তাঁর নিজের লেখা নাটকগুলির কটিরই বা ছবি তোলা হয়েছে। অথচ মঞ্চস্থ এবং চিত্রে রূপান্তরিত করবার মত কম নাটক তো তিনি লেখেন নি। কিন্তু আসলে এ সব নাটক যেন closet-play হিসাবেই আদৃত হয়ে আসছে আমাদের মাঝে।

সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি। আর ইংরাজরা তো জানে যারা পৃথিবীই সেক্সপীয়ারকে মহাকবি এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান দিয়ে আসছে চিরকাল ধরে। ইউরোপ কিন্তু সেক্সপীয়ারের নাটককে মৌখিক এবং লিখিত সম্মান দেখিয়ে মহাকবির নাটকগুলিকে closet-drama-র স্তরে নামিয়ে আনে নি। ওদেশে নিত্যনিয়মিতভাবে সেক্সপীয়ারের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়—দর্শকরা নাটক দেখতে আসে—নাটকের ভালমন্দ বুঝতে চেষ্টা করে। অভিনয়ের বিচার করে—আর এইভাবেই ওদেশের নাট্যামোদীদের কাছে সেক্সপীয়ার আদৃত হয়ে থাকেন।

ওদেশের অভিনেতারাও জানেন যতদিন না সেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করতে নামছেন, ততদিন অভিনেতা হিসাবে ঠিক কৌলিন্যের স্তরে উঠতে পারছেন না।

সেক্সপীয়ারের বহু নাটক নিয়ে ছবিও হয়েছে ইংরাজীতে। যাঁদের ওদেশের স্টেজে সেক্সপীয়ারের নাটকের মঞ্চরূপ দেখবার সুযোগ হয় নি, তাঁরা অন্তত ছবি দেখে খানিকটা আঁচ করতে পেরেছেন—অভিনয়ে এ সব নাটক কি রকম দাঁড়ায়।

শিশিরযুগের আগে পেশাদারী মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় হয়েছে—তবে সে অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছে বলে শুনি নি। শিশিরযুগে নাট্যমন্দিরে শেষরক্ষা এবং আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টারে চিরকুমার সভা খুব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায় শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী মশায়ের অভিনয় Great Acting-এর পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া এ নাটকে শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনবদ্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এক ধরণের অভিনয়ে চন্দ্রবাবু চরিত্রের রূপায়ণ করে এক শ্রেণীর দর্শকের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রবাবুকে ঠিকমত সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাছাড়া এ ভদ্রলোকের অভিনয়ে চিরকালই আমি একটা polish-এর অভাব দেখেছি। শিশিরকুমার যখন মাঝে মাঝে চিরকুমার সভায় চন্দ্রবাবুর রোলে নামতেন তখন ভূমিকাটির ভেতর একটা অন্য ধরণের dignity এসে যেত।

নাট্যমন্দির এবং নবনাট্য মন্দিরে বহুবার শেষরক্ষা নাটকের অভিনয় দেখেছি। গর্ডন ক্রেগ এক জায়গায় বলেছেন যে, প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মধ্যে Geniality and Bubbling Personality থাকা দরকার। শিশিরকুমার যখন চন্দ্রদার ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন দর্শকরা বার বার অনুভব করতো এই Geniality and Bubbling Personality ব্যাপারটা কি। এছাড়াও শিশিরকুমার বিসর্জন, তপতী, বৈকুণ্ঠের খাতা, যোগাযোগ উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রভৃতি মঞ্চস্থ করেছেন। প্রত্যেকটি নাটকেরই অভিনয় বেশ ভালই হয়েছে—তবে সে যুগের দর্শক ছিল অন্য ধরণের—রবীন্দ্রনাথের নাটক উপভোগ করবার মত মানসিক প্রস্তুতি তখনও তাঁদের হয় নি। ষ্টারেও শেষের রাত্রি এবং রাজা ও রানীর অভিনয় হয়েছে। নবনাট্য-মন্দিরের যুগে শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনায় এবং তাঁরই কৃত নাট্যরূপায়ণে নাট্যনিকেতনে গোরা উপন্যাসের অভিনয় হয়। নরেশচন্দ্রের পানুবাবুর কথা আজও নাট্যামোদী দর্শক ভুলে যায় নি।

আজকাল দু'একটি আধা সৌখিন এবং আধা পেশাদারী দল রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করে এক ধরণের নাম কিনেছেন। তবে এ নাম বেশিদিন

স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাধারণ বা সাঙ্কেতিক নাট্যের মঞ্চরূপ দিতে গেলে পরিচালকের যে কল্পনাশক্তি এবং মানসিক গভীরত্ব থাকা দরকার, তা এসব দলের দলপতিদের মধ্যে দেখি নি। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের মঞ্চরূপ দিতে গিয়ে এমনই একটি দল যে ভাবে morfid lighting এবং hysteric acting-এর নমুনা দেখিয়েছিলেন তাতে এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে, এই জাতীয় পরিচালকদের দ্বারা কিছুতেই কবিগুরুর নাটকের সুষ্ঠু পরিচালনা হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আমার 'রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা' বইতে যা লিখেছিলাম তার কিছুটা এখানে তুলে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্কের প্রতীক-নাট্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মেটারলিঙ্ক নাটকের বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার নাট্যে প্রাসাদ, টাওয়ার, নদী, বনানী ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায় এবং এগুলি সকলই সাঙ্কেতিকতার যাদুতে ভরা। রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ভাবের বিকাশের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে—অস্বাভাবিকতা বা ভয় সঞ্চার করিতে পারে এমন কিছুই তিনি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার রচনায় যাদুর খেলা নাই বলিলেই চলে। মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতির লেখায় অবচেতন মনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এজন্য তাঁহাদের সকল রচনাই যেন স্বপ্নালু, মায়াময়, অস্বাভাবিক এবং সময় সময় একটু morfid-ও লাগে। পড়িতে পড়িতে শরীর মন যেন আলস্যে ভরিয়া আসে। চারিদিকে একটা তন্দ্রালু ভাব বিরাজ করিতে থাকে—মনের মধ্যে একটা হতাশ ভাবের উদ্রেক হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় অধিচেতন মনেরই সমধিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন শিশির-ভেজা ঘাসের মত সতেজ, সুস্থ ও রসময় হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাট্যের মঞ্চরূপে যদি vitality না থাকে তবে spirit of the play-টাই নষ্ট হয়ে যায়। 'রক্তকরবী' বা 'রাজা'র অভিনয়ে নটনটীকে with passion প্লে করতে হবে—তবেই নাটকের সার্থক মঞ্চরূপায়ণ হবে।

আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। কলকাতার যে কোন রঙ্গালয়ে—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও একটি মঞ্চ আছে বলে জানি—যদি নিত্যনিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই সত্যিকার এবং সার্থকভাবে রবীন্দ্রস্মৃতি উৎসব পালন করা হবে—নচেৎ নয়।

● বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

# রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র চিন্তা

কল্পতরু সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ কি চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন? এ বিষয়ে আমাদের দেশে খুব বেশি আলোকপাত করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-কর্মীদের কাছ থেকে এমন একটা খবর পাওয়া গেছে। খবরটার সূত্র বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের স্ত্রী। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারের পক্ষ থেকে জোর চেষ্টা চলেছিল রাশিয়ায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে স্মৃতিকথা উদ্ধার করার জন্য। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন তাঁদের খুঁজে বার করা হয়। এ সময় একজন প্রবীণ চলচ্চিত্রকর্মী নিজের এ্যালবামের মধ্যে একটা ফটো খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরা এই ছবিটি তুলেছিলেন। ছবিতে উপস্থিতদের মধ্যে শ্রীমতী আইজেনস্টাইন তাঁর খুব চেনা। সুতরাং ছবিটি নিয়ে তিনি শ্রীমতী আইজেনস্টাইনের কাছে গেলেন। দুজনের আলোচনায় সেদিনের সাক্ষাৎকারের স্মৃতি উদ্ধারের জন্য।

শ্রীমতী আইজেনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনায় দু-জনার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার স্মৃতি।—

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। স্থান—মস্কো। সোভিয়েট চলচ্চিত্রকর্মীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' এবং 'ওল্ড এণ্ড নিউ' এ দুটি বিশ্ববিখ্যাত ছবির অংশ বিশেষ দেখানো হলো। রবীন্দ্রনাথ ছবি দুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। 'ব্যাটলশিপ পটেমকিনের' কথা তিনি বার বার উল্লেখ করলেন।

শ্রীমতী আইজেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি চিত্রনাট্যরচনা করার কথা চিন্তা করেন? উপস্থিত সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল চলচ্চিত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথ যেন কিছু রচনা করেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর

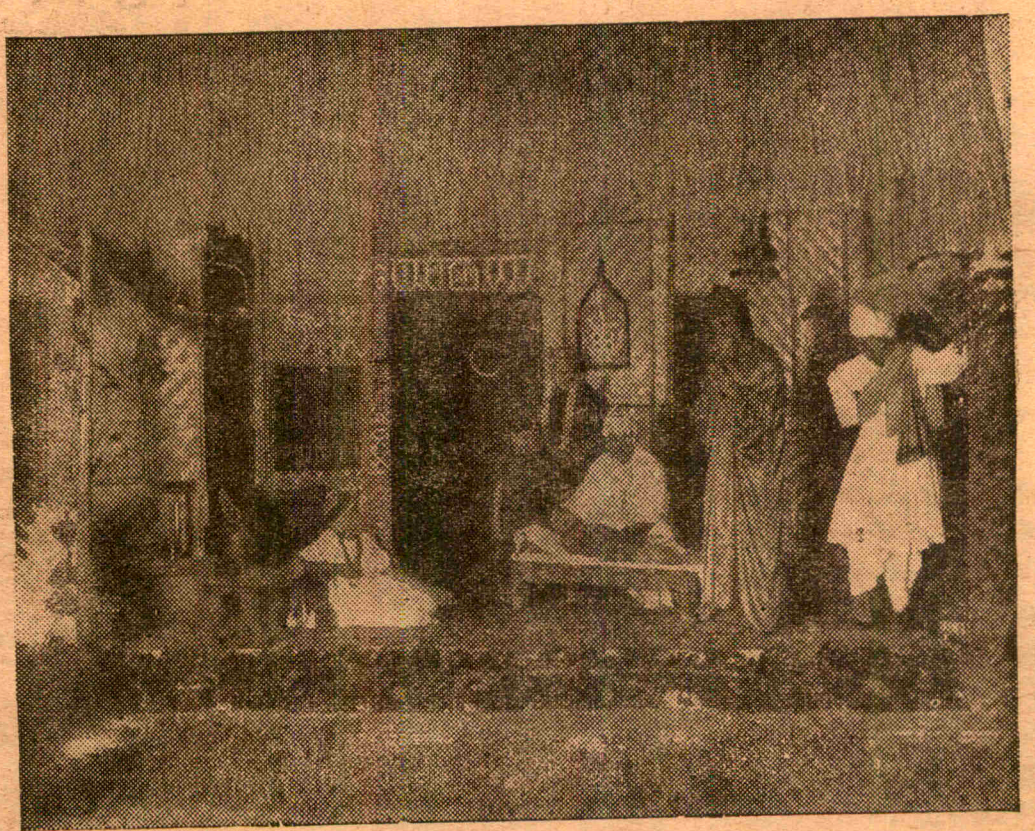

● 'ডাকঘর' অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ

আশামুকুল

আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা সিনারিও তিনি বলে যান। সেই সিনারিওর কথা এঁদের অস্পষ্ট মনে আছে: 'গিরি-চূড়ায় বসে আছেন এক ঋষি; চার-দিকে নীরবতা। অন্ধকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দিগন্তে দেখা দিল আলো-রশ্মি। মেঘ সরে গেল। পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।'—ইত্যাদি। কিছু-ক্ষণ বলার পর রবীন্দ্রনাথ থামলেন। চলচ্চিত্রকর্মীদের মধ্যে প্রশংসার গুঞ্জন উঠলো। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তারপরে আবার ২৫শে সেপ্টেম্বর 'সয়ুজকিনো'র চলচ্চিত্রকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি সে দিনের সিনারিও নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীমতী আইজেনস্টাইনের সঙ্গে প্রবীণ চলচ্চিত্রকর্মীর এই স্মৃতি-চারণের কথা ১৯৬০ সালে অথবা ১৯৬১-র প্রথম দিকে 'সোভিয়েট-ল্যাণ্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার সঙ্গে চলচ্চিত্রকর্মী পরি-বেষ্টিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনার একটা ছবিও ছাপা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে 'সোভিয়েটল্যাণ্ড'-এর সেই সংখ্যাটি আজ আমার কাছে নেই।

সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে রবীন্দ্র-নাথ বার্লিনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আগ্রহ সহকারে জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত উফা স্টুডিও পরিদর্শন করেন; এবং 'প্যাসন প্লে' নামের ছবিটি তাঁকে দেখান হয়। উফা স্টুডিওতে তাঁর গান ও আবৃত্তির সবাক চিত্র গ্রহণ করা হয়। সম্ভবত ১৯৩১ সালের দিকে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্রটি কলকাতায় দেখানো হয়েছে।

উফা কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিত্রনাট্য রচনার জন্য অনুরোধ করলে তিনি ইংরেজীতে 'দি চাইল্ড' রচনা করেন। 'দি চাইল্ড'-এর বাংলা 'শিশু-তীর্থ' কবিতাটি বলে মনে হয়। কারণ রাশিয়ার চলচ্চিত্রকর্মীদের সভায় যে সিনারিও তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন তার সঙ্গে মিল এই কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন :

'ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত,
তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে
আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি
চীৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে
মহান বলে জেনো।'
'মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর কক্ষ থেকে উঠলো আরামের
দীর্ঘনিঃশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়?
যাত্রার।'

'শিশুতীর্থ' রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র-চিন্তার একটি সৃষ্টি। জার্মানীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য; ফ্যাসিজমের উন্মত্ততায় মানবতা ও সৌন্দর্যের বাণী প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ায় হয়তো উফার পক্ষে 'দি চাইল্ড'-এর চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

রাশিয়া বা জার্মান যাবার বহু পূর্বে তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। ম্যাডান কোম্পানীর পক্ষে ঠাকুর পরিবারের আত্মীয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি 'বিসর্জন' চিত্ররূপ দেবার অনুমতিপত্র দেন। এই ঘটনাকাল ১৯১৯-২০ সাল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথকে (ডি-জি) তিনি চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ যাত্রার উৎসাহ এবং পরিচয়পত্রও দিয়েছিলেন (বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস—৩১৯ পৃঃ)। কথিত আছে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত 'নটীর পূজা'র চিত্রগ্রহণ দেখবার জন্য তিনি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে একদিন

আসমুদ্রহিমাচল যাঁর ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল, তাঁরই কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় চিত্রার্ঘ.....

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

জেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- মধু বসু
সঙ্গীত • অনিল বাগচী

রাধা - পূর্ণ - আলোছায়া - পদ্মশ্রী
পারিজাত - যোগমায়া - মায়াপুরী
নিউ তরুণ - শ্রীকৃষ্ণ - মীনা - লীলা
ইন্দ্রধনু ও অন্যত্র
পরিবেশনা: ভবতারিণী পিকচার্স

উপস্থিত হয়েছিলেন ( ছবিটি ১৯৩২ সালে মুক্তিলাভ করেছে )।

চলচ্চিত্র এ যুগের একটি অসাধারণ শক্তিশালী শিল্প। এবং অন্য সকল শিল্পের অপেক্ষা চলচ্চিত্র অধিক আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিকতার অর্থ এখানে এই নয় যে, সব দেশে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং এক দেশের ছবি সকল দেশে দেখাবার সুবিধা আছে। চলচ্চিত্র সর্বাধিক আন্তর্জাতিক এই কারণে যে সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে, বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে। এবং মানুষের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে এর তুলনা নেই। চারুকলা ও বিজ্ঞান এই শিল্পে হাত ধরাধরি করে চলেছে। সুতরাং এত শক্তিশালী শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত দার্শনিক, কবি, শিল্পী, সুরস্রষ্টা ও চিন্তাশীলের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক ও মানবতাবাদীর চিন্তাধারা প্রকাশের পথে চলচ্চিত্র একটি উপযুক্ত মাধ্যম।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর রচিত গল্প বা কাহিনীকে সুচারুরূপে চিত্ররূপ দিতে হয়তো কেউ সক্ষম হন নি। তখন চলচ্চিত্রের কলাকৌশলগত দুর্বলতা যেমন ছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও বক্তব্যকে গ্রহণ করতে পারার মত ক্ষমতার প্রশ্নও ছিল। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনাকাল থেকে যাঁরাই কিছুটা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং সেই সঙ্গে শিল্পবুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী তাঁরাই রবীন্দ্র-গল্পকে চিত্ররূপ দেবার কথা ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'র প্রথম চিত্ররূপ দিয়েছেন চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে—বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একজন যোগ্য প্রতিনিধি মধু বসু (১৯৩০)। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি 'শেষের কবিতা'র (১৯৫৩) চিত্ররূপও দিয়েছেন।

তারপরে নাট্যজগতের অন্যতম মহারথী নরেশ মিত্র উপস্থিত করলেন 'নৌকাডুবি' (১৯৩২), 'গোরা' (১৯৩৮), 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৯৫২)। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্ররূপ দিয়েছেন 'নষ্টীর পূজা' (১৯৩২); লেখক ও পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী 'চিরকুমার সভা' (১৯৩২); খ্যাতনামা মঞ্চশিল্পী সতু সেন দিয়েছেন 'চোখের বালি' (১৯৩৮); বিখ্যাত আলোকশিল্পী নীতিন বসু 'নৌকাডুবি'র (১৯৪৭) পুনর্বার চিত্ররূপ দেন। পঞ্চাশ দশকে হেমচন্দ্র ও সৌরেন সেন 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৫৫), দেবকী বসু 'চিরকুমার সভা'র (১৯৫৬) চিত্ররূপ দেন। তৎকালীন চলচ্চিত্রশিল্পে এঁরা দক্ষ পরিচালকরূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-গল্পকে চিত্ররূপ দেবার আগ্রহ থাকলেও ছবিগুলি দর্শকদের বিচারে এবং শিল্পগত ভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। অবশ্য চলচ্চিত্র-দর্শক তৈরির প্রশ্নটাও এর সঙ্গে কম জড়িত নয়। এই দশকে এক তরুণ পরিচালক তপন সিংহ নির্মিত 'কাবুলিওয়ালা'র (১৯৫৭) সাফল্যে রবীন্দ্র-গল্পের চিত্ররূপ সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়। দেশে-বিদেশে 'কাবুলিওয়ালা' সম্মান অর্জন করে। তারপরে তপন সিংহ চিত্ররূপ দিলেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০) গল্পের। এই ছবিটিও দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হয়। এ দুটি ছবির জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্র-গল্পের ছবির প্রতি সারা ভারতের দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গল্পের রসবোধ ও শিল্প বিচারে দুটি ছবির কোনটিই সম্পূর্ণ সার্থক নয়। রবীন্দ্র-জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তিনটি কবিতা অবলম্বনে ('অভিসার', 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য') 'অর্ঘ্য' নামক চিত্রগুচ্ছ তৈরি হয়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দেবকী বসু। এটিকে চলচ্চিত্রের পর্যায়ে উল্লেখ না করাই ভাল। এই ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ রাখাই ছিল সরকারের কর্তব্য। অগ্রগামী পরিচালক গোষ্ঠী ছোট গল্প 'নিশিথে'র চিত্ররূপ দিয়েছেন।

রবীন্দ্র-গল্পের চলচ্চিত্র রূপায়ণে সত্যজিৎ রায়ই সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট 'তিন কন্যা' (১৯৬১) থেকে বাংলা চলচ্চিত্র নতুন প্রাণস্পর্শ লাভ করেছে। মেজাজে ও স্বাদে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই চিত্রগুচ্ছ ('পোষ্ট মাষ্টার,' 'সমাপ্তি,' 'মণিহারা') রবীন্দ্র-চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করেছে। তাঁর পরবর্তী 'চারুলতা' (নষ্টনীড়) রবীন্দ্র-গল্পের চিত্ররূপের আর একটি সার্থক নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনা এই ছবিতে প্রতিফলিত।

এ সব ছবি গ্রহণ করতে পারার মত উপযুক্ত দর্শকও আজ তৈরি হয়েছে। আসল কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য এমন পরিচালক চাই—যিনি সমাজসচেতন, যিনি সাহিত্য ও শিল্পে প্রজ্ঞাবান এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে প্রগতিশীল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে চিত্ররূপের সম্ভাবনা যথেষ্ট। উপযুক্ত প্রযোজক ও পরিচালক এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প এবং সমাজ উপকৃত হবে।

রঙমহল ১২ই মে সন্ধ্যা ৭টায়
বঙ্কিমচন্দ্রের
ম্যাচরাম গুড়
প্রযোজনা : রূপকার
নাট্যরূপ : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা : সবিতাব্রত দত্ত

# মাদ্রাজে রবীন্দ্রনাথ

হরেন ঘোষ

বৈচিত্র্যপিয়াসী কবিমন গতানুগতিক দিনযাপনে হাঁপিয়ে ওঠে। নিত্য-নতুন সুরে মনোবীণার তার বাঁধতে চান কবি বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিকবার পরিক্রমা করেছেন। মন্দিরময় দক্ষিণ ভারতেও গিয়েছেন তিনি একাধিকবার।

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানের আহ্বানে কবি দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য একই সঙ্গে মাদ্রাজ, মাদুরা, মদনাপল্লী বেড়িয়ে আসা। সঙ্গী রয়েছেন তরুণশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। অতি অল্প সময়ে তিনি ঘুরলেন মহীশূর, সালেম, ত্রিচিনপল্লী, কুম্বকোনম, মাদুরা ও মদনাপল্লী। প্রত্যেক জায়গাতেই সভা, সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। বাকি রয়েছে মাদ্রাজ যাওয়া। মনে দ্বিধা জেগেছে। কারণ এই সময়ে মাদ্রাজে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। রবীন্দ্রনাথ অসবর্ণ বিবাহপদ্ধতি সমর্থন করেন। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণদের অসীম আধিপত্য, কবির সামাজিক মতের ঘোরতর বিরোধী তারা। কবি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন। এবার মনের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে মাদ্রাজে এলেন। হাইকোর্টের উকিল রঙ্গস্বামী আয়ারের বাড়ি উঠলেন। মিসেস বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলাররূপে বক্তৃতা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৯-এর ১০, ১১ ও ১২ই মার্চ বক্তৃতা দিলেন কবি। বিষয় ছিল (1) Education (2) Message of the Forest (3) The Spirit of Ponular Religion in India. ১৩ই মার্চ আর্য গণসভায় কবিকে অভিনন্দন জানান হয়। কয়েকটি কলেজে তিনি তাঁর কাব্যের অনুবাদ পাঠ করেন। এই সময়ই 'গান্ধারীর আবেদন'-এর অনুবাদ করেন Mother's Prayer নামে।

এরপর ১৯২২ সালে বোম্বাই, পুণা হয়ে মহীশূর গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর মাদ্রাজ। এবার অতিথি হলেন রামস্বামী আইয়ারের। ২৯শে সেপ্টেম্বর গোখ্‌লে হলে ভারতের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। পরদিন The Spirit of Modern Time সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। এরপর এনড্রুজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন নানা জায়গায়। কলম্বো ইত্যাদি ঘুরে ১৯শে নভেম্বর ফিরে এলেন মাদ্রাজ। ২০শে নভেম্বর এখানে United Womens' College-এ বক্তৃতা দিলেন। ২৩শে নভেম্বর বোম্বাই রওনা হলেন।

১৯২৮-এ বিলাত যাত্রার পথে মাদ্রাজ গেলেন। কবির অনুরোধে মাদ্রাজ পর্যন্ত সঙ্গে যেতে রাজি হলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ। তখন অসহ্য গরম মাদ্রাজে। ষ্টেশনে নিতে এসেছেন আরিয়াম ও এনড্রুজ। এবার মিসেস বেসান্তের অতিথি হলেন। 'ব্ল্যাভট্‌স্কি হাউসে' থাকবার ব্যবস্থা হল। ওরা মে পৌঁছলেন ওখানে। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই বাগানের গাছতলায় আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে মিসেস বেসান্ত কবির সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও কবি অভিভাষণ দিলেন।

পিঠাপুরমের মহারাজার আমন্ত্রণ এল। বেঁচে গেলেন কবি। গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। রাত্রের গাড়িতে কুন্নুর রওনা হলেন। কয়েক দিন সেখানে কাটিয়ে আবার মাদ্রাজ, লক্ষ্য কলম্বো হয়ে বিলেত।

এবার আড়িয়ারে না গিয়ে স্যর শঙ্কর নারায়ণের জামাই ও মাদ্রাজের D. P. I. মিষ্টার ক্যাণ্ডেতের বাড়ি উঠলেন। সেদিনই রওনা হলেন কলম্বো। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। কলম্বোতে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বিলেত যাওয়া বন্ধ হল। ফিরে এলেন মাদ্রাজ।

এবারও মিষ্টার ক্যাণ্ডেতের বাড়ি। জুনমাসের মাঝামাঝি বর্ষা পড়লেও ভ্যাপসা গরম। কলকাতা ফেরার জন্যে কবি ব্যস্ত। গাড়িতে জায়গা পাওয়া গেল না। কবির পুরোন বন্ধু স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার। ব্যাঙ্গালোরে থাকেন তিনি। এত কাছে। অসুস্থ শরীরে কবি জোর করে চলে গেলেন তাঁর কাছে। আসল কথা মাদ্রাজে মন টেকে না, মাদ্রাজ তখন অসহ্য। ওখানে গিয়ে 'শেষের কবিতা' শেষ করলেন।

১৯৩৪-এ মাদ্রাজ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। সেখানে শান্তিনিকেতনের শিল্পপ্রদর্শনী ও গীতোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ, পূজোর ছুটি। ২১শে অক্টোবর কবি মাদ্রাজ পৌঁছলেন। এবারও থাকার ব্যবস্থা হল আড়িয়ারে, থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে।

পরদিন মাদ্রাজ করপোরেশন থেকে কবিকে মানপত্র দেওয়া হল। প্রত্যুত্তরে কবি বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। পরদিন মিউজিয়াম থিয়েটার হলে ছাত্রদের এক সভায় কবি ভাষণ দিলেন। ছাত্ররা বিশ্বভারতীর জন্যে এক হাজার টাকা তুলে দেয়। এরপর ভারতীয় নারীসমাজ ও কুইন মেরী কলেজের ছাত্রীরা কবিকে সম্বর্ধনা জানায়।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা এসে পৌঁছল। নন্দলাল বসুও এলেন ছাত্রদের নিয়ে। চিত্র ও শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হল। ওদিকে 'শাপমোচন' গীতিনাট্যের অভিনয় চলছে। চারদিন অভিনয় হল। এবার কবি বারোদিন ছিলেন মাদ্রাজে। তারপর গেলেন ওয়ালটেয়ার।

একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ গিয়েছেন। কখনো আসা যাওয়ার পথের ধারে মাদ্রাজে ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু এখানে তিনি যেন মনের শান্তি খুঁজে পান নি, মন থেকে ভালবাসতে পারেন নি মাদ্রাজকে। নানা কারণ আছে তার। এখানকার অসহ্য গরমে তিনি বিরক্ত, ক্লান্ত হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর আশা ছিল বিশ্বভারতীর জন্যে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন মাদ্রাজে। কিন্তু তেমন সাড়া মেলে নি। তাঁর পরিকল্পনা তারা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তবে কবি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পান, মাদ্রাজে যখন তাঁর রাজনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক মতবাদ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা ও আলোড়ন জাগে। তাঁকে কেউ ভুল বুঝেছে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তবু বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ মনে অভিমান রাখেন নি। ১৯৩৪-এ আমন্ত্রণ পেয়ে মাদ্রাজ গিয়েছেন এবং এবার তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন, মাদ্রাজকে ভালোবেসেছেন।

# রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা

নির্মল বসু

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কেবল ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে পালিত হয়েছে। সব দেশই উৎসাহের সঙ্গে, পরম শ্রদ্ধাভরে, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছে। কবি ও সাহিত্যিকরূপে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই সর্বজাতিক শ্রদ্ধা নিবেদন কবির প্রতিভার স্বীকৃতি, এ কথা অস্বীকার করার কারণ নেই। তবু, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বের এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণ কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্যকৃতি নয়। রণক্লান্ত, বিভেদজর্জর ও হিংসা-দ্বেষ পরিপূর্ণ বিশ্বের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ শান্তি ও ঐক্যের পথ তুলে ধরেছেন। প্রথম প্রকাশেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের নিকট এমন বক্তব্য রেখেছেন যে অবাক-বিস্ময়ে পাশ্চাত্যবাসী এই নতুন কবির প্রতি তাকিয়েছে। বাঁচার পথ পেয়ে কবিকে তারা বরণ করে নিয়েছে। একজন বিদেশী লেখকের বর্ণনায়: "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! এই নাম ভড্‌কা-প্রিয় রুশের স্থূল জিহ্বায় উচ্চারিত হয়েছে, প্রার্থনারত চীনবাসী ঐ নামে থমকে দাঁড়িয়েছে। ঐ নামে আবেগ-প্রবণ ল্যাটিন জাতি মদের গ্লাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে—ঐ নামের মহিমায় জার্মানীতে শিশুরা খেলা ভুলে গিয়েছে, সুইজারল্যাণ্ডে শীতের সন্ধ্যায় বুড়োরা ঘরের কোণের আগুনের আরাম ছেড়ে বাইরে ছুটে এসেছে—মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ থেকে, হাত থেকে কলম খসে যাবার বহু পরে ছাড়া এশিয়ার কোনো কবিই তাঁর জীবিতকালে এমন সম্পূর্ণ বিশ্ব জয় করতে পারেন নি।" (বিশ্ব-সভায় রবীন্দ্রনাথ; শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। পৃঃ ৫)।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বজয়ের মূলে আছে তাঁর বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠকণ্ঠে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন এবং জাতীয়তা-বাদের পথ বর্জন করে আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের নিন্দা করেছেন। যেখানে মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে, তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর আহ্বান: সঙ্কীর্ণ জাতিস্বার্থ পরিত্যাগ করে, বিবাদবিসম্বাদের পথ পরিহার করে সকলকে এক হয়ে মিলতে হবে। আর এই ঐক্য হবে অধ্যাত্মভিত্তিক। আজও যখন জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, সম্প্রদায়গত কলহ রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আন্ত-র্জাতিক সংকটকে ঘনীভূত করছে, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ওপর বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নিয়ে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি শান্তি-বচনের পাশাপাশি যুদ্ধের হুমকী দিচ্ছে, তখন বিশ্ববাসী মুক্তির আশায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শের দিকে ঝুঁকবে, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভালবেসেছেন, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ নয়, মানবতার আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। মহাকবি গ্যেটে বলেছেন, "মানুষ ও নাগরিক-রূপে কবি তাঁর নিজের দেশকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার স্বদেশ রয়েছে সততা, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের জগতের মধ্যে —এই দেশের কোন সীমানা নেই।" এই কবিধর্মের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে রবীন্দ্রনাথ দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষের জয়গান গেয়েছেন—সকল সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার পক্ষে মহাবিপদ বলে মনে করেন। জাতীয়তাবাদকে "গুণ্ডাদের ভ্রাতৃত্ব" ("Brotherhood of hooligans") রূপে অভিহিত করে তিনি বলেছেন, এতে মানুষকে শৈশব থেকে ঘৃণা ও সর্বপ্রকার প্রলোভন শেখানো হয়—অর্ধসত্য ও অসত্য ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীকে উত্তেজিত করা হয়। জাতীয়তাবাদ মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। যা কিছু মহৎ আদর্শ সব বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। জাতির ধর্মরূপে স্বার্থপরতা স্বীকৃতি লাভ করছে। 'Nationalism' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"Where the spirit of the Western nationalism prevails, the whole people is being taught from boy-hood to foster hatreds and ambitions by all kinds of means—by the manufacture of half-truth's and untruth's in history, by persistent misrepresentation of other races and the culture of unfavourable sentiments towards them, by setting up memorials of events, very often false, which for the sake of humanity should be speedily forgotten, thus continually brewing evil menace towards neighbours and nations other than their own. This is poisoning the very fountainheed of humanity. It is discrediting the ideals, which were born of the lives of men who were our greatest and best. It is holding up gigantic selfishness as the universal religion for all nations of the world."

ইউরোপ ও আমেরিকায় জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার ধারণ করে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতিকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে এবং এই ঘৃণা তীব্র হয়ে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের মূলে রয়েছে 'নেশন' তত্ত্ব। জাপানও হীনমন্যতা ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের সমান শক্তি অর্জন করার

প্রয়াসে এই জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছে। আর তার ফল হয়েছে, সমগ্র জাপানী জাতি যুদ্ধের জন্য মেতে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে 'ন্যাশনালিজম ইন দি ওয়েস্ট' ও 'ন্যাশনালিজম ইন জাপান', এই প্রবন্ধ দু'টিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, উভয়ের জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছেন। জাতীয়তাবাদ মূলত সাম্রাজ্যবাদ, পরজাতিবিদ্বেষ ও যুদ্ধের মতবাদ। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় আপত্তি, এতে মানবতার বিনাশ হচ্ছে। মানবিক সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে 'নেশনের' জয়যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানবতাকে পঙ্গু করেই দীর্ঘকাল ধরে নেশন বিকাশ লাভ করেছে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষ 'ন্যাশনাল' যন্ত্রের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যায় যুদ্ধ ও টাকা তৈরির কলের পুতুলে পরিণত হয়ে বের হচ্ছে।

"The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creation of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-making puppets, ludicrously vain of their, pitiful perfection of mechanism." ভারতীয় সভ্যতা কখনও এই জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে নি। পাশ্চাত্য 'নেশন'-এর যথার্থ কোন প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় নেই। ভারত পররাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধের আদর্শকে গ্রহণ করে নি। 'ন্যাশনালিজম ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ভারতের আদর্শ হল মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে সকল আবেগ ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করা এবং অন্য প্রতিবেশীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার সৃষ্টি করা। "One is to regulate our passions and appetites for the harmonious development of man, and the other is to help him to cultivate disinterested love for his fellow creatures." জাতীয়তাবাদের পথ থেকে দূরে

● আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের সাথে মিস হেলেন কেলারের স্মরণীয় সাক্ষাৎকার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মিস কেলারকে নিজের লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন।

থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, সফরকালে সর্বত্র জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে সবাই বিদ্রূপ করেছে। পরাধীন দেশের মানুষ "পরাজিতের মনোভাব" থেকে এই কথা বলেছেন, এখন সমালোচনা হয়েছে। তথাপি 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পাশ্চাত্য জগতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। অনেক সৈনিক এই গ্রন্থ পাঠ করে যুদ্ধ ত্যাগ করেছে। মনীষী রোমাঁ রোঁলার সঙ্গে তখনও রবীন্দ্রনাথের চাক্ষুষ আলাপ হয় নি, তবু এই গ্রন্থ পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়াই তিনি তাঁর বোনকে দিয়ে ফরাসী ভাষায় এর অংশবিশেষ অনুবাদ করান।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম্ সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতাগুলি দেন এবং পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন সর্বত্র জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য। রেঁনা জাতীয়তাবাদের পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য রেখেছেন। উড্‌রো উইলসনের চোদ্দ-দফা শান্তিসর্তের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলের জাতীয়তাবাদ নতুন করে স্থান লাভ করেছে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভার্সাই চুক্তি ও লীগ অব্ নেশনস্ প্রতিষ্ঠা করা হল। এই সময় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা কম সাহসের কথা নয়। ভারতেও জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দি মেকিং অব্ ইণ্ডিয়ান নেশন" তখন প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংস্কারবাদী প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, উভয়েরই মূল ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ। ভারতেও তাই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা সফরকালে 'হিন্দুস্থান গদর পার্টি'র কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন পর্যন্ত করেছেন—তাঁদের ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথের এই সব

জন্যও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরই জয় হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পথ বর্জন করে মানব-মৈত্রীর পথ গ্রহণ করা ছাড়া যে উপায় নেই, পাশ্চাত্যের মনীষীরা সে-কথা স্বীকার করেছেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, "আমরা কেবলমাত্র সত্যের পূজারী—এই সত্য স্বাধীন, সীমানাহীন, বাধাহীন এবং কোন জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে এর কোন বৈষম্য নেই। আমরা সমগ্রভাবে মানবতার জন্য কাজ করব। কোন জাতিকে আমরা স্বীকার করব না।" ("Rolland and Tagore.") বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কির কণ্ঠেও আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শুনি: "জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বাদের ভৃত্যে পরিণত হয়। অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকেই এর শক্তিবৃদ্ধি এবং এই প্রয়াসের তীব্রতা থেকেই হয় যুদ্ধের সৃষ্টি।" (Laski, 'Nationalism and the Future of Civilisation.') রাষ্ট্রসংঘের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা, মার্কিনগোষ্ঠী ও সোভিয়েটগোষ্ঠী কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়াস এবং ভারত কর্তৃক 'পঞ্চশীলের' আদর্শ গ্রহণ রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ, লাস্কি প্রভৃতির এই মহাবাণীরই স্বীকৃতি।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ সর্বদা মুখর হয়েছে। বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন,—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।------
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,
লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগী
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"
(নৈবেদ্য)।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ সুতীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আফ্রিকার নেকড়েদের চেয়েও যারা হিংস্র, সেই সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কবির তীব্র সমালোচনা ও ঘৃণা 'আফ্রিকা' কবিতার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের
চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা
অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল
অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে
মিশে;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার
অপমানিত ইতিহাসে।"
(পত্রপুট)।

হিংস্র আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত আফ্রিকাবাসীর পাশে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়ে কবি বলছেন—

"আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা
বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের
অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,"
(পত্রপুট)।

সমগ্র আফ্রিকায় আজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটছে এবং নতুন আফ্রিকার আবির্ভাব ঘটছে, তাই এখন বহু বৎসর পূর্বে উচ্চারিত এই বাণী বারে বারে স্মরণ করার মত।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি ছিল। তাঁর বাণী ছিল সমগ্র বিশ্বের জন্য, যে-কোন সমস্যার বিচার তিনি বিশ্বজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে করতে পারতেন এবং তিনি একান্তভাবে চেয়েছেন 'পৃথিবীর কবি' হতে। তিনি ঘোষণা করেছেন—

"আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার
জাগিবে তখনি।"
(জন্মদিনে)।

তিনি বলেছেন, "যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়ে প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেন না পরস্পর নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎ ভাবে মানুষের সত্য-সাধনার ক্ষেত্র হবে।" শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর্জাতিকতাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ১৯১৬ সালে চিকাগো থেকে কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্ব-জাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন বোল-পুরের প্রান্তরেই হবে।" (রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়, পৃঃ ৫১২।) 'বিশ্বভারতী' হয়ে উঠবে বিশ্বের মিলনক্ষেত্র—এখানে সর্বদেশের মানুষ মিলিত হবে। নতুন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত নতুন মানুষ জন্মলাভ করবে।

'বিশ্বভারতী'র আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই।"

(বিশ্বভারতী, পৃঃ ৬৩-৬৪)

রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রচার ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও জাতীয়তাবাদের ভাল দিকগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। দেশপ্রেম, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে তিনি মূল্যবান বলে মনে করেছেন। যে জাতীয়বাদী আন্দোলন বিদেশী শাসনের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করে, তার প্রতি কবির পূর্ণ সমর্থন ছিল। এশিয়া-আফ্রিকার মানুষের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে তিনি সর্বদা সমর্থন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ গ্রহণও করেছেন। স্বদেশী মেলা ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন উৎসাহী কর্মী। কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল"কে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছেন। দেশজননীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—

"নমোনমো নম, সুন্দরী মম
জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন
জুড়ালে তুমি।"

আবার—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

কিংবা—

"আমার সোনার বাংলা, আমি
তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার
বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

যে জাতীয়তাবাদ সুস্থ দেশপ্রেমের সৃষ্টি করে মানুষের মনে ভালবাসা ও ঐক্যের ভাব জাগ্রত করে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নেই। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন স্বাধীনতা ও মানবতা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত তার জাতীয় সংহতি গড়ে তুলুক। (Radhakrishnan, 'The Philosophy of Rabindranath Tagore,')

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈচিত্র্যকে তিনি নষ্ট করতে চান নি —বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ তিনি চেয়েছেন। জাতিতে-জাতিতে পার্থক্য থাকবে, কিন্তু এই পার্থক্য বজায় রেখেই সবাইকে মিলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচীই সন্দেহ নাই এবং ইশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে। না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের মধ্যে ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।"

(রবীন্দ্রজীবনী —দ্বিতীয় খণ্ড; শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

ভারতের সভ্যতা নানাকে এক করার শিক্ষা দিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতের মর্মবাণীকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।... ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

(স্বদেশ)।

স্বাদে, বিন্যাসে, পরিবেশনায় এমন ছবি এ দেশের ষ্টুডিওতে ইতিপূর্বে তৈরি হয়নি···বলেছেন—

আনন্দবাজার পত্রিকা।

আর·ডি·বনশল প্রেজেন্টস্
মহত্তম ছায়াচিত্র

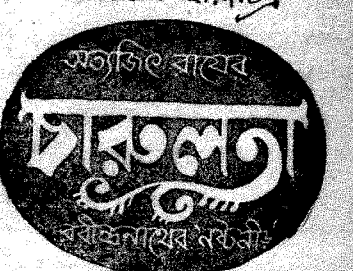


রূপে: সৌমিত্র·মাধবী·শৈলেন

শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা
অশোকা ও অন্যত্র

● মস্কোয় কেন্দ্রীয় কৃষিভবনে কৃষকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

এই ঐক্যের পথ আজ গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শ সফল করতে হলে জাতিতে জাতিতে শোষণ বন্ধ করতে হবে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে হবে এবং সকল দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। নইলে আদর্শ অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হবে। চীনের সানসি প্রদেশের গভর্নর ইয়েন-এর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি স্পষ্ট বলেছেন,—

"সকল দেশের সকল মানুষের অবস্থার উন্নতির দ্বারাই কেবল সমস্যার সমাধান সম্ভব।"

(Visva Bharati Quarterly, October 1924 )

সুতরাং বাস্তবতাশূন্য বিশ্ব-কল্পনার আদর্শ ছিল না রবীন্দ্রনাথের। আজ রাষ্ট্রসংঘ স্বীকার করেছে, অনুন্নত দেশের মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য দূর করতে না পারলে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হবে না, মানবিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সফল হবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিষ্প্রাণ ও ও অস্পষ্ট আন্তর্জাতিকতা বা স্বার্থপর জাতীয়তাবাদ কোনটার দ্বারাই মানবজাতির কল্যাণ হবে না।

"Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of national worship in the goal of human history."

'Nationalism.'

আন্তর্জাতিকতার আদর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির মধ্যে মহামানবের প্রাণশক্তির, বিশ্ব-মানবতার অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ চাই। "My religion is in the reconciliation of the super-personal man, the universal human spirit, in my own individual being." (রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে কথোপকথন, জুলাই, ১৯৩০)। যে-দিন সকল মানুষ মানবধর্ম গ্রহণ

**বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হওয়ায় এতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনাসমূহ প্রকাশ করা হোল।**

**—সম্পাদিকা**

করে নিজেদের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করতে পারবে সেদিনই সকল সমস্যার সমাধান হবে। অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা 'দি রিলিজন অব্ ম্যান' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতা 'মানুষের ধর্ম' এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'মানুষ'-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বমানবতার আদর্শকে পরিস্ফুট করেছেন। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে বিশ্ব এবং বিশ্ব থেকে অনন্তে পরিপূর্ণতা লাভই মানুষের আদর্শ।

"..individual body to community, from community to universe and from universe to infinity."

'The Religion of Man'

ব্যক্তি জাতি ও মানবতার পূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসমস্যার সমাধান প্রত্যক্ষ করেছেন। স্পষ্টতই এখানে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদের ওপর আন্তর্জাতিকতাকে স্থাপন করেছেন।

জীবনের সায়াহ্নে ইউরোপে যুদ্ধের তাণ্ডব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন জাতিবিদ্বেষের পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপই বা কতটা নগ্নরূপ ধারণ করতে পারে। তথাপি তিনি আশা ত্যাগ করেন নি। 'সভ্যতার সঙ্কটে' কবি বলছেন—

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

কবির অশীতিতম জন্মদিনের এই বাণী শেষ হয়েছে মানব-অভ্যুদয়ের জয়ধ্বনিতে—

"উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

মানবতার জয় অবশ্যম্ভাবী। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিন শেষ হয়ে আসছে, আন্তর্জাতিকতাই মানব-জাতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির পথ।

# নবীন অনবদ্যতা

## এসো হে বৈশাখ,

শ্রীপদাতিক

**হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,**
**ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,**
**ত্রস্ত ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল**
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

সে রুদ্র, সে প্রচণ্ড। সে ভৈরব, সে ভয়ঙ্কর। নেচে নেচে, বিপুল অট্টহেসে তার আবির্ভাব। প্রাণে প্রাণে, দারুণ অগ্নিবাণে তার উদ্বোধন। সে অসীম, সে অক্ষয়। সে দুর্জয়, সে দুর্বিনীত। দিকে দিকে, প্রলয়ের তুরঙ্গমে তার জয়যাত্রা। হাটে-মাঠে, বিনাশের অশান্ত কেতনে তার চিত্রার্পণ। সে পাগল, সে বৈরাচারী। নিয়মের অফুরন্ত ছন্দে সে অপ্রত্যাশিত উৎপাত। তবুও সে নবীন, সে উদাসীন। সে কুমার, তার ধনুকে সে টঙ্কার তোলে ক্ষণে ক্ষণে। সুরে সুরে সে সুরের অতীত, সুদূরের পিয়াসী! রূপে রূপে সে অরূপ-রতন, রত্নাকরের অন্বিষ্ট! তার বৈচিত্র্যের শেষ নেই, ভাবের বিলয় নেই, বৈভবের সীমা নেই। সে অসম্পৃক্ত নয় জলে-স্থলে-নভঃস্থলে। সে বিচ্ছিন্ন নয় জীবনে-তৃণে-তরু-লতায়। সবার সঙ্গেই তার নির্বিচার সম্বন্ধ, ক্ষমাহীন মিত্রতা। ---কেবল হাটে-মাঠে, বনে বনান্তরে, অথবা গ্রামে গ্রামে, দূরে দেশান্তরে তার বিস্তার নয়। মহানগরীর প্রস্তর-খচিত বুকেও তার চিত্ত-বিক্ষেপ অবারিত, নগর-নিসর্গের যান্ত্রিক বিধানেও তার আত্মপ্রকাশ নয়নাভিরাম। এখানে রাজপথের চক্রযানে তার দুরন্ত সংকেত; ফুটপাথের পদযাত্রায় কবোষ্ণ স্বাগতম! এখানে সৌধমালার শিখর-গ্রন্থণায় তার লীলায়িত তৃষ্ণা, পাষাণের বক্ষপটে তার শুভ্রতার নির্মলিন আলেখ্য! আর নগর-বিধৃত কৃত্রিম উদ্যানে, ময়দানে, অথবা বিশিষ্ট সরণীর দেওদার কুঞ্জে সে রচনা করে কিশলয়ের গান; কৃষ্ণচূড়ার উন্মুখ যৌবনে সে দান করে তার নিষ্কলঙ্ক অরুণি। সব মিলিয়ে সে চিরসুন্দর—যার পূজার তরে কোনো উপচারের বাহুল্য নিরর্থক। সব মিলিয়ে সে চিরনবীন—যাকে বরণের তরে কোনো প্রস্তুতির সাযুজ্য প্রয়োজন নেই। সে আপনি এসে পূর্ণ করে সর্বশূন্যতার অঞ্জলি; আপনি এসে উড়িয়ে দেয় দীর্ঘদিনের জঞ্জাল, পুড়িয়ে দেয় জীর্ণতার গ্লানি। কারণ সে সম্পূর্ণ বৈশাখ—আর সে বৈশাখই তো নিরুপম রবীন্দ্রনাথের পরিব্যাপ্ত মানস। রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন দৃষ্টিই চিত্রাপিত বৈশাখের বর্ণালি দিগন্তে; তাঁর অপার দাক্ষিণ্যেরই বিচ্ছুরণ বৈশাখের বিপুল বৈচিত্র্যে। তাই বৈশাখের চোখের দিকে তাকিয়েই রোমাঞ্চিত আজ রবিতীর্থ মহানগর। তার পাষাণ অন্তরের অনাবাদী জমিতেও দোল দিয়ে যায় কী-এক অনিশ্চিতের আবেগ। ঝড়ো হাওয়ার পক্ষ-বিধূননে, বারে বারে আজ তাই নগর-চিত্তেরও—

'পর্বত চাহিছে হতে
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'

এমন দিনেই বৈশাখের জন্ম, এমন বৈশাখেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সেদিন থেকেই তাঁর চিরঞ্জীবের তীর্থ-যাত্রা পদাবলীর ছন্দে।

---'কয়েটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই-যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া,
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে,
কেউ নেই তারা।
সেই বালক
না আছে আপন স্বরূপে, না আছে
কারো স্মৃতিতে।'

সে-দিনের সেই বালক, আজ কারো স্মৃতির মণিহারে বরণীয় হোক বা না হোক, মহানগর তাকে ভোলে নি। সেই বালক এবং সেই কিশোরকে সে চিনতে পারে প্রতিদিনের পথের ধূলোয়। সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দর যুবক এবং সেই ভাবলোকের দেবাদি-দেব প্রৌঢ়েরও অক্ষয় অভিষেক ঘটেছে তার স্মৃতির দেউলে। আর সেই মহা মুনি বৃদ্ধ বা সেই অমৃতের পুত্রকেও সে যান্ত্রিক নিসর্গের নিত্য-কালের ব্যক্তিতে অবলোকন করে গৌরবে।

আজ তাই বৈশাখের অগ্নি-সত্তার পরশে পবিত্র মহানগরে উচ্চারিত: আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি। তার আয়োজন চলছে দিকে দিকে: মাঠে-ময়দানে, পথে-উপপথে এবং ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়। এ-পাড়ার যে-দুরন্ত ছেলেটি ও-পাড়ার সেই মাতব্বর ছেলেটির ছায়া মাড়ায় না, এবং ও-পাড়ার যে-মাতব্বর ছেলেটি এ-পাড়ার এই দুরন্ত ছেলেটিকে বরদাস্ত করে না, আজ তারাও নির্বিভেদে একায়। কারণ এ-পাড়া এবং ও-পাড়া মিলে, আজ একত্রে আয়োজন চলছে তাঁরই আবির্ভাব-উৎসবের—যিনি এ-কালের অধিতীর গুরু, সে-কালের আরাধ্য দেবতা, সুদূর অতীতের রূপকথার রাজাধিরাজ এবং সর্বকালের রবীন্দ্র-নাথ। তাই আজ দুরন্ত ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ও-পাড়ার মাতব্বর ছেলেটি। তারা একত্রে

আজ উভয় পাড়ার উপকণ্ঠে, উৎসবের মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উদ্ব্যস্ত। পাড়ায় পাড়ায়, প্রতিঘরে আমন্ত্রণলিপি পরিবেশনের দায়িত্বও আজ তাদেরই।

আর ধলেশ্বরী নদীর ওপারের যে-গ্রাম—যা বাদামে-বেতসে এবং দেবদারুর ললিত বেষ্টনে নিবিড়, যা বেণুবন-বেণীটি দুলিয়ে, পায়ে-পায়ে ঢেঁকিটি নাচিয়ে, নিরুদ্বিগ্ন জীবনকে আহ্বান জানাতো ঘুঘুডাকা দুপুরে-সন্ধ্যায়—সেই প্রিয়তমা গ্রাম থেকে নির্বাসিত হয়ে, যে-ছিন্নমূল তরুণ আজ এপারের মহানগরে অনাদৃত, উপেক্ষিত এবং অনিকেত, যে আজ বৃন্দাবন মুদীর দোকানে ঘাট টাকায় খাতা লেখার হরিপদ কেরাণী—সে'ও আজ দিগন্তে তুলেছে চোখ, বৈশাখের উদ্ভাসিত মেঘপুঞ্জে সে'ও আজ রচনা করে চলেছে তাঁরই প্রতিকৃতি—যাঁর কাছে সে প্রশ্ন করেছে বারবার, তারপর উত্তর পেয়েছে একবার, আশাবাদীর উত্তর :

—'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে
শাশ্বত অধ্যায়।'

সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সেতুবন্ধ যে-জোড়াসাঁকো যা শৈশবের লীলাভূমি এবং যৌবনের সাধনপীঠ সেই শুভ জাতকের, সেখানে আজ তাঁকেই স্মরণ ক'রে সাড়া পড়েছে অভিরাম ছন্দে, বহুবর্ণের মুদ্রায় এবং বিচিত্র লাস্যে। সেই অনুপম তীর্থে আজ একত্রে সমাহার ঘটেছে শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের এবং বার্ধক্যের। সেখানে আজ এক রূপ, এক প্রাণ এবং একই ধ্যান সেই একের উদ্দেশে।

মহানগরের উত্তরাঞ্চলেও আজ রবীন্দ্রমেলার আয়োজন। সেখানে পুষ্পখচিত উদ্যানের সুশোভন মণ্ডপ আলোকসজ্জায় উজ্জ্বল। তার উৎসবের স্থিতিকাল পক্ষকালের সমারোহে। সঙ্গীতে, বেদমন্ত্রে এবং রবীন্দ্র-বাক্যের মধুর আবৃত্তিতে উন্মুখর সেই মণ্ডপেও আজ বিকাশ-প্রাপ্তি ঘটছে জীবনের, সমাজের এবং সংহতির।

আরও উত্তরের শ্যাম স্কোয়ারে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন—যা প্রতি বৎসরের বৈশাখে ঠিক এভাবেই আত্মপ্রকাশ করে নির্বিরোধ পরিবেশে। যাঁরা জ্ঞানী, গুণী এবং প্রজ্ঞা-পারমিতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে যাঁরা দিকপাল—তাঁরাই এখানে রবীন্দ্র-সমীক্ষার সুদায়িত্বের আসনে অলঙ্কৃত। এই উৎসব-মঞ্চেরও স্থিতিকাল একযোগে এক সপ্তাহ। এখানেও সঙ্গীতে, নাটকে এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের সার্থক রূপায়ণে বিরচিত এক দিব্য-প্রতীম সুরলোক।

আর গুরুদেব যাদের আহ্বান জানিয়েছেন বিগত শ্রাবণে—অখ্যাত জনের কবি যারা, কবি যারা নির্বাক মনের, আজ তারাও মিলেছে দলে দলে। বৈশাখের অগ্নি-নির্দেশে, আজ মুষ্টিবদ্ধ হাত তাদের আকাশ-পথে উত্তোলিত—

—'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

এ-বৈশাখ তাইতো চিরসুন্দর, তাইতো সে চিরনবীন। প্রতি বৎসরের উন্মেষ-লগ্নে নতুন জীবনের অভিনব সোপানে সে উত্তরণ ঘটায় আমাদের, আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে সে পুণ্য করে জীর্ণ মনের বাসনা।

অতএব আমাদের জীবন থেকে জীবনাতীত যাত্রাপথে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নাতীত মোহনায় তুমি এসো। দুঃখে, দুর্যোগে এবং সুখের শূন্য খোঁজার পরিমণ্ডলে—এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।

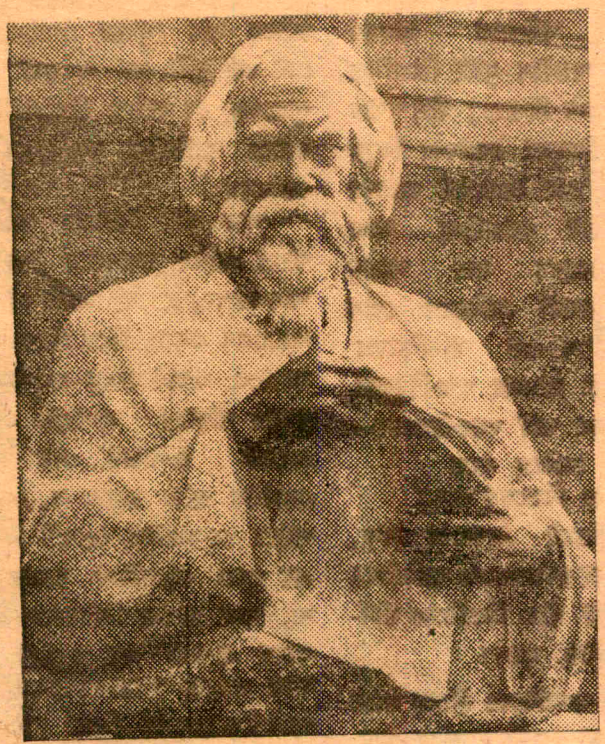

রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে রুশ ভাস্কর নির্মিত রবীন্দ্রনাথের অ বক্ষ মর্মরমূর্তি

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

# বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

— উপন্যাস —

**দ্বিতীয় খণ্ড ঃ**—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য ২৲ টাকা।

**তৃতীয় খণ্ড ঃ**—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [ সচিত্র ] মূল্য ৩৲ টাকা।

— সাহিত্য —

**প্রথম খণ্ড ঃ**—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য ২৲ টাকা।

**দ্বিতীয় খণ্ড ঃ**—ধর্ম্মতত্ত্ব ( ১ম ভাগ অনুশীলন ), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য় ), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য ২৲ টাকা।

**তৃতীয় খণ্ড ঃ**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, লঘিতা। মূল্য ২৲ টাকা।

---

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# মাইকেল গ্রন্থাবলী

**দ্বিতীয় ভাগ ঃ**—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ।

মূল্য—১৷৷০ টাকা।

---

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—
নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

# দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

**১ম ভাগে**—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা, ২। নীল-দর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

**২য় ভাগে**—১। সধবার একাদশী, ২। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৩। পোড়ামহেশ্বর, ৪। সুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা, ৮। পদ্য সংগ্রহ।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

---

সর্ব্বপুরাণ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

# স্তবকবচমালা

( পঞ্চম সংস্করণ )

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তনিবেদন অতি যত্নে সুনির্ব্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

---

পৃথিবীর অরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

# সার ওয়াল্টার স্কটের

## গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ
সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত
দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর
লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ
দি এ্যাবট ও কোয়ারি
মূল্য ১৷৷০ টাকা।

---

# কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর

## গ্রন্থাবলী

**রবীন্দ্রনাথ বলেন**—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Thursday, 7th May, 1964
Price : 25 nP.

SAPTAHIK BASUMATI
Gram : "BASUMATI"

Regd. No. C 71
Phone : { 34-7771, 34-7772, 34-7773.

7 MAY 1964

এ এল রাতের রেলগাড়ি
ঝমঝম পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে সে নামে নাহি ঠিক।
কেউ বলে যন্ত্রি সে আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, চলে একেলা সে রাতে
প্রাণমন ভরি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিমিত, চলে বনে সারা
নিমিষেও তার গতি।
নামহীন সে যে চলা কারকার থাকে ঘুমে ঘোর,
একেলার যারা সাথি রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস —
সন্ধে-সাতারার মুখচোরা বাসে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমিষের বিরামেরই আড়ালেরে চলে।

— রবীন্দ্রনাথ

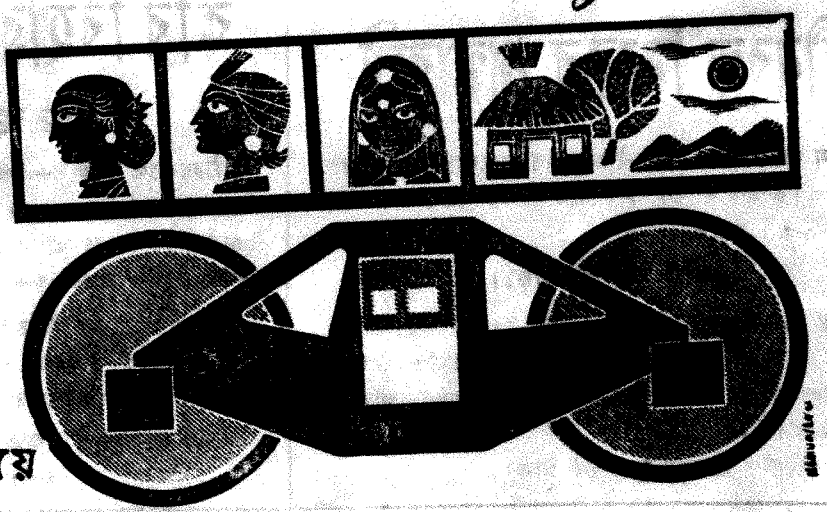

পূর্ব রেলওয়ে

সাপ্তাহিক
# বসুমতী

## দণ্ডকারণ্যে দুঃখের দুর্নিবার মিছিল

৪৮, ৫১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • • 14th May, 1964 • Vol. 68, No. 51

বোরোলীন

ত্বকের মসৃণতায় সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধন করে

বোরোলীন হাউস্ • কলিকাতা

# স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ

সেরা কাঁচের
ঘরকারে সর্বদা
এইচ, পি, জি,
কাঁচই নেবেন

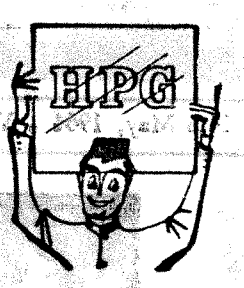


বর্ষায়, ঝড়ে অথবা দারুণ ঠাণ্ডায়—যে কোন অবস্থায়ই আপনি আরামে ঘরে বসে আপনার বাগানের শোভা উপভোগ করতে পারেন। ঘরে স্বচ্ছ কাঁচ লাগিয়ে নিলেই হলো। কাঁচে ঝামেলা কম, খরচা অল্প আর তা দেখতেও চমৎকার। কাঁচ লাগালে আপনার ঘর প্রশস্ত মনে হবে, বাইরের আলো ঘরে আসবে কিন্তু আওয়াজ ও ধুলোময়লা ঢুকবার পথ পাবে না। আর কাঁচ পরিষ্কার করতেও কোন ঝামেলা নেই। কাঁচ অজস্র কাজে লাগে—অফিসে, স্কুলকলেজে, হাসপাতালে, দোকানে, হাজারো জায়গায়। নানা মাপের নানা রকম পুরু কাঁচ পাওয়া যায়। আপনার যে কোন প্রয়োজনে এইচ, পি, জি, কাঁচের শীট ব্যবহার করতে পারেন।

## হিন্দুস্থান-পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেন্টস: তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

JWTHP 5564

# সূচীপত্র

756.3
.003/3
Y.68
no. 51


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৮২৭ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৮২৮ |
| সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর | হরপ্রসাদ মিত্র | ২৮২৯ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৮৩২ |
| একটি জীবন—বিচিত্র তাঁর কর্মধারা | পারুল সেনগুপ্ত ও মল্লিকা ঘোষ | ২৮৩৭ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৮৪৩ |
| লণ্ডনের চিঠি | অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৮৪৭ |
| দুরন্ত দেহলী (কাহিনী বিচিত্রা) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৮৫০ |
| বিকা নিলয়েষু (কবিতা) | অমিতাভ বসু | ২৮৫২ |
| বঙ্গদর্শন | ... | ২৮৫৩ |
| পঞ্চমী পুরাণ (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প) | লীলা মজুমদার | ২৮৫৬ |
| অনল আয়তী (উপন্যাস) | সুশীল রায় | ২৮৫৯ |


ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
( ডাকমাশুল স্বতন্ত্র )

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে
শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রজিৎ-
অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সরসতার
অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপ-
ন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।

২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি :
বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য
জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| রূপোলী পাখ্‌না ( গল্প ) | ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী | ২৮৬৩ |
| কৃষ্ণচূড়া ( উপন্যাস ) | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৮৬৮ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৮৭৯ |
| সিস্টার ভাস্করণ | বীরেন্দ্র মিত্র | ২৮৭৫ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৮৮০ |
| নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী | দেবনারায়ণ গুপ্ত | ২৮৮১ |
| সংবাদ বিচিত্রা | সাংবাদিক | ২৮৮২ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৮৮৩ |
| খেলাধুলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৮৮৭ |


**প্রচ্ছদ পরিচয় :**

ওপরে : ( ১ ) এক বালতি জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষারত উদ্বাস্তু নরনারী।
( ২ ) সাহায্যের আশায় লাইনে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বাস্তুরা।

নিচে : (১) আশ্রয়শিবিরে আশ্রিত উদ্বিগ্ন উদ্বাস্তুর দল। (২) কঙ্কালসার শিশুর দল গরমের জ্বালা জুড়াবার জন্য মেঝেতে পড়ে আছে।


রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

**উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সেনাফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

**বলিষ্ঠ কথাশিল্পী**

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

**মূল্য তিন টাকা**

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

**বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী**

যেঘাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

**রসরাজ**

**অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

**বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী**

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেববাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

**বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী**

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

**যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী**

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন।

**মূল্য দুই টাকা**

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

**শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী**

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২**

৬৮ বর্ষ, ৫১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৩১শে বৈশাখ ১৩৭১

Thursday, 14th May 1964

# বৈদেশিক দাক্ষিণ্য

পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক ব্যবসায়ের বিদায় আসন্ন বললেও তাতে অবিশ্বাস করার মতো কিছুই নেই। সংবাদটি চরম দুর্ভাগ্যের, তবু নির্মম সত্য। স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত পুস্তক ব্যবসায়কে বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে কী মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা যুক্তির সাহায্যেও বুঝে উঠতে অক্ষম হয়েছি বলেই অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সরকারী মোকাবিলার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

একথা ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক ব্যবসায় আজো সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারে নি। কেন না, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক তুলনায় যেমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের প্রকাশ অনেকটা প্রকাশকদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। অবশ্য সরকারী প্রসাদ-পুষ্ট ব্যবসায়ীরাই পাঠক-সাধারণের প্রতি খবরদারী করে থাকে, অন্যপক্ষে সৎ ব্যবসায়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে পুস্তক ব্যবসায়ের একটা ঐতিহ্য এখনো বর্তমান রয়েছে। আজকাল চমক-লাগানো বইয়ের চটকদারী প্রকাশকের অভাব নেই। কিন্তু একথা আমরা যেন না ভুলি যে, একালে যতই অবজ্ঞাত বলে মনে হোক একদা বটতলা থেকে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছিল—জনসাধারণের কাছে তাদের চাহিদা কম ছিল না। আর সেখান থেকে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বইয়ের সন্ধান আজও আমাদের করতে হয়।

এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, বটতলার বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ মানের তুলনায় নগণ্য হিসেবে পরিগণিত হলেও—ঐ সব বই আমাদের চিত্তের স্ফূর্তি ঘটিয়েছে এবং এদেশের লেখকদের প্রেরণাশক্তিকে জাগিয়ে রেখেছে এবং যথার্থ জ্ঞান প্রচারের সাহায্য করেছে। কিন্তু বৃটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী বা তাঁবেদারদের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ যতোই সুলভ ও মনোহারী হোক না কেন—তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের যোগসাধন ঘটানো অসম্ভব ব্যাপার। ঐ সঙ্গে পি-এল ৪৮০-র ফাঁকা টাকার পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার পশ্চিম-বঙ্গের পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত চল্লিশ হাজার বাঙালী পরিবারকে ভাতে মারার যে ষড়যন্ত্র সুরু করেছেন—তা নিয়ে হয়তো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারে—কিন্তু আরো দুঃখের ব্যাপার, সেই ইতিহাস ছাপার মতো তখন এদেশে সৎ কোনো পুস্তক ব্যবসায়ী আর থাকবে না। কেন না, অসম প্রতিযোগিতার ফলে তখন এদেশের প্রকাশক ও লেখকদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বিদেশী লেখকদের বই বাজারে সস্তায় পাওয়া গেলে—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকাশের স্বপ্নও বিলীন হয়ে যাবে। তাছাড়া, ব্যবসায় নামক বস্তুটি এমন জিনিষ যে, বিদেশী ব্যবসায়ীদের কৃপায় প্রথমে স্বল্পমূল্যে পুস্তক বিক্রিত হলেও—সারা বাজার দখলের পর স্বেচ্ছামতো লেখানো বই তারা চড়া দামে বিক্রি করবেই। সুতরাং বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে বইয়ের বাজার যদি চলে যায়—তাহলে সত্যি সত্যি আমাদের জীবনে দুর্দিন নেমে আসবে। আর চতুর ও ধুরন্ধর বিদেশী বণিকের দল এই ভেবে আনন্দে করতালি দেবে যে, তারা বাঙালীর বুদ্ধির ঘাঁটিতে হাত দিতে পেরে আর-এক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

কী বিচিত্র এই দেশ! কিন্তু এদেশের সর্বাধিক বিচিত্র পুরুষ হচ্ছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। বিহারের শরণ জেলার এই রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিটি ১৯২২ সালে পাড়ি দেন সুদূর আমেরিকায়। তখনো তিনি রাজনীতিতে নাবালক। বলা যায় আমেরিকাতেই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। সেখানে প্রায় আট বছর অবস্থানের মধ্যে পাঁচটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিয়ে এলেন এদেশে নতুন আদর্শ। জনসাধারণের সঙ্গে জয়প্রকাশজীর যোগাযোগ তখনো যৎসামান্য। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগের শোষিত মানুষ একটা নতুন কিছু পাবার জন্য যেন উন্মুখ হয়ে চেয়ে ছিল। জয়প্রকাশজী আমেরিকাতে যে সাম্যবাদের দীক্ষা গ্রহণ করে এদেশে ফিরে এসেছিলেন, তাকে তিনি সমাজতন্ত্রের ধুয়ো দিয়ে এদেশে প্রচার করতে লাগলেন। সাধারণ মানুষ সেই প্রচারের উন্মাদনায় সেদিন মত্ত হল।

১৯২৯ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি লাভ করলেন কংগ্রেসের শ্রম-গবেষণা বিভাগের প্রধান পদ। তারপর পেলেন কংগ্রেসের প্রধান সম্পাদক হিসেবে কার্যপরিচালনার দায়িত্বভার। ১৯৩৪ সালে তিনিই আবার গঠন করলেন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। ইংরেজ সরকারের চোখে তিনি তখন একজন মারাত্মক ব্যক্তি। তাঁর রণহুঙ্কারে ভীত ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বন্দী করলো তাঁকে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বন্দীদশা কাটিয়ে তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন নেশা তাঁর অনেকটা কেটে গেছে। সেই রোমাণ্টিকতা ধূলায় বিলীনপ্রায়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ব্যর্থ জয়প্রকাশজী অন্যদিকে তীর যোজনা করলেন। কিন্তু নেই সে তীরে বিষ। আর গেরুয়া রঙের টুপিধারী শ্রীনারায়ণ প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের হালে পানি না পেয়ে নিলেন নতুন ভেক।

এই বিচিত্র রাজনীতির ধনুর্ধারী জয়প্রকাশের কর্ম-জীবনের পূর্বাপর সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে আজ যদি কেউ থেই হারিয়ে ফেলেন—তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায়। আজ আর তাঁর 'বারুদের রাজনীতি' নেই, তিনি এখন সর্বোদয়পন্থী। তিনি অবশ্য সর্বোদয়ের আড়াল থেকে যে সব মত প্রকাশ করেন, তাও কম বিস্ময়কর নয়। জনতার সঙ্গে বর্তমানে কোনো যোগ না থাকলেও ছদ্মরূপে তিনি রাজনীতিতে বিরাজমান। সেই সুযোগে যখন-তখন আবোল-তাবোল মুসাবিদাও করে ফেলেন। তিব্বত, পাস্তারনাক, হাঙ্গেরী—যেখানে যা আছে সব কিছুর চেউয়ের পরিমাণ করতে চান তিনি, অথচ সেই ঢেউ গায়ে মাখতে তিনি একান্তই নারাজ, কেন না তাতে ধর্ম নষ্ট হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস।

ভারতের জনসাধারণের প্রতি সদা সহানুভূতিশীল আমাদের প্রধানমন্ত্রী এহেন জয়প্রকাশজীর পরামর্শও মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছেন এবং তাতেই হয়েছে সব চেয়ে বেশি বিপদ। আস্কারা পেয়ে—শ্রীজয়প্রকাশ আজকাল যেসব মতামত প্রকাশ করতে সুরু করেছেন—তার সঙ্গে দেশের কল্যাণের কোনো সঙ্গতি নেই। 'পার্টিলেস ডেমো-ক্র্যাসি'র প্রবক্তারূপে তিনি আয়ুবের স্বৈরতন্ত্রকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। পাক-ভারত মৈত্রীবন্ধনের জন্য দোসর পেয়েছেন রাজাগোপালাচারীকে। নাগাভূমি সম্পর্কেও তিনি গণভোটের কথা বলতে কসুর করেন না। ফিজোর সঙ্গে দোস্তীতে তাঁর লজ্জা নেই। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর ব্যাপারেও তিনি মাথা গলিয়েছেন।

তাঁর মত এই যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা না হলে বিদেশীদের কাছে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু এই যে বিদেশী—এরা কারা? কাশ্মীরের চূড়ান্ত

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ

ভারতভুক্তির পর একের পর এক যারা সমস্যার সৃষ্টি করে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে—তারাই আজ তাঁর বন্ধু। জয়প্রকাশজীর অন্তিম আদর্শ কি—আমাদের জানা নেই। কিন্তু সব দলেই নেতৃত্ব দখল করতে গিয়ে যিনি কোনো দলেই পাত্তা পেলেন না, বিদেশ থেকে মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে যিনি আজো বিদেশের আশীর্বাদের জন্য মাথা পেতে দিতে লজ্জিত নন—তিনি যে ভারতের জনগণের মঙ্গলবিধায়ক হবার বিন্দুমাত্র যোগ্যপাত্র নন, তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

# সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

## হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্যের এই দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো এক মোহ। মোহ বটে, কিন্তু মোহেরও শ্রেণীভেদ আছে। সব মোহ মর্মান্তিক নয়। চাঁদ, ফুল, প্রেম, আকাশ—এ জগতে কতো যে মোহের জাল! কবিতায় সেই মোহেরই বন্দনা!

খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের সূর্যকিরণ এখন ইতিহাসের কবরে সুষুপ্ত। সেখানকার মোহমুগ্ধ কবিরা এখন আর জগতের কোনো কবিসভায়,—কোনো আসরে উপস্থিত নেই। সেদেশে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই সংস্কৃতির অভিযান এসেছিল উত্তর থেকে। দক্ষিণের সহজ কবিপ্রাণ তাতে স্বাতন্ত্র্য হারায়। ফরাসী সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসে সে-অবসানের কথা তাড়াতাড়ি বলে নেওয়া হয়। তাড়াতাড়ি চলতেই হয়। কারণ, সময়ের ধারা অফুরন্ত। কোনো মোহই চিরকালের নয়, কোনো চাঁদই অনবসান নয়!

তবু, আজকের সূর্য কাল ফিরে আসে। এক বসন্তের চাঁদ আর-এক বসন্তে দেখা দেয়। একই সূর্য-চন্দ্রের সনাতন মোহের অধীন মানুষ!

ফ্রান্সের 'ত্রুবাদূর' কবির দল তাই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি। অভিজাত সমাজের সঙ্গে ঘুরতে অভ্যস্ত ছিল তারা। নিজেরাও বনেদী ছিল কেউ কেউ। প্রেমের কাহিনী গেয়ে গেয়ে, সুরুচি আর সুশীলতা বজায় রেখে চলবার প্রথা মেনে নিতে হয়েছিল সেই চারণ-কবিদের। মহৎ প্রাণ আর উচ্চমর্যাদা —'নাইটে'র বীরত্ব, আর বিশ্বস্ত সেবকের রমণী-বন্দনা—এই ছিল তাদের সেই কাব্যলোকের নিত্যকথা। এই লক্ষ্যের তাড়নায় পড়ে কবিদের সহজ কাব্যোচ্ছ্বাস হয়তো শুকিয়ে গেছে। হয়তো তারই মধ্যে কখনো চকিতে দেখা দিয়েছে প্রবল আবেগ আর অকৃত্রিম অনুভূতি। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বটে, তবে সে-সব লক্ষণও কম ছিল না। যথার্থ সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায়, তাও ছিল; ছিল তীক্ষ্ণ উক্তি, গভীর বেদনা, ব্যঙ্গের ঝাঁজ,—সূক্ষ্ম প্রকাশ-কলার আকস্মিক স্ফুরণ।

● মিস্ত্রাল

কিছু কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও সে-কালের সেই 'ত্রুবাদূর' কবিদের কাব্যই য়ুরোপের দেশ-দেশান্তরে সাহিত্যের এক-এক রকম 'জাতীয়' ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ফ্রান্সে ত্রয়োদশ শতক শেষ হবার আগেই সে ধারার অবসানের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল স্পেনে, ইটালিতে। খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দশ শতকে পেত্রার্কা-অনুস্থতির ব্যাপকতায় তারই দূরধ্বনি শোনা গেছে,—দান্তের শিল্প-মহিমা-বোধে তারই কিছু প্রভাব ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

উনিশ শতকে ফ্রেদেরিক মিস্ত্রালের (১৮৩০-১৯১৪) কবিতায় প্রভেন্সাল কাব্যের সেই সুদূর অতীত আবার জেগে উঠেছিল। পুরোনো দিনের মোহ ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। বাংলায় তাঁর কোনো কোনো কবিতার অনুবাদ হয়েছে। সত্যেন দত্তের একটি অনুবাদের নাম 'চাঁদনী রাতের চাষ'। সে চাঁদ মদির, অধীর। সে জ্যোৎস্নায়—

জল্-চক্কীর চাকা ঘুরায়ে ঘুরে
কল্লোলি চলে জল কোন্ সুদূরে;

একালের আকাশে কি আর সেকালের চাঁদ দেখা দেবে? সে অন্য দেশ, সে অন্য কাল।

ঝাউ বনে 'পিউ কাঁহা' গাহিছে কে রে!
টাঁপিন-তরু-তলে শশক ফেরে,
ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর
বিস্ফারি দুই আঁখি বসে আছে থির!

আজ নগরসর্বস্ব জটিল হাহাকার-ময় এই বর্তমানে দাঁড়িয়ে সে-কালের এ-দৃশ্য আর কোথাও দেখবার সুযোগ নেই। তবু মোহ দুর্মর। সত্যেন দত্তের অনুবাদটিও চমৎকার। মনের গহনে দেখা দেয়—

ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলে
চাঁদনী ধানের শিষ খোলে আড়ালে!
ভালবাসা ভবঘুরে হল সে ঝোঁকে,
চাঁদের সুতা যে তার লেগেছে চোখে।

মিস্ত্রালের মূলের এই অনুবাদেই সত্যেন দত্ত লিখে গেছেন—

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে
কি জাল বোনে
খেয়াল-মনে!

আবার—

প্রেত-পাণ্ডুর চাঁদ নত-নয়নে
গগন-কোণে
পশম বোনে।
নেবা-উননের কাঁখে ঘুমায় বুড়ি
বুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি;
বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না টিম্
ঝিঁঝি ডাকে তারি ফাঁকে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্।

সেই সে-কাল থেকে একালে ফিরলুম। এখানেও আকাশে আশ্চর্য চাঁদ উঠেছে! কী তিথি আজ, কে জানে। এ-ঘরে দেয়াল-পাঁজি নেই। তিথিটা জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই মুহূর্তে সামনের এই বৃহৎ আকাশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেও ভালো লাগছে না। তবু কী আশ্চর্য, মনে পড়ছে একেবারে বিপরীত সুরের কবিতা—

Shut up talking charming in the
best suits to be had in town
Lecturing on navigation while
the ship is going down.

এ-লেখা একালের কবির। কিন্তু এই কবি যাঁদের মুখ বন্ধ করতে বলেছেন, আমি সে দলের কেউ নই। আমি জীবনসত্য উপেক্ষা করবার মতন মূঢ় নই। তবু ঐ দুটি ছত্রের আশেপাশে মনের মধ্যে জেগে উঠছে অনেকদিন আগেকার এক দৃশ্য। রায়পুরের শাখা-লাইন ধরে ভিজিয়ানা-গ্রামের দিকে এগিয়ে চলছিল ট্রেন। তখন সকাল। চৈত্রশেষের বেলা আটটার রোদ এসে পড়েছিল গাছে গাছে। ঝিক্ ঝিক্ করে রেল-গাড়ি এগিয়ে চলছিল। আমার বয়স তখন ষোল বছরের বেশি নয়। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কী এক রকম শাদা শাদা ফুলের আস্তরণ। সেই সব পুষ্পিত লতামণ্ডপের মধ্যে প্রকৃতির নামহারা ঐশ্বর্য লুটিয়েছিল।

ভাবছি, আজকের এই বিশেষ তিথিটা না-জানার মতন সেদিনের সেই লতারও তো নাম জানা যায় নি। গাড়ির জানলা থেকে এক জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়েছিল অর্ধভুক্ত একটা জন্তুর শব।

জন্তুটার চেহারা ভালো করে দেখে নেবার আগেই দৃশ্যটা পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলুম আরো গভীর জঙ্গলে। জানলার ভেতরে উড়ে এসেছিল সবুজ কয়েকটি পাতা,—কী-একটা লতার ছেঁড়া টুকরো।

সেই সব পুরোনো কথা মনে পড়ছে। মানুষের মনে সব যুগেই সৌন্দর্যের এই অপরূপ মায়া। কখনো ভয়াল, কখনো কোমল,—কখনো কঠোর, কখনো মধুর। মনের এই অনুষঙ্গজাল। ভালো জামা-কাপড়ের সুখাচ্ছাদনের ভেতরে থেকেও মনটা খুশি হতে পারে, আবার দীনদরিদ্রের নিত্য অভাবের মধ্যেও মনের খুশি হতে বাধা নেই।

'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'—মনোভাবের মধ্যে অক্ষমের যে চাতুর্য দেখা যায়, সেইটেই নিন্দের জিনিষ। দেশে যখন আগুন লাগে, তখন দূরে দাঁড়িয়ে আগুন বাঁচিয়ে চলবার পরামর্শ দেওয়াটাই দাম্ভিকতা। কিন্তু তা ব'লে চাঁদ, ফুল, আকাশ দেখে-দেখেও মন তৃপ্ত হবে না,—এ কী রকম কথা? বরং এই কথাই মেনে নিতে হয় যে, ক্ষণিক ভালো-লাগা ব্যাপারটার সঙ্গে সামাজিক ন্যায়-বিচারের অথবা শুভকর্তব্যবোধের যোগ যে সব সময়ে ঘটতেই হবে, তার কোনো মানে নেই। ধরা যাক, সুনীতির আদর্শ-মাফিক জীবনটা আগাগোড়া পর্বে পর্বে বেঁধে নেওয়া গেল। বাল্যে শিক্ষা, —যৌবনে গার্হস্থ্য,—প্রৌঢ় অবস্থায় ভগবৎ-ভাবনা। লোভ নয়, হিংসা নয়, রাগ নয়, মিথ্যাও নয়। আসক্তির পাড়া মাড়ানো চলবে না! —আদর্শ হিসেবে এসব নীতির নিয়ম অকাট্য। কিন্তু আদর্শ দূরের লক্ষ্য। জীবনের গভীর এবং ব্যাপক আবেদনের মধ্যে আদর্শের জায়গা খুবই প্রশস্ত। । তবে, প্রতি দিনের জীবনে আদর্শের নিক্তি ধরেই কি সমস্ত দোলা, সকল চমক, প্রত্যেকটি সুখকর অভিজ্ঞতা আমরা পেয়ে থাকি?

মনে হচ্ছে—আকাশে প্রকাণ্ড সোনার থালা ঐ চাঁদ,—আর নিচে রাস্তায় সারা শরীর ঘষড়ে ঘষড়ে চলেছে, —মিত্রাক্ষরের কল্পনা নয়,—কে একজন, বিপরীত কে একজন। এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল? হায়, সত্যিই কি কোনো মিল নেই।

অবিশ্যি চাঁদকে যে-রূপে দেখা যাচ্ছে, আসল চাঁদ সে রকম কিছু নয়। পৃথিবী থেকে দূর শূন্যে ছিটকে-পড়া ঐ আমাদের বহুকালের উপগ্রহ। নানা স্মৃতির মাধুর্যে বেদনায় রমণীয় ঐ রূপ। চাঁদের স্বরূপ আমরা জানি না। আমাদের দুর্দশার পাশে রেখে, চাঁদকে দেখে দেখে বৃহৎ এক বিপরীতের কথা মনে আসে। সে আমাদের বিশেষ একটা সংস্কার। জ্যোৎস্না আমাদের স্নায়ুর উত্তাপ দূর করে। চাঁদ আমাদের রূপকথা। দুঃখ-দুর্ভোগ আমাদের বিচলিত করে। কিন্তু শ্বাসরোধ-করা স্থূল, নির্মম কোনো কোনো দুঃখে আমাদের জীবনতরী যখন জগৎ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, জ্যোৎস্না কি তখন আত্মগোপন করে? মায়ের কোলে শুয়ে কতো শিশু এখন চাঁদ দেখছে,—কতো বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে, দেবদারুর ঝিলমিল ঝরোখা বেয়ে,—কতো সমুদ্র-ছোঁয়া পাহাড়ের গায়ে, নদীর চরে, উধাও মাঠে জ্যোৎস্নার জোয়ার বয়ে চলেছে! এদিকে পৃথিবীর ঘরে ঘরে কতো অভাব, কতো রোগ, শোক, মহামারীর যন্ত্রণা!

তাই মনে হয়—এই রকম চকিত সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে কল্যাণের যোগ যে থাকতেই হবে, তার কোনো মানে নেই। তবে, সমস্ত খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, আংশিক ব্যাপারকে একসূত্রে ধরবার, গাঁথবার, এবং সম্পূর্ণ করে পাবার ইচ্ছেটাও অকৃত্রিম। সেটাও সৌন্দর্যপ্রেমিকেরই স্বভাব। আমরা যখন

কোনো করে চুকি, তখন আমাদের অজ্ঞাতসারেই চোখ প্রথমেই গিয়ে পড়ে খোলা জানলার দিকে। কারণ, আলো আমাদের সহজ প্রিয়! আমাদের চোখ-কান বিচিত্রের দিকে সদাই উদ্যত। যেন সমস্ত অবরোধ ভেদ করে প্রজাপতি কেবলি বেরিয়ে যাচ্ছে!

মিস্ত্রালের লেখাতেও সেই বিচিত্রতার স্বাদ। সে স্বাদ আজকের নয়,—চিরকালের। সেই চিরকালের দিকে নজর ফেরানো যাক্।

ফ্রান্সের উনিশ-শতকী কবিতার ধারায় প্রভেন্সাল ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল আলুতো ফ্রেদেরিক মিস্ত্রালের রচনায়। ১৯০৪-এ তিনি নোবেল পুরস্কার পান। বাংলায় ১৩২১-এর আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে সেই মিস্ত্রালের কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়—'মিস্ত্রাল শুধু নিজেরই রচনা দ্বারা প্রভেন্সাল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি অতীতকালের বহু বিস্মৃত প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, ছড়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন---।'

তারই এক বছর পরে ১৩২২-এর আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে মিস্ত্রালের কয়েকটি অনুবাদ ছাপা হয়। অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হয়তো মিস্ত্রালের আঞ্চলিকতা-প্রীতিই সত্যেন দত্তের সে-পর্বের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। তিনিও নানা দেশের নানা কালের বিশেষ বিশেষ 'আঞ্চলিকতা'র নমুনা রেখে গেছেন তাঁর অজস্র অনুবাদে।

কিন্তু সে-কথা যাক। মিস্ত্রালের আগে প্রথম যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনিও একজন ফরাসী সাহিত্যিক। রেনে ফ্রান্সোয়া আরমাঁ সুলি-প্রুধোম পান ১৯০১-এ। তারপর পান মিস্ত্রাল। কিন্তু মিস্ত্রালের একজন অংশীদার ছিলেন। তিনি স্পেনের নাট্যকার এখেগারে। তাঁর কথা পরে ভাবা যাবে।

মিস্ত্রালের পিতা ছিলেন ধনী কৃষিজীবী। ছেলেকে তিনি আইন পড়াতে চেয়েছিলেন। আভিগনোর ইস্কুলের পড়া শেষ করে নিমি (Nimes) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হন মিস্ত্রাল। জোসেফ রুমানিল্ নামে এক শিক্ষক ছিলেন আভিগনোর সেই ইস্কুলে। প্রভেন্স-অঞ্চলের ভাষা-রীতিতে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। আর, দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও ছিল আন্তরিক ঝোঁক। বিশ বছর আগে তাঁদের গ্রামে প্রাচীন ত্রুবাদুর গান গেয়ে শুনিয়েছে Jacques Jasmin নামে দক্ষ এক কবি। আভিগনোর সেই মাস্টারমশাই হয়তো তারই ফলে ভারি উৎসাহিত হন। নিজেদের গ্রামে তিনি এক যুবসংঘ গড়ে তোলেন। সাত-সাতটি স্বপ্ন-লোভাতুর কবি সেই সংঘের সদস্যদের মধ্যে গণ্য হন—রুমানিল, মিস্ত্রাল, ওবানিল, মাথিউ আর ব্রুনে (Roumanille, Mistral, Aubaniel, Mathieu, Brunet)।

মিস্ত্রালের অভ্যুদয় সম্বন্ধে এই এক কাহিনী; আবার এও বলা হয় যে, মিস্ত্রাল প্রথমে প্রচলিত সাহিত্যিক ফরাসী ভাষাতেই তাঁর কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর মা সে-ভাষা বুঝতেন না। মাতৃভক্ত মিস্ত্রাল নিজের মাকে শোনাবার জন্যেই প্রভেন্স-অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে মন দেন। আর, ছড়া, গান, কথা, কাব্য—সে-অঞ্চলের নানা রচনা ঘেঁটে ঘেঁটে ১৮৫৮তে তিনি তাঁর নিজের মৌলিক যে-কাব্যটি লিখে ফেলেন, তারই নাম 'মিরিও' (Mireio)।

সে এক মহাকাব্যের মতন। পুরো বারোটি সর্গে তিনি স্থানীয় নানা অভ্যাস-আচরণ, কীর্তি-কাহিনীর কথা জানিয়েছেন। উনিশ শতকের মধ্যপর্বের সেই রচনা প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর নানা পাঠকের মনে মনে জায়গা জুড়েছে। কোনো কোনো পাঠক ভেবেছেন মিস্ত্রাল ভার্জিল-এর সঙ্গে তুলনীয়, কেউ-বা বলেছেন থিওক্রিটাসের সঙ্গে,—কেউ আবার অ্যারিয়স্টো-র সঙ্গে।

কিন্তু এসব তুলনার কথাও যাক্। তাঁর 'মিরিও' কাব্যের বিষয়বস্তুর কথাটাই প্রাসঙ্গিক। মিরিয়ো ছিল ধনী এক কৃষকের কন্যা। এক অতি গরীব ঝুড়ি-কারিগরের ছেলের সঙ্গে তার ভালোবাসা ঘটে যায়। একে-একে অনেক সুখের দিন,—অনেক দুঃখের রাত কাটে তাদের জীবনে। পরিশেষে মিরিওর মৃত্যু হয়। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকে অন্ধকার যেন নীরন্ধ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু তারই মধ্যে মিরিওর অন্তিম উক্তিতে শোনা যায় আশার বাণী। মিস্ত্রাল তাঁর এই কাব্যের প্রস্তাবনায় লিখেছিলেন—'মিরিওর জন্যে আমার এই গানে আমি এক সিংহাসন সাজিয়ে দেবো,—নিজেদের এই উপেক্ষিত ভাষাতেই তাকে 'রাণী' বলে অভিনন্দিত করবো!'

সে-কাজ তিনি করে গেছেন।

'মিরিও'র পরে ১৮৬৭তে তাঁর 'ক্যালেণ্ডো' (Calendau) বেরোয়,—তারপর 'নের্তো' (Nerto)। ১৮৭৫-এ Les Isles d'or নামে তাঁর আর এক কবিতা-সংগ্রহ ছাপা হয়। ১৯১২তে বেরোয় 'Les Olivades'। মিস্ত্রাল তাঁর এই শেষের বইখানির নামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখে গেছেন---'দিন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে,—সমুদ্র ফুলে উঠেছে,—সবকিছুই আমাকে বলছে যে আমার দিন শেষ হয়ে এলো,—এবার ঈশ্বরের জন্যে এই আমার পুষ্পাঞ্জলি!'

জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁর এই আহরণে-সমর্পণে ভরে উঠেছিল!

সেও মোহ! মিস্ত্রালের দেশপ্রেমও তো গভীর এক রকম জীবনাসক্তি। উনিশ শতকের শেষদিকে তিনি প্রভেন্স-অঞ্চলের ফুল, পাতা, পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক প্রত্নশালা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সেই কাজটিকেই তিনি তাঁর 'শেষ কাব্য' বলে গেছেন। লিখেছেন তাঁর আত্মকথা। ভালো-বেসেছেন নিজের মাতৃভাষাকে আর গ্রামকে,—দেশকে,—দেশের কতো যে ফুল-পাখি-লতা-পাতা,—বীরত্ব আর প্রেমের গল্প,—কতো ছড়া আর প্রবাদ-প্রবচন। অর্থাৎ প্রাচীন প্রভেন্সের সমস্ত স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ মিশতে দিয়েছিলেন। তারপর, স্বপ্নের নদীতে তাঁর কল্পনার চাঁদ উঠেছিল। আজ সেই চাঁদের মোহ ফিরে এল মনে। মন বলছে—

ভালবাসা ভরঘুরে মন সে ঝোঁকে
চাঁদের সুতা সে তার লেগেছে চোখে।

(ক্রমশঃ)

● নেপালের রাজা মহেন্দ্র ভৈঁসালটনে ( বাল্মীকি নগরে ) গণ্ডক ব্যারেজের শিলান্যাস করছেন।

## রাজধানী :

রোদের তাপ বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। তার ওপর রাজস্থানের মরু অঞ্চলের হলকা হাওয়া এসে রাজধানীকে করে তুলেছে আরও উত্তপ্ত। শুকিয়ে উঠেছে ঘুঁই আর গোলাপের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপের মাত্রাটাও উঠছে উত্তুঙ্গ হয়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহ দিল্লীকে বরাবরই করে তোলে কতকটা রিক্ত সন্ন্যাসীর মত। রিক্ততা ও বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্য রাজধানীর মানুষগুলো তখন ছুটে চলে হিমালয়ের কোলের দিকে—কেউ যায় কাশ্মীরে, আবার কেউ বা আশ্রয় নেয় মুসৌরী অথবা অন্য কোন চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত জায়গাতে। কিন্তু এবারে সবই যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরের শের'কে নিয়ে যে-অভিনয়ের মহড়া চলেছে এবং তিনি নিজেও নয়া নয়া ওস্তাদের কাছে তালিম পেয়ে প্রতিনিয়ত যে-ভাবে 'দৃশ্য' পরিবর্তন করে চলেছেন, তাতে দিল্লীবাসী রিক্ত সন্ন্যাসীর মতই অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বসে উত্তেজনার উত্তাপ পোহানো ভিন্ন আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

শেখজী দক্ষিণ দেশের চাণক্য-প্রতিম চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর কাছ থেকে কাশ্মীরের সর্বরোগহর বিধান নিয়ে দিল্লীতে ফিরেছেন। কি বিধান এই ক্ষুরধার বুদ্ধি, ক্ষীণদেহ বৃদ্ধ দিয়েছেন তা' ফাঁস করতে শেখ আবদুল্লা নারাজ। তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনার শেষ না করে রাজাজীর দাওয়াই প্রকাশ্যে বাতলাতে প্রস্তুত নন।

এই অব্যর্থ দাওয়াই কি তা নিয়ে চলেছে রাজধানীতে জল্পনা-কল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সৃষ্টি হচ্ছে গভীর উদ্বেগ। ভারতের একটি মানুষও কুখ্যাত সি-আর ফরমুলার কথা বিস্মৃতির অতল গর্ভে ঠেলে দিতে পারে নি। আজ থেকে কুড়ি বছর আগের কথা। রাজাজীর সঙ্গে জিন্না সাহেবের আঁতাত হয়েছিল এই ফরমুলার মাধ্যমে। সেদিন তিনি পাতি দিয়েছিলেন ভারতের কল্যাণে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। তাঁর কাছ থেকে মদত পেয়েই মুসলিম লীগ জোরদার সংগ্রাম চালিয়েছিল। এবারে তেমনি ভেল্কিবাজীই মানুষ তার কাছ থেকে আশা করে। কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর ও তাঁর দলের মতও অবিদিত নয়। তিনি চান যেন-তেন প্রকারে স্বাধীন কাশ্মীরের সৃষ্টি করে পাকিস্তানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমেরিকার তাঁবেদারীতে নেমে পড়তে। কিন্তু ভারতের মানুষ দীর্ঘকাল পরশাসনের দুর্ভোগের পর নতুন করে কারও তাঁবেদার হতে প্রস্তুত নয়। তাই এত উত্তেজনা। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন কাশ্মীরের কোন নয়া ফয়সালা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর অনেকেই কিছুটা আশ্বস্ত অবশ্যই হয়েছেন। অতীতের ঘটনা—বেরুবাড়ী, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি এবং তিব্বতের ঘটনাবলী যাদের স্মৃতির দুয়ার খুলে বেরিয়ে যায় নি তাদের সংশয় কিন্তু এখনও কাটে নি।

আমরা আগে যা বলেছি, এখনও সেই মতই পোষণ করি। সদ্য কারামুক্ত শের-ই-কাশ্মীর গগন-বিদারী যে গর্জন তুলেছিলেন তার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে—বাস্তবের ধাক্কায় কিছুটা তিনি শুধরিয়ে নিয়েছেন। এখন আর তাঁর স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নের ঘোর নেই। কাশ্মীর উপত্যকার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিবর্তন তাঁর কাম্য নয়। কাশ্মীরের বর্তমান স্থিতাবস্থার পরিবর্তন তাঁর কাম্য। ক্ষমতালিপ্সু মানুষ শেখ আবদুল্লা। ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা সহজ নয়। তাঁর ক্ষমতার চটক অবশ্য অনেকখানি এর মধ্যে কেটে গিয়েছে। কাশ্মীরের রাজনীতির অলিগলিতে আরও কিছুদিন ঘুরপাক খেলেই তিনি আরও সম্বিৎ ফিরে পাবেন। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভারত সরকারের ওপর। ভারত সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে শেখজী ও তাঁর সাকরেদদের ছটফটানি এবং দাপাদাপি কমতে বেশিদিন লাগবে না। তবে, আবদুল্লাকে আরও কিছুদিন দিল্লীর দরবারের আশে-পাশে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার সঙ্গে একটু নজর রাখতে হবে, এমন কিছু মানুষের ওপর—গাঁয়ের লোকে না

● রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে শলা-পরামর্শরত শেখ আবদুল্লা

আমলেও যাঁরা মোড়লীর চাপকান পরে বসে আছেন এবং মানবিকতা, স্বাধীনতা-বোধ, নিরপেক্ষ মতবাদ ও রাজনীতির জগাখিচুড়ি পাকিয়ে পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে অম্লান বদনে বিতরণ করে চলেছে।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের জয়ঢাকের বাদ্যির কথাই আমরা বলছি। কখন যে কোন তালে তিনি ঢাকের বাজনার বোল তোলেন, বোঝা মুস্কিল। একবার তিনি রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ গণ-তন্ত্রের আজগুবি বুলি তুলে সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছিলেন। এবারে তিনি উদাত্তকণ্ঠে শেখ আবদুল্লার জয়গান গাইতে সুরু করেছেন। তাঁর মতে, গণ-ভোট ছাড়া কাশ্মীরের কোন স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। ভারতের অপরাপর প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যেও গণভোট নেওয়া উচিত কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন জবাব দেন নি। দ্রাবিড়ীস্থানের দাবীর প্রশ্নও তাঁর কাছে তোলা হয়েছিল। এ সব প্রশ্নে তাঁর বিরক্তির উদ্রেকই হয়েছিল।

বিপ্লবী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আজ শান্তির পূজারী। আয়ুবের তিনি গুণ-গ্রাহী। আয়ুবের কাছে শান্তির পতাকা নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগপর্ব তিনি করে চলেছেন। তাঁর দৌত্যে এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ফিরে এলে খুশি হবেন সকলেই।

তার আগে হিংসায় উন্মত্ত পাকি-স্তানের রাষ্ট্রনায়কদের কানে শান্তির বাণী পৌঁছে দিতে পারলে কাজটা হবে সহজ। পূর্ব বাংলার মানুষ আয়ুবের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গণমনের স্বাধীন অভিব্যক্তি তাদেরও দাবী। সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে সত্যিকারের মহৎ কার্য সাধিত হবে। আয়ুবের অত্যাচারে বেলুচিদের নাভিশ্বাস উঠেছে। পবিত্র ঈদের নামাজ পাঠরত বেলুচিদের ওপর আয়ুবের বোমা নির্মম আঘাত হেনেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বেলুচিস্থানের এবং পাকতুনিস্থানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীও অত্যন্ত ন্যায্য। আয়ুব খাঁকে মানবিক অধিকারের তত্ত্বকথা শুনিয়ে বেলুচিস্থান ও পাকতুনিস্থানের দাবীর যৌক্তিকতা প্রদর্শনে জয়প্রকাশের কার্পণ্য কেন? আসল কথা, রাজা-গোপালাচারী, মিনু মাসানি এবং জয়প্রকাশ তরী বেঁধেছেন একই ঘাটে। সে ঘাটের মালিকদের মর্জিমাফিক চলাই হল এঁদের প্রধান কাজ। তাই চীনের আক্রমণের দোহাই দিয়ে জন্মশত্রু পাকিস্তানের দরদে এঁদের হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁদের ভেল্কিতে কেউ ভুলবে না।

শেখ আবদুল্লা এঁদের কাছে পাঠ নিয়ে কাশ্মীরের গণভোট তৃতীয় নিরপেক্ষ শক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালনার দাবী তুলেছেন। এই দাবী মানতে হলে ভারত সরকারের কাশ্মীরের ওপর সার্বভৌম অধিকারই আর থাকে না। তাই বলছিলাম শেখজী এখনও প্রকৃতিস্থ নন। কাশ্মীরে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখলে পাকিস্তানের দাবী যায় ভেস্তে, কারণ পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র। স্বাধীন কাশ্মীরও তাঁর কাম্য নয়। তবে, কি তিনি চান? কোন দাওয়াই দক্ষিণ দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন?

এদিকে তাঁর গতিবিধি দেখে পাকিস্তান পড়েছে বড় বিপাকে। তাই ঘন ঘন চিঠি পাঠাচ্ছেন শেখের কাছে আয়ুব। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা বলার আগে পাকিস্তান চাইছে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে একবার মোলাকাত করে নিতে। আবদুল্লা তাতে সম্মত নন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু করতেও পারেন না। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান ফরমান জারী করেছে, তাঁদের মতামত না নিয়ে শেখ আবদুল্লা যেন কোন মীমাংসার চেষ্টা না করেন। দিল্লী ধৈর্য ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললে আবদুল্লাকে সামলানো কষ্ট-সাধ্য হবে না বলেই আমরা মনে করি। আবদুল্লা সংযত হলে পাকিস্তানের গলা-বাজিও বন্ধ হবে।

* * *

তাড়াহুড়ো করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখলে যে জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে। মানা, কুরুদ, নয়াগাঁও প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবিরে নেমে এসেছে মৃত্যুর ছায়া। এক মাসের মধ্যে এই শিবিরগুলোর ৪২৬ জন উদ্বাস্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ছায়াঘন পূর্ব বাংলার গ্রামের স্নিগ্ধ, শ্যামল আশ্রয়ে যাদের জীবন গড়া তাদের গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে দণ্ডকারণ্যের গাছপালাহীন মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুর ভেতরে। ১১৫ ডিগ্রী তাপে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। স্বাভাবিক

নিয়মেই দেখা দিয়েছে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব। মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষার আশায় অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতিপর্ব অন্যায় নিশ্চয়ই নয়। কুরুদ ও নানা শিবির থেকে ৫০০ উদ্বাস্তু ফিরে এসেছে। উড়িষ্যা থেকে সাড়ে সাত শ' উদ্বাস্তু চলে এসেছে। একবার শিবির ত্যাগের হিড়িক পড়লে তাকে প্রতিরোধ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু এসেছে প্রায় আড়াই লক্ষ। তার মধ্যে ৯৫ হাজার উদ্বাস্তুকে হাজির করা হয়েছে দণ্ডকারণ্যের ঊষর অঞ্চলে। মধ্যপ্রদেশ ২৫ হাজার, উড়িষ্যা ২৫ হাজার, মহারাষ্ট্র ১০ হাজার, বিহার ৫ হাজার, উত্তরপ্রদেশ ৫ হাজার এবং দণ্ডকারণ্যে ১০ হাজার উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাকি ১৫ হাজারকে আপাতত শিবিরেই পচতে হবে। এই অবস্থায় উদ্বাস্তুরা শিবির ত্যাগ করলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করলে এ অবস্থার সৃষ্টি নিশ্চয়ই হতো না।

অথচ সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে দণ্ডকারণ্য সংস্থার পরিচালক শ্রীজনসন খোশ মেজাজে নিজের আধিপত্য বজায় রাখবার চক্রান্তজাল বুনে চলেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্তকে সরিয়ে দেবার কারসাজিও করেছিলেন। পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীর জন্য তাকে রণে ভঙ্গ দিতে হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীত্যাগী শ্রীজনসনকেই ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিহার সরকারের বিভাগীয় কমিশনার শ্রী এস সি রায়কে দণ্ডকারণ্যের প্রধান পরিচালকের পদে নিযুক্ত করার কথা চলছে। দণ্ডকারণ্য সমস্যা সম্পর্কে শ্রীরায় ওয়াকিবহাল। পরলাকোটের পুনর্বাসনের সাফল্য তার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। নতুন প্রস্তাব কার্যকরী হলে দণ্ডকারণ্য দুষ্টগ্রহ মুক্ত হবে বলেই আমরা মনে করি। উদ্বাস্তুদের মনে সঞ্চার হবে নতুন আশার।

* * *

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা আরেক কিস্তি বাড়িয়ে দেওয়া হল। যাঁদের বেতন চারশ' টাকা পর্যন্ত তাঁদের ভাতা বাড়লো সাড়ে তিন টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত। চারশ' টাকা থেকে যাঁদের বেতন পাঁচশ' আশি টাকা তাঁরা পাবেন বিশ টাকা করে। পাঁচশ' একাশি টাকা থেকে ছয়শ' টাকা যাঁদের বেতন তাঁরা পাবেন উনিশ টাকা।

অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি আর ভার্গব ৭ই মে রাজ্যসভায় সংশোধিত মহার্ঘ ভাতার হার ঘোষণা করেছেন।

● শ্রীমহাবীর ত্যাগী

১লা ফেব্রুয়ারী থেকে এই নতুন হার কার্যকর হবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী গদীতে বসার পর থেকেই কর্মচারীদের দুর্মূল্যের বাজারে কিছুটা করে আর্থিক সুবিধাদানের চেষ্টা করে চলেছেন। এতে কর্মচারীরা খুশি হবেন নিশ্চয়ই; কিন্তু তাদের দৈন্য ঘুচবে না। এই দেউলিয়া অর্থনীতির সমালোচনা আমরা পূর্বেও করেছি। ভোগ্যপণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারলে সরকারের কোষাগারের অর্থই শুধু ব্যয় হবে—কোন সুরাহা তাতে হবে না। সংশোধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে সরকারের এক বছরে খরচ বাড়বে চোদ্দ কোটি টাকা। প্রয়োজনবোধে সরকার সার্বসিডি দিয়ে মূল্যমান মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখলে এর চাইতে ফল অনেক ভাল হবে।

* * *

সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় গঠিত সুরাটগড়ের কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে এক রূপান্তরের সঙ্কেতদান করেছে। সারা ভারতের কৃষক ও জনসাধারণ এই কৃষিক্ষেত্রের সাফল্যে উৎসাহিত। এখন সোভিয়েট সহযোগিতায় আর একটি এই ধরণের কৃষিক্ষেত্র গঠনের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যন্ত্রপাতি দেবে। এই কৃষিক্ষেত্র গঠিত হবে রাজস্থানের জেটসার গ্রামে।

* * *

সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলিকে কংগ্রেসের বাইরে রেখে সংহতি গঠনের জন্য প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কামরাজ-অশোক মেহতার কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের সমবেত করার পাল্টা হিসাবে এই উদ্যোগ করা হয়েছে। কারণ অশোক মেহতার সঙ্গে বহু পি-এস-পি সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করায় পি-এস-পি নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

পি-এস-পির নেতারা ইতিমধ্যে কৃষক-মজুর দলের (পি-ডবলিউ-পি) সঙ্গে দিল্লীতে কথাবার্তা সুরু করেছে। কৃষক-মজুর দল বিনাসর্তে পি-এস-পির সঙ্গে একত্রীকরণের পক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু, পি-এস-পির (সোস্যালিষ্ট পার্টি) একত্রীকরণের ব্যাপারটা আগে সমাধা হবার জন্য কৃষক-মজুর দল অপেক্ষা করছে। পি-এস-পির এই নতুন উদ্যোগে জয়প্রকাশ নারায়ণের সমর্থন আছে বলে তাঁরা দাবী করছেন। সম্ভবত এই কারণে লক্ষ্ণৌতে অশোক মেহতার দলের কনভেনসনে তিনি আমন্ত্রিত হয়েও যোগ দেবেন না।

সমাজতন্ত্রী দলের একত্রীকরণের জন্য পি-এস-পি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল

● শ্রীঅশোক মেহতা

(আর-এস-পি) এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছে। জানা গেল ফরোয়ার্ড ব্লক একত্রীকরণের পক্ষে।

কলকাতার ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এলে এই প্রস্তাব কার্যকরী হবার পথে অগ্রসর হবে। এইভাবে প্রাথমিক সাফল্যে পি-এস-পি নেতারা উল্লসিত। তাঁরা ভাবছেন এতে অশোক মেহতাকে যোগ্য উত্তর দেওয়া গেল এবং এর ফলে গুজরাট মহীশূর রাজ্যে অশোক মেহতার পূর্ণ সমর্থনেও কিছুটা ফাটল ধরেছে।

## কেরালা ঃ

আগামী মধ্যবর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচনে 'ক্ষমতা দখলের' জন্য কেরালায় স্বতন্ত্র পার্টি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কেরালায় স্বতন্ত্র পার্টির নেতৃত্বে মন্ত্রিত্ব গঠনের সংকল্পে ইতোমধ্যেই স্বতন্ত্র পার্টি নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, ক্যাথলিক চার্চ মুসলিম লীগ এবং পি-এস-পির একাংশের সঙ্গে ঐক্য গঠনের চেষ্টা সুরু করেছে। এই ঐক্যের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীচাকো। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীচাকো আগামী সপ্তাহে অথবা যে কোন সুবিধাজনক মুহূর্তে কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এবং কেরালায় স্বতন্ত্র পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

জানা গেল, প্রায় একমাসকাল পূর্বে শ্রীচাকো স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়ে সি রাজাগোপালাচারীকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। রাজাজী তাঁকে স্বাগতম জানালেও সঙ্গে সঙ্গে একথা বলেছেন যে, চাকো একা কংগ্রেস ত্যাগ না করে সদলে যেন স্বতন্ত্র পার্টিতে আসেন। চাকো রাজাজীর এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন নি। এখন তিনি ২০জন বিধানসভার সদস্য নিয়ে স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন।

শ্রীচাকোর এই সিদ্ধান্তে কেরালায় স্বতন্ত্র পার্টির আশার অধিক লাভ হ'ল। বিনা আয়াসে তারা বিধানসভার ২০জন সদস্যের গ্রুপ লাভ করছে। এতে উৎসাহিত হয়ে রাজাজী স্বয়ং 'কেরালা অভিযান' চালাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি নায়ার সার্ভিস সোসাইটির সর্বেসর্বা শ্রীমন্মথনাথ পদ্মনাভনের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি শ্রীপদ্মনাভন চলচ্চিত্র তারকা শ্রীমতী রাগিণীর বিবাহে মাদ্রাজ এসেছিলেন। জানা গেল, শ্রীমন্মথ পদ্মনাভন রাজাজীকে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কেরালায় কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার প্রধান নায়ক ছিলেন শ্রীমন্মথ পদ্মনাভন। মুসলিম লীগের সমর্থন যে রাজাজী লাভ করবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ দেশ বিভাগ থেকে সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যন্ত তাঁর মতামতের দরুণ

● শ্রীচাকো

মুসলমানদের তিনি আস্থাভাজন। রাজাজী নিজেই এবার কেরালা যাচ্ছেন। রাজাজীর এই 'কেরালা দখলের অভিযান'-এ আর একজন পার্শ্বনায়ক হচ্ছেন উগ্র-ধর্মযাজক ফাদার ভাদাক্কন। এই কমিউনিষ্ট-বিরোধী ধর্মযাজক এখন কংগ্রেস বিরোধীও হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কেরালায় স্বতন্ত্র পার্টি গঠনে উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানিয়ে রাজাজীকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর একমাত্র সর্ত ছিল শ্রীচাকোকে স্বতন্ত্র দলের নেতৃত্বের অধিকার দিতে হবে।

আর একটি রহস্যজনক ঘটনা, সম্প্রতি কোচিনে চাকোর দল, স্বতন্ত্র পার্টি, মুসলিম লীগ, কিছুসংখ্যক পি-এস-পি, ক্যাথলিক চার্চ, নায়ার সার্ভিস সোসাইটির প্রতিনিধি এবং বহু সংখ্যক রোটারিয়ান এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। সেই সভায় কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার রণকৌশল ঠিক করে, সভার পরে একজন রোটারিয়ান বলেছেন যে, 'কোন দামে হোক আমরা কেরালা অধিকার করবো।'

* * *

কেরালার কমিউনিষ্টদের মধ্যে যারা জাতীয় পরিষদের সমর্থক, তারা বামপন্থীদের ওপর সাসপেনসন প্রত্যাহারের পক্ষপাতী, যদি বামপন্থীরা বিভেদমূলক কাজ বন্ধ রাখেন।

কেরালার কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য-কমিটীর (দক্ষিণ পন্থী) সেক্রেটারী শ্রীঅচ্যুত মেনন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি গঠনের কাজ বন্ধ রাখলে আমরা বামপন্থীদের সঙ্গে ঐক্যের প্রস্তাব আলোচনা করতে রাজি আছি।

আগামী নির্বাচনের জন্য রাজ্যভিত্তিক কমিউনিষ্টদের ঐক্য সম্পর্কে বামপন্থীদের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—এইরূপ ঐক্য কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই হতে পারে। দক্ষিণ ও বামপন্থীদের পাল্টা পার্টির কাজ বন্ধ রাখার জন্য শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের বিবৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন,—'অফিসিয়াল' পার্টির কাজ বন্ধ রাখার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভেদে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কোন হাত নেই—শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের এই বিবৃতির প্রতিবাদ করে শ্রীঅচ্যুত মেনন বলেছেন—চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যে পাল্টা পার্টি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। সিংহলে এবং বেলজিয়ামে পাল্টা পার্টি গঠনের দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেন। শ্রীমেনন মনে করেন কেরালায় জাতীয়

● শ্রীগোপালন

পরিষদের প্রতি অনুগতদের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও শ্রী এ কে গোপালনের প্রচার সত্ত্বেও অটুট থাকবে।

## বিহার ঃ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে চম্পারণ জেলার ভৈষালোটনে ৪ঠা মে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ভারত ও

নেপালের অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনার এবং ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর অন্যতম প্রতীক ২৩৪৭ ফুট দীর্ঘ গণ্ডক বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন, ভারত সরকার নিজ ব্যয়ে হনুমান-নগর থেকে রাজবিরাজ এবং ফতেপুর থেকে কানলিবাজার পর্যন্ত পাকা সড়ক এবং নেপাল সরকারের সম্মতিক্রমে কোশী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিরাট নগর ও রাজবিরাজ পর্যন্ত বিদ্যুৎবাহী তার সংযোগ করে দেবেন। অতীতে কোশী ও গণ্ডক বহু গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস করেছে। এই দুটি নদীপ্রকল্প সম্পন্ন হলে ভারত ও নেপালের কৃষি কাজের ও বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতিবিধানে সহায়ক হবে।

রাজা মহেন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেছেন, সন্নিহিত দুটি দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি উভয় এলাকার গণমনের ওপর প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। এই দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বের বিরাট ঐতিহ্য। সমতার ভিত্তিতে এই বন্ধুত্বের মনোভাবকে বজায় রাখার জন্য বরাবর সক্রিয় থাকলে উভয় দেশই উপকৃত হবে, সন্দেহ নেই।

বিহার, উত্তর প্রদেশ ও নেপালের সংযোগস্থলেই এই বাঁধের এলাকাটি অবস্থিত। বাহান্ন কোটি টাকা খরচ করে ভারত সরকার এই বাঁধটি নির্মাণ করছেন। এর কাজ শেষ হতে সময় লাগবে চার বছর। ভিত্তিবেদীর গায়ে আঁকা ছবিতে ভারত ও নেপাল হাত ধরে আছে। উভয় দিকেই হাতে লেখা রয়েছে 'জয় ভারত' ও 'জয় নেপাল'।

পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের আদি কবি ঋষি বাল্মীকির স্মারক হিসেবে ভৈষালোটন এলাকার নতুন নাম হবে বাল্মীকি নগর। গণ্ডকের পশ্চিম তীরে ঋষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রম ছিল, এই বিশ্বাস থেকেই নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে। বাঁধটির কাজ শেষ হলে বিহারের সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙা জেলা, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর ও দেওরিয়া জেলা এবং নেপালের চার চারটি জেলা চিসাপানিগাড়ি, বোরা, পুবসা হাওহৎ উপকৃত হবে। উন্নত ধরণের সেচ ব্যবস্থায় একমাত্র বিহারেই প্রায় দু' কোটি বিশ লক্ষ মণ অধিক শস্য উৎপন্ন হবে। নেপালের প্রায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার একর জমিতে সেচের সুবিধা হবে।

রাজা মহেন্দ্রকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, বিহারের রাজ্যপাল, গণ্ডক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীআয়েঙ্গার, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায়। শ্রীনেহরুর সঙ্গে এসেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রসচিব শ্রীওয়াই বি গুণ্ডেভিয়া।

ভারত ও নেপালের বন্ধুত্বের বন্ধন গত এক বছরের মধ্যে কতটা দৃঢ়তর হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল গণ্ডক বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। স্মরণাতীতকাল থেকে ভারত ও নেপাল সকল দিক দিয়ে প্রায় একই সূত্রে গাঁথা। রাজনৈতিক দিক থেকেও বিচার করলে দেখা যাবে ভারত যখন পরশাসনের নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট তখন নেপালে চলেছে রাণাশাহীর স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতালাভের পর নেপালের সামন্ততন্ত্রের পেষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রামে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। রাজা মহেন্দ্র কৈরালা সরকার বাতিল করার পর নেপাল সরকার চীনের পরোক্ষ প্ররোচনায় ভারতের প্রতি সন্দিহান হতে থাকেন। চীন তো ভারতের হাত থেকে রাজা মহেন্দ্রকে বাঁচাবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল—ঘোষণা করেছিল ভারত রাজা মহেন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করলে চীন এসে নেপালের পাশে দাঁড়াবে। নেপালের হৃদয় থেকে এই অমূলক সন্দেহের অপসারণ করতে ভারতকে কম বেগ পেতে হয় নি। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েছে—নেপাল বুঝতে পেরেছে ভারত বরাবর তার মিত্রই ছিল এবং এখনও তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী গণ্ডক বাঁধ প্রকল্পের সাফল্য আরও প্রমাণ করবে নেপাল ও ভারতের ভৌগোলিক সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি দুটি দেশের অগ্রগতিও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

## মধ্যপ্রদেশ ঃ

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের নির্বাচন উপলক্ষে দলাদলি চরমে উঠেছে। মন্ত্রীসমর্থকদল ছত্রিশগড়ে এখন নিজেদের ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ তখত মল—দেশলেহরা গ্রুপের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করা। এই উদ্দেশ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান শ্রী এম সি দেশলেহরাকে এবং প্রাক্তন উপ-মন্ত্রী শ্রীসারদাচরণ তেওয়ারীকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলছে। কারণ এই দুই জনের ছত্রিশগড়ে যথেষ্ট প্রভাব আছে। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে ছত্রিশগড় হচ্ছে প্রধান কেন্দ্র। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এই অঞ্চল। জনসংখ্যার দিক থেকেও এই অঞ্চলের মানুষ মধ্য প্রদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। ছত্রিশগড়ের বিশেষ করে বিলাসপুরের এম-এল-এ-রা কংগ্রেস রাজনীতির ভাগ্য নিয়ন্তা। তারাই বিন্ধ্য অঞ্চলের শ্রী ডি পি মিশ্রকে ক্ষমতায় এনেছে শ্রীতখত মল জৈনের বিরুদ্ধে। শ্রীমিশ্র নর্মদাভ্যালি অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করে বর্তমানে ছত্রিশগড়ের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি

● শ্রী ডি পি মিশ্র

প্রাক্তন বিরোধীদলনেতা শ্রীশ্যামসকর ডাঃ কে সি বাগেল, শ্রীব্রিজলাল বর্মার মত লোককে কংগ্রেসের ভিতরে এবং তাঁর সমর্থনে নিয়ে এসেছেন।

## আসাম ঃ

আসামে আট কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পেট্রো-কেমিক্যাল ভিত্তিক সিনথেটিক উল ফাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতে এরূপ ফ্যাক্টরী এই প্রথম। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এত বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আসামে এটিই প্রথম হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেছে। আপার আসামের নাহারকাটিয়া গ্যাসকূপের নিকটে এই ফ্যাক্টরী স্থাপিত হবে। এই ফ্যাক্টরীতে পূর্ণ উৎপাদন সুরু হলে বহু পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে। বর্তমানে ভারত বছরে ১২ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী উল আমদানী করে।

# একটি জীবন — বিচিত্র তাঁর কর্মধারা

মধ্যাহ্নবেলার দীপ্ত রৌদ্রালোকের আভাস কি সত্যি সত্যি পাওয়া যায় ভোরবেলাকার সজীব স্বচ্ছ জ্যোতি-বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে! কে জানে!

ইংরাজী ১৯১৭ সালের এক অপরাহ্ণ। একটি প্রিয়দর্শন কিশোর বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছে। একটু এগিয়েই জেলা কালেক্টারের কুঠি। জাঁদরেল ইংরেজ কালেক্টার কুক সাহেব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলদর্পিত দৃষ্টিপাতে চারিদিকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছেন। তাঁর দৃষ্টিপথে কেউ যানবাহনে চ'ড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি রৌদ্রাতপ নিবারণের জন্য ছাতার আড়ালে পর্যন্ত যাওয়া-আসা করতে সাহসী হয় না। এতে ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রত্যক্ষে তাঁর এবং সমষ্টিগতভাবে ও পরোক্ষে বৃটিশ-রাজের অপমান হয়। এই আইন অলিখিত হ'লেও এমনই তার প্রতাপ যে, আইন অমান্যকারীর কপালে শাসকের মর্জি হলে ঘা কতক বেতের বাড়িও জুটে যেতে পারত। তবু ষোল বছরের নির্ভীক বালক সাইকেল চড়ে এগিয়ে এল অবিচলিত চিত্তে—কালেক্টার বাহাদুরের রক্তচক্ষুর সামনে। চাপরাশী পাঠিয়ে দুঃসাহসীকে ধরে আনা হল সমুচিত শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, অগ্নিশর্মা কালেক্টার বাহাদুর অপরাধীর নাম, ধাম, পিতৃ-পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ক'রে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে বিনা শাস্তিতেই অনেকগুলি বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে বালককে ছেড়ে দিলেন। দুর্বোধ্য বিলাতী উচ্চারণ ভেদ ক'রে কিশোরটি শুধুমাত্র এই কথাটুকু উদ্ধারে সক্ষম হলো: I shall box your ear next time

বালকের নাম সুকুমার সেন। ওয়েসলিয়ান কলেজের একটি মেধাবী জনপ্রিয় ছাত্র। পিতা অক্ষয়কুমার সেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে একজন সুযোগ্য প্রশাসক, তখন বাঁকুড়ার অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সেই সুবাদেই হয়ত সেবারকার মত সুকুমারের স্পর্ধা রুষ্ট শাসকের সহৃদয় ক্ষমা লাভ করেছিল, কিন্তু কে জানে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুই তার ভবিষ্যৎ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কি না। কে জানে, বিদেশী শাসকের এই বৈষম্যমূলক মনোভাবই তার অন্তরের অন্তর্দেশে এক জাতীয়তার বীজ উপ্ত করে দিয়ে ছিল কি না। সুকুমারের কিশোর বয়সের এই পরিচয় তার যৌবন ও পরিণত জীবনে ধীরে ধীরে আরও গভীর রূপ নিয়েছে। তার আশৈশবের নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততাই তাকে সামনে ঠেলে নিয়ে গেছে সংশয়-বিহীন কর্মযজ্ঞের নিত্য নূতন আমন্ত্রণে।

ওয়েসলিয়ান কলেজ থেকে যথা-সময়ে সুকুমার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় বি-এ পড়তে এলেন। এই সময়ে তিনি নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জানেন গীতার মর্মকথা তিনি কতখানি গভীরভাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে-ছিলেন এবং সত্য ও ন্যায়কে জীবনের প্রধান অবলম্বন ক'রে আমরণ কি দুরূহ কর্মযোগে তিনি সমাধিস্থ ছিলেন।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি ১৯১৯ সনে গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে সময়কার নিয়মানু-সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা বিলাতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য চিহ্নিত হ'য়ে যেতেন। পিতার ইচ্ছানুসারে সুকুমারও আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'য়ে ১৯২২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সে আমলে 'আই-সি-এস' সার্ভিসের বদনাম ছিল। লোকচক্ষে

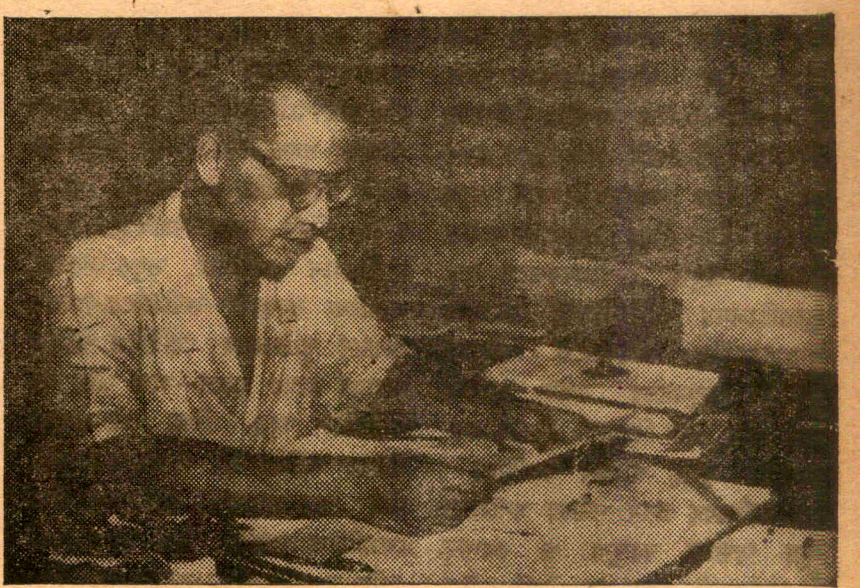

● অক্লান্ত কর্মী সুকুমার সেন

সেটি না ছিল Indian, না Civil না Service, সেই পরাধীনতার যুগে সিভিলিয়ানরা বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে হৃদয়হীন দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হিসাবেই জনসাধারণের চোখে প্রতিভাত ছিলেন। এই কারণে এঁদের পক্ষে যেমন এক দিকে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ প্রায় অসম্ভব ছিল, অন্যপক্ষে আবার রাজশক্তির অন্ধ আজ্ঞাবহ ভৃত্য না হতে পারলে [illegible]কুলের আনুকূল্য লাভ কঠিন [illegible]ল।

এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে থেকেও যে মুষ্টিমেয় ভারতীয় সিভিলিয়ান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে চিরভাস্বর হয়ে আছেন, সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এঁদের মত কয়েকটি সুযোগ্য অফিসারের মধ্যে Indian civil service-এর মহান আদর্শ সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইংরেজ শাসন ও শৃঙ্খলার লৌহ-কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সুকুমার আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তাধারা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেজন্য বৃটিশ আমলেই তিনি স্বাধীন-চেতা দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আবার অন্য দিকে নিজ তীক্ষ্ণ মেধাগুণে তিনি বৃটিশ শাসনপদ্ধতির যাবতীয় বিশিষ্ট ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে, নিজ অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাধীন ভারতের প্রকৃত দেশসেবকরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এই কারণেই সরকারী ব্যুরোক্র্যাসীর শক্তিদম্ভকে অতিক্রম ক'রে সুকুমারের মহান ব্যক্তিত্ব ক্রমে ক্রমে এক নিঃস্বার্থ নিষ্কাম জন-সেবকের মূর্তি পরিগ্রহ করছিল।

সার্ভিসের প্রথম পর্যায়ে যথারীতি ক্ষুদ্র অখ্যাত মহকুমা ও জেলার বিচারক হ'য়ে সুকুমার বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটিয়েছেন। সে যুগে স্বাধীন-চেতা, দেশপ্রেমিক সমস্ত ভারতীয় সিভিলিয়ানেরই এই নিয়তি ছিল। কিন্তু, বিনা ক্ষোভে, বিনা নালিশে তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। যখন তিনি যেখানে গেছেন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক হিসাবে তো বটেই, 'আদর্শ মানুষরূপেও তিনি জনসাধারণের মনে গভীর দাগ রেখে গেছেন।

১৯৪৭ সনের বিভক্ত ও বিপর্যস্ত পশ্চিম বাংলার সদ্য নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যখন তাঁর প্রধান কর্মসচিব নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সিনিয়র কর্মচারীদের পরিচয়-তালিকা চেয়ে পাঠালেন তখন তিনি জুডিশিয়ারীতে নির্বাসিত অফিসারদের নাম বিশেষ-ভাবে দাবী করেছিলেন। পরবর্তী-কালে তাঁর নিজের মুখে শুনেছি তিনি জানতেন স্বাধীনচেতা, দেশাত্ম-বোধযুক্ত কর্মচারীদের ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক কারণেই জুডি-শিয়ারীতে কোণঠাসা ক'রে রাখতেন এবং এদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ বিচক্ষণ শাসকের প্রতিভা অলক্ষ্যে নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। জুডিশিয়েল ও এক্সিকিউটিভ অফিসারের নাম-তালিকায় সিনিয়রিটি হিসাবে সুকুমার সেনের নাম এল প্রথম। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ উৎফুল্ল হলেন। প্রায় ২২ বছর আগেকার একটি দৈবাৎ দেখা ছবি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। গোয়ালন্দ স্টীমারে সহযাত্রী রূপে এই মানুষটিকে তিনি পেয়েছিলেন ঢাকার পথে। যদিও তিনি তখন সিরাজগঞ্জে সাব-ডিভিসনাল অফিসার, তবুও রাজবেশ পরিহিত সরকারী কর্মচারীরূপে নয়। সাধারণ ধুতি-চাদর পরিহিত বাংলার সাধারণ বরের বেশে—সঙ্গে তাঁর নব পরিণীতা বধূ। কিন্তু, এই সামান্য রূপের গভীরে যে অসামান্য মানুষটি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত ছিল—ডাঃ ঘোষের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে তা গোপন থাকে নি। সুতরাং মাত্র কয়েক ঘণ্টার সহযাত্রা ও পরিচয়ের আশ্বাসে তিনি অনেক-গুলি প্রবীণ অফিসারের মধ্যে সুকুমার সেনকে বেছে নিয়ে স্বাধীন ভারতে বাংলার প্রধান কর্মসচিবের গুরুদায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করলেন। এই নির্বাচনে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এবং খ্যাতনামা এক্সিকিউটিভ অফিসাররা অনেকেই অবজ্ঞার হাসি হেসেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে সুকুমার যোগ্যতাগুণে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, ডাঃ ঘোষের নির্বাচন ভুল তো হয়ই নি, বরং সুকুমারের প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে তিনি বাংলা দেশের সৌভাগ্য-সূচনা করেছিলেন। দেশ-বিভাগের উত্তরকালীন দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাংলার রাজনৈতিক অব্যবস্থার সে শোচনীয় ইতিহাস যার জানা আছে, তাকে আর নূতন ক'রে রাজ্য-পরি-চালনার দুরূহতা বোঝাবার প্রয়োজন নেই। বাংলার সে ঘোর সংকটে যে অপূর্ব কর্মকুশলতা, বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়ে-ছিলেন, তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ অপসারণ সম্ভব হয়েছিল। ভৌগোলিক বিভাগের স্থূল হিসাব সমাপ্ত হ'বার পরে শাসন-সংক্রান্ত স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় বস্তুর বিলিব্যবস্থা জটিল সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছিল। সুকুমারের নিরপেক্ষ হাত দলিল-দস্তাবেজ থেকে আরম্ভ ক'রে, আসবাবপত্রাদি, শাসনযন্ত্র সম্পর্কিত অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিষ, এমন কি উঁচু-নীচু নানা স্তরের সরকারী কর্মচারিবৃন্দের বণ্টন পর্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছিল। এক কথায়, নিরপেক্ষ বিচারে বলা চলে যে ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে সুকুমার সেনের অসীম ধৈর্য ও কর্মকুশলতা বাংলাদেশকে এক অতি কঠিন দুর্যোগের গ্রাস থেকে রক্ষা করে-ছিলেন।

এই সময়ে বাংলার দরদী বন্ধু সুকুমারের আন্তরিক চেষ্টায় বাংলা-ভাষা সেক্রেটারিয়েটে পূর্ণ মর্যাদা

প্রাপ্ত হয়। তাঁর নির্দেশিত পথে চললে অনেকে বিশ্বাস করেন, বাংলাভাষা আজ রাষ্ট্রভাষার পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারত।

সরকারী দপ্তরগুলিতে দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি তাঁর প্রধান কর্ম-সচিব-জীবনে দুর্নীতিদমন ( anti-corruption ) আইনেরও কিছু সংস্কার করেছিলেন। নিজে অতি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারী ছিলেন ব'লে তিনি স্বাধীন ভারতের শাসনযন্ত্র দুর্নীতিমুক্ত ক'রে এক আদর্শ স্থাপনের দুরাশাও আজীবন মনে মনে পোষণ করে গেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি যখনই যে কার্যভার নিয়েছেন, তখনই অধস্তন কর্মচারীদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নির্বাচন ক'রে আপন প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্নীতি-মুক্ত রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন।

এই সময় থেকেই সুকুমারের সম্মুখে স্বাধীন ভারত প্রতিদিন নানা বৈচিত্র্যময় সম্ভার দিয়ে বিশালতর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ক'রে ধরল। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি, অদম্য কর্মপ্রেরণা নিত্য নব নব পথে আপন বেগে ধাবিত হতে লাগল। উচ্চপদে আসীন থেকে নিষ্ক্রিয় আরামে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা উপভোগে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। নিত্য-নূতন কর্মপ্রেরণার তাগিদে তিনি অস্থির চঞ্চল হ'য়ে নূতন নূতন দুঃসাধ্য ব্রতে ব্রতী হতেন।

তাঁর কর্মকুশলতা রাজধানীর রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি স্বাধীন ভারতের নির্বাচন কমিশনারের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ পান। সমস্ত রাজ্য থেকে প্রেরিত সুদক্ষ অফিসারের তালিকা থেকে যোগ্যতম বিবেচনায় সুকুমার সেনকে এই পদে গ্রহণ নিঃসন্দেহে বাংলা দেশের গৌরব সূচনা করেছিল। বলা বাহুল্য, এই নূতন দায়িত্বও অতি দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান সুকুমার দ্বিধাহীন চিত্তে এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

● কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা পরিদর্শনকারী জাপানী প্রতিনিধিদের সঙ্গে লোকপ্রিয় প্রশাসক সুকুমার সেন।

ভারতবর্ষের মত সুবিশাল দেশে, যেখানে শতকরা ৯০টি অধিবাসী নিরক্ষর, যেখানে ইতিপূর্বে সাধারণ নির্বাচন আর হয় নি এবং সেজন্যই যেখানে অতীত অভিজ্ঞতার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব, যে দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি সমালোচনা-মুখর, সেখানে মাত্র ব্যক্তি-বিশেষের যোগ্যতা ও সততার উপরে নির্ভর ক'রে এতবড় একটা অনুষ্ঠান আদৌ সম্ভব কি না এবং সাফল্যের আশাই বা কতটুকু, এ নিয়ে বহু সংশয়ের অবকাশ ছিল। বিদেশের গণতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে গোপনে বহু পর্যবেক্ষক আমাদের নির্বাচন পদ্ধতি লক্ষ্য করতে ও ছিদ্রানুসন্ধান করতে এসেছিলেন। সুকুমার ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হলেন। দীর্ঘকাল প্রত্যেকটি রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত তদারকীতে তিনি সম্পন্ন করেন এবং তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সনে পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণ নির্বাচন দুটি অনুষ্ঠিত হয়। দেশে-বিদেশে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেন এবং তাঁর নিরপেক্ষ বিচারগুণে কোন রাজনৈতিক দলই কোন নালিশের ছিদ্র খুঁজে পান নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ-সূত্রে তাঁর পি-এর মুখে শুনেছি যে, তিনি যখন নির্বাচন শেষে আর একবার ভারত ভ্রমণকালে কেরালায় উপস্থিত

হ'ন, কমিউনিস্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ হঠাৎ তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুটিয়ে পড়েন। বিস্মিত সুকুমার ব্যস্ত হ'য়ে তাঁকে হাতে ধরে তুলে যখন এই আচরণের কারণ জানতে চান, কমিউনিস্ট নেতা গদগদ কণ্ঠে তাঁর ও তাঁর দলের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে, সুকুমারের ন্যায়নিষ্ঠ বিচার ও নিরপেক্ষ পরিচালনার আশীর্বাদ না থাকলে কমিউনিস্ট দল নিঃসন্দেহে পরাজিত হ'ত। প্রশাসন কৌশলের এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কি হ'তে পারত।

এই অসাধ্য সাধনের ফলে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। এর পরে আন্তর্জাতিক ইলেকশান কমিশনের সভাপতিরূপে সুদানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তাঁর আমন্ত্রণ আসে। বলা বাহুল্য, এই কাজও সুকঠিন ছিল। প্রতিযোগী দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে মতান্তর হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই বিষয় কেউ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্ণগোচর করলে পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, সুকুমার সেনকে নিয়ন্ত্রিত করা তাঁদের সাধ্যাতীত। তিনি নিজেই 'শুভ' ফল সংগ্রহ করতে পারেন এবং তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কর্মচারী ভারত সরকারের নেই। বাস্তবিকই যোগ্যতার এই নূতন পরীক্ষায়ও তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর স্বভাবসুলভ অকপটতায় তিনি এই নির্বাচন পরিচালনা ক'রে প্রতিযোগী দল তিনটিকেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ সুদান সরকার সুদানে একটি রাজপথের নামকরণ করেন—সুকুমার সেন রোড। বাংলা তথা ভারত-গৌরব সুকুমারকে ভারত সরকার ১৯৫৪ সনে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দুটি সাধারণ নির্বাচনের গুরু-দায়িত্ব অবসানে ১৯৫৯ সনে তাঁর রাজকার্য থেকে অবসরের সময় হ'ল। কিন্তু, তখনও তিনি কর্মবীরের শক্তি ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ একটি উজ্জ্বল অগ্নি-শিখার মত দীপ্তিমান।

এই সময়ে অনেক গুণগ্রাহী মনে করেছিলেন ভারত সরকার কোন কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে সুকুমার সেনকে বিদেশে পাঠিয়ে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দেখাবেন। কিন্তু, কার্য-কালে তা না হওয়ায় তাঁরা আশাহতও হ'য়েছিলেন। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এই ধরণের প্রস্তাব আসছিল এমন অনুমানের কারণ আছে। কিন্তু, এই সময় থেকেই সুকুমারের বীর মন রাজনৈতিক কচকচির বাইরে, শান্ত পরিবেশে কর্মযোগের সাধনায় সমাহিত হ'বার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হ'য়ে উঠছিল। তরুণ বয়সের মোহমুগ্ধ দিনগুলিতেই যে মানুষ সরকারী পদমর্যাদার চটকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিলেন, তাঁকে সাধক জীবনের পরিণত অধ্যায়ে বস্তুজগতের ভোগ-সুখ নূতন ক'রে টানবে ভাবাই ভুল। তাঁর আজন্মের স্বপ্ন 'জনসেবা', 'সমাজ-সেবা'র আহ্বান তাঁকে অদম্য আকর্ষণে এবার ঘরের দিকেই বাঁধতে লাগল। ভবিষ্যৎ-জীবনের প্ল্যান তাঁর তৈরি হয়ে থাকত অনেক আগে থেকে। এবার অবসর-জীবনের প্ল্যান কাজে লাগাবার জন্য তাঁর শেষ প্রস্তুতি চলতে লাগল। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এবার তাঁর মিলবে সত্যিকারের মুক্তি—সরকারী আইন-কানুন ও নিয়ম-শৃংখলার বন্ধনহীন অবারিত স্বাধীনতা। ঠিক করলেন পশ্চিমবঙ্গের কোন ছোট শহরে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন, আজীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নানা বিষয়ে পড়াশুনো করবেন এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির (Community Development Project) মাধ্যমে সমাজসেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন। এই আশায় তিনি মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে পশ্চিমবঙ্গের 'কল্যাণীতে' জমি কিনে তাঁর অবসরের আবাস তৈরির উদ্যোগ করছিলেন। আত্মীয় বন্ধু অনেকেই তাঁকে তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র দিল্লীতে স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও শান্তিপূর্ণ অবসর জীবন উপভোগে প্রলুব্ধ করেছেন। কিন্তু সুকুমার তাঁর জন্মভূমি বাংলা দেশকে ভালবেসে তাঁরই কোলে থাকতে এলেন। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক নানা সমস্যা-বিজড়িত বাংলা দেশকে তিনি ত্যাগ করলেন না। সহধর্মিণীকেও তিনি নিজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন।

আই-সি-এস থেকে অবসর পেলেও বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সুকুমারের নিশ্চিন্ত অবসরের সময় তখনও আসে নি। স্বাধীন ভারতের ত্রুটিযুক্ত প্রশাসন-ক্ষেত্রে তাঁর মত সুযোগ্য, দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসারের তুল্য অফিসার কমই ছিল। সুতরাং রাজদরবারে তাঁর আবার ডাক পড়ল, আবার ফিরে এল তাঁর রাজনীতির জীবন। ১৯৫৯-৬০ সনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগে শিক্ষাসচিবরূপে বিশেষ অধিকারবলে বর্ধমান, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তিনটির খসড়া-বিল তৈরি করেন। শীঘ্রই এগুলি আইনে রূপান্তরিত হ'য়ে উক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। এবং ১৯৬০ সনের জুন-আগষ্ট মাসে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত থাকেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' ব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে তিনি ঐ কয়েকটি মাস কি কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন বাঙালীর সেকথা অজানা নেই।

এই সময় দিয়ে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী কমিটীর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হ'য়ে তিনি কয়েক মাস ছিলেন। সুলভ সংস্করণে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ ও বিতরণ তাঁরই মৌলিক পরিকল্পনা। তিনি বলতেন, কেবলমাত্র পাঠ, গান আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী

প্রতিভার সম্যক পরিচয় দূরের কথা, এক ভগ্নাংশও পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণের নাগালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে হ'লে তাঁর রচনাকে সহজলভ্য করতে হবে। আজ বাংলার ঘরে ঘরে সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর সুকুমারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জয়গান করছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কল্পে গৃহীত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার তখন ঘোর দুর্দিন, রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ, প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-দুর্নীতি ও আত্মকলহের ঘাত-প্রতিঘাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার তরী নিমজ্জমান প্রায়। এই সংকটে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপযুক্ত কর্ণধার সন্ধানে নেমে আবার সুকুমার সেনের নাম উল্লেখ করলেন। বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাভাজন এই সুদক্ষ অফিসারকে ভারত সরকার অবিলম্বে আহ্বান জানালেন। সুকুমার একবারও দ্বিধা করলেন না, সরকারী আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাণে পৌঁছল জনসেবার ডাক, সমাজসেবার ডাক। বড় শহরের আরাম বিলাস ঠেলে ফেলে তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন দণ্ডকারণ্যের দুঃখ-কষ্টময় অরণ্য-জীবনে। সত্যযুগের শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হ'য়েছিলেন, এ যুগের আদর্শ সন্তান মাতৃঋণ শোধের জন্য অরণ্যবাসী হ'লেন। সংকল্পের দৃঢ়তায় দুজনেই সমতুল। ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যনিষ্ঠায়ও দুজনে সমান।

সুকুমার সেনের জীবনে কর্মভার বিচিত্ররূপে উপস্থিত হ'য়েছে। স্বাধীনতা প্রত্যুষের বিভক্ত ও বিক্ষুব্ধ বাংলার নায়কত্ব, বিশ্বের বৃহত্তম গণ-তান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনা ও তিনটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি দ্রুত শাসনপদ্ধতির সংগঠন—এই বিবিধ ক্ষেত্রেই কর্মভার এক একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ আসে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে চ্যালেঞ্জের উত্তরও যথাযথ দিয়ে গেছেন।

এইবার তাঁর জীবনে বৃহত্তম কর্মযজ্ঞের আহ্বান এসে পৌঁছল। কাজের দুরূহতা কখনই তাঁকে নিরুদ্যম করতে পারে নি। প্রশাসক, পরিচালক ও সংগঠকের যাবতীয় গুণে আবৃত হ'য়ে এবারও সুকুমার রণাঙ্গনে নামলেন। তবে এবারকার কলাকৌশলকে তিনি আর একটি বিশেষ অস্ত্রে সমৃদ্ধ করলেন —মানবিকতার যাদুকাঠি। এইখানেই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠিও লুকান ছিল। তিনি বুঝে ছিলেন, 'উদ্বাস্তু' নামে এই যে ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠী সরকারী ও বে-সরকারী কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে অনাদরে, অবহেলায় পথে-ঘাটে, শিবিরে শিবিরে ছড়িয়ে আছে এবং দিনে দিনে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণ হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে আসছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মসম্মান জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই এদের বাঁচান সম্ভব হ'বে, নচেৎ নয়। তিনি এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতদের তথাকথিত 'উদ্বাস্তু' নামে না চিনে বিপন্ন মানুষ হিসাবেই বিচার করেছিলেন। তাদের সুখ-দুঃখকে নিজের ক'রে নিয়েছিলেন এবং সেজন্যই তাদের তিনি মনের মানুষ হ'য়ে গিয়েছিলেন। অতিবড় নিরাশার দিনেও তিনি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারান নি। নিরাশাবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এদের অপদার্থ, অকর্মণ্য ব'লে গালাগাল দিতেও পারেন নি। কলকাতার আশে-পাশে ও দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু-শিবিরগুলিতে তিনি নিজে যেতেন এবং তাদের ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এমনও সময় গেছে যখন বেদরদী সরকারের প্রতিভূ হিসাবে তাঁর প্রতি সন্দিহান হ'য়ে উদ্বাস্তুরা মারমুখো পর্যন্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, ফন্দীবাজ রাজনীতিক-দের কবলীভূত হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অবশেষে তাঁর মানবিকতার পরশমণির ছোঁয়া লেগে এরা ধীরে ধীরে আশ্বস্থ হ'য়েছে এবং সুকুমারকে নিতান্ত আপনজন ভেবে হাজার হাজার উদ্বাস্তু তাঁকে অনুসরণ ক'রে অনির্দেশ্যের ভয় কাটিয়ে দণ্ডকের পথে পা বাড়িয়েছে।

সুকুমারের আদিবাস ছিল পূর্ব-বঙ্গের ঢাকা জেলায়। কত প্রাচুর্য, কত শান্তি, কত আনন্দ ও কত মুক্তি পেছনে ফেলে হতভাগ্যরা উৎখাত হয়ে এসেছে, তা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। সেজন্যেই এদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন ব্যাখ্যা করতেন তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে। অনেক প্রতিকূলতার মার খেয়ে এরা সব সমাজ-বিরোধীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু, তিনি সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, এরাই বাংলার শৌর্যপূর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী, এরাই স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর নায়কদের উত্তরাধিকারী,

এরাই ভবিষ্যৎ ভারতের অগ্রদূত, এরাই আপন পুরুষকারের সাহায্যে মিথ্যা অপবাদ মোচনের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম।

নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এদের সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তিনি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিকেও মনোযোগী হ'লেন। তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির সাহায্যে তিনি গ্রামপঞ্চায়েৎ সমিতি গঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হরিসভা, পাঠগৃহ, গ্রন্থাগার ও মন্দির স্থাপনের কাজে উদ্বাস্তুদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন-কল্পে যৌথ চাষ ও কো-অপারেটিভ ব্যবসায়-প্রণালী তিনি অনুসরণ করেন। চাষের বিকল্প হিসাবে ছোট-খাট ব্যবসায় ও কারিগরী শিল্প শিক্ষা দিয়ে তিনি অ-চাষী ও ছোট ছেলেদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া গ্রামের শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য শহরের বাজারে পৌঁছাবার জন্য শহর ও উপকণ্ঠে ছোট-খাটো শিল্পসংস্থা গড়ে তুলবার পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন।

সুকুমার সেনের ঐকান্তিক চেষ্টার আর একটি ফল আর-আই-সি'র (Refugee Rehabilitation Corporation) অর্থসাহায্যে প্রকল্পের পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবজীবন সমবায় সমিতি গঠন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছোট-খাট ব্যবসায়ী ও কারিগরশ্রেণীর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি আর-আই-সি'র সাহায্যে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলায় একটি 'সিপার কারখানা' স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই আর-আই-সি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানরূপে সুকুমার সেন বুদ্ধি-পরামর্শ ও সবরকমের সহযোগিতা দিয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মনোযোগী ছিলেন। আর-আই-সি'র মধ্যে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ডিরেক্টার শ্রীমণি মুখার্জী তাঁরই স্বনির্বাচিত কর্মচারী। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি শ্রী মুখার্জীর সঙ্গে উচ্ছ্বসিতভাবে আলাপ করতেন। আর-আই-সি'র শিল্পীদের জামা-কাপড় তিনি সর্বদা প'রে গৌরব বোধ করতেন। প্রিয়জনদের সর্বদা বলতেন, অবসর জীবনে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর-আই-সি'র মাধ্যমে তিনি বাংলা দেশের শিল্পজগতে যুগান্তর আনবেন এবং ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রণী রাজ্য-গুলির সঙ্গে বাংলা দেশকে এক সমতলে উন্নীত ক'রে প্রমাণ করবেন---বাংলা ও বাঙালী শিল্পক্ষেত্রেও কারও পিছে নয়। আর-আই-সির উদ্যোগে ক'লকাতায় চারটি এবং আসামে একটি বিক্রয়কেন্দ্র খুবই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

সুকুমার সেন তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে দণ্ডকারণ্যের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা লক্ষ্য ক'রে শংকিত হচ্ছিলেন। বিভিন্ন হাসপাতালে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক খুলবার পরিকল্পনাও তারই ফল।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্ন সফল করবার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখগুলিকে একেবারেই তুচ্ছ করেছিলেন। এই সময় যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা জানেন, জীবনের এই অধ্যায় তাঁর এক দুরূহ সাধনার পর্ব। এইখানে তিনি সংসারে থেকেও মুক্ত পুরুষ, প্রিয়জনের স্নেহডোরে ধরা দিয়েও নিরাসক্ত যোগী! হয়ত বা তাঁর কর্ম-জীবনে এমন আকস্মিক ছেদ পড়বে ব'লেই তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণে জীবনসর্বস্ব পণ ক'রে বসেছিলেন। তাঁর ক্রমক্ষীয়মান স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির কথা ভাববারও তাঁর অবকাশ ছিল না।

দ্রুত তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রিয়জনেরা তাঁর মুখের একটি কথা শুনবার আশায় দিনের পরে দিন তাঁর রোগ-শয্যাপাশে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে রয়েছেন। কিন্তু, মহাযোগী যোগনিদ্রায় মগ্ন---তাঁর মুখে আজ আর কেউ অন্তিম ইচ্ছা শুনবে না, শুনবে না তাঁর হঠাৎ ফেলে যাওয়া বিশৃঙ্খল সংসারের সমস্যা সমাধানে একটি মূল্যবান উপদেশ। চিরদিন তারা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সমস্যা নিয়ে তাঁরই মুখে চেয়ে থাকতে অভ্যস্ত! চিরকাল তিনি অকৃপণ ধারায় তাঁর সবকিছু ঢেলে দিয়ে সকলের সমস্যা পূরণে তৎপর। কিন্তু, আজ চৈতন্যের শেষ বিন্দুটুকু লোপ পাওয়া তাঁর শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে কেবলই তাঁর দণ্ডকারণ্যের কথা---তারই সুখ, তারই দুঃখ! তারই স্বপ্ন, তারই আশা। কিন্তু স্বপ্ন সার্থক হ'ল না, কর্মযজ্ঞ হ'ল না সমাপ্ত।

১৯৬৩ সনের ১৩ই মে তারিখে বেলা তিনটায় এই বিরাট কর্মযোগী মরদেহ ত্যাগ করে আরও কোন নূতন জগতে, আরও কোন বৃহত্তর ব্রত-সাধনের জন্য হয়ত মহাপ্রয়াণ করলেন, আমরা জানি না। বারংবার আমাদের বলে গেলেন, 'আমাকে যেতে হ'বে, আমাকে এখনই যেতে হ'বে।'

---কিন্তু, কোথায়? তবে কি তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তাঁর সেই পুণ্য তপোভূমি দণ্ডকারণ্যেরই আকাশে-বাতাসে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার ব্যাকুল আকূতি নিয়ে দেহবন্ধন মুক্ত করে গেল!

তবে তাই হোক, নূতন আঘাতে জর্জরিত বাংলা আবার যে নূতন করে রক্তমোক্ষণে স্পন্দনহীন হ'য়ে আসছে, নূতন সংকটের সম্মুখীন হ'য়ে আবার যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা টলমল করছে, তাদেরই শিরায় শিরায় সুকুমারের অমর আত্মা চিরপ্রেরণা জাগিয়ে রাখুক। তাঁর প্রিয় দণ্ডকবাসীরা যদি মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং তাঁর ব্রতসঙ্গীরা তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হ'য়ে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থকরূপ দিতে পারেন, তবেই তাঁর অতৃপ্ত আত্মা খুঁজে পাবে তৃপ্তি, অশান্ত আত্মার হ'বে শান্তি।

পারুল সেনগুপ্ত
মল্লিক ঘোষ

# আন্তর্জাতিক

* রোমের এক গীর্জায় প্রিন্সেস আইরিনের সঙ্গে প্রিন্স কার্লসের বিয়ের পর মহামান্য পোপ তাঁদের আশীর্বাদ করেন।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

**পাকিস্তানের দুমুখো নীতি ঃ** 'সেণ্টো' মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক উপলক্ষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো সপ্তাহখানিক ওয়াশিংটনে ছিলেন। 'সেণ্টো' ও সিয়েটো' চুক্তি-সংস্থার সদস্যরূপে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করছে, অথচ এই সব চুক্তি-সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য কমিউনিজমের গতিরোধের ব্যাপারে পাকিস্তান বিরোধিতা করছে। এশিয়ায় চীনের আগ্রাসী প্রচেষ্টা প্রতিরোধের পরিবর্তে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। পাকিস্তানের এই দুমুখো নীতির বিরুদ্ধে এবার মার্কিন সংবাদপত্রমহল ও কংগ্রেসে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং ভুট্টোকে সর্বত্র কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভুট্টো মার্কিন মুরুব্বীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, চীনের দিক থেকে পাকিস্তানের কোন ভয় নেই, পাকিস্তানের পক্ষে আসল বিপদ হল ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল-মহল এই 'থিসিস' গ্রহণ করে নি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে, এবার মার্কিন কর্তারা ভুট্টোকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, চীনকে কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা দেয়া চলবে না। এশিয়ার শান্তির পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের থেকে চীন আজ অনেক বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* জুলফিকার আলি ভুট্টো

পাকিস্তান বহুদিন থেকেই এই দুমুখো নীতি অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু মার্কিন সরকার আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন নি। যখনই কমিউনিজম রোধ, বিশেষ করে এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন ওঠে, পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন কর্তাদের তীব্র মতভেদ হয়। কিন্তু তারপরই সব চুপচাপ। কিছুদিন পূর্বে ম্যানিলায় 'সিয়েটো' বৈঠক ও এবারে ওয়াশিংটনে 'সেন্টো' বৈঠকে প্রমাণ হয়েছে, পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্য চীনা কমিউনিজমের গতিরোধ নয়, চুক্তি-সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এখনও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের এই খেলা ধরতে না পারেন, তবে ভবিষ্যতে আরও বিপদ আছে।

**অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে উপার্জন ঃ** হিসেব করে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দু'হাজার অনুমোদিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ১৩০০-এর ওপর কলেজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত। এই সব কলেজে ছাত্রদের প্রতি শিক্ষা-ক্রমের (প্রায় সাড়ে চার মাস) জন্য ৩০ ডলার (প্রায় ১৫০ টাকা) থেকে ৫০০ ডলার (প্রায় ২৫০০ টাকা) ট্যুইশন ফি দিতে হয়। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজ্যসরকার বা পৌর-কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত এবং এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের কাছ থেকে অতি সামান্য ট্যুইশন ফি নেয়া হয়—অনেক ক্ষেত্রে আবার কোন ফি-ই লাগে না। তবে, পাঠ্য পুস্তক, আহার

* বিজ্ঞাপন অফিসে বিজ্ঞাপনের ডিজাইন তৈরি-রতা জনৈকা আমেরিকান ছাত্রী।

ও বাসস্থান, জামাকাপড় এবং অন্যান্য খরচ সমেত বছরে ছাত্রপিছু কয়েক শ' ডলার খরচ পড়ে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। অধিকাংশের পরিবারের পক্ষেই অধ্যয়নের এই বিপুল ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। এর ফলে শতকরা প্রায় ৬০ জন ছাত্রকে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে নানা রকমের কাজ গ্রহণ করে। মার্কিন শিক্ষাবিদের মতে অধ্যয়নের সময় উপার্জনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশে বিশেষ সহায়তা হয়। এই কাজের দ্বারা অধ্যয়নের কোন ক্ষতিও হয় না। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ছাত্ররা উপার্জনের জন্য সব রকম কাজেই অংশ গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওকলাহামা রাজ্যের নবমান শহরের রাস্তায় রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত যে ব্যক্তিটিকে পুলিশের কাজ করতে দেখা যাবে, সে দিনের বেলায় ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেডিক্যাল ছাত্র সপ্তাহ শেষে বাড়িতে বাড়িতে রং দেবার কাজ করে। মারকোয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী এক বিজ্ঞাপন অফিসে বিজ্ঞাপনের ডিজাইন তৈরি করে। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন ছাত্রী বরফের ওপর স্কেটিং শিক্ষাদানের কাজ করে।

**মহাকাশ অভিযান :** জাতীয় মহাকাশ অভিযান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দু'জনকে নিয়ে বিশ্বের চার দিকে ঘোরার জন্য একটি জেমিনি মহাকাশযান প্রেরণের তোড়জোড় চলছে। এই আকাশযাত্রা এক সপ্তাহ ধরে চলবে। ২৯ জন জাতীয় আকাশযাত্রী বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে, এবং যে-সব সমস্যা পূর্বে দেখা দেয় নি, শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার সমাধানের

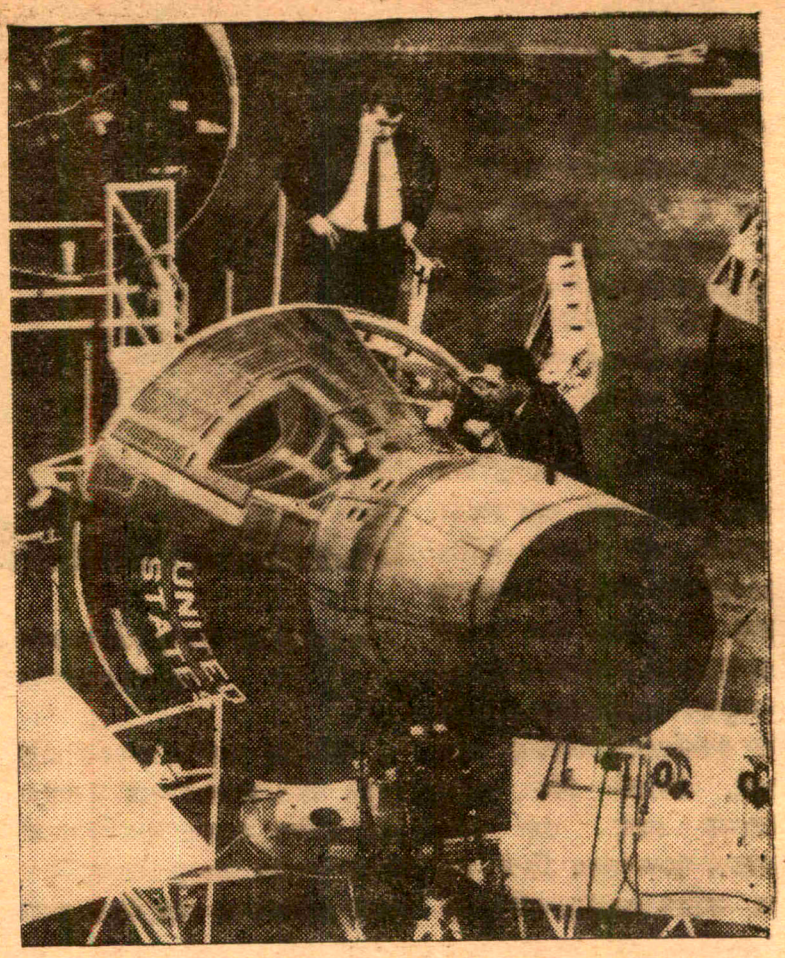

* এই মহাকাশযানে দু'জন লোককে নিয়ে / সপ্তাহব্যাপী আকাশযাত্রার তোড়জোড় চলছে

চেষ্টা চলছে। 'ফেথ-৭' মহাকাশযানে চড়ে ১৯৬৩ সালের মে মাসে যিনি বিশ্বপরিক্রমা করেন, সেই গর্ডন কুপার এক সাক্ষাৎকারে ১৯৫৯ সালে এইরূপ অভিযানের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করেন। পাইলটের সমস্যা ছাড়াও যন্ত্রপাতির নক্সা প্রস্তুত ও তা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা এবং মহাকাশযানের ইঞ্জিনীয়ারিং ও রকেট বিষয়ে গবেষণার কাজ রয়েছে। মেজর কুপার ও আর পাঁচজন অভিজ্ঞ পাইলটকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সব সময়েই পাইলট নির্বাচন প্রধান সমস্যা। কুপারের মতে, অতীতের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এখনও পাইলটই প্রধান সমস্যা।

## সোভিয়েট ইউনিয়ন :

**বেন বেলার সম্বর্ধনা :** বর্তমানে দু'টি বিদেশী প্রতিনিধিদল সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করছে—একটি এসেছে কেনিয়া থেকে, আর অপরটি আলজিরিয়া থেকে। কেনিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন কেনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজুমা ওগিঙ্গা ওডিঙ্গা এবং আলজিরিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা হলেন আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি আহমেদ বেন বেলা। বেন বেলা ও ওডিঙ্গা রেড স্কোয়ারে মে দিবসের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভের ঠিক পাশেই তাঁদের স্থান হয়েছিল। রেড স্কোয়ারে সমবেত বিশাল জনতা নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানায়। সোভিয়েট

ইউনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনোভস্কি সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে ম্যালিনোভস্কি আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর জোর দেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোভিয়েট জনসাধারণকে যুদ্ধবাজদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন। তিনি ঘোষণা করেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী যে-কোন আক্রমণকারীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। এক নতুন ধরণের মারাত্মক আণবিক অস্ত্র---জোড়া রকেট---এবারের কুচকাওয়াজে দেখানো হয়। অতি-আধুনিক বিমান ধ্বংসের যোগ্য রকেটও দেখানো হয়। জলের নীচে সাবমেরিন থেকে আণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের মত রকেট ও আন্তঃমহাদেশীয় রকেটও এবার অন্যতম দর্শনীয় ছিল।

মে দিবসের প্যারেডের পর ক্রেমলিন প্রাসাদে নৈশভোজে অতিথি-দের আপ্যায়িত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর সভাপতি ব্রেজনেভ রাষ্ট্রপতি বেন বেলাকে 'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রেজনেভ বলেন, আলজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে বেন বেলার বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সোভিয়েট জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে এই সম্মান জানানো হল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আলজিরিয়ার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে ব্রেজনেভ আশা প্রকাশ করেন। বেন বেলাকে লেনিন পদক ও স্বর্ণ-তারকা পদকও দেওয়া হয়। বেন বেলা প্রত্যুত্তরে এই সম্মানের জন্য ব্রেজনেভকে ধন্যবাদ জানান এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে আলজিরিয়াবাসীর সমাজতন্ত্র অনুসরণের কথা বলেন। ক্রুশ্চেভও এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেন বেলার অবদান এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আলজিরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ করেন।

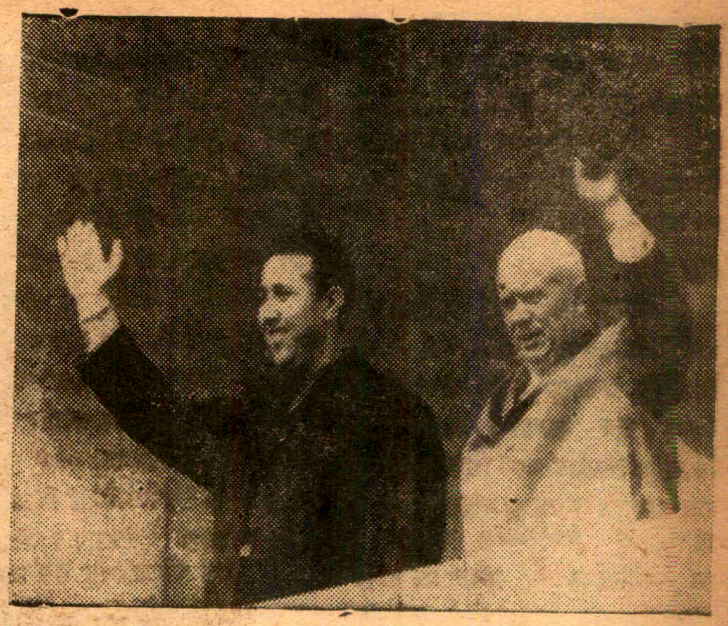

* রেড স্কোয়ারে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে বেন বেলা সেনাবাহিনী ও জনতার অভিবাদন গ্রহণ করছেন।

বেন বেলার উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ক্রুশ্চেভ চীনের উল্লেখ করে চীনের জাতিবিদ্বেষ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং চীনের অনুসৃত নীতিকে হিটলারের নাৎসীবাদের সঙ্গে তুলনা করেন। জাকার্তায় এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের প্রস্তুতিবৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন মূলত ইউরোপীয় জাতি বলে চীন-প্রস্তাবিত এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের যোগদানের বিরোধিতা করায়, ক্রুশ্চেভ একে চীনের জাতিবিদ্বেষ নীতির অনুসরণ বলে বর্ণনা করেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব হ্রাস করার জন্য চীন ইউরোপীয় জাতি-বিরোধী মনোভাব কাজে লাগাচ্ছে, এইরূপ ইঙ্গিত করে ক্রুশ্চেভ এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি আশা করেন, আলজিরিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ এই প্রতি-ক্রীয়াশীল জাতিবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

**চীনের দুর্দশা :** এপ্রিলের শেষ দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া'য় পত্রিকার সংবাদদাতা য়ুরি পোপোভ প্রেরিত এক সংবাদে চীনের অধিবাসীদের চরম দুর্দশার এক বিবরণ বেরিয়েছে। পোপোভ জানাচ্ছেন, প্রায় দশ লক্ষ চীনা ক্ষিধের জ্বালায় চীনের সীমান্ত অতিক্রম করে হংকং-এ চলে এসেছে। চীনে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাদের জীবন কাটছিল। এদের মধ্যে অনেক মেয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে, এবং বহুজন হংকং-এ এসে পতিতালয়ে নাম লিখিয়েছে। 'ইজভেস্তিয়া'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ চীনার চীন ত্যাগ করে চলে আসার ঘটনা আজ আর কোন-ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। চীনের নেতারা মুখে বড় বড় বিপ্লবের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করেন না।

এই ধরণের সংবাদ মার্কিন পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। লক্ষণীয় হল, ঠিক একই

ভাষায় একই রকমের সংবাদ আজ সোভিয়েট সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত হল। নিছক চীন-রুশ মতবিরোধের বহিঃপ্রকাশ বলে একে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

**হল্যাণ্ড ঃ**

হল্যাণ্ডের রাজকুমারী আইরিনের বিয়ে নিয়ে কেবল হল্যাণ্ড নয়, সমগ্র ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে নতুন রাজনৈতিক অভিনয় সুরু হয়েছে। রোমের এক গীর্জায় আইরিনের সঙ্গে প্রিন্স কার্লসের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে, মহামান্য পোপ নবদম্পতিকে আশীর্বাদও করেছেন। কিন্তু আইরিনের মা হল্যাণ্ডের রাণী জুলিয়ানা, বাবা বার্নহার্ড বা বোনেরা কেউ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না। ডাচ মন্ত্রিসভায় নির্দেশ, আইরিনের বিয়েতে রাজপরিবারের কেউ অংশ নিতে পারবেন না। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে অনেকে বাড়াবাড়ি মনে করলেও আইরিন ও কার্লসের বিয়েকে উপলক্ষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিয়েছে, তাতে মন্ত্রিসভার পক্ষে এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

কার্লসের পুরো নাম প্রিন্স হিউগো কার্লস দ্য বার্বোঁ ওয়াই পার্মা। হিউগো কার্লস স্পেনের সিংহাসনের একজন দাবীদার। ১৮৩৩ সালে স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দ অপুত্রক অবস্থায় মারা যাবার পূর্বে কন্যা ইসাবেলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করে যান। কিন্তু ফার্দিনান্দের ভাই ডন কার্লস এ ব্যবস্থা মেনে নেন নি। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেন। অবশ্য ইসাবেলা ও তাঁর বংশধরেরাই স্পেনে রাজত্ব করেন এবং স্পেনের শেষ রাজা ত্রয়োদশ আলফনসোও এই বংশেরই সন্তান ছিলেন। বর্তমানে স্পেনে কোন রাজা না থাকলেও ইসাবেলার বংশের ডন জুয়ান সিংহাসনের দাবীদার। ডন জুয়ান বর্তমানে নির্বাসনে। কিন্তু এত সত্ত্বেও কার্লসের বংশধরেরা সিংহাসনের দাবী ছাড়েন নি। এই বংশেরই বর্তমান দাবীদার হলেন আইরিনের নবপরিণীত স্বামী হিউগো কার্লস। স্পেনে রাজতন্ত্র আবার কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে কি না সে-বিষয়ে কোন স্থিরতা নেই, কিন্তু সিংহাসনে কে বসবেন, ডন জুয়ান না কার্লস, এই নিয়ে কৌতুককর কলহ আছে।

হিউগো কার্লস ও তাঁর বাবা জেভিয়ার কার্লস ডাচ রাজকন্যার এই বিয়েকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহার করতে চান। কার্লসদের দাবী ছিল, আমস্টারডামের এক পুরোনো প্রোটেস্টাণ্ট গির্জায় বিয়ে দিতে হবে--- যদিও কার্লসরা ঘোর রোমান ক্যাথলিক। এই বিয়েতে ইউরোপের সকল রাজাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং হিউগো কার্লসকে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে হল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া স্পেনে কার্লসের সিংহাসনের দাবীর সমর্থনে যে শোভাযাত্রা হবে, তাতে আইরিনকে যোগ দিতে হবে। ডাচ সরকারের পক্ষে এই সব দাবী মেনে নেয়া সম্ভব নয়। হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয় ধর্মমতের লোকই আছে। এই অবস্থায় বিয়ের জন্য আইরিন প্রোটেস্টাণ্ট মত ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক হবেন এবং বিয়ে দিতে হবে প্রোটেস্টাণ্ট গির্জায়, এ ব্যবস্থা মেনে নেয়া মুশকিল। কার্লসকে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতিদান করাও হল্যাণ্ডর পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর মারিজনেলের নেতৃত্বে ডাচ মন্ত্রিসভা রাণী জুলিয়ানাকে পরামর্শ দিয়েছে কন্যার বিয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য। বিয়ের ব্যাপার ব্যক্তিগত ও পরিবারের ঘরোয়া ব্যাপার হলেও, এ বিয়ের ফলে স্পেনের রাজনীতি ও ইউরোপের বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ভয় আছে। আর হল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় রাজ পরিবারের সকল কাজের জন্য মন্ত্রিসভাই দায়ী।

ডাচ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত ও বিয়েতে পিতামাতার অনুপস্থিতির কথা জেনেই ক্ষুব্ধচিত্তে আইরিন কার্লসকে বিয়ে করেছেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ হলেও, এই বিয়েকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাজনীতিতে নতুন কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা সাগ্রহে লক্ষ্য করার মত।

**বৃটেন ঃ**

**শ্রমিক দলের নেতাদের আসন্ন মস্কো সফর ঃ** আগামী জুন মাসে শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন সবলবলে মস্কো সফরে যাবেন। শোনা যাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের কাছে হ্যারল্ড উইলসন প্রতি বৎসর একবার করে পশ্চিম ইউরোপের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

* হ্যারল্ড উইলসন

সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতাদের শীর্ষসম্মেলনে মিলিত হবার প্রস্তাব করবেন। উইলসনের মতে নিয়মিতভাবে এরূপ সম্মেলনে মিলিত হবার ফলে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন সমস্যা সামাধানের পথ সহজ হবে। উইলসনের সঙ্গে যাবেন শ্রমিক দলভুক্ত দু'জন পার্লামেণ্ট সদস্য--- এ দের মধ্যে একজন হলেন মাইকেল স্টুয়ার্ট, শ্রমিকদলে উইলসনের পরেই তাঁর স্থান, আর অপরজন জে স্লেটার--- উইলসনের পার্লামেণ্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারী। শ্রমিকদলের সম্ভাব্য সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন ওয়াকারও এই সঙ্গে যেতে পারেন।

# লণ্ডনের চিঠি

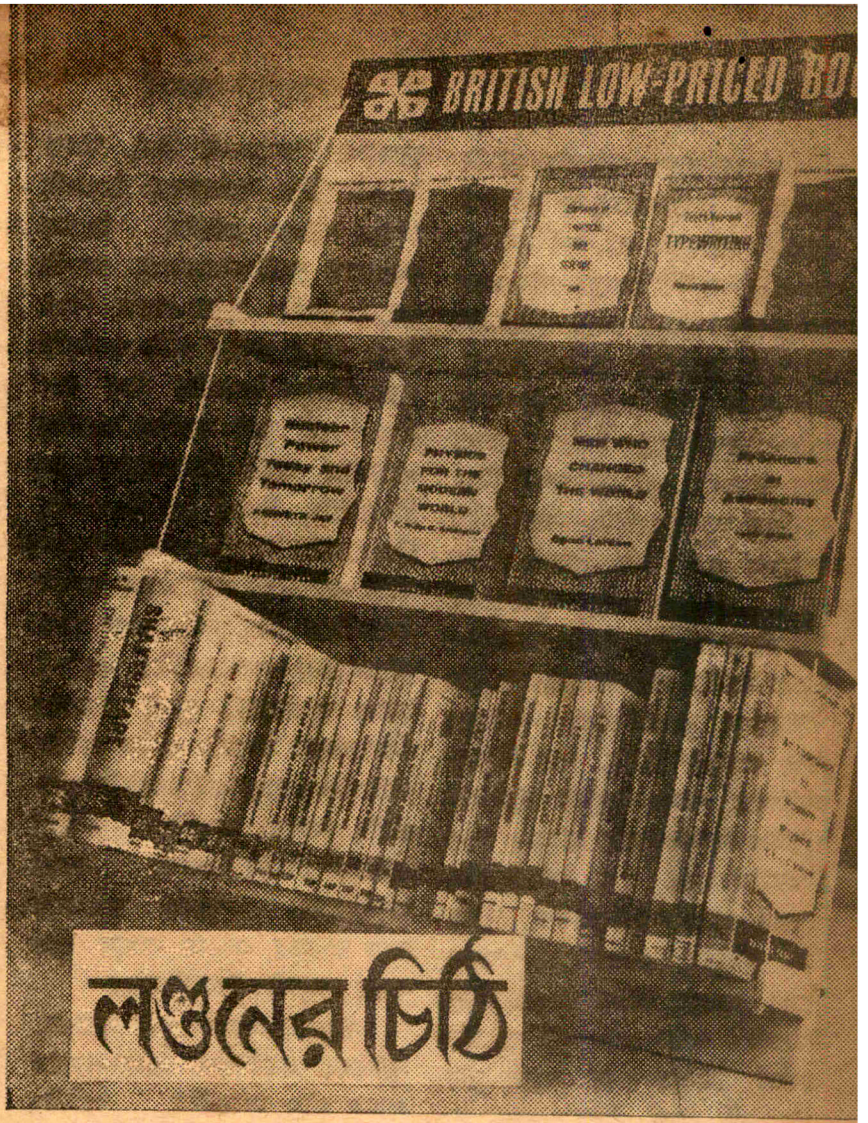


● খুবই স্বল্পমূল্যে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলোতে বিক্রয় ও সরবরাহের জন্য ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটির বইয়ের পসরা।

## ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি

ইংরেজ জাতি এক সময়ে পৃথিবীর নানা দেশে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। এই তো মাত্র সেদিনকার বহুবিদিত প্রবাদ, ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। এই প্রবাদের সত্যতা কবে ঘুচে গেছে। ইংরেজের রাজদণ্ডের প্রভাব এখন কত সঙ্কুচিত। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে ইংরেজের ভাষা, ইংরেজী সাহিত্য। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক ইংরেজীভাষী। ইংরেজী বলা-কওয়া এবং ইংরেজীতে লেখাপড়ার চর্চা পৃথিবীর সর্বত্র অব্যাহতভাবে রয়েছে: একমাত্র ইংরেজী ভাষা জানা থাকলে পৃথিবীর যে-কোন দেশে, এমন কি আটলাণ্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের কোন নাম-না-জানা দ্বীপে গিয়েও সব রকম কাজ-কারবার অতি সহজে ও অনায়াসে চালানো সম্ভব। আমাদের দেশেও তো হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা নিয়ে শত-সহস্র তোড়জোড় সত্ত্বেও হিন্দীর পাশাপাশি ইংরেজীকে বিকল্প ভাষা হিসেবে রাখতেই হয়েছে, ইংরেজীর অপরিহার্যতা ভারতবর্ষে আরো কতকাল ধরে যে অক্ষুণ্ণ থাকবে তা কেউ জানে না। ইংরেজী ভাষার প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে বলে ইংরেজী ভাষা যে একমাত্র ইংলণ্ডেরই নিজস্ব সম্পদ, তাই বা কেমন করে বলি? ইংরেজী মূলত ইংলণ্ডের ভাষা, ইংরেজ জাতির ভাষা সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজী ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্য ইংরেজীকে করে তুলেছে পৃথিবীর সব দেশের মানুষের সাহিত্যিক ভাষা। আর শুধুই কি ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর সব দেশে জীবন্তভাবে রয়েছে? ইংরেজী গান, বৃটেনের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি, অভিনয়, অঙ্গসজ্জা, বৃটেনের চারুশিল্প, স্থাপত্য, কারুশিল্প---এগুলোর প্রভাবও তো পৃথিবীর নানান দেশের ওপর কম নয়।

**অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়**

জ্যামাইকার এক কবি-বন্ধু সেদিন দুঃখ করে বলছিলেন, 'লণ্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হল, রয়্যাল অপেরা, রয়্যাল সোসাইটি অব আর্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যে সব অনবদ্য নৃত্য গীত ব্যালে অপেরা চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, আমার স্বদেশীয়দের সেগুলিতে খুব কমই যেতে দেখি। তাঁরা মনে করেন, ওগুলো ইংরেজদের জন্যে, সাদাদের জন্যে, আমাদের ওসব দেখবার শোনবার দরকার নেই। কিন্তু মহৎ শিল্প এবং শিল্পী কি কারো কেনা? কারো একচেটিয়া? শিল্পের অমৃত-নির্ঝরে স্নান-পান করার অধিকার এবং প্রয়োজন জগতের প্রতিটি মানুষের। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা দেশে জন্মেছিলেন, আর শেক্সপীয়ার যে ইংলণ্ডে, সে শুধু একটা যোগাযোগ মাত্র, তাঁরা কি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ নন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের আপন নন? আমি তো সার বুঝেছি, আমি আগে মানুষ, তারপর কালো মানুষ, তারপর জ্যামাইকান।'

এই গভীর বিশ্বাত্মবোধের পেছনে যে চেতনা, অভিজ্ঞতা, ধ্যান, জ্ঞান, রসানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি রয়েছে, তা সবাইকার থাকে না। কিন্তু দুঃখের এবং বিপদের কথা হল, এই জাতীয় কথা একটু মন দিয়ে

শোনার মত কানও আজকাল আগের চেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে না আমাদের দেশে। আমাদের ধর্ম অর্থ কর্ম মর্ম সব এখন রাজনীতিকদের দাবাবড়ের সামিল হয়ে রয়েছে। দেশের গণনেতারা যে পথে জনতাকে চালিত করেন, সেই পথেই তারা চলছে, সেই পথেই তারা চিরকাল ধরে চলবে। সংস্কৃত আর ইংরেজী, এই দুই ভাষা নিয়ে আমাদের ভুল-বোঝাবুঝির অন্ত নেই। সংস্কৃতের দোষ হ'ল একদল আত্ম-সর্বস্ব প্রগতি-পরিপন্থী কূপমণ্ডুকের ঘরে কয়েক শো বছর সে বাস করেছিল—যাদের না ছিল বাঁচবার শক্তি, না ছিল বাঁচাবার। দেশের সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, বহু শিক্ষিত লোকেরও ধারণা, সংস্কৃতটা চালকলার পুঁটলীর মধ্যেই মানায় ভালো। আর ইংরেজীর দোষ হল, সে এসেছিল একদল লোভী সাম্রাজ্যলিপ্সু কুটিল দ্বীপ কর্কটের শোষণ-যন্ত্রের বাহক হয়ে। সুতরাং ওঠাও সংস্কৃত, হটাও ইংরেজী। অথচ এই দুটি ভাষাকে একত্রে মিলিয়ে কলম করলে তার থেকে কী ফল দাঁড়াতে পারে তা দেখিয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের করা গীতাঞ্জলির অনুবাদ ইয়েট্‌সের হাতে দিয়ে সংশোধন করার অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন—'যে ব্যক্তি মনে করে এই অনুবাদের একটি শব্দও এদিক-ওদিক করা যায়, সে সাহিত্যের অ আ ক খ জানে না।' অথচ রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ কখনো রবীন্দ্রনাথের নিজের করা নয়। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষার প্রতি অন্ধ মোহ ছিল যাদের, তাদেরই ছিল ঐ রকম ধারণা।

ইংরেজী ভাষার প্রতি অন্ধ মোহ সেকালে অনেকেরই ছিল, কারণ ইংরেজী ছিল রাজভাষা। ইংরেজী শিখতে পারলে সেকালে ইংরেজ সরকারের আফিস-আদালতে চাকুরী পাওয়া যেত। সমস্ত দেশের শিক্ষা দীক্ষা আইন প্রশাসন গতি ও প্রকৃতি পুরোপুরিভাবে ইংরেজীর ধাঁচে গড়া ছিল। সে যুগে মধ্যবিত্ত বাঙালীর একেবারে আদর্শ ছিল—Write in English, Read in English, Dream in English : বাঙালী জাতির মতো ভারতবর্ষের আর কোন জাতিই ইংরেজীকে এমন ক'রে ঘরের ভাষা প্রাণের ভাষা করে নেয় নি। এর ফল ভালো ও খারাপ, দুই-ই হয়েছে। নিদারুণভাবে বাঙালী জাতির আত্মিক ক্ষতিসাধন করেছে এই উৎকট ইংরেজী-প্রীতি, আবার অন্যদিকে বাঙালী জাতিকে বিদ্যায় বৈদগ্ধ্যে মহত্তর অনুশীলনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সমস্ত জগতের চোখের সামনে তুলে ধরছে বাঙালীর ইংরেজীয়ানা।

এ-যুগেও একথা খুবই সত্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র মাধ্যম হ'ল ইংরেজী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান ভাণ্ডারের অনেক কিছুই আজ অবধি বাংলায় লেখা হয় নি, কবে যে লিখিত হবে আর লিখিত হয়ে কবে যে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হবে, তা এখনো অনিশ্চিত। আর হিন্দী তো হাটের ভাষা, হাটুরে ভাষাকে জোর করে দরবারী ভাষা করা যায়, কিন্তু কখনোই সে ভাষাকে, কিছুতেই সে ভাষাকে স্নাতকোত্তর ভাষা করা সম্ভব নয়, করা যেতে পারে না। কাজেই ইংরেজীই হ'ল আমাদের বাইরের জগতের সমস্ত রুদ্ধ দরজার একমাত্র চাবিকাঠি। বিজ্ঞান, কারিগরীবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির অফুরন্ত বই ইংরেজীতে রয়েছে, সেই সমস্ত বই খুবই অল্প মূল্যে যা'তে ভারতবর্ষে ও এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হয়, তার জন্য লণ্ডনে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি নামে বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কোন ইংরেজী বইয়ের সাধারণভাবে যা দাম, সেই দামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে এই সোসাইটি যাবতীয় বিষয়ের ওপর ইংরেজী বই প্রকাশ করে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করছেন। মুদ্রিত ইংরেজী বইয়ের যা আসল দাম, সেই দামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে ভারতবর্ষে ও এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বই বিক্রয় করার উদ্দেশ্য হ'ল ঐ সব দেশের কারুশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কারিগর, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ্ সমাজতত্ত্ব-বিদ্, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আরো ভালোভাবে তৈরি হয়ে উঠতে, শিক্ষিত হতে সাহায্য করা। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারকে অধিকতর সুগম ও সহজসাধ্য করে তোলার জন্য অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে ইংরেজী বই বিক্রয়ের এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় বছর তিনেক চার পূর্বে—১৯৬০ সালে। বই ছাপতে যা খরচ হয়, সেই খরচের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র মূল্যবাবদ নিয়ে বই সরবরাহ করার যে পরিকল্পনা এই সোসাইটি গ্রহণ করেছেন, তা সম্ভব হয়েছে পরিকল্পনাটির রূপায়ণে যুক্তরাজ্য সরকার বহু টাকা ব্যয় করছেন বলে। বৃটেনের সমস্ত খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশকেরাও এই পরিকল্পনার কার্যক্রমের মধ্যে যোগদান করেছেন। বুক সোসাইটি থেকে যে সমস্ত বই এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত হবে বলে স্থির হয়, সেই সব বই বিভিন্ন প্রকাশকের মাধ্যমে—এক এক ধরণের বইয়ের বা এক একটি বইয়ের প্রকাশক এক একটি সংস্থা—প্রকাশিত করে থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রকাশক

ভারত সরকারের ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান ডক্টর বি ভি কেশকার সম্প্রতি বৃটেনে এসেছিলেন। তিনি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটির প্রকাশিত বইগুলো মনোযোগ সহকারে দেখছেন।

সেই বইটিকে প্রকাশ করার পরে ভারতবর্ষে এবং এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বইয়ের প্রকাশনা-ব্যয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেন উপযুক্ত এজেণ্ট ও প্রতিনিধিদের সাহায্যে।

বলা বাহুল্য এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলোতে ইংরেজী ভাষার অধিকতর প্রচার এবং ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনকে অনায়াস-সাধ্য ক'রে তোলাই এই সোসাইটির লক্ষ্য। যেহেতু ইংরেজী ভাষা এশিয়া-আফ্রিকার অধিকাংশ দেশেই কাজ-কারবারের ভাষা, বিদ্যাচর্চার ভাষা, সেই কারণে এই বুক সোসাইটির প্রচেষ্টার ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই অনুকূল হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ ছাড়া এশিয়ার মধ্যে আফগানিস্থান, নেপাল, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, হংকং, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আফ্রিকায় নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরা-লিয়োন, লাইবেরিয়া, কঙ্গো, রোয়াণ্ডা, টোগো, সেনেগল, বুরুণ্ডি প্রভৃতি দেশে গত দুই-তিন বছরের মধ্যে এই সোসাইটি লক্ষ লক্ষ কপি বই সরবরাহ করেছেন। এই সোসাইটি কারিগরীবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনেক অনেক বই এবং বুক কিপিং, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, পশু চিকিৎসা, ব্যবসায় সংগঠন, আইন ও ইতিহাসের অজস্র বই ইতিমধ্যে প্রকাশ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন। এই সমস্ত বিষয়ের বই ছাড়াও বুক সোসাইটি ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের কতকগুলো ভাল ভাল বই প্রকাশ করেছেন: ঐ ছয়টি পর্যায় হ'ল Aids to English, Science Today, Practical Books, Modern World ও The Teacher's Bookshelf. সাধারণত ইংরেজী ভাষা খুব সহজে ও অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে শিখতে সাহায্য করার জন্য, আধুনিক কালের বিজ্ঞানের নানা বিষয় এবং সাধারণ জ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ খুব জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই ছয় পর্যায়ের বইগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও বুক সোসাইটি বিস্তর গল্প-উপন্যাসের বই প্রকাশ করেছেন আর, বিশেষ করে এই বছর শেক্সপীয়ারের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শেক্সপীয়ারের সমগ্র রচনার একটি অত্যন্ত মনোরম সুদৃশ্য সংস্করণ বের করেছেন। এই মনোরম সংস্করণটির মূল্য মাত্র সাড়ে সাত শিলিং। বুক সোসাইটির যাবতীয় কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা-মণ্ডলী। এই মণ্ডলীর চেয়ারম্যান এ-এল-পি নরিংটন অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজের প্রেসিডেণ্ট। তিনি দীর্ঘদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন য়ুনিভার্সিটি প্রেসের প্রতিনিধিদের সেক্রেটারী। মিঃ নরিংটন দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, ভারতবর্ষেই তিনি সর্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৬২ সালে নিউদিল্লীতে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়, ঐ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যরা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটির স্বল্পমূল্যে ইংরেজী বই প্রকাশনার যে পরিকল্পনা, তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই পরিকল্পনার অসাধারণ কার্যকারিতা ও সকল দিক থেকে এর ফলপ্রসূতা সম্পর্কে সমস্ত সদস্য অভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্র।

# বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

॥ তেরো ॥

কোম্পানীর অফিসে বসে বসে সমর নিজের নামেই নিজে একখানা চিঠি লিখতে বসলো। সত্যিই তো এতবড় জীবনে সে আজ পর্যন্ত একখানা প্রেমপত্র পায় নি। প্রেমপত্র! কথাটা ভেবেই শরীরে কি রকম একটা রোমাঞ্চ দেখা দেয়। নিরালা একাকীত্বে নিজের নামে চিঠিখানা লিখলো বটে, কিন্তু তার মনে হলো, যেন সর্বক্ষণ তার সামনে একটা অতি পরিচিত নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে হাসছে।

সমর লিখলো—

প্রাণের প্রিয়তম,

এতদিন তোমাকে কোনো চিঠি লিখি নি। তুমি নিশ্চয়ই ভাববে এতদিন আমি চিঠি লিখি নি কেন। মনের অবস্থা চিঠি লেখার মতন ছিল না। তোমার কথা ভাবলেই মনটা কি রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে। শুনলাম তোমার নতুন বাড়িতে একটি সুন্দরী বান্ধবী জুটেছে। একটু সাবধানে থেকো। আর কি লিখব। তুমি আমার প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ করো। ইতি—

তোমার সরমা।

চিঠিখানা বন্ধ করে সমর পোস্ট করে দিল। বেশি শক্তভাবে বন্ধ করল না। সে জানে এ চিঠি একজন নিশ্চয়ই খুলে পড়বে। অপঠিত চিঠি তার হাতে পড়বে না। লেডী কিলার না হলেও এইটুকু সে জানে যে নারী-দের কৌতূহলটা একটু বেশি।

অনেক দিন হ'ল নৃপেনের সঙ্গে দেখা হয় নি। সমরের জীবনে আপদে বিপদে শোকে আনন্দে এই নৃপেনই একমাত্র বন্ধু। আজ এতদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখাটুকু পর্যন্ত না করায় সমর নিজেকে অপরাধী মনে করল।

সে তাড়াতাড়ি মেসবাড়ির দিকে রওনা হ'ল। মেসের ছোট্ট নীড়ে তখন অফিস ফেরৎ পুরোনো বন্ধুরা একে একে প্রবেশ করছে।

সমরকে দেখে কানাই বলাই জাফিয়ে উঠলো। নৃপেন তখনও ফেরে নি। কানাই বলাই-এর আজও চাকরী জোটে নি। সমর উপেনকে ডাকলো। উপেন সমরকে দেখে ভারী খুশি। তবে একটুও নোটিশ না দিয়ে ডাকায় তাকে পুরোনো ছেঁড়া পোষাকেই আসতে হলো। উপেন নমস্কার করে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, 'আজ্ঞে, দিদিমণি ভালো আছেন তো?'

সমর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কোন্ দিদিমণি?'

উপেন ব্যাটা আস্ত গবেট, একটা হটেমটে। পাছে আবার অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করে বসে, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সমর বলল, 'হ্যাঁ। তোর খবর কি? একি দুর্দশা হয়েছে তোর। লক্ষ্ণৌ-এর 'নবাবের' এই ছিরি বসন?'

নাটকীয় কায়দায় উপেন বলল, 'তোমরা চলে গেছ দাদাবাবু, আর উপেনকে কে দেখে?' চুপি চুপি হাত নেড়ে বলল, 'তা ছাড়া নতুন ম্যানেজারটার জ্বালায় একটু সেজেগুজে থাকার উপায়টুকু নেই। তক্ষুণি এসে গোঁপ নাচিয়ে বলবে, বলি উপেন, আলু এখানে দশ সের আছে তো? নবাব পুত্তুরের মতন পোষাকটি হাঁকাচ্ছো কেমন করে বাবাজী? তুমিই বল, একবার আলু কেনার সঙ্গে পোষাকের কোনো সম্বন্ধ আছে? আমি তো আর চাই না। দোকানদার সিকিটা আধুলিটা দিলে নিয়ে নি। ম্যানেজারের তা সয় না। সেজন্য সেও আজকাল সঙ্গে সঙ্গে বাজারে যায়।'

কানাই বলাই বলে উঠলো, 'বুঝলি না, ওর আর সুবিধে হচ্ছে না।'

সমর বলল, 'পটলবাবু কি বলে? তোর কিছু আশা নেই সিনেমায়?'

কানাই বলাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আরে বাপ, আগে পটলটা তো চুকুক। আজকাল আবার যোগ অভ্যাস সুরু করেছে। শরীরটা খুব হাল্কা হবে। আর চমকটা বাড়বে। বনজোছনা দেবী আজকাল নাকি প্রায়ই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। উপেনকে তখন আর পায় কে? কি বলিস রে উপেন? আমাদের চিনতে পারবি তো?'

—'কি যে বল দাদাবাবু? আমার সিনেমা দেখাতে তোমাকে একেবারে

সামনের লাইনে বসাবো তবে জানবে আমার নাম উপেন। তবে হ্যাঁ দাদাবাবু, ম্যানেজারটাকে দেখে নেব। এটাই যত নষ্টের গোড়া। যাই, তোমাদের খাবার নিয়ে আসি।'

বলাই গোঁপ নাচিয়ে বলল, 'কি হে সমরভায়া, দিদিমণির খবরটা চাপা দিলে কেন?'

কানাই সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক, তোমার জীবনের নতুন চ্যাপ্টারটা শোনাই হয় নি। বলো হে বলো ভ্রাদার, অশ্রু না হাসি তার নামটা কি?'

সমর বলল, 'কেন রে অশ্রু হাসি হতে যাবে কেন?'

কানাই বলল, 'বুঝলে দুটো প্রশ্ন এক সঙ্গেই করে ফেললাম। তার নামটা ত' জানা যাবে। তোমাদের প্রোগ্রেসটা জানা যাবে। নেপেনদার পাল্লায় পড়ে কত ঘাটেরই না জল খেয়েছি। কত অশ্রু কত হাসির সঙ্গেই না দেখা করেছি। সমস্ত জীবনের পেণ্ডুলামটা ঐ দুটো বিন্দুর মাঝখানেই ভাসছে। অশ্রু আর হাসি। হাসি আর অশ্রু।'

বলাইটা হাঁ করে কানাইয়ের কথাগুলো গিলছিল; হঠাৎ বুকে একখানা হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গেলো গেলো, ও ভায়া সমর কোথায় নিয়ে গেছলে গো। কনে দেখতে গিয়ে হৃদয়খানা খুইয়ে এলুম গো।'

সমর ওর দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে ছিল। কানাই ওকে বুঝিয়ে বলল, 'জানিস না তোর জন্যে সেই কনে দেখতে যাওয়ার পর থেকেই বলাইটার হার্টের ট্রাবল হয়েছে। যখন তখন বুকে ব্যথা করে। দু-পাঁচ মিনিট বনানী দেবীর নাম করলেই ব্যথাটা সেরে যায়।'

সমরের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠলো। বনানীর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

কানাই বললো, 'কই? চুপ করে রইলে কেন? অশ্রু হাসির দু-পাঁচটা কথা শোনাও। আমরা তো আর ভাগ বসাতে যাব না। ইতর জন। মিষ্টান্নেই খুশি। কি বলিস রে বলাই?'

এর ভিতর উপেন থালায় করে সাজিয়ে এককাঁড়ি খাবার, চা নিয়ে হাজির।

জীবনে পটলার পরই সে সমরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। একজন তার জীবনের দেবতা—মানে হীরো। তাকে সিনেমায় পার্ট দেবে। অন্য জন তাকে পার্ট দেবার জন্য বই রচনা করবে।

কানাই বলাই ছাড়বার পাত্র নয়। 'হ্যাঁ রে উপেন যাচ্ছিস কোথায়, দাঁড়া দাঁড়া। কি বলছিলি সেই দিদিমণির কথা? সে সমরের দিদিমণি বুঝি?'

উপেন বলল, 'আজ্ঞে দাদাবাবু পরে বলব। ম্যানেজারটা রান্নাঘরের পিছনেই দাঁড়িয়ে। নকুলকে খিঁচোচ্ছে, ঘি খেয়েছে বলে। এবার আমাকেও ধরবে।'

বলাই বলল, 'নিকুচি করেছে তোর ম্যানেজারের। বল শীগগির দিদিমণি তোকে সেদিন কি খাওয়াল আর দাদাবাবুর জন্য কি কি আনতে দিল?'

সমর দেখলো উপেনটাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। সে বলল, 'সে কি রে উপেন, তোকে আবার দিদিমণি আমার জন্য কি আনতে দিলে। কবে?'

উপেন বলল, 'জানবে কি করে বল, সে যে নিজেই বলে দিলে উপেন এ খবরটা যেন কেউ টের না পায়। তারপর দিদিমণি তোমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে দরজা বন্ধ করে দিলে।'

আকাশ থেকে পড়ে সমর বলল, 'কি জিনিষ? কবে?'

বলাই বললে, 'ব্রাদার সব জানো, যাই হোক, আমাদের বলতে লজ্জা কি? শুনেই আমরা খুশি। দীর্ঘজীবী হও। তোমাদের প্রেম বেঁচে থাক। উপেন জিনিষটা কি ছিল রে?'

উপেন একবার অপ্রস্তুত সমরের দিকে আর একবার বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাতো জানি নে। দিদিমণি কাগজে লিখে দিল। আমি কিনে আনলাম। তবে মনে হল ঐ যে পটলাবাবু জামায় গন্ধ মাখে মাঝে মাঝে ঐ সেই জিনিষটাই হবে।'

কানাই বলাই শুধু সমরের দিকে তাকিয়ে চোখ দুজোড়া নাচিয়ে গেল।

সমর বলল, 'সত্যি বলছি ভাই, তোরা বিশ্বাস কর, আমি আজও সেই সেণ্ট-মেণ্ট দেখি নি।'

কানাইটা হতচ্ছাড়া। সে বললে,

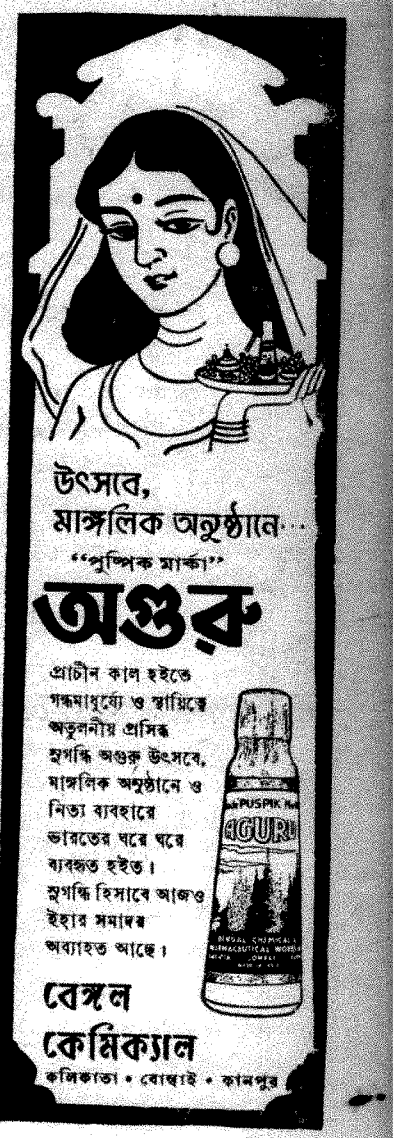

'আরে ভায়া, তাতো হবে সেন্টি-মেণ্টের খেলায় কি আর সেণ্ট-মেণ্ট মনে থাকে। যাক বাড়িতে গিয়ে স্থিরমস্তিষ্কে টেবিলের ওপর খুঁজে দেখো। নিশ্চয়ই সেটা পেয়ে যাবে।'

এর ভিতর হৈ হৈ করতে করতে নৃপেন এসে ঘরে ঢুকলো। সমরকে ঘরে দেখে বেশ খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই অনেকদিন বাঁচবি। তোর কাছেই যাচ্ছিলুম। শোন্ ঠিক করেছি কাগজ বার করবো?'

আকাশ থেকে পড়ে সমর বলল, 'কি বললে নেপেনদা, কাগজ বার করবে? কে? তুমি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই কাগজ, মানে পত্রিকা বার করব। এই দিল্লী শহর থেকে কাগজ বার করব। তোকে যে উপন্যাস লিখতে বলেছিলুম সেটা সুরু হয়েছে?'

সমর বলল, 'বইগুলো পড়ছি। কিন্তু লেখাটা কি সত্যিই আমাকে লিখতে হবে?'

—'নিশ্চয়ই, মানে আলবৎ। আমার পত্রিকাতেই সেই সব লেখা ছাপতে সুরু করব।'

একটু চিন্তিত হয়ে সমর বলল, 'নেপেনদা পত্রিকা বার করবে, সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাতে যে অনেক টাকা লাগবে। সেটা পাবে কোথায়?'

নৃপেন বলল, 'তুই কি ভেবেছিস আমি সে সব চিন্তা না করেই কোমর বেঁধে নামছি। কাগজে যাদের লেখা ছাপবো, ছাপাবার টাকাটা তারাই দেবে। যাদের ছবি ছাপাবো ছবিটার দাম তারাই দেবে। যাদের দিয়ে ইনগুরেট করাবো কাগজের দাম তার কাছ থেকেই নেব। তা ছাড়া পেট্রন, প্রেসিডেণ্ট, চেয়ারম্যান, লাইফ মেম্বার এরা সব কি করবে? তোর লেখা তাড়াতাড়ি সুরু করে দে। আধুনিক সাহিত্য তৈরি করতে হবে। চাই একেবারে নগ্ন প্রেম, সেখানে কোনো আবরণের বালাই থাকবে না। ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিছু নেই। এক কথায় নগ্ন শরীরের বর্ণনা। কবিতার জন্য চিন্তা করো না। সে ডিপার্টমেণ্টের ভার আমি নিজেই নেব। সমস্ত কবিতা লেখার ভার আমার।'

বেশ চিন্তিত হয়ে সমর বলল, 'নেপেনদা, তুমি যে কখনও কবিতা লেখো নি।'

নৃপেন বলল, 'তাতে কি হয়েছে? মায়ের পেটের থেকে পড়েই কেউ কবিতা লিখতে শেখে নাকি? প্র্যাকটিস করছি। জানিস না, প্র্যাকটিস ইস দি মাদার অব অল সাকসেস। প্র্যাকটিস মেক্‌স্ এ ম্যান পারফেক্ট। আমি যে আধুনিক কবিতা লিখছি, তুই শুনিস নি?'

নৃপেনের কবিতার কথায় কানাই বলাই বেশ ভীত হয়ে পড়েছে। সমর হতভম্ব। কিছুক্ষণ পরে বেশ খানিকটা দম নিয়ে বলল, 'তাই না কি? শোনাও তো তোমার আধুনিক কবিতা, নেপেনদা।'

নৃপেন বলল, 'শোন তাহলে।' বলেই পকেট থেকে একটা স্বরচিত আধুনিক কবিতা বার করলো—

'হে মোর আকাশের মেঘ!
ছুটেছো কোথায়?
দেখেছো কি উটের উদার দৃষ্টি?
শুনেছো কি
ভিশুবিয়সের তাণ্ডব গর্জন?
শুনেছো শুনেছো কি গর্দভের
প্রেমালাপ!
এমন সময় ঝাড়ু হাতে রাগিণী দেবী
এসে বললেন, নাথ কর গ্রহণ
প্রীতি সম্মান বা সম্মার্জনী।
দুটো অলটারনেটিভ।'

সমর একেবারে নির্বাক।

নৃপেন বলল, 'এটা এখনও ব্রাশআপ করতে হবে। এর ভিতর জুড়ে দিতে হবে স্পেশ ট্রাভেল, গ্যাগারিনের আকাশ ভ্রমণ আরও--- অক্টোপাস, ডাইনামিসম এই ধরণের দু-পাঁচটা কথা। সম্মানের সাথে সম্মার্জনী কি সুন্দর মিলে গেছে দেখেছিস? হ্যাঁ আরও ভেবে দেখলুম একটা আত্মজীবনীর সেকশন রাখতে হবে। কানাই, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি ভায়া ওটার ভার তোকেই নিতে হবে। বলাইকে করছি আর্ট-ক্রিটিক। কি বলিস সমর?'

সমরের মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। সে বেচারা যেন একটু হকচকিয়ে গেছে।

নৃপেন বলল, 'ঐ তো তোদের দোষ? অত ভাবাভাবির কি আছে? ব্যস, এইবার সবাই মিলে কাজ সুরু করে দে। নো রিস্ক্ নো গেইন।'

(ক্রমশঃ)

# বিকা নিলয়েষু

**আমতাভ বসু**

না; আমি পারি নি: এই কথা বলা সহজ ছিল না
যদিও, সামান্য মিথ্যে দিয়ে তুমি সাজানো কথায়
বলতে পারতে মৃদু হেসে হেসে করো নি ছলনা,
বরং করেছো চেষ্টা প্রতিপদে পূর্ণ মমতায়।
শুধু যা শুনেছি নিজে, প্রশ্ন আমি করেছি তা দিয়ে;
বলেছো কুঞ্চিত ঠোঁটে শোনা কথা—মিথ্যা আর ভুল,
তারপর যা বলেছো কানে কানে ইনিয়ে বিনিয়ে—
আজ ভাবি সে-ভাষার, সে-মিথ্যার নেই সমতুল।

অনেক বছর গেছে, তবু অন্ধকারে রাত্রি জাগি'
যখন নিজেকে দেখি,—আমি যেন তোমাতে বৈরাগী।

● পটারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণরত শ্রীরামস্বামী মুদালিয়ার।

**রাজধানী :**

বৈশাখের রোদের প্রখরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় বাংলার বুকে ফলের বাহার। আম, কাঁঠালের গন্ধে ভরে ওঠে চারিদিক। গরমের অবসাদ, তার সকল প্রকার দুর্ভোগ ভুলে যায় মানুষ—ফলভারে নুয়ে-পড়া শাখা-বাহুর আহ্বানে সাড়া পড়ে যায় সর্বত্র। শুধু আম আর কাঁঠাল নয়, লিচু, জাম, জামরুল প্রভৃতি রসাল ফল এই গ্রীষ্মকালেই বাঙালীর রসনাকে তৃপ্ত করে। বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সুরু করে জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি ফলের বাজার সরগরম থাকে।

এবারে আম ও লিচুর ফলন ভালই হয়েছে। কিন্তু হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণার ফল কালবৈশাখীর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় নি সবটা। কলকাতার আশে-পাশের এই ক'টি জেলাতেই নামকরা আম—গোলাপ খাস, হিমসাগর, বোম্বাই ও ল্যাংড়া জন্মায়। মালদহের আমের সংবাদও ভাল। তার এখনও ঢের দেরী।

কলকাতায় ফলের বাজার জমে উঠেছে মাদ্রাজ ও কাশীর আম এখনো এসে পড়ে নি। বোম্বাই গোলাপ খাস এবং লাল টুকটুকে লিচু ব্যাপারীর ঝাঁকা আলো করে তুলেছে। ক্রেতার ভিড়ও কম নয়। কিন্তু ট্যাঁকের জোর যাঁদের নেই, তাঁরা সরে পড়ছেন মানে মানে। ভাল আমের এবারে ইজ্জত বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি। বেশ কিছুদিন তারা উঠেছিল দাঁড়িপাল্লায়। মূল্য ছিল তাদের প্রতি কিলো আড়াই টাকা। নাম-না-জানা দেশী আম এসে তাদের পাল্লা থেকে নামিয়েছে। এখন তারা বিকোচ্ছে টাকায় তিনটে করে।

কাঁঠালের মর্যাদাও কম নয়। দেড় কিলো ওজনের একটা আস্ত কাঁঠালের দক্ষিণা দু' টাকা। পুষ্ট বড় লিচু বেছে নিতে গেলে প্রতি একশ'র মূল্য দিতে হয় আড়াই টাকা। কাঁচা-পাকা-শুঁটকো মিলিয়ে নিলে দোকানী একটু সুবিধে করে দেড় টাকায় দিতে রাজী হচ্ছেন। জামরুলের দামও কম নয়। কুড়িটি জামরুল নিতে হলে কমসে-কম চার আনা পয়সা দিতে হয়।

বাংলার দরিদ্র-সাধারণের কাছে গ্রীষ্মকালটা ছিল ভগবানের আশীর্বাদেরই মত। নিজের গাছের অথবা অপরের বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা ফল তাদের জঠরের জ্বালা মেটাতো বেশ কিছুটা। আম আর কাঁঠালের সঙ্গে সামান্য চিঁড়ে-মুড়ি অথবা পান্তাভাতের সংস্থান করতে পারলেই দিন কেটে যেতো কোন রকমে। কিন্তু সেদিন আস্তে আস্তে একেবারে বিদায় নিচ্ছে। নিজের বাড়িতে যার গাছ নেই ফল এখন আর তার ভোগে সহজে আসে না। চিঁড়ে-মুড়ির কথা না বলাই ভাল। ক'দিন আগেও চিঁড়ে ছিল প্রতি কিলো একটাকা চার আনা। মুড়ি এক কিলো একটাকা ছ' আনা। আমাদের সরকারের চালচলনে বাজার থেকে চালই উধাও হতে বসেছে। চিঁড়ে-মুড়ির নাগাল পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মশায় বোম্বাই থেকে ফিরে এসে ডি-আই-রুলস প্রয়োগের মোক্ষম বাণী শোনাবার পর হাহাকার পড়ে গিয়েছে। চাল, ধান আত্মগোপন করেছে চোরা-কারবারীদের গোপন গুহায়। ধানের অভাবে কলকাতার আশে-পাশের ৫২টি চালকলের ৪০টির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাদবাকী ১২টির অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল। মফস্বলের চালকলগুলিতেও সৃষ্টি হয়েছে একই অবস্থার। পশ্চিম বাংলায় ধান উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হল মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান এবং ২৪ পরগণার কিছুটা অঞ্চল। ধানের এই কৃত্রিম অভাব দূর করবার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকেরা নাকি কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন মজুতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। এ সংগ্রাম কতটা সফল হবে, বলা মুস্কিল। গেল ক'বছরের ইতিহাস ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এক শ্রেণীর জোতদার ও মজুতদারদের সঙ্গে প্রভাবশালী মহলের দহরম-মহরম অধিক থাকায়, আমরা বাধ্য হই গৃহস্থকে সজাগ থাকতে এবং চোরকে তার কাজ চালিয়ে যাবার উপদেশ দিতে। তারপর ফল যা হবার তাই হয়।

পকেট কাটা পড়ে ভালমানুষ গৃহস্থ-গোষ্ঠীর। চালকল বন্ধ হওয়ায় একদল শ্রমিক আবার বেকার হয়ে পড়েছেন। শ্রমিকদের প্রতিনিধি সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ কামনায় ধর্ণা দিয়েছিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্কটকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় কিছুদিন বিশ্রামের কথাও চিন্তা করছেন।

আমাদের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলেছেন তার সার মর্ম বাউলের ভাষায় দাঁড়ায়—

'আমি জাল ফালাইয়া খুঁইজ্যা বেড়াই
দিন যে গেল বইয়্যা ;
হায়, বুঝাই কারে কইয়্যা।'

সোজা কথায় তিনি আর হালে পানি পাচ্ছেন না। তাঁর সাধের মাছের ব্যবসারও না কি দিন ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম বাংলার মাছের পাইকারের দল উড়িষ্যায় গিয়েও হামলা

শুরু করেছে। পশ্চিম বাংলা সরকার যাতে উড়িষ্যার মাছ সরাসরি আমদানি করতে না পারেন তার ফিকির-ফন্দি চালাচ্ছে।

পাইকারদের কাছে নাজেহাল হয়ে তিনি ক্রেতা-সাধারণকে আক্কেল দেবার পন্থা নির্ধারণ করেছেন। ঘোষণা করেছেন, অন্যায় যে সহ্য করবে অর্থাৎ বেশি দামে যে মাছ কিনবে তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। হায়, সেলিউকাস বিচিত্র এ দেশ —শাসনদণ্ড একবার উঠলে তাকে সম্বরণ সম্ভব নয়। একজনের মাথায় সে আঘাত হানবেই। আমরা বারবার বলছি, মৎস্য-মন্ত্রী মশায় ভেবে-চিন্তে কাজ করুন—মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আগে ঘর সামলাবার পথ দেখুন। গোড়ার গলদ না গেলে আপনার বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতেই পরিণত হবে।

* * *

শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এক সময়ে বাংলা ছিল সারা ভারতের সেরা রাজ্য। হুগলীনদীর দুটি তীর ছিল বাংলার পীঠস্থান। শিল্পের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল ছিল অগ্রণী। ধীরে ধীরে শিল্প-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ছে বাংলা দেশ। হার মানতে হচ্ছে তাকে বোম্বাই, আমেদাবাদ, গুজরাট প্রভৃতি এলাকার কাছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স ভবনে অল ইণ্ডিয়া পটারী ম্যানুফ্যাক্চারার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা-কালে স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার অবদানের উল্লেখ করে বলেছেন, এককালে শিল্পে বাংলা গ্রহণ করেছিল অগ্রণী ভূমিকা। আজ সে পিছিয়ে পড়ছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় এ রাজ্যে গড়ে উঠেছিল রসায়ন শিল্প। আজ বোম্বাই প্রাধান্য লাভ করেছে সে শিল্পে। বাংলা থেকে কল-কারখানা সরিয়ে নেবার একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে শিল্পপতি-মহলে।

কলকাতায় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবের দরুণই শিল্পপতিরা স্থানান্তরের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন বলে স্যার রামস্বামী মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিও কিছুটা বক্রোক্তি করতে কসুর করেন নি। তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে প্রগতিপন্থী কোন মানুষই সায় দেবেন না, কারণ যাকে একবার পিছনে ফেলে আসা যায় তাকে আর সামনে টেনে আনা সম্ভব নয়; কারণ ফেলে আসা কিছুই আর যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু শিল্পপতিদের সামলাতে না পারলে সমস্যাসঙ্কুল খণ্ডিত বাংলার জীবনযাত্রা একেবারে ভেঙে পড়বে। নতুন করে উদ্বাস্তু আসছে,—বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে, সমস্যা অচিরে জটিল হয়ে উঠবে। বাংলার কর্ণধার যাঁরা তাঁরা যেন এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। ভারত সরকারের বাংলার প্রতি এ ব্যাপারে বিমাতৃসুলভ মনোভাবের কথাই সেদিন আরেকটি বণিকসভার অধিবেশনে উঠেছিল। তাঁরা তথ্য উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশে শিল্পায়নের জন্য যা ব্যয় করছেন, তার মোটা অঙ্ক যাচ্ছে বোম্বাই অঞ্চলের কল্যাণ সাধনের কাজে।

বাংলাকে আগামী দিনের সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে বাঙালী শিল্পপতি ও শ্রমিকদের এক-যোগে। আগের মত অবাধ শোষণের সুযোগ বাংলায় না পেয়েই শিল্পপতিরা কলকাতার অপর সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করে কল-কারখানা তুলে নিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। কলকাতার শ্রমিকসমাজ এখন তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের চাইতে অধিক সচেতন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের স্বার্থ-সিদ্ধির যূপকাষ্ঠেও তাদের বলি কম হয় না। এ দিকে তাঁরা একটু সতর্ক হলে বিপদ যাবে অনেকটা কেটে।

* * *

ধোঁয়ার জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে কলকাতাকে সুন্দরী মহানগরীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কলকাতার গৃহিণীদের আর যাতে কয়লার উনুনের ঝঞ্ঝাট পোহাতে না হয় সেইজন্য সস্তায় গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল রান্নার কাজে কয়লায় যা' খরচ পড়ে তার চাইতে শতকরা দশভাগ মাত্র বেশি পড়বে গ্যাস ব্যবহার করলে।

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর পক্ষে কলকাতার চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় বলেই দুর্গাপুরে গ্যাস উৎপাদন এবং সেই গ্যাস কলকাতায় টেনে আনার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে পাইপ-লাইন বসানো হল। গেল আগষ্ট মাসে দুর্গাপুর থেকে গ্যাস আনবার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এত সত্ত্বেও ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। গ্যাস কোম্পানী এই ক' মাসের মধ্যে বার শ' নতুন প্রার্থীকে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছেন। শোনা যাচ্ছে সারা বছরে আড়াই হাজারের অধিক প্রার্থীকে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।

আমাদের সরকারের কারবারই আলাদা। সরকারের হাত পড়লেই গোলমালের হয় সৃষ্টি। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর ভার যিনি পেলেন, তিনি কর্তৃপক্ষের পেটোয়া অফিসার ছিলেন। পশ্চিম বাংলা থেকে সার পাচারের কেলেঙ্কারীর সঙ্গে তাঁর নামও উঠেছিল। কিন্তু তিনি সরকারের অনুগ্রহভাজন। তাই নতুন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেলেন।

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর কর্তা-ব্যক্তি দায়িত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। চতুর ও দক্ষ ব্যবসায়ী মাত্রেই মাল উৎপাদনের আগে সন্ধান নিয়ে থাকেন বাজারের। বিক্রয়ের জন্যই পণ্য উৎপাদন। উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত করে রাখলে ব্যবসা চলে না। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর পরিচালকগণ এই সাধারণ নীতিটুকু পর্যন্ত অনুসরণ করেন নি। প্রয়োজনীয় মিটার ও পাইপ নাকি তাঁদের হাতে নেই। ফলে, নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ তো দূরের কথা, যাঁরা গ্যাস পেয়ে আসছেন তাঁদের মিটার খারাপ হলে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে না। এমনি অব্যবস্থার ফলে, একদিকে গ্রাহকদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, অপর দিকে জলের মত অপচয় হচ্ছে সরকারী অর্থ। দুর্গাপুরে উৎপন্ন গ্যাসের অধিকাংশই সেখানে পুড়িয়ে ফেলতে হচ্ছে। এরপর নিশ্চয়ই কেউ ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর মাতব্বরদের দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন না?

* * *

সপ্তবামের সংগ্রাম সুরু হয়েছে ট্রাম ও বাসের এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। চারদিক থেকে যাদের পকেট কাটা যাচ্ছে সমানে তারা যেন এক নয়া পয়সার জন্য হা-হুতাশ করতে নারাজ তাই প্রতিরোধ আন্দোলনকে উপেক্ষা করেই বুকভরা যাত্রী নিয়ে নিয়মিত

ছুটে এসেছে ট্রাম ও বাস। সেদিন ট্রামে উঠতে উঠতে একজন যাত্রী বলছিলেন, 'আজব এই কলকাতা শহর। তেলের দাম রাতারাতি একটাকা বেড়ে গেল। চালের দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আমাদের ভায়াদের সেদিকে নজর নেই—লড়াই করছেন এক নয়া পয়সা নিয়ে।' শুধু একজন নয়, কলকাতার প্রতিটি মানুষের মনের কথাই এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। আন্দোলনকারী-দেরও এ দিকটা একটু ভাল করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে!

* * *

গরমের ছুটিতে কলেজের ছেলেদের ষ্টেটবাসের কাজে নিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপাতত এক শ' কুড়ি জন ছাত্রকে কাজ দেওয়া হবে। তাদের প্রতিদিন চার টাকা হারে বেতন দেওয়া হবে। অর্থের অনটনে এ দেশের বহু ছাত্রকেই পড়াশোনার আশা ছেড়ে দিতে হয়। অনেকে আবার গৃহশিক্ষকের কাজ করে অথবা আফিসের কাজের শেষে রাত্রে ক্লাস করেন। সরকারের পরিকল্পনা কতটা সার্থক হবে জানি নে। তবে উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। এতে কিছুসংখ্যক ছাত্র কলেজে পড়ার সুযোগ পাবে।

* * *

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণায় নিযুক্ত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকগণ যাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজন তাঁদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার আনুষ্ঠানিকভাবে কারনানী হাসপাতালে একটি গবেষণাগারের উদ্বোধন-কালে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বলেছেন, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তার ব্যয়ের অর্ধেকটা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক-অধ্যাপকদের যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের জন্য 'প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস' করতে হয়; খুবই দুঃখের কথা।

**২৪ পরগণা:**

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার হাসনাবাদের উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে গেছেন। এই শিবিরগুলির অব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। পরিদর্শনান্তে অত্যন্ত ব্যথিত-চিত্তে তিনি মাত্র দুটি কথা বলেছেন, হতাশ হয়েছি।

কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী সি বি চারি, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীগোপালন এবং যাঁর ওপর এই উদ্বাস্তু আশ্রয়শালাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত—পশ্চিম বাংলার সেই রিলিফ কমিশনার শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ নায়ারের সঙ্গে সরেজমিনে উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা দেখে গেছেন।

ডাঃ নায়ার আশ্রয়শালার উদ্বাস্তুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে শতকরা ৯০ জন উদ্বাস্তুর দেহে রয়েছে ম্যালেরিয়ার বীজাণু।

● ডাঃ সুশীলা নায়ার

এদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং দিল্লীতে পরীক্ষার জন্য রক্ত পাঠাতে বলে গেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদ্বাস্তুদের দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকা দেখেও নাকি খুশি মনে ফিরতে পারেন নি।

সীমান্তে উদ্বাস্তুদের অভ্যর্থনার অব্যবস্থার কথা আমরা বার বার উল্লেখ করেছি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পর আশা করি, আমাদের রিলিফ কমিশনার উদ্বাস্তুদের কান্নাকাটির 'মানে' খুঁজে পাবেন।

**নদীয়া:**

কলকাতা হাইকোর্ট আদালত অব-মাননার দায়ে নদীয়ার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। আসামী শেষ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর দণ্ডও বিচারপতিগণ মকুব করেন।

যে ঘটনায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ড হল সে ঘটনাটিও খুব চাঞ্চল্যকর। প্রকাশ, কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে সাব-অডিনেট জজ নদীয়ায় বদলি হন। কোন বাসস্থান জোগাড় করতে না পেরে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ১০ দিনের জন্য কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে ওঠেন। তারপরেও বাড়ি না পেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সুপারিশ ও বোর্ড অফ রেভিনিউর অনুমতি নিয়ে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সাবজজ যখন তাঁর এজলাসে বসে বিচার কার্য চালাচ্ছেন তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাঁর ঘরের তালা ভাঙা হয় এবং মালপত্র স্থানান্তরিত করা হয় পুলিশের মালখানায়।

হাইকোর্টে আসামী-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পক্ষ সমর্থন করে বলেন, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সার্কিট হাউসের ভার ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপর। তিনি যা' করেছেন, তা' কর্তব্যের তাগিদেই করেছেন। সামরিক অফিসার ও মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের জন্য পুরো সার্কিট হাউস তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সাবজজকে হেয় করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আদালত তাঁর এই যুক্তি গ্রহণ করেন নি। বিচারপতিগণ তাঁদের রায়ে বলেছেন, বিচার বিভাগীয় একজন সহকর্মীর প্রতি যিনি এমন আচরণ করতে পারেন, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কি ভয়ানক হতে পারে, সে কথা চিন্তা করতেও ভয় হয়। এই রায়ের পর এই ধরণের একজন দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী অফিসার কি করে জেলার সমাহর্তার পদে বহাল থাকতে পারেন, আমরা বুঝে উঠতে পারি নে।

# পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

( ধারাবাহিক রহস্য-গল্প )

॥ দুই ॥

আমাকে পড়ার ঘরে ডেকে পাঠানো মানেই হল, আমার কাছ থেকে কি ঘটেছে না ঘটেছে সেটুকু মেসোমশাই জানতে চান। পঞ্চমী-দিদিকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যে বৃথা, সেটা তিনি খুব ভালো করেই বোঝেন। গম্ভীর মুখে বসেছিলেন, আমাকে দেখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখ টুনি, তোমার মেজমাসিমা গিয়ে অবধি একটা দিনের জন্যেও মনে শান্তি পাই নি। তোমার মাসি এত অল্পে কাতর হয়ে পড়েন যে, কি যে করব বুঝে উঠতে পারি না। তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া বড় শক্ত। কিন্তু সুখী না হলেও একটু শান্তিতে থাকতে চাওয়াটা কিছু তাঁর অন্যায় নয়, অথচ সেইটেই হয় না। কেন হয় না? কি ব্যাপার খুলে বল তো?'

যা যা জানি খুলে বললাম। হয়তো সবই মনগড়া কথা, তবে পঞ্চমীদিদি যে আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ে ভয়ে থাকে সেটা ঠিক। ওর হয়তো মানসিক চিকিৎসার দরকার। শুনে মেসোমশাই খুব খানিকটা হাসলেন। বললেন---'কয়েক বছর আগে ওর ধারণা হয়েছিল যে, ওর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ওকে চুরি করে নেবার জন্যে দলে দলে দুষ্টু লোকেরা ঘুরছে। সেবার তো তোমার মাসির সঙ্গে গোপালপুর গেল, সমুদ্রে স্নান করে সব সেরে গেল। এবার কি করা যায় বল দিকি নি? তোমার মাসি তো বিগড়ে গেছেন, বলছেন ওকে আর রাখা নয়।'

শিউরে উঠলাম শুনে। রাখা নয় মানে? পঞ্চমীদিদি তাহলে যাবে কোথায়? মনটা খারাপ হয়ে গেল; ওর দেখছি কপালটাই মন্দ, উদয়াস্ত খেটেও কারো মন পায় না, এমনি দুর্ভাগা। আমার মুখের ভাব দেখে মেসোমশাই কি বুঝলেন জানি না, মনের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করা আদৌ তাঁর স্বভাব নয়, তবু যেন একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন---'আহা, এক্ষুণি তাকে বিদেয় করে দেওয়া হচ্ছে না, দিলে তোমার মাসিই পড়বেন বিপদে। তুমি দিনরাত বই নিয়ে থাক, তোমার কাছ থেকে তো আর কিছু আশা করতে পারবেন না। তবে পঞ্চমীকে একটু সামলে চলতে বল। তোমার মাসির স্নায়ুর দুর্বলতা, কথায় কথায় এত গোলমাল তাঁর সহ্য হয় না। পঞ্চমীকে সাবধান করে দেবার জন্যই তোমাকে ডাকা।'

কথাটা শুনে একটু হাসিও পেল, বেশির ভাগ গোলমালের যিনি মালিক, তাঁর গোলমাল সয় না, এ তো ভারি মজার কথা। অবিশ্যি মেসোমশাইকে সে কথা বলার আমার সাহসই ছিল না। শুধু বললাম---'তবে কি আপনিও মনে করেন---পঞ্চমীদিদি সবটাই কল্পনা করে নেয়, আসলে কিচ্ছু নয়?'

আকাশ থেকে যেন পড়লেন মেসোমশাই। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন---'আমি মনে করি মানে? তুমিই তো বললে তোমার বিশ্বাস সবই মনগড়া ভয়। ঐ মনগড়া ভয় নিয়ে যেন বাড়িতে অশান্তি করা না হয়। আচ্ছা, এখন যেতে পার।'

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল, প্রায় সারা জীবন এখানে কাটালাম, তবু আজ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের একেকটা কথা একেবারে অসহ্য মনে হয়। মনে মনে দিনরাত প্রার্থনা করি---পরীক্ষার ফল যেন ভালো হয়, ভগবান, কলেজের স্কলারশিপটা যেন পাই, তা হলে মিসেস মোমগাঁইয়ের হোস্টেলে সেই যে গিয়ে উঠব আর এ মুখো হব না।

নিজের কথায় নিজেরি আশ্চর্য লাগে। আর এ মুখো না হলে পঞ্চমী-দিদির কি উপায়টা হবে? মেসো-মশাই বলেছেন---কেন অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজে নেবে। এক মাসের নোটিশ দেব, কেউ বলতে পারবে না অন্যায় করে ওকে তাড়ানো হয়েছে!

আসলে চাকরি করবার জন্যে জন্মায় নি পঞ্চমীদিদি, মুনিবিয়ানা করতেই জন্মেছিল বেচারা। কিন্তু কোথাও হিসাবের কি গণ্ডগোল হয়ে যাওয়াতে চাকরি করে খেতে হচ্ছে। আমি পাশ করে বেরিয়ে যখন নিজে চাকরি করব তখন পঞ্চমীদিদিকে এনে কাছে রাখতে পারব, রাঁধবে বাড়বে, খাসা রাঁধে। আমার ঘর-দোর আগলাবে। আমার ঘর-দোর? কথাটা বেশ মজার, চিরকাল পরের বাড়িতে, পরের দয়াতে মানুষ হয়ে আমি নিজের ঘর-দোরের স্বপ্ন দেখি। পঞ্চমীদিদি হয়তো সে রকম স্বপ্ন দেখাও কোন্ কালে ছেড়ে দিয়েছে।

তব কি দারুণ প্রাণের ভয় তার,

আর শরীরের কি যত্ন। পায়ের তলায় তেল মাখছে; গরম বেনিয়ান বুনে পরছে; মালা মেমিদের জন্যে যত টনিক আসে, লুকিয়ে সবটাতে ভাগ বসাচ্ছে। জানতে পারলে মাসি ওকে আস্ত রাখবেন না।

নিজের অজান্তেই কখন নিজের শোবার ঘরে এসে পৌঁচেছি। দোর-গোড়ায় মাসির পেয়ারের আয়া দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বললে—'মেমসাহেব জানাতে বললেন, চিঠি এসেছে, আজ সন্ধ্যেবেলায় বুড়ো দাদামশাই এসে পৌঁছবেন। তাঁর জন্যে পুবের ঘরটা যেন ঠিক করা হয়। মেমসায়েবের তবিয়ৎ ভালো না, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না।'

আমার বিমর্ষ মুখ দেখে বোধ হয় মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়েই আয়া তার মুনিবসাহেবার কাছে ফিরে গেল। ব্যস, আজ সন্ধ্যের মতো হয়ে গেল আমার পড়াশুনো। পঞ্চমীদিদিকেও ধারে কাছে কোথাও দেখছি নে। ইচ্ছে হলে অদ্ভুতভাবে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ও। মাঝে মাঝে হয়তো কোনো কারণে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে এমনি কাজের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে যে, সারাদিনের মধ্যে তার টিকিটি দেখতে পাই নে। সেই রাতে আমার পাশের খাটে যখন শুতে আসে তখন দেখি মুখখানি আড়ের মতো হয়ে রয়েছে। অবিশ্যি তখন ওকেই মান খুইয়ে মিটমাট করে নিতে হয়, নইলে রাতে কে যাবে ওর সঙ্গে কলঘরের দোর অবধি?

ভয় পাওয়া পঞ্চমীদিদির একটা রোগবিশেষ। শোবার আগে দরজা জানলার ছিটকিনি তো পরীক্ষা করবেই, আলো ফেলে ফেলে খাটের তলা, আলমারির কোণা সব দেখবে। একা দেখতে ভয় করে তাই আমাকেও সঙ্গে থাকতে হয়। একবার চেয়ারে উঠে আমাকে আলমারির মাথা দেখতে হয়েছিল, পাছে কোনো রোগা বেঁটে চোর সেখানে চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে থাকে। এই নিয়ে আমি কিছু বললে পঞ্চমীদিদি বলে, 'এখন আমার অবস্থা দেখে কিছু বোঝার জো নেই, কিন্তু আমার বাপের বাড়ির, মামার বাড়ির আর শ্বশুর বাড়ির অবস্থা খুব মন্দ ছিল না। নেহাৎ অদৃষ্টের দোষে সব খুইয়েছি, নইলে পায়ের ওপর পা তুলে দুবেলা চোব্যচোষ্য খাওয়ার আশা করাটা খুব বেমানান হত না। চোরদের সোনার খনি ছিলাম আমরা।'

জ্ঞানচক্ষু ফোটার আগেই বাপ-মা চোখ বুজেছেন, মামারা দেখতে দেখতে দেউলে হয়েছেন, বিয়ে হবার পর ছ' মাসের মধ্যে সিঁদুর-নোয়াও ঘুচেছে। তারপর দেশ ভাগাভাগি, বানের জলে ভেসে এসে এইখানে পঞ্চমীদিদি কূল পেয়েছে। নাকি এখনও ভালো করে খোঁজ নিলে এ কথা বেরিয়ে পড়তে পারে যে সে অনেক সম্পত্তির মালিক।

মাসির দেওয়া চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের দশহাতি থান পরে পঞ্চমী-দিদি তার পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্যের গল্প করে, তাঁদের মধ্যে কতজনা ঘাতকের গোপন আক্রমণে মরেছে তার ফিরিস্তি দেয়। হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নে। সাহস দিয়ে বলি, 'কিন্তু তোমার যখন সে ঐশ্বর্যের বালাই নেই পঞ্চমীদিদি, তোমার সে ভয়ও নেই।'

পঞ্চমীদিদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে পা দোলানো বন্ধ করে। তারপর বলে, 'কি করে জানলে নেই? না থাকবে তো আমার পেছনে লাগা কেন? তুমি নিজেই তো বল উলুবেড়ের দু' কাঠা জমির জন্য কেউ কাউকে খুন করে না; আর তাই যদি হয় তো তোমাকে কেউ কিছু করে না কেন?'

আমি বললাম—'সব তোমার কল্পনা, তোমাকেও কেউ কিছু করে না।'

পঞ্চমীদিদি একটু চুপ করে থেকে বলল—'সব কল্পনা নয়, আজ তাকে দেখেছি।'

আমি অবাক হয়ে পঞ্চমীদিদির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

সে বলে যেতে লাগল, 'রোগা লম্বা মিশকালো, কপালে একটা কাটার দাগ, আর সে যে কি সাংঘাতিক চোখ, খুনের চোখ, সরু চকচকে বাঁকা। ঠোঁট নেই, পাংলা একটা দাগের মতো, উঃ, কি নিষ্ঠুর! ছোট করে চুল কাটা। গলাবন্ধ একটা মেটে রঙের কোট আর আধময়লা ধুতি পরা। তার চেহারাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এমন করে টিপে টিপে কথাগুলো বলতে লাগল পঞ্চমীদিদি যে আমিও যেন লোকটাকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। গা শির শির করে উঠল, তবু বললাম—'আর কিছু ছিল না? লিকলিকে একটি ছুরি, কি ঐ ধরণের কিছু?'

পঞ্চমীদিদি শ্লেষ বোঝে না। বললে—'না, সে রকম দেখি নি, তবে পকেট থেকে একটা লাল পাংলা রেশমি দড়ির মুখ ঝুলে ছিল।'

'কি করে বুঝলে পঞ্চমীদিদি, এই লোকটাই সে?' পঞ্চমীদিদি সে যে কি বিশ্রী করে হেসে উঠল, আমার গায়ে কাঁটা দিল।

'তা বুঝব না? আজ দু' মাসের ওপর হয়ে গেল আমার পাছু নিয়েছে আর আমি বুঝব না? এত কাছে থেকে দেখার আগেই ওর চেহারা আমার জানা ছিল, কখনো জামাটা দেখেছি, কখনো শরীরটাকে দূরে ছায়ায় মিলিয়ে যেতে দেখেছি, কখনো খুব কাছে ভিড়ের মধ্যে টের পেয়েছি। সরু সরু হাড় বের করা আঙুল, তার ছুঁচলো নখ।'

পঞ্চমীদিদি দু' হাতে চোখ ঢেকে খাটে বসে দুলতে লাগল। এ তো হিস্টিরিয়া। দিলাম কুঁজো থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ওর মাথায় মুখে ঢেলে। ও চমকে লাফিয়ে উঠে আঁচল দিয়ে মুখ গলা মাথা মুছতে লাগল। ইতিহাসের বইটা তুলে নিয়ে

বললাম—'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে পঞ্চমীদিদি, এর পর মাথার গোলমাল সুরু হবে। ভালো চাও তো মেসোমশাইকে বলে ডাক্তার দেখাও। এখন আমাকে একটু পড়তে দাও।'

পঞ্চমীদিদি আর কোনো কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। পড়ায় কিন্তু মন বসাতে পারলাম না; এ সব খেয়াল তো ভালো নয়, বিশেষ করে একজন অনাথা বিধবা, যাকে খেটে খেতে হয়, তার পক্ষে। এ কথা অবিশ্যি পঞ্চমীদিদিকে বলা চলে না। কারণ সে তখুনি তার শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের ফিরিস্তি দিতে সুরু করে দেবে। যদি বলি—'অত টাকা, তা তোমাকে নিয়ে যায় না কেন?'

পঞ্চমীদিদি বলে—'তা কি আর চায় না, খুব চায়। আমার কাছে আমার দেওর লোক পাঠায়। তার বৌ মরেছে, ছেলেপুলেদের দেখবার কেউ নেই, বারুইপুরের বিশাল বাড়ি খালি খাঁ খাঁ করে, আমাকে সেখানে গিয়ে সংসারটাকে ঠেকাতে বলে। আমি যাই মা। গেলে নাকি রাণীর হালে রাখবে।'

'কেন, যাও না কেন? বেশ তো রাণী পঞ্চমী হবে।'

'দ্যাখ, সব জিনিষ নিয়ে অমন ঠাট্টা কর না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে সাবধানের শেষ থাকে না। ও কেমন লোক কিছু জানি না, ব্যস্ অমনি ছট করে গেলেই হল!'

'তা, মেসোমশাইকে বলে একটু খোঁজ খবর তো করাতে পারো; অত অগাধ সম্পত্তির আধখানা মালিক তা হলে তুমি। এখানে চল্লিশ টাকার জন্য গোলামি করবে কেন?'

পঞ্চমীদিদি অমনি সেখান থেকে কেটে পড়ে, যাবার সময় একটু ঠেস দিয়ে বলে—'আমি তো আর তোমার মতো কলেজে পড়ি না, ও রকম করে নিজের কথা তোমার মেসোমশাইকে বলতে আমার লজ্জা করে।'

এমন মানুষের কোন কথাটা যে বিশ্বাস করব আর কোনটা যে করব না ভেবে পাই না। কোনো রকম ভালো ব্যবহার বা শিক্ষা তো আর পায় নি কখনো, সারা জীবনটাই ওর দুঃখে দুঃখে কেটেছে, স্বাভাবিক হবে কি করে? তবু আমার পড়াশুনোর সময় অতটা বিরক্ত না করলে ওর জন্যে আরো বেশি সহানুভূতি হত।

রাতে বুড়োদাদু এলে পঞ্চমীদিদি একটা সহানুভূতি করবার লোক পেল। মাসি ঘর থেকে বেরুলই না, অথচ বুড়োদাদু তারই আত্মীয়; মেসোমশায় তখনো ক্লাব থেকে ফেরেন নি; আমি ঘরটা গুছিয়ে রেখে তাঁর খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা হল দেখতে গেছি, এরই মধ্যে তিনি এসে পৌঁচেছেন আর মালা মেমিকে ঘুম পাড়িয়ে পঞ্চমীদিদিও তাঁর পায়ের কাছে কেঁদে পড়েছে। আমি কিছু বলবার আগেই হাউমাউ করে এলোমেলো-ভাবে সব কথা বলা হয়ে গেছে, বুড়োদাদু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন আর পঞ্চমীদিদি ফুঁপিয়ে কান্না জুড়েছে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—'ক্লান্ত মানুষটাকে একটুও কি রেহাই দিতে নেই, পঞ্চমীদিদি? না হয় খাওয়া-দাওয়ার পর আমিই বলতাম।'

পঞ্চমীদিদি মুখ তুলে ফোঁস করে উঠল—'তুমি আবার বলবে কি, তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না, ভাবো আমি বানিয়ে বানিয়ে বলছি।'

আমি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম—'দাদু উঠুন, স্নানের ঘরে গরম জল দিতে বলছি, হাতমুখ ধুয়ে আগে একটু খেয়ে নিন, তারপর না হয় সব কথা শুনবেন।'

বুড়োদাদুর মুখটাকে বড় শুকনো বড় ক্লান্ত মনে হল, বয়সও তো কম হয় নি, স্ত্রী গেছেন, যত্ন করবার কেউ নেই, মেসোমশাই বলেন ছেলেটাও নাকি লক্ষ্মীছাড়া, বাপের কাছে থাকে না। আগে পয়সাকড়ি ছিল, এখন গরীব হয়ে গেছেন, তাতেই হয়তো শরীরটা ভেঙে পড়েছে, তবুও মুখে কিছুই বলেন না।

অনেক রাত অবধি কথাবার্তা হয়েছিল; পঞ্চমীদিদির চোখে ঘুম নেই, খালি বলে—'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান, আপনার সব কাজ করে দেব, আপনারো সেবাযত্ন দরকার, আমিও এখানে বাঁচব না।'

বুড়োদাদুর মুখটা দেখে কি যে দুঃখ হচ্ছিল, যেন কি দারুণ দুর্ভাবনা। দু-একবার জিজ্ঞাসা করলেন, মেসোমশাই কখন ফিরবেন, তারপর নিজেই বললেন—'তার সঙ্গে জরুরী কথা ছিল, কিন্তু ক্লাবের পার্টির পর কি তার মন মেজাজের কিছু ঠিক থাকবে?'

মন্দ বলেন নি কথাটা, তবে আজ পার্টি আছে বলে শুনি নি, বরং বাড়িতেই খাবার কথা বলে গেছেন।

বুড়োদাদু নিজের ঘরেই অপেক্ষা করতে চাইলেন, যদি দেখা হয়। নইলে কাল সকালে দেখা করেই চলে যেতে হবে বললেন। শেষটা যে কথা কখনো বলি না, তাই বলে বসলাম।

'দাদু, আর একা একা থাকবেন না। ছেলের কাছে যান।'

দাদু মাথা নাড়লেন, 'না রে, তার ঘুরে বেড়ানোর চাকরি। আমার জন্যে ভাবিস না, নিজের শরীরের যত্ন কর। রোগা দেখছি কেন? পরীক্ষার জন্যে বড্ড ভাবিস বুঝি?'

ব্যস, ঐটুকু, তাতেই আমার চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, গলার কাছটায় টন টন করতে লাগল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যেই পঞ্চমীদিদি শুনে পড়েছে। টেবিলের ওপর ছোট আলোটা জ্বলছে, আয়নার সামনেটা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে যেই না বড় আলোর সুইচ টিপেছি, ঘর আলো হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে পুরোনো কড়িকাঠের পাশ থেকে কি একটা কালো জিনিষ মাটিতে পড়েই কুলোপানা চক্কর ধরে মাথা উঁচু করল। (ক্রমশঃ)

# সুশীল রায়

# অনলআয়ী

ধারাবাহিক উপন্যাস

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

রাধার এ-সঙ্কল্প সম্বন্ধে আমাদের কোনো মন্তব্য করা সাজে না। আমরা তাকে পরিত্রাণ করতে পারি নি, পরিত্রাণের কোনো পথও আমরা বলে দিতে পারি নি তাকে। তাকে সাবধান করে দেব, এ-অধিকারই বা আমাদের কোথায়। উপযাচক হয়ে কোনো পরামর্শ আমরা তাকে দিলে সে আমাদের তিরস্কার করতে পারে। সে বলতে পারে, তোমাদের উপদেশ মানতে রাজি আছি. কিন্তু বলে দাও আমার সুখের পথ, আমার শান্তির উপায়। ঐ দেখ, আমার স্বামী। তার ব্যবহার লক্ষ্য কর তোমরা। তার স্ত্রীকে এখানে ফেলে সে মত্ত হয়েছে বারাঙ্গনা-বিলাসে। কোন্ মেয়ে পারে এ-অপমান সহ্য করতে। এত কষ্টের ওপর এই অপমান শেলের মত কি বেঁধে না বুকে? আমার এ কষ্ট কতটা যদি বুঝে না থাক, তাহলে নাও এই শেল, বুকে বিঁধিয়ে দেখতে হবে না, একবার তোমাদের বুকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে দেখ তাতেই জ্বালা কত।

সুতরাং রাধার কার্যে আমরা কোনো রকম প্রতিবন্ধক হতে চাই না। আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে চলি তার সঙ্গে সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গেই চলেছি আমরা। কোনো কথাই আমরা বলব না, তার চোখে জল দেখেও কোনো প্রশ্ন করব না তাকে।

চলতে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যে মহোৎসব সে দেখেছিল, তার মানে তার কাছে আজ স্পষ্ট। ও কথা ভাবলেই সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে। সেদিন সেই মেয়েটাকে জোর করে ধরে নিক্ষেপ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল ঐ চিতায়। শিউরে ওঠে গা। রাধাকেও নিশ্চয় অবিকল ঐভাবে নিক্ষেপ করবে শয়তানেরা। কিন্তু তাদের সে চক্রান্ত সে নিষ্ফল করে দেবে। অত সতী হয় না, অত সতীত্বগিরিতে কাজ নেই তার। সে বেছে নেবে নিজের পথ —এই তার সঙ্কল্প।

চারদিক থেকে নৌকো ছুটেছে মাহেশের দিকে। নৌকোয়-নৌকোয় জ্বলে উঠেছে আলোর মালা, আকাশের তারাগুলো বুঝি খসে পড়েছে নদীর জলে। আর, নেমে এসেছে বুঝি অপ্সরা আর কিন্নরীর দল।

নৌকোয়-নৌকোয় চলেছে হাসি গান নাচ আর উল্লাস। খড়দহ বরানগর বাগবাজার থেকে বারাঙ্গনাদের নিয়ে এসেছেন সৌখীন বাবুরা। ফরাশডাঙা চন্দননগর শ্রীরামপুর থেকেও ডাক্তার-বাবুরা নেমে পড়েছেন জলে।

আগামী কল্য জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। সেই উপলক্ষে বুঝি ধরার কার্তিকেরা মত্ত হয়েছেন জল-কেলিতে।

কাঁইকুঁই শব্দে বাজছে হার-মোনিয়াম, ঝুম ঝুম শব্দে নূপুর, সেতারে বীণে বেজে উঠছে ঝঙ্কার। সেই সুরলহরীর সঙ্গে গঙ্গার লহরী বাজাচ্ছে জলতরঙ্গের সুর। পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠেছে আজ। বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে উর্বশী-রম্ভারা হৃদয় হরণ করে চলেছে বিলাসী বাবুদের।

এই সঙ্গে চলেছে রূপনারায়ণের নৌবহর —পিনিস বজরা ভাউলে আর পালোয়ার। খানসামারা ফরাশেরা আবদারেরা ব্যস্ত হয়ে এ নৌকো থেকে ও নৌকোয় লাফিয়ে লাফিয়ে চলাচল করছে। সখের যাত্রায় যত প্রকার উপকরণ প্রয়োজন তার যথোচিত ব্যবস্থা আছে সঙ্গে।

সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নফরেরা বাবুদের উপকরণ বিলি করে চলেছে, কিন্তু এই পিনিসের দিকে মনোযোগ নেই কারো; এতে কোনো সওয়ার আছে কি নেই—তার কোনো উত্তম পানীয়ের প্রয়োজন না হলেও সামান্য খাদ্যের প্রয়োজন আছে কি না, সে খোঁজ নেবার অবসর নেই কারো।

বিদ্যাসুন্দরের পালা হচ্ছে খড়দহের নৌকোয়। সুন্দর চীৎকার করে প্রেম নিবেদন করছে বিদ্যার কাছে।

কৃষ্ণযাত্রা হচ্ছে বরানগর দলের খোলা ডিঙিতে। কৃষ্ণ তার মাথার উষ্ণীষ ভূলুণ্ঠিত করে শ্রীরাধার

কাছে প্রার্থনা করছে মাত্র এতটুকু করুণা। কিন্তু রাধার [illegible] এত সহজে বিগলিত হচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের চুঁচুড়ার পিনিসের রাধার মন আছে বিগলিত হয়ে। চাঁপার সঙ্গে সে কথা বলছে চাপা গলায়। সে-কথা এতই চাপা যে, আমরা তার এত কাছে দাঁড়িয়েও এতটুকু শুনতে পাচ্ছি নে। কিন্তু অনুমান করতে পারছি আমরা, ওদের অভিপ্রায় খুব ভালো না। বেনিয়ান রূপচরণের পুত্রবধূর কাছে এ রকম আচরণ প্রত্যাশা করে না চুঁচুড়া।

চাঁপার সাজটা বেশ মনোহর। সন্দেশ্বরতলার চড়কমেলা থেকে কেনা সেই তুলসীমালায় সে সাজিয়েছে তার গলা, নাসিকায় ও ললাটে পরেছে অলকা-তিলকা। আর নাকি তার ভালো লাগছে না এ সংসার। এই স্নানযাত্রা থেকে ফিরে সে চলে যাবে নবদ্বীপে।

বলল, তুমিও চললে, বৌদি, তুমি চললে আমিও চললাম। চুঁচুড়োয় আর থাকব কাকে নিয়ে বলো। তোমার মত আপনজন আর পাব কোথায়। তার চেয়ে শান্তি পাব যেখানে সেখানেই থাকব।

—কিন্তু শান্তি কি আর সহজেই পাওয়া যায় চাঁপা। আমার মা বলতেন, শান্তি আছে মনে; শান্তি নেই কোনো স্থানে। আমিও শান্তির জন্যেই ছুটেছি, কিন্তু কি শান্তি জোটে অদৃষ্টে বুঝতে পারব নিশ্চয়।

চাঁপা বলে উঠল, তা পারবে বুঝতে। তুমি কি ভেবেছ আমি জলে ফেলছি তোমাকে, ছিলে রাজ-রাণী হবে পাটরাণী। পেরিন সাহেবের বাগানের লাগোয়া মস্ত চক-মেলানো বাড়ি, সে-বাড়িতে তুমি হবে নতুন বধূ। সে বাবুটি তোমার রূপে মোহিত হয়ে আছে বৌদি, বলেছি না তোমাকে চতুরার।

চুপ রে। রাধা বলল, শুনেওছি আমি। বিশ্বাসও করেছি। তোকে যদি অবিশ্বাস করব তাহলে কি আজ এসেছি এই মাহেশের উদ্দেশে। ঝাঁপ দেব বলেই এসেছি। কিন্তু কি করছে তোদের দাদাবাবু একবার দেখার বড় সাধ। পারিস আমাকে দেখাতে?

—উঁহি করতে যেয়ো না বৌদি। তবেই ভেস্তে যাবে সব।

—কিন্তু দেখতে বড় সাধ হচ্ছে আমার। মেয়েমানুষের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করে তোদের দাদাবাবু।

কি ভাবে ব্যবহার? দেখার জিনিষই বটে। ফৈজ নেচে চলেছে আর রূপনারায়ণ মাঝে মাঝে চমকে ওঠার মত করে বলে উঠছে, বাহবা, বাহবা, তায়েফা তায়েফা।

মোসাহেবরা সেই সঙ্গে সুর ধরে বলছে, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ।

গায়ে গায়ে লাগালাগি করে চলেছে তাদের নৌবহর, তাই এ-সব ধ্বনি এ-নৌকোয় এসে পৌঁছতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু অসুবিধে অন্য কারণে; আর সব দলের হল্লা এমন বীভৎস রবে বেজে উঠছে যে, তাতে চাপা পড়ে যাচ্ছে রূপনারায়ণের উল্লাসের শব্দ।

শ্রীরামপুর পার হয়েছে তারা। আর বেশি পথ নয়। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। এই গভীরতার সঙ্গে বারাঙ্গনাদের কণ্ঠস্বরের গভীরতাও বাড়ছে। যতই ঐ ধ্বনি প্রবল হয়ে উঠছে, রাধার হাতের মুঠিও বুঝি প্রবল হচ্ছে সেই অনুপাতে। সেই বজ্রমুঠিতেও দেখা যাচ্ছে কম্পন। ফুলে ফুলে উঠছে বক্ষ-দুটি। কি একটা রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই হয়তো তার দেহে এই শিহরণ জাগছে।

—বৌদি, এস, এস। চাঁপা ডাকল।

ত্রস্তে সরে এল রাধা। চাঁপার পাশে বসে তাকাল জানলা দিয়ে।

বজরাটা তাদের পিনিসের পাশে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রূপনারায়ণকে। ফৈজ বসে তার পাশে বসে, এক হাত ফৈজের কাঁধে তুলে দিয়ে অন্য হাতে তার পায়ের ঘুঙুর খুলে দিচ্ছে রূপনারায়ণ, কানের কাছে মুখ নিয়ে আধো-আধো ভাবে কি যে বলছে দাঁড় টানার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তা শোনা যাচ্ছে না।

বজরার মধ্যে অত স্পষ্ট আলো জেলে নিয়ে, পাঁচজনের চোখের সামনে এই দীনতা প্রকাশে এতটুকু সংকোচ হচ্ছে না তার স্বামীর। বড় আশ্চর্য লাগছে, নিজের চোখে দেখা সত্ত্বেও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না রাধা।

সর্বাঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে, সর্বাঙ্গের অলঙ্কারে সোনালি আওয়াজ বাজিয়ে উঠে দাঁড়াল রাধারাণী। তার শরীরের ঝাঁকিতে খোঁপাটা ভেঙে পড়ল পিঠের ওপর।

দুই হাতে সেই বেণী জড়াতে জড়াতে রাধা বলল, প্রতিজ্ঞা। আমার পা ধরে ঐ ভাবে অনুনয় করতে হবে। আমি করাব, আমি করাব।

গভীর নিশ্বাসে ওঠা-নামা করতে লাগল তার বুক, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে সে ডাকল, চাঁপা।

উঠে এল চাঁপা, বলল, কি বৌদি?

—বৌদি না, বৌদি না, বৌদি না। কুলের বৌ হয়ে আমি আর থাকব না চাঁপা। আমি হব বারাঙ্গনা।

চাঁপা যেন আকাশ থেকে পড়ল এই কথা শুনে, একটা আঙুল গালে ঠেকিয়ে বলল, সে কি বৌদি?

গলার স্বর নামিয়ে ছলছল চোখে রাধা বলল, আমাকে অত নির্বোধ মনে করিস নে চাঁপা। আমি জেনে-শুনেই এসেছি। শান্তি স্থানে থাকে না, শান্তি থাকে মনে। আমার মনকে আমি নতুন করে গড়ে নেব।

—তা যাও। কিন্তু ও কি কথা বলে ফেললে বৌদি? কোনো ভদ্দরঘরের বৌয়ের কি ও-সব কথা বলতে আছে, না, চিন্তা করতে আছে।

চাঁপাকে বুঝিয়ে বলার মত নরম গলায় রাধা বলতে লাগল, আজ আট-দশ বছর তুমি লেগে আছ আমার পিছনে। কত দিন কত কথা বলেছ, কত প্রস্তাব করেছ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সব বুঝতে পেরেছি।

সবই সত্যি বুঝতে পেরেছিল রাধা। কিন্তু সহসা একটা ভীষণ পথ গ্রহণ করতে অত সহজে রাজি হতে পারে নি। দিনের পর দিন কেটে চলেছে। নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারের গতির বিচার করেছে সে ধৈর্য ধরে। অনেক দিন অপেক্ষা করেছে সে, অনেক কাল। তার স্বামীর সমস্ত অবহেলা সব রকমের উপেক্ষা সে সহ্য করেছে, তিলে তিলে দগ্ধ করেছে নিজেকে। ক্রমশ লক্ষ্য করল, গতি আরো বিপরীত দিকে ধাওয়া করেছে। রূপনারায়ণের ফুর্তির আড্ডা চোখের অলক্ষ্যের বাগানবাড়ি থেকে এসে পৌঁছল তাদের বসতবাটীর সদরে। এতটুকু লজ্জা এতটুকু সংকোচ দেখাল না রূপনারায়ণ। বাড়ির পোষা বেড়ালটার সামনেও স্বামীরা তার স্ত্রীর হাত চেপে ধরতে সংকোচ বোধ করে নাকি; কিন্তু কোনো সংকোচ বা জড়তার লেশ মাত্র দেখা গেল না রূপনারায়ণের। সদরের বৈঠকখানায় নিয়ে এল কাশীর বাই, কাশ্মীরের নর্তকী।

সেইদিন মনস্থির করে ফেলল রাধা, ঠিক করল আর না। আর এ-বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তার নেই। সেই দিনই চাঁপাকে সে বলল, চাঁপা, পাকাপাকি করে ফেল, রাজি আছি আমি।

কিন্তু চাঁপা এখন ভাব দেখাচ্ছে, একটা সৎ পথে যাবার জন্যে রাজি হয়েছিল তার বৌদি। একজন সম্ভ্রান্ত লোক রাধার রূপে আর গুণে মুগ্ধ; তিনি তাকে বধূরূপে পেতে চান। চাঁপার সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল রাধা। কিন্তু, সেই রাধার মুখে আজ একি কথা?

রাধা বলল, চমকে উঠিস নে চাঁপা। অমন চমক আর ভালো লাগে না। একটা ঘরের বৌকে বের করে নিয়ে গিয়ে কেউ কি তাকে কুলবধূ করে? আমাকে বোকা বুঝিয়ে লাভ? ডাঁশা পেয়ারা লোকে চিবিয়ে চুষে খেতেই ভালোবাসে, কিন্তু তার ছিবড়ে গিলে খায় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয় থু থু করে।

একটু থেমে বলল, দু-চার দিনের সে-জীবন যদি পাইই, তার স্বাদ জেনে নেব। তার পর আমাকে যে জীবন গ্রহণ করতে হবে, তার জন্যে আমি প্রস্তুত। তুমি তৈরি হও চাঁপা, কোনো ভয় নেই তোমার।

চাঁপা যেন ধরা পড়ে গিয়েছে তার বৌদির হাতে। দু-হাতে মুছে ফেলতে ইচ্ছে হল মুখের অলকা-তিলকা। চম্পা নাপিতানি সে, সেই নাপিতানির চাতুরী ধরে ফেলেছে তার বৌদি? তবে তো বড় চাপা মেয়ে এই বৌদি। এতকাল তার সঙ্গে সঙ্গে থাকল চাঁপা, তবু বৌদি একদিন প্রকাশ করল না যে চাঁপার চালাকি ধরে ফেলেছে সে?

কে জানে কোথায় আজ সেই কানাগিন্নি। কে জানে বৌদি কখনো তাকে বলে দিয়েছে কি না চাঁপার কথা। অভয় দিল বটে তার বৌদি, তবুও চাঁপার এখন কেমন ভয় করছে।

—অমন মুখ ভার করে দাঁড়াস নে চাঁপা। আমার বর হবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন যে ভদ্দর-লোক, কোথায় তিনি?

চাঁপা দুই হাতে চেপে ধরল রাধার মুখ। বলল, চুপ চুপ চুপ। মাঝি-মাল্লাদের কানে যাবে বৌদি। এতটুকু ডর নেই তোমার?

—যে ডুববে বলে শপথ করেছে তার ভয় কি রে চাঁপা?

—তবু। তবু। প্রাণের ভয় না থাক, কুলের ভয়, লোকলজ্জার ভয়।

রাধা হাসল, বলল, আমি তো চললেম চাঁপা। তোরা সব সুখে থাকিস, যেখানেই থাকি আমি এই কামনা করব।

দুই চোখ ভিজে উঠল রাধার। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল। বলল, শুধু খবর দিস আমার মা ও বাবাকে; আমার দুটো ভাই আছে, তাদের। বলিস ভালো আছি আমি।

মাহেশের ঘাটে এসে যখন পৌঁছল তাদের নৌ-বহর, রাত্রি তখন


সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্স

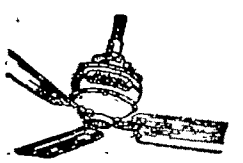

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

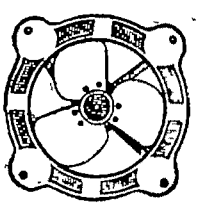

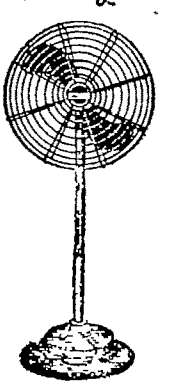

দ্বিপ্রহর। কলকাতা থেকে সখী-সংবাদের পালা নিয়ে এসেছে এক পাল নৌকো, চারদিকের কলরবের মধ্যেও তাদের নাকী কান্নার বিরাম নেই। তারা প্রাণপণ চীৎকার করে অভিনয় করে চলেছে।

চতুর্দিক থেকে অগণ্য যাত্রী এসে ভিড় করেছে মাহেশের ঘাটে। কত মজা এসেছে নৌকো চেপে, কত মেয়েমানুষ এসেছে, কত বাইজী এসেছে, কত নাচিয়ে। চোখে ঘুম নেই কারো, নদীর কিনারে এসে জড়ো হয়েছে সকলে এই মজা দেখতে।

সারারাত জেগে থাকবে আজ সকলে। সারারাত ধরে চলবে নৌকাবিলাস।

যে-পা দিয়ে পদ্মফুল কোটাতে পারে, ফৈজু রূপনারায়ণ দশ হাজার টাকা খরচ করে নিয়ে এসেছে সেই দুটি পা; তাকিয়ার ওপর সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সে ফৈজের সেই পা দুটি টেনে নিয়েছে তার বুকের মধ্যে। তোফা তোফা সব তুলে ফৈজের দু পায়ে প্রাণ ভরে চুমো খাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে তা এ পিনিস থেকে। দেখতে পাচ্ছে রাধা।

ও-সব দেখে মনের গ্লানি বাড়িয়ে আর লাভ নেই। সে তাই চোখ ফিরিয়ে নিল। নিজের গায়ের অলংকারগুলি সে খুলতে লাগল একে একে।

—ওকি বৌদি, ও কি করছ।

—মুক্ত হয়ে নিচ্ছি একেবারে। পূর্ণ মুক্তির আগে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাই সব বেড়ি থেকে।

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে কি যেতে আছে?

রাধা বলল, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে লাভ কি। এযে আমার সঙ্গেই থাকবে তার স্থিরতা কি। এই দেহটাকে যখন ছেঁড়া কাঁথার মত কেউ ফেলে দেবে, তখন এই সব গয়নাই হবে তার আকর্ষণ। এগুলি সঙ্গে থাকাই বিড়ম্বনা। বুঝিস নে চাঁপা, মান খোয়াতে চলেছি, কিন্তু প্রাণের টান যে আমার এখনো আছে। বাঁচতে চাই আমি।

চাঁপা সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল, বাঁচবে বই-কি, ষাট। এমন সোনার প্রতিমা কি বিসর্জন দিতে আছে এত সহজেই।

—আমার শাশুড়ি বেঁচেছেন এক ভাবে। আমি বাঁচতে চাই অন্যভাবে। কিন্তু বাঁচার চেষ্টা আমাদের দু-জনেরই।

একটু থেমে রাধা আবার বলল, আর, আমার ঠাকুরমা বেঁচেছেন অন্যভাবে। বিপদে পড়লে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ঠাঁই নিশ্চয় পাব।

রাধার ঠাকুরমার কাহিনী চাঁপাও জানে। এ-কথা না জানে কে। কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে আলোচনা করা তো ঠিক না। কারো ঘরের গ্লানি নিয়ে হাসি-মস্করা করা ঠিক না। করতেও চায় না চাঁপা। তাই এতদিন সে ওই প্রসঙ্গটি তোলে নি। কিন্তু আজ যখন রাধা নিজেই তুলল, তখন তাকে প্রবোধ দিতে ক্ষতি কি।

চাঁপা তাই বলল, ভাগ্যবতী নারী তিনি। তাই অমন পুরুষ পেয়ে গিয়েছেন তাঁর সহায়। কোনো বদমায়েশ বা কোনো বোম্বেটের হাতেও তো পড়তে পারতেন।

একটু থেমে চাঁপা বলল, তুমিও সৌভাগ্যবতী। তুমি যা-সব ভাবছ তা নাও হতে পারে বৌদি। তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে আছে যে, তোমার গুণ দেখে সে মোহিত হতেও পারে তো। চিরদিন তোমাকে বুকে করেই হয়তো রাখবে। আর যদি রাখতে চায় বৌদি, সে বুক থেকে নেমে যেয়ো না। তুমি সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে—এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

—আর হলপ করিস নে চাঁপা। আমার ভালো লাগছে না।

নীচের গঙ্গার জলে জোয়ার, ওপর থেকে ঝরছে জ্যোৎস্নার জোয়ার। আকাশে আর জলে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই অপরিসীম সৌন্দর্যের দেশে গৃহ-কোণে কারো মন বাঁধা থাকতে পারে না। কিনারের গাছে গাছে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে জ্যোৎস্নার তুফান, জোনাকিরা তাদের দ্যুতি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মর্ত্যের ক্ষুদে তারকা তারা, আকাশের ঐ গোলাকৃতি সুডৌল চাঁদের গা থেকে যে রূপালি উৎসব বৃষ্টি হচ্ছে সে উৎসবের মধ্যে তাদের আলোর সমারোহ আজ নিষ্প্রভ। এজন্যে খেদ হয়তো তাদের আছে, অথচ সে দুঃখ প্রকাশের অবসরও আজ রাখে নি ঐ জ্যোৎস্নার বন্যা। সুদিনে নিত্যসহচরকে যারা মনে রাখতে পারে, তাদের সংখ্যা বুঝি নগণ্য। কিন্তু আজ এই নদীতে যে উৎসবার্থীরা এসে জমায়েত হয়েছে, তাদের সংখ্যা সামান্য নয়।

শুধু জোনাকির কেন, ঝিঁঝিরাও আজ বুঝি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে; তারা তাদের নূপুরের ঝংকার দিয়ে সারাটা বৎসর মুখর করে রাখে এই কূল। কিন্তু আজ এখানে বেজে উঠেছে নূতন নূপুরের অপরূপ ঐকতান। ঝিঁঝিরা লজ্জা পেয়ে তাই সরে গিয়েছে নেপথ্য-লোকে।

কিন্তু চাঁদের মুখের হাসিও বুঝি ম্লান হয়ে গেছে। চারদিকে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা, নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠছে তার সংখ্যা। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় পুলকিত নৃত্য করে চলেছে সেই আলো। মনে হচ্ছে, জ্বলতে জ্বলতে ছুটে চলেছে বুঝি আজ গঙ্গা।

(ক্রমশঃ)

# রূপালী পাখনা

ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সুখ বলে—পাড়াগাঁয়ের বৃষ্টি কত সুন্দর। কত শত সতেজ ফোঁটা কেমন গাছের পাতায় পাতায় জড়িয়ে আছে, চাষের জমিতে প্রাণ খুলে হেসে চলেছে।

সারি ঠোঁট বাঁকায়। বলে—তবু যদি মাটির দেয়াল ধ্বসে না পড়ত, কাঁচা মেঠো রাস্তায় যদি একহাঁটু কাদা না হত।

সুখ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। বলে—দেখছ সারি, নদবদে কলাগাছেরা বীরের মত কেমন ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

সারি বলে—আহা, মরি আর কি! যার চোখ আছে সেই দেখতে পারে গাছগুলো শাসনের দিকে কতটা করে নুয়ে পড়েছে। পাগলা হাওয়া আর বে-সামাল বর্ষার আক্রমণে যেন পড়ো' পড়ো'।

সুখ বলে—তা কেন হবে। কাঁদি কাঁদি ফল ফলেছে। কি চমৎকার! ফল আর পাতা-প্রসবিনী মা যেন সন্তান-গর্বে গর্বিতা। মনে একটু কাব্যভাব আনবার চেষ্টা কর।

সারি এবার রেগে ওঠে।

বলে—থাক পাড়াগাঁয়ের মাহাত্ম্য, শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস শুনে এসেছি। আর কাব্যি করতে হবে না।

এভাবে যতদিন কথা উঠেছে, যত কায়দা করেই গ্রামের প্রশংসা করতে চেষ্টা করুক না কেন, সুখময় হেরেছে। বার বার। সব বার।

অবশ্য ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে তর্কে হারাতে তেমন কোন লজ্জা থাকার কথা নয়। বরং এমন পরাজয়ের মধ্যে একটু মাধুর্য আছে, একটা রোমাঞ্চ আর বেশ খানিকটা আনন্দ।

কিন্তু আনন্দ রোমাঞ্চ মাধুর্য বুঝি শুধু একা আসে না—সংগে নিয়ে আসে আরো কিছু। তাতে ঠিক চোখে জল না এলেও বুকটা চিপচিপ না করে পারে না—ভাবল সুখময়।

সারি আবার শহরের কথা তুলেছে। সুখময়কে বোঝাতে চেষ্টা করছে। আর না পারলে চিরাচরিত প্রথায় রেগে উঠছে।

সারি বলে—শহরের মানুষেরা সুন্দর সেজে-গুজে থাকে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। আবহাওয়া এত কদর্য নয়।

সুখ মুচকি হাসে। বলে—তবু যদি গাঁ থেকে চাল ডাল মাছ শাকসব্জি না যেত। গান্ধীজী বলেছেন—গ্রামে ফিরে যাও।

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে সারির।

বলে—শহরে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাস। কত সুযোগ-সুবিধা, কত আরাম।

সুখ 'হুরুৎ' করে হুঁকায় টান দেয়। অর্থাৎ ধোঁয়া।

চোখ বুজে তৃপ্তির সংগে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ে সুখ। বলে—আরাম হারাম হ্যায়।

সারির ভারী বিশ্রী লাগে। আড়-চোখে তাকায়। বিরক্তিতে মন ভরে যায়। মুখে কিছু বলে না।

এই গোটা পরিবেশটার সংগে কিছুতেই যে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। শুধু মাঠ আর মাঠ। গাছ আর গাছ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একঘেয়ে জীবন। কোন বৈচিত্র্য নেই।

সবচেয়ে বিরক্তিকর সুখ যখন চাষের জমি থেকে জল খাটিয়ে ফেরে। কি কুৎসিৎ দেখায় তখন। একহাঁটু মাটি। এলো গা। কাঁধে গামছা। হাতে দা। অসহ্য অসহ্য।

সারি বলে—কী বিকট গন্ধ। শহরের লোকেরা অমন করে এই বয়সে তামাক খায় না।

সুখ বলে—তা খায় না। তবে ভারা শুনেছি আরো কম বয়স থেকেই সিগারেট ধরে।

সারি ধমকে দেয়—থামো। সিগারেটের গন্ধ। আঃ চমৎকার। কোলকাতার তুমি কোনদিন যাও নি। সেখানকার লোকদের তুমি চেন না।

বার বার বোঝাতে চেষ্টা করে সুখ—ছঁ, আমি গেছি, তিন-চার বার নিশ্চয়ই কোলকাতায় গিয়েছি।

—ওখানকার রাস্তাঘাট চেন?

—মানে ঐটেই যা একটু গোলমাল। সবই প্রায় একই রকমের তো। কেবল দোকান পাট। কি রকম গুলিয়ে যায়।

—লজ্জা করে না বলতে? ঝাঁঝিয়ে ওঠে সারি।

কথাটা বুকের মধ্যে গিয়ে একটু ধাক্কা দিল। সারি ইদানীং বাপের বাড়ি চলে যাবার ভয় দেখাতেও সুরু করেছে।

আর স্কুল ফাইন্যাল ফেলের বিদ্যায় অন্তত এইটুকু শিখেছে সুখময় যে, কোলকাতা বর্তমান সভ্যতার পীঠস্থান। কত নামজাদা বড় বড় লোক বাস করেন। নাটক সিনেমা জলসা গান কত কী।

একবার যাবে নাকি কোলকাতায়? গিয়ে বেশ কটা দিন বাস করে প্রমাণ করে দেবে না কি যে সেও কোলকাতায় যেতে পারে, আর গিয়ে থাকতেও পারে?

সুখ বলে—ভাবছি কোলকাতায় যাব।

সারি ওর গম্ভীর মুখের দিকে স্পষ্ট না তাকিয়েই জবাব দেয়—তবে আর কি। মরে গেলাম।

—না, আমি এবার যাবই।

—কোথায় উঠবে?

—জানি না।

—তা সেখানে তো আর তোমার গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী জমি-জরাগুলো সংগে নিয়ে যেতে পারবে না। কি করবে তুমি?

সুখ বলে—কেন, খাব আর ঘুমোব।

—সে কাজটা অবশ্য অনেকে পারে। তুমি, পারবে কি না জানি না। কাদা আর ঘাস খাঁটবার জন্য হাত-পা সুড়সুড় না করলে বাঁচি।

—সেটা তো আর শহরতলীর এই আধুনিকার চোখের সামনে করবে না।

খোঁচাটা দুই দিক দিয়ে বিঁধল। শহর নয়, শহরতলী। কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলে নি। যাদবপুর এখনো খাস কোলকাতার মর্যাদা পায় নি। তবে 'পাব পাব' অবস্থা।

আবার বললে, 'আধুনিকা'। এই শ্লেষাত্মক কথাটায় সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে সারি। তার মধ্যে আধুনিকার এমন কি দেখেছে সুখময়? এই বছরখানেকের মধ্যে না সিনেমা, না থিয়েটার, না একটু বেড়ানো পর্যন্ত। এই অন্ধকার রাজ্যে দম বন্ধ করে পড়ে থাকা। তাই না সারি এই সেলাই কোঁড়াইয়ের কাজটাকে নিয়েছে সংগী করে। হয় উল, নয় তো এমব্রয়ডারি। একটা কিছু চাই-ই। অবশ্য রোজ করছে, তবু যেন এ কাজের মধ্যে একটু কিছু বৈচিত্র্য আছে।

তবে কি সুখময় তার বাপের বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ইংগিত করেছে? তার বাবার চেয়ে ওদের বাড়ির অবস্থা ভাল, সারি তো তা অস্বীকার করে না। স্কুলমাস্টার ওর বাবা, সামান্য আয়। আরো তিন দিদিকে বিয়ে দিতে হয়েছে। উপযুক্ত ভাই নেই একটা। আর এদের জায়গা-জমি আছে। খাওয়ার কোনদিন অভাব হবে না—এই ভেবেই তো এর সংগে এই পাড়াগাঁয়ে সম্বন্ধ করতে রাজী হয়েছিলেন বাবা।

এই খোঁচাটা তাই প্রথমটায় দমিয়ে দিল সারিকে। রাগ-বরফটা অশ্রু হয়ে এইবার গলে পড়বে বুঝি।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সুখ অনুভব করতে পারল এই প্রথমবার জিতে গেল সে। একটু আনন্দ হল। উৎসাহ বাড়ল।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

বলল—হুঁকো ছেড়ে দিয়েছি। কোলকাতা গিয়েই সিগারেট ধরব। আট দশবার চা খাব। সিনেমা দেখব।

সারি কান্নাটাকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। রাগের মাথায় বলল—দেখো। আর আসি মাসে মাসে এখান থেকে টাকা পাঠিয়ে দোব 'খন।

—তা দরকার হতে পারে। ওখানে আমার মত লোকের কোন কাজ নেই।

—তা ঠিক। কোলকাতায় যে টাকা ওড়ে তা দেখবার মত দৃষ্টি সবার থাকে না।

হাতের সেলাইটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সারি।

সুখ ভাবল—তাই তো। কোলকাতায় টাকা ওড়ে না কি?

ভাবলো। আবার ভাবলো। ভাবতে থাকলো।

কোলকাতার জীব দুখে। ওখানেই থাকে। কি কাজ করে কেউ জানে না। তবে তার মুখের লম্বা লম্বা কথা সবাইকে শুনতে হয়। ওর সংগে

বন্ধুত্ব রয়েছে সুখময়ের। তাই মনের কথাটা একদিন ওকে বলেই ফেললো।

সুখ বলে—হাঁরে দুখে, তুইও তো সেদিন বলেছিলি কোলকাতায় টাকা ওড়ে। সত্যি?

দুখে বলে—ওড়ে মানে—রূপোলী পাখনা নিয়ে ওড়ে। চালাক লোকেরা দেখে, 'কপাৎ' করে ধরে, আর দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ পকেট-খাঁচায় পুরে ফেলে।

—তুই কোনদিন দেখেছিস্?

—দেখেছি মানে ধরেওছি। দেখছিস্ না আমি কেবল কোলকাতা আর বাড়ি করছি। ডেইলী না হলেও উইকলি প্যাসেঞ্জার বলতে পারিস্।

সুখ বলে—এবার তো তুই দশ-বার দিন আগে এসেছিস্।

দুখে বলে—হ্যাঁ, ইদানীং চোখের দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা হয়ে পড়েছে। ধরা তো দূরের কথা উড়ন্ত টাকা ভাল দেখতেও পাচ্ছি না। কটা দিন রেষ্ট নিয়ে নতুন এনার্জি নিয়ে আবার যাব ভাবছি।

—ইস্ তুই খুব বোকা। দেখবার কায়দাটা একবার জানতে পারলে আর কখনো ভুল হয়।

দুখে বলে—হতে পারে। রূপোলী পাখনা কোলকাতার বাতাসে খালি পৎ পৎ করে উড়ছে। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সুখ বলে—কখ্খনো না। তুই হালে চশমা নিয়েছিস্। চোখে ভাল দেখতে পাস্ না। আমার চোখ ভাল আছে।

—এখনো আছে। মাস দুই বরফের মাছ, জলের দুধ আর কলের জল খেলেই চশমা নিতে হবে।

সুখ বলে—তা হোক। আগে টাকা। পরে ওসব ভাবলেও চলবে।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ হল। পাকা প্ল্যান। শুভদিনে যাত্রা করে একদিন দুজনে এসে পা দিল শিয়ালদহ স্টেশনে।

প্লাটফর্ম পেরিয়ে এসেই আরো সকলের মত ওদেরও দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রাস্তায় গাড়ির সারি। আটকে আছে।

ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে একটা মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে।

—আমাদের দাবী মানতে হবে!

—হাঁটাই করা চলবে না।

—মাইনে বাড়াতে হবে।

সুখ একবার দুখের মুখের দিকে

সাধনা
দশন

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

তাকাল। অর্থাৎ এখানেও টাকার অভাব আছে না কি? আর তা মেটাবার জন্যে অমন করে চিৎকার করে বলতে হয় না কি? তাহলে তো খুব লজ্জার কথা। অন্তত সুখময়দের সমাজে নিজের অভাব ঢাকঢোল পিটিয়ে অন্যকে জানানো একটা কিছু বাহাদুরীর কথা নয়।

দুখের দিদির ভাড়া বাড়িতে এসে ওরা উঠল। ঠিক হল ছোট ঘর-খানাতে দুই বন্ধু ক'টা দিন থাকবে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে আর উপায়ের একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই একটা বাসা করবে সুখ। সারিকেও নিয়ে আসতে পারে। অন্তত মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যেতে পারবে সে।

সন্ধ্যা হয় হয়।

দুখে বলে—চল্ তোকে রাস্তা-ঘাটগুলো চিনিয়ে দিই।

বেরুল ওরা।

সুখ দেখল—নানা চঙের বাড়ি আর গাড়ির যেন চলমান মেলা বসেছে। আর দেখল লোক আর আলোক। রাস্তায় চলতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেতে হয়। রঙ-বেরঙের আলোয় চোখ ঝলসে যায়।

কটা দিন কেটে গেল। সুখের মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। কারণ টাকার ছাপোলী পাখনা তো দূরের কথা সেফ কাগজের নোটও একখানা উড়তে দেখে নি সে। দেশ থেকে যা নিয়ে এসেছে সেই থেকেই খরচা হচ্ছে।

দুখে একদিন বলেছিল—চল্ সিনেমা দেখে আসি।

দেখেছিল। সুখ তাতে কোন কার্পণ্য করে নি। আর একদিন ওরা একটা নামী রেস্তোরাঁয় খেয়েছিল।

দুখে বলে—আসল কথা তোকে স্মার্ট হতে হবে। অর্থাৎ খুব চালু।

এই 'চালু' হবার জন্যও পকেট থেকে বেশ কিছু খসল। কৈ এখনো তো টাকা উড়ছে না।

দুখে বলে—উড়বে। গোটা দুই প্যাণ্ট-কোট বানিয়ে নে। ট্যাক্সি চড়ে যেতে শেখ্। তখন দেখতে পাবি।

স্যুট হল। দু-একদিন ট্যাক্সিতে বেড়ানোও হল।

দুখে এবার বলে, প্রয়োজন হলে এক-আধটা মিথ্যে কথা বলতে পারবি তো?

—কেন?

—রোজগার হবে।

দুখে বললে—একজনের সংগে তোর পরিচয় করিয়ে দোব—তুই একজন বড় জ্যোতিষী। তুই তার হাত দেখে সব বলে দিবি।

সুখ প্রশ্ন করে—সে কি! কি করে বলব? আর যা বলব তা মিলবেই বা কেন?

—আহা হা, ও সব আমার ওপর ছেড়ে দে না বিজ্ঞের ভাব দেখাল দুখে।

সুখ গম্ভীর হল।

দুখে বলে—ভাবিস্ না। প্রয়োজন-মত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে থেকেই তোকে আমি জানিয়ে দোব। তুই শুধু ম্যানেজ করে যাবি।

একদিন একটা চায়ের দোকানে এই ধনীনন্দনের সংগে সুখের সত্যি পরিচয় হল।

দুখে সুখকে দেখিয়ে বললে—আমি যার কথা বলেছিলাম, ইনিই সেই এ্যাস্ট্রলজার বন্ধু। জলন্ধর সিটি থেকে কয়েকদিনের জন্যে কোলকাতা এসেছেন।

—অ, নমস্কার। আপনার কথা অনেক শুনেছি।

শেখানো মত সুখ মুচকি হাসল, আর বাঁ হাতে টাইটা একবার টানল।

ধনীনন্দন বিস্মিত হলেন। হাতের রেখা বিচার করে সুখময় তাঁর সব গোপন কথা বলে দিল। ভেজাল প্রেমের কথা, প্রেমে হয়রানির কথা। আয় উপায় ব্যাঙ্কের সব

প্রশ্ন—নীতা কি সত্যি তাহলে বিট্রে করবে?

উত্তর—করবে নয়, করেছে। আপনার কিছু অর্থদণ্ডও ঘটিয়েছে।

মক্কেল উঠে যেতেই দুখে চিৎকার করে বলে উঠল—গ্র্যাণ্ড সুখ, সাকসাস্ফুল।

কিন্তু সুখময়ের অন্তরে তেমন সুখ হল না। মাত্র পাঁচটা টাকা ঠেকিয়েছে।

সুখ বলে—কেন, তুই তো বলেছিলি খুব বড়লোকের ছেলে।

—কখ্খনো এমন কথা আমি বলতেই পারি না। জিতেন বড়-লোকের ছেলে হবে কি করে? ওর বাপ এক রকম না খেতে পেয়ে মারা গেছে।

—মানে? সুখের চোখে জিজ্ঞাসা।

—তবে জিতেনের দৃষ্টিটা খুব পরিষ্কার। টাকা উড়ছে, আর ও খপ্ করে ধরে পকেটে পুরছে।

এরপর থেকে জিতেন ঘন ঘন এসেছে। আর যেদিনই এসেছে হয় পাঁচ নয় দশটাকা রেখে গেছে।

সুখ এবার ভাবতে পারল তাহলে এই করে তার দিন একদিন সত্যি ফিরবে।

সারিকে লিখে জানাল—সত্যি টাকা উড়ছে। আর আমি আস্তে আস্তে ধরবার কৌশলটা শিখে নেবার চেষ্টা করছি। হয়তো শীগগিরই বাসা করতে পারব, আর তোমাকে নিয়ে আসব।

কিন্তু একটা প্রশ্ন।

দুখেকে সে সমান শেয়ার দেবে কেন? সে তো একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, ব্যস্। তবে এখুনি গোলমাল করলে দুখে সব ফাঁস করে দিতে পারে। আর তাছাড়া জিতেনের প্রথম এবং শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন বেশ কয়েকদিন সময় নেয়, এ বুদ্ধিটাও শিখিয়ে দিয়েছে দুখে।

জিতেনের প্রশ্ন—ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছি, কোন বিপদে পড়ব না তো?

দুখে আগে মহড়া দিয়ে দিয়েছে, আর সুখ প্রকাশ্যে জবাব দিয়েছে—জটিল প্রশ্ন। ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে।

তালগোল পাকিয়ে দশ পাঁচ করে বেশ ক'টা দিন রোজগার হল। কিন্তু আর জিতেনকে ঠেকানো যাবে না। একটু ভয়ও হল। যদি ধরা পড়ে যায়।

সুখ বলে—তেমন কোন বিপদ হবে না। তবে শনির প্রকোপটা তেমন সুবিধের নয়। কিছু খরচা করতে হবে।

—কত?

—শ' দুই।

নগদ গুণে দিল জিতেন।

সুখ বলে—এভাবে প্যাণ্ট-টাই না পরে ধুতি চাদর আর টিকি রাখলে বোধ হয় ঠিক হত।

দুখে বলে—ধ্যেৎ, আধুনিক এ্যাষ্ট্রলজারদের এই পোষাক।

খুব আনন্দে কাটছে।

সেদিন চায়ের দোকানে একা বসেছে সুখময়। দুখে কি একটা কাজে আসতে পারে নি।

ট্যাক্সি থেকে নামল জিতেন।

হাতে একটা সুটকেশ। চুল এলোমেলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে চায়ের দোকানের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াল। বসল না।

সুখ দেখল জিতেনের চোখ দুটো লাল। খুব ক্লান্ত আর চিন্তিত মনে হচ্ছে।

বললে—বসুন।

—না, বড় ব্যস্ত।

তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—এই সুটকেশটা ভর্তি টাকা আছে। আপনাকে উপহার দিয়ে গেলাম।

সুখ যেন ভূত দেখল। এত টাকা। সে যে অনেক।

মনের ভাব গোপন রেখে বললে—আবার কবে আসছেন?

—বোধ হয় আর দেখা হবে না। আপনি জলন্ধরে ফিরে যাবেন, আমি হয়তো যাব অন্ধকারে। আচ্ছা, শুভ্ বাই।

দাঁড়াল না জিতেন।

সুখ ভাবছে ততক্ষণে অন্য কথা। এতগুলো টাকা—সেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের মত। কিন্তু এ টাকার কথাও দুখেকে জানাতে হবে? সমান অংশ দিতে হবে?

কিছুতেই না। এখুনি সে দেশে পালিয়ে যাবে। চুলোয় যাক্ কোলকাতায় থাকা আর বাসা করা।

ভাবনায় ভাবনায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ছুটে বাসায় চলে এল। নিজের যা কিছু গুছিয়ে নিতে লাগল দ্রুতহাতে।

দুখে বসে একখানা বই পড়ছিল।

প্রশ্ন করে—কি রে?

সুখ চমকে ওঠে। আবার সেই আপদটা। ঠিক দেখা হয়ে গেল।

বললে—দেশে ফিরে যাচ্ছি।

—হঠাৎ?

—ওসব পাপ কাজ আর আমার দ্বারা হবে না।

—বেশ।

দুখে জিতেনের দেওয়া সুটকেশটা তুলে নিল হাতে।

সুখ প্রশ্ন করে—ও কি?

—এটা থাকবে। দুখের স্পষ্ট জবাব।

—সব সময় ছেলেমানুষী ভাল লাগে না।

দুখের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় সুখ।

দুখে অনুসরণ করে।

দুজনেই এসে গ্রামের স্টেশনে নামল।

সুখ ভয়ানক রেগেছে।

প্রশ্ন করে—তুই কি চাস্?

দুখে উত্তর দেয়—আমি চাই বাড়িতে গিয়ে ওটা আমার সামনে খোলা হবে।

খুব বেগে গেলেও ওর আসাতে আপত্তি করা গেল না। লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

বাড়িতে এসে সুখ সারিকে বলে—সুটকেশটা ভর্তি টাকা আছে। ও যা চায় দিয়ে আগে ওকে বিদেয় কর।

দুখে হাসল।

সারি আশ্চর্য হয়—এত টাকা, অসম্ভব।

সুখ জবাব দেয়—খুলে দেখ না।

—শুনেছি এভাবে অনেক সময় মরা ছেলেও পাচার করা হয়।

দুখে বিজ্ঞের হাসি হাসে।

বলে—ওসব শুনিয়ে আমাকে তাড়ানো যাবে না। যা আছে তার অর্ধেক চাই।

খোলা হল বাক্স।

সকলেই দেখল একশ' টাকার নোটের নতুন নতুন বাণ্ডিল।

সুখের মুখ থেকে মাত্র একটা শব্দই বেরুল—আ আ আঃ।

সে বসে পড়ল।

দুখে ক'টা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

সারি নির্বাক।

দুখে রায় দেয়—জাল নোট।

—জাল?

সুখ দাঁড়িয়ে উঠে আবার বসে পড়ল।

সবাই বসে গেল।

গাঁয়ের পাশ দিয়ে ছোট্ট নদীটি কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই গিয়ে স্নান করে এল।

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

**জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী**

৮খানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
৩খানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চার ॥

প্রথমেই আপনাকে এইজন্যে সাধুবাদ জানানো যাক যে, আপনার বাংলো আমাকে নিরাশ করে নি। যদি আমি ত্রিশ বছর আগেকার বাঙালী কবি হতুম, তা হলে আপনার এই বাংলোতে বসে আমি দৈনিক অন্তত দশটি করে কবিতা লিখতে পারতুম। রঙের অভাব নেই, আলোর কৃপণতা নেই, আকাশটার সীমা নেই। আর আপনার বাংলোর সামনেকার কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটি। রোমান্টিক মনকে নেশা ধরিয়ে মাতাল করে দেবার পক্ষে সে একাই যথেষ্ট!

বিকেলে গিয়েছিলুম নদীটার ওদিকে। কী নাম ওর জানি না, আমার কিন্তু নাম দিতে ইচ্ছে করল, মিতালি। রোমান্টিক শোনালো? তা হোক। একা অনেকক্ষণ বসে রইলুম ওখানে। শুধু দূরে দূরে দু-একটি সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে কি সব ছোট ছোট রূপালি মাছ ধরছিল। আর ছিল পাখিরা—কাদা-খোঁচা, বক, গাংশালিক, মাছরাঙা। মোটা মোটা বালির দানার ওপর বসে রইলুম পা ছড়িয়ে, জলের ছোঁয়া বুলিয়ে হাওয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল, বেলা ডুবল, ছোট্ট নদীটির নীল জল রাঙা হল, ওপারে কতগুলো গাছপালার আড়ালে সূর্য অস্ত গেল, কোথা থেকে সাঁওতালী বাঁশিতে ঝুমুরের সুর কানে এল। নদীর জলে নেমে ইচ্ছে করে অনেকটা জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেললুম, তারপর সন্ধ্যাতারা উঠলে বাড়ি ফিরে এলুম।

বেশ কেটেছে দিনটা, রাজেনবাবু। কলকাতা থেকে বেরিয়ে কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই যেন সম্পূর্ণ একটা নতুন পৃথিবীতে চলে এসেছি। এত মানুষ, এত কথা, এত শব্দ, এত ক্লান্তি থেকে যেন এক অবিশ্বাস্য শান্তি, স্তব্ধতা আর বিশ্রামের মধ্যে ডুবে-যাওয়া। এইটুকুর দরকার ছিল। নদীর ধারে বসে বসে ভেবেছি এই আলো-রঙ-আকাশ পুরোনো হয়ে যাওয়ার আগে, এই নির্জনতার নিরবচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত হয়ে ওঠবার আগেই চলে যাব এখান থেকে। নিঃসঙ্গ রাত্রির ঝিঁঝির ডাক যতক্ষণ গানের মতো শোনাবে, ততক্ষণ আপনার বাংলোকে আমি ভালোবাসব। তারপর রক্তে কলকাতার আলো আগুন হয়ে ডাক পাঠাবার আগেই উধাও হয়ে যাব এখান থেকে। আমার প্রথম প্রেমকে অসহ্য হয়ে উঠতে দেব না।

আবার রোমান্টিক শোনাচ্ছে। কী করা যায় বলুন। স্থান-মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করা শক্ত।

এ পর্যন্ত গেল প্রশস্তিপর্ব। কিন্তু অভিযোগও যে একেবারে নেই, তা নয়। আপনি একবারও বলেন নি, আপনার কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটি যতই মনোহর হোক, একটি আল্‌সেসিয়ান কুকুর হঠাৎ সেখানে বর্গীর মতো হানা দিয়ে আমার ডায়েরী নিয়ে উধাও হতে পারে, ডাক্তার রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে নারী এবং শিশুর একটি দল এসে হঠাৎ হাজির হতে পারে, পূর্বজন্মের পাপে যে খানকয়েক বাংলা উপন্যাস লিখে ফেলেছি—এখানে তারও পাঠক-পাঠিকা থাকতে পারে এবং কাল সকালেই সেই সূত্রে একটি চায়ের নেমন্তন্ন জুটে যেতে পারে।

আমার ভয় হচ্ছে, নদীর সঙ্গে

মিতালিটা বুঝি বেশিক্ষণ রাখতে পারব না। মাঠ, পাহাড়, কৃষ্ণচূড়ার ফুল, নিজেকে নিয়ে কয়েকটা দিন চুপ করে থাকা—এই সুখস্বর্গে বোধ হয় ভাঙন ধরল। ডাক্তার রায়চৌধুরীকে চিনি না—শুনলুম, কবিতা লিখতেন। আশঙ্কা হচ্ছে, ট্রাঙ্কের তলা থেকে কুড়ি বছর আগেকার লাইনটানা বাঁধানো খাতা বেরুবে, শালবন, তালবন, প্রেম, তাজমহল প্রাগৈতিহাসিক ভাষায় এবং ছন্দে আমাকে আক্রমণ করবে। তাতেও শেষ হবে না, অতঃপর আসবে দুঃসহতম মুহূর্তগুলো—অর্থাৎ সাহিত্য আলোচনা। চা এবং ভালো খাবারের প্রলোভনেও যে সেটা কতক্ষণ সহ্য করা যাবে এখনো অনুমান করতে পারছি না। সুতরাং—'

চিঠিটা এই পর্যন্ত লেখা হতেই শম্ভু এল।

—বাবু, খাবার তৈরি।

—এত তাড়াতাড়ি?—কিরণ টেবিলের ওপর হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। মোটে তো ন'টা এখন।

শম্ভু হাসল। ন'টা কি কম রাত হল বাবু?

—আমার এগারোটার আগে খাওয়ার অভ্যাস নেই।

—কিন্তু সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—ঠাণ্ডাই আমার জোটে চিরকাল—বলে লেখাটা আবার সুরু করতে গিয়ে চোখে পড়ল, শম্ভু হাই তুলছে। তখন মনে হল, এ কলকাতা নয়, সন্ধ্যার পরে জীবন এখানে নতুন করে জ্বলে ওঠে না। এই পাহাড়, আকাশ আর ছোট নদীটির দেশে সূর্যের চোখ নিবে গেলে পৃথিবীও ঘুমের ভেতরে ডুবতে থাকে। তখন পাহাড় ঘুমোয়, নদী ঘুমোয়, শালের বন ঘুমোয়, আকাশের তারা ঘুমোয় আর ঝিঁঝিরা তাদের ঘুম-পাড়ানি গান শোনাতে থাকে। রাত ন'টা এখানকার মানুষের মাঝরাত। আঃ, মিছিমিছি শম্ভুকে কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ নেই।

—আচ্ছা, খাবারের ব্যবস্থা কর, আমি আসছি।

চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখে কিরণ উঠে পড়ল।

খাওয়া শেষ করে আরো আধ-ঘণ্টা পরে সে এসে বসল বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে। সিগারেট ধরিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে সামনের দিকে। ঘুম তার এখন আসবে না, বারোটার আগে কোনোদিন আসে না।

একটু আগেও দেখেছিল, পশ্চিমের আকাশে একটুকরো বঙ্কিম বিবর্ণ চাঁদ লেপ্‌টে আছে, কিন্তু এখন আর নেই, অস্ত গেছে। তারায় ঝক্‌ঝক্ করছে আকাশ, দিকে দিকে তরল অন্ধকারের ঢেউ খেলছে। দূরের পাহাড় সেই অন্ধকারে হারিয়েছে, কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটার অত রং এখন আর দেখবার জো নেই, আরো খানিকটা নিবিড় তমিস্রার রূপ ধরে সে দাঁড়িয়ে। সব মিলে একটা সম্পূর্ণ রাত্রি—একটা অবিমিশ্র অন্ধকার।

'আমি ক্লান্ত—শত জন্মের শ্রান্তির ভার আমার প্রতিটি রক্তকণাতে, শরীরের প্রতিটি কোষে আমার চেতনার অণুপরমাণুতে কি যন্ত্রণার আর্তি। দাও আমাকে অন্ধকার—নীরন্ধ্র এবং নিরন্ত যে অন্ধকারে আদিম আত্মা ছিল মৃত্যুমগ্ন—'

কা'র যেন কয়েকটা কবিতার লাইন—ছাড়া ছাড়া হয়ে মনে এল। আর তখন দিনের সমস্ত আলো, রঙ, আকাশ আর নদী ঘুমিয়ে পড়ল, হারিয়ে গেল; তখন কিরণের যে চিন্তা-চেতনা একটা আদিম অন্ধকারের ভেতরে মৃত্যুময় মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে—এক মুহূর্তে সে সামনে এসে দাঁড়ালো।

প্রতিমা।

পাগল হয়ে গেছে। থেকে থেকে চিৎকার করে বলে, জানি, তুমি কী চাও। আমাকে বিষ খাইয়ে মারতে পারলেই তুমি বাঁচো, কিন্তু আমি মরব না, কিছুতেই আমি মরব না।

রাঁচীতে রাখা হয়েছিল দু' বছর। কোনো ফল হয় নি। ফিরিয়ে আনতে হয়েছে।

কেমন করে যে ঘটল তারও কোনো স্পষ্ট উত্তর মেলে না।

প্রতিমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কিরণের কোনো ভূমিকা ছিল না। বিয়ে করবার কথাও সে ভাবে নি। তখন স্কুল মাস্টারিটা ছিল, আড্ডা ছিল, লেখা ছিল। বেশ কাটছিল দিনগুলো।

হঠাৎ একদিন দাদা এসে মেসে হাজির।

—তোর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

দাদা বয়সে দু-বছরের বড়ো, বন্ধুর মতো ঠাট্টা-তামাসা চলত। কিরণ বললে, হঠাৎ আমার ওপর এই উপদ্রব কেন? নিজে মাথা মুড়িয়েছ বলেই না কি? আর কেউ দু-দণ্ড শান্তিতে থাকবে, তা কি তুমি চাও না?

দাদা বললে, অনেক দিন তুমি শান্তিতে কাটিয়েছ। বয়েস নিতান্ত কম হয় নি তোমার।

—এ-যুগে ছাব্বিশ বছরে লোকে নাবালক থাকে।

—কেউ কেউ সারা জীবনেও সাবালক হয় না, তার নমুনা হচ্ছিস তুই। বাজে কথা রাখ। সত্যিই বলছি, তোর বিয়ে ঠিক করেছি।

—আমি কি অরক্ষণীয়া কন্যা?

—উঁহু, অবক্ষণীয় পাত্র।—দাদা মাথা নাড়ল: সত্যি, মেয়েটি ভালো রে। তোর বৌদি দেখে এসেছে।

—তাই বলো, সবটাই হায় ম্যাজেস্টিজ ভয়েস—তুমি কেবল দূত মাত্র।

দাদা মিটিমিটি হাসল।

—মেয়েটিকে দেখবি? গ্রাজুয়েট, চমৎকার চেহারা, বাড়ি ইস্টবেঙ্গলে ছিল, এখন—

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না দাদা, আমি বোঝাপড়া করব বৌদির সঙ্গে। শনিবার আমি বাড়ি যাচ্ছি।

কিন্তু শনিবারে বাড়ি গিয়েও

বিশেষ সুবিধে হল না। বৌদি চকিলের মেয়ে—আধঘণ্টার ভেতরে কিরণকে বিধ্বস্ত করে ফেললেন। রবিবার শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরবার সময় রেল লাইনের ধারে জোনাকিজ্বলা অন্ধকার ঝোপ-ঝাড়ের দিকে চোখ মেলে রেখে, চলন্ত গাড়ির চাকার একটানা আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে হল, মন্দ কী, জীবনে আসুক না একটি মেয়ে, তার সমস্ত রহস্য নিয়ে আবির্ভূত হোক, একটি অচেনা-অদেখা মানুষ কেমন করে দেখতে দেখতে দেহে মনে অচ্ছেদ্য একাত্ম হয়ে যায়—চিরকালের সেই পরমাশ্চর্য নাটকে এইবারে পটোন্মোচন হোক।

তারপর প্রতিমা এল।

একটা বছর যেন ঘুমের মধ্যে কাটল। প্রতিটি শনিবারের বিকেল কী প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। নতুন গল্পে প্রতিমার মুখের ছবি পড়ত, নতুন উপন্যাসে ধরা দিত প্রতিমার মনের ছায়া। আর এই গল্প-উপন্যাসের পথ বেয়েই একটু একটু করে মেঘ ঘনিয়ে এল।

সেই সন্ধ্যাটা মনে পড়ছে। সেই প্রথম।

হঠাৎ প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বিয়ের আগে তুমি অন্য মেয়েকে ভালোবাসতে, তাই না?

সুরটা অন্য রকম ঠেকল। যে পাণ্ডুলিপিটা কিরণ পড়ে শোনাচ্ছিল, সেটা নামিয়ে রেখে সে প্রতিমার মুখের দিকে তাকালো। এতক্ষণ একটা টুলের ওপর বসেছিল প্রতিমা, সেখান থেকে উঠে পড়েছে সে, গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানলার পাশে। তার মুখের এক পাশে ঘরের আলো, আর দিকে অন্ধকার।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ প্রতিমা?

—বিয়ের আগে থেকেই তো বই লিখছ তুমি। কাউকে ভালো যদি না-ই বাসবে, মেয়েদের মনের এত খবর তুমি পেলে কোথায়?

—কী আশ্চর্য, কল্পনা বলে তো একটা জিনিস আছে। তা-ছাড়া এত মানুষের অভিজ্ঞতা আছে, এত চিন্তা আছে—

—জানি, জানি, আর বলতে হবে না।

আলোচনাটা সেইখানেই থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রতিমা।

আর একটা সন্ধ্যা। সেদিন শনিবার। কলকাতা থেকে ফিরে নিজের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিরণ। খাটের তলায় পড়ে-থাকা তার একটা পুরোনো সুটকেস বের করে তা থেকে কী যেন ঘাঁটাঘাঁটি করছে প্রতিমা।

—ও কী করছ?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। একটা তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি ঝক্‌ঝক্ করছে তার ঠোঁটের কোণায়।

—তোমার পুরোনো চিঠিপত্রগুলো দেখছিলুম। আচ্ছা, শুক্লা কে?

—শুক্লা!

—পরপর তিনখানা চিঠি দেখছি কি না। 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লেগেছে', 'আমি আপনার একজন মুগ্ধ পাঠিকা', 'আবার কবে আসবেন আমাদের বাড়িতে?' খুব খাতির ছিল, তাই না?—প্রতিমার গলার স্বরে কয়েক বিন্দু বিষ ঝরে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিরণ। প্রথমে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল, তারপর প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত-বিরক্তিতে সমস্ত মন তার আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আবার কথা বলল প্রতিমাই।

—কী, জবাব দিচ্ছ না যে?

—জবাব আবার কী দেব? ও তো তিন বছর আগেকার চিঠি। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ক্যামিলিটার সঙ্গে। ভদ্রলোক প্রফেসার, মেয়েটি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত।

—চমৎকার! একেবারে আইডিয়াল!—আবার বাঁকা সুতীক্ষ্ণ হাসিতে ভরে উঠল প্রতিমার ঠোঁট: তাছাড়া দার্জিলিং খুব ভালো জায়গা—মেঘ, কুয়াশা, পাহাড়—ভালোবাসার একটা ড্রিমল্যাণ্ড। শুক্লাও দেখতে খুব ভালো ছিল আশা করি?

সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মস্তিষ্কে এবারে বিরক্তির বিদ্যুৎ ছুটে গেল খানিকটা। একটা প্রতিঘাত করবার লোভ কিরণ চেষ্টা করেও সামলাতে পারল না।

—হাঁ, ভালো ছিল, বই কি, চমৎকার ছিল দেখতে, তোমার বদলে তাকে বিয়ে করলে অনেক বেশি সুখী হতুম আমি।

—জানি, আমি জানি—বলেই একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চিৎকার করল প্রতিমা। তারপর হঠাৎ দাঁত দিয়ে নিজের শাড়ির আঁচলটাকে সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে আরম্ভ করল।

মেঘের ডাকে কিরণের ধ্যান ভাঙল। প্রতিমা নয়—দেশের বাড়িও নয়; তার নির্জন বাংলোকে ঘিরে ঘুমন্ত পাহাড়, ঘুমন্ত নদী, ঘুমন্ত কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ। মাথার ওপর তারাজ্বলা আকাশে কখন সারি সারি মেঘ ঘনিয়েছে—এখন অন্ধকার, ওপরে নীচে এখন কেবল নীরন্ধ্র আদিম রাত্রি।

আবার মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। সেই বিদ্যুতের চমকে চোখে পড়ল বারান্দায় কোথেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে।

ডগলাস?

না—ডগলাস নয়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো তার কান-ভরে সকালের সেই কান্নাটা আবার যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

(ক্রমশঃ)

# শহর কলকাতা

● চার্চ লেনে অবস্থিত সেণ্ট জন গীর্জা

## চার্চ লেনের নামকথা

Under this stone lies interred the body of William Hamilton, Surgeon, who departed his life.

the 4th December, 1717.

'His memory ought to be dear to this nation, for the credit he gained the English, in curing Ferrukseer, the present King of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great monarch, and without doubt, will perpetuate his memory as well as Great Britain, as other nations of Europe.'

১৭১৭ খৃষ্টাব্দের সেই সমাধি। তার পাষাণ-ফলকে আজও উৎকীর্ণ হয়ে আছে উইলিয়াম হেমিল্টনের কীর্তিকথা। সমাধি যেন কথা বলছে। চার্চ লেন আজ বিরামহীন ধ্বনি-নিগ্রহে বিপর্যস্ত হলেও, সেই নিথর সমাধির নিঃশব্দ কথার অনুরণন অনুপস্থিত নয় তার বুকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর যবনিকা-পতনের লগ্নে, অথবা কিছু আগে, উইলিয়াম হেমিল্টনের পদার্পণ ঘটে বাংলাদেশে। তিনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন চতুর চিকিৎসক। তৎকালীন একজন শল্য-চিকিৎসক রূপেও নাকি অদ্বিতীয় ছিলেন তিনি---যদিও Second-Surgeon-এর পদেই তিনি আমৃত্যুকাল বহাল ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে।

এ-দেশ থেকে ডাচ বা ওলন্দাজ বণিকদের অন্তর্ধানের পরেই বাংলার মাটিতে বাণিজ্য-বিস্তারের উদ্বোধন ঘটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ইংরেজ তখন এ-দেশের বণিক-প্রজা-রূপেই গণ্য। বাণিজ্যের নিপুণ কৌশল আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও, এ-দেশের শেঠ-সওদাগরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা, তাঁদের পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না তখনো। কারণ তৎকালীন সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কালী-ক্ষেত্র বা কলিকাতার হাটে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এ-দেশীয় বণিক-দেরই। তাঁরা এ-সমস্ত অঞ্চলে দিল্লীশ্বরের ফর্মান অনুযায়ীই একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন। তাই তাঁরা নবাগত ইংরেজ-দের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বরদাস্ত করলেও, সর্বক্ষেত্রে তাঁদের সমাধিকার লাভের বিরোধিতা করতেন

### শ্রীপদাতিক

হামেশাই। --- ঠিক এমনই দিনে, হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত সুযোগের উদ্ভব ঘটে ইংরেজের অনুকূলে:

আলমগীর বা ঔরঙজেবের পরবর্তীকালের কোনো এক দিল্লীশ্বর ---যিনি 'ফাররুকশিয়ার' উপাধির বিভূষণে আরোহণ করেন মসনদে ---হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। সারা হিন্দুস্থানের শীর্ষাধিষ্ঠিত হেকিম এবং কবিরাজকুল তাঁর নিরাময় সাধনে অকৃতকার্য হওয়ায়, এবার ডাক পড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Second-Surgeon উইলিয়াম হেমিল্টনের। হেমিল্টন যথাসময়ে এসে উপস্থিত হন দিল্লীর দরবারে। সম্রাটের রোগ নির্ণয় করা খুব একটা কঠিন হলো না তাঁর পক্ষে। তিনি যথারীতি ঔষধ প্রয়োগের পর সম্রাটের অঙ্গে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সম্ভবত অস্ত্রোপচারের ফলেই মাসখানেক পরে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে ওঠেন সম্রাট। তিনি রোগমুক্ত হয়েই বহুমূল্য রত্নসম্ভারে পুরস্কৃত করতে চাইলেন হেমিল্টনকে। এমন কি, তাঁর রোগমুক্তির প্রয়োজনে হেমিল্টন যে-অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন, তিনি সেগুলিকেও স্বর্ণ-খচিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন খুশি হয়ে। কিন্তু হেমিল্টন কেবল দক্ষ চিকিৎসক নন, রাজনীতির সপিল পথেও

তিনি সুচতুর পান্থ। দিল্লীর দরবারে তিনি একাই আসেন নি, তাঁর সঙ্গে এসেছে সমগ্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়তি। অতএব সেই নিয়তিরই নির্দেশলাভে তিনি ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের মোহবিস্তার সঙ্কুচিত করেন। তারপর সম্রাট কর্তৃক উল্লেখিত পুরস্কারের বিনিময়ে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা সমগ্র ইংরেজ-সমাজের হিতার্থে সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কালীক্ষেত্র বা কলিকাতায় কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করেন সম্রাটের কাছে। বলা বাহুল্য, সম্রাট তাঁর পূর্ব-বিরচিত সংবিধান অমান্য ক'রেও, হেমিল্টনের হস্তে দান করেন উক্ত অনুমতির লিখিত ফর্মান। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-নিয়তির শুভলগ্ন সূচিত হয় এবং বাংলার বুকে তার নতুন যাত্রাপথের প্রণয়ন ঘটে সাড়ম্বরে, সসম্মানে এবং নির্দ্বন্দ্ব গৌরবে।

দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন হেমিল্টন। বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন কলকাতার ইংরেজ-সমাজ। তারপর হেমিল্টনের সচেতন ধীশক্তির দাক্ষিণ্যগুণে, ১৭১১ খৃষ্টাব্দ থেকেই উল্লেখিত তিনটি গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠা ঘটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।

দেখতে দেখতে, কোম্পানীর প্রচেষ্টাতেই এবার শ্রীমণ্ডিত হয়ে আয়তন বাড়তে থাকে কলকাতার। এদিকে-ওদিকে মাথা তুলে দাঁড়ায় সজ্জিত বসতবাটী, অফিসঘর, কাছারীবাড়ি এবং বারুদখানার চত্বরে জব চানকের সমাধিকে কেন্দ্র ক'রে প্রতিষ্ঠা ঘটে এক সমাধিক্ষেত্রেরও। তারপর সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী যে-গীর্জা—যার প্রতিষ্ঠা ঘটে আলমগীরের তিরোধান লাভের পর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এবং যা লণ্ডনস্থ বিশপের নির্দেশে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত হয় সেণ্ট এ্যানের নামে—এবার সুরু হয় তারও সংস্কারসাধন। কারণ, কিছুকাল আগে দারুণ বজ্রপাতের ফলেই বিধ্বস্ত হয়েছিল গীর্জাটি। এ-সম্পর্কে তৎকালীন ফোর্ট উইলিয়ামে সংরক্ষিত নথিপত্রে উল্লেখ আছে :

'By terrible lightning on Saturday night last, the church has receiv'd great damage, and particularly the steeple which is all cracked, and the beams of the Belfrey almost all broke which makes it very insecure and in danger of falling.'

গৌড় এবং চুনারের মূল্যবান প্রস্তরে গীর্জাটির পুনর্নির্মাণ কার্য সমাধা করেন 'রোটেশন গভর্নমেণ্ট'। এই গীর্জা তৎকালের এক অভিনব স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়। রেভারেণ্ড গার্ভাস বেলামী ছিলেন এই চার্চের অস্থায়ী ধর্মযাজক। তাঁর সহকর্মী ছিলেন রেভারেণ্ড রবার্ট ম্যাপ্‌ল্‌টফ্ট। এই ম্যাপ্‌ল্‌টফ্ট সাহেবই নাকি পরবর্তীকালের তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পলায়ন করেন এবং পরে ফলতা দুর্গ অবরোধকালে নিহত হন।

যাই হোক, সেণ্ট এ্যান চার্চ কেবল একবার নয়, অনেকবার অনেক কারণেই তা বিধ্বস্ত হয়। বজ্রপাত ছাড়াও তা একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৈশাখের প্রচণ্ড ঝড়ে। ঝড়ের করাল আঘাতেই একবার ভেঙে পড়ে তার সুউচ্চ চূড়া এবং ফাটল ধরে তার চার দেয়ালের বিভিন্ন অংশে। এ-সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়ামে সংরক্ষিত উল্লেখিত নথিপত্রেই প্রমাণ আছে :

'The annual expenses exceeded some years ago particularly charges merchandize which were occasion'd by the storm.

Which levelled most of the walls in the Town, shattered and threw down many of the buildings and blew up the bridges, the tide some days after broke in upon and carried away some of the Wharfs, Slips and Stairs; the places most damnified are the Peers on the Factory Wharfs

● চার্চ লেনের রাস্তার দৃশ্য

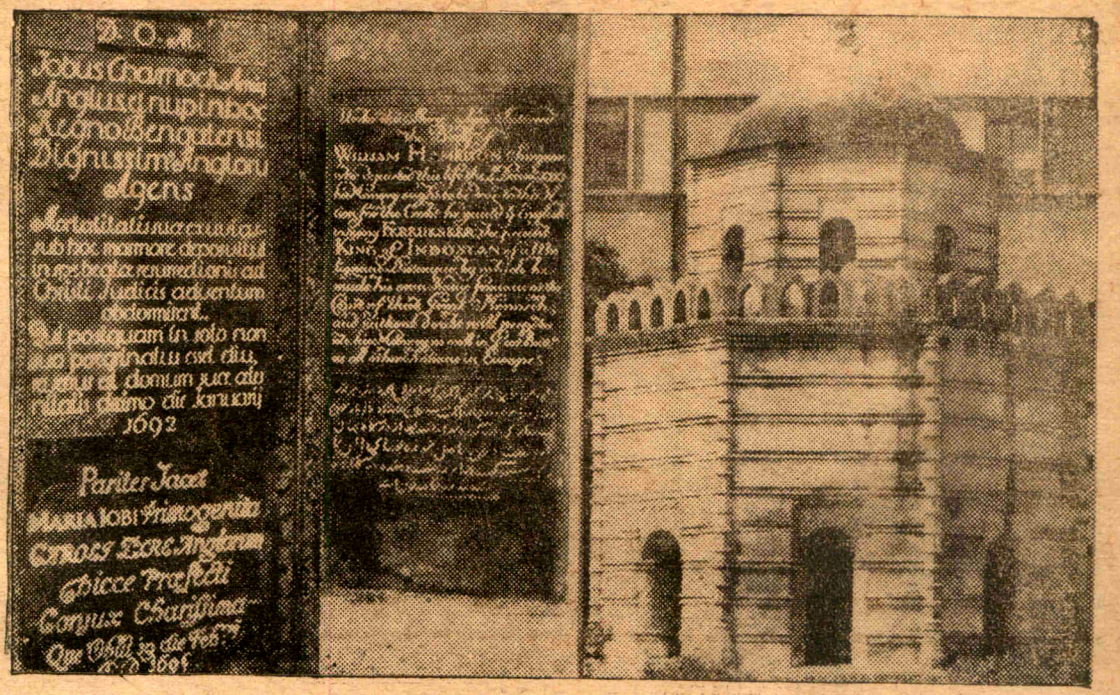

● গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত জব চার্নক এবং উইলিয়াম হেমিল্টনের সমাধি—যার স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ লিপিদ্বয় বাইরে দেখা যাচ্ছে।

Wharf and Slips and Soota Loota, walls round the burying place and powder magazine and Factory Points church steeple was overthrown.

Shall repair them in the most frugal and secure manner its deffered hitherto by chunams dearness and security.'

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের এমন এক আরাত্মক দুর্ঘটনার পরেও, সেণ্ট এ্যান চার্চ মাথা তুলে দাঁড়ায় নবীন কলেবরে। সম্ভবত চার্চটিকে এবার আরও বেশি মজবুত এবং অনেক বেশি শক্ত ভিতের ওপর স্থাপন করা হয়। দক্ষ স্থপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ধত চূড়াটিরও এবার সংস্থাপন ঘটে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে---যাতে ঝড়ে অথবা বজ্রপাতে আর কোনোদিন তার বিনাশপ্রাপ্তি না ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত সাবধানতা সত্ত্বেও, মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই একদিন ঘনিয়ে আসে তার চরম বিনাশের কাল---যা ইংরেজের ভাগ্যাকাশেও ঘনিয়ে তোলে এক মহাদুর্যোগের ঘনঘটা।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজশক্তিকে এক চরম শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই, মুর্শিদাবাদ থেকে হঠাৎ সসৈন্যে ফলকাতায় ছুটে এলেন তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলা। তাঁর চতুর্মুখি আক্রমণে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত ইংরেজ-বাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করে ফোর্ট উইলিয়ামে। কিন্তু দুর্জয় সিরাজ-বাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণে ফোর্ট উইলিয়ামের পতন ঘটে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই। তাই সমস্ত ইংরেজ নরনারী এবং সৈন্য-বাহিনী এবার কেল্লা ছেড়ে প্রবেশ করে সেণ্ট এ্যান চার্চে এবং সেখানেই তারা গ'ড়ে তোলে এক অন্যতম প্রতিরোধ কেন্দ্র। কিন্তু তাতেও কোনো সুবিধা হলো না। পরদিন প্রাতে চার্চের প্রতিরোধ কেন্দ্রেরও পতন ঘটলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র চার্চটিও ধূলিলীন হলো চিরকালের মতো। এ-সম্পর্কে পরবর্তীকালের ইংরেজদেরই লিখিত যে-বিবরণ প্রাচীন নথিপত্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তা এই :

'The Fort was vigorously attacked on the 19th and port on the 20th from the Adjacent houses and the Church, many being destroyed and the rest harrassed with continual duty overpowered by numbers and walls being scaled in the evening, it was surrendered on promise of civil treatment to the prisoners.'

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ কর্তৃক সমগ্র ইংরেজ-বাহিনী বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দেই আবার তারা ফিরে এলো কলকাতায় এবং এবার তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সুপ্রতিষ্ঠা ঘটলো সমগ্র বাংলায়। সেণ্ট এ্যান চার্চ চূড়ান্তরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিধ্বস্ত কেল্লার পার্শ্ববর্তী এক চালাঘরেই তারা প্রতিষ্ঠা করে এক সাময়িক উপাসনাক্ষেত্র---যার নামকরণ হয় 'সেণ্ট জন্‌স্ চ্যাপেল'। তারপর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বৃহদায়তন একটি চার্চ

প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়ে, তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ-রাজপুরুষগণ যে-সংস্থা গঠন করেন—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই সংস্থারই উদ্যোগে ওল্ড কোর্ট হাউসে আহূত হয় এক সাধারণ সভা। এই সভায় নাকি ওয়ারেন হেস্টিংসও উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানেই গৃহীত হয় একটি বৃহদায়তন চার্চ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রস্তাব।

সম্ভবত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, অতীতের সেণ্ট এ্যান চার্চের অবস্থান যেখানে ছিল—সেখানেই আরও কিছু জমির সংস্থান ঘটিয়ে নতুন চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তারপর একজন সুদক্ষ স্থপতির তত্ত্বাবধানে কিছুকালের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়ায় সুবৃহৎ চার্চ। এখানেই স্থানান্তরিত হয় চালাঘরের সেই সেণ্ট জন্‌স্ চ্যাপেল। পরে তাই সমগ্র চার্চটিই নামধারণ করে সেণ্ট জন্‌স্ চার্চ। অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে তার পরিচিতি ঘটে Stone-Church বা পাথুরিয়া গীর্জারূপে। তাছাড়া তৎকালের গভর্নর উপাসনার উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবন থেকে পদব্রজেই চার্চে এসে প্রবেশ করতেন ব'লে কেউ কেউ এই চার্চকে 'লাট সাহেব কা গীর্জা' নামেও অভিহিত করে।

আজও প্রাচীন অহমিকা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে সেণ্ট জন্‌স্ চার্চ। এই চার্চের অবস্থিতির জন্যেই তার পার্শ্ববর্তী রাস্তার নাম চার্চ লেন। চার্চের অভ্যন্তরে এদিনেও সংরক্ষিত আছে একাধিক ধর্মযাজকের স্মৃতিফলক এবং মূর্তি। তন্মধ্যে ডঃ টার্নার, ডঃ করি, জন আডাম এবং কার্ক প্যাট্রিকের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া চার্চের পশ্চিম গ্যালারীতে সংরক্ষিত রয়েছে যীশু সংক্রান্ত এক বিশেষ পরিবেশের অমূল্য চিত্র। এই চিত্র এঁকেছিলেন তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী স্যার জন জোফানী। এই চিত্রের মূল্য তৎকালেই তেরো হাজার টাকা ধার্য হয়েছিল। কিন্তু ধর্মভীরু জোফানী কোনো মূল্য গ্রহণ না ক'রেই তা চার্চের কর্তৃপক্ষকে উপহার দেন।

চার্চ সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের নাম 'Charnock Masoleum' এখানে জব চার্নক এবং উইলিয়াম হেমিল্টনের সমাধি ছাড়াও, ভাইস-এ্যাডমিরাল ওয়াটসন, স্যার হেনরী বুসেট, স্যার ক্রিস্টোফার ফুলার, স্যার বেঞ্জামিন ব্রেকিন, মিসেস ফ্রান্সিস জনসন প্রভৃতির সমাধি বর্তমান। তাছাড়া লর্ড ক্লাবোর্ন এবং লেডি ক্যানিঙের বিখ্যাত সমাধির পাশে দ্বিতীয় রোহিল্লা যুদ্ধে নিহত 'ইংরেজ-কমিশনড্' অফিসার-গণের ঐতিহাসিক সমাধিগৃহটিরও অবস্থান ঘটেছে এখানে। জব চার্নক, উইলিয়াম হেমিল্টন এবং আরও দু' একজনের সমাধি একটি গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। জব চার্নকের সমাধি-ফলকে ল্যাটিন ভাষায় উৎকীর্ণ রয়েছে:

'Jobus Charnock, Armigr; Anglus et nup in hoc Regno Bengalensi Dignissim Anglorum Agens. Mortalitatis sux exuvias, sub hoc marmore ceposuit, ut in spe beatae resurrectionis ad Christi Judices Adventum obdormirent. Qui postqnam in solo non suo perigrinatus esset diu reversus est domum suae oeternitatis cecimo die Januarii...'

মিসেস ফ্রান্সিস জনসনের সমাধিটিও অনুল্লেখ্য নয়। এই মহিলাই নাকি কলকাতার ইংরেজ-রমণীদের মধ্যে সব চাইতে প্রাচীনা, অর্থাৎ 'The oldest British Resident in Calcutta.' তাছাড়া তিনি 'Universally beloved, respected and revered.' তিনি বিয়ে করেছিলেন চারবার। একবার নাকি তাঁর কাছ থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে জহর পান করেছিলেন গোবিন্দপুরের এক বাঙালী জমিদার। কিন্তু প্রাণে মরেন নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডাক্তারই তাঁকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন সুকৌশলে। মিসেস জনসন এ-দেশীয় জমিদার শ্রেণীর কাছে পরিচিত ছিলেন 'The old Begum' নামে। তাঁরই সুদর্শনা দুহিতার সঙ্গে তৎকালীন রাইট অনারেবল চার্লস জেনকিনসনের বিয়ে হয়।

তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি-স্বরূপ সেই শ্বেত মর্মরের যে-স্তম্ভটি ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডালহৌসী স্কোয়ারের কোনো এক বিশেষ স্থানে, একদিন নেতাজী সুভাষ পরিচালিত অভূতপূর্ব আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার তার অপসারণ ঘটাতে বাধ্য হন। বর্তমানে সেই স্তম্ভটিও এই চার্চ সংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রেরই পশ্চিমপ্রান্তে পড়ে আছে অনাদৃত অবস্থায়।

দিনে দিনে চার্চ লেনের সমগ্র অংশে অফিস, ব্যাঙ্ক নানাবিধ প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিপণির সমাহার ঘটলেও এ-রাস্তা সেই সেণ্ট জন্‌স্ চার্চ এবং চার্চ সংলগ্ন Charnock Masoleum-এর অবস্থান হেতুই কলকাতার জনসমাজে আজও বিখ্যাত। তার এ-ঐতিহ্যই ইতিহাস-বিদের প্রেরণা, গবেষকের অন্বিষ্ট এবং কৌতূহলীর আরও কৌতূহল চয়নের উপকরণ।

ছাত্রদের অপরিহার্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পালামৌ
---ইহাতে আছে---
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ক্রতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।
মূল্য এক টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# বীরেন্দ্র মিত্র

—মিতা, অ-মিতা, মিতা!

আবার টেনে টেনে ডাকাডাকি শুরু করেছেন ভদ্রমহিলা। মিতা এক ডাকেই শুনতে পায়। একটা তো মাত্র পর্দার আড়াল। কিন্তু যতক্ষণ সম্ভব চুপ করেই পড়ে থাকে, সাড়া দেয় না। বড় একঘেয়ে ঐ ডাক, বড় আর্ত ভাস্করণের কণ্ঠস্বর।

এক এক সময় তাই প্রচণ্ড রাগ হয় মিতার। রাগ হয় নিজের অদৃষ্টের ওপর। লোকেশের অপদার্থতার জন্য। এতোবড় শহরটায় আর একটা নার্সিং হোম খুঁজে পেল না সে। এখানে এনে তুলল। তাও ডাক্তার সোম খাতির করে ব্যবস্থা না করলে যে বরাতে কী ছিল কে জানে। মিস ভাস্করণের ঘরটা পর্দার আড়াল দিয়ে দ্বিখণ্ড ক'রে কবুতরের মতো একটা খোপে মিতাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে ঐ ডাক কানে বিঁধছে।

ওরা যখন মিতাকে নিয়ে আসছিল, আধ-শোওয়া অবস্থায় ঝুঁকে পড়ে রুম মেট সিস্টার ভাস্করণের প্রায়-গোলাকার চোখ দুটো মিতাকে লক্ষ্য করেছে। মিতার মনে হ'য়েছিল একটা কালো বেড়াল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। চোখের পাতা চেপে বন্ধ ক'রেছে মিতা। এমন একটি রুম মেটের সঙ্গে রাত কাটবে ভাবতেও বুক ঠেলে কান্না আসতে চেয়েছে। কিন্তু সে সব প্রথম প্রথম। ক্রমে সিস্টার ভাস্করণের চেহারাটা চোখে সয়ে এলো। সেই স্থূলকায়া আলকাতরায় চোবানো লম্বা চওড়া দেহটাকে ভয় করার কোনো কারণ ঘটে নি অতঃপর। পটলের দোরমার মতো মাংসল নাকটা যে সব সময় রাগে ফুলে আছে, এরপর আর এমন ভুল হয় নি মিতার।

কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। অসহ্য লাগে ভাস্করণের যাতনাজড়িম কণ্ঠস্বরের ঐ ব্যাকুল ডাকাডাকি। মিতা, অ-মিতা, মিতা! একটানা ডাকেন। কান্নার মতো চাপা চাপা ভাঙা ভাঙা স্বর। শুনে কপালের পাশে রগ দুটো ঝনঝন করে। অসুস্থ হ'য়ে ওঠে ঘরের আবহাওয়া। তাড়াতাড়ি মাথার দিকের জানলা খুলে দিতে হয়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যশোর রোডের ওপর থেকে হুড়োহুড়ি ক'রে ঘরে ঢুকে পড়ে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আসে দু-তিন ব্যাটালিয়ন মশা।

তখন আবার সিস্টার ভাস্করণ নতুন সুর ধরেন,—আহ্, জানলাটা খুলে দিলে মিতা! শাট দি উইণ্ডো প্লিজ! দেখছ না, কী মশা। সো ডেরি ডিস্টারবিং! সঙ্গে সঙ্গে চটাস ক'রে মশা মারার শব্দ হয়।

সুরু হয় দ্বিতীয় দফা কাতরোক্তি,—আমি, আমি তাই এমনি ক'রে বেঁচে আছি। বাট মাই ডেজ আর নাম্বার্ড—দিন ফুরিয়ে আসছে আমার। কিন্তু সংসারটা এমনিই এক অতিথিশালা, আগামীকাল যে মানুষ বিদায় নেবে তারও দিকে একটিবার ফিরে তাকাবার কেউ নেই। মিতা, অ-মিতা, শুনছ। একাই বকে মরছি।

তাড়াতাড়ি মিতা বলে,—না, না বলুন, শুনছি। ভদ্রতার খাতিরে অমন বলতেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু করেন সিস্টার ভাস্করণ,—তোমার যেমন, তেমনি আমারও ভাই-ভাজ আছে। আর তারা আমাকে ভালও বাসে। তাছাড়া ঐ দুটো ফুলের মতো ছেলেমেয়ে। মিতা! তোমাকে আমি ওদের ফোটো দেখিয়েছি কি? দেখিয়েছি? না, না, ভুল করছ তুমি। এই, এই দেখো না!

পর্দার পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে

সেই বহু-কপিই ছবিটা আবারও বাড়িয়ে ধরবেন ভাস্করণ। বেড সুইচে আওয়াজ হবে। আলো জ্বলে উঠবে। আর কয়েকটা শব্দের ইঙ্গিতে বোঝা যাবে ভাস্করণ আধ-শোওয়া হ'য়ে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করছেন। মিতার বেডের দিকে ফিরে মিতার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি খুঁজছেন। তাঁর ফুলের মতো ভাইপো-ভাইঝির প্রশংসা।

অথচ একচুল নড়বার ক্ষমতা নেই ভাস্করণের। কোমর থেকে বাঁ পায়ের পাতা অবধি কড়া প্লাস্টার। সাইকেল রিক্সা থেকে পড়ে গেছলেন একেবারে স্কুল গেটের সামনে। ছুটে এসেছিল স্কুলের মেয়েরা,—সিস্টার, সিস্টার! সেই সমস্ত মিষ্টি স্বরধ্বনি ছাড়া এখন আর কিছুই স্মরণ নেই।

—আহা, ঐ সব সিজন ফ্লাওয়ার আছে ব'লেই তো আছি। জানো মিতা, ওদের ছেড়ে আমি ম্যাড্রাসও যেতে পারি না। ভাই কতবার লেখে। তাছাড়া ঐ ছোট দুটো। রাগ করে ওদের মাকে বলে,—পিতি এবার এলে আর কথাই বলব না! এইসব বলতে বলতে গরুর বাঁটে যেমন দুধ, ভাস্করণের স্বরে তেমনি আদর ঝরে।

চুপ ক'রে শোনে মিতা। ভাস্করণের ভাষায়ও বোধহয় সেই সব শব্দ আছে যা বাচ্ছারা উচ্চারণ করলে আধো আধো, মাখনের মতো শোনায়। তা হোক, তবু ছবিটা সে ইচ্ছে ক'রেই দেখে না। দেখলে ভাস্করণের শব্দোচ্ছ্বাস আরও অসহনীয় মনে হ'ত। ছবি দুটো (তোলার দোষেও হ'তে পারে) কোনোভাবেই কোনো ফুলের চিত্র মনের ওপর সাজিয়ে ধরে না। কালো সরু দুটো দেহের ওপর আনসেরি সরার মতো মাথা। ছেলেবেলায় পড়া স্বাস্থ্য বইয়ে এ-জাতীয় চেহারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পিলে রোগীর চেহারা যেন।

লোকেশকে ব'লে তাই বেবি-ফুডের বিজ্ঞাপনে-ছাপা হাবলা ছেলের ছবি আনিয়ে রেখেছে মিতা। ভাস্করণ ঐ ফোটো বাড়িয়ে ধরলেই মিতা চোখ বন্ধ করে। বালিশের নিচে থেকে বেবিফুডের ছবিটা বার ক'রে আনে। তারপর ফোটোটার ওপর ছবিটা চেপে ধ'রে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখে। রুম মেটের সঙ্গে প্রবঞ্চনা? লোকেশ তো হেসে হেসে ঠাট্টা করে। করুক। এ সময় পিলে রোগীর ছবি দেখার কল্পনাও করা যায় না। লোকে বলে,—এখন সুন্দর সুন্দর শিশুর রূপ দেখতে হয়। তাহলে কোলে যেটি আসে সেও হয় সুন্দর।

ভাস্করণ বহু কষ্টে পাশের বেড দেখেন। হ্যাঁ, মিতা দেখছে। পিছন থেকে ফোটোটা চোখে পড়ে। স্টুডিও ম্যাড্রাসের শীলমোহর দেখা যায়। খুশি গলায় বলেন,—অনেক রাতে যখন ঘুম আসে না, তখন আমি ও-দুটির ছবি দেখি।

নার্স পারুলও মাঝে-মধ্যে এসে কৌতুকটুকু উপভোগ করে।

ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে,—নেন কেন?

উত্তরে মিতা হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। মিতা তো অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে না। এক রকম ভাস্করণের জন্যই তার একটা হিল্লে হ'ল। নাহলে আজব শহর কলকাতায় জায়গা জুটত না। সিনেমা রেস্তোরাঁ টাম বাসই নয়, নার্সিং হোম হাসপাতাল কেওড়াতলা নিমতলায়ও হাজিরামাত্র জায়গা নেই। ডাঃ সোমের নার্সিং হোমও ফিরিয়ে দিত। শুধু ভাস্করণের জন্যই ৬ নম্বর রুমে জায়গা হ'য়ে গেছে তার। এক রকম ভাস্করণই আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এই প্রথম ইস্যু শুনেও হতাশভাবে ডাঃ সোম বলেছিলেন,—কিন্তু আমি কী ব্যবস্থা করি বলুন তো। একটা বেডও খালি নেই।

কিন্তু মরীয়া হ'য়ে উঠেছে তখন লোকেশ। আর সে রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে টহল মারতে পারে না শহরের অলিগলিতে। মিতার এই প্রথম সন্তান। মিতা তো স্বভাব-ভীতু। লোকেশও ঘাবড়ে গেছে বৎপরোনাস্তি। তার স্বরে হতাশার সঙ্গে আবেদন প্রায় কান্নার মতো শোনাচ্ছিল।

ঘরে শুয়ে সবই শুনছিলেন সিস্টার ভাস্করণ। পারুল তখন বেড-প্যান দিচ্ছে।

ভাস্করণ জিজ্ঞেস করেছেন,—এদের কি তিনকুলে কেউ নেই।

ঠোঁট উল্টে পারুল বলেছে,—কি জানি বাবা! থাকলে কি আর অমন দিশেহারা হয় কেউ। আহা, বৌটা একেবারে কচি। ভয়ে মখ আমসি হ'য়ে আছে।

—আহা, ডাক তো একবার ডাক্তারবাবুকে।

ডাঃ সোম মুগ্ধ হয়ে বলেছেন,—আশ্চর্য! একি ক্রিশ্চানিটির গুণ, না শিক্ষয়িত্রীর বদান্যতা?

উত্তরে মৃদু হেসেছেন সিস্টার ভাস্করণ,—বেবী, বেবীর ডিমাণ্ড সব আগে ডক্টর। কে জানে কালে সে কী হবে। আপনি বরং মেয়েটার এ-ঘরেই একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

আশ্চর্য হ'য়েছিল লোকেশও।

—ওঁর অসুখটা কী ডাক্তারবাবু?

—অসুখ? না অসুখ কিছু না। একটা এ্যাক্সিডেণ্টে শুধুমাত্র পড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের তো মনে হয় উনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবু পা থেকে তলপেট অবধি ব্যথা। কেন, বোঝা মুস্কিল। দিনরাত কাতরাচ্ছেন। প্লাস্টার খুলি নি তাই। দু-একটা দিন অবজারভেশনে রেখেছি। তবে এমন পেসেণ্ট বড় একটা পাই নি মশায়। যন্ত্রপাতিতে কিছুই ধরা পড়ছে না। কোনো কমপ্লেন নেই। কিন্তু ডাঃ সোম পাইপ মুখে একটা শ্রাগ ক'রে রাউণ্ডে চলে গেছেন।

লোকেশ ঘটনাটা মিতাকে ব'লে কিছু উপদেশও দিয়ে গেছে,—

ভদ্রমহিলার মতো মানুষ হয় না। ওঁর সুবিধে-অসুবিধে একটু বুঝে চলো।

সুতরাং মিতা হাসিমুখেই সহ্য করে ভাস্করণকে। তবু মানুষের মন, মাঝে-মধ্যে বিরক্তি না এসে উপায় কি।

ভাস্করণের অভিযোগ অজস্র। থেকে থেকে ব্যথা, যন্ত্রণা। না, কেউ দেখছে না। পারুলটা নামেই নার্স। মিতা লক্ষ্য করেছে, পারুল সন্ধ্যের পর কি সাজটাই সাজে। পুরুষ-বন্ধুরা আসছে। এমন নার্সিং হোম তো দেখি নি বাপু।

মিতার সন্দেহ হয়, ভাস্করণের কণ্ঠস্বরে যেন বিদ্বেষের থেকে ঈর্ষাই ঝরে পড়ে বেশি।

ভিসিটর লোকেশ কেবিনে এলেও ভাস্করণ নিজের কথাই পাড়েন। দুনিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবলি যেন নিজেকে খুঁটে খুঁটে দেখা।

লোকেশ ধৈর্যশীল শ্রোতা। ক্বচিৎ তর্কের অছিলায় সহানুভূতিও প্রকাশ করে,—আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল সিস্টার।

—সময় পেলাম কৈ। ভাস্করণ হাসেন, ম্লান স্মৃতিভারাক্রান্ত হাসি। লোকেশের ভয় করে কথা বাড়াতে। কিন্তু উনিই জের টানেন।

—আর বিয়ে করলে শুধু নিজেরটিকেই ভালবাসতাম। এই রোগা, স্কুলভর্তি শিশু আমার। বলতে বলতে তাদের ফুটফুটে মুখগুলি মনে আনার চেষ্টা করেন হয়ত।

—ওরা আমায় ভীষণ ভালবাসে, জানেন। আমিও ছোট ছেলেমেয়ে খুব ভালবাসি। মিতা, তোমার ছেলের একটা ছবি দিও কিন্তু আমায়।

মিতা লোকেশ দুজনেই ঘাড় নাড়ে। যদিও সবাই জানে এ ছবি কেউ দেবে না। ট্রেনে হাসপাতালে বিদেশ ভ্রমণের সময় পান্থশালায় প্রতিজ্ঞা অনেক হয় যার কোনোটার উদ্দেশ্যই প্রতিজ্ঞা পালনে সমাপ্ত নয়।

মিতার অনেক প্রয়োজনীয় কথা থাকে। সময় শেষ হ'য়ে এলে সে যখন লোকেশের একান্ত হতে চায়, ভাস্করণের ব্যথাটাও সেই সময় বাড়ে। কলিং বেলে ঘন ঘন চাপ দেন। নার্স পারুলকে বলেন,—যে যার নিজেরটা নিয়েই তো আছ। আমি মরছি যন্ত্রণায়। উঃ বাবা, পেটটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

পারুল মুখ লুকিয়ে মিতার চোখে চোখ পেতে হাসে। লোকেশ বিস্মিত হয়, একটু ভয়ও পেয়ে যায়।

লোকেশ বলে,—তোমাদের এই নার্সটি ভারি হাসিখুশি।

উত্তরে কপট কোপে কটাক্ষ করে মিতা।

—বাঃ। বিব্রত লোকেশ এতক্ষণে পারুলের রূপ দেখে, খেয়াল হয় মেয়েটা রূপসী না হলেও চটকদার। হাসে,—হ্যাঁ, বেশ চটক আছে!

মিতাও হাসে,—ভারি দুষ্টু প্রকৃতির মেয়ে। সিস্টারকে যা জ্বালায়।

পারুল এক সময় ক্লাশ-পালানো ছাত্রীর মতো ফস করে মিতার বেড়ে সরে আসে। মিতার কানে কানে কী যেন বলছে দেখে লোকেশ নিরিবিলি পারুলকে আরও একটু ভালো ক'রে দেখে নেয়। খুব যত্ন ক'রে সেজেছে। মনোহারিণীর সাজ।

মিতা ইশারায় ডাকছিল। কান বাড়িয়ে এগিয়ে এলো লোকেশ।

—পারুল কি বলছে জানো?

—কি?

—তুমি একটু সিস্টারের সঙ্গে গল্প করলে ও ছুটি পায়। বাইরে ওর বন্ধু অপেক্ষা করছে। বন্ধু মানে—বুঝলে?

লোকেশ বোকার মতো মাথা নাড়ে, যার মানে, না, সে বোঝে নি।

—তুমি একটা হোপলেস—

—অ!

এমনি ক'রে লোকেশকেও এক আধদিন পারুলের প্রক্সি দিতে হচ্ছে।

অনেক প্রশ্নের মাঝে লোকেশ কোন সময় বলে,—আপনাদের তো অঢেল ছুটি। সামারে বা পূজোয় ঘুরে আসেন না কেন দাদার ওখান থেকে। ছোট ছেলেমেয়ে দুটো আছে।

সমস্ত কমপ্লেন ভুলে গিয়ে উৎসাহ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

গ্ল্যাক্সো লেবরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

বোধ করেন ভাস্করণ,—ওদের ফোটো-গ্রাফ দেখেছেন?

—দেখেছি।

—কেমন?

—বেশ সুন্দর। খুব সুন্দর ভাইপো-ভাইঝি আপনার।

একটু সন্দিগ্ধ হলেও আশ্বস্তভাবে ভাস্করণ কিছুক্ষণ সিলিং-এ চোখ রেখে পড়ে থাকেন। পরে নিশ্বাসের সঙ্গে কথা জড়িয়ে বলেন,—তা গেলেও হয়। কিন্তু এখানেও যে আমার শতখানেক ছেলে-মেয়ে। স্কুল বন্ধ হলেও ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। সিস্টার সিস্টার ক'রে কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হবে।

লোকেশ সমর্থন জানায়,—তা বটে, এখানেও তো রোজ আপনার যে পরিমাণ ক্ষুদে দর্শনপ্রার্থীরা আসছে, মনে হয় আপনি একজন ভি-আই-পি!

কথাটায় খুশি হ'ন ভাস্করণ,—এই তো, দেখুন না। দু টিন লজেন্স বিস্কিট রেখেছি, দিন-তিনেক বড় জোর থাকবে।

—তাহলেও ম্যাড্রাসে আপনার মতের টান। মিতাও আলোচনায় নামে।

—না! জোরে শ্বাস ত্যাগ করেন ভাস্করণ,—আসলে কি জানো, আমাকে পেলে ওরা ওদের মায়ের থেকে আমাকেই টানে বেশি। কি দরকার বাপু আমার!

মশোর রোডে এই সময় সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে নামে। কী দরকার বাপু আমার! আলোর সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছেদ! তাই যতটা সম্ভব কালো বোরখায় চারদিক ঢেকে নিজেকে নিঃসঙ্গ ক'রে গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়েছে সন্ধ্যা। কেমন একটা মালিন্যে জানলার ভেতর-বাইরে একাকার হয়ে যায়। লোকেশ কথা খুঁজে পায় না। ভাস্করণ মনে মনে জিরোতে চান। এইভাবেই কিছুক্ষণ পর ব্যথা সুরু হবে তাঁর। তারপর সারা রাত কাতরানি। মনে মনে ভয় পায় মিতা।

মিতার যে রাত্রে ব্যথা উঠল, ভাস্করণের চোখের পাতায় ঘুম ছিল না সে রাতে। নিজের তলপেটের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে তিনি প্রায় আধ-শোওয়া হ'য়ে বিছানায় উঠে বসেছেন। পারুলকে ব'লে মাঝের পর্দাও তুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিতার কাতর মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে জিভে-তালুতে নানা রকম সহানুভূতিসূচক শব্দ করেছেন। নার্স পারুলকে ঘরের বাইরে পা ফেলতে দেন নি।

—আহা, দেখছ না মেয়েটা ছটফট করছে! রোগী নিয়ে নাড়াচাড়া করছ ব'লে কি মায়া দয়াও নেই তোমাদের।

পারুল চাপাগলায় গজগজ করেছে,—তা কী করতে হবে কি! এ হ'ল সৃষ্টির যন্ত্রণা, এর কি সেবা আছে! কিন্তু জোরে বলার উপায় নেই। সিস্টার ভাস্করণের স্কুলে ডাঃ সোমের ছেলে-মেয়ে পড়ে। এখানে তাঁর খাতিরই আলাদা। অযত্ন হ'লে প্রিন্সিপাল মিসেস মারির নালিশ আসবে ডাঃ সোমের কাছে। একেবারে চাকরি নিয়ে টানাটানি।

পারুল বরং চালাকি ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ল,—ওটাকে বলে সৃষ্টির ব্যথা, বুঝলেন সিস্টার! অর্থাৎ কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঢেলে দিল।

এজন্যই দেখতে পারেন না ভাস্করণ। বললেন,—হুঁ্যা হুঁ্যা, বুঝি! তোমার আসল টানটা কোথায় সে কি আর বুঝছি না। তারপরই একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। উত্তেজনায় শরীরটা শুধু অল্প অল্প নড়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে যেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই কাতরাতে সুরু করলেন আবার,—উঃ, পারুল! অঃ! কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটু ডলে দাও তো। বড্ড ব্যথা!

পারুল নিচু গলায় গজগজ করল,—আপনারও আবার ছোঁয়াচ লাগল নাকি? ওখানে সৃষ্টির ব্যথা, এখানে সৃষ্টিছাড়া ব্যথা—আর আমার হয়েছে গুষ্টির পাপের ব্যথা!

ভোরের দিকে লেবার রুমে নিয়ে গেল মিতাকে। সোজা কোমর অবধি উঠে বসলেন সিস্টার ভাস্করণ। বুকের ওপর আঙুল দিয়ে ক্রশ আঁকলেন। মঙ্গল হোক। ভালয় ভালয় ছেলে কোলে ফিরে আসুক মেয়েটা।

মিতা চলে গেলেও ভাস্করণ শুয়ে পড়তে ভুলে গেলেন। মিতার শূন্য বেডের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে কতক্ষণ ব'সে ছিলেন খেয়াল ছিল না। এক সময় অনুভব করলেন, তাঁর শরীরটাকে পাক দিয়ে দিয়ে একটা অননুভূতপূর্ব ব্যথা অজগরের মতো বুক অবধি উঠে আসছে। শ্বাসকষ্টে নিশ্বাস দ্রুত পড়ছে। কেমন একটা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা, অনিশ্চিতির আশঙ্কায় সমস্ত দেহটা দোলাচ্ছে। এমন আতঙ্কময় রাত এর আগে সিস্টার ভাস্করণ কখনো অনুভব করেন নি।

ভাস্করণের ৬ নম্বর রুম এখন ভীষণ ফাঁকা। শূন্য পড়ে আছে মিতার বিছানা। বাইরে শ্বাস রোধ করা অন্ধকার। পারুল ৬ নম্বরের। সে গেছে মিতাকে এ্যাটেণ্ড করতে। দোরটা আধ-খোলা ছিল, নার্সিং হোমের ওষুধের গন্ধ আর চাপা কাতরানির শব্দ ছাড়া গভীর রাত এখানেও ষড়যন্ত্রের সতর্কতায় নিস্তব্ধ নিথর হ'য়ে আছে।

ভয় করছিল। ভীষণ ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল ভাস্করণের। দুহাতে মুখ ঢাকলেন ভাস্করণ। ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে পথ হারালে, পথের সঙ্গীরা অদৃশ্য হ'লে যেমন ভয় করতে পারে।

ছেলেকে দুধ ধরিয়ে মিতা ডাকল,—এই!

জানলার বাইরে চোখ পেতে সিগারেট টানছিল লোকেশ। শূন্য-দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল; কিন্তু তাকাল চিন্তার দিকে, মিতা বা ছেলের দিকে নয়।

—সিস্টার বলতেন, ছেলে মানুষ

করা খুব সহজ নয় মিতা। দেখো যেন ছেলেটা সবার চোখ জুড়োতে পারে। আখখুটে আর দুর্বিনীত কোর না। সিস্টার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে সংসারের কত উপদেশই দিয়েছেন, যেন নিজে পাঁচ ছেলের মা!

লোকেশ এবার পরিপূর্ণ চোখে তাকাল। মিতার গর্বিত হাসিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। পরে একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করল। মিতাকে পরিতৃপ্ত আর সঙ্কীর্ণ মনে হ'চ্ছে ব'লে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল জানলার বাইরে।

৬ নম্বর রুমে সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট সিস্টার ভাস্করণ আর কাউকে উত্যক্ত করার জন্য ঠার শুয়ে নেই। অথচ তাঁর একটা শরীরহীন অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে লোকেশ।

—তুমি ফিরে এসে তাঁকে আর দেখ নি, না?

—কাকে! বিস্মিত কৌতুকে চোখ তুলল মিতা। আজ পৃথিবীর সব সমস্যাকে তুচ্ছ করে, সব প্রশ্নকে হাল্কা ক'রে উড়িয়ে দিতে পারে সে। লেবার রুম থেকে ফিরে আসার পর কিছুই আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। সব কিছু আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে, বিকেলের বাসন্তী বাতাস যেমন ক'রে ফুলের গায়ে পাতার দেহে স্পর্শ রেখে যায়।

—সিস্টারকে? ঐটুকু সময়ের মধ্যে সিস্টার সুস্থ হয়ে নার্সিং হোম ছেড়ে চলে গেলেন; ভাবতেও কেমন অবাক লাগছে আমার!

—ওহ্, তুমি সেই একই কথা ভাবছ বুঝি? এই, এই, দেখ না, ও কেমন পিট পিট ক'রে তাকাচ্ছে। ভীষণ দুষ্টু হবে কিন্তু।

—কে! লোকেশ মুখ ঘুরিয়ে দেখল,—ও:!

—আপনার ছেলের একটা ছবি দেবেন কিন্তু আমায়—সিস্টার ভাস্করণের কণ্ঠস্বর শুনেই যেন লোকেশ তাঁর পরিত্যক্ত বেডটার দিকে তাকাল। না, তাঁকে একটা ছবি কোনোদিনই দেওয়া হ'য়ে উঠবে না।

—হয়ত আপনি কোনোদিন আমাদের স্কুলেই আপনার ছেলেকে ভর্তি করতে আসবেন। কিন্তু তখন হয়ত আমিই নেই—

সিস্টারের চাপা শ্বাস শুনতে পেল লোকেশ। শুনতে পেল ভাস্করণ বলছেন, মুখে আড়াল-করা আলোর আবছায়া, বলছেন,—বিয়ে করার সময় পেলাম কৈ!

শুনল—জানেন, আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব ভালবাসি!

শুনল, ভাস্করণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

লোকেশ চমকে উঠল। পেছনে ডা: সোম মোটা গলায় বলছেন, —কনগ্র্যাচুলেশন! বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে হয়েছে, আট পাউণ্ড। তারপর মিতার দিকে ফিরে বললেন,—কি, কেমন লাগছে এখন? আর কোনো ট্রাবল্ নেই তো! ও: যা একটি রুম মেট ছিল আপনার!

মিতা সলজ্জ হাসল।

—আচ্ছা, উনি অমন হঠাৎ চলে গেলেন। সেরে গেছেন একেবারে? লোকেশ সিগারেট বাড়িয়ে ধরল।

—কে? সিস্টার ভাস্করণ? আরে ওঁর আর হয়েছিল কি মশাই যে সারবেন। ডা: সোম গলা ছেড়ে হাসলেন, চলে তো যাবেনই। ওঁকে তো আর লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া যেত না কোনোদিন।

আবার মিতার দিকে ফিরে পরিতৃপ্তভাবে মুচকি হাসলেন ডাক্তার-বাবু, আপনাকে ধন্যবাদ। বিনা অস্ত্রোপচারে একেবারে যাকে বলে চাঁদসীর চিকিৎসা করে ছেড়েছেন।

—তার মানে? চোখ বড় করে তাকাল মিতা।

—আপনার আসল ব্যথাই ওঁর নকল ব্যথার রহস্য ফাঁস করে দিল। উনিও নিজেই নিজের রিলিজ অর্ডার করিয়ে নিয়ে সরে পড়লেন, আমরাও বাঁচলাম। বুঝলেন মশাই, ডাক্তার হয়ে কত যে দেখলাম!

ডা: সোম উঠে দাঁড়ালেন।

—ভালো ক'রে একদিন খাইয়ে দেবেন।

মিতা বলল,—বা রে, নিশ্চয়।

—কৈ মি: সান্যাল তো কিছু উচ্চবাচ্যই করছেন না!

—এঁ্যা, না, মানে, নিশ্চয়ই। আপনার সুবিধেমত একদিন।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন।

ডা: সোম চলে যেতে লোকেশ জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। অজস্র মানুষ দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। কর্মব্যস্ত পথিকের অপেক্ষার মুহূর্ত নেই।

হঠাৎ মিতা বললে, সিস্টারকেও নেমন্তন্ন করবে?

লোকেশ ফিরে তাকাল। না, পরিহাস করছে না মিতা। ওর চোখমুখ পরিতৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

ধীরে ধীরে মিতার খাটের পাশে এসে বসল লোকেশ। তারপর কানের কাছে মুখ চেপে ফিসফিস করে বলল,—না, কাউকেই নেমন্তন্ন করব না।

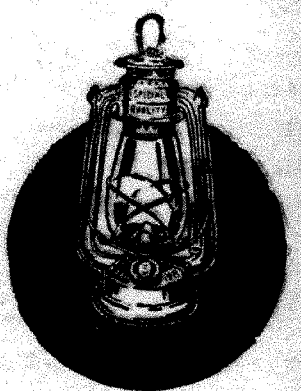
কিরণ
নতুন সংযোজন
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬,৩৩ নীলা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন-২২-৬৫৮০

# রঙ্গমঞ্চ ও দেশ এবং এদেশে

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

এই আর্মাডা-অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ফলে প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল ক্যাথলিসিজমের উপর—আর সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অবসান ঘটল। এর ফলে ইংলণ্ড হয়ে উঠল সর্ববিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—

In large part, therefore, the Elizabethan Age's great literary adventure sprang from the optimism and sense of destiny which the defeat of the Armada, almost by divine intervention, inspired in the minds and hearts of Englishmen.

রাণী এলিজাবেথ চাইতেন, রাজসভায় সব জ্ঞানীগুণীরা তাঁর প্রশংসায় সব সময় মুখর এবং নিয়ত তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবেন। তখনকার নাটক এবং কাব্যেও রাণীকে খুশি করবার চেষ্টার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ছিলেন এ বিষয়ে একজন অগ্রণী। র‍্যালেকে ঘিরেও আবার এক চাটুকারের দল ছিল। অবশ্য এ দলে সবাই থাকতেন শিল্প বা বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী। এই দলটিকেই সেক্সপীয়ার Love's Labour's Lost-এ ঠাট্টা করে নাম দিয়েছেন 'School of Night.' এ নাটকের Don Armado চরিত্রে আসলে সেক্সপীয়ার র‍্যালেকে নিয়েই তামাসা করেছেন। এ দলে নামকরাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ Thomas Hariot এবং John Doe, নাট্যকার Marlow এবং কবি George Chapman ( হোমারের ইংরাজী অনুবাদের জন্য প্রসিদ্ধ)।

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ—তখনকার দিনে বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া সুসাহিত্যিক হিসাবেও রাজসভাতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

সুকবি বলেও তিনি যথেষ্ট প্রভাব এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়ে

## শিলালি

ছিলেন রাজদরবারে—কারণ এলিজাবেথের সময় রাজ সরকারের কৃপাদৃষ্টি এই সব গুণের অধিকারীদের উপরই গিয়ে পড়তো। এ বিষয়ে Mrs. Bradbrook লিখেছেন :

'The delicate games of tokens and poetry were essential to a world where personal relationships were never merely private, and where public relationships were never merely formal! To mock or spoof one's rival successfully in a poem might be to laugh him out of court.

রাণীর বন্দনা করে র‍্যালে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। কখনও রাণীকে সম্বর্ধনা জানাতেন Diana হিসাবে সম্বোধন করে, বা Cynthia বলে। রাণীর কাছে র‍্যালের নিজস্ব নাম ছিল Water ( a pun on his christian name and on his seafaring exploits).

র‍্যালে আবার সময়ে সময়ে এলিজাবেথের স্তুতিগান গাইতেন Virgin বলে সম্বোধন করে। র‍্যালের উপদেশানুসারে আমেরিকার যে অংশটিতে গিয়ে ইংরাজরা র‍্যালের পরিচালনায় প্রথম বসতি স্থাপন করে, তারও নাম দেওয়া হয় Virginia—অর্থাৎ Virgin Queen-এর প্রতি এইভাবে সম্মান দেখানো হয়।

অবশ্য অন্যান্য অনেক গুণের জন্যও রাজদরবারে র‍্যালেকে বিশেষ খাতির দেখানো হোত। ড্রেকের মত তিনিও ছিলেন বীর যোদ্ধা। সমুদ্র অভিযানকারী বীর জলদস্যুদের অধিপতি। জলে এবং স্থলে বহু যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি রাণীর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েন।

১৫৯২ সালে রাণীর একজন পরিচারিকাকে বিয়ে করার জন্য র‍্যালে এলিজাবেথের বিরক্তিভাজন হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৫৯৫ গায়নার বিরুদ্ধে অভিযানে এবং ১৫৯৬ সালে ক্যাডিজ আক্রমণে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আবার তিনি রাণীর কৃপালাভ করেন।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর থেকেই র‍্যালের গৌরবসূর্য অস্তমিত হতে থাকে। প্রথম জেমসের সময় রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে টাওয়ারে ১৩ বছর বন্দীজীবন যাপন করতে হয়। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত History of the World রচনা করেন। এরপর রাজা তাঁকে এই সর্তে মুক্তি দেন যে, গায়নায় অভিযান করে সোনা লুঠ করে নিয়ে আসবেন। কিন্তু র‍্যালের এই অভিযান ব্যর্থ হয়। কিছুকাল পরেই ১৬১৮ সালে টাওয়ারে রাজবিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

Raleigh's death might be one way of marking the end of the Elizabethan Age. He embodied in his personality the elements of vigour and adventure that marked the period so strongly. He was a courtier and a poet, an entrepreneur and a pirate. Perhaps it was because he was so much of a microcosm of his age that around him gathered the group we are calling the School of Night. Raleigh's multiple personality could serve as a focus around which his friends, who practised more specialized activities, could gather and find a unity of purpose and spirit.

( ক্রমশঃ )

# নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

## দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হবে না

১৯২৯ সালের কথা। আর্ট থিয়েটারে তখন 'মন্ত্রশক্তি' চলেছে। নাটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় অভিনয়ের সুখ্যাতি সর্বত্র। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সহসা আর্ট থিয়েটারের যোগসূত্র ছিন্ন হল। অহীন্দ্রবাবু আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করলেন। এই সময়ে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন। শনিবার এবং রবিবারে তখন 'মন্ত্রশক্তি'র অভিনয় হোত। এই সময়ে দুর্গাবাবু তাঁর পরিবারবর্গকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে পাঠিয়েছিলেন।

এক শনি-রবিবারে অভিনয় ক'রে দুর্গাবাবু দেওঘরে গেলেন পরিবারবর্গকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে।

শিল্পীরা সাধারণত লোকপ্রিয় হন। বিশেষ করে যাঁরা স্বনামখ্যাত তাঁদের ত' আর কথাই নেই। সে যুগে দুর্গাবাবুর অসামান্য জনপ্রিয়তা ছিল। দেওঘর স্টেশনে পরিবারের লোকজনদের নিয়ে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন রেলের কর্মচারী দুর্গাবাবুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁরাই উপযাচক হয়ে দুর্গাবাবুর কলকাতায় ফেরার টিকিট কিনিয়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

যে ট্রেনে দুর্গাবাবু কলকাতায় ফিরছিলেন সেই ট্রেনে একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খালি ছিল। রেলের কর্মচারীরা সেই গাড়িতে দুর্গাবাবুর কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন। দুর্গাবাবু ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। কিন্তু তখন কে জানত যে ঐ কম্পার্টমেণ্টটি বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত রিজার্ভ হয়েছিল বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হক সাহেবের জন্য। যাই হোক, দীর্ঘপথ

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চিন্ত মনে পরম আরামে কাটিয়ে শেষে দুর্গাবাবুর ঝঞ্ঝাট হোল বর্ধমানে এসে।

ট্রেনটি বর্ধমান ষ্টেশন প্লাটফরমে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা ব্যস্তভাবে হক সাহেবের চিহ্নিত গাড়িটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাঁরা গাড়িটির হদিস করতে না পেরে শেষে রেলকর্মচারীদের শরণাপন্ন হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটির সন্ধান মিললো। রেলকর্মচারীরা দুর্গাবাবুকে এসে অনুরোধ জানালেন গাড়িটি খালি করে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু দুর্গাবাবু রেলকর্মচারীদের অনুরোধ রাখলেন না। বললেন—রিজার্ভের লেবেল কোথায়? সত্যিই কোন লেবেল আঁটা ছিল না। দুর্গাবাবুকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রেলকর্মচারীরা লেবেলটি দেওঘর থেকেই অপসারণ করে দুর্গাবাবুকে তুলে দিয়েছিলেন।

একদিকে রেলকর্মচারীদের কম্পার্টমেণ্ট খালি করে দেওয়ার জন্যে উপরোধ অনুরোধ, অপর দিকে দুর্গাবাবুর জিদ। তিনি কিছুতেই গাড়ি থেকে নামলেন না। শেষ পর্যন্ত পুলিশী জুলুমও সুরু হোল। কিন্তু দুর্গাবাবু তাতেও অবিচলিত। হক সাহেব দূর থেকে সবই লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জানতেন দুর্গাবাবুকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও রেলকর্মচারীদের তিনি নিরস্ত করে নিজেই অপর একটি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়লেন।

কিন্তু এই ঘটনার যবনিকাপাত এইখানেই হোল না। দুর্গাবাবুর নামে শমন এলো বর্ধমান কোর্ট থেকে। পুলিশ-কেস্-এ কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হোল দুর্গাবাবুকে। কিন্তু তাতেই বা কি? খেয়ালী-শিল্পীর জীবনে এ ঘটনাটাও ত' চিহ্নিত হয়ে থাকলো।

প্রায় সব সময়েই নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন দুর্গাবাবু! তাই বর্ধমান ষ্টেশনে যখন হক সাহেবের জন্যে দুর্গাবাবুকে কম্পার্টমেণ্ট খালি করে দিতে বলা হয়েছিল, তখন দুর্গাবাবু স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—এক প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় আর একজন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হবে না। কথাটা হয়ত তিনি নেশার ঝোঁকেই বলেছিলেন কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হয় নি, এটা বাস্তব সত্য।


রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

**দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী**

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০।

**বসুমতী প্রাইভেট লিঃ**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

# সংবাদ বিচিত্রা

### অথ গর্দভ কথা

না ক্ষেপলে কোন গাধাই বোধ হয় বিখ্যাত হয় না। কলকাতার গাধাটিও হত না যদি না ছেলেগুলো অনবরত ঢিল মেরে আর লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ওকে রাগিয়ে দিত। রাগল, তারপর তিনজনকে কামড়াল। পুলিশ এল। দড়ি দিয়ে গাধাটিকে বাঁধা হল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল।

কাগজে গাধার ছবি বেরোল। তার কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বিবৃত হল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল সেই অনামী গাধাটি।

*

ব্রেজিলের 'পেলে' কিন্তু আরও বেশি হৈ হৈ পড়িয়ে দিয়েছিল। সে অসরিও ফার্নাণ্ডেজ চাষার গাধা। তাকে নিয়ে ফার্নাণ্ডেজ এসেছিল হাটে। ফার্নাণ্ডেজ সব্জি বিক্রি করতে ব্যস্ত আর পেলে একপাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল।

একটা ছোট ছেলে হঠাৎ এসে পেলেকে কঞ্চি দিয়ে খোঁচাতে লাগল। পেলে প্রথমে সরে গেল। ফলে ছেলেটার উৎসাহ বাড়ল। আরও খোঁচাখুঁচি করতে লাগল।

পেলে বেশিক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে নি। চটে গিয়ে এক সোক্ষম চাট ছোঁড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির ভবলীলা সাঙ্গ।

থানার কর্তা এমিলিয়ানো গঞ্জালেস ফার্নাণ্ডেজকে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু ফার্নাণ্ডেজ থানায় গিয়ে এমন হাপুস নয়নে কাঁদতে সুরু করল যে, গঞ্জালেস ওকে ছেড়ে দিয়ে পেলেকে জেলে পুরে দিল। পেলের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হল।

ফার্নাণ্ডেজ প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, গঞ্জালেস নিজে গাধা-বিরোধী। একদিন তার অফিসের দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার পর একটা গাধা এসে সব কাগজপত্র মায় তার বিয়ের প্রমাণপত্র পর্যন্ত উদরসাৎ করে। সেই থেকে গঞ্জালেস গাধাদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। তাতে কাজ হল না দেখে ফার্নাণ্ডেজ আইনের প্যাঁচ কষল। বলল, পেলে আত্মরক্ষার্থে চাট ছুঁড়েছিল, অতএব সে বেকসুর খালাস হতে পারে।

গঞ্জালেস এতে টলল না। তার এক কথা—পেলে সাংঘাতিক গাধা, অতএব ওকে ফাটকে থাকতে হবে।

এদিকে কয়েক মাস কেটে গেল। পেলে কয়েদী। অন্যান্য কয়েদীরা গাধা নয়, মানুষ। তারা একদিন বিক্ষোভ জানাল। তাদের অভিযোগ, পেলে নোংরা, সব সময় একটা বোঁটকা গন্ধ বেরোয় ওর গা থেকে। তা ছাড়া রাতে ওর বিকট ডাকের ফলে কারুর ঘুম হচ্ছে না। জেলের পাচকও খুশি ছিল না পেলের ওপর। তার খাটুনি বেড়েছে, পেলের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করতে হয়। জেলর বলল, পেলের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে তাকে দ্বিগুণ খাটতে হচ্ছে। এর জন্য তার বেতন না বাড়ালে সে ধর্মঘট করবে।

শেষ পর্যন্ত সবাই বাঁচল। পেলে ছাড়া পেল। রাজধানী সালভেডরে খোদ নিরাপত্তা সেক্রেটারীর কানে গিয়ে পৌঁছাল পেলে-সমস্যার কথা। তিনি গঞ্জালেসকে টেলিগ্রাম করলেন, 'যদিও আদালতে বিচার হয় নি, তাহলেও গাধাটি জেলে তার মেয়াদ অনুযায়ী খেটেছে। অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেবে।'

### শিল্পাঞ্জিনীর প্রেম

চার বছর ধরে মনের মানুষ খুঁজছে সে। দক্ষিণ রোডেশিয়ার (আফ্রিকা) লোকেরা ওকে বলে 'উফিতি', ভূত। মানুষের মত হাব-ভাব হলেও সে মানুষ নয়, সাড়ে চার ফুটের তাগড়া শিম্পাঞ্জিনী।

প্রথমে সে জনৈক আফ্রিকান শ্রমিকের প্রেমে পড়ে। শ্রমিকটির বেশ কিছুদিন লাগল উফিতিকে বোঝাতে যে সে তার প্রিয়তমা হতে পারে না।

উফিতি তাতে দমে নি। লোকালয়ের কাছাকাছি তাকে ঘুরতে দেখা যায়। কেউ কেউ তাকে গাছে ঘর বানাতে দেখেছে। শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। অনায়াসে মোটা মোটা ডাল ভাঙতে পারে।

তার ঘরে কোন মানুষই আসবে না কিন্তু মানুষ তাকে একটা ছোট ঘরে বন্দী করার জন্য তোড়জোড় সুরু করেছে। নিয়াসাল্যাণ্ডের পশু সংরক্ষণ বিভাগ উদ্যোগী হয়েছে উফিতিকে ধরে তার সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য।

*

রীতার প্রেম অতটা উদ্দাম নয়। সে গোত্র ইত্যাদি দেখে বিয়ে করেছে। দিল্লীর চিড়িয়াখানায় সে একলা এসেছিল। প্রথম কয়েকদিন দর্শকদের সঙ্গে খুব হৈ-চৈ করল। তাদের একটা খারাপ অভ্যাস—ধূম-পান—আয়ত্ত করল। কিন্তু তারপর সব চুপচাপ।

এক কোণে উদাস হয়ে বসে থাকে রীতা। চীনেবাদাম, ভালমুট, সিগারেট কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ বুঝলেন রীতা দোসর চাইছে। চারদিকে খবর গেল। শেষ পর্যন্ত বিদেশ থেকে এল এক সুদর্শন তরুণ শিম্পাঞ্জী।

রীতা এখন ভাল আছে। সুখে ঘর করছে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ মনে করছেন তার ঘরে শীঘ্রই আর একজন আসবে।

—সাংবাদিক

# রঙ্গজগৎ

## রবীন্দ্র সরণীর আর কত দেরী

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে আমরা রবীন্দ্র সরণী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলাম। এবছর ২৫শে বৈশাখ আমরা রবীন্দ্রনাথের ১০৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করলাম। কিন্তু এখনো রবীন্দ্র সরণী নির্মাণের কাজ শেষ হয় নি। তিন বছর পরেও লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্যাথেড্রাল রোডের সংযোগস্থলে নির্মীয়মান গৃহে রজ্জুবদ্ধ বাঁশ ও বিক্ষিপ্ত ইট পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথিক ক্ষণেক থেমে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, রবীন্দ্র সরণীর আর কত দেরী!

কবে যে শেষ হবে সেকথা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্র-নাট্যনিকেতন নির্মাণ শেষ হয়েছে। গত ১লা মে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বোম্বাইয়ের রবীন্দ্র-নাট্যনিকেতন উদ্বোধন করলেন। তখন হয়তো ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল যে তাঁর নিজের রাজ্যে এখনো নির্মাণপর্বই শেষ হয় নি। কিন্তু সেকথা মন থেকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা ছাড়া আর উপায় কি আছে!

শোনা যাচ্ছে, সোভিয়েটের বলসয় ব্যালে দলের মৃত্যে রবীন্দ্র সরণীর উদ্বোধন করা হবে (হয়ত ব্যর্থতার লজ্জা ঢাকবার জন্য)। বলসয় ব্যালে অতি আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সারা ভারতের সম্মিলিত রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য ও নাটক উৎসবে উদ্বোধনের পর বলসয় ব্যালের অনুষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধনের এক উপযুক্ত উৎসব হতে পারে।

—সুজন।

● কিনু গোয়ালার গলিতে শর্মিলা ঠাকুর

## চিত্রআলোচনা

### বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

( সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান )

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রটি নির্মিত। এই চিত্রের জন্য কাহিনী রচনা করেছেন সাহিত্যিক অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক মধু বসু।

চিত্রনাট্য বিবেকানন্দের জন্মকাল থেকে সুরু, তাঁর আমেরিকা যাবার সঙ্কল্পে শেষ। প্রথম অংশে দেখা গেছে নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল। নাম ডাক নামে যখন তিনি সবার আদরের। দুষ্টুমীতে বাড়ি তোলপাড় করে তুলেছে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে অনুসন্ধিৎসা। তারপরে দেখা গেল এক মেধাবী ছাত্র-রূপে। এই সময় থেকে মনের গভীরে বিরাট জিজ্ঞাসা থেকে তিনি সান্নিধ্য লাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে যে দীক্ষা দিলেন তার মূলকথা শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। এই মন্ত্র নিয়ে বিবেকানন্দ ভারতের কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করলেন ও প্রচার করলেন তিনি কর্মযোগের মর্মবাণী।

বাঙালী মাত্রেরই স্বামী বিবেকা-নন্দের জীবনকথা জানবার আগ্রহ অসীম। জীবনের লক্ষ্য স্থির করার জন্য এবং দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্য সমাধানে এই জীবনী আমাদের প্রেরণা দান করে। বিশেষ করে আজকের বাংলা তথা ভারতে যখন মানুষ দারিদ্র্যে ও দুর্নীতিতে নিষ্পেষিত হচ্ছে, তখন বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনাকে তুলে ধরা দরকার।

মানুষের আগ্রহের দিক থেকে ছবিটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু এই আগ্রহ তৃপ্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে, কাহিনী রচনা যথোপযুক্ত হতে পারে নি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পূর্ণরূপ ও বাণী ছবিতে যথার্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় মধু বসু চিত্রটিকে যুগোপযোগী করে তুলতে পারেন নি। ছবিটি যেন মঞ্চরূপের প্রতিরূপ। জীবনীচিত্রের যে বৈশিষ্ট্যে ছবিটিকে অন্তরস্পর্শী করে তুলতে পারতো, সে গুণ এই ছবিতে অনুপস্থিত এবং এ কারণে বিবেকানন্দের বাণী এখানে আশানুরূপ নয়। চিত্রনাট্য যদি বিবেকানন্দের বাল্যকাল অপেক্ষা কর্মযোগের কালকে বেশি তুলে ধরতো, তবে ছবিটি আরো বেশি আকর্ষণীয় হতো।

অভিনয়াংশে বিবেকানন্দ চরিত্রে রূপদান করেছেন অমরেশ দাস। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুটি প্রধান চরিত্রে প্রথমটিতে ব্যক্তিত্বের অভাব এবং বাচনভঙ্গীর ত্রুটি রয়েছে, দ্বিতীয় চরিত্র অতি অভিনয় দোষে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে এবং রামকৃষ্ণদেবের দৈব্য চেহারায় অনুপস্থিত। সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, বিপিন গুপ্ত, মলিনা দেবী, বীরেন চ্যাটার্জী, মিহির ভট্টাচার্য, জীবন ঘোষ, প্রেমাংশু বসু প্রমুখ; এবং বাঈজীর ভূমিকায় শীলা পাল। শিল্পী নির্বাচনে পরিচালক সতর্ক হলে অভিনয়াংশ আকর্ষণীয় হতে পারতো।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দের সঙ্গীতাংশ (অনিল বাগচী) প্রশংসনীয়। সুগীত গানগুলি এই ছবির আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে।

## হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র

হাঙ্গেরীর নবীন চিত্র পরিচালকেরা বর্তমান জগতের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক। মানবতার উপর আলোকপাত করা তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা চরিত্র সৃষ্টি করেন বাস্তবজীবন থেকে। তাঁরা চান, মানব-ইতিহাসের নতুন জীবনকে প্রকাশ করতে। আজকের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, নিজের দেশের মানুষের চিন্তাধারা ও সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে তাঁরা উৎসাহী। এইরূপ চিন্তাধারা নিয়ে ১৯৪৫ সাল থেকে হাঙ্গেরীতে এক নতুন চলচ্চিত্র-রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তাকে বলা হয় হাঙ্গেরীয় রীতি।

● মধু বসু পরিচালিত ও সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবির একটি দৃশ্যে অমরেশ দাস ও বীরেন চ্যাটার্জী।

হাঙ্গেরীয় রীতির ছয়টি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা এবং হাঙ্গেরীয় দূতাবাস যুক্তভাবে। হাঙ্গেরী সম্পর্কে আমাদের দেশে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে, সুতরাং এই ছবিগুলি দেখবার জন্য চলচ্চিত্রামোদীরা আগ্রহী হবেন। হাঙ্গেরীয় ছবির এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য রয়েছে। ৩৫ বছর পূর্বে সেখানে মাইকেল কার্তিজ, চার্লস ভিডর, আলেকজান্দার কোর্ডার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক কাজ করেছেন। এঁদের ছবি দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। বেলা বালাজের মত চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক হাঙ্গেরীর সন্তান। চলচ্চিত্রে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অবদান কেবল হাঙ্গেরীর ছবিকে নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিকাশে সহায়ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের পুডোভকিনের প্রভাবে হাঙ্গেরীয় ছবি পুষ্ট। পুডোভকিন প্রত্যক্ষভাবে হাঙ্গেরীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। যুদ্ধের পূর্বে যেমন, তেমন যুদ্ধের পরেও হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র শিল্পের উপর প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। মতাদর্শের নানা দ্বন্দ্বে হাঙ্গেরীর ছবির রূপান্তর ঘটেছে। দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজ হাঙ্গেরীর ছবি যেন নিজস্ব একটা ধারায় এগিয়ে চলেছে। এই

চলচ্চিত্র-ধারা সম্পর্কে তাঁরা বলছেন : 'আমরা চাই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধন। আমেরিকার ছবির আধুনিক স্টাইল আমরা গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু সোভিয়েট ছবির স্বর্ণযুগে তাঁরা যেভাবে নীতি তুলে ধরেছেন এবং সমস্যা উপস্থিত করেছেন, তাকে বর্জন করে নয়। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে চিত্রনির্মাতারা যেরূপ চরম এবং অতি সংক্ষেপকরণের পথ গ্রহণ করেছেন, আমরা তা' সমর্থন করি না।'

## রাগিণীর বিবাহ

ত্রিবাঙ্কুর ভগিনীর তৃতীয়া শ্রীমতী রাগিণী শ্রীমাধবন থাম্বিরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন। গত ১৭ই এপ্রিল বিবাহবাসরে কেরালার নায়ার সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পরে শ্রীথাম্বি অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং শিখতে বিদেশ যাচ্ছেন, সঙ্গে শ্রীমতী রাগিণীও যাবেন। নায়ার সমাজের কল্যাণ কাজের জন্য শ্রীমতী রাগিণী ও শ্রীথাম্বি এক লক্ষ টাকা শ্রীমন্নাথ পদ্মনাভনের হাতে দান করেছেন। ত্রিবাঙ্কুর ভগিনীর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার পূর্বেই বিয়ে হয়েছে।

● হাঙ্গেরীয় ছবির একটি দৃশ্য

## যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

গত ২রা মে ললিতকলা একাডেমী হলে দিশারীর উদ্যোগে যোগেশ দত্তের মূক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে 'বেকার যুবক' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তারপরে 'প্রসাধনরতা ভারতীয় আধুনিকা নারী' উপভোগ্য। শ্রীদত্ত দশটি অভিনয় প্রদর্শন করেছেন। বহু দর্শকের উপস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল।

● অর্ধেন্দু মুখার্জী পরিচালিত 'রাধাকৃষ্ণ' ছবির একটি দৃশ্যে উত্তর ব্যানার্জী ও শীলা পাল।

## স্টুডিও খবর

* এক খবরে জানা গেল সুচিত্রা সেন একটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করতে সম্মত হয়েছেন। এস এম সগরের একটি ইস্টম্যান রঙের ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন অশোককুমার ও প্রদীপ-কুমার।

* পরিচালক মৃণাল সেন ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত 'প্রজাতন্ত্র দিবস' প্রামাণিকচিত্র গ্রহণের কাজে মাদ্রাজ যাত্রা করেছেন। একমাস ব্যাপী তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ

● সাজ ও আওয়াজ প্রযোজিত মূকাভিনয়ের একটি দৃশ্যে মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত।

করে চিত্রগ্রহণ করবেন। ইতোপূর্বে তিনি মণিপুর ও মাগাল্যাও থেকে ছবি তুলে এনেছেন। এই প্রামাণিকচিত্রে তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরবেন। ছবিটি হবে বর্ণরঞ্জিত।

* অরোরা ফিল্মস প্রযোজিত 'রাজা রামমোহন রায়'-এর চিত্রগ্রহণ ১৩ই মে সুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন 'ভগিনী নিবেদিতা' খ্যাত পরিচালক বিজয় বসু।

## নাটকের কথা

### সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন

জাতীয় নাট্যকার পরিষদের উদ্যোগে এক সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের আয়োজন চলছে। আগামী ৬ই ও ৭ই জুন এই সম্মেলন কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেণ্টস হলে এবং ৮ই জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে নাট্যকার ও নাট্যসংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা এক আবেদন প্রচার করেছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে আছেন---সর্বশ্রী মন্মথ রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, জোছন দস্তিদার, রমেন লাহিড়ী, সলিল সেন, নির্মল ঘোষ, হাবুল দাস, সুনীল দত্ত প্রমুখ। যোগাযোগের ঠিকানা : ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯।

### শ্রীমধুসূদন অভিনয়

কলিকাতা আরক্ষা কল্যাণ সমিতি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন মণ্ডপে অভিনয় করলেন বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনা নিখুঁত হয়েছিল। নাম ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, রেঃ কৃষ্ণমোহন, গৌরদাস বসাক, জাহ্নবী, রেবেকা ও হেনরিয়েটারের ভূমিকায় যথাক্রমে বসন্ত চট্টোঃ, অম্বিকা ভট্টাচার্য, উমাদাস মৈত্র, বিজন বিশ্বাস, মমতা বন্দ্যোঃ, মিসেস ডি'সুজা এবং দীপিকা দাস অভিনয় করেন। নাটকটি ইতিপূর্বে সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বনফুল স্বয়ং উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দেন ও অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন।

### ছন্দগীতিকা

বিগত ২৭শে এপ্রিল সোমবার সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায়তন ছন্দগীতিকা'র গবর্নমেণ্ট অনুমোদিত ডিপ্লোমা 'সঙ্গীতশ্রী' ও 'রবিদীপ্তি'র অন্ত্য-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বৎসর 'সঙ্গীতশ্রী' উপাধির ১ম বিভাগে শ্রীমতী মীরা চক্রবর্তী, ২য় বিভাগে জয়শ্রী ভট্টাচার্য, রুণু দাস, প্রণতি চ্যাটার্জি, ইন্দিরা পাল, ৩য় বিভাগে হেনা কাঞ্জিলাল এবং 'রবিদীপ্তি'তে ১ম বিভাগে রুণা মতিলাল, ও ২য় বিভাগে গীতালি হোড় উত্তীর্ণ হয়েছে।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত
**নাড়ীজ্ঞান-প্রদীপিকা**
( নাড়ী স্পর্শ দ্বারা রোগ নির্ণয় ও পরমায়ু নিরূপণ )
মূল্য এক টাকা
জাতীয়-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী**
পদ্মিনী, সুরসুন্দরী, কর্মদেবী, কুমার-সম্ভব, নীতিকুসুমাঞ্জলি, কাঞ্চী-কাবেরী, কবির জীবনী। ৭খানি একত্রে ২·০০।
প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
**অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী**
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# খেলা ধুলা

## ময়দান ক্রিকেটের তরুণ প্রতিভা

শ্রীঅমিতাভ

অবশেষে ময়দানী আসর থেকে এই মরশুমের ক্রিকেট বিদায় নিল, হকি প্রান্তসীমায় উপস্থিত, ফুটবল দ্বারে প্রবেশের অপেক্ষায়। মোহনবাগানের এবার জয়জয়কার, দুবারই এরিয়ান্সকে পরাজিত করে ১৯৬৩-৬৪র ক্রিকেট লীগ আর নক আউট ঘরে তুলল তারা। এই প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলার ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

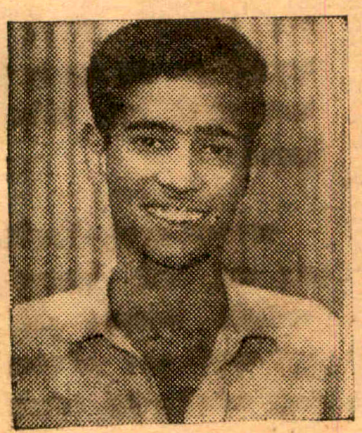

● অম্বর রায়

পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটে বাংলার একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু এই সীমানা পার হয়ে বোম্বাই বা দিল্লীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেই বাংলা ক্রিকেটের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। টেষ্ট ক্রিকেটের আসরে আজকাল বাংলার একজন খেলোয়াড়কেও খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজের মাঠ থেকে প্রতি বছরই নব নব প্রতিভার উন্মেষ ঘটছে, কিন্তু বাংলায় এর ব্যতিক্রম কেন?

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটে বাংলা দল যথেষ্ট শক্তিশালী বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলার তরুণ স্কুল খেলোয়াড়রাও শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এবং বোলার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজের স্কুল দলের সেরা খেলোয়াড়রাই অনেকে হয়েছেন ভবিষ্যতের টেষ্ট খেলোয়াড়। কিন্তু বাংলার সেরা স্কুল খেলোয়াড়, এমন কি যাঁরা সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন তাঁদের প্রতিভা কিন্তু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্ধানী দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। নানান ধরণের সমস্যা বাংলা প্রতিভা উন্মেষের পথে বাধা স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

পেছনে ফেলে আসা খেলাগুলির ওপরে সন্ধানী আলোক ফেলে হিসাব-নিকাশের সময় হয়েছে। অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। ব্যাটিং বা বোলিংয়ে নতুন কোন প্রতিভার উন্মেষ হল কি না প্রথমেই সেটা বিচার করতে হবে।

এই মরশুমে কলকাতা ময়দানের ক্রিকেট আসরে তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেরই খেলা চোখে পড়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য এবং সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুবই কম। বাংলার তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র অম্বর রায়। সহজাত ক্রিকেট প্রতিভার বলে অম্বর খুব অল্প বয়সেই তরুণ এবং উদীয়মান ক্রিকেটার হিসাবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁরই অধিনায়কত্বে বাংলা এবং পূর্বাঞ্চল স্কুল দল সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। অম্বর স্যাটা ব্যাটসম্যান, তাঁর আক্রমণাত্মক খেলার প্রশংসা করতেই হবে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার হিসাবে তাঁকে উল্লেখ করা যায়। উঠতি ক্রিকেটার হিসেবে অম্বর আজ সর্বভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিচিত। অদূর ভবিষ্যতে টেষ্টের আসরে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধিনায়ক শিবাজী রায় খেলেন ঠিক কেতাবী চালে। তাঁর খেলার মধ্যে, মারের মধ্যে আছে ছন্দ, আছে যথেষ্ট জোলুশ। বাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তাঁর ইতিমধ্যেই ঘটেছে; কিন্তু আরও উঁচুতে উঠতে গেলে তাঁকে যথেষ্ট সাধনা করতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দল থেকে গত দু' বছর আগে এক নতুন বোলার আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁ হাতে বল করেন এবং তাঁর বলে বেশ কাজ আছে। এই বোলারটি হলেন ভাস্কর গুপ্ত। এঁকে

● শিবাজী রায়

একদিক থেকে অল রাউণ্ডারও বলা যায়; কারণ ব্যাটিংয়েও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এই মরশুমের লীগ ও নক আউট ক্রিকেটে। উপযুক্ত অনুশীলন এবং আন্তরিক চেষ্টার সমন্বয় ঘটলে তিনি ভবিষ্যতে একজন উঁচুদরের বোলার হয়ে উঠতে পারবেন, কারণ তাঁর মধ্যে একজন জাত খেলোয়াড়ের সমস্ত গুণই আছে।

তরুণ ক্রিকেটার দেব মুখার্জিকে আর বাংলার ক্রীড়ামোদীদের কাছে নতুন

● মোহনবাগান ও কেনিয়া দলের প্রদর্শনী খেলায় শেষোক্ত দলের গোলের সম্মুখে এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

করে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। স্কুলে থাকতেই রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং একবার সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান মনোনীত হয়েছেন। ব্যাটে আর ফিল্ডিংয়ে এর মধ্যেই তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন মুখার্জি একজন সত্যিকারের খেলোয়াড়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর প্রতিভা অনাদৃত হল। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ তাঁর দিকে যেন ভবিষ্যতে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এবার আরেকজন তরুণ খেলোয়াড়ের খেলা খুবই ভাল লেগেছে, তিনি হলেন কল্যাণ সেন। তাঁর অপূর্ব ফিল্ডিংয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হবে। এই মরশুমে বোলিংয়ে একটি উজ্জ্বল আবিষ্কার হল জলি সরকার। যাই হোক, ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষকে স্কুল এবং কলেজ ক্রিকেটারদের ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তরুণ প্রতিভা উন্মেষের পথ প্রশস্ত হবে, ঘুচবে বাংলা ক্রিকেটের দৈন্যদশা।

## হকির সংক্ষিপ্ত সমাচার

কলকাতা ময়দানের হকি লীগ প্রায় সমাপ্তির পথে, বাইটনও উন্নীত হয়েছে সেমি ফাইন্যাল পর্যায়ে। মোহনবাগান আগা খাঁ এবং গোল্ড কাপ বিজয় সমাপ্ত করে লীগের খেলায় হোঁচট খেল বি এন রেলের কাছে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের যুদ্ধে এখন অগ্রগামী ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান তাকে অনুসরণ করছে।

বাইটন কাপে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মোহনবাগান সেমি ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে; বি এন রেল আর সেণ্ট্রাল রেলের বিজয়ীর সঙ্গে মোহনবাগানের শক্তি পরীক্ষা হবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মীরাটের ফ্রেসার্স ক্লাবকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় কলকাতা দলের ভাগ্যেই নাচছে বাইটন কাপের সম্মান।

ভারত-কেনিয়া হকি টেষ্ট ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কলকাতার টেষ্ট খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়। এই খেলায় ইমানুর অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এই টেষ্ট পর্যায়ে কেনিয়ার কাছে দু' বার ভারতকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত ভারত সিরিজে অগ্রগামী হয়েছে। আগামী টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে ভারতের এই খেলা ক্রীড়ামোদীদের মনে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত সুললিত বাংলা পয়ারে

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

এই মহদ্বৃহৎ গ্রন্থে আছে—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থের কবিচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী।

ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ

কবিচন্দ্রের

**শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত**

এবং

ভাগবতাচার্য্যের বিশ্বপ্রসিদ্ধ

**শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী**

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

"...শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পাঁচ
আকৃষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥"

ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন।

এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠিত করুক।

---

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীললৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

# হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেই দিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ —সবে করিয়াছে ঘুনাণী সভ্যতা। বাংলার সন্তান মোহ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি কমকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রধানপাল শ্রীযুক্ত শ্রীহরি এমি লিখিয়াছেন—

"...চমৎকার বই। যাহাদের প্রচারিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোরী ও কিশোরের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথায় সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিজাতি ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

---

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—

সারস্বতকুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্যোতি—

প্রতিভা ও মনীষীর অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—

সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

# কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ—

অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক

**পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ**

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।

দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲

তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲

গত প্রায় ২০ বৎসর এই অদ্ভুত ভক্তিগ্রন্থখানি মহাত্মা শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাই চরিতের' পরই সর্ব্বজনসমাদৃত।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

# শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তের কণ্ঠহার পবিত্র তুলসীমালা সদৃশ মহাগ্রন্থ।

মূল্য চার টাকা মাত্র।

---

উপন্যাস-সাম্রাজ্যের রত্নমুকুট—সেই সর্ব্ব-জনপ্রমোদন—অমরকীর্ত্তি

ঔপন্যাসিক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার—শক্তিমান রস-শিল্পী—'ভারতী'

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের—

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

৩য় ভাগে :—দরদী, প্রেয়সী, মুক্ত পাখী, বন্দী, কল্পনা, সুপর্ণা, পঞ্চশর, রূপসী, আধুনিক, সমাজ সমস্যা, লেখার নমুনা, গবেষণা, বায়োস্কোপের সিনারি, কবিতা ও গান, গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ, উষার, মোটরে কাশ্মীর।

সর্ব্বজন চিত্তবিনোদন—সর্ব্বরসসম্মিলন উপন্যাসরাজি সমন্বয় ১৷৷০

৪র্থ ভাগে :—মাতৃঋণ, সোণার কাঠি, মনের মিল, নেপথ্যে, পুনশ্চ, মৃণাল, হাতের পাঁচ, মুক্তার মালা, দেশের জন্য, বৃষ্টি, সহযাত্রী প্রায়শ্চিত্ত, দু'দিক, জাতীয় নাটকের প্লট, নয়াযুগের নাট্য ঠাট, মোটরে কাশ্মীর, রৌদ্র মেঘে মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৫ম ভাগে :—নূতন উপন্যাস সমন্বয়—বাবলা, মমতা, নির্ম্মম, অতঃপর, পরদেশী, সুরা, যবনিকার অন্তরালে, লেখার গলদ, পারিবারিক উপন্যাস, প্রগতি, অনাগত যুগ, আদর্শ এডিটোরিয়াল, আদর্শ সমালোচনা, সম্পাদকের দপ্তর, সংবাদপত্রের দৌলতে, মোটরে কাশ্মীর, একযাত্রায়, কুলকাঁটা, দুঃখীরাম, পান-সুপারি। এই সর্ব্বচিত্ত-বিভ্রম আনন্দসম্মিলন মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

---

**বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড**

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

femila
ফেমিলা স্নো
ম্যাজিক!
বোরো
(লোশন যুক্ত)
— এরূপ গুণ সম্পন্ন যে
একবার মাত্র ব্যবহারে ইহা মুখমণ্ডলের লুপ্ত
সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে আনে। ফেমিলা
সৌন্দর্য্যের ভিত্তি।
2
বোরোলীন হাউস

# সাপ্তাহিক বসুমতী

মানবতাবাদী শ্রীনেহরুর পাশে
তুর্জ্ঞেয় শ্রীআবদুল্লা

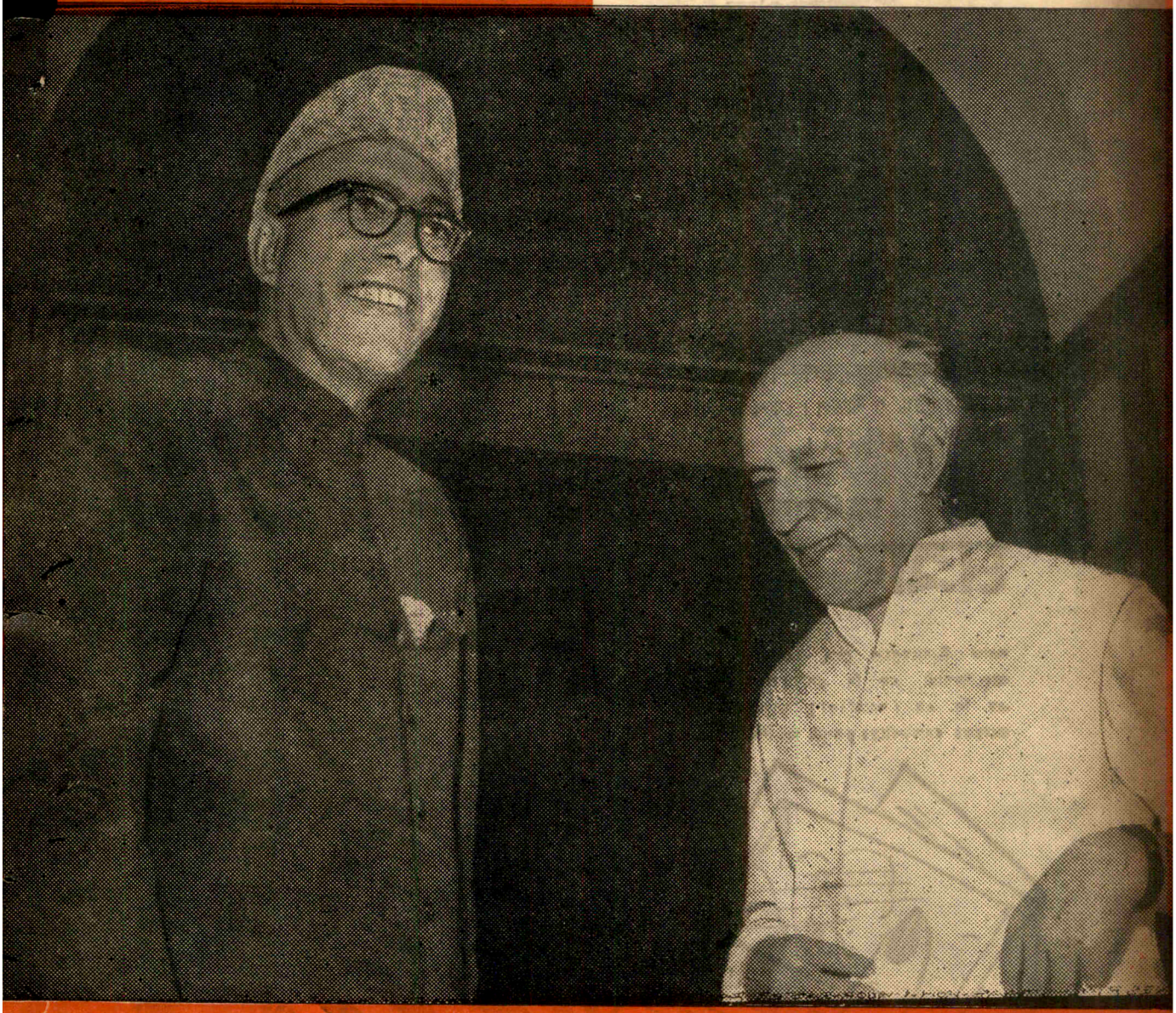

৮ বর্ষ, ৫২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • • • • 21st May, 1964 • Vol. 68, No. 52

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'

মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।

সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এফ. সি. এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ)
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

# সূচীপত্র

756.3
.003/3
Ka. 68
no.52


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | ... | ২৮৯১ |
| আজকের মানুষ | ... | ২৮৯২ |
| সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর | হরপ্রসাদ মিত্র | ২৮৯৩ |
| ভারত দর্শন | ... | ২৮৯৭ |
| জাপানী সন্দেশ | সন্দীপ ঠাকুর | ২৯০৩ |
| আন্তর্জাতিক | ... | ২৯০৬ |
| শহর কলকাতা | শ্রীপদাতিক | ২৯১১ |
| পঞ্চমী পুরাণ ( ধারাবাহিক রহস্য-গল্প ) | লীলা মজুমদার | ২৯১৪ |
| ছুঁচ কবিতা ( কবিতা ) | অরুণাচল বসু | ২৯১৭ |
| অনল আয়তী ( উপন্যাস ) | সুশীল রায় | ২৯১৮ |

শ্রী কৃষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য দুই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাশিবানন্দ।
"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমলা ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী ওঙ্কারানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না। মূল্য ১৷৷০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

অপরাজিত (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অপমানিতা | সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় | ২৯২৩ |
| দূরন্ত (দহলী ( কাহিনী বিচিত্রা ) | বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য | ২৯২৬ |
| কৃষ্ণচূড়া ( পন্যাস ) | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ২৯২৮ |
| চক্ষে আমার তৃষ্ণা | সমর বসু | ২৯৩১ |
| রঙ্গদর্শন | ... | ২৯৩৫ |
| গোবর্ধন চরিতামৃত ( রস রচনা ) | আশা দেবী | ২৯৩৯ |
| গ্রন্থমেলা | জয়ন্তী সেন | ২৯৪২ |
| রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে | শিলালি | ২৯৪৩ |
| রঙ্গজগৎ | ... | ২৯৪৫ |
| পাঠক মন | ... | ২৯৫০ |
| খেলাধূলা | শ্রীঅমিতাভ | ২৯৫১ |



# কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক )

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সকলের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা ( ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিভাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক
# বসুমতী
সম্পাদিকা - জয়ন্তী সেন

৬৮ বর্ষ, ৫২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ নঃ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

25 Naya Paisa
Thursday, 21st May 1964

## মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, না, ছাত্রবধ্যভূমি

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত আমরা মৌন নীতি অবলম্বন করেছিলাম এই কারণে যে, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির মধ্যে আকস্মিক ভুল-ত্রুটি ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর লক্ষাধিক ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানের ভুলের বোঝা যদি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা বা তার প্রতি কোনোরকম ঔদাসীন্য দেখানো অন্যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এতাবৎ কাল সুযোগ নিয়েই এসেছে, কিন্তু তার বিনিময়ে যে দায়িত্ব পালন করে আসছে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং বর্তমানে অত্যন্ত অসহনীয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেই কেবল ছাত্রদের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়, আর কর্তাব্যক্তিগণ সর্বদাই নিজেদের দায়িত্বকে হেয় জ্ঞান করেন। এ হেন প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা পরিচালনার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে কতদিন ছিনিমিনি খেলবেন, তা আজ উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাববার বিষয়।

পূর্বেক কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে যে, পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে প্রশ্নপত্রের গোপনতা রক্ষার ব্যাপারে পর্ষদ বার বার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ সাইক্লোস্টাইল কপি অর্থের বিনিময়ে বাজারে বিক্রি হয়েছে। যদিও কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই দুষ্কর্মের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়, তবু প্রশ্নপত্র বের হয়ে পড়ার প্রধান দায়িত্ব পর্ষদের কর্তৃপক্ষেরই। কিন্তু প্রশ্নপত্র বের হয়ে পড়ার মূল কারণগুলি আজো দূরীভূত হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। তাই কর্মভারগ্রস্ত পর্ষদের পরিমিত কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে বিক্ষোভ যদি ক্রমাগত দানা বাঁধতে থাকে তাহলে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু কেন এই বিক্ষোভ---মাথাভারি কর্তাব্যক্তিগণ কি এর কোনো কারণ সন্ধান করেছেন? সামান্য অর্থের লালসায় অথবা অন্য কোন্ কারণে পরীক্ষার উত্তরপত্র ছেলেদের হাতে পুনর্লিখনের জন্য তুলে দেওয়া হয়, তার পুঙখানুপুঙখ অনুসন্ধান কি তাঁরা করছেন? সর্বাপেক্ষা বড় যে ত্রুটি---তা হচ্ছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষেরই। উত্তরপত্রগুলিকে রাখার অব্যবস্থা ও দ্রুত পরীক্ষকদের কাছে না পাঠাবার অসামর্থ্যের ফলেই, উত্তরপত্রগুলি অলিন্দপথে বের হয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া আরও অনেক কেলেঙ্কারী রয়েছে। ঠোঙার বা ফুটপাথে রোলস্লিপ ও উত্তরপত্রের অংশবিশেষ পাওয়া প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হতে চলেছে। এই সব কারণে, অভিভাবকদের মনে আজ স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে যে, পর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষিত উত্তরপত্র দেখবার দাবী নিয়ে যথারীতি অর্থ জমা দিলেও সে খাতা না দেখিয়ে একটা মামুলি উত্তর দিয়ে ছাত্রদের জীবন হতাশ করে তোলা হয় কেন? অনেকের ধারণা, উত্তরপত্র লোপাট হয়ে গেলে খাতা না দেখিয়ে মামুলি উত্তর দেওয়াই হলো পর্ষদের একমাত্র উপায়। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ফেলের মাত্রা বাড়িয়ে পর্ষদ ভাবছেন, হয়তো তাঁরা যথার্থ দেশের উপকার করছেন।

সম্পাদকীয়

# আজকের মানুষ

মেঘ আর রোদ। আশংকা আর আশা। এমনিভাবেই আকাশ মেজাজ বদলায়। রঙ বদলায় দিনের। বদলায় রাজনীতির হাওয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী প্রতিনিধির পদ থেকেও তেমনই একদিন অবসর নিলেন শ্রী বি এন চক্রবর্তী। তবে স্বাভাবিকভাবে নয়। তাঁকে আসতে হ'য়েছে অসুস্থ শরীর নিয়ে। এইটেই দুঃখের। আজকের দিনে এমন অবসর ভারতের ভাগ্যের খাতায় এক ক্ষতিচিহ্ন। তবুও মেঘ কেটে গেল এক সময়। তাঁর মর্যাদার আসনে এলেন যোগ্য উত্তরনায়ক নবাব আলি ইয়ার জঙ্। বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সঞ্চয়ে আজ ভরে উঠেছে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি।

সাধারণ ঘরের সন্তান হয়েও কীর্তির সম্মান 'নবাব' উপাধি পেয়েছেন নিজামের কাছ থেকে। ভারত সরকার দিয়েছেন 'পদ্মভূষণ'। '৫৬ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের এই প্রিয় একদা উপাচার্যকে দিয়েছে সাম্মানিক ডক্টর অফ ল' উপাধি। এমনি আরও অনেক। পায়ে পায়ে সগৌরবে কীর্তির সোপান পেরিয়ে আজ নবাব আলি ইয়ার জঙ্ হায়দ্রাবাদের অন্যতম মন্ত্রীর দপ্তর থেকে পৌঁছে গেছেন সুদূর রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী ভারতীয় প্রতিনিধির দায়িত্বের আসনে। যৌবন কেটেছে অক্সফোর্ডে। সেখান থেকে ফিরে নিজামের দরবারে যোগ দিয়েছিলেন। এ সব স্বাধীনতার আগের দিনের কথা। সেখানেই প্রথম রাজনীতির মঞ্চে আলি ইয়ার প্রমাণ করলেন তাঁর যোগ্যতা। হায়দ্রাবাদের পুলিশ অভিযানের সময় তিনিই ছিলেন রাজ্যের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শাসনতন্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরের কর্মঠ মন্ত্রী। হায়দ্রাবাদ নিয়ে যখন রাষ্ট্রপুঞ্জে আলোচনা উঠল, ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের অন্যতম উপদেষ্টা হয়ে তিনিও গেলেন। এরপর যুদ্ধোত্তরকালে তিনি হয়েছেন ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের সম্মানে তখন রাজনীতির জগৎ থেকে আহ্বান আসছে অহরহ। অগত্যা '৫২ সালে তিনি যোগ দিলেন, পররাষ্ট্র দপ্তরে। এদিকে আবার উপাচার্যও রইলেন ওসমানিয়ায়। এই ভিন্নতর কর্মক্ষেত্রে সমতা রেখে চলা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থে তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতেই নামতে হ'ল একান্তভাবে। '৪৯ সাল থেকে পাঁচ বছর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সহনেতা থাকলেন। এক সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে SUNFED-এর এ্যাড হক কমিটীর চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন নবাব আলি ইয়ার। পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগ দেবার পর তাঁর প্রথম দু'বছর কেটেছে আর্জেন্টিনায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে। রাষ্ট্র-দূত হয়েই তারপর এসেছেন কায়রোয়। এ সময়ে নিঃসংশয়ে বিখ্যাত হ'য়েছেন তিনি। বান্দুং-এ ভারতের সম্মানজনক ভূমিকাও নাকি তাঁরই অবদান।

বিপদের দিনেই সত্যকার বন্ধুর পরীক্ষা, এ কথা প্রমাণ করলেন নবাব আলি। '৫৬ সালের জুলাই-এ। মিশরের ইতিহাস তখন লেখা হচ্ছে 'অগ্নি আখরে'। গোলাবৃষ্টিতে প্লাবিত পোর্ট সৈয়দ। আর সেই অশ্রান্ত ভীষণ অগ্নি-প্রবাহেও দৃঢ় সংকল্পে দাঁড়িয়ে আছেন কাণ্ডারী নাসের। আর তাঁরই পাশে তাঁরই মতন উদ্দীপ্ত অনড় আর একজন—সে-জন এই আলি ইয়ার জঙ্। কায়রোয় ভারতের রাষ্ট্রদূত, প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সবচেয়ে বিশ্বাসী সুহৃদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর একান্ত ভরসার মানুষ। অনিশ্চিত অদৃষ্টের আশংকায় সেদিন নাসের পরিবার নবাব আলি ইয়ারের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েই স্বস্তি

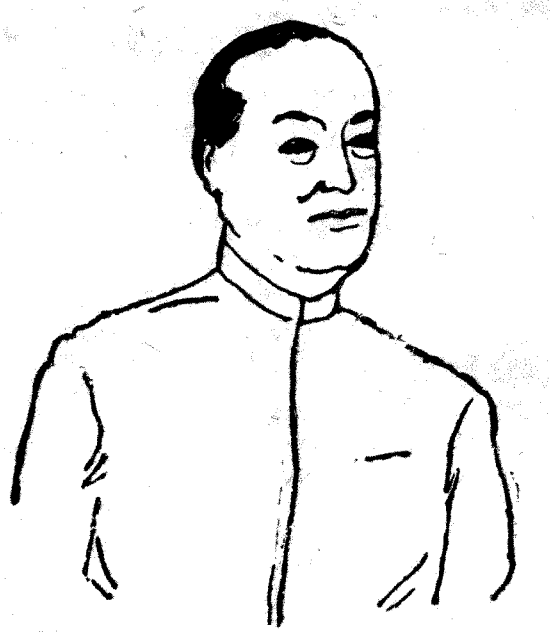

নবাব আলি ইয়ার জঙ

পেয়েছিলেন। এই দুই পরিবারের পরম ঘনিষ্ঠতার দিনেই কখন যেন ভারত আর মিশর—দুটো গোটা দেশই একে অন্যের মনের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ভারতের নিরপেক্ষ নীতির অগ্রদূত নবাব আলি ইয়ার এরপর গিয়েছেন বেলগ্রেড। সেখান থেকে রাষ্ট্রদূত হ'য়ে প্যারিসে—১৯৬১ সালে। এইভাবে ভারতের বাইরে তিনি সার্থকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন ভারতের উদার রাজনৈতিক আদর্শের মর্মবাণী, ভারতের সঙ্গে দেশ-বিদেশের আত্মীয়তার মালাকার নবাব আলি ইয়ার তাই আজ রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধির দায়িত্ব নিয়ে আমাদের আরও আশার বাতিকে তেমনই জ্বালিয়ে রাখবার অম্লান প্রতিশ্রুতি এনেছেন।

# সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

## হরপ্রসাদ মিত্র

ভালোবাসার এই 'নেশা',— এই 'চাঁদের সূতা' চোখে লাগবার বেদনা খুঁজে বেড়ায় যে-মন, দেশে দেশে মনের সেই রোমাণ্টিক সত্য বোধহয় এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু কালে-কালে তার অদৃষ্ট বদলে যায়। প্রসন্ন, নির্মল সব দিনের মিছিল এগিয়ে যায়। সেই মসৃণতায় অভ্যস্ত মনই আবার হঠাৎ একদিন শরতের প্রথম কুয়াশার আড়াল দেখতে পায়। সে-আড়াল তো মিস্ত্রালের আবেগের ঘোর নয়, সে এক ভিন্ন বৃক্ষ, ভিন্ন ফুল। সে নিঃসন্দেহে অন্য কালের স্বাদ।

আমাদের সাহিত্যে সেই ভিন্ন স্বাদেরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তারই একটি নমুনা হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ধূলিধূসর' গল্প-সংগ্রহের গল্প—'শরতের প্রথম কুয়াশা'। নায়ক নিরঞ্জন আর নায়িকা অতসী ঘোষের কথা ছিল তাতে। পরস্পরের প্রথম সান্নিধ্যে রোমাঞ্চিত এক সন্ধ্যা কাটিয়ে,—বাড়ি ফিরে শিল্পী-মনের নিগূঢ় এবং অনিবার্য সংশয়ে আচ্ছন্ন হয় নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের মনে হয় অতসী ঘোষের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যের সেই সন্ধ্যাটি যেন তার জীবনের অলৌকিক কোনো ঘটনা। কিন্তু নিজের সে-সৌভাগ্য কি নির্ভর-যোগ্য? মনে হয়, সে-সৌভাগ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা মূঢ়তা। মনে হয়, কে জানে,—হয়তো অতসী ঘোষের মনে নিরঞ্জন কেবলি তামাশার উপকরণ! ভাবতে-ভাবতে নিজের দু'হাতে মাথাটা গুঁজে রেখে নিরঞ্জন বিছানায় বসে থাকে। দুটি মাত্র নায়ক-নায়িকার সেই সমাবেশ আর সংঘাতের গল্পে অতঃপর পট-পরিবর্তন ঘটিয়ে লেখক বলেছিলেন—'অতসী ঘোষের কাছেও বিদায় নিয়ে আসা উচিত নয় কি?' এবং সে-গল্পে এইভাবে দৃশ্যান্তর ঘটিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন—অতসী ঘোষ বাড়ি ফিরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে কোল্ড-ক্রিমের পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে, ক্লান্ত চোখে নিজের প্রতি-বিম্বের দিকে তাকিয়ে বসে আছে! উচ্ছ্বসিত স্তুতির উৎস ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসার ট্রাজেডি তার জীবনে অনেকবার ঘটে গেছে। অতসী ঘোষ নিজের জীবনে আর সে-রকম ঘটনা ঘটতে দিতে চায় না। নিরঞ্জনের মোহ কাটতে দেবে না অতসী।

মিস্ত্রালের বেদনার সঙ্গে পাশা-পাশি মিলিয়ে দেখলে এ-কথা মানতেই হয় যে, অতসী-নিরঞ্জনের দৃষ্টি-বিভ্রম আর মোহ-সংরক্ষণের ব্যর্থ ব্যাকুলতার চেহারা অন্যরকম। এ আমাদের আধুনিক লক্ষণ। মিস্ত্রাল এ-রাজ্যের মানুষ নন। শরতের এই প্রথম কুয়াশার বিষাদ নেই তাঁর কাব্যে। লামার্টিন তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন যে, সে-সব রচনার তরল সুরেলা প্রবাহে পাঠকের মন মগ্ন হবার সুযোগ পায়, কিন্তু কোনোরকম মত্ততা ঘটায় না তাতে। শুধু মত্ততার কথাই নয়,—আধুনিক এই অন্যতর বিষাদের অন্ধকার দিকটাই ধর্তব্য। এবং শুধু বিষাদের কথাই নয়,—একালের সংশয় আর বিতর্ক-স্বভাবের কথাও বিবেচ্য। একালের বহুজনময় নির্জনতা আর অবসাদের দিকটাও স্মরণীয়।

যৌবন ফুরিয়ে আসার বেদনা কেবল নির্দিষ্ট কোনো কালের বা বিশেষ কোনো যুগের বিধিলিপি নয়। মানুষের এ-অভিজ্ঞতা চিরকালীন। চিরকালীন এবং অনিবার্য। যার মন আছে, তাকে এ কষ্ট পেতেই হয়। কিন্তু পৃথিবীতে মনুষ্য-সংসারের গতিবেগ এবং জটিলতা যতো বাড়তে থাকে, বোধহয় প্রসন্নতা ততোই কমতে থাকে। বিষাদকে তখন আর সূর্যকরোজ্জ্বল কোনো দৃশ্যের দিগন্ত বলে মনে হয় না,—হয়তো বিষাদ তখন আর শরতের কুয়াশা হয়ে থাকতেও নারাজ। তখন-কার বিষাদ বোধহয় গুহা-গহ্বর, হয়তো আরো সমর্থ কোনো রূপকে প্রকাশ্য,—সে হয়তো কোনো গভীরতর ব্যবধান।

বিষাদের বিপরীত অন্য যে-কারণে মন প্রসন্ন হয়, তারই নাম শুভ-বিশ্বাস! মিস্ত্রালের মনে সেই বিশ্বাস ছিল—কবিত্বে বিশ্বাস, মানুষে বিশ্বাস, মানুষের প্রেমে বিশ্বাস। তাঁর দেশপ্রেমও সেই বিশ্বাসের উদাহরণ। অন্য কোনো সম্মানের লোভে তিনি নিজের সেই আত্মস্থতা হারান নি। এবং এই দিকটি ভেবে দেখতে গেলে মনে পড়ে, একবার তাঁকে ফরাসী-আকাদেমীর এক 'চেয়ার' নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সে-পদে যোগ দিলে তাঁকে তাঁর প্রিয় বাসভূমি প্রভেন্স ছাড়তে হবে,—এই আশঙ্কা-তেই তিনি সে-সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন।

এ তাঁর গোঁড়ামি নয়। এও তাঁর অকৃত্রিম স্বভাব।

অথচ, ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতে তখন অন্য হাওয়া ছিল,—ছিল অন্য মেজাজের কবিতা। বদ্‌লেয়ার ছিলেন; সুলি-প্রুধোম ছিলেন। তিনিও নোবেল-পুরস্কার পেয়েছেন। মিস্ত্রালের চেয়ে বয়সে তিনি ন'বছর ছোটো। তাঁর জন্ম হয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে। ১৯০৭-এর ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি

লোকান্তরিত হন। তাঁর কবিতায় একদিকে বিশেষ বিশেষ কোমল অনুভূতির ঢেউ, অন্যদিকে গুরুগম্ভীর বিতর্কবুদ্ধির আঘাত। একদিকে স্নিগ্ধ আস্বাদন, অন্যদিকে জটিল জিজ্ঞাসা।

গণিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর মন ছিল দর্শনঘেঁষা। আবার, সূক্ষ্ম এক-একটি অনুভূতির কাব্যরূপ নির্মাণেও তাঁর ধৈর্য ছিল,—ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ। ১৮৬৬তে তিনি অংশত লুক্রেশিয়াসের ফরাসী-অনুবাদ ছেপে বার করেন। তার আগে ১৮৬৫-তে বেরিয়েছে তাঁর 'Stances et poemes'। ১৮৬৯-এ বেরোয় 'Les Solitudes',— তার ছ'বছর পরে ১৮৭৫-এ 'Les Vaines Tendresses',—১৮৭৮-এ 'La Justice',—দশ বছর পরে ১৮৮৮তে বেরোয় 'Le Bonheur'। তিনি যে সে-কালের অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি গদ্যপ্রিয় বা গদ্য-খেয়ালী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। চিত্রকর্মে, সংগীতধর্মে,—দু'দিকের দুই আকর্ষণেই তাঁর লেখাগুলি বেশ সমৃদ্ধ বলে শোনা যায়।

সুলি-প্রুধোমের চেয়ে সেকালের ফরাসী-সাহিত্যের নাম-করা কবি ছিলেন Francois Coppe'e (১৮৪২-১৯০৮)। সমকালীন অন্যান্য গৌণ কবিদের মধ্যে ছিলেন মাদাম লুই আকারম্যান (১৮১৩-৯০),—ছিলেন লুই বুইলে Louis Bouilhet (১৮২১-৬৯)। কিন্তু সেসব কথা থাক।—এখানে মিস্ত্রালের আত্মস্থতা আর অকৃত্রিম মৌলিকতার দিকটিই প্রাসঙ্গিক। সুলি-প্রুধোমের মতন সংঘর্ষময় নয় তাঁর মন। রূপানুরাগী মানুষ তিনি। 'মিরিয়ো' কাব্যের এক জায়গায় তিনি যা বলেছেন, ভাবানুবাদে সে কতকটা এইরকম দাঁড়ায়—

মাঠ থেকে জলপাই তোলা হয়েছে প্রচুর—
তার সোনার তেলে মাটির কলসীগুলি
টইটম্বুর;
অস্থির সেই ফসলের ভারে
প্রকাণ্ড ঠেলাগাড়িটা যখন দুলছে,
আর, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে
চলেছে মাঠে মাঠে,
গলিতে গলিতে—

ঠিক সেই সময়েই

খোলা গায়ে মজবুত শরীরে
এসে দাঁড়ায় 'বাকস্'
নৃত্যোৎসবের নেতা সেই দেবতা।

মিস্ত্রাল এই পূর্ণশস্যের অভিনন্দনের কবি। এই শস্যসম্ভারের মধ্যেই তিনি দেখেছেন নেপথ্যে নিহিত গুটিপোকার সক্রিয়তা। তারা সুখে স্তব্ধ হয়ে রেশমের তাঁত বুনছে যেন। তারাই

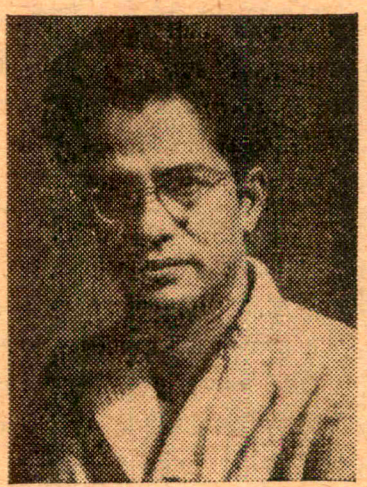

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কি সত্যেন দত্তের 'তুঁতপোকা'? উজ্জ্বল রোদে লক্ষ-লক্ষ তুঁতপোকার সেই ঘুম আর জাগরণ,—সেই সোনার রেশম বুনে তোলার নৈসর্গিক বিস্ময় দেখে-দেখে সুখী হয়েছিলেন তিনি। আর, তাঁরই সেই সুখের অংশীদার হয়ে, বাংলা দেশের কবি সত্যেন্দ্রনাথ বোধহয় কেবল মিস্ত্রালের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি; মিস্ত্রালের রূপকথা-প্রীতি তাঁর স্বভাবে আশ্রয় পেয়েছিল। বোধহয়, এই রকম আত্মিক যোগ,—এবং আবেগ ও মনোগঠনের সাদৃশ্যের ফলেই সত্যেন দত্তের বাংলা কবিতায় মাঝে মাঝে সেই 'স্বপ্নরস' দেখা দিয়ে গেছে যার সঙ্গে মিস্ত্রালের যোগ বা সম্পর্কের স্মৃতি অচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। 'ফুলের ফসল' অবিশ্যি সত্যেন দত্তের অনুবাদ-কবিতা নয়। কিন্তু নিচের এই লাইনগুলিতে মিস্ত্রালের তুঁতপোকা বা চাঁদনী রাত একেবারেই কোনো ছায়া ফেলে নি ভাবতে মন কুণ্ঠিত হয়। 'ফুলের ফসলে' তিনি লিখেছিলেন—

এক যে আছে কুজ্‌ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে।
মন্ত্র পড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক-পোকার জেল্লা
মন্ত্র পড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে।

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার
জানলাতে দেয় পর্দা,
হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
রাত্রিগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে!

করুণানিধানের 'স্বপ্নরস' অন্য জিনিস। মোহিতলাল তাঁরই কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে এ-শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু সত্যেন দত্তের এ স্বপ্নসামর্থ্য এক বিশিষ্ট লক্ষণ। বাংলা কবিতায় সে-যুগে এ রকম 'স্বপ্নরস' সত্যিই তুলনারহিত।

মিস্ত্রালের সঙ্গে সুলি-প্রুধোমের মেজাজের পার্থক্য দেখাতে গেলে অনেক উদাহরণ তুলতে হবে। সে রীতিমত প্রবন্ধের কাজ,—যুক্তি-তর্ক-উদ্ধৃতি-বিশ্লেষণের গুরুগম্ভীর আয়োজনসাপেক্ষ ব্যাপার। সে-দায়িত্ব যোগ্যতর অনুরাগীর জন্যে রেখে যাওয়াই ভাল। এখানকার সুখ শুধু হালকা ভ্রমণের সুখ। 'শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া'। অতএব আসল কথাটাই সংক্ষেপে বলতে চাই। সুলি-প্রুধোমের গভীর দার্শনিক মনের সংঘাত-চেতনা তাঁর একটি কবিতার অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমার নজরে পড়েছিল। বাংলায় তার ভাবানুবাদ কতকটা এই রকম—

সন্দেহ বার বার ফিরে আসে।
বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে প্রতি রাত্রে
যুদ্ধ করি দুর্জ্ঞেয় সেই দৈত্যের সঙ্গে।
নিঃসঙ্গতার মধ্যে বিনিদ্র আমার চেতনায়
সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
আমার সমস্ত আশাকে সে বিদ্রূপ করে।
আলো নিভে যাওয়া স্থির যন্ত্রণার মধ্যে
অজানার সঙ্গে যুযুৎসু চলে আমার।
রাত যেন হ্রস্বও নয়, দীর্ঘও নয়।
আমার দুঃখের শীর্ণ বিছানা যেন
মৃত্যুর কঠিন দেয়ালে-ঘেরা কবর।
প্রদীপ হাতে নিয়ে আমার মা আসেন কখনো
আমার ভেজা কপালে তখন কালঘাম।
মা জিগেস করেন—বাবা, কি
হয়েছে তোর?
আমার বুকের কাঁপুনি আর
কপালের জ্বালার মধ্যে বলি:
'মা গো, ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর লড়াই
হল আমার।'

স্থলি-প্রুধোমের এই গভীর লড়াই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন্ কোন্ ঘটনার সাক্ষাৎ বা তির্যক ফল, সে-গবেষণা তুচ্ছ নয়,—কিন্তু সেও অন্য আয়োজন। মূলের ইংরেজি অনুবাদে আছে 'sphinx', আমি তার বাংলা করেছি 'দুর্জ্ঞেয় দৈত্য'। স্থলি-প্রুধোমের মূল রচনা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এসব তথ্য আরো বিশদভাবে আলোচনা করে দেখাতে পারেন। কেন যে sphinx আর God,—দৈত্য আর ঈশ্বর তাঁর মনে একই প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে-দর্শন অন্যত্র বিচার্য। আমি মিত্রালের সঙ্গে তাঁর মেজাজের প্রভেদের কথা বলতে গিয়ে স্থলি-প্রুধোমের এই অদ্ভুত অন্তর-সংঘাতের কালঘামে এসে পৌঁছলুম।

এ অন্ধকার দুঃসহ। এ যুদ্ধ ভয়ংকর। মনে পড়ছে মানুষের এই মানসিক যুদ্ধের কথা আমাদের রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। কিন্তু তার স্বাদ অন্যরকম। 'বলাকা'র বিয়াল্লিশ নম্বর কবিতা মনে পড়ে—

'সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত—
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
—দুঃস্বপ্নের মতো।' কিন্তু সে তো দৈত্যে-ঈশ্বরে এক-হয়ে-যাওয়া দেয়াল নয়। হয়তো সেও এই একই প্রতিপক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষে তার চেহারা আরো কোমল,—তার সহিষ্ণুতা মানব-মনের আরো অনুকূল। তাকে নিঃসন্দেহে বলা যায়—

তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব
তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

এবং তারপর—

অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।

স্থলি-প্রুধোমের আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র বিয়াল্লিশ নম্বর কবিতার যুদ্ধকথার এই সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের ভাবনা নিতান্তই আনুষঙ্গিক। এ-বিষয়ে কথা বাড়াবার দরকার নেই। মিত্রালের তুঁতপোকার রেশম-বোনা আর চাঁদনীরাতের চাষ ছিল অন্য জগৎ। সেখান থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলুম স্থলি-প্রুধোমের ভয়াবহ নৈশ জগতে। রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন। তাঁরই কয়েক ছত্র অবলম্বন করে আমি অন্য অন্ধকারে এসে অন্য নিঃসঙ্গতার নির্ভর পেলুম। সেই নৈশ পরিবেশ আমাকে অন্য এক স্মৃতির ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। সে-স্মৃতিও দেখে যাওয়া যাক। তাতে মন হয়তো তৃপ্তি পাবে, হয়তো কিঞ্চিৎ বিরতি বোধ করবে।

ভুবনেশ্বরে একান্ত মার্গ ধরে এগিয়ে চলেছিল রিক্সা। দণ্ডপাত, পাখি, মোহান্তি—পর পর এইসব উপাধি-নামের ফলক দেখেছিলুম পরিচ্ছন্ন এক-একটি বাড়ির ফটকে। ঝিঙেফুলের হলুদ তারা ফুটেছে সবুজ লতায় ঢাকা


# রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

শেক্সপীয়র সংখ্যা

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

সম্পাদক ঃ ধীরেন দেবনাথ

এতে লিখেছেন: হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা চার টাকা।

বার্ষিক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

খুচরা বিক্রয়ের কেন্দ্র: বিভিন্ন পত্রিকা স্টল এবং
পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিমিটেড,
১২/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

মাটির কুঁড়ের বেড়াতে বেড়াতে যেতে। যেতে ডান দিকে ফিরতে হয়েছিল। রিক্সা চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে পড়েছিল নারায়ণ। সে বললে, ঐ দেখুন 'এগ্রিকালচারাল কলেজ'। বেশ মনে আছে, সে 'এগ্রিকালচার' বলেছিল। কিন্তু 'কালচার' অংশের ওপরেই জোর দিয়ে। ইংরেজি উচ্চারণে তার জিবের কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। ডান দিকে মোড় ফিরলো। বাঁয়ে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—ঐ যে বিজু পট্টনায়কের বাড়ি। নারায়ণের ভাষায় সে বাড়ি 'প্রাইভেট' 'রিজার্ভ'—অর্থাৎ বিজয় পট্টনায়ক মহাশয়ের নিজের বাড়ি,—মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাড়ি নয়।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। এরো-ড্রোমের উঁচু স্তম্ভে লাল আলো জ্বলছিল। 'কণ্ট্রোল আপিসে'র হাতায় বেতারের উঁচু দৈত্যের মতন বিশাল কটা লোহার স্তম্ভের মাথায় মাথায় আলো জ্বলে উঠেছিল। হাওড়া-মাদ্রাজ রেল লাইন পেরিয়ে পুরোনো ভুবনেশ্বরের ম্লান অবসন্ন সন্ধ্যায় এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একবার পিছন দিকে আঙুল বাড়িয়ে,—মুখ ফিরিয়ে সে বলেছিল,—ঐ দেখুন ওড়িশার নতুন রাজধানী।

আমরা সে পথ পেরিয়ে এসেছিলুম। গবর্নরের বাড়ি, সেক্রেটারিয়েট, অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের আপিস-বাড়ি,—রাজপথ, জনপথ,—খণ্ডগিরি মার্গ, একাম্র মার্গ—নিয়নে এবং সাধারণ-অসাধারণ নানারকম আলোতে আলোতে, লালে, নীলে, পীতাভ শাদায়, সে-রাত্রে সমস্ত ভুবনেশ্বর যেন ঝকমক করছিল।

সেদিন বিকেলে,—আমার সেই সান্ধ্যভ্রমণের একটু আগেই উদয়-গিরির রাণীগুম্ফার প্রাচীন চত্বরে পাথরের বেঞ্চে বসে নির্জনতার আর এক রূপ দেখতে দেখতে মালতীর গন্ধে মনে পড়েছিল অনেকদিন আগেকার এক সন্ধ্যা। মনে হয়েছিল এ জগতে মাত্র একটি লোকের সামান্য কয়েক বছরের আয়ুর মাপে রাণীগুম্ফার বয়সের হিসেব হয় না।

সেখানে গরু চরছিল তখন। উদয়গিরির সেই চবুতর থেকে নেমে খণ্ডগিরির আদিনাথ জৈন মন্দিরে,—পার্শ্বনাথের চকচকে কালো পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে,—সময়ের সুদীর্ঘ ধারার ধ্যান মনে এসেছিল।

তেমনি আবার সেই অমাবস্যার রাত্রে, কেশরী বংশের আশ্চর্য কীর্তির নমুনা সেই একশ' সাতাশ ফুট উঁচু ভুবনেশ্বর মন্দিরে, নিশা-পার্বতীর পাথরের গায়ে পাথরের কাপড় আর পাথরের গহনার কারুকার্য দেখতে-দেখতে,—কী যেন মনে হয়েছিল হঠাৎ। দেখেছিলুম কালো পাথরে কোঁদা রমণীর সুঠাম মূর্তি,—দেখেছিলুম তার বসনের শিল্পকর্ম। কালাপাহাড়ের হাত পড়েছিল ঐ কালো কষ্টির গায়ে। নাকের টিকলতা নেই, ভোঁতা হয়ে গেছে। ডান হাতটা কনুই থেকে নিরুদ্দেশ, পীন-কঠিন স্তন,—দেহের ভঙ্গি ঋজু, কোমল মনোহারী। কটিদেশে অলঙ্কারের লীলা। নিশা-পার্বতীর গায়ে হাত দিয়ে শিল্পের গৌরব দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল আমার পাণ্ডাজী গদাধর। সেকথা মনে পড়েছিল সূর্যনারায়ণ মূর্তির হাসি দেখতে দেখতে।

চত্বরের মাঝখানেই ছোটো একটা চৌবাচ্চার মতন নিচু জায়গা। তাতে দুহাতে দুই পদ্ম ধারণ করে কালা-পাহাড়ের হাতে প্রহৃত, নাকভাঙা সূর্যনারায়ণ হাসছিলেন। ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গিটি যেমন কোমল, তেমনি প্রসন্ন। যেন বালগোপাল। মূর্তির সামনে সেই চৌবাচ্চার নিচে সতেজ, সবুজ দুটি চারাগাছ—একটি তুলসী, অন্যটি কী যেন। তারই নাম 'কল্পবৃক্ষ'। গদাধর বলেছিল, 'বাবু, যা বাঞ্ছা আছে তা জানান এই সূর্যনারায়ণকে। এখানে যা চাইবেন, তাই পাবেন।'

কিছু কি চেয়েছিলুম? না। চেয়ে, পেয়ে, না-চেয়ে, না-পেয়ে জীবনের ধারা সব ক্ষেত্রেই সমান ব্যাহত, সমান অনিবার্য। না, আমার কিছুই চাইবার ছিল না। আমি গদাধরের সঙ্গে অমাবস্যার সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় ভুবনেশ্বর মন্দিরের আকাশ-স্পর্শী, বিশাল তুঙ্গতা দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম। আকাশ পরিষ্কার ছিল। সপ্তর্ষির চেউটা গড়িয়ে পড়েছিল মন্দিরের চূড়োর ওপাশ থেকে ডান দিক ঘেঁষে। একসঙ্গে আরো অনেক ঝকঝকে নক্ষত্রের আলো জ্বলছিল আকাশে। গদাধর আমাকে অনেক কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছিল। মন্দিরের গায়ে হাতীর মাথায় সিংহ আছে কেন,—কেন জগন্নাথ ভুবনেশ্বর থেকে পুরীতে চলে গেলেন—দেবতাদের একরাত্রে বিশ্বকর্মা একটি-কম সওয়া লক্ষ মন্দির গড়ে দেন কেন,—এবং লোকনাথের মন্দির বাদ পড়েছিল বলে জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্রে যান কবে,—কবে কেশরী-বংশ বিদ্যমান ছিল ইত্যাদি নানা কথা শোনাতে চেয়েছিল সে।

আমি শুনেওছিলুম, ঘুরতে-ঘুরতে দেখেওছিলুম সবই। কিন্তু জগমোহন নয়, নাটমণ্ডপ নয়, অসংখ্য শিবলিঙ্গও নয়,—আমি সমস্ত মন দিয়ে দেখেছিলুম আমলক আর কলস থেকে নিচে নেমে আসা সুদীর্ঘ খাঁজগুলি। ভুবনেশ্বর যে একাধারে লিঙ্গ এবং হরিহর, পিছল পাথরে দাঁড়িয়ে এই রকম কী যেন ব্যাখ্যা করছিল গদাধর। কে একটি মেয়ে ফানেলের মতন লম্বা একটা পাতার ঠোঙায় ফুল নিয়ে, একটা নারকেলের জল ঢেলে পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করে পূজো দিচ্ছিল তখন। অনেক অন্ধকার সিঁড়ি পেরিয়েছিলুম। অনেক পাথরের কক্ষে কোটরে গুহায় গুম্ফায় আমার মন ঘুরেছিল। নৃসিংহের কোলে মহালক্ষ্মীকেও দেখেছিলুম। পাথরের নর্তকীরা আমার অনেক সময় নিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সেদিন আমাকে আকর্ষণ করেছিল দুটি বস্তু—নিশা-পার্বতীর রূপ আর প্রধান মন্দিরের বিশালতা। আর, সেই সঙ্গে হঠাৎ সেই অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র এই বিয়াল্লিশ নম্বর কবিতার ক'টি লাইন মনে এসেছিল—

'যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ
নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।'

(ক্রমশঃ)

# ভারত দর্শন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদানের জন্য বোম্বাইয়ে সমাগত শ্রীনেহরু ও শ্রীকামরাজ নাদার প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

## রাজধানী :

পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশন শেষ হয়েছে। কংগ্রেসের ছোট-বড় নেতা, প্রধানমন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রীদের অনেকেই গিয়েছেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদানের জন্য বোম্বাই শহরে। বাকী যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও বেরিয়ে পড়েছেন যে যাঁর কাজে। দিল্লী শহর এখন ফাঁকা। শেখ আবদুল্লা ফিরে যাওয়ায় রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনার উত্তাপও অনেকটা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে।

জাতির বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার সঙ্গে আর্থিক সমস্যাদির আলোচনার চাইতে এবারের দীর্ঘতম বাজেট অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার পর থেকে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতিক্রিয়াই অধিক স্থান পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর ওপর অমানুষিক নিপীড়ন, উদ্বাস্তু সমস্যা, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে উত্তেজনা, কাশ্মীর, পাক-ভারত সম্পর্ক, জাকার্তা সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা, চীন-ভারত সীমানা-বিরোধ প্রভৃতি পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিল। প্রধান-মন্ত্রীর অসুস্থতার জন্য কাশ্মীরের মত দুরূহ সমস্যা এবং বৈদেশিক বিষয়ের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্যের ব্যাপারে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপরিমেয় ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন দপ্তরবিহীন-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু খুবই দ্রুত হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে তিনি এবারে কোন দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ না রেখে পার্লামেণ্টে তুলে ধরেছেন, একটা সুসংহত রাষ্ট্রনীতির পরিষ্কার ছবি। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই শেখ আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর আলোচনার গতিধারা বোঝা সহজ হবে অনেকটা। গতানুগতিকতাকে ঠেলে পেছনে রেখে তিনি যেন এবারে সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞের মত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে চাইছেন। তাই তিনি প্রতিবেশী শত্রু-মনোভাবাপন্ন ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামলাবার কথাও ভাবছেন। এমন কি, দু'টি দেশের মধ্যে ভবিষ্যতে কিছুটা সাংবিধানিক যোগাযোগের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। কাশ্মীর সম্বন্ধেও সকল সংশয়ের নিরসন করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পার্লামেণ্টকে না জানিয়ে কিছুই করা হবে না।

* * *

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনে পাক-ভারত স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলন পরিচালনায় শ্রীগুলজারীলাল নন্দও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। নেহরু-আবদুল্লা আলোচনার প্রাক্কালে শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর মুখে ভারতের নীতি ঘোষণার গুরুত্বও কম নয়। এই ঘোষণায় একদিকে যেমন পরিষ্কার হয়েছে আলোচনার আওতার একটা পরিমাপ, অপরদিকে কাশ্মীরের ব্যাপারে কৃষ্ণমাচারীর উদার মনোভাব সম্পর্কিত গুজবেরও হয়েছে অবসান। বাজেট অধিবেশন সুরু হয়েছিল ১০ই

ফেব্রুয়ারী। সে সময়ে আলোচনা চলছিল কাশ্মীর নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে। শেখজী ছিলেন তখন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। এখনও নিরাপত্তা পরিষদে 'কাশ্মীর' নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলেছে। শেখ আয়োজন করছেন পাকিস্তানে পাড়ি দেবার। তিনি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ফরমূলাও নাকি পেয়েছেন। আয়ুবকে দিয়ে তা' যাচাই করাই তাঁর কাম্য। তিনি যাই করুন না কেন, পার্লামেণ্টের অধিবেশনে ও বাইরে এবং নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য শ্রীচাগলা এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ দৃঢ়তার সঙ্গেই বারবার ঘোষণা করেছেন। এজন্য শেখ সাহেব শ্রীনেহরু ছাড়া অন্য মন্ত্রীদের সম্পর্কে বক্রোক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। শেখ সাহেব যেন ভুলে না যান, ব্যক্তির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমায়িত। অক্ষমতার অবশ্য সীমা-পরিসীমা নেই। সীমায়িত ক্ষমতার বাইরে গেলেই নেমে আসবে ট্র্যাজেডি---ক্ষুধিত পাষাণের চারদিকে তখন তিনি বৃথাই পাগলা মেহের আলীর মত মাথা ঠুকবেন আর বলবেন, 'সব ঝুটা হ্যায়। পাকিস্তানের ভিত্তি ঝুটার ওপর। সেই ঝুটাকে সাচ্চার পরিণত করতে গিয়ে পাকিস্তানের ধুরন্ধর অনেক মিঞাকেই রাজনীতি থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে। তাদের তুলনায় শেখজী চুনোপুঁটি মাত্র।

* * *

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের পথ থেকে সরে গিয়ে বাজেটের নয়া কাঠামো দেবার ইচ্ছে করলেও শ্রীকৃষ্ণমাচারী আশানুরূপ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। বিদেশী মূলধন ও ব্যক্তিগত মালিকানাকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিবাদে সমালোচনার তীব্র বাক্যবাণের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। চতুর যোদ্ধার মত তিনিই শেষের দিকে ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসার উপর আক্রমণ

● শ্রীকৃষ্ণমাচারী

চালিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের নিক্ষিপ্ত বাক্য-বাণকে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন।

মহলানবীশ কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় অর্থমন্ত্রী আরও কঠোর আঘাতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

* * *

এই অধিবেশনে বিতর্কমূলক সাংবিধানিক আলোচনায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন। উত্তর প্রদেশের

● শ্রীঅশোক সেন

বিধানসভা ও আদালতের এক্তিয়ার সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি আদালত, বিধানসভা এবং প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষমতা ও কাজের বিশ্লেষণে বিশেষ দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার পরই এ নিয়ে উত্তাল তরঙ্গের যে সৃষ্টি হয়েছিল, তা' কিছুটা প্রশমিত হয়। বিষয়টি এখন সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনাধীনে আছে।

* * *

একমাত্র জনসঙ্ঘ ছাড়া অপর বিরোধী দলগুলো আভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য এবারে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশনে তেমন কোন জোরদার ভূমিকা নিতে পারে নি। কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল কার্যত তিন ভাগে বিভক্ত। কাশ্মীর ও অন্যান্য প্রশ্নে শ্রীমাসানী ও মহারাণী গায়ত্রী দেবীর মধ্যেও বিরোধ চলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির আইনসভার নেতার আসন নিয়েই এখন অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জনসঙ্ঘ এই মওকায় কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছে।

**মহাশূর :**

হিন্দুস্থান বিমান কারখানার নির্মিত প্রথম সুপারসনিক জঙ্গী বিমান "মারুত" সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ইতিহাসে এই দিনটির গুরুত্ব সমধিক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, এইচ এফ-২৪ জঙ্গী বিমানের নির্মাণ থেকেই বোঝা যায় জাতি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কতটা সচেতন। বিদেশ থেকে বিমান আমদানী করেই ভারত ক্ষান্ত থাকবে না, দেশের প্রতিভা ও শক্তিকে এ কাজে লাগানো হবে পুরোমাত্রায়। এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই দেশ নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত প্রতিভার এইরূপ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় নি।

শ্রীচ্যবন ঠিকই বলেছেন সুযোগ-সুবিধা ও সঠিক সহযোগিতা পেলে গর্ব

করবার মত কৃতিত্ব প্রদর্শনে ভারতীয় কারিগর সর্বদাই সক্ষম। শব্দের চাইতে অধিক গতি সম্পন্ন এই জঙ্গী বিমানের মক্সা, কাঠামো, উৎপাদন-কৌশল সবটাই ভারতের নিজস্ব। এই বিমান প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা এনে দিয়েছে।

চীনের ভারত আক্রমণের পর আমরা সুপারসনিক বিমানের জন্য বারবার আবেদন-নিবেদন পেশ করেছি মার্কিন মুল্লুকের বন্ধুদের কাছে। তাঁরা পাকিস্তানের প্রতি করুণা বর্ষণ করে অকাতরে জেট সরবরাহ করলেও নানা টালবাহানা করে আমাদের জেট বিমান আজও দেন নি। যুদ্ধ বিমান মহড়ায় প্রমাণিত হয়েছে আমাদের বিমান বহর শক্তিশালী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক।

রাশিয়া মিগ বিমান নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেও, এখনও কারখানার পুরা পত্তন সম্ভব হয় নি। এই অবস্থায় হিন্দুস্থান বিমান কারখানার প্রচেষ্টা ও সাফল্যে আমরা গর্ববোধ না করে পারি নে।

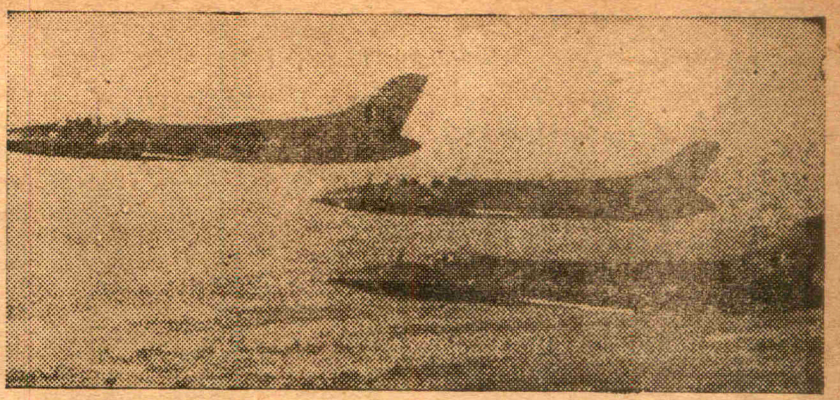

● ভারতে নির্মিত জঙ্গী বিমান "মারুত"

## উত্তর প্রদেশ ঃ

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ডে কামরাজ পরিকল্পনায় গদীচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত জয়ী হয়েছেন। শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীকে সাত ভোটে হারিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভোটের ফলাফলই প্রমাণ করে, লড়াইটা বেশ জোরদারই হয়েছিল। দু'দলই চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি করে নি। ভাব-ভঙ্গী দেখে উত্তর প্রদেশের পুলিশ বাহিনী পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। সহ-সভাপতির চারটি আসনে চন্দ্রভান গুপ্তের দলের একমাত্র শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ভিন্ন আর কেউ নির্বাচিত হতে পারেন নি।

নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই রিটার্নিং অফিসার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন। খেয়োখেয়ির পালাটা জমে উঠছে আরও বেশি করে। এই অভিযোগের প্রতিকার না হলে আদালতের আশ্রয় নেবার হুমকি দেখাচ্ছেন শ্রীগুপ্তের বিরুদ্ধ দল।

কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দলের অবসান ঘটিয়ে, কংগ্রেসকে কেন্দমুক্ত করে ঢেলে সাজাবার জন্যই কামরাজ পরিকল্পনার প্রবর্তন। শ্রীকামরাজ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতির আসনে আসীন থাকাকালেই দেখছি, কংগ্রেসের উপদলীয় সংঘাতটা আরও যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসে একাংশ অপরাংশের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগ তুলেছেন। দেখা যাচ্ছে, কামরাজ পরিকল্পনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে রূপ দেওয়ার চাইতে তাকে নস্যাৎ করবার দিকেই কংগ্রেসের একদল নেতার ঝোঁকটা বেশি।

● শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত

এই পরিকল্পনা গ্রহণের সময়েই আমরা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলাম—নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে একে রূপায়ণের কাজে কংগ্রেস-কর্মীরা একযোগে এগিয়ে না এলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সময়ের চক্রাকারে পরিবর্তনের চিরন্তন নিয়মের কথা যেন কংগ্রেস নেতৃবর্গ ভুলে না যান। শেষে ভুলের মাশুল জোগাবার সময়ও পাবেন না। কামরাজ পরিকল্পনাকে নিজেদের কার্যকলাপে প্রহসনে পরিণত করা মানেই কংগ্রেসকে আরও দুর্বল করে দেওয়া। কংগ্রেস দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কংগ্রেসের শক্তি হ্রাসে যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের কেউ ক্ষমা করবে না।

## মহারাষ্ট্র ঃ

নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছে বোম্বাই শহরে। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কংগ্রেস

সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ প্রথম সারির কংগ্রেসের নেতা থেকে সুরু করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কংগ্রেস কর্মীরাও এসেছেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে। বোম্বাই শহর জমজমাট---চাঁদের হাট বসেছে।

আলোচনা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ণের ব্যাপারে ডেবর-কমিটীর রিপোর্ট নিয়ে, কামরাজ পরিকল্পনা, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সংশোধন, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, মাদক দ্রব্য বর্জনের নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি বর্তমানের সমস্যাদির সমাধান নিয়ে। অধিবেশনের আনাচে-কানাচে ঘুরে ফিরে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যদের ভোটাধিকার সংকোচনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ ভিন্ন নতুন কিছু নজরে পড়লো না। এখন থেকে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যগণের কেবল ব্লক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার থাকবে। প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রী এস কে পাতিল আশা করেন, কংগ্রেসের সংবিধানের এই সংশোধনের পর ভুয়ো সদস্যগণ বিতাড়িত হবেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যালঘুদের প্রতি পাকিস্তানের সহৃদয়তার আশা পোষণ, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি প্রস্তাবগুলোতে ভাল ভাল কথা অনেক চয়ন করে সাজানো হয়েছে। এতে নতুনত্বের তেমন কিছু নেই। কংগ্রেসের গেল সতের বছরের অধিবেশনের ধারাবিবরণী আলোচনা করলে দেখা যাবে এই সব কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও অনেকবার বলা হয়েছে। তবে, শ্রীমহাবীর ত্যাগী একটু নতুন কথা শুনিয়েছেন। সরকারের গদীতে বসে তিনিই বোধহয় প্রথম পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উপযোগী জমি আদায়ের জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ দেবার কথাটা বললেন। তা' ছাড়া, কোন ব্যবস্থা না করেই দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের এনে ফেলার কথাটা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

মোরারজী ভাইকে কিছুটা কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন শ্রী এস এন মিশ্র। শ্রীদেশাই সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করে সাম্প্রতিক হাঙ্গামাকালে কংগ্রেস সদস্যগণ দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের জন্য কতটা কি করেছেন,

শ্রীমোরারজী দেশাই

ভেবে দেখতে বলেন। সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী দেওয়ার জন্য যে-সকল কংগ্রেস সদস্য দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কর্মকর্তারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি না শ্রীমিশ্র জানতে চান এবং বলেন, কে কে এ ব্যাপারে অপরাধী তাঁদের শ্রীদেশাই চেনেন? মোরারজী ভাই তখন কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে যান।

শ্রীমিশ্র যা' বলেছেন তা' উড়িয়ে দেবার নয়। তাঁর কথার ভেতর দিয়ে এটিই প্রমাণ হচ্ছে, কংগ্রেস বৈপ্লবিক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঠিকই; কিন্তু চলে গতানুগতিক পথে---বৈপ্লবিক চিন্তাকে কাজে লাগাবার, তার সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংশয়যুক্ত কুণ্ঠিত পদক্ষেপ। সাধু সঙ্কল্প গ্রহণে এবং সেই সঙ্কল্পে অটুট থাকার শপথবাক্য পাঠে আমাদের নেতাদের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজে নামতে গেলেই যত বিড়ম্বনা দেখা দেয়। তখন তাদের গতি হয় শম্বুকের মত ধীর, মন্থর।

কামরাজ পরিকল্পনা গ্রহণ, ভুবনেশ্বরে বসে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সঙ্কল্প পাঠের পর দ্বিধাজড়িত পদচালনা না হলে এ নিয়ে ডেবর-কমিটি নিয়োগের প্রয়োজন হত না। শ্রী ইউ এন ডেবরকে তাঁর সুপারিশের মর্মকথা ব্যাখ্যা করে সদস্যদের কাছে পেশ করতে সময় লেগেছে তিনটি ঘণ্টা পুরোপুরি। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি পুরানো বস্তা-পচা মাল নতুন মোড়কে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। সর্দার শরণ সিং, ডাঃ রামসুভাগ সিং, শ্রীপাতিল, শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়ক ভিন্ন আর কেউ এ আলোচনায় বোধ হয় এই জন্যই অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। শ্রীডেবরের কথার ভেতরেও ধ্বনিত হচ্ছে সেই কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ।

শ্রীডেবরের সুপারিশের ৩৫টি পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটি জায়গায়ও নতুন চিন্তাধারার কোন কথা পাবেন না। তিনি কুল ও মান দুই রক্ষা করতে গিয়ে আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পুরানো অস্পষ্ট কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। তাঁর মতে আদর্শের কোথাও খুঁত নেই ---পরিকল্পিত অর্থনীতিও বিলকুল ঠিক আছে। যত দোষ ঐ নন্দ-ঘোষের---প্রশাসনিক ব্যবস্থার। তাঁর রিপোর্টে তিনি মূল কথাটাকেই বেমালুম এড়িয়ে গেছেন। কংগ্রেসের অনুসৃত অর্থনীতি দেশের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে বলেই

ভুবনেশ্বরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা উঠেছিল। তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, ভুবনেশ্বরের প্রস্তাবকে কি ভাবে রূপ দেওয়া যায় তার পথ নির্দেশের জন্যই কমিটীর প্রয়োজন হয়েছিল। তা না হলে তিনি পলেস্তারার কাজে মন না দিয়ে সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এমনি করে জোড়া-তালি দিয়ে বেশি দিন চালানো যাবে না। মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। ভুবনেশ্বরের পরও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিয়েছে খাদ্য সঙ্কট, মুনাফাখোর ও কালো-বাজারীরা নির্বিবাদে মুনাফা লুঠছে, বেড়ে চলেছে দরিদ্রের ঋণের বোঝা। এ সব দেখে মানুষের মন সংশয়ে দোলা দিলে পলেস্তারায় কুলোবে না।

## কাশ্মীর ঃ

পাক-ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান কর্তব্য পালনের গুরুদায়িত্বভার স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা কাশ্মীরে ফিরে এসে শলাপরামর্শ চালাচ্ছেন তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চূড়ান্তরূপ অস্বীকার ছাড়া আর যা' কিছু শেখ আবদুল্লা দিল্লীতে অবস্থানকালে বলেছেন, তাতে তাঁর অনুগামীরা অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা উগ্রপন্থী তাঁরা আশা করেছিলেন, শেখজীর দিল্লী সফরে কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি বিরোধটা জমে উঠবে। এঁরা হলেন প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লার দল। এঁদের নেতা মীর ফারুক এবং মীর ইউসুফ শাহ। ফারুক ছিলেন পবিত্র-কেশ উদ্ধারের আন্দোলনের সংগ্রাম কমিটীর চেয়ারম্যান। শেখের পাকিস্তান সফরের প্রস্তাবে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ ভিন্ন এ দলটি আর তাঁর ওপর কোন আস্থা রাখতে পারছে না। পাকিস্তানের এই পৃষ্ঠপোষক দলটি তো এর মধ্যেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাদিকের বাসভবনে টাইম-বোমা নিক্ষেপই তার প্রমাণ।

আবদুল্লা-অনুগামীদের মধ্যে উদার-পন্থীদের অধিনায়ক মৌলানা মহম্মদ মাসুদির আশা ছিল অনেকখানি। তিনি শেখের মধ্যে নতুন মানুষের সন্ধান করছিলেন। আশা করে-ছিলেন, ১৯৫৮ সালের মত শেখ মুক্তি পাওয়ার পর আর আবোল-তাবোল বকবেন না এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির মৌলিক প্রশ্ন স্বীকার করে নিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তিনি [illegible] মুক্তির পর

শ্রীবক্সী গোলাম মহম্মদ

জম্মুতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে একজন বিদেশী সাংবাদিক গণ-ভোটের প্রশ্ন উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল্লা তাঁকে ধমকে দিয়ে-ছিলেন। খুশি হয়েছিলেন তাতে মাসুদির দল ভেবেছিলেন---আর কোন ভয় নেই, শেখ সাহেব আর বিপথগামী হবেন না।

এরপর রাতারাতি শেখ ভোল পাল্টালেন। তিনি যখন কাশ্মীরের ভারতভুক্তির মূল প্রশ্নে বেঁকে বসলেন তখন থেকেই নৈরাশ্য দেখা দেয় মাসুদিপন্থীদের মধ্যে। দিল্লীতে শেখের ভূমিকার পর তাঁরা কতকটা হতাশই হয়ে পড়েছেন।

অবস্থা ঘোরালো দেখে শেখ আবদুল্লা না কি বক্সী গোলাম মহম্মদের সঙ্গে আঁতাতের কথা চিন্তা করছেন। তাঁর আকস্মিক পরিবর্তনের পেছনে বক্সী গোলাম মহম্মদের কারসাজি আছে বলেও কোন কোন মহল মনে করেন। মুক্তির পর গভীর রাত্রিতে বক্সীর সঙ্গে আলোচনার পরই না কি শের-ই-কাশ্মীর হুঙ্কার দিতে সুরু করেন। সম্প্রতি দিল্লীতে এসে বক্সী গোলাম মহম্মদ শেখজীর সঙ্গে মিটমাটের যে সর্ত ঘোষণা করেছেন, তাতে এ ধারণা অমূলক না-ও হতে পারে।

শ্রীসাদিকের চেষ্টায় শেখ আবদুল্লা মুক্তি পাচ্ছেন দেখে বক্সীর দল তাড়াতাড়ি শেখের মুক্তির দাবীতে স্বাক্ষর গ্রহণের আন্দোলনে নেমে ছিলেন। যে কোন প্রকারে সাদিককে সরিয়ে দেওয়াই এখন বক্সীর লক্ষ্য। বক্সী-সাদিকের বিরোধ মেটাতে গিয়ে তাই বিজু পট্টনায়কের মত চতুর মানুষ ব্যর্থ হয়েছেন। শেখ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত মীর্জা আফজল বেগ মনে করেন মিতালী করতে হলে বক্সীর মত শক্ত খুঁটি ধরাই ভাল। শেখ সাহেব এখনও মনস্থির করতে পারেন নি। নয়া দিল্লীতে আরেক চক্কর আলোচনার সময় এ বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে বলেই অনেকের ধারণা।

## মধ্যপ্রদেশ ঃ

শ্রীকানাইয়ালাল খাদিওয়ালা মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নবগঠিত কার্য-নির্বাহক কমিটীর সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। মন্ত্রিসভা দলের সমর্থিত মিনিস্টেরিয়েলিস্ট প্রার্থী শ্রীখাদিওয়ালা বিরোধী দলের (ডিসিডেণ্ট) সমর্থিত প্রার্থী শ্রীমূলচাঁদ দেশলেহরাকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৫ ভোটে হারিয়েছেন। মন্ত্রিসভার সমর্থক দল ৩টি সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের পদটিও অধিকার করেছেন। বিরোধী দল কার্যনির্বাহক সমিতির ১৬টি

আসনের মধ্যে ২টির বেশি অধিকার করতে পারেন নি।

আশা করা যায়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র এবং তাঁর দল বিরোধী পক্ষকে পরাভূত করে আপাতত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

**মাদ্রাজ ঃ**

শ্রম-বিরোধ আইন সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থায় যাতে কার্যকর হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার শ্রম-বিরোধ আইনের সংশোধনের কথা বিবেচনা করছেন বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা পরিষদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শিল্প-মালিকদের প্রতিনিধিগণ সরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম না কি তাঁদের যুক্তি সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, যে আচরণবিধি সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রণয়ন করা খুবই খারাপ। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলো স্বাগত জানিয়েছে। আমরাও মাদ্রাজ সরকারকে স্বাগত জানাচ্ছি। সরকার আদর্শনিষ্ঠ মালিক না হলে অপরের ওপর কুণ্ঠাহীন ভাবে কোন আদর্শ চাপাতে পারেন না।

**আসাম ঃ**

নাগাভূমিতে সাপ্তাহকাল সফরের পর ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগাভূমির শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। ব্যাপটিস্ট চার্চ কাউন্সিলের প্রচেষ্টায় গঠিত নাগাভূমির শান্তি মিশনের তিনি একজন সদস্য। অপর দু'জন হলেন বিদ্রোহী নেতা ফিজোর আশ্রয়দাতা রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ।

শ্রীচালিহা জানিয়েছেন, শান্তি মিশন কোন রাজনৈতিক 'ফরমূলা' পেশ করেন নি। শান্তি মিশনের আপাতত লক্ষ্য হল দু'টি। —শত্রুতামূলক কাজ বন্ধ করা এবং সব বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য গোল-টেবিল বৈঠকের আয়োজন।

নাগাভূমির ভেতরের খবর সম্পর্কে অপর সকলের চাইতে শ্রীচালিহার

● রেভাঃ মাইকেল স্কট

অভিজ্ঞতা অধিক। অশান্ত নাগাদের মতিগতির বদল হয়েছে, তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে তিনি মনে করলে আমাদের অবশ্য সন্দেহ করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। ফিজোর মুরুব্বি রেভারেণ্ড স্কট এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের অতীত কার্যকলাপের যে নজীর রয়েছে তাতে সন্দেহ কিছুটা থেকেই যায়। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জয়প্রকাশ একটি বিরাট প্রহেলিকা। তিনি সব ব্যাপারে গলা বাড়িয়ে উপদেশ দিতে যান। মুখে বলেন, রাজনীতিতে তাঁর অরুচি ধরে গিয়েছে। কিন্তু যখনই রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়, তখনই শ্রীনারায়ণ সকলের আগে উড়ে এসে জুড়ে বসেন। সম্প্রতি তিনি কাশ্মীর ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যে ধরণের মুরুব্বিয়ানা ফলিয়েছেন, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলেই একবাক্যে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন নি। শ্রীনারায়ণ বেশ কিছুদিন নাগাভূমি চষে বেড়াবেন। বিদ্রোহী নাগাদের দুঃখে কাতর হয়ে পড়াও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়।

কিছুদিন আগে চারশ' নাগা পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এসেছে। তারা এখনও সক্রিয়। নাগাভূমি সম্পর্কে জয়প্রকাশের উদার নীতি, পাকিস্তানের প্রতি তাঁর অহেতুক অনুকম্পা সর্বজনবিদিত। এ হেন ব্যক্তি যে কমিশনের সদস্য, সে কমিশনের আশার বাণীতে আস্থা স্থাপন আমরা করে উঠতে পারছি নে।

* *

আসামের পাঁচটি পার্বত্য জেলায় স্কটল্যাণ্ডের ধরণে ব্যবস্থা প্রবর্তনের শ্রীনেহরুর পরিকল্পিত ফরমূলা নিয়ে রাজ্য-মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হয়েছে, রাজ্যের ঐক্যের কোন বিঘ্ন না ঘটলে পার্বত্য এলাকাকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়ায় কোন আপত্তি করা হবে না। শ্রীনেহরু

● শ্রীচালিহা

এ বিষয় নিয়ে শ্রীচালিহাকে যে পত্র লিখেছেন, তার উত্তরের একটা খসড়া প্রণয়নের ভার অর্পণ করা হয়েছে মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্যের ওপর।

# জাপানী সন্দেশ

## হিসেব খাতার ছেঁড়াপাতা—

বহুদিন ধরেই জাপানের standard of living বেশ নীচু। কারণ হোলো এদেশের বিরাট জনসংখ্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি বছর বিশেক জাপানীরা অপেক্ষামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। পরে একনাগাড়ে চার বৎসর ধরে যুদ্ধ চালানোর ফলে জাপানের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা দিল প্রচণ্ড অভাব। তার ফলে আজ জাপানের জনসাধারণের সাধারণ standard of living নীচু।

বিপ্লবের মত যুদ্ধও অনেক কিছুই ধুয়ে পুঁছে সাফ করে দিয়ে যায়। যুদ্ধের আগে যারা ছিল হর্তা-কর্তা-বিধাতা তাদের অনেকেই আজ সাধারণ মনুষ্যে পরিণত হয়েছে। অবশ্য অনেক জায়গাতেই স্বাচ্ছন্দ্যের বাহ্যিক প্রদর্শনী আছে এখানে। যেমন, রাজধানী টোকিওর পথে ঘাটে দেখা যায় প্রচুর চকচকে পালিশকরা মোটরগাড়ি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকথা বলতে আজকের জাপানে সত্যিকারের পয়সাওয়ালা লোক খুবই কম। যুদ্ধের পরে জাপান থেকে তথাকথিত middle class-টি যেন উবে গেছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে এদের একটি বেশ সত্যিকারের গোঁড়া middle class ছিল। এরাই ছিল জাপানের শিরদাঁড়া। আজকে তাদের যা' দশা তা'তে এদের middle class people বলা ঠিক হবে না। অবশ্য ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় না এদের। সব সময়েই পরিষ্কার, ভব্যসভ্য, ফিট্‌ফাট্। তবে এদের অবস্থা—দিন আনি দিন খাই।

যুদ্ধের আগে সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা বিদেশ থেকে আমদানী করা স্কচ হুইস্কি খেত। ফ্যান্সি বাক্স থেকে চকলেট খেত। প্রায় প্রত্যেক জাপানী বাড়িতেই থাকত একটি ইউরোপীয় ঘর। এদের ভাষায় 'ইয়ো-মা'। বৈঠকখানা। ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করে আরামসে সময় কাটাতো এরা এই বৈঠকখানায়। অনেকেরই নিজের মোটরগাড়ি ছিল না। তবে ট্যাক্সি চেপে এখানে সেখানে যাতায়াতের জন্য পয়সা ছিল প্রচুর।

**সন্দীপ ঠাকুর**

আজকের তুলনায় তখন অনেক ভালভাবে খেত এই মধ্যবিত্তের দল।

টোকিও ও অন্যান্য বড় শহরে যে বিলিতি ধরণের বাড়িগুলি আছে তা' দেখে আগেকার দিনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আভাষ পাওয়া যায়। আজ সেইসব বাড়িগুলিতে থাকে বিদেশীরা। যারা পয়সা ফেলতে পারে। তখনকার দিনের যে কোন প্রফেসর বা মিলিটারী হোমরা-চোমরারা বিলিতি ধরণের বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করতে পারতো। আজ ঐ সব বাড়ি-ঘরের maintenance খরচ এত বেশি যে, হয় ভাড়া দিয়ে দিতে হয় বিদেশীদের কাছে,—নয় বিক্রি।

যদিও যুদ্ধের পর ক্রমশ নীচ হয়ে যাচ্ছিল এদের living standard, আজ তার কিছুটা গতি হয়েছে। ধীরে ধীরে আবার উপর দিকে মাথা গজিয়ে উঠতে সুরু করেছে হাইসটিক্যাল্ কাঁটা। অঘটন কিছু না ঘটলে উপর দিকেই যাবে ঐ কাঁটা। তবে সময় নেবে বেশ। আজও এদের দেশের রাজনীতি ঐ নীচ living standard-এর ব্যাপার নিয়েই।

যুদ্ধে হারার পর এদের অর্থের দাম গেল বিশেষ কমে। যুদ্ধের আগে আমেরিকান ডলারের দাম ছিল দুই জাপানী ইয়েন্। আজকের অফিসিয়াল রেট হোলো ৩৬০ ইয়েন্। আন-অফিসিয়াল রেট অবশ্য ৪০০ ইয়েনেরও বেশি।

সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ মাসিক মাইনে আঠেরো হাজার (১৮০০০) ইয়েন্। অন্যান্য কোম্পানীরাও ঐ অনুযায়ী মাইনে ঠিক করেছে। স্বামী, স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি পরিবারের মাসিক আয় হোলো বিশ হাজার ইয়েন্। আমেরিকান ডলারের সঙ্গে তুলনা করলে এই বিশ হাজার ইয়েন পঞ্চাশ ডলারের সামিল। ঐ পাঁচজনী পরিবার যে কি করে বিশ হাজার ইয়েনে সংসার চালায় তা' সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার।

বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা যে, জাপানী living standard নীচ বলেই কর্মদের মাইনে কম এবং এই অনুযায়ী জাপানীরা পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের লোকেদের মতই আরামসে সংসার চালাতে পারে। জাপান সম্বন্ধে এই ধারণা ভুল।


সালফার
গায়েমাখা সাবান

গন্ধক চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। সেজন্য এই সাবান নিত্য ব্যবহারে, বিশেষতঃ গরমের দিনে, খোস, কোড়া, চুলকানি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্মরোগ নিবারণ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

দু-বেলা খাওয়া এদেশের লোকেরা অতি কষ্টেই চালায়। এর পিছনে আছে কিপ্টেমী আর প্রচণ্ড স্বার্থত্যাগ। মহিলাদের জন্য পত্রিকাগুলি এই বিষয় নিয়েই সচরাচর লেখালেখি করে থাকে। পুরুষমহলেও কয়েকটি কাগজ-পত্রিকার বিশেষ কাটতি। 'কি করে পয়সা বাঁচানো যায়', 'ভিখারী থেকে লক্ষপতি' ইত্যাদি নামের আর্টিকেলে ভরা এই সব পত্রিকা। কি করে ভালভাবে না খেয়ে, নিরানন্দে থেকে অবশেষে টাকা জমানো যায়—নানান উপায় লেখা আছে এই সব কাগজে। দরকারও অবশ্য আছে।

বহু জিনিষের আমেরিকান বাজার দর আর জাপানী বাজার দর প্রায় সমান সমান। যতই ইলেক্‌ট্রিক, রেডিও ট্রানজিসটার আর টেলিভিশন্ সস্তায় তৈরি করুক না কেন—সেগুলো তো খাওয়া যায় না! যত সস্তাই হোক না কেন। খাদ্যের দাম বেশ চড়া। ক্রমশই বেড়ে চলেছে। চালের দাম তেমন বেশি নয়। চিনি ও আটা বিদেশ থেকে আসে। এদেশে এক কিলোগ্রাম চিনির দাম প্রায় আড়াই টাকা। এক কিলো মাংসের দাম প্রায় ১৩ টাকা। মাছের দর অপেক্ষাকৃত কম। তবে ৭।৮ টাকা তো বটেই। মাখন, পনীর ও দুধের দাম চড়া। ডিম ২ টাকা ডজন। শাকসব্জীর দর কিছুটা কম। বড় একটি বাঁধাকপির দাম দেড়-টাকা। কফি, কোকোর দাম বেশ। সবই বিদেশ থেকে আমদানী। এক পাউণ্ড চায়ের দাম ৬।৭ টাকা। এক পাউণ্ড কফির দাম ৭।৮ টাকা। অন্যদিকে আবার হুইস্কি ও অন্যান্য মদের দাম সস্তা। সস্তা হুইস্কি এক বোতলের দাম ৪ টাকা।

মাসিক আড়াইশ' টাকা বেতনভোগী জাপানীদের দল সারাদিনে যা' খায় সে-অনুপাতে সাধারণ আমেরিকানরা প্রাতরাশ খায় অপেক্ষাকৃত বেশি। এরা বিদেশী খাবার খেতে ভালবাসলেও অর্থাভাবে তা' খেতে পারে না প্রতিদিন। তাই নিজেদের দেশী সস্তা খাবারের দিকেই নজর ফেলতে হয়। ঋতু হিসেবে খাদ্যের বদল হয় এদেশে। তবু নীচের এই লিষ্ট দেখলেই একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া শক্ত হবে না।—

প্রাতরাশ :

ভাত; ভাত 'মিসো' কিম্বা কড়াইয়ের ঝোল—সঙ্গে কিছু সব্জী; মাছের আচার; আর সবুজ চা।

দ্বিপ্রাহরিক অন্ন :

ভাত; সিদ্ধ কিম্বা পোড়া মাছ; সিদ্ধ শাকসব্জীর স্যালাড; আর সবুজ চা।

রাত্রাহার :

ভাত; 'তোফু' আর ('তোফু' : বাটা কড়াইয়ের বরফি) পেঁয়াজকলির সুপ; মাছ ভাজা; সিদ্ধ সব্জী; টক; সবুজ চা।

এই সারাদিনের খাবারের দাম গড়ে পড়তা এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সার মত। তাহলে পাঁচজনী পরিবারের মাসিক খাদ্যের খরচ হবে প্রায় দু'শ' পঁচিশ টাকার মত। আর যা বাঁচে তা'দিয়ে অনেক কিছু স্বার্থত্যাগের পর, অন্যান্য খুঁটিনাটি খরচ।

জাপানীরা বাইরে মানে হোটেলে, রেষ্টুরেণ্টে খেতে ভালবাসে। নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে এই বাইরে খাওয়া—ভালভাবে খাওয়া—সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সরকারী বা প্রাইভেট অফিস ইত্যাদিতে কাজ করে, তারাই শুধু এই ব্যাপারটি সারতে পারে অফিসের অর্থে। অফিসের কাজে বেরিয়ে অফিসের এ্যাকাউণ্টে খাওয়া চলে ভালই। উক্ত এ্যাকাউণ্ট সিষ্টেমে খাওয়া জাপানে আজ অতি ফ্যাশানেবল ব্যাপার। এই-দিক দিয়ে কর্তারা বাইরে খেয়ে নিজেদের ভিটামিন-ক্যালসিয়ামের কমতি রেগুলেট করতে পারেন। তবে গিন্নী ও ছেলেমেয়ের দল বাড়ির মেনু ধরেই খাওয়া দাওয়া চালান। ওঁদের ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি প্রচুর।

সাধারণত দেখবে কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলে অতিথিদের চেয়ে হোষ্টদের দলই ভারী! এও ওই সুখাদ্য খাবার অতি-আগ্রহের ফল।

যুদ্ধের ভাঙাচোরার ফলে আজ জাপানে ঘরবাড়ির বিশেষ কমতি। কণ্ট্রাক্টারের দল আজ সস্তায় বাড়ি তৈরি করে চলেছে যেখানে সেখানে। ভাড়াও কম।


মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—
কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র
সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার
সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়
তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের
বৃহৎ তন্ত্রসার
—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—
সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—
অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।
বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।
মূল্য দশ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কুঁড়েঘরের চেয়ে একটু ভাল। তবে এদেশী ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করতে অক্ষম এই জাপানী কুঁড়েঘরের দল। সেই অনুপাতে অবশ্য ভাড়া খুবই বেশি। বিশেষ কোনো প্রটেক্‌শন দিতে পারে না এই যুদ্ধোত্তর জাপানী ঘরবাড়ি।

বিজলীবাতি, গ্যাস, কয়লা ও কাঠের দাম অত্যন্ত চড়া। আড়াইশ' টাকা মাসে রোজগারওয়ালা পরিবারের পক্ষে ঘরে ১৬ ক্যাণ্ডল পাওয়ারের বেশি আলো জালিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ঘর গরম করার জন্য টাকা নেই। হাত গরমের জন্য ছোট্ট কাঠকয়লার চুল্লী জালিয়ে সবাই মিলে হাত মেলে বসে ঐ চুল্লীর ধারে। এই বরফের দেশে গরম ঘরে থাকতে পারে শুধু পয়সাওয়ালার দল। সাধারণের পক্ষে এ ব্যাপারটা অতি কষ্টের।

যুদ্ধের আগে রেশম আর সুতির (তুলা) কাপড়ের দাম ছিল বেশ সস্তা। আজ সে ছবি পাল্টে গেছে। তুলা বিদেশ থেকে এনে কাপড় তৈরি করা হয় জাপানে। আমদানীর খরচ বিরাট। অবশ্য জাপানে তৈরি সুতি-কাপড়ের খুবই নামডাক। তবে দামও তেমনি উঁচ। রেয়নের কাপড়ের চেয়ে সুতি-কাপড়ের দামই বেশি। রেশমী কাপড় সবই যায় বিদেশে রপ্তানী হয়ে। দেশে তাই রেশমী-কাপড়ের দাম উঁচ।

অনেকের ধারণা জাপানী কিমোনোর দাম কম। এ ধারণা ভুল। য়ুরোপীয় ধরণের জামা-কাপড় কিমোনোর চেয়ে অনেক সস্তা। তাই আজ জাপানীরা বেশির ভাগই য়ুরোপীয় জামা-কাপড়ই পরা পছন্দ করে।

এই শীতের দেশে heating এর অভাব বলে জাপানীরা সবাই উলের বা সুতির under wear পরে থাকে। মাঝে মাঝে গরম প্যাণ্টের তলা থেকে উলের চুড়িদার পাজামা (under wear) উঁকি মেরে বাইরের জগৎটাকে দেখে নেয়। এ দৃশ্য সব জায়গায়। এখানকার অফিসের কর্মীরা বছরে দু'বার করে বোনাস পায়। ওটা না পেলে জামা-কাপড় কেনা সম্ভব নয় এদের পক্ষে। প্রতি বোনাস এক মাসের মাইনের সামিল। অবশ্য প্রাইভেট কোম্পানী সময় বিশেষে প্রচুর পয়সা পিটলে ২।৩ মাসের বোনাসও দেয় কর্মীদের মাঝে মাঝে। ঐ বোনাসের সময়ে রেডিও, টেলিভিশনে সর্বদাই থাকে শেপাস্ অ্যাণ্ড ভার্টাইজিং প্রোগ্রাম্। কী করে ভালভাবে বোনাসের টাকার সদ্ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি।

জাপান হোলো ব্যুরোক্র্যাসির দেশ। তাই অফিসারের দল নানান ছলছুতো দেখিয়ে কোম্পানীর পয়সায় খাওয়া-দাওয়া, এমন কি সংসার চালনাও করে।

এদেশের লোকেরা খবরের কাগজ পড়তে ভালবাসে। টোকিও ও অন্যান্য শহরে অন্তত কম করে আট-দশটি 'লিডিং ডেইলী' আছে। যে কোন অফিসে দেখা যায় যে, কাজের সময়ে এরা একনাগাড়ে খবরের কাগজ পড়ে চলেছে। এরা নিজেরা একটা কাগজ কেনে দিনে। অফিসে অন্তত পনেরো-কুড়িটি আলাদা কাগজ আছে। কাজের সময়ে ঐ সব পড়া চাইই। বই পড়তেও ভালবাসে এরা। তাই দেখা যায় এদেশের হাজার হাজার বই-এর দোকান ও news stall-এ কী ভিড়। অবশ্য সকলেই যে বই কিনছে তা নয়। এরা বেশির ভাগই বই-এর দোকানে দাঁড়িয়ে যা কিছু পড়ার সব পড়ে নেয়! বই-এর দাম বেশ। তাই সকলে বই কিনতে পারে না ইচ্ছামত। দোকানদারেরা যাতে লোক বেশি আসে তাই এই পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে। বই বিক্রি হোক বা নাই হোক, চান্সটাতো বাড়ছে বিক্রির। ঐ অত লোকের মধ্যে কেউ না কেউ কিনছেই অবশ্য।

এরা hot-spring-এ স্নান করতে ভালবাসে! প্রতি অফিস থেকে কর্মীদের জন্য বছরে একবার করে hot-spring-এ নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত আছে। প্রতি মাসে প্রত্যেকের মাইনে থেকে ছয় টাকার মত কেটে নেওয়া হয় ঐ জন্য। বেশ ভাল ব্যবস্থা। তবে ঐ hot-spring-এ যাবার সময়ে অফিসের কর্মীদের সঙ্গেই যেতে হয়। পরিবারের সকলেই থাকে পশ্চাতে—বাড়িতে।

এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তেমন। সবাই বিনীত সর্বদাই। এমন কি একজন successful businessman-এর সবচেয়ে বড় অ্যাম্বিশন হোলো একটি ছোট্ট বাগান-ওয়ালা বাড়ি। আমেরিকানদের মত প্রাইভেট ইয়ট, বিরাট এষ্টেট, সারা পৃথিবী ঘুরে দেখা—এসবই সাধারণত লক্ষপতি জাপানীদেরও কল্পনার বাইরে।

ধীরে ধীরে এদের standard of living বেশ উঁচ হতে চলেছে। কয়েক বছর আগে এদের মাথাপ্রতি বাৎসরিক আয় ছিল ৬৫০ টাকার মত। আজ এদেশে মাথাপ্রতি বাৎসরিক আয় হ'ল ২০৮০ টাকা। পাশ্চাত্যের advanced দেশের তুলনায় এই রেট বিশেষ একটা বড় ব্যাপার হয় তো নয়। তবে আমাদের ভারতীয়দের পক্ষে এই রেট সত্যিই অভাবনীয় ব্যাপার। নয় কি?

# আন্তর্জাতিক

* সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সফরে ক্রুশ্চেভের অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা

## গ্রেট বৃটেন :

**বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে :** রক্ষণশীল কমনওয়েলথ কাউন্সিলের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ের উপসমিতি কাউন্সিলের আসন্ন লণ্ডন সম্মেলনে বিবেচনার জন্য বর্ণবৈষম্যের উত্তেজনা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সুপারিশ করেছে। উপসমিতি সুপারিশ করেছে, স্কুলে কৃষ্ণকায় বহিরাগতদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে কোনরূপ পৃথকীকরণ নীতি অনুসরণ করা চলবে না। যেখানে বহিরাগতরা ভাষার অসুবিধা অনুভব করবে সেখানে শিশু ও বয়স্ক সকলের ইংরেজি শিক্ষা-দানের জন্য বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বহিরাগত ব্যক্তিদের গৃহ-সমস্যার সমাধানের জন্য উপসমিতির প্রস্তাব, পৌর কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বে-সরকারী স্বেচ্ছামূলক গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হোক।

* *

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন-সংক্রান্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের উপসমিতির একটি বৈঠকে সম্প্রতি সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ পাভেল ফেদোরোভিচ শেখভ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত বৃটিশ অধিকৃত দ্বীপ মৌরিসাস ও সেচেলেসের দুরবস্থা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যুক্তিপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিকবাদের চাপে ঐ দ্বীপের প্রাকৃত অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। ঐ দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের অবিলম্বে স্বাধীনতা দিতে হবে বলে তিনি দাবী জানান। মিঃ শেখভের দাবী যে অনেকটা সত্যি তার অন্য একটি প্রমাণও সম্প্রতি পাওয়া গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ঐ উপসমিতিতে বৃটেনের গ্রাম্য প্রতিনিধি মিঃ সিসিল কিং পরিষ্কার একথা স্বীকার করেছেন যে, আসলে মৌরিসাস ও সেচেলেসের অবস্থা মিঃ শেখভের বর্ণনার চেয়েও খারাপ।

* * *

সম্প্রতি বৃটেন ইতালীকে খুশি করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ইতালীর মধ্য-বামপন্থী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এলদো মরো তাঁর পাঁচদিনব্যাপী লণ্ডন সফর শেষ করে ফিরেছেন। এই পাঁচ দিন তিনি নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এই লণ্ডন সফরে তিনি যে শুধুমাত্র বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক হিউমের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেছেন তা-ই নয়, তিনি বৃটেনের বাণিজ্য, শিল্প ও আঞ্চলিক উন্নয়নসচিব মিঃ এডোয়ার্ড হীথ এবং মিঃ মডলিংয়ের সঙ্গেও সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মিঃ মরো বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষের নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গেও ইতালীয় দূতাবাসে কয়েক মিনিট আলোচনা করেছেন।

মিঃ মরোর এই লণ্ডন সফর থেকে একটা জিনিষ বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান বৃটিশ সরকার রোমের সঙ্গে সম্পর্ককে যতদূর সম্ভব ভাল রাখার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। কিন্তু এর কারণটা কি? কেন বৃটেনের তরফ থেকে রোমকে খুশি রাখার জন্য এত ব্যাকুলতা? এর কারণ গত আঠারো মাস ধরে বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ঢোকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিন্তু কয়েকটি দেশ থেকে ক্রমাগত বাধা পাওয়ায় বৃটেন খানিকটা অসুবিধায় পড়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি দেশ এ-ব্যাপারে তাকে সমর্থনও জানিয়েছে। যে-সমস্ত দেশ তাকে সমর্থন জানিয়েছে, সেই স্বল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে ইতালী অন্যতম। অন্যপক্ষে এই

* ফ্যানফেনি ও মরো

ব্যাপারে ইতালীর কিছু স্বার্থ রয়েছে। ইতালী ইউরোপীয় বহু দেশের তুলনায় অর্থনৈতিক বিচারে অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল। ফলে সে চাইছে বৃটেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যদি তার অর্থনৈতিক সংকটের দিনে খানিকটা বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা পায়।

* * *

**পরলোকে বৃটেনের প্রথম মহিলা পার্লামেণ্ট-সদস্য ঃ** গত ২রা মে লেডি এ্যাস্টর ৮৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনে মারা গিয়েছেন। পার্লামেণ্ট-সদস্যদের কাছে 'ন্যান্সি' নামে সমধিক পরিচিত লেডি এ্যাস্টর বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম মহিলা সদস্য।

ন্যান্সির জন্ম ভার্জিনিয়ায় হলেও, বৃটেনকেই তিনি তাঁর স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে যখন ন্যান্সির স্বামী কমন্সসভার সদস্য ওয়ালডর্ফ পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডসভার সদস্য হন, তখন ওয়ালডর্ফ তাঁর প্লাইমাউথ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে স্ত্রীকে দাঁড় করান। ন্যান্সি ইউনিয়নিস্ট দলের (রক্ষণশীল) প্রার্থীরূপে এই নির্বাচনে জয়লাভ করে কমন্সসভায় প্রবেশ করেন। সেদিন রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির মধ্যে একজন মহিলার পার্লামেণ্ট প্রবেশ নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। গোঁড়া রক্ষণশীল উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, "যেন একজন মহিলা হঠাৎ আমার স্নানঘরে ঢুকে পড়েছে, এবং এক-টুকরো স্পঞ্জ ছাড়া নিজেকে ঢাকবার মত আমার আর কিছুই নেই।" মুখরা ও সুচতুরা ন্যান্সি সেদিন চার্চিলকে মুখের ওপর জবাবও দিয়েছিলেন। ন্যান্সি চার্চিলকে বলেছিলেন, "এ রকম অবস্থায় বিব্রত হয়ে পড়বার মত সুপুরুষ আপনি নন!"

ন্যান্সি ১৯৪৫ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের পার্লামেণ্টারী জীবনে তিনি বৃটেনে নারীজাতির অধিকার

* লেডি এ্যাস্টর (১৯০৮ সালে এবং ১৯৫৬ সালে গৃহীত চিত্র)

রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রায় এককভাবে তিনি মেয়েদের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করেন। এর জন্য নিজের দল ও বিরোধী দল, সকলের সঙ্গেই তাঁকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। নারী ও শিশুদের স্বার্থ-সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে তিনি সর্বদা উদ্যোগী হয়েছেন। রাজনীতির বাইরে সমাজসেবার ক্ষেত্রেও ন্যান্সি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় তাঁর কিুভ্ডন প্রাসাদে তিনি ১৬০০ শয্যাযুক্ত এক হাসপাতাল পরিচালনা করেন। বিভিন্ন মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রধান নিমন্ত্রণকর্ত্রী।

বৃটেনে মেয়েদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ন্যান্সি যে যাত্রা সুরু করেন, আজ তা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। ১৯১৯ সালে তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টের একমাত্র মহিলা-সদস্য, আর আজ সেখানে মহিলার সংখ্যা ৫৩ জন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রভাবশালী সদস্য।

**কিউবা ঃ**

গেল সপ্তাহে হাভানার 'রেভলিউশন স্কোয়ারে' অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ফিডেল ক্যাস্ট্রো ঘোষণা করেছেন যে, মার্কিন

* ফিডেল ক্যাস্ট্রো

যুক্তরাষ্ট্রের ইউ--২ বিমান অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে গোপন তথ্য সংগ্রহ করছে। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের এবং অপরাপর আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের এই বিমান পরিক্রমা বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আবেদন-নিবেদনে কোন সুফল না হলে আমরা অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে কিউবা নতুন কোন মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করছে কি না তার খবরাখবর সংগ্রহের অধিকার আছে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবী করে আসছে। সোভিয়েট সরকারেরও এতে সম্মতিই ছিল; ফিডেল ক্যাস্ট্রো আমেরিকাকে এই অধিকার দিতে নারাজ। এই অবস্থাতে যুক্তরাষ্ট্র ইউ-২ বিমান থেকে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। কিউবাকে অপদস্থ করাই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ক্যাস্ট্রো মনে করেন। তাই তাঁরা এই পথ অনুসরণ করেছেন।

এদিকে কিউবার প্রধান পণ্য চিনির উৎপাদনে মন্দা সুরু হয়েছে। চিনি উৎপন্ন হচ্ছে প্রতি বছর ৩,৩০০,০০০ টন। ক্যাস্ট্রোর আমলের আগের উৎপাদনের তুলনায় এ প্রায় অর্ধেক হবে। সব চিনিই যাচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া এবং অপরাপর কমিউনিস্ট দেশে। চিনি বেচে কিউবার আয় হচ্ছে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু চিনির উৎপাদন কমে যাওয়ায় কিউবা সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছে না। চীন ও বুলগেরিয়াকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চিনি সরবরাহ করতে কিউবাকে বাইরে থেকে চিনি কিনতে হচ্ছে।

## সোভিয়েট রাশিয়া :

অবিরাম বর্ষণ ও বন্যায় পাহাড়ের বিরাট ধ্বস নেমে এসে জেরাভসন নদীর (সমরখন্দের নিকট) গতিমুখ অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মধ্য এশিয়ায় চেঙ্গিজ খান ও তার পৌত্র তৈমুরের আমলের রাজধানী সমরখন্দ শহরের অস্তিত্ব ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। এই পাহাড় দ্বারা জেরাভসন নদীর জল অবরুদ্ধ হয়ে গেলে এবং এত জল বেরুতে রাস্তা না পেলে সমস্ত সমরখন্দ ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়তো আর সমরখন্দের অমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতি বা চিহ্ন সমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত। শত শত সোভিয়েট বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছিল ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক দিয়ে ঐ বদ্ধ জলকে মুক্ত করে দেবার জন্য। কয়েকদিন ব্যাপী অবিরাম চেষ্টার ফলে বিপদ কেটে গিয়েছে এবং বদ্ধ জল নিষ্কাশন সম্ভব হয়েছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে সেই জলকে বের করা হয়েছে।

* * *

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ কবি নজরুল ইসলামের কবিতা সোভিয়েট পাঠকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরেই জনপ্রিয়। বিভিন্ন সোভিয়েট সাহিত্য পত্রিকায় ও বিদেশী কাব্যের সংকলনে নজরুলের

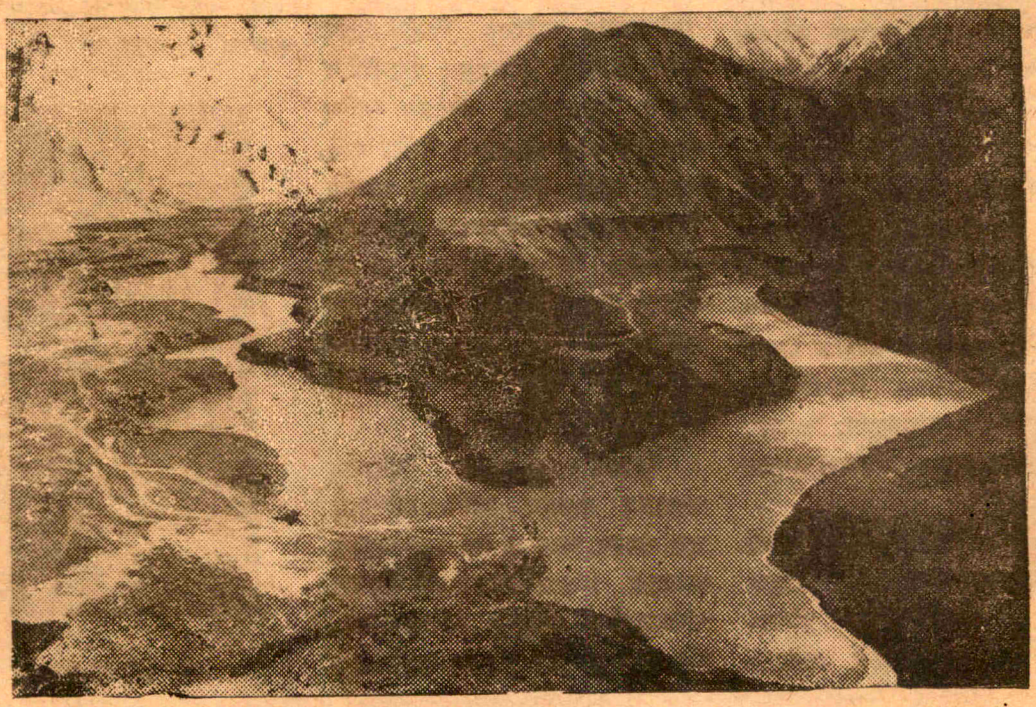

* ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত সমরখন্দের ভীতি এই সেই ধ্বস

বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল ইসলামের কবিতার কতকগুলি চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান রুশ পাঠককে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের প্রিয় কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কির কথা। মায়াকোভ্স্কির মতোই নজরুল তাঁর চারপাশের সব রকমের সামাজিক নৈতিক ও মানবিক সমস্যাকে দেখেছেন নিজের সমস্যা হিসেবে, সব রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যরচনাকে এক সক্রিয় জঙ্গী হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছেন। মায়াকোভ্স্কির মতোই নজরুল সার্থক জনগণের কবি।

সংকলনের অনুবাদ করেছেন খ্যাতনামা কবি মিখাইল কুরগান্‌ৎসেফ। সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে আছে "বিদ্রোহী", "ছাত্রদলের গান", "আগে চল", "কুলী-মজুর", "কৈফিয়ৎ", "মানুষ" ইত্যাদি সুবিখ্যাত কবিতা। নজরুলের কবিতার জলন্ত দেশপ্রেম আর উদ্দীপনা, মাতৃভূমির শত্রুদের প্রতি ক্ষান্তিহীন বিদ্রোহী মনোভাব, বন্ধনমুক্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন আর সুমধুর গীতিলালিত্য সোভিয়েট পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

ওই কাব্যসংকলনটি রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষে বিক্রি হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যাবে সোভিয়েট দেশের কাব্যানুরাগীদের কাছে নজরুল কতো প্রিয়।

## ইয়েমেন ঃ

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, ইয়েমেনের রাজধানী সান্না-র লিবারেশান স্কোয়ারে শত শত উপজাতীয় লোক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসে নাসেরের কাছে এডেনের মুক্তির জন্য দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের দাবীর উত্তরে প্রেসিডেণ্ট নাসের ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছেন, তিনি সমগ্র আরব জগৎ থেকে বৃটেনকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এই ঘটনা থেকেই প্রেসিডেণ্ট নাসেরের ইয়েমেন সফর পরিকল্পনার সূত্রপাত। ছয় দিনব্যাপী তাঁর এই সফর নানাদিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র বৃটেন সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করবার জন্যই ইয়েমেন সফরে আসেন নি, এই সফরের পেছনে অন্য কারণও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত ইয়েমেনের নতুন সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতি প্রেসিডেণ্ট নাসেরের বিশেষ মনঃপূত হয় নি। যখন আজ থেকে উনিশ মাস আগে একদল ইয়েমেনী বিপ্লবী ইমাম মহম্মদ এল ব্যাডর-এর কাদায়-গড়া অট্টালিকার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন তারা আসলে ইয়েমেনে একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যখন জেইদি উপজাতির লোকেরা সৌদি আরবের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর পেছনে ধাওয়া করেছিল, তখন ঠিক সময়মত মিশরীয় বাহিনীর উপস্থিতিই এই তরুণ প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

আজকে সান্নার কূটনীতিবিদ এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, অন্তত সাময়িকভাবে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভয় ইয়েমেন থেকে সরে গেছে। গত কয়েকমাস ধরে মিশরীয় বাহিনী রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করার ফলে এই ধারণাটা আরো দৃঢ় হয়েছে। বর্তমানে রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সামরিক ক্ষমতা খুবই সাধারণ স্তরে এসে পৌঁচেছে। এখন, এই মুহূর্তে, ইয়েমেনের মাটিতে প্রায় ৩৫,০০০ মিশরীয় সৈন্য রয়েছে—একথা অনায়াসেই বলা চলে পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে। গত বছর প্রেসিডেণ্ট নাসের যে সৈন্য বাহিনীকে ইয়েমেন থেকে সরিয়ে ফেলবেন বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই সৈন্য সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি।

আরব জগতে বৃটেনের প্রধান-

* ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সালালের সঙ্গে নাসের

খাঁটি হচ্ছে এডেন। এডেনকে কেন্দ্র করে সারা আরব জগতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইয়েমেন চায়, সারা আরব জগৎ থেকে বৃটিশ সরে যাক। অথচ বৃটেন তা চায় না। ফলে সমগ্র পশ্চিমী জগতে ইয়েমেন বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

## সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

এই মাসের ৯ তারিখ মিঃ ক্রুশ্চেভ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সফরে এসেছেন। ষোলো দিনব্যাপী তাঁর এই সফর বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ ক্রুশ্চেভের সফর এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে প্রথম তিনি এখানে এসেছেন; তাঁর সফর গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বর্তমান আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ, বিশেষত যুক্তরাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই সফর অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। এই সফরের তাৎপর্য যথার্থ উপলব্ধি করতে গেলে কোন সময়টায় তিনি এই সফরে এসেছেন তা একবার ভেবে দেখা দরকার। তিনি এমন একটা সময়ে এই সফরে বেরিয়েছেন যখন (১) ইয়েমেন এবং এডেনের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে (২) নাসের দৃপ্তকণ্ঠে এই দাবী তুলেছেন যে, সাইপ্রাসের বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতিজনিত যে সংকট তা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভীতিজনক (৩) 'আরব জগৎ থেকে যুক্তরাজ্য হাত গোটাও'---নাসেরের দীর্ঘদিনের এই দাবী আরব জগতে যথেষ্ট জনসমর্থন পেয়েছে (৪) জর্ডন নদীর গতিমুখ নিয়ে জর্ডনের সঙ্গে ইস্রায়েল ও আরবে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে।

স্বভাবতই এমনি একটা সময়ে মিঃ ক্রুশ্চেভের মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতার পক্ষে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে সফরে আসা নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে নানাধরণের জল্পনা কল্পনা। ষোলো দিনব্যাপী এই বাণিজ্য ও প্রমোদ সফরে এসে মিঃ ক্রুশ্চেভ যে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছেন কূটনৈতিকদের বিভিন্ন দেশে সফরের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এই সফরে তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্ত্রী নিনা, ছেলে সার্গেই, মেয়ে রাদা এবং জামাই (ইজভেস্তিয়া সম্পাদক) এলেক্সী এডঝুভেই। আশা করা যায় যে, ষোলো দিনব্যাপী এই সফর উপলক্ষে মিঃ ক্রুশ্চেভ সমগ্র সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র জুড়ে ঘুরে বেড়াবেন।

মাত্র কয়েকমাস আগে জঙ্গীচীনের নেতা মিঃ চৌ-এন-লাই বন্ধুর সন্ধানে বেরিয়ে নানা দেশ ঘুরে এখানটায় এসে-ছিলেন। তাঁর সম্বর্ধনার কোন ত্রুটি হয় নি প্রথম দিকে। আরব বিশ্বের ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে গিয়েই তিনি বিপদে পড়েন। তুমুল প্রতিবাদ ওঠে তাঁর এই দুরভিসন্ধিমূলক ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। শুধু ভারত নয়, সোভিয়েট দেশ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী দেশগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে নবজাগ্রত আরবের মনোরঞ্জনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদী প্রগতিপন্থী আরব বিশ্বে তাই তিনি আসর জমাতে পারেন নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সফরসূচীকেও তিনি শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আরবের বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলাই হচ্ছে বর্তমান সাধনা। সাম্রাজ্যবাদের আঘাত যখনই এসেছে ভারত ও সোভিয়েট দেশের অকুণ্ঠ সহানুভূতি তাঁরা পেয়েছেন। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে সোভিয়েটের সাহায্য তাদের শক্তি সঞ্চয়ের কম সহায়ক হয় নি।

সাম্রাজ্য হারালেও আর্থিক-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা হেলায় হারাতে কেউ চায় না। ইয়েমেন, এডেন ও সাইপ্রাসের ঘটনাবলীই তার জলন্ত প্রমাণ। সাইপ্রাসে সোভিয়েট দেশেরও স্বার্থ রয়েছে। এখানে আরব ও সোভিয়েটের সমস্বার্থ। তা ছাড়া, বর্তমান বিবদমান বিশ্বে শান্তিরক্ষায় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকা এবং সোভিয়েটের কর্ণধারগণ অকুণ্ঠচিত্তে তা মেনে নিয়েছেন। কাজেই শ্রীক্রুশ্চেভের সফর একদিক থেকে আরবের প্রগতিশীল আন্দোলনের যেমন সহায়ক হবে অপরদিক থেকে চীনের জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী সামান্য যে-কয়জন এখানে টিমটিম করে বাতি জ্বালাচ্ছিল তাদের দিনও ঘনিয়ে আসবে।

ধর্মতলা ষ্ট্রীটের প্রটেষ্ট্যাণ্ট মেথোডিষ্ট চার্চের দৃশ্য

## ধর্মতলার ইতিকথা

"Dhurmatolla in 1793 was described as an open and airy road. It was a well-raised cause-way above fields and lined with trees."

বিখ্যাত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মিঃ ইষ্টকেলার। সম্ভবত মিঃ ইষ্ট-কেলারের তিরোধানের পর, উক্ত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মতলা সম্বন্ধে যে-বিক্ষিপ্ত উপবর্ণনার উল্লেখ ঘটেছিল---সূচনার ইংরেজী পঙতি ক'টি তারই অংশ-বিশেষ। সেদিন ধর্মতলার মুক্তপক্ষ পরিবেশে সত্যই কোনো জটিলতা ছিল না। তার আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যের অনুপন্থী। সবুজের সহজাত লাবণ্যে বিধৃত ছিল তার ছায়াঘন মাঠ। তখন তরুশ্রেণীর বিন্যাস এলোমেলো হলেও, তাদের সাবিক চিত্রে কোনো নিষ্কান্তিময়তার প্রতিভাস ছিল না। সম্ভবত সে-কারণেই চিৎপুর অঞ্চলে প্রথম যে-হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে---পরবর্তী-কালে তার স্থানান্তর ঘটে ধর্মতলাতেই। অবশ্য আরো পরে তা ধর্মতলা থেকেও তার অধিষ্ঠানের স্থায়ী ভূমি নির্বাচন করে ষ্ট্রাণ্ড রোডে---যা আজও মেয়ো হাসপাতাল নামে সেখানেই বিদ্যমান।

আরও অনেক আগে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীরও প্রাগপর্বে একালের ধর্মতলা ছিল সেকালের কালীক্ষেত্র অঞ্চলের এক বিশেষ অংশ। তখন পরিবেশগত দিক থেকে অবস্থান ছিল তার আরও নির্জন এবং লোকালয়ের সঙ্গে অসম্পৃক্ত বলেই বেশ খানিকটা থমথমে। শোনা যায়: সেকালে এক দিগম্বর তান্ত্রিকের অবস্থিতি ছিল এখানে। তার মন্দির বলতে ছিল এক কুঁড়েঘর এবং সেখানেই অধিষ্ঠিতা ছিলেন চামুণ্ডা। এই তান্ত্রিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো যোগাযোগ ছিল না। সাধারণ মানুষ তার ছায়া মাড়াতে ভয় পেতো। কারণ প্রকৃতিগত দিক থেকে সে-তান্ত্রিক ছিল ভয়ঙ্কর ক্ষ্যাপাটে। তাই তৎ-কালীন পল্লীবাসীদের কাছে তার আরেক নাম ছিল 'ভূতনাথের ভৃঙ্গী'।

### শ্রীপদাতিক

সে যখন প্রথম এখানে আসে, তখন এক রাখালকে সে না কি গলা টিপে হত্যা করে। তারপর সেই মৃত রাখালের বুকের ওপর বসেই একাগ্র-চিত্তে সাধনা করে বেশ কিছুদিন। এ-সংবাদ পল্লীবাসীরা জানে এবং জানে বলেই তার নামোচ্চারণে শিউরে ওঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, একদিন এই ক্ষ্যাপা তান্ত্রিকেরই প্রকৃতিগত আচরণের পরিবর্তন ঘটে অকস্মাৎ। কেবল যে আচরণেরই পরিবর্তন ঘটে তা নয়, সে তার বহুকালের সাধনপীঠ ছেড়ে পালিয়ে যায় দূরে এবং দূর থেকে দূরেই সে হারিয়ে যায় চির-কালের মতো। তার কারণ এই: তৎকালীন আরামবাগ অঞ্চলের একজন জেলে, কালীক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী গঙ্গায় মৎস্য-শিকারের অনেক সুবিধে হবে ভেবেই, সপরিবারে এসে বসতি স্থাপন করে তৎকালীন ধর্মতলায়। সে বাসা বাঁধে সেই ক্ষ্যাপা তান্ত্রিকের কুঁড়েঘরের কাছাকাছি। জাতে সে জেলে হলেও, ধর্মঠাকুরের পূজারী। এই ধর্মঠাকুরের ভরসাতেই সে নির্ভীক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। কোনো বিপদকেই সে তেমন বিপদ ব'লে গ্রাহ্য করে না। ধর্মঠাকুরের সূত্রেই সে ভাগ্যবাদী। ভাগ্যে যা আছে ঘটবেই। যদি এমন কিছু ঘটে---যা ভাগ্যবহির্ভূত, তাহলে ধর্মঠাকুরই তাকে রক্ষা করবেন। এই মনোবলের সূত্রেই সে ক্ষ্যাপা তান্ত্রিকের নামে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে, সংসার পাতে তার কুঁড়েঘরের পাশেই। কিন্তু ক্ষ্যাপা তান্ত্রিক ক্ষেপে যায় সত্যই। জেলের উদ্দেশে সে গালাগাল ছাড়ে

অক্ষয্য ভাষায়, তারপর ভয় দেখায় নানাভাবে। কিন্তু জেলের মনে বা প্রাণে ভয়ের মৃদু লক্ষণও যখন পরিলক্ষিত হলো না, তখন একদিন সেই দিগম্বর তান্ত্রিক আগুনের মশাল হস্তে নাচতে নাচতে ছুটে যায় এবং অগ্নি-সংযোগ ঘটায় সেই জেলের ঘরে। জেলে অবস্থা বুঝতে পেরেই জলের সাহায্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে তখনই। তারপর তান্ত্রিকের কাছে সে ছুটে এসেই তাকে ধর্মঠাকুরের দোহাই দিয়ে স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। তাতে ক্ষ্যাপা তান্ত্রিক ক্ষেপে ওঠে আরও বেশি এবং একখণ্ড চেলাকাঠ নিয়ে সে আক্রমণ করতে আসে জেলেকে। কিন্তু বলিষ্ঠ জেলে নিপুণ কৌশলে তান্ত্রিককে জড়িয়ে ধরেই ভূপাতিত করে এবং ওভাবেই তাকে চেপে রাখে বেশ খানিকক্ষণ। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলে: "সর্বশক্তিমান ধর্মঠাকুর আমার সহায় বলেই তোমাকে অত সহজে কাবু করতে পারলাম। এবার তুমি এখান থেকে পালাও।"

এ-কথা বলেই জেলে ফিরে যায় তার ঘরে। তারপর সেদিন রাত্রেই তান্ত্রিক তার আস্তানায় যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন জেলে না কি গোপনে এসে তান্ত্রিকের সেই কুঁড়েঘরের চামুণ্ডা মূর্তি সরিয়ে, সেখানেই প্রতিষ্ঠা করে ধর্মঠাকুরের এক কূর্মমূর্তি। পরদিন চামুণ্ডার স্থলে কূর্মমূর্তির অধিষ্ঠান দেখেই ভয়ানকভাবে চমকে ওঠে তান্ত্রিক। তারপর সম্ভবত ভয় পেয়েই সে পালিয়ে যায় অনেক দূরে—যে-দূর থেকে আর কোনো খবর তার পাওয়া যায় নি।

ক্ষ্যাপা তান্ত্রিকের অপসারণ ঘটার পর থেকে জেলে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাবই প্রাধান্য বিস্তার করে সেখানে। তারপর নাকি সেই জেলের আকর্ষণেই আরামবাগ এবং ঘাটাল অঞ্চলের আরও জেলে বা মৎস্য-ব্যবসায়ী এসে বসতি স্থাপন করে কালীক্ষেত্রের সেই বিশেষ অংশে। তারা প্রত্যেকেই ধর্মঠাকুরের পূজারী। সুতরাং প্রতি ঘরেই প্রতিষ্ঠা পান ধর্মঠাকুর। তারপর পরবর্তীকালে সেই ধর্মঠাকুরকে স্মরণ করেই সমগ্র অঞ্চলের নামকরণ হয় 'ধর্মতলা'। ধর্মঠাকুরের প্রভাব ছিল রাণী রাসমণির আমল পর্যন্ত। ধর্মঠাকুরের অগণিত ভক্ত-বৃন্দের উদ্দেশে রাসমণির পোষকতা ছিল অপরিসীম। এ-সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন:

"পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল, আরামবাগ অঞ্চল থেকে আগত মৎস্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে ধর্মতলা অঞ্চলে প্রথমে যখন এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন থেকে তাঁরা ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলনও করেন এই অঞ্চলে। কলকাতার মধ্যে তাঁদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। তাঁদের পশ্চাতে ছিল রাণী রাসমণির ভরসা ও পোষকতা। মহা সমারোহে তাঁরা ধর্মঠাকুরের উৎসব করতেন, তার গাজন হতো, মেলা বসতো। গঙ্গার ঘাটে সন্ন্যাসীরা যেতেন বর্তমান ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ওপর দিয়ে। 'ধর্মতলা' নাম এখানকার ধর্মঠাকুরের এই আঞ্চলিক প্রতিপত্তি ও উৎসব থেকেই হয়েছে। জেলিয়াপাড়ার প্রাচীন মৎস্য-ব্যবসায়ীরা কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচনা করেছেন, অন্য কেউ করেন নি। ধর্মতলার সংলগ্ন আরও অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের পূজা হতো ব'লে অনুমান করা যায়। জানবাজারে তো হতোই, ডোম-টুলি, হাঁড়িপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও হতো। ডোমটুলি ছিল ধর্মতলার ঠিক উত্তরে এবং হাঁড়িপাড়া ছিল তালতলা অঞ্চলে। ডোম পণ্ডিতরা যে ধর্মঠাকুরের পূজারী তা সকলেই জানেন।"

যদিও শ্রীবিনয় ঘোষ প্রাচীন এবং সুদুর্লভ পুঁথি-পত্রের ইঙ্গিত-সূত্রে উল্লেখিত বক্তব্য অতি দৃঢ়তার সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন তবুও মতান্তরের অভাব নেই। এ-সম্পর্কে সেকালের একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থ থেকেই এমন অনেক অভিমত অনায়াসেই আহরণ করা যায়—যা শ্রীবিনয় ঘোষের বক্তব্যকে কোনোদিক দিয়েই সমর্থন করে না। সেকালের একাধিক ইতিহাস-বিদের অভিমত এই যে, অতি প্রাচীন কালে বর্তমান টিপু সুলতান-মসজিদের স্থলেই অন্য একটি শাহী মসজিদের অস্তিত্ব ছিল—যেখানে আরও পূর্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কুক সাহেবের আস্তাবল। তখন মসজিদ-সংলগ্ন একটি দরগাও ছিল। এই দরগা এবং শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম-সমাজের ধর্মানুষ্ঠানের আসর জমতো সেখানে। তাছাড়া প্রতি মহরমের সময় মসজিদ-প্রাঙ্গণে কারবালার মেলাও বসতো নিয়মিত—যে-মেলা আনন্দের অথবা উৎসবের নয়, কেবল বিষাদের। অবশ্য বিষাদের মধ্যেও তখন জৌলুশের বৈচিত্র্য ছিল অভাবনীয়। তবে যতো বৈচিত্র্যই থাক, তার সমস্ত আয়োজনে ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক স্মৃতিই ছিল স্পষ্ট। সুতরাং উক্ত মসজিদ এবং তার নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানই পরে 'ধর্মতলা' নামের প্রবর্তন করে। এ-সম্পর্কে লঙ সাহেব বলেছেন:

"Dharmatala is so called a great mosque, since pulled down, which was on the site of Cook's stables, the ground belonged, with all the neighbouring land to Jafir, the jamadar of Warren Hastings, a zealous Mussalman.....

The Karbela, a famous Mussalman assemblage of tens of thousands of people, which now meets in the Circular Road, used then the congregate there, and by its local sanctity, gave the name to the street of Dharmatala or Holy Street."

ধর্মযাজক উইলিয়াম ক্যারী সাহেবও তাঁর The Good old days of Honourable John Copany নামক গ্রন্থে প্রায় একই ভাষায় লঙ সাহেবের উল্লেখিত বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন:

"The Karbela, a famous Mussalman assemblage, which now meets in the Circular Road, used then the congregate at that mosque, and by its local sanctity the street look its name of Dharmatala or Holy Streef."

ঐতিহাসিক ডঃ হর্নেল কিন্তু ধর্মঠাকুর এবং মসজিদ—এ-উভয়ের কোনো সূত্রকেই 'ধর্মতলা' নামকরণের কারণরূপে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন: জানবাজার অঞ্চলে তৎকালে এক মহানির্বাণ মঠ বা বুদ্ধ-মন্দিরের অবস্থিতি ছিল। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো এখানে। তাঁদের তিনটি ধর্মোপদেশের অন্যতম একটি হচ্ছে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি'। সুতরাং বৌদ্ধদের এই 'ধর্মং'-শব্দসূত্রেই 'ধর্মতলা' নামের উৎপত্তি।

একাধিক ঐতিহাসিকের বিভিন্ন অভিমতের মধ্যে কোনটি সত্যের শরণে নির্ভেজাল—আজ তা সঠিক-ভাবে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। তবে মসজিদও ধর্মের, ধর্মঠাকুরও ধর্মের, এবং সেই বুদ্ধ-মন্দিরও ধর্মানুভূতির মহান উৎস। অতএব যেভাবেই হোক, 'ধর্ম'-শব্দ থেকেই যে ধর্মতলার উৎপত্তি—সে-বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকা উচিত নয়।

অতীতের সেই ধর্মের ঐতিহ্য আজও বহন ক'রে চলেছে ধর্মতলা স্ট্রীট। তার নাতিদীর্ঘ দেহের উভয় তটে আজও বিরাজ করছে একাধিক ধর্মপ্রতিষ্ঠান। আদিকালের সেই মসজিদ এবং কিছু পরবর্তীকালের সেই আস্তাবলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিপুল গাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে আছে টিপু সুলতান-মসজিদ—যার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স গোলাম মোহম্মদ। মসজিদ-সংলগ্ন এক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে:

"This Musjid erected during the Government of Lord Auckland G. C. B. by Prince Golam Mohommed, son of the late Tippoo Sultan in gratitude to God and in commemoration of Honourable Court of Directors granting him arrears of his stipend in 1840."

তাছাড়া আছে তিনটি ঐতিহ্য-ধারী গীর্জা: দি রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ, দি ইউনিয়ন চ্যাপেল এবং আমেরিকার ধর্মসংস্থা কর্তৃক পরিচালিত দি মেথোডিস্ট চার্চ। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। তার প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস প্যাশকোয়া বারেটো ডিসুজা। তারও আগে স্থাপিত হয় ইউনিয়ন চ্যাপেল। তার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২০ থেকে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। মেথোডিস্ট চার্চটি অপেক্ষাকৃত নতুন। তাছাড়া 'স্যালভেশন আর্মির' প্রধান কার্যালয় এবং মিশনারী পরিচালিত একাধিক শিক্ষা-কেন্দ্রেরও অধিষ্ঠান ঘটেছে ধর্মতলা স্ট্রীটেই। তন্মধ্যে 'কলিনস্ ইনষ্টিটিউট' এবং 'লরেটো ডে স্কুল ফর গার্লস্' বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য। কোনো এক কালে 'ধর্মতলা একাডেমী' নামেও একটি শিক্ষা-নিকেতনের অস্তিত্ব ছিল এখানে—যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎ-কালীন মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষানুরাগী মিঃ ড্রেমণ্ড এবং মিঃ উইলসন। এই শিক্ষালয় সম্পর্কে বাংলা ১২৩৬ সালের ১৩ই পৌষের 'সম্বাদ কৌমুদী'-তে যে-খবর পরিবেশিত হয় তা এই:

"শ্রীযুক্ত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের ধর্মতলা একাডেমী নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক সাহেব ও বিবিলোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বিবেরেও উলিয়েম অদম সাহেব এবং শ্রীযুক্ত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন। কুমার অপূর্বকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক [illegible] রূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দি[illegible] পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকদের কর্তৃক কোনো কোনো বালক পুস্তক ও কেহ কেহ রৌপ্যনির্মিত গোলাকৃতি বিশেষ গ্রথিত হার উপহার পাইয়াছেন।"

ধর্মতলা স্ট্রীটেই অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ'—পূর্বে যা আর্ট স্কুল-রূপেই পরিগণিত ছিল। বর্তমানে আয়তনগত দিক থেকে তার যেমন বিস্তৃতি ঘটেছে, তেমনই বিশেষ এক মহিমার তুলাদণ্ডে ওজনও বেড়েছে মর্যাদার। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও তার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের তুলনায় কম নয়। তাছাড়া বীশক্তির ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থিবৃন্দের প্রতিযোগিতা যে চমৎকারিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল—সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ধর্মতলার সর্বাংশেই আজ বিরাজ করছে নির্জনতার জটিল বৈপরীত্য। বসতবাটীর কুটিল বিন্যাসে তার সমগ্র পরিবেশের আজ আত্মাহুতি ঘটেছে চরম অনিয়ন্ত্রণের কবলে। এপারে-ওপারে বিপণি সম্ভারেরও শেষ নেই এবং ফেরীওয়ালাদের অস্থির পদ-সঞ্চারের কোনো বিরাম নেই। তার বুক বেয়ে সমস্ত যন্ত্রণার আর্তনাদ তুলে ছুটে যায় ট্রাম, ভয়ের অতর্কিত হাহাকার তুলে দৌড়ে আসে বাস। ধুলো ওড়ে হাওয়ার গলা জড়িয়ে, শূন্যে পা ফেলে নির্ভাবনায় পারচারী করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। যেন শান্তি নেই, আরামে নিঃশ্বাস নেবারও অবকাশ নেই এক মুহূর্ত। মৌলালি থেকে চৌরঙ্গীর মোড় এবং চৌরঙ্গীর মোড় থেকে মৌলালি পর্যন্ত যেদিকেই তাকাও না কেন—সবদিকে তার একই রূপ, সেই একই ছন্দপতনের নির্মম স্বাক্ষর।

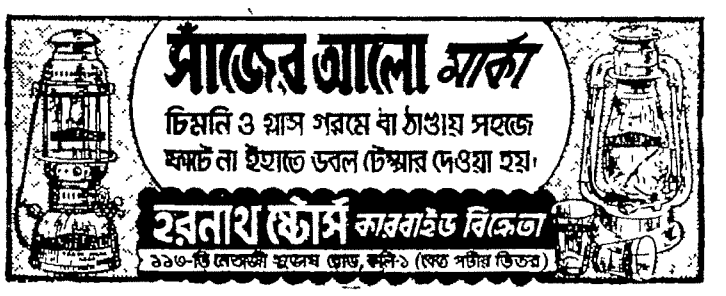

# পঞ্চমী পুরাণ

লীলা মজুমদার

(ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)

॥ তিন ॥

সুইচ থেকে তখনো হাত নামাই নি, ফণাধরা গোখরো সাপটার দিকে চেয়ে মনকে বারবার বলছি, ও কিছু নয়, টালি খসার মতো। পুরোনো বাড়িতে এও হয়। তবু হাত-পা কেমন অবশ হিম হয়ে যেতে লাগল, বুঝলাম শুধু পঞ্চমীদিদির কেন, আমার নিজেরো কত প্রাণের মায়া! উনুনে চাপানো কেটলির নল থেকে যেমন একটা আস্তে স্-স্-স্ শব্দ হয়, সাপটার মুখ থেকেও সেই রকম হচ্ছিল। শব্দটা পঞ্চমীদিদির কানেও গেল। আস্তে আস্তে মুখের চাদর নামিয়ে, একবারটি তাকিয়েই সে এমনি বিকট একটা চিৎকার দিল যে, এতকাল পরেও যেন মাঝে মাঝে সেটা কানে বাজে।

মিনিট দুই পঞ্চমীদিদি খাটে বসে সমানে চ্যাঁচাতে লাগল আর আমি সাপের চোখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চ্যাঁচানি শুনে বুড়োদাদু আর লছমি ছুটে এল, কিন্তু তারা ঘর অবধি পৌঁছবার আগেই, ঠিক যেন তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে সাপটা মাথা নামিয়ে নিয়ে সরসর করে ঘর থেকে জল বেরুবার পুরোনো নালাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। পরে হাঁকডাক করে যখন মালী খানসামা দরওয়ান সব এসে জড়ো হল সাপটাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না, নালার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করেও না।

এর মধ্যে মেসোমশাই এসে পড়ে আমাদের ভয় দেখে হেসে লুটোপুটি। 'পঞ্চমীর রোগটা দেখছি বড্ড ছোঁয়াচে, টুনি, নইলে তোমার মতো একটা বুদ্ধিসতী মেয়েও সাপ দেখতে আরম্ভ করে।'

আমি বললাম—'সাপ তো আর আমি একা দেখি নি মেসোমশাই, পঞ্চমীদিদিও দেখেছে।'

গোলমাল শুনে কখন মাসি তার রোগশয্যা ছেড়ে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে, আমি টের পাই নি। এবার সে কাষ্ঠ হেসে বললে—'তা দেখবে না? সুঁড়ির সাক্ষী যে মাতাল!' তারপর বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল—'সত্যি যদি সাপ ছিল তো তাকে পাওয়া গেল না কেন?'

এতগুলো লোকের সামনে আমি কি তাহলে মিথ্যাবাদী প্রমাণ হয়ে যাব? মরীয়া হয়ে পঞ্চমীদিদির দিকে তাকালাম, সে চাদর ছড়িয়ে খাটের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে, দুহাতে মুখ ঢেকে সমানে দুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার কথা সমর্থন করবার ক্ষমতা যে তার নেই সেটুকু বুঝলাম।

কেউ একটি কথা বলল না, ঝি চাকররাও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। মাসি লছমির সঙ্গে চলে গেলে মেসো-মশাই বুড়োদাদুকে নিয়ে তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকলেন। সেখান থেকে অনেক রাত অবধি তাঁদের তর্কাতর্কির শব্দ কানে আসতে লাগল। আজ যেন দুপক্ষেরই মেজাজ গরম।

পঞ্চমীদিদি একটুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর তাকের ওপর থেকে একরাশি পুরোনো কাগজপত্র পাড়ল, তারপর সেগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে জল বেরুবার নালার মুখ বন্ধ করল। দেরাল-আলমারী খুলে মশারি বের করে দুজনার খাটে টাঙাল, চার দিকটা ভালো করে গুঁজল। এ সমস্ত কাজেই আমি নিঃশব্দে ওকে সাহায্য করলাম। শেষে স্বাভাবিক গলায়, সে বললে, 'কাল ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড্ এনে, ন্যাকড়া করে দুজনার খাটের পায়ে জড়াব।'

আমি বলাম—'ছেলেপুলের বাড়িতে কার্বলিক আনাটা কি ঠিক হবে?'

পঞ্চমীদিদির চোখদুটি অস্বাভাবিক রকমে জ্বলে উঠল। সে বললে—'নিজের প্রাণের বড় আর কিছু নেই।' আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—'ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর বড়দাদা পুলিশে কাজ করতেন, এখন পেনসান নিয়ে টিকটিকি হয়েছেন। কাল একবার যেতেই হবে ওঁদের ওখানে।'

সারারাত ঘরে আলো জ্বলল, মশারির চার ধার ভালো করে গুঁজে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম পরদিন সকালে নিজেরি ভেবে আশ্চর্য লাগছিল। এতদিন পঞ্চমীদিদির ভয় নিয়ে ঠাট্টা করেছি, কাল রাত থেকে মনের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। আর শুধু তাই নয়, ওর সঙ্গী হওয়াটাও যে বিপজ্জনক তাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু এমন একটা অসহায়া অপ্রিয়া অভাগীকে ছাড়িই বা কি করে? নইলে আমার নিজের জন্যে সে রকম সমস্যা ছিল না; হস্টেলে এখুনি জায়গা পেতে পারি, তাও কারো দয়ার

জন্যে নয়। কলেজের পাশেই মিশন স্কুলের হস্টেল, সেখানে রোজ সন্ধ্যে-বেলায় সাড়ে ছটা থেকে আটটা অবধি মেয়েদের পড়া তৈরিতে সাহায্য করলেই, মিসেস মোমগাঁই আমাকে আদর করে নিয়ে নেবেন। ঐ সময়টুকু না হয় না-ই পড়লাম, এখানেও তো হরদম পড়ার ব্যাঘাত হয়। বরং হস্টেলে বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে পড়া যেত। কিন্তু এ বিষয় পঞ্চমীদিদিকে কিছু বলাও যাবে না, সে অমনি রাগে দুঃখে একটা কাণ্ড বাধাবে।

সে রাতে যে দুজনের মধ্যে কারো খুব গভীর ঘুম হয়েছিল তা মনে হয় না। পঞ্চমীদিদির বিছানা মাসি শঙ্করকে দিয়ে এঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে এর আগে যথেষ্ট কান্নাকাটি হয়ে গেছে, এখন আর বেচারার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। কখনো যদি নিজের কথা মনে করে দুঃখ হয়, অমনি আমি পঞ্চমীদিদির কথা ভাবি, তখুনি নিজের দুঃখগুলোকে তুচ্ছ মনে হয়।

সকালে উঠেই হাতমুখ ধুয়ে খুড়োদাদুর ঘরে গেলাম। ঘর ভোঁ ভোঁ, পুরোনো চামড়ার সুটকেসটা আর ছোট্ট বেডিংটি নিয়ে কোন ভোরে তিনি চলে গেছেন। হয়তো কাল রাতে মেসোমশায়ের সঙ্গে কিছু খিটিমিটি বেধে থাকবে, যার জন্যে এত সকালেই বিদায় নিয়েছেন। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। ঐ একটা লোকই আমার আপনার ছিল।

আরেকটু বেলা পড়লে মাসির মা'র মস্ত পুরোনো গাড়িটা এসে মাসি, সুকু, মালা আর মেনিকে নিয়ে গেল। দিদিমা নাকি বলেছেন মা'র কিঞ্চিৎ যত্ন ও শাসন দরকার, অন্তত লছমির কথা থেকে তাই বুঝলাম। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে হামের প্রকোপ, তাই তিন সপ্তাহ আগেই পুজোর ছুটি দিয়ে দিয়েছে। লছমিকে দিদিমা দু চক্ষে দেখতে পারেন না, তাই তার যাওয়া হল না; এই তো সবে এক মাসের ছুটি করে এসেছে তাই আর ছুটিও পেল না। নাকি বাবুর্চির বৌয়ের অসুখ, সে দেশে যাবে, লছমি রাঁধবে।

সত্যি কথা বলতে কি লছমি রাঁধে ভালো, এই একটা মাস খাওয়া-দাওয়া বরং আরো ভালো হবে, তবু মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে এই বিরাট বাড়িতে শুধু পঞ্চমীদিদি, আমি, আর লছমি রইলাম; মেসো-মশাই এত কম সময় বাড়িতে থাকেন যে, সে না থাকারই মধ্যে; হারু খানসামাটা মেসোমশাই বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় আর তিনি ফেরার আধঘণ্টা আগে আবার দেখা দেয়। থাকে পাশের গলিতে একটা গুদোমে, সেখানে নাকি তার ধর্মাবুদী বৌ থাকে।

এ ছাড়া অবিশ্যি মালী, ড্রাইভার, দরওয়ান, ঝাড়ুদার আছে, তবে তারা কেউ যাতে এ বাড়িতে থাকে না। এমন কি দরওয়ানকে ডাক দিলেও সে শুনতে পাবে কি না সন্দেহ, কারণ এ বাড়িটা বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত। এর সদর ফটক অনেকটা দূরে, সেই-খানে দরওয়ানের ঘর, তারপর দশ ফুট চওড়া একশো ফুট লম্বা লাল কাঁকর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে তবে বাড়ির সামনেকার ফালি বাগানে পৌঁছনো যায়। সেখানে একসারি সাবুগাছের


: প্রকাশিত হলো ভক্তিরসের প্লাবনসিক্ত গ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
কৈবল্যনাথের কথা — শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে ৬·০০

প্রলয় সেনের
যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ ২·০০ যুগমাতা সারদামণি ২·০০
যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ২·০০ যুগভগিনী নিবেদিতা ২·০০
আম আটির বাঁশী ২·০০

সুধাংশুবিকাশ দেবশর্মার
বিদেহী আত্মা ৩·০০ অবিশ্বাস্য ৩·০০

অরুণ সরকারের
দাক্ষিণায়ন ২·৫০ প্রাচীন পল্লীর প্রেমকথা ২·৫০

| | | | |
|---|---|---|---|
| সপ্তক | — অগ্নিদূত | একাঙ্ক নাটক সংকলন | ২·৫০ |
| চিরন্তন | — সুকুমার সেনগুপ্ত | উপন্যাস | ২·০০ |
| স্বপ্নশর্বরী | — গঙ্গাধর দাস | উপন্যাস | ২·০০ |
| কৃষ্ণকলি | — সুকুমার সেনগুপ্ত | কাব্যগ্রন্থ | ২·০০ |

রবীন্দ্রনাথ রায়ের
লগ বুক ২·৫০

বিমলেন্দু চক্রবর্তীর
পুনশ্চ ২·০০

সকল প্রকার রচনা প্রকাশের জন্য যোগাযোগ করুন। লেখক মহল

* প্রাতমা পুস্তক *
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা-১৪
শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলি-৯

স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, উপহারের যাবতীয় বই ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

গোড়ায় গোছা গোছা মেড়ন্ হেয়ার ফার্ন হয়ে আছে ; গাড়িগুলো বাইরে থেকে এসে গাড়িবারান্দার নিচে ঢোকে, আবার ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে ছোট্ট বাগানটিকে ঘুরে আবার সেই গলি দিয়েই বেরিয়ে যায়। সে পথে দুটি গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না, তাই দরওয়ান বড় রাস্তার ওপরে গলির মুখ আগলায়।

আমাদের যাওয়া-আসা কিন্তু এর ঠিক উল্টোপথে চলে, অর্থাৎ খিড়কি দিয়ে। বাড়ির পিছনেই একটা গলি, আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে সেই গলিটাকেই দেখা যায়, সদরের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি যোগাযোগ নেই।

মাসিরা চলে গেলে জানলা দিয়ে দেখি পঞ্চমীদিদি খিড়কিদোরের খিলটাকে পরীক্ষা করছে। দেখে আজ কিন্তু খুব বেশি হাসি পেল না। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খিড়কিদোরের ঠিক উল্টোদিকে ওপারের ফুটপাথে একটা লম্বা-চওড়া লোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের মতোই চেহারা, মুখটা দেখতে ভালোই বলতে হবে, মাথা-ভরা এক রাশ কোঁকড়া চুল, ফর্সা রং, কাটা কাটা নাকমুখ, গুরুগম্ভীর হাবভাব। কেন যে তাকে অতটা খুঁটিয়ে দেখলাম ভেবে পলাম না। পরণে সাদা সাধারণ ধুতী-পাঞ্জাবী, মুখে একটা সিগারেট। শুধু একটাই বা বলি কেন, আমার চোখের সামনে সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার একটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে ফুটপাথে পাইচারি করতে লাগল। ভাবখানা যেন কত গভীর চিন্তায় মগ্ন, কিন্তু চোখ দুটো যে আসলে এ বাড়ির ওপরেই রয়েছে সে আর বলে দিতে হল না।

পঞ্চমীদিদি যে কখন খিড়কি-পরীক্ষা সেরে ওপরে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। হঠাৎ সে বলে উঠল—'ঐ, ঐ, দ্যাখ, ডানদিকের পকেট ঝুলে রয়েছে, ওতে ওর নকল চাবিটার আছে, এক নিমেষে হাতে গলিয়ে একটা ঘুঁষি লাগালেই নাক চোখ মুখ সব একাকার হয়ে যাবে।

আমি না বলে পারলাম না,—'পঞ্চমী-দিদি, এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। ভদ্রলোক হয়তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে।'

পঞ্চমীদিদি বললে—'হুঁ, অপেক্ষা করছে সন্দেহ নেই, এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে যে সিগারেট ফেলে ফেলে ফুটপাথটাকে সাদা করে ফেলেছে।'

চেয়ে দেখি বাস্তবিকই তাই, বলি—'বাঃ, তুমি নিজেও দেখি টিকটিকি হয়ে উঠেছ। আর ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কি হবে?'

একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পঞ্চমী-দিদি বললে, 'না টুনি, সব কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাল রাতের ব্যাপারের পর, আশা করি তুমিও সে কথা বুঝেছ? এতকাল এ বাড়িতে বাস করেছ, এর আগে সাপ দেখেছ কখনো? তায় অত বড় গোখরো সাপ। কিন্তু এও আমি বলে রাখছি, এবা যতই আমার প্রাণটা নেবার চেষ্টা করবে, আমিও ততই প্রাণটার জন্যে লড়ব।'

জানলা ছেড়ে আবার খাটে বসে পড়ল পঞ্চমীদিদি, বেঁটে বেঁটে পা দুটো মাটি থেকে দু বিঘৎ ওপরে ঝুলতে লাগল। বিমর্ষমুখে বলল—'বাইরের বিপদ যদি বা এড়ানো যায়, ঘরের মধ্যে বিপদ থাকলে ঠেকাবে কি করে?'

'কি যে বল, পঞ্চমীদিদি, ঘরের মধ্যে বিপদ আবার কোথায় দেখলে?'

একটু চুপ করে থেকে পঞ্চমী-দিদি ঠোঁট চিপে বললে—'বুড়োদাদুর কথাটা ভেবেছ কখনো?'

'বুড়োদাদুর কথাটা? সে আবার কি?' হঠাৎ কি রকম উত্তেজনা বোধ করতে লাগলাম। রুক্ষস্বরে বললাম,—'কি বলতে চাইছ তুমি, পঞ্চমীদিদি? তুমি কি তাঁকে সন্দেহ কর নাকি? তাঁর কাছ থেকে তো কম উপকার পাই নি আমরা।'

পঞ্চমীদিদি পা দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে বসল। 'তা তুমি বলতে পার, একরকম বলতে গেলে তাঁর জন্যই তোমার প্রাণটা বেঁচেছিল। কিন্তু আমার কথা আলাদা।'

'কি আবার আলাদা? তোমাকে সরিয়ে ওঁর লাভ?'

'আরে, অত রেগে যাচ্ছ কেন? তোমার মেসোমশাই ঠিকই বলেছিলেন দেখছি।'

'কি ঠিকই বলেছিলেন মেসো-মশাই? অত হেঁয়ালি না করে খুলে বললেই তো পার।'

'বেশ তাই বলছি, আবার আমার ওপর চটে যেও না যেন। মেসোমশাই বলছিলেন যে হঠাৎ অবস্থা খারাপ হলে মানুষের মাথার কিছু ঠিক থাকে না। এককালে বুড়োদাদুর অগাধ সম্পত্তি ছিল, নিজের দোষেই সব খুইয়েছেন, এতে তাঁর মাথার ঠিক নাও থাকতে পারে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে বুড়োদাদু তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করছেন। আর হাসিও না, পঞ্চমীদিদি। কাল তো দেখলাম পায়ে পড়ে খুব খানিকটা কেঁদে নিলে।'

পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে ঘরদোর ঝাড়তে মুছতে লাগল, অন্যান্য ঘর শঙ্কর ঝাড়ে মোছে, এ ঘরটা ঝাড়তে মাসি বারণ করে দিয়েছে, কাজেই শুধু মুছে দিয়ে যায়। আমার তখন মাথাটা একটু গরম হয়ে উঠেছিল, তাই প্রসঙ্গটাকে ঐখানে থেমে যেতে দিলাম না। রাগতভাবে বললাম,—'তোমরা কি পাগল হয়েছ, পঞ্চমীদিদি? নিকট আত্মীয়, এত ভালো লোক, চিরকাল সমাজসেবার জন্যে নিজের পয়সা-কড়ি দু হাতে খরচ করেছেন, এখনি না হয় দুরবস্থায় পড়েছেন। এই সেদিনও আমাদের দু কাঠা করে জমি দান করেছেন—'

পঞ্চমীদিদি বাধা দিয়ে বলল—'সেই কথাই বললেন মেসোমশাই; ঐ জমি দানের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে, এমনি এমনি উলুবেড়েতে কেউ

জমি দেয় নাকি? আমরা কিছু সেখানে বাস করতে যাচ্ছি না।'

প্রাচীন ইতিহাসের বইতে আর মন বসছিল না, বই বন্ধ করে বললাম—'কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটা বল।'

হতাশভাবে পঞ্চমীদিদি বললে—'তাই যদি জানতাম, তাহলে তো বিপদ কেটে যেত। নাঃ, তোমাকে কিছু বলাটাই ভুল হয়ে গেছে, মেসোমশাই মানা করেছিলেন। তবে, বাজুর মার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

সত্যি বাজুর মার কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নি। লছমির আগে বাজুর মা মাসির কাজ করত, মাসির বিয়ে হয়ে অবধি সে এ বাড়িতে বাস করত, আমার প্রায় সারা শৈশবটাকে সে আলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছিল। মানুষটা কিন্তু ভারি সৎ ছিল, একটা পয়সায় হাত দিত না, মাসি ওর কাছে সিন্দুকের চাবি রাখত। আমার দিকে দয়া-মায়া না থাকলেও মাসিকে দিনরাত আগলে রাখত। হয়তো নিছক অনাত্মীয় বাইরের লোক হয়ে চারবেলা এ বাড়িতে খাচ্ছি দাচ্ছি পয়সা খরচ করাচ্ছি বলেই, তার আমার ওপর রাগ ছিল। মোট কথা তার জন্যে ছোটবেলায় কত যে অপদস্থ অপমান হয়েছি, লুকিয়ে কত যে কেঁদেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু মানুষটা যে সৎ ছিল এটা আমাকেও মানতে হত।

সেই বাজুর মা'র ছেলে বাজু বড় হয়ে কুসঙ্গে পড়ে গোল্লায় গেল, তখন তার খরচের টাকা মা ছাড়া আর কে জোগাবে? দিনে দিনে বাজুর মার পরিবর্তন হতে লাগল। তার জ্বালায় পয়সাকড়ি থেকে আরম্ভ করে, কাপড়-চোপড়, বই, কলম কিছু আর বাইরে রাখার জো রইল না।

প্রথমটা শুধু আমার জিনিষ নিত, মাসি বিশ্বাস করত না, টিটকিরি দিত, বলত, 'নেই-লোকদের দেখি খুব দানের হাত হয়েছে।' তারপর যখন মাসির জিনিষ নেওয়া ধরল, মায় মাসির ড্রেসিং টেবিলের টানা থেকে সোনার হাতঘড়ি পর্যন্ত, তখন তাকে বিদায় করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

পঞ্চমীদিদির কথায় হঠাৎ এত কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু বুড়োদাদুকে সন্দেহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ছোটবেলায় তাঁর এ বাড়িতে আসার দিনগুলি আমার মনের ক্যালেণ্ডারে লাল অক্ষরে লেখা থাকত। টুকিটাকি এটা ওটা আমার জন্যে নিয়ে আসতেন, সেগুলি আমি যত্ন করে তুলে রাখতাম, আজ পর্যন্ত আমার টিনের ট্রাঙ্কের সব চেয়ে তলায় রঙিন রুমালে জড়ানো তার কতক কতক রাখা আছে। সে কথা মনে করে ঢোক গিলতে গিয়ে গলায় ব্যথা লাগল।

পঞ্চমীদিদি অদ্ভুত একটা চাপা উল্লাসের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে ছিল, আমি দৃঢ়স্বরে বললাম—'একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।' এই বলে বইটা খুললাম।

পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে বলল—'কেন, বিশ্বাস না করার কি আছে? ওঁরও তো শুনেছি উড়নচণ্ডে একটি ছেলে আছে। পয়সাকড়ি নেই তার খরচ জোগাবে কে?'

রেগে বললাম,—'তুমি মলে কি তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক হবেন নাকি?'

একটু হাসল পঞ্চমীদিদি, 'হতেও পারেন, ওঁকেই তো সর্বস্ব উইল করে দিয়েছি।'

'কি সর্বস্ব? ভাঙা ট্রাঙ্কে কয়েকটা পুরোনো কাপড়-চোপড়, ওঁরই দেওয়া একটা সোনার হার আর ওঁরই দেওয়া দু কাঠা জমি, এই তো?'

এবার পঞ্চমীদিদিও রেগে গেল। উঠে পড়ে বলল—'দেখ, যাদের তিন-কুলে কেউ নেই, একটা মুখবাঁধা ছালায় যাদের খুঁজে পাওয়া গেছল, তাদের মুখে এত কথা শোভা পায় না। তাছাড়া কতবার বলেছি না তোমাকে বারুইপুরে আমার শ্বশুরের অনেক সম্পত্তি ছিল, তার অর্ধেকের মালিক আমি। না হয় দেয় নি কিছু, কিন্তু সেখানে গিয়ে তার ঘর-দোরের দেখাশুনো করতে দেওয়ার কতবার বলে পাঠিয়েছে তা তো তোমাকে বলেছি। তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কি করতে পারি।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না দেখে পঞ্চমীদিদি উঠে পড়ে আবার জানলার ধারে গেল। 'ইস, দেখেছ, ও লোকটা গেছে, তার জায়গায় একটা গাঁট্টাগোট্টা পাহাড়ি লোক ডিউটি দিচ্ছে। এবা যদি তোমার পেয়ারের বুড়োদাদুর চর না হয় তো কি বলেছি।'

সকালের মিষ্টি রোদটা কি করে গেল?

( ক্রমশঃ )

# দুটি কবিতা

অরুণাচল বসু

প্রাণের কণ্ঠে গান উঠেছিলো ভেসে
মাটির মরম-মন্থিত আশ্লেষে
তালবনে সুর চেলেছিল পৌষ হাওয়া
যায় নি তখনো শিশিরের স্বাদ পাওয়া,
চাঁদকে ফাঁসীর নিরস্ত কোনো মুখ
হয় নি ঠাহর; চঞ্চল উৎসুক
জীবনের সেই অনাহত পার থেকে
একটি স্মৃতির পালক পাঠালো—সে কে?

এ-তপস্যা অশ্রুর প্রেমের
তুমি একে স্পর্শ দিও, প্রিয়,
ক্লান্তির বিপুল ধূলি-ঝড়ে
রুদ্ধ চোখ, বিহ্বল উদ্যম।
তবু এরা তোমারই প্রান্তরে
শক্তির সমস্ত শস্য রেখে
অতর্কিত মূর্ছায় অসাড়—
তুমি তুলো বিস্মিত প্রাণনে।

সুশীল রায়

# অনলআয়তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নীচে ঝাড় আলোর ও গেলাসী বাতিদানের এই তুমুল আস্ফালন দেখে, জ্যোৎস্নার অন্তরালে মুখ ঢেকেছে তারারা। দু-চারটে নির্লাজ তারা আকাশের একপ্রান্ত থেকে উঁকি দিয়ে চঞ্চল চোখ মেলে কৌতূহল নিবারণ করছে। কি হচ্ছে ওই অগাধ নীচে, মর্ত্যের দেশে স্বর্গের এই উৎসবসজ্জা কেন?

এ কেনর উত্তর পায় না কেউ। কে কোথায় পেয়েছে সব কেনর জবাব। চাঁদের কাঁধের পাশ দিয়ে যে-শিশুতারাটি তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, সেও পাচ্ছে না এই কেনর উত্তর। তবু সে তার খুদে চোখ দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ওপর থেকে চেয়ে দেখছে ওরা। কিন্তু নীচে থেকে কেউ তাকাচ্ছে না ওপর দিকে। আকাশের ওই চাঁদের আননে কোনো শোভা আছে কি না আছে তা পরখ করার অবসর কোথায়। আজ সকলেই নিজের চারিপাশ নিয়ে বিব্রত। চারিপাশ ঘিরে বসে আছে যে চন্দ্রাননেরা।

ওপর থেকে ওরা বুঝতে পারছে না, কি ঘটছে এখানে। কিন্তু আমরা নীচের মানুষ। আমরা তাই এই উৎসব-ঘটার অর্থ বুঝতে পারছি। পূর্ণিমা।

মাহেশের স্নানযাত্রার উৎসব চলছে।

জলে চলেছে অনর্গল হাসি-গান। ডাঙায় বেচা-কেনা। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। জ্যোৎস্নার বন্যায় দিনের আলোর মতই আলোকিত হয়ে উঠেছে এই ডাঙা। এখানে দোকানে-দোকানে দরদস্তুর করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জনস্রোত।

গোলাপি খিলি সেজে সেজে কূল পাচ্ছে না, কানে ঝুমকো দোলানো ওই যুবতীটি। মাদুরের দোকান থেকে তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি পড়েই আছে।

শ্রীরামপুরের পাদ্রি সাহেব যীশুর গুণগান করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় কান নেই কারো।

কালীঘাটের পটুয়ারা পট সাজিয়ে ফেলেছে। দু পয়সায় তোফা তোফা ছবি, কত ছবি তার শেষ নেই। —মাথার কাছে তাকিয়া নিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে এক কন্যা; জোড়া মেয়ে ওড়না হাতে নিয়ে নৃত্য করছে; মাথায় টেরি কাটা, গায়ে কালো কোর্তা, কাঁধে চাদর—ফুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন কোঁচানো কোঁচা হাতে নিয়ে, তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আছে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী এক হাতে ফল অন্য হাতে পোষা টিয়া নিয়ে বসে আছে স্থূলকায়া এক মেয়ে; আহা মরি মরি—কালাপেড়ে মসলিন গায়ে জড়িয়ে, চোখে সুর্মা টেনে, হাতে গোলাপ ফুল ধরে এ কে গো পীন-পয়োধরা; দু হাতে দুই ফুল—এক হাত মাথায় তোলা, এক হাত বুকে রাখা—চোস্ত হয়েছে তো এই নায়িকার চিত্র; ছবির শেষ নেই—কানে ফুল নাকে নোলক, গলায় চিক, দু হাতে মোটা মোটা রূপোর বালা, পায়ে মল—হাতে ধরা রূপা বাঁধানো হুঁকা—তামাক সেবন করছেন এই সুন্দরী; পাশেই উনি বাজাচ্ছেন বেহালা; বা বা, গলায় বিছে হার, পায়ে পাঁইজোড়, জোড়াসন হয়ে ব'সে কোলের গর্তে বাঁয়া নিয়ে তবলা বাজাচ্ছেন এই তরুণী; পাশেই উনি কানে পরছেন দুল; ফুলের সুবাস নিচ্ছেন ইনি; আর ওদিকে উনি কি করছেন—দর্শকরা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল—বাঁ হাতে একটি মস্ত পটল তিনি চিরছেন বুঝি; আর পটল দুটি চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে এদিকে আছেন চেয়ে, ওই চোখ-দুটি ঠিক যেন পটলচেরা।

পটুয়ারা শুধু বসে নেই। তারা তাদের পটের ব্যাখ্যা করে চলেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন শুনছে, না, গিলছে ওই জমায়েত যাত্রীরা।

পনের দিন বাদে রথ, এখন থেকেই

তার মেলা বসে গিয়েছে। ঐ যে বাবুলোকরা এসেছেন বড় বড় না' ভাসিয়ে, ওঁদের কাছে সোটারকম কারবার করার আশা রাখে এই ব্যাপারীরা।

কয়েকটা পট এই রাত-দুপুরেও বিক্রি হয়ে গেল। এমনি কত পটের বিবি নিজেদের বিক্রি করছে এই মেলার পিছনের ওই ছাউনিগুলিতে, তার হিসাব আমরা নাই-বা নিলাম।

কিন্তু যে-হিসাব নেওয়ার জন্যে চুঁচড়া থেকে ওই নৌবহরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই ঘাটে এসে পৌঁছেছি, সে-হিসাব না নিলে তো চলে না।

তবে চলুন, হে পাঠক, হে পাঠিকা, এই মেলার প্রান্তর পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলুন ওই গঙ্গার্কিনারে। ওখানে যে-ঘটনা এখন ঘটছে তা লিখতে গিয়ে ইচ্ছে করছে ছুঁড়ে ফেলি এই কলম।

আশা করি, আপনারাও অনুমান করতে পেরেছেন সব। এখানে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারি যে, আপনাদের অনুমান ঠিকই। অতএব আমাকে যে-ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে অনুগ্রহ করে আপনারা অনুরোধ করবেন না।

লিখেও অনেক কথা বলা যায়, আবার না লিখেও না কি জানানো যায় আরো অনেক কথা। আপনাদের এখানে যে কথা জানাবার আমার ইচ্ছে, যে-ঘটনা আপনাদের দেখাবার জন্যে ডেকে নিয়ে এলাম এই গঙ্গার্কিনারে, এখানে পৌঁছেই আমার সমস্ত পরিকল্পনা গেল বানচাল হয়ে। ভেবেছিলাম, এ আবার এমন কি ঘটনা, বেদনার্জর যে গৃহবধূ স্বামীর উপেক্ষায় ও অবহেলায় অধীর হয়ে একটি ভয়ানক ঝাঁপ দেবার জন্যে সঙ্কল্প করেছে, এখন সে দিচ্ছে সেই ঝাঁপ। রাত্রিশেষের ক্লান্তিতে যখন সকলের চোখে নেমে এসেছে তন্দ্রা, যখন বজরায় ভাউলেতে ও পালোয়ারে আর কোনো ব্যস্ত সমাগম নেই, যখন থেমে গিয়েছে নূপুরের ধ্বনি ও কণ্ঠের সঙ্গীত, যখন নিস্তেজ হয়ে দাঁড়ের ও বৈঠার গায়ে এলিয়ে পড়েছে মাঝিমাল্লারা, তখন, সেই সুবর্ণ সুযোগে, সেই গৃহবধূটি তার পিনিস পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে নেমে গেল পার্শ্বে অপেক্ষমাণ ঐ দুই-তলা পানসিতে। নেমে গেল সে, সমাজ-সংসার-ধন-ঐশ্বর্য সব পরিত্যাগ করে সে নেমে গেল। কত নীচে সে নামল এখন পরিমাপ করা গেল না, কিন্তু সোনার প্রতিমাটি বুঝি নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্যে বিসর্জন দিল আজ নিজেকেই।

সেইজন্যেই ইচ্ছে করছে ছুড়ে ফেলি এই কলম, সেইজন্যেই ও-ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে এই সঙ্কোচ। এবং সেইজন্যেই অনুরোধ, আপনারা অনুমান করেছেন তার বেশি কিছু এখানে লিখে দিতে আমাকে আর বলবেন না।

একটা ভয়ঙ্কর শপথ রক্ষা করেছে রাধারাণী। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অদৃশ্য করে নিয়েছে নিজেকে। তার মা বাবা আর ভাইয়েদের কানে যখন পৌঁছবে এই সংবাদ, তখন তারা সহ্য করতে পারল কি পারল না, তা দেখতে আমরা আর যাব না সেই ফরাসগঞ্জের নিভৃত গৃহে। তাদের উঠোনের আমগাছে নূতন বোল দেখা দেবে, নিত্য প্রাতে ডেকে উঠবে ভোরের পাখি, কুয়োতে নিয়মিত পাওয়া যাবে শীতল জল। কোনো-কিছুরই বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়তো ঘটবে না, কিন্তু তাদের গৃহের মানুষদের মন নিশ্চয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে বেদনায়। গাঙ্গুলীবাড়ির পিসিমা আজও বেঁচে আছেন কি না, আমরা জানি নে। যদি জীবিত থেকে থাকেন, তিনি এসে কি কুশল প্রশ্ন করবেন হরিশঙ্করকে, কিম্বা ঐ গৃহের গৃহিণীকে—হেমাঙ্গিনীকে। হাটকেরতা মেয়েরা এসে যখন জড় হবে ঘাটের উঠোনে, তারা যখন জানতে চাইবে—কেমন আছে গো ঠাকরুণ তোমার মেয়ে? তখন কি উত্তর দেবেন হেমাঙ্গিনী? যে-মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে হরিশঙ্কর এতবার করে জানিয়েছিলেন তাঁর মনের বাসনা, তিনি আজ তার নিরুদ্দেশ মেয়ের উদ্দেশে কী প্রার্থনা জানাবেন? কাল হল বুঝি তাঁর শান্তিপুর-যাত্রা, ধনীভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি কিসের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, কেন তিনি সম্মত হয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে ঐ হাটের মাঝে সাজিয়ে-গুজিয়ে বাইবাজা বানাতে?

রাজা হল শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ ভাবে মনে
এমন রাজার দেশে থাকিব কেমনে॥
হাতে রাজদণ্ড নাই, নাই সিংহাসন
কেবল শাসন আছে এ-রাজা কেমন॥

ভোর চমকে উঠেছে পরিচিত বাগানবাড়িতে, নিরুপমা তাঁতে বসে খুটখুট শব্দে মাকু চালাচ্ছে আর গুন্ গুন্ করে নিজের বচা বাইবাজার কাহিনী আবৃত্তি করছে। আনটুনি এখনো ঘুমচ্ছে অকাতরে। কবিগালের ঘুম


সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলুক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

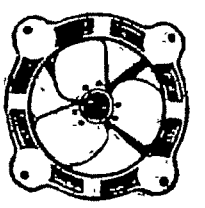

মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ৯টা

হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

ভাঙবে কখন কে জানে। অত বড় উৎসব চলেছে ঐ মাহেশে, নদীতে অত জনকল্লোল, কিন্তু এই ফিরিঙ্গিটার কোনো মন নেই ও-উৎসবে। কেলির কুঠির সামনে দিয়ে বজরে কাতারে কাতারে মানুষজন চলেছে কলকল করতে করতে, হুশহাশ শব্দে চলেছে পাল্কি, তড়বড় শব্দে পল্টনদের ঘোড়া—এত শব্দ চারদিকে, তবু মানুষটা ঘুমোয় কী করে অকাতরে?

অমনি অকাতরেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল রূপনারায়ণও।

চোখে জল নিয়ে, মুখে দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আর আশঙ্কার চিহ্ন যথাসম্ভব কুটিয়ে তুলে তার পিনিস থেকে চাঁপা এসে হাজির হল রূপনারায়ণের বজরায়।

ডাকতে লাগল কেঁদে কেঁদে, বাবু গো। ও বাবু! বাবু—

অনেকক্ষণ ধরে ডাকল চাঁপা। উত্তর না পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সে, বলল, বাবু গো, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

কালো গোঁফ বেঁকে ঢুকে পড়েছিল মুখের মধ্যে, নাক দিয়ে নিশ্বাস না নিয়ে রূপনারায়ণ মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঘুমচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার স্বপ্নের মধ্যে কেউ বুঝি ডাকছে তাকে।

আরো কাঁদতে লাগল চাঁপা, রূপনারায়ণ তাকাল।

চাঁপা বলল, বাবু গো। কি সর্বনাশ হল। বৌদি নেই।

—কী হল কথাটা? রূপনারায়ণ ভালো করে চেয়ে বলল, কি হল?

—বৌদি নেই গো, বৌদি নেই।

কৈজ বক্সের দুই পা ছিল বুকের ওপর, দুই হাতে সে পা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে বসল রূপনারায়ণ, বলল, কি?

—নেই। নেই গো। কোথাও নেই। পিনিসে নেই, ভাউলেতে নেই, পালোয়ারে নেই। ছুটে এলাম এখানে, এখানেও নেই।

গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল চাঁপা, কোথায় গেল গা বৌদি।

এত কান্নার শব্দে সকলেরই চোখ থেকে বুঝি ছুটে গেল নেশা। সকলে উঠে বসল।

রূপনারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে বলল, আছে নিশ্চয় কোথাও। মেলায় গিয়েছে হয়তো। বড়ডই সাহস। ঘরের বৌকে আস্কারা দিতে নেই। একটু প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে অমনি স্বাধীন হয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা—

কঠিন হয়ে আর শক্ত হয়ে বসল রূপনারায়ণ—এবার পেলে হয়। বেনিয়ান রূপচরণের পুত্রবধূ সে, সে খেয়াল নেই। সাধারণ যাত্রীরা যেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলায়, ওঁরও সাধ হয়েছে বুঝি তেমনি। ছোটঘরের মেয়ে হলে যা হয়।

রূপনারায়ণ বিশেষ ব্যস্ত বুঝি হল না। তার আশা আছে, শুধু আশা কেন, সে নিশ্চিত —ওই মেলার হল্লা দেখার জন্যে নেমে গিয়েছে সে। সকলে ঘুমে অচেতন, এই সুযোগ নিয়ে সে বুঝি গিয়েছে তার মনের বাসনা পূর্ণ করতে।

—ছি, দাদাবাবু। চাঁপা সজল চোখে বলতে লাগল, ও-কথা মুখে আনতে নেই। আমাদের বৌদি কি জাতের মেয়ে তা তো জানি। সাধ্বী নারীর নামে ও-সব কথা ভাবতেও নেই, দাদাবাবু।

কিন্তু ভাবনা চিন্তার বাইরে আজ সকলে। এদিকে এরা বসে-বসে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ওই বধূটির আচরণে, আর রাঙা চোখগুলি আরো যেন রক্তরাঙা হয়ে উঠছে ক্রমশ।

পূব আকাশে রক্ত ছিটিয়ে তখন উঠে আসছে সকালের সূর্য। ভোর-রাত্রের মুমূর্ষু জ্যোৎস্নার আড়ালে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, অকৃপণ আলো নিয়ে দেখা দিল সূর্য হয়তো তার পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করতে।

অনুসন্ধান আরম্ভ হল তখন থেকেই। সমস্ত নৌকোয় ছড়িয়ে গেল সংবাদ। সকলেই ব্যাপৃত হল সন্ধানে, সেই-সঙ্গে নানারকম আলোচনাও চলতে আরম্ভ করল, নানারকম মন্তব্য, নানা-রকম হাসি ও মশকরা। ওরি মধ্যে কেউ কপালে করাঘাত করছে, কেউ বাজাচ্ছে বগল।

জলে যেমন সন্ধান চলেছে, ডাঙাতেও তেমনি। রূপনারায়ণের নির্দেশে থানাদারের শরণাপন্ন হয়েছে মোতিলাল আর নরহরি। তিনি ভার নিলেন অনুসন্ধানের।

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমেছে মাহেশে। সেই মানুষদের উদ্দেশ করে ঢেঁটরা পিটিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে চৌকিদারেরা—

চুঁচুড়ার রাধারাণী। গায়ে গয়না, পায়ে পাঁইজোর, গলায় সাতনরী। হারিয়ে গেছে। সন্ধান পেলে থানা-দারকে জানাও।

ঘাটে ঘাটে ঢেঁটরা বাজছে, ঘাটে ঘাটে ওই আওয়াজ। জলে ডুব দিতে চমকে উঠছে স্নানার্থীরা ঐ শব্দে। ফিক ফিক হাসছে আবার কেউ কেউ।

বল্লভপুর আকনা রিসিড়া পর্যন্ত বেজে বেজে চলে যাচ্ছে ঢেঁটরা। কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না এখনো। বেলা দুপুর বেজে গেল।

অটল হয়ে বসে আছে রূপ-নারায়ণ। তার নেশা একেবারে কেটে গিয়েছে, একেবারে জীয়ন্ত মানুষ হয়ে বসেছে সে।

চাঁপার কান্নার বিরাম নেই। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। চোখের জলে মুছে গিয়েছে অলকা-তিলকা।

জগন্নাথদেবের স্নান এবার। সমস্ত জনতা এসে দাঁড়িয়েছে এখন কিনারে। এই স্নান দর্শনের জন্যেই তাদের আগমন, এই জন্যে সকলের মধ্যেই এর দর্শনলাভের জন্যে ব্যাকুলতা। এখন তারা ভুলে গিয়েছে বুঝি চুঁচুড়ার রাধারাণীর কথা। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা ওই জগন্নাথ।

মিসলবন্দী হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে করতে মন্দির থেকে জগন্নাথকে নিয়ে আসছেন পাটবস্ত্রধারী

পুরোহিতেরা। চারদিকে উঠেছে জয়ধ্বনি, কলরব আর কোলাহল।

বজরার জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রূপনারায়ণ। সে দেখতে লাগল, পুরোহিতেরা জগন্নাথের মূর্তি বক্ষে ধারণ করে ভাগীরথীর জলে নেমে চলেছেন।

জানলা থেকে মুখ সরিয়ে চাঁপার দিকে চেয়ে রূপনারায়ণ ডাকলেন, মাপিতানি।

চোখ তুলে তাকাল চাঁপা।

রূপনারায়ণের বুঝি মনে পড়ে গেছে ভামিনীর কথা, বলল, তোমার বৌদি ঝাঁপ দেয় নি তো জলে?

—কি করে বলব, দাদাবাবু। কিছুই আমি ভাবতে পারছি নে।

রূপনারায়ণ আবার বসে রইল চুপ করে। বেলা গড়িয়ে চলল ক্রমশ। বিকেলও হয়ে এল। ফিরে যেতে হবে তাকে, কিন্তু ফিরে গিয়ে কি বলবে সে চুঁচুড়ার লোককে। তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় রেখে এলে তোমার ঘরের বৌ। কি উত্তর দেবে রূপনারায়ণ।

ঘটনা তো গোপন রাখা হল না। ইস, বড় ভুলই হয়ে গেল। থানা-দারোগা না করলেই হত। ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল সকলকে ঐ খবর।

ফৈজের মুখের দিকে তাকাতে বুঝি সংকোচ হতে লাগল রূপনারায়ণের। কিন্তু ফৈজের কোনো সংকোচ নেই, সে একদৃষ্টে রূপনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে শক্ত হয়ে বসল, রূপনারায়ণ। নিজের মনেই বুঝি বলল, যেমন বংশের মেয়ে তেমনিই হবে।

চাঁপা যেন কিছু বুঝল না, তার দাদাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকলকে জানান্ দেবার মত করে এবার বলল রূপনারায়ণ, এই জন্যে ঘরে বৌ আনার সময়, তার শুধু রূপ দেখে নয়, তার ঘরের কথা ভালো করে জেনে নিয়ে আসতে হয়। যেমন ঠাকুরমা, তেমনিই তো হবে তার নাতনি। ঘেন্নার কথা।

ঘৃণায় বুঝি নাসা কুঞ্চিত হয়ে আসতে লাগল তার, জ্বলে উঠতে লাগল সর্বাঙ্গ। এমন অঘটন ঘটে গেল কি করে—এই তার একমাত্র জিজ্ঞাসা ও একমাত্র বিস্ময়। নরহরিকে বা মতিলালকে পুনরায় হুকুম করার ইচ্ছে হল না রূপনারায়ণের। যদিও সে জানে, হুকুম করা মাত্র তারা গিয়ে আবার খোঁজ আরম্ভ করবেই।

সারাটা দিন তন্ন তন্ন করে যার খোঁজ করে কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তাকে আর কি করে পাওয়া যাবে এই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে?

কিনারে জনকলরব বেজে চলেছে একটানা। ঐ কলরব থামতে এখনো অনেকদিন বাকি। সোজারথ হবে, উল্টোরথ হবে, তবে কমবে ঐ সমস্ত ভিড়। সমস্ত ভিড় সরে যাবার পরও যদি, জীবন্ত মানুষটির বদলে তার কঙ্কালও খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও বুঝি শান্তি।

শান্তি, খুঁজছে রূপনারায়ণ। তার জীবনের এত আনন্দ, এত প্রমোদ, এতো স্ফূর্তি—তবু কি না শান্তির জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে সে।

ফৈজ বক্স কথা বলল এতক্ষণে, সারাদিন সে হতভম্ব হয়ে বসে ছিল, মিহি সুরে মোলায়েম করে ডাকল, রাবুজি।

একটু বুঝি চমকেই উঠল রূপনারায়ণ, ঐ যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে বীণ, তার তারে কেউ আঙুলের স্পর্শ দিয়ে এই আওয়াজ তুলল, না, এ সত্যিই কারো গলার স্বর?

রূপনারায়ণ এতক্ষণে ফৈজের মুখের দিকে তাকাল, ও-মুখে কোনো বিষাদ নেই, বেদনা নেই, উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই, ফুল্ল নলিনীর মত প্রসন্ন ঐ মুখ; রূপনারায়ণ বলল, বলিয়ে।

ফৈজ বলল, আফসোস কেঁও বাবুজি। এক জরু চলা গিয়া। লাখো জরু মিল জায়েগী।

চলা গিয়া? সত্যিই যদি জানা যায় যে, সে চলেই গিয়েছে, তাহলেও তো কথা ছিল। কিন্তু কিছুই যে জানা যাচ্ছে না—এই জন্যেই তো আফসোস। পানিমে গিয়া, কি, ডাঙামে গিয়া, কি, জাহান্নামমে গিয়া—কাঁহা গিয়া, বাৎলায়গা কৌন?

পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠল ঝুম ঝুম শব্দে, নড়ে চড়ে বসল ফৈজ। কিছুক্ষণ বসে থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে যেন আদেশ করল, বলল, মুন্সিজি, বোল বোলাও।

তবলায় বেজে উঠল বোল, সমস্ত শরীরে পুলকিত শিহরণ জাগিয়ে তুলল ফৈজ। থুৎনিতে একটা আঙুল ছুঁইয়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে অপাঙ্গে রূপনারায়ণের দিকে চেয়ে গানের সুরে বলল—

আ জা আ জা,
এ বাবুজি আ জা—
দিল্লাগি ছোড় দোও বাবু
আও দিল্‌কি রাজা।

চাঙ্গা হয়ে বসল সকলে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পাক খেয়ে খেয়ে নাচতে লাগল ফৈজ বক্স।

পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল আবদারেরা। তাদের হাত থেকে গেলাস টেনে নিয়ে নিয়ে আকণ্ঠ পান করতে লাগল রূপনারায়ণ।

পুলকিত হয়ে উঠল বজরা। ঢেউয়ের দোলে দোলে কিংবা ফৈজের পদপাতেই বুঝি নেচে উঠল জলের উপর।

সন্ধ্যা নেমে এল ধীরে ধীরে মাহেশের কিনারে। অন্ধকারের নেপথ্য থেকে স্নানযাত্রীদের কলকণ্ঠধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু তাতে এখানকার এই নৃত্যগীতের কোনো বিঘ্ন ঘটছে না।

ফৈজ অনুনয় করে ডেকে ডেকে গেয়ে যাচ্ছে, সেই গানের সঙ্গে চলেছে নৃত্য। কতক্ষণ ধরে এ-নাচ চলবে কেউ জানে না। আলোকোজ্জ্বল

বজরার অভ্যন্তর থেকে সুরেলা আওয়াজ বেজে উঠছে চমকে চমকে—

আ জা আ জা আ জা
আ জা দিল্‌কি রাজা।

পায়ের আলতা দিয়ে পদ্ম ফোটাচ্ছে না ফৈজ, সে এখন তার চোখের ও মুখের ভাষা দিয়ে বুঝি বসরাই গোলাপ প্রস্ফুটিত করে তুলছে এই পাটাতনে। সে ফুলের গোলাপি বর্ণের ছোপ লেগেছে রূপনারায়ণের চোখে, সে বুঝি তার সৌরভও পেয়ে গিয়েছে।

তার জীবনে কি ঘটেছে বা কি ঘটবে—এসব সামান্য ও সাধারণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে সে এখন ইচ্ছুক নয়। হাজার হাজার বছর, লক্ষ শত বছর সে ঐ গানে কান পেতে এইখানে ঠিক এইভাবে বসে থাকতে রাজি। সব দুঃখ বুঝি ভুলে গিয়েছে রূপনারায়ণ,—সব বেদনা সব উদ্বেগ।

দুবার উপর বিছিয়ে দিলে মিলিয়ে যায় যে-মসলিন, সেই সূক্ষ্ম সবনাম দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করেছে ফৈজ। আবৃত করেছে বটে, কিন্তু তাতে কোনোরূপ আবরণ হয়ে ওঠে নি। বার-বার ঐ গান গেয়ে সে যখন দুটি আঙুলে তার হৃদয় দেখিয়ে দিয়ে বলছে—

আ জা দিল্‌কি রাজা।

তখন রূপনারায়ণের বুঝি ইচ্ছে হচ্ছে সে তার হৃদয়টা উৎপাটিত করে ফৈজের অঙ্গের তরঙ্গমের নিভৃতে তা জিম্মা রেখে দেয়—ঐ সৌখিন আংরাখায় ফৈজের অঙ্গরক্ষা হচ্ছে কতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আসরে উপস্থিত সকলের প্রাণরক্ষা করা বুঝি দায় হয়ে উঠছে।

গোলাপি রঙের রেশমি রুমাল নেড়ে নেড়ে রূপনারায়ণ ফৈজের নাচের তারিফ করছিল। সে রুমালে একগুচ্ছ মোহর বেঁধে ছুঁড়ে দিল ফৈজের পায়ের কাছে। ফৈজ ফিরেও তাকাল না সেদিকে, চোখে কটাক্ষ জানাতে লাগল শুধু এবং তার দিলের রাজাকে বার বার অভ্যর্থনা করতে লাগল যেন তার তরঙ্গমের নিভৃতে।

গান থামল। ক্লান্ত হয়েছে বুঝি ফৈজ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জেগেছে কপালে। পাখাবরদারেরা ইঙ্গিতমাত্র ফৈজের শরীরে বীজন করতে আরম্ভ করল।

একটু পরে বসে রূপনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে ফৈজ মিষ্টি হেসে বলল, আওরৎকা হাল তো এইসাই বাবুজি। মোহর ভি দিয়া বাবুজি, আপকা বহৎ মেহেরবানি।

ফৈজ কি বলল, বিশেষ-কিছু বুঝতে পারল না রূপনারায়ণ। তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল, কালো প্রজাপতির মত গোঁফজোড়া কেঁপে কেঁপে উঠল মাত্র।

ফৈজ বুঝেছে কত বড় অঘটন ঘটে গিয়েছে। নাচনেওয়ালি আর বাইজি নিয়ে মৌজ করতে যেখানে আসে সাহেবানেরা, জরু নিয়ে সেখানে এল কেন এই বাবুজি, এই বুঝি তার জিজ্ঞাসা। কিন্তু সে-কথা তো সত্যিই জিজ্ঞাসা করা যায় না। বাইজি ফৈজ তাই আওরৎদের হালের কথা বলে, আর বাবুজির মেহেরবানির কথা বলে।

নৌকোয়-নৌকোয় নৃত্যোৎসব চলেছে। কখনো ভেসে আসছে কারো গলার গান, কখনো বা কারো পায়ের নূপুরের শব্দ, কখনো-বা কোনো হল্লা।

সেইসব শব্দে কান পেতে ফৈজের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে রূপনারায়ণ। ভালো করে মনে পড়ছে না সেই মুখটা, কিন্তু সে-মুখটা কি এই-মুখটার চেয়ে কিছু হীন? মনে হয় না।

তাকিয়ার পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে রূপনারায়ণ ডাকল, আবদার।

তৈরিই ছিল তারা, বাবুর হুকুম তামিল করতে ছুটে এল।

এমন সময় তার বজরায় এসে হাজির হল এ কে? ভুরু টেনে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করল রূপনারায়ণ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই চিনতে পারল সে। হেসে বলল, এস মুকুন্দ।

পাথুরেঘাটার মুকুন্দরাম উড়ুনিটা গলায় জড়িয়ে নিতে নিতে সে বসল। তারপর রূপনারায়ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি সব আলোচনা করতে লাগল। সে না কি কিছুই জানত না, একটু আগে শুনল। এ পারে ছিল না সে, ঐ পারে সুখচরের কিনারে নৌকো বেঁধে ফুর্তি করছিল। খবরটা শুনেই চলে এসেছে। তার আসার আরো কারণ অবশ্যই আছে। দিল্লির সেই নামজাদা নাচিয়ে ইয়েকে—মানে ফৈজ বয়কে—নাকি নিয়ে এসেছে রূপ—

রূপনারায়ণ বলল, হ্যাঁ। এই সেই।

সোজা হয়ে বসে মুকুন্দ বলে উঠল, তবে চলুক নাচ, চলুক বাজনা। কত হাজার হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে এইখানে কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে, তার জন্যে ফুর্তি বন্ধ থাকে কেন, চালাও ফুর্তি—

গেলাসটা মুখের ভেতর উপুড় করে ঢেলে মুকুন্দ বলল, এই জলের উপর লিখে রেখে যাব নাম; মুছবে না, মুছবে না, মুছবে না। আর, নাম যদি মোছেই, মুছুক। মুছবে না আমাদের কীর্তি, ঐ ঢেউ টলমল করে বলবে,—শুধু বলবে—

রূপনারায়ণের গায়ের উপর চলে পড়ে মুকুন্দ বলল, কি বলবে, রূপ? কি বলবে এই হুগলী-নদীটা?

উত্তর দিল না রূপনারায়ণ।

(ক্রমশঃ)

বাংলা কথাশিল্পী
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী
একখানি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও
একখানি অপর রচনা—মূল্য ৩৲ টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

# অপমানিতা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালো সুতপা। বাসস্টপ থেকে বেশ খানিকটা পথই রোজ ওকে হাঁটতে হয়।

ও বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। ছাই কোলকাতা শহরে কি তাড়াতাড়ি কোন কাজ করবার উপায় আছে। কতক্ষণ ও দাঁড়িয়েছিল ধর্মতলার মোড়ে। কোন বাস বা ট্রামেই ও উঠতে পারে নি এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে উঠতে পেরেছে একটা বাসে। তার জন্য কত রকম কথাই যে শুনতে হয়েছে ওকে। কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে বলেছে, 'এ গাড়িতে উঠবেন না। লেডিজ সিট নেই।' যাত্রীদের অনেকেও বাঁকা কথা শুনিয়েছে। কিন্তু কোন উপায় ছিল না ওর। যে করেই হোক সন্ধ্যার মধ্যে ওকে বাড়িতে পৌঁছতেই হবে। না হলে মিসেস রায় অপমানের শেষ রাখবেন না।

একান্ত বাধ্য হয়েই ওকে গভর্নেসের এই কাজটা নিতে হয়েছে। কাজটা অবশ্য এমন কিছুই নয়। ধনী মহিলা মিসেস অনুপমা রায়কে সাহচর্য দেওয়া। আর তার টুকিটাকি কাজ করা। মাইনে অবশ্য ভালই দেয়। কি আর করবে সুতপা, কোন রকমে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিল ও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুটো চৌকাট পার না হলে আজকাল সাধারণ কেরানীর চাকরীও জোটে না, মেয়েদের ত নয়ই। আরও পড়বার ইচ্ছা থাকলেও তা ও পারে নি। অল্প বয়সে মনে মনে কত রঙিন স্বপ্নের জালই না বুনে ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব ওলট পালট হয়ে গেল। ওর বাবা একরকম হঠাৎ-ই মারা গেলেন। তিন-কূলে প্রায় কেউই ছিল না ওদের।

ততদিনে সুতপা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত দূর সম্পর্কের এক মামার কাছেই ওরা আশ্রয় নেয়। সেও তিন বছর আগেকার কথা। ঐ মামার কাছেই থাকেন ওর মা। কোলকাতায় একরকম জোর করেই এসেছে সুতপা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করে চাকরীটা পাওয়ার পর। মামা অবশ্য সন্তুষ্ট নয় ওদের ওপর। তবুও সুতপা মাসে মাসে কিছু টাকা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর কোন আপত্তি হয় নি। মনে মনে হাসে সুতপা, এই ত জগৎ।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো কথাগুলোই ওর মনে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত ও প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায়। কলিংবেল টিপতেই চাকর মধু দরজা খোলে।

ভেতরে ঢুকতেই ও শোনে মিসেস রায়ের কুৎসিত চিৎকার। চমকে ওঠে ও। ওকেই গালাগালি দিচ্ছেন না কি মিসেস রায়। সত্যিই আজ ওর খুব দেরী হয়েছে ফিরতে। তাড়াতাড়ি ও ওপরে ওঠে। নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই ও দেখে দরজা খোলা। ঘরের জিনিষপত্র সব ছড়ানো। মিসেস রায় ওর সুটকেশে হাত ঢুকিয়ে কি করছেন। মিঃ বিপুল রায়ও দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। সুতপার পায়ের শব্দে মিঃ রায় তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেলেন বাইরে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে বলতে। মিসেস রায় সুতপাকে দেখে ধরা পড়ার লজ্জায় যেন একটু ঘাবড়ে যান। তারপর সুটকেশটা ফেলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলতে থাকেন, 'না না। কিছু না। এমনিই দেখছিলাম।' একরকম ছুটেই তিনি নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুতপা অবাক হয়ে গেল। কি করছিলেন মিসেস রায় ওর সুটকেশটা নিয়ে? ও আবার সব গুছিয়ে রাখতে থাকে। এমন সময় ঘরে ঢোকে চাকর মধু।

'কি ব্যাপার মধু? বাড়িতে কিছু হয়েছে না কি?' ও প্রশ্ন করে।

'ও আপনি জানেন না দিদি, মেম সায়েবের সোনার লকেট চুরি গেছে তাই চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছেন। ভীষণ কাণ্ড। তাই আপনার ঘরেও—'

কথাটা শেষ করে না মধু।

সুতপা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মধুর কথার মানে বুঝতে ওর অসুবিধা হয় না। ওকেও তবে চোর ভাবছেন মিসেস রায়। পায়ের তলা থেকে ওর যেন মাটি সরে যায়। চোখ ফেটে ওর জল আসে।

মধু বোধহয় সুতপার মনের ভাব বুঝতে পারে। ও বলে, 'দুঃখ করবেন না দিদি, আমাদেরও কম অপমান করেন নি মেম সাহেব। আমাদেরও জিনিষপত্র সব তছনছ করেছেন। শেষকালে পুলিশে দেবেনও বলেছেন। ভগবান জানেন কে নিয়েছে লকেট। আমরা গরীব কিন্তু চোর নই দিদি। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে।'

মধুর কোন কথাই সুতপার বোধ হয় কানে ঢোকে না। ও চিন্তাও করতে পারছে না, ওকে চোর মনে করছেন মিসেস রায়।

মধু আস্তে আস্তে বাইরে চলে যায়।

সুতপা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিসেস রায়ের গলা আবার শোনা গেল। 'সব দূর করে দেব। যত সব চোর এসে বাসা বেঁধেছে এখানে। চাবুক মেরে আমার লকেট বের করব। সব ভদ্রলোকের রকম সকম আমার জানা আছে। এখনই পুলিশে খবর দিচ্ছি।'

সুতপা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে থাকে। কথাগুলো যে ওকে লক্ষ্য করেই বলা তা ও বুঝতে পারে। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। ও ভাবে সোজাসুজি ও গিয়ে মিসেস রায়কে বলবে, আমি এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাই। কিন্তু তাহলে চুরির অপবাদ নিয়েই হয়ত যেতে হবে। পুলিশে ধরা পড়াও আশ্চর্য নয়। মিসেস রায়কে ও চেনে, অতি নীচমনা মেয়েছেলে। ও ভেবে আশ্চর্য হয় কেমন করে ঐ মহিলাকেই ও সাহচর্য দিয়ে এসেছে। মিঃ বিপুল রায় অবশ্য ভাল লোক। কোন ব্যাপারেই তিনি থাকেন না। আসলে থাকতে পারেন না। সব ব্যাপারেই কর্তৃত্ব করেন মিসেস রায়। বিপুল রায় সুতপার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারই করেন। ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত ধরণের। কিন্তু তিনি

আজ কি ভাবছেন? লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যায় সুতপার। ও এ ধরণের ঘটনা কোনদিন ঘটতে পারে ভাবেই নি। কেমন করে বোঝাবে ও চোর নয়।

সুতপা বুঝতে পারে না কি করবে। আর এক মুহূর্ত এ বাড়িতে ওর থাকতে ইচ্ছা করছে না। ঘৃণায় সারা শরীর ওর যেন জ্বলে যাচ্ছে। যদিও জানে এ চাকরী ছেড়ে দেওয়া মানে আরও অপমানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করা। মামাকে ও ভাল করেই চেনে। হয়ত মাকে নিয়ে ওকে গাছতলাতেই দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বোধহয় তাও ভাল। সেখানে এ ধরণের অপবাদ নেই।

বাইরে জুতোর শব্দ শুনে ও চমকে উঠল। বিপুল রায় মাথা নীচু করে ওর ঘরে ঢুকলেন।

'সুতপা কিছু মনে কোরো না ওর কথায়। আমি জানি তুমি চোর নও।'

সুতপা বলে, 'বিপুলবাবু, আমাকে ছেড়ে দিন, এখনই আমি চলে যাব।'

যেন চমকে ওঠেন বিপুল রায়। প্রায় আর্তনাদ করে বলেন, 'না, না, সুতপা তুমি চলে যেও না।'

'না আমাকে যেতেই হবে। আর অপমানিত হতে পারব না।'

'জানি সুতপা তুমি অপমানিতা হয়েছ। শোন, অপমানিত আমিও এ বাড়িতে কম নই। এ বাড়ি আমার নিজের হয়েও আমার নয়। আমার আজ নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। না, কিছুই নেই। আমি সংসারে ভারবাহী বলদ মাত্র। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বিপুল রায়।

এত কথা ওর সঙ্গে কোনদিনই বলেন নি বিপুল রায়। কিন্তু কোন জবাব দেয় না সুতপা। আপন মনে ওর জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে থাকে। এ বাড়িতে আর ওর থাকা চলবে না এটা নিশ্চিত। কেউ তা পারে না।

বিপুল রায়কে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও বলে, 'আমায় ক্ষমা করবেন বিপুলবাবু, আমার থাকা সম্ভব নয়। কেন তা আপনি জানেন। আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে।'

'না, না সুতপা তুমি যেও না। আমি জানি তুমি লকেট নাও নি। নিতে পার না। আমি জানি কে লকেট নিয়েছে।' বিপুল রায় বলেন।

চমকে ওঠে সুতপা। 'আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি জানি' উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন বিপুল রায়।

'কে শীগ্‌গির বলুন।'

'বলব বলব সুতপা, আগে বল তুমি চলে যাবে না এখান থেকে?'

'সে কথা বলতে পারছি না। কিন্তু আগে বলুন কে ঐ লকেট নিয়েছে।'

'আমি।'

'আপনি?' বিস্ময়ে যেন থ হয়ে গেল সুতপা।

হ্যাঁ আমি। কেন নিয়েছি জান? আমার টাকা চাই। ওই লকেটটার অনেক দাম। তুমি জান আমার কিছুই নেই। হ্যাঁ সুতপা আমি চোর, চোর। দুনিয়াশুদ্ধ লোক দেখুক আমার সব থেকেও আমার কিছু নেই। তাই আমাকে চুরি করতে হয়। বল বল সুতপা তুমি কি আমার চেয়েও বেশি অপমানিতা?'

সুতপা কোন জবাব দেয় না। সুটকেশটা হাতে নিয়ে ও সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যায়। চলে যাবে বলেই ও মন স্থির করে ফেলে।

বিপুল রায় পাগলের মত বলে ওঠেন, 'যেও না সুতপা, এই নরককুণ্ডে অন্তত একটা কথা বলবার মত লোকও থাকুক। আমি পাগল হয়ে যাব না হলে।'

সুতপা কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। *

* শেষভের গল্পের ছায়ায়

/CMC-20A BFN

আপনার
সান্নিধ্য মধুর করে তুলবে
মলয় চন্দন সাবান
(পূর্বে ইংরেজী বানান ছিল 'MALAYA')

মলয় চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করুন। দেহমন তো স্নিগ্ধ হবেই, চন্দনের মৃদুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ আপনাকে ঘিরে থাকবে।

একটির বাক্স অথবা সুদৃশ্য উপহারোপযোগী তিনটির বাক্স পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক: দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা ২৯

দিল্লীর পটভূমিকায় রচিত
কাহিনী বিচিত্র

বিবেকরঞ্জন
ভট্টাচার্য

# দুরন্ত দেহলী

॥ চোদ্দ ॥

অরুণা কখন ঘরে এসে ঢুকেছে সমর টের পায় নি। সে তখন ঐ বিলিতি সেন্টের শিশিটুকুর কথাই ভাবছিল। কবে অরুণা এসে তার টেবিলে এটা রেখে গেছে, সে জানতে পারে নি।

অরুণা ইচ্ছা করে চুড়ির আওয়াজ করলো।

সমর বলল, এসো অরুণা। আমি বসে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম।'

—'তাই না কি? তাহলে সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।'

—'ঠিক তোমার কথা নয়, ঐ আতরের শিশিটার কথা। ভেবে দেখো তো তোমার বৌদি খবরটা পেলে কি মহাযুদ্ধটা না বাধবে।'

অরুণা বলল, 'বৌদি জানতে যাবেন কেন? আপনিও তো ওটা কিনে আনতে পারেন।'

—'ঐ তো ভুল করছো। তোমার বৌদি জানেন আমি কখনও আতর মাখি না। বিদেশী আতর তো নয়ই।'

—'তাহলে কি বলছেন ওটা ফিরিয়ে নেব?'

—'না না অত ভয় পেলে চলবে কেন? তুমিও প্রস্তুত থাকো। এত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে নেই।'

—'আপনার মনে আছে তো আজ আমাদের কলেজে রবীন্দ্র-জয়ন্তী। আপনি বলেছিলেন আমার সঙ্গে যাবেন। তাই মনে করিয়ে দিতে এলাম। শুনেছেন বোধহয় "চিত্রাঙ্গদা" নাটিকা হচ্ছে না। অজুনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কার সঙ্গে দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছে।'

সমর বলল, 'ঠিক আছে যাবো। সন্ধ্যা সাতটায় তো?'

মনে তার বেশ ভালোভাবেই ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত গুণে সে এই সন্ধ্যাটির প্রতীক্ষা করে এসেছে এই ক'দিন থেকে।

সন্ধ্যার সময়ে বেশ সেজেগুজে অরুণা এসে হাজির হ'ল।

সমর তৈরিই ছিল। সে বলল, এই যে এসো অরুণা! আমিও তৈরি। এসো তোমাকেও একটু এসেন্স লাগিয়ে দিই। তোমার বৌদি আসার আগে এটা শেষ করতে হবে। জানো তো?'

এতক্ষণ অরুণা বেশ খুশি ছিল। মুহূর্তের মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন মুখখানা হাঁড়ি করে বলল, 'ও শিশিটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে বলেই বুঝি আমাকে আতর মাখতে হবে? আপনি বৌদিকে এত ভয় পান?'

সমর বলল, 'যাক গিয়ে। গান গাইতে যাচ্ছো, ঝগড়াঝাঁটি করে শুভ কাজে বেরুতে নেই।'

দুজনে এসে তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসলো। সমর ইচ্ছে করেই ষ্টিয়ারিংটা অরুণার হাতে দিল। অরুণা গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। সমর অরুণার খোঁপায় রজনীগন্ধার গুচ্ছ লক্ষ্য করেছে দেখে অরুণা খুশি হ'ল। মৃদু হাসির সঙ্গে বলল, 'কি ভাবছেন? রজনীগন্ধা দেখে আবার মনটা উদাস হয়ে গেল না কি? সত্যি বলছি আপনার মত ইয়ে বড় কম দেখেছি।'

সমর বলল, কি করব বল? মনটাকে তো আর বেধে রাখা যায় না। যদি সে ছুটে দূরে চলে যেতে চায় তো আর কি উপায় বল।

খানিকটা ইতস্তত করে অরুণা বলল, 'আচ্ছা একটা কথা বলি?'

সমর বলল, 'বল।'

অরুণা বলল, 'আপনি বৌদিকে আমার কথা লিখেছেন?'

—'মানে?'

—'মানে হ'ল আপনি যে আমাকে পড়ান সে কথা তিনি জানেন?'

—'তোমাকে যে আমি কতখানি পড়াচ্ছি সে কথা তিনি, আমি ও তুমি সবাই ভালো করেই জানি।'

—'বৌদি এলে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই আপনার কাছেও ঘেঁসতে দেবেন না।'

—'না না। সরমা অন্য ধরণের মেয়ে। তুমি না দেখলে তাকে মোটেই বুঝতে পারবে না।'

প্রতিটি কথায় সমর যে সরমার এত প্রশংসা করে সেটা অরুণার মোটেই ভালো লাগে না।

গাড়িতে পাশাপাশি বসেছে দুজনে। শাড়ির আঁচলটা মাঝে মাঝে দুরন্ত বাতাসে এসে উড়ে উড়ে পড়ছিল সমরের গায়ে। ইচ্ছা করেই অরুণা সেটা সংযত করছিল না। সমরের এত কাছাকাছি সে আগে কখনও বসে নি। আজকাল দূর থেকে সমরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেও তার সমস্ত শরীরের ভিতরটা কি রকম যেন করে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর অরুণার কানের ভিতর দিয়ে যেন মরমে প্রবেশ করে। আকুল করে তোলে প্রাণ। তার প্রাণটার ভিতর কি রকম একটা অব্যক্ত অনুভূতি জাগে। অরুণার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই. সে সমরকে ভালোবাসে।

সমর সরল আদর্শবাদী যুবক। সে এদিকের কোন কিছুই টের পায় নি।

বৈশাখের দুরন্ত হাওয়ায় অরুণার চূর্ণ কুন্তল নেচে নেচে সমস্ত কপালে ও মুখে এসে পড়ছিল। অরুণার মনটা কিসের অজানা খুশিতে ভরে ছিল।

গাড়ি এসে কলেজের গাড়িবারান্দায়

দাঁড়ালো। সমর কি যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে হাত ধরে সমরকে তুলে অরুণা বলল, 'ওঠো। এসে পড়েছি।' ক্ষণিকের জন্য দুটো কোমল মন কোন্ স্বপ্নজগতে ছিল কে জানে?

সমর বলল, 'চলো, চলো।'

সমর জানে অরুণা কোন্ গানটা গাইবে। 'সে কোন্ বনের হরিণ' গানটাই অরুণা ঠিক করে রেখেছে।

অরুণাদের পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেছে। উদ্বোধন সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে। প্রধান বক্তার বক্তৃতা চলছে। তিনি তখন বলছেন, 'আমি জার্মানীতে গিয়েছি, আমি জাপানে গিয়েছি, শীঘ্রই আবার আমেরিকা যাবার পরিকল্পনার কথাও আপনারা কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন। বিশ্ব ভ্রমণের আমার এই যে দুরন্ত ইচ্ছা সেটা দেখেই মনে হয় গুরুদেবের ও আমার মনের কতখানি মিল রয়েছে। লণ্ডনে আমি একবার বক্তৃতা দিতে যাই। লোকে লোকারণ্য। বক্তৃতাটা যখন শেষ করলাম তখন সবাই বলল, হ্যাঁ এই হলেই একবার আমরা বেশ কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছিলাম। আজ শুনলাম তোমার। সত্যি তোমার পাণ্ডিত্যের তুলনা নেই।'

মেয়েদের কলেজ। শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রায় সবই নারী। প্রধান বক্তার বক্তৃতায় তারা বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে। সামনের সারির মেয়েরা মুখ টেপাটেপি করছে। বক্তা তখনও বলে চলেছেন, 'জার্মানীতে আমি পড়াশুনো করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন? আমি তাদের পড়িয়ে এসেছি।'

সামনের একটি মেয়ের ধৈর্যের বাঁধ বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিল। সে বলে উঠলো, 'মশাই গুরুদেব সম্বন্ধে বলুন।'

বক্তা একটু নতুন জোর নিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। গুরুদেব সম্বন্ধেই আমি বলব। তবে তার আগে আমার সাথে গুরুদেবের চিন্তাধারার কতখানি মিল সেটা বলা দরকার।'

আরেকটি মেয়ে সামনে থেকে বলে উঠলো, 'কি বিপদ!'

সমর লক্ষ্য করলো অরুণা বক্তৃতার একটা শব্দও শুনছে না। সে যেন কি ভাবছে। প্রধান বক্তা অনুগ্রহ করে তার বক্তৃতা শেষ করলেন। সভানেত্রী অরুণার নাম ঘোষণা করলেন। অরুণা সমরের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে গেল। অরুণা গান ধরলো,—

'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া
নীপ কুঞ্জতলে
শ্যাম কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া
ফিরে বৃষ্টিজলে...'

সমর একটু অবাক হ'ল। এ গানটা তো গাইবার কথা ছিল না। অরুণা অন্যদিনের চেয়েও আজ অনেক ভালো গাইলো। গানটা শেষ হতেই নিজেই অন্য গান সুরু করল—

'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে,
জাগার বেলা হ'ল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।'...

গানটা সমর আগেও শুনেছে। আজ যেন তার একটা নতুন অর্থ পেল।

গাড়িতে ফিরে অরুণা বলল, 'কেমন লাগলো আমার গান?'

সমর বলল, 'তোমার গলা মিষ্টি। গান দুটোও মধুময়। দুটো মিলিয়ে এফেক্ট হয়েছে অপরূপ।'

অরুণা মনে মনে বলল, গান দুটো তোমাকে শোনাতেই গাইলুম। জোরে বলল, 'আপনি কিন্তু কখনও আমার গান শুনতে চান নি।'

কণ্ঠস্বরে একটু অভিমানের স্পর্শ।

সমর একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে কি করে বলবে বহুদিন লুকিয়ে সে অরুণার গান শুনেছে। সমর বলল, 'আপনার ঐ গানটাও কিন্তু বেশ—সেই যে,

'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে'।'

অরুণা বলল, 'ওটা শুনলেন কোথায়? আজ যে ঐটা গাইবার কথা ছিল। কেন জানি না গাইবার সময়ে সেটা একেবারে মনে ছিল না।' হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে অরুণা সমরকে প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা শুনুন, বৌদি নিশ্চয়ই গান জানেন?'

সমর বলল, 'আ, একটু আধটু জানে বইকি। তবে তার গলাটা তোমার মতন এত মিষ্টি নয়।'

—'আমি কিন্তু ভেবেছিলুম আপনি এক্ষুণি বলবেন তার পঞ্চাশখানা রেকর্ড আছে। বৌদির কথায় আপনি সর্বদাই পঞ্চমুখ কিনা।'

—'তা সাজিয়ে বললে তাই বলতে হত। তবে তার কোন রেকর্ড এখনও হয় নি।'

—'আপনি বোধহয় কখনও সাজিয়ে কথা বলেন না? তাই না? সত্যি বলতে কি যারা একটু বেশি যুধিষ্ঠির টাইপের হয় তাদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। একটু যেন ভণ্ডামি ভণ্ডামি ভাব থেকে যায় তাদের ভিতর।'

—'তোমার কি মনে হয় আমার সব কথা সত্যি নয়?'

—'ঠিক তা নয়। ঠিক আপনার কথা বলছি না।'

—'কথাগুলো সাজানো হলে খুশি হতে কি?'

অরুণা কোন কথা বলল না।

গাড়ি থেকে নেমে সমরকে একটা নম্র অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে চলে গেল। আজকের সন্ধ্যাটা সত্যি মধুময়। মনটা তার খুশিতে ভরা।

সমর উপরে চলে যাচ্ছিল।

লেডি কিংকং হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন শুনলে বাবা, অরুণা কেমন গাইলো?'

সমর বলল, 'খুব ভালো। সত্যি ওর গানই সব চেয়ে ভালো হয়েছিল'—বলেই স্বভাববশেই সমর নিজেই একটু লজ্জা পেল।

লেডি কিংকং সমরকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখেন। তিনি বললেন, 'ওরা তাই নাকি।' বলেই খিলখিল করে হেসে ফেললেন। মনে হল যেন আটটা মটকার জল এক সঙ্গে কল কল করে গড়িয়ে পড়ল।

সমরের বড় ভয়। সব ফাঁস হয়ে গেলে নেপেনদার জন্য একদিন জেলে না যেতে হয়! (ক্রমশঃ)

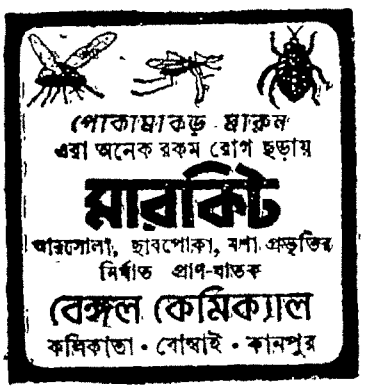

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

সে কথা ঠিক, এক সময়ে ডাক্তার রায়চৌধুরী কবিতা-টবিতা লিখতেন। অনেক দিন পর্যন্ত বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ তাঁকে কণ্ঠবিশ্লিষ্ট বিরহী-বিরহিণীর ব্যথায় আকুল করত, বসন্তে নন্দনের মন্দারমঞ্জরী দুলত তাঁর কবিতায়। অর্থাৎ পেশায় ডাক্তার হলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন—অঞ্জলি পেতে রাখতেন কালিদাসের কাছে।

তারপরে প্র্যাকটিস বাড়ল, বাংলা কবিতায়ও যুগ বদলালো। নতুন কবিতা কিছু কিছু পড়লেন, ভালো লাগল না—বুঝতেও পারলেন না। প্রথমে লজ্জিত হলেন, তারপরে ক্ষুব্ধ হলেন। হাজারীবাগের ছোট একটি সাহিত্য সমিতির সঙ্গে যোগ ছিল, মাঝে মাঝে তাদের অধিবেশনে যেতেন, স্বরচিত কবিতাও পড়তেন। সেখানেই তরুণ কবিদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধল। রায়চৌধুরী বললেন, 'এরা কবি নয়, মেনিনজাইটিসের পেশেণ্ট, ডিলিরিয়ম বকছে।' তরুণেরা পাল্টা জবাব দিলে, 'ডাক্তার রায়চৌধুরী কবিতার চাইতে ডাক্তারীটাই বোঝেন ভালো,' তিনি তাঁর ফার্মাকোপিয়া নিয়েই থাকুন—অকারণে আর কবিতার সুস্থ শরীরে সার্জারীর ছুরি চালাবেন না।'

এক কথায় চটাচটি হয়ে গেল। ডাক্তার রায়চৌধুরী মুখ লাল করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কি রবীন্দ্রনাথের ট্রাডিশন?'

তরুণেরা বললে, 'রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগে ফসিল হয়ে গেছেন—আপনি টেরও পান নি।'

সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে। রাগে আগুন হয়ে সাহিত্য-সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রায়চৌধুরী। একটু বেশি বয়েসে বিয়ে করেছিলেন, কাজেই তখনো ব্যাচেলার। হাজারীবাগের বাসায় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ ছিল না। রাগের মাথায় সারারাত রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেন, সকালবেলায় নিজের খান সাতেক কবিতার খাতা আহুতি দিলেন আগুনে। গজগজ করে বললেন, 'সেই ভালো, ডাক্তারীই আমি করব।'

কল্যাণী জীবনে এলেন আরো সাত বছর পরে। তখন পশারওলা কৃতী ডাক্তারের জীবনেও আবার অশোকের রঙ লাগল, পলাশের নেশা ধরল। একদিন কল্যাণীকে কবিতা শুনিয়ে চমকে দিলেন।

কল্যাণী বললেন, 'সত্যি তুমি এত ভালো লেখো? ছাপাও না কেন?

—কে ছাপবে? ছন্দ-মিল-অর্থের কবিতা আজকাল ভদ্রসমাজে অচল।

—কে বলেছে? ভালো জিনিস কখনো অচল হয় না।

স্ত্রীকে আদর করে রায়চৌধুরী বললেন, তুমি তো সমালোচক নও, সম্পাদকও নও। তোমার সার্টিফিকেট কেউ মানবে না।

—কিন্তু আমি তো পাঠিকা।

—সেকেলে পাঠিকা। আমিও সেকেলে লেখক। কাজেই আমি কবিতা লিখব, তুমি শুনবে। আমাদের দু-জনের ভেতরে এই চুক্তিটুকুই থাক।

—আমি তোমার কবিতা কাগজে পাঠিয়ে দেব।

—ফেগেছ!

কল্যাণী কথা শোনে নি। ডাক্তার রায়চৌধুরীকে না জানিয়েই কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছেন কলকাতার নামজাদা পত্রিকাগুলোতে। রায়-চৌধুরীর অনুমান মিথ্যে হয় নি। তার কিছু ফেরৎ এসেছে, বাকীগুলোর কী গতি হয়েছে কেউ জানে না, অন্তত ছাপার হরফে তারা দেখা দেয় নি।

ডাক্তার রায়চৌধুরী কিছুই জানতে পারেন নি, কিন্তু কল্যাণী দুঃখ পেয়েছিলেন। সময়টাই খেলো। কবিতার নামে কতগুলো অর্থহীন প্রলাপ মাসে মাসে ছাপার হরফে দেখা দেয়, কিন্তু সত্যিকারের ভালো কবিতার সমঝদার মেলে না। সম্পাদক তো নয়, একদল অপদার্থ বাংলা সাহিত্যের মুরুব্বি সেজে বসে আছে।

লেখা ছাপা না-ই হল, কল্যাণী স্বামীকে থামতে দেন নি। রায়-চৌধুরী এখনো মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন। কোনো সাহিত্য-সভায় তিনি আর যান না, কিন্তু এখানে যে কয় ঘর বাঙালী আছেন, তাঁদের প্রবীণেরা মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা শোনেন, তারিফ করে যান এবং কল্যাণী তাঁদের প্রচুর জলখাবার তৈরি করে খাওয়ান। বাইরে থেকে যাঁরা চেঞ্জে আসেন—স্বার্থের খাতিরেই তাঁদের রায়চৌধুরীর কাছে আসতে হয়; ডাক্তার এই সব চেঞ্জারদের কাছ থেকে কখনো ফী নেন না—কবিতা শুনলেই তিনি খুশি হন।

বাসব এসেছে, লেখা এসেছে, কেকা এসেছে। ডাক্তার রায়চৌধুরী প্রবীণ হয়েছেন, আরো সংসারী হয়েছেন, আরো বেশি করে তাঁর পশার বেড়েছে। কবিতার স্রোতটাও ক্ষীণ—বিশেষ লিখতে পারেন না, বলেন, 'যৌবনের লীলাসঙ্গিনী এখন বিদায় নিয়েছে আমার কাছ থেকে।' বাইরের লোককে পুরোনো কবিতাই বেশি পড়ে শোনান। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও বাড়িতে একটা সাহিত্যের আবহাওয়া আছে সব সময়।

—একটা আলাদা রুচি আছে এই পরিবারের। দু-একখানা নতুন উপন্যাস কেনা হয়, নিয়মিত বই আনানো হয় হাজারীবাগের পাবলিক লাইব্রেরী থেকে।

দু ভাই, এক বোন। রায়চৌধুরী সব চাইতে বড়ো, মাঝখানে বোন, সব চেয়ে ছোট অমিতাভ। বোন এলাহাবাদে ভরা সংসারের গৃহিণী। ছোট ভাই অমিতাভ গ্ল্যাসগো থেকে এঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছিল, ভালো চাকরিও পেয়েছিল। দেখে শুনে একটি মনের মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন রায়চৌধুরী—মেয়েটি এম-এস-সি পাশ করে সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছিল।

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। ডাক্তার রায়চৌধুরীর কবিতার মতোই অর্থ-ছন্দ-মিলে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না, সমস্ত একটা সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বাইয়ে বাসা বাঁধল অমিতাভ।

কিন্তু একটা বছরও কাটল না।

কারখানায় এক্সপ্লোশন ঘটল। এঞ্জিনীয়ার অমিতাভ রায়চৌধুরীর রক্তমাখা শরীরটাকে নিয়ে মোটর ঝড়ের বেগে ছুটল হাসপাতালে। কিন্তু সমস্ত ডাক্তারের সব চেষ্টাও তাকে বাঁচাতে পারল না।

এক মুহূর্তে ওপর থেকে বজ্র নয়, নীল আকাশটাই ভেঙে পড়ল যেন। বাড়িটা যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে অতলান্ত অবিশ্বাস্য একটা দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে তলিয়ে রইল কয়েক মাস। তখনো ঘরের দেওয়ালে বসুধারার সিঁদুরের বিন্দুগুলো জলজল করছে—ঘিয়ের দাগ তখনো মিলিয়ে যায় নি, বাড়ির পেছনের আবর্জনার ভেতরে তখনো প্রীতিভোজের শুকনো কলাপাতা উড়ছে, তখনো ছড়িয়ে আছে দুটো চারটে মাটির গেলাস।

কুমারীর শাদা সিঁথি নিয়ে, থান পরে শর্মিলা ট্রেন থেকে নেমে এলেন। অনেক দিন ডুবে রইল নিজের বেদনার শান্ত সমুদ্রে। তারপর একদিন কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় যাবি মা-বাবার কাছে?

শান্ত স্তিমিত চোখ তুলে চাইলেন শর্মিলা।

—না। কী হবে?

আবার কান্নার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন কল্যাণী। শর্মিলাকে জড়িয়ে রাখলেন বুকের ভেতর, আর শর্মিলার লালচে রুক্ষ চুলের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় তাঁর চোখের জল ঝরে যেতে লাগল। শর্মিলা চুপ করে বসে রইলেন।

একটু শান্ত হয়ে কল্যাণী বললেন, এখন তা হলে কী করবি? জীবনটা তো এভাবে কাটাতে পারবি না।

শর্মিলা বললেন, আমি একটা চাকরির দরখাস্ত করেছি দিদি। যা কোয়ালিফিকেশন চায়, আমার তা আছে।

—কোথায় চাকরি?

—রাঁচীর একটা কলেজে।

—তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি না তো?

—কোথায় যাব দিদি নিজের বাড়িঘর ছেড়ে?

রাঁচীর কলেজেই কাজ নিলেন শর্মিলা। বছরখানেকের ভেতরে দুঃখ আর শোকের পালা কিছু স্তিমিত হয়ে এল, আরো প্রায় তিন বছর বাদে এখন অমিতাভ রায়চৌধুরী স্মৃতির জগতে জায়গা নিয়েছে। তার জন্মদিনে ছবিতে মালা পরিয়ে দেওয়া হয়—মৃত্যুদিনটাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে সবাই।

শর্মিলার কৃতিত্বই এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি। সকলের আগে তিনি সহজ হয়ে উঠেছেন, পুরোনো আব-হাওয়াটাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। কলেজ ছুটি হলেই চলে আসেন, হৈ হৈ করেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ডাক্তার রায়চৌধুরীকে সভাপতি করে বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসান। বাসব আর লেখা গান গায়, রায়চৌধুরী কবিতা পড়েন।

এমনিভাবেই চলছিল। এরই মধ্যে এসে পড়ল কিরণ বসু।

ডাক্তার রায়চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমেই ডগলাসের অভ্যর্থনা পেলেন। তারপর বাসবই তাঁকে জানিয়ে দিলে, জানো বাবা, সাহিত্যিক কিরণ বসু আমাদের বাড়িতে আসবেন।

রায়চৌধুরী বললেন, তাঁকে আবার কোথায় পেলে?

—এখানে বেড়াতে এসেছেন। যারা নিমেছেন রাজেনবাবুর বাংলোতে।

রায়চৌধুরীর কপালে একটুখানি ছায়া পড়ল। জানতে চাইলেন, আধুনিক কবি?

—না, বাবা। উপন্যাস লেখেন।

—তবু ভালো।

—আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ ডগলাস—

বাকীটা আর বলা হল না বাসবের। তিনটি ছেলেমেয়ের হাসির ভেতরে চাপা পড়ে গেল। আর সব চাইতে খুশি হল ডগলাস। এই ফাঁকে সে রবারের একটা বল মুখে নিয়ে সারাটা লন দৌড়ে বেড়াতে লাগল।

ভেতরের হল ঘরে পা দিয়েই ডাকলেন, মিলা—মিলা—

বৌমা বলেন না—নাম ধরেই ডাকেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে নয়—শর্মিলাকে কখনো কখনো তাঁর নিজের মেয়ের মতো মনে হয়। স্নেহ তো আছেই, তার সঙ্গে সমবেদনা মিশে, শর্মিলার সম্পর্কে তাঁর মমতা যেন উপচে পড়ে আজকাল।

শর্মিলা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—ডাকছেন দাদা?

—কাকে আবার আজ বিকেলে চায়ে নেমন্তন্ন করে এলে?

—বাসব বলেছে বুঝি বাড়িতে পা দিতে না দিতেই?—শর্মিলা হাসলেন: উৎসাহে আর কিছু খেয়াল নেই ওর। আজ নয়, কাল সকালে কিরণবাবু আসবেন চা খেতে।

—খুব বড়ো লেখক বুঝি?

—নাম আছে।

—তুমি পড়েছ বই-টই?

—পড়েছি দু-একখানা।—শর্মিলার মুখে অকারণেই কৃষ্ণচূড়ার রং লাগল একটুখানি: বেশ লেখেন।

—সায়েন্সের প্রফেসারকেও যখন খুশি করতে পেরেছেন, তখন ভদ্রলোক ভালোই লেখেন নিশ্চয়।—রায়চৌধুরীও হাসলেন: কিন্তু সাহিত্যিককে আপ্যায়ন করবে কী দিয়ে? কী খাওয়ানো হবে?

—ওসব দিদির ডিপার্টমেণ্ট, আমি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু দাদা, কাল কিন্তু আপনাকেও কাব্য পাঠ করতে হবে।

—আরে ডাক্তারের আবার কবিতা! ওকি আর সাহিত্যিককে শোনাবার মতো?

—আপনার কবিতার বিচার করব আমরা, আপনি নন।

রায়চৌধুরী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রান্নাঘরের তত্ত্বাবধান সেরে কল্যাণী ফিরে এলেন। তারপরেই প্রথম সম্ভাষণ: ড্রয়ারের চাবি নিয়ে সেদিন তো আমায় খুব একরাশ বকাবকি করলে—সারা বাড়ি মাথায় তুললে। সে চাবি কোথায় আছে জানো?

ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবি আবিষ্কারের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল শর্মিলার। এখন আর সাহিত্যচর্চা নয়। এবার যে পর্বটা আসছে সেটা নিতান্তই দাম্পত্য—কুড়ি টাকার ক্ষতিপূরণেও কল্যাণী স্বামীকে সহজে ছাড়বেন না। এর মাঝখানে আর দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত নয়।

মৃদু হেসে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন শর্মিলা। পেছনে শোনা যেতে লাগল কল্যাণীর গলা: নিজের কোনো দিকে কিছু খেয়াল থাকে না, কোথাকার জিনিষ কোথায় যায়, কেবল চেঁচামেচির বেলায়—

দিনটা এইভাবে কাটল। বেলা পড়ল, বিকেল হল, সন্ধ্যা নামল। ডাক্তার রায়চৌধুরী আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, কল্যাণী রান্নাঘরে গেলেন, বাসব-লেখা-কেকা পরমানন্দে গানের আসর বসিয়ে দিলে। থেকে থেকে লেখার প্রতিবাদ শোনা যেতে লাগল: তুই থাম না দাদা—তোর বোটেই সুর হচ্ছে না—।

বারান্দায় কিছুক্ষণের জন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল ডগলাস—সারা রাত ধরে বাড়িনর ছুটোছুটি করবার আগে একটুখানি ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে নিতে চায়। আর দু-একখানা চিঠি লেখবার জন্যে নিজের ঘরে, টেবিলের সামনে বসে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলেন শর্মিলা। দেওয়ালে অমিতাভ রায়চৌধুরীর ছবি, এক্সছড়া শুকনো মালা এখনও দুলছে তার ওপর। কিন্তু মনটা না বসছে চিঠিতে, না মগ্ন হচ্ছে চিঠি লেখার ভেতরে। থেকে থেকে ছবি আসছে—একটা কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জ—সেখানে হরিয়াল ডাকছে, মাঠের ওপর দিয়ে বাতাস বইছে আর লাল মাটির ছোট টিলাটার ওপর ব্যায়নের মতো একটি মানুষ—টুপ টুপ করে ফুল ঝরছে তার গায়ে।

কখনো কখনো এক-একটা অবসরে, কী আশ্চর্য মনে হয় এক একজনকে।

শর্মিলা ছেলেমানুষ নন। লেখক-সাহিত্যিক দেখলেই মুগ্ধ হয়ে উঠবেন, তাদের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে ছুটবেন, বাসবের মতো এ দুর্বলতাও তাঁর নেই। তবু কিরণ বসুকে কেমন নতুন মনে হল। লোকটির ভেতরে কোথায় কিছু একটা আছে—মনে থাকে, মনে রাখতে ভালো লাগে।

'আপনার স্ত্রী আসেন নি? মিসেস বসু?' কিরণ যেন জবাবটা এড়িয়ে গিয়েছিল, মেঘের ছায়া ভেসে গিয়েছিল মুখের ওপর দিয়ে। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি বিবাহিত জীবনে সুখী নন?

ছি—ছি, কেন এসব ভাবনা! কিরণ বসুর জন্যে কেন মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন শর্মিলা? বিবাহিত জীবনে সে লোকটি সুখী কি না সে-কথা জেনে তাঁর কী আসে যায়?

শর্মিলা আবার চিঠির দিকে চোখ নামালেন।

আর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, এতক্ষণ ধরে রাইটিং প্যাডের ওপর শুধু আঁচড়ই কেটেছেন। আর বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন—'কৃষ্ণচূড়া'—'কৃষ্ণচূড়া'— (ক্রমশঃ)

# সন্ধ্যা নামার শুরুতে

## অমর বসু

বিহারী কাঁদছে।

"ডাউন প্ল্যাটফরমের" ওপরেই একটা নিমগাছ। চারদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে যাত্রীদের ছায়া দেয়। তারই নীচে ডালা সাজিয়ে ব'সে থাকে অতুল। পান-বিড়ি-সিগারেট আর দেশলাই। গরমের দিন দু'এক ফাঁদি ডাব। আর ছোট একটা দা। বর্ষার সময় অবশ্য ওকে চলে যেতে হয় 'শেডে'র তলায়।

অতুলকে সবাই চেনে। ছেলে-বুড়ো, এমন কি কলেজে যাওয়া মেয়েগুলো পর্যন্ত। আর চেনে ঐ বিহারীকে। অন্ধ ভিখারী। বেহালা বাজিয়ে গান করে।

ট্রেন আসতে দেরি থাকলে, অনেকেই এসে জড়ো হয় এই নিমগাছের তলায়। অতুলের কাছ থেকে পান কিনে খায়, কিংবা বিড়ি-সিগারেট। পান চিবোতে চিবোতে বিহারীর গান শোনে।

যাদের একটু তাড়া বেশি তারা অবশ্য এগিয়ে গিয়ে শেডের নীচে দাঁড়ায়। হাওড়ায় ট্রেন থামবার আগেই তারা নেমে পড়ে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রাম কিংবা বাসের হাতল ধরে।

অঙ্কুর কিন্তু ওদের দলের নয়। দুটো ট্রেন পরে গেলেও ওর লেট্ হয় না। ধীরে সুস্থে যেতে পারবে বলেই ও একটু আগে আগে বাড়ি থেকে বেরোয়। নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিহারীর গান শোনে। পান-বিড়ি-সিগারেট, কোনও নেশাই ওর নেই। গান শোনবার জন্যেই দাঁড়ানো।

গান শোনে, আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিহারীকে দেখে। চোখের দরজা বন্ধ বলে, ভেতরটার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই অন্ধদের দেখে মনে হয় শিশুর মত সরল। হাসিটা যেমন নির্মল, কান্নাটাও তেমনি অকপট।

কিছুদিন হল অঙ্কুরের বাবাও অন্ধ হয়ে গেছেন। অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু রোগ সারে নি। এখন দুটো চোখেই দেখতে পান না। চুপচাপ বসে থাকেন। কখনও বা হাতড়ে হাতড়ে এ-ঘর, ও-ঘর ঘুরে বেড়ান। বন্ধুরা এলে তাদের জড়িয়ে ধরে বলেন—আমি যে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম ভাই। বলেই কাঁদতে থাকেন।

অথচ এর আগে বিহারীকে কোনও দিন কাঁদতে দেখে নি অঙ্কুর। বিহারী বোধ হয় জন্মান্ধ। আলোর সন্ধান কোনও দিনই পায় নি বলেই ওর মনে কোন বেদনা নেই। ওর

গানগুলো সবই আনন্দের। আমি অন্ধ আমার কি যে কষ্ট। তোমরা তা বুঝবে না। আমায় কৃপা করো। এই ধরণের কোনও প্রার্থনা ওর গানের সুরের সোচ্চার হয়ে ওঠে না। ওর গানগুলো একেবারে অন্য ধরণের। শুনতে শুনতে মনে হয় বিহারী গাইবে বলেই যেন গানগুলো রচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলে, গানগুলো ওর নিজেরই তৈরি।

—"হে সৃষ্টা, তুমি তোমার বিচিত্র সৃষ্টির বন্ধনে মূঢ় মানুষগুলোকে কেমন বন্দী করে রেখেছ। রূপের আবারকে ভালবেসে ওরা কেমন রূপের সৃষ্টাকে ভুলে থাকে ; অরূপ। তোমাকে কেউ ওরা চেনে না। আমাকে বলে, তুমি অন্ধ, তোমার জীবন অভিশপ্ত। পৃথিবীতে কত আলো, কত রঙ, তুমি তার কিছুই জানতে পারলে না। প্রভু ওরা তো জানে না, চোখের তারায় তোমাকে আমি বন্দী করে রেখেছি। সৃষ্টির খেলনা দিয়ে তুমি আমাকে ভোলাতে পার নি। তাই নিজে এসে ধরা দিয়েছ।"

অঙ্কুলের বাবা কিন্তু এসব কথা বলেন না। অথচ তিনি একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী। অত্যধিক পড়াশোনা করে, লিখে লিখে, হিজিবিজি 'প্রুফ' দেখে দেখে এবং পুষ্টিকর খাদ্য না খেতে পেয়ে তিনি চোখ দুটো হারিয়েছেন। এখন এ-ঘরে বসে বসে শুধু হাহাকার করেন। মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে একে ওকে ডাকেন। কারোর সাড়া না পেলে নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেন,—এরপর আর আমায় কেউ দেখবে না, পরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ডাকলে কেউ সাড়া দেয় না, পাছে হাত ধরে কোথাও নিয়ে যেতে হয়।—কিন্তু আমি কি করবো। আমার তো কোনও দোষ নেই। দোষ এই সমাজব্যবস্থার। ভাগ্য বলে কোনো জিনিষ নেই। সবটাই প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজি। নতুন কিছু লিখতে হবে। এখনই কাগজ কলম নিয়ে এস। কই, কেউ এলো না তো। তবে কি ওরা ভেবেছে আমি শুধু অন্ধ নই, আমি একজন বদ্ধ পাগল। হ্যাঁ, আমি পাগল হ'য়ে যাবো। পাগল হয়ে গিয়ে সব ভুলে থাকব। এ্যাই, কে আছিস, একটু ওষুধ খাইয়ে আমাকে পাগল ক'রে দিয়ে যা।—

এই সব কথা শুনে, অঙ্কুরের মা কখনও কাঁদেন। কখনও বা বকাবকি করেন। বোনেরা কখনও ছুটে এসে বাবাকে সান্ত্বনা দেয়। বাবা কিন্তু তাতে একটুও শান্ত হ'ন না। আরও চীৎকার করতে থাকেন ; অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ ফেটে ছড়িয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে অঙ্কুর চুপ করে বসে থাকে। কি করলে বাবা শান্ত হ'বেন, ব'সে ব'সে সেই সব কথাই শুধু ভাবে।

বিহারী কিন্তু এ-সব কথা মোটেই ভাবে না। মনে তার কোনও ক্ষোভই নেই, তাই কোনও ভাবনাও নেই।

অঙ্কুর একদিন জিগ্যেস করেছিল, —অন্ধ বলে তোমার কি একটুও কষ্ট হয় না বিহারী।

বিহারী হেসে উঠেছিল। শিশুর মত সরল হাসি ; রুক্ষ চুলগুলো মুখের থেকে সরিয়ে নিয়ে বিহারী বলেছিল,—কষ্ট হয় বৈকি। কিন্তু সেটা বাইরের ; এই খোলসের। ভেতরে আমার একটুও কষ্ট নেই। সব সময় আনন্দে টলটল করছে।

কাঁধ থেকে বেহালাটা নামিয়ে নিয়ে বিহারী মাথা নীচু করে বসে রইল।

অঙ্কুরের মনে হয়েছিল,—বিহারীর কথাগুলো যেন সতর্ক প্রহরী। পথ আগলে বসে আছে। তাদের অমান্য করে ওর ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করা ভারি দুঃসাধ্য।

—সারা দিনে তোমার কত আয় হয়, কি ক'রে তোমার সংসার চলে, সংসারে কে কে আছে, কে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কার সঙ্গেই বা তুমি বাড়ি যাও।—ইত্যাকার প্রশ্নগুলো বিহারীর কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অন্তত অঙ্কুর সেই রকম মনে করে।

বিহারী বোধহয় অঙ্কুরের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল ; তাই হাসতে হাসতে বলেছিল,—আমায় গুরুজী বলতেন,—মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরো ন' কই।—বলেই বিহারী বেহালাটা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে ছড়ি টানতে টানতে গান ধরল—

—সূর্য দেখবে ব'লে—
ওরা এই নরদেহের প্রদীপ জ্বেলেছে
আকাশের অসীম পানে,—
অসীম দু'টি নয়ন মেলেছে।

গাইতে গাইতে হাসতে লাগল বিহারী।

আর অঙ্কুর ভাবতে লাগল—বাবার যখন চোখ ছিল তখন বিহারী এখানে আসে নি। এর আগে ও কোথায় ছিল কে জানে। বাবাকে একদিন বিহারীর গান শোনালে কেমন হয়। বিহারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবে, না, বাবাকে এখানে নিয়ে আসবে।

বাবাকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। বাবা হয়তো আসতেই চাইবেন না। তা ছাড়া—এই স্টেশনে,—রাজ্যের লোকের সামনে,—বাবা বসে বসে গান শুনবেন,—সবাই দেখবে একজন অন্ধ, আর এক অন্ধের গান শুনছে —না, না সেটা ভারি খারাপ দেখাবে। তার চেয়ে বিহারীকে নিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

কথাটা বিহারীকে জানাতে গিয়ে অঙ্কুর দেখল,—তখনও বিহারী আপন মনে গান গেয়ে চলেছে।—

ফুলের কি যে বর্ণ,
রূপালী কিংবা স্বর্ণ ;
সেই তর্কেই মত্ত থেকে,—
তোমায় ভুলেছে।
আকাশের অসীম পানে
অসীম দু'টি নয়ন মেলেছে।

অঙ্কুর কিছু বলতে পারল না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে উবু হয়ে বসে পড়ল বিহারীর পাশে।

এই দেহটার কি কোনও মূল্য নেই। এটা কি একেবারেই অর্থহীন। এই অস্তিত্বটাকে কেন্দ্র করেই তো যত সমস্যা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য দুঃসাধ্য প্রয়াস। সেটা বাইরের। ভেতরে আছে, কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি ষড় রিপুর নিয়ত আক্রমণ। দুঃসহ যন্ত্রণা।

তবুও তো এই অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা চলে না। কেন না বিশ্বজগতের সঙ্গে যে তার নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। তাই মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

বিহারীর কথাগুলোয় ফাঁকি আছে। কথাগুলো জীবনমুখী নয়। অঙ্কুর বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিহারীর কিন্তু সে-দিকে কোনও খেয়াল নেই। তখনও সে গেয়ে চলেছে।

অঙ্কুরের মনে হ'ল,—অন্ধত্ব নয়, —অন্ধতা ওকে অমন জীবনবিমুখ করেছে। লেখাপড়া শিখে, বিহারী যদি আজ কোনও কাজকর্ম করত, (যেমন অনেক অন্ধই আজকাল করছে) তাহলে ও এই ধরণের গান গেয়ে আনন্দ পেত না। গানের বদলে কত পয়সা পেল তারও হিসেব রাখবার চেষ্টা করত।

কিন্তু ওর অন্য ইন্দ্রিয়গুলো। সে-গুলোও কি ওর চোখ দুটোর মত নিষ্ক্রিয়। প্রবৃত্তি বলে কি ওর কিছু নেই। কিংবা কোনও বোধশক্তি।

অঙ্কুর জিগ্যেস করল,—বিহারী তোমার কি ভাললাগে।

—গান।

—সবচেয়ে কা'কে তুমি বেশি ভালবাস?

—এই বেহালাটাকে।

—না, আমি তা বলছি না। আত্মীয়-স্বজন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কাকে তুমি বেশি ভালবাস।

বিহারী হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল,—কি জানি, কোনও দিন ভেবে দেখি নি।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু অমন ক'রে হেসে উঠলে কেন।

বিহারী বলল,—ঐ তো আমার দোষ।—আপনি অফিস যাবেন না।

—যাবো বৈকি। ট্রেনও এসে গেছে। কাল আবার দেখা হ'বে। কেমন।

—কি জানি বাবু। নাও হ'তে পারে।

সত্যি পরের দিন বিহারীকে আর দেখা যায় নি। তার পরের দিনও নয়। তারপরে আরও অনেকদিন।

অঙ্কুরের মনের মধ্যে বিহারী যখন অন্যান্য অনেক অতীত ঘটনার মত বিস্মৃতির অতলে চাপা প'ড়ে গেছে—তখন একদিন বিহারীকে দেখা গেল,—নৈহাটি লোক্যালে।

অঙ্কুর একপাশে বসেছিল। ইছাপুর যাচ্ছিল—আত্মীয়ের বাড়ি। হঠাৎ বেহালার শব্দ শুনে ঘাড় তুলে দেখল।—হ্যাঁ,—বিহারীই। সঙ্গে —তার জামার পকেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। চোখে কাজল। সিঁথিতে এক ধ্যাবড়া সিঁদুর। পরণে, পাতলা ডুরে শাড়ি।

অঙ্কুর বুঝতে পারল—যাত্রীরা সবাই ভেবে নিয়েছে যে ওরা স্বামী-স্ত্রী। অঙ্কুর কিন্তু সেটা ভাবতে পারছে না। বিহারীকে সে চেনে। শুধু চেনে না, জানে। বিহারীর বউ থাকতে পারে না।

অঙ্কুর মন দিয়ে শুনল,—বিহারী নতুন একটা গান গাইছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও। গাইছে আর পয়সা চাইছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক পয়সা পেয়ে গেল।

অঙ্কুর অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিহারীকে নাম ধরে ডাকল। মেয়েটি সেই সময় ভিড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

অন্ধের হাত ধরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুত্র-কন্যা হয়ে ভিক্ষে ক'রে—বড় মেয়েরা স্ত্রী হ'য়ে। এ-লাইনে এইটাই রেওয়াজ। কে আর জানছে। এদের বিরাট দল আছে। যত কানা-খোঁড়া নিয়েই এদের কারবার।


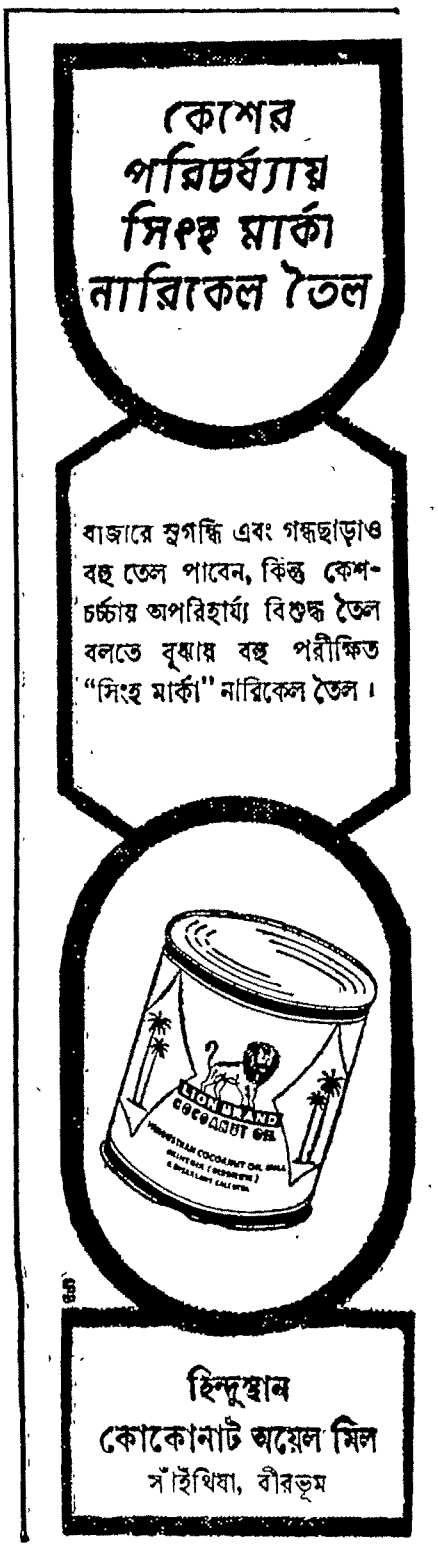

বিহারী বোধহয় অঙ্কুরের ডাক শুনতে পায় নি, তাই সাড়া দিল না ; কিংবা শুনতে পেয়েছে বলেই চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই বিহারী আর একটা গান ধরল। এ-গানটাও নতুন। গান শেষ হবার আগেই একটা স্টেশন এসে গেল। মেয়েটা তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দরজার কাছে। ট্রেন দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়তে হবে, নইলে অন্য কামরায় ওঠা যাবে না। আরও পয়সা ওদের চাই। আরও অনেক পয়সা!

মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে বিহারী নেমে পড়ল।

দৃশ্যটা ভারি অসহ্য ঠেকল। অঙ্কুরের মনে হল,—এ-যেন সে-বিহারী নয়। অন্য কেউ। একজন প্রতারক। শুধু তাই নয়, চরিত্রহীন লম্পটও!

অঙ্কুর অস্থির হয়ে উঠল। বাইরের দিকে আর তাকাতে পারল না। মেয়েটির সঙ্গে অন্য কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে কি না, সেটাও একবার ভেবে দেখল না।

—কি দরকার ছিল বিহারীর এইভাবে চলে আসবার!—বার বার শুধু এই প্রশ্নই অঙ্কুরের মনকে জর্জরিত করে তুলল।

দিনের পর দিন এইভাবে বিহারীর হাত ধরে ঐ বদপ্রকৃতির মেয়েটা গাড়িতে গাড়িতে ভিক্ষে করবে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। বিহারীকে যেমনভাবে চালাবে, বিহারী তেমনি ভাবে চলবে। এক জায়গায় ব'সে ব'সে ভিক্ষে করলে নিশ্চয়ই এত পয়সা পাওয়া যেত না। একই লোক আর কতবার ভিক্ষে দেবে ; মরণ যখন হচ্ছে না, তখন খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে তো। দুবেলা দুমুঠো জোটাতে গেলে,—এই পয়সায় চলবে কেন!—এই ভাবেই কি বিহারীকে লোভ দেখানো হয়েছে আর তাইতেই বিহারী গৃহপালিত পশুর মত ওর পিছু পিছু ঘুরতে রাজি হয়েছে। কিংবা অন্য কোনও তীব্রতর আকর্ষণ বিহারীকে টেনে এনেছে।

মেয়েটির নরম হাত, মেয়েটির নরম গলা, উষ্ণ সান্নিধ্য,—বিহারীকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। কিংবা সত্যিই ওরা স্বামী-স্ত্রী।

এই ধরণের আরও অনেক ভাবনা অঙ্কুরকে পেয়ে বসল। বিহারীকে কিছুতেই মন থেকে সরানো যাচ্ছে না।

বিহারীর প্রবৃত্তি, তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা, সবই আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বিহারী জন্মান্ধ, কিন্তু সজীব মানুষ। সুতরাং আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রীতি-ভালবাসা আছে।

অঙ্কুরের বাবার মত বিহারীর বোধহয় কোনও ক্ষোভ নেই ; কোনও দিনই সে কিছু দেখে নি, তাই কিছু দেখবার জন্যে তার মনে কোনও আকুলতা নেই। দিদৃক্ষার যন্ত্রণায় মন তার নিশ্চয়ই কাতর হয় না।

নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে তার নিবিড় নিঃসঙ্গতা তাকে কোনও দিনই পীড়া দেয় নি। তাই অঙ্কুরের বাবার মত, বিহারীকে মাঝে মাঝে চীৎকার করতে হয় না। দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয় না। এ-দিক থেকে বিহারী নিঃসন্দেহে খুব সুখী।

কিন্তু আজ সে কাঁদছে কেন।

কাঁদবার জন্যেই কি এতদিন পরে আবার সে এইখানে এসে বসেছে—এই নিমগাছের তলায়। শিয়ালদার লাইন ছেড়ে,—আবার সে আজ এখানে কেন? সঙ্গিনী ছেড়ে আবার একলা কেন?

অঙ্কুর খুব গভীরভাবে বিহারীকে দেখতে লাগল। সেই আগেকার বিহারী। নৈহাটি লোকালের সেই প্রতারক নয়।

অন্ধের চোখে জল! ভারি করুণ! ভারি দুঃসহ! সবাই এসে দেখছে বিহারীকে।

কেউ কেউ জিগ্যেস করছে—এই যে! এতদিন কোথায় ছিলে! দেশে গেছলে বুঝি!—কাঁদছ কেন!

বিহারী নীরব। শুধু ওর চোখ দুটো কথা বলতে চাইছে। অন্ধ বোবা চোখ।

কাঠের বাক্সর ভেতর থেকে বেহালাটা বার ক'রে নিয়ে বিহারী সুর বেঁধে নিল। তারপর ছড়ি টানতে লাগল।

কণ্ঠ স্তব্ধ। বেহালা যত আকুল হ'য়ে উঠল,—চোখ দিয়ে ততই জল ঝরতে লাগল।

অঙ্কুর পাশে এসে বসল।

বিহারী একা শুধু কাঁদছে না। ওর বেহালাটাও যেন অবিকল মানুষের গলায় কেঁদে উঠেছে! অত্যন্ত একটা পরিচিত গানের সুর। রবীন্দ্রসঙ্গীত। এমন গান গেয়ে কোনও ভিখারীকে কোনও দিন ভিক্ষা করতে দেখে নি অঙ্কুর। তার মনে হ'ল—বিহারী বোধহয় ভিক্ষে পাবার আশায় বেহালা বাজাচ্ছে না। কান্নায় ওর গলা ভেঙে গেছে। তাই বেহালার মুখ দিয়ে ও তার অন্তর্বেদনা প্রকাশ করতে চাইছে।

অঙ্কুর জিগ্যেস করল,—এ গান তুমি কোথায় পেলে বিহারী!

বিহারী চোখ মুছে নিয়ে বলল—সুধার কাছ থেকে তুলে নিয়েছি। ভারি ভাল মেয়ে সুধা!—কিন্তু—

—থামলে কেন!—অঙ্কুর আগ্রহ প্রকাশ করল।

—সুধাকে ওরা নিয়ে চলে গেল। অন্য কারোর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবে বোধহয়। আমার দোষ, আমি ওকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলুম। ওদের আইনে বুঝি সে-সব নেই।

আর কথা বলতে পারল না বিহারী। ওর বেহালাটা আবার কেঁদে উঠল,—ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে!—

● বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর খাঁড়িতে দ্রুতগতিতে স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ চলছে

**রাজধানী :**

বেশ কিছুদিন টালবাহানার পর রাজ্য সরকার খাদ্যশস্যের একটা কিনারা করার জন্য আসরে নেমেছেন। জেলায় জেলায় মজুতদারদের হাত থেকে ধান উদ্ধারের তোড়জোড় চলেছে। বেশ ক'জন দোকানীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। চাল ও মাছের দোকানে তল্লাসীর অভিনয়টাও উঠেছে জমে। প্রচার হচ্ছে, সরকার বাহাদুর না কি এবারে একটা সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। বেশ একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছে। খুবই সুখবর বলতে হবে। দরিদ্র-সাধারণের মধ্যে এ খবরে উল্লাসের সৃষ্টি হওয়ার কথা। সরকারের সক্রিয়তা দেশকে চোরা-বাজার ও মুনাফাশিকারীর কবল থেকে মুক্ত করবে, এই তো দেশের মানুষ এতদিন দাবীও করে আসছে। সত্যি, কারো মুখে কি হাসি ফুটেছে? ফোটে নি, কারণ গেল ক'বছরের নজীর রয়েছে তাদের সামনে। কাজেই সরকারের খাদ্য দপ্তরের মুখপাত্রগণ দফায় দফায় কাগজে পত্রে যত ভাল কথাই বলুন—মুনাফা নিরোধক আইন প্রয়োগের দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথাই বলুন, সাধারণ মানুষ আস্থা ফিরে পাচ্ছে না। তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, চালের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। পুলিশের ধর-পাকড়, মুদিখানায় পুলিশের হানা নতুন নয়। গেল কটি বছর ধরেই মাছ, চাল, চিনি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সময় এই একই অভিনয় হয়ে আসছে। আমাদের সরকার মূল্য হ্রাস করতে পারেন নি। অসাধু পাইকার, জোতদার, মজুতদার অবাধে বুক ফুলিয়ে চলেছে। চরম অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন সরকার অত্যধিক বর্ধিত মূল্যের থেকে দু'চার আনা কমিয়ে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' সম্পাদন করে। চুক্তির কথাটা ঘোষণাকালে সরকারের কর্ণধারের উক্তিগুলোই তাঁদের ব্যর্থতার পরিচায়ক। সে উক্তিতে প্রায়ই থাকে, 'ব্যবসায়ী এই মূল্যে বেচতে রাজী হয়েছেন।' তারপর সেই বর্ধিত মূল্যই হয়ে পড়ে ন্যায্য-মূল্য। ভোগ্যপণ্যের মূল্য, এমনি করে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাতেই ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে।

খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণের নামে এমনি করে সরকার বাহাদুর ব্যবসায়ীদের পকেটই ভারী করে চলেছেন। এটা এখন সরকারী নিয়মে পরিণত হয়েছে। এ যেন একটা নয়া প্যাটার্ন।

সদাপ্রফুল্ল আমাদের রাজ্য সরকার। তাই তাঁদের বিচার-বিবেচনার, কাজের যৌক্তিকতার কোন জবাবদিহির প্রশ্ন মনে জাগে না। কত ধানে কত চাল হয়, তার খবর রাখার তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না। তা' না হলে ২ টাকা ৬০ নয়া পয়সার সরষের তেলের দাম কি কারণে ৩ টাকা নির্ধারিত হল প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য তার একটা কারণ নিশ্চয়ই দেখাতেন। মার্চ মাসেও কলকাতার বাজারে তেলের দাম ছিল ২ টাকা ৪০ থেকে ৬০ নয়া পয়সা। মার্চের শেষের দিকে বাড়লো ৫ নয়া পয়সা। এপ্রিল মাসে ৩ টাকা ২০ নয়াতে এসে ঠেকলো। রাজ্য সরকার অসহায়ের মত তামাসা দেখলেন। তারপর ঘোষণা হল—'তেলের ব্যবসায়ীরা ৩ টাকায় তেল বেচতে সম্মত হয়েছে। তেলের দাম ৩ টাকা নির্ধারিত হল।' এতে সরকারের কোন কেরামতি থাকলে, স্বীকার করতে হয়, সরকার তেলের দাম ২০ নয়া পয়সা হ্রাস করেছেন। মার্চ মাসের চাইতে ৪০ নয়া পয়সা তেল আহারীদের বেশি দিতে হচ্ছে বলে আপশোস করা অন্যায়, কারণ সরকার যা' যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন তাই করেছেন। ব্যবসায়ীদেরও তো বেঁচে থাকতে হবে!

চিনির মূল্য বৃদ্ধির বেলাতে সরকারী ভূমিকায় এই প্যাটার্নের পরিচয়ই পাওয়া গেছে।

নতুন ধান যখন ওঠে তখন থেকেই সরকারী ঘোষণা চলতে থাকে পরিসংখ্যান পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে। সে ঘোষণায় থাকে, এবার আর ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ঠিক হওয়ার ইন্তেজাম চলতে চলতে চাষীর ভাণ্ডার হয় শূন্য—শস্য গিয়ে গোলাজাত হয় অতিমুনাফা-লোভীদের গোলাঘরে। তারপর একটা কিছু অছিলা তুলে জোতদার, পাইকার এবং কলমালিকের একজন না একজন হাহাকার রব তোলেন।

জোতদারকে দোষারোপ করেন কলওয়ালা, কলওয়ালার ওপর দোষ চাপাতে চান পাইকার। বাজার এদিকে তিনজনের প্রচ্ছন্ন আঁতাতের ফলে ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। সরকার ব্যবসায়ীদের শিক্ষা দেবার, শায়েস্তা করার ফতোয়া জারী করতে থাকেন। পুলিশ একটু সক্রিয় হয়ে ওঠে। সামান্য কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়। ঠিক এমনি সময়টিতে একদল ব্যবসায়ী ভাল মানুষ সেজে মহাকরণের মহাশয় ব্যক্তিদের দুয়ারে ধরা দিতে আরম্ভ করেন।

মহাকরণের দুয়ারে এবারে ব্যবসায়ীরা যাতায়াত এখনও সুরু করে নি। সরকারের ভূমিকার বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য বর্ধমানে ধান আটক করার কলকাতায় ধান আসতে পারছে না। কাজেই ধানকলগুলো অকেজো হয়ে পড়ছে।

সরকার ধান উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রথতলা, কুমারটুলী, হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি এলাকার চালের আড়তে মজুত চালের ওপর হাত দেন নি। আড়তদাররা খোশমেজাজেই আছেন। যাঁদের ওপর সরকারী প্রশাসনের যন্ত্র নেমে এসেছে, তাঁরা এঁদের কেউ নন। এঁরা কিন্তু মোটা চাল মিহি চালের দামে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিতে বাধ্য করছেন। সুযোগ বুঝে খুচরা ব্যবসায়ীরা আরেক ধাপ উঠে প্রতি কিলো চাল ৯০ নয়া পয়সা হাঁকছেন। আড়তদারদের মুখপাত্র প্রচার চালাচ্ছেন, ১৫ দিনের বেশি চাল কলকাতায় নেই।

রেশনের দোকানে (সরকারের অনুমোদিত ন্যায্যমূল্যের দোকানে) দুমাস হ'ল চাল পাওয়া যাচ্ছে না। সামান্য যে-ক'বস্তা চাল তাঁদের সরবরাহ করা হয়, তাও চলে যায় কালোবাজারে। দোকানে গেলেই শুনতে পাওয়া যায়,—যে-ক'বস্তা চাল এসেছিল নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আমরা বহু আগেই বলেছিলাম, জুন মাস থেকে পশ্চিম বাংলায় চালের কৃত্রিম অভাব দেখা দেবে। সরকার খাদ্যসমস্যার সমাধানে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এভাবে চললে ব্যবসায়ীরা সরকারকে ল্যাজে-গোবরে নাজেহাল করে তুলবেন। সঙ্কটটা দেখছি একমাস আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ল্যাজের গোবর মুখে লাগবার উপক্রম হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় খাদ্যদপ্তরে একহাজার লোক নিয়োগের কথা হচ্ছে।

ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ পরিমিত পরিমাণ চাল সরবরাহ করতে না পারলে এবং বড় দরের মজুতদার ও আড়তদারদের প্রতি কঠোর হতে না পারলে, লোকজন বাড়িয়ে কোন কাজই হবে না। দিনদশেক ধরে অভিযান চলার পরও কলকাতার চালের বাজারে সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। উড়িষ্যার চালের আমদানীও হ্রাস পাচ্ছে। তবে, ভরসার কথা, শরণ সিং না কি শরণাগতদের যে-কোন উপায়েই হোক উদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছেন। তাতে কতটা শেষরক্ষা হবে, বলা মুস্কিল।

* * *

চালের দাম, তেলের দাম সরকার বেঁধে দিয়েছেন। দুধেরও একটা ফয়সালায় সরকার হাত দিয়েছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাধের হরিণঘাটার দুধ দিনের পর দিন কমে যাচ্ছিল। খালি বোতল হাতে ফিরতে হচ্ছে গ্রাহকদের। অথচ এই হরিণঘাটার পত্তনের পরই কলকাতার গয়লারা একটু দমে গিয়েছিল—অন্য জিনিষের দামের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুধের দাম বাড়াতে পারে নি। হরিণঘাটার দুধের ঘাটতির সংবাদ পেয়ে দাম না বাড়ালেও বালতি বালতি জলের ব্যবস্থায় নেমেছিল কলকাতার গয়লার গোষ্ঠী। পরম কারুণিক সরকার করুণাপরায়ণ হয়ে এর মধ্যেই দুধের ঘাটতি মেটাবার পথ বের করেছেন। দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থ তুলে নিয়ে, অন্য কিছু মিশিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তাতে মূল্য অবশ্য একটু কম দিতে হবে। স্নেহজাতীয় অংশ তুলে নিলে কোন ক্ষতি কেন হবে না, আমরা বুঝতে পারলাম না। সুখের কথা, দুধের সরবরাহ বাড়ছে। সেই সঙ্গে দুধ বিলি-ব্যবস্থার ভার যাঁদের ওপর তাঁরা একটু নড়ে-চড়ে, একটু কর্মতৎপরতার পরিচয় দিতে পারলে কাজটা সহজ হবে অনেকখানি।

ভাত কম খেয়ে বিকল্প খাদ্য হিসেবে আলু দিয়ে উদরপূর্তির উপদেশ এতদিন বর্ষণ করেছেন আমাদের রাজ্য সরকার। গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আলুর দাম ৩৪ নয়া পয়সা থেকে ৭৩ নয়া পয়সা পর্যন্ত উঠেছে। শোনা যাচ্ছে আলুর দামও বেঁধে দেওয়া হবে শীগ্‌গিরই। সে দাম ৮৫ নয়া পয়সার কম হবে কি না, কেউ বলতে পারেন না। ৮৫ নয়া পয়সা বাঁধতে হলে আলুর বাজার আরও গরম হওয়া প্রয়োজন। অন্তত ৯৫ নয়া পয়সা না হলে, সরকার বাহাদুরী দেখাতে পারেন না। আলু ব্যবসায়ীরা প্রচার করে চলেছেন, এবারে উৎপাদন ভাল হয় নি। তার ওপর পোকায় আলু পয়মাল করে দিয়েছে। এতে উৎপাদকের ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়, অন্তত আড়তদারদের ভাবনা না ভেবে সরকার চুপ করে বসে থাকেন কি করে? তাই আলুর দাম বেঁধে দিতে গেলে একটু বুঝে সুঝেই করতে হবে।

এখানেই শেষ নয়—ডালের দামও সরকার ঠিক করে দেবার কথা ভাবছেন। এক টাকা বিশ থেকে ত্রিশ নয়া পয়সা ডালের দাম এখন চলছে। সরকারের মতে ডালের ন্যায্য দাম নিশ্চয়ই এক টাকা কিলোর কম হবে না। বেগুন, পটল, ঝিঙে, লঙ্কা, ঢেঁড়সাদির সম্পর্কেও নানা কথাই শোনা যাচ্ছে।

শোনা কথা নিয়ে আলোচনা আর করবো না। গুজবে কান দেওয়া ভাল নয়। চাল কিন্তু আমাদের ৮০।৯০ নয়া পয়সায়, মাছ ৪।৫ টাকা কিলোতে কিনতে হচ্ছে। এতে দুঃখ করেই বা লাভ কি? সরকার বাহাদুর দাম বেঁধে দিয়েছেন, একথা যেন ভুলে না যাই।

* * *

ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে সাধারণ মানুষ সাড়া দেয় নি। জীবনযাত্রার মূল্যমান বেড়ে যাওয়ায় প্রতি মানুষকে জীবিকার ধান্দায় ছুটে চলতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকলে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে ট্রাম-বাস বর্জন সম্ভব নয়। বৃথা ট্রামের লাইনে মাথা ঠোকা কেন? এতে কোন ফল হবে না। বাস্তববোধবর্জিত কোন আন্দোলনের পেছনে গণশক্তির সমর্থন থাকতে পারে না।

ট্রাম ও বাসের বর্ধিত হারে ভাড়া দিয়েও যাতে বাদুড়ঝোলা না হতে হয়, তার ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করেছেন কলকাতা মেট্রোপলিটন সংস্থা (সি-এম-পি-ও)। এই সংস্থার যিনি কর্ণধার তাঁর গুণপনার বিস্তৃত পরিচয় আমরা আগেই বঙ্গ-দর্শনের পাঠকদের কাছে দিয়েছি। পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এখনও। ট্রাম-বাসের হাতল ধরে ঝোলার কষ্ট লাঘবের জন্য যাত্রীদের বায়ুপথে পরিচালনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। মনো রেল বা এ্যারো রেল চালাবেন কলকাতার শূন্য পথে পথে। মাটির তলা দিয়ে রেলগাড়ির পরিকল্পনা বহুদিন চাপা পড়েছে, কারণ কলকাতার নীচে মাটি নেই---আছে শুধু বালু আর জল। তারপর জল্পনা-কল্পনা চলছিল মাটির ওপর দিয়ে সার্কুলার রেল চালাবার। এবারে সকলকে তাক লাগিয়ে মাটি থেকে রেলকে শূন্যে তোলার পরিকল্পনা হচ্ছে। আদপেই সব শূন্য না হয়, তাই আমরা ভাবছি। সি-এম-পি-ওর কর্ণধারের অসীম করুণা। তাঁর এই পরিকল্পনায় আর কিছু না হলেও, সার্কুলার রেলের প্রস্তাব একেবারে ধামাচাপা পড়বে।

* * *

পশ্চিম বাংলার মানুষ যখন সকালের ভাবনা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না, তখন দরিদ্রের নারায়ণ ---দৈন্য দায় থেকে সাধারণ মানুষ কে মুক্তি দেবার কাজের 'সোল এজেণ্ট' কমিউনিস্ট পার্টিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দলীয় কোঁদলে তাঁরা উন্মত্ত হয়ে 'এজেন্সির' দায়িত্বের কথা যেন বেমালুম ভুলেই গেছেন।

পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্টদের মধ্য ও বামের মধ্যে মিতালী জমে

● শ্রীহুমায়ুন কবির

উঠেছে। এঁরা মিলিতভাবে ডাঙ্গে-পন্থীদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার কাজে নেমেছেন। ময়দানে সভা করে শ্রীজ্যোতি বসু জোরদার বক্তৃতা করেছেন। সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীমুজাফর আহমেদ। শ্রীডাঙ্গের অনুগামী "দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে কোণঠাসা করে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করার জন্য" জনগণকে আহ্বান জানান হয়েছে সভা থেকে। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা ভুলে যাচ্ছেন, গণদেবতা চীনের ভারত আক্রমণের পর থেকেই তাঁদের কার্যকলাপে বিরূপ হয়ে আছেন। বামপন্থীদের চীনা-প্রীতির মোহ না কাটলে গণমানস আরও বামই হবে।

**২৪ পরগণা ঃ**

কদিন ধরে সমানে জল-ঝড় হওয়ায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের চাষের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। পাটের বীজ যা' ছড়ানো হয়েছিল তা' অঙ্কুরিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম---বৃষ্টিতে বীজ চাপা পড়ে গিয়েছে। আগাছা ও ঘাসে মাঠ ভরে উঠেছে। ধানের পক্ষে এ অবস্থা মোটেই শুভ নয়। আম, জামরুল, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলও নষ্ট হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। শুধু ২৪ পরগণা, নয়, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ থেকেও একই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

২৪ পরগণার চাষের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে আশাপ্রদ না হলেও এ জেলা সম্পর্কে সম্প্রতি সুখের খবর পরিবেশন করে গেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবির। ক্যানিং অঞ্চলের মাটির তলায় তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাকি অতি উজ্জ্বল। আসন্ন বর্ষার আগেই খনন কাজ সুরু হবে। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় দেড় বছর।

**পশ্চিম দিনাজপুর ঃ**

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে দেশের আর্থিক কাঠামোকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন স্বীকার করেই গ্রামে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্য জোর প্রচারকার্য চলেছে। এই প্রচারের পেছনে আন্তরিকার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই। গঙ্গারামপুর তপন মৎস্যজীবী সমবায় সংঘ তার একটি জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য।

সরকারের সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী এই সংস্থাটি রেজেষ্ট্রীকৃত।

এই সংস্থার সদস্যদের একমাত্র জীবিকা মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করা। পুনর্ভবা ও ব্রাহ্মণী নদীর জলই এদের সম্বল। বালুরঘাট মৎস্যজীবী সমিতির কাছ থেকে পুনর্ভবা ও ব্রাহ্মণী নদীর জলকর বন্দোবস্ত নেবার ব্যবস্থা করে। কথা পাকাপাকি হলে নির্ধারিত অর্থ ও সমবায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু বালুরঘাট মৎস্যজীবী সমিতি নতুন করে টাল-বাহানা সুরু করেছে। তারা নাকি জানিয়ে দিয়েছে গঙ্গারামপুর তপন মৎস্যজীবী সমবায় সংঘকে না দিয়ে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিবিশেষকে।

দেশের সমবায় আন্দোলনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, আমরা তাদের দৃষ্টি এ ঘটনাটির প্রতি আকর্ষণ করছি। সাত শ' পরিবারের জীবিকার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে সমবায় আন্দোলনের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণাই বাড়বে মাত্র।

* * *

বালুরঘাট মহকুমার জনসাধারণ বন্যার হাত থেকে শহরের একটা বিরাট অংশকে রক্ষা করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছিলেন। এই মহকুমার ভাঙ্গা এবং আরও কয়েকটি ইউনিয়ন আত্রেয়ী নদীতে বন্যার ফলে প্রায় প্রতি বৎসরই জলমগ্ন হ'ত। তার ফলে কয়েক হাজার একর জমির শস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হ'ত। শুধু তাই নয়, শহরের উদ্বাস্তু অধ্যুষিত বেলতলা পার্ক, চকভৃগু, নারায়ণপুর প্রভৃতি এবং খেলার মাঠগুলি বন্যার ফলে কয়েক মাস জলমগ্ন অবস্থায় থাকত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আত্রেয়ী নদীর বাঁধের কাজ সমাপ্ত করছেন। বর্তমানে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে আত্রেয়ী নদীর ফাঁড়িতে স্লুইস গেটের কাজ দ্রুতগতিতে সেচ বিভাগের পরিচালনায় চলছে।

বাঁধের কাজ চকভবানী মালোপাড়া ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বলে সেচ বিভাগের জনৈক মুখপাত্র এক সাক্ষাৎকারে জানান। কারণ, উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণ বাঁধ মালোপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত করবার জন্য দাবী জানিয়েছেন। ঐ অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু ঘরবাড়ি নির্মাণ করে চাষ-আবাদ করছেন। প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় বন্যার ফলে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ি ত্যাগ করে স্কুল-কলেজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেচ বিভাগের নিকট চকভবানী অঞ্চলের উদ্বাস্তুগণ আসন্ন বর্ষার পূর্বেই বাঁধের এক্সটেনসনের কাজ শেষ করবার জন্য দাবী জানিয়েছেন।

বালুরঘাট শহর রক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে স্লুইস গেট নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর স্লুইস গেটের ওপর দিয়ে ২৫ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ হওয়ার কথা। কারণ, বর্তমানে খাঁড়ির ওপর দিয়ে যে জরাজীর্ণ ব্রিজটি রয়েছে, তার ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়েছে।

এ ছাড়াও উক্ত পরিকল্পনার কৃত্রিম হ্রদ, মৎস্য চাষ, পার্ক, সুইমিং পুল প্রভৃতি রয়েছে। কৃত্রিম জলাশয়ে মৎস্যের চাষ করলে এই শহরে অনেকখানি মৎস্যের অভাব কমবে বলে অনেকে মনে করেন।

বিগত কয়েক বৎসরে এই শহরে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয় নি। সেচ বিভাগের উদ্যোগে এই পরিকল্পনার প্রতিটি কাজ যদি বাস্তবে রূপ পায়, তবে এই শহর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হবে এবং মহকুমার কৃষিজ উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

**বর্ধমান :**

জামালপুর থানার কোড়া, শিয়ালী, অমরপুর ও মাঠশিয়ালী গ্রামের মানুষ বাইশ বছর পর এবার ত্রিশ হাজার মণ অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করেছে। ঘটতি পশ্চিম বাংলায় এ উদ্যম প্রশংসনীয়। অথচ এ কাজটি আমাদের সরকারী দপ্তরের তত্ত্ব ও তথ্য বিশারদগণ একটু সচেষ্ট হলে আগেই হতে পারতো।

নতুন ও পুরানো দামোদরের মাঝখানেই অবস্থিত এই কটি গ্রাম। সাত শ' পরিবারের এখানে বসতি। বর্ষার সময়ে দামোদর থেকে বৃষ্টির জল নেমে এসে ভাসিয়ে দেয় বছরের পর বছর এ গ্রাম কটি। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নেই। তিন থেকে পাঁচ ফুট জল যায় জমে। বাইশ বছর আগে, বাদুরদহ খাল ছিল এ অঞ্চলের জল নিকাশের একমাত্র পথ। বালুচরে খালের মুখ গেছে বন্ধ হয়ে। জল নিকাশের অভাবে ক্ষতি হচ্ছিল তিন হাজার বিঘা চাষের জমির। অথচ এলাকাটি আমাদের সরকারের বহু বিঘোষিত 'প্যাকেজ প্রোগ্রামেরই' অন্তর্ভুক্ত। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে পুরানো দামোদরের অব্যবহার্য বাঁধটি কেটে আবদ্ধ জলে-ডোবা জমি উদ্ধারের আবেদন-নিবেদন কম হয় নি। কিন্তু শোনে কে? হাতে কলমে, সরেজমিনে কিছু করা যাঁদের কাজ নয় তাঁরা তত্ত্ব-কথা বিতরণ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারেন। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হয়েই অব্যবহার্য বাঁধটি গেল বছর জোর করে কেটে দিয়ে জল নিকাশের উপায় করে নিয়েছিল। জল নিকাশের পর তারা চাষ করে সোনা ফলিয়েছে---পেয়েছে ত্রিশ হাজার মণ ধান। আশা করি, এই সংবাদের পর আমাদের কৃষি ও সেচ দপ্তরের চৈতন্যোদয় হবে এবং তাঁরা গ্রামগুলোর জল নিকাশের আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেবেন।

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**বৃত্র-সংহার কাব্য**
দাম---দুই টাকা।
**বসুমতী প্রাইভেট লিঃ**
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

## এক

বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পরই গোবর্ধনবাবুর মনে হলো : ভাড়াটের বেশি আস্পর্ধা হওয়াটা ভালো নয়। সুতরাং নিয়ম করে দিলেন সকালে উঠতে হবে সাতটায় আর রাতে দশটার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে দরজা খোলাই হবে না।

পাগলকে নিয়ে স্ত্রী শশিমুখী আজ ত্রিশ বছর ঘর করছেন। অদৃষ্টকে তিনি মেনেই নিয়েছেন। টাকা-পয়সা শ্বশুর সবই তাঁর নামে দিয়ে গিয়েছেন। গোবর্ধনবাবু পরের গোলামী করেন না। বিয়েতে পাওয়া কোট প্রায় চাইনিজ ব্লাউজ হয়ে গেছে, তবু সেটা তাঁর অঙ্গ-ছাড়া কখনও হয় নি। গায়ে এত দুর্গন্ধ যে, একবার তাকে ডাষ্টবিন ভেবে ওপর থেকে এক ভদ্রমহিলা তাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টির মত তরকারির খোসা ইত্যাদি ঢেলে দিয়েছিলেন। পথে বেরুলে গরুতে পচা কাঁঠাল মনে করে গা চেটে দেয় আর ষাঁড়ে বিরক্ত হয়ে তাড়া করে।

এ হেন গোবর্ধনবাবু একদিন দেখলেন সন্ধ্যেবেলায় ভাড়াটের ঘরে আলো নেই—। সুতরাং থাবা পেতে বসে রইলেন সারা বাড়িতে আলো জেলে।

সাড়ে দশটার সময় কড়া নাড়তেই একটা ভেংচি কেটে গোবর্ধনবাবু বললেন : দরজা খোলো। সারা বাড়ি অন্ধকার কেন করেছিলে—বলো ?

: সে কি, আমাদের নেমন্তন্ন ছিল যে !—বাইরে থেকে জবাব এলো।

: নেমন্তন্ন ছিল !—তেমনি ভেংচি কেটে গোবর্ধনবাবু বললেন : তবে রাতটা ওখানে থাকলেই হতো, বাড়ি ফিরলে কেন ? দরজা খুলবো না, রকেই বসে থাকো।

ওপর থেকে শশিমুখী বললেন : কি হচ্ছে তোমার ?—ভদ্রলোক সারা রাত বাইরে বসে থাকবেন শীতের মধ্যে ?

: কি ? কে কথা কইলে ? শশিমুখী ! দেখো তোমাকে সাবধান করে দিলাম—বাড়ি আমার, ভাড়াটেও আমার। আমি তাদের যা খুশি তাই বলতে পারি। নাবালক পেয়ে তুমি আমায় শিক্ষা দেবে ? আমি কোনো তৃতীয় পক্ষের মত শুনতে চাই না। এ-ব্যাপারে আমি প্রথম পক্ষ—ভাড়াটে দ্বিতীয় পক্ষ আর তুমি তৃতীয় পক্ষ—। এসো তোমরা ভেতরে, আমি নিজে দরজা খুলে দেব—শেষকালে আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকাবে শশিমুখী—ওই শিখে উকিলের মেয়ে, যার নামে হাওয়া ফাটে। এসো, সব ভেতরে এসো বলছি !

সুশান্তবাবু স্ত্রী আর ছেলে মৃন্ময়কে নিয়ে বাড়ি ঢুকে বাঁচলেন। কিন্তু গণ্ডগোল বাধলো সকালেই। আজ ক'দিন মৃন্ময় ছিল তার মাসীমার বাড়িতে, সুশান্তবাবু ও স্ত্রীকে নিয়ে বিয়ে উপলক্ষে ক'দিন থেকে এলেন। এর মধ্যে বাড়ির ভেতরে ময়লা ফেলে প্রায় একহাঁটু করে ফেলেছেন গোবর্ধনবাবু। চারিদিকে ছাই আর ময়লা—এর মধ্যে থাকা যায় ! গোবর্ধনবাবুর মেয়ে সুধা নিচে নামতেই মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা। এক গাল হেসে সুধা বললে : দেখছো কি মৃন্ময়দা—বাঘ বেরুবে। বাবা তো জমাদারকে মারতে—বলেই ফিক করে হেসে ফেললো,—স্নান করবার ভয়ে মারে নি ; গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাড়ি তো সুন্দরবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি দক্ষিণ রায়ের হাতে প্রাণ না দিতে চাও তা'হলে একটা জমাদার ডাকো এই বেলা। বাবা বাজারে গেছে, ফেরবার আগেই আমরা পরিষ্কার করে নেব।

কিন্তু তারপর ?—মৃন্ময় বললে

: আমি সামলাবো।—তুমি আলো ধরো লক্ষ্মীটি।

বাজার থেকে ফিরলেন গোবর্ধনবাবু। গন্ধে ভারে মন্থর বায়ু, সুতরাং মৃন্ময় ছাদে আত্মগোপন করেছে, সুধা একেবারে চিলে কোঠায়।

হাতের ধ্বজধ্বজার মত কচুগাছ মাটিতে আছড়ে ফেলেই চিৎকার করে উঠলেন গোবর্ধনবাবু: আমার বাড়ি আমার অবর্তমানে কে পরিষ্কার করালে?

: বোধ হয় সুশান্তবাবু—ছি-ছি, যে নোংরা হয়েছিল, থাকবে কী করে?

: আমার বাড়ি পরিষ্কার করার কী ক্ষমতা ভাড়াটের। আমার উঠোন আমি যত খুশি ময়লা করবো। কার সাধ্যি সাফ করে দেখি—বলেই হাতের মাছ আর আলুর থলি ছুঁড়ে ফেলে সামনের ডাষ্টবিন থেকে দেদার ময়লা এনে বাড়ির উঠোনে জড়ো করলেন। মৃন্ময় মুখে রুমাল দিয়ে হাসতে লাগলো: কি করছে দেখ কাকাবাবু—

: তুমি হাসছো মৃন্ময়দা—দেখ, মা কাঁদছেন।

দু'দিনের জন্যে কি যেন বিশেষ দরকারে গোবর্ধনবাবু গেলেন শ্যামবাজারে। সে যেন তাঁর বিলেত যাওয়া। দু'পকেটে সংসারের যাবতীয় জিনিষ। যে-কটি জামা ছিল সব গায়ে দিয়েছেন, তারপর হাতে একটা চটের থলি নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন শ্যামবাজারে কাকার বাড়ি।

: এই সুযোগ।—শশিমুখী বললেন মৃন্ময়ের মাকে—চলুন দিদি, সুধার সেই পাত্রটিকে দেখে আসা যাক। আমরাই ঠিক করে আসি।

: বেশ তো চলুন—মৃন্ময়ের মা সুধাকে খুবই ভালোবাসেন, তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলায় ওঁরা দুজনে ছেলের বাড়ি-ঘর, ছেলে সব দেখে ভাবি প্রসন্ন হয়ে ফিরে এলেন। সুধা মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী, ওর একটা ভালো বিয়ে হলে সুশান্তর বাবা-মা সবাই খুশি হন। ওঁরাই জানাশোনা পরিবারের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাবটি করেছিলেন।

: মেয়ের বাবা কি করেন?—ছেলের মা জানতে চেয়েছিলেন।

: নিজেদের বিজনেস দেখেন।—একটা ঢোক গিলে বেশ খানিকটা দম নিয়ে শশিমুখী বললেন, খুব ব্যস্ত লোক।

: ও, তাই তিনি বরং আসতে পারলেন না?

: হ্যাঁ, তাই তো আমরা এলাম।—মাথা চুলকে বললেন মৃন্ময়ের মা—ওঁর সঙ্গেও আলাপ হবে, যেদিন মেয়ে দেখতে যাবেন।

: বেশ, কবে গেলে আপনার সুবিধা হয়?

: কালই আসুন, ভালো কাজে বেশি দেরী করা ঠিক নয়।

: বেশ কাল সন্ধ্যেয় যাব।—তাই ঠিক রইলো।

কিন্তু বিকেলবেলাতেই ফিরে এলেন গোবর্ধনবাবু। কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শশিমুখী সাড়া দিলেন: কে?

: কে?—শুনেই ভেংচে উঠলেন গোবর্ধনবাবু।—আমার নিজের বাড়িতে ঢুকবো তার জন্যে এত কৈফিয়ৎ? কো? কো? কেন চোর নাকি?—দুটো ঝাঁকা-মুটে গোবর্ধনবাবুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। গোবর্ধনবাবু বললেন: ভাঙ দরজা—এক টাকা বকশিস পাবি। আমি মেয়েলোকের আস্পর্দা দেখছি—আমায় বলে কি না, কে? কেন? আমি কি চোর যে এত কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকবো?

হঠাৎ দরজাটা খুলে শশিমুখী বেরিয়ে এলেন: এটা হচ্ছে কী শুনি? দরজাটা ভাঙলে ক্ষতিটা হবে কার?

: আমার দরজা আমি ভাঙবো তাতে কার কী বলবার আছে?

: বেশ ভাঙো!—শশিমুখী হাল ছেড়ে দিয়ে দম দম করে পা ফেলে ওপরে চলে গেলেন।

: ভাঙবো না আমি দরজা। শেষে স্ত্রীর কথায় দরজা ভাঙবো, আমি কি এতই বোকা!—তোরা কে—? তোদের কে ডেকেছে?

: আপনিই তো বাবা!

: চপ! নিশ্চয়ই আমাকে একা পেয়ে দরজা ভেঙে চুরির মতলব—পুলিশ পুলিশ! গোবর্ধনবাবু সিংহনাদ ছাড়লেন: তোদের আমি হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব, তবে আমার নাম গোবর্ধন!

: এটা কি গোবর্ধনবাবুর বাড়ি? এক ভদ্রলোক আর একটি ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন।

: হ্যাঁ—! আমিই গোবর্ধন। কি চাই—? গোবর্ধনবাবু যেন একটু সন্দিগ্ধ-ভাবে তাকালেন। কিন্তু কোন কথার উত্তর দেবার আগেই শশিমুখী এসে দাঁড়ালেন দরজায়: আসুন—আসুন।

গোবর্ধনবাবু অপ্রসন্নভাবে ভুরু কোঁচকালেন, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনি, তাই ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন।—

: আসুন—আসুন, বসুন—আমরা আপনার বাড়ি এসেছি—আপনি অবশ্য খুবই ব্যস্ত লোক—

: ব্যস্ত মানে? আমি তো বসেই থাকি সারাদিন। কাজকর্ম তো কিছুই নেই।

: তাতে কি হয়েছে। আমরা আপনার মেয়ে দেখতে এসেছি।—খাবি খেলেন বরের মা।

: মেয়ে দেখবেন? দেখতে পারেন, তবে আমার মেয়ে আমারই পছন্দ হয় না—আপনার কি হবে?

বরকর্তা তবু ধৈর্য ধরে রইলেন। সুধা এলো—ভারি সুন্দর টুকটুকে মেয়ে, পছন্দ হবারই কথা।

কাজেই পাত্রের বাবা-মা একেবারে এখানেই দেওয়া-নেওয়ার কথাটা শেষ করে নিতে চাইলেন।

: নগদ টাকা—অন্তত বিয়ের খরচ—

: আপনারা ভিক্ষুক। —এলেন,

কিয়ান
নতুন সংযোজন
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩০.৩শু চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

এতগুলো খেলেন, আবার টাকা চান—সোনা চান—নিকাল যাও! নিকাল যাও—গোবর্ধনবাবুর চিৎকারে বাড়িশুদ্ধ কেঁপে উঠলো। পাত্রপক্ষ একেবারে হতবাক্।

শুধু চিলে কোঠার ছাদে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলো সুধা—বিয়ে ভেঙে যাবার আনন্দে; আর ছাদের আলসের ওপরে বসে তর্জনী তুলে নীরবে শাসন করলো মৃন্ময়—দু'চোখে তার দুষ্টু মির হাসি।

কিন্তু শশিমুখী এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার ফয়সালা করতে দিলেন না। গোবর্ধনবাবু বাড়ি থাকতে কিছুতেই সুধার বিয়ে হবে না। বিয়ে দিতে হলে গোবর্ধনবাবুকে সরানো দরকার। সুতরাং ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করে একদিন শশিমুখীর ছোট ভাই টেপাকে পাঁচ টাকার মিষ্টি কবুল করে, স্বামীকে তিনদিনের জন্য চন্দননগর পাঠিয়ে দিলেন নিজের বাপের বাড়ি। খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন টেপাকে—যেন তিনদিনের আগে কিছুতেই গোবর্ধনবাবুকে ছাড়া না হয়। এখানে তিনটে দিন পেলেই শশিমুখী সব কাজ শেষ করে ফেললেন। বিয়ে হয়ে গেলে চেঁচিয়ে গোবর্ধনবাবু কী আর করবেন।

এদিকে গোবর্ধনবাবুকে ষ্টেশনে রওনা করিয়ে দিয়ে শশিমুখী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। গয়না—বাসন কোশন—সব। পরের দিনই বিয়ে।

সুধার চোখে জল! মৃন্ময়েরও চোখ প্রায়ই ফরফর করছে—মা জিজ্ঞাসা করলে বলছে, চশমার পাওয়ার বেড়েছে, বদলাতে হবে।

বর এসে গেছে গলির সামনে। বরণ করতে বেরিয়েই চার চোখের মিলন হলো—একেবারে সামনে গোবর্ধনবাবু দাঁড়িয়ে বিস্মিত—স্তম্ভিত এবং হতবাক। কী একটা সন্দেহ করে চন্দননগর থেকে পলাতক।

: একি—? কার বিয়ে?—ও গিন্নী তোমারই নাকি?

শশিমুখী মরণ কামড় দিয়ে পড়লেন। একটা ঝাপটা মেরে বললেন: মরণ আর কি? আমার বিয়ে হবে না তো হবে কার। যম তো এসে দাঁড়িয়েছে সামনে—বরণ করলেই—

: থামো—! এত খরচ করলো কে?—বাড়ির ভেতর ঝড়ের মত ঢুকে পড়লেন গোবর্ধনবাবু—একি, এত জিনিষ একটা শুঁটকে মরকুটে ছেলেকে দিতে হবে?—সুধা—! সুধা!—ও-মা সারা গায়ে এত গয়না—! বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তো মেয়েটাকে!

: তুমি যে দক্ষযজ্ঞ করে তুললে। এ বিয়ে আমি দেবই—শশিমুখী মাজায় হাত দিয়ে যুদ্ধের ঘোড়ার মত পা ছুঁড়তে লাগলেন।

: আমার মেয়ের কে বিয়ে দেয় দেখি!—যাও—দূর হও! আবার টোপর পরা হয়েছে? রাখো টোপর—! আমি সুধার বাবা। গোবর্ধন চক্রবর্তী আমার নাম। দেখি ওই সজনে ডাঁটার মতো ছেলের সঙ্গে কি করে আমার অমন মেয়ের বিয়ে দেয়।—আমি পুলিশ ডাকবো—পুলিশ—পুলিশ—ফায়ার ব্রিগেড—

: কী হচ্ছে কাকাবাবু—মৃন্ময় গোবর্ধন বাবুর হাত ধরলো।

: চুপ কর—তোদের সবার নামে আমি কেস করবো—আমার মেয়ে—আমার একটা কানাকড়ি কিছু আমি আমার এ বাড়ি থেকে বেরুতে দেব না। কষ্ট করে মেয়ে বড় করেছি, কলেজে পড়িয়েছি তা কি পরের বাড়ি দেবার জন্যে?

চারদিকে লোক জমা হয়ে গেছে। হট্টগোলে বরপক্ষ অপমানিত হয়ে গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—আর গোবর্ধন-বাবু স্থানে স্থানে লাফাচ্ছেন: পুলিশ—পুলিশ—ও কালকুটে মোকটাকে গ্রেপ্তার করো—ওটা চোর।—লক্ষ্য ভাবী জামাইয়ের দিকে।

: কাকাবাবু লগ্ন বয়ে যাচ্ছে—সুধা পিঁড়িতে বসে, সম্প্রদান না করলে—

: চুপ কর ভাড়াটে—আমার বাড়ির ভাড়াটের আমার মুখের ওপর কথা! বেয়াদপ, তোর যদি এত মায়া পড়ে থাকে, আমি তোর সঙ্গেই বিয়ে দেব। কারুর কথা শুনবো না। আমার মেয়ে আমি সম্প্রদান করবো, দেখি কে কি করতে পারে—বল হে টিকি-পণ্ডিত, মন্ত্র বল! সুধা বাবার পায়ে মাথা রাখলো, আর মৃন্ময় হতবাক হয়ে শুধু গোবর্ধনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তখন দুটো হাতই গোবর্ধনবাবুর হাতের মধ্যে ধরা।

সম্প্রদান করে বিজয়গর্বে গোবর্ধনবাবু ঘোষণা করলেন—দেখ কেমন বুদ্ধি—মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল আর কিছুই বাইরে বেরুল না।

: বেয়াই—সুশান্তবাবু ডাকলেন।

: মেলা বকবেন না। আমার ভাড়াটের সঙ্গে এখন আমি বোঝাপড়া করবো—দরজায় দাঁড়িয়ে গোবর্ধনবাবু বললেন—দশটা বেজে গেছে—সব যাও যে যার বাড়ি, নইলে পুলিশ ডাকবো—বলে সবার মুখের সামনে সশব্দে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

# গল্প মেলা

শুধু বাংলা দেশেই নয়—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে, সাহিত্য গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় পত্র-পত্রিকার অবদান প্রচুর। বাংলা সাহিত্য এখন রসসাহিত্যে সমৃদ্ধ। একথাও আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় যে-কোনো বিষয়ের অবতারণা করা সম্ভব। তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা দেশের লেখকবৃন্দ রসসাহিত্য পরিবেশনে যতখানি মনোযোগী, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ততখানি উদাসীন। রস-সাহিত্যে কল্পনার ঔদার্য থাকলেও জাতিকে বলিষ্ঠতর করার জন্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যা চর্চার একান্তই প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা দেশে বর্তমানকালে এই ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। ঐ সঙ্গে যে সব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ ও পুস্তক রচনা করছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষত, বিজ্ঞানভিত্তিক পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন ও প্রচার বর্তমানে সর্বাধিক। কেন না, প্রাথমিক প্রচেষ্টা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠলে তার সম্পূর্ণ রূপটি ভবিষ্যতে সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

"রাষ্ট্র" (সম্পাদক : নির্মল বসু। কার্যালয় : ১৫৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, বুক—এন, রুম নং ৮, কলকাতা-৬) বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনার একমাত্র ত্রৈমাসিক মুখপত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধুরন্ধর ব্যক্তিরা এই পত্রিকায় বাংলা ভাষায় তাঁদের রচনা নিয়মিত দান করছেন দেখে আমরা আনন্দিত। তৃতীয় বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নির্মলকুমার সেনের (সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা), সুকুমার দামের (ভারতের বিচার ব্যবস্থা), রঘুবীর চক্রবর্তীর (আন্তর্জাতিক আইন ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সমস্যা), সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা), অবিনাশ

**জয়ন্তী সেন**

দাশগুপ্তের (চীন-রুশ মতবিরোধ), সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের (সোভিয়েট-চীন দ্বন্দ্ব) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা হিসেবে সমুদ্র-মানুষ ও নাবিক-জীবন-সংক্রান্ত ত্রিমাসিক 'সিন্দবাদ নাবিকের' (সম্পাদক : ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী, কার্যালয় : ২, এন রায় রোড, কলকাতা-৮) অবদানও কিছুটা উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলা এই দুই ভাষায় প্রকাশিত। এতে কিছু গল্প ও কবিতা স্থান পেয়েছে। তথাপি এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বসুর 'প্রাচীন ভারতে নৌ-বিদ্যা' ও ডাঃ জহরুল হকের রচনাটি উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি আরো বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠলে আমরা আনন্দিত হবো।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্লাবের মুখপত্র 'সান' (সম্পাদক : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৩০৩ বি, টি, রোড, কলকাতা—৩৫ থেকে প্রকাশিত)।

একাদশ বছরে পড়লেও এর মাধ্যমে যে দায়িত্ব সম্পন্ন করা যেতে পারতো—সম্পাদক তা করতে পারেন নি—একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে। ক্লাবের পত্রিকা কতকটা রিক্রিয়েশনের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়—একথা ঠিক; কিন্তু 'লেখন' পত্রিকায় ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে রচনা প্রকাশিত হয়েছে—তা কি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল? শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের রচনাটি আমরা বাংলা ভাষায় রচিত দেখলে সুখী হতাম। এই পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ও কবিতাগুলি অন্যান্য পত্রিকার সমধর্মী বলা চলে।

'শর্মিষ্ঠা' (সম্পাদিকা : সুচেতা মৈত্র। ৫২-সি, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৫০ থেকে প্রকাশিত) যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরা এখনো বিদ্যালয়ের আঙিনা পার হয়ে আসে নি। তবে যে সব ছাত্রী এই পত্রিকা-প্রকাশে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তাঁরা একদিন আপন শক্তিতে জগৎ-আঙিনায় সহজেই ঠাঁই করে নেবেন, একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। পত্রিকাটি সাহিত্যমূলক হলেও একমাত্র মহিলাদেরই উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির অবদান একদা স্বীকৃত হবেই। ডক্টর রমা চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রী নিরুপেক্ষ, ও মোহিত মৈত্রের প্রবন্ধও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত। নরেন্দ্র দেব, সুশীল রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতির কবিতার পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবী ও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প দুটিও উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির মূল্যবান অংশ হচ্ছে 'বিচিত্রা' বিভাগ। শর্মিষ্ঠার প্রচ্ছদপট রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন শিল্পী নীপা চৌধুরী (মৈত্র)।

# রঙ্গমঞ্চ ও দেশ এবং বিদেশে

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

স্কুল অফ নাইটের একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং র‍্যালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন টমাস হ্যারিয়ট। গণিত এবং নক্ষত্রবিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। Alchemist (অর্থাৎ রসায়নের অপরিণত অবস্থায় তাকে বলা হত এ্যালকেমী) হিসাবেও তিনি নাম করেছিলেন। এলিজাবেথীয় যুগের বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রেও এর আগের যুগের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব

## শিলালি

দেখা যায়। হ্যারিয়ট ছিলেন এই সব বিজ্ঞানীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

He made major contributions to Algebra, especially in notation and symbolism ; for example, he introduced the signs $>$ and $<$ for 'greater than' and 'less than.'

এমন সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে যে, গ্যালিলিওর আগেই হ্যারিয়ট টেলিস্কোপ তৈরি করেন এবং sun-spots আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি তাঁর এ সব আবিষ্কার গোপনে রেখেছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তাঁর বিখ্যাত বই A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia (1588), বহুকাল অবধি আমেরিকার প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

বিজ্ঞানচর্চা থেকেই ক্রমশ হ্যারিয়ট বাস্তববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এই সব কারণেই অনেকের ধারণা জন্মায় যে, আসলে তিনি মনে-প্রাণে atheist. সৃষ্টির কারণ হিসাবে বাইবেলের নির্দেশ হ্যারিয়ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন না। কারণ হিসাবে তিনি Lucretins থেকে উদ্ধৃত করে বলেন--- Ex nihilo, nihil fit (From nothing, you can make nothing). This is fundamentally, the basis of modern materialism in science.

### সেক্সপীয়ারের সময়ের সমাজের ইতিহাস :

হ্যারিয়টের সমসাময়িক আর একজন গণিতজ্ঞ ও এ্যালকেমিষ্ট ছিলেন জন ডি। রাণী এবং তাঁর উপদেষ্টাবর্গ নানাধরণের কাজে ডি-কে মাঝে মাঝে নিয়োগ করতেন। ডি নিজে যে খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়—তবে রাজ-সরকারে তাঁর প্রতিপত্তি থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এলিজাবেথীয় যুগে দেশকে গড়ে তোলবার জন্য একটা বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হোত বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের ওপর।

ডি জাতীয় বৈজ্ঞানিকদের আসল পাণ্ডিত্যের থেকে বাইরের ভড়ংটা ছিল অনেক বেশি। এদের এই প্রতারক-মনোবৃত্তিকেই বিদ্রূপ করে বেন জনসন তাঁর উপাহাসাত্মক নাটক The Alchemist রচনা করেন। The

'ওথেলো' নাটকে ইয়াগোর ভূমিকায় জন নেভিল এবং ওথেলোরূপে রিচার্ড বার্টন ( ওল্ড ভিক ১৯৫৫—৫৬ )।

play is a satire on the unseemly aspects of the science of the time.

চুম্বকের শক্তি সম্বন্ধেও 'এ্যালকেমিষ্ট' নাটকে উল্লেখ আছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণীর চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্ট চুম্বক সম্বন্ধে একটি বই লেখেন। বিজ্ঞান বিষয়ক এই বইটিই প্রথম সারা ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর আবর্তন এবং ঐ জাতীয় সমস্যা সমাধানের সহায়ক হিসাবে এই বইটির গবেষণা খুব সাহায্য করবে—এই হয়েছিল তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলের ধারণা। এর কারণ, সে সময়ের বৈজ্ঞানিকেরা চৌম্বকশক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে তারতম্য করতে শেখেন নি। গিলবার্টের বইটির সাফল্যের আর একটি কারণ হোল এই—পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু তার উপরিস্থিত কোন কিছুই বাইরে ছিটকে পড়ছে না—বৈজ্ঞানিকেরা ভেবেছিলেন, গিলবার্টের বই এই সমস্যারও খানিকটা সমাধান করে দিয়েছে চৌম্বক-শক্তির ব্যাখ্যা দ্বারা।

'এ্যালকেমিষ্ট'-এ চৌম্বকশক্তির সঙ্গে নতুন আবিষ্কৃত 'তামাক' নিয়েও বেন্ জনসন বিদ্রূপ করেছেন। ইংলণ্ডে র‍্যালেই প্রথম তামাকের আমদানী করেন বাইরে থেকে। বধ্যমঞ্চে যাবার আগে র‍্যালে একপাইপ তামাক সেবন করেছিলেন। এর ফলে লোকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যায় যে, তিনি সত্যি-সত্যিই নাস্তিক (atheist) ছিলেন। 'এ্যালকেমিষ্ট' নাটকে Drugger নামে একটি চরিত্রও আছে। ঐ নাটকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে। অপরসায়নবিদ্ (Alchemist) Subtle নিম্নজাতীয় ধাতুকে সোনাতে পরিণত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন। শূন্যের রূপান্তর সম্ভব নয়। ধাতু না থাকলে, অন্য ধাতুতে তার পরিবর্তন হতে পারে না। 'This was a very important scientific remark at the time, and again shows Johnson's awareness of what scientists were saying. It is exactly like Hariot's remark, quoting Lucretius, that from nothing you can make nothing'

হ্যারিয়টের মত বেন্ জনসনও ছিলেন র‍্যালের ছেলের টিউটর। কিন্তু জনসন্ হ্যারিয়েটের মত র‍্যালের নিজস্ব চক্রের লোক ছিলেন না। বিখ্যাত নাট্যকার ক্রিষ্টফার মারলো ছিলেন র‍্যালের নিজস্ব চক্রে। যে পরিবারে মারলোর জন্ম হয়, তারা জুতো তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতো। মারলো শিক্ষালাভ করেন ক্যাণ্টারবেরী ক্যাথিড্র্যাল স্কুল এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থায়ও তিনি সরকারের তরফে গুপ্তচরবৃত্তি করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা প্রিভি-কাউন্সিলের একটি চিঠি আছে যাতে লেখা হয়েছে কর্তৃপক্ষীয়েরা যেন মারলোর সম্বন্ধে নিন্দাবাদে না কান দেন এবং তাঁকে যথাযথভাবে ডিগ্রী দিয়ে দেন—কারণ মারলো যা কিছু করেছেন, তা সরকারের স্বপক্ষে হয়েই করেছেন। কেম্ব্রিজে মারলো নিজেকে জেনটি শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেন।

লণ্ডনে এসে নাট্যকারের বৃত্তি নেবার পর তিনি কিন্তু আবার সমাজের নিম্নস্তরে নেমে এলেন। ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট নাটক-লেখাকে পেশা হিসাবে নেবেন, এ কথা তখনকার দিনে কেউ ভাবতে পারতো না। তাছাড়া সমাজের নীচের মহলের গুণ্ডা-বদমাইসদের সঙ্গে হুল্লোড় করে সময় কাটাতে ভালবাসতেন মারলো। চরম অসংযমের ঘূর্ণীর ভেতর পড়ে নিজের জীবনের সমতা যেমন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর নাটকের নায়কেরাও সেইভাবেই গড়ে উঠলো উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসংযমের নিদর্শন হিসাবে। মারলোর মতই তাঁর Tambulaine এবং Doctor Faustus জীবনের সমতার রেখাকে অতিক্রম (Overreach) করবার চেষ্টা করেছিলেন। Tambulaine wanted boundless power; Faustus desired ultimate knowledge; and the Jew of Malta thirsted after illimitable riches. (ক্রমশঃ)

● ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা মরিস ইভান্স এবং জুডিথ এণ্ডারসন।

# রঙ্গজগৎ

## শাড়ি বনাম বিকিনী ও সালোয়ার কামিজ

ভারতীয় নারীর শাড়ি নিয়ে কবিরা শুধু একালে নয়, বহুদূরে যাওয়া অতীত-কালেও কাব্য রচনা করেছেন। পল্লী-কবিরা শাড়ির রূপসাগরে ডুব দিয়ে গেয়েছেন—'নীলাম্বরী শাড়ি পরে নীল যমুনায় কে যায়।' শাড়ির মাদকতায় বাঁশীর সুর মধুর হয়ে উঠেছে। শুধু এদেশে নয়, যন্ত্রদেবতার দেশ ইউরোপ-আমেরিকায়ও আজ শাড়ির আদর। শাড়ির আঁচলের একটু হাওয়া লাগার মোহ তাদেরও পেয়ে বসেছে। তাই শুধু শাড়ির রপ্তানী বাড়ে নি, বিদেশী ছবিতেও শাড়ি-পরা নারী চোখে পড়ে।

কিন্তু আমাদের দেশে শাড়ি বুঝি সালোয়ার কামিজ আর মার্কিন দেশের বিকিনীর সঙ্গে পেরে উঠছে না। আমাদের চলচ্চিত্র-পরিচালকরা আজ আর শাড়ি নিয়ে খুশি নয়। শাড়ির দোষ—'বডির এনাটমি' না কি দেখা যায় না। এতদিন এই বাতিক বোম্বাইয়ের চিত্র-পরিচালকের মাথায় ছিল। কারণ, কাহিনী ও আঙ্গিক রচনায় তাঁদের শিল্প-চিন্তা দুর্বল। এই বাতিক থেকে বাংলা ছবিও মুক্ত নয়। তাই কয়েকজন হালে গজানো এবং কয়েকজন স্থবির পরিচালকের ছবিতে অনর্থক কোন নবাগতা তরুণী অভিনেত্রীকে স্ল্যাকস পরিহিতা দেখান হলো নানা ভঙ্গীতে। রূপালী পর্দার এই ঢেউ মঞ্চকেও স্পর্শ করছে। পর্দা থেকে যা মঞ্চে এসেছে, ঘরোয়া জীবনে আসতে তার কতক্ষণ। তাই মাঝে মাঝে রাস্তায় অনেক ভদ্রনারীর পোষাক দেখে চোখ ফেরাতে হয়। নিজেদের শাড়ির এত সৌন্দর্য, এত গ্লামার থাকতে, আমাদের চিত্র-পরিচালকরা বিকিনীর অনুকরণ আর সালোয়ার কামিজের বিকৃত কাটিং ব্যবহার করেন ব্যবসায়ের লালসায়। এই লালসা আমাদের চলচ্চিত্রের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

—সুজন।

সুমিত্রা দেবী

## চিত্র-আলোচনা

### বেটি বেটে

দর্শক মনোরঞ্জনের সর্বপ্রকার উপকরণপূর্ণ একটি হিন্দী ছবি 'বেটি-বেটে'। সাধারণ দর্শককে খুশি করার উদ্দেশ্যে এই ছবির কাহিনী এবং আঙ্গিক গড়ে উঠেছে। তিনজোড়া নায়ক-নায়িকা সুনীল-সরোজা, জয়ন্ত-ধুমল, মেহমুদ-শুভা খোটে দর্শকদের কখনো স্নেহ ও হাস্যরসের আনন্দ দান করেছেন। তার সঙ্গে রয়েছে শঙ্কর-জয়কিষণের শ্রুতিমধুর সঙ্গীত। সুতরাং হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে এটি উপভোগ্য ছবি বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে বাস্তব এবং যুক্তির কথা উত্থাপন করলে ছবিটিকে সস্তা তামাসার উর্ধ্বে মূল্য দেওয়া চলে না।

মিল-মজুর রঘু দেনার দায়ে এবং সর্বশেষে চোখ হারিয়ে তিনটি নাবালককে পথে বসিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। কিছু-দিন পরে এক বোন আর দুই ভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বোন বড়লোকের বাড়িতে আশ্রয় পায়, মেজ ভাই যাত্রাদলে, ছোট ভাই এক তামাসাওয়ালার ঘরে। বড় হলে তাদের ভাগ্য আবার পরিবর্তন হয়। বড় বোন গৃহ থেকে বিতাড়িতা কিন্তু আশ্রয়দাতা বড়লোকের ছেলের বাগ্‌দত্তা, মেজ ভাই শিল্পপতির কন্যার সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ, ছোট ভাইও বড়লোকের মেয়ের মন জয় করেছে। এ যেন দুঃখ-সুখের শোধবোধ। তার পরে ঘটনার চক্রগতিতে ভাইবোন

মিলিত হয়, এবং যে যার প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে একই বাসরে বসে বিবাহ করে। উপরি পাওনা স্বরূপ তাদের অন্ধ পিতাকেও ফিরে পায়।

কাহিনীকার এবং পরিচালক সাধারণ মানুষের রূপকথার গল্প শোনার সহজ মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুঃখের পরে সুখকে, এবং গরীবের সঙ্গে বড়লোকের মিলন ঘটিয়ে দিবা-স্বপ্নকে পর্দায় রূপায়িত করে তুলেছেন। শিক্ষিত রুচিবান দর্শকদের কাছে এই কাহিনী তামাসা মনে হলেও সাধারণ দর্শক শিস্ দিয়ে, নানারূপ মন্তব্য করে প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে তুলে ছবিটিকে তাদের ভাললাগার কথা প্রকাশ করেছে। তা কাহিনী যাই হোক, ছবিটির রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত সকল দর্শকের প্রশংসা পাবে।

● হাঙ্গেরীয় ছবি 'লিজেণ্ড ইন দি ট্রেন'-এর একটি দৃশ্য

## দুটি হাঙ্গেরীয় ছবি

হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে নিউ এম্পায়ার সিনেমায় প্রথম দিন 'টু-হাফ টাইমস ইন হেল' ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৪৪ সালে এক বন্দী-শিবিরে আটক কয়েকশত হতভাগ্য হাঙ্গেরীয়ের জীবন ও মুক্তির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে। ক্যামেরা এখানে বিস্ময়করভাবে বন্দীদের উপর নির্যাতনের চিহ্ন ও তাদের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশে দর্শকদের সামনে ফুটে ওঠে একাল, মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি অধ্যায়। যখন হিটলার নামক এক ঘাতক নাৎসীবাদ নামক এক বর্বর মতবাদ নিয়ে জগতে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। এদিক থেকে ছবিটি ইতিহাসাশ্রয়ী এবং ইতিহাসের একটা দুঃখজনক অধ্যায়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ। কাহিনী ঘনীভূত হয়ে ওঠে হিটলারের জন্মদিন উপলক্ষে নাৎসী সৈন্য ও বন্দীদের মধ্যে এক ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে। এই বন্দীদের মধ্যে এমন একজন ছিল যে অলিম্পিক খেলোয়াড়রূপে জনপ্রিয়। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় দল গঠন করে প্রস্তুত হবার জন্য। প্রস্তুতির সুযোগে খেলার আগের দিন তারা পালিয়ে গিয়েও ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পরে তাদের হত্যা করার পরিবর্তে খেলতে বাধ্য করা হয়। তারপরের কথা অনিশ্চিত। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যেও অন্যান্য বন্দীদের উৎসাহে তারা প্রেরণা লাভ করে। জার্মান সৈন্য ও হাঙ্গেরীয় বন্দীদের চিৎকারে খেলার মাঠ সরগরম হয়ে ওঠে। অর্ধেক সময় পরে হাঙ্গেরীয়দের কাছে জার্মানরা হেরে যায়। খেলা হলেও

● হাঙ্গেরীয় চিত্র 'ডলার ড্যাডি'র একটি দৃশ্য

এই পরাজয় যেমন জার্মান অধিনায়ক তেমন জার্মান সৈন্যরা বরদাস্ত করতে পারে না। মেসিনগানের গুলীতে বন্দী খেলোয়াড়দের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পূর্বে যে মাঠ খেলার উৎসাহে প্রাণচঞ্চল ছিল, এখন সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মত মনে হচ্ছে, আর শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

পরিচালক জোলটানফাব্রি কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে দশকমনকে আলোড়িত করে তুলেছেন। যেমন কাকেও অফিসে ডেকে পাঠালে সেটাকে মুক্তির লক্ষণ মনে করে তার মারফৎ কারো মা'র কাছে, কারো স্ত্রী বা কন্যার কাছে সংবাদ প্রেরণের জন্য কাড়াকাড়ি, প্রতি মুহূর্তে প্রিয়জনের চিঠি পাবার আগ্রহ, এত দুঃখের মধ্যেও টিনের বাক্স পিটিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি। জীবন যে অপরাজেয় প্রতি মুহূর্তে সে কথা অনুভব করবার চেষ্টা পরিচালক গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছেন মানবতাকে সবার উর্ধে।

ছবিটি বোষ্টন চলচ্চিত্র উৎসবে সমালোচকদের পুরস্কার লাভ করেছে।

### ফিভার

ভিক্টর গার্টলার পরিচালিত আর একটি ছবি 'ফিভার'। এই ছবিটি রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রধান। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের মধ্যে কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীর মধ্যে শিল্পপতিদের শঠতা, হাঙ্গেরীকে কাঁচামালের জোগানদার দেশে অর্থাৎ উপনিবেশে পরিণত করার জন্য জার্মান শিল্পপতিদের চক্রান্ত এবং সার্বজনীন স্বার্থ রক্ষিত না হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভারও যে মৃত্যু ঘটে, তা উপভোগ্য কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সাবো নামক এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার বক্সাইট খনি খুঁজে বার করেছিল। শিল্পপতি সেগালের সঙ্গে সে ব্যবসা সুরু করে, এবং সেগালের

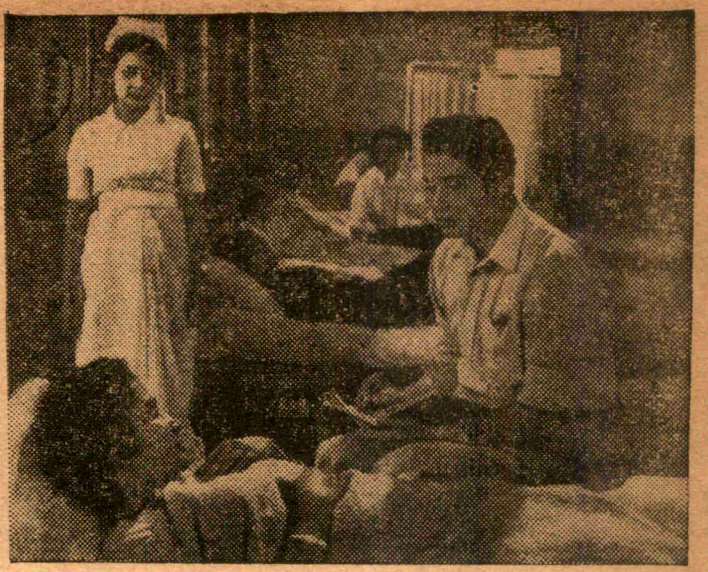

● অজয় কর পরিচালিত ও চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত "প্রভাতের রঙ" ছবির একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও মঞ্জু দে।

কন্যাকে বিয়েও করে। এখন সেও ধনী। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই জার্মান শিল্পপতিদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সুরু হলো। কারণ সাবো চেয়েছিল জার্মানদের কাঁচামাল সরবরাহ করবার পরিবর্তে তারা হাঙ্গেরীতে এল্যুমিনিয়ম কারখানা গড়ে তুলবে। এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবার পর চক্রান্ত করে সেগাল তার কন্যাকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে চলে যায়। শুশা সাবোর স্ত্রী হলেও শিল্পপতির কন্যা; সুতরাং সে সুইজারল্যাণ্ডে আবার বিয়ে করে। সাবো ব্যবসা থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে বসে। খনি অঞ্চলের শিক্ষিকা ফ্লোরাকে সে চেয়েছিল জীবন-সঙ্গিনীরূপে; কিন্তু তার মাথা থেকে তখনো খনির নেশা যায় নি। ফ্লোরা জানতো এর পরিণতি কি হতে পারে। তাই বলেছিল ---দুজনে সাধারণ গ্রামবাসী হিসাবে জীবন যাপন করার কথা; কারণ যতক্ষণ ধনতন্ত্রের অবসান না হবে, খনি ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তি না হবে ততক্ষণ এরূপ উচ্চাশা হঠকারিতার সামিল, সাধারণ কর্মীর প্রতিভার ফলভোগ করে ধনীরা, সমাজ তার কিছুই পায় না। সার্থক শিল্পপতি হতে হলে দেশপ্রেম এবং মানবতাকে সর্বাগ্রে বিসর্জন দিতে হয়। তার পরে একদিন জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতায় এলো, তার নাৎসীবাহিনী পোলাণ্ডের দিকে এগিয়ে এলো---হাঙ্গেরীর দিকে থাবা সে তো বাড়িয়েই রেখেছিল। সুতরাং সাবোর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষীর মৃত্যু হলো পথে।

ছোট একটা কাহিনীর মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক জগতের চরিত্র এবং উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের ভাগ্য ও জাতীয় চিন্তাকে ছবিটি প্রকাশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিজমের অর্থটিও এখানে স্পষ্ট। পরিচালক ভিক্টর গার্টলার ফ্যাসিস্ট-কবলিত পূর্ব ইউরোপের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন এবং যুগচেতনা ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছবিটির আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন।

### হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র ও দর্শক

হাঙ্গেরীর লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই এক কোটি মানুষের দেশে ১৯৬৩ সালে সিনেমার সংখ্যা ছিল ৪৪৬৫।

হাঙ্গেরীর শতকরা ৯৫ ভাগ গ্রামে নিজস্ব সিনেমা আছে। আধুনিক

চওড়া পর্দার সিনেমার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, গত বছর এরূপ সিনেমার সংখ্যা ছিল ৪৭৫। গত বছর ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টিকেট বিক্রয় হয়েছে। শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে সিনেমা দর্শকের গড়-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে হাঙ্গেরীয় ছবি দেখার জন্য, ৫ কোটি ১০ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে ধনতান্ত্রিক দেশের ছবি দেখার জন্য। গড়পড়তা হিসাব করলে শহরের প্রত্যেক মানুষ বছরে ১২ বার ছবি দেখেছে, গ্রামের লোক বছরে ৯ বার।

গত বছর হাঙ্গেরীতে মোট ১৬৭টি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। তার মধ্যে ২৩টি হাঙ্গেরীয়, ৩৪টি সোভিয়েট, ৫৪টি জনগণতন্ত্রী দেশের এবং ৫২টি ধনতান্ত্রিক দেশের ছবি।

হাঙ্গেরীতে নির্মিত ছবির মধ্যে এ যাবৎ ১২৩টি ছবি বিদেশী রাষ্ট্র কিনেছে এবং ১১টি টেলিভিশনের যোগ্য করা হয়েছে। হাঙ্গেরীর চলচ্চিত্র-ক্রেতাদের মধ্যে কিউবা প্রথম, এ যাবৎ ২৩টি ছবি কিনেছে। তারপরে কিনেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া।

হাঙ্গেরীতে নির্মিত ছবির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছে 'আলবা রেজিয়া'। এই ছবিটি ৪৪টি দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। তারপরে জনপ্রিয় হয়েছে 'লা-মিজারেবল' (ফরাসী), 'ওয়ার এণ্ড পীস' (আমেরিকা), ফরাসী ছবির জনপ্রিয়তা হাঙ্গেরীতে অধিক।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হাঙ্গেরীতে চলচ্চিত্র জাতীয়শিল্প; চলচ্চিত্র নিয়ে মুনাফা শিকার, ফাটকাবাজী, তারকা প্রথা ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক দেশের সর্বনাশা-ব্যবস্থা সেখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

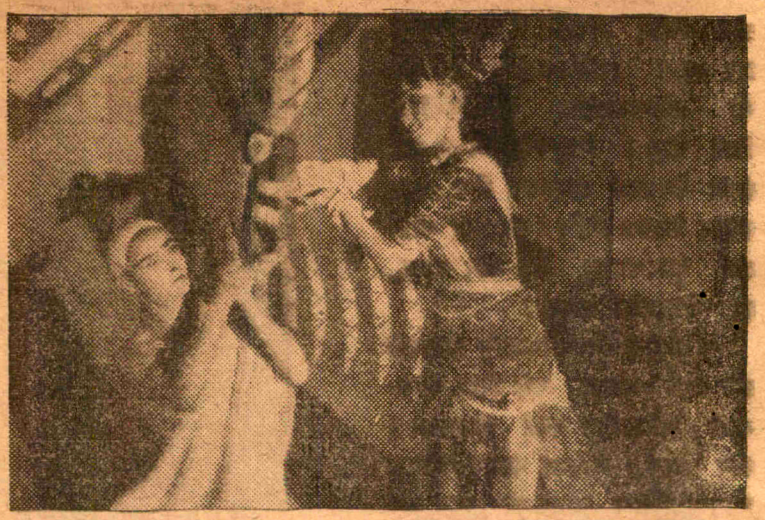

● রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে সত্য পাল ও ইরা সরকার।

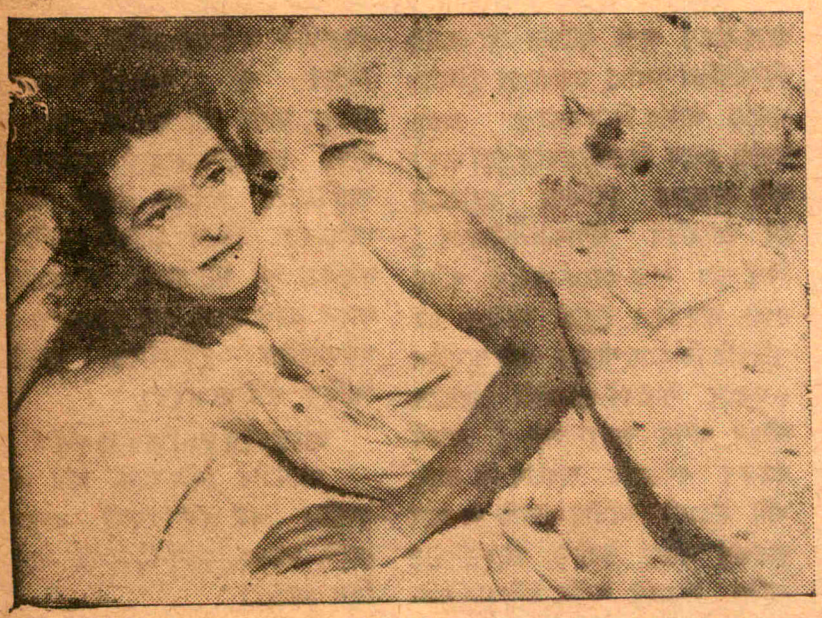

● 'অঙ্কার' বিজয়িনী প্যাট্রিসিয়া নীল। 'হুড' ছবিতে অভিনয়ের জন্য ১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন।

## ঢাকায় নতুন চিত্রগৃহ

ঢাকায় 'বলাকা' নামে একটি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই নিয়ে ঢাকায় চারটি চিত্রগৃহ তাপনিয়ন্ত্রিত হলো। ইংরেজী ও উর্দু নামের মধ্যে বাংলা 'বলাকা' তরুণ মহলে সন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

## নাটকের কথা

### রবীন্দ্রভারতী প্রতিষ্ঠা দিবস ও রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন

রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্র-ভারতীতে গত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ বিশেষ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয়ে, নৃত্যে

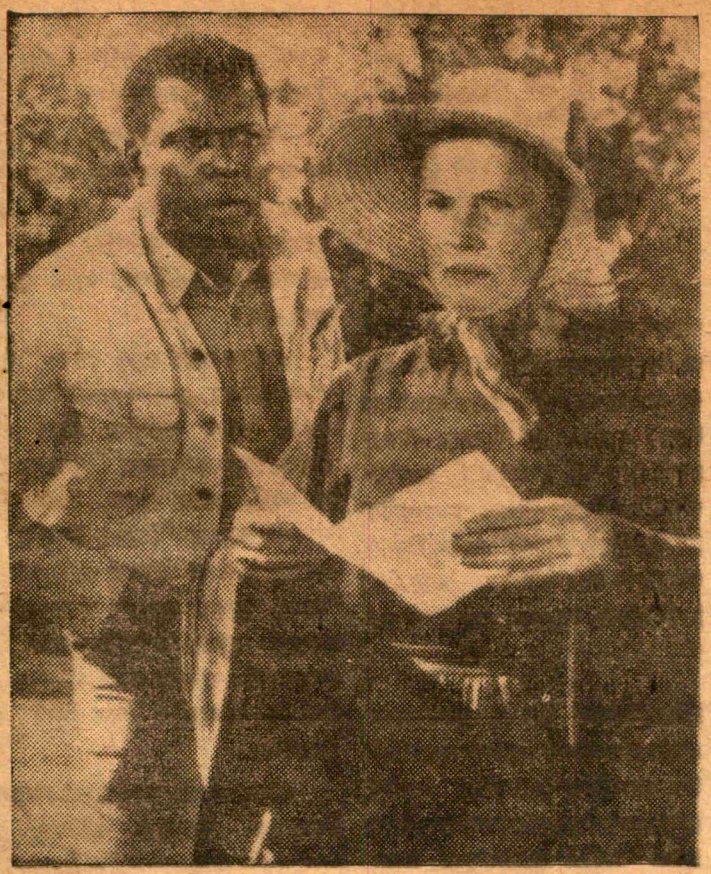

● শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে নিগ্রো অভিনেতা সিডনি পয়টারের অস্কার লাভ বিরাট চাঞ্চল্যকর সংবাদ। 'লিলিজ অফ দি ফিল্ড' ছবিতে লিলিয়া স্কালার সঙ্গে পয়টারকে দেখা যাচ্ছে।

গানে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ, কথাকলি নৃত্য, লোকনৃত্য ও রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" নাটকাভিনয় ছিল ২৫শে বৈশাখের মনোমুগ্ধকর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। 'কথাকলি' নৃত্যে অংশগ্রহণকারী তিনজন মহিলা-শিল্পী যেন এক বৃন্তের তিনটি ফুল। নৃত্যের ঐক্য, আঙ্গিকের সাযুজ্য এদের ব্যক্তি-বৈচিত্র্যকে শুধু আবৃত করে নি, বিস্ময়ঘন এক সামগ্রিক আনন্দে দর্শকদের করেছে পরম পরিতৃপ্ত। "সোনার বাংলা" কাহিনী ভিত্তিক লোকনৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণপ্রাচুর্য। দর্শক-মহলে নিঃসন্দেহে বিস্তৃত হয়েছে তার প্রভাব। "মুক্তির উপায়" নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় মেলে।

২৬শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। এদিনের নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে 'প্রকৃতি'র ভূমিকায় গীতা সরকার এবং 'মায়ের ভূমিকায় শর্মিষ্ঠা রায়গুপ্ত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

### পাখীর বাসা

আগামী ২৪শে মে নিউ এম্পায়ারে নট-নাট্যম প্রযোজিত 'পাখীর বাসা'র তৃতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

### নজরুল জন্মজয়ন্তী

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্ম জয়ন্তী কমিটীর উদ্যোগে বিদ্রোহী কবির পঁয়ষট্টিতম জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে মহাজাতি সদনে। আগামী ৩০শে ও ৩১শে মে দু'দিন-ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে নজরুল-সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি এবং সাহিত্য আলো-আলোচনা হবে। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিক-সাংবাদিকবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করবেন।

### উদীচীর রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ উদীচীর ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন। সমবেত কণ্ঠে 'হে চির নতুন' গানের পরে সমবেতভাবে গীটারে 'আনন্দলোক মঙ্গলালোকে' সুরটি বাজান হয়। তারপরে 'সূক্ষ্ম-বিচার' নাটিকা অভিনীত হয়। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ও বৈদিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা সহ ধর্মসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

## স্টুডিও খবর

অমরেশ বসুর উপন্যাস 'বাঘিনী'র চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা।

* 'লাল পাথর' ছবির কাজ সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। একজন নতুন শিল্পী রয়েছেন শ্রাবণী বসু।

* বনফুলের 'অর্জুন মণ্ডল' ও 'যুধিষ্ঠির কাকা' গল্প অবলম্বনে 'আরোহী' ছবির কাজ তপন সিংহের পরিচালনায় অগ্রসর হচ্ছে।

* তারাশঙ্করের 'না' ছবিকে হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন মোহন সাইগল। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন ধর্মিন্দর ও শর্মিলা ঠাকুর,

নিউ এম্পায়ারে নট-নাট্যমের
পাখীর বাসা
দায়ে পড়ে দারগ্রহ
নির্দেশনা : জগমোহন মজুমদার
২৪শে মে ১০টায় | টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।

# পাঠক মত

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে "সাপ্তাহিক বসুমতী"ও একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে—এ কথা বিশ্বাস করা যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে পত্রিকার আবেদনের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। যে কোনো পত্র-পত্রিকারই একটি নিজস্ব মত ও আদর্শ বর্তমান। আর সেই মত ও আদর্শকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে পত্র-পত্রিকার সর্ব শরীর। এই আদর্শ ও মত যখন জাতীয় জনমানসের চিন্তার অনুকূলে পরিচালিত হয়, তখনই সেই পত্রিকা জনমত দাবী করতে সমর্থ হয়। দলীয় কিংবা বিশেষ কোনো স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত পত্রিকার পরমায়ু কখনই স্থায়ী হতে পারে না। কারণ তার প্রকাশ বিশেষ কোনো প্রয়োজনের খাতিরে। তাই প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকার অপমৃত্যু ঘটে স্বাভাবিক কারণেই। যে দেশে পত্র-পত্রিকার জন্ম-মৃত্যু এত স্বাভাবিক, সে দেশে একটি সাপ্তাহিকের একটি বছর উত্তরণ একদিকে বিশেষ গৌরবের, অপর দিকে আশ্চর্যের সন্দেহ নেই। সংবাদপত্র জাতীয় জীবনের চিন্তামানসের দর্পণ। সকল প্রকারের রুগ্নতা, দীনতা ও অন্ধ রাজনীতি পরায়ণতাকে হাসিমুখে পরিহার করে "সাপ্তাহিক বসুমতী" মুক্তমনে জাতীয় কল্যাণব্রত ও দায়িত্ববোধকে পরিবেশন করার দিকে এগিয়ে চলেছে।

আজ থেকে এক বছর পূর্বে নবীন কলেবরে শুভমুহূর্তে জন্মলাভ করেছিল এই "সাপ্তাহিক বসুমতী"। জন্মের দিক দিয়ে সেদিনের সেই শিশু পত্রিকাটি অনেকেরই দৃষ্টির আড়ালে পড়েছিলো। জন্মের প্রথম লগ্নে আলোর দাক্ষিণ্য সে পায় নি। কিন্তু সেদিনের শিশু পত্রিকাটির শরীরের মধ্যেও অনুভূত হয়েছিলো তার অগাধ স্বপ্নের ফুলগুলি। জনমানসের চিন্তাকে সে জয় করবে। মানুষের মনের খোরাক সে দান করবে। জন্মলগ্নের সেই প্রতিশ্রুতি প্রমাণিত হয়ে গেছে, তার দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, তার নিয়মিত বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনার মাধ্যমে।

একদিকে রসসাহিত্য; অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিভীক সংবাদ পরিবেশন মানুষের চিন্তার জগতে নতুন আলোর প্রতিফলন এনেছে। বর্তমান জগৎ ও জীবন, শর্কে বিস্তৃত আলোচনা পত্রিকাটির আবেদনের দিক দিয়ে উপযুক্ত ঢেউ তুলেছে সন্দেহ নেই। জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারক-বাহক হিসেবে এগিয়ে আসে পত্রিকার সুষ্ঠু সম্পাদনা। দুর্যোগ-ময়ী ও কালিমালিপ্ত বাংলার মানসপটের দায়িত্ব "সাপ্তাহিক বসুমতী" গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করে বাংলা ও বাঙালীর গভীর বিশ্বাসের আশ্রয় হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রতিশ্রুতিবান তরুণ রচনাকারের রচনা এত সাদরে বাংলা দেশের অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। প্রবীণ ও প্রখ্যাত রচনাকারের পাশে প্রতি সংখ্যায় যে সকল নবীন রচনাকারের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, তা যেমন একদিক দিয়ে নতুন প্রতিভা বিকাশের পথে আশা ও গৌরবের কথা, অন্যদিকে সম্পাদকের সুষ্ঠু দায়িত্ব ও পত্রিকার পেছনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বুদ্ধিই যে বড় নয়, তারও বিশেষ প্রমাণ।

পরিশেষে "সাপ্তাহিক বসুমতী"র একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে আমার আবেদন, পত্রিকার ভারগাম্ভীর্য ও ছাত্রসমাজের বিশেষ উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি প্রতি সংখ্যায় একটি করে প্রবন্ধ সংযোজিত হয়, তা হলে পত্রিকা আরও ব্যাপক আরও সার্থক হবে বলে আমার বিশ্বাস। মুদ্রণের অপরিচ্ছন্নতা মাঝে মাঝে পত্রিকার সর্বাঙ্গসুন্দর শরীরকে এমনিভাবে বিকৃত করে তোলে, যা অসহনীয়। তাই এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে আমরা উপকৃত হবো।

মীরা সিংহ
ছাত্রী, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়,
পাটনা।

আমি "সাপ্তাহিক বসুমতী" পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। গ্রাহক হিসেবে আমি এ পত্রিকা সম্বন্ধে আমার মতামত জানাচ্ছি। আশা করি এর জন্যে বিরক্তি বোধ করবেন না।

আপনার পত্রিকার সম্পাদকীয়, আজকের মানুষ, বঙ্গদর্শন, আন্তর্জাতিক, ভারতদর্শন, খেলাধূলা, রঙ্গজগৎ প্রভৃতি বিভাগগুলি খুবই আকর্ষণীয়। এই বিভাগ-গুলি যদি আরও বিস্তৃত করেন তবে খুবই সুখী হব।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়, যেগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। যেমন, ২৭শে কার্তিক, ২৫শ সংখ্যায় মৈত্রেয়ী কর্তৃক লিখিত "আজকের যুগো-শ্লাভিয়া", ২৬শে ভাদ্র, ১৭শ সংখ্যায় লতিকা নাগের "বিদেশ বিভূঁয়ে", ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২৬শ সংখ্যায় রাণী মজুমদারের "প্রস্তর যুগের মানুষ" (প্রবন্ধ)—ইহা ছাড়াও কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা, সম্পূর্ণ ছোট গল্প ইত্যাদি রচনাগুলি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি।

আমার মতে, আপনাদের কতকগুলি বিভাগকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা এবং সম্ভব হলে একদম বাদ দিয়ে দেওয়াই উচিত এবং সেখানে রাজনৈতিক আলোচনা, সমালোচনা, সংবাদ, খেলাধূলা, রঙ্গজগৎ ইত্যাদি বিভাগগুলির সম্প্রসারণ করা উচিত।

বিশেষ করে পাঠক-পাঠিকা এবং সর্বসাধারণের মত প্রকাশের জন্য একটা নিয়মিত বিভাগ আপনাদের রাখা উচিত।

ধারাবাহিক উপন্যাস, কবিতা, রহস্য-গল্প প্রভৃতি বিভাগগুলি আরও সংক্ষিপ্ত করলে কিছুই যায় আসে না। প্রতি সংখ্যায় একটার বেশি কবিতা প্রকাশ না করাই সমীচীন। ধারাবাহিক উপন্যাস একটাই এবং অন্তত দুটি ছোট গল্প প্রকাশ করুন। গ্রন্থমেলা বিভাগটি নিয়মিত প্রকাশ না করে মাঝে মাঝে প্রকাশ করুন। রঙ্গমঞ্চ, নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী যথাসম্ভব আরো সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করলেই পাঠক পাঠিকা এবং সর্বসাধারণের মত প্রকাশের জন্য সহজেই আপনারা একটা সুযোগ দিতে পারেন।

নিকুঞ্জবিহারী দেবনাথ
অভয়নগর, আগরতলা (ত্রিপুরা)।

# খেলা ধুলা

## বাইটনে ও লীগে খণ্ডযুদ্ধ

গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, মোহনবাগান মাঠের ফ্ল্যাগ তখনও নামে নি। বাইটন সেমিফাই-ন্যালে মোহনবাগান---সেণ্ট্রাল রেলের খেলা, একে শনিবার আর ঠিক দ্বিতীয়ার্ধের অশুভ তেরো মিনিটে এসে খেলার অপমৃত্যু ঘটল। মাঠে সমবেত কুড়ি হাজার দর্শক সত্যই নীরব দর্শকের মত প্রত্যক্ষ করল এক অদৃষ্টপূর্ব অভিনব ঘটনা। সহস্র দর্শকের মুখর কণ্ঠ বোবা হয়ে গেল, অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব তাঁরা। দৃষ্টি তাঁদের নিবদ্ধ মাঠের মধ্যে, খেলার দিকে নয়---খেলোয়াড়দের খণ্ডযুদ্ধের দিকে।

বাইটন তার যাত্রা সুরু করেছে ১৮৯৫ সালে ; জয়-পরাজয় আর বৈচিত্র্যে ভরা সুদীর্ঘ সত্তর বছরের ইতিহাসে ছিল না কোন কলঙ্কের ছাপ। মোহনবাগানের হাতে পরাজিত ক্রোধান্ধ সেণ্ট্রাল রেল বিদায় বেলায় ক্রীড়াঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করল। সেণ্ট্রাল রেল নিজেদের মুখে চুনকালি ত লাগালই, অধিকন্তু অপবিত্র করল ময়দানের অঙ্গন। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য আম্পায়ারকে কতকাংশে দায়ী করা যায়, তাঁর দুর্বল পরিচালনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল সেণ্ট্রাল রেলের কয়েকজন খেলোয়াড়। মোহনবাগানের হাতে পরাজয় নিশ্চিত জেনে সেণ্ট্রাল রেলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা বিপজ্জনকভাবে ইচ্ছা-মত বেপরোয়া স্টিক চালনায় ব্যস্ত রইল, তবে মোহনবাগানের একজন খেলোয়াড়ও এই দোষে দোষী। মাঠে সেণ্ট্রাল রেলের খেলোয়াড়দের এই

শ্রীআমতাভ

জঘন্য অ-খেলোয়াড়ী ব্যবহার মনে হয় পূর্বপরিকল্পিত।

দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটে বালুর একটি পাশ থেকে এনামুর একটি সুন্দর গোল করলেন। কিভাবে জানি না বলটি নেটের ফাঁক দিয়ে গিয়ে বোর্ড এবং নেটের মাঝে পড়ল। তাই হল কাল, গোলরক্ষক কোয়ায়ুমের ধারা অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকজন সেণ্ট্রাল রেলের খেলোয়াড় আম্পায়ারকে হাত আর জামা টানতে টানতে গোলের কাছে এনে, তাঁর গোলের সিদ্ধান্তে আপত্তি জানাল, কিন্তু আম্পায়ারের মতের কোন পরিবর্তন হল না। এরপর খেলোয়াড়েরা মনের আনন্দে স্টিক চালাতে লাগল, অবশ্য বল লক্ষ্য করে নয়---অপরের মাথা লক্ষ্য করে। অবস্থা আয়ত্তে এল এবং দেখা গেল দুপক্ষের খেলোয়াড়রাই আঘাত পেয়েছে। এই সময় নাটকীয়ভাবে সেণ্ট্রাল রেলের খেলোয়াড়েরা মাঠ থেকে বিদায় নিল। হকি এ্যাসোসিয়েশন মোহনবাগানকে বিজয়ী সাব্যস্ত করল এবং অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পর ফাইন্যাল খেলায় সর্বপ্রথম মোহনবাগান-ইষ্ট-বেঙ্গলের সাক্ষাৎ হল। এটা আবার যুগ্ম-বিজয়ীর যুগ, তাই খেলার মীমাংসা না হতেই দুইদলই যুগ্ম-বিজয়ী বলে স্বীকৃত হল, টসে জয়লাভ করে মোহন-বাগান হল প্রথম ছয়মাসের ভাগীদার।

মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লীগের খেলাতেও ঘটল একই ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। লাঠা-লাঠি মারা-মারি আর নোংরামির মধ্যে খেলার শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটল। এই

ইষ্টবেঙ্গলের অধিনায়ক কুশলকুমার ও মোহনবাগানের অধিনায়ক আর শা বাইটন কাপ নিচ্ছেন।

● মোহনবাগান হকি দলের বালুকে আহত অবস্থায় মাঠের বাইরে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে খেলাধূলা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হবে। সময় থাকতে কর্তৃপক্ষকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, ক্রীড়াঙ্গনকে করতে হবে দোষমুক্ত।

## সমাচার দর্পণ

ইংলণ্ডে আগামী ইঙ্গ-অষ্ট্রেলিয়া এ্যাসেজ যুদ্ধ নিয়ে, জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। শিল্পিমনও যে এর প্রভাব-মুক্ত নয় তা বোঝা গিয়েছে লণ্ডনের এক চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্রকর রাসেলের অঙ্কিত একটি চিত্র থেকে। তুলির রেখায় তিনি ইংলণ্ডের দুরন্ত ফাস্ট বোলার ফারারী ফ্রেডীর এক সংহার-রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ঝড়ের বেগে ফ্রেডী ট্রুম্যান বল হাতে ছুটে আসছেন ভীষণরূপে, পিছনে তাঁর বিরাট এক বলের ঝড়। ডেলি টেলিগ্রাফ কাগজে প্রথম পাতাতেই প্রকাশিত এই সংবাদে রসিকতা করে বলা হয়েছে যে, টেস্ট খেলার প্রাক্কালে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের এই চিত্রপ্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়ে এই চিত্রটি দেখালে হয়ত একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

* * *

যথাসময়েই ময়দানের আসরে ফুটবলের আবির্ভাব হয়েছে। এই মরশুমে ফুটবলের যাত্রা শুভ হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সুরুতেই বাধা পড়েছে। বি এন রেল ও বাটার উদ্বোধনী খেলা---মাঠ প্রস্তুত না থাকার জন্য অনুষ্ঠিত হয় নি। ইতিপূর্বে কলকাতা ময়দানের ফুটবল খেলার সুরুতে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। এবার প্রথম ডিভিসনের খেলার আর তেমন জৌলুশ থাকবে না সুরুতে। কারণ প্রধান দলগুলির নামী ও দামী খেলোয়াড়েরা অলিম্পিক খেলার জন্য নিজ নিজ দলকে সাহায্য করতে পারবে না।

ভারতীয় অলিম্পিক দলের শিক্ষা-শিবিরের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। তেল আভিভে আগামী ২৬শে মে থেকে সুরু হচ্ছে তৃতীয় এশিয়ান ফুটবল কাপের খেলা। যোগদানকারী পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারতও অন্যতম। এখানকার খেলা শেষ করে ভারত তেহরাণে অলিম্পিকের খেলায় মিলিত হবে ইরাণের সঙ্গে ৭ই জুন, এর ফিরতি খেলা অনুষ্ঠিত হবে জুন মাসের শেষে কলকাতায়। ইরাণের সঙ্গে জয়লাভ করলে ভারত টোকিওর মূল প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করবে।

* * *

সফরের শেষ দিকের খেলাগুলি অসমাপ্ত রেখে কেনিয়া হকি দল রাতারাতি দেশের পথে পা বাড়াল। কেনিয়া দলের ম্যানেজার সমস্ত দোষ ভারতীয় হকি ফেডারেশনের ঘাড়েই চাপিয়েছেন। ভারত সফরে কেনিয়া দল খুবই ভাল ফলাফল প্রদর্শন করেছে। বিদায় বেলায় তাঁদের এই ধরণের আচরণ সত্যই খুব দৃষ্টিকটু লেগেছে।

টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে মালয় দল নিজেদের শক্তিপরীক্ষার জন্য ভারত সফরে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের দিকেই এই দল বেশি খেলবে। কেনিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলা ক্রীড়া-মোদীদের নিরাশ করেছে, আশা করা যায় মালয়ের সঙ্গে ভারত আশানুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্য-সম্রাট—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

# বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

— উপন্যাস —

দ্বিতীয় খণ্ড :—দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, সীতারাম। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী। [ সচিত্র ] মূল্য ৩৲ টাকা।

— সাহিত্য —

প্রথম খণ্ড :—কৃষ্ণচরিত্র, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম)। মূল্য ২৲ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড :—ধর্ম্মতত্ত্ব ( ১ম ভাগ অনুশীলন ), মুচিরাম গুড়, বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য় ), বিজ্ঞান রহস্য। মূল্য ২৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড :—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কমলাকান্ত, সাম্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, মানস, বিবিধ। মূল্য ২৲ টাকা।

---

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# মাইকেল গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—১৷৷০ টাকা।

---

সাহিত্য-জগতের গৌরবপ্রভা—হাস্যরসাবতার—নাট্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক—রস-সাহিত্যের স্রষ্টা—

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের

# দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা. ২। নীল-দর্পণ, ৩। জামাই বারিক, ৪। বিয়ে পাগলা বুড়ো, ৫। নবীন তপস্বিনী, ৬। কমলে কামিনী।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

২য় ভাগে—১। সধবার একাদশী, ২। যমালয়ে জীবন্ত মনুষ, ৩। পোড়ামহেশ্বর, ৪। দুঁড়ে গরুর তিন গোঠ, ৫। লীলাবতী, ৬। সুরধুনী কাব্য, ৭। দ্বাদশ কবিতা, পদ্য সংগ্রহ।

একত্রে মূল্য দুই টাকা।

---

সর্ব্বপুরাণ, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্ব উপনিষদ, সমস্ত ভক্তি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত

# স্তবকবচমালা

( পঞ্চম সংস্করণ )

যে ঋষির যে স্তবে যে দেবতা আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভক্তিগ্রন্থরাশি মথিত করিয়া সেই সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিবেদন অতি যত্নে সুনির্ব্বাচন—সঙ্কলন করিয়া স্তবকবচমালারূপে গ্রথিত। স্তব—ভক্তির উচ্ছ্বাস—দেবতার বন্দনাগীতি। আত্মনিবেদিত প্রাণে তন্ময় হইয়া স্তব পাঠে যে লাভ হয়—জাগতিক শক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। স্তবকবচমালায় প্রায় ৫০ দেব-দেবীর স্তবসন্নিবেশিত।

মূল্য পাঁচ টাকা।

---

পৃথিবীর অরুণ-সমাজের হৃদয়জয়ী

# সার ওয়াল্টার স্কটের

## গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

দি ব্রাইড অব ল্যামারমুর

লিজেণ্ডস অব মনট্রোজ

দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

---

# কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর

## গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই। এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বাঙ্গালার নব গীতিকবিতার এই প্রবর্ত্তক, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু ঋষি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ

মূল্য তিন টাকা

---

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কিশোর-সাহিত্যের অভিনব আকর্ষণ।

# হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

যাঁহার রচনাকুশল কাহিনীজাল পাঠ করিয়া বাংলার কিশোর-কিশোরীরা আজিকে, শিশু ও কৈশোরলোকে হইয়াছে লীন, আমরা বাংলার সেই প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থ রচনাজাল চয়ন করিয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থাবলীতে আছে—

১। যকের ধন, ২। প্রদীপ ও অন্ধকার, ৩। রহস্যের আলোছায়া, ৪। জুলিয়াসের কীর্তি, ৫। যেমা দেওগে তেমা পাওগে, ৬। ঘুড়োর বাহাদুরী, ৭। গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্কলন—চাবি ও খিল, একরাত্রি মাত্র, রোমাঞ্চ পাড়ী, হেলেখেলায় একদিন ও বন-পাহাড়। ৮। ভৌতিক কাহিনীর সঙ্কলন—এক রাত্রের ইতিহাস, করাল সারথি, বিজয়ার প্রণাম, কাপকাটা হাত, পরলোক, ভেলকির ছমকী, ভূতের রাজা, পরলোকী জামা। ৯। নতুন বাংলার গল্পের ঝাঁপি, ১০। জগন্নাথের গুপ্তকথা, ১১। হাসিটকের টাকায় পাহাড়।

মূল্য তিন টাকা

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

—যৌনশাস্ত্র ও যৌনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা—

।। জটিল প্রশ্নগুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ ।।

৩০ পাঁচটি খণ্ডে গভীর তত্ত্ব ও প্রচুর তথ্যের অভাবনীয় সমাবেশ ৩০

অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

# যৌন মনোদর্শন

( নরনারীর দেহীমনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ )

দ্বিতীয় খণ্ডে : বয়ঃসন্ধি—মূল্য ৩·০০। তৃতীয় খণ্ডে : কামাবেগের বিশ্লেষণ—মূল্য ৩·০০। চতুর্থ খণ্ডে : প্রেম ও পীড়া—মূল্য ৩·০০।

পঞ্চম খণ্ডে : কামাবেগের বিকৃত অভিব্যক্তির ব্যাপারসমূহ—মূল্য ৩·৫০।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম, সর্বাঙ্গীণ নিরপেক্ষ আলোচনা

# রবীন্দ্রনাথ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

১০ খানি রঙ্গীন আলেখ্য ও রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত

মূল্য ৭ টাকা ৫০ নঃ পঃ মাত্র

সাহিত্য-আলম্বরের মুক্তিমান বিকা
আষাঢ়-বৃষ-বাদিত্য-শিল্প পরবরের পা
একাধারে বিশ্বজয়-কীর্তি নাটক
সর্বজনমনোমোহন ঔপন্যাসিক—

রাজকৃষ্ণ রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—পরমেশ্বর ধন, মনস্ব
বজ্রমুষ্টি, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রাবলীর
চরিত্র, খোকাবাবু, হীরে নীল
মনজীর বদলে মুনিয়, পরলা-নম্বর
মূল্য ১৲ টাকা।

২য় ভাগে—হিরণ্ময়ী, হীর
লীলা, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, চাট
টোটকা, বজ্রমুষ্টি, বেলুনে যাত্রা
খিচি, গল্প, সাময়িক কবিতা। মূল্য
প্রেমলীলাহাব। মাত্র ১৲ টাকা।

বিখ্যাত কথা-শিল্পী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ— মূল্য ৩·০০ টাকা

স্বামী অভেদানন্দের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-রত্নাকর

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য-
পূজাপদ্ধতি সহিত )

শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অভিয়

( ১ম ভাগ )—৩৲ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নির্বাণ

এবং অন্য গল্পগুচ্ছ

বিপিনবিহারী মিত্রের

সোরাব ও রুস্তম

( অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদিত )

লোকনাথ ভট্টাচার্যের

আয়তি

বঙ্গাব্দত্যাগী রাজর্ষি কবি ভর্তৃহরির

শান্তিশতকম্

( তীব্র বৈরাগ্যের শান্তিজল )

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২